প্রবাসী, ৫৯শ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৬৬

সূচীপত্র

কার্ত্তিক—চৈত্র

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা


GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

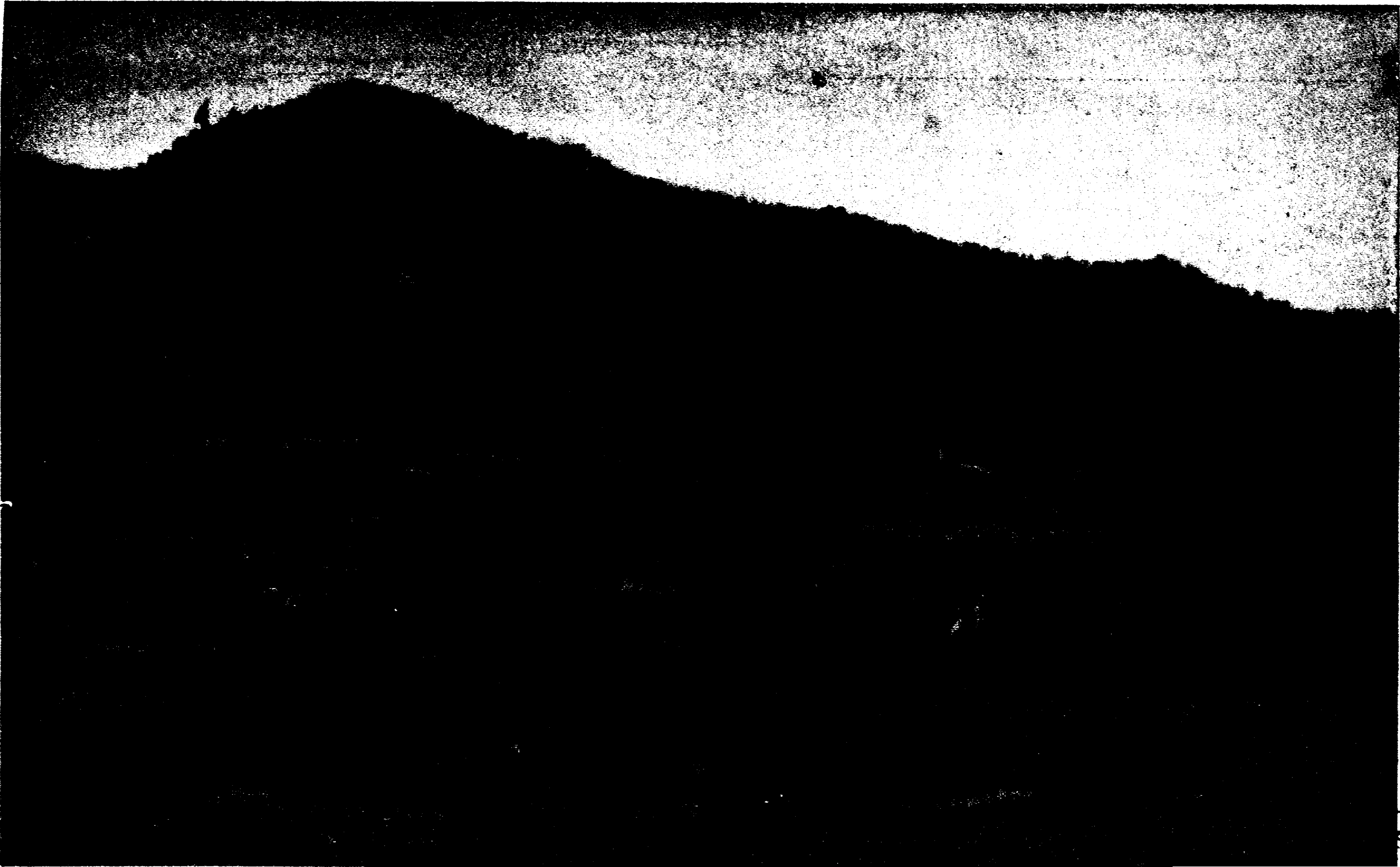
বিষয়-সূচী

বিবিধ প্রসঙ্গ

চিত্রসূচী

রঙীন চিত্র

একবর্ণ চিত্র



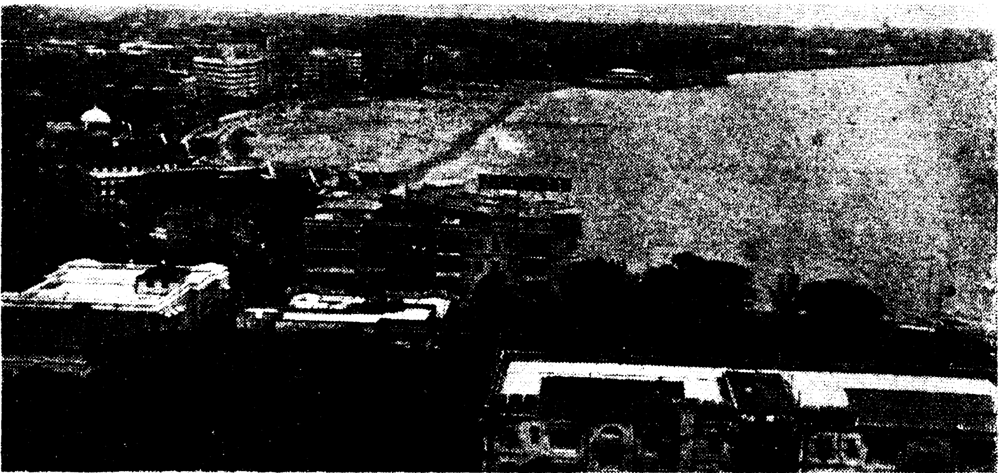
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

পাহাড়তলী
শ্রীপঞ্চানন রায়



কেনাবেচা

ফটোঃ পরিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়



মালাবার থেকে বোম্বে

ফটোঃ পরিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

:: ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৯শ ভাগ ২য় খণ্ড | কার্ত্তিক, ১৩৭৬ | ১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

নবজাগরণ কামনা

শারদীয়া বাঙালীর একান্ত নিজস্ব উৎসব। এই উৎসবে সকল দুর্গতি হইতে ত্রাণের এবং পরে শক্তির পূজায়, বাঙালী তাহার সমস্ত বৎসরের দুঃখ-কষ্ট-গ্লানি দূর করিবার চেষ্টা করে—অন্ততঃ পক্ষে তাহাই এই উৎসবের মূল প্রেরণা ছিল। অকালবোধনের পূর্ণ সংজ্ঞা, নিগূঢ় ব্যাখ্যা, নানাভাবে করা হইয়াছে। কিন্তু দুর্ব্বল ও ক্লান্ত দেহ মনে নূতন চেতনা এবং নবীন জাগৃতি ও শক্তির আবাহন বোধ হয় তার সব কয়টিতেই আছে, নচেৎ এই পূজা বাঙালীর কাছে এরূপে শতাব্দীর পর শতাব্দী নিত্য নূতন ও প্রাণময়ী হইয়া থাকিত না।

এখন বাঙালীর জীবনে একটি নূতন বিপর্য্যয়ের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। ইহার প্রধান লক্ষণ হইল, ব্যর্থতার স্বীকৃতি এবং সেইজন্য উদ্যমহীন ও শক্তিহীনের আক্রোশ ও আস্ফালন। এই আক্রোশের ও আস্ফালনের বহির্লক্ষণ—নষ্ট করার ও ভাঙিবার প্রবল স্পৃহা। "আমার যখন কিছুই থাকিবে না তখন অন্যের থাকে কেন? আমি যখন কিছুই গড়িতে পারিব না তখন অন্যের গঠনের কাজ থাকিবে কেন?" এইরূপ যুক্তি এবং এই স্পৃহার পরিণাম বিনাশ ও ধ্বংস, কেননা শক্তিমান যাহারা তাহারা এইরূপ স্পৃহাকে প্রশ্রয় কখনই দিবে না, উপরন্তু যদি শক্তির সহিত বুদ্ধির যোগ থাকে তবে ঐ ব্যর্থতায় অভিশপ্ত লোকসমষ্টিকে আরও বঞ্চিত ও সর্ব্বস্বহারা করিয়া ফেলিতে চেষ্টিত হইবে। আজ বাঙালীর জীবনে এই আশঙ্কা প্রবল ভাবে দেখা দিয়াছে।

অবশ্য একথা আমরা বহুবার পূর্ব্বেও লিখিয়াছি। কিন্তু সম্প্রতি দেখিতেছি একদল পণ্ডিত লোক দেশের এই নিম্নগতির নানা অপরূপ ব্যাখ্যা দিতেছেন এবং কেহ কেহ আরও আশ্চর্য্য প্রতিকারের উপায়ও নির্দ্দেশ করিতেছেন। এই সকল ব্যাখ্যার মূলে ইতিহাসের অভিনব বিকৃতি ও নির্দ্দেশের মূলে মানবত্বের সকল নীতির অপলাপ আমরা দেখিতে পাই।

পণ্ডিতজনের কূটতর্কের ধারা যাহাই হউক, দেশের ও দশের অবস্থার অবনতি যে চলিয়াছে তাহা কি অস্বীকার করা যায়? "ইহাই কালের গতি, ইহাই যুগধর্ম্ম"—এই কথা স্বীকার করিয়া কপাল চাপড়াইলে বা নিজের বুদ্ধিবিচারের ক্ষমতা বিসর্জ্জন দিয়া পরের ইঙ্গিতে ধ্বংসলীলায় মাতিলে কি কোনও উন্নতি, কোনও প্রতিকার সম্ভব? আজ এই প্রশ্ন প্রত্যেকের নিজ নিজকে করা প্রয়োজন হইয়াছে মনে হয়। কপট তার্কিক বা বিকারগ্রস্ত ঐতিহাসিকের হাতে নিজের ভবিষ্যৎ ছাড়িয়া দিলে ত ব্যর্থতা ও শক্তিহীনতার পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং ইহা কি ঐতিহাসিক সত্য নহে যে, ঐ স্বীকৃতির পরিণাম দাসত্ব ও বিনাশ?

এই অল্পদিন পূর্ব্বেও এই মহানগরীতে ধ্বংসলীলার তাণ্ডব চলিতেছিল। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, যে ভাবে আরম্ভ হইয়াছিল সেই ভাবে উহা বাড়িতে পায় নাই। উহা কেন হইয়াছিল, কাহার দোষে ধ্বংসের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, এই লইয়া তর্ক চলিতেছে। তর্কের অবতারণা যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহারা একথা কোথায়ও বলেন নাই যে, তাঁহারা এই রাষ্ট্রনৈতিক জুয়ার চালে যাহাদের দাবাবড়ে হিসাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাদের এবং সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ও নির্লিপ্ত নিরীহ জনসাধারণের যে ক্ষতি হইল সে বিষয়ে তাঁহারা কখনও চিন্তামাত্র করিয়াছিলেন কিনা, জুয়ার চাল চালিবার পূর্ব্বে। বরং যুক্তিতর্কের ধরনে এ কথাই মনে হয়, তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে এইরূপই ঘটিবে।

তাঁহাদের মনোভাবের বিশ্লেষণে কাজ নাই এখন, প্রয়োজন শুধু দেশের লোকের চৈতন্যোদয়ের। শারদীয়ায় আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা কাম্য চৈতন্যের উদয়, যাহাতে বাঙালী পূর্ব্বেকার মত নিজ বিচারবুদ্ধি বিবেচনায় নিজের ও নিজ সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া চলিতে পারে। আমাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে এক অংশ শুধু যে নিজের দাসত্ববরণ করিতেছে তাহা নহে, তাহাদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের ভবিষ্যৎ তিমিরাচ্ছন্ন করিতেছে।

কর্ত্তৃপক্ষের অশেষ দোষ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু "নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ" বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে, একথা যেন এই শারদীয়ার শুভক্ষণে আমাদের বোধগম্য হয়।

বিধানসভায় তাণ্ডব-নৃত্য

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় গত ২১শে সেপ্টেম্বর যে কুরুক্ষেত্র হইয়া গেল, তাহাতে লজ্জায় সকলেরই মাথা হেঁট হইবে। এতদিন অপ্রাপ্তবয়স্করা পরীক্ষার হলে চেয়ার-বেঞ্চ-ডেস্ক-টেবিল ভাঙ্গিয়াছে, কালির দোয়াত ছুঁড়িয়াছে, খাতাপত্র ছিঁড়িয়াছে। ছাত্রদের ঐ আচরণে আমরা বহুবার নিন্দা করিয়াছি। কিন্তু আজ প্রাপ্তবয়স্কদের এই আচরণ নিন্দারও অযোগ্য। অথচ ইঁহারাই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অভিভাবক, জন-প্রতিনিধি। রাজ্যের আইনকানুন রচনার মহান দায়িত্বও ইঁহাদের উপর। কেবল দায়িত্ব নয়, উহা পালনের জন্য এই সকল পশ্চিমবঙ্গ বিধাতাদের প্রত্যেককে জনসাধারণের অর্থ হইতে মোটা হারে মাসোহারা, ভাতা প্রভৃতি দিতে হয়। সদ্ব্যবহারের কথা আর তুলিব না, বিধানসভায় জনপ্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনের যে রেকর্ড ইঁহারা স্থাপন করিলেন তাহার তুলনা আর কোথাও নাই।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক বাদ-বিতণ্ডার সুযোগ যথেষ্ট থাকে, গুরুতর বিষয় লইয়া বিতর্কও উপস্থিত হইতে পারে। রাজনীতিতে বাদ-প্রতিবাদ হওয়াও স্বাভাবিক, এক পক্ষ অপর পক্ষের মধ্যে মতান্তর এবং মনান্তর পর্য্যন্ত ঘটিলে আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু আপত্তি সেইখানেই উঠিবে, যেখানে মারামারি, গালাগালি, জুতা এবং লৌহদণ্ড ছোড়ার মত নোংরামি হয়। এইরূপ বিকৃত-মস্তিষ্ক লইয়া রাজ্য করা চলে না! ভদ্রতা ও শালীনতার যেটুকু শিক্ষা নাগরিকমাত্রেরই আছে, তাহার বিন্দুমাত্র নিদর্শনও এই সব রাজনীতি ধুরন্ধরদের আচরণে দেখা যায় নাই। অথচ ইঁহারাই পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্য-বিধাতা। ইঁহারাই অপরকে রীতি-নীতির বড় বড় উপদেশ দিয়া থাকেন। আজ যে আচরণের নিদর্শন তাঁহারা রাখিয়া গেলেন, তাহার কলঙ্ক বুঝি কোন দিনই ধৌত হইবে না। সবচেয়ে আশ্চর্য্য, পার্লামেণ্টারী রীতিনীতির মর্য্যাদার মুখে জুতা মারিতেও ইঁহাদের লজ্জা হয় নাই। ইঁহারাই আবার পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নৈতিক বিপর্য্যয় দূর করিবেন বলিয়া আস্ফালন করেন।

এদেশে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইলে, জনসাধারণের বিন্দুমাত্র লাভ হইবে না, ইহা সকলেরই জানিয়া রাখা উচিত। পূর্ব্ব-পাকিস্থানের বিধানসভার সদস্যগণ যে দণ্ডতাণ্ডব সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং যাহার ফলে হতভাগ্য ডেপুটি স্পীকারের প্রাণ পর্য্যন্ত যায়, তাহার পরিণাম কি হইয়াছে তাহাও কাহারও অজ্ঞাত নয়। আমরা ধিক্কার তাহাদের দি, আজ যে সেই ধিক্কারের কালিমা সহস্র গুণ হইয়া নিজেদেরই মুখে পড়িতেছে! সবচেয়ে দুঃখের কথা, ছেলেদের সম্মুখে যে আদর্শ তাঁহারা রাখিয়া গেলেন, তাহার বিষময় প্রতিক্রিয়া আগামীকালের সমাজ-জীবনকে পর্য্যন্ত কলুষিত করিবে। প্রার্থনা করি, ভগবান তাঁহাদের সুবুদ্ধি দিন।

রাজনীতির চক্রান্তে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রদল

যুগধর্ম্মে রাজনীতিই আজ সর্ব্বত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। স্বাধীনতালাভের জন্য একসময় এই রাজনীতির প্রয়োজন ছিল, তখন ইহা কাহারও অশ্রদ্ধেয় হয় নাই। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় দলীয় রাজনীতির প্রয়োজন হয়ত অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া সমাজ-জীবনের সকলক্ষেত্রে ইহার প্রয়োজনীয়তা কোথায়? একে ত আমাদের দেশে এই দলীয় রাজনীতি রাষ্ট্র-পরিচালনায় সুস্থ ঐতিহ্য গড়িয়া তুলিতে পারে নাই, তার পর যদি সেই অপরিণত এবং অপরিণামদর্শী দলীয় রাজনীতি শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং পৌর-ব্যবস্থায় সকল ক্ষেত্র অধিকার করিয়া বসে, তাহা হইলে আদর্শ-বিভ্রাট ত ঘটিবেই।

দেখিতেছি, স্কুল-বোর্ডের সদস্য নির্ব্বাচন ব্যাপারেও সেই দলীয় চক্রান্ত প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। এখন কথা হইল, স্কুল-বোর্ডের উপর ন্যস্ত কাজের সহিত দলীয় রাজনীতির কি সম্পর্ক থাকিতে পারে? জেলার প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা তত্ত্বাবধান করার কাজ স্কুল-বোর্ডের। কংগ্রেস, কমুনিষ্ট, প্রজা-সমাজতন্ত্রী প্রভৃতি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্ম্মকাণ্ডের সহিত প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার কোন সম্পর্ক নাই। শিক্ষা বিষয়ে যাঁহারা অভিজ্ঞ এবং প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারে সত্যসত্যই উৎসাহী তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক ব্যাজ ধারণের কোন আবশ্যকতাই নাই।

অথচ মজা এই, দলীয় রাজনীতির দ্বন্দ্ব যত বাড়িতেছে, জনকল্যাণমূলক লোকায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলি ততই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেছে এবং স্বাভাবিক কাজকর্ম্মে দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা বাড়িয়াই চলিয়াছে। আজ কর্পোরেশনের সভা আর ময়দানের মিটিং-এ পার্থক্য নাই—না উদ্দেশ্যে, না আচরণে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই রাজনীতির অভিযান আরও গভীর অকল্যাণ ডাকিয়া আনিতেছে। শিক্ষকের সঙ্গে আজ ছাত্ররাও আসিয়া ভিড়িয়াছে। অবশ্য তাহারা আসিতেছে না, তাহাদের দলে টানা হইতেছে আপন আপন প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য। অপরিণতবুদ্ধি বালক, না বুঝিয়া উত্তেজনার বশে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে—কিন্তু এ সর্ব্বনাশ যাঁহারা করিতেছেন, তাঁহারা কি একবারও ভাবিতেছেন না, দেশের কত বড় অকল্যাণকে ডাকিয়া আনিতেছেন!

বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক সঙ্কল্প এবং প্রয়াস রোধ করা যাইবে না জানি। কিন্তু দলীয় রাজনীতির ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ এবং আচরণ সংযত করা অসম্ভব নয়। ভবিষ্যতে আর কিছু না হউক, অন্ততপক্ষে শিক্ষা ও জনকল্যাণের অন্যান্য উদ্যোগ যাহাতে দলীয় রাজনীতির কুক্ষিগত না হয় তাহার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে চেষ্টা করা উচিত।

পশ্চিম বাংলার খাদ্য-সমস্যা

পশ্চিম বাংলায় খাদ্যশস্যের অভাব আজ নূতন নয়, ভারত বিভাগের পর হইতেই এই সমস্যা লাগিয়া আছে। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে

পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের আগমন, ভারত বিভাগের ফলে অবিভক্ত বাংলার অধিকাংশ কৃষিজমিই পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রভৃতি কারণে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-উৎপাদনে ঘাটতি প্রায় চিরস্থায়ী ঘাটতিতে পরিণত হইয়াছে। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া খাদ্য-ঘাটতি প্রকট হইয়া উঠিয়াছে এবং এই সমস্যা সমাধানের কোনও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যশস্যের ঘাটতির ফলে এই প্রদেশে দুর্ভিক্ষ প্রায় স্বাভাবিক ঘটনার পর্য্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্প্রতি বাংলা দেশে, বিশেষতঃ কলিকাতায়, যে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ আন্দোলন চলিতেছে তাহা সর্ব্বজনবিদিত।

বাংলা দেশে চাউলের মূল্য অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, সাধারণ চাউলের মূল্য সাধারণতঃ ৩০,৩৫৲ টাকাতেই থাকে। বাংলা দেশে গরীব লোকদের মধ্যে অনেকেই চাউলের অতিরিক্ত মূল্যের জন্য ছোলার ছাতু খাওয়া আরম্ভ করিয়াছে। বর্ত্তমানে চাউলের সংজ্ঞা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে বেসরকারী দোকান এবং সরকারী দোকানসমূহ হইতে চাউল বলিয়া যে জিনিস সরবরাহ করা হয় তাহা পূর্ব্বেকার খাঁটি চাউল নহে, ইহা কাঁকড় মিশ্রিত চাউল। আমাদের মিশ্র অর্থনীতিতে চাউলেরও খাঁটিরূপ গিয়া মিশ্ররূপ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। চাউলের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি এবং কাঁকর-মিশ্রণ ইহার অভাব প্রতীয়মান করে। এই প্রদেশে খাদ্যমন্ত্রীর হিসাব অনুসারে ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ১৪ লক্ষ টন। কিন্তু সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের আইনপরিষদের কতিপয় কংগ্রেসী সভ্য পশ্চিম-বঙ্গ সফর নিয়া রিপোর্ট দিয়াছেন যে, এই প্রদেশে চাউল নাকি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে এবং ঘাটতি হওয়ার কারণ কিছু নাই। কিন্তু তাঁহাদের এই সাফাই গাওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজনীয় পরিমাণে চাউল পাওয়া যাইতেছে না এবং যাহাও পাওয়া যাইতেছে তাহার মূল্য এত অত্যধিক যে, তাহা সাধারণলোকের ক্রয়শক্তির নাগালের বাইরে।

কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রী পাতিলও বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে এবং সুতরাং বাংলা দেশেও খাদ্যের প্রকৃত কোনও অভাব নাই; যে অভাব দেখা যায় তাহা সাধারণতঃ বিতরণ-বৈষম্যের দরুণ। ভারতের এক প্রদেশ হইতে আর এক প্রদেশে প্রয়োজন অনুসারে খাদ্য-শস্যের আমদানী-রপ্তানী করা হয় না এবং তাহার ফলে কোথাও খাদ্যশস্যের প্রাচুর্য্য এবং কোথাও ঘাটতি দেখা যায়। অবশ্য সর্ব্ব-ভারতীয় প্রয়োজন অনেক বেশী, তাহাতে ঘাটতি দেখা যায় এবং সেই ঘাটতি পূরণ করা হয় বিদেশ হইতে আমদানী দ্বারা। বিশেষজ্ঞদের অভিমতে ভারতে যে দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে ঠিক সেই পরিমাণে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে না।

১৯৫২ সনে যদি জনসংখ্যার সূচী ধরা হয় একশত, তাহা হইলে দেখা যায় যে, ১৯৫৯ সনে এই সূচীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১০৮-এ, ১৯৫২ সনে ভারতে লোকসংখ্যা ছিল ৩৬ কোটি, আর বর্ত্তমানে হইয়াছে ৪০ কোটি। ১৯৫২ সনে কর্ষিত জমির পরিমাণ-সূচী ছিল ১০০, আর ১৯৫৯ সনে ইহা বৃদ্ধি পাইয়াছে মাত্র ১০৮-এ। ১৯৫২ সনের তুলনায় খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদনের পরিমাণের সূচী ১৯৫৯ সনে মাত্র ২৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমানে মোট খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ ৬ হইতে ৭ কোটি টনের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট আছে; ১৯৬৬ সনের মধ্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদনের পরিমাণ অন্ততঃ ১১ কোটি টন হওয়া প্রয়োজন, নচেৎ ঘাটতির পরিমাণ আরও অধিক হইবে।

বাংলা দেশে ১৯৫২ সনের পর হইতেই খাদ্যশস্যের উৎপাদন মাত্র সাত শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে; কিন্তু এই সময়ে জনসংখ্যার বৃদ্ধির পরিমাণ ১৫ হইতে ২০ শতাংশ হইয়াছে, সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ চিরন্তনভাবেই একটি ঘাটতি-প্রদেশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং চাউল সরবরাহের জন্য পশ্চিমবঙ্গকে অন্যান্য প্রদেশ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। বাংলা দেশের খাদ্য-ঘাটতির প্রধান কারণ প্রয়োজনের তুলনায় অল্প উৎপাদন এবং যাহা উৎপাদন হয় তাহার বিতরণে অনাচার, অসাধুতা ও অকর্ম্মণ্যতা দেখা যায়। বাংলা দেশের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় তাঁহার খাদ্যমন্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া বলিয়াছেন যে, বাংলা দেশের খাদ্য সঙ্কুলান করা দুরূহ ব্যাপার এবং কোনও খাদ্যমন্ত্রীর পক্ষেই তাহা সহজসাধ্য হইবে না। কিন্তু ডাঃ রায়ের প্রশংসাতে বাংলা দেশের খাদ্য সরবরাহ কিংবা উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে না। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য, এবং ডাঃ রায় নিজেও স্বীকার করিয়াছেন যে, পশ্চিম বাংলার খাদ্যমন্ত্রী নিজের দায়িত্বে কিছু করেন নাই, তিনি যাহা কিছু করিয়াছেন তাহা সমগ্র ক্যাবিনেটের সম্মতিতে, অর্থাৎ ডাঃ রায়ের দায়িত্বে।

সহজ কথায় পশ্চিম বাংলার খাদ্য-সমস্যার জন্য শুধু খাদ্যমন্ত্রীই দায়ী নহেন, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় এবং সমগ্র ক্যাবিনেটই এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী। গত বার বৎসর ধরিয়া তাঁহারা এই প্রদেশের খাদ্য-সমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই, ইহা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। মুখ্যমন্ত্রী জোর গলায় বলিয়াছেন, চাউলের মূল্য কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু বাজারে চাউলের মূল্য সেরূপ হ্রাস পায় নাই, বরং কোথায়ও বাড়িয়া গিয়াছে। প্রদেশকে খাদ্যশস্যে স্বাবলম্বী করা কর্ত্তৃপক্ষের প্রধান দায়িত্ব, এবং সেই দায়িত্বে ইঁহারা ইঁহাদের দীর্ঘসূত্রিতার পরিচয় দিয়াছেন। প্রথমতঃ, পশ্চিমবঙ্গের যে সমস্ত আবাদী জমি পতিত পড়িয়া আছে সেই সমস্ত জমিকে চাষের আওতায় আনিবার জন্য কোন প্রচেষ্টাই করা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ বড় বড় জোতদার ও আড়তদাররা যে চাউল মজুত করিয়া রাখিয়াছে এবং বাজারে ছাড়িতেছে না সে সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ কোনও কঠোর পন্থা অবলম্বন করেন নাই। চাউলের কলের উপর লেভী-প্রথা আরোপ করা উচিত ছিল, তাহাও করা হয় নাই। মূল্য নির্দ্ধারণ ও তাহার অপসারণ রহস্য-জনক বলিয়া মনে হয়। যখন চাউলের মূল্য স্বাভাবিক ভাবেই পড়তির দিকে ছিল, তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার মূল্য নির্দ্ধারণ দ্বারা ব্যবসায়ীগণকে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টির বিষয়ে সহায়তা

করিয়াছেন। তাঁহাদের জানা উচিত ছিল, চাউলের উৎপাদন এবং সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ না করিয়া মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতে গেলে কালো-বাজারের সমৃদ্ধি এবং কৃত্রিম অভাব ঘটিতে বাধ্য।

গত বারো বৎসরে পশ্চিম বাংলার মন্ত্রীপরিষদ খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহাকে কার্যকরী করিবার জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন সে সম্বন্ধে নিরপেক্ষ অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন। শুধু খাদ্যবিভাগ নহে, খাদ্য এবং মৎস্যবিভাগ সম্বন্ধে তদন্ত অতি অবশ্য হওয়া প্রয়োজন, কারণ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই দুইটি বিভাগই বহু প্রকার কলঙ্কে কলঙ্কিত। শুধু আইনপরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারাই ইহাদের কার্য্যতৎপরতার অভাব ঢাকা দেওয়া যাইবে না। সুন্দরবন এলাকা বাংলা দেশের শস্যাগার বলিয়াই অভিহিত হয়, কিন্তু সেই সুন্দরবন এলাকা আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া অনাবৃষ্টির ফলে প্রায় মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে, অধিকাংশ চাষী এখন ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। এ বৎসর অবশ্য অতিবৃষ্টির ফলে আবাদীশস্য নষ্ট হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কাঁথি মহকুমার জুনপুট এলাকার সমুদ্রতটে হাজার হাজার বিঘা আবাদযোগ্য জমি পতিত পড়িয়া আছে। এই জমিগুলিকে রাষ্ট্র নিজের অধীনে রাখিয়া ভাগচাষী দ্বারা চাষ করাইতে পারে।

জমিদারী প্রথা লোপ করিবার ফলে যে সকল জমি রাষ্ট্রের করায়ত্ত হইয়াছে সেগুলিকে খাসমহালের অধীনে রাখিয়া ভাগ-চাষের ব্যবস্থায় চাষ করাইলে প্রাদেশিক সরকারের উৎপাদনের উপরও বিরাট কর্তৃত্ব আসিয়া যাইবে এবং তাহার ফলে সরবরাহ ও বিতরণ ব্যবস্থায় সুবিধা হইবে।

খাদ্য-সমস্যা ও তাহার সমাধান

কেন্দ্রের খাদ্যমন্ত্রী শ্রী এস. কে. পাতিল বলিয়াছেন, "খাদ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা সম্পর্কে ভীতিবোধই খাদ্য-সঙ্কটের কারণ।"

সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও, এই মন্তব্যকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কারণ ইহা ত অস্বীকার করা যায় না, প্রতি বৎসরই ঠিক যে সময়ে যতটুকু বৃষ্টি দরকার, সে সময়ে ঠিক ততটুকুই বৃষ্টি হইবে। প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পূর্ণ অনুকূল থাকিবে, ইহা আশা করাই অবাস্তব। পৃথিবীর কোথাও তাহা ঘটে না, ঘটিতে পারেও না। বহু বৎসর ধরিয়া আবহাওয়ার গতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, অস্বাভাবিক দু'একটি বৎসর ছাড়া প্রায় প্রতি বৎসরই দেশের এক অঞ্চলে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ঘটিলে, অন্য অঞ্চলে প্রকৃতি শান্ত থাকে। কাজেই এক অঞ্চলে ফলন হ্রাস পাইলে অন্য অঞ্চলের ফসল বৃদ্ধি দ্বারা সে ক্ষতি উসুল হইয়া যায়। সুতরাং সরবরাহ ব্যবস্থায় ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করিতে পারিলে, কোথাও ফলন হ্রাস হইলেও খাদ্য দুষ্প্রাপ্য হইবার কথা নয়। উদ্বৃত্ত অঞ্চলের প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য ঘাটতি-অঞ্চলে পাঠাইয়া ন্যায্য দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিলেই এ সমস্যার সমাধান অনায়াসেই হইতে পারে। সুতরাং শ্রী পাতিল সত্যই বলিয়াছেন যে, গত কয়েক বৎসর যাবৎ নিয়মিত খাদ্য-সঙ্কট মানুষের দ্বারাই সৃষ্ট। দেশের প্রত্যেকটি লোক সৎভাবে চলিলে ইহা হইত না। কিন্তু বিপদ হইয়াছে ঐখানেই—মানুষ আজ ভিন্ন পথে চলিয়াছে। এই বণ্টন ও সরবরাহ-ব্যবস্থার ত্রুটির জন্যই মানুষ আজ ভিন্নরূপ ভাবিতে সুরু করিয়াছে। উৎপন্ন ফসল যে ন্যায্য দরে বিক্রয় হইবে, ইহাতে কাহারও আস্থা নাই। ভবিষ্যতে দর চড়িবার আশঙ্কায় সম্পন্ন চাষী যথাসম্ভব বেশী ফসল ধরিয়া রাখে, ধনী গৃহস্থ স্বাভাবিক ক্রয়ের তুলনায় বেশী খাদ্য কিনিয়া ভাঁড়ারে মজুত করে জোতদার-আড়তদার-পাইকার এবং খুচরা ব্যবসায়ীরাও ধরিয়া লয় যে, রাষ্ট্রের পক্ষে ন্যায্য দরে ন্যূনতম চাহিদা পূরণের উপযোগী ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না, সেজন্য বৎসরের শেষ দিকে দর চড়িবেই। সুতরাং তাহারাও হয় নিজের গোলায়, না হয় দাদন দিয়া অপরের মারফতে খাদ্যশস্য প্রকাশ্য বাজার হইতে সরাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে। ফলে, এই সব মিলিত চেষ্টায় বাজারে আর মাল পাওয়া যায় না। সরকারী ভাবগতিক দেখিয়াও তাহাদের আর আস্থা নাই। নতুবা প্রতি বৎসরই আষাঢ়-শ্রাবণ মাস হইতে খাদ্যশস্যের দর চড়াইবার ব্যাপারে তাঁহারা নিষ্ক্রিয় ও অসহায় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিবেন কেন? প্রধানতঃ আস্থার অভাবেই অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বসাধারণের মন হইতে এই সব ভয় দূর করিতে পারিলে উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীপাতিল আর একটি মন্তব্য যাহা করিয়াছেন, সে বিষয়ে আমরা একমত নই। তিনি বলিয়াছেন, দেশে সব রকম খাদ্যই পর্য্যাপ্ত অবস্থায় আছে। ইহা তাঁহার কল্পনামাত্র। দুধ, মাংস, মাছ, তৈল, ঘৃত, টাটকা ফল প্রভৃতি রোগ-প্রতিরোধক ও পুষ্টিকর খাদ্যের ঘাটতি যে অত্যন্ত বেশী, সে বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। এবং চাউল, গম, ডাইল প্রভৃতি মূল খাদ্যশস্যগুলিও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া মনে করার কারণ নাই। খাদ্য-ঘাটতির লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাজারদর চড়িয়া যায়, ফলে অধিকাংশ লোক খোরাকীতে শস্যের পরিমাণ হ্রাস করিতে বাধ্য হয়। সেজন্য মোট বিক্রয়ের পরিমাণও কমিয়া যায়। অতএব স্বাভাবিক চাহিদার ভিত্তিতে বৎসরের প্রথম দিকে যে ঘাটতি অনুমিত হইয়াছিল, কয়েক মাস যাবৎ পাইকারী হারে কম খাওয়ার জন্য, বৎসরের শেষে ঘাটতির পরিমাণ প্রকৃতপক্ষে অনেক কম দাঁড়ায়। কথাটা সহজ করিয়া বলিলে এই দাঁড়ায়, ফলন হ্রাসের জন্য যে ঘাটতি পড়ে, মূল্যবৃদ্ধিহেতু কম খাওয়ার জন্য সে ঘাটতি উসুল হইয়া আসে। সুতরাং সমস্যাটি বিশ্লেষণ করিলেই বুঝা যায় যে, দেশে পর্য্যাপ্ত খাদ্যশস্য মজুত থাকা সম্ভব নয়। ১৯৫৫ সনের শেষ হইতে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত খাদ্যশস্যের দর ক্রমশঃ চড়িয়াছে। সুতরাং নিছক অর্থাভাবের জন্য ক্রেতারা খাওয়া কমাইতে বাধ্য হইয়াছে। ফলে প্রতি বৎসরের শেষে খাদ্যশস্য

মজুত থাকার কথা। এক বৎসর বা দুই বৎসর পর্য্যন্ত মজুতদার-দিগের পক্ষে পুরাণো গম-চাউল প্রভৃতি আটক করিয়া রাখা অসম্ভব না হইতেও পারে। কিন্তু গত পাঁচ বৎসর যাবৎ প্রতি বৎসরই বিক্রয় হ্রাসের জন্ম মজুত খাদ্যশস্য এইভাবে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে—এ ধারণা অবাস্তব। আর নূতন খাদ্য-সচিবের ধারণাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিবে যে, এই পাঁচ বৎসরের মজুত শস্য গেল কোথায়? এ পরিমাণ ফসল মজুত রাখার জন্ম গুদাম বা সামর্থ্য মজুতদারদিগেরও নাই। সুতরাং ইহার অস্তিত্ব থাকিলে নিশ্চয়ই বাজারে দেখা যাইত।

খাদ্য-পরিকল্পনায় সর্ব্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি ঘটিয়াছে সমস্যার গুরুত্ব ও ব্যাপকতা হালকা করিয়া দেখিবার জন্ম। জনসাধারণের মনোবল যথাসম্ভব রক্ষায় রাখিবার উদ্দেশ্যেই কর্তৃপক্ষ হয়ত প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু তাঁহাদের ভাবা উচিত ছিল, একদিন এ ফাঁকি ধরা পড়িবেই। এক দিকে উৎপাদন বৃদ্ধির, অন্যদিকে ন্যায্য দরে ও ন্যায্যভাবে বণ্টনের ব্যবস্থাই যে সমস্যা-সমাধানের স্থায়ী ও সুনিশ্চিত উপায় সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নাই। সুতরাং সরকারকে আজ নূতন করিয়া চিন্তা করিতে হইবে, উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা বণ্টন ও সরবরাহ কোন্ রীতিতে করা যায়।

আটক-চিনি ঘরে তুলিতে খাদ্য-দপ্তরের অসম্মতি

কিছুকাল আগে চিনি-চালান নিয়ন্ত্রণ আদেশ লঙ্ঘন করিয়া যে দশ হাজার মণ চিনি পশ্চিমবঙ্গ হইতে গৌহাটিতে পাঠান হইতে-ছিল, এনফোর্সমেণ্ট পুলিস সেই চিনি আটক করে। কিন্তু পরে নাকি প্রশ্ন উঠে, সেই দশ হাজার মণ চিনির কি ব্যবস্থা করা হইবে? মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত উহা গুদামে রাখিয়া দিলে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। তা ছাড়া, চিনির অভাবে জনসাধারণেরও বহু অসুবিধা হইবে। চীফ প্রেসিডেন্সী-ম্যাজিষ্ট্রেট নির্দ্দেশ দিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য-ডাইরেকটরেট উহা বাজারদরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করুন। কিন্তু খাদ্য-ডাইরেকটরেট জানাইয়াছেন, বর্তমান মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত এনফোর্সমেণ্ট পুলিস খুব কম পরিমাণ মাল তুলিতে পারিয়াছেন। দশ হাজার মণ চিনি ত অল্প জিনিস নয়! খাদ্য-দপ্তরও তৎপরতার সহিত উহার যথাবিহিত ব্যবস্থা করিতে অপারগ। ম্যাজিষ্ট্রেট মন্তব্য করিয়াছেন, যদি খাদ্য-দপ্তরই চিনির ন্যায় অত্যাবশ্যক খাদ্যবস্তুর ব্যবস্থা করিতে না পারেন, তবে কে পারিবে? সে যাহাই হউক, এখন আটক-করা চিনির কি দশা হইবে? অবশেষে ম্যাজিষ্ট্রেট জামিনে মুক্ত আসামীকেই তাহার স্বীকৃত ৩৯ টাকা মণ দরে সমস্ত চিনি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এবং বিক্রয়লব্ধ টাকা কোর্টে জমা দিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট এই সমস্যা যেভাবে সমাধান করা সম্ভব, তাহা করিয়াছেন।

কিন্তু আমাদের কথা হইতেছে, খাদ্য-দপ্তর সম্বন্ধে। তাঁহারা হঠাৎ এতটা নিষ্ক্রিয় হইয়া গেলেন কেন? কার্য্যতঃ এই সব বিভাগের কোন তৎপরতাই এই কার্য্যে প্রকাশ পায় নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট নির্দ্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা কৌশলে এড়াইয়া গিয়াছেন। যেখানে তাঁহাদেরই এ বিষয়ে করণীয় ছিল। ইহা আগাগোড়াই রহস্যজনক।

মাধ্যমিক শিক্ষা-শিক্ষণে গলদ

বাঙালীর সমাজ-জীবন আজ সমস্যার ভারে জর্জ্জরিত। একটির পর একটি সমস্যা আসিয়া জড়ো হইতেছে। সমাধান কিছুই হইতেছে না। মাধ্যমিক শিক্ষা-সমস্যাও ক্রমশঃ জটিল আকার ধারণ করিতেছে। শিক্ষক-ছাত্র-অভিভাবক-সরকার এই চার শ্রেণীর যুক্ত প্রচেষ্টা যদি বৎসরের পর বৎসর পণ্ডশ্রমে পরিণত হয়, তবে তাহার ধাক্কাটা সমাজেও আসিয়া পড়ে। এই জন্যই প্রয়োজন, শিক্ষা সমস্যার একটা সন্তোষজনক মীমাংসা। নহিলে সমাজ-জীবন ভাঙিয়া পড়িবে।

এই শিক্ষা-সমস্যার দুইটি দিক আছে। এক, শিক্ষণ-সংক্রান্ত, অপর, পরীক্ষা-সংক্রান্ত। যে ভাবে বৎসরের পর বৎসর অনুত্তীর্ণ বিদ্যার্থীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে, তাহাতেই মনে হয়, শিক্ষা-শিক্ষণ ব্যবস্থায় গলদ কোথাও রহিয়াছে। সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ কথা আজ কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না, আমাদের শিক্ষার মান নিম্নাভিমুখী। দেশব্যাপী এই যে যৌবশক্তির অপচয় তাহা দেখিয়া কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ শ্রীমালী উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। শিক্ষা-প্রসারের জন্য অধিকতর অর্থব্যয় করা সত্ত্বেও অকৃতকার্য ছাত্রের সংখ্যা কমিতেছে না দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছেন। কিন্তু মুক্তহস্তে ব্যয় করিলেই যদি সমস্যার সমাধান হইত, তাহা হইলে আরও কিছু অর্থব্যয় করিলেই গোল মিটিয়া যাইত। শিক্ষার মান উন্নত করিবার জন্ম অর্থের প্রয়োজন অবশ্যই আছে, কিন্তু আরও বেশী প্রয়োজন সেই অর্থের সদ্ব্যবহারের।

গোল বাধিয়াছে সেইখানেই। শিক্ষা-সংস্কারের কথা প্রায়ই উঠে। কিন্তু সংস্কার করিতে হইলে যাহা যাহা করা প্রয়োজন, সেইরূপ কোন নির্দিষ্ট পথ তাঁহারা বাঁধিয়া দিতে পারেন নাই। ঘটা করিয়া কমিটি বসিয়াছে, তাহার জন্ম লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ও হইতেছে, সুবৃহৎ রিপোর্ট রচিত হইয়াছে, কিন্তু কাজ কি হইল?

পরীক্ষা-বিভ্রাট সম্বন্ধেও শ্রীমালী স্বীকার করিয়াছেন, জল্পনা-কল্পনাই হইয়াছে, উপায় নির্দ্ধারিত হয় নাই। অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, ইহার মূলেও রহিয়াছে সেই প্রশাসনিক শৈথিল্য। শিক্ষা-সচিব অভিযোগ করিয়াছেন, মাধ্যমিক শিক্ষা-বোর্ডগুলির সহিত বাস্তব শিক্ষা-জগতের সম্পর্ক নাই। কারণ তাঁহারা সে বিষয়ে সম্যক ওয়াকিবহাল নহেন। ইহাই যদি সত্য হয়, তবে

প্রশ্ন উঠে, এই অর্থহীন সংস্থাগুলির অস্তিত্ব কেন সরকারী আনুকূল্যে বজায় থাকিতেছে ? একথা শ্রীমালীর নিশ্চয়ই অজানা নয়, মান্ধাতা আমলের যে পরীক্ষা-পদ্ধতি আজও এ দেশে প্রচলিত আছে তাহা প্রত্যেকটি প্রগতিশীল দেশে পরিত্যক্ত হইয়াছে। দুর্ভাগ্য, আমরা আজও সেই বাঁধা ছকে চলিতেছি। ইহার জন্য দায়ী কে? এই প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতিতে প্রতিভার যোগ্য সমাদর হয় না, মননশীলতারও বিকাশ হয় না। ঠিক অনুরূপ কথাই রবীন্দ্রনাথ বহুবার বলিয়াছেন।

শ্রীমালী অনেক কথাই বলিয়াছেন, শুধু দোষ-ত্রুটির কথা বলিলেই ত সমস্যার সমাধান হইবে না। তাঁহার ভাষণের মধ্যে পথ-নির্দ্দেশ কোথায়? আমরা যে এখন সেই পথই খুঁজিয়া মরিতেছি।

কলিকাতা কর্পোরেশনের কলঙ্ক

কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান কিছুদিন পূর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছিলেন, কলিকাতার মত মহানগরীর সৌন্দর্য্য কিছুতেই নষ্ট হইতে দিবেন না। এমনকি শহরের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যাবতীয় ময়লা অপসারণ করিবেন, পথে-ঘাটে নিষ্ঠীবন ত্যাগও বন্ধ করিবেন। যাঁহারা আশা করিয়াছিলেন তাঁহারা হতাশ হইয়াছেন। হতাশার কারণ আর কিছুই নহে, কালক্রমে এই শহরের যে সব দোষ-ত্রুটির সংশোধন হইবে বলিয়া তাঁহাদের আশা ছিল, অনেক কাল কাটিবার পরেও আজ দেখা যাইতেছে যে, তাহার তিলমাত্র সংশোধনও সম্ভব হয় নাই। সংশোধন হয় নাই বলিলে বোধ হয় ভুল বলা হইবে, বরং বলা উচিত যে, দোষ-ত্রুটির পরিমাণ ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। আজও দেখিতেছি, গলিতে গলিতে ডাষ্টবিন উপচাইয়া জঞ্জাল জমে, রাস্তায় বাতির অভাব, মারী আর মড়কে আতঙ্কের সীমা নাই, পানীয় জলের অভাব উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে, বৃষ্টির জলে ঘর-বাড়ী ধ্বসিয়া পড়িতেছে। কিন্তু দোষ দিব কাহাকে? দোষ হিসাবে মুক্ত যে তাঁহারাই নন! সংবাদপত্রের কলমে যে সংবাদটি বাহির হইয়াছে তাহা তাঁহাদের সুনামকে কলঙ্কিত করিয়াছে। হিসাবে গরমিল হয়ত অনেকেরই হয়, কিন্তু ইহা যে ইচ্ছাকৃত। টাকার অঙ্ক বড় সোজা নহে—২৭ লক্ষ টাকার মত বিরাট একটা অঙ্ক। ইহা কিভাবে কোথায় উধাও হইল, তাহার কিনারা করিতেও আজ তাঁহাদের গলদঘর্ম্ম হইতে হইতেছে। অভিযোগ সামান্য নহে। যে প্রতিষ্ঠানের কার্য্য-পরিচালন ব্যবস্থার সহিত লক্ষ লক্ষ মানুষের মঙ্গল-অমঙ্গলের প্রশ্নটি অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত, সে প্রতিষ্ঠানে এত বড় নোংরামি মর্ম্মান্তিক। যদিও মেয়র আশ্বাস দিয়াছেন, তদন্ত হইবে।

হয়ত হইবে। কিন্তু যাঁহারা সদিচ্ছাবশতঃ শহরের 'নোংরা' উচ্ছেদ করিতে তৎপর, তাঁহাদের ঘরের নোংরা যদি বাহিরে প্রকট হইয়া প্রকাশ পায়, তবে অপরের চরিত্র শোধনে কি করিয়া তাঁহারা আগাইয়া আসিবেন? মাতাল যদি মদ বন্ধ করিবার আন্দোলন করে, তবে কে তাহার কথা বিশ্বাস করিবে? জানি না, তাঁহাদের ভিতরের আবর্জ্জনা কবে দূর হইবে!

হাওড়া ষ্টেশনে দুধ বিক্রয়ের ব্যবস্থা

গত ১৫ই আগষ্ট হইতে হাওড়া ষ্টেশনে যাত্রীদের সুবিধার জন্য একটি দুধের দোকান খোলা হইয়াছে। বাংলা দেশে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ রেলওয়ে ষ্টেশন এই হাওড়া। প্রত্যহ অসংখ্য যাত্রী এই ষ্টেশন হইতে যাতায়াত করে। শিশু, রোগী ও অন্যান্য যাত্রীর দুধের প্রয়োজন সেখানে বিশেষভাবেই থাকিবার কথা। ষ্টেশনে দুধ পাইবার নিশ্চয়তা থাকিলে যাত্রীদেরও একটা দুর্ভাবনার অবসান হয়। যাঁহারা এই কল্যাণকর কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছেন তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। ইঁহারা এক পাউণ্ড ও আধ পাউণ্ডের বোতল বরফ-আলমারীতে রাখিয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এক পাউণ্ডের বোতল ৪১ নয়া পয়সা এবং আধ পাউণ্ডের দাম ১২ নয়া পয়সা। শুনা যাইতেছে, দৈনিক একশত টাকার উপর এই দুধ বিক্রয় হইতেছে। জিনিস পাওয়া যায় জানিলে লোকের ক্রয়ের আগ্রহও বাড়ে। সুতরাং বিক্রয়ের পরিমাণ অদূর ভবিষ্যতে যে আরও বাড়িবে, তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে।

প্রতি ষ্টেশন-প্লাটফরমে চা বিক্রয় হয়। ইহার পরিবর্ত্তে দুধ বিক্রয় করিলে শিশুরা খাইয়া বাঁচে—বিক্রয়ও কম হইবে বলিয়া মনে হয় না। পরীক্ষা করিয়া দেখিতে দোষ কি? এরূপ ব্যবস্থা পশ্চিমের যে কোন ষ্টেশনেই রহিয়াছে দেখিয়াছি।

গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের আংশিক সংস্কার কাজে সরকার

গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের একটি অংশ বিশেষ—হরিবপুর-বামনগোলা সড়কের নির্ম্মাণ-কার্য্য সুরু হইয়াছিল, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কালে। কিন্তু আজও তাহা শেষ হয় নাই। এ সম্বন্ধে ২৫শে সেপ্টেম্বরের 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বড় মজার কথা বলিয়াছেন। আমরা নিজে কিছু না বলিয়া, সেই অংশটি তুলিয়া দিতেছি। "এক মাইল রাস্তার উন্নতি বিধানে যদি এক বৎসর সময় লাগে, তবে হাজার মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তা বানাইতে কত বৎসর লাগিবে? গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের নির্ম্মাতা শের শাহকে যদি এই প্রশ্ন করা হইত, তবে তাঁহার স্বীকার না করিয়া উপায় ছিল না যে, অন্তত হাজার বৎসর লাগিবে। শের শাহ কিন্তু অতটা সময় লন নাই। ভারতের শাসন ভার হাতে পাইবামাত্র পাঁচ বৎসর পরেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ঐ সামান্য সময়ের মধ্যেই গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের মত এত দীর্ঘ একটা সড়ক তিনি তৈয়ারি করিয়া গিয়াছেন। পূর্ত্তবিজ্ঞানের তখনও এত উন্নতি ঘটে নাই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই অসাধ্যসাধন তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। তাহার কারণ হয় ত এই যে, তিনি ছিলেন কাজের মানুষ, ফাঁকা কথায় তাঁহার আস্থা ছিল না। তা

যদি থাকিত, তবে সহস্র মাইল দীর্ঘ একটা রাস্তা বানাইবার আগে তিনিও হয়ত একটা সহস্রশালা পরিকল্পনা রচনায় লাগিয়া যাইতেন। কথাটা অকারণে বলি নাই। মালদহ জেলার হবিবপুর-বামনগোলা সড়কের উন্নতি-বিধানের কাজ সুরু হইয়াছিল সেই প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কালে। সে কাজ এখনও চলিতেছে। আরও কতদিন যে চলিবে, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় আমাদের উপজাতি-কল্যাণ মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার মহাশয়ও সে-বিষয়ে খুব জোর দিয়া কিছু বলিতে পারেন নাই। এখন শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইবেন যে, এত বৎসর ধরিয়া যাহার উন্নতি-সাধনের কাজ চলিতেছে, সেই রাস্তাটির দৈর্ঘ্য মাত্র তের মাইল। এবং কাজ যদিও শেষ হয় নাই, পাঁচ লক্ষাধিক টাকা কিন্তু ইতি-মধ্যেই খরচ করা হইয়াছে। এ ব্যাপারে বিশেষ কিছু বলিতে চাহি না। শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্যের সুযোগে আমলাতন্ত্রী ও ঠিকাদারি দুর্নীতির বাঁধনটা ক্রমেই শক্ত হইয়া উঠিতেছে। এ বন্ধন যদি এখনও ছিন্ন করা না হয়, উন্নয়নের সমস্ত পরিকল্পনাই তবে এক অর্থহীন প্রহসনে পরিণত হইবে।"

ইহার পর টীকা নিষ্প্রয়োজন।

অতি বর্ষণে মানুষের অবস্থা

উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির অভাব, অথচ বৃষ্টির দাপটে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানে বিস্তীর্ণ এলাকায় গেল গেল রব উঠিয়াছে। গ্রাম, মাঠ, ভাসিয়া যাইতেছে, বাঁধ ভাঙ্গিতেছে, ঘর-বাড়ী ধ্বসিয়া পড়িতেছে, জলে ডুবিয়া এবং ঘর চাপা পড়িয়া মৃত্যুর সংবাদ আসিতেছে। এক কথায় প্রকৃতি এবারে ধ্বংসলীলায় মাতিয়াছেন। এবারে প্রচুর শস্য ঘরে উঠিবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সে আশা-ভরসাও সমূলে উৎপাটিত হইয়া গেল। কারণ, প্রচুর ধানের জমি এখনও জলে ডুবিয়া আছে।

কিন্তু দুর্গতি, দুর্গতিই। প্রকৃতিকে দায়ী করিয়া লাভ নাই, অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়া সমানই অর্থহীন। প্রকৃতির বিরূপতার সহিত মানাইয়া লইয়া অথবা যুদ্ধ করিয়াই গড়িয়া উঠে জনপদ, শহর ও নগর। এই বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি যখন দিকে দিকে অপ্রতিহত তখন কলিকাতা মহানগরীও প্লাবনের পীড়নে বিপর্য্যস্ত। পল্লী-অঞ্চলের অসহায় অবস্থা বুঝিতে পারি, কিন্তু কলিকাতার মত মহানগরীর ত সেরূপ হইবার কথা নয়। কেন এরূপ হয়? প্রায়ই দেখা যায়, অতি বর্ষণ হইলেই কলিকাতায় অনেক অঞ্চল জলে ডুবিয়া যায়, নিকাশী-ব্যবস্থার গলদই ইহার প্রধান কারণ। অতি-বর্ষণের ফলে অতর্কিত বিপদ ঘটিয়াছে, এমন ওজর পৌরপ্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তারা নিশ্চয়ই দেখাইতে পারেন না। কারণ গলদ বহুদিনের। অব্যবস্থা এমন যে, জল-নিকাশের সামান্য যাহা বন্দোবস্ত আছে তাহাও ঠিকমত চলে না। বর্ষণের প্রথম পর্ব্বেই কর্পোরেশনের তিনটি পাম্পিং ষ্টেশনের প্রায় নাভিশ্বাস উঠে। মেয়র নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, পাম্পিং ষ্টেশনগুলি চালু থাকিলে নগরীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল এতখানি জলমগ্ন হইতে পারিত না। পয়ঃপ্রণালীর আবর্জ্জনা নিষ্কাশন-ব্যবস্থা সম্পর্কেও সেই সমান গাফিলতি। আড়াইশতের বেশী লোক নাকি এই কাজ করিবার জন্য বহাল আছে, অথচ ডেপুটি মেয়র বলিতেছেন, ইহাদের মধ্যে শতকরা কুড়িজনের খোঁজ মেলে কাজের সময়, বাকি যারা তাদের অস্তিত্ব মাহিনার খাতায়।

শুনিয়াছিলাম, ভারত-সরকার কলিকাতার এই জল-নিকাশী ব্যবস্থা-উন্নয়নের জন্য আশী লক্ষ টাকা দিয়াছেন। সে টাকার কি ভাবে তাঁহারা সদ্ব্যবহার করিলেন জানি না। কাজ যে হয় নাই, তাহা ত দেখিতেছিই।

যদিও স্বীকার করি, বৃহত্তর কলিকাতার জল-নিষ্কাশনের সমস্যা খুবই জটিল, কিন্তু সেই সঙ্গে কর্ত্তাদের আলস্য ও ঔদাসীনতার ব্যাপারটা আরও নিরাশাজনক। জল সরবরাহ ও নিষ্কাশন বোর্ড গঠনের একটি পরিকল্পনার কথা অনেক দিন হইতেই শুনা যাইতেছে। তাহারই বা কি হইল?

এই সব পরিকল্পনার কথা শুনিয়া শুনিয়া জনসাধারণ আজ এতই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, বর্ত্তমানে কোন কথাই আর তাহারা বিশ্বাস করিতে চাহে না।

মহানগরীর চতুর্দ্দিকে যে সব নূতন উপনগর ও উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছে, সেগুলির জলনিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত করিবার দায়িত্ব প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আজ যে দুর্গতি সৃষ্টি হইয়াছে তাহার কারণ, বৃহত্তর কলিকাতার নগর-বিন্যাস সম্পর্কে সরকার কোনরূপ পরিকল্পনা করেন নাই, এমনকি জল-নিষ্কাশনের স্বাভাবিক বন্দোবস্ত সামান্য যাহা কিছু ছিল তাহা সংরক্ষণের জন্য আইনসঙ্গত ব্যবস্থা পর্য্যন্ত অবলম্বন করেন নাই। খাল, বিল, মজিয়াছে, জল-নির্গমের উপযুক্ত জায়গাগুলি পর্য্যন্ত বেদখল হইয়াছে, পরিকল্পনাহীনভাবে যত্রতত্র ফ্যাক্টরী এবং উদ্বাস্তু উপনিবেশ গড়িয়া উঠায় সমগ্র বৃহত্তর কলিকাতা ভিড়ে ঠাসাঠাসি পঙ্ককুণ্ডে পরিণত হইয়াছে। এই অসহনীয় অস্বাস্থ্যকর এবং অস্বচ্ছন্দ পরিবেশ যে মহানগরীর জীবনে স্বাভাবিক অবস্থা রচনা ও রক্ষা করিবার পক্ষে বিষম বাধা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও পৌরকর্ত্তারা তাহা নিশ্চয়ই জানেন। তাঁহারা ইহাও জানেন, এই অবস্থার প্রতিকার অসাধ্য নয়। জানি না, কবে তাঁহারা সত্য সত্যই প্রতিকারে উদ্যোগী হইবেন।

কর্ম্মে নিয়োগে পক্ষপাতিত্ব

অনেকেই বলেন, বাঙালীরা শ্রমবিমুখ। একথা সর্ব্বক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ দেখা গিয়াছে, বহু যুবক আসানসোল ও দুর্গাপুর এলাকায় শ্রমের কাজে নিযুক্ত হইয়া দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। শুনা যাইতেছে, ঐসব অঞ্চলে আরও বহুলোকের প্রয়োজন হইবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই কর্ম্ম-নিয়োগ সম্বন্ধে নিয়োগ-

কর্ত্তাদের পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পাইতেছে। এই নিয়োগের ব্যাপারে যদি বিশেষ লক্ষ্য না রাখা হয় তাহা হইলে বাঙালীর ক্রমবর্দ্ধমান বেকারসমস্যা আরও ভয়াবহ হইয়া উঠিবে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রত্যেক রাজ্যেই কর্ম্মের সুযোগ প্রশস্ত হইতেছে, এবং বৃহৎ পরিকল্পনাগুলিতে উচ্চ কারিগরী জ্ঞানের কাজ ছাড়া অন্য সব কাজেই স্থানীয় বা সেই রাজ্যের অধিবাসীরাই কাজ পাইতেছে। সেখানে অন্যান্য রাজ্যের অধিবাসীদের প্রবেশের সুযোগ নাই বলিলেও বোধহয় অত্যুক্তি করা হইবে না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সরকারী বা বেসরকারী কাজে ত বটেই, বৃহৎ পরিকল্পনাগুলিতেও বাঙালীদের ন্যায্য দাবী একান্ত অসঙ্গতভাবে উপেক্ষিত হইতেছে। সরকার মাঝে মাঝে সদিচ্ছার অভিব্যক্তি হিসাবে সরকারী, আধা-সরকারী বা বেসরকারী নিয়োগ-কর্ত্তাদের এ বিষয়ে মনোযোগ দিবার কথা জানাইতেছেন, কিন্তু কাৰ্য্যতঃ কোন ফলই হইতেছে না। দুর্গাপুর, আসানসোল বাঙালীর কর্ম্মের সুযোগ প্রশস্ত হইবে, একথা উচ্চকণ্ঠে প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও কি ভাবে লোক নিয়োগ করা হইতেছে, তাহার কিছু কিছু পরিচয় সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙালী কর্ম্মপ্রার্থীদের কোণঠাসা করিয়া রাখিবার চেষ্টার অভিযোগও আজ নূতন নহে। দুর্গাপুরের আশেপাশে যে সকল বেসরকারী ব্যবসা গড়িয়া উঠিতেছে তাহাতে কত ভাগ বাঙালী কাজ করিতেছে তাহা নির্ণয় করিতে সংখ্যা গণনার প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেক রাজ্যেই বিভিন্ন কর্ম্মে সেই রাজ্যের অধিবাসীদের সুযোগদানে অগ্রাধিকারের প্রশ্ন প্রবল। কিন্তু বাঙালীর পক্ষে বাহিরে কর্ম্মের সুযোগও যেমন অপ্রত্যাশিতরূপে সঙ্কুচিত হইয়াছে তেমনি পশ্চিমবঙ্গেও তাহাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী একান্ত অসঙ্গতভাবে অগ্রাহ্য করা হইতেছে। সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে, কলে-কারখানায়, সওদাগরী অফিসে যেভাবেই হউক বাঙালী তাহার সাধারণ সুযোগেরও সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিতেছে না।

পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা যেমন জমির অনুপাতে অত্যধিক তেমনি কর্ম্মের সুযোগও অন্যান্য রাজ্য অপেক্ষা বহু সঙ্কুচিত। সুতরাং বাংলায় বাঙালীকে অধিক সংখ্যায় কর্ম্মে নিয়োগ করিলে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার প্রশ্ন উঠে না কিংবা কাহারও প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষের কথাও উঠে না। বাঙালীর বেকারসমস্যা ভয়াবহ, সুতরাং এই সমস্যা সমাধানের প্রশ্নও সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন। বাহিরে বাঙালীর যদি কর্ম্মের অবাধ সুযোগ থাকিত কিংবা তাহাদের কথা বাহিরের রাজ্য ভাবিত তাহা হইলে কাহারও কিছু বলিবার থাকিত না। বিভিন্ন রাজ্যে নিজ অধিবাসীদের প্রয়োজনে যদি বাঙালীর সুযোগ সঙ্কুচিত হইয়া থাকে তাহা হইলে এই রাজ্যের নিজ প্রয়োজনে তাহাদের আপন লোকদের নিয়োগের প্রশ্ন ভাবাই কি সঙ্গত এবং স্বাভাবিক নহে? প্রতিযোগিতার কথাই যদি প্রধান হইত তবে বাংলার বাহিরে অবশ্যই বাঙালীর সুযোগ এত অধিক পরিমাণে সঙ্কুচিত হইত না। পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রী অবশ্য বলিয়াছেন, বাঙালী যুবকদের যেন তাহাদের ন্যায়সঙ্গত কর্ম্মের অংশ হইতে বঞ্চিত করা না হয়। বাঙালীর কর্ম্মসমস্যা এমন এক সঙ্কটের মুখে আসিয়াছে যে, এই সমস্যার সমাধান করিতে না পারিলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। এ রাজ্যের আন্দোলন, উত্তেজনা, বিক্ষোভ ইত্যাদিও যে সেই বেকারসমস্যারই বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ, ইহা ভুলিলে চলিবে না।

অবশ্য সেই সঙ্গে একথাও আমাদের আজ অস্বীকার করিলে চলিবে না, কর্ম্মে নিষ্ঠা বলিয়া কোন বস্তু বর্ত্তমান বাঙালী যুবকের মধ্যে নাই। কালধর্ম্মে তাহাদের ফাঁকি দিবার স্পৃহাই প্রবল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। তাহারা দল গড়িতে জানে, ধর্ম্মঘট করিবার বিভিন্ন কৌশল তাহাদের অধিগত। এই অসদ্বৃত্তির জন্যই বাঙালী আজ উপেক্ষিত। অথচ ইহা পূর্ব্বে ছিল না। সেদিন যোগ্যতায় বাঙালীই ছিল শ্রেষ্ঠ। কেন এইরূপ হইল? ইহাও একরূপ নৈতিক পতন। বাঙালীকে আজ ভুলিতে হইবে, কোঁচা দুলাইয়া কাজ করিবার দিন আর নাই। আজ পরিশ্রম করিয়া জীবিকার্জ্জন করিবার দিন আসিয়াছে। যন্ত্রের যুগে প্রত্যেকটি মানুষ আজ শ্রমিক। দৃষ্টি আমাদের সেইদিকে না ফিরাইলে জাতির কল্যাণ নাই।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে ক্রমান্বয়ে ঘাটতি হইতেছে এবং এই বিষয়ে ভারতের কর্তৃপক্ষ তথা জনসাধারণ উভয়েই চিন্তিত। কয়েক মাস পূর্ব্বেও ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় অত্যন্ত সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছিল, সেই সঙ্কট এখন কিছুটা প্রশমিত হইলেও বিপদ একেবারে কাটিয়া যায় নাই। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে সঙ্কটের প্রধান কারণ—রপ্তানী হ্রাস ও আমদানী বৃদ্ধি। ১৯৫৫ সনে ভারতের রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৬০৮ কোটি টাকা। ১৯৫৬ সনে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ৬১৯ কোটিতে আসিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু ১৯৫৭ সনে ভারতের রপ্তানী হ্রাস পায় ৬১০ কোটি টাকায় এবং ১৯৫৮ সনে আমাদের রপ্তানীর মূল্য ৫৭৪ কোটি টাকায় নামিয়া আসে। ১৯৫৯ সনের অবস্থাও বিশেষ কিছু আশাপ্রদ নয়।

কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর উক্তি হইতে জানা যায় যে, চলতি বৎসরের প্রথম ছয় মাসে ২৬৬ কোটি টাকার দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে, অর্থাৎ সারা বৎসরে রপ্তানীর পরিমাণ ৬০০ কোটি টাকার উপরে উঠিবে বলিয়া মনে হয় না। পূর্ব্বে ভারতের রপ্তানীর পরিমাণ ছিল প্রায় ৭০০ কোটি টাকার মত এবং আমদানীও হইত প্রায় ঐ পরিমাণ মূল্যের দ্রব্য। কিন্তু গত কয়েক বৎসরে আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় ১১০০ কোটি টাকাতে উঠিয়াছে, আর রপ্তানীর পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ৬০০ কোটি টাকার নিম্নে নামিয়া আসিয়াছে। ঘাটতি-বাণিজ্যের অর্থ পরিকল্পনার প্রগতিতে রাশ টানিতে হয় কারণ বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে প্রয়োজনীয় শিল্প-মূলধন আমদানী

করা সম্ভবপর হইতেছে না এবং ব্যবহারিক দ্রব্যের আমদানীকেও হ্রাস করিতে হইয়াছে, ফলে আভ্যন্তরিক মূল্যমানও বাড়তির মুখে চলিয়াছে।

ঘাটতি-বাণিজ্যের ফলে রাষ্ট্রকে ঘাটতি-ব্যয়ের সাহায্য লইতে হয় এবং তাহাতে মুদ্রামূল্য হ্রাস পায়। প্রথম ছয় মাসে ডলার দেশগুলির সহিত বাণিজ্যে ভারতের প্রায় ৬৫ কোটি টাকা ঘাটতি হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে কেবলমাত্র আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্যে ভারতের ঘাটতি হইয়াছে প্রায় ৩০ কোটি টাকার মত। কিন্তু আমাদের বহির্বাণিজ্যে সব চেয়ে চিন্তাজনক ব্যাপার হইতেছে যে, মধ্য-ইউরোপের দেশগুলির সহিত বাণিজ্যে ভারতবর্ষ ক্রমাগত ঘাটতি ভোগ করিয়া আসিতেছে এবং এই ঘাটতির পরিমাণ অত্যধিক, কোন কোন বৎসর বাণিজ্যে এই দেশগুলির সহিত যে পরিমাণ ঘাটতি হয় তাহা মোট ঘাটতির প্রায় অর্দ্ধেকের কাছাকাছি গিয়া দাঁড়ায়। এই দেশগুলির মধ্যে আছে পশ্চিম জার্ম্মানী, ইটালী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও লুক্সেমবার্গ, ঘাটতি অবশ্য হয় প্রধানতঃ পশ্চিম জার্ম্মানীর সঙ্গে বাণিজ্যে।

এ বৎসর প্রথম ছয় মাসের বাণিজ্যের হিসাবে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষ রপ্তানী করিয়াছে ২২ কোটি টাকার দ্রব্য, কিন্তু এই দেশসমূহ হইতে তাহার আমদানীর পরিমাণ হইতেছে ৯৩ কোটি টাকার দ্রব্য, অর্থাৎ প্রথম ছয় মাসের বাণিজ্যে কেবলমাত্র এই পাঁচটি দেশের সহিতই ভারতের ঘাটতির পরিমাণ হইতেছে ৭১ কোটি টাকা। ভারতের গতানুগতিক রপ্তানী-বাণিজ্যে প্রধানতঃ চা, পাটজাত দ্রব্য ও বস্ত্র প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করিয়া আছে। ভারতের মোট রপ্তানী-বাণিজ্যের মধ্যে চায়ের অবদান হইতেছে ২৪·২ শতাংশ, পাটজাত দ্রব্যের ১৮·৩ শতাংশ এবং সূতী বস্ত্রের অবদান হইতেছে ৯·৩ শতাংশ। কিন্তু গত বৎসর সূচী-পত্রের রপ্তানী হঠাৎ খুব হ্রাস পাইয়াছে। রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য বহু প্রকার প্রস্তাব করা হইতেছে, সেইগুলিকে যথাসম্ভব কর্তৃপক্ষের গ্রহণ করা উচিত। অধিকন্তু আমাদের মনে হয় যে, প্রধান প্রধান সহরে, যথা, কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ সহরে রপ্তানী সংস্থা (Export House) স্থাপন করা উচিত এবং এই সংস্থাগুলি হইতে বিদেশীদের পক্ষে আমদানী সহজসাধ্য হইবে।

কুম্ভ মেলার শোচনীয় পুনরাবৃত্তি

রাজকোটে যে দুর্ঘটনার কথা সংবাদপত্রে পাওয়া গেল, তাহা যেমনই ভয়াবহ তেমনই হৃদয়-বিদারক। এরূপ মনুষ্যকৃত দুর্ঘটনা বোধ হয় একমাত্র ভারতেই সম্ভব। সেখানে সতের বৎসর বয়স্ক এক তরুণীর উপর দেবী ভবানী ভর করিয়াছেন এবং তরুণীটি এক মেলার স্থান করিয়া লইয়া দেবীত্বের আবেশে নাচিয়াছেন এবং নানা অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দেখাইয়াছেন। দর্শনার্থীরা আট আনা হইতে এক টাকা পর্য্যন্ত দক্ষিণা প্রদান করিয়া এই দৈবী বিভূতির প্রকাশ দেখিবার জন্ত মেলায় ভিড় করিয়াছেন। দর্শনার্থীর কৌতূহল এতই উদ্দাম হইয়া উঠে যে, ভীড়ের মধ্যে প্রচণ্ড হুড়াহুড়ি লাগিয়া যায় এবং তাহার ফলে পিষ্ট হইয়া উনপঞ্চাশ জন ব্যক্তিকে মৃত্যুবরণ করিতে হইয়াছে। তিন জন আহতের অবস্থা সাঙ্ঘাতিক। অপ্রিয় সত্য হইলেও ইহা নিঃসংশয়ে বাস্তব সত্য যে, ভক্তি, বিশ্বাস এবং পুণ্য কামনার মাত্রাছাড়া তাড়নায় ভারতীয় জনতার আচরণ প্রায় অনাচারে পরিণত হইয়া থাকে। উড়িষ্যার নেপাল বাবার কাছে সর্ব্বরোগের শিকড়-বাকড় আনিতে গিয়া বিশ্বাসীর দল ঠিক এই রকমই ভিড় করিয়াছিল এবং তাহার ফলে কলেরায় অনেক লোকের প্রাণান্ত হয়। আরও কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রয়াগে কুম্ভমেলার স্নানের কালেও ভিড়েরই বিচিত্র উদ্বেগ ও বিশৃঙ্খল আচরণের ফলে প্রায় পাঁচ শত নর-নারীর প্রাণ পদদলিত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছিল।

এ কি উন্মাদনা! যাহার ফলে পরের প্রাণ এবং নিজের প্রাণের প্রতিও সাধারণ দায়িত্ববোধটুকু ঘোলা হইয়া যায়। দেবতার নাম করিয়া যে-কোন বুজরুকি দেখাইলেই তাহা একটা আধ্যাত্মিক কীর্ত্তি বলিয়া প্রচলিত হইবার সুযোগ যতদিন পাইতে থাকিবে, ততদিন রাজকোটের দুর্ঘটনার অনুরূপ অভিশাপ হইতে মানুষের মুক্তি নাই। অলৌকিকের প্রতি বিশ্বাসের আতিশয্যে এত লোকের প্রাণ গেল, এই অতি-করুণ এবং অতি-ভয়াবহ পরিণামের দৃষ্টান্ত যদি ভবিষ্যতের পক্ষে শিক্ষাকর হয় এবং কুসংস্কারজনিত উন্মাদনা যদি সংযত হয় তবেই মঙ্গল। তবে সরকারের দিক হইতেও ইহার প্রতিষেধক-ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই করা উচিত। ধর্ম্মের নামে কু-সংস্কারকে তাঁহারা যেন আর প্রশ্রয় না দেন।

অক্সফোর্ড অভিধান পাকিস্থানে নিষিদ্ধ

সম্প্রতি অক্সফোর্ড কনসাইজ ডিক্‌সনারী যাহার চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাকিস্থানে নিষিদ্ধ হইয়াছে। ঐ অভিধানে নাকি পাকিস্থানকে ভারতের অংশ এবং স্বয়ংশাসিত মুস্লিম রাজ্য নামে অভিহিত করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ১৯৪৭ সনে ভারত বিভাগের পর পাকিস্থান একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ হইয়াছে, সুতরাং অভিধান-লিখিত সংবাদটি সত্য নহে। বিশেষ করিয়া পাকিস্থান যাঁহাদের সৃষ্টি, তাঁহাদের পুস্তকে এ ভুল হওয়া উচিত নয়। তবে একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে, এক দেশের পুস্তকাদিতে অপর দেশের দর্শন, ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস ও ভূগোলের তথ্য স্বাভাবিক কারণেই অনেক সময় ভ্রমাত্মক হয়। সোভিয়েট এনসাইক্লোপিডিয়ায় গান্ধীজী সম্বন্ধে এইরূপ একটি ভুল তথ্য পরিবেশিত হইয়াছিল। ধর্ম্মসম্পর্কীয় একখানি প্রামাণ্যগ্রন্থে কোন মুস্লিম পণ্ডিত লিখিয়াছেন, শঙ্করাচার্য্য তাঁহার অদ্বৈতবাদ এবং রামমোহন রায় তাঁহার ব্রহ্মতত্ত্ব ইসলাম হইতে পাইয়াছেন। চৈনিক সাইক্লোপিডিয়ায় বুদ্ধ জীবন ও বৌদ্ধধর্ম্মের যে অপরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তা কিছুদিন আগেই প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু ভুল ভুলই। ধৈর্য্য এবং শালীনতার সহিত তাহার সংশোধন যাহাতে হয় তাহারই চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু পাকিস্থানের

ধাতুতে সে-বস্তুটি নাই। তাই শুধু অক্সফোর্ড অভিধানই নয়, এরূপ বহু বই লইয়াই তাঁহারা অকারণে হৈ চৈ বাধান।

আফগান-ভারত মৈত্রী

আফগানিস্থানে সফর করিতে গিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলিয়াছেন, ভারতের সহিত আফগানিস্থানের একটা আত্মিক যোগ আছে যাহাকে কোন ক্রমেই আজ অস্বীকার করা যায় না। এই আফগানিস্থানের একটি প্রধান অংশ দূর অতীতে গান্ধার দেশ নামে পরিচিত ছিল। মহাভারতের গান্ধারী এই গান্ধার দেশেরই মেয়ে। পূর্ব্বে এ দেশের অধিবাসীরা ছিলেন হিন্দু এবং বৌদ্ধ। মুসলিম অভ্যুদয়ের পর ইঁহারা মুসলমান হন। এবং দেশও মুসলমানের অধিকারে আসে। এইখান হইতেই ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবর ভারতবর্ষে আসেন। ইরাণ বা পারস্য তাহারও পূর্ব্ব হইতে ভারতের সহিত সংশ্লিষ্ট। আর্য্যদের একটি শাখা যখন পঞ্জাবে আসিয়া বসবাস সুরু করেন, তাহার পূর্ব্বে আর একটি শাখা ইরাণে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। জরথুষ্ট্র উপাসকদের সহিত ভারতীয় আর্য্যদের সাংস্কৃতিক ঐক্য অতি ঘনিষ্ঠভাবে ছিল। পরে এই দেশও মুসলিম অধিকৃত হয় এবং অগ্নি-উপাসক পারসীদের একাংশ ভারতে চলিয়া আসেন। পরবর্ত্তীকালে সুফী সাধকরা ইরাণ বা পারস্যে যে কাব্য ও দর্শন প্রচার করেন, তাহার সহিত ভারতীয় বেদান্ত ও বৈষ্ণবধর্ম্মের গভীর ঐক্য লক্ষ্য করার মত। এশিয়ার মৃত্তিকায় পাশ্চাত্ত্য সাম্রাজ্যবাদীদের আবির্ভাবে এই সম্পর্কসূত্র ছিন্ন হইয়া যায়।

আজ নূতন করিয়া সেইসব দেশের সঙ্গে ভারতের অন্তরঙ্গতা হইতেছে, ইহা খুবই আনন্দের কথা। এই রাজনৈতিক মৈত্রীর সঙ্গেই যেন সাংস্কৃতিক দিক হইতেও আমরা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হই। কারণ প্রকৃত মৈত্রী তাহাতেই।

বর্ণ-বিদ্বেষী ইভলিন বেয়ারিংয়ের আর একটা দিক

দক্ষিণ অফ্রিকার ব্রিটিশ-শাসিত উপনিবেশ কেনিয়ার গবর্ণর সার ইভলিন বেয়ারিং—যাঁহার সংবাদ জানিবার আগ্রহ হয় ত কাহারও নাই। কিন্তু যাঁহাদের জানিতে চাহি না, তাঁহারাও সময় সময় এমন একটি সংকাজ করিয়া বসেন, যাহা সংবাদ হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

এই ইভলিন বেয়ারিংয়ের ২৯শে সেপ্টেম্বর অবসর গ্রহণের কথা। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে আরও দুই সপ্তাহ স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিবার আদেশ দিয়াছেন। অসুস্থতার জন্য ইভলিন মোম্বাসায় গিয়া বিশ্রাম ভোগ করিতেছিলেন। একদিন তিনি সমুদ্রোপকূলে একাকী বসিয়া সমুদ্র নিরীক্ষণ এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময় একটি ভারতীয় বালিকা দৌড়াইয়া আসিয়া আর্ত্তকণ্ঠে তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা করে। বলে, আমার দুই সঙ্গিনী সমুদ্রের জলে ভাসিয়া যাইতেছে। দয়া করিয়া উঁহাদের প্রাণ রক্ষা করুন।

ইভলিন ভাসমান দুইটি দেহ দেখিতে পাইলেন। ষাট বৎসরের বৃদ্ধ ইভলিন শ্বেতকায় হইয়াও, ভারতীয় বালিকার কাতর আবেদনে বিচলিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সমুদ্রবক্ষে ঝাঁপ দিলেন। প্রতিকূল স্রোত এবং উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে তিনি নিমজ্জমান বালিকা-দুটিকে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া কূলের দিকে আসিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্রমে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। শিথিল মুষ্টি হইতে একটি বালিকা স্খলিত হইয়া ডুবিয়া গেল। অপরটিকে তিনি প্রাণপণে ধরিয়া রাখিলেন বটে, কিন্তু নিজেরই অজ্ঞান হইবার উপক্রম হইল। এমন সময় আর একজন ভ্রমণরত শ্বেতাঙ্গ—যাঁহার বয়স ৭০ বৎসর, সার ইভলিনের ঐ অবস্থা দেখিয়া জলে ঝাঁপ দিলেন এবং বালিকাসহ ইভলিনকে ডাঙায় তুলিলেন।

সার ইভলিন নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া ভারতীয় বালিকার জীবন রক্ষার জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার জীবন-ইতিহাসে নূতন। কারণ বহু দুষ্কৃতির তিনি ধারক। বর্ণ-বিদ্বেষই তাঁহাকে অমানুষ করিয়া তুলিয়াছে। জানি না, কোন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে এরূপ অ-মানুষও সময় সময় চঞ্চল হইয়া উঠে! এই চঞ্চল মুহূর্ত্তেই মানুষের সুপ্ত মানবতা জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়। নহিলে ইভলিন কি করিয়া এত সহজে সাদা-কালোর ভেদ ভুলিতে পারিলেন! তবু তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহার তুলনা হয় না। ভগবান তাঁহাকে আরও সৎকার্য্যে নিয়োজিত করুন ইহাই প্রার্থনা।

ক্রুশ্চেভের মুখে নূতন শান্তির বাণী

সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মিঃ ক্রুশ্চেভ আমেরিকায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা শুধু অভিনবই নয়, তাঁহার এই প্রস্তাবে সকলে বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছেন। যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই—এরূপ কথা বহু হইয়াছে, কিন্তু তিনি এবারে মোক্ষম শান্তির কথা উচ্চারণ করিয়াছেন। বস্তুবাদী কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের মহানায়ক উপনিষদীয় মহাসত্যের কাছাকাছি প্রায় পৌঁছিয়াছেন। উপনিষদের পরম শান্তি লাভ করিতে হইলে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে। এই সর্ব্বস্ব ত্যাগের কথাই প্রায় তিনি বলিয়াছেন। তাঁহার প্রথম কথাই হইল, ক্ষেপণাস্ত্র, অ্যাটম-বোমা, হাইড্রোজেন-বোমা সমস্ত পৃথিবী হইতে ঝাঁটাইয়া বিদায় করিতে হইবে। কামান, বন্দুক, অস্ত্রশস্ত্র, সৈন্যসামন্ত কিছুই থাকিতে পারিবে না—এমনকি প্রতিরক্ষা-মন্ত্রণালয়গুলির পর্য্যন্ত দরজা বন্ধ করিতে হইবে। চার বৎসরের মধ্যে প্রত্যেকটি রাষ্ট্র এইভাবে নিরায়ুধ, বর্ম্মচর্ম্ম-কবচ-কুণ্ডলহীন যদি হয় তবেই জগতে নির্ব্বিঘ্নে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

যুদ্ধবিগ্রহের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিবার জন্য শ্রীক্রুশ্চেভ যে চূড়ান্ত নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা যদিও সম্পূর্ণ নূতন নয়। একবার লিটভিনফ লীগ অফ নেশনে এই কথাই বলিয়াছিলেন। বলিয়াছেন আরও অনেকে। যুগে যুগে বহু

জ্ঞানী-গুণী-মনীষী হিংসায়-উন্মত্ত এই পৃথিবীকে অস্ত্র ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন—আশা করিয়াছেন, এমন দিন আসিবে যখন অস্ত্রের ঝনৎকার স্তব্ধ হইবে, তরবারি ভাঙ্গিয়া গড়া হইবে লাঙ্গলের ফলক। শান্তিবাদীদের যাহা কল্পনামাত্র, মহাপরাক্রান্ত সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী আজ তাহাই বাস্তবে রূপ দিতে চাহিতেছেন।

এখন কথা হইতেছে, কে কতটা, কিভাবে ইহাকে গ্রহণ করিতে পারিবে। কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানকাল হইতে এ পর্যন্ত নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব লইয়া আলোচনা কম হয় নাই। বৈঠকের পর বৈঠক ব্যর্থ হইয়াছে, পরমাণবিক অস্ত্র-পরীক্ষা বন্ধ করার প্রস্তাবটিতে পর্যন্ত বৃহৎ শক্তিরা একমত হইতে পারেন নাই। ইহার কারণও সুস্পষ্ট। কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। পরস্পর অবিশ্বাস যখন প্রচণ্ড এবং তাহার বাস্তব কারণগুলিও উপেক্ষাযোগ্য নয়, তখন উভয়পক্ষে শান্তি-কামনা আন্তরিক হইলেও, অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধসম্ভার সমুদ্রে বিসর্জন দিয়া চূড়ান্ত নিরস্ত্রীকরণের ঝুঁকি লইতে সাহসী হইবে কে? আর যদি কেহ অগ্রসরও হয়, তবে তাহার সর্বদাই সন্দেহ থাকিবে, আমাকে ফাঁকি দিয়া উঁহারা ভিতরে ভিতরে অস্ত্র শানাইতেছে না ত? তাহাদের দুর্মতি হইলে যে কারখানায় ট্র্যাক্টর তৈয়ারী হয় সেখানে ট্যাঙ্ক, যেখানে পারমাণবিক শক্তি উৎপন্ন হয় সেখানে পারমাণবিক বোমা তৈয়ারি করিতে বাধা কোথায়? কোথায় কোন রাষ্ট্রে কোন বৈজ্ঞানিক গোপনে কি বানাইতেছেন তাহার সন্ধান রাখিবে কে? সুতরাং এই অবিশ্বাসী মনই ক্রুশ্চেভের এই প্রস্তাবকে সমর্থন করিতে চাহিবে না। তিনিও কি অপরকে মনে-প্রাণে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিবেন?

অবশ্য যুক্তি দিয়া বিচার করিতে হইলে, ক্রুশ্চেভ যে সব কথা বলিয়াছেন তাহা অযৌক্তিক নহে। তিনি বলিয়াছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি বৎসরে সামরিক-খাতে প্রায় এক শত লক্ষ-কোটি ডলার খরচ করেন। গত দশ বৎসরে সামরিক-খাতে যে ব্যয় হইয়াছে, তাহাতে পনর কোটি বাসভবন প্রস্তুত হইতে পারিত। বৃহৎ শক্তিগুলি সামরিক-খাতে অর্থব্যয় বন্ধ করিলে তাহার একটি অংশ মাত্র দ্বারা এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ-আমেরিকার অনুন্নত অঞ্চলে নূতন জীবনের গোড়াপত্তন করা যায়।

এ বাণী ভারতের পক্ষে নূতন নয়। ইহা ভারতেরই নীতি। আমরা শুধু বিস্মিত হইয়াছি, ক্রুশ্চেভের মধ্যে সেই নীতি সংক্রামিত হইতে দেখিয়া। যাহা হউক, আজ যদি ক্রুশ্চেভের প্রস্তাব অনুযায়ী অস্ত্রের প্রতিযোগিতা ও অস্ত্রের নির্মাণ এবং উৎপাদন বন্ধ হইয়া যায় তবে, অবিলম্বেই আমরা পৃথিবীতে এক নূতন অর্থনৈতিক যুগের দিকে যাত্রা করিতে পারি। জানি না, কার্যতঃ ইহা কতদূর অগ্রসর হইবে—কারণ, ইহা হইতেছে মহৎ আদর্শের কথা। কিন্তু আদর্শ লইয়াই ব্যক্তি বা জাতি বাঁচিয়া থাকে। আমরাও বাঁচিয়া থাকিব। কারণ, জানি, মানব-মহত্ত্বের গতি স্তব্ধ হইবে না। মানুষ একদিন যুদ্ধ ও হিংসার ঊর্ধ্বে উঠিবেই, ক্রুশ্চেভের কথা আজ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে উড়াইয়া দিলেও সেদিন ইহার মূল্য নিরূপিত হইবে।

চন্দ্রলোক-অভিযানে রাশিয়ার সাফল্য

মানুষ এ পর্যন্ত অনেক অসাধ্য সাধন করিয়াছে। মানুষের প্রতিভার কাছে মরুভূমি মেরুলোক সমুদ্রগর্ভ আগ্নেয়গিরি-জঠর আজ হার মানিয়াছে। এক্স-রে, টেলিভেসান, বেতার তাহাকে অসীম ক্ষমতার অধিকারী করিয়াছে। এমনকি বহু প্রায়-মৃত্যুঞ্জয় ঔষধ আজ তাহার আয়ত্তে আসিয়াছে। দেশ-কালের সীমাকেও সে লঙ্ঘন করিয়াছে। কিন্তু যাহাই এ পর্যন্ত করিয়া থাকুক, তাহার সমস্ত ক্ষমতাই এতকাল পৃথিবীর জল, স্থল ও অন্তরীক্ষেই সীমাবদ্ধ ছিল। আজ সে পৃথিবী ছাড়াইয়া মহাশূন্যে পাড়ি জমাইয়া চন্দ্রলোক-মুখে অভিযান করিল।

যে চন্দ্রলোকে পৌঁছিবার কথা এতকাল স্বপ্ন বলিয়াই মনে হইত, তাহা যে কোন দিন বাস্তব-সত্যে পরিণত হইতে পারে তাহা কল্পনারও বাহিরে ছিল। সেইজন্যই ১৯৫৯ সনের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখটি মানবজাতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ঐ দিন সোভিয়েট রাশিয়ার মহাজাগতিক রকেট লুনিক-২ চন্দ্রলোকে পৌঁছিয়াছে। দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার ছয় শত মাইল অতিক্রম করিয়া মাত্র চৌত্রিশ ঘণ্টায় ঐ রকেট চাঁদে হাজির হইয়াছে। এবং সবচেয়ে বিস্ময়, যে সময়-সূচী বাঁধিয়া ইহা ছাড়া হইয়াছিল, ঠিক ঐ সময়টিতেই লুনিক-২ তাহার গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়াছে।

রাশিয়া এ পর্যন্ত এক এক করিয়া চারিটি স্পুটনিক শূন্যে উড়াইয়াছে এবং দ্বিতীয় স্পুটনিক হইতে জীবন্ত প্রাণী পাঠানোর পরীক্ষাও হইয়াছে; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃতিত্বও এ ক্ষেত্রে কম নয়—তাঁহারাও জীবন্ত বানর মহাশূন্যে পাঠাইয়া তাহাকে সশরীরে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া সর্বাগ্রে সাফল্যের জয়মাল্য অর্জন করিলেন। মার্কিন রকেট চাঁদের অনেকটা কাছা-কাছি গিয়াও লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাইতে পারে নাই, আর রুশ-রকেট চাঁদে সোভিয়েট রাষ্ট্রপ্রতীক-সম্বলিত পতাকা প্রোথিত করিয়াছে।

এই অভাবনীয় ঘটনায় উল্লসিত হইয়া ব্রিটিশ, মার্কিন, জার্মান, ফরাসী, চেক, চীনা জাপানী দেশের বড় বড় বিজ্ঞানীরাই অভিনন্দন জানাইয়াছেন। একজন মার্কিন বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন, মানুষ যে অদূর-ভবিষ্যতে একদিন সশরীরে চন্দ্রলোকে পৌঁছিবে এই ঘটনায় তাহা নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণ হইল।

এইবারে প্রয়োজন হইবে রকেটের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করা। যাহাতে সবেগে চাঁদে গিয়া আঘাত করার পরিবর্তে, চন্দ্রলোকের কাছাকাছি গিয়া ধীরগতিতে আবর্তন করিতে করিতে সে অবতরণ করিতে পারে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, লুনিক-২ যে সত্য সত্যই চাঁদে পৌঁছিয়াছে, তা কেমন করিয়া বোঝা গেল? তাঁহারা এই জন্যই রকেটের অভ্যন্তরে এমন-সব যন্ত্রপাতি সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন, যাহার

সাহায্যে সমগ্র যাত্রাপথে বেতার-মাধ্যমে সঙ্কেতবার্তা পাওয়া যায়। আরও ব্যবস্থা করা ছিল, লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার সামান্য আগে হইতে সঙ্কেতধ্বনি পরিবর্তিত হইতে হইতে চন্দ্রকে স্পর্শ করা মাত্র সমস্ত আওয়াজ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যাইবে। এই বেতার মাধ্যমেই রকেটের নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছান সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া গিয়াছে। আজ রাশিয়ার এই গৌরব সমগ্র মানবজাতিরই গৌরব। কারণ প্রতিভা দেশ-কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—সেখানে সে একাত্ম।

ভারত-পাকিস্থান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন

২৯শে সেপ্টেম্বর 'আনন্দবাজার পত্রিকা' এই সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমরা সেই অংশটি অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :

"পাকিস্থানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী কে, এম. শেখ এবং ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থ আগামী পক্ষকালের মধ্যে নয়াদিল্লীতে এক বৈঠকে মিলিত হইয়া ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে সীমান্ত সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন বলিয়া অদ্য এখানে নির্ভরযোগ্য কূটনৈতিক মহলে জানা গিয়াছে।

উভয় দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে এই প্রস্তাবিত সাক্ষাৎকার গত ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে পালাম বিমান বন্দরে নেহরু-আয়ুব সাক্ষাৎকারের প্রত্যক্ষ ফল, ঐ সময় উভয় নেতাই এক বিষয়ে একমত হন যে, সীমান্ত ঘটনা, বিশেষতঃ পূর্ব্ব সীমান্তে প্রায়ই যে গুলীবর্ষণের ঘটনা ঘটে তাহা বন্ধ করার জন্য তাহাদের এই আলোচনার পরেই মন্ত্রী পর্য্যায়ে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

পাকিস্থানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জেনারেল শেখ ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সহিত একদিন আলোচনা করিবেন। তাহার পর তিনি শিলং অথবা ঢাকা সেখানে সীমান্তে গুলীবর্ষণ ও অন্যান্য বিরোধ সম্পর্কে ভারত ও পাক প্রতিনিধিদের আলোচনার স্থান হইলে সেখানে যাইবেন। ঢাকা অথবা শিলং যেখানেই বৈঠক হউক না কেন, অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়ে তাহা হইবে। পাক পররাষ্ট্র দপ্তরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত মহলের নিকট জানা যায় যে, এখনও বৈঠকের তারিখ স্থির হয় নাই। তবে অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষ নাগাদ বৈঠক হইবে বলিয়া আশা করা যায়।"

চীনা মানচিত্রে ভারতীয় এলাকা

২৭শে সেপ্টেম্বর 'যুগান্তর' পত্রিকা নিম্নোক্ত সংবাদটি পরিবেশন করিয়াছেন :

"আজ ভারত সরকার মানচিত্র প্রচার করিয়া চীন মানচিত্রাঙ্কণে কারচুপি করিয়া কি পরিমাণ ভারতীয় এলাকা দখল করিয়াছে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। চীনা মানচিত্রে ৪২ হাজার বর্গমাইলের অধিক ভারতীয় এলাকা চীনের অধীনে দেখান হইয়াছে।

এই মানচিত্র প্রচার করিয়া ভারত সরকারের একজন মুখপাত্র বলেন যে, ভারতীয় এলাকার আজগুবি দাবী করিয়া ১৯৩৩ সন হইতে চীনা মানচিত্রগুলি প্রচারিত হইলেও ভারত সরকারের মানচিত্র ১৯৫৬ সনে চীনা স্বরাষ্ট্র দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত মানচিত্রের ভিত্তিতেই পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে।

আড়াই হাজার মাইলব্যাপী ভারত-তিব্বত সীমান্তটি উত্তর-পশ্চিম কাশ্মীর হইতে ভারত, ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের টলু গিরিবর্ত্মের নিকট চীন এই তিনটি রাজ্যের সীমান্ত সংযোগস্থল পর্য্যন্ত প্রসারিত।

কাশ্মীর-তিব্বত সীমান্তটি প্রায় ১১ শত মাইলব্যাপী প্রসারিত। ইহার মধ্যে ভারতীয় এলাকার অন্তর্ভুক্ত ৩ শত মাইল পাকিস্থান বে-আইনী ভাবে দখল করিয়া রাখিয়াছে।

চীনারা লাডাকের প্রায় ৬ হাজার বর্গমাইল এলাকার উপর নির্লজ্জ দাবী করিতেছে।

পঞ্জাব সীমান্তটি প্রায় ৭০ মাইল দীর্ঘ। চীনারা এই সীমান্তে দুই একটি ছোট গ্রাম দাবী করিতেছে।

৯০ মাইলব্যাপী হিমাচল প্রদেশ সীমান্ত লইয়াও বিরোধ রহিয়াছে। চীন শিপকীর কিছু অংশ দাবী করিতেছে। চীন উত্তরপ্রদেশের ২২০ মাইল সীমান্তের প্রায় ৫০ বর্গমাইল এলাকা দাবী করিতেছে।

ভূটান হইতে ব্রহ্মের টলু গিরিবর্ত্ম পর্য্যন্ত ম্যাক্‌মোহন লাইনটি ৭১০ মাইল প্রসারিত। এইখানেই চীনারা একটা বিরাট অঞ্চল প্রায় ৩১ হাজার বর্গমাইল এলাকা দাবী করিতেছে। চীনা মানচিত্রে উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত এজেন্সীর বেশির ভাগ অঞ্চল এবং আসামের একটা ছোট অংশ চীনের অন্তর্ভুক্ত দেখানো হইয়াছে। চীনারা ভূটানের প্রায় ৩ শত বর্গমাইল এলাকা দাবী করিতেছে। ভারতের দাবী হইতেছে যে, ভারত ও তিব্বতের মধ্যে সীমান্তটি সুবিদিত বহু-প্রচলিত ব্যবস্থার দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত। ভারতীয় এলাকার এক ইঞ্চি পরিমাণ জমি অধিকার ত্যাগ করা যায় না। তবে ম্যাক্‌মোহন লাইনের যে অংশ সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয় নাই তাহা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আপোষ মীমাংসা করা যাইতে পারে। চীনা লাইন সম্পর্কে কম্যুনিষ্ট সমর্থন এবং নেহরু লাইন সম্পর্কে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির পূর্ণ সমর্থনের ফলে দিল্লীর মনোভাব কঠোর হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।"

আততায়ীর গুলীতে বন্দরনায়কের মৃত্যু

সিংহলের বিখ্যাত প্রধানমন্ত্রী এস, ডব্লিউ, আর, ডি, বন্দরনায়ক আততায়ীর গুলীতে প্রাণ হারাইয়াছেন। গত ২৫শে সেপ্টেম্বর সকালে তাঁহার বাসগৃহে জনৈক পীত-বেশধারী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অতি নিকট পাল্লা হইতে পর পর ছয়বার গুলীবর্ষণ করে। তাঁহার তলপেটে ও হাতে মোট চারটি বুলেট বিদ্ধ হয়। রক্তাপ্লুত অবস্থায় তাঁহাকে হাসপাতালে লওয়া হয় এবং তিনজন বিশিষ্ট সার্জ্জন পাঁচ ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহার দেহে অস্ত্রোপচার করেন। কিন্তু তাঁহাকে

বাঁচাইবার সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং পরদিন ২৬শে সেপ্টেম্বর সকালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

এই নিদারুণ হত্যাকাণ্ডের সংবাদে সমগ্র সভ্যজগত স্তম্ভিত হইবে সন্দেহ নাই। তিন বৎসর আগে ১৯৫৬ সনের সাধারণ নির্ব্বাচনে অসামান্য সাফল্য লাভ করিয়া, বন্দরনায়ক যখন প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হইয়াছিলেন, তখন শুধু ভারতবর্ষ কেন, সারা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার জনগণের তিনি শুভেচ্ছা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একমত হইয়া সোভিয়েট রাশিয়া, নয়াচীন ইত্যাদির সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

যদিও ভিতরে অনেক গোলযোগই ছিল, তাহা নিরাকরণের চেষ্টাও তিনি ধীরে ধীরে করিতেছিলেন। কারণ যাহাই থাক, তাঁহাকে এইভাবে হত্যা করিবার কারণটি কিন্তু সুস্পষ্ট নয়। সম্ভবতঃ আভ্যন্তরীণ সঙ্কটের সঙ্গে ইহার কোন যোগসূত্র থাকিলেও থাকিতে পারে। তথাপি উল্লেখযোগ্য যে, সিংহলে এই সর্ব্বপ্রথম এমন রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান হইল এবং দ্বিতীয়তঃ উল্লেখযোগ্য যে, হত্যাকারীরূপে যাহাকে ধৃত করা হইয়াছে, সেই ব্যক্তি একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বলিয়া বর্ণিত। অহিংসার পূজারী হঠাৎ এমন হিংস্র খুনে হইয়া উঠিল কেন, তাহা আমরা জানি না। তবে ইদানীং আমরা দেখিতেছি যে, হিংস ও অহিংসার পূজারীদের মধ্যে কোন সীমারেখা থাকিতেছে না।

যাহা হউক, রাজনৈতিক মত-বৈষম্যের জন্য লোকের প্রাণ লওয়াকে আমরা গর্হিত অপরাধ এবং আরণ্যক হিংস্র নীতি বলিয়া মনে করি।

যুক্তপ্রচেষ্টায় এলুমিনিয়াম কারখানা

সংবাদটি 'আমেরিকান রিপোর্টার' পরিবেশন করিয়াছেন :

"ওকল্যাণ্ড, ক্যালিফোর্নিয়া : কাইজার এ্যালুমিনিয়াম এণ্ড কেমিক্যাল কর্পোরেশন এবং ভারতের শিল্পপতি জি. ডি বিড়লার মিলিত উদ্যোগে ভারতে এলুমিনিয়াম উৎপাদনের একটি কারখানা প্রতিষ্ঠার আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে। সম্প্রতি কাইজার কর্পোরেশনের পরিচালকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান এডগার এফ কাইজার এই সংবাদ ঘোষণা করেছেন।

এই প্রতিষ্ঠানটির নাম হিন্দুস্থান এলুমিনিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড এবং এটি স্থাপন করা হবে উত্তরপ্রদেশের রিহান্দে। প্রতি বছর এই কারখানায় ২০ হাজার মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম উৎপাদন করা হবে।

এই কারখানার জন্য আনুমানিক প্রায় ৩ কোটি ডলার মূলধন বিনিয়োগ করা হবে এবং ইতিমধ্যেই হিন্দুস্থান এলুমিনিয়াম কর্পোরেশন টাকা এবং ডলারে মিলিয়ে মোট ১ কোটি ৫৭ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার দীর্ঘমেয়াদী ঋণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের আমদানী-রপ্তানী ব্যাঙ্কের নিকট আবেদন করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের জন্য যে পরিমাণ মার্কিন মূলধন বিনিয়োগ করা হচ্ছে, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মিলিত প্রচেষ্টায় গঠিত কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য বে-সরকারীভাবে এত অধিক মূলধন এর আগে বিনিয়োগ করা হয় নি। এই প্রতিষ্ঠানের সাধারণ শেয়ার কাইজার কোম্পানী, বিড়লা ব্রাদার্স এবং ভারতীয় মূলধন বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। কাইজার কোম্পানীর হাতে থাকবে শতকরা ২৭টি সাধারণ শেয়ার, বাদ বাকী ৭৩টি শেয়ার ভারতীয়দের হাতে থাকবে। প্রেফারেন্স শেয়ারের সবটাই থাকবে ভারতীয়দের হাতে।

আমেরিকায় ভারতীয় তাঁতজাত দ্রব্যের চাহিদা

'আমেরিকান রিপোর্টার' সংবাদটি দিতেছেন :

"সম্প্রতি মার্কিন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ভারতবর্ষ ২০ লক্ষ ডলার মূল্যের তাঁতবস্ত্রাদি যুক্তরাষ্ট্রে সরবরাহের ফরমায়েস লাভ করেছে। এই ফরমায়েস দেওয়া হয় সম্প্রতি শিকাগোতে অনুষ্ঠিত বাণিজ্য-মেলায়। ভারতীয় তাঁতশিল্পের পক্ষ থেকে যে সব প্রতিনিধি ঐ বাণিজ্য মেলায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা এই ফরমায়েস সম্পর্কে বলেছেন যে, এর দ্বারা আমেরিকার প্রয়োজনের সম্পর্কে যথার্থ কোন ইঙ্গিত পাওয়া না গেলেও আমেরিকার চাহিদা মেটাবার পক্ষে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সামর্থ্য যে সীমাবদ্ধ, সেটা বোঝা গেল।

প্রতিনিধিদল বলেছেন, তাঁতবস্ত্রাদি সরবরাহের পক্ষে প্রধান অসুবিধা হচ্ছে, দেশে তাঁতের কাপড় বেশী পরিমাণে পাওয়া যায় না। তা ছাড়া, উৎপাদন কেন্দ্রগুলিও দেশের বিভিন্ন জায়গায় এমনভাবে ছড়িয়ে আছে যে অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ বস্ত্রাদি সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। ফলে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফরমায়েস মত মাল সরবরাহ করবার পক্ষে অসুবিধা দেখা দেয়। এই সব কারণেই যে পরিমাণ মাল সরবরাহের ফরমায়েস শিকাগোর মেলায় পাওয়া গিয়েছিল, প্রতিনিধিগণ তার সবটা গ্রহণ করতে পারেন নি।

এ সব এবং অন্যান্য অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় তাঁতশিল্পের রপ্তানীর পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত বছর (১৯৫৮) সাড়ে ১২ লক্ষ ডলার মূল্যের তাঁতবস্ত্র যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়। আর বর্ত্তমান বছরে ৩৫ লক্ষ ডলার মূল্যের তাঁতবস্ত্রাদি রপ্তানি হবে বলে আশা করা যায়।

সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে জাপান

সম্প্রতি জাপানে এবং প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলবর্ত্তী কয়েকটি অঞ্চলে সামুদ্রিক ঝড়ের যে প্রলয়ঙ্কর তাণ্ডব বহিয়া গিয়াছে, তাহার ক্ষয়-ক্ষতির সম্পূর্ণ হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই। এক জাপানেই ইতিমধ্যে আড়াই হাজারেরও অধিক লোক হত বা নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার সহিত আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ জুড়িয়া দিলে

ধ্বংসলীলার ভয়ঙ্কর রূপটির কিছুটা অনুমান করা যায়। দুই শত আটত্রিশটি জাহাজ ডুবিয়াছে, ভাসিয়া গিয়াছে এক হাজারেরও উপর এবং প্রায় দেড় হাজার জাহাজ আংশিক ভাবে ধ্বংস হইয়াছে। সেতু, সড়ক এবং রেলপথের ক্ষতিও কম হয় নাই। দুর্বিপাক-দৈবের উপর অবশ্য মানুষের হাত নাই। তাহাকে স্বীকার করিয়া লইয়া নূতন উদ্যমে জাপানকে আবার আগাইয়া আসিতে হইবে তাহার গঠনকর্ম্মের জন্য, ইহা তাহারা ভাল করিয়াই জানে।

প্রশান্ত মহাসাগরের অশান্ত রূপের অভিজ্ঞতা অবশ্য তাহাদের এই প্রথম নয়। বহুবার প্রতিকূল প্রকৃতি প্রচণ্ড শক্তিতে তাহাদের আঘাত করিয়াছে। ভূমিকম্পে দেশ ধ্বংস হইয়াছে, আণবিক বোমায় তাহাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে—তাহার পরও যে-জাতি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে, তাহাদের চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। ভগবান তাহাদের এই বিপদে সেই শক্তি দান করুন।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা ও তাহার ভেষজগুণ

আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা আজও সরকারের স্বীকৃতি পাইল না, ইহা যেমনই দুঃখের তেমনি অগৌরবের। আয়ুর্ব্বেদ ভারতেরই আবিষ্কৃত এবং ভারতের একটি গৌরবস্থানীয়। ভারতের চরক, সুশ্রুত, বাগভট প্রভৃতি ঋষিকল্প ব্যক্তিগণ যে সমস্ত ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার অনেকগুলি বর্ত্তমানে পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহেও স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসার অগ্রগতিকে আজ কেহই অস্বীকার করিবে না, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের অত্যাশ্চর্য্য গুণও উপেক্ষণীয় নয়। তা ছাড়া ভারতের জল-মাটিতে ভারতীয় চিকিৎসার উপযোগিতা বিদেশেও স্বীকৃত হইয়াছে। অবশ্য অ্যালোপ্যাথির তুলনায় আয়ুর্ব্বেদের স্থান আজ অনেক নামিয়া গিয়াছে। তাহার কারণও আছে। প্রথম কারণ, পাশ্চাত্ত্য দেশের সকল জিনিসের উপর আমাদের অহেতুক মোহ। দ্বিতীয় কারণ, বিদেশী রাজশক্তি কর্ত্তৃক আয়ুর্ব্বেদের উপেক্ষা। কিন্তু স্বাধীন ভারতে এই উপেক্ষার কোন যুক্তিযুক্ততা থাকিতে পারে না। আমাদের বিশ্বাস যে, গবর্ণমেণ্ট যদি আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির জন্য যথোপযুক্ত অর্থব্যয় করেন, তাহা হইলে দেশবাসী অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়ে চিকিৎসার ও রোগনিরাময়ের সুযোগ পাইবে। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-পদ্ধতি এরূপ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং রোগ নিরাময়ে উহা এরূপ ফলপ্রদ, যাহার ফলে দেশে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার সহিত আয়ুর্ব্বেদের সহ-অবস্থান চলিতে কোন বাধা নাই।

অবশ্য বলিতে দোষ নাই, প্রাচীন কবিরাজরাও ইহার অনেকখানি ক্ষতি করিয়াছেন। তাঁহারা গবেষণার মনোবৃত্তি লইয়া ইহার উন্নতির কোন চেষ্টাই করেন নাই, যাহার ফলে পরবর্ত্তী যুগে তত্ত্বান্বেষী যুবকেরা অন্ধকারেই হাতড়াইয়াছেন। অথচ আমাদেরই দেশের উপকরণ লইয়া, সোভিয়েট রাশিয়া কত সহজে গবেষণার পর গবেষণা করিয়া চলিয়াছেন। ১৯৫৭ সনে সোভিয়েট উদ্ভিদবিজ্ঞানী আর চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের একটি দল ভারতে আসিয়া ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে ব্যবহৃত ভেষজগুণসম্পন্ন গাছ-গাছড়া সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করেন এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ১৮০ রকম এই জাতীয় গাছ-লতা-গুল্মের বীজ বা চারা সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। তার পর হইতে সোভিয়েট দেশে এ সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা-অনুশীলন চলিয়াছে।

ঘৃতকুমারী আর কুমারী-লতাকে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে প্রয়োগ করা সম্পর্কে গবেষণা করিতে গিয়া সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা দেখিয়াছেন যে, চারা অবস্থাতেই ইহাদের রোগ-নিরাময়ের ক্ষমতা থাকে সবচেয়ে বেশী। এইরূপে করবী আর ধুতুরা হইতে যথাক্রমে হৃদরোগের আর বায়ুরোগের ঔষধ তৈয়ারী করিয়াছেন। হাঁপানী নিরাময়ে খুব কার্য্যকরী ঔষধ তৈয়ারী করা হইয়াছে 'বেলফল' হইতে।

বিপাকক্রিয়া বা মেটাবোলিজমের ব্যাঘাত ঘটিলে নানারূপ চর্ম্মরোগ দেখা দেয়। একথা ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রীরা অতি প্রাচীন কাল হইতেই জানেন। এক্ষেত্রে বিছুটি জাতীয় এক রকম গুল্মের রস হইতে ইঁহারা চমৎকার ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছেন। দুরারোগ্য 'ধবল'ও ইহাতে সারিতেছে।

এই সমস্ত ঔষধই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের হাসপাতালগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। আরও কতকগুলি ঔষধ লইয়া তাঁহারা গবেষণায় রত আছেন। তাঁহারা আশা করেন, একদিন এই ঔষধগুলি পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হইবে।

সোভিয়েট রাশিয়ার এই অধ্যবসায় দেখিয়া আমাদের শিক্ষা হওয়া উচিত।

মাইক, লাউডস্পীকার

মাইক বা লাউডস্পীকারের প্রতাপ হইতে আমরা কবে মুক্ত হইব জানি না। কোন রকম পূজা-পার্ব্বণ উপস্থিত হইলেই সাধারণ শান্তিপ্রিয় নাগরিকের মনে ইহা কেমন একটা আতঙ্কের উদ্রেক করিয়া তুলিতেছে। গত বৎসর হইতে কলিকাতায় পুলিস ইহার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের কতকটা ব্যবস্থা করিতেছে বটে, কিন্তু সংক্রামক-ব্যাধির মত ইহার প্রতাপ মফঃস্বল শহরে ও পল্লীতে গিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে। সেখানে মাইকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের কোন-রূপ ব্যবস্থা হইতেছে না। দুর্গাপূজার সময় চার-পাঁচ দিন অনবরত মাইক চলে এবং ঐ ঐ অঞ্চলবাসী জনসাধারণের প্রাণ অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। পূজামণ্ডপের পার্শ্ববর্ত্তী কোন গৃহে যদি রোগী থাকে তবে মাইক বা লাউড স্পীকারের অবিরাম চীৎকার হেতু তাহার ভবলীলা সাঙ্গ করিবার ব্যবস্থাও করিয়া তোলা হয়। সামান্য পূজা-পার্ব্বণেও এই মাইক একটি অতীব অবাঞ্ছনীয় বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শুধু পূজা-পার্ব্বণই বা বলি কেন, বিবাহে, বৌভাতে, অন্নপ্রাশনে,

উপনয়ন-সংস্কারে সকল ব্যাপারেই মাইক নিজস্ব প্রতাপ বিস্তার করিতেছে। স্বদেশীয় গীতবাদ্য, ঢাক-ঢোল-কাঁসি কি রসাতলে গেল? শাসন-কর্তৃপক্ষ শুধু নয়, জনসাধারণকেও এই অস্বস্তিকর শান্তিনাশক মাইকের দৌরাত্ম্য হইতে আত্মরক্ষার জন্য সক্রিয়ভাবে তৎপর হইতে হইবে।

আগরতলায় সেণ্ট্রাল এম্বুলেন্স-ইউনিট

এম্বুলেন্স সরবরাহ ব্যাপারে কোন সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা না থাকায় মফঃস্বলের রোগীদের প্রায়ই চিকিৎসা-বিভ্রাট ঘটে। ডিস্পেন্সারী ও হাসপাতাল আঞ্চলিক পরিষদের নিকট হস্তান্তরের পর ভি, এম হাসপাতালের এম্বুলেন্স আগরতলা হইতে ৫ মাইলের মধ্যে যাতায়াত করে। পরিষদের নিকট মাত্র একটি এম্বুলেন্স আছে কিন্তু জটিল নিয়ম-কানুনে এম্বুলেন্স গাড়ী পাওয়া এক সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। ইহা ছাড়া একটি এম্বুলেন্স দ্বারা সমগ্র ত্রিপুরার চাহিদা মিটিতেও পারে না। এখানের চিন্তানায়কগণ মনে করেন যে, ত্রিপুরা প্রশাসন কর্ত্তৃক আগরতলায় একটি সেণ্ট্রাল এম্বুলেন্স ইউনিট স্থাপিত হইলে এম্বুলেন্স সমস্যার সমাধান সম্ভব।

ত্রিপুরার 'সেবক' পত্রিকার উক্ত সংবাদের প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। কারণ সমাজ-কল্যাণ কার্য্যে ইহা অপরিহার্য অঙ্গ।

বর্দ্ধমানে বিধ্বস্ত গ্রামসমূহ

দামোদরের দক্ষিণ তীরস্থ বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের বর্দ্ধমান শহরের সদরঘাট হইতে মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ রায়না থানার হিজলনা ইউনিয়নে এ পর্য্যন্ত কোন সরকারী সাহায্য পাঠানো হয় নাই। অবিলম্বে ঐ ইউনিয়নে সরকারী সাহায্য পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতেছে বলিয়া আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল। বন্যাবিধ্বস্ত হইবার পর দশ দিন পরেও সেখানে কোন সাহায্য দেওয়া হয় নাই। এই ইউনিয়নের বেলসর, কয়রাপুর, মাছখাড়া, বন্তীর গ্রাম বিশেষভাবে বন্যাবিধ্বস্ত হইয়াছে এবং অধিবাসীগণের মধ্যে অধিকাংশকেই অর্দ্ধাহারে অনাহারে থাকিতে হইয়াছে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে এই থানার আরুই ও গোতান ইউনিয়ন আংশিক প্লাবিত হওয়া সত্ত্বেও সেখানে সরকারী সাহায্যকারী দল পাঠানো হইয়াছে। রায়না থানার বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের মধ্যে একমাত্র হিজলনা ইউনিয়নকেই সাহায্য দেওয়া হয় নাই। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস-প্রেসিডেণ্ট যথাসময়েই উক্ত ইউনিয়নের দুর্দ্দশার কথা কর্তৃপক্ষকে জানাইয়াছেন।

'দামোদরে'র এই সংবাদটির প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

পাগলাঘাটা করলানদীর উপর পুল

জলপাইগুড়ির 'জনমত' পত্রিকা জানাইতেছেন:

বারপেটিয়ার পাগলাঘাটা করলানদীর উপরে একটি পুল তৈরির প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী অনুভূত হইতেছে। এই অঞ্চলের নাথুয়ার চর, তুলসীর চর, কাছারগাব, মৌয়ামারী, ধোদাগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলের প্রায় শত লোকের এই পুলটির অভাবে নানা অসুবিধায় পড়িতে হয়। এই অঞ্চলের হেলথ সেণ্টারের সুযোগ লইতে হইলে প্রত্যেককেই মালিভিটা যাইতে ৬ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া অনেক ঘুরিয়া তবে গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইতে হয়। পাগলাঘাটে পুল তৈরি হইলে মাত্র দেড় মাইল পথ অতিক্রম করিয়াই হেলথ সেণ্টারে যাওয়া যাইবে। আমরা জানিলাম জেলা সমাহর্ত্তা মহাশয় এই পুলটি তৈরির আশ্বাস গত এক বৎসর আগে দিয়াছিলেন। কিন্তু অদ্যাবধিও কোন ফল ফলে নাই।

কর্ম্মী আছে কাজ নাই

বর্দ্ধমানের 'দামোদর' বলিতেছেন:

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগ হইতে গত ৫ মাস যাবত প্রায় ১০০ জনকে জি. ডি, এইচ বিজয়চাঁদ হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। তাহাদের বেতন ৫৫ টাকা হইতে ৭৫ টাকা পর্য্যন্ত। তাহাদের কোন ডিউটি ঠিক করিয়া পাঠানো হয় নাই বলিয়া তাহারা বসিয়া আছে। গত ৪ মাস ধরিয়া প্রায় ৪০ জন মহিলা আরও পাঠান হইয়াছে, তাহাদেরও কোন ডিউটি নাই। হাসপাতালে বাগান করিবার জন্য ৮টি মালী আছে তাহাদের বেতন মাসিক ৭৫্ টাকা কিন্তু বাগান দূরে থাকুক, হাসপাতাল প্রাঙ্গণের চোরকাঁটাও পরিষ্কার করা হয় না। স্বাস্থ্যমন্ত্রী গত ২৩শে আগষ্ট হাসপাতাল পরিদর্শনে আসেন তখন দেখা যায় অধিকাংশ ঔষধই নাই।

সাধারণ পরিষদে তিব্বত প্রসঙ্গ

আনন্দবাজার পত্রিকা লিখিয়াছেন:

'নিউইয়র্ক, ২৮শে সেপ্টেম্বর—ওয়াকিবহাল মহলের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, অদ্য রাত্রে আয়ার্লণ্ড ও মালয় যুক্তভাবে তিব্বত পরিস্থিতি সম্পর্কে সাধারণ পরিষদে বিতর্ক অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন।

ঐ মহলের সংবাদে প্রকাশ যে, আয়ার্লণ্ড এবং মালয়ের প্রতিনিধির আনুষ্ঠানিক ভাবে সেক্রেটারী-জেনারেলের নিকট উপযোক্ত মর্ম্মে অনুরোধ জানাইয়াছেন। আগামীকল্য আয়ার্লণ্ড এবং মালয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত যুক্তপ্রস্তাবের বিবরণ প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

অপর একটি সংবাদে প্রকাশ যে, আয়ার্লণ্ডের প্রতিনিধিগণ সাধারণ পরিষদে তিব্বত প্রসঙ্গ উত্থাপনের যে পরিকল্পনা করিয়া-

ছিলেন, সে সম্পর্কে আশানুরূপ সমর্থন পাওয়া যায় নাই। আয়ার্লণ্ড এবং মালয়ের প্রতিনিধিরা ঐ প্রসঙ্গ লইয়া বর্ত্তমানে আর অগ্রসর হইবেন না বলিয়া ওয়াকিবহাল মহল মনে করিতেছেন।

কুমারী আরতি সাহার চ্যানেল অতিক্রম

উনিশ বৎসর বয়স্কা ছাত্রী কুমারী আরতি সাহা ১৬ ঘণ্টা ২০ মিনিটে ফ্রান্স হইতে ইংলণ্ডের পথে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করিয়া অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ইনি শুধু এশিয়ার প্রথম মহিলা হিসাবে গৌরব অর্জ্জন করিলেন না, বয়স হিসাবেও তিনি সর্ব্বকনিষ্ঠা সাঁতারু। ইহার পথপ্রদর্শক ক্যাপ্টেন হাটিনসন প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, কুমারী আরতি যে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে চ্যানেল অতিক্রম করিয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে আমি এইরূপ দেখি নাই। ইহা আরতির পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। আমরা ভারতবাসী হিসাবে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

সৈয়দ ফজল আলী

আসামের রাজ্যপাল সৈয়দ ফজল আলীর মৃত্যুতে ভারতের একজন প্রবীণ বিচক্ষণ আইনবিশারদের জীবনাবসান হইল। তাঁহার কীর্ত্তি বহুপ্রসারিত এবং গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্যপাল হিসাবেও তিনি আসামে যাইবার পূর্ব্বে উড়িষ্যায় দুই বৎসর রাজ্যপালপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহারও পূর্ব্বে তিনি বরাবর বিশেষ গুরুত্ব ও দায়িত্বপূর্ণ বহু সম্মানিত পদের কর্ত্তব্যপালনে নিজের প্রতিভা, কর্ম্মদক্ষতা ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়া ক্রমোন্নতির শীর্ষে পৌঁছিয়াছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ছাপরা ও পাটনায় ব্যারিষ্টাররূপে কর্ম্মজীবন আরম্ভ করেন। ১৯২৮ সনে তাঁহাকে পাটনা হাইকোর্টের একজন বিচারপতি নিয়োগ করা হয় এবং উহার দশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯৩৮ সনে পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ক্রমশঃ আরও উর্দ্ধে এবং আরও ব্যাপকভাবে প্রসারিত হইতে থাকে। ভারতের ফেডারেল কোর্টের ও সুপ্রীম কোর্টের জজরূপে তিনি সাত বৎসরকাল বিচার-বিভাগীয় উর্দ্ধতনপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘের দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রতিনিধি হিসাবে ভারত হইতে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

ভারতের এই প্রবীণ, বিচক্ষণ রাজ্যপালের মৃত্যুসংবাদে ভারতবাসী মাত্রেই মর্ম্মাহত।

শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

কবি শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ৭৩ বৎসর বয়সে সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। যে অর্থে আমরা সাহিত্যসেবী বা সাহিত্য-সাধক বলিয়া থাকি, শৌরীন্দ্রনাথের মধ্যেও আমরা তাহা পূর্ণমাত্রায় লক্ষ্য করিয়াছি। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গবাসী সত্যসত্যই একজন সাধক সন্তান হারাইলেন।

শৌরীন্দ্রনাথ পাবনা জেলার অধিবাসী ছিলেন, কিন্তু মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত সুবিখ্যাত কাশিমবাজারকেই তিনি জন্মভূমি রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যসাধনা এই কাশিমবাজারেই সুরু হয় এবং তাঁহার অধিকাংশ রচনাই এই কাশিমবাজারে বসিয়াই আত্মপ্রকাশ করে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁহার প্রচুর কবিতা প্রকাশিত হয়। 'প্রবাসী'র ছিলেন তিনি একজন নিয়মিত লেখক। বর্ত্তমান সংখ্যায়ও অন্যত্র তাঁহার একটি কবিতা প্রকাশ করিলাম।

তিনি সত্যকার সাধকের মত কবিতা লিখিয়াই যাইতেন, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইলেও, পুস্তকাকারে গ্রথিত করিবার বাসনা তাঁহাতে অত্যন্ত কমই লক্ষ্য করিয়াছেন। 'পদ্মরাগ' নামে তাঁহার একখানি কবিতার বই বহু বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার আর একখানি কবিতা পুস্তক প্রকাশিত হয় 'বাঁশীর আগুন' নামে। তিনি অমায়িক ও বন্ধুবৎসল ছিলেন। সাহিত্যিক বন্ধুদের নানা ভাবে সাহায্য করিতেও তিনি যত্ন লইতেন। তিনি শেষ জীবনে সরকারের নিকট হইতে কথঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য লাভ করেন। আমরা তাঁহার মৃত্যুতে আত্মীয়-বিয়োগের ব্যথা অনুভব করিতেছি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

আগামী ১৩৬৭ সালের বৈশাখ মাসে "প্রবাসী" ৬০তম বৎসরে পদার্পণ করিবে। দীর্ঘকাল যাবৎ ইহা বঙ্গভারতীর সেবায় নানাভাবে নিজেকে নিয়োজিত রাখিয়াছে। এই বৎসরটি আমাদের নিকট বড়ই শ্লাঘনীয়। এ সময়ে আমরা বিগত ষাট বৎসরে কতদূর চিন্তায় ও কর্ম্মে অগ্রসর হইয়াছি প্রবাসীর ফাইল-গুলি পরিদৃষ্টে তাহার সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা জন্মিতে পারে।

আমরা এই কার্য্যের প্রথম ধাপস্বরূপ বিগত যুগের বিবিধ লেখক ও মনীষীর রচনা হইতে কিছু কিছু পুনর্ম্মুদ্রিত করিতে প্রয়াস পাইব। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শিল্পীর উৎকৃষ্ট চিত্রসমূহ হইতে কোন কোনটি আমরা পুনরায় প্রকাশিত করিব। বর্ত্তমান সংখ্যায়ই পাঠক-পাঠিকা আমাদের এই প্রবন্ধের পরিচয়স্বরূপ দুইখানি চিত্র পুনর্ম্মুদ্রিত দেখিতে পাইবেন।

প্রবাসীতে যে-সব রচনা প্রকাশিত হইত, লিখন-শৈলী, বাচন-ভঙ্গী এবং ভাষ-পারিপাট্য গুণে তাহার অনেকগুলিই এ যুগের পাঠক-পাঠিকাদের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই সকল হইতে কিছু কিছু পুনর্ম্মুদ্রিত হইলে প্রবীণ পাঠক-পাঠিকাগণও পূর্ব্ব-স্মৃতি অনেকটা জাগরূক করিয়া তুলিতে পারিবেন। আমাদের এই প্রযত্ন আশা করি সকলেরই তৃপ্তিপ্রদ হইবে।

পূজার ছুটি

শারদীয় পূজা উপলক্ষে 'প্রবাসী'-কার্য্যালয় আগামী ২১শে আশ্বিন (৮ই অক্টোবর) বৃহস্পতিবার হইতে ৩রা কার্ত্তিক (২১শে অক্টোবর) বুধবার পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা আপিস খুলিবার পর করা হইবে।

কর্ম্মাধ্যক্ষ, প্রবাসী

ঐতিহাসিক আচার্য্য যদুনাথ সরকার

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

"উৎপস্যতে অস্তি বা কোঽপি মে সমানধর্ম্মা।
কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী॥"

১

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় ইতিহাস-কংগ্রেসের কটক অধিবেশনে শাখা-সভাপতি হিসাবে আমি গতানুগতিক এক অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলাম। সভার পরে আমার ঘরে বসিয়া এক বিশিষ্ট ঐতিহাসিক বন্ধু সরস শ্লেষের ভঙ্গিতে মন্তব্য করিলেন, আপনার অভিভাষণ শুনিয়া ধারণা হইল যেন ভারতবর্ষে একজন মাত্র ঐতিহাসিক আছেন! অনবধানতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বন্ধুবরের ক্ষোভ দূর করিলাম বটে, কিন্তু মন্তব্যটা মনের উপর দাগ কাটিয়া গেল। এইরূপ অভিভাষণ গবেষক ও উদীয়মান ঐতিহাসিকগণের নামোল্লেখ করিয়া প্রশংসা করিবার রীতি অন্যান্য শাখার সভাপতিরা পালন করিয়াছেন, আমি করিলাম না কেন? সভা-মজ্‌লিসে-আড্ডায় অভিভাষণে বন্ধুমহলে মুরুব্বিয়ানা কিংবা পরস্পর গাত্রকণ্ডুয়ন একটা সামাজিক প্রথা বটে, কিন্তু আসলে ইহা একটি নৈতিক ব্যাধি। কাহাকেও উপেক্ষা করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। ঐতিহাসিক হিসাবে দ্বিতীয় ব্যক্তির নামোল্লেখ করিতে গেলেই আমাকে লইয়া তেত্রিশ কোটি দেবতার বন্দনা করিতে হয়; এই দায় এড়াইতে গিয়া আমি হয়ত অনেকের আশাভঙ্গ করিয়াছিলাম! সেই দিন হইতে আমার মনে এই প্রশ্ন জাগিয়াছে ইংরেজী শব্দের তর্জ্জমা "ইতিহাস" ও "ঐতিহাসিক" যত্রতত্র বাংলায় প্রয়োগ হইলেও ইহার দ্বারা ইতিহাস ও ঐতিহাসিককে খর্ব করা হয় না কি? লোকে ভদ্রতার খাতিরে আমাকেও ঐতিহাসিক বলে, আমিও দম্ভ করিয়া মাঝে মাঝে নিজকে ঐতিহাসিক বলিয়া থাকি; কিন্তু এই গৌরব আমার ন্যায্য প্রাপ্য কি? ইহার পরে আমি নিজের বহিগুলি দ্বিতীয়বার পড়িয়া দেখিলাম কোনটাই আধুনিক পণ্ডিতসমাজে গ্রহণীয় "ইতিহাস"-সংজ্ঞার পর্য্যায়ে উঠে নাই, প্রকৃত ঐতিহাসিকের যে সমস্ত গুণের অধিকারী হওয়া উচিত উহার পরিচয় আমার পুস্তকে নাই। আমি গবেষণামূলক জীবনচরিত্র (biography) লিখিয়াছি, "ইতিহাস" লিখি নাই। এই যুগে Carlyle ঐতিহাসিক নহেন; "শূর-পূজা"ও ইতিহাস নহে।

আবুল ফজলের "আকবরনামা" অন্য লেখকগণের "নামা"র মত শুধু জীবনী হইলে তিনিও ঐতিহাসিক সমাজে স্থান পাইতেন না, আমি ত দূরের কথা। Trevelyan সাহেব "Garibaldi" লিখিয়া ঐতিহাসিক হইতে পারেন নাই; "Social History of England" পুস্তক তাঁহাকে এই গৌরবের যথার্থ অধিকারী করিয়াছে। বিরাট ইতিহাস না লিখিয়াও শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকের আসন পাওয়া যায়—যথা Lord Acton; যেহেতু প্রতিভাবলে তিনি ইতিহাসের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। উক্ত কারণেই Toynbee আধুনিক যুগে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক।

ঘরে বাহিরে সকলেই যদুনাথকে ঐতিহাসিক বলিয়া সমীহ করে; সুতরাং তিনিই আমাদের মাপকাঠি। তাঁহার কৃপায় আমি কত বড় ঐতিহাসিক হইয়াছি বুঝিবার জন্য মাপিয়া দেখিলাম, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর দাঁড়াইয়া মেরুদণ্ড সোজা করিলেও মাথা গুরুজীর কোমর পর্য্যন্ত পৌঁছায় না! অন্যান্য ভারতীয় ঐতিহাসিকগণকে পরলোক হইতে আমন্ত্রণ করিয়া (আমার নমস্য অধ্যাপকবর্গ ব্যতীত) পাশে দাঁড় করাইয়া দেখিলাম সকলেই যেন তাঁহার বগলের নীচে! ইহা দৃষ্টিভ্রম না মতিভ্রম?

২

প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে আচার্য্য যদুনাথের এক প্রাক্তন ছাত্র এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক কথাপ্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছিলেন, আওরঙ্গজেবের পিছনে পড়িয়া গুরুজী জীবনটাই মাটি করিলেন; আকবরের ইতিহাস লিখিলে পরিশ্রমটা সার্থক হইত, বহির কাটতিও বেশী হইত। মাটির গুণে আমার মাথা গরম হইয়া উঠিলেও কথাটা হাঁ জী, হাঁ জী করিয়া হজম করিলাম, কোন অনর্থ ঘটে নাই। ১৯২০ ইংরেজীতে গুরুগৃহ হইতে বিদায় লওয়ার সময় আচার্য্য যদুনাথ বলিয়া দিয়াছিলেন, যে যাহা বলে শুধু "হাঁ জী, হাঁ জী" করিয়া শুনিয়া যাইবে, তর্ক করিবে না। তাঁহার আদেশ অবিচারে যথাসামর্থ্য পালন করিয়া আসিতেছি এবং ইহাতে সব দিক রক্ষা হইয়াছে। যাহা হোক, তিনি ইহাও বলিয়া দিয়াছিলেন, বিপক্ষের কথা অপ্রিয় হইলেও উপেক্ষা করিবে না, ধীরভাবে উহার গুরুত্ব বিবেচনা করিবে। এই

জন্য আমি উক্ত মন্তব্য গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছিলাম, উহাতে বহি কাটতির পাটোয়ারি বুদ্ধিটা বাদ দিলে, বাকী অংশ আংশিক সত্য বলিয়াই মনে হইয়াছিল। আমার মনে প্রশ্ন জাগিল। যদুনাথ আকবরের ইতিহাস না লিখিয়া আওরঙ্গজেবের ইতিহাস লিখিতে গেলেন কেন? তাঁহার ইতিহাসচর্চ্চার দ্বারা দেশ ও জাতি কতটুকু উপকৃত হইয়াছে? আকবরের ইতিহাস লিখিলে আচার্য্য যদুনাথ দেশ তথা জাতির কী কল্যাণ সাধন করিতেন, এবং আওরঙ্গজেবের ইতিহাস রচনার দ্বারা কোন অকল্যাণ করিয়াছেন—ইহা ভাবিবার বিষয় সন্দেহ নাই।

আকবরের ইতিহাস পড়িয়া দেখিলাম, সে যুগে গণ-দেবতা নাই, দেশ নাই, জাতি (nation) নাই। আকবরের অলোকসামান্য রাজন্যপ্রতিভা, "নবরত্ন"-বন্দিত সাম্রাজ্যলক্ষ্মী, সম্রাটের নীতিনিয়ন্ত্রিত ন্যায়দণ্ড যে দেশে জাতিগঠনে বিফল হইয়াছে, ঐতিহাসিক আবুল ফজলের অপরিমেয় বিদ্যা, ভূরিস্রবা লেখনী এবং ভাষার জলদ-নির্ঘোষ যে সমাজের বিচারবুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে না, সে ক্ষেত্রে বর্ত্তমান যুগে আচার্য্য যদুনাথ আকবরের ইতিহাস লিখিয়া কাহার উপকার করিতেন?

ষোড়শ শতাব্দীতে আকবরের অসফল স্বপ্ন বিংশ শতাব্দীতে বাস্তবতার রূপ গ্রহণ করিবে বলিয়া কেহ কেহ আশা করেন, যেহেতু পণ্ডিত জবাহরলালজী হয়ত অজ্ঞাতসারে আকবরের পথেই চলিয়াছেন। যাহাকে আমরা "জাতি" বলিয়া ভ্রম করিতেছি, ইহা আকবর-জবাহরলালজীর কাম্য সেই মহাজাতি নহে। বর্ত্তমান ভারতীয় জাতি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এখনও সংকীর্ণবুদ্ধি সম্প্রদায়-সহস্রের সাময়িক ঐক্য এবং মৌখিক ঐক্য; এই জন্যই পণ্ডিতজী মাঝে মাঝে আমাদের nationalism-এর মুখোসের আড়ালে regionalism, casteism, communalism-এর নগ্নমূর্ত্তি দেখিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়েন। পরিস্থিতি দেখিয়া স্বাধীনতার দিনেই ভারত-মাতা শরশয্যা লইয়াছেন; তাঁহার বক্ষপঞ্জরে উভয় পার্শ্বে অর্দ্ধবিদ্ধ শাণিত ছুরিকা, উদরের মধ্যে মায়াবী বাতাপী-ইল্বল, অঙ্গে অহিংসা-চিত্রিত নামাবলী। আকবরের রাজত্বে ভারতীয় মহাজাতি পায়ের উপর ভর করিয়া না দাঁড়াইতেই হিন্দু মুসলমান মারাঠি গলা টিপিয়া মারিয়াছে। এই পাপে হিন্দুজাতি আলমগীর-শাহী রৌরবে পড়িয়াছে, মুসলমান মোগল সাম্রাজ্য হারাইয়াছে, হিন্দু-মুসলমান দেড় শত বৎসরের অধিক বিলাতী লাঙ্গল টানিয়া রক্তবমন করিয়াছে। আকবরের অসাফল্যের পরিণাম আওরঙ্গজেব, আওরঙ্গজেবের অসাফল্যের পরিণাম মোগল সাম্রাজ্যের অবসান। এই শিক্ষা আওরঙ্গজেবের ইতিহাসেই পাওয়া যায়, আকবরের ইতিহাসে নহে।

আকবরের ইতিহাস নূতন করিয়া লিখিবার অবকাশ এবং প্রয়োজনীয়তা নাই—এই কথা মোল্লা সমাজ বলিতে পারে, কেননা সত্যমিথ্যা যাহা কিছু আকবর সম্বন্ধে বলিবার ছিল, সে যুগের ধর্ম্মপ্রাণ মোল্লা আবদুল কাদের বদায়ূনী প্রাণ খুলিয়া বলিয়া গিয়াছেন! বদায়ূনী আকবরশাহী দরবারের ইমাম ছিলেন। বাদ্‌শার কাফেরী খেয়াল দেখিয়া তিনি চাকরি ইস্তফা দিয়াছিলেন। তিনি মনের দুঃখে বলিয়াছেন, হায় হায় ইসলাম গেল; আরবী ও মৌলবীর পাট উঠিয়াছে, মসজিদ আস্তাবল হইয়াছে; আলা হজরত হুকুমজারি করিয়াছেন, তোমরা গরু জবাই করিতে পারিবে না, গাইয়ের গোস্ত খাইতে পারিবে না, বরং গোমূত্র পান কর! প্রকাশ্যেই হজরত রসুল্লাহর নিন্দা করিয়া মরিবার সময় আকবরের বন্ধু কবি ফৈজী জলাতঙ্ক রোগীর ন্যায় কুকুরের ডাক ডাকিয়াছিলেন; আকবর কি করিয়াছিলেন স্পষ্ট জানিবার উপায় নাই। আকবরের ইতিহাস অসম্পূর্ণ রাখিয়া বদায়ূনী মুসলমান সাধক ও বিদ্বানগণের জীবনী (Muntakhabut Tuarikh, Vol-III) সঙ্কলন আরম্ভ করিয়াছিলেন; যেহেতু আকবরশাহী দরবারের পাষণ্ড (লুচ্চা: Luchchaha-i-Zamana)-দিগের কথা লিখিয়া লেখনী কলুষিত করাই পাপ! মৃত্যুশয্যায় আকবর আল্লার নাম লইয়াছিলেন কিনা এই বিষয়ে মোল্লাপন্থীগণের মধ্যে একটা সন্দেহ ছিল, হয়ত অশোভন গুজবও রটিয়াছিল; না-হয় আবুল ফজলের মৃত্যুর পর লিখিত "আকবর-নামা"র উপসংহারে আকবর কলমা পাঠ করিয়াছিলেন, এই কথা ফলাও করিয়া লিখিবার কারণ কি ছিল?

যাহা হৌক, আকবরের নাম লইলে ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমান আফসোস করেন, আওরঙ্গজেবের নাম করিয়া আল্লার "দোয়া" কামনা করেন। মোল্লাশাসিত মুসলমান-সমাজ হিন্দু-বেঁষা আকবরকে "একঘরে" করিয়াছেন,—যেখানে তিনি আবুল ফজলের সহিত দোজখের ইন্তেজার (অপেক্ষা) করিতেছেন। প্রমাণ? পাকিস্থানে মুসলমানের যম এবং লামাপন্থী বৌদ্ধ চেঙ্গিস খাঁর নামেও জাতীয় উৎসবে তোরণ নির্ম্মিত হয়, আকবরের জন্য নহে। উদারচেতা সুপণ্ডিত মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত দেশপ্রেমিক অল্পসংখ্যক মুসলমান ব্যতীত দুনিয়ার বাদবাকী মুসলমান সকলেই কি অবুঝ? এই বিচার মুসলমানই করিতে পারে, অমুসলমানের সাধ্য নহে। আকবরের প্রতি শিক্ষিত-অশিক্ষিত মুসলমান সমাজের বৃহত্তর অংশের এই আক্রোশ কেন? স্বাধীনতা হারাইলে হিন্দুর

যেমন বিলাপ করিবার অধিকার আছে, মুসলমান এবং ইংরেজকে গালাগালি দিয়া নিজের দোষ ঢাকিবার প্রয়াস আছে, হিন্দুস্থানের মৌরসী বাদ্‌শাহী হারাইয়া মুসলমানেরও মতিচ্ছন্ন হইবার অধিকার আছে! মুসলমান মনে করে আকবর বাদশাহর মত পাপী জালিম দজ্জাল মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ না করিলে ভারতে মুসলমান আধিপত্য কখনও ধ্বংস হইত না। ইতিহাস এই কথা উড়াইয়া দিতে পারে না। শরিয়তের ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত তুর্কী-তোগলক-পাঠান সাম্রাজ্যকে নিজের খেয়ালে নূতন ছাঁচে ঢালাই করিতে গিয়া মুসলমান সাম্রাজ্যের কবর তিনিই খনন করিয়াছিলেন, শাহজাহান ও আওরঙ্গজেব ঐ সাম্রাজ্যকে আবার বিশুদ্ধ ইসলাম ও শরিয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রশংসনীয় উদ্যম করিয়াছেন; আকবর যে গাছের মূল শিকড় কাটিয়া দিয়াছিলেন, আওরঙ্গজেব উহাকে কেমন করিয়া বাঁচাইবেন? বাদ্‌শাহ হইয়া আকবর স্বয়ং মুসলমান সমাজে বিরাট কুদৃষ্টান্ত; রোজা নাই, নমাজ নাই, কখনও কপালে তিলক, কখনও এক পায়ের উপর দাঁড়াইয়া সূর্য্যের সহস্রনাম পাঠ! তিনি মুসলমানের ন্যায্য অধিকারে হিন্দুকে শরীক করিয়া দিলেন, ধর্ম্মানুষ্ঠানে হিন্দুকে শরিয়তবিরোধী অধিকার দিয়াছিলেন, জিজিয়া কর রহিত করিয়া এবং দরবারে মনসবদার হিসাবে রাজপুতকে মোগল-পাঠানের মাথার উপর বসাইয়া হিন্দুর হাতে মুসলমান রাজ্য তুলিয়া দিলেন। সুলতানী আমলে মন্দির ভাঙ্গা হিন্দুর গা-সহা হইয়া গিয়াছিল, আকবরের রাজত্বে মথুরা ও অন্যান্য স্থানে মন্দির বানাইবার হিড়িক পড়িয়া গেল, মসজিদগুলি সংস্কারের অভাবে চামচিকার আস্তানা হইল। মোট কথা, হিন্দুর টিকির জন্য আকবরের যতটুকু দরদ ছিল, মুসলমানের দাড়ির (অর্থাৎ ইজ্জত) জন্য উহার অর্দ্ধেকও ছিল না। আকবরের পূর্ব্বে হিন্দুর চৌদ্দপুরুষ বিনা ওজরে জিজিয়া কর দিয়া আসিতেছিল, আকবর হইতে তিনপুরুষের পর আওরঙ্গজেব যখন জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্ত্তন করিলেন তখন হিন্দুরা আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইল কেন? ইহা মানুষের স্বভাব, কথায় বলে, "দিয়া দান হরণে, গতি নাই মরণে"। ইংরেজ এই ভুল করিয়াই ভারতবর্ষ হারাইয়াছে। ভারতীয়েরা না চাইতেই ইংরেজ বিবিধ উপকার ভারতের উপর বর্ষণ করিয়া ভারতের স্বাধীনতার ক্ষুধা তীব্রতর করিয়াছিল; লর্ড রিপনের আমলে ইংরেজ প্রভুত্বের যে ক্ষতি সাধিত হইয়াছিল, উহার নিমিত্ত ইংরেজকে উদার আদর্শচ্যুত হইতে হইল; লর্ড কার্জ্জন তাল সামলাইতে পারিলেন না, ব্রিটেনিয়ার সিংহাসন টলিল। আওরঙ্গজেব ইতিহাস লেখা বন্ধ করিয়াছিলেন, যেহেতু তাঁহার চোখে ইতিহাসই অনিষ্টের মূল। বস্তুতঃপক্ষে আবুল ফজলের প্রভুর ছায়ায় থাকি খাঁর আওরঙ্গজেব চিত্রিত না হইলে হিন্দুর চোখে আওরঙ্গজেবকে মন্দ দেখাইত না, অথবা কবির ভাষায় বলিতে হয়ঃ

"ঝোলে বলে দিবসের অঞ্চলে গোধূলি;
যতই তমসা বলে বোধ হয় মনে। না থাকিলে
রবি বিশ্বনয়ন পুত্তলী, দিবা বলে বোধ হ'ত নিশার তুলনে।
স্বাধীন অপক্ষপাতী আর্য্য রাজ্যপরে তেমতি যবন রাজ্য
স্বজাতি-প্রবণ। সন্দেহ হইত কিনা রাবণ ঘৃণিত
রামের ছায়ায় যদি না হ'ত চিত্রিত (পলাশীর যুদ্ধ)
[মুগ্ধবোধ টীকা করিয়া রসভঙ্গ করা হইল না।]

৩

সনাতনী হিন্দুর চোখে মুসলমানের ইতিহাস পড়িলে আওরঙ্গজেবকে বলিতে হয় "ভ্রাতৃহন্তা পিতৃদ্বেষী পাপী আওরঙ্গজেব"। আওরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া শরিয়তের আয়নায় শিবাজীকে দেখিয়াছিলেন, "শিবাজী দস্যু, শিবাজী তস্কর"। উভয় সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিক সত্য, কিন্তু ইতিহাস নহে—অন্ধের হস্তিদর্শন।

হিন্দু ও মুসলমানের ভুরুর নীচে দুইটি চোখ ব্যতীত উপরে অজ্ঞাতস্থানে আর একটি চোখ সৃষ্টিকর্ত্তা লুকাইয়া রাখিয়াছেন—উহাই প্রজ্ঞাচক্ষু, যাহা দ্বারা সত্যের স্বরূপ দর্শন হয়, ঐ প্রজ্ঞাচক্ষু জাতির স্বাধীনতার দিনে উন্মীলিত হয়, দাসত্বে অন্ধ হইয়া যায়। এই স্বাধীনতা শুধু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নয়, চিন্তার স্বাধীনতা এবং সর্ব্ববিধ সহজ সংস্কার হইতে বুদ্ধি ও বিচারের মুক্তি। এইরূপ মুক্তপুরুষই ইতিহাস-চর্চ্চার পূর্ণ অধিকারী। পরাশ্রিতা কাব্যলক্ষ্মী অনৃতভাষিণী প্রিয়ম্বদা (কালিদাসের "প্রিয়ম্বদা" নয়); পরাশ্রিতা ইতিহাস-সরস্বতী সাক্ষাৎ কুমতি। দুর্জ্জন অনধিকারীকে আশ্রয় করিয়া ভণ্ড ভক্তকে দ্রুত নিয়তির পথে বসাইবার জন্য দুষ্টা সরস্বতী বরপ্রদা হইয়া থাকেন। ইতিহাস-সরস্বতী স্বয়ং অনাসক্তা নির্ব্বিকার সেবাপরায়ণা পরিব্রাজিকা, সত্য-সুন্দরের উপাসিকা; মানবী কল্পনায় তিনি বাণভট্টের "মহাশ্বেতা", কিরাতার্জ্জুনীয়ের "দ্রৌপদী" নহেন কিংবা মধুসূদনের "জনা"ও নহেন। প্রকৃত ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক দেশকালনিরপেক্ষ সহজ সংস্কারমুক্ত,—মতবাদীর সংঘর্ষ এবং বাহবাস্ফোটনের বহু উর্দ্ধে। ইতিহাসের ধর্ম্মাধিকরণে নিন্দুক ও স্তাবকের "ব্যঙ্গ", "বক্র", "অধিবল" ও "অতিশয়োক্তি" বাগাড়ম্বর সূক্ষ্ম বিচারধারাকে প্রভাবিত করিতে পারে না। এই জন্যই মনে হয় হিন্দুর মহাভারত আধুনিক সংজ্ঞানুসারে ইতিহাস না হইলেও, কল্পিত কিংবা বাস্তব "বেদব্যাস" একমাত্র এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক।

ইতিহাসের বিশ্বরূপ দর্শন তিনিই করিয়াছেন। ঐ রূপ আমাদের ধারণার অতীত, গীতার "মহাকাল"কে শিবরূপে কল্পনা করিলে ইতিহাসরূপী মহাকালের বন্দনা কালিদাসের ধীর উদাত্ত ভাষায় করিতে হয়:

"যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতম যা হবি র্যা চ হোত্রী।
যে দ্বে কালং বিধত্ত শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্।"

শক্তি দেখিতে পায় নির্ব্বিকার শবরূপী মহাদেবের বুকের উপর মহাকালীর তাণ্ডব এই ইতিহাসের আদিপর্ব্ব, যিনি মৃতের মত শয়ান রহিয়াছেন তিনি আকাশরূপী মহাব্যোম, ধ্বনিব্রহ্মের বাহক ও ধারক এবং "সর্ব্বান্ আবৃত্য তিষ্ঠতি"; তিনি স্বয়ং নির্গুণ, কিন্তু যিনি নৃত্যপরায়ণা, তিনিই সগুণা-প্রকৃতি, তিনিই ইতিহাসের প্রত্যক্ষমূর্ত্তি। এই ইতিহাস দেবতার ইতিহাস নহে। দেবতার ইতিহাস নাই; ইতিহাস শুনিলে দেবতা রাগ করিবেন, যেহেতু এই ইতিহাসে অসুরের নিকট পরাজয়ের গ্লানি আছে, দেবতার ছল-কপটতা আছে। ইতিহাসস্বরূপা মহাকালীর দেহে দেবতার কোন অবদান নাই; পুরোত্তম "অ-সুর"গণই ইতিহাসস্রষ্টা (makers of history), এই জন্যই তাঁহার গলায় "অ-সুরের" মুণ্ডমালা। দেবতার মুণ্ড উহাতে স্থান পাইলে পঞ্চানন কিংবা চতুর্মুখ মুণ্ড দুই-একটা থাকিত। সৃষ্টির আদি হইতে এই মুণ্ডমালা দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া চলিয়াছে। এই মুণ্ডমালায় গাঁথিবার জন্য দেবী যদুনাথ-রবীন্দ্রনাথের মাথা লইতে পারেন, লেখক ও পাঠকের মাথা লইবেন না। অতীতে যে সমস্ত শূরবীর দেশ কিম্বা জাতির মান রক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহাদের কীর্ত্তিবাহু দিগম্বরীর কটির কল্পিত হস্ত-মেখলায় স্থান পাইয়াছে, আমরা তাঁহাদের ইতিহাস ভুলিয়া গিয়াছি, তবুও ভক্তির অর্ঘ্য দিয়া আসিতেছি। ইতিহাসের এই বিভীষিকাময়ী বিরাট রূপ জীবন-সায়াহ্নে আচার্য্য যদুনাথকে অভিভূত করিয়াছিল, তখন তাঁহার গৃহ মহাশ্মশান, তাঁহার ভিতরে বাহিরে অনির্ব্বাণ চিতা। এই সময়ে তিনি বুকের রক্ত দিয়া Fall of the Mughal Empire (চারি খণ্ডে) লিখিয়া গিয়াছেন। এই মোগল মহাভারত শেষ করিয়া যদুনাথ সরদেসাইকে লিখিয়াছিলেন:

On this your 86th birthday, I have given the finishing touch to the last chapter of my "Fall of the Mughal Empire" and sent it to the press. Its subject is even more truly the fall of the Maratha Empire.

I can say that I have written it, not with ink, but with my heart's blood. In saying so, I am not thinking of the personal sorrows and anxieties—which have clouded the evening of my day, nor of the minute study and exhausting labour that had to be devoted to the subject.…—but of subject-matter of the last chapters,—the imbecility and vices of our rulers, the cowardice of their generals, and the selfish treachery of their ministers. It is a tale which makes every true son of India hang his head down in shame.…

[Calcutta 29, 15th May, 1950, quoted from p. 265 "Life and Letters of Sir Jadunath Sarkar", Panjab University, 1958].

Gibbon এমনই বুকের রক্ত দিয়া তাঁহার Decline and Fall of the Roman Empire লিখিয়াছিলেন, রোমীয় সভ্যতা এবং সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী ইয়োরোপ এ জন্যই এই মহান্ ইতিহাসকে বুকে করিয়া রাখিয়াছিল, এখন মাথায় তুলিয়া রাখিয়াছে।

৪

ব্যক্তিগত কোন বিষয় আচার্য্য যদুনাথ কখনও কাহাকে জানিতে দিতেন না; সুতরাং এই সমস্ত প্রশ্ন তাঁহার কাছে আমরা উত্থাপন করিবার দুঃসাহস করি নাই। ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু হিসাবে কার্য্যপরম্পরা এবং এই শতাব্দীর প্রথম দশকে বাঙ্গালাদেশে ঐতিহাসিক গবেষণার গতি বিচার করিয়া যদুনাথের মুসলমান ইতিহাসচর্চ্চার আগ্রহ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা অনুমান আমরা হয় ত করিতে পারি।

কটকের বাসায় আচার্য্য যদুনাথের পুরনো কাগজপত্র ঝাড়িয়া গুছাইবার সময় একটা জীর্ণ বাণ্ডিল খুলিয়া দেখিলাম, উহার মধ্যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসমূলক তাঁহার হাতে আঁকা ম্যাপ এবং Cunnigham-এর Geography of Ancient India হইতে উদ্ধৃত পেন্সিলের নোট। ফার্সি শিখিবার পূর্ব্বে সংস্কৃত তিনি ভাল রকম পড়িয়াছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর পড়ার ঘর গুছাইবার সময় কালিদাস ভবভূতি ভারবি ও ভট্টনারায়ণের কাব্য বাংলা অক্ষরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ পণ্ডিতগণের সম্পাদিত প্রথম সংস্করণ ঐ ঘরে পাওয়া গিয়াছে। পাতা উল্টাইয়া দেখিলাম প্রতি পৃষ্ঠায় এমন নোট লিখিয়াছেন, ইংরেজী ও সংস্কৃত হইতে এমন চমৎকার parallel passage উদ্ধৃত করিয়াছেন যেন উহা সংস্কৃত ক্লাস পড়াইবার জন্য প্রস্তুতি। আমার মনে হয় তিনিও প্রথমে প্রাচীন ভারত বিষয়ক গবেষণার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন; পরে তিনি উহা ত্যাগ করিলেন কেন? ঐ সময়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং বৃদ্ধ ভাণ্ডারকরের কৃতিত্ব মধ্যাহ্ন রেখায় পৌঁছিয়াছে, প্রাচীন

ইতিহাসের গবেষণার ক্ষেত্র সংকীর্ণতর এবং উদীয়মান গবেষকগণের ভিড়ও বেশী, কিন্তু এই প্রতিকূল অবস্থা হয়ত যদুনাথের পশ্চাৎ অপসরণের কারণ নয়। "নূতন কিছু" পাওয়ার সম্ভাবনা প্রাচীন ভারত অপেক্ষা মুসলমান ইতিহাসে বেশী ; একটা তাম্রশাসন একটি মুদ্রা কিংবা পুঁথি পাওয়া গেলে প্রাচীন ভারতের ময়দানে কাড়াকাড়ি পড়ে, লড়াই শুরু হয়। হরিলুটের বাতাসায় সন্তুষ্ট হওয়ার ব্যক্তি যদুনাথ ছিলেন না ; তাঁহার প্রতিভা, উদ্যম ও উচ্চাকাঙ্খা সম্ভবতঃ নাদিরশাহী লুটের আশায় ময়ূরসিংহাসনকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়াছিল।

উদারচেতা মহানুভব সম্রাট আকবরকে উপেক্ষা করিয়া আওরঙ্গজেবকে যদুনাথ তাঁহার সংকল্পিত ইতিহাস মহাকাব্যের নায়করূপে বরণ করিলেন কেন? স্থূলদৃষ্টিতে মনে হয়, ইহা যেন শ্রীকৃষ্ণকে গৌণ করিয়া মনুষ্যময় দুর্য্যোধন মুখ্য উল্টা মহাভারত সৃষ্টির প্রয়াস। আসল কথা, আকবরের ইতিহাসে হাত দিলে "নূতন কিছু" পাইবার সম্ভাবনা ছিল অপেক্ষাকৃত অল্প। সেই সময়ে বেভারিজ দম্পতি বাবর-হুমায়ুন সম্বন্ধে গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। বাবরের দিনচর্য্যা গুলবদনের হুমায়ুননামা ও আকবরনামার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। আইন-ই-আকবরী, তুজুক-ই জাহাঙ্গীরী, বদায়ুনীর Muntakhab-ut-Tauarikh তখন ইংরেজীতে অনুবাদ সম্পূর্ণ করা হইয়াছে ; লক্ষ্ণৌর নবলকিশোর প্রেস প্রায় অধিকাংশ বিখ্যাত ফার্সি ইতিহাসের মূল পুঁথি ছাপা শেষ করিয়াছিলেন, আকবর সম্বন্ধে নূতন কাঁচা মাল পাওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? ঐ সময়ে V. A. Smith-এর মত যদুনাথ বড়জোর একখানা সুপাঠ্য পাঠ্যপুস্তক হয়ত রচনা করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার গবেষণার আয়োজন ও পরিকল্পনা ছিল বৃহত্তর। আওরঙ্গজেবের ইতিহাস সম্বন্ধে খাফি খাঁর Muntakhab-ul-Lubabikh ব্যতীত অন্যান্য পুঁথি তখনও প্রায় অজ্ঞাতবাসেই ছিল। আওরঙ্গজেবকে মসীবর্ণে চিত্রিত করিবার সম্বল এদেশে ও বিলাতে একমাত্র খাফি খাঁ। যদুনাথ ইতিহাসচর্চ্চা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই আকবর বাদশাহ দেশী-বিদেশী ঐতিহাসিকের কাছে সুবিচারেরও অধিক পাইয়াছিলেন। কিন্তু আওরঙ্গজেবের প্রতি তাঁহার পিতা অবিচার করিয়াছিলেন, ইতিহাসও হয়ত অবিচার করিয়াছে—এই জন্যই নবীন ঐতিহাসিক আলমগীর বাদশাহের আপীল মঞ্জুর করিয়াছিলেন। অধিকন্তু এই সময়ে William Irvine মোগল দরবারের দৈনিক সংবাদ-তালিকার (Akhbarat-i-darbar-i maula) সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত যদুনাথের পত্রালাপ ছিল, এই সমস্ত আনকোরা কাঁচামাল সংগ্রহ করিয়া অনন্যমুখাপেক্ষী এবং অভিনব ইতিহাস রচনা করিবার সুযোগ যদুনাথ গ্রহণ করিয়াছিলেন।* এই অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত মনে হয় না।

৫

শ্রদ্ধা এবং সহৃদয়তা না থাকিলে ইতিহাসে সত্যের সন্ধান কেহ পায় না। আচার্য্য যদুনাথ শুধু শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত আওরঙ্গজেবের ইতিহাস রচনা করেন নাই, আওরঙ্গজেবকে তিনি প্রায় শাহজাহানের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। সেই দৃষ্টিতে ছিল স্নেহ, ভয়, বিস্ময় ও দুশ্চিন্তার ছায়া। মাতা মমতাজ এবং জননীর প্রতিনিধি জ্যেষ্ঠা ভগ্নী জাহানারা ব্যতীত স্বভাবগুণে আওরঙ্গজেব তৃতীয় ব্যক্তির নিকট অনাবিল স্নেহের পাত্র হইতে পারেন নাই—পিতার নিকটেও নহে। এ হেন আওরঙ্গজেবকে লইয়া ঐতিহাসিক যদুনাথ বৃদ্ধ সম্রাট শাহজাহানের ন্যায় বিব্রত হইয়াছেন। দুষ্কৃতকারীকে ঐতিহাসিক দয়া করেন নাই, দরদ দেখাইয়াছেন। এই বিয়োগান্ত নাটকের শেষ অঙ্কে আওরঙ্গজেবের উপর নিয়তির নির্ম্মম পরিশোধ তাঁহাকে শাহজাহানের মতই ব্যাকুল ও স্তম্ভিত করিয়াছে। এই জন্যই হয়ত যদুনাথের গ্রন্থে ইতিহাসের কঠোরতা ও সাহিত্য-মাধুর্য্যের মনোরম সমাবেশ।

আওরঙ্গজেবের প্রমাণ বিচারমূলক ইতিহাস রচনা অতি দুরূহ। প্রথমতঃ আচার্য্য যদুনাথের অপূর্ব্ব সংগ্রহের পূর্ব্বে এই ইতিহাসের উপাদান দেশে-বিদেশে স্থানে-অস্থানে অজ্ঞাত ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল এবং এখনও কিছু কিছু ঐ ভাবেই আছে। দ্বিতীয়তঃ, উপাদানের আয়তনে আকবর-শাহী ইতিহাস বড়জোর গঙ্গাযমুনা-সঙ্গম, কিন্তু আলমগীর-শাহী ইতিহাস সুন্দরবনের জঙ্গল ও চর-বহুল সাগর-সঙ্গম, যেখানে শতধারা জাহ্নবীর খাত অতি বিপদসঙ্কুল। এই ইতিহাস অত্যন্ত বিতণ্ডামূলক, বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ব্যক্তি লিখিত বিবরণ প্রায়শঃ পরস্পরবিরোধী।

"I began my apprenticeship in the history workshop with a study of the fall of Tipu Sultun. It was written in 1891, when my only sources were printed English books...but no unprinted record, no original Persian or Marathi authority."—*Bengal Past and Present*, Jubilee, Number, 1957 ; p. 1.

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে যদুনাথ M. A. পাশ করেন নাই ; কিন্তু উদ্ধৃত উক্তি হইতে বুঝা যায় তাঁহার গবেষণার পরিকল্পনায় 'নূতন কিছু' আবিষ্কার ছিল প্রধান লক্ষ্য, ইংরেজ লিখিত ইতিহাস কিম্বা ইংরেজী অনুবাদের চর্ব্বিতচর্ব্বণ নহে। আকবর সম্বন্ধে গবেষণা করিলে তাঁহাকে প্রায় অনুরূপ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইত।

পুঁথি হাতে আসিলেই গবেষকের কাজ হাসিল হয় না, ইহার পর আরম্ভ হয় পূর্ব্ববর্ত্তী ঐতিহাসিকগণের ফৌজদারী জেরা—আবুল ফজল, বদয়ুনীফ খাঁ এবং আলমগীরনামা লেখক সাকি মুস্তায়েদ খাঁ, ঈশ্বরদাস-ভীমসেন প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ যেন এক একজন কাঠগড়ার আসামী! এই কাঠগড়ায় একদিন আচার্য্য যদুনাথকেও দাঁড়াইতে হইবে, তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণ তাঁহাকে জেরা হইতে রেহাই দিবে না। ইতিহাসের আদালতে গুরু-শিষ্য বাপ বেটার খাতির নাই, যে খাতির করিয়া হাল্কা জেরা করিবে, সে কুশিষ্য, কুপুত্র। এই জন্যই যদুনাথ স্বয়ং প্রথমে নিজের জেরা নিজেই করিয়াছেন, এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে জবাবের স্বপক্ষে দলিল-পত্র সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ইতিহাসের আপীল বিচার করেন আন্তর্জাতিক বিশ্ব-আদালত—যেখানে দেশ ও জাতি-নিরপেক্ষ মনস্বী বিশেষজ্ঞগোষ্ঠী চূড়ান্ত রায় দিয়া থাকেন, এই আপীল অনন্তকাল যুগে যুগে চলিতে থাকিবে, যাহা সত্য উহাই আগুনে পুড়িয়া সোনা থাকিবে, ওকালতী ধাপ্পাবাজি ভাষার চটক ভাবের ঘরে চুরির মাল সব ছাই হইয়া যাইবে।

৬

দেশের লোকের ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয় আচার্য্য যদুনাথের বিপুল আয়াস শুধু পণ্ডশ্রম, ভস্মে ঘৃতাহুতি। দেশের হিন্দু মুসলমান, মারাঠা-রাজপুত-শিখ যদুনাথের History of Aurangzib কিংবা Fall of the Mughal Empire পড়িয়া শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে অভিভূত হইতে পারে কিন্তু তাঁহাকে ভালবাসিতে পারে না, পাঠক আশাভঙ্গ ও বিরক্তির ভাব লইয়া ইতিহাস হইতে পলাইবার পথ খোঁজে। হিন্দুর চোখে যদুনাথ দ্বিতীয় আওরঙ্গজেব। বাদশাহ হিন্দুর অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছিলেন, আধুনিক ঐতিহাসিক এ হেন ব্যক্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া হিন্দুর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়াছেন। যদুনাথ মোগল দরবারের সাম্রাজ্যবাদ প্রচারক, জাতীয় ঐতিহাসিক নহেন, জাতির মুক্তি ও দেশের স্বাধীনতার জন্য যাহারা ধর্ম্মদ্বেষী আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল তাহাদিগকে তিনি স্বদেশপ্রেমিক বীরযোদ্ধা বলিয়া চিনিতে পারেন নাই, জনশ্রুতি এবং জাতির বাণী (?) উপেক্ষা করিয়া আলমগীরশাহী ঘৃণা ও ঔদ্ধত্যের সহিত ইহাদিগকে তিনি বিদ্রোহী দস্যু বলিয়াছেন। এক শ্রেণীর ঐতিহাসিক এই সুযোগে দেশপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা প্রচার করিতেছেন, মুসলমানের ইতিহাসকে অভ্রান্ত মনে করিয়া যদুনাথ ভুল করিয়াছেন, মহারাষ্ট্রে সংগৃহীত দলিলপত্র যাহা তাঁহার মনঃপুত হয় নাই উহা তিনি গ্রহণ করেন নাই, রাজপুতানার চারণ যে ইতিহাসকে তাজা রাখিয়াছে উহা তিনি কবিত্ব বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। শিখজাতির ইতিহাসের প্রতি তিনি ভক্তিমান নহেন, ইত্যাদি।

এই শ্রেণীর বিদ্বান্‌গণের চৈতন্যসম্পাদন তর্ক ও বিচার-বুদ্ধির দ্বারা হইবার নহে; জ্যা রোপণ করিতে গিয়া রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঢেঁকিতে "গুণ" দিতে পারেন নাই। শিক্ষাদীক্ষায় অধিকতর উন্নত এবং উদার হিন্দুসমাজ যদি মনেপ্রাণে যদুনাথের ইতিহাসকে অভিনন্দিত করিতে না পারে তবে "প্রগতি"-বিরোধী সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর যদুনাথের গবেষণার কী প্রতিক্রিয়া হইয়াছে? ইংরেজী শিক্ষিত বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক গবেষণায় সুনিপুণ কোন মুসলমানের যে কাজে হাত দেওয়া উচিত ছিল যদুনাথের পূর্ব্বে কেহ ঐ কাজ করেন নাই, অথচ বাদশাহী হারাইয়া মুসলমানের যত দুঃখ ও অভিমান হয় নাই, ইংরেজ পণ্ডিতগণ Elphinstone-এর সময় হইতে Elliot ও Dowson পর্য্যন্ত মুসলমান ইতিহাসের যে মূর্ত্তি জগতের সম্মুখে অনাবৃত করিয়াছেন উহাই তাঁহাদের পক্ষে সমধিক পীড়াদায়ক হইয়াছিল। যদুনাথের History of Aurangzibএর প্রথম দুইখণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পর শিক্ষিত মুসলমানগণ কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন, কেননা আওরঙ্গজেবের প্রতি তাঁহার পিতা যে সুবিচার করেন নাই ঐতিহাসিকের কাছে উহা অন্ততঃ আংশিক ভাবে পাইয়াছেন। ঐ ইতিহাসের তৃতীয় খণ্ড (রাষ্ট্রনীতি, ধর্ম্মসংস্কার, মন্দিরধ্বংস, হিন্দু নির্যাতন বর্ণনা) বাহির হওয়ার পর শিক্ষিত মুসলমান সমাজও অগ্নিশর্ম্মা হইয়া প্রতিবাদ বর্ষণ করিতে লাগিলেন, যদুনাথ কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্তে অচল অটল এবং অন্ধ উম্মার প্রতি উদাসীন। মৌলানারা দেখিলেন কাফের হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়াছে। তাঁহাদের ফতোয়া অচল, সুতরাং তোবা তোবা করিয়া সরিয়া পড়িলেন, যদুনাথ দ্বিগুণ উৎসাহে তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত (১৬৫৮-৮১) প্রথম সংস্করণ (১৯১৬ ইং) হওয়ার তিন বৎসরের মধ্যে চতুর্থ খণ্ড (১৬৪৪-১৬৮৯, প্রথম সংস্করণ, ১৯১৯ ইং) প্রকাশ করিলেন। এইবার আফজল খাঁ-বধ, শায়েস্তা খাঁর পুনা শিবিরে শিবাজীর কীর্ত্তি এবং দাক্ষিণাত্যে বিজয় অভিযানের পালা। এই খণ্ড পড়িয়া মুসলমান সমাজ প্রমাদ গণিল, অথচ যদুনাথের অভ্যুদয় বিপুল সম্ভাবনাযুক্ত বুঝিতে পারিয়া তাঁহার ইংরেজ ও ফরাসী ঐতিহাসিকগণ প্রশংসা-মুখর হইলেন। বৃদ্ধ ঐতিহাসিক Beveridge সাহেব পুস্তকের সমালোচনায় লিখিলেন:

Jadunath Sarkar may be called primus in Indis as the user of Perslan authorsities for the

history of India. He might also be styled as the Bengali Gibbon···The account of Aurangzib in the 3rd and 4th volumes is exceptionally good. (History, 1922)।

বেভারিজ সাহেব জজিয়তী মেজাজে লোককে মাপিয়া মাপিয়া প্রশংসা করিতেন। বহু বৎসর এই দেশে থাকিয়া আওরঙ্গজেবের উপর মুসলমানের মমতার কথা তিনি জানিতেন, তবুও যদুনাথের অকুণ্ঠ প্রশংসা করিলেন কেন? যদুনাথ এমন গীতাঞ্জলী লিখেন নাই যাহা ভারতবাসী প্রতীচ্যের জ্ঞানাঞ্জনশলাকা প্রয়োগ ব্যতীত বুঝিতে পারে নাই, কিংবা না বুঝিবার ভাণ করিয়াছিল। আসল কথা, মহারাষ্ট্র জয় করিতে না পারিলেও আওরঙ্গজেব একজন আদর্শচরিত্র বীর এবং পীর হিসাবে মুসলমানের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। যতদিন রামায়ণ থাকিবে ততদিন যেমন রাম থাকিবেন, তেমনই যতদিন শরিয়ত থাকিবে ততদিন আওরঙ্গজেবও থাকিবেন। "সূর্য্যপ্রভব" রঘুবংশীয়গণ "আ মনোঃ বর্ত্মনঃ পরম্" হইয়া যদি কীর্ত্তিমান হইয়া থাকেন, শরিয়ত হইতে সূচ্যগ্রচ্যুত না হইয়া আলমগীর "জিন্দা পীর" হইবেন না কেন? মন্দিরনির্ম্মাণ ও মূর্ত্তিপূজা হিন্দুর ধর্ম্ম, মন্দির ও মূর্ত্তিধ্বংস অনুরূপ বিধানে মুসলমানের ধর্ম্ম। ইহার মধ্যে কোন্‌টা ধর্ম্ম এবং কোন্‌টা অধর্ম্ম কে বিচার করিবে? রাম রাক্ষস মারিয়া যজ্ঞরক্ষা করিয়াছিলেন এই জন্য আর্য্যধর্ম্মই ধর্ম্ম, নতুবা রাক্ষসধর্ম্মই আর্য্যভূমির ধর্ম্ম হইত এবং বস্তুতঃ হইয়াছিল।

মুসলমান শাসকগণের মধ্যে আদর্শ মুসলমান হিসাবে প্রথম চারিজন ন্যায়নিষ্ঠ খলিফা এবং উম্মায় বংশের দ্বিতীয় ওমরের পরেই বিদ্যা ও চরিত্রগুণে আওরঙ্গজেবের স্থান। আওরঙ্গজেব এক হিসাবে অমর, আকবর মরিয়া গিয়াছেন। ভারতের ভিতরে-বাহিরে যেখানে শরিয়তের প্রতি অচলনিষ্ঠা আছে সেখানেই আওরঙ্গজেব আছেন এবং থাকিবেন, কিন্তু আকবর কোথায়? হিন্দুস্থানে দ্বিতীয় আকবরের উদয়ের পথ আওরঙ্গজেব চিরদিনের মত বন্ধ করিয়াছেন। খলিফা হারুণ অল রসিদের পুত্র মামুন আকবরের বহু পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি যুক্তিবাদী মোতাজিলা ছিলেন, তাঁহার দরবারে ফতেপুর সিক্রীর ইবাদতখানার ন্যায় ধর্ম্মের ঘোলশ্রাদ্ধ এবং ইমামগণের মুণ্ডপাত হইত। আকবরের মত মামুনের সিংহাসনও অল্পের জন্য রক্ষা পাইয়াছিল, উগ্র শরিয়তপন্থীগণ মামুনকে বলিত কাফেরের খলিফা (Commander of the unbelievers)। মোল্লার বিচারে আকবর মুসলমানের কেহ ছিলেন না, তিনি ছিলেন দজ্জাল (Anti-Christ), বে-ইমামের ইমাম! আকবরের সৃষ্টি ধ্বংস করিবার জন্য আবির্ভূত হইলেন শাহ উলীউল্লা। জাহাঙ্গীরের রাজত্বে মুজাদ্দিদ-ই-সানী এবং ইংরেজ আমলে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মুসলমান জগতে মোল্লাশাসিত সমাজের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে কেহ দণ্ডায়মান হয় নাই, বরং আওরঙ্গজেবের সস্তা "ওহাবী" সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আরব আবদুল ওহাবকে আশ্রয় করিয়া অধর্ম্ম ও অনাচারের বিরুদ্ধে জেহাদ করিবার জন্য সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। এই ধর্ম্ম-আন্দোলনের ঢেউ পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায়কেও প্রভাবিত করিয়াছিল এবং অন্যান্য অনর্থ যাহা ঘটিয়াছিল উহা ইতিহাসের বিষয়ীভূত। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাবে অবশেষে তুরস্ক সাম্রাজ্যে নব্যতুর্কী দল গঠিত হইল, মুস্তাফা কামাল পাশা রাষ্ট্রগঠন ও ধর্ম্মসংস্কারের উৎসাহে আকবরকে হার মানাইলেন, কিন্তু মোল্লার দল সহজে হার মানে নাই। ইস্‌লাম ও খেলাফতকে বাঁচাইবার জন্য তাঁহারা হিন্দুস্থানী মুসলমানের সাহায্য ভিক্ষা করিলেন, কাউ স্বরূপ কংগ্রেসী হিন্দুরা খেলাফত রক্ষার জন্য কোমর বাঁধিয়া মুসলমানগণের সহিত ইংরেজের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিল। হিন্দু-মুসলমানের সেই অকপট মিলনের দৃশ্য যে দেখে নাই সে আর কখনও দেখিবে না। আমার পরমবৈষ্ণব জ্ঞাতিভাই তখন মুসলমান বাড়ীতে পিঠা খাইয়া "খেলাফত জিন্দাবাদ" ধ্বনি করিতে করিতে রাস্তা মাতাইয়াছে।

উদারনৈতিক ইংরেজ এতদিন আকবরশাহী চালে চলিয়াছিলেন, কিন্তু এই মিলনের পরিণাম ভাবিয়া তাঁহারা এই দেশে আওরঙ্গজেব খুঁজিতে লাগিলেন, ইশারা পাইয়া হাজার আওরঙ্গজেব Music before mosque ধ্বনি তুলিয়া স্বতন্ত্রদল গঠন করিল, এবং এইভাবে বিলাতী শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে জিন্না-ভীমের হস্তে ভারতীয় কংগ্রেস-জরাসন্ধের শোচনীয় দশাপ্রাপ্ত হইল, বাদবাকী কাহারও অজানা নাই।

তুরস্ক ব্যতীত অন্যান্য মুসলমান রাজ্যে নব্যপন্থী "আকবর"গণ শাহজাদা দারার শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন—প্রমাণ কাবুলের আমানউল্লা এবং ইরাণের রেজা শাহ পেলহবী।

৭

আওরঙ্গজেব বর্ত্তমানেও ইতিহাসগত ভারত সম্রাট্ নহেন, তিনি একটি বিশেষ ভাবধারার (ideology) তেজদৃপ্ত প্রতীক্। সুতরাং কোন অমুসলমান সুস্থ মস্তিষ্কে মুসলমানের প্রীতিকর আওরঙ্গজেবের ইতিহাস লিখিতে পারিবে না, তবে নামের বাজারে মোটা দাম দিলে ঐতিহাসিকও পাওয়া যায়। যাহা হোক, ভারতীয় মুসলমানগণ এই বিষয়ে

নিশ্চেষ্ট থাকে নাই। বহু বৎসর পূর্ব্বে মৌলানা শিবলী উর্দু ভাষায় যদুনাথের মত খণ্ডন করিয়া এক উর্দু পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। আচার্য্য যদুনাথের বন্ধু হিসাবে মৌলানা সাহেব আমার নমস্য, তাঁহার খাতিরে যদুনাথ স্থানে স্থানে লেখনী সংযত করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়, সুতরাং তাঁহার লেখার সমালোচনা করিবার বিদ্যা ও বেয়াদবী আমার নিকট হইতে কেহ আশঙ্কা করিতে পারেন না, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে Zahir-ud-din Faruqi, Aurangzib and His Times প্রকাশিত করিয়াছেন। এই পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর অখণ্ড ভারতের পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাসের পাঠ্যতালিকা হইতে আচার্য্য যদুনাথের বহি বাদ দেওয়া হইয়াছিল। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রবীণ অধ্যাপক বলিয়াছিলেন, শেষের দিকে পরীক্ষক হিসাবেও যদুনাথের নাম প্রস্তাব করিবার দুঃসাহস লাহোরে কেহ করে নাই। বর্ত্তমান পাকিস্থান কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে বহুগুণ উদার ও গুণগ্রাহী। আলিগড়ের অধ্যাপক রহমান (পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলর Sir A. F. Rahman) ছাত্রসমাজে পাঠ্য বিষয়ে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দিতেন না। তিনি যদুনাথের গুণগ্রাহী ছিলেন, তবে যথারীতি রোজা নমাজ করিতেন বলিয়া মোল্লার দল তাঁহাকে সমীহ করিত, তাঁহার মতামতকে যদুনাথও শ্রদ্ধা করিতেন—যথা শিবাজী-আফজল বিষয়ক বিতণ্ডা।

আচার্য্য যদুনাথ বিরুদ্ধ সমালোচনার উত্তর ছাপাইয়া অযোগ্যকে অনুগৃহীত করিতেন না, এবং আমাদের অসহিষ্ণুতাকে তিরস্কার করিতেন। ইহা যেন সেই তীব্র শ্লেষ :

অগাধ জল-সঞ্চারী বিকারী ন চ রোহিতঃ।
গণ্ডূষ জলমাত্রেণ শফরী ফরফরায়তে।

এমন লেখকের অভাব নাই যাঁহারা অপরিচিত থাকা অপেক্ষা গালাগালি খাইয়া পরিচিত হওয়া শ্লাঘনীয় মনে করেন। ইঁহারা চতুর ব্যক্তি, বাজারের খবর রাখেন যে বহির যত নিন্দা ছাপার অক্ষরে বাহির হয় উহার কাটতি ততই বাড়িয়া যায়। বর্ত্তমানে ইহাই যুগধর্ম্ম।

প্রাচীন ভারতে নর-দেব এবং অর্ব্বাচীন ভারতে গণ-দেবতাই পণ্ডিতের পিণ্ডদাতা তথা পাণ্ডিত্যের বিচারক। মানুষ ও দেবতা অপ্রিয়সত্য শুনিতে আগ্রহশীল নহে, অথচ প্রকৃত ইতিহাসে "হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ"। আমাদের "সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্য" রাষ্ট্রকে (Welfare State) রূপায়িত করিবার জন্য সম্প্রতি জাতিগঠনধর্ম্মী সাহিত্যের প্রয়োজন হইয়াছে। শুনা যাইতেছে, যথেষ্টসংখ্যায় মার্কামারা সাহিত্যিক উৎপাদন করিবার জন্য দিল্লী কি অন্যত্র একটি সর্ব্ববিদ্যাপ্রসবিনী কারখানাও স্থাপিত হইয়াছে, সত্যমিথ্যা খোদাতালা জানেন।

অখণ্ড ভারত খণ্ডিত হওয়ার পর রাষ্ট্রের প্রয়োজনে হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের জন্য মুসলমান যুগের দুই প্রস্ত ইতিহাস লোকশিক্ষার জন্য নূতন পদ্ধতিতে রচনার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে শুনা যায়। সর্ব্বমঙ্গলার কৃপায় ভারতীয় গণতন্ত্রে ইতিহাসের অবস্থা আরও অধিকতর শোচনীয়। অপ্রিয়সত্যের অপলাপ করিয়া মিলন-প্রশস্তি রচনা করিলেও রেহাই পাওয়া যাইবে না। গোদের উপর বিস্ফোটের ন্যায় আমাদের ইতিহাসে নানাবিধ ism বা মতবাদ ক্রমশঃ প্রকট হইতেছে, যে ism দিল্লীর মসনদ দখল করিবে, ধূর্ত্ত ঐতিহাসিক উহার পিছনে দাঁড়াইয়া ডাক ছাড়িবে, "জয়, মামুর জয়!"। বর্ত্তমান বুদ্ধিজীবী ও "শাকাহারি" (নতুবা "অহিংস" হয় না) সরকার চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন, কাহাকেও চটাইবার প্রবৃত্তিও নাই, হিম্মতও নাই। এমন অবস্থায় সংস্কৃত "প্রবোধচন্দ্রোদয়ম্" নাটকের মত সর্ব্বদর্শন এবং সর্ব্ববিধ ismএর চমৎকার সমন্বয় করিয়া রাষ্ট্রভাষায় একখানা ঐতিহাসিক নাটক যিনি লিখিতে পারিবেন তিনিই জাতীয় ঐতিহাসিকের গৌরব লাভ করিবেন, যেহেতু পূর্ব্বতন ঐতিহাসিকগণ জাতির মনের উপর দুঃস্বপ্নের মত চাপিয়া রহিয়াছেন। বর্ত্তমানে স্কুল-কলেজে সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত ইতিহাস-পুস্তকে যাহা থাকিবে উহাই আদি-অকৃত্রিম ইতিহাস!

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)



বৌ-রাণীর ঘাট

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ঘাটে এসে দেখি খেয়া বন্ধ হয়ে গেছে।

কতকটা জেনেশুনেই আসা, রাত হয়ে যাচ্ছে, বর্ষাকাল, নদীতে বন্যা। কিন্তু প্রয়োজনটা বড় বেশি, তাই বেরিয়ে পড়েছিলাম। ঠিক করেছিলাম, তেমন বুঝি ত ছোট নৌকাটা ছেড়ে গাড়ি-গরু পার করবার ফ্ল্যাটটা খুলিয়ে নোব, যা নিতে চায় ঘাটোয়ার তার জন্যে। আমি আসছি অনেক দূর থেকে, জায়গাটা সম্পূর্ণ অজানা। অজানা জায়গা সম্বন্ধে যেমন একটা আশঙ্কা থাকে, তেমনি আবার মনে হয় কোন-না-কোন দিক থেকে একটা সুরাহা হয়ে যেতে পারে। সমস্যা পারে মিটে যেতে। একই অনিশ্চয়তার দুটো দিক আর কি, আমি এদিকটায় ভরসা করে বেরিয়েছি। অবশ্য প্রয়োজনটা খুব বেশি বলেই। গাং পেরিয়ে ওপারের শেষ বাসটা যদি না ধরতে পারি ত খুবই ক্ষতি হবে।

প্রশ্ন ছিল খেয়া খুলতে চাইবে কি চাইবে না। এ একেবারে মূলে-হাভাত। ঘাটের চালা-ঘরটায় রীতিমত তালা ঝোলানো, লোকজন কেউ নেই কোথাও।

ফিরতেই যাচ্ছিলাম, এপারের শেষ বাসটা এখনও হাতে রয়েছে, কিন্তু হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল—এমনও ত হতে পারে যে, এরা খেয়ে আসতে গেছে। কোথায়, কত দূরে তার কোনও আন্দাজ পাচ্ছি না, এদিককার বাস থেকে নেমে আমায় প্রায় মাইল খানেক আসতে হয়েছে, এর মধ্যে কোন গ্রাম চোখে পড়ে নি, তবু মনে হ'ল খানিকটা দেখেই যাই। হাতঘড়িতে দেখলাম পৌনে আটটা হয়েছে, পা চালিয়ে গেলে মিনিট ষোল-সতেরর মধ্যে গিয়ে পড়তে পারব, সাড়ে আটটায় এদিককার শেষ বাস, মিনিট কুড়ি স্বচ্ছন্দে বসতে পারি।

চালাটা তীরের একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছের নীচে। অনেকগুলো শেকড় সে মাটি থেকে বেরিয়ে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়েছে, মোটা দেখে তার একটার ওপর বসলাম। জ্যোৎস্না পক্ষ, সপ্তমী কি অষ্টমী তিথি হবে। আকাশে একটা পাতলা মেঘের আস্তরণ রয়েছে, যার জন্য জ্যোৎস্নাটা বেশ পরিষ্কার হয়ে খুলতে পায় নি। একটা যে হালকা হাওয়া রয়েছে তাতে আবার নীচের স্তরে মাঝে মাঝে খণ্ড মেঘের স্তূপ উড়িয়ে এনে চাঁদ ঢেকে ফেলে জ্যোৎস্নাটাকে এক-একবার আরও অস্বচ্ছ করে ফেলছে। সামনে ভরা গাং, শব্দের মধ্যে মাথার ওপর অশ্বত্থপাতার পৎপতানি, আর থেকে থেকে তীরের কোলে হাল্‌কা ঢেউয়ের ছলাৎ ছলাৎ।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, সামনেই যে সমস্যাটা রয়েছে সেটাও মন থেকে মুছে গেছে কখন, হঠাৎ খেয়াল হতে হাতটা উলটে দেখি আর মাত্র মিনিট-বারো বাকি। ছোটা ভিন্ন ত আর উপায় নেই। ঝোঁকের ওপর উঠেই পড়েছিলাম, হঠাৎ সমস্ত মনটা যেন বিরূপ হয়ে উঠল—তার মধ্যে ক্লান্তি ছিল, এতটা পথ হাঁটা ত অভ্যাস নেই, নিজের অদৃষ্টের ওপর বিরক্তি ছিল, আর ছিল এই পোড়া কাব্যে পাওয়ার ওপর। এমন নাকালে পড়েও লোকে জ্যোৎস্না, আর ভরা নদী আর নিস্তব্ধতার মধ্যে ডুবে থাকতে পারে, না, পারা উচিত?

অবশ্য নিজের ওপর এই অভিমানটুকু ক্ষণিক। ভেবে দেখলাম—এ তবু যা হোক খানিকটা আশা—এরা যদিই এসে পড়ে। তা ভিন্ন—নদীর তীর, গাছতলা, যা হোক একটা আস্তানা ত, ওদিকে বাস যদি ছেড়ে গেল—আর যাবেই—তা হলে একেবারে নিরাশ্রয়।

অনিশ্চয়তার পেছনে ছোটার উৎসাহও নেই আর। আবার বসে পড়লাম।

রাত এগিয়ে চলল। দৃশ্যটার ওপর মনটাকে আবার বসাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু বৃথা। মাঝে মাঝে ঘড়ির দিকে চেয়ে যখন রাত প্রায় সাড়ে ন'টা হয়েছে, মনে হ'ল যেন একটা নতুন সমস্যা এগিয়ে আসছে। চাঁদ অনেকখানি নেমে গিয়ে জ্যোৎস্নাটা আরও পাতলা হয়েই এসেছিল, তার ওপর খণ্ড মেঘগুলোও যেন ক্রমে জোড়া লেগে যেতে লাগল। হাওয়াটাও বেড়ে উঠছে। একটা দুর্যোগ ওঠবার সব লক্ষণ এক এক করে ফুটে উঠতে লাগল।

এর ওপর, অস্বীকার করব না, গভীর রাত্রে একা এই রকম একটা নির্জন জায়গায় নিরুপায় ভাবে বসে থাকবার যে অস্বস্তি—আরও ঠিক করে বলতে গেলে, যে একটা অহেতুক ভয়, সেটা ধীরে ধীরে মনটা আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগল। মনে হতে লাগল, এ জায়গাটা যেন ছেড়ে যাওয়াই ভালো, মনে হতে লাগল, এর চেয়ে পথ ধরে সমস্ত রাত যদি

চলাও যায়, তাতে অন্তত এই অস্বস্তির হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে।

উঠে পড়েছি, এমন সময় দেখি হাত পঞ্চাশেক তফাতে একটি লোক এই দিকে চলে আসছে। ঐ চিন্তার মধ্যেই হঠাৎ দৃষ্টি পড়ায় বুকটা ছ্যাঁৎ করেই উঠেছিল। তার পরেই কিন্তু সাহসটা বেশ ভালভাবেই ফিরে এল।

আর একটু এগিয়েও এসেছে। দেখলাম বেশ জোয়ান, হাতে একটা বড় লাঠি, চলেও আসছে বেশ খাড়া চালে। আরও কয়েক পা এগুলে আরও খুঁটিনাটি চোখে পড়ল। একটা হাঁটু পর্যন্ত ঝোলা লাল রঙের আচকান গোছের জামা পড়া, কোমরটা কিছু দিয়ে বাঁধা, আর মাথায় একটা লাল হালকা পাগড়ি। দেখলেই মনে হবে যেন কোন জমিদারের পেয়াদা।

সাহস ফিরে এলেও, বরং আরও বেড়ে গেলেও কিন্তু হঠাৎ এ রকম জায়গায় এ ধরনের লোকের আবির্ভাবে যে একটু বিস্মিত হয়ে গেছি, তার জন্যে ওকে কোন প্রশ্ন করার কথাটা মনেই উঠল না প্রথমটা। এদিকে সম্পূর্ণ না হোক, আমার শরীরের কতকটা অন্তত অশ্বথগুঁড়ির আড়ালে পড়ে যাওয়ায় লোকটাও নিশ্চয় আমায় দেখতে পায় নি। খানিকটা তফাৎ থেকেই তালা বন্ধ দেখে ঘুরেছে। আমি ডাকলাম—"ওহে শোন।"

লোকটা দাঁড়াল না। হাওয়ার সনসনানিটা বেড়েছে, শুনতে পায় নি নিশ্চয়, আমি জোরে হাঁক দিলাম। বেশ দ্রুত পেয়াদামার্কা চাল, অনেকখানি এগিয়ে গেছে, তবু যেমন জোরে ডেকেছি, কানে না যাওয়ার কথা মোটেই নয়। হঠাৎ আমার বাড়ির ঝিটার কথা মনে পড়ে গেল, যদি পেছন ফিরল ত ঢাক পিটোলেও তার সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ নেই কারুর।...কিন্তু এত কালা যে সে জমিদারের পেয়াদাগিরি করে কি করে? এই চিন্তাটুকুর মধ্যে লোকটা আরও বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে, আমি চকিত হয়ে উঠে পড়লাম, ভেবে দেখলাম,জমিদারের কাজ কি করে চলে সে জমিদারের ভাবনা, আমার এখন দরকার ওর অনুসরণ করা। বেশি আশা না রেখে এবার বেশ মুক্তকণ্ঠেই ডাক দিলাম একটা। কোন ফল না হওয়ায় নিঃসংশয় হলাম—আমার আন্দাজটা ভুল নয়। বেশ জোরেই পা চালিয়ে দিলাম। যেতে যেতেই ব্যাপারটা যে কি হওয়া সম্ভব তারও একটা ধারণা গড়ে নিলাম নিজের মনে। জমিদারের পেয়াদাই যে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মনিব একাই হোক বা সাজপাজ সঙ্গে করেই হোক কোথাও যাবেন রাত্রে, খেয়ার কি অবস্থা দেখতে, কিম্বা হয়ত খেয়া তোয়ের রাখতেই লোক পাঠিয়েছেন, অবস্থাটা দেখে নিয়ে রিপোর্ট দেওয়ার জন্যে ফিরছে তাড়াতাড়ি।...ব্যাপারটা ঠিক এই হোক, কিম্বা এই ধরনের কিছু হোক, আমি যে একটা আশ্রয় পাব, লোকজনের মধ্যে গিয়ে পড়ব, এই চিন্তায় বেশ লঘু পদক্ষেপেই এগিয়ে চললাম। জমিদার যদি লোক পাঠিয়ে মাঝিমাল্লাদের ধরিয়ে আনিয়ে নৌকা খোলবার ব্যবস্থা করেন, তাঁদের সঙ্গেই ফিরে এসে পার হওয়া যাবে, অন্যথা কাছারিবাড়ির এককোণে রাত কাটাবার জন্যে একটু জায়গা পাওয়া যাবেই। যে কাহিনীটা দাঁড় করিয়েছি তাতে যেখানে যেখানে খুঁত বা অসঙ্গতি আছে, পূরণ করতে করতে এগিয়ে চললাম।

আমরা সোজাই যাচ্ছি খেয়াঘাটের রাস্তা ধরে, যেটা বাসের বড় পিচঢালা সড়কটার সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। লোকটার সঙ্গে গোড়ায় আমার প্রায় পঞ্চাশ গজের তফাৎ ছিল, চলতে আরম্ভ করে আমি সেটাকে প্রায় অর্ধেকটা পর্যন্ত কমিয়ে এনে ছেড়ে দিয়েছি। ভেবে দেখলাম সামনে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছি এই যথেষ্ট। কালা মানুষ, একেবারে বদ্ধ কালা, পাশাপাশি হয়ে লাভ নেই ত। ঐ প্রভেদ রেখে চলেছি, প্রায় রাস্তার মাঝামাঝি যখন এসে পড়েছি, লোকটা হঠাৎ ডাইনে ঘুরল। একটা খট্‌কা লাগল, কিন্তু সেটা নিতান্তই ক্ষণিক। ভেবে দেখলাম—এ রাস্তার ত সমস্তটাই দেখা হয়ে গেছে, কোথাও গ্রাম বা মহাল-টানা বাড়ি নেই কোন, তা হলে পাশের দিকেই, দূরে বা কাছে, কোথাও কিছু রয়েছে। চিন্তার মধ্যেই আমিও ঐখানটায় এসে পড়লাম। খেয়ার এটা হাতপাচেক চওড়া কাঁচা রাস্তা। এসে দেখলাম এটাও ঠিক ঐ ধরনের, তবে তফাতের মধ্যে এটার মত বেশ চালু নয়। দু'দিকে ঘন আগাছা আর সমস্ত রাস্তাটাই দূর্বাঘাসে আচ্ছন্ন দেখে মনে হয় যেন নিতান্তই কালেভদ্রে কেউ চলে এ পথে। একটু থমকে পড়তে হ'লই, কিন্তু সেটাও খুব ক্ষণিক। হাতে শুধু লাঠি থাকলে যে ভয়টা অন্তত এই পথ-পরিবর্তনে আসতে পারত, সেটা মনে উঁকি মেরেই চলে গেল। ভেবে দেখলাম, লেঠেরা বা সে রকম কিছু হলে জমিদারী পেয়াদার কোমরবাঁধা লাল আচকান আর মাথায় পাগড়ি নিশ্চয় থাকত না। প্রায় ইতস্তত না করেই আমিও ঢুকে পড়লাম রাস্তাটায়।

দেখছি, রাস্তাটা সোজা না গিয়ে বেশ খানিকটা কোণা-কুণি, যেন নদীটা লক্ষ্য করেই চলেছে। একটা কথা এখানে বলে রাখা দরকার। ইতিমধ্যে হাওয়াটা আরও জোর হয়েছে এবং মেঘটা গাঢ়তর হয়ে আকাশের সেই পাতলা আস্তরণটা একেবারেই ফেলেছে ঢেকে। জ্যোৎস্নার আভাটা রয়েছে এখনও, তবে মুমূর্ষুর মত একেবারেই পাণ্ডুর।

বেশ বুঝছি, নদীর দিকেই চলেছি আবার, এবং আরও

খানিকটা এগিয়ে মনে হ'ল দূরে, একটা বড় কি গাছের নীচে একটা যেন বাড়ির আদল। এও মনে হ'ল, এদিকটা পথের দু'ধারে যেমন আগাছা ক্রমেই চাপ বেঁধে আসছিল, ওখানটায় গিয়ে খানিকটা জায়গা নিয়ে বেশ একটু যেন পরিষ্কার। বাড়ির আদলটা আর একটু স্পষ্ট হ'ল—দু'পাশে দু'খানা ঘর, মাঝখানটায় বারান্দা। আমার আন্দাজটুকু আরও খানিকটা পূর্ণ হয়ে উঠেছে—এসেই পড়লাম জমিদার দেউড়ির ফটকে, এমন সময় পেয়াদাটাও বারান্দায় পড়ল উঠে।

একটু পরেই আমিও গেলাম পৌছে।

দেখি, হালকা জ্যোৎস্নায়—যা অন্ধকারেরই সামিল হয়ে উঠেছে—দৃষ্টিবিভ্রম করিয়েছে। দেউড়ি-টেউড়ি কিছু নয়। নিতান্তই বিচ্ছিন্ন দু'খানি মাঝারি সাইজের ঘর আর মাঝখানে একটু বারান্দা।

বারান্দার ধারে দাঁড়িয়ে ওদিকটাও দেখলাম। ঘর দুটা নদীর ধারেই। বারান্দার নীচে থেকেই বারান্দা-বরাবর চওড়া সিঁড়ি নেমে গেছে নদীতে। এ জায়গাটা উঁচু, যার জন্মে বেশ খানিকটা পর্যন্ত দেখা যায় ঘাটটা। কিন্তু ঐ কথা, দু'ধারে আগাছা চেপে আসছে,আর কেমন একটা পরিত্যক্ত, অপরিচ্ছন্ন ভাব, যা দেখে মনে হয়, রাস্তাটার মত ঘাটও যদি লোকে সরেই ত সে নিতান্ত কালেভদ্রে।

এদিকটা দেখা শেষ হতে আমার লোকটার কথা মনে হ'ল। দেখি, উঠে আসতে বাঁ দিকে যে ঘরটা তার মাঝ-খানে, দোরের সামনাসামনি গায়ে একটা চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে আছে, খুব সম্ভব কোমরে সেটা জড়ানো ছিল। বাস থেকে নেমে পর্যন্তই একটা স্নায়বিক উত্তেজনা চলেছে আমার, ক্রমে বেড়েও গেছে। ওকে দেখেই যেন খেয়াল হ'ল, হাওয়ায় বেশ একটু শীতের ভাব এসে গেছে। শ্রান্তিটাও হঠাৎ যেন বেশি করে ঘিরে এল। কিন্তু এরকম একটা জনহীন জায়গায় ওর মত বেপরোয়া হয়ে শোয়াও ত যায় না। ঠিক করলাম বারান্দাতে বসেই রাতটা কাটিয়ে দোব। এই সময় কিন্তু মেঘগর্জনের সঙ্গে গোটাকতক বিদ্যুৎ খেলে যাওয়া দেখলাম—পারিপার্শ্বিকের দিক থেকে ঘর-গুলার অবস্থা যতটা খারাপ আন্দাজ করা গিয়েছিল, ততটা ত নয়ই, বরং বেশ পরিচ্ছন্নই। তবু একেবারে ভেতরের দিকে না গিয়ে ভেতর-বাহিরের মধ্যে কতকটা যেন রফা করে দরজা থেকে হাতখানেক গিয়ে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে পড়লাম। বারান্দাটা চওড়া নয়, বারান্দায় বসলে বৃষ্টি নামলে ছাট থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না।

সিল্কের চাদরটা কাঁধ থেকে নামিয়ে চড়িয়ে নিলাম গায়ে। একটি নিশ্চিন্ত আশ্রয় পেয়েছি, একটি লোক রয়েছে, সশস্ত্রই, নিশ্চিন্ততার সঙ্গে বেশ একটি আরামের ভাবই মনটাকে অধিকার করে নিল ধীরে ধীরে। ক্রমে, আমাদের, অর্থাৎ লেখক-সম্প্রদায়ের যে—কি বলব, জরা ব্যাধি? সেটি ভেতর থেকে ধীরে ধীরে উঠে আসতে লাগল, বাস ছাড়া থেকে আরম্ভ করে—আকাশ-বাতাস,নদী-পথ-ঘাট মিলিয়ে আজকের রাতের যে রোম্যান্স সেটার মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে যেন তলিয়ে যেতে লাগলাম।...বুঝলাম, সমস্ত রাত এভাবে বসে থাকা চলবে না, তবু আসন্ন নিদ্রাকে যতক্ষণ সম্ভব ঠেলে ঠেলে রেখে দুর্যোগময় এই আকস্মিক রাত্রিটিকে যতটা সম্ভব মনের মধ্যে সঞ্চয় করে নিতেই হবে।

আমার আন্দাজ বা মনগড়া কাহিনীটা ঠিকই আছে। লোকটা যাচ্ছিল ঘুরে রিপোর্ট দিতে, তার পর আকাশের অবস্থা দেখে স্থির করে নিয়েছে, আর প্রয়োজন হবে না। আশ্রয়টা জানাই, ঘুরে চলে এসেছে।

ঝড় বেড়েই চলেছে এবং একভাবে বসে থাকতে না পেরে আমিও পেয়াদাটার মত একসময় চাদরটা মুড়ি দিয়ে দরজার সামনে শুয়ে পড়েছি, এদিককার এইটুকুই মনে আছে। ঘুমিয়ে পড়তে অল্পই সময় লেগে থাকবে, নিদ্রাটা হয়েছিলও গভীর, হঠাৎ ভেঙে গিয়ে একেবারে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম।

উঠে বসলাম একটা খণ্ডপ্রলয়ের মধ্যে। ঝড়, বৃষ্টি, বজ্র, বিদ্যুৎ কিছুই আর বাকি নেই, সঙ্গে একটা মস্ত কলরোল, সব মিলিয়ে সমস্ত জায়গাটাকে মথিত করে তুলেছে। কিন্তু এ সবের জন্মে মনটা তৈয়েরই ছিল, যা আমায় বিস্মিত এবং অভিভূত করে ফেলল তা সম্পূর্ণ এক অন্য ধরনের ব্যাপার, যা বিশ্বাস এবং উপলব্ধি করতেই সেই সদ্যোত্থিত অবস্থায় বেশ খানিকটা সময় লেগে গেল।

সেই পেয়াদাটা নেই, কিন্তু সমস্ত জায়গাটা লোক, লস্কর, সান্ত্রী, পেয়াদায় ভরে গেছে। সবাই সাজগোজ করা, অনেকের ওর চেয়েও ভালো, কারুর হাতে আশাসোটা, কারুর কোমরে মখমল ঢাকা তরোয়ালের খাপ, একজনের পিঠে বন্দুক আর টোটার বেল্ট দেখে মনে হ'ল রাজা-জমিদার গোছের কেউ কোন একটা বড় উৎসবে কোথাও চলেছে। খুব একটা ব্যস্ত ভাব। বাঁশের বাতার মাথায় ফলকে বসানো আগেকার ধরনের গোটাকতক মশাল, তারই আলোয় সব আনাগোনা করছে। কেউ যাচ্ছে নদীর দিকে নেমে, কেউ আসছে উঠে। গতিবিধি লক্ষ্য করেই একটু সামনে ঝুঁকে গলাটা বাড়িয়ে দেখি নদীতে পাশাপাশি দু'খানা বজরা। তার একখানা বেশ ভাল করে সাজানো মনে হ'ল দূর থেকে। লোকগুলার আমার দিকে দৃক্‌পাত নেই দেখে কোন প্রশ্ন করব কিনা, করলে এত ব্যস্ততার মধ্যে কাকে

ডেকে করব মনে মনে ভাবছি, এমন সময় সেই উগ্রগামী জনস্রোতে একটা যেন নতুন জোড় নামল এবং উল্টোদিকে ঘুরে দেখি আরও লোকলস্করের মধ্যে আগে-পেছনে করে দু'খানি পালকি এসে পৌছল। সামনেরটা খোলা, তাঞ্জাম-গোছের, পেছনেরটা মখমলের ঘেরাটোপ দিয়ে ঢাকা। প্রত্যেকটাতে লাল বনাতের উর্দিপরা আটজন করে বেয়ারা, তারা বারান্দার নীচে দুটোকে পাশাপাশি নামিয়ে রাখতে তাঞ্জাম থেকে আরোহীটি নেমে বারান্দায় উঠলেন। বয়স কম করে ধরলেও সত্তরের নীচে হবে না, শরীরটা খুব দুর্বল বলে মনে হয় না বয়সের অনুপাতে, তবে সামনে বেশ ঝুঁকে এসেছে। এদিকে আগাগোড়া লাল রেশম আর মখমলের পোশাকে সজ্জিত, মোড়াই বলা ঠিক, মাথায় পালক গোঁজা একটা রাঙা রেশমের পাগড়ি।

পালকি নামাবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বাপর মিলিয়ে সমস্ত দলটা সুবিন্যস্ত হয়ে আগে-পেছনে-পাশে, যার হাতে যা রয়েছে প্রথামত বাগিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঢাকা পালকির পাশে পাশে চামর নিয়ে দুটি স্ত্রীলোক হেঁটে হেঁটে আসছিল, তাদের একজন ঘেরাটোপের মুখটা টেনে ধরেছে, একটি পাঁয়জোর-পরা রাঙা পা অর্ধেকটাও বেরিয়েছে কি না বেরিয়েছে, এমন সময় নদীর দিকে হঠাৎ একটা তুমুল কোলাহল উঠল।

আমি এগিয়ে এসে চৌকাঠের পাশে বসেই সব দেখে-ছিলাম। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি সেখানে রীতিমত একটা লড়াই বেধে গেছে। দূর থেকে যতটা আন্দাজ করতে পারলাম, গোটা চার-পাঁচ লম্বা ছিপ-গোছের নৌকা হঠাৎ বজরা দুটোর ওপর এসে পড়েছে। এত ঝড়ে বাইরে থেকে আসা সম্ভব নয়, নিশ্চয় একেবারেই কাছে নদীর কোন খাঁড়িতে লুকিয়ে এই অবসরটার জন্য প্রতীক্ষা করছিল, একেবারে বাজের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আকাশের ঐ অবস্থা, নদী উত্তাল, আছাড় খেয়ে খেয়ে পড়ছে বাজরা আর ছিপগুলা, তার ওপর ঐ কাণ্ড। মশালের আলোয় দেখছি লাঠি-তরোয়ালে মাথামাথি, চোট খেয়ে লোকেরা বাজরা থেকে ছিটকে পড়ছে জলে, এক-একবার গাদা বন্দুকের ধোঁয়ায় আবছা হয়ে যাচ্ছে খানিকটা করে, আবার মশালের আলোয়, বিদ্যুতের ঝলকে সেই উৎকট দৃশ্য।

এদিকে ঘুরে চাইলাম। সব স্তব্ধ, যেন জমাট বেঁধে পালকি দুটাকে ঘিরে যার হাতে যা আছে গুছিয়ে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এমন ভাবে যে, বারান্দার নীচে পালকি দুটা আর দেখাই যাচ্ছে না।...কিন্তু, অন্তত আরোহী নিয়ে পালকি দুটা ত সরিয়ে দেওয়া উচিত। আমার দিকে কেউ দৃক্‌পাত না করলেও, নিজের মনের উত্তেজনাতেই পরামর্শ দিতে যাব এমন সময় দেখি ওরাও যেন এই ধরনেরই একটা প্ল্যান আঁটছিল, বিধিমতই যোল বেয়ারার কাঁধে দুটো পালকি পড়ল উঠে এবং সমস্ত দলটা বিভক্ত হয়ে গিয়ে অর্ধেকগুলা নদীর দিকে মুখ করে প্রতিরোধের জন্য দাঁড়াল এবং অর্ধেকগুলা উল্টোদিকে। তার পর পালকি দুটা তুলে উঠেছে, দ্বিতীয় দলটাও পা বাড়িয়েছে, দৃশ্যপট একেবারে বদলে গেল। নদীর দিকটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল, অবশ্য ঝড়-ঝঞ্ঝা রয়েছেই, তবে ওখানকার লড়াইটা গেছে থেমে, দেখলাম প্রায় জনপঁচিশেক লোক লাঠি-সড়কি নিয়ে মশালের আলোয় সিঁড়ি বেয়ে ছুটে ছুটে আসছে। সামনে একজন যুবা, হাত তুলে কি বলল, ঝড়ের দোলায় মনে হ'ল "থামবে!" বলে একটা হুকুম। এদিকেও ঝড়ের দোলার মধ্যে কার যেন মৃদুকণ্ঠের হুকুমে —মনে হ'ল বৃদ্ধেরই—পালকির দলটা গেল থেমে।

এর পর শুধু একটা নিঃশব্দ অভিনয়, ঝড়ের দোলার মধ্যেই ইঙ্গিতের সঙ্গে হয়ত এক-আধটুকু জড়ানো কথা। লড়াই ঝগড়া আর একেবারেই নেই। পরিপূর্ণ স্তব্ধতার মধ্যে যুবকের ঐ রকম একটা তর্জনী ওঠানো ইঙ্গিত আর কথার পর শুধু তাঞ্জামটা উঠল আর পালকিটাকে ছেড়ে এদিককার সমস্ত দলটা তাঞ্জামের পেছন পেছন চলল। দাসীদের দু'জন ছিলই, যুবক একটু এগিয়ে গিয়ে ঐ রকম ইঙ্গিতে কি বলতে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। সমস্ত শরীরটা শাড়িতে-গহনায় ঝলমল, মুখটা একটা খুব পাতলা রেশমের উড়ুনি দিয়ে ঘোমটার আকারে ঢাকা। হঠাৎ এমন একটা উদ্বেগপূর্ণ মুহূর্ত এসে গেছে, আমার মনে হ'ল ঝড়-ঝঞ্ঝার সেই উৎকট শব্দ পর্যন্ত লুপ্ত, শুধু এরা দু'জনে কিসের একটা প্রতীক্ষায় পরস্পরের সামনাসামনি হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটা উৎকণ্ঠিত মুহূর্ত, তার পরেই মেয়েটি ধীরে ধীরে রতনচূর-পরা দুটি হাত দিয়ে মুখের অবগুণ্ঠনটা তুলে ধরে চাইল যুবকের দিকে। সে মুখের মধ্যে এমন একটা সহজ অন্তরঙ্গতার ভাব রয়েছে যাতে মনে হ'ল ওরা পূর্ব্ব থেকে পরিচিত এবং ওদের দু'জনের রচিত একটি পরিকল্পনা যেন এইমাত্র সফল হয়ে শেষ হ'ল।

একটি নতুন কাহিনীর আভাস ফুটি ফুটি করছে আমার মনে, এমন সময় দৃশ্যপট আবার হঠাৎ গেল পালটে।

যুবকটি এক পা এগিয়ে গিয়ে মেয়েটির হাত ধরেছে, হঠাৎ একটা বন্দুকের আওয়াজের সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়িয়ে পড়ল মেয়েটির পায়ের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে ঝড়-ঝঞ্ঝা-বজ্রের সাথে আবার সেই নারকীয় কলরোল। কিন্তু বাজের

ধোঁয়ায় ছোট জায়গাটা এমন ভরে গেছে যে, ভেতরে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছুই বোঝবার জো নেই। শুধু যেন হঠাৎ দ্বিগুণিত ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতের শব্দের সঙ্গে দুটা দলের সংঘর্ষ ঝনঝনা! মার মার! কাট কাট!...সব ভেদ করে আরও গাদা বন্দুকের শব্দ, সব লুপ্ত করে আরও বারুদের ধোঁয়া...।

ওদিকে আমার আর এইটুকুই মনে আছে যে, এক সময় এক মুহূর্তেই যেন হঠাৎ সবটুকুতে একটা ছেদ পড়ে গিয়েছিল, একটা চলতি সিনেমা, হঠাৎ কারেন্ট বন্ধ হলে বা রীল কেটে গেলে যেমন যায় মাঝপথে থেমে। পরে বুঝতে পারলাম, মনের ওপর আর চাপ সহ্য করতে না পেরে অচৈতন্য হয়ে পড়ি।

চৈতন্যটা ফিরেও এল আপন হতেই। হাতঘড়িটা উলটে দেখলাম চারটে বেজে মিনিট ছয়-সাত হয়েছে। নদীর ওপারে চক্রবালের খানিকটা উর্ধে শুকতারাটা দপ্ দপ্ করছে। একটা বেশ ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে, নদীর জলে শান্ত বীচিভঙ্গ।

রাত্রে যেন কিছু একটা হয়েছিল এখানে! চেষ্টা করে করে স্মৃতিটাকে স্পষ্ট করে আনছি, রাত্রের তাণ্ডবের চিহ্ন আচ্ছন্ন দৃষ্টি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুঁজছি জলে-স্থলে, এমন সময় অস্পষ্ট আলোয় দেখি যেন জন চার লোক পথ দিয়ে এই দিকে এগিয়ে আসছে, একজনের হাতে একটা লণ্ঠন। আর একটু আসতে বুঝলাম আমার বন্ধু, বাকি তিন জন ওরই লোক। ঘর থেকেই দেখছিলাম, বেরিয়ে আসতে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে একটু বিস্মিত হয়েই মুখের পানে চাইলেন, যেন কি লক্ষ্য করলেন, তার পর প্রশ্ন করলেন—"তুমি এখানে—বৌরাণীর ঘাটে হঠাৎ কি করে এলে?"

"বৌরাণীর ঘাট!" বেশ বিস্মিত ভাবেই প্রশ্ন করলাম আমি।

আবার ক্ষণমাত্র লক্ষ্য করে দেখলেন যেন। প্রশ্ন আরম্ভ করেছিলেন—"রাত্তিরে তুমি কিছু..."

মধ্যেই থেমে গিয়ে বললেন—"থাক, সে হবে'খন। এটুকু হেঁটে যেতে পারবে? জিপটার একটু কি বিগড়ে গেছে এই তেমাথায় এসে, ড্রাইভার ঠিক করছে, এক্ষুনি হয়ে যাবে।"

গিয়ে দেখলাম ঠিকই হয়ে গেছে। বাসার দিকে ছুটল জিপ। যেতে যেতে গল্প হ'ল। ওঁরটা সংক্ষিপ্ত। ঝড়-ঝঞ্ঝার জন্যেই এক জায়গায় আটকে গিয়ে রাত প্রায় একটার সময় 'ট্যুর' (Tour) থেকে ফিরে শুনলেন আমি এসেছিলাম, ওকে না পেয়ে এবং বিশেষ কাজ থাকায় সামনের বাস ধরেই বেরিয়ে পড়ি, রাত্রেই খেয়া পেরিয়ে ওপারে চলে যাব বলে। উনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। এসে দেখেন খেয়ায় লোক নেই, তবে নৌকা আর ফ্ল্যাট দুটাই এপারে বাঁধা দেখে অনেকটা আশ্বস্ত হন। কিন্তু আমি গেলাম কোথায় তা হলে? ফাঁকা জায়গা, খোঁজাখুঁজি করবার কিছুই নেই। তবুও খানিক এদিক-ওদিক ঘুরে-ফিরে যাবেন এমন সময় বৌরাণীর ঘাটের কথা হঠাৎ মনে পড়ল। এইখানেই কাছাকাছি কোথায় আছে। এর সম্বন্ধে একটা কিম্বদন্তী যখন শুনেছেন, একবার দেখে যাওয়াই ভাল।

"কিম্বদন্তীটা কি?"—আমি প্রশ্ন করলাম।

উনি আবার সেই ভাবে একবার লক্ষ্য করে নিয়ে প্রতি-প্রশ্ন করলেন—"রাত্তিরে কিছু দেখেছ তুমি?"

জিপ এগিয়ে চলেছে পাকা রাস্তায় উঠে। আকাশ অল্প স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। আমি সেই বধির পেয়াদার আসা থেকে নিয়ে সবটুকু বলে গেলাম।

শুনে বললেন—"সবটুকুই ত মিলে যাচ্ছে।" আবার মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে বললেন—"আশ্চর্য, সামলেছ ত ধকলটা। যদিও এও ঠিক যে, কিছু থেকেই গেছে বাকি।"

প্রশ্ন করলাম—"স্বপ্ন ছিল না? কিছুই ত চিহ্ন নেই সে সবের।"

বললেন—"স্বপ্ন মোটেই নয়, তা হলে আমার শোনা গল্পের সঙ্গে হুবহু মিলবে কি করে? পেয়াদা এসে ঘাট থেকে নিঃশব্দে ডেকে নিয়ে যাওয়া—ও কালা নয় মোটেই—তার পর খুড়ো-জমিদারের ভাইপোর জন্যে মেয়ে দেখতে গিয়ে—নিজের জন্যে জলুস করে খেয়াঘাটে নিয়ে আসা।...হ্যাঁ, বিয়ে হয়নি তখনও, সেটা বলে রাখি—ওদের ঘরের রেওয়াজ হচ্ছে মেয়েকে আনিয়ে নিজের এখানেই বিয়ে করা। খুড়ো দেখতে গিয়ে নিজেই নিয়ে আসছিল, ডাকসাইটে সুন্দরী মেয়ে। তার পর তুমি লেখক মানুষ, অতটা দেখলেও বাকিটা নিজেই সৃজন করে নিতে পেরেছ নিশ্চয়। ভাইপো বসন্ত রায় নয়, ছেড়েই দিয়েছিল খুড়োকে। খুড়ো কিন্তু ভুলতে পারল না। দলবল নিয়ে ফিরে যাওয়ার সময় কল টিপে দিয়ে গেল। সেই যে গাদা বন্দুক আর টোটার বেল্ট আঁটা সান্ত্রীটাকে দেখেছিলে, সেই গোলমালে নিঃশব্দে তোমার সামনের ঘরটায় ঢুকে পড়েছিল, তাল বুঝে কাজ সেরে দিলে।"

"মেয়েটি?...সে তা হলে খুড়োরই..."

"না, তাই ত বলছিলাম—তুমি ধাক্কাটা মোটামুটি সামলে গেলেও শেষ রক্ষা হয় নি। বৃদ্ধকে ওরা সরিয়ে দিয়েছিল। মেয়েকে কিন্তু নিয়ে যেতে পারে নি, কিম্বা যায় নি সে

নিজেই। ওই ঘাটেই সেই রাত্রে চিতা জ্বালানো হয় যুবকের, মেয়েটি সহমৃতা হয়।...মনে রেখ, সেই কোন গাদা বন্দুকের যুগের ঘটনা। এ-টেই তখন খেয়াঘাট ছিল, এখন শ্মশান, খেয়াঘাট এদিকে সরে এসেছে।”

খানিকটা নিঃশব্দে চললাম আমরা, তার পর বন্ধু বললেন —“যাই হোক মাঝখান থেকে খুব একটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নিলে।...আমি চেষ্টা করব যাতে শেষ পর্যন্ত দেখে নিতে পারি...জ-জ্যান্ত সতীদাহের চিত্র একটা।”

আমি বিস্ময়ে একেবারে ঘুরে চাইলাম, একেবারে কতকগুলা প্রশ্ন করে ফেললাম—“বল কি! তুমি দেখবে! এসব একটা ভৌতিক ব্যাপার! আবার হবে নাকি?”

বন্ধু বললেন—“আধিভৌতিক বল, ঠিক হবে। ভৌতিক বলতে আমরা যা বুঝি সেটা হ'ল তাদের নিয়মকানুন অনুযায়ী তোমার ঘাড় না মটকে বসে বসে তোমাকে তামাশা দেখতে দিত? আসল কথা—আজকাল যেমন বলছে—ওসবগুলা ত আর কিছুই নয়, ইথার বা অতিসূক্ষ্ম বায়ুস্তরে একটা ছাপ। ঠিক সিনেমার রীলে ছাপের মতই—একসময় ঘটনাগুলা সত্যই ঘটেছিল বা ঘটানো হয়েছিল, তার পর অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করলেই আবার অজ্ঞভাবে ঘটবে। এসব ব্যাপারের অনুকূল অবস্থা, সেই দিনের মত একটি বিক্ষুব্ধ রাত, যত সে রাতের কাছাকাছি হবে ততই পুনরভিনয় হবে স্পষ্ট এবং জোরালো।”

বললাম—“পড়ি এমন সব কথা মাঝে মাঝে, কিন্তু নিজের চোখে যা দেখলাম তার পর আর ওসব নতুন নতুন থিয়োরী বিশ্বাস করতে মন চায় না।”

ভোরের কচি রোদটা জিপের পাশ দিয়ে গায়ে এসে পড়েছে। বন্ধু একটা সিগারেটের টিন কাটছিলেন, শেষ হলে একটা বের করে আমার হাতে দিলেন, তার পর একটা নিজের ঠোঁটে চেপে ধরে একবার আকাশের দিকে চেয়ে বললেন—“করবে বিশ্বাস, দিনটা আর একটু এগুতে দাও।”

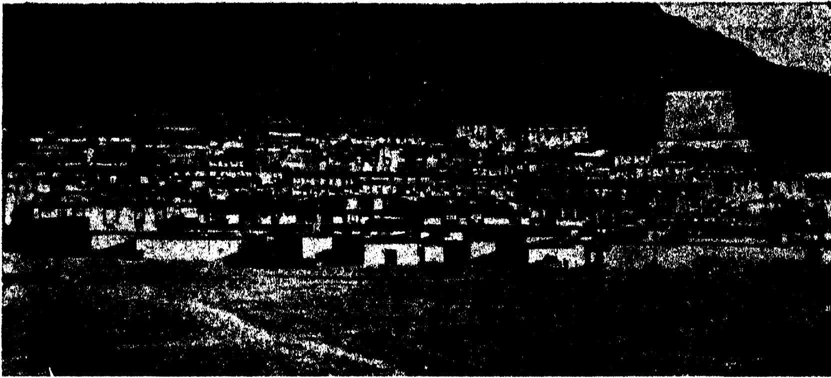
দেশলাইটা জেলে এগিয়ে ধরে বললেন—“নাও, ধরিয়ে নাও।”

কালিদাসের উদ্দেশে

শ্রীকালিদাস রায়

বহু শত বর্ষ আগে ওগো মহাকবি
আঁকিয়াছ স্বপ্নপটে হৃদয়ের ছবি,
সেদিনের বসুমতী লভিয়াছে কত রূপান্তর
সেদিনের পুর, পল্লী, জনপদ, শস্যের প্রান্তর,
পথ, ঘাট, বাসগৃহ বিবর্তিত নব রূপ লাভে।
প্রকৃতি কেবল আছে সেই একই ভাবে।
বিহগ কূজন আর কুসুম সৌরভ,
সমীরণে মর্মরিত তরুর পল্লব,
অরণ্য, তটিনী, শৈল বিরাজিছে সমানই ভূতলে,
রবিচন্দ্র তারাবলী একই ভাবে গগন উজলে।
বসন্ত, শরৎ, গ্রীষ্ম। বরষার মেঘ
সমানই জাগায় আজো হৃদয় আবেগ।
মানুষের রীতি-নীতি, আচার-বিচার, আচরণ,
সমাজ, সভ্যতা, রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান, অশন, বসন—
সবই আজ বিবর্তিত।
নারী-নরে হৃদয়ের মিল
সেই মুগ্ধ প্রেমলীলা ক্ষুণ্ণ শুধু নয় এক তিল।
বিরহ, মিলন-তৃষা, রূপমোহ, মান, অভিসার
একই ধারা ধরি করে আজো চিত্তে রসের সঞ্চার।

প্রকৃতি ও প্রেম এই দু'য়ে তুমি করিয়া আশ্রয়
বিকশিত করেছিলে শতদলে কমল-হৃদয়।
প্রকৃতিরে করেছিলে অসীমের দূতী
স'পিলে তাহারে তুমি দিব্য বার্তা প্রেমের আকূতি।
নিত্য-চিরন্তন যাহা শুধু তার গীত
গেয়ে গেলে তাই তুমি সর্ব-যুগ-জিৎ,
তাই আজো বহুকাল ব্যবধানে বিংশ শতাব্দীতে
রসমুগ্ধ হই তব গীতে।



তিব্বতের একটি বৃহত্তম বিহার

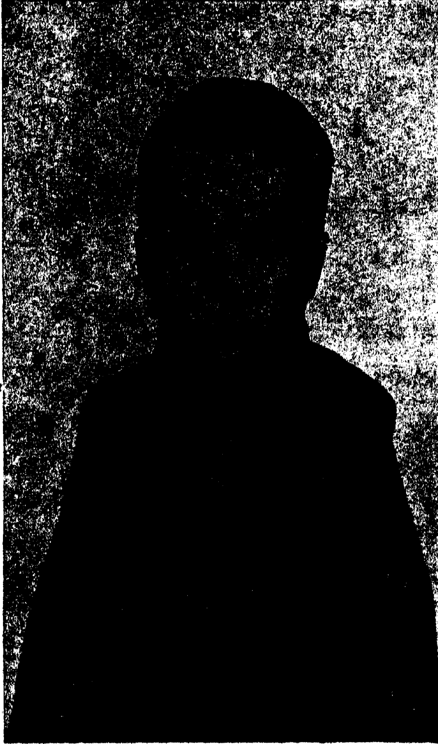
তিব্বত ও ভারত

ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ

এশিয়ার পূর্ব্ব ও পশ্চিম-ভাগ বাদ দিলে বাকী থাকে মধ্য-এশিয়া, তার উত্তরে কিউন্ লুন্ চীনা পর্ব্বতমালা ও দক্ষিণে ভারতের হিমালয়। এই হিমোত্তর (Trans-Himalaya) অঞ্চলে আমাদের কারবার সবচেয়ে বেশী তিব্বতীদেরই সঙ্গে যদিও পাশ্চাত্যজাতিরা নাম দিয়েছেন Forbidden land—দুষ্প্রবেশ্য দেশ। অথচ দুই সহস্রাধিক বছর ধরে ভারত ও চীন এই তিব্বত তথা মধ্য এশিয়া (বা চীনা তুর্কীস্থান) অতিবাহন করে নিজ নিজ ভাষা ও সভ্যতার আদানপ্রদান করে এসেছে।

বৈদিক যুগের শেষে যখন রামায়ণ ও মহাভারতের ভৌগোলিক নামগুলি দেখা যায় তার মধ্যে পাই বিশাল হিমালয় দেশ ও যক্ষ, কিন্নর, কিরাত, কাম্বোজাদি জাতি, যারা আমাদের সাহিত্যে ও শিল্পে স্থায়ী ছাপ রেখে গেছে। ভারতের বৌদ্ধ পরিব্রাজক দ্বয়ে—কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্ম্মরত্ন—এই মধ্য এশিয়া দিয়ে সুদূর চীনে ধর্ম্মপ্রচার করেছিলেন (খ্রীঃ ১ম শতক) চীনা বৌদ্ধভিক্ষু ফা-হিয়েন তেমনি ৪০০ খ্রীষ্টাব্দে এই পথেই পশ্চিম-তিব্বত ও কাশ্মীর পেরিয়ে ভারতে তীর্থযাত্রা করে যান ও প্রথম ভ্রমণ-কাহিনী লিখে যান। সেই গুপ্তযুগের কবিসম্রাট কালিদাস তাঁর মেঘদূতে বিরহী-যক্ষের 'অলকাপুরী'র যে অপূর্ব্ব বর্ণনা করেছেন হয়ত সেটি ভৌগোলিক অভিজ্ঞতাপ্রসূত (পণ্ডিতপ্রবর হরপ্রসাদের এই মত—"উৎসব সঙ্কেত" নামটীকা দ্রষ্টব্য)। সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের কল্যাণমিত্র হিউএন্ সাঙ (৬৩০-৪৫) প্রায় ১৫ বছর ধরে ভারতে ও প্রত্যন্ত দেশে পরিভ্রমণ করে যে তথ্যপূর্ণ বিবরণী লিখে গেছেন তাঁর সাহায্যে প্রথম স্পষ্টভাবে আমরা তিব্বতকে জানি। তিব্বতী সম্রাট স্রোচন্-গম্বোর ছিল দুই মহিষী—নেপাল ও চীনের দুই রাজকুমারী। তান্ত্রিক হিন্দু ও বৌদ্ধ যোগাচার মিশ্রণে তিব্বতের ভূত-প্রেত পূজক (Bon Cult)-দের মধ্যে মহাযান-মার্গী Lamaism প্রচারে সাহায্য করেন, অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে (৭০০—৭৫০) তিব্বতের ধর্ম্মাশোক সম্রাট স্রোং-লেদ-বচন্; তিনি বহু চীনা পণ্ডিত আমদানী এবং সেই সঙ্গে নালন্দা, ওদন্তপুরী ও বিক্রমশিলার প্রসিদ্ধ আচার্য্য শান্তরক্ষিত ও তাঁর সহকর্ম্মী কমল শীল, পদ্মসম্ভব (উড়িষ্যা), প্রভৃতিকে সাদরে তিব্বতে আমন্ত্রণ করেন। তাঁদের পাণ্ডিত্য ও ধর্ম্মপ্রচারের কীর্ত্তি তিব্বতী ভক্তেরা সাদরে লিপিবদ্ধ করেন এবং প্রসিদ্ধ বাঙালী পরিব্রাজক শরৎচন্দ্র দাস তাঁর "indian Pandits in the Land of Snow" ও কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকাদির মাধ্যমে তা প্রচার করে-গেছেন (১৮৮০—১৯০০)। তাঁর সাহায্যে ও স্যার আশুতোষের উৎসাহে পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ তিব্বতী ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করে বৌদ্ধ ন্যায়দর্শনের প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন। সেই কাজ অধ্যাপক নলিনাক্ষ দত্ত প্রমুখ বাঙালী পণ্ডিতেরা গবেষণা করে প্রসারিত করেছেন এবং যুদ্ধোত্তর যুগে তিব্বতে বিভ্রাট সুরু হবার পূর্ব্বেই মূল্যবান গিলগীট পুঁথি (Gilgit mss) সংগ্রহ ও প্রকাশিত করেছেন। পূর্ব্ব তিব্বতে চীনারা হানা দিলেই পাশ্চমে লাদকী (Ladak)

বৌদ্ধদের সাম্রাজ্যে তিব্বতীরা স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। সিংকিয়াংয়ের মত লাদাক অধিকারও চীনা রাষ্ট্রনীতির প্রধান অঙ্গ। অথচ লাদাক এখন ভারত তথা কাশ্মীরের অন্তর্গত এবং লাদাকী বৌদ্ধদের ধর্মগুরু—চীনা মঠাধীশ নয় পর্যন্ত দালাই লামা।



নূতন দলাই লামা

(দ্রঃ প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৪৮, পৃ ৫৬৯-৭৩)

ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম তিব্বতে প্রচারের আগে সেদেশে ছিল প্রেতপন্থী Bon মার্গ। পরে ক্রমশঃ তিব্বতী বৌদ্ধ মঠে ছোঙ খা-পা ও মিলা-রে-পা প্রভৃতি সাধকদের প্রভাব বিস্তার হয়। ফলে চীনের মোঙ্গল সম্রাট কুবলাই খাঁ (১২৫০—৮-)(চেঙ্গিশের বংশধর) ভারতীয় বৌদ্ধদার্শনিকদের অপেক্ষা তিব্বতী লামাদেরই গুরুত্বে বরণ করেন। তার পর (১৩০০—১৪০০) তুর্কীমোঙ্গলজাতি প্রধানতঃ মুসলমান ধর্ম্মই গ্রহণ করে, কিন্তু তবু আধুনিক মঙ্গোলিয় বৌদ্ধমঠের পণ্ডিতরা আজও তিব্বতে বাস ক'রে অধ্যয়ন ও প্রচার করে চলেছেন। তাদের ও তিব্বতী বৌদ্ধদের আজ একই সমস্যা, কারণ প্রবল চীনরাষ্ট্র আজ কম্যুনিষ্ট রাশিয়ার প্রভাবে ধর্ম্মবিরোধী।

অথচ ভারত-তিব্বতের, তথা এশিয়ার ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির বহু মূল্যবান তথ্য তিব্বতের মঠে মন্দিরে ও পুঁথির মধ্যে সুরক্ষিত আছে। পাছে সেগুলি (কম্যুনিষ্টদের অনাদরে) নষ্ট হয় "সেজন্য, শুধু ভারতীয় নয় পৃথিবীর বহু বিশ্ববিদ্যালয় ও পণ্ডিতমণ্ডলী উদ্বিগ্ন। সুদূর হাঙ্গেরী থেকে পদব্রজে তিব্বত প্রবেশ করেন Csoma deKoros এবং অতুলনীয় শ্রম ও সাধনায় তিব্বতী মহাকোষ (২৩ লক্ষ শ্লোকে) (১) কাঞ্জুর বা বুদ্ধবচন সংগ্রহ এবং (২) তুঞ্জুর বা ভাষ্য ও শাস্ত্রানুবাদ বাংলায় এশিয়াটিক সোসাইটিতে উপহার দেন। তাঁদের Bengal Govt.-এর চেষ্টায় প্রথম তিব্বতী অভিধান ও নিবন্ধাদি পত্রিকায় প্রকাশ হয় (১৮৩২—৪২)।

এই বিরাট তিব্বতী গ্রন্থমালা কাষ্ঠফলকে খোদাই করে ছাপান পঞ্চম দলাই লামা সুমতি সাগর (১৬১৬—৮১)। সেই যুগে তিব্বতী ঐতিহাসিক লামা তারনাথ এক মূল্যবান ইতিহাসও রচনা করেন। তিব্বতী লিপির ভিত্তি প্রধানতঃ বাংলা তথা পূর্ব্বভারতীয়; সে তথ্য মহাপণ্ডিত শান্তরক্ষিত থেকে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের রচনাদিতে প্রমাণিত হয়েছে। তিব্বতী লিপি ও শিল্পকলায় পালযুগের বাংলার প্রভাব সর্বত্র স্বীকৃত হয়েছে।

চীন ও ভারতের সঙ্গে যেমন তিব্বতের (Sino-Tibetar) বহু যুগব্যাপী সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ তেমনি লিপিজ্ঞানহীন বহু অসভ্য (Tibeto Burman) জাতির সঙ্গে আজও আমাদের গভীর যোগ আছে। এদের সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতায় অনুপ্রাণিত বিশাল ব্রহ্মদেশ, ভুটান, সিকিম এবং নেপালও যুক্ত আছে। তিব্বতে যে বিপ্লব দেখা দিয়েছে তার ফলে পূর্ব্ব ও উত্তর ভারতের অনেক জনসংঘ বিক্ষুব্ধ ও হয়ত বিপ্লবের বন্যায় রূপান্তরিত হবে। এই যুগসঙ্কটে তাই প্রত্যেক ভারতবাসী বিশেষতঃ (পশ্চিম ও পূর্ব্ববঙ্গীয়) বাঙ্গালীদের ঐক্যবদ্ধ ও সজাগ হয়ে কূটনীতির অনুসরণ করতে হবে।

অনেকের ধারণা নেই যে মোঙ্গল-মানচু সম্রাটদের যুগ থেকেই পাশ্চাত্ত্য খ্রীষ্টান জাতিরা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় জাপান, চীন থেকে সুরু করে ১৬৬১ সনে ক্যাথলিক মিশন তিব্বতে স্থাপন করে। লাসা তখন থেকে পাশ্চাত্ত্যদের প্রচার-কেন্দ্র। আজ সেখানে ইউরোপ-আমেরিকার লোক যেমন, তেমনি কম্যুনিষ্ট রাশিয়া এবং চীনও হাজির। পূর্ব্বভারতের নাগাদেশ ও নেফা থেকে ভুটান-সিকিম-নেপাল পর্য্যন্ত আজ চীন-ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়েছে। ১৭৯২ থেকে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নেপালী (গোর্খা)দের সঙ্গে তিব্বতীদের যুদ্ধ



অর্দ্ধনারীশ্বর

শ্রীনন্দলাল বসু

(আশ্বিন ১৩৪২ হইতে পুনর্মুদ্রিত)



তিব্বতের একটি বৃহত্তর বিহার

লাগে ; ফলে ভারতীয়দের চেয়ে নেপাল-রাষ্ট্র তিব্বতে কূটনৈতিক (extra territorial) অধিকার পায়। কিন্তু শান্তি-স্থাপনের সময় উভয়ে (চীন-তিব্বত) চীন সম্রাটের মধ্যবর্ত্তিতা স্বীকার করে। ১৮৯০ সনে সীমান্ত নির্দ্দেশ ও ব্যবসাচুক্তি হয়েছিল চীন ও তিব্বতের মধ্যে। কিন্তু দলাই লামা (Tsar—তান্ত্রিক) রাশিয়ার সঙ্গে সংযোগে ব্যস্ত দেখে ইংরেজ আতঙ্কিত হয় এবং ফলে চীন-জাপান (৮৯১) ও রুশ জাপান (১৯০৪) যুদ্ধের পরই ক্যাপ্টেন ইয়ংহ্যাজব্যাণ্ডের নেতৃত্বে, ইঙ্গ-ভারতীয় সৈন্য কর্ত্তৃক লাসা অধিকার ও নূতন সন্ধি হয়েছিল।

১৯১২ সনে মানচু রাজবংশকে তাড়িত করে চীনা গণতন্ত্র (Republic) স্থাপিত হয় এবং চীনা আক্রমণ তিব্বতীরা প্রতিরোধ করায় ভারতে প্রথম ১৯১৪ সনের "সিমলা চুক্তি" স্বীকৃত হয়, কিন্তু চীনা প্রতিনিধিরা "স্বাক্ষর" করতে ভুলে যান! সেই ১৯১৮ সনে আবার ক্ষুদ্র সংঘর্ষ থেকে ১৯৪৮ সন পর্য্যন্ত তিব্বত কুয়োমিণ্টাং-চীনাদের সঙ্গে বনিয়ে চলেছিল। তেমনি দলাইলামা ও পঞ্চন-লামাদের ভিতর ছোটখাট বিভেদ দেখা দিলেও চীনরাষ্ট্র তিব্বতের স্বাতন্ত্র্য মোটের উপর স্বীকার করে এসেছে। ১৯৩৩ সনে ত্রয়োদশ দলাইলামার মৃত্যুতে রিজেণ্ট সাময়িক ভাবে রাষ্ট্রপরিচালনা করেন। পশ্চিম চীনের-চিয়াংধাই অঞ্চলে বর্ত্তমান চতুর্দ্দশ দলাইলামাকে শিশু বুদ্ধ-রূপে আবিষ্কার করা হয়, এবং সেই ১৯৩৯ থেকে ১৯৫৯ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান দলাইলামা তাঁর মাত্র ২৫ বছরের জীবনেই যেন এক "যুগান্তর" দেখে গেলেন।

১৯৪৯ সনে মাও ৎ-সেটুঙের নেতৃত্বে কম্যুনিষ্ট চীন এক নূতন যুগ যেন সুরু করেছে। ১৯৫০ ফেব্রুয়ারীতে তিব্বত চেয়েছিল, স্বাধীন ভারতের সাহায্যে, নব্য চীন-নেতাদের সঙ্গে মিলতে, কিন্তু তাঁরা সেই অক্টোবর মাসেই সবলে তিব্বতে প্রবেশ করে বসেন। যা হোক ১৯৫১ (২৩শে মে) কিছু মিটমাট হ'ল ফলে পররাষ্ট্র ও দেশরক্ষার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করল চীন। এবং তিব্বত অনুমতি পেল আভ্যন্তরিক স্বাতন্ত্র্যে। কিন্তু চীনা সেনানায়ক লাসাতে স্থায়ীভাবে বসে গেলেন এবং ১৯৫৩ সন থেকে চীনা পররাষ্ট্রদপ্তর এককভাবে তিব্বতী-বিভাগ পরিচালনা সুরু করেন। ভারতরাষ্ট্রের বার বার তাগিদে ১৯৫৩ সনে 'Atlas of Chinese Peosple Republic' (মানচিত্র) দেখান হয় (১৯৪৮ সাং হইতে ছাপা) ভারতের প্রায় ৩৩০০০ বর্গমাইল ভূভাগ চীনে ঢুকেছে! ঠিক তাই দেখা গেল ১৯৫৪ সনের সোভিয়েট মানচিত্রে। সুতরাং সোভিয়েট রাশিয়ারও এক্ষেত্রে অনুমোদন ছিল মনে হয়। ১৯৫৪ সনের এপ্রিল মাসে "পঞ্চশীল চুক্তি" নামে এক সর্ত্ত চীন স্বেচ্ছায় ভারতের সঙ্গে স্বাক্ষর করে ; তার চতুর্থ দফায় দেখি :

"There will be peaceful co-existence with neighbouring countries and development of fair commercial and trading relations with them,

on the bases of equality, mutual benefit and respect for territory and sovereignity."

এই চুক্তির প্রায় ৪০ বছর আগে ১৯১৪ সনে সিমলা-বৈঠকে ম্যাকমোহন সীমারেখা টানা হয়েছিল। তাতে তখনকার চীনা প্রতিনিধি সই করেন নাই, এখনও সেটা স্বীকৃত হ'ল না; অর্থাৎ মৌখিক মিষ্টভাষা প্রয়োগ করলেও ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৮ সন পর্য্যন্ত কোন নূতন মানচিত্রাদি দেখাতে চীনরাষ্ট্র রাজী হলেন না। ইতিমধ্যে পণ্ডিত নেহরু নেপাল ও ভূটান নিজে পর্য্যবেক্ষণ করেছেন ও সিকিম রাষ্ট্রকে (কাশ্মীরের মত) অর্থসাহায্য করেছেন। অথচ ১৯৫৪ সনের সর্ত্ত অনুসারে চীনের সঙ্গে প্রায় সমস্ত হিমালয়ের রাষ্ট্রগোষ্ঠী—যথা নেপাল, সিকিম, ভুটান ও উত্তর-ব্রহ্ম সীমান্ত এখনও অনির্দ্ধারিত। ১৯৫৮ সনের নবেম্বর মাসে চীন প্রকাশ্যে ভারতকে আহ্বান করে—দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সীমানা—প্রতিবেশী দেশগুলির পরিপ্রেক্ষিতে—সুনির্দ্দিষ্ট করে ফেলতে। কিন্তু ডিসেম্বরে নয়াদিল্লী থেকে জানান হয় যে, আমাদের সীমান্ত (ম্যাকমোহন লাইন) জানাই আছে এবং সেটা নতুন করে বিচারাধীন নয় (will not be subject to negotiation.

দলাইলামার দেহরক্ষী ৭ ফুট লম্বা তিব্বতী Khamba। খাম্বা-জাতি প্রবল লড়িয়ে জাতি এবং ১৯৫৫ সন থেকে পিকিঙের কর্ত্তারা খাম্বাদের পশ্চিমে কোণঠাসা করে তাদের অঞ্চলে চীনারাষ্ট্র বহু চীন যুবক Pioneerদের উপনিবেশ স্থাপন করতে লাগেন। ১৯৫৮ সনের জুলাই মাসে নেপালী পত্রিকা "কল্পনা"র প্রকাশ পায় যে, অনেক খাম্বারা তিব্বত ছেড়ে নেপালে প্রবেশ করছে—৯০০ মাইল রাস্তা পার হয়ে। এদেরই জাতিরা হচ্ছে এক্কারেই বিজয়ী তেনজিংয়ের সমগোত্রীয়।

১৯৫৯ মার্চ্চ মাসেই আমরা খবর পাই যে, পূর্ব্ব তিব্বতে খাম এলাকায় চীনাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছে, তখন দলাইলামা ২৪ বছর পূর্ণ করেছেন ও সপরিবারে তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর ও পরামর্শদাতাদের সঙ্গে ক্রমশঃ লাসা থেকে অতি গোপনীয় গিরিসঙ্কট ও গ্রাম এবং গুপ্তপথ বেয়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এমনি অবস্থায় আর এক দলাইলামা পূর্ব্বে ভারতেই আশ্রয় নেন এবং তাঁর প্রতিপক্ষ লামা চীনে আশ্রয় নিয়েছিলেন—যেমন পাঞ্চেনলামা আজও নিয়ে আছেন। কত ধনরত্ন নিয়ে তাঁরা তিব্বত ত্যাগ করেছেন সেটা আমাদের অজ্ঞাত। শুধু এইটুকু স্পষ্ট যে, আশ্রয় দিলেও, পণ্ডিত নেহরু দলাইলামার দলকে প্রবাসী-রাষ্ট্রের পূর্ণ মর্য্যাদা দেন নি এবং জাতিসঙ্ঘের সামনে তাঁর জবানী শোনাতে ভারতীয় কোন প্রতিনিধি নিয়োগ করে নি। এর পরিণাম কোথায় কেউ বলতে পারে না—হয় ত ইউ-এন-ও বৈঠকে এ মাসে কিছু স্পষ্ট হবে। শুধু এই আমরা জানি, চীনা কুনলুন্ পর্ব্বতের নীচে ও হিমালয়ের উত্তরে প্রায় ৪,৭০,০০০ বর্গমাইল বিশাল তিব্বত দেশ স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে চীনের কবলে চলে গেল। চীনাদেরই ১৯৫৩ (৩০শে জুন) সেনসস অনুসারে প্রায় ৬০,০০,০০০ লক্ষ তিব্বতীয় জীবনমরণ সংগ্রাম যেন এক নূতন ও ভীষণ আকার ধারণ করেছে। এই বিপ্লব থেকে এশিয়ায় তথা সারা বিশ্বে যুদ্ধের আগুন না লাগে—এই প্রার্থনাই প্রত্যেক শান্তিপ্রিয় জাতির প্রাণে জাগছে।

উপনিষদ মালা

শ্রীপুষ্প দেবী

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।
কথায় শোনায় তাঁরে নাহি পাই মেধা মানে সেথা হায়
দয়া করে যদি নিকটে সে এসে নিজে খুলে দেয় যায়
আপনি বরণ করি যাঁরে লন
স্বরূপে লভিয়া ধন্য সে জন
অন্তরে লভি কামনার ধন সেই ত তাঁহারে পায়
তাঁহারে পাইব এমন সাধনা কি আছে মোদের হায়?

(কঠোপনিষদ প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় বল্লী ২৩ শ্লোক)

না বিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ
না শান্ত মানসো বাহপি প্রজ্ঞানে নৈমাপ্নুয়াৎ॥
লোভ ক্রোধ মোহ ভোগ সুখে রত মন যার অনুক্ষণ
পায় না সেজন লভিতে তাঁহারে সেই ধন অতুলন
শুধু জ্ঞান দিয়ে পাওয়া নাহি যায়
বিদ্যা বুদ্ধি বিফল সেথায়
নিরমল আর পূত পবিত্র কামনা হীন যে জন
তাঁহার হৃদয়ে নিজ কৃপা বলে আবির্ভূত যে হন।

(কঠোপনিষদ প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় বল্লী ২৪ শ্লোক)



পাঁচ ক্রোশ পথ এমন কিছু দূর নয়—পায়ে-হাঁটা মানুষের পক্ষে এ পাড়া ও পাড়া। মাঝখানে নদী থাকলেও বা কথা ছিল। নদী ত নয়ই—তেমন নামকরা খালবিলও নয়—অকূল সমুদ্র রচনা করেছে শুধু ধানক্ষেত। ক্রোশের পর ক্রোশ—আদি-অন্তহীন ক্ষেত—বর্ষার জল পেয়ে শ্যামল হতে হতে শরতে হিল্লোলময় শব্দহীন সমুদ্র হয়ে ওঠে। হেমন্তে সে সমুদ্রে সোনা রং ধরে আর নুয়ে-পড়া শস্যমঞ্জরীর বাতাসের দোল খেয়ে তোলে মৃদু আওয়াজ—যা নাকি লক্ষ্মীর চরণ-নূপুরের ঝঙ্কার বলে পরম শ্রদ্ধায় ও আনন্দে কান পেতে শোনে চাষীভাইয়েরা। শীতের মাঠে সবুজশ্রী থাকে না—সোনালী রঙের চিত্ত হরণ করে না, কিন্তু মাঠের এখানে-ওখানে পোয়াল দেওয়া বিচালীর রাশি ও চূড়াকৃতি ধানের স্তূপ মনকে ভবিষ্যতের স্বপ্ন-সুষমায় নাচিয়ে নিয়ে বেড়ায়। কত সাধ—কত আনন্দ, ছোটখাটো কত না ছবির ভাঙা-গড়া। পুরাতন চালে নূতন খড়ের ছাউনি, হেলে বলদ কিংবা দুগ্ধবতী গাভী কেনা, নবান্ন, বারোয়ারি পূজা, গাজনপর্ব্ব, ছেলেমেয়েদের বিয়ে কিংবা অন্নপ্রাশন, রূপার পৈঁছা খাড়ু, খেজুরছড়ি শাড়ী, জোতজায়গা—কত না ছবি—অফুরন্ত এদের মিছিল। নতুন ধানের সঙ্গে এরাও নূতন হয়ে, বিচিত্র হয়ে আসে প্রতিবারই।

শিবুর জীবনেও এরা এসেছে বহুবার। সব বারেই যে সব সাধ-আহ্লাদ পূর্ণ হয়েছে তা নয়, নিরাশার অগ্নি-উত্তাপও সইতে হয়েছে কতবার। মনে মনে তখন হয় ত প্রতিজ্ঞা করেছে—বামন হয়ে চাঁদ ধরবার আশা আর করবে না—ধারকর্জ্জ মহাপাপ। কিন্তু ধান পাকলে জমি যেমন স্বর্ণ-ভূষণা সীমন্তিনীর গৌরব লাভ করে—তার ছোঁয়া লেগে মনেতেও তখন নানা রঙের আলপনা আঁকা সুরু হয়। মনে হয়—এটা চাই—ওটা চাই। এমনি এক সচ্ছল দিনে মঙ্গলার বিয়েটা দিতে পেরেছে শিবু। একটু উঁচু ঘরে—শহরেই সেরেছে শুভকার্য্যটি। একটু দূরেও বা সে গ্রাম।

শিবু ভাবে কি এমন দূর—পাঁচ ক্রোশই ত। নদী বা খাল পেরুতে হয় না—দিগন্তজোড়া মাঠের আল ধরে চলে গেছে সেই পথ। অনেকখানি গিয়ে বাঁক নিয়েছে একটা বাঁধের গোড়ায়। সে ছাড়িয়ে আরও ক্রোশ খানেক গেলে তবে সে গ্রাম। বেশ বড় গ্রাম—গণ্ডগ্রামই। গ্রামের মধ্যে মাঠ নেই, চালাঘর কম, কাদায় জলে মাখামাখি নয় রাস্তা-ঘাট। ধান-চাল বেচতে গিয়ে যেমন জমজমাট লাগে গঞ্জকে, তেমন মানুষজন, কোঠাবাড়ী, দোকানপসারে গিজগিজ করে না জায়গাটা—তবু সেটা উদাস উদোম মাঠের মাঝখানে বাঙচিতে, লাল ভেরেণ্ডার বেড়া ঘেরা খানকয়েক চালাঘরের গ্রামও নয়। এখানে জরাজীর্ণ কোঠাঘরই বেশী—সবই প্রায় পাঁচিলঘেরা। আম-জামের গাছে—অন্ধকার ছায়া ছায়া উঠোন; কোন ঘরের দেওয়ালে চুণবালির পলস্তারা নাই—কোনটা বা বর্ষার জলে কালো হয়ে গেছে। ইটের ইমারৎ; শ্রী নাই সৌন্দর্য্য নাই, মাঠ আছে গ্রামের শেষে। সে মাঠে মা লক্ষ্মী প্রতিবারই আসেন না। যেবার আসেন—সেবার গোযানে চেপে গ্রামের মধ্যে ঢোকেন না—চলে যান দূর শহরে—যেখানে ধানের কল আছে। সেই প্রাসাদে

তাঁর অজচর্য্যার কাজটি সম্পূর্ণ হলে সেই গোষানে চেপেই তিনি গঞ্জে গিয়ে ওঠেন। তার পর রেল-ষ্টীমার-নৌকায় চেপে কোথায় যে ছোটেন কেউ জানে না, কিন্তু সম্পদ হয়ে ফিরে আসেন সিন্দুকে। খাওয়া-পরা, সাধ-আহ্লাদ, দায়-অদায় সব কিছুই মেটে তাঁর দৌলতে, তাঁকে দু'চোখ ভরে দেখার সাধ শুধু মেটে না।

মঙ্গলার চোখে এই মূর্ত্তিটা ভারি ফাঁড়া ফাঁড়া ঠেকে। সবই আছে—তবু কেমন ফাঁকা ফাঁকা।

একদিন শুধিয়েছিল স্বামী ষষ্ঠীচরণকে, হ্যাঁ গা, একটা ধানের মরাই নেই বাড়ীতে, ঢেঁকিশাল নেই—ধান ভানা কোটা হয় কমনে? কমনেই বা মজুত কর?

ষষ্ঠীচরণ বলেছিল, ওসব হাঙ্গামায় কি দরকার! আমাদের এখানে নগদানগদি কারবার। গ্রামে বড় বড় দোকান আছে যখনই ইচ্ছে—তা কিবা দিন কিবা রাত্তির, পয়সা ফেললেই মাল।

মঙ্গলা অবাক হয়ে বলেছিল, রাতদুপুরে ধর যদি আত্ম কুটুম কেউ এল—

হেসে ফেলেছে ষষ্ঠীচরণ ময়রা দোকান আছে—মুড়ি-মুড়কি, গজা, পকান্ন—এতেই দিব্যি চলে যায়।

বিস্ময় কাটেনি মঙ্গলার—অবাক হয়ে ভাবে—এই উঠনো জিনিসপত্তরে কি করে যে কি হয়—

বাপ আসে মাঝে মাঝে—মেয়ের তত্ত্বতল্লাস করতে। কখনও ধামায় করে কিছু লাল আর মোটা আউস চাল; কখনও ক্ষেতের আলু, কুমড়ো ঝিঙে, ধুঁধুল। কখনও বা গামছায় বেঁধে পৌষপার্ব্বণের আসকে-পিঠে হাতে ঝুলিয়ে কিংবা রথের মেলায় কেনা প্রকাণ্ড একটা কাঁঠাল কাঁধের উপর ফেলে।

মঙ্গলা জিনিস দেখে আহ্লাদে ডগমগ হয়ে বলে, আঃ। কতকাল যে লাল চালের ভাত খাইনি, কি সোন্দর কাঁঠাল? কুমড়ো-আলু বুঝি ভুঁইয়ের? নাবি ফসল দেখছি। কতটা জমিতে এবার নাঙ্গল দিয়েছ বাবা?

সে অনেক—অনেক—। তার গল্প কি সহজে ফুরোতে চায়। একজন বাঙ্ময় হয়ে ওঠে—অন্যজন শ্রবণময় হয়ে সেই সুধা পান করে। চৈত্রের বেলা যে মাথার উপরে প্রখর হয়ে ওঠে সে বোধ কারও থাকে না।

ও ঘর থেকে শাশুড়ী হাঁকেন, বউমা—শোন ইদিকে। মানুষটা হাক্লান্ত হয়ে এল—হাতপা ধোবার জল দাও—হ'ল বা পাখা দিয়ে খানিকটা বাতাস কর, কুটুমকে জল খাওয়াও—তোমার গল্প শুনলেই কি ওনার পেট ভরবে! চোপরদিন রয়েছে—বসে বসে গল্প কয়ো'খন।

অপ্রতিভ হয়ে বলে মঙ্গলা, আ আমার কপাল—রোদ যে চড়চড় করে উঠল! হাতমুখ ধোওসে বাবা।

শিবু বলে, বোস না রে—এত তাড়া কেন? বেয়ান বুঝি জলযোগ করিয়েই বামুভোন ভোজনের ফল-পিত্যেশী? নিজের রসিকতায় উচ্চহাস্য করে ওঠে শিবু।

আড়াল থেকে জবাব আসে, বামুভোন ভোজনে অপযশ ছাড়া সুযশ ত নেই। বেয়াইকে বল বউমা, লুচি-মোণ্ডা-মেঠাই-মেওয়া কোথায় পাব—যা করেন শাকঅন্ন। কাঙালের বাড়ী এসব পাতে দিয়ে কে আর নিশ্চিন্দি থাকে। বেয়াই! বলি নল্লাটের লেখন ত খণ্ডাবার নয়।

বাবা যতক্ষণ থাকে এমনি হাস্যপরিহাসে সময়টা কাটে ভাল। চলে গেলেই বড্ড ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। হাজারটা জিনিস দিয়েও সে ফাঁক ভরানো যায় না।

মোটা মোটা রাঙা লাল চাল শুধু আহার্য্যে স্বাদ আনে না—অতি-পরিচিত পুরাতন মাটির স্পর্শটুকু ধরে দেয়। ঝিঙে ধুঁধুলের সঙ্গে আসে গাব ভেরেণ্ডা-বাগচিতা-ঘেরা একটি ঝকঝকে তকতকে নিকানো উঠান—যার একধারে দাওয়া-সমেত দু'খানা খড়ের চালের ঘর আর একধারে পাট-কাপাটির বেড়া দেওয়া রান্নাঘর আর গোয়ালঘর পাশাপাশি। গোয়ালের কোলে কালিমত একটু জায়গা - তার ওপাশে ঢেঁকিশালা। ছোটবড় সব চালেতেই চাল-কুমড়োর ঝোপ। কার্ত্তিকের হিমেল হাওয়ায় কুমড়ো পাতা কার্তিকের যেরে আধশুকনো হয়ে আসে—আর কুমড়োগুলিতে কে যেন খড়ি মাখিয়ে রোদ পোয়াতে শুইয়ে রাখে চালের শয্যায়। পশ্চিমে ঝাঁকড়া ডালিমগাছের লাল টুকটুকে ফলগুলি অল্প হাওয়ায় দোল খেতে থাকে—যেন অবুঝ খোকার সামনে লাল ঝুমঝুমি নেড়ে সোহাগ জানায় তার মা, আর সঙ্গে সঙ্গে গোয়াল থেকে রাঙা গাইটা ডাকে, হাম্ - মা। নতুন বাছুর হলে গাই-দোয়ানোর সময় সুরভিরা এমনি করে ডাকে নন্দিনীদের—কি প্রাণজুড়ানো মিষ্টি ডাক।

বাছুরও জবাব দেয়, মাগো - মা!

ওরে মুঙলি, কেঁড়ে নিয়ে ঝট করে আয় ত। যে দামাল বাছুর—মা ধরলে একার সাধ্যি কি দুধ-দোয়াই।

যাই মা। ধড়মড় করে উঠে পড়ে মঙ্গলা।

যেমন ওঠা অমনি স্বপ্নের ছায়া কোথায় মিলিয়ে যায়।

শাশুড়ী ডাকছেন, গোয়ালা এসেছে দুধ দিতে—ঘটটা নিয়ে দুধটুকু নাও গে ত বউমা—আমার আবার হাত জোড়া!

মনটা হু হু করে ওঠে। এই কালটাই বুঝি কঠিন হয়ে বুকে চেপে রইল—আর একটা কাল কোথায় যেন তলিয়ে যাচ্ছে। বাবা এমন কাজ কেন করলেন! অজ

চাষাগাঁয়ের মেয়ে কেন শহরে এল। তাদের ঘরে এ রকম কাজ ক'টাই বা হয়েছে।

পোড়া অদৃষ্টের যোগাযোগটা কেমন করেই ঘটেছিল যেন।

দেয়াসীর মাঠে এক লপ্তে এক পাচ বিঘে জমি, পাশেই একটা কালিমত বাঁওড়—বর্ষায় যে জলটুকু জমিয়ে রাখে—বর্ষাশেষে সেটুকু ছেঁচে-কুটে নিতে পারলে আশপাশের জমিগুলি হয় সরস। আশ্বিন-কার্ত্তিকের আকাশ কৃপণ হলেও জমির মালিকের মুখ শুকোয় না। দেবতা যদি বর্ষণ কর ভাল, না দাও পরিশ্রম বাড়বে, ফসলের সেচ চলবে ঠিকই। সেই সোনা-ফলানো জমি কিনতে একদিন ষষ্ঠীচরণ এসেছিল এই গ্রামে।

পাশেই শিবুর জমি—যা কিছু জিজ্ঞাসাবাদ তার সঙ্গেই সুরু। জমির বৃত্তান্ত জানতে জানতে আকাশ আর মাটি তেতে উঠল। ষষ্ঠীচরণ বললে, দেখ কাণ্ড, ভাবলাম আজ মেঘ মেঘ আছে, জমিটা দেখেই আসি—তা সুমুক্ষির রোদের দাপটা একবার দেখেন। মেঘভাঙ্গা রোদ কিনা, রোক কত।

তা নাই বা গেলে এবেলা—গেরামেই ত এয়েছ, মাঠের মধ্যিখানে ত বাস বাঁধ নি। চান-আহার করে খানিকটা নিদ্রে দিয়ে রোদ পড়লে বাড়ী যাবা না হয়। শিবু হেসে বলল।

তা কি করে হয়—: মাথা চুলকোতে লাগল ষষ্ঠীচরণ।

কেনে হয় না—আলবৎ হয়। কণ্ঠে জোর দিয়ে বলল শিবু। ভরদুকুরে আহার করে না গেলে গেরামের অকল্যেণ হয় না? ভ্যালা বুদ্ধি ত দেখছি। বলি ক'বিঘে ভুঁই চষ? ক'খানা নাঙ্গল? ক'জোড়া হেলে গরু? শেষটায় যেন ধমক দিয়ে উঠল শিবু। তার মধ্যে অবশ্য উত্তাপ কম—স্নেহের ছায়াটুকুই বুকের তলায় এসে জমে।

নাঙ্গল-গরু? হো হো করে হেসে উঠল ষষ্ঠীচরণ। বলে, মোটে মা রাঁধে না তপ্ত আর পান্তা। তা ছাড়বেন না যখন চলেন আপনার আশ্রয়েই অন্ততঃ আহার করিগে। পড়ন্ত বেলায় যাত্রা করব—আজ ওখানে একটা মিটিন আছে কিনা।

মিটিন? কিসের মিটিন? শিবু শুধোয়।

এই আমাদের জমিজিরেতের যা আয়, ধরেন খেটেখুটে চাষবাস করলেও ত পেটে ভাত আর পরনে ট্যানা জোটে না—সব হই ত নেপোয় মারে—এই সব কথা শহর থেকে এসে ওনারা মাঝে মাঝে বুঝিয়ে ছায়। বলে, যার নাঙ্গল তার জমি। কেউ ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে নবাবী করবে—কেউ না খেয়ে শুকিয়ে মরবে—এ পৃথিমীতে তা নাকি আর চলচে না। কোথায় কোন্ দেশে নাকি আইন হয়েছে—যার নাঙ্গল তার জমি। বোঝেন ঠ্যালা। এ যেন গাড়ীর ওপর নাও—কখনো-বা নাওয়ের ওপর গাড়ী।

এমনি করে আলাপ জমিয়ে ওরা ঘরে ফিরল।

মঙ্গলা তখন পেতে নিয়ে লাল নটের ক্ষেতে উবু হয়ে বসে নটেশাক তুলছিল। নতুন মানুষটাকে নিয়ে আগড় ঠেলে হাসতে হাসতে বাবা ঢুকল বাড়ীতে। লোকটাও হাসছিল। হাসির আওয়াজটা নতুন, ধরনটা ভারি মিষ্ট। হাত নেড়ে আর ঘাড় দুলিয়ে সেই হাসি আজও চোখ বুজে দেখতে পায় মঙ্গলা।

মুঙলি রে, ভাল করে শাগ তোল ঝিঙে-উচ্ছে যা আছে উটকে-পাটকে আন—অতিথ এনেছি।

অতিথ মঙ্গলার পানে চেয়ে হেসেছিল। বলেছিল, আপনার কন্থে বুঝি মোড়লমশায়?

শিবু ত মহা খুশী। মোড়ল না হলেও ও যেভাবে তাকে মান্য করল...ওর মত ভাল লোক পৃথিবীতে আছে নাকি! ঘাড় নেড়ে হাসিমুখে বলল, হাঁ, কন্থেই বটে—আমার মা-জননী। কি বুদ্ধি? আর উপ (রূপ)? দেখছ ত, হত্তেলের মত অং—যেন দুগ্‌গো পিতিমে।

চাষার ঘরে রংটা উজ্জ্বলই। গৌরী না হোক—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের মেয়ে। মুখে-চোখে লাবণ্য আছে। বেশবাস বা অঙ্গরাগে সে লাবণ্য কিছু অগোছালো হলেও গ্রামের মানুষের চোখে ত্রুটিহীন। প্রসন্নদৃষ্টিতে আরও বারকয়েক ওর দিকে চেয়েছিল ষষ্ঠীচরণ। মঙ্গলার দৃষ্টি তখন লাল নটে ক্ষেতের মধ্যে সেঁধিয়েছে। ওই নটেশাকেরই রঙ ধরেছে মুখখানিতে।

তার পর জমি দেখার উপলক্ষ্যে আরও দু'বার এসেছিল ও। দু'বারই দুপুরের রোদ চড়া হয়েছিল, শিবু টেনে এনেছিল ওর বাড়ীতে, আর এই সুযোগে ধীরে ধীরে কোন্ অদৃশ্য সুতোয় রঙের মাঞ্জা দিয়ে ধরধার করে তুলেছিলেন সেই অচেনা বিধাতা, যাঁর কৃপায়—কত না অঘটন ঘটে এ পৃথিবীতে।

তার পরে? তার পরেও একটু ছিল। আনন্দ আর বেদনা মেশানো ছোট্ট একটু ঘটনা—যার সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটল নতুন দেশে পা বাড়াবার ক্ষণটিতে।

মায়ের আঁচলে মুখ লুকিয়ে কি কান্নাটাই না কেঁদেছিল মঙ্গলা। তেরো বছরের মেয়ে, জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত এই মাটি আর এই আকাশের কোলে মানুষ। সবুজের সমুদ্র ছিল

তার চারদিকে—আজ বুঝি সেই সমুদ্র পার হবার আয়োজন!

গরুর গাড়ীতে চেপে চোখের জল মুছতে মুছতে চলেছে। ছ'পাশে অফুরন্ত মাঠ। বৈশাখে অশথ আর জীয়লগাছে চিকন চিকন নরম পাতা হাওয়ায় কাঁপছে—চষা ভুঁইয়ে পড়েছে কঠিন রোদ। মাঠের এখানে-ওখানে আধশুকনো উচ্ছেলতার ঝোপ—বেগুনের মরাগাছ। শুধু কুমড়ো আর কাঁকুড়ের লতা ফুলে-ফলে ভুঁইয়ের রূপকে ধরে রাখার চেষ্টা করছে। ছ'পাশের আলগুলো রোগজীর্ণ মানুষের পাঁজরের মোটা মোটা হাড়ের মত ঠেলে উঠছে ভূমিমাতার দেহ থেকে। রুগ্ন জমি—তবু এর কত শোভা—কি স্নেহ! মাঠের পথ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত চোখের জল শুকোয় নি মঙ্গলার।

তার পর গ্রাম। এমন চেহারাও হয় গ্রামের। গাছ-গাছালি আছে—ঝোপঝাড় আছে—আছে পাঁচিলঘেরা বাড়ীঘর। কেমন যেন টুকরো টুকরো যেরূপ চেহারা! চোখের সামনে কতটুকু বা জমি—মাথার উপরে আকাশই বা কতটুকু। গ্রামের কোলে বিল-বাঁওর নেই—যার এক দিকে গড়ানে ঢালু জমি আর একদিকে মাঠের আঁচল বিছানো। সেই তিরতিরে জলে পদ্মপাতা, শালুক-সাপলারা চকচকিয়ে ওঠে, শ্যাওলার আঁশটে মিষ্টিগন্ধ ভেসে বেড়ায় আর পায়ের তলায় তকতকে বালির মেঝে। আশ্চর্য্য জল! জলে ডুব দিয়ে চোখ চাইলে প্রায় স্পষ্ট দেখা যায় সব—নিজের দেহটা, মুখের সামনে হাত নাড়লে ক'টা আঙুল রয়েছে তাও। আর এখানে কত পথ ঘুরে যাও এঁদো পুকুরে, শ্যাওলা-পিছল ভাঙা খানায় নামো পা টিপে টিপে—আর জলের বর্ণ যে এমন হয়—এই প্রথম দেখলে মঙ্গলা।

নেয়ে ধুয়ে সর্ব্বাঙ্গে ভিজে কাপড় জড়িয়ে এক গলা ঘোমটা টেনে ননদের পাছু পাছু বাড়ী ফিরে আসা—যেন জেলখানার কয়েদীকে কোর্ট থেকে জেলে ফিরিয়ে আনা হ'ল। অনেক দিন আগেকার কথা—শহরে একবার যায় দোলের মেলা দেখতে গিয়ে বাবা জেলখানার উঁচু পাঁচিল-ওয়ালা বাড়ীটা দেখিয়েছিল। দুপুরে কোর্টের ধার দিয়ে যেতে যেতে দেখেছিল কয়েদীভর্ত্তি জেলের গাড়ী। গাড়ীর জালতির ফাঁকে অনেক হাত আর চোখ—অবাক হয়ে তাকিয়ে-থাকা চোখ।

বাবা বলেছিল, এনারা জেলখানার লোক। কোর্টে হাজরে দিতে যাচ্ছে হাকিমের কাছে—কোর্ট হয়ে গেলে জেলখানায় ঢুকবে।

উঁচু পাঁচিলওয়ালা বাড়ী আর অবাক চোখে চাওয়া লোকগুলিকে অনেকদিন ভুলতে পারে নি মঙ্গলা। ছবিটা অবশ্য ক্রমশঃ ফিকে হয়ে এসেছিল—এখানে এসে সেটা আবার স্পষ্ট হয়ে উঠল।

এ বাড়ীতেও পাঁচিল—ওপিঠে কিছু দেখা যায় না।

এটা করতে নেই, অমন করে জোরে জোরে হেসো না, শব্দ করে চলো না, উঁচু হয়ে বসো না। মাথার কাপড়টা তুলে দাও, ভাসুরের সঙ্গে কথা কয়ো না, গুরুজনের সামনে হাসতে নেই, কাসতে নেই, ছুটতে নেই—গরাসে গরাসে ভাত তুলতে নেই মুখে···পাঁচিল ক্রমশঃই উঁচু হয়ে ওঠে। মঙ্গলা ছটফট করে। দুপুরে আধো-অন্ধকার ঘরে মাদুর পেতে সবাই যখন বিশ্রাম করে—ওর চোখ তখন শাসনের জ্বালায় জ্বলেপুড়ে যায়। ভাবে—এত শাস্তিও লেখা ছিল কপালে!

শাস্তি অবশ্য সবটাই নয়। রাত্রিতে পাঁচিল মুছে যায়—অন্ধকারে দিকপ্রান্তর এক হয়। ষষ্ঠীচরণের কোলের কাছে নিবিড় হবামাত্র বেদনা-জ্বালা নিমেষে জুড়িয়ে যায়। ফিসফিস করে গল্প করে ষষ্ঠীচরণ—ছ'চোখের পাতা এক না করে সেই গল্প শোনে মঙ্গলা।

কিন্তু সে কতটুকু বা! ভোরে কাক-কোকিল ডাকতে না ডাকতে ষষ্ঠীচরণ ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে। বলে, এই বেলা না বেরুলে গঞ্জের হাটে পৌঁছতে পারব না। প্রথম মওকায় মাল কিনতে না পারলে অনেক ভোগান্তি, অনেক লোকসান।

জমি এদের যৎসামান্যই আছে—ধানের গোলা নেই একটিও। জমির ফসল গোলায় ওঠে না—হাটেবাজারে ব্যাপারী মহাজনের হাত ফেরাফিরি হয়ে ওঠে গরুর গাড়ীতে, নৌকায়, সম্প্রতি লরীর চলন হয়েছে। এরা এক গা ধুলো আর ট্যাকভর্ত্তি টাকা নিয়ে হাসিমুখে ফেরে বাড়ী। কোন কোন বার সস্তাদামের চুলের ফিতে, কাঁটা, গিল্টির গহনা, ধামা-কুলো-বঁটি বা কলাই-এলুমিনিয়মের বাসন নিয়ে বাড়ী ফেরে। সেইগুলি নিয়ে এ বাড়ীর মানুষদের কি আনন্দ, কি কলকল, গলগল কথা!

আনন্দের প্রকাশ বাপের বাড়ীতেও দেখেছে মঙ্গলা। অগ্রহায়ণে সে উৎসব সুরু হয় নতুন চালের নবান্ন দিয়ে—শেষ পৌষ সংক্রান্তি আর উত্তুরুণিতে (উত্তরায়ণ)। তখন চাল কোটার ধুম—সারারাত দমাদ্দম পাড় পড়ে ঢেঁকিতে। নতুন খেজুর গুড় আসে গঞ্জ থেকে, নৌকা-বোঝাই নারকোল আসে পুব থেকে। ক্ষেতের তিল অবশ্য তখনই ঝাড়া হয় না—কলসীর মধ্যে ন্যাকড়ার পুঁটলি-বাঁধা গেল বারের পুরনো তিল বার করেন মা। সন্ধ্যে থেকে রাত দুপুর পর্য্যন্ত তৈরী হয় আসকে পিঠে, সরুচাকলি, সিদ্ধপুলি, মুগপুলি—নানান ধরনের রাশি রাশি পুলি আর পিঠে।

বউমা—কাপড়গুলো ক্ষারে সেদ্ধ করা আছে একটু আছড়ে কেচো ত।

কোথায় কাচবে এগুলো? একটিও বিল-বাঁওড় নেই যে, তার অঢেল জলের কিনারায় পাটা পেতে আছাড় মারবে কাপড়ে। এখানে তোলা জলে কোনরকমে ক্ষারটা বার করে দেওয়া চলে, কাপড়গুলো তেমন করে জলে ডুবিয়ে দু'হাতে রগড়ে রগড়ে জলের উপরেই লম্বা করে ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ কই! এরা তা বুঝবে না—শুধু বলবে, বোয়ের হাতে বুঝি জোর নেই? এমন করে শ্বশুরবাড়ীর অপযশ করতে হয়? ক্ষারের জলটাও ভাল করে তুলতে শেখনি?

কাজ নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা—খাওয়া নিয়েও তাই। ওমা, এত তরকারি পড়ে রইল, ভাত সব উঠে গেল? পাঁচখানা ব্যঞ্জন তবে রাঁধলাম কার জন্যে গো?

কিন্তু পাঁচখানা ব্যঞ্জন রাঁধবার দরকারই বা কি? কলায়ের ডাল, আলু ভাতে—এই ত যথেষ্ট। তার উপর একটু যদি মাছের টক হ'ল ত কোথায় লাগে নিমন্ত্রণ-বাড়ী। এই সামান্য উপকরণেই এক থোরা ভাত উঠে যায়—এত তরকারি পাতে দেওয়াই বা কেন?

ষষ্ঠীচরণ মাঝে মাঝে বলে, তরকারিই যদি না খেলে ত খাওয়ার ভোগ কি। আমরা মাছের ডালনা কি ঝাল ভালবাসি, তোমাদের টক না হলে চলে না।

মঙ্গলা বলে, টক খেলে জিবের সোয়াদ খোলে—চাড্ডি বেশী ভাত ওঠে।

ষষ্ঠীচরণ হো হো করে হেসে ওঠে।

একথা-সেকথার পর কোনদিন বা আসল কথা তোলে মঙ্গলা, তা আমাকে কবে পাঠাচ্ছ বাপের বাড়ীতে?

কেন—কেন, মন কেমন করছে বুঝি মায়ের জন্যে?

আহা—মন বুঝি কেমন করতে নেই। তা যাই বল, এবার গেলে আর শীগগির আসচি নে।

ষষ্ঠীচরণ ওকে দু'হাত দিয়ে কাছে টানতে টানতে বলে, থাকতে পারবে?

হুঁ। ষষ্ঠীচরণের বুকে মুখ গুঁজে স্পষ্ট জবাব দেয় মঙ্গলা।

সত্যি? সত্যি? জোর করে ওর মুখখানা তুলে ধরবার চেষ্টা করতে করতে ষষ্ঠীচরণ বলে, উঃ! কি পাথর প্রাণ তোমার!

খিলখিল করে হেসে ওঠে মঙ্গলা, তা বলে তোমাদের চেয়ে নয়।

হঠাৎ বাহুবন্ধন শিথিল হ'ল—ষষ্ঠীচরণের রূঢ় স্বরে চমকে উঠল মঙ্গলা। কি—কি বললি? আমরা পাষাণ? নিষ্ঠুর?

কথাটা রহস্যচ্ছলেই বলেছিল মঙ্গলা। সে যে ষষ্ঠীচরণকে এমন ভাবে আঘাত করবে ভাবতেই পারেনি। কিন্তু কথায় বলে, হাতের ঢিল আর মুখের কথা—বার হলে ফিরিয়ে আনা কঠিনই। তবু চেষ্টা করল ফিরিয়ে আনতে। মঙ্গলা নরম গলায় বলল, তা এত রাগ কেনে? কথার পৃষ্ঠে কথা বললেই মানুষ তাই হয়ে যায়?

যায়। থমথমে গলায় বলল ষষ্ঠীচরণ। একদিন-আধদিন নয় বহুবার শুনলাম ওকথা। আমি জানি, আমাদের কাউকে তোর ভাল লাগে না। আমাদের কথা ভাল নয়, রীত-ব্যাভার ভাল নয়। আমাদের জমি-জিরেৎ নেই, খালবিল নেই।...

মঙ্গলা ত অবাক! এসবের অভাববোধ মনকে পীড়া দেয় বটে, তবু সে অভাব ত সর্ব্বক্ষণ মনে লেগে থাকে না। আজন্মের অভ্যাস—ছাড়া কঠিন; তা নিয়ে খুঁতখুঁতুনি মানুষের স্বভাব। অভিযোগ হয় ত ওঠে তার থেকেই, কিন্তু সেইটাই ত সত্যি নয়। দিনের খানিকটা সময় ওগুলো মনকে অশান্ত করে পরক্ষণেই এখানকার আদরযত্নের প্রলেপও ত পড়ে ক্ষতমুখে। রাত্রিতে ষষ্ঠীচরণের নিবিড় সঙ্গলাভ করে সে বেদনা নিঃশেষেই মুছে যায়। অন্ধকারে এ বাড়ীর পাঁচিল থাকে না, বিধিনিষেধ মাথা তোলে না, এই ঘরের নূতন রীতি নূতন ব্যবস্থা অপর ঘরের বলে বোধ হয় না। এদের সঙ্গে নিজের যোগসূত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একদিন এই সংসার তার নিজের খুশীমত...কিন্তু যখন ভেদ-রেখা এমনি করে মুছে যায়—তখন সেই মায়াবী রাত্রিকালেই ঝড় উঠল কেন এমন করে?

এক নাগাড়ে বলেই চলেছে ষষ্ঠীচরণ। বলতে বলতে চড়ে উঠেছে গলার স্বর। বাষ্পাচ্ছন্ন মনের ঘন ধোঁয়া ভেদ করে আগুনের শিখা যেন দপদপ করে জ্বলে উঠছে। উত্তেজনায় বিছানায় উঠে বসেছে ষষ্ঠীচরণ। বলছে গলা চড়িয়ে, মহা অন্যায় করেছি তোকে চাষী-গাঁ থেকে এনে! তোদের উদোম মাঠই ভাল—পাঁচিলের আবরু সহ্য হবে কেন! মোটা চালের ভাতে যাদের রুচি তাদের মুখে সরু চাল রোচে কখনও? খড়ের চালে বিষ্টির জল চুঁইয়ে ছেঁড়া কাঁথা বিছিয়ে দেয়—বাইরেই আরাম করে ঘুম যাবি—তোদের কোটাঘরে তক্তাপোশে ভাল শয্যেয় ঘুম হবে কেন? ইল্লত কি ধুলে যায়?

শুনতে শুনতে মঙ্গলার দু'চোখ দিয়ে দরদর ধারে জল পড়তে লাগল। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল ও।

ওর কান্নার শব্দে ষষ্ঠীচরণের হুঁশ হ'ল। হঠাৎ ক্রোধের মাত্রা নেমে যেতেই নিজেকে কেমন অসহায় বোধ হ'ল। ব্যাপারটা ঘটেছিল মুহূর্তে। আদর-সোহাগের পথ ধরে এসেছিল অভিমান—তারই পিছনে দাঁড়িয়েছিল এক চণ্ডাল। সেই চণ্ডালের কীর্ত্তি দেখে ষষ্ঠীচরণ মর্ম্মাহত হয়ে খানিক স্তব্ধ হয়ে রইল। তার পর মঙ্গলার একখানা হাত টেনে নিয়ে নরম গলায় বলল, অ্যাই ত্যাখ—কান্নার কি হ'ল। ক্রোধ না চণ্ডাল! অ্যাই ত্যাখ—আবার কাঁদে!

যাও। এক ঝটকায় ষষ্ঠীচরণের হাতখানা ঠেলে দিয়ে শয্যার অপরপ্রান্তে সরে গেল মঙ্গলা।

ষষ্ঠীচরণ এগিয়ে এল সেদিকে। আরও নরম গলায় বলল, তুই বললি এক কথা—আমিও বললাম। মাইরি বলছি, তোর ওপর রাগ করে—

সরো। এক লাফে চৌকি থেকে মাটিতে নামল মঙ্গলা। বলল, আর সোহাগে কাজ নেই।

স্বল্পবাক মেয়েটির এমন দুর্জ্জয় ক্রোধ প্রত্যাশা করে নি ষষ্ঠীচরণ। তক্তাপোশে কাঠ-মেরে বসে রইল সে, মঙ্গলার দিকে এগুতে সাহস করল না।

মঙ্গলা মেঝেয় বসে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল। তার পর একসময়ে ঘুমিয়ে পড়ল। যখন ঘুম ভাঙল—সকালের আলোয় ঘর ভরে গেছে, ষষ্ঠীচরণ ঘরে নেই।

রাত্রির ব্যাপারটা যে কারও অজানা নেই—সেটা বাইরে বেরিয়েই টের পেল মঙ্গলা।

ছোট ননদ জয়া বলল, কি গো বৌদিদি, কাল রাতে নাকি ঘুমোও নি? চোপররাত ঝগড়া করেছ দাদার সঙ্গে?

কে বলল?

কেন, আমরা কি কানে কালা, না অন্ধ? দাদা মুখ ভার করে বলে গেল, তোদের খাওয়াদাওয়া হলে একখানা গরুর গাড়ী ডাকিয়ে দিস—ধনা যেন ওকে কলমিডাঙ্গায় রেখে আসে?

এ সংবাদে মনে মনে খুশী হ'ল মঙ্গলা। আহা—সুমতি হোক এদের। এই রাগ যেন আরও কিছুক্ষণ থাকে, অন্তত কলমিডাঙ্গায় না যাওয়া পর্য্যন্ত।

কথা গায়ে না মেখে বলল, পুকুরঘাটে যাবে ত ছোট ঠাকুরঝি?

পুকুর! ওরে বাপ রে—তার চেয়ে জল এনে দেই—এই খেনেই মুখ-হাত ধোও—এড়া কাপড় কাচকোচ। জয়া কর্ফিয়ে চলে যায় আর কি!

না—ঘাটে চল। ওর সামনে এসে দাঁড়াল মঙ্গলা।

জয়া হেসে ফেলল। বলল, যেতে পারি তোমার সঙ্গে যদি কালকে রাত্তিরে কি কুরুক্ষেত্তর বাধিয়েছিলে সব বল।

কুরুক্ষেত্তর? তোমার দাদাই ত যত নষ্টের গোড়া! আজ ক'বছর কলমিডাঙ্গায় যাইনি বল ত? যেতে ইচ্ছে করে না?

জয়া মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল। বলল, আহা, কি কষ্ট গো! তা যাবেই ত একদিন—এ মাসে না হয় ও মাসে। জোড়া মাসে যেতে আছে নাকি? মা-ই ত বলছিল কাল—

নূতন আনন্দে মঙ্গলার দেহ শিরশির করে উঠল। বলল, লক্ষ্মীটি—পুকুরঘাটে চল।

সারাদিন বাইরে বাইরে রইল ষষ্ঠীচরণ—রাত্রিতেও বাড়ী ফিরল না। মঙ্গলা অধীর ভাবে প্রতীক্ষা করছিল। শোবার-ঘরে হ্যারিকেনটার দম কমিয়ে ভাবছিল, সত্যিই কি রাগ করে চলে গেল ও। কি এমন কথা বলেছিল···আশ্চর্য্য—আজ সকালের শুভ সংবাদ রাতের ক্রোধ-অভিমান ব্যথার চিহ্নমাত্র রাখেনি মনে। এখন কেবল মনে হচ্ছে, ফিরে আসুক ষষ্ঠিচরণ—হাসি-ঠাট্টার সঙ্গে শুভ সংবাটুকুর ভাগ দিয়ে হালকা হোক মঙ্গলা। দুঃখই শুধু ভার হয়ে ব্যথা জমায় না মনে, আনন্দও ভাগ করে দিতে না পারলে ভারী হয়ে ওঠে।

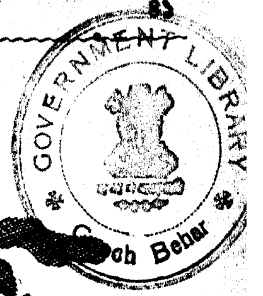
পরের দিনও ফিরল না ষষ্ঠীচরণ, তার পরের দিনও না। কাউকে জিজ্ঞাসা করতে বাধে—না শুধিয়েও স্থির হতে পারছে না। একসময় জয়াকে বলল, তোমার দাদার কি আক্কেল দেখ, আজ তিনদিন—

জয়া একটু অবাক হ'ল। বলল, সেকি তোমায় বলে যায় নি? ও মা—আমার কি হবে? তাই আগেভাগে ব্যবস্থা করে গেছে তোমাকে বাপের বাড়ী পাঠাবার? যেন আমরা গরুর গাড়ী ডাকিয়ে এ কাজটা করতে পারতাম না!

মঙ্গলা চুপ করে রইল। জয়া আপনমনেই বলল, নতুন মুগকলাই উঠেছে—ধান উঠেছে—মাল গস্ত করতে গেছে সেই কোন্ মুলুকে! দু'চারদিনের খেয়া ত নয়, মাস-ভোরেই হয় ত···

মাস-ভোরই বাড়ী এল না ষষ্ঠীচরণ, একদিনের জন্তও





নয়। শাশুড়ী প্রতিদিনই গজগজ করেন, এমন ত দেখি নি বাপু কোনকালে। আগে ত হপ্তায় দুটো দিনও আসত—এখন কি এমন কেনাকাটার ধুম যে একটুও ফুরসৎ হয় না। সবই কি অনাছিষ্টি! বউটা আজ বাদে কাল বাপের বাড়ী যাবে—তোর কি একবার আসা উচিত নয়?

এদিকে মঙ্গলারও কম রাগ হয় নি। একে ত শ্বশুর-বাড়ীকে ভাল চোখে দেখতে পারে নি কোনদিন, তার উপর যে মানুষটির ভরসায় এখানে থাকা সেও তুচ্ছ একটা কারণে এমন অবুঝ হয়ে উঠল। একটুও ভাল লাগছে না এখানে, প্রতিদিন মন যেন বেঁধে ঠেঙাচ্ছে মঙ্গলাকে। সে স্থির করল—এরা দিন স্থির করবার আগেই কোনমতে বাবাকে একটা খবর পাঠিয়ে কলমিডাঙ্গায় চলে যাবে। যত শীঘ্র হয় চলে যাবে। একদিন একটা মুনিষ ছেলেকে চারটে পয়সা দিয়ে বললে, দেখ, বাবাকে বলবি শীগগির যেন গাড়ী নিয়ে আসে, আমি কলমিডাঙ্গায় যাব—বুঝলি?

খবর পেয়ে পরের দিনই শিবু এসে পড়ল। একেবারে গাড়ী নিয়েই হাজির।

শাশুড়ী সামান্য আপত্তি তুললেন—মঙ্গলা মুখ গোঁজ করে রইল। জয়া বলল, মা, কেন দুখী হচ্ছ বাধা দিয়ে—বৌদির ধনুকভাঙা পণ—যাবেই।

জানি না বাপু কালের ধারা—যা খুশী করুক গে। ষষ্ঠী এলে কি বলব তাকে।

জয়া বলল, আমাদের আবার কথা—যা বলবার ওরাই বলবে'খন। দাদা কি আর না জানে কিছু!

এমনি অপ্রীতিকর পরিবেশকে গ্রাহ্য করল না মঙ্গলা। শাশুড়ীকে প্রণাম করে গাড়ীতে গিয়ে বসল।

গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠে পড়ল গাড়ী। সেই সীমাহীন অবারিত মাঠ—মাথার উপরে পাল্লা দিয়ে ছুটেছে অফুরন্ত আকাশ। মাঘের দিনেও ক্ষেতের ফসল একেবারে নিঃশেষ হয় নি—ছোলা-মটর-সরষে-তিসির-নীল-হলুদ সবুজ রঙের লম্বা গালিচা বিছানো দু'ধারে তার মাঝখান দিয়ে ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দে চলেছে গোযান। শিবু একটানা বকে চলেছে। কত বছরের জমা করা কত কথা, কত গল্প অনর্গল বলে যাচ্ছে—ভারমন্থর গাড়ীর মত সংক্ষিপ্ত 'হুঁ' 'হাঁ' দিয়ে যাচ্ছে মঙ্গলা। মন তার মাঠেও নাই, আকাশেও নাই—না কলমিডাঙ্গায়—না খালিসপুরে। সে কোথাও যে উধাও হয়েছে—নাম-না-জানা একটি গঞ্জে—যেখানে চাষী ব্যাপারীর ভিড় ঠেলে ঠেলে একটি মানুষ স্তূপাকার যুগকলাই ধান চালের কিনারায় কিনারায় সন্ধানী-দৃষ্টি ফেলে ঘুরছে। হৈ হৈ হট্টগোল হাটের—তার মধ্যেও স্বরটি তার স্পষ্ট, কি মোড়ল কন্দকুটো হাচবা না, মহাজনের মত বাঁধি রাখবা বুঝি? বোঝ না ত ঠ্যালা বাজারদরে বিশ্বাস কি—এই ওঠে, এই নামে। তার পর হো হো করে প্রাণমাতান হাসি, জানিস বউ, ভয় দেখিয়ে না দিলে মালের দর ত কমবে না সিকি পয়সা, দুনিয়ার সবাই সেয়ানা রে—সবাই সেয়ানা, আমরাই যা বোকা!

হাসির রেস অনবরত বেজে চলল কানের কাছে। দুনিয়ার সবাই সেয়ানা—বোকা শুধু আমরা। অর্থাৎ ষষ্ঠীচরণ আর মঙ্গলা। হাসিঠাট্টার মাঝখানে যারা শুধু শুধু ঝড় তোলে—শুধু শুধু কথা কাটাকাটি—মান-অভিমান, রাগগোসা করে—শুধু শুধু অশান্তি আর অনাসৃষ্টি—তারা বোকা নয় ত কি?

বুকের ভিতরটায় মোচড় দিয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি কি যেন বলতে গেল মঙ্গলা, বাবা কি মনে করবে ভেবে জোর করেই সেটা বুকের মধ্যে ঠেলে দিলে। এই চেষ্টায় মঙ্গলার সারাদেহ থর থর করে কেঁপে উঠল—একটা অস্ফুট গোঙানীর মত শব্দ বার হ'ল।

গাড়োয়ানের পিছনেই বসেছিল শিবু—তার পিছনে মঙ্গলা। সামনের দিকে চেয়ে আপন আনন্দে গল্প করছিল শিবু। অস্ফুট শব্দে পিছন ফিরে চেয়ে বলল, কিরে, কি হ'ল? ঝাঁকুনি লাগল বুঝি? রসিদ ভাই, একটু আস্তে আস্তে গাড়ী চালাও—এই আলের পথটা ভারি বিচ্ছিরি।

ততক্ষণে মনঃস্থির করে ফেলেছে মঙ্গলা। সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে বলল, না বাবা, গাড়ী ঘোরাতে বল, একটা জিনিস ফেলে এসেছি।

শিবু অবাক হ'ল ওর কথায়। এতখানি পথ এগিয়ে এসে সেই তুচ্ছ জিনিসটার কথা মনে পড়ল মুন্ডলীর। নাঃ, মেয়ে দেখছি ছেলেমানুষই আছে—মাথায় বাড়লে কি হবে! পিছন ফিরে এসে বলল, কি একটা তুচ্ছ জিনিস—তার জন্যে এতটা পথ উজিয়ে যেতে হবে! ধুত্তোরি কাণ্ড! কালই আমি ওনাদের কাছ থেকে চেয়ে আনব'খুন!

না বাবা, গাড়ী ফেরাও। কান্না-ভেজা করুণ কণ্ঠ নয় মঙ্গলার, জিদ ধরলে ওর মায়ের গলার স্বর যেমন ভারী আর ধারালো হয় আর থমথম করে, যুক্তি দিয়ে অনুনয় করে কিংবা ধমক দিয়েও সে সুর বদলানো যায় না—তেমনি অনমনীয় সুরে প্রতিবাদ জানাচ্ছে মঙ্গলা। ওর দুই হাঁটু মুড়ে বসবার ভঙ্গিতে কেমন একটা কঠিন ভাব। মুখখানা ফিরিয়েছে গাড়ীর পিছন দিকে। দৃষ্টিটা আটকে রয়েছে সেই দিকেই—যেখানে মাঠের শেষে ফালিমত সরু একটি পথ গ্রামের উঁচু জমিন বরাবর কাঁকড়া অশ্বত্থগাছটার তলায় একরাশ আগাছার জঙ্গলে হারিয়ে গেছে।

গাড়ীর মুখ ওই দিকেই ঘুরল। মঙ্গলাও ঘুরে বসল সামনে। অশ্বত্থের ছায়াভরা কোলে লতাগুল্মের কোলে-ঢাকা গ্রামমুখীন পথটাকে খুঁজে বার করবার দায়িত্ব এবার মঙ্গলারই।

শঙ্কর-মতে "সাধন": কর্ম

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

(১)

পূর্ব কয়েকটি সংখ্যায়, শঙ্কর মতে মোক্ষ বা মুক্তির স্বরূপ-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। মোক্ষকেই যদি মানব-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে গ্রহণ করা হয়, তাহলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে যে, সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার উপায় বা পন্থা কি? মোক্ষলাভের এরূপ উপায় বা পন্থাকেই বলা হয় "সাধন" বা সিদ্ধির উপায় বা পন্থা। সেজন্য "সাধন" ব্যতীত "সিদ্ধি" অসম্ভব। এই কারণে, শঙ্কর-বেদান্তেও "সাধন" সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আছে।

সাধারণতঃ, ভারতীয়-দর্শনে তিনটি "সাধনার" বিষয় বলা হয়—এদের সম্মেলিত নাম "ত্রি-মার্গ"। এই তিনটি হ'ল কর্ম-মার্গ, ভক্তি-মার্গ ও জ্ঞান-মার্গ।

প্রথমেই কর্ম-মার্গের কথা ধরা যাক্। কর্ম দু'শ্রেণীর: সকাম ও নিষ্কাম। ফল লাভের ইচ্ছায় যে কর্ম করা হয়, তা হ'ল "সকাম-কর্ম" কিন্তু যে কর্ম সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবে, ফলভোগের কোন কামনা না রেখে কেবলমাত্র কর্তব্যবোধে, শাস্ত্রের বিধি অনুসারে করা হয়, তা "নিষ্কাম-কর্ম"। মোক্ষ-পথে নিষ্কাম-কর্মের যাই মূল্য থাকুক না কেন, সকাম-কর্ম যে সম্পূর্ণরূপে মোক্ষবিরোধী, তা সর্বজনবিদিত সত্য। সেজন্য ব্রহ্মসূত্রের "চতুঃসূত্রীর" শেষ সূত্রে (১-১-৪), শঙ্কর এই বিষয়ে, অর্থাৎ কর্ম যে ব্রহ্মলাভের উপায় নয়, অথবা ব্রহ্ম যে কর্মাঙ্গ নয়, তা অতি বিশদভাবে, যুক্তি সহকারে আলোচনা করেছেন।

এক্ষেত্রে মীমাংসা মতবাদ এই যে,—

"প্রতিপত্তি-বিধিবিষয়তয়ৈব শাস্ত্রেন ব্রহ্ম সমর্প্যতে।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ১-১-৪)।

অর্থাৎ, শাস্ত্রে ব্রহ্ম কর্মবিধি বা উপাসনবিধির অঙ্গরূপেই নির্দিষ্ট হয়েছেন।

এই মীমাংসা মতবাদানুসারে, শাস্ত্রের উদ্দেশ্যই হ'ল মুমুক্ষু-জনদের পুণ্যকর্মে প্রবৃত্ত করা, এবং পাপকর্ম থেকে নিবৃত্ত করা। সেজন্য প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিই হ'ল শাস্ত্রের মূল কথা।

"প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-প্রয়োজনত্বাৎ শাস্ত্রস্য॥"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ১-১-৪)

সেজন্যই শাস্ত্রে নানারূপ বিধি ও নিষেধ আছে। বিধি অনুসারে, লোকে বিবিধ পুণ্যকর্মে প্রবৃত্ত হন; নিষেধ অনুসারে, তাঁরা বিবিধ পাপকর্ম থেকে নিবৃত্ত হন। এই ভাবে মীমাংসা মতানুসারে, বিধি ও নিষেধই হ'ল শাস্ত্রের মূল বিষয়-বস্তু, অথবা, জনগণকে শুভকর্মে প্রবৃত্ত বা অশুভ কর্ম থেকে নিবৃত্ত করাই হ'ল শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য, কেবলমাত্র

পূর্ব-সিদ্ধ বস্তুর স্বরূপ জানান নয়। এরূপে, বস্তু-জ্ঞানপ্রদান নয়, একমাত্র কর্ম-প্রচোদনাই হ'ল শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব।

অবশ্য কোন কোন স্থলে বিধি-নিষেধমূলক বাক্য ব্যতীতও কেবল বস্তু-বিষয়ক বাক্যও শাস্ত্রে পাওয়া যায়। মীমাংসা-মতে, সেই সকল বাক্য, বিধিরই অঙ্গমাত্র। শাস্ত্রে বিধি-নিষেধ মুখে এরূপ বস্তুর বিষয়ে স্থলবিশেষে উল্লেখ করা হয়, যা সাধারণের নিকট অজ্ঞাত। এই সকল অজ্ঞাত বস্তুর ব্যাখ্যা প্রয়োজন, যেহেতু অন্যথায় সেই বিধি-নিষেধের অর্থই বোধগম্য হবে না। কেবল এই কারণেই শাস্ত্র মধ্যে মধ্যে ঐ সকল সম্বন্ধে বিবৃতিদান করেছেন। যেমন, শাস্ত্রে একটি বিধি আছে: 'যূপে পশু আবদ্ধ করবে।' 'যূপ' কি পদার্থ, তা সাধারণ জনদের জানা সম্ভব নয়। সেজন্য শাস্ত্র এই বিধির অঙ্গরূপেই ব্যাখ্যা করে বলছেন: 'যূপ অষ্টাশ্রীকৃত (অষ্টকোণবিশিষ্ট) কাষ্ঠ'। শাস্ত্রে অধিকাংশই বিধি-নিষেধ-মূলক বাক্য থাকলেও যে কয়েকটি বিধি-নিষেধ-বহির্ভূত বাক্য আছে, তা এই ভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়।

সেজন্য মীমাংসা মতে, বেদান্ত-শাস্ত্রও বিধি-নিষেধ-পর। অতএব বেদের কর্ম-কাণ্ডে যেরূপ স্বর্গকামিগণের জন্য অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞীয় কর্মের বিধি আছে, বেদের জ্ঞানকাণ্ডেও সেরূপ মোক্ষকামিগণের জন্য ব্রহ্মজ্ঞানের বিধি আছে।

"সতি চ বিধি-পরত্বে, যথা স্বর্গাদি কামস্যাগ্নিহোত্রাদি—সাধনং বিধীয়তে, এবমমৃত-কামস্য ব্রহ্মজ্ঞান বিধীয়ত ইতি যুক্তম্।" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ১-১-৪)।

অবশ্য কর্মকাণ্ডের বিষয়-বস্তু 'ধর্ম' বা উৎপাদ্য কর্ম, জ্ঞান-কাণ্ডের বিষয়বস্তু 'ব্রহ্ম' বা নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্ম। তা সত্ত্বেও মীমাংসা-মতে, কর্ম-কাণ্ড ও জ্ঞান-কাণ্ডের মূল প্রতিপাদ্য-বস্তু হ'ল একই, অর্থাৎ, বিধি-নিষেধ—সে বিধি নিষেধ ধর্ম সম্বন্ধেই হোক, বা ব্রহ্ম সম্বন্ধেই হোক। সেজন্য, জ্ঞান-কাণ্ড বা বেদান্ত-শাস্ত্রেও অসংখ্য বিধি আছে। যথা:

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ।" (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ২-৪-৫)

"য অপহতপাপ্মা, সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।" (ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৮-৭-১, ৩)

"আত্মন্যেবোপাসীত।" (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ১-৪-৭)

"আত্মানমেব লোকমুপাসীত।" (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ১-৪-১৫)

"ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি।" (মুণ্ডকোপনিষদ্, ৩-২-৯)

"আত্মাকে দর্শন করবে।"

"যিনি পাপবিরহিত, তাঁকেই অন্বেষণ করবে, জানতে ইচ্ছা করবে।"

"আত্মাই ব্রহ্ম—এই ভাবে উপাসনা করবে।"

"আত্মাকেই লোকরূপে উপাসনা করবে।"

"ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মই হন।"

এরূপ বিধি-বাক্য থেকে স্বতঃই মনে প্রশ্ন উঠে: 'আত্মা কি?' 'ব্রহ্ম কি?' ইত্যাদি। আত্মা ও ব্রহ্মের স্বরূপ-বোধক বেদান্ত-বাক্যসমূহ এই প্রশ্নের উত্তর-স্বরূপই মাত্র। যেমন: 'ব্রহ্ম নিত্য, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, নিত্যতৃপ্ত, অনিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, বিজ্ঞানঘন ও আনন্দস্বরূপ,' ইত্যাদি। এরূপ ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারাই শাস্ত্রোক্ত মোক্ষফল লাভ হয়। সেজন্য মীমাংসা মতে, জ্ঞান-কাণ্ডে বা বেদান্ত-শাস্ত্রে আত্মা ও ব্রহ্ম-বিষয়ে যে সকল বাক্য আছে, তা স্বয়ং বিধিমূলক না হলেও ব্রহ্মোপাসনা-বিধির অঙ্গরূপেই উক্ত হয়েছে। সেজন্য কর্ম-কাণ্ডের যূপাদির স্বরূপ ব্যাখ্যাকারী বাক্যসমূহ, এবং জ্ঞান-কাণ্ডের আত্মা ব্রহ্মাদির স্বরূপব্যাখ্যাকারী বাক্যসমূহ একই শ্রেণীর ও একই উদ্দেশ্য-প্রসূত।

বস্তুতঃ মীমাংসা-মতে, বিধি-নিষেধ বর্জিত, (Non-Injunctive) কেবলমাত্র বস্তু-স্বরূপ প্রকাশক (Categorical) বাক্যসমূহ নিরর্থক—যথা: 'বসুমতী সপ্তদ্বীপা', 'রাজা গমন করেছেন' প্রভৃতি। একই ভাবে, যদি ব্রহ্মস্বরূপ-বোধক বেদান্ত বাক্যসমূহও পূর্বোক্ত প্রকারে উপাসনা-বিধির অঙ্গ না হ'ত, তাহলে তা সকলই সমভাবে নিরর্থক ও নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ত। ব্রহ্মস্বরূপ-বোধক বাক্যের দ্বারা যে মোক্ষলাভ হয়, এবং সেজন্য তা নিরর্থক ও নিষ্প্রয়োজন নয়—এ কথাও বলা চলে না। কারণ, দেখা যায় যে, ব্রহ্মস্বরূপ 'শ্রবণ' মাত্রেই মোক্ষলাভ হয় না, সংসার-ভ্রম বিদূরিত হয় না, পূর্বের সংসারিত্ব অক্ষুণ্ণই থাকে। বেদান্ত-মতেও 'শ্রবণের' পর 'মনন' ও 'নিদিধ্যাসনের' সমান প্রয়োজন।

সেজন্য, মীমাংসা মতে, ধর্মের ন্যায় ব্রহ্মও কর্মলভ্য—ধর্ম-লাভ হয় সাধারণ যাগযজ্ঞাদিরূপ কর্ম-সম্পাদন দ্বারা, ব্রহ্মলাভ হয় উপাসনাদিরূপ কর্ম-সম্পাদন দ্বারা—এইমাত্র প্রভেদ।

কিন্তু উপরের এই মীমাংসা-মতবাদ শঙ্কর পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে খণ্ডন করেছেন তাঁর ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে (১-১-৪)।

প্রথমতঃ, শঙ্কর বলেছেন যে, কর্ম বা ধর্মফল ও ব্রহ্মজ্ঞান-ফলের মধ্যে মূলীভূত প্রভেদ। 'ধর্ম' শব্দের অর্থ হ'ল শাস্ত্রানুসারী শারীরিক, মানসিক ও বাচিক বিহিত কর্ম। যেমন 'গমন' শারীরিক কর্ম, 'চিন্তন' মানসিক কর্ম, 'কথন' বাচিক-কর্ম। 'অধর্ম' হ'ল শাস্ত্র-বিরোধী হিংসাদি-প্রমুখ নিষিদ্ধ-কর্ম। এরূপ 'ধর্ম' বা পুণ্যকর্ম এবং 'অধর্ম' বা পাপ-কর্মের ফলেই সকলে যথাক্রমে সুখ ও দুঃখ ভোগ করেন। এই সুখ-দুঃখ যে সর্বক্ষেত্রে সমান নয়, কিন্তু ক্ষেত্রভেদে,তাদের মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য আছে, তা প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট সত্য। সুতরাং সুখ-দুঃখের তারতম্য আছে বলে তাদের কারণ কর্মেরও

তারতম্য আছে ; কর্মের তারতম্য আছে বলে, তাদের কারণ কর্তারও অধিকার সামর্থ্যাদির তারতম্য আছে—এ কথা অবশ্য স্বীকার্য। যেমন, সগুণোপাসক দেবযান-পন্থানুসারী, পুণ্যকর্মী পিতৃযান-পন্থানুসারী। এইভাবে কর্মকারী জীবের প্রত্যেকেরই অল্পাধিক পরিমাণে সুখ-দুঃখভোগ অনিবার্য।

সেজন্য মোক্ষ যদি পূর্বোক্ত-প্রকারে, কর্ম বা ধর্মেরই ফল হয়, তাহলে মোক্ষে ও সুখ-দুঃখের তারতম্য থাকা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু, পূর্বে যা বলা হয়েছে, মুক্তপুরুষ শরীরাভিমানশূন্য বলে, তাঁর ক্ষেত্রে এরূপ সুখ-দুঃখের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অসম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ, পূর্বেই যা বলা হয়েছে, কর্মের ফল হ'ল অনিত্য—অর্থাৎ, যা পূর্বেই উৎপন্ন বা সিদ্ধ ছিল না, তাই উৎপাদন বা সিদ্ধ করা। কিন্তু মোক্ষ নিত্য। সেজন্য মোক্ষ কোন প্রকারেই কর্মের দ্বারা উৎপাদ্য বা লভ্য হতে পারে না।

"অতস্তদ্ ব্রহ্ম যন্মোয়ং জিজ্ঞাসা প্রস্তুতা।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ১-১-৪)।

'মোক্ষই' হলেন 'ব্রহ্ম', যাঁর বিষয়ে জ্ঞানলাভের নিমিত্তই বেদান্ত-শাস্ত্র আরব্ধ হয়েছে।

"অতো ন কর্তব্য-শেষত্বেন ব্রহ্মোপদেশঃ যুক্তঃ।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ১-১-৪)

সেজন্য ব্রহ্মোপদেশকে কর্ম-বিধির অঙ্গরূপে গ্রহণ করা অযৌক্তিক।

তৃতীয়তঃ, সাধারণ ক্রিয়া বা কর্মের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রথমে প্রাপ্তব্য বস্তু ও তার প্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে জ্ঞান হয় ; তৎপরে সেই জ্ঞানানুসারে কর্ম করলে সেই বস্তুটি প্রাপ্ত হওয়া যায়। অর্থাৎ, এ স্থলে জ্ঞান ও প্রাপ্তির মধ্যে কর্মের প্রয়োজন। কিন্তু মোক্ষের ক্ষেত্রে জ্ঞান বা উপলব্ধি হওয়া মাত্রই বদ্ধ জীব মুক্ত হন, অথবা, স্বীয় নিত্য মুক্তস্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন। অপর কোন কর্ম বা অন্য কিছুর স্থান বা অবকাশ এতে নেই।

"শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিজ্ঞানন্তরং মোক্ষং দর্শয়ন্ত্যো মধ্যে তৎ-কর্তৃকং কার্যান্তরং বারয়ন্তি।

ব্রহ্মদর্শন—সর্বাত্মভাবয়োর্মধ্যে কর্তব্যান্তরং বারণায়োদাহার্যম্।" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ১-১-৪)।

অর্থাৎ, শ্রুতি ব্রহ্মজ্ঞানোদয় এবং মোক্ষলাভের মধ্যে অন্য কোন কার্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। এরূপে ব্রহ্মদর্শন ও সর্বাত্মভাবের মধ্যে অন্য কোন কর্তব্য-কর্ম নেই।

উদাহরণ দিয়ে, শঙ্কর বলছেন যে,—'তিষ্ঠন্ গায়তি', 'ঐ ব্যক্তি দণ্ডায়মান হয়ে গান করছেন' বললে বোঝা যায় যে, দণ্ডায়মান হওয়া ও 'গান করার' মধ্যে অন্য কোন কার্য নেই—অথবা 'দণ্ডায়মান হওয়া' ও 'গান করা' একই সঙ্গে যুগপৎ সম্পাদিত হচ্ছে। সমভাবে, অজ্ঞান নিবারণ বা ব্রহ্ম-জ্ঞানলাভ এবং মোক্ষলাভও একই সঙ্গে যুগপৎ সম্পাদিত হচ্ছে।

চতুর্থতঃ, ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানও মোক্ষের সৃষ্টি করে না, যেহেতু জীব নিত্যমুক্ত। ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান কেবল অজ্ঞান-কারণই অপসারিত করে। সুতরাং এই দিক থেকেও মোক্ষ উৎপাদ্য নয়।

পঞ্চমতঃ, ব্রহ্ম ও আত্মার যে একত্ব জ্ঞানকে মোক্ষের সাধক বলা হয়েছে, তা শুদ্ধ জ্ঞানই মাত্র, অভেদোপাসনারূপ কর্ম নয়। অভেদোপাসনা চতুর্বিধ : সম্পৎ, অধ্যাস, সংবর্গ এবং সংস্কার। উদাহরণ নিম্নলিখিতরূপ :

মনোবৃত্তিও অসংখ্য, বিশ্বদেবতাও অসংখ্য। এই সাদৃশ্যের ভিত্তিতে মনকে বিশ্বদেবতারূপে ধ্যানের নাম সম্পৎ উপাসনা। এক্ষেত্রে মনের অপেক্ষা বিশ্বদেবতার উপরই অধিক জোর দেওয়া হয়, এবং মন ও বিশ্বদেবতার মধ্যে প্রভেদজ্ঞানও যেন সামান্য অনুবর্তন করে।

মন, আদিত্য প্রভৃতিকে ব্রহ্মরূপে ধ্যানের নাম অধ্যাস বা প্রতীক উপাসনা। এক্ষেত্রে ব্রহ্মের অপেক্ষা মন, আদিত্য প্রভৃতির উপরই অধিক জোর দেওয়া হয়, এবং মন প্রভৃতি ও ব্রহ্মের মধ্যে বিন্দুমাত্রও প্রভেদজ্ঞান থাকে না।

বায়ু প্রলয়কালে অগ্নি প্রভৃতির সংহার করে। প্রাণও সুপ্তিকালে বাক্ প্রভৃতির সংহার করে। এই ক্রিয়া সাদৃশ্যের ভিত্তিতে প্রাণকে বায়ুরূপে ধ্যানের নাম সংবর্গ-ধ্যান।

মনের সংস্কারের জন্য মনকে দেবতারূপে ধ্যানের নাম সংস্কার উপাসনা।

ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদ সম্পৎ ও অধ্যাস উপাসনার ন্যায় গুণগত সাদৃশ্যমূলক নয়, সংবর্গ উপাসনার ন্যায় ক্রিয়াগত সাদৃশ্যমূলকও নয়, সংস্কার উপাসনার ন্যায় আত্মার সংস্কারের জন্যও নয়—কারণ, এই অভেদ সত্যই পরিপূর্ণ, বাস্তব অভেদ সাদৃশ্যমাত্রই নয়, এবং সেজন্য সংস্কারের কোন প্রশ্নও এ স্থলে নেই।

এরূপে ব্রহ্মাত্মজ্ঞান জ্ঞানই মাত্র ; উপাসনারূপ কর্ম নয়।

"অতো ন পুরুষব্যাপারতন্ত্রা ব্রহ্মবিদ্যা, কিং তর্হি? প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ-বিষয়-বস্তুজ্ঞানবৎ বস্তুতন্ত্রৈব। এবংভূতস্য চ ব্রহ্মণস্তজ্-জ্ঞানস্য বা ন কয়াচিদ্ যুক্ত্যা শক্যা কার্যানুপ্রবেশঃ কল্পয়িতুম্।" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ১-১-৪)

সেজন্য ব্রহ্মজ্ঞান পুরুষের কর্মের বা ইচ্ছার অধীন নয়, কিন্তু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগম্য বস্তু যেরূপ বস্তুস্বরূপেরই অধীন, সেরূপ ব্রহ্মবস্তুর অধীন। এরূপে, ব্রহ্ম বা ব্রহ্মজ্ঞানকে কোন যুক্তির দ্বারাই কর্মাঙ্গ বলে কল্পনা করা যায় না।

অন্ধ আকাশ

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

১৬

আজ ভোরবেলা ঠিকাদারের ছাউনিতে যাইবার তাড়া নাই, রুকিয়া ধীরে-সুস্থে কাজ করে। তিলকা বলে, "কি গো, আজ কাজে যাবি নে?"

রুকিয়া জবাব দেয়, "গোবিন্দ মহতোর কোঠাঘরে মাটি দেওয়া হয়ে গেছে, আর কাজ নাই।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিলকা চোখ বোঁজে, তাহার শরীর ইদানীং এত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, কোন কথা ভাল করিয়া ভাবিতেও পারে না। সারাদিন একটু জ্বর গায়ে লাগিয়া থাকে, না জাগিয়া, না ঘুমাইয়া একটু দীর্ঘ দুঃস্বপ্নের মত তার দিন কাটে।

ঘরের স্বল্প কাজ শেষ হইয়া গেলে রুকিয়া কি করিবে ভাবিয়া পায় না, দোর গোড়ায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। বেলা বাড়িয়া চলে, জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড রোদে পৃথিবী তাতিয়া ওঠে, মাঝে মাঝে গরম বাতাস ধূলা উড়াইয়া হু হু করিয়া বহিয়া যায়। গাছের ডালে কোন পাখীর সাড়া পর্যন্ত পাওয়া যায় না। দোর গোড়ায় বসিয়া রুকিয়া আকাশপাতাল কত কথা ভাবে। পৃথিবীটা যেন তাহার কাছে অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত মমতাহীন বলিয়া মনে হয়, সেখানে আপন বলিয়া তাহার কেহ নাই। কে যেন নির্দয়ভাবে তাহাকে পিছন হইতে একটা মহা বিপদের দিকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে, কেহ তাহাকে রক্ষা করিবে না। ভাবিতে ভাবিতে তাহার মাথার ভিতরটা হঠাৎ যেন গরম হইয়া ওঠে, সে আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না।

ঘরের দরজায় শিকল তুলিয়া দিয়া রুকিয়া নিঃশব্দে বাহিরে আসে। গ্রামের পথে লোক নাই, কাজের লোক কাজে গিয়াছে, যাহাদের কাজ নাই তাহারা এই প্রচণ্ড রোদে কেহ বাহির হয় না, যে যাহার ঘরে বসিয়া বিশ্রাম করে। রুকিয়া নির্জন পথ ধরিয়া চলে, তাহার কোন দিক-স্থির নাই, কোন উদ্দেশ্য নাই। বাতাসে তাহার ছেঁড়া-ময়লা আঁচলটুকু মাথার উপর হইতে পড়িয়া যায়, রুক্ষ চুল উড়িয়া মুখে-চোখে আসিয়া পড়ে, সে ধীরে ধীরে চলিতে থাকে। ঘরে ঘরে দরজা বন্ধ, মঙ্গুয়ার বাড়ী পার হইয়া, সরযুর বাড়ী পার হইয়া, গাঁড়ে টোলা পার হইয়া রুকিয়া গ্রামের প্রান্তে আসিয়া পড়ে। অদূরে কয়েকটা আমগাছ, তাহার নীচে গুটিকয়েক শীর্ণ ছেলেমেয়ে কাঁচা আমের সন্ধানে ঘুরিতেছে, রুকিয়া তাহাদের মধ্যে আসিয়া দাঁড়ায়। মাঝে মাঝে দমকা বাতাসে গাছের ডালপালা ঝটাপটি খায়, একটি-দুটি কাঁচা আম খসিয়া পড়ে, ছেলেমেয়ের দল ছুটিয়া গিয়া কাড়াকাড়ি করিয়া তাহা কুড়াইয়া নেয়। রুকিয়া দাঁড়াইয়া দেখে, তার পরে আবার যখন বাতাসের ঝাপটায় কাঁচা আম খসিয়া পড়ে, রুকিয়া ছুটিয়া গিয়া সকলের আগে কুড়াইয়া নেয়। ছেলেমেয়ের দল আপত্তি করে, দুই-একজন গালিও দেয়, রুকিয়া তাহা গ্রাহ্য করে না, নির্লিপ্তভাবে শিশুদের সম্পত্তি ছিনাইয়া লইয়া আঁচলে বাঁধে, তার পরে আবার চলিতে সুরু করে।

গ্রামের পথ জলহীন ছোট পুকুরের পাশ দিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে। সেইখানে গোবিন্দ মহতোর বাড়ী, বড় বড় কোঠাঘর, তিন-তিনটে করিয়া আঙিনা। গোবিন্দ মহতো বড় লোক, গ্রামের ভাল ভাল ধানক্ষেতগুলি তাহার, হাজার মণ ধান হয়। ধানে ধান বাড়ায়, গোবিন্দ মহতো এক মণ ধান ধার দিয়া দেড় মণ ধান আদায় করে। এই সর্তে ধান ধার লইবার লোকেরও অভাব নাই, কেননা, গ্রামের দু'চার জন গৃহস্থ ছাড়া আর সকলের সামান্য ক্ষেতে যা ফসল হয় তাহাতে কষ্টেসৃষ্টে তিন মাস চলে, বাকি নয় মাসের খাদ্যের জন্য ধার করিতে ও বিদেশে গিয়া কাজ করিতে হয়। রুকিয়া গোবিন্দ মহতোর বড় বড় ঘরগুলির পাশ দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ থামিয়া যায়, ঘরের দেওয়ালের উপর হাত রাখিয়া চুপ করিয়া দাঁড়ায়। এই দেওয়ালের ওপাশে বড় বড় বাঁশের বেড়ে ধান রাখা আছে তাহা সে জানে, সেই পুঞ্জীভূত ধান যেন চুম্বকের মত তাহাকে টানিতে থাকে। তাহার ঘরে একটি ধানও নাই, অথচ এই ঘরে এক হাত চওড়া একটা মাটির দেওয়ালের ব্যবধানে স্তূপাকার ধান পড়িয়া আছে, গৃহবাসীর সে ধানে কোন প্রয়োজন নাই। ইহার অর্থ সে ঠিক বুঝিতে পারে না, এ যেন সব হিসাবের বাইরে। বুড়ো গোবিন্দ মহতোকে সে এতদিন যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আজ হঠাৎ তাহার প্রতি একটা বিদ্বেষ রুকিয়ার মনে ঘনাইয়া ওঠে। সে মনে মনে গোবিন্দ

মহন্তোকে প্রশ্ন করে, "তোমার এত ধান আছে, আমার একটাও নাই কেন ?"

গোবিন্দ তাহার কোন উত্তরই দিতে পারে নাই। রুকিয়া ক্ষেপিয়া যায়, পথ হইতে একটা পাথর তুলিয়া লইয়া দেওয়ালের গায়ে বারে বারে ঠুকিতে থাকে, একটা প্রকাণ্ড অন্যায়কে যেন আঘাত করিয়া শাস্তি দিতে চায়।

এক ঝাপটা গরম বাতাস আসিয়া রুকিয়াকে ঠেলিয়া ফেলে, সে আবার আগাইয়া চলে। প্রচণ্ড রোদে গ্রামের জনহীন গলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষে ক্লান্ত হইয়া সে বাড়ী ফেরে। টলিতে টলিতে ঘরে ঢুকিয়া সে মাটিতে শুইয়া পড়ে।

১৭

এক একটা দিন অতিকষ্টে যায় আর রুকিয়ার চিন্তা যেন ক্রমে এলোমেলো হইয়া আসে, সহজ ভাবে সে আর ভাবিতে পারে না। দুই বেলা খাওয়া ছাড়িয়া একবেলা খাওয়া ধরে, এক বেলাও শেষে আধ পেট, তার পরে তিলকা আর পরসাদের জন্যে দুটি ভাত বা একটু মারুয়ার লপসী রাঁধিয়া দিয়া নিজে উপবাস করে। শরীর তাহার শুকাইতে থাকে।

জ্যৈষ্ঠ শেষ হইয়া আষাঢ় আসে, গরম যেন আরও বাড়িয়া যায়। আকাশে মেঘ নাই, সকাল হইতে সুরু করিয়া প্রচণ্ড গরম বাতাস সন্ধ্যা পর্যন্ত পাগলের মত দাপাদাপি করিয়া ফেরে। দুপুরে স্বামী আর পুত্র যখন গ্রীষ্মের অবসাদে ঘুমাইয়া পড়ে, রুকিয়া তখন আবার পথে বাহির হইয়া আসে। গ্রামের জনশূন্য গলিপথ দিয়া সে চলে, উত্তপ্ত কাঁকরে তাহার পা পুড়িয়া গেলেও সেদিকে খেয়াল নাই, উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। ঘুরিতে ঘুরিতে সে গোবিন্দ মহন্তোর বাড়ীর পাশে আসিয়া পড়ে। মহন্তোর ধান-বোঝাই ঘরগুলি যেন তাহাকে টানিয়া আনে। নাগালের বাহিরে শিকার থাকিলে হিংস্র জানোয়ার যেমন তাহার চারিদিকে অনবরত পাক দিতে থাকে, রুকিয়া ঠিক সেই ভাবে গোবিন্দ মহন্তোর বাড়ী বেষ্টন করিয়া ঘুরপাক খায়। ক্রমে তাহার পা দুটি ক্লান্ত হইয়া আসে, সে ঘরের দাওয়াতে ঠেস দিয়া বসিয়া পড়ে। বসিয়া বসিয়া সে ভাবে. তাহার খালি পেটে যখন দুই দিন ধরিয়া এক দানা অন্ন নাই তখন ঐ স্তূপীকৃত ধান গোবিন্দ মহন্তোর ঘরে বেড়বন্দী হইয়া কেন পড়িয়া থাকে ? এ 'কেন'র উত্তর নাই, এ যেন একটা গোলকধাঁধা, বাহিরে আসিবার পথ আছে কিন্তু খুঁজিলে পাওয়া যায় না। চোখ দুটি বুঁজিয়া সে বসিয়া ভাবে। ক্রমে তাহার সর্বাঙ্গে একটা আরাম নামিয়া আসে, মনে হয় কে যেন তাহাকে রোদ হইতে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতেছে, কি শীতল সে বাতাস! চোখে তাহার তন্দ্রা নামিয়া আসে।

হঠাৎ মেঘের ডাকে তাহার তন্দ্রা ছুটিয়া যায়, চোখ খুলিয়া দেখে পশ্চিমের আকাশ জুড়িয়া কালো মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে। রুকিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়ায়, অবাক হইয়া জলভরা মেঘের দিকে তাকাইয়া থাকে। গাঁয়ের ভিতর ততক্ষণ একটা কলরব উঠিয়াছে। যে মেঘের জন্যে সকলে দিন গণিয়াছে সে আজ উপস্থিত। পশ্চিম দিগন্ত-রেখা হইতে একখানা কালো মেঘ ধীরে ধীরে প্রসারিত হইয়া সমস্ত আকাশটা ছাইয়া ফেলে। পৃথিবীর বুক জুড়িয়া ছায়া পড়ে, বহুদিনের জ্বর যেন একমুহূর্তে ছাড়িয়া যায়। বহুদূর হইতে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ ক্রমশঃ আগাইয়া আসে, গাছের ডালপালা দুই-একবার কাঁপিয়া ওঠে। হঠাৎ অরণ্যকে মথিত করিয়া, ধূলারাশি উড়াইয়া দানবের মত প্রচণ্ড ঝড় ছুটিয়া আসে, আকাশ চিরিয়া বিদ্যুৎ খেলিয়া যায়, কড়কড় করিয়া আওয়াজ হয়। রুকিয়া চীৎকার করিয়া ওঠে, "আঁধি, আঁধি, আঁধি আসছে।" তার পরে ঘরের দিকে দৌড়ায়।

গ্রামের পথে এখন বহু লোক ছুটাছুটি করে। ধূলা-বালিতে চোখে প্রায় কিছুই দেখা যায় না, বাতাসের দাপটে কাত করিয়া ফেলিতে চায়। রুকিয়া কোনমতে আসিয়া আঙিনায় ঢোকে। পরসাদ জাগিয়া উঠিয়া ভয় পাইয়া কাঁদিতেছে, তিলকা ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিতেছে, "কোথায় গেলি গো ?"

ছেলেকে কোলে তুলিয়া রুকিয়া তিলকার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। তিলকা বলে, "কি হ'ল গো ?"

রুকিয়া তিলকার মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলে, "আঁধি এল, মেঘ করেছে খুব, বিষ্টি হবে।"

তিলকা বলে, "তাই বল, তাই দেহটা এমন জুড়িয়ে গেল।"

রুকিয়া দরজার সামনে দাঁড়াইয়া আঁধির তাণ্ডব নৃত্য দেখে। নদীর বালি হাওয়ার দাপটে উড়িয়া চলিয়াছে, চারিদিক প্রায় অন্ধকার, মনে হয় যেন সন্ধ্যা লাগিয়া আসিয়াছে। সামনের আমগাছটা পাগলের মত ডালপালা নাড়িতেছে। মাঝে মাঝে চোখ-ঝলসান বিদ্যুৎ চমকিয়া ওঠে, তার পরে কানে তালা লাগাইয়া বাজ পড়ে।

অনেকক্ষণ পরে ঝড় কমিয়া আসে, টপটপ করিয়া দু'চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে। এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস আসে; বৃষ্টির

কৌটা আরও গাঢ় পড়িতে থাকে। হঠাৎ হুড়মুড় করিয়া কে যেন আঙিনায় ঢুকিয়া ছুটিয়া ঘরের দেওয়ালের পাশে আসিয়া দাঁড়ায়। ভয় পাইয়া রুকিয়া বলে, "কে—কে গো ?"

মাথার পাগড়িটা খুলিয়া ফেলিয়া হাসিয়া লোকটা জবাব দেয়, "আমি গুলবা।"

"তুমি এখানে কেন এলে গো ?" প্রশ্ন করে রুকিয়া।

পাগড়িটা ঝাড়িতে ঝাড়িতে গুলবা বলে, "পথে বিষ্টি এল, তোমার আঙিনার দরজা খোলা দেখে একটু দাঁড়াতে এলুম। তবুও বেশ ভিজে গেছি গো।"

রুকিয়া আর কথা কয় না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। গুলবা রুকিয়ার দিকে চাহিয়া বলে, "তোমাকে কয়েকদিন দেখি নি পরসাদের মা, চেহারাটা তোমার কেমন হয়ে গেছে কেন গা ?"

রুকিয়া বৃষ্টির দিকে তাকাইয়া থাকে, জবাব দেয় না। গুলবা দরদের সঙ্গে বলে, "বড্ড শুকিয়ে গেছ।"

হঠাৎ রুকিয়া গুলবার খুব কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, চাপা গলায় বলে, "আমায় পাঁচটা টাকা দেবে গো ?"

গুলবা অবাক হইয়া রুকিয়ার মুখের দিকে তাকায়, এমন ভাবে তাহাকে কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে ও যাচিয়া টাকা চাহিতে কোনদিন দেখে নাই। একগাল হাসিয়া বলে, "তুমি চাইলেই ত আমি দিই পরসাদের মা, তুমিই ত আমাকে পর ভাব, নিতে চাও না।"

রুকিয়া বলে, "তুমি এনে দাও আমি নেব।"

গুলবা সরিয়া আসিয়া একেবারে রুকিয়ার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়ায়। রুকিয়া আবার বলে, "যাও নাগো, এনে দাও।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, এনে দিচ্ছি।" বলে গুলবা, তার পরে পাগড়ির কাপড়টা মাথায় চাপাইয়া ছুটিয়া বাড়ীর দিকে চলিয়া যায়।

বৃষ্টি বেশ চাপিয়া আসে। সামনের আমগাছ ক্রমশঃ ঝাপসা হইয়া ওঠে। ক্লান্ত তৃষিত ধরণী একটা পরম পরিতৃপ্তির আবেশে যেন মগ্ন হইয়া যায়। ভিজিতে ভিজিতে গুলবা ফিরিয়া আসে, ধুতির খুঁট হইতে পাঁচটা টাকা খুলিয়া রুকিয়ার হাতে দিয়া বলে, "তুমি জান না গো, তোমার জন্তে আমি কত ভাবি, তোমার কষ্ট দেখে আমার বুক ফেটে যায়।"

রুকিয়া জবাব দেয় না, টাকা কয়টা আঁচলে বাঁধিয়া রাখে।

গুলবা বলে, "তোমার সব কষ্ট আমি দূর করে দেব পরসাদের মা। তুমি শুধু আমার পানে একটু চাও।"

রুকিয়া ছোট্ট একটি "হুঁ" বলে।

গুলবা এবার রুকিয়ার হাতখানা ধরে, রুকিয়া কোন আপত্তি করে না, নির্লিপ্তের মত দূরের দিকে তাকাইয়া থাকে। গুলবা তাহাকে টানিয়া বুকের কাছে আনিতে চায়; কিন্তু রুকিয়া এবার সরিয়া যায়, বলে, "হাত ছেড়ে দাও।"

গুলবা তাহার হাত ছাড়ে না, কানের কাছে মুখ লইয়া বলে, "হ্যাঁ গা, তোমার কি একটুও মমতা নেই! আমি তোমার জন্তে সব করব, আমার রোজগারের সব পয়সা তোমাকে দেব, গহনাতে তোমার গা ভরে দেব।"

রুকিয়া মুখ তুলিয়া গুলবার দিকে তাকায়, গুলবা তাহার দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে পারে না, তাহাকে জড়াইয়া ধরে। রুকিয়া গুলবাকে ঠেলিয়া দিবার চেষ্টা করে কিন্তু পারিয়া ওঠে না—কাতরভাবে বলে, "না গো, এমনধারা করো না, আজ আমায় যেতে দাও—তুমি কাল আবার এস।"

গুলবার চোখ দুটি হিংস্র জানোয়ারের মত জলজ্বল করিয়া জ্বলিতে থাকে, রুকিয়ার কথায় সে কান দেয় না, তাহার শীর্ণমুখে চুমা খাইতে চায়। রুকিয়া এইবার একটা ঝটকা মারিয়া নিজেকে ছাড়াইয়া নেয়, তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেয়।

বৃষ্টি অঝোরে পড়িতে থাকে, গুলবা অনেকক্ষণ দরজার পাশটিতে ওৎ পাতিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, কিন্তু রুকিয়া আর বাহিরে আসে না। অবশেষে ভিজিতে ভিজিতে সে বাড়ী ফিরিয়া যায়।

ক্রমশঃ



চিরন্তন

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

চলেছ তোমরা কত দূর ?   কহ, চলেছ সে কোন্‌খানে ?
দূর, বহু দূর চলেছি আমরা সত্যের সন্ধানে।
দেখিলে চিনিবে ?   পেয়েছ কি তবে সত্যের পরিচয় ?
কেহ বলে, যেন জানি মনে হয়, কেহ বলে, নয় নয়।

সকলি সত্য যাহা কিছু আছে, কেহ বলে সব মায়া,
আলো বলি যারে নির্দ্দেশ করে, কেহ বলে তারে ছায়া।
ওরা বলে, শোন—বিশ্বের পানে চাও বাস্তব-ভাবে,
এরা বলে, হেথা স্বপ্ন সকলি, সত্য কোথায় পাবে ?

দ্রুত-ধাবমান ভাবনার পিছে ছুটে চলি দিন-যামি,
মনের নাগাল পাই না কিছুতে, ক্লান্ত—ক্লান্ত আমি।
কার কথা শুনি, কার কথা রাখি, কিসে হই নির্ভয় ?
কি-বা যথার্থ, কিই-বা অলীক, কে করে বিনির্ণয় ?

প্রাকৃত-জনেরে পুছিয়া কি হবে, প্রকৃত কথা কি জানে ?
সে কথা শিখিতে আগ্রহে চাহি বিশেষজ্ঞের পানে।
যা কিছু তথ্য তাহাই সত্য, কহিল বৈজ্ঞানিক,
পরীক্ষা করি গ্রহণ করিও ভুল-নয় যাহা ঠিক।

মোহ-আবরণ খসিল না তবু, আশা মিটিল না তায়,
প্রকৃতির নানা নিয়ম জানিলে জীবনে কি জানা যায় ?
বাসনা-বেদনা দিয়া সে যে গড়া, জীবন দুঃখময়,
তত্ত্বান্বেষী কহে, কর আগে সেই দুঃখেরে জয়।

জানি জানি জানি বন্ধু আমার, জীবনে বেদনা আছে,
আনন্দ সে কি ম্লান হয়ে যাবে দুঃখরাশির কাছে ?
অশ্রু-হাসির সঙ্গমে রাজে জীবন-তীর্থ বুঝি,
তারি বন্ধুর পথে পথে ফিরি তীর্থদেবতা খুঁজি'।

এই সংসারে থাকে না কিছুই, স'রে যায় চ'লে যায়,
অমৃতের তাই সন্ধানে ফেরে মর্ত্ত্য-মানব হায়।
চল-চঞ্চল জীবনে যে করে চির-অবিনশ্বর
সে-ই কি সত্য ?   তারি তরে এত তৃষিত কি অন্তর ?

সাধু ডেকে কয়, হা-রে মূঢ় তুই করিস নে মিছে ছল,
ভক্তজনেরা যে পথে চলেছে সেই পথ ধ'রে চল্।
বিচার-আচারে কি-বা কাজ বল, ছেড়ে দাও সব জ্ঞান,
তুমি কি জান না সত্য সে এক, সত্যই ভগবান।

কবিরে শুধাই, তুমি যে স্রষ্টা, উদ্বেল মোর মন,
পেয়েছ বন্ধু তুমি কোন্‌পথে সত্যের দর্শন ?
সুন্দর যাহা তা-ই ত সত্য, সত্যই সুন্দর,
এইটুকু জানা, কহে কবি, জেনে কি হবে অতঃপর ?

আমি বলি, তবু আরো কিছু আছে শেষ-আশ্রয়—আশা,
ধরার মানুষে অমর করেছে সে যে, প্রিয়, ভালবাসা।
প্রীতি—সুন্দরে করে সুন্দর, আনে অক্ষয় ক্ষেম,
অনেক ভুগিয়া ঠেকিয়া শিখেছি, সত্য শুধুই প্রেম।



ওড়িয়া শাক্ত সাহিত্য

ডক্টর শ্রীশশীভূষণ দাশগুপ্ত

শাক্ত ধর্ম, শাক্ত দর্শন ও শাক্ত উপাখ্যানাদি বাঙলা সাহিত্যকে কতভাবে প্রভাবিত করিয়াছে সে সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানি। এই প্রসঙ্গে অতি স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের কৌতূহল জাগে, বাঙলার প্রতিবেশী সাহিত্য—বিশেষ করিয়া ওড়িয়া, মৈথিলী এবং অসমীয়া সাহিত্যে এই শাক্ত প্রভাব কিভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে।

এখানে আমরা ওড়িয়া সাহিত্যের কথা আলোচনা করিতেছি। ওড়িয়া সাহিত্যের আরম্ভ কিন্তু শাক্ত প্রভাব লইয়া, যদিও পরবর্তীকালের ওড়িয়া সাহিত্যে শাক্ত প্রভাব অতি ক্ষীণ, কিছুসংখ্যক হরগৌরী সম্বন্ধীয় লৌকিক উপাখ্যান ও গীতিতেই ইহা নিবদ্ধ। ওড়িয়া সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য কবি পঞ্চদশ শতকের শূদ্রমণি সারলা দাস। ইঁহার সম্বন্ধে আমরা জানিতে পারি যে, ইনি নিরক্ষর গ্রাম্য চাষী-কবি, সারলা দেবীর প্রসাদে তাঁহার মধ্যে কবিত্বের স্ফুরণ। তাঁহার 'চণ্ডী-পুরাণ' গ্রন্থ প্রাচীন ওড়িয়া সাহিত্যের একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। শুধু প্রাচীন ওড়িয়া কাব্য বলিয়াই নয়, 'চণ্ডী-পুরাণে' বর্ণিত বিষয়ের অভিনবত্বের জন্যও কাব্যখানির কৌতূহলী পাঠকের নিকটে একটি বিশেষ মূল্য আছে।

চণ্ডী-কাহিনীর ভিতরে কবিকল্পনা ও লৌকিক কাহিনীর মিশ্রণ যে কতখানি ঘটিতে পারে তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন ওড়িয়া কবি সারলা দাসের রচিত 'চণ্ডী-পুরাণ' কাব্য। সারলা দাস হইলেন সারলা চণ্ডীর দাস। 'সারলা' 'সারদা' বা 'শারদা' শব্দ হইতে জাত; চণ্ডী-পুরাণে দেবীর নাম হিসাবে 'সারলা' এবং 'শারলা' দুইটি বানানই পাওয়া যায়, কবির নামের বানানও 'সারলা দাস' এবং 'শারলা দাস' উভয় রূপেই পাওয়া যায়। বাঙলা মঙ্গলকাব্যের কবিগণের ন্যায় এই কবিও স্বপ্নে দেবীর নিকট হইতে কাব্য-রচনার নির্দেশ পাইয়াছিলেন এবং 'নিশিরে প্রসন্ন তাই যাহা যে কহই। অরুণ প্রকাশে মুহিঁ তা সবু লেখই॥' সারলা দাস নিজেকে বার বার শূদ্রমুণি বলিয়াছেন, এবং বার বার বলিয়াছেন, তিনি অপণ্ডিত নিরক্ষর। বস্তুতঃ তাঁহার রচিত 'চণ্ডী-পুরাণ' পড়িলে মনে হয়, মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর সহিত তাঁহার কোনও প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না; লোকমুখে তিনি দেবী-কর্তৃক অসুর নিধনের যে সব কাহিনী শুনিয়াছেন তাহাকে পৌরাণিক এবং স্থানীয় লৌকিক নানা কাহিনীর সহিত যুক্ত করিয়া তিনি একটা রূপ দান করিয়াছেন।

গ্রন্থের প্রারম্ভেই দেখিতে পাই, সর্পভয়ে ভীত পরীক্ষিৎ রাজাই (পরীক্ষ রাজা) এই কাহিনীর বক্তা, ব্যাসসুত শুকদেব মুনিই এই সর্বাপদ-নাশিনী কাহিনীর বক্তা। এই কাহিনীর মধ্যে প্রথমেই লক্ষ্য করিতে পারি যে, যোগনিদ্রায় নিমগ্ন নারায়ণের শক্তি-স্বরূপা দেবী হইলেন 'বাক্যদেবী' বা সরস্বতী। নারায়ণ যোগবলে 'অনাদি মাহেশ্বরী বাক্যদেবীর কোলে' শুইয়াছিলেন; অত্যন্ত সুন্দর সেই ধবলাঙ্গী বাক্য-দেবীকে দেখিয়া মধুকৈটভ দুই দৈত্য শৃঙ্গার আকাঙ্ক্ষায় দেবীর প্রতি ধাবিত হইল। সরস্বতী দেবী বিষ্ণুর শরণ লইলে বিষ্ণু জাগ্রত হইয়া অসুরদ্বয় নিধন করিলেন। মহিষাসুর-নিধনের জন্যও দেবগণ 'বাক্যদেবী'রই শরণ গ্রহণ করিয়াছিল এবং প্রার্থনা করিয়াছিল—'প্রভুঙ্কর যোগনিদ্রা ভাঙ্গ আগে মাতা'। তখন দেবী তাঁহার বীণা বাজাইয়া নারায়ণের নিদ্রা ভাঙাইলেন :

অজপা লয় কারণ তানমান মেলা।
সপতস্বরেরে বীণা গুণিল অবলা॥

শেষে অবশ্য দেখি ক্রুদ্ধ দেবতাগণের মুখজাত অনল বিগ্রহীভূত হইয়াই দেবীরূপ ধারণ করিয়াছিল—তিনিই চণ্ডিকা। কিন্তু এই চণ্ডিকাও যখন রণোন্মত্তা হইয়া অসুরের প্রতি ধাবিতা হইলেন তখনও 'ধবল কামাক্ষী সে যে কর্পূর-বরণা'।

উড়িষ্যার কোনও কোনও অঞ্চলে সরস্বতী দেবীরই মহা-দেবীত্বের কোনও স্থানীয় প্রবাদ-কিংবদন্তী অবলম্বন করিয়া এই 'বাক্যদেবী'র কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে মনে হয়। প্রাচীন সরস্বতী দেবীও স্থানে স্থানে সিংহবাহনা। বাগ্‌দেবীর সিংহরূপ কাহিনী বৈদিক সাহিত্যেই প্রসিদ্ধ। এই বৈদিক কাহিনীর পরিণতিতেই পরবর্তীকালের মহাদেবী 'সিংহ-বাহনা' রূপ ধারণ করিয়াছেন বলিয়া একটি মত পণ্ডিতমহলে প্রচলিত আছে। পুরাণ-তন্ত্রাদিতে সরস্বতী ও দুর্গা-চণ্ডীর ঐক্য বহুধাবর্ণিত দেখা যায়।

সারলা দাসের 'চণ্ডী-পুরাণ'-বর্ণিত দেবীকর্তৃক অসুর-নিধনের কেন্দ্রে রহিয়াছে মহিষাসুর—শুম্ভ নিশুম্ভ, চণ্ড-মুণ্ড, রক্তবীজ (এখানে রক্তবীর্য) প্রভৃতি সব অসুরই মহিষাসুরের

সহিত যুক্ত। মহিষাসুরই রত্নগিরিতে অবস্থিতা দেবীর রূপ দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছিল। এই মহিষাসুরের উৎপত্তির দীর্ঘ লৌকিক কাহিনীর বর্ণনা রহিয়াছে। অসুররাজ কপিলা-সিংহের যুবতী স্ত্রী অসুররাজের শৃঙ্গারভয়ে পলাইয়া সিংহল দ্বীপে গিয়াছিল। কিন্তু ভাগ্যবিড়ম্বনায় সেখানে যমরাজের বাহন মহিষ তাহাকে একাকী দেখিতে পাইয়া কামোন্মত্ত হইয়া তাহার সহিত 'শৃঙ্গার গুঞ্জিল'। তখন মহিষবীর্যে অসুররাণী 'নিরখী'র গর্ভে একটি পুত্র উৎপন্ন হইল, তাহার মানুষের দেহ এবং অসুরের মুণ্ড ('মহিষের মুণ্ড গোটি শরীর মনুষ্য')। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে যে মহিষাসুরের প্রসিদ্ধি তাহার মহিষের দেহ—মানুষের মুণ্ড; কিন্তু দক্ষিণ ভারতের বহুস্থলে প্রচলিত মহিষাসুরের মূর্তি হইল নরদেহে মহিষ মূর্তি; মহাবলী-পুরম্-এর এই জাতীয় মহিষাসুরমূর্তি প্রসিদ্ধ। আমাদের দেশে প্রচলিত গজানন, হয়গ্রীব, নৃসিংহ, বারাহী প্রভৃতির মূর্তি কল্পনা দক্ষিণ দেশে প্রচলিত এই মহিষাসুর মূর্তি-কল্পনারই পরিপোষক। মহিষমুণ্ডধারী একটি অসুরের প্রাথমিক কল্পনা হইতেই কি পরবর্তীকালে অসুরের মহিষ-মূর্তি ধারণের উপাখ্যান পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে?

যাহা হোক, অসুররাজ কপিলসিংহ ভার্যাকে খুঁজিতে খুঁজিতে সিংহলদ্বীপে গিয়া এই মহিষাসুর পুত্রসহ ভার্যার সন্ধান পাইল। অসুররাজ পুত্রকে ত্যাগ করিলেন না, তাহাকে পালন করিয়া দুর্ধর্ষ অস্ত্রধারী করিয়া তুলিল। এই মহিষাসুর দীর্ঘকাল নিরাহারী হইয়া ব্রহ্মার বরলাভের জন্য তপস্যা করিয়াছিল এবং শেষ পর্যন্ত এই বরলাভ করিয়াছিল, কোনও পুরুষের হস্তে তাহার নিধন হইবে না। নারীর হস্তে নিহত হইবার শঙ্কা তাহার চিত্তে তখন জাগেই নাই।

সারলা দাসের 'চণ্ডী-পুরাণে' সকল অসুরেরই দীর্ঘ বংশ-তালিকা পাওয়া যায়। তাহাদের উৎপত্তি—বৃদ্ধি—এমনকি বিবাহাদিরও বিস্তৃত বর্ণনা (স্থান, মাস, পক্ষ, বার, তিথি, নক্ষত্র প্রভৃতি সব সহ) পাওয়া যায়। অসুরকন্যা কান্তি-মালার স্বয়ংবর লইয়া অসুরগণের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের দীর্ঘ বর্ণনা পাওয়া যায়। গ্রন্থখানি যুদ্ধের বর্ণনায় পূর্ণ এবং সব যুদ্ধবর্ণনাই অত্যন্ত লৌকিক। এই গ্রন্থে দেখিতে পাই, অসুরের অত্যাচারে পীড়িতা হইয়া শুধু দেবগণই বার বার দেবীর শরণ গ্রহণ করেন নাই, অসুরভার সহনে অসমর্থা পৃথিবীও বহুবার দীনা রূপ গ্রহণ করিয়া দেবীর শরণ গ্রহণ করিয়াছিল। দেবী অসুরের নিকটে যে তাঁহার শক্তি-রূপিণীত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাকে ঠিক 'চণ্ডী' গ্রন্থের প্রতিধ্বনি বলিতে পারি না, অনেকটা লৌকিক। অসুরের প্রতি দেবী বলিতেছেন:

আরে আহ্মে জাতকালে মাতা রূপ হেউঁ।
যুবাকালে ভার্য্যা রূপে রতিরঙ্গ দেউঁ॥
অন্তকালে হেউঁ পুণ কালিকা মুরতি।
দহন করু সকল গেলই দহতি॥
আদি অন্ত মধ্য আহ্মমানঙ্কর নাহিঁ।
সমস্ত করু আহ্মকু কেহ ন জাণই॥
জন্মকালে তুহ্মঙ্ক করাউঁ উতপন্ন।
অন্তকালে সমস্তঙ্কু করিবু ভক্ষণ॥
অজ্ঞান মূর্খপণে ন জাণ মন্দ বাই।
আহ্মে যে পরম যোগিনী আদি মহামায়ী॥১

যুদ্ধ-প্রসঙ্গে দেবীর সহচারিনী রূপে বহু দেবী, ডাকিনী-যোগিনী প্রভৃতির উল্লেখ পাই; এই তালিকায় সারলা দাস উড়িষ্যা অঞ্চলে তৎকালে প্রচলিত দেবী-উপদেবীগণের নাম আর প্রায় বাকী রাখেন নাই। দুর্গাদেবী নিজেই কেন কালিকারূপ ধারণ করিয়াছিলেন এ বিষয়ে কবি অত্যন্ত স্থূল লৌকিক কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। দুর্গাদেবী যখন কোনও প্রকারেই মহিষাসুরকে বধ করিতে পারিতেছিলেন না তখন তাঁহার এক সহচারিণী তাঁহাকে উপদেশ দিলেন:

এ বেশ ছাড়ি তু বিবসন্ রূপ ধর।
মহিমা বশ হেউঁ ভব দেখি তোহর॥

দেবী তাই 'বিবসনা হইলে কেশ বাস মুকুল'। বিবসনা দেবীকে দেখিতে পাইয়া অসুর বিমোহিত হইল—দুর্বল মুহূর্তে দেবী তাঁহাকে হত্যা করিলেন।

সারলা দাসের এই 'চণ্ডী-পুরাণে'র প্রসঙ্গে তাঁহার রচিত আর একখানি কাব্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে, ইহা হইল 'বিলঙ্কা-রামায়ণ'। এই বিলঙ্কা-রামায়ণে কবি সীতাকেই রাক্ষসনাশিনী ভয়ঙ্করী দেবীরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন, লক্ষশিরা রাবণ তাঁহা কর্তৃকই বিনিহত হইয়াছিল।

সাহিত্য হিসাবে কবি সারলা দাসের সর্বপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইল তাঁহার রচিত মহাভারত। এই মহাভারত রচনা-ব্যাপারেও কবি বলিয়াছেন যে, সারলা দেবীর আজ্ঞায় এবং প্রসাদেই এই গ্রন্থ রচনা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে।

শারলা চণ্ডী নাম অটই যেই দেবী।
তাহার দাস মুঁ যে সারলা দাস কবি॥
প্রসঙ্গে আজ্ঞা মোতে দেলে সে শাকম্ভরী।
লভ তু যশ মহাভারত গ্রন্থ করি॥
শুনিণ বুধজনে ন ধর আনমন।
মুহে পণ্ডিত মুঁহে স্বভাবে মূর্খজন॥২

১। চিন্তামণি প্রহরাজ পরিশর্মা দ্বারা প্রকাশিত, কটক।
২। ওড়িয়া সাহিত্য-পরিচয়, ১ম খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কিন্তু এই সারলা দাসের পরে সমগ্র মধ্যযুগের ওড়িয়া সাহিত্যে আর কোনও উল্লেখযোগ্য শাক্তকবি দেখিতে পাই না। তাহার ঐতিহাসিক কারণও রহিয়াছে। উড়িষ্যায় 'জগন্নাথ'দেবকে অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবধর্ম আস্তে আস্তে এমন জনপ্রিয় হইয়া সমস্ত জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, শাক্তধর্ম আর কোনও জনস্বীকৃতি লাভ করিতে পারে নাই। ষোড়শ শতক হইতে আবার উড়িষ্যায় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবল প্রভাব পড়িল, ফলে বৈষ্ণব ভক্তিধর্মই রাম-কৃষ্ণ-জগন্নাথকে লইয়া নানা শাখাবাহু বিস্তার করিয়া ছড়াইয়া পড়িল। উড়িষ্যায় নাথধর্মের যে একটা প্রবল প্রভাব ছিল তাহাও দেখিতে দেখিতে বৈষ্ণবমতের মধ্যেই রূপান্তরিত হইয়া গেল। সুতরাং ষোড়শ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া পার্থিব সাহিত্য প্রধান ভাবে গড়িয়া উঠিবার পূর্ব পর্যন্ত—অর্থাৎ অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ওড়িয়া সাহিত্যের রামায়ণ-মহাভারত ছাড়া অন্য সাহিত্য হইল মুখ্যভাবে বৈষ্ণব-সাহিত্য। ষোড়শ শতকের কবি জগন্নাথ দাস ভাগবতের অনুবাদের জন্য প্রসিদ্ধ, কিন্তু তিনি 'তুলাভিণা' নামে হর-পার্বতী সংবাদের একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

'তুলাভিণা' শব্দের অর্থ তুলা পেঁজা; তুলা যেমন পিঁজিয়া পিঁজিয়া ভিতরকার সমস্ত ময়লা ও জট ছাড়ানো হয়, এখানেও তেমনই সৃষ্টিবিষয়ক সকল তত্ত্বকে তুলা-পেঁজার ন্যায় পিঁজিয়া এ সম্বন্ধে সকল জট ও সংশয় দূর করিবার চেষ্টা হইয়াছে (তুলনীয় চর্যাপদ, তুলা ধুনি ধুনি আঁসুরে আঁসু ইত্যাদি)। এখানে প্রশ্নকর্তা পার্বতী, উত্তরে সব তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন ঈশ্বর মহাদেব। ভঙ্গিটি হইল তন্ত্র ও যোগ-গ্রন্থাদির প্রসিদ্ধ ভঙ্গি, সেসব স্থানেও পার্বতী জিজ্ঞাসু, মহাদেব তত্ত্বব্যাখ্যাকরণ। বৌদ্ধতন্ত্রগুলিতেও এই রীতি, ভগবতী প্রজ্ঞার জিজ্ঞাসা—ভগবান্ বজ্রসত্ত্ব বা বজ্রধরের মীমাংসা। এখানে আরম্ভেই দেখি :

পার্বতী বসি একদিনে। কহন্তি বসি শিব-সন্নিধানে ॥
হে প্রভু করুণা-সাগর। কেমন্তে হইলা সংসার ॥
তাহার তত্ত্ব মোহে কহ। যেণে খণ্ডিব ভব-মোহ ॥১

উত্তরে মহাদেব বলিলেন :

কহিবা শুন গো পার্বতী। মহাশূন্যরু হেলা জ্যোতি ॥
জ্যোতিরু স্থূলরূপ হেলা। স্থূলরু বিন্দু প্রকাশিলা ॥
বিন্দুরু অর্ধমাত্রা জাত। তাতহুঁ ওঁকার সম্ভূত ॥
ওঁকার ব্রহ্মরু জগত। শুন পার্বতী দেই চিত্ত ॥
শুনি পার্বতী তোষ হেলে। ঈশ্বর-চরণে পড়িলে ॥

১। ওড়িয়া-সাহিত্য-পরিচয়, ১ম খণ্ড, কলিকাতা। বিশ্ববিদ্যালয়

মহাশূন্য হইতে হইল জ্যোতি, জ্যোতি হইতেই হইল স্থূলরূপ স্থূল হইতে বিন্দু, বিন্দু হইতে অর্ধমাত্রা, তাহার পরে ওঁকার, ওঁকার-ব্রহ্ম হইতেই জগৎ।

ইহাতে আদিশক্তি পার্বতীর মনের সংশয় ঘুচিল না, ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য তিনি বিশ্বনাথের নিকট বিনীত প্রার্থনা জানাইলেন। বিশ্বনাথ বলিলেন :

শুন মোহর প্রিয়তমা। তোতে কহিবা তুলাভিণা ॥
আনকু ন কহন্তি মুহিঁ। তু মোর পঞ্চপ্রাণ সহি ॥
অণাকার যে জ্যোতিরূপ। সেটীরে নাহিঁ রেখরূপ ॥
ধূম্রবর্ণর প্রায়ে দিশে। অন্ধকারটি সে প্রকাশে ॥
ব্রহ্মাণ্ড অন্ধকার হোই। জ্যোতিরূপরে সংহরই ॥

সেখান হইতেই জন্মিল ওঁকার, ওঁকার হইতেই জগৎ। অর্থাৎ অশব্দব্রহ্ম হইতে ওঁকাররূপ সিসৃক্ষা-স্পন্দনাত্মক শব্দ-ব্রহ্মের উৎপত্তি—তাহা হইতেই জগতের উৎপত্তি। পার্বতীর পুনরায় প্রশ্নের উত্তরে শিব এই ওঁকার উৎপত্তির আরও বর্ণনা দিলেন। এই ওঁকার হইতে আবার 'ক্লী' বীজ জাত হইল, 'ক্লী' হইতে 'শ্লী', 'শ্লী' হইতে 'হ্লী' জাত হইল। আবার ক্লী হইতে কৃষ্ণ, শ্লী হইতে রাম, হ্লী হইতে হর জাত হইল। ইহারাই, সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণ। স্ত্রী-পুরুষতত্ত্বের আলোচনায় বলা হইয়াছে :

স্ত্রীরী পুরুষ এবে শুন। কহিবা তোতে বুঝাইন ॥
ক্লীয়টি পুরুষ বোলাই। শ্লীয়বীজটি রাধা হোই ॥
হ্লীয় বীজ যে সব জান। ষড় অক্ষর এবে শুন ॥
কৃ অক্ষর গোটি পুরুষ। ঋটি যে স্ত্রীরীক সদৃশ ॥
রা অক্ষর স্ত্রীরী কহি। ম অক্ষর পুরুষ বোলাই ॥
হুটি যে হোইলা অস্থির। রে অক্ষর যে স্ত্রীরী সার ॥
ইত্যাদি।

কিন্তু এই তুলাভিণা ব্যতীত সমস্ত মধ্যযুগে বাঙলা দেশে তখন বহুসংখ্যক মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, কালিকা-মঙ্গলাদি মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছে—তখন দেবীর কোনও রূপকে অবলম্বন করিয়াই ওড়িয়া সাহিত্যে আর কোনও কাব্য-কবিতা গড়িয়া ওঠে নাই। তবে একটি তথ্য এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। মধ্যযুগের ওড়িয়া সাহিত্য মুখ্যতঃ বৈষ্ণব-সাহিত্য হইলেও মধ্যযুগের বাঙলা শাক্ত মঙ্গল-কাব্যগুলির সহিত এক বিষয়ে আমরা ওড়িয়া সাহিত্যের একটা বিশেষ মিল দেখিতে পাই। বাঙলা মঙ্গল-কাব্যগুলিতে, বিশেষ করিয়া চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল এবং কালিকা-মঙ্গলে দেখিতে পাই নায়ক বা নায়িকা যখনই কোনও মহাবিপদে পতিত হইয়াছে তখনই দেবীর একটি

'চৌতিশা' স্তব করিয়াছেন। ক-কারাদিক্রমে বাঙলা ব্যঞ্জন বর্ণমালাকে চৌত্রিশটি বলিয়া ধরা হয়; ক-কারাদিক্রমে শব্দমালার যোজনাতেই এই স্তুতি সাধিত হয় বলিয়াই এই স্তুতিকে 'চৌতিশা' বলা হয়। ওড়িয়া সাহিত্যের প্রথমাবধিই এই 'চৌতিশা' কাব্যশৈলীর একটা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করি। বাঙলা সাহিত্যের চৌতিশা প্রায় সবই শক্তি দেবীকে অবলম্বন করিয়া (বৈষ্ণবও সামান্য কিছু কিছু আছে)। ওড়িয়া সাহিত্যের মধ্য যুগের চৌতিশা দেবীকে অবলম্বন করিয়া নহে—বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার—বিশেষ করিয়া রাম ও কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া, কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়াই সর্বাপেক্ষা বেশী। কিন্তু ওড়িয়া সাহিত্যের এই চৌতিশার মধ্যে আদি চৌতিশা নামে প্রসিদ্ধ 'বচ্ছাদাস' বা বৎসদাস (?) রচিত 'কলসা চৌতিশ'; ইহা উদ্ভিন্নযৌবনা উমার সহিত বুড়া বর শিবের বিবাহ লইয়া রচিত। এই 'বচ্ছাদাস' কে বা কখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এ বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা যায় না; তবে 'কলসা'র উল্লেখ সারলা দাসের মহাভারতের একটি পদে পাওয়া যায় বলিয়া অর্তবল্লভ মহান্তি এম-এ মহাশয় বচ্ছাদাসের এই 'কলসা চৌত্রিশা'কে চতুর্দশ শতকের রচনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কলসা' রাগে গীত বলিয়া এই চৌতিশা 'কলসা চৌতিশা' নামে খ্যাত। প্রারম্ভেই দেখিতে পাই:

> কহন্তি কামিনী শুন হেমন্ত ঢুলনি।
> কাহুঁ বরে বরিলে তুম্ভর পিতামণি॥
> কুল মূল গোত্রআদি নাহি জান তার।
> কনক বেদীরে বুঢ়া বসিছি মধ্যর॥
> খুং খুং খাস সাহাসেন পেলু অছি ধই।
> খর নিশ্বাস বুঢ়ার মাথ লাগে ভুইঁ।
> খণ্ডিআ যোগির সঙ্গে নাহি যান তার।
> খণ্ডিআ বলদ বুঢ়া বান্ধিছি পাথর॥

অতি প্রগণ্ডা কামিনীটি শিবের শুধু বৃদ্ধ রূপ নয়—এমন একটি জরাজীর্ণ জুগুপ্সিত রূপের বর্ণনা করিল যে, মহাদেবের এতখানি জুগুপ্সিত রূপের বর্ণনা আর বড় একটা পাওয়া যায় না। ভাঙামুখে ফোক্‌লা দাঁত, কোটরাগত ময়লাভরা চোখ, মুখ হইতে লালা পড়ে, মাথায় রুক্ষ জটা,কানে খাটো, গায়ে ছাইমাখা, সর্পের আভরণ,—এই বরের সঙ্গে বিবাহ লেখা আছে গৌরীর কপালে! এ যে একেবারে:

> ঝুলি হোই ঝিম্ফি হোই পড়ুছি ঢুলাই।
> ঝিঅ কি নাতুনী প্রায়ে দিশিবু গো তুহি॥

যে রকম ঝুলিয়া ঝিমাইয়া ঢলিয়া পড়িতেছে তাহাতে উমাকে ত ইহার পাশে দেখাইবে মেয়ে কি নাতনীর মত। রাত্রিকালে এরূপ দেখিলে ত ভয়ে প্রাণই উড়িয়া যাইত। কোন্ ঠকের পাল্লায় পড়িয়াছেন হেমন্তরাজ (হিমালয়)—সেই হেতু সর্বনাশ হইল 'হেমন্ত ঢুলণি'র। তপস্যা করিয়া লাভ হইল এই দিন-ভিখারী যোগী। আড়ালের ফাঁক হইতে বুড়া বর দেখিল মায়ে-ঝিয়ে; মূর্ছিত হইয়া পড়িল উমা; দাসীরা আসিয়া ধরিয়া তুলিল। হরহর বচনে উমার মা বলিল, 'মন স্থির কর মা, অচেতন হইও না, এই যৌবনে কেন জীবন দিবে?' উত্তরে উমা স্পষ্ট বলিয়া দিল:

> ছুইনি করি কহুছি শুন মোর মায়ে।
> দন্তে তিরিণ ধরিণ পলগই পায়ে।
> দরিদ্র হীন বুঢ়াকু যেবে মোতে দেবু।
> ছুই নয়নরে মোর মরণ দেখিবু॥

গোলমাল শুনিয়া গিরিরাজ নিজে আসিয়া বলিলেন, 'ধর্ম-পুণ্যকালে কম্পা করুছ রোদন।' রুষিয়া গিরিরাণী বলিলেন, নিলাজ বুড়াকে করিয়াছ আমার সুন্দরী কন্যার বর! মায়ে-ঝিয়ে দুই জনে একসঙ্গে বিষ খাইয়া মরিব। কথা শুনিয়া গিরিরাজ গেলেন চটিয়া, না জানিয়া-শুনিয়া যত গোলমাল। শিবের মহিমা কেহ জান?

> বিচার ন কর মাএ ঝিএ ছহেঁ তুম্ভে।
> বিকল মনকু ছাড় কহুঅছু আম্ভে॥
> ব্রহ্মা বিষ্ণু দেবতাএ ছন্তি তাঙ্কু বেঢ়ি।
> বড় ভাগ্যবন্ত গৌরী পুণ্যে অছি বঢ়ি॥
> ভাল পটে লেখন যা করিছি বিধাতা।
> ভল ভাগ্যবন্ত গৌরী আম্ভর দুহিতা॥

তখন লাগিয়া গেল বিবাহের যত হুলাহুলি শঙ্খধ্বনি। একটি একটি করিয়া মহানন্দে পালিত হইল যত আচার-অনুষ্ঠান। সজ্জিত করা হইল গৌরীকে বিবিধ রত্নে, বস্ত্রে, অনুলেপনে, তাহার পর 'বরকু সে দশজন তোলি বসাইলে'; কিন্তু হুড়েভিড়ে বুড়া বর একেবারে 'খাসু খাসু গলা মূর্ছা' —কাশিতে কাশিতে মূর্ছাই গেল। যাহা হোক, শেষ পর্যন্ত বিবাহ হইয়া গেল, দেবতারা যে-যাহার বাড়ী চলিয়া গেলেন, সন্তুষ্ট হইয়া নারীগণ জুয়াখেলা আরম্ভ করিলেন, তাহার পরে মধুশয্যা। তখন কিন্তু 'শোভা পাউছন্তি দুহেঁ রতি-কামদেব'।

> হেইলে সন্তোষ যে সকল লোক দেখি।
> হাস্য করুছন্তি সহী সজাতুণী দেখি॥
> সকলে চউটি সারি কাহখেলি গলে।
> ছ সাত অষ্টমঙ্গলা উচ্ছব শাখলে॥

ক্ষিতিপতি ঠাকুর সে কপিলা সে স্থিতি।
ক্ষুদ্রবুদ্ধি বচ্ছাদাস কলসা পড়ন্তি ॥১

হর-গৌরীকে লইয়া এই জাতীয় কিছু কিছু কবিতা ওড়িয়া লোক-সাহিত্যের মধ্যেও পাওয়া যায়। ডক্টর কুঞ্জবিহারী দাস-সম্পাদিত ওড়িষ্যার 'পল্লীগীতি সঞ্চয়ন' প্রথম ভাগে গ্রাম্য কৃষকরূপে হর পার্বতীর একটি চিত্র দেখিতে পাই। শিব মাঠে চাষ করিতে গিয়াছেন, পার্বতীর কথা ছিল অতি সকাল সকাল শিবের জন্য মাঠে খাবার লইয়া যাওয়া। মাঠে খাবার লইয়া যাইতে পার্বতীর একটু দেরী হইয়া গিয়াছে, তাহাতে শিবঠাকুরের একটু মেজাজ চড়িয়া গিয়াছে, ইহা লইয়াই ঝগড়াঝাঁটি:

রাত্র থাউঁ থাউঁ উঠিলে পার্বতী।
যমুনা নদীরে স্নাহান করন্তি ॥
সিয়ালি পত্তর পঞ্চগোটি দনা।
আম্ব-নিম্ব করি বাঢ়িলে ঘোটনা ॥
পাট পিন্ধি পাট উপুরাণ ঢেলে।
চন্দ্রাবলী পাট চিমুলা বোঢ়িলে ॥
ঘোটনা ধরি পার্বতী বউল মোলে টিয়া।
তা দেখি ঈশ্বর হল কলে টিয়া ॥
"কিল ঘোটনা উছুর।"
"জান না কি প্রভু পিলাঙ্ক জঞ্জাল?"
পদে হেউ অধে লাগিলা মহা গোল।
ঈশ্বর ধইলে পার্বতীঙ্ক বাল ॥
ছিড়ি জিব নথে কি চউঁরী।
দুসুরি চিনা মাল যে ॥

পার্বতী কাজে কিছু অবহেলা করেন নাই, রাত্র থাকিতে থাকিতেই উঠিয়া গিয়া যমুনা নদীতে স্নান করিয়া আসিয়াছেন। সিয়ালি-পাতা দিয়া পাঁচটি 'দনা' (ঠোঙ) তৈয়ারি করিয়া নিলেন—তাহাতে সাজাইয়া লইলেন আম,নিমের সব খাবার। একখানা শাড়ী পরিলেন, একখানা উত্তরীয়রূপে জড়াইয়া লইলেন—আর একখানা দিয়া মাথার 'বিড়া' করিয়া লইলেন। খাবার লইয়া গিয়া পার্বতী একটি বকুলগাছের নীচে দাঁড়াইলেন, পার্বতীকে দেখিয়া শিবঠাকুরও তাঁহার হাল থামাইলেন। পার্বতী সাধ্যমত তাড়াতাড়ি করিলেও সব জোগাড় যন্ত্র করিয়া বাহির হইতে একটু দেরী হইয়া গিয়াছে, শিব চটিয়া গিয়া বলিলেন,—'কি গো, খাবার আনিতে এত দেরী কেন?' সব মাতারাই এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণভাবে যে অছিলা দিয়া থাকেন মা পার্বতীও উপস্থিতমতে তাহাই করিলেন, তিনি বলিলেন,—'জান না কি প্রভু বাচ্ছাদের জঞ্জাল?' কিন্তু ক্ষুধায় ক্রোধার্ত শিব কি আর ঐ কথাতেই মানেন? এক-আধ কথাতেই মহা গোল লাগিয়া গেল,—শিব খপ করিয়া ধরিলেন পার্বতীর চুল। খোঁপার ফিতা ছিঁড়িবার উপক্রম—'দুসরি (দু-ফেরতা) চিনা মালা'ও ছিঁড়িবার উপক্রম! কৃষক-কৃষাণীর একটি নিখুঁত বাস্তব ছবি!

ডাঃ কুঞ্জবিহারী দাস-সঙ্কলিত 'পল্লীগীতি সঞ্চয়নে'র দ্বিতীয় ভাগে আর একটি হর-গৌরী উপাখ্যান দেখিতে পাই ওড়িষ্যাবাসীদের আর একটি সাধারণ সমস্যা লইয়া। সমুদ্রের কূলেই অনেক পল্লী, সমুদ্রের তীরের বালি বাতাসে উড়িয়া আসে—কিছুদিনের মধ্যে বাড়ির ঘরগুলি 'বালু'তে 'পোতা' হইয়া যাইবার উপক্রম হয়। গৃহকর্তা যদি এ বিষয়ে সর্বদাই অবহিত হইয়া বালি সরাইয়া গৃহ রক্ষা করেন তবেই উপায়—নতুবা বিষম বিপদ। শিব ত ভোলানাথ পুরুষ—বাড়ীঘরের কোনও খোঁজখবরই রাখেন না, এদিকে বালু পড়িয়া পড়িয়া ঘরের ত 'পোতা' হইবার অবস্থা।

দিনকু দিন বালি অগোচর।
দিনকু দিন বড়ই অপার ॥
পাচেরী ডেই পাট অগণারে।
পাদ পাদ করি পুরে গম্ভীরারে ॥
খরাবেলে বালি পিটই ঝাঞ্জি।
চালুথিলে গোড় পড়ই ভাজি ॥

দুপুর বেলায় ত বালুর ঝড় বয়, পা পাতিয়া চলে কাহার সাধ্য! বাড়ির লোকজনও সব পার্বতীর নিকট অভিযোগ জানাইতে লাগিল, নিজেরও দুর্ভোগের নাই শেষ। তখন ভাবিয়া-চিন্তিয়া মা খেপিয়া গেলেন, মুখ নীচু করিয়া রুষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন, আর দাসীদের বলিয়া দিলেন—'আজ আর আমার ঘরে খাবার হইবে না।'

এতেক বিচারি দেবী পার্বতী।
রুষি বসিঅছি বদন পোতি ॥
দাসীঙ্কু বইলে হর ঘরণী।
আজি মো পুরে নোহিব ঘটনি ॥

ইতিমধ্যে শিব বাড়ি আসিয়া উপস্থিত—কাঁধায় কৌপীন, বিভূতি ভূষণ, হাতের অমৃতের হাঁড়ি, বৃষভে চড়িয়া দেব ত্রিলোচন ধীরেসুস্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌরী আগাইয়া গিয়া কোন অভ্যর্থনা ত করিলেনই না, বরঞ্চ অন্যদিকে কোপ করিয়া ফিরিয়া বসিয়া রহিলেন।

কোপে গউরা বসিছন্তি হটি।
লোকনাথঙ্কু ন অইলে পাছোটি ॥

ত্রিলোচন বুঝিলেন, কিছু একটা ঘটিয়াছে এবং গৌরী বিষম ক্রোধ করিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে স্বামীদের করণীয় কি শিবের তাহা জানা আছে, তিনি নানাপ্রকার চাটুবাক্যে

১ পদ্ম পদ্মাদর্শ, শ্রীআর্তবল্লভ মোহান্তি কর্তৃক সম্পাদিত; প্রাচী গ্রন্থমালা।

গৌরীর ক্রোধবহ্নিতে শীতল জল ঢালিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শিব বলিলেন :

কি লো গউরি তোর বিরস মন।
কি অবা ন দেখি ধন বসন॥
জগত্রতারিণী সৃষ্টি করতা।
মৈষমর্দ্দিনী গিরি-দুহিতা॥
অসুর সংহারি রখিছু সৃষ্টি।
সবু দেবতা কলে পুষ্পবৃষ্টি॥
সবু দেবতাই চরণে তোর।
বর দেইগলে অমরপুর॥
সুরতি বজাছু সুন্দরী করু।
সকল সঙ্কটু উদ্ধরি ধরু।
অন্ধ ডাগিলে দেউ চক্ষুদান।
অপুত্রি লোককু দেউ নন্দন॥
দরিদ্র লোককু কুবের করু।
রখিলে ধ্রুব গছ করু দারু॥
কাহিঁ কি বসিছু মউন হোই।
তোর বুদ্ধি কি ত উপায় নাহিঁ॥

এইরূপে ত্রিলোচন যখন বহুত চাটুবাক্য বলিলেন তখন গৌরী প্রসন্ন হইলেন ; ঘনশ্বাস ছাড়িয়া বামচক্ষু ডলিয়া মুখ তুলিয়া অভিমানের সুরে অভিযোগ জানাইতে লাগিলেন শিবের কাছে,—মনের কথা সবই তোমার গোচর, তবু কেন এত ছাঁদ? দূরের লোকে কত বেদনা জানায়—তাহাদের নিস্তার কর, কিন্তু ঘরের দিকে ত তুমি একটুও মন দাও না, শুধু রঙ্গ-রস করিয়া দিন কাটাইতেছ। ঘরের কথায় ত তুমি কিছুই লাগ না, কিন্তু বালি পড়িয়া পুরী যে এখন 'পোতা' হইবার উপক্রম তাঁহার খোঁজ রাখ কি? পার্বতী অভিমানে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন :

সবু চঢ়েইর দেখ বরত।
বসা খোজুথান্তি অনবরত॥
বসা ন থাউ সে কেউঁ বেবস্থা।
তুমু লিনা কিছি ন লগে চিন্তা॥

বনের যত পাখী—তাহাদেরও দিনচর্যা দেখ, অনবরত তাহারা বাসা খোঁজে। বাসা থাকিবে না এ কেমন ব্যবস্থা? কিন্তু এসব ব্যাপারে তোমার নাই কোনই চিন্তা।

পার্বতী এইখানেই থামিলেন না, আরও যা দিয়া কথা বলিতে লাগিলেন, ধিক্কার দিতে লাগিলেন নিজের নারী-ভাগ্যকে ; বলিলেন, এমন বর কেন জুটিল আমার কপালে —চিরদিন একাকিনীই সামলাইতে হইল সব! বাকল-বসন পরিয়া ফলমূলাহারে অরণ্যে বসিয়া রাত্রিদিন বরের জন্য তপস্যা করিয়াছিলাম, তাহার ফলই এই ফলিয়াছে!

এতটা আবার শিবের সহ্য হইল না, বলিলেন—আমার ঘরে পড়িয়া তোমার এত চিন্তা ও ক্ষোভ! তবে :

কটাল হেলা গো শ্যাম নৃপতি।
তাহারি কিম্পা নোহিলু যুবতী॥
সর্বাঙ্গে হুঅন্ত রত্নভূষণ।
মোটারে দেবী পাইলু কষ্ট॥
কহিবু যেবে হাতপত্র দেবা।
অন্য বর বাছি হুঅ লো বিভা॥

কোটাল হইয়াছে শ্যাম-নৃপতি, কেন তাহার যুবতী হইলে না? সর্বাঙ্গে রত্নভূষণ থাকিত, আমার কাছে শুধু কষ্ট পাইলে। যদি বল ত হাতপত্র (বিবাহবিচ্ছেদের পত্র) দিব, তখন অন্য বর বাছিয়া বিবাহ করিও।

শুনিয়া দেবী লজ্জিতা হইলেন। মহাদেবও নরম হইয়া বলিলেন, বালি বালি করিয়া চিন্তা করিতেছ, বালির ব্যবস্থা আমি কালই করিব। সকল সেবককে শিব ডাকিয়া আজ্ঞা দিলেন,—দেখ, দেবী পার্বতী বড় কোপ করিয়াছেন, বালির ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমরা :

টোকাই কুন্দাই শিউলি বেতা।
বলি বোহিবাকু যেতু শকতা॥
সিংহ দুয়ারু পোখরী সরি কি।
বালি বোহি যিবা দিন চারি কি॥

"টোকাই কুন্দাই শিউলি বেতা"—যাহাতে যাহাতে করিয়া বালি বহন করা যায় সব লইয়া আসিয়া সিংহদুয়ার হইতে পুকুরের পথ পর্যন্ত দিন চারির মধ্যে সব বালি সরাইতে যাইব। শিবের আজ্ঞা পাইয়া রজনী প্রভাতে স্নান সারিয়া এবং যাহার যাহা কিছু নিত্যকর্ম সব সারিয়া সেবকরা সবাই সবাইকে ডাকাডাকি করিয়া জড় হইল। কড়া লাগিল না কড়ি লাগিল না—দেখিতে দেখিতে সব বালি পরিষ্কার হইয়া গেল। তাহার পরে দেবীর ভোগ লাগিল :

ভোগ পাঅন্তি ঈশ্বর-পার্বতী।
ভোগ সারি করি কলে ভোজন।
ভোজন করি কলে আচমন।
তহুঁ চঢ়াইলে বিড়িয়াপান॥
বিড়িয়াপানকু থট সুপাতী।
হরষ হোইলে দেবী পার্বতী॥
হর-পার্বতীঙ্ক পদে শরণ।
দোষ ক্ষমা কর সৃষ্টি কারণ
গাইলা লোককু বৈকুণ্ঠ বাস।
শুনিলা লোক পাপ হিব নাশ॥

হর-পার্বতীর এই লীলা-শ্রবণে আমাদেরও পাপনাশ না হোক মনের আনন্দ বর্ধিত হোক।

অন্ধ আঁখির কৃষ্ণ কুসুম—

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

থাক্ এ-রজনী
থাক্ যেন মণি-মালার মতন
গাঁথা এ-রতন
কণ্ঠাভরণে গাঁথা থাক্—
স্মৃতির সপ্তনরীর দীপ্ত-মিহির
তিমিরে ডুবে যাক্।
যাইবার যাহা,—পাইবার নহে—
থাকিবার নহে চলে যাক্—
ওরে,—থাকিবার যাহা শুধু থাক্।

ঝিম্ ঝিম্ করে আঁধার রজনী
বেপথু বক্ষে কান পেতে গণি
প্রতি পদ চার ছন্দ তাহার
মর্মে পশিছে শ্রবণপথে,
এসেছে রজনী, তামসী রজনী
প্রেয়সী রজনী মানস রথে।

থাক্ এ-রজনী, যাক্ দিনমণি
শিশিরের মুখে অরুণ বরণী
উষার লোহিত লাজ রঞ্জনী
প্রসাধন করি রেখে যাক্—
যাইবার যাহা, পাইবার নহে—
থাকিবার নহে,—রাখিবার নহে
যক্ষের মত বক্ষেতে বহে
হয় মাটি নয় হবে থাক্।
ওরে,—যাইবার যাহা, থাকিবার নহে
যেতে দে তাহারে চলে যাক্—
যাইবার নহে, থাকিবার যাহা—
নিবিড় বাঁধনে বেঁধে রাখ।

ঘটে যে ঘটনা তাহার রটনা করা সে মিছে
অঘটন-পটীয়সী এ-তামসী সবার পিছে।
মসীপ্রক্ষিত পটভূমিকায়
আলোকের রেখা লেখা দেখা যায়,
দিব্য তামস তামরসখানি ফুটিয়া উঠে—
নহে শতদল, সহস্রদল,
কালিয়দহের পদ্মপুটে।

কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ পলাশ
কৃষ্ণ পরাগ উড়ে রাশেরাশ
ঊর্দ্ধে গগন ভরায় পবন পাপড়ি টুটে
থাক্ এ-রজনী বাঁধা হয়ে থাক্—
যাবজ্জীবন বৃন্ত টুটে—
চির মুহূর্ত গাঁথা হয়ে থাক্
কালিয়দহের মর্মপুটে।

নিশার তিমির প্রান্তে উষার
অগ্নিশিখায় গলিলে তুষার
গিরি কন্দর রন্ধ্র বিদারি
গৈরিক ধারা বয়ে যাক্
(তারে) যায় নাকো রাখা জেনে রাখ।

জড় নিশ্চল পুরাণো পাষাণ
ঘুণ ধরা হাড় হবে খান্-খান্
ভয় নাই নাই—ভয় নাই তবু
ভয় ভাবনায় কেন জবুথবু ?
সিন্ধুর মাঝে লয় হয়ে যাবি
বিন্দুর মত পলকে,—
ঊর্দ্ধে আঁধার,—নীল পারাবার
নিখিল ভূ-লোকে দ্যুলোকে,
(তায়) মিলাবি মিলন-পুলকে।

কি হবে ? তা হবে যা হবার হবে
ফিরিয়া দাঁড়াবি জীবন-আহবে
ঊর্দ্ধ ললাটে বীর গৌরবে
চির নির্ভয় হয়ে থাক্—
(ওরে) ভাঙিবার যাহা—ভাঙিবেই তাহা
নিঃশেষে ভেঙে-চুরে যাক।

পড়িবার যাহা পড়িয়া উঠিবে
জগদ্দলন পাথর টুটিবে
বটের আঁকুরে প্রাণ উঁকি দিবে
চেতনায় চঞ্চল,—
আঁধারে হাতাড়ি বাহু বাড়াইবে
গুঞ্জন রত পাখীরা আসিবে
পথের পথিকে ছায়া পসারিবে
পাখীরে পক্ক ফল।

শাখায় শাখায় শ্যামল পত্র
ঝরাবে ঝঞ্ঝাবাত—
নিদাঘ অনল নিবায়ে বাদল
বরষিবে দিবারাত।
বটের অাঁকুর বেঁচে থাক
পাখী উড়ে যায় উড়ে যাক্
(শুধু) থাকিবার যাহা স্থাণুর মতন
অচলায়তন হত বাক্
(যত) বৃক্ষ পাষাণ পড়ে থাক্।
পাটলিপুত্র—আজি সে কুত্র?
ইন্দ্রপ্রস্থ নাহি থাক—
(শুধু) থাকিবার যাহা ভূ-তলে অতলে
এই পৃথিবীর স্মৃতির নিতলে
ঢাকা থাক।

তবু এ রজনী নহে নশ্বর
নহে 'নস্যাৎ' কাল-কলেবর
তাহার কেশের কালিমার লেশ-
টুকু অবিনশ্বর
(আজি) যে রজনী যায়, বুকে রেখে যায়
তিলক লিখিয়া নভ নীলিমায়
রাতের তারকা দিবসে লুকায়
সুচতুর নিশাচর।

তাই। নৃত্য নূপুর বাজায়ে দু'পায়
আবার সন্ধ্যা যখন ঘনায়
মিট্ মিট্ করে ডাইনী তাকায়
মরে নাকো জেনে রাখ।

(ওরে) সেই রজনীর কাজল পরেছি চক্ষে
(তাই) মৃদু সঞ্চারে নিভৃতে আসি অলক্ষ্যে
নিতি) নিশীথিনী আসি কহে রহস্য মৃদু বাক্,
(শুনি) তার পদচার ধমনী আমার
রক্তে লাগায় সাত পাক্।

থাক্ এ-রজনী
থাক্ যেন মণিমালার মতন
গাঁথা এ-রতন
কণ্ঠাভরণে গাঁথা থাক্—
স্মৃতির সপ্তনরীর দীপ্ত মিহির
তিমিরে ডুবে যাক্।

সেই মোর সাথী, সে মোর প্রেয়সী
অসীম আকাশে মালা গাঁথে বসি
সে-মালা আমারে পরাইবে বালা
সেই পরকালে শুনে রাখ,—
অসহ বিরহে সে সহ-মরণে
মরিবে আমার জেনে রাখ।

(এই) মূঢ় আলোক স্বচ্ছ বাচাল
করি পরিহার যবে মহাকাল
দিব্য তিমির অঞ্জন দিয়ে
জাগাইয়া দিবে চিরকাল
(সে যে) এই রজনীর চোখের কাজল
আমার নয়ন করিবে সজল
অসিত বরণ নিকষ কষিত দু-কূলে
তাহার অাঁচল ঘিরিবে আমায়
দিবসের মোহ সুকূলে।

মুক্তকেশীর চিকুরের মাঝে
মেঘ-ডম্বরে ডম্বরু বাজে
নিবিড় তিমির পরিমণ্ডিত পরিবেষ্টিত ধরা
তিমিরে তিমির ভরা—
কৃষ্ণ কুসুম-সুষমা-সুরভি-রভসে পাগল করা।

যা' কিছু গভীর যা' কিছু গহন
চির রহস্যে তমসে মগন
জীবনের আগে মৃত্যুর পরে—
অবাঙ্ মনস গম্য,
হেথায় মিলায় সকল বর্ণ
বৃথাই মণি-মাণিক্য স্বর্ণ
যেথায় নির্বাণ লভিয়া পরাণ
পায় তমিস্র রম্য,—
সেথা, আলোকের প্রবেশ নিষেধ
প্রবেশিলে নয় ক্ষম্য।

(তাই) আলো যায় যাক্—কালোটুকু থাক্
যাইবার যাহা সব চলে যাক্
যাইবার নহে থাকিবার যাহা
তাই শুধু পড়ে থাক্
(শুধু) অন্ধ অাঁখির কৃষ্ণ কুসুম
এই রজনীটি থাক্।

কালী

শ্রীচিন্তামণি কর

(কার্তিক ১৩৪৫ হইতে পুনর্মুদ্রিত)



বন্দিনী

ফটো ঃ সৌরেন মুন্সী



নির্জনে

ফটো ঃ রমেন বাগচী

লালসন্ধ্যা

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

শ্রীমতী এই উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়া থেকে বেরিয়ে এলেও মন থেকে খানিক পূর্ব্বের ঘটনাগুলিকে বিদায় করতে সক্ষম হ'ল না। বারে বারে তার মনে হতে লাগল যে, কেমন করে সে সূর্য্যদার সঙ্গে এতখানি রূঢ় ব্যবহার করতে পারল। অথচ এই সূর্য্যদাকে সে কত শ্রদ্ধা করত। এ শ্রদ্ধা তিনি এমনি পান নি। কিন্তু মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে তিনি যা অর্জ্জন করেছিলেন, কত স্বল্প সময়ের মধ্যেই তা খুইয়ে বসলেন। বর্ত্তমানের স্খলন অতীতের সব কিছু একেবারে ধুয়ে-মুছে দিল। এতটুকু অনুকম্পা কেউ দেখাতে রাজী নয়। তার নিজের ব্যবহারেই আজ এ কথা আরও স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে।

কিন্তু কেন? কিসের জন্য সূর্য্যদা আজ এই পথে নেমে এলেন? কি এর কারণ? মানুষের জীবনের পটপরিবর্ত্তন ঘটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তাই বলে দেবতা এমন দানবে রূপান্তরিত হবে! শেষ পর্য্যন্ত ভুলুয়া সর্দ্দারের মেয়েকে—শ্রীমতী নিজের মনে কথা কয়ে উঠল, সে কোন অন্যায় করে নি বরং সূর্য্যদাকে প্রশ্রয় দিলেই অন্যায়কে প্রতিপালন করা হ'ত। হীরের আংটিটা ফেরত দিতে পেরে সে খুশীই হয়েছে। আজ ক'দিন ধরেই ওটা একটা দুর্ব্বিসহ বোঝা হয়ে তার মনের উপর চেপে বসেছিল। আজ সে বোঝা নামিয়ে দিতে পেরে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

শ্রীমতী পায় পায় তার শয়ন কক্ষে এসে উপস্থিত হ'ল। মনটা তার বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ঠিক এই মুহূর্ত্তে তার বারে বারে ডাক্তার বাবুর কথা মনে পড়ছে। দিন কয়েক ধরে তিনি এ মুখো হন নি। ইতিমধ্যে দু'দিন টেলিফোন করেও তাঁর সন্ধান পাওয়া যায় নি।

কেষ্ট বলে, এমন মাঝে মাঝে তিনি অদৃশ্য হয়ে যান। ডাক্তার-বাবুর ছানাপোনা কি কম মনে করেছেন বৌদিরাণী? ওদের হাপা পোয়াতেই ডাক্তারবাবু ফকির।

শ্রীমতী বিস্মিতকণ্ঠে বলল, আজ নতুন কথা শোনালে কেষ্ট। এ সব কথা এর আগে কখনও শোনাও নি ত?

কেষ্ট এক মুখ হেসে কৃতার্থকণ্ঠে জানাল, আমরা চাকর-বাকর মানুষ। জিজ্ঞেস না করলে কিছু বলতে নেই। নইলে ডাক্তার বাবুর হাসপাতালের কথা কে না জানে?

শ্রীমতী প্রশ্ন করে, হাসপাতালের সঙ্গে ছানাপোনার সম্বন্ধ কি কেষ্ট?

কেষ্ট হেঁ হেঁ করে খানিক হেসে বলল, আজ্ঞে ওখানে যাঁরা আসেন-যান উনি তাঁদেরকে ছানাপোনা বলেন। ওদের চিকিচ্ছে-পত্তর ডাক্তারবাবু নিজের পয়সায় করেন।

শ্রীমতী পুনরায় জিজ্ঞেস করল, কত বড় হাসপাতাল কেষ্ট?

কেষ্ট জবাব দিল, বড় আর হবে কেমন করে? চিকিচ্ছে করে ত আর পয়সা পান না।

শ্রীমতী বিস্মিতকণ্ঠে বলল, পয়সা পান না মানে!

জিব কেটে কেষ্ট জবাব দিল, পয়সা নেন না যে—উল্টে দিয়ে আসেন। গরীব ছেলেদের জন্য আবার একটা স্কুল করে দিয়েছেন।

শ্রীমতী হেসে বলল, তোমাদের ডাক্তারবাবুর তা হলে অনেক পয়সা আছে বল।

কেষ্ট বলল, আজ্ঞে তা ত জানি না। তবে ডাক্তারবাবুর দিলটা খুব বড়। আমাদের বাবুও তাঁকে খুব মান্যি করেন।

শ্রীমতী হাসি মুখে বলে, করেন বুঝি? আচ্ছা কেষ্ট, তোমাদের ডাক্তারবাবু থাকেন কোথায়?

কেষ্ট গম্ভীরভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে জবাব দেয়, ঐ এক মস্ত দোষ ডাক্তারবাবুর। তিনি বস্তীতে থাকেন। যত সব পূবে বাংলার খেদান লোকগুলির সঙ্গে। আমাদের বাবু কি এখানে থাকবার জন্য কম খোশামোদ করেছেন! উনি পূবে বাঙলার লোক কিনা। বড্ড গোঁ। সাফ জবাব দিলেন, তোমাদের দালান কোঠায় আমার কাজ নেই।

শ্রীমতী বলল, ওখানেই বুঝি ডাক্তারবাবুর হাসপাতাল আর স্কুল?

নইলে আর কোথায়? কিন্তু বৌদিরাণী, হলে হবে কি বস্তি—বেজায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কেষ্ট মৃদুকণ্ঠে বলল।

শ্রীমতী জিজ্ঞেস করল, এখান থেকে কতদূরে ডাক্তারবাবুর বস্তী-বাড়ী কেষ্ট?

জবাব দিতে গিয়ে মুখ তুলেই কেষ্ট থামল। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে শ্রীমতী দেখল অদূরে নিঃশব্দে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন ডাক্তারবাবু। শ্রীমতীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই তিনি হেসে

বললেন, ডাক্তার বাবুর বস্তীবাড়ীর খোঁজ করছিলে কেন মা? ওসব জায়গা ত তোমাদের জন্যে নয় মা।

কে বলে ওকথা কাকাবাবু। বরং ঐটেই আমার উপযুক্ত স্থান। একটুখানি হেসে শ্রীমতী বলল, কথাটা তা নয়। খোঁজ নিচ্ছিলাম আপনার। আজ তিন চার দিনের মধ্যে একবারও দেখা দিলেন না। ডাক্তার বলে অসুখ বিসুখ হতে পারবে না এমন ত কোন কথা নেই—

শ্রীমতীর কণ্ঠস্বরে খানিক অভিমান ফুটে উঠল। ডাক্তারবাবুর কানেও তা স্পষ্ট ধরা পড়ল। ভালই লাগল তাঁর। তিনি সহাস্যে বললেন, এ বুড়োর জন্য তুমি এত ভাবতে সুরু করেছ মা—এতটা কি সহ্য হবে আমার।

শ্রীমতী কোন জবাব দিল না।

ডাক্তারবাবু পুনরায় বললেন, ভবিষ্যতে ত্রুটি দেখলে সংশোধন করে দিও মা।

শ্রীমতী লজ্জা পেল। মৃদুকণ্ঠে বলল, ও আবার কি কথা কাকাবাবু। ত্রুটি আবার কোথায় হ'ল আপনার, আসলে আমারই ভাল লাগছিল না। তার উপর আমাদের বাগানের মালী-বউয়ের বড্ড অসুখ। মালী এসে কেঁদে পড়ল।

ডাক্তারবাবু সহসা গম্ভীর হয়ে উঠে বললেন, বোকা লোকগুলির কি রেখে ঢেকে চলবার উপায় আছে মা। কিন্তু ভাবছিলাম চাকরিটি শেষ পর্য্যন্ত বজায় রাখতে পারব কিনা? যে কড়া মুনিব।

শ্রীমতী মৃদুকণ্ঠে বলল, এ কথা বলছেন কেন কাকাবাবু!

ডাক্তারবাবু তেমনি গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে বললেন, আজ মালী-বউ, কাল ধোপা-বউ, পরশু ড্রাইভারের শালা, তার পরে দেখা দেবে পাড়াপড়সীর পালা। এত ঝামেলা পোহাতে গিয়ে হয় ত রুটিন-বাঁধা কাজে দেখা দেবে অবহেলা। শেষ পর্য্যন্ত চাকরিটি খোয়াব না ত?

এতক্ষণে শ্রীমতী যেন কিছু আন্দাজ করতে পেরেছে। সে হেসে বলল, খোয়াতে হয় আপনি খোয়াবেন। তার জন্যে আমার অত ভাবনা নেই।

ডাক্তারবাবুও সে হাসিতে যোগ দিলেন। বললেন, তুমি ত আমার খুব হিতাকাঙ্ক্ষী মা!

ঠাট্টার কথা নয় কাকাবাবু। শ্রীমতী বলল, নিতান্ত বিপদে না পড়লে আপনাকে ব্যস্ত করব না। আপনার যে কত কাজ সে কি আমি জানি না মনে করেছেন? তা ছাড়া বহুর কথা চিন্তা করতে গেলে কাজের চেয়ে নিজের মনকেই ক্লেশ দিয়ে বসব। আমাদের আর কতটুকু সাধ্য।

ডাক্তারবাবু উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে বললেন, এটা একটা কথাই নয় শ্রীমা। মানুষই মানুষের কথা ভেবে থাকে। নইলে নিজের কাছেও সময়েতে কৈফিয়ৎ দিতে হয়। কিন্তু সাবধান, নিজেকে ভুল করেও প্রকাশ কর না। বিশেষ করে তোমার দুর্ব্বলতা। তা হলেই ভীড় জমবে। যার প্রয়োজন আছে সেও আসবে, যার নেই সেও ভিড় বাড়াবে। কিন্তু আর না, চল যাই, তোমার মালী-বৌকে একবার দেখে আসি গিয়ে।

শ্রীমতী খুশী হয়ে বলল, তাই বলে ধুলো-পায়ে যাবেন—একটুক্ষণ বসে গেলে হ'ত না?

ডাক্তারবাবু স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, না মা, তা হলে বসেও শান্তি পাব না। যখন বসব তখন বসবার মত করেই বসব।

শ্রীমতী ছেলেমানুষের মত উচ্ছসিত হয়ে উঠল, আপনি বড় ভাল কাকাবাবু।

ডাক্তারবাবু সস্নেহে বললেন, তুমি নিজে ভাল বলেই এ কথা বলতে পেরেছ। আমি ত বরং তোমার মালি বৌকে এড়িয়ে যেতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমিই যেতে দিলে না। নাও এবারে চল।

চলতে চলতে শ্রীমতী বলল, এখন মনে হচ্ছে গরজ আপনারই বেশী, কিন্তু প্রস্তাবটা শুনেই অমন করে উঠলেন কেন?

ডাক্তারবাবু একটু হেসে বললেন, ওটা অভ্যাসের দোষ। মনে যাই থাক না কেন মুখে তার প্রকাশ ঘটালেই আর বাঁচবার কোন উপায় থাকবে না। বড় বড় ডাক্তারেরা তাঁদের ফি-এর জোরে আত্মরক্ষা করেন, আর আমাদের মত অখ্যাতদের করতে হয় মুখের জোরে।

শ্রীমতী শ্রদ্ধা-মিশ্রিত কণ্ঠে বলল, আপনি কিন্তু এদের গোষ্ঠীর কেউ নন কাকাবাবু।

ডাক্তারবাবু প্রাণ খুলে হেসে বললেন, না মা, এটা ঠিক কথা বল নি। নাম চাই, পয়সা চাই, আত্মরক্ষার জন্য রূঢ় কথা বলি, তবুও তুমি এ কথা বলবে? তিনি আর একদফা হেসে উঠলেন।

মালিবৌর সামান্য জ্বর। সর্দ্দি বুকে আছে, কিন্তু তার জন্য ব্যস্ত হবার কিছুই নেই।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ডাক্তারবাবুকে নিয়ে শ্রীমতী পুনরায় তার শয়নকক্ষে ফিরে এল। বলল, আপনার খুব তাড়া নেইত কাকাবাবু।

ডাক্তারবাবু গম্ভীর হয়ে উঠে বললেন, তাড়া থাকলেই কি তুমি আমায় এখন যেতে দেবে?

শ্রীমতী জবাব দিল, আপনার কাজের ক্ষতি করে ধরে রাখব—এই কি আপনি মনে করেন?

ডাক্তারবাবু স্নেহ-কোমলকণ্ঠে কথাটা সংশোধন করে নিয়ে বললেন, উল্টো করে বলা হয়েছে মা। আমার বলা উচিত ছিল যে, কাজের তাড়া আমার যতই থাক একবার এসে যখন পড়েছি তখন অত সহজে কি চলে যেতে পারি?

শ্রীমতী খুশী হয়ে বলল, কথাটা আমার সব সময় মনে থাকবে। বলেই হেঁট হয়ে ডাক্তারবাবুর জুতোর ফিতে খুলতে সুরু করে দিল।

ডাক্তারবাবু বাধা দিলেন না। বরং পরম তৃপ্তির সঙ্গে পা দুখানি এগিয়ে দিলেন।

জুতো জোড়া খুলে বাইরে রেখে এসে শ্রীমতী বলল, আমি

ফিরে না আসা পর্য্যন্ত একটু বিশ্রাম করে নিন। দেরি হবে না আমার। শ্রীমতী দ্রুত পদে ঘর ছেড়ে চলে গেল। এবং প্রায় আধঘণ্টা পরে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ফিরে এসে সলজ্জ-হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে বলল, একটু দেরি হয়ে গেল।

ডাক্তারবাবু সস্নেহে বললেন, তা একটু হয়েছে, কিন্তু তুমি অমন করে নেয়ে উঠলে কেমন করে?

শ্রীমতী মৃদুকণ্ঠে বলল, এ বাড়ীর নিয়ম কানুনের গণ্ডি ডিঙ্গিয়ে গিয়েছিলাম তাই। আপনাকে আমি ঠাকুর চাকরের হাতের জিনিস খাওয়াতে পারব না। উঠুন। বাথ রুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে আসুন।

ডাক্তারবাবু প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন, তা না হয় উঠলাম, কিন্তু আমাকে যে খাওয়াতেই হবে তার কি কথা আছে?

শ্রীমতী ছেলেমানুষের মত বলল, তা কেমন করে হবে? আপনি যে খেতে ভালবাসেন।

ডাক্তারবাবু উৎসাহিত হয়ে উঠে বললেন, বিশেষ করে তোমার হাতের রান্না। এ বুড়োকে তুমি ঠিক চিনেছ মা। এতটুকু ভুল কর নি। বলেই তিনি বাথরুমের দিকে অগ্রসর হয়ে গেলেন।

ফিরে এসে খাবার আয়োজন দেখে ডাক্তারবাবু উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন, আয়োজন দেখছি নিতান্ত কম কর নি তুমি।

শ্রীমতী মিষ্টি করে একটু হাসল, জবাব দিল না। বস্তুতঃ আয়োজন সত্যই কম করে নি শ্রীমতী। এমন কি ডাক্তারবাবুর প্রিয় খাদ্যও দু'একটি ব্যবস্থা করতে সে ভুল করে নি।

ডাক্তারবাবু সহসা একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন, শ্রীমতীর তা দৃষ্টি এড়াল না। এমনি কিছুক্ষণ নীরব থেকে এক সময় তিনি মুখে তুলে তাকালেন। বললেন, মাঝে মাঝে নিজেকে বড় ক্লান্ত মনে হয়। দেহ বলে, আর পারি না। সে বিশ্রাম চায়। কিন্তু মন চোখ রাঙিয়ে কি বলে জান?···

শ্রীমতী সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, না।

ডাক্তারবাবু বলেন, মন বলে ঐটি কর না। কর্ম্মকে বাদ দিলে দেহও টিকবে না—মনও বাঁচবে না। তার চেয়ে কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম নাও। ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। মন সব ছেড়ে-ছুড়ে আমার মায়ের আশ্রয়ে চলে আসতে চায়।

শ্রীমতী উৎসাহিত হয়ে উঠে বলে, তা হলে আমিও বেঁচে যাই কাকাবাবু। পৃথিবীটা বড় আজব স্থান। একজন খোঁজে কাজ—আর একজন খোঁজে বিশ্রাম। আপনার খানিকটা বোঝা আমাকে বইতে দেবেন? এমনি করে শুয়ে-গড়িয়ে সময় আমার আর কাটতে চায় না কাকাবাবু। এমনি করে মানুষ কখনও বাঁচতে পারে কাকাবাবু?

ডাক্তারবাবু বলেন, কাজের অভাব আছে নাকি? কত কাজ তুমি চাও?

শ্রীমতী বলল, আমি অভাবের কথা বলছি না। এখানে কাজের চেয়ে লোক বেশি তাই—

ডাক্তারবাবু হেসে উঠে বললেন, তাদের ঠিকভাবে চালানও একটা মস্তবড় কাজ মা।

শ্রীমতী মৃদুকণ্ঠে বলল, তার জন্যে আবার এক নতুন হাউস-কীপার এসেছেন। এখানের এই অনাবশ্যক ভিড়ের মধ্যে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি কাকাবাবু। নিজেকে বড় অসহায়—বড় বেমানান মনে হচ্ছে। সেই জন্যেই আমি আপনার কাজে সাহায্য করতে চাইছি। আমি কাজ পেলে বেঁচে যাব।

ডাক্তারবাবু সহাস্যে বললেন, কাজের অভাবে বড্ড কষ্ট পাচ্ছ বুঝি?

শ্রীমতী মধুর হেসে বলল, অবর্ণনীয় কষ্ট কাকাবাবু—কিন্তু এসব কথা পরে হবে, আপনি আগে খেতে সুরু করুন। নইলে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

ডাক্তারবাবু বাধ্য ছেলের মত খাওয়ায় মন দিলেন। পর পর খানকয়েক লুচি ও গোটা কয়েক মিষ্টি গলাঃধকরণ করে পুনরায় মুখ তুলে কিছু বলবার উপক্রম করতেই শ্রীমতী শাসনের ভঙ্গীতে বলল, উঁহু, আগে খাওয়া তার পরে কথা—

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, কথা বলতে বলতে না খেলে এত খাবার উঠবে না যে মা।

ডাক্তারবাবুর কথা বলার ধরনে শ্রীমতী হেসে উঠল। বলল, তা হলে না হয় গল্প করতে করতেই খান। কিন্তু একেবারে নিঃশেষ করে খেতে হবে সে কথাও আগে থেকেই জানিয়ে রাখছি।

দরজার পাশ থেকে নবনিযুক্ত হাউস-কীপার সরে গেল। সেই দিকে দৃষ্টি পড়তেই ডাক্তারবাবু বললেন, উনিই তোমাদের হাউস-কীপার বুঝি? উনি চান কি?

শ্রীমতী অগ্রাহ্যভরে বলল, সেটা উনিই ভাল জানেন। ও নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।

ডাক্তারবাবু সায় দিয়ে বললেন, ওটা না থাকাই ভাল মা। তাতে মনও ভাল থাকে মাথাও হালকা থাকে। তাই বলে চোখ বুজে কোন-কিছুকে অবজ্ঞা করাও উচিত না। সময় মত সাবধান হতে পারলে অনেক অভাবিত দুর্ঘটনা থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। আমার কথাটা মনে রেখ।

রাখব—শ্রীমতী কৃতজ্ঞকণ্ঠে জবাব দিল, কিন্তু আপনি একে-বারেই কথা রাখছেন না কাকাবাবু। শুধু গল্পই করছেন, খাচ্ছেন না কিছু।

ডাক্তারবাবু জবাব দিলেন, ওটা বয়েসের দোষ মা। বলেই তিনি পুনরায় আহারে মনোনিবেশ করলেন। কিছুক্ষণ হাত এবং মুখের কাজ একসঙ্গে চলতে লাগল। সহসা একটা কথা মনে পড়তেই তিনি খাওয়া বন্ধ করে বললেন, কথায় কথায় আসল কথাটাই ভুলে বসে আছি। তখন থেকেই কথাটা বার বার মনে হয়েছে। একে একটা যোগাযোগ বলা যেতে পারে—অথচ কার্য্যকারণে ইচ্ছা-পূরণের পথে রয়েছে মস্তবড় অন্তরায়—

শ্রীমতী বিস্মিতকণ্ঠে বলল, কিসের যোগাযোগ কাকাবাবু? অন্তরায়টাই বা কি?

ডাক্তারবাবু বললেন, তুমি খুঁজে বেড়াচ্ছ কাজ আর আমি পাচ্ছি না কাজের লোক। অথচ তোমাকে আমি ডেকে নিতে পারছি না।

শ্রীমতী বলল, কেন পারেন না? বাধা কোথায়?

ডাক্তারবাবুর কণ্ঠস্বর গভীর হয়ে উঠল। তিনি বললেন, তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর মত এবং পথ এক নয় একথা আজ আমার কাছে আর অজানা নয়। কিন্তু তবুও আমার আশা আছে যে, এই বিপরীতমুখি দুটি ধারা একদিন একই বিন্দুতে গিয়ে মিলবে—

শ্রীমতীর মুখে বড় বিচিত্র একটুকরো হাসি ফুটে উঠল, এ অসম্ভব কেমন করে সম্ভব হতে পারে কাকাবাবু?

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, তুমি বুদ্ধিমতী। আমার কথাটা তোমার বোঝা উচিত ছিল। গতি-পথকে একটু একটু করে বাঁকা করতে থাক তা হলেই বিন্দুটির সন্ধান পাবে। নইলে অনন্ত কাল ধরে চলেও থামতে আর পারবে না। যত কিছু দেখবার যত কিছু অনুভব করবার তার থেকে বঞ্চিত হয়েই একটা জীবন কেটে যাবে। জীবনে সমস্যা যেমন আছে—সমাধানও আছে। বছরের পর বছর যারা লড়াই করে তারা শুধু উত্তেজনার স্বাদটাই পেয়ে থাকে—শান্তির নয়।

শ্রীমতী সহসা যেন ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। বলল, আপনার কথাগুলি ঘুমের মত নরম কিন্তু যুক্তি নেই—বড় একতরফা কথা।

পাগলী মা। ডাক্তারবাবুর কণ্ঠস্বর কোমল হয়ে উঠল, তিনি বললেন, তুমি ঠিক বলেছ মা। আমিও যুক্তির লড়াই করতে বসি নি। আমি আমার মাকে তার সত্যিকার উপযুক্ত স্থানে দেখতে চাই। যাতে খিদে পেলে অসঙ্কোচে হাত পেতে এসে দাঁড়াতে পারি—কিন্তু শ্রীমা, তোমার ঐ হাউস-কীপারটি অমন চোরের মত আশে-পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন বলতে পার?

শ্রীমতীর কণ্ঠস্বর বদলে গেল। সে বলল, জানি না। তবে মনে হয় এটাও ওর কাজের একটা অংশ। ওর মত ওকে চলতে দিন। এক সময় আপনিই থেমে যাবে।

ডাক্তারবাবু ভিতরে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলেও বাহিরে তা প্রকাশ পেল না। সে ত দেখতেই পাচ্ছি, তিনি বললেন, কিন্তু অতনুর শেষ পর্য্যন্ত মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? ঘরে-বাইরে কোথাও যে আর বন্ধু কেউ থাকবে না। তুমি শুধু একটা দিক চিন্তা করছ, কিন্তু আমি ভাবছি এতে যে শেষ পর্য্যন্ত সে নিজেই সবচেয়ে অসুখী হবে এটাও অতনুবাবু বোঝে না?

শ্রীমতী অন্যমনস্ক ভাবে বলল, আপনাকে ত খুব শ্রদ্ধা করেন শুনতে পাই—

ডাক্তারবাবু একটু হাসলেন, বললেন, বহু লোকের কাছে বহুবার শোনা কথা। কিন্তু বিশ্বাস করে এক পা এগুতে পারি নি। অতনুবাবু যত বড় ধনী তার চেয়েও বেশী খেয়ালী। খেয়াল হলে তিনি শ্রদ্ধাও করতে পারেন আবার খেয়ালের বশে ছুড়ে ফেলে দিতেও তার আটকায় না।

একটু থেমে তিনি পুনরায় বললেন, আজ আর বসব না মা, মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

শ্রীমতী বলল, তা হোক, তবুও আপনাকে বসতেই হবে। আমি না আসা পর্য্যন্ত চলে যাবেন না যেন। সে দ্রুত প্রস্থান করল।

ডাক্তারবাবু নিঃশব্দে বসে আছেন। কোন দিকে তাঁর হুঁস নেই। হাউস-কীপার পুনরায় দেখা দিল। হঠাৎ ডাক্তারবাবুর দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হ'ল। তিনি একটু নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে বসলেন। মনে মনে তিনি রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। কোথার জল কোথায় গিয়ে ঠেকবে ভাবতে গিয়ে তিনি অস্বস্তি-বোধ করছিলেন। এমনি সজাগ-প্রহরার কোন সহজ অর্থ তিনি খুঁজে পেলেন না। ডানকান-আগরওয়ালা চক্র অতনুর এতদিনের অভ্যস্ত জীবনযাত্রাকে সমূলে নাড়া দিয়েছে এ খবর তিনি পেয়েছেন, কিন্তু তাই বলে ঘরের আবহাওয়াকে এমন করে তিক্ত করে তুলতে সে অগ্রণী হ'ল কিসের জন্য!

ডাক্তারবাবু হাউস-কীপারকে আহ্বান জানালেন। সে ঘরে আসতেই ডাক্তারবাবু তাকে প্রশ্ন করলেন, কতদিন হ'ল তুমি বহাল হয়েছ? তিনি সতর্ক দৃষ্টিতে তার আপাদ মস্তক লক্ষ্য করছিলেন।

মৃদু জবাব এল, দিন সাতেক হয়েছে—

ডাক্তারবাবু সোজা জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাজ বুঝি সকলের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা?

পুনরায় জবাব এল, আপনি যা খুশী অনুমান করে নিতে পারেন—

তার উত্তর দেবার ধরনে ডাক্তারবাবু সাবধান হলেন। বললেন, আমি এ বাড়ীর ডাক্তার। যখন-তখন আসা-যাওয়া করতে হয়, তাই খবরাখবর নিচ্ছি। তোমার নামটি কি, বলবে কি?

একটু হেসে মেয়েটি জবাব দিল, মিত্রা রায়।

ডাক্তারবাবু মোলায়েমকণ্ঠে বললেন, সুন্দর নাম তোমার। মিত্রা রায়। এর আগেও বুঝি এ কাজ তুমি করেছ?

মিত্রা জবাব দিল, না, এই প্রথম। আপনার আর কিছু জিজ্ঞেস করবার নেই বোধ হয়। আমার অনেক কাজ—যাই।

ডাক্তারবাবু হাসিমুখে বললেন, সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বুঝি! তোমার অনেক কাজ। কাজের মেয়ে তুমি। আচ্ছা যাও।

মিত্রা চলে যেতে শ্রীমতী এসে উপস্থিত হ'ল। জিজ্ঞেস করল, মিত্রার খবরাখবর নিচ্ছিলেন বুঝি?

ডাক্তারবাবু জবাব দিলেন, নেবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু ব্যাপার কি শ্রীমা, কোথাও বেরুচ্ছ নাকি?

শ্রীমতী সহজ ভাবেই বলল, হ্যাঁ কাকাবাবু। আপনার সঙ্গে আজ হাসপাতাল দেখতে যাব।

ডাক্তারবাবু একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, অতনুবাবুর যে ফেরবার সময় হয়েছে মা। এই সময় তোমার চলে যাওয়াটা কি ভাল দেখাবে?

শ্রীমতী বলল, তার জন্যে আমার ভাববার কিছু নেই। চাকর-বাকর আছে, হাউস-কীপার মিত্রা রায় রয়েছে। প্রয়োজন হ'লে আরও নূতন লোক পাওয়া যাবে। আমাকে আমার মত করে ক'টাদিন চলতে দিন কাকাবাবু—

ডাক্তারবাবু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। বিষের ধোঁয়া এরই মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে অনেকখানি ঊর্দ্ধে উঠে গিয়েছে। যে প্রশ্ন তৃতীয় ব্যক্তি হয়েও তার মনে জেগেছে তা শ্রীমতীর মনে বহু পূর্ব্বে দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক। তাই হয়ত আঘাতকে আঘাত দিয়েই প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে চাইছে সে।

শ্রীমতী পুনরায় তাগিদ দিতেই ডাক্তারবাবু উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, যাবেই যখন চল মা। হয়ত এরই আজ প্রয়োজন আছে।

১৬

শ্রীমতী ডাক্তারবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরেই অতনু ফিরে এল। মিত্রা তার আবশ্যকীয় কাপড়-চোপড় এগিয়ে দিয়ে মৃদুকণ্ঠে জানাল, বৌদিরাণী আপনাদের ডাক্তারবাবুর সঙ্গে বার হয়ে গেছেন। খবরটা আপনাকে দিয়ে দিতে বলে গেছেন।

অতনু জিজ্ঞেস করল, হঠাৎ ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কোথায় আবার গেলেন? ডাক্তারবাবু কখন এসেছিলেন?

মিত্রা বলল, ঘণ্টা দুই আগে তিনি এসেছিলেন। বৌদিরাণী তাঁর খাতির-যত্নের কোন ত্রুটি রাখেন নি। একটু থেমে, একটু ইতস্ততঃ করে পুনশ্চ বলল, আপনি কিন্তু অযথা আমাকে রেখেছেন। মিথ্যে আপনার টাকা খরচ হবে। হাউস-কীপারের আপনার কোন দরকার আছে বলে আমার মনে হয় না।

অতনু একটু হেসে বলল, কিন্তু তোমার ত প্রয়োজন আছে মিত্রা!

মিত্রা মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, আমার প্রয়োজন আছে বলেই আপনি অকারণে দেবেন কেন? তা ছাড়া কাজ না করে হাত পেতে টাকা নিতে আমি সঙ্কোচ বোধ করি।

অতনু জবাব দিল, নতুন কথা শোনাচ্ছ মিত্রা। কাজ যারা করে না তারাই সব সময় দাবি করে—এইটেই ত এতদিন দেখে এসেছি।

মিত্রা বলল, আপনি কি দেখেছেন সেটা আমার জানার কথা নয়। আমি যেটা অনুভব করেছি তাই আপনাকে বললাম।

অতনু বলল, ওটা তোমার ভাববার কথা নয় মিত্রা। তোমাকে কখন কোন প্রয়োজনে আমি ব্যবহার করব তা তোমার দেখবার প্রয়োজন নেই। কাজ আপনি দেখা দেবে।

মিত্রার মুখে খানিকটা অর্থপূর্ণ হাসি।

অতনু বলল, তোমাকে নিয়ে আমায় ডানকান-আগারওয়ালা মনে করেছে কর্ম্মক্ষেত্রে এটা তোমার অবনতি, কিন্তু আমি মনে করি তোমার পদোন্নতি হয়েছে। তোমার তীক্ষ্নদৃষ্টি আমাকে ওদের নোংরা ষড়যন্ত্রের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। কথাটা আমার সব সময় মনে আছে মিত্রা।

মিত্রা বিনয়াবনতকণ্ঠে বলল, আমার একান্ত দুর্দ্দিনে আপনি আমাকে চাকরি দিয়ে অনুগ্রহ দেখিয়েছিলেন। আর আমি করেছি আমার কর্ত্তব্য।

অতনু হেসে বলল, অতনু তোমাকে মিথ্যে অনুগ্রহ দেখায় নি মিত্রা। তার প্রমাণ তুমি নিজেই। হিসেব সে খুব ভাল বোঝে।

মিত্রা সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকার ভান করে প্রফুল্লকণ্ঠে জবাব দিল, নইলে আর এত বড় ব্যবসা চালাচ্ছেন কেমন করে!

অতনু খুশী হয়ে বলল, সবটাই আমার কৃতিত্ব নয় মিত্রা, তোমার মত আমার আরও কয়েকজন হিতৈষী কর্ম্মচারী আছে বলেই বেঁচে আছি। এমনি করেই দুনিয়াটা চলে। নইলে দুদিনেই রসাতলে যেত। কিন্তু তোমার চরিত্র এখনও আমার কাছে দুর্ব্বোধ্য ঠেকে।

মিত্রা কোন জবাব দিল না। একটুখানি হাসল।

অতনু বলল, হাসির কথা নয় মিত্রা।

মিত্রা বলল, আমিও আপনার একজন সাধারণ কর্ম্মচারী। অভাবের জন্য চাকরি করতে এসেছি। অভাব মিটে যাবে এ আশাও যখন মনের মধ্যে আছে—

কথার মাঝে থেমে মিত্রা দ্রুত প্রস্থান করল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে ফিরে এসে যেন কিছুই হয় নি এমনি ভাবে বলল, না কেউ নয়। আপনার কেষ্ট ওখানে দাঁড়িয়েছিল।

কথাটা গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে অতনু বলল, আমার অনেক দিনের চাকর—খুব হিতাকাঙ্ক্ষী।

মিত্রা বলল, সত্যি কথা। আপনার উপর সর্ব্বদা সজাগ দৃষ্টি। আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী দেখছি সংখ্যায় অনেক।

অতনু তার কথাটা যেন শুনতে পায় নি এমনি একটা ভাব দেখিয়ে অন্য প্রসঙ্গে উপস্থিত হ'ল, তোমাদের দেশ কোথায় মিত্রা?

মিত্রা একটু যেন চমকে উঠেছে মনে হ'ল। সে বলল, সে পাঠ চুকে-বুকে গেছে।

অতনু বলল, অর্থাৎ পূর্ব্ব-বাংলায়। কিন্তু কোথায় ছিল সেইটেই আমার জিজ্ঞাস্য।

মিত্রা বলল, ফরিদপুর কোটালিপাড়া। কিন্তু আজ আবার নতুন করে এ প্রশ্ন কেন স্যার?

অতনু একটুখানি হেসে পুনরায় বলল, এর আগেও জিজ্ঞেস করেছি বুঝি? মনে নেই। হ্যাঁ, ভাল কথা। শোন হাউস-কীপার, এখুনি কেষ্টকে ডেকে আমার আপিস-ঘর খুলে দিতে বল।

মিত্রা জিজ্ঞেস করল আপনি কি এখুনি—

তাকে বাধা দিয়ে অতনু বলল, প্রশ্ন কর না। যা বলছি তাই কর। ওদের সঙ্গে আমার আজ শেষ হিসেব-নিকেসের দিন। ককটেলের নেমন্তন্ন করেছি। হ্যাঁ···আচ্ছা মিত্রা দেবী, হঠাৎ তুমি এদের গ্রাস থেকে অতনুকে বাঁচাতে গেলে কেন, আমায় বলবে কি?

মিত্রা সহজকণ্ঠে বলল, ওটা এখনও আমি ভেবে দেখি নি। তবে ওদের অসঙ্গত চক্রান্তের হাত থেকে বাঁচাবার কথাটা যে মনে এসেছিল সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই।

অতনু পরিহাসের ছলে বলল, অথচ এর পিছনে আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। তাই না?

মিত্রা সাবধানতা অবলম্বন করল। বলল, উদ্দেশ্য ছাড়া কোন কাজ কেউ করে বলে আমি বিশ্বাস করি না।

অতনু হেসে উঠে বলল, ভাল, ভাল। তুমিও দেখছি বেশ চমৎকার গুছিয়ে কথা বলতে জান। তোমার পড়াশুনা কতদূর মিত্রা?

মিত্রা বিব্রতকণ্ঠে বলল, খুবই সামান্য। আমার আবেদন-পত্রে সে কথা লেখা আছে।

অতনু তার পাইপে অগ্নিসংযোগ করে তাতে বারকয়েক টান দিয়ে বলল, তুমি জানিয়েছিলে বটে, কিন্তু আমাদের আগারওয়ালা আর ডানকান বলে ওটা মিথ্যা।

মিত্রার চোখে-মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠলেও সে সংযতকণ্ঠে বলল, আপনিও কি তাই বিশ্বাস করেন স্যার?

অতনু জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল, এ কথা বলবারই বা অর্থ কি মিত্রা দেবী?

মিত্রা মৃদুকণ্ঠে বলল, কথাটা আমার নয়—যারা বলেছে তারাই আপনার প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারবে।

অতনু বলল, আরও অনেক আপত্তিকর কুশ্রী ইঙ্গিত করেছে।

মিত্রা ভিতরে কেঁপে উঠলেও প্রকাশ্যে দৃঢ়কণ্ঠে বলল, এ কথা ওরা বলতে পারে অতনুবাবু। ওরা যে বোকা নয় বুদ্ধিমান এইটেই আর একবার জানা গেল। আপনাকে বাজিয়ে দেখছে। সাবধান হয়ে তাদের নাড়াচাড়া করবেন, এটা আমার অনুরোধ।

অতনু মৃদু হেসে বলল, তোমার অনুরোধটা সময়োপযোগী হয়েছে সন্দেহ নেই। ওরা একটা-কিছু অনুমান করে নিয়েছে—সেইটেই যাচাই করে দেখছে। এ অভিযোগ তারই প্রতিক্রিয়া।

প্রসন্ন হাসিতে মিত্রার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বলল, আপনি আমাকে বাঁচালেন। বলতে বলতেই সহসা থেমে সে কেষ্টকে উচ্চকণ্ঠে ডাকল, কেষ্ট উপস্থিত হতে তাকে অতনুর আদেশ জানিয়ে দিল।

কেষ্ট অদৃশ্য হয়ে গেল।

অতনু বলল, জান মিত্রা, মানুষকে বিশ্বাস না করেও উপায় নেই—করেও শান্তি নেই।

মিত্রা প্রশ্ন করল, এ কথা কেন?

অতনু বলল, বিশ্বাসভঙ্গের অসংখ্য নজির আমার আশেপাশে রয়েছে বলেই এ কথা বলছি। কথাটা পুরোপুরি শেষ না করেই সে আচমকা অন্য কথায় ফিরে গেল, আচ্ছা মিত্রা, তোমাকে আমার এখানে আসবার আগে আর কোথাও দেখেছি কি?

এই ধরনের কথাবার্তায় মিত্রা অস্বস্তিবোধ করছিল, কিন্তু প্রকাশ্যে যথাসম্ভব শান্তকণ্ঠে জবাব দিল, এ কথার জবাব আপনিই ভাল দিতে পারবেন।

অতনু বলল, তুমি ঠিক বলেছ মিত্রা। আমার মনে হয় তোমাকে আমি ঘুমের ঘোরে কোথাও দেখেছি। তাই প্রকাশ্য দিনের আলোয় ঠিক···

মিত্রা কথার মাঝে তাকে থামিয়ে দিয়ে হেসে উঠল। পর-মুহূর্তেই গম্ভীরকণ্ঠে বলল, আপনার মনের মধ্যে সন্দেহ বাসা বেঁধেছে তাই ঘুমিয়ে দেখেন স্বপ্ন, জেগে উঠে দেখেন তারই বিভীষিকা।

অতনু বার কয়েক মাথা নেড়ে ধীরে ধীরে বলতে থাকে, অস্বীকার করে কোন লাভ নেই মিত্রা। বিশ্বাস কাউকেই আমি পুরো করতে শিখি নি।

মৃদুকণ্ঠে মিত্রা বলল, যাদের আপনি বিশ্বাস করেন না তাদের আপনার চলার পথ থেকে সরিয়ে দেন না কেন?

এটা কাজের কথা হ'ল না মিত্রা—অতনু বলল, তা হলে নিতান্তই একক জীবন কাটাতে হয় যে। যা একেবারে অসম্ভব! মানুষ কখনও তা পারে না।

মিত্রা মৃদুকণ্ঠে বলল, বুঝতে পারলাম না।

অতনু হেসে বলল, বুঝতে না পারার মত এটা কি শক্ত কথা মিত্রা?

মিত্রা ধীরে ধীরে বলতে থাকে, সত্যিই বুঝতে কষ্ট হচ্ছে। আপনি এত স্পষ্ট বলেই বলছি। এর পরেও কেউ বিশ্বস্তভাবে আপনার স্বার্থ রক্ষা করে চলবে বলে কি আপনি মনে করেন স্যার?···

পারি বৈ কি মিত্রা দেবী, অতনু হাসিমুখে বলল, যারা সত্যিই বিশ্বস্ত তারা আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ধার ধারে না। ওরা সব আলাদা জাতের মানুষ।

আর যারা তা নয়? মিত্রা বলল।

অতনু বলল, যারা বিশ্বস্ত নয় তাদের কথা বলছ ত মিত্রা? তাদের আমি আরও ভাল করে চিনি। না বোঝার ভান করে পাশে থেকে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠবার চেষ্টা করে। দিনরাত খোসামোদ করে চলে, কিন্তু এমনি মজা যে, জেনে-শুনেও সহজে এদের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না—নিতান্ত প্রাণের দায় না হলে।

মিত্রা সহসা খাপছাড়া ভাবে বলে বসল, আপনি ত তা হলে আপনার স্ত্রীকেও বিশ্বাস করেন না—

অতনু হো হো করে হেসে উঠল। তার হাসির বন্যায় মিত্রার কথাটা প্রায় ভেসে গেল। সে গম্ভীরস্বরে বলল, প্রশ্নটা অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক আর অসঙ্গত হলেও উত্তরটা জেনে নাও মিত্রা রায়। অতনু প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাউকেই এক তিল বিশ্বাস করে না। তুমি এখন যেতে পার। তোমাকে আর আমার দরকার নেই এখন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে চাই।

মিত্রা বিনা বাক্যব্যয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

অতনু চোখ বুজে সোফার উপর নিঃশব্দে বসে আছে। ভাবছিল নিজের আচরণের কথা। মিত্রার মত একটা মেয়ের সঙ্গে কিসের জন্য সে এ ভাবে আলোচনায় যোগ দিল? ডানকান-আগরওয়ালা চক্রের সন্ধান সে দিয়েছে সত্য, কিন্তু তাই বলে সে খানিকটা বাড়াবাড়ি করে ফেলছে নাকি? ওকে আরও ঢের বেশি হিসাব করে বিশ্বাস করা উচিত ছিল। একজনার কাছে যে বিশ্বাস ভাঙতে পেরেছে প্রয়োজন হলে যে, সে আর একজনকেও ছেড়ে কথা কইবে না এ কথা তার বোঝা উচিত। এই কথাটাই সে প্রকারান্তরে মিত্রাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে।

ডানকান আগারওয়ালার তার বাড়ীতে আসা-যাওয়াটা আজ নতুন নয়। তবে আজকের প্রয়োজন তাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। আজ তারা ইঁদুরকলে ধরা পড়েছে। অতনু জানে, ছুটে না এসে তাদের উপায় নেই। এক কথায় সিংহাসনচ্যুতি তারা মেনে নেবে না। নেওয়া সম্ভবও নয়। তারা প্রাণপণে যুদ্ধ করবে। অতনু তার জন্য প্রস্তুত হয়েই আছে।

অতনুর চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল। শ্রীমতী ফিরে এসেছে। অতনু দেখেও দেখল না। কথাও কইল না।

শ্রীমতীই প্রথমে নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, তুমি কতক্ষণ এসেছ?

অতনু জবাব দিল, তুমি চলে যাবার পরেই—এই ঘণ্টা-তিনেক হবে।

শ্রীমতী কথাটা গায় না মেখে প্রস্থানোদ্যত হতেই অতনু তাকে ডেকে বলল, ডাক্তারবাবু এ বাড়ীর কর্মচারী আর তুমি গৃহিণী, এ কথাটা তুমি সব সময় ভুলে যাও।

শ্রীমতীর মুখভাব কঠিন হয়ে উঠল। সে একবার ঘুরে দাঁড়িয়ে অতনুকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, তোমার ইচ্ছেটা কি?

অতনু শান্তকণ্ঠে জবাব দিল, একটুও অস্পষ্ট নয় যে, না বোঝার ভান করছ। তুমি এখন যেতে পার।

তার কথার ধরনে শ্রীমতী প্রায় জ্বলে উঠতে গিয়েও আত্মসম্বরণ করল এবং আর একবার তার পানে অবজ্ঞার দৃষ্টি হেনে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

অতনু যেন অকারণেই মেঝের কারপেটে তার জুতা ঘষছে।

কেষ্ট এসে ডানকান-আগরওয়ালার আগমন সংবাদ দিতে অতনু উঠে দাঁড়িয়ে শিষ দিতে দিতে বাইরের পথে পা বাড়াল।

১৭

ডানকান এবং আগারওয়ালা সত্যিই ছুটে এসেছে। সহসা শিষ দেওয়া বন্ধ করে অতনু কেষ্টকে জিজ্ঞেস করল, ওদের ঘর খুলে বসিয়ে এসেছ ত?

তাদের ভিতরে ঢুকতে দেয় নি দরওয়ান—কেষ্ট জানাল।

অতনুর মুখে খানিক হাসি ফুটে উঠল। কারখানা থেকে তাড়া খেয়ে এসেছে। অতনু নিজেকে নিজে বলল।

কেষ্ট বলল, তা হলে কি হুকুম আপনার?

হুকুম! এর পরেও কি ওরা চলে যায় নি? অতনু জিজ্ঞেস করল।

আজ্ঞে না, ওরা দেখা না করে যাবে না। তাই ত আপনাকে খবর দিতে এলাম। কেষ্ট বলল।

বলেন ত ঘর খুলে বসাই—

অতনু সাপের মত ঠাণ্ডা গলায় বলল, তাই কর কেষ্ট। আমার এতদিনের পুরনো পার্টনার, তাদের এভাবে দরওয়ান অপমান করল কেন জান তুমি?

আজ্ঞে তাকে নাকি আপনিই হুকুম দিয়ে এসেছেন? কেষ্টর চোখে বিস্ময়।

অতনু বলল, তা দিয়েছিলাম—

অতনুর অন্যমনস্কভাব লক্ষ্য করে পুনরায় কেষ্ট বলল, তা হলে কি ওদের ঘর খুলে দেব?

দাও—আমি একটু পরে আসছি। অতনু হুকুম দিতেই কেষ্ট দ্রুত চলে গেল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে মিত্রা এসে উপস্থিত হ'ল। সে কোনপ্রকার ভূমিকা না করে বলল, আপনি কি ওদের—

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে অতনু বলল, আদর করে বসাতে বলে দিলাম। ভয় নেই, ওদের বিষদাঁত ভেঙে দিয়েছি। যত খুশী আদর করলেও—

সময় পেলে আবার বিষদাঁত গজাতে পারে স্যার। তাকে বাধা দিয়ে মিত্রা বলল।

অতনু ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল, তা পারে, যদি সময় পায়। কিন্তু তুমি খুব ভয় পেয়ে গেছ বলে মনে হচ্ছে মিত্রা। অতনু হাসল।

মিত্রা চুপ করে থাকে।

অতনু পুনরায় বলে, যাবে নাকি আমার সঙ্গে ওদের অভ্যর্থনা জানাতে?

মিত্রা চমকে উঠল।

অতনু হেসে বলল, থাক তোমাকে যেতে হবে না। দূর থেকেই না হয় ওদের অভ্যর্থনার বহরটা দেখে আসবে চল।

অতনু এগিয়ে চলল।

ডানকান এবং আগারওয়ালাকে বসিয়ে কেষ্ট বিনীতকণ্ঠে বলল, আমাদের দরওয়ানটা একেবারে বুনো। মানী লোকের

সম্মান দিতে জানে না শেঠ সাহেব। আমার সাহেব আপনাদের খাতির-যত্ন করতে বলেছেন। সোডা, হুইস্কি আনব কি?

ডানকান ক্ষিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিল, আমরা তোমার সাহেবকে চাই। হুইস্কি, সোডা নয়। বেয়াকুফ কোথাকার।

তার কথাটা শেষ করতে না দিয়েই অতনু এসে ঘরে প্রবেশ করল। শান্ত-ধীরকণ্ঠে বলল, ডানকান সাহেব বোধহয় ভুলে গেছেন যে, কেষ্ট আমার চাকর আপনার নয়। কথাটা ভুলেও কোনদিন ভুলবেন না।

ডানকান এবং আগারওয়ালার দু'জোড়া চোখই একসঙ্গে জ্বলে উঠে পরমুহূর্ত্তে নিভে গেল। অতনুর সাবধানী দৃষ্টিতে তা ধরা পড়লেও সে প্রকাশ্যে একটি কথাও না বলে দৃঢ়পদে এগিয়ে গিয়ে একখানি চেয়ার দখল করল।

কথা বলল আগারওয়ালা, ডানকান হয়ত মাথা ঠিক রেখে কথা বলতে পারে নি অতনুবাবু। আপনারই চাকর যদি আপনাকে বাড়ীতে ঢুকতে বাধা দেয় তা হলে আপনার মনের অবস্থাটা কেমন হয় তা নিশ্চয় বুঝিয়ে বলবার দরকার নেই।

অতনু কঠিনকণ্ঠে বলল, তা হলে সে চাকরকে চাবুক মেরে নিজের পথ করে নিতে আমি একবিন্দু দ্বিধা করতাম না। কিন্তু পরের বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ করতে গিয়ে গলাধাক্কা খেলে সে অপমান নিঃশব্দে হজম করা ছাড়া উপায় কি আগারওয়ালা সাহেব!

ডানকান পুনরায় মেজাজ দেখিয়ে বলল, আপনার এই বেআইনী কাজের জন্য অনুতাপ করতে হবে।

অতনু উত্তাপহীন-কণ্ঠে বলল, বেআইনী কাজের জন্য সকলেরই অনুতাপ করা উচিত। আমার কথাটা বুঝতে পেরেছেন সাহেব। বেআইনী লোভ আপনাদের বঞ্চিত করেছে এই কথাটা মনে রেখে ভবিষ্যতে পথ চলবেন।

ডানকান পুনরায় উত্তেজিত হয়ে উঠতেই তাকে থামিয়ে দিয়ে আগরওয়ালা ধীরে ধীরে বলল, আপনি বড় গোলমেলে কথা বলছেন বাবু সাহেব। এ বড় তাজ্জবের কথা। আমরা জানলাম না অথচ রাতারাতি কারবারে অধিকার হারালাম। জিজ্ঞেস করতে পারি কি আমাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে হটিয়ে দেবার ক্ষমতা আপনাকে কে দিল?

অতনু ভাবলেশ হীন চোখে তাদের পানে তাকিয়ে সাপের মত হিস হিস করে বলল, এ প্রশ্নটা নিজেদের করুন। জবাব খুঁজে পেতে দেরি হবে না।

ডানকান ধৈর্য্যহাড়া হয়ে উঠে দাঁড়াল। চীৎকার করে বলল, ভণ্ডামীর একটা শেষ আছে। চলে এস আগারওয়ালা। আমাদের প্রশ্নের কেমন করে জবাব আদায় করে নিতে হয় তা দেখে নেব। গায়ের জোরে দুনিয়া চলে না।

অতনু বরফের মত ঠাণ্ডা গলায় বলল, বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না কি ডানকান সাহেব। আমার ধারণা ছিল কারখানা থেকে তাড়া খেয়ে তোমাদের চৈতন্য হবে, কিন্তু এখন দেখছি তোমাদের গায়ের চামড়া ঢের বেশি মোটা। কিন্তু শেষ বারের মত শুনে যাও যে, সে চামড়া ভেদ করবার মত বুলেট আমার কাছে বহু আছে বলেই তোমাদের মুখোমুখী দাঁড়াবার আয়োজন করেছি।

অতনু থামল, তার কথার আঘাতে ওদের মুখের চেহারায় কতখানি পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছে তা একবার তীক্ষ্নদৃষ্টিতে দেখে নিয়ে সে পুনরায় বলতে সুরু করল, তোমাদের বন্ধুর মত বিশ্বাস করেছিলাম, তাই আমার ব্যবসার অংশীদার হতে পেরেছিলে। তাই বলে তোমাদের কারবারের মালিক হতে দিতে আমি পারি না। আমার সামান্য বেতনের একজন কর্ম্মচারীর যতটুকু সততা আছে তোমাদের মধ্যে সেটুকুও নেই। আমার কথাটা বুঝতে পেরেছ সাহেব?

ডানকান পুনরায় চীৎকার করে উঠল, Don't talk nonsense।

অতনু ডানকানের রাগ দেখে হাসল। কোন জবাব দিল না। আগারওয়ালা ডানকানকে নিয়ে বেশ খানিকটা বিব্রত বোধ করল। তাকে ইঙ্গিতে বাদানুবাদ করতে নিষেধ করলেও সে থামাতে পারল না। ডানকান ক্ষীপ্তের ন্যায় বলে উঠল, দুটো বাজে কথা বলে আমাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন মনে করে থাকলে আপনিও মারাত্মক ভুল করেছেন।

অতনুর মুখে অবজ্ঞার হাসি দেখা দিল। সে বলল, তুমি আবার আমাকে হাসালে সাহেব। তোমাদের এত বড় রুজি-রোজগারের পথটা বন্ধ করে দেওয়া হ'ল আর তোমরা চুপ করে থাকবে, এ কেউ বিশ্বাস করতে পারে না। আমিও তা করি নি। আর তার জন্যে তৈরী হয়েই আছি। তোমাদের জাল জুয়াচুরির প্রত্যেকটি নজির আমার কাছে আছে। খুব যত্ন করে রেখে দিয়েছি। তোমাদের সায়েস্তা করতে তার যে কোন একটাই যথেষ্ট।

অতনু আর একবার হেসে উঠল। ওকি আগারওয়ালা সাহেব! তোমার মুখটা অত কাল হয়ে উঠল কেন? ভয় নেই, তোমাদের জাল ধরিয়ে দিয়ে জেলে পাঠাবার ইচ্ছে আমার নেই, কিন্তু নিজেদের জালে যদি তোমরা ইচ্ছে করে জড়িয়ে পড় আমি তোমাদের মুক্ত করতে পারব না এই কথাটাই জানিয়ে দিলাম। ডানকান, তুমি একটু বেশি চেঁচামেচি করছিলে। ওটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তোমার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে দেখ সে তোমার চেয়ে বুদ্ধিমান।

ডানকান তথাপি চুপ করে থাকতে পারল না। বলল, আবার বলছি, আমরা চুপ করে থাকব মনে করলে ভুল করেছেন।

অতনু হেসে বলল, ডানকান সাহেব কি ভয় দেখাতে চেষ্টা করছেন?

ডানকান উত্তপ্তকণ্ঠে জবাব দিল, ও কাজ আপনিই ভাল পারেন।

অতনু ধমক দিল, থাম ডানকান সাহেব। স্পর্দ্ধা তোমার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কেষ্ট, বাবুদের বাইরের পথ দেখিয়ে দাও।

কেষ্ট কাছাকাছি কোথাও ছিল, ছুটে এল।

অতনু পুনরায় বলল, এর পরেও যদি তোমাদের কিছু বলবার থাকে আদালতের মারফৎ জানিও। জবাব পাবে। এবারে তোমরা যেতে পার।

ডানকান এবং আগরওয়ালা নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। কেষ্ট ওদের সঙ্গে গেল।

ওরা ঘর ছেড়ে চলে যেতেই অতনু তার পাইপে অগ্নি-সংযোগ করল, এবং চোখ বুজে টানতে সুরু করল।

ডানকানগুষ্ঠিকে সে বিতাড়িত করেছে। গুরুতর তাদের অপরাধ। অন্যায় ভাবে সেয়ার ছড়িয়ে অতনুকে তারা উচ্ছেদ করতে চেয়েছিল। কিন্তু অনেক এগিয়েও শেষ রক্ষা করতে পারে নি। অতনুর জন্য তৈরী দড়ির ফাঁস অজ্ঞাতে ওদেরই গলায় আটকে গেছে। টানাটানি করতে গেলে নিজেদেরই মৃত্যু ডেকে আনবে।

সময় থাকতে মিত্রা অতনুকে সাবধান করে দিয়েছে। ডাক্তারও করেছিল। একবার নয়, বহুবার, কিন্তু সে বিশ্বাস করতে পারে নি। মিত্রাকেও সে অবিশ্বাস করতেই চেয়েছিল। সে হাতে করে নিয়ে এল প্রমাণ। অতনুর বিস্ময় সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এই মেয়েটিকে ডানকান-আগরওয়ালার অনুরোধেই রাখা হয়েছিল। আর দশটা সাধারণ কর্ম্মচারীর চেয়ে ওকে আলাদা চোখে সে কোন দিন দেখে নি। হলেই বা সে মেয়ে।

পাইপের ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে পাকিয়ে শূন্যের পথে ভেসে চলেছে। আর তারই আবর্ত্তের মধ্যে সহসা এসে মিত্রা দাঁড়িয়েছে হাসিমুখে। এই মুহূর্ত্তে মিত্রা আর সাধারণ নয়। বরং একটু বিশেষভাবেই অসাধারণ মনে হচ্ছে। ওর হাসির মধ্যে একটা দৃঢ়-সঙ্কল্প। মিত্রা আজ তার কাছে অনন্যা।

অতনু পুনরায় জোরে পাইপে টান দিয়ে একরাশ ধোঁয়া শূন্যে নিক্ষেপ করল। ডানকান চলে গেছে। চলে গেছে আগরওয়ালা। ডানকানের বুদ্ধিটা একটু মোটা। আগরওয়ালা সতর্ক। তাই সে কথা বাড়ায় নি। গোলমালের সূত্রের সন্ধান পেয়েই থেমে গেছে।

মিত্রাকে ওরা চেয়ারে বসিয়েছিল। সে ওদের পথে বসিয়েছে।

ডানকান-আগরওয়ালাকে ফটকের বাইরে পৌঁছে দিয়ে এসে কেষ্ট খবরটা অতনুকে দিল, বলল, ওরা খুব গালমন্দ করছিল।

অতনু জবাব দিল, আমি জানি—সে পুনরায় চোখ বন্ধ করে ধূমপানে আত্মনিয়োগ করল।

আরও কিছু সময় নিঃশব্দে অপেক্ষা করে কেষ্ট পুনরায় বলল, আপনি কি এখন এখানেই থাকবেন ?

অতনু চোখ না খুলেই জবাব দিল, হুঁ—তুমি আলোটা নিভিয়ে দিয়ে চলে যাও কেষ্ট। আজ আর কেউ যেন আমাকে বিরক্ত করতে আসে না।

কেষ্ট আলোটা নিভিয়ে দিয়ে চলে যেতেই লঘু পদে সেখানে এসে উপস্থিত হ'ল মিত্রা। মার্জ্জারের মত নিঃশব্দ তার গতি। শুনতে না পাবারই কথা, তাই অতনুর মৃদু আহ্বানে সে চমকে উঠল।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বস মিত্রা। অতনু চোখ বুজেই বলল, তুমি যে আশে পাশেই উপস্থিত থাকবে তা আমি জানতাম।

কিছুক্ষণ মিত্রার মুখে কোন কথা যোগাল না।

অতনু অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে বলল, খুব অবাক হয়ে গেছ বুঝি ?

মিত্রা তথাপি নিরুত্তর।

অতনু বলতে থাকে, খুব ভয় পেয়ে গেছিলে তুমি। ওরা কিন্তু তোমার সম্বন্ধে একটিও বাজে কথা বলে নি।

মিত্রা এতক্ষণে মুখ খুলল, আমার জন্যে আমি ভাবি নি স্যার।

ভারী আশ্চর্য্য কথা শোনালে মিত্রা, অতনু হেসে উঠে বলল, তা হ'লে ওখানে লুকিয়ে ছিলে কেন মিত্রা দেবী ? আর এত দুর্ভাবনায় পড়েছিলে কার জন্য ?

মিত্রা সহজকণ্ঠে জবাব দিল, আমি ডানকান-আগরওয়ালাকে ভয় পাচ্ছিলাম। তারা এত সহজে চলে যাবে আমি ভাবতে পারি নি !

অতনু তার পাইপে পুনরায় গোটাকয়েক টান দিয়ে হেসে বলল, শোন মিত্রা—আমার ঠাকুর্দ্দা ছিলেন জমিদার। এক ছটাক জমির জন্য হাসতে হাসতে গোটাকয়েক কাঁচা মাথা দেহ থেকে নামিয়ে দিতে কোন দিন দ্বিধা করেন নি। আমার অবশ্য জমিদারী নেই, কিন্তু দেহে সেই একই রক্ত বইছে। তাছাড়া আমার যা কিছু শিক্ষা তা তাঁরই কাছে হয়েছে। কথাটা শুনে রাখ।

ক্রমশঃ



জটার জালে

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

(১২)

নীচেই প্রস্তরফলকে স্পষ্ট লেখা আছে—ত্রিযুগী পাহাড়ের পাদদেশ থেকে উপরে মন্দির পর্য্যন্ত পথের দূরত্ব তিন মাইল। সে পথ নীচের যাত্রী-সড়কের মত অত প্রশস্ত ও মসৃণ নয়। লোকজন আর ছাগল-মেষের পায়ের তাগিদে সৃষ্টি হয়েছে সেই পাকদণ্ডী পথ; ওর স্থিতিও সেই সব পায়েরই তাড়নায়। কেদার পথের অধিকাংশ যাত্রীই অতিরিক্ত চড়াই ভাঙবার কষ্ট এড়াবার জন্য বৈষ্ণবতীর্থ ত্রিযুগীনারায়ণের মন্দিরকে এড়িয়ে যান বলে সরকারের তেমন নজরও নেই ঐ পথটুকুর দিকে।

অমনি পাকদণ্ডী পথ আছে উপর থেকে বিপরীত দিক দিয়ে শোণপ্রয়াগের পুলের মুখে নীচের এই যাত্রী-সড়কের সঙ্গে সংগম পর্য্যন্ত। তারও দূরত্ব ঐ তিন মাইল। অঙ্কের হিসাবে মোট ছ'য় মাইল হলেও নীচের যাত্রী-সড়ক দিয়ে সোজা এগিয়ে গেলে ঠিক অতটা দূরত্ব এড়ান যায় না—মাইল দুয়েক হাঁটতেই হয়।

তাই করেছিলাম আমি—আগের দিন যেমন বলেছিলাম গঙ্গোত্রীকে, পর দিন কাজেও তেমনি। ত্রিযুগীনারায়ণকে মাথায় রেখে পাহাড়ের কোমর বেয়ে বেয়ে উতরাই পথে সোজা এগিয়ে গেলাম গৌরীকুণ্ডের দিকে। মাইল চারেক অতিরিক্ত চড়াই-উতরাই পথ চলবার ক্লেশ থেকে অব্যাহতি পেল আমার ক্লান্ত দেহ।

তবু মনে মনে লাভ-লোকসানের হিসাব খতিয়ে দেখি—কৈ, লাভের ঘরে তেমন কিছু নজরে পড়ছে না ত! শোণপ্রয়াগ পর্য্যন্ত উতরাই পথ। গতি তাতে দ্রুততর হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু পরিশ্রম কিছু কম হয় না। তার পর শোণপ্রয়াগের পুল পার হবার পরেই চড়াই শুরু হ'ল। কঠিন চড়াই এটি। ত্রিযুগীনারায়ণের চড়াইকে এড়িয়ে এসেছি বলেই বুঝি কেদার পথের এই গৌরীশৃঙ্গ তার প্রতিশোধ নিতে চায়। পথের প্রকৃতিও বদলে গিয়েছে এ পারে। শোণপ্রয়াগ পর্য্যন্ত নিবিড় বন ছিল। এপারে পথের দু'পাশে বনস্পতির পরিবর্ত্তে দেখছি লম্বা লম্বা এক রকম ঘাস। আর চার দিক থেকেই যেন পাহাড়গুলি এগিয়ে এসে আমাকে ঘিরে ধরছে। এদিকেও গভীর খাদ আমার দক্ষিণে। থেকে থেকেই শূলবিদ্ধ অজগরের দেহের মত মন্দাকিনীর বিপুল, কুটিল জলধারা চোখে পড়ছে। কিন্তু অদৃশ্য হয়েছে মন্দাকিনীর বিশাল উপত্যকা। ওপারের পাহাড় এখন অনেক কাছে মনে হয়। পায়ের নীচের পথও ক্রমশঃই সরু হয়ে আসছে। গজ দুই মাত্র প্রশস্ত পাথুরে পথে সন্তর্পণে পা ফেলে হাতের লাঠির ঠক্ ঠক্ শব্দ শুনে অতি কষ্টে পথ চলতে চলতে বেশ বুঝতে পারছি যে, এ কালের উন্নত স্থপতি-বিদ্যাও হার মেনেছে এই আসল হিমালয়ের কাছে। বেঁকে বসেছেন গিরিরাজ—সড়ক বানাবার জন্য আর সূচ্যগ্র ভূমিও তিনি ছেড়ে দেবেন না।

আসল কথা, ভূমিই এখানে নেই, যা কেটেকুটে সড়ক তৈরি করবে বাস্তুকার। শোণপ্রয়াগের পুল পার হয়েই দেখেছিলাম এক পাহাড়ী কিশোরকে। জলের ধারে সে খুঁড়ছে খানিকটা জায়গা, তার পর পাথর বেছে বেছে মাটি ভরছে একটি ছোট ঝুড়িতে। ঐ মাটি সে পিঠে করে বয়ে নিয়ে যাবে গৌরীকুণ্ডে। আমার বিস্মিত জিজ্ঞাসার উত্তরে সে বলেছিল যে, উপরে মাটি পাওয়া যায় না বলেই তার মুনিব তাকে পাঠিয়েছে নীচে থেকে মাটি নিয়ে যেতে।

তখন বিশ্বাস হয় নি ছেলেটির কথায়। কিন্তু যত উপরে উঠছি ততই বুঝতে পারছি যে, একবর্ণও মিথ্যা বলে নি সে। গৌরীকুণ্ডের পথে পাহাড় পাহাড়ই। ওর মধ্যে মাটি যদি থাকেও ত স্বর্গের মাটি তা—মর্ত্ত্যের মানুষের কোন কাজেই লাগবে না।

কঠিন পথ পায়ের নীচে, কঠিন চড়াই ভেঙে উপরে উঠছি। ত্রিযুগীনারায়ণকে এড়িয়ে এসে কি যে লাভ হ'ল তা বুঝতেই পারছি না।

দেহের শ্রান্তির চেয়েও মনের অবসাদ বেশী।

রোজই ত বেশীর ভাগ পথ একা একাই চলেছি আমি। কিন্তু আজ নিজেকে আমার যেন বড় বেশী নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে।

কেবল নিঃসঙ্গ নয়, নিজেকে যেন পরিত্যক্ত বোধ করলাম ওঁদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পরেই। রামপুর থেকে মাইল-খানেক পথ একসঙ্গেই এসেছিলাম। হাসি-গল্পে বেশ কেটেছিল সময়টুকু কিন্তু ত্রিযুগী-পাহাড়ের পাদদেশে আসতেই তাল কেটে গেল।

আমি যে উপরে যাব না তা বুঝি এতক্ষণে বিশ্বাস করেন নি গঙ্গোত্রী। যখন অবিশ্বাস করবার উপায় আর থাকল না তখন ক্ষুণ্ণ হলেন তিনি। কিন্তু মায়ে-ঝিয়ে তাঁরা হাসিমুখেই বিদায় নিলেন আমার কাছ থেকে।

খুবই স্বাভাবিক তাঁদের পক্ষে—তাঁরা আমার পথের সাথী বই ত নন। তবু যেন অপ্রত্যাশিত আমার কাছে। একটা যেন মোচড় লাগল আমার বুকের মধ্যে।

তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে তাকালাম জিতেনের মুখের দিকে—সে ত আমার নিজের দলের লোক, আমার লক্ষ্মণ-ভাই। বেশ খানিকটা প্রত্যাশা নিয়েই বললাম তাকে, তোমার না গেলে হয় না, জিতেন?

কিন্তু শুনে কেবল বিরক্ত নয় সে, একটু যেন রুষ্টও। উত্তরে সে বললে, এখন না গেলে আর কি সুযোগ পাব কোন দিন ?

কি উত্তর দেব। উত্তরের জন্য অপেক্ষাও করল না জিতেন; তর তর করে উপরে উঠে গেল সে। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই চক্রধরকে নিয়ে ওদের চার জনের দলটি একটি ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সামনে তাকিয়ে দেখি যে, আমার পথ একেবারেই জনশূন্য—আমাদের কুলিরাও গৌরীকুণ্ডের দিকে এগিয়ে গিয়েছে।

জানি যে, ঘণ্টাকয়েক পরেই গৌরীকুণ্ডে আবার দেখা হবে ওঁদের সকলের সঙ্গেই। তবু মনটা আমার উদাস হয়ে গেল।

আগেও ত পথে নামবার পরেই কতবার ছাড়াছাড়ি হয়েছে আমাদের। কিন্তু ভিন্নপ্রকৃতি আজকের ঘটনার। ইতিপূর্ব্বে পথের টানেই ছিটকে পড়েছি আমরা, কিন্তু একই পথের আগে বা পিছে। আজ ওঁরা গেলেন তেমন দীর্ঘ না হলেও একেবারে ভিন্ন এক পথে, অন্য এক আকর্ষণে—যার তুলনায় আমার টানের জোর অনেক কম। সুতরাং এবারের ছাড়াছাড়িটা স্থূল ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করে একেবারে আমার মনের গোড়ায় গিয়ে ঘা দিয়েছে যেন।

থেকে থেকেই মৃন্ময়ীর কথা মনে পড়ছে আমার—দল তাদের ভেঙে গিয়েছে বলে কি দুঃখ আর দুর্ভাবনা মৃন্ময়ীর। তুলনায় আমাদের ছাড়াছাড়িটা সাময়িক। তবু ঘটনাটিকে সহজ বলে মানতে চায় না আমার মন।

দুঃখ করছে সে, না অভিমান ? ঠিক ধরতে পারি না। একবার ভাবছি, ওরা ত্রিযুগীনারায়ণকে ছেড়ে আমার সঙ্গে এলেন না কেন ? পরক্ষণেই মনে হচ্ছে যে, আমিই ভুল করেছি ওঁদের সঙ্গে না গিয়ে।

মনের বীণায় সরু ও মোটা দুটি তার একসঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে বলেই আসল সুরটিকে সঠিক ধরা যাচ্ছে না।

কিন্তু নিঃসঙ্গতার অনুভূতি আমার নির্ভুল। গোপন মনের কোন সূক্ষ্মপথ বেয়ে সূক্ষ্মতর না জানি কোন আশাভঙ্গের বেদনা তার সঙ্গে মিশেছে বলেই আজ তীব্রতর সে অনুভূতি।

দার্শনিক হতে চেষ্টা করলাম একবার। ভাবলাম যে, মহাপ্রস্থানের পথে যখন চলেছি তখন নিঃসঙ্গ হয়েছি বলে দুঃখ করব কেন ? কিন্তু বৃথা চেষ্টা! আমি যুধিষ্ঠির নই। আর সত্যই মহাপ্রস্থানের যাত্রীও ত নই আমি। দৈহিক কষ্ট ও মনের দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি পাব কেন আমি!

তবে শক্তি পেয়েছিলাম নিশ্চয়ই ঐ দুস্তর পথে নিঃসঙ্গ যাত্রাও আমার সম্পূর্ণ করবার; কিছু সান্ত্বনা এবং ক্ষতিপূরণও।

তেমন দীর্ঘ নয় নির্দ্দিষ্ট পথটুকু—মাইল দুয়েরও কম। আর ঐ পথেই ত রয়েছে শোণ-প্রয়াগের ফুলঝুরিও। তা থেকে যে লক্ষ



বিকট পন্থ

লক্ষ জলকণা ছিটকে এসে পড়ল আমার মুখ ও মাথায়, তার স্নিগ্ধ প্রলেপ কি মনের গায়েও কিছুটা না লেগে পারে।

কিছু সান্ত্বনা পেলাম আরও একটি উৎস থেকে।

শোন-প্রয়াগের পুলের কাছে বাহাদুর আর ছত্রী বিশ্রাম করতে বসেছিল। আমি ওখানে পৌঁছতে না পৌঁছতেই আমার কাঁধের ঝুলিটি এক রকম টেনেই নামিয়ে নিল বাহাদুর। নিয়েই সে ওটাকে বেঁধে ফেলল তার নিজের মোটের সঙ্গে। সরবে প্রতিবাদ করবার সুযোগই পেলাম না আমি; প্রায় অভিভাবকের কর্ত্তৃত্বের স্বরেই সে বললে, ওপারে কঠিন চড়াই আছে বাবুজী। নিজে হালকা না হলে আপনি চলতে পারবেন কেন!

কিন্তু ওতেই শেষ নয়।

আমি মুগ্ধ চোখে শোণ-গঙ্গার অভিসারযাত্রী দর্শন করছি বুঝে আমাকে ওখানে রেখেই ওরা দু'জনে এগিয়ে গিয়েছিল। পরে আমি চড়াই পথে মাইল খানেক চলবার পর দেখি যে, বাহাদুর পথের ধারে শিলাখণ্ডের উপর একা বসে রয়েছে।

বোঝা নিয়ে চড়াই ভাঙতে খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি ? মোলায়েম সুরে জিজ্ঞাসা করলাম তাকে।

কিন্তু সবেগে মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করল বাহাদুর নহী বাবুজী।

তবে এখানে বসে আছিস কেন ?

আপনি যে একা একা আসছেন।

চমকে উঠলাম—ধরা পড়ে গিয়েছি নাকি বাহাদুরের চোখে। কিন্তু তখনই আবার কানে এল তার কথা, বড় কঠিন পথ এ দিকটাতে। আপনি বাবুজী, আমার কাঁধে উঠে বসুন।

বলে কি বাহাদুর! বোঝা ত আছেই ওর পিঠে, তার উপর ঠিক শাকের আঁটি ত হব না আমি—রোগা হলেও ত একশো পাউণ্ডের কাছাকাছি আমার ওজন। সেই আমাকেও সে তার সোয়ামণী বোঝার উপরে তুলে নিতে চাচ্ছে! সবিস্ময়ে আমি বললাম, বলিস কি রে! এত ভার তুই বইতে পারবি কেন?

আগের মতই আত্মবিশ্বাস তার, সনির্ব্বন্ধ অনুরোধও, খুব পারব বাবু।

আমি বললাম, পারলেও তা করতে যাবি কেন তুই?

হাঁটতে যে আপনার কষ্ট হচ্ছে।

ভাষা ছলনাময়ী, কিন্তু গলার স্বর আর চোখের দৃষ্টি ত মিথ্যা দিয়ে কলুষিত হয় না। আর চিত্র বা মঞ্চের অভিনেতাও নয় এই পর্ব্বতসন্তান অসভ্য বাহাদুর। কিছুতেই মনে করতে পারি না আমি যে, তার মনের আসলভাব মুখে প্রকাশ করে নি সে। চোখের দর্পণে ওর মনটাকেও যে স্পষ্ট দেখছি আমি।

বুকের মধ্যে প্রচণ্ড একটি দোলা লাগল আমার—তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

তথাপি আবার অনুরোধ করে বাহাদুর, আ যাইয়ে বাবু।

উত্তরে যা আমার বলা উচিত ছিল তা বলতে পারলাম না। বরং ধমক দিলাম তাকে, দূর বোকা! আমি তোর কাঁধে চাপলে দু'জনেই গড়িয়ে পড়ে মারা যাব যে!

শুনে নিরাশ হ'ল বাহাদুর। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর সে ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বললে, তা হলে, বাবুজী, আমার আগে আগে কাছাকাছি চলুন আপনি, যাতে আমি চোখে চোখে রাখতে পারি আপনাকে।

তাই চললাম বাকি পথটুকু। মাইল দুয়েক মোটে দূরত্ব। তবু থেমে এবং বসে বিশ্রাম করলাম বার কয়েক। আর অমনি এক বিশ্রামের ফাঁকেই দেখলাম সেই কুকুরটিকে।

আকস্মিক দর্শন। মনে হ'ল যেন মাটি ফুঁড়ে উঠেছে। খুব বড় নয়, দেহের তুলনায় মুখটা তার আরও ছোট—প্রায় কচি শিশুর মুখের মতই কাঁচা ও কোমল মনে হয়। কিন্তু বলিষ্ঠ গঠন তার, আর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার ছোট ছোট দুটি চোখে। সারা গায়েই লম্বা লম্বা লোম, আগাগোড়া কালো। প্রায় দুই ইঞ্চি প্রশস্ত ইস্পাতের ঝকঝকে বকলস আঁট করে বাঁধা আছে তার গলায়। হঠাৎ ওকে কাছে দেখে চমকে উঠেছিলাম আমি।

কিন্তু বাহাদুর বুঝিয়ে বললে। উপরে কোন মেষপালকের পশুপাল চরে বেড়াচ্ছে হয়ত। তারই পোষা পাহারাওয়ালা কুকুর এটি—নীচের পথে মানুষের সাড়া পেয়ে নেমে এসেছে। অথবা গৌরীকুণ্ড থেকেও এগিয়ে আসতে পারে—সরকারী কুকুর আছে সেখানে, আছে কোন কোন চটিওয়ালারও। সব চটিতেই থাকে এমন কুকুর। রাত্রে চটি পাহারা দেয় তারা, দিনের বেলায় মুনিবের ছাগল-মোষ পাহাড়ের উপর চরতে গেলে সঙ্গে গিয়ে তাদের খবরদারি করে। যাযাবর পশুপালকের প্রয়োজনে ভাড়াও খাটে এই সব কুকুর।

নেকড়ে বা চিতাবাঘের চেয়েও নাকি তীক্ষ্ণ এদের দাঁত, গায়ের জোরও কম নয়।

ঐ 'বাঘ' শব্দটির প্রভাবেই নিশ্চয়ই—বিদ্যুদ্দীপ্তির মত আমার মনে পড়ে গেল অনেক বৎসর পূর্ব্বে রুদ্ধ নিশ্বাসে যা পড়েছিলাম সেই জিম করবেটের বইতে রুদ্রপ্রয়াগের মানুষখেগো চিতাবাঘের প্রায় অলৌকিক কুকীর্ত্তিগাথা। আশ্চর্য্য! সেই রুদ্রপ্রয়াগ অতিক্রম করে গাড়োয়াল জিলায় কত বনের ভিতর দিয়ে অনেক সময় একা একা চলতে চলতেও একদিনও সে কাহিনী বা বাঘের ভয় একবারও মনে জাগে নি কেন? সে বাঘটা যে অবশেষে মারা পড়েছিল তা নিশ্চিত জানি বলেই অমন তামসিক বিস্মৃতি আমার, না মন আমার সুদূর আশ্বাসের প্রসাদ পেয়েছে অন্য কোন উৎস থেকে?

এখন মনে পড়বার পরেও, করবেটের সেই শয়তান বাঘটাকে কল্পনার চোখে অস্পষ্ট ভাবে দেখতে দেখতেও হালকা কৌতূহলের স্বরেই জিজ্ঞাসা করলাম আমি, বাঘ-টাঘ আছে নাকি এ সব পাহাড়ে?

আমারই মত নির্ভয় বাহাদুরও। সে হেসে উত্তর দিল: উপরের জঙ্গলে থাকে তারা। ছোট ছোট জানোয়ার সব। মানুষের কাছ দিয়েও ঘেঁষে না। কুকুরের সঙ্গে লড়াই হলে হেরে যায়, মারা পড়ে।

আশ্বস্ত হবার মতই খবর। কিন্তু বিশ্বাস হয় না। আমার সন্দেহ বুঝতে পেরে নিজেই বুঝিয়ে বললে বাহাদুর।

ঐ যে বকলস আছে কুকুরের গলায়, নেকড়ের দাঁত তা ভেদ করতে পারবে না। কিন্তু কুকুরের তীক্ষ্ণ দাঁতগুলি চক্ষের নিমেষে নেকড়ের গলার মাংস ভেদ করে ঢুকে যাবে। তাছাড়া, নেকড়ে বা চিতা আসে একক, কুকুর থাকে জোড়া জোড়া। একটি নেকড়ে বা চিতা যত বলবানই হোক না কেন, দুটি কুকুরের সঙ্গে লড়ে সে জিততে পারবে কেন; তাই পালিয়ে যদি সে বাঁচতে না পারে তবে কুকুরের সঙ্গে মৃত্যু তার অনিবার্য্য।

কিন্তু অত বড় যোদ্ধা যে কুকুর, সে দেখতে অত শান্ত কেন? বাহাদুরের মুখে গল্প শুনবার পর আবার কুকুরটির দিকে তাকিয়ে দেখি যে, সে একদৃষ্টে আমাদের দিকে চেয়ে আছে বটে, তবে দৃষ্টিতে তার একটুও হিংস্রতা নেই।

তবু সন্ত্রস্ত কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করলাম আমি, এটা কামড়াবে না ত?

না, বাবুজী, হেসে উত্তর দিল বাহাদুর: দিনের বেলায় কাউকে কিছু বলে না ওরা। আর যাত্রীকে রাত্রেও চিনতে পারে।

সত্যই নিরীহ জীব মনে হচ্ছে কুকুরটিকে। আমরা উঠে চলতে আরম্ভ করবার পর দেখি যে, পোষা কুকুরের মতই ওটি আমার পিছনে পিছনে আসছে।

আবার পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থানের কাহিনী মনে পড়ে গেল আমার। ভুল করেছিলাম তখন। যুধিষ্ঠির ত সে যাত্রায় একে-

বারে নিঃসঙ্গ কখনও হন নি—একটি কুকুর স্বর্গ পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গে গিয়েছিল।

মনে পড়বার পরেই আরও ভাল লেগেছিল কুকুরটিকে। কিন্তু তখনই পিছন ফিরে আর দেখতে পেলাম না তাকে। কোন ফাঁকে কোন দিকে যে গেল সে, তা বাহাদুরও বলতে পারে না।

একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম বই কি! কিন্তু মিনিট দশেক পর অভ্যাস মত আবারও পিছন দিকে তাকিয়ে দেখি—কুকুরটি আমার পিছনে না থাকুক, হাতের গামছা দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ভারবাহী বীরবাহাদুর আমার অনুসরণ করছে।

আবার চকিত বিদ্যুদ্দীপ্তি আমার মনে। চোখের সামনে উপস্থিত না থাকলেও সেই কুকুরটিকে এখন আমার আরও বেশী ভাল লাগছে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তার। সে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে যে,আমার মঙ্গল কামনায় আমাকে তার অনুসরণ না করলেও চলে।

এ পথের সর্ব্বত্রই দেখছি যে, চটির এলাকায় ঢুকলেই প্রতিটি দোকান থেকেই সাদর সম্ভাষণ কানে আসে। গৌরীকুণ্ডের অভ্যর্থনা পেলাম বসতি এলাকায় ঢুকবার আগেই।

বেশ সম্ভ্রান্ত ও সম্পন্ন রূপ গৌরীকুণ্ডের। গুপ্তকাশী ছাড়বার পর এমন আর চোখে পড়ে নি। শহর বলেই মনে হয়। অনেক-গুলি বাড়ী, সব কখানাই পাকা। আরও বৈশিষ্ট্য গৌরীকুণ্ডের—দুই থাকের বসতি এটি। যে পথে হেঁটে এলাম সেই পথ দেখি উপর দিয়ে চলে গিয়েছে। সেই পথ থেকেই একটি শাখা বের হয়ে গিয়েছে নীচের থাকের ভিতর দিয়ে। ঘরবাড়ীর সংখ্যা নীচেই বেশী। খোলামেলা একটি চত্বরও উপর থেকেই চোখে পড়ল সেখানে, যা ধর্ম্মশালার প্রাঙ্গণও হতে পারে, আবার বাজারও। কোন দিকে যাব ঠিক করতে না পেরে থমকে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেই মোড়ে।

আর সেখানেই আমার মুখোমুখি থমকে দাঁড়ালেন যিনি হন হন করে উপর থেকে নীচে, মানে রামপুরের দিকে যাচ্ছিলেন—সুঠাম, দীর্ঘ দেহ, তেমন উজ্জ্বল না হলেও গৌরবর্ণ, গায়ে সুতীর কামিজ, হাতে তার লাঠি নেই দেখেই বুঝলাম যে, তিনি আমাদের মত বিদেশী যাত্রী নন।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি ত বাঙালী—কলকাতা থেকে আসছেন?

ভাষা বাংলা, কিন্তু উচ্চারণে একটু আড় আছে। আমি ঘাড় নেড়ে স্বীকার করা মাত্রই তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, রামকৃষ্ণ মিশনের শিষ্য নাকি আপনি?

চটিওয়ালাদের সম্ভাষণের মাধুর্য্য নেই তার কথায়। কেমন যেন জেরার সুর। চোখের দৃষ্টিতে তার তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসা রয়েছে বলেই যেন তার সুরটা অত বেশী কানে লাগল আমার। ঈষৎ বিরক্ত হয়েই আমি বললাম, কেন, বলুন ত?

উত্তর তৎক্ষণাৎ আমার কথার পিঠেই: আমার নাম মহাদেব-প্রসাদ। রামকৃষ্ণ মিশনের পাণ্ডা কি না আমি, তাই জিজ্ঞাসা করছি আপনাকে। বলতে বলতে হাসলেন তিনি।

হাসলাম আমিও—পাণ্ডা না হলে কি আর অত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে কারও চোখে, অমন জেরা করে কেউ! তবে খুশীও হয়েছি। গুপ্তকাশীতে চক্রধরের সঙ্গে যখন রফা হয় আমাদের তখনই জিতেনের মুখে শুনে মহাদেবপ্রসাদ উপাধ্যায়ের নামটা আমার মনে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। কেদারনাথের পাণ্ডা ইনি। কেদারে পৌঁছবার পূর্ব্বেই তাঁর সাক্ষাৎ দর্শন পেয়ে এখন খুশী হব বই কি!

এর পর সহজভাবেই কথা বললাম তাঁর সঙ্গে। বললাম তাঁকে চক্রধরের কথাও—প্রশংসার সুরেই বললাম। সত্যই কিছু উপকার ত আমরা পেয়েছি তার কাছে। জিতেনদের সঙ্গে ত্রিযুগীপাহাড়ে উঠে গিয়েছে চক্রধর; তাদের সঙ্গেই সেও এখানে এল বলে।

কিন্তু মহাদেবপ্রসাদ দেখি একটু যেন ক্ষুণ্ণ। ক্ষুণ্ণ কণ্ঠেই তিনি বললেন, হরিদ্বার থেকে বাবুজী একখানা যদি চিঠি লিখে দিতেন আমাকে তা হলে এত আগে কেদার থেকে নেমে আসতাম না আমি। তবু কোন ভাবনা নেই আপনাদের। আজ এখান থেকেই আমার গোমস্তাকে আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি। সে আপনাদের উপযুক্ত যত্ন-সমাদর করবে—আমি ওখানে না থাকলেও কোন কষ্ট হবে না আপনাদের। ক'জন আছেন আপনারা? নাম বলুন ত।

তখনই টুকে নিলেন তিনি। শুধুই কি তাই! নীচের থাকে ঠিক গৌরীকুণ্ডের ধারে ভাল একখানা চটিতে আমার থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন; বার বার হুসিয়ার করে দিলেন চটিওয়ালাকে যাতে আমার বা আমার দলের কারও কোন অসুবিধা না হয়।

বিদায় নেবার আগে মহাদেবপ্রসাদ সতর্ক করে দিলেন আমাকে, অনেক বেলা যদি থাকেও তবু, বাবু আজ এখান থেকে যাত্রা করবেন না। সামনে পথ মোটে সাত মাইল হলে কি হবে, এইটুকুই হ'ল কেদারের বিকট পন্থ।

শুনে আসছি কথাটা কলকাতা ছাড়বার আগে থেকেই। শেষের এই পথটুকু সম্বন্ধে আমার একাধিক অভিজ্ঞ বন্ধু বার বার সতর্ক করে দিয়েছেন আমাকে। সেই সব স্মরণ করে বিজ্ঞের হাসি হেসেই আমি বললাম,—না, পাণ্ডাজী, আজ ত যাবই না, কালও একদিনে সবটা পথ চলবার ইচ্ছা নেই আমার। রামোয়ারাতে রাত্রিবাস করব।

শুনে তৎক্ষণাৎ সায় দিলেন মহাদেবপ্রসাদ, তাই ভাল বাবু। শরীর, মন দুই-ই ভাল থাকবে তাতে। আর তাড়াহুড়ো করে যাবার দরকারই বা কি? কেদার-বদরীতে বরফ পড়তে এখনও ঢের দেরি।

গঙ্গোত্রীর তাড়াতেই আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল তা—সেদিন রামপুর থেকে খুব ভোরে যাত্রা করেছিলাম। সুতরাং পথে অনেক জায়গায় বিশ্রাম করে ধীর-মন্থরগতিতে এগিয়ে এলেও বেশ সকাল

সকাল গৌরীকুণ্ডে পৌঁছে গিয়েছি। জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখবার পর ঘড়িতে দেখি যে তখনও দশটা বাজে নি।

জানি যে এখানে এসে পৌঁছতে দেরি হবে ওদের। তাড়াতাড়ি রান্না চাপাবার দরকার নেই। সুতরাং স্নানের আয়োজনও আমার চলল মন্থরগতিতেই।

আমি যে চটিতে আছি তার সামনেই আসল গৌরীকুণ্ড—এখানেই নাকি ঋতুস্নান করেছিলেন গৌরী। কেবল নামে নয়, আসলেও এটি কুণ্ডই। হাত দশেক হয়ত লম্বা, চওড়াও তেমনি। ঠিক কাণায় কাণায় না হলেও প্রায় পরিপূর্ণ। যাত্রী-সড়কের গা ঘেঁষে অবস্থিতি ওর। সেই সড়ক ভেদ করে উপরের পাহাড় থেকে কুণ্ড পর্যন্ত কোন নল নিয়ে আসা হয়েছে কি না কে জানে। কিন্তু এদিক থেকে বাঁধের মত উঁচু সড়কের নীচের দিকে ফুটো ও নল দুই-ই বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। সেই নল দিয়ে অনবরত জল পড়ছে কুণ্ডের মধ্যে। পড়ন্ত জল দেখতে সাধারণ জলের মতই, কিন্তু কুণ্ডের জল হলদেটে। ঐ রঙটাই আরও একটু ঘন হয়ে দুধের সরের মত কুণ্ডের জলের উপর এখানে-সেখানে ভাসছে এবং মলমের মত লেগে আছে নলের মুখে। ঠাণ্ডা জল। সব মিলিয়ে গৌরীকুণ্ড পল্লীবাংলার পানাপচা খিড়কির ডোবার মত।

যাত্রীরা, বিশেষতঃ সধবা ও কুমারী মেয়েরা নাকি পরম ভক্তিভরে এই গৌরীকুণ্ডে অবগাহন স্নান করে। কিন্তু সেদিন ঐ কুণ্ডে একজন স্নানার্থীও চোখে পড়ল না আমার। আমি নিজে ঐ জলে স্নান করবার কথা ভাবতেও পারি না। সুতরাং এগিয়ে গেলাম উত্তরে তপ্তকুণ্ডের দিকে। সেটিও ঐ নীচের থাকেই, বেশী দূরেও নয়।

কোন অদৃশ্য উৎস থেকে যেন এই কুণ্ডেও জল আসছে। ওদিকে ঠাণ্ডা কুণ্ডে যেমন, এই কুণ্ডের গায়েও তেমনি দেখা যাচ্ছে একটি নলের মুখ। তবে এ জল গরম; এ কুণ্ড আকারে অপেক্ষাকৃত বড়। এর পরিবেশও ঢের বেশী পরিচ্ছন্ন ও সমৃদ্ধ। গুপ্তকাশীতে যেমন দেখেছিলাম তেমনি চকমিলান গঠন এখানেও। প্রাঙ্গণের ঠিক মাঝখানে কুণ্ড। পারে গৌরীদেবীর মন্দির। স্ত্রী-পুরুষ ক'জন যাত্রী দেখলাম স্নান করতে এসে কুণ্ডের চারিদিকে ছড়িয়ে বসেছে। মাহাত্ম্যের কথা বলতে পারি না, জনপ্রিয়তা দেখলাম এই তপ্তকুণ্ডেরই বেশী।

আর হবেই বা না কেন। একে ত এ কুণ্ডের জল পরিষ্কার সাদা, তায় আবার উষ্ণ সে জল। ছয় হাজার ফুটেরও বেশী উঁচু এই গৌরীকুণ্ড বসতি। বেশ শীত এখানে। ঘরে গিয়ে গায়ের জামা ছাড়বার পর কাঁপুনি ধরেছিল। কুণ্ডের প্রাঙ্গণে চনচনে রোদ আছে বলেই আদুড়-গা হতে পেরেছি এখন। এহেন জায়গায় একেবারে নিখরচায় ও বিনা পরিশ্রমে যত খুশী গরম জল যদি পাওয়া যায় তবে তার কদর হবে বই কি! আমি ত তপ্তকুণ্ডের খবর পেয়েই উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম।

কিন্তু বড্ড গরম ঐ কুণ্ডের জল। পারে বসে ডান হাতের আঙুল ক'টি জলে ডোবাতেই এমন ছেঁকা লাগল যে, চমকে হাত টেনে নিলাম। তার পর যখনই চেষ্টা করি তখনই ঐ একই অভিজ্ঞতা। অত তপ্ত জলের কুণ্ডের মধ্যে নেমে ডুব দিয়ে যে স্নান করা যায় তা আমার বিশ্বাসই হয় না। মন্দিরের পূজারী অভয় দিল আমাকে, উৎসাহও দিল। কিন্তু সাহস হয় না আমার। আধ ঘণ্টাখানেক ওখানে বসে থেকেও ডুব দিতে দেখলাম না একজনকেও। যে দু'একজনকে যাত্রী বলে মনে হচ্ছিল তারাও দেখি ঘটি ডুবিয়ে জল তুলে তাই অল্প অল্প গায়ে ঢালছে।

ততক্ষণে আমার কানে অন্য একটি নিমন্ত্রণ এসে পৌঁছেছে। সেই পরিচিত গর্জনধ্বনি মন্দাকিনীর। শুনলাম যে খুব কাছেই আছেন তিনি। আর দেখি যে সত্যই তাই। কুণ্ড থেকে দু'মিনিটেরও পথ নয়। আর তেমন খাড়াও নয় পার। অন্যত্র যেমন দেখেছি এখানেও তেমনি ভয়ঙ্কর রূপ মূল ধারার। কিন্তু তা তীর থেকে অনেক দূরে। পারের কাছে ছোটবড় অসংখ্য শিলাখণ্ডের গা ঘেঁষে বা উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে সেই মন্দাকিনীরই যে জল ছুটে চলেছে তাতে তীব্র গতি থাকলেও গভীরতা মোটেই নেই। পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত সেই জলে ডুবিয়ে কোন একখানি শিলাসনে নির্ভয়ে বসে তোয়ালে ভিজিয়ে গা রগড়ানো যায় এখানে, ঘটি ভরে জল তুলে মাথায় ঢালা যায়।

তপ্তকুণ্ডের জল যত গরম মন্দাকিনীর জল তত ঠাণ্ডা। এ জলেও আঙুল ডুবিয়েই একেবারে বিপরীত কারণে তৎক্ষণাৎ হাত টেনে নিয়েছিলাম। তবু দেখি যে, মন্দাকিনী আমায় টানছেন। টানের চেয়েও বেশী। সেই যে কনখলের গঙ্গায় একটি ডুব দেবার পরেই গঙ্গা-স্নানের নেশা লেগেছিল আমার, এ সেই নেশা। কুণ্ডচটি ছাড়াবার পর এ ক'দিন মাঝে মাঝে মন্দাকিনীর দর্শন পেলেও স্পর্শ আর পাই নি। আজ তা লাভ করবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার মাতাল হয়ে উঠল আমার মন। এক নিমেষেই শীতের ভয়, নিউমোনিয়ার ভয় দুই-ই কাটিয়ে উঠল তা।

অবগাহন স্নান নয়, তবু তাতেই পরম তৃপ্তি। ক্লান্ত দেহ ও ক্লিষ্ট মন আমার সঞ্জীবিত হয়ে উঠল যেন। গঙ্গার প্রসাদ বলব নাকি একে! যাই হউক, এ যাত্রায় গঙ্গাস্নানের আনন্দ নিঃসংশয়ে আমার এক পরম লাভ।

১৩

'ভুংক্তে ভোজয়তে চৈব'। শাস্ত্রমতে খাওয়ার মত খাওয়ানোও প্রীতির লক্ষণ। আগের দিন গঙ্গোত্রী আমাদের জন্য ভাতে-ভাত রেঁধে রেখেছিলেন। আজ তাদের জন্যও রেঁধে রাখলাম আমি। অতিরিক্ত কেবল ডাল। বাহাদুর অনেক খুঁজেও এক ছিলতে সব্জিও সংগ্রহ করতে পারে নি।

রান্না শেষ করে আমি যখন বারান্দায় এসে বসলাম তখনও রোদ ছিল। কিন্তু হঠাৎ নিভে গেল তা। মেঘে মেঘে ঢেকে গেল আকাশ। গুরু গুরু গর্জন কানে এল কয়েকবার। তারপর ঝম ঝম বৃষ্টি শুরু হ'ল।

এ আর কি দেখছেন!—বললেন চটিওয়ালা শেঠজী: বরফ পড়া যদি দেখতেন তবে বুঝতেন যে কি সুখে আমরা এখানে থাকি। দেখতে দেখতে সব ঢেকে যায়—পথ-ঘাট আর ঘরের চালের মত গাছপালাও সাদা হয়ে যায়।

সে সব স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ঘটনা নয় শেঠজীর কাছে। সশঙ্ক সম্ভ্রমে দুই যুক্ত কর ললাটে ঠেকিয়ে নিজের কথার ব্যাখ্যা নিজেই করেন তিনি: সবই কেদারনাথজীর লীলা। প্রলয়ের দেবতা তিনি—সব কিছু তছনছ করে দেন। তাতেই তার আনন্দ।

সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মত শেঠজীর ঐ কথা। আর প্রবল উত্তেজক স্মৃতি ও কল্পনার। নটরাজের রূপ মনে পড়ে গেল আমার; মনে এল গুরুদেবের গানের দু'একটি কলিও—'প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে, নটরাজ, হে নটরাজ'—

তবে মাটির মানুষ আমি—স্বর্গ থেকে তখনই মর্ত্যে নেমে এল আমার মন। ভাবানুষঙ্গে গঙ্গোত্রীকেও মনে পড়ে গেল। গুরুদেবের রচনা কিছু কিছু পড়েছেন তিনি, অথবা অন্য কেউ তাকে পড়ে শুনিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এখন এখানে তিনি উপস্থিত থাকলে সুরে না পারি, কবিতার ছন্দে ঐ গানখানি শুনিয়ে দিতাম তাকে।

তখন কি আর জানি যে, আমাদের দলটিকে নিয়েও নটরাজের কৌতুকলীলা শুরু হয়ে গিয়েছে।

সেই যে তাল কেটে গিয়েছিল তারপর আসর আর তেমন জমল না।

শেষ বেলায় ফিরে এলেন তাঁরা। কিন্তু একা চক্রধরকে ছাড়া আর কাউকে যেন চেনাই যায় না।

গায়ে বর্ষাতি চাপিয়েও ভিজে ঢোল সকলেই; পায়ের জুতা ও মোজায় অতিরিক্ত কাদার প্রলেপ। মুখে চোখে কালি পড়েছে। বৃদ্ধার নিষ্প্রভ চোখ দুটিকে মনে হচ্ছে দৃষ্টি একেবারেই নেই—গঙ্গোত্রীর কাঁধে ভর দিয়ে এগিয়ে আসছেন তিনি। জিতেনের মুখের ভাব অপ্রসন্ন; আর কেমন যেন উদাস দৃষ্টি তার চোখে।

একটু সজীবতা যা আছে একা ঐ গঙ্গোত্রীর মনেই। তাই ক্লিষ্ট মুখেও অল্প একটু হাসি ফুটিয়ে তিনি বললেন, খুব শিক্ষা হ'ল আজ। ভিজতে ভিজতে কেবলই মনে হয়েছে যে পঞ্চকেদারের রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করে আছেন যে নারায়ণ তাঁকেই আগে দর্শন করতে গিয়েছি বলে রুষ্ট কেদারনাথ আমাদের সাজা দিচ্ছেন।

আসলে অনুতপ্ত তিনি অন্য কারণে—বৃদ্ধা জননীর জন্য রামপুরেই কাণ্ডি ভাড়া করেন নি বলে। তখনই তিনি ঘোষণা করলেন যে অতঃপর মাকে তিনি এক পাও হাঁটতে দেবেন না।

জিতেনের মুখ ভার হয়েছে নৈরাশ্যে। মনের মত কিছুই দেখতে পায় নি সে, কারণ নীচেও যেমন উপরেও তাই।

আপনিই, মণিদা, বুদ্ধিমান—এই প্রথম মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করল সে: একেবারে অনর্থক হেঁটেছি অতিরিক্ত ছয় মাইল পথ। ব্যর্থ শ্রম বলেই ক্লান্তিও বোধ করছি বেশী।

সুতরাং আশা করেছিলাম আমি যে বিশ্রাম করবার সুযোগ পেলে জিতেন ছাড়বে না তা। এবং সেই জন্যই বৃদ্ধার একটু জ্বর-জ্বর ভাব দেখে পরদিন ভোরে গঙ্গোত্রী যখন আমাদের ঘরে এসে বললেন যে, সে দিনটা তাঁরা গৌরীকুণ্ডেই বিশ্রাম করতে চান তখন আমি খুব উৎসাহের সঙ্গেই এ প্রস্তাব সমর্থন করে বললাম, বেশ ত। তীর্থবাসের কালটা আমাদের আরও চব্বিশ ঘণ্টা বাড়বে তাতে।

কিন্তু ফস করে অস্বীকার করে বসল জিতেন: না, মণিদা, আর দেরি করতে মন চায় না আমার।

কেন হে?—বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

উত্তর না দিয়ে আগের কথারই পুনরাবৃত্তি করল জিতেন: ভাল লাগছে না।

একে ত অসামাজিক সঙ্কল্প জিতেনের; তার উপর বলবার ধরনটাও তার রূঢ়। শুনে অপ্রতিভের একশেষ আমি।

কিন্তু গঙ্গোত্রী মুচকি হেসে বললেন, কালই ত ভাইয়া ত্রিযুগী পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে উঠতে চেয়েছিলেন। তখনই বুঝেছিলাম আমরা যে কেদারনাথ দর্শন করবার জন্য ওর মন ব্যাকুল হয়েছে! তা বেশ ত। এগিয়ে যান আপনারা বরং কেদারে গিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন।

তবু লজ্জা যায় না আমার। ওদের মা ও মেয়েকে সহযাত্রী হিসাবে পাবার জন্য আমরাই আগ্রহ প্রকাশ করেছিলাম বেশী। অথচ বৃদ্ধাকে অসুস্থ জেনেও একটি দিন মাত্রও অপেক্ষা করতে চায় না জিতেন। ততক্ষণে পায়ে পট্টি বাঁধতে শুরু করেছে সে। তার মুখের ভাবও দেখি অসাধারণ রকমের গম্ভীর। আর একবার তাকে অনুরোধ করতে সাহস হ'ল না আমার। নিজের লজ্জা ঢাকবার জন্য উত্তরে গঙ্গোত্রীকে আমি বললাম, না, মা; কেদারে পৌঁছবার আগেই আবার দেখা হবে আমাদের। কলকাতা থেকেই ঠিক করে এসেছি আমি যে রামোয়ারা চটিতে রাত্রিবাস করতে হবে শেষ পরীক্ষাটা পাশ করবার মত শক্তি সঞ্চয় করবার জন্য। সুতরাং আজ সেই পর্যন্ত গিয়েই আমাদের হাঁটা শেষ। কাল সকালেও সেখানেই তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব আমরা।

বলতে বলতে আড়চোখে জিতেনের মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। পাছে জিতেন প্রতিবাদ করে সেই ভয়। তা সে করল না দেখে মনে মনে একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম আমি।

এবার আসল কেদারের পথ—সত্যই "বিকট" পন্থ।

পথ বলে মনেই হয় না। খাঁজ-কাটা থাকলে বলতে পারতাম যে, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছি। একতলা থেকে দোতলায়, দোতলা থেকে তিনতলায়—উপর থেকে আরও উপরে। আর তা কলকাতায় নয়, কাশীর বিশ্বনাথ গলিতে প্রাসাদের মত কোন একটা বাড়ীতে—তেমনই ঘেরা, তেমনই সঙ্কীর্ণ, তেমনই কঠিন, তেমনই খাড়া ঐ পথ। কিন্তু ধাপ নেই; তাই স্পষ্টই হামাগুড়ি দিয়ে

পাহাড়ে উঠছে। আগাগোড়া পাথরের পাহাড় এদিকে। উপরে গাছপালা খুবই কম; পায়ের কাছে ঘাস বা গুল্মের মত যা আছে তাও মনে হয় যেন পাথর। উতরাই আর নেই, এবার একটানা চড়াই। এ পথও যদি আর সব পার্ব্বত্য পথের মতই ঘুরে ঘুরে গিয়ে থাকে তবে তা বুঝবার জো নেই। সমস্ত মনোযোগই ত নিজের পা-দুখানির দিকে—সামনে দু-তিন হাতের বেশী দেখাই যায় না। সেটুকুর গতি সর্ব্বত্রই দেখছি উর্দ্ধমুখী।

মানসিক, দৈহিক ও পারিপার্শ্বিক প্রত্যেকটি অবস্থাই সপ্তপদীর প্রতিকূল। তবু এ যাত্রায় ঐ সপ্তপদী গতি আমার—মানে, পাঁচ-সাত পা চলবার পরেই থমকে দাঁড়াতে হচ্ছে। কারণ, হয় পা ভেঙে আসছে, নয় দম বন্ধ হবার উপক্রম। ক্রমান্বয়ে লজেঞ্জ বা মিছরির টুকরা মুখে পুরেও শুকনো জিভ আর তালু সরস রাখতে পারছি নে। এত দুঃখেও হাসি পাচ্ছে আজ—গত কদিন চড়াই ভাঙতে যে কষ্ট পেয়েছি তাকেই কষ্ট মনে করেছি বলে।

শুনি যে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে এই পথের উপরেই পুরু হয়ে বরফ পড়ে থাকে—কোথাও পাথরের মতই শক্ত কোথাও আবার দইএর মত কাদা কাদা, কিন্তু সর্ব্বত্রই স্বগুণে তুষার শীতল। সাধে কি আর বিকট পন্থ বলে একে।

সেই আবদার আবার আজ সকালেও করেছিল বাহাদুর—আমাকেও সে তার পিঠে তুলে নেবে। ধমক খেয়ে মুখ কাঁচুমাচু করে সে বললে, তা হলে বাবুজী, ঘোড়ায় চেপে চলুন আপনি—সামনে বড়ই কঠিন পথ।

'কঠিন' পথ কথাটা শুনে শুনে সঙ্কল্পও কঠিন হয়েছে আমার—যত কষ্টই হউক না কেন, পায়ে হেঁটেই এ পথ অতিক্রম করব আমি। সুতরাং বাহাদুরের বিকল্প প্রস্তাবও অগ্রাহ্য করেছিলাম।

তাই শুনেই বাহাদুর বললে, ঘোড়ার ভাড়া আমার মজুরি থেকে কেটে নেবেন বাবু।

তার ড্যাবডেবে চোখ দুটির দিকে চেয়ে কথা তার অবিশ্বাস করতে পারি নি বলেই এবার আর মুখ ফুটে প্রত্যাখ্যান করতে পারি নি তার অনুরোধ। কিন্তু নিজের সঙ্কল্পে আমি অটুট থেকে হেঁটেই রওনা হয়েছিলাম গৌরীকুণ্ড থেকে।

খানিকটা চলবার পরেই বেশ বুঝতে পারলাম যে আমার মনের একটা অংশ এখন হায় হায় করে অনুতাপ করছে।

পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থানের কাহিনী আবার পুনঃ পুনঃ মনে পড়ছে আমার—দ্রৌপদী থেকে শুরু করে পাঁচ জনের পতন যে হয়েছিল তা নিশ্চয়ই এই শেষের সাত মাইলের মধ্যে।

৬০০০ ফুট লেখা দেখেছিলাম গৌরীকুণ্ডে ঢুকবার মুখে। এবার ৭০০০ ফুটের নিশানা চোখে পড়ল। কেদার দেখি ওখান থেকে ৬ মাইল। মানে, দূরত্বের হিসাবে যে পথটুকু এক মাইলেরও কম সেইটুকুই আকাশের দিকে উঠে গিয়েছে পুরা ১০০০ ফুট। কৌতূহলী হয়ে ঘড়ি দেখলাম—এটুকু পথ আসতে আমার লেগেছে প্রায় এক ঘণ্টা।

আরও খানিকটা এগিয়ে দেখি, সড়ক থেকে কিছুটা উপরে ভাঙা ভাঙা একখানি কুটির। কাছেই নেড়া নেড়া একটি গাছ। ঘরের চাল আর গাছের ডালে ডালে দেখি ছোট ছোট অসংখ্য জীর্ণ কাপড়ের টুকরা ঝুলছে।

মানুষের থাকবার ঘর নয়, ভৈরবের মন্দির। চীরবাসা ভৈরব। মন্দিরের সামনেই একখানি পাথরের উপর জিতেন বসে রয়েছে। কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি তার চোখে।

বোধ করি মন্দিরের পুরোহিতই হবেন তিনি যিনি বুঝিয়ে বললেন আমাকে।

কেদারক্ষেত্রের দ্বারপাল চীরবাসা ভৈরব। তাঁকে পূজায় সন্তুষ্ট করে তাঁর অনুমতি লাভ করতে পারলে তবেই কেদারনাথের দর্শন পাওয়া যাবে।

এত যাঁর ক্ষমতা, কি দিয়ে সন্তুষ্ট করতে হবে তাঁকে?

উত্তর হ'ল: জীর্ণ চীরমাত্র—ইনি যে চীরবাসা ভৈরব।

তাই গাছের ডালে ডালে ঝুলছে ঐ জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডগুলি।

নিজের দৈহিক অবস্থার তাগিদেই হবে, মাথায় আমার একটা ব্যাখ্যা এসে গেল ভক্তের কাছে অমন শক্ত ভৈরবের অত তুচ্ছ দাবির।

জিতেনকে উদ্দেশ করে হেসে বললাম আমি: গায়ের কাপড় ত ছার, হালকা হবার জন্য দেহটিকেই ত এখানে ছুড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে হয়। আর এই দুর্গম পথে এতদিন হেঁটে আসবার পর পরিধেয় বস্ত্র চীর হবে না ত কি?

কিন্তু পরিহাসের ধার দিয়েও গেল না জিতেন। রীতিমত গম্ভীর স্বরে সে বললে, না মণিদা। আমার মনে হয় যে, পূজার এই যে অসাধারণ উপকরণের দাবি এখানে, অত্যন্ত গভীর আধ্যাত্মিক অর্থ আছে তার। ভোগের সর্ব্বশেষে উপকরণের সঙ্গে লজ্জাটুকুও এই ভৈরবের চরণে উৎসর্গ করতে না পারলে কেদারনাথের দর্শন পাওয়া যায় না—তিনি যে সর্ব্বত্যাগী শিব।

শুনে বিস্মিত হয়ে বললাম আমি: ব্যাপার কি, জিতেন? এত সব তত্ত্বকথা তোমার মনে আসছে কেন?

অল্প একটু হেসে জিতেন উত্তর দিল: আসবে না? কত উপরে উঠে এসেছি একবার ভাবুন ত।

বলেই উঠে দাঁড়াল সে। পরক্ষণেই অগ্রগতি তার। আমি তার অনুসরণ করছি কি না, দেখবার জন্য একবারও পিছন ফিরে তাকাল না সে।

বাহাদুরেরও চোখ এড়ায় নি। নিজের মোট পিঠে তুলে নেবার পূর্ব্বে ক্ষুণ্ণকণ্ঠে সে বললে, ছোটা বাবুজী ন মালুম কিসলিয়ে উদাস হো গয়া।

কেদারপথের শেষ চটি রামোয়ারা। ৮০০০ ফুট উঁচুতে মন্দাকিনীর পারে স্বল্পপরিসর, ঢালু, পাথর জাতের জমির উপর চার-পাঁচখানা চালা ঘর ও একখানি মাত্র দ্বিতল কাঠের বড় যাত্রী-

নিশ্বাস নিয়ে এ পথে শেষ বিশ্রাম স্থান ক্লান্ত যাত্রীদের। চার মাইলেরও কিছু কম পথ পাকা সাড়ে তিন ঘণ্টায় অতিক্রম করে সেই অর্দ্ধমৃত অবস্থাতেও এই ভেবে মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম আমি যে, অন্ততঃ সে দিনের মত চলা আমাদের শেষ হয়েছে।

অথচ ঠিক তখনই জিতেন বললে, এখানে শুনছি যে দুধের সঙ্গে আটার রুটিও কিনতে পাওয়া যায়। একটু বিশ্রাম করবার পর তাই কিছু খেয়ে চলুন যাওয়া যাক। বেলা তো এখন বারটাও বাজে নি, আর সামনে পথ বাকি আছে মোটে তিন মাইল।

পরিহাস মনে করতে চেয়েও পারি নে—জিতেনের মুখের ভাবে সঙ্কল্পের দৃঢ়তার সঙ্গে কেমন যেন এক অস্বাভাবিক অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে।

তথাপি পরিহাসের স্বরেই আমি বললাম, এত তাড়া কেন, জিতেন? কেদারনাথ ত উড়ে যাচ্ছেন না। একদিন পরে গেলেও ঠিকই তাঁর দর্শন পাওয়া যাবে।

কিন্তু ভঙ্গিতেও সে-পরিহাসে যোগ দিল না জিতেন; বরং আগের চেয়েও গম্ভীর স্বরেই সে বললে, আমি এগিয়েই যেতে চাই, মণিদা। বেশ দম আছে আমার।

আমি তখন বিরক্ত হয়ে বললাম, কিন্তু আমার নেই। আজ আর এক পাও হাঁটতে পারব না আমি।

বৃদ্ধ চটিওয়ালাও আমাকেই সমর্থন করল। জিতেনকে উদ্দেশ করে সে বললে, সামনে আরও বিকট চড়াই আছে, বাবুজী। তাছাড়া বৈকালের দিকে ঝড়বৃষ্টির ভয়ও খুব। ভাল হয় আজ এখানেই থেকে গেলে। কেদারনাথজীর চূড়া ত এখান থেকেও দেখা যায়—ঐ সামনে তাকালেই হ'ল।

হস্তসঙ্কেতে দেখিয়েও দিল সে। সত্যই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একাধিক বরফ-ঢাকা পর্ব্বতশৃঙ্গ। রোদ নেই, তবু ঝলমল করছে নির্ম্মল শুভ্রতা।

জিতেনও সেই দিকে তাকিয়েছে। দেখে অনুনয়ের কোমল স্বরেই আমি আবার তাকে বললাম, পাগলামি কর না জিতেন। আজ সন্ধ্যাবেলায় কেদারে গিয়ে পৌঁছনোর চেয়ে কাল সকালের দিকে সেখানে পৌঁছনো ঢের ভাল হবে। ভাল সাথীও পাব কাল সকালে—গঙ্গোত্রীরাও ত ভোরেই গৌরীকুণ্ড থেকে রওনা হয়ে আসবেন।

জিতেন কোন উত্তর দিল না দেখে ভাবলাম যে একটু বুঝি নরম হয়েছে তার মন। সুতরাং অপেক্ষাকৃত আশ্বস্ত হয়ে মালপত্র নিয়ে আমি আর বাহাদুর উপরে গেলাম ভাল একখানি ঘর দখল করবার উদ্দেশ্যে।

আপাততঃ কোন প্রতিযোগিতা নেই। তবে এ সব চটিতে প্রতিযোগিতার সম্ভাবনাকে সর্ব্বদাই মনে না রাখলে অনেক সময়েই অসতর্ক যাত্রীর দুর্ভোগের সীমা থাকে না, কেন না যে কোন সময়েই যে কোন দিক থেকেই এক বা একাধিক ঝাঁক যাত্রী এসে অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে।

তবে নির্ব্বাচনের ক্ষেত্র খুবই সঙ্কীর্ণ এই রামোয়ারাতে। উপরে দুখানামাত্র ঘর। সিঁড়ির কাছের ঘরখানাকে ভাবী প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্ত রেখে ভিতরের ঘরখানাই দখল করলাম আমরা।

বেশ বড় ঘর। রান্নার জন্ত উত্তর দিকে সারি সারি উনান পাতা থাকলেও শোবার জন্ত জায়গার অভাব মনে হয় না। কেবল তিন জনের জন্ত জায়গা ত অঢেল। দক্ষিণ দিকে সরু হলেও ঢালা বারান্দাও আছে। সেখানে দাঁড়ালে নীচে মন্দাকিনীর ধারা একটু দূরে হলেও স্পষ্ট দেখা যায়। আর বেশ খানিকটা দূরপর্যান্তও। নীচে মন্দাকিনী রয়েছেন বলেই দুপারে দুসারী পাহাড়ের মাঝখানটা স্বভাবতঃই ফাঁকা। অনেকক্ষণ পর্যান্ত ক্রমাগত পাহাড়ের প্রাকার দেখবার পর এখন খানিকটা ফাঁকা জায়গা চোখে পড়তেই মনের সেই হাঁফ-ধরা ভাবটা অনেক কমে গেল।

কিন্তু ঘরের মধ্যে অন্ত রকম। বারান্দায় যাবার দরজা মাত্র ঐ একটি। উত্তর দিকের দেয়ালে গবাক্ষের মত যে দু'একটি জানালা আছে তা দেখলাম বন্ধ রয়েছে। বন্ধ ঘরের পাতলা অন্ধকারে পরস্পরের মুখও ভাল দেখা যায় না।

তবু বাহাদুর তার অভ্যস্ত হস্তে ঝোলা থেকে দরকারী জিনিস-গুলি বের করে ফেলল। নীচের দোকান থেকে সওদা করবার পর স্নানটাও যাতে সেরে আসতে পারি তার জন্ত প্রয়োজনীয় সব জিনিষই এক সঙ্গে গুছিয়ে নিল সে।

কিন্তু জিতেন ত জিনিস নয়। দূর থেকেই দেখি যে সে ঐ চায়ের দোকানের সামনে অস্থির ভাবে পায়চারী করছে। আমি কাছে আসতেই সে বললে, আমি চলি, মণিদা।

শুনে স্তম্ভিত আমি, মুখে কথাই ফুটল না আমার।

জিতেনই আবার বললে, এত কাছে এসেও পথে আটক থাকতে মন চায় না আমার।

দৃঢ় সঙ্কল্পের স্পষ্ট ছাপ তার মুখের উপর, অনুনয়ে কোন ফল হবে না বুঝে আমিও দৃঢ়স্বরে বললাম, আমি আজ যেতে পারব না—যাব না।

ব্রহ্মাস্ত্র মনে করেছিলাম আমি আমার ঐ ঘোষণাকে। কিন্তু ব্যর্থ হ'ল তা। উত্তরে জিতেন বললে, আপনারা এখানেই থাকুন, আমি একাই যাব।

পাশের পাহাড়টার মতই যেন সুদৃঢ়, অনড় সঙ্কল্প তার। আমার প্রতিটি যুক্তিই ফুঁড়ি মেরে উড়িয়ে দিল সে।

—বাহাদুরকে ছেড়ে দেব না আমি। এখানে তুমি দ্বিতীয় কুলী কোথায় পাবে?

আমার কুলীর দরকার নেই।

তোমার জিনিসপত্র তুমি নিজে বয়ে নিতে পারবে?

বয়ে কেন নেব? সব আপনাদের কাছেই থাকবে।

কিন্তু কেদারে যে দারুণ শীত। রাত্রে সেখানে লেপতোষক কোথায় পাবে তুমি ?

পাণ্ডার চটিতে কিছু পাওয়া যাবে আশা করি। তাতেই আমার চলবে।

স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম জিতেনের মুখের দিকে। তারপর অপেক্ষাকৃত নরম সুরে বললাম, তোমার সব কথাই না হয় বুঝলাম এবং মানলাম। কিন্তু এই দুস্তর পথে তোমাকে আমি একা একা ছেড়ে দিই কেমন করে ? পথে তোমার কোন বিপদ যদি হয়।

শুনে অদ্ভুত এক টুকরা হাসি ফুটে উঠল জিতেনের ওষ্ঠপ্রান্তে, আমার মুখের দিকে চেয়েই সে বললে, বিপদ যদি হয়ই তা হলে, মণিদা, কাছে থাকলেই আপনি কি তা ঠেকাতে পারবেন ?

আশ্চর্য্য ! কথা, হাসি, আচার ও আচরণে জিতেনকে জিতেন বলে আমি যেন আর চিনতেই পারছি নে। আমার নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বা নিরাপত্তার অজুহাত তুলে তাকে আর একবার অনুরোধ করতে প্রবৃত্তিই হ'ল না আমার।

আর সত্যই চলে গেল জিতেন। ঐ সিঁড়ির মত খাড়া চড়াই পথেও লম্বা লম্বা পা ফেলে একটি বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

অভাবনীয় এই ঘটনায় একেবারে দমে গিয়েছে আমার মন। হঠাৎ কানে এল বৃদ্ধ চটিওয়ালার শান্ত, গম্ভীর কণ্ঠস্বর : ফিকর মত কিজিয়ে, বাবুজী। উনহোনে কেদারনাথজীকা পুকার শুনা হোগা।

. হতেও পারে। কিন্তু আমার যে মানুষের মন। এখন বিরক্তির চেয়ে জিতেনের জন্য উদ্বেগই তার বেশী। সত্যই তেমন কোন অঘটন যদি ঘটে, কলকাতায় ফিরে গিয়ে সুরমার কাছে কি কৈফিয়ৎ দেব।

অবস্থা সবই আজ প্রতিকূল। পথ চলতে চলতে অত ঘাম হচ্ছিল। কিন্তু এখানে দারুণ শীত। ঠিক রোদ না হলেও রোদ-রোদ ভাব ছিল এতক্ষণ, কিন্তু জিতেন চলে যাবার পরেই আকাশ মেঘে ঢেকে গেল। এ যাত্রায় এই প্রথমবার বাহাদুরকে বললাম আমার গায়ে তেল মাখিয়ে দিতে—আশা যে ডলাইমালাইতে শীত ভাবটা কেটে যাবে। কিন্তু লাভ কিছুই হ'ল না। তেল মাখা শেষ হতেই মনে হ'ল যে আমার খালি গায়ে কারা যেন অনবরত বরফের ছুচ ফোটাচ্ছে। স্নান করবার জন্য নীচে মন্দাকিনী পর্য্যন্ত যেতে সাহসই হ'ল না। চটির প্রাঙ্গণেই একটি জলের কল ছিল। তাই থেকেই এক বালতি জল নিয়ে কাকস্নান করলাম। আর আমি ঐ কলতলায় থাকতেই বৃষ্টি নামল।

বড় বড় ফোঁটা গায়ে মুখে এসে পড়ছে আমার। তা তরল জল না কঠিন শিলা, চোখ বুজে সঠিক বোঝা যায় না।

উপরে গিয়ে গরম জামা ও পায়জামা পরেও কোন আরামই পাই নে। পুরু কম্বলের আসনে বসে অশীতিপর বৃদ্ধের মতই মাথাটা দুই হাটুর কাছাকাছি এনেও ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। হাতের আঙ্গুলগুলি অবশ। একটু স্বস্তি অনুভব করলাম দাউ দাউ করে উনান জ্বলে উঠবার পর।

রান্নার জন্য আজ আর একটুও উৎসাহ নেই আমার। বাহাদুরের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে জিতেনের কথাই কেবল ভাবছি। এই বৃষ্টিতে আত্মরক্ষার জন্য কি করছে সে। মাথা গোঁজবার জন্য একটু আশ্রয় যদি সে পায়ও তবু সঙ্গে সঙ্গেই আগুন না পেলে নিজেই যে সে বরফ হয়ে যাবে।

ঘণ্টা দুয়েক একটানা বৃষ্টি চলল। এর মধ্যে খাওয়াও হয়ে গেল আমার। খাদ্য আজ বিস্বাদ খিচুড়ী।

খাওয়ার পর দক্ষিণের বারান্দায় গিয়েছিলাম হাতমুখ ধোবার জন্য। তখনই দেখলাম সেই দৃশ্য—তছনছ কাণ্ড আর একটি।

আগের বার বারান্দায় এসে মন্দাকিনীকে দেখেছিলাম যেন শ্যামল পাহাড়ের কোলে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। এখন সেই শ্যাম মনে হ'ল যেন শুভ্র—নিথর নয়, হেলেদুলে নাচছে। নীচের আকাশে হালকা মেঘ দেখা যায় না বলে সেদিন ররাসুগ্রামের চটির বারান্দায় দাঁড়িয়ে মনে মনে দুঃখ করেছিলাম। আজ সেই ক্ষোভ মিটবে নাকি ! কিন্তু চোখের দৃষ্টি যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ করে সেই দিকে তাকিয়ে ঐ সঞ্চরণশীল শুভ্রতাকে মেঘ আর মনে হয় না। মনে হ'ল যে, ক্রমেই যেন বড় হচ্ছে তা ; আর এগিয়ে আসছে আমাদেরই এই সরণানার দিকে। দেখতে দেখতে মন্দাকিনীর ধারাই কেবল নয়, অমন গভীর খদের সবটাই সেই শুভ্রতার আবরণে ঢাকা পড়ে গেল ; ঢাকা পড়ল দু-পারেরই পাহাড়ও। তার পরেই দেখি যে, ঠিক আমার সামনেই ঐ পুঞ্জীভূত শুভ্রতা।

বিস্মিত হয়ে দেখছিলাম। কিন্তু তখনই ঘরের ভিতর থেকে বাহাদুরের উদ্বিগ্নকণ্ঠের সতর্কবাণী কানে এল আমার—হুশিয়ার হো যাইয়ে, বাবুজী।

খাওয়া ছেড়েই পরমুহূর্ত্তেই ছুটে বারান্দায় চলে এল বাহাদুর। থামের সঙ্গে দড়ি বেঁধে যে সব কাপড়-চোপড় শুকাতে দিয়েছিল সে তা ক্ষিপ্রহস্তে সংগ্রহ করে ভিতরে নিয়ে গেল ; তার পর আমাকেও সে হাত ধরে টেনে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

ঐ উদ্ধত শুভ্রতা মুক্ত দ্বারপথে ঘরের মধ্যে যদি ঢুকে যায় তা হলে আমাদের বিছানাপত্র একেবারে ভিজে না গেলেও অন্ততঃ সে রাত্রে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যাবে।

কুয়াশার রাজ-সংস্করণ ! আর দু-চার ধাপ এগোলেই ঐ জিনিসই তুষার-ঝড় হতে পারে। ওর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যই এমন দুর্গের মত গঠন এদিকের ঘরবাড়ীর—অতঃছোট আর অত কমসংখ্যক দরজা-জানালা তাতে।

একক আক্রমণ নয়। বন্ধ ঘরের মধ্যে বসেও বেশ বুঝতে পারলাম যে, আবার বৃষ্টি নেমেছে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে আবার উনুনের ধারে গিয়ে বসলাম।

তবে বৈকাল পাঁচটা নাগাদ সব পরিষ্কার হয়ে গেল। নীচে গিয়ে দেখি যে, কাছাকাছি পাহাড়গুলির চূড়ায় ঝিকিমিকি রোদ। বৃদ্ধ চটিওয়ালা পরম সমাদরে এক গ্লাস গরম চা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে উত্তর দিকের একটি পাহাড়ের চূড়া নির্দ্দেশ করে বললে, দেখিয়ে বাবু, অভী বর্ফ গিরা। ঔর দো-চার রোজ মে বহ্ পরভী গিরনে লগে গা।

বরফ আমিও দেখলাম। কিন্তু আমার মনের চোখের সামনে ভেসে উঠল জিতেনের মুখখানি। ভয়ে বুক কাঁপছে আমার। সে ত আরও হাজার দুই ফুট উপরে উঠেছে। আজ সেখানেও বরফ পড়ে নি ত—জিতেনের গায়ে, মাথায় ?

খুব ভোরে কোন দিনই ঘুম ভাঙে না আমার। কিন্তু সেদিন ব্যতিক্রম। জিতেনের জন্ম দুশ্চিন্তা ত ছিলই, তার উপর আবার দারুণ শীত। রাত্রে লেপ গায়ে দিয়েও সুনিদ্রা হয় নি। সুতরাং উঠলাম সকালেই। উঠেই বাহাদুরকে বললাম, সব বেঁধেছেঁদে যাত্রার জন্ম তৈরী হতে।

গঙ্গোত্রীদের জন্ম অপেক্ষা করবার ধৈর্য্য আর আমার নেই। গতকাল জিতেন যদি কেদারনাথের 'পুকার' শুনে থাকে তবে আমি আজ যেন জিতেনের 'পুকার' শুনছি—সামনের পথে কোথায় বুঝি বরফ চাপা পড়ে কাতরকণ্ঠে সে আমায় ডাকছে।

তথাপি প্রাতঃকৃত্য সেরে তৈরী হতে বেলা সাতটা বেজে গেল। ইতিমধ্যে চক্রধর ওখানে এসে উপস্থিত। তার মুখে সংবাদ পেলাম যে, সেদিনও গঙ্গোত্রীদের আসা হচ্ছে না।

বাঁচা গেল তা হলে—তাদের জন্ম অপেক্ষা করি নি বলে কৈফিয়ৎ আর দিতে হবে না। এক দিকে নিশ্চিন্ত হয়েই যাত্রা করলাম।

রাযোয়ারাতে পৌঁছবার আগেই স্বর্গারোহণ নামের একটি ছোট চটি দেখেছিলাম। কিন্তু এ আমি স্বর্গে যাচ্ছি না যমালয়ে !

হামাগুড়ি দেওয়া আর নয়, এবার যেন গাছে চড়ছি। প্রতিবারেই সামনের পা পড়ছে প্রায় ফুটখানেক উঁচুতে। তবে পাথরের মহীরুহ এটি—পাথরের ডালপালা ছড়িয়ে যেন আকাশে উঠে গিয়েছে। উদ্ভিদ জাতের তৃণগুল্মও আর বড় চোখে পড়ে না।

দু'মিনিট চলবার পরেই পাথরের ফলকে ৮০০০ ফুট লেখা দেখেছিলাম। '৯০০০' ফুট চোখে যখন পড়ল তখন ঘড়ির কাঁটা দেখি দেড় ঘণ্টা এগিয়ে গিয়েছে।

আর ওখানেই বৃষ্টি নামল—মুষলধারায়।

সেই বৃষ্টি মাথায় করে পাহাড়ে চড়ছি। চক্রধর ক্রমাগত আশ্বাস ও উৎসাহ দিচ্ছে। শুনে মনে জোর পাই বই কি ! কিন্তু পা দুটি ত আমার রক্ত-মাংসের—তা আর চলতে চায় না। পাঁচ-দশ পা গিয়েই থমকে দাঁড়াই, লাঠিতে ভর দিয়ে দম নিই, তারপর আবার চলতে থাকি।

রূপক নয়, এখন আক্ষরিক অর্থেই প্রায় শম্বুকগতি আমার।

তবু ১০,০০০ ফুট পর্য্যন্ত উঠলাম। আরও ঘণ্টাখানেক পর ১১,০০০ ফুট।

ততক্ষণে বৃষ্টির বেগ অনেক বেড়েছে। তবে চক্রধর আশ্বাস দিয়ে বললে যে, চড়াই ওখানেই শেষ—মালভূমিতে পৌঁছে গিয়েছি আমরা।

চমকে উঠলাম। পায়ের কাছাকাছি সত্যই সমতল। তবু বিশ্বাস হয় না। ঘন কুয়াশা ভেদ করে সামনে দৃষ্টি খুব বেশী দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয় না। কিন্তু আমার কাছাকাছি ডাইনে-বাঁয়ে ত দেখছি সত্যই ফাঁকা। কোথায় গেল পাষাণকারার সেই নিরবচ্ছিন্ন দেয়াল ? তবে কি সত্যই সশরীরে স্বর্গে উঠে এসেছি !

ক্রমশঃ

ভালবাসা

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দত্ত

চিরদিনই বিশ্বাসঘাতকতা করো,
অমৃতের পুত্র-কন্যা, তাই কবি-প্রাণ
ভালবাসা দিতে আজ ভয়ে জড়োসড়ো—
বৃথা অন্বেষণ করো মনের বিজ্ঞান !

বৃন্ত হতে ছিঁড়ে নিয়ে নিষ্কলঙ্ক ফুল,
রূপ-রস-গন্ধ চুষে শেষে অনাদরে
ফেলে দাও ধুলো মাঝে। একের এ ভুল,
ক্ষণমোহ, লালসায় অক্লে বৃথা মরে !

জানি সবি, সবি বুঝি ; তবু এও জানি—
ভালবাসা তোমাদের দিয়ে যেতে হয় !
অনেক ব্যথার পরও হৃদয়ের বাণী
ছড়াতেই সুখ ; তা যে রাখবার নয় !

তাই কি অমৃত সব দিলে পরে ভুলে
ব্যথা দাও, সুখ পাও, তবু যাও ভুলে ?

কবি কেমন?

শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

কবি নহে কোনো দলের সভ্য
আলাদা তাহার পথ,
তার পথ বহি স্বয়ং সে চলে
সে যে মহাপর্বত।
দূর থেকে তাকে দেখে পান্থেরা
বন্দে সর্বজন,
সে যে এক মনে গান গেয়ে চলে
ভেঙে সব বন্ধন।
দলগত কোনো মতবাদে কবি
বন্দী নহে ত কভু,
সব দল আর সকল মানুষ
পূজা দেয় তারে তবু।
তার লেখা পড়ি কোনো দল যদি
ভাবে—কবি আমাদেরি,
তা হ'লে তাদের মস্ত সে ভুল
কোনো গণ্ডীরে ঘেরি—
কবি কোনোদিন খণ্ডিত হয়ে
করে নাকো বিচরণ,
কোনো মতবাদে করে না সে কভু
আত্ম সমর্পণ।
নিজেরি কেন্দ্রে নিজে সে স্থির
সবারি বার্তা বহি—
কবি চলে সদা, যে চিরমুক্ত
কবি সে তাহারে কহি।
বিভিন্ন পথে বিভিন্ন মতে
তোমরা সকলে হাঁটো,
কবি যদি হোত দলেরি সভ্য
সে যে হত অতি খাটো।
তবু বলিব রে সে যেমনই হোক
কবি যে সাম্যবাদী,

সারা পৃথিবীর সকল মানুষে
বুকে সে রেখেছে বাঁধি।
তার হৃদয়ের প্রাঙ্গণতলে
খোলা মিলনের দ্বার,
জাতি ও ধর্ম তার বুকে এসে
হয়ে গেছে একাকার।
রাজনীতি তার বহু ঊর্দ্ধে
সব ফুলে গাঁথি মালা,
ভেদনীতি ছেদি সাজায় সে নিতি
মহাজীবনের ডালা।
সব মানুষের ঐক্যের বেদ
তাহার সাম্যবাদ,
ভেদের কুসুমে সাম্যের মালা
অমৃতের সংবাদ।
নিত্য-নতুন প্রগতির পথে
তাহার যাত্রা চলে,
সব মানুষের জীবন সত্য
বক্ষে তাহার জ্বলে।
সকল জনের কবি সে যে তাই
সবারি মহাত্মার,
সবারি মনের কথা কয় সে যে
অনন্ত জনতার।
তাই সে যে ভাই সকলের বড়ো
ঊর্দ্ধে তাহার শির,
বিচরণ তার সহস্র পথে
মুক্ত এ পৃথিবীর।
অভিনন্দনে আর অপমানে
থোড়াই গ্রাহ্য তার,
তাহারে ঘিরিয়া সারা এ ভুবন
করিছে নমস্কার।

মৃত্যুর অনতিকালপূর্ব্বে কবি এই কবিতাটি পাঠাইয়া ছিলেন। তাই মনে হয়, ইহাই তাঁহার শেষ রচনা



আনমনে পথ চলছিল। পায়ের নিচে ছোট একটা পাথরকুচির আঘাতে পড়ে যেতেই সামলে নিল। এমন হয় না কোনদিন। শুধু আজ। আজ যেন মনটাকে কিছুতেই বাঁধতে পারছিল না। পাঁচ বছরের একটানা একঘেয়ে সুর হঠাৎ বদলে যাওয়ায় ধরতে পারছিল না আজ।

সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট থেকে বেরোবার মুখে সেই মন্দিরটা। ইচ্ছা হ'ল হাতটাকে একবার কপালে ছুঁইয়ে নেয়। কোনদিন যা হয় নি আজ তা হতে দেখে ওড়িয়া পুরোহিতটাও তাকিয়ে থাকে। পাশে একটা পানের দোকান। দোকানের ঘড়িটাকে রোজ দেখতে হ'ত। আজ হাতেই ঘড়ি ছিল। তাই ওদিকে তাকাতে হ'ল না। পান-দোকানীও তাই তাকিয়ে থাকে।

এইটুকু ত পথ। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটটুকু পেরিয়ে মহাত্মা গান্ধী রোডের মোড়ে স্কুল। চেনা পথ, চেনা জন। একদিনের নয়, দীর্ঘ পাঁচ বছরের। তবুও আজ যেন অচেনা লাগে। নতুন লাগে। সামনেই স্কুলের গেট—"মনোরমা বালিকা বিদ্যালয়।" গেটের সামনে পা দিতেই দারোয়ান তাকিয়ে দেখে। হিন্দুস্থানী এই দারোয়ানের চোখেও সে নতুন। চোখে চোখ পড়তেই বলে, 'নমস্তে দিদিমণি।' বিনিময়ে কপালে হাত ঠেকাতে হয়। সব নতুন। সকলের চোখে বিস্ময়, সে বিস্ময় নিজের মনেও।

গেটটুকু পার হতেই একফালি লন। সেটা পার হলেই ক্লাশ-ঘরের আগে একটু দরদালান মত। সেখানে দাঁড়িয়ে একপাল মেয়ে একসাথে হেসে উঠল, 'এই দিদিমণি।'

প্রত্যুত্তরে একটু হাসি। তার পর সোজা আপিস রুমে ঢুকে পড়া। যেখানে নমিতা, বেলা, রমা, কল্পনা, শিপ্রাদি পা এলিয়ে বসে আছে।

ছায়াকে দেখেই একসাথে লাফিয়ে উঠল, 'হ্যালো মিস, তুমি মিসেস রায়, গুড মর্নিং।'

নমিতা নামের রোগা মেয়েটি উঠে এসে একেবারে জড়িয়ে ধরল, 'ইস ছায়াদিকে কি অদ্ভুত লাগছে দেখ।'

রমা একটু মুচকি হেসে বলল, 'কনগ্র্যাচুলেশন মানে অভিনন্দন জানাচ্ছি। অবশ্য তোকে নয়, মিঃ অমুতোষ রায়কে। যিনি সদ্য সদ্য ছায়ানাম্নী একটি কুমারীকে গেজেটেড করেছেন এবং সাথে সাথে নিজেও গেজেটেড হয়েছেন।'

'তার পর কি খবর?' এগিয়ে এলেন শিপ্রাদি। শিপ্রাদিই ওদের মধ্যে একমাত্র বিবাহিতা। তাই দিদির সম্মান পেয়েছেন। দু ছেলেও আছে। স্বামী বেশ ভাল চাকরি করেন। শিপ্রাদিকে কতবার বলেছেন চাকরি ছেড়ে দিতে। কিন্তু কিছুতেই রাজি হন নি। কারণ চাকরি করা তাঁর পেশা নয়, নেশা। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে পড়ানোর যে একটা চার্ম আছে এ কথা তিনি স্বামীকে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

বেলা বয়সে ছোট। বলল, 'ছায়াদি, তোমাকে কিন্তু খুব সুন্দর লাগছে।'

একমাস ছুটির পর ছায়ার জীবনে পরিবর্তন হয়েছে অনেক-খানি। আর সকলে যেমন ছিল ঠিক তেমনই আছে। সেই নমিতা, মুখচোরা স্বভাব। লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেমিকের চিঠি পড়ে। কারও চোখে পড়লে চোখ-মুখ ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে। অনেক পীড়াপীড়ি করেও কেউ ওর প্রেমিক সম্বন্ধে একটিও কথা শুনতে পায় নি।

বেলা বয়সে ছোট। তাই উচ্ছলতায় যেন উপচে পড়ে। একদণ্ডও কথা না কয়ে থাকতে পারে না। শিপ্রাদি ঠাট্টা করে বলেন, 'বেলা স্বামীকে তুই জ্বালিয়ে মারবি। বেচারা খেটেখুটে আপিস থেকে ফিরেও তোর মুখ থেকে নিষ্কৃতি পাবে না।

রমা মেয়েটি বড় বেশী সজাগ। একটু প্রচ্ছন্ন গর্বও মনে মনে পোষণ করে। কারও সঙ্গে বেশী কথা বলে না। নিজের সম্বন্ধে

এত বেশী সচেতন যে, কেউ কিছু বললে ঘুরিয়ে আক্রমণ করতে ছাড়ে না। ও নাকি কবে এক ইঞ্জিনিয়ারকে ভালবাসত। বিলেত থেকে ফিরে এসে বিয়ে করবে এই কথা বলে সেই যে সে চলে গেছে আর আসে নি। রমা অবশ্য মনে মনে ঐ রকম একটা আশা পোষণ করে আছে।

দুঃখ হয় কমলার জন্যে। প্রেমে ব্যর্থ হয়ে ও যেন জীবনের খেই হারিয়ে ফেলেছে। জীবন সম্বন্ধে ওর মন হতাশায় ভরা। হাসে খুব কম। বয়স হতে চলল। বলে, 'বিয়ে করব না।'

জয়েনিং রিপোর্ট দিয়ে ক্লাশ নিতে গেল ছায়া। সেই ক্লাশ। সেই কচি কচি পরিচিত মুখ। অসীম কৌতূহলে ভরা। ছায়াদির পরিবর্ত্তনে ওদেরও চোখেমুখে বিস্ময়। বিস্ময় তার নিজেরও। এই সব শিশু আজ যেন নতুন হয়ে ধরা পড়ল তার চোখে। আগে সে ছিল সব চেয়ে কড়া আর বদরাগী। আজ যেন সব থেকে সহজ হয়ে ধরা দিতে ইচ্ছা করছে। যাকেই শাসন করতে যাক সে, আজ তার চোখেমুখে স্নেহ-মাখানো কোমলতা ফুটে উঠছে।

সাড়ে ন'টায় ক্লাস শেষ হতেই মেয়েরা আবার ওকে জড়িয়ে ধরল, 'কি ভাই, খাওয়াটা কবে হচ্ছে। একেবারে ফাঁকি দিচ্ছেন ত? না কর্ত্তাটিকে একেবারে লুকিয়ে রাখতে চাও, পাছে খোয়া যায়।'

ছায়া একটু হাসল। বলল, 'তাই ত বলি খাওয়ানটা যার খাওয়াটাও তারই আতিথ্যে সম্পন্ন হলে চলত না?'

'এক্সেলেন্ট, নাইস প্রস্তাব। ম্যারেজ সেরিমনি। কবে হচ্ছে তা হলে?'

'কাল জানাব', বলে বেরিয়ে এল ছায়া।

অন্য দিন স্কুলের ছুটির পর পনের মিনিট কি আধ ঘণ্টা আড্ডা জমাতে বেশ ভালই লাগত। কিন্তু আজ যেন কিসের একটা আকর্ষণ তাকে কেবলই ঘরমুখো করতে লাগল। অমুতোষের আপিস ফেরবার আগেই তাকে পৌঁছোতে হবে। একবার দেখা হওয়া চাই।

স্কুল থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি চলতে লাগল ছায়া। মন কিসের আমেজে যেন ভরপুর। অমুতোষকে কেমন করে সুখী করা যায়? কেমন করে তার মনটাকে সম্পূর্ণ করে কেড়ে নেওয়া যায়। শুধু এই চিন্তা। অমুতোষ তাকে ভালবেসেছে। রুক্ষ-ভূমির মত তার উষ্ণ-ধূসর জীবনে এনেছে শান্তির জল-ধারা। নেশা লাগিয়েছে তার মনে প্রাণে, এমন কি দেহেও। গত রাতের নেশা আজও তার মনে জড়িয়ে রয়েছে। জীবনে অমৃতের স্বাদ এনে দিয়েছে অমুতোষ।

চান-খাওয়া সেরে অমুতোষ বিশ্রাম করছিল। দশটায় বেরতে হবে। ছায়া ত্রস্তপদে ঘরে ঢুকল।

অমুতোষ বলল, 'যাক, আমি ভাবলাম ছোট ছোট ছাত্রদের পেয়ে শিক্ষয়িত্রী বোধ হয় তার বুড়ো ছাত্রের কথা ভুলে গেল।'

তির্য্যক দৃষ্টিতে একবার তাকাল ছায়া। বলল, 'বুড়ো ছাত্র যে ক্লাশের বেড়া ডিঙোতে পারে না, তাকে একটু শাস্তি দেওয়া ভাল। যাক শোন, আজ অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরবে। আজ একটা প্রোগ্রাম তৈরি করতে হবে।'

'কিসের প্রোগ্রাম? সিনেমা থিয়েটার না আর কিছু?'

'ওসব নয়। আসছে রোববার স্কুল-বান্ধবীদের একটা ভোজ দিতে হবে ভাল করে।'

'ও হরি, তাই বল। তা এর জন্যে তাড়াতাড়ির দরকারটা কি। রবিবার আসতে ত এখনও ছ'টা দিন বাকী।'

'যাও ইয়ারকি কর না। অফিসের দেরী হয়ে গেল।' সবে-মাত্র টেনে ধরা হাতটা ছেড়ে দিয়ে অমুতোষ একটু হাসল। ছায়ারও মুখখানা সিঁদুর হয়ে উঠল।

সত্যি সত্যিই অমুতোষ মাথাটা আঁচড়ে নিয়ে যখন আপিস বেরিয়ে গেল ছায়ার মনটাও বিষণ্ণতায় ভরে গেল। সারা দুপুরটা তাকে একা একা কাটাতে হবে। এতদিন একটা নয়, বহু দুপুর ত সে একা একা কাটিয়েছে। কিন্তু এ রকম একক নিঃসঙ্গতা ত কখনও বোধ করে নি। আজ অমুতোষকে ছাড়া একটা মুহূর্ত্তও তার কাছে একান্ত অস্বস্তিকর। অমুতোষ যে তার সমস্ত কিছুকে এমন করে বদলে দেবে, সে কল্পনাই করেনি।

সকাল সকাল অমুতোষ ফিরল আপিস থেকে। নিঃসীম নিস্তব্ধতা থেকে ছায়াও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। চারটের পর থেকে দেওয়ালের ঘড়িটার দিকে চেয়ে বসেছিল। প্রতিটি মুহূর্ত্তকে গুনে চলছিল। কখনও বিরক্তি কখনও বা অহেতুক শঙ্কা। এত দিন শিক্ষয়িত্রী থেকে দূর থেকে যাদের সে দেখেছে, যাদের ভালবাসাকে করুণা করে এসেছে আজ তাদেরই সে একজন। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন উপলব্ধি যা থেকে ছায়া বঞ্চিত ছিল।

অফিস থেকে ফিরে এসে গায়ের জামাটা খুলে ফেলল অমুতোষ। দেওয়ালের আলনায় টাঙিয়ে রাখল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'বাপরে ট্রামে বাসে যা ভিড়, তাতে বউয়ের কথা রেখে সময়মত ঘরে ফেরা যে কি কষ্টকর তা এত দিনে ঠিক ঠিক বুঝলাম।'

ছায়া জানে অমুতোষ পরিশ্রান্ত। তাই ছাড়া কাপড়টাকে নিয়ে পাট করতে করতে বলল, 'আগে একটু জিরিয়ে নাও। তার পর একটু বাইরে বেড়িয়ে আসা যাবে। পার্কে কিম্বা ময়দানে।'

অমুতোষ বলল, বেশী জিরিয়ে লাভ নেই। কারণ এ ঘাম ঘরে বসে জুড়াবে না সহজে। তার চেয়ে চা টা শেষ করে চল বেরিয়ে পড়া যাক।'

অমুতোষের সঙ্গে পার্কে বেড়াতে যাওয়া। এও এক নতুনত্বের স্বাদ। একজন সুদর্শন যুবকের পাশে পাশে ছায়া বেড়িয়ে বেড়াবে। কত লোক তাকিয়ে দেখবে। কেউ কেউ দু'একটা মন্তব্যও ছুড়বে ওদের প্রতি ইঙ্গিত করে। যদিও তারা স্বামী স্ত্রী, তবুও এই বেড়ানোর মধ্যে সেই প্রেমিক-প্রেমিকার রোমান্স আছে। লজ্জা করে, কোন ছাত্রীর সামনে যদি পড়ে যায়! একটু একটু মেয়েরা

হয়ত হাসবে। না তার চেয়ে ময়দানেই যাওয়া ভাল। অমুতোষকে বলতেই বলল, 'তথাস্তু'।

মৌন মেয়ের মত শহরের আভিজাত্যকে এড়িয়ে নিরালায় বসে আছে ইডেনগার্ডেনটা। এখানে এখনও সবুজ রঙের সঙ্গে দেখা হয়। দু'একটা প্রাণের কথা বলার স্বস্তি আছে। ঘাসের উপর রুমাল বিছিয়ে বসতে বসতে অমুতোষ বলল, 'এখনও এদিকটায় এলে প্রাণভরে একটু নিঃশ্বাস নেওয়া যায়।'

ছায়া সায় দিল, 'সত্যি শহরটাকে যেন বুড়ো হাঁপানি রোগীর মত মনে হয়। শ্বাস টানছে আর ছাড়ছে কেবল।'

অমুতোষ বলল, 'তারপর, স্কুলে গিয়ে কেমন মনে হ'ল।'

ছায়া বলল, 'একটু নূতন নূতন লাগল। জান—আমাদের জীবনটাকে সবাই সুশ্রী দেখতে চায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর করে দেখতে পারে না। অভ্যস্ত জীবনযাত্রার বাইরে গেলে আমরা হলাম দর্শনীয়। সাদা শাড়ী, চওড়া লাল কিংবা কালো পাড়। চোখে সাধারণ চশমা আঁটা। সাদা সিঁথি আর পায়ে একজোড়া স্যাণ্ডেল। এই ত আমাদের লেবেল আঁটা জীবন। রোজ গড়িয়ে গড়িয়ে স্কুলে যাও আর এস। যদি কখনও ব্যতিক্রম ঘটিয়ে কোথাও বেড়াতে যাও ত লাগবে দৃষ্টিকটু। সিনেমা থিয়েটারগুলো ছাত্রীরা একচেটে করে নিয়েছে। দিদিমণিদের দেখলে তাদের অস্বস্তি বাড়ে। ক্লাবে-সোসাইটিতে আমরা বেমানান। একমাত্র প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশন সভা ছাড়া আমরা সর্ব্বত্র বেমানান খাপছাড়া।'

অমুতোষ একটু হাসল। আলোর গা বেয়ে আঁধার নামছিল। ছায়ার মুখখানার উপর বহুদিনের এঁটে দেওয়া এক কারুণ্য অমুতোষের চোখকে পীড়িত করতে লাগল। হঠাৎ সেদিনের ছবিটা ভেসে উঠল চোখের সামনে, যেদিন বন্ধুর স্ত্রী পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, 'ইনি আমার বান্ধবী ছায়া মুখার্জ্জী। আর শ্রীঅমুতোষ রায়।'

সাধারণ সুশ্রী চেহারা। দুটো চোখ কারুণ্যে ভরা। হাত তুলে নমস্কার করতে গিয়ে অমুতোষ দেখেছিল অসহায় একখানা মুখ। বিধ্বস্ত যৌবন, জীবনের হতাশায় ক্লান্ত মন।

নমস্কার করে অমুতোষ বলল, 'খুশী হলাম আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে। দেখুন, আপনাদের শিক্ষয়িত্রী জীবনটা আমার বড় ভাল লাগে।'

স্মিতহাস্যে ছায়ার মুখখানা আরও করুণ মনে হ'ল। বলল, 'দূর থেকে নদীকে মনে হয় বড় উজ্জ্বল। কিন্তু ভিতরে তার অজস্র কান্না লুকিয়ে থাকে জানেন কি?'

অদ্ভুত লাগল কথাগুলো। অমুতোষ মুগ্ধ হয়ে একটু তাকিয়ে রইল। একটু নিস্তব্ধতার পর বলল, 'বোধ হয় তাই। তবে কি জানেন আদর্শ আছে ত!'

'ওইটুকু সম্বল অমুতোষ বাবু। শুধু আদর্শ দিয়ে কি জীবনের সব ফাঁক ভরানো যায়?'

আরও কি কি কথা হয়েছিল অমুতোষের মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ে ও চলে যাওয়ার পর বন্ধুপত্নী বলেছিল, 'মেয়েটি বড় ভাল।'

তারপর অনেকদিন আর দেখার সুযোগ হয় নি। বহুদিন পরে দেখা হ'ল একটা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এক্জিবিশনে। একপাল ছাত্রীকে নিয়ে গিয়েছিল ছায়া। অমুতোষ গিয়েছিল বন্ধুদের সঙ্গে। দেখা হতেই একটু হাসি। বন্ধুদের থেকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'কেমন আছেন?'

'ভাল, আপনি কেমন?'

'ভাল, ওখানে যান না যে?'

'সময় পাই না একটুও। এই ত দেখুন না ছেলে চরানোর কাজ আমাদের। অবকাশ কই? আসুন না একদিন আমাদের বাসায়।'

অমুতোষ চাইছিল এমনি একটা আহ্বান। ছায়াকে তার যতখানি ভাল লেগেছে তার চেয়ে অনেক বেশী ভাল লেগেছে তার শিক্ষয়িত্রী জীবনকে। তাই জানবার আগ্রহে সে সাদরে গ্রহণ করল আমন্ত্রণ। পকেট থেকে একটুকরো কাগজ নিয়ে লিখে নিল ঠিকানাটা। তারপর···

চমক ভাঙ্গিয়ে জিজ্ঞাসা করল ছায়া, 'কি ভাবছ?'

'ভাবছি আমাদের প্রথম পরিচয়টা।' অমুতোষ পকেট- থেকে বের করল একটা সিগারেট। ধরিয়ে নিয়ে বলল, 'বল এবার তোমাদের স্কুলের গল্প। তোমাদের সেই মেয়েটির খবর কি, যে তার ছেলেবেলার প্রেমিকের পথ চেয়ে বসে আছে।'

'কল্পনা ত, আহা বেচারার কথা ভাবলেও দুঃখ হয়। কারও সঙ্গে বেশী মেশে না। কথা বলে না। মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকে। মেয়েরা ভালবেসে অমনি করেই ত মরে।' কটাক্ষপাত করল অমুতোষকে।

অমুতোষ বুঝতে পারল। বুঝতে পেরে একটু হাসল প্রথমে। পরে হাল্কা করে বলল, 'মেয়েরা আবার ভালবাসল করে? আমার মনে হয় ভালবাসার অভিনয়ে তাদের সমকক্ষ নেই। মেয়েদের মৃত্যুটা দেখেছ, তার কারণ সেটা বড্ড স্থূল, পুরুষের মৃত্যু ত দেখনি। সেটা খুব সূক্ষ্ম কিনা। এত সূক্ষ্ম যে চোখ দিয়ে দেখার উপায় নেই।'

'থাক থাক হয়েছে, কথা বলতে তোমরা পারদর্শী তা আমরা জানি। তবে ঐ পর্য্যন্ত!'

অমুতোষ বুঝল কথাটা ছায়াকে আঘাত করেছে। তাই একটু হাল্কা হেসে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। ছায়ার একখানা হাত মুঠোর মধ্যে নিয়ে বলল, 'সত্যি বলত, ছেলেবেলায় তুমি কাউকে ভালবাসতে?'

অকস্মাৎ এমনি প্রশ্ন করায় ছায়া ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। উত্তরের অপেক্ষা না করেই অমুতোষ বলতে লাগল, আমি বাসতাম। বড় লাজুক ছিল সে। সামনে এসে কিছুতেই

দাঁড়াতে চাইত না। বড়ই ডাকি না, দূর থেকে কথা বলে সরে যেতে চাইত। ভাবতাম ওটা ওর স্বভাব। কিন্তু আশ্চর্য্য একটা দিনের জন্যেও বুঝতে পারি নি সে আমাকে ভালবাসত না। আমাকে পছন্দ করত না একটুও। নিজের ভুল একদিন নিজের কাছে ধরা পড়তেই চাবুকের আঘাত খেয়ে অপরাধী যেমন কাঁদতে পারে না অথচ বেদনাকে চেপে রাখতে কষ্ট হয় আমার অবস্থা হয়েছিল সেই রকম।

ওরা আমাদেরই বাসায় ভাড়াটে ছিল। শেষে ওর বাবা বদলি হয়ে যাওয়ায় বাসা ছেড়ে দিয়ে উঠে গেল। যাওয়ার সময় মেয়েটাকে ডেকে বলতে চেয়েছিলাম মনের কথা, শোনে নি। সেখানেই যদি ইতি হ'ত ত বাঁচতাম। পাঁচ বছর বাদে আবার তাকে দেখলাম কলকাতার পার্কে। আবার আলাপ হ'ল। বাসার ঠিকানা নিয়ে ওদের নতুন বাসায় গেলাম। ওর বাবা আমাকে খুব ভালবাসত। মাকে কোনদিন দেখি নি। বাসাতে একটা পুরোনো ঝি ছিল। সেও আমাকে খুব ভালবাসত ও আমাকে দেখেই বলল, 'এই যে দাদাবাবু, বহুদিন পরে আপনাকে দেখলাম। মা-দাদারা ভাল আছেন ত?'

বললাম, 'সব ভাল, কাকাবাবু কই?'

'বাসায় নেই, এখন হাসপাতালে গেছেন। দিদিমণি আছেন ডেকে দেব।'

কাকাবাবু বাসায় নেই শুনে কি দুর্বুদ্ধি চাপল। ভিতরে ঢুকতেই সে বলল, 'এই যে আসুন, বাবা ত নেই।'

বললাম, 'জানি, নেই। তোমার সঙ্গে বসে ততক্ষণ গল্প করি একটু। উঃ কতদিন পরে যে দেখলাম।' এতটুকু দ্বিধা বা ইতস্ততঃ না করেই সেদিন পুরানো ভালবাসার সুরটা একবার বাজিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। বেশীক্ষণ নিজেকে সংযত রাখতে পারলাম না। চেয়ার ছেড়ে উঠে তার একখানা হাত চেপে ধরলাম। ছাড়াবার চেষ্টা করতেই টেনে নিলাম বুকের মধ্যে। কিন্তু আশ্চর্য, তার নরম হাতটা যে আমার গালে অতখানি কর্কশ হয়ে বাজবে জানতাম না। কালিমুখ নিয়ে বেরিয়ে আসব ঝি-টা সেই সময় চা নিয়ে এল। বললাম, 'চা খাব না, কাকাবাবু এলে বল আমার কথা।'

হঠাৎ এতখানি ব্যস্ততার কারণ বুঝতে না পেরে সে একটুখানি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। ও কি করছিল চেয়ে দেখার প্রবৃত্তি আর হয় নি। মুখ নিচু করে বেরিয়ে এলাম।

অনেকদিন আর ওমুখো হই নি। মাস তিনেক পরে বাসার ঠিকানায় আমার নামে এল চিঠিখানা। তারই লেখা। সেদিনের সেই রূঢ় ব্যবহারের জন্যে অজস্র ক্ষমা প্রার্থনা। কাকাবাবুর শরীর খারাপ। আমাকে একবার যেতেই হবে। শুধু কাকাবাবুর জন্যে নয়, তার জন্যেও তার বিশেষ অনুরোধ।

বীভৎস ক্ষতটাকে চেপে রাখতে পারি নি। চিঠিখানা পড়বার পর সেটা চোখের সামনে ভেসে উঠল স্পষ্টতর হয়ে। কেবলই মনে হ'ল সে আমায় ঘৃণা করে। তাই সে চিঠির এতটুকুও মূল্য দিই নি সেদিন।

সেখানেও শেষ হ'ল না। আবার কিছুদিন পরে দেখা হ'ল। সে তখন স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিয়েছে। রাস্তার উপরে দেখা হতেই সে প্রথমে কথা বলল। চেহারায় কথাবার্ত্তায় সেই উগ্রতা নেই। বরং কিসের ভারে যেন নুয়ে পড়েছে সব ঔদ্ধত্য অহঙ্কার। কণ্ঠস্বরে নেই সে তীব্রতা। দু' একটা কথার ফাঁকে আত্মীয়ার মত রাস্তার উপরে হাত চেপে ধরল, 'তোমাকে একবার আসতেই হবে।'

পা ছুঁয়ে শপথ করলাম যাওয়ার। সব অভিমান ত্যাগ করে একদিন হাজির হলাম সেই বাসায়। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কাকাবাবু, কই, কেমন আছেন?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'তিনি নেই।'

এই ছোট্ট কথাটি আমাকে তখন ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দিয়ে গেল। সেই বৃদ্ধ অসহায় লোকটা আমাকে কত ভালবাসত! মৃত্যুর আগে বোধহয় দেখতে চেয়েছিল। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলাম না। তার একখানা হাত চেপে ধরে বললাম, 'কেন আর একখানা চিঠি লিখলে না?'

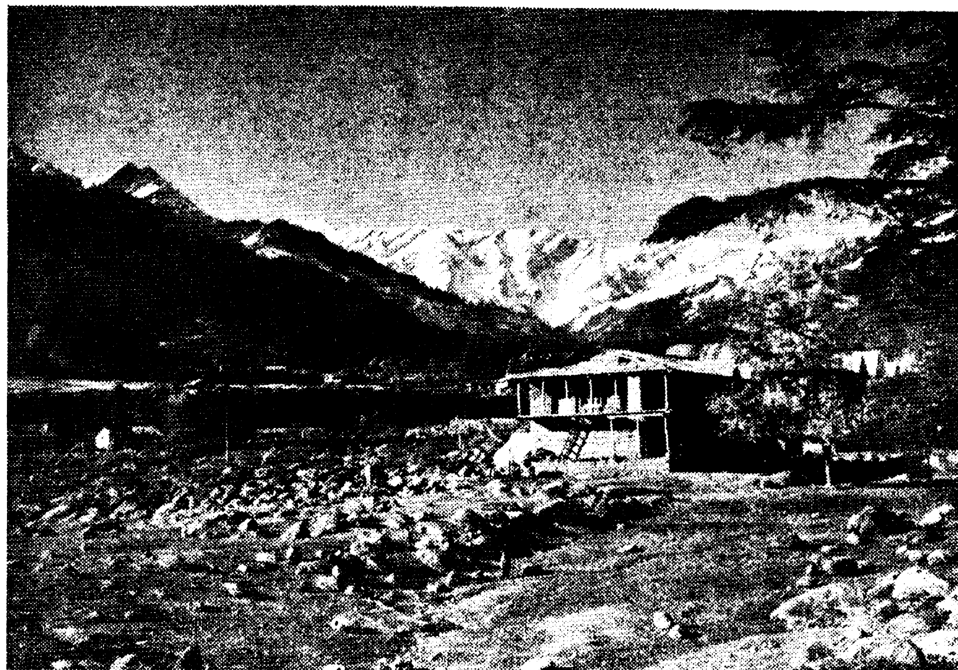
নির্ব্বিকারভাবে সে উত্তর দিল, 'আমি জানতাম তুমি আসবে না।

সেইদিনই তার মুখে শুনলাম, কাকাবাবু মারা যাওয়ার মাসখানেক আগে হসপিটাল থেকে ফিরে এসেছিল কাকীমা দীর্ঘকাল ক্ষয়রোগে ভোগার পর। আমাকে পরিচয় করিয়ে দিল। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই বললেন, বেঁচে থাক বাবা। তোমার নাম প্রায় শুনি খুকুর মুখে।'

তার পরের ইতিহাস আরও করুণ, আরও বেদনাময়। জানতাম না যে, মায়ের শরীরে যে রোগের বীজাণু ছিল তা আবার মেয়ের দেহে এসে বাসা বেঁধেছে। যে দিন জানতে পারলাম সে দিন আমিই ব্যবস্থা করে তাকে হসপিটালে রেখে এলাম। কিন্তু কাকীমাকে ধরে রাখতে পারলাম না। নিজেকে সবকিছুর জন্যে দায়ী করে কয়েক দিন পরে তিনি আত্মহত্যা করলেন। সংবাদ পেয়ে সে আমার হাত ধরে কেঁদে ফেলল। বললাম, 'সবই নিয়তি। ভয় কি? আমি ত রয়েছি তোমার কাছে কাছে।'

অনেক কষ্টে এক দিন তাকে সারিয়ে তুলতে সমর্থ হলাম। তার পর নিজের কাছে যে প্রতিশ্রুতি করেছিলাম তা পালন করতে চাইলাম। কিন্তু কি জানি সে কিছুতেই রাজি হতে চাইল না। আমাকে না জানিয়ে হঠাৎ এক দিন সে কোথায় চলে গেল। চিঠি লিখেছিল একখানা ঠিকানা না দিয়ে,...'তুমি যদি বিয়ে না কর ত আমি আত্মহত্যা করব।'

অমুতোষের অব্যক্ত যে ইতিহাস বার বার ছায়া শুনতে চায়নি সেটা যে এতখানি করুণ, বেদনাময় তা কি জানত? অতীতের কাহিনী বলতে বলতে তন্ময় হয়ে যাওয়া অমুতোষ যেন ছায়ার



কুলুভ্যালীর মনালি শহরের একটি মনোরম দৃশ্য

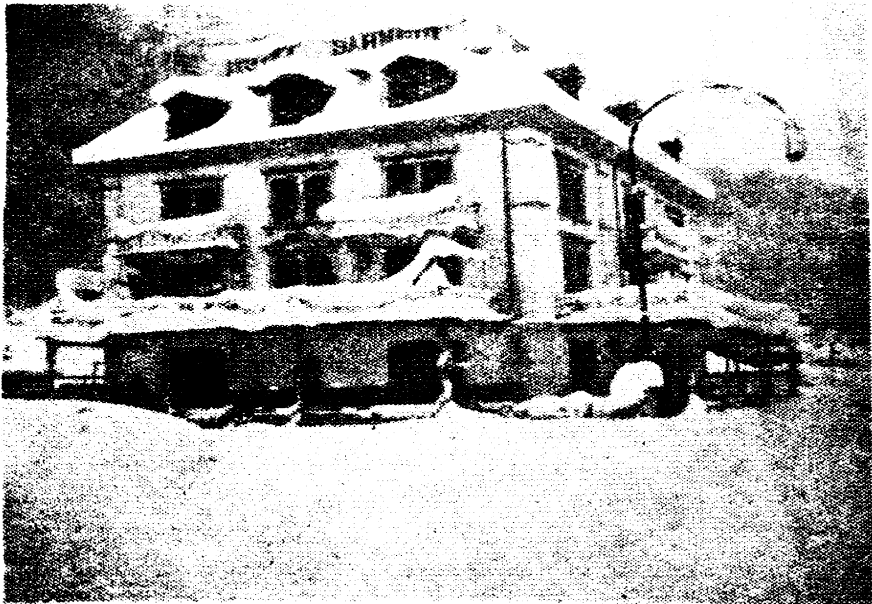


উত্তর প্রদেশে মীরাটের সন্নিকটে গ্রামবাসীরা নিজেরাই চেষ্টা করিয়া এই রাস্তা তৈয়ারি করিয়াছে



প্রাসাদ-তোরণ (বাকিংহাম প্যালেস)

ফটো ঃ সচ্চিতকুমার চট্টোপাধ্যায়



তুষারপুরী (সুইজারল্যাণ্ড)

ফটো ঃ সচ্চিতকুমার চট্টোপাধ্যায়

চোখে নতুন করে ধরা দিল। ছেলেটিকে দেখেই তার প্রথম মনে হয়েছিল ঘা-খাওয়া। কিন্তু সে আঘাত ওকে যে এতখানি বিকৃত করেছিল তা জানত না। তার চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে এল অমুতোষের মূর্তিটা। আর অন্ধকার হয়ে এল ওদের চোখের সামনে। সবুজ রঙের ফাঁকে ফাঁকে সোনালী বালবগুলো জ্বলছিল যেন অসংখ্য জীবনের ভ্রুকুটি। ছায়া একটু সরে এসে অমুতোষের হাতখানা চেপে ধরে বলল, 'আমি ত শুনতে চাইনি তোমার অতীতকে।'

দার্শনিকের মত চোখ নামিয়ে বলল অমুতোষ, 'নিজের ক্ষতটা তোমাকে দেখিয়ে রাখলাম ছায়া। যদি পার ত সেটাকে সারিয়ে তোলার চেষ্টা কর।'

বাসায় ফিরতে সে দিন একটু রাত হয়ে গেল। ফিরে এসে দু'জনে দু'জনের দিকে চেয়ে ভাবল কত অসহায়।

পর দিন স্কুলে গিয়ে ছায়া সকলকে নিমন্ত্রণ করল। শিপ্রাদি ঠাট্টা করে বলল, 'রান্নাটা কিন্তু মিস রায়ের নিজের হাতের হলে ভাল হয়।'

ছায়াও একটু ঠাট্টা করে বলল, 'কেন, ও হাতের হলে বুঝি ভাল লাগবে না। যাক শিপ্রাদি, তোমরা কিন্তু দু'জনে নিমন্ত্রিত। যেমন করে হোক উনিটিকে পাকড়ে আনতে হবে, বুঝলে? ওদিন গানের একটা প্রোগ্রাম রাখা হবে বলছিল।'

গানের কথা হতেই সকলে কল্পনার দিকে তাকাল। ওদের মধ্যে সেই একমাত্র ভাল গান জানে। ছায়া গিয়ে ওর হাত ধরে বলল, 'সত্যি ভাই, ওদিনকার গানের আসরে আমাদের মুখ রাখতে তুমি। ওঁর অনেক বন্ধুবান্ধব আসবে আপিস থেকে। দু' একজন নাকি রেডিও-আর্টিষ্ট আছে। তবে আমরা সিওর যে, তোমার গলা সকলকে চার্ম্ করতে পারবে।

কল্পনা স্বভাবতই লাজুক। আত্মপ্রশংসায় কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল। বলল, 'দেখি ভাই, চেষ্টা করব তোমাদের আসরে যোগ দিতে। তবে জান ত আমার শরীর ভাল নয়, গাইতে পারব কিনা বলতে পারি না।'

'আচ্ছা সে যা হয় হবে ভাই, তুমি অবশ্যই আসবে।'

আসর বসল রবিবারের সন্ধ্যায়। অনেকেই এল। আপিস থেকে অমুতোষের সাত-আট জন বন্ধু এল। সকলের সঙ্গে পরিচয় হ'ল ছায়ার। তার নিজের বন্ধুরাও সবাই এক এক করে এল। শিপ্রাদি এল স্বামীর সঙ্গে ছোট ছেলেটিকে নিয়ে। এসেই জিজ্ঞাসা করল, 'ওরা সব এসেছে—কল্পনা?'

ছেলেটিকে কোল থেকে নিয়ে একটু আদর করে ছায়া বললে, সে ত এসেছে। তবে কল্পনা কেন যে দেরী করছে বুঝতে পারছি না।

পরিচয় বিনিময় শেষ হ'ল। আসর জমে উঠল।

অমুতোষের বন্ধুরা গাইল। শিপ্রাদির স্বামীও গাইল। রমা সেতার বাজাল। বেলা গান গাইল মন্দ নয়। কিন্তু কল্পনা কই? এল না। শিপ্রাদি বলল,'আচ্ছা মেয়ে বাবা! এত করে বলা হ'ল।

রমা বলল, 'ও বরাবরই ঐরকম।'

বেলা বিদ্রূপ করে বলল, বোধহয় তার প্রেমিক এতদিন পরে ফিরে এসেছে তাই গান শোনাচ্ছে।'

নমিতা একটু সহানুভূতি দেখিয়ে বলল, 'অসুখ-বিসুখ হঠাৎ একটা কিছু হতেও ত পারে।'

সায় দিল ছায়া মাথা নেড়ে। সব কথার ফাঁকে তার মনটা কি একটা আশঙ্কায় থচ করে উঠল। সে জানে সকলের অলক্ষ্যে ঐ মেয়েটার জন্যে একটা অহেতুক বেদনা তার মধ্যে জমা ছিল। সে যে কতখানি অসহায় তা ছায়া বুঝত। ব্যর্থ প্রেমের যে জ্বালা নিয়ে মেয়েটা ঘুরে বেড়ায় তার খানিকটা উপলব্ধি করতে পারে সে। তবুও অনুরোধ রাখতে একবারও এল না।

আসর শেষ হয়ে গেল। এক এক করে সবাই চলে গেল। ছায়ার মনটা বিষণ্ণ হয়ে রইল কল্পনার জন্যে। রাত্রে অমুতোষকে বলল, 'জান, আজ সবচেয়ে দুঃখ হচ্ছে কল্পনার জন্যে। বেচারা একবারও এল না। সেই যে যার গল্প বলেছিলাম তোমাকে।

রাত্রির একটা আবরণ আছে। আর তা সবকিছুকেই ঢেকে রাখে। অমুতোষের ফ্যাকাশে ভাবটা তাই ঢাকা ছিল ছায়ার সামনে। বাস্তবতার মধ্যে দিয়ে ছায়া যেটা উপলব্ধি করতে পারে নি, অমুতোষের পাশে বিছানায় শুয়ে সেটাও তার উপলব্ধির বাইরে পড়ে রইল।

পরদিন সকালে স্কুলে যাওয়ার পথে ভাবছিল ছায়া, 'কল্পনার সত্যি হ'ল কি?'

স্কুলে গিয়েই শুনল, 'কল্পনা স্কুলে আসে নি।'

সকলেই ভাবল নিশ্চয় কোন অসুখ-বিসুখ করেছে। শেষে শিপ্রাদি যখন আসল-খবরটা দিল তখন সকলেই চমকে উঠল। কল্পনা শনিবার দিন সবাই চলে যাওয়ার পর স্কুল-কমিটির সেক্রেটারির বাড়ীতে রেজিগনেশন লেটার দিয়ে গিয়েছিল। শিক্ষয়িত্রীর পেশা তার নাকি ভাল লাগছিল না।

খবরটা শুনেই পরস্পর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ব্যর্থ প্রেমের জ্বালায় কল্পনা যে এইরকম একটা কিছু করবে একথা কেউ ভাবে নি।

তবুও একটা আশঙ্কা অমূলক হলেও কেউ মন থেকে তাড়াতে পারল না। খেয়ালের বশে মেয়েটা যদি আত্মহত্যা করে বসে!

সেই মুহূর্ত্তে ছায়ার মুখখানা ফ্যাকাশে পাণ্ডুর হয়ে গেল। সকলের সামনে দাঁড়িয়ে সে সকলকে ছাড়িয়ে একটু গভীরভাবে কি একটা ভাববার চেষ্টা করল। সবচেয়ে বড় ক্ষোভ জমা রইল তার মনে, কল্পনার যাওয়ার আগে একটা প্রণামও করতে পারল না। অন্ততঃ অমুতোষের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে পারত। নিজের অজ্ঞাত অপরাধের ভার হয়ত একটু লাঘব করে নেওয়া যেত। কিন্তু তার আগেই সে চলে গেল। আর এই চলে যাওয়াটা অমুতোষের মত ছায়ার কাছেও বড় ঘটনা হয়ে বেঁচে রইল।

আমাদের অভাব

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

চারিদিকে আমাদের অভাব-অনটনের কথা শুনিতে পাই। বেশীর ভাগই 'তেল-নুন-লকড়ি'র অভাবের কথা, ইহা মোচনের ভার নেতারা লইয়াছেন। এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিব না। আমরা ব্যক্তিগত জীবনে বাংলা ভাষায় যে যে বইয়ের অভাব অনুভব করিয়াছি, তাহার সম্বন্ধে সুধী পাঠকগণকে কিছু নিবেদন করিব। আমাদের মত অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিকেও এই অভাবের কথা বলিতে শুনিয়াছি।

এইরূপ বহু বিষয়ে অভাব থাকিলেও সম্প্রতি অভাব মোচনের জন্য কিছু কিছু চেষ্টা হইয়াছে ও হইতেছে। ব্যক্তিগত ভাবে এই চেষ্টায় প্রথম প্রথম ত্রুটি, ভুল-ভ্রান্তি, অসম্পূর্ণতা থাকিলেও ভবিষ্যতে এই সব ত্রুটি, ভুল-ভ্রান্তি, অসম্পূর্ণতা দূর হইবে—ইহার জন্য চাই সমবেত প্রচেষ্টা ও যথেষ্ট অর্থ ব্যয় এবং আগ্রহী কর্ম্মী।

আমাদের পৌরাণিক-অভিধান ছিল না। আমরা, যাহারা পাঠ্যাবস্থায় ঠাকুরমা, দিদিমার অনুরোধে-উপরোধে রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি পাঠ করিয়াছি, ভাসাভাসা ভাবে পৌরাণিক চরিত্রাদির কথা মনে থাকিলেও, যথাযথভাবে চরিত্রাদির বৈশিষ্ট্য বা সমস্ত কার্য্যাবলী মনে নাই। আমরা পৌরাণিক অভিধানের অভাব অনুভব করিতাম। আর যাঁহাদের, বিশেষ করিয়া বর্ত্তমান যুগের কলেজি শিক্ষিতদের, এইরূপ রামায়ণ-মহাভারতাদির সহিত পরিচয় নাই, তাঁহারা ত অভাব আরও অনুভব করিয়াছেন।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার মহাশয় এইরূপ একখানি ছোট পৌরাণিক অভিধান সঙ্কলন করিয়া আমাদের অভাব বহুলাংশে দূর করিয়াছেন। কিন্তু ইহাও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই—আশাকরি ভবিষ্যৎ সংস্করণে তিনি যে যে বিষয়ে ত্রুটি আছে তাহা দূর করিবেন। আর আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য তাহাতে যে যে বিষয় নাই, বা যে যে বিষয়ে অসম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া আছে তাহা তাঁহাকে জানান। তিনি অভিধানে কতকগুলি দেব-দেবীর ছবি দিয়াছেন, ইহাপেক্ষা আরও ভাল ছবির সন্ধান পাইলে তাঁহাকে পাঠান। দেব-দেবীর বিভিন্ন ধ্যানও আবশ্যক।

আশার কথা, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ একটি ভারত-কোষ বাংলায় প্রকাশ করিবার আয়োজন করিতেছেন, এ বিষয়ে তাঁহারা সরকারী অর্থ-সাহায্য পাইবেন। সমবেত চেষ্টায় এই ভারত-কোষ যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। এই ভারত-কোষ বাংলায় আমাদের একটি গুরুতর অভাব দূর করিবে।

আমাদের বাংলা সাহিত্যের সহিত, বিশেষ করিয়া পুরাতন বাংলা সাহিত্যের সহিত পরিচয়, ভাসা-ভাসা। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া জানিতে পারি যে, বাংলা সাহিত্যের জন্ম হইয়াছে হাজার বছরেরও পূর্ব্বে। তখন ভাষার কি রূপ ছিল? বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন সময়ে বাংলা পদ্য বা গদ্যের রূপ কি রকম? বাক্য-বিন্যাস কিরূপ? বিভিন্ন যুগের শব্দের রূপ, বাক-ভঙ্গি, ভাব-প্রকাশের রীতিই বা কিরূপ ছিল? সহজে জানিবার উপায় নাই।

এই বিষয়ে ইংরেজী manual of literature-এর অনুরূপ একখানি এক হাজার-দেড় হাজার পাতার সঙ্কলন-গ্রন্থ, যাহাতে চর্য্যাপদ হইতে রবীন্দ্রনাথ অবধি বিভিন্ন যুগের, বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন রচনার বা কাব্যের বেশ বড় বড় উদ্ধৃতি টিপ্পনীসহ থাকিবে, এবং প্রত্যেক যুগের, প্রত্যেক লেখকের বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবে, বিশদ সূচীপত্রসহ যদি প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে বাংলা সাহিত্যের ও বাংলা ভাষার ছাত্রদের ত বটেই, সাধারণ শিক্ষিত পাঠকেরও বহু কাজে আসিবে। বাংলা সাহিত্যের সহিত পরিচয় নিবিড় হইবে। এই সঙ্গে যদি প্রাচীন বাংলা শব্দের অর্থ বর্ত্তমান যুগের বাংলায় দেওয়া থাকে ত আরও ভাল হয়।

বাংলা ভাষার সমৃদ্ধিকল্পে যুগে যুগে বহু লেখক পরিশ্রম করিয়াছেন। ইঁহাদের সময় ও পরিচয় আমরা জানি না। এবং ইঁহারা এক এক জনে কি কি বই লিখিয়াছেন তাহাও জানি না। সাহিত্যের ইতিহাসে ইঁহাদের প্রধান প্রধান বা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লেখার সম্বন্ধে উল্লেখ আছে, কিন্তু ইঁহাদের সব লেখার উল্লেখ নাই ও তাহা থাকিতে পারে না। এ বিষয়ে dictionary of English [French ইত্যাদি] literature-এর অনুরূপ একখানি ছোট একখণ্ড তিন-চারি শত পৃষ্ঠার বই হইলে চলে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বহু লেখক সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ খানিকটা কাজ আগাইয়া দিয়াছেন। বৈষ্ণব গ্রন্থ সম্বন্ধে হরিদাস দাস বাবাজী মহাশয় বহুতথ্যপূর্ণ জীবনী-কোষ লিখিয়াছেন। আরও দুই-চারি জন কিছু কিছু কাজ করিয়াছেন। সুতরাং এ বিষয়ে সহজেই একটি বাংলা সাহিত্যের অভিধান সঙ্কলিত হইতে পারে বলিয়া মনে করি।

বাংলায় বহু দাতা, ধনী, ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর জন্মিয়াছেন ও তাঁহাদের কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। বহু বাঙ্গালী সাধক তাঁহাদের সাধনার ফল জাতিকে দিয়া গিয়াছেন। এই সব প্রখ্যাত বাংলার জীবনী-কোষ থাকা জাতির আত্ম-সম্মানের জন্য একান্ত প্রয়োজন। বঙ্কিমবাবু যেমন সাহিত্য-জগতে সম্রাট, তেমনি ব্যবসা-জগতে স্বর্গীয় স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, চিকিৎসা-জগতে ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, স্যর নীলরতন সরকার, আইনজ্ঞ হিসাবে স্যর রাসবিহারী ঘোষ, দানবীর হিসাবে রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, স্যর তারকনাথ পালিত অথবা হিসাবে "কাল দোয়ারী" বা প্রথম দ্বারকানাথ মিত্র, বৈজ্ঞানিক হিসাবে জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহা, থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে শরৎচন্দ্র ঘোষ (ছাতুবাবুর দৌহিত্র), ভুবন নিয়োগী, নট হিসাবে অমর দত্ত, অমৃতলাল মিত্র প্রভৃতির জীবনী একত্রে সংক্ষেপে পাইলে জাতির উপকার হয়। এইরূপ জীবনী-কোষ সঙ্কলন করা কি

দুঃসাধ্য ? শিক্ষিত বাঙালী একটু সমবেত চেষ্টা করিলেই সহজে এই কার্য্য সম্পন্ন হয়।

ইংরাজীতে বহু dictionary of references ও quotationsএ আছে। আমাদের পাঠ্যাবস্থায় ইংরাজী সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের জন্য আমরা Brewer-এর বই দেখিতাম। শুনিলাম "এ যে বগীবিন্দির ঝগড়া দেখিতেছি।" এই বগীই বা কে ? বিন্দিই বা কে ? দীনবন্ধু মিত্রের কোন লেখায় এই বগী-বিন্দীর কথা আছে তাহা জানি না। এক ভদ্রলোক বলিলেন যে, ইংরাজ লেখক থ্যাকারে বলিয়াছেন, "A pleasing face is a perpetual letter of recommendation." অপর এক ভদ্রলোক বলিলেন, "কেন বঙ্কিমবাবুও বলিয়াছেন 'সুন্দর মুখের সর্ব্বত্র জয়।' কোন বইয়ে বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন জানি না—জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস হইল না। একখানি বাংলা রেফারেন্সের ও উদ্ধৃতির অভিধান থাকিলে আমার পক্ষে বুঝা ও উদ্ধৃতিটি কোথা হইতে লওয়া খুঁজিয়া বাহির করা সহজসাধ্য হইত।

প্রবাদ-প্রবচনের সংগ্রহ বাহির হইয়াছে। কিন্তু প্রবাদের উৎপত্তি, অর্থ, তাৎপর্য্য সম্বন্ধে সুসম্বদ্ধ কোনও বই আমাদের চোখে পড়ে নাই। হয়ত আমাদের অজ্ঞতা বশতঃই চোখে পড়ে নাই। কিন্তু এইরূপ পুস্তকের অভাব আমরা অনুভব করিয়াছি। 'নবাব তেজচাঁদ বাহাদুরে'র অর্থ কি ? নবাবরা সাধারণতঃ অত্যন্ত বিলাসী, সৌখিন ও অমিতব্যয়ী। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ তেজচাঁদ বাহাদুর সম্বন্ধে বহু অমিতব্যয়ের, সখের গল্প প্রচলিত আছে। দেওয়ান খবর দিল ১০০,০০০৲ টাকা রাজস্ব বাকী পড়ায় জমীদারী নীলাম হইবে, তেজচাঁদ বাহাদুর তখন লালমুনিয়ার শিস শুনিতেছেন, পাছে তাহার ব্যাঘাত হয়—এ জন্য বলিলেন, 'কথা বন্ধ কর, 'লাল ঘাবড়াইবে।' ইত্যাদি ইত্যাদি। 'বাবু ত বাবু ছকু বাবু', ছকু বাবুর বাড়ীতে বহু ঝাড়-লণ্ঠন ও দেওয়ালগিরি। বাবু পায়খানায় গিয়াছেন। ফরাসেরা ঝাড় মুছিতে মুছিতে একটি ঝাড় ভাঙিয়া ফেলিল, ঝুন ঝুন করিয়া মিঠা শব্দ হইল। ছকু বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন কিসের শব্দ। ভয়ে কেহ কথা বলে না। পরে যখন শুনিলেন ঝাড় ভাঙিয়া যাওয়াতে এইরূপ ঝুন ঝুন মিঠা শব্দ হইয়াছে, তখন আর একটি ঝাড় ভাঙিয়া ফেলিতে হুকুম দিলেন—যাহাতে তিনি ভাল করিয়া মিঠা শব্দের তারিফ করিতে পারেন। এইরূপ একটি প্রবাদ-প্রবচনের সংগ্রহ বিশেষ আবশ্যক।

তারিখের অভিধান নাই আমাদের। আমরা চাই তারিখের অভিধান যাহাতে পৃথিবীর, বিশেষ করিয়া ভারতের ও বাংলার ঘটনার সুবিস্তৃত বিবরণ থাকিবে। প্রথমে ভারতে প্রচলিত নানান বৎসরের আরম্ভ ও পরিচয় থাকিবে ও কি করিয়া এই সব বৎসরের তারিখ ইংরাজী বৎসরে পরিণত করিতে পারি তাহার বিশদ বিবরণ ও হিসাব থাকিবে। যেমন হিজরী বৎসরকে ইংরাজী খ্রীষ্টাব্দে সহজে কি করিয়া পরিণত করিতে পারা যায়—ইত্যাদি থাকিবে। তাহার পর ঘটনার তারিখ থাকিবে, এ সম্বন্ধে বিমত থাকিলে সর্ব্বপ্রথমে আগেকার (বা পরেকার) তারিখ দিয়া পাদটীকায় অপর মতটিও দিতে হইবে।

যেমন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হিন্দু মতে ৩১০০ খ্রীঃ পূঃ-এ ঘটিয়াছিল। বঙ্কিমবাবুর মতে ১৪৫০ খৃঃ পূঃ, আবার কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ৮৫০ খৃঃ পূঃ-এ ঘটিয়াছিল। সবকটি তারিখই দিতে হইবে।

শঙ্করাচার্য্যের জন্মসময় ও কাল লইয়া এইরূপ মতভেদ আছে। সবকটি মতই দিতে হইবে। এইরূপ না দিলে ইহার কার্য্যকারিতা কমিয়া যাইবে।

সঙ্গে সঙ্গে কিছু ইতিহাস দিতে হইবে। যেমন শঙ্করাচার্য্য চারিটি মঠ স্থাপন করেন। প্রত্যেক মঠের জগদগুরু ছিল। কোন কারণে ৩০০।৪০০ বৎসর আগে যোশীমঠের জগদগুরু-পদ লুপ্ত হইয়া যায়। পুনরায় বিশ বৎসর আগে নূতন পর্য্যায়ে ব্রহ্মানন্দ প্রথম জগদগুরু হয়েন। তাঁহার মৃত্যুর পর করপত্রজী জগদগুরু হইয়াছেন। এইরূপ ইতিহাস বা বিবরণ থাকা চাই। নচেৎ কার্য্যকারিতা কম হইবে।

দিল্লীর বাদশাহদের আগাগোড়া তালিকা মায় বাদশাহীর তারিখসহ থাকিবে। বাংলার সুলতান ও নবাবদিগের তালিকাও থাকিবে। কিন্তু গুজরাটের সুলতান বা নবাবদের তালিকা না থাকিলেও চলিবে।

আজ যদি জিজ্ঞাসা করি, গজনবী ও ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী কোন দিন হইতে কোন দিন মন্ত্রীত্ব করিয়াছিলেন ? অনেকেই, এমন কি পাকা সাংবাদিকদিগকেও মাথা চুলকাইতে হইবে। অথচ মাত্র ৩০,৩৫ বৎসরের আগেকার ব্যাপার। মন্ত্রীদের মন্ত্রীত্বের তালিকা থাকিবে।

স্বদেশী আন্দোলনের বিশিষ্ট তারিখগুলিও থাকিবে, যেমন, ৭ই আগষ্ট ১৯০৫ সনের মিটিং, ১৯০৮ সনের মে মাসে প্রথম বোমা পড়া, আলিপুর বোমার মামলা ইত্যাদি।

গিরিয়ায় দুইবার যুদ্ধ হইয়াছিল। প্রথম বারে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ নবাব সরফরাজ খাঁকে পরাজিত ও নিহত করিয়া বাংলার মসনদ দখল করেন। দ্বিতীয়বার ইংরেজ নবাব মীরকাসিমকে পরাজিত করেন। একটি বাংলার ইতিহাসের, অপরটি ভারতের ইতিহাসের বিশিষ্ট ঘটনা। দুইটিই থাকা চাই। পক্ষান্তরে নবাব বাঙ্গাস খাঁয়ের রোহিল্লাদের সহিত যুদ্ধের ফলাফল, তারিখ বা স্থানের প্রয়োজন নাই।

এইরূপ একটি ৫০০,৬০০ পাতার তারিখের অভিধান থাকিলে কাজের খুব সুবিধা হয়। এ বিষয়ে বিজ্ঞ পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া জাতির কি করা উচিত, কাহাকে দিয়া করান উচিত, চিন্তা করিলে জাতির বহু উপকার হইবে বলিয়া মনে করি।

আরও অনেক বিষয়ে অভাব আছে, যেমন, সমার্থবোধক ও বিপরীতার্থবোধক শব্দের অভিধান,বাংলা শব্দের thesarus প্রভৃতি। আশাকরি, কালক্রমে এই সব অভাব শীঘ্রই দূর হইবে। (বিশদ ঐতিহাসিক মানচিত্রেরও অভাব আছে, যাহা আছে তাহা স্কুলপাঠ্য—ইহা অনেকটা নির্ভর করে ঐতিহাসিক গবেষণার ফলের উপর।



শাস্তি

(একাঙ্কিকা নাটিকা)

শ্রীকৃষ্ণধন দে

[শহরতলীর এক সঙ্কীর্ণ অন্ধকার পথ। পথের দুই পার্শ্বে কয়েকখানি ছোট-বড় পুরাতন বাড়ী। ঝড়-জলের সন্ধ্যা। সাতটা বাজিয়া গিয়াছে। প্রায় সকল বাড়ীরই দরজাজানালা বন্ধ। শুধু একটি ছোট একতলা বাড়ীর জানালা দিয়া খানিকটা আলো জনহীন কর্দমাক্ত রাস্তার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। বিদ্যুতের ঝলক, বজ্রের হুঙ্কার ও প্রচণ্ড ঝড়ের শব্দ। ঐ ছোট একতলার বাহিরের ঘরে—]

হৈমবতী। জানলা দুটো ভাল করে বন্ধ করে দে পীতু। রাস্তার দিকের দরজাটায় খিল দিয়ে দে।

প্রতিমা। সত্যি মা, আজকের রাতটা কি ভয়ানক! ঝড় যেন বাড়ীশুদ্ধ কাঁপিয়ে তুলছে, শুনছ না?

হৈমবতী। শুনছি, সব শুনছি। আজকের এই ভয়ানক রাতটাই আমার বড় আপন পীতু, বড় আপন। আজকের তারিখটা মনে আছে ত স্বদেশ?

স্বদেশ। আজ ২৫শে শ্রাবণ।

হৈমবতী। এ তারিখ যেন তোদের দু'ভাইবোনের বুকে চিরদিন আগুনের অক্ষরে লেখা থাকে। আজ সাত বছর ধরে এই দিনটাকেই সবচেয়ে পবিত্র, সবচেয়ে পুণ্যতিথি ভেবে মনে মনে পুজো করে এসেছি। সাত বছর আগে এই তারিখেই ভোর পাঁচটায় তোদের বাবা—

(একটা মাল্যশোভিত তৈলচিত্রে এক যুবকের দীপ্ত মুখ দেখা গেল, প্রতিমা ও স্বদেশ ধীরে ধীরে তৈলচিত্রের নিকটে গিয়া প্রণাম করিল)।

স্বদেশ। মা, আবার বাবার কথা বল।

হৈমবতী। বলব বৈ কি বাবা, বলার কি আর শেষ আছে রে! শুধু কি আমি বলি, দেশের সকলে আজও তাঁরই কথা বলেন। এতবড় নির্ভীক বীর এ দেশে ক'জন জন্মেছেন? কিন্তু এমন একদিন ছিল, যখন তাঁর কথা চুপি চুপি বলতে হ'ত, পাছে চারপাশের দেওয়াল তা শুনতে পায়।

(হৈমবতীর মাথাটা হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল, তার পর তিনি যেন তন্দ্রাচ্ছন্নের মত বলিতে লাগিলেন—)

সে রাত ছিল কালো মেঘে ভরা। নদীতে তুফান জেগেছে, ঝড়ের বেগে সামনের সুপুরীগাছগুলো নুয়ে পড়ছে, বাজের শব্দে আকাশ যেন কেটে চৌচীর হয়ে যাচ্ছে, আর সেই সময়ে দুপুর রাতে নদী পার হয়ে ভিজে-কাপড়ে তিনি এসে দাঁড়ালেন আমার ঘরের জানালার কাছে। আমি ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম, তিনি বললেন, "আমি এসেছি হেম।" আমি তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিতেই ঝড়ো-হাওয়ার সঙ্গে তিনি ঘরের ভেতর ঢুকলেন। আমি দরজায় খিল দিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এতদিন কোথায় ছিলে? এ ঝড়-জলের রাতে কোথা থেকে এলে? হাতে তোমার রিভলভার কেন? কি করে এসেছ তুমি?" তিনি হেসে হাতের রিভলভারটা বিছানার একপাশে রেখে বললেন, "যে লালমুখ বিদেশীরা কতকগুলো দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতককে নিয়ে আমাদের জন্মভূমি এই ভারতবর্ষের উপর নির্য্যাতন আর শোষণ চালায় তাদেরই দু'জনকে আজ একটু আগে শেষ করে এসেছি হেম। কালই ভোরে এখান থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছি—এ আমার এখনকার নিরুদ্দেশ যাত্রা। শুধু আজকের রাতটা এখানে থাকব। গোয়েন্দার দল হয়ত পিছু নিয়েছে। আজ শুধু তোমার কাছে শেষ বিদায় নিতে এসেছি হেম। হয়ত এটা আমার নিদারুণ ভুল, তবুও কত বড় বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তোমাকে শেষ দেখা দেখতে এসেছি জান?" আমি তাঁর হাতে একখানা শুকনো কাপড় দিয়ে কেঁদে ফেললাম। তিনি বললেন, "কাঁদছ কেন হেম? এই ত আমাদের দুর্গম পথ।" আমি বললাম, "থাক না কেন এখানে ক'দিন। অনেকদিন পরে ত এলে!" তিনি শুধু একটু ম্লান হাসি হাসলেন, বললেন—"তা হয় না, আমাকে যে কাল ভোরে যেতেই হবে!

(হঠাৎ হৈমবতী উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও অস্থিরভাবে পদচারণা করিতে লাগিলেন, তাঁহার চক্ষুদ্বয় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল)।

স্বদেশ ও প্রতিমা। মা,—মা,—মাগো!

(হৈমবতী হঠাৎ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন)

হৈমবতী। ভোরবেলায় হঠাৎ কিসের কোলাহল আর দরজায় ধাক্কা শুনে চমকে বিছানা থেকে উঠে দেখি, তিনি রিভলভার হাতে নিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। দারুণ ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমি জানালার ফাক দিয়ে দেখি বন্দুকহাতে পুলিসের বড় একটা দল আমাদের বাড়ী ঘিরে ফেলেছে। তিনি আমাকে দেখে আর একটা রিভলভার আমার হাতে দিয়ে বললেন, "তোমাকেও ত আমি রিভলভার ছুড়তে শিখিয়েছি হেম, এ বিপদের সময় তুমি আমার সাথী হও।" আমিও তাঁর দেওয়া রিভলভার হাতে নিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালাম। ঘরের দরজা ভেঙে প্রথম যারা ঘরে ঢুকল, তাদের মধ্যে আহত হ'ল জন-চারেক। একটু পিছিয়ে গেল তারা। এবার তিনি আমার হাত থেকে রিভলভারটা কেড়ে নিয়ে শুধু

"বিদায় হেম!" এই কথা ছটি বলে ছ'হাতে রিভলভার চালাতে চালাতে পথে বের হলেন। তাঁর সে বীরমূর্ত্তি এখনও যেন চোখের সামনে ভাসছে! পুলিসের দল তখন ভয়ে কে কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে। একটা গাছের তলা দিয়ে ছুটে যাবার সময় একজন পুলিস অফিসার হঠাৎ আড়াল থেকে তাঁর মাথায় একটা পাথর ছুড়ে মারে, তিনি আহত হয়ে টলতে টলতে সেইখানে পড়ে যান।

(হৈমবতী দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফু'পাইয়া উঠিলেন।)

স্বদেশ ও প্রতিমা। মা,—মা,—মাগো!

(হৈমবতী ধীরে ধীরে মুখ তুলিলেন ও গাঢ়স্বরে বলিতে লাগিলেন)।

হৈমবতী। তার পরের কথা অতি সংক্ষিপ্ত। চলল তাঁর বিচারের অভিনয়। প্রমাণের কি গোলমালে আমি পেলাম মুক্তি, কিন্তু তাঁর হ'ল চরম শাস্তি। শুনলাম, দারুণ নির্য্যাতনেও তিনি তাঁর দলের কোন কথা পুলিসের কাছে বলেন নি। আজকের দিনটা সেই পুণ্যতিথি—যেদিন ফাঁসীর মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি শেষ প্রণাম জানিয়ে গেলেন দেশমাতাকে।

(হৈমবতী একদৃষ্টে স্বামীর তৈলচিত্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া জলধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল)

স্বদেশ ও প্রতিমা। মা—মা—

হৈমবতী। তার পর দেশে আর টিকতে পারলাম না। তাঁর স্ত্রী বলে আমার উপর কি কম নির্য্যাতন চলেছিল! তোদের দু'জনকে নিয়ে কতজায়গা ঘুরে শেষে এসেছি এখানে। সেও আজ ক'বছর হ'ল! কিন্তু যে পুলিস অফিসার তাঁর মাথায় পাথর ছুড়ে মেরে তবে তাঁকে ধরতে পেরেছিল সেই লোকটার মুখ কোনদিন ভুলব না। আদালতে তার মুখখানা বেশ ভাল করেই দেখেছি—তার কপালে লম্বাভাবে একটা বড় কাটা দাগ আছে। নামটাও জানতে পেরেছিলাম, ইনসপেকটার বহু বিশ্বাস।

(হৈমবতীর চক্ষুদ্বয় যেন জলিয়া উঠিল।)

প্রতিমা। মা, মাগো, রাত যে বাড়ছে, তুমি কিছু খাও, সারাটা দিন উপোস করে আছ।

হৈমবতী। ভুলিস না পীতু, আজ আমি জলস্পর্শ করি না। শুধু আজকের দিনটা। আজ আমার বড় পুণ্য দিন। তোমাদের বাবার আত্মোৎসর্গের পবিত্র দিন। যাও স্বদেশ, যাও পীতু, তোমরা কিছু খেয়ে নাও। রাত যে বাড়ছে।

স্বদেশ ও প্রতিমা। আমাদেরও আজ খিদে নেই মা।

হৈমবতী। তবে চুপ করে আমার কাছটিতে বোস।

প্রতিমা। শুনছ মা, ঝড়ের বেগ আরও কত বেড়ে চলেছে। উঃ, কি ভয়ানক শব্দ!

(দরজা-জানালা যেন কাঁপিতে লাগিল। নিকটেই বোধহয় কোথাও বাজ পড়িল।)

প্রতিমা। কি ভয়ানক ঝড়-জলের রাত মা!

(হঠাৎ দরজায় ধাক্কা ও কড়ানাড়ার শব্দ)

হৈমবতী। কে? কে?

(বাহির হইতে চিৎকার করিয়া কে যেন বলিল, 'কে আছেন, একটু আশ্রয় দিন, ঝড়-জলের মধ্যে বড়ই বিপদে পড়েছি। আমি ভদ্রলোক, ঝড়-জল থামলেই চলে যাব। কিছুক্ষণের জন্ম একটু আশ্রয় দিন।')

স্বদেশ। খুলব মা?

প্রতিমা। না স্বদেশ, খুল না, ওকে অন্ত কোথাও যেতে বল। কি বল মা?

(পুনরায় ভয়ানক বজ্রধ্বনি শোনা গেল। বাহিরের আগন্তুক দরজায় ধাক্কা দিয়া চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, 'একটু আশ্রয় দিন।')

প্রতিমা। (দরজার নিকটে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে) অন্ত কোথাও যান, দরজা খুলব না।

(বাহিরের আগন্তুক পুনরায় চিৎকার করিয়া বলিল, 'একটু আশ্রয় দিন আমাকে, আমি ভদ্রলোক।')

হৈমবতী। নিশ্চয়ই ঝড়-জলে খুবই বিপদে পড়েছেন ভদ্রলোক। আচ্ছা, দরজা খুলে দাও স্বদেশ।

(স্বদেশ দরজা খুলিতেই সর্ব্বাঙ্গে জলসিক্ত রেনকোট-ঢাকা, মাথায় রেনক্যাপ কপাল পর্য্যন্ত টানা, খাঁকি প্যাণ্টপরা একটি লোক দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ঝড়ের বেগে দরজার ফাঁক দিয়া এক ঝাপটা বৃষ্টিধারা মেঝের খানিকটা ভিজাইয়া দিল। হৈমবতী ইঙ্গিতে তাহাকে দরজার পার্শ্বের একখানি চেয়ারে বসিতে বলিলেন। লোকটি যেখানে বসিল সে স্থান হইতে তৈলচিত্রটিকে ভাল দেখা যায় না। লোকটি বসিল কিন্তু গায়ের রেনকোট বা মাথায় রেনক্যাপ খুলিল না।)

আগন্তুক। নমস্কার, অশেষ ধন্তবাদ! ঝড়-জল একটু থামলেই চলে যাব। আপনাদের দয়ার কথা—

হৈমবতী। থাক, থাক, ও সব থাক। আপনার ওভারকোট আর টুপি খুলে ফেলে একটু স্বচ্ছন্দে বসুন।

আগন্তুক। এসব আর খুলব না। একটু শীত-শীত বোধ করছি। ঝড়জল একটু থামলেই ত চলে যাচ্ছি।

হৈমবতী। আপনি এ দিকে থাকেন না বুঝি? এমন ঝড় বৃষ্টি মাথায় নিয়ে এ রাত্রে—

আগন্তুক। (মৃদু হাসিয়া) বাধ্য না হইলে ইচ্ছে করে কি এ দুর্য্যোগে কেউ বেরোয়? কি করব বলুন, চাকরির দায়ে বাধ্য হয়েই বেরোতে হয়েছে।

হৈমবতী। (প্রতিমার দিকে ফিরিয়া) উনি এখন আমাদের অতিথি। যাও প্রতিমা, ভদ্রলোকের জন্ত একটু চা করে আন।

আগন্তুক। না, না, ও সব থাক।

হৈমবতী। আপনি ভদ্রলোক, এ দুর্য্যোগে আমাদের বাড়ীতে

এসেছেন, আপনার এতে সংকোচ করবার কিছু নেই। যাও প্রতিমা।

(প্রতিমা ভিতরের দ্বারপথে চলিয়া গেল।)

আগন্তুক। এ দুটি বুঝি আপনার ছেলেমেয়ে?

হৈমবতী। হাঁ, এর নাম স্বদেশ, ওর নাম প্রতিমা।

আগন্তুক। তুমি কোন্ ক্লাসে পড় স্বদেশ?

স্বদেশ। ক্লাস সেভেন।

আগন্তুক। আর তোমার দিদি প্রতিমা?

স্বদেশ। দিদি আর পড়ে না।

হৈমবতী। প্রতিমা গত বৎসর স্কুল ফাইনাল পাশ করেছে, কলেজের খরচ ত আর কম নয়, তাই আর পড়াতে পারি নি ওকে।

আগন্তুক। ওঃ। তা আপনার আত্মীয়-স্বজনের কোন সাহায্য?

(হৈমবতীর মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি আগন্তুকের কথার কোন উত্তর দিলেন না।)

আগন্তুক। মাপ করবেন, কথাটা বলে আমি হয়ত অন্যায় করেছি।

হৈমবতী। যাক সে কথা, কিন্তু আমার মনে হয়, রাত্রে এ ঝড়-বৃষ্টিতেও যেকালে আপনাকে বেরুতে হয়েছে, তখন নিশ্চয়ই কোন বিশেষ জরুরী কাজ আছে আপনার।

আগন্তুক। জরুরী ত বটেই, অবশ্য আপনাকে বলতে বাধা নেই আমার, একজন পলাতক আসামীর খোঁজেই—

(হৈমবতীর মুখে কঠোর ভাব ফুটিয়া উঠিল ও ওষ্ঠাধর দৃঢ়সংবদ্ধ হইল।)

হৈমবতী। আপনি তা হলে পুলিসের লোক?

আগন্তুক। অনেকদিন ধরে ত এ কাজ করছি, তবে আর বেশীদিন নয়।

(হৈমবতী স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁহার চক্ষুদ্বয় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। এই সময়ে প্রতিমা চায়ের কাপ হাতে লইয়া হৈমবতীর পাশ দিয়া আগন্তুকের দিকে অগ্রসর হইতেই সহসা হৈমবতীর আকস্মিক হস্ত-সঞ্চালনে চায়ের কাপ মাটিতে পড়িয়া ভাঙিয়া গেল ও চা মেঝের ছড়াইয়া পড়িল।)

প্রতিমা। এ কি করলে মা, চা-টা যে সব পড়ে গেল!

হৈমবতী। (ম্লান হাসি হাসিয়া) হঠাৎ হাতটা নড়ে উঠল কিনা!

প্রতিমা। আবার চা করে আনছি।

আগন্তুক। না, না, থাক। আর তোমাকে কষ্ট করতে হবে না প্রতিমা। তা ছাড়া, এ ঘরটা দেখছি বেশ গরম, চা না খেলেও চলে।

হৈমবতী। থাক প্রতিমা, উনি যখন বারণ করছেন—

(আগন্তুক এবার তাঁর ওভারকোট, রেনক্যাপ ও কোমরের পিস্তল সমেত বেল্টটি খুলিয়া পার্শ্বের টিপয়ের উপর রাখিলেন। তাঁহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়াছে, হৈমবতী তাঁহার কপালের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।)

স্বদেশ। মা।

(হৈমবতী কোন উত্তর দিলেন না। বাহিরে প্রচণ্ড বজ্রধ্বনি ও প্রবল ঝড়ের শব্দ। ঘরের মধ্যে দেওয়াল-ঘড়িতে টং টং করিয়া ন'টা বাজিল।)

স্বদেশ। মা, ন'টা বাজল। বাবার ছবির সামনে এখন সেই গানটা গাইব?

হৈমবতী। ওঃ! ভুলেই যাচ্ছিলাম সে কথা। আজকের দিনে সে গান যে গাইতেই হবে। গাও স্বদেশ প্রতিমা সে গান গাও।

(স্বদেশ ও প্রতিমা তাহাদের বাবার তৈলচিত্রের সম্মুখে জোড়-হস্তে দাঁড়াইয়া দ্বৈতকণ্ঠে গাহিতে লাগিল।)

গান

রক্ত-পিচ্ছিল মোদের পথ,
অগ্নিবজ্র মোদের রথ,
আমরা যে চলি কণ্টক দলি'
দানবভ্রূকুটি করি না ভয়!
মৃত্যুর পণে হবে বিজয়, হবে বিজয়, হবে বিজয়!

টুটে যাবে যত কারা-নিগড়,
সরে যাবে যত গ্লানি-পাথর,
মোদের রক্ত হবে অলক্ত
মায়ের চরণে সুনিশ্চয়!
মৃত্যুর পণে হবে বিজয়, হবে বিজয়, হবে বিজয়!

উল্কার মোরা রচি নিশান,
ঝঞ্ঝার তালে গাহি যে গান,
সপ্তসাগর-ঘূর্ণি-তুফানে
মোদের এ পথে জাগে প্রলয়!
মৃত্যুর পণে হবে বিজয়, হবে বিজয়, হবে বিজয়!

ফাঁসীর মঞ্চে যাক-না প্রাণ,
সার্থক হবে আত্মদান!
করিব রক্ত-প্রদীপ-শিখায়
অর্ঘ্য মোদের বহ্নিময়!
মৃত্যুর পণে হবে বিজয়, হবে বিজয়, হবে বিজয়।

(গান শেষ হইলে স্বদেশ ও প্রতিমা নতমস্তকে তাহাদের বাবার তৈলচিত্রকে প্রণাম করিয়া হৈমবতীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।)

আগন্তুক। (ঈষৎ রূঢ় কণ্ঠে) এ গান কোথায় শিখলে স্বদেশ, প্রতিমা?

স্বদেশ। এ গান বাবার রচনা, যার কাছে শিখেছি।

আগন্তুক। এ গানের মানে জান? কাকে লক্ষ্য করে এ গান রচিত হয়েছে বলতে পার?

স্বদেশ। পারি। যারা আমাদের দেশকে পরাধীন করে রেখেছে, সেই ইংরেজ শাসকদের আর যারা এ দেশের লোক হয়েও ইংরেজদের দলে মিশে দেশদ্রোহিতা করছে, তাদেরই উদ্দেশ্যে এ গান।

আগন্তুক। বটে! শোন, এ গান আর কোনদিন গেয়ো না। এতে কত বিপদ আছে জান?

স্বদেশ। কেন গাইব না? আমি বিপদকে ভয় করি না।

আগন্তুক। আর তুমি প্রতিমা?

প্রতিমা। (দৃপ্ত কণ্ঠে) আমিও করি না।

আগন্তুক। তোমরা বিপদকে ভয় কর না বললে ত বিপদ তোমাদের ছাড়বে না। কেন নিজেদের কিশোর জীবন এমন ভাবে নষ্ট করতে চাও? (হৈমবতীর দিকে ফিরিয়া) আর আপনিও কি আপনার ছেলেমেয়ের এ গান গাওয়া সমর্থন করেন?

হৈমবতী। (শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে) কেন করব না বলুন, এ গান যে আমার স্বামীর রচনা, তাঁর জীবনের মন্ত্র! এরই আহ্বানে তিনি যে প্রাণ দিয়েছেন!

আগন্তুক। প্রাণ দিয়েছেন? বটে! তা হলে ত দেখতে হ'ল কে সেই দেশভক্ত মহাপুরুষ!

(হৈমবতীর ললাটে ভ্রূকুটি দেখা দিল, স্বদেশ ও প্রতিমা দৃপ্ত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। আগন্তুক তৈলচিত্রের সম্মুখে গেলেন ও চমকিত হইয়া স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই সময়ে হৈমবতী দ্রুতপদে উঠিয়া গিয়া টিপয়ের উপর হইতে আগন্তুকের পিস্তলের বেল্টটি তুলিয়া লইয়া পুনরায় নিজ স্থানে আসিয়া বসিলেন।)

হৈমবতী। এবার ঠিক চিনতে পেরেছেন, কি বলেন?

(আগন্তুক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তৈলচিত্রের দিকে অল্পক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া হৈমবতীর দিকে মুখ ফিরাইলেন।)

হৈমবতী। আমিও এবার আপনাকে ঠিক চিনতে পেরেছি। সেই কপালের লম্বা কাটা দাগ, সেই মুখ, সেই ক্ষুধার্ত নেকড়ের দৃষ্টি! ইন্‌সপেক্টার যদু বিশ্বাসকে কি আমি এ জীবনে ভুলতে পারি?

আগন্তুক। (চমকিত হইয়া) আপনি আমাকে ঠিকই চিনতে পেরেছেন, আর আমিও এবার আপনাকে চিনতে বিন্দুমাত্র ভুল করি নি। কিন্তু যদু বিশ্বাস একদিন তার চাকুরির কর্তব্য করেছিল এবং আজও এখানে সে তাই করবে। এতে কি আমাকে অপরাধী করতে পারেন আপনি?

হৈমবতী। (শান্ত অথচ গাঢ় স্বরে) না, না, অপরাধী আপনি শুধু আমার কাছে নন, দেশের কাছে, ইতিহাসের কাছে, জগতের কাছে আপনার কি মূল্য তা জানেন? আপনার এ কলঙ্ক সাত-সাগরের জলেও যে ধুয়ে যাবে না ইনসপেক্টার যদু বিশ্বাস। হয়ত তাঁরা দেশকে স্বাধীন করতে পারতেন, কিন্তু পারেন নি শুধু আপনাদের মত কয়েকজন দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের জন্য। আপনারা বিদেশী শাসকদের সহায় না হলে, সাধ্য কি তারা এ দেশ যজ্ঞ পণ্ড করে! আপনারা শুধু দেশের কলঙ্ক নন, দেশের শত্রুও বটে।

আগন্তুক। এ সব কথা আমাকে বলবার সাহস আপনার এল কোথা থেকে?

হৈমবতী। (উচ্চ হাসি হাসিয়া) এ সাহস কোথা থেকে পেয়েছি, এখনও কি সেটা বুঝতে পারেন নি ইনসপেক্টার যদু বিশ্বাস?

আগন্তুক। বেশ, আপনার এ আচরণের কি ফল, সেটা আপনি এখনই টের পাবেন।

(হৈমবতী আবার উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। আগন্তুক দ্রুতপদে নিজের চেয়ারের কাছে আসিয়াই শঙ্কিত কণ্ঠে বলিলেন)

আগন্তুক। আমার রিভলভার ও বেল্ট কোথায় গেল? আমার রিভলভার?

হৈমবতী। বেল্টটা এই এখানে মাটিতে পড়ে আছে, আর আপনার রিভলভার, এই দেখুন, এসেছে আমার হাতে। দেখেছি এর ছ'টা চেম্বারই টোটাভর্তি। আমি যে রিভলভার চালাতে পারি এ পরিচয় আপনি সাত বছর আগেও একদিন পেয়েছিলেন। এ শিক্ষা দিয়েছিলেন আমার স্বামী। আজ হয়ত সেটা কাজে লাগতেও পারে।

আগন্তুক। (শঙ্কিত কণ্ঠে) আপনার উদ্দেশ্য কি?

হৈমবতী। অতি সহজ ও অতি সরল। আজ আমার স্বামীর মৃত্যুদিন। অতি পুণ্যতিথি আমার কাছে। এ তিথিতে তাঁর আত্মার তৃপ্তির জন্য হয়ত এ রিভলভারের একটু প্রয়োজন হতে পারে।

আগন্তুক। আপনি আমাকে খুন করতে চান?

স্বদেশ ও প্রতিমা। মা—মা—

হৈমবতী। তোরা ও ঘরে যা স্বদেশ শীগ্‌গির, এখন এখানে থাকবার দরকার নেই তোদের।

স্বদেশ ও প্রতিমা। মা, মা, আমরা যাব না মা—এখানেই থাকব—

হৈমবতী। না, না, তোরা ও ঘরে যা—যা বলছি—

(স্বদেশ ও প্রতিমা ধীরে ধীরে আগন্তুকের দিকে চাহিতে চাহিতে ভিতরের ঘরে গেল।)

হৈমবতী। রিভলভারের মুখ আর আমার নজর ঠিক আপনার দিকেই আছে ইনস্পেক্টার। অন্য চেষ্টা কিছু করবেন না। আজ আমার বড় পুণ্যদিন, বড় পুণ্যতিথি!

আগন্তুক। মনে রাখবেন, আপনার মত সামান্য এক নারীকে নিষ্পেষিত করতে মহাপরাক্রান্ত ইংরেজ সরকার এখনও বলহীন হন নি।

হৈমবতী। বাঃ, বাঃ, চমৎকার রাজভক্তি ত আপনার, ইনস্পেক্টার!

আগন্তুক। এখনও বলছি, আপনি আমার রিভলভার ফিরিয়ে দিন। নইলে—

হৈমবতী। কি, থামলেন কেন? বলুন। জগৎ জানুক—এক সামান্য নারীর হাতে ইনস্পেক্টার বহু বিশ্বাসের রিভলভার কেমন করে গেল! কত গৌরবের সে কথা বলুন ত!

আগন্তুক। (ঈষৎ রুক্ষ স্বরে) আমি আবার বলছি, আমার রিভলভার ফিরিয়ে দিন—আমি এখনই চলে যাচ্ছি।

হৈমবতী। কিন্তু যাবার আগে শরীরে কিছু স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে যাবেন না ইনস্পেক্টার?—যেমন ধরুন—(রিভলভার উদ্যত করিলেন।)

আগন্তুক। না, না, থামুন, থামুন। আপনি কি আমাকে হত্যা করবেন?

হৈমবতী। সেটা কি আমার পক্ষে অসম্ভব বলে মনে হয় আপনার? গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে আমার স্বামীর মাথায় একদিন পাথর ছুঁড়ে মেরেছিলেন আপনি। তিনি অজ্ঞান হয়ে যাবার পর তাঁকে ধরে শেষে তাঁর ফাঁসীর ব্যবস্থা পর্য্যন্ত আপনি করেছিলেন। আজ আমি তাঁর স্ত্রী হয়ে যদি তাঁর মৃত্যুর প্রতিশোধ নি, সেটা কি আমার পক্ষে অন্যায় হবে?

আগন্তুক। (কি যেন চিন্তা করিয়া) এর পরিণাম কি হবে, সেটা কি ভেবে দেখেছেন? আপনার সন্তান দু'টি—ঐ অসহায় স্বদেশ ও প্রতিমা—ওদের ভয়াবহ পরিণামও কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন না?

হৈমবতী। চমৎকার কথা বলেছেন ইনস্পেক্টার, চমৎকার! বেশ দরদভরা সেন্টিমেন্ট। কিন্তু ও অস্ত্রে আমাকে কাবু করতে পারবেন না। (আগন্তুককে তীব্রভাবে লক্ষ্য করিয়া) সাবধান! আর একটুও নড়বার কি এগোবার চেষ্টা করবেন না! ঠিক ঐ কোণে দাঁড়িয়ে থাকুন। দেখছেন ত, আমার রিভলভার রেডি।

আগন্তুক। আপনি আমার রিভলভার ফিরিয়ে দিন, আমি এখনই চলে যাচ্ছি। আমি ভগবানের নামে শপথ করে বলছি, আমি ভবিষ্যতে আপনাদের কোন বিপদে ফেলব না।

হৈমবতী। আর যদি না দি, আপনাকে যদি এই ঘরের কোণে গুলী করে মারি?

আগন্তুক। আমাকে মেরে আপনি কি আপনাদের বাঁচাতে পারবেন? এতে আপনার পক্ষে আমার উপর প্রতিশোধ নেওয়া ছাড়া সত্যি কি কোন লাভ হবে?

হৈমবতী। লাভ শুধু আমার একলার নয়, ভবিষ্যতে যাঁরা স্বাধীনতা লাভের দুর্গমপথে এগিয়ে আসবেন, তাঁদেরও। তাই আপনার মত একজন দেশের শত্রুকে পথ থেকে সরানো বিশেষ প্রয়োজন।

আগন্তুক। কিন্তু মনে রাখবেন, এক বহু বিশ্বাসের জায়গায় তখন অনেক বহু বিশ্বাস এগিয়ে আসতে পারে।

হৈমবতী। তা জানি, সেটা এ দেশেরই দুর্ভাগ্য।

আগন্তুক। সত্যই কি আপনি আমাকে হত্যা করতে চান?

হৈমবতী। হাঁ চাই, এবং তা এখনই—এই দণ্ডেই। নিন, মরবার জন্যে প্রস্তুত হন। (রিভলভার উদ্যত করিয়া) এক—দুই—ওকি! অত কাঁপছেন কেন? বিস্ফারিত চোখ দু'টিতে সব আতঙ্ক এনে ফেলেছেন দেখছি! মরবার সাহসও আপনার নেই? কিন্তু ভেবে দেখুন, যাঁরা দেশের জন্য ফাঁসীমঞ্চে প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের মুখে ছিল হাসি, মৃত্যুর প্রতি ছিল উপেক্ষা—একটুও কাঁপেন নি তাঁরা। ফাঁসীর রজ্জু ছিল তাঁদের জয়মাল্য। আর সেই দেশেরই মানুষ হয়ে, আপনি?—ধিক্ আপনাকে!

আগন্তুক। (মুখে করুণ ভাব আনিয়া ও স্বর কোমল করিয়া) আমি আমার নিজের জন্য ভাবি না, মরবার সাহস আমার আছে। কিন্তু ভাবছি আমার ছেলেমেয়ের জন্যে। তাদেরও বয়স ঠিক ঐ স্বদেশ ও প্রতিমার মত। আর ভাবছি, আমার সাধ্বী রুগ্না স্ত্রীর কথা। রোগে অবসন্ন, চিন্তায় কাতর, একান্ত অসহায় এক কঙ্কালসার নারীমূর্ত্তি, যাকে ডাক্তার শেষ জবাব দিয়ে গেছেন, যে প্রতি মুহূর্ত্তে মরণের আগে অন্তিমশয্যায় শুয়ে আমার শেষ দর্শনের আশায় তার করুণ বিহ্বল চোখ দু'টি মেলে চেয়ে আছে আমারই পথের পানে।

হৈমবতী। কিন্তু ভেবে দেখুন, এ সব কথা কি আপনি অপরের পক্ষেও কখনও ভেবে দেখেছিলেন?

আগন্তুক। আমি সেজন্য দারুণ অনুতপ্ত, হাঁ, অনুশোচনার আগুন আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত পুড়িয়ে দিচ্ছে। আজ আমি ভগবানের নামে শপথ করে বলছি, এ পাপ-চাকরি এই দণ্ডেই ছাড়লাম। আমি প্রায়শ্চিত্ত করব, হাঁ কঠোর প্রায়শ্চিত্ত। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্যে এই মহান্ বিপ্লবীদের দলে যোগ দিয়ে দেহের শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী-জন্মভূমির মুক্তিযজ্ঞে আহুতি দেব। আমি দেশের এই মাটি ছুঁয়ে, ভগবানের নামে শপথ করে প্রতিজ্ঞা করছি, এ চাকরী ছাড়লাম। আপনি বিশ্বাস করুন, এই মুহূর্ত্ত থেকে আমি বিপ্লবী। আপনার স্বর্গীয় স্বামীই আমার গুরু, তাঁর মন্ত্রই আমার ইষ্টমন্ত্র। আর যদি আমাকে বিশ্বাস না করেন, তবে এই আমি আমার বুক পেতে দিচ্ছি, আমাকে হত্যা করুন, হাঁ, নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করুন, আমি প্রস্তুত।

হৈমবতী। আপনি যে আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবেন, তার প্রমাণ কি?

আগন্তুক। প্রমাণ চান? বেশ, এই আমি প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালাম, আমাকে হত্যা করুন। এর চেয়েও প্রমাণ চান আপনি? তবে দেখুন, আপনার সামনেই আত্মহত্যা করে আমার এ পাপ-প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছি! দিন ও রিভলভার আমার হাতে, আমি নিজের হাতে আপনার চোখের সামনে আমার বক্ষঃস্থল গুলীবিদ্ধ করে প্রমাণ দি, যে আমি প্রাণ দিতে পারি। দিন ও রিভলভার আমার হাতে দিন, দেখুন এ পাপ জীবনের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত!

হৈমবতী। (ব্যঙ্গহাসি হাসিয়া) রিভলভার আপনার হাতে ফিরিয়ে দিলে সেটা যে তখনই আমারই দিকে মুখ ফেরাতে পারে, সেটা জানতে আমার একটুও বিলম্ব হয় না ইনস্পেক্টার। কিন্তু আপনি ভগবানের নাম নিয়ে জননী-জন্মভূমির মাটি ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছেন, চাকরী ছেড়ে বিপ্লবী হয়ে দেশের মুক্তিযজ্ঞের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

আগন্তুক। নিশ্চয়, নিশ্চয়, আমি যে কঠোর প্রতিজ্ঞা করেছি, যতদিন এ দেহে প্রাণ থাকবে মহাবিপ্লবী হয়ে সে প্রতিজ্ঞা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।

হৈমবতী। আমার ভাগ্যে যা হবার হয়েছে। কিন্তু আমি আর একজন রুগ্না সাধ্বীকে মরণের আগে বিধবা করতে চাই না।

আগন্তুক। আপনার এ দয়ার কথা আমাকে বিপ্লবের কাজে নূতন প্রেরণা এনে দেবে।

হৈমবতী। মনে থাকে যেন আপনার প্রতিজ্ঞার কথা। এই নিন আপনার বেল্ট আর রিভলভার। টোটাগুলো আমি কিন্তু সব খুলে নিচ্ছি। এগুলো থাকলে এটা দিয়ে আপনি হয়ত অনুশোচনায় আত্মহত্যাও করতে পারেন। যান, আর মুহূর্ত বিলম্ব করবেন না, এখনই চলে যান, যান—(ভয়ানক বজ্রধ্বনি) যান—যান—

(ত্রস্তে বেল্ট, টোটাশূন্য রিভলভার ও রেনকোট লইয়া হৈমবতীর দিকে চাহিতে চাহিতে দ্বার খুলিয়া আগন্তুক দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। হৈমবতী নিজ হস্তে দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন)।

প্রতিমা ও স্বদেশ। (দ্রুতবেগে প্রবেশ করিয়া) মা—মা

হৈমবতী। কেন রে ?

প্রতিমা। ও চলে গেল মা ?

স্বদেশ। ওকে ছেড়ে দিলে মা ?

হৈমবতী। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ও মৃদু হাসিয়া) হাঁ দিয়েছি। কেন যে দিলাম তা জানি না। (স্বামীর তৈলচিত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আকুলভাবে সেইদিকে চাহিয়া)—ওগো, তুমি আমায় ক্ষমা কর, আমি পারি নি, আমি পারি নি—আমি তোমার অযোগ্য, আমি পারি নি—(হৈমবতীর চক্ষে অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িল ও আবেগে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল]।

স্বদেশ ও প্রতিমা। মা—মা—মাগো—

হৈমবতী। (তৈলচিত্রের দিকে সেইভাবে চাহিয়া থাকিয়া) আমাকে শাস্তি দাও, ওগো, আমাকে শাস্তি দাও,—আমি পারি নি, আমি পারি নি।

স্বদেশ ও প্রতিমা। মা—মা—অমন কর না মা—একটু স্থির হও।

হৈমবতী। হয়ত ভুলই করেছি। কিন্তু এ আমি কি করলাম! আজ তোমার মৃত্যুর পুণ্যতিথিতে মুহূর্তের দুর্বলতার রক্তে তোমার স্মৃতিতর্পণ করতে পারলাম না। অপরাধীকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিলাম! তুমি আমাকে ক্ষমা কর,—ওগো আমাকে ক্ষমা কর। না পার, আমাকে শাস্তি দাও,—আমাকে শাস্তি দাও, আমাকে শাস্তি দাও!—

(হৈমবতী কাঁপিতে কাঁপিতে মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। স্বদেশ ও প্রতিমা তাঁহাকে তুলিয়া একখানি চেয়ারে বসাইল।)

প্রতিমা। মা, যা হবার হয়েছে, এখন একটু শান্ত হও, এ সব আর ভেব না মা, তুমি ছাড়া আমাদের কে আর আছে ?

স্বদেশ। তুমি অমন করলে আমরা কি করব মা ?

হৈমবতী। (সস্নেহে প্রতিমা ও স্বদেশের মাথায় হাত বুলাইয়া) রাত যে অনেক হ'ল, তোমরা এখন শোওগে যাও। আমি একটু পরে যাচ্ছি।

প্রতিমা। তোমায় ছেড়ে যাব না মা।

স্বদেশ। আমি আজ সারারাত তোমার কাছেই থাকব মা।

হৈমবতী। (ম্লানহাসি হাসিয়া) আজ কি আর আমার চোখে ঘুম আসে রে! বাইরের ঝড়-জল এবার বুঝি থেমে গেছে, কিন্তু সে সব এখন আমার বুকের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। জানালা দুটি এবার খুলে দে পীতু।

(প্রতিমা জানালা খুলিতে গিয়া চমকিয়া ছুটিয়া আসিল)।

প্রতিমা। মা,—মা,—পুলিস,—একগাড়ী পুলিস!

(সঙ্গে সঙ্গে দরজায় ভীষণ আঘাত। বাহির হইতে তীব্র কর্কশ কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—"দরজা খুলুন শীগগির—")

হৈমবতী। শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে) দরজা খুলে দাও স্বদেশ।

(দ্বার খুলিতেই রিভলভার হস্তে ইন্সপেক্টার বহু বিশ্বাস, তৎসঙ্গে একজন ফেল্ট-হ্যাট মাথায়, দাড়ি-গোঁফ কামানো লম্বাকৃতি সাহেব, দু'জন পুলিস অফিসার ও জন ছয়েক পাহারাওয়ালা প্রবেশ করিল।)

বহুবিশ্বাস। There she stands! She is a dangerous terrorist.

সাহেব। I see. You may arrest her.

প্রতিমা ও স্বদেশ। মা—মা—(হৈমবতীকে জড়াইয়া ধরিল)

প্রথম অফিসার। চলুন আমাদের সঙ্গে। আপনি একজন বিপ্লবী বলে আমরা আপনাকে এ্যারেষ্ট করলাম।

দ্বিতীয় অফিসার। আপনি রিভলভার দিয়ে ইন্সপেক্টার বিশ্বাসকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন। It was an attempt to murder a police officer. আর দেরী করবেন না, চলুন—

হৈমবতী। ঠিকই বলেছেন আপনারা। চলুন, যাচ্ছি।

প্রথম অফিসার। But the boy and the girl, Sir?

সাহেব। What's their offence?

বহু বিশ্বাস। They also sang a seditious song,—song of bloodshed, fire and thunder!

সাহেব। Where's the seditious song? Seize it atonce.

বহু বিশ্বাস। Can't seize, Sir. It is in their memory.

সাহেব। (মৃদু হাসিয়া) That's all right.

হৈমবতী। একটিবার আমার স্বামীর ছবির কাছে যেতে দিন,—একটিবার।

বহু বিশ্বাস। না, না, ওসব আব্দার আর চলবে না। চলুন আমাদের সঙ্গে—

সাহেব। I say Biswas, let the house be searched atonce, and let her see her husband's portrait for the last time. But don't forget to remove the portrait from the wall and take it with you.

বহু বিশ্বাস। Yes, sir (হৈমবতীর প্রতি) যান আপনি আপনার স্বামীর ছবির কাছে।

হৈমবতী। (ধীরে ধীরে স্বামীর চিত্রের নিকটে গেলেন ও গলায় অঞ্চল দিয়া অশ্রুসিক্ত চক্ষে সে চিত্রকে প্রণাম করিলেন। স্বদেশ ও প্রতিমা শান্তভাবে তাঁহার দুই পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল ও প্রণাম করিল। হৈমবতী আবেগকম্পিত স্বরে বলিতে লাগিলেন) ওগো, আমি একটু আগে তোমার কাছে শাস্তি চেয়েছিলাম, এবার তা পেয়েছি। মন হালকা হয়ে গেল আমার। একটা জগদ্দল পাথর এতক্ষণ বুকের ওপর বসেছিল, এখন সেটা সরে গেল, আমি আজ আমার অপরাধের শাস্তি চেয়েছিলাম, এখন সে শাস্তি এসেছে। আজ যে আমার অতি বড় পুণ্যতিথি, আজ কি আমি শাস্তি না নিয়ে থাকতে পারি? আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা তোমারই গৌরবময় নামের উপযুক্ত হই। বিদায়, ওগো বিদায়—

হৈমবতীর মাথা ছবির নিচে ঝুঁকিয়া পড়িল।)

স্বদেশ ও প্রতিমা। মা,—মাগো,—

সাহেব। No more waste of time. Lead her to the van, Take also the boy and the girl

বহু বিশ্বাস। Yes, sir. চলুন—

হৈমবতী। (ধীরে ধীরে স্বদেশ ও প্রতিমার হাত ধরিয়া বহির্দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে)—বন্দে মাতরম্।

স্বদেশ ও প্রতিমা। বন্দে মাতরম্।

[ধীরে ধীরে যবনিকা নামিয়া আসিল]

জীবনের পাতা ঝরে যায়

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ক্লান্তি আসে নেমে জীবনের পাতা ঝরে যায়।
অতীত দিগন্ত কথা কয়ে ওঠে,
শ্রান্ত-দিবসের অশ্রু আঙিনায়॥

কুসুমের দীর্ঘশ্বাস মালার কঙ্কাল আছে জুড়ে,
সর্পিল বাষ্পের ধোঁয়া—সে জল-তৃষ্ণিকা,
ওঠে বুঝি মরু-বক্ষ ফুঁড়ে,
দিক-ভ্রান্ত নিশিডাক, শোনে হায় যেদিকে তাকায়।
ক্লান্তি আসে নেমে জীবনের পাতা ঝরে যায়॥

হায়···কতটুকু এই ইতিহাস?
মনে হয়, সব মিলে একটি নিশ্বাস।

জোছনার ঢেউ নাচে, অনন্ত এ আকাশ-গঙ্গায়,
চকোর চকোরী উড়ে উড়ে মরে,—আর,
স্ফটিকের জল বুঝি চায়;
স্ফটিকের জল? শুধুই ঝাঁপট—হায় পাখায় পাখায়।
ক্লান্তি আসে নেমে জীবনের পাতা ঝরে যায়॥

আধুনিকপূর্ব্ব যুগের প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতি

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

প্রাচীনকালে আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতি কিরূপ ছিল বলিতে পারি না। পরবর্ত্তী যুগ সম্পর্কেও বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় বলিয়া জানি না। তাই যে শিক্ষাপদ্ধতির মধ্য দিয়া পূর্ব্ববঙ্গের গ্রামে আমাদের বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়াছে তাহার কিছু পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি। প্রাচীন কালের না হউক, আধুনিক যুগের প্রারম্ভকালের আভাস তাহার মধ্যে পাওয়া যাইবে সন্দেহ নাই।

পাঁচ বৎসর বয়সে ছেলেদের বিদ্যারম্ভ বা হাতেখড়ি হইত। শুভদিনে হাতে ধরিয়া খড়ি দিয়া পাথরের থালায় ছেলেকে প্রথম বর্ণমালা লেখান হইত। ইহারই নাম হাতেখড়ি। এই উপলক্ষ্যে দেবপূজা এবং ছোটখাট একটি উৎসবের অনুষ্ঠান করা হইত। এই অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে ছেলেকে লিখিতে দেওয়া বা লিখিতে শেখান হইত না। হাতেখড়ির পর ধীরে ধীরে লেখান হইত। লেখার উপকরণ ছিল তাল পাতা। তাল গাছের পাতা কাটিয়া জলে ভিজাইয়া পচান হইত—তার পর উহা শুকাইয়া আটি বাঁধিয়া তুলিয়া রাখা হইত। কয়েকটি পাতায় প্রথমে লোহার শিক দিয়া অ আ প্রভৃতি স্বরবর্ণ এবং পরে ক খ প্রভৃতি ব্যঞ্জনবর্ণের দাগ কাটিয়া দেওয়া হইত। শিশুকে সেই দাগের উপর দিয়া হাতে ধরিয়া লিখিতে শেখান হইত। হাত রপ্ত হইয়া গেলে অন্যের বিনা সাহায্যে অক্ষরের উপর দিয়া কালি বুলাইতে হইত। ইহার নাম ছিল 'খাড়া' (দাগ কাটা) লেখা। খাড়া লেখা অভ্যস্ত হইলে 'আখাড়া' লেখা অভ্যাস করিতে হইত—তখন আর পাতার উপর দাগ কাটিয়া দেওয়া হইত না। তবে প্রতিটি বর্ণ লিখিবার সময় চীৎকার করিয়া তাহার নাম ও বর্ণনা আবৃত্তি করিতে হইত। যথা, অ আকাড়িয়া আঞ্জি* কাঁকুড়িয়া 'ক', বগা 'খ' ল্যাঙ্গা 'গ' ইত্যাদি। মুখ বুজিয়া লেখা বিশেষ নিন্দার বিষয় ছিল, এইরূপে লেখার অভ্যাস হইলে বানান লেখা শেখান হইত। এই সময় আর হাতে ধরিয়া লেখান বা খাড়া পাতায় লেখার প্রয়োজন হইত না। একখানি পাতায় নমুনা লিখিয়া দেওয়া হইত এবং তাহা দেখিয়া লিখিতে হইত। একের পর এক ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে এক একটি স্বরবর্ণ যুক্ত করিয়া লিখিতে হইত। যেমন ক কা কি কী কু কূ কৃ কৄ কে কৈ কো কৌ কং কঃ। ঙ ঞ বাদে সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে এইরূপে স্বরবর্ণ যোগ করিয়া বানান লেখা অভ্যাস করিতে হইত। ইহাতে প্রতিদিন অনেকটা সময় লাগিত। বানান শেষ হইলে ফলা। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে বিভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণের যোগ শেখান হইত। ককারের সাহায্যে যোগগুলির এইরূপ নামকরণ করা হইত—ক্য (কেয়), ক্র (কের), ক্ন (কেন), ক্ল (কেল), ক্ব (কুয়), ক্ম (কুম), র্ক (আর্ক), ঙ্ক (আঙ্ক), ঙ্ক (আঙ্ক)। প্রথম সাতটি ফলা য ঙ ঞ ভিন্ন প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত করিয়া লিখিতে হইত। যেমন, ক্য খ্য গ্য ঘ্য ইত্যাদি। 'আঙ্ক' ফলায় অনুনাসিকের সঙ্গে বিভিন্ন বর্গীয় বর্ণের যোগ এবং 'আঙ্ক' ফলায় বিবিধ যোগ (যথা, ঙ্ক ঙ্খ ঙ্গ ঙ্ঘ ঞ্চ ঞ্ছ ঞ্জ ঞ্ঝ ণ্ট ণ্ঠ প্রভৃতি) শেখান হইত। বানান ও ফলা লেখার সময় যোগগুলি বিশ্লেষণ করিয়া উচ্চারণ করিতে হইত। যথা, 'ক-এ আকারে কা ইত্যাদি। বিবিধ বর্ণ যোগে যে সমস্ত বিচিত্র অক্ষর বা ছাঁদের অক্ষর (হ্ন, ক্ত, ক্র প্রভৃতি) গঠিত হয় এই সময়ে সেইগুলিও শেখান হইত। ফলার পরের পর্য্যায় নাম লেখা। নিজের পিতা পিতামহের, আত্মীয়-স্বজনের, পাড়া-প্রতিবেশীর, বন্ধুবান্ধবের নাম লিখিয়া বর্ণপরিচয় সম্পূর্ণ করা হইত। প্রথমে নামের বানান বলিয়া দেওয়া হইত। ক্রমশঃ আর বলিয়া দেওয়ার বা জানিয়া নেওয়ার প্রয়োজন হইত না। নাম লেখাই তাল পাতায় লেখার চরম পর্য্যায়।

ইহার পর কলাপাতায় বা চিল্‌থায় অঙ্ক লেখা। থাওয়ার পাতা যে পরিমাণের হয় তাহার অর্দ্ধ পরিমাণ অংশে শতকিয়া, কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া প্রভৃতি লেখা হইত। পরের দিনের ব্যবহার্য্য কলাপাতা আগের দিন বৈকালে সংগ্রহ করিয়া কাটিয়া রাখিতে হইত। ইহা তাল পাতার মত দিনের পর দিন ব্যবহার করা চলে না।

কলাপাতার পরে কাগজ ব্যবহারের সুযোগ জুটিত। এই সুযোগ লাভ করা একটা মস্তবড় গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে হইত। কাগজে লেখার সঙ্গে সঙ্গেই নিয়মিত বই ব্যবহারের সূত্রপাত হইত। এখনকার মত নানা রকমের সুদৃশ্য বই ও খাতা তখন ছিল না। 'শিশুবোধক' নামে একখানি বই তখন খুব প্রচলিত ছিল। তাহাতে নানা বিষয়ের সমাবেশ ছিল। হলুদে বা তজ্জাতীয় রঙের বড় আকারের কাগজ কিনিয়া চার ভাঁজ করিয়া খাতা বাঁধিয়া তাহাতে লাইন টানিয়া বড় বড় অক্ষরে লিখিতে হইত। সাদা রঙের কাগজ ব্যবহার করা এক

---

* বর্ণমালার আদিতে 'আঞ্জি' ছিল একটি মাঙ্গলিক চিহ্নবিশেষ (৮৭)। বর্ণমালার সংখ্যা ছিল ৫০, ১৬টি স্বরবর্ণ (ঋকার ও ঌ কারের দীর্ঘ ও অনুস্বার বিসর্গ সহ) ও ৩৪টি ব্যঞ্জনবর্ণ (ক্ষ সহ)। য়, ড়, ঢ়, ৎ, ঁ স্বতন্ত্র বর্ণ হিসাবে ধরা হইত না। একটি ছড়া ছিল—'চৌত্রিশ অক্ষর বার ফলা তার নাম শ্রী কফলা' ইহার অর্থ ঠিক বুঝা যায় না। ফলার মধ্যেও 'ষ' যোগ ও 'ঌ' যোগ অন্তর্ভুক্ত ছিল। সমস্ত ফলার শেষে বলা হইত সিদ্ধি অস্তে সিদ্ধি।

প্রকার নিষিদ্ধ ছিল—কারণ তাহাতে চক্ষু নষ্ট হইবার আশঙ্কা। ছোট করিয়া লেখা নিন্দনীয় ছিল—তাহাতে হাতের অক্ষর ভাল হয় না। ঘরে তৈয়ারী কালি ও হাতে-কাটা কলম ব্যবহারই প্রচলিত ছিল। তালপাতায় লেখার সময় মা-ই সাধারণতঃ কালি-কলম তৈয়ার করিয়া দিতেন। দোয়াত বা পিতলের ছোট ঘটিতে কালি রাখা হইত—কালিতে ন্যাকড়া ভিজান থাকিত। তাহাতে কলমে আঘাত লাগিত না। রান্নার হাঁড়ির পিছনের ভুষা কালি, নারিকেলের ছোবড়া পোড়ান গুঁড়া প্রভৃতি জলে গুলিয়া কালি তৈয়ারি করিয়া লওয়া হইত। কালি প্রায়ই পাতলা হইয়া যাইত এবং কলম দিয়া বার বার ঘুঁটিয়া উহা ঘন করিবার চেষ্টা করা হইত। এই প্রসঙ্গে এইরূপ প্রার্থনা বাক্য উচ্চারিত হইত—

কালি ঘুঁটি কালি ঘুঁটি
সরস্বতীর বরে।
যার দোয়াতের ঘন কালি
মোর দোয়াতে পড়ে॥

বাঁশের কঞ্চি বা খাগ কাটিয়া কলম তৈয়ারি করা হইত। কাগজে লিখিবার সময় হাঁসের পালকের তৈয়ারী কলম ব্যবহার করা হাইত। নিবের কলম ব্যবহার করা চলিত না। প্রথম দিকে কলম সমস্ত হাত দিয়া মুষ্টিবদ্ধ করিয়া লিখিতে হইত। ইহার নাম 'মুঠ কলমে' লেখা। অনেকে বৃদ্ধ বয়সেও মুঠ-কলমে লিখিতেন এবং খাগের-কঞ্চির বা পালকের কলম ব্যবহার করিতেন—নিবের কলম তাঁহারা আদৌ পছন্দ করিতেন না।

শৈশবে লেখার উপরই বেশী জোর দেওয়া হইত—পড়ার দিকে তেমন নজর দেওয়া হইত না। অবশ্য মুখে মুখে অনেক জিনিস শেখান হইত। প্রাচীনেরা সন্ধ্যার সময় বাড়ীর ছেলেদের একত্র করিয়া 'নাম শ্লোক' শিখাইতেন। পিতৃবংশ ও মাতৃবংশের পূর্ব্ব-পুরুষদের এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের নাম বলা হইত এবং ছেলেরা তাহার পুনরুক্তি করিত। এইভাবে কতকগুলি শ্লোক ও তাহার অর্থ মুখস্থ করান হইত। যেমন, পুত্র শব্দের অর্থ কি, পুত্রের কর্ত্তব্য কি, নামের পূর্ব্বে শ্রী বলা হয় কেন, সপ্ত মাতা ও পঞ্চ পিতা কি প্রভৃতি। প্রাচীনারা ছেলেমেয়েদের কাছে নানারূপ গল্প বলিতেন। বিভিন্ন ধরণের রূপকথা, রামায়ণ-মহাভারত পুরাণের গল্প, নানা বিষয়ের ছড়া—তাহারা এইভাবেই শিখিত। কখনও কখনও একটু বয়স্ক ছেলেরা রামায়ণ-মহাভারত পড়িত—এবাড়ীর ওবাড়ীর মেয়েরা মিলিয়া তাহা শুনিতেন। শিশুরা সব সময়ই গল্প শুনিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিত। তবে দিনের বেলা এইরূপ গল্প বলা নিষিদ্ধ ছিল,—বলা হইত দিনের বেলা গল্প বলিলে মামার বাড়ীর হাঁড়ি কাটিয়া যায়। রাত্রিতে কাজকর্ম্ম বিশেষ থাকিত না—তাই তখন গল্প বলিবার সময়। শিশুদেরও রাত্রে পড়ার প্রচলন তখনও হয় নাই।

কাগজে লেখা অভ্যাস করার সময় চিঠি, দলিলপত্র লিখিতে শেখান হইত। চিঠির আরম্ভ ও শেষ কিরূপ হইবে—কাহাকে কিরূপ পাঠ লিখিতে হইবে—শিরোনামা কিরূপ হইবে প্রভৃতি বিষয়ে সমস্ত খুঁটিনাটি ভালভাবে শিখিতে হইত। চিঠি লেখায় সামান্য ত্রুটি ধরা পড়িলে নিন্দা হইত। এখনকার মত যাহা খুসি লেখা তখনকার দিনে বরদাস্ত করা হইত না। এই জন্য প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেও সাধারণ কাজকর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে পারিতেন।

অঙ্ক খুব বেশী শেখানোর ব্যবস্থা ছিল না। সাধারণ যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের সঙ্গে সঙ্গে শুভঙ্করের আর্য্যাগুলি ভালভাবে শিখিতে হইত—নামতা মুখস্থ করিতে হইত। ইহাতে মুখে মুখেও হিসাবপত্র করিবার সুবিধা হইত। এখন খাতা-পেন্সিল না লইলে অতি সাধারণ হিসাবও অনেকে করিতে পারেন না। অঙ্ক করিবার জন্য শ্লেট ব্যবহার করা হইত। ভিজা ন্যাকড়া সঙ্গে থাকিত। তাহার দ্বারা অপ্রয়োজনীয় অংশ মুছিয়া ফেলা হইত। মাঝে মাঝে শ্লেট ভিজাইয়া কাঠ-কয়লা দিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিয়া নিতে হইত।

কাহারও ঘরের বারান্দায়, চণ্ডীমণ্ডপে বা আটচালায় পাঠশালা বসিত। পাঠশালার জন্য স্বতন্ত্র ঘর খুব কমই দেখা যাইত। গুরু-মহাশয়কে 'মশায়' বলা হইত। পিতা-পুত্র এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে পৌত্র পর্য্যন্ত একই মশায়ের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেন। গুরু মহাশয়েরা সাধারণতঃ ব্রাহ্মণেতর শ্রেণীর লোক হইতেন। ব্রাহ্মণ গুরুমহাশয় খুব কমই দেখা যাইত। পাঠশালায় এখনকার মত শ্রেণীবিভাগ ছিল না। ছাত্রদের বিবরণ ও পরিচয় দিতে হইলে খাড়া লেখে, আখাড়া লেখে, বানান লেখে—এইরূপ বলা হইত। অকারণে কেহ পাঠশালায় না গেলে ছাত্র পাঠাইয়া তাহাকে ধরিয়া আনিবার ব্যবস্থা ছিল। নানা-রকম কঠোর শাস্তির প্রচলন ছিল। রৌদ্রের মধ্যে চিৎ হইয়া শুইয়া দুই পা উঁচু করিয়া পায়ের পিছন হইতে হাত মাথার কাছে আনিয়া দুই কান ধরিয়া সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া থাকার নাম ছিল 'স্বর্গচিৎ'। মেয়েরা সাধারণতঃ বাড়ীতে বসিয়াই সামান্য লেখা-পড়া শিখিত। কচিৎ দুই-এক জন পাঠশালায় আসিত। শিশু-কাল হইতেই তাহাদের গৃহকর্ম্ম ভাল করিয়া শিখিতে হইত এবং বাড়ীর গৃহিণীদের কাজে সাহায্য করিতে হইত। অল্প বয়সেই বিবাহ হইত বলিয়া বেশী লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ তাহাদের ছিল না। শিশুকাল হইতেই তাহাদের গৃহকর্ম্মের প্রতি আগ্রহ দেখা যাইত। উচ্চশিক্ষা না থাকিলেও সাধারণ লেখাপড়া অনেকেই জানিতেন। বস্তুতঃ উচ্চশিক্ষা তখন পুরুষের মধ্যেও ব্যাপক ছিল না। নাম সহি করিতে পারেন না এরূপ পুরুষ ভদ্র-গৃহস্থের মধ্যেও দেখা যাইত না এমন নয়। শুদ্ধভাবে নিজের নাম লিখিতে পারিতেন না, এমন লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। বেশীর ভাগই অতি-সাধারণ ভাবে শিক্ষালাভ করিতেন। সাধারণ গণ্ডী ছাড়াইবার যোগ্যতা বা সৌভাগ্য যাঁহাদের ছিল

তাঁহারা টোলে ঢুকিয়া ব্যাকরণের কিছু অংশ পড়িতেন। প্রকৃত পণ্ডিতের সংখ্যা ছিল অপেক্ষাকৃত কম। অনেকেই সন্ধি, শব্দ বা বড় জোর ধাতু পর্য্যন্ত পড়িয়াই পড়া সাঙ্গ করিতেন। কেহ কেহ পৌরোহিত্য বা গুরুগিরি করিবার জন্ম ধর্ম্মকার্য্য অনুষ্ঠানের রীতি-নীতি শিখিতেন—গুরুর কাছে পূজার্চ্চনার পদ্ধতির পাঠ লইতেন—চণ্ডীপাঠ অভ্যাস করিতেন। কেহ কেহ ঠিকুজি কোষ্ঠী দেখিতে ও প্রস্তুত করিতে শিখিতেন। বৈদ্যেরা ঔষধ প্রস্তুত করার প্রণালী ও উহার প্রয়োগের নিয়ম শিখিতেন—নাড়ী-বিজ্ঞান চর্চ্চা করিতেন। গভীরভাবে শাস্ত্র আলোচনা করিতে খুব বেশী লোক অগ্রসর হইতেন না। অথচ তখনকার দিনে পড়া ব্যয়সাধ্য ছিল না। গুরুকে বেতন দিতে হইত না—থাকা-খাওয়ার খরচ লাগিত না। এমন কি মাঝে মাঝে পৌরোহিত্য কার্য্যের দ্বারা বা গুরুর সহচর হিসাবে ছাত্রবিদায়রূপে কিছু কিছু আয়ও যে না হইত এমন নয়। ন্যায় প্রভৃতি কঠিন বিষয় যাঁহারা অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহাদের ত বিশেষ আদর ছিল। তথাপি এ-সমস্ত বিষয়ে আগ্রহশীল ছাত্রের সংখ্যা খুব বেশী ছিল মনে হয় না। টোলের শিক্ষার পরিধিও তাই অনেক ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তর পর্য্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। এইরূপ প্রাথমিক শিক্ষার মধ্য দিয়াই কোনক্রমে চিরাচরিতভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইত—উচ্চাকাঙ্ক্ষা বড় একটা দেখা যাইত না। অবশ্য খুব বড় হইবার সুযোগও তখন সুলভ ছিল না। তাই কাজচলা-গোছের শিক্ষায়ই লোকে সন্তুষ্ট থাকিতেন। আজ সুযোগ বাড়িয়াছে—তাই শিক্ষার আগ্রহও বাড়িয়াছে। তবে প্রকৃত শিক্ষা-লাভের আকাঙ্ক্ষা—এজন্য শ্রম ও নিষ্ঠা এখনও আশানুরূপ বলা যায় না। অবশ্য, আগেকার তুলনায় শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছে—ব্যবস্থা সুন্দরতর হইয়াছে।

শরৎরাণী

শ্রীউর্ম্মিলা দেবী

ওগো আমার স্বপ্নে-দেখা মেয়ে,
আসবে বলে জানিয়েছিলে স্বপ্নে দেখা দিয়ে।
শঙ্খ-ধবল রংটি তোমার কাজলকালো চুল
চাঁপার কলি আঙুলগুলি গাল দুটি তুলতুল।

সেদিন হতে রই যে পথ চেয়ে।
জানি না ত আসবে তুমি কোন্ পথটি বেয়ে?
এলে তুমি শরৎপ্রাতে শিউলী-ঝরা পথে!
প্রথম উষার স্বর্ণগড়া সূর্য্যকিরণ রথে।

ওগো আমার স্বপ্নে-দেখা সই!
তোমায় দেবার মতন রতন কিছুই আমার নাই।
সোনা রূপা বসন ভূষণ তোমার দুটি করে
দেখছি চেয়ে দিচ্ছে সবাই কতই ধরে পরে।

আমি শুধুই গাঁথছি কথার মালা
শিউলী ফুলের মালার সাথে পরিয়ে দেব বালা
আমার প্রাণের হরষ-পরশ রইল তাহার সাথে
ধন্য হবে তৃপ্ত হবে তোমার দৃষ্টি পাতে।

ঊর্ণনাভ

শ্রীশান্তশীল দাশ

জাল ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়ঃ তবু জাল বুনি;
আসবে কি সে জীবন কোন দিন?
তবু দিন গুণি।
ছেঁড়া জাল জোড়া দিতে ভাল লাগে,
ভাল লাগে এক একটি করে
দিন গুণে গুণে চলা প্রতীক্ষার পথ ধরে ধরে।
সে পথ অনেক পথ, হোক না তা, কিবা আসে যায়;
এ মন কি শেষ পথ চায়?
চায় না তো—পথ চলে আর গান গায়ঃ
হাসি আর কান্নার সরু মোটা দুটো তারে-
বাঁধা সেই সুর ভেসে যায়।
অনেক অনেক দূর। আর সেই ছেঁড়া জাল
কোন মতে জোড়া লাগে, টেনে টেনে চলে কিছুকাল।
আবার আবার ছেঁড়ে।
এমনি তো দিন কাটে বেশঃ
কাল গুণে, জাল বুনে—হোক পথ অশেষ, অশেষ।

অলস মায়া

শ্রীচিত্রিতা দেবী

কিন্তু, আবার দ্বিধা জাগে কৃষ্ণার। প্রেম নাকি লুকিয়ে রাখা যায় না, কবি যা বলেছেন তা সত্যি, "গোপনে প্রেম রয় না ঘরে, আলোর মত ছড়িয়ে পড়ে।" কিন্তু শুধু আলো ত হয় না। আলোর পিছনে আছে আগুন, সে যে পুড়িয়ে মারে। ক্ষুধার্ত্ত অগ্নি সর্ব্ব গ্রাস করতে চায়। কৃষ্ণা যদি নিজেকে প্রশ্রয় দেয় তবে তার প্রেম কি শুধু হাতটুকু ধরেই ক্ষান্ত থাকতে চাইবে?—না, না, আলোর মূলে আছে আগুন, আর প্রেমের মূলে আছে কাম। একটুতে তার তৃপ্তি নেই। আগুনের মত বাতাসে উড়ে উড়ে সে কেবলই একটা থেকে আর একটায় বিস্তৃত হয়ে যায়। তার লালায়িত রসনা সমস্ত সুন্দরকে চেটে চেটে কুৎসিত করে তুলছে। ওই ত তার বীভৎস মুখটা কৃষ্ণা দেখতে পাচ্ছে নিজের মধ্যে। না, না, ওই লোভী রাক্ষসটার দাবি মানবে না কৃষ্ণা। লোলুপ মুঠি দিয়ে যে আত্মাকেও পিষে ফেলতে চায়। পবিত্রকে করে কলঙ্কিত—ওই ত তার সামনে শুয়ে আছে পবিত্র পুরুষ দেহ। কবিরা কেন বলেন শুধু নারীদেহ পবিত্র। পুরুষ কি পবিত্র নয়? সুন্দর নয়? নারীও ত পুরুষকে কম কলঙ্কিত করে না—এই ত একটু আগে কৃষ্ণা নিজেই তাই করছিল। চোখের জল দিয়ে, ভাবের মায়া দিয়ে কৃষ্ণা নিজেই ত মোহ রচনা করেছিল—টেনে নিয়েছিল কুমারের করুণা—যে করুণা প্রেমের সহোদরা। যদিও কৃষ্ণা নিজের অজ্ঞাতে না জেনেই করেছিল যা করবার, ময়ুর যেমন প্রাণের আবেগে না জেনেই পেখম ধরে, কোকিল যেমন না জেনেই ডেকে ডেকে মরে, মাকড়সা যেমন জাল বুনে যায়, তবু সবটাই কি না জেনে? কে বলে পুরুষই শুধু প্রতারক? তাকে প্রতারক করে তোলে মেয়েরাই। মেয়েরাই ত ভোলায় বেশী। পুরুষই ত ভোলে—সে যে ভোলানাথ।—এই ত মেরী ডিকসন একে ভুলিয়েছে। তার পরে কৃষ্ণা নিজেই কি আবার ভোলাতে এল নাকি? কেন এল কৃষ্ণা—কেন এল ওর দিকে উন্মুখ হয়ে? এখন কি করবে কৃষ্ণা, কি করবে? কিন্তু কৃষ্ণারই বা দোষ কি? ওর যে উপায় ছিল না? কারা সব যেন কানাকানি করল, চুপি চুপি ইসারায় সবাই মিলে হাসাহাসি করল, বাতাসে বাতাসে যেন রব উঠল—ওই তোর বর, ওই তোর বর। তাই ত কৃষ্ণা চোখ মেলে তাকিয়েছিল, আড়ালে আড়ালে চুপি চুপি, চুরি করে করে দেখেছিল। কিন্তু তখন ত সত্যি প্রেমে পড়ে নি। আজ যখন জানল যে, ও আর তার বর নয়, কোনদিন হবার সম্ভাবনাও নেই, তখনই কেন এমন হ'ল, বার বার কেন ওর মুখের দিকে দৃষ্টি ছুটে যায়?

কি সুন্দর গায়ের রং কালো ত নয়ই, ফরসাও নয়। একেই বোধহয় বলে মসৃণ-চিক্কণ। কৃষ্ণা এই মুহূর্ত্তে আবিষ্কার করল, এ বর্ণ শুধু মেয়েদের নয়—পুরুষেরও আছে। এ রঙের কি আশ্চর্য্য মহিমা, শান্ত, গভীর অথচ কেমন মৃদু-কোমল, কি সুন্দর চওড়া কপাল, আর তাতে গাছের পাতার সঙ্গে সূর্য্যের আলোর কেমন ছায়া ঢাকা ঢাকা খেলা। আর তার নীচেই কালো ভুরুর কোলে দুই বোজা চোখের আশ্চর্য্য শান্তি। খাড়া নাকের নীচে তাম্রবর্ণ অধরের দৃঢ়বদ্ধ রেখা। আর কঠিন চিবুকের তীক্ষ্ণ ভঙ্গি। লাল টাইটা ঢিলে হয়ে এক পাশে আধখোলা ভাবে ঝুলছে। ডোরাকাটা বিলাতী শার্টের গলার বোতাম খোলা। তার ভিতর দিয়ে রোমশ বুকের একাংশ আর গেঞ্জীর একটু সাদা জাল দেখা যাচ্ছে।

এই সমস্তই কৃষ্ণা দেখছে। ছি ছি, এ সে করছে কি? নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে যে পুরুষ ঘুমোচ্ছে, সে মেয়ে হয়ে তার দিকে দৃষ্টিপাত করছে। এ কোন দৃষ্টি তার চোখে? এরই নাম কি কামনা? মাগো মা? কোথায় তুমি? কোথায় তোমার সব বড় বড় উপদেশ? তোমার কৃষ্ণা এ কি করছে? জেনে-শুনে, পরপুরুষের দিকে লোভের দৃষ্টি হানছে। না, কৃষ্ণা এত নীচে নেমে যাবে না। এমন করে হারিয়ে ফেলবে না নিজেকে। ছিনিয়ে নিয়ে যাবে নিজেকে নিজের হাত থেকে। এখুনি, এই দণ্ডে, আর এক মুহূর্ত্তও দেরী করবে না। আস্তে নিজের ব্যাগটা তুলে নিল কৃষ্ণা। ঝিনঝিন-ধরে-যাওয়া পা কষ্টে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

কিন্তু সেই স্বল্পমাত্র আওয়াজেই ধড়মড় করে উঠে বসল কুমার। —"ইস অনেকটা ঘুমিয়েছি।" ঘড়ি দেখে বলল,—"পনেরো মিনিটেরও বেশী, কেন তুলে দাও নি কৃষ্ণা? এই প্রথম বিলেতে ট্রেন ফেল করব। আর সে তোমারই জন্তে।"

নিজের পোর্টফোলিওটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল কুমার। আবার কৃষ্ণা ভুলে গেল। আবার একটু হেসে, একটু মাথা নেড়ে, ছোট্ট একটু মায়াজাল রচনা করে, বললে,—"বারে! ঘুমোলেন আপনি আর দোষ হ'ল আমার? এমনি মেয়েদের কপাল বটে, দোষ করে পুরুষ, আর দায় চাপে মেয়েদের ঘাড়ে।"

—একটু ঘুমিয়েই কুমারের ক্লান্তি যেন অনেক ঝরে গেছে। খুব তাজা একটা হাসি হেসে কুমার বলল,—"হঠাৎ চুপি চুপি পা টিপে টিপে কেন পালাচ্ছিলে কৃষ্ণা, তোমার ত আর ট্রেন মিস করার ভয় নেই?"

—"নাঃ, পালাই নি ত?" হঠাৎ মিথ্যে বললে কৃষ্ণা,—"বসে

বসে পায়ে ঝি ঝি ধরে যাচ্ছিল, তাই উঠে একটু পায়চারী করব ভাবছিলাম।"

—"ওরে বাবা, এসব জায়গায় একা একা পায়চারী করা মোটেই সুবিধের নয়। এখানে চারিদিকে একবারে—'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে—কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে।' দেখছ না?" বলে কুমার, চারিদিকে একবার তাকাল। মাঠ ততক্ষণে অনেক ফাঁকা হয়ে গেছে।

কৃষ্ণা বললে,—দেখেছি বই কি, আপনি যতক্ষণ মগ্ন হয়ে গল্প বলছিলেন, ততক্ষণ কানে আপনার কথা শুনছিলাম বটে, কিন্তু চোখে ত এই সবই দেখছিলাম, চোখ-কান দুইই অকুপাইড ছিল।'

কুমার আবার একটু অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। কৃষ্ণা বুঝল, ওর কথা বলার ক্ষমতা মুগ্ধ করেছে কুমারকে। যাকে নেহাৎ সরলা বালিকা বলে ভাবত, তাকে হঠাৎ এ রকম বাকপটিয়সী হতে দেখে, অবাক হয়ে গেছে।

কৃষ্ণা আবদারের সুরে বললে,—"চলতে চলতে আপনার গল্পটা শেষ করুন না।"

কুমার বললে,—"গল্প ত আর বেশী বাকী নেই। আচ্ছা, তা হলে শেষটুকু বলি, বলতে ইচ্ছে করছে আমার। ধৈর্য্য ধরে বকবকানি শুনছ বলে ধন্যবাদ।"

এর উত্তরে কৃষ্ণা শুধু তার বড় চোখ বড় করে মাঠের দিকে তাকাল।

কুমার বললে,—"সেই অন্ধকার ঘরে বসে, একমাত্র মেরীর সন্ধান পাবার বাসনাটিকে মনের মধ্যে রেখে, আর সমস্ত ভাবনা মন থেকে দূর করে দিতে ব্যগ্র হয়ে রইলাম। ধীরে ধীরে আমার শরীর অবশ হয়ে এল। ডান হাতটা ব্যথা করতে লাগল, হাতটা যেন কাঁধ থেকে খসে পড়ে যাবে, তার পরে সেই ব্যথাটা ঘাড়ের মধ্যে উঠে টন টন করতে লাগল, তার পরে বাঁ হাতটা। ক্রমে এমন হ'ল যেন দুটো হাতই খসে পড়ে যাবে, তার পরে সেই ব্যথাটা ঘাড়ের মধ্যে উঠে টন টন করতে লাগল। আমি কেমন যেন আচ্ছন্নের মত হয়ে রইলাম। ইতিমধ্যে কখন যে ওরা ঘরে ঢুকে ব্যাণ্ডি-ট্যাণ্ডি খাইয়ে আমাকে চাঙ্গা করেছে মনেও নেই। জ্ঞান হলে ওরা বললে, 'কি হ'ল? আমি বললাম, 'কিছু না।"

—'সে কি? একেবারে কিছুই না? যা জানতে চেয়েছিলে, পাও নি?'

—"আমি বললাম, 'না'। শুনে ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল, বলল, 'পারবে পারবে, আজই জানতে পারবে দেখ।'

—"আমি যখন ওদের ওখান থেকে বেরুলাম, প্রায় দশটা বেজে গেছে। মাথাটা যেন একেবারে খালি হয়ে গেছে। যেন মস্ত একটা শূন্য দেহের উপরে টল মল করছে, আর পেটের মধ্যে জলছে চনচনে খিদে।"

শুনে কৃষ্ণার বুকের মধ্যে দুলে দুলে উঠল। —আহা রে! কাল সন্ধ্যাবেলা, কৃষ্ণা যখন পরিপাটি সেজে, কুমারের জন্তে প্রতীক্ষা করেছিল, তখন কুমারের মুহূর্ত্তগুলি এই বেদনার মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছিল।

কুমার বললে,—"পকেটে বেশী পয়সা ছিল না। রাত দশটায় প্রায় সব দোকানই বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক ঘুরে একটা ছোট্ট রেস্তোঁরা খুঁজে বার করলাম। তারা তখন বন্ধ করব করব ভাবছে। আমায় দেখে বিরক্ত হ'ল। বললে, 'শুধু একটু খরগোসের ঝোল আছে। তাই চাও ত এনে দিতে পারি।'

—বসে আছি, হঠাৎ মাথাটা যেন ঘুরে উঠল। আমি টেবিলের উপরে কুনুইয়ের ভর দিয়ে, দুই মুঠোর মধ্যে মাথা রাখলাম। ধীরে ধীরে সব যেন কেমন একরকম হয়ে গেল। আমি যেন স্পষ্ট অনুভব করলাম মেরী সেইখানে উপস্থিত আছে, আমার পাশে, আমার খুব কাছে। ওর সান্নিধ্য আমায় যেন ঘিরে আছে। আমার মনে হ'ল, আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম, 'মেরী, মেরী'। অমনি যেন মেরী বললে, 'কি কি'।"

—"আমি বললাম, 'তুমি কোথায়'?"

—"সে বললে, 'এই ত আমি তোমার পাশে।"

—"একি কাণ্ড! মেরী মেরী মেরী।"

—"এই যে, এই যে, এই যে! ঘর ভরে উঠল মেরীর হাসিতে। আমি পাগলের মত মুখ তুলে তাকালাম। শূন্য ঘর শুধু মেরীর আভাস ভরে নিয়ে চুপ করে আছে।"

ওরা চলতে চলতে বাগানের গেটের কাছে এসে পড়েছিল। কৃষ্ণা সেখানে একটু থেমে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, চোখ বুজে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। ওর যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল। এটুকু না দাঁড়িয়ে সে পারল না। সেদিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে কুমার বললে,—"এর ব্যাখ্যা কি করবে তুমি?"

কৃষ্ণা চোখ মেলল, তর্কের সূচনায় অনেক হালকা হয়ে এল ওর মনের ভার। বলল,—"এর ব্যাখ্যা ত খুবই সোজা। আপনার আড়াই ঘণ্টার একনিষ্ঠ চিন্তা মেরীকে আপনার কাছে মূর্ত্ত করে তুলেছিল। সেইটুকুই এর মধ্যে সত্যি। মেরী হয়ত সেই সময় দিব্যি বসে কারুর সঙ্গে সিনেমা দেখছিল। কিংবা স্রেফ ঘুমুচ্ছিল। সে নিশ্চয়ই টেরও পায় নি যে, রাত দশটায় এক রেস্তোঁরায় বসে খরগোসের কারীর জন্তে অপেক্ষা করতে করতে আপনি তাকে নিয়ে একটা ধ্যানলোক সৃষ্টি করে বসেছেন। অবশ্য আপনার মনের মধ্যে সে বাস্তব হয়ে উঠেছিল।

—"কিন্তু সে আপনারই মনের রচনা। সত্যিই মেরী কখনো ওভাবে ওখানে আসতে পারত না, মরে গেলেও না। মৃত-আত্মার উপস্থিতিও আমি বিশ্বাস করি না। তা মেরী ত বেঁচেই আছে, যখন বলছেন, সে বিয়ে করেছে।"

—"তা সত্যি", ঈষৎ অপ্রস্তুতভাবে ঘাড় নাড়ে কুমার,—"কিন্তু কৃষ্ণা, তুমি ব্যাপারটা একেবারে হালকা করে দিলে। সত্যি, আমি কিন্তু কখনও ভাবি নি যে, তুমি এইরকম ভাবে কথা বলতে পার। তোমাকে দেখে মনে হয় এত নরম-সরম—"

—"এখন দেখছেন নেহাৎ অতটাই অবলা-সরলা নয়," বলেই অস্থির হয়ে উঠল কৃষ্ণা। ওর দেহের মধ্যে কিসের যেন অস্থিরতা ওকে অসহিষ্ণু করে তুলল। হঠাৎ কৃষ্ণা বলে উঠল, —"এ সব থাক, আসল কথা বলুন? কি করে জানলেন যে, মেরী আবার বিয়ে করেছে?"

—"আহা তাই ত বলতে চাইছি, তুমি বলতে দিচ্ছ কই?"

—"আমি? আচ্ছা অপরাধ স্বীকার, এবার বলুন।"

আচ্ছা শোন, কুমার বললে,—"আমি তখন ভাবলাম, এ কি হ'ল, আমি ত মেরীকে চাই নি, শুধু তার সন্ধান চেয়েছিলাম। কিন্তু সন্ধান ত পেলাম না, তার বদলে মিনিট দুয়েকের জন্যে তাকেই পেলাম। এর অর্থ কি? এই সব ভাবতে ভাবতে, পকেট থেকে পার্স বার করে আমি তার মধ্যে থেকে মেরীর ছবিটা বার করে নিয়ে টেবিলের উপরে রেখে দেখছি, আর কি যে ভাবছি, তা জানি না। এমন সময় লোক দুটোর একজন টেবিলে কাঁটাছুরি সাজাতে এল। টেবিলের উপরে ছবিটি দেখে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থেকে ভাঙা ভাঙা গুমগুমে গলায় অশিক্ষিত উচ্চারণে বললে, 'আই নো দিস গর্ল'। তাই নাকি?"

—"আমি ভীষণ রকম চমকে উঠলাম, 'বলত এর নাম কি?'

—'ওর নাম? মেরী—মেরী—মেরী। কি আমার মনে পড়ছে না। তবে সবাই ওকে মেরী বলে ডাকত মনে আছে।'

—"সবাই—কে?"

'সবাই, মানে ওর বন্ধুরা।'

—"বন্ধুরা কে?"

'তুমি পাগল।' লোকটা বললে 'মেরী প্রত্যেক শনিবার এখানে খেতে আসত। আর জান,' লোকটি বললে, 'এইখানেই ওর সঙ্গে আমার ভাগ্নের দেখা হ'ল।'

—"কে তোমার ভাগ্নে?"

'আমার ভাগ্নে মস্ত ইঞ্জিনীয়ার।' বুড়ো বললে, 'রবার্ট···কি যেন একটা উপাধি বললে, 'আমার মনে নেই।' বললে, 'সে ত গেছে তোমাদের দেশে বাঁধ বাঁধার কাজে।'

—"আমি বললাম, 'তার সঙ্গে মেরীর সম্পর্ক কি।"

'দাম্পত্য সম্বন্ধ।' বুড়া হাসলে, 'সে যে ওর স্বামী।'

—"স্বামী? মেরী বিয়ে করেছে?"

'নিশ্চয়ই, আমারই বোনের ছেলেকে। আমার বোন যে-সে নয়। অনেক টাকার মালিক তার স্বামী। আর ছেলে ত রীতিমত বিখ্যাত। সে যে হঠাৎ এমন করে বিয়ে করবে, তা আমরা ভাবতেও পারি নি। কিন্তু রবার্ট বলত ও মেরীকে বিয়ে করছে বলার চেয়ে মেরী ওকে বিয়ে করছে বলাই ঠিক। কারণ প্রেমের প্রথম টানটা মেরীর দিক থেকেই এসেছে।'

সেই মুহূর্তে আবার মেরীকে অনুভব করলাম কাছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল মেরীর টান এড়ান কত শক্ত। মেরী যা চায়, তা সে নেবেই। কিন্তু হঠাৎ একে চাইল কেন মেরী সে ত এত খেলো নয়। তবে এটা কি আমার উপরে ক্রোধেরই এটা আর একটা পরিণতি? নাকি আমার প্রেম ওকে প্রেম চাইতে শিখিয়েছিল। প্রেম ছাড়া ও হয়ত বাঁচতেই পারছিল না। এত কথা তখন অবশ্য আমার মনে হয় নি। শুধু মাথা ঝিম ঝিম করছিল। বুড়া অনেক কথা বকে যাচ্ছিল। আমার কানে ভাল করে তার শব্দগুলোও পৌঁছাচ্ছিল না। হঠাৎ কানে এল বুড়ো বলছে, মেরী কিন্তু তোমাদের দেশটাকে ভালবাসত। রবার্ট বলত, ভারতবর্ষ দেখার সখ মেরীর এত বেশী, যে আমার এক এক সময় সন্দেহ হয়।' ভারতে যাবার লোভেই হয়ত মেরী আমাকে ভালোবেসেছে।"

—'যাক খবর পাওয়া গেল, যার জন্যে এত সাধনা, অবশেষে তা সিদ্ধ হ'ল। যার জন্যে এত উতলা হয়েছিলাম তা এক মুহূর্তে জানা হয়ে গেল বাসি খবরের মত। খরগোসের ঝোল গলা দিয়ে নামল না। দাম রেখে জলের গেলাসটা ঢক ঢক করে শেষ করে আমি বেরিয়ে এলাম। লোকটি সংশয়িত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল।

—"বাইরে এসে দেখি, আকাশে যেন উৎসব লেগে গেছে। পূর্ণ জ্যোৎস্না থম থম করতে করতে রূপো ছড়াচ্ছে। চারিদিকে ঢালছে যেন রূপের সুরা—নাকি সুরলোকের মদ, যা খেলে সুন্দরে-কুৎসিতে ভেদ ঘুচে যায়। নইলে কালো-কুশ্রী বড় বড় বাড়ীগুলি চাঁদের আলোয় অমন অপার্থিব মায়াময় হয়ে পড়ে কি করে বল ত। আমার হঠাৎ এত ভাল লাগতে লাগল কৃষ্ণা, বহুদিনের মনের ভার যেন কেমন করে হালকা হয়ে গেল। গাছের মাথায় মাথায় ঝিকমিকে জ্যোৎস্নার স্বপ্ন। পীচ ঢালা নেহাৎই বাস্তব মোটা রাস্তাটা যেন নন্দনকাননের পথ। আর তার মধ্যে মর্মরিত হয়ে উঠছে বসন্তের বাতাস। সেই পথ, সেই বাতাস যেন আমাকে নতুন জীবন এনে দিল। ঘুরে ঘুরে অনেক হেঁটে প্রাণভরে বুকের মধ্যে খোলা হাওয়া পুরে নিয়ে আমি বাড়ী ফিরে এলাম।"

কৃষ্ণা মনে মনে বললে,—'সেই সময়ে আমি তোমাকে দেখে অভিমানে কেঁদেছিলাম।'

কুমার বললে, "ঘরে এসে দেখি কে আমার জন্যে পুডিং, বিস্কিট আর এক গেলাস দুধ ঢাকা দিয়ে রেখে গেছে। ঠিক বুঝলাম, এ রমলার কাজ। খেয়ে নিয়ে পোশাক-টোশাক ছেড়ে বিছানায় শুয়ে হাত বাড়িয়ে আলোটা নিবাতে যাব, হঠাৎ তাকের উপর থেকে মেরীর ছবিটা পড়ে গেল আমার বিছানায়। কি আশ্চর্য্য! ছবিটা পড়ল কি করে? তুলে নিয়ে দেখি ওর ষ্ট্যাণ্ডটা পুরোণো হয়ে ছিঁড়ে নড়বড় করছে। এতদিন খেয়ালই করি নি। ছবিটা দেখতে দেখতে আর সন্ধ্যাটার কথা ভাবতে ভাবতে অজস্র ঘুমে চোখ ভরে এলেও কিছুতে ঘুমুতে পারলাম না। ভোরের দিকে একটু ঘুমুতে পেরেছি।"

হঠাৎ কৃষ্ণা মুখ ফিরিয়ে বললে,—"আজ ত ট্রেন ফেল করলেন, বেশ খানিকটা ঘুমিয়ে নিন না এখন। কাল সকালের ট্রেনে

গেলেই ত হবে।" ব্যাগ খুলে দরজার চাবি বার করলে কৃষ্ণা।

—"না না, তা কি হয়, আজকেই যেতে হবে। আর একটা ট্রেন আছে রাত এগারটায়। ট্রেনের দুলুনিতে আরাম করে ঘুমুব, আর স্বপ্ন দেখব।"

কৃষ্ণার চোখের দিকে চেয়ে কুমার হাসল। বলল,—"কৃষ্ণা!"

—"কি?" চমকে মুখ তুলে তাকাল কৃষ্ণা।"

ওর চোখে চোখ রেখে হাসল কুমার। বলল,—"কৃষ্ণা, মেরীর সঙ্গে আরও একটা ছোট্ট মেয়ের মিষ্টি মুখ আজ আমার স্বপ্নে স্বপ্নে ভাসবে।"

শুনে কৃষ্ণা দরজা খুলে এক ছুটে ভিতরে চলে গেল। আর সেদিকে চেয়ে অবাক হয়ে কুমার ভাবল, ও অমন করে পালাল কেন?

প্রথম পর্ব্ব সমাপ্ত

ছুটি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

গ্রীষ্ম ও পূজার ছুটি প্রাক্কালে শ্রদ্ধেয় ও স্মরণীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "প্রবাসী" মাধ্যমে ছাত্রদের আহ্বান করিয়া ছুটিতে তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বহু মূল্যবান উপদেশ দিতেন। নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি সেই সকল উপদেশ গ্রহণ করিয়া তৎকালীন বহু গ্রামীণ ছাত্র নিজেরা ত উপকৃত হইয়াছেন, গ্রামেরও বহু উপকার করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ন্যায় সম্পাদকও নাই, সেই প্রকার উদাত্ত এবং শিক্ষণীয় উপদেশও নাই। তখনও রাজনীতি কম ছিল না, এবং তিনিও কম রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না। "প্রবাসী" ও "মডার্ণ রিভিউ" রাজনীতিতে পরিপূর্ণ থাকিত। তখনকার ইংরেজ শাসকবর্গ এই দুইখানি পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যসমূহকে যেমন শ্রদ্ধা করিতেন তেমন ভয়ও করিতেন। রাজনীতির মধ্যে মগ্ন থাকিয়াও রামানন্দ বাবু পাড়াগাঁর কথা চিন্তা করিতেন, ছাত্রদের পাড়াগাঁর উন্নতিমূলক উপদেশ দিতেন—তিনি জানিতেন পাড়াগাঁর উন্নতি ব্যতীত রাজনীতি পূর্ণতা লাভ করে না।

যাহা হউক, মহান্ ব্যক্তির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পূজার ছুটির প্রাক্কালে আমি গ্রামীণ ছাত্রদের প্রতি পাড়াগাঁর উন্নতিমূলক কয়েকটি সহজ কথা বলিতেছি। পল্লীগ্রামে বর্ত্তমানে নেতার অভাব, পূর্ব্বকালের চণ্ডীমণ্ডপও নাই, চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া গ্রামের মোড়ল মহাশয়দের সহিত গ্রামের নানাবিধ সমস্যা সমাধানের আলোচনাও নাই, গ্রামের দলাদলির, মনোমালিন্যের, অভিযোগ ইত্যাদির আপোষে নিষ্পত্তিও নাই। বর্ত্তমান সময়ে ছাত্রদেরই সেই নেতা বা মোড়ল মহাশয়দের স্থান অধিকার করিতে হইবে। গ্রাম্য বাদ-বিসম্বাদ, দলাদলির মীমাংসার উপরেই সর্ব্বাঙ্গীন গঠনমূলক সর্ব্বপ্রকার পরিকল্পনা প্রধানতঃ নির্ভর করে।

পাড়াগাঁয়ের রাস্তা-ঘাট, নদী-নালা, বন-জঙ্গলের সংস্কার বিশেষ ব্যয়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য নহে। দরকার কেবল পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা অনুসারে কার্য্যপ্রণালী গঠন এবং সঙ্ঘবদ্ধতা। ছাত্রগণ এই বিষয়ে অগ্রণী হইয়া ছোটখাটো পরিকল্পনার পত্তন করিতে পারেন। কৃষিই গ্রামের প্রধান পেশা এবং কৃষকই গ্রামের মেরুদণ্ড। সুতরাং কৃষির ও কৃষকের উন্নতিই গ্রামের প্রধান ও প্রথম কাজ। কৃষক তথাকথিত শিক্ষিত নহে, কিন্তু সে বুদ্ধিমান, অবুঝ নহে, তাহার অভিজ্ঞতাও প্রচুর। তাহার দরদী হইয়া তাহাকে বুঝাইলে সে বুঝিবে। এমন অনেক ছোটখাটো জিনিস আছে যাহা গ্রহণ করিলে কৃষকের ও কৃষির উন্নতি হইবে, যেমন গোবর সংরক্ষণ, কম্পোষ্ট সার প্রস্তুত, জ্বালানীর জন্য গোবরের অপচয় নিবারণ, প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীর সংলগ্ন জমিতে তরিতরকারির বাগান, বীজ সংরক্ষণ, ইত্যাদি। এই সকল কাজ ব্যয়সাপেক্ষ নহে, কষ্টসাধ্যও নহে। স্থানীয় সরকারী কৃষি-কর্ম্মচারীর সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া ছাত্রগণ এই সকল কাজে অবহিত হইয়া কৃষকদিগকে এই সকল কাজে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন। ইহার ফলে সরকারী কর্ম্মচারীগণ সচেতন ও অধিকতর কর্ত্তব্যপরায়ণ হইবে।

আজকাল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে কোন আপত্তি নাই, প্রত্যেক দলের প্রতি আমার নিবেদন গ্রামের উন্নতি সম্বন্ধে কোন দলাদলি থাকা উচিত নয়, we should stand on a common platform irrespective of our political creeds for all-round development of our villages.

বাঙালীর সংলাপ

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী

আধুনিক বাঙালীর কথোপকথনের ধারা ও বাক্যরীতি সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। সামাজিক জমায়েতে, বৈঠকী আলাপ-আলোচনায়, দেখা-সাক্ষাতের কালে কুশল-বিনিময় পর্ব্বে, দুই বা তিন ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক কথাবার্ত্তায় সচরাচর যে ধরনের বাক্যের ব্যবহার হয় তা বিশ্লেষণ করলে কতকগুলি মূল্যবান তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস এবং সে সব তথ্যের সব কটিই যে সমান প্রীতিকর এমন নাও হতে পারে।

আমার নিজের ধারণা, বাঙালীর সংলাপ কোন কোন দিক থেকে বিশেষ ভাবেই ত্রুটিপূর্ণ। এই ত্রুটির সংশোধনের প্রয়োজন আছে। জাতীয় আত্মমর্য্যাদা ও জাতীয় সুনামের মুখ চেয়েই আমাদের কথোপকথন রীতির কিঞ্চিৎ অদল-বদল হওয়া আবশ্যক। তাতে যদি আমাদের প্রচলিত ভাষার কাঠামোরও কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করতে হয় তাতেও পেছুপা হলে চলবে না। আমাদের কথোপকথন আমাদের স্বীকৃত ভাষা-রীতিকে অনুসরণ করে গঠিত, আবার আমাদের ভাষা-রীতির উপর আমাদের কথোপকথনের ভঙ্গিমার ছাপ গিয়ে পড়ে। এই পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অনবরত আমাদের ভাষা-দেহের বদল হয়ে চলেছে। কখনও কলমের কথা মুখে আসছে, কখনও মুখের কথা কলমের ডগায় গিয়ে বসছে। সাহিত্যের অগ্রগতির পক্ষে এই দেওয়া-নেওয়া যে অবিমিশ্র শুভফলদায়ক হচ্ছে এমন কথা ভাবতে পারলে সুখী হওয়া যেত, কিন্তু ভাববার যৌক্তিকতা নেই। আমাদের সংলাপ প্রভূত পরিমাণে মার্জ্জিত ও উন্নত হওয়ার অবকাশ রাখে।

অনেকেরই নিকট এই প্রবন্ধের প্রস্তাব সম্পূর্ণ অভিনব বলে মনে হবে। লেখকও এই অভিনবত্বের বিষয়ে সচেতন। কিন্তু লেখক নাচার। সূত্রপাতে অনেক কথাই অভিনব বলে মনে হয়, কিন্তু একটু চিন্তা করলেই দেখা যায়, নিছক নূতনত্ব-স্পৃহা বা মৌলিকত্বের ক্ষুধাই তাদের উৎসভূমি না হতে পারে, তাদের অনেক কটিরই পশ্চাতে সত্যের পটভূমি থাকা সম্ভব। বর্ত্তমান প্রবন্ধের বক্তব্যের পিছনে তেমন এক পটভূমি বিরাজিত রয়েছে বলে লেখকের স্থির বিশ্বাস। বক্তব্যটি স্বীকার করা না করা পাঠকের ইচ্ছাধীন, কিন্তু বক্তব্যটি আন্তরিকতা প্রসূত। ওটি পাঠক সমক্ষে উপস্থিত করার পিছনে জাতিকল্যাণ ভিন্ন অন্য কোন মনো-ভাবই লেখকের মনে সক্রিয় নেই সে-কথা আত্মপক্ষ সমর্থনে বলা দরকার।

ইউরোপীয়দের মধ্যে একটা রীতি আছে, আলাপ-আলোচনা কালে কখনও উপস্থিত জনদের সম্বন্ধে কোনরূপ ইঙ্গিতাত্মক কথা ব্যবহার করতে নেই। যেখানে কয়েক ব্যক্তি সামাজিক মিলনোদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছেন সেখানে এমন কোন বাক্য ব্যবহার শিষ্টাচারসম্মত নয় যার প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন অর্থে উপস্থিত জনদের কারও উপর কোনরূপ কটাক্ষ প্রকাশ পায়। Present company কে বাদ দিয়েই এ সব স্থলে আলাপ পরিচালনা করা নিয়ম।

কিন্তু আমাদের কথাবার্ত্তায় সব উল্টা চাল। ঠেস দিয়ে কথা বলা আমাদের একটা জাতিগত স্বভাবে পরিণত হয়েছে বললেও চলে। আলাপে-আলোচনায় উপস্থিত জনদের মধ্যে কাউকে প্রচ্ছন্ন সঙ্কেতাত্মক বাক্য ব্যবহারের দ্বারা ঘায়েল করতে পারলে আমরা যেন আর কিছু চাই না। আমাদের ধারণা, এতে আমা-দের বাক্‌পটুতা প্রকাশ পায়, উপস্থিত বুদ্ধির কৌশল প্রকাশ পায়, কিন্তু এটি যে নিতান্ত শিষ্টাচারবহির্ভূত আচরণ সে কথা একটু চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারব।

যদি বলেন অনুপস্থিত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত কটু বাক্য বক্তা হয়ত যথার্থ আন্তরিক ভাবে অনুপস্থিত ব্যক্তির উদ্দেশ্যেই প্রয়োগ করেছেন, উপস্থিত কাউকে আঘাত দেওয়া তাঁর মনোগত অভিপ্রায় না হতে পারে। সে স্থলে বলব, সেটিও শিষ্ট রীতি নয়। যথার্থ রুচিবান ভদ্র সজ্জন ব্যক্তি এমনতর বাক্য ব্যবহার থেকে সতত বিরত থাকেন। আমাদের মনোভাব যাই হোক, একটি জমায়েত বা বৈঠকের মধ্যে আমরা এমন কোন বাক্য ব্যবহার করতে পারি না যা উপস্থিত জনদের কানে গিয়ে খট করে বাজে বা যার নিহিতার্থ নিতান্ত ক্ষীণ বা সূক্ষ্ম ভাবে গিয়েও উপস্থিত জনকে আঘাত করে। শ্রুতিকটু কর্ণপীড়াদায়ক কথার একটা অসুস্থ আবেদন আছে। তা অন্যথা প্রফুল্ল হাসি-গল্পে মুখর একটি আড্ডার আনন্দকে চকিতে বিস্বাদ করে দিতে পারে। দিয়েও থাকে। সেইজন্য, যাঁরা সত্যিকার অনুভূতিশীল ব্যক্তি তাঁরা সর্ব্বদাই প্রীতিকর কথা দিয়ে বৈঠকী মেজাজকে সজীব রাখবার পক্ষপাতী। এমনকি পরচর্চ্চার বেলায়ও তাঁরা কখনও সীমা লঙ্ঘন করেন না। শুনি পরচর্চ্চা নাকি আড্ডার প্রাণ। কিন্তু সৌজন্যবাদী শিষ্টাচার-পরায়ণ ব্যক্তিরা জানেন ও মানেন যে, পরচর্চ্চা পরেরই চর্চ্চা, তা একটি নির্দ্দোষ ব্যসন, তার মধ্যে উপস্থিত জনদের চর্চ্চার অবতারণা করলে—তা সে যত সূক্ষ্ম ভাবেই হোক—আবহাওয়া ঘুলিয়ে উঠতে মুহূর্ত্তেকের বিলম্ব হয় না।

আর আন্তরিকতার প্রশ্নেই বা নিঃসন্দেহ হই কি করে। অনেকে ইচ্ছা করেই অপরের বিরুদ্ধে ইঙ্গিতাত্মক বা শ্লেষাত্মক বাক্য ব্যবহার করেন। 'ল্যাং' মেরে কথা বলা এ দের একটি

স্বভাব। ঝিকে মেরে বৌকে শেখানর মত এরা অনুপস্থিত ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে কটুবাক্য প্রয়োগ করেন ঠিকই কিন্তু বক্তব্যের উদ্দিষ্ট থাকে উপস্থিত জনদেরই কেউ না কেউ এবং বক্তব্যের সেই অভিপ্রেত সঙ্কেত অন্যেরা যাতে ধরতে পারে সে বিষয়েও এদের চেষ্টা গোপন থাকে না।

বলাই বাহুল্য, এ রকম আচরণ অতীব গর্হিত। শিষ্ট ব্যক্তিরা কদাপি এরকম আচরণের দ্বারা আত্মাবমাননা ঘটান না। নিজের প্রতি তাঁরা যে সম্মান আশা করেন তাঁরা পরকেও সর্ব্বদা সে সম্মান দিয়ে থাকেন। ভালমানুষিটুকু নিজে সবটাই দখল করে অপরের ভাগে তাচ্ছিল্যের হাড়গোর ছুড়ে ফেলার নীতিতে তাঁরা বিশ্বাস করেন না। আর তা বিশ্বাস করেন না বলেই নিছক শ্লেষাত্মক বাক্যের দ্বারাও অপরকে চিহ্নিত করবার কথা তাঁরা ভাবতে পারেন না। তাঁদের মনন-মানসিকতা আর রুচিটাই এত উচু সুরে বাঁধা যে, পারস্পরিক বিদ্বেষ, পারস্পরিক প্রতিযোগিতা আর বুদ্ধিবিকারের আবহাওয়ার সংস্পর্শমাত্রে তাঁদের মন পীড়িত হয়। তাঁদের নিজের মনে যে গ্লানি নেই, সেই গ্লানির অস্তিত্ব তাঁরা অপরের মধ্যেও কল্পনা করতে পারেন না। কল্পনা করতে কষ্টানুভব করেন।

কিন্তু এ সমাজের ধরন-ধারনই আলাদা। একটা অসুস্থ প্রতিযোগিতার আবহাওয়া চারিদিকে নিত্য বিরাজমান। প্রতিটি মানুষ তাল ঠুকে আছে, এই বুঝি অপরে তাকে কথায় বা ব্যবহারে অপমান করল, ফলে কারণে-অকারণে সে তেড়েই আছে। সর্ব্বত্র একটা সন্দেহ ও 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব। এমন উৎকট আত্মাদর ও অহংবুদ্ধির পরিবেশে যে শালীনতা সৌজন্য শিষ্টাচার পদে পদে পীড়িত হবে তা না বললেও বোধ করি চলে।

মুস্কিল হয়েছে সদ্বুদ্ধিপরায়ণ ব্যক্তিদের নিয়ে। তাঁরা এরকম তাল-ঠোকাঠুকির সম্পর্কে অভ্যস্ত নন, অথচসমাজের প্রচলিত আচরণবিধি অনুযায়ী তাঁদের প্রায়শঃ ভুল-বোঝাবুঝির বলি হতে হয়। যে অর্থে যে বাক্য তাঁরা প্রয়োগ করেন নি, বিপরীত পক্ষের অথবা প্রতিযোগিতাসুলভ মনোভাবের জন্য তাঁদের সেই বাক্যে সেই অর্থ আরোপ করা হয় এবং ফলে তাঁদের উপর অযথা প্রতিঘাত এসে পড়ে। পুনরায় বলি, ঠেস দিয়ে কথা বলা আমাদের একটি জাতীয় কু-অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। সেয়ানাদের এতে অসুবিধা হয় না, কেননা সেয়ানায়-সেয়ানায় কোলাকুলি এই উপায়েই বোধ হয় ভাল জমে; অসুবিধা যত ভালমানুষের। ভালমানুষ কি করে জানবেন যে অপর পক্ষ তাল-ঠোকাঠুকির ভাষা ছাড়া আর কোন ভাষা বোঝেন না এবং এই ভাষা ব্যবহারের জন্য সর্ব্বদাই আগু বাড়িয়ে আছেন? আমাদের হিংসাচার ত শুধু কর্ম্মেই নয়, আচরণেই নয়, বাক্য-ব্যবহারেও আমরা হিংসাচার করতে ছাড়ি না।

বলা বাহুল্য, আমাদের এ অভ্যাসের পরিবর্ত্তন ঘটাতে হবে। তা নইলে অন্তহীন ঘাত-প্রতিঘাতে সমাজে শুধু বিষই উথলে উঠতে থাকবে, সমাজের কর্ম্মশক্তির যথাযথ চালনা হবে না। অকারণ ভুল-বোঝাবুঝির দুষ্ট-চক্রের আবর্ত্তনে শক্তির কত যে অপচয় হয় তা বলে বোঝান যায় না। বাঙালীর সামাজিক ব্যবহার কথাবার্ত্তা ও সংলাপ ঠোকাঠুকিতেই কেবল তৃপ্তিবোধ করে এ আমাদের পক্ষে মোটেই শ্লাঘার বিষয় নয়। মানুষের মানবীয় মর্য্যাদায় ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে সহজাত আস্থা ও সম্ভ্রমবোধ যে-কোন সমাজের সামাজিক স্থিতির একেবারে গোড়ার কথা। মানুষে মানুষে সেই সম্ভ্রমই যদি নষ্ট হয়ে যায় তা হলে কিসের উপর আমরা আমাদের সমাজকে দাঁড় করাব? সমাজ এগিয়ে চলবে কোন প্রেরণার উপর ভর করে?

কেউ কেউ সংলাপের শ্লেষাত্মক বা ইঙ্গিতাত্মক প্রয়োগ সমর্থন করেন এই যুক্তিতে যে, নিরুদ্দিষ্ট অচিহ্নিত ব্যক্তির উদ্দেশে যে কথা বলা হয়েছে তা নিজের গায়ে না মাখলেই হয়, অপরের উদ্দেশে প্রযুক্ত কটূক্তি বা শ্লেষবাক্য নিজের উপর টেনে নিয়ে বিচলিত বোধ করবার কোন মানে হয় না। এই ভাবে কথায় কথায় যদি সংলাপের রাশ টেনে ধরতে হয় ত কোনপ্রকার সামাজিক কথাবার্ত্তাই সম্ভবে না।

উপরের কথাগুলির মধ্যে যে কিছু পরিমাণ যুক্তি নেই তা নয়। তবে তার উত্তর এই যে, আমরা আলাপ-আলোচনায় যে-কোন প্রকার কটূক্তি-প্রয়োগেরই বিরোধী, প্রত্যক্ষ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করেই হউক, আর পরোক্ষ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করেই হউক। যে-কোন প্রকার অ-শালীন কথাই কানে খট করে এসে বাজে। সকলের হয়ত বাজে না, কিন্তু যাঁদের রুচি পরিমার্জ্জিত, শব্দমনস্কতা প্রবল, নিরন্তর সুষম-বাক্য প্রয়োগে যাঁদের রসনা বিশেষভাবে কর্ষিত, তাঁদের পক্ষে এ-জাতীয় শ্রুতির অভিজ্ঞতা বাস্তবিকই পীড়াদায়ক। বর্ষীয়সী বিধবার শুচিবাইয়ের মত এটাকে স্কুল-মাষ্টারী রুচিবাই বলে মনে করলে ভুল করা হবে। এ রুচির বাই নয়, এ রুচির দাবী।

অনেকের আবার উপস্থিত জনকে লক্ষ্য করে নির্ম্মম রসিকতা করবার অভ্যাস আছে। এ অভ্যাসও কতকটা সঙ্কুচিত হলে সমাজের পক্ষে তার ফল ভাল বই মন্দ হবে না। রসিকতা ভাল, তা যদি নির্ম্মল হাস্যরসের উৎস থেকে উৎসারিত হয় তবে আরও ভাল, তা বলে মিছরির ছুরির ধারে ধারালো রসিকতা ভাল নয়, অন্ততঃ সামাজিক আলাপ-সংলাপের বেলায় ত নয়ই। সাহিত্যে বক্রোক্তি (wit), পরিহাস (banter), শ্লেষ ও ব্যঙ্গ খুবই উপভোগ্য সন্দেহ নেই কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যবহারের ক্ষেত্রে যদি এই তরবারির খেলা ঘন-ঘন চলতে থাকে তা হলে আবহাওয়া অচিরেই দূষিত হয়ে ওঠার আশঙ্কা থাকে। নির্ম্মল হাস্যপ্রসূত রসরসিকতা আর শব্দালঙ্কারজাত ব্যঙ্গোক্তি এক জাতের বস্তু নয়। প্রথমটিতে যাকে উদ্দেশ করে রসিকতা করা হয় সে-ও তা উপভোগ করে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উপভোগ বিমুখতায় পরিণত হয়। রসিকতার নামে ব্যঙ্গ করতে গিয়ে কত সময়ে যে হিতে-বিপরীত ফল হয় তার অভিজ্ঞতা বোধ

হয় প্রায় সকলেরই আছে। আসল কথা, 'হিউমার' আর 'উইটে'র মধ্যে তফাৎটি জানা দরকার, নয় ত সমাজ-ব্যবহারে বিপত্তি ঘনিয়ে ওঠা আশ্চর্য্য নয়। অঘোরবাবু নামক এক অতিরিক্ত সজ্জাবিলাসী ভদ্রলোককে যখন রসিকতার ছলে 'ঘোরবাবু' বলে বর্ণনা করা হয় তখন ত হয় নির্ম্মল হাস্যরসের দৃষ্টান্ত, কিন্তু যখন এই বিশেষ বাবুটিকে লক্ষ্য করে সাধারণ ভাবে বাবু-সমাজের উপর কটাক্ষ ক্ষেপ পূর্ব্বক এক ছোটখাট বক্তৃতাই ফাঁদা হয়ে থাকে তখন তা শোভনতার সীমা অতিক্রম করে যায় এবং তার মধ্যে তিক্ততার ঝাঁজ এসে পড়ে। কোন সম্যক্‌দর্শী রুচিবান ব্যক্তিই এ রকম বাক্যব্যবহারের অনুমোদন করবেন বলে মনে হয় না। এই-জাতীয় বাক্যব্যবহার তিক্ততাসঞ্চারী বলেই তা থেকে আমাদের প্রতিনিবৃত্ত থাকা উচিত।

ইউরোপীয় সমাজে কথার পৃষ্ঠে কথা যোজনা করে আঘাত-প্রতিঘাতমূলক উত্তর-প্রত্যুত্তরের খেলা খেলবার রেওয়াজ আছে। ইংলণ্ডের ডক্টর জনসন এই বিদ্যায় পটু ছিলেন। কিন্তু এই বিদ্যারও মাত্রাহীন অনুশীলন ভাল নয়। তাতে মনোমালিন্যের সঞ্চার হতে পারে, হয়েও থাকে। যিনি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উত্তরের পৃষ্ঠে প্রত্যুত্তর দান করতে পারেন আমরা তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সক্রিয়তার প্রশংসা করতে পারি, কিন্তু সব সময়েই যে তাঁর প্রত্যুত্তরের (retort) যৌক্তিকতা আছে এমন নাও হতে পারে। উপস্থিত বুদ্ধির অতিরিক্ত সজাগতার একটা মুস্কিল এই যে, তা কেবলই মানুষকে আঘাত-প্রতিঘাতে প্ররোচিত করে, তাকে স্থির হয়ে থাকতে দেয় না। কাউকে বাক্যের দ্বারা কাবু করতে না পারলে মনে হয় রসনা-সঞ্চালনপটুত্বের শক্তি বৃথা গেল। পরকে জব্দ বা অপমান করাতেই যে বাক্যক্ষমতার উল্লাস, সে রকম ক্ষিপ্রতার অপেক্ষা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন জড়তা অনেক ভাল। সমাজে সংসারে দুষ্ট বুদ্ধির চতুর্দ্দিকে জয়জয়কার; শুভবুদ্ধি আর সৎবুদ্ধিরই বড় অভাব। বাক্যব্যবহারের ক্ষেত্রে আরও একটু বেশী পরিমাণে যদি শুভবুদ্ধির অনুশীলন হ'ত তা হলে আমরা অনেক বিপত্তির হাত থেকে বেঁচে যেতাম।

আমাদের পারস্পরিক কুশল-বিনিময়ের সংস্কারের মধ্যেও আজকাল অনেক রকমের খাদ ঢুকে গেছে। দেখা হলে নমস্কার-প্রতিনমস্কার সাধারণ সৌজন্যের একটি অঙ্গ, কিন্তু এখন সৌজন্যের ব্যত্যয় পদে পদে চোখে পড়ে। ক্ষমতাবান বলে যাঁর আত্মাভিমান আছে, অপরকে ছোট ভেবে যিনি এক প্রকারের কল্পিত শ্রেষ্ঠত্ব-সুখ অনুভব করেন, তিনি কচিৎ কখনও অপরের নমস্কারের প্রতিদান দেন। এই অবহেলা অন্যমনস্কতার ফল মোটেই নয় বরং একে অতি-মনস্কতার ফল বলা যেতে পারে। স্বীয় ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অতিরিক্ত সচেতনতা থেকেই এই পরিকল্পিত ঔদাসীন্যের উদ্ভব।

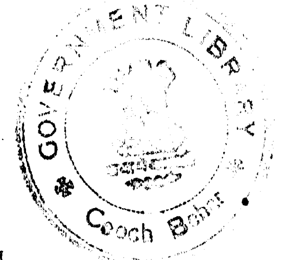
এ ত গেল আচরণগত বিচ্যুতি, বাক্যব্যবহারেও কত রকমের অপূর্ণতার সন্ধান মেলে। রাস্তায় দেখা হতে কেউ যদি অপরকে নিতান্ত খোলা মনে জিজ্ঞাসা করেন 'কি খবর?' এবং তার বদলে জবাব পান 'আপনার কি খবর?' তা হলে এই পাল্টা প্রশ্নের সম্ভাষণে অসৌজন্যই সূচিত হয়। কিম্বা 'কি, ভাল আছেন ত?' এই নির্দ্দোষ প্রশ্নের উত্তরে কেউ যদি জবাব দেন 'ভাল না থাকবার কোন কারণ নেই', সেটাও সৌজন্যের সুস্পষ্ট ব্যত্যয়। প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া বা হুঁ হাঁ বলে কথা সারা—এও শিষ্টাচার-বহির্ভূত ব্যাপার। শিষ্টাচারের এ রকম বিকার যে কত চোখে পড়ে তার ইয়ত্তা নেই।

ইংলণ্ডীয় সমাজে প্রতি কথায় 'থ্যাঙ্ক ইউ', 'প্লিজ' 'কাইণ্ডলি' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারের চলন আছে। বস্তুতঃ এই খাতে ইংলণ্ডীয় লোকেরা কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়িই করে থাকে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাদের এই অতি-সৌজন্য সময় সময় বিদ্রূপেরও লক্ষ্য হয়। কিন্তু সামাজিক ব্যবহারকে সুসহ, মসৃণ ও স্নিগ্ধ করে তুলতে হলে এ রকম ব্যবহারের যে প্রয়োজন আছে তা বোধ হয় অস্বীকার করবার উপায় নেই। এ সব সৌজন্যমূলক শব্দ যদিও নিতান্তই আনুষ্ঠানিক অভিব্যক্তি মাত্র, তাদের ভিতর আন্তরিকতা তেমন নেই, তা হলেও তাদের উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না। হোক এ সৌজন্য কতকটা লোক দেখান, হোক তা হৃদয়তাপহীন, তাতে যদি লোক-ব্যবহার সুরুচির সীমার মধ্যে ধরে রাখতে পারা যায় সেইটাই বা কি কম লাভ! আমাদের সমাজ-ব্যবহারে অবশ্য এই অতি-সৌজন্য অনুকরণের কথা কেউ বলবে না, তবে কথায়-বার্ত্তায় আলাপে-আলোচনায় কোন রকম সৌজন্যেরই কোন রকম বালাই থাকবে না সেই বা কি কথা। 'পহেলা আপ' জাতীয় উত্তর-ভারতীয় আমীরী সহবৎ আমরা হুবহু নাই বা অনুশীলন করলাম, তা বলে সহবৎ চর্চ্চার প্রয়োজন অসিদ্ধ হয়ে যায় না। অতি-বুদ্ধির পথে আমরা নাই গেলাম, প্রতিহিংসাতাড়িত আর প্রত্যাঘাতপরায়ণ হয়ে অপরকে জব্দ করবার মতলবে ঠেস দিয়ে কথা আমরা না-ই বললাম, আমাদের আর একটু সরল বুদ্ধির বশ হতে দোষ কি। কথার পৃষ্ঠে কথা রচনার দক্ষতায় বুদ্ধির চাতুর্য্য প্রকাশ পেতে পারে, কিন্তু মানুষের মানবীয় মর্য্যাদার অপহ্নব ঘটিয়ে এ চাতুর্য্যের সুনাম ক্রয়ের কোন অর্থ হয় না।

সংসারে যাঁরা কৃতী পুরুষ বলে লোকধন্য হন তাঁরা কেউ আঘাত-পরায়ণ নন, তাঁরা সারল্যের প্রতীক। মহত্ত্বের একটা লক্ষণই হ'ল সারল্য। মাঝারী ও মামুলী মনের মানুষেরাই শুধু কথায় কথায় সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন এবং অপর পক্ষে প্রতিযোগিতা অনুমান করে সুরুতেই পায়তাঁড়া কষিতে থাকেন। মহত্ত্বের এমন রীতি নয়। তিনি নিজে সরল বলে সবাইকেই সরল ভাবতে তিনি অভ্যস্ত। 'আপ ভালা ত জগৎ ভালা।' পর পক্ষের আক্রমণ আশঙ্কা করে তিনি সর্ব্বদা সঙ্কুচিত হয়ে থাকেন না, কাজেই অপর পক্ষকে জুৎসই কথার মারপ্যাঁচে ঘায়েল করবার জন্য তাঁর অকারণ তড়পাবারও কোন প্রয়োজন হয় না। কারও বিরুদ্ধে তাঁর যদি কিছু বক্তব্য থাকে তবে তিনি তা সেই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে তাঁর

সামনা সামনিই বলেন, তার জন্য অনুপস্থিত তৃতীয় এক ব্যক্তিকে খাড়া করবার তাঁর প্রয়োজন হয় না। উপস্থিত ব্যক্তিকে সরাসরি সমালোচনা করবার বদলে অনুপস্থিত তৃতীয় এক ব্যক্তির (প্রায়শঃ সে ব্যক্তি কল্পিত) বকলমে সে কাজ সেরে গায়ের ঝাল ঝাড়বার এই-যে চেষ্টা, তার চেয়ে কাপুরুষতা ও হীনতা কিছু হতে পারে না। হিম্মৎ যাঁর আছে তিনি মুখের উপরই বলেন, বাঁকা পথের আশ্রয় তিনি নেন না। তাতে তাঁর আত্মসম্মানে বাধে। বেনামীতে পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে কারও বিরুদ্ধে কটূক্তি করার মতই এ জিনিস অশ্রদ্ধেয়। আড়ালের আশ্রয় তাঁরাই নেন যাঁদের সৎসাহস কম। স্বাক্ষরবিহীন রচনার দ্বারা কুৎসাকীর্ত্তন আর অনুপস্থিত ব্যক্তির উদ্দেশে শরনিক্ষেপ দ্বারা উপস্থিত ব্যক্তিকে বিদ্ধ করবার চেষ্টা একই প্রকারের অভব্যতা। রুচিবান ব্যক্তির আচরণে এমনতর বৈক্লব্য কখনও প্রকাশ পায় না।

বাঙালীকে তার এই আচরণ সংশোধন করতে হবে। বাংলা সাহিত্যের লিখিত রূপের সুসমৃদ্ধ ঐতিহ্যের মত তার বাচনিক রূপও অনুরূপ সমৃদ্ধ ঐতিহ্যমণ্ডিত হওয়া প্রয়োজন। কলমের ভাষাকে শাণিত করলেই হ'ল না, মুখের ভাষারও সংস্কার চাই। আমাদের মৌখিক বাক্যরীতি শুধু মুখের কথাই হবে না, সুখের কথাও হবে—এ না হলে মুখের কথার কোন দাম নেই।



মহাকাশ

শ্রীউমা দেবী

হৃদয়ের পৃথিবীর রঙ বারে বারে মুছে যায়—
নূতন ফসলে পুনরায়
ভরে যায় বারে বারে সময়ের ক্ষেত,
ফুল ফোটে—পাতা ঝরে—দেহের সঙ্কেত
বয়ে আনে নতুন ইঙ্গিত জনে জনে
মানব ও মানবীর মনে।
এখানে হৃদয় ফেলে বেদনার্দ্র বাসনার সুরভি নিঃশ্বাস—
সমুদ্রের ঢেউ লেগে বালুতটে জেগে ওঠে
অভিমান-গূঢ় হতাশ্বাস,
নগ্ন ইচ্ছা ছুঁড়ে ফেলে রহস্যের অলীক শাসন,
উদ্বায়ু বিবশ ক্ষণে পেতে চায় স্নেহ-উদ্বর্তন ;
—সময়ের উত্তপ্ত কটাহে
পরিপাক দৃঢ়তায় হয়তো বা পায় কোনো
রূপান্তর মর্মান্তিক দাহে।

তবু হৃদয়ের আছে কোনো এক প্রশান্ত-আকাশ,
ধ্যানের মুহূর্তে শুধু মগ্ন নেত্র তারকায় জাগে
তার আলোক-আভাস,
ইন্দ্রধনু রঙগুলি লুপ্তি পায় মেঘের সুনীলে।

মনের অর্গল খুলে দিলে
সমস্ত বাঞ্জনা আর সঙ্গীত সেখানে এসে স্তব্ধ হয়ে যায়—
তারার-বন্দর-ভাঙা ছায়াপথ নদীটিও প্রবাহ হারায়।
সে আকাশ আনে অবসর—
ধ্যানের মুহূর্তে-পাওয়া শান্ত শুদ্ধ একটি প্রহর।

তবু যেন মনে হয় আরো আছে কোনো এক
মহতী পৃথিবী কিংবা অন্য মহাকাশ
সেখানে এ হৃদয়ের পৃথিবী-আকাশ মিলে
পায় কোনো জীবনের অন্য এক অকূল আভাস।

স্তব্ধতা ও কলরব যেখানে হয়তো অন্য অর্থ খুঁজে পায়,
আলোক ও অন্ধকার বিরোধ হারায়।
সব গান সব রঙ সমস্ত সৌরভ কোনো ধ্যানশান্ত
নিবিড় নিস্তব্ধ অবকাশে
পেয়ে যায় জীবনের অভীপ্সিত বিস্তৃতিকে হয়তো বা
অন্য কোনো মহতী-পৃথিবী কিংবা অন্য মহাকাশে।

বন্ধন

শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

টাগোর টাউনের ছোট হলেও সবচেয়ে সুন্দর যে বাড়ীটি সেই বাড়ীটাই ভাড়া পেয়ে গেল ওরা। ওরা মানে মনোজ আর তার স্ত্রী এনাক্ষী। বাড়ীটার সামনে পার্ক, দু' পাশে রাস্তা। একদিকে খালি জমি। ঘরের সামনে একটুকরো বাগান। ছোট্ট একটু ছাত—আর ছাতে ঘেরা বারান্দা। সামনের রাস্তায় লোক চলাচল খুব কম। যেমনটা চেয়েছিল এনাক্ষী ও মনোজ ঠিক তেমনটাই, কিম্বা হয়ত তার চেয়েও বেশী।

পুরোপুরি বাঙালী পাড়া এটা। চেনাপরিচয় হতে দেরী হওয়া উচিত নয়। অন্ততঃ পাড়ার সকলেই চিনে ফেলল ওদের দু'জনকে। এমন অপূর্ব্ব সুন্দর একজোড়া নরনারী বড় কম চোখে পড়ে। যেমন বলিষ্ঠ অথচ কমনীয় চেহারা মনোজের তেমনি তন্বী ও মধুর গঠন এনাক্ষীর। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে দু'জনে প্রায়ই সন্ধ্যের দিকে যায় বাঁধের ধারে, কিম্বা জহরলাল নেহরু রোড ধরে বাটলার মার্কেট পার হয়ে গঙ্গার দিকে, অথবা লাউদার রোড দিয়েই জর্জ্জ টাউনের গা-ঘেঁষা কারও বাড়ীতে হয়ত। মনোজের ব্যবহার যদি ভদ্র হয় ত এনাক্ষীর চরিত্র মাধুর্য্যপূর্ণ। মনোজ যতটা বিনীত ও নিরহঙ্কার, এনাক্ষী তার চেয়েও বেশী। মনোজ এসেছে দর্শনের অধ্যাপক হয়ে। এনাক্ষীর বাবা বারাণসীর একজন নামকরা ব্যবসায়ী। অর্থের অস্বাচ্ছল্য ওদের নেই। আর নেই বিনয়ের অভাব।

সকলেই মুগ্ধ। সুখী দম্পতীর এমন অপূর্ব্ব উদাহরণ হঠাৎ চোখে পড়ে না।

কিন্তু যে আকাশ নীল দেখায় তারও অন্তরালে থাকে জলভরা শ্রাবণের মেঘ। পরিচ্ছন্ন চৈত্রের দিনে পলকে দেখা দেয় কাল-বৈশাখীর ধূলিঝড়। মনোজ ও এনাক্ষীর ব্যবহারিক জীবনের আড়ালে এমনি কিছুটা ব্যতিক্রমও থেকে গেছে।

সেদিন ওদের বেড়াতে যাওয়ার সময় পার হয়ে গেছে প্রায়। প্রসাধন শেষ করে সজ্জিতা এনাক্ষী যখন মনোজের বসবার ঘরে এসে দাঁড়াল তখনও তার তৈরী হতে অনেক দেরী। মনোজ টেবিলে বসে লিখে চলেছে। চোখ না তুলেই বলল, একটু দাঁড়াও, লক্ষীটি।

মনোজের চুল এলোমেলো। কপালটা ঘামে ভিজে। সমস্ত শরীরে ব্যস্ততা। এনাক্ষী জানে ও গল্প লিখছে। এখন ওকে বিরক্ত করা অনুচিত। আস্তে আস্তে নিজের রুমাল দিয়ে ওর কপালের ঘামটা মুছিয়ে দিল এনাক্ষী। তার পর পাখাটা খুলে দিয়ে পাশে বসল।

মিনিট পনেরো পরে লেখা শেষ হ'ল। প্যাডটা চাপা দিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল মনোজ। তার পর জামাটা গায়ে চড়াতে চড়াতে বলল, উঃ! বড্ড দেরী হয়ে গেল। চল, চল!

—না।

এনাক্ষী শক্ত হয়ে বসল চেয়ারে। বলল, গল্পটা না শুনে নড়ব না। তুমি পড়, আমি শুনি।

—পরে শুনবে। এখন দেরী হয়ে গেছে। ওঠো।

এনাক্ষীর হাত থেকে প্যাডটা কেড়ে নিয়ে সরিয়ে রাখল মনোজ। তার পর ঘরের বাইরে এসে বলল, কি হ'ল, এস?

কিন্তু এনাক্ষীর মুখে ততক্ষণে মেঘের কালোছায়া। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সুরে বলল সে, আমি না হয়ে যদি লতিকা হতাম, তা হলে তুমি গল্পটা সরিয়ে রাখতে না নিশ্চয়ই।

আশ্চর্য্য হয়ে গেল মনোজ। লতিকা তাদের প্রতিবেশী ব্যানার্জ্জি সাহেবের মেয়ে। বি, এ পড়ছে। বাংলা সাহিত্যে অনুরাগ আছে। তাই মাঝে মাঝে আসছে সাহিত্য আলোচনা করতে।

মনোজ ঘরের মধ্যে ফিরে এল। তার পর ওর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে বলল, তোমার কথাটার মানে?

—মানে অত্যন্ত স্পষ্ট। এটুকু বুঝবার মত বুদ্ধি তোমার নিশ্চয়ই আছে।

মনোজকে পাশ কাটিয়ে এনাক্ষী বেরিয়ে গেল। আর মনোজ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শুধু।

পরের দিন সকালে চায়ের টেবিলে দু'জনে বেশ হাসিমুখেই বসল। মনোজকে মাখন-রুটি দিয়ে চা ঢালতে ঢালতে বলল এনাক্ষী,—তোমার গল্পটা পড়ে ফেলেছি কিন্তু।

কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করল মনোজ, কেমন লাগল বল ত?

—ভারী সুন্দর! কি করে যে তুমি লেখ...? আচ্ছা ঐ যে মাষ্টার মশাইটি তাঁর ছাত্রীর প্রেমে পড়লেন—ওকি সম্ভব? বয়েসের ত অনেক তফাৎ। ছাত্রীটিও তার মাষ্টার মশাইকে ভালবেসে ফেলল—সত্যি সত্যিই কি অমন হয়?

মনোজ ভারিক্কি-চালে হাসল একটু। বলল, প্রায়ই হচ্ছে। মানুষের মন বড় বিচিত্র। প্রেম সব সময়ে বয়েসের হিসেব করে চলে না।

চা-য়ে চুমুক দিতে দিতে কি যেন ভাবতে লাগল এনাক্ষী

তার পর হঠাৎ বলল, তা হলে তুমিও ত লতিকার প্রেমে পড়তে পার ? ও কিন্তু তোমার দিকে যে ভাবে তাকায়, মনে হয় গিলে খাবে। তুমি কথা বললেই নির্লজ্জের মত চেয়ে থাকে। তুমি বাপু ওদের বাড়ী আর যেয়ো না।

মনোজ আশ্চর্য্য হয়ে গেল এনাক্ষীর কথা শুনে। একটু তিরস্কারের সুরে বলল, তোমার মন বড় ছোট হয়ে যাচ্ছে এনা।

এনাক্ষী চা-য়ের কাপ টেবিলে রেখে চেয়ে রইল মনোজের মুখের দিকে। তার পর হঠাৎ বলে উঠল, তোমার গায়ে এত বাজল কেন বল ত ? ভিতরে পাপ না থাকলে মানুষ এমন করে রাগে না।

—পাপ ?

মনোজ চাপা গর্জ্জন করে উঠল, আমি তোমার মত ইতর নই।

—কে ইতর তা বোঝাই যাচ্ছে।

এনাক্ষী উঠে গেল ঘর থেকে।

সেদিন ছুটির বার ছিল। দুপুরের ভাত বেড়ে এনাক্ষী ডাক দিল মনোজকে। কিন্তু মনোজ উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে এনাক্ষী ঘরে এসে দেখল—মনোজ চেয়ারে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। পিঠে হাত দিয়ে ডাকল এনাক্ষী, খাবে চল। ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে যে।

মনোজ উত্তর দিল না। এনাক্ষী এবার ওর চুলের মধ্যে আঙুল ঘসতে ঘসতে বলল, তুমি বড্ড ছেলেমানুষের মত রাগ কর। স্বামী-স্ত্রীতে কত কথা-কাটাকাটি হয়। রাগ করে না খেয়ে কতক্ষণ থাকবে ? চল লক্ষ্মীটি।

মনোজ এবারে উঠে এল। দু'জনে একসঙ্গে খেতে বসল। সেদিন দু'জনে এক সঙ্গেই আবার বেড়াতে গেল। কেউ হয়ত জিজ্ঞেস করল, কাল দেখি নি যে ?

উত্তর দিল এনাক্ষীই, একটু মাথা ধরেছিল আমার। উনি আর বেরুবেন না কিছুতেই। সারাটা বিকেল আমাকে শুইয়ে রেখে উনিও পাশে বসে রইলেন।

—সত্যিই, কি আশ্চর্য্য সুখী ওরা ?

সকলে বলাবলি করে। ওরাও ভাবে, ওরা সুখী বই কি। রাত্রে ঘরের সবুজ আলোটা জেলে রাখে এনাক্ষী। শুয়ে শুয়ে বিছানার মাঝখানকার পাশবালিশটাকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দেয় সে। তার পর মনোজের বুকের কাছে মাথা এনে মৃদুস্বরে বলে তুমি শুধু আমার।

একটি অল্প বয়সী মেয়ে ওদের বাড়ীতে সব সময়ে থেকে কাজ করে। বাসার সবকিছু কাজ ওর হাতে ছেড়ে দিয়ে এনাক্ষী নিশ্চিন্ত। এমনকি ওদের রান্নাটাও সে প্রায়ই চালিয়ে দেয়। তার ওপর সংসারের ভার দিয়ে ওরা দু'জনে বেড়াতে যায়। যায় কখনও কাকামো ব্রীজ, কখনও বা খসরুবাগে। আবার কোনদিন পরিচিতদের সঙ্গে দেখা করতে।

মেয়েটির নাম মুন্না। ভারী স্ফূর্তিবাজ আর বিশ্বাসী। এ রকম একটা লোক পাওয়াও ভাগ্যের কথা। মনোজ সেই কথাই বলছিল এনাক্ষীকে। কিন্তু এনাক্ষী হঠাৎ গম্ভীরভাবে বলে উঠল, তাই বলে ওর সঙ্গে তুমি যে হাসাহাসি কর—এটাও দেখতে বড় খারাপ লাগে।

—তার মানে ?

মনোজ প্রায় চমকে উঠল। আমি হাসাহাসি করি মানে ?

এনাক্ষী ঠিক তেমনি ভাবেই বলল, আমি দেখেছি, তুমি ওকে দেখলেই ওর দিকে চেয়ে হাস আর মুন্নাও তোমায় দেখলেই ফিক্ ফিক্ করে হাসে।

মনোজ ভেবে পেল না কি উত্তর দেবে সে। শুধু বলল, তুমি অত্যন্ত মিথ্যেবাদী আর নীচ। তুমি নিজেও বোধহয় বোঝ না যে, তুমি কি বল।

—আমি ঠিকই বুঝি। ও নেহাৎ খুকী নয়। পুরুষ আর মেয়ে হ'ল কিনা আগুন আর ঘি।

হঠাৎ মনোজ বোমার মত ফেটে পড়ল। অত্যন্ত ছোটলোকের বংশে তোমার জন্ম। অশিক্ষিত, হীন তুমি।

এনাক্ষী উঠে দাঁড়াল। ক্রোধে তার মুখ-চোখ হিংস্র ও কুটিল হয়ে উঠেছে। মুখ বিকৃত করে সে বলল, হ্যাঁ। তবে আমার বংশে কেউ পুরুত-বামুন ছিল না। পরের বাড়ী বাড়ীও কেউ ঘুরে বেড়ায় নি।

এবার মনোজকে কুৎসিত আঘাত দিয়েছে এনাক্ষী। মনোজ রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলে উঠল, তুমি দূর হও আমার সামনে থেকে। যাও, তোমার বড়লোক বাপের কাছে গিয়ে থাকগে।

এবার কুটিল একটা হাসির রেখা দেখা দিল এনাক্ষীর ঠোঁটে। তার সুন্দর মুখ পলকে কুৎসিত হয়ে উঠেছে। ঠোঁটে বাঁকা হাসি নিয়ে সে বলল, তা হলে তোমার বেশ সুবিধে হয় বুঝি ? রাত্রেও মুন্নাকে থাকতে বলবে ?

দু'জনে দু'জনের দিকে হিংস্র, বিভৎস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। সে দৃষ্টি অমানবিক।

গোটা এলাহাবাদ শহরটা টহল দিয়ে ঘুরে বেড়াল মনোজ। সেই বিকেল থেকে রাত এগারোটা অবধি। রাতের শীতল বাতাসে ঠাণ্ডা মনে হ'ল মাথাটা। হেঁটে হেঁটে ক্লান্তিতে জড়িয়ে এল পা। রাতের স্নিগ্ধ হাওয়ায় ওর আবার মনে পড়ল এনাক্ষীর কথা। সে অশিক্ষিত ও কটুভাষী সত্য—কিন্তু শুধু তাকে ভালবাসে বলেই এমন-ধারা ব্যবহার সে করে। নইলে অন্যের সঙ্গে ব্যবহারে এমন কর্কশ ত সে কখনও নয়।

তবুও বাড়ীতে পা দিয়েই মনটা আবার বিষিয়ে উঠল।

মনোজ নীরস মুখে এসে দাঁড়াল জানালার কাছে। তার পর জামাটা খুলে রেখে তার বসবার ঘরের আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ল।

এনাক্ষী ডাকল এসে—খাবে চল। কোন উত্তর দিল না মনোজ। এনাক্ষী আবার ডাকল। তার পর কাছে এসে হাত রাখল ওর মাথায়। বলল, খাবে চল, লক্ষ্মীটি।

মনোজ উত্তর দিল না তবুও। আর এনাক্ষী এবারে ওর পা ধরে বলল, খাবে চল লক্ষ্মীটি। আমি মাপ চাচ্ছি। মাপ করবে না আমাকে?

রাগ জল হয়ে গেল মনোজের। এনাক্ষীর হাত ধরে বলল, চল।

দেখতে দেখতে মনোজের খ্যাতি এলাহাবাদের বাঙালীমহলে ছড়িয়ে পড়ল। সে যে কথা-সাহিত্যিক, তার গল্প কলকাতার কাগজে ছাপা হয়, এটাই যথেষ্ট। বিভিন্ন সভাসমিতি থেকে ডাক আসতে লাগল মনোজ ও এনাক্ষীর। এমনকি তরুণদের মহলে এনাক্ষীর প্রতিপত্তিই বেশী দেখা গেল। এনাক্ষী ত একদিন বলেই ফেলল, তুমি স্বীকার কর বা নাই কর, তোমার সমাদর কিন্তু আমার জন্যেই বাড়ছে মনে রেখ।

মনোজ হাসতে হাসতে বলল, স্বীকার করছি।

কয়েকদিন পরের কথা। কলেজের ছেলেরা একটি বাংলা নাটক অভিনয় করছে। ঐ উপলক্ষ্যে একটি ছোট অনুষ্ঠানও আছে। সভায় সভাপতি মনোজ মুখোপাধ্যায়। ছেলেদের অনুরোধে শ্রীমতী মুখার্জী প্রধান অতিথি।

সন্ধ্যে ছটায় অনুষ্ঠান। সাড়ে পাঁচটায় ছেলেরা এল ওদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবে বলে। কিন্তু এনাক্ষী তখনও ঘর ঝাঁট দিচ্ছে। মনোজ ততক্ষণ তার অভিভাষণ তৈরি করতে ব্যস্ত ছিল, তাই সে খেয়াল করে নি মুন্নার অনুপস্থিতি। এখন এসে তাড়া দিল, কি আশ্চর্য! সময় হয়ে গিয়েছে, ওরা এসে তাড়া দিচ্ছে আর তুমি ঘর ঝাঁট দিচ্ছ? চল তাড়াতাড়ি।

এনাক্ষী লজ্জিতভাবে তাকাল। সত্যিই দেরী হয়ে গেল। কিন্তু আমার ত এখনও রাজ্যের কাজ বাকী। তা ছাড়া আমার গা-ধোওয়াও হয় নি। আমার ত যাওয়া হবে না আজ।

—যাওয়া হবে না? মনোজ ক্রুদ্ধস্বরে বলল, মুন্না কি আজ দিন বেছে কামাই করল?

—ও চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।

—চাকরি ছেড়ে দিয়েছে মুন্না? মনোজ বিস্মিত হয়ে চাইল এনাক্ষীর দিকে। বলল, কেন? হয়েছিল কি?

এনাক্ষী কোন কথা না বলে উঠে গেল। তার পর টেবিল থেকে ভাজ-করা একটা কাগজ এনে মনোজের চোখের সামনে ধরল। দু'দিনের পুরনো খবরের কাগজ। মনোজ পড়ল, আইন-আদালতের সংবাদের তলায় ছোট্ট একটি খবর: এক তরুণ গৃহকর্তা গৃহে তাঁর স্ত্রীর অনুপস্থিতির সুযোগে তরুণী পরিচারিকার শ্লীলতাহানি করিয়াছেন...ইত্যাদি।

মনোজ স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইল। তার পর বলল, এর মানে?

এনাক্ষী ভারিক্কিচালে বলল, রাগ কর না তুমি। কথায় বলে, পুরুষের মন না মতি। আগে থেকে সাবধান থাকাই ভাল।

সেদিন রাত্রে মনোজ ফিরল প্রায় রাত বারোটা নাগাদ।

এনাক্ষী এসে জিজ্ঞেস করল, এত দেরী হ'ল?

মনোজের মনে হ'ল একটা সাপ যেন হিস হিস করে উঠল। কোন উত্তর না দিয়ে সে ঘরের ভেতরে এসে ফিরে দাঁড়াল। তার পর এনাক্ষীর মুখের ওপরেই দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিল।

অনেকক্ষণ ধরে দরজায় ধাক্কা দিল এনাক্ষী। অনেকবার সে ডাকল। কিন্তু স্তব্ধ-নিঃশব্দ হয়ে বসে রইল মনোজ। তার পর একসময়ে চেয়ারে বসে বসেই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোর-রাত্রির দিকে ঘুম ভাঙতেই মনে হ'ল সর্বাঙ্গে মশার দংশন-জ্বালা। অসহ্য গরমে ভেপসে উঠেছে শরীর। মনোজ উঠে দাঁড়াল। জানলা দিয়ে আসছে জোৎস্নার একটু রেখা। দরজা খুলে ফেলল সে। আর সঙ্গে সঙ্গেই স্তম্ভিত হয়ে পেছিয়ে এল।

দরজার চৌকাঠে মাথা রেখে অগোছালো বেশে বারান্দার মেজেতে শুয়েই ঘুমোচ্ছে এনাক্ষী। মনোজ দেখল আকাশ ভরে ছড়িয়ে রয়েছে চাঁদের আলো। এনাক্ষীকে অতিক্রম করে মনোজ রেলিং-এর ধারে দাঁড়াল। শেষ-রাত্রের অদ্ভুত পৃথিবীকে দেখে তার মনে হ'ল—মানুষ পৃথিবীর মত জটিল; আর হৃদয় আকাশের মত দুর্গম।

রাগারাগির পালাটা এবারে বেশীদিন ধরেই চলল। সকালে না খেয়েই কলেজ গেল। রাত্রে ফিরে এসেই শুয়ে পড়ল। এনাক্ষী এসে ডাকল একবার—খাবে না?

—না। সুস্পষ্ট উত্তর এল তার কাছ থেকে। পরের দিন সকালেও যখন মনোজ না খেয়েই কলেজ গেল, তখন আর থাকতে পারল না এনাক্ষী। নিজেই বেরিয়ে গিয়ে একটা টেলিগ্রাম পাঠাল কাশীতে। আসতে লিখল তার ছোট ভাইকে।

সেদিন ফিরে এসে অন্ধকার ছাতে মনোজ চুপচাপ বসেছিল। কিছুক্ষণ পরে এনাক্ষীও এসে বসল কাছে। বলল, অধীরকে আসতে বলে 'তার' করেছি। তুমি ত আর আমাকে সহ্য করতে পারছ না। ভাবছি কিছুদিন ঘুরে আসি।

উত্তর দিল না মনোজ। শুধু বুঝল সে, তাদের দাম্পত্য-জীবনের শেকল ছিঁড়ে যাচ্ছে। বন্দর থেকে নোঙর তুলে নিচ্ছে জাহাজ।

এনাক্ষী আবার বলল, মাস দুই বোধহয় থাকব বাবার কাছে।

একা একা ত ভালই লাগবে তোমার। মুন্নাকে ডেকে ব্যবস্থা করে যাও। সেই ত রান্না করে দিতে পারবে।

এনাক্ষী উঠে গেল।

সকালের ট্রেনে এল অধীর, এনাক্ষীর ছোট ভাই। আর এনাক্ষী যখন গুছিয়ে দিচ্ছে মনোজের একক-বাসের ব্যবস্থাকে, ঠিক সেই সময়ে বিকেলের ট্রেনে এসে পৌঁছাল মনোজের পিসতুত বোন রমা আর তার বন্ধু সুলতা।

সুলতা···কলকাতার এক স্কুলের শিক্ষয়িত্রী সে। কিন্তু মনোজের সহপাঠিনী। পুরানো দিনের স্মৃতি পলকে ধরা দিল। মনোজ ভীষণ খুশী হয়ে উঠল। আর রমা ত অত্যন্ত আমুদে মেয়ে। হাসিতে গানেতে সে নিমেষে ভরিয়ে তুলল বাড়ী।

সুলতা···নামটা মনে মনে আবৃত্তি করছিল এনাক্ষী। হঠাৎ মনে পড়ল এই ত সেই মেয়ে—যাকে এক সময়ে বিয়ে করতে চেয়েছিল মনোজ।

রমা, এনাক্ষী আর সুলতা তিন জনের মিলিত হাসি-গানে বাড়ীর আবহাওয়া সহজ হয়ে গিয়েছে। ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে অধীর—এনাক্ষীর ছোট ভাই। মনোজ অনেক দিন পর শান্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

রাত্রে উপরের ছোট ঘরটায় শুতে গেল মনোজ। নীচের ঘরে তখন ওরা চার জনে তাস খেলছে—কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই ঘরের দরজায় ছায়া পড়ল। আর এনাক্ষী এসে বসল মনোজের পায়ের কাছে।

অন্ধকারের মধ্যে চুপচাপ বসে রইল এনাক্ষী। তার পর হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল, আমি চলে যাচ্ছি বলেই কি তুমি ওদের আনিয়েছ?

—তুমি চলে যাচ্ছ বলে?

মনোজ আশ্চর্য্য হয়ে গেল। বলল, ওদের আসার খবর আমি কিছুই জানতাম না। আমাকে কিছুই জানায় নি ওরা।

অন্ধকারে বোঝা গেল না এনাক্ষীর মুখের ভাব। কিন্তু সে নিঃশব্দে উঠে গেল ঘর থেকে।

রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল মনোজের। তার মনে হ'ল কে যেন এসে জড়িয়ে ধরেছে তার দু'পা। চকিতে উঠে বসল সে। চোখের জলে সিক্ত হয়ে উঠেছে তার দেহ। উপুড়-হয়ে-পড়া এনাক্ষীকে দুই হাতে সে তুলবার চেষ্টা করল। কিন্তু এনাক্ষী তার দুই পায়ের মধ্যে মুখ গুঁজে ফোঁপাতে লাগল। বলল, আমায় তুমি তাড়িয়ে দিও না। আমি পারব না দূরে গিয়ে থাকতে। আমায় তাড়িয়ে দিলে আমি মরে যাব।

মনোজ এবার জোর করে টেনে তুলল তাকে। তার পর বুকের কাছে ধরে বলল, না, তুমি যেও না, এ বাড়ী ত তোমার, তুমি যাবে কেন এনাক্ষী?

পরের দিন সকালে একাই ফিরে গেল অধীর। তার কলেজ কামাই হচ্ছে।

সে দিন বিকেলেই কলেজ থেকে ফিরে শুনল মনোজ যে রমারা চলে যাচ্ছে সন্ধ্যের ট্রেনেই।

আশ্চর্য্য হয়ে গেল সে। এ রকম কথা ছিল না। রমারা যেন কয়েক দিন এখানে থাকবে বলে ঠিক করেছিল।

রমার সদা প্রফুল্ল মুখ ঈষৎ গম্ভীর। সে বলল, অনেক কাজ আছে কলকাতায়। চলে যাওয়াই ভাল মনোজদা।

মনোজ বলল, তাই বলে আজই যাবে কেন? কাল-পরশু গেলেই চলবে।

সুলতা এগিয়ে এল এবারে। বলল, না, চলবে না। অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে আজ না গেলে। যেতে আমাদের হবেই আজকে।

সন্ধ্যের ট্রেনে ওদের তুলে দিয়ে বাড়ী ফিরে এসে দেখল মনোজ যে, এনাক্ষী আজ অনেকদিন পর সেজেগুজে অপেক্ষা করছে, তার মুখ প্রফুল্ল।

মনোজ গম্ভীর মুখে বলল, ওরা চলে গেল কেন?

—আমি কেমন করে জানব?

এনাক্ষী হাল্কা সুরে বলল, কিন্তু মনোজ বিষণ্ণ ও বিরক্ত কণ্ঠে বলল, তুমি যেতে বলেছ ওদের?

এবারে সহজ অথচ কঠিন কণ্ঠে বলল এনাক্ষী,—হ্যাঁ বলেছি, কেন বলব না? শত্রুকে ঘরে নিয়ে কে বাস করতে পারে? সুলতার খবর আমি সব জানি, ঐ ত তোমাকে আমার হতে দিচ্ছে না।

রাগে দুঃখে উন্মত্ত হয়ে মনোজ এনাক্ষীর হাত চেপে ধরল, আর এনাক্ষী আশ্চর্য্য শান্তকণ্ঠে বলল, আমি জানতাম তুমি ওকে ভালোবাস, কিন্তু ওর জন্যে তুমি আমাকে মারবে? আমি ত তোমার স্ত্রী, আমাকে ত বিয়ে করেছ তুমি।

মনোজের হাতের মুঠি আস্তে আস্তে শিথিল হয়ে গেল। এনাক্ষীর চোখ সাপের মত স্থির, শীতল অথচ তীক্ষ্ণ।

আকাশে তখন ধূসর মেঘ জমে উঠেছে। এলোমেলো বাতাসের ঝাপটায় গাছ-পাতা কাঁপছে থর থর করে। বৃষ্টি আসবে হয় ত। শীতের বৃষ্টি।

মনোজ তার দৃষ্টিতে অন্তহীন ঘৃণা আর অদ্ভুত অসহায়তা নিয়ে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল শুধু।

এনাক্ষী যে তার স্ত্রী—তাকে নিয়েই ত পাড়ি দিতে হবে এই পৃথিবীর জীবন-সমুদ্র। কিন্তু এই বন্ধনই কি অনাদিকাল থেকে কামনা করে এসেছে মানুষ??

শিল্প-ব্যবসায় দাদন ও পুনর্লগ্নী কর্পোরেশনের ব্যর্থতা

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

পুনর্লগ্নী কর্পোরেশন স্থাপিত হয়েছে ১৯৫৮ সনের জুন মাসে। বিগত ২৩শে মার্চ্চ বম্বেতে শ্রী এইচ, ভি. আর. আয়েঙ্গার কর্পোরেশনের প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভায় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। শ্রী আয়েঙ্গার হলেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার গভর্ণর এবং পুনর্লগ্নী কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান। শ্রী আয়েঙ্গার বলেছেন, আড়াই বৎসর আগে এই পুনর্লগ্নী কর্পোরেশন স্থাপন করার উদ্দেশ্যে যে উচ্চ আশা পোষণ করা গিয়েছিল সে আশা সম্পূর্ণভাবে সফল হয় নি, যদিও কর্পোরেশনের কার্য্যে অগ্রগতি ঠিক অসন্তোষজনক নয়। অর্থাৎ তিনি বুঝতে চেয়েছেন, কর্পোরেশন কর্ত্তৃক প্রাপ্ত টাকা যত তাড়াতাড়ি ব্যয়িত হবে বলে আশা করা গিয়েছিল আসলে সেটা হয় নি। তাছাড়া শ্রী আয়েঙ্গার কর্পোরেশনের কার্য্যাবলী সম্পর্কে কোন আশার বাণী শুনাতে পারেন নি। বরঞ্চ তাঁর গোটা ভাষণের ভিতর যেন একটা হতাশার সুর ধ্বনিত হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে, কি কারণবশতঃ অল্প দিনের মধ্যে বরাদ্দ টাকা নিঃশেষ হবার আশা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে। পুনর্লগ্নী কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান শ্রী আয়েঙ্গার অবশ্য কারণ প্রদর্শন করার চেষ্টা করেছেন। জানি না, তাঁর প্রদর্শিত কারণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে সকলে আশ্বস্ত হবেন কি না। তিনি বলেছেন, বিগত ১৯৫৬ এবং ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে আমাদের দেশে শিল্পপ্রসারের জন্য জোর আয়োজন চলছিল। কিন্তু ১৯৫৭ সনের পরে শিল্পপ্রসারের তৎপরতা কমে গেছে। যে সব কারণবশতঃ শিল্পপ্রসার ব্যাহত হয়েছে সে সব কারণের মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি অন্যতম। এই ঘাটতির দরুণ বাহির থেকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কলকব্জা ইত্যাদি আমদানী হ্রাস পেয়েছে। অর্থাৎ শ্রী আয়েঙ্গার যে কথাটি বলতে চাইছেন সে কথাটি হ'ল এই যে, শিল্পপ্রসারের তৎপরতা হ্রাস পাবার দরুণ অল্পসময়ের মধ্যে বরাদ্দ টাকা নিঃশেষ হবার আশা ব্যর্থ হয়ে গেছে। এখন চিন্তা করে দেখার বিষয় হ'ল, শ্রী আয়েঙ্গার যা বলেছেন সেটা ভারতের সত্যিকারের অবস্থা বিবেচনা করে গ্রহণযোগ্য কি না। কেন ভারতে পুনর্লগ্নী কর্পোরেশনের কাছ থেকে ঋণ নেবার আগ্রহ দেখা যায় নি, সেটা পরীক্ষা করতে গেলে প্রথমেই মনে হয়, যে পদ্ধতি এবং সর্ত্ত অনুযায়ী ঋণ দেবার ব্যবস্থা হয়েছে সে পদ্ধতি এবং সর্ত্তই যেন পুনর্লগ্নী কর্পোরেশনের উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হবার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। অন্য কোন কারণ প্রদর্শন করার আগে শ্রী আয়েঙ্গারের উচিত ছিল এ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা। অথচ তিনি অন্যদিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলেন। জনমতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা তাঁর ভাষণের মধ্যে নেই, একথা জোর করে বলা যায় কিনা সন্দেহ। এক্ষেত্রে পুনর্লগ্নী কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের প্রদত্ত ভাষণের কঠোর সমালোচনা করার কারণ হ'ল এই যে, আজকের দিনে আমাদের দেশে কোন বুদ্ধিমান শিক্ষিত লোককে বুঝাবার দরকার করে না, ঋণলাভের যোগ্য এমন একশত প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে আছে, যাদের মধ্যে পুনর্লগ্নী কর্পোরেশনের জন্য বরাদ্দ ছাব্বিশ কোটি টাকা বিলি করা খুব শক্ত ব্যাপার নয়। অথচ বরাদ্দ টাকার মোটা অংশ বিলি করা সম্ভবপর হয় নি, যদিও মূলধনের অভাব রয়েছে। কাজেই অভাব রয়েছে, অথচ টাকা বিলি করা হয় নি, এটা নিশ্চয় অদ্ভুত ব্যাপার। সুস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, যেখানে আসল গলদ রয়েছে' সেখানে শ্রী আয়েঙ্গার হাত দেন নি। সম্প্রতি প্রকাশিত পুনর্লগ্নী কর্পোরেশনের রিপোর্টটি অধ্যয়ন করলে মনে হয়, যে সব প্রতিষ্ঠান কর্জ্জবিলিকারী ব্যাঙ্কের পরিচালকদের সুনজরে পড়ে নি সে সব প্রতিষ্ঠানের কপালে ঋণ জুটে নি। এছাড়া নয়া শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ঋণ পাবার কোন প্রশ্নই উঠে না। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, পুনর্লগ্নী কর্পোরেশনের দাদনযোগ্য তহবিলের মোট পরিমাণ হ'ল ছাব্বিশ কোটি টাকা। প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায়, বিগত ১৯৫৮ সনের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত এক কোটি আটাত্তর লক্ষ টাকা দাদন মঞ্জুর হয়েছিল এবং পরবর্ত্তী পৌনে তিন মাসে আরও পঁয়ষট্টি লক্ষ টাকা দাদন মঞ্জুর হয়েছে। বলা হয়েছে, এটা বিলি করা হবে আটটি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। কাজেই অনুসৃত ব্যবস্থার মধ্যে নিশ্চয় এমন একটা গলদ রয়েছে যেটা সত্যি গুরুতর।

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশে শিল্পে দাদন দেবার জন্য কতকগুলি সংস্থা গঠিত হয়েছে। এই সব সংস্থার পিছনে রয়েছে সরকারী প্রেরণা এবং আনুকূল্য। এখানে অবশ্য আমরা কেবলমাত্র পুনর্লগ্নী সংস্থার কথা বলছি। এই সংস্থাটি মাঝারি শিল্পে ঋণ দেবার জন্য গঠিত হয়েছে। ঋণ দেবার জন্য সংস্থা কোথা হতে টাকা পাবেন এবং কিভাবে ঋণ দেওয়া হবে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে দু'একটা কথা বলা দরকার।

আমাদের হয়ত জানা আছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘকাল ধরে কিস্তিবন্দী হারে দাম পরিশোধের সর্ত্তে ভারতে পণ্য প্রেরণ করেছেন। এই পণ্যের মূল্য বাবদ ভারতে যে টাকা আমানত রয়েছে সে টাকা থেকে ছাব্বিশ কোটি টাকা পুনর্লগ্নী সংস্থার মাধ্যমে মাঝারি আকারে শিল্পে কর্জ্জ দিবার ব্যবস্থা হয়েছে। অবশ্য কেবলমাত্র কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অনুমোদিত ব্যাঙ্ক এই ছাব্বিশ কোটি টাকা

বিলি করতে পারবেন। তবে কতদিন পর্য্যন্ত ঋণের মেয়াদ থাকবে, ঋণ নিতে হলে কিপ্রকার সুদ এবং জামিন প্রয়োজন হবে এবং কোন্ শ্রেণীর শিল্পে ঋণ দেওয়া যাবে সেটা পুনর্লগ্নী সংস্থা ঠিক করে দিবেন। অবশ্য কোন কর্জ্জপ্রার্থী প্রতিষ্ঠানের কর্জ্জ পাবার সত্যিকারের যোগ্যতা আছে কি না সেটা নির্দ্ধারণ করবেন একমাত্র কর্জ্জবিলিকারী ব্যাঙ্ক। কাজেই সুস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, যদি কোন কর্জ্জপ্রার্থী প্রতিষ্ঠানকে কর্জ্জবিলিকারী ব্যাঙ্কের পরিচালকবৃন্দ প্রীতির চোখে না দেখেন তা হলে সে প্রতিষ্ঠানের কর্জ্জ পাবার আশা নেই বললেই চলে। তাছাড়া একথা কোন ব্যক্তিকে হয়ত বুঝিয়ে বলার দরকারও নেই যে, সহজে কোন নয়া শিল্প-প্রতিষ্ঠান ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষের সহানুভূতি পাবেন না। আমরা আগেও উল্লেখ করেছি এবং এখনও করছি, ভারতে সমস্তপ্রকার শিল্প-ব্যবসায়ে মূলধনের অভাব তীব্র ভাবে অনুভূত হচ্ছে। অবশ্য এই অভাব কেবলমাত্র ভারতে সীমাবদ্ধ নয়। তবে শিল্পোন্নত দেশের সঙ্গে ভারতের পার্থক্য হ'ল এই যে, যে ক্ষেত্রে শিল্পোন্নত দেশে শিল্প-ব্যবসায়ে মোট লগ্নীর একটা বিরাট অংশ ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য ধরণের দাদনী-সংস্থা থেকে সংগ্রহ করা যায় সে ক্ষেত্রে ভারতে আগে এই ভাবে লগ্নী সংগ্রহের উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থাই ছিল না এবং যেটুকু ব্যবস্থা ছিল সেটুকু অতি নগণ্য। হয়ত মুষ্টিমেয় লোকের পক্ষে নিজেদের সঞ্চিত অর্থের সাহায্যে শিল্প-ব্যবসা চালান সম্ভবপর। কিন্তু পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দেখতে পাচ্ছি, শিল্প-ব্যবসা চলেছে কর্জ্জের উপর নির্ভর করে। যে দেশে প্রয়োজন অনুযায়ী বাজার থেকে ঋণ পাবার সুষ্ঠু ব্যবস্থা আছে সে দেশই আজকের দিনে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। এই পটভূমিকায় আমাদের বিচার করে দেখতে হবে ভারতে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দাদন পাবার কতটা সুযোগ আছে। সুযোগ আজও সীমাবদ্ধ। দাদন পাবার সুব্যবস্থা আজও হয় নি। এখনও বেশীর ভাগ কারবারের পক্ষে ন্যায্য সুদে ঋণ পাওয়া কষ্টকর। আবার কর্জ্জের কিস্তিগুলিও খুব অসুবিধা-জনক। এ ছাড়া ব্যাঙ্কের পক্ষে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেওয়াও প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় যদিও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করার পক্ষে এই ঋণ একান্ত দরকার। এর কারণ হ'ল এই যে, ব্যাঙ্কের আমানতী অর্থের বিরাট অংশ এমন সম্পত্তিতে লগ্নী রাখা দরকার যেটা যে কোন সময় নগদে পরিবর্ত্তনের উপযোগী। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, মোট স্থিতের যে অংশ দীর্ঘমেয়াদী লগ্নী হিসাবে দেওয়া চলে—সেটা অতি নগণ্য। তাই বলে এই প্রকার লগ্নী পাওয়া সহজ—এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই। যে সব কারবার সুপ্রতিষ্ঠিত এবং ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে যে সব কারবারের মালিকদের বন্ধুত্ব আছে একমাত্র সে সব কারবারই হয় ত কিছু কিছু দীর্ঘমেয়াদী কর্জ্জ পেয়ে থাকে। নয়া কারবারীর পক্ষে এই প্রকার কর্জ্জ পাবার আশা নেই বললেই চলে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, স্বাধীন ভারতেও নয়া কারবারীদের অসুবিধার অন্ত নেই। অতীতের মত আজও ভারতের শিল্প-ব্যবসা সমস্যা জর্জ্জরিত। এ ছাড়া দাদন দেবার ব্যাপারে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগও মাঝে মাঝে শোনা যায়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর শ্রীএইচ. ভি. আর. আয়েঙ্গার একটা সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দিবার সময় এই মর্ম্মে আশা ব্যক্ত করেছেন যে, ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি শিল্পক্ষেত্রে অগ্রগতিতে সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে কর্জ্জ দিবার সর্ত্তাদি উন্নয়নে সাহসিকতার সঙ্গে ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। তিনি বলেছেন, যেহেতু ব্রিটেনের ব্যাংকিং ব্যবসার পথ অনুসরণ করে ভারতীয় ব্যাংকিং ব্যবসা অগ্রসর হয়েছিল সেহেতু নিরাপদ ধরনের ঋণ দিবার পথ অনুসৃত হতে দেখা গিয়েছিল। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে ব্যবস্থা চোখে পড়ে সেটা অন্য ধরনের। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যদি কোন ব্যক্তি সুচিন্তিত শিল্প-পরিকল্পনা কার্য্যকরী করতে সচেষ্ট হয়ে উঠেন তা হলে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ পেতে তাঁর অসুবিধা হয় না এবং পরিকল্পনার উন্নতি সম্ভবপর করে তোলার জন্য বিশেষজ্ঞের সাহায্য দিবারও ব্যবস্থা আছে।

প্রচারিত খবরে প্রকাশ, শিল্পে ঋণদান ও লগ্নী কর্পোরেশন এবং পুনর্লগ্নী কর্পোরেশনের কার্য্যের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে উভয় সংস্থার মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলছে। শ্রীআয়েঙ্গারও আলাপ-আলোচনা চলার খবর সমর্থন করেছেন। তিনি বস্তুতে নিজেই বলেছেন—

"Discussions have been initiated between the Industrial Credit and Investment Corporation of India and the Refinance Corporation for a closer working relationship so that the resources available between us may be more effectively utilized for the benefit of the country's economy. Discussions have also been initiated with the International Finance Corporation and the Commonwealth Finance Development Company to negotiate, in particular cases, for the provision of the necessary foreign exchange for schemes for which the rupee finance, in part or wholly, would be provided by the Refinance Corporation."

যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই সব আলাপ-আলোচনা সুরু হয়েছে সে উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য কি রকম আয়োজন এবং চেষ্টা চলছে সেটা আমরা আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করতে থাকব।

দীপান্বিতা

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

ভারতের জনসাধারণ নানাবিধ ব্রত, পূজাপার্বণ ও উৎসবে সমাজকে প্রাণবন্ত করে রেখেছে। এসব সার্বজনীন উৎসবের সঙ্গে দেব-দেবী সংক্রান্ত বহু সুন্দর সুন্দর কাহিনীও জড়িত আছে। ভারতের সব প্রদেশে হিন্দু জনসাধারণ যে সমস্ত উৎসব বিশেষভাবে পালন করে তার মধ্যে দশহরা, দেওয়ালী ও হোলী প্রধান। আবার এ তিনটির মধ্যে বহুস্থানে দেওয়ালী উৎসবই বিশেষ করে সর্বজনপ্রিয়। এ উৎসব আবালবৃদ্ধবণিতার প্রাণে এক উচ্ছল আনন্দের স্রোত বইয়ে দেয়। হিমাচল থেকে সুরু করে কুমারিকা পর্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষ আলোমালায় ঝলমল করে ওঠে। সর্বসম্প্রদায়ের হিন্দু এ উৎসব পরম উৎসাহে পালন করে, নিজ নিজ গৃহ প্রদীপ জ্বালিয়ে সাজায়, বাজী পোড়ায়, অমাবস্যার নিবিড় কালো আকাশ লালে লাল হয়ে ওঠে।

বাংলা দেশে এই উৎসবকে দীপান্বিতা, দক্ষিণ-ভারতে দীপাবলী এবং সর্বত্র দেওয়ালী বলে থাকে। বাংলা দেশে দীপান্বিতা একটি বিশেষ পূজোর দিন। অন্যান্য দেশে এদিনে লক্ষ্মীপূজা হয়, বাংলা দেশে শ্যামাপূজা হয়। যারা শাক্ত তারা গভীররাত্রে শ্যামামায়ের পূজা নিষ্ঠাসহকারে করে, শ্যামাবিষয়ক গান-কীর্তন ইত্যাদিতে ভক্তরা বিভোর হয়ে থাকে। বাংলার কোন কোন অঞ্চলে এদিনে পূর্বপুরুষের উদ্দেশে জলতর্পণ করে, সন্ধ্যায় কলাগাছের বাকলের ঠোঙায় প্রদীপ জ্বালিয়ে নদীতে বা দীঘিতে ভাসিয়ে দেয়। তা ছাড়া রাত্রে আকাশ-প্রদীপ জ্বালানো হয়, কেউ কেউ সারা কার্তিক মাস প্রতি রাত্রে আকাশ-প্রদীপ জ্বালায়।

বাংলা দেশে ঘরদোর লেপেপুছে ঝকঝকে করে তোলে। কেউ কেউ বাড়ীর সামনে কলাগাছ পুঁতে বাঁশের চাঁচর দিয়ে সুন্দর করে তোরণদ্বার তৈরি করে। বাড়ীর বালক-বালিকারা কয়েকদিন আগে থেকেই কাগজের শেকল ও নিশান তৈরি করে রেখে দেওয়ালী দিনে বাড়ী সাজায়। মেয়েরা আর বুড়ীরা ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে সলতে তৈরি করে রাশি রাশি। ছেলেরা যে-যার বাড়ীকে সুন্দর করে আলোমালায় সাজাবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করে। ছাদের কার্ণিশে, আলিসায় চড়ে ছোট ছোট মাটির প্রদীপ বসিয়ে, সন্ধ্যা হওয়া মাত্রই তাতে তেল ঢেলে সলতে ভিজিয়ে প্রদীপ জ্বালায়। দেখতে দেখতে বাড়ী বাড়ী আলো জ্বলে উঠে। মৃৎ-প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোয় সমস্ত শহর একটা কল্যাণশ্রী-মণ্ডিত হয়ে ওঠে।

আজকাল অবশ্য অনেক ধনী-গৃহে মাটির প্রদীপের বদলে রঙ-বেরঙের বাল্‌ব লাগিয়ে সমস্ত গৃহ বৈদ্যুতিক আলোতে উদ্ভাসিত করে তোলা হয়। মনে হয়, বাল্যে আমরা কাগজের শেকল ও নিশান বানিয়ে, সলতে পাকিয়ে, ভাইবোনে মিলে কাড়াকাড়ি করে প্রদীপে তেল ঢেলেছি, আলো জ্বালিয়েছি: মনে যে উত্তেজনা ও আনন্দ পেয়েছি, আজকালকার অনেক ছেলেমেয়েরা সুইচ টিপে বাল্‌ব জ্বালিয়ে বাড়ী উজ্জ্বল করে বোধ হয় সে আনন্দের এক কণাও অনুভব করতে পারে না।

দেওয়ালীতে ঘরে ঘরে মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসব করার কি মূল কারণ সে সম্বন্ধে নানা কাহিনী চলিত আছে। কেউ কেউ বলে, লঙ্কা ধ্বংস করে সীতা উদ্ধার করে শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে এলে তাঁর রাজ্যাভিষেক হ'ল, সমস্ত রাজ্যে আনন্দের স্রোত বইল। প্রতিগৃহ, রাস্তাঘাট, দীপমালায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। শ্রীরামচন্দ্রের সেই স্মৃতি রাখবার জন্যে প্রতিবৎসর দীপ জ্বালানো হয়। হনুমান-ভক্তরা বলে, শ্রীরামচন্দ্রের প্রধান সেবক ও ভক্ত পবননন্দন বানর-রাজ হনুমানের জন্মদিন বলে তাঁরা ঐদিনে প্রদীপ জ্বালিয়ে এ উৎসব করে।

গুপ্ত সম্রাট বিক্রমাদিত্য এইদিনে রাজ্যারোহণ করেন ও সেদিন থেকে নতুন বৎসর সুরু হয়, তাকে সম্বৎ বলে।

ঐশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মী দেওয়ালী দিনে সর্বত্র পূজিতা হন। কেউ কেউ বিশ্বাস করে দেওয়ালী দিনেই লক্ষ্মীনারায়ণের শুভবিবাহ হয়েছিল। তাই ভক্তরা পরম আনন্দে দেওয়ালী উৎসব পালন করে।

জৈনরা এই দিনকে মহাবীরের নির্বাণ দিবস বলে বিশেষ আড়ম্বর করে ও প্রদীপ জ্বালায়।

অমৃতসরে দেওয়ালী দিন শিখদের বিখ্যাত স্বর্ণমন্দিরে অপূর্ব আলোকসজ্জা হয়। লক্ষ লক্ষ লোক পঞ্জাব ও আশেপাশের স্থান থেকে এসে অমৃতসরে ভিড় করে। এইদিনে শিখদের ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দের জন্মদিন। তাই শিখরা খুব আড়ম্বর করে উৎসব করে, প্রদীপ জ্বালিয়ে বাড়ীঘর উজ্জ্বল করে তোলে।

পুরাণে নাকি বর্ণিত আছে যে, চার বর্ণের জন্য ভগবান বিষ্ণু চারিটি বিশেষ উৎসব নির্দেশ করে দেন। যথা: ব্রাহ্মণের জন্য শ্রাবণী, (নতুন উপবীত গ্রহণ ও উপনয়ন) ক্ষত্রিয়ের জন্য দশহরা, বৈশ্যের জন্য দেওয়ালী এবং শূদ্রের জন্য হোলী। কিন্তু এই বিধি থাকা সত্ত্বেও শ্রাবণী উৎসবটি ছাড়া বাকি তিনটে উৎসবই সকলে পালন করে। তবে দেওয়ালী উৎসবে বৈশ্য বা ব্যবসায়ীদের আড়ম্বরটা সত্যি বেশী থাকে। তারা দেওয়ালী দিনে লক্ষ্মীদেবীর

পূজো বিশেষ জাঁকজমকে করে। লক্ষ্মীর কৃপা পেলে রাতারাতি ভাগ্য ফিরে যায়, সে সম্বন্ধে একটি কাহিনীও প্রচলিত আছে।

এক রাজা তাঁর চার মেয়ে। একদিন রাজা জিজ্ঞেস করলেন, তারা কার ভাগ্যে খায়। তিনটি মেয়ে রাজাকে খুশী করবার জন্য খোসামোদ করে বলল, তারা রাজার ভাগ্যে খায়। শুধু ছোট মেয়ে বললে দেবতার দয়ায় খায়। রাজা রাগ করে ছোট রাজকন্যাকে এক গরীব ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বিদায় দিলেন। রাজকন্যা এই তার ভাগ্যলিপি জেনে সন্তুষ্ট মনে গরীব ব্রাহ্মণ-স্বামীর সঙ্গে তার কুঁড়েঘরে চলে গেল। ব্রাহ্মণ দোরে দোরে ঘুরে ভিক্ষা করে যা আনে রাজকন্যা তাই রাঁধে, এ ভাবে দিন কাটে। একদিন ব্রাহ্মণ কিছুই পেল না, পথে চলতে চলতে একটা মরা সাপ দেখে কুড়িয়ে নিল, যদিই বা তা কোন কাজে লাগে। রাজকন্যা মরা সাপ আবার কি কাজে লাগে বলে সাপটাকে ঘরের পেছনে ফেলে দিল।

ইতিমধ্যে সেদিন ঐ রাজ্যের রাজা দীঘিতে স্নান করতে নামলেন, আর গলার বহুমূল্য রত্নহার খুলে রাখলেন সিঁড়ির উপর। একটা চিল উড়তে উড়তে এসে হঠাৎ ছোঁ মেরে হারটা নিয়ে পালিয়ে গেল। তাড়া করেও চিলটার কাছ থেকে হার পাওয়া গেল না। চিলটা উড়তে উড়তে ব্রাহ্মণের বাড়ীর কাছে এসে মরা সাপটা দেখে হারগাছা ফেলে সাপটা নিয়ে উড়ে চলে গেল। রাজকন্যাও রত্নহার এনে তুলে রেখে দিলেন।

রাজা ঢেঁড়া পিটাতে বললেন, যে এই রত্নহার খুঁজে এনে দেবে তাকে প্রচুর পারিতোষিক দেওয়া হবে। রাজার এই ঘোষণা শুনে রাজকন্যা ব্রাহ্মণের হাতে হার দিয়ে শিখিয়ে দিল রাজার কাছে কি পুরস্কার চাইবে। ব্রাহ্মণ হারগাছা নিয়ে সাহসে ভর করে রাজবাড়ীতে চলল। রাজার কাছে গিয়ে তাঁকে যথাযোগ্য নমস্কার ও আশীর্ব্বাদ করে হারগাছা বের করে দিল। রাজা তাঁর বহুমূল্য হারানো হার পেয়ে এত খুশী হলেন, বললেন ব্রাহ্মণ তোমার কি পুরস্কার চাই বল? ব্রাহ্মণ হাতজোড় করে বললে, মহারাজ! আমার একটা সামান্য ভিক্ষা যে, অমাবস্যা রাত্রে কারও গৃহে, এমন কি রাজপ্রাসাদেও যেন আলো জ্বালান না হয়, শুধু আমার কুঁড়ে ঘরে আলো জ্বলবে।

মহারাজ ব্রাহ্মণের এই অদ্ভুত প্রার্থনা শুনে বিস্মিত হয়ে বললেন তাই হবে।

দীপান্বিতা এল, রাজার আদেশে কেউ আলো জ্বালতে পারল না, সমস্ত পুরী অন্ধকার। শুধু রাজকন্যা তার কুঁড়ে ঘরখানা লেপে পুছে তকতকে করে, সারি সারি মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে কুঁড়ে ঘরখানা উজ্জ্বল করে তুলেছে। ঘরের ভেতরে লক্ষ্মীর আসন সুন্দর করে পাতা। গভীর রাত্রে লক্ষ্মীঠাকরুণ স্বর্গ থেকে তাঁর বাহন পেঁচায় চড়ে মর্ত্তে নেমে এলেন। এসে দেখেন, এত বড় রাজপুরী ঘুটঘুটে অন্ধকার, কোথাও এক ফোঁটা আলো নেই, সারা রাজ্য অমাবস্যার অন্ধকারে ডুবে আছে। অসন্তুষ্ট মনে লক্ষ্মী চলতে চলতে রাজ্যের এক দিকে ছোট একটি কুঁড়ে ঘরে সারি সারি মাটির প্রদীপ জ্বলছে দেখে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লেন। দেখতে পেলেন, রাজকন্যা আর ব্রাহ্মণ অতি নিষ্ঠা সহকারে তাঁর পূজা করছে। তা দেখে দেবী অতি সন্তুষ্ট হয়ে তাদের বর দিলেন। লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদে রাতারাতি তাদের ভাগ্য ফিরে গেল, তারা রাজঐশ্বর্য্য লাভ করে পরম সুখে দিন কাটাতে লাগল।

এ সমস্ত পৌরাণিক কাহিনী জনসাধারণ অল্পবিস্তর বিশ্বাস করে। তাই রাজকন্যার মত নিজ নিজ ভাগ্য ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত করবার জন্য গৃহলক্ষ্মীরা দেবী লক্ষ্মীকে দেওয়ালী দিনে অতি নিষ্ঠা-সহকারে আরাধনা করে। ঐশ্বর্য্যের দেবী লক্ষ্মী তাঁর মোহিনী মূর্ত্তিতে হাতে কমল নিয়ে প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর মৃণাল ভুজ উদ্যত হয়ে আছে ঐশ্বর্য্য বিতরণের জন্য। কিন্তু দেবী সহজে মানুষের হাতে ধরা দেন না, বহু সাধ্যসাধনা করতে হয় তবে দেবীর কৃপা মিলে। তাই ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র দেওয়ালী উপলক্ষ্যে সমস্ত পাকাবাড়ী চুণকাম করা হয়, গৃহের যত আবর্জ্জনা, নোঙরা-ভাঙা জিনিস বর্জ্জন করে চারিদিক নির্ম্মল শুচি করে তোলে —নারীরা যে যার গৃহের সামনে আঙ্গিনায় নিপুণ হাতে রাংগোলী দিতে থাকে। রংবেরংয়ের গুড়ো দিয়ে নানা রকমের নক্সা ও চিত্র করাকে রাংগোলী বলে। এক বাংলা দেশেই শুধু পিটুলী গোলা দিয়ে আল্পনা আঁকে, তা ছাড়া সর্ব্বত্র গুড়া দিয়ে রাংগোলী দেয়, এটা নারীদের একটি সুকুমার বিদ্যা। লক্ষ্মীর মূর্ত্তি বা চিত্রকে ষোড়শোপচারে পূজা করা হয়, লক্ষ্মীর সামনে দেওয়ালী দিন রূপার টাকা স্তূপাকারে হলুদ ও সিন্দুর লাগিয়ে রেখে দেয়।

শরৎকালে আনন্দময়ী মায়ের আগমনে যেমন বাঙালীর গৃহে আনন্দের সাড়া পড়ে তেমনি মহারাষ্ট্রে, গুজরাটে, উত্তর ভারতে ও অন্যান্য প্রদেশে দেওয়ালী উৎসবে প্রতি গৃহে আনন্দের হাট বসে যায়। কোথাও কোথাও তিন দিন কোথাও বা পাঁচ দিন ধরে দেওয়ালীর উৎসব চলে ও একে লোকেরা ছোট দেওয়ালী ও বড় দেওয়ালী বলে। এই পাঁচ দিনেরই পাঁচটি কাহিনী আছে। প্রথম দিনকে তারা ধন ত্রয়োদশী বলে, এ দিন ব্যবসায়ীদের নতুন বৎসর আরম্ভ হয়, পুরাণ হিসাবনিকাশ করে নতুন খাতা সুরু করে।

দ্বিতীয় দিন হ'ল নরক চতুর্দ্দশী, এর কাহিনী হ'ল নরকাসুর অতি প্রতাপশালী অসুররাজ ছিল, তার অত্যাচারে দেবতারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। তখন দেবতাদের অনুরোধে ভগবান বিষ্ণু নরকাসুরকে বধ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে নরকাসুর তার শেষ প্রার্থনা জানায়, হে ভগবান, বহু পুণ্য ফলে আজ তোমার হাতে আমার মৃত্যু ঘটবে, তুমি আমার একটা প্রার্থনা পূর্ণ কর। তোমার হাতে আমার মৃত্যু এই আনন্দের দিনটা যেন সবাই চিরদিন স্মরণ করে প্রতি গৃহে আলো দেয়। ভগবান তথাস্তু বলে নরকাসুরকে বধ করেন। সেই থেকে প্রতি বৎসর লোকেরা এ দিনে ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে এ ঘটনাকে স্মরণ করে।

মহীশূর ষ্টেটে সোমনাথপুরের কেশব মন্দিরে বিষ্ণু এবং নরকাসুরের ভীষণ যুদ্ধ প্রস্তর-মূর্ত্তিতে খোদাই করা আছে। তৃতীয় দিন হ'ল বড় দেওয়ালী, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পরিবারের সবাই গায়ে ও মাথায় সর্ব্বাঙ্গে তেল মেখে স্নান করে, তারা বিশ্বাস করে এই দিনে এই তেল-স্নান গঙ্গা-স্নানের সমতুল্য হয়। স্নানান্তে সবাই নূতন কাপড় পরে মণ্ডামিঠাই খায়। বন্ধুবান্ধবের বাড়ী বেড়ায়। আমোদ, আহ্লাদ করে, সন্ধ্যায় প্রদীপমালায় বাড়ী সাজায়, বাজী পোড়ায়। দেওয়ালী রাতে সবাই সঙ্গবিত্তর জুয়া খেলে, তারা বিশ্বাস করে, দেওয়ালীর দিন জুয়া খেললে দেবী লক্ষ্মী প্রসন্না হন। এই জুয়া খেলা নিয়েও একটি কাহিনী রচিত হয়েছে।

এক বর্ষার দিনে শিব-পার্ব্বতী পাশা খেলতে বসলেন বাজী রেখে। ছোটখাট জিনিস বাজী রেখে খেলতে খেলতে প্রতিবারই হেরে গেলেন। শেষ পর্য্যন্ত কৈলাস পর্ব্বত বাজী রেখে তাও হারালেন। তখন শিব মহা অসন্তুষ্ট হয়ে গঙ্গা নদীর তীরে তপস্বীর ন্যায় বাস করতে লাগলেন। শিব-পার্ব্বতীর দুই পুত্র কার্ত্তিক-গণেশ ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কার্ত্তিক পিতার পক্ষ সমর্থন করে পার্ব্বতীর সঙ্গে পাশা খেলতে বসে একে একে শিবের বাজীর জিনিস পুনরুদ্ধার করলেন। তা দেখে গণেশ মায়ের পক্ষ নিয়ে খেলতে বসলেন এবং আবার সব জিনিস জিতে মায়ের পায়ের নীচে রাখলেন।

তখন দেবতারা দেখলেন, এ ত মহা বিপদ, শিব-পার্ব্বতীর কলহে সব রসাতলে যাবে। তারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন, তখন বিষ্ণু আবার শিব-পার্ব্বতীকে খেলতে বসিয়ে দিলেন। আর নিজে গোপনে শিবের পাশায় ঘুটি হয়ে শিবকে খেলায় জিতিয়ে দিলেন। এবার পার্ব্বতী গেলেন মহা চটে। তখন নারদমুনি ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয়ে দেবদম্পতির মধ্যে মিলন ঘটালেন। এই পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে দেওয়ালীতে বাজী রেখে জুয়াখেলা অনুষ্ঠানের একটা অঙ্গ হয়েছে, অন্য দিনে অবশ্য জুয়াখেলা নিন্দনীয়।

চতুর্থ দিনে গোবর্দ্ধন পূজা হয়। একবার মথুরার গোপদের উপর দেবরাজ ইন্দ্র কোন কারণে রুষ্ট হয়ে অতিবৃষ্টি দিয়ে তাদের শাস্তি দিলেন। ব্রজবাসীদের দুঃখ ও অসুবিধার সীমা রহল না। তখন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীদের রক্ষা করতে ও ইন্দ্রের দর্পচূর্ণ করতে এক অঙ্গুলী দিয়ে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উত্তোলন করে রাখলেন। গোপালরা বন্যা থেকে রক্ষা পেল। এই জন্য গোবর্দ্ধনের পূজা হয়। মহীশূর ষ্টেটের এক মন্দিরের দেয়ালগাত্রে শ্রীকৃষ্ণের গিরিগোবর্দ্ধন উত্তোলনের নানা চিত্র খোদিত আছে।

পঞ্চম দিনে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া সর্ব্বত্রই দেওয়ালীর উৎসবকে প্রাণবন্ত করে তোলে বালকবালিকারা ও নারীরা। মহারাষ্ট্রে নবরাত্র উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে নারী ও বালক-বালিকাদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা যায়। উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে দর্জ্জিদের ব্যস্ততার সাড়া পড়ে। পাড়ায় পাড়ায় দর্জ্জিরা রংবেরং-এর ফ্রক-জামা, সার্ট-প্যাণ্ট তৈরি করতে বসে। যেমনি শিশুদের মধ্যে বাজী পোড়াবার ও নূতন পোষাক পরবার আগ্রহ তেমনি মেয়েদের নানা রকম সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য তৈরি করবার ঘটা। নিঃস্তব্ধ দুপুর মশলা গুড়ো করবার শব্দে মুখরিত হয়ে উঠে। খুব ভোরে উঠে বৌরা যাঁতাতে ডাল ও গম পিষতে থাকে, আর দাঁতে দাঁত চেপে সরু গলায় গান গাইতে থাকে। ওদেশে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী বাড়ী ভত্তের থালা পাঠাবার নিয়ম আছে। একদিনে নানা রকম মিষ্টিমণ্ডা তৈরি করা অসম্ভব, তাই দেওয়ালীর দশ-পনের দিন পূর্ব্ব থেকেই বৌঝিরা মণ্ডামিঠাই তৈরি করতে বসে যায়। আমাদের দেশের বিশেষ সুখাদ্য ছানার সন্দেশ রসগোল্লা, পানতোয়া, চমচম এরা জানে না কিন্তু তার বদলে এরা তৈরি করে চিওড়া, কাঙ্গুলা, কড়বোলে, সেউ আরও নানারকম মুখরোচক খাদ্য।

দেওয়ালীর আগে লোকেদের একটানা জীবনের গতিতে বেশ একটু চাঞ্চল্য আসে, দেওয়ালী উপলক্ষে স্কুল-কলেজ, আপিস ছুটি হয়। শহরে গ্রামে কেনাবেচায় ধুম লেগে যায়। শহরের এমন কি গ্রামের দোকানগুলি নানাবিধ দ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ হয়ে উঠে। কাঁচের আলমারীগুলি নানারূপ জামাকাপড়ে ভর্ত্তি ত হয়ই কিন্তু বিশেষ করে নানারূপ সুগন্ধি তেল, আতর, পটকাবাজী ও নানা রকমারী বাজীতে ঠাসা থাকে। ওদেশে দেওয়ালী ও ভাইফোটাতে নতুন সুগন্ধি তেল মেখে স্নান করা একটা বিশেষ স্নান। ভোরের আলো ফোটবার আগেই ঘরে ঘরে তেল মেখে স্নানপর্ব্ব শেষ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করা এই অনুষ্ঠানের একটা বিশেষ অঙ্গ। দোকানগুলি সুসজ্জিত মা ও ছেলেমেয়েতে পূর্ণ থাকে। ছেলে মেয়েরা দুহাত বোঝাই করে অজস্র বাজী, সুগন্ধি তেল, আর মায়েরা শাড়ী জামা কিনে মনের আনন্দে ঘরে ফিরে।

দেওয়ালী উৎসবে আলো জ্বালানই হচ্ছে আসল আনন্দ; বাড়ী বাড়ী, নগরে নগরে আলোমালা পরানো যেমন বাংলা দেশে তেমনি মহারাষ্ট্রে, কোন বৈষম্য নেই। কিন্তু বোম্বাইতে বাজী পোড়ানোর যা হিড়িক দেখেছি এমনটা আর কোথাও দেখতে পাই না। দেওয়ালীর চার-পাঁচ দিন আগে থেকেই শেষ রাত্রে সুখনিদ্রা ভেঙ্গে যায় পটকাবাজীর ফট ফট আওয়াজে। আর পটকা বাজীর সে কান-ঝালাপালা-করা আওয়াজ শেষ হয় ভাইফোটা উৎসবের পর। এক বোম্বাইতেই হাজার হাজার টাকার পটকা বাজী বিক্রী হয় আর তা ছাড়া আরও কত সুন্দর সুন্দর বাজী যে আছে তার ঠিক নেই। বাংলা দেশ ছাড়া অন্যত্র আর এক বিশেষত্ব—বাড়ী বাড়ী থালাভরা মিষ্টি পাঠানো। কোলাপুর রাজ্যে দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ দেবী মহালক্ষ্মীর মন্দিরে সেদিন ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে বহু লোকই 'তাট' (থালা) নিয়ে যায়। মন্দিরে দেবীকে মিষ্টি দেওয়ার পর আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের বাড়ী তাট পাঠান হয়, আর প্রত্যেক বাড়ীতে এত লাড্ডু ও মিষ্টি আসে যে, খেয়ে শেষ করা যায় না। সুগৃহিণীরা তা সযত্নে রক্ষা করে, এবং

উৎসবের পরেও বহুদিন পর্য্যন্ত বাড়ীতে অতিথি-অভ্যাগতদের সেই মিষ্টি চায়ের সঙ্গে দেওয়া হয়। অনেক সময় এই লাড্ডুর স্থায়িত্ব এত দীর্ঘকালব্যাপী হয় যে, তা খেতে গিয়ে দাঁত ভাঙবার উপক্রম হয়।

কোলাপুরে দেওয়ালীর জলুষটা একটু বেশী, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রাজপ্রাসাদ তিনটির যা আলোকসজ্জা দেখেছি তার তুলনা নেই। কোলাপুর আর মহীশূরে দেখেছি দেওয়ালীর সময় রাজপ্রাসাদগুলিতে সামান্য অন্তর করে করে রংবেরং-এর বাল্‌ব লাগিয়ে প্রাসাদের প্রত্যেকটি রেখাকে উজ্জ্বল করে তোলা হয়, আর অন্ধকারে সে প্রাসাদগুলি আলোমালায় ঝলমল করে মায়াপুরী হয়ে যায়। অপূর্ব্ব আলোকসজ্জায় সজ্জিত মহীশূরের রাজপ্রাসাদকে লোকেরা গোল্ডেন প্যালেস বলে।

দিল্লীতে দেওয়ালীর আলোকসজ্জায় বৈশিষ্ট্য নেই, কারণ, পনেরই আগষ্ট, ২৬শে জানুয়ারী, এবং সময় সময় বিশিষ্ট রাজা ও প্রতিনিধিদের আগমনে প্রেসিডেন্ট ভবন, পার্লামেন্ট হাউস সেক্রেটারিয়েট ও বহু সরকারী ভবন এবং তৎসংলগ্ন উদ্যানের বৃক্ষগুলি লাল-নীল, সবুজ-হলদে ইত্যাদি নানা রংবেরং-এর বাল্‌ব দ্বারা সজ্জিত হয়ে পরীরাজ্যের সৃষ্টি করে। ইণ্ডিয়া গেটের সুবৃহৎ ফোয়ারাগুলো নিত্যই রঙীন আলোমালা পরে মোহিনীমূর্ত্তিতে দর্শককে আকৃষ্ট করে। দিল্লীর অধিবাসীদের নয়ন-ঝলসানো আলোমালায় অভ্যস্ত দৃষ্টি দেওয়ালীর মৃৎপ্রদীপের অথবা মোমবাতির স্নিগ্ধ আভার বৈশিষ্ট্য দেখতে পায় না।

দিল্লীর আশেপাশের মথুরা বৃন্দাবনে, এবং গ্রামগুলিতে অধিবাসীরা পরম উৎসাহে দেওয়ালীর উৎসব করে। তারা তিন দিন ধরে দেওয়ালী উৎসবে আলো জ্বালায়। প্রথম দিন হ'ল ছোট দেওয়ালী, সেদিন বাড়ী বাড়ী শুধু পাঁচটি প্রদীপ জ্বালায়। দ্বিতীয় দিন হ'ল বড় দেওয়ালী, সেদিন গৃহাঙ্গনে একটি প্রদীপ সারারাত জ্বালিয়ে রাখে, পরের দিন সূর্য্যোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত। আর সেদিন যে-যার সামর্থ্য ও রুচি অনুযায়ী বহুসংখ্যক প্রদীপ জ্বালিয়ে ঘরের শোভা বাড়ায়। বড় দেওয়ালীর গভীর রাত্রে লক্ষ্মীপূজা হয়, লক্ষ্মীর সামনে এক'শ এক টাকা থেকে শুরু করে যে যত পারে হাজার রূপোর টাকা স্তূপাকৃতি করে রাখে, তাতে হলুদ ও সিন্দুর লাগায়। যাদের এত রূপোর টাকা নেই তারা পরিবারের নারীদের রূপোর অলঙ্কার যথা গলার হাঁসুলী হার, হাতের কঙ্কন ইত্যাদি রেখে ষোড়শোপচারে লক্ষ্মীপূজা করে।

তৃতীয় দিনে গোবর্দ্ধনপূজা হয়। সকালবেলা পুরুষ-লোকেরা গোবর দিয়ে বড় করে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি বানায়। এই পূজা পাড়ায় পাড়ায় দলবদ্ধ হয়ে একত্রে করে। গোবর মূর্ত্তির পাশে মাখন তোলবার মুটনি, চাল কোটার মুষল ও গরু তাড়াবার একটি লাঠি রাখে। সন্ধ্যার অন্ধকার গভীর হলে রাত্রে নয়-দশটার সময় পুরুষলোকেরা গোবর্দ্ধনপূজা করে। রুটিতে ঘি ও চিনি মেখে মুঠি বানিয়ে মূর্ত্তির মুখের উপর রাখে, পাশে মাটির ভাড়ে পানীয় জল দেয়, আর এক পাশে ঘি-এর প্রদীপ জ্বালায়। যথারীতি পূজা শেষ করে পুরুষরা সবাই মিলে স্ফূর্ত্তি করে নাচ-গান করে, গানের নাম হ'ল হিরো।

হিরোরে রে হিরো, অম্বরমে এক ঝোঝরি
জঙ্গলমে এক ঝোঝরি, জিসমে ত ইস পঁচাশ
টিকেওয়ালী ছাটলেও, জিসকা দুধ মিঠাস।

হিরোরে হিরো, আকাশে এক ঘাসের ঝোপ, জঙ্গলেও এক ঘাসের ঝোপ, তাতে পঞ্চাশ মোষ আছে। তা থেকে এক মোষ বেছে নাও, যার কপালে সাদা চাঁদের টিকা আছে, আর তারই দুধ মিঠে হয়।

এভাবে বহুধরনের হাস্যরসযুক্ত নৃত্যগীত করে সারারাত তারা আমোদ-আহ্লাদ করে। ভোরে নারীরা গোবর্দ্ধন মূর্ত্তি ভেঙে গোবর দিয়ে ঘুটে তৈরী করে এবং যারা যারা একত্র হয়ে পূজা করেছিল, তাদের প্রত্যেকের বাড়ীতে একটি একটি ঘুটে দিয়ে আসে। তার পর ভাইদোজ উৎসব করে দেওয়ালী পর্ব্ব সমাপ্ত করে।

দেওয়ালীর অমাবস্যা রাতে লক্ষ্মীপূজার পূর্ব্বে রাত বারোটাতে তারা নিজ নিজ শিশুসন্তানের মঙ্গলার্থে কিছু কিছু তুকতাক করে। একটা মৃৎ পাত্রে ফুল, সাতরকমের মিঠাই, পুরী, ক্ষীর, হালুয়া বা যা ঘরে তৈরী হয় তা সাজিয়ে নিয়ে চৌরাস্তায় রেখে আসে, পাশে একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে, পরদিন ভোরে হয় সে নৈবেদ্য কালো কুকুরে খায়, নয়ত ঝাড়ুদার নিয়ে যায়। এই প্রকরণের নাম 'সৈনিক'।

সুদূর নেপালেও দেওয়ালী এবং লক্ষ্মীপূজা বিশেষ আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। নেপালীরা পাঁচ দিন ধরে এই উৎসব করে ও দেওয়ালীকে পঞ্চক বলে। তবে তাদের পূজায় বৈশিষ্ট্য আছে, তারা জীবজন্তুকেও দেওয়ালী উৎসবে বিশেষ যত্ন ও আদর দেখায়।

প্রথম দিনে তারা গরুপূজা করে। সবৎসা গাভীর কপালে চওড়া করে সিন্দুর লেপে তাতে আবীর-মাখা চাল ও ধান বসিয়ে দেয়। তার পর শাঁখ বাজিয়ে মন্ত্রপাঠ করে যথাবিহিত পূজা করে, খুব ভাল করে খাওয়ায়। সন্ধ্যায় ঠোঙাতে প্রদীপ জ্বালিয়ে তাদের পবিত্র নদী বাগমতী নদী বা তার শাখা বিষ্ণুমতী নদীতে ভাসিয়ে দেয়। সারি সারি প্রদীপ আলোশিখা নিয়ে ভাসতে ভাসতে চলে, যে পর্য্যন্ত-না ঢেউ-এর দোলায় জলের নীচে তলিয়ে যায়।

দ্বিতীয় দিনে তারা কাক ভোজন করায়। বাড়ীর গৃহিণীরা সকালে নানারূপ রান্না করে বাড়ীর সামনে অনেকগুলো গাছের পাতা ছিঁড়ে বিছিয়ে দেয় ও তার উপর সেই পক্কান্ন পরিবেশন করে কাকদের জন্য। এই দিনে তারা কোন উচ্ছিষ্ট কাককে খেতে দেয় না। মহাসমারোহে কাকের দল ভোজনপর্ব্ব সমাধা করে।

তৃতীয় দিন হ'ল আসল দেওয়ালী, সেদিন প্রাতে কুকুরকে সমাদর করা হয়। কুকুরের দেহ নানা রঙবেরঙে চিত্রিত করা

হয়। গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দেয় এবং যত্ন করে ভাল ভাল খাবার খেতে দেয়। সেদিন কুকুরের প্রতি কেউ দুর্ব্যবহার করে না।

দেওয়ালী দিন সারা শহরে আনন্দের বন্যা ছুটে, বিশেষ করে কাটমুণ্ড শহরে। এদিন বিষ্ণু নরকাসুরকে বধ করেন, তাতে লোকের যত দুঃখকষ্ট, অমঙ্গল দূর হয়ে যায়, তাই সবাই আনন্দোৎ-সব করে। রাত্রে অ াকজমকে লক্ষ্মীপূজা হয় এবং বাজী রেখে খুব জুয়াখেলার ধুম পড়ে যায়।

চতুর্থ দিন প্রাতে আবার গরুপূজা হয়। এদিনের উৎসব বিশেষ করে বলিরাজের জন্য। মহারাষ্ট্রে এদিন বলিরাজের পূজা হয়। দৈত্যরাজ বলি অতি পরাক্রমশালী ছিলেন। ইনি দেবতাদের যুদ্ধে পরাজিত করে ত্রিভুবনের অধীশ্বর হন তখন দেবতারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু বামন অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেন। দৈত্যরাজ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলে বামনদেব সেখানে উপস্থিত হয়ে ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেন, অসুররাজ তথাস্তু বলেন। বামন এক পা স্বর্গে আর এক পা মর্ত্তে রাখেন, নাভিনির্গত তৃতীয় পা রাখবার জন্য স্থান চাইতে বলিরাজ নিজের মস্তক অবনত করে দিলেন। তখন বামন বিষ্ণুর তৃতীয় পা বলিরাজের মস্তকে রেখে তাকে পাতালে প্রবেশ করিয়ে দেন। এ ভাবে চাতুরী করে বিষ্ণু বলিকে রাজ্যচ্যুত করলেন। ধার্ম্মিক বলিরাজ বৎসরে অন্তত: একদিনও যেন নিজরাজ্যে ফিরে আসতে পারেন বিষ্ণুর কাছে এই প্রার্থনা করেন ও বিষ্ণু তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ করেন। সেই থেকে প্রতি বৎসর বলিরাজ এইদিনটিতে নিজরাজ্যে ফিরে আসেন এ ধারণায় বশীভূত হয়ে সকলে আনন্দ-উৎসব করে। মহারাষ্ট্রের নারীরা আটা বা গোবর দিয়ে বলিরাজের মূর্তি গড়ে পূজা করে।

নানাস্থানের আদিবাসীরাও দেওয়ালী উৎসব করে। তারা শস্যক্ষেতে, মাঠে ঘাটে প্রদীপ জ্বালিয়ে অপদেবতা তাড়ায়। যারা যাদুকর ও ডাইনী, তারা নানারূপ তুকতাক করে। শ্মশানে ও কবরস্থানে গিয়ে তারা মন্ত্রতন্ত্র করে ভূতপ্রেতকে বশীভূত করে। তাদের দেবতা পূজা করেও নানারূপ নৃত্যগীত করে।

দেওয়ালী উপলক্ষে নানাস্থানে নৃত্যগীত হয়। উত্তর ভারতে আহীর গোয়ালাদের নাচ বড় সুন্দর। তারা পায়ে ঘুঙুর বেঁধে হাতে বাঁশী নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ সাজে এবং অতি সুন্দর নৃত্য করে। রাজ-স্থানে নারীরা নানা রংবেরঙের ঘাঘরা ওড়নায় সুসজ্জিত হয়ে ঝুমুর নৃত্য করে। রাজস্থানী পুরুষ ও নারীদের তরবারি-নৃত্য অতি চমৎকার।

প্রদীপমালায় বাড়ী সাজিয়ে, বাজী পুড়িয়ে নানা নৃত্যগীতির, ও আনন্দ উচ্ছাসের ভিতর দিয়ে লোকেরা দেওয়ালী উৎসব মহা-সমারোহে সম্পন্ন করে। দেওয়ালীর পর দ্বিতীয়াতে ভাইফোঁটা বা ভাইদোজ উৎসব হয়। বোনেরা ভাইদের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে দীর্ঘ-জীবন কামনা করে, নববস্ত্র উপহার দেয় সুখাদ্য খাওয়ায়, একটি অতি সুন্দর মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে হিন্দুদের সার্ব্বজনীন শরৎকালের অনুষ্ঠান শেষ হয়।

আধুনিক বাংলার মনোজগৎ

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে বাঙালীর আত্মবিস্মৃতি অনেক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার ফল অনিবার্য্যরূপে দেখা দিয়াছে অশনে, বসনে, সমাজে, ব্যবহারে—সর্ব্বত্রই। অন্ধ প্রগতি-সুন্দরী আজ এ জাতির চালক। তাহার সঙ্গে সে কোন নিরুদ্দেশ-যাত্রা করিয়াছে তাহা বিবেচনা করিবার সময় নাই। পথের ধারে আছে রঙিন ফুলের সমারোহ, তার গন্ধ না থাকুক—আছে মনোহর রঙ। আর আছে রাশি রাশি সরস ফল; তার রূপের বাহার রসের বিকৃতিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

এই ক্রমবর্দ্ধমান আত্মবিস্মৃতির মূল কোথায় তাহার সন্ধান আবশ্যক। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে ইংরেজি শিক্ষার নব-ভাবধারায় প্লাবিত হইয়াছিল। সে ভাবধারায় ভগীরথের দল ছিল মুষ্টিমেয়। তাহাদের ছিল সংস্কার-বর্জ্জনের সাধনা। অন্ধতমসা পার হইয়া নূতন আলোকের সন্ধান করাই ছিল তাঁহাদের লক্ষ্য। মুষ্টিমেয় ভগীরথের দল সে সাধনায় সিদ্ধিলাভও করিয়াছিলেন। এই নূতন আলোকের কূলপ্লাবনে তাঁহাদের আত্মবিস্মৃতি ঘটে নাই; কারণ সে বিস্মৃতি ঘটিয়াছিল তাহার বহু পূর্ব্বেই। এ প্লাবন যখন আসে তখন না ছিল তাঁহাদের জ্ঞানের তপস্যা, না ছিল তাঁহাদের আত্মবল। কাজেই এ নব-ভাবধারাকে প্রথমেই তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন নির্ব্বিবাদে, নির্ব্বিচারে। ক্রমে বিচারের সময় আসিল, বিশেষ করিয়া ধর্ম্ম ও নীতির জগতে। সে বিচার, বিতর্কে তাহাদের লুপ্ত আত্মবোধ ফিরিয়া আসিল অনেকাংশে। পাশ্চাত্ত্যের নূতন আলোকেই সে বিচার, বিশ্লেষণ চলিল। কিন্তু সে তরঙ্গের আঘাত, সে নব অনুভূতি সীমাবদ্ধ রহিল সমাজের শুধু একটি মাত্র প্রগতিশীল স্তরে। দেশের জনসাধারণের কাছে সে আলোক সূর্য্যালোক হইয়াই রহিল, উহাকে গৃহ-প্রদীপের কাজে লাগানো গেল না।

ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারায় তখন সমগ্র ইউরোপ আত্মসচেতন। দিকে দিকে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার জয়গান। ইংরেজি শিক্ষার স্রোতে পশ্চিম হইতে যে সকল সামগ্রী ভাসিয়া আসিল তাহার মধ্যে এই সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার জয়গান অন্যতম। এ জয়গান দেশের চারিদিকে ঘোষিত হইল। সারা শিক্ষিত সমাজ এ গানের ভাবে ও ভাষায় মুগ্ধ হইয়া ইহার তালে তালে পা ফেলিয়া চলিল।

ভাবরূপের সাধনা বাঙালীর চিরকালের। কারণ যাহাই হউক, ইহা তাহার কুলগত আচার। সে সাধনায় প্রথম ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালী নিজের দেশকে ইংলণ্ডেরই একটি ছোটখাট সংস্করণে পরিবর্ত্তিত করিতে বাসনা করিল। সমাজে ও রাষ্ট্রে পাশ্চাত্ত্য রূপের হইল সূত্রপাত। এ ভাবধারায় স্নান করিতে গিয়া কেহ কেহ অগাধ জলে পড়িয়া তলাইয়া গেল। কিন্তু বেশীর ভাগই যে ভেলা ধরিয়া রক্ষা পাইল তাহার কাঠামো সৃষ্টি করিয়াছিলেন রাজা রামমোহন রায়। সে অন্য কথা।

সমাজ তখন পল্লী-কেন্দ্রিক। একদিকে গুরু-পুরোহিত-তন্ত্রের তামসিকতা অন্যদিকে বিচারহীন আচারের মায়াজাল। কিন্তু মৈত্রী তখনও বাংলাদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হয় নাই। অপরের জন্য দুঃখ-বরণ করিবার শক্তি তখনও নিঃশেষিত হইয়া যায় নাই; আর হয় নাই পরের দুঃখে অশ্রুপাতের অভাব। দারিদ্র্য, দুঃখ, বিদ্বেষ সত্ত্বেও অল্পমাত্র মৈত্রীর সহযোগে পল্লী-জীবনে মোটামুটি সাম্যেরও অভাব ছিল না। কাজেই এই ভাবকোলাহলের মধ্যে যে ধ্বনি প্রখর হইয়া উঠিল তাহা স্বাধীনতার।

ক্রমে সে ধ্বনি কোলাহলে পরিণত হইল। হইবার কারণও ছিল। শিক্ষার সঙ্গে জাগ্রত হইল আত্মবোধ। সে আত্মবোধের সঙ্গে সংঘাত লাগিল বিজয়ী বিদেশীর ঔদ্ধত্যের। রাষ্ট্রের বেদীতে স্বাধীনতা দেবীর প্রতিষ্ঠা হইল। দেশের সাহিত্য ও কলাশিল্প সে দেবীর মন্দিরে শঙ্খঘণ্টাধ্বনি করিয়া তাহার বোধন আরম্ভ করিল। বঙ্কিমচন্দ্র দেশমাতৃকার যে কল্যাণময়ী মূর্ত্তি কল্পনা করিলেন তাহাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলেন রবীন্দ্রনাথ। বাংলার জল, বাংলার মাটি পুণ্য ধন্য হইয়া গেল।

কিন্তু ভাবরূপের পূজারী বাংলা শুধু পূজা করিয়াই ক্ষান্ত হইল না। সে বিপ্লবের স্বপ্নও দেখিল। সে স্বপ্নকে সার্থক করিতে গিয়া সঞ্জীবিত হইল তার ক্ষাত্রতেজ। বাংলার যুবক সে তেজ-প্রভায় লাভ করিল অফুরন্ত বীর্য্য ও তিতিক্ষা। দেশ প্রস্তুত ছিল না। তাই বিপ্লবের ধারা একটি মাত্র সূক্ষ্ম খাত ধরিয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু বিপ্লবী বাংলার যুবকের দল যে আদর্শ স্থাপন করিল তাহাতে অন্যান্য প্রদেশ আকৃষ্ট না হইয়া পারিল না। মহৎ কাজের জন্য দুঃখবরণ দেশের পক্ষে সহজ হইয়া আসিল।

তাহার পর আসিল দেশের স্বাধীনতা। আদর্শবাদী বাংলার কল্পনায় সে স্বাধীনতার হয়ত পুরোপুরি মূল্য দেওয়া হইল না। কিন্তু রাষ্ট্রের এই বন্ধন-মুক্তিকে ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহাকে স্বীকার করিতেই হইল। কিন্তু এ স্বাধীনতার আস্বাদে প্রাণ-মন ভরিয়া উঠিল না। কল্পনায় স্বাধীনতার যে কল্যাণময়ী রূপ সৃষ্টি করা হইয়াছিল, বাস্তবের সঙ্গে তাহার মিল রহিল কই? যে জলধারা তাহার কূলপ্লাবনে সারা দেশ প্লাবিত করিয়া যাইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল সে যেন শীতের মরা নদীর মত শীর্ণ-

অত্যাশ্চর্য্য কাপড় কাচার পাউডার



মূল্যঃ
বড় সাইজ ২ টাকা ১৯ ন.প.
সাধারণ সাইজ ১ টাকা ১২ ন.প.
(স্থানীয় কর ছাড়া)

নীল সার্ফ

অপূর্ব সাদা করে জামাকাপড় কাচে

অত্যাশ্চর্য্য কাপড় কাচা পাউডার সার্ফে কাচা জামাকাপড়ের অপূর্ব শুভ্রতা দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। এক প্যাকেট ব্যবহার করলে আপনাকে মানতেই হবে যে…

আপনি কখনও কাচেননি জামাকাপড় এত ঝকঝকে সাদা, এত সুন্দর উজ্জ্বল করে! সার্ট, চাদর, শাড়ী, তোয়ালে—সবকিছু কাচার জন্যেই এটি আদর্শ!

আপনি কখনও দেখেননি এত ফেণা—ঠাণ্ডা বা গরম জলে, ফেণার পক্ষে প্রতিকূল জলে, সঙ্গে সঙ্গে আপনি পাবেন ফেণার এক সমুদ্র!

আপনি কখনও জানতেন না যে এত সহজে কাপড় কাচা যায়। বেশী পরিশ্রম নেই এতে! সার্ফে জামাকাপড় কাচা মানেই মানে ৩টি সহজ প্রক্রিয়াঃ ভেজানো, চেপা এবং ধোওয়া মানেই আপনার জামাকাপড় কাচা হয়ে গেল।

আপনি কখনও পাননি আপনার পয়সার মূল্য এত চমৎ-কারভাবে ফিরে। একবার সার্ফ ব্যবহার করলেই আপনি এ কথা মেনে নেবেন! সার্ফ সব জামাকাপড় কাচার পক্ষেই আদর্শ।

সার্ফে জামাকাপড় অপূর্ব সাদা করে কাচা যায়!

আপনি নিজেই পরখ করে দেখুন

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তুত

SU. 28-X52 BG

ধারায় বহিতে লাগিল। দুঃখীর দুঃখমোচন হইল কই? অন্নাভাব, অশিক্ষা ও অন্ধসংস্কার হইতে মুক্তি পাইবার উপায় হইল কই?

জোয়ারের জলপ্লাবনে দেশের খাল, নালা, ডোবা ভরিয়া একাকার হইয়া যাইবার কথা, তাহা হইল না। স্বাধীনতার সঙ্গে সাম্য আসিল না। বরং যাহাদের সঙ্গে প্রভেদ কম ছিল তাহাদের সঙ্গে প্রভেদ যেন বাড়িয়া গেল। দেশবিভাগের ফলে খানা, নালা ডোবার সংখ্যা হইল অগণিত। তাহাতে কর্দম জমিল প্রচুর; দুর্গন্ধ বিষ-বাষ্পে চারিদিক ভরিয়া গেল। স্বাধীনতার পরে সাম্যের দাবী প্রখর হইয়া উঠিল। সে সাম্যের সঙ্গে মৈত্রীর বন্ধন নাই। সে সাম্য আদর্শবাদীর সাম্য নহে; তাহার জন্ম আত্মপরায়ণতার মধ্যে। ভাবপ্রবণ বাংলা আজ সেই মৈত্রী-হীন সাম্যকে পূজার বেদীতে বসাইয়াছে। জড়বাদের মধ্যে আদর্শবাদের মূর্ত্তি খুঁজিয়া ফিরিতেছে।

পাশ্চাত্যের 'সাম্য ও স্বাধীনতা'বাদের সঙ্গে সেখানকার প্রতিটি মানুষের দাবী অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ব্যক্তি-স্বাধীনতা তাহার মর্ম্মবাণী। আত্মপরায়ণতা তাহার মূলমন্ত্র। প্রতিটি মানুষ তার নিজের জন্য সুখ আহরণ করিবে। প্রতিটি মানুষের জীবন তার নিজের; সে যে ভাবে ইচ্ছা ইহা যাপন করিতে পারে। অশনে, বসনে, ভাবে, ব্যবহারে, শিক্ষায় তার নিজের মতে চলিবার দাবী অগ্রগণ্য। এ দাবী শুধু মৈত্রী-বন্ধনেই সীমাবদ্ধ হইতে পারে নচেৎ উহাকে রোধ করিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই। আর সীমাবদ্ধ না হইলে এই উৎকট ব্যক্তি-স্বাধীনতার দাবী বর্ব্বরতারই নামান্তর হইয়া দাঁড়াইবে। একথা পাশ্চাত্যের মনীষীগণ বুঝিয়াছিলেন। আর তাহা বুঝিয়াই সাম্যের সঙ্গে মৈত্রীকে এক আসনে বসাইয়াছেন। আর বসাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই। মৈত্রীর-প্রাধান্যে সাম্যকে বশে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্ক অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্যের ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে যে নিছক আত্মপরায়ণতা এদেশে আমদানি হইয়াছে তাহা বাংলার কাছে বড় লোভনীয় হইয়া দেখা দিয়াছে। এ ব্যক্তি-স্বাধীনতারূপ দেবী-পূজায় ঐশ্বর্য্যলাভের সম্ভাবনা প্রচুর। ফলও আশু পাওয়া যায়। আত্মপ্রত্যয়ী পুত্র-কন্যা আজ পিতামাতাকে সাম্য-বন্ধনে বাঁধিতে চায়—মৈত্রী-বন্ধনে নহে। স্বামী-স্ত্রী, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন সকলেই সাম্যবাদী। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এই উৎকট আত্মাভিমান প্রচণ্ডরূপে দেখা দিয়াছে। তুমিও মানুষ, আমিও মানুষ; আমার জীবন আমার, তোমার জীবন তোমার। কে কাহার তোয়াক্কা রাখে? এ চিন্তা সমাজের সর্ব্বস্তরে ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে। ফলে, পরিবারে, সমাজে, জীবনে সর্ব্বত্রই নানারূপ সংঘাত। মৈত্রীহীন সাম্য পিতা-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধবকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে। স্বামী-স্ত্রীর মৈত্রী-বন্ধনও শিথিল। ব্যক্তি-স্বাধীনতার গৌরবে পুত্র পিতার নিকট তাঁহার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দাবী পেশ করিতেছে। পুত্রকে তাহার পিতার প্রতি কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিতে কেহ নাই। এই ব্যক্তিগত জড়বাদ বা দেহাত্মবাদে সারা দেশ ভরপুর।

এই উগ্র ব্যক্তিতাবাদকে বাংলা দেশ আজ ব্যক্তিত্ব-বাদ বলিয়া ভুল করিতেছে। পাশ্চাত্যের সৃষ্টি ব্যক্তিতা-বাদ। উহার উপরেই দেশের সভ্যতা ও সমাজ প্রতিষ্ঠিত। সে সভ্যতার, সে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি প্রাচ্য সভ্যতা, সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এ দেশের পুঁজি ব্যক্তিত্ব-বাদ। এখানে ব্যক্তি সমাজকে, সভ্যতাকে মান্য করিয়া আপন শক্তিতে নব নব ভাব রচনা করে। সমাজকে, সভ্যতাকে সে অতিক্রম করিয়া, পদদলিত করিয়া যাইতে পারে না। এই ব্যক্তিত্ব কর্ত্তব্য ও দাবীর সামঞ্জস্য করিয়া লয়, আত্মাভিমানকে সঙ্কুচিত করিয়া আনে আর মহৎ আদর্শের জন্য স্বার্থকে বলি দিতে দ্বিধা বোধ করে না। ব্যক্তিত্ব আদর্শবাদকে সযত্নে রক্ষা করিয়া চলে, তাহাকে হত্যা করে না।

কিন্তু ব্যক্তিতা-বাদ আত্মপরায়ণতারই নামান্তর। পদে পদে সে মৈত্রীকে আঘাত করে; বন্ধনকে শিথিল করিতে চেষ্টা করে। দেহাতিরিক্ত কোনও কথায় তাহার মন বসে না, জড়জগতের বাহিরে তাহার দৃষ্টি যাইতে পারে না। কোন আদর্শের ধার সে ধারে না। তাই তার আকর্ষণও অতিশয় তীব্র।

আধুনিক বাঙালীর মন আজ এই দুই বিষে জর্জ্জর। একদিকে মৈত্রীহীন সাম্যবাদ অন্যদিকে ব্যক্তিতা-বাদ। নীচু উঁচুর সমান হইতে চাহিতেছে কর্ম্মের দ্বারা নয়, শুধু বাক্যের দ্বারা। দরদের সাম্য তাহার কাম্য নয়; কাম্য সংঘাতের সাম্য। অপর দিকে ব্যক্তিত্বকে ভুলিয়াছে, ব্যক্তিতার মোহে। যতদিন স্বাধীনতার প্রচেষ্টা বাঙালীর চরমাদর্শ ছিল, ততদিন এই সকল ভাবরূপের সাধনায় তার মন বসে নাই। উনবিংশ শতাব্দীর যে মহতাদর্শের প্রেরণা তাহাকে এতদিন চালনা করিয়াছে তাহা কি সহসা অন্তর্হিত হইয়াছে? এই ব্যক্তিতা-বাদের মোহস্পর্শ ত উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিয়াছিল কিন্তু তাহার প্রতিরোধ হইয়াছিল আত্মচেতনার মধ্যে। সে আত্মচেতনার পন্থা ত সেই পুরাতন আদর্শবাদের মধ্যেই নিহিত ছিল। এই দ্বন্দ্ব, এই সংঘাত, এই বিদ্বেষ, এই বিভেদ দূর করিবার জন্য বাঙালীকে আবার আত্মস্থ হইতে হইবে।

ঠাকুরকবি স্মরণে

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আজকের এই দিনটিতে সমুদ্রের এপারে-ওপারে অসংখ্য নরনারী কবিকে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্মরণ করছে। স্মরণ করছে—কারণ তাঁর লেখা পড়ে অনেক মানুষ সংশয়ের অন্ধকারে জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়েছে, কত আশাহত প্রাণ তমসাচ্ছন্ন দিগন্তে নূতন উষার আলো দেখেছে, কত ভাবপ্রবণ তরুণ নির্জ্জনে তাঁর কবিতা উচ্চারণ করে রক্তের মধ্যে অনুভব করেছে নব-জীবনের স্পন্দন, কত শোকার্ত্ত হৃদয় তাঁর অমর সঙ্গীতকলির মধ্যে খুঁজে পেয়েছে আত্মার সান্ত্বনা।

২২শে শ্রাবণ আবার ঘুরে গেল। অনেক বছর আগে শ্রাবণের এই দিনটিতে আমাদের মাঝখান থেকে তিনি বিদায় নিয়েছিলেন। কিন্তু কবি ত চিরকালের। তাঁর ত কখনও মৃত্যু হতে পারে না। আমাদের মনটা যে তাঁরই হাতে গড়া। আর সত্যিকারের বাঁচা ত মন দিয়েই বাঁচা। বৃক্ষ-লতা পশু-পক্ষী—কে বেঁচে নেই? কিন্তু তাদের বাঁচা আর মানুষের বাঁচা—এ দুয়ে আকাশ-পাতাল তফাৎ। মনের জীবনই মানুষকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। জীবজগতে একমাত্র মানুষই জানে, কি করে মন দিয়ে বাঁচতে হয়।

বিংশ শতাব্দীতে তরুণ ভারতবর্ষের মনে যাঁরা নব বসন্তের সবুজ রঙ ধরিয়েছেন, তার চিত্তলোকে এনেছেন লড়াইয়ের ঝোড়ো হাওয়া, তার আত্মাকে করেছেন বিপ্লবমুখী, তার দৃষ্টিভঙ্গিমায় এনেছেন একটা বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন। তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা নিশ্চয়ই অগ্রদূত বলতে পারি। গান্ধীজী যাঁকে গুরুদেব বলে সম্বোধন করতেন তিনি সত্য সত্যই নবীন ভারতের রণগুরু ছিলেন। অন্ধকারের সমস্ত শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে সংগ্রাম করবার প্রেরণা তিনিই আমাদের যুগিয়েছেন। শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে, সমাজের দোহাই দিয়ে, রাষ্ট্রের দোহাই দিয়ে কর্ত্তব্যের মুখোসপরা নানা রকমের অন্যায়ের দোহাই দিয়ে যে অত্যাচার দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসছিল রবীন্দ্র-সাহিত্যে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জয়ধ্বনি।

সমস্ত রকমের নিরর্থক অনুশাসনের বিরুদ্ধে রবীন্দ্র-সাহিত্যে এই যে অভিযানের দৃপ্ত সুর—এই অভিযানের প্রেরণা এসেছে মানুষের প্রতি প্রাণের অপরিমেয় শ্রদ্ধা থেকে। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্যে এমন একটি আবহাওয়ার মধ্যে তিনি মানুষ হয়েছিলেন যা পরিপূর্ণ ছিল উপনিষদের উদার ভাবধারায়। আশৈশব উপনিষদের অমৃত পান করে যাঁর মনের জীবন গড়ে উঠেছিল তাঁর উপলব্ধিতে ঐক্যই যে জীবনের পরম সত্য বলে প্রতিভাত হবে—এতে বিস্মিত হবারকি আছে? বেদান্তে ধ্যানের যে মন্ত্রগুলি রয়েছে তাদের সার্থকতা ত আমাদের মনের ভেদবুদ্ধিকে দূর করায়। যাকে আমরা সাধনা বলি সে হচ্ছে বিশ্বের সকলের সঙ্গে যোগের সাধনা। এই সাধনায় কবি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। আত্মপরিচয়ের শেষের দিকটায় দেখছি এক জায়গায় লেখা রয়েছে: "নানা কাজে আমার দিন কেটেছে, নানা আকর্ষণে আমার মন চারিদিকে ধাবিত হয়েছে। সংসারের নিয়মকে জেনেছি, তাকে মানতেও হয়েছে, মূঢ়ের মত তাকে উচ্ছৃঙ্খল কল্পনায় বিকৃত করে দেখিনি, কিন্তু এই সমস্ত ব্যবহারের মাঝখান দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে 'আমার মন' যুক্ত হয়ে চলে গেছে সেইখানে যেখানে সৃষ্টি গেছে সৃষ্টির অতীতে। এই যোগে সার্থক হয়েছে আমার জীবন।" (আত্মপরিচয় রবীন্দ্রনাথ)

বিশ্বজগতের সঙ্গে যোগই যে ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির মূল সত্য—এই কথাটি উপনিষদের যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত কত সাধক, কত কবি, কত না বিচিত্র ভঙ্গিমায় প্রকাশ করে গেছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যেও ভারতবর্ষীয় আত্মার এই চিরকালের বাণী। 'শিক্ষা'র তপোবন প্রবন্ধে জাতীয় সভ্যতার এ বৈশিষ্ট্যের কথা অনন্যকরণীয় ভাষায় তিনি ব্যক্ত করেছেন:

প্রবলতার মধ্যে সম্পূর্ণতার আদর্শ নেই। সমগ্রের সামঞ্জস্য নষ্ট করে প্রবলতা নিজেকে স্বতন্ত্র করে দেখায় বলেই তাকে বড় মনে হয়, কিন্তু আসলে সে ক্ষুদ্র। ভারতবর্ষ এই প্রবলতাকে চায় নি, সে পরিপূর্ণতাকেই চেয়েছিল। এই পরিপূর্ণতা নিখিলের সঙ্গে যোগে; এই যোগ অহঙ্কারকে দূর করে বিনম্র হয়।"

বিশ্বজাগতিকতার এই পরম সত্যের উপলব্ধি থেকেই কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে:

এস হে আর্য্য, এস অনার্য্য,
হিন্দুমুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ,
এসো এসো খ্রীষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি' মন
ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত, করো অপনীত
সব অপমান ভার।

আজকের এই বাইশে শ্রাবণে কবির মৃত্যুতিথিতে আমাদিগকে হৃদয়ের মধ্যে গেঁথে নিতে হবে সেই মূলকথাটি যা গদ্যে এবং পদ্যে, বিচিত্র রচনার মধ্যে নানা ভঙ্গিতে কবি বার বার আমাদিগকে

শুনিয়ে গেছেন। কি সেই মূলকথা? আবার রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি:

"ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্ম্মে যোগসাধনা। ভারতবর্ষের অন্তরের মধ্যে যে উদার তপস্যা গভীরভাবে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে সেই তপস্যা আজ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ এবং ইংরেজকে আপনার মধ্যে এক করে নেবে বলে প্রতীক্ষা করছে—দাসভাবে নয়, জড়ভাবে নয়, সাত্ত্বিকভাবে, সাধকভাবে।"

জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সমস্ত মানুষের সঙ্গে ঐক্যের এই জীবন্ত অনুভূতি থেকেই রবীন্দ্র-সাহিত্য হয়েছে বিপ্লবধর্ম্মী। প্রতিবেশীকে যেখানে আমরা আত্মবৎ ভালবাসি সেখানে সেই ভালবাসার জীবন্ত অনুভূতি বাক্যের শূন্যগর্ভ উচ্ছ্বাসের মধ্যে কখনও নিঃশেষিত হতে পারে না। সেই প্রেমের অনিবার্য্য প্রকাশ ঘটবে কর্ম্মের মধ্যে। মানুষের সম্মানে হস্তক্ষেপ রবীন্দ্রনাথ তাই কখনও নিঃশব্দে সহ্য করেন নি।

পঞ্জাবে ডায়ারের অমানুষিক নৃশংসতার প্রতিবাদে 'নাইট' উপাধি প্রথম যিনি ত্যাগ করেছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথ। মহাচীনের উপরে জাপানের আক্রমণ নিয়ে জাপানী কবি নোগুচির সঙ্গে তাঁর যে সমস্ত পত্র-বিনিময় ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথের সেই ঐতিহাসিক পত্রগুলির মধ্যে মানবপ্রীতির কি উদার সুর এবং বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে কি তীব্র প্রতিবাদের শঙ্খনাদ। অস্পৃশ্যতার মধ্যে যে অমানুষিক হৃদয়হীনতা রয়েছে—সেই হৃদয়হীনতাকেও কি তিনি ক্ষমা করতে পেরেছিলেন? গান্ধীজী এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই বিশ্বাস করতেন: মানুষের মধ্যে যারা অধর্ম্মের চেয়েও অধম এবং দীনের থেকেও দীন তাদেরও জীবনের এমন একটি মূল্য আছে যার কোন পরিমাণ করা যায় না। বুদ্ধির এবং গায়ের জোরে আত্মকেন্দ্রিক পুরুষ যেখানে নারীকে মানুষের মর্য্যাদা না দিয়ে তাকে খেলাঘরের পুতুল বানাবার চেষ্টা করেছে সেখানেও সেই বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্র-সাহিত্যে একই প্রতিবাদের সুর। নারীর উপরে আজ পর্য্যন্ত যে জুলুম চলে এসেছে সারা পৃথিবী জুড়ে সুদীর্ঘকাল ধরে—রবীন্দ্রনাথের

'হীরপন্থ' গল্পটিতে সেই জুলুমের উপরে কি তীব্র কষাঘাত করা হয়েছে। 'যোগাযোগ' উপন্যাসখানিতে হঠাৎ নবাব মধুসূদন ঘোষাল আপন সহধর্ম্মিণী কুমুদিনীকে নারীর মর্য্যাদা দিতে অস্বীকার করেছে। তার কাছে টাকাই সব—মানুষের জীবনের কোন দাম নেই। নারীর উপরে পুরুষের এই গর্ব্বোদ্ধত অবিচার রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে যে নির্ম্মম আঘাত পেয়েছে—এমন আঘাত এ যুগে আর কোন সাহিত্যিকের কাছ থেকে পেয়েছে বলে আমরা জানিনে।

'রক্তকরবী'তে যক্ষপুরীর রাজা সোনার নেশায় পাগল। মাটির মধ্যে সুড়ঙ্গ কেটে সোনার তালের উপরে তাল জমাতে ব্যস্ত। এ কাজে মানুষের দরকার। রাজা গাঁয়ের মানুষগুলিকে তাই যন্ত্র-হিসাবে ব্যবহার করছে নিজের ঐশ্বর্য্যকে স্তূপাকার করবার জন্যে। দরিদ্রের দারিদ্র্যের উপরে রাজার ঐশ্বর্য্য। সে ঐশ্বর্য্যের মূলে হৃদয়হীন শোষণ অর্থাৎ জঘন্যতম হিংসা। এ শোষণকে রবীন্দ্রনাথ ক্ষমা করেন নি। যক্ষপুরীর নির্জীব শান্তির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মানসকন্যা 'নন্দিনী' বহন করে এনেছে বিপ্লবের ঝড়। সেই ঝড়ের ঝাপটায় যক্ষপুরীর শাসনসৌধ শেষ পর্য্যন্ত ধূলিসাৎ হয়ে গেছে।

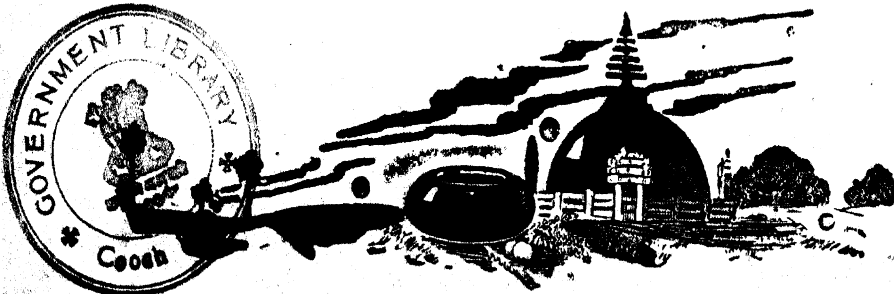
'মুক্তধারা' নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর কণ্ঠে রাজদ্রোহের সুর। বৈরাগী পাড়ায় পাড়ায় উৎপীড়িত প্রজাদের ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছে অত্যাচারী রাজাকে খাজনা না দেবার জন্যে। ইংরেজ-গর্ব্বিত রাজা যন্ত্ররাজ বিভূতিকে দিয়ে মজবুত বাঁধ বেঁধেছিল মুক্তধারার জল থেকে পর-রাজ্যের নিরীহ জনসাধারণকে বঞ্চিত করবার জন্যে যাতে তারা নিরুপায় হয়ে রাজার বশ্যতা স্বীকার করে। এ জুলুমের বিরুদ্ধে যুবরাজ অভিজিৎ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে এবং সেই বাঁধ ভেঙে দিয়েছে নিজেকে বলি দিয়ে।

যে রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের মানুষকে ভালবেসে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন ক্ষমতার সর্ব্ববিধ অপব্যবহারের বিরুদ্ধে, যে রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়ে দেশে দেশে উৎপীড়িত মানুষ শিকল ভাঙার প্রেরণা পেয়েছে এবং অত্যাচারীরা শিউরে উঠেছে আতঙ্কে, সেই রবীন্দ্রনাথকে আজ আমরা বিশেষ করে স্মরণ করব। অনেক সংগ্রামের ভিতর দিয়ে গিয়ে তবে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। এ স্বাধীনতা অটুট থাকবে যদি আমাদের নিজেদের মধ্যে মৈত্রীভাব অম্লান থাকে। কারণ পরস্পরকে ভালবাসে যারা তারা পৃথিবীতে নিশ্চয়ই থাকবে অপরাজেয়। যেখানে একের জন্যে হাজার জন হাসিমুখে আত্মবলি দিতে প্রস্তুত সেখানে কি কোন বিপদ ঘটতে পারে?

সব বড় সাহিত্যেরই একটি কাজ হচ্ছে: সমস্ত মানুষই যে মূলতঃ এক—এই পরম সত্যকে প্রকাশ করা। রবীন্দ্র-সাহিত্য নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠ করলে আমাদের হৃদয় থেকে ভেদবুদ্ধি দূর হয়ে যাবে, আমাদের প্রাণ সম্প্রসারিত হবে, যে মানুষের সঙ্গে আমাদের আচারগত, ধর্ম্মগত, জাতিগত, বর্ণগত প্রভেদ আছে তার সঙ্গেও একটা মৌলিক আত্মীয়তা আমরা অনুভব করতে পারব।

আজকের এই বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে 'টেক্‌নলজি'র দৌলতে ভৌগোলিক দূরত্ব যখন অতিক্রান্ত অপস্রিয়মান, মানুষ যখন মানুষের অত্যন্ত কাছাকাছি এসে পড়েছে তখন একটা কথা বিশেষ করে ভাববার দিন এসেছে। কথাটা হচ্ছে: যন্ত্রশক্তিকে আশ্রয় করে এই যে বিভিন্ন দেশের মানুষের পরস্পরের অত্যন্ত কাছাকাছি আসা—এ নৈকট্য ত নিতান্তই দৈহিক নৈকট্য। শরীর শরীরের নিকটে এল কিন্তু মনের সঙ্গে মনের কোন ঘনিষ্ঠতা হ'ল না, পরস্পরের মধ্যে ভাবের কোন বিনিময় ঘটল না—এমন একটা অবস্থাকে আমরা কখনোই সন্তোষজনক বলতে পারি নে। তাই 'টেক্‌নলজি' যে জাগতিক পরিস্থিতি আজ ঘটিয়েছে তার মধ্যে কল্যাণের আলো আনতে হলে কবিকে চাই যাঁর লেখনীর মুখে থাকে স্বর্গের আগুন—যে আগুনের আভায় মানুষ মানুষকে চিনতে পারে আত্মীয় বলে, ভাই বলে, একই সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার বলে। রবীন্দ্রনাথ সেই অমর কবি যাঁর বাঁশীতে বেজে উঠেছে, 'নমি নরদেবতারে।' জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল দেশের সকল কালের মানুষকে তিনি দেবতার সম্মান দিয়েছেন। এইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য।*

* অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সৌজন্যে।

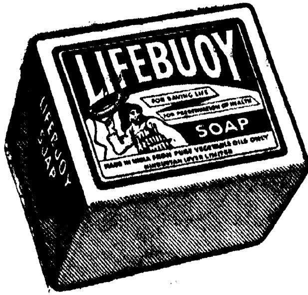


যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সবসময় লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করেন।

খেলাধুলোই বলুন বা কাজকর্ম্মই বলুন আমরা কখনই ধুলোময়লার থেকে নিরাপদ নয়। আর ময়লা বহন করে রোগের বীজানু যা সবসময় আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতি-কর। লাইফবয় সাবান এই বীজানুগুলি ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।

প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন— এটি আপনাকে এত ঝরঝরে করে তোলে।







হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তুত।

L/P. 2-X52 BG

পুস্তক-পরিচয়

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রশ্ন ও উত্তর—পাবলিকেশন্‌স ডিভিশন, গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ৪০ নয়া পয়সা, পৃষ্ঠা ১১৪।

প্রশ্নোত্তরে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও ফলাফল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আজকাল বিষয়টি পাঠ্যবস্তুর অন্তর্গত হইয়াছে সুতরাং শিক্ষার্থীরও ইহা না জানিলে চলে না। সাধারণ লোকেরও পরিকল্পনার কার্য্যাদি প্রতিদিনই চোখে পড়ে। সুতরাং এই বিষয়ে দেশের লোক যতটা ওয়াকিবহাল হয় ততটাই মঙ্গল। শেষ পর্য্যন্ত গণসাহায্য ব্যতীত পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ সফলতা কিছুতেই সম্ভব নহে—বিশেষতঃ গণতন্ত্রী ভারতে। প্রাদেশিক ভাষায় এরূপ প্রচার-গ্রন্থের খুবই প্রয়োজন। ইহার বিপুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

হিন্দুধর্ম্ম প্রবেশিকা—স্বামী বিষ্ণুশিবানন্দগিরি। সত্যাশ্রম, হাজারিবাগ থেকে প্রকাশিত। মূল্য চার টাকা, পঞ্চাশ নয়া পয়সা। পৃষ্ঠা ৪৫১।

ভারতবর্ষের কৃষ্টিগত পটভূমিকায় গ্রন্থকার হিন্দুধর্ম্মের মনোজ্ঞ-আলোচনা করেছেন। ধর্ম্মই যে বিশ্বসংসারকে ধারণ করে আছে, ধর্ম্মো ধরাধারক, শ্রুতির এই গভীর জ্ঞানগর্ভ বাণীটি গ্রন্থকার আশ্রয় করেছেন। ধর্ম্মের এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থটি গ্রহণ করলে ধর্ম্মগত আলোচনা মানুষের নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং কৃষ্টিগত জীবনের সকল বিষয়ের সম্যক আলোচনার সমর্থক হয়ে পড়ে। তাই আলোচ্য গ্রন্থখানির সুবৃহৎ কলেবরে গ্রন্থকার হিন্দুর আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক জীবনের উৎকর্ষের এবং আদর্শের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ধর্ম্মের সারতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে গ্রন্থকার হিন্দুধর্ম্মের উৎপত্তি-বিষয়ক আলোচনায় বললেন যে, সকল ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা আছে। হিন্দুধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা নেই : এই ধর্ম্মের উৎপত্তিকাল অনির্দ্দিষ্ট। তাই এই ধর্ম্মকে সনাতন ধর্ম্ম বা বৈদিক ধর্ম্ম বলা হয়। এই ধর্ম্মের দু'টি দিক—তত্ত্ব এবং সাধনা। এই তত্ত্বের সুবিস্তৃত আলোচনা করতে গিয়ে গ্রন্থকার হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থসমূহের সরল এবং প্রাঞ্জল আলোচনা করেছেন। বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, আগম, ষড়্‌দর্শন ও স্মৃতি-সংহিতার তত্ত্বকথা আলোচিত হয়েছে। সাধনা পর্য্যায়ের আলোচনায় নানাবিধ যোগপদ্ধতির আলোচনা করা হয়েছে। হঠযোগ, রাজ-যোগ, ভক্তিযোগ এবং কর্ম্মযোগের ব্যাখ্যায় গ্রন্থকার যে মননশক্তি এবং ভাষ্যকরণের শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা সহজলভ্য নয়। এ ছাড়া বৈদিক কর্ম্ম, স্মার্ত্তকর্ম্ম, পৌরাণিক কর্ম্ম ও তান্ত্রিক কর্ম্মেরও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। হিন্দু-সমাজে যে বিভিন্ন উপাসনা-পদ্ধতি ধীরে ধীরে আপনার মূল সমাজের গভীরে অনুপ্রবেশ করিয়ে দিল তার আলোচনাও গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। বৈদিক উপাসনা, পৌরাণিক উপাসনা এবং তান্ত্রিক উপাসনার মর্ম্মকথা গ্রন্থকার সহজ-বোধ্য ভাষায় পরিবেশন করেছেন। গ্রন্থের প্রথম নয়টি অধ্যায়ে গ্রন্থকার হিন্দুধর্ম্ম ও শাস্ত্রবিধির বিভিন্ন তথ্য এবং তত্ত্বাদির পর্য্যালোচনা করে দশম অধ্যায়ে হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। এই আলোচনায় আমরা তুলনা-মূলক ধর্ম্মালোচনার সূত্র আবিষ্কারে সফল হই। গ্রন্থকারের আলোচনা এক দিকে যেমন তথ্যানুগ অন্য দিকে তেমনি সহজ ও প্রাঞ্জল। আমরা গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

স্বর্গ—শ্রীসুবোধ বসু। জিজ্ঞাসা, ১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা—২৯। মূল্য দুই টাকা।

আকারে ছোট বলিয়া নয়, 'স্বর্গ'কে একখানি উপন্যাস না বলিয়া বড় গল্প বলাই ভাল। স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনের মধ্য দিয়া লেখক একটি সরস গল্প বলিয়া গিয়াছেন। স্ত্রী চামেলী কৌতুকময়ী। স্বামীকে রাগাইয়া খুনসুটি করিয়া সদা-চঞ্চলা চামেলী তাহার ঐ ছোট্ট সংসারটিতে স্বর্গ রচনা করিয়াছে। এই স্বর্গই মানুষ কামনা করে, কিন্তু কোথায় সেখানে চামেলী! চামেলীর মত স্ত্রী ত সকলের ভাগ্যে জোটে না। স্ত্রী-ভাগ্যে সকলেই কুলীন। মানুষের এই যে আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে তোলা, ইহাও লেখকের বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়। লেখক আর একটি গুণে পাঠক মনকে আকৃষ্ট করিয়াছেন, সেটি হইল তাঁহার সরস 'ডায়ালগ'।

কিন্তু একটানা মিলনের আনন্দে প্রেম পূর্ণ হয় না। সেখানে প্রয়োজন হয় বিরহের। অর্থাৎ বিচ্ছেদ ছাড়া মিলন সম্পূর্ণ নয়। সেই কারণেই গ্রন্থকার তাঁহার গল্পটিকে দুটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন। একটি মিলনে সম্পূর্ণ, একটি বিচ্ছেদে। গ্রন্থকারকে এই জন্য এখানে অতি কঠোর হইতে হইয়াছে। নির্ম্মমভাবে চামেলীকে প্রশান্তর বুক হইতে ছিনাইয়া লইয়াছেন। সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে পাঠকের প্রতি গ্রন্থকার অবিচার করিয়াছেন। কিন্তু ইহা না করিলে প্রেম পূর্ণতা লাভ করিত না। শ্রীকৃষ্ণ-রাধাকেও এই বিচ্ছেদ সহ্য করিতে হইয়াছে, রামের বিরহ ত আজীবন। প্রশান্তও এই কারণে জীবনে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

গল্পের বিষয়বস্তু বিশেষ-কিছু নাই। কথার যাদুতে তিনি পাঠককে টানিয়া লইয়া গিয়াছেন। পড়িতে ভাল লাগে, পড়িতে বসিলে আর উঠা যায় না—আলোচনাক্ষেত্রে এই ত বড় কথা। বইখানি সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছে সমাদর লাভ করিবে বলিয়াই বিশ্বাস।

শ্রীগৌতম সেন

দেশ-বিদেশের কথা

ঝাড়গ্রাম 'পল্লী-চিকিৎসা সম্মেলন'

বিগত ২রা আগষ্ট মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামের সেবায়তন আশ্রম ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের পশ্চিমবঙ্গ শাখার উদ্যোগে সহরে দেবেন্দ্রমোহন মেমোরিয়াল হলে চিকিৎসক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন মেজর কে, কে, ঘোষ, প্রধান অতিথি হন আশ্রমের আচার্য্য স্বামী সত্যানন্দ গিরি। স্বামিজী সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া প্রার্থনা করেন। এসোসিয়েশনের ঝাড়গ্রাম শাখার সম্পাদক ডাঃ কানাইলাল দে বহিরাগত অতিথিবৃন্দকে পরিচিত করাইয়া দেন। ডাঃ এম, এন, হালদার সকলকে স্বাগত জানান। প্রদেশ শাখা-সম্পাদক ডাঃ সৌরেন সেনগুপ্ত এ অঞ্চলের জন-স্বাস্থ্য অবনতির কারণ, স্কুলের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য উন্নয়নের উপায় প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করেন। জনসাধারণের সঙ্গে চিকিৎসাবিদদের সহযোগিতার জন্যও তিনি আবেদন জানান। স্থানীয় বহু প্রতিপত্তিশালী ও গণ্যমান্যব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

তাঁহারা সর্ব্বপ্রকারে এসোসিয়েশনের সঙ্গে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন। সভায় 'অঞ্চলপ্রধান' ডাঃ সুধীরকুমার মণ্ডল বিদ্যালয়গামী ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের স্বাস্থ্যোন্নয়ন সংস্থা গঠনের প্রস্তুতির জন্য কমিটির পক্ষে আহ্বায়ক নির্ব্বাচিত হন।

মধ্যাহ্ন ১টায় সেবায়তন আশ্রমে অতিথিবৃন্দের মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা হয়। অপরাহ্ণের প্রকাশ্য অধিবেশনে মেজর কে, কে, ঘোষ পৌরোহিত্য করেন। প্রধান অতিথি স্বামী সত্যানন্দ গিরি সকলকে স্বাগত জানাইয়া তাঁহাদের পুণ্যবৃত্তির উল্লেখ করেন এবং দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া দেশ সেবার আহ্বান জানান। ডাঃ কানাইলাল দে সম্পাদকীয় রিপোর্টে পল্লীর চিকিৎসার অর্থ নৈতিক ও সামাজিক সুবিধা-অসুবিধাগুলির উল্লেখ করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগ-সম্পর্কিত তিনি সমালোচনা করেন। ডাঃ সতীশ দাশগুপ্ত কুষ্ঠব্যাধির পরিসংখ্যান উল্লেখসহ আলোচনায় প্রবৃত্ত হন।

বিজ্ঞান বিষয়ক সভায় উদ্বোধন করেন ডাঃ টি, মজুমদার। তিনি 'নিউরাল টাইপ লিপরোজি' সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। অন্যান্য আলোচ্যবিষয় ছিল, ডাঃ এস, সুর রায়ের "একলাম্পসিয়া" ডাঃ এস, কে, রায়ের "ইনফ্যানটাইল সিরোসিস অব লিভার" এবং ডাঃ এন, ব্যানার্জ্জীর "ক্রনিক অটোরিয়া"। সভাপতি মহাশয় একটি সময়োপযোগী ভাষণ দেন।

ঐদিন সেবায়তন পল্লী ডাঃ ডি, পাল মহাশয়ের গৃহে "ডাঃ কে, ডি পাল মেমোরিয়াল রুরাল মেডিক্যাল লাইব্রেরী"র উদ্বোধন করেন। মেজর কে, কে, ঘোষ। ডাঃ ডি, পালের দাদামহাশয় কে, ডি, পালের নামে তাহার নিজস্ব গ্রন্থাগারটি উৎসর্গ করিয়াছেন। স্বামী সত্যানন্দ গিরি, ডাঃ কানাইলাল দে, ডাঃ এম, এন, হালদার এবং সৌরেন সেনগুপ্ত প্রখ্যাত সিভিল সার্জ্জন কে, ডি, পালের কীর্ত্তিকাহিনীর কথা উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন। প্রাদেশিক সেক্রেটারী ডাঃ সৌরেন সেনগুপ্ত গ্রন্থাগারটির সর্ব্বপ্রকারে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯।



প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

সাধু

শ্রীঅসিতরঞ্জন বসু



নৃত্য-শিল্পী বৈজয়ন্তীমালা প্যারিসে অনুষ্ঠিত নৃত্য-প্রদর্শনীতে
আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাইয়াছেন



পরিবহন সমস্যার সমাধান

ফটো : শ্রীঅমল সেনগুপ্ত

:: ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৯শ ভাগ ২য় খণ্ড | অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬ | ২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

প্রশ্ন

লিখিবার সময় খবর প্রকাশিত হইল যে, লাদকে চীনারা দশজন বন্দী ভারতীয় পুলিস এবং চীনাদের আক্রমণে নিহত নয় জন পুলিসের মৃতদেহ "হটস্প্রিং" নামক স্থানে ভারতীয় সীমান্ত পুলিসের এক দলের হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়াছে।

আরও খবর পাওয়া গেল যে, "ভারতীয়" কম্যুনিষ্ট পার্টি গোপনে বহু তর্কবিতর্ক ও সলা-পরামর্শ করিবার পরে, মীরাটে তাহাদের "জাতীয়' পরিষদের সম্মেলনে, এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে এবং সেই প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। প্রস্তাবে ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত রেখা রূপে মাকমোহন লাইনকে স্বীকার করা হইয়াছে। পশ্চিম সীমান্তের ব্যাপারে বলা হইয়াছে যে, ঐ অঞ্চলের "চিরাগত সীমারেখাকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে" ভারত সরকারের এই নীতি সমর্থন বিধেয়। বলা বাহুল্য চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাইয়ের ভূয়সী স্তুতিবাদ ও প্রশংসা করা হইয়াছে এবং চীনকে কোথায়ও আক্রমণকারী বা অন্য কোন হিসাবে অভিযুক্ত করা হয় নাই। পণ্ডিত নেহরুর এই সঙ্কটকালীন অবস্থায় যে "জোটভুক্ত" না হওয়ার নীতি দৃঢ়ভাবে অবলম্বন এবং যুদ্ধের উন্মাদনার বিরুদ্ধে সংগ্রামেরও প্রশংসা করা হইয়াছে।

সেই সঙ্গে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই পণ্ডিত নেহরুকে তাঁহার জন্মদিনে যে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহারও বিবরণ পাওয়া গেল। তাহাতে শুভেচ্ছার মধ্যে আছে "আপনি পূর্ণ উদ্যমে ও সুগভীর প্রজ্ঞায় ভারতের স্বাধীনতা, সমৃদ্ধি ও শক্তি এবং চীন ও ভারতের মধ্যে মৈত্রী এবং এশিয়া ও বিশ্বের শান্তির প্রচেষ্টায় আরও মূল্যবান সহায়তা করিবেন।"

আমরাও সর্ব্বপ্রথমে পণ্ডিত নেহরুকে তাঁহার সত্তর বৎসর পূরণে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। তার পর প্রশ্ন এই যে এর পর কি?

পুলিস—জীবন্ত ও মৃত—ফিরিয়া পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ যে অপহৃত জমির দরুণ তাহার এক ছটাকও ফিরিয়া পাওয়া যায় নাই। পাওয়া গিয়াছে পণ্ডিত নেহরুর নিষ্ক্রিয়তার অভিনন্দন অপহরণকারীদিগের মুখপাত্রের নিকট হইতে এবং তাহাদের "সমর্থক" অর্থাৎ জয়চাঁদ-উমীচাঁদের ঐতিহ্যবাহী-দিগের—মুখপাত্রগণের নিকট হইতে। তার পর?

স্বাধীনতা, সমৃদ্ধি ও মৈত্রী বলিতে মিঃ চৌ-এন-লাই কি বুঝেন তাহাও জানা দরকার। পিকিং হইতে সম্প্রতি প্রত্যাগত এক ভারতীয়ের বিবৃতিতে শুনিতেছি যে, চীন এখন নেপাল, ভুটান, সিকিম ও দার্জ্জিলিং অঞ্চলকে "লিবারেট"—অর্থাৎ স্বাধীনতা দান করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প। ইতিপূর্ব্বে তিব্বত সম্পর্কে ত শোনাই গিয়াছে যে, তিব্বতের হাঙ্গামা ঐ স্বাধীনতা দানেরই ব্যাপার, তবে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের সন্তানদের কয়জন মরে, বাঁচে, সেটা ভিন্ন প্রশ্ন। শোনা যায়, তিব্বতে স্বাধীনতা-বিরোধী মূর্খের সংখ্যা অত্যধিক এবং তাহাদের "দ্রবীভূত" করায় লোকসংখ্যা কিছু বেশী কমিয়া যাইতেছে। "সমৃদ্ধি" পদার্থটা সব দেশে ও সব ভাষায় একই, তবে সেই সমৃদ্ধি কাহার অধিকারে থাকিবে এই প্রশ্ন। মৈত্রী ও শান্তির পূর্ণরূপ দেখা যায় শ্মশানে ও কবরস্থানে। সুতরাং যে প্রশ্ন সেই প্রশ্নই রহিয়া গেল।

সমগ্র জগতে, সময়ে ও অসময়ে, পাত্রে ও অপাত্রে আমরা অহিংসা, পঞ্চশীল, নিরস্ত্রীকরণ ইত্যাদির গীত গাহিয়া শুনাইয়াছি। জগতে আমাদের সভ্যতার গুণগান প্রথমে আমরাই করিয়াছি এবং যখন বানডুঙে চীনা প্রধানমন্ত্রী আমাদের এই আত্মশ্লাঘায় আরও উস্কানী দিলেন তখন "হিন্দী-চীনী ভাই ভাই" শব্দে আমরা গগন বিদারিত করিয়াছি। আজ সেই 'হিন্দী-চীনা ভাই ভাই" শব্দ শুধু শোনা যায় চীনাদের পঞ্চমবাহিনীর মুখে। এখনও কি সময় হয় নাই আমাদের চোখের ঠুলী খুলিয়া ফেলিবার?

ভারতের প্রায় সহস্র বৎসরের পরাজয়ের ও পরাধীনতার ইতিহাস ত আজিকার এই মূঢ়তা, এই বাস্তবজ্ঞানহীনতারই পূর্ব্ব-কালের ইতিহাস। অহিংসা, বিশ্বপ্রেম, বিশ্বশান্তি এসকল বাণী ত সেই ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বেকারই বিনয়ের অনুশীলন। তাহার ফল দাঁড়াইয়াছিল বহির্জগতের সকল শক্তির, সকল প্রতিরক্ষার উপায় সম্পর্কে ঔদাসীন্য। আমরা তখনও কোন "শক্তিজোটে"র অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। ফলে, বাহিরের শত্রু ঘরের শত্রুর সঙ্গে নির্ব্বিবাদে ষড়যন্ত্র করিয়া আমাদের পরাজিত করে। তখন বাহিরের শত্রুর প্রধান সহায়ক ছিল আমাদের ভিতরের বিশ্বাসঘাতকের দল এবং এই ইতিহাসের ধারা ত ১৯৪২ সনের স্বাধীনতা-সংগ্রামেও সুস্পষ্টভাবে দেখা দিয়াছিল। তবে আজ কি সময় হয় নাই চৈতন্ত উদয়ের ?

পঞ্চশীলের কোন্‌টি আজ অটুট রাখিয়াছেন আমাদের প্রতিবেশী ? পরস্পরের ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রিক অধিকারকে ব্যবহারিক স্বীকৃতি দেওয়া, আক্রমণাত্মক যুদ্ধবিরতি, পরস্পরের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকা, সহযোগিতা এবং শান্তির সহিত জগতে বসবাস, এই ত পঞ্চশীলের নীতিপঞ্চক। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই নীতিই আমরা জগতে প্রচার করিয়াছিলাম সকল যুদ্ধের সকল বিরোধের অব্যর্থ মহৌষধ রূপে। আজ সে নীতি কোথায় ?

আজ জগতে ধুয়া চলিয়াছে নিরস্ত্রীকরণের। এই মহান্ আদর্শের কথা তুলিয়াছেন সোভিয়েটের কর্ণধার শ্রীক্রুশ্চেভ। তাঁহার এই মহৎ উদ্দেশ্যে সন্দিহান হইবার কোনই কারণ নাই, কেননা তিনি সোজাসুজি বলিয়াছেন যে, আজ যুদ্ধ মানে জগতে শুধু মানবত্বের অবসান নয়, মনুষ্যজাতিরও প্রায় অবসান, কেননা দুই সশস্ত্র জোটের উভয়েরই অধিকারে সমস্ত সভ্যজগত ধ্বংসকারী অস্ত্র রহিয়াছে। সুতরাং যুদ্ধ মানেই দুই পক্ষেরই বিনাশ। ক্রুশ্চেভ একথা স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন এবং একথা যে সত্য সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু নিরস্ত্রীকরণ মানে দুই পক্ষেরই এক-সঙ্গে অস্ত্রত্যাগ। নচেৎ শেষের দিকে যাহার হস্তে ঐ অস্ত্র থাকিবে সে ভুবনবিজয়ী হইবেই। অন্ত পক্ষ নিশ্চিহ্ন হইবার ভয়ে পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হইবে, যেভাবে জাপান পরাজয় স্বীকার করে হিরোশিমা ও নাগাসাকির বিস্ফোরণের পর।

সেই জন্তই আজ হঠাৎ মার্কিনগোষ্ঠীর মনে সন্দেহ জাগিয়াছে চীনের কার্য্যকলাপে। ১লা নবেম্বর 'নিউইয়র্ক টাইমস' সেই জন্ত সম্পাদকীয়তে লিখিয়াছেন :

"এশিয়া ভূমিখণ্ডে কম্যুনিষ্ট নীতি আজ কয়েক মাস যাবৎ এক প্রহেলিকা হইয়া রহিয়াছে। একদিকে প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ মধুর-বাণী শুনাইতেছেন সকল সঙ্কটময় পরিস্থিতির শান্তিময় সমাধানের, অন্তদিকে সেখানকার (এশিয়ার) পরিস্থিতিতে না মাধুর্য্য না আলোক, কিছুই দেখা যায় না।"

"সোভিয়েট স্পষ্ট জানাইয়াছেন যে, লাওসে জাতিসঙ্ঘ কোনও পরিদর্শক নিয়োগ করা তাঁহারা চাহেন না। চীন ও ভারতের মধ্যে মনকষাকষিতে তাঁহারা দুঃখিত একথাও তাঁহারা বলিয়াছেন। ইহাতে মনে হয় কম্যুনিষ্ট 'লেনদেন ও কথাবার্ত্তা' আন্তর্জাতিক নিরীক্ষা সহিতে পারে না। ভারত সম্বন্ধে পিকিংকে যে কোনও সতর্কীকরণ বা সমাধানবাণী মস্কো পাঠাইয়াছেন, তাহারও কোন আভাস এখনও পাওয়া যায় নাই।"

"পিকিন ত কোনও প্রকার ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারের পরিচয় দেয় নাই। যেভাবে ভারতের চিঠির রূঢ় জবাব দেওয়া হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বপরিকল্পিত নিশ্চয়ই। 'আচ্ছা, কয়টা ভারতীয়ের মৃতদেহ আমরা ফেরৎ দিতেছি, তোমরা কয়েক হাজার বর্গমাইল (ভারতীয়) ভূখণ্ড আমাদের ছাড়িয়া দাও' এরূপ পত্রে নয়াদিল্লী পুলকিত না হওয়াই সম্ভব।"

"উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না এই প্রশ্নের, 'কেন ও কি কারণে ?' প্রতিবেশী ভারতীয়দিগকে এই ভাবে উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ করিয়া পিকিনের অধিকারীবর্গেরই বা লাভ কি এবং আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিজমেরই বা কোন কাজ অগ্রসর হয় ? লাল চীনারা কি মনে করে যে, এই ভাবে পণ্ডিত নেহরুকে অপদস্থ ও কোণঠাসা করায় কোনও লাভ আছে ? এ ভাবে এক বিরাট জাতিকে শত্রু করায় কি স্থায়ী লাভ হইতে পারে চীনের ?"

"চীন এখানে শুধু বুদ্ধির অভাব দেখাইতেছে এবং সোভিয়েট সেটায় গুরুত্ব আরোপ করিতে ইচ্ছুক নহে, বর্ত্তমান পরিস্থিতির এই বিচার করা আমাদের পক্ষে নিরাপদ নহে। একদিকে "বন্ধুভাব, মৈত্রী" এই সব কথা বলা হইতেছে, অন্তদিকে কার্য্যতঃ এমন পন্থা লওয়া হইতেছে যাহাতে স্থায়ী বিরোধ ও শত্রুতার বীজ রোপিত হয়। ভারত যদি কোন পক্ষভুক্ত না হইয়া কোনও জোটে না যায়, তবে পিকিঙেরই লাভ। অথচ মাও ও চৌ দুই জনে ভারতকে এমন অবস্থায় ফেলিতেছে যে, তাহাকে আত্মরক্ষার জন্য অন্তের সহিত ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইতে হইবে। এই অবস্থায় ক্রুশ্চেভ হাসিমুখে শান্তির আশা জানাইতেছেন। কোনও মানে হয় না এ সবের।"

বুঝিলাম, "কোনও মানে হয় না", বুঝিলাম না যে শুধু তত্ত্বকথায়, স্তোকবাক্যে এবং শত শত মণ ছাপা "সাদা কাগজে" আমাদের প্রতিরক্ষা কতদূর অগ্রসর হইয়াছে। আমাদের প্রশ্ন এই যে, ভারতের স্বাধীনতা, অর্থাৎ চল্লিশ কোটি ভারতীয়ের স্বাধিকার ও স্বাতন্ত্র্য বড়, না পণ্ডিত নেহরু এবং তাঁহার পরামর্শ-দাতাদিগের মুখরক্ষা বড়। যদি পণ্ডিত নেহরুর স্বদেশপ্রেম সত্যই তাঁহার আত্মাভিমান হইতে বড় হয় তবে কথা বন্ধ করিয়া ভারত-রক্ষার ব্যবস্থা তিনি করুন। "হাম লড়েঙ্গে, হাম লড়েঙ্গে" এই চীৎকার সভ্যজনোচিত না হইতে পারে। কিন্তু "হাম কভি নহি লড়েঙ্গে" এই চীৎকার এখন শুধু হাস্যকর নহে ইহা ক্লীবত্বের পরিচায়ক। প্রশ্ন এই, কোনটা বড়, স্বাধীনতা না জিগীর ?

রাষ্ট্রসঙ্ঘ কর্ত্তৃক নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব গ্রহণ

গত ৩রা নবেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদের রাজনৈতিক কমিটি সর্ব্বসম্মত ভাবে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সারা পৃথিবীতে পূর্ণাঙ্গ নিরস্ত্রীকরণের যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে শান্তিকামী মানুষমাত্রই তাহাকে স্বাগত জানাইবেন। বলা বাহুল্য, মিঃ ক্রুশ্চেভের পূর্ণাঙ্গ নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতেই রাষ্ট্রসঙ্ঘ ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। আশা ও আনন্দের কথা, বিষয়টি সার্ব্বভৌম অনুমোদন লাভ করিয়াছে। তবে কি ভাবে অনতিবিলম্বেই পৃথিবী হইতে যুদ্ধ-ত্রাস চিরদিনের মত দূর করা যাইতে পারে, তাহার উপযোগী কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণের জন্য একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হইয়াছে।

এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না, যুদ্ধ মানব-সভ্যতার এক কলঙ্ক-স্বরূপ। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শিক্ষায়-শিল্পে-সংস্কৃতিতে মানবজাতি গত পাঁচ হাজার বৎসরের সভ্যতায় সমৃদ্ধি বড় কম সঞ্চয় করে নাই। আদিকালের কৃষি ও কুটির-শিল্প দিয়া যাত্রা সুরু করিয়া মানুষ আজ জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে তাহার অসীম শক্তির পরিচয় দিয়াছে। যাহা প্রথম যুগে, মধ্যযুগে মানুষের কল্পনার বিষয় ছিল, আজ তাহাও একে একে বাস্তব মূর্ত্তি ধরিতেছে। এমন দিনেও মানুষের সেই আদিম প্রবৃত্তি! যাহার ফলে, তাহারই সৃষ্ট নগর,জনপদ, বন্দর, শিল্পশালা সবকিছুই ধ্বংস হইবে। তাই ত যুগে যুগে মনস্বী, চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে বুদ্ধির আবেদন শুনাইয়াছেন। রামায়ণ-মহাভারত যুগেও বলিয়াছেন, আজও বলিতেছেন। এই সেদিনও রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, রলা, রাসেল বলিয়া গিয়াছেন, 'যুদ্ধ সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিবে।' প্রথম মহাযুদ্ধের পর এই অস্ত্র-পরিহারের কথা একবার উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহা অঙ্কুরেই শেষ হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধই মানুষকে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে ইহার ভয়ঙ্কর রূপ! আজ মানুষ বুঝিতে পারিতেছে, ধ্বংসের পথে কল্যাণ নাই।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ সনদে মানুষের যে চতুর্ব্বর্গ স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে, তাহার প্রধানতম অঙ্গ হইল, ভয়মুক্ত জীবন। এই ভয়মুক্ত, সহজ ও স্বচ্ছন্দ জীবন পৃথিবীতে ততদিন আসিবে না, যতদিন যুদ্ধ-ত্রাস মানুষের সম্মুখে অন্ধ নিয়তির মত দোদুল্যমান থাকিবে। দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে অবিশ্বাস, ঈর্ষা ও বৈরিতার অবসানও হইবে না।

কিন্তু মানুষ যুদ্ধ করে কেন? যুদ্ধ বন্ধ করিলেই শুধু হইবে না, যে জন্য যুদ্ধ করে সেই সঙ্গে তাহারও মৌলিক পরিবর্ত্তন ঘটাইতে হইবে। পরদেশ কবলিত করিয়া স্বদেশের ভৌমিক সীমানা বৃদ্ধি করা, অন্য দেশকে দমিত ও পদানত করিয়া তাহার লুণ্ঠিত বিত্তে নিজ দেশের তহবিল স্ফীত করা, অন্যকে ঘাড়ে ধরিয়া আপন মতের অনুবর্ত্তী করা, অন্য দেশকে অনগ্রসর রাখিয়া, তাহার বাজারে বাণিজ্যিক একাধিকার ভোগ করা, এইগুলিই হইল যুদ্ধের সুবিদিত কারণ। মারণাস্ত্রগুলির মত এই মূলগত কারণগুলিরও সর্ব্বাঙ্গীণ অপসারণ প্রয়োজন এবং সেজন্য সমগ্র বিশ্বব্যবস্থাই ঢালিয়া সাজা দরকার।

নূতন চুক্তিতে পাকিস্থান

ভারত-পাকিস্থান সীমান্ত লইয়া যে বিরোধ, বোধহয় এবারে তাহার অবসান হইল। নূতন যে চুক্তি হইয়াছে তাহার সর্ত্তাবলী ভারতবর্ষ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বোধ করি, প্রকাশ্যে স্বীকার না করিলেও পাকিস্থান ভাল করিয়াই জানে, ভারত কপটতার আশ্রয় কখনও লয় না। কিন্তু পাকিস্থানকে তাহার আচরণের দ্বারা প্রমাণ করিতে হইবে, সত্যই সে সীমান্ত-বিরোধের নিষ্পত্তি চায়।

এতকাল ধরিয়া এ সমস্ত বিরোধের অবসান যে ঘটে নাই তাহার কারণ এ নয় যে, তাহাদের মিটাইবার কোনও শান্তিপূর্ণ উপায় ছিল না। মীমাংসা অনায়াসেই হইতে পারিত যদি পাকিস্থানের থাকিত প্রতিবেশী-প্রীতি, আন্তরিকতা ও ন্যায়ের প্রতি অনুরাগ। কি কাশ্মীর, কি খালের জল, কি দেনা-পাওনা, এমনকি সীমান্ত-রেখাও এত জটিল নহে যে, একটা বোঝাপড়া হইতে পারিত না। হইতে অবশ্যই পারিত, কিন্তু পাকিস্থানের আপোষ-বিরোধী মনোবৃত্তিই ইহাদের জিয়াইয়া রাখিয়াছে। জানি না, এ মনোভাব এখনও তাহারা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিতে পারিয়াছে কি না!

তবে পাকিস্থানের যে খানিকটা চৈতন্যোদয় হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। নহিলে টুকেরগ্রাম ছাড়িয়া দিতে সে রাজী হইত না এবং সুদীর্ঘ সীমানা চিহ্নিত করিতেও অগ্রসর হইত না।

কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, এতদিন যাহা সে করিতে চাহে নাই, আজ তাহার এই হঠাৎ পরিবর্ত্তনের কারণ কি? পাকিস্থানের বর্ত্তমান কর্ণধার প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁর সাম্প্রতিক উক্তিতে ইহার হদিস রহিয়াছে। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, ইহা তিব্বতের বর্ত্তমান ঘটনাবলী ও চীনের ভারত-সীমান্ত লঙ্ঘনের প্রতিক্রিয়া। আয়ুব খাঁ মনে করেন, তিব্বত ও আফগানিস্থানের ঘটনায় প্রমাণিত হয় যে, মাত্র পাঁচ বৎসরের মধ্যেই এই উপমহাদেশ সামরিক লক্ষ্য হইয়া উঠিবে। অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে, চীনের আক্রমণাত্মক মনোবৃত্তিই আয়ুব খাঁকে বিচলিত করিয়াছে। আয়ুব খাঁর নূতন নীতির ইহা অন্যতম কারণ বলিয়া মনে হয়।

এ কথা আজ অস্বীকার করিবার উপায় নাই, টুকেরগ্রাম ছাড়িয়া দিতে রাজী হইয়া পাকিস্থান বাস্তবকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে মাত্র, ইহার মধ্যে কোন বদান্যতা বা উদারতা নাই। কারণ টুকেরগ্রাম ভারতেরই। সে অন্যায়ভাবে দখল করিয়াছিল। এতদিনে সেই অন্যায়ের অবসান ঘটিতে চলিয়াছে মাত্র। তার পর পাথারিয়া অঞ্চল ও কুশিয়ারা নদী এলাকা সম্বন্ধে যে মীমাংসা হইয়াছে, তাহাও মানিয়া লওয়া চলে।

শুনা যাইতেছে, সুপ্রীম কোর্টে বেরুবাড়ী লইয়া একটা মামলা

চলিতেছে। সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইবার পর হয়ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। তবে অনুমান করা যাইতেছে যে, নেহরু-নূন চুক্তিতে যাহা স্বীকৃত হইয়াছিল তাহাই কার্য্যতঃ হইবে। বেরুবাড়ী ইউনিয়নের অর্দ্ধাংশ বোধহয় এই নূতন চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্থানেই যাইবে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উহা আঞ্চলিক অধিবাসীদের স্থানান্তরের বিষয়। পাকিস্থানের যে সকল উদ্বাস্তু বেরুবাড়ী ও অন্যান্য অঞ্চলে গিয়া বসবাস করিতেছে তাহাদের দ্বিতীয়বার উদ্বাস্তু হইতে হইবে। ইহার সমাধানই বা কোথায়? তবে সুখের বিষয়, চুক্তিতে ইহা স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে, উভয় দেশের মধ্যে যাহাতে কথায় কথায় বিরোধ, সঙ্ঘর্ষ দেখা দিতে না পারে সেজন্য উভয় দেশের সীমারেখার দেড়শত গজের মধ্যে কোন রক্ষী-ঘাঁটি স্থাপন করা চলিবে না। ইহাতে সীমান্তের উৎপাত, উপদ্রব লাঘবেরও সম্ভাবনা আছে। যাহাই হোক, পাকিস্থান যদি আন্তরিকভাবে ইহা পালন করিয়া যাইতে প্রস্তুত থাকে, তাহা হইলে উভয় দেশের বিরোধের কারণও যে দূর হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আয়ুব খাঁ কাশ্মীরের কথাও বলিয়াছেন। কাশ্মীর সম্বন্ধেও এইরূপ একটি সুষ্ঠু সমাধান হইবে, আমরা নিশ্চয়ই ইহা ধরিয়া লইতে পারি।

সমবায় খামার

ভারতবর্ষে সমবায় খামার কিম্বা যৌথকৃষি-ব্যবস্থার প্রচলন সম্বন্ধে কিছুদিন যাবৎ বাদানুবাদ চলিতেছে। প্ল্যানিং কমিশন যৌথকৃষি-ব্যবস্থা প্রচলনের পক্ষপাতী; এই ব্যবস্থা ভারতবর্ষে একেবারে নূতন নহে। ভারতবর্ষের অনেক জায়গায়, বিশেষতঃ উত্তরপ্রদেশে যৌথখামার-ব্যবস্থা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। পণ্ডিত নেহেরু যৌথকৃষির খুব পক্ষপাতী এবং মনে হয় যে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে যৌথকৃষি-ব্যবস্থা যাহাতে বিস্তৃতভাবে প্রচলিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। যৌথখামারের বিরোধিতা করিতেছেন শ্রী মিনু মাসানী ও স্বতন্ত্রী দল। ইহাদের মতে গণতন্ত্রের ভিত্তি হইতেছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিস্বাধীনতা; এবং সমবায় কৃষি প্রচলন করিলে কৃষকদের ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকিবে না, বাধ্যতামূলকভাবে তাহাদের শ্রম নিয়োগ করিতে হইবে। ইহারা সমবায় কৃষির বিরোধিতা করিবার মানসে ইহার বিকৃত রূপও জনসাধারণের নিকট প্রচার করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে, যৌথকৃষির আওতায় কৃষকদের ব্যক্তিগত মালিকানা থাকিবে না, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণরূপে সত্যের অপলাপ।

সম্প্রতি পণ্ডিত নেহেরু এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে, যৌথকৃষির ব্যবস্থার দ্বারা যৌথমালিকানা প্রথা প্রচলন করা হইবে না; ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় থাকিবে। কৃষক নিজের ইচ্ছানুসারে যৌথকৃষি-ব্যবস্থায় নিজের জমিকে সংযুক্ত করিবে এবং ইচ্ছা করিলে ইহার বাহিরেও চলিয়া আসিতে পারিবে। কিন্তু বিপক্ষদল যে কেন যৌথকৃষি-ব্যবস্থার বিরোধিতা করিতেছেন তাহা বোঝা যাইতেছে না। ইহা শুধু প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তির পরিচায়ক নহে, ইহা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। ভারতে প্রবল জনবৃদ্ধির চাপে খাদ্যশস্যে ঘাটতি একটানা পরিস্থিতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে; ভারতের জমিগুলির উৎপাদনশীলতা অন্যান্য দেশের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ মাত্র।

ভারতের জমিগুলির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে গভীরতম আবাদ করা এবং তাহা সম্ভবপর যদি যান্ত্রিক কৃষি-ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হয়। যান্ত্রিক কৃষি-ব্যবস্থা প্রচলন করিতে গেলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিগুলির একত্রীকরণ প্রয়োজন, খণ্ডজমি ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার অভিশাপস্বরূপ। সুতরাং যৌথকৃষি-ব্যবস্থার দ্বারা খণ্ডজমিকে যদি বৃহত্তর এলাকায় রূপান্তরিত করা যায় তাহা হইলে তাহাতে আপত্তি করিবার মত কিছু নাই। যে আপত্তি করা হইতেছে তাহার পিছনে আছে গোঁড়ামি, ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং ব্যক্তিগত নেতৃত্ব-কামনার ঈর্ষা। পণ্ডিত নেহেরু বলিয়াছেন যে, সমবায় কৃষি-ব্যবস্থা হইবে স্বাধীন কৃষকদের স্বাধীন সংস্থা। ইহাতে কর্তৃপক্ষের প্রভাব নামমাত্র থাকিবে।

বিরোধীদল অজুহাত তুলিয়াছেন যে, কৃষিক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা প্রয়োজন, কারণ প্রতিযোগিতা ব্যক্তিস্বাধীনতাকে কার্য্যকরী করিবার সুযোগ দেয় এবং প্রতিযোগিতা বিনা কৃষকদের স্বাধীনতা বজায় থাকিবে না। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, ১৯৪৩ সনে বাংলা দেশে যে দুর্ভিক্ষ হয় তখন ত চাষীদের প্রতিযোগিতা করিবার অধিকার ছিল, কিন্তু তবু কেন তাহাদের কয়েক লক্ষকে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষ অনুসন্ধান কমিটির অভিমতে ১৯৪৩ সনের দুর্ভিক্ষের সময় বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষে খাদ্যশস্যের অভাব ছিল না, অভাব ছিল জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার; দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ ছিল খাদ্যশস্যের পরিবহন এবং বণ্টন বৈষম্য এবং সরকার সমস্ত চাউলই তখন খোলাবাজারে ক্রয় করিয়া মজুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রতিযোগিতার বাজারেই সরকার চাউল ক্রয় করিয়াছিলেন এবং চাউল বিক্রয় করিয়াছিলেন গরীব চাষীরা। পরে সেই চাউলের মূল্য যখন চার-পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পায় তখন চাষীদের আর ক্রয় করার ক্ষমতা ছিল না। সুতরাং তথাকথিত প্রতিযোগিতায় সমাজে লাভবান তারাই যারা আর্থিক-ভিত্তিতে ও ক্ষমতায় শক্তিশালী। সমাজে যাহারা দুর্ব্বল ও গরীব তাহারা চিরকালই পদদলিত।

যাঁহারা আজ প্রতিযোগিতার সাফাই গাহিতেছেন তাঁহারাও বিশেষরূপে জানেন যে, প্রতিযোগিতায় কাহারা লাভবান হয়। বর্ত্তমানে বাংলা দেশে যে চাউলের অভাব হইতেছে তাহার পিছনেও আছে প্রতিযোগিতার কুফল, বিত্তশালী জোতদার ও আড়তদাররা বহুল পরিমাণে খাদ্যশস্য মজুত করিয়া রাখিয়াছে যাহার ফলে খোলাবাজারে চাউলের অভাব হইতেছে, অবশ্য ঘাটতি উৎপাদনও ইহার জন্য কিছু পরিমাণে দায়ী।

সমবায় প্রথার অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তায় বিষয়ে বিরোধীপক্ষ চিন্তা করিতেছেন না, কিংবা ইহার তাৎপর্য্য বুঝিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। জনসংখ্যাবৃদ্ধির চাপে যতদূর সম্ভব অনুর্ব্বর জমি যাহা এতকাল পতিত পড়িয়া থাকিত, সে সমস্ত জমিকেও বর্ত্তমানে চাষ-আবাদী করা হইতেছে। উর্ব্বর জমির তুলনায় এই সকল অনুর্ব্বর জমিতে উৎপাদন খরচ বেশী হইতে বাধ্য। যত অধিক পরিমাণে পতিত অনুর্ব্বর জমিকে চাষ-আবাদী করা হইবে খাদ্যশস্যের মূল্য সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য। সরকারী হুকুমনামা জারী করিয়া ধান্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর নয় এই কারণে যে, ব্যবসায়ীদের চোরাকারবারী ও ফাটকাবাজি ব্যতীত আর একটি জিনিস ইহার প্রতিকূল এবং তাহা হইতেছে যে, প্রান্তিক জমির উৎপাদন খরচা বেশী।

এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে প্রয়োজন সমবায় কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন এবং ইহার ফলে সকল জমিতে উৎপাদন খরচ গড়ে এক পর্য্যায়ে নামিয়া আসিবে। সোভিয়েট রাশিয়ায় যৌথকৃষি-ব্যবস্থায় দ্বারা কৃষিজাত উৎপাদনকে এক মূল্যের পর্য্যায়ে রাখা সহজ হইয়াছে। যেখানে খরচ বেশী পড়ে সেখানে রাষ্ট্র হইতে অনুপূরক সাহায্য দান করিয়া মূল্যের পর্য্যায় বজায় রাখা হয়। ভারতবর্ষে মোট জমির প্রায় ৪৫ শতাংশ চাষ-আবাদযোগ্য, কিন্তু ইহার মধ্যে মাত্র ৩০ শতাংশ জমিতে চাষ করা হয়, বাকী জমিতে চাষ করা হয় না, কারণ ঐগুলি প্রান্তিক ও অনুর্ব্বর জমি, এবং উহাতে আবাদী খরচা অধিক। সমবায় কৃষিতে এই বাধা অতিক্রম করা সম্ভব হইবে।

বন্যার প্রতিরোধ

দামোদর এবং ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার বহু প্রকার উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং নিরোধ, পরিকল্পনা দুইটি প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু ঐ উদ্দেশ্য সফল হয় নাই—বন্যার প্রাবল্য আজও অনিয়ন্ত্রিত। পূর্ব্বেও কয়েকবার আমরা এই বিষয়ে আমাদের অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং তাহাতে বলিয়াছিলাম যে, দামোদর পরিকল্পনার দ্বারাই বন্যা-নিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর নহে। মেদিনীপুর জেলার দুর্দ্দান্ত কংসাবতী ও কেলেঘাই নদীর বন্যার ধ্বংসলীলা প্রায় প্রতি বৎসরই ঘটে, কিন্তু নদীয়া কিংবা মুর্শিদাবাদের মত অত সাংঘাতিক হয় না। এ বৎসরও তুলনামূলক ভাবে দেখা যায় যে, মেদিনীপুরের বন্যার প্রাবল্য নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের বন্যার তুলনায় অনেক কম! নবদ্বীপ ও মুর্শিদাবাদ ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার আওতায় পড়ে।

বন্যা অনিয়ন্ত্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। এবারকার পশ্চিম বাংলায় বন্যায় ক্ষতির পরিমাণ অনেক কোটি টাকার সমান বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। কিন্তু কেবলমাত্র টাকার মারফতেই বন্যার ক্ষতির পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা যায় না। মানুষের জীবননাশ, সম্পত্তিধ্বংস এবং শস্যনাশ টাকার দ্বারা পূরণ করা যায় না। যে লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহীন হইয়াছে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই চাষী এবং তাহাদের পুনর্ব্বাসন না হওয়া পর্য্যন্ত প্রাদেশিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অব্যবস্থায় পরিণত হইয়া থাকিবে। কয়েক বৎসর ধরিয়াই বন্যার ধ্বংসলীলা চলিতেছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকার উভয়েই এই বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন না। তাঁহারা প্রকৃতির উপর দোষ চাপাইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন এবং বর্ত্তমান নদী-পরিকল্পনাগুলি যথোচিত ব্যবস্থা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। দামোদর পরিকল্পনার কর্ত্তৃপক্ষ অবশ্য জোর গলাতেই পরিকল্পনাটিকে সমর্থন করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের পক্ষে তাহা স্বাভাবিক: তাঁহারা বলেন যে, দামোদর পরিকল্পনা না থাকিলে অবস্থা আরও সাংঘাতিক হইত।

নদী পরিকল্পনাগুলি সুরু হইয়াছে মাত্র কয়েক বৎসর এবং এই কয়েক বৎসর হইতেই বাংলা দেশের প্রকৃতিদেবী যেন অত্যন্ত ক্রুর এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছে। দুর্গাপুর ব্যারেজ হইতে বন্যার মুখে জল ছাড়ায় বন্যার দুর্দ্দমতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল ইহা সাধারণ ধারণা। কর্ত্তৃপক্ষ একথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তবে তাঁহারা আত্মপক্ষ সমর্থনে বলিয়াছেন যে, এই অবস্থা ঘটিতে বাধ্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আবহাওয়া আপিস হইতে আগমন ঝড়ের সংবাদ আগে হইতে দেওয়া হইতেছে। বর্ত্তমান দামোদর-পরিকল্পনা অনুসারে সাড়ে ছয় লক্ষ কুসেক পর্য্যন্ত জল ইহা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরে বন্যার প্লাবন নাকি আট লক্ষ কুসেক পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল, এবং এই পরিমাণ জলকে নিয়ন্ত্রণ করা নাকি বর্ত্তমান দামোদর-পরিকল্পনার ক্ষমতার বাহিরে। কর্ত্তৃপক্ষ বলিতেছেন যে, দামোদর পরিকল্পনায় আরও দুইটি ড্যাম নির্ম্মাণ করিতে হইবে, তবে নাকি বিরাট জলস্রোতকে প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হইবে। এই দুইটি প্রস্তাবিত জলাধারের মধ্যে একটি হইবে আয়ারে এবং অপরটি হইবে বরাকরের নিকট বুলপাহারী জলাধার।

সম্প্রতি আমেরিকা হইতে যে নদী-বিশেষজ্ঞ দল আসিয়াছিলেন তাঁহারা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, দুর্দ্দান্তস্বভাব নদীগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য যে পরিমাণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত ছিল সেই পরিমাণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই। শুধু জলাধার নির্ম্মাণ করিয়াই বন্যা নিরোধ করা যায় না।

বাংলা দেশের বর্ত্তমান নদী-সমস্যা হইতেছে যে, নদীর জল আছে, কিন্তু নদী নাই। অর্থাৎ নদীর উৎস এলাকায় পূর্ব্বে যে পরিমাণ বারিপাত হইত, বর্ত্তমানেও তাহাই হইতেছে। কিন্তু এই বিরাট জলস্রোত আজ যাইবে কোন পথ দিয়া? নদীগর্ভগুলি বর্ত্তমানে ভরাট হইয়া গিয়াছে, সুতরাং জলের ঢল নামিলেই বন্যার প্লাবন দুই কূল ছাপাইয়া উঠে। সারা বৎসর জলস্রোত থাকিলে পলিমাটি ধুইয়া যায় এবং তাহাতে প্রকৃতি নিজেই যেন ড্রেজিংয়ের কাজ করে, এবং নদীগর্ভগুলি ভরাট হইলেও সম্পূর্ণরূপে ভরাট হইয়া যাইতে পারে না।

বন্যার প্রতিকার কি ?

বাঁধ বাঁধিয়া যে বন্যা প্রতিরোধ করা যায় না, উপর্যুপরি দুই-বারের বন্যায় তাহা প্রমাণিত হইয়া গেল। জল-নিকাশের ব্যবস্থা না করিয়া তাহার গতি-পথকে রুদ্ধ করিয়া দিলে তাহা যে একদিন স্ফীত হইয়া উঠিবে, ইহা স্বাভাবিক বুদ্ধিতেই ধরা পড়িবার কথা। বাঁধ নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বে কেন যে তাঁহারা এই কথাটি তলাইয়া দেখেন নাই ইহাই আশ্চর্য্য। দশ বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্বতন সেচ-মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার মহাশয় ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলেন, জল-নিকাশের ব্যবস্থা করিয়া তবে বাঁধ নির্ম্মাণ কর। তখন সে কথাকে কেহ আমল দেন নাই। বাঁধ নির্ম্মাণে গলদ কোথায় কিভাবে হইয়াছে, আমরা সে কথা আজ তুলিব না। যে ত্রুটি আজ সাধারণ চক্ষে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে তাহারই উল্লেখমাত্র করিতেছি।

বর্ত্তমানে বন্যা-প্লাবিত অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুও বলিয়াছেন—"বাঁধ নির্ম্মাণের কথা শুনিলেই তাঁহার গায়ে জ্বালা ধরে। বন্যা-নিয়ন্ত্রণের উপায় হইতেছে অতি দ্রুত জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা, জলপ্রবাহ রুদ্ধ করা নহে।" দীর্ঘকালের অবহেলায় মজিয়া যাওয়া নদীগুলি প্রায় নিশ্চিহ্ন হইতে বসিয়াছে, সেই পথ আজ খুলিয়া দিয়া প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিকে অব্যাহত রাখিতেই হইবে, নহিলে বিপর্য্যয় ঘটিবেই। ইহাই প্রকৃতির প্রতিশোধ। বাঁধে জল ঠেকাইয়া বন্যা-নিবারণের চেষ্টা আপাতদৃষ্টিতে সহজসাধ্য মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতির পরিহাস এমন যে, জলধারার স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করিলে নূতন নূতন অসুবিধা ও বিপদ সৃষ্টি হয়। পশ্চিম বাংলার জলনিকাশী ব্যবস্থায় মারাত্মক বিপর্য্যয় সেইভাবেই ঘটিয়াছে এবং ইহার সামগ্রিক প্রতিকার সন্ধান না করিলে বিপর্য্যয় আবারও ঘটিবে। নদী-নিয়ন্ত্রণের অর্থ কেবল বাঁধ নির্ম্মাণ নয়, রাজ্যের সমস্ত নদ-নদী, নালা ও খাল দিয়া যাহাতে জলস্রোত স্বাভাবিকভাবে বহিতে পারে তাহার জন্য সর্ব্বাঙ্গীন ব্যবস্থা প্রয়োজন। দেরীতে হইলেও সরকার ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন।

অবশ্য ইহা ছাড়াও, বন্যার বিস্তৃতি ও তীব্রতার অন্য কারণও রহিয়াছে। বাঁধের মতই আরও শক্তভাবে জল সরিবার স্বাভাবিক পথ রোধ করিতেছে আমাদের রেলপথগুলি। যে উচ্চভূমির উপর এই রেল-লাইনগুলি অবস্থিত, তাহাতে নদী-নালার স্বাভাবিক গতি অনেকস্থলে বাধাপ্রাপ্ত হয়। পশ্চিম বাংলার নানাস্থানে শিল্পপত্তনে জল-নিকাশী ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া পরিকল্পনাহীনভাবে যেখানে-সেখানে জমির উচ্চতা বাড়াইয়া বাড়ী-ঘর নির্ম্মাণের ফলে এই সমস্যা আরও জটিল হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও কোন কোন অঞ্চলে এইভাবে শিল্পনগরী গড়িয়া উঠিবার ফলে বন্যার উপদ্রব বৃদ্ধি পাওয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষ কতকগুলি প্রতিরোধ-ব্যবস্থা অবলম্বন করেন এবং বন্যা-নিয়ন্ত্রণে সফল হন। তাঁহারা স্থির করেন, বৃহদায়তন বাঁধ অপেক্ষা ছোট ছোট বাঁধ দ্বারা সুষ্ঠু জল-নিকাশী ব্যবস্থা করা অনেক বেশী ফলপ্রদ। ইহা ছাড়া, নগরপত্তনের ফলে বহু জমি যাহা স্বাভাবিকভাবে জল শোষণ করিয়া লইত, তাহাদের অভাব পূরণ করিবার দরকার হয়। বাঁধ অপেক্ষাও স্বাভাবিক উন্মুক্ত জমির জল ধরিবার ক্ষমতা বেশী। কাজেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমি-সংরক্ষণ সংস্থা বন্যাপীড়িত অঞ্চলে যেখানে যতটা পরিমাণ সম্ভব উন্মুক্ত জমিতে গভীর মূলবিশিষ্ট ঘাস-লতা-গুল্ম এবং বৃক্ষাদি রোপণ করিয়া জমির জল-সঞ্চয়ের ক্ষমতা বাড়াইয়াছেন। ইহা দ্বারা অতি-বর্ষণের ফলে প্লাবনের প্রকোপ রোধ করা সম্ভব হইয়াছে।

পূর্ব্বে আমাদের দেশেও এই সুবিধাগুলি ছিল যাহার ফলে বন্যার জল অতি-স্ফীত হইবার সুযোগ পাইত না। কিন্তু এখন বৃক্ষাদি দেশ হইতে লুপ্ত হইয়া যাওয়ায় বন্যা-রোধ ক্ষমতাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া জমিগুলিতে পূর্ব্বে আঁকা-বাঁকা নালা কাটা থাকিত যাহার ফলে বন্যার জল উচ্ছ্বসিত হইবার অবকাশ ছিল না—গতি ব্যাহত হইত। সে অবকাশও বর্ত্তমানে নাই। পূর্ব্বে দেশের লোকই এই কাজগুলি করিত। বর্ত্তমানের মতো সরকারের মুখ চাহিয়া তাহারা থাকিত না। আপন প্রয়োজনে নিজেরাই তাহার প্রতিবিধান করিত। আজ তাহাদের এই পরমুখাপেক্ষিতাই দেশের সকল সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিতেছে।

সমস্যা যে আজ চূড়ান্ত বিপর্য্যয়কারী আকার লইয়াছে, তাহার সমাধান করাও বর্ত্তমানে সহজসাধ্য নয়। কারণ নদীগুলির পলি-মাটি অপসারণ করিতে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। শুধু 'ড্রেজিং'-এর সাহায্যে এই সংস্কারসাধন সম্ভব নয় এবং তাহা ব্যয়সাধ্যও। তা ছাড়া, উহাতে স্থায়ী ফলও বিশেষ হয় না। আর একটি উপায় হইতেছে, নদীকে তার প্লাবন-ভূমি ফিরাইয়া দেওয়া। পূর্ব্ব-পাকিস্থানের দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখযোগ্য। সেখানে নদীকে বাঁধের দ্বারা শৃঙ্খলিত করা হয় নাই। সেইজন্যই বন্যা সেখানে শত্রু না হইয়া বন্ধু হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্যই মনে হয়, বাঁধের পিছনে এখন আর কোটি কোটি টাকা ব্যয় না করিয়া, তাহার কিছু অংশে নদীগুলির আংশিক সংস্কার করিলেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইবে। কিন্তু বন্যা-নিরোধের কোনও পরিকল্পনাই সার্থক হইবে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত না মুমূর্ষু ভাগীরথী পুনরুজ্জীবন লাভ করিতেছে। নামে বাঁধ হইলেও, ফরাক্কা বাঁধ পলি-অপসারণ কাজেই সহায়তা করিবে। ফরাক্কা বাঁধের আশু প্রয়োজন সেইজন্যই। গঙ্গার সহিত ভাগীরথীর সংযোগ বাধামুক্ত করা হইলে, পলিমাটির চাপে নদীখাত ভরাট হইয়া যাওয়ার বিপদ অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইবে। ব্যয়সাধ্য হইলেও, ভাগীরথী, রূপনারায়ণ ও কংসাবতীর স্বাভাবিক জলবাহন ক্ষমতা ফিরাইয়া না আনিলে বন্যার পৌনঃপৌনিক বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে না। এক কথায় বলিতে গেলে, পশ্চিম বাংলার বন্যা-নিরোধ অথবা নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপায় নদীগর্ভের গভীরতা ও জলবহন-ক্ষমতা বৃদ্ধি। ইহা ছাড়া প্রয়োজন, বাঁধ,

রেলপথ এবং শিল্প-পত্তনের ফলে জল-নিকাশী ব্যবস্থায় যে সকল নূতন নূতন বাধা সৃষ্টি হইয়াছে সেগুলির অন্ততঃপক্ষে আংশিক সামঞ্জস্যবিধান। সমস্যা নিঃসন্দেহে বৃহৎ, কিন্তু সামগ্রিক প্রতিকার-ব্যবস্থা ছাড়া আংশিক ও বিক্ষিপ্ত চেষ্টায় পশ্চিম বাংলাকে সর্বনাশা প্লাবনের বিপদ হইতে রক্ষা করা যাইবে না, এবারের বন্যা হইতে রাজ্য সরকার ও ভারত সরকার আশা করি তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন।

গৃহনির্ম্মাণ সমস্যায় মধ্যবিত্ত পরিবার

মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে গৃহনির্ম্মাণ-সমস্যা আর একটি বড় সমস্যা। অবশ্য পৃথিবীর সকল দেশেই এ সমস্যা অল্প বিস্তর দেখা দিয়াছে। ইহা পূর্ব্বে ছিল না, যুদ্ধের পরবর্ত্তী যুগে এই সঙ্কট ব্যাপক ভাবে দেখা যাইতেছে। অবশ্য তাহারা এই সমস্যা মিটাইবার জন্য সরকারী, বে-সরকারী চেষ্টাও করিতেছে। সেখানকার সমস্যা প্রধানতঃ গৃহনির্ম্মাণের সরঞ্জামের অভাব—আর একটি বাধা, বিত্তশালী ব্যক্তি—যাঁহারা ব্যবসায়ে বা শিল্পে অর্থ নিয়োগ করিতে উৎসুক, তাঁহাদের ইহাতে মূলধন লগ্নী করিবার অনিচ্ছা। আমাদের দেশে এ দুইটি সমস্যা ত আছেই, উপরন্তু রহিয়াছে জনসাধারণের দারিদ্র্য। সরঞ্জাম সুলভ হইলে, ইউরোপে এবং আমেরিকায় অনেকেই নিজস্ব গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারেন—অর্থসামর্থ্যও তাঁহাদের আছে। আর সরকারী বা বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিলে নিয়মিত ভাড়া দিয়া থাকিবার লোকও আছে যথেষ্ট। কিন্তু এ দেশে এক দিকে যেমন প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম অপ্রচুর ও দুর্ম্মূল্য, আর এক দিকে তেমনিই অধিকাংশ লোকেরই অর্থসঙ্গতি নাই। :ঘর বানাইবার স্বপ্ন অনেকেই দেখেন যৌবনে, কিন্তু জমির ও সরঞ্জামের উচ্চমূল্যের জন্য সে স্বপ্ন কদাচিৎ সত্যে পরিণত হয়। স্বল্পবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে গৃহ-নির্ম্মাণের আশা—বিশেষ করিয়া শহর অঞ্চলে সুদূরপরাহত।

স্বল্পবিত্ত বা মধ্যবিত্ত পরিবার এই কলিকাতার লোকারণ্যে যে ভাবে বাস করে, তাহা অপেক্ষা বোধ করি বনবাসও ভাল। ইহার উপর পূর্ব্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তু আগমনের ফলে অবস্থা আরও গুরুতর হইয়াছে। একটি ছোট ঘরে একটি পরিবারের বাস এখন আর অস্বাভাবিক ঠেকে না। এমনকি একই ঘরে একাধিক পরিবারের বাসও বিরল নহে। স্বাচ্ছন্দ্য বা স্বাস্থ্যের প্রশ্ন এখানে উঠিতেই পারে না। কোনও ক্রমে মুক্ত আকাশের বিস্তৃতি হইতে মাথা বাঁচাইয়া একটা আচ্ছাদনের নীচে রাত্রিযাপন করাই এখানে একমাত্র লক্ষ্য। ইহাতে প্রাণরক্ষা হয়ত হয়, কিন্তু না বাঁচে মান, না বাঁচে স্বাস্থ্য। এই ধরনের অসহনীয় অবস্থা কোন দেশেই কাম্য নহে—কল্যাণরাষ্ট্রের পক্ষে ইহা দুরপনেয় কলঙ্ক।

অবশ্য ভারত সরকার এ বিষয়ে উদাসীন নহেন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও এই সঙ্কট দূর করিবার জন্য অর্থমঞ্জুরও করা হইয়াছে। কিন্তু কেবল অর্থমঞ্জুর করিলেই ত চলিবে না, তাহার যথাযথ ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই পরিকল্পনাকে সফল করিয়া তুলিতে হইলে, প্রথমতঃ জমির দর বাঁধিয়া দিতে হইবে যাহাতে জমি লইয়া জুয়াখেলা না চলে। দ্বিতীয়তঃ, স্বল্পবিত্ত বা মধ্যবিত্ত পরিবারদের গৃহনির্ম্মাণ ঋণদানের নিয়ম বাস্তবানুগ করিতে হইবে, যাহাতে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি এই পরিকল্পনার সুযোগ গ্রহণ করিয়া নিজেদের গৃহ-সমস্যা মিটাইতে পারে। তাহার জন্য সুদের হারও কমাইতে হইবে এবং ঋণ পরিশোধের সহজসাধ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এ সব বিষয়ে সরকারের ইচ্ছা হয়ত আছে, কিন্তু সরকারের শম্বুক-গতিই একমাত্র বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শিক্ষা-ব্যাপারে গলদ কোথায়?

শিক্ষার মান কি হওয়া উচিত এ লইয়া তর্কের আর অবসান নাই। সকলেই ভাবিতেছেন, কিন্তু কোন কূল-কিনারা পাইতেছেন না। অবশ্য শিক্ষার্থিগণ কি ভাবিতেছে তাহা বলা কঠিন। শিক্ষাক্ষেত্রে আদর্শ-বিচ্যুতি এবং অবনতির কতকগুলি দিক অবশ্য সকলেরই চোখে পড়িতেছে। কিন্তু তাহার সমাধান কোন্ পথ ধরিয়া করা হইবে তাহাই বিবেচনার বিষয়। সমাজ-জীবনে দুর্নীতি, আদর্শ-ভ্রষ্টতা এবং বিশৃঙ্খলা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। সাধারণ বুদ্ধিতে ইহাই প্রতীয়মান হয়, শিক্ষার্থী তরুণ সম্প্রদায়ের বিদ্যা, বুদ্ধি এবং আচার-আচরণের সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশ যাহাতে হয় তাহার দিকেই লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়-সাহায্য-উন্নয়ন-কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ দেশমুখ এই সম্পর্কে কিছু মূল্যবান কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, শিক্ষা-সঙ্কট বর্ত্তমানে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই অল্পবিস্তর দেখা দিয়াছে। তবে ভারতবর্ষে শিক্ষা-সঙ্কটের প্রকৃতি বিশেষভাবে জটিল। ইহার একটি প্রধান কারণ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে জীবন ও জীবিকার সমস্যাগুলি এখনও পুরাপুরি খাপ খাইতেছে না। যাহারা উচ্চ-শিক্ষার সুযোগ পাইতেছে তাহারাও তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত আশ্বাস পাইতেছে না। এই অনিশ্চয়তার সামাজিক এবং বৈষয়িক কারণগুলি সহজে এবং অবিলম্বে দূর করা যাইবে না। কাজেকাজেই ভবিষ্যৎ কর্ম্মজীবন সম্পর্কে অনিশ্চয়তা মানিয়া লইয়াই শিক্ষার্থিগণকে বিদ্যাবুদ্ধি এবং দায়িত্বশীল আচার-আচরণ অনুশীলনে উদ্যোগী হইতে হইবে।

এদেশে ইহা খুবই সত্য কথা। কর্ম্ম-জীবনে সকলের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত নয় বলিয়া শিক্ষার্থিগণ সুযোগের অসদ্ব্যবহার করিবে ইহা সঙ্গত নয়। দেশের ভবিষ্যৎ গড়িবার দায়িত্ব যুবক সম্প্রদায়ের। বর্ত্তমান অবস্থার সহিত মানাইয়া লইয়া শিক্ষার সকলরকম সুযোগের সদ্ব্যবহার না করিলে শিক্ষার এত আয়োজন নিরর্থক হইবে।

আমাদের দেশে বর্ত্তমানে রাজনীতির প্রভাব শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকগণকে যে পরিমাণ অসহিষ্ণু এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতেছে, সেরূপ অন্য কোনও দেশে দেখা যায় না। দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও বৈষয়িক সমস্যাগুলি সম্বন্ধে ছাত্রদের জ্ঞানলাভ হওয়া প্রয়োজন—

অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজে রাজনীতির চর্চ্চা হয়, কিন্তু তাহারা ইহাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে না। আমাদের দেশের ছেলেরা তাহাতেই জড়াইয়া পড়িতেছে। শিক্ষার মান নামিয়া যাইবার ইহাই প্রধান কারণ। ইহাতে ছাত্রদের চিত্ত-বিক্ষোভ ঘটিবেই। শিক্ষার আয়োজন এবং সুযোগ যতই বাড়ানো হউক না কেন, ছাত্র এবং শিক্ষকগণ এই সক্রিয় রাজনীতির সংস্পর্শ হইতে দূরে না থাকিলে উন্নতির কোন সম্ভাবনাই থাকিবে না।

প্রায়ই দেখা যায়, কলেজের ছাত্র-ইউনিয়নগুলির নেতৃত্ব অনেকক্ষেত্রেই এমন সব গোষ্ঠির কবলিত হয়, যাহারা সকলপ্রকার নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সংযমের বিরোধী। এদিক হইতেও বিশেষ সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন। ছাত্রগণের সহিত অধ্যাপক ও অধ্যক্ষগণের সম্পর্ক কেবল ক্লাসে লেকচারদান ও বেতন আদায়ে সীমাবদ্ধ থাকিলে শিক্ষায় সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইতে পারে না। মোটকথা', শিক্ষার পরিবেশ সুস্থ ও স্বাভাবিক করা ব্যাপারে প্রধানতঃ শিক্ষক ও অধ্যাপকগণের ভূমিকা ও উদ্যোগের উপর ইহা অনেকখানি নির্ভর করিতেছে।

উচ্ছৃঙ্খলতাই কি স্বাধীনতা?

দেশ স্বাধীন হইবার পর মানুষের চাল-চলন, রীতি নীতির এমন হঠাৎ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে যে, তাহাদের সভ্য দেশের নাগরিক রূপে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে বারুইপুর রেল-ষ্টেশনে যে ঘটনাটি ঘটিয়া গেল, আমাদের জন-মনস্তত্ত্বের গতি-প্রকৃতি বোঝার দিক হইতে তাহার গুরুত্ব অল্প নয়। একখানি লোকাল ট্রেন ঐদিন সকালে বারুইপুরের কাছাকাছি পৌছালে, একজন টিকিট পরীক্ষক ট্রেনে উঠেন। দুই ব্যক্তি ইহাতে ভীত হইয়া—সম্ভবত টিকিট না থাকায়, চলন্ত গাড়ী হইতে ঝাপ দেন এবং নিকটবর্ত্তী এক পুকুরে পড়িয়া যান। ইহাদের একজনকে অচেতন অবস্থায় জল হইতে উঠানো হয় এবং হাসপাতালে পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। অপর ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ইহার পরই দুই শতাধিক মানুষের এক জনতা ষ্টেশন আক্রমণ করিয়া সেখানকার কর্ম্মচারিদের মারপিট এবং হাঙ্গামা সুরু করে। পুলিস আসিলে, পুলিসের উপরেও তাহারা আক্রমণ চালায়। ইহাতে তের-চৌদ্দজন লোক আহত হয়। শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য অবস্থা আয়ত্তে আসে।

ইহা বলিতেও লজ্জা করে, ট্রেনে চাপিব অথচ টিকিট করিব না—টিকিট চাহিতে আসিলেই মারপিট করিব, এই অন্যায় জুলুমকে কোন সুস্থ ব্যক্তিই সহানুভূতির চক্ষে দেখিতে পারেন না। গাড়ী হইতে ঝাপ দেওয়া এবং তাহার ফলে মৃত্যু দুঃখের হইলেও, সেজন্য চেকার বা রেল-কর্ম্মচারিদের অপরাধ কোথায়? যুক্তি কোথাও নাই। দুঃখের কথা, এই শ্রেণীর যুক্তিহীন গুণ্ডামিই আজকাল চলতি রেওয়াজে দাঁড়াইয়াছে। কারণে অকারণে যেখানে সেখানে দল বাঁধিয়া হৈ-হুল্লোড় ও মারামারি করা, দোষী-নির্দ্দোষ গ্রাহ্য না করিয়া হাতের কাছের সকলকে পাইকারী হারে প্রহার করা যেন প্রতিদিনের ঘটনা হইয়া পড়িতেছে। একথা বলিতেছি না যে, কোন ক্ষেত্রেই মানুষ সঙ্গত কারণে ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হইয়া নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেন না। তেমন ঘটনাও কখনও কখনও ঘটে এবং অনুচিত ও অ-নাগরিক সুলভ আচরণ হইলেও, তাহার তবু একটা অর্থ বোঝা যায়। কিন্তু বহুস্থলে এবং বেশীর ভাগ স্থলেই দেখা যায়, অন্যায় করিবার মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই যেন ছোট-বড় সব মানুষের লক্ষ্য হইতে চলিয়াছে। আমাদের সমাজ-মনস্তত্ত্ব যে নিতান্ত নীতিহীন ও উৎকেন্দ্রীক হইয়াছে, এসব ঘটনা তাহারই বেদনাদায়ক প্রমাণ এবং এই নৈতিক অবক্ষয়ের স্রোত যদি রুদ্ধ করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে দেশের সমাজ, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান কোন কিছুরই ভবিষ্যৎ নাই। এই অপচিত মনুষ্যত্বের বিপাকেই দেশ রসাতলে যাইবে।

চাঁদা না দিতে পারায় ছুরিকাঘাত

পূর্ব্বে দেখা যাইত, দুই-তিনটি বা তাহারও বেশী পাড়া মিলিয়া একটি বারোয়ারী পূজা করিত। এখন বারোয়ারীর স্থান অধিকার করিয়াছে সার্ব্বজনীন পূজা। যেহেতু সর্ব্বজনের, সেই হেতু সংখ্যানুপাতে ইহার আধিক্য দেখা যাইতেছে। ভক্তির আধিক্য সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ নয়, ইহা বলাই বাহুল্য। দলাদলি, রেষারেষি, ক্ষুদ্রতরগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্যস্পৃহা ইত্যাদিই পূজার সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ। ইহাতে পূজা হইতেছে না—পূজার নামে কয়েকদিন ধরিয়া দল-গোষ্ঠীর তাণ্ডব। কিন্তু তাহাতেও কিছু আসিয়া যাইত না যদি চাঁদার দাবির অত্যাচারে স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া না উঠিত। একই ব্যক্তিকে বিভিন্ন বারোয়ারী পূজার জন্য চাঁদা দিতে হইবে এবং সে চাঁদার পরিমাণও স্থির করিয়া দিবে, যাঁহারা চাঁদা আদায়কারী তাহারা। দাবি অনুযায়ী চাঁদা না দিলে অনেক রকমে নির্যাতন সহিতে হয়, ইহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। এই জুলুমবাজির পরিণতি কতদূর পর্য্যন্ত গড়াইতে পারে, বরানগরের একটি ঘটনা হইতেই বোঝা যাইবে।

সংবাদপত্রে দেখা যায়, বরানগর গোপাললাল ঠাকুর রোডে কোন ব্যক্তির গৃহে আসিয়া কয়েকজন লোক বেলা প্রায় এগারটার সময় কালীপূজার জন্য পাঁচ টাকা চাঁদা দাবি করে। গৃহস্বামী তাহা দিতে অস্বীকৃত হইলে, এক ব্যক্তি তাহাকে ছোরা লইয়া আক্রমণ করে। অপর কয়েকজন বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়া একটি জামার পকেট হইতে কিছু টাকা হস্তগত করে। এমন সময় গৃহস্থের চীৎকারে স্থানীয় লোকেরা ছুটিয়া আসাতে তাহারা বোমা পটকা ফেলিয়া পলাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাঁহারা তিন ব্যক্তিকে ধরিয়া ফেলেন। পরে পুলিস আরও দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

সবই বুঝিলাম। শাস্তিও হয়ত তাহাদের হইবে। কিন্তু চাঁদার জুলুমবাজী যদি এই পর্য্যায়ে পৌছায়, তবে স্থানীয় গৃহস্থ

ব্যক্তিদের সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে স্থির করিতে হইবে, বারোয়ারী পূজায় চাঁদা দেওয়া আদৌ উচিত হইবে কি না। গার্হস্থ্য জীবন পদে পদে গুণ্ডামির দ্বারা সন্ত্রস্ত হইবে, এ অবস্থা সত্যই অসহনীয়।

বেলঘরিয়ায় নারী-ডাকাত

সমাজ আজ কোন্ স্তরে নামিয়া যাইতেছে, চিন্তা করিয়াও তাহার সঠিক নির্ণয় করা যায় না। এই দুষ্কার্য্যে নারীরাও আগাইয়া আসিতেছে এই সংবাদও ক্রমে ক্রমে পাওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে নারীদস্যু পুতলীবাঈয়ের নাম শুনা গিয়াছে বটে, কিন্তু বঙ্গললনাদের মধ্যে এতখানি পৌরুষ দেখা যাইবে, ইহা কল্পনা করিতেও বাধে। ঘটনাটি ঘটিয়াছে বেলঘরিয়ায়। গত পূজায় ষষ্ঠীর দিন দিবাভাগে যতীন দাস কলোনীতে দুইজন নারী এক গৃহস্থ বাড়ীতে সহসা ঢুকিয়া পড়ে। বাড়ীতে তখন পুরুষ কেহ ছিল না। বাড়ীর গৃহিণী প্রশ্ন করিবার আগেই তাহারা ছোরা বাহির করিয়া চাবি দিতে বলে। ভদ্রমহিলা অস্বীকার করিলে তাহার হাত-পা বাঁধিয়া জোরপূর্ব্বক চাবি ছিনাইয়া লয় এবং নগদে ও জিনিসপত্রে প্রায় চারি হাজার টাকা লইয়া যায়। মহিলাটি ভয়ে চীৎকার করিতেও পারেন নাই। এই নারী-ডাকাতদের এখনও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

ঘটনাটি গুরুতর নিঃসন্দেহ। কিন্তু ইহার পশ্চাতে দেশের সমাজ-মনস্তত্ত্ব কোন্ পথে চলিয়াছে, তাহার বৃহত্তর একটি সংকেত রহিয়াছে। পুলিস ইহার কতটুকু দায়িত্ব লইতে পারে? সমাজের অভ্যন্তরে যে ফাটল ধরিয়াছে—চিন্তা করিতে হইবে আমাদের সেইদিক দিয়াই। দেশকে বড় করার আগে আজ মানুষকে বড় করিতে হইবে। মনুষ্যত্বশূন্য দেশের মূল্য কোথায়?

দিবালোকে নৃশংস হত্যাকাণ্ড

২৭শে কার্ত্তিকের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় একটি সংবাদ বাহির হইয়াছে যাহা পড়িয়া বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না। প্রকাশ্য দিবালোকে দিল্লীর মত জায়গায় এরূপ নৃশংস হত্যাকাণ্ড অত্যাশ্চর্য্যই বটে। সংবাদটি এইরূপ: "আজ (১২ই নবেম্বর) নয়া দিল্লীর দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি নূতন কলোনীতে প্রকাশ্য দিবালোকে এক নৃশংস ঘটনা ঘটিয়াছে। ইহাতে এক দুর্বৃত্তের হস্তে তিন বৎসরের একটি শিশু নিহত ও তাহার তরুণী মাতা গুরুতররূপে আহত হইয়াছে।...পুলিসের প্রদত্ত বিবরণে প্রকাশ, উক্ত দুর্বৃত্ত একজন যুবক; তাহার পরিধানে প্যাণ্ট ও শার্ট ছিল। সে বাড়ীর পিছন দিকের দরজায় আঘাত করিলে পদ্মাবতী দরজা খুলিয়া দেন। সে বলে যে, সে একজন 'প্লাম্বার' মিস্ত্রী। সে পদ্মাবতীকে আরও বলে যে, জলের পাইপ মেরামত করার জন্য বাড়ীওয়ালা তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

পদ্মাবতীর ইহাতে কোন সন্দেহ হয় নাই, কারণ জলের একটি পাইপ সত্যই খারাপ হইয়া গিয়াছিল, সেইজন্য বাড়ীওয়ালা তাহাকে পাঠাইতে পারেন। তিনি লোকটিকে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেন।

কিছুক্ষণ পরে লোকটি তাঁহাকে ডাকিয়া কয়েকটি প্রশ্ন করে, কিন্তু ইহার আসল উদ্দেশ্য ছিল, সে সময় বাড়ীতে আর কেহ আছে কিনা তাহা জানা। পুলিসের বিবরণে আরও প্রকাশ যে, উক্ত দুর্বৃত্ত তাহার পর পদ্মাবতীকে একটি ঘরে লইয়া যায় এবং ছোরা দেখাইয়া তাঁহার সোনার হার ও বালা ছিনাইয়া লয়।

তাহার পর উক্ত দুর্বৃত্ত তাঁহার নিকট ট্রাঙ্কগুলির চাবিকাঠি দাবি করে। পদ্মাবতী চাবিকাঠি তাঁহার নিকট নাই বলিলে সে একটি ট্রাঙ্ক ভাঙিয়া ফেলে এবং তিন শত টাকার নোটের একটি বাণ্ডিল হস্তগত করে।

এই সময় শিশুটি ঘুম হইতে জাগিয়া উঠে এবং অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া কাঁদিতে থাকে।

'কেমন করিয়া কান্না থামাইতে হয়, আমি জানি'—এই কথা বলিয়াই সে শিশুটির গলদেশে এক প্রকাণ্ড ছোরা প্রবেশ করাইয়া দেয়। শিশুটির রক্তাপ্লুত মৃতদেহ পড়িয়া থাকে। মাতার সম্মুখে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড হয়। বাড়ীতে আর কেহই ছিল না। প্রকাশ, মহিলাটি দুর্বৃত্তের পদতলে পড়িয়া সন্তানের প্রাণ-ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার করুণ আবেদনে দুর্বৃত্ত কর্ণপাত করে নাই। তাহার পর পদ্মাবতীকে আক্রমণ করা হয়। দুর্বৃত্ত তাঁহার গ্রীবাদেশে, পৃষ্ঠে ও বাহুতে ছোরা মারে। তিনি ৫.৬ জায়গায় ছোরার আঘাতে আহত হন।

তিনি আততায়ীর কবল হইতে নিজেকে কোনক্রমে মুক্ত করিয়া বাড়ীর বাহিরে ছুটিয়া যান, কিন্তু সাহায্যের জন্য ডাকাডাকি করিতে তাঁহার কিছু সময় লাগে। ইহার অন্যতম কারণ, তিনি হিন্দুস্থানী জানেন না, তবে প্রধান কারণ হইতেছে ঐ অঞ্চলটিতে বসতি খুব বিরল; বাড়ীগুলি বহুদূরে অবস্থিত। হত্যাকাণ্ডের প্রায় আধ ঘণ্টা পরে নয়াদিল্লী পুলিসের ফ্লাইং স্কোয়াড ঘটনাস্থলে পৌঁছে এবং মহিলাকে হাসপাতালে প্রেরণ করে। তাঁহার অবস্থা এক্ষণে বিপন্মুক্ত বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।"

দিন দিন যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইতেছে তাহাতে শান্তিতে বসবাস করা একরকম কঠিন হইয়া পড়িল। মানুষ কাহার উপর নির্ভর করিবে, যেখানে কোন নিরাপত্তাই আশাপ্রদ নয়। সমাজজীবন যদি এইভাবে নিরন্তর বিঘ্নিত হইতে থাকে তবে মানুষ দাঁড়ায় কোথায়?

রেলপথে দুর্নীতি প্রতিকারে রেল-কর্তৃপক্ষ

দুর্নীতি আজ সমাজজীবনে ব্যাপকভাবে প্রবেশ করিয়াছে। প্রায় শুনিতে পাওয়া যায়, রেলের যাত্রী-গাড়ী, মালগাড়ী, শেড, পার্শেল আপিস ইত্যাদি হইতে অবিরত রেলের মালপত্র চুরি, রেলের যাত্রী-গাড়িতে ডাকাতি ও খুন এবং রেলের মহিলা-যাত্রীর উপর দুর্ব্যবহার হইতেছে। ইহাতে রেল-কর্তৃপক্ষও বিশেষ বিচলিত হইয়াছেন। এই সব অনাচারের কিভাবে সুষ্ঠু প্রতিকার হইতে

পারে, সে বিষয়ে তাঁহারা দেশের অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানের নিকট পরামর্শ চাহিয়াছেন।

রেল দেশের সর্ব্ববৃহৎ জাতীয় সম্পত্তি। উহার ক্ষতি জাতিরই ক্ষতি। সে ক্ষেত্রে রেলের যাত্রী-গাড়ীতে যদি ডাকাতি ও খুন এবং মহিলা-যাত্রীর সম্ভ্রমহানি ঘটে, তাহা হইলে সকলেই রেলে ভ্রমণ করিতে ভয় পাইবে এবং রেলের রাজস্বহানি ঘটিবে। সুতরাং রেলের এই অবস্থার প্রতিকার হওয়া আবশ্যক। কিন্তু এই সব অনাচারের প্রতিকার-পন্থা কি হইতে পারে তাহাও ঐ সঙ্গে চিন্তা করা দরকার। এই জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন জনসাধারণের সহ-যোগিতা। কারণ দেশের সর্ব্বত্র নানা স্থানে রেলের মালপত্র এরূপ ভাবে ছড়াইয়া আছে যাহার ফলে কোনও পুলিসী-ব্যবস্থা দ্বারাই তাহার সম্যক্ প্রতিকার হইতে পারে না। কিন্তু কথা হইতেছে, জনসাধারণই বা কিভাবে এই অবস্থার প্রতিকার করিতে পারে? রেলে যে সব দুর্বৃত্ত মালপত্র চুরি করে, তাহারা সংঘবদ্ধ এবং অনেক সময় রেলের প্রহরী ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদের সহিত তাহাদের যোগসাজস থাকে। তারপর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিলে, অনেক সময়েই তাহারা ধরা পড়ে না এবং ধরা পড়িলেও প্রায়ই তাহাদের শাস্তি হয় না। এ জন্য যাঁহারা দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট দেন, তাঁহাদের জীবন ও সম্পত্তি বিপন্ন হয়। এরূপ অবস্থায় জনসাধারণ রেলের নানা অনাচার দমনে কর্ত্তৃপক্ষের সাহায্য করিতে গিয়াও পিছাইয়া আসে। রেল-কর্ত্তৃপক্ষও যে ইহা না জানেন এমন নয়। সুতরাং রেল-কর্ত্তৃপক্ষেরই উচিত, আগে ঘর শায়েস্তা করা, না হইলে ইহার প্রতিকার কোন দিনই হইবে না।

বালকের বীরত্ব

আন্দুলের একটি বালক নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া, অগ্নিকুণ্ড হইতে বয়স্ক এক ব্যক্তির প্রাণ বাঁচাইয়াছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে ইহা উল্লেখযোগ্য।

অগ্নিকাণ্ডের ফলে একটি তেলের গুদাম জ্বলিতেছিল, ভিতরে বিপন্ন পিতা, বাহিরে ক্রন্দনরতা তাহার কন্যা। অসহায় মেয়েটি আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতেছে—সেখানে বহু লোকই জমিয়া গিয়াছে, কিন্তু কেহই ঐ অগ্নিকুণ্ড হইতে বৃদ্ধকে রক্ষা করিতে আগাইয়া আসিল না। যে আসিল, সে নিতান্তই বালক। বয়সে ঐ মেয়েটিরই সমান হইবে। কিন্তু সে দ্বিধামাত্র না করিয়া সেই অগ্নিব্যূহের মধ্যে ঝাপাইয়া পড়িল। সুখের বিষয়, তাহাকে আগুনে দগ্ধ হইতে হয় নাই—বৃদ্ধকে লইয়াই সে ফিরিয়াছে।

এরূপ মহৎ দৃষ্টান্ত অনুকরণীয়। দেশে নৈতিক চরিত্রের অবনতির দৃষ্টান্তও যেরূপ রহিয়াছে, তেমনি রহিয়াছে এমনি মহৎ প্রাণের উজ্জ্বল উদাহরণ। এ বীরত্বের পুরস্কার হয়ত কেহ দিবে না, কিন্তু মানুষের অন্তরে ইহাদের আসন চিরপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। একটি শিখা হইতে শত শত দীপ জ্বালান যায়, একটি দৃষ্টান্ত হইতে সেইরূপ অসংখ্য লোক অনুপ্রেরণা পাইবে ইহাই আমরা আশা করি।

ভাষা-ভিত্তিক রাজ্যগঠন

ভাষা-ভিত্তিক রাজ্যগঠনের দাবি আজ নূতন নহে। স্বাধীনতা-পূর্ব্ব যুগে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এই ভাষা-ভিত্তিক রাজ্যগঠনের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশ স্বাধীন হইবার পর যখন তাঁহারাই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলেন, তখন সে মনোভাব তাঁহাদের দূর হইয়া গেল। এই ব্যাপারে তাঁহাদের অনাগ্রহ যে কিরূপ প্রবল তাহা অন্ধ্ররাজ্য গঠনে প্রথমে অসম্মতি ও পরে বাধ্য হইয়া সম্মতিদান হইতেই বুঝা যায়। অথচ ভাষার ভিত্তি যে রাজ্যগঠনের স্বাভাবিক ভিত্তি হওয়া উচিত তাহা দেশ-বিদেশের বহু বিশেষজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিই স্বীকার করেন। মহাত্মা গান্ধীও ইহা চাহিয়াছিলেন।

মাতৃভাষা মানুষের প্রিয়তম বস্তুগুলির মধ্যে একটি। স্বাভাবিক পরিবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, শাসক-শক্তির খেয়াল যদি তাহাকে ভিন্নতর পরিবেশের সহিত সংযুক্ত করিতে বাধ্য করে তাহা হইলে সেই ভাষাভাষীদের মনে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে তাহা বলাই বাহুল্য। সে প্রতিক্রিয়া যে অনেক সময় গুরুতর অবস্থারও সৃষ্টি করিতে পারে—সে অভিজ্ঞতা ভারত সরকারেরও গত কয় বৎসরে কম হয় নাই।

বিহারে অনুরূপ ঘটনা ত লাগিয়াই আছে। শুনা যাইতেছে, চাণ্ডিল প্রভৃতি কতকগুলি এলাকার বাংলাভাষী অধিবাসীদের উপর জোর করিয়া হিন্দী ভাষা চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে এবং অন্যপ্রকারেও তাহাদের সাংস্কৃতিক জীবন বিঘ্নিত করার চেষ্টা করা হইতেছে। এ সংবাদ যে একেবারে ভিত্তিহীন নহে, তাহা ইহা হইতেই অনুমান করা চলে যে, ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু দপ্তরের অ্যাসিষ্টাণ্ট কমিশনার চাণ্ডিল, ইছাগড় প্রভৃতি পাঁচটি অঞ্চলে এ সম্বন্ধে সরজমিনে তদন্ত করিতে যাইতেছেন।

তদন্তের ফলাফল যাহা হইবে তাহা অনুমান করিয়া বলা সঙ্গত নয়। কিন্তু একথা অবশ্যই বলা চলে, এইসব অঞ্চলগুলিকে বাংলাভাষী রাজ্যের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলে বহু অপ্রীতিকর এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সম্ভাবনা দূর হইতে পারে। এই দিক হইতে চিন্তা করিয়াই কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় সরকার যখন ভাষার ভিত্তিতে বোম্বাই রাজ্যের পুনর্গঠনের কথা বিবেচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখনই বাংলা, উড়িষ্যা ও মিথিলার কথাও ঐ প্রসঙ্গে আসিয়া পড়ে। রাজ্য পুনর্গঠনের সময় বঙ্গভাষী তিন হাজার বর্গমাইল অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও বিহারের অন্তর্গত ধানবাদ, সাওতাল পরগণা, পূর্ণিয়া, আসামের অন্তর্গত গোয়ালপাড়া ও কাছাড় এবং ত্রিপুরার বাংলাভাষী-অধ্যুষিত এগারো হাজার বর্গমাইল অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইতে বাকী আছে। এই সব অঞ্চলের বাংলাভাষী অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় সত্তর লক্ষ হইবে। ভারত সরকার যখন ভাষার-ভিত্তিতে

বোম্বাই রাজ্য পুনর্গঠনের কথা চিন্তাই করিতেছেন তখন পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা ও মিথিলার সঙ্গত দাবির যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া প্রতিকূল অবস্থায় নিষ্পেষণ হইতে এইসব ভাষাভাষীদের রক্ষা করিবেন, ইহাই সকলে আশা করে।

দণ্ডকারণ্যে বিশৃঙ্খল আবহাওয়ার সৃষ্টি

দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন আলোচনা বিভিন্ন সংবাদপত্রে হইয়াছে এবং আজও হইতেছে। উদ্বাস্তুদের প্রায়ই সেখানে পাঠানো হইতেছে, অথচ তাহারা ফিরিয়া আসিতে চাহিতেছে কেন? দু-এক দলের কথা নয়, সকলের মধ্যেই একটা অসন্তোষ দেখা যাইতেছে। কারণ নিশ্চয়ই একটা কিছু আছে। দণ্ডকারণ্যের উজ্জ্বল সম্ভাবনা সম্বন্ধে সরকারী প্রচারকার্য্যের ফলে শিবিরবাসী উদ্বাস্তুরা যে সেখানে নব-জীবনারম্ভের জন্য উৎসাহিত হইয়াছিল, ইহা তাহাদের কথাতেই বুঝা যায়। তবে একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, জনমত তাহাদের সেই উৎসাহ-বর্দ্ধনের প্রচুর সহায়তা করিয়াছিল। আজ যদি উদ্বাস্তুদের মধ্যে অনাগ্রহ বা নিরুৎসাহের সঞ্চার হইয়া থাকে, তবে দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে সরকারী অ-ব্যবস্থাই দায়ী, এ কথা অপ্রীতিকর হইলেও বলিতে হইতেছে সরকারী সতর্কতা সত্ত্বেও দণ্ডকারণ্য-পরিকল্পনা সম্পর্কে দুর্নীতি, বিশৃঙ্খলা ও অ-ব্যবস্থার যেসব উদ্বেগজনক সংবাদ নানা সময়ে প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে, তাহা শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের মনে যদি দণ্ডকারণ্য-ভীতি এবং বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়া থাকে, তবে তাহাদের উপর সেজন্য দোষারোপ করা সঙ্গত হইবে না। দণ্ডকারণ্য ছাড়িয়া যেসব উদ্বাস্তু চলিয়া আসিয়াছে, দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে প্রতিকূল মনোভাব সৃষ্টির তাহারাও কিছু উপকরণ যোগাইয়াছে এ কথাও সত্য।

দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা রূপায়ণের ব্যাপারে পরিচালক স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যেই যে নানাপ্রকার বাদ-বিসম্বাদ চলিতেছে এবং প্রধানতঃ তাহার ফলেই যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইতেছে, সে কথা আজ গোপন নাই। এখন দলাদলি, রেষারেষি, বাদ-বিসম্বাদ এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে যে, তাহাতে পরিকল্পন বানচাল হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। শুনা যাইতেছে, কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বাসন-দপ্তরের সেক্রেটারী এই সম্বন্ধে তদন্ত করিতেছেন।

এ কথা আজ অস্বীকার করিবার উপায় নাই. এই দণ্ডকারণ্য-পরিকল্পনার সাফল্য দেখিতে দেশবাসী আগ্রহান্বিত। সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কার্য্য পরিচালিত হইলে সেখানে উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা না হওয়ার কোনই কারণ নাই। যে পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের উপর সহস্র সহস্র ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠা নির্ভর করে, ব্যক্তিবিশেষ বা কতিপয় ব্যক্তির অকর্ম্মণ্যতা, খেয়াল বা অনাচারের ফলে তাহা ব্যর্থ হইয়া যাইবে, দেশবাসী তাহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না।

গলদ অনেক দিক দিয়াই ঢুকিয়াছে যাহা সর্ব্বত্র হইতেছে, এখানেও তদনুরূপ—কাজ হইতেছে না অথচ টাকা উড়িয়া যাইতেছে। জানি না, তদন্তের ফল কিরূপ দাঁড়াইবে, কিন্তু সরকার কঠোর হইলে ইহার সুষ্ঠু সমাধান যে হইয়া যাইবে ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা চলে। সুষ্ঠু সম্পাদনের পথে যাঁহারা বাধা, তাঁহারা যত প্রভাবশালী ব্যক্তিই হউন, তাঁহাদের অপসারণে দেশবাসীর পূর্ণ সমর্থন যে সরকার পাইবেন, এ কথা জোর করিয়া বলা যায়।

মানুষের আয়ু ও বিষ

জাল-ভেজালের বিরুদ্ধে কড়াকড়ি ব্যবস্থা যতই বাড়িতেছে, তাহাদের ফাঁকির প্রক্রিয়াও সেই হারে বাড়িতেছে। পৌরসভার হেল্‌থ অফিসারের বিবৃতিতে তাহার সামান্য আভাস পাওয়া যায়। তাঁহারা বলিতেছেন, গত তিন মাসের মধ্যে প্রায় চারি শত আড়তে এবং কারখানায় হানা দিয়া সরিষা, সরিষার তেল, ঘি, মাখন, গম, মসলা ও চায়ের ৭৮০টি নমুনা ভেজাল-সন্দেহে সংগ্রহ করিয়াছেন। রাসায়নিকের বিশ্লেষণে বহুক্ষেত্রেই সন্দেহ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। দুই হাজার মণেরও উপর খাদ্যদ্রব্য আটক করা হইয়াছে। ভেজালের শতকরা হার নাকি প্রায় আধাআধি! পুরাপুরি ভেজাল শুনিলেও লোকে বিস্মিত হইত না। কারণ তাহারা ইহাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। চোরাকারবার, কালোবাজার, জিনিসের দুর্ম্মূল্যতা এবং দুষ্প্রাপ্যতায় মানুষ এমনিতেই নাজেহাল ও দিশেহারা হইয়া আছে। ভেজালের উপদ্রব বোঝার উপর শাকের আটি মাত্র।

সবচেয়ে আশ্চর্য্য তবু ইহারা বাঁচিয়া আছে—নেহাৎ পরমায়ু আছে বলিয়াই বাঁচিয়া আছে। আজ তাহারা নিরুপায়ের মত ইহাই ভাবিতে শিখিয়াছে, জিনিসটা খাঁটি নাই বা হইল, ভেজালটা অন্ততঃ যেন নির্ভেজাল হয়। অর্থাৎ দুধে জল থাকে থাকুক, জলটা নির্দ্দোষ হইলেই হইল, যেন ডাক্তার না ডাকিতে হয়। আবার ডাক্তার ডাকিয়াও রক্ষা নাই—ঔষধে ভেজাল। খাদ্যদ্রব্যে তবু শুধু ভেজাল, ঔষধের বলায় অনেকগুলিই জাল। এই জাল-ভেজালের তথ্য পূর্ব্বে অনেক প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাদের ধরিবার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থাও অনেক করা হইয়াছে। কিন্তু ভেজালের মাত্রা কমিতেছে না, বরং উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে।

প্রতিকারের উপায় চিন্তা অনেকেই করিতেছেন, কিন্তু সকল উপায়কে ব্যর্থ করিয়া দিয়া তাহাদের অবাধ রাজত্ব চলিতেছে। পৌরসভার হেলথ অফিসার বলিতেছেন, গুরু পাপে লঘু দণ্ডের ব্যবস্থাটাই আমাদের কাল হইয়াছে। শাস্তির লক্ষ্য হইতেছে দুইটি। এক, অপরাধীর চরিত্র সংশোধন, দুই, অপরাধ নিবারণ। নামমাত্র সাজায় কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইতেছে না।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য-দপ্তরের সচিব একটুখানি আশার বাণী শুনাইয়াছেন। ঔষধপত্রাদি সম্পর্কিত আইনটি এমনভাবে

সংশোধন করা হইবে যাহাতে শাস্তির কঠোরতা বৃদ্ধি পায়। রাজ্য-সরকারগুলির নিকট প্রয়োজনীয় নির্দেশনামাও পাঠানো হইবে। আইন-মাফিক ঔষধ তৈয়ারী হইতেছে কিনা দেখিবার জন্যও ইন্‌সপেক্টার নিয়োগের কথা চলিতেছে।

কিন্তু কথা হইতেছে, এইরূপ বিবিধ ব্যবস্থা বহুবার হইয়াছে। যে ব্যবস্থায় কোন ফল হইবার নহে, প্রতিকারের নামে বিবিধ প্রক্রিয়া করিলেই কি তাহা বন্ধ হইয়া যাইবে?

ইহা বন্ধ করিতে হইলে মরক্কো সরকার যাহা করিয়াছেন, তাহার কথা ভাবিতে হয়। সে দেশে ঠিক এইভাবেই ৬,১০০ লোক বিষ-ক্রিয়ার কবলে পড়িবার পর, সরকার স্বাস্থ্যহানিকর অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ-ব্যবস্থা এদেশে অনেকের হয়ত মনঃপূত হইবে না। তাঁহারা কাজীর বিচারের যুগে ফিরিয়া যাইতে চাহিবেন না—সভ্যতার দোহাই দিবেন। কিন্তু কোন্ সভ্যদেশে আজও খাদ্যদ্রব্যে বিষ মিশাইতেছে? অপরাধ কাহার বেশি, যে-ব্যক্তি একটিমাত্র লোকের প্রাণ হরণ করে তাহার না যে ব্যবসায়ীরা অসংখ্য মানুষের জন্য মৃত্যুর নিষ্ঠুর ফাঁদ রচনা করিয়া রাখে তাহাদের। আজ হউক, কাল হউক, এ প্রশ্নের জবাব সরকারকে দিতেই হইবে। আমাদের প্রশ্ন এই যে, একটি মাত্র হত্যার অপরাধে যে অপরাধী, তাহার জন্য ফাঁসির ব্যবস্থা যখন এদেশে আজও বহাল আছে তখন এই ভেজাল দিয়া ব্যাপক হত্যার শাস্তি কি হওয়া উচিত?

কানপুরে পুলিশের গুলীবর্ষণ

কানপুরে এক উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার কারণে পুলিসের গুলীবর্ষণ এবং এই গুলীবর্ষণের ফলে ১১ জন লোক নিহত ও বহুলোক আহত হয়। উন্মত্ত জনতা পুলিসের উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করে, একটি সাব-পোষ্ট অফিসে আগুন জ্বালাইয়া দেয়, একখানি যাত্রীবাহী বাস ও একটি পোষ্ট্যাল ভ্যানে অগ্নিসংযোগ করে। এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, আহতের মোট সংখ্যা ৯০ জন, পুলিস সহ ১৩৭। নিহতদের মধ্যে দুই জন কলেজের ছাত্র, একটি বালক ও ৪৩ বৎসর বয়স্কা একজন মহিলা আছে। কালেক্টর গঞ্জ থানার উপর জনতা ইট-পাটকেল ছুড়িতে থাকে। পুলিস লাঠি চার্জ করিয়া এবং কাঁদুনে গ্যাস ছুড়িয়া জনতা ছত্রভঙ্গ করিতে ব্যর্থ হইলে গুলী চালায়। যে উপলক্ষে এই ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা সংক্ষেপতঃ এই যে, শহরে রটিয়া যায় জনৈকা বিবাহিতা মহিলাকে একজন হেড কনেষ্টবল ধর্মশালা হইতে টানিয়া লইয়া গিয়া থানার ভিতর তাহার শ্লীলতা হানি করে। যে হেড কনেষ্টবলের বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ আনা হয়, তাহাকে তখনই সাসপেণ্ড করিয়া হাজতে রাখা হয়। কিন্তু হেড কনেষ্টবলকে জনতার হস্তে অর্পণ করার জন্য জনতার পক্ষ হইতে দাবি জানান হয়। পুলিস এই দাবি মানিয়া লইতে অস্বীকার করায় জনতা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। কানপুর শিল্প-অধ্যুষিত অঞ্চল, একবার কোন উপলক্ষে উচ্ছৃঙ্খলা দেখা দিলে সহজেই উহা চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং উত্তেজিত জনতা শান্ত করা কঠিন হয়, যে ব্যাপারে ১১ জন লোক নিহত এবং শতাধিক লোক আহত হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষায় যাহারা নিয়োজিত, তাহাদেরই একজন যদি একটি বিবাহিতা নারীর শ্লীলতা হানি করে, তাহা হইলে সে অভিযোগও গুরুতর। দিল্লীতে সম্প্রতি যে রাজ্যপাল সম্মেলন হইয়া গেল, তাহাতে নিরস্ত্র জনতার উপর পুলিসের গুলীবর্ষণ বন্ধ করার কথা বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। উহার কিছু পরেই কানপুরে পুলিসের এই গুলীবর্ষণের ঘটনা যেমন মর্মান্তিক, তেমনি শোচনীয়। সম্প্রতি একাধিক স্থানে একাধিকবার উত্তেজনা দেখা গিয়াছে, এবং হাঙ্গামায় মধ্যে লুঠ-তরাজের চেষ্টাও হইয়াছে। প্রত্যেক বড় শহরে জনসংখ্যা যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে জনতা একবার দলবদ্ধ ভাবে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলে তাহাকে ছত্রভঙ্গ করা কঠিন, কিন্তু তাহা অপেক্ষাও শোচনীয় ব্যাপার এই যে, উহাতে নিরীহ ব্যক্তিরাও মারা পড়ে। কানপুরেও যে তাহাই হইয়াছে, তাহা অনুমান করা যায়। প্রত্যেক গুলীবর্ষণের পরেই প্রশ্ন উঠে যে, নিরস্ত্র জনতার উপরে পুলিসের গুলীবর্ষণের অবসান হইবে কবে? অন্য দিকে এরূপ প্রশ্নও স্বাভাবিক যে, জনতা অল্পকালে এত অধিক পরিমাণে উত্তেজিত হয় কেন? কানপুরের ঘটনায় উত্তেজনার কারণ অবশ্যই ছিল। কিন্তু সামাজিক অবস্থার মধ্যেই এমন এক প্রতিকূল আবহাওয়া বহিতেছে যে, প্রায় সকল মানুষের মধ্যেই কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান পর্যন্ত আজ অন্তর্হিত হইয়াছে।

বেকারদের কথায় শ্রীনেহরু

বেকার-সমস্যা যে আমাদের দেশে কি ব্যাপক আকার লইয়াছে তাহা হায়দরাবাদের একটি জনসভায় শ্রীনেহরুই ব্যক্ত করিয়াছেন। পরিশেষে তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, বহু লোক তাঁহার নিকট যায় এবং চাকুরীর প্রার্থনা জানায়। কিন্তু তিনি কোথায় চাকুরী খুঁজিয়া পাইবেন? একজন পিওন নিয়োগেরও ক্ষমতা তাঁহার নাই। কারণ, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মারফতে পিওন বাছাই হইয়া থাকে। সেই নির্বাচিত পিওনদের মধ্য হইতেই তিনি কাহাকেও নিয়োগ করিতে পারেন। তাঁহার আপিসে তিনি একজনও পিওন নিয়োগ করেন নাই। গবর্ণর বা রাষ্ট্রদূত নির্বাচনের ক্ষমতা তাঁহার অবশ্য আছে। কিন্তু বিভাগীয় চাকুরীগুলিতেও বাঁধা-ধরা নিয়ম-কানুন আছে। শ্রীনেহরু যদিও ঠিক কথাই বলিয়াছেন, তথাপি সাধারণ লোক সে কথা মানিতে চাহিবে কেন। প্রধানমন্ত্রী যদি চাকুরী দিতে না পারেন তবে কে পারিবে? শুধু প্রধানমন্ত্রী নহেন, যিনি যেখানে যে কোন কাজে নিযুক্ত রহিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নিকটেই বহু লোক কাজের জন্য গিয়া থাকেন। "যে কোন একটা কাজ দিন" এই কাতর আবেদন লক্ষ লক্ষ লোকের নিকট হইতে প্রতিদিন যে কতবার শুনিতে হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। শ্রীনেহরুই যদি বলেন, কোথায় কাজ খুঁজিয়া বাহির করিব, তবে অন্যেরা কি বলিতে পারে? প্রধান-

মন্ত্রীর নিকট আবেদন জানাইবার সুযোগ সকলের হয় না, কিন্তু সরকারী বে-সরকারী যে সকল কর্ম্মচারীর দ্বার সকলের জন্য অবারিত তাঁহারা নিশ্চয়ই এই অনুরোধের আতিশয্যে তাঁহার অপেক্ষা বহু গুণ বেশী বিপন্ন। নিয়ম-কানুনে তাঁহারা বাঁধা থাকিতে পারেন, কিন্তু মানুষের প্রয়োজন ত নিয়ম-কানুন মানিয়া দেখা দেয় না। তবে একটা কথা সকলকে স্মরণ রাখিতে হইবে, সকলেই চাকুরী করিব এই মনোভাব দূর করিতে না পারিলে, কেহই কিছু করিয়া দিতে পারিবে না। এইজন্যই বাঙালীকে কেরাণী অপবাদ সহ্য করিতে হইতেছে। জীবিকার জন্য উপায় আমাদেরই আজ বাছিয়া লইতে হইবে।

জঙ্গীপুর যক্ষ্মা-হাসপাতাল

রঘুনাথগঞ্জে 'ভারতী' পত্রিকা জানাইতেছেন :

জঙ্গীপুর হাসপাতালে যক্ষ্মা রোগীদের চিকিৎসার যে ব্যবস্থা আছে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত অপ্রচুর। কোন রোগী এখানে হাসপাতালে গেলে তাহাকে বহরমপুরে পরীক্ষার জন্য পাঠান হয়। বহরমপুর চেষ্ট ক্লিনিক হইতে পরীক্ষান্তে কিভাবে চিকিৎসা হইবে তাহা বলিয়া দেওয়া হয়। রোগী সেই প্রেসক্রিপশন এখানকার হাসপাতালে দেখাইলে তাহার প্রয়োজনীয় ঔষধ-ইন্‌জেক্‌শনাদির জন্য বহরমপুরে লেখা হয়। বহরমপুর হইতে ঔষধ সরবরাহ করা হইলে তবে রোগীকে ঔষধ দেওয়া হয়। স্থানীয় হাসপাতাল শুধু মধ্যবর্ত্তী পোষ্ট আপিসের মত কাজ করে। এই সরকারী কায়দা-কানুনের দীর্ঘসূত্রী পথে ঔষধ আসিয়া পৌঁছাইতে অনেক দেরি হয়। তাহা ছাড়া, বহরমপুর হইতে কোন সময়েই চাহিদার পরিমাণ অনুযায়ী ঔষধ সরবরাহ করা হয় না। যাঁহাকে বহরমপুর চেষ্ট ক্লিনিক হইতে কুড়িটি ইন্‌জেকশন লইতে বলা হয়, তাঁহার জন্য শেষ পর্য্যন্ত বহরমপুর হইতে এখানকার হাসপাতালে ছয়টি ইন্‌জেক্‌শন হয়ত আসিয়া পৌঁছায়। ইহার ফলে রোগীদের অসুবিধা হয়। আমরা চাই, যক্ষ্মা রোগীদের চিকিৎসায় যেন সরকার দ্রুত পরীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করিয়া প্রয়োজনীয় পরিমাণ ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থা করেন।

বারাসতের সদর রাস্তা

'বারাসত' পত্রিকার এই সংবাদটির প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। পথের ক্ষতি মানুষকে বিপন্ন করে ইহা তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত।

গত চার মাস ধরিয়া অত্যধিক বৃষ্টিপাত বর্ষাজনিত কারণে বারাসত শহরের অন্তর্বিস্তর প্রায় সমস্ত পথের ক্ষতি হইয়াছে। যে সমস্ত পথের উপর দিয়া বাস, লরী প্রভৃতি ভারী যানবাহন চলাচল করে ইহার ক্ষতি খুবই বেশী হইয়াছে। পীচগুলি উঠিয়া গিয়াছে অথবা কাটিয়া গিয়াছে এবং পীচের পার্শ্ববর্ত্তী উভয় দিক গভীর খাদে পরিণত হইয়াছে। এই খাদগুলি এইরূপ বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে যে, রিক্সা, সাইকেল কেন পায়ে-হাঁটা পথিকের বিপদ যে কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তে ঘটিতে পারে। যদিও বারাসত পৌরসভা বড় বড় গর্ত্ত ও খাদের উপর কিছু কিছু মাটি ফেলিতেছেন কিন্তু এই ব্যবস্থা কোন প্রকারেই সমর্থন করা যায় না। কেন না বাস, লরী প্রভৃতি ভারী ভারী যানবাহনের চাকার চাপে আলগা মাটি কয়েকদিনের মধ্যেই উঠিয়া যাইবে এবং বর্ত্তমান ভিজা পথ একটু শুষ্ক হইলে ইহার দ্বারা ভীষণ ধূলার সৃষ্টি হইবে। প্রকৃতপক্ষে বর্ষার ক্ষতিগ্রস্ত পথগুলির আমূল সংস্কারের আবশ্যক হইয়াছে। বারাসত পৌরসভার দৈনিক বাজার হইতে রেল গেট পর্য্যন্ত পথটার পীচ বাধাই আরও প্রশস্ত করা আবশ্যক। এই পথের উপর ব্যারাকপুর রোড ও কৃষ্ণনগর রোডের বিভিন্ন বাস চলাচল করে। হরিতলা হইতে রেল গেট পর্য্যন্ত কয়েক ফার্লং পথের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় এবং বিপজ্জনক হইয়াছে। রিক্সা-চালকেরা পথের জন্য ভীষণ কষ্টভোগ করিতেছে এবং রিক্সাগুলিও দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে।

করিমগঞ্জ হাসপাতাল

করিমগঞ্জে 'যুগশক্তি' পত্রিকার এই সংবাদটি সত্য হইলে ইহার সত্বর প্রতিকার আবশ্যক।

করিমগঞ্জ হাসপাতালে রোগীদের আগমন এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে বর্ত্তমানে যে সমস্ত কর্ম্মচারী আছেন তাহাদের দ্বারা কাজ চালাইয়া যাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর। হাসপাতালে স্থানাভাব হেতু বহু রোগীকে বারান্দায় বাস করিতে অথবা ফিরিয়া যাইতে হইতেছে।

হাসপাতালের সম্প্রসারণ সত্বর সম্পূর্ণ করা প্রয়োজন। বিভিন্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারীর সংখ্যাও বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক। এই হাসপাতালে একজন ড্রেসার এবং আরও একজন কম্পাউণ্ডার নিয়োগ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ মহল হইতে যে প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছিল তাহাও এ পর্য্যন্ত পূরণ করা হয় নাই। তদুপরি লেডি ডাক্তারও বর্ত্তমানে ডিব্রুগড়ে চলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং লেডি ডাক্তার ছাড়াই এখন হাসপাতাল চলিতেছে। প্রকাশ, এপিডেমিক ডাক্তার অন্যত্র বদলী হওয়ায় হাসপাতালের একজন ডাক্তারকে উক্ত পদে সরাইয়া নেওয়া হইয়াছে। ফলে, একজন মহকুমা মেডিকেল অফিসার ও আর এক-জন এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনকে দিয়া হাসপাতালের সমস্ত কাজ চলিতেছে। তার উপর রহিয়াছে করিমগঞ্জ জেলের কাজ—মহকুমা মেডিকেল অফিসার জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

আরও একজন ডাক্তার, একাধিক কম্পাউণ্ডার, ড্রেসার ও একাধিক নার্স এই হাসপাতালে অবিলম্বে নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক। একজন হেলথ ভিজিটারও প্রয়োজন। লেডি ডাক্তার ছাড়া এই হাসপাতাল চলিতে পারে না। অবিলম্বে এখানে একজন লেডি ডাক্তার নিযুক্ত করার জন্য করিমগঞ্জবাসীর পক্ষ হইতে সরকারের কাছে দাবি জানাইতেছি।

করিমগঞ্জ হাসপাতালের সব অব্যবস্থা দূরীকরণ এবং সামগ্রিক উন্নয়নকল্পে আসাম সরকারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে।

বালুরঘাট সদর অপসারণের চেষ্টা

বালুরঘাট 'আত্রেয়ী' পত্রিকা নিম্নের সংবাদটি দিতেছেন :

গত ১২ বৎসরকাল হইল বালুরঘাটে জেলার সদর রহিয়াছে। কিছুকাল হইল বালুরঘাট হইতে জেলা সদর অপসারণের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন হয়। তখন ডা: রায় বিকল্প পন্থা হিসাবে জানাইয়া দেন যে, বালুরঘাটের উন্নয়ন ও বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা না করিয়া বালুরঘাট হইতে সদর শহর অপসারণ করা হইবে না।

এখন এক যুগ পর জেলা সদর অপসারণের কোন প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বালুরঘাটে কোনরূপ উন্নয়নমূলক কাজও এ যাবৎ কাল আরম্ভ হয় নাই। দীর্ঘকাল যাবৎ বালুরঘাট মহকুমা হাসপাতালেই সদর হাসপাতালের কাজ চালাইয়া যাওয়া হইতেছে। কিন্তু যখন বালুরঘাট শহরের অধিবাসীর সংখ্যা ছিল মাত্র আট হাজার তখনকার হাসপাতালে এখন পঞ্চাশ হাজার লোকের কিরূপ চিকিৎসাকার্য্য চলিতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়।

পৌরসভায় এখন অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের শাসন চলিতেছে। বালুরঘাটের উন্নয়নের জন্য ১৯৫০ সাল হইতে রেলপথ স্থাপনের তোড়জোড় আরম্ভ হয়, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে, রেলপথ নির্ম্মাণ পরিকল্পনাটি তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

পালিতপুর-বক্রেশ্বর তা রোড

বর্দ্ধমানের 'দামোদর' পত্রিকার এই সংবাদটি উল্লেখযোগ্য। কারণ প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়া এই রাস্তাটির মূল্য অনেকখানি। কর্ত্তৃপক্ষের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া দরকার।

বর্দ্ধমান সদর থানার সরাইটিকর ইউনিয়ানের অন্তর্গত মনগিরা, পালিতপুর, নূতনগ্রাম, সিজেপাড়া, দিউড়া প্রভৃতি গ্রামগুলির একমাত্র বহির্গমনের পথ "পালিতপুর-বক্রেশ্বর তা রোডটি" বর্দ্ধমান-কাটোয়া রাস্তার দেওয়ানদীঘি হইতে পালিতপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে। রাস্তাটি বর্দ্ধমান জেলা বোর্ডের অধীন কিন্তু ১৩৬৫ সাল হইতে উক্ত রাস্তাটির কোনরূপ মেরামত হয় নাই। ফলে গত বৎসর হইতে রাস্তাটির উপর কয়েকটি বৃহৎ ভাঙ্গন হইয়াছে। গ্রামগুলি হইতে দৈনিক বহু ছাত্র, শ্রমিক, ব্যবসায়ী ও চাকুরীজীবিকে বর্দ্ধমান যাইতে হয়। তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা নাই। পরাধীন ব্রিটিশ ভারতে কোন দিন রাস্তাটি মনুষ্য যাতায়াতের অনুপযুক্ত হয় নাই বলিয়া গ্রামগুলির অধিবাসীগণ এক মিলিত আবেদন জানাইয়াছেন।

মহিলা যাত্রীদের অভিযোগ

সংবাদটি বাহির হইয়াছে জলপাইগুড়ির 'জনমত' পত্রিকায়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

যে বাসটি জলপাইগুড়ি হইতে রায়গঞ্জ বা বালুরঘাটে যায় সেই বাসটিতে যাত্রীদের যাতায়াতে বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। দূর-পাল্লার যাত্রীদের জন্য, বিশেষ ভাবে মহিলাদের জন্য পথের মাঝে মাঝে বিশ্রামাগার, পায়খানা ও প্রস্রাবাগার না থাকিলে মহিলা যাত্রীদের বিশেষ অসুবিধা হয়। বর্ত্তমানে রেলে দেখা যাইতেছে কয়েকটি কামরাতে মিলিটারীগণ যাতায়াত করে এবং সাধারণ যাত্রীদের সেই কামরায় ওঠা সম্ভব হয় না। এই অবস্থায় যাত্রীদের স্থান সঙ্কুলানে বিশেষ অসুবিধা হয়। নর্থ ব্যাঙ্ক এক্সপ্রেস, লক্ষ্ণৌ, আমিন-গাঁও এক্সপ্রেস প্রভৃতি গাড়ীতে মিলিটারীদের জন্য আলাদা রিজার্ভ কামরা থাকা প্রয়োজন। তাহা হইলে সাধারণ যাত্রীগণেরও সুবিধা হয়—মিলিটারী চলাচলেও বিঘ্ন ঘটে না। নতুবা প্রায়ই যে গণ্ড-গোল হইতেছে তাহা আরও বৃদ্ধি পাইবে।

দলিল-দস্তাবেজ সংরক্ষণে নূতন ব্যবস্থা

ভারতের জাতীয় দলিল-দস্তাবেজ রক্ষার দপ্তর হইতে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে। বিজ্ঞপ্তিটি এইরূপ : "ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিচায়ক বহু প্রাচীন দলিল, চিঠিপত্র, হস্তলিখিত দ্রব্যাদি ভারতের নানাস্থানে বিচ্ছিন্ন ভাবে ছড়াইয়া আছে। এই সকল দলিলাদিতে ভারতের অতীত যুগের বিষয়-ব্যাপার সম্পর্কে আলোকসম্পাত করে। কিন্তু বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট অজ্ঞাতভাবে উহা ছড়াইয়া থাকায় বা সযত্নে রক্ষিত না হওয়ায় উহা যে কোন সময় নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। ন্যাশনাল আর্কাইভস উহা বিভিন্ন স্থান হইতে একস্থানে মজুত ও রক্ষা করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। এজন্য তাঁহারা জনসাধারণকে অনুরোধ জানাইতেছেন, ঐতিহাসিক মূল্য আছে এরূপ দুর্লভ হস্তলিখিত জিনিস, দলিল, ফরমান, নিশান, পরোয়ানা, সনদ ইত্যাদি যাঁহাদের নিকট আছে, তাঁহারা যেন নয়াদিল্লীর দলিল-রক্ষা-দপ্তরে উহা দান করেন। জাতীয় স্বার্থেই ইহা বিশেষ প্রয়োজন। দলিল-দপ্তর ইতিমধ্যে এরূপ দুই হাজার দলিলপত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। মূল্যবান তথ্যসম্বলিত জিনিস যদি কেহ দান করিতে অনিচ্ছুক হন এবং বিক্রয় করিতে চাহেন, তাহা হইলেও যুক্তিসঙ্গত মূল্যে সরকার উহা ক্রয় করিতে পারেন। দান বা বিক্রয় কিছুই করিতে যাঁহারা রাজী নহেন, অথচ তাঁহাদের জিনিস যদি প্রয়োজনীয় মনে হয়, তাহা হইলে সরকার অগত্যা সেই সকল দলিলের চিত্র রক্ষা করিবেন। স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে সকলেরই এই সকল অতি-মূল্যবান জিনিস জাতীয় দলিল-রক্ষাগারে দান করা উচিত। বহু প্রাচীন চিঠিপত্রাদি ইতিপূর্ব্বে অযত্নে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পুরাতন জিনিস রক্ষা সম্পর্কে সকলে সমান আগ্রহশীল নহেন। এক পরিবারের কর্ত্তার নিকট যাহা বিশেষ মূল্যবান, তাঁহার বংশধরের নিকট হয়ত উহা অনাবশ্যক বিবেচিত হয়। কোন্ জিনিসের কি মূল্য, তাহা অনেকে উপলব্ধিও করিতে পারেন না। জাতীয় দলিল-রক্ষাগারে উহা দান করিলে যেমন উহা সযত্নে রক্ষিত হইবে, তেমনি ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবেও

উহা স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই কারণেই প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি-পত্র-দলিলাদি যাহা যাঁহার নিকট আছে তাহা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জানাইতে, দান বা বিক্রয় করিতে কিংবা উহার মাইক্রোফিল্ম করিয়া রাখিয়া দিতে আমরাও দেশবাসীর নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। কারণ, ইহা জাতীয় কর্ত্তব্যেরই অঙ্গ।

সর্ব্বাধিক প্রাচীন গম্বুজ আবিষ্কৃত

ইস্কার দরিয়ার তীরে শক উপজাতিগুলির প্রধানদের একটি কবর আবিষ্কৃত হইয়াছে। পৃথিবীর স্থাপত্যের ইতিহাসের সমস্ত গম্বুজের মধ্যে এই কবরের গম্বুজই সর্ব্বাধিক প্রাচীন।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞান পরিষদের করেসপণ্ডিং মেম্বর এবং প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানের নেতা সের্গেই তলস্তফ জানাইয়াছেন, এই নবাবিষ্কৃত গম্বুজটি নির্ম্মিত হইয়াছিল রোমের সর্ব্বাধিক প্রাচীন গম্বুজওয়ালা ইমারতগুলি নির্ম্মিত হওয়ার দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে। এতকাল লোকের এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, এই ধরনের ইমারত প্রথমে নির্ম্মিত হয় রোমে, তার পর বাইজানটিয়ামে (প্রাচ্য রোম রাজ্যের রাজধানী কনষ্টানটিনোপলে)। পরবর্ত্তী যুগে এই স্থাপত্য-রীতিই এশিয়ায় অনুকরণ করা হইয়াছে।

কিন্তু উক্ত কবর আবিষ্কৃত হওয়ায় এই ধারণা এখন মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

বিশ্বভারতীর উপাচার্য্য পদে শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ

বিশ্বভারতীর উপাচার্য্য পদে শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ বৃত হইয়াছেন। এই পদে তাঁহার নিয়োগ অবশ্য অপ্রত্যাশিত নয়। কিছুদিন ধরিয়া বিশ্বভারতীর মধ্যে দলাদলি, কলহ, ক্ষমতার কাড়াকাড়ির জন্য যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছিল শ্রীযুক্ত দাশের নিয়োগে এবার তাহার অবসান হইল। শ্রীযুক্ত দাশ এই বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন। বিশ্বভারতীর সঙ্গে তাঁহার আত্মিক যোগ। ইহার আদর্শ ও লক্ষ্য একদিন তাঁহারও জীবনাদর্শের অঙ্গীভূত হইয়াছিল। আজ দেশবাসীর জন্য তাহাকেই সত্য করিয়া তুলিবার ভার তাঁহারই উপর পড়িয়াছে। উপাচার্য্য হিসাবে তাঁহার প্রাপ্য মাসিক দেড় হাজার টাকা দক্ষিণা শ্রীদাশ স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া, ছাত্র ও কর্ম্মী-কল্যাণের জন্য সমর্পণ করিবেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। এইরূপ ত্যাগব্রতে উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি বিশ্বভারতীকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলুন এবং কবিগুরুর স্বপ্নকে সার্থক করিয়া তুলুন—জাতির পক্ষ হইতে ইহা অপেক্ষা বড় শ্রদ্ধার্ঘ্য আর নাই।

বিশ্বভারতীর কর্ত্তৃত্ব লইয়া দীর্ঘদিন তুমুল গোলমাল যাহা চলিতেছিল নূতন উপাচার্য্য প্রবীণ ব্যবহারজীব এবং ভারতের উচ্চতম ধর্ম্মাধিকরণের যিনি একদা প্রধান ছিলেন, তাঁহার বিচার-বিবেচনায় এইবারে গোলমালের মূল অপসারিত হইবে আমরা আশা করি।

ডঃ জন মাথাই

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ ও স্বাধীন ভারতের দ্বিতীয় অর্থসচিব ডঃ জন মাথাই যকৃতে ক্যান্সাররোগে গত ২রা নবেম্বর পরলোকগমন করিয়াছেন। ডঃ জন মাথাই ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই জানুয়ারী ত্রিচুড়ে জন্মগ্রহণ করেন। মাদ্রাজ খ্রীষ্টান কলেজে কৃতিত্বপূর্ণ ছাত্র-জীবন শেষ করিয়া তিনি লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্‌সে এবং অক্সফোর্ড বেলিয়ল কলেজে অধ্যয়ন করেন। লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্‌স হইতে তিনি ডি-এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন। বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ডঃ মাথাই মাদ্রাজ হাইকোর্টে আইনজীবী হিসাবে প্রবেশ করেন। তাহার পর তাঁহার দীর্ঘ-কর্ম জীবনের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে। বস্তুতঃ রাজনীতির সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটিয়াছিল প্রায় জীবন-সায়াহ্নে, জীবনের আরও নানাক্ষেত্রে—শিক্ষায়, শিল্পে আর বাণিজ্যে—তীক্ষ্ণধী এই মানুষটির প্রতিভার প্রভাব যখন স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে। ডঃ মাথাইয়ের প্রধান পরিচয়—এ যুগের তিনি এক অসামান্য অর্থনীতিবিদ্‌। অর্থনীতির মৌল রহস্যগুলিকে তিনি অধিগত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই ব্যাপারে জ্ঞানার্জ্জনই শুধু লক্ষ্য ছিল না। তাঁহার লক্ষ্য ছিল আরও দূরপ্রসারী—ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে তাঁহার জ্ঞানকে তিনি ফলপ্রসূ করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের শিল্প-জীবনে সেই জ্ঞানের প্রভাব যে কতখানি ফলপ্রসূ হইয়াছে, সে কথা আজ কাহারও অজানা নাই। পরবর্ত্তীকালে—স্বাধীনতালাভের পর, এদেশের রাজনৈতিক জীবনেও সেই সুফলের অংশভাক্‌ হইয়াছে। ডঃ মাথাইয়ের মৃত্যুতে অর্থনীতির ক্ষেত্রে এমন একটি আসন আজ শূন্য হইয়া গিয়াছে, অনতিকালের মধ্যে যাহা পূর্ণ হইবার নহে।

অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু

প্রখ্যাত নাট্যকলা-রসিক, নটগুরু ও শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু গত ২৮শে আশ্বিন পরলোকগমন করিয়াছেন। বঙ্গ রঙ্গালয়ের সহিত অধ্যাপক বসুর দীর্ঘ ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। তাঁহার এই লোকান্তর প্রাপ্তির ফলে বাংলার শিক্ষা সংস্কৃতি তথা সাহিত্য ও নাট্যকলার রাজ্য হইতে একজন প্রবীণ মনীষীর আসন শূন্য হইয়া গেল। স্কটিশ চার্চ্চ কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে জীবন আরম্ভ করিয়া তিনি পরে স্কটিশচার্চ্চের অধ্যাপক হন এবং সুদীর্ঘকাল এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। শিশিরকুমার ভাদুড়ী, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তি তাঁহার ছাত্র। বাংলা নাটক ও নাট্যালয়ের আদি যুগ হইতেই তিনি ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং একাধারে নাট্যকার ও নাট্য-ব্যাখ্যাতা হিসাবে দেশে প্রভূত খ্যাতির অধিকারী হন। বাংলা নাটক ও নাট্যশালা সম্বন্ধে তিনি বহু মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন। গিরীশ-বক্তা হিসাবেও নাট্যকলার উপর তিনি যথেষ্ট নূতন আলোকপাত করেন। বার্দ্ধক্যে পর পর দুই পুত্রের পরলোক প্রাপ্তির পরও স্থির শান্ত জ্ঞানতপস্বীর মত তিনি দিনাতিপাত করিয়া গিয়াছেন। এরূপ লোক বর্ত্তমানে বিরল।

গল্প-প্রতিযোগিতা

প্রবাসীর পক্ষ হইতে আমরা গল্প-প্রতিযোগিতার আয়োজন করিতেছি। আগামী ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬ হইতে ১লা চৈত্র, ১৩৬৬-এর মধ্যে লেখকগণ প্রেরিত গল্প লওয়া হইবে। প্রতিটি গল্প তিন হাজার হইতে ছয় হাজার শব্দের মধ্যে হওয়া চাই। গল্পের সঙ্গে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় অবশ্য লেখা প্রয়োজন :

১। নাম

২। ঠিকানা

৩। প্রেরণের তারিখ

৪। ইতিপূর্ব্বে সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রিকায় বা উভয়ে লেখকের কোন গল্প প্রকাশিত হইয়াছে কিনা।

৫। মোড়কের উপর অথবা গল্পের শিরোনামার পাশে লেখা থাকিবে প্রবাসীর গল্প-প্রতিযোগিতার জন্য।

গল্পের গুণানুসারে নিম্নরূপ পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে :

(ক) সর্ব্বোৎকৃষ্ট গল্পের জন্য পুরস্কার একশত টাকা,

(খ) পরবর্ত্তী শ্রেষ্ঠ দুটি গল্পের প্রত্যেকটির জন্য পুরস্কার পঁচাত্তর টাকা,

(গ) পরবর্ত্তী উৎকৃষ্ট পাঁচটি গল্পের প্রত্যেকটির জন্য পুরস্কার পঞ্চাশ টাকা।

এতদ্ব্যতীত যেসব গল্পের জন্য পুরস্কার দেওয়া হইবে না, অথচ প্রবাসীতে প্রকাশযোগ্য বিবেচিত হইবে সে সকল গল্পের নিমিত্ত লেখকগণকে যথানিয়মে দক্ষিণা দেওয়া যাইবে।

প্রকাশ থাকে যে, প্রাপ্ত পুরস্কার গল্প এবং অপ্রাপ্ত পুরস্কার অথচ প্রকাশযোগ্য সকল গল্পই ক্রমান্বয়ে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইবে।

গল্প-প্রতিযোগিতার জন্য প্রদত্ত গল্প অন্য কোন গল্পের অনুবাদ, আংশিক অনুবাদ বা ছায়া-অবলম্বনে লিখিত হইলে চলিবে না এবং অন্যত্র প্রকাশিত গল্প গ্রাহ্য হইবে না।

প্রবাসীর বিচার চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। গল্প-প্রাপ্তির শেষ-তারিখের পর যথাসম্ভব শীঘ্র প্রবাসীতে প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষিত হইবে। এ সম্বন্ধে কোন পত্রালাপ চলিবে না।

কর্ম্মাধ্যক্ষ—"প্রবাসী"



ঐতিহাসিক আচার্য্য যদুনাথ সর:

ডক্টর শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

Mommsen বলিয়াছেন, ইতিহাস এক হিসাবে পবিত্র বাইবেল পুস্তক, সাধু ও শয়তান সমানভাবে উহা কাজে লাগাইতে পারে। স্বদেশী যুগে দেখিয়াছি খুনে বিপ্লবীর এক হাতে পিস্তল, অন্য হাতে "গীতা", মুখে "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়…"। এখন শুনিতেছি Karl Marx-র বহু পূর্ব্বে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ "সাম্যবাদ" (Socialism) প্রচার করিয়া গিয়াছেন, ভণ্ড ব্রাহ্মণ কায়েমী স্বার্থের খাতিরে গীতার অপব্যাখ্যা করিয়া নিজে ডুবিয়াছে, দেশ ও জাতিকে ডুবাইয়াছে। ধর্ম্মধ্বজী "মহাসভা" গীতা আবৃত্তি করিয়া প্রমাণ করিতেছে অনাচারী "কংগ্রেস" ধর্ম্মরূপী বৃষের অবশিষ্ট পা-খানা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, জবাই করিতে ইতস্ততঃ করিবে না; ভগবান বলিয়াছেন, "চাতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টম", সেই সমাজ কোথায়? অজাতি বিজাতি বিবাহ করিয়া হিন্দু-সন্তান বর্ণসঙ্কর জন্মাইতেছে, কিন্তু "সঙ্করাঃনরকায়ৈব চ…"; মুসলমানের ভোটের জোরে মুসলমানী দায়ভাগ হিন্দুর উপর চাপাইয়াছে, হিন্দুর মেয়ে বিধর্ম্মী বিবাহ করিয়া বাপদাদার সম্পত্তির উপর কামড় বসাইবে। হিন্দু ফাঁপড়ে পড়িয়া ভাবিতেছে, আজাদী রাখি, না হিন্দুয়ানি রাখি? পণ্ডিতজীর চেয়ে আওরঙ্গজেব খারাপ কি ছিল? ইহাই সনাতনী মনোভাব,—গঙ্গাকে উত্তর-বাহিনী করিয়া গঙ্গাধরের জটাজালে পুনঃস্থাপনের প্রয়াস।

আগ্নেয়গিরির মুখে বসিয়া আমরা কবিতা আওড়াইয়া মনকে প্রবোধ দিতেছি:

"দ্বিতীয় বাবর ভারতের রঙ্গভূমে হইয়া উদয়
অভিনব রাজ্য নাহি করিবে স্থাপন। কিংবা
অতিক্রমী দূর হিমাদ্রিকান্তার, দিল্লীর ভাণ্ডার রাশি
করিতে লুণ্ঠন ভীমবেগে দস্যুস্রোত আসিবে না আর।"

ভাল কথা, কিন্তু "বর্ত্তানিয়া" কোথায়?

যাহারা কিছু হিসাবী তাহারা বলিবে, আমরা প্রতিবেশীর চেয়ে সংখ্যায় দশগুণেরও বেশী; আমাদের ফৌজ পাকিস্থানী ফৌজের চেয়ে তিন গুণ ভারি; তবে সীমান্তের এপারে দ্বিপদ ছাগল অর্দ্ধেকের বেশী, ঐ পারে সব নেকড়ে বাঘ!

ঐতিহাসিক বলিবে পাণিপতে, খানুওয়ায় (বাবর-সংগ্রাম সিংহের যুদ্ধ) হিন্দুস্থানী ফৌজ কি সংখ্যায় কম ছিল? অহিংসবাদী মনে করে আমাদের বৈষ্ণব রাষ্ট্র আমাদের মাথার উপর চরকা-চক্র ঘুরিতেছে, চক্রধারী রক্ষা করিবেন। শাক্ত হতাশ হইয়া ভাবে, হিংসা ছাড়া মায়ের পূজা কেমন করিয়া হয়? ডাকাতি মন্দ কি? ইহা কাপুরুষের ভরসা, স্বাধীন জাতির বলিষ্ঠ মনোবৃত্তি নহে।

নীতি শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, "উপায়ং চিন্তয়ন্ প্রাজ্ঞঃ অপায়মপি চিন্তয়েৎ"; সুতরাং চতুর্থ পাণিপত কিংবা দিল্লীর দশমদশা ঐতিহাসিক সম্ভাব্যতার মধ্যেই রহিয়াছে। ইতিহাস বসন্তের কোকিল নয়, দুর্দ্দিনের আশ্রয়। ঐতিহাসিক যদুনাথ ভারতীয় রাষ্ট্রের "উপায়" এবং "অপায়" চিন্তা করিয়াছেন। শেষ-জীবনে তিনি ভারতবর্ষের সামরিক ইতিহাস রচনা অর্দ্ধ-সমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছেন। স্বাধীনতার পরে যদুনাথের চিন্তার বিষয় ছিল কি করিয়া এই স্বাধীনতা রক্ষা পাইতে পারে, জাতিকে কি ভাবে প্রতিরক্ষা (Defence) সম্বন্ধীয় সমস্যার সমাধান করিতে হইবে, ভারতের আদর্শ-সৈনিক কি ভাবে শিক্ষিত করা উচিত। তিনি এই সম্বন্ধে দৈনিক ও মাসিক পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সামরিক বিভাগ একাধিকবার তাঁহাকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিল, বক্তৃতা শুনিয়া পদস্থ সামরিক কর্ম্মচারীগণ অবাক্ হইতেন যে একজন বেসামরিক নাগরিক যুদ্ধবিদ্যার (Military strategy) এত সূক্ষ্ম বিষয়গুলি কি করিয়া আয়ত্ত করিতে পারেন? যদুনাথের লাইব্রেরীতে যুদ্ধবিদ্যাবিষয়ক পুস্তক সংগ্রহ দেখিলে তাঁহাদের অবাক হওয়ার কারণ থাকিত না। আচার্য্য যদুনাথ কুচকাওয়াজ না করিয়া মনে প্রাণে মেজাজে জঙ্গ-বাহাদুর ছিলেন, এই কথা অধিকাংশ লোক হয়ত জানেন না। পারিবারিক ব্যাপারেও মিলিটারী ভূত যেন তাঁহার কাঁধে চাপিয়াছিল, এক জঙ্গী-জামাতা করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সিঙ্গাপুরে তিনি বীরগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। দুই পৌত্র এবং এক দৌহিত্রকে তবুও তিনি মিলিটারীতে পাঠাইয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেন। একদিন বেশ খোশ মেজাজে তিনি আমাকে বলিলেন, কালিকা, তুমি একটা ছেলেকেও মিলিটারীতে দিলে না? এ দেশের তিন ভাগের এক ভাগ লোক মিলিটারীতে না গেলে

স্বাধীনতা থাকিবে ? তাঁহার অভিপ্রায় যেন আমার তিন ছেলের মধ্যে অন্ততঃ একজন সিপাহী হয়। আমি হাসিয়া বলিলাম, এখন অহিংসার আমল, বাঙ্গালার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলা (নাট্যাকারে) বাঙ্গালীর আদর্শ দেশ-প্রেমিক, বলা হইয়াছে—

"প্রাণান্তে সমরক্ষেত্রে পশিব না আমি।
অরিবৃন্দ দেখিবে না নখাগ্র আমার।"

যদুনাথ শোক পাইয়াছেন, অনুশোচনা করেন নাই। মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার ছোট পৌত্র পুণা ছাউনিতে মোটর-সাইকেল দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ার খবর পাইয়া তিনি শুধু বলিয়াছিলেন, বালক যুদ্ধ করিয়া মরিলে আমার লেশ-মাত্র দুঃখ হইত না। বীরযোদ্ধা (Knight) আর কাহাকে বলে ?

যাহা হউক, প্রথম বয়সে সৈনিক কর্ম্মচারী না হইলে ঐতিহাসিক Gibbon যেমন তাঁহার Decline and Fall of the Roman Empire এমন কৃতিত্বের সহিত সমাপ্ত করিতে পারিতেন না, সেই প্রকার পুস্তক পড়িয়া যুদ্ধ-বিজ্ঞান ও যুদ্ধ-সাহিত্য আয়ত্ত করিতে না পারিলে আচার্য্য যদুনাথ যুদ্ধ-বহুল History of Aurangzib (৫ খণ্ড) এবং Fall of the Mughal Empire রচনা করিয়া যশস্বী হইতে পারিতেন না। লোকে মনে করে যুদ্ধবিদ্যা বহি পড়া বিদ্যাই নয়, কিন্তু মধ্যযুগের ইতিহাস বলে, বহু যুদ্ধবিজয়ী বোহি-মিয়ার বিদ্রোহী নেতা Countzisea জন্মান্ধ ছিলেন, নিজাম-উলমূলক (হায়দরাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা) বৃদ্ধ বয়সে চক্ষু হারাইয়াও পাল্কীতে বসিয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিতেন, সুতরাং চক্ষুষ্মান ব্যক্তির বহি বুদ্ধি ও নিষ্ঠা থাকিলে অন্ততঃ অতীত-কালের যুদ্ধের চাল বুঝিবার মত বিশেষজ্ঞ হওয়া বড় কথা নহে।

আচার্য্য যদুনাথ অপণ্ডিতের জন্য ইতিহাস লিখেন নাই, ইতিহাসে তিনি মতবাদী ছিলেন না, তত্ত্বদর্শী ছিলেন। স্বরচিত ইতিহাসের মধ্যে "মানুষ" যদুনাথকে খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নয়, জুরীর কাছে মামলা বুঝাইয়া দিয়াই তিনি খালাস, যেহেতু জজ উহার বেশী আইনতঃ কিছু বলিতে পারেন না, ঐতিহাসিক কিছু লিখিতে পারেন না। ইহার ব্যতিক্রম হইলেই ঐতিহাসিক সুরুচিসম্পন্ন বিচক্ষণ পাঠকের কাছে "পণ্ডিত মশাই", উকীল কিংবা মতলববাজ প্রচারকের ন্যায় বিরক্তিকর ও সন্দেহভাজন ব্যক্তি হইয়া পড়েন।

৯

মেভারিজ সাহেব ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে History পত্রিকায় আচার্য্য যদুনাথ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, উহার কিছু অংশ পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ইহার পর যদুনাথ চৌত্রিশ বৎসর ইতিহাস চর্চ্চা করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম পুস্তক India of Aurangzib. Topography, Statistics প্রকাশিত হইয়াছিল ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে। History of Aurangzib-এর শেষ খণ্ডে (vol. V, 1924) ঐতি-হাসিক যদুনাথ প্রকৃতপক্ষে তাঁহার অসামান্য প্রতিভার প্রথম পরিচয় দিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি বিশ বৎসরে যাহা লিখিয়াছেন তাহা হয়ত কোন মেধাবী এবং অসাধারণ পরিশ্রমী ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসু চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসরে লিখিতে পারিতেন, কিন্তু পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পরে তিনি ভারতীয় ঐতিহাসিকগণের প্রতিযোগিতার সীমার বাহিরে চলিয়া গেলেন, অথচ তখনও তাঁহার প্রতিভা মাত্র অর্দ্ধস্ফুট। শিবাজীর জীবন-চরিত (Shivaji and His Times, July 1919) রচনা বাঙ্গালী ঐতিহাসিকের পক্ষে নিঃসন্দেহ একটি কঠিন পরীক্ষা, একেবারে "বর্গী"র বুকের উপর হামলা। বয়সে ও বন্ধুত্বে অগ্রজতুল্য রিয়াসৎকার রাও-বাহাদুর সরদেসাইর সহযোগিতা না পাইলে তিনি মোগল তোপখানা লইয়া মহারাষ্ট্রের ইতিহাস-দুর্গে বিজয় পতাকা উড়াইতে পারিতেন না, হয়ত এই উদ্যম সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য অভিযানের মত ঐতিহাসিক যদুনাথের অগস্ত্য-যাত্রা হইত। ব্যক্তি হিসাবে ঐতিহাসিক যদুনাথ আওরঙ্গ-জেবের দোষ-গুণ পাইয়াছিলেন। যদুনাথের "জিদ" (Obstinacy) আওরঙ্গজেবের "জিদের" ন্যায় বাধা পাইলেই মারমুখী হইত, লাভ ক্ষতি বিচার করিত না; সম্রাটের এই জিদে মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়াছিল, ঐতি-হাসিক এই জিদে পড়িলে সেই ধ্বংসের ইতিহাস বোধ হয় আর লিখিত হইত না, যদি তিনি সরদেসাইকে সহায় না পাইয়া একাকী মহারাষ্ট্রের ইতিহাস উদ্ধারের কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিতেন। কোন বিষয়ে আপোষ রফা করা আওরঙ্গজেব এবং যদুনাথ উভয়ের প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল, দুজনেই যাহা সত্য এবং বিবেকের বাণী বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিতেন উহার মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য তাঁহারা সুবিধা-জনক সর্ত্তে কাহারও সহিত সহজে আপোষ করেন নাই। আওরঙ্গজেবের চোখে যাহা কিছু শরিয়ত-বিরুদ্ধ উহাই "অসত্য" এবং এই "অসত্য" ধ্বংস করার আদেশ রসুলাল্লাহর মারফত মুসলমানের কাছে আসিয়াছে। আচার্য্য যদুনাথের পীর না থাকিলেও "রসুল" ছিল, "শরিয়ত" ছিল। এই শরিয়তের "কদম-রসুল" (রসুলাল্লাহর পদচিহ্ন-জ্ঞাপক মসজিদ) কলিকাতা শহরে ওয়ারেন হেষ্টিংসের আমলে স্থাপিত হইয়াছিল—পূর্বনাম Royal Asiatic Society of Bengal। এইখানে বিলাতী পণ্ডিতগণ এদেশের পণ্ডিত-

গণের চোখের ছানি কাটা আরম্ভ করিয়াছিলেন, যেহেতু পণ্ডিতেরা "ইতিহাস" বস্তুটা দেখিতে পাইতেন না; অন্যবিধ সমস্ত শাস্ত্রে তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত প্রখর। এই শরিয়ত যদুনাথ ছাত্রাবস্থায় পাশ্চাত্ত্য ইতিহাসের মাধ্যমে কবুল করিয়াছিলেন; ইহার বিলাতী নাম Scientific Method of Historical Research অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ঐতিহাসিক গবেষণা। এই শরিয়তের অনেক টীকাভাষ্য হইয়া গিয়াছে, এবং ইহাই ইতিহাস-চাষের অদ্বিতীয় পদ্ধতি বলিয়া সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে। আওরঙ্গজেব এবং যদুনাথ উভয়েই স্ব স্ব শরিয়তে অকপট নিষ্ঠাবান ছিলেন। ইহার ফলে এক দিকে হিন্দুর মাটি পাথরের মন্দির ও মূর্ত্তি ধ্বংসের কার্য্যে সপ্তদশ শতাব্দীতে আওরঙ্গজেব মাতিয়া উঠিয়াছিলেন, অন্য দিকে বিংশ শতাব্দীতে হিন্দু মুসলমান ইত্যাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে মধ্যযুগের ইতিহাসের নামে যে পুতুল-পূজা চলিতেছিল, এবং রাজনৈতিক প্রচারকগণ যে সমস্ত নূতন নূতন ইতিহাস-পুত্তলিকা সৃষ্টি করিয়া ঐতিহাসিক সত্যের নিত্য অপমান করিতেছিলেন, উহার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিলেন যদুনাথ। এই "অসত্যের" বিরুদ্ধে বাদশাহী অভিযানে মথুরায় কেশবজী গোবিন্দজী, যুগলকিশোরজীর মন্দির হইতে দক্ষিণে পাণ্ডারপুর, পশ্চিমে সোমনাথ, পূর্ব্বে ঢাকা জেলার ধামরাই গ্রামের যশোমাধবের মন্দির হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত ছোট বড় সমস্ত মন্দির ধ্বংস হইল, গৃহস্থ বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপ, পণ্ডিতের টোলও রেহাই পাইল না।*

এই মহৎ কার্য্য আওরঙ্গজেব অত্যন্ত নিন্দনীয় কূটনৈতিক কপটতা ও শাঠ্যের সহিত আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার আধুনিক শ্রেষ্ঠ হিন্দু ঐতিহাসিক দিয়াছেন শুধু মন্দিরধ্বংসের সন তারিখ। পরবর্ত্তী মুসলমান ঐতিহাসিকগণ আওরঙ্গজেবের এই কার্য্যের যেমন ইসলামীভাষ্য করিয়াছেন, যদুনাথ কেবল উহারই ইংরেজী অনুবাদ দিয়াছেন। এই ব্যাপারে ঐতিহাসিকের কোন ভাবাবেগ নাই, "আওরঙ্গজেবের শনিদৃষ্টি" (Aurangzib's baleful eye) ব্যতীত কোন নিন্দা নাই, তিনি যেন "মোগলউচ্ছিষ্টভোজী পুষ্টকলেবর" রাঠোর হাড়া শিশোদিয়া কচ্ছবাহ কুলের একজন বাদশাহী মনসবদার—যাহারা হিন্দুর দমনকার্য্যে মোগল সম্রাটের সহায়ক, হিন্দুর মন্দির-ধ্বংস দৃশ্যের উদাসীন দর্শক। শাজাহানের হুকুমে বিদ্রোহী বুন্দেলারাজ জুঝার সিংহের পিতা বীরসিংহ দেবের নির্ম্মিত ওরছা নগরীর বিশাল হিন্দু মন্দির চক্ষুর সম্মুখে ধ্বংস ও অপবিত্র হইতেছে দেখিয়াও যে সমস্ত বীরাগ্রগণ্য রাজপুত প্রভুভক্তিতে অবিচল ছিলেন তাঁহাদিগের প্রতি তিনিই আবার তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন, যেন তাঁহারাই পাপী।* ঐতিহাসিক যদুনাথ হিন্দুর ছিদ্রান্বেষণে "বিরূপাক্ষ" হিন্দুর নিন্দায় চতুর্ম্মুখ মুসলমানের বেলায় নির্গুণ ব্রহ্ম সাজিয়াছেন বলিয়া কোন সমালোচক মন্তব্য করিলে উহা সাধারণ বুদ্ধিতে অসঙ্গত বলিয়া মনে হইবে না।

এইরূপ নির্ব্বিকার মনোভাব লইয়া আওরঙ্গজেবের ইতিহাস রচনা করিয়াও মুসলমান সমাজের উপর উহার কি প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল উহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। আওরঙ্গজেবের ইতিহাস প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার কিছু পূর্ব্বে আওরঙ্গজেবের কুখ্যাত Benaras Farman* আবিষ্কার হইয়াছিল। উৎসাহী শিক্ষিত মুসলানগণ ভাবিলেন, এইবার বুঝি আলমগীর বাদশার বদনাম ঘুচিল। আচার্য্য যদুনাথ এই ফরমানের তারিখের অশুদ্ধ পাঠ শুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের ভাঙ্গা নৌকার তলা ফুটা করিয়া তামাসা দেখিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন এই ভাঙ্গা নৌকায় মুখ'ও পা বাড়াইবে না, কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় উহার দোহাই দিয়াই একজন মুসলমান আওরঙ্গজেবের সাফাই গাহিয়া

* বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, History of Aurangzib, Appendix V. pp 280—285.

* "It has been decided according to our Canon Law that long-standing temples should not be demolished, but no new temple be allowed to be built···Information has reached our···Court that certain persons have harassed the Hindu residents in Benares and its environs and certain Brahmans···further desire to remove from their ancient office. Therefore, our royal command is that you should direct that in future no person shall in unlawful ways interfere with or disturb the Brahmans and other Hindus resident in those places"—

Aurangzib's "Benares farman" aderessed to Abul Hassan, dated 28th February, 1659, granted through the mediation of Prince Muhammad Sultan. J. A. S. B. 1911, p 689, with many mistakes, notably about the date, which of (Jadunath) have corrected from a photograph of the farman.

দ্রষ্টব্য—History of Aurangzib, vol. III, p, 281.

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হইয়াছেন, এবং তাঁহার বহি* শুধু লাহোর করাচী নয়, ভারতবর্ষের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকায় স্থান পাইয়াছে। একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং সুপাঠ্য পাঠ্যপুস্তক লেখক‡ নূতন পথ ধরিয়া Benares farman এবং ঐ জাতীয় দলিলকে আওরঙ্গজেবের ধর্ম্ম-নীতিকে "qualified toleration-র" পর্য্যায়ে উঠাইয়াছেন। শিক্ষকেরা এই বহি যুগোপযোগী মনে করেন, ছাত্রেরা পরীক্ষা পাস করে, কিন্তু ইতিহাসের সর্ব্বনাশ হয়। কাশীর ব্রাহ্মণের প্রতি আওরঙ্গজেব কিঞ্চিৎ সদয় ছিলেন মনে হয়, কেননা এই জাতীয় আরও দুইখানা farman পাওয়া গিয়াছে যেগুলিকে যদুনাথ আমল দেন নাই।

১০

একবার আমি এই সমস্ত দলিল লইয়া আচার্য্য যদুনাথকে কোণঠাসা করিবার চেষ্টা করিয়া ধমক খাইয়াছিলাম। তিনি আমাকে প্রশ্ন করিলেন, "ফরমান্ জারি করিবার তারিখে আওরঙ্গজেবের কি অবস্থা ছিল? বিশ্বনাথের মন্দির কোন্ বৎসর ধ্বংস করা হইয়াছিল? যাহারা ইতিহাস পড়ে তাহাদের কাণ্ডজ্ঞান থাকে।" যাহা হউক, আমার জবাব আমি পাইলাম, কিন্তু জবাবটা কি জানিবার জন্য যদি কাহারও আগ্রহ হয়, আমিও বলিতে পারি জিজ্ঞাসুর কাণ্ডজ্ঞান নাই! মোট কথা, যদুনাথের মাপে আমার কাণ্ডজ্ঞান হয় নাই, এবং এই কাণ্ডজ্ঞান যুগে যুগে দেশে দেশে বিভিন্ন। বেদব্যাস বলিয়া গিয়াছেন মগধদেশীয়গণ অর্দ্ধোক্তির দ্বারা বুঝিতে পারে, পাঞ্চালদেশীয় (গঙ্গা-যমুনার দোয়াববাসীগণ) ইঙ্গিত বা ইশারায় বুঝিতে পারে, অন্য দেশীয়গণ পূর্ণোক্তি দ্বারা এবং পার্ব্বতীয়গণ প্রহারের দ্বারা বুঝিতে পারে। তিনি পাটনায় বসিয়া "অর্দ্ধোক্তি" করিয়াছেন; সুতরাং যাহারা ভাত খায় তাহারা উল্টা বুঝিতে পারে, যব ছোলার ত কথাই নাই। ইতিহাস-বিমুখ দেশে ইতিহাস বুঝাইতে হইলে হাতুড়ীর ঘা দরকার, অবনীন্দ্রনাথের তুলির পোঁচে কি হইবে? ব্যাপারটা ছিল নিম্নরূপ—

১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজেবের ভাগ্যাকাশে মেঘ কাটিয়া যায় নাই, শুজা মুঙ্গেরের দুর্গে, পলাতক দারার কোন সংবাদ নাই। আওরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদ সুলতান কাশী অধিকার করিয়া মুঙ্গেরের দিকে অভিযান করিয়াছেন, পশ্চাতে দারার পূর্ব্বতন সুবা এলাহাবাদের হিন্দু প্রজা। এই জন্য হিন্দুর প্রতি আওরঙ্গজেবের এই সাময়িক কুটিল উদারতা, কাশীর পাণ্ডাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া হিন্দুকে ঠাণ্ডা রাখিবার প্রয়োজনীয়তা। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দের Benares farman মারফত আওরঙ্গজেব স্বয়ং পুত্রকে জানাইতেছেন, ইহা স্থির হইয়াছে যে, আমাদের শরিয়তের বিধান অনুসারে পুরাতন মন্দির ধ্বংস করা অনুচিত। ইহার দশ বৎসর পরে সেই শরিয়তের বিধান ডিগবাজী খাইয়া পুরাতন বিশ্বনাথের মন্দির ধ্বংস করিবার ফতোয়া দিল কেন? মীর্জ্জা রাজা জয়সিংহের মৃত্যুর পূর্ব্বে শরিয়তের বিধান হিন্দুর জন্য যে রকম ছিল, মৃত্যুর পরে সেই রকম থাকিলে বিশ্বনাথ জ্ঞানবাপীতে লুকাইতেন না। মহারাজা যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পূর্ব্বে হিন্দুর উপর জিজিয়া কর চাপাইবার সাহস আওরঙ্গজেবের হয় নাই, মরিবার পরেই বাদশাহী ধর্ম্মবুদ্ধি চাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল। সুবিধামত শরিয়তের ব্যাখ্যার জন্য দায়ী আওরঙ্গজেব, না তাঁহার বিবেক রক্ষক সেখ্-উল্ ইসলাম (ধর্ম্মবিষয়ক উপদেষ্টা)?

অধুনা আবিষ্কৃত অন্য দুইটি ফরমান্ আরও রহস্যজনক। ১৬৬১ এবং ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব কাশীবাসী ভগবন্ত গোঁসাই এবং রামজীবন গোঁসাইকে ভূমিদান করিয়াছিলেন, যেন তাঁহারা সম্রাটের বিধিদত্ত অক্ষয় সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য (For the continuation of our God-given Empire that is to last for ever) মনের শান্তি লইয়া প্রার্থনা করিতে পারেন।* ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এক হাতে বিশ্বনাথের মন্দির ধ্বংস অন্য হাতে গোঁসাইকে ভূমিদানের উদ্দেশ্য কি হইতে পারে? গোঁসাইগণের স্থান কাশী নহে, গোকুল গোবর্দ্ধন, শৈবপ্রধান কাশীতে বৈষ্ণব গোঁসাই তোষণের উদ্দেশ্য কি? সম্রাটের অক্ষয় সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের জন্য কাফেরের দোয়ার প্রয়োজন কেন হইল? আওরঙ্গজেবের যদি সত্যই বৈষ্ণবপ্রীতি থাকিত তাহা হইলে গোকুলস্থ গোস্বামীগণের কাছে আওরঙ্গজেব আমলের একখানি সনদও পাওয়া যায় নাই কেন? ‡

ঐতিহাসিক সন্দেহ করিবে এই গোঁসাইদ্বয় হয়ত মোগল গুপ্তচর ছিল, কিংবা শৈব-বৈষ্ণবের বিবাদের আগুন উস্কাইয়া হিন্দুর অসন্তোষকে নিষ্ক্রিয় করিবার হীন অভিসন্ধি এই পুণ্য কার্য্যের পশ্চাতে লুকাইয়াছিল। যাহা হউক, আকবর অপেক্ষা আওরঙ্গজেব এক হিসাবে

* Zahiruddin Faruqi, Aurangzib and his Times.

‡ S. R. Sharma, The Making of Modern India (From A. D. 1526 to the present day).

* দ্রষ্টব্য—S. R. Sharma, The Making of Modern India, p 105.

‡ দ্রষ্টব্য—Javeri, Imperial Farmans.

অধিক ভাগ্যবান। সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধি—সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের চোখে একটি সুন্দর ইমারত মাত্র, দর্শনীয় তীর্থস্থান নহে। হিন্দুরা আওরঙ্গজেবের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য আকবরের শবাধার খুঁড়িয়া তাঁহার অস্থি আগুনে পোড়াইয়াছিল, অপর পক্ষে আওরঙ্গজেবের মামুলী কবর ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানের তীর্থস্থান। তাঁহার কবরের উপর রামতুলসীর গোড়ায় হিন্দু প্রণাম করিয়া জল ঢালে।*

১১

ইতিহাস বুঝিবার আগ্রহ অপেক্ষা "মানুষ"কে জানিবার আগ্রহ মানুষের মধ্যে প্রবলতর। সৃষ্টির মধ্যে ভক্ত সৃষ্টি-কর্ত্তাকে দেখিতে চায়, সাহিত্য সমালোচকগণ কাব্যের মধ্যে কবিকে, রচনার মধ্যে রচয়িতাকে ধরিবার আশায় বসিয়া থাকেন, প্রজাপতি তাড়াইয়া হয়রান হইয়া পড়েন। যদুনাথের ইতিহাসে ঐতিহাসিকের সাক্ষাৎকার দুর্লভ, অথচ লোকে বলে সামাজিক জীব হিসাবে যদুনাথ গোটা মানুষটাই সাক্ষাৎ আওরঙ্গজেব! ইহা বিরূপ জনশ্রুতি নয়, ইহার মধ্যে হয়ত কিছু সার্থকতা আছে।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত আওরঙ্গজেব-ইতিহাসের যদুনাথ আওরঙ্গজেবের অন্তিম দশার বর্ণনায় লিখিয়াছেন:

"The last years of Aurangzib were inexpressively sad ... A sense of unutterable loneliness haunted the heart of Aurangzib in his old age. His puritan austerity had, at all times, chilled the advances of other men towards him, but its effect was intensified by the reputation of being a miracle— working saint. Men shrank in almost supernatural dread from one, who was above the joys and sorrows, weakness and pity of mortals, one who seemed to have hardly any element of common humanity in him, who lived in the world but did not seem to be of it. The genial human heart was not touched in others by Aurangzib, and therefore his own heart's hunger could not be satisfied .....

His domestic life was darkened, as bereavements thickened round his closing in years ...."*

ইহার ৩৪ বৎসর পরে ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে যদুনাথের কি অবস্থা হইয়াছিল? উক্ত উদ্ধৃতাংশে আওরঙ্গজেবের জায়গায় "যদুনাথ" এবং saint-এর জায়গায় Historian বসাইয়া দিলে ইহাই আচার্য্য যদুনাথের অন্তিম দশার নিখুঁত ছবি হইয়া যায়। এই ভাষা ব্যতীত তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনী লেখক গ্রন্থের উপসংহার লিখিবার জন্য অন্য ভাষা পাইবেন না। দীর্ঘ বিশ বৎসর ইতিহাসের মধ্যে আওরঙ্গজেবের সাহচর্য্য করিয়া যদুনাথ কি সম্রাটের দুর্ব্বার নিয়তির কোপে পতিত হইলেন? উভয়ের মধ্যে এই মাত্র তফাৎ—আওরঙ্গজেব মানুষের সহানুভূতির জন্য আকুল হইয়াও নিরাশ হইয়া ছিলেন, যদুনাথ সহানুভূতিকে সগর্ব্বে উপেক্ষা করিয়াছেন, না পাইবার খেদ তাঁহার হয় নাই। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যদুনাথ তাঁহার একমাত্র জীবিত পুত্র সত্যেন• সরকারকে লিখিয়াছিলেন:

"আমি সংসারে নিতান্ত একক। আমার সুখ-দুঃখের ভাগিদার কেহ নাই। আমি self-pity করিতে চাহি না বা কাহারও সহানুভূতি চাহি না।"†

ইহা বিয়োগান্ত নাটকের নাটকীয় pose নহে, যদুনাথের আসল চিত্র। জীবন-মৃত্যুর খেলায় যদুনাথের চোখে কেহ জল দেখে নাই, শুনিয়াছে মৃতের সৎকারের জন্য অকম্পিত কণ্ঠে সেই আলমগীরশাহী হুকুম। এ হেন ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি ঘৃণাক্ষরে প্রকাশ করাও বিপজ্জনক ছিল। আসলে কিন্তু সুলতান বলবনের মত গুরুজী মার খাইয়া মার চুরি করিতেন। এই রহস্য তাঁহার পড়ার ঘর গুছাইবার সময় টের পাইয়াছি। যেখানে কাহারও হাত পড়িবার সম্ভাবনা নাই সেইখানে তাঁহার প্রত্যেক মৃত সন্তানের ছবি চিঠিপত্র তিনি লুকাইয়া রাখিতেন, সম্ভবতঃ রাত্রে তিনি ঐগুলি দেখিয়া প্রাণের হাহাকার মিটাইতেন, দিনের বেলায় অন্য মূর্ত্তি—মেঘমুক্ত কর্ম্মচঞ্চল সুলতানী মেজাজ, কোথাও কোমলতার চিহ্ন নাই। জীবনের কোন অধ্যায়ে যদুনাথ

---

* ফারগুসন্ (Eastern Architecture, vol. II) লিখিয়াছেন, আওরঙ্গজেবের কবরের উপর তুলসী গাছ জন্মায়, একবার তুলিয়া ফেলিলে আবার গজায়। গত বৎসর ঐতিহাসিক সফরে আমার ছেলে ইহা সচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে। কবরের উপর তুলসী গাছ এখন সেবা যত্ন পায়। এই তুলসী বৈষ্ণবের প্রিয় কালতুলসী নহে, এই জাতীয় তুলসীকে পূর্ব্ববঙ্গে বলে "রামতুলসী" মুসলমানেরা বলে "রহমান" গাছ।

* History of Aurangzib, vol, v, pp 248-49

† এই চিঠিখানা ৺সত্যেনবাবু তাঁহার বন্ধু ও ভগ্নীপতি শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ বসুকে দেখাইয়াছিলেন। আসল চিঠির খোঁজ পাওয়া যায় নাই; তবে উদ্ধৃতাংশের প্রত্যেকটি শব্দ যদুনাথের, এই বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

ব্রজবাখালের "বংশীবট" ছিলেন না, তিনি উষরভূমির অন্তর্বহ্নি অথচ শ্যামায়মান শমী মহাদ্রুম ; উহার কণ্টকাকীর্ণ কাণ্ড সহজ মানুষের পক্ষে অপ্রধৃষ্য অথচ উহার উগ্র কুসুম-সুরভি ক্লান্ত পথিককে বিমোহিত করিত, রেণু অনুকম্পা-পবন তাড়িত হইয়া সাহসী জিজ্ঞাসুর শিরে আশীর্ব্বাদরূপে বর্ষিত হইত। তাঁহার জীবন মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্ব্বে তিনি দৌর্ব্বল্যবর্জ্জিত "যুধিষ্ঠির", স্থিরলক্ষ্যে নিবদ্ধ-দৃষ্টি, সহযাত্রীগণের মধ্যে কে কখন পড়িয়া গেল সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, শোক নাই, অগ্রগতির বিরাম নাই। লোকোত্তর মহামানবগণের ইহাই নিয়তি।

১২

পুণ্যাত্মা হিন্দু মনে করেন আওরঙ্গজেব স্বখাদ-সলিলে ডুবিয়া মরিয়াছেন ; তবে ঐতিহাসিক ডুবিলেন কোন খাদে ?

যদুনাথ কেমন করিয়া শোক-হলাহল কণ্ঠে লইয়া নীলকণ্ঠ হইলেন ? আঘাতের পর আঘাতে ভাঙ্গিয়া না পড়িয়া নিয়তির বিরুদ্ধে আওরঙ্গজেব ও যদুনাথ কোন শক্তিবলে কি ভরসায় আজীবন যুদ্ধ করিলেন ? উভয়ের মধ্যে চরিত্রগত সামঞ্জস্য না থাকিলে যদুনাথ হয়ত রণে ভঙ্গ দিতেন। তাঁহাদের দুর্জ্জয় আশাবাদ, অসীম আত্মবিশ্বাস, অপরাজেয় পৌরুষ, "ভিদ্যন্তে ন চ নমান্তে"—মনোবৃত্তি যেন বজ্রাঘাতে পতিত বিদ্রোহীর সেই দারুণ বিজীগিষাবৃত্তি—যাহা লইয়া মিল্টনের মহাকাব্য সৃষ্টি। শয়তান অসত্যকে জয়মণ্ডিত করিবার জন্য সত্যস্বরূপ আল্লার বিরুদ্ধে ছলে বলে কৌশলে যুদ্ধ করিয়াছিলেন ; ধর্ম্মাত্মা আওরঙ্গজেব ব্যক্তিগত জীবনে ইবলিসের (শয়তানগোষ্ঠীর নেতা) সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন, ধর্ম্ম (শরিয়ত) সংস্থাপকরূপে আল্লার খাতিরে "অসত্য" (কুফর) ধ্বংস-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, ঐতিহাসিক যদুনাথ ঘোষণা করিলেন ইতিহাসে "অসত্যে"র বিরুদ্ধে জেহাদ, এবং এই অসত্যের "মন্দির" "মসজিদ" এবং অনৈতিহাসিক অর্দ্ধ-ঐতিহাসিক বীরপূজার পুত্তলিকাভাবের ও ভক্তির পুত্তলিকা, মাটি-পাথরের পুতুল নহে। আওরঙ্গজেব যাহা করিয়াছেন তাহা যদুনাথ লিখিয়া গিয়াছেন, উহা এখনও অলিখিত ইতিহাস। ঐতিহাসিকের ইতিহাস সাধারণতঃ আমরা তাঁহাদের স্বরচিত আত্মজীবনীর মধ্যেই অনুসন্ধান করিয়া থাকি। যদুনাথ স্বয়ং একটি Autobiography লিখিবার আয়োজন করিয়াছিলেন। আমাদের মনে হয় উহা না লিখিয়া ভালই করিয়াছেন। আওরঙ্গজেব ও যদুনাথ অসাধারণ ব্যক্তি হইলেও মহাপুরুষ ছিলেন না, কেহই মহাত্মা গান্ধী নহেন, এবং মহাত্মা গান্ধীর মত অলৌকিক নৈতিক সাহস না থাকিলে কেহ প্রকৃত আত্মজীবনী লিখিতে পারে না। ইঁহারা আত্মজীবনী লিখিলেও মানুষ হিসাবে ধরা দিতেন কিনা সন্দেহ, অধিকন্তু দুইজনই আত্মজীবনী রচনা কার্য্যের যোগ্য ছিলেন না। আচার্য্য যদুনাথ আত্মরক্ষার জন্য মনের প্রতি প্রকোষ্ঠে এক একটি দারুণ কপাট লাগাইয়া রাখিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকের মন-দুর্গে মোগলাই ঠাটে দেওয়ান ই-আম, দেওয়ান ই-খাস এবং শাহ-বুরুজ ছিল, শাহ-বুরুজের ফাটক স্বয়ং সাম্রাজ্ঞীর হুকুমেও খুলিবার নহে—ভিতরে যিনি ছিলেন তিনি নিঃসঙ্গ যোগী। সমগ্র মানুষ হিসাবে যদুনাথকে জানিবার উপায় নাই, যেহেতু Dr. johnson এর মত যদুনাথের Boswell ছিল না। যাঁহাদিগকে এক দিকে তিনি অতি নিকট টানিয়া আনিতেন, অন্য সর্ব্ব দিক হইতে তাঁহাদিগকে ততোধিক দূরে রাখিতেন— Thus far and no farther।

১৩

"অসত্যের" বিরুদ্ধে আওরঙ্গজেবের জীবনব্যাপী সংগ্রাম মুখ্যতঃ ধ্বংসাত্মক ; তাঁহার সৃজনী-প্রতিভা ছিল না, থাকিলে মোগল সাম্রাজ্য এত সহসা ধ্বংস হইত না। যদুনাথ তাঁহার "জেহাদে" হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজের মর্ম্মস্থলে আঘাত করিয়াছেন ; আওরঙ্গজেব মাটি পাথরের মূর্ত্তি ধ্বংস করিয়াছেন, কিন্তু যদুনাথ ধ্বংস করিয়াছেন দুই সাম্রাজ্যাভিমানী জাতির ইতিহাসের আধারে কল্পনার আলেয়ায় ঘেরা মধ্যযুগের ইতিহাস-স্রষ্টাগণের ছায়াপুত্তলিকা। মহারাষ্ট্র-জাতি, যুগপ্রবর্ত্তক ছত্রপতি শিবাজীর প্রতি উৎকট ভক্তির আতিশয্যে শিবাজীর অবতারত্ব ঘোষণা এবং "শিবভারতম" ইত্যাদি রচনা করিয়া তাঁহার "মনুষ্যত্ব" হরণ করিয়াছিল ; যদুনাথের গবেষণা শিবাজীকে "মানুষ" করিয়াছে—যে মানুষের স্থান দেবতার বহু ঊর্দ্ধে—যাঁহারা অবতারবাদী কিংবা সাফাই গাহিবার "ঐতিহাসিক-উকীল" তাঁহারা যদুনাথকে দ্বিতীয় আফজল খাঁ মনে করিয়া থাকেন। মহারাষ্ট্র এখন কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ। অসত্যের উপাসনা এবং নিজের ছিদ্র নিজের কাছে গোপন করিয়া কোন জাতির মঙ্গল হয় না—এই সত্য মহারাষ্ট্রসন্তান হিন্দুপাদ পাতসাহী হারাইয়া বুঝিতে পারিয়াছেন।

শিবাজীর সৃষ্টি শিবাজী অপেক্ষা মহত্তর। এইখানেই শিবাজীর মাহাত্ম্য। এই সৃষ্টি স্বাধীন মহারাষ্ট্র রাজ্য নহে, যাহা আওরঙ্গজেব প্রথম আক্রমণেই ধূলিসাৎ করিয়াছিলেন—এই সৃষ্টি স্বাধীনতা-মন্ত্রে দীক্ষিত বীর মারাঠা জাতি—যাহার নিকট দিল্লীশ্বর শোচনীয় পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন, যে বিজয়দৃপ্ত জাতি "জয়, ভারতের জয়" এই মহামন্ত্রে উত্তর ভারতকে দীক্ষিত করিয়াছিল, যে জাতির বীরাঙ্গনাগণ নীতি ও শৌর্য্যে মোগলের প্রাণে আতঙ্ক সঞ্চার

করিয়াছিল। বাঙ্গালী কবি শিবাজীর মুখে যে ভবিষ্যৎবাণী শুনাইয়াছেন উহা শিবাজীর মৃত্যুর অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যেই সফলতা লাভ করিয়াছিল :

"মহারাষ্ট্র মহিলারা ভৈরবী রূপিণী ; প্রেমরঙ্গ পরিহরি
রণরঙ্গে মাতি গাইবে উল্লাসে সবে, জয় ভারতের জয়।
যথা এই মহামন্ত্র হইবে ধ্বনিত, আর্য্যের শৃঙ্খলভার
পড়িবে খসিয়া তুষারশৃঙ্খল যথা দ্বিষাম্পতি করে।"

[নবীনচন্দ্র—"রঙ্গমতী"]

মহারাষ্ট্র ইতিহাসের ব্যাখ্যানে আচার্য্য যদুনাথ এবং তাঁহার অগ্রজপ্রতিম অন্তরঙ্গ বন্ধু রাওবাহাদুর সরদেসাই স্থানে স্থানে সমান্তরাল ভাবেই চলিয়াছেন, অথচ একজন আর একজনের প্রতি ইঙ্গিত করেন নাই, মত খণ্ডনের চেষ্টা করেন নাই। উভয় মত কখনও যুগপৎ সত্য হইতে পারে না। ইহা কি বন্ধুত্বের খাতিরে বিবেকবিরুদ্ধ আপোষ রফা? বিচারের বেলায় কাহাকেও রেহাই দেওয়ার শিক্ষা যদুনাথের শিষ্যগণ পায় নাই ; সুতরাং ব্যাপারটা আমাদের কাছে অস্বস্তিকর হইয়া উঠিয়াছিল। একবার সাহস করিয়া আচার্য্য যদুনাথকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি হাসিয়া বলিলেন—"We have agreed to disagree agreeably"। ইহার বেশী কিছু তিনি বলেন নাই। প্রায় সমকক্ষ বিরুদ্ধ মতবাদীর প্রতি এইরূপ সৌজন্য ও উদারতা নিঃসন্দেহে অতি প্রশংসনীয় ; কিন্তু আমরা দেখিতে পাই একজন ছাড়া অন্য সকল বিপক্ষের প্রতি যদুনাথের মনোভাব অত্যন্ত কঠোর এবং তাঁহার ভাষা শালীনতার বেলাভূমি অতিক্রম করিয়াছে। ইতিহাসবিচারে কোদালকে কোদাল না বলিয়া খনিত্র বলিলে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা হয় না। মহান্ ত্যাগী পণ্ডিত খারে রাজওয়াড়ে প্রমুখ ঐতিহাসিক দলিল সংগ্রহকারীগণ বহু পরিশ্রমে ভাল মন্দ পুরাতন কাগজের টুক্‌রা যাহা যেখানে পাইয়াছেন ঐগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া সরদেসাই এবং যদুনাথের ইতিহাস-চর্চ্চার পথ সুগম করিয়াছিলেন। নিজের সংগ্রহের প্রতি অন্ধ মমতা মহারাষ্ট্র জাতির পক্ষে অতি স্বাভাবিক। যদুনাথ বিজ্ঞানসম্মত বিচারের ধারায় মহারাষ্ট্র ঐতিহাসিকগণের দেশ-প্রেমরঞ্জিত ভুল সিদ্ধান্ত এবং তাঁহাদের সংগৃহীত অনেকগুলি দলিলকে তুলাধুনা করিয়া ছাড়িয়াছেন। এই জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্রে "হে কাগদ কার মহত্ত্বাচী আহে"র* দল বিরোধগীরণ করিয়াছিল। ইহার কড়া জবাব দেওয়া আচার্য্য যদুনাথের পক্ষে সমীচীন হইয়াছে ; কিন্তু ইহার জন্য ঐতিহাসিকগণের মধ্যে ব্যক্তিগত তিক্ততা সৃষ্টির দায়িত্ব হইতে যদুনাথ রেহাই পাইতে পারেন না।

যাহা হউক, সমস্ত বিরুদ্ধ মতবাদীর প্রতি যদুনাথ একই নীতি (to disagree agreeably) অবলম্বন করিলে ইতিহাসের কোন ক্ষতি হইত না, যাহা বিচারসহ নহে উহা কালের বাতাসে উড়িয়া যাইত।

১৪

আওরঙ্গজেব ধ্বংস করিয়াছিলেন বাঙ্গালীর ঠাকুর দেবতা ; ঐতিহাসিক ধ্বংস করিয়াছেন বাঙ্গালীর মনগড়া প্রতাপাদিত্য। যে মোগলসেনানী স্বয়ং প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন তিনি সমসাময়িক বাঙ্গালার বিস্তারিত ইতিহাস Bahars tan-i-Ghaibi লিখিয়াছেন। ইহা একমাত্র যদুনাথেরই আবিষ্কার। ইহার পর আমাদের "বঙ্গবীর"গণ সাধারণ বিদ্রোহীর পর্য্যায়ে নামিয়া আসিয়াছেন, অধীনতা স্বীকার করিয়াও রেহাই পান নাই। এই ইতিহাস পাঠান ওসমানকে বাঙ্গালীর পূজ্য বীরের আসনে বসাইয়াছে। স্বদেশী যুগে দেশপ্রেমে মাতোয়ারা বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের মিলন-মন্দিরে আলীবর্দ্দী সিরাজউদ্দৌলার মনগড়া মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া ভক্তির অর্ঘ্য দান করিয়া আসিতেছিল, যদুনাথের গবেষণার আঘাতে ঐগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, উহাদের জায়গায় ঐ ইতিহাসের পাথরে গড়া আসল মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে ঐতিহাসিকের কোন ভাবাবেগ কিংবা বিদ্বেষ নাই। পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পরাজয় হয় নাই, পরাজিত হইয়াছে যুগধর্ম্মের কাছে অকল্যাণকর স্থবির সনাতনধর্ম্ম বা সামন্ততন্ত্র। ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন :

"Ignoble as the life of Siraj-ud-daulah had been and tragic his end, among the public of his country, his memory had been redeemed by a woman's devotion and a poet's genius. For many years after his death, his widow Lutf-un-nisa Begam used to light a memorial lamp on his tomb every evening as long as she lived. The Bengali poet Nabin Ceandra Sen in his masterpiece *The Battle of Plassey* has washed away the follies and crimes of Siraj by artfully drawing his reader's tears for fallen greatness and blighted youth, . . .

When the sun dipped into the Ganges

---

* অর্থাৎ এই কাগজ অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ।

behind the blood-red field of Plassey, on that fateful evening of June, did it symbolise the curtain dropping on the last scene of a tragic drama? Was that day followed by "a night of eternal gloom for India" .... ? Today the historian, looking backward over two centuries that have passed since them, knows that it was the beginning, slow and unperceived, of a glorious dawn, the like of which the world has not seen elsewhere. On the 23rd June, 1757, the middle ages of India ended and her modern age began."*

যাঁহার এইরূপ সহৃদয়তা এবং সত্যনিষ্ঠা আছে, যিনি যুগদ্রষ্টা, যাঁহার দূরদৃষ্টি দিগন্তপ্রসারী এবং যাঁহার অন্তর্দৃষ্টি "মর্মভেদী", প্রজ্ঞার অনুরূপ যাঁহার ভাষা আছে, সাহিত্যের সুরাসারে রক্ষিত যাঁহার বিষয়বস্তুর রূপরসগন্ধ পাঠককে বিমোহিত করে, তিনিই ঐতিহাসিক, বাদবাকী আমরা গবেষণামূলক বিবরণ লেখক (Chronicler)। আচার্য্য যদুনাথ কেবলমাত্র "India through the Ages" পুস্তিকা লিখিয়া গেলেও এই আসনের অধিকারী হইতেন, রত্ন-পরীক্ষক পদ্মরাগমণির আকার দেখিয়া উহার আভিজাত্য নির্ণয় করেন।

১৫

বেভারিজ সাহেব ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য্য যদুনাথকে Bengali Gibbon আখ্যা দিয়াছিলেন; রাওবাহাদুর সরদেসাই ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে মৃত্যুর পূর্ব্বে Gibbon of India বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন। মুসলমানযুগের ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ ইংরেজ ও ফরাসী ঐতিহাসিকগণ যদুনাথকে বর্ত্তমান ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক বলিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়াছেন—এই উক্তির সমর্থনে দলিল দাখিল করিতে গেলে রসভঙ্গ হয়, পরলোকগত আচার্য্যের আত্মার অবমাননা করা হয়। সরদেসাই প্রমুখ ঐতিহাসিকগণের মত গ্রহণ করিলে আমি অল্পেই রেহাই পাইতাম বটে; কিন্তু লোকে আমাকে কালিদাসের ভাষায় "মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়-নেয়-বুদ্ধিঃ" বলিয়া গালাগালি দিলে জবাব কোথায়? ইতিহাসের রাজসূয় যজ্ঞে ভীষ্মপ্রতিম সরদেসাই যদি যদুনাথকে প্রথম পূজা দেওয়ার আদেশ করেন তাহা হইলে হয় ত উহা শিশুপাল বধে পর্য্যবসিত হইতে পারে। যদি বলা যায় যদুনাথ Gibbon নহেন, Macaulay-ও নহেন, "তিনিই তাঁহার মাত্র উপমা কেবল"—ইহা গুরুপূজা হইতে পারে বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক বিচার হইবে না।

বস্তুতঃ পক্ষে গুরুপ্রতিম পূর্ব্বাচার্য্যগণের যদুনাথ-প্রশস্তির মূল্যই বা কি? সরদেসাইর মুখে যদুনাথের প্রশংসা কোন আদালত আইনসম্মত প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না; বরং দুর্ম্মুখ বলিবে যদুনাথ সরদেসাইকে সপ্তম স্বর্গে চড়াইয়া গিয়াছেন, সরদেসাই মহোৎসাহে যদুনাথকে নবম স্বর্গে উঠাইয়াছেন। বৈদেশিক পণ্ডিতগণের মত খণ্ডন করিয়া "লঘুচেতা" সমালোচক হয় ত বলিবেন, যদুনাথ বর্ত্তমানের মাপকাঠিতে স্বদেশ এবং স্বজাতি-প্রেমিক ছিলেন না, মনে-প্রাণে তিনি ছিলেন ইংরেজ-ঘেঁষা ভারতনিন্দুক, তাঁহার ইতিহাস "জাতীয়" ইতিহাস নহে; সুতরাং বিলাতী ঐতিহাসিকেরা তাঁহাকে বাহবা দিবেই!

আচার্য্য যদুনাথকে কেহ কেহ ভারতীয় Gibbon কিংবা Macaulay বলিয়া উচ্চপ্রশংসা করিয়াছেন। ইহা সুরুচির পরিচায়ক নহে, সত্যও নহে, যেহেতু উপমান এবং উপমেয়ের মধ্যে ঐতিহাসিক হিসাবে মিল অপেক্ষা অমিল চোখে বেশী পড়ে। Macaulay এবং Gibbon ইংরেজী ছাড়িয়া যদি ফরাসী ভাষায় ইতিহাস লিখিতেন তাহা হইলে উঁহাদের সহিত যদুনাথের তুলনা সুবিচার হইত। মাতৃভাষার মৃণাল হইতে অর্দ্ধবিচ্ছিন্ন প্রতিভা-কমল পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয় না, ফুটি ফুটি করিয়া ফোটে না। যদুনাথ যে যুগে ইতিহাস চর্চ্চা করিয়াছেন সে যুগে Gibbon এবং Macaulay-র রচনা শ্রদ্ধা ও ঈর্ষার বস্তু হইলেও অননুকরনীয়, এবং আদর্শ হিসাবে "সনাতন" হইয়া গিয়াছিল। এই তিনজন ঐতিহাসিকের ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সুতরাং ভাষা এবং বিষয়বস্তুর প্রকাশভঙ্গীও চিন্তা এবং ব্যক্তিত্বের অনুরূপ স্বতন্ত্রধর্ম্মী। Macaulay জন্ম মাত্রেই ঘটোৎকচ; দাড়ি গজাইবার পূর্ব্বেই তিনি History of the World লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। যদুনাথ জন্মিয়াছিলেন পরাধীন ভারতে, ইঙ্গ-বঙ্গ যুগের শেষ পাদে, তাঁহার মনীষা পরভৃতিকা, তিনি কি করিয়া Macaulay হইবেন? তাঁহার স্থান তিনি নিজেই করিয়া লইয়াছেন, তিনি গুরুনিরপেক্ষ নিঃসঙ্গ সাধক মহাভারতের একলব্য। Macaulay-এর কলম মোগল দরবারের নিপুণ শিল্পীর সূক্ষ্ম তুলিকা নহে, উহা পরশুরামের কুঠার। তাঁহার বাগ্মিতা Burke এর অনলস্রাবী গৈরিক-প্রবাহ না হইলেও জ্বালামুখীর চঞ্চল অগ্নিশিখা, তাঁহার ভাষা ভরা বরষার পর্ব্বত-নির্ঝরিণী। যদুনাথের ভাষায় এই দারুণ দুর্ব্বার গতি

* Dacca University *History of Bengal*, vol. ii p49

অনুপম ঝঙ্কার এবং অসংযত পৌরুষ কোথায়। বাঙ্গালীর সাত্ত্বিক গঙ্গাজলে "কাদম্বরী" (মদ্য বিশেষ) কটু কষায় মাদকতা কিঞ্চিৎ আছে, Macauly-মার্কা ব্রাণ্ডির ঝাঁজ কোথায়? যদুনাথের প্রথম বয়সের লেখার মধ্যে এবং "Economics of British India" পুস্তকের আক্রমণাত্মক অংশে Macaulay-র বেশ কিছু কিছু পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ইতিহাসে নয়। Macaulay ছিলেন ব্যারিষ্টার, যাহাকে ধরিতেন তাহাকে পথে বসাইয়া ছাড়িতেন, Whig হইলে সুর নরম করিতেন। ঐতিহাসিক যদুনাথ শান্ত সমাহিত-চিত্ত রাগদ্বেষ-বর্জ্জিত বিচারক। Macaulay-র দোষজ্ঞ সমালোচকগণের অভিযোগ,—তিনি চমৎকার ভাবে বলিয়াই খালাস ("describes but does not explain"), বুঝাইবার বালাই নাই; তাঁহার রচনায় চিন্তাশীলতা অপেক্ষা ভাষার ওজস্বিতা এবং পারিপাট্যই অধিক। উহার sweet allusiveness সাহিত্যরসিকগণকে তন্ময় করিয়া রাখে, ভাষার বিদ্যুৎ-ছটা পাঠককে স্তম্ভিত করে, কিন্তু ভাবিত করিয়া তোলে না। সাধারণ সূত্র (generalization) উদ্ভাবন করিবার ক্ষেত্রে Macaulay বেপরোয়া ছিলেন—যথা "...As civilization advances, poetry declines" ("Essay on Milton")। ইহা যদি সত্য হয়, তবে আমাদের রবীন্দ্রনাথ কি করিয়া জন্মিলেন? এই বাতিক আমাদের দেশে Intellectual গণকে বর্ত্তমানে পাইয়া বসিয়াছে, কিন্তু যদুনাথ এক পা ফেলিয়া আর এক পায়ে সামনে কি আছে দেখিয়া লইতেন (কেবল কলিকাতার রাস্তায় চলিবার সময় ছাড়া)। এইজন্য তিনি কাঁচা generalization-এর চোরা বালি এড়াইয়া চলিয়াছেন।

Macaulay বলিয়া গিয়াছেন কাব্য দর্শনাদি শাস্ত্রে "পূর্ণতা" (perfection) লাভ বরং সম্ভব, কিন্তু ইতিহাসে উহা প্রায় অসম্ভব, যেহেতু "সাহিত্য" (Literature) এবং "বিজ্ঞান" (science) এই দুই প্রতিস্পর্দ্ধী সাম্রাজ্যের প্রত্যন্তবাসী "ইতিহাস"-সামন্তের উভয় সঙ্কট। সার্ব্বভৌমদ্বয়ের দাবীদাবা এই দুই মহাপ্রভুর মনঃপূত না হইলে ইতিহাস অনবদ্য ও পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না, এবং ঐতিহাসিককে "ষোল কলায়" পরিপূর্ণ (perfect) বলা যাইতে না। এই সুষ্ঠু আদর্শ অনুযায়ী Macaulay তাঁহার "History of England" লিখিয়াছিলেন। এই ইতিহাস পড়িয়া তাঁহার সমকালীন ইংরেজ সমাজের ইতিহাসে অরুচি রোগ দূর হইয়াছিল। ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ ইতিহাস-বিমুখ কোন পাঠককে ইতিহাসের নেশা ধরাইবার জন্য এমন বস্তু আর আবিষ্কৃত হয় নাই। দোষজ্ঞ সমালোচকগণ বলেন Macaulay-র ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ নহে, বরং বিকলাঙ্গ, যেহেতু তিনি "বিজ্ঞান" অপেক্ষা সাহিত্যকে প্রাধান্য দিয়াছেন, তাঁহার সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক মতবাদজনিত পক্ষপাত-দুষ্ট।

যাহা হউক "বর্ণনা" (narrative) "রাষ্ট্রীয়" (political) ইতিহাসের প্রাণবস্তু। বর্ণনার সর্ব্ববিধ গুণে Macaulay-র রচনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ঐতিহাসিক হিসাবে Macaulay সম্বন্ধে বলা হয়—"একোহি দোষঃ গুণসন্নিপাতে...." তাঁহার measured accuracy, অর্থাৎ সঠিক সত্য সঠিক ওজনে প্রকাশ করিবার আগ্রহ দেখা যায় না। দ্বিতীয় Macaulay ভারতবর্ষে দূরের কথা ইংলণ্ড ও আমেরিকায় অদ্যাবধি জন্মগ্রহণ করেন নাই। যদুনাথ সম্বন্ধে এই মাত্র বলা যাইতে পারে master of historical narrative হিসাবে বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে তিনি Macaulay-র স্থান কথঞ্চিৎ পূর্ণ করিয়াছেন। M-A পাশ করিবার পর যদুনাথ স্বর্গীয় N.N. Ghosh (Editor, "Indian Mirror") মহাশয়ের কাছে ইংরেজী লেখার জন্য শিক্ষানবীশী করিয়াছিলেন। N. N. Ghosh তখন উদীয়মান লেখকগণের মুরব্বী—"Dr. Johnson"। যদুনাথ বলিতেন, এক বৎসর সাক্রেদী করিবার পর একটি উপ-সম্পাদকীয় (Leaderette) যে দিন "Indian Mirror" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল সে-দিন তাঁহার কি আনন্দ! Macaulay লিখিয়াছেন Sir Walter Scott-র ইংরেজী শুনিলে লণ্ডনের মজুর মিস্ত্রীর (London apprentice) হাসি পায়; বলা বাহুল্য এই apprentice স্বয়ং Macaulay! সুতরাং যদুনাথের ইংরেজী পড়িবার জন্য Macaulay যদি বাঁচিয়া থাকিতেন তাহা হইলে সম্ভবতঃ তাঁহার কৃপার উদ্রেক হইত,—আমাদের ইংরেজী পড়িলে "Murder, Murder" চীৎকার ছাড়িয়া মূর্চ্ছা যাইতেন।

সাহিত্যশিল্পী হিসাবে যদুনাথ Macaulay অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও বর্ত্তমান যুগে ইতিহাসের সংজ্ঞা অনুসারে ঐতিহাসিক-মহারথী গণনায় Macaulay অপেক্ষা যদুনাথ অর্দ্ধগুণে শ্রেষ্ঠ।

১৬

গিবন্ এবং যদুনাথ সুবিশাল পটভূমির উপর শোকাবহ ও বৈচিত্র্যময় ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন। যাঁহাদের ইতিহাসের নেশা ঊর্দ্ধগামী তাঁহারা ভাবিবেন, ইতিহাস ইঁহাদের যেন পুরুষোত্তমের সমুদ্র-সৈকতে বসিয়া নিদাঘ সন্ধ্যায় বঙ্গবারিধির লহরী-গণনা;—ক্লান্তি নাই, তৃপ্তির অবসাদ নাই, সম্মুখে তরঙ্গ-চঞ্চল জীবনের উত্থান-পতনের অফুরন্ত খেলা, অনন্তর ইতিহাস। দূরে দিগন্তের কোলে এই সীমাহীন অন্তহীন সমুদ্রমধ্যে যেন একখানা অতিকায়

অর্ণবপোত বালুকাবন্ধনে আবদ্ধ, উদ্ধারের আশা নাই, অধিকন্তু সমুদ্রতস্করের কবলগ্রস্ত, উপরে, প্রকোষ্ঠে এবং পাটাতনে আহতের আর্তনাদ, অবলার ক্রন্দন, দস্যুর অট্টহাসি ও পাশবিক উল্লাস, দস্যুগণের মধ্যে নানা বর্ব্বর জাতি, টিউটন, গথ, হুণ, আরব (রোম-পক্ষে), কিংবা মারাঠা, জাঠ, শিখ, পাঠান, ইংরেজ (দিল্লী-পক্ষে)।

যাহা হউক, যদুনাথ Gibbon এর সমকক্ষ ঐতিহাসিক নহেন। এই কথায় সন্দেহ প্রকাশ করিলে উভয় ঐতিহাসিকের প্রতি অবিচার করা হয়, কিন্তু পূজ্যপাদ সরদেশাই-র কথা সরাসরি খারিজ করা যায় না। এইজন্য "ভারতীয় গিবন" এবং ইংরেজ Gibbon-এর সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা প্রীতিকর না হইলেও অপরিহার্য্য।

Edward Gibbon (b. 1737) আচার্য্য যদুনাথের (জন্ম ১০ই ডিসেম্বর ১৮৭০) একশত তেত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি যদুনাথ অপেক্ষা ত্রিশ বৎসর কম (d. 1794) পরমায়ু পাইয়াছিলেন। Gibbon বার বৎসর পরিশ্রম করিয়া ৬ খণ্ডে তাঁহার "Decline and Fall of the Roman Empire" (1776-1789AD) সমাপ্ত করিয়াছিলেন। যদুনাথ বিশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার "History of Aurangib" ৫ খণ্ডে শেষ করিয়াছিলেন এবং ১৮ বৎসরে Fall of the Mughal Empire (1932-1950) ৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। এই দুই বৃহৎ ইতিহাস ব্যতীত যদুনাথ ইংরেজী ছোট-বড় আরও ১২খানা পুস্তক লিখিয়াছেন, ফার্সি ইতিহাস অনুবাদ করিয়াছেন, এবং কয়েক শত ইংরেজী-বাংলা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, অধিকন্তু বহু পরিশ্রমে এক বিশিষ্ট ইতিহাস গোষ্ঠী সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। মোট কথা পরিমাণে যদুনাথ Edward Gibbon অপেক্ষা (ইংরেজী-ফরাসী লেখা সমেত) প্রায় চারি গুণ বেশী লিখিয়াছেন, এবং গবেষণার উৎকর্ষে তাঁহার লেখা Gibbon-এর লেখা হইতে অধিক মূল্যবান, যেহেতু যদুনাথ শতাধিক বৎসর পরে জন্মিয়াছিলেন, এবং Gibbon এর উত্তরাধিকারের সহিত পরবর্ত্তী শতাব্দী-সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার যদুনাথ পাইয়াছিলেন। যদুনাথ তবে Gibbon-এর সমকক্ষ হইতে পারেন নাই কেন? ইহার জন্য মুখ্যতঃ দায়ী যদুনাথের দেশ, যদুনাথের সমাজ।

ইউরোপীয় রেনেসাঁ-র (Revival of Learning) পর হইতে (১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে) Gibbon-র ঐতিহাসিক গবেষণার কাল পর্য্যন্ত তিনশত বৎসর কাল রোমের ইতিহাস উদ্ধারের জন্য পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহ নবীন যৌবনের উদ্দীপনায় কর্ম্মতৎপর ছিল। Gibbonর পূর্ব্বেই তাঁহার সংকলিত ইতিহাসের কাঁচা মাল সংগ্রহ প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে, রোমের প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য-শিল্পকলা সম্বন্ধে গবেষণা প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করিয়াছে, খ্রীষ্টধর্ম্মের বিচারমূলক ইতিহাস চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে, রোম সাম্রাজ্যের প্রত্যন্তবাসী জাতিসমূহের মোটামুটি নির্ভরযোগ্য বিবরণ সংকলিত হইয়াছে। গিবন "গ্রন্থাগার-মুখ্য" গবেষক, তিনি নূতন মাল-মসলা সংগ্রহ করেন নাই। তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াই ইতিহাসের জল মিশ্রিত দুগ্ধসমুদ্রে সাঁতার কাটিয়াছেন। তাঁহার মানস-হংস উহা হইতে দুধকে পৃথক করিয়া জগতকে চমৎকৃত করিয়াছেন। রোমের প্রতি শ্রদ্ধাবান ইয়োরোপের সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার তাঁহার কাছে বিশ্রব্ধভাবে উন্মুক্ত ছিল, অপর পক্ষে আচার্য্য যদুনাথকে দেখিলেই মোগল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হিন্দু ও মুসলমান দেশীয় রাজ্যে "সামাল, সামাল" রব উঠিত, পশ্চাতে গুপ্তচর লাগিয়া থাকিত। যদুনাথ দমিবার পাত্র ছিলেন না, রাজন্যবর্গের মজ্জাগত পা-চাটা মোগলাই মনস্তত্ত্ব তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। তাঁহার প্রয়োজনীয় পুঁথির জন্য আবেদন Sir Edward Gait প্রমুখ ইংরেজ বন্ধুগণের সৌজন্যে দরবার বিশেষের রেসিডেণ্ট সাহেবের কাছে পৌঁছিত। সাহেবকে অদেয় কিছুই নাই, নবাব রাজা মহারাজা হন্তদন্ত হইয়া ঐ সমস্ত পুঁথির নকল মরোক্ক চামড়ায় বাঁধাইয়া সাহেবকে নজর করিতেন, এবং ঐগুলি দুই-তিন হাত ঘুরিয়া যথা স্থানে আসিয়া পড়িত। এমন দেশে হঠাৎ Gibbon জন্মায় না। এই দেশের হিন্দু মুসলমান যক্ষের ধনের মত প্রাচীন দলিল লুকাইয়া রাখে, ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণকে কাগজ দেখায় না, মুসলমান অমুসলমানকে সহজে বিশ্বাস করে না—ইহা আচার্য্য যদুনাথের তিক্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা—অবশ্য উভয় সমাজের মুষ্টিমেয় উদারচেতা পণ্ডিতের এইরূপ সংকীর্ণতা ছিল না।

Gibbon এবং যদুনাথের মধ্যে চরিত্র, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং ইতিহাস-চর্চ্চায় সাফল্য ইত্যাদির যে সমস্ত ক্ষেত্রে মিল ও অমিল মোটামুটি জানা যায়, ঐগুলি নিম্নরূপ :

১। Gibbon কয়েক পাতা অসম্পূর্ণ আত্মচরিত লিখিয়াছেন (Autobiography), উহার মধ্যে আছে ব্যক্তিগত জীবনের "দিগম্বর" সত্য (Truth, nothing but naked truth)। এই জন্য ঐতিহাসিক তাঁহার ইতিহাস অপেক্ষা কম জনপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন, তিনি নাকি দাম্ভিক ছিলেন, তাহার মধ্যে আবাঞ্ছনীয় "ছেলেমী" ছিল, দুই-একবার অকারণে মিথ্যা কথাও বলিয়াছেন। আত্মচরিত না লিখিয়াও যদুনাথ রেহাই পাইতে পারেন নাই। "ছেলেমী" ও মিথ্যা ভাষণের অপবাদ তাঁহার শত্রুও দেয় নাই। তিনি জন্মাবধি গম্ভীর এবং অত্যন্ত মিতভাষী ছিলেন বলিয়া অসত্য ভাষণের রন্ধ্র ছিল না। যদুনাথ দাম্ভিক বলিয়াই লোকে জানে, আমরাও জানি তিনি বিনয়ের অবতার ছিলেন

না, কিন্তু উহা ছিল পোষাকী দাম্ভিকতা, আসল মানুষ অন্য রকম। Gibbon সম্বন্ধে চূড়ান্ত রায় দেওয়া হইয়াছে—"We admire, we commend, we like, but we cannot love the character of Edward Gibbon।"*

এই উক্তি যদুনাথ সম্বন্ধে সর্ব্বথা প্রযোজ্য। কেহ কেহ সখ করিয়া বাঘ পুষিয়া থাকেন এবং বাঘেরও সন্তানবাৎসল্য আছে, এই জন্য বাঘকে বিড়াল বলা যায় না।

২। রোমক সাম্রাজ্য কিংবা মোগল সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত না হইলেও ইতিহাস-"মহাকাব্য", চতুর্দ্দশপদী কবিতা নয়। যাঁহারা এইরূপ ইতিহাস-মহাকাব্য লিখিয়া গিয়াছেন তাঁহারা সমকক্ষ না হইলেও সমানধর্ম্মী, ইংরেজীতে বলা যায় Epic genius. শ্রমসাপেক্ষ গবেষণা পুরাতন "আবর্জ্জনা"র স্তূপ হইতে সত্যকে তিল তিল আহরণ করিয়া ঈদৃশ মহাকাব্যের উপাদান সংগ্রহ করিতে থাকে। ঐতিহাসিক কল্পনায় (Historical imagination) একনিষ্ঠ সাধক ইতিহাসের যে বিরাট রূপ প্রত্যক্ষ করেন উহার প্রতিচ্ছবি ঐতিহাসিকের মহান সৃজনী শক্তি, (constructive genius) মৃত-সঞ্জীবনী ভাষার ঝঙ্কার এবং সাবলীল রচনাশৈলীর প্রভাবে প্রাকৃত জনের অধিগম্য হইয়া থাকে।

৩। ইতিহাস প্রান্তরে সাহিত্য-শিল্প হিসাবে Gibbon-এর ইতিহাস ভারতীয় উপমায় "তাজমহল", যদুনাথের ইতিহাস "কুতব মিনার"। যদুনাথ এই মিনারের উপর হইতে আশীর্ব্বাণীরূপে শেষ আজান্ (call to prayer) দিয়া গিয়াছেন—

My message to my pupils and my pupils-pupils is one of hope. I bid them to be of good cheer, because the opportunities for carrying on scientific research in Indian history on the Indian soil are now unimaginably great, and the right atmosphere for this type of work has also been created around us . . .

Work in the right way, for the means are ready to hand and reward is sure.*

"ইমাম" (guide) চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ইতিহাস অরণ্যের মধ্যে অসহায় গবেষক দিশাহারা হইলে তাঁহার অশরীরী বাণী শুনিতে পাইবে, "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ ?...যাম্ অনুসর।" ইহাতে বলি পড়িবার আশঙ্কা নাই, উদ্ধারের আশা আছে।

৪। Gibbon তাঁহার Decline and Fall of the Roman Empire-এ আগাগোড়া অতুলনীয় শিল্পী (supreme artist), যদুনাথ তাঁহার ইতিহাসে অভ্রান্ত ঐতিহাসিক। কেহ যেন মনে না করেন Gibbon ইতিহাসকে খর্ব্ব করিয়াছেন, কিংবা যদুনাথের ইতিহাসে ভাব-দ্যোতক উচ্চস্তরের সাহিত্য-কলা নাই, অনুকরণ করিতে গেলেই ইহা টের পাওয়া যায়। Gibbon-এর সৃষ্টি রেনেসাঁ যুগের বর্ণসম্ভার-সমৃদ্ধ চিত্রশালিকার মায়াপুরী। এই চিত্রশালার চিত্রসারিকা (gallery of portraits) নির্ব্বাক চলচ্চিত্রের ন্যায় আনন্দ ও বিস্ময়ে পাঠককে অভিভূত করে। তাঁহার লেখনীর এই গুণ কিন্তু পরবর্ত্তীকালের নিরস ঐতিহাসিক সমালোচকগণ দোষ বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন।

যদুনাথের ইতিহাসে ছোট বড় সমস্ত চরিত্রগুলি ছবির মতই আঁকা, তবে তাঁহার ছবি রং-এর যাদু নয়, বলিষ্ঠ রেখার বাহাদুরী—যাহা শাজাহানের রাজত্বে দরবারী চিত্রশিল্পীগণ দেখাইয়া গিয়াছেন। রং চড়াইতে গেলেই ইতিহাস খানিকটা ঢাকা পড়ে। পূর্ণ একশত বৎসর ইংরেজ জাতি Gibbon-এর ইতিহাসকে বুকে করিয়া রাখিয়াছিল, এখন মাথায় তুলিয়া রাখিয়াছেন। যদুনাথের ইতিহাস বুকে মাথায় রাখিবার বস্তু নয়, ইহা সর্ব্বদা হাতের কাছে রাখিবার জিনিস। মধ্যযুগের গবেষকগণ যদুনাথের ইতিহাসে "নূতন কিছুর" আবিষ্কারের অভ্রান্ত নির্দ্দেশ পাইবেন, নাট্যকার নাটকীয় চরিত্র পাইবেন, "অর্ব্বাচীনতা"য় (Modernism) অরুচি ধরিলে কিংবা উদ্ভাবনী-শক্তি শিথিল হইলে ঔপন্যাসিক "Fall of the Mughal Empire" গ্রন্থে চমৎকার ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রচুর মাল পাইবেন, ভারতবর্ষীয় যে কোন কুলের কোষ্ঠি বিচার করিতে গেলে যদুনাথ ছাড়া গত্যন্তর নাই, ভারতীয় রাষ্ট্রে "আওরঙ্গজেব-তন্ত্র" কিংবা "মনুস্মৃতি"-র আতঙ্ক হইতে গণতন্ত্রকে যদি বাঁচাইতে হয় তবে ঐতিহাসিক যদুনাথকে উপদেষ্টা মানিতে হইবে।

৫। Gibbon এবং আচার্য্য যদুনাথের প্রতিপাদ্য বিষয়ের মধ্যে গুরুত্বের পার্থক্য আছে। খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব যুগের অর্দ্ধ পৃথিবীব্যাপী রোমক সাম্রাজ্যের সহিত মোগল সাম্রাজ্যের তুলনা হয় না। সভ্যতার সমৃদ্ধি এবং সংস্কৃতির বৈচিত্র্যে মোগল সাম্রাজ্য রোমের তুলনায় বহু গুণে নিকৃষ্ট। রোম ইয়োরোপীয় সভ্যতাকে যাহা দিয়াছে দিল্লী তাহা ভারতীয় সভ্যতাকে দিতে পারে নাই। রোমের রাষ্ট্রীয় সার্ব্বভৌমত্বের

---

* দ্রষ্টব্য—"Biography" (Everyman's Series), Introduction by Oliphant Smeaton, p x.

*'Life and Letters of Sir Jadunath Sarkar' (vol. 1, Panjab University, 1958

ধ্বংস অপেক্ষা ক্রততর গতিতে খ্রীষ্টধর্ম রোমের আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছে, রোম বস্তুতঃপক্ষে লোপ পায় নাই, নবকলেবর ধারণ করিয়াছে। মুসলমান সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় দশা অনুরূপ। "বন্দেমাতরম্" ভীতিগ্রস্ত ইংরেজ ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী পত্তন না করিলে দিল্লী বর্তমান ভারতীয় রাষ্ট্রের রাজধানী হইত না, বর্তমান দ্বিতীয় মহম্মদ তোগলকের মত কিছুকাল দিল্লী-দৌলতাবাদের মধ্যে আনাগোনা করিয়া রাষ্ট্রের অষ্ট-ভৌগোলিক দিক হইতে জরিপে নির্দ্ধারিত কেন্দ্র স্থলে রাজধানী স্থাপন করিতে বাধ্য হইতেন। Holy Roman Empire যে অর্থে প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী ছিল বর্তমান ভারত-রাষ্ট্র সে অর্থে মোগল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী নয়।

প্রতিপাদ্য মহিমায় প্রবন্ধ মহত্তর হইয়া থাকে সুতরাং Gibbon-এর ইতিহাস যদুনাথের গ্রন্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, এই কথা মানিতেই হইবে। Gibbon-এর বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের ধর্ম-যাজক সম্প্রদায় ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। তিনি নাকি খ্রীষ্টান ও খ্রীষ্টধর্মের প্রতি সুবিচার করেন নাই, যদুনাথের প্রতি হিন্দুর মনোভাব অনুরূপ। ঐতিহাসিক হিসাবে ইহা তাঁহাদের নিন্দা না পরোক্ষ প্রশংসা (left-handed compliment) ?

৬। Gibbon এবং যদুনাথ দুজনেই ইতিহাস রচনা করিতে গিয়া এক বিশ্বজিৎ যজ্ঞ (encyclopaedian task) আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং উহাতে পূর্ণাহুতি দিয়া অক্ষয় কীর্তিলাভ করিয়াছিলেন, এইখানেই উঁহাদের মধ্যে মিল। Gibbonএর উপর Western Church-এর শনিদৃষ্টি ছিল। যাহার জন্য তাঁহাকেও Vindication লিখিতে হইয়াছিল। যদুনাথের উপর ছিল নবগ্রহের প্রকোপ। ঐতিহাসিকদ্বয় উহাতে বিচলিত না হইয়া ন্যায়নিষ্ঠতার পরিচয় দিয়াছেন, তবে সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই।

Gibbon অপেক্ষা যদুনাথের কার্য্য এক হিসাবে অধিক দুষ্কর ছিল। রোমক সাম্রাজ্যের পতন ইংলণ্ডের ইতিহাস নহে; যে জাতি ঐ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল, সেই জাতি Gibbon জন্মগ্রহণ করিবার প্রায় তের শত বৎসর পূর্ব্বে মরিয়া গিয়াছিল। "Fall of the Mughal Empire" কোন মৃত জাতির ইতিহাস নহে, মোগল সাম্রাজ্য না থাকিলেও মুসলমান আছে; অষ্টাদশ শতাব্দীর স্বল্পায়ু হিন্দুপাদ্ পাত-শাহীর অবসান হইলেও মারাঠা জাতি বিলক্ষণ জীবিত; "গুরু" না থাকিলেও শিখ আছে, ভরতপুরের সুরজমল-জবাহির সিংহ মরিয়া গেলেও জাঠ মরিতে পারে না; ছত্রসাল বুন্দেলা নাই, কিন্তু বুন্দেলার জাত্যভিমান আছে; অমর্ষ-পরায়ণ শৌর্য্যাভিমানী রাজপুতগণ চারণ ব্যতীত কোন ঐতিহাসিককে সমীহ করে নাই। আবঙ্গালী-মজিবুদ্দৌলা গিয়াছে কিন্তু ভারতের ভিতরে বাহিরে পাঠান নগণ্য নহে, দাক্ষিণাত্য তখনও আওরংজেব-তন্ত্রের পীঠস্থান।

Gibbonএর সময় সমগ্র ইয়োরোপের সুধীসমাজ রোমের প্রতি ভক্তিমান্ ছিল, রোমের প্রশংসা কিংবা নিন্দা ঐতি-হাসিকের পক্ষে "অধিকন্তু ন দোষায়:" ছিল; অপর পক্ষে ঐতিহাসিক যদুনাথকে ক্ষুরের ধার কিংবা পুল-ই-সিরতের উপর দিয়া চলিতে হইয়াছে। বস্তুতঃ আচার্য্য যদুনাথ বারুদের কারখানায় বসিয়াই ইতিহাস লিখিয়াছেন, এবং উহার উপর শান্তিবারি নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। যদুনাথ স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন ভারতবর্ষে Gibbon and Fisherএর মত ঐতিহাসিক নাই, পরে জন্মিতে পারেন।*

১৭

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে অগস্ত্য যাত্রার দিন আমি আচার্য্য যদুনাথের সঙ্গে আবাসিক ছাত্ররূপে কটক গিয়াছিলাম। ঐখানে যাইয়া বুঝিলাম গবেষণা আমার কাজ নহে। আমাকে কি করিতে হইবে তাহা তিনি বলিয়া দিতেন না, অথচ প্রত্যহ বিকালে বেড়াইবার সময় জিজ্ঞাসা করিতেন, কাজ কত দূর? নূতন কিছু পাওয়া গেল? তিনি সকাল বেলা কতকগুলি বহি আমার টেবিলে রাখিয়া যাইতেন, ঐগুলির প্রয়োজনীয়তা আমাকে অনুমান করিয়া লইতে হইত। মাঝে মাঝে এমন বহি রাখিয়া যাইতেন, যেগুলির সহিত শের শাহ দূরের কথা হিন্দুস্থানের কোন সম্পর্ক নাই; যথা ইটালী এবং অন্যান্য দেশের রণবিজ্ঞানের ইতিহাস। ক্রমশঃ আমি সর্ব্বভুক হইয়া পড়িলাম, কারণ বিকালে মৌখিক পরীক্ষা। একখানা বহি কিছুতেই আমি হজম করিতে পারিলাম না। ইহা Goochএর সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক "History and Historians of the Nineteenth Century"। উহার দুই অধ্যায় পড়িয়া আমি মাথায় হাত দিলাম, লেখক, উদ্দেশ্য এবং বিষয়বস্তু কিছুই বোধগম্য হইল না। ঐ বহির মধ্যে তখন পর্য্যন্ত আমার Macaulay, Gibbon, Grote, Mommsen ছাড়া অন্য ঐতিহাসিকের নামগন্ধ আমার জানা ছিল না। এক সপ্তাহ পরে প্রশ্ন হইল, Goochএর মতে আদর্শ ঐতিহাসিক কে? আমি বলিলাম, Macaulay। তিনি হাসিয়া জেরা করিলেন কেন? তাবার

* **This is the general type of our [Research workers in India] work. . . . a full history of India can be constructed by some future synthetic genius like Gibbon or H.L.A. Fisher". (Bengal Past and Present, Jubilee Number 1957)**

তুবড়ী ফুটাইয়া "বাবের" শ্রাদ্ধ করিতে চাও নাকি ? আমি আরও এক মাস সময় পাইলাম ; ইহার পরে আবার জেরা। এইবার প্রশ্ন হইল, উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসগোষ্ঠীর ("Schools of History") মধ্যে কোন্ "School"র ধারা ভারতবর্ষের পক্ষে উপযোগী ? তখন আমারও কিঞ্চিৎ স্বদেশী "জোস্" ছিল, এবং আমি উহাই খুঁজিতেছিলাম ; সুতরাং আমি বলিয়া ফেলিলাম, Prussian School—যাহা নেপোলিয়নের পদদলিত জার্ম্মান জাতিকে নেপোলিয়ন-জয়ী করিয়াছে। যদুনাথের মুখে একটু বিরক্তির ভাব দেখা গেল যেন তাঁহার উদ্দেশ্য বিফল হইয়াছে ; পরে তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, উহা ইতিহাস নয়, প্রচারমূলক সাহিত্য ; জার্ম্মান জাতির উপর সালসার কাজ করিয়া ঐ ইতিহাস মরিয়া গিয়াছে কিন্তু উহার বিষ জাতির শরীরে আছে। আমি সব কথা না বুঝিলেও Prussian School-এর মোহ ত্যাগ করিলাম।

ইহার কিছুদিন পরে যদুনাথ Ranke ("History of the Popes" প্রণেতা) সম্বন্ধে আমার কি ধারণা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, Ranke বড় কঠোর বিচারক ; তাঁহার আসন সকলের উপরে বটে, কিন্তু লেখা সহজে বুঝা যায় না, পড়িলে রক্ত গরম হয় না। কয়েক দিন Ranke, Mommsen লইয়া আলোচনা চলিল, ইহাতেই বুঝিয়া লইলাম হাওয়া কোন্ দিকে চলিয়াছে। Mommsen সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ হইলে "History of Rome" পড়িয়া আমি যাহা অনুমান করিতে পারিয়াছিলাম উহাই বলিলাম ; Mommsen শ্রেষ্ঠ জার্ম্মান পণ্ডিত, কিঞ্চিৎ ফরাসী বিদ্বেষ আছে, রচনা একেবারে পাথুরে প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, তবে Gibbon, Macaulayর মত সুপাঠ্য নয়। মোট কথা যদুনাথ Rankeর প্রতি ভক্তিমান ছিলেন এবং তিনি Mommsen রোমের ইতিহাস উদ্ধারের জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন ভারতে মুসলমান যুগের ইতিহাসে অনুরূপ কার্য্য করিবার উচ্চ আশা পোষণ করিতেন ; কিন্তু পরমায়ুতে কুলায় নাই। এই সমালোচনা লিখিতে না বসিলে যদুনাথের বহি এই বয়সে পড়িবার প্রয়োজন ছিল না, ঐতিহাসিক যদুনাথকে বুঝিবার প্রয়াস হইত না।

১৮

আচার্য্য যদুনাথ মহান্ কর্ম্মযোগী ছিলেন। ইতিহাসকে কেন্দ্র করিয়া তিনি স্বকীয় কর্ম্মক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ইতিহাস তাঁহাকে অতুল প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছে, জীবনে আনন্দ দিয়াছে, শোকে শান্তি দিয়াছে। তাঁহার কর্ম্মক্ষমতা অসাধারণ এবং কর্ম্মস্পৃহা ছিল অপূরণীয়। "খ্যাতি খ্যাতি" (Fame, more fame) করিয়া মহাবীর নেপোলিয়ন মরিয়াছিলেন ; "কাজ আরও কাজ" করিয়া যদুনাথ মরিলেন। দশ জনের মত তিনিও নিজের পরমায়ু বেশী দেখিয়াছিলেন, এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে এইজন্য ঐতিহাসিক গবেষণার দশবার্ষিক পরিকল্পনা করিয়া গিয়াছেন। এই পরিকল্পনার মধ্যে ছিল ঐতিহাসিক দলিল ও দুষ্প্রাপ্য পুথিগুলির সম্পাদনা ; Mommsen রোম ইতিহাসের যে রকম "Corpus" প্রকাশিত করিয়াছিলেন, মোগল ইতিহাসেরও তদনুরূপ "Corpus" সংকলন তাঁহার কাম্য ছিল। তাঁহার সংগ্রহের মধ্যে অনুমান চারি হাজার "আখবারাত" অর্থাৎ দিল্লী দরবারের দৈনিক সংবাদ-তালিকা আছে। এইগুলি ছাপাইবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল ; টাকা থাকিলে হয় ত করিয়া ফেলিতেন। যাহা করিয়া গিয়াছেন উহাতে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না।

যদুনাথ মাঝে মাঝে হতাশ হইয়া বলিতেন, ইতিহাসে, আমি কি "সান্তা খোর্‌পাদে" [মারাঠা সেনাপতি] কিংবা সুইডেনের রাজা দশম চার্লসের মত একটা ধূমকেতু হইয়া থাকিব—যাহার পশ্চাতে অন্ধকারের ধূম্রপুচ্ছ, মধ্যে গতিকক্ষে ক্ষণিক আলো, সম্মুখে মহাশূন্যে পুড়িয়া ভস্মমুষ্টি যাহার পরিণাম ? তিনি ধূমকেতু না ধ্রুবতারা উহার বিচার তাঁহার দেশবাসীরা করিবে,—যে দেশ সরদেসাই-যদুনাথের ঐতিহাসিক গবেষণা-গৌরবে পাশ্চাত্যকে পঞ্চাশ বৎসর পিছনে ফেলিয়াছে। এই কৃতিত্বের ভাগাভাগি করিবার অপচেষ্টা আমরা করিব না।

স্বাধীনতার অরুণোদয়ে ইতিহাস-গগনে প্রভাতী-তারার ন্যায় যদুনাথের আবির্ভাব হইয়াছিল ; সেই প্রভাতী তারা স্বকীয় শক্তিতে অসংখ্য তারকাপুঞ্জের কক্ষপথকে অবহেলা করিয়া ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসুর দৃষ্টিপথে ধ্রুবত্ব লাভ করিয়াছে। আচার্য্য যদুনাথের বিদ্যা "সুশিষ্য-পরিদত্তা" হইলে এত সহসা নিরাধারা হইত না, তাঁহার "Military History of India" অসমাপ্ত থাকিত না। তাঁহার পরিত্যক্ত গাণ্ডীব শিষ্যগণ বংশদণ্ডবৎ ব্যবহার করিয়া আত্মরক্ষা করিবে ; উহাতে জ্যা রোপণ করিয়া কুরুক্ষেত্রজয়ী হইবার আশা নাই।

পাষাণের প্রাণ

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

অনিমেষের জগতটা মৃতদেহে ঘেরা। সাদা, কালো, লাল— নানাপ্রকার পাথরে রচিত গ্রীক, বৌদ্ধ, হিন্দু দেবদেবী ও রাজা-রাজড়ার মৃতদেহ, সৌন্দর্য্যের অবিনশ্বর ঐশ্বর্য্য, অতীতের মূর্ত্ত সাক্ষী। বেদ-পুরাণ-তন্ত্র জাতকের বিপুল ভূস্তরের অভ্যন্তরে বিরাজ করেছে সুদূর অতীতের বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া মানুষগুলি—অনিমেষের কাছে এরাই সত্য। বর্ত্তমানকালের মানুষ অর্থাৎ যারা বেঁচে আছে, তাদের সঙ্গে অনিমেষের বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই, কেননা তারা ত এখন পর্য্যন্ত গোটা মানুষ নয়, মানুষের ভগ্নাংশ। মানুষ মরে গেলে তবে সে গোটা বলে প্রমাণিত হবে। তারও বহু পরে, এবং কালের সঙ্গে যুদ্ধ করে টি'কে থাকতে পারলে তবে সে বস্তুতঃ সত্য হয়ে উঠবে। অতএব অনিমেষের কাছে বুদ্ধদেব সত্য, জুলিয়াস সীজার, কনফুসিয়াস বা কালিদাস সত্য, কিন্তু যদু, মধু সত্য নয়। তর্ক তুললে ভাষাকে একটু সংশোধন করে অনিমেষ বলে, অসত্য একথা জোর করে বলছি না, তবে বিচারাধীন। এ বিচার শেষ হতে পাঁচশ, হাজার বা দু' হাজার বছর লাগতে পারে। তোমরা প্রমাণিত হবে ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকদের হাতে, আমার কাছে তোমরা মূল্যহীন।

অতএব অনিমেষ মানুষের দিকে তাকাবার প্রয়োজন অনুভব করে না। প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্য্যের শিল্প-নৈপুণ্যে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছে, অজন্তার চিত্রকলায় মুগ্ধ হয়ে সে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়েছে, হিন্দু-স্থাপত্যের গগনচুম্বী বিরাটত্বে অভিভূত হয়ে সে হাঁ করে চেয়েছে, কিন্তু জীবিত মানুষের দিকে তাকাবার কথা তার কখনও মনে হয় নাই।

এ হেন অনিমেষ একদিন বিয়ে করল। মস্ত মস্ত থিয়োরী আর অগণিত প্রমাণে-ঠাসা তার মগজে যে কখনও কোন রক্ত-মাংসে গড়া নারী স্থান পাবে, এটা অবিশ্বাস্য, যদিও পাথরের নারীরা চিরকালই তার মন হরণ করেছে। যদি কালস্রোতে উজান বহা সম্ভব হত তা হ'লে সে এক্ষুণি চতুর্থ শতাব্দীর মিথিলায় চলে যেত। সেখানে হাতে লীলা কমল এবং অলকে বালকুন্দানুবিদ্ধ, লোধ্র ফুলের রেণুতে পাণ্ডুর-মুখ কামিনীর চঞ্চল কটাক্ষে বিপর্য্যস্ত হ'ত। কিন্তু বর্ত্তমানের বাস্তব নারীকে সে কি বলে বিশ্বাস করবে? এদের খোঁপায় ফুলের মালা শুকোয়, গরমকালে গা দিয়ে ঘাম বেরোয়, অসুখে এরা রোগা হয় এবং বার্দ্ধক্যে এদের চুল পাকে, চামড়া কুঞ্চিত হয়। অতীতের নারীরা সকলেই চির-যৌবনা।

অথচ অনিমেষ যে অকস্মাৎ বিয়ে করল, তার জন্য দায়ী কে? দায়ী তার ঐ ঐতিহাসিক মগজই।

দার্জ্জিলিং-এ এক সন্ধ্যায় কোন এক বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে অস্তগামী সূর্য্যের সোনালী কিরণে ঝলসানো পাহাড়ের ব্যাকগ্রাউণ্ডে নীল শাড়ী-পরা এক অপূর্ব্ব নারীর চিত্র দেখে সে জীবনে আর একবার ফ্যাল ফ্যাল করে, ড্যাব ড্যাব করে এবং হা করে তাকিয়ে ছিল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় তার তথ্য-শিকারী ঐতিহাসিক মন উক্ত অসাধারণ আর্ট-স্পেসিমেনটি দখল করবার জন্য প্রলুব্ধ হয়েছিল। কোন ঐতিহাসিকই কি এমন অমূল্য সম্পদ হাতে পেলে হাতছাড়া করে? অনিমেষও করে নি, একেবারে বিয়ে করে তবে নিশ্চিন্ত হয়েছে।

সুনন্দার কিন্তু মানুষটিকে অত্যন্ত ভাল লেগেছে। একেবারে আপন-ভোলা, সদাশিব। তার এত দিনকার শিবপূজা বুঝি সার্থক হ'ল। অনিমেষ অধ্যয়ন ছাড়া আর কিছু জানে না। তার ছোট পড়ার ঘরের বিচিত্র পরিবেশে মানুষের চোখের আড়ালে মিশরের মমির মত সে স্বমহিমায় বিরাজ করে। সুনন্দা ঘর গোছায়, সংসার আগলায় এবং মাঝে মাঝে এসে স্বামীর পড়ার ঘরের ঐতিহাসিক নিস্তব্ধতা ভাঙ্গে।

একটু দুষ্টামিও করে। পা টিপে টিপে এসে অনিমেষের চেয়ারের পিছনে দাঁড়ায়। তারপর দু'হাতের আঙুল দিয়ে অনিমেষের দু'দিককার পাঁজরে সুড়সুড়ি দিতে চেষ্টা করে। অনিমেষের সমাধি ভাঙ্গে।

"কে, সুনন্দা?" অনিমেষ প্রশ্ন করে।

"উঁহু," সুনন্দা সামনে এসে দাঁড়ায়।—"ছদ্মেনসাঙ।" হাসতে হাসতে বলে।

অনিমেষ একাগ্র দৃষ্টিতে সুনন্দার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

"কি দেখছ?" সুনন্দা প্রশ্ন করে।

"তুমি বাস্তবিকই সুন্দর।" অভিভূতের মত অনিমেষ বলে ওঠে।—"অসাধারণ।"

"তাই নাকি ?" সুনন্দা উত্তর দেয়। "তোমার গুপ্ত কয়েনের চেয়েও ?" বলেই খিল খিল করে হেসে ওঠে।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে অনিমেষ ভাবে, অত হাসে কেন সুনন্দা। একান্ত অর্থহীন হাসি, যা কালের ধোপে টিকবে না। কই, বুদ্ধদেবের মা তাঁর বাবাকে কাতুকুতু দিয়ে হাসাচ্ছেন, আর নিজে হেসে গড়িয়ে পড়ছেন, এমন ছবি অজন্তা গুহার গায়ে সে কখনও দেখেছে বলে ত মনে পড়ে না। যবদ্বীপের প্রজ্ঞাপারমিতা কি লুভ্‌র্ মিউজিয়ামে বসে অনাদিকাল ধরে হি হি করে হাসছেন ? বই বন্ধ করে অনিমেষ একখানি ছবির য়্যালবাম টেনে নেয়। পাতা ওলটাতে ওলটাতে চোখে পড়ে—মোনালিসা। হ্যাঁ, অনিমেষ ভাবে—যদি হাসতেই হয় তবে এমনি করে। গভীর রহস্যময় অতীন্দ্রিয় হাসি, যেন মহাকালের খরস্রোতের মাঝখানে একটি নিশ্চল অবিনশ্বর শতদল ফুটে আছে। সুনন্দার সৌন্দর্য্যও ত ইতিহাসের যে কোন সৌন্দর্য্যের সঙ্গে তুলনীয়। তবে ও অমন বিশ্রীভাবে হাসে কেন ? ও কি মোনালিসার মতন হাসতে পারে না ?

"দেখছ ?" সুনন্দার দিকে ফিরে ছবিটার দিকে আঙ্গুল প্রসারিত করে সে দেখায়।

"দেখছি।" গভীর ঔদাস্যভরে সুনন্দা জবাব দেয়।

"কি রকম দেখছ ?" অনিমেষ রহস্য করে প্রশ্ন করে।

"তুমি যেমন দেখছ, তেমনি। একটা মেয়ের ছবি, তার বেশী কি ?" নিরুৎসুকভাবে সুনন্দা বলে।

"আর কিছু নয় ? কেন, হাসিটা ?" অনিমেষ হঠাৎ গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করে।

"হাসিটা কি ?"

"জান, ওই হাসির জন্যই ছবিটার এত কদর। ওই রকম হাসতে পেরেছিলেন বলেই ত ঐ মহিলাটি পৃথিবী-বিখ্যাত হয়ে আছেন।" অনিমেষ উত্তেজিত ভাবে বলে।

"সত্যি নাকি ?" সুনন্দা হঠাৎ উৎসুক হয়ে ওঠে। "কই, দেখি—" বলে ঝুঁকে পড়ে সে। "আচ্ছা দেখত", অনিমেষের মুখখানি দু'হাতে উঁচু করে ধরে বলে, দেখত, আমিও ঠিক অমনি ভাবে হাসতে পারি কিনা ? দেখ, লক্ষ্য কর, আমি হাসছি।" সুনন্দা গম্ভীর ভাবে মোনালিসার মত হাসতে চেষ্টা করে দু'এক সেকেণ্ড, কিন্তু তারপরেই খিল খিল করে হেসে ওঠে।

"নাঃ, তুমি একেবারেই হোপলেস।" চেয়ারে এলিয়ে পড়ে অনিমেষ। য়্যালবামখানা টেনে নেয় সুনন্দা। পাতা ওলটাতে ওলটাতে এক জায়গায় এসে থামে।

"এই, এটা কেমন বল না ?"

"ওটা মিলোর ভেনাস মূর্ত্তি।" উত্তেজিত ভাবে অনিমেষ বলে, "নারীদেহের সৌকুমার্য্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।" বলে চোখ বুঁজে ভাববার চেষ্টা করে। কিছুক্ষণ পরে বলে, "ওর দুটো হাতই ভেঙ্গে গেছে, না ?"

সুনন্দা দেখে বলে, "তাই ত মনে হচ্ছে।"

হঠাৎ অনিমেষ উজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, "কিন্তু ও তোমার চেয়ে সুন্দর নয়।"

"উঁহু, আমার চেয়ে ঢের বেশী সুন্দর।"

পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে এবার অনিমেষ বলে, "তা হতেই পারে না। তুমি সম্পূর্ণ নিখুঁত, তোমার দু'খানা হাতই আছে।"

অনিমেষের কথা সুনন্দার কানে যেন দুম করে বন্দুকের মত আওয়াজ করে। কিন্তু স্বাভাবিক হওয়ার জন্য সে দু'হাতে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে বলে, "এ দু'খানা কি তা হ'লে ? তোমাদের বইয়ের ভাষায় বল্লরী, না ?"

অনিমেষ একটু নড়ে চড়ে বসে। কেমন যেন একটা মাদকতা আছে সুনন্দার স্পর্শে,—দেহের রোমকূপের ভিতর দিয়ে একটা অনুভূতি ঢুকে শিরা-উপশিরা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ? একেই কি বলে শিহরণ ? আর হৃৎপিণ্ডের মধ্যে কেমন যেন একটা চুলবুলানি, একটা উদ্গত পুলক যেন গলার মধ্য দিয়ে ঠেলে বের হতে চায়। এ ধরনের অনুভূতি অনিমেষের কাছে সম্পূর্ণ নূতন—ইতিহাস পাঠ করে এ বস্তু সে কখনও লাভ করে নাই। মোটের উপর বেশ ভালই লাগে, একটু যেন নেশার ভাব আছে এর মধ্যে।

বাঁ হাতে সুনন্দার কটি বেষ্টন করে সোহাগের সুরে সে বলে, "যাই বল সুনন্দা, তোমাকে কিন্তু ঘরের কোণে মানায় না।"

"কোথায় মানায় তা হ'লে ?"

"মিউজিয়ামে।" অনিমেষ উত্তর দেয়।

"আর তোমাকে চিড়িয়াখানায়, না ?" হেসে সুনন্দা প্রশ্ন করে, কিন্তু মনে মনে দারুণ অস্বস্তিবোধ করে।

তবুও মোটের উপর ওদের দিনগুলি বেশ কাটে। অনিমেষের পাগলামিতে কখনও কখনও ছন্দপতন ঘটলেও সুনন্দা তার ছেলেমানুষী দিয়ে পাদপূরণ করে নেয়। কিন্তু ওদের যৌথ জীবনের মাঝখানে ইতিহাস-নামক প্রকাণ্ড একটি অশরীরী দানবের উপস্থিতিকে সুনন্দা একটু আতঙ্কের চোখেই দেখতে আরম্ভ করেছে আজকাল। অনিমেষ ওই দানবের কবলিত, আর সুনন্দার চেষ্টা ওকে মুক্ত করে স্বাভাবিক জীবনের আবহাওয়ায় ফিরিয়ে আনা। অতিরিক্ত পড়ার ফলেই অনিমেষের কাছে অবাস্তব বাস্তবের রূপ

পরিগ্রহ করেছে। নইলে যার এত প্রভাব-প্রতিপত্তি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে যার তুলনা নাই, যার গবেষণার প্রশংসায় পণ্ডিত-সমাজ মুখর, তার মস্তিষ্কের স্থৈর্য্য সম্বন্ধে সন্দেহ যে করে সেই ত পাগল। তাই সুনন্দা মাঝে মাঝে ওর পড়ার ঘরে হানা দিয়ে ওকে অতীতের অন্ধকার গুহা থেকে বর্ত্তমানের উজ্জ্বল আলোতে টেনে আনবার চেষ্টা করে।

"বলত পণ্ডিতপ্রবর, আমার হাতে কি?" বদ্ধমুষ্টি দেখিয়ে সুনন্দা জিজ্ঞাসা করে।

অনিমেষ গভীর ভাবে নিবিষ্ট। ইদানিং একটি প্রশ্ন তার মনে বিশেষ করে জেগেছে। ইতিহাসে কারা স্থান পায়? শুধু রাজা-রাজড়াদের কাহিনী নিয়েই ত ইতিহাস নয়, এক কথায়, ইতিহাসে তাঁরাই স্থান পেয়েছেন যাঁরা অসাধারণ। অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, হানিবল, সক্রেটিস, কালিদাস, লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি—এঁরা সকলে অসাধারণ বলেই ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

সুনন্দাও ত অসাধারণ। ওর সঙ্গে তুলনা হয় এমন সৌন্দর্য্য অনিমেষ কোথাও দেখে নাই, বাস্তবে ত নয়ই, এমন কি আর্টেও নয়। ইতিহাসে ক্লিওপেট্রা বা মমতাজের পাশে স্থান পাওয়ার যোগ্য। অনিমেষের কি উচিত নয়, সুনন্দাকে তার প্রাপ্য দেওয়া?

সুনন্দার প্রশ্নের উত্তরে সে বিপন্ন বোধ করে মাথা চুলকায়। তারপর রসিকতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

"বোধহয় ঘোড়ার ডিম।" খুশী মনে বলে।

"উঁহু, হ'ল না। তুমি বুঝি আজকাল প্রাচীনকালের ঘোড়ার ডিম নিয়ে গবেষণা করছ?"

"তাহলে দিল্লীকা লাড্ডু।"

"সে ত খেয়ে পস্তাচ্ছ। ওটাও নয়। তবে, হ্যাঁ, খাবার জিনিসই বটে, চেখে দেখবে? তা হ'লে চোখ বুঁজে হাঁ কর—হ্যাঁ, হয়েছে। দেখ, যেন হাতটা আবার কামড়ে দিও না।"

অনিমেষ মুখ বিকৃত করে বলল, "বাব্বাঃ, ভয়ানক টক। তাই ত, কুল পেলে কোথায়?"

"ওটা সম্রাট টুটান খামেনের বড় পেয়ারের জিনিস কিনা।" সুনন্দা অতিশয় গম্ভীর হয়ে উঠেছে। শীঘ্রই হাসির ঝড় উঠবে, তারই পূর্ব্বাভাষ। "সম্রাট টুটান-খামেনের একেবারে খাস বাগিচার জিনিস, এক নম্বর পিরামিডে পাওয়া গেছে।"

"ঠাট্টা হচ্ছে বুঝি?"

"বা-রে, ঠাট্টা হবে কেন?" সুনন্দা এবার হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়ে। "প্রত্যেকেই যে যার বিষয় নিয়ে রিসার্চ করবে ত? তুমি কয়েন, স্কালপচার, আর্কিটেক্‌চার নিয়ে রিসার্চ করছ—ওগুলো তোমার বিষয়। আমি কলা, মুলা, বেগুন নিয়ে রিসার্চ করি, ওগুলো আমার বিষয়।" সুনন্দা দুলে দুলে হাসতে থাকে।

সুনন্দার মুখের দিকে তাকিয়ে অনিমেষের মনে হয়, অমনি ভাবে হাসি-ঠাট্টা করলে, নড়ে চড়ে বেড়ালে সুনন্দাকে সত্যিই মানায় না। সুনন্দা যেন ওর আরাধ্যা, তাকে পূজা করেই ও খুশী। কিন্তু ভক্ত মন্দিরে গিয়ে বিগ্রহের সামনে ভক্তিভরে প্রণাম করছে এমন সময় বিগ্রহ যদি বেদী থেকে নেমে এসে ভক্তের কান কামড়ে দেন, তা হ'লে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক হয়। এও যেন কতকটা সেই রকম।

অনিমেষের মনে পড়ে একদিনের কথা। সন্ধ্যার সময় ও সাধারণতঃ পড়ার ঘরেই কাটায়। সেদিন কি কারণে হঠাৎ দোতলার ঘরে গিয়েছিল। ঘরে ঢোকবার আগেই তার চোখে পড়ল, সুনন্দা পশ্চিমের জানালার ধারে চেয়ারে বসে আছে। কোলের উপর একখানি খোলা বই, কিন্তু চোখ সেদিকে নেই। সুনন্দা দূর দিগন্তের দিকে চেয়ে আছে। সন্ধ্যার ঘনায়মান রহস্য তার চোখে নিবিড় ভাবে ফুটে উঠেছে। অস্তগামী সূর্য্যের কিরণে তার খোলা চুলের একটা পাশ যেন ঝলসে যাচ্ছে। অর্দ্ধ-প্রকাশিত দেহের প্রতিটি রেখায় সাড়ীর ভাঁজে ভাঁজে আলো-ছায়ার দ্বন্দ্ব খেলছে। সামান্য ফাঁক করা ঠোঁট দু'টির মাঝখানে দু'টি দাঁতের উজ্জ্বল আভাস। কিছুক্ষণ আগেই বোধহয় হেসেছিল, তার রেশ এখনও মিলিয়ে যায় নি। অনিমেষ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। এ তার স্ত্রী নয়—এ যেন কুমারসম্ভব কিংবা উত্তররামচরিত থেকে নেমে আসা একখানি জীবন্ত প্রতিমা, যুগ যুগ ধরে যার তপস্যা সে করে এসেছে। অনিমেষ এরই ছায়া দেখে এসেছে অজন্তার প্রাচীরে।

তাড়াতাড়ি সে নীচে নেমে গিয়েছিল ক্যামেরা আনবার জন্য। শিল্পীর স্বপ্ন এই রূপের সামান্য রেশও যদি ধরে রাখা যায়। কিন্তু ফিরে এসে দেখল, সুনন্দা ঝাঁটা হাতে ঘর ঝাঁট দিচ্ছে। মূর্ত্তিমান য়্যান্টি-ক্লাইমেক্স।

অনিমেষকে চেয়ে থাকতে দেখে সুনন্দার হাসি থেমে গেল। আবার সেই দৃষ্টি—একটা অজ্ঞাত ভয়ে গা-টা শির শির করে ওঠে। ওই দৃষ্টিতে কেমন যেন একটা হিংস্রতা আছে। ঈষৎ শঙ্কিতভাবে তাই সে জিজ্ঞাসা করল, "কি দেখছ?"

"তোমাকে।" আবিষ্টের মত বলল অনিমেষ।

"কেন?" আরও শঙ্কিত হ'ল সুনন্দা।

"কেন, জিজ্ঞেস করছ?" উত্তেজিত ভাবে অনিমেষ বলল, তুমি কি, তুমি নিজেই জান না। তুমি অসাধারণ।

ইতিহাসের পাতায় যাঁরা অমর হয়ে আছেন, তাঁরা সকলেই অসাধারণ। তোমাকে আমি যদি অবহেলায় নষ্ট করে ফেলি তা হ'লে ভবিষ্যতের কাছে আমাকে অপরাধী হতে হবে।"

সস্নেহে স্বামীর হাত ধরে সুনন্দা বলল, "চল ছাতে যাই, বিকেল হয়ে এল। চা খাবে? আজকে তোমার জন্য পুডিং তৈরি করেছি। তুমি যে সেই গ্লোব নার্সারী থেকে যুঁই-এর চারাটা এনে দিয়েছিলে, সেটা এখন কত বড় ঝাড় হয়েছে দেখবে চল। দু'চারটে ফুলও ফুটছে। বেশী ফুটলে তোমাকে মালা গেঁথে দেব।"

"জাপানীরা ফুল খুব ভালবাসে। ওদের আর্টের হিষ্ট্রি আলোচনা করলেই সেটা বোঝা যায়।" অনিমেষের মন্তব্য সুনন্দা কানে যেন ক্ষুধিত শ্বাপদের গর্জ্জনের মত শোনাল।

"ফের যদি তুমি আমার কাছে ইতিহাসের কথা বলবে তা হ'লে আমি গলায় দড়ি দেব, নিশ্চয় গলায় দড়ি দেব, নয়ত ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ব।" সুনন্দা প্রায় কেঁদে ফেলল।

আনমেষের মুখে করুণ নিরুপায় ভাব ফুটে উঠল। "বা—রে, তুমি রাগ করলে সুনন্দা, সত্যি, আমি কখন কি যে বলে ফেলি। যাক, আর বলব না। কই আমায় চা দিলে না ত?"

"চা তৈরি করে ফ্লাস্কে রেখে এসেছি। ছাতে চল, পুডিং আর ডিম ভাজা দিয়ে খাবে'খন।" ছাতে যেতে যেতে আবদারের সুরে বলল, "এই শোন, আমায় একটা কাকাতুয়া কিনে দেবে? আমার অনেকদিন থেকে একটা কাকাতুয়া পোষবার ভয়ানক সখ। সেই-যে দক্ষিণেশ্বরে দেখেছিলাম, ধবধবে সাদা, কি সুন্দর যে কথা বলে। সেই রকম, বুঝলে? ছাতের একটা পাশ তার দিয়ে ঘিরে দেব, সেখানে থাকবে। ভাল ভাল কথা শেখাব, রবিবাবুর কবিতা।

"মোগলরা……যাকগে।" অনিমেষ থেমে গেল।

"মোগলরা কি?"

"নাঃ, কিছু না। ওই দেখ, চিলটা কত উপরে উঠেছে। সত্যি, কাকাতুয়া ভারি সুন্দর। আজই একবার মার্কেট ঘুরে আসব'খন। সুনন্দা, লেকে যাবে?"

"নাঃ।" সুনন্দা বলল, "লেক আমার ভাল লাগে না।"

তা হ'লে হেদো, কিংবা কলেজ-স্কোয়ার, না হয় আউটরাম ঘাট? তোমার একটু বেড়ানো দরকার। ঘরের ভিতর থেকে থেকে শরীরটা যেন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

"কিছু না, আমার শরীর বেশ আছে। তুমি বরং চা খেয়ে একটু বেড়িয়ে এস গে।"

"হ্যাঁ, আমি যাব, কিন্তু তুমিও যাবে। বাইরের লোকজন দেখলে মনটা প্রফুল্ল হবে।"

"আমার মন বাড়ীতে চমৎকার থাকে।"

"না হয় অন্যে তোমাকে দেখবে, তাদের জন্য বেরুবে।"

"ওমা, সে কি গো!" অকৃত্রিম বিস্ময় সুনন্দার চোখে-মুখে ফুটে উঠল। "অন্যে আমায় দেখবে, সেজন্য আমি বেরুব?"

"হ্যাঁ, বেরুবে, অন্যে দেখবে, সেজন্যই বেরুবে।" অনিমেষের মধ্যে সেই জানোয়ারটা আবার যেন জেগে উঠল। "আমার মতে কোন আদর্শ জিনিসই কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারে না। যা যুগ যুগ ধরে আলো বিতরণ করবে, যার পায়ের নীচে এসে দাঁড়ালে মানুষ রোগ, শোক, জরা সব ভুলে যাবে, যা সত্য-শিব-সুন্দরের প্রতিভূ, তা কাহারও একার নয়—সবার। তুমি এ পৃথিবীতে একটা বিরাট বিস্ময়,তোমার অসীম মহিমা নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াও, লুটিয়ে পড়বে তোমার পায়ে শিল্পীর দল, সাধকের দল। সেটা কি আমার কম গর্ব্ব, সুনন্দা? আমি তোমার আবিষ্কারক, সেই হিসাবে আমার আত্মপ্রসাদ কি কম?"

"চা যে জুড়িয়ে গেল!" অনিমেষের গায়ে মৃদু ধাক্কা দিয়ে সুনন্দা বলল, "খেয়ে নাও, আমি ততক্ষণ ডিম ভেজে নিয়ে আসি, তার পর আর এক কাপ তৈরি করে দেব।" বলে সে নীচে যাবার জন্য পা বাড়াল।

অনিমেষ খপ করে তার শাড়ীর আঁচল ধরে ফেলল, বলল, "দাঁড়াও, কথা আছে।"

"কথা?" আতঙ্কিত দৃষ্টিতে সুনন্দা তাকাল।

"আমি ভাবছি" অনিমেষ বলল, "কি করে তোমাকে ইতিহাসে স্থায়ী করা যায়। তুমি ত জান না তুমি কি। তুমি…"

"ইন্দ্রপ্রস্থের ধ্বংসাবশেষ—না না, অতটা অর্ব্বাচীন নই, আরও প্রাচীন, বোধহয় গুহামানবের পাথরের হাতিয়ার। অর্থাৎ তোমার পি-এইচ-ডি'র উপকরণ, এই ত? তা হ'লে এক কাজ কর। আমাকে চট্ করে মেরে ফেল। তার পর মাংস-টাংস সব বাহুল্য অংশগুলো চেঁছে ফেলে কঙ্কালটা নিয়ে সোজা চলে যাও অক্সফোর্ড—।" সুনন্দা শেষের দিকে প্রায় রেগেই উঠল।

অনিমেষের মুখে শিশুর মত নিরুপায় ভাব ফুটে উঠল। বলল, "সত্যি সুনন্দা, ইতিহাস যেন আমায় পিষে মারল। কি করি বল ত?"

"দার্জ্জিলিং চল। দাদার কাছে দিনকতক থেকে

আসব। শীতকালে দার্জ্জিলিং আমার খুব ভাল লাগে। হি হি শীত হাড়-কাঁপানো, দাঁত ঠক্ ঠক্, কম্বল আর আগুনের কুণ্ড। কাঁচের জানালা দিয়ে দেখা যায়, কুয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে চাদর মুড়ি দিয়ে ভূতের মত সব পাহাড়ের চূড়াগুলো।"

"আমার বোধহয় দার্জ্জিলিং যাওয়া হবে না। বোম্বেতে যেতে হবে হিষ্ট্রি কংগ্রেসে, সেখানে আমাকে প্রবন্ধ পড়তে হবে।" অনিমেষ চিন্তিত মুখে বলল। এবার ফিরে এসে ইতিহাস আলোচনা একেবারে ছেড়ে দেব। তার পর তুমি আর আমি হাজারীবাগ জেলার ছোট্ট একটা গ্রামে চলে যাব। পাহাড়-ঘেরা গ্রাম, উঁচু-নীচু লাল মাটি। কোন লোকজন নেই সেখানে—লোক মানে অবশ্য ভদ্রলোক। দু'চার ঘর চাষী আছে, তার ক্ষেতে ভুট্টা আর কড়াইশুঁটি জন্মায়। আমাদের একখানা মাটির ঘর থাকবে, তার চারিদিকে শাল-বন আর সামনে ছোট্ট একখানি ক্ষেত, সেখানে আমি কাজ করব। জলের কল নেই কিন্তু, আছে ঝরণা, পাহাড়ের গা বেয়ে ঝর ঝর করে নেমে আসছে। তুমি রোজ দু'বেলা কলসী ভরে জল আনবে সেখান থেকে, পারবে না সুনন্দা?"

"নিশ্চয় পারব, খুব পারব।" উৎসাহে সুনন্দার চোখ ঝক্ ঝক্ করে উঠল।—"সত্যি, সে ভারি সুন্দর হবে। যাবে ত ঠিক? তুমি আবার যে মানুষ।"

"যাব বৈকি। তুমি না হয় তোমার দাদার ওখানে দার্জ্জিলিং গিয়ে থাকগে। লিখে দেব?"

"সে হবে'খন। সেজন্য ব্যস্ত হতে হবে না। ব'স, ডিম ভেজে আর চা তৈরি করে আনি। আকাশটা কি সুন্দর দেখাচ্ছে আজ, না?" চঞ্চল হাওয়ার মত লঘুগতিতে সুনন্দা চলে গেল।

বোম্বে থেকে ফিরবার পথে আর একবার অজন্তা ঘুরে এসেছে অনিমেষ। সেই অজন্তা যা দেখলে শিল্পীরা পাগল হয়ে যায়, কবিরা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, ভাবুকরা ধ্যানমগ্ন হয়। আর ঐতিহাসিকরা?...

"সুনন্দা, যারা অজন্তা দেখেনি তাদের জীবনই বৃথা। তোমায় একবার নিয়ে যাব।"

"তার আগে তুমি গল্প বল, তাতেই আমার অর্দ্ধেক দেখা হয়ে যাবে।"

অনিমেষের মুখের উপর যেন কোন নূতন আবিষ্কৃত গ্রহ থেকে পাণ্ডুর আলো নেমে এসেছে। এ যুগ যেন তার সামনে হাওয়ার মত মিলিয়ে গেছে, আর সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে প্রাচীনকালের উজ্জয়িনী। মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের রাজসভা, যুবরাজ চন্দ্রগুপ্ত শকনিধনে যুদ্ধযাত্রা করবেন, নগরীতে অসীম উত্তেজনা। রথ, অশ্ব ও পদাতিক বাহিনীর বিপুল সমাবেশ। ওদিকে শিপ্রানদীতীরে নগরপ্রান্তে এক ছায়াস্নিগ্ধ কুটীরের প্রাঙ্গণে মাধবীকুঞ্জে মহাকবি কালিদাস কাব্য রচনায় ব্যাপৃত। রাজ্যের প্রান্তে পর্ব্বতগাত্রে ক্ষোদিত চৈত্যগৃহে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সমবেত হয়েছেন। স্থবির উদাত্ত-কণ্ঠে উচ্চারণ করছেন, তমসো মা জ্যোতির্গময়। অন্য এক কক্ষে বৌদ্ধ-শিল্পীরা প্রাচীরগাত্রে বজ্রলেপ লেপন করছেন, চিত্র অঙ্কিত করতে হবে।

সুনন্দার প্রশ্নের উত্তরে অনিমেষ যেন স্বপ্নের ঘোরে বলে চলল, "মুখে বলতে গেলে অজন্তাকে খাটো করা হয় সুনন্দা। রেখায়, ছন্দে, রঙের বিন্যাসে প্রতিটি ছবিই যেন কালজয়ী। পঞ্চম শতাব্দীর প্রতিনিধি ওরা, আজ আমাদের চোখের সামনে খুলে দিয়েছে এক রূপের ভাণ্ডার, সুন্দরের রাজ্য। সেখানে ওরা ফুটে আছে, বিকশিত হয়ে আছে ওদের অপার মহিমায়, আর আমরা অসীম বুভুক্ষা নিয়ে তাকিয়ে আছি ওদের দিকে, থাকবও চিরকাল।"

সুনন্দা শিউরে উঠল। আবার বুঝি ঘাড়ে ভূত চেপেছে। নাঃ, অনিমেষকে নিয়ে ও আর পেরে ওঠে না।

"তোমার কিন্তু, যাই বল, শরীর খারাপ হয়ে গেছে। হবে না, এ-ত একৃজারসান্ সহ্য হয় কখনও? এখন কিছু-দিন পড়াশুনো একদম বন্ধ।" সুনন্দা বলল, "চল, হাজারীবাগ ঘুরে আসি।"

"হাজারীবাগ যাওয়া এখন হবে না।" অনিমেষ যেন পাথর ছুঁড়ে মারল।—"সুনন্দা, তোমার সেই ফটোখানা আছে ত? আমি তুলিয়েছিলাম,—সেই যে তুমি বসেছিলে পদ্মাসনে, আর তোমার হাতে ছিল ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন মুদ্রা। ফটোখানা দিও একবার, অয়েল পেন্টিং করাব। আর্টিস্ট ঠিক করেছি, সাতশ' টাকা নেবে। সামান্য টাকা, কিন্তু বদলে পাব—"

"না না, আমি দেব না, কিছুতেই দেব না, ফটো দেব না।" সুনন্দা ফেটে পড়ল। ফটো আমি ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলব। আমি আর আমার ছবি একসঙ্গে এ বাড়ীতে থাকতে পারবে না। তুমি যেদিন অয়েল পেন্টিং আনবে সেই দিনই আমি গলায় দড়ি দেব।"

অনিমেষ ভয়ানক গম্ভীর হয়ে গেছে। সুনন্দার একি ব্যবহার! তার প্রতি কাজে যেন মূর্ত্তিমান বাধার মত সুনন্দা। অনিমেষ বুঝে ওঠে না, ওর এত আপত্তি কেন। সুনন্দা অনিমেষের প্রাণে প্রেরণা এনেছে। সেজন্য অনিমেষ সুনন্দার কাছে কৃতজ্ঞ। সহস্রবার সে এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। সুনন্দাকে অমর করে রাখবার জন্য অনিমেষের এই যে প্রচেষ্টা, এর জন্য তার অন্ততঃ আনন্দিত হওয়া উচিত। আজকের সুনন্দা কাল মরে যাবে, পরশু কে

তাকে স্মরণ করবে? প্রতিদিনইত এই রকম শত-সহস্র লোক মরছে, কে তাদের খবর রাখে? কিন্তু সুনন্দা ত তাদের একজন নয়, সে স্বতন্ত্র। অতএব তাকে স্বতন্ত্র করে রাখাই উচিত। সাধারণ লোক অজ্ঞ, তারা সুনন্দাকে চিনবে কি করে? চিনেছে অনিমেষ। তাই তাকে কালের নিষ্ঠুর আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে রাখবার ভার অনিমেষের উপরই অর্পিত হয়েছে। অথচ সুনন্দা—। অনিমেষ গরম হয়ে উঠল।

"সব ঠিক হয়ে গেছে সুনন্দা, আপত্তি চলবে না। কেন তুমি এমনি করে আমায় বাধা দিচ্ছ, বল ত? মনে রেখ, তোমার আমার মিলন একটা য়্যাকৃসিডেণ্ট নয়। তুমি ত অন্য যে-কোন লোকের হাতে পড়তে পারতে। খেয়ে, ঘুমিয়ে, শ্বশুরের বংশ রক্ষা করে নাতিপুতির মুখ দেখে বুড়ো বয়সে নিমতলায় দেহ রাখতে পারতে। কিন্তু তা হয় নি কেন? কারণ সেভাবে নষ্ট হওয়ার জন্য তোমার সৃষ্টি হয় নি। ইতিহাসের পাতায় তুমি অমর হয়ে থাকবে, কালের বুকে অবিনশ্বর হয়ে ফুটে রইবে, এ জন্যই তোমার ভার ঐতিহাসিকের হাতে পড়েছে। এতে তোমার আনন্দিত হওয়া উচিত, অথচ তুমি বাধা দিচ্ছ। কেন, কি তোমার আপত্তির কারণ?"

"তুমি বুঝবে না, তুমি বুঝবে না, ওগো, এ তোমার বোঝবার নয়।" সুনন্দা এবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

অনিমেষ বিস্মিতভাবে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। সুনন্দার ব্যবহার বরাবরই তার কাছে দুর্জ্ঞেয়, আজকেরটা একটা প্রহেলিকা। কিন্তু তার চোখের জলে সে ব্যথিত হ'ল।

"কিন্তু কেন, কেন তোমার এই আপত্তি? সত্যিই আমি বুঝতে পারছি না।" অনিমেষ বলল, "অজন্তার সেই সব ছবি দেখলে তুমি কিছুতেই আপত্তি করতে পারতে না। মা ও মেয়ে শাক্যমুনিকে ভিক্ষা দিচ্ছে। কি গভীর তাদের মুখের ভাব, সমস্ত জগতের করুণা যেন ওদের চোখে জমাট হয়ে আছে।"

"তুমি আমায় ক্ষমা কর। ফটো রইল, ভাঙব না। আমি মরে যাওয়ার পর তোমার যা ইচ্ছা করো। তোমায় জ্বালাতন করবার জন্য আমি আর বেশীদিন বেঁচে থাকব না।"

অনিমেষ চমকে উঠল।—"ছিঃ সুনন্দা, ও কি কথা! আমি আর ছবির কথা কক্ষনো বলব না। তুমি যে ও কথায় এত আঘাত পাবে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। থাকগে, চল সিনেমা দেখে আসি। ও সব বাজে ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন মানে হয় না, কি বল?"

দুই জন সিনেমা দেখে ফিরেছে। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে অনিমেষ হঠাৎ প্রশ্ন করল, "ওই যে মেয়েটা নায়িকার পার্টে প্লে করল, ও দেখতে বেশ সুন্দর, না?"

"ছাই, ও আবার সুন্দর। কপাল উঁচু।" সুনন্দা ঠোঁট উলটে ঘৃণা প্রকাশ করল।

"অবশ্য তোমার সঙ্গে তুলনা হয় না, হতেই পারে না। তা হলেও পর্দায় ওরকম কমই দেখা যায়।"

"এস এস, শোবে এস, অনেক রাত হয়েছে।" কাল সিনেমার কথা আলোচনা করা যাবে। বড্ড ঘুম পেয়েছে, তোমার পায় নি?"

"ভীষণ পেয়েছে।"

সুনন্দা ঘুমিয়ে পড়েছে। তার উষ্ণ দেহ সুস্থ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে উঠছে-পড়ছে। ও বড্ড নরম, নয় কি? সিনেমার ওই মেয়েটি সুন্দরী, কিন্তু সুনন্দার সঙ্গে তুলনা হয় না। তবু লোকে ওকে দেখে, জানে, প্রশংসা করে। হ্যাঁ, লোকে পুজো করে, হয়ত কোন শিল্পী তার তুলির ছন্দে ওর বন্দনা গান করে।

কি শিল্পী ওকে অমর করে রাখবে, আর ওর চেয়ে সহস্র গুণ রূপ নিয়ে সুনন্দা অনিমেষের ঘরের কোণে নিরুদ্বেগে ঘুমাবে? অসম্ভব!

অনিমেষ সুনন্দার কোন আপত্তি শুনবে না, তাকে প্রচার করবে। এর জন্য প্রয়োজন হলে যে-কোন ত্যাগ স্বীকার করবে।

সুনন্দা ঘুমোচ্ছে। নিশ্চিন্তে, নিরুদ্বেগে। অনিমেষ আজকের রাতটা ঘুমাবে না, চেয়ারে বসে কাটাবে।

ঘরটা এত নির্জ্জন, কোন সাড়াশব্দ নেই, কেউ তাদের দেখছে না,সুনন্দাও অনিমেষকে দেখছে না। সুনন্দা ঘুমোচ্ছে, কিন্তু আবার ত সে জাগবে, আবার বাধা দেবে।

সুনন্দা এক ভয়ানক ইঙ্গিত করেছিল। সে ত প্রস্তুতই।

এ কি! অনিমেষ সুনন্দাকে খুন করবে নাকি? ক্ষতি কি, এই ত সুযোগ! কেউ দেখবে না, সুনন্দাও জানতে পারবে না, কে তাকে খুন করল। ও মরলে অনিমেষের কষ্ট হবে। মানুষ হিসাবে, স্ত্রী হিসাবে ওর একটা সত্তা ছিল। স্নেহে, প্রেমে, সেবায় সে অনিমেষকে মুগ্ধ করেছিল। অনিমেষও মানুষ, সে স্বামী। সে-ও সুনন্দাকে গভীরভাবে ভালবাসে।

কিন্তু মহৎ আদর্শের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জ্জন দেওয়া উচিত। তার বদলে অনিমেষ সুনন্দাকে চিরন্তন করে রাখবে। দোতলায় উঠবার সিঁড়ি যেখানে মোড় ঘুরেছে সেখানে সুনন্দার প্রতিকৃতি স্থাপিত হবে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-

নামায় সময় দেখা যাবে—এই সুনন্দা, সৌন্দর্য্যের রাণী, কালের অনুশাসনকে লঙ্ঘন করে তার অবিনশ্বর মহিমায় দ্যুতিমান হয়ে আছে।

এ-কি! অনিমেষ এ-কি করল? সুনন্দা নড়ে না, তার উষ্ণ দেহ শীতল হয়ে আসছে। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে তার দেহের মৃদু ওঠা-নামা একেবারে থেমে গেছে। তার মুখে শুধু এক কোমল তীক্ষ্ণ হাসি।

"সুনন্দা, সুনন্দা, এই তোমার প্রকৃত স্বরূপ, তোমার চিরন্তন রূপ। তোমায় আজ পেয়েছি তোমার পূর্ণ বিকাশের মধ্যে। তুমি আজ কালজয়ী, অমর, সুনন্দা—।" অনিমেষ পাগলের মত চিৎকার করে বিছানার উপর উঠে বসল। সকালবেলাকার রোদ চঞ্চল শিশুর মত ঘরের মধ্যে লুটোপুটি করছে।

"তোমার চা যে জুড়িয়ে গেল, কত ঘুমুচ্ছ?" সুনন্দা ঘরে ঢুকল। রাশীকৃত ভিজে চুল ওর পিঠের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। সকালবেলাই স্নান করে একখানা লাল সাড়ী পরেছে। স্নান করলে ওকে এত সুন্দর দেখায়!

"চল সুনন্দা, হাজারীবাগ যাই। আজই, বুঝলে? আর দেরী নয়। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও।" ব্যগ্রভাবে অনিমেষ বলল।

নিরুপমার প্রেম

শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ

এখনো অনেক দূরে—দুপুরের নির্জন নদীতে
আকাঙ্ক্ষারা গান গায়! চেতনার অনন্ত ভঙ্গীতে
আমি তার মূর্তি গড়ি, যন্ত্রণার মোম
গলে গলে পড়ে; আমি সাথী তার। যৌবনের হোম
এরই নাম!—এই ছন্দে পৃথিবীর আকাশ-উচ্চার
এই রক্তে পৃথিবীর প্রাণ আজো স্বপ্ন-সম্ভবা।

আমি যে নেপথ্য-সূচী—শেষহীন পঞ্চাঙ্ক নাটকে;
যন্ত্রণার তিলোত্তমা—তাই তুমি থাকবে আমার
চিরকাল, কান্নার পাহাড়ে মন থাকুক উৎসবা:
আমার তুষার-গলা উৎস থেকে—নদীর কথনে
এত গান! এ সুরের ও স্বারূপ্য আমার।

প্রত্যহেরে পরাজয়ে—যন্ত্রণার নির্মম কঠিন প্রস্তরে
আমি যে ভাস্কর এক, রক্তগত রহস্যের ডাকে
শোক-লজ্জা-স্বপ্ন-সাধে সত্যের ছেনি ধরে ধরে
নিটোল নিভৃত মূর্তি—নিরুপম লাবণ্যে গভীর
গড়েছি তোমাকে আমি; রাত্রি-দিন তাও ত তোমাকে
তোমার দুহাতে তুলে—আমি আজো শাশ্বত প্রেমিক।

এ প্রেম যন্ত্রণা দেবে; আকাঙ্ক্ষারা পাবে নাকো নীড়
উধাও অমর শূন্যে—তবু তারা কী যে সাহসিক…
স্বপ্ন দেখে। অথচ সে জানে এই জীবনের জ্বরে
প্রেমের আরোগ্য নেই। লবণাক্ত সমুদ্রের ঘরে
কেবল ঢেউয়ের দোলা। ডানা মেলা হাঁস—
কূল নেই কোনোদিকে, বহুদূরে জীবনের ভিড়!
তবু সে চলেছে একা রোদ বৃষ্টিঝড়ের প্রহরে—
হয়তো তোমার রূপে প্রাণ হবে প্রথম উল্লাস!
সামুদ্রিক পাখী তার জন্ম-মৃত্যু ঢেউয়ের উপরে
আগ্নেয় আবেগে তবু ঋজু মন বিশ্বের বিশ্বাস॥

শিল্পে প্রয়োজনবাদ

ডক্টর শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

রঁলার এক বান্ধবীর কথা আমরা জানি, যাঁর কথা রঁলা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এই ভদ্রমহিলা তাঁর ব্যক্তিগত আবেগজীবনের সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছিলেন শেক্সপীয়রের ওথেলো নাটকের অভিনয় দেখে। নিষ্পাপ ডেসডিমোনার মর্মন্তুদ পরিণতি, দুরন্ত আবেগ-প্রবণ ওথেলোর প্রেমোন্মত্ততা ও তজ্জনিত অশান্তিময় পরিস্থিতি—এরা হয়ত কখন কখন ব্যবহারিক-জীবনে সত্য হয়। এই দুঃখজনক জীবননাট্যের কুশীলবেরা হয়ত 'ওথেলো' নাটকের সার্থক অভিনয় দেখে তাঁদের আপন আপন ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানও কখন কখন পেয়ে যান, সে সত্য সদাস্বীকৃত! তবে প্রশ্ন হ'ল এই যে, নরনারী বিশেষের ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা সমাধানে পারগতাই কি ওথেলো নাটকের শিল্পমূল্য নির্ণয় করবে? আধুনিক শিল্প বিচার পদ্ধতিকে গ্রীস দেশের দার্শনিক-চিন্তা আজও কি আচ্ছন্ন করে রাখবে? ওথেলো নাটকে কুশীলবদের নাট্য-কুশলতায়, নাটকের ঘটনা-সংস্থানে, চরিত্রচিত্রণে এবং নাটকের রসঘন পরিণতিতে আমরা মুগ্ধ এবং বিস্মিত হই, না আমরা অন্বেষণ করব কোথায় কোন্ মানুষের ব্যক্তিগত আবেগ সমস্যার সমাধান করল এই নাটকের অভিনয়? নাটকের উৎকর্ষ-অপকর্ষের বিচারটুকু কোন্ মানদণ্ডকে আশ্রয় করবে? আমার রসতৃষ্ণা মিটলেই কি আমি তাকে সার্থক শিল্প বলব? অথবা শিল্প আমার ব্যবহারিক প্রয়োজনে এলেই তাকে শিল্প হিসেবে সানন্দ-স্বীকৃতি দেব?

প্রয়োজনকে মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যে প্রয়োজন শিল্পীর আন্তর-প্রয়োজন নয়, যার উৎস কোন ব্যবহারিক জীবনবোধ, তা হ'ল বাহিরের প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের সঙ্গে শিল্পের আত্যন্তিক স্বভাবের কোন যোগ নেই। যেমন, ধরা যাক, রঁলা কথিত 'Peoples, Theatre'-এর কথা। সেখানে যে নাটকের অভিনয় হবে তার মধ্যে মানুষের স্বার্থের সংঘাত দেখান চলবে না। কেন না, তা মানুষে মানুষে ঐক্য প্রতিষ্ঠার বিরোধী। এখানে নাটকের ঘটনা-সংস্থানকে মানবকল্যাণের জন্য, শিল্পীর একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। শিল্পের প্রকৃতি নির্ণীত হচ্ছে শিল্পের আন্তর-প্রয়োজনে নয়, বাহিরের[১] জগতে ঐক্য প্রতিষ্ঠার মহৎ প্রয়োজন সিদ্ধির তাগিদে। এই প্রয়োজনটুকু যত বড়, যত মহৎই হোক না কেন, এটি শিল্পের প্রকৃতিবিরোধী। এই প্রয়োজনটুকু শিল্পের 'স্বরাট' প্রকৃতিকে ক্ষুণ্ণ করেছে। শিল্প আত্মস্বাতন্ত্র্য হারিয়ে পরতন্ত্রবশীভূত হয়ে পড়েছে। শিল্পচারিত্র্য বহির্জীবনের প্রয়োজনে ক্ষুণ্ণ এবং ব্যাহত হচ্ছে। সুন্দরের প্রতিষ্ঠা শিল্পে ঘটল কি না তার বিচার হচ্ছে শিল্পের ব্যবহারগত প্রয়োজনের নিরিখে। শীতকালের সকাল বেলার কাঁচা-সোনা রোদ্দুরকে সুন্দর বলছি তার বর্ণসুষমার জন্য নয়, তা শীত-জড়তাকে দূর করে দিয়ে শরীরকে উত্তপ্ত করে দিচ্ছে বলে। এ হ'ল প্রয়োজনবাদীদের মত। সুন্দরকে এঁরা ব্যবহারের তাঁবেদার করে সৌন্দর্যের প্রকৃতিকে খর্ব করলেন। যে প্রয়োজন শিল্পীর অন্তরলোকের প্রয়োজন, সেই প্রয়োজনেই যথার্থ শিল্পের উৎপত্তি ঘটে। একেই শিল্প এবং কলা-রসিকেরা অপ্রয়োজনের প্রয়োজন বলেছেন। শিল্পীর প্রয়োজনে কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। এই লক্ষ্য-অনির্দিষ্টতা শিল্পীর প্রয়োজনকে ব্যবহারিক প্রয়োজন থেকে স্বতন্ত্র এবং পৃথক করেছে। শিল্পগত প্রয়োজনের কোন ধারণাও শিল্পীমানসে থাকে না। মহাদার্শনিক কান্টের মতে শিল্পের মূলে এই অপ্রয়োজনের প্রয়োজনের[২] প্রেরণা থাকে বলেই শিল্পানন্দ সর্বত্রগামী হয়, তার আবেদন হয় সার্বিক কোন চিন্তাসিদ্ধ ভাবের (Reflective Idea) সহায়তা ব্যতিরেকেই। অর্থাৎ কান্টের মতে শিল্পের প্রয়োজনটুকুর কোন নির্দিষ্ট রূপ নেই। এই রূপহীন প্রয়োজনটুকু কোন নির্দিষ্ট ভাবকে আশ্রয় করে না বলেই আমাদের কল্পনা (imagination) এবং বোধ (understanding) রসাস্বাদনের ক্ষেত্রে মুক্ত হতে পারে। আমাদের সৌন্দর্য্য-বোধের মূলে রয়েছে সুন্দর বস্তুর সঙ্গে আমাদের জ্ঞানবৃত্তির (cognitive faculties) সুসংগতি; সুন্দর বস্তুকে সুন্দর বলি এই সমন্বয়ের এবং সঙ্গতির জন্য, বহির্জগতের অথবা অন্তরলোকের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করল বলেই তাকে আমরা সুন্দর বলি না।

---

১ দার্শনিকপ্রবর হিউম ও তাঁর Treatise of Human Nature গ্রন্থে শিল্পে প্রয়োজনবাদকে স্বীকৃতি দিলেন। তিনি তাঁর 'সংশয়বাদকে নন্দনতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করেন নি, এটা লক্ষ্য করবার বিষয়।

২ "In an aesthetic judgment the beautiful object is perceived as exhibiting a purposiveness without purpose, that is to say, a purposiveness without the representation of an end, without a concept of its nature. (Knox প্রণীত The Aesthetic Theories of Kant, Hegel and Schopenhauer, গ্রন্থের ৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের লীলাধারণার প্রয়োজন-অতিরিক্ত এই ব্যঞ্জনাটুকু রয়েছে। স্বয়ং বিধাতা যখন লীলাপরবশ হ'ন তখন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিচিত্র সৃষ্টি সম্ভব হয়। বিধাতা যখন সৃষ্টিশীল হ'ন তখন কোন প্রয়োজন তাঁর সৃষ্টি কর্ম্মের প্রেরণা জোগায় না। সৃষ্টি হ'ল তাঁর লীলা। লীলাধারণায় সর্বপ্রয়োজন অস্বীকৃত। পাখী যে গান করে, তাকে লীলা বলব কিনা সে সম্বন্ধে চিন্তার অবকাশ আছে। মিথুন কালে পুরুষ-পাখীর নৃত্যগীত অনুষ্ঠিত হয় স্ত্রী-পাখীকে আকৃষ্ট করবার জন্য, এ কথা পক্ষীতত্ত্ববিদেরা বলেন। এক্ষেত্রে নৃত্যগীতের পিছনে ব্যবহারগত প্রয়োজন রয়েছে। এই প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে শিল্পসৃষ্টি কখনই সম্ভব হবে না। যদি কখনও এমন দেখা যায় যে, শিল্পসৃষ্টি হয়েছে কোন প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে, তখন বুঝতে হবে যে প্রয়োজন মেটানোর জন্য সৃষ্ট কর্ম্ম শিল্প হয়ে উঠে নি, তা শিল্প হয়েছে শিল্পীর প্রকাশগুণে। শিল্পী যদি সত্য সত্যই কোন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হন, যে উদ্দেশ্য তাঁর শিল্পকর্ম্মের জনক, তবে তা হ'ল রূপাভাব দূর করা, অর্থাৎ রূপসৃষ্টি করা। এই রূপসৃষ্টির তাগিদ আসে ভিতর থেকে, ভাববাদী দার্শনিকেরা বলবেন যে, শিল্পীর এষণা হ'ল ভাবকে (idea) তার পূর্ণ মহিমায় প্রকাশ করা। ভাব যখন জড় বস্তুর মাধ্যমে আপনাকে প্রকাশ করে তখন জড়বস্তুর জড়তার জন্য ভাবের পূর্ণাঙ্গ এবং সম্যক প্রকাশ সম্ভব হয় না। শিল্পী প্রকৃতিতে ভাবের এই সম্পূর্ণ প্রকাশ প্রত্যক্ষ করেন। তিনি প্রয়াস পান শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে এই ভাবকে পূর্ণতর মহিমায় প্রকাশ করতে। একে আমরা আন্তর-প্রয়োজন বা অপ্রয়োজনের প্রয়োজন বলতে পারি। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের শিল্পধারণায় এই আন্তর-প্রয়োজন স্বীকৃত। এই প্রয়োজনটুকু শিল্পের প্রকৃতির সঙ্গে অসঙ্গত নয়। এই প্রয়োজনের স্বীকৃতি শিল্পের প্রকৃতিকে ক্ষুন্ন করে না। ভাববাদী দার্শনিকদের অনুসরণে অবনীন্দ্রনাথ বললেন যে, রূপাভাবই হ'ল একমাত্র প্রয়োজন, যা নন্দনতত্ত্বে স্বীকৃত হতে পারে। এই প্রয়োজনটুকু শিল্পীর জগতে নিত্য-সত্য। এই প্রয়োজন কখনও মেটে না। শিল্পী যখন রূপসৃষ্টি করেন তখন এই প্রয়োজনের সাময়িক এবং আংশিক পূর্ত্তি হয়। শিল্পীমনে আসে ক্ষণিকের তৃপ্তি এবং পূর্ণতার আনন্দ। এই তৃপ্তি এই আনন্দ একান্তই ক্ষণিকের। এর পরেই আবার সেই অতৃপ্তি শিল্পীমানসকে আচ্ছন্ন করে। এই অতৃপ্তিকে স্বর্গীয় অতৃপ্তি বা Divine Discontent বলা হয়েছে। শিল্পী আবার সৃষ্টিলীলায় মেতে ওঠেন। এক রূপ থেকে আর এক রূপ সৃষ্টি হয়। কবি নিরন্তর একরূপ থেকে অন্যরূপে যাওয়া-আসা করেন। সকাল গড়িয়ে যায় দুপুরে, দুপুর সায়াহ্নের স্তিমিত আলোয় অবসিত হয়ে আসে। সন্ধ্যার নিঃশব্দ অভিসার নিশুতি নিশীথের দ্বারপ্রান্তে এসে থেমে যায়। তবুও শিল্পীর রূপসৃষ্টি প্রয়াসের শেষ হয় না। তাঁর শিল্পীমানস নিত্য অশান্ত, সে অশান্তি নিত্য নূতন নূতন সৃষ্টির প্রত্যাশা সঞ্জাত। নব নব সৃষ্টির প্রেরণা আসে পূর্ব্বতন সৃষ্টির অপূর্ণতা থেকে। তাঁর শিল্পের অপূর্ণতা তাঁর কাছে নিত্য প্রত্যক্ষ। দুঃখী মানুষই কেবল জানে দুঃখের দারুণতম বেদনা কোথায় রয়েছে? তেমনিধারা শিল্পী জানেন তাঁর বহুবন্দিত শিল্পকর্ম্মের কোথায় ত্রুটি রয়েছে, কোথায় রয়েছে অপূর্ণতা, তাই ত রবীন্দ্রনাথের মত মহাকবিকেও আগামী যুগের কবিকে আহ্বান করে দুঃখী মানুষের মর্ম্মবেদনাটুকু উদ্ধার করার জন্য তাঁর কাছে আবেদন জানাতে হয়। নিজ সৃষ্টিতে শিল্পী যখন এই অপূর্ণতাটুকু প্রত্যক্ষ করেন তখন তাঁর চোখে সেই নিত্য-সত্য চিরন্তন রূপাভাবটুকু প্রকট হয়ে ওঠে। অবনীন্দ্রনাথ বললেন যে, এই রূপাভাবটুকুই হ'ল সমস্ত শিল্প-কর্মের জনক। যে মুহূর্ত্তে শিল্পীর জাগ্রত চেতনায় এই রূপাভাবটুকু অনুভূত হয় তখন তাঁর অন্তরে সৃষ্টির জ্বালা আগুন ধরায়। কবি এক স্বর্গীয় বেদনায় কাতর হ'ন। কবি অপূর্ব্ব উদ্বেগ ভরে সৃষ্টির-সম্ভাবনায় অশান্ত হয়ে ওঠেন। ধূর্জ্জটির মত তখন তাঁর মানসিক অবস্থা ; সার্থক সৃষ্টিতে, 'রামায়ণের রচনায় এই অশান্তির শেষ হয়। সার্থকসৃষ্টি শিল্পীমানসে যে আনন্দের সৃষ্টি করে তা 'বিমল আনন্দ', এই আনন্দ কোন প্রয়োজন-সিদ্ধির আনন্দ নয়। এ আনন্দ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুন্দর বস্তু-দর্শনের আনন্দ নয় ; সবুজ ঘাস, ফুলের সৌগন্ধ, বীণার সুর, এরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আনন্দ দেয়। এ আনন্দকে দার্শনিক কাণ্টের অনুসরণে আমরা 'বিমল আনন্দ' (pure joy) বলব না। বর্ণসমন্বয়, ফুলের গঠন, সুরের সংগতি এরা যে আনন্দ দেয় তা হ'ল 'বিমল আনন্দ'। এ আনন্দ নন্দনতাত্ত্বিক, এ আনন্দই যথার্থ শিল্পকর্ম্মজাত, যে শিল্পকর্ম্মে সুন্দরের নিত্য-প্রতিষ্ঠা। দার্শনিক কাণ্টের এই 'বিমল আনন্দে'র তত্ত্বটুকু হারিসন এবং লর্ড কেমেসের নন্দনতাত্ত্বিক ধারণাকে প্রভাবিত করেছিল। এঁদের 'স্বনির্ভর (free) এবং পরনির্ভর (dependent) সুন্দরের ধারণা বহুল পরিমাণে কাণ্ট-কথিত এই 'বিমল নন্দনতাত্ত্বিক আনন্দের' তত্ত্ব থেকে গৃহীত। কাণ্ট-কথিত এই বিমল আনন্দ, শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়জাত আনন্দ নয় ; 'নন্দনতাত্ত্বিক আনন্দ' উপজাত হয় যখন বোধ (understanding) এবং কল্পনা (imagination) সুন্দরের রসাস্বাদনে নিয়োজিত হয়। এই বিমল আনন্দই সৌন্দর্য্যরসাস্বাদনের লক্ষ্য হয় তবে শিল্পকর্ম্মকে কোন প্রয়োজনের অধীন করা অসঙ্গত হবে। তাই কাণ্ট বললেন, শিল্পের প্রয়োজন হ'ল 'Zweckmassigkait ohne zweck' অর্থাৎ 'অপ্রয়োজনের প্রয়োজন'।

শিল্পীমানসে যে রূপাভাব থেকে শিল্প সৃষ্টি হয় তা শিল্পীমনের নিত্য সহচর। এই অভাববোধটুকু পূর্ণ করার চেষ্টা কখন কখন বাইরের জীবনের প্রয়োজনকে উপলক্ষ্য করে প্রকট হয়। আমরা যদি তখন বাইরের জীবনের এই উপলক্ষ্যটাকেই শিল্পসৃষ্টির মূল বা উৎস বলে ভুল করি তা হলে বিচার ভ্রান্ত হবে।৩ কখন ধর্ম্ম-

৩। "The true artist is indifferent to the materials and conditions imposed upon him. He accepts any conditions, so long as they can be used to express his will-to-form".

ভাবকে, কখন মানবপ্রেমকে, কখন জীবে দয়াকে উপলক্ষ্য করে শিল্পীর শিল্প প্রেরণা উৎসারিত হয়ে ওঠে। দক্ষিণ-ভারতের মন্দিরাভ্যন্তরের অপূর্ব্ব শিল্পকর্ম্ম, গুহাগাত্রে অঙ্কন এবং ভাস্কর্যশিল্প রূপ পেয়েছিল যে-সব শিল্পীর হাতে তারা হয়ত ধর্ম্মকে উপলক্ষ্য করে এইসব শিল্পকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করেছিল। ধর্ম্মোন্মাদনা বা ধর্ম্মভাব শিল্পকর্ম্ম নয়। সেই মহাভাবকে সুষ্ঠুরূপে প্রকাশ করতে পারলে তবেই তা শিল্পকর্ম্ম হয়ে ওঠে। সুতরাং প্রকাশটাই হ'ল শিল্পকর্ম্ম, উপলক্ষ্যটা নয়। এই শিল্পের উৎকর্ষ-অপকর্ষ নির্ভর করে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব-বিচ্যুতির (desubjectification) ওপর। শিল্প-বৈরাগ্যের ওপর শিল্পকর্ম্ম নির্ভরশীল। অর্থাৎ শিল্পীর অনুরাগ, তার ভালোলাগা, মন্দলাগা সবটাই যদি শিল্পকর্ম্মে প্রতিফলিত হয় তা একান্তই একটি মানুষের রুচিকেন্দ্রিক হয়ে পড়বে যে শিল্প-বৈরাগ্যের কথা বলেছি তার দ্বারা এই শিল্পকর্ম্ম চিহ্নিত হবে। বৈরাগ্যের শুভ্র-সিংহাসনে আর্টের প্রতিষ্ঠা নিত্যকালের, তার জন্যই ত তার আবেদন সার্বিক হয়। শিল্পীমানসে এই বৈরাগ্যের অভাব ঘটলে শিল্প তার সার্থক আবেদনে ঐশ্বর্য্যবান হয়ে উঠতে পারে না। তাই ত অবনীন্দ্রনাথ বললেন যে শিল্পকে সার্ব্বিক করতে হলে শিল্পীর ইণ্ডিভিডুয়ালিজমকে সার্ব্বজনীন রুচির হাতুড়ি দিয়ে ভাঙতে হবে। শিল্পের এই নির্ব্যক্তিকরণ ঘটলে তবেই শিল্পী জীবনের সাময়িক প্রয়োজনকে, যাকে আমরা 'উপলক্ষ্য' বলেছি তাকে অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারে। উদাহরণ হিসাবে রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থের কথা বলি। এই কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই সাময়িক প্রয়োজনে লিখিত। প্রীতি এবং স্নেহভাজনদের বিবাহ উৎসব উপলক্ষ্যে অনেকগুলি কবিতা কবি লিখেছিলেন। তাদের অনেকেই রসোত্তীর্ণ হয়েছে। যারা রসোত্তীর্ণ হ'ল তারা প্রয়োজন সাধন করেছে বলে রসোত্তীর্ণ হয় নি। প্রয়োজন সাধন 'ত' সকলেই করল, তবে মাত্র কয়েকটি কবিতা রসোত্তীর্ণ হ'ল, এ কেমন কথা ? তা হলে বোঝা যাচ্ছে যে, প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে বলেই রসোত্তীর্ণ কবিতাগুলি রসোত্তীর্ণ হয় নি, তারা রসোত্তীর্ণ হয়েছে শিল্পীর সার্থক-প্রকাশের প্রসাদগুণে। তারা কালোত্তীর্ণ হ'ল শিল্পীর প্রকাশ-মাহাত্ম্যে। শিল্প হ'ল প্রকাশ। অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিল্পবিদ মনীষীরা বললেন যে, ব্যবহারিক জীবনের, বাস্তবজীবনের কোন প্রয়োজন মেটানো শিল্পের কাজ নয়। যদি প্রয়োজন মেটানোর জন্যই কেউ শিল্প-সৃজনে প্রয়াসী হন তা হলে প্রয়োজনটা বড় হয়ে উঠে শিল্পকে গ্রাস করবে ; চারুকলা কারুকার্য্যে (crafts) পর্য্যবসিত হবে, তাই অবনীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্বে শিল্পের প্রায়োজনিক চারিত্র্যটুকু অস্বীকৃত। আমরা বলব যে প্রয়োজন শিল্পচেতনাকে উদ্বোধিত করতে পারে। তবে সে প্রয়োজনসিদ্ধির কোন সজ্ঞান নিশানা শিল্পীর শিল্পকার্যে থাকে না। ভ্যান গগ যাঁদের দুঃখে উদ্বোধিত চিত্ত হয়ে 'পট্যাটো ইটার্স' ছবিখানি আঁকলেন তাঁরা সর্বকালের দুঃখী মানুষ। গগের সমকালীন দুঃখী মানুষদের দুঃখ-দারিদ্র্য, আনন্দ-বেদনার কোন চিহ্নই রইল না তাঁর সৃষ্টিতে। ঐতিহাসিক গগের সমকালীন মানুষদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ইতিহাস আবিষ্কার করবে। সে কাজ শিল্পীর নয়। শিল্পরসিক সর্বকালের নিপীড়িত মানুষের দুঃখ প্রত্যক্ষ করবেন এই অনবদ্য চিত্রটিতে। এ চিত্র কোন হৃদয়বান মানুষকে সমাজ সেবাকার্য্যে উদ্বুদ্ধ করবে না। আর যদিও তা করে তা হলেও তা শিল্পীর অভিপ্রেত নয়। আমাদের তন্ত্রে শিল্পকর্ম্মকে এক গাছ থেকে পাখীর আর এক গাছে উড়ে যাওয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। শিল্পী আপন রচনা পথের কোন চিহ্নই রাখে না যেমন পাখী আকাশে আপন গমনপথের কোন চিহ্ন রেখে যায় না। শিল্পীর সাময়িক প্রয়োজনও শিল্পকর্ম্মের কোথাও আপনার চিহ্ন রেখে যায় না। প্রয়োজনের তত্ত্বটুকু শিল্পকর্ম্মের পক্ষে অনাবশ্যক। অতিরিক্ত, বুলগেরীয় ভাস্কর Daskalov 'কোরীয় ছেলেমেয়ে' (Korean Children) শীর্ষক ভাস্কর্যকর্ম্মে যে ভয়বিহ্বল মেয়ের এবং যুদ্ধাহত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বালকের চিত্র এঁকেছেন তার ঐতিহাসিক মূল্য আমরা স্বীকার' করি। আন্তর্জাতিক জনমত গঠনের জন্য এই ধরনের শিল্পকর্ম্মের মূল্য সর্বজন স্বীকৃত। জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ কোরীয় নাগরিকদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞার প্রতীক বুঝি এই বালক। সাম্রাজ্যবাদ-শোষিত দেশের অসহায়ত্বের প্রতীক বুঝি ঐ ভয়বিহ্বল মেয়েটি, এই সার্থক-শিল্পকর্ম্মের রচনার সময় শিল্পীর নিজ্ঞান মনে তাঁর জাতীয় জীবনের সমগ্র দুঃখ-বেদনা-নৈরাশ্য এবং তা উত্তীর্ণ হবার দুর্নিবার প্রতিজ্ঞা যে কাজ করেছে, এ কথা অনস্বীকার্য। তবু শিল্পকর্ম্মের মধ্যে এই 'মহৎ প্রয়োজনটুকুর' ব্যঞ্জনা কোথাও নেই, তা শিল্পকর্ম্মকে ব্যাহত করে নি। রুমাণীয় ভাস্কর kaznovski'র একটি শিল্পকর্ম্মের উল্লেখ করি। তাঁর 'শ্রমবীর' Heroes of Labour শীর্ষক ভাস্কর্যকর্ম্মে কোথাও শ্রমের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার ব্যঞ্জনা নেই। এই সার্থক-শিল্পটিতে 'শ্রম' এক অনির্ব্বচনীয় মর্যাদা লাভ করেছে কেন না যথার্থ শিল্পীর হাতে শিল্পবস্তু (content) রসোত্তীর্ণ হয়েছে। এই সার্থক শিল্পসৃষ্টির জগতে প্রয়োজন নিত্য-অতিক্রান্ত।

পরন্তু যাঁরা শিল্পকলাকে প্রয়োজনের দাসত্বেই শুধু আবদ্ধ করে তার উপর চরম মূল্য আরোপ করার চেষ্টা করলেন তাঁরাই সংখ্যা-গরিষ্ঠ। এ দের শিল্পকলা উত্তরসূরীদের কাছে শিল্পমূল্যে বিকোয় নি, ঐতিহাসিক এ দের ব্যর্থ সৃষ্টিকে আবিষ্কার করেছেন, কলারসিক এই ব্যর্থতার জন্য এদের ভ্রান্ত শিল্প-দর্শনকে দায়ী করেছেন—এমনি ধারা ব্যর্থশিল্পীর দল হলেন রুশিয়ার 'purpose' গোষ্ঠীর শিল্পীরা।

[Herbert Reed প্রণীত The Meaning of Art গ্রন্থের পৃঃ ১৯১ দ্রষ্টব্য]

শিল্পীর প্রকাশেচ্ছাটাই বড় কথা। কি উপলক্ষ্যে প্রকাশটা ঘটল সেটা বড় কথা নয়, এটাই হার্বার্ট রীড বললেন।

৪। Tamara Talbot Rice প্রণীত 'Russian Art' শীর্ষক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ঊনবিংশ শতকে এদের অভ্যুদয় সমকালীন মানুষদের মধ্যে শিল্পপ্রীতি এবং শিল্পবোধ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল, তবু এঁরা উত্তর যুগের সমালোচকদের বিচারে নিন্দিত হলেন, কেন না, এঁরা শিল্পকে নীতিগত এবং ব্যবহারগত প্রয়োজনের অধীন করেছিলেন। এই শিল্পীগোষ্ঠীর মধ্যে আমরা Nesterov, Vasnetsov, Vereschagin প্রভৃতির উল্লেখ করতে পারি। উঁচুদরের শিল্পীর শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়েও Nesterov শিল্পলোকে অমর আসনের অধিকারী হলেন না, কেন না, তাঁর শিল্পে আমরা নীতি-প্রচারের একটা উদগ্র প্রয়াস লক্ষ্য করি। নীতিবিদের উন্নাসিকতা শিল্পীর শিল্পবোধকে ছাপিয়ে উঠে তাঁর সৃষ্টির শিল্পমূল্যে ন্যূনতা ঘটাল। Vereschagin ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত অজস্র সৃষ্টি করলেন। প্যারিসে তাঁর শিল্প-শিক্ষা, ভারতবর্ষের শিল্পকলার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ-পরিচয় কিছুই কাজে এল না তাঁর। 'Purpose' গোষ্ঠীর শিল্পী হিসেবে তিনি শিল্পের ব্যবহারগত প্রয়োজনটাকে অস্বীকার না করে শিল্পকে যুদ্ধের প্রচারের কাজে লাগালেন। দেশের আপামর জনসাধারণ তাঁর শিল্পকর্ম্মের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল। কিন্তু শিল্পকে প্রচারের কাজে ব্যবহার করতে গিয়ে শিল্পের শাশ্বত মূল্যের হানি হ'ল। শিল্প তাঁর স্বকীয় মূল্য হারিয়ে ফেলল। উত্তর যুগের মানুষের চোখে শিল্পীর প্রয়োজনটাই বড় হয়ে দেখা দিল। তাই এঁরা কলারসিকের অভিনন্দন-ধন্য হলেন না। এঁদের শিল্পে 'প্রকাশ'টা বড় হয়ে উঠল না, 'প্রচারটা'ই বড় হয়ে উঠল। তাই এঁদের শিল্পকর্ম্মে 'সৃষ্টিকর্ম্মে'র অসদ্ভাব চোখে পড়ল। আর এই জন্যই ইতিহাস এঁদের শিল্পকর্ম্মের শিল্পমূল্যকে অস্বীকার করল।

সমবেদনা

শ্রীআরতি মুখোপাধ্যায়

কান্নাকে রয়েছে ছুঁয়ে সাগরের জল
পাহাড়ে ঝর্ণার খেলা সেও বুঝি অসীম ক্রন্দনে
তোমার আঁখির থেকে ঝরে অবিরাম ; কেন বল
রোদ্দুরের মেখলায় জড়ায়ে স্বপনে
চাতকের কানে কানে কয়ে যাও কথা !

আশীর্বাদ সে ত নয় জীবনে পাবার
সুখের এষণা শুধু ছড়ায়েছে মনে ,
অনেক করেছি ভুল কেউ ত জানেনা তার
কোথায় ঠিকানা, কোথায় বেঁধেছি ঘর সেও ত স্মরণে
চোরাবালি হয়ে আজ অনেক গভীরে নিয়ে যায়।

এ দুটো সরলরেখা ধরে যেখানে এসেছি আমি একা,
এ দুটো পথের মাঝে সেদিনের আলো
একটু প্রত্যাশা নিয়ে কেন যে আসেনি, কেন বাঁকা
পথ ঘুরে ঘুরে খুঁজেছে সে জীবনের পুঞ্জীভূত কালো ;
অতৃপ্ত সুখের রেখা তাইত কাঁপছে থরো থরো ॥

চাতক

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য

কখনো কখনো কোন মেঘনীল রঙে—
তোমার বিবর্ণ শাড়ি 'সুনীলবসন',
আমার চাতক-মন মেঘের স্মরণে
তোমা ঘেরি বিরহের মেঘ-দূত গড়ে।

উজ্জয়িনীপুরে নয়, ধূলায় ধূসর—
তোমার নগর-মনে কি বা অন্বেষণ ?
কোন ট্রাম, বাস কিংবা পথেতে উষর
হঠাৎ মেঘের সুর বৈশাখীর ঝড়ে।

বাঁকাভুরু চেয়ে দেখো অলিন্দ-আকাশ
গাছে গাছে শিহরণ প্রাণের আবেগ !
নগরীর শাখে শাখে নীলের প্রকাশ,
হঠাৎ তোমার মন কি মায়ায় ভরে !

তুমিও কি ভুল করে মেঘ-শ্লোক পড়ো ?
ভিজে চুলে ভিজে মনে হয়ে জড়োসড়ো !

ইঁদুর

শ্রীসমর বসু

যাব না যাব না করেও শেষকালে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল প্রাণতোষ। পরণে সেই ধুতি-পাঞ্জাবী আর পায়ে তালতলার চটি। চাদরটা আজ আর সে নিতে পারে নি, কেননা নিতে গেলেই সে ধরা পড়ে যেত ইরাণীর কাছে। চাদর কাঁধে না ফেলে যেখানে-সেখানে যাওয়া যায়। কিন্তু চাদর নিলেই বুঝতে হবে প্রাণতোষ সেখানেই গেছে—যেখানে যাওয়াটা আর সহ্য করতে পারে না ইরাণী। এই একটি ব্যাপারেই ইরাণীর অবাধ্য হয়েছে প্রাণতোষ। আর এই একটি ব্যাপারকেই কেন্দ্র করে তাদের যুগল অস্তিত্বের মাঝখানে একটা কন্‌ক্রীটের প্রাচীর ধীর অথচ অপ্রতিরোধ্য গতিতে মাথা তুলতে সুরু করেছে। ইরাণী এখন বুঝতে পারে—প্রাণতোষের মনের অতি সামান্য ভগ্নাংশই এতদিনে তার দখলে এসেছে। বাকী জায়গায় যে বসে আছে—রক্তে-মাংসে সে যদি তার সপত্নী হ'ত তা হলে না হয় একটা কিছু ব্যবস্থা সে করতে পারত; কিন্তু তা যখন নয় তখন রাগ-অভিমান ছাড়া আর কি-ই বা করবে ইরাণী? কিন্তু রাগ-অভিমান করেও প্রাণতোষকে সে আটকাতে পারে নি। প্রাণতোষ আবার সেখানে গেছে, লুকিয়ে চুরিয়ে—ইরাণীকে না জানিয়ে। ফিরে এসে মিথ্যা কথা বলেছে প্রাণতোষ। ইরাণীর কাছে যখন ধরা পড়ে গেছে তখন নির্লজ্জের মত হাসতে হাসতে ইরাণীকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছে প্রাণতোষ, কিন্তু মুখফুটে একবারও বলে নি, আর সেখানে যাব না।

ইরাণী আর পারে না। সহ্যেরও একটা সীমা আছে। সর্ব্বংসহা ধরিত্রীও মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠেন। কিন্তু কি-ই বা করবে ইরাণী! ইরাণী ভাবতেই পারে না, সাহিত্যসভায় এমন কি আকর্ষণীয় আছে যার জন্যে—ইরাণীর শত অনুরোধ, রাগ-অভিমান সব কিছুকে উপেক্ষা করতে পারে প্রাণতোষ। প্রাণতোষ লেখক নয়, সাহিত্য-সমালোচক নয়। এমনকি উঠতি বয়সে একটা কবিতাও লেখে নি সে। বিয়ের পরেই যে চিঠিগুলো ইরাণীকে সে লিখেছিল তাতেও ছিল না একটুকরো ভাবোচ্ছ্বাস। নেহাৎ সাংসারিক খবরাখবরের ঠাসবুনোনিতে চিঠিগুলো দীর্ঘ হয়ে উঠত। আর সেই সঙ্গে অভিমানে ফুলে উঠত ইরাণীর ঠোঁট দুটো। চিঠির পাতায় পাতি পাতি করে কি যেন খুঁজত ইরাণী, কিন্তু কিছুই সে পেত না। বন্ধুরা এই নিয়ে ঠাট্টা করত ওকে। ইনিয়ে-বিনিয়ে কত কথা বলত। ইরাণী সব ঠিক বুঝতে পারত না—কিন্তু তবুও ছলছলিয়ে উঠত ওর চোখ দুটো। বন্ধুরা বলত, নিরেট লোহা দিয়ে গড়া তোর বরের মন, একটুও রসকষ নেই। এমন লোককে নিয়ে কি করে ঘর করবি তুই?

সে-সব কথা আজও মনে আছে ইরাণীর। তাই ত সে বুঝতে পারে না—কি এমন মধু লুকোন আছে ঐ সাহিত্যসভায় যার জন্যে এমন একটা বেরসিক মনও হাতাড়ি-পাতাড়ি করে ছোটে?

প্রাণতোষ যে সাহিত্যচক্রের সভ্য তাদের পাক্ষিক অধিবেশনে নিয়মিত হাজিরা তাকে দিতে হয়। তাছাড়া এখানে-সেখানে প্রায় প্রতি শনি-রবিবারেই বেরিয়ে যায় প্রাণতোষ। সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক যে কোনও সভাসমিতিতে বিনা নিমন্ত্রণে সে গিয়ে হাজির হয়। কার্ড না থাকলেও কোনদিন তার কোনও অসুবিধা হয় নি। এ ত আর সংস্কৃতি বিচিত্রানুষ্ঠান নয় যে, গেটের বাইরের জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে। এ হ'ল অবিমিশ্র নির্ভেজাল সাহিত্যসভা। নামী-অনামী সাহিত্যিক এবং অধ্যাপকদের জ্ঞান বিতরণীসভাও বলা যেতে পারে, সুতরাং জনসাধারণের হাঁকাহাঁকি, দাপাদাপি সেখানে অনেক কম। তাই কার্ড না পেলেও কোনদিন কোনও অসুবিধায় পড়তে হয় নি প্রাণতোষকে।

পর পর এমনি অনেক শনিবার কেটে গেছে—ইরাণীকে নিয়ে সিনেমায় যাব বলেও যেতে পারে নি প্রাণতোষ। ইরাণীও আর কিছু বলে না। সেদিনও ইরাণীকে সে বলেছিল তৈরী হয়ে থেক, অফিস থেকে ফিরেই এগজিবিশন দেখতে যাব। তাই শুনে ইরাণী হেসে উঠেছিল খিলখিল করে। হাসতে হাসতে হঠাৎ ককিয়ে উঠে ভিজে ছলছলে গলায় বলেছিল—আজ যে আবার নীলিমাকে নেমন্তন্ন করেছি, বিকেলবেলায় আসবে।

: তাই নাকি! তা হলে বেশ ভালই হবে। ভেবেছিলাম ভবানীপুর সাহিত্য-পরিষদের সভায় আজকে আর যাব না। তা তুমি যখন বন্ধুকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে তখন আর তার মাঝে আমি থেকে হাঙ্গামা বাধাই কেন, এ্যা, কি বল, তা হলে ভবানীপুরেই ঘুরে আসি।

: ভবানীপুর সাহিত্য-পরিষদ! ইরাণীর কপালের উপর দুটো পাশাপাশি রেখায় একটুকরো সন্দেহ যেন উঁকি দিলে।

: কি, চমকে উঠলে কেন? কৌতূহলী প্রাণতোষের গলায় অপরাধীর উদ্বেগ।

: না, এমনি, নামটা খুব জানা কিনা? একটু যেন সহজ হবার চেষ্টা করল ইরাণী। নীলিমাকে না আসতে বললে তোমার

সঙ্গে আমিও যেতাম। সাহিত্যের কিছু না বুঝলেও বহুদিনের পুরনো বন্ধুর সঙ্গে হয়ত দেখা হয়ে যেতে পারত।

: এ্যা, কে তোমার পুরনো বন্ধু?

: ঐ পরিষদের সম্পাদিকা মৃন্ময়ী হালদার।

: তাই নাকি! মিস হালদারের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে। তা এতদিন ত সে-কথা বল নি।—হঠাৎ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে উঠল প্রাণতোষ। কেমন যেন রুক্ষ কর্কশ হয়ে উঠল ওর মুখের রেখাগুলো। ইরাণী তা লক্ষ্য করেই বললে, এতদিন বললেই বা কি লাভ হ'ত তোমার? আমার ত মনে হয় একেবারে না বললেই বরঞ্চ ভাল ছিল।

: কেন? আতঙ্কিত প্রাণতোষের অস্বস্তি ফেটে পড়ল ওর গলার স্বরে।

: 'কেন'র উত্তর জলের মত পরিষ্কার। নিজের মনকে জিগ্যেস করলেই সে উত্তর মিলবে, আমি আর মুখ ফুটে সেকথা বলে দোষের ভাগী হই কেন? ইরাণীর ঠোঁটে মৃদু ব্যঙ্গের হাসি অস্থির করে তুলল প্রাণতোষকে।

: থাকগে সে-কথা, একটা কথা জিগ্যেস করব? ভ্রূ দুটোকে যথা সম্ভব কপালের উপর ঠেলে তুলে দিয়ে—ঠোঁটের এক পাশ দিয়ে এক ঝিলিক হাসি ফুটিয়ে তুলে এক বিচিত্র ভঙ্গীতে প্রাণতোষের দিকে তাকাল ইরাণী। প্রাণতোষ কিন্তু চুপ করেই রইল, চুপ করেই সে সহ্য করল ইরাণীর এই দুঃসহ শ্লেষ। মিস হালদারের সঙ্গে আলাপ করে তুমি খুব আনন্দ পাও, না? আমার আন্দাজ যদি ঠিক হয়—তা হলে তুমি তাকে নিশ্চয়ই বলেছ তোমার বিয়ে-থা এখনও হয় নি।

: বাঃ, তুমি ত ঠিক ধরেছ! মনে মনে খুব ক্ষুব্ধ হয়েও হাসতে হাসতে কথাগুলো বললে প্রাণতোষ। ভাবলে এর বেশী কিই বা চিন্তা করতে পারে ইরাণী। অসূয়াকে অতিক্রম করে সুস্থ বিচার-শীল মনে সবকিছু বিশ্লেষণ করার মত মানসিক শক্তি ইরাণীর কাছ থেকে কি করে আশা করা যায়? ছেলেমেয়েদের ঘনিষ্ঠ মেলা-মেশার হেতুগুলি অন্বেষণ করতে গেলে জৈব প্রবৃত্তির যে প্রাকৃত ছবিটা এদের চোখের সামনে প্রকট হয়ে ওঠে তাকে অতিক্রম করে আর একটু এগিয়ে যাবার দৃষ্টিশক্তি এদের নেই। গঙ্গার উৎস সন্ধান করতে এরা ভুলে যায়, এরা শুধু দেখে—কত জনপদের পয়ঃপ্রণালী বেয়ে কত নোঙরা আবর্জ্জনা এসে পড়ছে গঙ্গার বুকে। নাক কুঁচকে এরা ফিরে আসে, অবগাহন আর হয় না। প্রাণতোষ তাই রাগ করে না—হাসতে হাসতেই বলে—যখন ধরেই ফেলেছ—তখন না চাইলেও কৈফিয়ৎ আমাকে একটা দিতেই হবে।

: দিলেই যে আমাকে তা শুনতে হবে এমন কোনও চুক্তি কি আমাদের বিয়ের মন্ত্রে ছিল?

: ইরাণীর মুখে হাসি নেই, চোয়ালের হাড়টা নরম গালটাকেও যেন শক্ত করে তুলেছে। একটা কঠিন কথা বলবার জন্য কালো চোখ দুটো স্থির হয়ে এল। যে চোখের দিকে চেয়ে প্রাণতোষ একদিন ভুলে গিয়েছিল সমস্ত বিশ্বসংসার, যে চোখ থেকে সব সময়ই ঝরে পড়ত সঞ্জীবনী সুধাধারা, শ্বাপদের দৃষ্টি সে-চোখ পেল কোথা থেকে! অমন সুন্দর ঢলঢলে মুখটাকে ঘিরে কেমন করে আশ্রয় করল বর্ষার কালো মেঘ! মুহূর্ত্তের মধ্যে কত কথা ভেবে নিল প্রাণতোষ। মুহূর্ত্তের মধ্যেই সে বুঝতে পারল অনেক দিনের অবরুদ্ধ অভিমান—যা উপেক্ষা পেয়ে পেয়ে ওর মনের কোণে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে এখনই তা ফেটে পড়বে মরে-যাওয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মত। একটা বিশ্রী পরিস্থিতি সহ্য করবার জন্য মনকে সে আগে থেকেই তৈরি করে নিল। বললে, বিয়ের মন্ত্রে কি ছিল না ছিল সেটা তোমার জানার কথা নয়। কেন না মন্ত্র যা তা আমিই পাঠ করেছিলাম—তুমি তখন চুপ করেই ছিলে। তখন তোমার বলার কিছুই ছিল না—এখন যদি থাকে অনায়াসে তা তুমি বলতে পার।

প্রাণতোষের এই আশ্বাস পেয়ে সুরু করল ইরাণী, আমার কথা হ'ল, আমার কোনও ক্ষতি না করে যা খুশী তুমি করতে পার। আমার প্রাপ্য মর্য্যাদাটুকু ক্ষুণ্ণ না করে ডানা মেলে তুমি উড়ে বেড়াতে পার নীল আকাশে। কিন্তু মনে রেখ, অমন হাজারো মিস হালদারের ছায়াপথ ঘুরেও কামনা তোমার মিটবে না। কক্ষচ্যুত উল্কার মত একদিন তুমি খসে পড়বে কঠিন মাটিতে। তখন যেন আমাকে তোমার না প্রয়োজন হয়।' ধনুকের ছিলে থেকে মুক্তি পাওয়া তীরের মত দ্রুতগতিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ইরাণী। আর প্রাণতোষ বেবাক বোবা চোখে দেওয়ালে টাঙানো বিবাহ-বাসরে তোলা দম্পতীর ছবির দিকে চেয়ে রইল। একি! ইরাণীও কথা বলতে জানে? ইরাণীও জানে তাকে ভয় দেখাতে, তাকে শাসন করতে?

এর পরও অনেক দিন কেটে গেছে। নিয়মিত ভাবেই প্রত্যেকটি সাহিত্যসভায় উপস্থিত হয়েছে প্রাণতোষ। ইরাণী বাধা দেয় নি—অনুযোগ জানায় নি—অভিমানও করে নি। কাজে-কর্ম্মে, কথায় বার্ত্তায় কোথাও তার প্রকাশ পায় নি এতটুকু অসন্তোষের ছায়া। কিন্তু সেদিন আর পারল না ইরাণী—যেদিন সন্ধ্যা-বেলায় ধুতি পাঞ্জাবী পরে বাইরে বেরোবার জন্যে প্রাণতোষ যখন তৈরী হচ্ছিল, তখন হাতের কাজ ফেলে রেখেও ইরাণী ছুটে এল ওর সামনে।

: আজ তুমি কোথাও বেরোতে পারবে না।

: কেন? আমার গতিবিধির নিয়ামক হবার অধিকার তোমায় কে দিলে? এমন কোনও চুক্তি বিয়ের মন্ত্রে ছিল বলে আমার ত মনে হয় না।

: চুক্তি থাকুক আর নাই থাকুক, আজ তুমি কোথাও যেতে পাবে না—এই আমি বলে দিলাম—সাধ্য থাকে যাও। ইরাণীর ধীর শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে কি যে মেশান ছিল সেটা ঠিক না বুঝতে পারলেও মন্ত্রমুগ্ধের মত সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল প্রাণতোষ। অনেক দিনের অনেক কথা তার মনে পড়ল—কিন্তু একবারও মনে

পড়ল না যে, আজ-ই তাদের বিয়ের দিন। মনে পড়ল না—ছ' বছর আগে এমনি এক সন্ধ্যায় ইরাণীর ডান হাতখানা নিজের বাঁ হাতের মধ্যে চেপে ধরে সামনের পথে সে ফেলেছিল প্রথম পদ-ক্ষেপ। সেদিনের সে যাত্রার উদ্দাম আনন্দের উচ্ছলতায় এমনই সে আবিষ্ট হয়ে পড়েছিল যে, তার স্মরণ ছিল না—যাকে সে গ্রহণ করল বাকী জীবনের সঙ্গিনী হিসাবে তার নামের পরে নেই কোনও বিদ্যামন্দিরের ক্ষীণতম স্বীকৃতি। তার দেহের রেখায় রেখায় নব-যৌবনের যে জীবন-স্রোত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল, পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল যে আবেদন তার বঙ্কিম অধরে, রক্তিম কপোলে—আর কালো চোখের সলজ্জ চাহনিতে—তাতেই মুগ্ধ হয়েছিল প্রাণতোষ। ইরাণী বেশী লেখাপড়া জানে না, তাতে কি হয়েছে—ইরাণী কাজ জানে—সংসারের যাবতীয় খুটিনাটি কাজ। ইরাণী লিখতেও জানে, পড়তেও জানে—তবে সেটা নেহাত কাজ চলার মত—তা হোকগে তাতে কোনও দুঃখ নেই প্রাণতোষের, ইরাণীর রূপ আছে—পাঁচ জনের কাছে গর্ব্ব করার মত রূপ। পরের মনে ঈর্ষা জাগানোর মত রূপ তার নেই; ব্যস আর কিছুই চায় না প্রাণতোষ।

কিন্তু জোয়ারের পরেও ভাঁটা আসে, পূর্ণিমার পরে ধীর গতিতে এগিয়ে আসে নিশ্চন্দ্র নীরন্ধ্র রাত্রি। প্রাণতোষের জীবনেও এক দিন উন্মাদনা ঘুচে গেল। দেহকে অতিক্রম করে দেহাতীতের সন্ধান করতে গিয়ে হঠাৎ সে আবিষ্কার করল যে, সে ঠকেছে। মর্ম্মান্তিক ভাবে ঠকেছে। বস্তু-জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তার আড়ালে মননশীলতার যে বিচরণ ক্ষেত্র সেখানে সে নিতান্ত সঙ্গী-হীন। সেই দিনই সে বুঝতে পারল—ইরাণীকে পাওয়ার মধ্যে জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা তার মেলে নি। সেইদিনই তার সুরু হল পালিয়ে যাওয়া। যেমন করে স্কুল-পালিয়ে ছেলেরা মাঠে মাঠে খেলা করে, নদীতে সাঁতার দেয়, পরের গাছের ফল পেড়ে নিয়ে আসে। বালক-প্রবৃত্তির অতি স্বাভাবিক তাড়নায় কঠিনতম শাস্তিকেও যেমন করে তারা উপেক্ষা করে—ঠিক তেমনি করেই প্রাণতোষের পলাতক মন ছুটে বেড়াতে সুরু করল প্রতিদিনের 'রুটিন'কে অস্বীকার করে, ইরাণীর কটূক্তিকে গায়ে না মেখে—ওর রাগ-অভিমানকে গ্রাহ্য না করে।

বিয়ের পর কিছুদিন ধরে খুব সংসারী হয়ে পড়েছিল প্রাণতোষ। সে ভেবেছিল সংসারকে ভালবাসতে পারলেই ইরাণী বুঝি খুব খুশী হবে। বিষয়-বুদ্ধিতে মন দিলেই ওর নারী-মন পুলকিত হয়ে উঠবে—তাই সোনার কাঁকনে সে ভরে দিয়েছিল ওর সোনার দেহ। শাড়ীর বিচিত্রতায় বিহ্বল করে তুলেছিল ওর মুগ্ধ মনকে। সেই প্রাণতোষের এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ইরাণী তাই সহ্য করতে পারে নি। সম্পূর্ণ প্রাণতোষকে সে বুঝতে পারে নি। নিজেকে আড়ালে ঢেকে নিজের সর্ব্বনাশই করেছে প্রাণতোষ। স্ত্রীর কাছে নিজের অন্তরকে সে অর্গলবদ্ধ করে রেখেছিল—অন্তরে-বাইরে সে এক হতে পারে নি। আজ তাই তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে এই অসেতু-সম্ভব ব্যবধান।

কিন্তু আজ এই মুহূর্ত্তে ইরাণীর কণ্ঠে যে দৃপ্ত স্বাধিকারের ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেল—সে সাহস উচ্চকিত হয়ে উঠল ওর প্রতিটি উচ্চারণে—তাতে কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়ল প্রাণতোষ। এ-ঘরে ও-ঘরে সে অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়াল কিন্তু বাইরে আর বেরুতে পারল না। অসহায়ের মত একবার চেয়ে দেখল ইরাণীকে—নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ। তাকে ডাকতে পারল না প্রাণতোষ। অন্যদিন যেমন বলে, তেমনি করে ডেকে বলতে পারল না 'আজ বেশি দেরী হবে না ইরা, যাব আর চলে আসব। না গেলে ভাল দেখায় না। তা ছাড়া আজ একজন ভাল বক্তা আসবেন।

জানালার গরাদটা চেপে ধরে দূরের আকাশের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল প্রাণতোষ। দূরের কোনও একটা কারখানার চিমনীর ধোঁয়া পাক খেতে খেতে উপরের দিকে উঠতে সুরু করল, তার পর অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল আকাশের প্রান্তে।…নাঃ, যেতেই হবে, বাতাসহীন এই বদ্ধ ঘরের মধ্যে আর বসে থাকা চলে না। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ভরে গেছে—দোতলা-তিনতলার খুপরী-খুপরী ঘরগুলো। বাইরের বাতাস একটু চাই, একটু আলো, একটু…।

জানালা থেকে সরে এসে ট্রাঙ্কটা খুলে সিল্কের চাদরটা বার করে নিয়ে এল প্রাণতোষ। ইস—ভাঁজে ভাঁজে কেটেছে। কেমন করে ঢুকল ইঁদুরটা। ইস! ইরাণী—ইরা শুনছ? চাদরটা বুকে নিয়ে বিছানায় এসে ভেঙে পড়ল প্রাণতোষ—সমস্ত শরীরে তার বিবশ বিষণ্ণতা। হঠাৎ সে যেন ধরা পড়ে গেল তার নিজের কাছে। বুদ্ধির চর্চায় মনের আহার সংগ্রহ করতে গিয়ে দেহের বাস্তুতেই যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল প্রাণতোষ, এই রূঢ় সত্যটুকু ইরাণী তার স্বাভাবিক নারী-মন দিয়েই বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু বুঝতে পারে নি প্রাণতোষের রুচিবান বিদগ্ধ মন। মিস হালদারের মনে সাহিত্যরস যত না ছিল, তার চেয়ে ঢের বেশী জীবনরস ছিল ওর দেহের লাবণ্যে, ওর চোখের হাসিতে ওর কুমারী অঙ্গের প্রতিটি রেখায় ফুরিয়ে-যাওয়া ইরাণীতে হয়ত ক্লান্তি বোধ করছিল প্রাণতোষ, তাই বোধ করি সে খুঁজেছিল নতুন আশ্রয়। চমকে উঠল প্রাণতোষ এই মুহূর্ত্তে সে ধরা পড়ে গেল নিজের কাছে। যুক্তি-তর্কের জাল বিস্তার করে নির্জ্জন মনের অপরাধকে স্খালন করবার কোনও পথই সে আর খুঁজে পেল না।

: কি, ডাকছ কেন? খাটের পাশে এসে দাঁড়াল ইরাণী।

: আর কোনদিনই কোথাও যাব না, কোথাও না!

: কেন গো মশাই এত বৈরাগ্য কেন?

: বৈরাগ্য নয়, এই দেখ চাদরের কি দশা হয়েছে।

: ওঃ, এই জন্তে? ক্ষুব্ধ হ'ল ইরাণী। তা হলে চাদরের জন্তে! আমি যে অত করে বললাম। কোনও কথা না বলেই বিছানা ছেড়ে সে উঠে পড়ল ইরাণী। খপ করে ওর হাতটা বুকে টেনে নিল প্রাণতোষ। বলল, আমার অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে বাক্সের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল ইঁদুরটা। প্রবৃত্তির তাড়নায় এমন

একটা সাধের জিনিস সে টুকরো টুকরো করে কেটে দিয়ে চলে গেল। এ থেকে কি শিক্ষা পাওয়া যায় ইরাণী?

: ধরাতলে নরাধম খল আছে যত—ওর মুখটা বুকের মধ্যে চেপে ধরে বাকীটুকু আর বলতে দিল না প্রাণতোষ। নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই সে দিল। বললে, নিজের অসাবধানতায় ঠিক এমনি আর একটা ইঁদুর আমার ভালাখোলা মনের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। আমাদের এত সাধের মধুর জীবনকে সে-ও যেন চেয়েছিল টুকরো টুকরো করে কেটে দিতে। কিন্তু আর তা সে পারবে না।

প্রাণতোষের বুকের মধ্যে মাথা রেখে কানপেতে কি যেন শুনল ইরাণী। তার পর সে হেসে উঠল। হাসতে হাসতেই বললে, যা পায় তাই কেটে ইঁদুর শুধু ছারখার করে না—কাটা-ছেঁড়া জিনিসও জোড়া দিতে জানে। প্রাণতোষও হেসে উঠল, বলল, ঠিক বলেছ।

ফতেপুরসিক্রি

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

তীক্ষ্ণ তীরের মত শীতের বাতাস গায়ে বিঁধছে। মাঘ মাস। সকাল ছ'টা। টিকেট কেটে ফতেপুরসিক্রিগামী বাসের আপার ক্লাসে চড়ে বসেছি। চব্বিশ মাইলের পাড়ি। এক পাশে আছেন এক কাণে মাকড়ী, মাথায় পাগড়ী ভদ্রলোক। অন্য পাশে দু'জন লালচে দাড়িমুখো মুসলমান। এঁরা অভিজাত সম্প্রদায়ের। এঁদের গা থেকে একটা স্নিগ্ধ আতরের 'খুসবো' বেরোচ্ছে।

কুলবধূর মত একটা পাতলা কুয়াশার বোরখায় সব কিছু ঢাকা পড়ে আছে এখনও। আগ্রা দুর্গ সম্মুখে। কিন্তু কিছু তার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। শাহগঞ্জের ভেতর দিয়ে বাস চলল। কিছু পরে কুহেলী ভেদ করে প্রভাত-সূর্য্যের মিষ্টি রোদ গায়ে পড়ে শৈত্যের কিছুটা লাঘব করলে।

'পাঁচ কুইয়ন,' 'পিরগিলানি' 'ইদ্গা মহল্লা,' 'শা এমৎউথারি'ও 'মহল্লা'পৃথিবীনাথ অতিক্রম করে আগ্রা নগরীর শেষ সীমা পার হয়ে গেল বাস। অপরিচয়ের রাজ্য, তাই বিশেষ কিছু চোখে পড়লেই পাশের মুসলমান ভদ্রলোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করছিলাম। দু'পাশে সর্ষে ক্ষেত, অড়হড় ক্ষেত, পেয়ারা বাগান, কোথাও বা দুই মোটা থামে বসান 'স্বাগতম্ বিকাশ ক্ষেত্র' লেখা সাইন বোর্ড, বিকাশ ক্ষেত্র বোধ হয় সরকারী কৃষি ক্ষেত্রই হবে। দেশী পুলি সিটেমে বলদ সংযোগে জল তোলা হচ্ছে কৃষি ক্ষেত্রের জন্য। তবু বলব, এখানে ফসল ভাল ফলে না।

একটা পুকুরের মাঝের জলটুঙ্গি দেখিয়ে মুসলমান ভদ্রলোকদের জিজ্ঞাসা করলাম ওটার সম্পর্কে। দাড়ি নেড়ে ওঁদের একজন বললেন, ও আকবর কা টাইম কা হোগা। আবভি সব বরবাদ হো গয়া। কভি আঁধারা, কভি উজালা এ ত হ্যায়ই, হায়। কথা বলার সময় তাঁর হাত আর মুখ এক সঙ্গে সক্রিয় হয়ে উঠল।

সত্যি-মিথ্যে বহু কাহিনীতে বিমণ্ডিত পথ। অতীত-বর্ত্তমানের সামঞ্জস্য বিধান করবে কে? যা দেখি তারই পরিচয় জানতে ইচ্ছে করে। সে পরিচয় আজ আর দেবে কে? বন জঙ্গলে যে সব জায়গা ভরে উঠেছে বা যে সব ঢিবি চোখের সামনে দেখছি হয় ত সে সবই ছিল এক দিন স্তব্ধ অতীতের রাজ্যপাট।

বাস চলেছে দ্রুত বেগে। মাঝে মাঝে দু' চারটে গম্বুজ, আর জরাজীর্ণ পাথরের পরিত্যক্ত বাড়ী নজরে পড়ছে। নজরে পড়ছে সাদা মাটির বুকে উঁকি-মেরে-থাকা লাল পাথর। দূরে দূরে ছোট-খাটো টিলা, কোথাও বা টিলার উপরে গড়ে-ওঠা গ্রাম, শিশু পাহাড়, উটের পিঠে বোঝাই করা মাল, খচ্চরের পিঠের ঘুটের ছালা, ছোট ছোট দেহাতী গ্রামের পরিপাটি-অঙ্গনে বাঁধা ধানের নয়, ঘুটের মরাই। বোঝা যাচ্ছে এই সব গ্রামের গোপালনই হচ্ছে প্রধান উপজীবিকা। জ্বালানী কাঠের অভাব এ পাশে, তাই ঘুটে সে সমস্যার সমাধান করে। কোথাও কোথাও ঝাউ চারাও চোখে পড়ল। এগুলিও ঐ একই উদ্দেশ্যে লাগানো হয়েছে। ব্রজভূমিও দূরে নয়। তাই গোধনই বোধ হয় প্রধান ধন এ পাশের। এরা গরুর যত্ন জানে। সূচি-শিল্প-সমৃদ্ধ কাঁথা দিয়ে এদের অঙ্গ ঢেকে রেখেছে। এ পাশের শ্যামলী ধবলীরাও বেশ হৃষ্টপুষ্ট।

লাল পাথরের দেশ ফতেপুরসিক্রি। আনাচে-কানাচে লাল পাথর ছড়ানো এখানে। কোথাও লাল পাথরে কুয়ো বাঁধানো হয়েছে কোথাও স্নানের যায়গা, কোথাও ক্ষেতের ঘেরা। মাইল-ষ্টোন থেকে মিল ষ্টোন পর্য্যন্ত সব লাল পাথরের।

আগ্রা থেকে তিন মাইল দূরে 'পথৌলি' গ্রামে প্রথম বাস থামল। ঠেলা গাড়ীতে আনাজ বিক্রী হচ্ছে এখানে। টাটুর পিঠে জ্বালানী কাঠ বিক্রী হচ্ছে। মহাভারতের যুগের বিরাট বিরাট চাকাওয়ালা গাড়ীতে গামলার আকারের গুড় চালান যাচ্ছে। থমথমে ধোঁয়া জমে যে আকাশ প্রান্ত এতক্ষণ অভিমানী মেয়ের মত মুখ ভার করে ছিল সে এখন দিব্য হাস্যময়ী হয়েছে।

আবার দশ মাইল দূরে 'মিটাকুর' গ্রামে বাস থামল, গ্রামটি বড়,

অনেক ঘর-বাড়ী, ইট-পাথরের তৈরী একতলা, দোতলা বাড়ীও অনেক আছে এখানে। দোকানপাট, সব্জীর বাজারও আছে। উট চলেছে সারি সারি। তাদের গলা সঙ্কুচিত ও সম্প্রসারিত হচ্ছে, পিঠের কুৎসিত কুঁজগুলি নাচছে।

'ফেরাউলি' গ্রাম পার হয়ে গেল বাস। রাজপুতানার প্রত্যন্ত প্রদেশ। পথে দু'দশ জন রাজপুত মেয়ে-পুরুষ নজরে পড়ছে। মেয়েদের নাকে সোনার কদম ফুল, গলায় সাতনরী, হাতে বালা, গায়ে ওড়না, পরণে ঘাঘরা—হলদে, লাল, জাফরানী রঙের, পায়ে চুমকী দেওয়া চটি। কোমরে রূপার বিছা, গালার রঙীন চুড়ী হাতে। কারও কারও কাচের চুড়ীও আছে। এ হ'ল অভিজাত বা অবস্থাপন্ন রাজপুতানীর চিত্র। এ পাশের মেয়েদের কাঁখে কলসী নেই, আছে মাথায়, তাও একটা নয়, তিন-চারটে। কলসীগুলির আকার বড় থেকে ক্রমশ ছোট হয়ে গেছে। মেয়েরা অক্লেশে ভারসাম্য বজায় রেখে জল ভরে নিয়ে চলেছে, আর ভরা গাগরী মাথায় নিয়ে গরু মহিষ তাড়াচ্ছে অনায়াসে। এরা সত্যিই শক্তিরূপা। পথে দু'চার জায়গায় দেখলাম রাজকীয় আয়ুর্ব্বেদিক চিকিৎসালয়—সাইন বোর্ড লেখা আছে। এ পাশে আয়ুর্ব্বেদকেও বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হয়েছে, শুধু ডাক্তারীর উপর নির্ভর করেনি এরা। পথে পাপড়ি গাছ, চেরঞ্জি গাছ, শিসম গাছ, পিলু গাছ চোখে পড়ল, সহসা লাল পাথরের প্রাচীর মাথা তুলে দাঁড়াল। ঐ প্রাচীরই হ'ল ফতেপুরসিক্রির বেষ্টনী। এক দিন ছ' মাইল পরিধি ড় এর বিস্তার ছিল। ছিল এগারটি প্রবেশ পথ। আজ তা নষ্ট হয়ে গেলেও বাসের প্রবেশ পথে তার কিছুটা অন্ততঃ সাক্ষী হয়ে বেঁচে আছে।

প্রবেশ করল পরিত্যক্ত পাষাণপুরীতে বাস। এখানে অগুন্তি দোকানপাট নেই, হোটেল নেই, ক্লাব নেই, শুধু আছে একটি ডাক-বাংলো, হোটেলের প্রয়োজনও নেই। যাঁরা দেখতে আসেন তাঁরা সন্ধ্যের পূর্ব্বেই ফিরে যান। আগ্রা থেকে প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাস ছাড়ে ফতেপুরের দিকে। আবার সকাল সাতটায় একটা ট্রেনও আছে। কাজেই যাওয়া-আসার কোন কষ্ট নেই।

গুলাব সিং গেটের বিপরীত দিকে বাস থামল। সম্মুখে একটি উঁচু টিলা—ছোটখাটো পাহাড়ও বলা চলে। তার উপরে ফতেপুরসিক্রি দুর্গ গড়ে উঠেছিল। এই দুর্গটি একপাশের ফতেপুর ও অন্য পাশের সিক্রির মধ্যে মিলন-রাখী বেঁধে দিয়েছে। পূর্ব্বে ফতেপুর আর সিক্রি দুটি পাথর-শিল্পীদের গ্রাম ছিল।

আকবরের মনে শান্তি নেই, সাতাশ বছর বয়েস হ'ল, কিন্তু সন্তান কই? কে তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার লাভ করবে? দাক্ষিণাত্যে গুজরাটে বিদ্রোহের আগুন। সেই আগুন নেভাতে ছুটলেন আকবর। যাত্রা পথে থামলেন ফতেপুরে। বন্দনা করলেন সাধু সেলিম চিস্তিকে। আশীর্ব্বাদ করলেন সাধু—মনস্কামনা পূর্ণ হবে। হ'লও তাই। যুদ্ধে জয়লাভ করে আবার আকবর সাধু সন্দর্শনে গেলেন। এবারও সাধু আশীর্ব্বাদ করে বললেন, মনস্কামনা পূর্ণ হবে। এর অর্থ বুঝতে পারলেন না আকবর। আগ্রা ফিরে এর অর্থ বুঝলেন, যখন শুনলেন, সন্তানসম্ভবা অম্বর রাজকন্যা যোধাবাঈ। তৎক্ষণাৎ আকবর ফিরে গিয়ে চিস্তি সাহেবের চরণ বন্দনা করলেন। সেলিম চিস্তি বেগমকে ফতেপুরে রাখতে উপদেশ দিলেন। গড়ে উঠল একটি প্রাসাদ। নাম হ'ল রঙমহল। এই রঙমহলে রইলেন যোধাবাঈ। এই প্রাসাদেই ভূমিষ্ঠ হ'ল তাঁর সন্তান। নাম হ'ল তার—সাধুর প্রসাদী বলে—'সেলিম'। এর পর থেকেই ফতেপুরের ভাগ্যোদয়। তিন পাশে পাথরের দেওয়াল, এক পাশে কৃত্রিম হ্রদ দিয়ে সুরক্ষিত করে পুরী গড়া হ'ল। রাজধানী স্থানান্তরিত হ'ল ফতেপুরসিক্রিতে। স্থানটি আকবর-সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত ছিল, তাই রাজনৈতিক কারণেও এটি রাজধানী হবার যোগ্য হয়েছিল। কিন্তু এর সৌভাগ্যসূর্য্য মাত্র ষোল বছর দেদীপ্যমান ছিল। তার পর সূর্য্য গেল অস্তাচলে, কেবল ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ শা রাজ্যাভিষেকের পর এখানে প্রথম দরবার করেন।

বাস থেকে নামতেই একটি বিশ বাইশ বছরের গাইড সঙ্গ নিলে। সে দেখাবে সব কিছু আড়াই টাকার বিনিময়ে। নীচের একটি চায়ের দোকানে চা পান করে আমরা দু'জনে উপরে উঠতে সুরু করলাম। কিছুটা টিলার উপর চড়ে পাওয়া গেল সিঁড়ি।

নহবৎখানার দিক দিয়ে দুর্গে প্রবেশ করলাম আমরা। দুর্গ পড়ে আছে। দুর্গেশনন্দিনীরা নেই। এর প্রবেশ-পথ চারটি। দু'টিতে হিন্দু স্থাপত্য, দু'টিতে মুসলিম। সভা-গায়কেরা এখান থেকে সঙ্গীতের মাধ্যমে আনন্দ-বিষাদ মূর্ত্ত করে তুলতেন। শাহান শাহের আগমন, বিজয়লাভের বার্ত্তা প্রভৃতিও এখান থেকেই ঘোষিত হ'ত।

এর পর তানসেনের প্রাসাদে এলাম, এখানে সঙ্গীত-সরস্বতী মূর্ত্তি পেয়েছিলেন। কত রাগ-রাগিনী মূর্ত্ত হ'ত—আজ সব মূর্চ্ছিত।

মুদ্রাখানায় এলাম আমরা, গাইড দেখালে কোথায় আসরফি তৈরি হ'ত। ধ্বসে পড়েছে এ সৌধটি।

সাধারণের বিচারালয় দেওয়ান-ই-আমে এলাম এবার। এর মাঝখানে সম্রাটের বসার স্থান; দু' পাশের পাথরের জালিঘেরা স্থানে বসতেন মহিলারা। সম্রাট থাকতেন উঁচুতে, নীচে দাঁড়িয়ে বিচারপ্রার্থীরা আবেদন জানাত। এখানের দেওয়ান-ই-আম আগ্রা বা দিল্লীর দেওয়ান-ই-আম অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

দেওয়া-ই-খাসে এসে পৌঁছলাম আমরা। এ বিচারালয়টি বিশেষ জনের। এখানে বিশেষ বিশেষ সভা-সমিতিও সংগঠিত হ'ত। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় তর্ক-বিতর্কে এ সৌধটি মুখর হয়ে উঠত। এর লাল পাথরের আটকোণে কেন্দ্রীয় স্তম্ভটি কারুশিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন। এটি তুলনারহিত। এর উপরে কার্নিশ-ঘেরা চারিটি পথ। পথগুলি একত্রে মিশেছে একটি গোলাকার জাফ্রিঘেরা গ্যালারির মত স্থানে। এখানে সম্রাট বসতেন। একতলায় মত উঁচু এটি, মন্ত্রীরা বসতেন গ্যালারি সংলগ্ন পথগুলিতে। সভা-

সদস্যা থাকতেন প্রায় একতলা নীচের স্তম্ভঘেরা মেঝেতে—তাঁদের মর্য্যাদা অনুযায়ী। তাঁরা কেউ হাজারী, কেউ পাঁচহাজারী, কেউ দশহাজারী মনসবদার। বিক্রমাদিত্যের মত আকবরেরও নবরত্ন ছিল। তাঁরাও থাকতেন সভাতে। স্তম্ভটি এরূপ বৈজ্ঞানিক শিল্পকুশলতায় নির্ম্মিত যে, যে-কোন স্থান হতেই সম্রাটকে স্পষ্ট দেখা যেত। এই প্রকারের স্তম্ভ জগতে আর দ্বিতীয় নেই।

দেওয়ান-ই-খাস হতে বেরিয়ে জ্যোতিষীর 'চবুতরায়' প্রবেশ করলাম আমরা। আকবর জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। এক জন হিন্দু জ্যোতিষী থাকতেন এই 'চবুতরায়'। তাঁর নির্দ্দেশ নিয়ে যুদ্ধযাত্রা, গৃহ-নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্য করতেন সম্রাট।

এর পর 'পঁচিশী কোর্ট' আর 'কানামাছি ভোঁ ভোঁ' খেলার স্থান দেখলাম। 'পঁচিশী কোর্টে সুন্দরী সুবেশা তরুণীদের দাঁড় করিয়ে ছক কাটা ঘরে পাশা খেলতেন সম্রাট। আর লুকোচুরি খেলা হত মহিলাদের সঙ্গে 'আখ মি-চালি'তে।

এলাম খাসমহলে। একদিন এখানের বাতাস আতরে-গোলাপের গন্ধে ভরপুর থাকত। সঙ্গীত উঠত এর কক্ষে কক্ষে। আজ 'নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী'।

খাসমহল থেকে 'হাজ-ই-খাসে' এসে বসলাম আমরা। চার পাশ থেকে চারটি রাস্তা এসে মিশেছে এখানে। 'খাসে'র চারধার জলে ভর্ত্তি—এটি চার ভাগে বিভক্ত। মাঝখানে বসবার যায়গা আছে। হাতী-ফটকের 'পানিকা-আস্থান' থেকে জল আসত এই খাসে। এখানে বসে সঙ্গীত সাধনা করতেন তানসেন। সামনের প্রাসাদ থেকে গান শুনতেন আকবর। এইখানেই বৈজু বাওয়ার সঙ্গে মিলন ঘটে তানসেনের। এই খাসের কক্ষগুলি সময় সময় টাকা দিয়ে ভরে ফেলা হত আর সেই টাকা আকবর গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করতেন। জাহাঙ্গীর ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে লেখা তাঁর আত্মজীবনীতে এই দানের উল্লেখ করেছেন।

হাজ-ই-খাসের সম্মুখে বাদশাহের শয়নকক্ষ। এর প্রাচীর চিত্রে পপি, গোলাপ, আঙ্গুর প্রভৃতির প্রতিকৃতি ছিল। শিশু-কোলে 'হুরপরীর' চিত্রটি বোধ হয় সেলিমের জন্ম-স্মারক চিত্র হিসেবে অঙ্কিত করানো হয়েছিল।

এর পরে আমরা বালিকা-বিত্তালয় ভবনে এলাম। আকবর স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন করেছিলেন। নিজে নিরক্ষর হলেও তিনিই ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ বিত্তানুরাগী। খাসমহল ও তুর্কীমহলের মধ্যে ব্যবধান রচনা করেছে এই বিত্তাভবনটি।

পাশেই তুর্কীমহল। ইস্তাম্বুলী বেগমের জন্ত নির্ম্মিত হয়েছিল এটি। আঙ্গুরলতায় এ সৌধটির দেওয়ালগুলি বহুস্থানেই চিত্রিত। ফার্গুসান সাহেব বলেছেন, শিল্প সৌন্দর্য্যে সমৃদ্ধতম এবং আকবরের স্থাপত্যরীতির শ্রেষ্ঠতর নিদর্শন এটি। আবার তিনি একথাও বলেছেন, একাধিক বিষয়ের পুনরাবৃত্তিও রয়েছে এখানে। ইতালীয় পদ্ধতির ছাপ পড়েছে এখানের শিল্লাঙ্কনে। এর দেওয়াল-গাত্রের কিছু চিত্র ছুৎমার্গী ঔরঙ্গজীব কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়েছিল। তিনি এদের মধ্যে পৌত্তলিকতার গন্ধ পেয়েছিলেন। পশু-পক্ষীর ছবি আঁকাতে নাকি পয়গম্বরের নিষেধ আছে। এখানের শিল্প রূপ-সজ্জার ভারে ভারাক্রান্ত, কিছু যেন কুণ্ঠিত। শিল্পী খেয়াল-খুশিমত আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে দু' একটি সাবলীল রূপের প্রতিমা রেখায়িত করেছেন। অমনি মনে পড়েছে সম্রাটের নির্দ্দেশের কথা। তিনি সচেতন হয়ে উঠেছেন তাই বুঝি প্রাণের স্পর্শ পায় নি এখানের কলাকৃতি। তবুও এখানের শিল্প-শোভা মনলোভা। লর্ড কার্জ্জন এখানের অনেক ছবির পুনরঙ্কন ব্যবস্থা করেন।

'হামামে' এলাম। এই হামাম বা স্নানাগারটি আকবর তাঁর তুর্কী বেগমের জন্ত নির্ম্মাণ করান। একটি ছোট বাঁধকার মধ্য দিয়ে এর প্রবেশপথ। তপ্ত ও শীতল জলের ফোয়ারার ব্যবস্থা ছিল এখানে।

এর পর দেখলাম দপ্তরখানা। এখানে সংকারী নথীপত্র থাকত। এটি সম্রাটের শয়নকক্ষের সন্নিকটে অবস্থিত। আকবর নিজে হিসেবপত্র দেখতেন, আর্জ্জি শুনতেন। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত কর্ম্মচারীদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন।

এর পরের গন্তব্যস্থান হল হাসপাতাল। ষোড়শ শতাব্দীতেও ভারতবর্ষে যে হাসপাতাল ছিল তা ফতেপুরসিক্রি প্রমাণ করে দিয়েছে। হয়ত এ হাসপাতাল উন্নতধরনের ছিল না, তবু এর অস্তিত্ব উন্নত সমাজ-ব্যবস্থার পরিচয় দিচ্ছে।

পাঁচতলা বাড়ী 'পাঁচমহলে' এলাম এবার। ফতেপুরসিক্রির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সৌধের মধ্যে এটি অন্যতম। পরবর্ত্তী কালে এটি সেকেন্দ্রায় আকবর-সমাধির আদর্শ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। এটি মৌল নয়, নকল। এখানে বৌদ্ধবিহারের অনুকরণ করা হয়েছে। সৌধটি ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে। স্তম্ভ এখানে অনেক। কিন্তু আশ্চর্য্যের, কোন দুটো স্তম্ভ একরকমের নয়। আকবরের সমন্বয়সাধন পদ্ধতির এটিও একটি নিদর্শন। এই সৌধে তিনি মুসলমান বেগমদের ঈদের চাঁদ দেখার ব্যবস্থা করেছেন। হিন্দু বেগমদের সূর্য্য প্রণামের ব্যবস্থা করেছেন, খ্রীশ্চান বিবিদের হাওয়া খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। সৌধটি ফতেপুরসিক্রির সর্ব্বোচ্চ সৌধ, কাজেই গ্রীষ্মের তপ্ত দিনে এর সর্ব্বোচ্চ মহলে বেগমসাহেবারা শীতল বায়ু সেবন করতেন।

পাঁচমহলের পর 'হারেম'। এখানে অন্তঃপুরিকারা অসূর্য্যম্পশ্যা থাকতেন। একদিন মীনাবাজারের মেলা বসত এর চৌহদ্দির ভেতর। বিবিবাজার, বাঁদীবাজার জমজমাট হয়ে উঠত। কত মন দেওয়া-নেওয়া চলত এখানে। কত পুলক রোমাঞ্চ, কত তরল হাসি, কত অভিমানের কত কৃত্রিম কান্না কান পাতলে হয়ত আজও শোনা যাবে এখানে। কত আনারকলির দীর্ঘশ্বাস আজও আছাড় খেয়ে পড়ছে হারেমের পাষাণ বক্ষে। অকস্মাৎ বাতাসের শব্দে সচকিত হয়ে অন্তঃপুরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মনে হল কত ব্যর্থ-যৌবনা যবনকন্যার প্রেতাত্মা যেন তাদের প্রেমিককে খুঁজে

বেড়াচ্ছে আজও। তাদের অতৃপ্ত কামনা এখনও তাদের এই পাষাণপুরীতে বন্দী করে রেখেছে, যেমন একদিন তারা বন্দী ছিল বাদশাহের অভীপ্সা চরিতার্থ করতে 'হাবসী' খোজা প্রহরী পরিবেষ্টিত হয়ে। হারেমের হর্ম্মে ঝুলন্ত রেশমী রঙ ঝলমলে পর্দ্দা, তার ফাঁকে দেখা যেত কাশ্মীরী গালিচার উপর দিলরুবা হাতে ভুস্ত র-পরা-পা ছড়িয়ে বসে আছে কত মণিবানু, কত পরিবানু, কত হাসুবানু, দিলবাহার বেগম, হীরাবাঈ। কিন্তু তারা সব পুতুল, প্রতিমা নয়, তাদের প্রাণ নেই। হয়ত শুধু একবার একটি মধুরাতি তাদের জীবনে এসেছিল। তার পর হায় হায়!

পাঁচমহলের দক্ষিণ দিকে আকবরের খ্রীশ্চান পত্নী মেরিয়ম জামানী বেগমের সৌধ। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে এঁকে বিয়ে করেন সম্রাট। সোনালী রঙে এ সৌধের দেওয়াল চিত্রিত ছিল, তাই এটির নাম ছিল 'সোনহেরা প্রাসাদ'। ফেরদৌসির শাহনামা চিত্র, হিন্দুদের পুরাণ চিত্র, খ্রীষ্ট-জীবনী-গল্প চিত্র প্রভৃতিতে প্রাসাদ-গাত্র অলঙ্কৃত ছিল। এখনও তোতার পিঠে চড়ে থাকা সুন্দরীর আলেখ্যের অস্পষ্ট আভাস রয়েছে এই প্রাসাদের পশ্চিম দিকের বারান্দায়। আকবরের সূর্য্য-প্রীতির পরিচয় লেখা ছিল এই প্রাসাদে। আকবরের উদার মনোভাব এখানের চরিত্র-চিত্র-চিত্রণে পরিস্ফুট হয়েছিল। ব্রিটিশ যুগে এখানে পি-ডাবলিউ-ডি-এর দপ্তর-খানা ছিল। ১৯০৫ সন থেকে সেটি উঠে যায় এবং দর্শকরা প্রবেশাধিকার লাভ করে।

যোধবাঈয়ের প্রাসাদে প্রবেশ করলাম। স্ফুটোনোন্মুখ পদ্ম-কুঁড়ি, ঘণ্টা, হার, মাল্য প্রভৃতির মধ্যে হিন্দু কারুশিল্পের আদর্শ এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। যোধপুর রাজ-নন্দিনী পুত্রবধূ যোধবাঈয়ের জন্য আকবর এটি ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করান। এইটিই এখানের সর্ব্ববৃহৎ প্রাসাদ। এখানের দেওয়ালে ন'জন মন্ত্রীর প্রতিকৃতি আঁকা ছিল। লর্ড কার্জ্জন এখানের শিল্পকৃতির সংস্কার করেন। বংশীধারী মূর্ত্তিটি তাঁর নির্দ্দেশে আঁকা হয়।

আমাদের এর পরের গন্তব্য স্থান হয়েছিল 'হাওয়াই-মহল'। নামই বলে দিচ্ছে এ প্রাসাদটি হাওয়া খাওয়ার জন্য নির্ম্মিত হয়েছিল। বিশ্রাম করতে লাগলাম এখানে আমরা। আশ্চর্য্য উদার আর মহিমান্বিত এই পাষাণপুরী। এর গায়ে কত জনা কত আঁচড় কাটছে। নির্ম্মম হাতে কত লোক একে নিয়ত নিপীড়ন করে যাচ্ছে। স্যুটেড-বুটেড কত তথাকথিত সাহেবের দল সদর্পে এর বুকে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কৈ, এ ত একবারও অভিযোগ জানাচ্ছে না? একটুকুও মুখ ভার করছে না, বরং ক্লান্ত শ্রান্ত পথিককে অপার স্নেহে ছায়া শীতল আশ্রয় দিচ্ছে।

যোধবাঈয়ের প্রাসাদের উত্তর-পশ্চিম কোণে রয়েছে বীরবলের প্রাসাদ। গরীব ব্রাহ্মণ ছিলেন মহেশ দাস, গোপাল ভাঁড়ের মত রসিক এবং তীক্ষ্ণধী সম্পন্ন ছিলেন তিনি নিজের প্রতিভায় তিনি আকবর শাহকে সন্তুষ্ট করে মন্ত্রীত্ব লাভ করেন আর পদবী পান 'বীরবল'। আবার কবিও ছিলেন তিনি। তাঁর এই প্রাসাদ তৈরী হয়েছিল ১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে। কেউ বলেন আকবর এটি তাঁ মহিষী বিকানীর রাজকন্যার জন্য নির্ম্মাণ করান। এখানে জন্মলাভ করে তাঁর পুত্র দানিয়েল। পরে এটি বীরবলের বাসস্থান হয়।

এর পর আমরা পা বাড়ালাম 'কবুতরখানার' দিকে। লোটন পায়রা, ময়াজ পায়রা, পালখ-পা পায়রা—কত রকমের পায়রাই না ছিল এখানে।

হাতীশালা, ঘোড়াশালা, উটখানা—এ সব দেখলাম এর পরে। আকবর নিজে পশুপক্ষীদের তদারক করতেন। কোন সহিস যদি কোন পশুকে ঠিক মত যত্ন না করত তবে তাকে শাস্তি পেতে হ'ত। পশুর লড়াই করাতেন সম্রাট মাঝে মাঝে এবং সপার্ষদ উপভোগ করতেন সেই লড়াই। আবুল ফজল বলে গেছেন ১২০০০ ঘোড়া ছিল ফতেপুরসিক্রিতে। আমরা ১১০টি ঘোড়া বাঁধার গোলপাথরের চক্র দেখলাম ঘোড়াশালায়। হয়ত এ স্থানটি আকবরের বিশেষ প্রিয় ঘোড়াগুলির জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। অন্য সকল ঘোড়া রাখার জন্য কোন বড় আস্তাবল ছিল। উটখানায় ৫১টি উটরাখার স্থান দেখতে পেলাম। প্রতি বছর আকবর পশু-পালন প্রতিযোগিতা করতেন এবং শ্রেষ্ঠ পশুপালককে পুরস্কার দিতেন।

সরাইখানায় এলাম এবার। এখানে থাকত হরেক দেশের আগন্তুকেরা। থাকত বালুচ সওদাগরেরা, থাকত মহীশূরী বণিকের দল। সামনের বিশাল চত্বরে বাঁধা থাকত সারি সারি হাতী, উট, তেজী আরবী অশ্ব, চিতাবাঘ, কাকাতুয়া, টিয়া, ময়না। আকবর পছন্দ মত পশুপক্ষী ক্রয় করতেন।

শেষ প্রান্তের চত্বরে দাঁড়িয়ে 'হিরণ মিনার' দেখলাম। এটি আকবরের প্রিয় হাতী হিরণের কবরের উপর নির্ম্মিত স্মৃতিস্তম্ভ। নব্বই ফুট উঁচু এটি। এর সারা অঙ্গে কৃত্রিম হাতীর দাঁত সংযুক্ত করা আছে। এগুলিকে দূর থেকে লৌহশলাকার মত মনে হয়। পূর্ব্বে হারেমের বিবিজানেরা পর্দ্দা-ঘেরা পথে গিয়ে এই মিনারে চড়ে সামনের হ্রদের নৌকা বাইচ উপভোগ করতেন। আজ সে পথ নষ্ট হয়ে গিয়েছে, হ্রদও শুকিয়ে গেছে।

পুরী হ'ল, প্রাসাদ হ'ল, অথচ উপাসনার ব্যবস্থা থাকবে না, এ ত আর হতে পারে না। কাজেই জামাই মসজিদের' জন্ম হ'ল ১৫৭১-৭২ খ্রীষ্টাব্দে। পারস্যের একটি মসজিদের অনুকরণে এটি তৈরী হয়েছিল। এর তিনটি গম্বুজ। তিন ভাগে বিভক্ত এ মসজিদ। সর্ব্বশেষের জালিঘেরা জায়গায় মহিলাদের নামাজ পড়ার স্থান। এর 'নবাব-দরওয়াজা' ফটক দিয়ে আকবর আসতেন নমাজ পড়তে।

মসজিদ সংলগ্ন একটি আরবী কলেজ ছিল। এখানে আরবী ভাষা ও কোরাণ শরিফ পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা ছিল।

ফতেপুরসিক্রির সেরা সৌধ হ'ল 'সেখ সেলিম চিস্তির' মর্ম্মরের সমাধি সৌধ। এইটিই একমাত্র মার্ব্বেলের তৈরী সৌধ ফতেপুর-

চিত্রিত এর সূক্ষ্ম মার্বেলের জালি এবং স্তম্ভ, কার্নিসের বাঁকানো কারুকার্য্য অতুলনীয়। ইৎমদউদ্দৌলার কারুকৃতির সঙ্গে এর এক মাত্র তুলনা সম্ভব। কিন্তু সে তুলনাতেও এরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হবে। একটি মূল্যবান সূচি-শিল্প-সমৃদ্ধ বস্ত্রখণ্ডে আচ্ছাদিত আছে পীর চিস্তি সাহেবের সমাধি স্থানটি। ১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে দেহরক্ষা করেন পীর সাহেব। ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে আকবর এ সমাধি সৌধটি সমাপ্ত করান। এর দরওয়াজা আবলুস কাঠের। রমজানের অষ্টবিংশ দিবসে প্রতি বছর এখানে একটি মেলা হয়। অনেক বন্ধ্যা রমণী পীর সাহেবের 'দোয়া মাঙতে' আসেন এই রমজানের মেলায়। সাধারণের বিশ্বাস, ফকির চিস্তি সাহেবের মেহেরবাণীতে সন্তান লাভসেই। তাই অনেক মেয়েই চিস্তি সাহেবের সমাধি সৌধের মার্বেলের জালিতে জালিতে বেঁধে যায় বস্ত্রখণ্ড। ফারসী ভাষায় প্রশস্তি-কবিতা খোদাই করা আছে সমাধিগাত্রে।

এর পর গাইড দেখালে সেলিম চিস্তি সাহেবের নাতি নবাব ইসলাম খাঁর সমাধি। ইসলাম খাঁ ছিলেন আবুল ফজলের ভগ্নীপতি, লাডলী বেগমের স্বামী। জাহাঙ্গীর তাঁকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারা যান। তাঁর সমাধির পাশে তাঁর আত্মীয়-স্বজনের সমাধি ছড়িয়ে রয়েছে। শুরু চিস্তির পত্নী জেনব বিবি যেখানের সমাধিতে শুয়ে আছেন, সে স্থানের নাম 'জেনানা রৌজা'। এটি মহিলাদের গোরস্থান।

সর্ব্বশেষে এলাম বুলান্দ দরওয়াজাতে। এটি ভারতের সর্ব্বোচ্চ সিংহদ্বার। শুধু ভারতের কেন, জগতের সর্ব্বোচ্চ সিংহদ্বারদের অন্যতম এটি। রাস্তা থেকে এটি ১৭৬ ফুট উঁচু। ১৬০২ সনে দাক্ষিণাত্য বিজয়ের স্মরণচিহ্নরূপে এটি ফতেপুরী দুর্গে সংযোজিত হয়েছিল। তাই এটিকে বিজয় তোরণও বলা যায়। এই সিংহদ্বারে লেখা আছে : এ জগৎ পান্থশালা, ক্ষণিকের আবাস, অতএব আল্লাহকে স্মরণ কর। জানি না আকবরের জীবন-দর্শন এই লেখার মধ্যে লুকিয়ে আছে কি না।

সিংহদ্বারটি নিজেই একটি প্রাসাদ। এর বহু কক্ষ। আকবরের সময় এই কক্ষগুলি নজরখানা রূপে ব্যবহৃত হত। সিংহদ্বারের দ্বার দুটি লোহার অশ্ব-খুরে ভর্ত্তি হয়ে আছে। কোন অশ্ব অসুস্থ হয়ে পড়লে এখানে মানত করা হয় লোহার খুর দেবার। সেই অশ্ব সেরে উঠলে মালিক লোহার খুর লাগিয়ে দিয়ে যায় সিংহদ্বারের দরওয়াজাতে। এই প্রথা চলে আসছে আকবরের সময় হতে। এখানের সবচেয়ে বড় অশ্ব-খুরটি লর্ড কার্জ্জন কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয় ১৮৯৫ সনে। এই সিংহদ্বারের একটা বিশেষ স্থান থেকে একশ্রেণীর লম্ফপ্রদানকারী লাফিয়ে পড়ে সিঁড়ির পাশের একটি কূপে। বলা বাহুল্য, দর্শকদের নিকট হতে টাকা-সিকে আদায় করার জন্যই এই দুঃসাহসিক কর্ম্ম-অনুষ্ঠান।

শ্রান্ত হয়ে 'বুলান্দ' দরওয়াজাতে বসলাম। সম্মুখের বাগানে রাস্তার অপর পারে দু'টি অট্টালিকা দেখা গেল। একটি আবুল ফজল সাহেবের, একটি ফৈজীর আবাসস্থল ছিল। আকবরের 'বিবিধ রতনে'র মধ্যে ছিলেন এই দুই ভাই। আবুল ফজল ঐতিহাসিক। 'আকবরনামা', 'আইন-ই-আকবরী', আর 'মকতুবৎ-ই-আলামা'—লিখেছিলেন তিনি। ফৈজী ছিলেন কবি ও রাজনৈতিক। দৌত্যকর্ম্মে তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন বহুবার।

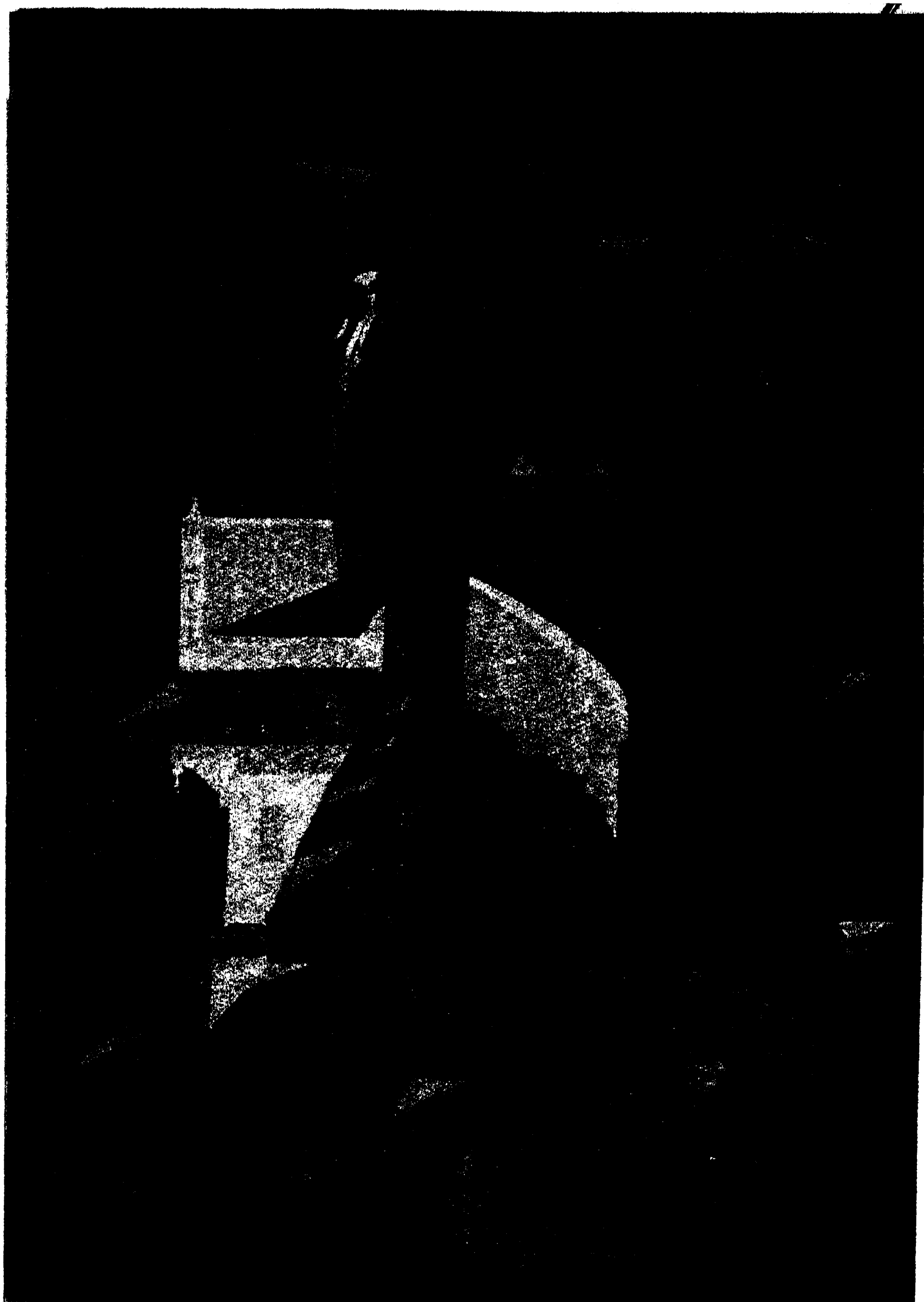
পরিশ্রান্ত হয়ে বসে রইলাম বুলান্দ গেটের বাইরের 'করিডরে'। ভাবতে লাগলাম, কেনই বা আকবর এত অর্থ ব্যয়ে এ নগরী নির্ম্মাণ করালেন, কেনই বা পরিত্যাগ করলেন একে। কেউ বলেন, জলাভাবের জন্য এখানের জীবনযাত্রা দুর্ব্বহ হয়েছিল, কেউ বলেন, রাজনৈতিক অবস্থা ঘোরাল হয়েছিল বলে আকবরকে লাহোরে রাজদরবার স্থাপন করতে হয়। জানিনে এ সম্রাটে খেয়াল কি না।

কী পাইনি ?

শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত

কী খবর আর শোনাতে পারবে বলো ?
বলার আগেই চোখের চাতক হয়ে ওঠে ছলোছলো !
মেঘ নেই মোটে, তবু যে কেমন করে,
শ্রাবণের ধারা ঝরিয়ে কদম ফোটালো মনের ঘরে !
রৌদ্রও নেই, ছায়াও দেখিনি মোটে
তবু বলো দেখি চৈত্রের শেষে কী করে কুসুম ফোটে ?
আলো নেই তবু অমাবস্যায় দেখি—
রূপোলী জ্যোৎস্না রাজকন্যার গাল ছুঁয়ে গেল এ কী !

অন্ধকারের লেশটুকু আর নেই—
সূর্য্য তোরণে কালো চোখ তবু জলে জলে উঠবেই !
স্বর্গ বলেও ধরাতো পড়ে নি আগে—
পৃথিবী শুধুই আরো কাছে যেন এসে গেছে অনুরাগে।
কী খবর তুমি শোনাবে অবাক করে ?
কতো তুমি ডাকো যুগে যুগে এই আমারই নামটি ধরে !



প্রবাসী প্রেস. কলিকাতা

আজান

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(মাঘ, ১৩৪১ হইতে পুনর্মুদ্রিত)

লালসন্ধ্যা

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

১৮

শিক্ষা অতনু যাঁর কাছেই পেয়ে থাক না কেন ডানকান-আগরওয়ালা চক্র তাকে রীতিমত বিব্রত এবং চিন্তিত করে তুলেছে। আইনের সাহায্য তারা নেয় নি। এমনকি সামনা সামনিও এগিয়ে আসে নি। অথচ অষ্টপ্রহর তারা অতনুকে অনুসরণ করে ফিরছে। চোখে দেখা না গেলেও সে স্পষ্ট অনুভব করছে, কতগুলি অদৃশ্য হস্তের দুর্ব্বোধ্য নাড়াচাড়া। অতনু ওদের যত বোকা আর সাধারণ ভেবেছিল তা ওরা নয়। বরং ঢের বেশী চতুর আর হুসিয়ার। অলক্ষ্যে থেকে নিজেদের কাজ করে চলেছে। অতনুকে ভাবিয়ে তুলেছে—শঙ্কিত করে তুলেছে।

যে শত্রুকে চোখে দেখা যায়—কাছে পাওয়া যায়, তাকে হয়ত কাবু করাও সম্ভব, কিন্তু নাগালের বাইরে থেকে যারা শত্রুতা করতে সুরু করেছে তাদের কেমন করে কায়দা করবে অতনু ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। তার বুদ্ধি তেমন খেলছে না। শুধু একটা অসহনীয় দুশ্চিন্তা দিনের পর দিন তার মনের উপর চেপে বসে অতনুকে দুর্ব্বল করে ফেলেছে। ফলে তার মধ্যে একটা সুস্পষ্ট পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছে। কারণে সে চুপ করে থাকে—অকারণে চীৎকার করে। তার আশেপাশে যারা ঘুরে বেড়ায় তারা কেউ বা বিস্মিত হয়, কেউ মুখ টিপে টিপে হাসে।

মিত্রা অনুযোগের ভঙ্গিতে বলে, আপনি খুব ভয় পেয়ে গেছেন মনে হয়। আপনার কর্ম্মচারীদের দাবিটাই বরং মেনে নিন। সব গোলমাল মিটে যাবে।

অতনু ধমক দিল, ভবিষ্যতে একটু হিসেব করে কথা বল মিত্রা দেবী। আর ভুলে যেও না যে কারখানার পরিচালক তুমি না আমি।

মিত্রা আর কথা না বাড়িয়ে নিঃশব্দে সরে পড়ল। যে কোন কারণেই হউক ইদানিং সে সব সময়ই অতনুকে তাতিয়ে রাখতে চায়। অথচ তেতে উঠলেই সেখানে আর দাঁড়ায় না।

শ্রীমতী বলে, কাজটা তুমি ঠিক করছ না। যখন জানতে পেরেছ যে, ডানকান আর আগরওয়ালা এই গোলমালে ইন্ধন যোগাচ্ছে তখন—

বাধা দিয়ে অতনু উষ্ণ কণ্ঠে বলল, আমার কাজের সমালোচনা না করলেই আমি খুশী হব।

শ্রীমতী সহজ কণ্ঠে বলল, সমালোচনা না হলে সংশোধন হয় না। তা ছাড়া একে সমালোচনা না ভেবে সৎপরামর্শ বলে ধরে নিতে পারছ না কেন?

অতনু অধৈর্য্য কণ্ঠে জবাব দিল, তোমার বাবার মাষ্টারী-বিদ্যেটা বেশ আয়ত্ত করে নিয়েছ দেখছি, কিন্তু দয়া করে ভুলে যেও না যে, আমি তোমার স্বামী—ছাত্র নই।

শ্রীমতীর মুখভাব কঠিন হয়ে উঠল। নিরস কণ্ঠে বলল, সেটা আমার ভাগ্য। নইলে আপশোষের সীমা থাকত না। তুমি স্বামী-স্ত্রীর বাংলা অর্থও জান না।

অতনু গম্ভীর হয়ে উঠল। একটা শক্ত কথা তার ঠোঁটের ডগায় এসে পড়েছিল। অতি কষ্টে সামলে নিয়ে বাঁকা হেসে বলল, তোমার বাবা তাঁর মেয়েকে বিয়ে না দিলেই ভাল করতেন। তা হলে তিনি লাভবান হতেন সন্দেহ নেই।

শ্রীমতী বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে বলল, তিনি ব্যবসাদার নন—স্কুল-মাষ্টার। লাভ লোকসান কম বোঝেন। কিন্তু তোমার কথা শুনে এখন মনে হচ্ছে যে, তোমার মত যদি তাঁর ব্যবসা-বুদ্ধি থাকত তা হলে আমার চেয়ে সুখী আর কেউ হ'ত না।

একটু থেমে শ্রীমতী পুনরায় বলতে থাকে, কোন কথাই তুমি আমাকে বলতে চাও না। বলার আবশ্যক আছে বলেও মনে কর না। তোমার অহঙ্কার তোমাকে অন্ধ করে রেখেছে, নইলে সহজ পথটা চোখে পড়ত। কিন্তু তোমার ইহজন্মেও চোখ ফুটবে না। বারুদের উপর দাঁড়িয়ে তুমি আগুন জ্বালতে জান—জলের কথা একবার মনেও আসে না।

অতনুর চোখে মুখে খানিক অবজ্ঞা-মিশ্রিত হাসি ফুটে উঠল। সে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল, জল ঢালা তুমি কাকে বলতে চাও আমি বুঝি না। তিল তিল রক্তের বিনিময়ে যা কিছু এতদিন ধরে গড়ে তুলেছি 'তাকেই দু' হাতে বিনা বাধায় বিলিয়ে দেওয়াকে?

শ্রীমতী বলল, অংশ দেওয়ার নাম বিলিয়ে দেওয়া নয়। তোমার এই প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলতে যত রক্তক্ষরণ হয়েছে তার কতটুকু তোমার আর কতটুকু ওদের তার হিসেব করে দেখলে এ কথা এত সহজে তুমি বলতে পারতে না। ওরা বাঁচলে তুমিও বাঁচবে। এ কথা ভাববার দিন আজ এসেছে।

অতনু কঠিন কণ্ঠে বলল, যারা দূরে বসে তোমার মত

সমালোচনা করে তারাই এ কথা বলে থাকে। কিন্তু আমি ভাবছিলাম, তুমি আমার স্ত্রী না আমার কারখানার মজুরদের সেক্রেটারী? তোমার কথাবার্তা অত্যন্ত বিপজ্জক হয়ে উঠেছে।

শ্রীমতী খানিক স্থিরদৃষ্টিতে অতনুর মুখের পানে চেয়ে থেকে মৃদু কণ্ঠে বলল, আমার ভুল হয়েছে। তোমাকে কিছু বলতে যাওয়া বৃথা। তুমি কৃপার পাত্র।

চলে যাবার জন্তে শ্রীমতী পা বাড়াতেই অতনু তাকে বাধা দিয়ে বলল, দাঁড়াও। তার রক্তের মধ্যে প্রচণ্ড দাপাদাপি সুরু হয়েছে। সে ব্যঙ্গ-মিশ্রিত কণ্ঠে বলল, তোমার বাবার একটা জিনিস আমার খুব ভাল লাগে।

শ্রীমতী ঘুরে দাঁড়াল।

অতনু বলতে থাকে, অবাধ্য ছাত্রকে বেত মেরে শাসন করাটা। আমরা শাসন করি অবাধ্য ঘোড়াকে চাবুক মেরে।

শ্রীমতীর দু' চোখ জ্বলে উঠল। সে তীব্র ঘৃণা ভরে অতনুর আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

অতনু হো হো করে হেসে উঠল। শব্দটা শ্রীমতীকে তাড়া করে নিয়ে চলল। অতনু যেন আজ পাগল হয়ে গেছে। অতি সাধারণ আর সহজ কথাটাকেও সে বুঝতে চাইছে না। নিজের কথার গুরুত্বও সে নিজে বুঝতে পারছে না। শ্রীমতী এক প্রকার ছুটতে ছুটতে এসে নিজের ঘরে প্রবেশ করে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তার পর স্থিরভাবে চিন্তা করতে লাগল। ঝোঁকের বশে হঠাৎ একটা-কিছু করে বসবার মত চঞ্চল প্রকৃতির মেয়ে শ্রীমতী নয়। তাই বলে এত বড় অপমানকেও সে বরদাস্ত করতে পারছিল না। এ বাড়ীতে প্রবেশ করবার পর একে একে সে তার বহু মত এবং পথকে ত্যাগ করেছে। ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, এমনি এক মধ্যপন্থা বেছে নিয়ে অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেবার চেষ্টা সে করে আসছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই বলে···শ্রীমতী আর ভাবতে পারছে না। তার মাথার মধ্যে দপ দপ করছে। এখানে আর একটি মুহূর্ত থাকতে তার মন চাইছে না। কিন্তু তার এত বড় পরাজয় বাবার বুকে কত বড় যে আঘাত করবে এই কথা ভাবতে গিয়ে তাকে বারে বারে চতুর্দ্দিকে তাকাতে হচ্ছে। তা ছাড়া সর্ব্বাঙ্গে এতখানি পরাজয়ের গ্লানি মেখে অপরের কাছেই বা সে মুখ দেখাবে কেমন করে। তার পর···তার পর কেন···সেই কথাটাই ত তাকে আজ সর্ব্বাগ্রে ভাবতে হচ্ছে। শ্রীমতী আজ আর একলা নয়। তার দেহকে আশ্রয় করে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে অতনুর সন্তান। তার ত কোন অপরাধ নেই।

শ্রীমতী বাথরুমে প্রবেশ করে বহুক্ষণ ধরে মাথায় জলের ধারা দিল। তার পর ফিরে এসে কাপড় বদলে ড্রাইভারকে ডেকে গাড়ী নিয়ে বার হয়ে পড়ল।

গাড়ীর শব্দটা অতনুর পরিচিত। সে উঠে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়াল। অদৃশ্যমান গাড়ী আর তার আরোহিনীর পানে চেয়ে চেয়ে তার দু'চোখ উত্তেজনায় জ্বলে উঠল। অতনু জানে কোথায় শ্রীমতী গেল। ডাক্তারের ওখানে আসা-যাওয়াটা কিছুদিন ধরে তার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কথাটা ডাক্তারকে জানিয়ে দেবারও সময় হয়েছে। অতনু ঘরময় পায়চারি করতে করতে ভাবছিল।

মিত্রা এসে ঘরে প্রবেশ করল।

অতনু দেখেও দেখল না।

মিত্রা চলে যাবার উদ্যোগ করতেই অতনু ডাকল, কতক্ষণ এসেছ?

এই মাত্র, মিত্রা জবাব দিল।

যাচ্ছ কেন? বস। অতনু বলল, এবং নিজেও একটি সোফায় দেহ এলিয়ে দিল।

মিত্রা নিঃশব্দে তার পাশের সোফায় উপবেশন করতেই অতনু সরাসরি বলল, তোমার বুদ্ধি আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তির উপর আমার আস্থা আছে মিত্রা।

মিত্রা বলল, আপনি বোধ হয় ঠাট্টা করছেন···

অতনুর কণ্ঠস্বরে পরিবর্ত্তন দেখা দিল! সে বলল, তোমার সঙ্গে আমার ঠাট্টার সম্বন্ধ নয় মিত্রা। তা ছাড়া অকারণে ঠাট্টা করাটা আমি পছন্দ করি না।

নিরীহ কণ্ঠে মিত্রা জবাব দিল, আমার বুঝতে ভুল হয়েছে—

অতনু বলল, ডানকান-আগরওয়ালা-চক্র পূর্ণবেগে ঘুরতে সুরু করেছে মিত্রা। আমি তাদের চিরদিনের জন্ত থামিয়ে দিতে চাই।

মিত্রা বলল, চক্র যে সত্যিসত্যিই ঘুরতে সুরু করেছে তা আপনাকে কে বললে? আর যদি ঘুরতেও থাকে তাতেই বা ভয় পাবার কি আছে?

ভয়···অতনু যেন গর্জ্জন করে উঠল।

মিত্রা একটু হেসে জবাব দিল, হ্যাঁ ভয়—নইলে আপনি এতটা উত্তেজিত হয়ে উঠতেন না। আপনি রাগ করবেন না—সত্যি-সত্যিই আপনি এত ভয় পেয়েছেন যে, কারুর ভাল কথাও আর ভাল মনে নিতে পারছেন না। আমার কথা ছেড়ে দিন—বাইরের লোক, আপনার একজন সাধারণ কর্ম্মচারী, কিন্তু আপনি আপনার স্ত্রীকেও অকারণে না হোক দশ কথা শুনিয়ে দিয়েছেন।

খানিক চুপ করে থেকে অতনু বলল, স্ত্রীর কথা থাক। তোমার কথা বল। আমি শুনব।

মিত্রার মুখে একটুখানি হাসি দেখা দিল। বলল, আমিও যদি আপনার স্ত্রীর কথা ক'টিই আবার নতুন করে বলি তা হলে কি তা আপনার ভাল লাগবে? তিনি ত কিছু অন্যায় বলেন নি।

অতনু পুনরায় উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল, ন্যায়-অন্যায়ের কথা নয় মিত্রা। কিন্তু এইসব বস্তা-পচা অতি সাধারণ উপদেশ-গুলো শুনতে আমার ভাল লাগে না। নতুন কিছু শোনাতে পার? নতুন কোন পথের সন্ধান দিতে পার তুমি? যাতে করে সবদিকে

একটা সামঞ্জস্য থাকে? তোমার প্রচুর বুদ্ধি আছে, শক্তি আছে, সেই সঙ্গে আছে সজাগ দৃষ্টি। একদিন তুমি আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছ মিত্রা। সেইজন্যই তোমাকে এতকথা বলছি। যদি গ্রহণযোগ্য কোন পথ তোমার জানা থাকে আমাকে দেখিয়ে দাও।

মিত্রা শান্ত গলায় বলল, গ্রহণযোগ্য কিনা সেটা বিচার করে দেখবে কে অতনুবাবু? আপনি নিজে ত? আমার মুস্কিল ত সেইখানে। আপনার মনের মত করে বলতে না পারলেই রাগ করবেন। তার চেয়ে আপনার পথ আপনিই দেখে নিন।

অতনু বলল, তোমার বক্তব্যটা কি মিত্রা?

খুব সহজ অতনুবাবু। মিত্রা গম্ভীর কণ্ঠে বলতে থাকে, আপনার স্ত্রীর যুক্তি আর অনুবোধকে যে ভাবে উপহাস আর অসম্মান দেখিয়ে উপেক্ষা করেছেন তার পরেও কি আপনি আশা করেন যে, আমার মত একজন নগণ্য কর্মচারী আপনাকে কোন যুক্তি-পরামর্শ দিতে পারে?

অতনু মৃদু কণ্ঠে বলল, বার বার তুমি ঐ একটা কথা বলছ কেন মিত্রা? আমি ত তোমাকে ঠিক ও ভাবে দেখি না।

মিত্রা স্নিগ্ধকণ্ঠে বলল, সেটা আপনার অনুগ্রহ। আজ দয়া করে মূল্য দিতেও পারেন, কাল ইচ্ছে করলে বাইরে ছুড়ে ফেলে দিতেও পারেন। আমার কাছে এ অনুগ্রহের যথার্থ কোন মূল্য নেই অতনুবাবু।

অতনু খানিক স্থির দৃষ্টিতে মিত্রার মুখের পানে চেয়ে থেকে মৃদু কণ্ঠে বলে, আমি তোমার বন্ধুত্বের দাবি করছি।

মিত্রা বলে, প্রভু-ভৃত্যের মধ্যে বন্ধুত্ব হয় না অতনুবাবু। মাঝে একটা বস্তবড় ফাঁক থেকে যায়। তা ছাড়া কেমন করে আপনার একথা আমি বিশ্বাস করতে পারি? যে লোক স্ত্রীর বন্ধুত্বকে সহজ মনে মেনে নিতে পারে না, তাঁর মুখে একথা সত্যিই কি পরিহাসের মত শোনায় না?

অতনু বলে, আমাদের মধ্যের প্রত্যেকটি কথাই তুমি শুনেছ দেখছি।

মিত্রা জবাব দিল, আমার দুর্ভাগ্য, আপনার প্রত্যেকটি কথাই আমার কানে গেছে।

অতনু বলল, কথাগুলি অপরের শেখান বুলি—শ্রীমতী স্রেফ মুখস্ত বলে গেছে।

মিত্রা বলল, তাতেই বা ক্ষতি কি? ভাল ভাল কথা জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা শিখি না অতনুবাবু—মেহনৎ করে শিখতে হয়।

অতনু উষ্ণ হয়ে উঠেও সামলে নিয়ে বলল, তোমাদের সকলেরই দেখছি এক রোগ। সুযোগ পেলেই উপদেশ দিতে সুরু কর। ওটা একটু কম করে দিলে ক্ষতি কি?

মিত্রা বিন্দুমাত্র না দমে সহজ কণ্ঠেই জবাব দিল, আপনি যা খুশী বলতে পারেন, কিন্তু যারা আপনার যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী তারা সব সময় এ কথা বলবে। আপনার স্ত্রী এবং ডাক্তারবাবু—

বাধা দিয়ে অতনু বলল, তাদের কথা আমি জানিনে মিত্রা, কিন্তু তোমার সত্যিকার পরিচয় আমি পেয়েছি বলেই তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি।

মিত্রা মৃদু হেসে বলল, আপনার কি কখনও ভুল হতে পারে না? আপনি অত্যন্ত বাড়িয়ে বলে আমাকে সঙ্কোচের মধ্যে ফেলছেন। তা ছাড়া এতবড় একটা সমস্যাপূর্ণ জটিল প্রশ্নের মীমাংসা এত সহজে হয় না অতনুবাবু।

অতনু বলল, শ্রীমতী কিন্তু কিছু না ভেবেই উপদেশ দিতে এগিয়ে এসেছিল মিত্রা।

মিত্রা বলল, তাঁরা হয়ত অনেক আগেই ভেবে রেখেছিলেন। আমাকে আপনি মাপ করুন। এ নিয়ে অনর্থক আমাকে প্রশ্ন না করে নিজেই ভেবে-চিন্তে একটা পথ আবিষ্কার করে নিন। সেইটেই হয়ত সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সমাধান হবে। তবে আমাদের যুক্তিগুলোকে নিছক কুযুক্তি ভেবে অন্যায় ভাবে বাতিল করে দেবেন না যেন।

বলেই কতকটা খাপছাড়া ভাবে ঘর থেকে বার হয়ে গেল।

অতনু বিস্মিত ভাবে তার চলার পথে নিঃশব্দে চেয়ে রইল।

১৯

আশ্চর্য্য! মিত্রা তার নিজের ব্যবহারে সবচেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। এমনটি কেমন করে সম্ভব হ'ল তা সে নিজেও সঠিক ভেবে পেল না। যে কথাগুলি কথাপ্রসঙ্গে সে অতনুকে বলে এল এইটেই কি তার মনের কথা? এ কথা সে বলতে চায় নি। কেউ যেন তাকে দিয়ে জোর করে বলিয়ে নিয়েছে। এ পথ তার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথ নয়। মিত্রা কি করতে চেয়েছিল আর কি সে করতে বসেছে।

আগরওয়ালা আর ডানকান তার দেহটাকে অপবিত্র করেছে। এই মূল্য দিয়েই তাকে মুক্তি ক্রয় করতে হয়েছিল। অতনু তার সর্ব্বনাশ করতে গিয়েও করে নি। ওদের হাতে ফেলে রেখে নিজে সরে গিয়েছিল। আর ঐ দুই নরপশু তার দেহটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে। এতবড় অন্যায়কে এক মুহূর্ত্তের জন্যও মিত্রা ভুলতে পারে নি। অতনুকেও সে একই দলভুক্ত করে বিচার করে রায় দিয়েছিল। ডানকান আর আগারওয়ালাকে আশ্রয় করেই সে ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করেছে—ফিরে আঘাত করবার প্রত্যাশায়। তার পর সময় এবং সুযোগ বুঝে আঘাত হেনেছে। রাজ-সিংহাসন থেকে একেবারে পথের ধূলায় নিক্ষেপ করেছে। কিন্তু এইখানেই মিত্রার থেমে যাবার কথা নয়। থেমে যাবার জন্য সে আরম্ভ করে নি। তার বর্ত্তমান অবস্থার জন্য যারা দায়ী তাদের একে একে চূর্ণ করবার প্রতিজ্ঞা নিয়েই মিত্রা এই-সিংহগহ্বরে প্রবেশ করেছিল। অতনুকেও সে ঘৃণা করে—সেই সঙ্গে

কিছুটা ভয় এবং শ্রদ্ধাও করে। তার অপরাধটাকে কিছুটা লঘু করে দেখবার চেষ্টাও সে করে। কিন্তু ডানকান আর আগর-ওয়ালাকে শুধু ঘৃণাই করে। পেটের জ্বালায় ওদের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। খুবলে খুবলে গায়ের মাংস তুলে নেয়। নেকড়ের মত লোভী আর শিয়ালের মত ধূর্ত ওরা। মাংসের লোভ অতনুরও আছে। কিন্তু সে লোভের মধ্যেও একটা রাজকীয় আভিজাত্য আছে। ক্ষুধা আছে হ্যাংলামী নেই। যে শিকার একবারে ধরতে পারে না তাঁর পিছু নেওয়ার প্রলোভন তার নেই। কথাটা যতই দিন যাচ্ছে, মিত্রা ততই অনুভব করতে পারছে। তাই আঘাত করবার সুযোগ পেয়েও সে নিজেকে সংযত রেখেছে। এই সামান্য ক'টা মাসের সান্নিধ্য মিত্রাকে ভিতরে ভিতরে অনেকখানি দুর্ব্বল করে ফেলেছে। আর এই দুর্ব্বলতার মধ্যে যে একটা প্রচ্ছন্ন আনন্দ লুকিয়ে আছে এ কথাটাও আজ আর অস্বীকার করবার উপায় নেই।

এতদিন মিত্রার মধ্যে যুক্তি-বিচারের স্থান ছিল.না। শুধু একদিকে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে চলেছিল, কিন্তু ডানকান আর আগর-ওয়ালা ধরাশায়ী হতে সে চলা বন্ধ করে ভাবতে সুরু করেছে এবং নিজের মনের এক আশ্চর্য্য রূপ দর্শনে স্তম্ভিত-বিস্ময়ে হতচকিত হয়ে গেছে। এমন অসম্ভব কেমন করে সম্ভব হতে পারে? অমৃত বলেই কি এতখানি বিষেও তাকে ম্লান করতে পারে নি!

মিত্রা আবার নতুন করে ভাবতে বসেছে। ভাবতে বসেছে তার ক্ষতির পরিমাণ কতখানি আর কতটুকু ক্ষতি সে তার পরিবর্ত্তে করতে পেরেছে। কতটুকু সে করতে পারত সেটা বড় কথা নয়। কতটুকু করেছে সেইটেই হিসেব সাপেক্ষ। অতনু থাবা গুটিয়ে নিয়েছিল তার অসহায় অবস্থা দেখে, কিন্তু তার পার্শ্বচর নেকড়ে দুটো সুযোগ নিয়েছিল সেই অসহায় অবস্থার। আক্রান্ত উভয় দিক থেকেই সে হয়েছিল, আর না বুঝে, মিত্রা নেকড়ের গহ্বরে গিয়ে ধরা দিল। যে সুন্দর দেহটাকে কেন্দ্র করে তার জীবনে এত বড় একটা দুর্ঘটনা দেখা দিয়েছিল তাকেই শেষ পর্য্যন্ত সে মূলধন হিসেবে বিনিয়োগ করল।

এক মুহূর্ত্তে মিত্রা বদলে গেল। তার মুখভাব বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। তার পুরানো ক্ষতস্থান থেকে আবার নতুন করে রক্ত-ক্ষরণ সুরু হয়েছে। মিত্রার স্বপ্নে-গড়া সুন্দর মন আর ফুলের মত নরম দেহটাকে নিয়ে ওরা ছিনিমিনি খেলেছে। সে তুলনায় মিত্রা ওদের কতটুকু ক্ষতি করতে পেরেছে? মিত্রা নিজেকে নিজে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রশ্ন করে। ওরা প্রয়োজন মিটিয়ে হাত জোড় করে ক্ষমা চেয়েছে। বলেছে, ওরা নাকি শুধু অতনুর ইচ্ছাকেই পূরণ করেছে। আসলে তারা আজ্ঞাবহ মাত্র।

মিত্রা ভিতরে ভিতরে গুমরে মরেছে—মুখে বোকার মত হেসেছে। প্রকাশ্যে আরও এগিয়ে গিয়ে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। ওরা ক্ষতিপূরণ করবার অছিলায় তাকে অতনুর কারখানায় নিয়ে এসে চাকরী দিয়েছে। মিত্রা কৃতজ্ঞতা জানাবার ছলে নানাভাবে তাদের প্রলুব্ধ করেছে। অন্তরঙ্গতার সুযোগ নিয়ে পরামর্শ দিয়েছে। পরামর্শ মত কাজ করতে প্রেরণা জুগিয়েছে। তার পরে সুযোগ মত সে পাশ ফিরেছে, ওরা গড়িয়ে পড়েছে।

অতনুর সঙ্গে সঙ্গোপনে দেখা করে ডানকান-আগরওয়ালার বিশ্বাসভঙ্গের দলিলপত্র তার হাতে তুলে দিয়ে এল মিত্রা। তাদের উদ্ধত ফণা আর বিষ দাঁত একটি আঘাতে চূর্ণ হয়ে গেল। এইবার অতনুর পালা। যার জন্য মিত্রাকে আরও ঢের বেশী সতর্ক হয়ে এগোতে হয়েছে। পাশের অনুচর দুটো গেছে বটে, কিন্তু তারাও যে চুপ করে নেই তা সে টের পেয়েছে। তার প্রমাণ অতনুর কারখানার বর্ত্তমান অস্থির পরিণতি। মিত্রার দাবার ঘুটি অবশ্য এখানেও অলক্ষ্যে থেকে চলাচল করছে।···

কে—মিত্রা যেন ভয় পেয়েছে এমনিভাবে আর্ত্তনাদ করে উঠল।

আমি—সাড়া দিয়ে অতনু দৃঢ় পদক্ষেপে এসে তার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, কিন্তু তুমি অমন করে চেঁচিয়ে উঠলে কেন বল ত?

মিত্রা বিব্রত কণ্ঠে বলল, আপনি এত রাত্রে আমার ঘরে···

বাধা দিয়ে শান্ত হেসে অতনু জবাব দিল, কত আর রাত হবে মিত্রা? এই ত সবে বারটা বাজল।

বা-র-টা···মিত্রার কণ্ঠে বিস্ময়, কিন্তু আপনি খুব অন্যায় কাজ করেছেন অতনুবাবু। আপনার স্ত্রীর চোখে পড়লে তিনি ভুল বুঝতে পারেন।

নির্লিপ্ত কণ্ঠে অতনু জবাব দিল, খুবই স্বাভাবিক। তবে শুনে আশ্বস্ত হতে পার তিনি এখনও ফিরে আসেন নি। আর ফিরলেও তোমার কাছে আমাকে আসতেই হ'ত।

একটু থেমে, একটু হেসে সে পুনরায় বলল, ভেবে দেখলাম শত্রুই হউক, আর মিত্রই হউক, তাকে মুখোমুখি পাওয়াই শ্রেয়। তোমার কি মত?

অতনুর কথা বলার ধরনে ভিতরে ভিতরে মিত্রা রীতিমত অস্বস্তি বোধ করলেও প্রকাশ্যে যথাসম্ভব সংযম রক্ষা করে সে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, ঠিক কথাই বলেছেন অতনুবাবু। তাতে সহজ জিনিস অকারণে ঘোরালো হয়ে উঠতে পারে না।

অতনু হো হো করে হেসে উঠে বলল, আমার মনের কথা বলেছ তুমি। কথাটা বুঝতে পেরে আর এক মুহূর্ত্ত দেরী করি নি। খোলাখুলি তোমাকে বলবার জন্য ছুটে এসেছি।

মিত্রা বিস্ময়ের ভান করে বলল, এত লোক থাকতে এ কথা আমাকে বলবার জন্য কেন ছুটে এসেছেন ঠিক বুঝলাম না অতনুবাবু!

বিচিত্র ধরনের খানিকটা হাসি অতনুর মুখে ফুটে উঠল। সে সহজ কণ্ঠে বলল, বুঝতে তুমি ঠিকই পেরেছ মিত্রা। আমি আমাদের এই এতদিন ধরে অভিনয় করে যাবার কথা বলছি। এবারে ওগুলো বাদ দিয়ে চললে কেমন হয়?

আলোচনার এই আকস্মিক পটপরিবর্ত্তনে মিত্রা মুহূর্ত্তের জন্য

বিহ্বল হয়ে পড়লেও অল্পেই সামলে নিয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, কাকে আপনি অভিনয় বলছেন স্যার ?

অতনু অম্লান হেসে পুনরায় বলতে লাগল, তোমার-আমার লুকোচুরি খেলার কথা বলছি মিত্রা। তোমার একটু আগের কথাগুলোই যদি ধরা যায়—

মিত্রা ভাবলেশহীন কণ্ঠে বলল, আপনার আজ কি হয়েছে বলুন ত অতনুবাবু ? আপনি কি অসুস্থ ?

অতনু প্রশান্ত হেসে বলল, অসুস্থ—না মিত্রা, বরং আজকের মত সুস্থ এবং স্বাভাবিকভাবে এর আগে কোন দিন তোমার সঙ্গে কথা বলি নি। তুমি মিথ্যা চেষ্টা করছ। আমি বেশ বুঝতে পারছি তুমি আমার বক্তব্যটা সহজ আর খোলা মনে গ্রহণ করতে দ্বিধা করছ। এইটেই স্বাভাবিক।

একটু থেমে সে পুনরায় বলল, ভাল কথা—না হয় আর একটু খোলাখুলি ভাবেই বলছি। শোন মিত্রা, অতনু যাকে একদিন দেখেছে তাকে কোনদিন ভোলে না। তোমাকেও আমি ভুলি নি। সামান্য একটু ভুল বুঝেছিলাম। তাই সুধরে নেবার চেষ্টা করছি।

অতনুবাবু ! মিত্রা আর্তনাদ করে উঠল।

অতনু হাসিমুখে বলতে থাকে, ভয় পেও না মিত্রা। যদিও ইতিপূর্ব্বে একদিনের জন্যও তোমাকে আমি মিত্র হিসেবে দেখি নি আর সব সময়ই তুমি আমার সজাগ প্রহরাধীনে ছিলে, তবুও আমি আজ বন্ধুর মতই তোমার কাছে হাত বাড়িয়ে দিয়েছি।

একটু থেমে অতনু পুনরায় বলতে থাকে, চেয়ে চেয়ে দেখছ কি মিত্রা ? সত্যি বলছি তোমার মত আমিও তোমাকেই আমার কার্য্যোদ্ধারের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করব বলেই আমার কারখানায় প্রবেশ অধিকার দিয়েছিলাম।

মিত্রা কম্পিত কণ্ঠে বলল, আপনার এসব কথার অর্থ ?

অতনু স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট। তুমি কুটনীতির সাহায্যে দুর্জ্জনকে সায়েস্তা করবার ব্রত নিয়েছিলে। আর আমি তোমার সাহায্যে নিজের পথ পরিষ্কার করেছি। ডানকান আগারওয়ালার ওপর আমারও নজর ছিল। ছিল না প্রামাণ্য দলিলপত্র।

এর পরে আর গোপন করবার কিছু অবশিষ্ট থাকে না। সত্যের মুখোমুখি সোজা হয়ে মিত্রা দাঁড়াল। দৃঢ় কণ্ঠে বলল, সেটা কি খুব অন্যায় করেছি অতনুবাবু ?

অতনু সহজ কণ্ঠে বলল, ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করবার ইচ্ছে আর আমার নেই মিত্রা। আমি শুধু বলতে চাই যে, একই অস্ত্রে সকল শ্রেণীর পশুকে বলি দেওয়া যায় না। অস্ত্রের ধার এবং ভার দুই পরীক্ষা করে নিতে হয়। সেইখানেই তোমার ভুল হয়ে গেছে।

সহসা মিত্রা যেন কেঁপে উঠল, এ ভাবে অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার অভ্যাসটা আপনি ছাড়ুন অতনু বাবু।

অতনু বলল, কিন্তু ঢিলটা যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয় তা হলে অন্ততঃ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় নি এ কথা নিশ্চয় স্বীকার করবে মিত্রা।

মিত্রা নিরীহ কণ্ঠে জবাব দিল, অভিনয় করতে আপনি নিষেধ করেছেন, আবার আপনিই নির্ব্বিবাদে অভিনয় করে চলেছেন।

অতনু হাসিমুখে বলল, তোমার কি সত্যিই তাই মনে হচ্ছে মিত্রা ?

মিত্রা প্রতিবাদের সুরে জবাব দিল, মনে হচ্ছে না অতনুবাবু—যা সত্যি, সেই কথাই আপনাকে জানিয়েছি।

অতনু অম্লান কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাল। তোমার কথা যে কত বড় মিথ্যে তা আমার চেয়েও তুমি বেশী জান। তোমার দোষ নেই মিত্রা। আমি হলেও তোমার পথেই চলতাম। কিন্তু আরম্ভ করতে পারাটা যত সোজা, থামতে পারাটা তত সোজা নয়। তুমি হঠাৎ মাঝপথে থেমেছো—বার বার পিছন ফিরেও তাকাচ্ছ। আশেপাশের চেহারা দেখে কতকটা দিশেহারা হয়ে পড়েছ। অথচ কথাটা স্বীকার করতে পারছ না। তোমার জন্য সত্যিই আমি দুঃখিত। তবে যা তুমি খুইয়েছ তা ফিরিয়ে দেবার সাধ্য আমার নেই। বড় জোর কিছুটা ক্ষতিপূরণ করতে পারি। তাই জিজ্ঞেস করেছিলাম মিত্রা, তোমার এই থেমে যাওয়াটা কি সত্যিই থামা না সাময়িক বিরতি মাত্র ?

বহুক্ষণ মিত্রা আর কথা বলল না। নিঃশব্দে নতমুখে বসে কিছু চিন্তা করে যখন সে মুখ তুলে তাকাল তখন সে মুখে ভয়-ভাবনার পরিবর্ত্তে একটা দৃঢ় সঙ্কল্পের চিহ্ন ফুটে উঠল। সে স্থির-অবচলিত কণ্ঠে বলল, আমার মুখের কথায় কি আপনি আস্থা রাখতে পারবেন অতনুবাবু ? আর আমি থামলেও আপনার পক্ষে থামা কি সম্ভব হবে ?

অতনু বলল, তোমার কথা বল মিত্রা।

বড় করুণ ভাবে একটু হেসে মিত্রা বলল, বুদ্ধির লড়াইতে আমি হেরে গেছি। তা ছাড়া আমার নিজের মনই আমাকে পদে পদে বাধা দিচ্ছে। আমার এগুবার শক্তি ত নেই-ই, পিছিয়ে যাবার ক্ষমতাও লোপ পেয়েছে। নিজের বুদ্ধির অহঙ্কার অনেক দূরে আমাকে টেনে নিয়ে গেছে অথচ ফেরার পথ আমার জানা নেই। কোন রকমে আমায় সুরুতে ফিরিয়ে আনতে পারেন অতনুবাবু ? বিশ্বাস করুন, আমি আপনাকে এক বিন্দু মিথ্যে বলছি না।

অতনু বলল, তোমার স্পষ্ট স্বীকৃতির জন্য ধন্যবাদ। সেদিনে তুমি বাঁচবার জন্য পালাতে চেয়েছিলে, কিন্তু বাঁচতে পার নি, আর আজ মরবার জন্য ফাঁদে পা দিয়েও বেঁচে গেলে মিত্রা।

মিত্রা সহজ কণ্ঠে বলল, আপনার কথাগুলো ঠিক হ'ল না। আমাদের দু'জনের বেলায়ই ওটা সমান সত্য, কিন্তু আজ আর এসব আলোচনা থাক। অনেক রাত হয়েছে। আপনি এবারে যান।

অতনু বলল, এতক্ষণ ধরে শুধু বাজে কথা বলেই গেলাম। আসল কথা এখনও যে বলাই হয় নি মিত্রা।

মিত্রা অনুনয় করে বলল, এ আলোচনা একটি রাতের জন্ত মুলতুবী রাখা কি কিছুতেই সম্ভব নয়?

অতনু বলে, আজকের প্রশ্ন কাল হয়ত সহস্র চেষ্টায়ও আর মনে আসবে না।

মিত্রা বলল, তা হলে ওটা একটা সমস্যা নয়। কিন্তু আপনি এবারে দয়া করে যান। আপনার স্ত্রী বহুক্ষণ ফিরে এসেছেন। আমাকে সম্ভ্রম দেখাতে না পারেন ক্ষতি নেই, তা বলে নিজের কথা ভেবে দেখছেন না কেন?

অতনু মৃদু কণ্ঠে বলে, যে অপরকে সম্ভ্রম দেখাতে পারে না নিজের কথা তার মনেই আসতে পারে না। তবে বলছ যখন, যাচ্ছি। প্রশ্ন কালকের জন্তই তোলা থাক।

অতনু দীর্ঘ পদে ঘর থেকে বার হয়ে গেল।

২০

মিত্রার ঘর থেকে বার হয়ে এসে আপন শয়নকক্ষের প্রবেশদ্বারে অতনুর শ্রীমতীর সঙ্গে দেখা হ'ল। শ্রীমতী তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা দেখিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাবার উপক্রম করতেই অতনু তাকে আহ্বান জানিয়ে প্রশ্ন করল, এত রাত পর্যান্ত কোথায় ছিলে দয়া করে বলবে কি? রাত এখন কটা তা জান?

শ্রীমতী কঠিন কণ্ঠে জবাব দিল, তোমার প্রথম প্রশ্নের জবাব আমি দেব না। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর, আমি জানি।

শ্রীমতীর উত্তর দেবার ধরনে অতনুর আপাদমস্তক জ্বলে উঠল। সে শ্লেষ করে বলল, এটা ভদ্রলোকের বাড়ী।

শ্রীমতী ভ্রূভঙ্গি করে জবাব দিল, খুব আশ্চর্য্য কথা ত!

অতনু চীৎকার করে উঠল, তোমার সাহস দেখছি দিন দিন সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তুমি এত বড় কথা বলতে পার···

বাধা দিয়ে শ্রীমতী বলল, বলবার দরকার কি যখন আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেই চুকে যায়।

অতনু অবাক-বিস্ময়ে কিছুক্ষণ শ্রীমতীর মুখের পানে এক দৃষ্টে চেয়ে থেকে কথা কটি পুনরুক্তি করল, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেই চুকে যায়···তার পরেই ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলল, কিন্তু জিজ্ঞেস করি, সুচরিতা শ্রীমতী এই রাত একটা পর্য্যন্ত কার নিকুঞ্জে কাটিয়ে এইমাত্র ফিরে এলে?

এই অশ্লিল ইঙ্গিতে শ্রীমতীর আপাদমস্তক জ্বলে উঠল। সে একবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে অতনুর পানে চেয়ে দেখে অবজ্ঞাভরে পিছন ফিরে দাঁড়াল। কোন জবাব দেবার প্রবৃত্তি তার হ'ল না। রাগে ক্ষোভে অপমানে সে তখন কাঁপছিল।

অতনু পুনরায় গর্জ্জে উঠল, পিছন ফিরে দাঁড়ালেই ভেবেছ তুমি রেহাই পাবে? তা হলে আজও অতনুকে চেন নি?

শ্রীমতী তেমনি নীরব।

অতনু কুশ্রী ভাবে হেসে বলল, আজ এই মুহূর্ত্ত থেকে এ বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙান তোমার কাছে নিষিদ্ধ হ'ল। আর সেই সঙ্গে ডাক্তার সাহেবের অন্নও উঠল।

শ্রীমতী পুনরায় ফিরে দাঁড়াল। দৃপ্ত কণ্ঠে বলল, তোমার আর কিছু বলবার আছে কি? এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রলাপ শুনবার মত আমার সময় নেই।

অতনু ব্যঙ্গ করে বলল, অনেক দিন ধরেই তোমার সময়ের অকুলান হচ্ছে, তাই এখন থেকে যাতে প্রচুর সময় পাও তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

বলেই অতনু টেলিফোনটা তুলে নিয়ে ডায়েল ঘোরাতে সুরু করল।

শ্রীমতীর সারা মুখে কালি ঢেলে দিল। অতনু বলছিল, হ্যাঁ আপনাকেই আমার দরকার ডাক্তারবাবু। কাল থেকে আপনাকে আর দরকার নেই, আমার লিখিত চিঠি এবং আপনার প্রাপ্য কালই পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

সশব্দে টেলিফোনটা রেখে দিয়ে অতনু সোজা হয়ে দাঁড়াল।

শ্রীমতী অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে উঠল। অপরিসীম ব্যথায় আর লজ্জায় সে একেবারে মুয়ে পড়ল।

অতনু হিংস্র উল্লাসে হেসে উঠে বলল, আমার কথায় আর কাজে কোন তফাৎ নেই, বুঝলে?

শ্রীমতী ফেটে পড়ল, অর্থাৎ—

অতনু কটু কণ্ঠে বলল, সেটা কাল সকাল থেকেই জানতে পারবে। তবুও শুনে রাখ—ঘরের বাইরে পা বাড়াবার চেষ্টা কর না। বাধা পাবে। আর সেটা কোন তরফেরই সম্মানের হবে না।

শ্রীমতীর মুখে একটুখানি হাসি ফুটে উঠল। সে অবজ্ঞাভরে বলল, হুকুম তুমি একটা কেন একশ'টা দিয়ে রাখতে পার, কিন্তু সে হুকুম মেনে চলা না চলা সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছে, এ কথাটাও জেনে রাখ।

বলেই আর উত্তরের অপেক্ষা না করে সে নিজের ঘরে প্রবেশ করে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল।

মিত্রার ঘরের দরজার পাল্লা দুটাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বুজে গেল।

অতনু পাগলের মত খানিক একলা একলা হাসতে থাকে। তার পর এক সময় নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করে তার পাইপে অগ্নি সংযোগ করে উপর্যুপরি ধূম উদ্গীরণ করতে লাগল। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঘরটা আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। ঐ ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে অতনু নিজেকে এক নতুন মূর্ত্তিতে দেখতে পেল। এ তার আর এক রূপ। অপরিসীম ক্লান্তিতে সে যেন ভেঙে পড়েছে। মুখের হাসিটাও অত্যন্ত বিষণ্ণ। এত দুর্ব্বলচিত্ত অতনু কোন দিন ছিল না। অতনু আশ্চর্য্য হয়ে ভাবছে—এ তার উত্থান না পতন।

নিঃশব্দ চিন্তার অবকাশে ধূম্রজাল অপসারিত হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে তার মুয়ে-পড়া মনটাও অনেকখানি সজাগ হয়ে উঠেছে।

নিজের চেতনাকে ধাক্কা দিয়ে অতনু জাগিয়ে তুলল। দেয়াল-আলমারীর একটা গোপন অংশ থেকে সে হুইস্কির বোতল বার করল। ভেঙে পড়লে তার চলবে না। তাকে আরও দৃঢ়চিত্ত হতে হবে। আরও ঢের বেশী দৃঢ়! ঘরে বাইরে নিজেকে সে হাস্যাস্পদ করে তুলতে পারবে না।

খানিকটা নির্জ্জলা হুইস্কি অতনু গলায় ঢেলে দিল। তার রক্তের মধ্যে একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেল।

একবার সে শ্রীমতীর রুদ্ধ দ্বারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে এই মুহূর্ত্তে শ্রীমতী কি করছে তার ঘরের মধ্যে বসে। কিন্তু কিছুই বোঝার উপায় নেই। অতনু পুনরায় খানিকটা হুইস্কি তার গলায় ঢেলে দিল। নিজেকে সে কিছুতেই আয়ত্তে আনতে পারছে না। ঘুরে ফিরে শুধু একটা কথাই বারে বারে তার মনে হচ্ছে। কাজটা হয় ত সে ভাল করে নি। বড্ড বেশী এগিয়ে গেছে সে। এবং সম্ভবত নিতান্ত অকারণে।

অতনু পুনরায় হুইস্কির বোতলটা তুলে নিল।

আর পাশের ঘরে শ্রীমতী তখন তার দু'হাতের মধ্যে নিজের মাথাটা চেপে ধরে চুপ করে বসে আছে। তার মনের মধ্যে ক্ষণ-পূর্ব্বের ঘটনাগুলি একের পর এক আনাগোনা করছে। কিন্তু কোন চাঞ্চল্য নেই। নিজেকে এই অল্প সময়ের মধ্যেই সে সামলে নিয়েছে। তার ভবিষ্যৎ-কর্ম্মপন্থাও স্থির করে ফেলেছে। এমনি এক চঞ্চল প্রকৃতির উচ্ছৃঙ্খল লোকের সঙ্গে ঘর-করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। মনকে গলা টিপে মেরে দেহের প্রয়োজন মেটাতে সে পারবে না। এখানকার সোনার খাঁচার মোহ আর তার নেই। সে মুক্তি চায়। অতনুর সন্তানকে শ্রীমতী গর্ভে ধারণ করেছে—তার দেহের রক্তমাংস দিয়ে তাকে পালন করে ভূমিষ্ঠ হবার সুযোগ তাকে দিতেই হবে। তার পর···হাঁ। তার পর না হয় ভেবে দেখবে—না হয় সন্তানের দাবীও সে ছেড়ে দেবে।···

অতনু সত্যই কৃপার পাত্র। নইলে তাকে উপলক্ষ্য করে ডাক্তারবাবুর মত একজন যথার্থ শুভানুধ্যায়ীর সঙ্গে এমন অভদ্রোচিত ব্যবহার করতে তার আটকাত। যে লোক তার ভবিষ্যৎ মঙ্গল চিন্তায় অধীর হয়ে শ্রীমতীকে ডেকে পাঠিয়ে এতক্ষণ ধরে নানা জল্পনা-কল্পনা করে স্থিরলক্ষ্যে পৌঁছিলেন তাঁকেই কিনা···শ্রীমতী আর ভাবতে পারে না। ভাবতে সে চায় না। শুধু দুঃখে আর লজ্জায় সে মরমে মরে গেল।

শ্রীমতী একটি অ্যাটাচি কেসের মধ্যে তার বাবার দেওয়া সোনার গহনা কখানি ভরে রাখল। সেই সঙ্গে কিছু নগদ টাকা নিতেও সে ভুল করল না। যদিও টাকাটা নেবার আগে সে বার বার ইতস্ততঃ করেছে। কিন্তু অতনুর সন্তানের জন্ত যে গুরুদায়িত্ব তাকে পালন করতে হবে তার জন্ত টাকার প্রয়োজন হবে। সুতরাং টাকা তাকে নিতেই হ'ল এবং কিছু বেশী পরিমাণেই নিল। অবশ্য এ টাকাটা অতনুর তহবিল থেকে তাকে নিতে হয় নি। তাকেই উপহার দেওয়া হয়েছিল আর শ্রীমতী খরচ না করে তা তুলে রেখে ছিল।

এ নিয়ে অতনু বহুবার তাকে ঠাট্টা করেছে। বলেছে, জমিয়ে রাখাটাই বড় কথা নয়, ব্যয় করতেও জানতে হয় শ্রীমতী। নইলে টাকার কোন দাম থাকে না।

কথাটা মেনে নিয়ে শ্রীমতী সেদিন হাসিমুখে জবাব দিয়েছিল, খুব সত্যিকথা বলেছ। গরীবের মেয়ে কিনা, তাই অকারণে খরচ করতে পারি না। আজ কিন্তু তার প্রয়োজনের কথাটা ভাবতে হচ্ছে। সুতরাং টাকাটা তাকে নিতে হ'ল।

কত বড় নির্লজ্জ! রাত দুপুরে মিত্রার ঘর থেকে বার হয়ে এসে তার কাছে কৈফিয়ৎ চায় দেখো করে ফিরে আসবার জন্ত। অবাধ্য ঘোড়াকে তিনি নাকি চাবুক মেরে সায়েস্তা করেন। মানুষ যে ঘোড়া নয় এ কথাটা ভাববার মত ঔদার্য্য তার নেই। ঠাকুর-দাদার ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি ছিল, তাই সময় মত জমিদারী বিক্রি করে নগদ টাকা রেখে গিয়েছিলেন। জমিদার হলেন শিল্পপতি কিন্তু সাবেক দিনের তোগলকি মেজাজ সঙ্গে করেই নিয়ে এলেন। অভ্যাস ত্যাগ করা সম্ভব হ'ল না। তাই পদে পদে এত মতবিরোধ আর গোলযোগের সৃষ্টি। তার উপর আবার শত্রুপক্ষ অদৃশ্য থেকে ঘুটি, চালছে।

শ্রীমতীর সখেদ অনুযোগের উত্তরে ডাক্তারবাবু কথাকটি তাকে বলেছেন। উত্তেজিত না হতে উপদেশ দিয়েছেন—অতনুর শুভাশুভ নিয়ে গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। ডাক্তারবাবু ওকে প্রাণপণে আগলে রাখতে চান। এই বিস্ময়কর আসক্তির পরিচয় শ্রীমতী তার বহু কাজের এবং ব্যবহারের মধ্যে প্রকাশ পেতে দেখেছে। অবাক হয়েছে কিন্তু কোথায় যে এর প্রকৃত রহস্য তার সন্ধান আজও পায় নি।

আগামী প্রভাতের পূর্ব্বেই তাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। যাবার পূর্ব্বে একবার ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করবার কথাটা মনে এল। শুধু একটিবার তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নেবার জন্ত। কিন্তু দেখা করতে গেলে তার আর এখান থেকে চলে যাওয়া হবে না। তিনি বাধা দেবেন। শুধু বাধাই দেবেন না, পথ আগলে দাঁড়াবেন। কথাটা শ্রীমতী স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে।

শ্রীমতী উঠে গিয়ে খোলা জানালার কাছে দাঁড়াল। চাপ চাপ অন্ধকার যেন বাড়ীখানাকে ঢেকে রেখেছে। কৃষ্ণ পক্ষ। এই নিরেট অন্ধকারের সীমাহীন সমুদ্রের পানে সে তার দৃষ্টি মেলে ধরল। কোথাও কি এক বিন্দু আলো চোখে পড়ছে। তার মনের সঙ্গে বাইরের প্রকৃতির একটা অবিশ্বাস্য মিল রয়েছে। অন্ধকার আর অন্ধকার! দুর্ব্বিসহ!

শ্রীমতীর বাবা হয়ত এই কারণেই ভয় পেয়েছিলেন। দ্বিধা-গ্রস্ত হয়েছিলেন। পিছিয়ে যাবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন।

নিজের আন্তরিক বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি শ্রীমতীর মুখ থেকে শুনবার জন্য আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীমতী পারে নি। যার উৎফুল্ল একাগ্রতা আর নিজের ভবিষ্যৎ-জীবনের উজ্জ্বল ছবি তার মনেও রং ধরিয়েছিল। তার উপর শ্রীমতীর বিবাহ নিয়ে তার মা এবং বাবার মতান্তর এমন এক পর্য্যায় এসে উপস্থিত হয়েছিল যার জন্য মাকে মেনে নিয়ে বাবাকে সঙ্কটমুক্ত করা ছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না। আজ তার জীবনের এই চরম সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্ত্তে কে তাকে বুদ্ধি দেবে—কে দেবে তাকে সঠিক পথের সন্ধান? বাবাকে গিয়ে সে কি বলবে? মার কাছেই বা সে কি জবাবদিহি করবে…

অন্ধকার…যতদূর দৃষ্টি যায় সব অন্ধকার!

ক্রমশঃ

মৃগ

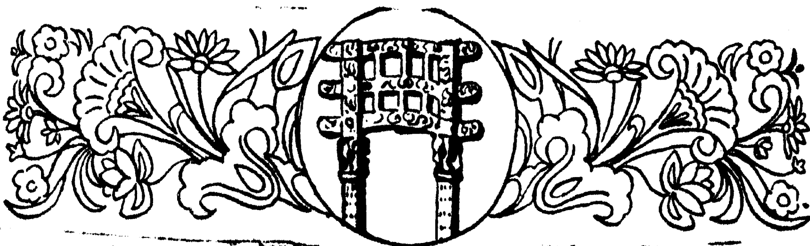
শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

কস্তুরীর তীব্র গন্ধে শিকারী আহত,
নাক দিয়ে টোসা-টোসা রক্ত ঝরে পড়ে।
বিপদ জানাতে গিয়ে চিতালের ছোট লেজ নড়ে,
জাভা ও তিব্বত-চীন-অরণ্যের টিলার উপরে
ওরা খাদ্য অন্বেষণে রত॥

শিঙ দিয়ে বরফ সরিয়ে খায়—ওরা কচি ঘাস,
তুচ্ছ করে এস্কিমো সন্ত্রাস।
চোখের পলকে ওঠে কতবার গিরির মাথায়,
মুহূর্ত্তে কখন নামে।—যখন আকাশ
গোধূলির মৃত্যুমেঘে লাবণ্য পাঠায়!
ল্যাব্রাডোর-আলাস্কা আর ল্যাপ্ল্যাণ্ড অঞ্চলে
কখনো 'হাঙ্গুল' বা 'কেরিবো'ও ওরা।
সোনালী বাদামী আর ডোরা।
সাইবেরিয়ার বনে-বনে চলে॥

তিন মণ ওজন, আর শাখা-প্রশাখায়
ওদের শিঙের রঙ কখনো বদলায়।
পুরুষের গলদেশে মাংসপিণ্ড ঝোলে,
ক্ষুরে-ক্ষুরে আর্ত্তনাদ পাহাড়ে-জঙ্গলে—
শিকারীর আগ্নেয়াস্ত্র অনিবার্য্য হলে!

কস্তুরীর গন্ধে হ'ল এ-বাতাস ভারী।
মৃগচর্ম্মে হবে জুতা, পবিত্র আসন।
মাথার খুলিটা হবে এ-ড্রয়িংরুমের ভূষণ,
শিঙ দিয়ে গড়া হবে সেতারের শৌখিন সোয়ারী॥



একাঙ্কিকা

শ্রীবিকাশকান্তি রায় চৌধুরী

"কাব্যেষু নাটকং রম্যম্।" নাটক দৃশ্য ও শ্রব্য কাব্যের একাঙ্গীভূত সমন্বয়। তাই কাব্যের এই রমণীয় রূপ-সৃষ্টি বড় কঠিন শিল্পকর্ম। গতিশীল মানবজীবনের কোন একটি স্থিতিমান কাব্য মুহূর্ত্তের প্রতিচ্ছবি চোখের সম্মুখে মূর্ত্ত হয়ে উঠবে। বিভিন্ন রুচি সামাজিকের দশ ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হবে—তবেই নাটক সফল সৃষ্টি। নাটক তার আপন প্রাণধর্ম্মে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। মঞ্চে সেই সাহিত্যের বিকাশ। অভিনয় নৈপুণ্যে নাটকের নগ্ন কঙ্কালে প্রাণ সঞ্চার করবেন শিল্পী, কাহিনীকে রূপ দেবে সে বাস্তবের, নিরাভরণকে রূপ-ঐশ্বর্য্যের। নাটকের কাব্য-প্রেরণা কবিকর্ম্ম বটে, কিন্তু নাটক একক সৃষ্টি নয়, যৌথ শিল্প। অর্থাৎ সাহিত্য বিচারে নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব নয়, তার সার্থকতা মঞ্চ পাদপ্রদীপের আলোকে আপন রূপের মাধুরী বিকাশে, তার বৈচিত্র্যময় আঙ্গিকে এবং রূপকলায়। নাট্যকার, মঞ্চ ও অভিনয়-শিল্প স্রষ্টা এই তিনের সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্মেলনে। কেন না নাটক মূলতঃ দৃশ্যকাব্য। এলিজাবেথ ড্রু নাটকের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করেছেন সুন্দর কয়টি কথায়।

"Drama is the Creation and Representation of Life in terms of Theatre."

নাট্যকার ভাবকে প্রাণ দেয়, অভিনেতা সেই প্রাণময় ভাবকে রূপ দেয়, রঙ্গমঞ্চ সেই রূপের লীলাভূমি আর সামাজিকগণ সেই লীলাবৈচিত্র্যের দ্রষ্টা। এখন ভাবময় সত্তাকে যিনি প্রাণময় প্রত্যক্ষে রূপান্তরিত করেন তিনি এই যৌথ শিল্পের মূল এবং প্রধান অংশীদার। তিনি সাহিত্য-স্রষ্টা। নাটকের সাহিত্য-সৃষ্টি ও রচনাশৈলীর উৎকর্ষ বিশ্লেষণ করে মোটামুটি একটি ছক বাঁধা হয়েছে পাঁচটি ভাগ নিয়ে। এই পাঁচটি পর্য্যায় হচ্ছে, ১। নাটকীয় আখ্যান বা Plot ; ২। ঘটনা পারম্পর্য্য বা Action ; ৩। চরিত্র-সৃষ্টি বা Characterisation ; ৪। সংলাপ বা Dialogue এবং ৫। পরিবেশসৃষ্টি বা Local Colour.

আখ্যানভাগের ঘটনাপ্রবাহ ঠিক অমনি পাঁচটি অনুশাসনে শাসিত। অনুশাসনগুলি আবার পর্য্যায়ক্রমে নাটকের কাঠামোতে সাজানো থাকে। (১) প্রারম্ভ Exposition ; (২) প্রবাহ Growth of action ; (৩) উৎকর্ষ Climax ; (৪) গ্রন্থি-মোচন Falling action এবং (৫) শেষ পর্য্যায়ে পরিণতি বা Catastrophe.

প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় নাটকে এই ক্রমপর্য্যায়ের অনুশাসন মতে নাটকের কাঠামোতে সুনির্দ্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট ভাবে অঙ্ক সমাবেশ ছিল। বর্ত্তমান শতাব্দীতে পর্য্যায়ক্রম বজায় রেখে প্রথমে পাঁচ অঙ্কের নাটক পেশাদার রঙ্গমঞ্চে প্রবর্ত্তিত হ'ল। শেষ পর্য্যন্ত তিন অঙ্কের নাটকেই পর্য্যায়ক্রম কৌশল বহাল করা হয়েছে পেশাদার রঙ্গমঞ্চের চাহিদা মেটাতে।

এ যুগের মানুষ কিন্তু পূর্ণাবৃত্ত জীবনের প্রতিবিম্ব পূর্ণস্ফুট করার চাইতে খণ্ডিত জীবনের কোন একটি বিশেষ নাটকীয়তা নিয়েই নিজের রসবোধকে পরিতৃপ্ত করতে পারলেই খুসী। জীবনের কোন একটি একক সমস্যা আর সেই বিশেষ সমস্যাটির গ্রন্থি মোচনের একটা ইঙ্গিত—এইটুকুই তার ঈপ্সিত। পেশাদার রঙ্গমঞ্চ নিরপেক্ষ তাই একটা অতি আধুনিক প্রচেষ্টা চলেছে একাঙ্কিকা সৃষ্টি আর তার রূপের পুরোদস্তুর অনুশীলনের জন্যে।

পাঁচ অঙ্ক বা তিন অঙ্কের পূর্ণবৃত্ত নাটকের সঙ্গে একাঙ্কিকার প্রভেদ শুধু আকারগত এমন কথা ঠিক নয়। উভয়ের পার্থক্য আকারে নয় শুধু প্রকারে, প্রকৃতিতে এবং গঠনরীতিতে। একাঙ্কিকা তিন অঙ্কের পূর্ণবৃত্ত নাটকের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ নয়, কিংবা খুসীমত একাঙ্কিকাকে বাড়িয়ে তিন অঙ্কের নাটকে রূপান্তর ঘটানও সম্ভব নয়। খণ্ডিত জীবনের কোন একটি সজ্ঘাতময় ঘটনার বিশেষ একটি আবেদন আধুনিক যুগমানসের নাট্যরস-পিপাসা চরিতার্থ করবার পক্ষে যথেষ্ট। একটিমাত্র ঘটনা একমুখী সজ্ঘাতের মাধ্যমে একটিমাত্র পরিণতি সৃষ্টি করবে। টর্চ্চলাইটের আলো যেমন তার একরোখা আলোর উজ্জ্বল ছটায় ক্ষুদ্র একটি গণ্ডীকে ভাস্বর করে তোলে একাঙ্কিকা ঠিক তেমনি তার নির্দ্দিষ্ট পরিণতির পথটুকুকে আলোকিত করে। নাটকের সুরুতেই সামাজিকগণের মনমানসে তাকে সোজাসুজি রেখাপাত করতে হবে। সেখানে কোন দুর্ব্বল প্রারম্ভের (Exposition) স্থান নেই, অকারণ সংলাপের অবকাশ নেই। লক্ষ্য থাকবে অবিভাজ্য নির্দ্দিষ্ট, সেখানে দ্বিধা, সংশয় বা ভ্রান্ত পদক্ষেপের বিলাস নেই। ঘটনা বিন্যাস হবে এমন নাটকীয় যে, আপন কক্ষ থেকে বিচ্যুত হবার কোন আশঙ্কা থাকবে না। তার গতি হবে দ্রুত, তীরের ফলার মত সোজা লক্ষ্য-ভেদী গতি। একটিমাত্র বিশেষ পরিবেশ, ক্রমপ্রসারী অবিচ্ছিন্ন একটি দৃশ্য, একটিমাত্র ভাবানুভূতি, সুনির্ব্বাচিত বেগবান ঘটনার সংস্থান ও ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে একটি মাত্র চরিত্র তাকে চরম পরিণতিতে নিয়ে যাবে। পূর্ণবৃত্ত নাটকের মত শ্লথ ঘটনার বিন্যাসের দ্বারা মন্থর ক্রম পরিস্ফুটন এখানে সম্ভব নয়। যবনিকা ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাপ্রবাহ ঝাঁপিয়ে পড়বে। বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের ন্যায় আসন্ন সম্ভাবনায় কাহিনী যেন কম্পমান, নায়ক চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব বহির্দ্বন্দ্বের ঘটনাপুঞ্জ ঘনসন্নিবিষ্ট—জমাট দানাবাঁধা

মেঘের প্রবল বর্ষণের মতই। নাট্যকারকে এইটুকু সতর্ক হতে হবে যাতে পূর্ব্ব ইতিহাস বিবৃতির (Exposition) আভাস যেন পরিস্ফুট হয়, ঘটনাতরঙ্গ যেন সামাজিকগণের মনের উপর তার ক্রিয়া প্রকাশের সুযোগ পায় আর চরিত্রসৃষ্টির মূলে যেন ভাব সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়।

একাঙ্কিকার আখ্যানভাগ কখন চরিত্রে, কখনও বা একটি ভাবকল্পনায়, কখনও বা হাস্যরসাত্মক সংস্থানে আবার কখনো বা পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে রসঘন হয়ে উঠতে পারে। আখ্যানভাগের নাটকীয়তার দিক থেকে Joe Corrie-র "Hewers of coal," Norman McKinnel-এর "The Bishop's Candlestics" Galsworthy-র "The Little-man", David Scott Daniel-এর "The Queen and Mr. Shakespear", Maurice Baring-এর "The Rehearshal" চরিত্র প্রধান নাটক। বাংলাতে মন্মথ রায়ের বিদ্যুৎপর্ণার নাম করা যেতে পারে এই শ্রেণীর চরিত নাটক হিসাবে। গিরিশচন্দ্রের "বৃষকেতু" ও "প্রহ্লাদ চরিত" চরিত্র-প্রধান একাঙ্কিকা। একাঙ্কিকাতে সাধারণতঃ একটিমাত্র চরিত্রই প্রধান। সুতরাং চরিত্রচিত্রণের কলা-কৌশলের উপর একাঙ্কিকার সাফল্য পূর্ণবৃত্ত নাটকের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে নির্ভরশীল। সৃষ্ট চরিত্র বাস্তবানুগ হওয়াই উচিত। সর্ব্বগুণসমন্বিত নায়ক ও সর্ব্বদোষদুষ্ট চরিত্র অতি প্রাকৃত নাটকের (Melodrama) বস্তু। চরিত্র সৃষ্টিতে যথাসাধ্য বাস্তবতা ও মানবোচিত ভাব রক্ষা করাই সর্ব্বতোভাবে অভিপ্রেত। John Hampden এই সম্পর্কে নাট্যকারকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, নাটকের অস্বাভাবিক নায়ককে আমেরিকান ফিল্ম বা Blood and Thunder Stories-এর জন্যে ছেড়ে দাও। "Make your hero a human being in whom the audience will be interested."

সংলাপেই চরিত্রের প্রকাশ। Sygne-এর মতে 'In a good play every speech should be as fully flavoured as a nut or apple and such speeches cannot be written by anyone who works among people who have shut their lips on poetry."

Synge-এর "Riders to the Sea" বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত শ্রেষ্ঠ একাঙ্কিকা। এই নাটকে নাট্যকার তাঁর সংলাপের ভাষা সংগ্রহ করেছেন সমুদ্র উপকূলের জেলে অথবা ডাবলিনের ভিখারিণীর গাথা থেকে। নীরস গদ্যকে নাট্যকার তাঁর আপন প্রতিভায় রূপান্তরিত করেছেন কাব্যময় গদ্যে। ভাবের অনবদ্য বাহন হয়ে উঠেছে তাঁর ভাষা। পরিবেশ কল্পনায় কাহিনীর বৈচিত্র্যে এবং কুশলতায়, চরিত্ররূপায়ণের স্বচ্ছন্দতায় কিংবা জীবনের ভাবদ্বন্দ্বের বৈচিত্র্যে "Riders to the Sea" আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। Frank Veran সংলাপের যাদুকেই স্বীকার করে বলেছেন যে, "The primary magic of the theatre is the spoken word." তবুও সংলাপ সম্পর্কে নাট্যকারকে এ কথা মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন আছে যে, সংলাপ চরিত্রবিকাশের শ্রেষ্ঠতম সহায় বটে, তবে সংলাপের মাধ্যমে চরিত্র বিশেষ পরিস্ফুট করে নাটক সৃষ্টি করা যায় না। সংলাপের মধ্য দিয়ে ঘটমান চরিত্রবিকাশই নাটকের নির্দ্দেশ।

পরিবেশ সৃষ্টিও (Local Colour) নাটকের শিল্পকর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ স্তরে উন্নীত করতে পারে। তার প্রমাণ আছে W. W. Jacols এর "The Monkey's Paw" নাটকে। Sergent Major-এর চরিত্রে অতিলৌকিক পরিবেশের শিহরণ এমনি ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যে, তাতে নাটকের গতি ব্যাহত হওয়া ত দূরের কথা বরং রসঘন ভাবটি যেন উপচে উঠেছে। Lady Gregory-র "The Rising of the Moon" অবিশ্যি চরিত-প্রধান নাটক, কিন্তু পরিবেশ সৃষ্টির কুশলতায় নাটকের প্রাণ নিহিত রয়েছে একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

আবার সামাজিক বা চরিত্রগত অসঙ্গতিকে মৃদুবিদ্রূপ বা লাঞ্ছনার দ্বারা হাস্যরসাত্মক সংস্থান সৃষ্টিতে Milne-এর "The Boy comes Home" অনবদ্য নাটকীয় শ্রী লাভ করেছে।

একাঙ্কিকা নাটক ত বটে। তাই নাটক রচনার প্রচলিত ছকের বাহিরে সে পা দেয় নি। সেই পূর্ব্বাভাষ বিবৃতি—Galsworthy-র "The Little man," Clifford Bax এর "The Poetasters" নাটকের পূর্ব্বাভাষের অংশটি একাঙ্কিকার ধরনটিকে ভারী চমৎকার ভাবে পরিস্ফুট করেছে।

পূর্ব্বাভাষ বা পূর্ব্ব ইতিহাস বিবৃতির কৌশলটি এখানে এত স্বাভাবিক অথচ এমন চাতুর্য্যপূর্ণ যে যবনিকা সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সামাজিকগণের মন থেকে অজ্ঞতাও দূর হয়। একাঙ্কিকা স্বল্প পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলেই ঘটনার প্রবাহ বা growth of action-এর অবকাশ কম। Exposition এবং growth of action অর্থাৎ পূর্ব্বাভাষ এবং ঘটনাপ্রবাহ এমন ভাবে জড়িয়ে যায় যে একের আলিঙ্গন থেকে অপরকে মুক্ত করা সম্ভব হয় না। তা না হউক, তাতে সুষ্ঠু শিল্পসৃষ্টির ব্যাঘাত হয় না এমন-কিছু।

এর পরেই হুড়মুড় করে এসে পড়ে Climax বা পরিণতি। "The Allison's Lad এবং Synge-এর "Riders to the Sea" নাটকে ক্ষুদ্র পরিণতিগুলি অনিবার্য্য গতিতে দুর্ব্বার বেগে নিয়ে এসেছে চরম পরিণতি। একাঙ্কিকাতেও একাধিক ক্ষুদ্র পরিণতির অবস্থান সম্ভব, কিন্তু তারাই শেষ নয়। তারা মিলিত হয়ে চরম পরিণতিকে চরমতম রূপ দেয় শেষ পর্য্যন্ত।

আবার গ্রন্থিমোচন (Denouncement) চরম পরিণতিকে এমন দ্রুত ভাবে অনুসরণ করে আসে যে, যবনিকা পতনের ঠিক আগের মুহূর্তটিতেই শুধু তার প্রকাশ উপলব্ধি করা যায়। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রেও নাটকের ঠিক এমনি পাঁচটি ভাগের উল্লেখ আছে। সেই পাঁচটি পর্ব্বকে বলা হয় মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্শ আর নির্ব্বহণ।

একাঙ্কিকার প্রতিটি ভাষায় অর্থব্যঞ্জনা ব্যাপক, সূচনায় বহু বিস্তৃতির ইঙ্গিত। কবি Yeats একাঙ্কিকার সাফল্য সম্পর্কে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন একটি কথায় "Surprise···is what is necessary. Surprise and then more surprise and that is all." Percival Wilde অবিশ্যি সংলাপের উপর জোর দিয়েছেন অনেকখানি। তাঁর মতে সংলাপ "creates atmosphere or reveals character or gives the illusion of real life." Synge-এর অভিমত আগেই বলা হয়েছে বটে। তাঁর মতের আরও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যখন তিনি বলেছেন, "Like the other arts drama does not mere copy life; it selects and arranges the raw material which life provides, in order to recreate and interpret." Chapin তাঁর সমালোচনায় নাট্যরচনার প্রচলিত অনুশাসনের গণ্ডীকে বরদাস্ত করেন নি। সেই বিদ্রোহী মনোভাবের ছাপ রয়েছে তাঁর "Philosopher of Butter Biggins" নাটকে। কিন্তু Chapin ছিলেন জন্মপ্রতিভা—"A born dramatist who did not know how it was done but could do it".

নাটক ঘটনাত্মক, দ্বন্দ্বাত্মক—ভাবাত্মক নয়। কাজেই দ্বন্দ্বসঙ্কুল চিত্তাবস্থার সৃষ্টি হতে পারে ঘটনাবিন্যাস এমন পরিপাটি হওয়া প্রয়োজন। Aristotle-এর ভাষায় "The poet should prefer probable impossibilities to improbable possibilities". শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের উদ্দেশ্য purposeless purpose অর্থাৎ উদ্দেশ্যকে গৌণ করে সৌন্দর্য্য সৃষ্টির প্রশ্নকে সম্মুখে রেখে সামাজিকগণের মনকে প্রভাবিত করা। Ibsen-এর "The Dolls House" এরই একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

একাঙ্কিকার রচনাশৈলী প্রসঙ্গে অনেকে ছোট গল্পের শিল্পরীতির অবতারণা করেন। সত্যিই, উভয়েই খণ্ডিত জীবনের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু উপন্যাস আর পূর্ণাঙ্গ নাটকের শিল্পরীতি অনেকটা বিপরীতধর্মী। ছোট গল্প ও একাঙ্কিকার সেই মূলগত পার্থক্য বিদ্যমান। উপন্যাস পাঠ্য কাব্য, একাঙ্কিকা দৃশ্য কাব্য। ছোট গল্পের আবেদন মন্থর, ক্রমপ্রসারী। দৃশ্যকাব্যের আবেদন প্রত্যক্ষ। নাটক হিসাবে একাঙ্কিকা বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় (objective) এবং নৈর্ব্যক্তিক, উপন্যাস বা ছোট গল্পে তন্ময়ভাবেরই প্রাধান্য। নাটকের দৃশ্যপট সংযোজনায় নাটকের অনেক অকথিতবাণী মূর্ত হয়ে ওঠে; এমনকি অতি প্রাকৃত সংস্থানেও নাটকের ভাবদ্বন্দ্ব এবং দৃশ্যপর্কের পরিবেশ প্রতিফলিত হয়। উপন্যাস এই হিসেবে বর্ণনাময় হয়ে ওঠে।

বাংলা একাঙ্কিকা রচনায় সংলাপেরই প্রাধান্য দেখা যায়। কিন্তু রচয়িতাদের এ কথা মনে রাখা উচিত যে, সংলাপই নাটক নয়, একাঙ্কিকা জীবনের কোন significant event বা idea-র বিশ্লেষণ বা বর্ণনা নয়, বিচার বা বিনির্ণয় নয়—উহা ঘটনাত্মক দৃশ্যকাব্য—রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের তলে প্রদর্শন করাই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

ইংরেজী সাহিত্যে অনেকগুলি একাঙ্কিকা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। Synge-এর "The Riders to the Sea", Bennett-র "The Step Mother", Galsworthy-এর "The Little Man", Maurice Baring-এর "The Rehearsal", Olive Conway-র "Becky Sharp", Harold Brighouse-এর "The Price of Coal", Bernard Gilbert-এর "The Old Bull", Clifford Bax-এর "The Poet asters of is pahan", Ferguson-এর "Caiubell of Kilmher", Drinkwater-এর "X—O", Chapin-এর "The Philosopher of Butter Biggins", Mckinnel-এর "The Bishop's Candlestics", Lady Gregory-র "Tne Gaol Gate" Herman Ould-এর "Discovery". Bernard Shaw-র "She Devil's Disciple" J. M. Barric-এর "Twelve Pound Look", Masefield-এর "The Tragedy of Nan" Yeats-এর "The Land of Heart's Desire", Bottomley-র "Midsummer Eves", Dunsany-র "The Golden Doom", Houseman-এর "Little Plays of St. Francis" একাঙ্কিকা রচনায় বিভিন্ন কলাকৌশলের এবং বিশিষ্ট শিল্পকর্মের অপূর্ব্ব নিদর্শন।

বাংলা সাহিত্যে মন্মথ রায় একাঙ্কিকা রচনায় প্রশংসনীয় সৃষ্টির দাবি রাখেন। তা ছাড়া প্রবোধ মজুমদারের "শুভযাত্রা", বনফুলের "দশভান", শিবরাম চক্রবর্তীর "চাকার তলে" ও অচিন্ত্য সেনগুপ্তের "নূতন তারা" উল্লেখযোগ্য রচনা। অবিশ্যি মন্মথ রায়ের "বিদ্যুৎপর্ণা" এবং প্রবোধ মজুমদারের "শুভযাত্রা" সার্থক সৃষ্টি। সম্প্রতিকালে গ্রন্থম কর্তৃক ছয়খানি একাঙ্ক নাটকের সঙ্কলন ছাড়াও আরও কয়েকখানি সঙ্কলন বাংলা একাঙ্কিকা রচনার প্রসারে যথেষ্ট উৎসাহের সূচনা করেছে।

কথাপ্রসঙ্গে সেদিন নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী মশায় ইংরেজী সাহিত্যের দু'শ' একাঙ্কিকার একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলেন। Galsworthy-র "The Littleman" ছাড়াও আরও অনেকগুলি নাটকের অভিনয় তিনি দেখেছেন খাস ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ পর্য্যায়ের শিল্পীগোষ্ঠীর অভিনয়। মঞ্চের কলাকৌশল ও মঞ্চসজ্জা দুই-ই ছিল মনোমুগ্ধকর। ইবসেন প্রমুখ নাট্যকারগণ নাটকে যুগচিত্তের যে অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন "Hewers of Coal" সেই সমস্যার জাতীয় রূপায়ণ এবং "The Littleman" তারই আন্তর্জাতিক ইঙ্গিত। আজকের ইংলণ্ডেও পেশাদার রঙ্গমঞ্চে পেশাদারী দলগুলি একাঙ্কিকাকে প্রাধান্য না দিলেও ছাত্র এবং সৌখীন নাট্যসম্প্রদায়ের মধ্যে একাঙ্কিকার সমাদর প্রচুর। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে একাঙ্কিকার প্রচলনে অবিশ্যি অসুবিধাও কম

নয়। নাট্যাচার্য্য নিজেও যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার সুযোগ পান নি বলে বাংলা দেশের রঙ্গমঞ্চে একাঙ্ক নাটকের পেশাদারী প্রচলন সম্ভব কিনা সে সম্পর্কে কোন নিশ্চয় মতামত দিতে নারাজ। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ বা অপেরা হাউসগুলি প্যারী মহানগরীতে যতখানি সমাদৃত হয় কলকাতার নাট্যজীবন তার তুলনায় অনেকখানি নীরব মন্থর এবং স্থবির। প্যারীতে তবুও পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রচুর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও একাঙ্ক নাটকের পেশাদারী চলন আজও খুব স্বচ্ছন্দ গতি এবং বিস্তৃতি লাভ করতে পারে নি। পেশা হিসাবে একাঙ্কিকার প্রচলন সম্পর্কে তাই কোন স্পষ্ট ভবিষ্যৎবাণী করা এই মুহূর্ত্তে সম্ভব না হলেও একথা ঠিক যে একাঙ্কিকার ভবিষ্যৎ অসামান্য—তা সে পেশাদারী এলাকার বাইরে হলেও।

"জীবনদোলনা"

শ্রীমায়া বসু (রাহা)

কেটেছে অনেক বেলা,
তবু কেন হায় শেষ হ'ল নাকো,
মন দেয়া নেয়া খেলা!
রাখিনি হিসাব কি যে পাই নাই,
কারে দিয়েছিনু ফাঁকি;
জীবন পাত্র পূর্ণ হয়নি
রয়ে গেছে আরো বাকী।
ক্ষুধিত হৃদয়ে পরম পিপাসা
কভু মেটে নাকো হায়!
জীবন দোলায় দুলে দুলে মরি
অলক্ষিত দোলনায়!

সে এক দোলনা দ্বিধাদ্বন্দ্বের
মোহ আর সংশয়
সরে যেতে চাই—তার মুঠি হতে
সে ত ছাড়িবার নয়।
বার বার সে যে কাছে টেনে নেয়,
ভাল বাসিবার ভাণে,
ক্ষণকাল পরে কোথা ঠেলে দেয়,
দূর হতে দূর পানে
তবু কেন তারে পারিনা ভুলিতে?
সে যে মোহময় ভুল;
জানি ঝরে যাবে ফুটিবার শেষে,
মোর মরসুমী ফুল!

তবু তারে নিয়ে নিজেরে ভোলাই,
সাজাই কত না ছলে,
আমার চিহ্ন রেখে যাই তার
প্রতি দলে উপদলে
তার পর যদি শুকায় সে ফুল
যায় যদি যাক ঝরে
ক্ষণ সান্ত্বনা বহিব একাকী
সারাটি জীবন ভরে!

ভুল কি শুধুই ভুল? তার মাঝে
কিছুই কি পাই নাই?
সে ভুলের ফুলে ভরেছে জীবন
সে কথা ত ভুলি নাই!
সেই পাওয়া মোর পরম প্রাপ্তি
মনের গভীরে জানি
চিরদিন ধরে জ্বলে রবে তার
অনিমিখ শিখাখানি।
রবে নাকো কোন ফাঁক
ভুলের মধুতে পূর্ণ করেছি
জীবনের মৌচাক।



শেষ পরিপূর্ণতা

জটার জালে

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

১৪

কেদারক্ষেত্র।

এ জগতের কোন স্থান যেন নয়। অথবা গতিশীল জগতের পরিণত রূপ। গতির সমাধি অবস্থা। জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা যে মরণ তারই অপরূপ রূপ যেন প্রত্যক্ষ করছি। শিবশঙ্করের শ্মশানচারী অভিধার তাৎপর্য্য এই প্রথম হৃদয়ঙ্গম হ'ল।

পরম পবিত্র, চরম যোগের স্থান বলে যে শ্মশানের বন্দনা গান রচিত হয়েছে, এই বুঝি সেই শ্মশান। খানকয়েক ঘরবাড়ী পিছনে ফেলে মন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই উদার, উন্মুক্ত কেদারক্ষেত্রের রিক্ত রূপহীনতার উদাস গাম্ভীর্য্য মুহূর্ত্তে মনকে অভিভূত করে। অত যে কঠিন পথের অত যে কঠোর পরিশ্রম, এক নিমেষেই কোথায় গেল তা? বিস্মৃতি নয়, মহামূল্য এক প্রাপ্তির উপলব্ধি। 'শ্রান্তপদে রক্তসিক্ত বেশে' অবশেষে সত্য সত্যই শ্রান্তিহরা শান্তিলাভ করলাম।

শীতকালের তো কথাই নেই। একাদিক্রমে ছয় মাস বন্ধ থাকবার পর বৈশাখ মাসে কেদারনাথের মন্দিরদ্বার প্রথম যখন উন্মুক্ত করা হয় তখনও সর্ব্বত্রই বরফ আর বরফ। কেদারক্ষেত্রে তখন থাকে এক সর্ব্বব্যাপী তীক্ষ্ণ শুভ্রতা—রজতগিরি কেদারনাথের তখন যেন সমাধির অবস্থা। সে অপরূপের দেখা পেলাম না শরৎকালে। কাছাকাছি কোথাও এখন বরফের লেশমাত্রও নেই। তথাপি, অথবা বোধ করি সেই জন্যই কেদারক্ষেত্রের রিক্ত গাম্ভীর্য্য অত প্রশান্তি, অত চরিতার্থতার উপলব্ধি এনে দিল আমার মনে।

কাশী নাকি জগতের বাইরে। এ কালে কে মানবে সে কথা! অথচ কেদারের স্বল্পায়তন এই মালভূমিটুকুকে আমাদের চেনা জগতেরই একটি অংশ বলে মানতেই চায় না মন। স্বর্গের মন্দাকিনী এই ভূমিটুকুকে চতুর্দ্দিকেই হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী থেকে যেন বিচ্ছিন্ন করে একে স্বতন্ত্র এক সত্তা ও বিপুল গৌরব দিয়েছে।

মন্দাকিনীর স্ফটিকশুভ্র জলধারা চরণের নূপুরের মতই কেদার-ক্ষেত্রকে বেষ্টন করে রয়েছে। গর্জ্জন আর নয় নূপুরেরই শিঞ্জন শুনি এখানে কেদারনাথের চরণাশ্রিতা মন্দাকিনীর গতিছন্দে।

সেই ত পাহাড়ই রয়েছে এই কেদারক্ষেত্রেরও চারিদিকেই। উত্তরে বরফঢালা ঐ চূড়াগুলির কোন কোনটির উচ্চতা নাকি ২৪,০০০ ফুট। তবু বন্ধকারার অনুভূতি এখানে একবারও মনে আসে না। এখান থেকে পাহাড়গুলি মনে হয় যেন অনেক দূরে। কেদারক্ষেত্র মনে হয় যেন মুক্তভূমি। মুক্তির সৌরভ এখানকার নির্ম্মল বাতাসে। লঘু সেই বায়ু, লঘু হয়ে গিয়েছে যেন আমার নিজের দেহও।

ধরণী থেকে বিচ্ছিন্ন এই কেদারক্ষেত্রই তা হলে স্বর্গ !

তবে নন্দনকানন নয়, মহাতাপসের তপোভূমি। খাঁ খাঁ করছে মন্দিরের পিছন দিকটা। সেদিকে তাকালেই চোখের দৃষ্টি স্বতঃই স্তিমিত হয়ে আসে। বৈরাগ্যের উদাস সুর বেজে উঠে মনের বীণায়। আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্ত নয়, নিবৃত্তি হয় এই বৈরাগীর স্বর্গে।

আশ্চর্য্য প্রতিসাম্য এই কেদারক্ষেত্রের গঠন ও অবস্থিতির—উত্তরে পর্ব্বতমালার বিরাট চালচিত্র ও দক্ষিণে প্রবেশপথের সঙ্গে কি বিস্ময়কর সঙ্গতি মুক্তদ্বার মন্দিরের মৌন নিমন্ত্রণের। বিশাল ভারতের কোন কোণ থেকে অগণিত নরনারী শত-সহস্র বিভিন্ন পথ বেয়ে আসেন শ্রীকেদারনাথকে দর্শন করতে। হিমালয়ে মন্দাকিনীর উপত্যকায় প্রবেশ করবার পর কিন্তু একটিই মাত্র পথ তাঁদের সকলের জন্যই। আর কেদারের সেই বিকট পন্থের সমাপ্তি ঠিক কেদারনাথের এই মন্দিরের নিম্নতম সোপানে।

আশ্চর্য্য কল্পনার ততোধিক আশ্চর্য্য রূপায়ণ—সুদীর্ঘ ও সুকঠিন জীবনযাত্রার যেন সার্থক সমাপ্তি মহামরণের বিগ্রহ শ্রীকেদারেশ্বরকে আলিঙ্গনের তুহিন-শীতল পরিতৃপ্তিতে।

কোন মহাপুরুষের ধ্যাননেত্রে কেদারনাথের তীর্থস্বরূপ প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল, ইতিহাসের পাতায় তার অবিসম্বাদিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। পাণ্ডারা কেদারনাথকে বলেন স্বয়ম্ভু শিব। সে সম্বন্ধে অবশ্য সন্দেহের অবকাশ নেই, বিগ্রহ বলে যাকে এখানে পূজা করা হয় তা কোন গঠিত মূর্ত্তি নয়, অ-সুত বিপুলায়তন শিলাও নয় একখানা। কেদারনাথ ছোট একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিলাময় পাহাড়—গঠন ও বিন্যাসের বিস্ময়কর অসাধারণত্ব সত্ত্বেও খামখেয়ালী প্রকৃতির অন্যতম একটি সাধারণ সৃষ্টি। তবে মানুষের চোখে চমক লাগাবার মত, মানুষের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করবার মতই বিচিত্র ঐ গঠন ও বিন্যাস। হয়ত সেইজন্যই প্রাগৈতিহাসিক যুগের ঐ বিস্ময়কর আকস্মিক সৃষ্টি কোন আদিম মানবের চোখে অলৌকিক বলে প্রতিভাত হয়েছিল, তার অন্তরে স্বীকৃত হয়েছিল ঈশ্বরের অভিব্যক্তি বলে।

অনুমান করি যে, ইতিহাসপূর্ব্ব যুগ থেকেই তুষারক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী এই প্রস্তর-দেবতা হিমালয়বাসী ও হিমালয়প্রবাসী নরনারীর কাছে পূজা পেয়ে আসছেন। ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক যুগে সেই খ্যাতি আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল বলেই পুরাণে কেদারনাথের অত প্রশস্তি কীর্ত্তিত হয়েছে। বৌদ্ধ যুগেও ম্লান হয় নি কেদারনাথের মহিমা। হিন্দুর দেবতা তাঁর বিশিষ্ট অবস্থিতির জন্য ধার্ম্মিক বৌদ্ধের চোখে ধ্যানী বুদ্ধ বলে প্রতিভাত হয়েছিলেন কি না কে জানে! বুদ্ধের মূর্ত্তির সঙ্গে না হউক, বৌদ্ধের কাছে অত মাহাত্ম্য যে স্তূপের তার সঙ্গে বিচিত্রগঠন কেদারেশ্বরের সাদৃশ্য ত আরও প্রকট। বুদ্ধদেবের সমাধি বলেও ঐ স্তূপাকৃতি শিলার পূজা হয়ে থাকতে পারে বৌদ্ধ যুগে।

নিশ্চয়ই বিতর্কের অবকাশ আছে এ রকম ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে। তবে কেউ প্রতিবাদ করবেন না যদি বলা হয় যে, শঙ্করাচার্য্যের জীবদ্দশায় (৭৮৮-৮২০ খ্রীঃ ?) বিপুল গৌরব ছিল এই দুর্গম কেদারতীর্থের। হয়ত সেই সঙ্গে কিছু অখ্যাতিও তার ছিল অন্যতম বৌদ্ধতীর্থ অথবা বৌদ্ধ সংস্পর্শে ভ্রষ্ট হিন্দুতীর্থ হিসাবে। সন্দেহ নেই যে, ঐ রকম খ্যাতি বা অখ্যাতির টানে সশিষ্য শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং অন্ততঃ একবার কেদারক্ষেত্রে গমন করেছিলেন। সেই পদার্পণের শুভ মুহূর্ত্তেই বর্ত্তমান কেদারতীর্থের জন্ম।

ইংরেজীতে বলা হয় যে, মানুষের কল্পনায় আগুন লাগে। ঐ রূপকের সার্থক প্রয়োগ হবে শঙ্করাচার্য্য ও কেদারনাথের মিলন সম্পর্কে। কল্পনা ছিল শঙ্করাচার্য্যের—অত বড় কবি ক'জন জন্মেছেন এ জগতে? আর এই কেদারনাথ নিঃসংশয়ে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ। উভয়ের সংস্পর্শে সৃষ্টি হয়েছে কেদারতীর্থ নামক কঠিন প্রস্তরভূমিতে বরফের অক্ষরে লেখা বর্ত্তমান যুগের অতুলনীয় মহাকাব্য।

বলা হয় 'শঙ্করো শঙ্করঃ সাক্ষাৎ'—শঙ্করাচার্য্যই সাক্ষাৎ শিব। সেই জ্ঞানযোগীর নিবিড়তম উপলব্ধি—চিদানন্দরূপং শিবোঽহং। তাঁর শিব সচ্চিদেকং ব্রহ্ম—মহাযোগী, নির্ব্বিকার পুরুষ। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের উমা-মহেশ্বরকে অনুষ্ঠান হিসাবে বন্দনা করেছেন তিনি। কিন্তু তাঁর ধ্যানের দেবতাকে খুঁজে পাননি তিনি কোন যুগলমূর্ত্তি, অর্দ্ধনারীশ্বর বা লিঙ্গ-বিগ্রহের মধ্যে। অনুমান করি যে, প্রকৃতিবিজয়ী, অদ্বৈতবাদী সিদ্ধপুরুষ সেই শঙ্করাচার্য্য ক্ষুব্ধচিত্তে সারা ভারত ভ্রমণ করবার পর এই কেদারক্ষেত্রে এসেই প্রথমে স্তম্ভিত ও পরক্ষণেই উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন, বোধ করি কেদার পাহাড়ের এই শিলাময় একক কেদারেশ্বরের মধ্যেই তিনি তাঁর ধ্যানের সার্থক প্রতীক প্রত্যক্ষ করে কেদারক্ষেত্রকে তৎক্ষণাৎ হিন্দুর শ্রেষ্ঠতম তীর্থের মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

শঙ্করাচার্য্যের সব-চাওয়া ও সব-পাওয়ার শেষ হয় এই কেদারক্ষেত্রে। এখানেই দেহত্যাগ করেছিলেন তিনি। তাঁর সমাধিও রয়েছে এখানে—দেহজ্ঞানমুক্ত যোগীর উপযুক্ত অনাড়ম্বর নিরলঙ্কার সমাধি।

মহাজ্ঞানী, মহাযোগী শঙ্করাচার্য্যের সমস্ত জ্ঞান ও সকল স্বপ্ন যেন রূপায়িত হয়ে আছে এই কেদারক্ষেত্রে—ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা।

অরূপের রূপ! দেখে আর তৃপ্তি হয় না চোখের।

জিতেনকে মোটেই খুঁজতে হয় নি। সে যে স্থানীয় থানার জমাদারের সঙ্গে গল্প করছিল তা হয়ত নিছক সময় কাটাবার জন্যই, আসলে আমারই পথ চেয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল সে। আমি পুল পার হয়ে উপরে এসে উঠতেই তার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। রূপ যা হয়েছে তার তা কি আর বলব। তবু তাকে দেখেই খুশির

নিঃশ্বাস ফেললাম আমি—যাক্, তেমন কোন বিপদ ঘটে নি তা হলে।

তারই মুখে শুনলাম যে কষ্ট যা তার হয়েছিল তা ঐ পথেই। এখানে আসবার পর থেকে একরকম জামাই আদরেই আছে সে। জিতেনের পূর্ব্বেই পাণ্ডা মহাদেবপ্রসাদের চিঠি এসে পৌঁছেছিল তার স্থানীয় গোমস্তা সত্যনারায়ণের হাতে। সুতরাং নিজের নাম প্রকাশ করে বলতে না বলতেই প্রয়োজনীয় ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেক কিছুই পেয়েছে জিতেন—খাদ্য ও শয্যা ত বটেই, তার উপরে আবার গরম জল ও লোহার কড়াতে গনগনে আগুন।

অবিশ্বাস করতে পারি নে, কেন না আমার জন্যও ঐ দিনের বেলাতেই দেখি লেপ-কম্বল এল; নীচের দোকান থেকে উপরে শোবার ঘরে এল গরম চা; খবর এল যে নীচে আমার স্নানের জন্য গরম জলও প্রস্তুত হয়ে আছে।

আরও অপ্রত্যাশিত ও অসাধারণ আয়োজন—আমার দাঁত নেই জেনে একা আমারই জন্য খিচুরি রাঁধা হয়েছে।

ডাল-ভাত বা খিচুরি রাঁধবার প্রথা নেই এখানে, কারণ কাঠ এখানে দুষ্প্রাপ্য এবং জল বরফের মত ঠাণ্ডা। ঘি গলিয়ে পুরি ভাজতে কাঠ ও সময় কম লাগে বলে সব যাত্রীই এখানে পুরি ও হালুয়া খায়। আমার জন্য দু' ছটাক সরু চাউল ও দু' ছটাক কাঁচা মুগডালের খিচুরি রাঁধতে হালুইকরের উনুনের আগুনেও ঝাড়া দু' ঘণ্টা লেগে গেল। তবু খেতে বসে দেখি যে চাউল যেমন-তেমন ডাল একটিও সিদ্ধ হয় নি। তবু কৃতজ্ঞচিত্তে এবং বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই সেই খিচুরি আমি খেলাম সত্যনারায়ণের উনুনের ধারে বসেই।

ইতিমধ্যে চক্রধর ঐ দোকানে এসে আমারই মত উনুনের ধারে জেঁকে বসেছিল। কি সে দেখলে আমার মুখের ভাবে, তা সে-ই জানে, তবে আমার খাওয়া শেষ হবার পর সে মুচকি হেসে বললে, অব বোলিয়ে তো বাবুজী, হমলোগ ক্যা আপলোগোঁকে লিয়ে কুছ নহী করতে হৈ?

তার প্রশ্নের গূঢ় অর্থ তৎক্ষণাৎ বুঝতে না পেরে আমি বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে আছি দেখে সে তার বিশিষ্ট ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে আবার বললে, মনে করে দেখুন, বাবুজী, আপনারাও বলেছেন। আমাকে দেখে কি বিরক্তই না হয়েছিলেন আপনিও? কুণ্ডচটিতে একবার আপনাদের ঘর থেকে আমাকে ত দূর দূর করে তাড়িয়েই দিয়েছিলেন আপনার ঐ সাথী।

সহাস্য মুখ চক্রধরের, কণ্ঠস্বরে তিক্ততা একেবারেই নেই। সুর তার অভিযোগের বলেও মনে হয় না। কিন্তু কথাটা ত তার মিথ্যা নয়। সত্য বলেই ওটা খোঁচার মত গিয়ে বিঁধল আমার মনে। লজ্জিত হয়ে বললাম, না ঠাকুর, তাড়িয়ে কেন দেব? আমরা ত ক্রিয়াকর্ম্ম তেমন করি নে—তাই বলেছিলাম তোমাকে।

ও একই হ'ল,—বলতে বলতে হাসি যেন আরও ছড়িয়ে পড়ল চক্রধরের সারা মুখে: পাণ্ডাকে যাতে দক্ষিণা না দিতে হয় সেই জন্যই ত ক্রিয়াকর্ম্ম এড়িয়ে চলা। তা কত নি-ই আমরা? আর নিলেও কিছু কিছু সেবাও ত আমরা করি। পথ দেখিয়ে আনাটা কি সোজা কাজ? তা ছাড়াও ভাবুন ত একবার—আমার কাকা এখানে এই যাত্রীনিবাস যদি তৈরি করে না রাখতেন তবে এই বরফের দেশে এসে থাকতেন কোথায় আপনারা?

অন্য আশ্রয়ও আছে। কিন্তু সে কথা আমার মুখে এল না। হোটেলের আরামে আছি মহাদেব প্রসাদের যাত্রীনিবাসে যার জন্য একটি পয়সাও দিতে হয় না। ঐ চক্রধরের কাছেও কম সাহায্য আমরা পাই নি পথে আসতে আসতে। সত্যই ঋণের বোঝা তখন ভারী হয়ে উঠেছে আমার মনে। সুতরাং খোঁচা খেয়েও কুণ্ঠিতস্বরে বললাম, আর লজ্জা দিও না ঠাকুর। সত্যই তোমরা আমাদের অনেক উপকার করেছ। এ সব কথা চিরদিন আমার মনে থাকবে।

কিন্তু সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম যে, আমার ও কথা শুনে উৎফুল্ল না হয়ে যেন বিমর্ষই হল চক্রধরের মুখ। সেই তার নিজস্ব ভঙ্গিতে মাথাটা দুলিয়ে দুলিয়ে সে বললে, কিন্তু আর চলবে না বাবুজী। যজমানেরা সে কালে মোটা মোটা দক্ষিণা কাকাকে দিত বলেই এমন সব আয়োজন করতে পেরেছিলেন তিনি। সে সবই ত একালে উঠে গেল। এখন সবাই পাণ্ডার পিছনে লেগেছে—যেমন যাত্রীরা, তেমনি গবর্ণমেণ্টও।

অনেক অভিমান ও অভিযোগ জমে আছে চক্রধরের মনে। কারণ আছে বই কি! একটু আগে নিজেই দেখে এসেছি আমি। কেদারনাথের মন্দিরে পাণ্ডা-পুরোহিতের প্রতাপ আর নেই—হাজার বিধি-নিষেধের বেড়া তুলে তাদের কর্ত্তৃত্ব খর্ব্ব করা হয়েছে। পূজার উপকরণের নিম্নতম মূল্য ও দক্ষিণার পরিমাণ আজকাল নির্দ্দিষ্ট। কেদারনাথের উদ্দেশ্যে যাত্রী যা উৎসর্গ করবে তা টাকা-পয়সাই হোক, আর সোনাদানাই হোক ফেলতে হবে সীলমোহর-করা বাক্সের মধ্যে। দাবিদাওয়া আজকাল একেবারেই নেই। নিজেরই অভিজ্ঞতা আমার। পুরী, গয়া বা মথুরা-বৃন্দাবনের তুলনায় কেদারনাথ মনে হয় যেন পাণ্ডাবর্জ্জিত তীর্থ।

কেদার-বদরীনাথের মন্দিরে এ সব সংস্কারসাধিত হয়েছে অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে—পুনর্গঠিত মন্দির কমিটির চেষ্টায়। কমিটির কালোপযোগী পুনর্গঠন হয়েছে শিক্ষিত জনমতের চাপে। যাত্রীর উপর জোরজুলুম যাতে না হয়, দেবতার ভোগ বা দক্ষিণা যাতে তাঁর মনুষ্যপার্শ্বচরদের পেটে না যেতে পারে, ক্রমবর্দ্ধমান দেবোত্তর সম্পত্তির উদ্বৃত্ত আয় যাতে যাত্রীর কল্যাণমূলক কর্ম্মে ব্যয় হয়, তারই জন্য নানারকম নিয়মকানুন প্রবর্ত্তিত হয়েছে।

কিন্তু কমিটি বোঝে না চক্রধর। সে চেনে কেবল গবর্ণমেণ্টকে। অন্যত্র যেমন, দেবমন্দির পরিচালনার ক্ষেত্রেও তেমনি তার কল্পিত ধর্ম্মজ্ঞানহীন স্বেচ্ছাচারী ও মহাপরাক্রান্ত এক গবর্ণমেণ্টের স্থূল হস্তাবলেপন চোখে পড়ে তার। হাজাররকমের বিধি-নিষেধের

বেড়া তুলে সরকার পাণ্ডার অধিকার খর্ব করেছে বলে তীব্র অভিযোগ তার সরকারের বিরুদ্ধে।

তবু লড়াই করছি আমরা, একটু যেন গর্বের সুরেই আমাকে বললে চক্রধর: রুটির লড়াই আমাদের। আমরা সরকারকে বললাম, হয় আমাদের সকলকে চাকরি দাও, নয় ত পূর্ব্ব-পুরুষের বৃত্তি চালাতে দাও আমাদের। শেষে আধাআধি রফা। গবর্ণমেণ্ট মন্দিরের উপর দখল নিয়েছে, আমাদের হাতে রয়েছে 'সুফল' দেবার অধিকার।

পরে কেদার থেকে বিদায়ের প্রাক্কালে দেখেছিলাম সুফলদানের প্রক্রিয়া। তীর্থের ফল নাকি দেবতার ভাণ্ডারে নেই; তা থাকে তীর্থগুরু পাণ্ডার এক্তিয়ারে। পাণ্ডা স্বয়ং সন্তুষ্ট হয়ে মুখফুটে না বললে যাত্রী সে ফল পেতে পারে না।

অদ্ভুত সেই সুফলদানের প্রক্রিয়া। ফুল, চন্দন এবং আরও কি কি যেন থালায় সাজিয়ে নিয়ে এল চক্রধর। তার মধ্যে যা চোখে পড়বার মত তা বেশ মোটা রুদ্রাক্ষের মালা একগাছা। সেই মালা দিয়ে আমার দু' হাত জড়িয়ে বেঁধে চিরাচরিত পদ্ধতিতেই পরিচিত ছন্দের মন্ত্র পড়াতে সুরু করেছিল সে—'উত্তরাখণ্ডে কেদারক্ষেত্রে···' ইত্যাদি। কিন্তু খানিকটা এগিয়েই একেবারে থেমে গেল চক্রধর। চলতি গাড়ী অকস্মাৎ ব্রেইক কষে থামিয়ে দেওয়া আর কি। ফলে গাড়ীর মধ্যে নিশ্চিন্ত আরোহীর যে অবস্থা হয় আমারও তাই।

মন্ত্রের মোটা অর্থ হল তীর্থগুরু পাণ্ডার কাছে যাত্রীর একটি জিজ্ঞাসা, আমার ক্রিয়াকর্ম্ম সব নির্দ্দোষ হয়েছে ত? সেই সঙ্গে একটি প্রার্থনাও—হে তীর্থগুরু, আমায় তীর্থফল দাও। কিন্তু সেই ফলের জন্যই মূল্য দিতে হয় পাণ্ডাকে—তার দক্ষিণা। সেই দক্ষিণার পরিমাণ যাত্রীকে দিয়ে কবুল করিয়ে নেওয়াই হ'ল ঐ বিশিষ্ট প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য।

দুটিহাতই রুদ্রাক্ষের মালা দিয়ে বাঁধা। দক্ষিণার পরিমাণ শুনে সন্তুষ্ট না হলে পাণ্ডা সে বন্ধন খুলে দেবে না—'সুফল' দান ত দূরের কথা। জোর করলে ছিঁড়ে ফেলা যায় না তেমন শক্ত নিশ্চয়ই নয় সেই রুদ্রাক্ষের মালা। কিন্তু ঐ বন্ধন পরবার জন্য পাণ্ডার দিকে নিজের হাত দু'খানি এগিয়ে দেবার দুর্ব্বলতা যার আছে সে জোর করে ঐ মালার বন্ধন ছিন্ন করবার শক্তি কোথায় পাবে? হাত দুখানা বন্ধনমুক্ত হলেও পাণ্ডার কাছে ঋণমুক্তি হবে না অবাধ্য যাত্রীর। আর পাণ্ডা তার নিজমুখে 'সুফল' দান না করলে ব্যর্থ হ'ল যাত্রীর তীর্থযাত্রা।

নিশ্চয়ই যাত্রীর উপর জুলুম হতে পারে ঐ প্রক্রিয়ার সাহায্যে। দর কষাকষি নিশ্চয়ই হয়। তবে আমাদের বেলায় কিছুই হ'ল না।

হাতবাঁধা অবস্থায় মন্ত্রের গূঢ় অর্থ সম্বন্ধে অকস্মাৎ সচেতন হয়ে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি যে, চক্রধর আমার মুখের দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসছে। ও হাসি বুঝি সংক্রামক। হেসে ফেললাম আমিও। বললাম, বুঝেসুঝে তুমিই বল ঠাকুর—কত দিতে হবে?

হাসি থামিয়ে কেমন যেন করুণকণ্ঠে বললে চক্রধর: বালবাচ্চা নিয়ে ঘর করি বাবুজী। আর কতদূর থেকে হেঁটে এসেছি তাও ত নিজের চোখেই দেখেছেন আপনারা। পাঁচ-পাঁচটি টাকা দিন।

এ যেন অনুনয়কে জুলুম দূরে থাক, দাবিই বা বলব কোন হিসাবে? আমি তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলাম। 'সুফলও' পেলাম সঙ্গে সঙ্গেই—দু'জনের কাছে মোট দশটি টাকা পেয়েই চক্রধরের মুখ দেখি খুশীতে ঝলমল করছে।

কিন্তু ওটা তৃতীয় দিনের ঘটনা। আমার কেদার প্রবাসের প্রথম দিনে সত্যনারায়ণের দোকানে বসে চক্রধর 'গবর্ণমেণ্টে'র সঙ্গে পাণ্ডাসমাজের লড়াই ও শেষ পর্য্যন্ত আপোষ-রফার কাহিনী আমাকে শুনিয়ে অবশেষে জিজ্ঞাসা করল, বলুন বাবুজী, আপনিই বলুন—কি দোষ হয়েছে আমাদের? সাত পুরুষের বৃত্তি গেলে কি করে চলবে আমাদের?

ইতিপূর্ব্বে পাণ্ডা-পুরোহিতের পরগাছা প্রকৃতির বিরুদ্ধে আমি নিজেও ক্ষুরধার কত যুক্তিই না প্রয়োগ করেছি। কিন্তু সেদিন চক্রধরের মুখের দিকে তাকিয়ে তার একটিরও পুনরাবৃত্তি করতে পারলাম না আমি। বরং তখনই আমার মনে পড়ে গেল রুটির, মানে জীবিকার জন্য লড়াইয়ের আরও শত শত দৃষ্টান্ত। সে লড়াই ত সকলেই করে আজকাল—কুলি-মজুরের মত তাঁতী-কুমোর এবং কেরাণী-শিক্ষক-সাংবাদিকেরাও। আজকাল কেবল বেতন বৃদ্ধির জন্যই ধর্ম্মঘট ইত্যাদি শাণিত অস্ত্রের প্রয়োগ হয় না, চাকরি বজায় রাখবার জন্যও সরকারী-বেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠানেই কুরুক্ষেত্রের সংগ্রাম চলেছে। কাজ না থাকলেও আপিস বা কারখানা চালু রাখতে হবে—এই দাবি নিয়ে কত আন্দোলনকেই ত সার্থক হতে দেখেছি। ঠিক সেই দাবিই চক্রধর ও তার পাণ্ডাসমাজের। এরা পরশ্রমজীবী হলেও দাবি তাদের বেঁচে থাকবার দাবি। তাকে আমি অসঙ্গত বলব কোন হিসাবে?

চুপ করেই ছিলাম। তথাপি চক্রধরের উৎসাহে ভাটাই পড়ল দেখলাম। 'গবর্ণমেণ্টে'র বিরুদ্ধে বলতে বলতে উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছিল তার মুখ। কিন্তু এখন দেখি সন্দিগ্ধ দৃষ্টি তার চোখ দুটিতে—যেন আমাকেও সে তার প্রতিপক্ষ মনে করছে। কিন্তু একটু পরে সে ভাবটাও তার কেটে গেল, বিষণ্ণতার ম্লান ছায়া নেমে এল তার সন্দিগ্ধ চোখে। সে বললে, তবে, বাবুজী, গবর্ণমেণ্টকে কত আর দুষব! মাঝে মাঝে মনে হয় বুঝি কেদারনাথজীই বিমুখ হয়েছেন আমাদের প্রতি। যাত্রীরাই ক্রিয়াকর্ম্ম করতে চায় না এখন, 'সুফল' না পেলেও পরোয়া করে না। পথঘাট ভাল হবার পর যাত্রী ত কেদারে আসছে আগের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশী। কিন্তু তাদের অধিকাংশই পাণ্ডাকে কাছেও ঘেঁষতে দেয় না—বলে যে কেবল দেখতেই এসেছে তারা, পূজা করতে নয়।

একটু থেমে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে সে আবার বললে, পনর-বিশ বৎসর আগেও এমন ছিল না বাবুজী। তখন কেদারের পাণ্ডাকে কেদারনাথজীর মতই ভক্তি করত যাত্রীরা, আর বাঙালীদের ভক্তি ছিল তখন সব চেয়ে বেশী।

উদাহরণ দিল চক্রধর তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে। তার বাল্যকালে সে তার পিতার সঙ্গে প্রায় প্রতি বৎসরই বাংলা দেশে গিয়েছে যাত্রী সংগ্রহ করতে। সেখানে যজমানের বাড়ীতে কেবল আতিথ্য নয়, পূজাই পেয়েছেন তার পিতা। স্পষ্ট মনে আছে চক্রধরের যে, সেকালে ভক্তিমতী গৃহিণীরা নিজের হাতে পাণ্ডার চরণ প্রক্ষালন করে ভক্তিভরে পাদোদক পান করতেন।

মনে আছে আমারও। আমার বাল্যকালে আমিও দেখেছি দেবস্থানে গুরু পুরোহিতের পাদোদক পান করার দৃশ্য। সুতরাং চক্রধরের মনের বেদনা বেশ অনুমান করতে পারলাম আমি। পাণ্ডা-পুরোহিতের সম্মান ও সমৃদ্ধির স্বর্ণযুগ প্রত্যক্ষ করেছে সে। সুতরাং বর্ত্তমান লৌহযুগে প্রাচীন পদ্ধতিতে জীবন সংগ্রাম চালাতে গিয়ে পদে পদে পরাজয়ের যে দুঃখ ও গ্লানি তাকে পরিপাক করতে হচ্ছে তাতে অতীতের সেই স্বর্ণযুগের জন্ত মাঝে মাঝে সে কি দীর্ঘশ্বাস না ফেলে পারে ?

মন্দাকিনী কি টানেই যে টানছেন আমাকে—কোন বাধাই বাধা মনে হয় না। ১১,৭৫০ ফুট উঁচু এই কেদারক্ষেত্র। যে রোদটুকু উঠেছিল তাও নিভে গেল। স্থানীয় প্রত্যেকটি লোককেই দেখেছি কান-মাথা ঢেকে উনুনের ধারে বসে আগুন পোয়াতে। তবু আমি সত্যনারায়ণের দেওয়া হাতের কাছের গরম জল পায়ে ঠেলে শ'খানেক ফুট নীচে মন্দাকিনীর জলেই স্নান করতে গেলাম।

এখানে মোটেই ভয়ঙ্করী নয় মন্দাকিনী। স্রোত থাকলেও তরঙ্গ নেই, গভীরতা থাকলেও তেমন প্রস্থ নেই, গর্জ্জন একটু থাকলেও কুটিল আবর্ত্ত একেবারেই নেই। কিন্তু অত্যন্ত ঠাণ্ডা জল। বরফের মত জল নয়, এ যেন নির্জ্জলা বরফ। কারণ সুস্পষ্ট। অত শীতেও যাত্রীর আশায় ঘাটে যে পুরোহিত বসে ছিল সে অঙ্গুলি সঙ্কেতে আমায় দেখিয়ে দিল যাকে সে বলে মন্দাকিনীর গঙ্গোত্রী, মানে উৎস। তা কেদারক্ষেত্রের উত্তর-পশ্চিম কোণে বরফ ঢাকা একটি পর্ব্বতশিখর। মনে হয় যে, মিনিট পনর লাগবে সেখানে হেঁটে যেতে। সেই বরফ গলেই ঘাটের এই জল হয়েছে। আঙুল সে জলে ডোবালেই যেন অসাড় হয়ে যায়।

তবু সেই জলেই আমি স্নান করলাম আমার বিশিষ্ট পদ্ধতিতে। অপরিমেয় পরিতৃপ্তি তাতে। সেই সঙ্গে গর্ব্বও বোধ করছি—আর কিছু না হউক শীতকেও জয় করেছি আমি।

কিন্তু পরক্ষণেই দর্পচূর্ণ। স্নানের পর গরম জামা-কাপড় যত সঙ্গে ছিল সব গায়ে চাপিয়েও নিস্তার নেই। শীত আর যায় না। ছুটে গিয়ে বসলাম সত্যনারায়ণের উনুনের ধারে।

'একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর।' একে ত প্রায় বার হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের স্বাভাবিক শীত। তার সঙ্গে আবার বৃষ্টি। হাঁটাচলার উপায়ই নেই। সারাটা দিন আমার কাটল সেই উনুনের ধারে। রাত্রে দু'খানা লেপ গায়ে দিয়েও ঘুমের জন্ত সে কি সাধ্য-সাধনা আমাদের।

কিন্তু পরদিন অঢেল ক্ষতিপূরণ।

পূবমুখো ঘর, পূবদিকেই জানালা। ভোরবেলায় সেই জানালা খোলবার পর নিজের চোখ দুটিকেই যেন আর বিশ্বাস হয় না।

বরফ-ঢাকা পাহাড়ের সাদা চূড়াগুলি আজ দেখি লালে লাল। কে যেন রাশি রাশি আবির মাখিয়ে দিয়েছে প্রত্যেকটি পাহাড়ের মাথায়। স্তূপীকৃত সেই আবির-পাহাড় আর আকাশের মাঝখানের সবটা ফাঁকই ভরে দিয়েছে।

ঘরে বসেই একটু পরে দেখলাম প্রকাণ্ড একখানি সোনার থালার মত সূর্য্য পাহাড় ডিঙিয়ে লাফিয়ে উঠে এল আমাদের দিকে।

তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এসে দেখি যে কালকের দেখা ভস্মভূষণ কেদারনাথ যেন এইমাত্র সোনার জলে স্নান করে উঠে এসেছেন। সোনালী জল ঝরে ঝরে পড়ছে তার অমল ধবল সিক্ত দেহ থেকে।

সোনা ঝলমলে ঝরঝরে প্রভাত। বিশ্বাসই হয় না যে, কাল বৃষ্টি মাথায় করে এই জায়গাটাতেই এসে উঠেছিলাম অথবা কাল যে অত বৃষ্টি হয়েছিল এখানে। আজ বৃষ্টি ত নেই-ই, এক ফোঁটা মেঘও কোথাও নেই। নেই কুয়াশার সামান্ত আভাসও। বার হাজার ফুট উঁচুতে বায়ুমণ্ডলে ধূলা-বালি ত থাকতেই পারে না। যদিও বা কিছু ছিল তাও কালকের বৃষ্টিতে ধুয়ে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। সুতরাং শরতের সোনার রোদ আজ স্বরূপে ও সগৌরবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ ত বঙ্গদেশ নয়, শ্যামল অঙ্গও নয় কেদার পাহাড়ের। কিন্তু সেই পাহাড়ই নিঃসংশয়ে 'ঝলিছে অমল শোভাতে'। সেই সোনালী রোদে উদ্ভাসিত হয়ে নীল আকাশ হয়েছে আরও নীল, উত্তরে সেই নীল ছোঁয়া পর্ব্বতশ্রেণীর শিখরে শুভ্র বরফ যেন আরও বেশী শুভ্র। কেদার পাহাড়ের স্বাভাবিক পিঙ্গলবর্ণও তরুণ সূর্য্যের সুবর্ণ কিরণ সম্পাতে উজ্জ্বলতর হয়েছে।

ঘরের মধ্যে কাঁপছিলাম, কিন্তু প্রাঙ্গণে নেমে আসবার পর তেমন শীত আর লাগে না।

এই লীলাই কেদারনাথজীর। নিজে উঠে এসে চায়ের গ্লাসটি আমার হাতে দিয়ে বললে সত্যনারায়ণ: বৃষ্টি হ'ল ত বৃষ্টিই, আবার রোদ হ'ল ত বেশ রোদ। তবে আজকের মত এত উজ্জ্বল রোদ বড় একটা দেখা যায় না। আজ বুঝি বিশেষ করে আপনাকেই আশীর্ব্বাদ করছেন কেদারনাথজী। বলতে বলতে আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসল সে।

কিন্তু জিতেন দেখি আজও গম্ভীর। উৎফুল্ল নয়, অস্থির সে। দেখে একটু বিরক্ত হয়েই আমি বললাম, ব্যাপার কি জিতেন ?

কেদারনাথজী অত টানছিলেন তোমাকে, তবে এখানে এসেও এমন গোমড়া-মুখ কেন তোমার? এখন ত আমার মত বুড়োমানুষেরও নাচতে ইচ্ছা হচ্ছে।

শুনে কিন্তু শুকনো মতন একটু হেসে উত্তর দিল জিতেন: আমার, মণিদা, আরও একটু বেশী। ঐ বরফের চূড়ায় উঠবার ইচ্ছা আমার।

ইচ্ছা যে আমারও হয় না তা নয়। কিন্তু আমি জানি যে, তা অসাধ্য। সুতরাং মুচকি হেসে আমি বললাম, ও সাধটা আগামী জন্মের জন্ত তোলা থাক। আপাততঃ আর একটু বরং নীচেই যাওয়া যাক। চল, মন্দাকিনীতে স্নান করে আসি।

কিন্তু তাতে রাজী নয় জিতেন। বরফ তাকে টানে, কিন্তু শীতকে তার ভয়। গায়ের জামা খুলতে হবে বলে গত কাল গরম জলেও স্নান করে নি সে। আজও আমার প্রস্তাব সে হেসে উড়িয়ে দিল।

(১৫)

প্রথমে চিনতেই পারি নি। যখন চিনতে পারলাম তখন মনে হয় বুঝি দৃষ্টিবিভ্রম আমার।

কি করে চিনব! কুলির পিঠে কাণ্ডিতে যিনি বসে আছেন তাঁর ত মুখই দেখা যায় না। আর সালোয়ার, কোট-টুপীপরা বেঁটে মতন যে মানুষটি ঘোড়ার পিঠের উপর থেকে অবলীলাক্রমে অবতরণ করলেন, দূর থেকে কেমন করে আমি বুঝব যে তিনিই গঙ্গোত্রী!

কিন্তু গঙ্গোত্রী ঠিক চিনতে পেরেছেন আমাকে। পুল পার হয়ে আমার কাছে এসে সহাস্য মুখে সরব সম্ভাষণ তাঁর। তার পর উভয় পক্ষেরই সে কি আনন্দ!

সলজ্জ কৈফিয়তের সুর গঙ্গোত্রীর। সে কৈফিয়ৎ ঘোড়াটিকে জড়িয়ে, কেননা গঙ্গোত্রীর যে রণসাজের উপর বার বার আমার চোখ গিয়ে পড়ছে, তার প্রয়োজন ত হয়েছে ঐ ঘোড়ায় চড়বার জন্তই।

বৃদ্ধার স্বাস্থ্যের জন্তই এত দেরি হয়েছে তাঁদের। একটু ত জ্বর উঠেছিল আমরা গৌরীকুণ্ডে উপস্থিত থাকতেই। এখন পর্য্যন্ত সে জ্বরের সম্পূর্ণ বিরাম হয় নি। হাঁটবার শক্তি নেই বৃদ্ধার। তাঁকে হাঁটতে দেবার ইচ্ছাও নেই গঙ্গোত্রীর। কিন্তু কেদারের অত কাছে আসবার পর দর্শন না করে ফিরে ত যেতে পারেন না তাঁরা। তাই বাহনের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। দ্রুতগতিতে এসে দ্রুতগতিতেই ফিরে যেতে হবে বলে দু'জনেই তাঁরা বাহন নিয়েছেন।

কৈফিয়ৎ দিতে দিতেই বাহাদুরের সঙ্গে কয়েকবার সহাস্য চোখোচোখি হয়েছে গঙ্গোত্রীর। কৈফিয়ৎ শেষ করেই আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার হনুমানটি দেখছি আপনার সঙ্গেই রয়েছে। তবে লছমন ভাইয়াকে দেখতে পাচ্ছি নে কেন?

হেসে উত্তর দিলাম আমি: লক্ষ্মণের যেমন স্বভাব। জানকী আমার সঙ্গে নেই বলেই তা কি বদলাতে পারে? আমার লক্ষ্মণ ভাই কুটির পাহারা দিচ্ছে। সেখানে গেলেই তাকে দেখতে পাবে তুমি।

কিন্তু গঙ্গোত্রীরা আমার পাণ্ডার বাড়ীতে বা ধর্ম্মশালায় উঠবেন না। তাঁদের পরিচিত এক ভদ্রলোক আছেন এখানে—সরকারী পোষ্ট-অপিসে বেতার-বার্ত্তা বিভাগে কাজ করেন তিনি। তাঁর বাসাতেই গিয়ে উঠবেন তাঁরা।

আমি অগত্যা বাহাদুরকে ওঁদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম বাসাটা চিনে আসবে। উদ্দেশ্য, আমি জিতেনকে সঙ্গে নিয়েই সেখানে যাব।

কিন্তু কোথায় জিতেন? সে প্রাঙ্গণে নেই, ঘরে নেই, এ তল্লাটে কোথাও তাকে দেখা গেল না। অগত্যা একাই আমি গেলাম যে বাড়ীতে গঙ্গোত্রীরা গিয়ে উঠেছেন।

গঙ্গোত্রী তাঁর জননীকে নিয়ে তখন ঢুকলেন গিয়ে স্নানের ঘরে। ওটি যাঁর বাসা তিনিই সমাদর করে বসালেন আমাকে। শিক্ষিত ভদ্রলোক তিনি। বয়স বেশী নয়। অমায়িক, মধুর ব্যবহার তাঁর। মাস পাঁচেক যাবৎ এখানে আছেন। অনেক খবর জানেন তিনি। তাঁরই মুখে কিছু কিছু শুনলাম এই কেদারক্ষেত্র ও তার পারিপার্শ্বিকের বিবরণ।

পূর্ব্বদিকে অপেক্ষাকৃত নীচু যে পাহাড়টি তারই গায়ে পাকদণ্ডি পথের রেখা দেখা যায় কেদারক্ষেত্র থেকেও। সেই পথ বেয়ে অভিজ্ঞ লোকেরা অনেক উপরে উঠে যায় শিলাজতুর খোঁজে। পাণ্ডারাও যায় কোথায় নাকি ব্রহ্মকমল নামক এক রকমের যে ফুল ফোটে তাই কেদারেশ্বরের পূজার জন্ত আহরণ করতে। ঐ পাহাড়ের সঙ্গে সমান্তরালে পশ্চিম দিকে যে অনুরূপ পাহাড় দেখা যায় তাও সহজগম্য। আর উত্তরে ঐ যে বরফ-ঢাকা, আকাশ-ছোঁওয়া পাহাড়গুলি দেখা যাচ্ছে তাও নাকি অগম্য নয়।

উত্তরের ঐ পাহাড়গুলির গায়ে গায়ে বরফের উপর দিয়েই নাকি আসল মহাপ্রস্থানের পথ—স্বর্গারোহিনী স্রোতস্বিনীর গতি-পথের ধারে ধারে তারই উৎসের দিকে। এ অঞ্চলের মানস-সরোবর আছে ঐ পর্ব্বতশ্রেণীর পিছনে উত্তর-পশ্চিম কোণে বিরাট এলাকা জুড়ে। ফণা-তোলা সাপের মত তরঙ্গবিক্ষুব্ধ হ্রদ, বলে 'বাসুকীতাল' তার নাম। উত্তর-পূর্ব্ব কোণ দিয়ে স্বর্গারোহণের পথ। সেই পথেই গিয়েছিলেন পাণ্ডবেরা, গিয়েছিলেন তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরবর্ত্তীকালে অগণিত মহাপ্রস্থানের যাত্রী। মরদেহটিকে জীর্ণবস্ত্রের মত বর্জ্জন করবার উদ্দেশ্যে কেদারনাথের চরণতলে যাঁরা আসেন, বিষয়বিরাগী, ব্রহ্মজ্ঞানী সেই সব যাত্রী মন্দিরে দর্শন-আলিঙ্গনশেষে কেদারনাথের মন্দির পরিক্রমা সমাপ্ত করে দলে দলে এগিয়ে গিয়েছেন ঐ চিরতুষারের দেশে স্বর্গারোহণের পথ ধরে। অত কঠিন পথে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর দেহের পতন ত অনিবার্য্য। কেউ পা পিছলে পড়ে মরেছেন, কেউ শীতে জমে গিয়ে, কেউ বা তুষার ঝড়ের আক্রমণে বরফ চাপা পড়ে। স্বেচ্ছা-মৃত্যু সবই, তবু স্বর ভেদ আছে তার। মৃত্যু নিজে এগিয়ে এসে

যাকে গ্রহণ করে নি, তিনি নিজেই গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন মৃত্যুর কোলে।

শুনলাম যে, ঐ পথেই আছে ভৈরবঝম্প—ঐ সব পাহাড়েরই কোন একটি শিখর। তার পাদমূলে ব্রহ্মগুম্ফা না ভৃগুপাত নামক গভীর এক গুহা। স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে দেহত্যাগ করবার অদম্য বাসনায় এই সেদিন পর্য্যন্তও নাকি অনেক যাত্রী ঐ ভৈরবঝম্প শিখরের উপর দাঁড়িয়ে 'শিবোহহং' 'শিবোহহং' বলতে বলতে ভৃগুপাত, না ব্রহ্মগুম্ফার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।

সরকারী আদেশে কিছুদিন পূর্ব্বে পাথর দিয়ে বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে সাক্ষাৎ কৃতান্তের সেই করাল মুখগহ্বর।

তার মানে, রূপকথা নয় এসব কাহিনী। সত্যই, এই সেদিন পর্য্যন্তও ঐ বিশিষ্ট প্রক্রিয়ায় আত্মহত্যা করেছেন এই কেদার-তীর্থের কোন কোন যাত্রী।

শুনতে শুনতে গায়ে কাঁটা দিয়েছিল আমার। কিন্তু 'আত্মহত্যা' কথাটা মনে উঠতেই আমার চিন্তা ও কল্পনায় ছেদ পড়ল।

আত্মহত্যা, না মৃত্যুবিজয়? গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়বার মত মোটা মোটা গাছের ডাল বাড়ীর কাছেই অত থাকতেও বিশেষ একটি গুহার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্ত দুর্গম পথে হাজার হাজার মাইল যাঁরা হেঁটে আসতেন তাঁরা কি 'আত্মহত্যা' করতেন ঐ মহাপ্রস্থানের পথে?

বেঁচে থাকবার জন্ত এত আকুপাকু আমাদের। বৃদ্ধবয়সে আত্মীয়-পরিজনের চক্ষুশূল হয়েও সংসারকে আমরা আঁকড়ে থাকতে চাই। আর তাঁরা সংসার ছেড়ে এগিয়ে যেতেন সজ্ঞানে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে। সে পদ্ধতিতে জয় কার? মৃত্যুর? না যিনি মরতেন তাঁর?

ও কি উন্মত্ততা! মন তাও মানতে চায় না। মনে পড়ে ইতিহাসের সাক্ষ্য, আমার সংক্ষিপ্ত জীবনকালেই আমারই কত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। যুগে যুগে আমারই মত রক্তমাংসের কত নরনারীই ত সহাস্যমুখে আগুনে ঝাঁপ দিয়েছেন, ঘাতকের খড়্গের নীচে মাথা পেতে দিয়েছেন, ফাঁসির রজ্জুকে চুম্বন করেছেন, বুক পেতে দিয়েছেন গুলির মুখে, হাসতে হাসতে প্রাণ দিয়েছেন কেউ ধর্ম্মের জন্ত, কেউ বা দেশের স্বাধীনতার জন্ত। ওগুলিকে যদি আত্মহত্যা না বলি, উন্মত্ততা না বলি তবে মহাপ্রস্থানের পথে কেদারযাত্রীর মৃত্যুবরণকে ঐ ব্যাখ্যা দিয়ে ছোট করব কোন হিসাবে?

শাশ্বত ঐ আবেগ। অন্ততঃ জীবনেরই সমবয়সী মানুষের মনে ঐ রোমাঞ্চকর মৃত্যুপ্রীতি। বার বার ভোল বদল করেও দেশে দেশে, যুগে যুগে ঐ একই উন্মত্ততা জীবনের রঙ্গমঞ্চে অনুপ্রবেশ করে সাধারণ মানুষকে অসাধারণ করেছে।

বৃথা চেষ্টা অতি-সতর্ক মানুষের। ভৃগুপাত বা ব্রহ্মগুম্ফাকে পাথর দিয়ে বুজিয়ে দিলে কোন লাভ হয় না। মরার আগেও দু'বেলাই যারা মরে তেমন মানুষকে কোন দিনই টান দেয় নি ঐ গুহা। আর বহু ভাগ্য বলে মহাসিন্ধুর ওপার থেকে ভেসে-আসা মহাজীবনের সঙ্গীত একবারও যার মনের কানে প্রবেশ করে তাঁর মহাপ্রস্থানের পথ পাথরের বেড়া তুলে বন্ধ করা যায় না।

থেকে থেকেই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই আমরা। কেদারের উত্তরে মহাভারত যুগের মহাপ্রস্থানের পথ আজ বন্ধ। কিন্তু বন্ধ হয় নি দেবতাত্মা হিমালয়ের উদাত্ত আহ্বান। আজও এই হিমালয়ের দুর্দ্দম আকর্ষণে দেশ-বিদেশ থেকে ছুটে আসে দুর্দ্ধর্ষ অভিযাত্রীদল। পাগল হয়ে ছুটে যায় তারা এক শিখর থেকে অন্ত শিখরে। অনেকেই ফিরে আসে। কিন্তু কেউ কেউ ফিরতে পারে না। তুষারের নীচে বা কোন গভীর গুহার মধ্যে জীবনের অবসান হয় তাদের।

এরাও সেই পঞ্চপাণ্ডবেরই সগোত্র মহাপ্রস্থানের যাত্রী।

এ সব আমার মস্তিষ্কের চিন্তা। কিন্তু চিরন্তন দ্বন্দ্ব রয়েছে মস্তিষ্কের সঙ্গে হৃদয়ের। শুনতে শুনতে বুক কাঁপছিল আমার। একটা দুর্ব্বোধ্য আশঙ্কা আমার মনে—কি প্রেরণা আছে কেদারনাথের ঐ ছোট্ট মন্দিরটির মধ্যে যা লাভ করে রক্তমাংসের দুর্ব্বল মানুষই মুহূর্ত্তে মৃত্যুঞ্জয় হতে পারে।

সেই জন্তই গঙ্গোত্রীর শোকসন্তপ্তা বৃদ্ধা জননীকে মন্দিরে প্রবেশ করতে দেখে ভয় পেয়েছিলাম আমি। কিন্তু তিনি পূজা শেষ করে বের হয়ে আসবার পর বেশ উৎফুল্ল দেখলাম তাঁর রোগক্লিষ্ট, জরালাঞ্ছিত বলিষ্ঠ মুখখানি।

উল্লসিতকণ্ঠেই আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন তিনি: পরম আনন্দ পেলাম ভাই—বড় শান্তি। অভাগিনীকে বুঝি দয়া করেছেন কেদারনাথজী।

গঙ্গোত্রীও দেখি উৎফুল্ল। আমাকে তিনি চুপি চুপি বললেন, আমি বাঁচলাম, চাচা। গত পাঁচ বছরের মধ্যে মাকে আমি এত খুশী কোন দিনই দেখি নি।

এবার ফলাহারী বাবাকে দর্শন করতে যাবেন তাঁরা। মন্দিরের কাছেই পশ্চিম দিকে বাবার কুটির।

বোধ করি লছমন ঝোলাতেই কার কাছে যেন শুনেছিলাম এই ফলাহারী বাবার কথা। সংসারীর তুলনায় সন্ন্যাসীমাত্রই অসাধারণ। সন্ন্যাসীর মধ্যেও আবার অসাধারণ ঐ ফলাহারী বাবা। কিছু আভাস রয়েছে তাঁর নামেই। আগে নাকি ফলমূল ছাড়া আর কিছুই খেতেন না তিনি। তার চেয়েও কঠিন পরিচয় তাঁর বর্ত্তমানের। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী কেদারক্ষেত্রে উপস্থিত হবার পর এ জায়গার স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছেন। শীতকালে প্রবল বরফপাত হয় এই কেদার পাহাড়ে—এত বেশী যে, ঘরবাড়ী সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় সেই বরফের নীচে। স্বয়ং কেদারনাথজীও মেনে নিয়েছেন যে, কোন মানুষের পক্ষেই তখন কেদারক্ষেত্রে বাস করা সম্ভব নয়। তাই তিনিও শীতকালে ছুটি দেন তাঁর পাণ্ডা পুরোহিতকে।

মন্দিরের দ্বার বন্ধ করে তাঁরাও তখন কয়েক হাজার ফুট নীচে নেমে যান আত্মরক্ষার জন্ম।

যান না কেবল ঐ ফলাহারী বাবা। শীতের ছয় মাসও নিজের ঐ ছোট্ট কুটিরখানিতে একেবারে একাকী বাস করেন তিনি।

গতকাল সকালেই জিতেন একবার দেখে গিয়েছে ফলাহারী বাবাকে। তাঁর নিজের মুখ থেকেই শুনে গিয়েছে তাঁর বিস্ময়কর জীবনযাত্রার কিছু কিছু কাহিনী। তার আবার কিছু কিছু জিতেন রাত্রে বলেছিল আমাকে। কিছু খাদ্য সঞ্চিত থাকে ফলাহারী বাবার কুটিরে—থাকে প্রচুর কাঠ। বরফ পড়া শুরু হলে কুটিরের দ্বার বন্ধ করে ধুনি জেলে তপস্যায় মগ্ন হয়ে যান ফলাহারীবাবা। বাইরে অবিরাম বরফ পড়তে থাকে। পুরু হয়ে জমে সেই বরফ তাঁর কুটিরের চালের উপর, নীচে দোরগোড়ায় তাঁর বহির্গমনের পথ বন্ধ করে হাঁটু সমান, কোমর সমান উঁচু হয়ে। মাঝে মাঝে ফলাহারী বাবা তাঁর ধুনির আগুন প্রয়োগ করে দোরগোড়ার সেই পুঞ্জীভূত বরফ গলিয়ে একটু পথ করে বাইরে বের হয়ে আসেন, খন্তা-কোদালের সাহায্যে নিজের হাতেই বরফ সরিয়ে পরিষ্কার করে নেন তাঁর কুটিরের সামনে ছোট্ট অঙ্গনটুকু, সরিয়ে দেন চালের উপরকার জমা বরফস্তূপ যাতে বরফের ভারে চালখানি ভেঙে না পড়ে।

—একেবারে একা কেন থাকেন বাবা? জিতেন জিজ্ঞাসা করেছিল তাঁকে।

শুনে নাকি গম্ভীর স্বরে উত্তর দিয়েছিলেন তিনি: একা কেন থাকব। দোসর থাকেন কেদারনাথজী।

—তাহলেও এ সব কাজে আপনাকে সাহায্য করবার জন্য দু'একটি চেলা রাখেন না কেন?

উস্‌সে সাধন-ভজনকা বিঘ্ন হোতা হৈ।

সেই ফলাহারী বাবা। আমি ভেবেছিলাম যে, অত্যন্ত কঠোর ও কঠিন হবেন তিনি।

কিন্তু আসলে তা নয়। এখন অবারিত দ্বার তাঁর কুটিরের। সকলের সঙ্গেই কথা বলেন তিনি, জিজ্ঞাসা করলেই প্রশ্নের উত্তর দেন। যা বলেন সবই তত্ত্বকথা। কিন্তু বলেন ঘরোয়া ভাষায়। সে ভাষা হিন্দী। কিন্তু শুনতে শুনতে আমার মনে হ'ল যে, শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের প্রতিধ্বনি শুনছি।

আমরা তাঁর কুটিরে গিয়ে ঢুকতেই কানে এল আমার যে একজনকে তিনি বলছেন, বিবেক, বৈরাগ্য, ত্যাগ, ধ্যান, ধারণা, এ ছাড়া আর ত পথ নেই বাবা। আর ও পথে চলতেও হবে তোমার নিজেকেই। আমি কেবল তোমাকে আশীর্ব্বাদ করতে পারি। আসল কাজটা বাপু তোমারই।

শান্ত, গম্ভীর কণ্ঠস্বর ফলাহারী বাবার, আর তাঁর মুখখানাও গম্ভীর। যতক্ষণ ওখানে ছিলাম, হাসতে দেখলাম না তাঁকে। তবে ভ্রূকুটিও নেই সে মুখে। করুণাঘন মূর্ত্তি।

অমলধবল বা গৌরকান্তি নয়। কালো রং। কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট দেহ। মাথায় জটা ও মুখমণ্ডলে পাতলা দাড়িগোঁফ আছে। অত যে শীত কেদারে তবু তাঁর দেহে ভস্ম ছাড়া অন্য কোন আবরণ নেই। কটিতে কিছু থাকলেও তা কৌপীন জাতের—আসন করে বসেছেন বলে তাও চোখে পড়ে না। তাঁর সামনের নাতিগভীর ধুনিতে কাঠের গুঁড়ি একটির এক মুখে শিখাহীন গনগনে আগুন। খুব ধীরে ধীরে পুড়ে ভস্ম হচ্ছে সেই কাঠ। কাঠের আগুন বলেই একটু ধোঁয়াও আছে ঘরের মধ্যে। খুব স্পষ্ট কিছুই চোখে পড়ে না।

স্বয়ং ফলাহারী বাবাও নন।

হয়ত ইচ্ছা করেই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকেন তিনি। মেঝে থেকে খানিকটা উঁচু বেদীর মত তাঁর আসন কুটিরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে। সেই আসনের উপর প্রায় দেয়াল ঘেঁষে তিনি বসেন। তাঁর সামনে ঐ প্রকাণ্ড ধুনি তাঁকে পৃথক করে রাখে দর্শনার্থীর ভীড় থেকে। ইচ্ছা করলেই ভক্ত পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে পারে না তাঁকে। গঙ্গোত্রীর জননীও পারলেন না।

তাঁর নিষ্প্রভ চোখে ফলাহারী বাবাকে স্পষ্ট দেখতেও পাচ্ছেন না তিনি। কিছুক্ষণ ব্যর্থ চেষ্টা করবার পর ক্ষুব্ধকণ্ঠে তিনি বললেন, আপকা দর্শন ভী ত নহী মিলতা হৈ, মহাত্মাজী।

গম্ভীর স্বরে উত্তর হ'ল: মুঝকো ক্যা দেখেগী, মায়ী। দর্শন করো কেদারনাথজীকো।

মায়ের হয়ে মেয়েই বললেন, কেদারনাথজীকে দর্শন করেই আমরা আপনার কাছে এলাম, বাবা।

বেশ, বেশ—বলে উঠলেন ফলাহারী বাবা: তব মজেমে ঘর লোট যায়ো। উনকা প্রসাদ ত মনমে জরুর মিলা হোগা। অব দুসরেসে ক্যা মাঙনা?

শুনেই গঙ্গোত্রী তাঁর জননীকে জড়িয়ে ধরলেন। ফলাহারী বাবার মুখের কথাটাই যেন লুফে নিয়ে তিনি বললেন, শুনলে ত মা? বাবা তোমাকে বলছেন ঘরে ফিরে যেতে।

হ্যাঁ!—আবারও গম্ভীর কণ্ঠ বেজে উঠল ফলাহারী বাবার, ঘরে গিয়ে ভগবানের নাম কর। ভক্তি থাকলে নিজের ঘরে বসেই তাঁকে পাওয়া যায়।

বৃদ্ধারই মনের কথা ওটি। তবু ঐ কথা শোনামাত্রই যেন বুকের মধ্যে তাঁর অবরুদ্ধ আবেগ উথলে উঠল। গাঢ় স্বরে তিনি বললেন, কিন্তু আমার সে ত বাবা, বুঝল না ও কথা—আমাকে ছেড়ে, আইবুড়ো মেয়েকে ছেড়ে, সংসার ছেড়েই চলে গেল।

কে?—জিজ্ঞাসা করলেন ফলাহারী বাবা। একটু যেন বিহ্বল তাঁর কণ্ঠস্বর।

বৃদ্ধা উত্তরে বললেন, আমার স্বামী।

কিন্তু তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করলেন গঙ্গোত্রী, না, বাবা। আমার মা জানেন না—সত্য কথা বুঝিয়ে বললেও উনি মানতে চান না তা। আমার বাবা সংসার ছেড়ে যান নি, মারা গিয়েছেন।

ঠিক সেই স্বর গঙ্গোত্রীর কণ্ঠে বা রামপুর চটিতে আমি শুনে-

ছিলাম ঠিক এই বিষয়েই ওঁর সঙ্গে আলাপ শুরু করবার পর। বিষণ্ণ, বিপন্ন কণ্ঠস্বর। শুনলেই গঙ্গোত্রীর জন্ত সমবেদনায় শ্রোতার অন্তর কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠে।

হয়ত তাই হয়েছিল সংসার-ত্যাগী ফলাহারী বাবারও। তিনি চিমটা দিয়ে ছাই ঝেড়ে ধুনির আগুন যথাসম্ভব উজ্জ্বল করে দিলেন। সেই আলোকে ক্রমান্বয়ে মা ও মেয়ের মুখ দেখলেন তিনি বারকয়েক এবং তার পরেও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অবশেষে নিজের স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর স্বরে তিনি বললেন, রোনো এক হী বাত হৈ বেটী। ঔর, মায়ী, শোক করনে কী কোই বাতভী নহী। ঈশ্বর নে উনকো বোলা লিয়া। সময় হোনেসে তুমকোভী বোলা লেঙ্গে। তবতক তুম খুশমেজাজসে অপনা কাম করতে রহো।

কথা বের হ'ল সাধুর মুখ থেকে। কিন্তু যার উদ্দেশ্যে বলা তিনি সংসারী জীব—নারী এবং বৃদ্ধা। ও কথা শুনে কাতর কণ্ঠে তিনি বললেন, আমার যে বাবা, বুক খালি, ঘর খালি। কি কাজ করব আমি!

নাম কর—ফলাহারী বাবা উত্তরে বললেন, সাধুসন্তের সেবা কর। তা হলেই ঘর-বুক সব ভরে উঠবে।

বলতে বলতে হাতের চিমটা দিয়ে জলন্ত কাঠখানি আর একবার ঝেড়ে দিলেন ফলাহারী বাবা। সঙ্গে সঙ্গেই গনগনে আগুনের উজ্জ্বলতর দীপ্তিতে ঈষং উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সাধুর মুখখানি। সে মুখ এতক্ষণ পর মোটামুটি চোখে পড়ে থাকবে বৃদ্ধার; তিনি অকস্মাং উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, আপনার চেয়ে বড় সাধু আমি আর কোথায় পাব, বাবা। আপনারই সেবা করব আমি। দয়া করে আমার ঘরে চলুন আপনি। না হয় এখানেই আপনার কাছে থাকবার অনুমতি আমায় দিন।

আমি ঠিক ঐ মুহূর্তেই একটু যা চঞ্চল দেখলাম ফলাহারী বাবাকে। পিছন দিকে একটু সরে বসলেন তিনি; ধুনির আলোর সাক্ষাং গতিপথ থেকে নিজের মুখখানি সরিয়ে নিয়ে যেন আগের চেয়েও গম্ভীর স্বরে তিনি উত্তর দিলেন, দেখছ না মায়ী? অন্নপূর্ণার কোল থেকে ছিনিয়ে এনে কেদারনাথজী তাঁর নিজের দোসর করেছেন আমাকে। তিনিই আমার দেখাশোনা করেন। আর কোন সেবার আমার দরকারই নেই। যে চায় তার সেবা করগে তুমি।

কে সে?—বৃদ্ধার কাতর কণ্ঠে এবার যেন ঔংসুক্যের রেশ।

ফলাহারী বাবা উত্তর দিলেন, অপনা আখে খুলকর দেখো—মিল যায়েগা। অব যায়ো মায়ী। খুশ রহো।

বিরক্তি না হোক, হুকুমের সুর বাবার শেষের কথাটাতে। বুদ্ধিমতী গঙ্গোত্রী আবার বৃদ্ধাকে জড়িয়ে ধরে অনুনয়ের সুরে বললেন, বাবার উপদেশ আদেশ দুই-ই ত তুমি পেলে, মা। এখন প্রণাম কর বাবাকে। তার পর চল।

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা যায় না ফলাহারী বাবাকে—আগুনের পরিখা রয়েছে তাঁর তিন দিকেই। মাটিতেই মাথা ঠেকিয়ে উদ্দেশে তাঁকে আর একবার প্রণাম করলেন বৃদ্ধা। তার পর মেয়ের হাত ধরে ধীরে ধীরে বের হয়ে গেলেন তিনি।

দেখাদেখি আমিও প্রণাম করলাম। আর একবার ফলাহারী বাবার মৃদু, গম্ভীর কণ্ঠস্বর কাণে এল আমার, খুশ রহো।

ইচ্ছা থাকলেও সে দিনটা কেদারক্ষেত্রেই থেকে যাবার উপায় ছিল না তাঁদের। গঙ্গোত্রীর ঘোড়াওয়ালা ক্রমাগত তাকে তাড়া দিচ্ছিল। প্রকৃতির তাড়না আরও প্রবল। একেই ত দুর্দান্ত শীত ওখানে—চনচনে রোদে দাঁড়িয়েও বৃদ্ধাকে শীতে কাঁপতে দেখেছিলাম। সেই রোদও নিভে গিয়েছে এখন। দুপুর হতে না হতেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালিয়ে বাঁচতে চান তাঁরা।

বিদায়ের পূর্ব্বে বার বার দুঃখ করলেন গঙ্গোত্রী তাঁর 'ভাইয়া'র সঙ্গে দেখা হ'ল না বলে। আমার মনে ক্ষোভের সঙ্গে একটু বিরক্তিও—জিতেন এখন উপস্থিত থাকলে ওঁদের সঙ্গেই আমরাও রওনা হতে পারতাম।

বিরক্তি আমার উদ্বেগ হয়ে উঠল ওঁদের বিদায় দেবার পর। তাইত—জিতেন গেল কোথায়?

খোঁজ করতে করতে একটি সূত্র পাওয়া গেল—একজন অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শকের খোঁজ করেছিল জিতেন একাধিক স্থানীয় লোকের কাছে, যাকে সঙ্গে নিয়ে সে উত্তরের ঐ চিরতুষারের দেশে যাত্রা করতে পারে।

অসম্ভব নয়। তার ঐ ইচ্ছা ইতিপূর্ব্বে একাধিকবার জিতেন নিজেই আমাকে জানিয়েছে। তবু অন্য একজনের মুখে জিতেনের সেই পুরাতন অভিলাষের কথা নূতন করে জানবার পর ভয়ে আমার বুক কেঁপে উঠল—পূর্ব্বে যা আমি জানতাম না, ইতিমধ্যে তা যে আমার জানা হয়ে গিয়েছে! যা ছিল কেবলই পাহাড়, তা যে এখন আমার চোখেও স্বর্গারোহণের পথ—যার সঙ্গে এসে মিলেছে ভৈরবঝম্প, ভৃগুপতি, ব্রহ্মগুম্ফা ইত্যাদি পরলোকের সোজা পথগুলিও।

অতীতে যে দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণ শত শত কেদারযাত্রীকে ঐ আসল মহাপ্রস্থানের পথে টেনে নিয়ে গিয়েছে, সেই চৌম্বক শক্তিই কোন অদৃশ্য পথে জিতেনের মনের উপর কাজ করছে না ত?

বাহাদুরকে সঙ্গে নিয়ে তখনই উত্তর দিকে রওনা হলাম আমি।

মন্দিরের পিছনে ক্ষেতের আলের মত সরু পায়ে-চলা-পথ আছে একটি। এঁকেবেঁকে নীচের দিকে গতি তার। তেমন খাড়া অবশ্য নয়, তবে দুস্তর। স্থানে স্থানে জল জমে রয়েছে, গুল্মের মত যা ওখানে জন্মে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে তাই পচে গিয়ে ভিন্ন-জাতের এক রকম কাদা হয়ে জমে আছে ও পথের সর্ব্বত্রই।

অবিরাম বৃষ্টিতে শেওলা জমে পিছল হয়ে আছে প্রত্যেকখানা পাথরই। আর ততক্ষণে টিপটিপ করে বৃষ্টিও শুরু হয়েছে।

অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে চললাম দু'জনে।

তবে খুব বেশী দূর পর্য্যন্ত নয়। খানিকটা চলবার পরেই স্বয়ং মন্দাকিনীই আমাদের গতিরোধ করলেন।

প্রথম দর্শনেই মন্দাকিনী বলে তাকে চেনা যায় না এখানে। ওদিকের তুলনায় চওড়া বেশী, কিন্তু গভীরতা কম। খুব রৌদ্র পেয়ে উপরের বরফ বেশী পরিমাণে গললে অথবা খুব বেশী বৃষ্টি হলে নিশ্চয়ই খুব ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করেন ইনিও। তবে আপাততঃ দেখছি জল খুব কম। বালি এখানে নেই, তবে পরিমাণে বালুকণার মতই অসংখ্য ছোট-বড় শিলা ছড়িয়ে আছে সন্তস্নাতা এই মন্দাকিনীর নাতিগভীর দোলনার মধ্যে।

অর্দ্ধবৃত্তের আকারে সারা উত্তরদিকটা জুড়ে আছেন মন্দাকিনী—আর দুধ, মধু, ক্ষীর ইত্যাদি এসে পড়ছে তার মুখে। অর্থাৎ উত্তরের ঐ আকাশচুম্বী পর্ব্বতশ্রেণীর গা বেয়ে বেয়ে শতধারায় জল নেমে এসে মিশছে মন্দাকিনীর জলের সঙ্গে। দুধগঙ্গা, মধুগঙ্গা ইত্যাদি নাম সেই সব ছোট বড় স্রোতস্বিনীর।

তবে জল ওখানে দাঁড়াতে পারে না বলেই মোটেই গভীরতা নেই মন্দাকিনীর, চেষ্টা করলে পায়জামা না ভিজিয়েও ওপারে যাওয়া যায়। সেই চেষ্টাই করেছিলাম আমি। কিন্তু পার হবার আর প্রয়োজন হ'ল না। পূর্ব্বদিকে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে যে জায়গায় মন্দাকিনীকে দেখলাম—তুলনায় খুবই ক্ষীণকায়া, সেখানেই জিতেনের দেখা পেয়ে গেলাম। সে কিন্তু জল পার হয়ে ওপারে চলে গিয়েছে।

উপরে কেদারনাথের মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়েই লক্ষ্য করেছিলাম আমি। উত্তর-পূর্ব্ব কোণে বরফ-ঢাকা দুটি গিরিশৃঙ্গের মাঝখানে আকৃতি ও বিন্যাসের বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। নিকষকালো নীরেট পাথরের খাড়া পাহাড় দু'দিকেই। কিন্তু উভয়ের মাঝখানে পিঙ্গলবর্ণ রাশি রাশি ভাঙা টালি যেন বিশৃঙ্খল ভাবে স্তূপীকৃত হয়ে আছে। পরে যখন শুনলাম যে উপরের মহাপ্রস্থানের পথে মৃত্যুর হাঁ-করা মুখটাকে সরকারের হুকুমে পাথর দিয়ে বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন ভেবেছিলাম যে ঐ বুঝি দূর থেকে বয়ে আনা সেই সব পাথরের স্তূপ—বুঝি হিমালয়ের কোলে ঐ বিচিত্র ব্যতিক্রমটুকুই অতীতের সেই ভৃগুপাত বা ব্রহ্মগুম্ফাকে চিহ্নিত করে রেখেছে। সেই ধারণাই আমার মনে আরও প্রবল হয়ে উঠল যখন দেখলাম যে, ওপারে সেই অংশটুকুরই পাদমূলে দাঁড়িয়ে উপর দিকে চেয়ে আছে জিতেন।

প্রথমে বাহাদুরই দেখতে পেয়েছিল তাকে, সেই উল্লাসের স্বরে বলে উঠল, ঐ যে ছোটা বাবুজী।

দেখেই আমিও যথাসম্ভব গলা চড়িয়ে ডাকলাম, জিতেন, ও জিতেন।

ভাগ্য ভাল আমার, দু'তিনবার ডাকবার পরেই শুনতে পেল সে।

আরও সৌভাগ্য যে, আমার ইসারা বুঝতে পেরে জিতেন তখনই এপারে চলে এল।

আমি তাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার পূর্ব্বেই নিজেই সে বললে, দূর থেকে মণিদা মনে হয়েছিল আমার যে একটা ফাঁকা জায়গায় বুঝি পাশের কোন একটা পাহাড়ের বড় একটা অংশ ভেঙে পড়ে স্তূপ হয়ে আছে। কিন্তু আসলে দেখলাম যে, তা নয়। ভিন্ন রঙের একেবারে আলাদা একটি পাহাড় ওটি। দূর থেকে যে পাথরগুলিকে আলগা মনে হয়, তা কাছে গিয়ে দেখি বড় রুই মাছের আঁশের মত পাহাড়টার গায়েই আটকে রয়েছে।

আমার মনের সব কৌতূহল তখন একটি অস্পষ্ট, কিন্তু প্রবল আশঙ্কার নীচে চাপা পড়ে গিয়েছে। জিতেনকে আমি খুলে বলতেও পারি না সে আশঙ্কার কথা, পাছে আমার কথা শুনেই আরও বেশী ঝোঁক চাপে তার ঐ পাহাড়টাকে খুঁচিয়ে দেখবার জন্য। এখন ভালয় ভালয় তাকে ফিরিয়ে নিতে পারলে বাঁচি আমি। তাই ও প্রসঙ্গের উল্লেখমাত্র না করে আমি বললাম, তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান আমরা। বাহাদুরকেও ত কিছু বলে আসনি তুমি। কি করে বুঝব যে, এই দিকে এসেছ?

কিন্তু আমার কথা যেন কানেই গেল না তার। সে মুখ ফিরিয়ে আবার ঐ পাহাড়টার দিকে চেয়ে বললে, ওপরে ওঠবার ইচ্ছা ছিল আমার। কিন্তু পথ খুঁজে পেলাম না।

আমি তাড়াতাড়ি তার একখানা হাত চেপে ধরে বললাম, পথ খুঁজে পেলেই কি উঠতে পারব আমরা? আর পারলেও ওঠা উচিত নয়। ওপরে ত আর চটি নেই—গেলে থাকব কোথায়?

জিতেন প্রতিবাদ করল না দেখে আশ্বস্ত হয়ে আমি আবার বললাম, চল ফিরে যাই। দেখছ না বৃষ্টি ক্রমেই বাড়ছে। এমন খোলা জায়গায় আর কিছুক্ষণ ভিজলে আমরাও জমে বরফ হয়ে যাব।

একরকম টেনেই ফিরিয়ে নিয়ে এলাম তাকে।

দু'দিন পর ফিরবার পথে নালাচটিতে আবার ঐ প্রসঙ্গ উঠেছিল। স্থানীয় কার সঙ্গে যেন অনেক রাত পর্য্যন্ত গল্প করবার পর ঘরে ফিরে এসে বেশ একটু উত্তেজিত স্বরেই জিতেন বললে, শুনেছেন মণিদা। কেদারের পিছনের ঐ পাহাড়গুলির মধ্যে কোথায় নাকি একটি গুহা আছে। সেকালে যাত্রীরা তার মধ্যে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করত বলে গবর্ণমেণ্ট নাকি সেটি বুজিয়ে দিয়েছে।

শুনেই ভাবানুষঙ্গে সেদিনের সব কথা মনে পড়ে গেল আমার। হঠাৎ বুকটাও কেঁপে উঠল। জিতেনের মুখের দিকে চেয়ে রুদ্ধনিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলাম, এ খবর আগে জানতে না তুমি? কেদারে গিয়ে শোন নি কারও মুখে?

ঘাড় নেড়ে অস্বীকার করল জিতেন। কিন্তু তার পরেই অন্য

একটু হেসে সে বললে, ভাগ্যিস জানা ছিল না। কেদারে গিয়ে যে রকম মনের অবস্থা হয়েছিল আমার তাতে ঐ খবর জানা থাকলে আমি নির্ঘাৎ সে গুহাটিকে খুঁজে বের করতাম।

আর তার পর বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়তে তার মধ্যে ?

সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে দিয়ে জিতেন উত্তর দিল, এখন আর কি করে বলি তা! ঝাড়া থাকলেও তা কেটে গিয়েছে।

একটু থেমে সে আবার বললে, ঝাড়া সত্যি কেটে গিয়েছে মণিদা। নইলে কি আর জীবনের দেবতা বদরীনারায়ণকে দর্শন করতে ছুটি!

জীবনের জয়যাত্রা।

কেদারক্ষেত্রে থাকতে থাকতেই নিজেও লক্ষ্য করেছিলাম আমি। ঐ ত কেদারনাথের দক্ষিণদুয়ারী মন্দির! তার উপরেও জীবন তার বিজয়বৈজয়ন্তী উড়িয়েছে।

শঙ্করাচার্য্য কেদারনাথ ও তাঁর মন্দিরের সংস্কারসাধন করেছিলেন। কিন্তু শঙ্করের শঙ্করও ইতিমধ্যে পুনরায় রূপান্তরিত হয়েছেন।

সেই রাত্রে শ্রীকেদারেশ্বরের আরতি দেখতে দেখতেই মনে হয়েছিল আমার যে, জীবের কাছে আবার হার মেনেছেন শিব।

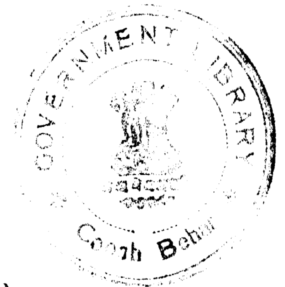
ভাবসর্ব্বস্ব কেদার-শিলারই রাজবেশ এখন। যোগীশ্বরেরও শৃঙ্গারবেশ। শঙ্করাচার্য্যের উপাস্য শিবকেও রাজার বেশে, ভোগীর বেশে সাজিয়ে তবে তাঁর আরতি করা হয়। শীর্ষে এখন সোনার মুকুট তাঁর, গায়ে মহামূল্য কিংখাবের মণিমুক্তাখচিত উত্তরীয়। তার উপর আবার থরে থরে মালা। অন্য যে কোন মন্দিরে যেমন, এখানেও তেমনি—ধূপ, দীপ, ব্যজনী ইত্যাদি দিয়ে পর্য্যায়ক্রমে আরতি করা হয় রাজরাজেশ্বররূপী কেদারনাথের। গমগম শব্দে কাঁসর-ঘণ্টা বাজে, স্তোত্রগান হয় পূজারী ও ভক্তবৃন্দের সমবেত কণ্ঠে।

নির্ব্বিকল্প সমাধিতে তৃপ্তি হয় না ভক্তের। সুষুপ্তি নয়, স্বপ্নই বুঝি অধিকতর কাম্য তার। চিদানন্দরূপী শিবকে ষড়ৈশ্বর্য্যময় ভগবানে রূপান্তরিত করেছে সে।

একালে জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা আর নন এই কেদারনাথ; তিনি এখন নবজীবনের প্রেরণা। শঙ্করাচার্য্য বদ্রীনাথে দিব্যজ্ঞান লাভ করে জীবনের শেষ পূজা করতে এসেছিলেন কেদারক্ষেত্রে। একালের যাত্রীরা কেদারনাথকে দর্শন করবার পর জীবনের দেবতা বদরীনারায়ণের দেউলের উদ্দেশে যাত্রা করে।

আমরাও তাই করলাম পরদিন। নূতন যাত্রায় নূতন মন্ত্রে—জয় বদরীবিশালকী জয়।

ক্রমশঃ



উপনিষদমালা

শ্রীপুষ্পদেবী

(কঠোপনিষদ প্রথম অধ্যায় তৃতীয় বল্লী ১৩ শ্লোক)

যচ্ছেদ্বাঙ্ মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্ জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদযচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি॥

সংযত কর ওগো চঞ্চল বাক্য বিলাস যত
মনের মাঝেতে লীন হয়ে যাক উচ্ছাস শত শত
শুধু সেই জ্ঞান বক্ষ ভরিয়া
পরাণ পাত্রে উঠে উপচিয়া
সে জ্ঞান প্রবাহে ধুয়ে মুছে যাবে দ্বিধা সংশয় যত
কার্য্য কারণ বিকার বিহীন পরমাত্মাতে রত।

প্রাণ চেতনার নিরমল ধারা যাবে দিকে দিকে বয়ে
সে কি আনন্দ পরিপূর্ণতা যাবে তার সাথে লয়ে
ক্ষুদ্র তটিনী আর সেই নয়
মহা সাগরেতে পায় সেই লয়
আপনার মাঝে আপনি মগন থামিয়াছে কলরব
সবার অতীত তাঁহারে পাইয়া পূর্ণ তাহার সব॥

একজন অজ্ঞাত মহিলা কবি

শ্রীঅনিলকুমার আচার্য্য

"জীবনে অনেক সাধ
গিয়াছে বিফল হয়ে।
অতৃপ্ত বাসনা, আশা
তৃষ্ণা এনেছে বয়ে;
তাহাদের অভিঘাতে
ব্যথিত ব্যাকুল প্রাণ,—
লেখনীর মুখে তাই
অশ্রু করেছি দান।"

এই বেদনা-করুণ উক্তিতে যে কাব্যের(১) আদি থেকে অন্ত পর্য্যন্ত বিধুর, সে কাব্যের ইতিহাস, বিশেষতঃ কবির জীবন-কাহিনী কোন অর্থেই নগণ্য নয়। বস্তুতঃ, এই একটি মাত্র বেদনা-ময় উক্তিতে কবির সমস্ত জীবন ও কাব্য সাধনার মূল সুরটি বিধৃত। 'ব্যথিতার গান' কাব্যের প্রথমে আছে "এষার কবি", "রবীন্দ্রনাথ" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা প্রিয়লাল দাস এম-এ, বি-এল, মহোদয়ের লিখিত কবির জীবন-কাহিনী। কলিকাতা নগরীর এক বিদ্যানুরাগী ব্রাহ্মণ পরিবারে চারুলতার জন্ম হয় ১৩০৮ সালের ১৫ই কার্ত্তিক তারিখে। সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ বিখ্যাত পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ ও বহু ভাষাবিদ মহামহোপাধ্যায় আচার্য্য সতীশচন্দ্র বিদ্যা-ভূষণ এম-এ, পি-এইচ-ডি সিদ্ধান্ত মহোদধি, শাস্ত্র সুধাকর, ত্রিপিটক বাগীশ্বর এবং 'দক্ষিণাপথ ভ্রমণ', 'রামানুজ চরিত' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী চারুলতার জ্যেষ্ঠ-তাত ছিলেন। চারুলতার পিতা যতীন্দ্রভূষণ আচার্য্য বঙ্গ সরকারের অধীনে চাকুরি করতেন। অধ্যাপক শ্রীধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ, বি-এল, পি, আর, এস, অধ্যাপক হেমচন্দ্র শাস্ত্রী প্রভৃতি আই-এ, এস কৃতবিদ্য মহোদয়গণ চারুলতার ভ্রাতা।

মাত্র দশ বৎসর বয়সে চারুলতার বিদ্যালয়ের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন হয়। এ সম্বন্ধে চারুলতার ছোট বোন শান্তিলতা দেবী লিখেছেন,(২) "কলিকাতা পুলিশ কোর্টের সুযোগ্য ইণ্টার প্রিটার শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ ঘোষাল এম-এ-র সহিত চারুলতা দেবীর দশ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। ইতিপূর্ব্বে ঘোষাল মহাশয়ের প্রথমা স্ত্রী সংসার ভাসাইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। দশ বৎসর বয়স্কা বালিকা চারুলতা সেই সংসারে সেতু বাঁধিলেন।"

কিন্তু বিদ্যালয়ের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন হলেও চারুলতার পড়াশুনায় ছেদ পড়েনি। তাঁর পাঠস্পৃহা ছিল খুব প্রবল, মেধা ছিল অসাধারণ আর বুদ্ধিও ছিল খুব তীক্ষ্ণ। স্বামীগৃহে গিয়েও নিয়মিত পাঠাভ্যাসের অনুশীলনের ফলে তিনি বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজী ও ওড়িয়া ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শিতার জন্য কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ হতে 'ভারতী' উপাধি লাভ করেন।

বিবাহের পর চারুলতা অনূ্যন ছয় বৎসর কাল সুস্থ ছিলেন। মাত্র ষোল বৎসর বয়সে তিনি প্রবল হাঁপানী রোগে আক্রান্তা হন। কবির জীবনে এ থেকেই বিষাদের সূত্রপাত। তখন হতে ১৩৩৭ সালে মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত অনবরত এই রোগে তিনি ভুগেছেন। শুধু দৈহিক কষ্টই নয়, চারুলতার জীবনী মানসিক দুঃখকষ্টেরও এক সকরুণ কাহিনী। সে কথা আমরা পরে লিখছি। কিন্তু উচ্চ শিক্ষালাভ না করেও আজীবন অতিশয় ভগ্ন স্বাস্থ্য ও ভগ্ন মন নিয়ে এই মহিলা তাঁর স্বল্পপরিসর জীবনে যেরূপ অক্লান্ত ভাবে কাব্যচর্চ্চা করে গেছেন, তা বাস্তবিকই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কিন্তু দৈহিক ও মানসিক কষ্ট-যন্ত্রণা চারুলতার কবি-প্রতিভার বিনাশ সাধন করতে পারে নি, তাঁর কাব্যে এর ফলে বেজে উঠেছে বিষাদের এক সকরুণ সুর। আজীবন এরূপ নিরবচ্ছিন্ন ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে অক্লান্ত কাব্যচর্চ্চার দৃষ্টান্ত শুধু বঙ্গ-সাহিত্যে কেন, পৃথিবীর যে-কোন সাহিত্যেই বিরল। বোধ হয় শুধু এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিংয়ের সঙ্গেই এ ব্যাপারে চারুলতার তুলনা চলতে পারে। দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত থাকার পর চারুলতা দেবী বুঝেছিলেন তিনি স্বামীর সংসারযাত্রার সহায়রূপে কোন কার্য্যের ভার গ্রহণে অসমর্থ। অথচ স্বামীর প্রতি তাঁর ভালবাসার অন্ত ছিল না। বস্তুতঃ চারুলতার বহু কবিতা স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রগাঢ় ভালবাসায় প্রোজ্জ্বল। একটি নারীহৃদয় স্ত্রী রূপে, মাতা রূপে স্বামীসোহাগিনী রূপে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের এই পৃথিবীকে উপভোগের জন্য ব্যাকুল—কিন্তু এ জীবনে আর বুঝি তা হ'ল না সম্বৎসর রুগ্নদেহে জীবন্মৃতের মত থেকে থেকে জীবনের শত আশা, শত সাধ, শত কল্পনা রোগশয্যার পার্শ্বে আছড়ে পড়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। জীবন-দেবতার নিকট তাই কত প্রার্থনা—ভক্তি অপ্লুত অশ্রু কোমল হৃদয়ের কত কান্না। 'ব্যথিতার গান' একটি

(১) ব্যথিতার গান: চারুলতা দেবী, সিংহ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৩৪।১ বাদুড় বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত। প্রকাশ এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিমিটেড, ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, আশ্বিন, ১৩৪০। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৵০+ন+১৭৯ মূল্য—১০ কবির মৃত্যুর পর তাঁর রচনা সংগ্রহ করে উক্ত কাব্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

(২) 'ব্যথিতার গান' কবিজীবনী; পৃষ্ঠা ধ।

বেদনামথিত হৃদয়ের স্বতঃউৎসারিত অশ্রুরাজি। কাব্যগ্রন্থটির নামেই এর সুস্পষ্ট প্রকাশ।

কিন্তু 'ব্যথিতার গান' শুধু আত্মবিলাপের নিরবচ্ছিন্ন ক্রন্দনেই ভরপুর নহে। কবির প্রকৃতি-প্রীতি, স্বাদেশিকতাবোধ, স্বামীভক্তি প্রভৃতির সহিত যুক্ত হয়েছে অপরিসীম ভগবদ্ নির্ভরশীলতা—যা রোগতাপদগ্ধ কবির জীবনে সান্ত্বনা ও শক্তির উৎস। এই বিশ্বাসেই তিনি লিখেছিলেন :

"জীবন-দেবতা, পেয়েছি তোমারে জীবনের প্রতি কাজে,
প্রতি নিমেষের অন্তরালে নাথ, তোমারি প্রতিমা রাজে।"
—জীবন দেবতা

কাননে কুসুমের অপরূপ বর্ণসুষমায়, জোনাকীর দীপ্ত অঙ্গে, নবকিশলয়দলে, প্রকৃতির চারুতায়, নদীর স্বচ্ছন্দ-প্রবহমান সাবলীল গতিতে, আরক্ত ঊষার অপরূপ বর্ণচ্ছটায় ও নৈশনীরবতায় কবি তাঁর জীবন-দেবতার প্রকাশ দেখে বিস্ময়-বিমুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকেন। কবির প্রকৃতি-প্রীতিমূলক কবিতাগুলি ভগবদ্-ভক্তিতে অনুস্যূত। বিরাট অম্বুধি যেমন ভগবানের মানচিত্র, অণুপরমাণুতেও তেমনই তাঁর তুল্য প্রকাশ। ক্ষুদ্র কবি হৃদয় কি ভগবানের চরণরেণুতে পূত হবে না? মাঝে মাঝে কিন্তু "জীবন-দেবতার" আভাসে, কবি হৃদয়ের দ্বিধা-সংশয়ের সকল অন্ধকার দূর হয়ে যায় :

"অন্ধকার, ঘোর অন্ধকার
অন্ধকারে ডুবিব কেমনে?
আঁখি দুটি মুদিয়া সভয়ে
রহিলাম গুপ্ত গৃহকোণে।
মেলিলাম নয়ন যখন
সবিস্ময়ে দেখিলাম চেয়ে,
কোথা ভয়, তমসা কোথায়
কান্তরূপে বিশ্ব গেছে ছেয়ে।"—আভাস

কিন্তু স্বদেশপ্রেম ('আবার জাগো হে বঙ্গবীর'—উদ্বোধন)—স্বামীভক্তি, ভগবদভক্তি প্রভৃতির সুর কবির কাব্যে যতই ধ্বনিত হোক্ না কেন, চির স্বাস্থ্যহীনতাজনিত ব্যর্থজীবনের উদ্গত অশ্রু তাতে লুক্কায়িত থাকে নি।(৩) ভগবানের নিকট সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণের মুহূর্তেও কবির মনে জেগে উঠে দারুণ অভিমান বোধ। হাসি-অশ্রুজল যখন হৃদয়ের কোণে আঘাত করে তখন ধারণাশক্তি ভগবানেরই চরণতলে লুটিয়ে পড়ে সত্য (৪), কিন্তু জীবন-দেবতাকে একথাও শুনতে হয় :

(ক) হে দেবতা, "নিয়েছ অটুট স্বাস্থ্য তাতে কাঁদি নাই,
নয়নের দৃষ্টি আমি চিরতরে চাই।"—আবেদন

(খ) "জীবন যদ্যপি তব স্নেহ আশীর্বাদ,
আনন্দ জাগে না কেন চারিদিকে তার?"—কেন?

মাঝে মাঝে এক অজানা চিন্তায় দেশের কবিচিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠে। ভব জলধির ধারে, নীলিমার পরপারে যে দেশ আছে(৫) সে দেশ কি এই পৃথিবীরই মত চাঁদের কিরণে, ঊষার পেলবতায়, ফুলের হাসিতে ভরপুর? জীবনের যত ভুলভ্রান্তি, দেহের যত যন্ত্রণাক্লেশ, পার্থিব ভালবাসা, স্নেহ, আশা, হাসি, প্রীতি, সুখ, স্মৃতি—সব কিছুই কি দেহের সঙ্গে বিলীন হয়ে যায়? মৃত্যুতেই কি জীবনের পরিসমাপ্তি? কবির মনে এরূপ কত কি দ্বিধা ভয়সংশয় জেগে উঠে। কিন্তু কে এসব প্রশ্নের উত্তর দেবে? কে তাঁর সংশয়ের নিরসন করবে? অজানা দেশের ডাক কবিচিত্তকে আলোড়িত করে তুলেছে সত্য, কিন্তু কৈ? মন ত বারণ মানে না! সবে এই ত জীবনের প্রভাত! দেহ-নিকুঞ্জে যৌবন-কুসুম প্রস্ফুটিত হয়েছে মাত্র। এখনই কি, এত শীঘ্র, এত সকালে পৃথিবী হতে বিদায় নিতে হবে? এই পৃথিবী কি খেলাঘর মাত্র? এখানে কি শুধু দু'দিনের কান্না-হাসি? কবি দুঃখে বলে উঠেন :

"তরুণ হৃদয়ে এ কে বাসনার ছবি
কি দেখিব আর?
জীবন-বেলায় গড়া বালুকার ঘর
ভেঙ্গেছে আমার।"—চিত্র

হাজারো কামনা, অযুত বাসনা-আশাভরা নারী-হৃদয়ের দেহের নিকট এই যে পরাজয়—রূপরসগন্ধস্পর্শের পৃথিবীকে উপভোগ করার প্রবল আকাঙ্ক্ষার এই যে ব্যর্থ পরিণতি, তা কবির কাব্যকে এক করুণ রসে সিক্তিত করে দিয়েছে।

কিন্তু কবির কাব্যের এই যে দুঃখের সুর, চারুলতার স্বাস্থ্য-হীনতাই তার একমাত্র উৎস নহে। 'মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত বাঙালী গৃহস্থের সংসারে ভাগ্যবিড়ম্বনায় গৃহিণীর অক্ষমতা অনেক

---

(৩) তুমি কি বুঝিবে সখি
কি যাতনা মরমে আমার?"—নিশির প্রতি

(৪) "হাসি-অশ্রুজল হৃদয়ের কোণে
যখন আঘাত করে,
ধারণা শকতি তোমার চরণে
তখনি লুটায়ে পড়ে।"—আত্মহারা

(৫) "ভব জলধির ধারে
নীলিমের পর পারে
কোথায় সে দেশ?
যায় কি তথায় দেখা
অরুণের জ্যোতিরেখা,
আলোকের লেখা?
সেথা কি চাঁদিমা তারা
বরষে অমিয়-ধারা
কিরণ ঢালিয়া?
ঊষার তরুণ রবি
ফুলের ললিত ছবি
উঠে কি হাসিয়া?"—অজানা দেশ

সময় যে শোকাবহ ঘটনাবলীর চিত্রলোক নয়নের অন্তরালে অবচেতনের মধ্যে নারীর মানসপটে প্রতিফলিত করিয়া তোলে, চারুলতার লেখনীমুখে তাহার বর্ণনা কাব্যাকারে বাহির হইয়া আসিয়াছে। চারুলতার পদ্যময় সুবৃহৎ আত্মজীবনী "শোভাময়ীর জীবনকাব্যে কবি-হৃদয়ের সেই ট্রাজেডি পরিস্ফুট।"(৬)

কবি যখন বুঝতে পারলেন, তাঁর রোগ আর সারবার নয়, তখন তিনি একদিন স্বামীর সহিত ভাবী সপত্নীর গৃহে গিয়ে তাঁকে মনোনীত করে আসেন।

"চারুলতা ইহার পর গৃহে ফিরিয়া আসিয়া ব্যথাভরা হৃদয়ের অব্যক্ত হাহাকার কালিদাসের মেঘদূতে বর্ণিত যক্ষ ও যক্ষ-পত্নীর বিরহ-স্মৃতির সহিত মিশাইয়া 'শোভাময়ীর জীবনকাব্যে' যেভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে মনে হয়, তিনি মুখে যাহাই প্রকাশ করুন, কাজে যাহাই প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করুন সে সময়ে, তাঁহার অন্তরের অন্তরতম স্থানে জ্বালাময়ী অগ্নিস্রাব তাঁহার কোমল নারী-হৃদয়কে—তাঁহার সমুদয় অস্তিত্বকে দগ্ধ করিতেছিল। সপত্নী নির্ব্বাচনে যেটুকু রোমাঞ্চ বিষাদময়ীর জীবনকাব্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার অলৌকিক সৌন্দর্য্য ট্রাজেডির ঘনান্ধকারে ডুবিয়া গেল। নারী-হৃদয়ের রঙ্গভূমিতে অসপত্ন স্বামীপ্রেমের ব্যাঘাত-জনিত অন্তর্দ্বন্দ্ব যথার্থই কল্পনাতীত।"(৭)

কবির "জীবন কাব্যে" ষোড়শ হতে চতুর্ব্বিংশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত জীবনের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই কাব্যরচনার পর কিছুকম চারি বৎসর কাল চারুলতা জীবিত ছিলেন। জীবনের এই শেষ কয় বৎসরে কবির জীবন-দর্শনে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন এসেছিল। সুদীর্ঘকাল মানসিক দুঃখ, শোক, অন্তর্দ্বন্দ্বের সহিত যুদ্ধ করে কবি শেষজীবনে চিত্তের প্রশান্তি ও ভগবানে পরিপূর্ণ বিশ্বাস লাভ করেছিলেন। দুঃখের অগ্নি-পরীক্ষার ভিতর দিয়ে মানুষ যে মহত্তর জীবনের দিকে অগ্রসর হয়, কবির শেষ পর্য্যায়ের কবিতাগুলিতে সে বোধের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর লক্ষনীয়:

(ক) "না ফুরায় আঁখিনীর যদি এ জনমে প্রভু
মানিয়া লইব আমি সেও দান তব বিভু।"—বরণ

(খ) আমি জানি সফলতা মনোরম সাজে,
জেগে থাকে জীবনের ব্যর্থতার মাঝে।"—সাফল্য

(গ) "পীড়িত, দলিত আমি
এ তো নয় দুঃখের কারণ,
পীড়াই এখন দেব
ফুটায়েছে আমার নয়ন।"—পুরস্কার

(ঘ) "কখনো নিষ্ফল নয় জীবনের কঠোর সাধনা"
—প্রলয়ে

(ঙ) "অনাগত দিনগুলি পরিপূর্ণ করি নিরন্তর
তোমার মধুর নাম হৃদয়ের প্রতি স্তরে স্তরে
চিরদিন উজলিয়া থাকে যেন অমর অক্ষরে।"
—প্রার্থনা

বস্তুতঃ, কবির জীবনের শেষ কয় বৎসরে রচিত অধিকাংশ কবিতা ভাবের গভীরতায়, চিন্তার দ্যোতনায়, প্রকাশনৈপুণ্যে ও বৈচিত্র্যে সমসাময়িক সাহিত্য জগতে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেছিল। তাঁর রচিত কবিতাসমূহ বিচিত্রা, বামাবোধিনী, পঞ্চপুষ্প, জন্মভূমি, মাতৃমন্দির, অর্চ্চনা, বিকাশ, বিশ্বজনীন, পুষ্পপাত্র প্রভৃতি বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

চারুলতার কাব্য বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে সমসাময়িক কাব্য-সাহিত্যের আলোচনা প্রয়োজন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে (১৩০৮ বঙ্গাব্দে) চারুলতার জন্ম। তাঁর জন্মের ঠিক সাত বৎসর আগে বিহারীলালের মৃত্যু হয়, আর দুই বৎসর পরে হেমচন্দ্রের ও আট বছর পরে নবীনচন্দ্রের। সে সময়ে অক্ষয় বড়ালের কবি-প্রতিভা সুপ্রতিষ্ঠিত, আর রবীন্দ্র-কাব্য প্রতিভার ত তখন মধ্যাহ্ন লগ্ন। অর্থাৎ যে সময়ে চারুলতার কবি-সত্তার বিকাশ, তখন বঙ্গ-সাহিত্যে মহাকাব্যের ধারা অপসৃতপ্রায়, আর গীতি-কবিতার গতি স্বচ্ছন্দ-প্রবহমান। চারুলতার পাঠস্পৃহা ছিল অসাধারণ। সুতরাং তিনি স্বভাবতঃই পূর্ব্বজ ও সমকালীন কবিদের কাব্যের সহিত পরিচিত হয়েছিলেন। অন্ততঃ অক্ষয় বড়াল ও রবীন্দ্রনাথের কবিতার স্বাদ তিনি পেয়েছিলেন—এর প্রমাণ তাঁর কবিতায়ই আছে।

চারুলতার উপর বড়াল-কবির প্রভাব কতকটা বিষয়বস্তু ও ছন্দ নির্ব্বাচনে, কতকটা দৃষ্টিভঙ্গিতে।

চারুলতার

"কত যে আকুল আশা, কতখানি কাতরতা,
হৃদয়ে জাগিয়া উঠে কত যে বিফল ব্যথা,
তরঙ্গিয়া মহাব্যোম
উদ্ভাসিয়া সূর্য্যসোম
তোমার চরণতলে ছুটে যায় কত কথা"

এই অংশের সহিত অক্ষয় বড়ালের নিম্নোক্ত পঙক্তি কয়টি ছন্দসাদৃশ্যের জন্য তুলনীয়:

"অতি অসহায় প্রীতি দাঁড়াইয়া পথ ধারে,
দিয়া হাসি দিয়া গান বরিয়া লহ গো তারে!
নগর প্রান্তর ঘুরি,
ত্যজি, কত রাজপুরী,
কি পুণ্যের ফলে আজি এসেছে তোমার দ্বারে।"

---

(৬) প্রিয়লাল দাস লিখিত 'কবিজীবনী' পৃষ্ঠা ন। 'ব্যথিতার গানে'র সঙ্গে একত্র গ্রথিত হয়ে 'শোভাময়ীর জীবনকাব্য' প্রকাশিত হয়েছিল। সমস্ত কাব্যটি ১৯১৬ ছন্দে সমাপ্ত। ইহাতে কবির ষোল হতে চব্বিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত জীবন-কাহিনী বিবৃত হয়েছে। কবির পঁচিশ বৎসর বয়সের সময় এই কাব্য রচিত হয়।

(৭) 'কবি-জীবনী'—প্রিয়লাল দাস, পৃষ্ঠা দ

অক্ষয়কুমারের "পৃথিবীর শত দুঃখে হৃদয় শতধা চুর"৮ অথবা "কি দুর্বহ আমার জীবন।"৯ এই দুটি কবিতার সহিত চারুলতার নিম্নোক্ত দুটি কবিতাংশের ভাবসাদৃশ্যও লক্ষ্য করার মত :

(ক) "তুমি কি বুঝিবে সখী কি যাতনা মরমে আমার ?
বুঝিবে কি দিবানিশি প্রাণে কেন জাগে হাহাকার ?"
—রজনীর প্রতি

(খ) "এ জীবন লয়ে আর কতদিন
সময় কাটাতে হবে ধরণীর বুকে ?
দুঃসহ দুঃখের ভারে হইয়া মলিন
শূন্যে চেয়ে আর কত রব ম্লান মুখে ?"
—নিরাশায়

চারুলতার কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর লেখা 'জীব না দেবতা' প্রভৃতি কবিতা রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দেবতার' ছায়ামাত্র। তা ছাড়া রবীন্দ্রকাব্যের উন্নততর শব্দসম্পদ চারুলতার বহু কবিতায় লক্ষ্যণীয়। অবশ্য চারুলতার কাব্যের শব্দসম্পদ শুধু রবীন্দ্র-কাব্য পাঠের ফলেই গড়ে উঠে নি, এর মূলে রয়েছে তাঁর সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি ও বহু অধ্যয়নজনিত মার্জিত মন। চারুলতার

"ছাড়িতে শোভন বসুধারে
কখনো ত হৃদয় না সরে !"

রবীন্দ্রনাথের "মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে"র কথা মনে করিয়ে দেয়।

তাঁর

"আজি পুষ্পকাননে গুঞ্জরে অলি
মধুঝঙ্কৃত বিহগ-কাকলী
ঝরিছে শেফালী সৌরভ ঢালি
হাসিয়া উঠিছে ধরণী"

অথবা

"মন্দিরে আজি বাজিছে শঙ্খ, অর্ঘ্য পূরিত থালা
জ্বলিছে প্রদীপ, কুসুম পাত্রে শোভিছে পুষ্পমালা
মঙ্গল ঘট সিন্দুর মাখা
চন্দনলিপ্ত আম্রশাখা
চারু আলিপনা গৃহ কুট্টিমে যত্নে রয়েছে ঢালা,
কর্পূর ধূপ চামর শঙ্খে পূর্ণ আরতি ডালা"

প্রভৃতি কবিতাংশে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব লক্ষণীয়। রবীন্দ্র-কাব্যসাম্রাজ্যের মধ্যে বাস করে চারুলতার কাব্যে রবীন্দ্র-কাব্যের ছায়াসম্পাত না হওয়াই অস্বাভাবিক। কিন্তু উপরের দৃষ্টান্ত সত্বেও কবির কাব্যের সামগ্রিক বিচারে রবীন্দ্রনাথের তথা অক্ষয়কুমারের প্রভাব নিতান্তই আপত্তিক।

বঙ্গদেশের মহিলা কবিদের কাব্য ব্যক্তিগত জীবনের হতাশা ও দুঃখের অশ্রুতে মেদুর। "ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতা এবং অপ্রাপ্তির মধ্য থেকেই তাঁদের বিশেষ কাব্যদর্শন গড়ে ওঠে।" বঙ্গের অন্যতম আদি মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর কাব্যের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রাবতীর রামায়ণ ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখের অশ্রুবিন্দুতে করুণ। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে কামিনী রায়, মানকুমারী বসু প্রভৃতির কবিতায়ও কবিমানসের ব্যক্তিগত দুঃখ-বেদনার সুস্পষ্ট প্রকাশ। চারুলতা দেবীর কাব্যের মূলেও রয়েছে ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ, বঞ্চনা ও বেদনার সকরুণ ইতিহাস। একটি অনুভূতিপ্রবণ বেদনা-মথিত হৃদয়ের বহিঃপ্রকাশ এই কবিতাগুলি।

"বঙ্গের মহিলা কবি" পুস্তকের রচয়িতা শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সমস্ত মহিলা কবিদের কাব্য পর্য্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, "মহিলা কবিদের প্রত্যেকেরই কবিতায় একটা বিষাদের সুর—একটা নিরাশার সুর প্রবাহিত।" অন্যান্য মহিলা কবিদের সঙ্গে চারুলতার "সম্বন্ধসূত্র আবিষ্কার করতে গিয়ে প্রথমেই মনে হয় এদের সঙ্গে তাঁর চেতনার বিশেষতঃ মুডের এক বিশেষ অদ্বৈত সম্পর্ক আছে···অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে অন্যান্য মহিলা কবিদের সংযোগ বেদনার সেতুবন্ধে। যদিও সে বেদনা একই সমতলের হৃদয়জাত নয়।" (১০)

এইবার চারুলতার কাব্য-বিচার সুরু করা যাক। তাঁর বিভিন্ন কবিতা হতে কিছু কিছু উদ্ধৃতি বর্তমান প্রবন্ধে আগেই দেওয়া হয়েছে। তা থেকে আশা করি চারুলতার কবিত্ব, শিল্প-নৈপুণ্য ও কবিতার আঙ্গিক সম্পর্কে পাঠকের খানিকটা ধারণা হয়েছে। তাঁর অনাদৃত জীবনের বেদনাময় রূপটি তিনি কয়েকটি ইমেজের সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেছেন :—

(ক) নীরবে ফুটেছি, নীরবে ঝরিব,
মিশিয়া যাইব আঁধারে,
কাননের ফুল শুকাবে যখন,
কোলে তোলে নিও আদরে।
—বনের ফুল

(খ) বাগানের এক প্রান্তে
ফুটে আছে সূর্য্যমুখী ফুল···
তবু সে চাহিয়া আছে
নিশিদিন আকাশের পানে
জীবন জুড়াবে তার
চির প্রিয় দেবতার ধ্যানে
—ব্যথিতার গান

(গ) ঝরিছে শেফালি অশ্রু ঢালিয়া
—বোধনে বিজয়া

---

৮ 'নিশীথে'—শঙ্খ

৯ 'দুর্ব্বহ জীবন'—প্রদীপ

১০ এই প্রসঙ্গে শ্রীসুধীর চক্রবর্ত্তীর নীলনলিনী দেবীর কাব্য ও জীবন-কাহিনীমূলক প্রবন্ধ পঠিতব্য। নীলনলিনী দেবীর জীবনও চারুলতার মত দুঃখের এক করুণ কাহিনী।

(ঘ) ফুটিয়া ফুটিয়া ফুল বনপ্রান্তে পড়িল ঝরিয়া —প্রহেলিকা

উপরের চারটি ইমেজই তিনি পুষ্প-জগৎ থেকে আহরণ করেছেন আর তাতে তাঁর নিজের বঞ্চিত অনাদৃত জীবনের বেদনাময় প্রতিভাস যেরূপ আশ্চর্য্য কুশলতার সহিত ফুটিয়ে তুলেছেন, তা ভেবে বিস্ময়ে হতবাক্ হতে হয়। বিশেষতঃ, বাগানের এক প্রান্তে সূর্য্যমুখী ফুলের (চিরপ্রিয় দেবতার ধ্যানে) নির্নিমেষ প্রতীক্ষার রূপকটি আশ্চর্য্য ব্যঞ্জনাময়।

চারুলতার কবিতার শব্দসম্পদও লক্ষণীয়। সংস্কৃত ভাষা হতে তিনি অনবরত শব্দ চয়ন করেছেন, সমাসবদ্ধ ও সন্ধি গ্রথিত বড় বড় শব্দের ব্যবহার করেছেন, কিন্তু এর ফলে তাঁর কাব্যের সৌন্দর্য্যহানি ঘটে নি। পরন্তু সুনির্ব্বাচিত শব্দসমষ্টি আঙ্গিক নৈপুণ্যের সহিত যুক্ত হয়ে তাঁর কাব্যকে অপূর্ব্ব সুষমায় মণ্ডিত করেছে।১১

চারুলতার কাব্য-বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে মনে রাখা দরকার চারুলতার কবিতা তাঁর একান্ত নিজস্ব বেদনাসম্ভব কবি সত্তার বহিঃপ্রকাশ। আজীবন যে দুঃখের অনল তাঁর সমুদয় অস্তিত্বকে দগ্ধ করছিল, কবিতাগুলি তারই বেদনাময় অভিব্যক্তি। এই অর্থে চারুলতার কবিতাগুলি তাঁর জীবনের অনুপূরক। চারুলতা ছিলেন অতিশয় স্বল্পভাষিণী। অসহ্য দুঃখ-যন্ত্রণাও নীরবে হাসিমুখে সহ্য করার ক্ষমতা তাঁর ছিল। কিন্তু তার ফলে তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থল হতে যে শোণিত ক্ষরিত হ'ত, তার সাক্ষাৎ মিলত শুধু কবিতায়। 'ব্যথিতার গান' পাঠে চোখের সম্মুখে ভেসে উঠে এক বিষাদ-প্রতিমা, আর কানে বাজে বেদনা-বিধুর অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর

(ক) "একটি স্নেহের বাণী একটু প্রাণের প্রীতি
জগতে আমার তরে নাই।" —লক্ষ্যহারা

(খ) "ডুবেছে নিরাশা গর্ভে আনন্দের প্রতিমা তাহার
জীবনে সপ্তমীতিথি কোনদিন ফিরিবে কি আর?"
—নৈরাশ্য

বাস্তবিক, এই আনন্দপ্রতিমা চিরতরে বিষাদ ও নৈরাশ্যের অতল গর্ভে নিমজ্জিত হয়ে গেল। তাঁর জীবনের আকাশে সৌভাগ্য-শশী আর কোনদিন উদিত হয় নি।

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে চারুলতা লিখেছিলেন:—

"বেদনার রক্ত রাগে রঞ্জিত হৃদয়
তোমারে দিলাম সঁপি ওগো বিশ্বময়।" —উৎসর্গ (১২)

সমস্ত কাব্যটি পড়ে বেদনা-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্বীকার করতেই হয়, 'ব্যথিতার গান' চারুলতার বেদনাক্ষত হৃদয়ের 'রক্তরাগে' অনুলিপ্ত।

* * *

শুধু কাব্য ক্ষেত্রেই নয়, গদ্য রচনায়ও চারুলতা ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি 'নারী জাগরণের পদ্ধতি', 'স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একটি কথা', 'সভ্য সমাজে নব্য রোগ' প্রভৃতি বহু বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। চারুলতার বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রিয়লাল দাস লিখেছেন, "লজ্জাবতী বিনয়িনী মৃদু মৃদু ভাষ।" তাঁর গদ্য রচনায় এমন একটা স্বচ্ছন্দ পরিহাস-মধুর গতি ছিল, যা কবির নিজের সহিত তুলনায় সার্থক। এ গদ্যরীতি সরস, প্রাঞ্জল ও কৌতুকোজ্জ্বল।

নিম্নোক্ত অংশটি পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তি করবে:

"আপনি আমাকে দেখিতেছি প্রশংসার বেলুনে উড়াইয়া আমার উর্দ্ধগতি লক্ষ্য করিতেছেন। যে বেচারা অত উঁচুতে উঠিয়াছে তার প্রাণ পড়িয়া যাইবার ভয়ে যে জাগিয়া রহিয়াছে, সেটা আপনি বোধহয় ভাবিতেছেন না। দূরে থেকে পাহাড়গুলিকে বেশ সুন্দর দেখায়। মেঘের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়া কবিরা কত শত যুগ কাটাইয়া দিয়াছে, তবু তাহারা মেঘের সৌন্দর্য্য অঙ্কিত করিতে ক্ষান্ত হয় নাই। কল্পনা আমাদের চোখে এমন একখানা রঙিন চশমা আঁটিয়া দেয় যে, তাহার ভিতর দিয়া দূরের জিনিস অসুন্দর দেখায় না। ওসব আপনি জানেন, তবু যে আমাকে প্রশংসার উড়ো-জাহাজে তুলিয়া দিয়া দূরবীনের ভিতর দিয়া আমার উর্দ্ধগতি লক্ষ্য করিতেছেন, ইহাতে যদি আপনার অভিজ্ঞতা লাভের সুবিধা হয় ভাল, কিন্তু ভুলক্রমে কল্পনার বশীভূত হইবেন না।"

কিন্তু গদ্যরীতির শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও বঙ্গভাষার কাব্য নিকুঞ্জেই চারুলতার যথার্থ স্থান। চিরস্বাস্থ্যহীন দেহে নিরবচ্ছিন্ন অন্তর্দ্বন্দ্বের অগ্নিময় জ্বালা বক্ষে ধারণ করে অবরোধের মধ্যে ব্যথাভরা হৃদয়ের যে গান আজীবন তিনি গেয়েছেন, সে বিষাদ সঙ্গীতের সকরুণ ধ্বনি পাঠক-হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে চক্ষু অশ্রুসজল করে তোলে।

---

১১ সংস্কৃতপ্রধান অথবা সমাস ও সন্ধিবদ্ধ পদ:

অঞ্জন সন্নিভ অদ্রি, অম্বুরক, তমসা, উর্ম্মি প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ প্রধান কবিতা

"এখন গভীর নিশা, চিত্রার্পিতা দিগাঙ্গনাগণ
ধরণী সুপ্তির কোলে ঢালিয়াছে অঙ্গ আপনার
শীতল চন্দ্রিকা স্নাত, মহাকাল ধ্যান পরায়ণ—"

অথবা

ঝিল্লীকণ্ঠে ভেসে উঠে মঞ্জুল রাগিনী
নিশীথ প্রসূন ঢালে সুরভি সুন্দর।"

(১২) এ প্রসঙ্গে চারুলতার 'শেষ-সাধ' কবিতাটিও পঠিতব্য:

শেষ-সাধ

"অন্তর শোণিমা ঢালি পৃথিবীর বুকে
অস্তমান রবিসম—আমার জীবন
যে দিন বিদায় লবে বসুন্ধরা হতে,
স্নেহ-প্রীতি-প্রেম-ভরা আঁখি দুটি তুলি
সে দিন আমার পানে বারেকের তরে
চেয়ে দেখো চিরপ্রিয়; সকরুণ দুটি
নয়ন-পল্লবে মম, তব আঁখি-তারা
নিমেষের তরে যেন হয়ে থাকে স্থির।
তার পরে আমি—চির পরিপূর্ণ বুকে,
পরিতৃপ্ত সুখ-ভরে লইলে বিদায়,
স্মৃতির ফলকে এঁকে সেই ছবিখানি
তুমি ফেলে চলে যেয়ো আপনার কাজে।"

সাধ

শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী

দূর আকাশে ধূসর রংয়ের এক টুকরো মেঘ জমেছে, তেমনি মেঘ ঘনিয়েছে অপর্ণার মনে। বিরক্তিতে কুঞ্চিত ভ্রূ' চোখের দৃষ্টি বারে বারে ডান হাতের মণিবন্ধে—যেখানে ছোট্ট সোনার ঘড়িটি টিক্ টিক্ করে চলেছে—সেখানে পড়ছে।

অধীর-মনের চঞ্চলতাকে প্রকাশ করে দিচ্ছে তার দ্রুত পা নাড়ার ভঙ্গি।

ভ্যানিটি ব্যাগটি অকারণেই একবার খুলে আবার চট্ করে বন্ধ করে অপর্ণা। চশমার ভেতর দিয়ে চোখের শাণিত উজ্জ্বল দৃষ্টি জনবহুল রাজপথের উপরে ফেলে।

নাঃ, এখনও দেখা নেই আনন্দের।

রসকষহীন পার্কের এই বেঞ্চিটার গায়ের সঙ্গে যেন আঠার মত সেঁটে গেছে অপর্ণা, অনেকবার উঠে যাই যাই করেও উঠতে পারে নি। সূর্য ডোবার পরেও মেঘে মেঘে ছড়িয়ে-থাকা আলোর রেশের মত আনন্দের আসার আশা ছেড়েও ছাড়তে পারে নি সে।

চুরি করে বার করা বিকেলের এই দুর্লভ ক্ষণটুকু বৃথা বয়ে যেতে দেখলে কার না রাগ হয়! কথা দিয়ে ঠিক সময়ে যে আসতে পারে না, সে কি আবার পুরুষ! ঢের শিক্ষা হয়েছে—আর তার কথার মায়ার ফাঁদে পা দেবে না অপর্ণা। আসুক না একবার—এমন কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দেবে—

হঠাৎ পেছন দিকে চাপা নরম হাসির শব্দ শুনতে পেয়ে, আর সেই সঙ্গে ঘাড়ের উপর গরম নিশ্বাসের স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠে পেছন দিকে তাকায় অপর্ণা।

ঠিক তার পেছনে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে হাসছে লজ্জাহীন আনন্দ।

কিন্তু ওর হাসিটা কি মারাত্মক রকম ছোঁয়াচে—রাগ করতে গিয়েও হেসে ফেলে অপর্ণা।

ঘুরে এসে অপর্ণার পাশে বসে আনন্দ বলে, "ক্লাস-পালিয়ে আসা কি সোজা ব্যাপার! পঞ্চাশটি ছেলের কাছে পঞ্চাশ রকম কৈফিয়ৎ দিতে হ'ল। তবে হ্যাঁ, ভদ্রলোকের এক কথা—সবাইকে বলেছি যে—"

"থাক থাক, থামো—আর ওজোর দেখাতে হবে না—" কথার ভেতর বেশ একটু সরোসের ঝাঁঝ মিশিয়ে অপর্ণা বলে, "আমি যেন আর ক্লাস-পালিয়ে আসি নি—"

"আহা, তোমাদের, মেয়েদের কথাই যে আলাদা"—বুঝিয়ে বলার সুরে আনন্দ বলে, "চোখে চোখে ইসারাতেই বুঝে নেয়, বড়জোড় মুখ টিপে হাসে একটু। কিন্তু আমাদের যে দস্তুরমত কথা কয়ে জবাব দিতে হয়—তাও বিশ্বাসযোগ্য হওয়া চাই। ওসব আভাস-ইঙ্গিতের সূক্ষ্মতা মেয়েদেরই শুধু সাজে। আমরা হচ্ছি, যাকে বলে একটু স্থূল—সব বিষয়েই—"

"এবং নিরেট—" যোগ দেয় অপর্ণা।

"ঝগড়াই করবে শুধু আজকের এই আশ্চর্য বিকেলে?" ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সোজাসুজি প্রশ্ন করে আনন্দ।

"করব না? এক'শ বার করব। জানো, আধ ঘণ্টা ধরে ঠায় বসে আছি এখানে চুপটি করে। কত লোক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে গেল, কি ভাবল তারা বলত?" রাগ করে যে কথার শুরু তার শেষ দিকটাতে অভিমানের সুর স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অপর্ণার হাতটা নিজের হাতে তুলে নেয় আনন্দ, বলে, "ভাববে আবার কি! সত্যি কথা যা তাই ভেবেছে। ঐ দেখ না, ওপাশের ও বেঞ্চিটায় আমার মত উদাস প্রেমিক ছেলেটি একলাটি বসে আছে, ঘন ঘন রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে—বার বার ঠোঁট কামড়াচ্ছে—মেয়েটির দেখা নেই এখনো। নাও, এবার দুঃখ ঘুচল ত? চল, কোথায় তোমার সেই পাঞ্জাবী রেষ্টুরেণ্ট—শিককাবাব খাবার জন্য নোলা সকসক করছে—"

"পেটুক কোথাকার—" প্রতীক্ষার সব ব্যথা বেদনা ভুলে গিয়ে অপাঙ্গে আনন্দের পরিপাটি বেশ-ভূষার দিকে তাকিয়ে বলে অপর্ণা।

উঠে দাঁড়ায় ওরা দু'জন।

বিকেলের ফুরফুরে বাতাসে অপর্ণার বিশ্বভারতী শাড়ীর আঁচল ওড়ে, ঝুলানো বেণীর প্রান্ত দোলে আর মন ভোলে প্রিয় সমাগমে।

পাশাপাশি হাঁটে ওরা। মাঝে মাঝে কাঁধে কাঁধ, হাতে হাত ঠেকে যায়। দু'জনে চোখ তোলে, দু'জনের চোখে তাকায়, হেসে ওঠে।

ভাবনা-চিন্তাহীন পরিচ্ছন্ন ওদের জীবনে প্রথম প্রেমের ছোঁয়া লেগেছে। বিশ্বভুবন যেন মধুমাখা। জীবিকার্জনের রুদ্র সংগ্রাম থেকে এখনও অনেক দূরে ওরা। হৃদয়ে এখনও তাপ আছে—চোখে আছে স্বপ্ন।

অল্প দূরে, জম্‌কালো সাইনবোর্ডের নীচে কাটা দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢোকে আনন্দ আর অপর্ণা।

লোক গিসগিস করছে দমবন্ধ ছোট ঘরটায়। চেয়ার-গুলো সব ভর্তি। ডিস হাতে ছুটোছুটি করছে ব্যস্ত বেয়ারা-গুলো। আট-সাঁট শাড়ীপরা কয়েকটি মেয়ে-পরিচারিকা খদ্দেরদের কাছে গিয়ে তাদের ভোজনস্পৃহা জেনে নিচ্ছে। এক কোণে ক্যাশ-বাক্স আর মসলা নিয়ে বসে আছে বিপুলকায় সর্দারজী। কথাবার্তা, হৈ-হট্টগোলে ঘর সরগরম।

ভাগ্য ভাল ওদের। দেয়ালের কাছে লেডিস লেখা ছোট খুপরিটা খালি পেল ওরা।

ভেতরে ঢুকে বসতে না বসতেই বাসনা এসে কাছে দাঁড়ায়, বলে, "আপনাদের কি দেব বড়দা?"

বড়দা! চোখ তুলে বাসনার দিকে তাকায় আনন্দ। বেঁটে মোটা-সোটা মেয়েটির বয়স বছর পঁচিশ হবে। গোল শামলা রংয়ের মুখে দু'চারটি ব্রণের দাগ। সাদা শাড়ীর সবুজ পাড়টি সাপের মত পা থেকে উঠে গেছে পরিণত উদ্ধত বুকের মাঝখান দিয়ে কাঁধের ওপাশে।

অভ্যাসবশে বড়দা বলেই লজ্জায় পড়ে গেছে বাসনা। এরই মধ্যে অপর্ণাকে খুঁটিয়ে দেখা সারা হয়ে গেছে তার। বুঝে নিয়েছে ওদের সঠিক সম্বন্ধ। বুকের ভেতরটা কড়কড় করে ওঠে বাসনার।

ভাবলেশশূন্য স্বরে একবার বলে, "কি দেব আপনাদের বলুন?"

বাসনা 'বলুন' কথাটি শেষ করবার আগেই জোরের সঙ্গে আনন্দ বলে ওঠে, "শিককাবাব। শিককাবাব আর চা—দু'জনের জন্য—

অর্ডার নিয়ে বেরিয়ে যায় বাসনা। যথাস্থানে বলে এসে এদিকে আসতে আসতে ভাবে—বেশ মিলেছে কিন্তু জোড়াটি—পকেটে পয়সা কম—কিন্তু রেষ্টুরেন্টে খাবার সখ আছে ষোল আনা—

বুকের ভেতর কেমন একটা বেদনা অনুভব করে বাসনা। রোজ রোজ লেডিস লেখা পর্দা-ঘেরা ঘরগুলোতে জোড়া জোড়া তরুণ-তরুণীর খাওয়া, হাসি, ঠাট্টা, মান-অভিমান দেখে দেখে তার নিষ্প্রাণ যান্ত্রিক মনেও কেমন একটা শিরশির ভাব জেগে ওঠে। নিত্যদিনের টাকা-আনা-পাই এর হিসাবের বাইরেও যে একটা অতি সুন্দর জগত আছে তার অস্তিত্ব অস্পষ্টভাবে অনুভব করে সে।

কিন্তু এ জগতে তার প্রবেশাধিকার নেই। সে শুধু নীরব দ্রষ্টা। দেখে দেখে শুধু মনে ব্যথা পেতে পারে সে।

এখানে লোক আসে, বানাৎ করে পয়সা ফেলে খেয়ে যায়। কিন্তু দু'টি ভাত খাবার জন্য পয়সা জোগাড় করবার সংগ্রামটা যে কি কঠিন, কি ভয়ানক, তার পরিচয় লেখা আছে বাসনার দেহে আর মনে। একটা নিশ্বাস ফেলে বাসনা। বুকের ভেতরটা সীসার মত ভারী হয়ে উঠে।

"তিন নম্বর কেবিনে দুটো শিককাবাব আর দুটো চা—" এক পাক ঘুরে সর্দারজীকে বলে আসে বাসনা।

শিককাবাব আর চা পৌঁছে যায় তিন নম্বর কেবিনে।

সোৎসাহে খেতে থাকে আনন্দ আর অপর্ণা। সামান্য সামান্য কথায় দু'জনে হেসে ওঠে খিল খিল করে। সেই হাসির সুর রেষ্টুরেন্টের সমস্ত গোলমালকে ছাপিয়ে ওঠে—এমনি তার প্রাণশক্তি।

"শিককাবাব খেয়েই ত সময়টা কাবার হ'ল আজ—বেড়াবে আর কখন?" তৃপ্তির উদ্গার দিয়ে চায়ের পেয়ালাটা টেনে নিয়ে আনন্দ বলে।

"কার হ'ল কাবার, তোমার না আমার?" তরল সুরে অপর্ণা বলে।

"আমার—আবার কার?"

"হতে পারে তোমার, আমার নয়—আমার হাতে আজ অঢেল সময়—এমন কি সিনেমা দেখাও চলে—" চোখ নাচিয়ে অপর্ণা বলে।

"সত্যি?" দু'চোখ খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আনন্দের।

ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে দু'খানা সিনেমার টিকিট বার করে আনন্দের নাকের ডগার কাছে দুলিয়ে অপর্ণা বলে, "তোমার এ কথা জেনে লাভ? তোমার ত আর সময় নেই—"

"সময় হচ্ছে রবারের মত, যত ইচ্ছে টানা যায়, আর যত টানা যায় ততই বাড়ে। এ টানাটানিতে আমার মত ওস্তাদ খুব কমই আছে"—হাত বাড়িয়ে টিকিট দুটো অপর্ণার হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে আনন্দ বলে।

হাত সরিয়ে নেয় অপর্ণা, কাড়াকাড়ি পড়ে যায় দু'জনে।

পর্দার ওপারে দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে ওদের কথাগুলো যেন গিলতে থাকে বাসনা। ওর বঞ্চিত বুভুক্ষু মনে অপর্ণা-আনন্দের খুনসুড়ি ছোট ছেলের রূপকথা শোনার তৃপ্তি নিয়ে আসে।

নোংরা বস্তিতে একখানা মাত্র ঘর।

বাপ, গোকুল, কারখানায় মিলের চাকার দাঁতের কাছে গোটা ডান হাতখানা রেখে দিয়ে এসেছে আজ দু'বছর। বাতের ব্যথা কম থাকলে পাড়ায় পাড়ায় বাসন মাজার কাজ

করে বেড়ায় মা সৌদামিনী। ছোট ছোট তিনটি ভাই-বোন সব সময়ে খাবার জন্ম হাঁ করে আছে। অনেক চেষ্টা চরিত্র করে, অনেক কিছু খুইয়ে রেষ্টুরেন্টের এ চাকরিটা পেয়েছে বাসনা। এই পঁচিশ বছরের জীবনে মনের কোন সাধ-আহ্লাদই মেটাতে পারে নি সে।

তারও ইচ্ছে করে এই মেয়েটির মত বেণী দুলিয়ে, ছিমছাম শাড়ী পরে গোবিন্দের সঙ্গে গিয়ে রেষ্টুরেন্টের কোণে বসে খায়, হাসে, গল্প করে। তারপর সিনেমায় যায় একসঙ্গে।

কিন্তু ছুতার-মিস্ত্রী গোবিন্দর হাতে রোজ টাকা পয়সা থাকে না। যেদিন থাকে সেদিন মদে চুর হয়ে থাকে, তখন কোন কথা ভাল করে শোনার মত হুঁশ থাকে না তার। ভাল কথা বললেও গালাগালির বন্যা ছুটিয়ে দেয়। মন্দ কথা বললে ভেউ ভেউ করে কাঁদে। কিন্তু অন্য সময়ে গোবিন্দ একেবারে মাটির মানুষ। বাসনার জন্য আকাশের চাঁদ পেড়ে আনতে চায়, কিন্তু বাসনা চাঁদ চায় না, চায় চাঁদি, চায় সেই চাঁদি ভাঙিয়ে একটু ফুর্তি করতে।

আচ্ছা, গোবিন্দ যদি এই ছোকরাটির মত সুন্দর স্যুট পরে বের হয় তাকে সঙ্গে নিয়ে। কল্পনা করতেও দম বন্ধ হয়ে আসে বাসনার। গোবিন্দর পেশীবহুল সুঠাম পুরুষ-দেহটা চোখের সুমুখে ভেসে ওঠে। এমন মেয়েলি চেহারা নয় তার গোবিন্দর। হ্যাঁ, সাচ্চা পুরুষ একটি। নাই বা রইল তার স্যুট, আধ-ময়লা ধুতিতে আর কাঠের গুঁড়ো-লাগা তাঁতের সস্তা ছিটের হাফ-সার্টেও চমৎকার মানায় গোবিন্দকে।

হঠাৎ একটা তীব্র ইচ্ছা বাসনার বুকটাকে যেন চিরে ফেলে। ধ্বক ধ্বক করতে থাকে তার হৃৎপিণ্ডটা।

কাছেই ফার্ণিচারের দোকানটায় কাজ করে গোবিন্দ। এখনও বোধহয় কাজ করছে। দু' প্লেট শিককাবাব আর দু' কাপ চা—কতই বা তার দাম? জীবনের কোন্ সাধটাই বা পূর্ণ করেছে বাসনা? প্রেমাস্পদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে চা-খাবার খাওয়াটা বেশী কি আর এমন! গোবিন্দের কাছে টাকা থাকলে সিনেমা দেখবে—না থাকলে না-ই দেখবে। পর্দা-ঘেরা একটা ছোট্ট খুপরীতে মুখোমুখি বসে চা খেতে খেতে গল্প করবে সে আর গোবিন্দ। কথায় কথায় অমনি করে হেসে উঠবে।

তীব্র তীক্ষ্ণ কামনায় অধীর হয়ে ওঠে বাসনা।

বিল এনে আনন্দর হাত থেকে টাকা নিয়ে ভীড়ের ভেতর দিয়ে মালিকের ক্যাশ-বাক্সের দিকে হাঁটে না সে। কেউ তাকে লক্ষ্য করছে কিনা দেখতে দেখতে আনন্দ-অপর্ণার পেছনে পেছনে কাটা দরজা ঠেলে পথে গিয়ে নামে।

অল্প দূরেই গোবিন্দর ফার্ণিচারের দোকানটার সাইনবোর্ড দেখা যাচ্ছে।

বর্ত্তমান বাঙ্‌লা

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

(সংস্কৃত লীলাখেল ছন্দে)

অন্নের বস্ত্রের বিস্তর চিন্তায় লোকজন দিনরাত অস্থির আজ!
বিপ্লবময় ঘোর দুর্গম পন্থায় দুর্দম চায় দেশ ভাঙবার কাজ!
ইজ্জৎ রক্ষার নির্ভীক চেষ্টায় ভাববার বোধ নাই ভুল-নির্ভুল;
পুত্রের কন্যার ভার্য্যার ম্লান মুখ সব
পাপকার্য্যের হয় আজ মূল!

সম্মান নাই তাই সাম্যের গান গায়, দেশময় বিপ্লব হয় উদ্ভব;
বাঁচবার জন্যই মৃত্যুর রাস্তায় যৌবন পায় যশ মান গৌরব।
প্রাণ থাক্ নয় যাক্, ছারখার হয় হোক্ সুন্দর সংসার তার;
বন্দুক-পিস্তল নিষ্ফল নিষ্ফল তণ্ডুলহীন যার হয় ভাণ্ডার!

ওই শোন্ দুর্ব্বার বিপ্লব-হুঙ্কার চিত্তের কর্ণের দূর-পর্দ্দায়!
এক সাথ আজ সব অক্ষম দুর্ব্বল দুর্ভর দুঃখের নিঃশেষ চায়!
উচ্চের সাথ আজ নিম্নের লোকজন এইবার শেষবার চায়
সংগ্রাম;
নির্ম্মম দুর্দম অর্থের দুর্লোভ প্রাণ বধ করবার পায় দুর্নাম!

ক্ষুৎক্ষাম এই দেশ অস্থির চঞ্চল, দুশ্চিন্তায় আজ ঘোর উন্মাদ!
চাই আজ বিপ্লব রুখবার চেষ্টায় রক্তের বন্যায় অন্নের বাঁধ!
চক্ষের তেজ নাই, বক্ষের দুধ নাই, বৌদের প্রেম প্রাণ হয়
পয়মাল!
বাঙ্‌লার স্থল জল আসমান দশদিক সোরগোলময় আজ
ঘোর গোলমাল!

উড়িষ্যায় সংস্কৃত চর্চা

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

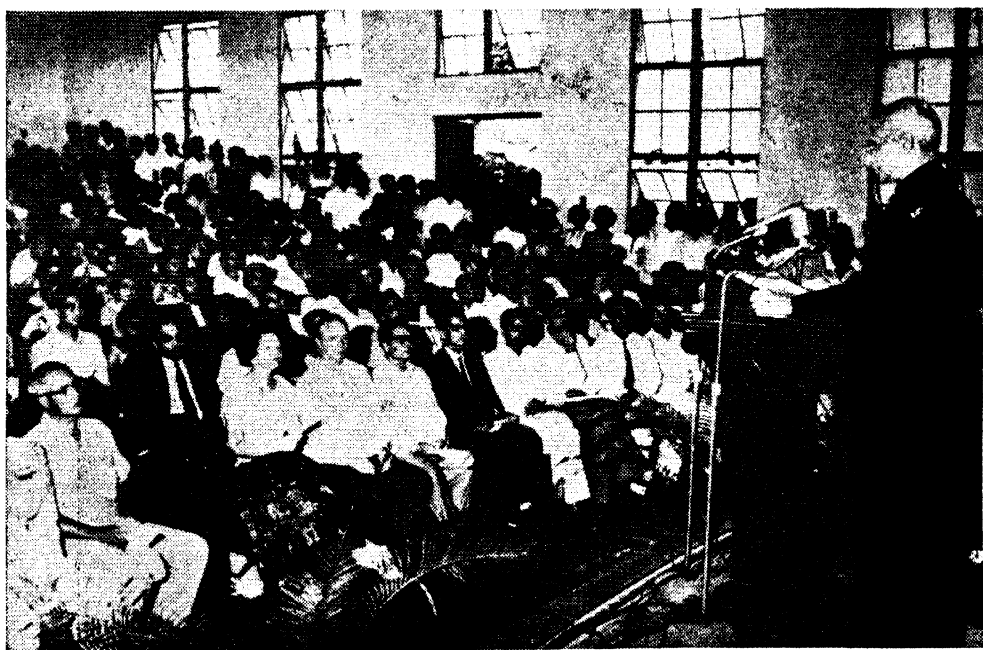
তীর্থস্থান হিসাবে উড়িষ্যার পুরুষোত্তমক্ষেত্র বা পুরী সারা ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজের নিকট সুপরিচিত, পরম শ্রদ্ধার বস্তু। ভুবনেশ্বর, পুরী, কণারকের মন্দিরের মারফত ইহার শিল্পসম্পদ্, সমগ্র জগতের শিল্প-রসিকের সমাদর লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই প্রদেশের সাহিত্যিক ঐশ্বর্য ও পাণ্ডিত্যগৌরবের কথা পণ্ডিতসম্প্রদায়েও সুপরিজ্ঞাত নহে—পণ্ডিতসমাজের বাহিরে ইহার প্রচার নগণ্য। অথচ উড়িষ্যার বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্যবিচার বিষয়ক গ্রন্থ 'সাহিত্যদর্পণ' ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সংস্কৃতের ছাত্রদের অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ—উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র গজপতির সভাসদ্ চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ রামানন্দ রায়ের জগন্নাথ-বল্লভ-নাটক বাংলার বৈষ্ণবসমাজে সুপ্রসিদ্ধ—উৎকলীয় নব্য-স্মৃতি কলিকাতা সংস্কৃত শিক্ষাপরিষদের পরীক্ষা তালিকায় স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে স্থান লাভ করিয়াছে। বহু বৎসর পূর্বে এই স্মৃতিশাস্ত্রের অংশ-বিশেষ কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির প্রসিদ্ধ গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইয়াছে।

আধুনিককালের মহামহোপাধ্যায় সামন্তচন্দ্রশেখর সিংহ বিরচিত 'সিদ্ধান্তদর্পণ' নামক জ্যোতিষগ্রন্থ সাধারণের নিকট তেমন পরিচিত না হইলেও আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় প্রমুখ পণ্ডিতের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। যোগেশচন্দ্র গ্রন্থকারের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুসন্ধিৎসা ও প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া ১৮৯২ সনে রচিত এই গ্রন্থ ১৮৯৭ সনে প্রকাশ ও পণ্ডিত-সমাজে প্রচার করিয়াছিলেন।

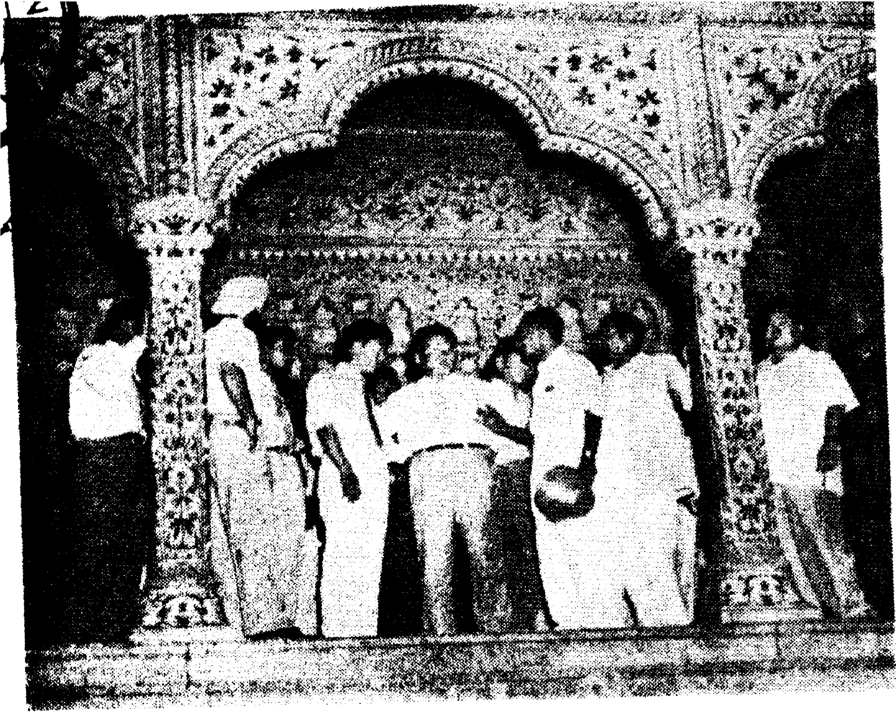
সম্প্রতি বিগত পূজাবকাশের প্রারম্ভে ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত প্রাচ্য বিদ্যাসম্মেলনের অধিবেশনে যোগ দিতে যাইয়া উড়িষ্যার এই সমস্ত গৌরবের কথা বিশেষ করিয়া মনে পড়িল। ভাবিয়াছিলাম এই সম্মেলনে উড়িষ্যার এই সমস্ত গৌরবের কথা বিস্তৃতভাবে শুনিতে,দেখিতে ও জানিতে পারিব। কিন্তু আমার সে আশা পূর্ণ হয় নাই, অধিবেশনের মধ্য দিয়া উড়িষ্যার সাংস্কৃতিক গৌরবের চিত্র যথাযথ ভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অতি সংক্ষিপ্ত ভাষণে ইহার ক্ষীণ আভাসমাত্র আছে। উড়িষ্যার আধুনিক পণ্ডিতসমাজ এই অধিবেশনে এমন কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই যাহা হইতে ইহার প্রাচীন বা বর্তমান গৌরবের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। অথচ উড়িষ্যাবাসীরা যে নিজেদের গৌরব সম্বন্ধে সচেতন নহেন এমন কথা বলা চলে না। উড়িষ্যার প্রাচীন গৌরবের নিদর্শন সংগ্রহ ও প্রচারের কার্যে তাঁহারা উদাসীন নহেন। উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়, উড়িষ্যা ষ্টেট মিউজিয়ম, উড়িষ্যা সাহিত্য আকাদেমি, উড়িষ্যা কলা বিকাশকেন্দ্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এই কার্যে বিশেষভাবে ব্রতী হইয়াছেন। তবে দুঃখের কথা, বাহিরের লোক ইঁহাদের কৃতকার্যের কথা বিশেষ কিছু জানেন বলিয়া মনে হয় না। ইঁহাদের প্রচারের ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয়। সংস্কৃত-কমিশনের সদ্য-প্রকাশিত রিপোর্টেও উড়িষ্যার এই দৈন্যের কথা স্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক, সম্মেলন উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি প্রদর্শনীতে উড়িষ্যার সাহিত্য ও শিল্পের বহু মূল্যবান্ নিদর্শনের একত্র সমাবেশের ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রদর্শনীটি প্রধানতঃ প্রাচীন পুঁথির। পুঁথিগুলির অধিকাংশ উড়িয়া অক্ষরে তালপাতায় লেখা। ইহাদের অনেকগুলির মধ্যে নানারূপ চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে—কতকগুলির লিখন-ভঙ্গি বিচিত্র। আনুমানিক আধ ইঞ্চি পরিমিত ব্যাসের গোল করিয়া কাটা মালার মত গাঁথা তালপাতায় লিখিত একখানি গীতার পুঁথি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুঁথির আকারে কাটা একখানি তালপাতায় সমগ্র বিষ্ণুসহস্র নাম লেখা—চারখানি পাতায় গীতগোবিন্দ ও রাসপঞ্চাধ্যায় লেখা লিপিকরের বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচায়ক। লেখার উপকরণ হিসাবে বাঁশের পাতার ব্যবহার এই প্রদর্শনীতে দুই জায়গায় দেখা যায়। একখানি বাঁশের পাতায় গীতগোবিন্দের কিছু অংশ এবং আর একখানিতে শ্রীকৃষ্ণতাণ্ডব স্তোত্র। সমগ্র গ্রন্থ এইরূপ বাঁশ-পাতায় লেখা হইত কিনা বলিতে পারি না। কুন্তীপত্র বা তেরেট পাতায় (?) লেখা দুইখানি বঙ্গাক্ষরে লিখিত পুঁথি প্রদর্শিত হইয়াছিল। একখানি দ্বিজরত্নের রচিত আচাররত্ন আর একখানিতে ভগবদ্গীতা।

অবশ্য এই সমস্ত বস্তু উড়িষ্যার পাণ্ডিত্যের সাক্ষ্য প্রদান করে বলা চলে না। তবে পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্র-চর্চার নিদর্শন-স্বরূপ কিছু কিছু গ্রন্থও প্রদর্শনীতে ছিল। তন্মধ্যে কৃষ্ণানন্দ মহাপাত্র রচিত সহৃদয়ানন্দ, মহেশ্বর মহাপাত্রের অভিনয়-চন্দ্রিকা, রামচন্দ্র মহাপাত্রের শিল্পপ্রকাশ, কবি ডিণ্ডিম বাহিনীপতি জীবাচার্যের ভক্তিবৈভব নাটক প্রভৃতি গ্রন্থের

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চিত্র-প্রদর্শনীতে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ



ফিলিপাইন বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্ত্তন উপলক্ষ্যে ডঃ রাধাকৃষ্ণণ ছাত্রদের সম্মুখে বক্তৃতা করিতেছেন



মঙ্গোলিয়ানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ যুমজাগিন চেডেনবাল আগ্রাদুর্গের দেওয়ান-ই-খাস পরিদর্শন করিতেছেন

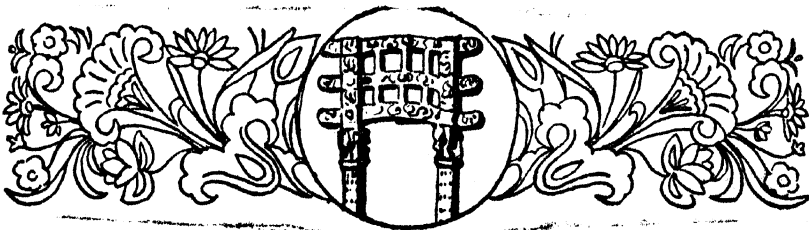


পাঞ্জাবে পশু প্রদর্শনী

পুঁথির নাম করা যাইতে পারে। এই সমস্ত পুঁথি ষ্টেট মিউজিয়ম, উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় ও পুরীর রঘুনন্দন লাইব্রেরীতে সংগৃহীত ও রক্ষিত হইয়াছে। মিউজিয়মে রক্ষিত পুঁথির দুই খণ্ড বিবরণও প্রকাশিত হইয়াছে দেখিলাম। প্রথম খণ্ডে ধর্মশাস্ত্র ও দ্বিতীয় খণ্ডে কাব্যের পুঁথির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষ বিশ্বনাথ কবিরাজের অপ্রকাশিতপূর্ব চন্দ্রকলা নাটকের একটি সংস্করণ এবং উড়িয়া-লিপিমালার একটি খণ্ড (প্রথম খণ্ড—দ্বিতীয় ভাগ) প্রকাশ করিয়াছেন। সাহিত্য আকাদেমি এবং উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ও উড়িষ্যার লেখকদের লেখা সংস্কৃত-গ্রন্থ প্রকাশে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। আকাদেমি এ পর্যন্ত দুইখানি সংস্কৃত-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। একখানি ১৬শ শতাব্দীর উড়িয়া কবি মার্কণ্ডেয় মিশ্রের দশাগ্রীববধকাব্য আর একখানি অষ্টাদশ শতাব্দীর রঘুনাথ রথলিখিত নাট্যমনোরমা। উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন—ইহার নাম সঙ্গীত মুক্তাবলী; গ্রন্থকার কণিকার বীরাধিবীরবর নৃপতিচূড়ামণি শ্রীগোপীনাথ ভঞ্জের পুত্র হরিচন্দন। শুনিলাম—প্রাচী প্রকাশন প্রকাশিত নারায়ণ শতক ও পরশুরামব্যায়োগও এখন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাবলী প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয় নাই। সঙ্গীতমুক্তাবলীর সম্পাদক অধ্যাপক বাণাম্বরাচার্য-সাহিত্যাচার্য বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ হইল। প্রাচীন ধরনের পণ্ডিত হইলেও গ্রন্থপ্রচারে তাঁহার যথেষ্ট উৎসাহ ও আগ্রহ আছে। তিনি এখন আর একখানি গ্রন্থের সম্পাদন কার্যে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার গ্রন্থখানি পূর্ব হইতেই সমালোচনার জন্য হাতে আসিয়াছিল—কিন্তু অন্য গ্রন্থের কোনও খবরই পূর্বে পাই নাই। মনে হয়, সঙ্গীত, নাট্য, শিল্পের গ্রন্থগুলি প্রকাশিত ও আলোচিত হইলে অনেক নূতন তথ্য জানা যাইবে। প্রাচীন নৃত্য ও অন্যান্য শিল্পের ধারা নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়া উড়িষ্যায় এখনও সজীব রহিয়াছে—এখনও প্রাচীন পরিভাষা [illegible] অজ্ঞাত অপরিচিত হইয়া পড়ে নাই। এই [illegible] পূর্ণ পরিচয় লাভের পক্ষে এই সব গ্রন্থ যথেষ্ট সহায়তা করিবে সন্দেহ নাই। এদিকে শিল্পী ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত উভয়ের দৃষ্টি সমভাবে আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সম্প্রতি উড়িষ্যায় শাস্ত্রচর্চার এক নূতন দিকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। অধ্যাপক শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য পুরী জেলার বাসুদেবপুর গ্রামে অথর্ববেদীয় পৈপ্পলাদ শাখার ব্রাহ্মণসমাজের এবং পৈপ্পলাদ সংহিতার একখানি পুঁথির সন্ধান পাইয়াছেন। সম্মেলনের অধিবেশনে তিনি এই মূল্যবান্ সংবাদ সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধের মধ্য দিয়া ঘোষণা করেন। এই পুঁথিপ্রাপ্তির ফলে ইতঃপূর্বে প্রকাশিত এই শাখার অশুদ্ধবহুল খণ্ডিত অংশের সংশোধনের ব্যবস্থা হইবে—এই শাখা সম্বন্ধে পণ্ডিতসমাজে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হইবে। অনুসন্ধান করিলে হয়ত কালক্রমে উড়িষ্যার গ্রাম হইতে পৈপ্পলাদ শাখা সম্বন্ধে আরও অনেক নূতন তথ্য সংগৃহীত হইতে পারিবে। বস্তুতঃ উড়িষ্যায় এ পর্যন্ত প্রাচীন পুঁথির অনুসন্ধানের কার্য ব্যাপক ও নিয়মবদ্ধভাবে অনুসরণ করা হয় নাই।* অবিলম্বে এই কার্য আরম্ভ করা দরকার। এখনও চেষ্টা করিলে অনেক অমূল্য রত্ন ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করা সম্ভবপর হইতে পারে। সুখের কথা, পুরীতে একটি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় ও পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ইনষ্টিটিউট ফর সংস্কৃত রিসার্চ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইতেছে। আশা করি, সত্বর ইহার কার্য আরম্ভ হইবে এবং উড়িষ্যায় সংস্কৃত-চর্চার গৌরবময় ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতবর্গের গোচরীভূত হইবে।

* স্বর্গত রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নেতৃত্বে প্রারব্ধ উত্তর-পূর্ব ভারতীয় অনুসন্ধান উড়িষ্যায় পুরী ধামের বাহিরে প্রসারিত হয় নাই।



মানসিক রোগ সম্পর্কে নানা তথ্য

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

আপনার মানসিক স্বাস্থ্য যাচাই করুন

আমেরিকার ক্যানসাস ষ্টেটের, টোপিকা শহরের মেনিঞ্জার ফাউণ্ডেসনের প্রেসিডেন্ট ডক্টর উইলিয়ম সি মেনিঞ্জার কয়েকটি প্রশ্ন তৈরী করিয়াছেন, এই সকল প্রশ্নের উত্তর হইতে আপনি নিজের মানসিক স্বাস্থ্যের নাড়ীর গতি বুঝিতে পারিবেন।

আপনার কি সকল সময় অস্বস্তি বোধ হয়?

আপনার কি এরূপ হয় যে, কোন কাজে মনস্থির করিতে পারিতেছেন না, অথচ কি কারণ জানেন না?

আপনার কি কেবলই অশান্তি বোধ হয় অথচ ইহার কোন উপযুক্ত কারণও দেখা যায় না?

প্রায়ই কি আপনার মেজাজ সহজে বিগড়ায়?

আপনি কি প্রায়ই অনিদ্রার জন্য কষ্ট পান?

আপনার কি মেজাজ এরূপ হয়—কখনও খুব আনন্দ আবার খুব নিরানন্দ—এবং এজন্য নিজের কাজকর্মে ব্যাঘাত?

আপনার কি মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করিতে একেবারে অনিচ্ছা হয়?

আপনার চলতি কাজের ধারায় নড়চড় হইলে আপনার মন কি একেবারে অচনচ হয়?

আপনার মেজাজ কি এরূপ যে, ছেলেপিলের দুষ্টামি কি একেবারে অসহ্য?

প্রায়ই কি আপনি রাগেন এবং মনের তিক্ততা অনুভব করেন?

অকারণ কি আপনি ভীত হন?

আপনার কি ধারণা সব সময়ই কি আপনি ঠিক, আর সকলে অ-ঠিক?

আপনার ব্যথা-বেদনা কি লাগিয়াই আছে যাহার হদিশ কোন ডাক্তার করিতে পারে না।

ডক্টর মেনিঞ্জার বলেন যে, কোন একটি প্রশ্নের উত্তর পরিষ্কার "হাঁ" হইলেই বুঝিতে হইবে আপনার মানসিক স্বাস্থ্য দুর্বল তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বাভাষ দেখা যাইতেছে।

মানসিক রোগীর সংখ্যা

নির্ভরযোগ্য সংখ্যাতত্ত্বের অভাবে সঠিক বলা যায় না পৃথিবীতে মানসিক রোগী কত জন। জগতের নানা দেশ সামাজিক ও আর্থিক উন্নতির বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত—এই দিক হইতে বিচার করিয়া মানসিক রোগীর সংখ্যার একটা আন্দাজ করা সম্ভব।

হাজারকরা দুই জন

ভারত—"হাজারে প্রায় ২ জন লোক মানসিক রোগগ্রস্ত—শীঘ্র বা কিছুদিন পরে তাহাদিগকে হাসপাতালে পাঠাইতে হইবে। আমাদের দেশে হাজারকরা ৮ হইতে ১০ জন আছে যাহাদের মনের পূর্ণ বিকাশ হয় নাই ইহাদিগকেও হিসাবে ধরিতে হইবে এবং সম্ভবতঃ শতকরা ০'৫ জন বিকলাঙ্গ এবং বিকলমন বা হাবা। ইহা ছাড়া শারীরিক অসুস্থতা, যথা উচ্চ রক্তের তাপ, নানারূপ চর্মের রোগ প্রভৃতি এবং মানসিক কারণে যে সকল রোগ প্রধানতঃ হয় তাহা ত আছেই। এত বড় তালিকার সঙ্গে আছে আবার সামাজিক সমস্যাজড়িত নানা রোগ। ভারতে প্রতি বৎসর ১১,৫০,০০০ লোক অপরাধ করে, বৎসরে আত্মহত্যার সংখ্যা ১৫ হইতে ১৭ হাজার এবং খুব কম করিয়াও শতকরা ১৫ হইতে ২০ জন অপ্রাপ্ত বয়স্ক অপরাধপ্রবণ।"

প্রতি ষোল জনে একজন

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র: এরূপ অনুমান করা হয় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৯০ লক্ষ লোক মানসিক রোগে ভুগিয়া থাকে—অর্থাৎ এরূপ রোগীর সংখ্যা প্রতি ১৬ জনে ১ জন। ইহা ছাড়া ১৫ লক্ষ লোকের মনের বিশ্বাস অসম্পূর্ণ অর্থাৎ এরূপ লোকের সংখ্যাও শতকরা ১ জন।

প্রতি বৎসর যে ১২ জন সন্তান আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করে জীবনে তাহাদের একজনকে মানসিক রোগের জন্য হাসপাতালে যাইতে হয়। অবশ্য যে সকল মানসিক রোগী অল্প-অসুখের জন্য হাসপাতালে যায় না তাহাদের সংখ্যা আরও বেশী।

প্রতিদিন যত রোগী হাসপাতালে যায় তাহার প্রায় অর্দ্ধেক মানসিক রোগী। হাসপাতালের মানসিক রোগী এবং বিকলমন ও শিরার রোগী যাহারা আরোগ্যশালায় আছে তাহাদের সংখ্যা অন্যান্য সকল রোগীর মোট সংখ্যার ৫৫ ভাগ।

ইহা ছাড়া মানসিক রোগের জন্য যে সকল লোক ক্লিনিকে বা ডাক্তারের বাড়ীতে চিকিৎসিত হইতে যান তাহাদের সংখ্যাও ঐ সকল স্থানের মোট রোগীর শতকরা ৩০ ভাগ এবং সাধারণ হাসপাতালের রোগীর সংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগ। এই সকল রোগীর কাহারও পরিষ্কার মানসিক রোগ বা উন্মাদ অবস্থা, কাহারও সাময়িক উন্মাদনা এবং কাহারও কাহারও এরূপ সকল শারীরিক রোগ আছে যাহার কারণ মানসিক।

দশ জনে একজন

ফরাসী শিশুদের—অনুমান করা হয় যে ফরাসী দেশে স্কুলের

ছেলেমেয়েদের যাহাদের বয়স ৪ হইতে ১৭ তাহাদের শতকরা ৪৩ জনের কোন না কোন মানসিক অসম্পূর্ণতা আছে এবং এই কারণে তাহাদের জন্ম বিশেষ শিক্ষা-ব্যবস্থা ও মনোযোগের প্রয়োজন হয়। স্কুলের শিক্ষাকালে কিম্বা পরবর্তী সময়ে যাহাদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্ম বিশেষ ভাবে যত্ন লইতে হয় তাহাদের সংখ্যা কমপক্ষে শতকরা ৫ হইতে ১০।

সেনা বিভাগে—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনা বিভাগ হইতে মানসিক অসুস্থের একটি সংবাদ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সেনা বিভাগ ১৮ হইতে ৩৭ বৎসর বয়সের ১,৮০০,০০০ জনকে পরীক্ষা করিয়া উহাদের মধ্যে ৯০০,০০০ জনকে মানসিক রোগের জন্ম সেনাবিভাগের কার্য্যের অযোগ্য বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে।

মানসিক রোগ চিকিৎসার ব্যয়

মানসিক রোগের চিকিৎসার জন্ম যে বিপুল ব্যয় হয় তাহাতে অবাক্ হইতে হয়। এক আমেরিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাগলের চিকিৎসার জন্ম বার্ষিক ব্যয় ৭৫,০০,০০,০০০ কোটি ডলার। প্রত্যেক করদাতার উপরে এই খরচ কি ভাবে বর্ত্তায় ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, নিউইয়র্ক ষ্টেটে আদায়ী প্রত্যেক ডলারের ২৮ সেণ্ট পাগলের চিকিৎসা বা তাহাদের পরিচর্য্যার জন্ম খরচ হয়। ইহার সহিত যদি সেনা বিভাগের বা অন্যান্য কর্ম্মে নিযুক্ত কর্ম্মীগণ, যাহারা পাগল হইয়া গিয়াছে এবং তজ্জন্ম যে খেসারত দিতে হইয়াছে, তাহা ধরা হয় তাহা হইলে সমগ্র দেশের এই বাবদে দৈনিক ব্যয় ৩০,০০,০০০ লক্ষ ডলার। সমস্ত সমাজের যে ক্ষতি হয় তাহা হিসাব করা সম্ভব নহে।

মানসিক রোগের মূল

গত ২৫ বৎসরের মানসিক রোগ সম্পর্কীয় চিকিৎসার অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায় যে শিশু তাহার মাতাপিতার নিকট হইতে যেরূপ স্নেহ ভালবাসা পায় উহার উপরেই তাহার পরবর্তী জীবনের মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থা নির্ভর করে।

শিশু বা অল্পবয়সের ছেলেমেয়ে মাতা বা মাতৃস্থানীয়ার খুব সান্নিধ্যে থাকিবে এবং স্নেহ ও ভালবাসার মধ্যে এরূপে মানুষ হইবে যাহাতে উভয়েরই খুব আনন্দ ও সুখ হয়। আবার এই স্নেহের পরিবেশ (অবশ্য পিতা এবং অপর সকলের ভালবাসা ও সান্নিধ্যও যে থাকিবে না তাহা নহে, তাহাও বিশেষ প্রয়োজনীয়) শিশুর মানসিক রোগের চিকিৎসকগণের মতে শিশুর চরিত্রও মানসিক স্বাস্থ্যগঠনের বিশেষ সহায়ক।

ভাঙ্গা সংসারের (অর্থাৎ যেখানে স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ) সন্তানেরা বেশী অপরাধপ্রবণ হয়—পরীক্ষার দ্বারা এই সত্যই প্রমাণিত হইয়াছে।

শিশু অপরাধী

ইস্রাইল রাষ্ট্রে, কোন শিশুর উপরে যৌন আক্রমণ হইলে, তাহাকে আদালতে উপস্থিত করা হয় না। কোন সমাজকর্ম্মী শিশুর সহিত বাক্যালাপ করিয়া শিশুর বক্তব্য আদালতে পেশ করে। আদালতে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিলে সাওয়াল জবাব দ্বারা শিশুর যে অপকার হয় আসল অপরাধ দ্বারা যে ক্ষতি হইয়াছে উহা তাহা অপেক্ষা বেশী—এজন্ম সে দেশে একটি আইন দ্বারা এরূপ বিচারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় যৌন আক্রমণের জন্ম পরবর্তীকালের ক্ষতির পরিমাণ কিছুটা হ্রাস করা হইয়াছে।

ভাঙ্গা সংসার—বিচ্ছিন্ন জীবন

যুক্তরাজ্যে ৪১৮ জন অপরাধপ্রবণ শিশুর মধ্যে শতকরা ৪৫ জন ভাঙ্গা সংসার (অর্থাৎ যেখানে পিতামাতার বিচ্ছেদ হইয়াছে) হইতে আসিয়াছে দেখা যায়। বাকী শিশুদের প্রায় অর্দ্ধেক (মোট সংখ্যার শতকরা ২৫ জন) এরূপ পরিবার হইতে আসিয়াছে যেখানে পিতামাতা একত্রে থাকিলেও—পরিবেশ বড়ই খারাপ, নিষ্ঠুরতা, দুর্নীতি, মানসিক অস্থিরতা, অনাদর, কঠোর ব্যবহার, এবং সন্তানের সম্পূর্ণ অযত্নই এই পরিবেশের প্রকৃত রূপ। কেবলমাত্র শতকরা ৩০ জন অপরাধপ্রবণ শিশু মোটামুটি সুখী পরিবার হইতে আসে দেখা গিয়াছে।

প্যারী শহরে ৮৩৯ জন 'সমস্যা' শিশুকে ৭০,০০০ সাধারণ পরিবারের শিশুর সহিত তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, 'সমস্যা' বা 'অস্বাভাবিক' শিশুগণের শতকরা ৬৬ ভাগ ভাঙ্গা সংসার হইতে এবং মাত্র শতকরা ১২ ভাগ সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের।

নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ লোক

বঙ্গদেশে যে পরিমাণে বৃদ্ধের সংখ্যা বাড়িতেছে তদপেক্ষা বেশী পরিমাণে বৃদ্ধেরা মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসিত হইতেছেন—অর্থাৎ বৃদ্ধদের মধ্যে উন্মাদের সংখ্যা বাড়িতেছে।

তথ্য সংগ্রহকারীগণ বলেন যে, শোকতাপ, নির্জ্জনবাস এবং শারীরিক অক্ষমতা হইতেই নিঃসঙ্গ, নিরাশ্রয়ভাব, হতাশা, নিরানন্দই আসে। একদল গবেষক বৃদ্ধদের মধ্যে শতকরা ৫০ জনকেই হতাশ ও উদ্বেগপূর্ণ লক্ষ্য করিয়াছেন—অবশ্য ইহাদের অনেকেই নিঃসঙ্গ এবং অসুখী জীবনযাপন করিতেছিলেন। আশ্চর্য্য এই যে, সমাজ এই সকল বৃদ্ধের জন্ম মানসিক চিকিৎসা বা কল্যাণমূলক ব্যবস্থা আদৌ দরকার বলিয়া ভাবিতেছে না।

আত্মহত্যা ও মানসিক স্বাস্থ্য

যে সকল মানুষ আত্মহত্যা করে তাহারা অনেক সময় মানসিক বা শারীরিক রোগে ভুগিয়াই ইহা করে। জাপান, ডেনমার্ক, অষ্ট্রিয়া এবং সুইজারল্যাণ্ডে আত্মহত্যার সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। সর্ব্বাপেক্ষা কম আত্মহত্যা হয় আয়ারল্যাণ্ড, নর্থ আয়ারল্যাণ্ড, চিলি,

সুইজারল্যাণ্ড এবং স্পেনে। সব দেশেই পুরুষেরা মেয়েদের অপেক্ষা বেশী সংখ্যায় আত্মহত্যা করে। অনুপাত ৩:১ কিন্তু নরওয়ে ৪ ১ এবং জাপানে ২ ১ হইতেও কম।

পুরুষের আত্মহত্যার সংখ্যা সুইজারল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, অষ্ট্রিয়া এবং ফিনল্যাণ্ডে বেশী, জাপান, ডেনমার্ক এবং অষ্ট্রিয়ায় স্ত্রীলোক আত্মহত্যাকারীও কম নহে।

অপরাধীর মন অস্বাভাবিক

সমাজের অপরাধ সংখ্যা হ্রাস করিতে হইলে নানাভাবে চেষ্টা করিতে হইবে—সমাজে যাহাদের দুর্বল মন তাহাদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়াও এই চেষ্টার অন্যতম। গবেষণা দ্বারা দেখা গিয়াছে অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী এক-তৃতীয়াংশ হইতে তিন-চতুর্থাংশ অপরাধী কোন না কোনরূপ মানসিক রোগগ্রস্ত।

অযৌক্তিক ভয় ও আশা

আজ জগতে সকলের মুখেই 'আণবিক' শক্তির ভাল-মন্দের কথা শুনা যায়। ইহাদ্বারা কি উপকার হইবে সে কথা যত শুনা যায় তাহা অপেক্ষা ক্ষতির কথাই বেশী আলোচিত হয়। অনেক মানুষেরই এ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান নাই, বোঝে না, কখনও এ সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে নাই, অথচ ভয়, যদি এই শক্তি বে-হাত হয় তবে আর রক্ষা নাই, মৃত্যু নিশ্চিত।

দৈনন্দিন আলাপ-ব্যবহারের মধ্যে মানুষের এই ভয়ের আভাস পাওয়া যায়। যদি ঋতুর কোন পরিবর্তন হয়, শস্যহানি হয়, প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা দেখা যায়, অমনি বলা হয় 'আণবিক' পরীক্ষার জন্য ইহা হইয়াছে। 'আণবিক' পরীক্ষার জন্য দুধ, জল, খাদ্য বিষাক্ত হইয়াছে, এমনকি মানুষের জননশক্তি হ্রাস পাইয়াছে—মানুষের মনে এরূপ ত্রাসের সঞ্চার হইতেছে। আণবিক যুগের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের নূতন নূতন সমস্যা দেখা দিয়াছে।

চিকিৎসকের দৈনন্দিন কার্য্য

ফরাসী দেশে অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে, ১০০ রোগীর মধ্যে ৫০টি রোগীর রোগ মানসিক অথচ প্রতিদিন চিকিৎসকগণ ক্ষয় যৌন-ব্যাধি প্রভৃতি রোগ সম্বন্ধে যতটা সচেতন, মানসিক রোগ সম্বন্ধে সে তুলনায় কিছুই নহে। অথচ তাহাদের এই বিষয়ে গুরুতর দায়িত্ব। হাসপাতালের বহির্বিভাগে, স্কুলে, প্রসূতি-চিকিৎসায়, শ্রমিকগণের স্বাস্থ্য পরিদর্শনের সময় চিকিৎসকগণ সমাজকর্ম্মী, শ্রমিক, নার্স এবং মালিকগণের সংস্পর্শ ও সহযোগিতায় তাহারা সমাজ ও মানুষের প্রভূত কল্যাণে সক্ষম।

আধুনিক মানুষের মনের স্বাস্থ্য

কেবল বিজ্ঞাপন আর বিজ্ঞাপন! আধুনিক মানুষের বিশ্রাম কোথায়! ঘুমের জন্য বড়ি, ঘুম না হওয়ার জন্য ঔষধ। স্বপ্ন দেখিবার জন্য স্বপ্ন রুখিবার জন্য দাওয়াই। দুঃখ-কষ্ট হইতে মুক্তি পাইবার জন্যও ঔষধ আছে। এরূপ সকল ঔষধের খবর পাওয়া যায় যাহা সেবন করিলে মানুষ শিশুত্ব অর্জ্জন করে—Alice-in-wonderland Drug.

হাসি-ঠাট্টার কথা নয়, আমাদের জীবন (অর্থাৎ পাশ্চাত্য দেশে) এরূপ হইয়া পড়িয়াছে। (স্বাধীনতা লাভের পর আমরাও আধুনিকতা তথা পাশ্চাত্যের পথে পা দিয়াছি, একটু চিন্তা করিলেই যে-কেহ ইহা বুঝিতে পারিবেন)। খবরের কাগজের 'হেড লাইন', টেলিফোনের কর্কশ শব্দ, রেডিওর আওয়াজ, কি ঘুম কি জাগ্রত অবস্থা সকল সময়ই মনকে পীড়া দেয়। ইহার উপর আছে 'রক্তের চাপ, প্রস্রাবে শর্করা, পেটের 'অম্ল', সকলে মিলিয়া যেন মানুষকে বেপরোয়া চালকের হাতের মোটর গাড়ীর মত অবিরাম গতিতে টানিয়া চলিয়াছে। গোটা পৃথিবীর ২৫০ কোটি লোকে প্রত্যেক মানুষের আপনার জন—অথচ নিজের ঘরে সে প্রকৃতই এক—যেন সঙ্গীহীন।

আবার আর এক শ্রেণীর লোকের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় তাহাদের মানসিক অবস্থা কি ভীষণ—কারখানার কলের ঠিকা-কাজে তাহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, আবার কাহাকে পরিষ্কার জামা-পোশাক সত্ত্বেও আর্থিক দুর্ভাবনায় তাহাকে ছাড়িতেছে না। কাহারও স্ত্রীর সহিত 'খিটিমিটি' চলিতেছে, অনেকের খাটুনির প্রাচুর্য্য আছে কিন্তু ক্ষুধার নিবৃত্তি নাই, সমাজের সবই নিম্নস্তরের হতভাগ্য কৃষকের দল, কোনরূপে খাইয়া বাঁচিয়া আছে।

আপনার দৃষ্টিভঙ্গি

কোন মানসিক রোগগ্রস্তের বা উন্মাদের বা যাহার উন্মাদ রোগ সারিয়াছে তাহার সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা? আপনার জানা উচিত তাহার উন্মাদ রোগ নিরাময় হওয়া বা তাহার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসা আপনার ধারণার উপর নির্ভরশীল হাসপাতালে, হাসপাতালের বহির্বিভাগে, ঘরে রাখিয়া যে ভাবেই আধুনিক মতে উন্মাদের চিকিৎসা হোক সমাজের লোকের মনোভাব যদি সহানুভূতিশীল এবং পরিবর্ত্তিত না হয় কিছুতেই কিছু হইবে না।

যে সকল দেশে বড় বড় পাগলা-গারদ তৈরি করিয়া চিকিৎসা তথা আটক রাখিবার জন্য উন্মাদ রোগীকে বন্ধ রাখা হইত সেই সকল দেশে সাধারণতঃ লোকের এই সকল রোগীর প্রতি একটা ভীতি এবং বিতৃষ্ণার ভাব দেখা যায়। কিন্তু যে সকল দেশে সম্প্রতি মানসিক রোগের চিকিৎসাদি আরম্ভ হইয়াছে সেখানে সাধারণের এরূপভাব দেখা যায় না।

ভূতে ধরা

আদিম জাতির মধ্যে কেহ উন্মাদ হইলে লোকে মনে করিত সে পাপের শাস্তি পাইতেছে, অথবা ইহা ভূতের কাজ অথবা রোগী একেবারে ভূতগ্রস্ত। এরূপ ধারণা আফ্রিকার কোন কোন দেশে

এবং ভারতবর্ষে এখনও কিছু কিছু দেখা যায়—মধ্যযুগে এবং পরবর্ত্তী কালেও এরূপ ধারণা খুবই বদ্ধমূল ছিল।

মধ্য যুগে কোন কোন ধর্মমন্দিরে উন্মাদদিগকে আশ্রয় দেওয়ার রীতি ছিল। কিন্তু উন্মাদের যত্ন নেওয়ার চেষ্টা এবং এজন্ত উন্মাদ-ভবন নির্ম্মাণ প্রথমে মুসলমানেরাই করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ভারতের চিকিৎসকগণের নিকট হইতেই ইহারা মানসিক রোগের চিকিৎসা-প্রণালী আয়ত্ত করিয়াছিল। ইউরোপের লণ্ডনের বেথলেম হাসপাতাল ১৪০৩ খৃষ্টাব্দে সর্ব্ব প্রথম উন্মাদ-ভবনরূপে ব্যবহৃত হয়। স্পেনদেশে ভেলেনসিয়ায় ১৪০৮ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় ভবন খোলা হয়। পরবর্ত্তী শতাব্দীতে ইউরোপের অন্যান্য স্থানে আরও এরূপ ভবন বা এসাইলাম স্থাপিত হয়। ১৭৫৬ সনে উত্তর আমেরিকার পেনসিলভ্যানিয়া শহরের এক সাধারণ হাসপাতালে উন্মাদ রোগী-গণকে চিকিৎসার জন্য পৃথক পৃথক কুটরীতে বন্ধ রাখিয়া চিকিৎসা করা সুরু হয়। আমেরিকার প্রথম উন্মাদ ভবন ১৭৭৩ সনে ভার্জ্জিনিয়ায় খোলা হয়।

উন্মাদ-ভবন বা বন্দীশালা

এই সকল উন্মাদ ভবন স্থাপনের উদ্দেশ্য উন্মাদগণের চিকিৎসা বা যত্ন নহে, তাহাদিগকে বন্ধ রাখা বিশেষতঃ যাহারা ভয়ানক উন্মাদ তাহাদের দমিত রাখা। অনেক ভবনই ছিল প্রায় বন্দীশালা এবং উন্মাদ রোগীকে অপরাধী বলিয়া গণ্য করা হইত। অতি ধীরে ধীরে এই দৃষ্টিভঙ্গি দূর হইয়া রোগীর প্রতি মানবীয় সহানুভূতির ভাব আসিতে থাকে। ১৭৯২ সনে প্যারীর বেসত্রে হাসপাতালের ৫০ জন উন্মাদ রোগীর শৃঙ্খল মুক্ত করা হয়—এই শৃঙ্খলগুলি ৩০ বৎসরের ব্যবহারে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। দেখা গেল এরূপ নূতন ব্যবস্থায় পাগলের পাগলামী কমিয়াছে বই বাড়ে নাই। ইটালিতেও প্রায় এই সময় Viacenzo chiarugi উন্মাদকে 'বেড়ি' মুক্ত করিয়া দিল।

কোয়েকারগণ ইংলণ্ডে এই বিষয়ে সংস্কার আনে—১৮১৩ সনে York Retreat স্থাপন করে—তাহারা 'উন্মাদ-আশ্রয়' বা 'পাগলা-গারদ' কথাগুলি একেবারে বর্জ্জন করে। লৌহ-শৃঙ্খলের ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হয়—রোগীদের জন্য কাজ, ব্যায়াম ও নীতি উপদেশের প্রবর্ত্তন করা হয়। ইংরেজ কোয়েকারদের সুনাম আমেরিকায় ছড়াইয়া পড়ে এবং সেখানে পেনসেলভেনী যায়—১৮১৭ সনে Friends Asylum খোলা হয়—এখানে মানসিক রোগগ্রস্ত ত আর পশুর মত নহে। মানুষের মতই ব্যবহার পাইত।

চিকিৎসার সুফল

দশ বৎসর পূর্ব্বে ফরাসী দেশে ভীল-এভরার্ড নামক স্থানে প্রত্যেক মানসিক রোগগ্রস্তকে অন্ততঃ এক বৎসর হাসপাতালে থাকিতে হইত, এখন চারিমাস থাকিলেই মুক্তি পায়। এই হাসপাতালে ১৯৪৮ সনে ৫৫০টি বেড ছিল, বৎসরে ১০০টি রোগী নেওয়া হইত—এখন স্থায়ী বেডের সংখ্যা ২৭০, বৎসরে ৬০০ নূতন-রোগীর চিকিৎসা হয়। যে সকল রোগীকে অনির্দ্দিষ্ট দীর্ঘকালের জন্য রাখা হইত তাহাদের সংখ্যা শতকরা ৫০ হইতে কমিয়া ৭এ দাঁড়াইয়াছে।

নিউইয়র্ক ষ্টেটে মানসিক হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা গত তিন বৎসরে বাড়িয়াছে শতকরা ১০ কিন্তু নিরাময়ের সংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ২০। ফলস্বরূপ মানসিক রোগীর মোট সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে—১৯৫৫-৫৬ ১৯৫৬-৫৭ সনে ৪৫০ জন এবং ১৯৫৭-৫৮ সনে ১২০০ জন।

বর্ত্তমান সমাজ ও মানসিক রোগ

বর্ত্তমান কালে সমাজের প্রত্যেকেই নিজের মান বাড়াইবার জন্য ব্যস্ত। অর্থোপার্জ্জনেই মান সহজে বাড়ে। তাই অর্থ, আরও অর্থ, অর্থের পিছনে ছুটাছুটি। যে কোন উপায়ে অর্থোপার্জ্জন। যাহার যথেষ্ট অর্থ নাই সেও লোককে—সমাজকে দেখাইতে চায় যে, সে অর্থবান্। এই ঠাট বজায় রাখিবার জন্যই শেষ পর্য্যন্ত স্থান হয় মানসিক হাসপাতালে। পাশ্চাত্য সভ্যতা এই ভুল পথে বেশ অগ্রসর হইয়াছে—আমরা সবে পা দিয়াছি। ভারতের বহু রাষ্ট্র-নেতাগণ দেশকে রাতারাতি জীবনধারণ-মান বাড়াইবার নামে—ইউরোপ,আমেরিকার মত করিতে চান এবং যে পথে এই উন্নতি(?) আনিতে চান তাহার বিপদ ঘটিতে পারে এ কথা বিস্মৃত হন। প্রাচীন ভারতের আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অগ্রসর হইলে এবং পাশ্চাত্যের ভুল-ত্রুটী এড়াইয়া চলিলে আমাদের দেশে ব্যাধির জয়ের সহিত মানসিক ব্যাধি দেখা দেবে না ইহাই আশা করা যায়।

বিশ্বশান্তি ও মানসিক ব্যাধি

সমস্ত পৃথিবীতে শান্তি আনিতে হইলে প্রত্যেক দেশেরই উন্নতি দরকার। আর্থিক উন্নতি চাই, ব্যাধির জয় চাই—শারীরিক ও মানসিক উভয় ব্যাধির। মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা, জাতির প্রতি জাতির ঈর্ষা দূর করা প্রয়োজন। ব্যক্তি এবং জাতি নিজের অপরাধী মনোভাব ভয় এবং হেয় অবস্থা স্বতঃই অপর ব্যক্তি ও জাতির উপর আরোপ করে। ইহা হইতেই পরস্পরের সম্পর্ক তিক্ত হয় এবং বিবাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি হয়। বিশ্বশান্তির জন্যই বিশ্বমানবের সুস্থ মন এবং উদার মনের প্রয়োজন। চেষ্টা এবং সাধনা দ্বারাই মনের স্বাস্থ্য অর্জ্জন করিতে হয় প্রাচীন ভারত তাহা জানিত। এই জন্যই ছিল তাহাদের 'যোগ' ব্যবস্থা। ঐহিক সম্পদ ও অর্থ লোভে উন্মাদ বিশ্ব আজ 'চিত্তবৃত্তি নিরোধে'র বাণী শুনিবে কি? অথচ বিশ্বশান্তি এই পথে।

শশাঙ্ক পণ্ডিতের পাঠশালা

শ্রীসজলকুমার চট্টোপাধ্যায়

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা ছাড়িয়ে আরও মুঠোখানেক পথ, তবে চিনতে দেরী হয় না। রাস্তার ধারেই বাঁশের খুঁটিতে পেরেক দিয়ে মারা টিনের সাইনবোর্ড। কালে আর জলে ধুয়ে গেছে তার রং। তীর চিহ্নটাও তাই চোখে পড়ে না। উৎসাহীজন হয় ত কাছে গিয়ে পড়ে নিতে চেষ্টা করে—তাও না পারলে গোটা দুই ফুঁ-ই হয় ত মারে। পড়তে অসুবিধা হলেও অস্পষ্টভাবে বোঝা যায় "কেতুপুর মাইনর স্কুল।"

বছর দশেক পরে এ রাস্তা ধরে যেতে যেতে সাইনবোর্ডটা আমারও চোখে পড়ল। কাছেও যেতে হ'ল না—ফুঁও দিতে হ'ল না। হলুদে রঙের পরে কালো সে লেখাগুলো আজও যেন ঝক্ ঝক্ করে ওঠে। মনে পড়ে প্রথম দিনের কথা—যদিন ওটা টাঙানো হ'ল এখানে। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বার জগত্তারণ চক্কত্তি ওই সাইনবোর্ডের পাশের অশথ গাছতলায় দাঁড়িয়েছিলেন। অশথ গাছটাও কি তখন এত বুড়ো বুড়ো দেখাত! কি জানি! আর ঐ যে বাঁ হাতি ঝোপটা—বনগাঁদার ঝোপ—ওখানে দাঁড়িয়েছিলেন শশাঙ্ক পণ্ডিত। পণ্ডিত শশাঙ্কমোহন ভট্টাচার্য, স্মৃতিরত্ন, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ।

আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঘুণ ধরে গেছে সাইনবোর্ডের বাঁশে। কালের বিরুদ্ধে কিছুই করবার নেই—না হলে পণ্ডিত হয় ত এটাকে কালজীর্ণও হতে দিতেন না। এর গায়ে এতটুকু আঁচড় সহ্য করতে পারতেন না শশাঙ্ক পণ্ডিত। সেদিনের কথাটাও মনে আছে। যদু—ওই যে ধর্মদাস মুখুজ্যের ছেলে—বাঁশের গায়ে ছুরি দিয়ে কেটে কেটে নাম লিখেছিল যেদিন। তা পড়বি ত পড় একেবারে পণ্ডিতেরই চোখে। আর তা না পড়ার দোষই বা কি! রোজ যাওয়া-আসার সময় একবার দাঁড়িয়ে পড়তেন পণ্ডিত ওখানে। আপন মনে কি যেন বিড় বিড় করে বকতেন। অচেনা লোক দেখলে ভাবত পণ্ডিত হয় ত পাঠশালাই খুঁজছেন। আর চেনা লোকে প্রথম প্রথম হয় ত অবাক হ'ত। নিকুঞ্জ পরামাণিক একবার জিজ্ঞাসাও করেছিল—কি দেখেন গো পণ্ডিতমশাই অমন করে?

পণ্ডিত যেন ঘুমুচ্ছিলেন, নিকুঞ্জর কথায় হুঁস এল, বলেছিলেন—এ গাঁয়ের লোকগুলো কেমন ধারা হে নিকুঞ্জ?

এজ্ঞে...অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল নিকুঞ্জ।

বোকার মত চেয়ে আছ যে, ছাখো ত খুঁটির গায়ে কে গরু বেঁধেছে—স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি দড়ির ঘষা ঘষা দাগ।...

অবাক্ হয়ে তাকিয়েছিল নিকুঞ্জ সেদিন। বাঁশের খুঁটির গায়ে দড়ি বাঁধার দাগ দেখতে পায়—কৈ এমন কথা ত তার জানা ছিল না। মানুষটা কি রকমের।

আর সেই খুঁটির গায়ে কি-না ছুরির দাগ। পাঠশালা হতে না হতে চেরা বেত নিয়ে পণ্ডিত এসেছিলেন। চিৎকার করে ডেকেছিলেন—যদু, শোন এদিকে।

যদু আমাদের সঙ্গেই পড়ত, পণ্ডিতের ডাকে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে গেল।

বাঁশের গায়ে ছুরি দিয়ে নাম লেখা হয়েছে কেন?

মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিল যদু। কান ধরে নাড়া দিয়ে পণ্ডিত আবার হুঙ্কার দিয়ে উঠেছিলেন—কেন লেখা হয়েছিল?

পেছন থেকে কে যেন বলে উঠেছিল—অমর হবে মাষ্টার মশাই।

অমর—রাগের মাথায় কথাগুলো বিকৃত হয়ে বেরিয়েছিল পণ্ডিতের গলা দিয়ে। তার পর সুরু করেছিলেন মার। ওঃ সে কি মার! আজও যেন সেদিনের কথা মনে পড়ে।

তা কোথায় গেল সেই নিকুঞ্জ পরামাণিক, কোথায় গেল ধর্মদাস মুখুজ্যের ছেলে যদু মুখুজ্যে আর বাঁশের খুটির ঝকঝকানি চেহারা। ঘুণ ধরেছে, রূপ পাল্টেছে, কি ছিল কি হয়ে গেছে! আর কি হয়ে গেল শশাঙ্ক পণ্ডিত আর তার পাঠশালা!

রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছি আর ভাবছি শশাঙ্ক পণ্ডিতের কথা। শশাঙ্ক পণ্ডিতের সঙ্গে এইমাত্র কথা বলে আসছি। চলেছিলাম বাড়ীর দিকে, কিন্তু সাইনবোর্ডটা দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কি হবে আর ওটা রেখে? পাঠশালাটা আর টিকল না বোধ হয়, শশাঙ্ক পণ্ডিত আর পণ্ডিত থাকবেন না। তবে ওটা আর থাকে কেন? কাছে গিয়ে একটানে ভেঙ্গে ফেললাম ওটাকে। ছুঁড়ে ফেলে দিলাম জঙ্গলের মধ্যে। মনে আছে খুঁটিটা আমিই কেটে এনে বসিয়েছিলাম এখানে। আর আজ এতদিন পরে আমাকেই তুলতে হ'ল।

কণ্টিকারী আর কালকাসুন্দের ঝোপটা নড়ছে এখনও, নড়ুক। পা বাড়ালাম বাড়ীর দিকে।

আজ এ গল্প লিখতে বসে বারবার মনে হয়েছে—এ গল্প হয় ত অনেককে খুশী করতে পারবে না। এ ত আর ছেলেমেয়ের মন-দেওয়া-নেওয়ার গল্প নয়। এক গম্ভীর রাশভারী পণ্ডিতের জীবনের এক বিশেষ মুহূর্তে যাকে আমি চিনেছিলাম তারই কথা। বারবার সন্দেহ জেগেছে, তবু লিখেছি আর ছিঁড়েছি, কৈ পাইনি ত তাকে খুঁজে। হারিয়ে গেছে বারবার, তবু আবার লিখেছি। ভুল হয়নি ত?

তা শশাঙ্ক পণ্ডিতকে আর ভুলব কেমন করে। ছেলেবেলার সব কুড়িয়ে নেওয়া মনে পণ্ডিতের মূর্ত্তি যেন চিরস্থায়ী ভাবে আঁকা হয়ে গেছে। শশাঙ্ক পণ্ডিতের পাঠশালা ছেড়ে কত স্কুল, কলেজ ঘুরে এলাম কিন্তু আজও শিক্ষকের কথা উঠলে শশাঙ্ক পণ্ডিতের কথাই যেন সবচেয়ে আগে মনে আসে।

মনে আছে শশাঙ্ক পণ্ডিতের ও পাঠশালা যখন প্রথম বসে, শশাঙ্ক পণ্ডিতের বাপ মৃগাঙ্ক পণ্ডিত শিষ্য যজমান নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। শশাঙ্ক পণ্ডিতকেও সঙ্গে নিতেন মাঝে মধ্যে। ছোটবেলায় আমাদের বাড়ীতেও সত্যনারায়ণ পূজো, লক্ষ্মী পুজো, মাকাল পুজোতে অনেকদিন শশাঙ্ক পণ্ডিতকে দেখেছি। চাঁপা ফুলের মত রঙ, গায়ে নামাবলী দিয়ে মটকার কাপড় পরে পুজো করতে আসতেন পণ্ডিত। সুর করে ব্রতকথা শোনাতেন। গাঁয়ের লোকেদের, বিশেষ করে বৌ-ঝিয়েদের ত শশাঙ্ক পণ্ডিতের কাছে ব্রতকথা না শুনলে, ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময় তাকে না পেলে ব্রতে একটা খুঁতই থেকে যেত। ঠাকুরঘরের দরজার কাছে ছোট্ট একটা জল-চৌকীর উপর তালপাতার পুঁথি রেখে পড়তেন পণ্ডিতমশাই। ছেলেবেলায় শোনা সে সুর, সব কথা হয় ত মনে নেই। তবু দু'এক লাইন যা মনে আছে তা যেন ভোলার নয়। সত্যনারায়ণের পাঁচালী পড়তেন পণ্ডিত ত্রিপদীর ছন্দে—

"আমার কিঙ্কর, তুই সদাগর বন্দী রাখ কি কারণে।
প্রাণ রক্ষা চাও, তুয়ে ছাড়ি দাও, সপ্ততরী পুরি' ধনে॥
হয় চমৎকার, সুরথ রাজার, পাত্রগনে বিচারিয়া।
সদাগরে আনি কহে স্তুতি বাণী, বসন-ভূষণ দিয়া॥

ত্রিপদী ছেড়ে শেষে দীর্ঘ ত্রিপদী ধরতেন পণ্ডিত—

না জানি কি কৈনু পাপ, কেবা দিল ব্রহ্মশাপ; বিবাদ সাধিল কোন দেবে।
পতিব্রতা বিনাপতি, অন্ত নাহি তার গতি মোরে নাথ সংহতি করিবে॥
আচম্বিতে বজ্রাঘাত, হারাইনু প্রাণনাথ, বিধবার জীবন বিফল।
কহে পিতা-মাতা আগে, অভাগী বিদায় মাগে, কুণ্ড কাটি জ্বালহ অনল॥

মেয়েরা চোখ মুছত বারবার, বুড়ীরা শুনতে শুনতে ঝিমিয়ে পড়ত, রাত গড়িয়ে যেত, পণ্ডিত তখন নির্বিকার চিত্তে পড়ে যেতেন...

যথা গেল প্রাণনাথ সেইস্থানে যাব সাথ, কোন লাজে রহিব ভবনে।
নিশ্চয় সাধুর সুতা হইবেন অনুমৃতা, হেনকালে দেববাণী শুনে॥
পতির আনন্দে ভুলি, প্রসাদ ভূমিতে ফেলি, এখন হইছ অনুমৃতা।
পতির জীবন চাও, প্রসাদ তুলিয়া খাও, সত্য বটে—বলে সাধুসুতা॥

তা সে পুরুতগিরি ছেড়ে দিলেন পণ্ডিত। বাপ-ছেলের মধ্যে মন কষাকষি চলল কতদিন। গাঁয়ে বেরুনই মুস্কিল হয়ে পড়ল পণ্ডিতের। মৃগাঙ্ক পণ্ডিত গাঁ এক করে ফেলেছেন একেবারে ছেলের কথা প্রচার করে। কি, না শশাঙ্ক পণ্ডিত আর পুরুতগিরি করবেন না, পাঠশালা খুলবেন। এক গাঁ শিষ্য-যজমান থাকতে এ খেয়াল কেন বাপু?

পাড়ার বৌ-ঝিরা ত ঘর পর্যন্ত ধাওয়া করল। হরি চাটুজ্যের বৌ ত কেঁদেই ফেলেছিল—কি হবে বাবা, একলা পণ্ডিতমশাই বুড়োবয়সে ক'ঘর সামলাবেন। শেষটায় কি আমাদের কুল-পুরোহিত ছাড়তে হবে।

সত্যি সে সব কথা ভাবলে এখন কেমন যেন লাগে, বিশ্বাসই করতে ইচ্ছে হয় না। একটা পুরোহিতের বৃত্তি ত্যাগে কত লোকই না ভেবে মরেছিল। কুল-পুরোহিত ত্যাগ সে ত তখনকার দিনে দুটো চাড্ডি কথা নয়। আর এখন সস্তা সুবিধে পেলে কুলগুরু ত্যাগেও......যাকৃগে সে কথা।

শেষ পর্যন্ত পাঠশালাই বসালেন পণ্ডিত। আগে ঠাকুর-দালানে বসত পাঠশালা। তার পরে জগত্তারণ চক্কত্তি যেবার ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার হলেন সেবার একটা চালা তুলে দিলেন বাড়ী-লাগোয়া। একটা মাসোহারার ব্যবস্থাও করে দিলেন। শিষ্য ছিলেন ত মৃগাঙ্ক পণ্ডিতের তাই বোধ হয়, যা হোক্ আরও অনেক ব্যবস্থাও করলেন তিনি। নাম দিলেন একটা পাঠশালার—'কেতুপুর মাইনর স্কুল'। সেই নামের সাইনবোর্ড লিখিয়ে আনা হ'ল জংশন বাজার থেকে। বাঁশ কেটে এনেছিলাম আমি আর ভুতো। তা বাঁশ কি

আর দেয় পাঁচু সরকার। কি কৃপণই না ছিল লোকটা। ষষ্ঠীর দিন দাঁড়িয়ে থাকত বাঁশতলায় পাছে কেউ পাতা ছেঁড়ে, কঞ্চি ভাঙে বলে। তা কোথায় গেল পাঁচু সরকার আর তার পাকা ঝাড়ে ভর্তি বাঁশবাগান। যুদ্ধের সময় গোরা-পল্টনের ছাউনি তৈরি করতে, ব্যারাক গিরতে সব বাঁশ জোর করে নিয়ে গেল……

হ্যাঁ যা বলছিলাম। ঐ একটা দোষ আমার, এক কথা লিখতে বসে আর এক কথা লিখি। তা সেই যুদ্ধের বাজারেও পাঠশালা বন্ধ করেন নি পণ্ডিত। ছেলে বরং বেড়েই গিয়েছিল পাঠশালায়। যুদ্ধের ভয়ে শহর ছেড়ে গাঁয়ে এসে জড়ো হতে লাগল লোক। দু'চার মাস থাকতে হবে কি তার বেশীও। ছেলেগুলো আর বাঁদর হয়ে ঘুরে বেড়ায় কেন? পাঠশালায় আটকও ত থাকবে, যতক্ষণ থাকে নিশ্চিন্তি! সব সময় "গেল গেল" করতে হবে না। তা ছাড়া পণ্ডিতের বিদ্যেও ত কম নয়, ইংরেজী লিখতে-পড়তে জানে। সংস্কৃতে দুটো পাস, স্মৃতিরত্ন আবার কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ। ভাল না হলেও খারাপ ত হবে না।

আমরা তখন পাঠশালা ছেড়ে তিন মাইল দূরের হাই-স্কুলে পড়ি। সকালে যাওয়ার সময় দেখতাম কোনদিন অঙ্ক কষাচ্ছেন, শুভঙ্করীর আর্যা পড়াচ্ছেন, কোন কোন দিন আবার শ্লোকও লেখাতেন—

চর্মণি দ্বীপিনং হন্তি, দন্তোর্হন্তি কুঞ্জরীম
কেশেষ চমরীং হন্তি…

থমকে দাঁড়িয়ে পড়তাম এক একদিন। কি সুন্দর লাগত শশাঙ্ক পণ্ডিতের আবৃত্তি। এতটুকু জড়তা নেই, অস্পষ্টতা নেই। পণ্ডিত বংশেই জন্ম বটে, আর পড়ানোর নিয়মই বা কি! আবৃত্তি, শ্রুতিলিখা আর ব্যাকরণ এক সঙ্গেই শেখাতেন উনি। ভাবতাম, এ মাধুর্য আর বিচার বোধ ত আগে পাই নি! তখন "দ্বীপিনং" আর "চমরীং" বানান অশুদ্ধ হওয়ার ভয়ে সুর বেসুরো লাগত। কাঁপতে কাঁপতে শ্লেট এগিয়ে দিতাম।

মাঝে মাঝে রাস্তায় দেখাও হয়ে যেত। হয় ত ডাকতেন এক আধ দিন—ওহে, কি নাম যেন তোমার?

নামটা বলতাম, বলতে হ'ত প্রায়ই, নাম মনে থাকত না পণ্ডিতের। নাম শুনে পণ্ডিত লজ্জিতই হতেন—এই গ্যাখো, তুমি ওই চাটুজ্যেদের বাড়ীর…তা কোন ক্লাস হ'ল?

একই ক্লাসে উঠে অনেকবার হয় ত বলেছি, তবু আবার বলতে হ'ত—এবার—

ক্লাস টেনে উঠেও পণ্ডিতের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারিনি কোনদিন।

তার পর কত বছর গেছে, স্কুল ছেড়ে কলেজে পড়তে এসেছি কলকাতায়। মাঝে মধ্যে বাড়ী গেছি। "কেতুপুর মাইনর স্কুল"-এর সাইনবোর্ডটা বারবার চোখে পড়েছে যাওয়া আসার পথের ধারে। দেখেছি মুঠোখানেক পথ পেরিয়ে গাছপালার ফাঁক দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে আসা পাঠশালার টুকরো টুকরো ছবি, নূতনত্ব কিছুই পাইনি তার মধ্যে। কেতুপুর গ্রামে পাঠশালা একটা চিরকাল আছে। চিরকাল সেখানে শশাঙ্ক পণ্ডিত বলে একজন মাষ্টার আছেন। এ দুয়ের সঙ্গে অচেনা লোকের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে আছে এক সাইনবোর্ড। এ যেন আবহমান কাল থেকে আছে। নিজের অস্তিত্বের কথা বারবার জানায় না অথচ সে না থাকলে কি যেন থাকবে না একটা, একটা নেই নেই ভাব হবে।

বছরের পর বছর কেটে গেছে। ছাত্রজীবন শেষ করে সংসার-জীবনে পাড়ি দিয়েছি। স্থিতিহীন এক চাকরির হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে এই দশ বছর ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। হঠাৎ কাল দশ বছর পরে আবার পা দিয়েছি এখানে। হঠাৎ আর বলি কি করে। এমন করেই ত চিরকাল ঘুরলাম। আজ রাতে ঠিক নেই কাল কোথায় যাব। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনদের কাছে এজন্যে তিরস্কার ছাড়া পুরস্কার আর পাইনে কোনদিন, তবু এ আকস্মিকতার মোহ আমার গেল না।

হাটের দিকে গিয়েছিলাম সকালে। দেখা হয়ে গেল পণ্ডিতের সঙ্গে। পায়ের ধুলো নিলাম। পরিচয়ও দিতে হ'ল নিজের। চিরকালের মত আজও পণ্ডিত ভুলে গেছেন আমার পরিচয়। ঠিক তেমনই আছেন পণ্ডিত, শুধু একটু বুড়ো হয়েছেন এই যা। সেই রঙ, বলিষ্ঠ, ঋজু চেহারা। নতুনের মধ্যে কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি পণ্ডিতের। তাও হয় ত এমনটা লাগল অনেকদিন পরে দেখা বলে। চলে আসছিলাম, পণ্ডিতই ডাকলেন, একথা-সেকথা বলতে বলতে শেষে বললেন—পাঠশালাটা তুলে দিচ্ছি বাবা।

তুলে দিচ্ছেন পাঠশালা?—বিস্মিত হয়ে তাকালাম পণ্ডিতের দিকে। সব বললেন তার পরে, তাকিয়েছিলাম পণ্ডিতের দিকে। থর্‌ থর্‌ করে কাঁপছিলেন রাগে না দুঃখে জানি না। শেষে চোখ মুছলেন কোঁচার খুঁটে। এতদিন পণ্ডিতকে কাঁদাতেই দেখেছি আর আজ দেখলাম কাঁদতে। কেন কি দোষ ছিল পণ্ডিতের!

সত্যিই ত দোষ দেওয়া যায় না পণ্ডিতকে। রাস্তা দিয়ে সেই কথা ভাবতে ভাবতেই ফিরছিলাম। দোষ যদি হয়ে থাকে ত সেকালের যুগের। আবার কালেরই বা দোষ বলি কেন। সব কপালের ফের।

তা দোষ পণ্ডিতের কপালেরই বটে। যুগ পাল্টাচ্ছে,

সব পুরনো জিনিস গেল, নতুন যুগের সঙ্গে তাল ফেলে চলতে পারেন নি পণ্ডিত, তিনি ত যাবেনই।

কথাটা হাটবারেই কানে উঠেছিল প্রথম। ছোট্ট কথা, তাও আবার মহেন্দ্র মিস্তিরের। বারো রাজ্যের খবর ঐ একটা লোকের কাছে। পণ্ডিত গিয়েছিলেন হাটে, মহেন্দ্র মিস্তিরই বলেছিলেন—বলি ওহে পণ্ডিত, তোমার সংস্কৃত ত গেল এবার। ওটা ডেড ল্যাংগুয়েজ হয়ে গেছে বুঝলে। মৃতভাষা, হিন্দী পড়াতে হবে এবার থেকে।

শশাঙ্ক পণ্ডিত হেসেছিলেন সেদিন। মৃতভাষা। সংস্কৃত মৃত ভাষাই বটে। অশিক্ষিতদের কাছে দেবভাষা, রাজ-ভাষার কদর এই বটে! বুঝবে কি ওরা! মনে মনে আবৃত্তি করেছিলেন—

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমাল তালী বনরাজিনীলা
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখাঃ।

কি বুঝবে ওরা এর মর্ম। আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন তিনি। হাসবেনই ত, তখন কি জানতেন তার ভাগ্যের কথা। না হ'লে মিস্তির মশায়ের ছোট্ট কথা আজ এত বড় গ্রহ হয়ে দেখা দেবে কেন তার জীবনে?

সত্যিই ছেলে-কমা সুরু হ'ল পাঠশালায়। তিন মাইল দূরের হাইস্কুলে ইংরেজী, হিন্দি, বাংলার ক্লাসে ছেলে আর জায়গা পায় না। তবু পাঠশালাটা টি'কে ত ছিল। ক্ষুদ্রকায় হলেও অস্তিত্বটা ত ছিল।

বছরখানেক বাদে আবার এক হাটবারে মহেন্দ্র মিস্তিরের সঙ্গে দেখা, হাঁক পাড়েন মিস্তির—বলি ও পণ্ডিত, তোমার শুভঙ্করীও গেল।

কি রকম?—পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

তা কি জানি, শুনছি নতুন রকমের টাকা হবে। একশ' পয়সায় টাকা।

হ্যাঁ, তোমার যেমন কথা, এরপর একদিন বলবে: পণ্ডিত দু'য়ে আর দু'য়ে তিন হবে, আঠার মাসে বছর হবে, চোদ্দির মাসে বছরের শেষ নয়, সুরু হবে—হাসতে হাসতেই বলেছিলেন কথাগুলো। তা হাসিরই ত কথা, শুভঙ্করী থাকবে না অঙ্কশাস্ত্র থাকবে, এও কি হয়। শুভঙ্করী কি আজকের, সেই কবে পড়েছিলেন তিনি। শুধু তিনি কেন তাঁর পিতামহ প্রপিতামহ, সকলেই। ও ত শিক্ষার অঙ্গই হয়ে গেছে।

সের প্রতি যত তঙ্কা হইবেক দর,
তঙ্কা প্রতি এক আনা ছটাকেতে ধর।

তারপর,

কুড়বো কুড়বো কুড়বো লিজ্যে
কাঠায় কাঠায় কাঠায় লিজ্যে

এ সব থাকবে না অথচ শিক্ষা থাকবে, অঙ্কশাস্ত্র থাকবে, তা কেমন করে হয়! শাস্ত্রের বিধান ত আর পরিবর্তনশীল নয়। মিস্তিরের কথাই ওরকম। বার রাজ্যের কথা শুনে একটার ঘাড়ে আরেকটা চাপিয়েছেন হয়ত।

কিন্তু না, মিস্তিরের কথাই ঠিক হ'ল। একশ' নতুন পয়সাতেই টাকা হবে এবার থেকে। মিস্তিরই খবরটা দিয়ে গেলেন এসে। বললেন, দেখলে ত পণ্ডিত, আমার কথায় তোমার পেত্যয় হ'ল না তখন। তা বিশ্বাসই কি আমারও হয়েছিল পণ্ডিত যে, চোদ্দির মাসে বছর সুরু হবে!

তাও হচ্ছে নাকি?—বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন পণ্ডিত।

হচ্ছে নাকি মানে। সামনের বছর থেকে চোদ্দির মাসে বছর সুরু হবে—গড়গড় করে বলে গিয়েছিলেন মিস্তির।

গেল, গেল, গেল। সব গেল, ভাষা গেল, অঙ্কশাস্ত্র গেল, সময়ের হিসাবে গেল। রইল কি আর বাকি। তবু ত পাঠশালাটা ছিল এত দিন। দু'চারটে ছেলে নিয়ে চলে ত যেত, কিন্তু আর পারলেন না পণ্ডিত, নতুন হাটে নতুন কথা আবার শুনলেন পণ্ডিত—ওজন পাল্টাচ্ছে। দশমিক প্রথায় এবার থেকে ওজন হবে। এবার আর মিস্তির নয় খবরের কাগজ থেকে নিজেই পড়লেন। একবার নয়, দু'বার নয় বার বার। এতদিনের পাঠশালাটা তাহলে গেলই এবার সত্যি সত্যি। জোড়া দিয়ে দিয়ে আর কতদিন চালাবেন তিনি। তুলেই দেবেন এবার পণ্ডিত। মৃগাঙ্ক পণ্ডিত কত নিষেধ করেছিলন পাঠশালা করার জন্যে। কত নিষেধ করেছিল হরি চাটুজ্যের বউ, আর পাড়ার অন্য বউ-ঝিয়েরা। সেদিন শোনেন নি কারো নিষেধ। আর আজ কারো নিষেধ নেই অথচ তুলে দিতে হ'ল, তার আর দোষ কি?

মৃগাঙ্ক ভটচাযের ছেলে শশাঙ্ক পণ্ডিত আবার পুরুতগিরি করবেন। লক্ষ্মীপুজায় আর ব্রতকথার ব্রাহ্মণ ভোজনে আবার তার ডাক পড়বে। আবার সত্যনারায়ণের পাচালী পড়বেন পণ্ডিত ত্রিপদীর ছন্দে—

আমার কিঙ্কর, দুই সদাগর, বন্দী রাখ কি কারণে।
প্রাণ রক্ষা চাও, দুয়ে ছাড়ি দাও, সপ্ততরী পুরি ধনে॥
হয় চমৎকার, সুরথ-রাজার, পাত্রসনে বিচারিয়া।
সদাগরে আসি, কহে স্তুতি বাণী, বসন-ভূষণ দিয়া॥

ত্রিপদী ছেড়ে আবার দীর্ঘ ত্রিপদী ধরবেন—

না জানি কি কৈনু পাপ, কেবা দিল অভিশাপ,
বিবাদ সাধিল কোন দেবে।
পতিব্রতা বিনাপতি, অন্য নাহি তার গতি,
মোয়ে নাথ সংহতি করিবে॥
আচম্বিতে বজ্রাঘাত, হারাইনু প্রাণনাথ,
বিধবার জীবন বিফল।
কহে পিতামাতা আগে, অভাগী বিদায় মাগে,
কুণ্ড কাটি জ্বালহ অনল॥

মেয়েরা চোখ মুছবে বার বার। বুড়ীরা শুনতে শুনতে ঝিমিয়ে পড়বে। রাত গড়িয়ে যাবে প্রথম প্রহর থেকে দ্বিতীয় প্রহরের দিকে। পণ্ডিত তখনও নির্বিকার চিত্তে পড়ে চলবেন—দীর্ঘ ত্রিপদীর মধুময় ছন্দে···

শঙ্কর-মতে "সাধন" : কর্ম

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

২

পূর্ব সংখ্যায় শঙ্কর-মতে, জ্ঞান যে কর্মাঙ্গ নয়, কর্ম যে মোক্ষের সাধন নয়, সে বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলা হয়েছে। এই সংখ্যায় সে সম্বন্ধে আরও কয়েকটি প্রমাণ দেওয়া হচ্ছে।

শঙ্কর বলেছেন যে :

ষষ্ঠতঃ, স্বয়ং জ্ঞানকে 'বিদিক্রিয়ারূপ' কর্ম, 'জানা' এই কর্ম বলে গ্রহণ করা চলে না এবং বলা চলে না যে, এই ভাবে ব্রহ্ম কর্মলভ্য। কারণ, ব্রহ্ম অবিষয় বলে, 'বিদি-ক্রিয়া' বা 'জানার' বিষয়ও তিনি নন। বস্তুতঃ, জীব ব্রহ্মকে জানেন না, কারণ জীবই ত স্বয়ং ব্রহ্ম। সেজন্য মুক্তির সাধক ব্রহ্মজ্ঞান প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের জ্ঞান নয়, ব্রহ্মের জ্ঞানের আবরক অজ্ঞানের অপসারকই মাত্র অর্থাৎ, এরূপ জ্ঞান সদর্থক ব্রহ্মজ্ঞান নয়, নঞর্থক মিথ্যাজ্ঞান ধ্বংস-কারক। সাধারণতঃ, অবশ্য ব্রহ্মজ্ঞানকে সদর্থক ব্রহ্মবিষয়ক বলে গ্রহণ করা হলেও, বাস্তবপক্ষে, তা নঞর্থক দেহাত্ম ভ্রমাদিনিরাস-বিষয়ক। সেজন্য ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকৃতরূপ এই নয় : 'ব্রহ্মই আত্মা'; এর প্রকৃত রূপ এই : 'আত্মা দেহ নয়।' আত্মা যে দেহ নয় এই নঞর্থক জ্ঞান হলেই, আত্মা ব্রহ্ম হন, অথবা স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপত্ব উপলব্ধি করেন, ব্রহ্মকে জ্ঞানের বিষয়রূপে স্বতন্ত্রভাবে জানবার তাঁর আর সুযোগ বা অবকাশই থাকে না। বস্তুতঃ, 'জানার' অর্থই হ'ল যে, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় দুটি স্বতন্ত্র বস্তু। মানস প্রত্যক্ষের (Intros-fection-এ) ক্ষেত্রে অবশ্য বলা হয় যে, চিত্ত নিজেই নিজেকে জানে; অর্থাৎ চিত্ত তার একটি চিত্তবৃত্তিকে জানে। কিন্তু চিত্ত ও চিত্তবৃত্তির মধ্যে যে প্রভেদ, ব্রহ্ম ও আত্মার মধ্যে সেই প্রভেদটুকুও নেই। অতএব আত্মা ব্রহ্মকে জানবে কি করে? এমন কি "তত্ত্বমসি" (ছান্দোগ্যোপনিষদ ৬-৮-৭) প্রমুখ সদর্থক বাক্যেও ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় হয়ে পড়েন না। এ স্থলেও, 'তৎ' ও 'ত্বম্', ব্রহ্ম ও জীবের একত্ব উপলব্ধির পথের বাধাপসারণই হ'ল এই মহাবাক্যের প্রকৃত অর্থ। এরূপে, এমন কি জ্ঞানও মোক্ষের কারণ নয়, অজ্ঞান-বিনাশেরই কারণমাত্র, এবং মোক্ষ অজ্ঞানবিনাশ ব্যতীত অপর কিছুই নয়, যেহেতু, শঙ্কর যা বারংবার বলেছেন, অজ্ঞানবিনাশ হলেই হয় নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্ম বা মোক্ষের প্রকাশ।

একটি তুলনার উল্লেখ করে বলা যেতে পারে যে, যোগ-সূত্রেও এই একই ভাবের কথা আছে :

"নাত্র দর্শনং মোক্ষকারণং, অদর্শনাভাবাদেব বন্ধাভাবঃ, স মোক্ষঃ ইতি। দর্শনস্য ভাবে বন্ধকারণস্যাদর্শনস্য নাশ ইত্যতো দর্শনজ্ঞানং কৈবল্যকারণমুক্তম্।" (যোগসূত্র ২-২৩)।

অর্থাৎ, দর্শন বা জ্ঞান মোক্ষকারণ নয়; বরং অদর্শন বা অজ্ঞানের অভাব থেকেই বন্ধের অভাব হয়, এবং এরূপ বন্ধাভাবই মোক্ষ। দর্শন বা জ্ঞান হলে, বন্ধের কারণ অদর্শন বা অজ্ঞানের বিনাশ হয়—এই অর্থেই কেবল দর্শন বা জ্ঞানকে মোক্ষের কারণ বলা হয়েছে।

এরূপে, বেদান্ত ও সাংখ্যযোগ মতানুসারে মুক্তি-প্রণালী এইরূপ :

জ্ঞান থেকে অজ্ঞান বিনাশ, তা থেকে বন্ধ-বিনাশ, তা থেকে মোক্ষ।

অর্থাৎ, মোক্ষ যে কেবল কর্মরূপ কারণেরই কার্য নয়, তাই নয়; মোক্ষ জ্ঞানরূপ কারণেরও কার্য নয়; কোন কারণেরই কার্য নয়; কিন্তু নিত্য।

অতএব, সিদ্ধান্ত করা চলে যে, ব্রহ্ম অবিষয়, জ্ঞানেরও বিষয় নন, জ্ঞানরূপ ক্রিয়ারও বিষয় নন, কর্ম দ্বারা লভ্য নন, কর্ম মোক্ষের সাধন নয়।

সপ্তমতঃ, উৎপত্তি, বিকার, প্রাপ্তি ও সংস্কারপ্রমুখ চতুর্বিধ কর্মের কোনটিই মোক্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ, মোক্ষ উৎপাদ্য, বিকার্য, প্রাপ্তব্য ও সংস্কার্য কোনটিই নয়। এ বিষয় পূর্বেই বলা হয়েছে।

এরূপে, শঙ্কর সিদ্ধান্ত করছেন ঃ

"অতোহন্যৎ মোক্ষং প্রতি ক্রিয়ানুপ্রবেশদ্বারং ন শক্যং কেনচিদ্দর্শয়িতুম্। তস্মাৎ জ্ঞানমেকং মুক্ত্বা ক্রিয়ায়া গন্ধমাত্রস্যানুপ্রবেশ ইহ নোপপদ্যতে।" (ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য, ১-১-৪)।

অর্থাৎ, মোক্ষ যদি উপরে উক্ত চতুর্বিধ কর্মের কোনটিরই অন্তর্ভুক্ত না হয়, তা হলে অন্য কোন প্রকারেই মোক্ষে ক্রিয়ার প্রবেশের পথ দেখাতে পারা যাবে না ; অর্থাৎ, অন্য কোন প্রকারেই মোক্ষকে কর্ম দ্বারা লভ্য বলে প্রমাণিত করা যাবে না। সেজন্য, মোক্ষে জ্ঞান ব্যতীত ক্রিয়ার গন্ধমাত্রও প্রবেশ অযৌক্তিক।

অষ্টমতঃ, পূর্ব প্রমাণানুসারে, ব্রহ্ম জ্ঞানের অবিষয় হলেও, জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানবিনাশ এবং অজ্ঞানবিনাশই মোক্ষ বলে, জ্ঞানকেই সেই অর্থে মোক্ষের সাধকরূপে গ্রহণ করা হয় ; কিন্তু সেজন্য জ্ঞানই স্বয়ং "মানসী ক্রিয়া", এবং সেই দিক্ থেকে মোক্ষে ক্রিয়ার স্থান আছে—এ যুক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে মানসী ক্রিয়া নয়,—জ্ঞান ও ক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে পরস্পরভিন্ন। এ সম্বন্ধে পূর্বেই কিছু বলা হয়েছে।

"ননু জ্ঞানং নাম মানসী ক্রিয়া, ন, বৈলক্ষণ্যাৎ।" "ক্রিয়া হি নাম সা যত্র বস্তুস্বরূপনিরপেক্ষৈব চোদ্যতে, পুরুষ-চিত্ত-ব্যাপারাধীনা চ।" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ১-১-৪)।

প্রথমতঃ, ক্রিয়া বস্তুস্বরূপ নিরপেক্ষ। অর্থাৎ ক্রিয়ার লক্ষ্য একটি পূর্বসিদ্ধ বিরাজমান বস্তু নয়, একটি ভাবী, প্রাপ্তব্য লক্ষ্য। কেবল তাই নয়, ক্রিয়ার ক্ষেত্রে, বিহিত কর্মটিই সেই কর্মের লক্ষ্য বস্তু বা বিষয় অপেক্ষা বহুগুণে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। যেমন ঃ 'গ্রামে গমন কর'—এই ক্রিয়ার স্থলে 'গমনই' প্রধান কথা, গ্রাম বা গ্রামস্বরূপ নয়। দেবতাকে ধ্যান ও হবিঃ অর্পণই প্রধান কথা, দেবতার স্বরূপ নয়। "ভামতী" টীকাতেও বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন ঃ

"দেবতা-সম্প্রদানক-হবিগ্রহণে দেবতা-বস্তুস্বরূপানপেক্ষা দেবতা-ধ্যান-ক্রিয়া।" (ভামতী ১-১-৪)।

দ্বিতীয়তঃ, ক্রিয়া চোদনা-তন্ত্র। অর্থাৎ, 'এই কর' এরূপ চোদনা, আজ্ঞা বা নির্দেশের অধীন।

তৃতীয়তঃ, ক্রিয়া পুরুষ-তন্ত্র বা পুরুষ-চিত্ত-ব্যাপারাধীন। অর্থাৎ, ক্রিয়া সম্পূর্ণরূপেই কর্তার ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। কর্তা ক্রিয়াটি করতেও পারেন, না করতেও পারেন, নানাভাবে করতেও পারেন।

কিন্তু জ্ঞানের স্বরূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রথমতঃ জ্ঞান বস্তু-তন্ত্র। অর্থাৎ, একটি পূর্বসিদ্ধ, বিরাজমান বস্তুর অজ্ঞানাবরণ বিনাশ করে, বস্তুস্বরূপ উদ্ভাসিত করে, সেজন্য এই জ্ঞান ক্রিয়ার সাহায্যে কোনও কিছু সৃষ্টি করে না। (পৃঃ ২৪৮)।

দ্বিতীয়তঃ, জ্ঞান চোদনাতন্ত্র নয়। অর্থাৎ, বস্তুর অধীন বলে, চোদনা আজ্ঞা, বা নির্দেশের অধীন নয় ; যেহেতু যা' পূর্ব থেকেই আছে, তা' 'কর' বলে' করাতে হয় না, বা করান যায় না।

তৃতীয়তঃ, জ্ঞান পুরুষতন্ত্র নয়।

সেজন্য শঙ্কর সিদ্ধান্ত করছেন যে ঃ

"তস্মান্মানসত্বেঽপি জ্ঞানস্য মহদ্ বৈলক্ষণ্যম্।"

(ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য ১-১-৪)।

অর্থাৎ, জ্ঞান মানসিক অবস্থা হলেও, ক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

"তত্রৈবং সতি, যথাভূতব্রহ্মাত্মবিষয়মপি জ্ঞানং ন চোদনা-তন্ত্রম্।" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ১-১-৪)।

একই ভাবে, যথাভূত বা পূর্বসিদ্ধ ব্রহ্মাত্মজ্ঞানও ব্রহ্মাত্ম-বস্তুরই অধীন, নিয়োগের অধীন নয়।

উপমা দিয়ে শঙ্কর বলছেন যে, যেমন সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরও প্রস্তরের ক্ষেত্রে শক্তিহীন হয়ে যায়, সেরূপ লিঙ্-রূপ বিধি-প্রত্যয় থাকলেও ব্রহ্ম-বাক্যের ক্ষেত্রে তা শক্তিহীন বা নিরর্থক।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ২-৪-৫) এই সুবিখ্যাত বিধিমূলক উপনিষদ্ মন্ত্রটি শঙ্কর গ্রহণ করেছেন। এরূপ "বিধিচ্ছায়ানি বচনানি" বা আপাতদৃষ্টিতে বিধিমূলক বাক্য বহির্মুখীন অজ্ঞ জীবকে অন্তর্মুখীন হতেই কেবল নির্দেশ দেয়। বাহিরের ইন্দ্রিয়-ভোগ্য-জাগতিক বস্তু কোনদিনই মানবকে প্রকৃত মুক্তি ও আনন্দ দান করতে পারে না। সেজন্য, সেই সকল বস্তু ত্যাগ করিয়ে, আত্ম-দর্শনে উদ্বুদ্ধ করাই এই সকল তথাকথিত বিধিমূলক বাক্যের উদ্দেশ্য—এদের দ্বারা ব্রহ্ম বা মোক্ষ কর্মাঙ্গ ও ক্রিয়ালভ্য হয়ে পড়েন না।

নবমতঃ, কেবল বস্তুতন্ত্র, বিধিবিহীন বাক্যও যে নিরর্থক, এ কথাও বলা যায় না। কর্মকাণ্ডেই দধি-সোম প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল দ্রব্যাদি বিষয়ক ও বিধিবিহীন বাক্যাদি আছে, তা কি নিরর্থক ? বেদান্তেও এরূপ বস্তু-তন্ত্র ও

ব্রহ্মাত্মস্বরূপ-বোধক যে সকল বাক্যাদি আছে, সেই সকল বাক্যাদি জীবের অজ্ঞান-নিবারণ করে। তার সাংসারিত্ব বিনাশ ও মুক্তি সাধন করে। (পৃঃ ২০২)।

দশমতঃ, একমাত্র ক্রিয়াই যদি ধর্মশাস্ত্র ও মোক্ষশাস্ত্র উভয়েরই মূল কথা হয়, তা হ'লে এই সকল শাস্ত্রে 'নিষেধের' স্থান কই? 'বিধির' অর্থ ক্রিয়া বা প্রবৃত্তি, 'নিষেধের' অর্থ ক্রিয়ার অভাব বা নিবৃত্তি। যেমন, 'ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ।' এ স্থলে, ক্রিয়া বা কর্মের নিয়োগ নেই, তার বিপরীত বা কর্মাভাবেরই নিয়োগ আছে।

এরূপে, নানা দিক্ থেকে, যুক্তি সহকারে আলোচনা করে শঙ্কর উপরের দশটি প্রধান প্রমাণ দিয়ে তাঁর ব্রহ্ম-সূত্র-ভাষ্যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সাধারণ সকামকর্ম এবং শাস্ত্রোপদিষ্ট বা বেদের কর্ম-কাণ্ড-বিহিত, যাগ-যজ্ঞ-দানাদিরূপ সকামকর্ম মোক্ষের সাধন নয়, এবং বন্ধ বা জন্ম-জন্মান্তরেরই কারণ। ব্রহ্মই মোক্ষ। সেজন্য শাশ্বত, নিত্য-সত্য, নিত্য-সিদ্ধ ব্রহ্ম বা মোক্ষ কর্ম, বা জ্ঞান, বা ভক্তি, বা অন্য কোন কারণের কার্য নন; অথচ তাঁর অস্তিত্ব অবশ্য-স্বীকার্য।

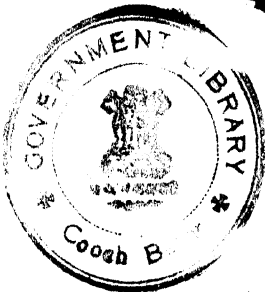
"ন হি অহম্ প্রত্যয়-বিষয়-কর্তৃব্যতিরেকেণ তৎসাক্ষী সর্বভূতস্থঃ সন্ একঃ কূটস্থনিত্যঃ পুরুষো বিধি-কাণ্ডে তর্ক-সময়ে বা কেনচিদধিগতঃ সর্বস্যাত্মা। অতঃ সঃ ন কেনচিৎ প্রত্যাখ্যাতুং শক্যো বিধিশেষত্বং বা নেতুম্। আত্মত্বাদেব চ সর্বেষাং ন হেয়ো নাপ্যুপাদেয়ঃ।" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ১-১-৪)।

অর্থাৎ, কেহই বিধিকাণ্ড বা কর্মকাণ্ড এবং তর্ককাণ্ড বা যুক্তি-তর্ক দ্বারা সেই এক কূটস্থনিত্য পুরুষকে জানতে পারেন না—যিনি 'অহং' প্রত্যয়ভাগী কর্তা বা বদ্ধ-জীবের উর্দ্ধে সাক্ষিস্বরূপ, যিনি সর্বাত্মা ও সর্বভূতস্থ, অর্থাৎ যিনিই স্বয়ং জীব-জগৎ। সেজন্য তাঁকে অস্বীকারও করা যায় না, কর্মাঙ্গ বলেও স্বীকার করা যায় না। সকলেরই আত্মা বলে তিনি হেয়ও নন, উপাদেয়ও নন, অর্থাৎ নিত্যপ্রাপ্ত।

"অতো বস্তুপরো বেদভাগো নাস্তীতি বচনং সাহস-মাত্রম্।" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ১ ১-৪)।

অতএব, সমগ্র বেদই কর্মাঙ্গ, বিধিমূলক ও ক্রিয়াপর, কেবলমাত্র বস্তু-স্বরূপ-দ্যোতক বেদাংশ নেই—এরূপ উক্তি দুঃসাহসই মাত্র।

এরূপে, শঙ্কর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরল সহজ, অথচ সুনিপুণ সুনিগূঢ় ভাবে, কর্মের স্বরূপ ও ফল সম্বন্ধে যে সুন্দর আলোচনা করেছেন, তা মুমুক্ষু-জনকে সত্য পথের সন্ধান দেবে, নিঃসন্দেহ।



বন্যা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

আমার এক পুত্র বাংলার বাহির হইতে তাহার কনিষ্ঠ সহোদরকে লিখিয়াছে, "বাঙালীর মেরুদণ্ড ভাঙবে না, ইতিহাসের প্রত্যুষ থেকে সঙ্কট আর সংশয়ের মধ্যে বাঙালী চলেছে পতন এবং অভ্যুদয়ের মধ্যে। প্রাকৃতিক আর সরকারী অত্যাচার ও লাঞ্ছনা বাংলার দুর্বার প্রাণশক্তিকে বার বার চেষ্টা করেছে পরাভূত করতে, কিন্তু অজেয় প্রাণ-প্রাচুর্য্যের অধিকারী বাঙালী প্রত্যেক বার তীব্রতর তেজে জেগে উঠেছে। ১৯৪৩ সন থেকে নানা দুঃখের মধ্যে বাঙালী এগোচ্ছে। আমার মনে হয় কোন এক মহত্তর ভূমিকার জন্য ঈশ্বর বাঙালীকে গড়ে তুলছেন এই সব কঠিন পরীক্ষার মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের কথাই ঠিক হবে—"দুঃখ সহার তপস্যাতেই হোক্ বাঙালীর জয়।" যুবক পুত্রের যুবোচিত বিশ্বাস অটুট থাকুক—এই প্রার্থনা করি।

পশ্চিম বাংলার বুকের উপর দিয়া বন্যা ও বৃষ্টির যে তাণ্ডবলীলা চলিয়া গেল—ইহার জন্য কে বা কাহারা দায়ী এই সূক্ষ্ম বিচার আরম্ভ হইয়াছে; বিভিন্ন দল (সরকারী ও বেসরকারী) বিভিন্ন মত প্রকাশ করিতেছেন; তবে সকল দলেরই সব অভিমতের মূলে যে রাজনীতির স্পর্শ আছে সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিভিন্ন দলের সূক্ষ্ম বিচার চলুক,ইহাতে জনসাধারণের কোন আপত্তি থাকিতে পারে না এবং ইহার ফলে ভবিষ্যতে বন্যার আক্রমণ যদি প্রতিহত হয় জনসাধারণ অধিকতর উপকৃত হইবে এবং তাহাদিগকে ভবিষ্যতে এমনতর বিপদ ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে হইবে না।

কিন্তু সব চেয়ে বড় আশঙ্কা হইতেছে যে এই চরম দুর্গতির সময়ে বন্যাবিধ্বস্ত পল্লী অঞ্চলবাসী কতটা সাহায্য কি ভাবে পাইবে। তাহারা ত একেবারে সর্বহারা।

অবশ্য, পল্লী অঞ্চলের দুর্গতি দূর করিবার জন্য সরকারী এবং বেসরকারী মহল কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং প্রায় প্রত্যেক স্তরের নেতৃবৃন্দ সাহায্যের জন্য,অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান বা সঙ্ঘের সংখ্যা ইতিমধ্যেই কম নয়, আরও বাড়ীতে পারে। অর্থ সংগ্রহের জন্য বিবিধ উপায়ও অবলম্বিত হইয়াছে ; সব উপায় যে সমীচীন ও শোভন তাহা বলা কঠিন। দুর্গত এবং সর্ব্বহারাদের সাহায্যের জন্য আমার ক্ষমতা অনুযায়ী আমি সোজাসুজি অর্থ দান করিতে পারি না, কিন্তু তাহাদের সাহায্যের জন্য খানিকটা আনন্দ উপভোগের মাধ্যমে অর্থ দান করিতে পারি। ইহাতে আমার আত্মপ্রসাদ ত হইবেই, পুণ্য সঞ্চয়ও কম হইবে না। পরের দুঃখ মোচনের এবং নৈতিক উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য একদা যে বাঙালী দীঘি, পুষ্করিণী, রাস্তা, ঘাট, হাসপাতাল, দেবালয়, বিদ্যালয় প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছে সেই বাঙালী কি বর্ত্তমানে আর্ত্তের প্রতি একেবারে উদাসীন ও দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে, অর্থ সংগ্রহকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা সঙ্ঘের উদ্দেশ্য যে একেবারে রাজনীতি বিবর্জ্জিত তাহা বলাও কঠিন। বিভিন্ন দলের মধ্যে পরস্পর রেষারেষি এবং অবিশ্বাসের ছোঁয়াচ যে নাই এ কথাও বলা যায় না। শুনিতে পাই, চাঁদা সংগ্রহকারী কোন কোন দল দুর্গত অঞ্চলে নিজেরা যাইয়া দুর্গতদের সাহায্য করিবেন ; তাঁহারা অন্য কোন তহবিলে তাঁহাদের সংগৃহীত দিবেন না। ইহা হইতেই প্রতীয়মান হইতেছে যে, কোন সঙ্ঘের উপরেই তাঁহাদের বিশ্বাস নাই। আজ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের 'সঙ্কট ত্রাণ সমিতি'র কথা মনে হয়, কোথায় সেই নেতা, সেই নেতৃত্ব, সেই বিশ্বাস ? 'সঙ্কট ত্রাণ সমিতি'র উদ্দেশ্যের মূলে ত্রাণই ছিল, কোন রাজনীতি ছিল না, কাহারও কোন প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা ছিল না, ভোট-যুদ্ধে নামিবারও উদ্দেশ্য ছিল না। সংগৃহীত অর্থ বন্যা বিধ্বস্ত পল্লী অঞ্চলের সর্ব্বহারাদের নিকট ঠিক কতটা পৌঁছিবে, সে সম্বন্ধেও সাধারণের মধ্যে গবেষণা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন হিসাব। কেহ কেহ বলিতেছেন—রামকৃষ্ণ মিশন এবং ভারত সেবাশ্রমের উপর ত্রাণের ভার অর্পিত হইলে জনসাধারণ এবং দুর্গতগণ এই বিষয়ে আশান্বিত হইত।

যে পরিমাণ ফসলের ক্ষতি হইয়াছে যথা সম্ভব তাহা পূরণের জন্য রাষ্ট্র চেষ্টা করিতেছেন এবং বর্ত্তমান ঋতুর উপযোগী নানাবিধ ফসল অধিকতর পরিমাণে প্রচলনের ব্যবস্থা করিতেছেন। উদ্দেশ্য যে সাধু, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই ; কিন্তু অতীতের মূর্ত্তীভূত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, কাগজে কলমে হয়ত অধিকতর উৎপাদন দেখা যাইবে, কিন্তু বাস্তবে তাহা টিকিবে না। স্বাভাবিক সময়েও কৃষি-বিভাগ কর্ত্তৃক প্রদত্ত বীজ, সার ইত্যাদি উপযুক্ত সময়ে সরবরাহ করা হয় না ; আবার কৃষি-বিভাগ কর্ত্তৃক প্রদত্ত বীজ সকল স্থানে সমান ভাবে অঙ্কুরিত হয় না—এ সম্বন্ধে কৃষক সম্প্রদায়ের কৃষি বিভাগের উপর কখনও আস্থা ছিল না, এখনও নাই। এবারে আবার বেশী পরিমাণ বীজই বিভিন্ন দেশ হইতে আমদানী করা হইবে ; বিভিন্ন স্থানের সকল প্রকার বীজ পশ্চিম বাংলার সকল স্থানের মাটি, জলবায়ু প্রভৃতির উপযোগী হইবে কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ঠিক সময়ে কৃষকেরা বীজ, সার পাইবেন কিনা তাহাও বলা যায় না। যাহা হউক কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম হইবে।

বীজ, সার প্রভৃতি সময় মত পৌঁছাইলেও কাহারা তাহা দ্বারা ফসল ফলাইবে—তাহাও এই প্রসঙ্গে বিবেচনা করা দরকার—সর্ব্বহারারাই ফসল ফলাইবে! সম্প্রতি ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন বলিয়াছেন—দেশ হইতে দারিদ্র্য দূর করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে আমাদের জাতীয় অর্থ সম্পদ এবং কৃষি-জাত এবং শিল্প-জাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা। একমাত্র কঠিন পরিশ্রমের ও কাজের দ্বারাই ইহা সম্ভব হইতে পারে। জাপান, জার্ম্মানী, সোভিয়েট ইউনিয়ন, চীন প্রভৃতি দেশের লোকেরা নিজেদের দেশ গঠনের গর্ব্ব অনুভব করে এবং দেশ গঠনের জন্য পরিশ্রম ও কাজ করে। আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যেও এই গর্ব্ব জাগরূক করা দরকার—তাহা হইলেই আমাদের জনসাধারণ কঠিন পরিশ্রম করিতে উৎসাহিত হইবে * *। আমাদের মধ্যে অনেকেরই 'সাধারণ তহবিল' সম্বন্ধে কোন বিবেকই নাই ; আমরা যদি আমাদের মধ্যে একাত্মবোধ এবং ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারি, এবং উহা বর্দ্ধিত করিতে পারি এবং আমরা যদি দেশ হইতে দুর্নীতি বিতাড়িত করিতে পারি এবং নৈতিক অবনতি দমন করিতে পারি তবেই জনসাধারণ অধিকতর পরিশ্রম করিতে উদ্বুদ্ধ হইবে ; তাহাদের এই শক্তি আছে। কিন্তু জনসাধারণ অধিকতর পরিশ্রম করিতে উদ্বুদ্ধ হইবে না, যদি তাহাদের এই বিশ্বাস না থাকে যে, রাষ্ট্র দুর্নীতিশূন্য এবং রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ নির্ম্মল। তিনি আরও বলিয়াছেন আমাদের দেশে ভীষণভাবে দারিদ্র্যপ্রপীড়িত, এমন ভীষণ ও ব্যাপক দারিদ্র্য আর কোন দেশে নাই। দারিদ্র্য মানুষকে মনুষ্যত্বহীন ও অধঃপতিত করে, মানুষকে অসংখ্য অবমাননা এবং নিগ্রহের মধ্যে নিক্ষেপ করে। অবশ্য অনাড়ম্বর এবং বিলাসশূন্য জীবনই অভিপ্রেত, কিন্তু দরিদ্র জনগণের মধ্যে অনাড়ম্বর ও বিলাসশূন্য জীবনের প্রচার-মহিমা করা নির্ব্বোধের কাজ। উপরিস্তরের লোকদের মধ্যেই ইহার আরম্ভ হওয়া উচিত। দারিদ্র্য কুৎসিত ও ঘৃণিত, কিন্তু আড়ম্বর ও বিলাসপূর্ণ জীবন অধিকতর কুৎসিত ও ঘৃণিত। প্রত্যেক নাগরিকের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তাহাকে ন্যূনতম স্বচ্ছন্দ দিতেই হইবে। যে সর্ব্বহারা কৃষক সম্প্রদায়ের উপর অধিকতর ফসল ফলানোর ভার অর্পিত আছে, তাহারা কি ন্যূনতম স্বাচ্ছন্দের মধ্যেও আছে ? তাহারা কোন্ ভরসায় অধিকতর ফসল উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত হইবে এবং সেই উদ্দেশ্যে অধিকতর পরিশ্রমের সম্মুখীন হইবে, বর্ত্তমানে তাহাদের দেহ ও মন কি কঠিন পরিশ্রমের পক্ষে উপযোগী ও পটু ? তাই বলি, ডাঃ রাধাকৃষ্ণন অরণ্যে রোদন করিয়াছেন। আগে তাহাদের গড়িয়া তুলিবার ব্যবস্থা করা হউক, পরে তাহারা দেশকে গড়িয়া তুলিবে।

অন্ধ আকাশ

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

১৮

পরদিন সন্ধ্যায় গুলবা চুপি চুপি রুকিয়ার আঙিনায় আসিয়া ঢোকে, দেখে ঘরের দরজা বন্ধ। দরজার পাশে সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, কিন্তু কেহ দরজা খুলিয়া বাহিরে আসে না। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া গুলবা চলিয়া যায়, খানিক পরে আবার সে ফিরিয়া আসে, বন্ধ দরজার পাশে শিকারী জানোয়ারের মত ওঁৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে। রাত ক্রমে বাড়িয়া যায়, আকাশে তারা ঢাকিয়া মেঘ ঘনাইয়া আসে। গুলবা উঠিয়া দরজা আস্তে ঠেলিয়া দেখে, কিন্তু দরজা সত্যই বন্ধ। গুলবা অধৈর্য হইয়া ওঠে, দরজায় দু'বার টোকা দিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া শোনে, কিন্তু ভিতর হইতে কোনই সাড়া আসে না। টুপটাপ করিয়া বৃষ্টি সুরু হয়, গুলবা ক্রমে হতাশ হইয়া পড়ে। অবশেষে দরজায় শেষবার জোরে একটা ধাক্কা দিয়া চলিয়া যায়।

বর্ষা আসিয়া পড়ায় কাজ বন্ধ, তাই গুলবা দিনেও ঘোরাফেরা করে। কিন্তু রুকিয়ার ঘরের দরজা প্রায় সময়ই বন্ধ দেখে, দেখা পাইলেও তাহাকে একা পায় না, কেহ না কেহ সঙ্গে থাকে। রুকিয়া যে তাহাকে ধরা দিতে চাহে না গুলবা তাহা বুঝিতে পারে কিন্তু তাহার রক্তে শিকারের উত্তেজনা জাগিয়াছে, হিংস্র জানোয়ারের মতই নিঃশব্দে আড়ালে আবডালে অনুসরণ করিয়া বেড়ায়।

সপ্তাহ শেষ না হইতে গুলবার দেওয়া পাঁচ টাকা শেষ হইয়া যায়, রুকিয়ার উনুনে আবার আগুন জ্বলে না। রোগে ও অনাহারে তিলকা এমন একটা অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে যেখানে তাহার বুদ্ধি ও বিবেচনা লোপ পাইতে বসিয়াছে। টাকা না দিলে কেহ ধান-চাল দেয় না, এই সোজা কথাটা সে বুঝিতে চায় না, ক্ষুধা পাইলেই খাইতে চায়, এবং খাদ্য না পাইলে রুকিয়াকে গালাগালি করে।

বাহিরে বৃষ্টি পড়িতেছে, দরজা বন্ধ করিয়া ছেলে কোলে লইয়া রুকিয়া ঘরের কোণে বসিয়া থাকে। তিলকা ঝিমাইতেছিল জাগিয়া উঠিয়া ডাকে, "কোথায় গো, কি করছিস ?"

রুকিয়া জবাব দেয়, "এই ত এইখানে আছি।"

তিলকা ক্ষীণকণ্ঠে বলে, "হ্যাঁ গা, দুপুর হয়ে গেল, আমাকে খেতে দিবি নে ?"

অবাক হইয়া রুকিয়া বলে, "দুপুর কিগো, এই ত সকাল হ'ল।"

"খিদেয় আমার পেট জ্বলে যাচ্ছে আর তুই বলিস্ বেলা হয় নি ? খেতে দে, খেতে দে শীগগির।" বলে তিলকা।

রুকিয়া উঠিয়া পড়ে, তিলকার কাছে আসিয়া বলে, "বেলা হয় নি, সত্যিই বলছি বেলা হয় নি। বাইরে বিষ্টি পড়ছে, চেয়ে-চিন্তে যে দুটো চাল নিয়ে আসব তারও উপায় নেই। আর একটু সবুর কর্, অমন অবুঝের মত করিস্ নে।"

শুনিয়া রাগিয়া ওঠে তিলকা, চেঁচাইয়া বলে, "তুই আমাকে অবুঝ বললি ? আমি সব বুঝি, তুই খেয়ে বসে আছিস্ আমাকে দিবি কি ? তোর বজ্জাতি আমি সব বুঝি।"

রুকিয়া জবাব দেয় না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। তিলকা ক্ষীণকণ্ঠে তাহাকে গালাগালি করে, "হারামজাদী, বজ্জাত।"

রুকিয়ার রক্ত গরম হইয়া ওঠে, কোনমতে রাগ চাপিয়া সে বলে, "গালাগালি করিস্ নে, রোজগার নাই, হাতে পয়সা নাই, অত খাই-খাই করলে চলবে কেন ? খাবি কি ?"

তিলকা সে কথায় কান দেয় না, তাহার অসুস্থ দেহমন যুক্তির ধার ধারে না, বলে, "তুই চুরি করে নিজে খাস্, আমাকে দিস্ নে।"

রুকিয়ার মুখ দিয়া কড়া জবাব বাহির হইতে যায়, কিন্তু দাঁতে দাঁত চাপিয়া সে নিজেকে সংযত করে। তিলকা থামে না, সে গালাগালি করিয়া চলে। রুকিয়া এইবার তাহার অত্যন্ত কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, কঠিন কণ্ঠে বলে, "থাম, থাম বলছি।"

ধমক খাইয়া তিলকা থামিয়া যায়, তাহার জ্যোতিহীন চোখ দুটি বিস্ফারিত করিয়া রুকিয়ার দিকে তাকায়। রুকিয়া বলে, "ফের যদি বলবি আমি চুরি করে খাই তা হলে তোর মুখ ভেঙ্গে দেব। তুই চোখের মাথা খেয়েছিস, তা না হলে দেখতিস না খেয়ে না খেয়ে আমার কি হাল হয়েছে। আমার পেটে অন্ন নাই, পরণে কাপড় নাই।

আমি কাঁথা পরে' থাকি, আমি যে লজ্জায় লোকের সামনে বেরুতে পারি নে।"

অপরিসীম দুঃখে রুকিয়ার গলা বন্ধ হইয়া আসে, সে থামিয়া যায়। তিলকা ধীরে ধীরে চোখ বোজে, একটু পরে ঝিমাইতে থাকে।

বাহিরে বৃষ্টির বিরাম নাই। দরজায় ঠুক ঠুক করিয়া টোকা পড়ে। রুকিয়া দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়ায়, সে বুঝিতে পারে গুলবা আসিয়াছে। একটা নিশ্চিন্ত জীবনের ছবি তাহার মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারে, পেটে ভাত, পরনে শাড়ী, গায়ে গহনা। ইচ্ছা হয় দরজা খুলিয়া দেয়, দরজা খুলিয়া হাত পাতিলে এখনই টাকা পাইবে। রুকিয়া দরজার হুড়কোর উপর হাত রাখে কিন্তু বুঝিতে পারে না, হাত পাথরের মত ভারী হইয়া ওঠে। দরজায় আবার টোকা পড়ে, রুকিয়া আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকে না, ছেলেকে টানিয়া আবার ঘরের কোণটিতে গিয়া বসে।

অনেকক্ষণ পরে রুকিয়া দরজা খুলিয়া বাহির হয়, বৃষ্টি তখন থামিয়াছে। একটি বাটি আঁচলের আড়ালে করিয়া সে মনুয়ার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু ভিতরে তাহার আর ঢোকা হয় না, মনুয়া ও মনুয়ার স্ত্রী কোন্দল সুরু করিয়াছে। গরীবের সংসারে সব কলহেরই ভাষা ও সুর এক—অন্ন নাই, বস্ত্র নাই। রুকিয়া যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল তেমনি নিঃশব্দে ফিরিয়া পথে আসিয়া দাঁড়ায়। বেলা দুপুর, ছিন্ন মেঘের ফাঁক দিয়া সূর্য উঁকি মারে। রুকিয়া গলি ধরিয়া আগাইয়া চলে, সামনে হরি গোপের বাড়ী। রুকিয়ার অবস্থা যখন ভাল ছিল তখন হরির স্ত্রী অনেক সময় তাহার নিকট সাহায্য চাহিতে গিয়াছে, সেও সাধ্যমত সাহায্য করিয়াছে। আজ তাহার অভাব, আজ হরির স্ত্রী তাহাকে সাহায্য করিবে এই ভরসায় সে হরির বাড়ীর দিকে চলে। পথে হরির ছোট মেয়ের সঙ্গে তাহার দেখা হইয়া যায়, রুকিয়া তাহাকে আদর করিয়া দিদি বলিয়া ডাকে, জিজ্ঞাসা করে, "কোথায় যাচ্ছিস্ গো দিদি?"

হরির মেয়ে বলে, "বাবাকে ক্ষেত থেকে ডেকে আনতে যাচ্ছি, সে আসে নি বলে এখনও আমাদের খাওয়া হয় নি।"

"যা দিদি যা" বলিয়া রুকিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিয়া হরির বাড়ী গিয়া উপস্থিত হয়। গ্রাম-সম্পর্কে হরির বউ তাহার শাশুড়ী, তাই সে দরজার সামনে আসিয়া ডাকে, "ঘরে আছ গো মা?"

"কে গা" বলিয়া হরির বউ ঘরের বাহিরে আসে, রুকিয়াকে দেখিয়া বলে, "বউ, কি বলছ?"

রুকিয়া তাহার খুব কাছে গিয়া চাপা গলায় বলে, "আজ আমার ঘরে চাল বাড়ন্ত মা, রান্না হয় নি, তাই পরসাদের জন্তে চাট্টি ভাত নিতে এলুম, এই এতটুকু ভাত।"

শুনিয়া হরির বউ গালে হাত দিয়া বলে, "এই যাঃ, কি লজ্জার কথা হ'ল, আমাদের যে খাওয়া হয়ে গেছে বউ, হাঁড়িতে যে একটিও ভাত নেই। আর একটু আগে যদি আসতে!"

রুকিয়া অবাক হইয়া হরির বউয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া বলে, "খাওয়া হয়ে গেছে তোমাদের?"

"অনেকক্ষণ গো" বলে হরির বউ। রুকিয়া আর কোন কথা না বলিয়া চলিয়া আসে, রাগে দুঃখে তাহার ভিতরটা জ্বলিয়া যাইতে থাকে, সে যে কোন্ পথ ধরিয়া কোন্ দিকে চলিতেছে তাহাও তাহার খেয়াল থাকে না। হঠাৎ বৈজুর মেয়ে টুকনী যখন তাহাকে ডাকিয়া প্রশ্ন করে, "কোথায় চলেছিস্ ভৌজী?"

তখন তাহার সম্বিত ফিরিয়া আসে। টুকনী বলে, "অমন গোঁজ গোঁজ করে কোথায় যাচ্ছিস্ গো, ঘরে ঝগড়া করেছিস্ বুঝি?"

রুকিয়া দাঁড়ায়, স্রিয়মাণ ভাবে জবাব দেয়, "ঝগড়া করব কার সঙ্গে লা, মরা মানুষের সঙ্গে? তা নয় গো, এসেছিলুম হরি মহতোর বাড়ী।"

"কেন গো, ওর কাছে কেন?" প্রশ্ন করে টুকনী।

রুকিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলে, "আজ আমার ঘরে হাঁড়ি চড়ে নি বোন, তাই পরসাদের জন্তে চাট্টি ভাত চাইতে এসেছিলাম।"

ঠোঁট উলটাইয়া টুকনী বলে, "দেয় নি নিশ্চয়ই, ও কারুকে দেয় না ভৌজী, ও সবার কাছ থেকে নেয়।"

রুকিয়া বলে, "বলতে নেই, আমি গরীব, আমিই কি ওকে কম দিয়েছি!"

রুকিয়ার মনটা তিক্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার আর কারুর সঙ্গে কথা বলিতেও ইচ্ছা করে না, সে ঘরের দিকে চলে। টুকনী ছুটিয়া আসিয়া খপ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলে, "ছেলেটা না খেয়ে আছে, আর তুই ভৌজী খালি হাতে ঘরে ফিরে যাবি? চল না আমার ঘরে, পরসাদের জন্য চাটিভাত আমিই দিতে পারব।"

রুকিয়া অবাক হইয়া টুকনীর মুখের দিকে তাকায়, এই কচি মেয়েটার দরদ এতখানি! টুকনীর বাপও গরীব, রোজ আনে রোজ খায়, মাঝে মাঝে উপোসও করে, অথচ সেই লোক যখন ডাকিয়া ঘরের অন্ন পরকে দেয় তখন সে ত সাধারণ নয়। টুকনীর থুতনী ধরিয়া চুমা খাইয়া রুকিয়া বলে, "আহা, সোনার টুকরো মেয়ে, ভগবান তোর মঙ্গল করবেন গো।"

টুকনী রুকিয়ার হাত হইতে বাটিটি লইয়া বলে, "একটু দাঁড়া ভৌজী. আমি ঘর থেকে ভাত নিয়ে আসচি।"

তার পরে ছুটিয়া ঘরে যায়, একটু পরে বাটি ভরিয়া ভাত লইয়া ফিরিয়া আসে। বাটিটি হাতে লইয়া রুকিয়া মাথা নাড়িয়া বলে "এ তোর বখর আমাকে এনে দিলি, এখন তুই উপোস করবি।"

হাসিয়া টুকনী বলে, "না গো, উপোস করব না, এক আঁজলা মহুয়া সেদ্ধ খেয়ে পেট ভরে জল খাব, তা হলেই এ বেলা কেটে যাবে।"

আবার বৃষ্টি পড়িতে সুরু করে রুকিয়া ভাতসমেত বাটি আঁচলের আড়াল করিয়া তাড়াতাড়ি ঘরের দিকে চলে।

১৯

সারারাত বৃষ্টি হইয়া সকালের দিকে একটু ধরিয়াছে। রুকিয়া ঘরের দরজা খুলিয়া বাহিরে আসে, ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়া রোদটুকু আঙিনার যেখানে আসিয়া পড়িয়াছে সেইখানে গিয়া দাঁড়ায়। ভোর না হইতে চাষারা ক্ষেতে নামিয়া গিয়াছে, ঘরে ঘরে আজ ব্যস্ততার অন্ত নাই। রুকিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কর্মতৎপর প্রতিবেশীদের হাঁকডাক শোনে, অনেকক্ষণ হইতে তিলকা যে তাহাকে ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিতেছে তাহা সে খেয়াল করে না। তিলকার ডাকে সাড়া দিয়াও ত কোন লাভ নাই, সে খাইতে চাহিবে, অথচ খাদ্য বলিয়া কোন পদার্থ ঘরে নাই। তিলকা ডাকিয়া ডাকিয়া ক্লান্ত হইয়া থামিয়া যায়।

আকাশে মেঘ আবার ঘনাইয়া আসে, আবার টুপটাপ বৃষ্টি সুরু হয়। রুকিয়া ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। সাড়া পাইয়া তিলকা আবার ডাকে, কিন্তু রুকিয়া নিঃশব্দে ঘরের কোণটিতে গিয়া বসে। তিলকা এইবার ক্ষেপিয়া যায়, ক্ষীণ কণ্ঠ যতখানি উঠিতে পারে ততখানি উঠাইয়া সে গালাগাল সুরু করে। রুকিয়া তাহা ভ্রুক্ষেপও করে না, সে দেওয়াল ঠেস দিয়া চোখ বুঁজিয়া বসিয়া থাকে। বাহিরে অবিরাম বৃষ্টি পড়িতে থাকে, বেলা ক্রমে বাড়িয়া যায়, তিলকার গলা দিয়া আর আওয়াজ বাহির হয় না। আপনার মনে সে বিড়বিড় করিয়া বকিয়া চলে।

ছেলেটা এতক্ষণ ঘুমাইয়াছিল, এইবার সে উঠিয়া মায়ের কোলের কাছে আসিয়া বসে। তাহার শীর্ণ মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া রুকিয়া হঠাৎ উঠিয়া পড়ে, ঘরের একপাশে ছড়ানো মাটির হাঁড়িকুড়িগুলি একটি একটি করিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া উলটাইয়া দেখে। কিন্তু কোন হাঁড়িতেই কিছু নাই, রুকিয়া হাঁড়িগুলি ঠেলিয়া দিয়া ছেলের কাছে আসিয়া বসে। কিন্তু বেশীক্ষণ ব'সয়াও থাকিতে পারে না, আবার উঠিয়া আসিয়া হাঁড়িগুলি নাড়াচাড়া করে। এক-একটা হাঁড়ি দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া তাহার শূন্যগর্ভের দিকে তাকাইয়া থাকে।

বেলা বাড়িয়া যায়, দুপুর আসে। রুকিয়া ঘরের দরজা খুলিয়া দেখে আকাশ মেঘে ঢাকা, বৃষ্টি অবিরাম পড়িতেছে। দরজা ধরিয়া সে সিক্ত পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া থাকে।

তিলকা ডাকে, "ওগো, কোথায় গেলি?"

সাড়া দেয় না রুকিয়া। তিলকা আবার ডাকে, শুনিয়াও শোনে না রুকিয়া।

তিলকা ডাকে, "কোথায় গো, ক্ষিধে পেয়েছে, খেতে দে।"

রুকিয়া দরজা ভেজাইয়া দিয়া তিলকার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। তিলকা তাহার জ্যোতিহীন চোখ দুটি তুলিয়া রুকিয়ার মুখের দিকে তাকাইয়া বলে, "খেতে দে গো।"

এইবার রুকিয়া বলে, "খাবি কি? ঘরে খাবার নাই।"

সেকথা শুনিতে পায় না তিলকা। সে বলে, "দে, খেতে দে।"

রুকিয়ার মুখখানা হঠাৎ কঠিন হইয়া ওঠে, বলে, "শুনতে পাস্ না, বলছি ঘরে খাবার নাই। কলসী ভরা জল আছে, খাবি?"

কথাটার অর্থ যেন বুঝিতে পারে না তিলকা, বলে, "দে।"

রুকিয়া একবাটি জল লইয়া আসিয়া তিলকার সামনে ধরে। শীর্ণ দুর্বল হাত বাড়াইয়া তিলকা বাটিটা নেয়, মুখের কাছে তুলিয়া যখন দেখিতে পায় তাহাতে কেবল জল তখন সে একটা কুৎসিত গালাগালি দিয়া বাটি ছুঁড়িয়া ফেলে। বাটিটা রুকিয়ার গায়ে আসিয়া পড়ে। চোট বিশেষ না লাগিলেও রুকিয়া হঠাৎ রাগে দিশাহারা হইয়া যায়, দাঁতে দাঁত চাপিয়া তিলকার গলাটা দুই হাতে চাপিয়া ধরিবার জন্য আগাইয়া আসে। রুকিয়ার হিংস্র চোখ দুটির দিকে তাকাইয়া তিলকা বিহ্বলের মত শীর্ণ দুটি হাত তুলিয়া আত্মরক্ষা করিতে চায়। খাটিয়ার পাশে আসিয়া রুকিয়া দাঁড়ায়। তাহার দুর্বল হাত দুটি দিয়া তিলকা রুকিয়াকে ঠেলিয়া দিবার চেষ্টা করে। যেমন ভাবে হঠাৎ রুকিয়া রাগিয়া উঠিয়াছিল তেমন ভাবে হঠাৎ আবার স্থির হইয়া যায়। উত্তেজিত মাথাটা ঝিমঝিম করিতে থাকে—খাটিয়ার একটি পাশ ধরিয়া সে চোখ বুঁজিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

ছেলেটা কাঁদিয়া ওঠে। রুকিয়া তাহাকে কাছে লইয়া আবার ঘরের কোণটিতে গিয়া বসে। তাহার মনে এখন আর রাগ নাই—তাহার মনে এখন যেন কিছুই নাই, কোলের কাছে বসা ছেলেটার কথা সে ভাবে না, তিলকার

কথা সে ভাবে না। সমস্ত দেহ যেন ধীরে ধীরে শিথিল হইয়া আসে। বুকের ধুকধুকিও যেন ক্রমে ক্রমে থামিয়া যাইবে। বাহিরের কর্মব্যস্ত জীবনের আওয়াজ সে শুনিতে পায় না, সে যেন পৃথিবীর বাহিরে। বহুবার ছেলেটা কাঁদিয়া ওঠে, খাইতে চায়, বহুবার ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। রুগ্ন তিলকা মাঝে মাঝে কাতরাইয়া ওঠে, সেও আর ডাকে না, খাইতে চায় না। বৃষ্টি থামে, আবার বৃষ্টি নামে, এই ভাবে ধীরে ধীরে দিন শেষ হইয়া আসে।

ঘরের ভিতর অন্ধকার জমিয়া ওঠে, হঠাৎ রুকিয়ার তন্দ্রা ভাঙিয়া যায়। সে চারিদিকে তাকাইয়া দেখে, কোথায়, কেন সে একা অন্ধকারে বসিয়া আছে বুঝিতে পারে না। ক্রমে তাহার চোখের ঘোর কাটিয়া যায়, অতীত বর্তমান আবার ফিরিয়া আসে। আবার রাত, আবার দিন, অন্ন নাই, সহায় নাই, স্বজন নাই—রুকিয়ার বুকের ভিতরটা কে যেন নির্মম ভাবে সবলে চাপিয়া ধরে। সে আর পারে না, সে আর সহ্য করিতে পারে না, অদৃষ্ট তাহার চারিদিকে একটা কঠিন প্রাচীর গাঁথিয়া তাহার মুক্তির পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে, এইখানে না খাইয়া তাহাকে তিলে তিলে মরিতে হইবে।

দরজায় টোকার আওয়াজ শুনিয়া রুকিয়ার সমস্ত শরীর কাঁপিয়া ওঠে, তাহাকে মুক্ত করিতে, প্রাণ দিতে দূত আসিয়াছে! ত্রস্তপদে সে উঠিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দেয়। বাহিরে রাত্রির অন্ধকার তখন ঘনাইয়া আসিয়াছে, দরজার পাশে নিঃশব্দে যে দাঁড়াইয়াছে রুকিয়া তাহাকে চেনে। গুলবার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলে, "ওগো, নিয়ে চল আমাকে।"

অবাক হইয়া যায় গুলবা, রুকিয়া যে এমন সহজ ভাবে ধরা দিবে তাহা সে বিশ্বাস করিতে পারে না, সন্দেহের সঙ্গে বলে, "আমি গুলবা গো, চিনতে পেরেছ আমাকে?"

আরও কাছে আসিয়া রুকিয়া উদ্‌গ্রীব ভাবে বলে, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তুমি যে বলেছিলে আমাকে নিয়ে যাবে, আমি যাব তোমার সঙ্গে, আমাকে নিয়ে চল।"

এখন আর সন্দেহ করিবার কিছু নাই, উত্তেজনায় গুলবার চোখ দুটি জলজল করিয়া ওঠে, রুকিয়ার কানের কাছে মুখ লইয়া বলে, "তুমি ত একদিন আমাকে ফাঁকি দিছিলে গো। তোমার জন্যে আমি সব করতে পারি, তুমি বললে তোমাকে আমি মাথায় করে নিয়ে যাব।"

ঘরের বাহিরে আসিয়া রুকিয়া বলে, "নিয়ে চল।"

আবার অবাক হইয়া গুলবা বলে, "কি বলছ গো, এখনই যাবে?"

রুকিয়া জবাব দেয়, "এখনই যাব, সেই যে কোথায় আমাকে নিয়ে যাবে বলেছিলে, সেইখানে নিয়ে চল।"

উত্তেজিত গুলবা বলে,"তাই নিয়ে যাব গো। তুমি একটু এইখানে দাঁড়াও, আমি বাড়ী থেকে ছুটে টাকাকড়ি নিয়ে আসি।"

হঠাৎ রুকিয়াকে জড়াইয়া ধরিয়া কানে কানে গুলবা বলে, "আবার ফাঁকি দিও না কিন্তু!"

মাথা নাড়িয়া রুকিয়া বলে, "না।"

২০

কিছুক্ষণ পরে গুলবা যখন একটা পুঁটলি ও ছাতা বগলে করিয়া ফিরিয়া আসে তখন দেখে রুকিয়া দরজার পাশে সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে। গুলবা কাছে আসিয়া বলে, "চল তা হলে গো, আমি তৈরি হয়ে এসেছি।"

দরজাটা নিঃশব্দে ভেজাইয়া দিয়া রুকিয়া বলে, "চল।"

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, সাবধানে গ্রাম ছাড়াইয়া তারা মহুয়াঁটাড় স্টেশনের পথ ধরে। কিছুক্ষণ ধরিয়া বৃষ্টি বন্ধ আছে। কখনও মাঠ, কখনও বনের ভিতর দিয়া পায়ে-চলার পথ, মাঝে মাঝে আবার দু'একটা ছোট নদী। এ কয়েক দিনের বৃষ্টিতে নদীগুলি জলে ভরিয়া গিয়াছে, অতি-কষ্টে পার হইয়া তাহারা চলে। মাইলতিনেক আসিবার পরে চাপিয়া বৃষ্টি নামে, আকাশ মেঘে ঢাকিয়া যায়, অন্ধকারে পথ প্রায় দেখা যায় না। পথের ধারে একটা বড় মহুয়াগাছ দেখিয়া গুলবা রুকিয়াকে টানিয়া তাহার নীচে আনিয়া বলে, "এত বিষ্টিতে পথ চলা যাবে না গো, এস, এইখানে একটু বসি।"

রুকিয়া তাহার হাত ছাড়াইয়া আবার পথে নামিয়া বলে, "না না, বসে কাজ নাই, চল তাড়াতাড়ি এদেশ থেকে পালাই।"

অগত্যা গুলবাও পথে নামিয়া পড়ে।

বহুকষ্টে পাঁচ মাইল রাস্তা চলিয়া তাহারা মহুয়াঁটাড় স্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হয়। ছোট্ট স্টেশন, মেল দাঁড়ায় না, সকাল-সন্ধ্যায় দু'খানা আপ-ডাউন প্যাসেঞ্জার দু'এক মিনিটের জন্য দাঁড়াইয়া যাত্রী তুলিয়া নেয়। গুলবার স্টেশন চেনা, এই স্টেশনে গাড়ী চাপিয়া বহুবার সে কয়লার খাদে কাজ করিতে কাতরাস গিয়াছে। রুকিয়াকে সঙ্গে লইয়া গুলবা স্টেশনের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের বসিবার টিনের চালার নীচে আসিয়া দাঁড়ায়। বহু যাত্রীর সেখানে সমাবেশ, বিজলীর আলোয় স্থানটা ঝলমল করিতেছে। বিজলীর আলো রুকিয়া কখনও দেখে নাই, রাত্রে কেরোসিনের ছোট্ট একটা ডিবা জ্বালিয়া তাহারই ধোঁয়াটে আলোয় সংসারের

কাজ করিয়াছে, আজ রাতকে দিন করা আলোর জৌলুস দেখিয়া তাহার চোখ ঝলসিয়া যায়। গুলবা আগে চলে, রুকিয়া যন্ত্রের মত তাহাকে অনুসরণ করে। মালপত্র ও যাত্রীর ভিড়ের মধ্য দিয়া কোনমতে আগাইয়া তাহারা একটা কোণে আসিয়া আশ্রয় নেয়।

ছোট বোঁচকাটি নামাইয়া রাখিয়া গুলবা বলে, "তুমি এখানে বসো গো, আমি গাড়ীর খবরটা নিয়ে আসি।"

রুকিয়া বসে, গুলবা চলিয়া যায়, একা বসিয়া রুকিয়া ভয়ে ভয়ে চারিদিকে তাকাইয়া দেখে, কত রকমের কত লোক, কেহ খাইতেছে, কেহ গল্প করিতেছে, কেহ বিছানা পাতিয়া ঘুমাইতেছে, কেহ লটবহর লইয়া আসিতেছে, কেহ চলিয়া যাইতেছে। রুকিয়ার চোখে এ একটা নূতন জগত, ইহার সহিত তাহার পরিচয় নাই, সে যেন এখানে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে। তাহার ভিতরটা সঙ্কুচিত হইয়া ওঠে।

গুলবা ফিরিয়া আসে, হাতে তাহার শালপাতার একটা ঠোঙা। বসিয়া পড়িয়া ঠোঙাটা রুকিয়ার সামনে রাখিয়া গুলবা বলে, "পুবের গাড়ী আসবে ভোরবেলা, গোটা রাতটা বসে কাটাতে হবে গো। পুরি-তরকারি নিয়ে এসেছি, খেয়ে নাও।"

রুকিয়া বলে, "তুমি খাও।"

গুলবা হাসিয়া বলে, "তোমার জন্যে আনলাম গো, তুমি না খেলে আমি খাব না।"

রুকিয়া মাথা নাড়িয়া বলে, "না গো, আমি এখন খাব না, তুমি খাও।"

গুলবা জিদ করিয়া বলে, "তা হবে না, তুমি খেলে আমি খাব।"

গুলবার মনে একটা নেশা লাগিয়াছে, তাহার মুখে-চোখে তাহার চলায় বলায় খুশী যেন উছলিয়া পড়িতেছে। রুকিয়ার গা ঘেঁসিয়া বসিয়া সে হাসিয়া বলে, "তোমার জন্যে আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলুম বুঝলে গো, বিশ্বাস করবে না বললে, আমি রাতভোর তোমার দরজায় বসে থাকতুম।"

রুকিয়া শুনিয়া যায়, কোন জবাব দেয় না। নিজের মনে গুলবা বলিয়া চলে, "কয়লার খাদে কাজের অভাব নেই গো, গেলেই কাজ পাব, ছোট একখানা ঘর ভাড়া করে সংসার পাতব, কি বল?"

খুশীর আবেগে গুলবা রুকিয়ার হাতখানা টিপিয়া দেয়। চারিদিকে তাকাইয়া গলা খাটো করিয়া গুলবা বলে, "যখন দুজনে একবার গাঁ থেকে বেরিয়েছি তখন আর সেখানে ফিরে যাব না।"

ঠোঙাটির প্রতি আবার নজর পড়ায় গুলবা অনুযোগের কণ্ঠে বলে, "কি গো, খাবে না তুমি? দিনভোর কিছু খাও নি, খাও গো, খিদে পেয়েছে তোমার। আমি ততক্ষণ দু' পয়সার পান আর এক গাঁট্টা বিড়ি কিনে আনি।"

গুলবা উঠিয়া ব্যস্তভাবে চলিয়া যায়, তাহার উৎসাহের যেন অন্ত নাই।

রুকিয়া আবার একা বসিয়া থাকে। আলোর জৌলুস সে যেন সহ্য করিতে পারে না, গায়ের আঁচলখানা ভাল করিয়া সর্বাঙ্গে জড়াইয়া সে যেন নিজেকে আড়াল করিতে চায়। হুড়মুড় করিয়া একখানা মালগাড়ী আসিয়া পড়ে, রুকিয়া ভয় পাইয়া যায়; মুসাফিরখানার একপ্রান্তে একটি শিশু কাঁদে, রুকিয়া ভীষণ ভাবে চমকাইয়া ওঠে, বুকের মধ্যে কে যেন কঠিনভাবে একথা চাবুক মারে, সে থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকে। ব্যাকুলভাবে সে একবার চারিদিকে তাকায়, খাবারের ঠোঙাটি কোনমতে আঁচলে বাঁধিয়া উঠিয়া পড়ে, এক পা দুই পা করিয়া মুসাফিরখানার প্রান্তে আসিয়া দাঁড়ায়, তার পরে হঠাৎ ছুটিয়া সে আলোর রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অন্ধকারে গিয়া ঢোকে।

বৃষ্টি থামিয়া গেলেও আকাশ মেঘে ঢাকা, তারাহীন আকাশের নীচে, গাঢ় অন্ধকারে রুকিয়া গাঁয়ের দিকে ছুটিয়া চলে। শূন্য মাঠের উপর দিয়া, গভীর বনের মধ্য দিয়া পায়েচলার সরু পথ, কিন্তু সে পথে চলিতে রুকিয়ার মনে বিন্দুমাত্র ভয় নাই। আলোয় বসিয়া তাহার ভয় করিতেছিল, অন্ধকারে আসিয়া সে নির্ভয় হইয়াছে। উঁচুনীচু পিচ্ছিলপথে সে কতবার পড়িয়া যায়, অন্ধকারে গাছের ডালে চোট খাইয়া কপাল কাটে, কাপড় ছিঁড়িয়া যায়, খাবারের ঠোঙাটি বুকে চাপিয়া তবু সে পাগলের মত ছুটিয়া চলে।

এতক্ষণে গ্রামের সীমানায় আসিয়া পড়ে রুকিয়া। মাঠের মাঝখানে পরিচিত মহুয়াগাছটা দেখিয়া সে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া ওঠে, যেন এক পরমাত্মীয়কে পাইয়াছে। মাঠ পার হইয়া, ক্ষেত পার হইয়া, বাঁধের উপর দিয়া ছুটিয়া সে গ্রামে আসিয়া ঢোকে। এইবার পা টিপিয়া টিপিয়া নিঃশব্দে চলে, গলি ঘুরিয়া নিজের আঙিনায় আসিয়া দাঁড়ায়। বুক তাহার দুর দুর করিতে থাকে, পা যেন আর চলিতে চায় না। সাবধানে ঘরের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে উঁকি মারিয়া দেখে, অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পায় না, কোন আওয়াজ শুনিতে পায় না। ধীরে ধীরে সে ঘরের ভিতরে ঢোকে, ধীরে ধীরে সে তিলকার খাটিয়ার পাশে আসিয়া দাঁড়ায়, ঘুমন্ত তিলকার টানা টানা নিশ্বাসের আওয়াজ শুনিতে পায়। আবার সে ঘরের কোণের দিকে আগাইয়া যায়, নিঃশব্দে হাতড়াইয়া এদিক-ওদিক খোঁজে, পরসাদের গায়ে হাত লাগিতে তাহাকে কোলে টানিয়া নেয়, প্রচণ্ড আবেগে বুকে চাপিয়া ধরে। জাগিয়া উঠিয়া পরসাদ ডাকে, "মা।"

ক্রমশঃ

বাংলার আধুনিক তরুণ তরুণী

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

আজকাল যে কথাটার বহুল প্রচার হইয়াছে সেটা এই যে, বাংলার তরুণ-তরুণী শ্রী ও কল্যাণের পথ বর্জ্জন করিয়া শ্রদ্ধাহীনতা ও নৈরাশ্যের পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কথাটা কতদূর সত্য সেটা বিচার করা আমদের পক্ষে একান্ত দরকার, কারণ বাংলা দেশের ভবিষ্যৎ এই তরুণগোষ্ঠীর উপরই নির্ভর করিতেছে।

প্রথমেই এই তরুণগোষ্ঠীর একটা সংজ্ঞা দরকার। বয়সের দিক দিয়া যাহারা আঠারো হইতে পঁচিশ-ছাব্বিশের ঘরে তাহা-দিগকেই আমরা এই পর্য্যায়ে ফেলিতে চাহি। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ নানা বিভাগে অধ্যয়নরত ছাত্র, কিছু শিক্ষিত, কিছু অর্দ্ধশিক্ষিত বেকার আর কিছু অর্দ্ধবেকার অর্থাৎ আশানুরূপ জীবিকা অর্জ্জন যাহারা করিতে পারে নাই। এই যুবগোষ্ঠীকে নিয়াই আমাদের কথা।

ইহাদের প্রত্যেকেরই বাল্য অথবা শৈশব কাটিয়াছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে। সে সময়কার বাংলা দেশের কথা একবার মনে করা যাউক।

ভারতবর্ষ তথা বাংলা দেশের রাষ্ট্রজগৎ তখন বিপর্য্যস্ত। ইংরেজ শাসনের শৃঙ্খলা তখন ভাঙিয়া পড়িয়াছে। শাসকবর্গ আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। প্রত্যক্ষ শাসকমণ্ডলী কেবল দিনগত পাপক্ষয় করিয়া চলে, সকল সমস্যার বিচার হয় যুদ্ধোদ্যমের পরিপ্রেক্ষিতে। সঙ্গে সঙ্গে সমাজের শৃঙ্খলা শিথিল হইতে শিথিলতর হইতে থাকে। আহার্য্য, বস্ত্র প্রভৃতি অত্যাবশ্যক জিনিসপত্রাদি বণ্টনের ভার গভর্ণমেণ্টের হাতে। বণ্টনের মধ্যে প্রবেশ করে অবিচার, অনাচার—বণ্টকদলের অর্থলিপ্সার দ্বারপথে। মানুষে মানুষে সহৃদয়তার বন্ধন টুটিয়া যায়। আত্মপরায়ণতার জয়ধ্বজা উড়িতে থাকে। দেশ যখন এই অস্বাভাবিক স্বার্থপরতার বিষে জর্জ্জরিত তখন জন্ম হয় এই শিশুর।

ক্রমে সে বড় হইতে থাকে। যে স্বার্থপরতা ও অর্থলিপ্সা তাহার চারিদিকে ব্যাপ্ত তাহাকে সে স্বাভাবিকরূপেই গ্রহণ করে। তখন সৈন্যদলের ছাউনির জন্য বিদ্যামন্দির বন্ধ। শিক্ষকদল আত্ম-রক্ষার জন্য শিক্ষকতার কাজে ইস্তফা দিয়া নানা প্রকারে অর্থসংগ্রহে ব্যস্ত। পিতা কালোবাজারে মহালক্ষ্মীর পূজায় আত্মবিস্মৃত, মাতা স্বর্ণতৃষায় আত্মহারা। সমস্ত দেশের নৈতিকবোধ অর্থলিপ্সার যুদ্ধে পরাজিত। আর লোভ জীবনদেবতার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই আবহাওয়ার মধ্যে তার শিক্ষা আরম্ভ হয়।

তার পর আসে বাংলা দেশের মন্বন্তর ১৯৪৩ সনে। বাড়ী বাড়ী ভাতের ফেন ভিক্ষা করিয়া কঙ্কালের দল সর্ব্বত্র হানা দেয়। শিশু দেখে, মা, বাবা হয় দরজা বন্ধ করিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে নয় কাহাকেও দু'মুঠা অন্ন দিয়া কর্ত্তব্য সমাপন করে। কেহ কেহ হয়ত ইহার চাইতেও হৃদয়হীনতার পরিচয় দেয়। শিশু সেই শিক্ষাই গ্রহণ করে। অপরের দুঃখ, বেদনা, অন্নাভাব ও মৃত্যু তাহার প্রাণে আর গভীর বেদনার সঞ্চার করিতে পারে না।

পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দেখা দেয় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা। সারা বাংলা বর্ব্বরতায় বন্যজীবনের আস্বাদ লাভ করে। পল্লীতে পল্লীতে রণদামামা বাজিয়া উঠে। বালক ও যুবকের দল নৃশংসতায় দীক্ষালাভ করে।

দাঙ্গা শেষের সঙ্গে সঙ্গেই আসে দেশ-বিভাগ আর তার পিছনে পিছনে আসে বাস্তুহারার দল। আর আসে অর্থাভাব, দুঃখ, দৈন্য, আত্মাবমাননা। অর্দ্ধ বাংলা মূলচ্যুত হইয়া যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করে। ফলে অপরার্দ্ধকে এক বৃহৎ পরীক্ষার সম্মুখে উপস্থিত হইতে হয়। এই দ্বন্দ্ব, এই সংঘাত, এই বিদ্রোহের মধ্যে বালক-বালিকা ক্রমশঃ তরুণ-তরুণী হইয়া উঠে।

এক কথায় বলিতে গেলে, বাংলার আধুনিক তরুণ-তরুণী যে পরিবেশে মানুষ হইয়াছে তাহা যেমন অস্বাভাবিক তেমনি সুস্থ স্ব-বোধহীন। জন্ম হইতেই সে শুনিয়াছে অর্থের বন্দনা, স্বার্থপরতার স্তবপাঠ। অন্যায়ের প্রতি মানুষের যে স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা থাকে তাহা তাহার চরিত্রে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। মনুষ্যত্ববোধের জন্য মনের যে গভীরতা থাকা দরকার তাহা তাহার চিত্তে জন্মিতে পারে নাই, হৃদয়বৃত্তির চর্চ্চার সঙ্গে তাহার সম্পর্ক অতি অল্প।

এই বিসদৃশ পরিবেশে মানুষ হইলে অর্থকে কল্যাণ বলিয়া আর জলুসকে শ্রী বলিয়া ভ্রম হইবারই কথা। ইহাই তাহার স্বাভাবিক পরিণতি; কোথাও আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। এই পরিণতির পঙ্কিলময় গর্ত্ত ভরিয়া যাইতে পারিত একমাত্র স্বাধীনতার অনাবিল জলস্রোতে। কিন্তু সে স্রোত বহিল নিতান্ত ক্ষীণধারায় আর জলও তাহার অনাবিল ছিল না।

আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয়স্বাধীনতা কোনও কল্যাণময় আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিল না—না রাষ্ট্রে, না সমাজে। বরং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে যে নিদারুণ অর্থলোভ ও আত্মপরায়ণতার সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল উহা রাষ্ট্রস্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতবর্ষে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে দেখা দিল। তাহার সঙ্গে জুটিল শক্তি অহঙ্কার। স্বার্থপরতা জাতীয় কল্যাণবোধের গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিল।

বাংলার যুবশক্তি সে হত্যাকাণ্ড দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল কিন্তু দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল না। অর্থকে কল্যাণ বলিয়া যাহারা গ্রহণ করে তাহাদের নিকট এই হত্যাকাণ্ড অগৌরবের বিষয় নহে, বরং স্বাভাবিকই মনে হইবার কথা। শুধু বাংলার দুঃখ হইল যে, এ লুঠের ভাগ তাহার ভাগ্যে বেশী জুটিল না। কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া লওয়া যাউক।

রাষ্ট্রীয়স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে দেশে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন আসিল না। ইংরেজের পুরাতন শাসন-কাঠামোটাই বজায় রহিল। কংগ্রেসের প্রধান প্রধান পাণ্ডারা ইংরেজের গদীতে গদীয়ান হইলেন। কিন্তু কথায়, বিচারে, আচারে আর সর্ব্বপ্রধান ঐশ্বর্য্য-সেবায় তাঁহারা ইংরেজেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন। বিশ্বজগতের সঙ্গে অযথা টক্কর দিবার অজুহাতে তাঁহাদের ভোগ ও অর্থলিপ্সা সার্থক হইতে লাগিল। এই মুষ্টিমেয় রাজা-উজীরের দলে বাঙালীর সংখ্যা অল্প। ইহার জন্য বাঙালী কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের দপ্তরে, চাকুরি বা ঠিকায়, কোনরূপেই প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিল না। কাজেই দেশমন্থনে যে অমৃতভাণ্ড উঠিল তাহা হইতে ছিটার্ফোটা মাত্র বাঙালীর ভাগে পড়িল। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের দিক হইতে ফিরিয়া আপন দেশের দিকে চাহিয়াও বাংলার তরুণ-তরুণী শান্তি পাইল না। সেখানেও মুষ্টিমেয় বাঙালীর রাজগি। সে রাজগিতে বাংলার যুবশক্তির কোন আপত্তি ছিল না। নৈরাশ্য আসিল শুধু যার যার নিজের ভাগ্যের কথা ভাবিয়া। আহা, যদি এই রাজকীয় পরিবারের সঙ্গে কোন যোগাযোগ থাকিত! রাজদরবারে সুপারিশের যদি কোন সুযোগ থাকিত! থাকিলে আর নৈরাশ্যের কারণ ঘটিত না। ইহা ত আদর্শবাদের কথা নয়, নিছক আত্মপরায়ণতার কথা। ফলে বিদ্যা, বুদ্ধি, অধ্যবসায় ও শ্রমের মূল্যবোধ কমিয়া গেল। রহিল শুধু ভাগ্যের দোহাই আর 'সস্তায় কিস্তি মারিবার' চেষ্টা।

এই পরিণতিই স্বাভাবিক। একমাত্র জড়বাদকে সম্বল করিয়া যাহারা জীবনের পথে চলে, তাহারা কোথাও ধাক্কা খাইলেই নৈরাশ্যের করতলগত হইয়া পড়ে। ভাল খাওয়া-পরা এখন জীবনের চরম লক্ষ্য। ইহা অপেক্ষা উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর কি থাকিতে পারে? যে জীবনটা ভাগ্যক্রমে পাওয়া গিয়াছে তাহা পিতারও নয় মাতারও নয়—সেটা আমার নিজস্ব। যতদিন এবং যতভাবে পারা যায় সেটাকে ভোগ করাই একমাত্র কাম্য। কিন্তু সে ভোগের যথাযোগ্য উপকরণ সংগ্রহ করা ত সহজসাধ্য নয়! তাহার জন্য প্রতিযোগিতা করিতে হয়, তাহার জন্য যুদ্ধ করিতে হয়। কিন্তু সে প্রতিযোগিতার শক্তি কোথায়? সে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য যে সাধনা করিতে হয় তাহা বাংলার আধুনিক তরুণ-তরুণী ভুলিয়া গিয়াছে। তাহাদের ভোগেচ্ছা তাহাদের উপকরণ সংগ্রহের শক্তিকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে, আর সেই জন্যই তাহাদের মধ্যে আসিয়াছে নৈরাশ্যবাদ।

মোটকথা, গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে বাংলা দেশের যুব-সমাজের জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে তাহাদের মনে আদর্শবাদের একটা স্বচ্ছধারা প্রবাহিত ছিল। সে অনাবিল ধারার সঞ্জীবন রসে তাহারা শক্তি লাভ করিত। সে ধারা প্রধানতঃ বহিয়া চলিত দেশপ্রেমের খাতে আর তার সৃষ্টি হইয়াছিল বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে। সে সময়ে বাংলার ধর্ম্মে, সাহিত্যে, সমাজে ও রাজনীতিতে যে অভূতপূর্ব্ব জাগরণ আসিয়াছিল তাহার কোলাহল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্তও শোনা যাইত। সেই দেশপ্রেমের আদর্শবাদের ধারায় বাংলা তাহার আত্মার স্বরূপ খুঁজিয়া পাইয়াছিল।

যতদিন সেই আদর্শবাদের ধারা সে রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল ততদিন সমগ্র ভারতবর্ষে বাঙালীর গৌরব ছিল অসামান্য। তখন সে ছিল শহীদ, তখন সে ছিল সাধক। দেশমাতৃকার পূজায় সে আপনার জীবনের মধ্যে সত্যের সন্ধান পাইয়াছিল আর সেই সত্যানুভূতি সে ছড়াইয়া দিয়াছিল নানা প্রদেশে। বাংলার আদর্শবাদকে লক্ষ্য করিয়াই ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পথে পা বাড়াইয়াছে; বাংলার সাধনাই তাহার সিদ্ধির পথ সুগম করিয়া দিয়াছে।

বাংলার যুবক তখন পরের জন্য অকাতরে অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়াছে, সেবায়, স্নেহে আত্মপর-ভেদ রাখে নাই এমনকি আদর্শের সাধনায় নির্ব্বিবাদে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে। গত কয়েক বৎসরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত তাহার সাধনার পথে বিঘ্ন আনিয়াছে সত্য কিন্তু এখনও তাহার মনে পূর্ব্ব আদর্শের ধারা একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা তাহার বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হইলেও একেবারে নিঃশেষিত হইয়া যায় নাই। ইহাই আমাদের আশার কথা।

যে কোন কারণেই হউক, বাংলার তরুণ-তরুণীর নিকট সাধনার মূল্যবোধ অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। জ্ঞানের জন্য, আনন্দের জন্য, বিদ্যার সাধনা করিতে তাহারা চাহে না, কারণ তাহাদের ধারণা হইয়াছে যে, অর্থমূল্যে জীবনের সকল সম্পদ ক্রয় করা যায়; অর্থমূল্যেই শ্রী ও কল্যাণকে করায়ত্ত করা চলে। এই সাধনার প্রতি শ্রদ্ধাহীনতাই তার জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতার মূল কারণ। দরিদ্র অধ্যাপক বা শিল্পী অপেক্ষা ধনী কালোবাজারীর উপর শ্রদ্ধা তাহার অনেক বেশী। ইহা চিন্তাহীনতারই নামান্তর মাত্র। এই চিন্তাহীন জগতে বাংলার তরুণ-তরুণী আজ সাধারণের সঙ্গে তাল রাখিয়া শুধু সাধারণ খেলাই খেলিয়া যাইতেছে। এ খেলায় চিন্তা বা ধ্যানের স্থান নাই, আছে শুধু কোলাহলের। সে কোলাহলের রূঢ়তা যে আজ বাংলার কানেও বাজিয়াছে, ইহাই আশার কথা।

দিব্য আঁখির রশ্মি কুসুম

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

যাক্ এ রজনী,—যাক্ সে এখনি
কণ্ঠে পরিয়া অগণিত মণি মণ্ডিত মালা চলে যাক্—
(দূর) গগনের পারে উড়ে যাক্—
নিঃস্ব মনের দুঃস্বপনের রহস্য জাল পুড়ে যাক্
ঊর্ণনাভের জীর্ণ তন্তু ছিঁড়ে যাক্ ছিঁড়ে খুঁড়ে যাক্।
শুধু তমসার পারে তারকা নিকরে
অশ্রু কিনারে থরে থরে থরে
দিব্য আঁখির রশ্মি কুসুম ফুল্ল নয়নে ফুটে থাক্।

ঝরায়ে অঝোর আলোর ঝরণা
আসুক উর্বশী অগ্নি বরণা
বেঁধে নিয়ে তার দিব্য বীণার স্বর্ণতন্ত্রী গুটি সাত
সেই সপ্ততন্ত্রী করি ঝঙ্কার
অতি উদাত্ত তুলি ওঙ্কার
রজত মৌলী ধবল গৌরী-শঙ্করে করি প্রণিপাত।

ঝিলমিল করে সোনালী আলোক
মিতালির মোহে মিলিয়াছে লোক
ফাল্গুনী মোহে নরনারী দোঁহে গাঁথিয়া পরেছে মালতী,
রাঙা হয়ে উঠে পলাশের ফুল
ফুটিয়া উঠিল রসাল মুকুল
মাধবী কুঞ্জে দুজনে ভুঞ্জে দোঁহারে যুবক যুবতী।

আঁখিতে আঁখিতে চায় অনিমিখ
দিক্ বিদিকের শুধু একদিক
কিছু খন পরে ভরা অন্তরে গৃহপিঞ্জরে ফিরি তার
সাথে লয়ে যায় স্মরণ-সুরভি সপ্তপর্ণ বীথিকার।
আঁখি ছলছল হৃদয় উতল
দখিনা পবন ঢালে পরিমল
এক পা বাড়াতে, পিছু ফিরে চায়, কিছু ফিরে পেতে চায় বা,
শিথিলবৃন্ত শেফালির মত ঝরে পড়ে পাছে তায় বা।

আলোকের খনি যে পরশমনি রয় প্রত্যূষে-প্রদোষে
(হায়!) মেঘছায়া ঘন ঝঞ্ঝা পবনে কোথায় লুকায় বল সে?
চুম্বিয়া যার কিরণ কণিকা নদীজল উঠে ছলকি
চারণের বীণে জীবনের গান গুঞ্জরি উঠে পুলকি
প্রলয়ে সৃজনে সে ইন্দ্রজাল
সুরুকাল হতে চলে সারাকাল
কুঁড়ি হতে ফুল ফুটিলে দোদুল কত বুলবুল গায় গান
কত না ভৃঙ্গ, কত প্রজাপতি, তবু তার নাহি যায় মান।
(সেই মানিনীর এত অভিমান!)
ফাগুনে ভুবনে লাগে কম্পন
ক্রন্দসী বুঝি করে ক্রন্দন
অবনীর নব অবগুণ্ঠন মহাকাল খুলে দেয় তাই,
রাঙানো রঙন অশোক পলাশে
চকিত নয়নে চেয়ে চারিপাশে
মন খুলে বলে কুসুমের দলে প্রাণ চায় যারে তারে চাই।
(তারি) অন্তঃপুরে আসে বসন্ত অন্তর মধু ভিখারী
পারায়ে মৌন মহা পারাবার অভিসার পথে দিশারি।
রবিরশ্মির রমণীয় রূপ
হর্ষে শিহরে প্রতি রোমকূপ
তৃণে ও পর্ণে বিনায় বর্ণে অবর্ণনীয় মালিকা—
(তারি) পর্বে পর্বে বন্দনা বাণী জপে বিরহিনী বালিকা।
(সেই) অনুরাগে রাঙা বৈরাগিনীর অক্ষমালিকা গলে
(তারি) ধুকধুকিখানি মধ্যমণির ধিকিধিকি যেন জ্বলে!
আলোকে পুলকে বন্দনায়, চেতনা সিন্ধু ছন্দ পায়,
কম্পিত মীড় মূর্চ্ছনায় বেজে ওঠে কার বাঁশী?
(যার) সুরে সাড়া দিয়ে বলে উঠে প্রাণ এই আসি, এই আসি
আমি ইহারেই ভালবাসি।
আসুক সে-আলো কালো চলে যাক্ পারায়ে তেপান্তরা
কালভৈরব নিয়ে চলে যাক্ জলদ কাদম্বরী
তার—ডম্বরু ডম্বরী।

এই আলোকের অবাক যে বাণী
দেয় সে ইসারা দেয় হাতছানি
সে রাগিনী রাগে ফাগুয়ার ফাগে রাঙায় রঙ্গভূমি
(তাই) নবদূর্বার আভিম বিছায়ে শ্যামার চরণ চুমি।
অবারিত আলো উজল নবীন
আরো বেশী ভালবাসি প্রতিদিন
নির্জনে বসি রজনী বিহীন চাহি না রাতের কালো
যত করি পান, আপূর্যমান আরো চাই তত আলো।
ছি ছি ছি! মাগো মা! কালো মিশমিশ!
কালীয় সাপের কালকূট বিষ!

কালো দেখিলেই করে নিশপিশ অন্তর বিষে বিষায়ে,
আলো দাও মোরে বুক ভরে ভরে
আলো দাও মোরে দু'নয়ন ভরে
বর্ণমালার সাতনরী হার কণ্ঠে সে সব মিশায়ে
আলোরেই ভালবাসি চিরকাল বাসিয়া মেটে না তৃষা এ।
রূপকথা পুরে যে মায়ার পুরী
সেথায় বিহরে আরবের হুরী
অপাঙ্গে হানি আঁখির বিজুরী ধৈর্য্য ভাঙিয়া করে চুর
আরো আলো দাও, আরো দাও সুর,
হৃদয়ে বাণীর বন্যা মধুর
মন্দাকিনীর আনন্দ নীর নটন ছন্দে পরিপুর
তবু, তবু অন্তর সুবিধুর।

আকাশে উজল আলোর বন্যা শ্যামল সোহাগে ঢালা
ধরণী ধন্যা, স্রোতস্বিনীর বন্যা উষার আলা,—
আলোর রাগিনী, আলোকের সুর,
পাখীর কূজনে বাজায় নূপুর,
নারিকেল তাল করে করতাল বাজায় সে খঞ্জনি,—
কাহারে কাকুতি কাহারে মিনতি করে মান ভঞ্জনি।
(তার) শোভন নয়নে নয়নের জল
হয় সুশোভন করে টলটল
সরসীর পরে প্রভাত কমল শিশিরেও অমলিন,
দেবী বীণাপাণি বাঙ্ময়ী বাণী বাজান দিব্য বীণ
রিণি ঝিনি রিণি রিণ।
উলসিয়া উঠে অলসিত হিয়া গাহিয়া বাণীর জয়
রূপ লাবণ্য প্লাবন ধন্য মুখরিত বিস্ময়।

যাক্ চলে যাক্ রাতি, প্রেতাধ্যুষিত রাতি
ভয় সঙ্কুল মত্ত বিপুল দৈত্যের মত রাতি।
অগণিত ফণী ডাকিনী যোগিনী প্রেতিনীবৃন্দ সাথী
ঐরাবতের মত অতিকায় গম্ভীর বেদো হাতী।
বিভ ষিকা শিখা বিদ্যুৎ লিখা আগ্নেয়গিরি বুক
উল্কা আলেয়া গরজয়ে দেয়া বজ্র উগারে মুখ।
ভ্রূকুটি-কুটিল চোখের চাহনি চমকে চতুর্দ্দিশ
(বুঝি) মুখভরা মধু অভিনয় শুধু বুকভরা তার বিষ!
আঁধারের ধারা ঝরে অবিরল
নিবিড় নিকষ কালো কুন্তল
বিশ্ব নিখিল ভয়-বিহ্বল তাণ্ডবময়ী রাতি
ক্ষণিক আলোকে ঘনীভূততম তমসায় উঠে মাতি।
থাক্ দিনমণি মহামহীয়ান্
তমসার পারে চির অম্লান
ওঠে না ডোবে না নাবে না নেভে না দীপ্তি অনির্বাণ।
অমৃতোৎসার রশ্মি তাহার শাশ্বত ভাস্বান
এক সে বিবস্বান।

উদয় নাই, অস্ত নাই, অবগুণ্ঠন কুণ্ঠা নাই,—
ছায়া যবনিকা মায়াভরণিকা জ্বালা বরণিকা পুড়িয়া ছাই।
নাই শোক মোহ, নাই নির্মোক,—
শুধু আলো, শুধু অরুণ আলোক, শুভ্র স্বচ্ছ স্বপ্রকাশ,
শুধু প্রেম, শুধু নিকষিত হেম,
চক্ষে হেরিয়া বক্ষে পেলেম
বক্ষ শোণিতে লিখিয়া গেলেম যুগ যুগান্তে সে-ইতিহাস।
শুধু আলো আর শুধু প্রেম, আর
শুধু আনন্দ অমৃত স্নান
পূর্ণ ধন্য মৌন মগ্ন, মগ্ন তবু নিমজ্জমান।
তাই বলি চলে যাক্ এ রজনী
আঁধার রজনী চলে যাক্—
রশ্মি কুসুম থরে থরে থরে
দেখিয়া দেখিয়া দুটী আঁখি ভরে
মিটে যদি আশা মিটে যাক্—
জীবনের মুখে মরণের চুম
স্বপ্ন জড়িমা চোখে ঘুম ঘুম কেটে যাক্—
(শুধু) দিব্য আঁখির রশ্মি কুসুম
ফুল্ল নয়নে ফুটে থাক্।

খাদ্যশস্য বৃদ্ধি ও গ্রামে কুটীর-শিল্প

শ্রীসারদাচরণ চক্রবর্ত্তী

বর্ত্তমান মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারসমস্যার দিনে খাদ্যশস্য বৃদ্ধি ও গ্রামে কুটির-শিল্প প্রচলন বিষয়ে সকলেরই চেষ্টা করা প্রয়োজন।

১। পশ্চিম বাংলায় আশু ধানের গুরুত্ব এবং ইহার চাষে অসুবিধা—

বৎসরের যে সময়ে, ভাদ্র আশ্বিন মাসে, ধান, চালের মূল্য বৃদ্ধির জন্য সাধারণ গরীব চাষীরা প্রয়োজনানুযায়ী পরিমাণ তাহা খরিদ করিতে পারে না সে সময় আশুধান পাইবার আশাই তাহাদিগকে কোন মতে বাঁচাইয়া রাখে। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায়, সেচবিহীন বিস্তৃত উচ্চ ভূমির ইহাই বর্ষার প্রধান ফসল। ইহার চাষ মোটেই লাভজনক নহে। তবুও এই ফসল উঠিতে আরম্ভ করিলে ধান-চালের চড়া দর অনেক নামিয়া যায়। আশুধানের পর সাধারণতঃ কোন রবিশস্য—

	প্রতি বিঘাতে
আশুধান, বৈশাখ-ভাদ্র ৩ মণ ১১৲ হিসাবে	৩৩৲
কলাই, ভাদ্র-পৌষ ২ মণ "	২২৲
মোট	৫৫৲

কোন মতে পাওয়া যায়। অন্য উপায় নাই বলিয়াই ইহারা এ প্রকার চাষ করিয়া থাকে। একটি পরিবারে সাধারণতঃ যে ৫৬ বিঘা জমি থাকে, তাহা এ ভাবে চাষ করিয়া ৬ মাসের খোরাকও করতে পারে না। বৎসরের অধিকাংশ সময় কাজ না থাকাতে, বেকার অবস্থায় অতি কষ্টে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হয়। এ বৎসর ত, কেহ কেহ আত্মহত্যা করিয়াছে।

২। প্রতিকার। আশুধান, পরে কলাই-এর সহিত ইজিপশিয়ান কার্পাস চাষ।

পূর্ব্বে আমেরিকান ও অন্যান্য কার্পাস চাষ করিয়া, পরে দীর্ঘ ২৫।৩০ বৎসর যাবং সফলতার সহিত ইজিপ্শিয়ান কার্পাস চাষ করিয়া, ইহা এদেশে সহনশীল (acclimatize) করিতে সমর্থ হইয়াছি। ইহার চাষ প্রয়োজনীয় ও লাভজনক হইলেও সরকারী কৃষিবিভাগ, ব্রিটিশ আমল হইতে এখন পর্য্যন্ত, কেন যে ইহার বিরোধিতা করিয়া আসিতেছেন বুঝা যায় না। রোগাদি প্রতিকারে সামান্য সাহায্য করিলেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের, এ বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণামূলক কার্য্যে, ইহার চাষের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এ প্রকার কার্পাস আশুধানের সহিত ৪ ফুট অন্তর বুনিয়া বেশ ভাল ফল পাইতেছি। বিভিন্ন গবর্ণমেণ্ট ফার্ম্মে অল্প জমিতে এ প্রকার মিশ্রিত চাষ হইলেও, ইহা চাষীদের মধ্যে প্রচলনের কোন চেষ্টা হয় নাই, কিংবা ইহার ফলাফলও সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত হয় নাই। আমি নিজে এভাবে কার্পাসে সহিত আশুধান, পরে কলাই চাষ করিয়া, চাষীদের বর্ত্তমান আয় ৫৫৲ স্থলে প্রতি বিঘায় ২০০৲ টাকার উপর বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছি।

আশুধান বৈশাখ-ভাদ্র ৭ মণ ১১৲ হিসাবে	৭৭৲
কলাই ভাদ্র-পৌষ ৩ মণ " "	৩৩৲
ইজিপশিয়ান কার্পাস বৈশাখ-মাঘ ৩ মণ ৫০৲ হিসাবে	১০০৲
মোট	২১০৲

কার্পাস চাষে সুফল পাইতে হইলে অতিরিক্ত সার এবং জমি আবশ্যক মত খুঁড়িয়া, বিদে, মই দিয়া ও নিড়াইয়া দিতে হয়। এজন্য ধানের ও কলাই-এর ফলন বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ধান চাষে এবং ধান কাটিয়া কলাই-এর জন্য চাষে যে মই, বিদে ব্যবহৃত হইবে, তাহা দুই হাতের অধিক লম্বা হইবে না। ইহাতে ৪ ফুট অন্তর বোনা কার্পাস চাড়া বাঁচাইয়া, মই চলাচল করিতে পারিবে। কার্পাস বীজ বপন করা হইতে ফসল না হওয়া পর্য্যন্ত, মাঝে মাঝে গাছের গোড়া কোপাইয়া নিড়াইয়া দেওয়া হয় বলিয়া, কার্পাস গাছের শিকড় মাটির বহু নীচে প্রবেশ করিয়া রস সংগ্রহ করাতে শীত ও গ্রীষ্মের অনাবৃষ্টির সময়েও গাছ বেশ সচেতন ও ফল, ফুল, কার্পাসে পূর্ণ থাকে। কার্পাসের প্রয়োজনে অতিরিক্ত সার ও পরিশ্রম বাবদ ৪০৲ বাদ দিলেও প্রচলিত আয়ের ৩ গুণ মূল্য পাওয়া যায়।

৩। গবর্ণমেণ্টের চেষ্টা ভিন্ন এ প্রকার চাষ চাষীদের মধ্যে প্রচলন করা কঠিন—

চাষীদের মধ্যে এ প্রকার চাষ প্রচলন করিতে হইলে প্রথম কয়েক বৎসর (ক) সর্ব্বদার জন্য তত্ত্বাবধান (খ) উৎপন্ন কার্পাস বীজ ছাড়াইয়া বিক্রীর ব্যবস্থা (গ) সময় মত ধান ও কার্পাস বুনিয়া কোপান, নিড়ানের জন্য আবশ্যকীয় অর্থ ব্যবস্থা (ঘ) বিনামূল্যে সার বিতরণ (ঙ) এবং পুরস্কার ঘোষণা দ্বারা প্রণালী মত যত্ন লইয়া চাষ করানো ও অন্যান্য ভাবে সাহায্য না করিলে সুফল পাওয়া কঠিন। এ প্রকার কাজের সফলতার জন্য যেমন দরদী, অভিজ্ঞ, কর্ম্মঠ কর্ম্মীর আবশ্যক তাহা পাওয়া কঠিন। এজন্যই বোধহয় কৃষি বিভাগ এ প্রকার কাজে হাত দেন না। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অনুকরণে যোগ্য কর্ম্মীকে পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা থাকিলে এ কাজ সহজ হয়। আমি নিজে এই উদ্দেশ্যে ৫টি চাষী দ্বারা, এ ভাবে চাষ করাইতে যাইয়া উপরোক্ত সকল রকম ব্যবস্থা করিতে অশক্ত হওয়ায়, আশানুরূপ ফল পাই নাই। পুরস্কারের লোভে যে ২।৩

জন চাষী ভাল ভাবে চাষ করিতেছিল তাহারাও যখন জানিতে পারে যে, এই পুরস্কার বিষয়ে গবর্ণমেন্টের সমর্থন নাই, তখন হইতে তাহারা কার্পাসের আর কোন যত্ন লয় নাই। কার্পাসের মত একটি নূতন ফসলে চাষীদের কোন আকর্ষণ নাই। ধান ও কলাই তুলিয়া কার্পাসের জন্ত কোন যত্নই লয় নাই।

৪। ইজিপশিয়ান কার্পাস চাষের আবশ্যকতা—

ভারতবর্ষে এক ইঞ্চির উপর লম্বা আঁশের কার্পাস জন্মে না বলিয়া কাপড়ের কলগুলির প্রয়োজনে বহু কোটি টাকার উৎকৃষ্ট কার্পাস বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। ইহা নিবারণ উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের যে কোন প্রদেশে কোন পরিকল্পনানুযায়ী কিংবা তাহার উপর আঁশের কার্পাস চাষ করিলে কেন্দ্রীয় সরকার ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কমিটি মারফৎ ১৯৫৪ সন হইতে ১৫ বৎসরের জন্ত তাহার যাবতীয় খরচ বহন করিয়া থাকেন। Letter No. F1/14/55 II dated 15-16 Dec. 1954 to I. C. C. C. from the Under Secretary to Govt. of Indian, Ministry of Food and Agriculture, New Delhi.

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ এই সাহায্য লইয়া উৎকৃষ্ট কার্পাস চাষ করিলেও পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিভাগ যাহাতে এ প্রকার চাষ করেন সে জন্ত আই সি. সি. সি.-র ডেপুটি সেক্রেটারী পশ্চিম বাংলার কার্পাস বিশেষজ্ঞকে লইয়া ১৯৫৫ ডিসেম্বর মাসে আমার ইজিপশিয়ান কার্পাস চাষ দেখিয়া বিশেষ প্রশংসা করেন। এই তুলার আঁশ সোয়া এক ইঞ্চি। এ প্রকার চাষের লাভালাভ পরীক্ষার জন্ত তিনি অন্ততঃ পাঁচ একর জমিতে ইহার চাষ করিবার পরামর্শ দেন। ইহার যাবতীয় খরচ তাঁহারা বহন করিবার প্রতিশ্রুতি দেন এবং পরের দিন বাংলার কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়ের সহিত দেখা করিয়া এ বিষয়ে বলিয়া যান। এ সময়ে ও তাহার পর ১৯৫৭ সন পর্যান্ত লোকসভায় পশ্চিম বাংলায় এ প্রকার তুলা চাষের প্রচলন বিষয়ে আলোচনা হয়। কৃষি বিভাগ হইতে এই উদাসীনতার কারণ স্বরূপ জানান হয় যে, (ক) শ্রীসারদাচরণ চক্রবর্ত্তীই ইহার একমাত্র উৎপাদক এবং ১৯৫২ সন পর্য্যন্ত তাঁহার চাষ ভাল হয় নাই। (খ) কার্পাস বিশেষজ্ঞ ডক্টর হারলেণ্ডের মতে ইজিপশিয়ান কার্পাস ভারতবর্ষের অনুপযোগী। ১৯৫২ সন পর্যান্ত আমার চাষ ভাল হয় নাই মানিয়া লইলেও বিজ্ঞানের প্রগতির যুগে এই ধারণা বর্তমান ১৯৫৯ সনের শেষভাগেও কৃষি বিভাগের মত উন্নত প্রতিষ্ঠানের পোষণ করিবেন আশা করি নাই। বিশেষ ১৯৫২ হইতে আমার উৎপন্ন ইজিপশিয়ান কার্পাস পরীক্ষা করিয়া প্রতি বৎসর বিভিন্ন কটন মিল, বিশেষজ্ঞরা এবং ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কটন কমিটি যে প্রশংসাসূচক মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিয়া বিভিন্ন সময়ে আমার ইজিপশিয়ান কার্পাস চাষ বিষয়ে মডার্ণ রিভিউ, অমৃতবাজার পত্রিকা, প্রবাসী, যুগান্তর প্রভৃতি কাগজে আলোচনা হইয়াছে। ১৯৫২ সন হইতে কৃষি বিভাগকে আমার চাষ দেখিবার জন্ত প্রতিবৎসর বার বার অনুরোধ করিলেও কেবল ১৯৫৪ ডিসেম্বর আই. সি. সি. সি-র ডেপুটি সেক্রেটারীর সহিত ভিন্ন, আজ পর্য্যন্ত আমার চাষ দেখেন নাই। আশুধান পরে কলাই-এর সহিত মিশ্রিত ফসল হিসাবে আমি যে ১৯৫৮-৫৯ সনে ইজিপশিয়ান কার্পাস উৎপন্ন করিয়াছি তাহা পরীক্ষা করিবার জন্ত কৃষিবিভাগের ডাইরেক্টর আই. সি. সি. সি-কে পাঠাইলে পর তাঁহারা জানাইয়াছেন যে, এই কার্পাস খুবই ভাল। ইহার আঁশ সোয়া ইঞ্চি লম্বা এবং ৮০নং সূতা প্রস্তুতোপযোগী। "The cotton is very good. Its staple length is 1⅛, fit to spin 80 standard yarns".

৫। ইজিপশিয়ান কার্পাস চাষ পরিকল্পনা—

ভারত কেন্দ্রীয় কার্পাস কমিটির উপদেশমত ১৯৫৬-৫৭ সন হইতে প্রতি বৎসর পাঁচ একর করিয়া ইজিপশিয়ান কার্পাস চাষ উদ্দেশ্যে তিন বৎসরের জন্ত একটি পরিকল্পনা উপস্থিত করি। কৃষি বিভাগ ইহা বিবেচনা করিয়া মত দিবার জন্ত কয়েকজন বিজ্ঞানীকে লইয়া একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। তাঁহাদের নিকটেও কৃষিবিভাগের পূর্ব্বোক্ত আপত্তিগুলি উত্থাপিত হইলেও তাঁহারা সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিকল্পনানুযায়ী কার্য্য করিবার জন্ত সুপারিশ করেন। শেষ পর্য্যন্ত কার্পাস বীজ পুতিবার দুই মাস উত্তীর্ণ হইলে, কৃষি বিভাগ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং পরবর্ত্তী বৎসরেও এপ্রকার চাষের কোন সম্ভাবনা নাই জানাইয়া দেন। আমি যে ইজিপশিয়ান কার্পাসের সহিত মিশ্রিত ফসল হিসাবে আশুধান ও কলাই চাষ করিতেছি, বহু বিশিষ্ট লোক তাহা দেখিতে আসেন। গত এপ্রিল মাসে পদ্মভূষণ ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণনগরের এ. ডি. এম্. এখানে আসিয়া এ প্রকার একটি চাষের পরিকল্পনা দিতে বলেন। ১৯৫৯-৬০ সনের জন্ত চাষীদের মধ্যে প্রচলনের জন্ত এ প্রকার মিশ্রিত ফসলের একটি পরিকল্পনা এ. ডি. এম, কৃষি বিভাগকে পাঠাইলে পর চাষের সময় উত্তীর্ণ হওয়ায়, বর্তমান মাসে, "১৯৫২ সন পর্য্যন্ত আমার চাষ ভাল হয় নাই এবং ডক্টর হরম্যান ইহা ভারতবর্ষের অনুপযোগী বলিয়াছেন", অজুহাতের পুনরাবৃত্তি করিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। কৃষিবিভাগের সাহায্য ও সহযোগিতায়, এ ভাবে বঞ্চিত হইয়াও এই মূল্যবান ইজিপশিয়ান কার্পাস বীজ রক্ষার্থ প্রতিবৎসরই নানারকম অভাব-অভিযোগ ও বাধা-বিঘ্নের মধ্যে কৃষিবিভাগ কোনদিন ইহা গ্রহণ করিবে আশায়, এই বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত কোনও মতে এই চাষ চালাইয়া যাইতেছি। সুখের বিষয় যে, সমাজ-উন্নয়ন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, অভয় আশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এ প্রকার চাষ গ্রহণ করিয়াছেন।

৬। গ্রামে কুটীর-শিল্প—

কৃষকদের মধ্যে অল্প পরিমাণে হইলেও এই তুলার চাষ প্রবর্ত্তিত হইলে বেকার সময়ে তাহারা এই তুলায় অম্বর চরকায় সূতা কাটিয়া

দৈনিক দেড় হইতে দুই টাকা উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে। বাংলায় তুলা জন্মান হয় না বলিয়া ১৯০৫ সন হইতে বহু চেষ্টা করিয়াও আজ পর্য্যন্ত চরকার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। অথচ যে সকল প্রদেশে তুলা জন্মে সেখানে শিশুরা ক্রীড়াচ্ছলেও চরকা কাটিয়া থাকে। (এখানে শিশুদের চরকা কাটা বিষয়ে একটি চিত্র দিলে আকর্ষণীয় হয়। Modern Review, Dec. 1953, এবং প্রবাসী, ১৩৫৮ সনে এ প্রকার ছবি আছে)।

ইহা সকলেই জানেন যে, কলে কিংবা চরকায় প্রস্তুত সূতার অর্দ্ধেক মূল্যই তুলার মূল্য শোধ করিতে ব্যয়িত হয়। বর্ত্তমানে ব্যাপকভাবে যে অম্বর চরকা প্রচলনের চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে তুলার মূল্য শোধ করিয়া দৈনিক বার আনার মত উপার্জ্জন হয়। নিজের উৎপন্ন তুলায় অম্বর চরকায় সূতা কাটিলে যে বার আনার স্থলে দেড় টাকা হইতে দুই টাকা আয় হইবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। বিশেষ টাটকা বীজ ছাড়ান, তুলার পাঁজ করার সুবিধা হয় এবং তাহা ছাড়া দ্রুত মিহি ও শক্ত সূতা প্রস্তুত হয়।

সর্ব্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি A. I. C. C. এবং দেশের কর্ণধারগণ যে খাদ্যশস্য বৃদ্ধি ও গ্রামে কুটীর-শিল্প প্রচলন বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন, উপরোক্ত পরিকল্পনানুযায়ী কার্য্য করিলে তাহার অনেকাংশে নিশ্চিত সমাধান হইবে সন্দেহ নাই।

চিতোর নগরের প্রাচীন ইতিহাস

ডক্টর শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

চিতোর রাজস্থানের উদয়পুর রাজ্যে অবস্থিত। ইহার প্রাচীন নাম চিত্রকুট। এই চিত্রকুট নগরী রামায়ণে উল্লিখিত চিত্রকুট হইতে বিভিন্ন। রামায়ণে বর্ণিত চিত্রকুট বুন্দেলখন্দের অন্তর্গত বান্দা জেলায় অবস্থিত এবং ঐতিহাসিক যুগে ইহা কখনও রাজনৈতিক গুরুত্ব অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয় নাই। গুপ্তযুগ পর্য্যন্ত কোন তাম্র বা শিলালেখতে অথবা কোন সমসাময়িক গ্রন্থে রাজস্থানের চিত্রকুটের উল্লেখ নাই।

চীনা পরিব্রাজক হিউ-এন-সঙ্গের বিবরণীতে আছে যে ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বলভি হইতে প্রায় ৩০০ মাইল উত্তরে কুচেলোতে গমন করেন। কুচেলো হইতে প্রায় ৪৬৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে উসে এনন এবং উসে এনন হইতে প্রায় ১৬৬ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে চিকিট বা চিচিট অবস্থিত। পণ্ডিতেরা মনে করেন কুচেলো দেশ বলিতে গুর্জ্জর দেশ বুঝায়। ৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ নৌশরি লিপিতে আছে যে তাজিক (আরব) সৈন্য সৈন্ধব, কচ্ছেল্ল, সৌরাষ্ট্র চাবোটক, মৌর্য্য ও গুর্জ্জর প্রভৃতি দেশ ধ্বংস করে। মনে হয় হিউ-এন-সঙ্গ বর্ণিত কুচেলো এবং নৌশরিলিপিতে উল্লিখিত কচ্ছেল্ল অভিন্ন। গুর্জ্জর ইহা হইতে একটি পৃথক দেশ ছিল। আলেকজেণ্ডার কানিংহাম চিকিট নাম জেজাকভুক্তি নামের অপভ্রংশ বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহার এই মত অনেকে সমর্থন করেন। বুন্দেলখন্দের প্রাচীন নাম জেজাকভুক্তি। নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে চন্দেল্ল বংশের নৃপতি জেজ্জক তাঁহার নামানুসারে এই দেশের নাম জেজাকভুক্তি রাখিয়াছিলেন। সুতরাং কানিংহামের এই বিষয়ে মত সমর্থনযোগ্য নয়। চিকিট রাজস্থানের চিত্রকুট ছিল বলিয়া গ্রহণ করা শ্রেয়ঃ যদিও হিউ-এন-সঙ্গ উসে এনন হইতে ইহার অবস্থিতির দিক নির্ণয়ে ভুল করিয়াছেন।

চিত্রকুট সম্বন্ধে হিউ-এন-সঙ্গ লিখিয়াছেন যে, ইহা পরিধিতে প্রায় ৬৬৬ মাইল এবং ইহার রাজধানীর পরিধি ২।০ মাইল। ইহার জমি উর্ব্বর ও এখানে প্রচুর শস্য জন্মে। এই স্থানের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ডাল ও গম। এখানের অধিকাংশ অধিবাসী বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিল না ও এখানে দশটি দেবমন্দির ছিল। দেশের রাজা ব্রাহ্মণ ছিলেন কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের উৎসাহ দিতেন। নানা দেশ হইতে পণ্ডিতগণ এখানে সমবেত হইয়াছিলেন।

হিউ-এন-সঙ্গ বর্ণিত চিত্রকুটের ব্রাহ্মণ রাজা কে ছিলেন এ পর্য্যন্ত তাহা নির্ণীত হয় নাই। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে তাহা অনুমান করা সম্ভবপর। রাজস্থানের জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত চতসুতে আবিষ্কৃত একটি শিলালেখতে গুহিল বংশের একটি শাখার দ্বাদশ জন রাজার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাওয়া যায়। ইহারা প্রাচীন গুর্জ্জরত্র বা গুর্জ্জর দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজস্থানের জয়পুর ও আলোয়ার রাজ্য গুর্জ্জরত্র দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে এলবিরুণি এই দেশকেই গুজরাত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান গুজরাটকে নহরওয়ালা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। গুহিল বংশের পঞ্চম নৃপতি ধনিকের শিলালিপি উদয়পুর রাজ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে ও এই বংশের নবম নৃপতি হর্ষকে একটি তাম্রলেখতে "চিত্রকুট ভূপাল" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই দুইটি লিপি ও চতসু লিপি আলোচনা করিলে প্রমাণ হইবে যে, এই গুহিল বংশের রাজ্য জয়পুর হইতে উদয়পুর রাজ্যের পূর্ব্বাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল ও চিত্রকুট ইহার রাজধানী ছিল। নবম শতাব্দীতে উকীর্ণ একটি রাষ্ট্রকুট লিপিতে আছে যে, ঐ সময়ে গুর্জ্জরেরা চিত্রকুট দুর্গে বাস করিত। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত হইবে যে, চিত্রকুট গুর্জ্জর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই বংশের রাজারা গুর্জ্জর দেশে রাজত্ব করিতেন বলিয়া ইহাদের

সমসাময়িক শিলা ও তাম্রলেখতে গুর্জ্জর এবং গুর্জ্জরেশ্বর নামে প্রকাশ করা হইয়াছে। চতস্থ লিপিতে হর্ষরাজকে দ্বিজ বলা হইয়াছে। সুতরাং হর্ষ ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। পঞ্চম নৃপতি ধনিক ৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আসীন ছিলেন। এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বংশের প্রথম নৃপতি ভর্তৃপট্টের রাজত্বকাল ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে ছিল বলিয়া নির্দ্ধারিত করা যাইতে পারে। এই সব প্রমাণাদি হইতে মনে হয় হিউ-এন-সঙ বর্ণিত চিত্রকূটের ব্রাহ্মণ রাজা গুহিল বংশের তৃতীয় নৃপতি উপেন্দ্রভট ছিলেন।

উপরোক্ত গুহিল বংশের শাখা বিশেষের ইতিহাস চিত্রকূটের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। চতস্থ লিপিতে আছে যে, ভর্তৃপট্ট গুহিল বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি রামের (পরশুরামের) ন্যায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের গুণাবলী-সম্পন্ন ছিলেন।

প্রায় ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে গুহিল বা গুহদত্ত নামে এক ব্যক্তি নাগত্রহে রাজত্ব স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র ও পৌত্রাদি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত নাগত্রহ হইতে মেদপাট, বর্ত্তমান মেবার বা উদয়পুর রাজ্য শাসন করেন। উদয়পুরের নিকটে অবস্থিত বর্ত্তমান নাগদার প্রাচীন নাম নাগত্রহ বা নাগহ্রদ ছিল। মনে হয় ভর্তৃপট্ট এই গুহিল বা গুহদত্তের পুত্র বা পৌত্র ছিলেন, এবং গুহিল বংশের মূল শাখা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গুর্জ্জর দেশে নূতন রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন।

বাণভট্টের হর্ষচরিত হইতে জানা যায় যে, সে স্থাণ্বীশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্দ্ধন গুর্জ্জরদের পরাজিত করিয়াছিলেন। এই গুর্জ্জর রাজ সম্ভবতঃ ভর্তৃপট্ট ছিলেন। ভর্তৃপট্টের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ঈশানভট্ট রাজপদ প্রাপ্ত হন। ঈশানভট্টের রাজত্বকাল ৬০৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছিল অনুমান করা যাইতে পারে। এই সময়ে বাদামির চালুক্য বংশের দ্বিতীয় পুলিকেশী লাট, মালব ও গুর্জ্জর দেশে সৈন্যাভিযান করিয়াছিলেন। পুলিকেশীর প্রতিদ্বন্দ্বী গুর্জ্জররাজ ঈশান ভট্ট ছিলেন। ঈশান ভট্টের পর তাঁহার পুত্র উপেন্দ্র ভট্ট রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। উপেন্দ্রভট্টের রাজত্বকাল ৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছিল। তাঁহার রাজত্ব সময়ে হিউ এন সঙ চিত্রকূট পরিদর্শন করেন। উপেন্দ্র ভট্টের পর তাঁহার পুত্র গুহিল গুর্জ্জর দেশের সিংহাসনে আরোহণ করেন। গুহিলের পুত্র ও উত্তরাধিকারী ধনিক ছিলেন। ধনিকের রাজত্বকালের দুইটি শিলালেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথমটি চতস্থ হইতে ৫০ মাইল দক্ষিণে নগর নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছে এবং ইহার উৎকীর্ণের তারিখ ৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। দ্বিতীয়টি উদয়পুর রাজ্যের দেবোক নামক স্থানে পাওয়া যায়। ইহার উৎকীর্ণের তারিখ ৭২৫ খ্রীষ্টাব্দ। ইহাতে আছে যে, ধনিক মহারাজাধিরাজ ধবলপ্প-দেবের অধীন রাজা ছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন এই ধবলপ্পদেব কোটারাজ্যের কানসুবানে প্রাপ্ত লেখতে উল্লিখিত মৌর্য্য বংশের নৃপতি ধবল অভিন্ন ছিলেন। গুহিলেরা কতকাল এই ধবলপ্পদেবের অধীন ছিলেন তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ চিতোরে প্রাপ্ত একটি লেখ হইতে জানা যায় যে, এই সময়ে মান নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চিত্রকূটে বাস করিতেন। তাহার পিতা ভোজ, পিতামহ ভীম, ও প্রপিতামহ মহেশ্বর ছিলেন। ধনিকের পর তাঁহার পুত্র আউক সিংহাসনে আরোহণ করেন। আউকের রাজত্বকালে ৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে আরব সৈন্যগণ গুর্জ্জর দেশ বিধ্বস্ত করে। আউকের পুত্র ও উত্তরাধিকারী কৃষ্ণরাজের রাজত্বকাল ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অনুমান করা যাইতে পারে। দাক্ষিণাত্যে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে দন্তিদুর্গ রাষ্ট্রকূট বংশের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এলোরার দশাবতার মন্দিরগাত্রে খোদিত লেখ হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, দন্তিদুর্গ সিন্ধু, কাঞ্চী প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া উজ্জয়িনীতে হিরণ্যগর্ভের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার সৈন্যগণ তীরক্ষিতি জয় করিয়া গুর্জ্জররাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সৌধে এক কার্য্য সম্পাদন করেন। পরবর্ত্তীকালে উৎকীর্ণ সঞ্জন তাম্র-শাসনে অতিরঞ্জিত করিয়া লেখা হইয়াছে যে, দন্তিদুর্গ উজ্জয়িনীতে হিরণ্যগর্ভের অনুষ্ঠানের সময় গুর্জ্জর প্রভৃতি রাজবৃন্দকে প্রতিহার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দন্তিদুর্গের প্রতিদ্বন্দ্বী গুর্জ্জররাজ গুহিল কৃষ্ণরাজ ছিলেন বলিয়া মনে হয়। কৃষ্ণরাজের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শঙ্করগণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। শঙ্করগণের রাজত্ব-কালে মালবের প্রতিহার বংশের নৃপতি বৎসরাজ গুর্জ্জর দেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। এই সময় হইতে শঙ্করগণ ও তাহার বংশধরেরা প্রতিহারদের বশ্যতা স্বীকার করিয়া গুর্জ্জর দেশের শাসনকার্য্য পরিচালনা করে।

রাষ্ট্রকূট বংশের এক শাখা লাট বা দক্ষিণ গুজরাতে রাজত্ব করে। এই বংশের নৃপতি ইন্দ্ররাজ শঙ্করগণের সমসাময়িক ছিলেন! ৮১২ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ কর্করাজের বরোদা লেখতে আছে যে, তাঁহার পিতা ইন্দ্ররাজ গুর্জ্জরেশ্বরপতিকে পরাজিত করিয়া-ছিলেন। এই লেখর অন্ত পঙক্তিতে গুর্জ্জরেশ্বরের উল্লেখ আছে। এই লেখর গুর্জ্জরেশ্বরপতি বলিতে প্রতিহার বৎসরাজকে বুঝায় ও গুর্জ্জরেশ্বর শঙ্করগণকে নির্দ্দেশ করে।

দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশের তৃতীয় গোবিন্দ (খ্রীঃ ৭৯৫-৮১৪) প্রতিহার বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভটকে পরাজিত করিয়া মালব দেশ জয় করেন ও সেই দেশের শাসনভার পরমার বংশের প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রের হস্তে অর্পণ করেন। ইহার পর সিংহাসনচ্যুত হইয়া নাগভট শঙ্করগণের সাহায্যে গৌড়রাজ ও তাঁহার আশ্রিত চক্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া কান্যকুব্জ অধিকার করেন ও তথায় তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। (খ্রীঃ ৮০৮-৮১২)। এই সময় হইতে একাদশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশ পর্য্যন্ত নাগভটও তাহার বংশধরেরা কান্যকুব্জ শাসন করেন। চতস্থ লেখতে আছে যে, শঙ্করগণ গৌড়রাজের সাম্রাজ্য জয় করিয়া তাঁহার প্রভুকে

(দ্বিতীয় নাগভটকে) উপহার প্রদান করেন। ইহার পর শঙ্করগণ মালবদেশ জয় করিতে সচেষ্ট হন, কিন্তু রাষ্ট্রকূট তৃতীয় গোবিন্দ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করেন ও লাট দেশের অধিপতি কর্করাজকে গুর্জ্জরদের আক্রমণ হইতে মালবদেশ রক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। নীলগুণ্ড লিপিতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তৃতীয় গোবিন্দ চিত্রকূট গিরিদুর্গে অবস্থিত গুর্জ্জরদের পরাজিত করিয়াছিলেন। বরোদা তাম্রলেখতে আছে যে, তৃতীয় গোবিন্দ মালবরাজকে গুর্জ্জরদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্রকূট কর্করাজকে গুর্জ্জর ও মালবদেশের মধ্যে দরজার অর্গলস্বরূপ নিযুক্ত করেন। এই সময়ে চিত্রকূটে গুর্জ্জররাজ শঙ্করগণ ছিলেন। শঙ্করগণের রাজত্বকাল ৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৮২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছিল বলিয়া মনে হয়। শঙ্করগণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র হর্ষ রাজপদ প্রাপ্ত হন।

হর্ষ প্রতিহার বংশের নৃপতি ভোজদেবের (খ্রীঃ ৮৩৫-৮৯২) সমসাময়িক ছিলেন। হর্ষের রাজত্বকালে গৌড়রাজ ধর্ম্মপালের পুত্র নৃপতি দেবপাল গুর্জ্জর দেশে সৈন্যাভিযান করিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে কলচুরি বংশের কোকল্লদেব ডাহলদেশে (জব্বলপুর) আধিপত্য স্থাপন করেন। এই বংশের কর্ণদেবের বারাণসী তাম্রলেখতে আছে যে, কোকল্লদেব—ভোজ, বল্লভরাজ, চিত্রকূট-ভূপাল হর্ষ ও শঙ্করগণকে অভয় প্রদান করিয়াছিলেন। কিলহর্ণ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ চিত্রকূট-ভূপাল হর্ষ ও জেজাক ভুক্তির চন্দেল্লবংশের নৃপতি হর্ষ অভিন্ন ছিলেন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এই প্রবন্ধের লেখক অন্যত্র প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে, চিত্রকূট-ভূপাল হর্ষ এবং চিত্রকূটের গুহিল হর্ষ একই ব্যক্তি ছিলেন। দক্ষিণ কোশলের কলচুরী বংশের পৃথ্বীদেবের আমোদা তাম্রলেখতে আছে যে, কোকল্লদেব—কর্ণাট, বঙ্গ, গুর্জ্জর, কোঙ্কন, শাকম্ভরীরাজ ও রঘুবংশের রাজার কোষাগার লুণ্ঠন করেন। কোকল্লের প্রতিদ্বন্দ্বী গুর্জ্জররাজ হর্ষ ও রঘুবংশের নৃপতি ভোজ ছিলেন। কোকল্ল ইহাদের পরাজিত করিয়া অভয় দিয়াছিলেন যে, ইহাদের সিংহাসনচ্যুত করিবেন না। হর্ষ চিত্রকূট ভূপাল ছিলেন বলিয়া বর্ণিত হওয়ায় তাঁহার রাজধানী চিত্রকূট ছিল বলিয়া প্রমাণিত হয়। এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ও এই গুহিল বংশের রাজ্য উদয়পুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এই প্রমাণ আবিষ্কৃত হওয়ায় এই বংশের রাজত্ব আরম্ভ হওয়ার সময় হইতেই চিত্রকূট ইহার রাজধানী ছিল বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

চতসুলেখতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, হর্ষ উদিচ্যদেশ জয় করিয়া ভোজদেবকে অশ্ব উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। এই সময়ে হর্ষ টক্ক, বর্ত্তমান পঞ্জাব জয় করিয়া গুর্জ্জর রাজ্যভুক্ত করেন ও সেখানে অধিরাজ ভোজদেবের সার্ব্বভৌমত্ব স্থাপন করেন। হর্ষের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় গুহিল সিংহাসন আরোহণ করেন। দ্বিতীয় গুহিলের রাজত্বকালে কাশ্মীররাজ শঙ্করবর্ম্মণ (খ্রীঃ ৮৮৩-৯০২) টক্ক দেশ গুর্জ্জর অলখনের নিকট হইতে জয় করেন ও তথায় ভোজদেব যে সার্ব্বভৌমত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা ধ্বংস করেন। অলখন দ্বিতীয় গুহিলের অপর নাম ছিল অথবা ইহা তাঁহার অধীন পঞ্জাবের ঐ সময়ের শাসনকর্ত্তার নাম ছিল। দ্বিতীয় গুহিল প্রতিহার ভোজের পুত্র নৃপতি মহেন্দ্রপালের সমসাময়িক ছিলেন। মহেন্দ্রপাল দ্বিতীয় গুহিলের সাহায্যে পালবংশের নারায়ণপালকে পরাজিত করিয়া গৌড়দেশ প্রতিহার রাজ্যভুক্ত করেন। চতসুলেখতে আছে যে, দ্বিতীয় গুহিল গৌড়রাজ্য জয় করিয়া পূর্ব্বদেশের রাজবৃন্দ হইতে কর আদায় করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় গুহিলের মৃত্যুর পর ভট রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। ভট প্রতিহার বংশের রাজা মহীপালের (খ্রীঃ ৯১৪-৯৪২) সমসাময়িক ছিলেন। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশের তৃতীয় ইন্দ্র কান্যকুব্জ দখল করেন ও তথা হইতে মহীপাল পলায়ন করেন। গুহিল ভট ও জেজাকভুক্তির চন্দেল্লবংশের হর্ষ রাষ্ট্রকূটদের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া মহীপালকে রাজ্য উদ্ধার করিতে সাহায্য করেন। চতসুলেখতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ভট তাঁহার প্রভুর আদেশে দাক্ষিণাত্যাধীশকে পরাজিত করিয়াছিলেন। দশম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে কলচুরীবংশের প্রথম যুবরাজ ও চন্দেল্ল বংশের যশোবর্ম্মণ গুর্জ্জর দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। ভটের মৃত্যুর পর বালাদিত্য সিংহাসন আরোহণ করেন। বালাদিত্যের রাজত্বকালে চতসুলেখ উৎকীর্ণ করা হইয়াছিল, বালাদিত্য দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে ভগবান মুরারির জন্য একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে চিত্রকূটের গুহিলবংশের পতন আরম্ভ হয় ও কান্যকুব্জের প্রতিহার রাজগণ হীনবল হন। গুহিলেরা প্রতিহার রাজগণের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন ও তাহাদের রাজ্যবিস্তারে ও রাজ্যরক্ষায় সর্ব্বদাই সাহায্য করিয়াছিলেন। ৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে তাহারা রাষ্ট্রকূট বংশের তৃতীয় কৃষ্ণকে চিত্রকূট ও কালঞ্জর জয়ে বাধাপ্রদানে অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। মহীশূরের রাজা গঙ্গবংশের সত্যবাক্য কোঙ্গনিবর্ম্মণ দাবী করেন যে, তিনি তৃতীয় কৃষ্ণকে উত্তর দেশ জয় করিতে সাহায্য করিয়া গুর্জ্জরাধিরাজ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। বালাদিত্যের তিন পুত্র ছিল—বল্লভরাজ, বিগ্রহরাজ ও দেবরাজ। বালাদিত্যের মৃত্যুর পর এই রাজপুত্রেরা সিংহাসনে আরোহণ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন কিনা তাহা জানা যায় না।

মালবের পরমার বংশের নৃপতি বাক্‌পতি-মুঞ্জ দশম শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে গুহিলদের পরাজিত করিয়া চিত্রকূট মালব রাজভুক্ত করেন। পরমার বংশের ভোজদেব (খ্রীঃ ১০০০-১০৫৫) চিত্রকূটে ত্রিভুবন নারায়ণের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। তিনি সেখানে "ভোজস্বামী জগতি" নামে একটি ইমারত তৈয়ার করেন। ১০৩১ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান গুজরাটের রাজা চৌলুক্য বংশের ভীমদেব আবুপর্ব্বত আক্রমণ করেন। আবুরাজ পরমার বংশের ধন্ধুক আত্মরক্ষার্থে ভোজদেবের রাজ্যে চিত্রকূটে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে তিনি ভীমদেবের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করিয়া চিত্রকূট পরিত্যাগ

না, না !
এ 'ডালডা' নয় !
'ডালডা' কখনও খোলা অবস্থায় বিক্রী হয় না !



আজ্ঞে হ্যাঁ, ডালডা বনস্পতি আপনি কেবল শীলকরা টিনেই কিনতে পাবেন। এই জন্যেই এতে কোনও ধুলো ময়লা লাগতে পারে না আর না পারা যায় একে নোংরা হাত দিয়ে ছুঁতে। তাছাড়া খোলা অবস্থায় 'ডালডা' কেনার দরকারই বা কী যখন আপনার সুবিধের জন্য ভারতের যে কোন জায়গায় আপনি ১০, ৫, ২, ১ ও ½ পাঃ টিনে 'ডালডা' কিনতে পাবেন।



হ্যাঁ, এই তো 'ডালডা' !
এর হলদে টিনের ওপোর খেজুর গাছের ছবি দেখলে সবাই চিনতে পারে।

মনে রাখবেন 'ডালডা' কেবল একটি বনস্পতির নাম। আপনার এবং পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখতে সব সময়েই ডালডা বনস্পতি কিনবেন শীলকরা বন্ধ টিনে। কেন না কোন রকম ভেজাল বা দোষযুক্ত হবার বিপদ এতে থাকে না আর যা কিছু এই দিয়ে রাঁধবেন সেই সব খাবারের প্রকৃত স্বাদ বজায় থাকবে।



ডালডা বনস্পতি দিয়ে রাঁধুন—আর স্বাস্থ্য ও শক্তি সঞ্চয় করুন।

DL. 469-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই।

করিয়া আবুরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ভোজদেবের মৃত্যুর পর চৌলুক্য বংশের অধীনস্থ হয়।

চৌলুক্য বংশের কুমার পাল (খ্রীঃ ১১৪৫-১১৭২) শাকম্ভরী বিজয়ের পর গুজরাটে ফিরিবার পথে চিত্রকূটে শিবির স্থাপন করেন। এই সময়ে ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেই স্থানে ভগবান সমিদ্ধেশ্বরের পূজা করেন ও তাঁহার মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি গ্রাম দান করেন। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চিত্রকূট নাগদ্রহের গুহিল বংশের রাজ্যভুক্ত হয়।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, গুহিল বংশের মূল শাখা খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে মেদপাট বা মেবার শাসন করে। এই রাজ্যের রাজধানী নাগদ্রহ ছিল। এই বংশের নৃপতি জৈত্র সিংহের পুত্র তেজসিংহ ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে নাগদ্রহের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে ১২৬৭ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ এক শিলালেখ চিতোরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই লেখতে চিত্রকূট মহাদুর্গের উল্লেখ আছে। ইহা নাগদ্রহের গুহিল বংশের চিতোরে প্রাপ্ত লেখগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন। তেজসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সমরসিংহ নাগদ্রহে রাজা হন। তাঁহার রাজত্বকালে উৎকীর্ণ পাঁচখানা শিলালেখ চিতোরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই লেখগুলি ১২৭৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৩০১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১২৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রণস্তম্ভপুরের চাহমান বংশের নৃপতি হম্মীর চিত্রকূট আক্রমণ করিয়াছিলেন। ১৩০২ খ্রীষ্টাব্দে সমরসিংহের পুত্র রত্নসিংহ নাগদ্রহের সিংহাসনপ্রাপ্ত হন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিবার অনেক পূর্ব্বে গুহিল বংশের শিশোদীয়া শাখার লক্ষ্মণসিংহের সঙ্গে তাঁহার কন্যা পদ্মিনীর বিবাহ দেন।

১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান অলাউদ্দিন খালজি চিত্রকূট দুর্গ আক্রমণ করেন। রত্নসিংহকে এই বিপদে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহার জামাতা লক্ষ্মণসিংহ পুত্রাদিসহ চিত্রকূট দুর্গে আগমন করেন। রত্নসিংহ দুই মাস মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার পর দুর্গরক্ষার হতাশ হইয়া সকলের অগোচরে গোপনে দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সুলতানের শিবিরে গিয়া আত্মসমর্পণ করেন। সুলতান তাঁহাকে বন্দী করেন ও বিপুল উদ্যমে চিত্রকূট দুর্গ আক্রমণ করেন ও তাহা জয় করেন। লক্ষ্মণসিংহ ও তাঁহার পুত্রগণ যুদ্ধে নিহত হন। সুলতান তাঁহার পুত্র খিজির খাঁকে দুর্গরক্ষক নিযুক্ত করিয়া বন্দী রত্নসিংহসহ দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। খিজির খাঁর চিত্রকূট দুর্গে বেশী দিন থাকা নিরাপদ নয় মনে করিয়া তিনি চাহমান বংশের মালদেবের হস্তে দুর্গের ভার অর্পণ করেন। মালদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র জেসো দুর্গভার গ্রহণ করেন। ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দের অত্যল্পকাল পরে গুহিল বংশের শিশোদীয়া শাখার হম্মীর দেব জেসোকে পরাজিত করিয়া চিত্রকূট দুর্গ দখল করেন। হম্মীর এবং তাঁহার বংশধরগণ চিত্রকূটে তাঁহাদের রাজধানী স্থাপন করেন ও মহারাণা উপাধি গ্রহণ করেন।*

---

* প্রবন্ধের কলেবর সঙ্কোচিত করিবার জন্য ইহার রচনার মূল উপাদানগুলির প্রকাশপত্রের পরিচয় দেওয়া হইল না। পাঠকেরা ইহাদের প্রকাশপত্রের পরিচয় প্রবন্ধ লেখকের রচিত নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলিতে প্রাপ্ত হইবেন :—

(1) Origin of the Pratihara Dynasty, Indian Historical quarterly, vol. X, p. 337.

(2) History of the Gurjara Country, Ibid, p. 613.

(3) Early History of the Kalachuri Dynasty, Ibid, vol. XIII, p. 482.

(4) The Pratiharas and the Gurjaras, Journal of the Bihar and Orissa Research Society, vol. XXIV, part IV.

আর্ত্ত-ত্রাণে নৌকার অভাব

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বহু জেলায়, বহু স্থানে এই বৎসর দারুণ বন্যা হইয়াছে। ঘর, বাড়ী, মাঠ, ঘাট ও পথ জলে ডুবিয়া গিয়াছে—জলে তলাইয়া গিয়াছে বলিলে প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে কতকটা খাপ খায়। গরু, বাছুর, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি গৃহপালিত জীবজন্তু সব ভাসিয়া গিয়াছে। অন্যান্যবারের ন্যায় এইবারে বন্যার জল সহজে কমিতেছে না—কারণ বা কারণসমূহ যাহাই হউক না কেন। ফলে জনসাধারণের দুঃখ, দুর্দ্দশা, কষ্ট বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আর্ত্তত্রাণের জন্য সরকার কর্ত্তৃক এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্ত্তৃক প্রেরিত খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধাদি ও মাথা গুঁজিবার জন্য তাঁবু, ত্রিপল, হোগলা প্রভৃতি নৌকার অভাবে বন্যাপীড়িত গ্রামাঞ্চলে সহজে বা শীঘ্র শীঘ্র পৌঁছিতেছে না, কোন কোন জায়গায় আদৌ পৌঁছিতেছে না। সামরিক বিভাগ হইতে লওয়া রবারের নৌকার সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। তবুও তাহাদের সাহায্যে কিছুটা খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধপথ্যাদি বন্যাপ্রপীড়িত জনগণের নিকট পৌঁছাইতেছে।

হাওয়াই জাহাজে করিয়া খাদ্যাদি যে সব উঁচু জায়গা জলের উপর জাগিয়া আছে ও যেখানে বন্যাপীড়িত জনগণ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাহার উপর ফেলা হইতেছে। সামান্য কিছু লোক এই খাদ্যাদি ফেলিবার কালে বস্তাচাপা পড়িয়া আহত হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন মারা গিয়াছে।

আর্ত্তত্রাণে সাধারণ নৌকার অভাব, বিশেষ করিয়া ডিঙ্গীর অভাব দারুণ অনুভূত হইতেছে। উপযুক্ত সংখ্যক নৌকা বা ডিঙ্গী নাই কেন?

প্রথমেই দেখা যাউক আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে কতগুলি নৌকা, ডিঙ্গী, সালতী আছে। ইংরেজী ১৯৩১ সনের আদমসুমারীর সময় অখণ্ডবঙ্গের নৌকাদির সংখ্যা গণনা করা হয়। এই সংখ্যা যে সঠিক তাহার দাবী কর্ত্তৃপক্ষ করেন নাই। ঐ সনের সেন্সাস সুপারিনটেনডেন্ট লিখিয়াছেন যে:

"Subsidiry Table VII slows the results of an attempt to obtain an estimate of the numbers boats and steamers in Bengal. Bengal is unique in India for the extent of its navigable water-ways and for the number and variety of boats which ply upon them, but no estimate for the whole province exists from which their numbers can be calculated. The figures given in Subsidiary table makes no pretence to completeness or accuracy but they are interesting as the first attempted estimate of this kind."

অর্থাৎ নৌকা ও ষ্টীমারের সংখ্যা নির্দ্ধারণের চেষ্টায় ফল ৭ নং পরিপূরক কোঠায় দেওয়া হইল। ভারতবর্ষের মধ্যে নৌকার প্রকার ও সংখ্যায় এবং নাব্য জলপথের পরিমাণে বাংলা অদ্বিতীয়। কিন্তু এ যাবৎ সমগ্র প্রদেশের নৌকার সংখ্যা আন্দাজ করিবার মত কোন তথ্য ছিল না। পরিপূরক কোঠায় যে তথ্য দেওয়া হইল তাহা সঠিক বা সম্পূর্ণ এ সম্বন্ধে কোন দাবী নাই, কিন্তু প্রথম চেষ্টা হিসাবে ইহার মূল্য আছে।

নিম্নে আমরা ১৯৩১ সনের বাংলার সেন্সাস রিপোর্টের ৭০ পৃষ্ঠায় যে সমস্ত তথ্যাদি দেওয়া আছে তাহা হইতে পশ্চিমবঙ্গের জন্য আবশ্যক তথ্যাদির চুম্বক সঙ্কলন করিয়া দিলাম। আগ্রহশীল পাঠক সম্পূর্ণ তথ্যাদির জন্য ঐ রিপোর্ট পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন।

	চাষীদের ছোট ছোট নৌকা প্রভৃতি		মাল ও আরোহী বহিবার বড় বড় নৌকা		
	ডিঙ্গী, সালতী প্রভৃতি	৫০ মণের কম বহন ক্ষমতার নৌকা	৫০ মণ হইতে ৩,০০০ মণের উপর বহন ক্ষমতা	যাহাদের বহন ক্ষমতা জানিতে পারা যায় নাই	
				বড়	ছোট
বর্দ্ধমান	৯১	৫	৩০	১	৬০
বীরভূম	×	×	×	×	×
বাঁকুড়া	১০	×	×	×	×
মেদিনীপুর	৫,০২৮	১১৫	২২৯	৪	৪৬৯
হুগলী	৪০	২৯৫	২৫	৭৪	১০৫
হাওড়া	১২৭	১২	৬০	২১	১০৮
বর্দ্ধমান বিভাগ	৫,২৯৬	৪২৭	৩৮৪	৭০	৭৪২
২৪ পরগণা	৩,১২১	২৮৫	১,১৫৫	২৫৯	৪৭০
কলিকাতা	×	×	×	×	১,৪৮০
*নদীয়া	৪,০২২	২৫০	৩১৯	১৬৩	৭৬৯
মুর্শিদাবাদ	১,৫৫৩	৭৪	২৪৬	৩৫	১০৬
*দিনাজপুর	×	×	×	×	×
*জলপাইগুড়ি	×	×	১	১০	৬
দার্জ্জিলিঙ	×	×	×	×	×
*মালদহ	২ ০৩৫	২২৮	২৩০	৭৩	৬৬৫
কুচবিহার	১৪	১১১	৩	৫	১
পশ্চিমবঙ্গ	১৬,০৪১	১,৮০২	২,৬৪৫	৬৮৫	৪,৯৮১
অখণ্ড বঙ্গ	৮,৮০,৯২৮	৪৮,৬০২	২১,৫৯৫	১৬,৪০২	৭৮,৯৩৪

পশ্চিমবঙ্গের (তারকা চিহ্নিত জেলার সব নৌকাদি ধরিয়া) নৌকাদির মোট সংখ্যা :— ২৬,১৫৪টি। অখণ্ড বঙ্গের নৌকাদির মোট সংখ্যা :— ১০,৪৬,৪৯১টি। পশ্চিমবঙ্গে সমগ্র বঙ্গের নৌকাদির শতকরা ২৫ ভাগ নৌকাদি ছিল।

উপরোক্ত তথ্য হইতে আর্ত্তত্রাণের কার্যে ব্যবহৃত হইতে পারে এইরূপ নৌকাদির সংখ্যার মোটামুটি একটা হদিশ পাওয়া যাইতে পারে। যেমন কিছুসংখ্যক নৌকাদি পূর্ব্বোক্ত গণনার সময় বাদ পড়িয়াছে, তেমনি নদীয়া, মালদহ প্রভৃতি জেলার গণিত নৌকাদি (যাহার একটা মোটা অংশ পাকিস্থানের ভাগে পড়িয়াছে) সবটাই পশ্চিমবঙ্গের ভাগে ধরিয়াছি।

পশ্চিমবঙ্গে ছোট ছোট নৌকা, ডিঙ্গী, সালতী প্রভৃতির সংখ্যা ১৬,০৪১+১,৮০২=১৭,৮৪৩টি। আমরা যদি ধরিয়া লই যে, নৌকাদি গণনার সময় সিকি বাদ পড়িয়াছে, তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গে ছোট ছোট নৌকাদির সংখ্যা হইবে ১৭,৮৪০×৪ ৩= ২৩,৭৮৭টি। আর নদীয়া ও মালদহ জেলার ছোট ছোট নৌকাদির সংখ্যা হইবে ৮,৭১৩টি। ইহার অর্দ্ধেক পাকিস্থানভুক্ত এলাকার মধ্যে পড়িয়াছে বলিয়া যদি ধরি ত খুব অন্যায় হইবে না। কারণ নদীবহুল অংশই পাকিস্থানের ভাগে পড়িয়াছে। এমতে এই দুই জেলার ৪,৩৫৭টি নৌকা পূর্ব্বোক্ত ২৩,৭৮৭ হইতে বাদ যাইবে। মোট ছোট ছোট নৌকাদির সংখ্যা, যাহা পশ্চিমবঙ্গের ভাগে পড়িয়াছে, দাঁড়ায় ১৯,৪৩০টি। মোটামুটি ২০,০০০ হাজার।

গড়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি বর্গমাইলে দু'তিনখানি করিয়া নৌকা পড়ে। আর বর্দ্ধমান বিভাগে প্রতি বর্গমাইলে অর্দ্ধেকেরও কম।

এখন কথা হইতে পারে যে, ইহা ত ৩০ বৎসর আগেকার অবস্থা ; এখন লোকবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নৌকাদির সংখ্যা বাড়িয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা নিম্নলিখিত ভাবে গত ৩০ বৎসর বাড়িয়াছে :

	শতকরা	
১৯৩১-৪১	২৩·৬	মোট
১৯৪১-৫১	১৩·৬	
১৯৫১-৬১	২০*	৬৮·৫ জন

তর্কের খাতিরে নৌকাদির সংখ্যা লোকবৃদ্ধির অনুপাতে বাড়িয়াছে ধরিয়া লইলেও, প্রতি বর্গমাইলে একখানি করিয়া নৌকাও হয় না।

আমাদের যতদূর মনে হয়, গত ত্রিশ বৎসরে নৌকাদির সংখ্যা বাড়ে নাই, বরং কমিয়াছে। যে সকল কারণে নৌকাদির সংখ্যা কমিয়াছে তাহা দেখাইতেছি। জাপানী আক্রমণের ভয়ে ব্রিটিশ সরকার অনেক নৌকা জলে ডুবাইয়া দেন ও পোড়াইয়া ফেলেন। অবশ্য এইটি পূর্ব্ববঙ্গেই ব্যাপক ভাবে হইয়াছিল ; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গও রেহাই পায় নাই। তাহার পর যুদ্ধ শেষ হইলে নদীমাতৃক পূর্ব্ববঙ্গের স্বাভাবিক দরকারে পশ্চিমবঙ্গ হইতে বহু নৌকাদি খরিদ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে চালান দেওয়া হয়। সরকারের নৌকা তৈয়ারীর পরিকল্পনা, অন্যান্য পরিকল্পনার ন্যায়, অকর্ম্মণ্যতা ও চুরির জন্য বানচাল হয়।

নৌকার মাঝিমাল্লারা বেশীর ভাগই মুসলমান। যাহারা নৌকায় মাল ও যাত্রী বহন করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে তাহাদের মধ্যে মুসলমানের অনুপাতই বেশী। ১৯২১ সনে, হিন্দু, মুসলমান হিসাবে যাহারা এইরূপে জীবিকা অর্জ্জন করিত (Transport water) তাহাদের সংখ্যা পাওয়া যায়। হিন্দু ও মুসলমানের অনুপাত হইতেছে ৯৫ : ১৩২। দেশ বিভাগের পর অনেক মুসলমান, যাহারা পশ্চিমবঙ্গের নদীতে এইরূপে জীবিকা অর্জ্জন করিত, নৌকা লইয়া পাকিস্থানে পলাইয়া যায়। যদিও তাহাদের মধ্যে অনেকে পশ্চিমবঙ্গে ফিরিয়াছে পাকিস্থান সরকারের কড়াকড়িতে নৌকা ফেরত আনিতে পারে নাই। এইরূপে নৌকার সংখ্যা কিছুটা কমিয়াছে।

আজকাল নদীনালায়, খালবিলে তেমন মাছ পাওয়া যায় না। এ বৎসর ভাগীরথীতে তোপসে মাছ বা ইলিশ মাছ আসে নাই। শুধু এ বৎসর নহে গত দশ-বার বৎসর যাবৎ মাছের অভাব ঘন ঘন অনুভূত হইতেছে। জেলেদের নৌকার সংখ্যা দ্রুত কমিয়া যাইতেছে। জেলেরা অন্য ব্যবসা ধরিতেছে। শুধু ভাগীরথীতে নহে, অন্যান্য বহু স্থানে অবস্থা অনুরূপ, এজন্য জেলেদের দুঃখ-দুর্দ্দশা, অভাব-অভিযোগের কথা প্রায়ই সংবাদ পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে নৌকায় মালবহন করা সহজ ও সস্তা ছিল। অনেক গৃহস্থ মাসকাবারের বাজার গঞ্জ হইতে খরিদ করিয়া নৌকায় করিয়া গৃহে আনিতেন। ঘোলার ক্ষেত্রহরিবাবুর পিতা পানিহাটীতে বাজার করিয়া জেলে ডিঙ্গী করিয়া খড়দহের খাল দিয়া মালামাল আনিতেন। এক্ষণে খড়দহের খাল মজিয়া যাওয়ায় ও রেলের পুল নীচু হওয়ায় নৌকায় মাল লইয়া যাওয়া সম্ভব নহে। এইরূপ বহু স্থানের খাল, বিল মজিয়া যাওয়ায় ও রাস্তা পাকা হওয়ায় গরুর গাড়ী বা বেশী মাল হইলে মোটর-লরীতে আনিবার ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। এজন্য নৌকার সংখ্যা কমিতেছে বৈ বাড়িতেছে না।

পূর্ব্বে জমিদারগণ খাল, বিল পারাপারের জন্য খেয়া নৌকা রাখিতেন—ইহাতে তাঁহাদের সামান্য কিছু আয় হইত। এখন জমিদারগণের জমিদারী গিয়াছে ; আইনতঃ হয়ত খেয়া পারাপারের অধিকার সরকারের না বর্ত্তাইলেও তাঁহারা এই সব খেয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন ও নৌকা বেচিয়া দিয়াছেন। আমরা একটি খেয়ার কথা জানি, জমিদারের বার্ষিক আয় খেয়া হইতে হইত ৬৻৷৴ টাকা। মাল লইয়া পারাপার হইলে এক পয়সা করিয়া নিকটস্থ জমিদারের কাছারীতে দিতে হইত। এখন কাছারী

* জন্ম ও মৃত্যুহার হইতে এবং Sample census-এর যে সব তথ্যাদি জানা গিয়াছে তাহা হইতে।

উঠিয়া গিয়াছে ; বার্ষিক ৬৲।৭৲ টাকা আদায়ের জন্য লোক রাখা সুবিধার নহে। এজন্য তাঁহারা নৌকা বেচিয়া দিয়াছেন।

এইরূপ বহু কারণে আমাদের মনে হয় নৌকাদির সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা খুবই কমিয়া গিয়াছে। আমরা আন্দাজ করি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে নৌকাদির সংখ্যা ১৫,০০০ হাজারের বেশী হইবে না। আমাদের অনুমান ভুল হইতে পারে। এ বিষয়ে সঠিক তথ্যাদি যদি সরকার আগামী ১৯৬১ সনের আদমসুমারীর সময় সংগ্রহ করেন ত ভাল হয়।

নৌকা বা ডিঙ্গীর প্রকৃত সংখ্যা ও মালবহন ক্ষমতা নির্দ্ধারিত হইলেই হইল না। যাহাতে বন্যার সময় আর্ত্তত্রাণের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক ছোট ছোট নৌকা, ডিঙ্গী, সালতী প্রভৃতি পাওয়া যায় তাহারও ব্যবস্থা আগে থেকে করিতে হইবে। ছোট ছোট নৌকা, ডিঙ্গী, সালতী প্রভৃতির সংখ্যা বাড়ে তাহারও ব্যবস্থা আগে থেকে করিতে হইবে।

ইতিহাস পাঠে অবগত হই যে, প্রুসিয়ার রাজা ফ্রেডারিক দি গ্রেট যাহাতে যুদ্ধের সময় তাঁহার নিজ রাজ্য মধ্যে কামান টানিবার ও অশ্বারোহী সৈন্যদের ব্যবহারের বলশালী ভাল ঘোড়া যথেষ্ট সংখ্যায় সহজে পাওয়া যায় তাহার জন্য বড় বড় কৃষকদের বলশালী ভাল ঘোড়া কিনিবার জন্য টাকা দাদন দিতেন। কৃষকেরা লাঙল টানিবার জন্য ছোট ঘোড়ার পরিবর্ত্তে বড় ঘোড়া কিনিতে পারে ও রাখে, তাহার জন্ম উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমাদের দেশের মুঘল বাদসাহরা কোন বিদেশী ব্যবসায়ী ঘোড়া বেচিতে আসিলে আগে পছন্দমত ভাল ভাল ঘোড়া কিনিয়া বাকী ঘোড়া বাজারে বেচিবার হুকুম দিতেন।

যাহাতে লোকে ছোট ছোট নৌকা, ডিঙ্গী, সালতী রাখে তাহার জন্ম অল্পমূল্যে সরকার যদি কাঠ ও সরঞ্জামাদি সরবরাহ করেন ত ভাল হয়। পাকা তাল গাছ—সরকার ত এখন দেশের জমিদার ও প্রাইভেট ফরেষ্টের মালিক—আধা কড়িতে দেন বহু লোকে সালতী রাখিতে পারে। অজয়ের মত নদ, যেখানে গ্রীষ্মকালে লোকে পায়ে হাঁটিয়া পার হয় ও বর্ষায় নৌকায় বা ডিঙ্গীতে পার হয়, নৌকা, ডিঙ্গী প্রভৃতি বাঁধিবার জন্ম বা ডাঙ্গায় তুলিয়া রাখিবার জন্ম ঘাট বা জমির যদি ব্যবস্থা সরকার করেন, তাহা হইলে লোকের নৌকা, ডিঙ্গী প্রভৃতি রাখিবার আগ্রহ বাড়িতে পারে। নৌকা, ডিঙ্গী প্রভৃতি যাহাতে চুরি না যায় তাহার জন্ম নৌকা, ডিঙ্গী প্রভৃতিতে নম্বর করিয়া থানায় রেজিষ্ঠারী করিবার ব্যবস্থা করিলে লোকে নৌকা ডিঙ্গি প্রভৃতি রাখিতে উৎসাহ বোধ করিবে এবং চুরিও বন্ধ হইবে।

এই বিষয়ে কি কি করা উচিত আমাদের যাহা মনে হইল নিবেদন করিলাম, কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ। [সরকার] যদি বিভিন্ন স্থানীয় মাতব্বর প্রজাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন ত ভাল হয়। নামজাদা ব্যক্তিদের লইয়া বা পাকা সরকারী কর্ম্মচারীদের লইয়া কমিটি গঠন করিলে বিশেষ কাজ হইবে বলিয়া মনে হয় না।

আর আমাদের দেশের নৌকা, ডিঙ্গী, সালতী সহজেই, বিশেষ করিয়া স্রোতে, উল্টাইয়া যায়। নৌকার ভারকেন্দ্র সেণ্টার অব গ্রাভিটি) ও মেটা সেণ্টারের ব্যবধান বেশী হয়, যাহাতে নৌকা, ডিঙ্গী, সালতী সহজে উল্টাইয়া না যায় তজ্জন্য ইহাদের আকার-আকৃতি সম্বন্ধে একটি বিশেষজ্ঞদের কমিটি গঠন করিয়া তাঁহাদের মতামত ছবিসহ বাংলায় প্রকাশ করিলে ভাল হয়। যাহাতে নৌকাদিতে বেশী বোঝাই না হয় তাহার জন্ম জাহাজে যেমন প্লিমসোল লাইন আঁকা থাকে তেমনি দাগ প্রত্যেক নৌকাদিতে দিবার ব্যবস্থা থাকা উচিত বলিয়া মনে হয়।

কি করিলে মফঃস্বলে নৌকা, ডিঙ্গী প্রভৃতির সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কি করিলে আরোহীদের নিরাপত্তা বাড়ে এ সম্বন্ধে যদি দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা মন দেন ত ভাল হয়।

পুস্তক-পরিচয়

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নব জাগরণ—ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত এম-এসসি, এম-এ, ডি-ফিল। এ, মুখার্জ্জী এণ্ড কোং (প্রাইভেট লিমিটেড, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য সাত টাকা।

গবেষণামূলক এই আলোচ্য গ্রন্থটিতে উনিশ শতকের বাংলা দেশে যে জাগরণ আসিয়াছিল তাহারই একটি ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। এ জাগরণ ইতিহাসের স্মরণীয় অধ্যায়। জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে এই পরিবর্ত্তন, পরবর্ত্তী যুগের ক্ষেত্র-রচনায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। এক হিসাবে ইহাই বর্ত্তমান যুগের বনিয়াদ।

যে পাঁচটি অধ্যায়ে গ্রন্থখানিকে ভাগ করা হইয়াছে তাহার একটা যৌক্তিকতা ত আছেই, বরং তাহার ধারাবাহিকতাও লক্ষ্য করা যায়। এই পাঁচটি অধ্যায় হইতেছে—ধর্ম্মান্দোলন, সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ ও রাজনীতি। এই ধর্ম্মান্দোলন হইতেই জাগরণের সূত্রপাত। কারণ ধর্ম্মান্দোলনকেই কেন্দ্র করিয়া তাহার জাতীয় সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ—এমন কি রাজনীতিও গড়িয়া উঠিয়াছে।

এইরূপ গবেষণামূলক গ্রন্থ আমাদের দেশে খুব বেশী নাই। পূর্ব্বে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি ঐরূপ অনেক গ্রন্থও রচনা করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় অবশ্য অনেক কাজ করিতেছেন। সুখের বিষয়, এ বিষয়ে আজ অনেকেরই দৃষ্টি পড়িয়াছে। এই নব জাগরণের কথা যোগেশবাবুও পূর্ব্বে লিখিয়াছেন। তবে এই গ্রন্থের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র দিক লইয়া বর্ত্তমান গ্রন্থকার এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। গবেষণামূলক গ্রন্থের সংখ্যাধিক্যে তাহার জাত যায় না। বরং একই বিষয়ের একাধিক গ্রন্থরচনায় বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করিবার অবকাশ আছে। এইরূপ অবকাশের ফলেই সুশীলকুমার তাঁহার এই গ্রন্থখানিতে নূতন

আলোকপাত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি যে ধর্মান্দোলনের সূত্র ধরিয়াই আগাইয়া গিয়াছেন ইহা খুবই যুক্তিসঙ্গত। তাঁহার এই স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গিই গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্য। এই ধর্মান্দোলনের জন্যই যে একদা সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহার পারিপার্শ্বিকতা বিচার করিলেই সেটি বুঝা যায়। গ্রন্থকারও বলিয়াছেন, "ধর্মপ্রচার ও শিক্ষ বিস্তারের প্রেরণা প্রথমে গদ্যের ব্যাপক ব্যবহারের মূলে কাজ করিয়াছে।" সমাজসচেতনতাও এই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ। সমাজের কুসংস্কারগুলি দূর করিবার জন্যই একদা আইনের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। এই কার্যে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। এই রামমোহনই প্রথম জাতির সহিত রাজনীতির পরিচয় করাইয়া দেন। সে দিক দিয়া "রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষের ক্ষেত্রে রামমোহনই পথিকৃৎ।"

এইরূপ জাগরণ সর্বদেশে সর্বকালে হইয়াছে। যাঁহারা বাংলার নবজাগরণের সহিত ইউরোপীয় রেনেসাঁসের তুলনা করেন, তাঁহারা একটা বিষয়ে ভুল করিয়া থাকেন, বাংলার জাগরণের স্বরূপের সহিত ইউরোপের নব অভ্যুত্থানের কোথাও মিল নাই। সত্য বটে, এই জাগরণের মূলে ইউরোপীয় প্রভাব আছে এবং তাহারই মিলনের ফলে এইরূপ জাগরণের সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু ইহার প্রতি-প্রকৃতি, ইহার সমাজ-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং চিন্তাধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই বৈশিষ্ট্য ছিল বলিয়াই জাতি হিসাবে ইহার অস্তিত্ব এখনও বর্তমান।

এই বিষয়টিকে গ্রন্থকার মাত্র কয়েকটি কথায় অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"বাংলার নব জাগরণের মধ্যে যুক্তিবাদ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বাধীন বিচারবুদ্ধির বিকাশ থাকিলেও ভাবাদর্শের প্রাবল্য স্বতঃই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে না। এই কারণেই নবযুগের বহু মানবমুখী সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন এক ভাবলোকে উত্তীর্ণ হইয়া নবযুগের আশ্চর্যসুন্দর আদর্শ হইতে চ্যুত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে একটি সুফলও ফলিয়াছিল। এই ভাবাদর্শের প্রাবল্যের জন্যই হিউ-ম্যানিজম্ এই দেশে রূপে রসে জাতীয় চৈতন্য-মানসে একটি বিশেষ প্রেরণা হইয়া জাতিকে নবযুগের প্রাণরূপসমৃদ্ধ শিল্প-সাহিত্যের পদ্ম ফুটাইতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। ইউরোপের ন্যায় ভোগবাদ যান্ত্রিকতা ও প্রয়োজন-বিচারবুদ্ধির প্রাবল্যে হিউম্যানিজম এদেশে এক প্রাণ-হীন মর্মরে পরিণত হয় নাই।"

গ্রন্থকার এ সব বিষয়ে সচেতন থাকিয়াই বাঙালীর নবজাগরণের গৌরবময় ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। তাহার এ প্রয়াস সার্থক হইয়াছে। যাঁহারা তথ্যানুসন্ধানী গবেষক তাঁহাদের কাছে এ গ্রন্থ অমূল্য সম্পদ রূপে গৃহীত হইবে।

নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ—শ্রীরমেশচন্দ্র সেন। গ্রন্থভবন, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭। মূল্য আড়াই টাকা।

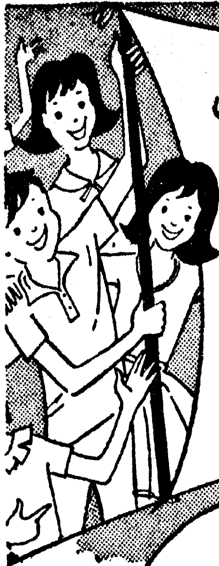
আলোচ্য গ্রন্থখানিকে উপন্যাস না বলিয়া বড় গল্প বলিলেই ভাল হয়। গল্প হিসাবে ইহা একটি সার্থক রচনা। প্রশান্ত এবং ইরা—পরস্পর ভালবাসিয়াও বিবাহ করিতে পারিল না। বাধা আসিল পিতার দিক হইতে। পিতা যদুপতি ধনগর্বী, প্রশান্ত জ্ঞানে গুণে সমৃদ্ধ হইলেও, দরিদ্র। সুতরাং ধনী ইস্পাত-ব্যবসায়ী যদুপতির একমাত্র কন্যা ইরা হইল প্রশান্তর পক্ষে নিষিদ্ধ ফল। ইরার বিবাহ হইল এক বিখ্যাত ব্যবসায়ীর অংশীদার দ্বিজদাস দত্তের সঙ্গে। ব্যবহারিক জীবনে ইরাকে দেখিলে অসুখী মনে হইবে না। স্বামীকে সে ভালও বাসিয়াছিল। তথাপি মনের কোণে কোথায় যেন ক্ষত ছিল। এই ক্ষতই তাহাকে দিগ্বিদিকে চালাইয়া লইয়া ফিরিয়াছে। সে নিজে গাড়ী চালাইত। ঐ গাড়ীর স্পীডের মতই সে নিজেকে বে-পরোয়া করিয়া তুলিল। রূপ ছিল তাহার অসাধারণ। এই রূপকে তাহার স্বামী ব্যবসা-ক্ষেত্রে কাজে লাগাইল। দ্বিজদাসের 'কুইন' ধনী-মহলে 'মক্ষীরাণী' হইয়া উঠিল। কিন্তু এই কেনা-বেচার হাটে ইরাও একদিন হাঁপাইয়া ওঠে। সে চায় এই সব কোলাহল হইতে দূরে সরিয়া যাইতে। সে চায় নিঃসঙ্গ একক জীবন।

স্বামীকে সুখী করিতে সে অনেক চেষ্টাই করিয়াছে। ভালও বাসিয়াছে, তবু যেন সম্পূর্ণ করিয়া নিজেকে বিলাইয়া দিতে পারে নাই। সে নিজেই একস্থানে বলিয়াছে—"এমন স্বামী তার, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, কর্মনৈপুণ্যে কোন দিকেই একটুও খুঁত নেই তার। কত ভালবাসে তাকে, বিশ্বাস করে, শ্রদ্ধা করে। কিন্তু সে কি এগুলি অপাত্রে দান করে নি? ইরা ভাবে সে ত এর যোগ্য নয়, সে ত তাকে ভালবাসে না, চেষ্টা করে ভালবাসতে, আদর করতে, যত্ন করতে। করেও। কিন্তু সেই আদর যত্নের মধ্যে কোথাও যেন ফাঁক থেকে যায়। ভালবাসার মধ্যে যে তীব্র ব্যাকুলতা থাকে, দ্বিজকে সেই ব্যাকুলতা দিয়ে কখনও পেতে চায় নি। নিজেকে যেরূপভাবে বিলিয়ে দেওয়ায় তৃপ্তি আছে, পরিপূর্ণ আনন্দ আছে, স্বামীর কাছে সে ভাবে নিজেকে বিলিয়ে দেয় নি, চেষ্টা করেও দিতে পারে নি। এই তার নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ, এইজন্য আত্মগ্লানি বোধ করে। এক এক সময় কেমন যেন অস্থির হয়ে যায়। ঝড় বইতে থাকে বুকের মধ্যে। সে তখন শান্তি খুঁজে বেড়ায় গতির মধ্যে..."

এই গতি দিয়াই সে তাহার জীবনের ছেদ টানিয়াছে। ফুল-স্পীডে গাড়ী চালাইয়া দিয়া সে যেন নিজেকে ছাড়িয়া দিল।

প্রবীণ লেখকের হাতে পড়িয়া পুরাতন বস্তুও নূতন হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক সভ্যতার বিষবাষ্পে যে সমাজ-জীবন আমাদের কলুষিত, লেখক সুকৌশলে সে দিকে কটাক্ষপাত করিয়াছেন। সবচেয়ে বড় কথা, বইখানি পড়িতে কোথাও বাধে না। সহজ প্রকাশভঙ্গি, সুমধুর বাক্যবিন্যাস। বইখানির নামকরণ খুব ভাল হইয়াছে। তবে ছাপার ভুল বড় বেশী চোখে পড়িল। আশা করি পরবর্তী সংস্করণে ইহা সংশোধিত হইবে।

শ্রীগৌতম সেন



তাড়াতাড়ি করো! তাড়াতাড়ি করো!

সানলাইট রঙ দেওয়ার প্রতিযোগিতা

২৫,০০০ টাকার চমৎকার পুরস্কার!

২টী প্রথম পুরস্কার

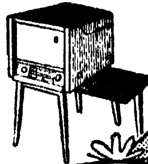




৪,০০০ টাকার
ভেতর সারা ভারত
ভ্রমন বা নগদ
৪,০০০ টাকা

চারটী ২য় পুরস্কার

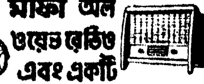
এইচ.এম.ভি. রেডিওগ্রাম



৬ টী ৩য় পুরস্কার

মার্ফী অল ওয়েভ রেডিও এবং একটি করে হিন্দ র‍্যাম্বলার সাইকেল





২,০০০ অন্য পুরস্কার ছবি আঁকার রঙের বাক্স বা ডল্ পুতুল





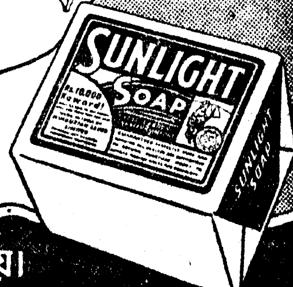
অভিভাবকরাঃ আপনাদের ছেলেমেয়েরা এখনও যোগদান করেছে কি? মনে রাখবেন সানলাইটের প্রতিটী মোড়ক পাঠিয়ে তারা সানলাইট রঙ দেওয়ার প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে।

এই প্রতিযোগিতা দুটী বিভাগে ভাগ করা হয়েছে (১) ১০ বছর বয়সের কম (২) ১০ থেকে ১৫ বছর পর্য্যন্ত। এই দুটী বিভাগের ছবিগুলি আলাদা ভাবে বিচার করা হবে এবং প্রত্যেক বিভাগে ১ম, ২য় ও ৩য় ও অন্য পুরস্কার যারা পাবে তাদের একই রকম পুরস্কার দেওয়া হবে।

তাড়াতাড়ি করো

শেষ তারিখঃ ১৬ই নভেম্বর ১৯৫৯।

বিনামূল্যে আপনার সানলাইট বিক্রেতার কাছ থেকে প্রবেশপত্র নিয়ে আসুন। প্রতিটী প্রবেশপত্রে একটা সুন্দর ছবি আছে তাতে আপনার ছেলেমেয়েদের রঙ লাগাতে হবে! যে রকম রঙ তাদের ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারবে।



অল্প একটু সানলাইটেই অনেক কাপড় কাচা যায়।

হিন্দুস্থান লিভার লিঃ, কর্ত্তৃক প্রস্তুত। S/9-X58 BG

নন্দনতত্ত্ব—ডক্টর সুধীরকুমার নন্দী। প্রকাশমন্দির, ৩নং কলেজ রো, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে তেরটি নন্দনতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কেন্দ্রীয় কৃষ্টি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরের ভূমিকাই পুস্তকের মূল্যবান সংযোজন। গ্রন্থকার বহুদিন হইতে নানান দেশী ও বিদেশী পত্র-পত্রিকায় নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে প্রবন্ধাদি লিখিতেছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থ এই সব প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর একটি সুষ্ঠু সঙ্কলন। কয়েকটি প্রবন্ধে গ্রন্থকার নন্দনতত্ত্বের মৌল ধারণাগুলির বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই দিক হইতে বক্রোক্তি, আর্টের মর্ম্মকথা, আর্টে বাস্তবতা, আর্টে সার্ব্বিকতা, শিল্পে অধিকার-ভেদ, শিল্পীর বৈরাগ্য এবং শিল্পে প্রয়োজনবাদ সবিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও তাঁহার রচনাশৈলীকে সাতিশয় সাধুবাদ দিতে হয়। একদিকে দার্শনিকের চিন্তা-দার্ঢ্য এবং অন্যদিকে সাহিত্যিকের সরস বাচনভঙ্গী, এতদুভয়েই যে গ্রন্থকারের সমান অধিকার, ইহা গ্রন্থকারের রচনায় প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। চলতি সমালোচনা গ্রন্থের সহজ ভাবালুতা আলোচ্য গ্রন্থের কোথাও চোখে পড়িল না। যে বিশ্লেষণী পদ্ধতির সহায়তায় গ্রন্থকার উপরোক্ত মৌল নন্দনতত্ত্বের ধারণাগুলির ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাই তিনি প্রয়োগ করিয়াছেন নাট্যশাস্ত্রকার ভরত, দার্শনিক হেগেল, রোমা রোঁলা, রবীন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথের নন্দনতাত্ত্বিক ধারণার সার্থক আলোচনায়। গ্রন্থখানি আধুনিক যুগে বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট বিভাগের আবার নূতন করিয়া দ্বারোদ্ঘাটন করিল, এ কথা বলিলে সত্যের অপমান করা হইবে না। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস, গল্প, ভ্রমণকাহিনী, রম্য রচনা, কবিতা ও গানের যে অসদ্ভাব নাই, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। তবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনার সূত্রপাত হইলেও বাংলা সাহিত্যে ইহা বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে নাই। গ্রন্থকারের প্রচেষ্টা সেই দৃষ্টিকোণ হইতে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। দার্শনিক ক্রোচে একদিন নন্দনতত্ত্বকে দর্শনের উপর নির্ভরশীল পরভুজের অসম্মান হইতে মুক্তি দিয়া তাহাকে স্বস্থ এবং আত্মনির্ভর করিয়া দিয়াছিলেন। সেই দিন হইতে নন্দনতত্ত্বের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকৃত হইয়াছিল। এ দেশেও নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনায় স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত হইবার সময় আসিয়াছে। যাঁহারা এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করেন তাঁহাদের বিরাট দায়িত্ব পালনের সময় আসিয়াছে। গভীর নিষ্ঠা এবং সুনিবিড় একাগ্রতা লইয়া নন্দনতত্ত্বকে স্বমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার কাজে ব্রতী হইতে হইবে। ডক্টর নন্দী এই পুরোগামীদের একজন। তাই আমরা তাঁহার গ্রন্থকে অভিনন্দিত করিতেছি এবং ইহার বহুল প্রচার কামনা করিতেছি।

শ্রীগৌতম সেন

যান্ত্রিক—অঞ্জনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতীয় সাহিত্য পরিষদ। ১৮০-এ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য দু' টাকা।

ভূমিকায় লেখক বলেছেন : যাকে জেনেছিলাম ছেলেবেলায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহানগরী বলে—ঠিক যেমন ভাবে তাকে দেখেছি—দেখেছি বিভিন্ন ঋতুতে, বিভিন্ন পরিবেষ্টিতে আর চিনেছি ও বুঝেছি অন্তর দিয়ে—ঠিক তেমনি ভাবে তার আলেখ্য রচনার চেষ্টা করেছি এই লেখাগুলোর মাধ্যমে। শশব্যস্ত সাংবাদিক আমি। খেইহারা কাজের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে যখন একটু সময়ের মুখ দেখি, তখন যা হউক কিছু লিখি।

সুতরাং 'শহরের জুলাই', 'পনেরোই আগষ্ট, 'কাফি হাউস', 'রাত্রির লেক', 'ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাস' 'বুক ষ্টল,' ও 'শহরের সিনেমা' এই কয়টি লেখার মাধ্যমে শহর কলকাতাকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন লেখক। এগুলি গল্প নয়, প্রবন্ধ বা তথাকথিত রম্যরচনাও নয়—এলোমেলো চিন্তার সমষ্টি মাত্র। বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনে লেখকের কৃতিত্ব অবশ্যই আছে, কিন্তু বাণী সাধনার আসনে তিনি স্থির হয়ে বসতে পারেন নি। ফলে—শহরের চিত্রটা তাঁহার মনে স্পষ্ট হলেও পাঠক-চিত্তকে কৌতুহলী করতে পারবে কি না সন্দেহ!

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

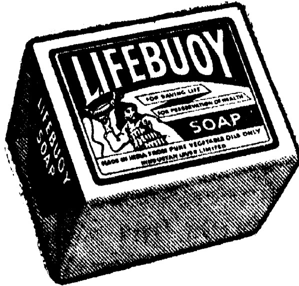
শিক্ষণ সঙ্কিতা—(প্রথম খণ্ড) অধ্যাপক শ্রীজগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২৪৩। মূল্য চার টাকা।

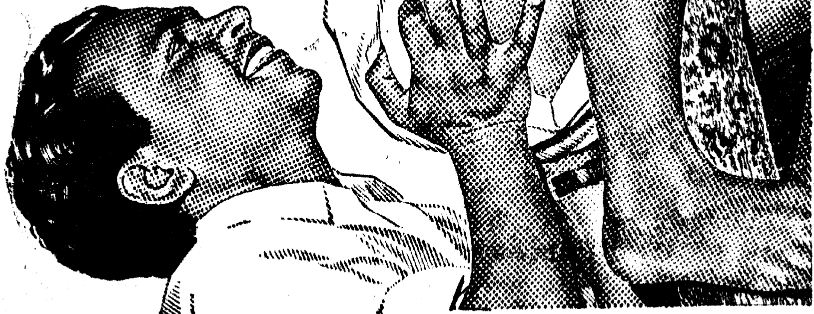
বুনিয়াদী শিক্ষাকে কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগ জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। অদূরভবিষ্যতে প্রথম শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত এই শিক্ষা ছেলেমেয়েদের বাধ্যতামূলকভাবে দেওয়া হইবে, ইহাও স্থির হইয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান প্রাথমিক এবং নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করিতে হইবে। এই বিরাট পরিবর্ত্তনের জন্য বহু শিক্ষকের প্রয়োজন। এই সকল শিক্ষককে আবার শিক্ষণ বিষয়ে পারদর্শী হইতে হইবে। এজন্য শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়ের প্রয়োজন দেশের সর্ব্বত্রই অনুভূত হইতেছে। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি শিক্ষণ-শিক্ষাব্রতীগণের জন্য বিশেষভাবে লিখিত হইয়াছে এবং ইহার ভবিষ্যৎ খণ্ডগুলিতে বুনিয়াদী শিক্ষার বিষয় আরও বিশদ ও ব্যাপকভাবে আলোচিত হইবে গ্রন্থকার এরূপ আভাস দিয়াছেন। গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে যথা: (১) বুনিয়াদী শিক্ষার ইতিহাস, (২) বুনিয়াদী শিক্ষার কথা, (৩) বুনিয়াদী শিক্ষা-সংগঠন। প্রথম অধ্যায়ে—ভাব সংগঠন ও প্রস্তুতিপর্ব্ব (১৯০৪-৩৭) দক্ষিণ আফ্রিকায় ও ভারতে পরীক্ষামূলক কাজের বিবরণ ও প্রয়োগপর্ব্ব (১৯৩৭ হইতে) ও বুনিয়াদী শিক্ষার

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সবসময় লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করেন

খেলাধুলোই বলুন বা কাজকর্ম্মই বলুন আমরা কখনই ধুলোময়লার থেকে নিরাপদ নয়। আর ময়লা বহন করে রোগের বীজানু যা সবসময় আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতি-কর। লাইফবয় সাবান এই বীজানুগুলি ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।

প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন—এটি আপনাকে এত ঝরঝরে করে তোলে।





হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, কর্তৃক প্রস্তুত।

L/P. 2-X52 BG

ক্রমপরিণতি বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ১৯৩৭ সনের অক্টোবর মাসে পুণায় প্রথম বুনিয়াদী শিক্ষা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ও হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কয়েকটি প্রদেশে বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভের পর কংগ্রেসী মন্ত্রীগণ পদত্যাগ করিলে এবং যুদ্ধকালীন নানা বিপর্য্যয়ের জন্য বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতির ব্যাহত হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, শিশুর সামাজিক চেতনার বিকাশ, শিশু-মনোবিজ্ঞান, যন্ত্রযুগে বুনিয়াদী শিক্ষা আলোচিত হইয়াছে। এই অধ্যায়টি যে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন। তৃতীয় অধ্যায়টি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের জন্য লিখিত। এই সুলিখিত অধ্যায়টি শিক্ষক-শিক্ষণ শিক্ষার্থীগণের বিশেষ কাজে লাগিবে সন্দেহ নাই।

গ্রন্থখানি শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়ের জন্য লিখিত হইলেও ইহার প্রথম দুইটি অধ্যায় যে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি ও অভিভাবকের পাঠ করা উচিত। বুনিয়াদী শিক্ষা মহাত্মাজীর জীবনের অমর-কীর্ত্তি। ভবিষ্যৎ ভারত এই শিক্ষার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিলে দেশের প্রভূত মঙ্গল হইবে—স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার্থী এবং শিশুর মনের ও বুদ্ধির বিকাশ হইবে।

এরূপ সদ্‌গ্রন্থের বিপুল প্রচার কামনা করি।

চন্দ্রগ্রহ—শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। লেখক কর্ত্তৃক ১০, শ্রীকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা-৪ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২১৭। মূল্য চার টাকা।

গ্রন্থকার বলেন, "ভারতে যে যথার্থ বিজ্ঞানের উপাসনা হইয়াছিল তাহা এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু।" লেখক নিজে আধুনিক শিক্ষিত হইলেও ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রীয় গ্রন্থে উল্লিখিত তথ্যাদিতেই একমাত্র বিশ্বাসী। ভারতের প্রাচীন বিদ্যার ও জ্ঞানের আলোকে তিনি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান যাচাই করিয়া তবেই উহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ ও গ্রহণ করেন। পুস্তকের অধ্যায়গুলি এরূপ—পদার্থ বিজ্ঞান, পদার্থ গুণ ও কর্ম্ম একাধারে, চন্দ্রগ্রহ, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, তেজঃবায়ু, সবিতা, সুমেরু দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ন, সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ, চন্দ্রের ষোড়শ কলা, সুমেরু হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি, আকাশ এবং ভারতবর্ষ।

লেখক একস্থানে বলেন, "বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ যন্ত্রের সাহায্যে মূল আদিত্যকে দেখিতেছেন, গ্রহ সকল দেখিতেছেন, কেহ বা মঙ্গল-গ্রহে জীব আছে—উহাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছেন। কিন্তু কি করিয়া দেখিতেছেন আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। কারণ উহাদের যন্ত্রের গুণ আমাদের বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ। গ্রহ সম্বন্ধে যাহাদের কোন জ্ঞান নাই তাহাদের মুখেই এই সকল উক্তি সম্ভব।" আর উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নাই। গ্রন্থকারের, সকল না হইলেও বহু মত এরূপ। অবশ্য পুস্তকখানা পূর্ব্বেকার লেখা। সোভিয়েটের ১ম, ২য় ও ৩য় লুনিকের চন্দ্রাবর্ত্তনের পরে তিনি কি বলিবেন জানি না।

বর্ত্তমানকালে এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার হইবে ইহা অবশ্য আশা করা যায় না তবে লেখকের মতে বিশ্বাসী লোক বা পাঠক একেবারে নাই তাহাও বলা চলে না। কারণ ভারতবর্ষ সকল রকম মতের দেশ এবং সকল রকম বিশ্বাসীর মিলন এবং সংগ্রাম-ক্ষেত্র।

আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীমণি বাগচি প্রণীত। প্রকাশক: জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। পৃষ্ঠা ১২৩। মূল্য দুই টাকা।

বর্ত্তমান গ্রন্থ শ্রীমতী মেরী লুইস বার্ক লিখিত 'Swami Vivekananda in America: New Discoveries হইতে গৃহীত উপকরণে রচিত। আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম দুই বৎসরের কার্য্যাবলী তাঁহার কর্ম্মজীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এতদিন এই দুই বৎসরের ইতিহাস প্রায় অপরিজ্ঞাত ছিল। শ্রীমতী বার্কের পুস্তক বিশ্ববাসীর নিকট যে সকল তথ্য উপস্থাপিত করিয়াছে তাহা হইতে জানা যায় স্বামীজী কি না অসাধ্য সাধন করিয়াছেন, কত বিরুদ্ধশক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রকৃত পরিচয় আমেরিকার নরনারীর নিকট তুলিয়া ধরিয়াছিলেন।

স্বীকার করিতেই হইবে যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্ব্বাদে স্বামীজী সেই দূর দেশে নিজে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ব্যক্তি হইয়াও চরিত্রবলে ও মাধুর্য্যে বহু নরনারীর স্নেহ, ভালবাসা ও ভক্তি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই দূর দেশেও সর্ব্বদাই তাঁহার মনে জাগ্রত থাকিত শ্রীরামকৃষ্ণের ভবিষ্যৎবাণী, ভারতের ও ভারতবাসীর চরম দুর্দ্দশা ও দারিদ্র্যের কথা। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। ঐদিন বয়ঃকনিষ্ঠ পরিচয়হীন ভিক্ষুক সন্ন্যাসী গৈরিক আলখাল্লা, গৈরিক পাগড়ি-পরিহিত স্বামী বিবেকানন্দ সিকাগোর বিশ্বধর্ম্ম মহাসভায় ভারতের মহান্ সনাতন বাণীর সহিত বিশ্বধর্ম্ম প্রতিনিধিমণ্ডলীকে পরিচিত করাইলেন। মহাসভার অধিবেশন শেষ হইলে আমেরিকার নানা শহরে বেদান্ত প্রচারে আত্মনিয়োগ করিলেন। ১৮৯৫ সনের আগষ্ট মাসে তিনি একবার ইংলণ্ডে গেলেন কিন্তু আবার ডিসেম্বর মাসেই মার্কিনে ফিরিলেন। দ্বিতীয় বার ভ্রমণের শ্রেষ্ঠ ঘটনা হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বামীজীর নিমন্ত্রণ। ১৮৯৬-এর ১৫ই এপ্রিল ইউরোপ হইয়া ভারতে ফিরিবার পথে তিনি আবার মার্কিন ত্যাগ করিলেন। এইভাবে দুই বার স্বামীজী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোট দুই বৎসর সাড়ে চারি মাস কাল থাকিয়া বেদান্ত প্রচার করিয়াছিলেন। বেদান্ত প্রচারের বিনিময়ে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার পাইয়াছিলেন সেবাধর্ম্মের নূতন আদর্শ।

গ্রন্থের ছাপা, কাগজ, বাঁধাই উৎকৃষ্ট। বাঙালী মাত্রেই বিশেষতঃ তরুণেরা এই গ্রন্থপাঠে উপকৃত ও অনুপ্রাণিত হইবেন।

ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

উত্তরস্যাং দিশি—স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ প্রণীত। প্রকাশক: জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-১৩। পৃষ্ঠা ৯২। মূল্য তিন টাকা।

কেদার-বদ্রী ভ্রমণকাহিনী। লেখক ১৩ই বৈশাখ ইং ২৬শে এপ্রিল ১৯৪০ বাসযোগে অন্যান্য সঙ্গীর সহিত হরিদ্বার হইতে যাত্রা আরম্ভ করেন। তখন বহুদূর পর্য্যন্ত বাস চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। আজ বাসের রাস্তা আরও প্রশস্ত হইয়াছে। স্বামীজীর বদ্রীনাথ পৌঁছিতে দশ দিন হাঁটিতে হইয়াছিল, সেখান হইতে কেদার পথে আবার দশ দিনের হাঁটা-পথে কেদারনাথ দর্শন হয়। সহজ, সরল এবং অনাড়ম্বর ভাষায় বইখানি লেখা। শেষ না করিয়া ওঠা যায় না। পড়িতে পড়িতে মনে হয় সাধুসঙ্গে দুর্গম তীর্থের মহা আকর্ষণে পথ চলিয়াছি। বইখানি পড়িলে পাঠের আনন্দ ব্যতীত সাধুসঙ্গ ও তীর্থ দর্শনের ফল পাওয়া যায় এবং তদ্ব্যতীত পথ সম্বন্ধে নানা তথ্য জানা যায়। নির্ভুল লাইনোতে ছাপা। বাঁধাই চমৎকার। ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

ভাঙন দিনের কথামালা (প্রথম পর্ব্ব)

সৈনিকের প্রাণবীণা (দ্বিতীয় পর্ব্ব)—শ্রীচুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। গাঙ্গুলী গ্রন্থাগার, ৬ বেনিয়াপুকুর লেন, কলিকাতা-১৪। মূল্য প্রত্যেকখানি '৫০ নয়াপয়সা।

প্রথমখানিতে আছে চিন্তাশীল কয়েকজন অখ্যাত বা প্রায়-অখ্যাত হিন্দু মুসলমানের মনে ১৯৪৭-এর বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া—বেদনা ও বিক্ষোভের প্রকাশ। দ্বিতীয়খানিতে মানভূমের গণ-আন্দোলন, ঢাকার বাংলা ভাষা আন্দোলন প্রভৃতি উপলক্ষ্যে রচিত কয়েকটি কবিতা। লেখকের বলিষ্ঠ ও উদার মনোভাব প্রশংসনীয়।

শিশিরবিন্দু—শ্রীসমীরকুমার গুপ্ত। পরিবেশক সাধারণ পাবলিশার্স, ৬ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য ১৲।

রৌদ্রোজ্জ্বল শিশিরবিন্দুর মত সুন্দর কবিতার মালা। ভাবের গভীরতা এবং রচনার সংযত পারিপাট্য মনোরম।

"কথা দাও কবিতা।
অন্তরের সমস্ত আবরণ উন্মোচন করে
আমার সঙ্গে নিবিড় ভাবে কথা কও।"

তাঁর কবিতা 'নিবিড় ভাবেই' কথা বলতে চেয়েছে।

ঝরা পাতা—শ্রীগৌরদাস। প্রাপ্তিস্থান—হাউস অব বুকস, ১২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য ১টা, ৫০ ন. প.।

প্রকৃতির আলোছায়া আর জীবনের হাসি-অশ্রু—দুই-ই রূপ নিয়েছে কবিতাগুলিতে। মোটের উপর উপভোগ্য। কিন্তু কবির রুচির প্রশংসা করতে পারি না—আষ্টে-পৃষ্ঠে-মলাটে প্রশংসা ও প্রচারপত্র আঁটবার প্রবল আগ্রহ দেখে। আরও মনে কুণ্ঠাবোধ করি—যখন ভিতরে পড়ি: "ধীরে চুমু দাও, কোন মেগো সাড়া পাবে", আর মলাটে নামের সঙ্গে পরিচয়-লেখা দেখি—প্রধান শিক্ষক, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

রক্তরেণু—শ্রীরমেশ মজুমদার। অরুণিমা প্রকাশনী। ২ জগবন্ধু মোদক রোড, কলিকাতা—৫। মূল্য ২৲।

প্রচ্ছদে পড়লাম, "কাব্য-জগতে লেখক আজ নতুন নয়। কয়েক বৎসর ধরে তিনি কঠিন ভাবে পদচারণা সুরু করেছেন যা বিদগ্ধ পাঠকবর্গের কাছে অবিদিত নয়।" ভাবলাম, পরিচয়পত্রের ভাষা যতই অদ্ভুত হউক কবিতার ভাষা ত্রুটিহীন হবে। কিন্তু হতাশ হতে হ'ল।

প্রথম কবিতা 'আকাশের চাঁদ':

"মনে পড়ে তোমা আজিকে হঠাৎ প্রিয়ে
ভাসে মনে সেই নিবিড় রজনীর মাঝে
ছলছল দুকুল (?) প্লাবিত গঙ্গার বুকে
ভেসেছিনু মোরা তরণীতে"

—জানি না, কোন্ ছন্দে লেখা।

তার পর 'চঞ্চলা'

"মনে হয় তুমি আজো চলিছ চঞ্চল চরণে
খিন খিন খিন ঐ ছন্দ-চলন-ধরণে'

—ভাবে ও ভাষায় অনবদ্য, 'বিদগ্ধ পাঠক'মাত্রেই অনুভব করবেন।

'উজ্জ্বলা'য় তাঁর চিন্তা:

"আমি হাঁটুজলে দাঁড়ায়েই ভাবি
কি দেখলাম ওরে,
সেই কথাটি কেমন করে বুঝাইব গো তোরে"

—বোঝাতে পারেন নি, নিঃসন্দেহ।

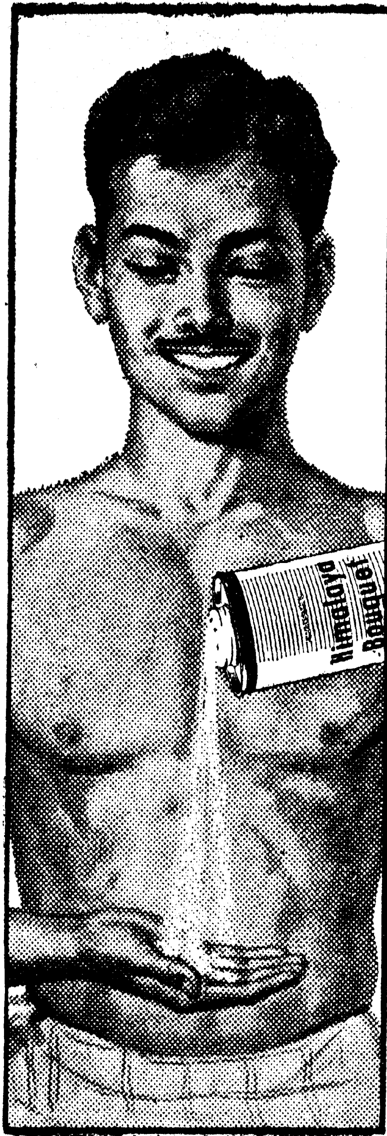
তবে, আমরা বুঝি বা না বুঝি, কবি অঙ্গীকার করেছেন:

"পাড়ি দিতে যদি পড়ে যাই ঢলি'
তোমার করুণা জিনিতে কখনও গলিব না।"

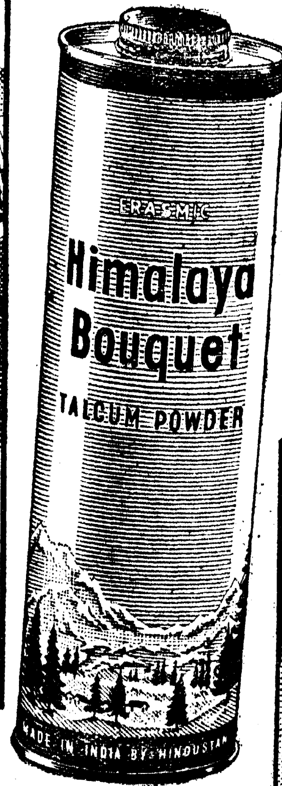
—আহা। 'পাড়ি দিতে ঢলে পড়ে যাবেন?' এ দুর্ভাগ্য তাঁর শত্রুর ঘটুক!

উৎপল—সংসার-জীবনে শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ-বিরচিত। প্রকাশক শ্রী অরুণপ্রকাশ সাহা। ৪৭এ বলরাম মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৫। মূল্য ২৲। ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তক। সদ্ভাবপূর্ণ সুখপাঠ্য কয়েকটি চতুর্দ্দশপদী কবিতা। দুঃখের বিষয় ছাপার অনেক ভুল রয়ে গেছে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়



Himalaya
Bouquet



ERASMIC
Himalaya
Bouquet
TALCUM POWDER
MADE IN INDIA BY HINDUSTAN



দেশ-বিদেশের কথা

সংস্কৃত ও দক্ষিণ ভারত

মাদ্রাজ প্রদেশ সংস্কৃত সাহিত্যের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। সেজন্য সংস্কৃত সাহিত্যের জন্য দত্তপ্রবণ ডাঃ চৌধুরী দম্পতীর মাদ্রাজ গমন অতি স্বাভাবিক। তবু শুনেছিলাম যে মাদ্রাজের কেউ কেউ বাঙালীদের সংস্কৃত উচ্চারণ বিষয়ে সন্দিগ্ধচিত্ত ছিলেন। কিন্তু প্রাচ্যবাণী মন্দিরের সংস্কৃত অভিনেতৃগণ ১৪ই অক্টোবর তারিখে মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ ও সুবিশাল রসিক-রঞ্জনী হলে মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠের তত্ত্বাবধানে ডক্টর চৌধুরী রচিত "মহাপ্রভু-হরিদাসম্" নামক সংস্কৃত অভিনয় করে বাঙালীর উচ্চারণ যে কত সুললিত হতে পারে, তা সংস্থানিক বিদগ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মুখে প্রমাণিত করেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন মাদ্রাজের রাজ্যপাল পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীবিষ্ণুরাম মেধী মহাশয়; মাদ্রাজ শহরের বহুমান্য শ্রীপতঞ্জলি শাস্ত্রী প্রমুখ মাদ্রাজের সমস্ত জ্ঞানী-গুণীগণও সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভান্তে মাদ্রাজের রাজ্যপাল, শ্রীযুক্ত পতঞ্জলি শাস্ত্রী এবং রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী আদিদেবানন্দ প্রমুখ অনেকেই অভিনয়ের উচ্চ প্রশংসা করেন।

মাদ্রাজে দ্বিতীয় সংস্কৃত অভিনয় হয় রামকৃষ্ণ মিশনের সারদা-বিদ্যাপীঠে এবং তৃতীয় অভিনয় হয় মাদ্রাজের রায় পেটায় ওয়াই-এম-আই-এ হলে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ রাঘবনের "মাদ্রাজ সংস্কৃত রঙ্গ" নামক সংস্থানের তত্ত্বাবধানে। উভয় স্থানেই ডক্টর যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী কর্তৃক শ্রীসারদামণি দেবীর পুণ্য জীবনী অবলম্বনে বিরচিত সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটক "শক্তি সারদম্" অভিনীত হয়। এই নাটকটি পূর্ব্বে কলিকাতায় ও ভারতবর্ষের বহু স্থানে প্রশংসা অর্জ্জন করেছে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভাবধারা পরিপ্লাবিত মাদ্রাজ রাজ্যে পূর্ব্বে এরূপ সংস্কৃত নাটকাভিনয় আর হয় নি। এটি উভয় স্থানেই সকলকে বিশেষ মুগ্ধ করে। "মাদ্রাজ সংস্কৃত রঙ্গে"র পক্ষ থেকে প্রাচ্যবাণী মন্দিরের সদস্য-সদস্যাগণকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। এই সভায় মাদ্রাজের বিশিষ্ট পণ্ডিত ও অন্যান্য সংস্কৃতবিদ্‌গণ, বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, অধ্যাপিকা প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। প্রারম্ভে ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী সংস্কৃতে এবং শেষে ডাঃ রমা চৌধুরী ইংরেজীতে সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সভান্তে ডাঃ রাঘবন, বেঙ্কটরমণ আয়ার প্রভৃতি সুধীমণ্ডলী অভিনয়ের উচ্চ প্রশংসা করেন।

পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে একই ভাবে প্রাচ্য-বাণীর দল সকলের চিত্ত জয় করেছেন। এখানেও পূর্ব্বে কোনও দিন সংস্কৃত অভিনয় হয় নি। কিন্তু "শক্তি-সারদম্", "ভারত-হৃদয়ারবিন্দম্" এবং "মহাপ্রভু-হরিদাসম্"—এই তিনটি নাটকের পর পর তিন দিন অনুষ্ঠানেও সুবিশাল প্রেক্ষাগৃহে ও বাইরের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে

অধ্যক্ষ শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী ও অভিনেতৃবর্গ

প্রায় দ্বিসহস্র দর্শক আকুল আগ্রহে নাট্যরস উপভোগ করেছেন নিস্তব্ধ বিস্ময়ে। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারায় বিশেষ অনুরাগী। সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদামণি দেবীর পুণ্য জীবনালেখ্য আশ্রমবাসীগণ শ্রদ্ধাবনতচিত্তে দর্শন করে বিমুগ্ধ হন। দ্বিতীয় দিনের শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কিত নাটকটি সম্বন্ধে স্বভাবতঃ তাঁদের আগ্রহ ছিল সমধিক। কারণ অতি নিগূঢ় তাঁর পুণ্য জীবন। তাঁর পূর্ণ জীবনীও নেই। পূর্ব্বে কোনও দিন তাঁর সম্বন্ধে কোনও নাটক রচিত বা অভিনীত হয় নি। সেজন্য সেদিনের অভিনয় সকলের হৃদয় গভীরভাবে স্পর্শ করে। শ্রীঅরবিন্দের জীবনের কয়েকটি প্রধান ঘটনা অবলম্বনে এই নাটকটি অতি সুললিত ভাষায় বিরচিত হয়েছে। যেমন, বারীন্দ্রকে অরবিন্দের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দান, সুরাট কংগ্রেস সেশন, দেশবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক মানিকতলা বোমা-ষড়যন্ত্র মামলার সওয়াল, নিবেদিতার সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের সাক্ষাৎ এবং পরিশেষে স্বাধীনতা দিবসে শ্রীশ্রীমায়ের ভারতীয় ধর্ম-পতাকা উত্তোলন প্রভৃতি দৃশ্য সকলকে বিশেষ অভিভূত করে।

শেষ দিনে অভিনয়ান্তে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্ব্বাদপূত আশ্রমে প্রস্তুত সাড়ী, বস্ত্র ও অন্যান্য বহু দ্রব্য অভিনেত্রী ও অভিনেতাদের প্রত্যেককে উপহার দেন এবং অভিনয়ের উচ্চ প্রসংশা করেন। তৃতীয় দিনে প্রাচ্যবাণী মন্দিরের সর্ব্বজনসমাদৃত ভক্তিরসঘন সংস্কৃত সঙ্গীতমুখর নাটক "মহাপ্রভু-হরিদাসম্" বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনীত হয়। অভিনয়ের শেষে বিদূষী শ্রেষ্ঠা অধ্যক্ষা ডাঃ রমা চৌধুরী তাঁর স্বভাবসুলভ সুললিত ইংরাজী ভাষায় মাতৃলীলা বর্ণনা করে সকলকে বিশেষ মুগ্ধ করেন।

অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন নাম ভূমিকায় অধ্যাপক শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় এবং অধ্যাপিকা শ্রীস্বপ্না দাশ। তা ছাড়া অন্যান্য সকলেও বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করেন—যেমন মঞ্চাধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য্য, শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীশক্তিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী উমা গুহ, শ্রীমতী সুনন্দা মিত্র, শ্রীদীপক চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীদীপক ঘোষ। সঙ্গীতাংশে বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করেন—শ্রীবিমলভূষণ, শ্রীবিজয়ভূষণ, শ্রীপ্রভাতভূষণ, ব্রহ্মচারী শ্রীমনোহর চৈতন্য ও শ্রীসুধীর চট্টোপাধ্যায়। ডক্টর চৌধুরী বিরচিত জাতীয় সঙ্গীত "জন্মভূমি ভারত জননী। গঙ্গা গোদাবরী নর্ম্মদা-কাবেরী পুণ্যধারা পীযূষিণী" যখন প্রত্যহ গীত হ'ত, তখন সকলেই স্বতঃই উদ্বুদ্ধ হয়ে শ্রদ্ধাসহকারে দাঁড়িয়ে উঠতেন।

সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয় ডক্টর চৌধুরী দম্পতী সুদীর্ঘ বিশ বৎসর কাল ধরে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত গবেষণাগার প্রাচ্যবাণী মন্দিরের মাধ্যমে সংস্কৃত জননীর সেবা করে আসছেন নানা ভাবে। বহু গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ, চতুষ্পাঠি পরিচালনা, সঙ্গীত ভাষণ পরিষদ, সংস্কৃত সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় প্রভৃতি তাঁদের অমর কীর্ত্তি। কিন্তু আমাদের মনে হয় প্রদেশে প্রদেশে সংস্কৃতের মাধ্যমে নিগূঢ় সৌহার্দ্দ স্থাপনই তাঁদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি।

হাওড়া যক্ষ্মা হাসপাতাল

পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র ভারতবর্ষে যক্ষ্মা-রোগের দ্রুত বিস্তৃতি সম্পর্কে আমরা সকলেই ওয়াকিবহাল আছি, শতকরা মৃত্যু সংখ্যা এবং নূতন রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির বাৎসরিক সংখ্যাতত্ত্ব পড়িয়া এই রোগের ভীষণতা সম্পর্কে আমরা আতঙ্কিত হইয়া থাকি। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগ এই রোগের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান সুরু করিয়াছেন। সরকারী উদ্যোগ ব্যতীত আরও বহু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও যক্ষ্মা রোগের প্রশমন কল্পে হাসপাতাল স্বাস্থ্য নিবাস ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা করেছেন। এইরূপ একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হইতেছে হাওড়া যক্ষ্মা হাসপাতাল। কয়েকজন উদ্যোগী এবং সমাজহিতৈষী ভদ্রমহোদয়ের সমবেত প্রচেষ্টায় এই হাসপাতাল হাওড়ার বোটানিক্যাল গার্ডেনের নিকট স্থাপিত হইয়াছে। এই হাসপাতালের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে বিনামূল্যে সেবা এবং সহায়তা প্রদান করা। জনসাধারণ এবং অন্যান্য জন-হিতকর প্রতিষ্ঠান হইতে দান সংগ্রহ করিয়া এই হাসপাতালের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়, আশ্চর্য্যের বিষয়, কোন রকম সরকারী সাহায্য হইতে এই প্রতিষ্ঠান এখনও বঞ্চিত। সরকারী সাহায্য ব্যতীরেকে কেবলমাত্র দানের উপর নির্ভর করিয়া এত বড় প্রতিষ্ঠান চালান যে কতখানি গভীর নিষ্ঠা এবং সেবা আদর্শের উপর নির্ভরশীল তাহা সহজেই অনুমেয়। উক্ত হাসপাতালের ১৯৫৮ সনের বাৎসরিক হিসাবে দেখিতে পাইতেছি ঐ বৎসর মোট পাঁচ সহস্র আট শত বাহান্ন জন যক্ষ্মা রোগী ঐ হাসপাতালে চিকিৎসিত হইয়াছেন। এক সহস্র চারি শত আটানব্বই জনের রেডিয়োগ্রাফী করা হইয়াছিল। এক্সরে, থুথু-রক্ত ইত্যাদি পরীক্ষা করিবার জন্য কোনরূপ মূল্য আদায় করা হয় না। উক্ত রিপোর্টে কর্তৃপক্ষ অর্থাভাবে বিনামূল্যে রোগীদিগকে সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় ঔষধ দিতে না পারায় জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন।

এইরূপ একটি সমাজ-হিতকর প্রতিষ্ঠান কোনরূপ সরকারী সাহায্য প্রত্যক্ষভাবে পাইতেছে না দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। যক্ষ্মা রোগের বিস্তৃতি দমনের জন্য সরকারী এবং বেসরকারী উভয় প্রচেষ্টার মধ্যে সহযোগিতা থাকা একান্ত আবশ্যক। প্রত্যেকেই হাওড়া যক্ষ্মা হাসপাতালের প্রশংসনীয় সেবাধর্ম্মে চমৎকৃত হইবেন।

শ্রীমান গোরা চট্টোপাধ্যায়

কবি শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান গোরা চট্টোপাধ্যায় উচ্চ কারিগরী বিদ্যাশিক্ষা লাভার্থে গত ২৫শে অক্টোবর মাদ্রাজ মেল যোগে পশ্চিম জার্ম্মানী অভিমুখে রওনা হইয়াছেন। শ্রীমান গোরা আই, এস, সি, পাশ করিয়া ট্রাক্টর ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে তিন বৎসর শিক্ষানবিশী সমাপ্ত করেন। বর্ত্তমানে শ্রীমানের বয়স মাত্র ২২ বৎসর। আমরা তাহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাফল্য কামনা করি।

শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অমৃতসর খালসা কলেজের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় ইন্দোনেশীয় সরকার কর্ত্তৃক যোগজাকর্ত্তা গজা ম্যাডা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি শীঘ্রই নূতন কর্ম্মস্থলে যাত্রা করিবেন।

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় খ্যাতিমান শিক্ষক এবং শক্তিমান লেখক। চীন, রাশিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায় সম্বন্ধে তাঁহার লেখা বই সুধী সমাজে সমাদৃত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত তিনি বহু ইংরেজী ও বাংলা পত্র-পত্রিকার নিয়মিত লেখক। প্রবাসী এবং মডার্ণ রিভিয়ু-র লেখক এবং পুস্তক-সমালোচক রূপে তাঁহার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বহু দিনের। তাঁহার বিনয়-নম্র, মধুর ব্যবহারে আমরা সহজেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম।

আমরা অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের দীর্ঘায়ু এবং উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি। তিনি বিদেশে বাঙালী তথা ভারতবাসীর মুখোজ্জ্বল করুন।

ভ্রম-সংশোধন

গত কার্ত্তিক সংখ্যায় 'ঐতিহাসিক আচার্য্য যদুনাথ সরকার' প্রবন্ধে কয়েকটি ভুল ছাপা হইয়াছে।

পৃষ্ঠা	কলম	হইবে না	হইবে
১৮	২	Muntakhabut Tuarikh	Twarikh
১৯	২	বণভট্টের	শ্রীহর্ষের
২০	১	শক্তির	শাক্ত
২০	১	কীর্ত্তিবাহ	কীর্ত্তিবাহ
২১	১	Tuarikh	Twarikh
২১	১	Lubabikh	Lubab
২২	১	বদায়ুনীক খাঁ	বদায়ুনী ও খাফি খাঁ
২২	২	তাঁহার	×
২৩	২	শাহ উলীউল্লা	(ইহা ২য় পংক্তিতে ইংরেজ আমলের পরে বসিবে)
২৩	২	কংগ্রেস-জয়াসন্ধের	কংগ্রেস জয়াসন্ধের
২৪	১	'পারেন না' এই শব্দের পরে দাঁড়ি চিহ্ন হইবে	

শ্রীঅমিতাকুমারী বসুর 'দীপান্বিতা' প্রবন্ধে ১১৪ পৃষ্ঠায় মহাত্মাজীর মন্দিরের স্থলে মহালক্ষীর মন্দির হইবে 'তাউ' স্থলে 'তাট' হইবে।

সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বিগত ১৮ই কার্ত্তিক 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়ু'র ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুকাল রোগভোগের পর পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ১২৯২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত কুমারডাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ অঞ্চলের একজন জনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন।



সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্যকিঙ্কর কৈশোরে বাঁকুড়ায় অধ্যয়ন করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া তিনি মধ্যমা ভগিনীর নিকট এলাহাবাদে গমন করেন ১৩১২ সাল নাগাদ। এই মধ্যমা ভগিনীর বিবাহ হয় সুবিখ্যাত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি তখন এলাহাবাদের কায়স্থ পাঠশালার অধ্যক্ষপদে বৃত ছিলেন। তিনি ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে এলাহাবাদ হইতে 'প্রবাসী' প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। রামানন্দবাবু বন্ধুবর চিন্তামণি ঘোষকে বলিয়া সত্যকিঙ্করকে ইণ্ডিয়ান প্রেসে একটি শিক্ষানবিশী কর্ম্ম যোগাড় করিয়া দেন। সত্যকিঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে ভগিনীপতির 'প্রবাসী'র কার্য্যও কিছু কিছু করিতেন। ইংরেজি ১৯০৭ সনের জানুয়ারী হইতে রামানন্দবাবু 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রিকাও প্রকাশ করিতে থাকেন।

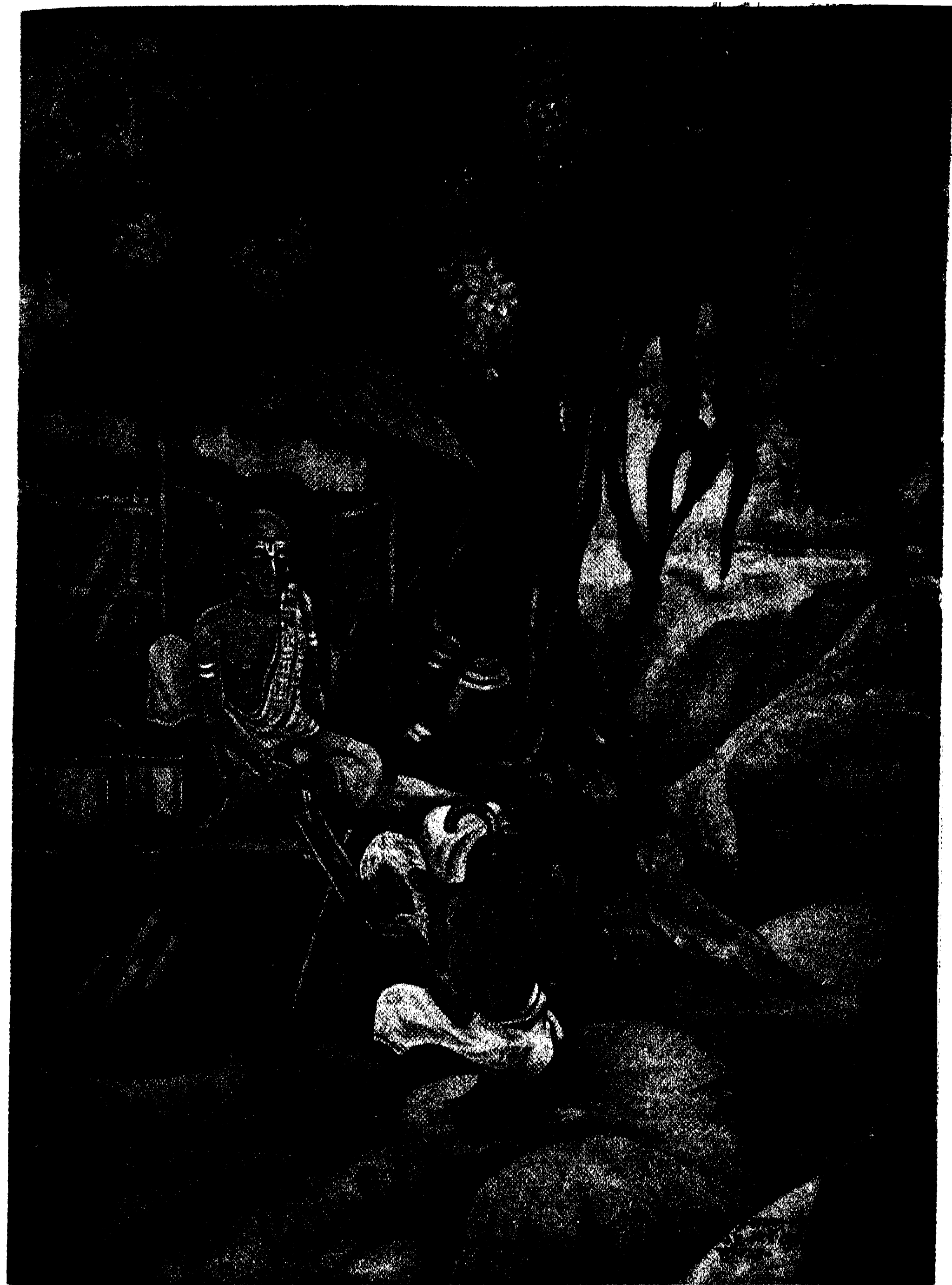
সরকারী হুকুমে চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশে ১৯০৮ সনে রামানন্দবাবুকে সপরিবারে এলাহাবাদ হইতে চলিয়া আসিতে হয়। তিনি কলিকাতায় স্থিত হইলেন এবং এখান হইতে পত্রিকা দুইখানি প্রকাশিত হইতে লাগিল। সত্যকিঙ্কর ছায়ার মত রামানন্দবাবুর অনুসরণ করিতেন। তিনি এই সময় হইতে পত্রিকাদ্বয়ের কার্য্যে সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করিলেন। রামানন্দবাবুর সম্পাদনা ও পরিচালনায় এবং সত্যকিঙ্করের কর্ম্মতৎপরতায় এই পত্রিকাদ্বয়ের দ্রুত উন্নতি হয়। কোন বিপদ-আপদই প্রতিমাসের নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রত্যেকটি পত্রিকা প্রকাশে বিঘ্ন ঘটাইতে পারিত না। প্রকৃত-প্রস্তাবে সত্যকিঙ্কর ১৯০৮ সন হইতে ১৯৫৬ সন পর্য্যন্ত এই আটচল্লিশ বৎসর এই পত্রিকাদ্বয়ের সেবা করিয়া গিয়াছেন। আজ যে ইহা একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে তাহার মূলে সম্পাদক ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ ব্যতিরেকে কর্ম্মিপ্রধান সত্যকিঙ্করের দানও রহিয়াছে যথেষ্ট। তাঁহার পরিশ্রম, অধ্যবসায়, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতি গুণগুলি আমাদিগকে নিয়ত মুগ্ধ করিয়াছে। সত্যকিঙ্করের দরদীমন সহকর্ম্মিদের দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগ দূরীকরণে আকুল হইত। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার শ্রমশক্তি দেখিয়া আমরা মুগ্ধ না হইয়া পারিতাম না। 'প্রবাসী প্রেস' সংগঠনেও রামানন্দবাবুকে তিনি বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন।

সত্যকিঙ্কর সঙ্গীত-প্রিয় ছিলেন। তিনি নিজে সঙ্গীতের চর্চ্চা করিতেন। শুনিয়াছি, প্রসিদ্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে সঙ্গীত-অনুশীলনে প্রথম দিকে তাঁহার নিকট হইতে বিশেষ উৎসাহ পাইয়াছিলেন। 'প্রবাসী' কার্য্যালয়ের কর্ম্মে একান্তভাবে ব্যাপৃত হইয়া না পড়িলে, সত্যকিঙ্করও হয়ত বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের ক্লাসিক সঙ্গীতের ধারাকে নিয়ত চর্চ্চার দ্বারা পুষ্ট ও উন্নত করিয়া তুলিতে পারিতেন।

বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার কাল হইয়াছে, এ বিষয়ে আক্ষেপ করিবার কিছু নাই। তথাপি আমরা—যাহারা দীর্ঘকাল তাঁহার সান্নিধ্যলাভ করিয়াছি—তাঁহার মৃত্যুতে আত্মীয়-বিয়োগের ব্যথা অনুভব না করিয়া পারিতেছি না। তিনি সহকর্ম্মিদের হৃদয়ে কতখানি গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির আসন লাভ করিয়াছিলেন, 'প্রবাসী' আপিসে অনুষ্ঠিত তাঁহার শোক-সভায় বিভিন্ন বক্তার স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাষণ হইতে বুঝা গিয়াছে। সত্যকিঙ্করের বিদেহী আত্মা শান্তিলাভ করুক এই প্রার্থনা।

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯



প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

জলসত্র

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী



প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ও আইজেনহাওয়ারের ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার

:: ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৯শ ভাগ ২য় খণ্ড | পৌষ, ১৩৬৬ | ৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

প্রাতরক্ষার অর্থ কি ?

বিগত মাসের ঘটনাবলীর মধ্যে দুইটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমটি চীন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় রাজ্যসভায় বিতর্ক এবং দ্বিতীয়টি মার্কিন প্রেসিডেন্টের ভারতে আগমন ও বিদায়যাত্রা।

প্রথমটিতে কয়েকটি বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় আছে। আমরা এই সম্পাদকীয় প্রসঙ্গাবলীর মধ্যে পণ্ডিত নেহরুর রাজ্যসভায় প্রাথমিক ভাষণের ও বিতর্কের পরের ভাষণের সারাংশ অন্যত্র দিয়াছি। এখন সেই ভাষণ দুইটির কিছু বিবেচনা আমরা এখানে করিব।

পণ্ডিত নেহরুর বক্তৃতায় শান্তিবাদের উপর গুরুত্ব আরোপের সঙ্গে সঙ্গে এখন দেখা যাইতেছে তাঁহার ব্যর্থতারও উপলব্ধি হইয়াছে, তবে তাহাতেও অনেক "কিন্তু" ভাব জড়াইয়া আছে। তিনি স্বীকার করিয়াছেন "চীন আমাদের দেশ আক্রমণ করিবে তাহা আমরা ভাবিতেও পারি নাই।" সেই সঙ্গেই পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন, "যদি কোন সদস্য মনে করেন যে, পঞ্চশীলের মোহে সরকার প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি উদাসীন ছিলেন, তাহা হইলে তিনি ভুল করিবেন।"

তিনি এবার স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, "যে অশান্তি দেখা দিয়াছে তাহা স্বল্পস্থায়ী নয়। এই সত্য সকলকেই উপলব্ধি করিতে হইবে যে, ইহা দীর্ঘস্থায়ী ব্যাপার।" আবার এ কথাও বলিয়াছেন, "স্বল্পমেয়াদী অবস্থা হইতেই দীর্ঘমেয়াদী অবস্থা আসে। সুতরাং স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।"

প্রতিরক্ষা ব্যাপারে কারিগরি ও শিল্পোন্নতির চরম গুরুত্ব বিষয়ে সদস্যদিগকে জানাইয়া তিনি বলেন যে, কারিগরি উন্নতির বিষয় ভাবিতে হইবে।

শেষের দিকে তাঁহার নূতন উপলব্ধির পরিচয় তিনি দিয়াছেন এই বলিয়া "বন্ধুত্বের মনোভাবই ঠিক মনোভাব। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সতর্ক থাকিতে হইবে, এবং দেশরক্ষা-ব্যবস্থা শক্তিশালী করিতে হইবে। সতর্ক না থাকিয়া বন্ধুত্বের হাত বাড়াইলেই বিপদে পড়িতে হইবে। সে বিপদ মহাবিপদ কারণ, তাহাতে যে কোন-কিছু ঘটিতে পারে।"

তিনি আরও বলিয়াছেন, "যুদ্ধ অতি নিন্দার্হ, কিন্তু যদি দেশের মান, মর্যাদা ও স্বাধীনতার উপর আক্রমণ হয়, তবে প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিয়াই দেশ রক্ষা করিতে হইবে।"

রাজ্যসভায় বিতর্কের শেষে তিনি নানা কথার মধ্যে বলেন, "সরকার দেশের প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন এবং দেশের শিল্প-কাঠামোকে শক্তিশালী করারও চেষ্টা করিতেছেন। আর ভবিষ্যতের জন্য শিল্প প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকেও গড়িয়া তোলা হইতেছে।"

বুঝা গেল যে এতদিনে পণ্ডিত নেহরু বুঝিয়াছেন যে ক্ষীণবল হইয়া শান্তির প্রয়াস বৃথা। অন্য দিকে তিনি প্রতিরক্ষা বলিতে কি বোঝেন তাহা আগেরই মত আবছায়া রহিয়া গিয়াছে। সামরিক ক্ষেত্রে, কি নীতি প্রয়োগ করা হইতেছে সে বিষয়ে তিনি যথার্থই বলিয়াছেন যে, তাহা প্রকাশ্য ভাবে বলা উচিত নহে। কেন না তাহাতে শত্রুপক্ষ সে বিষয়ে সাবধান হইয়া তাহার পাল্টা ব্যবস্থা করিবে এবং তাহা ব্যর্থ করারও ব্যবস্থা করিবে।

কিন্তু আমরা ত দেখিতেছি বিপক্ষের পঞ্চমবাহিনী এখনই সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। যানবাহন-ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত করার জন্য রেললাইন ও ট্রেনে বিস্ফোরকের ব্যবহার ত চলিতেছেই। উপরন্তু ইহাও বুঝা যায়, যে সামরিক দপ্তরে উহাদের গুপ্তচর অনুপ্রবেশ করিয়াছে, নহিলে সামরিক চলাচলের এত সঠিক খবর উহারা পায় কোথায় ? পণ্ডিত নেহরু যদি এ বিষয়ে কিছু না করেন তবে দেশের লোকেরই চোখে ঠুলি পরাইয়া দেওয়া হইবে। বিপক্ষ সবই জানিবে।

দেশের আভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষার ত কোনও ব্যবস্থা আপাত-

দৃষ্টিতে দেখা যায় না। কালিম্পং হইতে এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, সেখানের পঞ্চমবাহিনীর নেতা স্থানীয় অজ্ঞ পাহাড়ীদিগকে উত্তেজিত করিয়া বলিয়াছে, "মিথ্যা গুজব যাহারা রটায় তাহাদের শাস্তি জনসাধারণে দিবে।" অর্থাৎ চীনাদের অনুপ্রবেশ বা চীনা গুপ্তচর ও চীনাদের দালাল দলের ধ্বংসাত্মক কাজের খবর নেওয়া-দেওয়া বা বাধা দেওয়া বিপজ্জনক করিয়া তোলা হইবে। কারিগরি বা শিল্পপ্রতিষ্ঠান জলের মত টাকা ঢালিয়া গড়িয়া তোলা সম্ভব। কিন্তু বিপদকালে সে সকলকে অকেজো করিয়া দেওয়া বা যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থা বানচাল করা, ইহার পূর্ণ ক্ষমতা যদি শত্রুর পঞ্চমবাহিনীর হাতে অক্ষুণ্ণভাবে থাকে তবে তাহার মূল্য কি?

দেশের অবস্থা অন্যদিকে ত চোরাবাজারি, ঘুষ এবং সরকারী মহলে দুর্নীতি ও সাধারণের প্রতি অবহেলার ফলে অতি সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পণ্ডিত নেহরু কি মনে করেন যে, এই অবস্থায় দেশ সমূহ বিপদ উপস্থিত হইলে দৃঢ়ভাবে প্রতিরক্ষায় সমর্থ হইবে? সরকারী কর্ম্মচারীদিগের উৎকোচগ্রহণ লালসা ত অতি উচ্চস্তরেও পৌঁছাইয়াছে। অন্যদিকে তাঁহাদের হাতে উৎপীড়নের ব্যবস্থা ক্রমেই বাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে। আমরা আশ্চর্য্য হই যে, যাঁহারা আমাদের মুখপাত্র সাজিয়া নয়া দিল্লীতে বিলাসব্যসনে উন্মত্ত তাঁহাদের মধ্যে কি কেহই এ বিষয়ে মুখ খুলিতে সাহস করেন নাই?

পণ্ডিত নেহরু ত লোকসভা রাজ্যসভা দুই ক্ষেত্রে কপট বিনয়ের সঙ্গে আজ্ঞাবহ ভৃত্য সাজিয়া বলিয়াছেন, "তোমরা বল আমি কর্ণধার থাকিব কিনা?" অবশ্য তিনি ইহার কি উত্তর হইবে তাহা জানিতেন। কিন্তু তিনি নিজে কি মনে করেন যে, দেশকে বিপদগ্রস্ত অবস্থায় ফেলিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেই তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান এবং বিশ্বস্ততার পরাকাষ্ঠা হইত? দেশকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখিয়া যে অবস্থার সৃষ্টি তিনি ও তাঁহার চাটুকারবৃন্দ করিয়াছেন তাহার দায়িত্ব কি ঐটুকু মাত্র?

চীন যে এখন ক্ষণিক বিরতি দিয়াছে তাহার কারণ তাহার গোষ্ঠীর সকলে বোধ হয় পূর্ণ সমর্থন এখন দিতে প্রস্তুত নহে এবং বিপক্ষগোষ্ঠী ইতিপূর্ব্বেই প্রমাণ দিয়াছে যে, তাহারা সশস্ত্র প্রতিরোধ ও আক্রমণে সমর্থ ও প্রস্তুত। কোরিয়া, ক্যিময় দ্বীপপুঞ্জ ও লেবাননে তাহার প্রমাণ হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু এই ক্ষণিক বিরতি শুধু ভুয়া বাক্যজাল বিস্তারে ও শান্তিবাদের বক্তৃতায় কাটাইলে বিপদ পরে ঘনাইয়া আসিবেই। সামরিক সজ্জা আমাদের কি আছে সে বিষয়ে আমরাই—অর্থাৎ সাধারণ জন, লোকসভা ও রাজ্যসভার বিদগ্ধ চূড়ামণিবৃন্দ—অজ্ঞ, চীন নিশ্চয়ই জানে নহিলে এভাবে অগ্রসর হইতে সাহস করিত না।

দেশের দুর্দ্দশা ও আভ্যন্তরীণ বিপর্য্যয়ের ও ধ্বংসাত্মক কার্য্যের সুযোগ ও গুপ্ত ব্যবস্থার একটা আবছায়া আন্দাজ আমাদের আছে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিবৃন্দ এবং লোকসভা বিধানসভার সাধারণ খেলোয়াড়বৃন্দ সে বিষয়ে একেবারে অন্ধ। অবশ্য পঞ্চমবাহিনীর মুখপাত্রেরা তাঁহাদের নিজের দলের ব্যবস্থা কিছুটা জানেন। আমাদের হিসাবে দেশের আভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা অতি জঘন্য ও অকেজো। লুটনবীশের চালনায় ও বাক্যবাগীশদিগের তত্ত্বাবধানে দেশ কোন্ অধঃপাতে চলিয়াছে তাহা বিচক্ষণ ও ভুক্তভোগী জনমাত্রেই জানেন।

এইমত অবস্থার মধ্যে আমাদের দেশে এক বন্ধুজনের আগমন হইয়াছে, যাঁহার নাম আইজেনহাওয়ার। তাঁহার সঙ্গে পণ্ডিত নেহরুর কি কথাবার্ত্তা হইয়াছে তাহার অতি সামান্য আভাস আমরা সংবাদপত্রে পাই। তবে প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার কি মনে করিয়া আসিয়াছেন তাহার সুস্পষ্ট চিত্র আমরা পাই তাঁহার যুক্ত পার্লামেণ্টের সম্মুখে প্রদত্ত ভাষণে। উহার সারাংশ আমরা অন্যত্র দিয়াছি।

ইহা বিশ্বশান্তিকামী সজ্জনের বিবৃতি এবং তাহাতে আছে সক্রিয় দেশ পরিচালকের ও বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্যতম রণনায়কের অভিজ্ঞতা-প্রসূত বিবরণ। কেননা মার্কিন দেশের প্রেসিডেণ্ট সে দেশের শাসনতন্ত্রের প্রধান পরিচালক, শুধু নামমাত্র রাষ্ট্রপতি নহেন। সেই সঙ্গে এই শান্তিবাদের পিছনে রহিয়াছে দুর্দ্ধর্ষ ও আধুনিক সমরসজ্জায় সজ্জিত পৃথিবীর ধনিকশ্রেষ্ঠ জাতি। সুতরাং এই ভাষণের তাৎপর্য্য অনেক গভীর, শুধুমাত্র অভ্যাগত এক বিদেশী রাষ্ট্রনায়কের শিষ্টাচারপূর্ণ অভিভাষণ ও সম্ভাষণ নহে।

ইহাতে রহিয়াছে পণ্ডিত নেহরুর শান্তিবাদের সমর্থন এবং এই ভারতীয় জাতিপুঞ্জের পূর্ব্বসূরীগণের জীবনবেদের স্বীকৃতি। এবং সেই সঙ্গে রহিয়াছে এই দেশের ও এই জাতিপুঞ্জের ইষ্ট কামনা জ্ঞাপন।

প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ারের আগমনের ফলাফল বুঝিবার ও বিচার করিবার সময় এখনও হয় নাই। সে কথা বুঝা যাইবে পরে। কিন্তু ইতিমধ্যেই যাহা লক্ষ্য করা যায় তাহাতে মনে হয় যে, তিনি যে নিজের ও মার্কিন দেশবাসীগণের পক্ষ হইতে আমাদের জন্য যে বন্ধুত্ব ও প্রীতি জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহা বোধ হয় মৌখিক শিষ্টতা মাত্র নহে। আমাদের কল্যাণ ও আমেরিকার কল্যাণ অচ্ছেদ্যরূপে জড়িত এবং আমাদের কাছে যাহা কাম্য সে সবই মার্কিন জাতিরও কাম্য, আমাদের লক্ষ্য ও উহাদের লক্ষ্যও এক, এই সকল কথা, ঐরূপ পরিবেশে এবং এহেন অধিকারীর মুখে সহজে উচ্চারিত হয় না।

বর্ত্তমানে আমরা যে পরিস্থিতির সম্মুখীন সে বিষয়ে পণ্ডিত নেহরুর সহিত আলাপ সম্যকভাবে হইয়াছে এ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। পণ্ডিত নেহরু কতটা কি বলিয়াছেন এবং তাহার বিষয়ে প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার কি মতামত প্রকাশ বা পরামর্শ দান করিয়াছেন জানি না। তবে একথা নিশ্চয় যে, যদি পণ্ডিত নেহরু সবকিছু প্রকাশ করিয়া বলিয়া থাকেন তবে অবস্থার বিচার মার্কিন প্রেসিডেণ্ট নিশ্চয়ই স্পষ্ট ভাষায় করিয়াছেন।

কলিকাতায় চীনা গুপ্তচর এবং গোপন ঘাঁটি

বিভিন্ন সংবাদ হইতে জানা যায়, কলিকাতা শহর এখন চীনা গুপ্তচর ও এজেন্টদের গোপন-কার্য্যকলাপের প্রধান ঘাঁটি হইয়া উঠিয়াছে। সংবাদকে মিথ্যা বলিতেও ইচ্ছা হয় না। কারণ, অল্প-কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যাইতেছে, কলিকাতায় ও হাওড়ায় চীনাদের আকস্মিক সংখ্যাবৃদ্ধি। কিন্তু লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি ইহা বিশ্বাসই করেন না। চীনারা যে আমাদের সীমান্ত অঞ্চলে এবং কলিকাতায় লণ্ড্রী ও অন্যান্য দোকান খুলিয়া সুকৌশলে প্রচার-কার্য্য চালাইতেছে, সরকার তাহা জানেন কিনা—লোক সভায় শ্রীমহাবীর ত্যাগী এই প্রশ্ন করেন। তাহার উত্তরেও শ্রীনেহরু বলেন, কলিকাতার মত মহানগরীতে প্রচুরসংখ্যক চীনা দীর্ঘদিন যাবৎ জুতা-প্রস্তুতকারী ও লণ্ড্রী-ব্যবসায়ী হিসাবে বসবাস করিয়া আসিতেছে এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র এইগুলিই হইতেছে তাহাদের বিশেষ উপজীবিকা।

শ্রীনেহরু এ সংবাদ কোথা হইতে পাইলেন? দেখিতেছি, জুতার সঙ্গে সঙ্গে লণ্ড্রীর ব্যবসায়টাকেও তিনি এখানে চীনাদের একটা দীর্ঘদিনের ব্যবসায় বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। সত্য বটে, জুতার ব্যবসা তাহাদের বহুদিনের। শুধু জুতা কেন, চীনা রেস্তোরাঁ অথবা চীনা ডেণ্টিষ্টের ক্লিনিকও অতি পুরাতন। কিন্তু চীনা লণ্ড্রী সাম্প্রতিক উপদ্রবের মত যত্রতত্র গজাইয়া উঠিয়াছে। এই আকস্মিক আবির্ভাবে সন্দেহ করিবার কিছু আছে বই কি।

মনে হইতেছে, শ্রীনেহরু এত বড় একটা সংবাদকে কোন গুরুত্বই দেন নাই। তাহা না দেন, কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, লণ্ড্রী ব্যবসায়টা যে এখানে চীনাদের একটা দীর্ঘদিনের কারবার, এমন ধারণা তাঁহার হয় কেন? সংবাদ যিনিই দিয়া থাকুন, সত্য সংবাদ দেন নাই। সত্য সংবাদ এই কথাই বলিবে যে, কলিকাতার পথে পথে চীনা-লণ্ড্রীর এই আকস্মিক আবির্ভাব একটা সম্পূর্ণই নূতন ঘটনা। শুধু নূতন নহে, রহস্যময়ও। ভারতের প্রধানমন্ত্রী হইয়া এত বড় একটা সংবাদ তিনি রাখেন না ইহাও বিস্ময়কর। যাহাই হউক, এ সম্বন্ধে সতর্ক তদন্তের প্রয়োজন আছে।

গ-স

এই চীনা লোকটি কে?

খবরের কাগজে একটি বিচিত্র সংবাদ বাহির হইয়াছে। ভারতের উত্তর-সীমান্ত অঞ্চল হইতে একজন চীনা নাকি কলিকাতার দিকে আসিতে আসিতে বর্দ্ধমানের কাছাকাছি গুসকরা ষ্টেশনের নিকট চলন্ত ট্রেন হইতে লাফাইয়া পড়িয়া অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। তাহার নিকট কতকগুলি গুপ্ত কাগজ ছিল এবং সেজন্য পুলিস তাহার উপর নজর রাখিয়া নিশ্চয়ই ঐ ট্রেনে আসিতেছিল। লোকটা তাহা টের পাইয়া চম্পট দেয়। ট্রেনের চালক লোকটাকে লাফাইয়া পড়িতে দেখিয়া বর্দ্ধমানের ষ্টেশন-মাষ্টারকে জানান এবং তাহার পর ব্যাপারটাকে লইয়া পুলিস-মহলে নাকি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পুলিস সেই লোকটার উপর যে কি ভীষণ ভাবে নজর রাখিতেছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়, যখন দেখি, লোকটার পলায়নের খবর দিয়াছেন ট্রেনের চালক—প্রহরারত পুলিস নহে। পুলিসের সতর্ক দৃষ্টি ইহাকেই বলে! পুলিসের এইরূপ দক্ষতা আমরা প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই। দেশের সঙ্কট যখন আসন্ন, ঘরে-বাহিরে শত্রু যখন ওৎ পাতিয়া আছে, তখন পুলিসের এই অসাবধানতা অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা, লোকটাকে নাকি আর পাওয়া যাইতেছে না। লোকটা নিশ্চয়ই শূন্যে মিলাইয়া যায় নাই এবং একজন বিদেশীর পক্ষে গা-ঢাকা দেওয়াও সম্ভব নয়। তবে গেল কোথায়? শহরে লুকাইবার স্থান অজস্র থাকিতে পারে, কিন্তু গাঁয়ে সেরূপ স্থান কোথায়? এবং তাহাকে খুঁজিয়াই বা বাহির করা যাইবে না কেন? অথচ এই একই পুলিস ব্রিটিশ আমলে ভেলকি দেখাইয়াছে! দোষ পুলিসের নয়, দোষ, তাহাদের যাঁহারা চালনা করেন সেই উপরওয়ালাদের। রাষ্ট্রের এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে পুলিস যদি এরূপ নিষ্ক্রিয় হয় তবে তাহার কঠোর দণ্ড হওয়া উচিত।

যাহা হউক, পরে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, ঐ চীনা লোকটি নাকি কলিকাতায় ধরা পড়িয়াছে। তাহার কথা এলোমেলো এবং কোন প্রশ্নেরই সে সঠিক জবাব দিতে পারে নাই। তবে জানিতে পারা যায় নাই, তাহার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সত্যই বিশেষ তদন্ত হওয়া উচিত।

গ-স

সরকারী অর্থের অপচয়

ভারতবর্ষে স্বাধীনতা লাভের পর হইতে সরকারী অর্থের অপচয় কিংবা বে-আইনী খরচ দেশশাসনের স্বাভাবিক ব্যবস্থার পর্য্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কতকগুলি অপচয় খরচা ঘটিয়াছে কর্ত্তৃপক্ষের খামখেয়ালীতে কিংবা নির্বুদ্ধিতার ফলে। প্রতি বৎসরই অডিটার জেনারেল তাঁহার রিপোর্টে এই সকল বাজে খরচের বিষয়ে মন্তব্য করেন এবং তাহা আইন-পরিষদের দৃষ্টিগোচরে আনয়ন করেন। ইহা কাগজে ছাপানো হয়, দুই-একদিন আইন-পরিষদে আলোচনা হয়, তার পর সব চুপচাপ হইয়া যায়। ইহার জন্য কাহারও কোন সাজা হইয়াছে বলিয়া আজ পর্য্যন্ত শোনা যায় নাই। সরকারী অর্থ হইতেছে জনসাধারণের অর্থ এবং সে অর্থ আসে জনসাধারণের উপর কর আরোপ করিয়া। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ বহুক্ষেত্রে খেয়ালখুসী মত এই অর্থের অপচয় করেন, অধিকাংশ সময়েই খরচটা হয় আইনের আওতায়, কিন্তু তাহার ফল ও বিধি-ব্যবস্থা সমস্তটাই হইয়া উঠে বে-আইনী। অতীতের জীপগাড়ী ক্রয় করা বিষয়ে কেলেঙ্কারী, দামোদর ভ্যালী, সিন্ধ্রি সারের কারখানার ব্যাপার প্রভৃতি জনসাধারণ বর্ত্তমানে ভুলিয়া গিয়াছেন।

কর্ত্তৃপক্ষের খামখেয়ালের জন্য অর্থের অপচয়ের নিদর্শন দেখা যায় কল্যাণী পরিকল্পনা কিংবা গভীর জলে মাছ ধরিবার পরিকল্পনায়।

সম্প্রতি পশ্চিম বাংলার আইন-পরিষদের নিকট পাবলিক একাউণ্টস কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন তাহাতে অনেক অসঙ্গত কিংবা বে-আইনী খরচের উদাহরণ দেখানো হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রীয়-পরিবহন সংস্থার কর্তৃপক্ষ হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া একটি মোটর গ্যারেজ নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু পরে ঠিক হয় যে, আরও বড় গ্যারেজের প্রয়োজন আছে, তখন এই গ্যারেজকে ১২ হাজার টাকা ব্যয়ে ভাঙিয়া ফেলা হয় এবং জিনিসপত্র ১৩ হাজার টাকায় বিক্রয় করা হয়। এই গ্যারেজের জন্য ১.৬৪ লক্ষ সরকারী অর্থের অপচয় ঘটে। যে গ্যারেজ নির্ম্মাণ করিতে ১.৬৫ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহার জিনিসপত্রের মূল্য যে মাত্র ১৩ হাজার টাকা হইতে পারে না তাহা সহজ বুদ্ধিতেই ধরা পড়ে। সুতরাং এই বিষয়ে যে চুরির ভাগ-বাঁটোয়ারা ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। এ বিষয়ে অনুসন্ধান হওয়ার ছিল যে, এত অল্প দামে এই গ্যারেজের জিনিষপত্তর কেন বিক্রয় করা হইয়াছে। ব্যাপার দেখিয়া মনে হয় যে, সরকারী ব্যবস্থায় অরাজকতা বিরাজ করিতেছে এবং আইনের মাধ্যমেই চুরি-বাটপারি প্রভৃতি হইয়া যাইতেছে।

রাষ্ট্রীয় পরিবহন-সংস্থার আর একটি চুরির ব্যবস্থা হইতেছে যে, অল্প কয়েক বৎসরের পুরানো বাসকে জলের দরে বিক্রয় করিয়া দেন এবং সেই বাস বেসরকারী মালিকরা বিভিন্ন রুটে চালু করে। পরিবহন-সংস্থা এইরূপ চুরি চুরি খেলা প্রথম হইতেই খেলিয়া আসিতেছেন, সুতরাং ইহা নূতন কিছু নয়। এবারে পাবলিক এ্যাকাউণ্টস কমিটি দেখাইয়াছেন যে, ১৭টি ষ্টুডিবেকার বাস ৪৭,০০০ টাকায় বিক্রয় করা হয়, তাহার মধ্যে ক্রেতা মাত্র ৩৬,০০০ টাকা দিয়াছে বাকী টাকা দেয় নাই। রাষ্ট্রীয় পরিবহন-সংস্থা ৩১,০০০ টাকা ব্যয় করিয়া এই বাসগুলিকে সারাইয়া দেন। এই ১৭টি বাস বিক্রয় করিয়া সরকার মাত্র মোট ২০,০০০ হাজার টাকা পাইয়াছেন। এক-একটি নূতন বাসের মূল্য প্রায় ৪০ হাজার টাকা। যাহারা ক্রয় করিতেছে তাহারা এই বাসগুলিকে পুনরায় চালু করিবার মানসেই ক্রয় করিতেছে, ফেলিয়া রাখিবার জন্য ক্রয় করে নাই। রাষ্ট্রীয় পরিবহন-সংস্থা এই বাসগুলিকে সারাইয়া চালু রাখিতে পারিতেন। এক-একটি বাস প্রায় হাজার টাকা মূল্যে বিক্রয় করা হইয়াছে অর্থাৎ ইহাদের লোহালক্কড় যেন সের দরে বিক্রয় করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন স্বভাবতঃই আসে যে, মন্ত্রীমহাশয়েরা কি করেন? আইনতঃ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী-মহাশয় এই সকল অনাচারের জন্য দায়ী। ব্যাপার দেখিয়া মনে হয় যে শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ের কার্য্য তাঁহারা একেবারেই দেখেন না। তাঁহাদের লজ্জা বলিয়া বস্তু থাকিলে এই সকল অনাচার বিষয়ে রিপোর্টের পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহাশয়দের পদত্যাগ করা উচিত ছিল। পার্লামেণ্টারী গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় শাসনতান্ত্রিক বিভাগের গাফিলতির জন্য কিম্বা অন্যায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহাশয় পরোক্ষভাবে অবশ্যই দায়ী এবং এই জন্য তাঁহার পদত্যাগ করা প্রয়োজন। যেমন মুন্দ্রার শেয়ার ক্রয় করা ব্যাপারে অর্থমন্ত্রী শ্রী টি, টি, কৃষ্ণমাচারীকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

অডিটর জেনারেল এবং পাবলিক এক্যাউণ্টস কমিটি এইরূপ আরও কয়েকটি উদাহরণ দিয়াছেন, যেমন ৮৮,০০০ হাজার টাকায় ৯৬,০০০ টিন জমাট দুধ ক্রয় করা হয় কিন্তু বিলি করার ব্যবস্থা না থাকায় এই দুধ নষ্ট হইয়া যায়। খরচের অনাচারের ফিরিস্তী দেখিয়া মনে হয় যে, পরিকল্পিত অর্থনীতিতে সমস্তই অপরিকল্পিত ব্যবস্থা, শুধু তাহাই নহে—সরকারী অর্থের এইরূপ অপচয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তি পাওয়া প্রয়োজন। সরকারী অর্থের অপচয় বহু প্রকারে হয়, কতকগুলি চিরকালই গোপন থাকিয়া যায়। কতকগুলি অপচয় হয় ঢাক বাজাইয়া এবং আইন-পরিষদের তথা-কথিত সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাহায্যে।

কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালীর জন্যও সরকারী অর্থের অপচয় হয়; কলিকাতার ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানীকে জাতীয়করণ করিবার জন্য যে বিল আনয়ন করা হইয়াছিল, তাহাতে সরকারী অর্থের অপচয়ই হইত। এই কোম্পানীর শেয়ারের বর্ত্তমান বাজার দর মাত্র ৩২ লক্ষ টাকা, সেই জায়গায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রায় দেড় কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ দিয়া এই প্রতিষ্ঠানটিকে জাতীয়করণ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু, এই কোম্পানীর যন্ত্রপাতি প্রভৃতি এত পুরানো এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, যে তাহা প্রায় পুরানো লোহা হিসাবে সের দরে বিক্রীত হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে। কাগজে-কলমে যন্ত্রপাতির মূল্য অবশ্য যথেষ্ট পরিমাণে স্ফীত করিয়া দেখান হইয়াছে, এই প্রতিষ্ঠানটি বর্ত্তমানে সুরজমল নাগরমল, অর্থাৎ শ্রীজালানদের সম্পত্তি। এই কোম্পানীকে ভাল করিয়া চালু করিতে গেলে প্রায় এক কোটি টাকার নূতন যন্ত্রপাতি লাগিবে। সুতরাং এই রকম একটি অকেজো এবং ক্ষয়প্রাপ্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে কি করিয়া ১'৪০ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া জাতীয়করণ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন তাহাতে আমরা আশ্চর্য্য হইতেছি। প্রকারান্তরে এই অর্থ কোম্পানীকে দান করার সামিল হইত। পশ্চিমবঙ্গ আইন-পরিষদে জাতীয়করণ প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা হওয়ায় বিলটি বর্ত্তমানে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

জাতীয়করণ করিবার পরিবর্ত্তে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভারতীয় সংবিধানের ৩১ক ধারা অনুসারে আগামী দুই বৎসরের জন্য এই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার ভার গ্রহণ করিবেন। কিন্তু তাহাতে সমস্যার প্রকৃত কোনও সমাধান হইবে না। দুই বৎসর পরিচালনা করিবার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রতিষ্ঠানটিকে ব্যক্তিগত মালিকানায় ফেরত দিতে পারিবেন না এবং তখন জাতীয়করণ করিতে গেলে আবার এই ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন আসিবে; সুতরাং বর্ত্তমান আপত্তি তখনও দেখা দিবে।

প্রকৃষ্ট উপায় হইতেছে বর্তমান বাজার মূল্যে ইহাকে ক্রয় করিয়া লওয়া।

ন-র

পুলিসের নিষ্ক্রিয়তায় সমাজ-জীবন বিপন্ন

২৫শে নবেম্বরের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় একটি নৃশংস হত্যার কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে। সংবাদটি এইরূপ: "গত ১৩ই সেপ্টেম্বর ডাঃ ব্যোমকেশ মণ্ডল এক তরুণীকে সঙ্গে লইয়া আসানসোল রেল-ষ্টেশন হইতে রিক্সাযোগে আসিতেছিলেন। উঁহারা জি, টি, রোডের নিকটবর্তী হইলে একখানা ট্যাক্সি পিছন হইতে আগাইয়া আসিয়া রিক্সাচালককে থামিতে বাধ্য করে। রিক্সা থামিলে তিনজন যুবক ট্যাক্সি হইতে লাফাইয়া নামে এবং তরুণীটিকে জোর করিয়া রিক্সা হইতে নামাইয়া ট্যাক্সিতে তোলে। ডাঃ ব্যোমকেশ মণ্ডল দুর্বৃত্তদিগকে বাধা দিবার চেষ্টা করেন কিন্তু দুর্বৃত্তেরা তাঁহাকে কাবু করিয়া ফেলিয়া তাঁহাকেও ট্যাক্সিতে তুলিয়া লয়। অতঃপর আততায়ীগণ ট্যাক্সি চালাইয়া নিসার নিকটবর্তী কোন স্থানে যায়, তথায় ডাঃ মণ্ডলকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় এবং তাঁহার মৃতদেহ টুকরা টুকরা করিয়া একটি বস্তায় পুরিয়া মুর্গাসোলে লইয়া যাইয়া রাস্তার ধারে ড্রেনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। পরদিন প্রাতে পুলিস মৃতদেহটির খোঁজ পায়।"

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে সংবিধানসম্মত উপায়ে গঠিত একটি সভ্য গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে থাকিয়া রাজ্যবাসীর ধন-প্রাণ, মান-সম্মানের নিরাপত্তা গুণ্ডাদের অনুগ্রহনির্ভর হইবে, এ অবস্থা নিতান্তই দুঃসহ। পুলিস-ব্যবস্থার কথা ছাড়িয়াই দিলাম, এ অবস্থার প্রতিকারের জন্ম সরকারী তৎপরতাই বা কোথায়? এই সেদিনও দুর্গাপুর হইতে দেড় মাইল দূরে লছিপুর কলোনীতে পঞ্চাশ-ষাট জন দুর্বৃত্ত এক বিশিষ্ট ভদ্রলোকের অবিবাহিতা কন্যাকে অপহরণ করার চেষ্টা করিয়াছিল। তার পর খাস দুর্গাপুর হইতেই কয়েক-জন অবাঙালী কোক-ওভেন কলোনী হইতে একটি তরুণীকে হরণ করিয়া মোটরযোগে উধাও হইয়া গিয়াছে। তরুণীটি ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া মোটর হইতে লাফাইয়া পড়িলেও তাহারা পুনরায় তাহাকে তুলিয়া লইয়াছে এবং কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে বা মোটরের গতিরোধ করিতে সমর্থ হয় নাই।

এখানে বিস্ময়ের বিষয় এই যে, অপরাধের তাণ্ডবভূমি পঞ্চাশ হাজার লোক-অধ্যুষিত দুর্গাপুরে নাকি বারোজন কনেষ্টবল ও এক-জন সাব-ইনসপেক্টরযুক্ত একটিমাত্র পুলিস-ফাঁড়ি! এবং তাহাতেও টেলিফোন সংযোগের কোন ব্যবস্থা নাই। শুনিয়াছি, পুলিসী-খাতে বহু টাকা ব্যয়বরাদ্দ আছে। চারিদিকে যেরূপ অবস্থা চলিতেছে তাহাতে যদি পশ্চিমবঙ্গে সহসা অষ্টম শতাব্দীর মত মাৎস্যন্যায় মাথা চাড়া দিয়া উঠে তবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই থাকিবে না।

গ-স

জমিদারী বিলোপ সংশোধনী আইন

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার জমিদারী বিলোপ আইনকে সংশোধন করিবার জন্ম আইন-পরিষদে একটি বিল উত্থাপন করিয়া-ছিলেন। কিন্তু এই বিলের কতকগুলি ধারা আইনসঙ্গত কি না সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ উদ্রেক হওয়ায়, বিলটিকে বর্ত্তমানে স্থগিত রাখা হইয়াছে। বিলে বে-আইনী ভাবে জমি হস্তান্তরিত করিবার জন্ম শাস্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং তাহা যথার্থ আইনসঙ্গত কি না সে বিষয়ে মতবিরোধ হওয়ায় বিলটির পুনর্ব্বিবেচনা হইতেছে। আজ প্রায় পাঁচ বৎসর হইতে চলিল তথাপি জমিদারী বিলোপ এবং জমির পুনর্ব্বণ্টন ব্যবস্থার কোনও সমাধান হইল না। জমির মালিকরা এখনও ক্ষতিপূরণ পায় নাই, এবং জমিগুলির শেষ নিষ্পত্তিসূচক জরীপও সম্পন্ন হয় নাই। ভূমি সংস্কারের প্রথম ধাপেই (অর্থাৎ জমিদারী প্রথা বিলোপে) কর্ত্তৃপক্ষ নাজেহাল হইয়া উঠিয়াছেন। দ্বিতীয় পর্য্যায়, অর্থাৎ জমির পুনর্ব্বণ্টন ব্যবস্থা এখনও সুরুই হয় নাই, ফলে ভূমিনীতির ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে। ইহাতে বাংলা দেশে কৃষির প্রগতি ব্যাহত হইতেছে।

দার্জ্জিলিঙে যে সিলেক্ট কমিটির অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে জমির পুনর্ব্বণ্টন ব্যবস্থা এবং কৃষিনীতিও নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সে বিষয়ে কিছুই হয় নাই। কুচবিহারে জমিদারী বিলোপ আইনের ৫ক ধারা কার্য্যকরী না করায় সেখানে যথেচ্ছা-ভাবে এবং বে-আইনী ভাবে জমি হস্তান্তরিত করা হইতেছে। এই প্রসঙ্গে ইহা বলা প্রয়োজন যে, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের সহিত পাকিস্থানে গত মুসলমানদের সহিত জমি অদল-বদল করা হয়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই প্রকার হস্তান্তরের দলিল রেজেষ্ট্রি করা হয় নাই। বর্ত্তমানে মুসলমানরা পাকিস্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া এই সকল জমি আবার দখল করিয়া লইতেছে, কারণ হস্তান্তর দলিল রেজেষ্ট্রী না করায় সেটলমেণ্ট অফিসাররা হিন্দুদের নামে জমি রেকর্ড করিতে আপত্তি করিতেছেন, এবং তাহা খুবই স্বাভাবিক। ফলে হিন্দুদের পাকিস্থানের জমিও গিয়াছে এবং এখানকার জমিও যাইতেছে। পাকিস্থান সরকার অবশ্য এই অবস্থার সুরাহা করিয়া দিয়াছেন যে, যে সকল হিন্দু পাকিস্থান হইতে চলিয়া আসিয়াছে তাহাদের জমি বাজেয়াপ্ত হইয়াছে! কিন্তু ভারতবর্ষে এইরূপ কোনও আইন না করায় পাকিস্থান হইতে আগত হিন্দুরা বিশেষ অসুবিধায় পড়িয়াছে। যে সকল মুসলমানরা ভারতবর্ষে জমি পরিত্যাগ করিয়া পাকিস্থানে চলিয়া গিয়াছিল তাহারা ফিরিয়া আসিয়া আবার তাহাদের পুরানো জমি দখল লইতেছে এবং তাহা সম্ভবপর হইতেছে ভারতবর্ষের আইনে ফাঁক থাকায়। এই ফাঁক কর্ত্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে বহুপূর্ব্বেই বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন। কুচবিহারের মেকেলিগঞ্জ এলাকায় এই অব্যবস্থার জন্ম উদ্বাস্তু হিন্দুরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

ভূমি সংস্কার আইনকে এখনও কার্য্যকরী করা হয় নাই, যদিও ইহা ১৯৫৬ সনে আইনবদ্ধ হইয়াছে। ভূমি সংস্কার আইনকে কার্য্যকরী করিতে না পারার অর্থ যে, কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে এখনও কোন সঠিক নীতি নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। ভূমি সংস্কার আইনকে কার্য্যকরী করিতে গেলেই দুইটি সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন; প্রথমতঃ ব্যক্তিগত মাথাপিছু সর্ব্বোচ্চ জমির পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, এবং দ্বিতীয়তঃ কৃষিপ্রথা কি ভাবে চলিবে তাহাও স্থির করিতে হইবে অর্থাৎ সমবায় প্রথার কি অবস্থা হইবে তাহাও স্থির করিতে হইবে। ভূমি সংস্কার আইনে সমবায় প্রথার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাকে কবে এবং কি ভাবে কার্য্যকরী করা হইবে তাহা এখনও ঠিক হয় নাই। উত্তর প্রদেশে জমিদারী প্রথা বিলোপের ফলে যত উদ্বৃত্ত জমি পাওয়া গিয়াছে তাহার অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমবায় প্রথায় চাষ আবাদ সুরু করা হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিম বাংলায় সরকার কি পরিমাণ উদ্বৃত্ত জমি পাইয়াছেন এবং তাহার পুনর্ব্বণ্টনের কি ব্যবস্থা করিয়াছেন সে সম্বন্ধে জনসাধারণ এখনও ওয়াকিবহাল নহে। তবে বহু কৃষি জমিকে খোসা জমির আখ্যায় ফেলিয়া মালিকরা নিজের অধীনে রাখিতে সমর্থ হইয়াছে; অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মালিকরা কৃষি এবং বাস্তু জমি মিলাইয়া মাথাপিছু ৪০ একর (প্রায় ১২০ বিঘা) করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। এবং বাদবাকী জমি বেনামীতে হস্তান্তর করিয়া প্রকৃতপক্ষে নিজেদের অধীনে রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহার ফলে সরকার উদ্বৃত্ত জমি বিশেষ কিছু পাইতেছেন না এবং সেই কারণে সঠিক ভাবে কোনও ভূমিনীতি অনুসরণ করিতে সক্ষম হইতেছেন না।

ন-র

রেল-যাত্রীদের দুর্ভোগ

ডেলী প্যাসেঞ্জারী যাঁহারা করেন, তাঁহারা জানেন কি দুর্ভোগের মধ্য দিয়া প্রত্যহ তাঁহাদের যাতায়াত করিতে হয়। যুদ্ধ-পূর্ব্বকালে যে ব্যবস্থা ছিল আজ নানা কারণে দেশের অবস্থা বদলাইয়া যাওয়ায় সে-ব্যবস্থা নিশ্চয়ই চলিতে পারে না। আজ বহু উদ্বাস্তু-কলোনী বিভিন্ন স্থানে গড়িয়া উঠিয়াছে। লোকসংখ্যাও অসম্ভব রকম বাড়িয়া গিয়াছে। ইহা রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ যে জানেন না এমন নয় এবং তাঁহাদের অবগতির জন্য এ সম্বন্ধে বহুবার বিভিন্ন সংবাদপত্রে আলোচিতও হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত প্রয়োজনানুরূপ না বাড়াইলেন গাড়ী, না করিলেন সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা।

কলিকাতা শহরে যেসকল তরিতরকারী আসে, তাহার অধিকাংশই আসে দক্ষিণ ও উত্তর অঞ্চল হইতে। কিন্তু উহার জন্য প্রয়োজনীয় ভেণ্ডার-গাড়ী না দেওয়ায় অধিকাংশ যাত্রী-গাড়ীতেই মাল বোঝাই করায় যাত্রীদের দাঁড়াইবার স্থানটুকুও থাকে না। এইসব নানা কারণেই তাহাদের গাড়ীর বাহিরে হাতল ধরিয়া ঝুলিয়া আসিতে হয়। ভেণ্ডারগণের পক্ষ হইতে নাকি বহুবার তাহাদের অসুবিধার কথা রেল-কর্ত্তৃপক্ষের গোচরে আনিয়াও কোন ফল পাওয়া যায় নাই। অবিলম্বে যাত্রী-গাড়ী ও ভেণ্ডার-গাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। আপিসের সময় যাত্রীদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠে। বিশেষ করিয়া মহিলা-যাত্রীদের দুর্ভোগ ভুগিতে হয় অত্যন্ত বেশী। তাঁহারা না পারেন তরকারীর বোঝা ঠেলিয়া ভিতরে যাইতে, না পারেন গাড়ী হইতে নামিতে।

ইহা ছাড়া অনেক অসুবিধাই যাত্রীদের ভোগ করিতে হয়। গাড়ীগুলি প্রায় অব্যবহার্য্য হইয়া আসিয়াছে, আলোগুলির ব্যবস্থাও তদনুরূপ। মধ্যপথে হয়ত আলো নিভিয়াই গেল। চোর, বাটপাড়, পকেটমারের ইহাতে সুবিধাই হইয়াছে। ইহার উপর আছে অনিয়মিত ট্রেন-যাতায়াত। এসবের প্রতিকার কি একেবারেই অসম্ভব? রেলওয়ে যদি সাধারণের সম্পত্তি হয়, তবে সাধারণের সুখ-সুবিধার প্রতি এতটা অবহেলা কেন? যাঁহাদের অর্থ-সাহায্যের উপর এতবড় এক প্রতিষ্ঠানের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে, তাঁহাদের উপেক্ষা না করিয়া আত্মকৃপা করিবেন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমরা ইহাই আশা করি।

গ-স

বিহারে হিন্দী প্রবর্ত্তনে নূতন জুলুম

বিহারে বাংলা ভাষাকে উচ্ছেদ করিয়া, উহার পরিবর্ত্তে বঙ্গভাষা ভাষীদের উপর জোর করিয়া হিন্দী চাপাইয়া দিবার যে অপচেষ্টা চলিতেছে, ইহার প্রতিকারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারেরও দৃষ্টি বহুবার আকর্ষণ করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইহা আরও জটিল আকার ধারণ করিতেছে। সম্প্রতি বিহারের বঙ্গভাষা-ভাষীরা এই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন যে, তাঁহারা এতদিন বিদ্যালয়ে ও আদালতের কাজকর্ম্মে বাংলা ভাষা ব্যবহারের সুবিধা পাইয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু এখন হইতে বিহার গবর্ণমেণ্টের আদেশে বাংলার বদলে হিন্দী ভাষা প্রচলনের ব্যবস্থা হওয়ায়, তাঁহারা গুরুতর অসুবিধার সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছেন। একদিকে যেমন প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দীকেই শিক্ষার মাধ্যম করা হইয়াছে, অপর দিকে তেমনি বাড়ীঘর ও সাধারণ ভূ-সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিলগুলি—যাহা পূর্ব্বে বাংলাতেই লিখিত হইত, আজ তাহা হিন্দীতে লিখিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার মাধ্যম হারাইয়া ঐ সকল অঞ্চলের বাঙালী বালকবালিকাদের শিক্ষা যেমন বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে, বাড়ী ও জমি-সংক্রান্ত দলিলগুলি হিন্দীতে লিখিত হওয়ায়, বাঙালী কৃষক ও সাধারণ গৃহস্থের দুর্ব্বোধ্য হইয়া আর্থিক ক্ষতিরও কারণ হইতেছে। বিশেষ করিয়া একশ্রেণীর দালাল হিন্দী অনভিজ্ঞ কৃষকদের ঠকাইয়া পয়সা রোজগার করিবার ফাঁদ পাতায়, তাহারা আরও বিপন্ন হইয়া পড়িতেছে।

কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্যের ভাষার দিক দিয়া সংখ্যালঘুদের

স্বার্থরক্ষা সম্বন্ধে যতই মুখর হউন না কেন, কার্য্যত কিন্তু বহুস্থানে—বিশেষ করিয়া, বিহার রাজ্যে হিন্দী ভাষার দাপাদাপিতে অহিন্দী-ভাষীরা ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে। অথচ তাঁহারা জানিয়া-শুনিয়া চুপ করিয়া রহিয়াছেন। এ বিষয়ে নবতম যে উদ্যমের কথা শুনা যাইতেছে তাহা আরও ভয়াবহ। বিহার বিশ্ববিদ্যালয় নাকি প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা আইনের একটি ধারার উল্লেখ করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ১৯৬০ সন হইতে সকল পরীক্ষার্থীকেই মাতৃভাষার পরীক্ষা ছাড়া, অন্য সব বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর হিন্দী ভাষায় লিখিতে হইবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্যের বিশেষ অনুমতি লইলে ইংরেজী ভাষাতেও উত্তর-পত্র লেখা যাইবে।

বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অহিন্দীভাষী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা নগণ্য নয়। তাহাদের কাছে এই সিদ্ধান্ত বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতই হইয়াছে। কারণ প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্তরে তাহাদিগকে হিন্দীর মাধ্যমে ইতিপূর্ব্বে শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। বিহার বিশ্ববিদ্যালয় বিপুল-সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া এ নিয়ম কার্য্যে পরিণত করিতে বিরত থাকিবেন, ইহাই আমরা আশা করিব। অন্যথায় তাঁহারা যে শুধু অহিন্দীভাষী ছাত্র-ছাত্র ও তাহাদের অভিভাবকদের মনে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করিবেন তাহাই নহে, হিন্দী ভাষার প্রতিও তাহাদের মনকে বিদ্বিষ্ট করিয়া তুলিবেন। এ কথা বলিলে বোধ হয় অসত্য বলা হইবে না যে, হিন্দী প্রচারের অত্যুৎসাহ ইতিমধ্যেই ভারতের বিপুলসংখ্যক অহিন্দীভাষীকে হিন্দীর প্রতি বিরূপ করিয়া তুলিয়াছে। এই নূতন জুলুমে সেই বিদ্বেষ আরও তীব্র করিয়া তুলিবে মাত্র।

গ-স

শিশু-রক্ষায় আইন প্রবর্ত্তন

ভিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য শিশুহরণ এবং শিশুর অঙ্গ-হানি ঘটাইবার জন্য সারা দেশে একশ্রেণীর সঙ্ঘবদ্ধ অপরাধীর দল সর্ব্বদা তৎপর রহিয়াছে, আদালতের অনেক মামলায় ইহার সত্যতা ধরা পড়িয়াছিল। এতবড় একটি দুষ্কার্য্য আমাদের দেশে অবাধে এতকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে ইহাই আশ্চর্য্য! চলতি কথায় যাহাকে বলে 'ছেলেধরা' ইহা পূর্ব্বেও ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে ইহা এমন ব্যাপক এবং ভীতিপ্রদ আকার ধারণ করিয়াছে, যাহাতে সমাজ-জীবন প্রায় বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

শুনা যাইতেছে, রাষ্ট্রপুঞ্জের শিশু-সংস্থার পক্ষ হইতে সম্প্রতি শিশুর মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে একটি খসড়া রচিত ও প্রচারিত হইয়াছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের শিশু-সংস্থা এ বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক কোড বিহিত করিবার জন্যও উদ্যোগী হইয়াছেন।

শিশু-রক্ষার এরূপ ব্যবস্থা ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্রই আছে, নাই কেবল অভাগা ভারতবর্ষের। লোকসভায় শিশুর সুরক্ষা সম্বন্ধে যে বিল উত্থাপিত ও আলোচিত হইয়াছে তাহা অবশ্যই সাধারণভাবে শিশুর মৌলিক অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি বহন করে না। ইহা মূলতঃ একটি ভয়ানক সমাজ-বিরোধী অনাচার দমনের জন্য আইন প্রণয়নের প্রয়াস। মন্দের ভাল। অন্ততঃ শিশু-রক্ষার একটা দায়িত্ব সরকারের আওতায় আসিবে। ভিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য শিশুহরণ এবং শিশুর অঙ্গহানি ঘটাইবার জঘন্য প্রথা দমন করিবার জন্য এই বিলে বিভিন্ন মেয়াদের দণ্ড প্রস্তাবিত হইয়াছে। শিশুহরণের জন্য দশ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং শিশুর অঙ্গহানি ঘটাইবার জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চূড়ান্ত শাস্তি হিসাবে প্রস্তাবিত হইয়াছে।

সকলেই জানেন, এই কারবার যাহারা চালায়, তাহার পিছনে একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। তাহারা ধনী এবং পদস্থ। এ ব্যবসা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে—পরাধীন ভারতেও ছিল, স্বাধীন ভারতে ইহা আরও ব্যাপক এবং বেপরোয়া হইয়াছে। স্বরাষ্ট্রদপ্তরের সহকারী মন্ত্রী শ্রীমতী আলভা স্বীকার করিয়াছেন যে, এই বিল আরও আগে উত্থাপিত হওয়া উচিত ছিল, একটু দেরি হইয়া গিয়াছে। অথচ কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতের বিভিন্ন মহিলা সমিতি, শিশুকল্যাণ-সংস্থা এবং নাগরিক সমিতির সম্মেলনে শিশু-জীবনের এই নির্ম্মম বিপদ সম্পর্কে বহু আলোচনা হইয়াছে এবং সরকারকে ব্যবস্থা অবলম্বনে তৎপর হইবার অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও বিল উত্থাপনে সরকারের আলস্য ঘুচিতে কয়েকটি বৎসর সময় লাগিয়াছে। অথচ ইহা এমন কোন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের বিল নহে, যাহার জন্য বিপুল পরিমাণের অর্থব্যয়ের কোন প্রশ্ন দেখা দিতে পারে—তাহা হইলেও না হয় দুশ্চিন্তার কারণ থাকিত। অথচ, আজ বলিতে বাধ্য হইতেছি, ব্রিটিশ আমলে পশুক্লেশ-নিবারণী সমিতি পশুর উপর নির্ম্মমতার আচরণ দমন করিবার জন্য সরকারকে দিয়া যে-ধরনের রক্ষামূলক আইন সহজেই প্রবর্ত্তন করাইয়া লইতে পারিয়াছিলেন, স্বাধীন ভারতের বারো বৎসরের জনমত শিশু-মানুষের প্রাণের নিরাপত্তার জন্য সে-ধরনেরও কোন রক্ষামূলক আইন প্রবর্ত্তন করাইয়া লইতে পারে নাই। এই সেদিনও কলিকাতায় এক শিশুর অঙ্গহানি করিয়া তাহাকে ভিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করিবার অপরাধে বয়স্ক ভিক্ষুকের মাত্র দুই বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। আরও লঘুদণ্ড হইয়াছে, এমন ঘটনা বিরল নহে। যাহা হউক, শেষ পর্য্যন্ত সরকার যে সমস্যার প্রতিকারে কঠোর দণ্ড দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহাতে জনসাধারণ অবশ্যই কিছুটা আশ্বস্ত হইবে।

তবে একটা কথা আমাদের বলিবার আছে। ভিক্ষা-প্রথার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ না হওয়া পর্য্যন্ত এই ধরনের অপরাধের বিলোপসাধন হইবে কিরূপে? ভিক্ষা যতদিন অর্থকরী বৃত্তি হিসাবে প্রচলিত থাকিবার সুযোগ পাইবে ততদিন পর্য্যন্ত শিশুকে দিয়া ভিক্ষা করাইবার প্রয়োজনাও থাকিবে। ভিক্ষা-বৃত্তি বে-আইনী করা বা না-করা নাকি রাজ্যসরকারের ইচ্ছাধীন কর্ত্তব্য। ইহাতেই আশঙ্কা থাকিয়া যাইতেছে, আলোচ্য বিলের উদ্দেশ্য ততদিনই সফল হইবে না, যতদিন না সরকার এই ভিক্ষা-বৃত্তির নিরোধ সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন।

ইহা ছাড়া আরও অনেক প্রশ্ন আছে। অনেক পিতামাতা শিশুকে ভিক্ষাকার্য্যে নিয়োজিত করেন, তাঁহারা এই আইনের আওতায় পড়িবেন কিনা? যাহা হউক, এই ভিক্ষা-ব্যবসায়ের মহাজন হইয়া ও আড়ালে থাকিয়া এবং অনেকক্ষেত্রে পুলিসেরই পৃষ্ঠপোষকতায় এই খেলা খেলিতেছেন, তাহাদের উচ্ছেদ সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন—সেখানে না আর এক খেলা চলে এ বিষয়ে সরকারকে সতর্ক থাকিতে বলি।

গ-স

পণ-প্রথা নিবারণী বিল

লোক সভায় পণ-প্রথা নিবারণী বিলের একটি খসড়া উপস্থাপিত করা হইয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছিল, নগদ টাকা এবং গহনার দাবি করা ত চলিবেই না, উপরন্তু উপহারের নামে কোন কিছু দেওয়াও অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। এই বিলটি বিবেচনার জন্য এতদিন লোকসভায় রক্ষিত ছিল। সকলেই জানেন, এই পণ প্রথার ভারে কত সমাজ-জীবন ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। আইন করিয়া কত তুচ্ছ জিনিস বন্ধ করা হইতেছে, অথচ যে-বিষ সমাজ-জীবনকে কুরিয়া কুরিয়া খাইতেছে, তাহার প্রতিরোধমূলক কোন ব্যবস্থাই আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। বর্ত্তমানে এই বিল উপস্থাপিত হওয়ায়, দরিদ্র কন্যার পিতারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতেছিলেন। কিন্তু এখন শুনা যাইতেছে, ঐ বিলটির মধ্যেও তাঁহারা ফাঁক রাখিতেছেন। এই ফাঁকটি হইতেছে—বিবাহে যে ধরনেরই উপহার দেওয়া হউক না কেন, তাহার মূল্য বা খরচ সম্পর্কে কোন বাধা-নিষেধ থাকিবে না। এই "যে ধরনেরই উপহার হউক না কেন" কথাটির তাৎপর্য্য তিনি ব্যাখ্যা করেন নাই। ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, নগদ টাকার আকারে উপহার দিলেও এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে। সুতরাং পণ-প্রথা নিবারণী আইন পাস হইলেও শেষ পর্য্যন্ত পণ, যৌতুক ও উপহারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের কোনও বাধ্যবাধকতা থাকিবে না। কথায় ও কাজে এমন আসমান-জমিন ফারাকের দৃষ্টান্ত অন্যান্য উন্নত দেশে বিরল! যাহা হউক, সে আক্ষেপ করিয়া কোন লাভ নাই। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে যে, বিবাহের সময় নগদ পণ কিম্বা উপহার ও যৌতুকের মাধ্যমে পাত্রী পক্ষের উপর দুর্ব্বহ চাপ হ্রাস করা যদি সম্ভব না হয়, তাহা হইলে, এই "পণপ্রথা নিবারণী আইন" পাস করারই বা কি সার্থকতা? একটা মন-ভুলান নাম দিয়া জনসাধারণের মনে উচ্চাশা সৃষ্টি করা হইতেছে—অথচ, সে আশা পূরণের উপযোগী ব্যবস্থা আইনে থাকিবে না, ইহা অপেক্ষা অশোভন ব্যবস্থা আর কি হইতে পারে? নগদ টাকার দাবী না করিয়া যৌতুক হিসাবে যদি কেহ একশতখানি গিনি এবং মূল্যবান আসবাবপত্র চাহিয়া বসেন, অথবা পুত্র ডাক্তার হইয়া বাহির হইবে, তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়োজনীয় যাবতীয় সরঞ্জাম প্রার্থনা করেন, তবে ত তাহা উত্থাপিত বিলের পণ-আইনে পড়িবে না। দাবী-দাওয়ার চরম সুযোগ এই ছিদ্রপথেই রহিয়া যাইতেছে। অথচ এই হাস্যকর বিলই সরকারের হাত দিয়া পাস হইয়া গেল। দুঃখ করিয়া লাভ নাই, ইহাই বোধহয় গণতন্ত্র!

গ-স

'পশ্চিমবঙ্গ' নামের অযৌক্তিকতা

পশ্চিমবঙ্গ পুলিস সরকারের কাছে এই প্রস্তাব করিয়াছেন যে, 'পশ্চিমবঙ্গ পুলিস' এই নামের পরিবর্ত্তে কেবল 'বঙ্গ' কিংবা 'বেঙ্গল পুলিস' এই নাম করা হউক। তাঁহারা যুক্তি দেখাইয়াছেন, 'পূর্ব্ববঙ্গ' এই নাম কোন দেশের জন্য সরকারী ভাষায় যখন ব্যবহৃত হইতেছে না, বরং উহার পরিবর্ত্তে পূর্ব্ব-পাকিস্থান শব্দ ব্যবহার করা হইতেছে, তখন 'ওয়েষ্ট বেঙ্গল' নামের কোন আবশ্যকতা অথবা যৌক্তিকতা নাই। পঞ্জাব বিখণ্ডিত হইবার পর উহার দুই অংশের জন্য 'পশ্চিম পঞ্জাব' ও 'পূর্ব্ব পঞ্জাব' নাম সরকারী ভাষায় ব্যবহৃত হইতেছে না। 'পশ্চিম পঞ্জাব' নাম উঠিয়া যাওয়ায় পঞ্জাবের ভারতস্থিত অংশকে কেবল 'পঞ্জাব' বলা হইতেছে। সেইরূপ 'পশ্চিমবঙ্গ' নামের বদলে কেবল 'বেঙ্গল' শব্দই বা ব্যবহার করা হইবে না কেন? আমাদের মনে হয়, পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের এই নাম পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত। যাহার পূর্ব্ব নাই, তাহার পশ্চিমও থাকার কোন হেতু নাই। তবে যদি কেহ মনে করেন যে, ভবিষ্যতে কোনদিন যদি 'পূর্ব্ব-পাকিস্থান'কে 'পূর্ব্ব-বঙ্গ' করা হয়, তখন 'পশ্চিমবঙ্গ' নামেরও সার্থকতা উপস্থিত হইবে। কিন্তু সেদিন কোনকালে আসিবে এমন ভরসা কেহ দিতে পারে না। তথাপি যদি সত্যই সুদূর ভবিষ্যতে সেরকম সময় উপস্থিত হয় তবে এখানকার 'বঙ্গ'কে 'পশ্চিমবঙ্গ' করা অথবা উহাকে আরও বর্দ্ধিত আকারে প্রদর্শন করা অসম্ভব হইবে না। 'পূর্ব্ব-পঞ্জাব'কে শুধু 'পঞ্জাব' করিবার বিষয়ে যে যুক্তি, 'পশ্চিমবঙ্গ'কে 'বঙ্গ' কিংবা 'বেঙ্গল' করিবার সম্পর্কেও সেই একই যুক্তি।

কিন্তু যুক্তি যাহাই থাক, সরকারের যুক্তি অন্য পথ ধরিয়া চলে। তাহা না হইলে সরকারই ইহার অযৌক্তিকতা বহুদিন আগেই উপলব্ধি করিতে পারিতেন।

গ-স

ডাকাতের দলে গ্রাজুয়েট শিক্ষক

১৪ই নবেম্বরের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ পরিবেশিত হইয়াছে। সংবাদটি এইরূপ: "১১ই নবেম্বর বুধবার রাত্রে নর্দার্ণ রেলওয়ের বারাণসী-এলাহাবাদ সেক্‌সনে ফুলপুর ষ্টেশনের নিকট দিল্লীগামী এক ট্রেনে যে দুঃসাহসিক ডাকাতি হয় সেই সম্পর্কে ধৃত আসামীদের মধ্যে দুইজন গ্রাজুয়েট ও কানপুরের অধিবাসী বলিয়া জানা গেল।

তাহাদের মধ্যে একজন কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষক, অপরজন পূর্ত্তবিভাগের কর্ম্মচারী। আসামীগণ কাকামাউ ষ্টেশনে অবতরণের পূর্ব্বে যাত্রীদের হাত-পা বাঁধিয়া রাখিয়াছিল এবং শ্রীবিশ্বাস নামে এক ব্যক্তিকে পায়খানার মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছিল। ট্রেন কাকা-

মউ ষ্টেশনে থামিলে পাশের কামরার যাত্রীগণ আর্তনাদ শুনিয়া উক্ত যাত্রীদের বাঁধন খুলিয়া দেন।"

পুলিসে সংবাদ দেওয়া হইলে গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিস সারা-রাত্রি ঐ অঞ্চলে তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাসী চালায়। অনুসন্ধানরত একদল পুলিস শেষ রাত্রিতে কাঙ্কামাউ সেতুর নিকটে আসামীদিগকে গ্রেপ্তার করে।

এই সংবাদটি সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। চুরি, ডাকাতি, খুন প্রভৃতি যাহারা করে, তাঁহারা প্রায়ই অশিক্ষিত বেকার। তাঁহাদের এইরূপ আচরণের অর্থ হয়ত একটা কিছু করা যাইতে পারে, কিন্তু শিক্ষিত গ্রাজুয়েট—বিশেষ করিয়া স্কুলের শিক্ষকদের এই মনোবৃত্তি কি করিয়া আসে? অভাবের তাড়নায় এইরূপ অসৎ কার্য্য নিশ্চয়ই কারণ নয়। শুনা যায় এরূপ কার্য্য অনেকে স্বভাবে করে। ইহাদের সম্বন্ধে সেকথাও বলা চলে না। কারণ তাঁহারা দীর্ঘদিন ধরিয়া শিক্ষকতা করিয়া আসিতেছেন।

কারণ যাহাই হউক, যাঁহাদের ধর্ম্ম কল্যাণ-ধর্ম্ম, যাঁহাদের উপর লক্ষ লক্ষ সন্তানের শিক্ষা, দীক্ষা, আচার-আচরণের গুরু দায়িত্ব রহিয়াছে, যাঁহারা ভবিষ্যৎ বংশধরদের চরিত্র গড়িয়া তুলিবার কাজে নিযুক্ত—এককথায়, যাঁহাদের হাতে আপন আপন সন্তানদের তুলিয়া দিয়া পিতামাতা নিশ্চিন্ত আছেন, তাঁহাদের এতবড় পতন শুধু নিন্দনীয় নয়, অমার্জ্জনীয় অপরাধ। বিচারে এই অপরাধীদের চরমদণ্ড দেওয়া উচিত।

গ-স

দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ-বিদ্বেষ

দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গ নির্য্যাতন আজ নূতন নহে। মহাত্মা গান্ধীও এই কারণে সত্যাগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, গান্ধীজীর একপুত্র প্রাণও দিয়াছেন, কিন্তু এই বর্ব্বর আচরণের কিছুমাত্র প্রশমিত হয় নাই। এই নির্য্যাতন-নীতির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য আমেরিকা ও ইউরোপের অনেক রাষ্ট্র মৌখিক প্রতিবাদ জানাইলেও, কোন শ্বেতাঙ্গ-রাষ্ট্র দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ক্রিয়াত্মক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। কিন্তু পি, টি আই কর্ত্তৃক লণ্ডন হইতে প্রেরিত এক সংবাদে দেখা যাইতেছে যে, ইংলণ্ডে দক্ষিণ আফ্রিকার এই কৃষ্ণাঙ্গ-বিদ্বেষ-নীতির বিরুদ্ধে কেবল ব্যাপক আন্দোলনই আরম্ভ হয় নাই, দক্ষিণ আফ্রিকার বাণিজ্য-দ্রব্য বয়কট করার ব্যবস্থাও ঐ সঙ্গে শুরু হইয়া গিয়াছে। লণ্ডন প্রবাসী দুইজন দক্ষিণ আফ্রিকার লোক এই বয়কট আন্দোলনে যোগ দিবার জন্য ব্রিটিশ জাতির কাছে আবেদন জানাইয়াছেন। ইহাদের একজন হইতেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকার ন্যাশনাল কংগ্রেসের সভ্য। এই প্রতিষ্ঠানটি অশ্বেতাঙ্গদের প্রতিনিধি সভা। অপর লোকটি দক্ষিণ আফ্রিকার লিবারেল পার্টির সদস্য। ইহাও শ্বেতাঙ্গ প্রতিষ্ঠান। তাঁহাদের এই আবেদনে সাড়া পাওয়া গিয়াছে।

বয়কট আন্দোলন আপাততঃ যদিও কেবল কিছুসংখ্যক ছাত্র ও শ্রমিক, লিবারেল দল ও খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার সমিতিসমূহের সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে, তথাপি ক্রমেই উহা বিস্তার লাভ করিতেছে এবং বৃহত্তর শ্রমিক সঙ্ঘ, ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিল, সমবায় সমিতি এবং সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিও বয়কট আন্দোলনে যোগ দিবে এরূপ আশা করা যাইতেছে। বয়কট আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য জনসভা, শোভাযাত্রা, পিকেটিং প্রভৃতির আয়োজনও করা হইতেছে। মোটের উপর লণ্ডন ও নিকটবর্ত্তী অঞ্চলসমূহে দক্ষিণ আফ্রিকার জিনিসপত্র বয়কট দ্বারা কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্বেষ-নীতির যে ক্রিয়াত্মক প্রতিবাদের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে, উহা সাফল্যমণ্ডিত হইলে, দক্ষিণ আফ্রিকার উপর যথেষ্ট চাপ পড়িবে এবং ব্রিটেনের দৃষ্টান্ত যদি অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ-দেশেও অনুসৃত হয়, তবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হয়ত বাধ্য হইয়া এই কালা-বিদ্বেষ-নীতি ত্যাগ করিতে হইবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘে বৎসরের পর বৎসর কেবল মৃদু মৌখিক প্রতিবাদ-স্বরূপ প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করিয়া রাখার পরিবর্ত্তে লণ্ডনের এই পদ্ধতি অধিক কার্য্যকরী হইবে ইহা বলাই বাহুল্য।

গ-স

বাস দুর্ঘটনার কারণ ও তাহার প্রতিকার

যানবাহনের সমস্যা আজ মানুষকে সকল দিক দিয়াই বিব্রত করিয়াছে। লোক-সংখ্যা অধিক হইয়াছে সত্য, কিন্তু তদনুরূপ গাড়ীর সংখ্যা বাড়ান হয় না কেন? মানুষ যেন আজ মানুষ নয়! কোনরূপে ঠাসা-মালের মত তাহাদের গাড়ীতে বোঝাই করিয়া দিলেই হইল। তাহাতেও যখন কুলায় না, তখন পা-দানীতে ঝুলন্ত অবস্থায় নতুবা গাড়ীর ছাদে গিয়া মানুষ আশ্রয় লয়। ট্রামে-বাসে-রেলগাড়ীতে পর্য্যন্ত এই একই অবস্থা। অথচ এই অবস্থা যে চালু রাখা কোনক্রমেই উচিত নয়, ইহা গাড়ীর মালিকও বুঝিতে চাহেন না, আমাদের সরকারও এ বিষয়ে দৃষ্টি দেন না। এই অবাঞ্ছিত ভিড়ের চাপে প্রত্যহ কত যে প্রাণ বিনষ্ট হইতেছে তাহারও সীমা-পরিসীমা নাই। শুধু কলিকাতাতেই নয়, এই অবস্থা মফঃস্বলেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জীবন-যাত্রায় মানুষের সমস্যার চাপ নানা দিক হইতেই আসিয়াছে, উহার মধ্যে যানবাহন-সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। একটি ভয়াভহ বাস দুর্ঘটনা সম্প্রতি রামপুরহাটে ঘটিয়াছে। এই দুর্ঘটনার কারণ আর কিছুই নয়, যাত্রীদের সংখ্যাধিক্য। বাসের মধ্যে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় তিনজনকে ছাদে উঠিতে হইয়াছিল। তার পর বাসটি যখন এক বট গাছের তলা দিয়া যাইতেছিল, ছাদের উপরে অবস্থানকারী ব্যক্তিদের সঙ্গে তখন বৃক্ষশাখার সংঘর্ষ ঘটে। সংবাদটি মর্ম্মান্তিক। কিন্তু এমন কথা বলিয়া কোনও লাভ নাই যে, জীবন যেখানে বিপন্ন হইতে পারে, বাসের উপরে না ওঠাই সেখানে উচিত ছিল। লাভ নাই এই কারণে যে, সখ করিয়া কেহ ছাদে ওঠে না—বাসের মধ্যে জায়গা মেলে না বলিয়াই ছাদে উঠিতে বাধ্য হয়। বলা

বাহুল্য, যাত্রীদের উপদেশ দিয়া এই মর্ম্মান্তিক অবস্থার প্রতিকার করা যাইবে না। দেখিতে হইবে, বাসের মালিকদের লোভ যেন সীমা না ছাড়াইয়া উঠে এবং যাত্রীদের নিরাপত্তার দিকেও যেন তাঁহারা লক্ষ্য রাখিতে বাধ্য হন। কিছুদিন আগে আন্দুলের একটি খবর বাহির হইয়াছিল, তাহা পড়িয়া বোঝা যায়, বাসের মালিক বা কর্ম্মকর্ত্তারা মানুষকে মানুষ বলিয়াই গণ্য করেন না। যতজন যাত্রী উঠাইলে স্বাভাবিক হয়, বেশী আয়ের লোভে তাহার তিন গুণ যাত্রীকেও অনেক সময় বাসে উঠানো হইয়া থাকে।

এই অতিরিক্ত আয়ের লোভটাকেই প্রতিহত করা দরকার। ইহার জন্ত এমন গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা করা উচিত, বাসের কণ্ডাক্টর যাহাতে কোনক্রমেই আর নির্দ্ধারিত সংখ্যার অতিরিক্ত যাত্রীকে বাসে তুলিতে সাহসী না হয়। সেই সঙ্গে, জনসাধারণের প্রয়োজনের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া, বাসের সংখ্যাও যে আরও বাড়াইতে হইবে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

গ স

দেব-দেবীর নামে খেলা

'শিব গড়িতে বানর' বলিয়া আমাদের দেশে একটি কথা আছে। ঠিক অনুরূপ বানর না হইলেও, দেব-দেবীর মূর্ত্তি-গঠনকার্য্যে যে বিকৃত রুচির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহা আপত্তিকর। ধর্ম্ম-বিশ্বাস সকলের সমান নহে, কিন্তু তাই বলিয়া ধর্ম্মে আঘাত করিতে হইবে এই বা কেমন কথা! ইহা ধর্ম্মের প্রতি নিষ্ঠার কথাও নয়, অনুরাগের কথাও নয়—যাঁহাকে শ্রদ্ধা করা যায়, তাঁহার গায়ে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করা কেহই সহ্য করিবে না। যখন দেখি, দেবী-মূর্ত্তির মুখে কোনও অভিনেত্রীর মুখের আদল আঁকিয়া দেওয়া হইয়াছে অথবা দেবমূর্ত্তির হাতে ঘড়ি আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে—শুধু ধর্ম্মনিষ্ঠ মানুষ নহে, আপন দেশের ঐতিহ্য সম্পর্কে এই নির্ব্বোধ তাচ্ছিল্য দেখিয়া সকলেই লজ্জায় অধোবদন হইবেন। তাচ্ছিল্য যাহারা দেখায়, কালাপাহাড়ের তুলনায় তাহাদের আচরণ কিছু কম নিন্দনীয় নহে। কালাপাহাড় ছিল মূর্ত্তিনাশক। তার একটা অর্থ পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক কালের কালাপাহাড়রা মূর্ত্তি ভাঙেন না, মূর্ত্তি বিকৃত করেন। সে আরও ভয়ানক। ইহা কি পরিহাস? 'কলির কার্ত্তিক'-এর যে একটি নব্য মূর্ত্তির আলোক-চিত্র সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই মূর্ত্তির মধ্যেও ঠিক এই ধরনেরই একটা পরিহাস আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। এ পরিহাস শুধু নির্বুদ্ধিতা নহে, কু-রুচিরও পরিচায়ক। আমাদের বলিবার কথা এই যে, বিকৃত এই রুচির নেতৃত্ব কোথা হইতে আসে, তাহাও এখন ভাবিয়া দেখিতে হইবে। দুর্গাপূজার প্রাক্কালে এমন কিছু কিছু লেখা চোখে পড়ে, দেব-দেবীদের লইয়া কিছু ঠাট্টা করাই যাহার অন্যতম উদ্দেশ্য। ঠাট্টাটা নির্দ্দোষ হইতে পারে, কিন্তু রচনার পাত্র-পাত্রী যেখানে দেব-দেবী, আলোচনার ভাষা এবং ভঙ্গিতে কোনও তারল্য সেখানে শোভা পায় না।

গ-স

জাল পাসপোর্ট-ভিসার কারখানা আবিষ্কার

শুনা যাইতেছে, পাসপোর্ট-ভিসাবিহীন অসংখ্য পাকিস্থানী মুসলমান এদেশে বসবাস করিতেছে। সংবাদ অবশ্য নূতন নহে। সরকারও ইহা অবগত আছেন, কিন্তু ইহার প্রতিকার কিছু করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। এই পাকিস্থানীরা নানা ছুতায় কেহ ব্যবসায়ে, কেহ চাকুরি লইয়া এখানে অবস্থান করিতেছে। ইহাদের অনেকে স্বজাতিদের গৃহে বা নাম ভাঁড়াইয়া, পরিচয় গোপন করিয়া অন্যত্র বাস করিতেছে। ইহাদের অনেক গোপন তথ্যও মাঝে মাঝে প্রকাশ হইয়া পড়ে। জানা গিয়াছে, ইহারা কোন কোন রাজনৈতিক দলের আশ্রয়ে পুষ্ট। ইহাদের পাসপোর্ট-ভিসা সংগ্রহ করিতে বেগ পাইতে হয় না। বিনা পাসপোর্টেও তাহারা অবাধে চলিয়া আসিতেছে। এই পাসপোর্ট-ভিসা জালের কারখানাও সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাণাঘাট, কুপার্স উদ্বাস্তু ক্যাম্পে এই জাল-কারখানাটি অবস্থিত। সম্প্রতি চারজন নাকি মালপত্রসহ ধরা পড়িয়াছে। একটির সন্ধান মিলিয়াছে বটে, কিন্তু কে বলিতে পারে এরূপ জাল-কারখানা আমাদের দেশে আর কতগুলি আছে?

কিন্তু কারখানা আবিষ্কার হইতেও বেশী প্রয়োজন বে-আইনী-ভাবে এই রাজ্যে অবস্থিত পাকিস্থানীদের সন্ধান করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা ও তাহাদের অপসারিত করা। এবং ভবিষ্যতে আর যাহাতে এরূপ ভাবে কেহ প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা। আজ পররাষ্ট্রের দ্বারা দেশ আক্রান্ত, এরূপ অবস্থায় কোন বিদেশীরই এখানে অবস্থান নিরাপদ নহে, ইহা সরকারকে স্মরণ রাখিতে বলি।

গ-স

রাজ্যসভায় চীন বিতর্ক

প্রথম দিনে পণ্ডিত নেহরু বলেন:

শ্রীনেহরু বলেন, এখন দুই দিক দিয়া প্রশ্নটি বিবেচনা করা যাইতে পারে: প্রথমতঃ এই সভা বিষয়টি পুনরায় বিবেচনা করিয়া সরকারের নীতি সম্পর্কে ইহার মত প্রকাশ করিতে ও পরামর্শ দিতে পারেন; দ্বিতীয়তঃ ঐ নীতি কার্য্যকরী করার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে সে সম্পর্কে প্রস্তাব করিতে পারেন। এ সম্বন্ধে পরিষ্কার চিন্তা করা দরকার।

বর্ত্তমানে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহা অত্যন্ত জটিল এবং এই লইয়া জনসাধারণের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই ভাবাবেগের সঞ্চার হইয়াছে। কিন্তু এই কারণেই অনুসৃত নীতি ও তাহার রূপায়ণের ব্যাপারে শান্তভাব বজায় রাখা ও পরিষ্কার চিন্তা করা দরকার। এই রূপায়ণের অনেক দিক আছে, যেমন সামরিক। কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হইল প্রতিরক্ষার জন্য দেশের শক্তি বৃদ্ধি করা।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত যে নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেছে,

তাহা গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতার নীতি, অর্থাৎ দেশকে কোন সামরিক গোষ্ঠীর সহিত যুক্ত না করার নীতি। "আমরা যখন আমাদের নিজেদের সীমান্তের গুরুতর বিপদের সম্মুখীন, তখন আমাদের এতকালের অনুসৃত নীতিই পৃথিবীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সাফল্যমণ্ডিত হইতেছে এবং সম্ভবতঃ পৃথিবী আজ সাধারণভাবে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসান ও সামরিক গোষ্ঠী বিলোপের দিকে চলিয়াছে।

"ইহা আপাতবিরোধী মনে হইতে পারে। কিন্তু আমি বলিতেছি, অতীতে আমরা যে নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছি তাহা যথার্থ এবং আজও যথার্থই আছে। তবে পরিস্থিতি অনুযায়ী সেই নীতিকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইতে পারে।"

চীনের সহিত আমাদের সম্পর্ক বর্তমান মুহূর্তে শান্তিপূর্ণ নহে, এবং অন্ততঃ এইটুকুর বিচারে এই নীতি ব্যর্থ হইয়াছে বলা যায়। কিন্তু তাহার কতকগুলি কারণ রহিয়াছে। "আমরা মনে করি ইহার জন্য দায়ী চীন সরকারের কার্য্য এবং সম্প্রসারণমূলক ও আক্রমণাত্মক মনোভাব। কার্যতঃও তাহারা আমাদের এলাকা লঙ্ঘন করিয়াছে তাহার জবাব আমাদিগকে দিতে হইবে, কিন্তু মূলনীতির সহিত তাহার সম্পর্ক টানা চলে না।"

শ্রীনেহরু বলেন যে, তিনি এই বিষয়ে পার্লামেন্টের সুস্পষ্ট নির্দেশ চাহেন। কারণ, শেষ পর্যন্ত পার্লামেন্টের সিদ্ধান্তই বহাল থাকিবে। পার্লামেন্ট যাহা সিদ্ধান্ত করিবে, সরকারকে তাহা অনুসরণ করিতে হইবে। যদি সরকার তাহা অনুসরণ করিতে পারেন ভাল, তাহা না হইলে অন্য সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া পার্লামেন্টের নীতি কার্য্যকরী করিবেন। তবে সামরিক ক্ষেত্রে কি নীতি প্রয়োগ করা হইতেছে, পার্লামেন্টে তাহার সবিশেষ আলোচনা সম্ভব নহে।

শ্রীনেহরু বলেন যে, নীতি কার্য্যকরী করার প্রশ্ন উঠিলে একমাত্র নীতির সামরিক দিক কার্য্যকরী করার প্রশ্ন উঠে। আজকাল দেশের কারিগরি ও শিল্পোন্নতির উপরই প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা নির্ভর করে। সমগ্র পৃথিবী তাহা জানে। সুতরাং কেবল সৈন্যদলে নূতন লোক ভর্ত্তি করিলেই যুদ্ধের প্রস্তুতি হয় না। এজন্য কারিগরি ও শিল্পের প্রসার আবশ্যক। তাহা না হইলে সামরিক দিক হইতে দেশ দুর্ব্বল বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, স্বাধীনতা লাভের পর হইতেই সরকার এই বিষয়ে মনোযোগী আছেন। যদি কোন সদস্য মনে করেন যে, পঞ্চশীলের মোহে সরকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রতি উদাসীন ছিলেন, তাহা হইলে তিনি ভুল করিবেন। সরকার অনেক ভুলভ্রান্তি করিয়াছেন, কিন্তু দেশরক্ষা সম্পর্কে কখনও অমনোযোগী থাকেন নাই।

শ্রীনেহরু বলেন, "তবে আমি আপনাদের নিকট একটি স্বীকারোক্তি করিতেছি। চীন আমাদের দেশ আক্রমণ করিবে, তাহা আমরা কখনও ভাবিতে পারি নাই।"

শ্রীনেহরু বলেন যে, যে অশান্তি দেখা দিয়াছে তাহা স্বল্পস্থায়ী নয়। এই সত্য সকলকেই উপলব্ধি করিতে হইবে। ইহা দীর্ঘস্থায়ী ব্যাপার। আমরা যাহাই ভাবি না কেন ভৌগোলিক সত্য উপেক্ষা করিতে পারি না। ভারত ও চীন প্রতিবেশী রাষ্ট্র। উভয়ের সীমান্ত হাজার হাজার মাইল দীর্ঘ। এই সীমান্ত বহাল থাকিবে। এই দুইটি রাষ্ট্র এখনও যেমন প্রতিবেশী, ভবিষ্যতেও তেমনি প্রতিবেশী থাকিবে। কোন রাষ্ট্রই তাহার ভৌগোলিক সীমারেখা হইতে সরিয়া যাইবে না। সুতরাং ভারতকে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার বিষয় ভাবিতে হইবে। তিনি আরও বলেন যে, স্বল্পমেয়াদী অবস্থা হইতেই দীর্ঘমেয়াদী অবস্থা আসে। সুতরাং স্বল্পমেয়াদী প্রশ্নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

শ্রীনেহরু বলেন যে, কারিগরি উন্নতির বিষয় ভাবিতে হইবে। দেশকে একটা চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইতেছে বলিয়া প্রকৃত অবস্থাকে উপেক্ষা করা যাইবে না। শুধু অবস্থার প্রতিকারের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে চলিবে না। ব্যবস্থার ফল ভবিষ্যতে কি হইবে তাহাও ভাবিতে হইবে। ভবিষ্যৎ বলিতে কেবল দেশের কারিগরি ও শিল্পোন্নতি বুঝাইতেছে না। অন্যান্য দেশের সহিত সম্পর্কের বিষয়ও বুঝাইতেছে।

শ্রীনেহরু আরও বলেন যে, অন্য দেশের সহিত মৈত্রী স্থাপনের বিষয়ে ভারতের নীতি ফলপ্রসূ হইয়াছে। তিনি বলেন, "সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, আমরা হিন্দী-চীনি ভাই ভাই বলিয়া মাতিয়া উঠিয়াছি। কিন্তু বাস্তবকে উপেক্ষা করিয়াছি। হিন্দী-চীনী ভাই ভাই বলিয়া প্রকৃতপক্ষে কে রব তুলিয়াছিল, আমি জানি না। কিন্তু যিনিই করুন, তিনি ভালই করিয়াছেন। কারণ, সকল দেশের প্রতিই আমাদের এইরূপ মনোভাব থাকা উচিত। যিনিই আসুন, তিনি ভাই-এর মতই আসেন। অবশ্য কিছু বাড়াবাড়ি হয়, এবং ভুলও হয়। ইহাই বেদনাদায়ক। তবে বন্ধুত্বের মনোভাবই ঠিক মনোভাব। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সতর্ক থাকিতে হইবে, এবং দেশরক্ষা-ব্যবস্থা শক্তিশালী করিতে হইবে। কিন্তু সতর্ক না থাকিয়া বন্ধুত্বের হাত বাড়াইলেই বিপদে পড়িতে হইবে। সে বিপদ মহাবিপদ। কারণ, সে বিপদে যে কোন কিছু ঘটিতে পারে।"

পাশ্চাত্যে অস্ত্রশস্ত্রের যে উন্নতি হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া শ্রীনেহরু বলেন যে, ইতিহাসের এমন একটি অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে, যেখানে লড়াই অথবা ঠাণ্ডা লড়াই ঘৃণার বস্তু হইয়াছে। প্রত্যেকেই যুদ্ধ এড়াইতে চায়।

শ্রীনেহরু বলেন, "যুদ্ধ অপেক্ষা শান্তি ভাল। যুদ্ধ অত্যন্ত নিন্দার্হ, কিন্তু যদি দেশের মান-মর্য্যাদা ও স্বাধীনতার উপর আক্রমণ হয়, তাহা হইলে প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিয়াই দেশরক্ষা করিতে হইবে।"

শ্রীনেহরু বলেন যে, চীন অথবা অন্য কোন দেশ কি করিবে,

তাহা তাঁহার বিচার্য্য নয়। তাঁহার বিচার্য্য বিষয়, তাঁহার নিজের দেশের অভিমত কি?

তিনি বলেন যে, মানুষ এখন এক অসাধারণ অবস্থার মধ্যে বাস করিতেছে। বিজ্ঞানের নূতন নূতন গবেষণা হইতেছে। পুঁজিবাদ অথবা কম্যুনিষ্ট মতবাদ পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে।

বিতর্কের শেষে পণ্ডিত নেহরুর বক্তৃতা:

তিনি বলেন, এই প্রথম এশিয়ার দুইটি বৃহৎ শক্তি—ভারত ও চীন—দীর্ঘ সীমান্ত বরাবর পরস্পরের সম্মুখীন; এই প্রথম একটি বিশ্বশক্তি বা ভবিষ্যৎ বিশ্বশক্তি ভারতের সীমান্তে চাপিয়া বসিয়াছে। "ইহাতে সমগ্র প্রসঙ্গটিরই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই চিত্রটিই আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে।"

সেই সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, "কেবল আজ বা আগামীকালের জন্যই নহে, শত শত বৎসর ধরিয়া আমরা পরস্পরের সম্মুখীন থাকিব। কারণ, ভারত বা চীন কেহই এশিয়া পরিত্যাগ করিতে যাইতেছে না।"

সুতরাং প্রশ্ন হইল, এই দুই দেশ চিরস্থায়ী শত্রুতার মধ্যে বাস করিবে, না এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, যাহাতে তাহারা "বন্ধুভাবে না হউক অন্ততঃ পরস্পরকে সহ্য করিয়া" বাস করিতে পারে।

সরকারের আন্তর্জাতিক ও চীননীতি সমর্থন করিয়া প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বিশ্ব সংঘর্ষের কেন্দ্রস্থল এশিয়ায় সরিয়া আসিতেছে।"

প্রধানমন্ত্রী বলেন, উত্তর সীমান্তে প্রতিরক্ষার জন্য যন্ত্রপাতির তত প্রয়োজন নাই, যত আছে "শিক্ষিত, সমর্থ, বলিষ্ঠ লোকের—যাহারা ঐ উচ্চতার কষ্টদায়ক আবহাওয়া সহ্য করিতে পারিবে।" সরকার দেশের প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন এবং দেশের শিল্প কাঠামোকে শক্তিশালী করারও চেষ্টা করিতেছেন। আর ভবিষ্যতের জন্য শিল্প প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকেও গড়িয়া তোলা হইতেছে।

"এই সকল কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা শান্তিপূর্ণ মীমাংসার দিকেও লক্ষ্য রাখিব, শান্তির জন্য চেষ্টা করিব; দেশের ক্ষতি করিতে পারে, এমন কোন জঙ্গী মনোভাব পোষণ করিব না।"

পার্লামেন্টে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার

"যুগান্তর" মার্কিন প্রেসিডেন্টের বক্তৃতার নিম্নলিখিত সারাংশ দিয়াছেন:

"আপনাদের এই সভায় বক্তৃতা দানের জন্য আমন্ত্রণ আমি বিশেষ মর্য্যাদারূপে গ্রহণ করিয়াছি। আমি মনে করি যে, ইহা দ্বারা আপনারা ব্যক্তিগতভাবে আমায় বিশেষ সম্মানিত করিয়াছেন। আমাদের উভয় দেশের জনগণের অকৃত্রিম মৈত্রীর উজ্জ্বল প্রতীকরূপেও আমি ইহাকে বিবেচনা করি।

"আমার দেশের জনগণের নিকট হইতে এই ৪০ কোটি লোকের নিকট আমি এই আশ্বাস বহন করিয়া আনিয়াছি যে, আমার দেশের লোকেরা আমেরিকার কল্যাণ ভারতের কল্যাণের সহিত অচ্ছেদ্যরূপে জড়িত বলিয়া মনে করে। স্বাধীনতা, মানবিক মর্য্যাদা, শান্তি ও ন্যায় বিচারের আবহাওয়ায় জীবনযাপনের যে গভীর আকাঙ্ক্ষা ভারত পোষণ করে, আমেরিকাও তাহার অংশীদার।

"গত কিছু বৎসরের মধ্যে বিজ্ঞানীরা যে সকল বিস্ময়কর আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার পরিণতিতে ঐ ধরনের জীবনযাপনের নূতন এক বিরাট সুযোগ আমাদের নিকট সমুপস্থিত হইয়াছে। বিজ্ঞানকে আমরা কি উদ্দেশ্যসাধনে নিয়োজিত করিব এই প্রশ্নই এখন সোজাসুজি আমাদের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

"আমাদের সম্মুখে নবযুগের দীর্ঘ বৎসরগুলি বিস্তৃত রহিয়াছে। সেই যুগে মানুষ প্রতি বৎসর মৃত্তিকা হইতে ক্রমশঃ উন্নততর ফসল সংগ্রহে সমর্থ হইবে, মৌলিক শক্তিগুলিকে মানব কল্যাণে নিয়োজনের জন্য উহার উপর অধিকতর প্রভুত্ব অর্জ্জন করিবে, ক্রমবর্দ্ধমান বাণিজ্য, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অংশীদার হইবে এবং সকলে মিলিয়া শান্তিতে জীবনযাপন করিবে।"

কিন্তু ইতিহাসে যে পৃথিবীর পরিচয় পাওয়া যায় সন্দেহ ও অবিশ্বাস উহাকে বহুবার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, বহুবার শাসনশক্তি ধরিত্রীতে রক্তস্রোত বহাইয়াছে এবং মারণাস্ত্র প্রয়োগের দ্বারা পৃথিবীতে ভীতি ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি করিয়াছে। অপরের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা বিজ্ঞানের বিপুলতা শক্তি প্রয়োগ করিয়াছে, এমনকি ব্যবসা-বাণিজ্যকে তাহারা শোষণের হাতিয়াররে পরিণত করিয়াছে।

আমার মত অন্যান্য যাহাদের উপর জনগণ দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে তাহাদের এবং আপনাদের সকলকেই খোলাখুলিভাবে সহজ প্রশ্নটি আমি করিতেছি:

যে কুসংস্কার, আচার-আচরণ ও নীতি অনুসরণের ফলে আমাদের পুত্র, পৌত্রাদি অতীতের মতই অসহায়ভাবে জীবনযাপন করিবে, হয়ত বা ভাবী যুদ্ধের ফলে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে আমরা এখনও কি সেই সকল সংস্কার, আচার-আচরণ, নীতি আঁকড়াইয়াই থাকিব?

আমরা আন্তরিকভাবে এই প্রার্থনাই জানাই ইহা যেন আমরা না করি। বিশ্বব্যাপী এই প্রার্থনায় যদি কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি যোগদান করিতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহার রাজনীতি জ্ঞানের কোন পরিচয় দেওয়া হইবে না। প্রচার-যন্ত্রের স্থলে আলোচনা-বৈঠক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে হুমকী ও পারস্পরিক দোষারোপ স্থলে জ্ঞান-বিনিময়ের ব্যবস্থা করিতে, অস্ত্রোৎপাদনের উন্নত প্রতিযোগিতার স্থলে শান্তিকালীন নানা সৃষ্টিমূলক কাজে আত্মোৎসর্গ করিতে পৃথিবীর বেশীর ভাগ অঞ্চলের নরনারীরাই আজ সঙ্কল্পবদ্ধ।

আমরা একটি উন্নততর যুগের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছি—এই আমাদের আশা। ব্যক্তিগতভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের মত কাজ করিয়া আমি এই পৃথিবীর সকল নরনারী ও শিশুর জন্য

শান্তি, স্বাধীনতা, মানবিক মর্য্যাদা ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিষ্ঠাকল্পে আমার সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিব।

এই উদ্দেশ্যসাধনে আমাদের সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিলে আমরা আমাদের ভাবী বংশধরদের ধন্যবাদার্হ হইব। আমরা কি এই কর্ত্তব্য সম্পাদনে বিমুখ হইব, না ধ্বংস ও মানবকুলের আত্মহত্যার উপায়স্বরূপ যুদ্ধের পথ অবলম্বন করিব—যাহার ফলে আমাদের পরে মানবজাতির আর কোনও অস্তিত্ব থাকিবে না।

আমি সেই দেশেরই প্রতিনিধি হিসাবে এখানে আসিয়াছি অন্য কাহারও এক বিন্দু জমি দখলের যাহার কোনও আকাঙ্ক্ষা নাই অন্য কোন জাতির শাসন-ব্যবস্থার উপর কোন রকম নিয়ন্ত্রণাধিকার স্থাপনের চেষ্টা করে না এবং যাহারা অপর জাতির স্বার্থ বলি দিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য, রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ কিংবা অপর কোনরূপ ক্ষমতার সম্প্রসারণ করিবার চেষ্টা করে না। মানবজাতির শান্তি ও স্বাধীনতার জন্য গভীর ও চিরন্তন যে আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে সেই আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণে এই দেশটি ও অন্যান্য দেশের সহিত তাহাদের সম্পদ নিয়োজিত করিয়া সাহায্য করিতে প্রস্তুত।

ভারতের বন্ধু হিসাবে আমি এখানে আসিয়াছি এবং ভারতের ১৮ কোটি মার্কিন বন্ধুর পক্ষ হইতে কথা বলিতেছি—আমি এখানে আসিতে পারিয়া আমার সুদীর্ঘকালের বাসনা পূর্ণ হইল। আমি আমার দেশবাসীদের পক্ষ হইতে ব্যক্তিগতভাবে ভারতবাসীর প্রতি ভারতের সংস্কৃতি, অগ্রগতি এবং স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে তাহাদের শক্তি ও প্রতিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছি।

সমগ্র মানবজাতিই আপনাদের এই দেশটির কাছে ঋণী। কিন্তু আশা-আকাঙ্ক্ষার দিক হইতে আমাদের, আমেরিকানদের সহিত আপনাদের বিশেষ ধরনের মিল রহিয়াছে।

রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রথম দিন হইতেই আপনাদের ও আমাদের রাষ্ট্রনীতি গণতন্ত্রের প্রসার কামনা করিয়া আসিতেছি। আমাদের দেশেও আপনাদেরই মত নানা জাতি, গোষ্ঠী, নানা ভাষাভাষী ও ধর্ম্মসম্প্রদায়-অধ্যুষিত দেশ। এত বৈচিত্র্যের মধ্যেও আমাদের এই দুই দেশ রাষ্ট্রীয় শক্তি অর্জ্জন করিয়াছে। আমরা কেহই এই অহঙ্কার করি নাই যে, আমাদের পথই একমাত্র পথ। আমরা উভয়েই আমাদের ব্যর্থতা এবং দুর্ব্বলতা সম্পর্কে সচেতন। দেশবাসীদের এবং অন্যদের উপর গুরুত্ব আরোপ না করিয়া রাষ্ট্র জনগণের সেবা করিবে—এই প্রতিশ্রুতি দিয়া আমরা উভয়েই আমাদের সকল নাগরিকের কল্যাণ ও উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকি। সর্ব্বোপরি আমাদের উভয়ের লক্ষ্য একই। দশ বৎসর পূর্ব্বে আপনাদের প্রখ্যাত প্রধানমন্ত্রী নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন আমার অতিথি হইয়াছিলেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন :

রাজনৈতিক পরাধীনতা, জাতিগত বৈষম্য এবং আর্থিক দুর্গতি—শান্তির নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইলে আমাদের এই সকল দুষ্ট ব্যাধি দূর করিতে হইবে।

আমাদের প্রজাতন্ত্রও প্রতিষ্ঠার পর হইতেই রাজনৈতিক পরাধীনতা, জাতিগত বৈষম্য এবং আর্থিক দুর্গতি এই তিনটি দুষ্ট ব্যাধির বিরুদ্ধে নির্ম্মমভাবে অবিরাম সংগ্রাম চালাইয়া আসিতেছে।

এই সকল দুষ্ট ব্যাধি অপনোদনের প্রয়াসে আমেরিকা অবশ্য সর্ব্বদা আশু সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। তাহাদের উপর জয়লাভ করা হইয়াছে একথা কোনক্রমেই বলা চলে না। প্রকৃত পক্ষে মানব প্রকৃতির রূপান্তর না ঘটিলে ইহাদের উপর সম্পূর্ণ জয়লাভ কখনই সম্ভব হইবে না। এই সকল দুষ্ট ব্যাধি ও অন্যায় দূরীকরণে আমাদের জীবন ও সম্পদ নিয়োগ করিবার জন্য আমাদের সম্মানিত নেতৃবর্গ প্রায় দুই শত বৎসর ধরিয়া আমাদের প্রাণে প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছেন। আমাদের সর্ব্বজনের কল্যাণ সাধনের এই চেষ্টায় আমরা কখনও শ্রান্ত বা উহা হইতে নিবৃত্ত হইব না।

শ্রীনেহরু এই কথা বলার পর দশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। নৈরাশ্যবাদীরা বলিতে পারেন, এই তিনটি দুষ্ট ব্যাধির উপদ্রব পৃথিবীতে এখনও বর্ত্তমান, শুধুমাত্র তাহাই নহে ইহা দৃঢ়মূল হইয়া আরও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে এবং ইহার তীব্রতা কখনও হ্রাস পাইবে না। তাহারা এই সিদ্ধান্তও করিতে পারেন—ভবিষ্যৎ হইবে অতীতেরই পুনরাবৃত্তি এবং পৃথিবীতে সঙ্কটের পর সঙ্কট দেখা দিবে, উত্তেজনা ও দুশ্চিন্তা হইতে মানুষ কখনও অব্যাহতি পাইবে না—এজন্য মানুষ সর্ব্বদাই এই চিন্তায় সশঙ্কিত হইয়া থাকিবে যে কোনরূপ আক্রমণাত্মক ঘটনা হইতে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ বাধিয়া যাইবে।

নৈরাশ্যবাদীরা এই রকম কথা বলিতে পারেন এবং আমরাও যদি একমাত্র নৈরাশ্য, ব্যর্থতা ও অকৃতকার্য্যতার ইতিহাসই পর্য্যালোচনা করি তাহা হইলে আমরাও তাহারই সমর্থন করিতে বাধ্য হইব।

দুশ্চিন্তা, দুর্ভাগ্য ও চরম ব্যর্থতা যে কি তাহা আমরা, আমেরিকাবাসী, জানি। দশ বৎসরের মধ্যে আমাদের ইহাদের সহিত পরিচয় হইয়াছে। কোরিয়া প্রজাতন্ত্রে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা এবং ন্যায়ের বিধান বজায় রাখার জন্য আমেরিকার হাজার হাজার পরিবার প্রভূত মূল্য দিয়াছে। আক্রমণ যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত না হয় তাহার জন্য আমাদের দেশের বহু পরিবারের বহু যুবক তাহাদের যৌবনের কয়েকটি বৎসর উৎসর্গ করিয়াছে। নিকট ও দূরবর্ত্তী অঞ্চল হইতে এই দশ বৎসর আমেরিকায় যে সকল সংবাদ আসিয়াছে তাহা আমাদের কেবল শঙ্কিতই করিয়াছে।

বিরাট সামরিক শক্তির সমর্থনযুক্ত একটি বিরুদ্ধবাদী দর্শন ও নীতির আক্রমণাত্মক অভিপ্রায়ের মধ্যেই এই সকল আতঙ্কের অবস্থার উৎস নিশ্চিতরূপে নিহিত রহিয়াছে। এই অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার ফলেই আমরা যথোপযুক্ত সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীর ব্যবস্থা করিয়া আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে আমাদের সঙ্কল্পের কথা স্পষ্টরূপে জানাইয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। এই সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী শুধু যে আমাদের কাজে লাগিয়াছে তাহা নহে, আমাদের বন্ধুবর্গ ও মিত্রপক্ষীয়রা, যাহারা আমাদেরই মত এই বিপদ উপলব্ধি

করিয়াছে তাহাদেরও কাজে লাগিয়াছে। কিন্তু এই সৈন্যবাহিনী কেবলমাত্র প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যেই কাজ করিয়াছে। এই শক্তি সংহত করিয়া আমরা বর্ত্তমানের জন্য ও সেই সঙ্গে ভবিষ্যতের জন্যও স্থায়ী শান্তির পথে প্রয়োজনীয় সহায়তা করিয়াছি বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

ঐতিহাসিক দিক হইতে এবং সহজাত প্রবৃত্তির দিক হইতেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলপ্রয়োগ দ্বারা আন্তর্জ্জাতিক সমস্যাবলী ও বিরোধ-সমূহের মীমাংসা করিতে বরাবরই অস্বীকার করিয়াছে এবং এখনও তাহাই করে। আমরা যদিও স্বাধীন বিশ্বের নিরাপত্তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, তথাপি ফলপ্রসূরূপে পারস্পরিক যাথার্থ্য প্রতিপাদনের ভিত্তিতে অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করার উপর আমরা পূর্ব্বের মতই জোর দিতে থাকিব।

গত দশকের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের নৈরাশ্য দেখা দিলেও এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাসমূহের নেতিবাচক লক্ষ্য সত্ত্বেও আমেরিকানরা রাজনৈতিক, কারিগরি ও জাগতিক বিষয়ে বিশ্বের সমৃদ্ধিমূলক কার্য্যেও অংশ গ্রহণ করিয়াছে। এই সকল কার্য্যের দ্বারা মানুষের মর্য্যাদা ও স্বাধীনতার নীতি সমর্থিত হইয়াছে। ইহার ফলে ভবিষ্যতে এই প্রকার কার্য্য ও ইহা অপেক্ষাও বৃহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইবে বলিয়া আমেরিকা মনে করে। উন্নততর জীবনযাত্রার জন্য বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের, বিশেষ করিয়া যাহারা নূতন স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, তাহাদের নির্ভীক প্রয়াস আমেরিকা বন্ধুত্বের মনোভাব লইয়া লক্ষ্য করিতেছে।

মাত্র দশ বৎসর পূর্ব্বে ভারত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ভারতের সাহস রহিয়াছে, সঙ্কল্প রহিয়াছে। কিন্তু এই দেশ এইরূপ বহুবিধ গভীর সমস্যার পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে আধুনিক ইতিহাসে যাহার তুলনা কদাচিৎ মেলে। আপনারা যে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন অত্যন্ত আশাবাদী পর্য্যবেক্ষকের পক্ষেও সে সময়ে ঐ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব ছিল না।

ভারত আজ সুদৃঢ় আস্থার সহিত বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত কথা বলিতেছে এবং সেই সকল রাষ্ট্রও অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত তাহা শুনিতেছে। ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসায় ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রতিটি নর ও প্রতিটি নারী কতখানি দৃঢ়তা ও একাগ্রতার সহিত অভীষ্ট সাধনে তৎপর হইয়া থাকে, তাহা হইতেই সমস্যার দুরূহতার পরিমাণ করা যায়। বিগত দশকে বিশ্বে যাহা কিছু ব্যর্থতা দেখা দিয়াছে ভারতের এই জয় তাহা মুছিয়া দিবে।

ভারত অন্যান্য মহাদেশের জনসাধারণকে নির্দ্দেশ ও উৎসাহ দিয়াছে এবং তাহাদের কাজে প্রবৃত্তি জোগাইয়াছে। যে কেহ একটি পৃথিবীর মানচিত্র লইয়া গত দশ বৎসরে যে সকল দেশে রাজনৈতিক পরবশতার অবসান হইয়াছে, বর্ণগত বৈষম্য হ্রাস পাইয়াছে এবং যেখানে অর্থনৈতিক দুঃখ-দুর্দ্দশার অন্ততঃ কিছুটা লাঘব হইয়াছে সেই সকল দেশগুলি একটি করিয়া পতাকা দ্বারা চিহ্নিত করুন। তিনি সম্ভবতঃ দেখিতে পাইবেন যে, এই তিনটি দুষ্ট ব্যাধি হইতে উদ্ধার লাভের জন্য যুগ যুগ ধরিয়া যে সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে তাহার মধ্যে বিগত দশটি বৎসরের মত সার্থকতা আর কোন সময়ে দেখা যায় নাই।

বিশ্বের সকল মানুষের জীবনকে উন্নত করিয়া তুলিবার পথে আমাদের প্রথম পদক্ষেপ সম্ভব হইয়াছে এই দশটি বৎসরের জন্যই।

আমরা যে অচিরেই প্রাচুর্য্য ও শান্তির যুগে অগ্রসর হইয়া যাইতে পারিতেছি না তাহার অন্তরায় কোথায়?

ইহার উত্তর সুস্পষ্ট। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে ভীতি ও আশঙ্কা রহিয়াছে আমরা এখনও দূর করিতে পারি নাই। ফল হইয়াছে এই যে, কোন দেশের সরকার শুধুমাত্র নিজের দেশের জনগণের কল্যাণের জন্য স্বীয় দেশের সম্পদ কাজে লাগাইতে পারে না।

এমন সকল অর্থব্যয়ের বোঝা সরকারসমূহের উপর চাপিয়াছে যাহা ফলদায়ক নহে। প্রতিরক্ষামূলক সামরিক ব্যবস্থা খাতে পূর্ব্ব হইতেই অর্থ ব্যয়িত হইতেছে, অথচ আজিকার দিনের অস্ত্রবাহী যন্ত্রের কাছে তাহা নিরর্থক হইয়া যাইতেছে।

বিশ্বের অধিকাংশ দেশই এই দুষ্টচক্রে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। সামরিক দুর্ব্বলতার ফলে পররাজ্য কর্ত্তৃক আক্রমণ, নাশকতামূলক কার্য্য বা বাহির হইতে গড়িয়া তোলা বিপ্লবের সৃষ্টি হয়। কোন একটি রাষ্ট্রের ক্রমবর্দ্ধমান সামরিক শক্তি অপর রাষ্ট্রসমূহের মনে যে ভীতির সঞ্চার করে তাহার ফলে উহারা অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক ব্যবস্থাদির জন্য অধিকতর সম্পদ নিয়োজিত করিতে প্রণোদিত হয়। তখন বিশ্বব্যাপী অস্ত্র প্রতিযোগিতা সুরু হয়। এই সকল অস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ বিদ্যমান থাকায় উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পায়। জাতিসমূহ নিজেদের শান্তিপূর্ণ উন্নতির সুযোগলাভেও বঞ্চিত হয়। ফলতঃ শুভেচ্ছা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শান্তির জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিকভাবেই আরও তীব্র হয়।

আমাদের এযুগে বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রিত নিরস্ত্রীকরণ অবশ্যই সম্ভব করিয়া তুলিতে হইবে। ইহার জন্য লক্ষ লক্ষ লোকের দাবি এই-রূপ ব্যাপক ও তীব্র হইয়া উঠিবে যে কোন মানুষ বা কোন সরকার তাহা প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।

প্রকৃত নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব করিয়া তুলিবার অন্বেষণে আমাদের রাষ্ট্র অবিরাম চেষ্টা করিয়া যাইতে প্রতিশ্রুত। ছয় বৎসর পূর্ব্বে ১৯৫৩ সনের এপ্রিল মাসে আমি বলিয়াছিলাম, "নিরস্ত্রীকরণের দ্বারা যে সঞ্চয় হইবে তাহার একটা মোটা অংশ বিশ্বের সাহায্যে ও পুনর্গঠন তহবিলে দান করিবার কাজে অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাহার জনগণকে আহ্বান করিতে প্রস্তুত আছে।" আমার সরকার এখনও তাহার জনগণকে সেই আহ্বান জানাইতে প্রস্তুত।

কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র আপন হইতেই যুদ্ধ বাধায় না—যুদ্ধ সৃষ্টি করে মানুষ।

অতীতের উপর মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ। সেই মৃত অতীতে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ, দায়িত্বের অপব্যবহার এবং বলপ্রয়োগ দ্বারা যে কোন সমস্যার সমাধান হইতে পারে এইরূপ অসার বিশ্বাস আজিকার মানুষকে প্রভাবিত করিতেছে।

মানবতার নামে আমরা কি অতীতের সংশয়, অবিশ্বাস ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে একযোগে একটি পঞ্চবার্ষিকী অথবা একটি পঞ্চাশং বার্ষিকী পরিকল্পনায় সহযোগিতা করিতে পারি না? বর্ত্তমানে পৃথিবীতে যে উত্তেজনা বিদ্যমান রহিয়াছে তাহার কারণ দূর করিবার বা হ্রাস করিবার কাজে আমরা কি নিজেদের নিয়োজিত করিতে পারি না? এই সমস্ত পরিস্থিতি সরকারসমূহের সৃষ্টি এবং সরকারগুলিই উহাদের পরিপোষক। বিশ্বের জনগণ যদি ব্যাপক প্রচার ও চাপ হইতে মুক্ত হইত, তাহা হইলে তাহারা কখনই এই উত্তেজনা অনুভব করিত না।

গত দশ বৎসরকালে আমার নিজের যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহা হইতে আমার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, বিশ্বের এই আশঙ্কা, সন্দেহ ও সংস্কার অনেকাংশে দূর করা যাইতে পারে। এজন্য বিশ্বের সর্ব্বত্র জনগণকে অতীতের কথা ভুলিয়া গিয়া একযোগে ভবিষ্যতের দিকে আগাইয়া যাইতে হইবে।

অতীতের যে অন্যায়ের প্রতিবিধান এখনও হয় নাই, বর্ত্তমানে আমরা যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছি এবং অপরের দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া যে ক্ষণস্থায়ী লাভ অর্জ্জন করা যাইতে পারে—এ সকলের কোন কিছুই আমাদের লক্ষ্যের পথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না।

আমাদের প্রয়োজনীয় শক্তি আছে, সামর্থ্য আছে ও জ্ঞান আছে। বিশ্বের সর্ব্বত্র জনগণের সঙ্কল্প ও প্রজ্ঞাই এখন আমাদের সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। এইগুলি অর্জ্জনের সংগ্রামে ঈশ্বর যেন আমাদের অনুপ্রেরণা দেন।

আপনাদের জাতির ইতিহাস হইতে আমি উপলব্ধি করিয়াছি যে, এই মহান সংগ্রামে ভারত বরাবরই পুরোভাগে থাকিবে।

দলীপ সিংজী

পৃথিবী-খ্যাত ক্রিকেট-খেলোয়াড় কে. এস. দলীপ সিংজী গত ৬ই ডিসেম্বর নিদ্রিত অবস্থায় হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া, মাত্র ৫৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

ক্রিকেট-জগতে মহারাজ দলীপ সিংজী সকলের নিকট 'দলীপ' নামে পরিচিত ছিলেন। ইনি বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় রণজিৎ সিংজীর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। তিনি ১৯০৫ সনের ১৩ই জুন তারিখে জন্মগ্রহণ করেন এবং চেলটেনাহাম কলেজ ও কেম্ব্রিজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লেয়ারে শিক্ষালাভ করেন। তিনি কেম্ব্রিজে 'র‍্যাকেট' খেলায় 'ব্লু' লাভ করেন এবং ১৯৩১-৩২ সনে ইংলণ্ডের কাউণ্টি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় সাসেক্স দলের অধিনায়কত্ব করেন। ইংলণ্ডে ক্রিকেট খেলিয়া তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, এবং অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেষ্ট খেলায় সুযোগ পাইয়া 'সেঞ্চুরী' লাভ করেন। যে তিনজন ভারতবাসীর ইংলণ্ডের পক্ষে টেষ্ট খেলায় সুযোগ ঘটিয়াছে, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময় হইতেই তাঁহার ক্রিকেট খেলার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে, যদিও ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য তাঁহার খেলা দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে নাই, এবং ১৯৩১-৩২ সনের পর তিনি আর টেষ্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করেন নাই, তথাপি ইংলণ্ডের পক্ষ হইয়া তিনি অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে মোট বারটি খেলায় যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহার এই স্বল্পকালীন ক্রীড়া-জীবনে তিনি মোট ৪৯ বার সেঞ্চুরী, ৪ বার ডবল সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব সহ মোট ১৫৩০৬ রাণ করিয়াছিলেন।

ক্রিকেটপ্রিয় ইংলণ্ডের অধিবাসীরা তাঁহাকে আদর করিয়া ডাকিতেন 'টিউলিপ।' তাঁহার খ্যাতি ও কৃতিত্ব শুধু ক্রীড়া-জগতেই আবদ্ধ ছিল না। অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে তিনি ভারতের প্রধান রাষ্ট্রদূত পদে নিযুক্ত ছিলেন, নিখিল ভারত ক্রীড়া-সংস্থার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ক্রিকেট খেলার শিক্ষাদাতা রূপে অনেককে খেলাইয়া শিখাইয়াছেন এবং মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি বোম্বাই-এর পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সভাপতি ছিলেন। ক্রিকেটের ইতিহাসে তাঁহার নাম ভারতবাসীর নিকট অবিস্মরণীয়। গ-স

সনৎকুমার রায়চৌধুরী

কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র প্রবীণ আইনজীবি ও হিন্দুমহাসভা নেতা সনৎকুমার রায়চৌধুরী গত ৬ই ডিসেম্বর পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৫ বৎসর হইয়াছিল।

সনৎকুমার ১৮৮৪ সনে টাকির জমিদারবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বর্গত ভোলানাথ রায়চৌধুরীর জ্যেষ্ঠপুত্র। তিনি ১৯০০ সনে মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউসন হইতে এণ্ট্রান্স পাস করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। এবং ১৯০৫ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরেজীতে এম-এ পাস করেন এবং ১৯০৭ সনে বি. এল. পাস করিয়া আলিপুর কোর্টে আইন-ব্যবসায় সুরু করেন। তিনি ১৯২১ সনে বঙ্গীয় আইনসভায় স্বতন্ত্র সদস্য হিসাবে নির্ব্বাচিত হন। আইন-ব্যবসায় হইতে অবসর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাজনৈতিক কার্য্য হইতেও অবসর গ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৩ সনের দুর্ভিক্ষের সময় এবং ১৯৪৬ সনের দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় ডঃ শ্যামা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দুর্গত মানুষের সেবাকার্য্য পরিচালনায় করেন। তিনি হিন্দু-সংকার সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। "হিন্দুধর্ম্ম পরিচয়" নামে তিনি দুইখণ্ড গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। নিজ গ্রাম টাকিতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একটি কারিগরি শিক্ষালয়ও আছে। ১৯৩৭-৩৮ সনে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র পদে নির্ব্বাচিত হন। রাজনৈতিক জীবনে তিনি ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অনুগামী। ১৯৪১ সন হইতে তিনি হিন্দু মহাসভায় যোগদান করেন। সরল, নিরহঙ্কার, মিষ্টভাষী, নিষ্ঠাবান ও সজ্জন হিসাবে তিনি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। গ-স

গল্প-প্রতিযোগিতা

প্রবাসীর পক্ষ হইতে আমরা গল্প-প্রতিযোগিতার আয়োজন করিতেছি। ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬ হইতে ১লা চৈত্র, ১৩৬৬-এর মধ্যে লেখকগণ-প্রেরিত গল্প লওয়া হইবে। প্রতিটি গল্প তিন হাজার হইতে ছয় হাজার শব্দের মধ্যে হওয়া চাই। গল্পের সঙ্গে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় অবশ্য লেখা প্রয়োজন :

১। নাম

২। ঠিকানা

৩। প্রেরণের তারিখ

৪। ইতিপূর্ব্বে সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রিকায় বা উভয়ে লেখকের কোন গল্প প্রকাশিত হইয়াছে কিনা।

৫। মোড়কের উপর অথবা গল্পের শিরোনামার পাশে লেখা থাকিবে প্রবাসীর গল্প-প্রতিযোগিতার জন্য।

গল্পের গুণানুসারে নিম্নরূপ পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে :

(ক) সর্ব্বোৎকৃষ্ট গল্পের জন্য পুরস্কার একশত টাকা,

(খ) পরবর্ত্তী শ্রেষ্ঠ দুটি গল্পের প্রত্যেকটির জন্য পুরস্কার পঁচাত্তর টাকা,

(গ) পরবর্ত্তী উৎকৃষ্ট পাঁচটি গল্পের প্রত্যেকটির জন্য পুরস্কার পঞ্চাশ টাকা।

এতদ্ব্যতীত যেসব গল্পের জন্য পুরস্কার দেওয়া হইবে না, অথচ প্রবাসীতে প্রকাশযোগ্য বিবেচিত হইবে সে সকল গল্পের নিমিত্ত লেখকগণকে যথানিয়মে দক্ষিণা দেওয়া যাইবে।

প্রকাশ থাকে যে, প্রাপ্ত পুরস্কার গল্প এবং অপ্রাপ্ত পুরস্কার অথচ প্রকাশযোগ্য সকল গল্পই ক্রমান্বয়ে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইবে।

গল্প-প্রতিযোগিতার জন্য প্রদত্ত গল্প অন্য কোন গল্পের অনুবাদ, আংশিক অনুবাদ বা ছায়া-অবলম্বনে লিখিত হইলে চলিবে না এবং অন্যত্র প্রকাশিত গল্প গ্রাহ্য হইবে না।

প্রবাসীর বিচার চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। গল্প-প্রাপ্তির শেষ-তারিখের পর যথাসম্ভব শীঘ্র প্রবাসীতে প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষিত হইবে। এ সম্বন্ধে কোন পত্রালাপ চলিবে না।

কর্ম্মাধ্যক্ষ—"প্রবাসী"

ভারতীয় সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার

পাদাপসারিণং ধর্ম্মং স তু বিদ্বান্ যুগে যুগে।
আয়ুঃ শক্তিং চ মর্ত্ত্যানাং যুগাবস্থামবেক্ষ্য চ ॥
ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণানাঞ্চ তথানুগ্রহকাঙ্ক্ষয়া।
বিব্যাস বেদান্ যস্মাৎ স তস্মাদ্ব্যাস ইতি স্মৃতঃ ॥
মহাভারত (অংশাবতার পর্ব্বাধ্যায়)।

বেদের অপর নাম শ্রুতি। ইহার কারণ এই যে, উহা কেবল শুনিয়াই স্মরণে রাখা হইত। বিশাল বৈদিক সাহিত্য শুনিয়া কণ্ঠস্থ করা অনেকেই অসম্ভব মনে করিবেন। কিন্তু ইহা অসম্ভব নহে। অন্ধের শ্রবণশক্তি ও স্পর্শশক্তি অধিক তীব্র হয়। সেইরূপ যখন লেখন-কলা আবিষ্কৃত হয় নাই তখন মানুষকে স্মরণশক্তির উপরই অধিক নির্ভর করিতে হইত যাহাতে উহা বেশী তীব্র হইয়া যাইত। মানুষের স্মরণশক্তি এমনই জিনিস যে, এক দীর্ঘ কবিতা বিশবার পড়িয়াও বোধ হয় মুখস্থ হইবে না, কিন্তু যদি ক্রমান্বয়ে বিশ-দিন একবার করিয়াও উহার আবৃত্তি শুনা যায় ত মুখস্থ হইয়া যাইবে। এইরূপে কত গ্রাম-গীত অশিক্ষিতেরা শুধু শুনিয়াই শিখিয়াছে। সেইরূপ ব্রাহ্মণদের ঘরে বৈদিক স্তব-সকল নিত্য-গীত হওয়ায় তাহাদের সন্তানদেরও মুখস্থ হইয়া যাইত। প্রত্যেক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সমগ্র বৈদিক সাহিত্য কণ্ঠস্থ থাকিত—ইহাও আমার বলার অভিপ্রায় নয়। হাঁ, ইহা ত তখন সম্ভব ছিল যখন বৈদিক সাহিত্য অধিক বিকশিত হয় নাই। কালক্রমে ইহা বহু শাখায় পল্লবিত হইয়া উঠে। আর্য্যদের বসতিও চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া যায়। ইহার ফলে অবশ্যই বৈদিক সাহিত্যের কিছু অংশ লুপ্ত হইয়া যায়। বাকি শাখাগুলি ভিন্ন ভিন্ন ঘরানাতে সীমাবদ্ধ থাকে। এখন এক ধর্ম্মপ্রাণ, সংস্কৃতি-প্রেমী মহান্ ঋষির কাজ রহিল এগুলি সংগৃহীত করিয়া লিপিবদ্ধ করা। যেমন আজকালও দেখা যায়, কোন কোন উৎসাহী ব্যক্তি বিদ্যাপতির গান বা ডাকের বচন সংগৃহীত করিয়া প্রকাশিত করেন।

বৈদিক যুগে কখনই লেখন-কলা ছিল না, ইহা আমি বলি না। বেদেরই কোন কোন স্থানে বেদপাঠের (স্বাধ্যায়) উল্লেখ আছে। একস্থানে বাক্স খুলিয়া বেদ পড়িবার কথাও আছে। সম্ভবতঃ উত্তর-বৈদিক যুগে লেখন-কলার প্রচার হইয়া গিয়াছিল। ইহা কোথা হইতে আসিল। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, আর্য্য-পূর্ব্ব সিন্ধুতট জাতি হইতেই আর্য্যেরা লিখিবার কলা শিক্ষা করিয়াছেন। ইহা আজকাল সর্ব্বমান্য যে,আর্য্যদের আগমনের পূর্ব্বে উত্তর-পশ্চিম ভারতে এক সুসভ্য জাতি বাস করিত। হিন্দু জাতি উহাদের সহিত আর্য্যদের সংমিশ্রণেই উদ্ভূত হইয়াছে। উহাদের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে আর্য্যদের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি মিশ্রিত হইয়াই হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতি উৎপন্ন হইয়াছে। ইতিহাসে ইহার পুনঃ পুনঃ উদাহরণ পাওয়া যাইবে যে, বিজেতা জাতি বিজিত জাতি হইতে সম্পূর্ণ বা আংশিক সভ্যতা লাভ করিয়াছে। আর্য্যেরা এক বিষয়ে প্রায় সম্পূর্ণ বিজয় লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা সমগ্র উত্তর-ভারতের অনার্য্য জাতিদের ভাষাগুলি ভুলাইয়া নিজ ভাষা ধরাইয়া-ছেন। বেলুচিস্তান ও সিন্ধুদেশের সীমায় দুই-চারি হাজার ব্রাহুই জাতির লোক বাস করে যাহারা এখনও ব্রাহুই ভাষা বলে যাহা মূলতঃ এক দ্রাবিড়ী ভাষা। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, এক সময় দ্রাবিড়েরা উত্তর-ভারতে থাকিতেন। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার প্রাচীন সভ্যতা বোধ হয় ইহাদেরই কীর্ত্তি। এই সকল স্থানের খননে যে সব মোহর (seal) পাওয়া গিয়াছে উহাতেই ভারতের সর্ব্বপ্রথম লিপির নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। যখন এই জাতির মধ্যে লিপির ব্যবহার ছিল, কিন্তু আর্য্যদের মধ্যে ছিল না, তখন অনুমান করা স্বাভাবিক যে, আর্য্যেরা ইহাদের নিকটই লেখন-কলা শিখিয়াছেন। ইহা প্রায় অবিসংবাদিত সত্য যে, প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মীলিপি কোন বিদেশ হইতে আসে নাই। দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-এশিয়া ব্যতীত সমগ্র জগতে বর্ত্তমানে যে সকল লিপি প্রচলিত উহারা ফীনিশিয়ান লিপি হইতে উৎপন্ন। ফীনিশিয়ান লিপি হইতে হিব্রুলিপি এবং তাহা হইতে আরবীলিপির জন্ম হইয়াছে। ওদিকে প্রায় ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব্বে কাদমস নামক এক ফীনিশিয়ান গ্রীসে গিয়া বসতি স্থাপন করেন এবং তথায় ফীনিশিয়ান লিপির প্রচার করেন। উহা হইতে গ্রীকলিপি এবং গ্রীক হইতে রোমানলিপির জন্ম হয়। এই সকল বর্ণমালার নাম ও বিন্যাস তুলনা করিলে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিবে না যে, উহারা একই

মূল হইতে আসিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মীলিপি যাহা হইতে বাংলা ও দেবনাগরী প্রভৃতি লিপি আসিয়াছে তাহা উহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

কিন্তু এরূপ অনুমান করা হয় যে, মহেঞ্জোদাড়োতে এক-প্রকার সাঙ্কেতিক লিপির প্রচার ছিল, ধ্বনিমূলক (phonetic) নহে। মিশরে প্রাচীন সাঙ্কেতিক (hieroglyphic) লিপি হইতেই ধীরে ধীরে hieratic প্রভৃতি লিপি উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে সম্ভবতঃ আর্য্য-পূর্ব্ব সাঙ্কেতিক লিপি হইতেই ধীরে ধীরে ধ্বনিমূলক ব্রাহ্মীলিপি উৎপন্ন হইয়াছে। এবং এই ক্রমবিবর্ত্তন আর্য্যেরাই আনিয়াছেন, যেহেতু তাঁহাদের ভাষারই অধিক প্রচার হইতেছিল এবং লিপিও নিজ ভাষানুরূপ প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন ছিল।

যে সব জাতির প্রাচীন সাহিত্য আছে, তাহাদের মধ্যেও সর্ব্বপ্রথম লিপির ব্যবহার সাহিত্যের উদ্দেশ্যে হইত না। অন্ধকবি হোমার নিজের মহাকাব্য মুখেই রচনা করিয়া গাহিতেন। প্রথমে শিলালেখ ও ধাতুপত্রেই ইহার ব্যবহার হইত। পুরোহিতেরা চাহিতেনই না যে, ধর্ম্মগ্রন্থ লিপিবদ্ধ করা হয় এবং জনসাধারণে উহা পড়িতে পারে। কিন্তু তথাপি তাঁহারা নিজেদের স্মরণার্থ বেদের অংশবিশেষ পাতায় লিখিয়া রাখিতেন, ইহা খুবই সম্ভব।

বেদকে এক পুস্তক না বলিয়া এক লাইব্রেরী বলাই অধিক সঙ্গত। লাইব্রেরীতে যেমন ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন লেখকের রচনার সংগ্রহ দেখা যায়, বেদেও তদ্রূপ। প্রাচীনতম মন্ত্র হইতে উত্তরকালীন অংশের মধ্যে কয়েক শতাব্দীর ব্যবধান। প্রথমে ঋষিরা মন্ত্র রচনা করেন, পরবর্ত্তী ঋষিরা উহাদের প্রয়োগ নির্দ্দেশ করেন। যাঁহাদের পেশাই ছিল পৌরোহিত্য, তাঁহাদের পক্ষে উভয়ই স্মরণ রাখা প্রয়োজনীয় ছিল। এদিকে নূতন মন্ত্রাদিরও রচনা হইতে থাকে যাহা ঋষিরা নিজ নিজ বংশ এবং শিষ্য-পরম্পরার মধ্যে লিখিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকিবেন।

এই যুগে নূতন প্রতিভাসম্পন্ন লেখকদের আবির্ভাব হয়। বেদ সম্বন্ধে বিবিধ প্রকার বিচার আরম্ভ হয়। বেদের উৎপত্তি কি? দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? আত্মা কি? ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাপ্তি কিরূপে হয়? ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া বেদের উচ্চারণ ও পাঠের রীতি, ইহার ব্যাকরণ, ইহার ছন্দ, ইহার শব্দার্থ, ইহার অনুক্রমণী। অর্থাৎ সূচী ইত্যাদির রচনায়ও অনেকে ব্রতী হন। নূতন যাহা কিছু লিখিত হইত সকলই উক্ত লাইব্রেরী অর্থাৎ বেদেতেই জুড়িয়া দিবার রীতি ছিল, কিন্তু উহা এখন অত্যন্ত বিশাল হইয়া গিয়াছিল এবং নূতন রচনাগুলির বিষয়ও ভিন্ন ছিল, সুতরাং উহারা 'বেদাঙ্গ' নামে একত্রিত হইতে লাগিল। বেদের, বিশেষতঃ উপনিষদের উক্তির উপর আধারিত দর্শন-গ্রন্থ রচিত হইতে থাকে ত উহারাও 'উপাঙ্গ' নামে অভিহিত হয়। অর্থাৎ এই লেখকেরা কোন বিদ্যাকেই বেদ হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে চাহিতেন না। এই গ্রন্থ-সকল সূত্ররূপে রচিত হওয়ায় মনে হয় যে, তখন পর্য্যন্তও লেখার সুষ্ঠু প্রচার হয় নাই। লেখা কঠিন কার্য্য ছিল, সুতরাং স্মরণের জন্য অত্যল্প শব্দের সূত্রসকল গ্রথিত হয়।

তখন সাহিত্যিক ভাষাও প্রাচীন মন্ত্রসকলের ভাষা হইতে অনেক পরিবর্ত্তিত হয়। পাণিনি এই সংস্কৃত (অর্থাৎ পরিমার্জ্জিত) ভাষাকে নিয়মে বাঁধিয়া দেন। যদ্যপি পাণিনির পূর্ব্বেও অন্যান্য বৈয়াকরণ ছিলেন, কিন্তু পাণিনির ব্যাকরণই সর্ব্বমান্য। প্রাচীন মন্ত্রসকলের বহু শব্দ তখন অপ্রচলিত হইয়া যায় এবং বহু শব্দের অর্থে পরিবর্ত্তনও ঘটে। যাস্কের 'নিরুক্ত' গ্রন্থে এই সকলের ব্যাখ্যা আছে। বাংলার বালক ও নবযুবকেরা সহসা 'হেরি', 'নারিলা', 'পাসরিনু' প্রভৃতি পদের অর্থ বুঝিতে পারিবে না। সকল ভাষার পদ্যেই এরূপ অনেক প্রাচীন রূপ (archaic forms) পাওয়া যায়, যাহাদের অর্থ বর্ত্তমানে কেহ বুঝিবে না, যদি না তাহার প্রাচীন কাব্যের সহিত পরিচয় থাকে। এই সকলের ব্যাখ্যা দ্বারা বেদব্যাস নিঃসন্দেহ আর্য্য-সংস্কৃতি রক্ষার পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান কাজ করিয়াছেন।

কিন্তু এই ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস যে কাজ করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। তিনি লেখন-কলার ব্যাপক প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি দেখিলেন যে, লোকের মন এত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের প্রতি যাইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং বেদজ্ঞদের সংখ্যা এত কমিয়া যাইতেছে যে, শীঘ্র ইহা লিখিয়া না ফেলিলে সমগ্র বৈদিক সাহিত্যই লুপ্ত হইয়া যাইবে। বর্ত্তমান যুগেও আমরা অনুভব করি যে যে সব গ্রন্থ এখনও হস্তলিখিত পুঁথিরূপে আছে, শীঘ্র ছাপান না হইলে উহাদের লুপ্ত হইয়া যাওয়ার ভয় আছে। ঐরূপ বেদেরও লুপ্ত হইবার ভয় ছিল। ব্যাসদেব বেদের রচয়িতা ছিলেন না, লেখন-কলার আবিষ্কারকও ছিলেন না, কিন্তু বেদের সংগ্রাহক (compiler), লেখক (scribe) ও বিভাজক (arranger) ছিলেন এবং এই জন্যই হিন্দু-সংস্কৃতির সংরক্ষণে সর্ব্বোচ্চ মর্য্যাদা তাঁহারই প্রাপ্য। এজন্য তাঁহাকে যে পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল তাহার আন্দাজ করাও আমাদের পক্ষে কঠিন।

বেদের এক বৃহৎ অংশ অবশ্যই ব্যাসদেবের কণ্ঠস্থ ছিল। বাকী অংশ সংগ্রহ করিবার জন্য সম্ভবতঃ তাঁহাকে দূর দূর ভ্রমণ করিতে হইয়াছে। কারণ উহার ভিন্ন ভিন্ন শাখা ভিন্ন ভিন্ন ঘরানা গুরু-পরম্পরায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাহাও

কালবশে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কোন প্রাচীন কবির গান সংগ্রহ করিতে অনেক সজ্জন অনুভব করিয়া থাকিবেন যে, যদি একই গান ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বা অঞ্চলে পাওয়া যায় ত উহাতে কিছু না কিছু পাঠভেদ দেখা যায়। ঐরূপ একই সূক্ত যখন ভিন্ন ভিন্ন শাখায় পাওয়া যায় তখন তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন পাঠ পাই নিজের ঘরানার জিনিস লোকে সহজে দিতে চাহিত না, সুতরাং এই জন্য সামদানাদি উপায় অবলম্বন করিতে হইয়া থাকিবে। প্রত্যেক সূক্ত দেবতা, ঋষি ও বিনিয়োগ অনুসারে সাজানও এক কঠিন কাজ ছিল। 'ঋষি' কথার অর্থ আমরা আজকাল 'রচয়িতা' বুঝি, কিন্তু তৎকালে এই বিশ্বাস প্রায় সর্ব্বত্রই ছিল যে, বেদ অপৌরুষেয়, উহার কোন রচয়িতা নাই। 'ঋষি' অর্থ মন্ত্রদ্রষ্টা বুঝা হইত। বহু প্রাচীন ঋষিদের নাম লোকে ভুলিয়া গিয়া থাকিবে, সুতরাং কেবল গুরু-পরম্পরার নামেই উহাদের নাম রাখা হইত। যথা, মধুচ্ছন্দা ঋষির শিষ্য-প্রশিষ্যদের নিকট হইতে যে সকল মন্ত্র মিলিল তাহাদের ঋষিই মধুচ্ছন্দা মানিয়া লওয়া হইল। তৎপরে ব্যাসদেব বেদকে ঋক, সাম ও যজুঃ খণ্ডে বিভক্ত করিলেন এবং ইহা হইতেই তাহার উপাধি 'বেদব্যাস' হয়।

স্কুল-পাঠ্য ইতিহাসের বইয়েও আমরা এরূপ কথা পাই যে, ঋগ্বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বেদ এবং অন্যান্য বেদের অধিকাংশ ঋগ্বেদ হইতেই গৃহীত। আমাদের মতে এরূপ কথা ভ্রমাত্মক। যদি ব্যাসদেবকেই জিজ্ঞাসা করা যাইত যে, কোন্ বেদ অধিক প্রাচীন ত তিনি এরূপ প্রশ্ন নিরর্থক মনে করিতেন, যেহেতু তিনি সবকেই অনাদি মনে করিতেন। তাঁহার শ্রেণীবিভাগও প্রাচীন-নবীন বিচার হইতে করা হয় নাই। ইহা পুরোহিতদের সুবিধার জন্য করা হইয়াছে। ইহা আমরা অবশ্য বলিব যে, ঋগ্বেদে প্রাচীনতম মন্ত্রের অধিক সমাবেশ হইয়াছে এবং অনেক মন্ত্র তিন বেদেই সাধারণ ভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, প্রথমে সমগ্র ঋগ্বেদের রচনা হইয়া যাওয়ার পর উহা হইতে সামগ্রী লইয়া অন্যান্য বেদ প্রস্তুত হইয়াছে। ঋগ্বেদের তৃতীয় ও চতুর্থ মণ্ডলেই প্রাচীনতম মন্ত্র অধিক সংখ্যায় সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য বেদেও এরূপ মন্ত্র আছে, যাহা ঋগ্বেদের কিছু মন্ত্র হইতে প্রাচীন। উদাহরণ স্বরূপ, যজুর্ব্বেদে দুই অরণি কাষ্ঠকে (যাহার ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয়) ব্যক্তিরূপে কল্পনা করিয়া তাহাদিগকে উর্ব্বশী ও পুরূরবা নাম দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাই অধিক প্রাচীন মনে হয়। পরে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে উর্ব্বশী-পুরূরবাকে নায়ক-নায়িকা মানা হইয়াছে। ডক্টর অবিনাশচন্দ্র দাস লিখিয়াছেন যে, চারি বেদের মধ্যে শুধু অথর্ব্ব বেদে মহাপ্রলয়ের উল্লেখ আছে এবং তাহা হইতেই তিনি নির্ণয় করিয়াছেন যে, ঋগ্বেদাদি রচনার পরে জলপ্লাবন হইয়াছিল। কিন্তু আমরা একটু পরেই দেখিব যে, এরূপ তর্ক নিরর্থক।

অনেকে মনে করেন যে, লেখাপড়া না শিখিয়া কেহ কবি হইতে পারে না। কিন্তু আজ যদি পৃথিবীতে সমস্ত লেখাপড়া বন্ধ হয় ও সমস্ত পুস্তক নষ্ট হয়, তথাপি মানুষের মধ্যে কবিপ্রতিভা নষ্ট হইবে না। খোঁজ করিলে নিরক্ষর জাতিদের মধ্যেও এমন অনেক লোক পাওয়া যাইবে যাহারা মুখে মুখে পদ্য রচনা করে। যে সকল জাতিতে কখনও লেখাপড়ার রীতি ছিল না তাহাতেও অনেক লোক-গীত পাওয়া যাইবে। বেদমন্ত্রের রচয়িতারাও এইরূপ স্বভাবকবি ছিলেন। পুরাতন 'নাচারী' (মৈথিলী শিবগীত) গুলির প্রয়োগ আজকাল লোকে বিবাহাদি উৎসব উপলক্ষে করে। সেইরূপ পরবর্ত্তী ঋষিরা যজ্ঞাদিতে প্রাচীন মন্ত্রের বিনিয়োগ করিতে লাগিলেন এবং গদ্যে অথবা গদ্য-পদ্যে যজ্ঞের বিধি-নিষেধ রচনা করিতে লাগিলেন। সব ভাষার সাহিত্যেই, প্রথমে পদ্য ও পরে গদ্য আসে। সুতরাং প্রথমে মন্ত্র বা সংহিতা ভাগ এবং পরে বিধিমূলক ব্রাহ্মণভাগ রচিত হওয়া স্বাভাবিক। কেহ কেহ বার্দ্ধক্যে যজ্ঞাদি কর্ম্ম ছাড়িয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করা উচিত মনে করিলেন ত তাঁহাদের ক্রিয়া বা চিন্তার সামগ্রী আরণ্যক ভাগও রচিত হইল। ইহাই বৈদিক সাহিত্যের পৌর্ব্বাপর্য্য। ঋগ্বেদের আরণ্যকের পরে সামবেদের সংহিতা রচিত হইয়াছে এরূপ মনে করা ভুল। পক্ষান্তরে বেদ ইতিহাস-গ্রন্থ নয়, যদিও খুঁজিলে ইতিহাসের মসলা ইহাতে যত্রতত্র পাওয়া যায়। সুতরাং বেদে কোন ঘটনার উল্লেখ না থাকিলেই এরূপ বলা যায় না যে, উক্ত ঘটনা (যথা জলপ্লাবন) বেদ রচনার পরে হইয়াছে।

আর্য্যেরা ঐহিক ও পারলৌকিক ফল কামনায় অথবা শুধু ধর্ম্মবোধে পুরোহিতদ্বারা যজ্ঞ করাইতেন। এ সময় হোতা, উদ্গাতা ও অধ্বর্যু নামক তিন শ্রেণীর পুরোহিতের উদয় হয়। তাঁহারা ক্রমশঃ ঋক, সাম ও যজুঃ (এ সকল নাম বেদবিভাগের পুর্ব্বেই প্রচলিত ছিল) মন্ত্রের ব্যবহার করিতেন। 'হোতা' শব্দের অর্থ হরণকারী, কিন্তু মনে হয় হোতা শ্রেণীর গুরু-পরম্পরা অত্যন্ত প্রাচীন এবং ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মন্ত্রের ব্যবহার করিতেন। পরে স্বর-লয়ের কিছু জ্ঞান হইলে (সঙ্গীতবিদ্যা বা গন্ধর্ব্ববেদ সাম বেদেরই অংশ মানা হয়) কোন কোন পুরোহিত গাহিয়া

গাহিয়া মন্ত্রগুলির উপযোগ করিতে থাকেন ও তাঁহারা উদ্‌গাতা নামে খ্যাত হন। অধ্বর্য্যুরা বোধ হয় বিধিনিষেধ, বেদী নির্ম্মাণ, যজ্ঞের উপযুক্ত স্থান সময় ইত্যাদির বেশী খেয়াল করিতেন, সুতরাং ইঁহাদের জটিল সংবিধান প্রস্তুত করেন। এই শ্রেণীদের মধ্যে পরস্পর বহু বিরোধও দেখা যাইত। এই শ্রেণীদের ব্যবহারের জন্য ব্যাসদেব বেদের পৃথক পৃথক খণ্ডের সঙ্কলন করেন এবং তাহাদের পারস্পরিক বিরোধও বহু পরিমাণে দূর করেন।

অথর্ব্ববেদ কিছু অন্য প্রকারের। ইহাতে যাগযজ্ঞের বিস্তার নাই, কিন্তু মন্ত্র-তন্ত্র ও ওষধি প্রয়োগেরই অধিক আলোচনা আছে। এইজন্য বহুদিন পর্য্যন্ত বৈদিক সাহিত্যে ইহার স্বীকৃতিই হয় নাই। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের মার্গের নামই ছিল ত্রয়ী ধর্ম্ম অর্থাৎ তিন বেদের বিহিত কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান। কিন্তু অথর্ব্ববেদও অপর তিন বেদ হইতে নূতন নয়। লোকমান্য তিলকের মতে ইহার সামগ্রী মুখ্যতঃ সুমের আদি অনার্য্য জাতি হইতে আসিয়াছে এবং বোধ হয় Non-canonical literature-রূপে বেদের সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু শুধু বেদের সংগ্রহ ও বিভাগই ব্যাসদেবের একমাত্র মহত্ত্ব নয়। তাঁহার দ্বিতীয় কীর্ত্তি আর্য্যদের কথা-কাহিনীর সংগ্রহ এবং উহাদের সম্বন্ধে মূল রচনা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, তখন পর্য্যন্ত আর্য্যদের সকল রচনাই বেদের অঙ্গ মনে করা হইত। এখন ব্যাসদেব ভারত সংহিতা নামক পৃথক্ গ্রন্থ রচনা করিয়া এই রীতির উল্লঙ্ঘন করিলেন। এই যুগে যদি কেহ স্বতন্ত্র কাব্য রচিয়া থাকেন ত কেবল বাল্মীকি। যদিও হিন্দুদের সাধারণ বিশ্বাস যে, রামায়ণ মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীন, তথাপি বহু আধুনিক পণ্ডিতের (যথা, ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী) মতে মহাভারতই অধিক প্রাচীন।

রায় চৌধুরী মহাশয় বলেন যে, রাজা জনমেজয়ের পুরোহিত তুর কাবষের শিষ্য-পরম্পরায় অধস্তন পঞ্চম ও ষষ্ঠ ঋষি যথাক্রমে উদ্দালক, আরুণি ও যাজ্ঞবল্ক্যের সমসাময়িক ছিলেন। এই উভয় ঋষিই বিদেহের সম্রাট প্রথম জনকের সভা অলঙ্কৃত করিতেন। অপর গণনায় জনমেজয়ের বংশে তাঁহার অধস্তন পঞ্চম রাজা নিচক্ষু প্রথম জনকের সমসাময়িক ছিলেন। নিচক্ষুর পরেই প্রবল বন্যায় হস্তিনাপুর ধ্বংস হইয়া যায় এবং পরবর্ত্তী কৌরব রাজারা কৌশাম্বীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। জনকবংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম জনক বিদেহরাজ্যের স্থাপয়িতা নিমির পৌত্র ছিলেন ও সম্রাট উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি বড় বড় পণ্ডিতদের সঙ্গে বেদ ও দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিতে ভালবাসিতেন। রামায়ণেও ইহার উল্লেখ আছে এবং উহাতে সীতার পিতা সিরধ্বজ জনককে এই আদিজনকের বংশধর বলা হইয়াছে। জনকবংশের শেষ রাজা করাল জনক নাকি নিজ দোষেই জনকবংশের পতন ঘটান। ইহার পরবর্ত্তী ইতিহাসেই বিদেহরাজ্যকে "বৃজ্জি সমবায়ের" অন্তর্ভুক্ত দেখি। ইহা বৃজ্জি, বৈশালী ও শাক্য গণরাজ্যগুলিরই সমবায়। বোধ হয় বংশগত রাজাদের কুশাসনে অতিষ্ঠ হইয়া নগরবৃদ্ধেরা নিজ নিজ নেতা নির্ব্বাচিত করিয়া শাসন চালাইতে আরম্ভ করেন যে পর্য্যন্ত না তাহারা অজাতশত্রু কর্ত্তৃক মগধ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। বেদে বিদেহের রাজধানী মিথিলার ও কোশলের রাজধানী অযোধ্যার উল্লেখ নাই। বৌদ্ধযুগে কোশলের রাজধানী ছিল শ্রাবস্তি। বৌদ্ধসাহিত্যে দশরথ ও তৎপুত্র রামের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাঁহাদিগকে বারাণসীর রাজা বলা হইয়াছে। রামায়ণের ঐতিহাসিক আধার অত্যন্ত দুর্ব্বল। ইহার পাত্রদের উল্লেখ বেদে নাই* কিন্তু বেদে কুরু-পাঞ্চাল রাজ্যের শত্রুতা এবং ভারত যুদ্ধের উল্লেখ আছে। ধৃতরাষ্ট্র, অর্জ্জুন, পরীক্ষিৎ, জনমেজয় এবং দেবকীনন্দন কৃষ্ণের নাম আছে। পাণিনি ও গৃহ্যসূত্রেও ইহাদের নাম আছে। সুতরাং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ এক ঐতিহাসিক ঘটনা—কবিকল্পনা মাত্র নয়। মহাভারত ও পুরাণে এক বৈদিক পরম্পরা পাই। বহু বৈদিক উপাখ্যান ইহাতে ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া আসিয়াছে। মহাভারতের এক শৈলী, যথা পরবাক্যগুলি "অমুক উবাচ" বলিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে এবং এই শৈলীই পরবর্ত্তী পুরাণগুলিতেও অক্ষুণ্ণ আছে। কিন্তু রামায়ণে এরূপ নাই।

স্বর্গীয় লোকমান্য তিলক বলেন যে, পূর্ব্বে মহাভারত "জয়" নামক এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ ছিল ("ততো জয় মুদীরয়েৎ", "জয়ো নামেতিহাসোঽয়ম্")। পরে বাড়িতে বাড়িতে বর্ত্তমান মহাভারত হইয়াছে, যাহাতে লক্ষের উপর শ্লোক। আদিপর্ব্বে উল্লিখিত আছে যে, মহর্ষি ব্যাস ২৪ হাজার শ্লোকে "ভারত-সংহিতা" রচনা করিয়া নিজ শিষ্য সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল এবং বৈশম্পায়নকে দেন, যাহারা উহা হইতে পৃথক পৃথক সংহিতা প্রণয়ন করেন। "জৈমিনি ভারতে"র কিয়দংশ এখনও পাওয়া যায়। কিন্তু অধুনা যে "মহাভারত" আমাদের লভ্য তাহা উগ্রশ্রবা-কথিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রথমে বৈশম্পায়ন সর্পযজ্ঞান্তে অর্জ্জুনের প্রপৌত্র রাজা জনমেজয়কে কহেন এবং পুনরায় সৌতি (সূতপুত্র) উগ্রশ্রবা

* বশিষ্ঠাদি ঋষি এবং বাল্মীকির পিতা চ্যবনের নাম আছে। নিষদে রাম নামক এক ঋষির নাম আছে। রামোপনিষৎ প্রভৃতি আধুনিক রচনা।

নৈমিষারণ্যে সমবেত শৌনকাদি মুনিগণকে কহেন। যদি ইহা সত্য হয় ত উগ্রশ্রবা বোধ হয় ইহা বৈশম্পায়ন হইতে অথবা স্বীয় পিতা লোমহর্ষণ হইতে পাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার আরও কলেবর-বৃদ্ধি পরবর্ত্তী কবি ও লিপিকারদের দ্বারা হইয়াছিল। বোধ হয় গুপ্তবংশের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত এইরূপ প্রক্ষিপ্ত-রচনা জারী ছিল। মহাভারতে রামায়ণের যেটুকু প্রসঙ্গ মিলে তাহা নিশ্চয়ই পরবর্ত্তীকালে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সমগ্র মহাভারতের রচয়িতা যেমন ব্যাসদেব নন সেইরূপ আঠার পুরাণ ও অতিরিক্ত উপপুরাণগুলির রচয়িতাও ব্যাসদেব হইতে পারেন না। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, ব্যাসদেব একই "পুরাণ-সংহিতা" রচনা করিয়াছিলেন। বেদের বিভাগ করিয়া তিনি স্বীয় ব্রাহ্মণ-শিষ্য সুমন্ত, জৈমিনি, পৈল ও বৈশম্পায়নকে এক এক বেদের শ্রাবক করেন। কিন্তু সূত (সারথি) জাতীয় শিষ্য লোমহর্ষণকে (যেহেতু শূদ্রের বেদে অধিকার ছিল না) পুরাণ ও ইতিহাস (মহাভারত) দিয়াছিলেন। উক্ত চারি ব্রাহ্মণ-শিষ্য সকলেই বিদ্বান্ ছিলেন এবং তাঁহাদের নিজ নিজ রচনাও আছে। কিন্তু শূদ্র লোমহর্ষণ বোধ হয় লেখাপড়া জানিতেন না, কিন্তু উত্তম প্রবক্তা ছিলেন। তিনি পুরাণেতিহাসের কাহিনীগুলি এরূপ রোমাঞ্চক ভাবে বলিতেন যে, শ্রোতাদের লোমহর্ষণ হইত, ইহা হইতেই তাঁহার নাম লোমহর্ষণ হইয়াছে। লোমহর্ষণের শিষ্য কাশ্যপ, সাবর্ণি ও শাংসপায়ন এক পুরাণ-সংহিতা হইতে তিন পৃথক্ পৃথক্ পুরাণ প্রস্তুত করেন। যদি ইহা সত্য হয় ত তাঁহার প্রশিষ্যদের ৩×৩ পুরাণ প্রস্তুত করাও অসম্ভব নয়। পুরাণের সংখ্যা ও প্রত্যেক পুরাণের কলেবরও বাড়িতে বাড়িতে গুপ্ত রাজাদের সময় পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়া থাকিবে।* আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি পুরাণগুলি অধ্যয়ন করিয়া এরূপ তিনটি বাহির করিয়াছেন যাহা পুরাণের পঞ্চলক্ষণযুক্ত, যাহাতে তীর্থমাহাত্ম্য, ব্রতমাহাত্ম্যাদি কম এবং অন্যান্য লক্ষণ হইতে সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়। ইহারা বিষ্ণু, মৎস্য ও বায়ুপুরাণ। তিন পুরাণেই কিছু অংশ প্রায় এক রকম। সুতরাং এই সাধারণ অংশকে আদি পুরাণ-সংহিতা এবং তিনটি পুরাণকে উক্ত শিষ্যত্রয় প্রণীত মনে করিবার হেতু আছে। বায়ু ও মৎস্যপুরাণে কথিত হইয়াছে যে, জনমেজয়ের প্রপৌত্র অধিসীমকৃষ্ণের রাজত্বকালে কুরুক্ষেত্রে বহু ঋষি মিলিত হইয়া দ্বিবর্ষব্যাপী এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞান্তে ঋষিরা লোমহর্ষণের নিকট পুরাণ কথা শুনিয়াছিলেন। এখন ইনি কদাপি ব্যাস-শিষ্য লোমহর্ষণ হইতে পারেন না। সম্ভবতঃ তাঁহারই বংশে অপর কোন সূত লোমহর্ষণ নাম ধারণ করিয়া থাকিবেন। 'লোমহর্ষণ' ও 'উগ্রশ্রবা' নাম নহে, উপাধিমাত্র।

ভারত-সংহিতাতে ত ব্যাসদেব নিজ প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনা লিখিয়াছেন। কিন্তু পুরাণগুলির সাংস্কৃতিক মূল্যও কম নয়। ইহাদের কিছু অংশ ত বেদের মতই প্রাচীন। বেদ সাহিত্যরূপে এবং পুরাণ কাহিনীরূপে সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়া আসিয়াছে। বেদেও 'পুরাণ' নামের উল্লেখ আছে এবং বোধ হয় যজ্ঞান্তে পুরাণ-কথা শুনিবার রীতিও অতি প্রাচীন। বিষ্ণুপুরাণ হইতে জ্ঞাত হয় যে, ইহার কিছু অংশ অতি প্রাচীন এবং তাহা ব্যাস-পিতা পরাশর স্বীয় পিতামহ বশিষ্ঠ হইতে পাইয়াছিলেন এবং স্বীয় শিষ্য মৈত্রেয়কে দিয়াছিলেন। পুনরায় তাহাই রাজা পরীক্ষিৎকে (অভিমন্যুর পুত্র) শোনান হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অংশের অপর নাম বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর। ইহাতে কৃষ্ণের জীবনী আছে এবং নিশ্চয়ই ইহার পরে (কিন্তু হরিবংশ পুরাণের পূর্ব্বে) সংযোজিত হয়। ভাগবতপুরাণ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, ইহা ব্যাসপুত্র শুকদেব পরীক্ষিৎকে শুনাইয়াছিলেন। ইহাতে কৃষ্ণলীলার বিস্তার হইয়াছে সুতরাং ইহার রচনা হরিবংশের পরে মনে হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ যাহাতে সর্ব্বপ্রথম রাধার নাম আসিয়াছে তাহা আরও পরে রচিত। এগুলিই প্রধান বৈষ্ণব পুরাণ। আর এসকল মূল বিষ্ণুপুরাণ হইতেই সঙ্কলিত হয়।

এই সকলের তুলনা করিলে নিম্নলিখিত কথাগুলি অনুমিত হয়। (১) পুরাণের কিছু অংশ অতি প্রাচীন। সৃষ্টিতত্ত্ব, মহাপ্রলয়, মৎস্যাবতার, দেবাসুর সংগ্রাম প্রভৃতি কাহিনী আর্য্যেরা ভারতের বাহির হইতে আনিয়া থাকিবেন। সূর্য্যবংশ, চন্দ্রবংশ ও যদুবংশের আদি রাজাদের কাহিনীও বহু প্রাচীন। (২) পরাশরের পিতামহের সময় হইতেই বৈষ্ণবধর্ম্ম দানা বাঁধিতে থাকে। উত্তর বৈদিকযুগের দেবতা বিষ্ণুকেই ঈশ্বর মানা হইতেছিল এবং মৎস্য-দেবতা (সুমেরীয় পুরাণেও মৎস্য-দেবতার উল্লেখ আছে) প্রভৃতি বিষ্ণুরই অবতার বলিয়া মানা হইল। কৃষ্ণ হইতে ভাগবতধর্ম্ম আরও জোর পাইল এবং বোধ হয় ব্যাসদেবই সর্ব্বপ্রথম কৃষ্ণের অতিমানবতাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন এবং (ব্যাস নিজে নয় ত) তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যদের দ্বারা তাঁহাকেই বিষ্ণুর প্রধান অবতার মানিয়া কৃষ্ণোপাসনার বিস্তার সাধন

* গুপ্তযুগ সংস্কৃত সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বা Age of Rennissance ছিল। বৌদ্ধ-প্লাবিত ভারতে পুনরায় হিন্দুরাজাদের আগ্রহাতিশয্যে কেবল নূতন পুস্তকই লিখিত হয় নাই, প্রাচীন গ্রন্থসকলেরও পুনর্লিখিত enlarged editions প্রস্তুত হইয়াছিল।

করিয়াছেন।* (৩) অমুক পুরাণ অমুকে "দিয়াছেন", "পাইয়াছেন", "বলিয়াছেন", "শুনিয়াছেন" (কদাপি "লিখিয়াছেন" বা "পড়িয়াছেন" নয়) ইত্যাদি শব্দ হইতে মনে হয় যে, তখনও লিখিবার পূর্ণ প্রচার হয় নাই। কেহ মূল বস্তু কোন অগ্রজের নিকট শুনিয়া এবং তাহা কিছু বাড়াইয়া পরে অনুজকে বলিয়াছেন। উত্তরকালে কোন বিশেষ বিশেষ রাজার সন্তোষার্থ ভবিষ্য নৃপতি বলিয়া তাঁহাদের মাহাত্ম্য, তীর্থমাহাত্ম্য, ব্রতমাহাত্ম্যাদি দ্বারা ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে প্রাপ্য রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, মনুসংহিতা আদি গ্রন্থ বোধ হয় একটিও ঐ মহাত্মাদের "লিখিত" নয়, যাঁহাদের নামে উহারা চলে। এগুলি সব সংগ্রহ (compilations) মাত্র এবং শেষ সংগ্রহ বোধ হয় গুপ্তরাজাদের সময়ে হইয়াছে। (৪) বশিষ্ঠ, ব্যাস, বিশ্বামিত্র আদি প্রত্যেক নামের ঋষিও বোধ হয় একাধিক হইয়া গিয়াছেন, যাঁহারা বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হন। (৫) কোন শাস্ত্রের মূল বক্তাকে পরবর্ত্তী লেখকেরা পরবর্ত্তী যুগে টানিয়া আনিয়াছেন।

ব্যাসদেবের অপর কীর্ত্তি সমন্বয় সাধন। তাঁহার ধর্ম্মমত উদার ছিল। তিনি কোন ধর্ম্মমতকেই দ্বেষ করিতেন না। তাঁহার শিষ্য জৈমিনি যদি মীমাংসা-সূত্রকার প্রসিদ্ধ জৈমিনি হন ত তাঁহার দ্বারাই ত্রয়ীধর্ম্মের বিস্তার হইয়াছে এবং বেদের বিভিন্ন ভাগের বিরোধ মিলন হইয়াছে। যেখানে যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ ঋক্-মন্ত্র শোনাও পাপ মনে করিতেন এবং যেখানে প্রায় সকলেই বেদকে লিপিবদ্ধ করার বিরোধী ছিলেন সেখানে পরে সকলেই বেদবিভাগ হইতে লাভ অনুভব করিলেন। এখন বড় বড় যজ্ঞে সকল শ্রেণীর পুরোহিতই নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। যদিও ইন্দ্রের প্রাধান্য লুপ্ত হইতে যাইতেছিল, তথাপি অনার্য্য দেবতা শিব ও শক্তিকে লওয়া হইয়াছিল। বায়ুপুরাণের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহা এক শৈবপুরাণ এবং ইহাতে শিব-সম্বন্ধীয় কাহিনী আছে। পরে অন্যান্য শৈবপুরাণ উহা হইতেই উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে 'কর্ম্ম' শব্দে কেবল যজ্ঞ বুঝাইত কিন্তু এখন ইহাতে যজ্ঞ (হবিষ্কর্ম্ম) ও পূজা (পুষ্পকর্ম্ম) উভয়েরই বোধ হইতে লাগিল। ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ফুল (পঐং পুষ্পং) দিয়া পূজার পদ্ধতি অনার্য্যদের নিকট হইতেই লওয়া হইয়াছে। ত্রয়ী, সাংখ্য, যোগ, শৈব ও বৈষ্ণবমতের সমন্বয় করা হইল। শুধু তাহাই নয়, বৈদিক ত্রয়ীধর্ম্ম যাহা প্রাণহীন ক্রিয়াকর্ম্মেই সীমিত ছিল তাহাতে ভক্তির ধারা সেচন করিয়া সরস করিয়া দিলেন। ভাগবতপুরাণ ত ভক্ত বৈষ্ণবের কাছে বেদের চেয়েও শ্রদ্ধার জিনিস। জ্ঞানকাণ্ডেও ব্যাসদেবের দান অসীম। বেদান্তসূত্রকার বাদরায়ণ ব্যাস যদি এই ব্যাসদেবই হন ত হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার চেয়ে কেহই বেশী প্রভাব বিস্তার করেন নাই। উপনিষদ্‌সকল হইতে এই রত্ন আহরণ করিয়া তিনি সূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। ইহার উপর যত ভাষ্য, উপভাষ্য, টীকা-টিপ্পনী এবং পৃথক গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে তাহাতেই একটি বড় লাইব্রেরী হইতে পারে। শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ, নিম্বার্ক, বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি সকল ধর্ম্মাচার্য্যই বেদান্তসূত্রের উপরই স্ব স্ব মত আধারিত করিয়াছেন।

এরূপ বলা হয় যে, যদি কোন নদী মরুভূমির মধ্য দিয়া বহে ত প্রায়ই ক্রমশঃ শুষ্ক ও ক্ষীণ হইতে হইতে বালুর মধ্যে লুপ্ত হইয়া যায়। ইহার বিপরীত যদি কোন নদী সুজলা ভূমির মধ্য দিয়া বহে ত বৃষ্টি ও উপনদীসকলের সাহায্যে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সমুদ্রে পতিত হয়। এইরূপ কোন সাহিত্য বা বিচারধারা আগ্রহহীন যুগের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতে করিতে অবশেষে লুপ্ত হইয়া যায়। একটি উদাহরণ দিতেছি। সাংখ্যমত অতি প্রাচীন মত। ইহার উল্লেখ পুরাণেতিহাস, শ্রুতি-স্মৃতি ও সূত্র সাহিত্যে আছে। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রাপ্ত সর্ব্বপ্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ "সাংখ্যকারিকা" নামক ক্ষুদ্র পুস্তক অনেক পরবর্ত্তী। ইহাতে উক্ত হইয়াছে যে, "মূল সাংখ্যশাস্ত্র মহর্ষি কপিলের প্রবর্ত্তিত ইহা তিনি নিজ শিষ্য আসুরিকে দিয়াছিলেন এবং আসুরি পঞ্চশিখকে দিয়াছিলেন। পঞ্চশিখ উক্ত শাস্ত্রকে অনেক বৰ্দ্ধিত করেন। শিষ্য-পরম্পরায় উক্ত শাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরকৃষ্ণ সংক্ষেপে এই কারিকা রচনা করেন। ইহাতে আখ্যায়িকা ভাগ ও পরমত খণ্ডন ভাগ পরিত্যক্ত হইয়াছে।" "সাংখ্য-প্রবচন সূত্র" নামক যে গ্রন্থ আজকাল পাওয়া যায় এবং কপিল-প্রণীত বলা হয়, তাহা সাংখ্যকারিকার অনেক পরে রচিত। তবে ইহা হইতে পারে যে, উহাতে সংগ্রাহক মূল কপিলের সূত্রকে reconstruct করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে জানা যায় যে, বিস্তৃত সাংখ্যশাস্ত্র লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।*

* "অবন্তিকা" নামক হিন্দী মাসিকপত্রের জুলাই, ১৯৫৩ সংখ্যায় প্রকাশিত আমার "জাতি, দেবতা ঔর ধর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধে আমি এই সকল কথার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

* সাংখ্যের পরম্পরা ঠিক বৈদিক পরম্পরা নয়। বরং ইহা সন্ন্যাস-মার্গী বৌদ্ধ ও জৈন পরম্পরার সঙ্গে অধিক সম্বন্ধ। উপনিষদে ও গীতায় যে 'সাংখ্য' শব্দ পাওয়া যায়, তাহাও কাপিল-সাংখ্য নয়, কর্ম্ম-সন্ন্যাস-যোগ।

এইরূপ জনসাধারণের অবহেলনা দ্বারা আমাদের কত বস্তু নষ্ট হইয়াছে তন্মধ্যে কতিপয়ের কেবল নামই পাওয়া যায়। কিন্তু ব্যাসদেবের প্রবর্ত্তিত ভারত-কথা, পুরাণ ও বেদান্ত সুজলা ভূমি বিহারিণী নদীর মত উত্তরোত্তর বিকশিত হইয়া আসিয়াছে।

আমাদের দেশে বরাবর অধিকাংশ লোক নিরক্ষরই ছিল। কিন্তু নিরক্ষরদের মধ্যেও বীরগাথা (রামায়ণ-মহাভারত) ও পুরাণের কথাগুলি কখনও বিস্মৃত হয় নাই। রামলীলা, যাত্রা, কথকতা এবং নিজ নিজ পিতা-পিতামহের নিকটই লোকে এগুলি শিখিয়া লইত। পৌরাণিক কাহিনী শুধু যুগে যুগে কত হাজার বৎসর চলিয়া আসিতে পারে তাহা আজ বিংশ শতাব্দীতে আমরা অনুমান করিতে পারি না। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্তও নিরক্ষর লোকেরা মায়ের কোল হইতেই এই সকল কাহিনী শুনিয়া আসিত। ইহা আমরা গত দেড় শতাব্দীর 'সভ্যতা' সংঘাতে যেন ভুলিতে বসিয়াছি। এখন লিপিবদ্ধ হইলেও কোন সাহিত্যের সংরক্ষণ হয় না, ছাপিতে হয়। মুদ্রিত হইলেও এই বৈজ্ঞানিক যুগে ঐগুলি কে পড়ে? সংস্কৃত ভাষাই ত ভারত হইতে বিস্মৃত হইতে যাইতেছে। যদি এক শতের মধ্যে কেহ কেহ স্কুলে পাস করিবার জন্য একটু সংস্কৃত পড়িয়াও থাকে, সে বিদ্যায় কি মূল সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়নের সাহস করা যায়? সুতরাং এখন একমাত্র উপায় হপকিন্স, রাপসন, পার্জিটার, টমাস, ম্যাকডোনাল্ড, উইনটারনিৎস, বারনেট, ডসন প্রভৃতি ইউরোপীয়দের ইংরেজী পুস্তক হইতে আমাদের হিন্দু সংস্কৃতি সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা। নতুবা কেহ কেহ এই উদ্দেশ্যে সিনেমার সাহায্য লন। এক পিতাকে বলিতে শুনিয়াছি, "হিন্দু সন্তানের পক্ষে পৌরাণিক কাহিনী কিছু জানা আবশ্যক এবং সেই জন্য আমার ছেলে-মেয়েদের পৌরাণিক সিনেমা দেখাই।"

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, মহর্ষি বেদব্যাস জাতির ধর্ম্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরম্পরা রক্ষার জন্য যে কাজ করিয়াছেন, কোন দেশে কোন মনুষ্যই তাহা করিতে পারেন নাই। হোমারের কাব্য একই ঘটনা ট্রয়ের যুদ্ধের উপর আধারিত এবং বোধ হয় পরবর্ত্তী লেখকদের হাতে কিছু বাড়িয়াও থাকিবে। অধিকতর প্রাচীন কিছু কাহিনীর সমাবেশ ইহাতে অবশ্য আছে, কিন্তু তিনি পূর্ব্বতন সাহিত্যের কিছুই রক্ষা করিতে পারেন নাই। আর্য্যদের মানসক্ষেত্র কখনও মরুভূমি ছিল না এবং তাঁহাদের গ্রীক শাখাতেও নিশ্চয় কিছু স্তব-স্তুতি ও বীরগাথা ছিল যাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইরাণের (পারস্য) প্রাচীন স্তবস্তুতির সংগ্রহ অবশ্যই আছে, কিন্তু তাহার সংগ্রহকার্য্যে এক ব্যক্তিরও নাম শুনা যায় না। উহাদের উপর আধারিত করিয়া জরথুস্ত্র এক ধর্ম্মমত অবশ্যই প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পুরাণেতিহাস প্রস্তুত করেন নাই, যেমন বহু পরে ফিরদৌসী করিয়াছেন। মুসা (moses) ইস্রাইলদের প্রাচীন কাহিনী ও বিধিনিষেধের পুস্তক অবশ্যই প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহা তৌরাৎ বা Pentatruch নামে প্রসিদ্ধ, কিন্তু তাহা অতি ক্ষুদ্র পুস্তক। বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ, সুতরাং ইহার রক্ষার দ্বারা ব্যাসদেব সমগ্র মানবজাতিরই সংস্কৃতি বাঁচাইয়াছেন, যাহা হইতে ধর্ম্মেতিহাসের (History of Religion) যে কোন ছাত্র লাভবান হইতে পারে। হইতে পারে যে, ব্যাসদেব অনার্য্য মাতার সন্তান ছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার মহত্ত্ব কিছুই কম হয় নাই। বরং যেরূপ দারাশিকোহ মুসলমান পিতার ও হিন্দু মাতার সন্তান হওয়ায় তাঁহাদ্বারা উভয় সংস্কৃতির সামঞ্জস্য সাধনের প্রয়াস সম্ভব হইয়াছিল, সেইরূপ ব্যাসদেব দ্বারা আর্য্য-অনার্য্য সংস্কৃতির সামঞ্জস্য সম্ভব হইয়াছে।

যে সকল পুস্তক ও প্রবন্ধ হইতে সাহায্য লইয়াছি:

১। তিলক—গীতারহস্য। Vedic Chronology.
২। বঙ্কিমচন্দ্র—কৃষ্ণচরিত্র।
৩। ডঃ সুনীতিকুমার চ্যাটার্জী—Krishna Dwaipayana and Krishna Vasudeva (Asiatic Society's Journal)
৪। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি—পুরাণে কাল (প্রবাসী)
৫। মহাভারত—আদিপর্ব্ব
৬। বিষ্ণুপুরাণ।
৭। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী—Political History of Ancient India.

সুরের নেশা

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

বলার কথা অনেক আছে,—
তবু বলা হয় না,
আজ উঠেছে মুখর হয়ে
নীরব মনের ময়না!
মর্ম্ম-কোষের দেদার মধু
উপচে এখন পড়ছে বঁধু,
আখের গুড়ের মরশুমে কেউ
সাধুর সোয়াদ লয় না!

কাকের মেলায় কোকিলকে কেউ
ডাকে না গান গাইতে,
হাঁড়িচাঁচার কদর এখন
দোয়েল-শ্যামার চাইতে।
জানি,—তবু সুরের নেশায়
নিলাজ এ প্রাণ আজ ভেসে যায়;—
গুঞ্জরিয়া অলির পুলক—
গুঞ্জরে সে তাইতে!

পথ চলি আর পাঁচালি গাই
তেমি আমি হায় গো,
হাটের ভিড়ে বিভোল উদাস
ক্ষ্যাপা বাউল প্রায় গো।
কেউ শোনে আর কেউ না শোনে
হিসাব নাহি—কেই বা গোনে?
বনের টিয়া রাজার সভার
শিরোপা কি চায় গো?

ভাবের ভাঙের ঘোরে আমার
মনের আঁখি লালচে,
যতই দাগা পাচ্ছে সে যে—
সুরের সুধা ঢালছে।
দুঃখ আমার অস্থিপাঁজর
করছে ক্রমে যতই ঝাঁঝর,—
কোন্ সে মহা সরস্বতীর
আরতি-দীপ জ্বালছে!

মরণ

শ্রীপুষ্প দেবী

আসিবে মরণ কামনার ধন দুটি বাহু প্রসারিয়া
জননীর মত মমতা কোমল স্নেহে ভরা তার হিয়া
প্রতীক্ষা মোর কতদিন ধরে
ছিল পথ চেয়ে লভিতে ইহারে
আজিকে সফল কামনা আমার পূর্ণ যা কিছু সাধ
মরণ এ নয় মানব জীবনে দেবের আশীর্ব্বাদ।

পরাণ আজিকে নির্ভয় হ'ল তোমার দরশ পেয়ে
বুঝেছ কি তুমি কত দিন ধরে আছি এই পথ চেয়ে
শিশুরে লইয়া কৌতুকসম
লুকাইয়া ছিলে কোথা মনোরম
এতদিন পরে হয়েছে কি দয়া আসিয়াছ মধু হেসে
জননীর মত মমতা কোমল করুণাময়ীর বেশে।

দুটি হাতে তব সান্ত্বনা দানি জানাইলে বরাভয়
কত যে সরস তোমার পরশ বলে বোঝানর নয়
ও দুটি আঁখিতে বরষি অমৃত
বলিলে যে কথা ছিল অকথিত
দক্ষিণ পাণি ললাটে রাখিয়া মুছে নিলে সব দুখ
নিমেষে মিলাল বাঁচিবার ভয় আনন্দে ভরে বুক।

দীর্ঘ জীবনে প্রতি পরতেতে কত সুখদুখ মাখা
কত নিষ্ফল প্রয়াস আমার বুকের শোণিতে আঁকা
শুধু শেষ আশা মরণ আসিবে
নিমেষে সকল দুঃখ নাশিবে
মোর মুখপানে চেয়ে সে হাসিবে শুকাবে সকল ক্ষত
সুগভীর স্নেহে কোলে নেবে মোরে আপন জননীমত।

জননীরে পেয়ে ভরেনি কি হিয়া তুমি কি জননী মোর?
ক্রন্দন মোর পশেছে শ্রবণে ভাঙ্গিয়াছে ঘুম ঘোর?
ছুটিয়া আসিতে খুলেছে কি কেশ?
এলে দ্রুত পায়ে সম্বরি বেশ!
হেথা অভিমানে কাঁদে যে তনয়া তাই কি ব্যাকুল মন?
নয়নের দিঠি হারাল সীমানা পেয়ে তব দরশন।

আঁধার ঘনাল আঁখি দুটি ভরে তোমার মায়ার রেশ।
নহে আবরণ নহে যবনিকা আলুলিত তব কেশ!
আসিয়াছ তুমি সব দুখ নাশি।
তাপিত বক্ষে অমৃত বরষি!
হাত ধরে তুমি লয়ে যাবে মোরে দুখ সীমানার পার।
জরা শোক ব্যথা বিরহ বেদনা রহিবে না সেথা আর।

পেয়িং গেষ্ট

শ্রীসীতা দেবী

সুবিমল যেদিন সুখবরটা নিয়ে বাড়ী ফিরল সেদিন বাড়ীর সকলের উপর প্রতিক্রিয়াটা সমান হ'ল না।

ভবানীপুরের অপেক্ষাকৃত নিরালা একটা রাস্তার উপরে বাড়ী। খুব নতুন বাড়ী নয়, আবার পুরনো ঝরঝরেও নয়। বর্ষাকালে জোরে বৃষ্টি হলেও এখনও ঘরের ভিতর জল পড়ে না। হরিসাধনবাবু বহুকাল এই একই বাড়ীতে বাস করছেন, কাজেই বাড়ীর ভাড়া আগেকার কালের দরেরই আছে। দোতলায় চারখানি থাকার ঘর, আবার তিন তলার উপরেও মাঝারি আকৃতির একটি ঘর ও সংলগ্ন বাথরুম আছে। এই ঘরটিতেই সুবিমল থাকে। দোতলার দু'খানি শোবার ঘরের অধিবাসী তিন জন। গৃহকর্ত্তা হরিসাধনবাবু, তাঁর মেয়ে শুক্লা ও হরিসাধনবাবুর অবিবাহিতা ছোট বোন মাধবী।

শুক্লা এই পরিবারের সকলের বড় আদুরে। তার জন্মের পরই মা মারা যাওয়ায় অনাদর অযত্ন ত তার হয়ই নি, বরং অতিরিক্ত আদর-যত্নে সে একটু "আদুরে"ই হয়ে গেছে। পারতপক্ষে, তার কোনও আবদার বড় একটা অবহেলিত হয় না। বাবা ত "শুকু" বলতে অজ্ঞান, পিসিমা মাধবীও নিতান্ত অন্যায় আবদার না হলে সেগুলি রক্ষা করতেই চেষ্টা করে থাকে। নামে পিসীমা হলেও মাধবী বয়সে ঠিক শুক্লার মাতৃস্থানীয়া নয়। শুক্লার চেয়ে বছর চৌদ্দ পনের বড় হবে। হরিসাধন মাধবীকে সন্তান স্নেহেই পালন করেছিলেন, মাধবীও তাঁর মাতৃহীনা কন্যাকে লালন পালন করে সে ঋণ শোধ করছে।

সুবিমল ফিরে এসেই অফিসের ধড়াচুড়া ছাড়তে উপরের ঘরে চলে গেল। কাপড় বদলে, হাতমুখ ধুয়ে নীচে খাবার ঘরে ঢুকে ডাক দিল, "শুকু, পিসীমা।"

মাধবী চাকরকে চায়ের জলের জন্য বলে ঘরে এসে ঢুকল। পেয়ালা-পিরীচ সব গুছচ্ছে, এমন সময় শুক্লা চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে ছুটে এসে বলল, "আমার জন্যে চা কর না পিসীমা, আমার বুড়ুদের বাড়ী চায়ের নেমন্তন্ন আছে।"

মাধবী বলল, "নিত্যি নেমন্তন্ন মেয়ের। কি আজকে আবার বুড়ুদের বাড়ী?"

শুক্লা বলল, "ঐ যে ওর বোনটা, বুবু না কি বলে তাকে, তারই জন্মদিন আজ। যত সব বাচ্চা বাচ্চার ব্যাপার তার মধ্যে আমাকে ডেকেছে কেন কে জানে?"

মাধবী বলল, "তা হলে ত আবার প্রেজেণ্ট দেওয়ার পর্ব্ব আছে। কিছু জোগাড় করেছিস্?"

শুক্লা বলল, "না, এখনও ত কিছু জোগাড় হয় নি। যাবার পথে কিছু একটা কিনে নেব। এ বয়সের মেয়েগুলোকে কি যে দেওয়া যায় সেই এক সমস্যা। খেলনা-পুতুলের পক্ষে বড় হয়ে গেছে। বই পড়তে চায় না, আবার এমন তাল-হিড়িঙে লম্বা যে, ফ্রক পিস্ দিতে গেলেও আড়াই গজ কাপড় না হলে চলে না। কি দিই বলত?"

মাধবী বলল, "বই-ই দিস্, কমে হবে। স্কুলে পড়ছে, বাংলা বই কি আর পড়বে না?"

শুক্লার বয়স যদিও আঠার উনিশ বছর হয়েছে, তবু ছেলেমানুষের মত ঠোঁট ফুলিয়ে সে বলল, "বাব্বাঃ, তোমার খালি খরচ কমানোর ভাবনা। দিও এখন আনা চার পয়সা, একটা প্রথম ভাগ কিনে দেব।"

মাধবী বলল, "তোমার মত খরচ বাড়াবার ভাবনা ভাবলে আর আমার চলছে কই? অল্প টাকায় সংসার চালানোর ভারটা ত আর তুমি নেবে না?"

সুবিমল একটু বিরক্তভাবে বলল, "আরে, আগে চা-টা কিছু একটু দাও। সারা দিন বক্ বক্ করে এলাম, এখন শুধু তোমাদের বক্তৃতা শুনে ত আর পেট ভরবে না?"

মাধবী তাড়াতাড়ি চা ঢালতে ঢালতে বলল, "এই দিচ্ছি। বালীগঞ্জের মাসিমা জয়নগরের মোওয়া পাঠিয়ে দিয়েছেন, দেব দুটো?"

সুবিমল উদাসভাবে বলল, "দেও, খেয়ে নি একটু, দিশী জিনিস, এর পর বহুদিন আর জুটবে না।"

শুক্লা চেয়ারে বসতে যাচ্ছিল, এক ঠেলায় সেটাকে পিছনে সরিয়ে দিয়ে বলল, "ওমা কেন?"

সুবিমল বলল, "স্কলারশিপটা জুটে গেছে। এবার তল্পিতল্পা বাঁধতে হবে।"

শুক্লা মুখটা লম্বা করে বলল, "এই সেরেছে রে!"

মাধবী সবাইকে চা দিয়ে হরিসাধনবাবুকে ডাকতে

যাচ্ছিল। শুক্লার আর্তনাদে একটু অবাক হয়ে বলল, "কেন সারল আবার কিসে? কতদিন ধরে আমরা অপেক্ষা করে আছি খবরটার জন্যে, আজকে জানা গেল পাকাপাকি কথা, এতে ত খুশীই হওয়া উচিত।"

হরিসাধনবাবু না ডাকতেই এসে ঘরে ঢুকলেন। এরই মধ্যে তিনি গায়ে শাল চড়িয়েছেন। বয়স বেশী, স্বাস্থ্য দুর্ব্বল, সর্ব্বদাই তিনি খুব সাবধান হয়ে চলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "কিসের কথা হচ্ছে? সবাই এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছ যে?"

মাধবী বলল, "দাদা, খোকা স্কলারশিপটা পেয়ে গেছে।"

ছেলের দিকে তাকিয়ে মুখে একটু হাসির রেখা দেখা দিল। হরিসাধনবাবু বললেন, "বেশ বেশ, কখন যেতে হবে?"

সুবিমল বলল, "বেশী দেরি আর কই? মাস দেড়েক বড় জোর হাতে আছে। এর মধ্যে সব জোগাড়-জাগাড় হয়ে উঠলে হয়।"

আস্তে আস্তে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে হরিসাধন বললেন, "অবশ্য তোমার ভবিষ্যৎ ভেবে আনন্দিতই ত হওয়া উচিত, কিন্তু এত দিনের জন্যে তুমি বিদেশ চলে যাবে ভেবে যেন কেমন একটু আশঙ্কার ভাব আসছে। নিজে ত বুড়ো হয়ে পড়েছি, স্বাস্থ্যও ভাল নয়। প্রায় কাজের বার হয়ে গেছি।"

মাধবী বলল, "সে ভাবলে কি আর চলে দাদা? কত বড় চান্স এটা। একবার ফসকে গেলে আর কোনদিন জুটবে না। দুটো বছর কোনমতে কেটে যাবে। যেমন করে হোক্, আমরা চালিয়ে নেব।"

শুক্লা গাল ফুলিয়ে বলল, "হ্যাঁ, এখনই ত আধপেটা খাই, তখন সিকি-পেটা খাব আর মনের আনন্দে ঠেঁটি পরে চটি ফট্‌ফট্ করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াব।"

মাধবী বলল, "তোমার শ্রী অঙ্গে ত আধপেটা খাওয়ার কোন লক্ষণ আমি দেখছি না। যা কাপড়-চোপড় জমা করেছ তাতে দু'বছরের অনেক বেশী তোমার চলবে। আর রাস্তায় ঘুরতে ত তোমার কোনদিন কোন আপত্তি আমি ইতিপূর্ব্বে দেখি নি, ঘরে থাকতেই আপত্তি।"

শুক্লা বলল, "কথায় কথায় কি যে খোঁটা দাও! না হয় আছিই একটু মোটা। তোমার মত সিড়িঙে সবাই হবে নাকি?"

হরিসাধনবাবু বললেন, "সিড়িঙেও কেউ নেই, মোটাও কেউ নেই। যার যেমন দৈর্ঘ্য তার তেমন প্রস্থ। তা শুকু যাচ্ছ না যে?"

শুক্লা বলল, "আমাকে যে আবার বুড়ুদের বাড়ী যেতে হবে। তার বোনের জন্মদিন। যাই তৈরী হয়ে নিই গিয়ে। তোমার বটুয়ার থেকে টাকা নেব নাকি পিসীমা?"

মাধবী চা খেতে খেতে বলল, "নাও গিয়ে গোটা চার, তার বেশী নিও না।"

"না গো না, আমি তোমার পকেট মারতে যাচ্ছি না।" বলে শুক্লা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হরিসাধনবাবু বললেন, "শুকু ছেলেমানুষের মত কথাটা বলল বটে, কিন্তু বিষয়টা ভেবে দেখবার মত। খোকা চলে গেলে আমাদের আয় ত শ'দেড়েক টাকা কমে যাবে, সেটা ত পুষিয়ে নেওয়া দরকার। কি করা যায়, তোমরা কিছু ভেবেছ?"

সুবিমল বলল, "আমার খাওয়া খরচটাও ত অন্ততঃ কমবে?"

মাধবী বলল "তা গোটা ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা কমতে পারে। দিনরাতের চাকরটা ছাড়িয়ে দিয়ে একটা ঠিকা ঝি রাখা যেতে পারে। তাতেও গোটা ত্রিশেক টাকা কমবে।"

সুবিমল বলল, "ওসব গাঁজাখুরি প্ল্যান ছাড় দিখি। এমনি ত কত সুখে আছ, তার উপর চাকর-বাকর ছাড়িয়ে দিয়ে দিনরাত কয়লা আর ঘুঁটের মধ্যে বসে থাক, তা হলেই সপ্তম স্বর্গ লাভ হবে।"

হরিসাধনবাবু বললেন, "না মাধু, তা হয় না। এমনিতেই তোমাকে যা খাটতে হয়, তাতে আমি নিজেকে বড় অপরাধী মনে করি। কিছুই ত তোমার জন্যে করতে পারলাম না।"

মাধবী বলল, "তোমার ঐ এক কথা। কি আমার জন্যে করাটা হয় নি? খেয়েছি, পরেছি, পড়াশুনো করেছি, বাকি আছে কি? এক নড়া ধরে পরের ঘরে বিদায় করে দাওনি, এই ত।"

হরিসাধন এই ক্ষেত্রে সত্যই নিজেকে অপরাধী ভাবতেন, তাঁর মা-বাবা মাধবীকে সাত-আট বছরের রেখে মারা যান। তিনি নিজেও তখন অল্পবয়স্ক যুবক, সবে বিয়ে করেছেন এবং সবে চাকরীতে ঢুকেছেন। মাধবীকে তিনি যথাসাধ্য যত্নে মানুষ করেছিলেন, কিন্তু টাকার অভাবে তার বিয়ে দিতে পারেন নি। মাধবী শ্রীমতী মেয়ে, কিন্তু রং তার কালো। বিনা টাকায় কোথায় তার ভাল বর পাওয়া যাবে? নিজের মেয়ের বিয়ের কথাও এজন্যে তিনি ভাবতে পারেন না। যদিও শুক্লার রং খুব ফর্সা এবং সমবয়সী বন্ধুবান্ধবীদের মধ্যে তার খুব খাতিরও আছে।

সুবিমল বলল, "...কু, ওসব ভাবনা ভাবার সময় এখন

নয়। আমার মনে হয় ভুলু কাকার প্রস্তাবটা ভেবে দেখা ভাল। আমার ঘরখানা বেশ ভালই, সঙ্গে বাথরুমও আছে। একজন মহিলা কি পুরুষ স্বচ্ছন্দে ওখানে থাকতে পারে। তোমাদের বিশেষ ঘাড়েও পড়বে না। খানিকটা তফাতেই থাকবে। পিসীমা যেমন ভাল ম্যানেজার, তাঁর আওতায় ভালই থাকবে এবং খুশি হয়েই দেড়শ'-দুশো যা চাও দিতে রাজী হবে।"

হরিসাধন বললেন, "মহিলা 'পেয়িং গেষ্ট' পাওয়া যায় নাকি।"

সুবিমল বলল, "বিংশ শতাব্দীতে কলকাতার শহরে কি না পাওয়া যায়। বিজ্ঞাপন দিলে সবই জোটে। বল ত কালই কাগজে একটা বিজ্ঞাপন পাঠিয়ে দিই।"

মাধবী বলল, "রোস বাপু, অত তড়বড় করো না, একটু ভেবে দেখি আগে। মেয়েমানুষ হলে একদিক দিয়ে নিশ্চিন্ত অবিশ্যি, কিন্তু অন্য একটা দিকও দেখবার আছে। খুব বেশী গায়ে পড়া না হয়। সারাক্ষণ বসে আড্ডা দিতে আমি পারব না এবং আমার সংসারের সব ব্যাপারে নাক ঢোকানও আমি পছন্দ করব না। মেয়েমানুষদের এ দুটি দোষ একটু বেশী।"

সুবিমল বলল, "বিজ্ঞাপন দিলে পুরুষ অতিথি ত তখনি দশ গণ্ডা জুটে যাবে, কিন্তু তারও কি কিছু অসুবিধা নেই? তাঁরাও যে সময়বিশেষে গায়েপড়া না হতে পারেন এমন ত নয়। শুক্লা রয়েছে বাড়ীতে, তার বয়স খুবই কম, এবং ধরনধারণে, যা বয়স তার চেয়েও ঢের ছেলেমানুষ। বুঝে চলতে জানে না। পিসীমাকে আবার এদিক দিয়ে ব্যতিব্যস্ত না হতে হয়।"

হরিসাধনবাবু বললেন, "একেবারে অজ্ঞাতকুলশীল লোক ত নেওয়া হতেই পারে না। জানাশোনা ভদ্রলোক হয়, একটু মধ্যবয়স্ক হয় তা হলেই। বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনের চেনা হলে আরও ভাল।"

সুবিমল বলল, "এত সব কথা ত বিজ্ঞাপনে গুছিয়ে বলা শক্ত। তা হলে আগেই খবরের কাগজের শরণ না নিয়ে চেনাশোনার মধ্যে খোঁজখবর নেওয়া ভাল। ভুলুকাকা কথাটা তুলেছিলেন, তাঁরই কাছে প্রথম সন্ধান নিই। তিনি হয়ত কোন বিশেষ লোকের কথা মনে করেই প্রস্তাবটা করেছিলেন।"

শুক্লা সেজেগুজে এসে বলল, "যাচ্ছি পিসীমা। গোলমালে একটু দেরি হয়ে যেতে পারে, অমনি যেন থানায় খবর দিতে যেও না।"

মাধবী বলল, "আচ্ছা, আচ্ছা, পাকামি করতে হবে না, যাও ত এখন। আটটার বেশী রাত হলে বুড়ুর মাকে বলে একটা ঝি বা চাকর সঙ্গে নিয়ে এস।"

শুক্লা দুড়দুড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেল। পিসীমার জ্বালায় তার যে পুরোপুরি আধুনিক হওয়া হয় না, এজন্য তার একটা ক্ষোভ মনের মধ্যে সারাক্ষণ জেগে থাকে। ঐ ত বেলা, রেবা ওরা কত রাত করে একলা একলা বাড়ী ফেরে, কই ছেলেধরায় ধরে নেয় না ত? তাদের মা-বাবারা কিছু বলে না ত? বরং যারা একটু কুনো ভীতু মেয়ে, এঁরা তাদের নিন্দেই করেন 'ন্যাকা, বোকা' মেয়ে বলে। কিন্তু বাবা আর দাদার কাছে পিসীমার এতই খাতির যে তার সঙ্গে মন খুলে ঝগড়াও করা যায় না।

হরিসাধনবাবু বললেন, "আমি বড় সেকেলে থেকে গেছি মাধু, তোমাকে নিয়ে আমার কোন হাঙ্গামা হয় নি, কিন্তু এই যে শুকু একলা একলা সন্ধ্যার পরে ঘুরে বেড়ায়, এটা আমার একেবারেই ভাল লাগে না। যতক্ষণ না বাড়ীতে ফেরে আমি মনে স্বস্তি পাই না।"

সুবিমল বলল, "পিসীমার মত আর্য্যনারী আর ক'টা পাচ্ছ এ যুগে? ওসব নিয়ে অস্বস্তি ভোগ করে লাভ নেই। যে কালের যা ফ্যাসান তা ছেলেমেয়েরা অনুসরণ করবেই, বাপমা তাতে যাই ভাবুন।"

সুবিমল খাওয়া শেষ করে উপরে নিজের ঘরে চলে গেল। হরিসাধন বারান্দায় গিয়ে ইজিচেয়ারে বসে দর্শনশাস্ত্রের বই পড়তে আরম্ভ করলেন। মাধবী চায়ের পাট উঠিয়ে ফেলে নৈশ আহারের ব্যবস্থায় মন দিল। শীতকাল প্রায় এসে পড়েছে, দিনের আলো বেশীক্ষণ থাকে না। বাইরের আবহাওয়াও ক্রমে ধোঁয়ায় ঘোলাটে হয়ে উঠছে।

নিজেদের শোবার ঘরে গিয়ে মাধবী দেখল শুক্লা তার বটুয়াটা হাঁ করে খুলে রেখে গিয়েছে। একটু বিরক্ত হয়ে বন্ধ করবার জন্যে সেটা তুলে ধরে দেখল যে তার ভিতর একটাও টাকা নেই। গোটা ছয় টাকা সে রেখে গিয়েছিল, চার টাকা নেবে বলে শুক্লা সব ক'টাই নিয়ে গিয়েছে। তার এ অভ্যাসটা মাধবীর একেবারেই ভাল লাগে না, কিন্তু হাজার বলেও সে শুক্লার এ অভ্যাসটি ছাড়াতে পারে নি। বাড়ীর টাকা নিচ্ছে তাতে আবার দোষ কি? তাও আবার বলেই নিচ্ছে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, রাস্তার আলো জ্বলে উঠল। রান্নাবান্না হয়ে গেল, হরিসাধন সন্ধ্যার সময়েই দিনের শেষ খাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেলেন, মাধবী তাঁকে ডেকে এনে খেতে বসিয়ে দিল। তিনি এসেই জিজ্ঞাসা করলেন, "শুকু ফেরেনি?"

মাধবী বলল, "এই ত সবে সাতটা, এখনই আসবে না।

বুড়ুর মা সঙ্গে লোক দিয়ে দেবেন, তিনি জানেন আমরা রাত্তিরে মেয়েদের একলা ফেরা পছন্দ করি না। তুমি খেয়ে নাও।”

এমন সময় সুবিমল বেড়িয়ে-চেড়িয়ে ফিরে এল। মাধবীর দিকে তাকিয়ে বলল, “ভুলুকাকার সঙ্গে দেখা করে এলাম। সত্যিই তাঁর এক চেনা ভদ্রলোক আছেন, তিনি “পেয়িং গেষ্ট” হয়ে থাকতে চান। এখন একটা মেস মত স্থানে আছেন, তাঁর খুবই অসুবিধা হচ্ছে। তিনি খুব আগ্রহ করেই আসতে রাজী হবেন, ভুলুকাকা বললেন। একেবারে ছোকরা মানুষ নয়, চল্লিশের উপর বয়স। চুপচাপ ‘অ্যাট-মোসফিয়ার’ ভালবাসেন, আমাদের বাড়ীর আবহাওয়া তাঁর অপছন্দ হবে না।”

হরিসাধন জিজ্ঞাসা করলেন, “কি নাম ভদ্রলোকের? করেন কি?”

“নাম নিখিলরঞ্জন মিত্র। ব্যাঙ্কে বড় কাজ করেন।”

মাধবী বলল, “বড়লোক দেখছি। সংসারে কেউ নেই নাকি।”

সুবিমল বলল, “বোন আছেন একজন, বিবাহিতা, অন্য প্রদেশে থাকেন। ভাই একটি আছেন, তা তিনি একেবারে আমেরিকায় ‘সেটল’ করে গেছেন, বিয়ে করেন নি।”

হরিসাধনবাবু বললেন, “একবার আলাপ করে দেখলে হয়।”

সুবিমল বলল, “কাল ভুলুকাকা তাঁকে নিয়ে আসবেন, বেলা পাঁচটা আন্দাজ। আমি সকাল সকাল ফিরব। পিসীমা চায়ের ব্যবস্থাটা কাল ভাল করে করো।”

মাধবী বলল, “তা হলে তিনি রোজই ঐ রকম চা চাইবেন।”

সুবিমল বলল, “আহা, আমি কি আর তোমাকে রাজ-সূয় যজ্ঞের আয়োজন করতে বলছি? এই আলুর সিঙারার বদলে মাছের সিঙারা আর কি।”

মাধবী বলল, “তোমার ত এখনও যেতে মাস দেড়েক দেরি আছে, ততদিন ভদ্রলোক অপেক্ষা করবেন?”

সুবিমল বলল, “তা করবেন বই কি? ভাল জায়গা পাওয়ার জন্যে লোকে দরকার হলে এর চেয়েও বেশীদিন অপেক্ষা করে।”

শুক্লা এই সময় ফিরে এল। মুখে স্পষ্ট বিরক্তির ছাপ। একজন হিন্দুস্থানী আয়া এসে তাঁকে পৌঁছে দিয়ে গেল।

সুবিমল বলল, “এত সকাল সকাল যে?”

শুক্লা বলল, “কি কতকগুলো চুনোপুঁটির কিচির-মিচির বেশীক্ষণ ভাল লাগল না। রেবা ছাড়া আমাদের দলের কেউ আসেই নি।”

অতঃপর যে যার নিজের কাজে চলে গেল, প্রত্যাশিত অতিথির বিষয়ে আর কোন কথাবার্ত্তা হ'ল না।

সকালবেলা শুক্লা যখন শুনল যে, তাদের বাড়ীতে বাইরের এক ভদ্রলোক থাকতে আসবেন, তখন মনে মনে সে খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠল। তবে বাইরে বেশী-কিছু প্রকাশ করল না, কারণ পিসীমা হয়ত বকুনি লাগাবেন এবং দাদা ত নিশ্চয়ই ঠাট্টা করবে। খেয়ে-দেয়ে নিয়মমত কলেজে চলে গেল। কলেজ-ব্যাপারটা খুব যে তার ভাল লাগে তা নয়, তবে যা বাড়ীর লোকগুলি, একথা ত কাউকে ঘুণাক্ষরেও বলা যায় না। পড়তে তাকে হবেই এবং পড়ার শেষে হয় মাষ্টারণীগিরি নয় কেরানীগিরি করতে হবে। বাবা কি আর তার বিয়ে দেবেন? পিসীমার এত বয়স হয়ে গেল, আজ অবধি তারই বিয়ে দিয়ে উঠতে পারলেন না।

কলেজ থেকে অন্যদিন সে যথাসাধ্য দেরি করেই ফেরে, সেখানে তবু বন্ধুবান্ধবের দল আছে। ক্লাস না থাকলে, কাউকে কিছু না বলে সিনেমায়ও চলে যাওয়া যায়। কোন বন্ধু হয়ত পয়সা দেয়, মাঝে মাঝে শুক্লা নিজেও দেয়। পিসীমার হ্যাণ্ডব্যাগ ও বটুয়া হাতড়ে পয়সা সে সর্ব্বদাই কিছু জোগাড় করে রাখে। তাকে তাঁরা যখন হাতখরচ বলে কিছুই দেন না, তখন নেবে নাই বা কেন? সে কি বড় হয় নি? অন্য সব মেয়েরা কত খরচ করে। ছেলেবন্ধুদের সঙ্গে কফিহাউসে যায়, সিনেমায় যায়। সে ত তবু তা করে না। করতে যে কিছু তার আপত্তি আছে তা নয়, বকুনি খাবার ভয়েই করে না। বাড়ীতে কেউ যে তার পক্ষ সমর্থন একেবারেই করবে না, সেটা তার জানাই আছে।

আজ কিন্তু সে বেশ তাড়াতাড়িই ফিরে এল। দাদা তখনও ফেরেনি, বাবা নিজের ঘরে। পিসীমা রান্নাঘরে বসে রসিকের সঙ্গে কি একটা তৈরি করছেন। খাবারের সুগন্ধে জায়গাটা ভরে উঠেছে।

“আমি এসে গেছি পিসীমা,” বলে ডাক দিয়ে শুক্লা নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

“এত সকাল সকাল যে?” পিসীমা জিজ্ঞাসা করল। “আচ্ছা মুখ হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে আয়, আমি চা দিচ্ছি।”

শুক্লা তাড়াতাড়ি কলেজের কাপড়-চোপড় ছেড়ে মুখ-হাত ধুতে বাথরুমে চলে গেল। একটু সাজতে হবে, কিন্তু খুব সাবধানে, যাতে পিসীমা বা দাদার চোখে না পড়ে। বাবা ত এসব বিষয়ে কিছুই বোঝেন না, তাঁর চোখেও কিছু পড়ে না। মুখ ধুয়ে এসে অনেক ভেবেচিন্তে সে একটা

সাদা মাদ্রাজী শাড়ী পরল, তবে পাড়টা তার খুব বাহারের। জামাটা পরল গাঢ় হলদে রঙের।

মাধবী হাত ধোবার জন্ত রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাথরুমে যাবার পথে ভাইঝির দিকে চোখ পড়ায় জিজ্ঞাসা করল, "কি ব্যাপার ? আবার বেরচ্ছিস নাকি ?"

ধরা পড়ে গিয়ে একটু আমতা আমতা করে শুক্লা বলল, "এই চা খেয়ে একটু রেবার ওখানে যাব, একটা বই আনতে হবে। টেষ্টটা ত এসে পড়ল।"

সুবিমল এই সময় এসে পড়াতে আর কথাবার্ত্তা এগোল না। মাধবী বলল, "কি যে ঘরটাকে করে রাখ খোকা। আজ দুপুরে আমার দু'ঘণ্টা সময় গেল তোমার ঘর সাফ করতে। ভদ্রলোক ঐ অবস্থায় ঘরখানিকে দেখলে প্রথমেই অপছন্দ করে ফিরে যেতেন।"

সুবিমল বলল, "আমাদের জাত অত খুঁটিনাটি দেখে না বাপু তোমাদের মত। ছাদের উপর অত বড় ঘর দেখেই তিনি মুগ্ধ হয়ে যেতেন। তাঁর এখনকার ঘরখানি যা অবস্থায় থাকে তা ত দেখ নি, তাই বলছ।"

মাধবী বলল, "তা বেশ, নোংরামিতে যদি তাঁর আপত্তি না থাকে ত আমার কিছু এসে যায় না। বরং ঘর গোছানোর পরিশ্রমটা বেঁচে যাবে। তা চা কি তোমাদের এখন দেব, না সে ভদ্রলোক এলে খাবে।"

সুবিমল বলল, "তাঁরাও এসে পড়লেন বলে, একসঙ্গেই খাব, তবে শুকু আগে খেতে চায় যদি ত ওকে দাও।"

শুকু বলল, "আমারও তাড়া নেই কিছু।"

বলতে বলতেই সিঁড়িতে পদধ্বনি শোনা গেল। সুবিমল বলল, "ওরাই আসছে বোধহয়। তা পিসীমা এখন যোগিনী বেশ ধরে রইলে কেন। একটু 'সাজিগুজি' করলে ত পারতে। দেখ ত শুকুকে।"

প্রায় এক-বয়সের গণ্ডীর মধ্যে পড়ে বলে সুবিমলের সঙ্গে মাধবীর ঠাট্টা-তামাসাও চলত। সে বলল, "কেন তোমার "পেয়িং গেষ্ট" কি আমাকেই দেখতে আসছেন। তা ভাবনা নেই দ্রষ্টব্যের অভাব হবে না, শুকু ত আছে।"

চটবার ভান করে শুক্লা বলল, "আহা, পরেছি ত একটা সাদা শাড়ী। বাইরে যাচ্ছি বললাম না।"

"কই সব কোথায়।" বলে হাঁক দিয়ে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক উপরে উঠে এলেন। ইনি সুবিমলের দূরসম্পর্কের কাকা। তাঁর পিছন পিছন আর এক ভদ্রলোক উঠে এলেন। বয়স তাঁর ভুলুকাকার চেয়ে খানিকটা কম, তবে কতটা কম তা ঠিক বোঝা যায় না। বেশ লম্বা দোহারা চেহারা, রং শ্যামবর্ণ, রগের কাছে দু'এক গাছা চুল পাকতে আরম্ভ করেছে।

সুবিমল আর মাধবী এগিয়ে গেল, তাঁদের অভ্যর্থনা করতে। শুক্লা একটু পিছনে দাঁড়িয়ে ভাল করে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে নিয়ে মনে মনে বলল, "এ রাম, একেবারে বুড়ো।" তারপর হরিসাধনের ঘরে ছুটে গিয়ে তাঁকে খবর দিল, বাবা, ওঁরা এসে গেছেন।"

হরিসাধন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন অভ্যাগতরা সকলে বসবার ঘরে গিয়ে বসেছেন। তিনি ঘরে ঢুকতেই সুবিমল বলল, "নিখিলবাবু ইনি আমার বাবা। আর এই আমার ছোট বোন শুক্লা।"

নিখিল উঠে দাঁড়িয়ে হরিসাধন আর শুক্লাকে নমস্কার করলেন। হরিসাধন বললেন, "বসুন বসুন, ভুলুর কাছে ত আপনার কথা আগেই অনেক শুনেছি। আপনারা সব পশ্চিমে মানুষ হয়েছেন না ? আদিবাস কোথায় ছিল আপনাদের।"

নিখিলরঞ্জন বললেন, "আদি বাসভূমি মেদিনীপুরের কোন গ্রামে ছিল। ঠাকুরদাদা কমিসরিয়টে কাজ নিয়ে পশ্চিমে চলে যান। সেখানে পয়সাকড়ি অনেক উপার্জ্জন করেছিলেন, সেইখানেই থেকে গেলেন। বাবাও চিরকাল ঐখানেই কাটিয়েছেন। দিদিরও বিয়ে হয়েছে ঐ দেশেই। এক আমিই বাংলা দেশে ফিরে এসেছি।"

হরিসাধন বললেন, "আপনার ছোট ভাই বুঝি ইউ-এস-এতে আছেন ?"

নিখিল বললেন, "হ্যাঁ, সে বিয়ে-টিয়ে করে ঐখানেই বসে গেছে।"

মাধবী বলল, "আপনাদের একটু চা দিতে বলি ? আপিস থেকে ফিরে নিশ্চয়ই চা খাওয়া হয় নি ?"

ভুলুকাকা বললেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়। চা একবার খেয়ে এলেও আর একবার খেতে আপত্তি নেই। মাধবীর চা আমাদের পরিবারে বিখ্যাত।

মাধবী এবং শুক্লা মিলে চা এবং জলখাবার পরিবেশন আরম্ভ করল। ভুলুকাকা বললেন, "ঘর ত দেখবেই, খাওয়াটাও দেখে নাও। তোমার মেসের খাওয়ার চেয়ে ঢের তফাৎ নিশ্চয়ই দেখবে।"

নিখিল বললেন, "আমার মেসের যা খাওয়া তা ত আপনি খান নি, কাজেই কতটা যে তফাৎ তা আপনি বুঝবেন না।"

ভুলুকাকা বললেন, "আরে মশাই মেসে আমিও থেকেছি। সব মেসই সমান, যেমন খাওয়া, তেমনি আব-হাওয়া।"

মাধবী বলল, "ঘরখানাও একবার দেখে যান।"

হরিসাধন বললেন, "ছাদের উপর নিরিবিলি ঘর। তবে বাড়ীটা বহুদিনের পুরনো।"

নিখিল বললেন, "কিছু ত এমন পুরনো মনে হচ্ছে না।"

চা খাওয়া শেষ হয়ে গেলে উপরের ঘর দেখে আসা হ'ল। ঘরটি ভালই, অপছন্দ হবার কিছু ছিল না।

সুবিমল বলল, "মাসদেড়েক অসুবিধায় থাকতে হবে আপনাকে, তার আগে ত ঘরটা খালি করতে পারছি না।"

নিখিল বললেন, "তাতে আর কি? বারো মাস যেখানে কেটেছে তেরো-চৌদ্দটা মাসও সেখানে কেটে যাবে। এত ভাল জায়গা পাবার কোন আশা ত ছিল না।"

তাঁরা বিদায় নেবার আগে হরিসাধনবাবু ভাইকে নিম্নকণ্ঠে বললেন, "দরদামটা তুমিই কোরো। বেশী আদায় করার ইচ্ছা আমার নেই, তবে খোকা চলে যাওয়ায় আয়ে যে ফাঁকটা হবে সেটা যেন পুরে যায় এই আর কি?"

ভুলুবাবু বললেন, "সে ত নিশ্চয়।"

ভদ্রলোক দু'জন নেমে যেতেই হরিসাধন মাধবীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমার ত ভালই মনে হচ্ছে, তুমি কি বল?"

মাধবী বলল, "একবার দেখে যতটুকু বোঝা যায়, তাতে ত খুঁৎ কিছু দেখলাম না।"

দু'এক দিনের মধ্যেই জানা গেল যে, নিখিলবাবু আসবেন বলে পাকা কথা দিয়েছেন, দু'শ টাকা দিতে তিনি রাজী। শুক্লা তাড়াতাড়ি খবরটা রটিয়ে দিল তার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে। রেবা বলল, "আমরা বুঝি জানি না ভেবেছিস? তলে তলে সব খবর নিয়ে রেখেছি।"

শুক্লা বলল, "বাবাঃ, ঝড়ের আগে কুটিনাচ সব! এত খবর নেবার কি হ'ল?"

বেলা বলল, "তা নেব না কেন শুনি? বাড়ীতে দু'জন 'বে'র যুগ্যি' মেয়ে রয়েছে, আর একজন অবিবাহিত 'পেয়িং গেষ্ট' আসছেন, এতে কৌতূহল হয় না?"

শুক্লা চোখ বড় বড় করে বলল, "দু'জন? কি পিসীমাও এখনও 'বে'র যুগ্যি'র দলে আছেন নাকি?"

রেবা বলল, "ইস্, মেয়ের ঢং দেখে আর বাঁচি না! না হয় তোমার মত নবযুবতী নাই হলেন, তাই বলে তাঁর বিয়ের বয়সও একদম উৎরে গেছে নাকি?"

শুক্লা বলল, "আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আর কি খবর নিলে?"

রেবা বলল, "এই না তোমার কোন কৌতূহল নেই! বলছি, বলছি, ব্যস্ত হয়ো না। ভদ্রলোক বেশ ভাল কাজ করেন। অবশ্য ইনকাম্ ট্যাক্স বাদ দিয়ে কত হাতে পান, তা জানি না। তবে এটা জানি যে, বাপের কাছ থেকে বহু টাকা পেয়েছেন এবং সব ব্যাঙ্কে জমা করে রেখেছেন। বদ্‌খেয়াল কিছু নেই।"

বেলা বলল, "চেহারাও ভাল, সে ত তুমি স্বচক্ষেই দেখেছ।"

শুক্লা বলল, "বাঁচালে। কোন ত্রুটি আর রাখ নি। এখন ক্লাশের ঘণ্টা পড়ছে, সেদিকে একটু মন দিতে হয়।"

সেদিন বাড়ী ফিরে শুক্লা দেখল দাদার বিদেশযাত্রার আয়োজন এরই মধ্যে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। মাধবী সুবিমল দু'জনেই ব্যস্ত। হরিসাধনবাবু আগের চেয়েও আরো বেশী গম্ভীর হয়ে গেছেন। ছেলের সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদটা তাঁর মোটেই ভাল লাগছে না।

দিনগুলো হু হু করে কেটে যেতে লাগল। সুবিমল যে দু' বছরের জন্যে চলে যাচ্ছে, এতে সবাই কাতর, অথচ ভবিষ্যতের কথা ভেবে সবাই প্রফুল্ল থাকার চেষ্টা করছে। ভুলুকাকা মাঝে মাঝে আসেন, নানা বিষয়ে কথাবার্তা হয়। নিখিলবাবুও দু'তিনবার বেড়িয়ে গেলেন এর মধ্যে। দুঃখের বিষয়, শুক্লার সঙ্গে সাক্ষাৎ তাঁর একদিনই হ'ল। আগে থেকে ত জানা ছিল না, কাজেই বাকি দু'বার সে যথারীতি দেরী করে কলেজ থেকে ফিরে শুনল যে, ভদ্রলোক এসেছিলেন এবং ঘণ্টাখানেক বাবার সঙ্গে দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করে ফিরে গেছেন।

সুবিমলের যাবার দিন অবশেষে এসেই পড়ল। শুক্লা খুব খানিক কেঁদে নিল, মাধবীর কান্না পাচ্ছিল ঢের বেশী, কিন্তু যাত্রাকালে অশ্রুজলে অমঙ্গল হয় ভেবে চুপ করেই রইল। সুবিমল বার দুই চোখ মুছল রুমাল দিয়ে এবং তার বাবা গম্ভীরমুখে ছেলেকে উপদেশ দিতে লাগলেন।

পরদিন উপরের ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নতুন আগন্তুকের জন্যে সাজিয়ে রাখা হ'ল। তার পর দিনটা ছিল রবিবার, সেইদিনই ন'টা-দশটার সময় নিখিলবাবু তাঁর জিনিসপত্র নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। জিনিসপত্রের মধ্যে বেশীর ভাগই হ'ল বই। খাওয়া-দাওয়া করে তিনি উপরে গিয়ে একবার স্তূপাকার বইগুলির দিকে বিব্রতভাবে তাকালেন, তার পর স্থির করলেন একটুখানি বিশ্রাম করে নিয়ে তার পর সেগুলি গুছিয়ে রাখবেন। বেলা চারটের সময় ঘুমিয়ে উঠে দেখলেন যে, শীতকালের ছোটবেলা শেষ হয়ে আসছে এবং চা খাবার জন্য রসিক তাঁকে ডাকতে এসেছে।

চা-খাবার সময় মাধবী জিজ্ঞাসা করল, "কিছু অসুবিধা হচ্ছে না ত?"

নিখিল বললেন, "বিন্দুমাত্র না। অসুবিধা হবার কোন ফাঁক কি আর আপনারা রেখেছেন ?"

শুক্লা অত্যন্ত বিজ্ঞের মত বলল, "এর পর কত ফাঁক বেরবে দেখবেন এখন।"

নিখিল বললেন, "কি কারণে ?"

শুক্লা বলল, "মানুষ, মানুষ বলেই। কাছে এলে তারা একজন আর একজনকে খানিকটা বিরক্ত না করেই পারে না।"

নিখিল হাসতে হাসতে বললেন, "বয়সের পক্ষে সাংসারিক জ্ঞান আপনার বড় বেশী হয়ে গেছে দেখছি।"

শুক্লা বলল, "আহা, আমার বয়স কিছু কম নাকি ? আমি ত ভীষণ বুড়ো।"

মাধবী বলল, "ঢের হয়েছে বুড়ো যদি এতই ত বুড়োর মত ভারিক্কি হয়ে থাক। নিখিলবাবু, আপনাকে আর এক পেয়ালা চা দিই ?"

নিখিল বললেন, "না থাক্, আমাকে এখনি একটু বেরুতে হচ্ছে। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল, ভুলেই গিয়াছিলাম," বলে তিনি উঠে পড়লেন।

শুক্লা বলল, "পিসীমা, উনি যদি খুব রাত করে ফেরেন, তা হলে তুমি কি করবে ?

মাধবী বলল, "কি আবার করব ? জানিয়ে দেব কোন-মতে যে আমরা খুব সকাল সকাল খাই।"

নিখিল অবশ্য খুব রাত করলেন না, আটটার মধ্যেই ফিরে এলেন। ভুলুবাবু এসেছেন দেখে বসবার ঘরেই বসে গেলেন গল্প করতে। কথাবার্তা হতে হতে খাওয়ার সময়ও হয়ে গেল। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে অবশেষে নিখিল তাঁর উপরের ঘরে চলে গেলেন।

ঘরের চেহারা একেবারে বদলে গেছে। ইতস্ততঃ স্তূপাকার করা জিনিসপত্রের চিহ্নমাত্র নেই। বইগুলি সব দেওয়ালের তাকে এবং বুক্‌কেসে সাজানো হয়ে গেছে। অন্য জিনিসগুলিও যথাযোগ্য স্থানে সুবিন্যস্ত। বিছানা পরিপাটি করে পাতা। রাত্রে খাবার জল ঠিক করা রয়েছে। একটি টেবল-ল্যাম্পেরও আবির্ভাব হয়েছে যথাস্থানে।

বাড়ীতে যারা বাস করে পরিবারের মধ্যে, এ সব জিনিস তাদের চোখেই পড়ে না, চিরকালই তারা এগুলিতে অভ্যস্ত, কিন্তু নিখিল ঘুরেছেন বাইরে বাইরে, যত্ন করবার লোক কেউ বড় হয়ে যাবার পর তাঁর সঙ্গে থাকে নি, কাজেই এসব ব্যাপারে তিনি অভ্যস্ত নন। তাঁর মনটা পরিতৃপ্তিতে ভরে গেল। কাকে যে এর জন্য ধন্যবাদ দেবেন ভেবেই পেলেন না। মাধবী বাড়ীর গৃহিণী, তিনিই কি এসব ব্যবস্থা করেছেন ? চাকরের কাজ বলে ত মনে হচ্ছে না। না কি শুক্লাই করেছে। মেয়েটি বেশ সুন্দরী ও সুভাষিণী। কাজ-কর্ম্মেও কি খুব পটু ? যা হোক, তিনি সবেমাত্র একদিন হ'ল এসেছেন, এখনই ত এসব নিয়ে আর কারও সঙ্গে গবেষণা করা চলে না। ক্রমে বোঝা যাবে।

দিন একটা একটা করে কাটতে লাগল। কাছে এলেই মানুষ মানুষকে বিরক্ত করে, শুক্লার এই ভবিষ্যৎবাণীটা সফল হবার কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। শুক্লার হৈ-হল্লোড় যেন আরোই বেড়ে গেল। কলেজের বন্ধুরা বলল, "ইস্, 'প্রাণে খুশির জোয়ার এসেছে।' হ'ল কি তোর ?"

শুক্লা বলল, "হবে আবার কি ? কোন্‌দিনই বা আমি ঘরের কোণে বসে তপস্যা করতাম ?"

মাধবী শুক্লাকে একটু সাবধান করে দেবার চেষ্টা করল। "অত বেশী হৈ হৈ কর না বাপু, তোমার বাবা এতে অসন্তুষ্ট হন। নিখিলবাবুও একটু গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, তিনিও যাতে বেশী অবাক না হয়ে যান, সেটাও দেখতে হয়।"

শুক্লা গাল ফুলিয়ে বলল, "বাব্বাঃ, যেন রামগরুড়ের বাসায় এসে পড়েছি।"

নিখিল অবশ্য অবাক হবার বা বিরক্ত হবার কোন লক্ষণ দেখালেন না। তিনি বাড়ীতেও খুব বেশীক্ষণ থাকতেন না। শুক্লার দিকে তাকিয়ে তাঁর ভালই লাগত, পুরাকালের আত্মীয়ারা এই বয়সে কি দারুণ গিন্নী হয়ে গিয়েছিলেন ভেবে তাঁর হাসি পেত। "সময়টা খুবই বদলেছে," তিনি ভাবতেন।

মাধবী কিন্তু সেই আগের কালের মেয়েদেরই মত কিন্তু কত মার্জ্জিত কত সপ্রতিভ। নীরবে সমস্ত বাড়ীটাকে কি নিপুণ ভাবেই চালাচ্ছেন। কিন্তু হাসির প্রভায় আলো করে রেখেছে সমস্ত বাড়ীটা ঐ শুক্লাই। এই ধরনের মেয়ে, এত কাছ থেকে আগে তিনি কখনও দেখেন নি।

শুক্লার সারাক্ষণ হা-হুতাশ। বন্ধুরা কত জায়গায় যায়। রাত্রি ন'টার 'শো'তে সিনেমায় যায়, গড়ের মাঠে প্যারেড দেখতে যায়, অপেরায় যায়, আরও কত কি ! তাকে কে নিয়ে যাবে ? দাদা ত দিব্যি চলে গেল, সেখানে কত মজা করবে। আর বাবা ত ঘর থেকে বছরে একদিনও বেরোন না। বেরোতেনও যদি তাঁর সঙ্গে ওসব জায়গায় যাবার কথা সে স্বপ্নেও ভাবত না।

রাশিয়ান নাচ এসেছে। শুক্লা কথাটা তুলল চায়ের টেবিলে। বলল, "আমি নিশ্চয়ই যেতে পাব না ?"

মাধবী বলল, "ঐ দুপুররাত অবধি তোমাকে কার সঙ্গে ছেড়ে দেব বল ?"

শুক্লার মুখটা অন্ধকার হয়ে এল। নিখিল দু' পেয়ালা চা শেষ করে বললেন, "দেখুন একটা কথা বলি, আমি ভাব-

ছিলাম ঐ নাচটা দেখতে যাব। আপনারা দু'জন যেতে পারেন না আমার সঙ্গে? হরিসাধনবাবুর কি আপত্তি হবে? আমি ত ঘরের লোকই এখন।"

শুক্লা হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠল, "হ্যাঁ পিসীমা চল, লক্ষ্মীটি চল। তুমি গেলে বাবা কিছু আপত্তি করবেন না। বলি বাবাকে?"

মাধবী এ সব জায়গায় বিশেষ যায় না। রাতবিরেতে বেরুতে তার ভালও লাগে না। কিন্তু অস্বীকার করলে নিখিল ভাববেন কি? হয়ত তাঁর সঙ্গে বেরুতে অমত—এইটাই ভাববেন। আর শুক্লাত কেঁদেই ফেলবে। একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলল, "আচ্ছা, দাদাকে বলে দেখি। কবে যেতে চান?"

নিখিল বললেন, "কাল যেতে পারি, আজ টিকিট করে রাখব।"

হরিসাধন কথাটা শুনে বললেন, "যাবে মাধু? আবার এই নিয়ে কোন কথা উঠবে না ত?"

মাধবী বলল, "আজকাল সবাই এ রকম বেরোয়, কে বা তা নিয়ে মাথা ঘামায়?"

হরিসাধন বললেন, "আচ্ছা যাও। নিখিলত খুবই ভাল ছেলে। তবে অনাত্মীয় কিনা, তাই ভাবছিলাম।"

শুক্লার আর আনন্দ ধরে না। নিতান্ত বকুনি খাবার ভয় না থাকলে সে দু'পাক নেচেই নিত। বেরোবার আগে যখন সাজ-পোশাক করবার সময় এল, তখন দেখা গেল যে, শুক্লা আলমারি উজাড় করে সবচেয়ে ভাল শাড়ী আর জামা বার করছে। মাধবী বলল, "বাপরে, কি ব্যাপার?"

শুক্লা অসহিষ্ণুভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "তুমি কিছু জান না পিসীমা, 'অপেরা'তে আর 'ব্যালে'তে সবাই ভীষণ সাজে। আমরা ঠিকমত না সাজলে লোকে আমাদের গেঁয়ো ভাববে। তুমি তোমার ঐ ফিতে-পাড়ের গরদটা পরে যেও না যেন। দাদা ত তোমাকে খুব ভাল একটা শাড়ী দিয়েছিল, সেই যখন প্রথম তার চাকরি হ'ল, সেইটা পর না।"

মাধবী কি একটু ভেবে নিয়ে হাল্কা ধূসর রংয়ের সেই বেনারসীটিই বার করল। ভাইপো-ভাইঝি অনেক জেদা-জিদি করেও এটা তাকে একবারের বেশী পরাতে পারে নি। সাজসজ্জা শেষ করে যখন তারা বেরুল, তখন মনে হচ্ছিল যেন একসঙ্গে ঊষা ও সন্ধ্যা মূর্তি ধরে চলেছে। পরস্পরকে দু'জনে খুবই তারিফ করল, সঙ্গের তৃতীয় ব্যক্তি তাদের দেখে কি ভাবলেন তা বোঝবার অবশ্য কোন সুবিধা হ'ল না।

নাচটা তিন জনেরই খুব ভাল লাগল। শুক্লা বলল, "দেখলে পিসীমা, ভাগ্যে আমি অত চেঁচামেচি করলাম, তাই ত দেখতে পেলে এমন জিনিস।

মাধবী ক্ষীণ একটু হেসে বলল, "জিনিসটা খুবই ভাল, সত্যি, তবে ধন্যবাদটা কাকে দেব বুঝতে পারছি না।"

নিখিল বললেন, "আমাকে নিশ্চয়ই না, আমারই বরং উল্টে আপনাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।"

পরদিন মাধবী হরিসাধনবাবুকে বলল, "দাদা, কাল ত নিখিলবাবু একরাশ টাকা খরচ করলেন আমাদের নাচ দেখিয়ে—আমাদেরও একটু কিছু করা উচিত তাঁকে আনন্দ দেবার জন্য। কিন্তু এমন কিছু প্ল্যান কর যাতে তুমি বাদ না পড়। সেদিন তোমায় একলা ফেলে গিয়ে আমার বড় দুশ্চিন্তা হচ্ছিল।"

হরিসাধন ত সন্ধ্যার পরে বেরোতে একেবারেই নারাজ। কাজেই সবাই মিলে ভেবে-চিন্তে স্থির কর যে, সামনের রবিবারে শিবপুরের বাগানে গিয়ে পিক্‌নিক্‌ করা হবে।

রান্নাবান্না সব ভোরে উঠে বাড়ীতেই করিয়ে নিল মাধবী। ওখানে গিয়ে রাঁধতে বসলে ত বেড়ান-টেড়ান কিছুই হবে না। বন্ধু-বান্ধবের কাছে চেয়ে-চিন্তে একটা বাড়ীর গাড়ী জোগাড় হ'ল এবং ট্যাক্সিও একটা ভাড়া করা হ'ল। জিনিসপত্র আগলাবার জন্য রসিক চলল সঙ্গে।

বাগানে পৌঁছে শুক্লা ত বনের হরিণের মত উদ্দাম হয়ে উঠল। খালি দল ছেড়ে এগিয়ে যায়, আর হরিসাধনের দুশ্চিন্তা ধরে যায়। নিখিল দু'তিন বার গিয়ে শুক্লাকে খুঁজে নিয়ে এলেন।

মাধবী বলল, "পারি না এ মেয়ের জ্বালায়! খালি ছাড়া গরুর মত দৌড়ে বেড়াচ্ছে।"

নিখিল বললেন, "জন্মেছেন উনি বাঙালীর ঘরে, মনটা কিন্তু একেবারে পশ্চিম জগতের মেয়েদের মত। প্রাণ-চাঞ্চল্যটা ওদের বেশী।"

মাধবী হাসবার চেষ্টা করল, কিন্তু হাসিটা ভাল করে ফুটল না।

খাওয়া দাওয়া হবার পর হরিসাধনবাবু একটু ছায়াঘন জায়গা বেছে নিয়ে বিশ্রাম করতে লাগলেন। অন্যরা এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করতে লাগল।

হঠাৎ রসিক বললে, "আরে, পাঁড়েজী এত হন্‌হনিয়ে আসছে কেন? কি হ'ল আবার!" এই লোকটি হরিসাধনের আগেকার কলেজের দরোয়ান। বাড়ী আগ্‌লাবার জন্য একে রেখে আসা হয়েছিল। সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

পাঁড়েজী প্রায় দৌড়ে এসে নিখিলের হাতে একটা

টেলিগ্রামের খাম দিল। বলল, "ভয়ানক জরুরী, নীচের তলার বাবু বললেন, তাই নিয়ে এলাম।"

নিখিল ব্যস্ত হয়ে খামখানা খুলে বললেন, "সর্ব্বনাশ!"

হরিসাধন উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন, "কি হ'ল, খারাপ খবর?"

নিখিল বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ।—ব্যাঙ্কটা ফেল হ'ল।"

মাধবী অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করল, "আপনার টাকা ছিল ওখানে?"

নিখিল সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। হরিসাধন মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে দরোয়ানকে বললেন, "তুমি বাড়ী ফিরে যাও। আমরাও আসছি, অল্প পরে। মাধু, জিনিসগুলো গুছিয়ে নাও, আর এখানে থাকতে ভাল লাগছে না।"

নিখিল গাছতলায় যেমন চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাই রইলেন। শুক্লা খবর শুনে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে বসে পড়েছিল, হঠাৎ উঠে দৌড়ে সামনের দিকে চলে গেল।

হরিসাধন বললেন, "বড় দুঃখের ব্যাপার হ'ল। তবে আপনি অল্পবয়স্ক কৃতবিদ্য মানুষ, এ ক্ষতি কালে পূরণ হয়ে যাবে।"

নিখিল সংক্ষেপে বললেন, "তা হতে পারে।"

মাধবী বলল, "শুকুটা আবার গেল কোথায়? এই ত এখানেই ছিল?"

নিখিল বললেন, "ঐ যে ঐ ঘোড়া'র কাছে দাঁড়িয়ে একদল ছেলেমেয়ের সঙ্গে গল্প করছেন।"

মাধবী উচ্চকণ্ঠে ডাকল, "শুকু শুনে যা।" শুক্লা ধীর-মন্থরগতিতে এসে দাঁড়াল, "কি বলছ?"

মাধবী বলল, "চল আমরা যাচ্ছি।"

শুক্লা মাথা নেড়ে বলল, "আমি এখন যাব না। বেলারা এসেছে দেখছ না, ওদের সঙ্গে ফিরব।" নিখিলের দিকে তাকালও না।

হরিসাধন বললেন, "আচ্ছা যাও, সন্ধ্যের মধ্যে ফিরো।" মাধবীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "ছেলেমানুষ, ওর ফুর্ত্তিটা কেন মাটি হয়?"

মাধবী কঠিনমুখে জিনিস গোছাতে লাগল, কোন উত্তর দিল না। নিখিল তার কাছে এসে বললেন, "সত্যি, বড় অসময়ে দুঃসংবাদ এল। এত আনন্দের আয়োজন আপনাদের সব মাটি হয়ে গেল।"

মাধবী বলল, "আপনার ক্ষতির তুলনায় আমাদের আর কতটুকু ক্ষতি? কি যে আপনাকে বলব আমি তা ভেবেই পাচ্ছি না।"

নিখিল বললেন, "ক্ষতি অবশ্য হ'ল খানিকটা। কিন্তু শুধু ক্ষতিই কি হ'ল মাধবীদেবী?"

মাধবী নীরবে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। নিখিল বললেন, "কাচ আর হীরার তফাৎ বোঝবার যে জ্ঞান, সেটাকে আমি এ ক্ষতির অনেক উপরে স্থান দিচ্ছি।"

বিরহিনী

শ্রীকালিদাস রায়

সখীরা চলে গেছে গা ধুয়ে নিজ ঘরে
গাগরী ভরি কালো জলে,
এখনো দীঘিনীরে ডুবায়ে তনুটিরে
কে করে দেরি কোন্ ছলে?
দন্তে কাটিতেছে পাপড়ি কমলের
কে অই করে জলখেলা,
গাগরী ভরে আর ঢালিয়া ফেলে জল
শুধুই ভরা আর ফেলা।
সারাটি দিন ধরে দহেছে খরতাপ
শীতল জলে অবগাহ
আরামদায়ী বটে কিন্তু ওর কেন
কিছুতে ঘুচিল না দাহ?

সন্ধ্যাতারকাটি কখন উদিয়াছে
চাহিয়া আছে তার পানে,
তীরের বেণুবনে জোনাকি চমকায়,
ঝিঁঝিঁরা ডাকে একতানে।
পাখীর কলরব থামিয়া গেছে, তারা
নীড়ের বাহিরে না রয়।
আঁধার ঘনাইছে ফিরিতে বনপথে
ওর কি করিবে না ভয়?
বড়ই সাধ যায় শুধাই গিয়ে তায়
কে তুমি ঘাটে একাকিনী,
ফিরিয়া যেতে ঘরে কেন না টান পড়ে
তুমি কি তবে বিরহিনী?

দীপালীর পরে

শ্রীসুখময় সরকার

কার্তিকী অমাবস্যায় ভারতের প্রায় সর্বত্র মহাসমারোহে দীপালী-উৎসব। প্রবাসীতে (১৩৬২—মাঘ) 'দীপালী' বর্ণনা করিয়া তাহার উৎপত্তি অনুসন্ধান করিয়াছি। এক্ষণে তাহার পরবর্তী দুই-তিন দিনের উৎসব বর্ণনা করিতেছি। আমাদের বর্ণনীয় উৎসবের দেশ বাঁকুড়ার পশ্চিমাংশ।

দীপালী-অমাবস্যার পরদিন যে প্রতিপদ তিথি, তাহার বিশেষ নাম দ্যূত-প্রতিপদ। আর এক নাম বীর-প্রতিপদ। দ্যূত-প্রতিপদে দ্যূত-ক্রীড়া শাস্ত্রীয় বিধান। সে বিধান অদ্যাপি আমরা মানিয়া চলি। পূর্বরাত্রে চণ্ডীমণ্ডপে শ্যামা পূজা হইয়া গিয়াছে, প্রতিমা এখনও বিসর্জন হয় নাই। মণ্ডপটি এখনও সুসজ্জিত, আম্রশাখার বনমালা এখনও শুকাইয়া যায় নাই; অলিম্পন-রেখা এখনও মুছিয়া যায় নাই। দেওয়ালের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এখনও যেন ধুপের গন্ধ লাগিয়া আছে। সেদিন বৈকাল হইতে চণ্ডীমণ্ডপের দ্বারপিণ্ড প্রৌঢ় ও প্রবীণদের সমাগমে মুখর হইয়া উঠে। এখানে-ওখানে পাঁচ-সাতটা শতরঞ্চী পাতিয়া পাশাখেলা আরম্ভ হইয়া যায়। বিষ্ণুপুরের অম্বরী তামাকের গন্ধে আর 'কচে বারো' হুঙ্কারে মণ্ডপ-প্রাঙ্গণ প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠে। বালক-যুবকেরা পাশা খেলিয়া আমোদ পায় না, কিন্তু তাহার বিকল্প কেরম-বোর্ড আছে। চণ্ডীমণ্ডপের দেহলীতে অভিভাবকদের সাক্ষাতে কেরম-বোর্ড খেলা সম্ভবপর হয় না; তাই এ পাড়ায়-সে পাড়ায় দুই একটা নিভৃত বৈঠকখানায় তাহাদের কেরম-খেলার আসর জমিয়া উঠে।

দ্যূত-ক্রীড়ার বিকৃত রূপ জুয়াখেলা। কেবল শব্দানুসারে নয়, অর্থানুসারেও। দ্যূত-প্রতিপদের সমস্ত রাত্রি জুয়াখেলা চলিতে থাকে। বাল্যকালে দেখিয়াছিলাম, পাশের গ্রামের অমর বাঁড়ুজ্জে ছিল একমাত্র জুয়াড়ী। চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে বিস্তীর্ণ-শাখ এক অশ্বত্থের মূলে সে জুয়ার ছক পাতিয়া বসিত, আর দুই-চারি জন অতি সঙ্কোচে পয়সা খেলিতে আসিত। ইদানীং দেখি, জুয়াড়ীর সংখ্যা বাড়িয়াছে। আমতলা, নিমতলা, বিষ্ণুমন্দিরের চত্বর, পুরাতন ভাঙ্গা ভোগের-দালান, সমস্ত জুয়াড়ীতে ভরিয়া গিয়াছে। জুয়াখেলা বে-আইনী। কখনও কখনও দেখা যায় দুই-একটা লাল পাগড়ী ঘোরাঘুরি করিতেছে। কিন্তু তাহারা কিছু দেখিতে পায় না। মধ্যস্থলে কাগজের নোটের ব্যবধান। দ্যূতক্রীড়া ভারতে কতকাল ধরিয়া চলিতেছে! বৈদিক আর্যগণ দ্যূতক্রীড়া করিতেন। মহাভারতে কুরু-পাণ্ডবের দ্যূত-ক্রীড়ায় কুফল-স্বরূপ লোকক্ষয়ী, বীরক্ষয়ী, ধর্মক্ষয়ী ভারত-যুদ্ধে মাত্র আঠার দিনে ভারতের সর্বনাশ হইয়াছিল। এখনও কত লোক জুয়া খেলিয়া রাতারাতি সর্বস্বান্ত হয়। তথাপি শাস্ত্রে ইহার বিধান কেন? পরে সে কথা বলিতেছি।

দ্যূত-প্রতিপদের অপর নাম বীর-প্রতিপদ। কেন এই নাম? সেদিন কেহ বীরত্ব প্রকাশ করে কি? অন্য কোথাও করে কি না, জানি না; কিন্তু বাঁকুড়ায় করে। এখানে সে বীরত্ব-গাথা গাহিব। অবশ্য এই বীরত্ব-প্রকাশ বাউরী, হাড়ী, ভূমিজ, সাঁওতাল কোড়া (কোলাঃ?) প্রভৃতি অন্ত্যজ ও উপজাতীয় লোক-গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বাঁকুড়ায় এই উৎসবের নাম গোরু-খোঁটানো, কাড়া-খোঁটানো। গ্রামে সাধারণের যাতায়াতের অপ্রশস্ত পথ; বর্ষাকালে তাহার উপর দিয়া জল বহিয়া যায়; সে পথের নাম কুলি। কুলির মাথায় এবং অন্য উন্মুক্ত স্থানে মাঝে মাঝে মোটা মোটা শক্ত খোঁটা পুতিয়া দেওয়া হয়। একটা করিয়া দীর্ঘশৃঙ্গ সবল বলীবর্দ অথবা পুং-মহিষ (স্থানীয় নাম কাড়া) খোঁটায় খোঁটায় বাঁধিয়া দেওয়া হয়। দোড়িটা এমন আলগাভাবে বাঁধা হয় যে বলদ বা মহিষ স্বচ্ছন্দে খোঁটাকে কেন্দ্র করিয়া বারংবার ঘুরিলেও দোড়ি খোঁটায় জড়াইয়া যায় না। সাধারণতঃ বৈকাল বেলায় গোরু-খোঁটানো আরম্ভ হয়। খোঁটায় বাঁধা গোরু বা মহিষের সহিত যাহারা বিক্রম প্রকাশ করে, তাহারা মদ্যপান করে। দুই-একদিন পূর্ব হইতে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া চাউল সংগ্রহ করে, সেই চাউলের পচাই বা হাঁড়িয়া মদ তাহারা নিজেরাই চোলাইয়া লয়। জুয়াখেলার মত মদ চোলাইও বে-আইনী। কিন্তু আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া নির্বিবাদে ইহারা উৎসবের প্রয়োজনমত মদ প্রস্তুত করিয়া লয়। বলদ-মহিষের সহিত বিক্রম-প্রকাশকারীরাই সম্ভবতঃ 'বীর।' অদ্ভুত তাহাদের বেশভূষা। মুখে কালি, সর্বাঙ্গে খড়ির বড় বড় ফোঁটা। যেন এক একটা প্রেত। তাহাদের পরিধানে বীর-ধটি (মালসা-কোঁচা-করা ছোট কাপড়); গলায় শালুক ফুলের মালা; হাতে একটা পুতিগন্ধী, অর্ধশুষ্ক গো-চর্ম বা মহিষ-চর্ম। এক পার্শ্বে একদল 'গায়েন' গীত গাহিতে থাকে—কৃষ্ণ-লীলার গীত। বাঁকুড়া ও মানভূম জেলার কত কবি এমন গীত রচিয়া গিয়াছেন, কে তাহার হিসাব রাখে? সে গীতের সুর সরল, ভাষা আরও সরল, কিন্তু বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ঠিক কেমন গীত, না শুনিলে কেবল ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। আর একদিকে কাড়া-নাকাড়া বাজে। নাকাড়ার শব্দ শুনিয়া খোঁটায় বাঁধা বলদ ও মহিষ মাতিয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে বীরগণও মত্ত হইয়া তাহাদের সমীপবর্তী হয়। মুখে এক প্রকার বিকট শব্দ

করিয়া দুর্গন্ধ চর্মখণ্ড লইয়া যেমন কোন বীর আসিয়া বলদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, অমনই সে বলদ শৃঙ্গ আস্ফালন করিয়া বীরের দিকে ধাবিত হয়, শৃঙ্গদ্বারা তাহাকে আঘাত করে, কখনও বা বীরকে শৃঙ্গে উত্তোলন করিয়া দশ-বিশ হাত দূরে নিক্ষেপ করে। কিছুক্ষণ নিশ্চেষ্ট থাকিয়া বীর হামাগুড়ি দিয়া আবার একটা মহিষের সহিত বিক্রম প্রকাশ করিতে যায়। কোন বীর গীতের একটা কলিতে বিকৃত স্বর-সংযোগ করিয়া মুখভঙ্গি বিকটতর করিয়া একটা বলদের সম্মুখীন হয়; আর অমনই রক্ত-চক্ষু বলদটা ঘাড় বাঁকাইয়া নাসারন্ধ্রে ফোঁস ফোঁস শব্দ করিতে করিতে বীরকে আক্রমণ করে। শৃঙ্গ দ্বারা আহত হইয়া বীর ডিগবাজী খাইতে খাইতে খানিকটা দূরে চলিয়া যায়, আবার ফিরিয়া আসে। এইরূপে খোঁটার চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে ষণ্ড ও বীর, উভয়ের বীরত্ব প্রকাশ চলিতে থাকে। কখনও কখনও মহিষ বা বলিবর্দের শাণিতাগ্র শৃঙ্গ বীরের দেহে বিদ্ধ হইয়া যায়; কখনও কোন মহিষ বন্ধন-রজ্জু ছিন্ন করিয়া জনতা ভেদ করিয়া দিগ্‌বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া দৌড়াইতে থাকে। ইহাতে অনেকেই আহত হয়, কাহারও বা প্রাণহানি পর্যন্ত হয়। তথাপি এই উৎসব দেখিতে গ্রামের সকল লোকই সমবেত হয়। মনে হয়, প্রাচীনকালে বন্ধনমুক্ত বলীবর্দ বা মহিষের সহিত বীরেরা লড়াই করিত; এখনকার রজ্জুবদ্ধ বলীবর্দ বা মহিষের সহিত লড়াই সেই প্রাচীন রীতির অনুকরণ। গ্রীস দেশ যখন সভ্যতার চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, তখনও সেখানে Bull-fight ছিল; কয়েক শতাব্দী পূর্বে স্পেন দেশেও ছিল।

গোরু-খোঁটানো সূর্যাস্তের পূর্বেই শেষ হইয়া যায়। ইহার পর গো-পূজা। গো-পূজাও শাস্ত্রীয় বিধান। গ্রামাঞ্চলে ইহার প্রচলিত নাম 'গোরু-বান্দনা' অর্থাৎ গো-বন্দনা। হেমন্তের স্তিমিত-বিক্রম সূর্য যখন পশ্চিম গগনে অস্তরাগ ছড়াইতে ছড়াইতে বিদায় গ্রহণ করেন, পক্ষিকুল যখন কলরব করিতে করিতে কুলায় প্রত্যাবর্তন করিতে থাকে, উর্ধ্বপুচ্ছ গাভীর দল তখন গ্রাম-পথে গোক্ষুর-রেণু উড়াইয়া গোধূলির মায়ালোক রচনা করিতে করিতে গোষ্ঠ হইতে গৃহে ফিরিয়া আসে। গাভীগণ গৃহাগত হইবামাত্র গৃহিণী হরিদ্রা-চূর্ণ-মিশ্রিত জলে তাহাদের পা ধোয়াইয়া দেন। কোন কোন গৃহিণী স্বীয় কেশগুচ্ছ দ্বারা দুগ্ধবতী গাভীর ধৌত পদ মুছাইয়া দেন। তার পর সকল গোরুর গাত্রে কলিকা কিংবা বাটি দিয়া রঙের ছাপ দেওয়া হয়। শ্যামলীর গাত্রে খড়ির সাদা ছাপ, ধবলীর গাত্রে গিরি-মাটির লাল ছাপ। গোধনের অঙ্গরাগ সমাপ্ত হইলে তাহাদের লেজের কেশগুচ্ছ কাঁচি দিয়া ছাটিয়া সুদৃশ্য করা হয়। তার পর আরম্ভ হয় প্রত্যেক গাভীর প্রসাধন। প্রত্যেকের শৃঙ্গে ধান্য-শীর্ষের সীঁথি-মৌর এবং গলায় শ্যামালতার মালা পরাইয়া দেওয়া হয়। সীঁথি-মৌরগুলি সাধারণতঃ রাখালেরাই প্রস্তুত করে, কদাচিৎ গৃহিণীরা। সীঁথি-মৌরের কারুকার্য রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্যামালতা পাওয়া না গেলে প্রিয়ঙ্গুলতা অথবা শালুক ফুলের মালা গাভীদের কণ্ঠদেশ শোভিত করে। সন্ধ্যার পর পুরোহিত আসেন। বরণডালা রীতিমত সজ্জিত করিয়া শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনি সহকারে গাভীদের বরণ করা হয়। সেদিন যথাসম্ভব সুখাদ্য দিয়া গাভীগণকে আপ্যায়িত করা হয়। গৃহপালিত পশুকে এমন করিয়া আদর করিতে কোন জাতি জানে কি? উহারা যে ইতর প্রাণী, সেদিন সে কথা ভুলিয়া যাইতে হয়; মনে হয় যেন উহারা আমাদের পরিবারভুক্ত আত্মীয়-স্বজন। পশু ও মানুষের সম্পর্ক যে কতদূর নিবিড় হইতে পারে, তাহা বুঝিবার জন্য পুরাতন পুঁথির জীর্ণ পাতা উল্টাইবার পূর্বে এই সকল গ্রামাঞ্চলে আসিয়া প্রতিপদের 'গোরু-বান্দনা' দেখিলে অধিকতর ফললাভ হইবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

দ্যূত-প্রতিপদে রাত্রি-জাগরণ বিধেয়। কেন রাত্রি-জাগরণ করিতে হইবে, সে কথা পরে বলিতেছি। কিন্তু এতদঞ্চলে রাত্রি-জাগরণের যে বিচিত্র উপায় অবলম্বিত হয়, এক্ষণে তাহা বর্ণনা করিতেছি। দ্যূত-ক্রীড়া, রাত্রি-জাগরণের একটি উপায়, কিন্তু ইহা সকলের জন্য নহে। নারীগণ দ্যূত-ক্রীড়া করেন না, অল্প-বয়স্ক বালক-বালিকারাও দ্যূতক্রীড়ার জটিলতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। রাত্রি-জাগরণের অন্যান্য উপায় আছে—রামায়ণ-গান, যাত্রা-গান, কীর্তন-গান। কিন্তু সমস্ত রাত্রি বসিয়া বসিয়া গান শুনিবার ধৈর্যও সকলের থাকে না। রাত্রি-জাগরণের সর্বাপেক্ষা কৌতুককর ও সর্বজনিক অবলম্বন 'টাট্টু ঘোড়ার নাচ।'

গভীর রাত্রে 'টাট্টুঘোড়ার নাচ' অনুষ্ঠিত হয়। পার্শ্ববর্তী গ্রামের হাড়ীরা এই নাচ নাচিয়া থাকে। হাড়ীরা ঢাক বাজাইতেও নিপুণ। টাট্টুঘোড়ার নাচে ঢাকের বাজনা উপভোগ করিবার মত। নিশীথের স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া যখন ঢাকের বজ্র-নির্ঘোষ গ্রাম-প্রান্ত হইতে শ্রুত হয়, তখন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই তন্দ্রা টুটিয়া যায়। টাট্টু ঘোড়ার নাচ এক বিচিত্র ব্যাপার। 'টাট্টু ঘোড়া' কোন জীবন্ত প্রাণী নয়। খড়, বাঁশ ইত্যাদি দ্বারা একটা ঘোড়ার মুখ নির্মাণ করে, তাহার উপর কাপড় জড়াইয়া কালি দিয়া মুখ-চোখ আঁকিয়া দেয়। মুখের পশ্চাতে ঘোড়ার দেহের সমান আয়তনের একটা বাঁশের ফ্রেম, সমস্তটা কাপড় দিয়া ঢাকা। ঘোড়ার পশ্চাতে শণের লেজটি কিন্তু চমৎকার ঝুলিতে থাকে। একটা মানুষ ফ্রেমের মধ্যে ঢুকিয়া দুই হাতে দুই দিকের বাজু ধরিয়া নাচ আরম্ভ করে। রাত্রিকালে আলো-অন্ধকারের রহস্যময় পরিবেশের মধ্যে মনে হয়, সত্যই একটা লোক ঘোড়ায় চড়িয়া আছে এবং ঘোড়াটা বাজনার তালে তালে নাচিতেছে। একটা নয়, দুইটা নয়, সাত-আটটা টাট্টু ঘোড়া সারি সারি দাঁড়ায় এবং ঢাকের বাজনার তালে তালে বিচিত্র ভঙ্গিতে নাচে। ঘোড়-সওয়ার মাঝে মাঝে এমন 'চিঁহি-হি-হি' শব্দ করিয়া উঠে, মনে হয় সত্যই অশ্বের হ্রেষাধ্বনি। ঘোড়-সওয়ার ব্যতীত নাচের দলে অনেক লোক থাকে। তাহাদের

মাঝে কেহ গান গায়, কেহ বাজনা বাজায়। খানিকক্ষণ পরে নাচ-গান-বাজনা থামিয়া যায় এবং দুই জন লোক সম্মুখে আগাইয়া আসে। ইহারা যে দলের অধিকারী, বেশভূষা এবং চালচলন হইতে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। মাথায় পাগড়ী, হাতে লাঠি মুখে প্রকাণ্ড টাঙ্গির মত একজোড়া গোঁফ। গায়ে বেনিয়ানের মত জামা, ধুতি পরার ধরণ পশ্চিমাদের মত। একজন অপর জনকে বলে, "আরে নাগরিয়া, তোর ঘোড়া কোথায় কিনেছিলি র‍্যা। এ যে একদম নাচতে নারে।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি ক্রুদ্ধকণ্ঠে উত্তর দেয়, "নাচতে নারে, কি র‍্যা? এ ঘোড়া আমি যে হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় কিনেছি র‍্যা।"

প্রথম। আরে ছিঃ ছিঃ! ছ্যাঃ ছ্যাঃ!! ছোঃ ছোঃ!!! কুম্ভমেলায় আবার ভাল ঘোড়া কবে পাওয়া যায় র‍্যা? বাগিস না ভাই, তা তোর ঘোড়ার দাম কত শুনি।

দ্বিতীয়। আমার ঘোড়ার দাম তিন লাখ পাঁচ হাজার। তোর ঘোড়ার দাম কত? কিনেছিস কোথায়?

প্রথম। আমার ঘোড়ার দাম পাঁচ লাখ তিন হাজার। কিনেছি হরিহরছত্রের মেলায়। বুঝেছ ভায়া? একবার নাচ দেখতে চাস? তবে চলুক ভাই!!

বলিবামাত্র ঢাকের বাদ্য বাজিয়া উঠে, আবার ঘোড়া-নাচ আরম্ভ হয়। এইরূপে উষাকাল পর্যন্ত নাচ চলিতে থাকে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই নাচ দেখিয়া আমোদ পায়, তাহারা অক্লেশে সারারাত্রি জাগিয়া থাকিতে পারে। নাচ শেষ হইলে মুরুব্বিরা আসিয়া 'শিরোপা' প্রার্থনা করে। তখন কেহ পয়সা, কেহ পুরাতন কাপড় ইত্যাদি আনিয়া দেয়। শিরোপা পাইয়া ঘোড়া-নাচের দল যখন প্রফুল্ল মনে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে, তখন পাহাড়ের চূড়ায় পূর্বগগনে অরুণ-রাগ প্রকাশিত হয়।

দ্যুত-প্রতিপদের দিন বাঁকুড়ায় বিশেষ অনুষ্ঠান 'জামাই-বান্দনা' (অর্থাৎ জামাতৃ-বন্দনা); কেহ কেহ বলে 'জামাই-ফোঁটা। আবার কেহ কেহ 'বান্দনা' শব্দ 'বন্ধন' শব্দজাত মনে করিয়া জামাইকে বাঁধিয়া কৌতুক করে। এটি স্বচক্ষে দেখি নাই, অনেকের মুখেই শুনিয়াছি। স্মৃতিতে ইহার বিধান নাই, পঞ্জিকায় ইহার উল্লেখ নাই, অথচ বাঁকুড়ায় ইহা আবহমান কাল প্রচলিত আছে। শ্বশ্রূ সেদিন প্রাতঃকালে শুচিস্নাতা হইয়া নিমন্ত্রিত জামাতার ললাটে চন্দনের তিলক আঁকিয়া দেন এবং শিরে ধান্যদূর্বা দিয়া আশীর্বাদ করেন; তাহার দীর্ঘায়ুঃ কামনা করেন, তাহাকে উত্তম ভোজ্য, পানীয় ও বস্ত্রাদিদ্বারা আপ্যায়িত করেন। জামতাও শ্বশ্রূকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করে, ক্ষেত্র বিশেষে শ্বশ্রূকে শ্রদ্ধার সহিত বস্ত্রাদি উপহার দেয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষে অরণ্যষষ্ঠীর দিন অন্যত্র 'জামাই-ষষ্ঠী' পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সেদিন বাঁকুড়ায় জামাতৃ-বন্দনা হয় না। ইদানীং কদাচিৎ কেহ কলিকাতা ও পূর্ববঙ্গের অনুকরণে 'জামাই-ষষ্ঠী' পালন করিতেছে, দেখিতে পাই। পঞ্জিকায় জামাই-ষষ্ঠীর উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহা 'আচারাৎ'।

পরদিন ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া। প্রাতঃকালে ভগিনীরা স্নান করিয়া শুচি বসন পরিধানপূর্বক ভ্রাতৃপূজনের জন্য প্রস্তুত হয় প্রচলিত নাম 'ভাই-ফোঁটা।' এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য অতি মধুর। ভগিনী ভ্রাতার ললাটে চুয়া-চন্দনের তিলক আঁকিয়া দিয়া ভালবাসার শক্তিতে শক্তিমতী হইয়া বলিতেছে, "ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা। যমের দুয়ারে দিলাম কাঁটা।" 'ভবদম দুরন্ত শমন' যে যম, যাহার প্রভাব অতিক্রম করিবার সাধ্য কাহারও নাই, ভগিনী ভালবাসার শক্তিতে সেই যমকে ফাঁকি দিতে চায়; মৃত্যুকে অস্বীকার করিবার স্পর্দ্ধা রাখে। সেদিন কেবল যে সহোদরা ভগিনীই সহোদর ভ্রাতার ললাটে তিলক দিয়া তাহার মঙ্গল কামনা করে তাহা নহে, পারিবারিক সম্পর্কে, গ্রাম-সম্পর্কে, জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে ভ্রাতা-ভগিনী সম্পর্ক হইলেই ভাই-ফোঁটা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। পতিগৃহবাসিনী বিবাহিতা ভগিনী সেদিন পিত্রালয়ে আগমন করে, যদি কোন কারণে তাহা না পারে, ভ্রাতৃগণকে সে পতিগৃহেই নিমন্ত্রণ করে। সেদিন ভগিনীর হস্তে সযত্নে অন্নগ্রহণ সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া গণ্য হয়। সাধারণতঃ জ্যেষ্ঠা ভগিনী কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠা ভগিনীকে সেদিন বস্ত্রাদি উপহার দেয়। যাহার ভগিনী নাই, অন্ততঃ সেই দিনটির জন্য তাহার মনে হয়, সে বড়ই দুর্ভাগা। গৃহে গৃহে সেদিন আনন্দের কলরোল, মাঙ্গলিক হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি, আর 'দীয়তাং ভুজ্যতাম্।'

ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার দিনে আনন্দ পরিবেশন করে 'কাঠি নাচের দল।' বাউরী-হাড়ী এবং কোড়া-সাঁওতালেরাই সাধারণতঃ কাঠিনাচের দল বানাইয়া এই শুভদিনটিকে উপভোগ্য করিয়া তোলে। একদল বালককে নারীর বেশে সজ্জিত করা হয়। মাথায় হীরাকষের কালি-মাখানো শণের পরচুলা, নাকে নথ, কানে দুল, কপালে রাংতার টিপ, বুকে কাঁচুলি, হাতে চুড়ি, কোমরে ঘাগরা, পায়ে ঘুঙুর। ইহারাই নর্তকী। প্রত্যেক নর্তকীর হাতে একজোড়া 'কাঠি' আর কোমরে গোঁজা একটি কারয়া রুমাল। সঙ্গে একদল 'গায়েন' আর অন্ততঃ একজোড়া মাদল। নাচের দল যে গ্রাম হইতেই আসুক না কেন, প্রথমে চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে নাচ দেখায়, তার পর বাড়ীতে বাড়ীতে। প্রথমটা ঢিমে তালে মাদল বাজে, গায়েনেরা সুর ভাঁজে আর নর্তকীর দল সারি সারি দাঁড়াইয়া এক হাত কোমরে দিয়া আর এক হাতে রুমাল ঘুরাইতে ঘুরাইতে ধীরে ধীরে নাচ সুরু করে। কিছুক্ষণ পরে এক হাতে কাঠি লইয়া নৃত্য। তখন মাদল দ্রুতলয়ে বাজে, গায়েনদের গান চলে পুরাদমে। সেই গ্রাম্য কবির কৃষ্ণলীলার গান। নাচ-গান-বাজনা যখন সমে আসিয়া ঠেকে, তখন নর্তকীর দল দর্শকদলকে চকিত করিয়া সমস্বরে কলকণ্ঠে বলিয়া উঠে, "ঝিঙাফুল ঘরে নাই—ঝিও—ঝিও।" নৃত্যের দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত হইলে দুই হাতে কাঠি লইয়া নৃত্য আরম্ভ হয়। কখনও সম্মুখে নত হইয়া, কখনও বসিয়া বসিয়া, কখনও শুইয়া শুইয়া নানা ভঙ্গিতে নর্তকীরা নাচে। মাদল তখন দ্রুততম লয়ে

বাজিতে থাকে আর গায়েনদের গানের সুর তখন পঞ্চমে পৌঁছিয়া যায়। অপূর্ব এই লোকনৃত্য। না দেখিলে ইহার মহিমা উপলব্ধি করা যাইবে না। গরীব-দুঃখী চাষী-মজুরের ছেলে মাত্র দুই-চারিদিনের মহড়ায় এই নৃত্য অভ্যাস করিয়া লয়। ইহাদের শিল্প-প্রতিভা অনস্বীকার্য। অথচ ইহাদিগকে উৎসাহ দিবার কেহ নাই। এই নৃত্যকলা বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য শিক্ষিত ভদ্রসমাজে কেহ মাথা ঘামাইতে চাহে না। গুরুসদয় দত্ত 'ব্রতচারী' আন্দোলনের মারফতে ভদ্রসমাজে এই নৃত্য প্রবর্তিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু 'ব্রতচারী' এখন লুপ্তপ্রায়। সৌখিন রঙ্গমঞ্চে এই নৃত্যের অভিনয় নিতান্ত প্রহসনে পর্যবসিত হয়।

কাঠিনাচের গাইয়ে-বাজিয়ে-নাচিয়ের দল গ্রামবাসীকে আনন্দ-দান করিয়াই তুষ্ট হয়; তাহাদের দাবি নিতান্তই তুচ্ছ। কেহ দুইটা পয়সা দেয়, কেহ দুইমুঠা চাউল, কেহ চারিটি মুড়ি-মুড়কি। এক-আধটা পুরাতন ছেঁড়া কাপড়-জামা পাইলে তাহাদের আহ্লাদের সীমা থাকে না। এই স্বল্প-তুষ্ট শিল্পীর দল দেশের যে কি মূল্যবান্ সম্পদ, গ্রামবাসী তাহা জানে না। তাহারা বর্ষে বর্ষে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন বেলা আড়াইপ্রহর হইতে রাত্রি দেড়প্রহর পর্যন্ত গ্রামের প্রত্যেক গৃহাঙ্গনে যে আনন্দ-সুধা পরিবেশন করিয়া যায়, তাহার মূল্য অতি অল্পলোকেই বোঝে। তাহাদের ঋণ কেহ কখনও পরিশোধ করিতে পারিবে না।

ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার পরদিন তৃতীয়া তিথি; কিন্তু লোকে বলে 'যম-দ্বিতীয়া'। যম-দ্বিতীয়া বলিয়া কোন পর্ব নাই; যদি থাকে, সে ঐ ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার দিন। সেদিনই যম-যমুনা ও চিত্রগুপ্তের পূজা বিহিত। কিন্তু প্রাকৃতজনে তাহা জানে না। তৃতীয়ার দিনে 'যম-দ্বিতীয়া' হয়, যমুনা তাঁহার ভ্রাতা যমকে ফোঁটা দেন,—এই বিশ্বাস ব্যাপক ও দৃঢ়মূল। এই বিশ্বাসের বশে সেদিন কেহ কোন শুভকর্ম করে না, কেহ বিদেশ-যাত্রা করে না। তবে উৎসবের রেশ সেদিন পর্যন্ত প্রায় সমভাবেই বিদ্যমান থাকে। সেদিনও দিবাভাগে কোন কোন বৎসর কাঠিনাচ হয় এবং প্রায় প্রতিবৎসর রাত্রিতে যাত্রাগান অথবা রামায়ণ-গান হয়।

এক্ষণে এই সকল উৎসবানুষ্ঠানের মূল অন্বেষণ করি। দ্যূত-প্রতিপদের রাত্রিতে কেন দ্যূত-ক্রীড়া করিতে হয়, ইহাই প্রথম প্রশ্ন। সেদিন রাত্রি-জাগরণ ও শাস্ত্রীয় বিধান, পূর্বে বলিয়াছি। দ্যূত-ক্রীড়া রাত্রি-জাগরণের একটি অবলম্বন। কিন্তু ইহার অন্য উদ্দেশ্যও ছিল। রাত্রি-জাগরণের বিধানই বা কেন? দীপালী-প্রবন্ধে দেখিয়াছি, অতি প্রাচীন কালে কার্তিকী অমাবস্যায় রবির দক্ষিণায়ন হইত এবং পরদিন দ্যূত-প্রতিপদে নূতন বৎসর আরম্ভ হইত। ইহা আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৭০০০ অব্দের কথা। সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র থাকিয়া তখন নববর্ষ দিবসটিকে চিহ্নিত করা হইত। রাত্রিতে লোকে প্রতিদিনই নিদ্রা যায়; কিন্তু বিশেষ বিশেষ উৎসবের দিনে লোকে রাত্রি-জাগরণ করে। বিশেষতঃ সেই সুদূর অতীত কালে যখন পঞ্জিকা বলিয়া কিছু ছিল না, তখন নববর্ষ-দিবসটিকে বৈশিষ্ট্য দান করিবার জন্য রাত্রি-জাগরণ একটি বিশেষ উপায় ছিল। নববর্ষ-দিবসে দ্যূত-ক্রীড়ার তাৎপর্য আছে। দ্যূত-ক্রীড়ায় জয়পরাজয় হইতে লোকে অনুমান করিয়া লয়, সমস্ত বৎসরটা কেমন কাটিবে। ভবিষ্যৎ যতই অপ্রীতিকর হউক, যতই ভয়ঙ্কর হউক, তাহাকে জানিবার, তাহার আভাস পাইবার জন্য মানব-মনের একটা স্বাভাবিক ব্যাকুলতা আছে। এক কালে কোজাগরী পূর্ণিমাতেও নববর্ষ আরম্ভ হইত বলিয়া সেদিনও দ্যূত-ক্রীড়া ও রাত্রি-জাগরণের বিধান হইয়াছে (১৩৬৫ অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে 'কোজাগরী পূর্ণিমা' পশ্য)।

গো-পূজন, জামাতৃ-বন্দনা, ভ্রাতৃপূজা—এ সমস্তই নব-বর্ষোৎসবের সহিত জড়িত। ভারতীয় আর্যগণ পঞ্চনদের তীরে উপনিবেশ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে গো-পালন আরম্ভ করিয়াছিলেন। কৃষিকর্ম ব্যতীত কোন জাতি সভ্য হয় না, আর গোরু ব্যতীত কৃষিকর্ম সম্ভবপর নহে। মানব-সভ্যতার উন্মেষে গোরু যে কতদূর সহায়তা করিয়াছে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বৎসরের প্রথম দিনে তাই গোরুর বিশেষ আদর-যত্ন করা তাহার ঋণ-স্বীকারের নিদর্শনমাত্র এবং ইহা সভ্যতার পরিচয়ই বহন করে। জামাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি প্রিয়জনকে আদর-আপ্যায়ন এবং তাহাদের মঙ্গলকামনা নববর্ষের খুব স্বাভাবিক অনুষ্ঠান। নৃত্য-গীতাদি আমোদ-আহ্লাদও বৎসরের প্রথম দিনে অনুষ্ঠিত হওয়া স্বাভাবিক। বৎসরের প্রথম দিন আনন্দে কাটিলে সমগ্র বৎসর সুখে কাটিবে, প্রাচীনকালে এই বিশ্বাস ছিল, এখনও আছে।

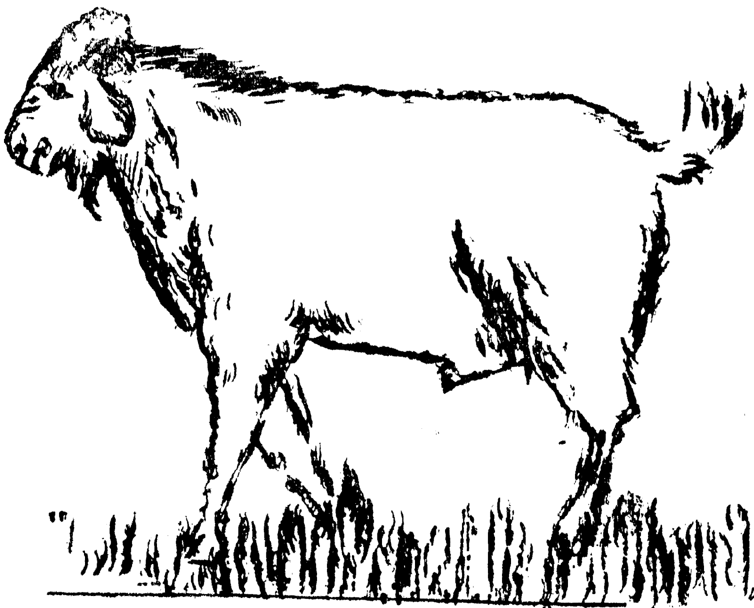
কতকাল ধরিয়া এই সকল উৎসব চলিতেছে, দীপালী-প্রবন্ধেই তাহা জানা গিয়াছে; বর্তমান প্রবন্ধ পূর্ব-সিদ্ধান্তের পোষকতা করিয়া প্রাচীনতর কালের ইঙ্গিত করিবে।

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস দ্যূত-প্রতিপদের দিন বলিদৈত্যরাজ-পূজার বিধান দিয়াছেন। হরিভক্তিবিলাস অতিশয় প্রাচীন গ্রন্থ না হইলেও নিশ্চয় তাহাতে প্রাচীন স্মৃতি অনুসৃত হইয়াছে। হেতু ব্যতিরেকে কেহ কোন কর্ম করে না, সে হেতু জ্ঞাত হইতে পারে, অজ্ঞাতও হইতে পারে। দ্যূত-প্রতিপদে দৈত্যরাজ বলি পূজিত হইতেন কেন? নিশ্চয় সেদিন দৈত্যরাজের কোন বিশেষ মহিমা প্রকাশিত হইয়াছিল। সে মহিমার কথা সকলেই জানেন, বহু পুরাণে তাহার উল্লেখ আছে। দৈত্যরাজ বলি একদা মহা-পরাক্রান্ত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে স্বর্গচ্যুত করিয়া বিরাট দান-যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু বামন-মূর্তি ধারণপূর্বক যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হইয়া বলির নিকট ত্রিপাদ-ভূমি যাচ্ঞা করিলেন। দৈত্যরাজ দানে স্বীকৃত হইলে বিষ্ণু প্রথম পদে স্বর্গ, দ্বিতীয় পদে মর্ত্য আকীর্ণ করিলেন। বলি বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, বিষ্ণুর দেহ হইতে তৃতীয় পদ উৎপন্ন হইয়াছে। বিষ্ণু তৃতীয় পদ কোথায় রাখিবেন? বলির প্রার্থনানুসারে ভগবান্ তাঁহার তৃতীয় পদ বলির মস্তকে স্থাপন করিলেন। তৃতীয় পদ সহ বলি পাতালে নিবদ্ধ হইলেন। তদবধি তিনি পাতালের অধিপতি

হইয়া রহিয়াছেন। ভগবান্ বিষ্ণুর তৃতীয় পদ মস্তকে ধারণ করার সৌভাগ্য যেদিন দৈত্যরাজের হইয়াছিল, নিশ্চয় তিনি সেদিনই পূজা পাইবার যোগ্য বিবেচিত হইয়াছিলেন।

আমরা একাধিক প্রবন্ধে দেখিয়াছি, বিষ্ণু সূর্য। দৈত্যরাজ বলি কে, "তদবিষ্ণোঃ পরমং পদম্" প্রবন্ধে (প্রবাসী—১৩৬৫। আশ্বিন) তাহারও ইঙ্গিত পাইয়াছি। মূলা নক্ষত্রের অধিপতি রাক্ষস বা দৈত্য। অর্থাৎ মূলা-নক্ষত্রই দৈত্যরাজ বলি। মূলার তারাগুলি যোগ করিলে এক দানবের আকৃতি পাওয়া যাইতে পারে। আকাশের দক্ষিণ অংশ পাতাল গণ্য হইত। মূলা-নক্ষত্রও আকাশের দক্ষিণ অংশে থাকে। মূলা-নক্ষত্রের বৈদিক নাম নিঋতি। নিঋতি শব্দের অর্থ মৃত্যু। পরবর্তী কালে নিঋতি এক রাক্ষসী কল্পিত হইয়াছিল। তাহার নামানুসারে নৈঋত কোণ। বিষ্ণু তাঁহার তৃতীয় পদ বলির মস্তকে স্থাপন করেন—এই রূপক-কাহিনীর ফলিতার্থ এই যে, সূর্য মূলা-নক্ষত্রে গমন করিলে দক্ষিণায়ন হইয়াছিল। সে কতকালের কথা? বর্তমানে আর্দ্রা-নক্ষত্রে রবির দক্ষিণায়ন হয়। অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র-গণনায় আর্দ্রার স্থান ষষ্ঠ, মূলার স্থান উনবিংশ। উভয়ের মধ্যে ত্রয়োদশ নক্ষত্র-ভাগের ব্যবধান। অয়ন-দিন এক নক্ষত্র-ভাগ পশ্চাদগত হইতে প্রায় ৯৫০ বৎসর লাগে। অতএব আনুমানিক ৯৫০×১৩ ১২,৩৫০ বৎসর পূর্বে মূলা-নক্ষত্রে রবির দক্ষিণায়ন হইয়াছিল, দ্যূত-প্রতিপদে সেই স্মৃতি রক্ষিত হইয়াছে।

এই সকল উৎসব যে, দক্ষিণায়ন দিনের স্মৃতি বহন করিতেছে, তাহার আরও প্রমাণ আছে। ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ায় দিন যমার্ঘ দান শাস্ত্রীয় বিধান। কে যম? তিনি বৈবস্বত, বিবস্বানের পুত্র। বিবস্বান্ দক্ষিণায়ন দিনের সূর্য। যমও দক্ষিণ দিকের অধিপতি। এই সকল যোগাযোগ দক্ষিণায়ন দিনেরই ইঙ্গিত করে। বিশেষতঃ যমার্ঘদান পিতৃ-তর্পণের অঙ্গ। দক্ষিণায়নই পিতৃ-তর্পণের প্রশস্ত কাল। অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, দীপালীর পরে যে সকল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, সে সকলের মধ্যে লুক্কায়িত আছে অতি প্রাচীনকালের দক্ষিণায়ন দিনের স্মৃতি এবং সে স্মৃতি প্রায় ১২০০০ বৎসরের। ভারতে আর্য্য-কৃষ্টির বয়স মাত্র ৪০০০ বৎসর বলিতে পারি কি?



রামছাগল

শিল্পী—শ্রীঅনিলকুমার দে

(টাইপ-রাইটিং মেশিনে কয়েকটি Key-র সাহায্যে ইহা অঙ্কিত)

লালসঙ্কেত

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

বাড়ী-ঘর, আসবাবপত্র, হুইস্কির বোতলটা, এমনকি যাকে নিয়ে কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেও অতনু এক নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল সেই শ্রীমতীও এক বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল। অতনু তার শয্যার উপর পড়ে আছে। অকাতরে ঘুমাচ্ছে। শ্রীমতীরও সাড়া নেই। কেষ্ট বার কয়েক এসে ফিরে গেছে। সাহস করে ডাকে নি।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় কেষ্টর দেখা পাওয়া গেল। তার চোখেমুখে খানিকটা শঙ্কা আর খানিকটা সংশয়। গত-রাত্রের বাদানুবাদের সেও একজন অদৃশ্য শ্রোতা। শেষ পর্য্যন্ত কেষ্ট ডাক্তারবাবুকে খবর দিল।

ডাক্তার বাবু কেষ্টর কাছে গতরাত্রের সংবাদ শুনে অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে উঠলেন। তিনি কেষ্টকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বৌদিরাণী ঘরে আছেন কি না সে খবর নিয়েছ?

কেষ্ট ঘাড় নেড়ে জানায়, দরজা ভিতর থেকে বন্ধ বলেই ত মনে হ'ল।

কতকটা আশ্বস্ত হয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, তুমি এখন চলে যাও কেষ্ট, দরকার হলে আমি পরে যাবার চেষ্টা করব।

কেষ্ট বিনা বাক্যব্যয়ে চলে গেল।

কেষ্ট চলে যেতে ডাক্তারবাবু বহুক্ষণ ধরে অন্যমনস্কভাবে পায়চারি করে এক সময় থামলেন। নিজের সঙ্গেই তিনি কথা কয়ে উঠলেন। ডাক্তার তুমি আর কি করবে? কতটুকু এগোলে তোমার সম্মান থাকবে? যার স্ত্রী কিছু করতে পারল না—উল্টো অপমানিত হ'ল সেখানে তোমার আর কতখানি সাধ্য? অতনু খেয়ালী, সে বেপরোয়া আর উদ্ধত কিন্তু, এতবড় নির্ব্বোধ এ তিনি কেমন করে জানবেন? কেষ্ট না এলেও ডাক্তারবাবুকে একবার যেতেই হ'ত। অতনুর জন্যও বটে আর শ্রীমতীর জন্যও বটে। গতরাত্রে শ্রীমতীকে বড় বেশী উত্তেজিত মনে হয়েছিল। নিজের সম্বন্ধে কিছু বলতে গিয়েও শেষ পর্য্যন্ত অতনুর কারখানা সম্বন্ধে আলোচনা করেই চলে গেল।

টেলিফোন বেজে উঠেছে। ডাক্তারবাবু রিসিভারটি তুলে নিলেন, হ্যালো···হ্যাঁ আমি ডাক্তারবাবু বলছি, কিন্তু তুমি কে মা? ও তুমি মিত্রা···কি বলছ? অতনুর স্ত্রী তাঁর ঘরে নেই? খোঁজ করে দেখ, নিশ্চয়ই কোথাও আছেন···আর এ খবর আমাকে দিয়ে লাভ কি? তুমি বরং অতনুবাবুকেই জানিয়ে দাও। ব্যবস্থা যদি কিছু করবার প্রয়োজন থাকে তিনিই করবেন।

শেষের দিকে ডাক্তারবাবুর কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে উঠল। তিনি আর উত্তরের অপেক্ষা না করে রিসিভারটি নামিয়ে রাখলেন। গত-রাত্রে এখান থেকে চলে যাওয়ার পরে এমন কি ঘটনা ঘটল যার ফলে শ্রীমতী এভাবে কাউকে কিছু না বলে চলে যেতে পারে, তা তিনি বুঝতে পারেন না। তবে কোথাও যে অসম্মানজনক কিছু ঘটেছে এ বিষয় তাঁর সন্দেহ নেই। নইলে যে মেয়ে রাত বারটা পর্য্যন্ত অতনুকে ভরাডুবির হাত থেকে কেমন করে কোন পথে বাঁচান যায় তাই নিয়ে আলোচনা এবং কর্ম্মপন্থা স্থির করে গেল, সেই মেয়ে তাঁর কাছ থেকে চলে যাবার পরেই অতনু তাকে কর্ম্মচ্যুতির নির্দ্দেশ দিল কেন? শ্রীমতীর এই চলে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে কথাটা বার বার তাঁর মনে হচ্ছে। অতনু তাঁকে ছাড়াতে চাইলেও তিনি তাকে ত্যাগ করতে পারেন না। তাঁর নিজের প্রয়োজন আজও শেষ হয় নি। শ্রীমতীর চলে যাওয়া কিংবা অতনুর ব্যবহার তাঁকে যত না বিস্মিত করেছে মিত্রার ব্যবহার তার কাছে তার চেয়েও বিস্ময়কর। অতনুর চতুর্দ্দিকে যে বিপদ ঘনিয়ে এসেছে তার পিছনে ডানকান-আগরওয়ালার যেমন হাত আছে মিত্রাও যে নিষ্ক্রিয় নেই এ কথাও তাঁর জানা। অতনুও এ খবর রাখে। তবুও অতনু কেন যে এই বিপজ্জনক খেলায় মেতে উঠেছে আর মিত্রা যে কেন এমন নাটকীয়ভাবে তাঁর স্মরণাপন্ন হতে চাইছে এ রহস্যের সন্ধান ডাক্তারবাবুকে কে দেবে। অতনুর প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তার শত্রুও যেমন আছে মিত্রও তেমনি আছে কিন্তু অতনু···

চিন্তায় বাধা পড়ল। টেলিফোন বেজে উঠল। এবারে মিত্রা না—অতনু। অত্যন্ত উত্তেজিত তার কণ্ঠস্বর। সে বলছিল, সবকথা টেলিফোনে বলা যায় না। আপনি এখুনি একবার আসুন। বড় দরকার।

ডাক্তারবাবু চুপ করে থাকেন। কৌতূহল ক্রমশঃই সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। শ্রীমতী এদের ভাবিয়ে তুলেছে।

পুনরায় অতনুর কথা শোনা গেল, আমার গাড়ী এখুনি আপনাকে আনতে যাবে। অতনু রিসিভার রেখে দিল।

ডাক্তারবাবু তৈরি হয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। অতনুর তাঁকে বড় দরকার। শ্রীমতী রাগ করে চলে গেছে। তাঁর কাছে না এসে অন্যত্র চলে গেছে। কোথায় সে যেতে পারে তা ডাক্তারবাবুর জানা। নিশ্চয় সে তার বাপের কাছে গেছে। এর বেশী সাহস তার নেই। ডাক্তারবাবু তাকে ভাল করেই চেনেন।...

অতনুর ড্রাইভার এসে সেলাম করে সম্মুখে দাঁড়াল। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর এতদিনের এত আয়োজন কিছুতেই ব্যর্থ হতে তিনি দেবেন না। অতনুর চলার এই মারাত্মক গতিকে সংযত করতেই হবে। নইলে তাঁর স্বপ্ন আর সাধনা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

ডাক্তারবাবু নিঃশব্দে এসে গাড়ীতে উঠলেন। গাড়ী দ্রুত গতিতে ছুটে চলল। ডাক্তারবাবুর মাথার মধ্যেও গতরাত থেকে এই মুহূর্ত পর্যন্ত ঘটে-যাওয়া ঘটনাগুলি বিদ্যুৎ গতিতে পাক খেতে লাগল।

গাড়ী এসে বাড়ীর কম্পাউণ্ডে উপস্থিত হতেই সর্ব্বপ্রথমে ছুটে এল মিত্রা। অত্যন্ত আগ্রহভরে সে বলল, আপনি এসেছেন, তার পরেই কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব মৃদু করে পুনরায় বলল, অতনুবাবুর সঙ্গে কাজ শেষ করেই আপনি চলে যাবেন না যেন ডাক্তারবাবু—আমারও বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা আছে।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যে ঘটনাগুলি ঘটে চলেছে তার আকস্মিকতায় তিনি কিছুটা বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। ডাক্তারবাবু একটু অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলেন, আমার সঙ্গে তোমার কি দরকার থাকতে পারে ঠিক বুঝতে পারলাম না ত মিত্রা?

মিত্রা ডাক্তারবাবুর কথার ধরনে ক্ষুণ্ণ হলেও প্রকাশ্যে শান্ত কণ্ঠে বলল, সব কথা শুনলেই আপনি বুঝবেন। সহসা আলোচনার ধারা পাল্টে সে পুনরায় বলল, অতনুবাবুও এসে পড়েছেন। আপনি যান, আমি আপনার চায়ের ব্যবস্থা করিগে।

ডাক্তারবাবুকে নিয়ে অতনু সোজা তার শয়নকক্ষে এসে উপস্থিত হল। মুহূর্ত্তের জন্য একটু সঙ্কোচবোধ করে অল্পেই সে ভাব কাটিয়ে উঠে ধীরে ধীরে বলল, সব খবরই বোধ হয় শুনেছেন—

ডাক্তারবাবু বললেন, সব খবর বলতে কি শ্রীমতীর চলে যাওয়ার খবরের কথা বলা হচ্ছে?

অতনু মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল, আপাতত তাই।

ডাক্তারবাবু মৃদু শান্ত কণ্ঠে বললেন, ওটা খবর নয়। খবর হচ্ছে শ্রীমতীর চলে যাওয়ার কারণগুলি। এই বাড়ীর এবং পরিবারের অমঙ্গল আশঙ্কায় যে মেয়ে গতরাত্রে আমার কাছে গিয়েছিল, আমি ত ভাবতেই পারি না সে এখানে ফিরে আসবার পর এমনকি ঘটতে পারে যার জন্য সেই রাত্রেই এ বাড়ী ছেড়ে তাকে চলে যেতে হ'ল অতনুবাবু? তাছাড়া এখন মনে হচ্ছে অপরের পারিবারিক ব্যাপারে আমি একটু বেশী মাথা ঘামাতে শুরু করেছিলাম—তার পুরস্কারও আমি পেয়েছি। আর নতুন করে নিজেকে জড়াতে চাই না। তাছাড়া আমাদের মধ্যের সম্বন্ধ ত চুকেই গেছে।

অতনু একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, সম্বন্ধ যদি চুকে গিয়েই থাকে তা হলে আবার এলেন কেন?

ডাক্তারবাবু গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলেন, আমার কথা সকলে বুঝবে না অতনুবাবু। আমার কথা থাক, কিন্তু শ্রীমতী যে এ বাড়ী থেকে অন্যত্র চলে গেছেন তা কি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে?

অতনু জবাব দিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ডাক্তারবাবু খানিক চুপ থেকে বললেন, কিন্তু আমাকে কেন ডেকে পাঠান হয়েছে সে কথা এখনও জানতে পারি নি আমি।

অতনুর ঝিমিয়ে-পড়া ভাবটা মুহূর্ত্তের জন্য কেটে গেল। তার মুখেরভাব কঠিন হয়ে উঠল। বলল, আপনি কোন খবর রাখেন কি না সেইটে জানবার জন্য।

তার মুখের ভাব এবং কণ্ঠস্বরের এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেই ডাক্তারবাবু বললেন, এ প্রশ্নের জবাব টেলিফোনেও আমি জানাতে পারতাম।

তা হয় ত পারতেন—অতনুর কণ্ঠস্বরে পুনরায় সংযম ফিরে এল। মৃদু শান্ত কণ্ঠে সে বলতে লাগল, কিন্তু আমার কি জানি কেন বিশ্বাস ছিল যে, এ বাড়ীর মানসম্মান আর শুভাশুভর দিকে আপনারও দৃষ্টি আছে। এ বাড়ীর সুখ-দুঃখের আপনিও একজন অংশীদার।

ডাক্তারবাবু প্রাণহীন কণ্ঠে জবাব দিলেন, খুবই আশ্চর্য্যের কথা। কথাটা কি আজ সকাল থেকেই ভাবতে সুরু করা হয়েছে?

অতনু এতবড় আঘাতেও কিন্তু রাগ করল না। বরং একটুখানি হাসবার চেষ্টা করেই জবাব দিল, আপনিও মিথ্যে বলেন নি, আমিও মিথ্যে বলিনি। আমাদের মধ্যের সম্বন্ধটা প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু এ নিয়ে কোনদিন একটি কথাও বলা হয় নি। আমি নির্ব্বিবাদে সম্বন্ধের চেয়ে আপনার বয়েসকে সম্মান দিয়ে এসেছি। কেন দিয়েছি তা আমি জানি না—তবে দিয়েছি এ কথা সত্য। আর তার জন্য কোন দিন নিজেকে আমার ছোট মনে হয়নি।

ডাক্তারবাবু একটুখানি হাসলেন—কথা বললেন না।

অতনু থামতে পারল না। বলে চলল, আমার এই অকারণ দুর্ব্বলতায় আমি নিজেও বড় কম আশ্চর্য্য হইনি। কাল রাত্রের কথা ভাবুন আর আজ সকালের দিকে তাকান। শ্রীমতী চলে গেছে শুনে চমকে উঠলাম। মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল। ভাবতে বসে কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে আপনার কথাই মনে হ'ল। আপনাকে মিথ্যে বলব না। গতরাত্রে আমি ঠিক প্রকৃতিস্থ ছিলাম না। তার উপর শ্রীমতী আমাকে অন্যায়ভাবে কুৎসিত আক্রমণ করে বসল। আমিও তাকে ওজন করে ফিরিয়ে দিয়েছি।

ডাক্তারবাবু তথাপি নীরব। কোন প্রকার মতামত প্রকাশ করলেন না।



রাখালিয়া

ফটো : শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ



দুই বোন

ফটো : শ্রীশান্তনু চট্টোপাধ্যায়



ক্রুশ্চেভের বিদায় সম্বর্দ্ধনায় আইসেনহাওয়ার



গঙ্গাতীরে

ফটো : শ্রীরমেন বাগচী

অতনু যেন নেশার ঘোরে কথা বলে চলেছে এমনি ভাবে বলতে থাকে, কিন্তু আমার চাকর-বাকর আর কর্মচারীদের কাছে এই যে আমাকে ছোট করা হ'ল এ আমি ভুলতে পারব না। আপনার সঙ্গে তার দেখা হলে বলে দেবেন যে, এ ভাবে এ বাড়ীর চৌকাট ডিঙোলে আর কোন দিন প্রবেশ অধিকার পাওয়া যাবে না। আমি জানি, যেখানেই থাক আপনার কাছে একদিন সে আসবেই।

এতক্ষণে ডাক্তারবাবু কথা বললেন, সে না এলেও আমাকে খুঁজে বার করতে হবে। এ বাড়ীর দোর তার কাছে চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেলেও আমার দরজা চিরদিনই শ্রীমতী মায়ের জন্য খোলা থাকবে অতনুবাবু। আমার মন বলছে, শ্রীমতী খুব সামান্য কারণে চলে যায় নি। কিন্তু এ নিয়ে মিথ্যে বাদানুবাদ করে আর কি হবে।

ডাক্তারবাবু সহসা উঠে দাঁড়ালেন। তিনি প্রস্থানোদ্যত হতেই অতনু পুনরায় বলল, কারণ যত বড়ই হোক তার জন্য ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার কোন যুক্তি নেই।

ডাক্তারবাবু বললেন, কার্য্য আর কারণের বড় নিকট সম্বন্ধ অতনুবাবু। যে কারণে তাকে চলে যেতে হয়েছে সেই একই কারণে তার ফিরে আসার পথ সব সময় খোলা থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি।···বলেই ডাক্তারবাবু দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। রাস্তায় এসে প্রথমেই সম্মুখে যে ট্যাক্সি পেলেন তাতে উঠে বসলেন। মিত্রার সঙ্গে তিনি ইচ্ছা করেই দেখা করলেন না।

কিন্তু তিনি না করলেও মিত্রা চুপ করে থাকতে পারল না। ঝোঁকের মাথায় যে "সময় বোমা" এদের ধ্বংস করবার জন্য সে লুকিয়ে স্থাপন করেছে, বিস্ফোরণের সময় নিকটবর্ত্তী হয়ে আসতে তার ভয়াবহ পরিণতির কথা ভেবে এখন পিছিয়ে আসতে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। ভয় পেয়ে পথ খুঁজে পাচ্ছে না। নিজেকে বড় অসহায় মনে হচ্ছে। অতনুকে সব কথা খোলাখুলি বলে কোন লাভ হবে না। তা ছাড়া সে যে কিছু জানে না এ কথা ভাববারও কোন যুক্তি নেই। অতনুর বুদ্ধির চেয়ে অহঙ্কার বেশী, ধৈর্য্য কম—যা তাকে বাঁচাতে পারবে না বরং ধ্বংসকে আরও ত্বরান্বিত করবে। তাই সে ছুটে এসেছে ডাক্তারবাবুর কাছে।

ডাক্তারবাবুকে কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে মিত্রা ক্লান্ত গলায় বলল, আমাকে মাপ করবেন এ ভাবে না বলে-কয়ে বিরক্ত করতে আসার জন্য। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এ ছাড়া আমার আর অন্য কোন উপায় নেই। দয়া করে আমায় ভুল শোধরাবার সুযোগ দিন।

ডাক্তারবাবু ক্লান্ত হেসে বললেন, আমি তোমার ভুল শুধরাবার সুযোগ দেবার কে···কতটুকু আমার শক্তি···তাঁর কণ্ঠে এমন একটা আর্ত্ত সুর ধ্বনিত হয়ে উঠল যে, মিত্রা নিরতিশয় বিস্ময়-বিহ্বল হয়ে পড়ল। সে খানিক তাঁর চিন্তিত মুখের পানে চেয়ে থেকে পুনরায় মৃদু কণ্ঠে বলতে লাগল, আপনি কে তা আমি জানি না, কিন্তু কারখানার শ্রমিকদের উপর আপনার প্রভাব কতখানি সে খবর আমার অজানা নেই। আর অতনুবাবুর যে আপনি কতবড় শুভানুধ্যায়ী সে খবরও আমি রাখি।

ডাক্তারবাবু সহসা সোজা হয়ে বসে মিত্রার মুখের পানে তাকালেন। বললেন, তাই যদি তোমার বিশ্বাস তা হলে সময় থাকতে এলে না কেন মা? তুমি ফিরে যাও মিত্রা। সব কথা অতনুকে গিয়ে বল। সে তোমাকেও জানুক নিজেকেও চিনুক। হয়ত কোন নতুন পথের সন্ধান পাবে। তোমার শুভ বুদ্ধি জয়-যুক্ত হোক। মনে হচ্ছে এখনও সময় বয়ে যায় নি।

খানিক চুপ করে থেকে মিত্রা বলল, এ পথে বিস্ফোরণ ঠেকানো সম্ভব হলে আমি আপনার কাছে আসতাম না। আমাকে আপনি বাঁচান।

ডাক্তারবাবুর মুখে বড় সুন্দর একটুখানি হাসি দেখা দিল। তিনি স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বললেন তোমার বাঁচার পথ ত তুমি নিজেই দেখতে পেয়েছ মিত্রা। সাহসের সঙ্গে এগিয়ে গেলে তুমি নিজেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে। আমার সাহায্যের দরকার হবে না।

কিছুক্ষণ চুপ করে চোখ বুজে থেকে তিনি নিজের মধ্যে তলিয়ে গেলেন। তার পর এক সময় চোখ খুলে বললেন, তা ছাড়া কাকে বাঁচাবার জন্য তুমি এমন উতলা হয়েছ মিত্রা আমি এখনও বুঝতে পারছি না।

মিত্রা একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, আপনাকে মিথ্যে বলব না। অতনুবাবুর জন্য আমি ভাবছি না। আমি ভাবছি কারখানার শ্রমিকদের জন্য। শেষ পর্য্যন্ত মরবে যে ওরাই ডাক্তারবাবু।

ডাক্তারবাবু স্নিগ্ধ গলায় বললেন, তোমার অনেক ক্ষতি হয়েছে আমি জানি। যা হারিয়েছ তা আর ফিরে পাওয়া যাবে না, সম্ভবও নয়, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড় বস্তু তুমি আয়ত্ত করতে পেরেছ মিত্রা। অতনুর সর্ব্বনাশ যে শুধু তার একলার সর্ব্বনাশ নয় এ কথা দেরীতে হলেও যে তুমি বুঝতে পেরেছ এতে সত্যিই আমি খুশী হয়েছি।

মিত্রা নীরব।

ডাক্তারবাবু বলতে থাকেন, তুমি মাথা নীচু করে আছ কেন মা? তোমার ত লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই। লজ্জা তাদের যারা মানুষকে সৎপথে চলার রাস্তায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। আমি এখানে থাকতে পারব না। শ্রীমতীকে ফিরিয়ে আনতে দুএক দিনের মধ্যেই আমাকে যেতে হবে। এদিকের দায়িত্ব তোমাকেই বহন করতে হবে।

মিত্রা হতাশ সুরে বলল, এত বড় দায়িত্ব কি একলা আমি বহন করতে পারব?

ডাক্তারবাবু ভরসা দিয়ে বললেন, যে বুদ্ধি দিয়ে তুমি এতবড় একটা ঝড়ের সৃষ্টি করতে পেরেছ সেই বুদ্ধিই তোমাকে তা প্রতি-রোধ করবার উপায় বাতলে দেবে। তা ছাড়া তোমার কাজ আমি অনেকটা এগিয়ে রেখেছি মিত্রা। তুমি শুধু প্রকৃত পথটা দেখিয়ে দিতে পারলে বাকী কাজটুকু ওরা নিজেরাই করতে পারবে।

মিত্রা মৃদু কণ্ঠে বলল, আমার আর কিছু বলবার নেই। আপনার কথা মত চলবার চেষ্টাই আমি করব।

মিত্রা ধীরে ধীরে চলে গেল।

ডাক্তারবাবু বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

ডাক্তারবাবুর ওখান থেকে ফিরে এসে মিত্রা সোজা তার নিজের ঘরে প্রবেশ করে দরজাটা বন্ধ করে দিল। বহু দিন পরে আবার সে তার অতীত জীবনের পানে দৃষ্টি ফেরাল—যে অতীত এই সামান্য কয়েক মাসের তাণ্ডবে তার জীবন পথ থেকে প্রায় মুছে যেতে বসেছিল। বাবার আদর্শ শিক্ষা…জীবনের স্বপ্ন রাজনৈতিক দাবা খেলায় যেদিন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল সেই দিন থেকেই তার মধ্যে পরিবর্ত্তনের সূচনা দেখা দেয়। কিন্তু এই পরিবর্ত্তিত আদর্শহীন চলার গতি তাকে কতটুকু শান্তি দিতে পেরেছে—এই কথাটা কিছুদিন ধরে তার মনকে নাড়া দিচ্ছে। যে দুর্ব্বার গতিতে সে ভেঙেচুরে এগিয়ে এসেছে তা আজ থেমে গেছে। ক্ষয়-ক্ষতির পানে চোখ পড়তে নিজেই সে চমকে উঠেছে।…চলতে আর পারছে না। পারবেও না। আবার তাকে গোড়া থেকে সুরু করতে হবে।

২২

• শ্রীমতীর আকস্মিক উপস্থিতিতে আনন্দের পরিবর্ত্তে একটা বিস্ময় আর সন্দেহের ঝড় বয়ে গেল প্রণবের সংসারে। প্রণব কেমন যেন বিহ্বল দৃষ্টিতে মেয়েকে দেখতে লাগলেন। বহুক্ষণের মধ্যে কেউই একটা সাধারণ কুশল প্রশ্ন পর্য্যন্ত করতে পারল না।

শ্রীমতী নত হয়ে মা ও বাবার পায়ের ধুলা নিল। একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, অনেক দিন তোমাদের দেখি নি তাই চলে এলাম বাবা।

প্রণবের মুখোভাব ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে উঠল। কিন্তু রাণীর চোখে-মুখে সন্দেহের একটা কুঞ্চন লেগে রইল। সন্দিগ্ধ কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করলেন, এসেছিস তা ভাল কথা, কিন্তু আগে থেকে একটা খবর দিয়ে এলি নে কেন?

চিঠি দেবার আর সময় পেলাম কোথায়—শ্রীমতী বলল, কাল রাত্রে ঠিক হ'ল আসব। আর আজ সকালে গাড়ী চড়েছি।

রাণী বললেন, কিন্তু জামাই এল না কেন?

শ্রীমতী একটু যেন কুণ্ঠিত হয়ে বলল, তার আমি কি জানি?

অরুণ এসে খানিক হৈ চৈ করে বলল, কথা নেই বার্ত্তা নেই তুই যে হঠাৎ? বড়লোকটি বুঝি আসে নি? একলাই এসেছিস, না চাকর-বাকর কাউকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিস?

বাবা, বাবা…শ্রীমতী ককিয়ে উঠল, তোমরা যেন কি! এসে দাঁড়াতেই খালি প্রশ্ন আর প্রশ্ন! ধুলো-পায় তোমাদের এত প্রশ্নের জবাব দিতে আমি আর পারছি নে দাদা।

প্রণব বললেন, ঠিক কথা। সারাদিন গাড়ীতে কেটেছে। ওকে একটু বিশ্রাম নিতে দে তোরা। এসে অবধি…কথাটা শেষ না করেই তিনি অন্য কথা বললেন, আমি আমার ঘরেই আছি সুবিধে মত একবার যেও মা।

প্রণব চলে গেলেন।

এমনি বহু অবাঞ্ছিত প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে একথা শ্রীমতীর জানা ছিল। সে সব প্রশ্নের জবাবগুলোও সে ঠিক করে রেখেছে, কিন্তু যে লোকটিকে ফাঁকী দেওয়া সবচেয়ে সোজা তাঁকে কি করে সত্য ঘটনাটা জানাবে এই ভয়েই শ্রীমতী দিশেহারা হয়ে পড়ল। তার নির্ব্বিরোধী সরল প্রকৃতি বাবাকে নিয়েই যত ভয়।

শ্রীমতী ঠিক বুঝতে পারছে না কতখানি তার বাবার কাছে প্রকাশ করা সঙ্গত হবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল বাবাকে কিছুই বলতে হ'ল না। তার মা চেঁচামেচি করে এমন এক কাণ্ড বাধালেন যে, শ্রীমতী মুখ লুকাতে পথ পায় না। অরুণ মাকে ঠাণ্ডা করতে গিয়ে আরও ক্ষেপিয়ে তুলে শেষ পর্য্যন্ত নিজেই পালিয়ে আত্মরক্ষা করল। শুধু প্রণব একটি কথাও বললেন না। খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে একসময় কন্যার হাত ধরে আকর্ষণ করে নিজের ঘরে নিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

কিছুক্ষণ উভয়েই চুপচাপ। কারুর মুখে কোন কথা যোগাল না। শ্রীমতী ভাবছিল তার বাবাকে সে কি বলবে—আর প্রণব ভাবছিলেন যে, কতবড় অপমানের জ্বালা জুড়াতে মেয়েটা একলা একলাই তার বাবার কাছে ছুটে এসেছে।

আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে একসময় শ্রীমতী উঠে এসে তার বাবার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কুণ্ঠিত হেসে বলল, তুমি যে কোন কথা জিজ্ঞেস করছ না বাবা?

প্রণব ধীরে ধীরে জবাব দেন, কি আর জিজ্ঞেস করব মা—

শ্রীমতী স্তিমিত গলায় বলল, কেন এভাবে চলে এলাম? এই সব আর কি…

স্নিগ্ধ কণ্ঠে প্রণব বললেন, এই কি তার সময়? তা ছাড়া জিজ্ঞেস করে কি হবে মা? আমি কি বুঝি না যে, কতবেশী উত্যক্ত হলে আমার মেয়ে এভাবে চলে আসতে পারে?

শ্রীমতী বলল, মা কিন্তু খুব রাগ করেছেন।

প্রণব একটি নিঃশ্বাস চেপে গিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললেন, ওটা রাগ নয় শ্রী—দুঃখ, আশা ভঙ্গের বেদনা।

শ্রীমতী প্রশ্ন করে, তুমি কি একটুও দুঃখ পাও নি বাবা?

প্রণব চমকে উঠলেন। ঠিক এই ধরনের প্রশ্নের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। বললেন, দুঃখ পাই নি এমন কথা বলি কি করে মা। কিন্তু তা এভাবে চলে আসার জন্য নয়। তোমার পরাজয় স্বীকার করবার জন্য।

শ্রীমতী একটুখানি হাসবার চেষ্টা করে বলল, একে তুমি পরাজয় ভাবছ কেন বাবা? আমি অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি। জয়-পরাজয়ের কথা এখনই উঠতে পারে না বাবা।

প্রণব একটুখানি করুণ হেসে বললেন, তুমি রণক্ষেত্র ত্যাগ করে পালিয়ে এসেছ একথাটা ত মিথ্যে নয় শ্রী।

শ্রীমতী দৃঢ় কণ্ঠে বলল, অপর পক্ষকে দুর্ব্বল করবার উদ্দেশ্য

নিয়ে যে একাজ করা হয় নি তা কেমন করে তুমি বুঝলে তোমরা মিথ্যে ভয় পাচ্ছ—অকারণে দুশ্চিন্তা করছ বাবা!

প্রণব বার বার মাথা নেড়ে বলতে থাকেন, সংসারের রণনীতি কোনদিনই আমি ভাল বুঝি না মা, তাই ঘরে-বাইরে কোথাও আমোল পাই না। তবুও আমার মন বলে যে, মতবাদের লড়াইয়ের নীতি আরও ঢের বেশী জটিল। যার জীবনে এ যুদ্ধ দেখা দেয় সে-ই শুধু জানে এর ভয়াবহতা। তাই আমি ভয় পেয়েছিলাম। দু' পা এগুতে গিয়ে দশ পা পিছিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু পিছন থেকে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলাম। দাঁড়াতে গিয়ে টের পেলাম আমার একখানা পা ভেঙে গেছে।

শ্রীমতী চঞ্চল হয়ে উঠল, তার স্বল্পভাষী বাবার মুখে এ ধরনের সংসারতত্ত্বের আলোচনা সে ইতিপূর্ব্বে আর শোনে নি। তিনি যে কোন্ প্রসঙ্গের অবতারণা করতে উদ্যত হয়েছেন একথা বুঝেই শ্রীমতী স্নিগ্ধ হেসে বলল, ভাঙা পা ত চিরদিন ভাঙা থাকে না বাবা।

প্রণব মাথা নেড়ে বলেন, তা হয় ত থাকে না শ্রীমতী, কিন্তু এই হাড়মাংসের আড়ালে যে বস্তুটি আত্মগোপন করে আছে তাকে তুমি কোন দাওয়াই দিয়ে জোড়া লাগাবে মা? ওখানে ত তোমার ডাক্তার-বদ্যি পৌঁছুতে পারবে না।

বাবার কথায় শ্রীমতী শুধু বিস্মিতই হ'ল না কতকটা বিব্রত বোধ করল। তথাপি সে চুপ করে থাকতে পারে না। বলে এত কথা তুমি কবে থেকে ভাবতে সুরু করেছ বাবা?

প্রণব ছেলেমানুষের মত বলেন, তোদের সব দেখে-শুনে মা। কিন্তু এই পথে চিন্তা করতে আমার ভাল লাগে না।

শ্রীমতী গভীর কণ্ঠে বলে, তা হলে আর ভেব না বাবা। এসব তোমার জন্ত নয়—তোমাকে মোটেই মানায় না। বড় গোলমেলে মনে হয়।

প্রণব সহসা জোরে জোরে হেসে উঠলেন। বললেন, তুই ঠিক বলেছিস শ্রী। আমার নিজের কানেও বড় বিশ্রী লাগছিল। জোর করে মানুষের স্বভাব পাল্টানো যায় না একথা তোর মা বোঝেন না।

একটা জবাব দিতে গিয়ে শ্রীমতীকে থামতে হ'ল। মা খেতে ডাকছেন। ভাত দেওয়া হয়েছে।

মার কণ্ঠস্বর কেমন যেন ভিজে ভিজে মনে হ'ল শ্রীমতীর। সে সাড়া দিয়ে জানাল যে, এখুনি যাচ্ছে।

সবদিক দিয়ে একটা স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে শ্রীমতী বদ্ধপরিকর। কিন্তু এমনি ভাবে সকলে মিলে তাকে যদি একটা বিশেষ দৃষ্টিতে দেখতে সুরু করে তা হলে…

অরুণ এসে পুনরায় আহ্বান জানাল, কই রে আয়। তোর জন্তে বসে আছি যে।

শ্রীমতী উঠে দাঁড়াল।

প্রণব বললেন, খেয়ে-দেয়ে আবার আমার কাছে একবার আসিস মা।

শ্রীমতী বলল, আসব বাবা।

বাবার ঘর থেকে বার হয়ে আসতেই কাবিয়ার সঙ্গে চোখাচোখি হ'ল। ও কথা বলল না, মুচকি হাসল। ইতিপূর্ব্বেও বার কয়েক ঠিক এমনি করেই হেসেছে, কথা বলে নি। ও হয়ত একলা পাবার সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছে। শ্রীমতী মুহূর্তের জন্ত থমকে দাঁড়িয়েছিল। অরুণ পুনরায় তাগিদ দিল।

খেতে বসে অরুণ বলল, একসঙ্গে বসে খাওয়া প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম মতি।

শ্রীমতী একটু হাসল।

অরুণ পুনরায় বলল, শুধু নাড়া-চাড়া করছিস—খাচ্ছিসনে কেন?

এ কথার কোন জবাব না দিয়ে শ্রীমতী ঝোলমাখা ভাতে অম্বল ঢেলে নিল।

অরুণ বিস্মিত কণ্ঠে বলল, ও কিরে ঝোলের সঙ্গে অম্বল…

শ্রীমতী এবারেও একটু হাসল। কোন জবাব দিল না। তার হাসিটা অন্ত ধরনের। রাণীর মুখভাব সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অরুণ লক্ষ্য না করলেও শ্রীমতী মায়ের এই ভাব-পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে। তার সারা মুখে খানিক রক্ত ছুটে এল। মা ধীরে ধীরে উঠে গেলেন। তোরা খা আমি এখুনি আসছি, বলে, তিনি সোজা প্রণবের ঘরে এসে উপস্থিত হলেন।

প্রণব শূন্যে দৃষ্টি মেলে গভীর চিন্তায় মগ্ন। স্ত্রীর উপস্থিতি টের পেলেন না।

রাণী ডাকলেন, শুনছ—

প্রণব আত্মস্থ হলেন, আমাকে কিছু বলছ?

রাণী হাসিমুখে বলেন, কথার ছিরি দেখ! তোমাকে নয়ত এখানে আর কে আছে? একটু থেমে কণ্ঠস্বর আরও অনেকটা খাদে নামিয়ে তিনি পুনরায় বলেন, বুঝলে, এ সময় মেয়েরা মায়ের কাছেই থাকে। এসেছে ভালই করেছে, কিন্তু গোলমাল করে না এলেই পারত!

প্রণব খুব মনোযোগ দিয়ে স্ত্রীর কথাগুলি শুনে মৃদু কণ্ঠে বললেন, তুমি অল্পেই বড় উতলা হয়ে ওঠো রাণী। এতটা ভাল নয়।

রাণী চলে যাচ্ছিলেন, প্রণব তাঁকে পিছু ডেকে বললেন, আমার একটা অনুরোধ রাণী, শ্রীমতীকে দিন কয়েক তোমরা উত্যক্ত কর না।

রাণী বলেন, আমি বুঝি শুধু উত্যক্ত করতেই জানি!

প্রণবের একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল। রাণীর তা দৃষ্টি এড়াল না। তিনি সহসা অত্যন্ত কোমল কণ্ঠে বললেন, সংসারে এত বড় বন্ধন আর মেয়েদের নেই।

প্রণব বার বার মাথা নাড়তে নাড়তে বলেন, সেই জন্তেই

আমি আরও ভয় পেয়েছি, এতখানি এগিয়ে গিয়েও শ্রীমতী আবার পিছু হটে এল কেন? তুমি যাও রাণী···আমাকে আরও ভাবতে দাও···ভাল করে বুঝতে দাও।

রাণীর চোখে-মুখে কিন্তু কোন প্রকার চিন্তা প্রকাশ ঘটল না। তিনি পরম নিশ্চিন্তে স্বামীর দুর্ভাবনাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে পুনরায় রান্না ঘরে ফিরে এলেন।

ভাই-বোনে তখনও খাওয়া নিয়ে বচসা চলছিল। অকারণেই অরুণ বিস্তর হৈ চৈ করছে। কিছু পূর্ব্বের গুমোট আবহাওয়াটাকে সে হয়ত হাল্কা করে নিতে চায়।

মা ফিরে আসতে অরুণ আর এক দফা চীৎকার করে নিয়ে বলল, দাও ত মা আর এক বাটি অম্বল মতিকে।

শ্রীমতী পুনরায় সিন্দুর রাঙা হয়ে উঠল। সেইদিকে চেয়ে মা মনে মনে খানিক হাসলেন। এবং সত্যি সত্যিই তিনি আর এক বাটি অম্বল শ্রীমতীর পাতের গোড়ায় ধরে দিলেন।

অরুণ হেসে উঠল।

মা ধমক দিলেন, গাধার মত হাসিস নে অরুণ।

শ্রীমতী বলল, তুমিও মা দাদার কথা শুনে—

বাধা দিয়ে রাণী বলেন, পেটে কিছু দিতে হবে ত। যদি অম্বল দিয়ে ছুটো খেতে পারিস তাই খা, নইলে এ অবস্থায় শরীর টি কবে কেমন করে।

শ্রীমতী চুপ করে থাকে। আর অরুণ হয়ত মনে মনে ভাবে, তার সম্বন্ধে মা একেবারে মিথ্যে বলেন নি।

পরদিন শ্রীমতীকে একলা পেয়ে ক্ষীরিয়া একগাল হেসে চোখ টিপে বলে, মা বলছিল তোর ছেলে হবে দিদি—মনের মিল হ'ল না, আর ছেলে হবে, এটা আবার কেমন কথা গো···

শ্রীমতী ধমক দেয়, তোর কি তাতে হতভাগী—

ক্ষীরিয়া হেসে চলে যায়।

২৩

অতনুর জীবনে এত বড় পরাজয় বুঝি ইতিপূর্ব্বে আর কখনও ঘটে নি। কিছু দিন ধরেই চলছিল ঝড়ের তাণ্ডবলীলা। ভেঙেছে বিস্তর—ধুলা উড়েছে প্রচুর। এমন কি তার আত্মাভিমানকে পর্য্যন্ত ধূলিশয্যা নিতে হয়েছে। তার মাথার উপরকার আচ্ছাদন-টুকুও আর অবশিষ্ট নেই। অতনু তাই আবার নূতন করে ভাবতে বসেছে। তার জীবন পথের ভিত প্রস্তুত করতে যে মাল-মশলা সে ব্যবহার করেছিল তার কতটুকু ছিল খাঁটি আর কতটুকু ভেজাল। অতনু পর্য্যটন করে দেখছে তার অতীত জীবনের প্রত্যেকটি স্তর। কেন এই বিপর্য্যয়? তার বিবাহিত স্ত্রী পর্য্যন্ত তাকে পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছে। শ্রীমতীকে সে স্বেচ্ছায় বিবাহ করে এনেছিল। কিন্তু স্ত্রীকে যে একটা আলাদা সম্মান দিতে হয় এ কথাটা একদিনের জন্যও তার মনে হয় নি। দরিদ্র পিতার কন্যা শ্রীমতীকে বিবাহ করে সে তাদের কৃতার্থ করেছে এই কথাটাই তার ব্যবহারে মাঝে মাঝে উগ্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাই মানুষ শ্রীমতীকে সে জয় করতে পারে নি। সে চলে গিয়েছে।

মিত্রা বলে, যার যতটুকু প্রাপ্য তাকে সেটুকু না দিলে নিজের পাওনা আশা করা যায় না। ভয় দেখিয়ে দেহটা হয়ত পাওয়া যায়, কিন্তু মন চলে যায় বহুদূরে। আমাকেই দেখুন না কেন অতনুবাবু। কিছুদিন আগেও আপনার অনিষ্ট করবার জন্য কত আয়োজন না করেছি আবার আজ সেই আমিই আপনাকে অষ্টপ্রহর পাহারা দিচ্ছি যাতে কোন ক্ষতি আপনাকে না স্পর্শ করতে পারে।

অতনু বলে, আমি কিন্তু তোমার এ পরিবর্ত্তনের কোন সঙ্গত কারণ দেখতে পাই না মিত্রা।

মিত্রা জবাব দেয়, আপনার সে চোখ নেই বলেই দেখতে পান নি। সঙ্গত কারণেই পরিবর্ত্তন ঘটেছে।

ক্লান্ত হেসে অতনু বলে, আমার চোখ নেই বলেই হয়ত দেখতে পাচ্ছি না—অন্ধের মত খুঁজে বেড়াচ্ছি। তবুও তোমার ব্যক্তিগত কোন কিছুই আমি জোর করে জানতে চাইব না। তবে ডাক্তার-বাবু সম্বন্ধে যদি তোমাকে কোন প্রশ্ন করি মিত্রা? ও লোকটিকে আজও আমি বুঝলাম না।

মিত্রা হেসে বলে, এত বছরে আপনি যাঁকে বুঝলেন না তাঁর সম্বন্ধে আমি আবার কি বলব! তবে এ কথা আমি বিশ্বাস করি যে, তিনি যথার্থই আপনার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

অতনু জিজ্ঞেস করে, এতবড় বিশ্বাসের কারণও নিশ্চয় আছে।

মিত্রা দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলল, এতবড় প্রবলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার আগে আমি ছোট-বড় কাউকেই উপেক্ষা করি নি। ঠাণ্ডা মাথায় হিসেব করেই নেমেছিলাম অতনুবাবু।

অতনু প্রশ্ন করে, তাহলে থামলে কেন মিত্রা?

মিত্রা অদ্ভুত ভঙ্গিতে হেসে বলল, আপনি কিন্তু সেই ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়েই আবার প্রশ্ন করছেন।

ভুল হয়ে গেছে মিত্রা, অতনু বলে।

মিত্রা বলে, আপনি ত অনায়াসে ধরে নিতে পারেন যে, হেরে যাবার ভয়ে মিত্রা পিছিয়ে গেছে।

অতনু একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলল, আগে হলে তাই ভাবতাম, কিন্তু শ্রীমতী আমাকে বদলে দিয়েছে। নিজের সম্বন্ধে যতই ভাবছি, ততই মনে হচ্ছে এতদিন শুধু চোখ বুজে আত্মবঞ্চনা করেছি। যাকে জয় ভেবে গর্ব্ববোধ করেছি তা আমার জয় নয় পরাজয়।

মিত্রা হেসে বলে, আপনার এ শ্মশান-বৈরাগ্য কতদিন স্থায়ী হবে অতনুবাবু?

অতনুর মুখেও হাসি দেখা দিল। সে শান্ত হেসে বলল, কথাটা আমারও মনে হয়েছে মিত্রা। কিন্তু এই শ্মশান-বৈরাগ্যও আমার মধ্যে কোনদিন এর আগে দেখা দেয় নি। আমার মধ্যে ষড়রিপুর গুটিকয়েক সব সময় মাথায় চড়ে থাকত। তাছাড়া কোন কাজ

করে পিছন ফিরে তাকানোকে আমি দুর্বলতা ছাড়া আর কিছু ভাবতে জানতাম না।

মিত্রা তিরস্কারের সুরে বলল, আপনার এই শক্তির দম্ভই আপনার প্রধান শত্রু। অপরের শক্তিকে আপনি সব সময়ই লঘু করে দেখেন। নইলে মিত্রার পক্ষে এতখানি অগ্রসর হওয়া কিছুতেই সম্ভব হ'ত না অতনুবাবু।

অতনু বলল, মিত্রার কথা থাক। তার সঙ্গে হিসেব-নিকেশ পরে হবে—

বাধা দিয়ে মিত্রা বলল, এখনও আপনার অহঙ্কার?

অতনু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাসিমুখে জবাব দিল, ওকে আমি অহঙ্কার বলি না। ব্যবসায় "স্পেকুলেসান" বলে একটা কথা আছে জান ত?

মিত্রা বলে, যাকে বোকা লোকগুলো জুয়াখেলা বলে?

অতনু জবাব দেয়, হতেও পারে—

মিত্রা গম্ভীর হয়ে বলল, ঠিক তাই, আর এই খেলাই আপনি ঘরে-বাইরে এক সঙ্গে সুরু করেছিলেন। যার ফলে ঘর এবং বার দুই ভাঙনের মুখে এসেছে।

অতনু কোন জবাব না দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে মিত্রার মুখের পানে চেয়ে রইল।

মিত্রা বলতে থাকে, অথচ যাকে আপনার দ্বিধাহীন চিত্তে বন্ধুর মত বিশ্বাস করা উচিত ছিল, তাকেই করলেন মর্ম্মান্তিক উপেক্ষা আর যে মিত্রাকে গলা ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় বার করে দেওয়া আপনার উচিত ছিল তার সঙ্গে বসলেন পরামর্শ করতে—দিলেন বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে।

অতনু কেমন একপ্রকার হেসে বলল, ঐ জন্যেই ত "স্পেকুলেসান" কথাটা ব্যবহার করেছি মিত্রা। তুমিই বল দেখি এতে কি আমি ঠকেছি?

মিত্রা বলল, এ প্রশ্নের উত্তর আপনার ভবিষ্যৎ দেবে অতনুবাবু। তবে এমন মারাত্মক খেলা আর কোনদিন খেলবেন না। মানুষের জীবন নিয়ে এ ধরনের ফাটকা খেলা বিপজ্জনক। এর পরিণাম কোনদিন ভাল হয় না জানবেন।

তুমি কি সুযোগ পেয়ে আমাকে উপদেশ দিতে সুরু করলে মিত্রা?

মিত্রা খানিক চুপ করে থেকে কোমল কণ্ঠে বলল, না অতনুবাবু, এত বড় ধৃষ্টতা আমার নেই। আমি শুধু তৃতীয় পক্ষের মনের উপর প্রতিক্রিয়ার কথাটাই বলতে চেয়েছি। তার বেশী নয়। যে ব্যবহার শত্রুর মতি গতি বদলে দিতে পারে সেই ব্যবহার দিয়ে নিজের স্ত্রীকে আরও কত বেশী কাছে টেনে নিতে পারতেন এ কথাটা কেন আপনি বুঝতে চাইছেন না। আপনার স্ত্রীর মনের দিকে চোখ মেলে চাইলেন না। জাঁক করে স্কুল-মাষ্টারের মেয়ে বলে খোঁটা দিলেন। বিয়ে করে কৃতার্থ করেছেন এই কথাটাই—

কথার মাঝে থামিয়ে দিয়ে অতনু বলল, শ্রীমতী তোমাকে এই সব কথা বলেছে বুঝি?

অতনুর মুখের পানে খানিক চেয়ে থেকে দুঃখিতভাবে মিত্রা জবাব দিল, খুব দুর্ভাগ্যের কথা। এতদিন কাছে কাছে থেকেও তার সম্বন্ধে আপনি এ কথা ভাবতে পারলেন কি করে বুঝি না। মানুষ গরীব হলেই ছোট হয় না। এত বড় অসম্মানের কথা মরে গেলেও তিনি কাউকে বলবেন না আপনার সঙ্গে আপনার স্ত্রীর যথার্থ সম্বন্ধটা এ বাড়ীর চাকর-বাকরও জানে। আর আপনিই তা জানতে দিয়েছেন।

অতনু একটি নিঃশ্বাস চেপে গিয়ে স্তিমিত গলায় বলল, অথচ আমি জানতে পারি নি!

মিত্রা মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল, নিজে চোখ বুজে কাজ করে যাঁরা মনে করে তার কাজের বুঝি কেউ সাক্ষী রইল না। এমনি করেই তাদের ক্ষতি পূরণ করতে হয় অতনুবাবু।

অতনু ম্লানকণ্ঠে জবাব দেয়, কিন্তু একটা কথা আমি বুঝি না মিত্রা। অন্যায় যদি আমি করেই থাকি তার প্রতিবিধান ত আর পাঁচটা অন্যায় দ্বারা হবে না!

মিত্রা বলল, যারা ভাল কথায় বোঝে না তাদের এমনি করেই বোঝাতে হয় অতনু বাবু। গান্ধীজীর হত্যাকারীকেও তাই ফাঁসী-কাঠে ঝুলতে হয়েছে।

অতনু অন্য প্রসঙ্গে উপস্থিত হ'ল, শ্রীমতী কোথায় গেছে তুমি জান মিত্রা?

মিত্রা বলল, না জানলেও আন্দাজে বলতে পারি। চেষ্টা করলে আপনিও জানতে পারেন।

অতনু ম্লান হেসে বলল, তা হয় ত পারি।

মিত্রা বলল, আজ এত দিন পরে শ্রীমতীর খোঁজ করছেন কেন জানতে পারি কি? এ বাড়ীর দরজা ত তাঁর কাছে বন্ধ হয়ে গেছে বলে শুনেছি।

অতনু একটু যেন অন্যমনস্কভাবে বলল, মিথ্যে কথা শোননি মিত্রা।

মিত্রা প্রশ্ন করে, তা হলে খোঁজ করে লাভ?

নিছক কৌতূহল, অতনু জবাবে বলল।

মিত্রা বলল, ডাক্তারবাবু বললেন, তিনি তাঁর বাবার কাছে চলে গেছেন।

অতনু সহসা শ্রীমতীর কথা বাদ দিয়ে ডাক্তারবাবু সম্বন্ধে প্রশ্ন করল, শ্রীমতী চলে যাবার পর তিনি বোধ হয় আর আসেন নি?

মিত্রা বলল, আপনি ডেকে পাঠাতে সেই যে একবার এসে-ছিলেন তার পরে আর আসেন নি।

অতনু সুধায়, তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল কোথায়?

মিত্রা সংক্ষেপে জবাব দিল, তাঁর বাড়ীতে।

অতনু বলল, তোমরা সকলেই ইচ্ছামত চলা-ফেরা করছ, কিন্তু আমার উপর এত বিধিনিষেধ কেন বলবে কি মিত্রা?

মিত্রা বলল, যতদিন আপনার কারখানার ঘুণধরা খুঁটিগুলো পালটে ফেলতে না পারি ততদিনই আমার প্রত্যেকটি কথা আপনাকে মেনে চলতে হবে।

অতনু বলল, আর আমি যদি তোমাদের কথা অগ্রাহ্য করি মিত্রা ?

মিত্রা একটু চমকে উঠলেও মুহূর্ত্তে সামলে নিয়ে স্বাভাবিক হেসে জবাব দিল, আপনি তা পারেন না অতনুবাবু। কারণ আপনি কথা দিয়েছেন।

অতনু ক্লান্ত হেসে জবাব দিল, আমি ভিতরে ভিতরে খুব দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি মিত্রা। নইলে এভাবে আমাকে নিয়ে তোমরা মজা করতে পারতে না। কিন্তু আমার একটা কথার স্পষ্ট জবাব দেবে।

মিত্রা বলে, দেব।

অতনু মৃদু শান্ত কণ্ঠে বলল, আমার অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে এই যে কাণ্ডটি করে যাচ্ছ এতে সত্যি সত্যি বাঁচবে কে ? শুধুই কি আমি ?

মিত্রা দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলল, শুধু আপনি হতে যাবেন কেন।

অতনু হেসে বলল, তা হলে বেছে বেছে আমার মাথায় ঘুণধরা খুঁটি ভেঙে পড়বে কেন বলতে পার মিত্রা ?

মিত্রা বলল, বড় গাছকেই বড় ঝাপটা সইতে হয়।

অতনু জবাব দিল, তাতে সব সময় গাছ ভেঙে পড়ে না।

মিত্রা বলল, কিন্তু যে গাছের শেকড় মাটি থেকে আলগা হয়ে গেছে তার বেলায় ও যুক্তি টেকে না অতনুবাবু।

মিত্রার এ যুক্তি অতনু মানতে চায় না। সে মাথা নেড়ে বলে, তোমার এ যুক্তি আমার জন্য নয় এ কথা আমি হলপ করে বলতে পারি। তোমার ঐ তথা কথিত খুঁটিতে যাঁরা ঘুণ ধরায় তারা কি একবারও ভেবে দেখে না যে কারা ঐ ঘুণধরা খুঁটি চাপা পড়ে মারা যায় ? ঐ মৃতদেহের সংখ্যা বৃদ্ধি অন্তত আমার শ্রেণীর যারা তারা কোন দিন করে না। যারা আজীবন খেটে খায় মরতে তারাই শেষ পর্য্যন্ত মরে।

মিত্রা মৃদু মৃদু হাসতে থাকে। কোন জবাব দেয় না।

অতনু বলে, খুব কি হাসির হ'ল এটা মিত্রা ?

অন্য কারণে হাসছিলাম, মিত্রা বলল, আচ্ছা অতনুবাবু, যে দুর্ভাগাদের কথা একটু আগে বললেন, ক্ষতিটা যদি শুধু তাদেরই এক তরফা হয় তা হলে এই অসুস্থ শরীর নিয়ে ছুটে যেতে চাইছেন কেন ? ডানকান-আগরওয়ালাকেই বা কিসের জন্য তাড়ালেন ?

অতনু উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল, আর যাদের কথা ইচ্ছে তুমি বলতে পার আমি বাধা দেব না, কিন্তু ওদের নাম আমার কাছে তুলো না।

মিত্রা বলল, আপনি যদি না চান তবে আর বলব না। কিন্তু আপনার অন্যান্য কর্ম্মচারীদের বিষয় যদি কিছু বলি ? তাদের অভিযোগ জানাবার একটি মাত্র স্থান ছাড়া ত আর নেই অতনুবাবু।

অতনু বলল, আমার দেবার ক্ষমতার চেয়ে বেশী যদি তারা দাবী করে সেক্ষেত্রে আমার করণীয় কি বলতে পার মিত্রা ?

মিত্রা জবাব দেয়, সেক্ষেত্রে দায় এবং দায়িত্ব তাদের হাতে ছেড়ে দিন। সত্য অবস্থাটা জানতে পারলে ওরা আপনিই থেমে যাবে।

শান্ত কণ্ঠে অতনু বলল, কাজ করা আর কাজ করানো কি এক কথা মিত্রা ?

মিত্রা চুপ করে থাকে।

অতনু বলতে থাকে, তোমার যুক্তি ভ্রান্ত এমন কথা আমি বলতে চাই না কিন্তু আমাদের দিকটাও একবার ভেবে দেখতে বলি।

মিত্রা বলে, করতে আমি কিছুই বলছি না। আমি শুধু যাচাই করে দেখার কথা বলছিলাম। ব্যবসায় এটাও একধরনের "স্পেকুলেসান" নয় কি ? একবার পরখ করে দেখুন না কেন।

অতনু সহসা গম্ভীর কণ্ঠে বলল, আর কেউ পারবে কিনা আমি জানি না, কিন্তু আমি এ কাজ মরে গেলেও পারব না। তার চেয়ে বরং নিজের হাতে সব ধ্বংস করে ফেলব।

তবুও এই পথে চলতে পারবেন না···মিত্রা বলে, অতনুবাবু পুরানো দিনের সবই যখন ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে তখন পুরাতন আর নতুনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রেখে না চলতে পারলে যে অস্তিত্বই বিপন্ন হবে।

অতনু বলল, কার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে ? পুরাতন-পন্থীদের না আধুনিক-পন্থীদের। মিত্রা তুমি আমাকে পুরাতন ভিতের উপর নূতন ইমারৎ তুলবার বুদ্ধি দিচ্ছ—তার পরমায়ুর কথাটা একবারও ভেবে দেখছ না। বাইরে থেকে রং পালিশ করে যতই দৃষ্টি-শোভন করে তোলা হোক না কেন ভিতটা কিন্তু নোনাধরাই থেকে যাবে। তুমি যা বলছ তাকে আমার দালদা-মেশান ঘি বলতে ইচ্ছে হচ্ছে। অর্থাৎ ওটা ঘি-ও নয় দালদাও নয়। এই মধ্য-পন্থাকে আমার ভাল লাগে না মিত্রা।

মিত্রা হাসতে থাকে।

অতনু ক্ষুণ্ণিত হয়ে বলে, এটাও বুঝি একটা হাসির কথা বলেছি ?

মিত্রা বলল, আপনি বেশ মজার মজার কথা বলতে পারেন। শুয়ে শুয়ে এই সবই আজকাল ভাবেন বুঝি ? আপনার জন্য সত্যিই এতদিন পরে আমার ভাবনা হচ্ছে। কোথায় চাবুক আর কোথায় স্নেহপদার্থ ঘি। সত্যি সত্যিই আপনি খুব দুর্ব্বল হয়ে পড়েছেন। এবারে বাড়ীর দরজা, জানালা আর চৌকাঠগুলি একে একে তুলে ফেলুন দেখবেন জীবনটা কত সহজ আর সুন্দর হয়ে উঠেছে অতনু বাবু।

অতনু গম্ভীর হয়ে উঠল।

মিত্রা তার মুখের পানে খানিক চেয়ে থেকে নরম গলায় বলল, আপনাকে দুঃখ দিলাম কি অতনু বাবু ? বিশ্বাস করুন আমার উদ্দেশ্য মোটেই খারাপ নয়।

অতনু একথারও কোন জবাব দিল না।

মিত্রা থামতে পারে না। বলতে থাকে, আর একটু সহজ হয়ে উঠুন···আর একটু নেমে এসে ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান—ডাক্তারবাবু গুছিয়ে দেবেন আপনার কারখানা। আমি গুছিয়ে দেব আপনার ঘর—

সহসা অতনু উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল, হঠাৎ সকলে মিলে আমার ভাল করবার জন্ম এমন উঠে পড়ে লেগেছ কেন বলতে পার মিত্রা দেবী? আমি ত কোন দিন তোমাদের এতটুকু উপকার করেছি বলে মনে পড়ে না!

মিত্রার মুখের চেহারা বদলে গেল। সে করুণ হেসে বলল, অপরের কথা জানি না। আমি কিছুটা ক্ষতিপূরণ করতে চাইছি।

অতনু একজোড়া সন্ধানী দৃষ্টি মেলে মিত্রার মুখের পানে খানিক চেয়ে থেকে এক সময় হা হা করে হেসে উঠে বলল, তোমার এ কথাটাও কি আজ আমাকে বিশ্বাস করতে বল মিত্রা?

মৃদুকণ্ঠে মিত্রা জানাল, হ্যাঁ।

অতনু মিত্রার দৃষ্টি এড়িয়ে একটি নিঃশ্বাস মোচন করে বলল, বিশ্বাস করলাম। জান মিত্রা মানুষের মন বড় বিচিত্র বস্তু। একদিন যা ছিল নিছক অভিনয় আজ তাই হ'ল সত্য। তোমাকে কোনদিন কোন কারণে আমি বিশ্বাস করতে পারব একথা যদি দৈববাণীও হ'ত আমি সে দেবতাকে কৃপার চোখে দেখতাম।

মিত্রার কণ্ঠস্বর প্রায় বুজে এল। সে ফিস ফিস করে বলল, আশ্চর্য্য! এই একই কথা আমিও যে সবসময় ভাবি। ভয় হয়···হাসিও পায়। এ কেমন করে সম্ভব হ'ল বলতে পারেন। এর কি সত্যিই কিছু দরকার ছিল।···অথচ···

কেষ্ট দেখা দিয়েছে।

মিত্রা একটু নড়ে-চড়ে অকারণে কাপড়-চোপড় ঠিকঠাক করে নিয়ে স্থির হয়ে বসল।

কেষ্ট ঘরে প্রবেশ করে বলল, দাদাবাবুর খাবারটা কি এখন তৈরি করবেন? বলেন ত আমিও ব্যবস্থা করতে পারি। পাঁচটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে।

অতনু বলল, তুমিই যা হয় কর কেষ্ট।

বাধা দিয়ে মিত্রা বলল, খাবারটা আমিই করব। চল কেষ্ট।

ওরা একসঙ্গেই ঘর ছেড়ে চলে গেল।

ক্রমশঃ

বন্যা ১৯৫৯

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বিপন্ন মোরা—অবসন্ন ও বিষন্ন দেহমন—
এই কি বন্যা নিয়ন্ত্রণ না বন্যা বিবর্দ্ধন?
বন্যা হয়েছে, হতেছে এবং প্রতিকার নাই যবে—
ফায়ার ব্রিগেড সঙ্গে, বন্যা ব্রিগেড গড়িতে হবে।
গেছে ঘরবাড়ী, ভাঙ্গা দেহমন, ধুয়ে মুছে গেছে ধান—
পল্লী হতেছে অ-বাসযোগ্য রক্ষ হে ভগবান।
ফারাক্কা বাঁধ বাঁধা চাই আগে—তার তোড়জোড় কর—
কিম্বা সকলে নিরুপায় হয়ে 'নোয়া'র আর্কই গড়।
মর্ম্মন্তুদ যাতনা পেয়েছি—যা-অবিস্মরণীয়—
শহর বাঁচুক, সঙ্গে তাঁহার পল্লীকে বাঁচাইয়ো।

২

সাপের সঙ্গে এক সাথে থাকি স্রোতের সঙ্গে লড়ি,
বছর বছর কেমন করিয়া এমন জীবন ধরি?
কেহ গাছে ঝুলে, কেহ চালে চেপে, রক্ষা করেছি প্রাণ,
ভেসে গেলে বেশী ক্লেশ ত হ'ত না—সব জ্বালা অবসান।
খড়কুটা দিয়া দু'বছর ধরে যে বাসা হইল গড়া—
নিমেষে কোথায় সব ভেসে গেল—অধিক যাবে কি করা?
এমন অগৌরবের জীবনধারণ করাও পাপ—
সভ্য স্বাধীন পুণ্য দেশেতে বিধাতার অভিশাপ।
সময় থাকিতে উপায় না করা—সে কি নয় অপরাধ?
স্বেচ্ছায় এ যে কাছে ডেকে আনা জাতির আর্ত্তনাদ।

৩

গোহাল পড়িছে—ঘরে হাঁটু জল, উপায় খুঁজে না পাই,
যোজন খুঁজিয়া 'অজয়' 'কুনুরে' সবল নৌকা নাই।
মিলিটারী বোট আসিল ক'খানা বন্যা সরিয়া গেলে,
কত যে শক্তি সান্ত্বনা দিত দুই দিন আগে এলে।
আঁধারে কাটিল 'আন' 'আন' করি বিভীষিকাভরা রাত—
প্রভাতে পাচটা পেট্রোমাক্সে জানালো সুপ্রভাত।
রিলিফ আসিছে ভিক্ষা আসিছে কম্বল পিছু পিছু,
বন্যায় প্রাণরক্ষার শুধু উপায় ছিল না কিছু।
দোষ দিব কারে? কষ্টে কাটানু সব সাধনার রাতি—
শবাসনা ভালে দেখিলাম কই, খণ্ড চন্দ্র ভাতি?

বিদেশী নামের বাংলা প্রতিরূপ

শ্রীভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রিটিশ জাতি

গোটা পৃথিবীটা ব্রিটিশ জাতির কর্ম্ম ও বিচরণ ক্ষেত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্‌কালে সমগ্র ভূভাগের এক পঞ্চমাংশের উপর তারা প্রভুত্ব করত। গত পাঁচশ' বৎসরের ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহে তারা প্রধান প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ইংরেজীতে অনুবাদ নাই এমন কোনও মূল্যবান গ্রন্থ অন্য ভাষায় আছে কিনা সন্দেহ। এ সবের ফলে ভূগোল ইতিহাস সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতিতে যাদের উল্লেখ আছে এমন সকল দেশের সকল নামই পাওয়া যায় ইংরেজীতে।

বাঙালী

বহির্জগতের সহিত বাঙালীর পরিচয় নূতন না হলেও তার পরিসর সঙ্কীর্ণ। আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটে ইংলণ্ডের সঙ্গে। ফরাসী বিপ্লব ফ্রান্সকে পরিচিত করে দেয় যাঁদের সঙ্গে তাঁদের সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়। ক্রমে রাশিয়া ছাড়া ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের অন্যান্য দেশও শিক্ষিত বাঙালীর চেনা হয়ে ওঠে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে বাঙালী বিদ্যার্থী ও পর্যটকদের আকর্ষণ করে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা। রাশিয়ার লৌহকপাট খুলে দিয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। স্বাধীনতা লাভের পর সকল দেশের দ্বারই এখন আমাদের জন্য উন্মুক্ত। তা সত্ত্বেও নানা কারণে বিদেশগামী বাঙালীর সংখ্যা বেশী নয়। আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের এলাকা প্রধানতঃ ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় সীমাবদ্ধ। বিদেশ-প্রত্যাগত বাঙালীর অতি অল্প কয়েকজন মাত্র। তাঁদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে বহু বই ছাপেন। ভ্রমণ বৃত্তান্ত যাঁরা লেখেন তাদের বিষয়বস্তু সাধারণত থাকে বর্ত্তমানকে ঘিরে। বাংলা দৈনিকের উপজীব্যও বর্ত্তমান। ভ্রমণকারীর প্রত্যক্ষ জ্ঞান আকস্মিক। নানা দেশের ও নানা কালের বিবরণের জন্য আমাদের এখনও নির্ভর করতে হয় ইংরেজী বইয়ের উপর। বাংলা বইতে বিদেশী নাম যে কম তার কারণ এই। স্কুল-পাঠ্য ভূগোলের বাইরে স্থানের নাম, বিদেশী ইতিহাসের স্থান ও ব্যক্তির নাম এবং সাহিত্যে ব্যবহৃত নামের বাংলা প্রতিরূপের প্রয়োজন ছিল কম। সম্প্রতি অকস্মাৎ স্কুলের ষষ্ঠ মান থেকে বি-এ ক্লাস অবধি ইউরোপ ও পৃথিবীর ইতিহাস বাংলায় পড়াবার ব্যবস্থা হয়েছে। এবার বিদেশী নামের ঢল নেমে এসেছে গল্প-উপন্যাস-প্রধান বাংলা ভাষার উপর। ছাত্রদের জন্য নূতন নূতন ইতিহাস বাংলায় রচিত হইতেছে। এ সব পুস্তকের লেখকগণ প্রায় সকলেই কৃতবিদ্য অধ্যাপক। ইংরেজী ইতিহাস এঁদের রচনার অবলম্বন। ইংরেজী নামের বাংলা প্রতিরূপ লেখকরা সৃষ্টি করে নিচ্ছেন। বহু নামের বাংলা পূর্ব্বে কোন দিন ছিল না, যা ছিল তাও তাঁরা নূতন করে লিখছেন।

ইংরেজী নাম

লিপি ধ্বনির প্রতীক। বিদেশীর মুখের ধ্বনি লিপিতে প্রকাশে শোনা এবং লেখা দুরকমেই ভুলের সম্ভাবনা বিদ্যমান। এ ভুলের প্রমাণ মিলে এ দেশের নামের ইংরেজী রূপে। বিদেশী নামের প্রথম প্রতিবর্ণকারী ছিল ইংরেজ নাবিক সৈনিক পর্য্যটক অথবা বণিকের গোমস্তা। এরা কেহ ধ্বনিতত্ত্ব-বিশারদ না থাকারই সম্ভাবনা।

কলকাতার ইংরেজী রূপটি সম্ভবতঃ জব চার্ণকের সৃষ্টি। যে রিপোর্ট ক্লাইভের বিজয় বার্ত্তা বহন করে প্রথম লণ্ডনে পৌঁছেছিল তাতেই আগেকার অখ্যাত প্রান্তর পলাশী রূপান্তরিত হয়ে থাকবে প্লাসিতে। কুঠীর ইংরেজ গোমস্তাদের খাতায় চুঁচুড়া ঠাঁই লাভ করেছিল তার নূতন রূপ চিনসুরায়। ইংরেজের হাতে পড়ে শ্রীরামপুর হারিয়েছে তার শ্রী। 'ম' লোপের পর তার 'মান' খুইয়ে বর্দ্ধমান হয়ে গেছে বার্ডোয়ান। চন্দননগরে আর 'চন্দন' মিলে না, এবার সেখানে 'চন্দর' বা চন্দ্র। কৃষ্ণচন্দ্রের নগরের 'ন' কাটা গেছে, এখন তা কৃষ্ণগর।

কঞ্জিবরমের আড়ালে যে কাঞ্চীপুরম্ লুকিয়েছিল তা আমাদের জানা ছিল না। স্বাধীনতা লাভের পর জব্বলপুর ফিরে পেয়েছে তার আসল নাম জাবালপুর। বিজয়বাড়া যে ইংরেজের আমলে বেজোয়াড়া নাম নিয়েছিল তা বোঝা কঠিন। বিলিতি স্বাটে পর্ব্বিত মথুরা হয়ে পড়েছিল 'মুত্রা'। বন্দর ও জাহাজ নির্ম্মাণের কর্ম্মশালা বিশাখাপত্তমকে ইংরেজী বই পড়ে আমরা এতকাল বলে এসেছি ভিজাগাপত্তম।

কোন এক ভক্তিমান হিন্দুর মুখে নদীর নাম 'গঙ্গাজী' শুনে কোন অজ্ঞাত বিদেশী তার প্রতিলিপি করেছিল 'গঙ্গজী'। তাদের স্বরবর্ণের উচ্চারণে অনিশ্চয়তার জন্য অপর ইংরেজেরা লিপির 'জ' কে পড়েছে 'গ্যাং' আর অন্তে জুড়ে দিয়েছে এক 'স'। এরূপে গঙ্গাজী হয়েছিল গ্যাঞ্জেস। লিপি পড়বার দোষে 'কলকত্তা'ও সেইরূপে হয়ে দাঁড়িয়েছে 'ক্যালকট্টা' কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের নর্ম্মসহচরী নর্ম্মদাকে তার ইংরেজী বেশে চেনা সহজ নয়। বর্দ্ধা ভাষান্তরিত হবার পথে হারিয়েছে তার 'উ'। সিন্ধু আর তার পাঁচটি করদা নদী ত বদলে গেছে বিলকুল। এরূপে শত শত ভারতীয় নাম ইংরেজেরা করে দিয়েছে অঙ্গহীন বা বিকলাঙ্গ।

নামের বাংলা প্রতিলিপি

ইংরেজীতে এদেশের নামে যে বিকৃতি ঘটেছে অন্য দেশের নামেও সেরূপ ঘটেছে তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। বাংলা বিদেশী নাম সাধারণতঃ ইংরেজী নামেরই প্রতিলিপি; সুতরাং এতে স্থানীয় উচ্চারণের ইংরেজীতে ভুল ছাড়া ইংরেজী লিপির বাংলা রূপান্তরেও ভুল ঘটা অসম্ভব নয়। বাঙালী পণ্ডিতদের কেহ কেহ আবার ফরাসী জার্মান প্রভৃতি ভাষার ধ্বনি অনুলিখনের চেষ্টা করে থাকেন। কলকাতা থেকে ফিরে গিয়ে পূর্ববঙ্গের লোক যেমন বাঙাল ভাষার মাঝে মাঝে দু'চারটে 'যাচ্ছি' 'খাচ্ছি' আর 'মাইরি' বলে গর্ববোধ করে, ইংরেজী উচ্চারণের মধ্যে ফরাসী ও জার্মান উচ্চারণ তেমনি শোনায়।

আমাদের চিন্তায় ইউরোপ অনেকখানি স্থান জুড়ে রয়েছে। ইউরোপ নামটি বাংলা ভাষায় প্রাঙ্গণে প্রবেশলাভ করেছিল প্রায় দুইশ' বৎসর আগে। এত দীর্ঘকাল ভাষায় থেকে নিজের বানানে তার মৌরসীস্বত্ব জন্মিল না। অধ্যাপক দেবজ্যোতি বর্ম্মণ তাঁর বইয়ের নাম রেখেছেন 'আধুনিক ইউরোপ।' রবীন্দ্রনাথের, 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে'র অনুকরণে অধ্যাপক বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'ইতিবৃত্তিকা'র লিখেছেন 'য়ুরোপ'। অধ্যাপক কিরণচন্দ্র চৌধুরী তাঁর ইতিহাসের নামকরণ করেছেন 'ইওরোপের ইতিহাস'। সাহিত্যিক মনোজ বসুর বই বেরিয়েছে 'নতুন ইয়োরোপ' নাম নিয়ে।

আমরা আনাড়ীরা বিস্মিত হয়ে ভাবি 'ইউরোপে'র আদিস্বর দুটি নিয়ে এত গোল কেন। নামটির আদি বানান 'ইউরোপ' লিখলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় কিনা জানি না। এ যেন 'হাতী ঘোড়া হজম করে ডাঁশ দেখে নাক সিটকানো'র মত লাগে। সেকালের মুনিরা শব্দের বানানে ভেদ সৃষ্টি করে নিজের মুনিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করতেন না। বিশুদ্ধ উচ্চারণের দোহাই দিলে আফ্রিকা ও আমেরিকা ত বাদ পড়ে না। আমরা বলি অ্যাফ্রিক্যা ও অ্যামেরিক্যা কিন্তু লিখি আফ্রিকা আর আমেরিকা। এশিয়ার অন্ত্যস্বরও আ নয় অ্য। বিশুদ্ধতাবাদীরা এদের কি ব্যবস্থা করবেন জানতে ইচ্ছে হয়।

মহাদেশ ছেড়ে এবার দেশ ও শহরের বাংলা নাম দেখা যাক। নামগুলো রবীন্দ্রনাথ, অধ্যাপক বর্ম্মণ, চৌধুরী, মুখোপাধ্যায় এবং সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়ের গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হ'ল। একই দেশের নাম জরমানি, জার্ম্মানি, জারমেনী, জার্ম্মেনী। সে দেশের ভাষা জার্মন, জর্মান ও জার্ম্মান। প্রধান শহরের নাম বর্লিন বা বার্লিন। বইতে প্রাশিয়া ও প্রুশিয়া দুই-ই রয়েছে। রাশিয়াকে রুষদেশ লেখার পরামর্শ দিয়েছেন সুনীতিবাবু। পোল্যাণ্ড বা পোলাণ্ডের রাজধানী ওয়ারস অথবা ওয়ারসো। সুইটজারল্যাণ্ড না সুইজারল্যাণ্ড? বাভেরিয়া, বেভেরিয়া, এই-লা-স্যাপল, এ-লা-চাপেল, ইতালি, ইটালি, পর্টুগাল, পোর্ত্তুগাল, লাইপজিগ, লাইপৎসীগ, প্যারিস, প্যারী, পিডমণ্ট, পাইডমণ্ট, ন্যাপল্‌স, নেপলস, ট্রেণ্ট, ট্রেণ্ট, ভেনিস, ভিনিস, জেনিভা, জেনেভা, বেথলিহেম, বেথলেহেম, ক্যানাডা, কানাডা, সাংহাই, সাংঘাই। রুষ-জাপান যুদ্ধে রুষীয় নৌবহর যে প্রণালীতে বিধ্বস্ত হয়েছিল তার নাম এক অধ্যাপক লিখেছেন ৎসিমা, অন্য একজন, তুসিম। (Tshusima)।

ব্যক্তির নাম—ট্যালিয়ান্ত, তালের্যা, রাফেল, র‍্যাফেইল, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, নেপোলিয়ন বোনাপার্টি, বুর্ব্বন, বুরবোঁ এরূপ বিভিন্ন বানানে ব্যক্তি ও স্থানের নাম বই ক'খানায় ছড়িয়ে আছে। আমাদের আলোচনার জন্য উপরের দৃষ্টান্তগুলিই যথেষ্ট।

বাংলায় বিদেশী নামের একাধিক রূপের ফল

আমাদের ছাত্র জীবনে আলোচনা হ'ত নামের বানান ভুলে নম্বর কাটা যায় কি না। শিক্ষক মশায় বলতেন, 'পরিচিত শব্দের বানান ভুল লিখলে নম্বর কাটা যাবে বই কি।' তাঁর কথা এখন আর খাটে না। সর্ব্বাধিক পরিচিত নামগুলোর মধ্যে ইউরোপ অন্যতম। তা বাংলায় এ পর্যন্ত চার বানানে দেখা দিয়েছে। যাঁরা লিখেছেন তাঁরা খ্যাতনামা বিদ্বান ব্যক্তি। কাজেই ছাত্রদের মুখে শোনা যায়, 'বাংলায় যে কোন বানান লিখলেই চলে।' ইংরেজীর বেলা কিন্তু সবাই সতর্ক। বাংলা বানানে এই শিথিলতার প্রতিক্রিয়া শুধু ইংরেজী নামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, বাংলা নাম ও শব্দের মধ্যেও প্রসারিত হয়ে পড়েছে। এ অবস্থা কোন ভাষার পক্ষেই গৌরবজনক নয়।

চেনা নাম অপরিচিত বানানে দেখা দিয়ে মনকে পীড়িত করে তোলে নিত্য চলার পথে আকস্মিক বাধায় হোঁচট খাওয়ার মত।

ঘটনাস্থল সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা ইতিহাস পাঠে সহায়তা করে। মানচিত্র সম্মুখে রেখে ইতিহাস পড়ায় ঘটনা ও ঘটনাস্থল মনে আঁকা হয়ে যায়। বাংলায় নির্ভরযোগ্য ম্যাপের অভাব। বাংলা বইয়ে বা মানচিত্রে বর্ণানুক্রমিক সূচী থাকে না। বই পড়তে পড়তে যখন 'ৎসিমা' বা 'সর্ব্বকের' সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে তখন তাদের অবস্থান খুঁজে বের করবার কোন উপায় থাকে না। নতুন বানান বোধের বাধা জন্মায়। পাঠকদের সাহায্যের জন্য লেখক অচেনা বাংলা নামের পাশে ইংরেজী নাম দেবার আবশ্যকতাও বোধ করেন না।

বিদেশী বাংলা নামে বানান বিভ্রাটের কারণ

ইংরেজীতে একই বর্ণ বিভিন্নরূপে উচ্চারিত হয়। লেখকের ইংরেজী ধ্বনি সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকলে প্রতিবর্ণীকরণে ভুল দেখা দেয়। বিভিন্ন লেখকের ধ্বনি-জ্ঞান অনুসারে প্রতিলিপি করায় বানানে বিভিন্নতা ঘটে। এখানে ইংরেজী বর্ণের উচ্চারণ বৈচিত্র্যের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

a—Hall, Hallam, Hals, Hare, Hading, Hale, Hannibal, Haberlin,—এই আটটি পারিবারিক উপাধির চিহ্নিত a কয়টির উচ্চারণ আট রকম। কোন কোনোটির সূক্ষ্ম প্রভেদ বাংলায় ধরা পড়ে না। অপর নামগুলো অনবধানতা বশতঃ বিভিন্ন লেখকের বিভিন্নরূপে লিখিবার আশঙ্কা থাকে।

শুধু স্বরে নয়, ব্যঞ্জনবর্ণেও একবর্ণের পৃথক পৃথক ধ্বনি আছে। Darjeeling, Dibrugarh ও Dacca-তে একই 'd' দ ড ও ঢ এর প্রতীক। Gauhati, Geonkhali ও Genoa, Canada, Ceylon ও Cyprus-এর g ও c-র উচ্চারণ একাধিক। Briton, Brighton, Birmingham, Hertfordshire—এই চারটি 'i' এর উচ্চারণ চার রকম। এরূপ দৃষ্টান্ত আর বাড়ানো নিষ্প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "ইংরেজী বর্ণের ঠিক বাংলা প্রতিবর্ণ সম্ভব নহে।" তথাপি আমাদের লেখকগণ অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করে বাংলা ভাষায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে থাকেন।

'একটা নূতন কিছু কর' ডি. এল. রায়ের এই উপদেশ গ্রহণ করে কেহ কেহ শুধু নূতনত্বের জন্যই নূতন বানানে নাম লিখে থাকেন।

লেখকদের সমুখে বাংলায় বিদেশী নামের কোন অভিধান থাকে না বলে তাদের তাড়াতাড়ি একটা প্রতিলিপি নিজেদেরই করে নিতে হয়। বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন রূপে প্রতিবর্ণ করেন, তাই বানানে অনৈক্য ঘটে। রোমান বর্ণের উপর নির্ভর করে কিরূপ ঠকতে হয় তা দেখা গেছে একখানা প্রসিদ্ধ বাংলা দৈনিকের স্তম্ভে। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্টের নাম যখন প্রথম সংবাদে দেখা দেয় তখন কাগজখানি লিখেছিল 'সোয়েকর্ণ'। ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিবর্ণ হয়েছিল সন্দেহ নেই। লেখকের জানা ছিল না যে Shoe লেখায় oe মিলে যেমন 'উ' হয়, রাষ্ট্রপতির নামেও তা হয়েছে। কিছুদিন পর থেকে অবশ্য সোয়েকর্ণ সুকর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

নামের বানানে ভিন্ন ভিন্ন রূপের আর এক কারণ ইংরেজী ও অন্য দেশের স্থানীয় উচ্চারণ—এ দুয়েরই ব্যবহার। প্যারিস ও মারসেলস ইংরেজী আর ফরাসী, প্যারী ও মার্সাই, বাংলায় উভয়ই প্রবেশ করেছে। একই কারণেই বাংলায় বর্লিন ও বার্লিন, জরমানি ও জার্মানি দেখা যায়। রাশিয়ার বেলা কিন্তু আমরা ইংরেজী রাশ্যা, ছেড়ে রাশিয়ান উচ্চারণ 'রাশিয়া' ধরেছি। প্রাশিয়ার ইংরেজী 'প্রাশ্যা'কে আমরা করেছি 'প্রাশিয়া' আর জার্মান উচ্চারণ 'প্রুশিয়া'ও ছাড়িনি।

দেশী ও বিদেশী নামের দ্বন্দ্ব এখনও চলছে। ভারত এদেশের রাখা নাম, ইণ্ডিয়া তার ডাক নাম হয়ে পড়েছে। ঈজিপ্ট না মিশর, নাইল না নীল, সকোত্রা না সুখদ্রা, সিলোন না সিংহল, কেপ কমোরিন না কুমারিকা, বার্মা না ব্রহ্মদেশ, জাভা না যবদ্বীপ, এদের কোনটা টিকে থাকবে?

প্রতিকারের পথ

"বিদেশী নামের মধ্যে রুষদেশ স্থলে রাশ্যা, চীন স্থলে চায়না, পারস্য স্থলে পার্শিয়া, প্রভৃতি কখনও লিখন"কে ডাঃ চট্টোপাধ্যায় 'বর্বরতা' বলে অভিহিত করেছেন। এসব 'ভাষাগত বর্বরতা বা অশিষ্টতা' পরিহারের উদ্দেশ্যে আমরা ইংরেজদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে উপকৃত হতে পারি। বিদ্যার বাহন ইংরেজী পরিত্যাগ করে বাংলা ধারায় আমাদের সামনে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে বিংশ শতকের মাঝামাঝি, ইংরেজী ভাষায় তার উদ্ভব হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের শেষার্দ্ধে। ভারত ইংরেজ শাসনাধীনে আসিলে ভারতীয় নামের ইংরেজী প্রতিরূপে বিশৃঙ্খলতা দেখা দেয়। তখন স্যর উইলিয়ম জোন্স প্রতিবর্ণীকরণের নিয়ম রচনা করেন। সকল এশিয়াটিক সোসাইটি এবং কোলব্রুক উইলসন প্রমুখ পণ্ডিতগণ স্যর উইলিয়মের নিয়ম অনুসরণ করে চলতে থাকেন। এর ফলে প্রাচ্য নামের ইংরেজী প্রতিলিপি-নিয়ন্ত্রিত নির্দিষ্ট রূপ ধারণ করেছে। উচ্চারণ ও লিপি বিকৃত হয়েছে জেনেও যে-সব নাম ইংরেজী ভাষায় সুপ্রতিষ্ঠিত ও দৃঢ়মূল হয়েছিল তাদের কোন পরিবর্ত্তন তাঁরা করেন নি। 'গ্যাঞ্জেস' বললেও ব্রিটিশ পাঠকরা গঙ্গাই বুঝবে। বিশুদ্ধতার নামে তাঁরা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাই তাঁরা সিন্ধুকে ইণ্ডাস, গঙ্গাকে গ্যাঞ্জেস, দিল্লীকে ডেহলি, মুম্বাইকে বম্বে, মহীশূরকে মাইসোর, বৌদ্ধদের বুদ্ধিষ্ট নাম স্থানীয় উচ্চারণ অনুযায়ী পরিবর্ত্তন না করে ইংরেজ পাঠকদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েছিলেন। এখানে কিন্তু দু'শ বছর ধরে বাংলায় প্রচলিত ইউরোপের বানান নিয়ে খেলা চলছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, বাঙালীরা 'পদ্মবনে মত্তকরীসম বাংলা ভাষার বানান এবং ব্যাকরণ ক্রীড়াস্থলে পদদলিত করিতে পারেন।'

কোন কোন ব্যাকরণে ইংরেজী বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণ দেওয়া হয়েছে। তা পড়ে কবি পোপের কথা মনে পড়ে। একবার তিনি বলেছিলেন যে, অভিধানকারগণ শুধু একক শব্দের অর্থ জানেন। একত্রিত পদসমূহের অর্থ তাঁদের গণ্ডীর বহির্ভূত। ব্যাকরণের বর্ণের প্রতিবর্ণ ও কোন নামের প্রতিলিপি লিখতে খুব বেশী সাহায্য করে না।

বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে ইংরেজী ভৌগোলিক নামের গেজেটিয়ার থেকে ভূগোলের নাম এবং ইতিহাস থেকে সঙ্কলন করে ঐতিহাসিক নামের একটি বাংলা গেজেটিয়ার প্রস্তুত করে স্থানের নামের বানানে বিশৃঙ্খলা দূর করতে পারে। ব্যক্তির নামের বাংলা অভিধান রচনা করে ব্যক্তির নামের বানানের একটি প্রামাণ্য অভিধান করা যায়। ওয়েবষ্টারের অভিধানে এ ধরনের সংক্ষিপ্ত নাম-পরিচয় দেওয়া আছে। এরূপ দু'খানি পুস্তক সঙ্কলন করে নামের বানান সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।

প্রয়োজনের সীমা

শ্রীকানু রায়

চিঠিটা হাতে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকে পরিতোষ। এলো-মেলো অনেক কথা একসঙ্গে ভিড় করে আসে। কিন্তু ভাল লাগে না—কিছুই যেন ভাল লাগে না। বাইরের থমথমে মেঘলা আকাশটার মত তার মনও বড় বেশী ক্লান্ত আর বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছে। মেঘ করেছে সেই কখন থেকে, কিন্তু এখনও এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়বার নাম নেই। চতুষ্কোণ জানালাটার ফাঁক দিয়ে যতদূর চোখ যায় তাকিয়ে ছিল সে. কখন আকাশের রং পালটায়, কখনও বৃষ্টি নামে। অসহ্য—অসহ্য এই প্রতীক্ষা! আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বিরক্তি আর বিস্বাদে অস্থির হয়ে উঠেছিল পরিতোষ চৌধুরী। ছটফট করেছিল নিজের মনে মনে। অন্ততঃ যদি ঝড় উঠত সেও অনেক ভাল ছিল।

তখন—ঠিক তখনই চিঠিটা এল। এনভেলাপটার দিকে এক নজর তাকিয়েই সব টের পেল সে। আপিসের ছাপানো এনভেলাপ, পরিতোষ জানত—নিশ্চিত জানত চিঠিটা আসবে। তাতে কি লেখা থাকবে তাও তার অজানা নয়। কি হবে খুলে, কি হবে পড়ে! তার কোন কৌতূহল নেই, উৎসাহও নেই। আপিসে কাজ করতে করতে আর কাসতে কাসতে যখন আশ্চর্য এক তরলের নোনা স্বাদে তার মুখটা ভরে গিয়েছিল তখনই পরিতোষ টের পেয়েছিল চাকরির পালাটাও এবার শেষ হতে চলল। বেতনসহ এক মাস ছুটি পাওয়া গেল—পুরো একটি মাস। নিয়মিত মাছ-মাংসের ব্যবস্থা হ'ল, আধ সের করে দুধ, প্রায়ই দামী ফলের রস; সপ্তাহান্তে ডাক্তার ইনজেকশান দিয়ে গেলেন। সমুদ্রের ধারে যেতে পারলে সুবিধা হ'ত। একটু চেঞ্জ—শরীরের, হ্যাঁ মনেরও পরিবর্তন দরকার বৈকি।

—চেঞ্জ! হাসতে হাসতে পরিতোষ নমিতাকে বলেছিল, কেন? এই মীর্জাপুরের স্বাস্থ্য এমনকি খারাপ?

—তা হয় না। তোমাকে যেতেই হবে। মাথা ঝাঁকিয়ে নমিতা বলেছে, আমি সব ব্যবস্থা করব।

—বুঝলাম। যেমন করে মাছ মাংস আর দুধের ব্যবস্থা করেছ?

—সে তোমাকে ভাবতে হবে না।

পরিতোষ আস্তে আস্তে বলেছে, কিন্তু এটাই একমাত্র নির্ভরযোগ্য পথ নয় নমিতা। চুড়ি-আংটি ত আগেই গেছে, এবার বোধ হয় গলার হারটাকেও বেচবে?

-হার!

কেঁদে ফেলেছে নমিতা, গয়না আমি আর পরব না।

কিন্তু হার বেচেও সমুদ্রের ধারে যাওয়া হ'ল না। ডাক্তার ইতিমধ্যে আরও দামী দামী ওষুধের নাম বললেন, ভিজিটের টাকাও গুনে নিলেন নিয়মিত। আপিসের ছুটি শেষ হয়ে এল। এবার কিছুদিন অর্ধবেতন তার পর বিনা বেতনে এক মাসের ছুটি পাওয়া গেল। আপিস থেকে এর চেয়ে বেশী কি আর সাহায্যের কথা আশা করতে পারত? আন্তরিক চিকিৎসা করেছিলেন ডাক্তার, নমিতার সেবাযত্নেও এতটুকু ত্রুটি ছিল না, আর এই মীর্জাপুর ষ্ট্রীট থেকে সমুদ্রের দূরত্বটাই এমনকি বেশী। তপনের ভূগোল বইতেই লেখা আছে মাত্র আশী মাইল! সেই আশী মাইল দূর থেকে ওজোন মেশানো সামুদ্রিক বায়ুর এতটুকুও কি এসে ঢোকে না সওদাগরী আপিসের নগণ্য কেরানী পরিতোষ চৌধুরীর ঘরে?

এই ছোট্ট ঘরটাতে শুয়ে শুয়ে সেই আশ্চর্য তরলের নোনা স্বাদ অনুভব করেছে সে, আর দেওয়ালের গায়ে টাঙানো ক্যালেণ্ডারের লাল আর কালো কালিতে ছাপা সংখ্যাগুলি এক এক করে লক্ষ্য করেছে। এই প্রায়ান্ধকার একটা ঘর, প্রত্যহের নোনা স্বাদ। ক্লান্ত, ক্লান্ত, ক্লান্ত এক একটা দিন! জীবন নয়, মৃত্যুও নয়—প্রতিনিয়ত মৃত্যুর বিভীষিকা! আরও বেশী অসহ্য এই আতঙ্কের ছায়া। অবশেষে আপিসের ছাপানো খামের আড়ালে মৃত্যুর সুনিশ্চিত আহ্বান!

নমিতা চা নিয়ে ঘরে ঢুকছিল। পরিতোষকে ঐভাবে নিশ্চল হয়ে বসে থাকতে দেখে কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল সে। ভয়ের একটা মৃদু কিন্তু অনিবার্য অনুভূতি তার শরীর বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে গেল।

বড় দেওয়াল ঘড়িটায় সাড়ে ছ'টা বাজল।

—কি হয়েছে! অমন করে বসে আছ কেন?—চা রাখতে রাখতে অনেক কষ্টে উচ্চারণ করল নমিতা।

হাসতে চেষ্টা করে পরিতোষ, না, কিছু নয়।

—ওটা কিসের চিঠি? ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে নমিতা।

—নাও, পড়ে দেখ।

পরিতোষ হাত বাড়িয়ে চিঠিটা এগিয়ে দিল কাঁপা

কাঁপা হাতে খোলে নমিতা। চিঠিটা পড়ে—একবার, দু'বার, তিনবার। না, মুখে তার কান্না নেই, আর্তনাদ নেই, যন্ত্রণার ছাপও নেই। এখন নমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে পরিতোষের মনে হ'ল অনুভবের কোন ছবিই বোধ হয় এই মেয়ের মুখে ফুটে ওঠে না! নমিতা কাঁদে না কেন? কাঁদতে কি তার ভাল লাগে না? গয়না বেচার কথায় একবার যে কেঁদেছিল তার পর থেকে কি কাঁদতেই ভুলে গেছে নাকি?

—পড়লে?

—হ্যাঁ।

—কি লিখেছে?

—তুমি চা-টা খেয়ে নাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। ওকি, তুমি অমন করে তাকিয়ে আছ কেন?

—নমিতা!

—ও কিছু নয়, তুমি ব্যস্ত হয়ো না।

পরিতোষ কোন রকমে নিজেকে সামলে নিল। তার পর যেন নিজের কাছেই বলছে এমনি ভাবে বিড় বিড় করে বলে, আজ যেন আমার কি হয়েছে! কিছুই বুঝতে পারছি না।

—ওষুধটা খাবে এখন?

—না ওটা এখন থাক। ওষুধ খেতে আমার আর ভাল লাগে না। কি হবে ওষুধ খেয়ে—বলতে বলতে যেন একটু বিরক্তই হয়ে যায় পরিতোষ, আচ্ছা, রান্না করা, আমাকে ওষুধ খাওয়ানো আর সেবা করা ছাড়া তোমার কি আর কোন কাজ নেই নমিতা? বল, জবাব দাও আমার কথার।

উত্তেজনায় তার দেহ থরথর করে কাঁপতে থাকে।

নমিতা তাকে দু'হাত দিয়ে ধরে ফেলে, একি স্থির হও তুমি।

না না, ও সব কথা আমি শুনতে চাই না। আমার প্রশ্নের জবাব দাও।

—কি দেব?

—কেন, কেন শুধু এই—

হঠাৎ সে কাশতে থাকে। নমিতা আস্তে তাকে বিছানায় শুইয়ে দেয়। চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে দেয় সারা শরীরে। শিশুর মত ফ্যালফ্যাল করে তাকালো পরিতোষ। কাশি থামলে আস্তে আস্তে ঘুমোবার চেষ্টা করে সে।

ঠিক এই সময় বাইরে কড়া নাড়ার আওয়াজ পাওয়া গেল। অল্প অল্প বৃষ্টিও পড়তে সুরু করেছে এতক্ষণে। নমিতা ভেবে পেল না এখন কে আসতে পারে। কপালের উপরে ঘোমটাটা একটু টেনে দিয়ে জড়িতপদে বাইরের ঘরে এসে দরজাটা খুলে দিল সে।

বার-তের বছরের একটি ছেলে।

—শঙ্কর তুমি? এই বৃষ্টিতে ভিজে এলে!

—ও কিছু নয়।—শঙ্কর বাঁ হাত দিয়ে কপালের ওপর থেকে ভিজে চুলগুলি সরিয়ে দিতে দিতে বলে, মাষ্টারমশাই কেমন আছেন?

—এস, দেখবে চল।

নমিতা তাকে পাশের ঘরে নিয়ে যায়। বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতেই পরিতোষ জিজ্ঞেস করে, কে এসেছে নমিতা?

—আমি মাষ্টারমশাই।—জবাব দেয় শঙ্কর।

—শঙ্কর!

পরিতোষ উঠে বসে।

—ও কি, তুমি আবার উঠছ কেন? নমিতা দ্বিধান্বিত ভাবে বলে।

—কোন ভয় নেই। তুমি অল্পেতেই বেশী উতলা হয়ে পড়।—শঙ্করের দিকে তাকিয়ে সে বলে, তার পর, তোমার কি খবর?

—আপনার খবর নিতেই এলাম মাষ্টারমশাই।

ম্লান হাসল সে. আমার খবর?

নমিতা একটা শুকনো গামছা নিয়ে আসে, এই নাও শঙ্কর, ভাল করে ভিজে মাথাটা মুছে ফেল।

—থাক, আমাকে আবার এখুনি বাড়ী যেতে হবে।

—শঙ্কর! পরিতোষ ডাকে।

—বলুন মাষ্টারমশাই।

—তুমি পড়ায় অনেক পিছিয়ে আছ, তাই না? এ্যালজ্যাব্রার অঙ্কগুলি ভাল করে বুঝতে পার?

শঙ্কর মাথা নীচু করে বসে থাকে। কোন জবাব দেয় না।

—বুঝেছি, আমার জন্য তোমার খুব কষ্ট হয়?

—আপনি তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠুন।

—ভাল! এ রোগ থেকে আমাদের মত মানুষরা সহজে ভাল হয় না শঙ্কর। আমি জানি তোমার অনেক অসুবিধা হচ্ছে, কিন্তু কি যে করি!

শঙ্কর মাথা গুঁজে অপরাধীর মত বলে, বাবা আমার জন্য নতুন মাষ্টার ঠিক করেছেন।

—নতুন মাষ্টার?

—হ্যাঁ। বাবা বলেছেন—

—তুমি লজ্জা পাচ্ছ কেন শঙ্কর? এছাড়া ত আর কোন উপায় ছিল না। নতুন মাষ্টার এসেছেন, ভালই হয়েছে, মন দিয়ে পড়াশুনো করো, পরীক্ষায় তোমাকে ভাল রেজাল্ট করতেই হবে।

—মাষ্টারমশাই, আপনি ছাড়া আর কারো কাছে পড়তে আমার ভাল লাগে না।

—পাগল ছেলে! তা কি হয় কখনও? তোমার মাষ্টারমশাই আর কত দিন পড়াবেন। বিষাক্ত জীবাণু আমার বুকের পাঁজর কুরে কুরে খেয়ে চলেছে। জীবনের পরমায়ু এবার বোধ হয় সত্যি সত্যি শেষ হয়ে এল—নমিতা, তুমি কাঁদছ? আচ্ছা থাক ওকথা।

শঙ্কর পকেট থেকে কটা দশ টাকার নোট বার করে, এই নিন মাষ্টারমশাই।

—টাকা?

—হ্যাঁ, বাবা আপনাকে দিতে বলেছেন।

—আমাকে দিতে বলেছেন—কিন্তু কেন? না না শঙ্কর, ও টাকা আমি নিতে পারব না। যতদিন তোমাকে পড়িয়েছি তত দিন টাকা নিয়েছি, আজ কিসের দাবিতে নেব?

—আপনার যে অনেক প্রয়োজন।

—সত্যি প্রয়োজন আমার অনেক। তবু এ টাকা আমি কিছুতেই নিতে পারব না। শঙ্কর, তুমি এটা ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

—মাষ্টারমশাই!

—কোন কথা নয় শঙ্কর। এ অনুরোধ আমি কিছুতেই রাখতে পারব না।

ব্যথাহত শঙ্কর নীরবে বসে রইল। তার পর পরিতোষকে একটা প্রণাম করে সেই বৃষ্টিঝরা সন্ধ্যার মধ্যেই বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ দু'জনে চুপচাপ! কিছুক্ষণ নয়, অনেকক্ষণ। এবার পরিতোষ আস্তে আস্তে ডাকল, নমিতা!

—কি?

—শঙ্করের কথা শুনলে ত? টাকা দিতে এসেছে! আমার আর প্রয়োজন কি বল ত? তা ছাড়া নেব কেন? আমার প্রয়োজন যখন ওদের কাছে ফুরিয়ে গেছে। ফুরিয়ে আমি সকলের কাছেই গেলাম নমিতা। ফুরিয়ে গেলাম আপিস থেকেও। এবার তোমার কাছ থেকে বিদায় নেবার পালা।

নমিতার চোখ বেয়ে দু' ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

—আঃ, মেয়েদের এই চোখের জল আমার সহ্য হয় না। কিন্তু জীবনের সব প্রশ্নের উত্তর কেবল চোখের জল দিয়ে দেওয়া যায় না নমিতা। আশ্চর্য্য! তুমি চুপ করে আছ কেন? শুনতে পাচ্ছ না নাকি! নমিতা আমার কথার জবাব দাও নমিতা।

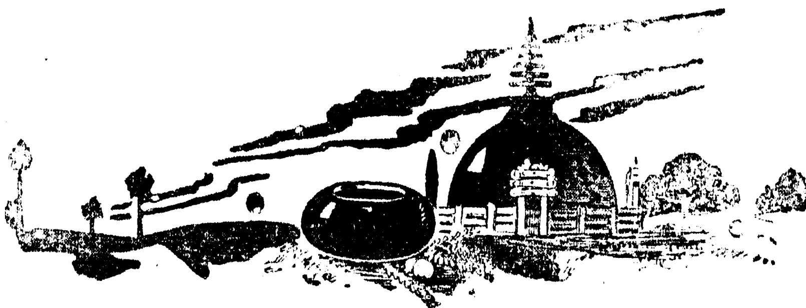
উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে থাকে তার সারা দেহ। ফ্যাকাসে মৃতের মত হয়ে যায় দুটি চোখ।

আর নমিতা।

এতটুকু কুঞ্চিত হ'ল না তার মুখের পেশী, কান্না থামিয়ে চোখের জল মুছল। আস্তে আস্তে পরিতোষকে দু'হাতে ধরে রোজকার মত বিছানায় শুইয়ে দিল। তার পর ধীরে অস্ফুটস্বরে প্রায় ফিসফিস করে বলল, তুমি ঘুমোও এবার লক্ষীটি, আর কথা বলো না। আমি তোমার চুলে আঙুল বুলিয়ে দেব। বসে থাকব তোমার পাশে সারারাত।

—টাকা দিতে এসেছে শঙ্কর।—হাসবার চেষ্টা করে পরিতোষ, নেব কেন টাকা। আমার আর প্রয়োজন কি?

নমিতা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।



সিনেমা ও বাংলাদেশ

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

শিল্প হিসাবে না হউক, স্বপ্ন হিসাবে আজ সিনেমা বাংলা দেশে জাঁকিয়া বসিয়াছে। এ তথ্য প্রমাণ করিবার জন্য কাহাকেও দূরে যাইতে হইবে না; ইহার জন্য অনুমান বা আপ্তবাক্যের দরকার নাই। যার যার পরিবারগোষ্ঠীর মধ্যেই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলিবে।

বাংলার তরুণ-তরুণী এখন সিনেমা-স্বপ্নে বিভোর। চিত্র-তারকারা এখন তাহাদের নমস্য, আরাধ্য দেবতা। শুধু বসন-ভূষণে নয়, আচার-ব্যবহারেও তাহারা আজ অনুকরণীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের দর্শনের জন্য এখন আর শুধু ক্ষীণ-মেধার দলই ভিড় করিয়া আসে না, বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাও তাহাদিগের সান্নিধ্যের জন্য লালায়িত।

অর্দ্ধ-শিক্ষিত বা অ-শিক্ষিত শ্রমিকদের কথা না হয় বাদই দিলাম, ছাত্রদের মধ্যে যাহারা নিয়মিত সিনেমা দেখে না তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। বাঙালী গৃহিণীরা সিনেমার অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক। দুপুরের আসর তাঁহারাই জমাইয়া রাখেন। বলা বাহুল্য, ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। কাজেই অশন-বসন সঙ্কোচ না করিয়া আসরের নিয়মিত দর্শনী সংগ্রহ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না।

কিন্তু সিনেমার জের প্রেক্ষাগৃহেই শেষ হইয়া যায় না। ইহার চমক ঘরে ঘরে আসিয়া হানা দেয়। স্বপ্ন হিসাবেই আজ সিনেমার সমাদর, শুধু আমোদের খোরাক হিসাবে নহে। কাজেই সে স্বপ্ন মনকে চঞ্চল করিয়া রাখে, তাহাকে উত্তরোত্তর ব্যাকুল করিয়া বাস্তব-বিমুখ করিয়া তোলে।

অপরিণত বা রুগ্ন মনের উপর এই স্বপ্নের প্রভাব অভাবনীয়-রূপে দেখা দেয়। সিনেমার কথা ও কাহিনী, সিনেমার গান, অভিনেতাদের হাব-ভাব—এ সমস্তই সে মনের মধ্যে বিরাট বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। ফলে সে জীবনকে রূপায়িত করিতে চায় এই স্বপ্নের মধ্যে আর সেই সূত্রেই তাহার জীবনে অসীম দুঃখ ও সংঘাতের সূচনা হয়।

বাঙালীর মন চিরদিনই কোমল ও কল্পনাপ্রবণ কিন্তু তাই বলিয়া অপরিণত নয়। বিচার-বুদ্ধি তাহার যথেষ্ট ছিল আর এখনও আছে। তবে তার চরিত্রে এ অশোভন শিশুত্ব কেন দেখা দিয়াছে?

এ সমস্যার সমাধান করিতে খুব বেশী দূর যাইতে হইবে না।

গত মহাযুদ্ধ ও তৎপরবর্ত্তী কালে জাতিহিসাবে বাঙালীকে যত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে এমন আর কোন জাতিকেই করিতে হয় নাই। দেশ বিভাগ হইয়াছে ১৯৪৭ সনে, আজ ১৯৫৯ সন অর্থাৎ বারো বৎসর পরেও বাস্তুত্যাগীদের সমস্যার সমাধান হয় নাই। কেন হয় নাই সে অন্য কথা, কিন্তু আজও শিয়ালদহ ষ্টেশনে বাঙালীর যে প্রেতমূর্ত্তি দেখা যায় তাহা দেখিলে পৃথিবীর যে-কোন জীবিত জাতি শিহরিয়া উঠিবে। কিন্তু ইহা এ জাতির দুঃখ-দুর্দ্দশার একদিকের চিত্র মাত্র। লোকচক্ষুর অন্তরালে যে সকল চিত্র আছে তাহা বাহির করিলে সারা জগতের মনুষ্যত্ব যে লজ্জা পাইবে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। এই অমানুষিক দুঃখ ও লাঞ্ছনার ফল, মনের মৃত্যু। সে মৃত্যু অবশ্য একদিনে আসে নাই, আসিয়াছে তিলে তিলে। সে মৃত্যু যতই ঘনাইয়া আসিয়াছে, মনের বাস্তব-বিমুখতা ততই বাড়িয়া গিয়াছে। পরিণত মন ক্রমশঃ শিশুমনে রূপান্তরিত হইয়াছে। দুঃখকে অবিচলিত চিত্তে সহ্য করিবার যে শক্তি, অর্থাৎ তিতিক্ষা, তাহা লোপ পাইতে বসিয়াছে। ক্রমে এমন হইয়াছে যে, শিশু যেমন কোন ভয়ের বা দুঃখের লেশমাত্র কারণ দেখিলে চক্ষু বুঁজিয়া মায়ের কোলে উঠিতে চেষ্টা করে, বাঙালীও তেমনি ক্ষণিক দুঃখ-বিস্মৃতির জন্য পুনঃ পুনঃ এই সিনেমা-স্বপ্নের শরণাপন্ন হইতেছে। বিচার করিলে একথা তাহার নিশ্চয়ই মনে হইত যে, ইহাতে দুঃখবোধ তাহার কমে নাই, বরং মনের চাঞ্চল্য বাড়িয়াই গিয়াছে। কিন্তু বিচার করিবে কে? শিশুমন কি বিচার করিতে পারে?

দ্বিতীয়তঃ সিনেমা-জগৎ বাঙালীর এই মানসিক অবস্থাকে মূল-ধন করিয়া ব্যবসা করিতে সুরু করিয়াছে। বাংলার ভীত ও ত্রস্ত মনের চাঞ্চল্য প্রশমনের জন্য এক মহামৃতের সৃষ্টি হইয়াছে। সে হিতকর বস্তু আর কিছুই নহে—অপরিমিত যৌন-আবেদন। এই যৌন-আবেদনই আজ সিনেমার অন্যতম প্রধান উপজীব্য; এমনকি একমাত্র উপজীব্য বলিলেও অন্যায় হয় না। পঙ্গু মনকে পঙ্গুতর করিবার জন্য এমন মাদক-দ্রব্য আর কি আছে? জাতির মনের এক বৃহদাংশ অবশ না হইয়া পড়িলে সিনেমা-জগতের এই ব্যবসা-তত্ত্ব অচিরেই ধরা পড়িয়া যাইত। এ কদর্য্য ব্যবসা বেশী দিন চলিত না।

ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। দুর্ব্বলের প্রতিই চিরদিন অত্যাচার বেশী হয়। আজ বাংলার চরম দুর্দ্দিন; কাজেই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা খাদ্যে-ভেজাল চলে বাংলা দেশেই। পঙ্গু বাংলা সে অত্যাচার সহ্য করিয়া ক্রমশঃ ক্ষীণবীর্য্য হইয়া যাইতেছে। তেমনি করিয়া চলিতেছে এই মানসিক জগতে সিনেমার অত্যাচার। শিল্প, প্রগতি, রূপসৃষ্টি প্রভৃতি মনোহর

মোড়কে আবৃত হইয়া যৌন-আবেদন প্রতিদিন মহামূল্যে বিক্রীত হইতেছে। ইহা যে রস নয় রসাভাস তাহা কে প্রচার করিবে? সকল বাঙালীই জানে যে, তাহার খাদ্যে ভেজাল দিয়া এক চরমতম নিষ্ঠুর ব্যবসা চলিতেছে। কিন্তু যে সুস্থ মন সে অত্যাচারের বিরুদ্ধে মরণপণ করিয়া যুদ্ধ করিতে পারে তাহা কোথায়? হয়ত এখন বাঙালীর মনে সিনেমা-জগতের এই অপচেষ্টা সম্বন্ধে কিছু কিছু সন্দেহ জাগিয়াছে, কিন্তু সে কদর্য্য ব্যবসার সফল প্রতিবাদ করিবার মত শক্তি সে এখনও সঞ্চয় করিয়া উঠিতে পারে নাই।

অথচ, এই সিনেমাই পঙ্গু বাঙালীর অশেষ উপকার করিতে পারিত। তাহার দৈন্য-জর্জ্জরিত, অবসাদগ্রস্ত প্রাণে শক্তিমান, মহত্তর জীবনের প্রেরণা আনিতে পারিত। আর সাহায্য করিতে পারিত তার জীবনের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করিতে। কিন্তু রুগ্ন মনকে সযত্ন-শুশ্রূষায় সুস্থ করিয়া তুলিবার জন্য যে দরদের দরকার তাহা না আছে বাঙালীর নিজের, না তাহার প্রতিবেশীদের। তার উপর, রাষ্ট্র সিনেমাকে কল্যাণের পথে গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে নাই। যে পথে সে চলিয়াছে সে পথ তাহার পক্ষে বিপথ। রাষ্ট্র ব্যবসাবুদ্ধিকে নির্বিচারে প্রাধান্য দিয়াছে: সে ব্যবসায়ে সমগ্র জাতির লাভ-লোকসানের হিসাব সে খতাইয়া দেখে নাই। আজও সে তা দেখিতেছে না। হয়ত সমগ্র দেশে সিনেমার প্রসার ও প্রচারকেই প্রগতির পরিমাপ বলিয়া রাষ্ট্রনেতারা আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন। ব্যাঙের ছাতার মত যে সিনেমা-হল গজাইয়া উঠিতেছে তাহার সংখ্যা কষিয়া, সেগুলিতে সপ্তাহ ভরিয়া কতজন যে এই যৌন-আবেদনের মহামৃত পান করিতেছে তাহার হিসাব লইয়া আর বৎসরে কতগুলি 'ফিল্ম' তৈরী হইল তাহার অঙ্ক কষিয়া তাহারা বিশ্বজগতে আপনাদের ঐশ্বর্য্য জাহির করিতেছেন। সিনেমা বেশী দেখে ক্ষীণ-মেধা বালখিল্যের দল; যাহাদের মন অপরিণত অথবা রুগ্ন। সেই অপরিণত অথবা রুগ্ন মনের উপর ইহার কি প্রতিক্রিয়া হইতে পারে তাহা যে একান্ত বিবেচনার বিষয় সেকথা তাহাদের মাথায় ঢোকে নাই।

কিন্তু রাষ্ট্রনেতারা ইহা অপেক্ষাও গর্হিত কাজ করিয়াছেন ও করিতেছেন সিনেমার নট-নটীদের সামাজিক সম্মান দিবার চেষ্টা করিয়া। কাহাকেও ডাকিয়া আনিয়া রাষ্ট্র খেতাব দিয়াছেন, শ্রদ্ধাভাজন নেতারা তাহাদের সঙ্গে একত্রে ফটো তুলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন, কেহ তাহাদিগকে খেলার মাঠে ডাকিয়া আনিয়া আর তাহাদের দিয়া 'হকি', 'ফুটবল' খেলা দেখাইয়া রাষ্ট্র-হিতার্থে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা সামাজিক নিয়মভঙ্গের ইতিহাস। ইহা সমাজকে দুর্ব্বল করিবার চেষ্টা; সাধারণ লোককে বিভ্রান্ত করিবার অপপ্রয়াস।

কিন্তু এ প্রয়াস ফলপ্রসূ হইতে পারে না। কারণ সমাজের কল্যাণ না করিলে কাহারও সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভ হইতে পারে না। প্রকৃত কল্যাণকৃৎ না হইলে সমাজ কাহাকেও মান্য করে না—রাষ্ট্র তাহাকে বহুবিধ সম্মান করিলেও তাহার মর্য্যাদা বৃদ্ধি হয় না। সিনেমার নট-নটীরা এখন সমাজের পক্ষে কতখানি কল্যাণকর সে কথা না বলিলেও চলে। তবে যদি কোনদিন তাহারা সমাজের কল্যাণসাধন করেন তবে সামাজিক শ্রদ্ধা ও প্রতিষ্ঠা তাহারা অবশ্যই পাইবেন। তাহার জন্য রাষ্ট্রের প্রয়াসের দরকার হইবে না। রাষ্ট্রনেতারা হয়ত ভাবিয়াছেন যে, কেবলমাত্র রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করিয়াই সমস্ত জাতিটা টিঁকিয়া আছে। এ ধারণা নিতান্ত ভ্রম। সমগ্র জাতির নির্ভর রাষ্ট্র অপেক্ষা সমাজের উপর অনেক গুণ বেশী।

উপনিষৎ বলিয়াছেন, "আনন্দেন জাতানি জীবন্তি।" জীব আনন্দের মধ্যেই বাঁচিয়া থাকে। অন্ন নয়, প্রাণ নয়, মন নয়, বিজ্ঞান নয়, শুধু আনন্দের আস্বাদেই লোক বাঁচিয়া থাকে। যতদিন তার দেহে বল ও মনে স্বাস্থ্য থাকে ততদিন সে আনন্দের অংশ গ্রহণ করিতে চায় সক্রিয়ভাবে। কিন্তু যেই দেহ অথবা মন অথবা উভয়ই রুগ্ন হইয়া যায় তখন আর সে আনন্দের অংশ সক্রিয়ভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। সুস্থ তরুণ-তরুণী খেলাধুলা, দেশ-ভ্রমণ, চড়ুইভাতি প্রভৃতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া আনন্দ পায়। আর তাহাদের মন ও শরীর যত রুগ্ন হইতে থাকে ততই তাহারা আনন্দ পায় খেলা বা সিনেমা দেখিয়া অথবা গল্পগুজবে। সিনেমা দেখাই যে রুগ্ন অবস্থার লক্ষণ তাহা নহে। তবে অপরিমিত সিনেমা দেখা যে মনের স্বাস্থ্যের লক্ষণ নহে একথা আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাংলা দেশে সিনেমা আজ মাদক-দ্রব্যরূপে দেখা দিয়াছে। ইহার মধ্যে বিচার-বুদ্ধির কোন স্থান নাই। রাষ্ট্র এ মাদক-দ্রব্যের প্রচার ও প্রসারে ব্যস্ত। বাঙালীর রুগ্ন মনের কাছে এ নেশার প্রলোভন অপরিসীম। তার মনের স্বাস্থ্য ফিরিয়া না আসিলে এ নেশার ঝোঁক তার কমিবে না।



বকুল গন্ধে

শ্রীহরিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ছানি[redacted] বৃষ্টিকে ঠেলে দিয়ে দাওয়ার ওপর চুপচাপ বসে আছেন সুকুমারী। শরীরটা তাঁর ক'দিনই ভাল নেই। জ্বর জ্বর ভাবটা যেন আজই বেশী মনে হচ্ছে। ফোপরা বকুল গাছটার গায়ে যেন কুড়ুল পড়ছে না—আঘাতটা যেন সরাসরি সুকুমারীর বুকে এসে লাগছে। তরঙ্গ যেমন তটে এসে মাথা খুঁড়ে মরে অনেকটা তেমনি ভাবে। মজুরদের পেশীগুলো সাপের মত পাকিয়ে উঠছে। কুড়ুলটা মাথার ওপরে উঠে আবার এসে পড়ছে বকুল গাছের বুকে। অসহ্য! তবু সুকুমারীকে এ আঘাত সহ্য করতেই হবে। অথচ বকুল গাছটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কত স্মৃতি। সে-সব পুরানো দিনের কথা ক'জনই বা মনে রাখে? যারা জানত তারা আজ এ জগতে কেউ বুঝি বেঁচে নেই।

বৌমারা জেদ ধরল। আর ধরবে না-ই-বা কেন? রাজ্যের দাঁড়কাক এসে বাসা বাঁধল বকুল গাছটার ওপর। দিন নেই, ক্ষণ নেই কেবল শোনো কা-কা রব। নাতি পলটনের জ্বর হতেই সুকুমারী অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। বড় ছেলেকে ডাকিয়ে নিজেই ফোপরা বকুল গাছটা কাটাবার কথা পাড়লেন—মাত্র পরশুদিন কথাটা পাকাপাকি হ'ল আর আজ মজুররা এসে পড়েছে। দাঁড়কাকগুলো সকাল থেকেই মিত্তিরদের ছাদে আস্তানা নিয়েছে আর সমস্বরে সুকুমারীর দিকে চেয়ে যেন বিদ্রূপ করে পরিত্রাহি ডেকে চলেছে। সুকুমারী অসুস্থ শরীরে পলটনের কথা ভেবে দাঁড়কাকগুলোর সঙ্গে সমানে চেঁচিয়ে উঠছেন, রাম—রাম—রাম। ঐ কাকের ডাক শুনে সুকুমারীর বুকটা এখনও গুর গুর করে ওঠে। স্বামীর রোগশয্যার কথা মানসপটে ভেসে ওঠে। কতদিনকার কথা, এখনও সুকুমারীর সব কথা মনে আছে। সেদিন হুলো বেড়ালটা কি ডাকই না ডেকেছিল! সেই অলুক্ষণে ডাক শুনে রোগশয্যাতে স্বামীর হাত দুটো চেপে ধরেছিলেন। কিন্তু বাঁচাতে পারলেন না। এখনও বেড়াল ডাক শুনলেই অজানা ভয়ে সুকুমারীর শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে। দাঁড়কাকের ডাক শোনবার পর থেকেই সুকুমারীকে অজানিত আশঙ্কায় পেয়ে বসেছিল। সংসারের মঙ্গলকামনা তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় জিনিস। কতকগুলো কাককে শাস্তি দেবার জন্য সুকুমারীর সাধের বকুল গাছটা চলে যাচ্ছে; আর তার সঙ্গে চলে যাচ্ছে এবাড়ীর বুড়ীর বেশ-কিছুটা সত্তা। কে বিশ্বাস করবে ঐ বকুল গাছটার জন্যে একটা রক্ত-মাংসের মানুষ আজ তিন দিন ধরে গোপনে অশ্রুজল ফেলছেন? কেউ বুঝবে না। বুঝতে চাইবে না। বাইরের সবকিছু এখন সুকুমারীর দৃষ্টিপথ থেকে সরে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে দৃষ্টির অন্তরালে-আর ঠিক সেই সঙ্গেই আজ তিন দিন সুকুমারীর আর একটি দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠেছে। মানস দৃষ্টি কিন্তু অন্তর্দাহকে ত চাপা দেবার কোন উপায় নেই।

শ্বশুর বাড়ীর চারিদিক ছিল জঙ্গলে ঘেরা। দিনের বেলা জঙ্গলের দিকে তাকালে গাটা কেমন যেন ছম ছম করত। সুকুমারীর বয়স তখন কত হবে? বড়জোর দশ বছর। এখনও সুকুমারীর সব কথা মনে আছে। পায়ের মল পরে লালপেড়ে খাট-শাড়ীটা পরে বকুল ফুল তুলছিলেন—আর জমিদার বাড়ীতে চিকের আড়াল থেকে দেখা 'কৃষ্ণপালা'র একটা গানের কলি তুলছিলেন গুন গুন করে। হঠাৎ সুকুমারীর পিসীমা তাঁকে ধরে এনেছিলেন অন্দরে। কিছুক্ষণ পরে তাঁকে যেতে হয়েছিল বৈঠকখানায়। শ্যামলালবাবুর মেয়ে দেখেই পছন্দ হ'ল। আড়তদার মানুষ, রাত থাকতেই গঞ্জে বেরিয়েছিলেন—গিন্নীর গঞ্জনার কথা সারাটা রাস্তা তাঁর বুকে বিঁধেছিল। তাই অনেক দিনের কথা-দেওয়া মেয়েটিকে সরাসরি ভোরেই দেখতে এসেছিলেন। সেই সুন্দর ভোরবেলার কথা সুকুমারীর এখনও স্পষ্ট মনে আছে। প্রজাপতিগুলো ক'দিন থেকেই তাঁর মাথায় বেশী বসেছিল, সখিদের তাই নিয়ে কি রসিকতা! শ্যামলালবাবু পছন্দ করে চলে গেলেন, তার পর সখিরা ঘিরে ধরেছিল। সখিদের আনন্দ-ভরা মুখগুলো এখনও সুকুমারীর মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। চোখ বুজলেই এখনও সে-সব হারিয়ে-যাওয়া মুখ একে একে এসে ভিড় করে। সেই দিনগুলোই শুধু তাঁর কাছে ধরা আছে। মানুষগুলোর কোন হদিস নেই।

দাঁড়কাকগুলো একটু আগে এক পশলা বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। উড়তে পারছে না। কেবল ডানা-ঝট-পটানি শোনা যাচ্ছে মিত্তিরদের বাড়ীর ছাদ থেকে। মজুররা বকুল গাছটাকে আষ্টে-পিষ্টে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলেছে। এইবার গাছটা দক্ষিণমুখো ফাঁকা জায়গাটাতে হুড়মুড় করে পড়বে। গাছটাকে আর একবার শেষ বারের মত দেখবার ইচ্ছা হ'ল সুকুমারীর। ঐ গাছের একটা ডালে দোলা খাটান থাকত। দড়ির ঘষটানি লেগে ডালে দুটো দাগ পড়েছিল। একটু তফাতে তফাতে দুটি দাগ। ডালটাকে মনে হ'ত নধর সুপুষ্ট হাত। মাঝে মাঝে দড়ির দাগগুলোকে সুকুমারীর মনে হ'ত অনেক কিছু। বকুল গাছ যেন সুপুষ্ট হাতে দু'গাছি বালা পরেছে। মনে পড়ে সুকুমারীর। একবার স্বামী কাপড়-চোপড় টাঙ্গাবার জন্য একটা দড়ি খাটিয়ে দিয়েছিলেন। হুকের মাথাটা বকুলগাছের বুকে যখন গিয়ে বিঁধেছিল তখন থেকে একটা রস সারাদিন চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়েছিল। সুকুমারীর মনে হয়েছিল গাছ যেন কাঁদছে। গাছেরই চোখের জল যেন চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে।

আশীর্বাদ হ'ল। গায়ে-হলুদের পর্ব্বও চুকে গেল। রাত্রিতে ইংরেজী বাজনা বাজিয়ে বড় বড় মশাল জ্বালিয়ে ওরা মানে বর-

যাত্রীরা বজরা থেকে নামলেন। দশ বছরের সুকুমারীর চোখে তখন রাজ্যের ঘুম নেমে এসেছে। বড় কাপড়টা পরে যেন বেশী জবুথবু হয়ে গিয়েছিলেন। সারাটা মুখ চন্দনের ফোঁটায় একাকার হয়ে গিয়েছিল। বৃন্দাদির কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

তার পর মশালের তীব্র আলো, শাখের আওয়াজ আর ইংরেজী বাজনার মধ্যে ঘুমঘুম চোখে সুকুমারী জানলার ধারে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রখর আলোতে প্রথমেই বাড়ীর বকুল গাছটাকে দেখতে পেয়েছিলেন। গাছের নীচে কে যেন সাদা চাদর একটা বিছিয়ে রেখেছিল। বরযাত্রীর পায়ে পায়ে দলিত হয়ে ফুলের গন্ধ, মশালের তেলপোড়া গন্ধ, আতসবাজীর গন্ধ সব মিলিয়ে এক হয়ে-গিয়েছিল। পাল্কী-বেয়ারারা একসুরে গান গেয়ে চলেছিল। বৃন্দাদি বলেছিলেন, ঐ পাল্কীতেই নাকি সুকুমারীর বর আছে। তার পর সবাই একে একে চলে গিয়েছিল বাগানবাড়ীতে। অন্ধকারের জালটা আবার ঘিরেছিল জায়গাটাকে। আবার জোনাকীর দল গাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখা দিয়েছিল। টিপ টিপ করে জ্বলেছিল। বরযাত্রীরা যাবার সময় গ্রামের কুকুরগুলো পিছনে পিছনে খানিকটা এগিয়ে এসেছিল, শেষে তারাও এদিক-ওদিকে মিলিয়ে গিয়েছিল। বরযাত্রীদের ছায়াগুলো দীঘির শান্ত-জলে ভেসে উঠেছিল, কিছু পরে সব যখন চুপচাপ, ঠিক তখন দীঘির কাল জলটাকে যেন কাল মসৃণ বিরাট একটা সরীসৃপ বলে মনে হয়েছিল।

বকুল গাছটা সশব্দে পড়ল। সুকুমারী হঠাৎ চমকে উঠলেন। আওয়াজ শুনে দাঁড়কাকগুলো আর একবার তীব্রস্বরে ডেকে উঠল। কা—কা—কা—।

শেষে কুশণ্ডিকার পাঠ চুকল।

পাল্কী করে সুকুমারী এলেন শ্বশুরবাড়ী। স্বামী সারাটা রাস্তায় মাত্র দুটি কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন—তার পর চুপচাপ। আর সুকুমারীর মন কেবলই কেঁদে উঠেছিল—বৃন্দাদির কথা ভেবে, সেই কমলার কথা ভেবে, ছোট ভাই রাখালের কথা ভেবে, বাড়ীর বুদি গাইটার কথাও মনে পড়েছিল। আর মনে পড়েছিল দীঘির কথা, বাঁশবাগানের ফাঁক দিয়ে যে চাঁদটা উঠতো তার কথা। খুকীর মাকে সঙ্গে দিয়েছিলেন সুকুমারীর মা। পাল্কীটা যখন মাঠের মধ্যে অশ্বত্থ তলায় রাখা ছিল—বেয়ারাগুলো দা-কাটা তামাকে মৌজ করে সুখে টান দিচ্ছিল—ঠিক তখন খুকীর মা এসেছিল সুকুমারীর কাছে। কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন সুকুমারী। এতদিন পরেও খুকীর মার মুখটা হুবহু মনে পড়ল সুকুমারীর। শেষে পাল্কী এসে দাঁড়াল শ্বশুরবাড়ীর দরজায়। শাশুড়ি ত বউ দেখে হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিলেন, তাই দেখে সুকুমারী কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে-গিয়েছিলেন। কিন্তু মানুষটাকে চিনতে একটুও দেরী হয় নি সুকুমারীর। পাল্কী থেকে নামিয়ে সুকুমারীকে চুমু খেয়েছিলেন, আর সুকুমারীর মনে হয়েছিল যেন নিজের মার বুকেই ফিরে এসেছেন। তার পর ঠিক বকুল গাছটার নীচে এসেছিলেন। কি অদ্ভুত মিল। বাপের বাড়ীর গাছটার সঙ্গে এখানকার গাছটার কি সাদৃশ্য! সুকুমারীর সেদিন মনে হয়েছিল বাপের বাড়ীর গাঁটাকে কে যেন শ্বশুরবাড়ীতে এনে বসিয়ে দিয়েছে। দুধে-আলতার থালায় দাঁড়িয়ে ছিলেন সুকুমারী, আর টুপটাপ দু'একটা ফুল মাথায় ঝরে পড়েছিল। সেদিন থেকেই বকুল গাছ সুকুমারীর সত্তার সঙ্গে এক হয়ে আছে। সে কি আজকের কথা!

দু'দিন পরে কিন্তু সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল। তাঁর স্বামী পড়বার জন্য শহরে চলে গেলেন। ননদ কুসুমকুমারীকে সব চেয়ে ভাল লেগেছিল সুকুমারীর। কোথায় কুসুমকুমারী চলে গেলেন? কুসুমকুমারীর কথা ভাবতে ভাবতে যুগপৎ হাসি আর অশ্রু একসঙ্গে দেখা দিল সুকুমারীর মুখে আর চোখে। রান্না-বান্না খেলা, দশ-পঁচিশ খেলা, অষ্টা-কষ্টি খেলা, কড়ি-কড়ি খেলা হ'ত। ঐ ফোঁপরা বকুল গাছটার নীচে সান বাঁধানো চাতালে বসে দুই ননদ-ভাজে কত সুখ-দুঃখের কথাই না হয়েছে। কে তার হিসাব রাখে? এসব ভাবতে ভাবতে এক সময় সুকুমারী নিজের মনেই হেসে উঠলেন। কুসুমকুমারীর অতীত দিনের কথা ভেবে তাঁর মুখে আজ হাসি আসছে। খুব দস্যি মেয়ে ছিলেন কুসুম। ঘুমন্ত শাশুড়ীর আঁচল থেকে চাবি নিয়ে ভাঁড়ারঘর খুলত কুসুমকুমারী। বয়ামে থরে থরে আচার সাজানো থাকত। সেই আচার এক খাবলা তুলে এনে চাবিটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে আসতেন কুসুমকুমারী। কিন্তু এত হাসি, এত আনন্দের মধ্যেও সুকুমারীর মনটা কেমন যেন উদাস হয়ে যেত। বাপের বাড়ীর জন্তে প্রাণটা আনচান করে উঠত। এখনকার মেয়েদের মত স্বাধীনতা ছিল না। কাপড় শুকতে দেবার ছল করে ছাদে এসে দাঁড়াতেন সুকুমারী। বাপের বাড়ীর দিকের আকাশটার মাঝে কি খুঁজে পেতেন তিনিই জানেন, অনিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন। মাঝে মাঝে পথ-চলতি মানুষ-গুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন। যদি বাপের বাড়ীর কোন পরিচিত মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। রাতে কুসুমের গলা জড়িয়ে এক বিছানায় শুতেন, কুসুমের খুনসুড়ির মাত্রা মাঝে মাঝে ছাড়িয়ে যেত। তবু কুসুমকে মনে হ'ত আপন মায়ের পেটের বোন।

পিঠের শিরদাঁড়াতে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে সুকুমারীর। চোখ দুটো জ্বলে যাচ্ছে। গলায় যেন মরুভূমির তৃষ্ণা। পাথরের বাটি থেকে ঢক ঢক করে জল খেলেন সুকুমারী। তার পর? একদিন বাবা নিতে এলেন সুকুমারীকে। বাপের বাড়ী যাবার আগের দিন সুকুমারীর ঘুম আসে নি। মনটা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, সে কি উত্তেজনা! এ উত্তেজনা সব মেয়েরা বোঝে। একান্ত স্বাভাবিক। কুসুমের বিয়ে হয়ে গেল সেই কোন দূর দেশে। তার পর একদিন সুকুমারী নিজের চেহারাটা ভাল করে খুঁটিয়ে খুটিয়ে দেখলেন। নিজের শরীরটাকেই শুধু দেখতে পেলেন না। দেখতে পেলেন বিশ্বের অনেক কিছু অবিদিত জিনিস। শুধু কি শরীরটারই পরিবর্তন হয়েছিল? আর মন? মনের গহনে স্তরে

ভরে ভেসে উঠেছিল নতুন সুরের ছন্দ। কোকিলের স্বরকে মনে হত কত মিষ্টি। নিজের গলার স্বরটা নিজের বলেই মনে হ'ত না নিজের কাছে। গা-হাত-পাগুলো কত ভারি ভারি হয়ে গেল। চলনে হারিয়ে গেল পূর্ব্বের সহজ স্বাচ্ছন্দ্য। একটু রসিকতার কথা শুনলে মনে হ'ত রাজ্যের রক্ত তার মুখে এসে জমা হয়েছে। স্বাস্থ্যমাপি সুরু করেছে। ভাঙা তোবড়ানো গালে, মাথার ছোট ছোট চুলে হাত বুলিয়ে দেখলেন সুকুমারী। হ্যাঁ, চুল ছিল বটে সুকুমারীর! পাড়ার মেয়েরা চুলের কথা হলে সুকুমারীর চুলের কথা এনে ফেলতেন। নিজেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখার আর শেষ ছিল না। কোন অঙ্গকে বাদ দেবেন? কোন অঙ্গের সাদর আহ্বান উপেক্ষা করবেন? মাথায় চিরুনী, নাকে নলক, গলায় হেলে হার, কোমরে গোট, হাতে চুর-চুড়ি, বাউটি, তাগা, বাজু, কানে গোকরি মাকড়ি নয়ত ইহুদী মাকড়ি। এ সব পরে কি সুন্দর দেখাত সুকুমারীকে। বৌমাদের সেই যৌবন-কালের মধ্যে এনে বিচার করেন সুকুমারী। রোগ লেগেই আছে। আজ এ-হাসপাতাল কাল সে-হাসপাতাল। অথচ পাস করা বৌমাদের গর্ব্বে সুকুমারীর বুক ফুলে ওঠে। বৌমারা গড় গড় করে মণিঅর্ডার পড়তে পারে, মোটা মোটা বই পড়িয়ে শোনায়। কিন্তু বৌমাদের স্বাস্থ্য না থাকার জন্য সুকুমারী বিষণ্ণ হয়ে পড়েন। পৃথিবীর সব কিছু একটু একটু করে ভাল লাগতে লাগল সুকুমারীর কাছে। সেই মানুষটার জন্যে মনটা আনচান করে উঠত। বিকালে চুল বাঁধার পর মা যখন সিঁথিতে, হাতের চুড়িতে সিন্দুর পরিয়ে দিতেন, মাকে প্রণাম সেরে সুকুমারী কেমন যেন উদাস হয়ে পড়তেন। এবার কলকাতার দিকের যে আকাশ সেই আকাশটার দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন। কোথায় কোন দূরে স্বামী আছেন তাঁর কথা মনে পড়ত। সুকুমারীর মনটা ঘুরে-ফিরে বেড়াত নাম-না-জানা শহরের আঁকা-বাঁকা রাস্তায়। কল্পনার অঞ্জন চোখে পরে স্বামীর ধ্যান করতেন। বিয়ের পর মানুষটাকে ক'দিনই বা দেখেছিলেন, কেবল পড়াশুনা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। স্বামীর মুখের প্রতিটি রেখা তবু সুকুমারীর অচেনা লাগত না। মেয়েরা একবার যে মুখ মন-প্রাণ দিয়ে দেখে নেয় সে মুখ তারা কোন দিন ভোলে না।

তার পর কোন এক বকুল-ঝরা চাঁদনী রাতে স্বামী ফিরে এলেন। দুটো পাস করা স্বামী। মনটা একটু দুলে উঠল সুকুমারীর। কুসুম তখন ছিলেন। একটা বকুল ফুলের মালা গেঁথেছিলেন নিজের মনের অজান্তে। তাই নিয়ে কুসুমের সে কি রসিকতা "ওলো ভেতরে ভেতরে এত!" মালাটা কেড়ে কুসুম চেঁচাতে যাবেন ঠিক তখনই কুসুমের মুখটা চেপে ধরেছিলেন সুকুমারী। খুব প্রাণখোলা মেয়ে ছিলেন কুসুম। প্রথম প্রথম কুসুমের স্বামী নাকি কুসুমকে নিয়ে ঘর করতেন না। এ খবর সবাই জানত, কিন্তু কুসুম জেনেও জানতে দিত না। ভারি দুঃখ হ'ত কুসুমের জন্য। বেচারীকে বছরের বেশী সময় বাপের বাড়ীতেই থাকতে হ'ত। কিন্তু শেষে একদিন সব ঠিক হয়ে গেল। কুসুমের জীবনে আবার শান্তি ফিরে এসেছিল।

ডালপালাগুলো কাটা হচ্ছে। এবার ও গুঁড়িগুলো বোঝাই হবে গাড়ীতে। তার পর চলে যাবে আড়তে। ওখানে টুকরো টুকরো করে গাছটাকে কাটা হবে। শেষে আম, জাম, কাঁঠালের স্তূপের মধ্যে বকুল গাছটা তার আপন অস্তিত্ব হারিয়ে মিশে যাবে। খদ্দের এসে চাইবে। দোকানী ওজন করে দেবে। সেই কাঠ কোন গৃহস্থ বাড়ীতে এসে পড়বে। উনুনের মধ্যে সেই বকুল কাঠ এগিয়ে দেবে বাড়ীর কোন বধূ। রান্নাঘরটা হয়ত কিছুক্ষণের জন্য ধোঁয়ায় ভরে উঠবে। তখন কুলবধূ হয়ত চোখ মুছবেন। এদিকে সুকুমারী সম্পূর্ণ অদৃষ্ট ধোঁয়াকে কেন্দ্র করে চোখের জল ফেলবেন। হাঁপিয়ে উঠবেন। প্রাণটা ছটফট করে বেরিয়ে আসতে চাইবে তাঁর। একবার সুকুমারী ভাবলেন ওদের বারণ করে দেবেন। হাতও তুললেন কিন্তু অবশ হাত দুটো পাশে পড়ে গেল। বিড় বিড় করে মজুরদের ডাকলেন কিন্তু কেউ শুনতে পেল না। বাতাসের সন সন ছাড়া আর কিছু স্বর ভেসে এল না।

মজুররা চলে গেছে। তাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে। দাঁড়-কাকগুলো একভাবে ঝিমিয়ে চলেছে, নিশ্চপ হয়ে বসে আছে। এবার কোথা থেকে শোনা যাচ্ছে দু' একটা ঘুঘুর ডাক। ছাদের মাথা দিয়ে একটা কুটুম পাখী ডেকে গেল। ঐ ডাকটা শুনে সুকুমারী আর একবার সচকিত হয়ে উঠলেন। ঐ ডাকটা সুকুমারীর বড় প্রিয় ছিল। ঐ ডাকটা যেন সুকুমারীকে স্বামীর আগমন বার্ত্তা শুনিয়ে যেত। তাড়াতাড়ি আলতা পরতেন সুকুমারী। গামছা দিয়ে ঘষে ঘষে মুখটা পরিষ্কার করতেন। কখন উনি আসেন। মহালেই উনি থাকতেন কিন্তু সুকুমারীর মনটা ছায়ার মত স্বামীর সঙ্গী হয়ে থাকত। আর ও পাশের আম চারাটার ডালে যে পাখীটা ডাকছে, ঐ পাখীটাকে সুকুমারী এখনও দুষ্টু পাখী বলেই জানেন। দুষ্টু নয়ত কি! পাখীটা এখনও বলে খোকা হউক। তখনও ঐ এক সুরে বলত খোকা হউক। কতদিনকার কথা সুকুমারীর, সে সব কথা এখনও ভুলতে পারেন নি। আজও তাঁর তোবড়ান ভাঙা গালে লজ্জার একটা ঝিলিক খেলে গেল। স্বামী তখন মহাল থেকে ফিরতেন—তখন ঐ আজকের পাখির মত সেদিনের পাখিটাও ডাকত—খোকা হউক। আর তাই শুনে উনি বলতেন, "শুনছ পাখীটা কি বলছে।" কথা শুনতে খুবই ভাল লাগত সুকুমারীর, তবু লজ্জায় মুখটা রাঙা হয়ে উঠত। দ্রুত পা ফেলে চলে যেতেন আড়ালে কিন্তু মনটা বার বার স্বামীর ঐ কথাগুলো শুনতে চাইত। কোথায় গেল সে সব দিন। আর এখন?

পাশের ঘরে বৌমারা অনুরোধের আসর শুনছে। কে একজন গান গাইছে, তার না আছে মাথা না আছে মুণ্ডু। হ্যাঁ, গান শুনেছিলেন বটে একবার, অনেক দিন আগে; ঘুম-ভাঙা শ্রাবণ মাসের দুপুরে এক ফকির গান গেয়েছিল। সে গান সুকুমারীর

হৃদয়ে গাঁথা আছে। যেমন গলা তেমন সুর। ওঘরে সেলাই-কল চলছে। ঝক ঝক করে শব্দ হচ্ছে। সেজ বৌমা গান গাইতে গাইতে সেলাই করছে। সূচটা না হাতে পড়ে, বার বার এই আশঙ্কায় সুকুমারী অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। সব ভাল লাগে সুকুমারীর। তাঁদের সময় মেয়েদের কাছে এই রকম স্বাধীনতা স্বপ্ন বলে মনে হ'ত। আহা! বৌমাদের সুখ কেউ যেন না কেড়ে নেয়. ঈশ্বরের কাছে বার বার প্রার্থনা জানান সুকুমারী। তবু সুকুমারীকে ভাবিয়ে তোলে, ভাবতে হয় বৈকি! বৌমাদের সব স্বচ্ছন্দ আড়ালে একটা ফাঁক আছে বলে বুঝতে পারেন। তাই সুকুমারীর মনে একটা চাপা ক্ষোভ আছে। মনস্তাপটাকে চাপা দিয়ে রাখেন। সংসারে পাঁচ জনকে নিয়ে মানিয়ে চলতে গেলে সব কথা জানানো যায় না। নিজের মনেই পুষে রাখেন। এত যত্ন, এত আদর, তবু সুকুমারীর চোখে ফাঁকি ধরা পড়ে। সব থেকেও যেন পর হয়ে আছেন। সব থেকেও যেন কিছু নেই। ঝোপরা বকুল গাছটাকে চারিদিকের সতেজ গাছগুলি ঘিরে রেখে-ছিল। কিন্তু ঐ ঘিরে রাখাই সার। ঝোপরা গাছটার সঙ্গে বেশ একটা সাদৃশ্য খুঁজে পান সুকুমারী। অত তেজী গাছটার হঠাৎ কি হ'ল? একে একে পাতাগুলি ঝরে গেল। অমন গুড়ি, ডাল-পালা সব যেন শুকিয়ে খসখসে হয়ে গেল। সুকুমারীর নিজের লোল চামড়াগুলির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সারাটা গায়ে নিজের হাতটা বুলিয়ে দেখলেন। কত চিক্কণ ছিল চামড়ার ওপরটা। মাছি পিছলে পড়ত যেন। বলি রেখাযুক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি দেখে বেশ বুঝলেন এবার তাঁর যাবার সময় হয়ে এসেছে। কোথায় গেল চামড়ার সে তেল-তেল ভাব—বকুল গাছটাও সে মসৃণ চেহারাটা হারিয়ে ফেলেছিল। দু'জনের সঙ্গে কত মিল!

সন্ধ্যা থেকেই জ্বর বাড়ল সুকুমারীর, প্রবল জ্বর। বৌমারা মাথার শিয়রে বাতাস করছে—কেউ পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। ছেলেরা মুখভার করে ঘোরাফেরা করছে। ওদিকে সুকুমারী জ্বরের ঘোরে বকে চলেছেন। দাঁড়কাকগুলোকে প্রলাপের ঘোরে তাড়াচ্ছেন। রাম-রাম-রাম বলে চেঁচিয়ে উঠছেন। আর দাঁড়-কাকগুলোও যেন মজা পেয়েছে। সবাই মিলে মিত্তিরদের ছাদে যেন সভা বসিয়েছে। সন্ধ্যা বেলা যখন নীড়ের পাখীরা সব নীড়ে ফিরে এসেছে শুধু গৃহহারা উদ্বাস্তু দাঁড়কাকগুলোর মুখে কা-কা ধ্বনির বিরাম নেই।

—কে কুসুম এলি ভাই, বস তোর ছেলেটাকে ঐ দোলনায় বসিয়ে দে, কি, হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে? বুঝতে পারলি না—বকুল গাছের দোলনার কথা বলছি যে—

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

—কে নিশিকান্ত, দেখত বাবা, হুলো বেড়ালটা কেন অলুক্ষণে ডাক ডাকছে, তাড়িয়ে দিয়ে আয় না বাবা, তোর বাবার জন্য কবরেজের কাছ থেকে অষুধটাও অমনি নিয়ে আয় বাবা—

সুকুমারীর চিন্তার ঢেউ আজ অনেক বছর পরে স্মৃতির সৈকতে এসে আছড়ে পড়তে চাইছে, বেশ ছিলেন। কোন কথা বলতেন না। ভুল ভুল করে তাকিয়ে থাকতেন। নির্ব্বিকার হয়ে পৃথিবীর শেষ কটা দিন কাটিয়ে দিচ্ছিলেন। আসন্ন মৃত্যুকে বধূ রূপে ধ্যান করছিলেন। বাড়ীর লোকেরা সুকুমারীকে শুধু দেখে-ছেন, বুঝতে পারেন নি তাঁর মর্ম্মব্যথাকে। কি ব্যথা তিনি মনে পুষে রেখেছেন। সবাই দেখতেন সুকুমারী ঘুম থেকে উঠলেন—লাঠি ঠুক্‌ঠুক করতে করতে দাঁড়ালেন, কাপড়টা ছাড়লেন, তার পর মুখে চোখে জল দিয়ে, মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে ইষ্ট দেবতার জপে বসলেন। তখন তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে আসে। হুঁস থাকে না যদি না নাতির দল তাঁকে ডাকে। ইশারা করে তাঁদের চুপ করতে বলে খেই হারিয়ে-যাওয়া মন্ত্রটা আবার হয়ত জপ করা সুরু করেন—কতক্ষণ ছোট নাতিরা বসে থাকবে? আবার তারা ডাকে—"ঠাকুমা, দিবি না?"

চোখ খুলতেই হয় সুকুমারীকে। নাতি ত নয়—একসঙ্গে অনেকগুলি শিশু-দেবতাকে সামনে বসে থাকতে দেখেন সুকুমারী। এক একটা মিষ্টি তুলে দিতে হয় হাতে। নাতিদের মধ্যে পলটনটাই সুকুমারীর 'নেওটা' বেশী। সে আধখানা সন্দেশ সুকুমারীর মুখে তুলে দিয়ে বাঁহাতে তাঁর মাথাটা ধরে থাকে। ঠাকুমা ত নয়—যেন এক বছরের কচি শিশু। খেতেই হয় সুকুমারীকে। পলটন ত পলটন। কুরুক্ষেত্র বাধায়। কেঁদেকেটে সব ভেস্তে দেয়। সুকুমারীর অবিরত চর্চনরত মুখটা দেখে পলটন হাসে। সুকুমারী নাকি দিনরাত্রি পাকলে পাকলে সন্দেশ খান। না হলে মুখ নড়বে কেন? সুকুমারী পলটনের সঙ্গে প্রাণের ঝগড়া করেন—'তোর কচি বোনটা দিনরাত কি খায় শুনি দাদু?' তখন মিটমাট হয়ে যায়। রোজকার ঘটনা। সবাই জানে। তার পর অন্যান্য নাতিরা হৈ-হল্লা করে চলে যায়। শুধু থাকে পলটন। তার কাঁধে হাত রেখে সুকুমারী লাঠি ঠুকতে ঠুকতে ঝোপরা বকুল গাছটার নীচে এসে হয়ত বসে রইলেন। ঝাপসা চোখে চারিদিকটা ভাল করে দেখলেন। একটা পুঁই মাচার কথা প্রায়ই মনে পড়ে। কুসুমের সাধের পুঁইগাছ ছিল। সুকুমারীর মনে হয় যেন থোকা থোকা পুঁই ফল মাচাটাকে ভরিয়ে ফেলেছে। ঐ ফল নিয়ে খেলা হ'ত। হাতের তালুটা পুঁই ফলের রসে ছোপ ধরত। তবু ভাল লাগত। গাছটার নীচে এসে বসলেন। ঝোপরা বকুল গাছটা তখন যেন বুড়ীর সান্নিধ্য পেয়ে সজাগ হয়ে উঠল। মরা ডালগুলো যেন নড়ে-চড়ে উঠল। গুঁড়ির গায়ে বিরাট বিরাট ফোকর। শূন্য ফোকরে হাওয়া এসে লাগল—ঠিক তখনই সুকুমারীর মনে হয় যেন গাছ কথা কইতে চাইছে। গাছের ভাষায় কথা বলে বকুল গাছটা; সে ভাষাটা বুঝিয়ে দেয় আশে-পাশের সবুজ গাছের দল। তাঁর নাতিরা যেমন তাকে ঘিরে থাকে, ভাষা যোগায়। ঠিক তেমনি বকুল গাছটাও ভাষা পায় কচি কচি গাছেদের কাছে। পলটন তখন খেলা করে, ফড়িং ধরে, আমচারাটার গায়ে, তার কচি কচি

পাতায় ফু দেয়। ফু দিয়ে দুলিয়ে দেয়। সুকুমারী নাতির কাণ্ড দেখেন আর মনে মনে হাসেন, আমচারাটা বড় হবে, পলটন ওকে চিনবে, বুঝবে। ওর সঙ্গে আমচারাটার সত্তার যখন পূর্ণ মিল হবে তখন ও গাছ থাকবে না। গাছ আর মানুষ অভিন্ন হয়ে বেঁচে থাকবে।

বৃষ্টি যদি পড়ল—চুপচাপ ঘরে বসে রইলেন সুকুমারী। পলটন তখন শুধু ঠাকুমার পাকা চুল তুলতে তুলতে গল্প করে।

—ঠাকুমা বকুলগাছও যেমন ন্যাড়া তুমিও তেমনি—না ঠাকুমা?

—হ্যাঁরে দাদু, এই মাথায় কত চুল ছিল জানিস? গাছটারও পাতা ছিল বুঝলি।

এমনি কত গল্প হয় নাতিতে-ঠাকুমাতে। ঠাকুমা নাতিকে গোপন করে মানসাঙ্ক মেলাবার চেষ্টা করেন। বকুল গাছটার সঙ্গে তাঁর কতটা মিল হয়েছে! অঙ্কের হিসাব মিললে তাঁর মুখটা হাসিতে ভরে ওঠে।

ডাক্তারবাবু মুখ ভার করে চলে গেলেন। আর সুকুমারীর বাঁচবার আশা নেই। কুলপুরোহিত জোরে জোরে গীতাপাঠ করছেন। একটা তুলসী চারা রাখা হয়েছে মাথার শিয়রে। সব নাতিরা ভিজে ভিজে চোখে ঠাকুমার দিকে তাকিয়ে দেখছে। শুধু জানলার ধারে পলটন একা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। রোজকার সন্ধ্যা নয়—আজ আর ঠাকুমা নাতিদের ঘিরে গল্প বলবেন না। আজ ঠাকুমা অন্য জগতের চিন্তায় মগ্ন। নাতিরা কেউ বুঝতে চাইছে না। তারা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে, কখন রাজপুত্রদের গল্প সুরু হবে। আবার ভোর হবে—আবার সব হবে! আর ওদিকে? চারাগাছগুলো কি ভাবছে? ফোঁপরা বকুলগাছটা হয়ত সকালবেলা তাদের মধ্যে ফিরে আসবে। তাদের মাঝখানে এসে আবার দাঁড়িয়ে থাকবে। বকুল গাছটার ফোকরে হাওয়া ঢুকে সন সন করে আওয়াজ হবে। বকুল গাছ যেন নাতি, গাছেদের আবার গল্প বলবে।

শীত শীত করছিল ক'দিন ধরে। রাতটাকে কত দীর্ঘই না মনে হ'ত। শৃগালের ডাক, চৌকিদারের হাঁক, সরীসৃপের বুকে-হেঁটে চলা, ঘাটে বৌ-ঝিদের বাসন মাজার আওয়াজ—আর বুঝতে পারছিলেন না সুকুমারী। জ্বরটা রাত্রিতে বাড়ত। গভীর রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ত তখন লাঠি ঠুক ঠুক করে বকুল গাছের নীচে এসে বসতেন সুকুমারী। গাছটাকে কাটবার আদেশ তিনিই দিয়েছিলেন, গাছের গায়ে হাত বুলিয়ে যেন সেই অপরাধই স্বীকার করতে আসতেন। রাতজাগা অত্যাচার, অন্তর্দাহ সব সহ্য করেও সুকুমারী টিকে ছিলেন। আজ বকুল গাছটার শেষ চিহ্নটুকু যখন মিলিয়ে গেল তখন যেন একেবারে ভেঙে পড়লেন।

সুকুমারী জ্বরের ঘোরে বকে চললেন—

—আঃ! কোথা থেকে এত সুন্দর গন্ধ আসছে গা, বকুল গন্ধ না কুসুম, দে দে আমাকে···

দু' হাত দিয়ে ফুল নেবার জন্য হাত তুলতে গেলেন সুকুমারী। অদৃশ্য কুসুমের হাত থেকে। হাত দুটো সজোরে বিছানায় পড়ে গেল। বিড় বিড় করে শুধু বললেন—

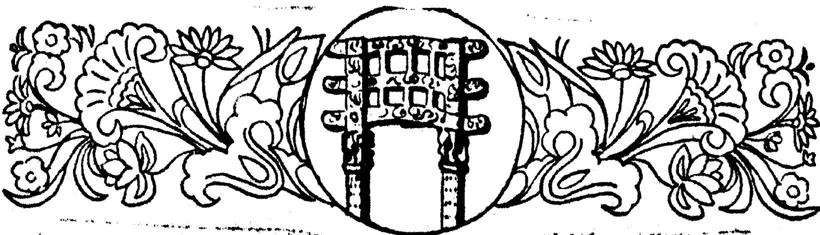
—একটা রেকাবীতে কিছু ফুল ওঁর ঘরে রেখে দিয়ে আয় না ভাই—মানুষটা ফুল ভালবাসে—

দু' বার রাম, রাম করলেন, তার পর—

বকুল গন্ধের যেন ঘ্রাণ নিলেন বুক ভরে। মুখটা সুকুমারীর স্বর্গীয় হাসিতে ভরে গেল। বৌমারা সবাই একসঙ্গে শাশুড়ির দিকে ঝুঁকে পড়ে পায়ের ধূলো মাথায় নিল। ঠিক সেই সময় একটা বন্দুক ছোড়ার শব্দ হ'ল। ভোর হয়ে গেছে। মিত্তিরদের ছেলে বন্দুক দিয়ে একটা দাঁড়কাক মেরেছেন। আর বাকী কাক-গুলো কিছুক্ষণ শূন্য বকুল গাছটার মাথায় চক্রাকারে ঘুরলো। তার পর চলে গেল একে একে। আর হয়ত ফিরবে না।

নাতিরা ঘুম-ঘুম চোখে দেখল—খাট তৈরী, অনেক লোকে বাড়ী ভরে গেছে। ফিস ফিস কথা হচ্ছে। মেয়েরা কাঁদছে, পুরুষেরাও কাঁদছে, সব দেখাদেখি নাতিরাও কাঁদছে। কেন কাঁদছে তারা বোধ হয় এখনও বুঝতে পারে নি। কাঁদতে হয় তাই কাঁদছে।

শুধু পলটন একা ঢুলু ঢুলু চোখে নেমে এল উঠোনে। চারা আমগাছটার কাছে এসে হাঁটুভেঙে বসল। ফিস ফিস করে আম-চারাটার সঙ্গে ঘুমন্ত পলটন কি কথা বলল সেই জানে। আম-চারাটার গায়ে ফু দিল। দুলতে লাগল আমচারাটা। একবার হাতটা বাড়িয়ে পলটন যেন কাকে খুঁজলো। হয়ত ঠাকুমাকে নয়ত বকুল গাছটাকে। তার পর আচমকা তার ঘুম ভেঙে গেল। দেখল বকুল গাছটা নেই—সেই শূন্যস্থান দিয়ে আকাশটার অনেকটা দেখা গেল—সেদিকে হাঁ করে চেয়ে রইল পলটন।



জটার জালে

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

১৬

আগের দিন বৈকালেই দেখেছিলাম যে, অনেক যাত্রীর বেশ বড় একটি দল কেদারক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হ'ল। পরদিন পথে বের হয়ে দেখি যে, দলে দলে আরও যাত্রী আসছেন।

মন্দির বন্ধ হবার তারিখ এগিয়ে আসছে বলেই যাত্রীর ভিড় বাড়ছে। প্রতি বৎসরই এমনই হয়ে থাকে। গোড়ার দিকে যাত্রী আসে বন্যার বেগে, মাঝে থিতিয়ে যায়, শেষের দিকে আবার জোয়ার। সেই জোয়ারেরই আভাস পেলাম আমরা আমাদের ফিরতি পথে।

কেবল ইঙ্গিত নয়, দীপ্তিও। অনেকগুলি অচেনা মুখ পিছনে ফেলে আসবার পর হঠাৎ দেখি দুটি চেনা মুখ। সেই মৃন্ময়ী ও তাঁর স্বামীর দেখা পেলাম রামোয়াড়ার কাছাকাছি আসবার পর।

মৃন্ময়ীর ঈষৎ পাণ্ডুর মুখখানিও দেখলাম উৎফুল্ল। দল ভাঙা-ভাঙি, দৈহিক অসামর্থ্য এবং পরে শক্ত জ্বরের মত প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করেও তিনি যে শেষ পর্যন্ত শ্রীকেদারনাথের চরণতলে গিয়ে পৌঁছতে পারছেন সেইজন্যই অত উল্লাস মৃন্ময়ীর।

খানিকটা তার উছলে পড়ল আমাদের সঙ্গে তাঁদের দেখা হতেই। মৃন্ময়ী প্রায় আবদারের সুরেই আমাকে বললেন, একটু ধীরে ধীরে চলবেন রায় মশায়—যাতে আমরাও আপনাদের সাথী হতে পারি। কেদার থেকে আজই আমরা রওনা হয়ে আসব।

কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও ধীরে ধীরে চলতে পারি কৈ! এখন উপর থেকে নীচের দিকে গতি আমাদের। এ যেন ভাটার টানে তর তর করে এগিয়ে চলা। সেই রামোয়াড়া ও সেই গৌরীকুণ্ড পার হয়ে গেলাম। চেনা জায়গা বলেই আমারও সেখানে রাত কাটাতে মন চায় না। নূতন পরিবেশ, অচেনা মানুষের সাহচর্য্য আস্বাদন করতে চায় নূতনের পিয়াসী মন।

তিন দিন লেগেছিল উজান ঠেলে যে পথটুকু অতিক্রম করতে তার চেয়েও বেশী পথ একদিনেই পার হয়ে এলাম। পাঁচ ঘণ্টায় প্রায় ১৩ মাইল পথ এসে থামলাম বদলপুর চটিতে।

পরদিনও ঐ রকম। পাঁচ ঘণ্টায় ১১ মাইল পার হয়ে পৌঁছলাম নালাচটিতে। বেলা তখন প্রায় দুটো। দিনের আলো ও পায়ের জোর, কোনটারই অভাব নেই। তবু ওখানেই থামতে হ'ল। কেদার-বদরী পথের এক জংশন ঐ নালাচটি—উজান পথে যেমন গুপ্তকাশী। পায়ে জোর থাকলেও মন স্থির করবার এবং পথ ঠিক করবার জন্য সব যাত্রীকেই থামতে হয় ওখানে।

দোটানা নয়, একেবারে তেটানা।

বদরী-কেদারের অতি প্রাচীন পায়দল মার্গ ঐ নালাচটি থেকেই চামোলি পর্য্যন্ত গিয়েছে উখীমঠ ও তুঙ্গনাথ হয়ে। হাওড়া-দিল্লী রেলপথের প্রান্ড কর্ড লাইনের সামিল ঐ পায়ে-চলা পথ কিন্তু তা কেবল দূরত্বের হিসাবে। একালে তারও প্রায় ২৩ মাইল দূরত্বকে ফাঁকি দেওয়া যায় মাত্র ১৪ মাইল পথ সামনে পশ্চিমদিকে হেঁটে ফিরে অগস্ত্যমুনি চটিতে গিয়ে বাস ধরলে। তৃতীয় টান আরও নীচে যায় যায় ঘরবাড়ীর। অগস্ত্যমুনি চটিতে পৌঁছবার পর বাসে চড়লে বদ্রীনাথ না গিয়ে সোজা ফিরে যাওয়া চলে হরিদ্বারে।

"স্বর্গ হইতে বিদায়" নিয়ে এসেছি। মর্ত্ত্যের টান এখন অনুভব করছি নাড়ীতে নাড়ীতে। তাই বললাম জিতেনকে: ফিরে গেলেও হয়—বদরীনাথ গেলে নূতন আর কি দেখতে পাব?

জিতেন হেসে উত্তর দিল: আমি নিজে সেখানে না গেলে আপনার প্রশ্নের উত্তর কেমন করে দেব? আর আপনিও নিজে সেখানে না গেলে কোন উত্তরেরই সত্যাসত্য যাচাই করবেন কেমন করে?

এ প্রশ্নের উত্তর নেই। মাঝপথ থেকে ফিরে যাবার স্বপক্ষে যুক্তি নিতান্তই দুর্বল। আর যাওয়াই যদি ঠিক হয় তবে হাঁটা পথই যে প্রশস্ত সে সম্বন্ধে জিতেনের সঙ্গে আমি একমত।

শেষ অনিশ্চয়তাটুকুরও নিরসন হ'ল রাত্রে জিতেন ভৈরবঝম্প ইত্যাদির তাৎপর্য্য জেনেনেবার পর।

স্থানীয় প্রাচীনদের সকলেরই অংন্ধ বিশ্বাস ও গম্ভীর নির্দ্দেশ, কেদারনাথ দর্শন করবার পর বদরীনারায়ণকে দর্শন না করলে অমঙ্গল হয়।

একই মন্দাকিনীর এপার আর ওপার। এপারে নালাচটি, ওপারে উখীমঠ। তথাপি দূরত্ব আড়াই মাইল। উত্তর-দক্ষিণে হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণীকে কেটে দু'ভাগ করেই তৃপ্তি হয় নি মন্দাকিনীর। শিখরের দুহিতার ঝোঁক কেবলই হিমালয়ের চরণের দিকে। সেই চরণ ছুঁয়েই মন্দাকিনীর গতি এখানে। সুতরাং নদী পার হবার জন্যই যাত্রীকে নালাচটি থেকে নীচের দিকে নামতে হবে মাইল-খানেক। আবার ওপারের পাহাড়ে উঠতে হবে অতিরিক্ত আরও আধ মাইল উখীমঠ গিয়ে পৌঁছবার জন্য।

শ্রীকেদারেশ্বরের দ্বিতীয় রাজধানী ঐ উখীমঠ। সারাটা শীতকাল ওখানেই কেদারনাথের পূজা-আরতি হয়ে থাকে। সে মরশুম পড়ে নি এখনও। সুতরাং ছাড়া বাড়ীর মতই শ্রীহীন এখন উখীমঠের

মন্দির-এলাকা। যেটুকু ওখানে জনপদ তা তৃতীয় শ্রেণীর শহর। চারিদিকের উদ্দাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে কেমন যেন বেমানান চুণ-সুরকী আর রংয়ের জলুস।

ঐ জলুস আছে কেদারনাথের প্রধান মোহন্ত রাওয়ল সাহেবের প্রাসাদেও। মহাভারত যুগের বাণ রাজা ও তাঁর কন্যা উষার (যা থেকে উখী বা উখী নাম হয়েছে) রাজপ্রাসাদের ভগ্নস্তূপের উপর প্রতিষ্ঠিত শঙ্কর-শিষ্যদের মঠ বুঝি ক্ষুধিত পাষাণের অপরিমেয় আকাঙ্ক্ষার প্রভাবেই নিজেও কালক্রমে প্রাসাদ হয়ে উঠেছে।

তা খুঁটিয়ে দেখবার ধৈর্য্য নেই আমাদের, সুতরাং সময়ও নেই। দিনের যাত্রা শুরু করবার পূর্ব্বেই গাইড বই দেখে লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছি আমরা—বেণিয়াকুণ্ডে গিয়ে রাত্রিবাস করব। উখীমঠ থেকে তার দূরত্ব প্রায় ১২ মাইল। সুতরাং কেদারনাথের শূন্য মন্দির এবং পাশাপাশি কয়েকটি ভবনে এক একবার উঁকি দিয়েই আবার পা চালিয়ে দিলাম আমরা।

বেণিয়াকুণ্ডের নিজস্ব কোন আকর্ষণ নেই। ওখানে না আছে বেণিয়া, না কুণ্ড, তবু অত যে নামডাক ঐ চটির তার কারণ তুঙ্গনাথ পাহাড়ের পাদমূলে ওর অবস্থিতি। কেদারক্ষেত্রের পথে যেমন ত্রিযুগীনারায়ণ, গ্র্যাণ্ডবর্ড লাইনে যেমনি তুঙ্গনাথ পাহাড়। এখানেও অতিরিক্ত ৩ মাইল দুর্গম চড়াই। তাই ভাঙবার শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যই যাত্রীরা আগের দিন বেণিয়াকুণ্ডে উপস্থিত হয়ে অন্ততঃ একটি রাত্রি বিশ্রাম করে সেখানে।

অতিরিক্ত আর একটি কারণে এক দিনে প্রায় ১৫ মাইল পথ হাঁটতে রাজী হয়েছিলাম আমি, নিজেরই গরজ আমার। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের এই পার্ব্বত্য অভিযান শেষ করবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠেছে আমার মনে। দৈনিক মাইল তিনেকও যদি বেশী হাঁটতে পারি তবে চার দিনের পথ তিন দিনে পার হয়ে যাব এবং ঐ অনুপাতেই কমে যাবে আমাদের বনবাসের কাল। উদ্দাম প্রকৃতির নিবিড় সাহচর্য্যে অতি-তৃপ্ত মনের কাছে সে প্রলোভন কিছু কম নয়। আর আমার মনের তলে আশা ছিল যে, তুঙ্গনাথের নাম করা চড়াইকে বাদ দিলে এদিকের পথ হয় ত তেমন কঠিন হবে না।

অঙ্কের হিসাবে আমার কোন ভুল হয় নি, কিন্তু আশা মরীচিকা।

চড়াই হলেও বেশ ছিল উখীমঠ পর্য্যন্ত। কিন্তু জনপদটুকু ছাড়িয়ে যাবার পরেই দেখি যে, পথের চেহারা একেবারে বদলে গেল। তেমন প্রশস্ত আর নয়, সেটা অবশ্য পদযাত্রীর চোখে পড়বার মত কিছু নয়। যাকে উপেক্ষা করা যায় না সেটি সত্যই মারাত্মক দোষ, সে দোষ আমার চরণ দুটিকে ক্রমাগতই খোঁচা দিচ্ছে, চোখ দুটিকেও তা রেহাই দেয় না। অব্যবহৃত, অবহেলিত সংস্কার অভাবে জীর্ণ এ দিকের পথ, কোথাও গর্ত্ত, কোথাও দেখি যে, পথের উপরেই স্তূপ হয়ে জমে আছে মাটি, পাথর ও গাছের ডাল। একাধিক জায়গায় দেখলাম যে, যাত্রীসড়ক একেবারেই অব্যবহার্য্য বলে পরিত্যক্ত হয়েছে, আর লোকজন, জন্তু-জানোয়ারের পায়ের তাগিদে পাশের পাহাড়ের উপর দিয়ে এমন খাঁটি পায়ে-চলা পথের সৃষ্টি হয়েছে যাতে চলতে গিয়ে হাতে অত বড় একটি লাঠি থাকতেও আমার মত যাত্রীকে সার্কাসের কসরত করতে হয়। বেচারা বাহাদুরের অবস্থা স্বভাবতঃই আরও কাহিল। একটু উঁচু অথচ মসৃণ জায়গা না পেলে পিঠের বোঝা সে নামাতেই পারে না। তেমন জায়গা ঐ উখীমঠ পর্য্যন্ত অনেক পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু এ পথে যাত্রী বা কুলির পরিশ্রম লাঘব করবার জন্য মানুষ যেন কিছুই করে নি; আর প্রকৃতি এদিকে মনে হচ্ছে অকরুণ ও কৃপণ।

পাণ্ডার প্রচার-পুস্তিকার পৃষ্ঠায় চটির তালিকায় নাম আছে অনেক, কিন্তু আমার চোখে যেগুলি পড়ছে সেগুলি ঐ পথের মতই পরিত্যক্ত মনে হয়, কেবল ভিটাই চোখে পড়ে অনেক। কোন কোন ঘরের চালাখানি মাত্র কোন রকমে খাড়া আছে। কুটিরের আকার মোটামুটি বজায় আছে এমন অনেক চটিতেও চটিওয়ালা উপস্থিত নেই, দু'চার জন যাদের দেখা মিলল তাদের চটিতেও আতিথ্যের তেমন আয়োজন নেই, তাদের আহ্বানে সহৃদয়তার অভাব না থাকলেও উৎসাহের অভাব আছে মনে হয়।

একাদিক্রমে তাদেরই কয়েক জনের মুখে শুনে কারণটা বুঝতে পারলাম। যাত্রীর মরশুম শেষ হয়ে আসছে বলে নয়, এ পথে যাত্রী আজকাল আসেই খুব কম। যে কালে সবটাই হাঁটাপথ ছিল সেকালে কেদার থেকে তুঙ্গনাথ হয়ে বদরীনাথ যেতেই হাঁটতে হ'ত কম। এখন অগস্ত্যমুনি পর্য্যন্ত মোটর চলবার ফলে প্রায় বিপরীত অবস্থা। এখন অধিকাংশ যাত্রীই পয়সা খরচ করে মোটরে যায় হাঁটবার পরিশ্রম লাঘব করবার জন্য, কাজেই তুঙ্গনাথের পথে লোক চলাচল আজকাল অনেক কম।

শুনতে শুনতে একবার জিতেন বলে উঠল: তা হলে গঙ্গোত্রীরাও বোধকরি এ পথে না এসে অগস্ত্যমুনি হয়ে মোটরেই গিয়েছেন।

তাঁদের স্মৃতি আমারও মনের কোণে উঁকিঝুঁকি মারছিল, আশা আমারও ছিল যে, এই পথে চলতে চলতে কোন একটি চটিতে আবার দেখা হবে তাঁদের সঙ্গে। জিতেনের মন্তব্য শুনে এখন মনে হ'ল যে সে আশা আমার নাও মিটতে পারে, তবু যথাসম্ভব গঙ্গোত্রীদের বর্ণনা দিয়ে সেই চটিওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

কিন্তু মাথা ঝেকে উত্তর দিল লোকটি: না, বাবুজী, পুরুষেরাই এ পথে চলে না আজ কাল, তা মেয়েরা আসবে এই বনজঙ্গলের হাঁটা পথে।

বেশ তিক্ত কণ্ঠস্বর তার, তবে যাত্রীর চেয়ে তুঙ্গনাথের বিরুদ্ধেই যেন বেশী অভিযোগ ও অভিমান তার। একই রকম কথা শুনলাম আরও অনেকের মুখে—ঘোর কলিযুগে তুঙ্গনাথের মাহাত্ম্যই কমে গিয়েছে, নইলে কি আর তাঁর যাত্রী ভাঙিয়ে নেবার জন্য এই উত্তরাখণ্ডে মোটরবাস প্রবেশ করতে পারে।

শুনতে শুনতে মনে দোলা লাগে আমার। এও একরকম নিষ্ঠুর নিয়তি। কতদূরে অগস্ত্য মুনি—এখান থেকে মাইল দূর ত হবেই। আর উচ্চতার হিসাবেও অনেক নীচে তার অবস্থান। অথচ ঋষিকেশ থেকে সেই পর্য্যন্ত যে মোটর বাস আসা-যাওয়া করছে তারই ধাক্কায় এত দূরের যাত্রী সড়ক ও তার দু'পাশের চটিগুলিই কেবল নয়, তুঙ্গনাথের মত মহাদেবতার বেদীতেও ফাটল দেখা দিয়েছে।

তবু ফাটা হউক, সরু হউক, বন্ধুর হউক—উখীমঠ ছাড়বার কিছু দূর পর্য্যন্ত মোটামুটি চলনসই পথ পেয়েছিলাম। আর ঠিক সমতল না হলেও কঠিন চড়াই বা খাড়া উতরাই পাওয়া যাচ্ছিল না। মাঝে মাঝে গ্রাম এবং শস্যক্ষেত্রও চোখে পড়ছিল। একটি বেশ বড় বসতি বা গ্রাম পেলাম—আপাতদৃষ্টিতে সমতল ভূমির গ্রামেরই যেন প্রতিচ্ছবি। একটি ঘরের চাল দেখি নধরকান্তি কুমড়োর ডগা ও বড় বড় সতেজ, সবুজ পাতায় প্রায় ঢেকে ফেলেছে। আর একটু কাছে এসে দেখি যে, ছোট-বড় অনেক কুমড়োও ফলে রয়েছে চালের উপর ঐ পাতাগুলির ফাকে ফাকে। এমন দৃশ্য হিমালয়ে প্রবেশ করবার পর আর চোখে পড়ে নি। এখন দেখেই আমার মন ত 'লোভে কম্পমান।' হাঁক-ডাক করে মালিকের সন্ধান পাওয়া গেল। সে মাঝারি আকারের একটি কুমড়োর দাম বললে চার আনা। চার টাকা দামও যদি সে হাঁকত তবু এ রকম জায়গায় তা আমি বেশী মনে করতাম না। সুতরাং তৎক্ষণাৎ চার আনা দিয়ে জিনিসটি কিনে ঝোলাজাত করলাম আমি।

কারণ ত লোভ। আর শাস্ত্রে আছে যে, লোভই পাপ। সেই পাপেরই ফল হবে হয়ত। সের চারেক ওজনের সেই কুমড়োটি আমি স্বেচ্ছায় নিজের পিঠে তুলে নেবার পরেই দেখি পায়ের নীচের পথ ও তার দু'পাশের দৃশ্য একেবারে ভিন্ন আকার ও প্রকৃতি ধারণ করেছে।

দোয়েড়া না দুর্গা চটি থেকেই শুরু। আকাশগঙ্গা নামের একটি স্রোতস্বিনী পার হয়েছিলাম পাতালের দিকে অনেকটা নেমে গিয়ে, তার পর কাঠের পুলের উপর দিয়ে, তার পরেই চড়াই। প্রথমে ভেবেছিলাম যে, ওপারে যতটা নীচের দিকে নামতে হয়েছিল এ পারে মোটামুটি ততটাই উঠতে হবে। কিন্তু একটু পরেই ভুল ভেঙে গেল। এবার আরোহণের দেখি আর শেষ নেই। উঠতে পথেই চটি পেলাম একটি। জন দুই মাত্র দোকানদার। টিম টিম করে জ্বলছে একটি যেন মাটির প্রদীপ। সেই চটির সঙ্গে সঙ্গে আলোও অদৃশ্য হ'ল।

"পোথীবাসা" সার্থক নাম চটিটির। ঘরবাড়ী কখানা পিছনে ফেলে যেখানে প্রবেশ করলাম, কেবল ডানাওয়ালা পাখিরাই সহজে যেতে পারে সেখানে। যেমন উঁচু, তেমনি দুর্গম।

নিবিড় অরণ্যের ভিতর দিয়ে চড়াই পথ। কেদারের পথে আগাগোড়াই যেমন পেয়েছি তেমন খাড়া চড়াই অবশ্য নয়। পায়ে চলা সরু পথ খুব ধীরে ধীরে উপরে উঠে গিয়েছে। তেমন হাঁফ ধরে নি বলেই বলতে পারি নি এতক্ষণ। হঠাৎ পাথরের ফলকে ৬০০০ ফুট লেখা দেখে বেশ যেন একটা ধাক্কা খেয়ে মন আমার সচেতন হয়ে উঠল। আরও কিছুক্ষণ পর দেখি ৭০০০ ফুট—ও পথ গৌরীকুণ্ডের চেয়েও বেশী উচু। উখীমঠের উচ্চতা ছিল ৪০০০ ফুট। মোট ৩০০০ ফুট একদমে উঠে আসবার পরেও সহজভাবেই যে হাঁটতে পারছি তার কারণ উচ্চতা এ পারে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে।

ভিন্ন প্রকৃতি এ দিকের পাহাড়ের। ওপারে অধিকাংশ পথেই একদিকে দেখেছি গভীর খাদ ও অপরদিকে আকাশ সমান উঁচু পাহাড়। এপারে পথের ধারেই খাদ চোখে পড়ে না; অপরদিকে পাহাড়ের বুক বা পিঠও নয়। আসল কথা, পাহাড়ের গা বেয়ে আর চলছি নে আমরা, পাহাড় ডিঙিয়ে চলেছি তার মাথার উপর দিয়ে। তবে চূড়ার আকার নয় এই মাথার। কাছিমের মত আকারের বিশাল একটি মালভূমি এটি। 'ভূমি' কথাটি সার্থক এই পাহাড়টির বর্ণনায়। পাথর নিশ্চয়ই অনেক আছে এখানে—আমাদের পায়ের নীচের পথটাই ত পাথর দিয়ে বাঁধানো। তবে পাথুরে পাহাড় এটি নয়। নিবিড় বন ছড়িয়ে রয়েছে সবটা মালভূমি জুড়েই। সেই বনের ধারে ধারে নয়, মাঝখান দিয়ে আমাদের পথ।

কেবল নিবিড় নয়, অদৃষ্টপূর্ব্ব এই বন। ওপারের বন দেখে ভয় পেয়েছিলাম। এখন সেই কথা স্মরণ করে নিজের কাছেই লজ্জা পাই। আমার অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ মন আজকের এই বন দেখে বিস্ময়ে বিহ্বল। ওপারে যাকে মনে করেছিলাম মহীরুহ, এপারে এই নিবিড় অরণ্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে তারই রূপ কল্পনা করে বুঝি যে, তুলনায় তা ছিল সাধারণ একটি গাছই।

বেনিয়াকুণ্ড পর্য্যন্ত চার মাইল পথের প্রায় সবটাই ঐ মহীরুহ-সঙ্কুল নিবিড় বন। বুঝি হিমালয়েরই সমবয়সী ও-বনের প্রত্যেকটি মহীরুহই। বন অত নিবিড় বলেই বৎসরের বার মাসই বৃষ্টি হয় এদিকে—তখনও বৃষ্টি মাথায় করেই চলছিলাম আমরা। যুগ-যুগান্তর ধরে এমনি অবিরাম বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে লোহার মত কালো হয়ে গিয়েছে অধিকাংশ বৃক্ষেরই গায়ের রং। শেওলা যা জমেছে তা এদের কাণ্ড ও শাখায় পুরু প্রলেপ লাগিয়েই নিঃশেষ হয় নি। সমতল-ভূমিতে বটগাছের যেমন ঝুরি নামে তেমনি ঐ সব বৃক্ষের নানা শাখা-প্রশাখা থেকে থরে থরে ঘনীভূত শেওলায় ঝুরি নেমে এসেছে প্রায় মাটি পর্য্যন্ত। থেকে থেকেই ভ্রম হয়, বুঝি জটাজুটধারী সন্ন্যাসীরা সারি সারি ধ্যানে বসেছেন, অথবা অধোবাহু হয়ে ঝুলে ঝুলে কৃচ্ছ্র সাধনা করছেন।

জিতেন এগিয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে বেনিয়াকুণ্ডের কাছাকাছি এসে দেখি যে, পথের ধারে একখানা পাথরের উপর চুপ করে বসে আছে সে।

তখনও টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। কিন্তু আকাশে নিবিড় মেঘ নেই। আর বনের ওখানে শেষ বলেই ডাইনে, বাঁয়ে সামনের বৃক্ষগুলি মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। এখন বেশ বুঝা যায় যে, বাঁয়ে একটু দূরেই খদ ও তার ওপারে নাতি-উচ্চ পাথুরে পাহাড়ের সারি। সামনে বেনিয়াকুণ্ড চটির ঘর-বাড়ীও কয়েকখানা দেখা যাচ্ছে।

আমি তার কাছে আসবার পরেও জিতেন উঠে দাঁড়াল না। দেখে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সুরেই আমি বললাম, হাঁটবার সখ মিটেছে তোমার? বুঝেছ যে, তোমার পা-দু'খানিও লোহা দিয়ে তৈরী নয়?

কিন্তু বিদ্রূপ গায়ে মাখল না জিতেন। বরং মিষ্টি রকমের একটু হেসেই সে আমাকে বললে, আমার প্রশ্নের জবাব আগে দিন আপনি। সব রকমই দেখা হয়ে গিয়েছে বলে ওপার থেকেই ত আপনি ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। এখন বুকে হাত দিয়ে বলুন ত, এ দিকে না এলে মস্ত একটা লোকসান হত, কি না?

কোন মুখে অস্বীকার করব! চড়াই পথে একটানা পনর মাইল হেঁটে দেহ আমার যতই ক্লান্ত হউক না কেন, মন যে আমার নব নব প্রাপ্তির আনন্দে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে তা অস্বীকার করবার জো নেই। সুতরাং প্রশ্ন শুনে লজ্জিত হাসি মুখে চুপ করে থাকতে হ'ল।

কিন্তু বিজয়গর্কে উৎফুল্ল জিতেনের মুখ। সে সহাস্যকণ্ঠে আবার বললে: ঐ দেখুন, আরও একটি নতুন দৃশ্য—বলতে বলতে সে তার ডান হাতখানা তুলে অঙ্গুলী সঙ্কেতে খদের ওপারের একটি পাহাড় দেখাল আমাকে।

গোধূলির অস্পষ্ট আলোকে দূরের দৃশ্য দেখবার জন্য বিশেষ একটু চেষ্টা করতে হয়েছিল বই কি। কিন্তু দেখবার পর চোখ আর ফিরতে চায় না। নয়নাভিরাম দৃশ্য। গঠনের বৈচিত্র্য পাহাড়ে পাহাড়ে কতই ত দেখেছি ওপারে। সে সবই মনে হয়েছে খাম-খেয়ালী বিধাতার আকস্মিক সৃষ্টি। কিন্তু এখন সামনের ঐ পাথুরে পাহাড়গুলির একটির গায়ে দেখলাম অনবদ্য কারুকার্য্য—যেন সেই বিধাতাই পাথরের বুকে মন ঢেলে নিজের হাতে রূপ সৃষ্টি করেছেন।

খদের ওপারে পাটকিলে রং-এর একটি পাথুরে পাহাড়। কি কারণে কে জানে—তার শিখর থেকে মেখলা পর্য্যন্ত অনেকটা অংশ ভেঙে গিয়েছে। অবশিষ্ট পাহাড়টুকু এপার থেকে মনে হচ্ছে যেন প্রাচীন চিত্র-শিল্পের সমৃদ্ধ একটি প্রদর্শনী। উড়িষ্যা থেকে সুরু করে সারা দক্ষিণ-ভারত জুড়ে দেবমন্দিরের দ্বার ও দেয়ালে যে অতুলনীয় সূক্ষ্ম কারুকার্য্য দেখা যায় তাদের যে-কোনটির সঙ্গেই তুলনা হতে পারে ওর এক একটি চিত্র। নৃত্য-বিহ্বল যে নট-রাজের বামপদের আঘাতে ঐ পাহাড়ের একটি অংশ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ভেঙে পড়েছে, তাঁরই দক্ষিণ চরণের নৃত্যছন্দে অবশিষ্ট অংশের খাঁজে খাঁজে নিখুঁৎ হয়ে ফুটে উঠেছে ঘর-বাড়ী, ফুল-পাতা, জন্তু-জানোয়ার, এমন কি মানুষের ভাববিহ্বল মুখচ্ছবিও।

নূতন দৃশ্য আরও কিছু কিছু দেখা হ'ল বই কি! পঞ্চকেদারের অন্যতম তুঙ্গনাথ। তুঙ্গশিখরে অধিষ্ঠান বলেই বুঝি তুঙ্গনাথ তাঁর নাম। ফুটএর মাপে কেদারক্ষেত্রের চেয়েও উঁচুতে তাঁর দেউল। বহু আয়াসসাধ্য তাঁর দর্শন। বৃষ্টি ও কুয়াশার জন্য তা অস্পষ্ট হলেও তুঙ্গনাথ পাহাড়ের সানুদেশে তার অঢেল ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলাম। উপরে দর্শন দিতে পারবেন না বলেই বুঝি তুঙ্গনাথ নীচেই তাঁর বিরাট রূপ ও বিপুল বিভূতি ক্ষণেকের জন্য প্রকাশ করে দেখিয়েছিলেন।

সারা রাতই অঝোরে বৃষ্টি হলেও বেশ নির্ম্মল রোদ উঠেছিল সকালে। সেই পরিচ্ছন্ন প্রভাতে বেনিয়াকুণ্ড থেকে যাত্রা করবার অল্প কিছুক্ষণ পরেই একটিবার দেখেছিলাম আমাদের বাঁয়ে ও সামনে তরঙ্গায়িত চিরতুষারের সমুদ্র। সম্পূর্ণ হিমালয় নিশ্চয়ই নয়! কিন্তু কেদারের তুলনায় অনেক বেশী প্রসার দেখা যায় এখান থেকে, স্তর ও শৃঙ্গের সংখ্যাও গণনায় অনেক বেশী।

তবে ঐ যাকে বলে ঝাপি-দর্শন! না জানি কোন পাণ্ডার অদৃশ্য হস্ত সামনের আবরণখানি সরিয়েই তৎক্ষণাৎ আবার টেনে দিল তা।

তার পরেই আবার বনবাস।

ভুলোকনা চটি পর্য্যন্ত চলনদই অবস্থাই ছিল। কিন্তু চলতে চলতে এক সময়ে নিজের চারিদিকে অস্বাভাবিক অন্ধকারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে মেঘের সন্ধানে উপর দিকে তাকিয়ে আকাশের একটি কালিতে দেখতে পেলাম না। চোখে যা পড়ল তা কেবল গাছের ডাল আর পাতা। উভয়েরই কালো রং।

আবার দেখি যে, সেই প্রায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের বন সুরু হয়েছে। আমাদের দু'দিকেই দৈত্যের মত মহীরুহ সব। পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখি যে, যে পথে চলেছি তাকে পথ বলে চেনাই যায় না। পচা পাতার দুর্গন্ধময় কাদার মধ্যে পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত যেখানে ডুবে যাচ্ছে না, সেখানে বল্লমের-ফলার মত উঁচু হয়ে আছে অযত্নবিক্ষিপ্ত সব পাথর।

উতরাই পথ এটি। এতক্ষণ পর বুঝতে পারলাম যে, গতকাল চড়াই ভেঙে যে পাহাড়ে উঠেছিলাম আজ উতরাই পথে সেই পর্ব্বতশ্রেণী থেকে অবতরণ করছি। কিন্তু তুলনায় অনেক বেশী খাড়া মনে হয় আজকের এই উতরাই পথ। চলতে আজ কষ্ট হচ্ছে বেশী। কারণ আছে বই কি! বেশ ঢালু পথে নীচের দিকে গতি আমার; সে পথ আবার পিচ্ছল। পা পিছলে পড়ে যাবার ভয়ে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে চলতে হচ্ছে বলেই পায়ের পেশীগুলির সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুর উপরেও খুব চাপ পড়ছে।

অনেকক্ষণ পর পথের ধারে বড় একখানি পাথর চোখে পড়ল। শেওলা কিছু জমে আছে তার উপর, তবে বসবার অনুপযুক্ত নয়। দেখে বাহাদুরকে আমি বললাম ওখানে বসে একটু জিরিয়ে নিতে।

কিন্তু অমন সঙ্গত প্রস্তাবও তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করল বাহাদুর। আর রীতিমত উত্তেজিত প্রত্যাখ্যান তা। অত ভারী বোঝা তার

পিঠে থাকলেও আমার প্রস্তাব তার কানে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে সবেগে তার মাথা ও হাত নেড়ে এত উচ্চৈঃস্বরে তার অস্বীকৃতি আমাকে জানিয়ে দিল যে, আমি ত বিস্ময়ে হতবাক। অথচ তার পরেই বাহাদুর আরও জোরে তার পা চালিয়ে দিল।

অগত্যা আমিও তার অনুসরণ করেছিলাম। কিন্তু আরও খানিকটা এগিয়ে যাবার পর বাধা পড়ল।

একটু দূরে সামনের একটি গাছে দেখি একপাল হনুমান। ঠিক পবননন্দনকে মনে করিয়ে দেবার মত না হলেও দীর্ঘ, বলিষ্ঠ দেহ ওদের অধিকাংশেরই। কালো মুখ। কিন্তু ঘাড়ে, গলায় প্রায় সাদা লম্বা লম্বা লোম। একেবারে চুপ করে বসে নেই ওদের কেউ। কি যেন ওরা খাচ্ছে, আর বোধ করি সেই খাদ্যবস্তুর সন্ধানেই মাঝে মাঝে লাফিয়ে যাচ্ছে এক ডাল থেকে আর এক ডালে।

যাত্রী-সড়ক থেকে বেশ একটু দূরে আর অনেকটা নীচে দু'-তিনটি মাত্র গাছে চলেছে ঐ হনুমানদের লীলা। তবু সভয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। কেদারের পথে দু'-একটি কুকুর আর ঘোর ছাড়া আর কোন জন্তু-জানোয়ারই ত চোখে পড়ে নি। সুতরাং এই নিবিড়, নির্জ্জন বনের মধ্যে হঠাৎ অতগুলি হনুমান দেখে একটু ভয় পাব বই কি!

কিন্তু বাহাদুর দেখি ভ্রূক্ষেপও না করে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি গলা চড়িয়ে বার দুই তাকে ডাকবার পর সে পিছন ফিরে হাসিমুখে হাতছানি দিয়ে ডাকল আমাকে।

আমি এক চোখ ঐ হনুমানযূথ ও অপর চোখ পথের উপর রেখে পায়ে পায়ে ঐ জায়গাটা পার হয়ে গেলাম।

নিরাপদ দূরত্বে চলে যাবার পর বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করলাম আমি: এই হনুমানের ভয়েই বুঝি তুমি ওদিকে বসে বিশ্রাম করতে চাও নি?

অস্বীকার করল বাহাদুর: না, বাবুজী!

তবে?

মৎ পুছিয়ে,—বলেই আবার দ্রুতবেগে পা চালিয়ে দিল বাহাদুর।

প্রায় তিন মাইল দূরে পাঙ্গরবাসা চটি। চারিদিকে নিবিড় অরণ্যের মধ্যে আট-দশখানা মাত্র চালাঘর। তারও আবার দু'-তিনটি মনে হ'ল পরিত্যক্ত। লোভনীয় বিশ্রামস্থান মোটেই নয়। তথাপি ঘড়িতে প্রায় দুটো বেজেছে দেখে ওখানেই সেদিনের মত বাসা বাঁধবার প্রস্তাব করেছিলাম। কিন্তু শুনেই সবেগে মাথা নেড়ে সে প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করল বাহাদুর।

ক্ষুণ্ণ তত নয়, যত বিস্মিত হলাম আমি। অত বাধ্য বাহাদুর এত অবাধ্য কেন আজ! তার প্রত্যাখ্যানের ধরনটাও বিস্ময়কর। কেমন যেন সন্ত্রস্তভাব তার। তখন তার কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আমি: এখানে রাত কাটাতে তোমার ভয় করে নাকি বাহাদুর?



গৌরীকুণ্ড

বিব্রতভাবে স্বীকার করল সে: হ্যাঁ, বাবুজী।

কেন? বাঘ-ভালুক আছে এখানে?

না, বাবুজী।

তবে কি চোর-ডাকাত?

না, বাবুজী?

তবে কিসের ভয় তোর?

মৎ পুছিয়ে।—বলেই বাহাদুর তার বোঝার দিকে এগিয়ে গেল সেটি যথানিয়মে তার পিঠে তুলে নেবার জন্য।

নিবিড় বন নিবিড়তর হয়েছে সামনের পথে। অপরাহ্ণবেলায় গভীর অরণ্যের অন্ধকারে স্বতঃই গা ছম ছম করে। জিতেনও আমার কাছাকাছি নেই বলে মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে যে, ঐ বনের মধ্যে আমি একেবারে একা। পরিবেশ অনুকূল বলেই বুঝি ধারণাটা আমার মাথায় এসে গেল। হঠাৎ মনে হ'ল যে, বাহাদুরের ভয়ের কারণটা আমি বুঝতে পেরেছি।

কেদার-তুঙ্গনাথের দেশ—মর্ত্ত্যে আর স্বর্গের সীমান্ত। ওদেশে হাঁটা-পথে চলতে শুরু করলেই যেন মনের অতল থেকে অবোধ শৈশবের রঙিন প্রত্যাশাগুলি উপর তলায় ভেসে উঠতে থাকে। দেব-দেবী, কিন্নর-কিন্নরী, যক্ষ-যক্ষিণী দেখবার আশায় কতবার আমার চোখ দুটিও ত চঞ্চল হয়েছে। সুঠাম গঠন ও ললিত-লাবণ্য দেখবার প্রত্যাশা তা! কিন্তু এখন বোধ করি চারিদিকে ঐ ভয়ঙ্কর পরিবেশের প্রভাবেই হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল যে, পার্ব্বতীর সখী ও পরিচারিকারা শাস্ত্রমতে যত সুন্দরীই হোক না কেন, ভোলানাথের পার্শ্বচরেরা অধিকাংশই ভূত ও প্রেত। এই তুঙ্গনাথের রাজ্যে তাদের কোন একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার আশঙ্কাতেই বাহাদুর অত সচল ও সতর্ক হয়েছে নাকি?

ঐ বনের পথে তখন আর জিজ্ঞাসা করি নি তাকে। কিন্তু রাত্রিবেলার ভিন্ন পরিবেশ। বেশ খোলামেলা জায়গায় মণ্ডলচটি। পাকা দ্বিতল বাড়ী সেখানে কালী কমলীওয়ালার ধর্ম্মশালার। সৌভাগ্যক্রমে চটিওয়ালার ভাণ্ডারও সেখানে পেয়েছিলাম সমৃদ্ধ।

পরিপাটি ভোজনের পর দুর্গের মত নিরাপদ ঘরের মধ্যে ভূতের গল্প তেমন ভয়ের কারণ হবে না মনে করে সোজাসুজিই জিজ্ঞাসা করলাম বাহাদুরকে।

শুনেই ভয়ে শিউরে উঠেছিল সে, কিন্তু জিতেনও নানাভাবে তাকে আশ্বাস দেবার পর কেবল মুখই নয়, মন খুলেই উত্তর দিল বাহাদুর।

নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করে সে যে, এই কেদার-বদরীর দেশে সর্ব্বত্রই ছড়িয়ে আছে অশরীরী প্রেতেরা। কেউ সদাশয়, কেউ ভয়ঙ্কর।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কাউকে দেখেছ তুমি?

নহী, বাবুজী,—কেদারনাথজীকী কৃপাসে—

বলতে বলতে সারা দেহ যেন কেঁপে উঠল বাহাদুরের। আতঙ্কের সুস্পষ্ট চিহ্ন! কিন্তু দুই চোখের দৃষ্টিতে তার কৃতজ্ঞতাও আছে—কেদারনাথজী যে অমন দুর্ভোগ থেকে তাকে রক্ষা করেছেন সেই জন্য কৃতজ্ঞতা। দুই হাত জোর করে কপালে ঠেকিয়ে কেদারনাথজীর উদ্দেশ্যে প্রণামও করল সে।

কিন্তু আমার হাসি পাচ্ছে, সকৌতুক কণ্ঠে আমি বললাম, অত ভয় কেন রে? তুই-ই ত বললি যে, ভাল ভূতও আছে।

— আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু তাদের সম্বন্ধেও তেমন ভরসা নেই বাহাদুরের মনে। যে মানুষকে দয়া করে তাঁরা দর্শন দেন, বুঝতে হবে যে, সংসারে তাঁর দিন ফুরিয়ে এসেছে।

আর যাঁরা খারাপ ভূত?

তাঁরা তখনই মেরে ফেলে, বাবুজী,—আর খুব কষ্ট দিয়ে মারে।

এমন সুরে কথাটা বললে বাহাদুর যে, আমার মনে হ'ল বুঝি সেই মুহূর্ত্তে সে নিজেই সেই মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছে।

তথাপি কৌতূহলী জিতেন তাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার সামনে ত কোন ভূতই কোন দিন আসে নি। তবে তুমি কেমন করে জানলে?

আমি জানি, বাবুজী,—বিষণ্ণ কণ্ঠে উত্তর দিল বাহাদুর : আমারই এক সঙ্গীকে এক বদমাশ ভূত সেবার মেরে ফেলল—ঐ জঙ্গলচটির কিছুটা আগে।

পাঙ্গরবাসাকেই জঙ্গলচটি বলে বাহাদুর। শুনেই বুঝলাম আমি যে, আমার প্রকল্প প্রমাণ হয়ে গেল—ভূতের ভয়েই ঐ চটিতে রাত্রিবাস করতে রাজী হয় নি সে, পথে কোথাও বসে দু' দণ্ড বিশ্রাম করতেও নয়।

বাহাদুরকে জেরা করে করে শোনা গেল গল্পটা। ব্যাপারটা ঘটেছিল ঐ অরণ্যের পথেই। চনচনে রোদ ছিল সেদিন বার জন্য ঐ নিবিড় বনের ভিতর দিয়ে চলতে চলতেও গলদঘর্ম্ম সকলেই। দারুণ পিপাসায় কাতর হয়ে পথশ্রান্ত একটি কুলি তার পিঠের বোঝা নামিয়ে রেখে নীচের এক ঝর্ণায় জল খেতে গিয়েছিল। লোকটি দুই অঞ্জলি জল পান করতে না করতেই সেই যে অজ্ঞান হয়ে পড়ল তার পর হাসপাতালে নিয়ে অনেক চিকিৎসা করিয়েও তাকে আর বাঁচানো গেল না—ধনুকের মত বেঁকে গিয়ে মৃত্যু হ'ল তার।

বড় বদমাস একটি ভূত আছে ঐ বনের মধ্যে। বিশেষ ঐ ঝর্ণাটির ধারে বাসা নিয়ে ঐ ঝর্ণাটির উপর তার নিজস্ব সত্ত্ব কায়েম করে রেখেছে সে। বাহাদুরের বন্ধু কুলিটি অনধিকার প্রবেশ করে সেই ঝর্ণার জল খেয়েছিল বলে রেগে গিয়ে ভূতটি চপেটাঘাত করেছিল কুলিটির ঘাড়ে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর আরও একটু বুঝিয়ে বললে বাহাদুর। এ দেশের লোক বা যাত্রীদের ভূত যারা এই পথের ধারে ধারে থাকে তারা কারও তেমন অনিষ্ট করে না। ভয়ঙ্কর আর বদমাশ ভূত হয় মরবার পর ঐ যাযাবর পশুপালকেরা। ঠাকুরদেবতা মানে না ওরা, তর্পণ, পিণ্ডদান ইত্যাদি অনুষ্ঠানের ধার দিয়েও যায় না ঐ বিধর্ম্মীদের বংশধরেরা। সুতরাং মেয়ে হউক, পুরুষ হউক—ওদের কেউ যদি এই উত্তরাখণ্ডে মারা যায় তবে নির্ঘাৎ সেই জায়গাতেই ভূত হয়ে থাকবে সে এবং অজুহাত ও সুযোগ পেলেই পথচারীর সর্ব্বনাশ করবে।

১৭

গল্পের ভূতের ধর্ম্মই ঐ—মনে গিয়ে বাসা বাঁধবে সে। বাহাদুরের গল্পের বিশেষ ভূতটিকে পর দিন সকালেও মন থেকে তাড়াতে পারি নি। আমি নিজে ত সে সেখানে জেঁকে বসে আছেই, তার উপর আবার কিছু স্মৃতি ও চিন্তাও জাগিয়ে তুলেছে সে।

গত রাত্রে গল্পটি শুনতে শুনতেই প্রচলিত বিশ্বাসের তাৎপর্য্য আমি বুঝতে পেরেছিলাম। বেচারা যাযাবর পশুপালক। বাড়ীঘর নেই, দেশ নেই। ছাগল-ভেড়া-মোষের পাল নিয়ে অনবরত ঘুরে ঘুরে প্রায় পশুর জীবনই যাপন করে সে। তথাপি মরবার পর ভূত সে হবেই। আর তাও ভয়ঙ্কর, খুনে ভূত। এ হেন মনোবৃত্তির উৎস নিশ্চয়ই বিজাতি ও বিধর্ম্মীবিদ্বেষ।

কখন যে আমার চিন্তা সমষ্টি ছেড়ে ব্যষ্টিকে, সম্প্রদায় ছেড়ে নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে আশ্রয় করেছে তা রাত্রে বুঝতে পারি নি। কিন্তু পরদিন সকালে যাত্রা শুরু করবার পর বুঝতে পারলাম যে, মৈখণ্ডা থেকে রামপুরের পথে আমার ক্ষণেকের পরিচয় যে ভৈশাল পরিবারের সঙ্গে সেই স্বামী-স্ত্রী সমগ্র যাযাবর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হয়ে যেন আমার কাছে এসে সুবিচার প্রার্থনা করছে। স্মৃতির পটে আমি যেন স্পষ্ট দেখলাম সেই হাসি-হাসি-মুখ নুরওয়ালা যুবকটি ও তার সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে। রায় দিতে একটুও দেরি হ'ল না আমার। বসরাই গোলাপ আর শাণিত খড়্গের সম্মিলিত রূপ দেখেছি যে হাস্যমুখ তরুণীর মুখে সে যে মৃত্যুর পর শাকচুন্নী হয়ে গাছের ডালে ঠ্যাং পেতে বসে থাকবে নিরীহ যাত্রী বা তার কুলির ঘাড় মটকাবার জন্য তা আমি কোন মতেই মানতে রাজী নই।

মন আমার যতই ঐ বায় দেয় ততই যেন আরও স্পষ্ট দেখি সেই যাযাবরীর মুখ। বুঝি সেই জন্যই চলার পথে আর একখানি সুন্দর মুখ অত বেশী চোখে পড়ল আমার।

সেই বয়সেরই মেয়ে এটিও। তবে অত তীক্ষ্ণ নয়, বরং ঢল-ঢলে এ মেয়েটির মুখখানি, আর ঈষৎ ক্লিষ্ট। মাঝারি আকারের একটি ঘাসের বোঝা তার পিঠে। সেই বোঝার ভারে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে ধীরে ধীরে, একটু যেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বিপরীত দিক থেকে হেঁটে আসছে মেয়েটি।

থমকে দাঁড়ালাম আমি—লোভ হচ্ছে মেয়েটির সঙ্গে দুটি কথা বলতে। সে আমার কাছাকাছি আসতেই জিজ্ঞাসা করলাম, ক্যা নাম হ্যায়, বেটি?

সঙ্গে সঙ্গেই দেখি যে, মেয়েটির গৌরবর্ণ মুখখানি যেন টকটকে লাল হয়ে উঠল, লজ্জায় নুয়ে পড়ল তার চোখের পাতা দুটি, ঈষৎ সঙ্কুচিত হয়ে আমার পাশ কাটিয়ে পিছনে চলে গেল সে।

কিন্তু পরক্ষণেই আমার কাণে এল মিষ্টি, মিহি সুরের একটি মাত্র কথা—সীতা।

এ ত নাম। তা হলে আমাকে এড়িয়ে গিয়েও আমাকে উপেক্ষা করে নি মেয়েটি—একটু দেরিতে হলেও আমারই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে সে।

তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি যে, মেয়েটিও থমকে দাঁড়িয়ে আমারই দিকে চেয়ে আছে—প্রসন্ন চোখদুটিতে তার কৌতূহলী দৃষ্টি।

দুর্নিবার আকর্ষণ সেই চোখ মুখের। সেই টানেই আমিও হাসিমুখে তার কাছে গিয়ে বললাম, বাঃ বেশ নামটি ত! বাড়ী কোথায় তোমার?

আর তখনই ঘটল এক অঘটন। চোখদুটি তার আরও বিস্ফারিত করে হঠাৎ অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল সীতা। পড়ে গেল মাটিতে। তার পর কেবল গোঁ গোঁ আওয়াজ তার কণ্ঠে, মুখে গাঁজলা উঠছে, সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্থির আক্ষেপ।

চীৎকার করে উঠলাম আমিও! মেয়েটির জন্য যত, নিজের জন্য তার চেয়ে অনেক বেশী উদ্বিগ্ন আমি। অপরিচিত, বিদেশী লোক আমি। কে যে কি দুরভিসন্ধি বা অসদাচরণ আরোপ করবে আমার উপর কে জানে।

তবে ভাগ্য ভাল আমার। বাহাদুর আর জিতেন সেদিন চটি থেকেই একটু দেরিতে বের হয়েছিল বলে আমার পিছনে পিছনে আসছিল তারা। এখন তারা দু'জনেই এক সঙ্গে ঐ জায়গায় এসে উপস্থিত হ'ল। আর সোরগোল শুনে ছুটে এল স্থানীয় কয়েকজন নর-নারীও। সীতার পরিচর্যা করতে করতে তারাই অভয় ও আশ্বাস দিল আমাকে—কোন সন্দেহই করে নি তারা, বিস্মিতও হয় নি। মেয়েটি তাদের চেনা। অমন মূর্চ্ছা প্রায়ই হয় তার—যখনই ভূতে পায় তাকে।

ভূত!—

আমি চমকে জিতেনের মুখের দিকে তাকালাম, তার পর দু'জনেই এক সঙ্গে বাহাদুরের মুখের দিকে। সে দেখি তার দুই হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়েছে, বোধ করি ভূতনাথ কেদারনাথজীর উদ্দেশ্যে।

কিন্তু নির্বিকার সেই স্থানীয় লোকটি। সে আরও একটু ব্যাখ্যা করে শোনালো আমাকে। সীতার উপর ভর করেছে যার প্রেতাত্মা, সেই ভ্রষ্ট সাধু গড়ুর মহারাজকে সীতার পিতা শম্ভু পাণ্ডা ব্রহ্মশাপে ভস্ম করেছিল।

ঘাবড়াও মৎ বাবুজী—লোকটি অল্প একটু হেসে আবার আমাকে আশ্বাস দিল: শম্ভুজী খোদহী আ গয়ে। অঙ্গুলী সঙ্কেতে একজনকে দেখিয়েও দিল সে।

নাম শুনেই আমার মনের অতলে একটি আলোড়ন শুরু হয়েছিল। লোকটিকে দূর থেকে দেখবার পর একটি বিস্মৃত প্রায় অভিজ্ঞতা হঠাৎ যেন স্মৃতির পটে আকার ধরে ফুটে উঠল। তিনি কাছে আসবার পর সব সন্দেহের নিরসন।

ইনিই সেই শম্ভু পাণ্ডা—দেবপ্রয়াগের ঘাটে যিনি তাঁর ভ্রূকুটির একটি কষাঘাতেই তাঁর নিজের অসাধারণত্ব সম্বন্ধে আমাকে সচেতন করে তুলে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাও জাগাতে পেরেছিলেন আমার মনে।

আভাসও ত দিয়েছিলেন তিনি যে, গোপেশ্বরের পথে তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখাও হয়ে যেতে পারে।

ঘটনার আশ্চর্য্য মিল রয়েছে তাঁর গণনার সঙ্গে। কিন্তু কি শোচনীয় দুর্ঘটনা তার উপলক্ষ! লজ্জায়, সঙ্কোচে ভাল করে তাকাতেই পারি নে শম্ভুজীর মুখের দিকে।

ব্যাখ্যাটা মানেন শম্ভুজী। কিন্তু যে কৃতিত্ব তাঁর উপর আরোপ করা হয়েছে তাকে তিনি মনে করেন অভিযোগ। খ্যাতিই হয়েছে তাঁর জীবনের এক বিড়ম্বনা। বিশ্বাস কর, বাবু—শম্ভুজী আমাকে বললেন: অভিশাপ তাকে আমি দিই নি। শুধু বলেছিলাম এই গাঁ ছেড়ে চলে যেতে।

থেমে থেমে সম্পূর্ণ কাহিনীই আমাকে শোনালেন শম্ভুজী। দেবপ্রয়াগে তাঁর যে কথাগুলি আমার মনে হয়েছিল দুর্বোধ্য, সেগুলির অর্থ বুঝলাম এতদিন পর।

চেলা গড়ুরকে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় তার দীক্ষাগুরু সন্ন্যাসীমণ্ডল চটির একখানা কুঁড়ে ঘরে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল। কিন্তু গাঁয়ের লোকেরা ফেলতে পারে নি তাকে। বছর কুড়ি বয়সের সুঠাম, সুদর্শন যুবক সেই গড়ুর, গাড়োয়াল জেলারই লোক। সন্ন্যাসের পথে নূতন যাত্রী। মাথায় জটা হবে কি, চুলই মোটে বড় হয় নি। বৈরাগ্যের যা কিছু নিদর্শন তা কেবল তার কটিতে কৌপীন ও অঙ্গের ভস্মরাগে। এ হেন লোকটিকে প্রবল জ্বরে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দেখতে পেয়ে স্থানীয় লোকেরাই তার চিকিৎসা

ও শুশ্রূষার ভার নিয়েছিল। খবর পেয়ে পাশের গ্রাম থেকে এসেছিলেন শম্ভুজীও।

একদিকে দেবপ্রয়াগ ও আর একদিকে বদ্রীনাথ। প্রায় দুই সীমান্তের দুই তীর্থে জাত-ব্যবসায়ের তাল সামলিয়েও নিজের সংসার ও পৈত্রিক সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মাঝে মাঝে গ্রামের বাড়ীতে আসতে হয় শম্ভুজীকে। সেবারও তিনি বাড়ীতে এসেছিলেন তাঁর নিজের গরজেই। কিন্তু জড়িয়ে পড়লেন গড়ুরের ব্যাপারটির সঙ্গে। পরিত্যক্ত রুগ্ন সাধুর সেবা-পরিচর্য্যা আরম্ভ করবার পর তাঁর উৎসাহটুই যেন সবচেয়ে বেশী।

শুধু রোগীর সেবাই নয়, ওটি সাধু সেবাও—গৃহীর পক্ষে মহা পুণ্যের কাজ। খবর পেয়ে অনেক কুলবধূও ছুটে এসেছিল—শম্ভুজীর স্ত্রী যশোদা এবং কন্যা সীতাও।

দায়সারা কাজ নয়, আন্তরিক সেবা। দু'এক দিন নয়, প্রায় এক মাস, রোগ সারবার পরেও রোগী নিশ্চিন্ত আরামে কয়েকদিন ওখানে বিশ্রাম করেছে, ততদিনে গাঁয়ের লোকের সঙ্গে কত কথা-বার্ত্তা হয়েছে তার, কত ছোঁয়াছুঁয়ি, কিছু রঙ্গকৌতুকও। তা আবার একদিন হয়েছিল সীতাকে উপলক্ষ্য করেই।

অল্প বয়সেই একবার মারাত্মক জ্বরে পড়েছিল সীতা, তার পর থেকে একটি পা তার খোঁড়া হয়ে আছে, খোঁড়া পাখানির জন্য অনেকের কাছে অনুকম্পা। পেত সীতা, সখীদের কাছে মাঝে মাঝে একটু ব্যঙ্গবিদ্রূপও।

একদিন গড়ুরের কুটিরে সীতার ঐ খোঁড়া পায়ের প্রসঙ্গ ওঠবার পর অনুকম্পা ও বিদ্রূপ মিশে এক হয়ে গেল।

বেশী বয়সের একটি নারী বলেছিল গড়ুরকে : সীতার খোঁড়া পাখানি তুমি সারিয়ে দিতে পার না, সাধুজী?

শুনেই দু'তিনটি ছোট মেয়ে সমস্বরে বলে উঠেছিল : সারিয়ে দাও সাধুবাবা—সীতাদিকে ভাল করে দাও তুমি।

শুনে গড়ুর সীতার পায়ের অস্বাভাবিকরকমের সরু জায়গাটাতে হাত বুলিয়ে দেখবার চেষ্টা করতেই কিশোরী সীতা অনেকখানি দূরে সরে গিয়ে ভ্রূভঙ্গি করে বলেছিল : নিজের জ্বর যে সারাতে পারে না সে আবার—

শুনে খিল খিল করে হেসে উঠেছিল ছোটদের সঙ্গে সঙ্গে বেশী বয়সের নারীটিও। গড়ুর হয়েছিল অপ্রতিভ।

অন্য ধরনের কথাও হয়েছে। যশোদা তাঁর কঠোরপ্রকৃতি, শাস্ত্রজ্ঞ স্বামীর ধমক উপেক্ষা করেও জেরা করে বের করতে চেষ্টা করেছেন নবীন সন্ন্যাসীর পূর্ব্বাশ্রমের খবর।

এমনি ভাবে ধীরে ধীরে গ্রামের সকলের সঙ্গেই বেশ একটু অন্তরঙ্গ সম্বন্ধই গড়ে উঠেছিল গড়ুরের। সুতরাং সেরে উঠবার পর কেদার পর্য্যন্ত গিয়েও তার দীক্ষাগুরু সন্ন্যাসীকে খুঁজে না পেয়ে গড়ুর যখন বিমর্ষমুখে আবার ঐ মণ্ডল চটিতেই ফিরে এল তখন গাঁয়ের লোকে আবারও সমাদর করেই গ্রহণ করেছিল তাকে। স্থানীয় মন্দিরে তার স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল তারা।

আর এক দফায় বাড়ীতে এসে তাই দেখে শম্ভুজীও খুশী।

মন্দিরের সামনে সদর রাস্তার ধারে দিনের বেলায় আসন পেতে বসত গড়ুর মহারাজ। তবে যাত্রীর চলাচল যেদিন কম থাকত, প্রণামী যেদিন পরিমাণে বেশী পড়ত না তার সামনে, সেদিন সে উপরে বা নীচে কোন গাঁয়ে চলে যেত গৃহস্থদের বাড়ীতে বাড়ীতে ভিক্ষা করতে। যেত শম্ভুজীর বাড়ীতেও।

সেই গড়ুরজীকে—

বলতে বলতে থেমে গেলেন শম্ভুজী। উত্তেজনায় যেন লাল হয়ে উঠল তাঁর মুখমণ্ডল। দূরের পাহাড়টির দিকে কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে থাকবার পর ফিরে আমার মুখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন : সেই গড়ুর একদিন বেশ বড় একটি ঘাসের বোঝা পিঠে নিয়ে সীতার পিছনে পিছনে আমাদের এই উঠানে এসে উপস্থিত হ'ল।

কেন? সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

উত্তরে শম্ভুজী বললেন, সেই প্রশ্ন ত তখন আমারও মনে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম গড়ুরকে। সে হেসে উত্তর দিল যে, অত ভারী বোঝা নিয়ে চড়াই ভেঙে উঠতে সীতার কষ্ট হচ্ছিল বুঝে সেদিনের বোঝাটা সীতার পিঠ থেকে নিজেই টেনে নিয়েছে সে।

দৃশ্যটি মনে মনে কল্পনা করে স্মিতমুখে আমি বললাম : বাঃ! বেশ ত।—

বোধ করি এমন একটি উত্তরের প্রত্যাশা ছিল না শম্ভুজীর মনে। তিনি বিব্রতের মত কয়েক সেকেণ্ডকাল আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকবার পর হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে গাঢ়স্বরে বললেন, কিন্তু, বাবু, সবাই তোমার মত ভাববে কেন? বাজারের চটিওয়ালারা, আমার প্রতিবেশীরা যারা ও দৃশ্য দেখেছিল তাদের সকলের চোখে ভাল লাগে নি ব্যাপারটা। হাসাহাসিও কিছু হয়েছিল ঐ কথা নিয়ে।

একটু থেমে, একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে তিনি আবার বললেন, পরকে কি দোষ দেব, বাবু! আমার নিজের স্ত্রীও ত তাই ভেবেছিলেন।

ছিঃ!—সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় গর্জ্জন করে উঠলেন যশোদা। মেয়ের শয্যা ছেড়ে উঠে এসে স্বামীকে ধমক দিলেন তিনি : কি যা-তা তুমি বলছ পরদেশী যাত্রীর কাছে!

তার পর আমার মুখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, আমি, বাবুজী, শুধু বলেছিলাম যে, মায়া যখন একটু পড়েছে দেখা যাচ্ছে তখন বেশ হ'ত ঐ গড়ুরের সঙ্গে সীতার বিয়ে দিতে পারলে।

আমার কল্পনা ত উদ্দীপ্ত হয়েই ছিল, আমি তৎক্ষণাৎ সায় দিয়ে বললাম : ঠিকই ত। আমিও ত তাই ভাবছিলাম।

সহানুভূতির স্পর্শে যশোদার মনে অবরুদ্ধ আবেগ উদ্বেলিত হয়ে উঠল যেন। আঁচল দিয়ে চোখের কোণ মুছে গাঢ়স্বরে তিনি বললেন : কত সহজে, বাবুজী, তুমি বুঝলে কথাটা। আর উনি? শুনে কি বলেছিলেন, জান?

আমার উত্তরের জন্ত অপেক্ষা করলেন না তিনি। স্বামীর দিকে একটি জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করবার পর আবার আমার মুখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, উনি বললেন যে, যে মেয়ের নাম সীতা, সে কেন উর্ব্বশী হবে।—

চমকে উঠলাম আমি—একটি মধুর স্বপ্নের মাঝখানে হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে গিয়েছে। কিন্তু জেগে ত উঠেছি পরিচিত জগতেই! তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেল আমার—দেবপ্রয়াগে এই শম্ভুজীর যে কঠোর রূপ দেখবার পর কঠিন পরিচয় পেয়েছিলাম। সচকিতে শম্ভুজীর মুখের দিকে চেয়ে দেখি, পাথরের মত কঠিন তাঁর মুখ—সেই সেদিন দেবপ্রয়াগের ঘাটে যেমন দেখেছিলাম তাঁকে—আমার দেওয়া দক্ষিণা প্রত্যাখ্যান করবার পর।

আমি তাঁর দিকে চেয়েছি দেখেই তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাৎ করে স্ত্রীর অভিযোগ স্বীকার করলেন শম্ভুজী। মুখেও তিনি বললেন, হাঁ, বাবু, নিশ্চয়ই বলেছিলাম ও কথা। এখনও তাই বলি আমি।

মৃদু, কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠস্বর তাঁর। দুই চোখে কেমন যেন স্বপ্নের আবেশ—তাঁর দৃষ্টি বুঝি বর্ত্তমান ছেড়ে সুদূর অতীতে চলে গিয়েছে।

কিন্তু পরক্ষণেই সেই চোখ দুটিই ধ্বক ধ্বক করে জ্বলে উঠল যেন। দৃপ্তভঙ্গিতে মাথা তুলে ক্রুদ্ধকণ্ঠে তিনি আবার বললেন, আমি জানি, বাবু, আমার সীতার কোন দোষ ছিল না। মূল দোষ আমার পুত্রের—কুলাঙ্গার, চণ্ডাল সে।

সে পশ্চাৎ-পটও উদঘাটিত হ'ল। থেমে থেমে, কখনও উত্তেজিত, কখনও করুণ সুরে সে কাহিনীও আমাকে শুনালেন শম্ভুজী।

তাঁর সব আশায় ছাই দিয়েছে পুত্র অযোধ্যানাথ। কি কুক্ষণেই যে তাকে তিনি চামোলির ইংরেজী স্কুলে পড়তে দিয়েছিলেন—কন্যা সীতার একেবারে বিপরীত হয়েছে সে। কি বিদ্যা যে সে অর্জ্জন করছে, তা জানেন না শম্ভুজী। তবে তার অবিদ্যার সন্তার নিজের চোখেই দেখেছেন তিনি। ব্রাহ্মণোচিত আচার-আচরণ একেবারে নেই অযোধ্যানাথের। দেবদ্বিজে ভক্তি লোপ পেয়েছে তার, ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক পর্য্যন্ত করে না সে। পিতাকে সে সাফ বলে দিয়েছে যে, যাজনের কাজ সে কিছুতেই করবে না। সংসারের আর কোন কাজেও লাগে না সে। চাষ-আবাদের কাজ করবে কি, ক্ষেত বা গোয়ালের ধার দিয়েও যায় না অযোধ্যানাথ। বোর্ডিং থেকে বাড়ীতে যখন সে আসে তখন বিজাতীয় সজ্জায় সেজে চোখে চশমা লাগিয়ে কব্জিতে হাত-ঘড়ি বেঁধে কেবল গায়ে ফু দিয়ে বেড়িয়ে বেড়ায় সে।

সেই অযোধ্যানাথ একদিন গড়ুরকে ভিক্ষা করতে দেখে তাঁদেরই বাড়ীর উঠানে স্বয়ং শম্ভুজীর চোখের সামনে দাঁড়িয়েই গড়ুরকে বলেছিল, শরীরটা ত, সাধুবাবু, দেখছি খুব শক্তই আছে তোমার। তবে ভিক্ষা কর কেন তুমি? খেটে খেতে পার না?

শম্ভুজীর মত সীতার কানেও গিয়েছিল সে কথা। তোতা-পাখীর মত সীতা আবার সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করেছিল। দিন কয়েক পর নিজেদের ক্ষেতে কাজ করতে যাবার পথে মন্দিরের সামনে গড়ুরের ঠিক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

চরম দুর্ঘটনাটি ঘটে যাবার পরে সীতাকে জেরা করতে করতে তার মুখেই শম্ভুজী শুনেছিলেন তার স্বীকারোক্তি, শুনেছিলেন তখন গড়ুর যে উত্তর দিয়েছিল তাও।

—ভাইয়া ত তোমাকে ঠিক কথাই বলেছে, সাধুজী। তুমি ভিক্ষা না করে কাজকর্ম্ম কর না কেন?

—কাজ আমাকে দেবে কে?

—কেন, আমিই দিতে পারি। চল না আমাদের ক্ষেতে ঘাস কাটতে।

—মজুরি কি দেবে?

—মজুরি আবার কি! খেতে দেব পেট ভরে।

এমনি আরও সব কথা হয়েছে দু'জনের মধ্যে, কথামত কাজও হয়েছে কিছু কিছু। দোষের কিছু যে নয়, তা শম্ভুজী নিঃসংশয়ে বুঝেছিলেন সীতার মুখের ভাব দেখে—পিতার প্রশ্নের উত্তর দিতে দু'একবার লাল হয়ে উঠেছে সীতার মুখখানি, কিন্তু কালো হয় নি একবারও।

সেদিন ত সীতা হেসে কুটি কুটি—মাঝখানের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানবার পূর্ব্বেই শম্ভুজী যেদিন গড়ুরকে দেখেছিলেন ঘাসের বোঝা পিঠে নিয়ে সীতার পিছনে পিছনে তাঁদেরই বাড়ীর প্রাঙ্গণে এসে উঠতে।

নির্ম্মল হাসিই শম্ভুজী দেখেছিলেন গড়ুরের মুখেও, কিন্তু পরে প্রতিবেশীদের মুখে যে হাসি তিনি দেখলেন তার প্রকৃতি স্বতন্ত্র—গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয় তা। আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ল মনের বিরক্তি স্ত্রীর কাছে প্রকাশ করবার পর উত্তরে যশোদার মুখের কথায়।

কঠোর প্রকৃতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরদিনই গড়ুরকে একান্তে ডেকে নিয়ে কর্ত্তৃত্বের কঠিন কণ্ঠে তাকে আদেশ করেছিলেন অবিলম্বে মণ্ডল চটির এলাকা ছেড়ে যেতে।

বিশ্বাস কর বাবুজী—শম্ভুজী সনির্ব্বন্ধকণ্ঠে আমাকে বললেন: সেদিন উপবীত আমি স্পর্শও করি নি, শুধু মুখে বলেছিলাম তাকে যে, ত্রিরাত্রি পূর্ণ হবার পূর্ব্বেই সে যদি এ গ্রাম ছেড়ে না যায় তবে ব্রহ্মশাপ লাগবে তার উপর।

তার পর বুঝি তৃতীয় রাত্রেই ঘটল সেই মর্ম্মান্তিক ঘটনাটি।

স্বপ্নের মত মনে পড়ে শম্ভুজীর। আর তখনও স্বপ্নই মনে হয়েছিল তাঁর। অন্ধকার ঘরের মধ্যে বিছানায় শুয়েই শুনেছিলেন তিনি সংক্ষিপ্ত কথাবার্ত্তাটুকু।

—তোমার বাবা আমাকে এ এলাকা একেবারে ছেড়ে যেতে বলেছেন—যেন গড়ুরের কণ্ঠস্বর।

উত্তরে যেন সীতা বললে, তবে চলেই যাও তুমি। আমার বাবা যে রকম রাগী মানুষ, হয় ত সত্যাই শাপ দিয়ে বসবেন।

তবে তুমিও চল আমার সঙ্গে।

না, ছিঃ! বিয়ে না হলে কি সঙ্গে যাওয়া যায়?

তবে চলি আমি—ভোর হয়ে এল।

তার পর ভিজা ঘাসের উপর দিয়ে পায়ে-চলার ছপ ছপ শব্দ যেন, কিন্তু একটু পরেই ছোট্ট, তীক্ষ্ণ আর্ত্তনাদ—ওঃ!

কি হ'ল?—সীতার গলা।

সংক্ষিপ্ত উত্তর গড়ুড়ের ক্লিষ্ট কণ্ঠে: সাপে কাটল বুঝি।

নিদ্রা ও জাগরণের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা তখন শম্ভুজীর। গা-মোড়া দিয়েছিলেন তিনি। আর সেই মুহূর্ত্তেই সম্পূর্ণ ঘুম ভেঙে গেল তাঁর।

সাপ, সাপ—

এবার আর অস্ফুট নয়, স্পষ্ট সীতার কণ্ঠস্বর। কথা নয়, আর্ত্তনাদ! শয্যা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন শম্ভুজী। ছুটে গিয়ে ঊষার অস্পষ্ট আলোকে দেখেন যে, ঘরের পিছন দিকে সব্জী বাগানের আলের উপর পড়ে ছটফট করছে সীতা, গোঁ গোঁ আওয়াজ তার কণ্ঠে, মুখে গাঁজলা উঠছে, প্রতি অঙ্গে আক্ষেপ—সেই দিনই আমরা যেমন দেখেছি প্রায় তেমনি।

সাপে কেটেছে, সাপে কেটেছে সীতাকে,—চীৎকার করে বলেছিলেন শম্ভুজী। শুনে বাড়ীর যশোদা ও প্রতিবেশী যারা ছুটে এল তাদেরও সেই সন্দেহ। সোরগোল, হৈ হৈ, কান্নাকাটি।

কিন্তু না। ঘণ্টাখানেক পরে জ্ঞান ফিরে এল সীতার। তখনও খুব দুর্ব্বল সে। কিন্তু বিষক্রিয়ার কোন লক্ষণই নেই তার দেহে।

সে সব স্পষ্ট দেখা গিয়েছিল সেই দিনই তাঁদের বাড়ী থেকে খানিকটা দূরে নীচে যাত্রী-সড়কের উপর নবীন সন্ন্যাসী গড়ুর মহারাজের মৃতদেহে।

ঠিক ঐ জায়গাটাতেই,—শম্ভুজী আমার মুখের দিকে চেয়ে তার কাহিনী শেষ করলেন: আজ যেখানে সীতা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল সেখানেই পাওয়া গিয়েছিল গড়ুরের লাশ। ঐ ঘটনার পর থেকেই বাবু, প্রায়ই এমন মূর্চ্ছা হয় সীতার,—আর বেশী করে ঠিক ঐ জায়গাটাতেই।

একটু থেমে স্বপ্নাবিষ্টের মত মৃদুস্বরে শম্ভুজী আবার বললেন, কারণ আছে বই কি! আসক্তি ত ছিলই গড়ুর মহারাজের, তার উপর অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে তার। আত্মার ত সদ্গতি হয় নি। অতৃপ্ত কামনা নিয়ে সেই প্রেতাত্মা এখনও এদিকে বিচরণ করে—সুযোগ পেলেই ভর করে এসে সীতার উপর।

যন্ত্রচালিতের মতই সবেগে মাথা নেড়ে অস্বীকার করলাম আমি—যুক্তিবাদী মন আমার এমন ব্যাখ্যা মানতে চায় না। যন্ত্রচালিতের মতই আমার চোখ দুটি গিয়ে পড়ল সীতার মুখের উপর। মূর্চ্ছা ভাঙবার পর ঘুমিয়ে পড়েছে সে। হাত-পা সবই কম্বল দিয়ে ঢাকা। কিন্তু সম্পূর্ণ মুখখানিই দেখা যায়। এখন অবসাদে ঈষৎ বিবর্ণ তা। তবু অপূর্ব্ব সুন্দর। একটি যেন প্রস্ফুটিত স্থলপদ্ম—সারাদিন রোদে পুড়ে এলিয়ে পড়েছে।

আমি ফিরে শম্ভুজীর মুখের দিকে চেয়ে বললাম, ওর বিয়ে দেন না কেন ঠাকুরমশায়?

বিয়ে!—

এমনভাবে কথাটা বললেন শম্ভুজী যেন, প্রচণ্ড একটি ধাক্কা খেয়ে হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছেন তিনি। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি সশব্দে হেসে উঠলেন।

উদ্‌ভ্রান্তের মত হাসতে হাসতে তিনি বললেন, কে ওকে বিয়ে করবে, বাবু? এই পাহাড়ের দেশে শক্ত মেহনৎ করতে না পারলে মেয়ের আদর হয় না। সীতা আমার খোঁড়া বলেই ত সময়মত ওর বিয়ে হয় নি। তার উপর এল এই কলঙ্ক। আর কি বিয়ে হয় ও মেয়ের!—

ক্রমশঃ



ভারতে জনসমস্যার রূপ

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

স্বাধীন ভারতের যে কয়েকটি বড় সমস্যা আছে তাহার মধ্যে অসম্ভব জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে সর্ব্বপ্রধান স্থান দেওয়া হইয়া থাকে। দেশে অন্নাভাব যথেষ্ট আছে, যতটা আছে তাহার অনেকটা হয়ত স্বার্থদুষ্ট অতিলোভী মানুষের সৃষ্ট, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সরবরাহের একটা বড় অসামঞ্জস্য না থাকিলে বৎসরের পর বৎসর ক্রমেই ভোজ্যবস্তুর মূল্য উর্দ্ধমুখী হইয়া থাকিতে পারিত না। এখন খাদ্যতণ্ডুলের উৎপাদন প্রতি বৎসর যে হারে বাড়িতেছে; তাহা অপেক্ষা লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রুততর গতি লইয়া চলিতেছে। ব্যবধান ক্রমেই দীর্ঘতর রূপে প্রকাশ পাইতেছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির শব্দ সৃষ্টি করিবার যে শক্তি আছে, মানুষের ভোজ্য উৎপাদন-ব্যাপারে তাহা নাই। হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে কৃষিপণ্যের উৎপাদন যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হয়, তাহা এক বৎসরের সুবৃষ্টির অভাবে কঙ্কালরূপে নরসমাজে আবির্ভূত হইয়া থাকে।

এতৎসত্ত্বেও লোকবৃদ্ধির সমস্যা যে কি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে অনেকেরই ধারণা নাই। আর এই বৃদ্ধির হার চলিতেছে তাহার নানারূপ প্রতিকূল অবস্থা উপেক্ষা করিয়া, বলা বাহুল্য তাহাতেই ইহার গুরুত্ব বেশী।

আইন দ্বারা বিবাহের বয়স বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই আইন অবশ্য বাল্য (?) বিবাহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিতে পারে নাই, কিন্তু বহুলাংশে যে প্রযুক্ত হইতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে দ্বাদশ হইতে চতুর্দ্দশ বৎসরের যে সংখ্যক সন্তানবতী নারী দেখা যাইত, নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সে সংখ্যা অতিমাত্রায় কমিয়াছে। অপ্রাপ্তবয়স্কের বিবাহে আইনগত বাধা যতটা না করিয়াছে অর্থনৈতিক অবস্থার চাপ তাহা অপেক্ষা বহুগুণে বিবাহের বয়সের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। মানুষের নিজ স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের প্রতি লোভ বাড়িয়াছে, সুতরাং স্ত্রীপুত্রকন্যার বা অপরপক্ষে স্বামী, পুত্র ও শ্বশুরালয়ের প্রভাব (অত্যাচার) হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে বিবাহের কাল ক্রমেই পিছাইতেছে। তাহা ছাড়া স্ত্রীলোকের মধ্যে শিক্ষালাভের একটা তীব্র স্পৃহা জাগিয়াছে; ধনীর ত কথাই নাই, মধ্যবিত্ত দরিদ্র ঘরেও এই লক্ষণ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং এই এক কারণেই বালিকা-বিবাহ ভীষণ বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে।

তাহা ছাড়া সমস্যার গুরুত্ব হ্রাস করিবার চেষ্টায় "পরিকল্পনা"র প্রথম হইতেই আর্থিক ও মাতার কায়িক শক্তি-সামর্থ্যের অধিক সন্তান লাভের বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে প্রচারকার্য্য চলিতেছে; পরিবার নিয়ন্ত্রণের জ্ঞান বিস্তারেও ত্রুটি নাই। কিন্তু উপরিউক্ত সকল বাধাই বিফল হইতে বসিয়াছে।

গত আদমসুমারি (১৯৫১) কালে ভারতের লোকসংখ্যা ছিল ৩৫,৬৭,৪১,৬৬৯; আর ইউ-এন-ও'র ১৯৫৭ সনের মধ্যবার্ষিকী হিসাবে ইহা ধরা হইয়াছে ৩৯,২৪,৪০,০০০ জন। পৃথিবীর জনসংখ্যা ১৯৫০ সনের ২৪৯·৩০ কোটি লক্ষের স্থলে (১৯৫৭) ২৭৯·৫ কোটি লক্ষ লোকে দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে জন্মহার প্রতি হাজারে ৩৪ এবং মৃত্যুহার ১৮ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।

স্বাধীনতা লাভের কাল হইতে প্রতি বৎসর জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে প্রায় অর্দ্ধ কোটি; অর্থাৎ দুই বৎসর কোনও রকমে পার হইয়া গেলে মোটামুটি এক কোটি লোক বাড়িতেছে। অন্ন উৎপাদন এই ভাবে বৃদ্ধি পায় নাই, পাওয়া সম্ভবও নয়। প্রতি বৎসর বৃদ্ধি হিসাব সংখ্যাতালিকায় নিম্নলিখিত রূপ দাঁড়ায়:

সাল	বৃদ্ধি (হাজার)	পূর্ব্ব বৎসর হইতে বৃদ্ধি (হাজার)
১৯৪৭	৩৪,৫০,৮৫	...
১৯৪৮	৩৪,৯৪.৩০	৪৩,৪৫
১৯৪৯	৩৫,৩৮,৩২	৪৪.০২
১৯৫০	৩৫,৮২,৯৩	৪৪.৬১
১৯৫১	৩৬,২৭,৯০	৪৪,৯৭
১৯৫২	৩৬,৭৫,৩০	৪৭,৪০
১৯৫৩	৩৭,২৩,০০	৪৭,৭০
১৯৫৪	৩৭,৭১,৩০	৪৮,৩০
১৯৫৫	৩৮,২৩,৯০	৫২,৬০
১৯৫৬	৩৮,৭৩,৫০	৪৭,৬০
১৯৫৭	৩৯.২৪,৪০	৪০,৯০
১৯৫৮	৩৯,৭৫,৪০	৫১,০০

অর্থাৎ সহজ ভাষায় বলা যায়, ১৯৫৮ সনের ভারতবর্ষে আনুমানিক লোকসংখ্যা ৩৯,৭৫,৪০,০০০ বা ৪০ কোটি এবং ১৯৫৭ হইতে ১৯৫৮ এক বৎসরে জন্ম হইতে মৃত্যুসংখ্যা বাদ দিয়া মোট ৫১ লক্ষ লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্থূল কথা,

দুই বৎসরে কিঞ্চিদধিক এক কোটি লোক বাড়িয়া চলিতেছে। আর এই বৃদ্ধির হার ক্রমেই বিস্তৃত হইবে, কারণ প্রতি বৎসরই অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকা বিবাহিতা ও সন্তানধারণে সমর্থা হইবে এবং প্রতি বৎসর যত লোক মারা যায় তাহার অধিক এই বয়সের যুবতী সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

আলোচনা-প্রসঙ্গে যাঁহারই সহিত জনসমস্যার কথা প্রথম উঠিয়া পড়ে, তাহার অধিকাংশই বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন যে, বৎসরে ৫০ লক্ষ লোক বৃদ্ধি পাইতেছে। শতকরা নব্বই জনের ধারণা যে, ভারতে মোট নবজাতকের সংখ্যাই ৫০ লক্ষ অপেক্ষা কম। যাহা বলা হইয়াছে উক্ত ধারণা যে ভুল, তাহা নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা উচিত। যাহা হউক, অতিরিক্ত কিঞ্চিৎ প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।

ভারতে প্রতি বৎসর মোট (জীবন্ত) শিশু জন্মসংখ্যা ১৯৪৮ হইতে ১৯৫৫ পর্য্যন্ত নিম্নে দেওয়া যাইতেছে। ইহা ছাড়া প্রসবকালীন বা তৎপূর্ব্বে ভ্রূণ অবস্থায় যাহাদের মৃত্যু ঘটিয়াছে তাহাদের হিসাব ইহাতে নাই। আর যে সকল স্বাভাবিক সজীবন জন্ম সরকারী হিসাবের খাতায় জমা পড়ে নাই, তাহার সংখ্যাও নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু সংখ্যাও প্রদর্শিত হইল। যে সংখ্যক জন্ম-সংবাদ রেজেষ্ট্রী হয় না, মৃত্যু সম্বন্ধে সে কথা প্রযোজ্য নহে, কারণ অধিকসংখ্যক মৃতের অন্ত্যেষ্টি সরকারী কর্ম্মচারী গোচরীভূত না করিয়া সম্পন্ন করার সম্ভাবনা কম।

	রেজেষ্ট্রীকৃত জন্মসংখ্যা	মৃত্যু সংখ্যা
১৯৪৮	৬১,৯৬,০০৮	৪১,৬৭,৮৭৭
১৯৪৯	৬৭,৬২,১৩১	৪০,৪৪,৪২৫
১৯৫০	৬৭,২৮,৭২৩	৪৩,৩২ ৬৮৪
১৯৫১	৬৮,৭৬,৫১৭	৩৯,২৯,৫০৬
১৯৫২	৭০,৫২,৭৩৬	৩৮,৪৩,৮২১
১৯৫৩	৬৯,৬৯,৩৫৮	৪০,৫৭,২০০
১৯৫৪	৬৯,৫২,৪১০	৩৫,৬৬,৩০৫
১৯৫৫	৫৮,৫৫,৮৫৪	২৫,২৩,৫২০

জন্ম ও মৃত্যুর উদ্ধৃত সংখ্যা পূর্ব্বে বর্ণিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত কিছু তারতম্য দেখা যাইবে। তাহার প্রধান কারণ প্রথম হিসাবে যেখানে রেজেষ্ট্রী বাধ্যতামূলক নয় সেরূপ এলাকার এবং যাহা মোটেই পঞ্জীভূত হয় নাই, অথচ বৃদ্ধির হার দেখিয়া হিসাব করা যাইতে পারে, এরূপ সংখ্যাও ধরা হইয়াছে।

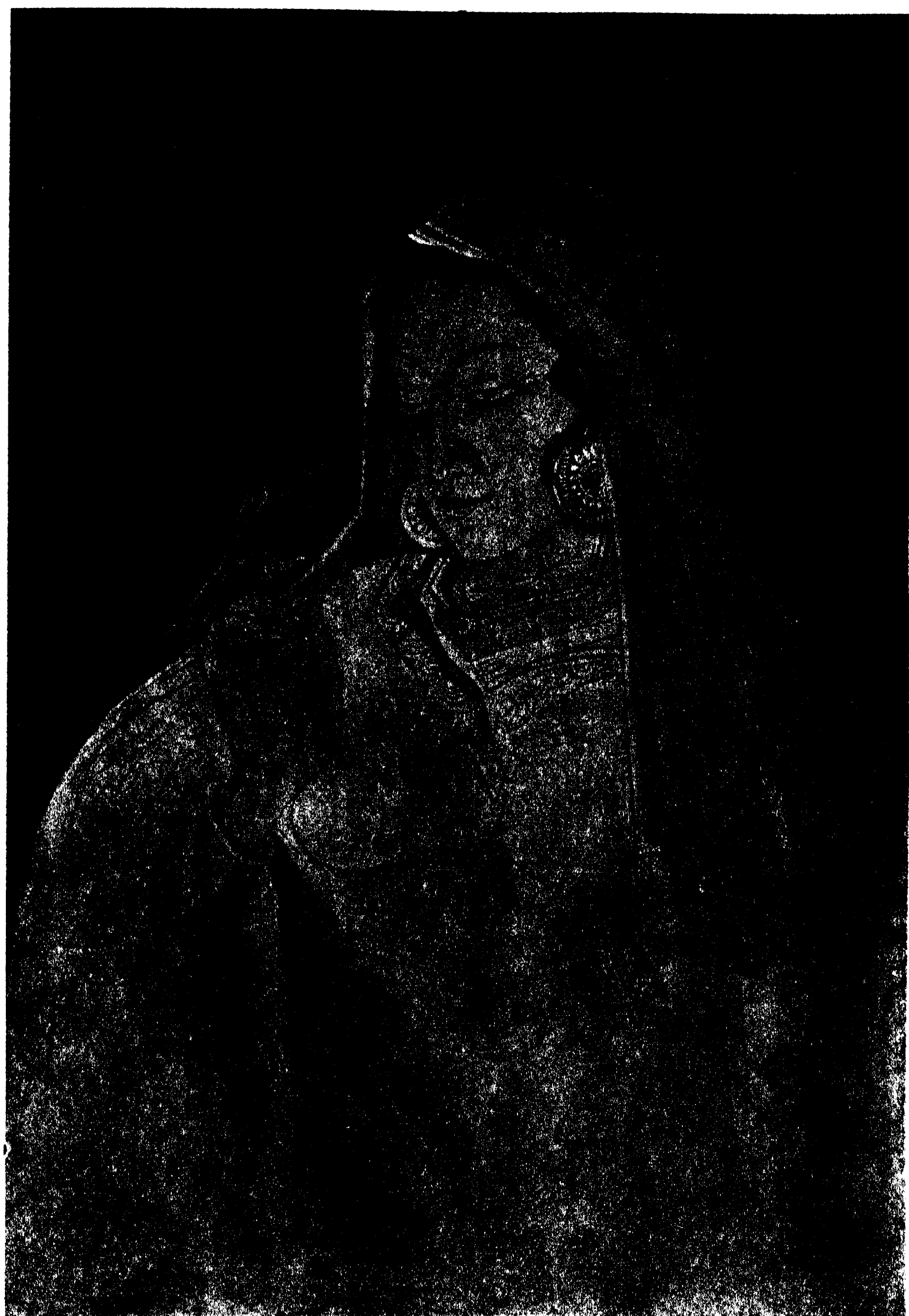
এখন জন্মহার যদি প্রায় সমানই থাকে এবং মৃত্যুহার দ্রুত হ্রাস পায়, তাহা হইলে সমস্যার গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ইহাই বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয় বস্তু। নিম্নে গত কয়েক বৎসরের প্রতি হাজারে জন্ম ও মৃত্যুহার দেওয়া হইতেছে :

	জন্মহার লোকসংখ্যার প্রতি হাজারে	মৃত্যুহার লোকসংখ্যার প্রতি হাজারে
১৯৪৮	২৫.২	১৭.০
১৯৪৯	২৬.৪	১৫.৮
১৯৫০	২৪.৯	১৬.১
১৯৫১	২৪.৯	১৪.৪
১৯৫২	২৫.৪	১৩.৮
১৯৫৩	২৪.৮	১৪.৫
১৯৫৪	২৪.৪	১২.৫
১৯৫৫	২৭.০	১১.৭
১৯৫৬	২৭.৪	১১.৬
১৯৫৭	২৪.২	১১.৮

এখন জন্মের হার যদি প্রতি হাজারে ২৪-এর নীচে নামিতে না চায় এবং কোনও কোনও বৎসর ২৭ বা ২৭.৪ হয় এবং মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ১৭ হইতে নিয়মিত হারে কমিয়া ১১.৮ হয় তাহা হইলে বিনা বিচারেই বলা যায়, দেশ জনসংখ্যার বন্যায় ভাসিয়া যাইতে বসিয়াছে।

আমার মনে হয়, পরিবার নিয়ন্ত্রণের যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে এবং যে পরিমাণ অর্থব্যয় হইতেছে তাহার তুলনায় ফল আশানুরূপ কেন কোনও উল্লেখযোগ্য ফল হইতেছে না। আর মৃত্যুহারের সম্পর্কে বলা যায় যে, গত যুদ্ধকালীন ভারতে অবস্থিত আমেরিকার সৈনিকদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার্থে যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহাতেই ম্যালেরিয়া প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ লোপ পায় ; এই ম্যালেরিয়াকে "রাক্ষসী" নামে অভিহিত করা হইত, কারণ কেবল ম্যালেরিয়া হইতে বার্ষিক মৃত্যুসংখ্যা অবিভক্ত ভারতে ৪০ লক্ষ বা ততোধিক ছিল। তাহার পর স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে বর্ত্তমানে যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে বা হইতেছে তাহাতে মৃত্যুর হারের উপর যথেষ্ট প্রভাব পড়িয়াছে। ফলে এই হার হ্রাস পাইতে পাইতে প্রায় ইংলণ্ডের লোকের মৃত্যুহারের কাছে পৌঁছিয়াছে। আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে অবশ্য এই হার আরও নিম্নস্তরে পৌঁছিয়াছে।

অধিকসংখ্যায় লোক হত্যা করিবার যুক্তি কেহ দিবে না, কিন্তু পরিমিত ভাবে যাহাতে লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তাহার আরও সুষ্ঠু এবং ফলদায়ক ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া প্রয়োজন।



প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

আত্মনিমগ্না

শ্রীপ্রভাত নিয়োগী

[প্রবাসী, ১৩৪৩ কার্ত্তিক হইতে পুনর্মুদ্রিত

খাজুরাহো

শ্রীভূপেশচন্দ্র দাস

উত্তর ও মধ্যভারত ভ্রমণে বের হয়েছি আমরা। আমাদের দলে রয়েছে আবালবৃদ্ধবনিতায় জন চল্লিশেক—বাংলা দেশের অতি ক্ষুদ্র একটি সংস্করণ বললেই চলে। একটি পুরো বগী আমাদের দখলে। এই বগীতেই আমাদের আহার, বিহার, স্নান ও শয়ন।

জব্বলপুর পরিক্রমা সেরে আমরা রওনা হলাম খাজুরাহোর উদ্দেশ্যে। মানিকপুর জংশনে ট্রেন বদলাতে হ'ল। মানিকপুর ও ঝাঁসির মাঝপথে, অনেকটা ঝাঁসির দিকেই পড়ে হরপালপুর ষ্টেশন। হরপালপুর থেকেই যেতে হয় বাসে করে খাজুরাহোতে। খাজুরাহো এখান থেকে ৬২ মাইল।

৮ই অক্টোবর ১৯৫৯। খুব ভোরে উঠেই খাজুরাহো যাত্রার তোড়জোড় সুরু হয়ে গেল। উদ্বেগে আনন্দে আমরা রাত তিনটে-সাড়ে তিনটেতেই উঠে পড়েছি। হাতমুখ ধুয়ে, প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে জামাকাপড় পরে সবাই আমরা প্রস্তুত সাড়ে চারটের মধ্যেই। কিন্তু দেরী করে ফেললেন মহিলারা। তাঁরা পছন্দসই শাড়ীই খুঁজে পান না। এ জন্যেই বোধ হয় শাস্ত্রকারেরা লিখেছেন—পথি নারী বিবর্জ্জিতা। তাঁরাও বোধ করি আমাদের মতই ভুগেছেন।

যা হোক, আমাদের বাস ছাড়ল ভোর পাঁচটা পনেরোয়। হরপালপুর থেকে খাজুরাহোর রাস্তাটি অতি চমৎকার। দু'পাশে নিম ও আমগাছের সারি। পথের দৃশ্যাবলী নয়নাভিরাম। বেশ সুন্দর সিধে রাস্তাটি। খাজুরাহো গ্রামে পৌঁছতে আমাদের সময় লাগল প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা। বাস থেকে নেমেই চোখে পড়ল সুবিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অনেকগুলো মন্দির। সমগ্র অঞ্চলটি সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে রয়েছে।

খাজুরাহোর প্রাচীন নাম হচ্ছে খর্জ্জুরবাটক বা খর্জ্জুরবাহ। খর্জ্জুরবাটক এক সময়ে ছিল মধ্যযুগের চন্দেল্লগণের রাজধানী। মনে হয় এই অঞ্চলে এককালে প্রচুর খেজুরগাছ ছিল বলেই এই নাম। আমরা কিন্তু একটাও খেজুরগাছ দেখতে পেলাম না। চন্দেল্লগণের রাজ্য ছিল জেজকভুক্তিতে, অধুনা বুন্দেলখণ্ড। কয়েক শতাব্দী ধরে খাজুরাহো তৎকালীন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নগরসমূহের অন্যতম বলে বিবেচিত হ'ত। বিখ্যাত ভ্রমণকারী ইবন বতুতা তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে খাজুরাহোর মন্দিরগুলোর উল্লেখ করেছেন।

নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত চন্দেল্লগণ মধ্যভারতে রাজত্ব করেন। এঁরা ছিলেন রাজপুত বংশীয় হিন্দু রাজা। প্রথমে চন্দেল্ল-রাজারা ছিলেন বিষ্ণুর উপাসক। পরবর্ত্তী যুগে শিবই তাঁদের প্রধান উপাস্য হয়ে দাঁড়ায়। তাই খাজুরাহোতে বিষ্ণু ও শিব উভয়েরই মন্দির রয়েছে। তবে শিবমন্দিরের সংখ্যাই বেশী। আর রয়েছে জৈন মন্দির। খাজুরাহোর মন্দিরগুলো ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত বলে পণ্ডিতরা অনুমান করেন। যতদূর জানা যায়, এখানে সবশুদ্ধ পঁচাশীটি মন্দির তৈরী হয়েছিল। এখন মাত্র কুড়িটি টিঁকে আছে মহাকালকে ফাঁকি দিয়ে।

খাজুরাহোর মন্দিরগুলো স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। মন্দিরশিল্পের সুসংবদ্ধ নমুনা হিসাবে এরা অদ্বিতীয়। প্রতিটি মন্দির সুউচ্চ ভিত্তির উপর স্থাপিত। প্রতি মন্দিরেই চারটি করে ক্রমোন্নত স্তবক বা অংশ। সকলের পেছনে রয়েছে সর্ব্বোচ্চ শিখরটি। দেখে মনে হয় এভারেষ্টের পাদদেশ জুড়ে অবস্থান করছে কয়েকটি ক্রমোচ্চ শিখর। সর্ব্বোচ্চ শিখরের তলায়ই রয়েছে বিগ্রহমূর্ত্তি বা লিঙ্গ। এদিক থেকে উড়িষ্যার মন্দিরের সঙ্গে এদের কিছুটা মিল রয়েছে। উড়িষ্যার মন্দিরগুলোতেও রয়েছে চারটি অংশ—মূলমন্দির, জগমোহন, নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপ। কিন্তু এই চারটি অংশ যেন পৃথক পৃথক, খাজুরাহোর মন্দিরগুলোর মত ঘননিবদ্ধ নয়। উড়িষ্যার মন্দিরের মত এদেরও শিখরে রয়েছে আমলক। তবে উড়িষ্যার মন্দিরে আমলক যে প্রাধান্য পেয়েছে এখানে সে প্রাধান্য অনুপস্থিত। শিখরের গায়ে ছোট-বড় বহু শিখর সংযোজনার ব্যাপারে খাজুরাহোর মন্দিরের সঙ্গে গয়ার বিষ্ণুপদ মন্দিরের কিছুটা মিল খুঁজে পেলাম। যদিও অলংকরণ বৈচিত্র্যের ব্যাপারে শেষোক্ত মন্দিরটি অনেকটা পিছিয়ে আছে।

খাজুরাহোর মন্দিরগুলো আরেকটা বিষয়ে উড়িষ্যার মন্দির-গুলোর সমগোত্রীয়। সেটা হচ্ছে মন্দিরগাত্রে বহু বিচিত্র অলঙ্করণের সঙ্গে নরমিথুন বা বন্ধকাম মূর্ত্তির অবস্থিতি। তবে ভুবনেশ্বর ও কোনারকের মন্দিরে এরা যে বিপুল পরিমাণে রয়েছে এখানে সেরূপ সংখ্যাধিক্য নেই। তবে যা আছে তাও নেহাৎ কম নয়। শিল্পসৃষ্টি হিসাবে এগুলো অতুলনীয়। মৈথুনের বিভিন্ন ভঙ্গি রূপায়িত হয়েছে ভাস্কর্য্যের অলঙ্কৃতিতে। বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রের বিশেষ কয়েকটি অধ্যায় উৎকীর্ণ রয়েছে বিচিত্র ছন্দে, বিচিত্র সৌন্দর্য্যে। কেন যে এই ধরনের অশ্লীল (?) মূর্ত্তি দেবমন্দিরগাত্র অলঙ্কৃত করছে তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। কেউ বলেন, নরনারীর এই মিথুনমূর্ত্তি হচ্ছে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদের প্রতীক। কেউ মনে করেন, বজ্রভয় নিবারণের উদ্দেশ্যে এদের সৃষ্টি। কারও মতে জীবনকে পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে শিল্পী জীবনের অন্যান্য দিকের চিত্রের মত এগুলোকেও নিরাবরণ সত্যের স্বীকৃতিতে

পাষাণগাত্রে রূপায়িত করেছেন। কেউ কেউ আবার মনে করেন, দেবদর্শনে আগন্তুক দর্শকের চিত্তে যদি এই আপাত-অশ্লীল মূর্তিগুলো কোন রেখাপাত করতে না পারে তবেই তিনি বাইরের এই কাম-ক্রোধাদি ষড়্‌রিপুর আক্রমণপাশ কাটিয়ে ভেতরে বিগ্রহমূর্তি দেখার সার্থক অধিকারী। নানা জনে বলে নানা কথা। কিন্তু আমি বলি এরা শিল্পেরই অঙ্গ, জীবনের সহজ সত্যের সরল প্রকাশ। বিন্দুমাত্র অশ্লীলতা নেই এতে। অশ্লীল ভাবলেই অশ্লীল। উলঙ্গ শিশুর নগ্নতা কি অশ্লীল? তা কি সহজ সৌন্দর্য্যের পরিপোষক নয়?

মন্দির পরিক্রমার পথে প্রথমেই পড়ল বরাহমন্দির। এখানে রয়েছে সুন্দর সুমসৃণ একটি বরাহমূর্তি। ইনি সামান্য বরাহ নন, বরাহ-অবতার ভগবান বিষ্ণু। সুবিরাট এই বরাহমূর্তির সর্বশরীর জুড়ে বহু দেবদেবীর ছোট ছোট মূর্তি উৎকীর্ণ। কদর্য্য একটি শূয়োরের মূর্তি যে এত সুন্দর ও মহিমময় হতে পারে তা এ মূর্তিটি না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। বরাহের দশনশিখরে রয়েছে কে একজনের ভগ্ন মূর্তি। শুধু পা দুটি রয়েছে অভগ্ন। মনে হ'ল এ হচ্ছে হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপুর বড় ভাই। বরাহরূপী ভগবান হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন। কিংবা এও হতে পারে ভগ্ন মূর্ত্তিটি হচ্ছে পৃথিবীর। জয়দেবের দশাবতার স্তোত্রের সেই শ্লোকটি মনে পড়ল—

বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না।
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃত শূকররূপ জয় জগদীশ হরে॥

বরাহমন্দিরের সামনেই লক্ষ্মণ ও মতঙ্গেশ্বরের মন্দির। খাজুরাহোর মন্দিরগুলোর মধ্যে একমাত্র লক্ষ্মণ মন্দিরের চার কোণে চারটি নাতিবৃহৎ শিখর মন্দির রয়েছে। এগুলো মন্দিরের সুউচ্চ ভিত্তির উপরেই চারটি কোণে স্থাপিত হয়ে মন্দিরের শোভা বর্দ্ধন করছে। খাজুরাহোর সব মন্দিরই সুন্দর। তবে তাদের মধ্যে যেগুলো সৌন্দর্য্যের দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ মন্দির তাদের অন্যতম। অনুরূপ বা ততধিক সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট মন্দির হচ্ছে কন্দর্য্য-মহাদেবের মন্দির, বিশ্বনাথের মন্দির, পার্শ্বনাথের মন্দির ইত্যাদি।

চন্দেল্লরাজ যশোবর্ম্মণ (৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ) এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ করান। তাঁর অপর নাম লক্ষ্মণ বর্ম্মণ থেকেই এই মন্দিরের নাম হয় লক্ষ্মণ মন্দির। নাম যাই হোক আসলে এটি একটি বিষ্ণু মন্দির। বিচিত্র অলঙ্করণসৌকর্য্যে ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যে লক্ষ্মণমন্দির অতুলনীয়। সমগ্র মন্দিরের ভেতরে-বাইরে কঠিন পাষাণের গায়ে কত যে কারুকার্য্য, প্রাণহীন পাষাণকে জীবন্ত করে তোলার কি কঠিন প্রয়াস! শিল্পীর কি অলোকসামান্য নৈপুণ্যই না প্রকাশিত হয়েছে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত এই সু-উৎকীর্ণ পাষাণনিচয়ে। এখানে দেখতে পেলাম মুকুরধারিণী সেই বিখ্যাত নায়িকার মূর্ত্তিটি। মন্দিরেক্ষণার সমগ্র মুখমণ্ডলে এক সুস্মিত অথচ সুগঠিত ভাবের ব্যঞ্জনা। আয়নায় নিজের মুখাকৃতি দেখে কি অপূর্ব্ব ভাবাবেশ। তার সমগ্র শরীরে স্বাস্থ্যের লাবণ্যের পেলবতার কি অপরূপ সমাবেশ। মনে মনে বললাম, ওগো অজ্ঞাতনামা নায়িকা, তোমার দেহবল্লরীর হিল্লোল তোমার সৃষ্টির বহুশত বৎসর পরে আজও আমার হৃদয়ে তুলছে কলকল্লোল উচ্ছ্বাসে আবেগে আনন্দে। মরি মরি! কি অনবদ্য ছন্দে তুমি ছন্দায়িত। তুমি কে, আর কে সেই শিল্পী কঠিন পাষাণকে মন্থন করে যে তোমায় অমৃতরূপ দিয়েছে, শাশ্বত করে রেখে দিয়েছে তোমায় চিরসজীবতার পাষাণবন্ধনে? তুমি কি তার মানসী প্রিয়া? তুমি কি তার পাষাণী কায়া?

মন্দিরের যেদিকে তাকাই সেদিকেই দেখি পাষাণীভূত সৌন্দর্য্যের নীরব আহ্বান। কত বিচিত্র সুন্দর দেবদেবীমূর্ত্তি, কত নয়নরম্য পদ্মপলাশের সুচিত্রিত অলঙ্কৃতি। কত নরমিথুন, সর্প-মিথুন, সিংহশার্দুল ও শালভঞ্জিকার ছড়াছড়ি।

সৌন্দর্য্যানুভূতিজনিত ভাবাবেগের স্থায়িত্বকালটা বোধ হয় একটু বেশীক্ষণ ধরেই ছিল। তাই কিছুক্ষণ পরে চেয়ে দেখি আমার অন্যান্য সঙ্গীরা অন্য মন্দির দেখতে বেরিয়ে পড়েছে, এ মন্দিরে শুধু আমিই পড়ে রয়েছি।

লক্ষ্মণ মন্দিরের দক্ষিণ পাশেই মতঙ্গেশ্বর শিবের মন্দির। এ মন্দিরের বিশেষত্ব এর বিগ্রহলিঙ্গটি। ৮ ফুটেরও বেশী উঁচু এবং প্রায় ৪ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট এই সুবিশাল লিঙ্গটি। এত বড় শিবলিঙ্গ আমি এর আগে কখনও দেখিনি। ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরের শিবলিঙ্গই আমার এর আগে দেখা শিবলিঙ্গের মধ্যে সর্ববৃহৎ ছিল। মতঙ্গেশ্বর সে রেকর্ড ভঙ্গ করলেন। জয় মতঙ্গেশ্বরের!

মতঙ্গেশ্বরের মন্দিরের দক্ষিণে এখানকার মিউজিয়ম। মিউ-জিয়মটি দেখবার মত। অজস্র ভগ্ন, ভগ্নপ্রায়, অভগ্ন সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি ও প্যানেলে মিউজিয়মটি সমৃদ্ধ। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন ধারার শিল্পকর্ম্মের মহৎ দৃষ্টান্ত রয়েছে এখানে। একটি গণেশমূর্ত্তি আমাদের সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করল। নৃত্যরত গণেশের সর্বাঙ্গে নৃত্য হিল্লোল। ভুঁড়িটি এত স্বাভাবিক এবং সুন্দর যে, আমরা কেউ-ই লম্বোদরের সে সুডৌল সুবৃহৎ ভুঁড়িটিতে হাত বুলানোর লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। গণেশের কাছে আমরা যেন তখন-কার মত ছেলেমানুষ হয়ে গিয়েছিলাম।

মিউজিয়মের কাছেই বিরাট এক দীঘি। এতে লোকে স্নানাদি করে ও পুণ্যফল অর্জ্জন করে। আমরা এমনই পাষণ্ড যে, পুণ্যফল নাগালের মধ্যে পেয়েও স্নান করি নি।

লক্ষ্মণ মন্দিরের কিছু পেছনে উত্তর দিকে খাজুরাহোর সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির—সুউচ্চ, সুবিস্তৃত, সু-অলঙ্কৃত কন্দর্য-মহাদেবের মন্দির। এর উচ্চতা ও দৈর্ঘ্য প্রায় সমান। প্রস্থ দৈর্ঘ্যের অর্দ্ধেকের চেয়ে একটু বেশী। (উচ্চতা ১০১´ ৯´´, দৈর্ঘ্য ১০২´ ৩´´ এবং প্রস্থ ৬৬´ ১০´´)। এর আকার ও আয়তনের সৌষম্য একে বিশিষ্ট সৌন্দর্য্যে ভূষিত করেছে। মন্দিরের প্রবেশপথের দু'পাশে সৈনিকের সঙ্গে ক্রীড়ারত সিংহের মূর্ত্তি। সিংহ অবলীলাক্রমে অনেকটা যেন হাস্যচ্ছলে, সৈনিক-পুরুষের সঙ্গে ক্রীড়া করছে। মূর্ত্তি দুটি কৌতূহলোদ্দীপক।

এই মন্দিরটি বহুশত বৎসরের প্রাচীন হলে কি হবে, মনে হয় যেন মাত্র কয়েক বছর আগে তৈরী হয়েছে, এমনি সুন্দর এর বর্তমান অবস্থা। মন্দিরগাত্রের প্রতি ইঞ্চি পরিমিত স্থান অলঙ্করণ-সমৃদ্ধ। এবং সে অলঙ্করণবৈচিত্র্য বর্ণনাতীত। ভাস্করের ছেনী লেখকের লেখনীকে হার মানায়। এ শুধু দেখে দেখে মুগ্ধ হবারই ব্যাপার। মন্দিরের প্রতি স্তম্ভ, প্রতিটি প্রত্যঙ্গ, ভিতরের ছাদ, অলিন্দ, গবাক্ষ, মানুষ-জন্তু-জানোয়ার থেকে সুরু করে ফল-ফুল-পাতার সুচিত্রিত ভাস্কর্যে সুসমৃদ্ধ। বিভিন্ন বাদ্যবাদনরত বিচিত্র ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান নারীমূর্ত্তি, দেবদেবীর বহুবিধ মূর্ত্তি, বামনমূর্ত্তি—সর্ব্বত্র মূর্ত্তিতে মূর্ত্তিতে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে শিল্পরস। মণ্ডনশিল্পের এত নয়নানন্দকর নিদর্শন বোধ করি আর কোথাও নেই এবং এর বেশী আর কিছু হতে পারে কি না তা আমাদের চিন্তায় আসে না। মন্দিরগাত্রে সুরসুন্দরীরা উৎকীর্ণ। কেউ পায়ে দিচ্ছে আলতা, কেউ চোখে পরাচ্ছে কাজল, কেউ লীলাকমল হাতে দাঁড়িয়ে আছে, কেউ দয়িতের জন্য অপেক্ষা করছে, কেউ পত্রলিখনরতা, কেউ প্রসাধননিবিষ্টা। এদের দাঁড়াবার ভঙ্গি, দেহের ছন্দ, চোখের দৃষ্টি, বরতনুর সালিত্য এত মনোমুগ্ধকর, এত নয়নাভিরাম যে, অপলক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে হয় অনেকক্ষণ ধরে। চেয়ে চেয়ে আর তৃপ্ত হয় না, আরও দেখতে ইচ্ছে করে। বিদ্যাপতির ভাষায় বলতে ইচ্ছে হয়—"জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।"

সৌন্দর্য্যের সুনিবিড় প্রকাশে কন্দর্য্য মহাদেবের মন্দির অপ্রতি-দ্বন্দ্বী, অদ্বিতীয়। আমি বারকয়েক মন্দিরটির ভেতর-বার ঘুরে ঘুরে দেখলাম। দেখছি আর মুগ্ধ হচ্ছি, মুগ্ধ হচ্ছি আর দেখছি। আর অন্তরের সর্ব্বোত্তম শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সেই সব স্থপতি এবং ভাস্করদের উদ্দেশ্যে যাঁরা তাঁদের অতিলৌকিক শিল্পপ্রতিভার অদ্বৈত দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন এই সব মন্দিরের গঠননৈপুণ্য ও শিল্পসমৃদ্ধির মধ্যে। ধন্য তাদের রূপকল্পনা, ধন্য তাদের ধৈর্য্য, শ্রম ও শিল্পদক্ষতা!

কন্দর্য্য-মহাদেবের মন্দিরের উত্তরে দেবী জগদম্বার মন্দির। এটা আগে নাকি বিষ্ণু মন্দিরই ছিল। পরে কোনও সময়ে বিষ্ণু-মূর্ত্তি অপসারিত হয়ে সে জায়গায় এই দেবীমূর্ত্তি স্থাপিত হয়। এই দেবীই জগদম্বা নামে কথিতা হয়ে আসছেন। মন্দিরটি ছোট, গঠনরীতি অন্যান্য মন্দিরের মতই।

এর কাছেই উত্তরদিকে হচ্ছে চিত্রগুপ্ত বা ভরতজীর মন্দির। নাম যাই হোক না কেন এটা হচ্ছে আসলে সূর্য্যমন্দির। মন্দিরাভ্যন্তরে বেদীর উপরে প্রমাণ মাপের অতি সুন্দর একটি সূর্য্য-মূর্ত্তি রয়েছে। এই মন্দিরের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের জীবনযাত্রার বাস্তবানুগ অলঙ্করণ। মন্দিরের বহির্গাত্র এই ধরনের বিচিত্র চিত্রমূর্ত্তি দ্বারা অলঙ্কৃত। এ ছাড়া রয়েছে রাজকীয় শোভাযাত্রার ছবি, নৃত্যশীলা রমণীর ছন্দোময় চিত্র, শিকারের দৃশ্য ইত্যাদি। কোণারকের সূর্য্যমন্দিরের একটি বিশেষ অলঙ্করণ এখানেও চোখে পড়ল। জানি না এটা সূর্য্য মন্দিরমাত্রেরই অলঙ্কৃতি কি না। কোণারকের মন্দিরে যেমন ভূমিরেখা বরাবর মন্দিরগাত্রের সমগ্র পরিসীমা বেষ্টন করে রয়েছে হস্তীচিত্রের বিঘৎ-প্রমাণ চওড়া একটি সুসংবদ্ধ রেখা, এখানেও তেমনই একটি হস্তিময় পরিবেষ্টনী রয়েছে। হস্তী, হস্তিশাবক, হস্তিশিকার, মত্তহস্তীর যুদ্ধ প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে উৎকীর্ণ এই প্যানেলটি সমস্ত মন্দিরগাত্র বেষ্টন করে রয়েছে। তবে হস্তিময় অলঙ্কৃতিটি এখানে ভূমিরেখা বরাবর নয়, আরও উপরে। মন্দিরটি খুবই সুন্দর।

রাস্তার একদম কাছেই হচ্ছে বিশ্বনাথের মন্দির। এই মন্দিরটিকে কন্দর্য্য-মহাদেবের মন্দিরের ছোট সংস্করণ বললেই হয়। ক্রমোচ্চ শিখরগুলির অলংকরণে অল্প কিছু বৈসাদৃশ্য ছাড়া আর সব বিষয়ে আকৃতিতে ও অনুকৃতিতে মন্দির দুটিকে এক ধরনেরই মনে হয়। তবে অলংকরণপ্রাচুর্য্যে কন্দর্য্য মহাদেবের মন্দিরের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য্য। বিশ্বনাথের মন্দিরের সামনেই রয়েছে নন্দীর মন্দির একই ভিত্তির উপর। মহাদেবের বাহন এই অতিকায় নন্দীবৃষটি মূর্ত্তি-শিল্প হিসাবে কত সুন্দর। এর উচ্চতা ৬ ফুট এবং দৈর্ঘ্য ৭ ফুটেরও বেশী। গা খুব মসৃণভাবে পালিশ করা।

মন্দির দেখে দেখে আমাদের চোখ ক্লান্ত, হেঁটে হেঁটে পা দুটো পরিশ্রান্ত। কিন্তু মন এখনও উৎসুক, সে চায় আরও দেখতে, এবং আরও অনেক মন্দির বাকীও রয়েছে দেখার। আমরা ত মাত্র পশ্চিমগোষ্ঠীর মন্দিরগুলো দেখলাম। খাজুরাহোর মন্দিরগুলো অবস্থিতি অনুযায়ী তিন ভাগে বিভক্ত—(১) পশ্চিমগোষ্ঠী, (২) পূর্ব্বগোষ্ঠী এবং (৩) দক্ষিণগোষ্ঠী। প্রধান সড়কের একেবারে কাছেই রয়েছে বলে আমরা প্রথমে পশ্চিমগোষ্ঠীর মন্দিরগুলিই দেখে নিলাম। দক্ষিণগোষ্ঠীর মন্দিরগুলি এখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে। সেখানে এবার আর যাওয়া হবে না। পূর্ব্বগোষ্ঠীর মন্দির দেখেই ফিরে যাব।

রাস্তার ধারে একটা রেস্তোরাঁ। বিশ্বনাথের মন্দিরের ওপাশে, সেখান থেকে কে যেন আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকল। দেখি সেখানে সমবেত হয়েছে আমাদের দলের অন্যান্য যুবকেরা—সুকুমার সাধন, জানকী, উষাপ্রসন্ন, সাবিত্রিপ্রসন্ন, সুপ্রভাত ইত্যাদি। আমিও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। চা-টা খাওয়া হ'ল। আর সেই সঙ্গে বায়ুরোধক টিনের ডালমুট। ডালমুটের গন্ধে কিনা জানি না কিছুক্ষণ পরেই সেখানে উপস্থিত হলেন আমাদের দলের তরুণীরা। তাঁরা আমাদের চায়ে ও ডালমুটে ভাগ বসালেন। তবে সুখের বিষয় নারীসুলভ লজ্জাবনত ডালমুটের টিনটি তাঁরা একেবারে সাবাড় করেন নি। আমাদের জন্যও কিছু রেখেছিলেন।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আমরা রওনা হলাম পূর্ব্বগোষ্ঠীর মন্দিরগুলো দেখতে। সবাই গেলেন না, বৃদ্ধবৃদ্ধারা রয়ে গেলেন, তরুণতরুণীরাই আমরা গেলাম। গ্রামের পথ, হাঁটতেও হবে কম নয়, তাই আমরা মেয়েদের এগিয়ে দিয়ে তাদের কাছ থেকে সম্ভ্রমব্যঞ্জক দূরত্ব বজায় রেখে পথশ্রম লাঘবের জন্য যে যার টক খালি করে চুটকী গল্প বলতে বলতে পথ চলতে লাগলাম। উষাপ্রসন্নরই টক

বেশী, তবে তার গল্পগুলি আমেরিকান। অন্যান্যদের মধ্যে সুকুমার ও জানকী বেশ সরস গল্প পরিবেশন করছিল। এদের গুলো হচ্ছে দেশী। আমিও একটি বিলিতি চুটকী ছাড়লাম। আমাদের উৎকট হাসির হো হো শব্দে মেয়েরা বার বার পেছন ফিরে তাকাচ্ছিল। বোধ হয় ভাবছিল, এদের হ'ল কি? এদের হাসির লক্ষ্য কি আমরা?

পূর্ব্বগোষ্ঠীর মন্দিরের মধ্যে আদিনাথ ও পার্শ্বনাথের মন্দিরই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও অনেক পরবর্ত্তী কালে নির্ম্মিত একটি সুন্দর জৈনমন্দির রয়েছে এখানে। এখানকার অধিকাংশ মন্দিরই হচ্ছে জৈনদের। এদের মধ্যে পার্শ্বনাথের মন্দিরই সর্ব্বোত্তম। এখানে একটি সুবিরাট মূর্ত্তি রয়েছে পার্শ্বনাথের। পার্শ্বনাথ মন্দিরের গায়ে যে বিচিত্র কারুকার্য্য রয়েছে তা অতুলনীয়। কত বিভিন্ন সুশোভন ভঙ্গিতে দণ্ডায়মানা রমণীমূর্ত্তি রয়েছে এখানে তার ইয়ত্তা নেই। পত্রলিখনরতা, অলক্তকরাগ অঙ্কনকারিণী, পদতলবিদ্ধ কণ্টক-উন্মোচননিরতা, প্রসাধন বিলাসিনী, বৃক্ষশাখা-ধারিণী, (শালভঞ্জিকা)—কত লীলায়িত ভঙ্গিতে এরা উৎকীর্ণা। এতৎসহ রয়েছে অন্যান্যবিধ অলঙ্করণ।

পার্শ্বনাথ মন্দিরের কাছেই আদিনাথের মন্দির। এটি ছোট কিন্তু অলঙ্করণের সূক্ষ্মতায় অনবদ্য। এর আশে-পাশে আরও কয়েকটি ছোট ছোট মন্দির রয়েছে। মন্দির প্রাচুর্য্যে যে খাজুরাহো এক সময়ে সুসমৃদ্ধ ছিল তা বর্ত্তমানের মন্দিরগুলো এবং বিধ্বস্ত মন্দিরের ভিত্তিসমূহের অবস্থান থেকেই নির্ণয় করা যায়।

মন্দিরগুলো বেশ নির্জ্জন, সংস্কারের অভাবে মন্দির-প্রাঙ্গণের কোণায় কোণায় এখানে-সেখানে ছোট ছোট গাছপালা গজিয়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে ফুলের গাছও রয়েছে বেশ কিছু। সব ফুলের নাম জানি না। কে যেন আমার হাতে এনে দিল কিছু সাদা ফুল। শুঁকে দেখলাম বেশ সুগন্ধ। চামেলী। এত বড় চামেলী এদিকে জন্মায়, চামেলীর প্রসঙ্গে মনে পড়ল একটি হিন্দী কহাবত বা প্রবাদ—"ছুছুন্দরকা শিরপর চামেলীকা তেল।" অর্থাৎ বাঁদরের গলায় মুক্তা হার।

দুপুরের উত্তপ্ত রোদ মাথায় নিয়ে যখন ফিরে এলাম স্থানীয় ডাকবাংলোয় তখন ক্ষিদের পেট চোঁ-চোঁ করছে, নাড়ীভুঁড়ীগুলো হজম হয়ে যাবার জোগাড়। পশ্চিমের জলহাওয়ারই এমন গুণ যে, খুব ক্ষিদে পায়, বিশেষতঃ বাঙালীদের। তাড়াহুড়ো করে কোন রকমে স্নান সেরে নিয়ে ডাকবাংলোর বাগানে বসে গেলাম আমরা গোল হয়ে ডান হাতের কসরতে। এই ডাকবাংলোতেই আমাদের রান্নার জোগাড় করা হয়েছিল। মুখে দিয়ে দেখি, ওরে বাবা, খিচুড়ীতে কি ঝাল! চাটনী দাও, চাটনী দাও। পেটে কিছু ভোজ্য পদার্থ যা হোক করে ঢুকিয়ে ভিজে গামছা-টামছাগুলোকে জড়ো করে আমরা উপস্থিত হলাম আমাদের রিজার্ভ বাসখানি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে। হরপালপুর ষ্টেশন থেকে আজ বিকেলেই আমরা রওনা হব গোয়ালিয়রের দিকে।

বাসে বসে বসে পর্য্যালোচনা করছিলাম 'কি দেখিলাম।' ন' শো থেকে এগারো শ' বছরের প্রাচীন সব মন্দির আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাগর্ব্বী মানুষের কাছে এ এক পরম বিস্ময়। মধ্য যুগটাকে কুসংস্কারের যুগ বলা হয়ে থাকে প্রায়শঃ। কিন্তু এই কি কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের চিন্তাধারার নমুনা? জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শিল্পরুচি ও অর্থে-সামর্থ্যে কতখানি সমৃদ্ধ হলে এই ধরনের রূপকল্পনা সম্ভব? একটা জাতি সভ্যতার কতখানি সমুন্নত শীর্ষে উঠলে তার মধ্যে এই ধরনের উচ্চ মননশীলতা ও মানসিকতা গড়ে ওঠে? জানি, এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারব না এবং চেষ্টাও করব না দিতে। শুধু প্রাণ ভরে দেখে গেলাম বহুখ্যাত বহুবিশ্রুত খাজুরাহোর মন্দির-শিল্পের অবিস্মরণীয় নিদর্শন, মনের মনিকোঠায় রেখে দিলাম এর অদ্ভুত সুন্দর চিত্রাবলী আর জানিয়ে গেলাম আমার হৃদয়মথিত একটি প্রণাম—সেই সব অখ্যাত-অজ্ঞাত স্থপতি ও ভাস্করদের উদ্দেশ্যে, যাদের শিল্পীমানসের চরমোৎকর্ষতার প্রতীক হিসাবে আজও দাঁড়িয়ে আছে খাজুরাহোর এই অনবদ্য মন্দিরগুলো তাদের নয়নাভিরাম মহীয়ান মূর্ত্তি নিয়ে।

[এই নিবন্ধ রচনায় ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত একখানা গাইড বুকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।]



পাড়াগাঁয়ের কথা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

গত শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে পাড়াগাঁ সম্বন্ধে আমার মনে একটা আনন্দ ও ভবিষ্যৎ আশার ভাব জেগে উঠেছিল। উপরি উপরি দু'বছর আমার গ্রাম অঞ্চলে চাষ-আবাদের পক্ষে উপযুক্ত পরিমাণ বারিপাত একেবারেই হয় নাই। পুকুর-ডোবা সব বিশুষ্ক হয়ে গিয়েছিল; স্নান-পান দূরের কথা, বাসন মাজার জলও প্রায় কোনও জলাশয়ে ছিল না। দু' বছর চাষের জমি প্রায় সব পতিত পড়েছিল; মাঠে তৃণগাছটিও ছিল না। আমার অঞ্চলে দুই-চারিটি বৃহৎ জলাশয় ছাড়া আর জলাশয় নাই। পুষ্করিণীর গর্ভ আগাছায় ভর্ত্তি হয়ে গিয়েছিল। অতি অল্পসংখ্যক যে কয়টি নলকূপ পাড়াগাঁয়ে চালু আছে, সেইগুলি মাত্র ভরসা ছিল। কিন্তু এবার মনে খুব আশা ও ভরসা হয়েছিল। আকাশের বৃষ্টির উপর আর সম্পূর্ণ নির্ভরতার আবশ্যক নাই। বৃষ্টি যতটুকু হয়েছে, হয়েছে। দামোদর পরিকল্পনায় সেচ-খালের জল (ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনারও বটে) আমাদের মাঠের বেশীর ভাগ চাষের জমিতে "উঠেছে।" আমন ধানের আবাদ অতি চমৎকারভাবে হয়েছে। অনেক বছর এমন ভালভাবে ধানের চাষ, আমাদের অঞ্চলের চাষীরা করতে পারে নাই। এবার নিশ্চয় গরীবেরাও দু'মুঠো ভাত খেতে পাবে। ছয় মাস কাল যাবৎ কৃষি-শ্রমিকেরা বেঁচে আছে "টেষ্ট রিলিফের" কাজ করে, দৈনিক মজুরী হিসাবে আড়াই সের গম তাদের রোজগার। তাও কিন্তু সারা সপ্তাহকাল নয়, অসংখ্য কর্ম্মপ্রার্থী; তাই সপ্তাহে গড়ে তিন-চার দিনের বেশী কাউকেও কাজ দেওয়া সম্ভব হয় নাই। এবার কৃষি-শ্রমিকেরা ধান রোয়ার কাজ পেয়েছে। এর পর নিড়ানো, কাটা, তোলা ও ঝাড়ার কাজ মিলবে। জমির মালিকেরা কম জমিরই হউক, আর বড় জোতদারই হউক সবারই সুবিধা হবে। সেচের জল পাওয়া যাবে, খাল, পুকুর ডোবা প্রভৃতি হইতে আলু, কপি প্রভৃতি আয়কর ফসলের চাষের জন্য। এককথায় এই খাদ্যাভাবক্লিষ্ট পশ্চিম বাংলার অনেকখানি অন্ততঃ এবার সরকারের "পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার" রূপায়ণের কিছুটা সুফল ভোগ করবে।

কিন্তু সব আশা-ভরসা-আনন্দ নির্ম্মূল হয়ে গেল। হতভাগ্য পশ্চিম বাংলার গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী! মহাভারতে, দুর্য্যোধনের "হরিষে বিষাদের" কথা আছে। এখন আমাদেরও তাই হ'ল যে! প্রকৃতির এ কি রুদ্রমূর্ত্তি! একি প্রচণ্ড বর্ষণ! দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার একি সর্ব্বনাশা রূপ! 'উপরে ঝরিছে বারি ঝরঝর, গুরুগুরু দেয়া ডাকে", "বেগে ধেয়ে আসে ছেড়ে দেওয়া জল, কাটাখাল বুকে বুকে।" জানি না আমাদের শহরবাসীরা এ প্রচণ্ড প্লাবনের ধ্বংসলীলা অনুমান করতে পেরেছেন কি না। খবরের কাগজে বন্যার ও ক্ষয়ক্ষতির অনেক বিবরণ এবং আলোকচিত্র প্রকাশিত হয়েছে। ইহা হতে অনেকে কিছুটা অনুমান করতে পারবেন। কিন্তু সে অনুমানের পরিধি কতটুকুই বা!

আমার নিজ গ্রাম আঁটপুর এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলের কথাই একটু বলি। এই গ্রামের অধিবাসীদের আমন ধান চাষের জমি প্রধানতঃ যে মাঠে রয়েছে, সেই কয়েকবর্গ মাইলব্যাপী "কাঁকড়ির মাঠে" আজ ধানের চিহ্নমাত্রও নাই। এইরকম শুধু একটি মাঠই নহে, এই অঞ্চলের বহু মাঠের ধানগাছ প্লাবনে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েছে। গরীব লোকের অনেক মাটির ঘর ভূমিসাৎ হয়েছে; পুকুর-ডোবা "ভেসে" গেছে, রাস্তাঘাট নষ্ট হয়েছে। সরকার এই অঞ্চলে যে নূতন পাকারাস্তা নির্ম্মাণ করেছিলেন, সেগুলিও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশ ঘরেরই দেওয়াল মাটির, ঐ সকল বিদ্যালয়-গৃহের বেশীর ভাগই অত্যন্ত জখম হয়েছে। সমস্ত অঞ্চলটিতে যেন একটা "ওলট-পালট" হয়ে গেছে।

সরকার সাধ্যমত যতটুকু করতে পারেন করছেন। নানাস্থানে "ত্রাণ-সমিতি" গঠিত হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক দল "কোমর বেঁধে" লাগলেও বে-সরকারী সাহায্যের তেমন কোনও ব্যবস্থা এ অঞ্চলে এখনও দেখা যাচ্ছে না। সরকার যে সাহায্য পাঠাচ্ছেন তাহাও সুষ্ঠুভাবে বণ্টিত হয় না, এইরূপ অভিযোগও দুর্লভ নহে।

এখন ধানকাটার কাজ চলছে। কৃষি-শ্রমিকদের এখন কাজ মিলছে, তারা সপরিবারে উপবাসের ক্লেশ থেকে কিছুটা মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু শীতের পীড়নও বড় কম নহে। ঘরের চাল শতছিদ্র, পরিধেয় বস্ত্রই নাই; শীতবস্ত্রের কথা কল্পনা মাত্র। শীতে "জানুভানু কৃশানুই" ভরসা। তারা এতে কতকটা অভ্যস্ত।

পাড়াগাঁয়ে আগেকার মত ম্যালেরিয়ার প্রবল প্রতাপ আর নাই। কিন্তু অন্য রোগ প্রধানতঃ, পেটের অসুখের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। ভেজালদ্রব্য ইহার একমাত্র কারণ না হলেও অন্যতম প্রধান কারণ বটে। পাড়াগাঁয়ে এখন অনেক জায়গায় সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশে পূর্ব্বের তুলনায় অনেক বেশী সংখ্যক "পাশ করা ডাক্তার" চিকিৎসা ব্যবসায়ে লিপ্ত রয়েছেন। শিক্ষার বিস্তার হওয়ায়, সাধারণভাবে মানুষও স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি জানছে, এবং ঐগুলি পালনে সচেষ্ট আছে, তবে অর্থের অভাব। যাহা হউক, এই সকল কারণে জনস্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভাল মনে হলেও উপযুক্ত পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবের প্রতিক্রিয়াও জনস্বাস্থ্যেরই মধ্যে বেশ প্রতিফলিত হচ্ছে।

শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে ইহা স্বীকার করতেই হবে, শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারে সরকার আগ্রহশীল,তবে মন্থরগতিতে। তবে যে-সব শিক্ষা-পরিকল্পনা চালু করার চেষ্টা ও ব্যবস্থা হচ্ছে সেগুলির উপযুক্ততা এখনও পরীক্ষিত হয় নাই। এজন্য আরও ধৈর্য্য, সময় ও পরীক্ষার প্রয়োজন আছে। পল্লীঅঞ্চলবাসীদের বালক-বালিকা-দের জন্য 'বিশেষ' ধরণের শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়া দরকার। উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা সংগ্রহ করার সমস্যা এখনও ঠিক আগেকার মতই অমীমাংসিত রয়েছে। এ সম্বন্ধে সরকার নির্ব্বিকার আছেন। শুধু আমার গ্রামাঞ্চলের উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি নহে, যতদূর জানি পশ্চিম বাংলার কোনও অঞ্চলেই ঐ শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলি নির্দ্দিষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকা সংগ্রহ করতে সক্ষম হন নাই। অথচ, সরকার প্রারম্ভিক বেতনহারের সংশোধন করে উহা বর্দ্ধিত করার বিষয়ে নীরব ও নিষ্ক্রিয় রয়েছেন। দেশের শিক্ষার মানের উন্নতি কি এই পথেই চলবে? গৃহ-নির্ম্মাণ ও সাজ-সরঞ্জামাদির জন্য সরকার অর্থবরাদ্দ করছেন, পাঠক্রম রচনা করেছেন,বিদ্যালয়ের পুস্তকাগারের উন্নতিবিধানের বন্দোবস্ত হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীরও অভাব নাই। অভাব মাত্র একটি—সামান্য একটি মাত্র শিক্ষক-শিক্ষিকার। অর্থাৎ "নুন-লেবু" সবই আছে—নাই কেবল অন্ন! এই শিক্ষক-শিক্ষিকা সংগ্রহ করতে অক্ষমতার প্রত্যক্ষ ফল নিম্নরূপ। এম-এ, এম, এস-সি, অথবা অনার্স প্রাপ্ত গ্রাজুয়েট ছাড়া আর কোনও শিক্ষকের নিযুক্তি সরকার অনুমোদন করেন না, এবং ঐরূপ নির্দ্দিষ্ট যোগ্যতাহীন শিক্ষক নিযুক্ত করা হলে (যেমন, পাশ কোর্সে উত্তীর্ণ গ্রাজুয়েট) তাঁদের বেতন বাবদ "গ্রাণ্ট-ইন্-এইড" মঞ্জুর করবেন না! সুতরাং নূতন শিক্ষক নিযুক্ত না করেও, উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কার্য্য, পূর্ব্বে যখন ঐ সকল বিদ্যালয় দশশ্রেণীর সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় ছিল, তখন যত জন শিক্ষকের নিযুক্তি সরকার মঞ্জুর করেছিলেন, কেবল সেই সংখ্যক শিক্ষক দ্বারাই, চালিয়ে যেতে হচ্ছে। উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে, ক্ষেত্র বিশেষে এক, দুই বা ততোধিক সংখ্যক "কোর্সের" অধ্যাপনার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তাহার ফলে, নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণী, "ইলেকটিভ অর্থাৎ ঐচ্ছিক" বিষয়গুলি অধ্যাপনার জন্য বিভিন্ন "গ্রুপে", অর্থাৎ দলে বিভক্ত হয়ে যায়। মনে করুন, কোনও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে তিনটি 'কোর্স' পড়বার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সে ক্ষেত্রে ঐ তিনটি শ্রেণীকে নয়টি গ্রুপে পড়াতে হবে। কিন্তু বিদ্যালয়টির, দশশ্রেণী বিদ্যালয় থাকা-কালীন, ঐ দুইটি শ্রেণীর জন্য কোনক্রমেই তিনজনের বেশী শিক্ষক নিয়োগের অনুমোদন নাই। এখন আপনারা ভাবিয়া দেখুন, তিনজন লোকে কি করিয়া একসঙ্গে নয়টি শ্রেণীতে অধ্যাপনা করবেন? কিন্তু জেনে বিস্মিত হবেন, খুব বেশী সংখ্যক বিদ্যালয়েরই এই অবস্থা। আমি একটি তিন কোর্স শিক্ষাদানের অনুমতিপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে পরিচালনা, এবং বহুমুখী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিবিধ আপিস-সংক্রান্ত ও অন্তবিধ বহুপ্রকারের কর্ত্তব্যসম্পাদনের পরে সপ্তাহে "ত্রিশ পিরিয়াড" ক্লাস লইতে হয়, ইহা দেখেছি। গত কয়েক বৎসর যাবৎ এইরূপ অবস্থা চলছে।

সরকার, যতদিন না উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকগণকে আকর্ষণীয় বেতনহার দেন, ততদিন এই অবস্থার কোনও উন্নতির সম্ভাবনা আছে কি? শহরগুলিতে, গৃহশিক্ষকতা এবং কোচিং ক্লাস পরিচালনা দ্বারা অতিরিক্ত অর্থোপার্জ্জনের পথ রয়েছে। সেজন্য, ঐ সব অঞ্চল নির্দ্দিষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক, উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির পক্ষে সংগ্রহ করা একেবারে অসম্ভব নহে। কিন্তু পল্লী অঞ্চলে—যেখানে শহরবাসের সুখসুবিধাও নাই, বেতনছাড়া, অতিরিক্ত রোজগারের কোন পথও নাই, সেখানে, কি হতে পারে?

উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা আগামী ১৯৬০সনের মার্চ্চ মাসে প্রথম গৃহীত হবে। এই পরীক্ষায় পল্লী অঞ্চলের এমন কি শহর অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীরা কিরূপ কৃতিত্ব দেখাতে পারবে, তাহা বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ, এবং অভিভাবকগণ, কেহই অনুমান করতে পারছেন না। ছাত্র-ছাত্রীদেরও আগামী পরীক্ষায় নিজেদের কৃতিত্বের সম্ভাবনা সম্বন্ধে কোনও ধারণা নাই। গ্রামের কথা কিছু বলতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে পাড়াগাঁয়ের লোকেদের ব্যাপক বেকারত্ব ও তাহার ফলস্বরূপ ভয়াবহ দারিদ্র্য। এখানকার যারা শ্রমিক পর্য্যায়ভুক্ত, তাদের অধিকাংশকেই বৎসরের অন্ততঃ অর্দ্ধেককাল বেকার থাকতে হয়। ইহার প্রতিকারের জন্য, দেশ-হিতৈষী মাত্রেরই সচেষ্ট হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু, ইংরেজ-শাসকদের আমল থেকেই, পাড়াগাঁগুলি অবহেলিত, বর্ত্তমানেও, ইহার বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন হয়েছে—এরূপ বলা যায় না। তাহা না হইলে, পাড়াগাঁয়ের অর্থনৈতিক দুর্দ্দশার এতদিন কিছুটা প্রতিকার নিশ্চয়ই হ'ত।

কথা উঠতে পারে, কি ভাবে গ্রামীণ অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হওয়া সম্ভব? ইহার উত্তর অর্থনীতি-বিশেষজ্ঞ ও দেশহিতৈষী বিজ্ঞব্যক্তিগণ অনেক বারই দিয়েছেন। দেহের সমস্ত রক্তকে শুধু মস্তিষ্কে স্থান না দিয়ে সারা দেহে সঞ্চারিত করাই যেমন কর্ত্তব্য দেশেও শিল্পোৎপাদন সংস্থাগুলির মধ্যে যেগুলি ক্ষুদ্রতর এবং আধুনিক কুটিরশিল্প হিসাবে পল্লী অঞ্চলে গড়ে তোলার যোগ্য, সেগুলিকে পাড়াগাঁয়ে প্রতিষ্ঠিত করলেও এই বেকারত্বের ও অর্থ-নৈতিক দুর্দ্দশার অবসান বা লাঘব ঘটতে পারে। অবশ্য গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষি এখনও প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। যন্ত্রশিল্পের যুগে হস্তশিল্প প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে, এইরূপ হতে বাধ্য। ফলে গ্রামের হস্তশিল্পী সম্প্রদায় (artison class) বেকার হচ্ছে। কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে সমগ্র সমাজ-সমষ্টির উন্নতি হয়, তাহার ব্যবস্থার আশু প্রয়োজন।

তবে একথাও স্বীকার্য্য যে, শুধু সরকার সবকিছু করতে পারেন

না। পশ্চিমবঙ্গে অন্ত রাজ্য থেকে বহু শ্রমশীল লোক এসে শুধু যে জীবিকা অর্জ্জন করছে, তাহা নহে, তারা সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। একটা আমার দেখা উদাহরণ দিই। ৫।৬ বৎসর আগে, এক বিহারী দম্পতি উপার্জ্জনের তাগিদে আঁটপুর হাইস্কুলের এক শিক্ষকের বাটিতে কৃষি-শ্রমিক হিসাবে আসে। কিছুদিন পরে আঁটপুর রেল ষ্টেশনের তদানীন্তন ষ্টেশন মাষ্টারকে অনুরোধ করে, 'যে সব বড় বড় মুদীখানার মালিক রেলপথে আপনার ষ্টেশন দিয়ে মাল আমদানি করে, আপনি দয়া করে বলে দিন, তাঁহারা আমাকে অল্প পরিমাণে "মালপত্র" যেন ধারে দেন। আমি আপনার ষ্টেশনের পাশেই একটি মুদীখানা খুলিব। বিক্রয়ের টাকা থেকে একবারের ধার শোধ করে আবার 'ধারে' মাল লইব।"

ষ্টেশন মাষ্টার খুব দয়ালু ছিলেন, রাজী হলেন। সেই দম্পতি এখন এখানে বাড়ী কিনেছে, চাষের জমি কিনেছে, আরও শুনি, কারবারটির দাম এখন কয়েক হাজার টাকা। কিন্তু কই? আমার গ্রামের কেহ ত এ রকম উদাহরণ দেখাতে পারে নি।

শেষ কথা, পাড়াগাঁয়ের দিকে রাষ্ট্র ও সমাজের সবিশেষ দৃষ্টিপাতের অত্যন্ত প্রয়োজন হয়েছে। নতুবা, পল্লী অঞ্চলগুলি, যেখানে পশ্চিমবঙ্গের শতকরা ৭৫ জন লোক বাস করে, অবহেলিতই থেকে যাবে। ফলে জাতির অগ্রগতি ব্যাহত হবেই হবে।

তবু দেখ সে তোমার আছে

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

প্রভাত আকাশ 'পরে ওঠে শুকতারা,
পথিকেরে এনে দেয় দিনের কিনারা।
ফুল ফোটে নিকুঞ্জ ছায়ায়,
ভ্রমর গুঞ্জরি ফিরে পাতায় পাতায়।
এল বুঝি তার মধু দিন,
এ ফুল, ও ফুল তাই তার স্পর্শে হয় সে নবীন।
উপরেতে চেয়ে থাকে "তারা" শিশিরে ভেজান আঁখি,
মনে হয় এর চেয়ে জগতে সত্য আছে নাকি?
পথিকের কণ্ঠ বেড়ি "তারা" যদি হেসে কথা বলে,
কেড়ে নেয় মন তার আপনার মন-শতদলে,
সে মুহূর্ত মিথ্যা কভু নয়?
শোন তবে কহিব নিশ্চয়,—
উদ্ভিন্ন কুসুম সনে, ঝরে যাওয়া পাপড়ির নাহি পরিচয়।
ধীরে ধীরে ফুল পড়ে ঝরে,
বিস্মৃতি বেদীর 'পরে,
আকাশের রং যায় টুটে,
মিথ্যা হয় শুকতারা—মুছে যায়,—
ক্রমে হায়,
সূর্য তবে উঠে।
সেও মিথ্যা হায়।
খর রৌদ্রে পথিক হাঁকিয়া যায়,
ঘর্মক্লান্ত প্রখর প্রকাশে,
কেহ হাসে…কেহ ভালবাসে।
দিবসের দরিদ্র সে আলো
অজস্র আঘাতে রচে আঁধারের কালো।
বেলা বয়ে যায়,
অন্তিম গগনে শেষ রংয়ের ছটায়।
থর থর বিশ্বচরাচর,
ডুবে গেল প্রদীপ্ত ভাস্কর।
এখনি যা সত্য ছিল মিথ্যা হয়ে গেল সে এখনি,
পথিকের পরিক্রমা সমুখের আঁধার রজনী।

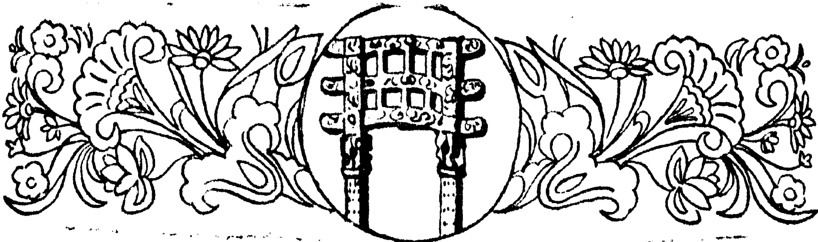
সন্ধ্যাতারা উঠিল আকাশে,
ধীরে বহে দখিনা পবন মৃদুমন্দ মলয় সুবাসে।
"তারা" বলে হে পথিক তুমি মোর কবি,
আমার মালঞ্চে আঁকা তোমারই সে ছবি।
তোমার যাত্রার পথ সন্ধ্যাতারা জানে,

যতটুকু আছে আলো,—ধন্য হব সেইটুকু দানে।
মনে হয় এমন আশ্বাস যাঁর,
তারে হায় অবিশ্বাস করিব কেমনে,
মনে হয় অনন্তের রূপহার,
আছে এর সত্য সমর্পণে।

এও সত্য নহে,
পথিক ফুকারি কহে,
কোথা তুমি ওগো "তারা"
উপরে জমেছে মেঘ,—অন্ধকারে করে দিশেহারা।
হঠাৎ চীৎকার,
বায়ু বহে দুর্নিবার,
মেঘে মেঘে চুল ছেঁড়াছিঁড়ি,
এ উহার কণ্ঠ যেন ধরেছে আঁকড়ি,
"তারা" ভরা আকাশেরে ছিন্নভিন্ন করে দেয় বুঝি,
দন্ত কড়মড়ি এ উহারে বজ্রমুষ্টি মারে সমতালে যুঝি।
কর্দমে ঢেকেছে পথ,
ভেঙ্গে গেছে যাত্রারথ,
তবু যেতে হবে রাত্রির আহবে,
ছিন্নবস্ত্র···সিক্তদেহ, সাঁপটিয়া দুই হাতে,
পাদক্ষেপে, নিমজ্জিত প্রতি পদখানি,
টানি টানে,
চলিয়াছে সে প্রলয় রাতে।

চারিদিকে গোপন নাগিনীদল করে কিলবিল,
ডানা ভাঙ্গা শঙ্খচিল,
দূর বনে করুণ কাঁদুনী গায়,
হায়,—
এ কি আর্তনাদ···এ কি সারা সৃষ্টির ক্রন্দন?
কোথা সত্য···কোথা আলো···হৃদয়ের শাশ্বত স্পন্দন।
হায় রে দুরাশা,
কেন এই পথচক্রে নিত্য যাওয়া-আসা।
মিথ্যার বেসাতি নিয়ে নিত্য বেচাকেনা,
লাভক্ষতি মানদণ্ডে যতটুকু চেনা।
সাংঘাতিক মিথ্যার বিচার,
আত্মঘাতী আত্ম অনাচার।
অজস্র বেদন লাগি নিত্য আয়োজন,
তাই এ ক্রন্দন,
পলে পলে তাই জমে অশ্রুর ভাণ্ডার,
অসহায় রিক্তপাত্রে পথের সম্ভার।

কে যেন সহসা, মেঘেরে আড়াল করি,
অন্তর আকাশে, হস্তে ধরি—
প্রাণের প্রদীপখানি,—কহে পথহারা,
স্বপনের সত্য নিয়ে,
কারে তুমি চিনিবে কি দিয়ে!
কত "তারা" জ্বলে নভে,—তারও মাঝে আছে ধ্রুবতারা
কালের ঝঙ্কার বেগ তুচ্ছ তার কাছে,
আজি কেহ নাই,—তবু দেখ সে তোমার আছে।



শঙ্করমতে "সাধন" : কর্ম

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

পূর্ব দুই সংখ্যায় শঙ্করমতে যে, সকাম-কর্ম মোক্ষের সাধন নয়, সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু পুণ্যকর্ম ও শাস্ত্রোপদিষ্ট নিত্যকর্ম মোক্ষসাধন হতে পারে কি না সে বিষয়ে মতভেদ হতে পারে।

এস্থলে কেহ কেহ বলেন যে, সম্পূর্ণ নিষ্কাম ভাবে এবং জ্ঞান-সহযোগে অনুষ্ঠিত কর্ম বিষ, দধি প্রভৃতি বস্তুর ন্যায় ভিন্ন ফল বা মোক্ষও উৎপাদন করে। অর্থাৎ বিষের নিজস্ব ফল হ'ল মৃত্যুসাধন করা। কিন্তু এই বিষই পুনরায় বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে মন্ত্র-সহযোগে বিদ্যা প্রভাবে মৃত-সঞ্জীবনী সুধায় পরিণত হয়। একই ভাবে, অম্ল দধিরও সাধারণ কর্ম হ'ল শ্লেষ্মাদি বৃদ্ধি করে শরীরের অনিষ্ট সাধন করা। কিন্তু এক্ষেত্রেও শর্করা প্রভৃতি দ্রব্যের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে সেই একই দধি শরীরের বিশেষ পুষ্টি-সাধকও হয়। একই ভাবে, পুণ্যকর্মও সংসারের কারণ হলেও নিষ্কামতা ও জ্ঞানের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে মোক্ষেরও কারণ হয়।

শঙ্কর এই মতবাদ সজোরে খণ্ডন করে বলছেন যে, পুণ্যকর্ম সকাম ভাবেই হোক বা নিষ্কাম ভাবেই হোক, জ্ঞান-বিহীন ভাবেই হোক বা জ্ঞানসহযোগেই হোক—যে কোন প্রকারেই হোক—কোন প্রকারেই কোনদিনই মোক্ষসাধক হতে পারে না। তার কারণ ত এক কথাতেই বলা যায়—মোক্ষ কোন কর্মেরই ফল নয়।

"অনারভ্যত্বাৎ মোক্ষস্য।" (৩-৩ ভূমিকা)

বন্ধন-নাশই হ'ল মোক্ষ। বন্ধন হ'ল অবিদ্যা। সেজন্য অবিদ্যা-নাশই হ'ল মোক্ষ। কিন্তু—

"অবিদ্যায়াশ্চ ন কর্মণা নাশ উপপদ্যতে।"

(৩-৪—ভূমিকা)

কর্মদ্বারা অবিদ্যার বিনাশ হতে পারে না। একমাত্র বিদ্যা দ্বারাই অবিদ্যার, জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের ধ্বংস সম্ভবপর। বস্তুতঃ, পূর্বেই যা বারংবার বলা হয়েছে, উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকৃতি, সংস্কৃতি—ফলভেদে চার প্রকারের। মোক্ষ এর একটিরও অন্তর্ভুক্ত নয়।

এক্ষেত্রে, পুনরায় আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে যে, উপরে যা বলা হ'ল, তা ত কেবল জ্ঞানরহিত কর্মেরই স্বভাব। কিন্তু বিদ্যা-সংযুক্ত নিষ্কাম কর্মের সম্পূর্ণ অন্য স্বভাব। কারণ, পূর্বেই যা বলা হয়েছে, বিষ, দধি প্রভৃতি বস্তুর সাধারণতঃ যা সামর্থ্য আছে বিদ্যা, মন্ত্র, শর্করা প্রভৃতির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে তা অন্য প্রকার হয়ে গিয়ে বিপরীত প্রকারের ফলপ্রসূ হয়। নিষ্কাম কর্মের ক্ষেত্রেও ত অনায়াসে তাই হতে পারে।

এর উত্তরে শঙ্কর বলছেন :

"ন, প্রমাণাভাবাৎ।" (৩-৩—ভূমিকা)

এ বিষয়ে কোন প্রমাণই নেই। অর্থাৎ, সাধারণ কর্মের যে ফল, বা সংসার, তার অতিরিক্ত বিভিন্ন কোন ফল বা মোক্ষ, যে কর্মসৃষ্টি করতে পারে, সে বিষয়ে কোন প্রমাণই নেই।

পুনরায় আপত্তি উঠতে পারে যে, নিষ্কাম কর্ম যদি সকাম কর্মেরই ন্যায় একই স্বভাবের এবং একই ফলোৎপাদক হয়, তা হলে শাস্ত্রে নিষ্কাম কর্ম সম্বন্ধে স্বতন্ত্র বিধিবিধান দেওয়া আছে কেন? শাস্ত্রোক্ত সমস্ত কর্মেরই এক-একটি বিশেষ বিশেষ ফল আছে। নতুবা সেই কর্মে লোকের প্রবৃত্তি হবে কেন? সেজন্য "বিশ্বজিৎ ন্যায়ানুসারে" যে কর্মের কোন বিশেষ ফলের উল্লেখ নেই, সেই কর্মের ফলরূপে গ্রহণ করা হয় স্বর্গকে। এক্ষেত্রে অবশ্য নিষ্কাম, নিত্যকর্মের স্বতন্ত্র কোন ফলের উল্লেখ না থাকলেও স্বর্গকে তার ফলরূপে গ্রহণ করা যায় না, যেহেতু স্বর্গ সকাম কর্মেরই ফল। সেজন্য, আর অন্য কোন ফলের সম্ভাবনা না থাকায়, "পারিশেষ্য ন্যায়ানুসারে" পরিশেষে, মোক্ষকেই নিষ্কাম, নিত্যকর্মের ফলরূপে গ্রহণ ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপায় নেই।

এর উত্তরে শঙ্কর বলছেন যে, ফল না থাকলে নিত্যকর্মে লোকের প্রবৃত্ত হবে না আশঙ্কায় যদি "বিশ্বজিৎ ন্যায়েরই" আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, তা হলে শেষ পর্যন্ত ত সেই বিশ্বজিৎ ন্যায়েরই মতে চলতে হবে; অর্থাৎ, সেই ন্যায়ানুসারে স্বর্গকেই নিত্যকর্মের ফলস্বরূপ বলে গ্রহণ করতে হবে—হঠাৎ মোক্ষকেই বা কেন এরূপ ফলরূপে গ্রহণ করা হবে?

পুনরায় পূর্বপক্ষবাদী বলতে পারেন যে, মোক্ষ প্রকৃতপক্ষে ফলই নয়, সেজন্যই "বিশ্বজিৎ ন্যায়" এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, এবং সেজন্যই মোক্ষের কথা এক্ষেত্রে বলা হয়েছে :

এর উত্তরে শঙ্কর বলছেন যে, পূর্বপক্ষবাদী একথা

বলতেই পারেন না; যেহেতু পূর্বেই তিনিই স্বয়ং বলেছেন যে, বিষ, দধি প্রভৃতির ন্যায় নিষ্কাম, নিত্যকর্ম অন্য ফলরূপ মোক্ষ উৎপাদন করে। সেক্ষেত্রে মোক্ষকে নিত্যকর্মের বিশেষ ফলরূপে ত স্বীকার করেই নেওয়া হয়েছে।

বস্তুতঃ, মোক্ষ নিত্যকর্মের "ফল", অথচ কর্মের "কার্য" বা ক্রিয়া জন্য নয়—এরূপ উক্তি স্ববিরোধ-দোষদুষ্ট। "ফল" ও "কার্য",—এই দুটি শব্দ ত সমার্থক। সেজন্য:

"অফলঞ্চ মোক্ষ:, নিত্যৈশ্চ কর্মভিঃ ক্রিয়তে; নিত্যানাং কর্মণাং ফলং ন কার্যমিতি চ—এযোঽর্থো বিপ্রতিষিদ্ধোঽভিধীয়তে, যথাগ্নিঃ শীতঃ ইতি।"

(বৃহদা-ভাষ্য—ভূমিকা ৩ ৩)

মোক্ষ কোন কর্মের ফল নয়, অথচ নিত্যকর্ম দ্বারা নিষ্পন্ন হয়; মোক্ষ নিত্যকর্মের "ফল", কিন্তু নিত্যকর্মের "কার্য" নয় বা নিত্যকর্ম থেকে উৎপন্ন হয়—এরূপ উক্তি, "অগ্নিশীতল"—এরূপ উক্তির ন্যায়ই স্ববিরোধ-দোষদুষ্ট।

পুনরায় আপত্তি হতে পারে যে, জ্ঞানদ্বারা মোক্ষের উৎপত্তি না হলেও, সর্বদাই বলা হয়ে থাকে যে, মোক্ষ জ্ঞানেরই "ফল"। একই ভাবে, নিত্য-কর্ম দ্বারা মোক্ষের উৎপত্তি না হলেও, অনায়াসে মোক্ষকে নিত্যকর্মের "ফল" বলা যেতে পারে।

এর উত্তরে শঙ্কর বলছেন যে, "জ্ঞান" ও "নিত্যকর্মের" মধ্যে প্রভেদ অনেক। জ্ঞান মোক্ষাবরক অজ্ঞানের বিনাশ করে মোক্ষ বা আত্মার নিত্যমুক্তস্বরূপটি প্রকাশিত করে, এবং সেই বিশেষ অর্থেই মোক্ষকে জ্ঞানের "ফল" বলা হয় (পৃঃ ২৩০, ২৫৯), যদিও প্রকৃতপক্ষে নিত্যসিদ্ধ মোক্ষ কোন কিছুরই "ফল" বা "কার্য" নয়। কিন্তু নিত্যকর্মের ক্ষেত্রে তাও ত সম্ভবপর নয়, যেহেতু এমনকি, নিত্যকর্মও অবিদ্যা বিনাশ করতে পারে না, যা পূর্বেই বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে, কোন অর্থেই ত মোক্ষকে নিত্য-কর্মের "ফল"রূপে গ্রহণ করা যায় না।

"অজ্ঞান-নিবর্তকত্বাৎ জ্ঞানস্য।...ন তু কর্মণা নিবর্তয়িতুব্যমজ্ঞানম্।"

(বৃহদা ভাষ্য—ভূমিকা ৩-৩)

জ্ঞানের ন্যায় কর্ম যে কেবল অজ্ঞানেরই ধ্বংস করে, মোক্ষকে "ফল"রূপে সৃষ্টি করে না—একথাও বলা যায় না। কারণ, পূর্বেই যা বলা হয়েছে:

"কর্ম তু নাজ্ঞানেন বিরুধ্যতে। তেন জ্ঞানবিলক্ষণং কর্ম।"

(বৃহদা-ভাষ্য—ভূমিকা ৩-৩)

জ্ঞান যা এক্ষেত্রে বা অজ্ঞানের ক্ষেত্রে করতে পারে, কর্ম তা কখনই পারে না, তার কারণ হ'ল এই যে, জ্ঞান ও কর্ম পরস্পরবিভিন্ন। অর্থাৎ, জ্ঞান ও অজ্ঞান স্বভাবতঃই পরস্পর-বিরুদ্ধ, কর্ম ও অজ্ঞান তা নয়। জ্ঞান আত্মস্বরূপের অভিব্যক্তি, অজ্ঞান আত্মস্বরূপের অনভিব্যক্তি—সেজন্যই জ্ঞান ও অজ্ঞান স্বভাবতঃই পরস্পরবিরোধী, সেজন্যই জ্ঞান অজ্ঞানকে বিনষ্ট করতে পারে। এমনকি, অজ্ঞানকে জ্ঞানাভাব, সংশয়-জ্ঞান বা বিপরীত-জ্ঞান প্রভৃতি অর্থেও গ্রহণ করলে একমাত্র জ্ঞানই সেই সবের বিনাশ সাধন করতে পারে—কর্ম কোনদিনও নয়।

পুনরায়, যদি বলা হয় যে, অন্যান্য কর্মের অজ্ঞান-নিবৃত্তি করবার শক্তি থাকলেও, নিত্যকর্মের তা আছে—তার উত্তর হ'ল এই যে:

"জ্ঞানেনাজ্ঞান নিবৃত্তৌ গম্যমানায়ামদৃষ্ট নিবৃত্তি-কল্পনানুপপত্তেঃ।"

(বৃহদা-ভাষ্য—ভূমিকা ৩ ৩)

জ্ঞান দ্বারা যে অজ্ঞাননিবৃত্তি হয়, তা প্রত্যক্ষদৃষ্ট সত্য। সেক্ষেত্রে, নিত্যকর্ম দ্বারাও যে অজ্ঞান-নিবৃত্তি হয়, তা যখন কোনদিনও দৃষ্ট হয় নি, তখন অকারণে কল্পনা করা যায় কি করে? বস্তুতঃ, দৃষ্ট ফল বর্জন করে অদৃষ্ট ফল কল্পনা করা চলে না। যেমন: "ব্রীহীন অবহন্তি" এই শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে মুষল-প্রহারের দৃষ্ট ফল তুষ-নিবৃত্তি বলে তার আর কোন অদৃষ্ট ফল কল্পনার প্রয়োজনই ত নেই। একই ভাবে এক্ষেত্রেও জ্ঞানের দৃষ্ট ফল বর্জন করে, কর্মের অদৃষ্ট ফলের কল্পনা অনুচিত। প্রকৃতকল্পে যা বারংবার বলা হচ্ছে, কর্ম অজ্ঞানের বিরোধী নয় বলে, অজ্ঞানের বিনাশকও হতে পারে না। এক্ষেত্রে এই মাত্র বলা চলে যে, সাধারণ সকাম কর্ম-মাত্রেই জ্ঞানের বিরোধী। কিন্তু যে সকল নিষ্কাম কর্ম জ্ঞান-বিরোধী নয়, তা দেবাদি লোকপ্রাপ্তি বা ক্রমমুক্তির হেতু হয়।

পুনরায়, নিত্যকর্মের যদি ফল-কল্পনা করতেই হয়, তবে:

"যচ্চ কর্মণাং ফলমবিরুদ্ধম্ তৎকল্প্যতামিতি।"

(বৃহদা-ভাষ্য—ভূমিকা ৩-৩)

যে ফল কর্মের সঙ্গে অবিরুদ্ধ, কেবলমাত্র সেই ফলই ত কল্পনা করা উচিত; যে ফল বিরুদ্ধ, তা কল্পনা করা চলে কি করে? বস্তুতঃ, কর্ম-ফলের বিধানদান বা কল্পনা করা হয় লোকদের কর্মে প্রবৃত্ত করবার জন্যই, যেহেতু ফলের বিষয় না জানলে স্বভাবতঃই তাদের সেই সেই বিশেষ কর্মে মতি ও প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু এরূপ ফল যদি বলা হয় যা কর্মেরই বিরোধী, তা হলে ত বরং ফল বলার চেয়ে না বলাই ভাল। এক্ষেত্রে অজ্ঞান-নিবৃত্তি বা মোক্ষরূপ ফলটি সম্পূর্ণ-

রূপেই কর্ম-বিরোধী, যেহেতু মোক্ষের পর, যা পূর্বেই বারংবার বলা হয়েছে, সকল কর্ম ত্যাগ করা হয়।

পুনরায়, পূর্বে "পারিশেষ্য-ন্যায়েঃ" উল্লেখ করে বলা হয়েছিল যে, নিত্য-কর্মের ফল "বিশ্বজিৎ ন্যায়ানুসারে" স্বর্গ বলে গ্রহণ করা যায় না, এবং অন্য কোন ফলেরও বিধান এক্ষেত্রে নেই,—সেজন্য পরিশেষ ফল একমাত্র মোক্ষই নিত্যকর্মের ফল। এই মতবাদও যুক্তিযুক্ত নয়, যেহেতু "পারিশেষ্য-ন্যায়" এক্ষেত্রে প্রযোজ্যই নয়। কারণ, যেস্থলে একটি নির্দিষ্ট-সংখ্যক ফল জানা আছে, সেক্ষেত্রেই কেবল স্থির বলা চলে যে, অন্য সবগুলি ফল এক্ষেত্রে হতে পারে না বলে, পরিশেষে অবশিষ্ট ফলটিকেই সেই কর্মের ফলরূপে গ্রহণ করা ব্যতীত আর অন্য কোন উপায়ই নেই। কিন্তু কর্মের ক্ষেত্রে সেকথা কোনক্রমেই বলা চলে না। তার কারণ হ'ল :

"কর্ম-ফল-ব্যক্তীনামানন্ত্যাৎ পারিশেষ্য-ন্যায়ানুপপত্তেঃ।"

(বৃহদা-ভাষ্য—ভূমিকা ৩-৩)

কর্মকারী ব্যক্তির সংখ্যা অনন্ত, তাঁদের ইচ্ছা, শক্তি প্রভৃতিও অনন্ত, তাঁদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেশকালাদিও অনন্ত, —সেজন্য স্বভাবতঃই কর্মের ফলও অনন্ত। সেজন্য সর্বজ্ঞ ব্যতীত এরূপ অনন্ত ফল জ্ঞাত হওয়া অন্যের পক্ষেও অসম্ভব নিশ্চয়।

পুনরায় বলা হতে পারে যে, ব্যক্তিগত ভাবে কর্ম ও কর্মফল অনন্ত হলেও, জাতিগত ভাবে তা নয়, এবং সেই দিক্ থেকে এই "পারিশেষ্য-ন্যায়টি" এক্ষেত্রেও অনায়াসে প্রযোজ্য হতে পারে : অর্থাৎ, "কর্মফলত্ব"রূপ জাতিসকল অসংখ্য কর্মের ক্ষেত্রেই সমান, যেমন "মানবত্ব"রূপ জাতিটি সকল, অসংখ্য মানবের ক্ষেত্রেই সমান। সেজন্য যখন এই কর্মফলত্ব নিত্যকর্মের ক্ষেত্রে হচ্ছে না, তখন অবশিষ্ট মোক্ষই এর ফল হতে বাধ্য। এই আপত্তির উত্তর হ'ল এই যে, নিত্যকর্ম যখন কর্মই, তখন কর্মফলত্বই ত তার ক্ষেত্রে হওয়া উচিত, অকস্মাৎ কর্মবিরুদ্ধ মোক্ষ তার ফল হবে কেন? সেজন্য কর্মের যে চতুর্বিধ ফল—উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকার ও সংস্কার, তার মধ্যেই একটি ফল তার ক্ষেত্রেও হয়, তা অবশ্যস্বীকার্য।

যদি বলা হয় যে, মোক্ষই এই চতুর্বিধ ফলের অন্যতম—তার উত্তর পূর্বেই দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে আরও কিছু আলোচনা পরে করা হবে।

দ্বিধা

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দত্ত

অনেক দিনের চেনা-জানা ; আজকে দুটি সত্তা হ'ল এক—
তবু আমায় ভয় করা কি সাজে ?
যে বিশ্বাসে সব ছেড়েও বেঁধেছ গাঁটছড়া,
হারালে তা বাসরঘরে, লাজে।

চোখের কোণে মনের কালো জল
রুদ্ধাবেগে হয়েছে উজ্জ্বল—
অতর্কিত-দ্বিধায় কেঁপে নিটোল দুটি হাতে
যত্নে-পরা সোনার বালা বাজে!
তবু আমায় ভয় করা কি সাজে ?

ও দেহমন স্পর্শ করার দাবী
পূর্ণ হ'ত, যখন ছিলে ভাবী ;
আজকে সে-সব অধিকারের তুচ্ছ হিসেব ফেলে
স্বেচ্ছাতেই এলে বুকের কাছে!
তবু আমায় ভয় করা কি সাজে ?

মা

শ্রীসত্যপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্তর কার কুসুম-কোমল, বয়ানে কাহার স্নিগ্ধ-হাসি ?
নয়নে কাহার দরশ মধুর মাধবী-রাতের জ্যোৎস্নারাশি ?
পরাণে কাহার বহিছে নিত্য গোপন স্নেহের ফল্গুধারা ?
দিবস রজনী আপনার কাজে আপনি রয়েছে আত্মহারা ?

প্রতিদিন কার আহ্বান আসে ক্ষুধায় খাদ্য চা'বার আগে ?
সুশীতল বারি কাহার হস্তে নেহারি সহসা তৃষ্ণা জাগে ?
বিপদে কাহার আকুল হৃদয় যাচে দেবতার প্রসাদটুক ?
অমঙ্গলের বিষম ভাবনা শেলসম বিঁধে কাহার বুক ?

জীবনপথের বিঘ্ন বাধায় পশ্চাতে ঠেলে কাহার হাত ?
সংসার-মরু ছায়াময় রয় সে শুধু কাহার আশীর্ব্বাদ ?
সন্তান-সুখ-গৌরবে কার ভরে আছে বুক সবার চেয়ে ?
শুভদিনে কার হৃদয়-কামনা ঝরে পড়ে দুটি নয়ন বেয়ে ?

স্বরগ হতেও প্রিয় আপনার করিয়াছে কেবা ধরার মাটি ?
সে তুমি জননী দেবী স্বরূপিনী চির-স্নেহময়ী-আমার মা-টি।

বর্ষার কবি রবীন্দ্রনাথ

শ্রীউমা দেবী

রবীন্দ্রনাথের বহুগামী প্রতিভার একটি দিক মাত্র আজ আলোচ্য—বর্ষার কবি রবীন্দ্রনাথ। এই বাংলা দেশেরই এক আদি কবি একদিন গেয়েছিলেন বর্ষার অমিত গাম্ভীর্য্যের কথা—"মেঘৈ-র্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ।" রবীন্দ্রনাথও বর্ষার এই গাম্ভীর্য্যকে ধ্বনিসৌন্দর্য্যে মূর্ত্ত করে তুলেছেন তাঁর কাব্যে, গাথায়, গানে। কিন্তু বর্ষার কবি রবীন্দ্রনাথের ধ্যানদৃষ্টি এইখানেই নিমীলিত হয় নি, তা আরও অতলে গিয়ে পৌঁছেছে জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে এক সামগ্রিক সুষমার পূর্ণ চেতনায়। এ বিষয়ে তিনি উত্তরাধিকারী ছিলেন বাল্মীকি-কালিদাসের কাছে—এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না, যদিও পাকা জহুরীর মতন তিনি সেই মণিটিকে সংস্কৃত ও মার্জ্জিত করে আরও উজ্জ্বল ও মনোহর করে তুলেছেন। সাহিত্যের স্বরূপ আলোচনায় সাহিত্যের ঐতিহাসিকতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন—"আপন সৃষ্টিক্ষেত্রে রবীন্দ্র-নাথ একা—কোন ইতিহাস তাকে সাধারণের সঙ্গে বাঁধে নি।" কথাটি রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অনন্যসাধারণতার দিক দিয়ে সত্য কিন্তু এর তাৎপর্য্য উত্তরাধিকারিত্বের ঐতিহ্যের অস্বীকৃতিতে নয়। কথাটা আর একটু বিস্তার করে বলা দরকার।

কোন প্রতিভাই—তা সে যতই অনন্যসাধারণ বা অলোক-সামান্য হোক না কেন ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে সার্থক হতে পারে না। শাণোৎকীর্ণ মণির মতই প্রতিভাও সংস্কারাপেক্ষ। প্রাচীন আলঙ্কারিক মম্মট কাব্যহেতু নির্ণয়প্রসঙ্গে এক জায়গায় বলেছেন যে, কাব্যহেতু মাত্র একটি এবং সেই হেতুতে তিনটি বিষয় অপেক্ষিত আছে—প্রতিভা, ব্যুৎপত্তি ও অনুশীলন—

"শক্তির্নিপুণতালোকশাস্ত্রকাব্যাদ্যবেক্ষণাৎ।
কাব্যজ্ঞশিক্ষয়াভ্যাস ইতি হেতু তদুদ্ভবে॥"

—অপূর্ব্ববস্তুনির্ম্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা প্রতিভা বা শক্তি বা কবিত্ববীজরূপ সংস্কারবিশেষ। এ শক্তি যার নেই তার পক্ষে কাব্যরচনা করা অসম্ভব। যদি বা করে তাও হাস্যকর হয়ে ওঠে। অভ্যাস বা অনুশীলন দক্ষতার অধিকারী করতে পারে কিন্তু সত্যকারের কাব্য-সৃষ্টির ক্ষমতা এনে দিতে পারে না। প্রতিভা হচ্ছে সেই প্রাণ যার অভাবে কাব্যদেহ শবদেহের মতনই অস্পৃশ্য ও পরিবর্জ্জনীয়। এই প্রতিভার অগ্নি যার মধ্যে আছে অনুশীলনের ঘর্ষণে সেই উপলখণ্ড থেকেই শিখা প্রজ্জ্বলিত হতে পারে। এক ডেলা মাটিকে যতই ঘষা যাক না কেন তার থেকে অগ্নি উদগারিত হতে পারে না। প্রতিভা হচ্ছে সেই মূল সম্পদ যা খাটিয়ে অমিত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হওয়া যায় এবং যা না থাকলে ঐশ্বর্য্য অর্জ্জনের প্রয়াস ভিক্ষার্জ্জনের প্রয়াসে রূপান্তরিত হয়।

কিন্তু প্রতিভা কাব্যনির্ম্মিতির প্রথম কথা হলেও শেষ কথা নয়। প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্র নির্ভর করে অভিজ্ঞতার প্রসারের উপর। মানুষ তার সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থেকে সন্তুষ্ট নয়—সে চাইছে নিজেকে বিস্তার করতে, প্রসারিত করতে, চাইছে সীমার শৃঙ্খল থেকে অসীমে মুক্ত হতে—চাইছে জানতে নিজেকে এবং নিজেকে জানার পিছনে আছে সকলের সঙ্গে মিলে নিজেকে জেনে নেওয়া, চিনে নেওয়া। তাই আপন অভিজ্ঞতার সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যেই সে সন্তুষ্ট নয়, সে জানতে চায় পরস্ব অভিজ্ঞতাকে। সে অভিজ্ঞতার রূপও দুটি—একটি ভাবগত, অপরটি বুদ্ধিগত। এই বিশ্বে মানুষ যা কিছুই অনুভব করেছে প্রাণের মধ্যে তাকে রূপ দিয়েছে ভাবের, প্রকাশ করেছে কাব্যে, দর্শনে। আর যাকে জেনেছে, বিশ্লেষণ করেছে, ধরেছে বুদ্ধির জালে তাকে রূপ দিয়েছে বিজ্ঞানে, শাস্ত্রে। তাই বুদ্ধিগত ও ভাবগত নিজস্ব ও পরস্ব অভিজ্ঞতার সোপান বেয়ে মানুষ উত্তীর্ণ হয়েছে আনন্দলোকে, প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রকে করেছে উন্মুক্ত, উদার।

কিন্তু কাব্যনির্ম্মিত সম্বন্ধে এও শেষ কথা নয়। আরও একটি বস্তুর অপেক্ষা আছে সে বস্তু অনুশীলন। প্রদীপ আছে, শলাকা আছে কিন্তু তাকে প্রজ্জ্বলিত করতে হবে, অরণি-ঘর্ষণে শিখাটিকে জ্বালিয়ে নিতে হবে, সেই জ্বালিয়ে নেবার ব্যাপারটিই কাব্যনির্ম্মিতি ব্যাপারের অনুশীলন। ভাবের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসে চিত্ত যখন টলমল তখন তার স্ব-উচ্ছ্বসিত প্রকাশকে কিংবা আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে বাঙ্ময় প্রকাশকে বলি কাব্য। কিন্তু কাব্য-রচয়িতার মধ্যে আর একটি সত্তা লুকিয়ে থাকে তাকে বলি সমালোচক সত্তা। সে সত্তা প্রতিভাবান্ কবির মধ্যে সদাজাগ্রত। যা খুশী লেখা সে সইতে পারে না—কলম আটকে সে বলে এখানে কাটো, ঐখানে বাড়াও, এটা বদলাও, ওটা আবার নূতন করে সৃষ্টি কর। নিজের মনের ভাবের আরশিতে যাকে অনুভব করেছ, দেখ তার একটি রেখাও যেন তুলি থেকে হারিয়ে যায় না, যে রাগিনী প্রাণের মধ্যে আলাপে আলাপে মুখরিত হয়ে উঠেছে দেখ যেন তার একটি তানও হারিয়ে না যায়।

তাই "বৃন্তহীন পুষ্প সম আপনাতে আপনি বিকশি" উঠতে পারে না কোন কবিই। তার শিকড় চারিয়ে যায় মাটির অতলে, ঐতিহ্যের গোপন রসে রূপায়িত হয়ে ওঠে তার প্রাণসত্তা, তার পুষ্প অনন্ত নীলাকাশের তলে মধুময় বীজকোষটিকে রেখে যায় ভবিষ্যের

হাতে আর শাখার পল্লবে-পুষ্পে-ফলে, আলোকে-বাতাসে হিল্লোলিত হয়ে সফল, সুন্দর ও বিকাশে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার বর্তমান সত্তা।

সর্ব্বকবিসাধারণ এই সত্য রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য। সংস্কৃত সাহিত্যের ধ্বনিমাধুর্য্য ও উপনিষদের ভাব-গাম্ভীর্য্য রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তায় এক অপূর্ব্ব সুষমায় পর্যবসিত হয়েছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের আদিযুগের সাহিত্যের দর্শনের অপরোক্ষতায় অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও স্পষ্টানুভূতির নিরপেক্ষ আত্ম-অসংসৃষ্ট প্রকাশের ঋজুতার সঙ্গে পরবর্ত্তীযুগের শব্দনির্ম্মিতি-কৌশল ও বাক্যরচনাশৈলীর কারুকার্য্যমণ্ডিত সৌষ্ঠব রবীন্দ্রকাব্য-সাহিত্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয় এবং এই সঙ্গেও লক্ষণীয় সেই উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ধ্বনি ও রসের ঐতিহ্যকে রবীন্দ্রনাথ আরও কতগুণ বর্দ্ধিত করেছেন, তিনি আহরণ করেছেন যেন সহস্রগুণ বেশী বিতরণ করার জন্য—"সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুম আদত্তে হি রসং রবিঃ।"

রবীন্দ্র-কল্পনায় বর্ষার যে রূপ ও ধ্যানধারণার পরিচয় আমরা পাই তার জন্য কালিদাসের নিকট আমরা বহুল পরিমাণে কৃতজ্ঞ। বর্ষাকাব্য কালিদাস যা রচনা করেছেন তার মধ্যে মেঘদূত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যদিও ঋতুসংহারেও একটি তরঙ্গ আমরা পাই বর্ষাবর্ণনার এবং রঘু-বংশ ও কুমারসম্ভবের মধ্যে সামান্য কয়েকটি পংক্তিমাত্র পাওয়া যায়। নাটকের মধ্যে বিক্রমোর্ব্বশীয়তে চতুর্থ অঙ্কে বর্ষার সামান্য কিছু রূপ বিদ্যুচ্চমকের মতন দীপ্ত হয়ে উঠেছে। অমৃতরসে সিক্ত, চন্দনরসে অনুলিপ্ত—চন্দ্রকিরণে উদঘৃষ্ট কালিদাসের কাব্য, বলেছেন জয়ন্তভট্ট তাঁর ন্যায়মঞ্জরীতে—

"অমৃতেনেব সংসিক্তাশ্চন্দনেনেব চর্চ্চিতা।
চন্দ্রাংশুভিরিবোদ্ঘৃষ্টাঃ কালিদাসস্য সূক্তয়ঃ॥"

সুকবির কাব্যনির্ম্মিতি সম্বন্ধে বিদ্যাধর তাঁর একাবলীতে বলেছেন—কাব্য হচ্ছে:

"কিঞ্চিৎপীড়িতচন্দ্রমণ্ডলগলৎপীযূষস্নিগ্ধো রসঃ।
তৎকিঞ্চিৎকবিকর্ম্মমর্ম্ম ন পুনর্ব্বাগডিণ্ডিমাড়ম্বরঃ॥"

চন্দ্রবিম্বকে ঈষৎ পীড়ন যদি করা যেত তবে যে পীযূষধারা নির্গলিত হ'ত তারই তুলনা সুকবির কাব্য। শব্দডিণ্ডিম বা বাগাড়ম্বরে কবিকর্ম্মকে প্রত্যক্ষ করা যায় না।

ভ্রমর যেমন পুষ্পিত ফুলবনে স্বচ্ছন্দবিহারে স্বর্ণাভ রৌদ্রে বিচরণ করে তেমনি সুকবিও অযত্নজাত সহজ অলঙ্কার-সৌন্দর্য্যে কাব্যকে উদ্ভাসিত করে রসসৃষ্টির পথে এগিয়ে চলেন। কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথও এগিয়ে গেছেন সেই পথে এবং এগিয়ে যেতে যেতে রবীন্দ্রনাথ যেমন কালিদাসের প্রতিভার রৌদ্রালোকে পক্ষ মেলে গিয়েছেন কালিদাসও তেমনি বাল্মীকির প্রতিভার রৌদ্রালোক পান করে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন! বর্ষার সৌন্দর্য্যকল্পনা ও রসানুভূতির তীব্রত্ব কি ভাবে এক থেকে অন্যে ক্রমশঃ গাঢ় ও গভীর হয়ে উঠেছে তার আস্বাদ কাব্যপাঠক মাত্রেরই আস্বাদ্য। মেঘদূত কালিদাসের এক অনবদ্য সৃষ্টি। জড়প্রকৃতিকে চেতনার আলোয় সুন্দর করে তুলে মানব তার চিরবিরহী অন্তরের সমস্ত বেদনা তাকে সমর্পিত করে প্রিয়বন্ধুর মতন আশ্বস্ত করে নিয়েছে, কালিদাসের কল্পনায় এই অভিনবত্ব পরবর্ত্তীকালের বহু কবিকে দূতকাব্য রচনায় প্রেরণা দিয়েছে। কিন্তু কালিদাসও তাঁর এই কল্পনার অভিনবত্বের জন্য বাল্মীকির কাছে বহুল পরিমাণে ঋণী। রামগিরির বিরহী যক্ষ এবং অলকার বিরহিনী প্রিয়তমা রামচন্দ্র ও সীতার পরিচিত প্রতিনিধিস্থানীয়। সমাগত বর্ষাকালে "মেঘাশ্লিষ্ট সানুদেশে কুটজ পুষ্পের কান্তিদর্শনে বিরহিনী প্রেয়সীর জন্য উভয়ের হৃদয়েই প্রেমবাসনা জাগ্রত হয়েছে।

বাল্মীকি বলেছেন:

"ক্বচিদ বাষ্পাভিসংরুদ্ধান্ বর্ষাগমসমুৎসুকান।
কুটজান্ পশ্য সৌমিত্রে। পুষ্পিতান্ গিরিসানুষু॥
মম শোকাভিভূতস্য কামসন্দীপনান্ স্থিতান্॥"

কালিদাস বলেছেন:

"স প্রত্যগ্রৈঃ কুটজকুসুমৈঃ কল্পিতার্ঘায় তস্মৈ,
প্রীতঃ প্রীতিপ্রমুখ বচনং স্বাগতং ব্যাজহার।"

রবীন্দ্রকাব্যেও মেঘদর্শনে প্রিয়বিরহিত কান্তের উক্তি পাই:

আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল গেল রে দিন বয়ে—
বাঁধনহারা বৃষ্টিধারা ঝরছে রয়ে রয়ে।...
সজল হাওয়া যূথীর বনে কি কথা যায় কয়ে?
হৃদয়ে আজ ঢেউ দিয়েছে খুঁজে না পাই কূল
সৌরভে প্রাণ কাঁদিয়ে তুলে ভিজে বনের ফুল।

বাল্মীকির উক্তি পাই রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা পর্ব্বে:

"সম্প্রস্থিতা মানসবাসলুব্ধাঃ
প্রিয়ান্বিতাঃ সম্প্রতি চক্রবাকাঃ॥"

কালিদাসের উক্তি পাই মেঘদূতের পূর্ব্বমেঘে:

"তৎচ্ছ্রুত্বা তে শ্রবণসুভগং গর্জিতং মানসোৎকাঃ
আকৈলাশাদ বিসকিশলয়চ্ছেদ সম্পকরম্যাঃ
সম্পৎস্যন্তে কতিপয়দিনস্থায়িহংসা দর্শাণাঃ।"

কিংবা বাল্মীকির:

"সমুদ্বহন্তঃ সলিলাতিভারং
বলাকিনো বারিধরা নদন্তঃ।
মহৎসু শৃঙ্গেষু মহীধরাণাং
বিশ্রম্য বিশ্রম্য পুনঃ প্রয়ান্তি॥"

মেঘগুলি জলভারে কাতর হয়ে আকাশপথ অতিক্রম করছে—গর্জ্জন করে, শৃঙ্গ থেকে শৃঙ্গান্তরে লগ্ন হয়ে বিশ্রাম করতে করতে। ঠিক এই কল্পনাই কালিদাসেও পাই:

"খিন্নঃ খিন্নঃ শিখরিষু পদং ন্যস্য গন্তাসি যত্র।"

কিংবা "কালক্ষেপং ককুভ সুরভৌ পর্বতে পর্বতে তে।"

কিংবা "নীচৈরাখ্যং গিরিমধিবসেস্তত্র বিশ্রান্তি হেতোঃ।

কালিদাস বলছেন:

"গর্ভাধানক্ষণপরিচয়ান্নমাবদ্ধমালাঃ।
সেবিষ্যন্তে নয়নসুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ।"

ঠিক এরই অনুরূপ কথা আছে রামায়ণে :

মেঘাভিকামা পরিসম্পতন্তী
সম্মোদিতা ভাতি বলাকপংক্তিঃ।
বাতাবধূতা বরপৌণ্ডরীকী
লম্বেব মালা রুচিরাম্বরস্য।"

রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে আছে :

"নীলমেঘাশ্রিতা বিদ্যুৎ স্ফুরন্তী প্রতিভাতি মে।
স্ফুরন্তী রাবণস্যাঙ্কে বৈদেহীব তপস্বিনী।"

অনুরূপ বর্ণনা বিক্রমোর্বশীয়ে আছে :

"নবজলধরসন্নদ্ধোঽয়ং ন দৃপ্তনিশাচরঃ।...
কনকনিকষস্নিগ্ধা বিদ্যুৎ প্রিয়া ন মমোর্বশী॥"

এই প্রসঙ্গে অলকার বর্ণনার সঙ্গে রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ক্রৌঞ্চরন্ধ্রের পরপারবর্তী উত্তরকুরু জনপদের বর্ণনা তুলনীয়। বাল্মীকির রামায়ণ যে কালিদাসের মেঘদূতের প্রেরণা একথা অনস্বীকার্য।

মেঘদূতের প্রখ্যাত টীকাকার দক্ষিণাবর্তনাথ ও পূর্ণসরস্বতী কালিদাসের মেঘদূতের উপমার সঙ্গে রামায়ণের উপমার সাদৃশ্য অনেক স্থানেই দেখিয়েছেন, কল্পনার সাজাত্যও লক্ষ্য করেছেন। অবশ্য এপিক কাব্যের সঙ্গে সাধারণ কাব্যের পার্থক্যকে মনে রেখে তুলনার তারতম্য বিচার করতে হবে।

বাল্মীকি মহাকাব্যের রচয়িতা, কালিদাস প্রধানতঃ কাব্যকার এবং রবীন্দ্রনাথ গীতিকার। কাব্যপ্রতিভার এই বৈশিষ্ট্যের জন্য বর্ণিত বিষয়বস্তুর তাৎপর্য্য ও স্বরূপের পার্থক্যও রসিকজনসংবেদ্য। তুলনা যদি করা যায় তা হলে বাল্মীকিকে মহোদয় পর্বতের সঙ্গে তুলনা করতে হয়। কালিদাসের কাব্য যেন তাজমহল এবং রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতা যেন সহস্র আলোক-সূচী বিচ্ছুরণকারী অত্যুজ্জ্বল হীরকখণ্ড। বর্ষার যেরূপ বাল্মীকিতে সহজ ও সরস, কালিদাসে তা সরস ও সুন্দর, রবীন্দ্রনাথে সুন্দর ও বিচিত্র। বাল্মীকির বর্ষাপ্রকৃতি অচেতন, কালিদাসের চেতনধর্ম্মা, রবীন্দ্রনাথের স্থানে স্থানে অতি-চেতনরূপেও উদ্ভাসিত।

প্রাচীন সাহিত্যে মেঘদূতের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এক-স্থানে বলেছেন—"রামগিরি হইতে হিমালয় পর্যন্ত প্রাচীন ভারতবর্ষের যে দীর্ঘ এক খণ্ডের মধ্য দিয়া মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা-ছন্দে জীবনস্রোত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে সেখান হইতে কেবল বর্ষাকাল নহে, চিরকালের মত আমরাও নির্ব্বাসিত হইয়াছি।...মনে পড়িতেছে, কোন ইংরেজ কবি লিখিয়াছেন—মানুষেরা এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত, পরস্পরের মধ্যে অপরিমেয় অশ্রু-লবণাক্ত সমুদ্র। দূর হইতে যখনই পরস্পরের দিকে চাহিয়া দেখি, মনে হয় এককালে আমরা এক মহাদেশ ছিলাম, এখন কাহার অভিশাপে মধ্যে বিচ্ছেদের বিলাপরাশি ফেনিল হইয়া উঠিতেছে। আমাদের এই সমুদ্রবেষ্টিত ক্ষুদ্র বর্তমান হইতে যখন কাব্যবর্ণিত সেই অতীত ভূখণ্ডের তটের দিকে চাহিয়া দেখি তখন মনে হয়,সেই সিপ্রাতীরের যূথীবনে যে পুষ্পলাবী রমণীরা ফুল তুলিত, অবন্তীর নগরচত্বরে যে বৃদ্ধগণ উদয়নের গল্প বলিত, এবং আষাঢ়ের প্রথম মেঘ দেখিয়া যে পথিক প্রবাসীরা নিজ নিজ স্ত্রীর জন্য বিরহ-ব্যাকুল হইত, তাহাদের এবং আমাদের মধ্যে যেন সংযোগ থাকা উচিত ছিল। আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের নিবিড় ঐক্য আছে অথচ কালের নিষ্ঠুর ব্যবধান। কবির কল্যাণে এখন সেই অতীতকাল অমর সৌন্দর্য্যের অলকাপুরীতে পরিণত হইয়াছে,আমরা আমাদের বিরহবিচ্ছিন্ন এই বর্ত্তমান মর্ত্তলোক হইতে সেখানে কল্পনার মেঘদূত প্রেরণ করিয়াছি। কিন্তু কেবল অতীত—বর্ত্তমান নহে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতলস্পর্শ বিরহ। আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি, সে আপনার মানসসরোবরের অগম্য তীরে বাস করিতেছে, সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠান যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোন পথ নাই। আমিই বা কোথায় আর তুমিই বা কোথায়! মাঝখানে একেবারে অনন্ত। কে তাহা উত্তীর্ণ হইবে। অনন্তের কেন্দ্রবর্তী সেই প্রিয়তম অবিনশ্বর মানুষটির সাক্ষাৎ কে লাভ করিবে...হে নির্জ্জন গিরিশিখরের বিরহী, স্বপ্নে যাহাকে আলিঙ্গন করিতেছ, মেঘের মুখে যাহাকে সংবাদ পাঠাইতেছ, কে তোমাকে আশ্বাস দিল যে, এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যলোকে শরৎ-পূর্ণিমারাত্রে তাহার সহিত চিরমিলন হইবে। তোমার ত চেতন-অচেতনে পার্থক্যজ্ঞান নাই, কি জানি, যদি সত্য ও কল্পনার মধ্যেও প্রভেদ হারাইয়া থাক।"

রবীন্দ্রনাথের বর্ষাপ্রকৃতির ধ্যান ধারণার এই চরম রূপ। বর্ষা এখানে চিরবিরহের প্রতীক—বর্ষার সৌন্দর্য্য সেই চিরবিরহীর সঙ্গে চিরসুন্দরের মিলনের প্রেরণা। বর্ষাগমে যে বিরহকল্পনা বাল্মীকির রামায়ণে সাধারণ ও নিরপেক্ষ ভাবে বর্ণিত হয়েছে, কালিদাসের কবিচেতনায় বর্ষাপ্রকৃতির মধ্যে সেই বিরহকল্পনা এক নিগূঢ় প্রেমের সৌন্দর্য্য অমর হয়ে উঠেছে। এখানে সমস্ত প্রকৃতি কবির অন্তরের ভাবস্পন্দনের সঙ্গে এক তারের মূর্চ্ছনায় স্পন্দিত হচ্ছে কিন্তু তবু এই বিরহ কান্ত ও কান্তার প্রেমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের ভাবকল্পনায় বর্ষাপ্রকৃতির এই রূপ তার স্থূল সৌন্দর্য্যকে বিচিত্র করে এবং উত্তীর্ণ হয়ে অন্তর্জ্জগতের সূক্ষ্ম আনন্দবেদনার তরঙ্গে তরঙ্গে হিল্লোলিত হয়ে গভীর চেতনার মর্ম্মমূলে এক আধ্যাত্মিক উপলব্ধির মধ্যে পূর্ণ ও সার্থক হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে শেষ সপ্তকের পঞ্চম কবিতাটি দ্রষ্টব্য।

যে বর্ষা নেমেছে প্রান্তরে, ঘনিয়েছে সার-বাঁধা তালের চূড়ায়, রোমাঞ্চ জাগায় "বাঁধের কালো জলে যার আনন্দ সজ্জার মধ্যে রসসম্পদ, প্রতিবার যে রঙের প্রলেপ লাগায় জীবনের পটভূমিকায় নিবিড়তর করে, যে বিচিত্র কারুকলায় চিত্রিত সমগ্র সত্তাকে দিব্য-দৃষ্টির সম্মুখে অবারিত করতে পারে, যে বধূর মতন প্রাণে জাগায় প্রেম—দুঃখকে পারে গলার হার করাতে সেই বর্ষাপ্রকৃতিকে কবি আহ্বান জানিয়েছেন হৃদয়ের দিগন্তে।

শুধু আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ক্ষেত্রেই নয়, জীবন সংগ্রামের মধ্যেও কবি জীবনকে বর্ষার প্রতীকে গ্রহণ করেছেন—যখন বলেছেন :

এবার যে ঐ এল সর্ব্বনেশে গো
বেদনায় যে বান ডেকেছে
রোদনে যায় ভেসে গো
রক্ত মেঘে ঝিলিক মারে
বজ্র বাজে গহন পারে
কোন পাগল ঐ বারে বারে
উঠছে অট্টহেসে গো
এবার যে এল সর্ব্বনেশে গো।

সীমাই যে শুধু অসীমের দিকে এগিয়ে যায় না—অসীমও আসে সীমার দিকে এগিয়ে এই সুন্দর সত্যটিকেও কবি বর্ষাপ্রকৃতির প্রতীকে উপলব্ধি করেছেন এবং সেই উপলব্ধির গাম্ভীর্য্য পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করেছেন অসংখ্য গানের মধ্যে—যেমন—

"আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণসখা বন্ধু হে আমার
আকাশ কাঁদে হতাশ সম
নাই যে ঘুম নয়নে মম
দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম
চাই যে বারে বার
বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই
তোমার পথ কোথায় ভাবি তাই
সুদূর কোন নদীর পারে
গহন কোন বনের ধারে
গভীর কোন অন্ধকারে
হতেছ তুমি পার

শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে যার আগমন, আষাঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে যার জন্য আকুলতা, বজ্ররবে যার আহ্বান, যার জন্য অন্তরে কলরোল, যে না এলে অপূর্ণতার বেদন তারই জন্য কবি প্রাণের মৃদঙ্গে অসংখ্য সুর তুলেছেন :

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ে ঝড় এল যে আজ
মেঘের ডাকে ডাক মিলিয়ে বাজরে মৃদং বাজ,
আজকে তোরা কি গাবি গান
কোন রাগিণীর সুরে
কালো আকাশ নীল ছায়াতে
দিল যে বুক পুরে—

বর্ষাপ্রকৃতির রূপায়ণে, ভাবায়নে ও উপলব্ধিতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আমরা তিনটি স্তরই দেখতে পাই—প্রাচীন মহাকাব্যের সরল ও সাবলীল প্রত্যক্ষ বর্ণনা, সৌন্দর্য্য ও রসে টলমল কালিদাস-প্রমুখের সংস্কৃত-কাব্যের বৈচিত্র্য ও বিরহ এবং সর্ব্বশেষে উপনিষদের উপলব্ধিতে সম্পূর্ণ এক আধ্যাত্মিক ধ্যানসম্পদ।

একটি স্মৃতি

শ্রীকরুণাময় বসু

উড়ন্ত মেঘের ছায়া, এক ফোঁটা বৃষ্টি, চাঁপা রোদ
স্মরণের খেলাঘরে মায়াময় বসন্ত শরৎ
এনেছে দুর্ল্লভ ব্যথা। পীত রৌদ্র শুক্তির ঝিনুকে
নিটোল মুক্তোর দিন চোখ মেলে উজ্জ্বল কৌতুকে।
ঝাউবন মাথা নাড়ে, গাছে গাছে ফুল থোকা থোকা,
ভিজে ঘাসে উড়ে আসে সবুজ রঙের কাঁচ পোকা।
দীঘিজল টলোমল, পদ্মকুঁড়ি কাঁপে ছলোছল,
আকাশে বৃন্তের মতো এক ঝাঁক কপোত চঞ্চল
মেঘ ছায়ে উড়ে যায়; মনে হ'ল কবে একদিন
সোনালি রৌদ্রের স্বপ্নে এসেছিল সোনার হরিণ
আমার মনের বনে: যুথি-গন্ধে ভরা দিনগুলি
বিস্মৃত বেদনারসে অতীতের পটে আঁকে তুলি।
তারপর বেলাশেষে চাঁদ আনে রূপকথা-রাত,
আমার কপালে ছোঁয় অদেখা কোমল কারো হাত?
মৌমাছির খেলা শেষ, তবু দেখি মনের মৌচাকে
নাগকেশরের স্বপ্নে এক বিন্দু মধু জমে থাকে।
পার হয়ে সময়ের অতি দীর্ঘ ধূসর পাহারা
আজো অপরাহ্ণ বেলা ক্ষণে ক্ষণে পাই তার সাড়া;
পার হয়ে বৃষ্টি ভেজা শ্রাবণের চামেলির বন
নূপুরের শব্দ আসে, সেই শব্দ শোনে আজো মন।

অলৌকিক

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

১৯৩৭ সনের সেপ্টেম্বর মাস। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে গুরুতররূপে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মনীষী নীলরতন সরকার মহাশয় ছুটে এলেন তাঁর চিকিৎসার জন্য। তাঁর সঙ্গে এলেন বাংলা দেশের সেরা সেরা ডাক্তার। তাঁদের অক্লান্ত অধ্যবসায়ে এবং সুচিন্তিত চিকিৎসায় গুরুদেবের প্রাণরক্ষা হ'ল।

কবি আরোগ্যলাভ করেছেন। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে সরকার মহাশয় তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে আশ্রম দর্শনে বাহির হলেন।

চীন ভবন তখন নতুন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দোতলা সম্পূর্ণ হয় নি। পূর্ব্ব-পশ্চিমে অবারিত ছাদ। মাঝখানে মাত্র দু'খানি বৃহৎ প্রকোষ্ঠ। তার একটিতে চীনা গ্রন্থাগার। অন্যটিতে তিব্বতী পুস্তকাদি এবং গবেষণাগৃহ। দোতলার প্রবেশমুখেই ঐ গবেষণাগৃহ। সরকার মহাশয় ধীর পদক্ষেপে সেখায় উপস্থিত হলেন। শুভ্রকেশ, প্রশান্ত প্রসন্নমূর্ত্তি। আমরা সসম্ভ্রমে তাঁকে অভ্যর্থনা করলাম।

সম্মুখেই তিব্বতীগ্রন্থ। পুথি-আকারে ছাপা। বৌদ্ধশাস্ত্রের ঐ তিব্বতী অনুবাদরাশি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আমরা তার পরিচয় দিলাম:

"সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বতের সঙ্গে ভারতের ধার্ম্মিক ও সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তার পর থেকে বহু শতাব্দী ধরে ভারতীয় পণ্ডিতগণ তিব্বতে যান এবং তিব্বতীগণ ভারতে আসতে থাকেন। সমস্ত বৌদ্ধ ত্রিপিটক তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়। ত্রিপিটকের অন্তর্গত নয়, এমন বহু বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থেরও তিব্বতী অনুবাদ আছে। সপ্তদশ শতাব্দীতেও পাণিনি ব্যাকরণের (প্রক্রিয়া-কৌমুদীর) তিব্বতী অনুবাদ করা হয়েছে—তদানীন্তন দলাইলামার নির্দ্দেশে। অনুবাদক ভারতে এসে, পঞ্জাবে বসে এই অনুবাদ করে গেছেন। তার পর থেকে তিব্বতের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়।"

মনীষী নীলরতন তাঁর স্বাভাবিক শান্ত স্বরে বললেন, "কিন্তু ধার্ম্মিক যোগসূত্র আজও ছিন্ন হয় নাই। তিব্বতী ও ভারতীয় যোগীদের সম্বন্ধ আজও অটুট রয়েছে।

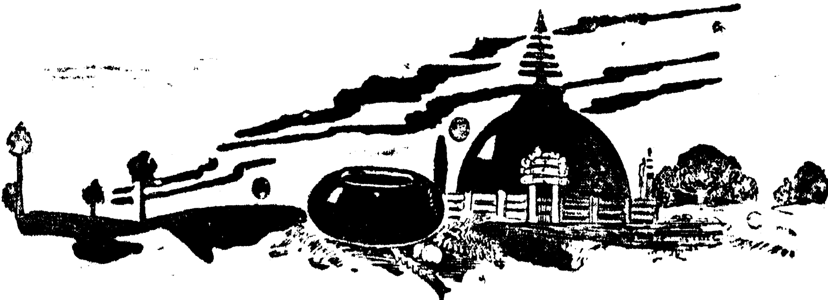
"আপনারা হয়ত বিশুদ্ধানন্দের নাম শুনে থাকবেন, কাশীতে যিনি "গান্ধীবাবা" বলে পরিচিত। তাঁর গুরু তিব্বতী। গুরু ও শিষ্য উভয়েই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন।

"আমি তাঁর অলৌকিক শক্তির প্রত্যক্ষদর্শী। কলকাতায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। আমি তাঁকে শ্রদ্ধাভরে একটি ফুল দিই। তিনি আমাকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দিয়ে—ঐ ফুলটিকে হীরাতে পরিণত করেন। যাদুবিদ্যার হীরা নয়—যথার্থ হীরা। মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষমহাশয় ও আমি উভয়েই সে হীরা পরীক্ষা করলাম। হীরা—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এর পূর্ব্বেও তিনি এই ভাবে হীরা তৈরি করেছেন এবং আমি জানি তাঁর প্রদত্ত সেই হীরা বাজারে ত্রিশ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে।

"আমি করজোড়ে প্রণাম করে তাঁকে সেই হীরা ফেরত দিলাম। বিনীতভাবে বললাম—'আমায় আর প্রলোভন দেখাবেন না। আশীর্ব্বাদ করুন, আমার যেন অর্থাসক্তি দূর হয়।'"

আমরা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ঐ অপূর্ব্ব অলৌকিক কাহিনী শ্রবণ করলাম। অন্য কোন ব্যক্তির মুখ হতে এ কথা শুনলে আমরা তা 'গাঁজাখুরি' বলে উড়িয়ে দিতাম। কিন্তু বাংলার সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় সত্যনিষ্ঠ নীলরতন সরকার মহাশয়ের প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনায় অবিশ্বাস করি কিরূপে?*

* দীর্ঘকাল পূর্ব্বের (বাইশ বৎসরের) ঘটনা। এ পর্য্যন্ত অনেককেই এ কথা বলেছি। কিন্তু (সম্ভবতঃ আলস্যে এবং সঙ্কোচে) লিপিবদ্ধ করতে পারি নাই। এখন এ কথা প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য মনে হ'ল।



অন্ধ আকাশ

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

২১

আজ সকালবেলাটা ভারি সুন্দর। কয়েকদিনের বাদ্‌লা কাটিয়া গিয়াছে, ভিজে মাঠেঘাটে রোদ পড়িয়া ঝলমল করিতেছে। হৈ-চৈ করিয়া চারিদিকে বোনার কাজ সুরু হইয়াছে। কেহ চারাধান তুলিয়া আঁটি বাঁধিয়া রাখিতেছে, কেহ ক্ষেতচাষ দিতেছে, গালাগালি, লেজমলা ও লাঠির বাড়ি খাইয়া ক্লান্ত বলদ একহাঁটু কাদার মধ্যে মাথা হেঁট করিয়া লাঙল টানিয়া চলিয়াছে। আলের উপর বসিয়া কেহ জলপান খাইতেছে। গ্রামের পথে ছুটাছুটি, হাঁকডাকের অন্ত নাই।

আঙিনায় রোদে বসিয়া রুকিয়া পরসাদকে পুরি-তরকারি খাওয়াইতেছিল, এমন সময় মঙ্গুয়ার বউ ব্যস্তভাবে আসিয়া ডাকে, "কি করছিস গো পরসাদের মা?"

ঠোঙাটা আঁচলের আড়াল করিয়া রুকিয়া বলে, "কিছু করছি নে দিদি।"

মঙ্গুয়ার বউ বলে, "তুলসী মহতোর রোপা হচ্ছে আজ, আমাকে রোপনী খুঁজতে বলেছে, যাবি ত চল।"

মঙ্গুয়ার বউয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া রুকিয়া বলে, "হ্যাঁ গো দিদি, আমার অবস্থা কি তুমি জান না? কাজ কাজ করে মাথা খুঁড়েও ত কাজ পেলুম না, না খেয়ে মরতে বসেছি। তুমি সেধে কাজের কথা বলতে এলে, তুমি আমার আর জন্মের সত্যিকার দিদি ছিলে।"

কৃতজ্ঞতায় রুকিয়ার দুই চোখ ভরিয়া জল আসিয়া পড়ে। ধান রুপিতে গেলে দুপুর বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে, কাজের শেষে সন্ধ্যাবেলা তিন সের ধান পাইবে—এ যেন তাহার পক্ষে হাতে স্বর্গ পাওয়া। রুকিয়া চোখ মুছিয়া বলে, "চল গো দিদি।"

মঙ্গুয়ার বউ বলে, "তুই তুলসী মহতোর ক্ষেতে চলে যা, আমি ঘর হয়ে যাচ্ছি।"

মঙ্গুয়ার বউ ব্যস্তভাবে চলিয়া যায়। রুকিয়া পরসাদকে খাওয়াইয়া ঠোঙাটি লইয়া ঘরে ঢোকে, তিলকার পাশে আসিয়া ডাকে, "ধর গো।"

ডাক শুনিয়া তিলকা চোখ মেলিয়া তাকায়। রুকিয়া একটুকরা পুরি লইয়া তাহার মুখের কাছে ধরিয়া বলে, "খা।"

রুকিয়াকে দেখিয়া তিলকা আর রাগিয়া ওঠে না, গালাগালি করে না, একটা অসহায় করুণ দৃষ্টি মেলিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া থাকে। রুকিয়া খাইতে বলায় সে খায়, কি খাইতেছে, রুকিয়া এ খাবার কোথায় পাইল, এসব কোন প্রশ্নই তাহার মনে ওঠে না। খানদুয়েক পুরি খাওয়াইয়া রুকিয়া বলে, "আমি তুলসী মহতোর ধান রুপতে যাচ্ছি, দুপুরবেলা ভাত নিয়ে আসব।"

তিলকা কিছুই বলে না, আবার চোখ বোঁজে।

ছেলেকে কোলে লইয়া রুকিয়া তুলসীমহতোর ক্ষেতের দিকে চলে। গ্রাম প্রায় শূন্য করিয়া মেয়েপুরুষ ক্ষেতে আসিয়া নামিয়াছে। ছোট ছেলেমেয়েরা মাঠের ধারে কোন একটা গাছের নীচে জমা হইয়াছে, এক-আধজন বুড়ী তাহাদের তদারকের ভার লইয়াছে। পরসাদকে সেইখানে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া রুকিয়া মিনতি করিয়া বলে, "পরসাদকে একটু দেখ আই, ওকে রেখে গেলুম এখানে।"

তদারকরকারিনী বৃদ্ধাটি গ্রামের সাধারণ ঠাকুরমা, দন্তহীন মুখে একগাল হাসিয়া সে বলে, "রেখে যা বউ, আমি দেখব 'খন। আয় পরসাদ, আয়।"

রুকিয়া পরসাদের পিঠে একটা ঠেলা দিয়া তাহাকে আগাইয়া দেয়, তার পরে আলপথ ধরিয়া তাড়াতাড়ি তুলসী মহতোর ক্ষেতের দিকে চলে। তুলসী মহতো মাঝারি গৃহস্থ পাঁচ-ছ' বিঘা তাহার ধানক্ষেত, সেখানে দশ-বার জন রোপণী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তৈরী ক্ষেতে চারাধানের আঁটি ছিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এখন রোপা সুরু করিলেই হয়। সর্ব্বাঙ্গে কাদামাখা তুলসী মহতো লাঙল থামাইয়া হাঁক দিয়া বলে, "তোমরা আলের উপর কাঠপুতলির মত দাঁড়িয়ে রইলে কেন গো, মাথার উপর সূর্য উঠল, নেমে পড়, নেমে পড়।"

সাড়ী হাঁটু পর্যন্ত তুলিয়া আঁট করিয়া পরিয়া মেয়েরা ক্ষেতে নামিয়া পড়ে। সারিবন্দী তাহারা ক্ষেত্রের এক সীমা হইতে রোপা সুরু করে। প্রত্যেকের বাঁ হাতে এক আঁটি করিয়া চারাধান, সেই আঁটি হইতে ডান হাত দিয়া জুটিদুই চারা পরম ক্ষিপ্রতার সঙ্গে টানিয়া লইয়া কাদায় পুঁতিয়া চলে এবং ক্রমে ক্রমে পিছনে হটিয়া যায়। শ্রেণীবদ্ধ রোপণীর অঙ্গভঙ্গির মধ্যে একটা ছন্দ ও তাল আছে।

বেলা ক্রমে বাড়িতে থাকে, রুকিয়ার পা ভারী হইয়া

আসে, হাত আর চলে না। রোপার কাজে যথেষ্ট শক্তির প্রয়োজন, দুর্বল রুকিয়া তাই সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। ঝুঁকিয়া থাকিতে থাকিতে মাজাটা টনটন করিয়া ওঠে, রুকিয়া মাঝে মাঝে সোজা হইয়া দাঁড়ায়। পাশের রোপনী বিরক্তির সঙ্গে বলে, "হাঁ গা, ঘড়ি ঘড়ি খাড়া হয়ে দেখছ কি ?"

রুকিয়া লজ্জিত হইয়া পড়ে, শরীরের নিঃশেষিত শক্তিটুকু প্রয়োগ করিয়া সে রুপিয়া চলে। সে জানে, এ কাজে ফাঁকি ধরা পড়িলে ভবিষ্যতে আর তাহার রোপার কাজ মিলিবে না। এক মাস রোপার কাজ চলিবে, এই এক মাসের রোজকার সে কিছুতেই নষ্ট হইতে দিবে না। রুকিয়ার দেহের ও মনের মধ্যে বোঝাপড়া চলিতে থাকে, দেহ থামিয়া যাইতে চায়, মন তাহাকে চাবুক মারিয়া ক্লান্ত পশুর মত চালাইয়া লয়।

সূর্য ঠিক মাথার উপর আসিতেই রোপনীদের খাইবার ছুটি হয়। এতক্ষণে শিশুর পাল কাঁদাকাটি সুরু করিয়াছে, ছুটি মিলিতেই মায়েরা ছুটিয়া আসিয়া ছেলেমেয়েদের কোলে তুলিয়া নেয়। রুকিয়া ধীরে ধীরে আসে, পরসাদকে কাছে টানিয়া গাছের ছায়ায় বসিয়া পড়ে, মাথাটা তাহার ঝিমঝিম করিতে থাকে। তুলসী মহতো হাঁক পাড়ে, "ওগো রোপনীরা, খেতে এস।"

প্রথা এই যে, রোপনীরা দুপুরে খাওয়া পাইবে ও দিনান্তে তিন সের ধান পাইবে। মহতোর বাড়ীর মেয়েরা ঝুড়ির ভিতর হাঁড়িকুঁড়ি বসাইয়া ভাতডাল ইত্যাদি ক্ষেতের ধারে লইয়া আসিয়াছে, রোপনীদের খাবার ব্যবস্থা সেইখানেই হইয়াছে। ডাক শুনিয়া তুলসীর রোপনীরা উঠিয়া পড়ে। রুকিয়ার যেন উঠিবারও ক্ষমতা নাই, কোনমতে সেও উঠিয়া পড়ে। অনেকেই নিজের নিজের খাইবার থালাবাসন লইয়া আসিয়াছে, তাহাতে ডালভাত তুলিয়া দেওয়া হয়, যাহারা আনে নাই, তাহাদের গৃহস্থের থালাবাসনেই দেওয়া হয়। হাসিগল্পে সকলেই খাইতে বসে, রুকিয়া মহতো-গৃহিণীকে বলে, "আমি এখানে বসে খাব না মা, ভাত বাড়ী নিয়ে যাব।"

"তা যাও গো।" বলে মহতো গৃহিণী, "তবে চটপট চলে এস, দেরী করো না যেন, বড় ক্ষেতটাই পড়ে আছে।"

ভাতের থালা তুলিয়া লইয়া রুকিয়া বলে, "যাব আর চলে আসব মা।"

ঘরে আসিয়া রুকিয়া অর্দ্ধেক ভাত তিলকাকে খাওয়াইয়া দেয়—রোগা মানুষ, বেশী খাইতে পারে না। বাকি অর্দ্ধেক ছেলেকে সঙ্গে লইয়া সে খাইতে বসে। পেট না ভরিলেও পেটে ভাত পড়ায় দেহে স্বস্তি অনেকখানি ফিরিয়া আসে। ঢক ঢক করিয়া এক ঘটি জল খাইয়া তাড়াতাড়ি থালাখানা মাজিয়া নেয়, তার পরে ছেলের হাত ধরিয়া আবার সে ক্ষেতে ফিরিয়া আসে।

রোপার কাজ চলিতে থাকে। এ বেলা রুকিয়ার তেমন কষ্ট হয় না, মাথাটাও ঝিমঝিম করে না। সকলের সঙ্গে প্রায় তাল রাখিয়াই সে রুপিয়া চলে।

বহু গৃহস্থেরই রোপা হইতেছে, আশেপাশে বহু ক্ষেতেই মেয়েদের ভিড়। রুপিতে রুপিতে রোপনীরা গান ধরে, একটানা একটা মিষ্টি সুরে মাঠ মুখরিত হইয়া ওঠে। মহতো-গিন্নী বলে, "ওগো রোপনীরা গান ধর, গানের সঙ্গে হাতের কাজ বড় এগোয় গো।"

এ উহাকে ঠেলিয়া বলে, "তুই ধর গো।"

কিন্তু কেহই প্রথমে ধরিতে চায় না। ইহাদের মধ্যে যে প্রবীণা সে ঠেস দিয়া বলে, "হ্যাঁ গো, এত ঠেলাঠেলি কেন, গান ধরবে তার আবার এত বাহানা কিসের ?"

একজন বলে, "তুমিই ধর না গো ভৌজী ?"

প্রবীণা গান ধরে, আগে সে এক পদ গায়, আর সকলে পরে একসঙ্গে সেইটা আবার গায়। সেই গানের তালে তাল রাখিয়া রোপনীরা রুপিয়া চলে। রুকিয়া নিঃশব্দে হাত চালায়, হৃদয়ের যে সরসতা হইতে মুখে গান বাহির হয় তাহার হৃদয়ে সে সরসতা বিন্দুমাত্রও নাই।

বেলা পড়িয়া আসে, রোপনীরা কাজে ঢিলা দেয়, হাতের চেয়ে মুখ চলে বেশী। সূর্য দিগন্তে হেলিয়া পড়িতেই তাহারা ক্ষেত হইতে উঠিয়া পড়ে। সারাদিন তাহারা ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আছে, এখন বাড়ী যাইবার জন্য চঞ্চল হইয়া ওঠে। কলরবের অন্ত নাই, দিনের মজুরি তিন সের ধানের জন্য তুলসী মহতোকে তাগিদ দিতে থাকে।

মহতো বলে, "চল না গো আমার বাড়ী হয়ে, ঐ পথেই ত যাবে সব, ঘর থেকে ধান দিয়ে দেব।"

কেহ আপত্তি করে না, মহতোর পিছনে পিছনে ঘরের পথ ধরে।

ধান লইয়া রুকিয়া যখন বাড়ী আসে তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। উঁকি মারিয়া সে তিলকাকে একবার দেখিয়া নেয়, তার পরে পরসাদকে দরজার সামনে বসাইয়া কুলায় করিয়া এক সের আন্দাজ ধান লইয়া তাড়াতাড়ি মনুয়ার বাড়ী যায়। ধান কুটিয়া ফিরিয়া আসিতে তাহার রাত হইয়া যায়। ঘরে তেল নাই, ডিবা জ্বালিতে পারে না, অন্ধকারে হাতড়াইয়া দু'খানা খড়ি টানিয়া উনুনে আগুন জ্বালিল। এইবার সেই আগুনের ক্ষীণ আলোয় তড়িঘড়ি ভাত চড়াইয়া দেয়, রুকিয়া

ধীরে ধীরে উনুনে জাল ঠেলে, পরদাদ উৎসুক নয়নে ভাতের হাঁড়ির দিকে তাকাইয়া থাকে।

২২

চারদিন তুলসী মহতোর ধান রুপিয়াছে, তিন দিন রুপিয়াছে মাণিক মুদীর, আজ রুকিয়া হরি সিংএর ধান রুপিতে যাইবে। তিলকাকে দু'মুঠো বাসিভাত খাওয়াইয়া, ছেলে ও নিজে দু'গ্রাস খাইয়া রুকিয়া মাঠে যাইবার জন্য প্রস্তুত হয়। ঘরের ভিতর তাহার আজ অনেকটা গোছগাছ, খালি হাঁড়িগুলি আর এলোমেলো ঘরময় ছড়াইয়া নাই, এক পাশে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে ; সব হাঁড়ি শূন্যও নয়, দুই-একটার মধ্যে কিছু ধানও সঞ্চিত আছে।

ছেলেকে কোলে লইয়া রুকিয়া তিলকাকে বলে, "আমি চললুম গো।" তার পরে তড়িঘড়ি ঘরের বাহির হইয়া পড়ে। তিলকা শূন্যঘরে খাটিয়ার উপর শুইয়া পড়িয়া থাকে। কয়েকদিন উপরি উপরি দু'বেলা পেটে অন্ন পড়ায় তিলকার দেহের ও মনের দুর্বলতা অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে, চোখে আর অবসাদের ঘোর নাই। গরীবের সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাধি হইতেছে খালি পেট, অন্যান্য ব্যাধি তাহার তুলনায় কিছুই নয়। খাইতে না পাইয়া তিলকা ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার পায়ের ঘাও বাড়িয়া যাইতে ছিল, আবার খাইতে পাইয়া জীবনীশক্তির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ঘা কমিয়া আসিতেছে।

তিলকা মাথাটা তুলিয়া অন্ধকার ঘরের ভিতরটা তাকাইয়া তাকাইয়া দেখে। অতিপরিচিত পুরনো পরিবেশ, অথচ কেমন যেন নতুন বলিয়া মনে হয়। ঘরের কোণে সেই উনুন, তার পাশে মেটে কলসী দুটি, ওপাশে সারিবন্দী কয়েকটা মেটে হাঁড়ি, কাঠের ভাঙা বাক্স, একখানা ভাঙা কুলা। কুলুঙ্গিতে কালিমাখা ডিবাটা। এসব যেন সে বহুদিন পরে আবার দেখিতেছে। বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিলে মানুষ যেমন করিয়া নিজের ঘর-দুয়ার আঙিনার দিকে নতুন করিয়া তাকায়, তিলকা আজ নিজের ঘরখানির দিকে সেইভাবে তাকাইয়া দেখে। গত বছর খাপরার চাল মেরামত করা হয় নাই, তাহাতে অসংখ্য ছিদ্র, বাহিরের প্রখর আলো সেই অসংখ্য ছিদ্রে ঝলমল করে, তিলকা মুগ্ধ হইয়া সেইদিকে তাকাইয়া থাকে।

এতদিন তিলকা যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিল, তাহার মধ্যে ছিল না কোন শৃঙ্খলা, কোন স্পষ্টতা, আজ তাহার এলোমেলো চিন্তার মধ্যে একটা শৃঙ্খলা আসিয়াছে, সেই দুঃস্বপ্নের অনেক অংশ সে ভুলিয়াও গিয়াছে। আজ সে শুইয়া শুইয়া অতীত দিনগুলির ছিন্নসূত্র জোড়া দিবার চেষ্টা করে।

দুপুর বেলা রুকিয়া ভাতের থালা লইয়া ঘরে আসে। কলসীতে জল নাই দেখিয়া তাড়াতাড়ি জল আনে, তিলকাকে খাওয়ায়, তার পরে ছেলেকে সঙ্গে লইয়া নিজে খাইতে বসে। তিলকা তাকাইয়া তাকাইয়া রুকিয়াকে দেখে, তাহার ব্যস্ত ছুটাছুটি, তাহার ওঠাবসা তিলকার চোখে অদ্ভুত লাগে। হঠাৎ সে বলে, "এদিকে আয় গো।"

রুকিয়া আশ্চর্য হইয়া যায়, তিলকার কণ্ঠস্বরে এমন সুর সে অনেকদিন শোনে নাই, সে উঠিয়া তিলকার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়।

রুকিয়ার মুখের দিকে তাকাইয়া তিলকা বলে, "তোকে বড্ড রোগা দেখাচ্ছে।"

রুকিয়ার সর্বাঙ্গে একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলিয়া যায়, কত দিন পরে তিলকা আবার তাহার দিকে ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিয়াছে! কিছুক্ষণ রুকিয়া কোন জবাবই দিতে পারে না, উদ্বেলিত হৃদয়টাকে সংযত করিতে চেষ্টা করে, তার পরে বলে, "বেশ ত আছি গো।"

তিলকা রুকিয়ার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে, সেখানে কি যেন সে দেখিতে পায়, কিসের যেন সে অর্থ বুঝিতে পারে না। রুকিয়া অস্বস্তি বোধ করে, একটু পরে সরিয়া যায়, বলে, "আমি যাই গো, হরিসিংয়ের ধানক্ষেত মাঠের ওপারে, বড্ড দূর, যেতে অনেকটা সময় লাগবে।"

তিলকা বলে, "যা তা হলে, পরদাদকে রেখে যা আমার কাছে।"

পথ চলিতে চলিতে রুকিয়া আজ গাঁয়ের লোকের সঙ্গে ডাকিয়া কথা কয়। আজ মনটা তাহার ভারি হালকা। এতদিন সে যেন নিজের মধ্যে একাকী বন্দী হইয়াছিল, বাহিরের আলো-বাতাস সেখানে প্রবেশ করিবার পথ ছিল, না, আজ হঠাৎ বন্দীশালার দরজা যেন খুলিয়া গিয়াছে, সেখানে বাহিরের আলো-বাতাস ঢুকিয়া পড়িয়াছে, জগতের সঙ্গে আবার তাহার যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে। পথে টুকনীকে দেখিয়া রুকিয়া ডাকে, "কোথায় চলেছিস বোন, কার ধান রুপছিস গো?"

টুকনী জবাব দেয় না, রুকিয়ার ডাক সে শুনিয়াও শোনে না। তাড়াতাড়ি রুকিয়া তাহার কাছে গিয়া হাত চাপিয়া ধরে, হাসিয়া বলে, "ডাকছি যে, শুনতে পাসনে?"

টুকনী গম্ভীরভাবে বলে, "কি ভাগ্যি, আজ তোমার নজরে পড়লুম ভৌজী, সেদিন কত ডাকলুম, সাড়াও দিলে না।"

দুই হাতে টুকনীকে জড়াইয়া ধরিয়া রুকিয়া বলে, "রাগ

করিসনে লক্ষ্মী বোন, আমি কি মানুষ ছিলুম গো, আমি যে পশুরও অধম হয়েছিলুম।"

টুকনী রুকিয়ার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখে, আশ্চর্য হইয়া বলে, "কি চেহারা হয়েছে তোর ভৌজী, অসুখ করেছে নাকি গো ?"

হাসিয়া রুকিয়া বলে, "এ পোড়া শরীরে অসুখও হয় না ভাই, অসুখ হয়ে কত লোক মরে, আমার মরণ নাই।"

রুকিয়াকে একটা ধাক্কা দিয়া টুকনী বলে, "মরবি কেন গো, তোর কি মরবার বয়স হয়েছে !"

হাত ধরাধরি করিয়া দুই জনে গল্প করিতে করিতে মাঠে আসিয়া উপস্থিত হয়।

"হাঁ গা, চমন তেলির ক্ষেতখানা পড়তি আছে কেন গো ?" ধান রুপিতে রুপিতে পাশের রোপণীকে প্রশ্ন করে রুকিয়া।

"চমনারা দু'ভাই পৃথক হয়ে গেছে যে।" জবাব দেয় পাশের বউটি।"

"তা ত জানিনে।" বলে রুকিয়া।

"হ্যাঁ গো, ওরা দু'ভাই পৃথক হয়েছে, চমনের এক জোড়া বলদ আছে, তার ভাগের ক্ষেত চাষ হয়ে গেছে, ছোট ভাইটার হাল-লাঙ্গল নাই, এর-ওর কাছে চেয়েচিন্তে কোন মতে চাষ করছে, তাই চাষ পিছিয়ে পড়েছে।" বলে পাশের বউটি।

এতদিন রুকিয়া ধান রুপিতে আসিয়াছে, ধান রুপিয়া চলিয়া গিয়াছে, আশেপাশে কাহারও ক্ষেতের দিকে তাকায় নাই, আজ সে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখে, এত বড় মাঠ সবটাই প্রায় রোপা হইয়া গিয়াছে, এখানে-ওখানে দু'একটি ক্ষেত মাত্র পড়তি আছে। এই সবুজের সমারোহ দেখিয়া তাহার মন আজ খুশী হইয়া ওঠে, বলে, "কই গো, আজ তোমরা গান ধরবে না ?"

একজন জবাব দেয়,"ধরলেই বা কি, তুমি ত গাও না।"

রুকিয়া বলে, "আমি ভাল গাইতে পারি নে বলে গাই নে। তা ধর না গো তোমরা।"

মেয়েরা গান ধরে—

উঁচি কুড়িবয়া, পুরবে দুয়ারিয়া
হল হল ঢুকহে বাতাস।
পিয়োয়া এই সান নিরমোহিয়া
টাটিও না দেলকেই ভিড়কা।
পিয়োয়া গেলেই পরদেশীয়া
সঁচলো যৌবনোয়া গেলেই বহয়,
আপনেও না আইলা পিয়োয়া,
না চিঠি ভেজলা।

অর্থাৎ—ঘরখান আমার উঁচু, তাতে আবার পূবদিকে দরজা, হু হু করে বাতাস ঢুকছে। প্রিয় এমনই নির্মম যে, দরজাটা বন্ধ করেও দিয়ে গেল না। প্রিয় চলে গেল পরদেশে, ভরা যৌবন আমার বয়ে গেল। নিজেও এল না প্রিয়, চিঠিও দিল না।

আকাশে মেঘ ঘনাইয়া আসে, দেখিতে দেখিতে বৃষ্টি নামিয়া পড়ে। রোপণীদের অনেকেরই ছাতা আছে, অথবা পাতায়-বোনা ছোপি আছে, রুকিয়ার কিছুই নাই—সে ভেজে, ভিজিতে আজ তাহার ভালই লাগে, সে ভিজিতে ভিজিতে গান গায় :

সঁচলো যৌবনোয়া গেলেই বহয়।

২৩

কয়েকদিন পরে আজ রুকিয়ার ছুটি, আজ কেহ তাহাকে ধান কাটিতে ডাকে নাই। ছুটি বলিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া নাই, আকাশ পরিষ্কার দেখিয়া সকাল হইতে তাহার অতি মলিন দুই-একখানা শাড়ী উনুনের ছাই দিয়া সেদ্ধ করিয়াছে। একটু বেলা হইতেই শাড়ীসমেত হাঁড়িটি লইয়া কাচাকুচি করিতে বাঁধে যাইবে এমন সময় তিলকা ডাকিয়া বলে, "একবারটি এদিকে আয় ত।"

রুকিয়া বলে, "কেন গো, কি বলছিস, বাঁধে যাচ্ছি কাপড় কাচতে।"

তিলকা ব্যগ্রভাবে বলে, "আয় না একটু, কাজ আছে।"

হাঁড়িটি রাখিয়া রুকিয়া তিলকার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, তিলকা তাহার শীর্ণ হাতখানা রুকিয়ার দিকে বাড়াইয়া দিয়া হাসিয়া বলে, "একটু ধর্ আমি উঠব।"

আশ্চর্য হইয়া রুকিয়া বলে, "উঠবি কেন ?"

তিলকা বলে, "আমি একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াব, ধর দিকিন আমাকে।"

অবাক হইয়া যায় রুকিয়া, বলে, "পারবি যেতে বাইরে ?"

"হ্যাঁ গো পারব, আমি তোর কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে যেতে পারব, পাটা আমার অনেক হালকা হয়েছে।"

রুকিয়া তাহার হাত ধরে, তিলকা ধীরে ধীরে উঠিয়া বসে, তার পরে সন্তর্পণে ভাল পাখানা নামাইয়া দিয়া তাহার উপর ভর দিয়া খাড়া হয়। রুকিয়া ভয়ে ভয়ে তাহাকে শক্ত করিয়া ধরে, তিলকা যে আবার উঠিয়া দাঁড়াইবে সে কথা যেন বিশ্বাস করিতে চায় না। তিলকা রুকিয়ার কাঁধে ভর দিয়া বলে, "এইবার চল।"

রুকিয়া সাবধানে আস্তে আস্তে চলে, তিলকা আহত পা

খানি আলগোছে ফেলিয়া এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হয়। ধীরে ধীরে তাহারা ঘরের বাহিরে আঙিনায় আসিয়া দাঁড়ায়।

"আমাকে ছেড়ে দে গো, আর চট করে খাটিয়াখানা বাইরে নিয়ে আয়।" বলে তিলকা।

রুকিয়া তাহাকে ছাড়িতে সাহস পায় না, বলে, "হ্যাঁ গো, পারবি দাঁড়াতে, পড়ে যাস্ যদি?"

মাথা নাড়িয়া তিলকা বলে, "না পড়ব না, তুই ছেড়ে দে।"

তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া রুকিয়া পাশেই দাঁড়াইয়া থাকে, তিলকা পড়িয়া যায় না, সে দাঁড়াইয়া শিশুর মত হাসিতে থাকে। রুকিয়া ছুটিয়া গিয়া হালকা খাটিয়াখানা তাড়াতাড়ি বাহিরে আনিয়া পাতিয়া দেয়, তিলকা তাহার উপর বসিয়া পড়ে।

বৃষ্টিধোয়া পৃথিবীর উপর রোদ পড়িয়া ঝলমল করে। সেদ্ধ কাপড়ের হাঁড়িটি মাথায় লইয়া রুকিয়া বাঁধের দিকে চলে। পথের বাঁ পাশে মস্ত বড় মাঠটায় ধান রোপা হইয়া গিয়াছে, সে যেন অসংখ্য খোপকাটা একটি নরম গালিচা, কোন খোপটা গাঢ় সবুজ, কোনটা হালকা সবুজ, কোনটা ফিকে সবুজ, কোনটা আবার সবুজের সঙ্গে হলুদ মেশান। যে ক্ষেত আগে রোপা হইয়াছে তাহার ধানগাছগুলি মাটিতে শিকড় পুঁতিয়া গাঢ় সবুজ হইয়া উঠিয়াছে, যে ক্ষেত হালে রোপা হইয়াছে তাহার ধানগাছ এখনও দুর্বল, এখনও ক্ষেত হইতে রস টানিতে পারে নাই; তাই তাহা ফিকে সবুজ। পথের ডান পাশে মাঠ, কখনও উঁচু, কখনও নীচু হইয়া দূরে শালবনে গিয়া ঠেকিয়াছে, তাহার মাঝে মাঝে আম ও মহুয়া গাছ। মাঠের লাল-কাঁকর ঢাকিয়া ঘাস গজাইয়াছে, আম-মহুয়ার শ্রী ফিরিয়াছে। সরু পথ ধরিয়া বাঁধের দিকে চলিতে চলিতে রুকিয়া দুই চোখ ভরিয়া সবুজের এই সমারোহ দেখে। একটু পরে সে বাঁধের ধারে আসিয়া দাঁড়ায়। জ্যৈষ্ঠের শুষ্কপ্রায় বাঁধ শ্রাবণে কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছে, রোদ পড়িয়া কালো জল ঝিকমিক করিতেছে। মাথার হাঁড়িটি ঘাটে নামাইয়া রুকিয়া একবার চারিদিকে তাকাইয়া দেখে। বাঁধের ওপারে ঢালু মাঠ, তার পরে জঙ্গল, জঙ্গলের পিছনে দূরে নীল পাহাড়। ঐ নীল পাহাড়ের ওপাশে রুকিয়ার নাইহার (বাপের বাড়ী), বনে-ঘেরা ছোট্ট গ্রাম। শিশুকালে তাহার বিবাহ হইয়াছিল, কৈশোরে শ্বশুর বাড়ী আসিয়া সে ঐ দূরের গ্রামখানির জন্ম কাঁদিয়া চোখ ফুলাইত। আজ সেখানে রুকিয়ার আপনার বলিতে কেহ নাই, মা-বাপ মরিয়া গিয়াছে, একটি ভাই ছিল, সে বহু দিন হইল কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহার কোন ঠিকানা নাই। তবু দূরের পাহাড়ের দিকে তাকাইয়া রুকিয়ার মন কেমন করিয়া ওঠে।

কাপড় কাচিয়া বাড়ী ফিরিয়া রুকিয়া দেখে তিলকা খাটিয়ার উপর কাত হইয়া শুইয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া আছে। ভিজে কাপড় রোদে দিয়া সে ঘরে ঢুকিয়া রান্নার আয়োজন করে। এক ফাঁকে বাহিরে আসিয়া বলে, "হ্যাঁ গা, সারাদিন কি বাইরে বসে থাকবি? ভিতরে যাবি নে?"

তিলকা বলে, "কতদিন পরে আজ আলো-বাতাসে এসে বসেছি গো, ভেতরে যেতে আর মন হচ্ছে না।"

রুকিয়া আর কিছু না বলিয়া ঘরের কাজে চলিয়া যায়।

তিলকার চোখে পৃথিবীটা আজ বড় নতুন, বড় সুন্দর লাগে। সামনের আমগাছটার দিকে সে তাকাইয়া থাকে, আজন্মপরিচিত এই গাছটার দিকে ভাল করিয়া কোন দিন সে তাকায় নাই, আজ তাকাইয়া তাকাইয়া সে দেখে। অনেক দিন পরে কোন প্রিয় আত্মীয়কে দেখিলে লোক যেমন খুশী হইয়া ওঠে, আমগাছটার দিকে তাকাইয়া তিলকা তেমনই খুশী হইয়া ওঠে। মাথার উপরের আকাশটাও আজ যেন নীচে আসিয়া তাহার মন স্পর্শ করিয়াছে। এতদিন ধরিয়া দেহ ও মনের যে দুর্বহ কষ্ট সে ভোগ করিয়াছে আজ বাহিরের আলো-বাতাসে আসিয়া তাহা একেবারেই ভুলিয়া যায়।

পরসাদ আসিয়া খাটিয়ার পাশে দাঁড়ায়। তিলকা তাহার কচি হাতখানা ধরিয়া টানে, পরসাদ আরও কাছে সরিয়া আসে। তিলকা তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া চমকাইয়া ওঠে, কি শীর্ণ, কি শুকনো তাহার ছেলের কচি মুখখানা! ঘরের মধ্যে আবছা অন্ধকারে সে পরসাদকে ভাল করিয়া দেখিতে পায় নাই, আজ বাহিরে আসিয়া আলোর মধ্যে তাহার দিকে তাকাইয়া দেখে। চুলগুলি তাহার প্রায় জট পাকাইয়া গিয়াছে, চোখ দুটি কোটরাগত, শুকনো মুখে লাবণ্যের লেশমাত্র নাই, তাহাতে আছে একটা কাতরতার ছাপ। হাত-পাগুলি শীর্ণ, সরু, বুকের পাঁজর একটি একটি করিয়া গণিতে পারা যায়। তিলকার বুকটা হঠাৎ ব্যথায় ভরিয়া ওঠে, মনের চিন্তা এলোমেলো হইয়া যায়। যে দুই-আড়াই মাস সে খাটিয়ায় পড়িয়াছিল সেই দীর্ঘ সময়ের একটা স্পষ্ট ধারণা সে করিতে চায় কিন্তু পারে না, মাঝে মাঝে এক-একটি ফাঁক ছুটিয়া যায়। যে ঝড় তাহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, সেই ঝড়ের ঝাপটায় যে ইহারাও ধ্বংস হইতে চলিয়াছিল সেটুকু তিলকা বুঝিতে পারে। তিলকা তাহার জীর্ণ পাঁজরার উপর শিশুর শীর্ণ মুখখানা চাপিয়া ধরে। দীর্ঘ-কাল খাটিয়ায় পড়িয়া থাকার জন্যে সে অতিশয় সঙ্কোচ বোধ

করে, রোগটা যে তাহার ইচ্ছাকৃত নয় একথা মন যেন সম্পূর্ণ স্বীকার করিতে চায় না।

রুকিয়া বাহিরে আসিয়া বলে, "ভাত হয়েছে, খাবি চল।"

তিলকা তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলে, "আর হপ্তাখানেক পরেই আমি চলতে-ফিরতে পারব গো, তার পরে একটা কাজটাজ জোগাড় করে নেব।"

রুকিয়া হাসিয়া ফেলে, বলে, "আজ ত সবে ঘর থেকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বেরুলি, এখনই কাজের ভাবনা!"

তিলকা বলে, "হ্যাঁ গো, আমার মন বলছে এইবার আমি ভাল হয়ে উঠব।"

রুকিয়া তিলকার হাত ধরে, তিলকা রুকিয়ার কাঁধে ভর দিয়া ভিতরে যাইতে যাইতে বলে, "আমি যদি এমনি করে দু'বেলা খেতে পাই তা হলে হপ্তাখানেক পরেই ঠিক চলতে পারব, তুই দেখে নিস।"

২৪

এক সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে, সেদিন সন্ধ্যাবেলা ধান রুপিয়া ঘরে ফিরিতে রুকিয়া দেখে তিলকা পথে দাঁড়াইয়া আছে। রুকিয়াকে দেখিয়া তিলকা আরও একটু আগাইয়া আসে, উৎসাহের সঙ্গে বলে, "এই দেখ গো, এতটা পথ আমি চলে এসেছি।"

ততক্ষণে রুকিয়া তিলকার পাশে আসিয়া দাঁড়ায়, ভয়ে ভয়ে বলে, "তুই পাগল, একা একা কেন এলি! আমি ধরে ধরে যাচ্ছি, ফিরে চল।"

রুকিয়া তাহাকে ধরিতে যায়, তিলকা বাধা দিয়া বলে, "ধরবি কেন গো, এই দেখ আমি কেমন চলে যাব।"

তিলকা ধীরে ধীরে খোঁড়াইয়া চলে, কখনও টাল খায় আবার সামলাইয়া নেয়, যেন একটি শিশু প্রথম চলিতে শিখিয়াছে। রুকিয়া পিছনে পিছনে আসে, তিলকার অদ্ভুত চলা দেখিয়া তাহার হাসি পায়, পরমুহূর্তে আবার স্বস্তিতে বুকটা ভরিয়া ওঠে।

রাত্রে রান্না-খাওয়া শেষ করিয়া রুকিয়া আজ তিলকার খাটিয়ার একপাশে আসিয়া বসে। দরজা খোলা, আকাশে শুক্লপক্ষের আধখানা চাঁদ উঠিয়াছে; ঘরের ভিতরেও খানিকটা জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। তিলকা রুকিয়াকে প্রশ্ন করে, তোর বুঝি ঘুম পায়নি?"

"না" বলে রুকিয়া।

তিলকা বলে, "আজ আমারও ঘুম পাচ্ছে না, কত কথা যে ভাবছি।"

উদ্‌গ্রীব হইয়া রুকিয়া জিজ্ঞাসা করে; "কি ভাবছিস?"

রুকিয়ার কাছে সরিয়া আসিয়া তিলকা বলে, "গায়ে আর একটু জোর পেলেই আমি কাজ করতে পারব, তাই ভাবছি, গাঁয়ে ত কাজ পাব না। কাতরাস গেলে কয়লার খাদে কাজ মিলবে, কিন্তু তোকে একলা রেখে যেতে আমার মন সরে না।"

কাতরাসের নামে রুকিয়ার বুকটা ধড়াস করিয়া ওঠে, বলে, "না গো না, কাতরাসে তোকে যেতে দেব না, এই শরীর নিয়ে বিদেশে গেলে তুই মরে যাবি।"

"কিন্তু এ সময়ে গাঁয়ে যে কোন কাজ মেলে না গো।" বলে তিলকা।

রুকিয়া তা জানে, অগ্রহায়ণ মাসে ধান কাটিবার সময়, দু'চারদিন কাজ মিলিলেও মিলিতে পারে, তা বাদে গাঁয়ের ভূমিহীন বাসিন্দারা দীর্ঘকাল বেকার বসিয়া থাকে। রুকিয়া তিলকার কথার কোন জবাব দেয় না, নিঃশব্দে বসিয়া ভাবে।

হঠাৎ তিলকা সজাগ হইয়া ওঠে, বলে, "হ্যাঁ গো, শুনতে পাচ্ছিস গান গাইছে? কাদের বাড়ী গো?"

রুকিয়াও শুনিতে পায়, দূর হইতে মিলিত নারীকণ্ঠের গান ভাসিয়া আসে। রুকিয়া চমকাইয়া ওঠে, এ গানের সুর ও ভাষা মুহূর্তে তাহার অন্তরকে আলোড়িত করিয়া দেয়, বিস্মিত কণ্ঠে বলে, "করমার গান গাইছে গো, করমা যে এসে পড়েছে সেকথা দেখ ভুলেই গেছি।"

শুনিয়া তিলকা উৎসাহিত হইয়া ওঠে, বলে, "তাই ত গো, ধান রোপা হয়ে গেল, করমা ত এসে পড়বেই।"

করমা হইতেছে এ দেশের জনসাধারণের একটা প্রধান পরব। ধান রোপা যখন শেষ হইয়া যায়, ভাদ্র মাস আসিয়া পড়ে, নদী নালা, বাঁধ-পুকুর কানায় কানায় ভরিয়া থাকে, অথচ বর্ষার বর্ষণ কমিয়া যায়, তখন শ্বশুরবাড়ী হইতে মেয়েরা বাপের বাড়ী ফিরিয়া আসে, ভাইয়ের কল্যাণে তাহারা করমের পূজা করে। নাচ ও গান এ পরবের প্রধান অঙ্গ, তাই করমপূজার কয়েকদিন নবমী ও দশমীর ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় মেয়েরা সারারাত মাদলের তালে নাচে আর গান গায়।

রুকিয়া কান পাতিয়া গান শোনে, অতীতের কত কথা তাহার মনে পড়িয়া যায়। অল্পবয়সে তাহার বিবাহ হইয়াছিল, শ্বশুরবাড়ী আসিলে বাপের বাড়ীর জন্য প্রাণ কাঁদিত। ধান রোপা হইয়া গেলেই সে রোজ বাপের বাড়ীর লোকের প্রত্যাশায় পথ চাহিয়া থাকিত। যেদিন কেহ তাহাকে লইতে আসিত সেদিন তাহার আনন্দের সীমা থাকিত না। মনে পড়ে, একবার তাহাকে লইতে কোন লোক আসিল না,

গ্রামের মেয়েরা শ্বশুরবাড়ী হইতে একে একে ফিরিয়া আসিতে লাগিল, সে কাঁদিয়া দুই চোখ লাল করিয়া ফেলিল। পূব হইতে যে পথটি মহুয়াতলা দিয়া গ্রামে আসিয়া ঢুকিয়াছে দিনের মধ্যে একশ'বার সেই পথের দিকে সে আকুল হইয়া তাকাইয়া থাকিত। পরব আসিয়া পড়িল অথচ শেষ পর্যন্ত কেহ যখন তাহাকে লইতে আসিল না তখন বার বছরের মেয়ে বিকালের দিকে শাশুড়ীর চোখ এড়াইয়া বাপের বাড়ীর পথ ধরিয়া ছুটিল। সন্ধ্যা যখন নামিয়া আসিল তখন বাপের বাড়ী অনেক দূর ; পাহাড়ের কোল ঘেঁষিয়া শালবনের মধ্য দিয়া সরুপথ, সেই পথ ধরিয়া সে ছুটিতে লাগিল, ভয় পাইল না। এক প্রহর রাত্রে তাহাদের বাড়ীর আঙিনায় তখন নাচ চলিতেছে এমন সময় সে ছুটিয়া সেখানে আসিয়া প্রবেশ করিল।

"ওমা, এ কে গো, আমার পাগলী বেটি যে।" এই বলিয়া মা আসিয়া তাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিল। আজ তাহার মা নাই, বাপ নাই, ভাই নিরুদ্দেশ, আজ তাহার বাপের ভিটাটি পর্যন্ত লোপ পাইয়াছে, রুকিয়া একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে।

তিলকা রুকিয়াকে একটা ঠেলা দিয়া বলে, "কি ভাবছিস গো ?"

রুকিয়া বলে, "না, কিছু না, আমার ঘুম পাচ্ছে।"

"তবে যা, শোগে যা" বলে তিলকা।

রুকিয়া উঠিয়া গিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দেয়, তার পরে এক কোণে বিছান কাঁথাটির উপর গিয়া ছেলেকে কোলে টানিয়া শোয়। কিন্তু শুইয়া সে ঘুমায় না, ছেলে-বেলার চিন্তা তাহাকে পাইয়া বসে, সে চোখ বুঁজিয়া সেই সব কথা ভাবে। তাহাদের সংসারে গুটিতিনেক ছাগল ছিল, একটু সেয়ানা হইলেই সে ছাগল চরাইত। সকাল বেলা নিজের ছাগল তিনটি লইয়া অন্যান্য রাখাল ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে গ্রামের পাশে জঙ্গলে চলিয়া যাইত, সেইখানে দুপুর পর্যন্ত ছুটাছুটি, হৈ চৈ ও ছাগল সামলাইয়া কাটিত। ক্ষুধা পাইলে গ্রীষ্মকালে পিয়ারের টক ফল ও শীতকালে জংলী কুল সংগ্রহ করিয়া খাইত, তার পরে নদীতে নামিয়া পেট ভরিয়া জল খাইত। দুপুরে বাড়ী ফিরিয়া বরাদ্দমত ভাত বা লপসি খাইয়া আবার ছাগল চরাইতে বাহির হইত, তার পরে সূর্য পাহাড়ের আড়ালে হেলিয়া পড়িতেই ক্লান্ত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিত। জুটিলে কোনদিন খাইত কোনদিন খাইত না, খাটিয়ার একপ্রান্তে শুইয়া পড়িতেই সারাদিনের ক্লান্তিতে সে অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িত।

রুকিয়া যেন অতীতের দিনগুলি ছবির মত পরিষ্কার দেখিতে পায়। আহা, কি আনন্দেই না সে সময়টা কাটিয়াছে ! মাঝে মাঝে বিপদ-আপদ দুঃখও যে আসে নাই এমন নয়। একবার তাহার বসন্ত হইয়াছিল, বাঁচিবার আশা ছিল না, সর্বাঙ্গে ঘা লইয়া সারাদিন আঙিনায় শুইয়া থাকিত, আর তাহার মা নিমগাছের পাতাসমেত একটা ডাল লইয়া মাঝে মাঝে হাওয়া করিত। সে যাত্রা কোন রকমে সে বাঁচিয়া ওঠে। আর একবার তাহার দুইটি ছাগলকে নেকড়ে বাঘ মারিয়া ফেলে। রোজকার মত সেদিনও দল বাঁধিয়া তাহারা শালজঙ্গলে ছাগল চরাইতেছিল। সেটা শীতকাল, হু হু করিয়া ঠাণ্ডা পশ্চিমে বাতাস বহিতেছিল, নেংটি বা পুতলি (ছোট মেয়েদের কোমরে জড়াইবার ঠেঁটি কাপড়) ছাড়া তাহাদের দেহের কোথাও আর আবরণ ছিল না, তাই একটা উঁচু পাথরের আড়ালে সকলে জমা হইয়া বসিয়াছিল, এমন সময় হঠাৎ গোটা পাঁচেক নেকড়ে বাঘ আসিয়া এক মুহূর্তে তাহার দুইটা ছাগলকে মারিয়া ফেলে। চীৎকার-চেঁচামেচি করাতে গ্রাম হইতে লোক আসিয়া পড়ে কিন্তু ততক্ষণ মরা ছাগল দুইটিকে লইয়া নেকড়ের পাল উধাও হইয়া যায়।

সেদিন তাহার বড় দুঃখ হইয়াছিল, সারারাত কাঁদিয়া-ছিল।

রাত অনেক হইয়া যায়, অদূরে করমার গান থামিয়া যায়, রুকিয়াও ঘুমাইয়া পড়ে।

২৫

সকাল বেলা রুকিয়া ঝুড়িতে কয়েক সের ধান লইয়া পাড়ার দিকে যাইতেছে দেখিয়া তিলকা প্রশ্ন করে, "কোথায় চললি, আজ বোধ হয় ধান রুপতে যাবি নে ?"

রুকিয়া বলে, "গাঁয়ের ধান রোপা শেষ হয়ে গেছে, কে আর ডাকবে বল্। পাঁচ সের ধান নিয়ে বেনোয়ারীর মার বাড়ী যাচ্ছি, কুটে নিয়ে আসি। ঘরে ত চাল নেই, ধানই আছে কয়েক সের।"

সঙ্গে সঙ্গে দরজা পর্যন্ত আসিয়া তিলকা বলে, "তা যা, কুটে নিয়ে আয়, আতপ চালের ভাত বেশ লাগে খেতে।"

রুকিয়া ধানের টুকরি মাথায় তুলিয়া চলিয়া যায়, তিলকা বাড়ীর বাহিরে আসিয়া পথের পাশে আমগাছটার নীচে গিয়া বসে। আকাশ পরিষ্কার, কোথাও মেঘের লেশ নাই, সকালের রোদে সবুজ পৃথিবী ঝলমল করিতেছে। তিলকার মনটা ধীরে ধীরে খুশী হইয়া ওঠে। মাথায় বেনাতির ঝুড়ি লইয়া বুড়ো শিউচরণ মুদীকে পথ দিয়া যাইতে দেখিয়া তিলকা হাঁক দেয়, "শিউচরণদা গো, ও শিউচরণদা !"

বুড়ো শিউচরণ মুদী থমকিয়া দাঁড়ায়, সে কানে কম শোনে তাই হাঁকটা কোনদিক হইতে আসিতেছে তাহা ঠাহর করিবার জন্য চারিদিকে তাকায়। তিলকা এইবার হাত নাড়িয়া তাহাকে ডাকে। তিলকাকে দেখিয়া মুদী আগাইয়া আসে, হাসিয়া বলে, "এই যে ভাই, কেমন আছ গো ?"

তিলকা তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া বলে, "ভাল আছি দাদা, বড্ড ভুগে উঠলুম।"

বেসাতির ঝুড়িটি নামাইয়া তাহার পাশে বসিয়া পড়িয়া শিউচরণ বলে, "জানি ভাই সব, তা ভগবানের কৃপায় বেঁচে উঠেছ।"

তিলকা মাথা নাড়িয়া সায় দেয়, তার পরে ঝুড়ির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া প্রশ্ন করে, 'কি বেচতে বেরিয়েছ শিউচরণদা ?"

শিউচরণ বলে, "আছে ভাই সবই কিছু কিছু, ছাতু, ছোলা ভাজা, নুন, তামাকপাতা এই সব। ঘুরে বেড়ানই সার হয়, বিক্রি কিছুই হয় না।"

"তামাকও আছে নাকি দাদা ?" উৎসুক ভাবে বলে তিলকা।

ঝুড়ির শালপাতার ঢাকা সরাইয়া শিউচরণ বলে, "এই যে রয়েছে ভাই।"

"তামাকের একটা পাতা তুলিয়া নাকের কাছে লইয়া তিলকা গন্ধ শুঁকে, তার পরে ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করে, "একটা পাতার কত দাম হবে গো ?"

ভুরু দুটি কুঞ্চিত করিয়া শিউচরণ বলে, "সের হিসেবে বিক্রি করি গো। ও পাতাটার ওজন হবে প্রায় আধ ছটাক, তা হলে এই ধরো দাম পড়বে চার আনা।"

পাতাটা তাড়াতাড়ি নামাইয়া রাখিয়া তিলকা বলে, "বাবা গো, একটা পাতার এত দাম !"

শিউচরণ মাথা নাড়িয়া বলে, "জিনিসটা যে ভাল গো, তা সস্তা চাও ত তেমন জিনিসও আছে।" শিউচরণ আর একটা পাতা তুলিয়া ধরে।

তিলকা সেটা হাতে লইয়া প্রশ্ন করে, "এটার দাম কত ?"

শিউচরণ একটু ভাবিয়া বলে, "অন্য কেউ হলে তাকে দশ পয়সা বলতুম, তোমার কাছ থেকে কি আর লাভ নেব, খরিদ দাম দু'আনা—তাই দাও।"

পাতাটাকে বার দুই সযত্নে আন্দোলিত করিয়া তিলকা করুণভাবে হাসিয়া বলে, "দু'আনাই দেব দাদা, কিন্তু দামটা এখন দিতে পারব না, হাতে পয়সা নাই। যত শিগগির পারি দিয়ে দেব।"

মাথা নাড়িয়া শিউচরণ বলে, "না ভাই, বাকি দিতে পারব না। নগদ বিক্রি বলেই দু'পয়সা কমিয়ে বলেছি।"

তিলকা বিনয় করিয়া বলে, "তোমার পয়সা আমি রাখব না শিউচরণদা, সে ভয় তুমি করো না। গরীব বটে কিন্তু আমি বেইমান নই।"

পাতাটির জন্য হাত বাড়াইয়া শিউচরণ বলে, "না ভাই, বাকির কথা বলো না। দু'চার টাকা পুঁজি গো, ধারে বিক্রি করলে আমার ব্যবসা চলে না।"

তিলকা তামাকের পাতাটা শিউচরণকে ফিরাইয়া দেয় না। শিউচরণ অধৈর্য হইয়া বলে, "দাও গো দাও, উঠতে হবে।"

তিলকা এইবার বলে, "তামাক যখন হাতে পেয়েছি তখন আর তা ফেরত দিচ্ছিনে শিউচরণদা ; পয়সার বদলে আমি এক পাইলা ধান দিচ্ছি—নেবে ?"

শিউচরণ ব্যবসাদার, ধান, চাল মহুয়া-মকাই পাইলে সে আপত্তি করে না, তাহার বদলে জিনিস দেয় ; বলে; "তা কেন নেব না গো, এক পাইলা ধানের দাম দু'আনাই হবে, তুমি নিয়ে এস।"

তিলকা উঠিয়া যায়, ঘরে গিয়া রুকিয়ার সঞ্চিত ধান হইতে এক পাইলা ধান কোঁচরে করিয়া আনিয়া শিউচরণকে দিয়া দেয়।

দরজার ধারে বসিয়া তিলকা খৈনি টিপিতেছিল, এমন সময় রুকিয়া ধান কুটিয়া ফিরিয়া আসে। ঘরে ঢুকিয়া হাঁড়িতে চাল রাখিতে গিয়া রুকিয়া দেখে কুলুঙ্গিতে গোটা একটা তামাকপাতা যত্নে রাখা আছে। জলের কলসীটা হাতে লইয়া আঙিনায় আসিয়া সে প্রশ্ন করে, "তামাকপাতা কোথায় পেলি গো ?"

তিলকা বলে, 'শিউচরণ মুদীর কাছ থেকে কিনলুম।"

উত্তর শুনিয়া রুকিয়া অবাক হইয়া যায়, ঘরে পয়সা কোথায় যে গোটা একপাতা তামাক সে কিনিতে পারে ! মুখের দিকে তাকাইয়া তিলকা রুকিয়ার মনের ভাবটা আঁচ করিয়া নেয় ; বলে, "ধারে কিনেছি গো, হাতে পয়সা এলে দিয়ে দেব।"

রুকিয়া হাসিয়া বলে, "তাই বল।"

ক্রমশঃ

গ্রন্থাগারের সামাজিক দায়িত্ব ও আমাদের পরিকল্পনা

শ্রীশিবদাস চৌধুরী

(১)

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ একদা দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"দুর্গম, দুরূহ পদ্ধতির অনুসরণ করে বহু ব্যয়সাধ্য ও সময়সাধ্য সুযোগ অধিকাংশ লোকের ভাগ্যেই ঘটে না। তাই বিদ্যার আলোক পড়ে দেশের অতি সঙ্কীর্ণ অংশেই। এমন বিরাট মূঢ়তার ভার বহন করে দেশ কখনই মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে না।"

আমাদের সদিচ্ছার বিজ্ঞাপনের অভাব নাই ও অর্থব্যয়ের (অপব্যয় ?) কার্পণ্য নাই। আমরা "সোসালিষ্টিক প্যাটার্ণ অব সোসাইটি"র দেশে পৌঁছাইতে দুই পরিকল্পনার তরী ছাড়িয়া তৃতীয়টিতে আরোহণ করিতে চলিয়াছি। এতৎসত্ত্বেও "মূঢ়তার ভার" স্কন্ধ হইতে নামিতেছে না। রবীন্দ্রনাথের মনোবেদনা স্বাধীনতাপ্রাপ্তির বার বৎসর পরেও মোচন করিতে পারি নাই।

শিক্ষা-ব্যবস্থা জাতীয় জীবনধারার সহিত সামঞ্জস্য-পূর্ণ কিনা, ব্যক্তি-কল্যাণমূলক না গণ-কল্যাণমূলক, মানবীয় সুপ্ত বৃত্তিগুলিকে উন্মেষিত করিয়া গণ-কল্যাণে নিয়োজিত করিতে পারে কি না, জাতীয় জীবনে সত্য, সুন্দর ও শিবের অভিব্যক্তি প্রকটিত হয় কি না, এবম্বিধ প্রশ্নের উত্তরের উপরেই শিক্ষার মানদণ্ড স্থির করিতে হয়। এই বিষয়ে বহু আলোচনা ও বাদানুবাদ হইয়াছে, পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। তাই আলোচনা বাহুল্য, অপ্রাসঙ্গিকও। তবু বলিব যে, বিশেষজ্ঞদের এই বিষয়ে বাস্তববাদীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়া চিন্তা করিবার সময় অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে।

আমরা এখানে শুধু শিক্ষার কাঠামোতে গ্রন্থাগারের স্থান ও ইহার সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিব। বিতর্কমূলক আলোচনাতে প্রবৃত্ত না হইয়া কলিকাতার গ্রন্থাগারগুলির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বক্তব্য পেশ করিব।

সমাজের ভিত্তি শিক্ষার উপরে প্রতিষ্ঠিত। ইহা জাতীয় জীবনকে সুদৃঢ় বা নড়বড়ে করিতে পারে। এই জাতির চরিত্রকে স্বরূপ দিতে হইলে ও বলিষ্ঠ করিতে হইলে সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। এই শিক্ষার রূপ সম্বন্ধে জোসেফ ষ্টালিন যে ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত করিলাম। ইহা হইতে সুন্দর ভাষায় সুষ্ঠুভাব প্রকাশ করা যায় না। তাঁহার রাজনৈতিক মতবাদে আমরা বিশ্বাসী না হইতে পারি—কিন্তু শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য।

"Will voluntarily and willingly throw open every door of learning to the young forces of the country, and afford them the opportunity of scaling the peaks of learning, and will recognise that the future belongs to the young generations; this (education) will have the courage and determination to smash the old traditions, standards and views when it will become antiquated and begin to act as a fetter on progress and will be able to create new traditions and new views. The role of . . . . education is to make every possible member of a state an effective and efficient citizen and thus to give reality to the ideal of democracy. Literacy is a means and not an end in itself. The end is that whole education of the individual's personality which will develop to the highest degree his physical, intellectual and moral faculties, raise him to the full stature of a man and transform him into a conscious and useful member of a society."

এই শিক্ষার আদর্শকে জাতীয় জীবনে রূপায়িত করিতে হইলে, ইহার উপযুক্ত বাহন দরকার। গ্রন্থাগারই ইহার বাহন হইবার যোগ্য। ইহা 'আদর্শ নাগরিকের' friend, philosopher and guide ; স্কুল-কলেজের শিক্ষা অনেকের নিকট দুর্গম, দুরূহ। বর্ত্তমান পরিকল্পনা ইহাকে আরও সঙ্কুচিত করিতে উদ্যত। ইহা শিক্ষাকে পূর্ণরূপও দিতে পারে না। ইহা একমাত্র পথের নিশানা দিতে পারে—তাহাও যদি সংগুরুর সংস্পর্শে আসা যায়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের মতে আসল লেখাপড়া আরম্ভ হইবে বিদ্যালয়ের চৌকাঠ ডিঙ্গাইবার পরে। এই বিষয়ে প্লেটো ও এমার্সনের কথাও বিশেষ মূল্যবান।

প্লেটো বলেন :

"The question is whether the larger and more advanced part of the study tends at all to facilitate our contemplation of the essential form of good. Now, according to us, this is the tendency of every thing that compels the soul to transfer itself to that region in which is contained the most blissful part of that real existence, which it is of the highest importance for it to behold."

এমার্সন বলেন—

"Consider what you have in the smallest chosen library. A company of the wisest and wittiest men that could be picked out of all civil countries, in a thousand years, have set in best order the results of their learning and wisdom. The men themselves were hid and inaccessible, solitary, impatient of interruption, fenced by etiquette; but the thought which they did not uncover to their bosom friend is here written out in transparent words to us, the strangers of another age. We owe to books those general benefits which come from high intellectual action. Thus, I think, we often owe to them the perception of immortality. They impart sympathetic activity to the moral power. Go with mean people, and you think life is mean. Then read Plutarch, and the world is a proud place, peopled with men of positive quality . . . . who will not let us sleep. Then they address imagination . . . They become the organic culture of the time."

(২)

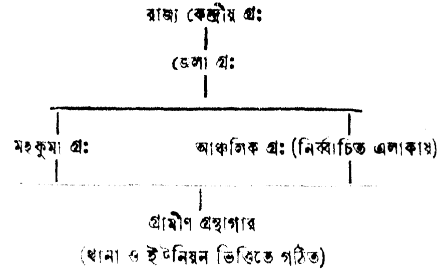
গ্রন্থাগারকে এই বিরাট দায়িত্ব পালন করিতে হইলে ইহাকে সকলের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইবে। ইহার জন্য সুস্থির মিতব্যয়ী পরিকল্পনা চাই। দেখিতে হইবে যেন লাভের গুড় পিঁপড়াতে না খাইয়া ফেলে। বর্তমান পরিকল্পনা ও পরিচালনা-পদ্ধতি আলোচনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে আমরা কোথায় চলিয়াছি? কতটুকু সামাজিক দায়িত্ব গ্রন্থাগার পালন করিতে পারিতেছে?

এখানে আমরা কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উল্লেখ করিব। গরীব দেশের পক্ষে আয়োজনের ত্রুটী নাই—আড়ম্বরেরও অভাব নাই। কিন্তু উপযুক্ত পুরোহিতের অভাব। যজ্ঞের ফল অনুমেয়।

কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম পঞ্চবার্ষিকীতে ৯টি রাজ্য কেন্দ্রীয়, ৯৬টি জেলা গ্রন্থাগার স্থাপন ও ৫২টি জেলাগ্রন্থাগারের উন্নতি বিধানের বাবদ ৮৮,৯১,৪৯৯ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে মোট ব্যয় হইবে ১৪ কোটি টাকা এবং আরও ৩২০টি জেলা গ্রন্থাগার স্থাপন করা হইবে। এই সমস্ত রাজ্যসরকারের মারফতেই করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের গণ-গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্বন্ধে (Social Education) সমাজ শিক্ষাধ্যক্ষ শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় 'সাহিত্যের খবরে'র বৈশাখ (১৩৬৬) সংখ্যাতে একটি তথ্যমূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইহাকে সরকারী ভাষ্য মনে করিয়া ইহার সারাংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"১৯৫০-৫১ সনে সরকার গ্রন্থাগার উন্নয়ন-পরিকল্পনায় হাত দেন ও বিভিন্ন সাধারণ গ্রন্থাগারে পুস্তক ও প্রয়োজনীয় আসবাব ক্রয়ের জন্য এককালীন সাহায্যরূপে ১,০৬,১০০ টাকা মঞ্জুর করেন। সেই সঙ্গে কেবলমাত্র স্বাক্ষর ব্যক্তিদের জন্য সমাজ শিক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গে জড়িত বা নিকটবর্ত্তী পাঠকেন্দ্র এবং গ্রন্থাগার-কেন্দ্র স্থাপনের জন্য অর্থসাহায্য দেওয়া হয়। ১৯৫০-৫১ সন থেকে ১৯৫৭-৫৮ সন এই আট বৎসরে এই বাবদে ৯,৪৩,১০০ টাকা সাহায্য করিতে হয়। রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে নবপ্রতিষ্ঠিত পাঠকেন্দ্র ও গ্রন্থাগারগুলি উপকৃত হয়। গ্রন্থাগার উন্নয়ন-পরিকল্পনাটির কাঠামো এইরূপ—



১৯৫৬-৬০ সনের বাজেটে গ্রন্থাগার উন্নয়ন ও শিক্ষা বাবদ ৪৮,৭২,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

ব্যয়বরাদ্দ (পরিচালনা খরচ ব্যতীত)

	গ্রন্থক্রয়	আসবাব ইত্যাদি	গৃহসংস্কার বা গ্রন্থাগার গঠন	মোটরভ্যান
কেন্দ্রীয়	১,৫০,৫০০ ১ম কিস্তি	১,০০,০০০ ১ম কিস্তি	১,৫০,০০০	২৫,০০০
জেলা	১২,০০০ ১ম কিস্তি	১৫,০০০ ১ম কিস্তি	৭৮,০০০	২৫,০০০
আঞ্চলিক	৮০০০ (,,)	৮০০০ (,,)	২৫,০০০	
গ্রামীণ	৬০০০		৫০০০ (স্থানীয় ২০০০ সহ)	

এই পর্য্যন্ত ১৮টি জেলা গ্রন্থাগার, ১২০টি শাখাসহ ২৪টি আঞ্চলিক ও ২৬৪টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে। গ্রামের অভ্যন্তরে স্থাপিত ছোট ছোট শাখা-গ্রন্থাগারগুলি গ্রামের স্বেচ্ছা-কর্ম্মীদের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। জেলা, আঞ্চলিক ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার সরকার বহন করেন কিন্তু সংগঠন ও পরিচালনা স্থানীয় কর্ম্মী সমিতির উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। ইহা ছাড়া কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও রামমোহন লাইব্রেরী; উত্তরপাড়া, বাঁশবেড়িয়া ও বজবজের সাধারণ পাঠাগার, ও পশ্চিমবঙ্গ সমাজসেবা সমিতিকে এককালীন নিয়মিত সাহায্য করা হয়।

গ্রন্থাগারিক শিক্ষা-কোর্সের জন্ম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ১২ হাজার টাকা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সমিতিকে ২ হাজার টাকা ও হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার সমিতিকে দেড় হাজার টাকা সাহায্য করা হয়।"

এই হইল পরিকল্পনার রূপ। এই বাবদে ২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে মোট ব্যয় হইবে ৬০ লক্ষ ৩ হাজার টাকা। সরকারী বিভাগ ও স্কুল-কলেজের জন্ম এ বছরে বাজেটে লক্ষাধিক টাকার উপর বরাদ্দ করিয়াছেন, ইহা ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার সংস্কার ও প্রসারণ এবং শিক্ষা ব্যয় খাতের ১৯৫৮-৫৯ ও ১৯৫৯-৬০ বরাদ্দের নমুনা :

	১৯৫৯-৬০	১৯৫৮-৫৯
বেতন	২৪,০০০	১০,০০০
ভাতা ইত্যাদি	১২,০০০	৬,০০০
পরিচালনা	১২,০০০	৮,০০০
কন্টিঞ্জেন্সি	৩,০০,০০০	২,৩৪,০০০
সাহায্য	১২,০০,০০০	৯,৭৮,০০০
মোট	১৫,৪৮,০০০	১২,৩৬,০০০

এই ব্যয়ে ৪,৮০,০০০ জন বঙ্গবাসী গ্রন্থাগারের সুযোগ পাইতেছে। পশ্চিম বাংলার লোকসংখ্যা ২,৬৩,০২,৩৮৬। টীকা নিষ্প্রয়োজন।

একদ্ব্যতীত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও উহার পাঠকক্ষের উন্নতির জন্ম দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ব্যয় হইবে ১৬ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা। বিদ্যালয়গুলি ঘুরিয়া আসিলেই বুঝা যাইবে অর্থের সদ্ব্যবহার হইতেছে কি না? ইহা ব্যতীত (১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১,৮০,০০০ টাকা), (২) জাতীয় গ্রন্থাগার (৯,৫০,০০০), (৩) কেন্দ্রীয় রেফারেন্স গ্রন্থাগার (১,৬৫,০০০), (৪) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, (৫) কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, যথা—জিওলজিকেল সার্ভে, (৬) ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন অব কাল্টিভেশন অব সায়েন্স, (৭) ইণ্ডিয়ান ষ্টাটিষ্টিকেল ইন্‌ষ্টিটিউট, ও (৮) এশিয়াটিক সোসাইটি প্রমুখ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ গ্রন্থাগার পরিচালনা করেন। কলিকাতা কর্পোরেশনও কলিকাতার পাবলিক লাইব্রেরীগুলিকে বাৎসরিক সাহায্য করেন।

এই সমস্ত তথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, যে পরিমাণ অর্থ আমরা ব্যয় করি তাহার তুলনায় আমরা অতি সামান্যই রিটার্ন পাইতেছি।

(৩)

এখন আমরা গ্রন্থাগার পরিকল্পনা ব্যাপারে দুই-একটি কথা লিখিব। গ্রন্থাগার (১) গ্রন্থ (২) পাঠক (৩) গৃহ ও (৪) কর্মী এই চার উপাদানের ক্রমানুসারে গঠিত। এই ক্রমানুসারে চলিলে আমরা আমাদের লক্ষ্যে সহজে পৌঁছাইতে পারি। কিন্তু সরকারী নিয়মে ক্রম হইল (৩), (৪), (১), (২)। ফলে অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় আমরা অনেক পিছনে পড়িয়া রহিয়াছি। আমাদের দুই পরিকল্পনার ব্যয়ের তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, বেশীর ভাগ অর্থই গৃহ নির্মাণে খরচ হইয়াছে। অথচ গ্রন্থাগারের মূল উপাদান গ্রন্থ ক্রয় সর্বনিম্ন স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। প্রয়োজনীয় গ্রন্থ ব্যতীত সুরম্য গ্রন্থাগারের মূল্য খুবই কম। কারণ পাঠক চায় তাঁহার বই ও বসিবার একটু স্থান—আরামপ্রদ না হইলেও চলে—হইলে আপত্তি নাই। আর সময় মত বই না কিনিলে উহা দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়ে। পরে কিনিতে হইলে বহুগুণ মূল্য দিতে হয়—যদি পাওয়া যায়। পরিকল্পনাতে গ্রন্থাগারের স্থান হইবে তৃতীয়। প্রথমে পুস্তক রাখিবার স্থান হইলেই চলে। পরে, প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হইলে, উহাতে হাত দিতে হইবে। পণ্ডিত নেহরুও একবার দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বহু ব্যয়সাধ্য অট্টালিকা নির্মাণ না করিয়া সেই অর্থ শিক্ষা প্রসারের জন্ম ব্যয় করা উচিত।

এই বিষয়ে প্রসঙ্গান্তরে রবীন্দ্রনাথের কথা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "যে সার্ব্বজনীন শিক্ষা দেশের উচ্চ শিক্ষার শিকড়ে রস যোগাইবে কোথাও তার সাড়া পাওয়া গেল না, তার উপরে আবার আর এক উপসর্গ জুটিয়াছে। এক দিকে আসবাব বাড়াইয়া অন্য দিকে স্থান কমাইয়া আমাদের সঙ্কীর্ণ উচ্চ শিক্ষার আয়তনকে আরও সঙ্কীর্ণ করা হইতেছে। ছাত্রের অভাব ঘটুক কিন্তু সরঞ্জামের অভাব না ঘটে সেদিকে কড়া দৃষ্টি।

মানুষের পক্ষে অন্নেরও দরকার থালারও দরকার। এ কথা মানি, কিন্তু গরীবের ভাগ্যে অন্ন যেখানে যথেষ্ট মিলিতেছে না সেখানে থালা সম্বন্ধে একটু কষাকষি করাই দরকার। যখন দেখিব ভারত জুড়িয়া বিদ্যার অন্নছত্র খোলা হইয়াছে তখন অন্নপূর্ণার কাছে সোনার থালা দাবী করিবার দিন আসিবে। আমাদের জীবনযাত্রা গরীবের অথচ আমাদের শিক্ষার বাহাড়ম্বরটা যদি ধনীর চালে হয় তবে টাকা ফুঁকিয়া দিয়া টাকার থলি তৈরী করার মত হইবে। আঙিনায় মাদুর বিছাইয়া আমরা আসর জমাইতে পারি, কলাপাতায় আমাদের ধনীর যজ্ঞের ভোজও চলে। আমাদের দেশের নমস্য যাঁরা তাঁদের অধিকাংশই খোড়ো ঘরে মানুষ; এদেশে লক্ষ্মীর কাছ হইতে ধার না লইলে সরস্বতীর আসনের দাম কমিবে, একথা আমাদের কাছে চলিবে না।"

(৪)

গ্রন্থাগার গৃহনির্মাণ ব্যাপারেও আমাদের গতানুগতিকতা পরিত্যাগ করা প্রয়োজন। ইহা গ্রন্থের সংরক্ষণ ও পাঠকদের ব্যবহারের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে (১) ভারতীয় জলবায়ু গ্রন্থের প্রথমশ্রেণীর শত্রু—(২) গ্রন্থাগার ক্রমবর্দ্ধনশীল।

(৫)

স্থান-নির্ব্বাচন—ইহা সহজগম্য লোকবসতিপূর্ণ বা যেখানে লোকের আবশ্যিক সমাগম হয় অথচ শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রহিয়াছে

এইরূপ স্থানে হইতে হইবে। পাঠক যেন অনায়াসে প্রয়োজনমত সেখানে পৌঁছাইতে পারে। নতুবা ইহা দর্শনীয় বস্তুই হইয়া থাকিবে। কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের স্থান-নির্ব্বাচন উপযুক্ত হইয়াছে কি না তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

(৬)

পাঠ-কক্ষ—ইহা পুস্তক-ভাণ্ডারের নিকটবর্ত্তী হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে পাঠক প্রয়োজনমত নিজের বই নিজেই বাছিয়া লইতে পারেন। বর্ত্তমান নিয়মানুযায়ী অধিকাংশ গ্রন্থাগারেরই "ভাণ্ডার-গৃহে" সাধারণ পাঠকের প্রবেশ নিষেধ। ফলে গ্রন্থের সঙ্গে পাঠকের সান্নিধ্যের অভাবহেতু বহু গ্রন্থেরই সদ্ব্যবহার হয় না। অনেক পাঠকই গ্রন্থাগারের নিয়মের বেড়াজাল অতিক্রম করিয়া ইহা ব্যবহার করিতে ইতস্ততঃ বা বিব্রত বোধ করেন। তাই দেশের অতি নগণ্য অংশই এই অমূল্যসম্পদ ব্যবহার করিতে পারে। এই চলতি-প্রথা পরীক্ষামূলকভাবে তুলিয়া দিলে গ্রন্থাগারের পরিচালনা-ব্যয়ও কিছুটা কমিয়া যাইবে। পাঠকেরও সময়ের অপচয় ঘটিবে না।

বর্ত্তমানে পাঠকের গ্রন্থসূচী আলোচনা করা সত্ত্বেও প্রায় প্রতি পদে তাঁহাকে গ্রন্থাগারকর্ম্মীদের উপর নির্ভর করিতে হয়। গ্রন্থসূচীও পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া রচিত না-ও হইতে পারে। এবং বহু গ্রন্থাগারেরই গ্রন্থসূচী সুপরিকল্পিত ও সর্ব্বজনবোধগম্য নহে। তার পরে এই গ্রন্থসূচী দেখিয়া পাঠক তাঁহার স্লিপ জমা দিলেই তৎক্ষণাৎ যে বই পাইবেন তার কোন নিশ্চয়তা নাই। হয়ত বা অর্দ্ধঘণ্টা পরে স্লিপ (১) "নাই", (২) "বাহির হইয়া গিয়াছে", (৩) "বাঁধিতে গিয়াছে", (৪) "স্থানচ্যুত" (৫) "দুষ্প্রাপ্য" ইত্যাদি মন্তব্য সহ ফেরত আসিল। ফলে পাঠকের মনে যে পড়িবার ইচ্ছা জন্মে তাহা স্তিমিত হইয়া আসিতে থাকে। ইহার জন্য গ্রন্থাগারকর্ম্মীই ষোল আনা দায়ী তাহা নহে। ইহা বর্ত্তমান ব্যবস্থা বা পরিচালনা নীতির বিষময় ফল। পাঠক যদি ভাণ্ডার গৃহে স্বয়ং পুস্তক নির্ব্বাচনের সুযোগ পান তবে অতি অল্প সময়েই ও সহজেই তিনি তাঁহার প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা করিতে পারেন। ইহাতে তাঁহার কাজে উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। গ্রন্থাগারও ইহার দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করিতে পারে। ইহার বিরুদ্ধে একটি আপত্তি হইতে পারে। বই হারানোর সম্ভাবনা, প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করিয়া—অবাধ চলাফেরার সুযোগ-সুবিধা দিয়া—তাহাদের প্রয়োজন অনায়াসে মিটাইয়া দিতে পারিলে এই ভয় ও সন্দেহ অমূলক বলিয়াই প্রমাণিত হইবে। পাঠকদিগকে পাইকারী হারে সন্দেহ না করিয়া তাঁহাদের মনে আস্থার ভাব সৃষ্টি করিতে হইবে। এমন আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে হইবে যেন তাঁহারা নিজেদিগকে গ্রন্থাগারের অংশীদাররূপে মনে করেন। আর যতই সাবধানতা অবলম্বন করা হউক না কেন বই চুরি একেবারে বন্ধ করা নানা বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

(৭)

গ্রন্থ—সকল বিষয়ে, সকল ভাষাতে লিখিত গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশে অন্ততঃপক্ষে ছয়টি গ্রন্থাগারের এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। বর্ত্তমানে ব্যবহৃত হইবে না এই অজুহাতে বিভিন্ন ভাষার বই সংগ্রহ বন্ধ করা উচিত হইবে না। তাহা হইলে ভবিষ্যৎ ভারতবাসীর অভিশাপ কুড়াইতে হইবে। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনেরও এই অভিমত। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি সম্প্রসারণ ব্যাপারে অনুষ্ঠিত প্রেস-কনফারেন্সে আরও বলেন যে, কোন কিছুই নগণ্য বলিয়া ফেলিয়া দেওয়া বা সংগ্রহ না-করিবার নীতি ঠিক নহে। কারণ আজ যাহা ব্যক্তিবিশেষের আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ মনে হইতে পারে—এমন সময় বা প্রয়োজন আসিতে পারে যখন এই "তুচ্ছ" নথি-পত্রই গবেষকদের তাহাদের সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে বিশেষ আলোক-সম্পাৎ করিতে পারে। অথচ আমাদের দেশের—বিশেষ বিশেষ গ্রন্থাগারগুলির, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির, এমনকি জাতীয় গ্রন্থাগারের সংগ্রহ-নীতি কালোচিত নহে। এই সমস্ত গ্রন্থাগারে ইংরেজী ভাষা ব্যতীত অন্যান্য ভাষাতে লিখিত পুস্তক অতি কমই ক্রয় করা হয়। অথচ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্যান্য ভাষার (বিশেষতঃ, ফরাসী, জার্ম্মানী, রুশ ও জাপানী) অবদান বেশী ছাড়া কম নহে। কিন্তু উহার যতটুকু আস্বাদ পাই (ছিটেফোঁটা বলিলেও দোষ হয় না) তাহা ইংরেজী চামচের সাহায্যে। দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাইতে হয়। জাতীয় গ্রন্থাগারের সাইক্লোষ্টাইল-করা লিষ্ট হইতে আমরা দেখিতে পাই, সেখানে ১৯৫৮ সনে ৪,৯২৩ খানি ইংরেজী, ১০৫ খানি ফরাসী, ২৮ খানি জার্ম্মানী, ৬৯ খানি রুশ ও ২২ খানি অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত মুদ্রিত পুস্তক সংগ্রহ করা হইয়াছে। প্রাচ্য ভাষাগুলির ভিতর (ভারতের বাহিরে প্রকাশিত) একমাত্র "ফারসী" ভাষায় প্রকাশিত কিছু বই সংগ্রহ করা হইয়াছে। জাতীয় গ্রন্থাগারের যখন এই নীতি তখন অন্যান্য-দের কথা না বলাই ভাল।

ইহা ছাড়া সাময়িক পত্রিকার সংগ্রহও অতি নগণ্য। সাময়িক পত্রিকা সমকালীন গবেষণার সংবাদ বহন করে। অতএব ইহার সংগ্রহের দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। শুনা যায়, জাতীয় গ্রন্থাগার ৩,০০০ হাজার সাময়িক পত্রিকা বৎসরে সংগ্রহ করে। ইহা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। তবে রাতারাতি সমস্ত সাময়িক পত্রিকা সংগ্রহ করা সম্ভব না হইলে এশিয়াটিক সোসাইটি, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন অব কালটিভেসন অব সায়েন্স, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও জিওলজিকেল এন্থ্রোপলিজিকেল জুলজিকেল, বোটানিকেল, সার্ভেস অব ইণ্ডিয়ার সঙ্গে মিলিত হইয়া একটি যুক্ত সংগ্রহ-পন্থা স্থির করা উচিত। কারণ ইহাদের সকলের নিজস্ব পত্রিকা রহিয়াছে ও "পরিবর্ত্ত" (exchange) নীতিতে বহু ইহারা সাময়িক পত্র পায় ও পাইতে পারে। তাই এমন ব্যবস্থা করা অসম্ভব নহে যাহাতে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাষাতে প্রকাশিত

সমস্ত প্রয়োজনীয় সাময়িক পত্র কলিকাতাতে সংগ্রহ করা যায়। এই নীতি ধীরে ধীরে অন্যান্য চারটি জাতীয় গ্রন্থাগারের বেলায়ও প্রযোজ্য। এখানে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন—এই সমস্ত সদ্য-সংগৃহীত সাময়িক পত্রপাঠকদের দৃষ্টিতে যথাসম্ভব শীঘ্র আনিতে হইবে। জাতীয় গ্রন্থাগারের display পদ্ধতি ঠিক হইয়াছে কি না চিন্তার বিষয়। কারণ ৩,০০০ পত্রিকার ভিতর মাত্র কয়েকশত লোকচক্ষুর সামনে আসে—বাকী অন্তরালে।

Display'র ও শিশু লাইব্রেরী বা পুস্তকের দোকানের মত। ফলে স্থানাভাব প্রকট হইয়া দেখা দিয়াছে।

৮

গ্রন্থসূচী: গ্রন্থসূচী গ্রন্থাগারের প্রাণ। ইহাই গ্রন্থাগারকে সামাজিক দায়িত্ব পালনে মুখ্যতঃ সাহায্য করে। ইহাকে দর্পণ বলা যাইতে পারে—গ্রন্থাগারের সম্পদসমূহ ইহাতে প্রতিফলিত হয়। পুস্তকসংখ্যাই গ্রন্থাগারের মর্য্যাদার মাপকাঠি নহে। অথবা দেশে বহু গ্রন্থাগার থাকিলেই দেশের কৃষ্টির ও সার্ব্বজনীন উন্নতির পরিপোষক না-ও হইতে পারে। এই সমস্ত গ্রন্থের কয়েকখানার খবর পাঠকসম্প্রদায় শ্রেণী নির্ব্বিশেষে জানেন বা ব্যবহার করিয়াছেন? মানুষের সুকোমল বৃত্তিগুলির উন্মেষে, জাতীয় প্রতিভার বিকাশে ও চরিত্রগঠনে কতটুকু এই গ্রন্থাগারের দান? এই প্রশ্নগুলির উত্তরের উপরে নির্ভর করে—গ্রন্থাগার কি পরিমাণে সামাজিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম হইয়াছে। ইহার জন্য প্রয়োজন গ্রন্থাগারে রক্ষিত সমস্ত পুস্তকের জন্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত গ্রন্থসূচী। এই সূচীর প্রণয়ন গতানুগতিক হইলে চলিবে না। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে স্থানীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা রচনা করিতে হইবে। নতুবা ইহা স্পুটনিকের যুগে শকট-যানের কাজ করিবে। এই সূচী এমন হইবে যে, ইহাতে পাঠকদের মনে নূতন নূতন প্রশ্নের উদয় হইবে। তাঁহাদের চিন্তাধারার স্রোতের মুখে বাধা সৃষ্টি না করিয়া প্রশ্নের সমাধান-সূত্র বাহির করিতে সাহায্য করিবে। সব সময়েই এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের সর্ব্ব কর্ম্ম চেষ্টার মূলে রহিয়াছে "মানবকল্যাণ"। সেই "মানব কল্যাণে" গবেষকের গবেষণায় যদি গ্রন্থাগার সাহায্য করিতে না পারে তবে এই গ্রন্থাগার রাখিয়া কি লাভ? কলিকাতায় যে সমস্ত গ্রন্থাগার রহিয়াছে তাহাদের অনেকেরই এখন পর্য্যন্ত পূর্ণসূচী প্রস্তুত হয় নাই। বর্ত্তমান পরিচালনা নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্ত্তিত না হইলে, কবে যে ইহা সম্পূর্ণ হইবে তাহা বলা কঠিন। যে প্রণালীতে প্রস্তুত করা হয় তাহাও কতটুকু কাজে আসে তাহাও ভাবিয়া দেখিবার সময় হইয়াছে। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী তাহাদের দোষ-ত্রুটি নাও থাকিতে পারে। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্রকে বাদ দিলে চলিবে কেন? জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থসূচী এদেশে আদর্শ-স্থানীয় হওয়া চাই। ইহার ইউরোপীয় ভাষার গ্রন্থসূচী "R" পর্য্যন্ত (১৯৪১ সনে প্রথম খণ্ড ছাপা হয়), সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত ভাষার গ্রন্থসূচী "Q" পর্য্যন্ত (১৯৫৬) ও বাঙলার গ্রন্থসূচী "L" পর্য্যন্ত এযাবৎ ছাপা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ছাপা হইয়াছে সাময়িক পত্রসূচী ও আশুতোষ সংগ্রহের সূচী। অন্যান্য প্রাচ্য ভাষার (আরবী, পারসী, চীন ইত্যাদি), আধুনিক ভারতীয় ভাষার (হিন্দী, উর্দ্দু, মারাঠী ইত্যাদি) ও সরকারী পুস্তকের গ্রন্থ-সূচী এখনও বাহির হয় নাই।

ইহার টেকনিকেল দিক, ছাপার গতি ও ব্যয়ের হ্রাস বাদ দিয়াও একটি বিষয়ে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। প্রাচ্য ভাষার পুস্তক-সূচী বর্ত্তমানে রোমান হরফে ছাপাইবার সার্থকতা আছে কি? পূর্ব্বে বোধ হয় ইংরেজী-নবীশ ও ইউরোপীয় পাঠকদের মনে রাখিয়াই এই সমস্ত সূচী প্রস্তুত হইত, এখনত সে পরিবেশ নাই। এখনকার মুখ্য পাঠক সাধারণ ভারতবাসী। তাঁহাদের সকলের রোমান হরফের সঙ্গে পরিচয় নাও থাকিতে পারে। তাহা হইলে কি তাঁহাদের এই জ্ঞানরাজ্যে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিতে হইবে? ফলে, দেখিতেছি গ্রন্থাগারের বিরাট গ্রন্থরাশী মুষ্টিমেয় কয়েক জনের কাজে লাগিতেছে। অগণিত সাধারণের কোনও কাজে আসিতেছে না। তাই বহু সৃজনীশক্তি আমাদের অজ্ঞাতসারেই অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। ইহাকে গ্রন্থাগারের কলঙ্ক-চিহ্ন বলা যায় না কি? একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, গ্রন্থে ব্যবহৃত লিপির ও ভাষার সঙ্গে পরিচয় না থাকিলে সাধারণতঃ সেই গ্রন্থ ব্যবহার করা যায় না। তাই অ-রোমান অক্ষরে লিখিত গ্রন্থের নাম রোমান অক্ষরে গ্রন্থতালিকাতে নিবদ্ধ করা মানে জ্ঞানরাজ্যে জাতিভেদ সৃষ্টি করা। তাই যে লিপিতে যে গ্রন্থ লেখা সেই লিপিতেই সূচী প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহাতে জ্ঞানের আলোর পরিধি বাড়িবে। লোকের মনে জ্ঞানতৃষ্ণা জাগিবে—তাঁহার চিন্তাশক্তিকে সঞ্জীবিত করিবে। রাশিয়া, চীন, জাপান প্রভৃতি প্রগতিশীল রাষ্ট্রের নিজস্ব লিপি ও ভাষা প্রীতি ত তাঁহাদের প্রগতির পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতেছে না। তাহা হইলে আমাদের আপত্তি কেন? ব্রিটিশ মিউজিয়ম বা মার্কিন লাইব্রেরী অব কংগ্রেস ও গ্রীক ও রাশিয়ান পুস্তকের নাম তদ্দেশীয় লিপিতেই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তবে বলিতে পারেন যে, বর্ত্তমান পদ্ধতিতে বিশ্বজোড়া পাঠকের সুবিধা হয়। কিন্তু গ্রন্থসূচী (catalogue) গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography) নহে। ইহার উদ্দেশ্য স্থানীয় খদ্দের ও দেশীয় পাঠক। একমাত্র গ্রন্থপঞ্জীর ক্ষেত্রেই (National Bibliography বাদে) আমাদের দৃষ্টি সুদূর প্রসারিত করিতে হইবে। তবে ভিন্নদেশী পাঠকদের সুবিধার জন্য রোমান হরফের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা পরিশিষ্ট আকারে সংযোজনা করিলে সোনায় সোহাগা। এই ব্যবস্থা হইবে সহজসাধ্য ও আদর্শ।

দ্বিতীয়তঃ, গ্রন্থের স্থান-নির্দ্ধারক সংখ্যা বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বিভিন্ন প্রথা চালু না করিয়া একটি সর্ব্বজন স্বীকৃত সহজবোধ্য বিশ্বজনীন প্রথা চালু করিলে পাঠক-সমাজের বিশেষ উপকার হইবে। তাঁহার বহু সময়ও বাঁচিয়া যাইবে। কারণ তাঁহারা এই সংখ্যার জটিলতা বা কারুকার্য্য লইয়া মাথা ঘামাইতে চান না।

তাঁহারা চান সহজে প্রয়োজনীয় পুস্তকের সান্নিধ্যে আসিতে। ইহাতে পরিচালনার ব্যয়ও অনেক কমিয়া যাইবে। এখন পর্য্যন্ত উদ্ভাবিত কোন প্রথাই আমাদের সমস্ত সমস্যা সমাধান করিতে পারে নাই। তাই ইহার ভিতর যেটি সরল, সহজবোধ্য ও বহুল-প্রচলিত তাহারই কিছু অদল-বদল করিয়া প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

তৃতীয়তঃ, পূর্ণ বিবরণী ও বৈজ্ঞানিক প্রথায় সূচী প্রণয়ন সময় ও অর্থ সাপেক্ষ। ইহা ধীরে-সুস্থে করা যাইতে পারে। তাই একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থসূচী অবিলম্বে প্রকাশ করা দরকার (যেমন এশিয়াটিক সোসাইটি করিতেছে)। এই তাড়াহুড়াতে কিছু ভুল-ভ্রান্তি থাকিতে পারে।

চতুর্থতঃ, আর একটি বিষয়ে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। গ্রন্থসূচী প্রণয়ন ব্যয়সাধ্য। তাই প্রত্যেক গ্রন্থাগারের পক্ষে ইহার প্রণয়ন সহজসাধ্য নহে। এমতাবস্থায় কয়েকটি লাইব্রেরী মিলিয়া আঞ্চলিক সংযুক্ত-সূচী প্রণয়ন করা যাইতে পারে। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় গ্রন্থাগার ও ভারতীয় গ্রন্থাগার জগতের নিয়ন্ত্রণ, কর্তৃপক্ষ যদি তাঁহাদের পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়ন করেন তবে পাঠক-সমাজ ও গ্রন্থাগার কর্মীদের বহু সময় বাঁচিয়া যাইবে। অর্থেরও অকুলান হইবে না।

পঞ্চমতঃ, প্রত্যেক মাসের সংগৃহীত পুস্তকের একটি যুক্ত "আঞ্চলিক" গ্রন্থসূচী প্রকাশ করা উচিত। এখন জাতীয় গ্রন্থাগার ও এশিয়াটিক এই ধরনের সূচী বাহির করিতেছে, কিন্তু সমবায়-ভিত্তিতে করিলে আরও ব্যয় কম পড়িবে, বেশী সংখ্যক পাঠকের প্রয়োজনে আসিবে। জাতীয় গ্রন্থাগারের দ্বৈমাসিক সূচী সম্বন্ধে প্যাট্রিক উইলসনের বরোদার জার্ণাল অব ওরিয়েণ্টাল ইনষ্টিটিউটে (৭, ৪. ১৯৫৯ জুন, পৃঃ ৪১৮) মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

"This is less useful than might be expected, . . . and not being cumulated or indexed, is ferociously difficult to use for ordinary purposes. . . . ."

৯

এমার্সন বলেন :

" . . . . the colleges, whilst they provide us with libraries, furnish no professor of books; and I think no chair is so much wanted. In a library we are surrounded by many hundreds of dear friends, but they are imprisoned by an enchanter in these papers and leathern boxes; and though they know us, and have been waiting two, ten or twenty centuries for us—some of them—and are eager to give us a sign, and unbosom themselves, it is the law of their limbo that they must not speak until spoken to; and as the enchanter has dressed them, like battelians of infantry, in coat and jacket of one cut, by the thousand and ten thousand, your chance of hitting on the right one is to be computed by the arithmetical rule of permutation and combination—not a choice out of three caskets, but out of half a million caskets all alike."

এই "Professor of books"দের বিরাট দায়িত্ব। গ্রন্থাগারের কর্মী হইল সমাজসেবক। তাঁহাকে কিন্তু অন্যান্য অফিসের কর্মীদের পর্যায়ে ফেলিলে চলিবে না। তাঁহাকে দরদীমন নিয়া পাঠকের ও পুস্তকের সেবা করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে পাঠকের মনের গতি অতীব বিচিত্র। সেই জন্য তাঁহার শিক্ষাব্যবস্থা তদনুরূপ হইতে হইবে। গতানুগতিক হইলে চলিবে না। বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থা বা পদ্ধতি আদর্শ কর্মীসৃষ্টি করিতে পারেনা। ইহা তাঁহার দায়িত্ব পালনে খুব কমই সাহায্য করে। ইহা গতানুগতিকতা ও ফাইল-দুরস্ত কেদারাপ্রিয় কর্মীই সৃষ্টি করে। শিক্ষাকালও এক বছর। এত অল্প সময়ে এই শিক্ষা নিয়া গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু পরিচালনা কষ্টসাধ্য। ফলে গ্রন্থাগার জনপ্রিয় হয় না। তাই গ্রন্থাগার পূর্ণভাবে সামাজিক দায়িত্ব পালন করিতে পারে না। তাই প্রয়োজন, তিন কি চার বৎসরের একটি কোর্স প্রস্তুত করা। সার্টিফিকেট বা সর্টকোর্সও কম পক্ষে এক বৎসর হওয়া উচিত। ছাত্র গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার psychological test লওয়া উচিত। যাহাতে এই কার্য্যের উপযুক্ত প্রকৃতির লোক পাওয়া যায়।

শিক্ষা ব্যবস্থাতে (১) মনস্তত্ব, (২) গ্রন্থ সংরক্ষণ ও (৩) ২।৩টি ভাষা শিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে। ভাষার ভিতরে একটি ইউরোপীয়, একটি ভারতীয় ভাষা (মাতৃভাষা ব্যতীত), ও সম্ভব হইলে একটি প্রাচ্য ভাষা (ভারতীয় ব্যতীত)। বর্ত্তমানে যে ভাষা শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে, তাহা নাম মাত্র। ইহার সঙ্গে অবশ্য পাঠ্য থাকিবে (৪) ক্যাটালগিং ও ক্লাশিফিকেসন, (৫) এডমিনিষ্ট্রেসন, (৬) গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন পদ্ধতি ও সাধারণ জ্ঞান, (৭) বিজ্ঞান ও চারুকলা বা সাহিত্যের অর্থাৎ humanistic sciences যে কোন একটি বিষয়ের ইতিহাস, (৮) ভারতীয় সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম্ম ও দর্শনের চুম্বক ইতিহাস, (৯) তুলনামূলক ভাষা, (১০) উপরে উল্লেখিত যে কোন একটি বিষয়ে পত্র। (৪), (৫) ও (৬) নং বিষয়ে হাতেকলমে শিক্ষার উপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে এবং ছাত্রদিগকে স্থানীয় গ্রন্থাগারসমূহে কম পক্ষে ৬ মাস যুক্ত করিয়া রাখিতে হইবে। এই ব্যবস্থা করিলেই উপযুক্ত কর্মী গড়িয়া উঠিবে। সর্টকোর্সে ও (১), (২) (৩ একটি ভাষা), (৪), (৫), (৬) ও (৭ অথবা ৮) বিষয়ে শিক্ষার বন্দোবস্ত থাকা দরকার।

১০

এখানে আমরা যে সমস্ত সমস্যার উল্লেখ করিলাম ইহার পরিপ্রেক্ষিতে বর্ত্তমান পরিচালিত গ্রন্থাগারসমূহের কার্য্যাবলীর

আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ইহারা সামাজিক দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করিতে পারিতেছে না। ফলে আমরা দ্রুত অগ্রসরমান জ্ঞানের জগতে তাল রাখিয়া চলিতে পারিতেছি না। পুস্তকপাঠ কেবলমাত্র অবসর বিনোদন বা চিত্তের উৎকর্ষতার জন্য নহে। ইহার আরও মহৎ উদ্দেশ্য রহিয়াছে, তাই জ্ঞান রাজ্যে যে সমস্ত গবেষণা চলিতেছে তাহার সঙ্গে সমতালে চলিতে হইলে দুনিয়ার যেখানে যাহা হইতেছে তাহার খবর রাখিতে হইবে। ইহার সূত্রই হইল পুস্তক ও সাময়িক পত্র। নতুবা অনুসন্ধিৎসুদের বহু সময় ও অর্থ নষ্ট হয়। বর্তমান অব্যবস্থার দায়িত্ব জাতীয় কর্ণধারেরা অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

সামাজিক চেতনার উদ্বোধনে বর্তমান গ্রন্থাগারগুলির অবদান নিরূপণ করা বর্তমানে সহজসাধ্য নহে। এই বিষয়ে কাজ করিবার আশু প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কারণ ইহার উপরেই গ্রন্থাগার পরিকল্পনার স্থায়ী বনিয়াদ করিতে হইবে। এই তথ্যমূলক অনুসন্ধানের ভিত্তি হইবে সঠিক পরিসংখ্যান ও নানা বিষয়ের বিশেষ বিবরণ। বর্তমানে ইহার একান্ত অভাব রহিয়াছে। এই জন্যও গ্রন্থাগারিকদের পারস্পরিক প্রীতির সম্বন্ধ হেতু স্থানীয় গ্রন্থাগারের সমালোচনা হইতে বিরত রহিলাম। সাধারণভাবে বক্তব্যের সাক্ষ্য হিসাবে মাঝে মাঝে তাহাদের কার্যাবলীর কিছি ইঙ্গিত দিয়াছি। নানা কারণে দোষ ত্রুটীর কারণও বিশদ সমালোচনা হইতে বিরত রহিলাম।

কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার ইহার সুযোগ্য অক্লান্তকর্মী শ্রীকেশবনের তত্ত্বাবধানে তাঁহার সহকর্মীদের সাহায্যে ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিতেছে। এতৎ সত্ত্বেও ইহা সময়ের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে পারিতেছে না। এমন কি সরকার বিঘোষিত Socialistic pattern of society গঠনেও ইহা পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেছে কি না ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

উচ্চতর শিক্ষার কেন্দ্র বিশ্ববিখ্যাত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের কথা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। দৈনিক কাগজেও এ বিষয়ে বহু সমালোচনা হইয়াছে। কিন্তু কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদের পরিকল্পনার অভাবে—অর্থের অনটনের অজুহাতে ইহার দুর্দশার অন্ত নাই। অথচ এই অমূল্য গ্রন্থ-ভাণ্ডারটিকে অন্যান্য অপচয় ও অপব্যয় বন্ধ করিলেই যে অর্থের সাশ্রয় হইবে তাহাতেই নূতন গৃহ হওয়া সাপেক্ষ পুনর্বাসন করা যাইতে পারে। অন্যান্যদের কথা না ধরিয়া ভারতের কৃষ্টিকেন্দ্র কলিকাতার (জনসংখ্যা ৪৬ লক্ষ) গ্রন্থাগারের সাধারণ চিত্রটি দেখা যাউক। এখানে বৎসরে গ্রন্থাগারের জন্য কম পক্ষে ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ইহাদের সম্মিলিত পুস্তক সংখ্যাও ২৫ লক্ষের কম নহে। যদিও ইহার বেশীর ভাগই আলমারির শোভাবর্দ্ধন করিতেছে বা কীটের খোরাক হইয়া মহাপ্রস্থানের পথে পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে। সুপরিকল্পিত সংগ্রহ-নীতির অভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি বিভাগের প্রয়োজনীয় পুস্তক পাইবেন না। এমনকি কোন কোন বিষয়ে প্রয়োজনীয় standard বই কলিকাতার কোন একটি গ্রন্থাগারেও পাইবেন না। ইংরেজীতে লেখা হইলেও না। অন্য ভাষা ত বাদই। আবার এমনও আছে যে, বই আছে কিন্তু হদিস করা যাইতেছে না।

যাহা হউক এখন আমাদের কি কর্তব্য তাহা বলিয়া বক্তব্যের উপসংহার করিব।

১১

গ্রন্থাগারের সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে আমরা ধীরে ধীরে সচেতন হইতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু ইহাকে যদি ইহার সুমহান ঐতিহ্য বজায় রাখিয়া চলিতে হয় তবে আমাদের সকলকেই (পাঠক, কর্মী ও রাষ্ট্রনায়ক) গ্রন্থাগারও সমকালীন জীবনের অদ্ভুত আত্মীয়তার সম্বন্ধ দ্বিধাহীন মনে স্বীকার করিতে হইবে। বিজ্ঞানের সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে অধ্যাপক জে. ডি. বার্ণল যাহা বলিয়াছেন সামান্য রদবদল করিয়া গ্রন্থাগার সম্বন্ধেও তাহা বলা যাইতে পারে। তিনি বলেন—

"If Library had any function at all—it is universal beneficence. It was the noblest flower of the human mind and the most promising source of material benefactions. There could be no doubt that its activities were the main basis of progress."

এই উদ্দেশ্যে পৌঁছাইতে হইলে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সময়ে সমগ্র ভারতে প্রতিটি সাক্ষর লোককে তাঁহার প্রয়োজনীয় পুস্তক ও একটু পড়িবার জায়গা করিয়া দিবার সঙ্কল্প সরকার গ্রহণ করিলে পরিণাম শুভই হইবে। ইহাতে অন্যান্য পরিকল্পনা রূপায়ণ ও ত্বরান্বিত হইবে। পুঁথিগত বিদ্যাতে অন্ততঃপক্ষে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির প্রায় সমকক্ষ হইয়া উঠিতে পারিবে। ইহার জন্য পরিকল্পনা ঢালিয়া সাজাইতে হইবে। প্রত্যেক বিদ্যায়তন বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত গ্রন্থাগারের উন্নয়নের চেষ্টা না করিয়া প্রতি এলাকায় লোকসংখ্যা ও প্রয়োজন অনুপাতে বিভিন্ন শ্রেণীর ও মানের গ্রন্থাগার স্থাপন করিতে হইবে, যেমন—(১) শিশু, (২) জনসাধারণ, (৩) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, (৪) জুনিয়র কলেজ ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, (৫) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, (৬) আইন, চিকিৎসা ও ইঞ্জিনিয়ারীং বিদ্যা, (৭) বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উচ্চতর কারিগরী বিদ্যা, (৮) সাহিত্য, কলা, ইতিহাস, ইত্যাদি humanistic scienes বিষয়ে (৯) হাসপাতাল, (১০) শ্রমিক ও কৃষক, (১১) সাক্ষর।

ইহার সহিত স্থানীয় গ্রন্থাগারের সহযোগিতা গ্রহণ করিতে হইবে। সংবাদে প্রকাশ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাঠ্যপুস্তক-ভাণ্ডার সৃষ্টি করিবেন। ইহাতে বিশেষ ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না। ছাত্রদের ডে-হোমের কার্য্যের সঠিক নিরপেক্ষ বিচার করিলে দেখিবেন—অর্থব্যয়ের তুলনায় অতি অল্পই ছাত্র-

সমাজ উপকৃত হইয়াছে। ফলেন পরিচীয়তে। পরীক্ষার ফল দেখুন। টীকা নিষ্প্রয়োজন।

ভারতের জনসংখ্যা ৪০ কোটি। ইহার লোকসংখ্যা অনুপাতে গ্রামের ও শহরের সংখ্যা :

জনসংখ্যা	শহর ও গ্রামের সংখ্যা
৫০০ পর্য্যন্ত	৩,৮০,০১৯
৫০০—১০০০	১,০৪,২৬৮
১০০০—২০০০	৫১,৭৬৯
২০০০—৫০০০	২০,৫০৮
৫০০০—১০,০০০	৩,১০১
১০,০০০—২০,০০০	৮৫৬
২০,০০০—৫০,০০০	৪০১
৫০,০০০—১,০০,০০০	১১১
ঊর্দ্ধে	৭১
	৫,৬১,০০৪
১,০০,০০০ ঊর্দ্ধে	৭২ শহর
৪৬,০০,০০০	কলিকাতা
২৮,০০,০০০	বোম্বাই
১৩,০০,০০০	দিল্লী
১৪,০০,০০০	হায়দ্রাবাদ

এই বিরাট দেশের বিরাট জনসংখ্যার জন্য চারিটি জাতীয় গ্রন্থাগার কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী ও মাদ্রাজে স্থাপিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। সে যাহা হউক, এই চারিটি গ্রন্থাগারকে প্রত্যেকটি ভাষার প্রতি বিষয়ের পুস্তকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিতে হইবে; যেন ভবিষ্যৎ ভারতবাসীর পুস্তকের অভাবে কাজের অসুবিধা না হয়।

১৯৫৭ সনে সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটিশ সরকার, পাবলিক লাইব্রেরীর সার্ভিস সম্বন্ধে রিপোর্ট করিতে এক কমিটি নিয়োগ করেন। বিলাতের Nature পত্রিকায় (৪০৭ সংখ্যা, ৯ই মে, ১৯৫৯) সেই রিপোর্ট সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছে তাহা সময়োচিত ও প্রণিধানযোগ্য। ইহা আমাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাই ইহার খানিকটা উদ্ধৃত করা গেল।

"This is in keeping with the educational functions of the public library service, but is not enough. The real problems in establishing an adequate national library service which will meet scientific and technical needs, among others, have not been faced; and the extent to which it is a factor in industrial and scientific efficiency and not merely in education, is not understood. The contribution which the commercial or technical library of a large local authority could make in developing an economic service is ignored, as are the financial implications which arise when such a body is asked to meet national needs from local resources. If the nation's growing needs for scientific and technical information, educationally or in research, in industry and in commerce, are to be met at any reasonable and practicable cost, full and efficient account must be taken of all existing resources and the means provided for efficient co-operation without making demands liable to impair the efficient discharge of any institution's primary responsibilities. Further, we must proceed boldly and imaginatively to fill lacunae in the existing structure from rational resources, making full use of all appropriate advances in the handling and processing of scientific and technical or other informations."

প্রবন্ধের আয়তন আর স্ফীত না করিয়া আমরা বলিব যে তৃতীয় পরিকল্পনা রচনার সময় বিশেষ সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। পরিচালনা নীতিরও আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। গ্রন্থাগার কর্মী ও পাঠককে এই পরিকল্পনা এবং পরিচালনাতে অংশীদার করা আশু প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত খরচ সঙ্কুলানের জন্য প্রত্যেকটি জাতীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে একটি করিয়া কেন্দ্রীয় গ্রন্থ ক্রয়, গ্রন্থসূচী প্রণয়ন, পুস্তক সংরক্ষণ, প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষণ-বিভাগয় থাকা দরকার। ইহারা অন্যান্য লাইব্রেরীকে এই সমস্ত বিষয়ে সাহায্য করিবে। ইহাতে খরচও কম পড়িবে ও uniformity থাকিবে। গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography) প্রস্তুতও এভাবে হওয়া দরকার। বারান্তরে আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করিব।

গঙ্গালাভ

শ্রীসুবোধ বসু

চিরবিদায়! আর কোনও দিনই সে ফিরিয়া আসিবে না! নবনীতবাবুর মনটা খারাপ হইয়া গেল। মর্ম্মে মর্ম্মে তিনি আত্মীয় বিয়োগ ব্যথা অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাই কালের ধর্ম। ইহাকে অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। কঠোর সত্যের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

নবনীতবাবুর মনে অতীতের স্মৃতিগুলি ভিড় করিয়া আসিতে লাগিল। দীর্ঘকালের সাহচর্য্য। আট-দশ বছর বয়সে যার সংসর্গ লাভ করিয়াছিলেন, যার সেবা অখণ্ডভাবে নিরলস নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর পঞ্চান্ন বছর পর্য্যন্ত চলিয়াছে, সহসা তাকে হারাইতে হইলে একটা অপূরণীয় ক্ষতিবোধ মনকে আচ্ছন্ন করিবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি!

এই বিচ্ছেদ আসিতেছে, তাহা কিছুকাল হইতেই টের পাওয়া যাইতেছিল। আজ এই অসুখ, আজ এই ব্যথা, আজ এখানটা ফুলিয়াছে। দুর্ব্বলতা ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছিল। বন্ধনমুক্তির সময় আসিয়াছে—ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় নাই। তবু হঠাৎ যখন একদিন বিচ্ছেদপূর্ণ হয়, তখন শোক না করিয়া উপায় থাকে না।

লোকে বলে, দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝা যায় না। কথাটা যে কত বড় খাঁটি তাহা নবনীতবাবু সম্পূর্ণভাবেই উপলব্ধি করিলেন। উপর-পাটির মাংস-খাওয়া দাঁত এটি। আর পড়িবি ত পড় প্রথম সেই দাঁতটিই পড়িল!

ছিন্নমূল দাঁতটি দুই আঙুলে ধরিয়া নবনীতবাবু স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। অতীতে ইহার সাহায্যে কত কাবলী-মটর ও মাংসের হাড় চিবাইয়াছেন, কত আখের খোলা ছাড়াইয়াছেন, শিশির শক্ত হইয়া আঁটিয়া যাওয়া খাপ ঢিলা করিয়াছেন, কত উড্-পেন্সিল কামড়াইয়া তাহাতে দাগ বসাইয়া দিয়াছেন তাহার স্মৃতি এক পলকে হুসহুস করিয়া বোম্বাই মেলের মত তাঁর মগজের মধ্য দিয়া ছুটিয়া গেল।

এইবার? কোথায় ফেলিবেন এটিকে? দোতলার ব্যালকনির তলায়ই রাস্তার ডাস্টবিনটা। টুক্ করিয়া নীচে ফেলিয়া দিলেই হয়। কিন্তু ফেলিতে গিয়া সহসা তিনি হাত গুটাইয়া লইলেন।

নোংরা ডাস্টবিন! যত বাড়ীর যত আবর্জ্জনা, ছাই-পাঁশ, ময়লা ন্যাকড়া, ভাঙা শিশি-বোতল, এঁটো-কাঁটার দুর্গন্ধ স্তূপ। তাঁর এত যত্নের, এত টুথপেস্ট ও ব্রাশের পরিচর্য্যা-উজ্জ্বল দাঁতটি এই উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিয়াছে ইহা কল্পনা করিতেই তাঁর অবশিষ্ট একত্রিশটি দাঁত এবং সারা শরীরে তীব্র শিহরণ খেলিয়া গেল। আর যেখানেই হোক, ডাস্টবিনে এটি ফেলা চলিবে না।

'বেলুন কিনতে পয়সা দেবেন বলেছিলেন,এখন দেবেন?'

নবনীতবাবু দাঁতের অন্য সমাধিস্থলের অনুসন্ধানে মাত্র চিত্ত নিয়োজিত করিয়াছেন,এমন সময় নীচের ফুটপাথ হইতে সজোর হাঁক শুনিলেন। চিনিতে বিলম্ব হইল না। অদূরবর্ত্তী বস্তির বাঁদর ছোকরাটা। বছর দশেকের এক মানবকের মধ্যে এতটা বজ্জাতি থাকিতে পারে, তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন। এখন দেখিলে, বড় একটা রবারের বল আনিয়া তোমার বাড়ীর দেওয়ালে বেপরোয়া তাহা ছুঁড়িয়া মারিতেছে ও লুফিতেছে। আপত্তি করিলে মন্তব্য করিবে, 'তাতে কি হয়েছে মশায়। দেওয়াল ক্ষয়ে যাবে নাকি? ভেজা বল, কাদার ছাপ লাগছে দেওয়ালে? হি হি, ভালই ত। বিনি পয়সায় জলছবি উঠে গেল!' কিছুক্ষণ পরে হয় ত দেখা যাইবে বল পরিত্যাগ করিয়া সে ঢিল ধরিয়াছে। তোমার বাড়ীর নানা জায়গায় ভূতের ঢিলের মত বেপরোয়া প্রস্তরবর্ষণ শুরু হইয়াছে। প্রতিবাদ জানাইলে সে অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে জানাইবে সে চড়ুই মারিতেছে, অন্য কোনও দুষ্ট উদ্দেশ্য নাই। তাড়া দিয়াও লাভ নাই। এক ছুটে বস্তির ভিতর গিয়া ঢুকিবে। সেখানে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য কর্ম্ম।

অভিজ্ঞতার সঙ্গে নবনীতবাবু বুঝিয়াছেন, ইহাকে চটাইয়া লাভ নাই, হাতে রাখিলেই সুবিধা। এজন্য মাঝে মাঝে এটা-ওটা ঘুষ কবলাইতে হয়।

এখন একেই নবনীতের মন খারাপ। তার উপর দাঁতের কি যে সদ্গতি করা যায় তাহা স্থির করিতে না পারিয়া তিনি বিব্রত। এমন সময় ফিচেল ছোকরার আব্দার তাঁহার মেজাজ বিগড়াইয়া দিল।

'পালা!' রুষ্টকণ্ঠে তিনি কহিলেন, 'সারাক্ষণ এটা দাও, ওটা দাও। বাঁদরামির আর সীমা নেই! কিচ্ছু পাবিনে। ভাগ্।'

ছোকরা আড়চোখে একবার উপর দিকে তাকাইল। ভাবখানা এই—'নিজের মুখেই ত বলেছিলেন মশায়। না দেবেন বয়ে গেল, কিন্তু মেজাজ দেখাবেন না।' কিন্তু ভাষায় সে ভাব ব্যক্ত করিল না। বলিল, 'আচ্ছা, কাল আসব।' বলিয়া ফুটপাথ ধরিয়া এক ছুট লাগাইল।

কিছুক্ষণ ধরিয়াই অদূরে ডুগডুগির আওয়াজ শুনা যাইতেছিল। নবনীত এবার সেদিকে লক্ষ্য করিলেন। এত সহজে রেহাই পাইবার কারণ বুঝিলেন। হনুমানের খেলা দেখানো হইতেছে। কিছু লোক দাঁড়াইয়া গেছে। হনুমানমাত্রেই যে সেদিকে আকৃষ্ট হইবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি!

একটু রাত করিয়াই নবনীতবাবু পাড়ার পার্কে পায়চারি করিতে গিয়াছিলেন। বাড়ী ফিরিবার মুখে বাগিচার ফটকের কাছাকাছি একটা গাছ হইতে সত্যই হনুমান সামনে লাফাইয়া পড়িল। নবনীতবাবু কিছুটা চমকাইয়া উঠিয়াছিলেন, এমন সময় একটা পরিচিত দুষ্ট হিহি শব্দ শুনিয়া ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন।

'এত রাত্তিরে গাছে কি করছিলি?'

'লক্ষ্মীপূজার জন্ম আমের পল্লব নিতে এসেছি। আজ বেস্পতিবার কিনা।'

বৃহস্পতিবার সন্দেহ নাই। কিন্তু এত রাত্রে? ন'টা বাজিতে বড় দেরি নাই। আম্রপল্লব ভাঙিবার ইহা কি যোগ্য সময়! তা ছাড়া কতক্ষণ ধরিয়া আসিয়াছে বাঁদর ছোক্‌রা? ইতিপূর্ব্বে নবনীতবাবুকে লক্ষ্য করে নাই ত? অবশ্য পার্কের বিপরীত দিকে কৃষ্ণচূড়া গাছের গুঁড়ির কাছে পেন্‌-নাইফে মাটি খুঁড়িয়াই তিনি দাঁতটিকে কবর দিয়াছেন। এত দূরের গাছ হইতে তাহা লক্ষ্য করা অসম্ভব। কিন্তু কে বলিতে পারে আগে হইতেই ছোক্‌রা বাগানে বেড়াইতেছিল না? তবে কথা এই, আগেই যদি সে নবনীতবাবুকে লক্ষ্য করিয়া থাকে, তবে কি সে সঙ্গে সঙ্গেই কাছে হাজির হইয়া কৌতূহল মিটাইত না? বলিত না, গাছের গুঁড়ির কাছে বসিয়া কি করিতেছেন? ইহার কৌতূহলের আধিক্য অন্দর মহলের ঘটনাকেও সম্মান করে না। প্রায় প্রত্যেকের হাঁড়ির ভেতর সে নিজের নাকটা গলাইয়া দেয়।

'সেই সন্ধ্যেবেলা থেকে পার্কে বসে আছিস্? পড়াশুনো করিস না?'

'বারে, এইমাত্র ত এলাম।'

'আধ ঘণ্টা আগে ত পার্কের ওদিকটায় ঘুরছিস দেখলাম।'

'যোৎ, বাজারে তবে ঠোঙাগুলি পৌঁছে দিতে গিয়েছিল কে?'

'তবে ত কাজের ছেলে গন্থু। আচ্ছা আসিস, বেলুন কেনার পয়সা দেব।'

নিশ্চিন্ত হইয়া নবনীতবাবু বাড়ী ফিরিলেন।

দাঁত একটিমাত্রই হারাইয়াছেন। চর্ব্বণে বিশেষ কোনও অসুবিধা হইতেছে না। মুখের গঠন বা হাসির উজ্জলতা ইহাতে সামান্যমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তবু জিহ্বাগ্র সর্ব্বদা হারানো দাঁতটির ফাঁকের মধ্যে তাহার অনুসন্ধান করিয়া মরে, নবনীতবাবুকে উহার কথা ভুলিতে দেয় না।

ডেন্‌টিস্টের কাছ হইতে কৃত্রিম দাঁত গ্রহণের কথা তিনি ইতিমধ্যেই ভাবিয়া দেখিয়াছেন। কিন্তু ইহা কেমন যেন গহিত বলিয়া মনে হইয়াছে। প্রথম স্ত্রী মরিতে না মরিতেই দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের মতই এই ত্বরা নিন্দনীয়। সুতরাং এই ক্ষতি মানিয়া লইয়া ইহাকে ভুলিয়া যাওয়াই শ্রেষ্ঠ পন্থা।

ইহাতে বাধা আসিল ঠিক দুই দিন পরে। সকালের খবরের কাগজ হাতে লইয়া নবনীতবাবু দোতলার ব্যাল-কনিতে আসিয়া বসিয়াছেন। নীচে একটা সহর্ষ শিসের শব্দে দৃষ্টি ফুটপাথের দিকে আকৃষ্ট হইল। দেখিলেন, চিরপরিচিত গন্থু বামহস্তের মাঝের আঙুলে একটা মার্ব্বেল স্থাপন করিয়া সেটা ধনুকের জ্যার মত আকর্ষণ করিতেছে এবং লক্ষ্যবস্তুর প্রতি মনোযোগ অখণ্ড করিবার উদ্দেশে ঠোঁট ছুঁচলো করিয়া শিস দিতেছে।

অদূরবর্ত্তী লক্ষ্যবস্তুটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নবনীতবাবু চমকাইয়া উঠিলেন—বস্তুটি একটি দাঁত!

দাঁত নবনীতবাবুর একার হয় না, সবারই দাঁত হয়। কিন্তু প্রথম দর্শনেই তাঁর 'ইনটুইশান' বলিল, ইহা তাঁহার নিজস্ব দাঁতটি ছাড়া আর কিছু নয়। আরও মনোযোগ দিয়া নীচে তাকাইয়া এই ধারণা তাঁহার দৃঢ়তর হইল। তাঁহার সমাধিস্থ দাঁতটিকে তিনি প্রায় সনাক্ত করিতে সমর্থ হইলেন। বজ্জাত ছোক্‌রা সেদিন স্পষ্টই তাঁর কাছে মিথ্যা কথা বলিয়াছে! নিঃসন্দেহে সে সেইদিন নবনীতবাবুর কার্য্য-কলাপের উপর নজর রাখিয়াছিল এবং সমস্ত লক্ষ্য করিয়াছে। আহূত হইয়াও সে বেলুনের পয়সা নিতে আসে নাই, ইহাও অপরাধী বিবেকেরই পরিচয় দিতেছে।

নবনীতবাবু কি করিবেন তাহা বুঝিয়া উঠিবার আগেই 'ঠকাং' করিয়া একটা শব্দ হইল। মার্ব্বেল লক্ষ্যস্থল ভেদ করিয়াছে।

এই আঘাত তাঁর সমস্ত অটুট দাঁতগুলির মধ্যে আসিয়া লাগিল।

'ওটা কি রে?' নিজেকে যথাসাধ্য সংযত করিয়া নবনীত কহিলেন।

পুরা দুই সেকেণ্ড পরে মাথাটা বাঁ দিকে ঈষৎ কাত করিয়া গম্বু সংক্ষেপ জবাব দিল, 'দাঁত।'

'দাঁত? কার দাঁত? কোথায় পেলি?'

ইহার কোনও জবাব না দিয়া গম্বু 'ঠুং' করিয়া আবার দাঁতে মার্ব্বেল মারিল।

'ওটা আমাকে দিবি? কবরেজ মশায় বলছিলেন, ওষুধ তৈরির জন্যে একটা দাঁত চাই—গুঁড়ো করবেন। অথচ কোথাও একটা দাঁত পাচ্ছিনে। খুব ভাল ছেলে গম্বু। ওটা আমাকে দিয়ে দে।...কই, বেলুন কেনার পয়সা ত নিলি নে। আর না হয়, ঘুড়ি-লাটাইয়ের পয়সাও দিচ্ছি। আজকাল আর ঘুড়ি ওড়াস নে?...'

গম্বু একবার আড়চোখে তাকাইয়া দেখিল।

'এই নে, পয়সা ফেলছি, ধর।' নবনীতবাবু একটা আধুলি আঙুলে ধরিয়া কহিলেন।

'চাইনে পয়সা।' গম্বু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কহিল, 'পয়সা চাইলেই যে খেঁকিয়ে ওঠে, তার পয়সা কে চায়? তার চেয়ে বরঞ্চ আমি দাঁতের সঙ্গে মার্ব্বেল খেলব। এই দাঁতের দাম দু'টাকা।'

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। নিশ্চয়ই নবনীতবাবুর গরজটা টের পাইয়াছে এবং দাম হাঁকিয়াছে। দু'আনা পাইলেই যে সন্তুষ্ট হইয়া একটা সম্পূর্ণ সপ্তাহ কথার বাধ্য থাকিত, নহিলে সে কথনও দু'টাকা চাহিতে সাহস করে। একরত্তি ছেলের এই ডেঁপোমীতে নবনীতবাবু রুষ্ট হইয়া উঠিলেন।

'বেশি চালাক হয়েছিস, না?' তিক্তকণ্ঠেই তিনি কহিলেন। 'দু'টাকায় ক'পয়সা হয়? ওর অর্দ্ধেক ব্যয় করলে এক ডজন দাঁত আমি কিনে আনতে পারি। কোথা থেকে চুরি করেছিস ওটা? দাঁড়া, তোর মজা দেখাচ্ছি।'

মজা দেখিবার জন্য গম্বু আর দেরি করিল না। মার্ব্বেল ও দাঁত গুটাইয়া 'স্ট্র্যাটেজিক রিটিট' করিল।

অবশ্য নবনীতবাবুর ইহা ফাঁকা হুমকি ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি জানেন, জোর করিয়া কিছু করিবার উপায় নাই। সামান্য ব্যাপার লইয়াও বস্তির বাসিন্দারা হৈ-হৈ ব্যাপার করিতে পারে। আর তা ছাড়া এটা যে তাঁরই দাঁত তাই বা ঠিক কি! আর যদি তাঁরই দাঁতটি হয়, তাতেই বা কি? একটা বখাটে ছোকরা তাঁর ভাবাবেগের সুযোগ লইয়া তাঁহাকে 'ব্ল্যাকমেইল' করিবে, ইহা কি সমর্থন করা উচিত? একটা পড়িয়া-যাওয়া দাঁত এমন কিছু মূল্যবান নয়।

তবু আপিস যাইবার সময় তিনি একবার পার্কটা ঘুরিয়া গেলেন। যে কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় দাঁতটি শান্তিতে চির-বিশ্রাম করিতে পারিবে ভাবিয়াছিলেন তার গুঁড়ির কাছে হাজির হইয়া দেখিলেন, যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই সত্য। প্রায় হাতখানেক জায়গা ইঞ্চি দুয়েক গভীর করিয়া খোঁড়া। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য্যের পর অমূল্য বস্তু উদ্ধার করা হইয়াছে!

ইহার পর দু'দিন নবনীতবাবু এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়াছেন। বাঁদর ছোকরা তাঁকে দেখাইয়া দেখাইয়া দাঁতটি ফুটপাথে সজোরে ঘর্ষণ করিয়াছে, উহাকে লাথি মারিয়া গেণ্ডুয়া খেলিয়াছে, উহাতে পেরেক বসাইয়া রাস্তায় সংগৃহীত ইটের সহায়তায় দুমদুম হাতুড়ি মারিয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহার ব্যথা নবনীতবাবুর সমস্ত শিরা-উপশিরার উপর পড়িয়াছে। এই নিগ্রহের অপমানে তাঁর ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তবু তিনি নীরব রহিয়াছেন।

কিন্তু শত হোক্ নাড়ীর টান। দাঁতটি পড়িয়া গেলে কি হয়, উহার সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক ভুলা যায় না। আপনজনের মৃতদেহের উপর অত্যাচারের মতই ইহার উপর যে অত্যাচার হইতেছে তাহা নবনীতবাবুকে মর্ম্মে মর্ম্মে পীড়া দিতেছিল। সুতরাং পরদিন যখন তাঁরই চোখের সামনে তাঁরই বাড়ী হইতে মাত্র হাত কুড়ি দূরে তাঁর এই দাঁতটির উপর বেপরোয়া অপমান বর্ষিত হইতে লাগিল তখন ইহাকে নিতান্ত ছেলেমানুষী বলিয়া তিনি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। বার বার চোখ ফিরাইয়া আনিলেন, বার বার তাহা শ্রীমান্ গম্বুর কার্য্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ফুটপাথের এক পাশে একদলা থুতু ও কফ পড়িয়াছিল। গম্বু প্রথমে উহাতে দাঁতটি ডুবাইল। পরে উহা হইতে আকর্ষণ করিয়া—হয় ত পবিত্র করিবার উদ্দেশ্যেই পাশের গোবরের গাদার মধ্যে পুঁতিল। হাতের কাছেই একটা কাঠি রাখা ছিল। এইবার সেটি তুলিয়া লইয়া সহসা গোবর ঘোঁটা শুরু হইল।

ইহা হইতে যে দুর্গন্ধ উত্থিত হইল তাহা নবনীতবাবু যেন নিজের নাকের মধ্যে টের পাইলেন।

তাঁহার বয়স যদি অন্ততঃ কিছুটা কমও হইত তবে তিনি ছুটিয়া গিয়া অনায়াসে বাঁদর ছোকরার কানটা টানিয়া ধরিতেন। কিন্তু তাঁর মত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যদি ছুটিয়া গিয়া একটা নিতান্ত ছেলেমানুষের সঙ্গে ঝগড়া বাধান, তবে তাহা

কেলেঙ্কারীর সৃষ্টি করিবে। তাঁহার দাঁতটির নিগ্রহের কথা লোকদের বলা চলিবে না। ছোক্‌রার বাঁদরামিকে কেহই গুরুত্ব দিবে না। তাঁর নিজেকেই হাস্যকর হইতে হইবে।

সম্ভ্রান্ত হওয়া যে কতটা দুর্ব্বলতা তাহা এমন স্পষ্টভাবে ইহার আগে তিনি আর কখনও টের পান নাই।

ছোক্‌রা একবার আড়চোখে তাঁহার দিকে তাকাইয়া দেখিল। নবনীতবাবুর ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে কষ্ট হইল না। অর্থাৎ, এতেই হইয়াছে কি? না, আরও কিছু করিতে হইবে? তাঁর এই ব্যাখ্যা যে নির্ভুল তাহার প্রমাণ পাইতেও দেরি হইল না।

রাস্তা ও ফুটপাথের সংযোগস্থলটা বস্তির লোকদের কল্যাণে সর্ব্বদাই একটা আস্তাকুঁড় ও নর্দ্দমার সমাবেশ হইয়া থাকে। দিনে বারদুয়েক কর্পোরেশনের ধাঙরেরা তাহা সাফ করিয়া যায়, কিন্তু পরের মুহূর্ত্তে তাহা আবার যথাপূর্ব্বং। বর্ত্তমানে উহার একস্থলে ব্যাণ্ডেজ বাঁধার ন্যাকড়া ও রক্তাক্ত তুলা গড়াগড়ি যাইতেছে এবং উহাদের সংস্পর্শে কাছাকাছির জল পুঁজ-মিশ্রিত রক্তের মত বীভৎস হইয়া আছে। কাঠির সহায়তায় ছোক্‌রা এইবার নবনীতবাবুর দাঁতটিকে সেই দিকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল।

'গম্বু, শুনচিস্। গম্বু!'

গম্বু ফিরিয়া তাকাইল।

'শুনে যা!' নবনীতবাবু হাতছানি দিয়া ডাকিলেন।

গম্বু সেকেণ্ডদুয়েক দ্বিধা করিল, তার পর দাঁতটি লাঠি দিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে নবনীতবাবুর ব্যালকনির তলায় আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'কি?'

'দাঁতটা চেয়েছিলাম যে ওষুধ তৈরীর জন্য। আরেক জনের উপকার করা কি উচিত নয়? আচ্ছা নে, দু'টাকাই নে।'

গম্বু সত্যই মর্ম্মাহত হইয়া ছিল। বেশি লোভ করিতে গিয়াই সেদিন সে দুই-দুইটা গোটা টাকা হারাইয়াছে। জীবনে সে নিজস্ব দুইটা সিকিও কোনদিন পায় নাই। এমন বোকামিও কেউ করে! আবার সুযোগ আসিলে হাতছাড়া করিবে না তাহা ঠিকই ছিল এবং এই সুযোগ-সৃষ্টির চেষ্টা চলিতেছিল গত দু'দিন ধরিয়া। তবু সে আর একবার চেষ্টা করিল।

'আজ আর অত সস্তায় হবে না, মশায়। আজ এর দাম বেড়েছে। পাঁচ টাকার এক আধলা কম নয়।'

নবনীতবাবু কোনও দামাদামি করিলেন না। মনিব্যাগ হইতে পাঁচ টাকার একটা নোট বাহির করিয়া আনিলেন।

ফাউ স্বরূপ শ্রীমান্ গম্বু দাঁতটিকে রাস্তার কলের জলে ভাল করিয়া ধুইয়া দিয়াছিল। নবনীতবাবু আর ঝুঁকি লইলেন না। দাঁতটি কাগজে মুড়িয়া মনিব্যাগে ভরিয়া সরাসরি যাইয়া হাইকোর্টের ট্রামে উঠিলেন এবং আউটরাম ঘাটের জেটি হইতে উহা সজোরে ছুঁড়িয়া গঙ্গার যথাসম্ভব ভিতরে ফেলিলেন।

শান্তি, সান্ত্বনা

শ্রীহাসিরাশি দেবী

এ রাতও সুদীর্ঘ নয় : একথা তুমিও জানো,—আর
আমিও জেনেছি ব'লে কিছু নেই এমন লজ্জার
যাতে নুয়ে আসে দু'চোখের পাতার ঝালর,—
বিষণ্ণ মেঘের নীচে ঢাকা পড়ে দৃষ্টির আলোর
ছোঁয়া ; সে ছোঁওয়ার রং বুঝি থরথরে নীল—
সমুদ্রের-স্বাদ-তার :—সে আমার অনন্ত-নিখিল।

একে একে চলে যাক্ এ রাতের অসংখ্য প্রহর,
আকাশের স্বপ্ন-ভরা তবু এই পৃথিবীর ঘর
দু'হাতে আগুলে রব' খুলব না—দোর খুলব না—
তুমি যদি ভুলে যাও, মনে জেন,—আমি ভুলব না
আজ এই মুহূর্ত্তের-অন্ধকার—রাতের শপথ—
দিন যদি কাছে আনে—আরও এক নয়া ভবিষ্যৎ॥

তামসী সাকীর হাতে যৌবনের সুরাপাত্রখানি
ভেঙে যাবে অকস্মাৎ—এ সত্য নিষ্ঠুর : তবু জানি
ফ্যাকাশে আলোয় ঢাকা লালসার লালা মাখামুখ
চকিত-চাহনি' দিয়ে চেখে নিতে তৃষ্ণায় উন্মুখ
আমি নই। আমার এ নিশ্ছিদ্র-শান্তি। আর কারও নয়,
নিরুদ্বেগ মন তাই। মেনেছি সকল পরাজয়॥

মরক্কো

শ্রীপ্রেমকুমার চক্রবর্ত্তী

মধ্যপ্রাচ্য ও আরব জগত সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে (প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৬৫) বলা হইয়াছে মূল আরব ভূখণ্ডের 'আরব' ও 'মোস্তারাব' ভিন্ন উত্তর আফ্রিকার ভূমধ্য সাগর তীরবর্ত্তী আরবগণকে 'মঘারব' নামে অভিহিত করা হয়। মরক্কোর অধিবাসীগণকে আরব ভাষায় 'মঘারব আল-আক্‌সা' বা 'মঘ্রিব আল-আক্‌সা' (অর্থাৎ পশ্চিম আরবের সীমান্তবাসী) বলা হয়। এই নামের ইংরেজী অপভ্রংশ 'মারাকুস' হইতেই মরক্কো নামের উৎপত্তি হইয়াছে। আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত এই রাজ্যটির পশ্চিমতীর অতলান্তিক মহাসাগর বিধৌত ও ইহার উত্তরে ভূমধ্য সাগর, দক্ষিণে অ্যাটলাস পর্ব্বতমালা ও উচ্চ মালভূমি এবং পূর্ব্বপ্রান্তে আলজিরিয়া রাজ্যের সীমানা।

পূর্ব্বকালে এই স্থানে বারবারি জাতির বাসভূমি ছিল। ইহারা ককেশীয় হেমাটাইট জাতির একটি শাখা। ইহারা কতকাল এই স্থানে বসবাস করিতেছে তাহা সঠিকভাবে বলা যায় না। ইহাদের ভাষা ইহুদীগণের হিব্রু ভাষার অনুরূপ। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের অভ্যুদয়ের পরবর্ত্তীকালে আরবগণ সমগ্র উত্তর আফ্রিকা জয় করিয়া স্পেন পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর উম্মিয়াদ বংশের রাজত্বকালে এই দেশে ইসলাম ধর্ম্ম স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পরবর্ত্তীকালে উত্তর আফ্রিকার রাজ্যগুলি আরব সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। আরবগণ এই রাজ্যে আসিবার পূর্ব্বেই খ্রীষ্ট ধর্ম্ম এই দেশে সামান্য প্রসার লাভ করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে ইউরোপে জেসুইট নিপীড়নের ফলে বহু ইহুদী এই দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই অবধি ইহারা এই রাজ্যেই স্থায়ীভাবে বসবাস করে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকগণের প্রাধান্য লইয়া দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয় এবং ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিন চুক্তি অনুসারে আলজিরিয়া ও মরক্কো সহ সমগ্র উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার বিশাল ভূখণ্ড ফরাসীগণের 'প্রভাবান্বিত এলাকা'র অধীনে আসে। ১৯১১ সনের একটি নূতন চুক্তিতে ফরাসীগণ মরক্কো রাজ্যের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা লাভ করে। এই সময় ফরাসী এলাকা পরিবেষ্টিত কয়েকটি স্থান লইয়া স্পেনের সহিত ফরাসীগণের বিবাদ চলিতে থাকে। অবশেষে ১৯১২ সনে স্পেনের সহিত একটি চুক্তিতে ফরাসী ও স্পেনীয় এলাকা সম্পর্কে একটি মীমাংসা হয় এবং টাঞ্জিয়ার আন্তর্জ্জাতীয় নিরপেক্ষমুক্ত বন্দররূপে ঘোষিত হয়। এই ব্যবস্থা ১৯৫৬ সন পর্য্যন্ত বলবৎ থাকে। ইতিমধ্যে এই রাজ্যে স্বাধীনতার আন্দোলন তীব্র হইয়া উঠে। কিছুকাল প্রবল আন্দোলন ও সংঘর্ষের পর ফরাসীগণ মরক্কো রাজ্যের স্বাধীনতা মানিয়া লয় (১৯৫৬)।

মরক্কোর আয়তন এক লক্ষ বাহাত্তর হাজার বর্গ মাইলের কিঞ্চিৎ অধিক, এবং জনসংখ্যা প্রায় চুয়াল্লিশ লক্ষ। এই দেশের ভূমধ্য সাগর তীরবর্ত্তী সমতল ভূমি ক্রমশঃ মধ্য মরক্কো হইতে উচ্চ হইয়া অ্যাটলাস পার্ব্বত্য অঞ্চলে মালভূমির সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। মরক্কো রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ তিন সহস্র ফুটের অধিক উচ্চে অবস্থিত। সমুদ্র তীরবর্ত্তী অঞ্চলে ভূমধ্য সাগরীয় উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া ও উচ্চ মালভূমি অঞ্চল শীতল। সাহারার সন্নিহিত দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চল মরুসদৃশ উত্তপ্ত, শুষ্ক ও অনুর্ব্বর।

মরক্কোর অধিবাসীবৃন্দকে মোটামুটি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা যায়: (১) অতলান্তিক সমতল উপকূলের কৃষক শ্রেণী—বারবারি ও আরবীয়, (২) পার্ব্বত্য দেশের উর্ব্বর উপত্যকার বারবারি প্রধান কৃষক, (৩) অর্দ্ধ যাযাবর পার্ব্বত্য পশুচারক বারবারি, ইহারা বৎসরের অধিকাংশ সময়ই পশুপাল লইয়া স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, (৪) মরুময় দক্ষিণ-পূর্ব্বাঞ্চলবাসী যাযাবর ও অর্দ্ধ-যাযাবর বারবারি (তুয়ারেগ প্রধান) জাতি,—ইহারা দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির, (৫) নগরবাসী, ইউরোপীয় সহ বিবিধ জাতি।

মরক্কোর প্রধান অধিবাসী বারবারি ও আরব বংশোদ্ভূত। আরবী ভাষাই এই দেশের প্রধান ভাষা। অষ্টম শতাব্দীতে মরক্কোর বারবারি জাতি ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও পার্ব্বত্য অঞ্চলে অদ্যাপি তাহাদের প্রাচীন মাতৃভাষার প্রচলন আছে। রাষ্ট্র ভাষারূপে সকলেই আরবী বুঝিতে ও বলিতে পারে। এই দেশে ইহুদী ও হিব্রু ভাষীর সংখ্যাও নেহাৎ নগণ্য নহে। বারবারি জাতির একটি শাখা দুর্দ্দান্ত তুয়ারেগ জাতি, প্রধানতঃ মরক্কোর দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে বসবাস করে। সাহারা মরুভূমির পথে পথিকগণ এই তুয়ারেগ দস্যুর ভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকে। ইহাদের পুরুষগণ অবগুণ্ঠনের অনুরূপ মুখাবরণ ব্যবহার করে ও অপর পক্ষে রমণীগণ অনাবৃত বদনে ভ্রমণ করে। আরবগণের সহিত এই পার্থক্য মরক্কোর সর্ব্বস্থানেই দৃষ্টিগোচর হয়। ইহা ভিন্ন প্রায় চার লক্ষ বিদেশীয় (ইউরোপীয়সহ) এই দেশে বসবাস করে। তাহাদের মধ্যে শতকরা সত্তর জন ফরাসী ঔপনিবেশিক ও ব্যবসায়ী প্রভৃতি; শতকরা দশ জনের অধিক অন্যান্য আফ্রিকীয় জাতি, অবশিষ্ট অন্যান্য ইউরোপীয় ও বিবিধ জাতি। দুই-চারি জন ভারতীয় ব্যবসায়ীও

সহর থেকে গায়েঁ

গত বছর যখন আমি নির্ম্মলাকে বিয়ে করেছিলাম আমার বাবা মাকে না জানিয়ে তাঁরা খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তবে কিছুদিনের ভেতরেই অবশ্য তারা এ ব্যাপারটা খুব সহজ ভাবে মেনেনিয়েছিলেন। বিয়ের প্রায় একবছর বাদে আমি আর নির্ম্মলা আমাদের গায়েঁর বাড়ীতে গেলাম।



আমার মা নির্ম্মলার সুন্দর চেহারা ও মিষ্টি ব্যবহারে খুব খুশী হলেন। সন্দুয়ে শিক্ষিতা বৌ সংসারের কাজ কর্ম্ম



করবে না ভেবে যেটুকু দুশ্চিন্তা ছিল সেটাও কেটে গেলো যখন নির্ম্মলা সংসারের সবকাজেই নিজে থেকে এগিয়ে গেলো।

মা সবথেকে খুশী হতেন যখন সব মেয়ে বৌয়েরা নির্ম্মলাকে দেখতে আসতো আর নির্ম্মলা তাদের নিয়ে বসে দেশবিদেশের পাঁচ রকম গল্প শোনাতো। মা তাঁর শিক্ষিতা বৌ সম্বন্ধে খুবই গর্ব্বিত হলেন।

সবে গত কালই ও পাড়ার লক্ষী মাকে বলছিলো "আমরা ভাবতাম লেখাপড়া শেখা মেয়েরা ঘর গেরস্থালীর কাজকর্ম্ম পারেনা কিন্তু তোমার বৌমা সেধরনের মেয়েই না।"

"কাজের কথাই যখন তুললে তখন শোন বৌমা সকাল থেকে কি করেছে—রান্নাবান্না সেরেছে, ঘরদোর ঝাঁট দিয়েছে, জিনিষ পত্তর গোছগাছ করেছে, সেলাই নিয়ে বসেছে, দুটো চিঠি লিখেছে—এ সব সেরেও চান করতে যাওয়ার আগে একগাদা কাপড় কেচেছে" বলে মা দড়ীর ওপর টাঙ্গানো একরাশ কাপড় দেখালেন। লক্ষী কাপড়গুলো দেখে অবাক" ওঃ মা এসব তোমার বৌমার কাচা—এমন কি বিছানার চাদর পর্য্যন্ত। কি রকম ধব্‌ধবে সাদা হয়েছে। আর আমি যখন কাপড় কাচি কাপড় থেকে ময়লা বার করতে আমার প্রানান্ত হয়। তবে হাজার হোক আমাদের নির্ম্মলা হলো গিয়ে লেখাপড়া জানা মেয়ে।"

নির্ম্মলা তখন চান সেরে বেরুচ্ছিলো— লক্ষীর কথা ওর কানে গেলো—"মাসীমা, এর সাথে লেখাপড়া শেখার কি যোগ আছে। ঠিক মতন সাবান ব্যবহার করলেই কাপড় পরিষ্কার হবে।"

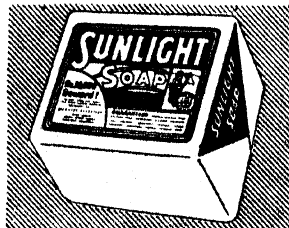
"কি সাবান বাছা আমায় বলতো?" "কেন, সানলাইট সাবান, আপনি জানেন না?" লক্ষী তো অবাক্ "সত্যিই সানলাইট্ কাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে কারণ অল্প একটু ঘষলেই প্রচুর ফেনা হয় যাতে সুতোর ভেতর থেকে ময়লার প্রতিটী কণা বার করে দেয়।"

নির্ম্মলার কথাগুলো যেন সকলকে একটু দরুণ নতুন খবর জানালো। মা বললেন "এতে আরও সুবিধা যে এ সাবানে কাপড় আছড়াতে হয়না একদম—অল্প একটু ঘষলেই কাপড় পরিষ্কার হয়ে যায়। শুধু খাটুনীই বাঁচেনা কাপড়গুলোও বেশীদিন টেঁকে।"



"কিন্তু এ সাবানটীর দাম বড় বেশী না কি?" এ প্রশ্নে মা চুপ করে গেলেও নির্ম্মলা বল্লো "সত্যি কথা বলতে এটা মোটেই বেশী খরচা পড়েনা কারণ এতে এত ফেনা হয় যে এক গাদা কাপড় কাচা যায়। দেখুন টাঙ্গানো কাপড়গুলো—ছোটবড় মিলিয়ে প্রায় ২০টা কাপড় এগুলো সব কাচতে একটা সানলাইটের আধখানা লেগেছে। তবুও কি আপনি বলবেন বেশী খরচা পড়ে।"

লক্ষীর মুখ হাসিতে ভরে গেলো, ও বললো, "বেঁচে থাকো মা, তোমার গুনের শেষ নেই। রোজ তোমার কাছ থেকে আমরা কত কিনা শিখছি।"



হিন্দুস্থান লিভার লিঃ, কর্ত্তৃক প্রস্তুত।

S/P. 5B-X52 BG

এই দেশে বাস করে। ১৯৫৬ সনে স্বাধীনতা ঘোষণার পর বহু ফরাসী অধিবাসী এই দেশ ত্যাগ করে, তাহাদের অনেকে সরকারী ও অন্যান্য বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীবৃন্দ। ১৯৫৬ সন হইতে মরক্কো সরকার সকল প্রতিষ্ঠানে, বিশেষজ্ঞ ব্যতীত, সমস্ত পদেই মরক্কোবাসীর নিয়োগের নীতি গ্রহণ করিয়াছে।

মরক্কো রাজ্য সুলতানের শাসনাধীন। এতকাল পর্য্যন্ত সুলতান একনায়ক শাসনকর্তা ছিলেন। ছিয়াত্তর জন সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় পরামর্শ পরিষদের সদস্যগণ সুলতান কর্তৃক মনোনীত হয়। সুলতান নিজেই প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার সদস্য মনোনয়ন করেন। তাঁহাকে পরামর্শ দিয়া সাহায্য করা ভিন্ন পরিষদের অন্য কোনও ক্ষমতা নাই। মন্ত্রীসভা তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে শাসন-কার্য্য পরিচালনা করে। স্বাধীনতা-আন্দোলনের সূচনা হইতে নির্ব্বাচনের দ্বারা প্রতিনিধি পরিষদ গঠনের জন্যও আন্দোলন চলিতেছিল। স্বাধীনতা-আন্দোলনের একজন প্রাক্তন নেতা বর্ত্তমান সুলতান পঞ্চম মহম্মদ এই বৎসরের (১৯৫৯) অক্টোবর মাসে সর্ব্বপ্রথম নির্ব্বাচনের দ্বারা জাতীয় পরিষদ গঠনের সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়াছেন।

মরোক্কা রাষ্ট্র ইসলাম ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক হইলেও অন্যান্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলে। রাষ্ট্রীয় বিধি অনুসারে অন্যান্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিঘ্নকারী দণ্ডনীয় বলিয়া পরিগণিত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এই রাজ্যে বহু সংখ্যক ইহুদী ও খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীর বাস।

মরক্কো রাজ্য কৃষিপ্রধান হইলেও শিল্প-বাণিজ্যেও অনেক উন্নত। মরক্কোর 'ফেজ' টুপীর শিল্প বিখ্যাত। এই টুপী নির্ম্মাণের কেন্দ্রস্থল ফেজ নগরীর নামানুসারেই এই টুপীর নাম হইয়াছে। মরক্কোর চামড়া (Morocco Leather) ও কার্পেট বিশ্ববিখ্যাত। এই রাজ্যের কর্ক-সিডার বৃক্ষের ছাল হইতে উৎকৃষ্ট কর্ক প্রচুর পরিমাণে নির্ম্মাণ হয়। এই সকল পণ্য বিদেশে প্রচুর রপ্তানী হয়। কৃষি উৎপাদনের মধ্যে ভূমধ্য সাগরীয় জলবায়ুতে উৎপন্ন গম, যব প্রভৃতি শস্য ও জলপাই, দ্রাক্ষা, কমলালেবু, ডুমুর প্রভৃতি ফল। দক্ষিণে সাহারার সন্নিকটে প্রচুর খর্জ্জুর উৎপন্ন হয়। সাগর উপকূলের মৎস্য ব্যবসায় হইতেও মরক্কোর যথেষ্ট উপার্জ্জন হয়। এই স্থান হইতে টিনে রক্ষিত মৎস্য প্রচুর পরিমাণে ফরাসী দেশে ও অন্যান্য ইউরোপীয় রাজ্যে বহু পরিমাণে রপ্তানী হয়। এই রাজ্যে সামান্য পরিমাণে খনিজ সম্পদও আছে। বর্ত্তমানে সরকার খনিজ সম্পদ আবিষ্কারের জন্য নূতনভাবে চেষ্টা করিতেছেন।

মরক্কোর পরিষদ-গৃহ ও সুলতানের প্রাসাদ রাজধানী রাবাটে অবস্থিত। রাবাট নগরীতে প্রাচীন ইসলামীয় শিল্প ও আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্প উভয়েরই নিদর্শন দেখা যায়। অতলান্তিক উপকূলে ক্যাসাব্লাঙ্কা অপর একটি প্রাচীন বন্দর-নগরী। তুয়ারেগ দস্যুগণের লুণ্ঠনের প্রতিশোধ গ্রহণার্থে পর্ত্তুগীজগণ ১৪৬৮ খ্রীঃ অব্দে এই বন্দর একবার ধ্বংস করে। ফরাসী অধিকারকালে ইহা পুনর্নির্ম্মিত হয়। জিব্রাল্টার প্রণালীর সন্নিকটে প্রাক্তন আন্তর্জ্জাতিক বন্দর তাঞ্জিয়ার অবস্থিত। এই নগরীতে ইউরোপীয় ও অন্যান্য বহু জাতির বাস। ইহা ফরাসী আদর্শে নির্ম্মিত একটি আধুনিক নগরী। মরক্কোর বৃহত্তম নগরী 'ফেজ' দেশের অভ্যন্তরভাগে একটি নদীতীরে অবস্থিত। এই শিল্প-নগরীটির জনসংখ্যা সর্ব্বাধিক। নগরীটির অধিকাংশ অঞ্চল ঘন বসতিপূর্ণ ও অপরিচ্ছন্ন। অল্প-সংখ্যক আধুনিক অট্টালিকা ও পথ-ঘাটও আছে। অপরাপর পথ সঙ্কীর্ণ ও দিবাভাগে জনাকীর্ণ। ফেজের সন্নিকটে একটি অতি প্রাচীন নগরী জাবেল-সার্সের অবস্থিত। এই নগরীর উপকণ্ঠে বহু প্রাচীন ফোনেসীয়, রোমক প্রভৃতির নির্ম্মিত অট্টালিকা ও প্রাসাদাদির ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি দৃষ্টিগোচর হয়।

এই রাজ্যে শতকরা প্রায় পঁচাশী জন অধিবাসী অশিক্ষিত। স্থানে স্থানে অশিক্ষিতের সংখ্যা প্রায় শতকরা ছিয়ানব্বই হইতে আটানব্বই জন পর্য্যন্ত। নগরাঞ্চলে শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার আছে। তাঞ্জিয়ার প্রভৃতি নগরীতে শিক্ষিতের সংখ্যা ত্রিশ হইতে চল্লিশ পর্য্যন্ত। শিক্ষা-ব্যবস্থা ফরাসী ব্যবস্থার অনুকরণে পরিচালিত হয়। বালক-বালিকাগণ ষষ্ঠ হইতে দ্বাদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকারী। তৎপর তাহারা নিদর্শনপত্র (Certificat d' Etudes primaires Musalmanes) লাভ করে। এই নিদর্শনপত্র লাভ করিলে ছাত্র-ছাত্রীগণ উচ্চ বিদ্যালয়ে (French Lycee) প্রবেশের অধিকারী হয়। উচ্চ বিদ্যালয়ে সপ্ত বৎসর পাঠ গ্রহণ করিতে হয়। স্বাধীনতা লাভের পর হইতে শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতি ও প্রসারের চেষ্টা চলিতেছে। পল্লী-অঞ্চলেও দুই-এক স্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টাও চলিতেছে।

বর্ত্তমান সুলতান পঞ্চম মহম্মদ একটি ঘোষণায় বলিয়াছেন—মরক্কো রাজ্য প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে সেতু বন্ধন করিয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় যখন তাঞ্জিয়ারের রাজপথে দ্রুতগামী মোটর সাইকেলে বোরখা-পরিহিতা কোনও সম্ভ্রান্ত রমণীকে চকিতে পাশ দিয়া চলিয়া যাইতে দেখা যায়। তদুপরি চপেটাঘাতের ভয়ে ভীত ট্রাফিক পুলিসকে যখন সশঙ্কিতভাবে কোনও ধনী সম্ভ্রান্ত বোরখা-পরিহিতা মহিলাকে ট্রাফিক বিধি মানিয়া চলিবার অনুরোধ জানায় তাহাও উল্লেখযোগ্য। মোটর চালনা ভিন্ন বর্ত্তমানে কেহ কেহ পুরুষের সহিত টেনিস খেলায় অংশও গ্রহণ করিয়া থাকে। নগরী ও আরবীয় প্রধান পল্লী-অঞ্চলে বোরখার প্রচলন বেশী দেখা যায়। শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে সামাজিক অনুষ্ঠানের সময় ব্যতীত বোরখার ব্যবহার কম। তুয়ারেগ রমণীগণ আদৌ বোরখা বা কোনও প্রকার অবগুণ্ঠন ব্যবহার করে না। ইহারা খুব তেজস্বী ও স্পষ্ট-বাদী। মরক্কোর নারী-আন্দোলনে শিক্ষিতা তুয়ারেগ রমণীর অবদান নগণ্য নহে। পার্ব্বত্য অঞ্চলেও বিবাহাদি অনুষ্ঠানের সময় ভিন্ন অন্য সময় বোরখা পরিধানের বেশী বাধ্যবাধকতা দেখা যায় না। বোরখা পরিহিতা অনাবৃতা বদনে কর্ম্মরতা অবস্থায়ই বেশী দেখা

যায়। এই সকল স্থানে পাত্রাবরণ হিসাবেই বোরখার ব্যবহার বেশী দেখা যায়। ত্যাঞ্জিয়ার প্রভৃতি বৃহৎ নগরীতে অবস্থাপন্ন গৃহের রমণীগণকেও সামাজিক রীতি অনুসারে বোরখা পরিহিতা দেখিলেও দোকান-পাটে দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার কালে অনাবৃতা বদনে বিক্রেতার সহিত বচসায় প্রবৃত্ত অবস্থায় দেখা যায়। বর্ত্তমানে নগরাঞ্চলের বহু স্থানে রমণীগণ-পরিচালিতা অনেক নারী-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে।

নগরাঞ্চলে মরক্কোবাসী অবস্থাপন্ন পুরুষদের মধ্যে অনেককেই ইউরোপীয় পোশাক পরিধান করিতে দেখা যায়। ফরাসী ধাঁচে ইউরোপীয় পোশাক পরিধান করিলেও অধিকাংশই দেশীয় 'ফেজ' টুপী ব্যবহার করে। নগরাঞ্চলে ইউরোপীয় পোষাক ও ফরাসী ভাষা স্বাধীনতালাভের পরেও ভারতের ইংরেজী ভাষা ও ইউরোপীয় পোশাকের ন্যায় অব্যাহত রহিয়াছে।

মরক্কো দেশে পল্লী ও নগর অঞ্চলে পার্থক্য অত্যন্ত অধিক। ফরাসী-প্রভাবান্বিত নগরাঞ্চলে কিছুটা বিলাসিতা দেখা যায়, অপরপক্ষে পল্লী-অঞ্চলের দারিদ্র্য ও দীনতা বিসদৃশ। শিক্ষা-দীক্ষায় অধিক অগ্রসর না হইলেও আরব জগতের অন্যান্য স্থানের তুলনায় মরক্কোবাসীর চরিত্র বাস্তবতঃ কিছু উন্নত।

অ্যাটলাস পর্ব্বতের পঞ্চ সহস্র ফুট উচ্চে অবস্থিত ক্ষুদ্র ইফ্রেন নগরী পাশ্চাত্ত্য দেশের একটি আকর্ষণীয় স্থান। শীতকালে এই স্থানে তিন ফুট পর্য্যন্ত তুষারপাত হয়। পর্ব্বত ও বনানী বেষ্টিত এই স্থানটি গ্রীষ্মকালে পত্রে-পুষ্পে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হইয়া উঠে। ইহাকে মরক্কোর কাশ্মীর বলা চলে। পর্ব্বতের উপরিভাগের সমতলভূমি বহু হ্রদ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদীতে পূর্ণ। ইহা শিকারীদেরও একটি আকর্ষণীয় স্থান। বর্ত্তমানকালে ইহা মরক্কোবাসী ধনীদিগের গ্রীষ্মাবকাশের ও প্রমোদ-ভ্রমণের স্থান বলিয়া বিবেচিত। প্রতি গ্রীষ্মকালে নগরীটির জনসংখ্যা অন্ততঃ দশ গুণ বৃদ্ধি পায়। এই স্থানে রমণীগণের বোরখার আবরণ কিছুদিনের জন্য অপসারিত দেখা যায়।

১৯৫৬ সনে স্বাধীনতা লাভের পর হইতে বিদেশীয়, বিশেষভাবে ইউরোপীয়ের সংখ্যা অনেক হ্রাস পাইয়াছে। নাসেরের সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রে যোগ না দিলেও মরক্কীয়গণ তাহাদের প্রতি সহনাভূতিশীল। অন্যদিকে তাহারা ফরাসী ও অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য জাতির সহিত তিক্ততা বৃদ্ধিরও পক্ষপাতী নহে। বর্ত্তমান বৎসরের অক্টোবরে সাধারণ নির্ব্বাচনের পরে দেশোন্নয়নের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা ধার্য্য হইয়াছে। অন্যান্য আরব রাষ্ট্র হইতে পৃথক হইলেও মরক্কো পশ্চাতে পড়িয়া নাই।

প্রভাময়ী মিত্র

শ্রীউষা মিত্র

বাংলা ১২৯৮ সালের ৬ই আষাঢ় তৎকালীন সুবিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার অক্ষয়কুমার দত্তের দ্বিতীয়া কন্যারূপে প্রভাময়ীর জন্ম। সহজাত প্রতিভা লইয়াই প্রভাময়ী জন্মলাভ করিয়াছিলেন এবং শৈশব হইতেই নানাভাবে তাহার প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিভা পরিণতি লাভ করিতে লাগিল তাঁহার পারিবারিক প্রেরণায়।



প্রভাময়ী মিত্র

১৩ বৎসর বয়সে হুগলী জেলার আটপুর গ্রামের মিত্র পরিবারের ৺মহেন্দ্রনাথ মিত্রের কনিষ্ঠ পুত্র ৺সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের (পরবর্তী জীবনে জেলা ও দায়রা জজ) সহিত প্রভাময়ীর বিবাহ হয়। প্রভাময়ী পিতৃগৃহ হইতে কাব্য, সাহিত্য, শাস্ত্র, দেশাত্মবোধ প্রভৃতিতে যে অনুপ্রেরণা ও আগ্রহ বহন করিয়া আনিয়াছিলেন বাল্যবিবাহ তাহার গতিরোধ করিতে পারে নাই। তাঁহাদের স্বামী-স্ত্রীর মিলিত অনুশীলনে তাহা দিনে দিনে পরিপুষ্টি লাভ করিতে লাগিল।

প্রভাময়ীর কাব্যসাধনা ছিল একলব্যের মত। অন্তরে কবিগুরুকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিভৃতে চলিত তাঁহার কাব্যসাধনা। এই প্রসঙ্গে গুরুদেবের উদ্দেশে তাঁহার নিজের লেখায় তাঁহার মনের ভাবটি সুস্পষ্ট :

"তোমার আলোয় যে ফুল মেলিল আঁখি
বনের অন্তরালে
হোক রূপহীনা নাই থাক নাম খ্যাতি
না যদি গন্ধ ঢালে
ওগো সকরুণ! তব গতিপথে দিও
শয়ন বিছাতে তার
চরণ অরুণ পরশ, আনত শিরে
ছোঁয়ায়ো একটি বার।"

অন্তঃপুরবর্তিনী প্রভাময়ীর জীবনে গুরুদেবের সাক্ষাৎ মিলিয়াছিল গোধূলিবেলায়। ধন্য হইয়াছিল উন্মুখ হৃদয়। তাই তিনি লিখিলেন :

"গেছে দিবা বিভাবরী যাঁর প্রতীক্ষায়
প্রতিক্ষণে ক্ষীয়মান অপরাহ্ন ছায়
শুধু ক্ষণেকের তরে
একান্ত আপন করে
এ নির্জন অবসরে মিলিল তাঁহার—
পরম নির্ভরভরে লুটাইনু পায়।"

কৈশোর হইতে মৃত্যুর অনতিপূর্ব পর্যন্ত তাঁহার কাব্যসৃষ্টি চলিয়াছিল অব্যাহত গতিতে—অনায়াসে, অবলীলায়। তাহারই অতি মুষ্টিমেয় মাত্র প্রকাশ লাভ করিয়াছে "সায়াহ্নিকা" কাব্যগ্রন্থরূপে। তিনি বিভিন্ন সময়ে 'ধূমকেতু', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত লেখিকা ছিলেন। "দেউল" নাটক তাঁহার গদ্যরচনা ও শিল্পানুভূতির নিদর্শন। শৈশব হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পাঠানুরাগ তাঁহার ছিল অনন্যসাধারণ। বৈষ্ণব সাহিত্য, প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য, রবীন্দ্র-সাহিত্য এবং রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যে তাঁহার ছিল সমান দখল। শুধু বাংলা সাহিত্য নয়, বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন ধরনের সাহিত্যের সহিতও তিনি সাগ্রহে পরিচয় করিলেন। তাঁহার এই আগ্রহ মৃত্যুশয্যাতেও অক্ষুণ্ণ ছিল। ইতিহাস এবং বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্রেও তাঁহার জ্ঞান ছিল।

বাগ্মী হিসাবেও প্রভাময়ীর বিশেষ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন পরিবারের অবরোধবর্তিনী বধূ যেদিন স্বামীর আগ্রহে ও উৎসাহে প্রকাশ্য মঞ্চে বক্তারূপে উপস্থিত হইলেন সেদিন তিনি নিজেও ভাবিতে পারেন নাই এতটা সাফল্যলাভ করিতে পারিবেন। তাঁহার প্রথম দিনের ভাষণেই শ্রোতারা মুগ্ধ হইলেন

বক্তৃতায় বৈশিষ্ট্যে এবং তেজস্বিতায়। এর পর নানা জায়গা হইতে আহ্বান আসিতে লাগিল। প্রত্যেক জায়গাতেই তিনি সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে তিনি শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া সমাজে নারী-কল্যাণে বিশেষ অংশ-গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার বিভিন্ন বক্তৃতায় তিনি বহু নরনারীকে পরিতৃপ্তি ও প্রেরণা দিয়াছেন। মৃত্যুর ১ বৎসর পূর্ব্বেও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যা শ্রীশ্রীগৌরীমাতাজীর শততম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে নানা জায়গায় ভাষণ দিয়াছেন।

প্রভাময়ী ১৩৩৮ সালে পুণ্য জন্মাষ্টমী তিথিতে রামকৃষ্ণলীলা-সহচর শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজজীর কৃপালাভ করেন। ঠাকুরের "যত মত তত পথ" এবং বিশেষ করিয়া "জীব শিবে"র আদর্শ তাঁহার জীবনের প্রতিটি পরিচ্ছেদে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তাঁহার নিজের কথায়:

"খুঁজিলা দেবতা তীর্থে দেউলে
পূজিলা প্রতিমা পটে
মোর মরমের মরমিয়া সে যে
বিহরিছে ঘটে ঘটে।"

জীবের সেবা এবং জীবকল্যাণকেই তিনি ঈশ্বরের সেবা বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাহা সক্রিয়-ভাবে মানিয়া চলিয়াছিলেন।

তৎকালীন পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীর পত্নী হইলেও তাঁহার দেশাত্মবোধ ও স্বদেশপ্রেম কোনদিন ক্ষুণ্ণ হয় নাই। অগ্নিযুগের বিভিন্ন স্বাদেশিক কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার পরোক্ষ সংযোগ ছিল এবং অন্তরালে থাকিয়াও তিনি তাঁহাদের নানাভাবে সাহায্য করিয়া গিয়াছেন।

স্বামীর সঙ্গে কার্য্যসূত্রে জীবনে বহুদিন তাঁহার প্রবাসে কাটিয়াছিল। প্রবাসের নিঃসঙ্গ ক্ষণগুলি কাটাইবার জন্ত তিনি চিত্রশিল্পকে অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং এই বিষয়েও তিনি সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার চিত্র বহু প্রদর্শনীতে প্রশংসা-লাভ করিয়াছে। ১৩৪১ সালের ভাদ্রসংখ্যা 'প্রবাসী'র মহিলা-সংবাদে তাঁহার প্রতিলিপি ও চিত্রসমালোচনা প্রকাশিত হয়। শ্রীমতী প্রভাময়ী 'প্রবাসী'র প্রথম বৎসর হইতে নিয়মিত গ্রাহিকা ও পাঠিকা ছিলেন।

পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীমতী মিত্রের গভীর জ্ঞান ছিল। বিশেষ করিয়া কনিষ্ঠা কন্তার মৃত্যুর পর তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী এই বিষয়ে বহু অনুশীলন ও গবেষণা করিয়াছেন। বহু শোকসন্তপ্ত নরনারী তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়া এবং তাঁহার সহিত আলোচনা করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিয়াছেন।

১৩৬৬ সালের ১০ই শ্রাবণ তাঁহার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হয়।

মৃত্যু সম্বন্ধে প্রভাময়ীর মতে একটি নিঃসংশয় অনুভূতি ছিল। শেষ-শয্যায়ও তাঁহার মনে কোনদিন কোন দ্বিধা আসে নাই। মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁহার অনুভূতি ও ধারণা তাঁহার নানা কবিতায় নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে রোগ-শয্যায় তাঁহাকে নিজেরই লেখা কবিতার অংশ ক্ষীণকণ্ঠে আবৃত্তি করিতে শুনা যাইত:

"মৃত্যু তোমারে বরিয়াছি আমি, ভাবিনি ভয়ঙ্কর
তিমির গহীন কঠিন মরণে তুমি যে দীপঙ্কর।
বিশাল ললাটে বিভূতির টীকা, আননে গভীর কান্তি
প্রসন্ন দিঠি বিতরে প্রসাদ, আয়ত নয়নে শান্তি।

প্রিয় প্রিয়তম বহু জনমের তব সাথে পরিচয়
বাজুক ডঙ্কা, না মানি শঙ্কা—হে বিজয়ী হোক জয়।"

দি রিহাবিলিটেশন ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশন ও শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

সম্প্রতি ভারত সরকার যে রিহাবিলিটেশন ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশন গঠন করেছেন সে কর্পোরেশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পূর্ব্ব-পাকিস্থানের উদ্বাস্তুদের কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। কর্পোরেশনের কাজ হচ্ছে প্রধানতঃ দুটো। এর প্রথম কাজ হচ্ছে শিল্প স্থাপন করা। বলা হয়েছে, যদি কেবলমাত্র নিজেদের চেষ্টায় শিল্প স্থাপন করা কর্পোরেশনের পক্ষে সম্ভবপর না হয় তা হলে কর্পোরেশন ব্যক্তিগত মালিকানার সঙ্গে সহযোগিতায় শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে কুণ্ঠিত হবে না। কর্পোরেশনের দ্বিতীয় কাজ হ'ল ব্যক্তিগত মালিকানাকে সাহায্য করা। অবশ্যি কেবলমাত্র ঋণ দিয়ে সাহায্য করার কথা বলা হয় নি। ঋণ ছাড়াও পরামর্শ, কাঁচামাল সরবরাহ, উৎপন্ন মাল বিক্রির সুবিধা ইত্যাদির দ্বারা কর্পোরেশন সাহায্য করবেন।

শ্রী জি. ডি. বিড়লা হলেন রিহাবিলিটেশন ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান। এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হলেন শ্রী জে. সি. দে। এ ছাড়া আর যাঁরা কর্পোরেশনের ডিরেক্টর বোর্ডে আছেন তাঁদের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যেমন স্যার বি.পি. সিংহ রায়, সর্ব্বশ্রী কে. কে. রায়, ডি. এন. সেন, ডি. পি. গোয়েঙ্কা, এস. সি. রায়, পুনর্ব্বাসন দপ্তরের সেক্রেটারী ধর্ম্মবীর, অর্থ দপ্তরের সেক্রেটারী এন. এন. ওয়ানচু, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের স্পেশাল সেক্রেটারী এল. কে. ঝা, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সিনিয়র শিল্প উপদেষ্টা ডাঃ বি ডি কালেলকর, এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প- ও বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী আর গুপ্তা।

রিহাবিলিটেশন ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশন ১৯৫৯ সনের ১৩ই এপ্রিল তারিখে কলকাতায় রেজিষ্ট্রি করা হয়েছে। আমরা আগেই বলেছি, শ্রী জে. সি. দে হলেন কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ৮ নং থিয়েটার রোডে ভারত সরকারের পুনর্ব্বাসন দপ্তরে কর্পোরেশনের আপিস স্থাপিত হয়েছে বলে জানা গেছে। বলা হয়েছে, কর্পোরেশনটি একটা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচালিত হবে। সাহায্যাকাঙ্ক্ষী শিল্প মালিকদের উদ্বাস্তু হতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে সাহায্যের সর্ত্ত হ'ল এই যে, পূর্ব্ব পাকিস্থানের উদ্বাস্তুদের চাকুরি দিতে হবে কিম্বা অন্যভাবে এঁদের পুনর্ব্বাসনে সাহায্য করতে হবে। শ্রী জে. সি. দে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন :

"It is necessary to dispel the prevalent misconception that industrialists eligible for assistance, must be displaced persons ; for them there already exists a financing agency, the Rehabilitation Finance Administration."

আশা করা যাচ্ছে, যে সব শিল্প রিহাবিলিটেশন ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশনের কাছ থেকে সাহায্য পাবে সে সব শিল্পে যাতে উদ্বাস্তুদের কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয় সেজন্য কর্পোরেশন সর্ব্বদা চেষ্টা করবেন, কারণ উদ্বাস্তুদের চাকুরি দিবার সর্ত্তে শিল্পগুলোকে সাহায্য দেওয়া হবে। বর্ত্তমানে পাঁচ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন নিয়ে রিহাবিলিটেশন ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন কাজ সুরু করেছেন। এই টাকা দিয়েছেন ভারত সরকার। যদি প্রয়োজন হয় তা হলে আরও বেশী টাকা কর্পোরেশনকে দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। সাহায্যপ্রার্থী শিল্পকে কতটা পরিমাণ সাহায্য দেওয়া হবে সেটার কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা ঠিক করে দেওয়া হয় নি। তবে সাহায্যের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করার সময় প্রধানতঃ দুটো জিনিসের উপর জোর দেওয়া হবে বলে শ্রী জে.সি. দে অভিমত প্রকাশ করেছেন। প্রথম জিনিস হ'ল সাহায্যের আবশ্যকতা। দ্বিতীয়তঃ সাহায্যপ্রার্থী শিল্প প্রাপ্ত সাহায্যের সদ্ব্যবহার করতে পারবে কি না সেটা পরীক্ষা করে দেখা হবে। শ্রী দে বলেছেন, সাহায্যপ্রার্থী শিল্পগুলো যাতে খুব তাড়াতাড়ি সাহায্য পেতে পারে সেজন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। যাঁরা সাহায্য চাইছেন তাঁদের কতখানি যোগ্যতা আছে সেটা কর্পোরেশনের ইকনমিক অফিসার পরীক্ষা করে দেখবেন। এ ছাড়া যে স্থানে শিল্প স্থাপনের প্রস্তাব করা হবে সেটাও পরীক্ষা করার দায়িত্ব কর্পোরেশনের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইঞ্জিনীয়ারের উপর ন্যস্ত হয়েছে। কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান শ্রী জি. ডি. বিড়লা বলেছেন :

In trying to create employment, if we concentrate only on displaced persons we might lose the opportunity of createig employment for Bengalis. I would, therefor, like to widen the scope to include every Bengali in the employment picture. If we take a general view, you will agree that once you create employment among certain Bengalis, then it will have its impact also on the displaced persons."

এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, রিহাবিলিটেশন ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন ক্ষুদ্র, মাঝারি,এবং বৃহৎ সমস্ত প্রকারের শিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে ঋণ এবং অগ্রিম দিবেন। এ ছাড়া যে সব শিল্প স্থাপিত হয়েছে সে সব শিল্পের সম্প্রসারণের জন্যও এবং অগ্রিম দিবার ব্যবস্থা হয়েছে। জানা গেছে, কর্পোরেশন কতকগুলো উপযুক্ত এলাকায় শিল্প-পল্লী প্রতিষ্ঠা করবেন। আশা করা যাচ্ছে, এই সব শিল্প-পল্লীতে কারখানার স্থান, জল, বিদ্যুৎ, যানবাহন এবং কাঁচা মাল ক্রয় সম্বন্ধীয় সুবিধা থাকবে। যে সব শিল্প-মালিক ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প স্থাপন করতে চাইবেন সে সব মালিককে শিল্প-পল্লীতে কারখানার স্থান ভাড়া দেওয়া হবে। এমনকি এঁদের কাছে কিস্তিবন্দি মূল্যে কিম্বা সরাসরি কারখানার স্থান বিক্রি করা হবে

বলেও জানা গেছে। এই মর্ম্মে একটা সংবাদ প্রচারিত হয়েছে যে, কলকাতার নিকটে অন্ততঃ একটা অথবা দুটো শিল্প-পল্লী স্থাপন করা হবে। যে সব শিল্প-মালিক কর্পোরেশনের কাছ থেকে সাহায্য লাভ করতে ইচ্ছুক তাঁদের থিয়েটার রোডস্থ দপ্তর থেকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কর্পোরেশনের তরফ থেকে সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে, কর্পোরেশন পশ্চিম বাংলার যে কোন স্থানে শিল্পের জন্ম সাহায্য দিতে রাজী আছেন। তবে যে ক্ষেত্রে সাহায্য দরকার সে ক্ষেত্রটি উপযুক্ত হওয়া চাই। এখানে আমরা আরেকটা জিনিস বিশেষ ভাবে উল্লেখ করছি। পশ্চিম বাংলার পল্লী-অঞ্চলে উপযুক্ত ক্ষেত্রে কর্পোরেশন সাহায্য দিতে খুব উদ্‌গ্রীব। প্রচারিত খবরে প্রকাশ, ত্রিপুরা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা এবং দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু কলোনী ও উপনগরীগুলোতে কিম্বা এগুলোর কাছাকাছি শিল্প স্থাপন এবং সম্প্রসারিত করার প্রস্তাবও রিহাবিলিটেশন ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশন বিবেচনা করবেন। প্রধানতঃ দুটো উদ্দেশ্য সাধনের জন্ম কর্পোরেশন ট্রেনিং দিবার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। প্রথম উদ্দেশ্য হ'ল শিল্পে দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা মিটান। দ্বিতীয়তঃ যাতে উৎপাদনের ব্যাপারে আধুনিক পদ্ধতি অনুসৃত হয় এবং উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা সম্ভবপর হতে পারে সেজন্ম কর্পোরেশন চেষ্টা করবেন। ট্রেনিং দিবার জন্ম বিভিন্ন শিল্পশিক্ষা-সংস্থাগুলোর সঙ্গে কর্পোরেশন বন্দোবস্ত করবেন বলে জানা গেছে।

কোন কোন মহলের ধারণা, বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সাহায্যের বিনিময়ে উদ্বাস্তুদের কর্ম্মসংস্থানের যে পরিকল্পনাটি চালু করা হয়েছে সে পরিকল্পনা প্রকৃতপক্ষে বানচাল হয়ে গেছে। উদ্বাস্তুদের কর্ম্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে পশ্চিম বাংলার চৌদ্দটি শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে ভারত সরকারের পুনর্ব্বাসন দপ্তর দু' কোটি টাকা ঋণ দিয়েছিলেন। এই টাকা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মারফৎ বন্টিত হয়েছে। অথচ শতকরা মাত্র চল্লিশ জন উদ্বাস্তুকে চাকুরি দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রদত্ত ঋণের পরিমাণের অনুপাতে উদ্বাস্তুদের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোতে কাজ দেওয়া হয় নি। তাই কেন্দ্রীয় সরকার আসল অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্ম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

কলকাতার বিগত ২৭শে জুলাই তারিখে এই মর্ম্মে একটা খবর প্রকাশিত হয়েছে যে, কয়েকটা শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীয় সরকার আরও বার লক্ষ টাকা কর্জ্জ দিতে রাজী হয়েছেন। এই কর্জ্জের পিছনেও একটা সর্ত্ত আছে। সর্ত্তটি হ'ল এই যে, উদ্বাস্তুদের চাকুরি দিতে হবে। তা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার নাকি স্থির করেছেন, ঋণ মঞ্জুর করার আগে ভারত সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিজে তদন্ত করবেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করছি, কিছুদিন আগে ভারত সরকার চৌদ্দটি শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে দু' কোটি টাকার ঋণ দিয়েছিলেন। সে ঋণেরও সর্ত্ত ছিল, উদ্বাস্তুদের চাকুরি দিতে হবে। এই মর্ম্মে অভিযোগ করা হয়েছে, চৌদ্দটি প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলোই এই সর্ত্ত পালন করতে অসমর্থ হয়েছেন। হয়ত এঁরা ইচ্ছা করেই সর্ত্ত পালন করতে চান নি। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই ব্যাপারে একটা তদন্ত পরিচালনা করা হচ্ছে। বিগত ২৭শে জুলাই তারিখে কেন্দ্রীয় উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী শ্রী খান্না পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন দপ্তরের সেক্রেটারী শ্রী এস. ব্যানার্জ্জির সঙ্গে এমন কতকগুলো শিল্প-প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন যেগুলো ঋণের জন্ম আবেদন করেছেন। প্রচারিত খবরে প্রকাশ, বিগত ২০শে জুলাই তারিখে চার-পাঁচটা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের অফিসারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এই সব প্রতিষ্ঠানকে আনুমানিক পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছিল। তদন্তের ফলে জানা গেছে, একটা কাপড় কলে নাকি চারশত উদ্বাস্তুকে কাজ দিবার কথা ছিল। অথচ মাত্র দু'শত বিরাশী জন উদ্বাস্তুকে কাজ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া একটা শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে নাকি মিল খুলবার জন্ম ঋণ দেওয়া হয়েছিল। অথচ এখনও পর্য্যন্ত এই মিল স্থাপিত হয় নি। এই প্রস্তাবিত মিলে নাকি ছয় শত উদ্বাস্তুকে কাজ দেওয়া হবে বলে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অথচ এখনও পর্য্যন্ত একজন উদ্বাস্তুকেও কাজ দেওয়া হয় নি। জানা গেছে, যে সব শিল্প-প্রতিষ্ঠান সরকারের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে ঋণের সর্ত্ত ভঙ্গ করেছেন সর্ত্তভঙ্গ করার কারণ প্রদর্শন করার জন্ম সে সব প্রতিষ্ঠানের উপর সরকার নোটিশ জারী করেছেন। প্রচারিত খবরে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের অফিসারদের সঙ্গে আলোচনার সময় কোন কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ নাকি বলেছেন, বৈদেশিক মুদ্রার অভাবের দরুণ বাইরে থেকে ঠিক সময়ে যন্ত্রপাতি আমদানী করা সম্ভবপর হয় নি। এজন্ম তাঁদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। 'দি ষ্টেটসম্যান' পত্রিকায় বিগত ১৫ই আগষ্ট তারিখে এই মর্ম্মে একটা সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে যে:

"If setting up industries for employment of refugees in West Bengal has been slow, it is because of time-consuming procedure followed by the Government and lack of co-ordination between its different departments and between the Union and State Governments.

দি রিহাবিলিটেশন ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান শ্রী জি. ডি. বিড়লাও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের পুনর্ব্বাসন দপ্তরের চিঠির উত্তরদান প্রসঙ্গে বলেছেন:

I get a general impression that many of the projects have been held up because of too much red-tapism. That we shall have to eliminate."

আমাদের মনে হচ্ছে, উদ্বাস্তুদের কাজ দিবার সর্ত্তে শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিবার পরিকল্পনার ব্যর্থতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করার সময় উল্লিখিত গলদগুলোর উপর নজর রাখা একান্ত দরকার। আমরা এখনও আশা করছি, উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হলে পরিকল্পনাটি সফল হবে।

ডুইট ডেভিড আইসেনহাওয়ার

ডুইট ডেভিড আইসেনহাওয়ার ১৮৯০ সনের ১৪ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ডেভিড জে. আইসেনহাওয়ার ও মাতা আইডা এলিজাবেথের ইনি তৃতীয় পুত্র। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন জার্ম্মানী। অতি সামান্য অবস্থা হইতে ডুইট ও তাঁহার পাঁচ ভ্রাতা জীবনে যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য-লাভ করিয়াছেন, তাহার পিছনে রহিয়াছে পিতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অনুপ্রেরণা।

সাধারণ ভাবে লেখাপড়া শেষ করিয়া ডুইট ওয়েষ্ট পয়েণ্টে সমরশিক্ষা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। এই সময় হইতেই তাঁহার সুরু হইল দীর্ঘ সমর-জীবন। ১৯১৫ সনে ডুইট স্নাতক হন। ইহার পর স্যান অ্যাণ্টোনিওতে (টেক্সাস) উনবিংশ ইন্‌ফ্যাণ্ট্রি রেজিমেণ্টে সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্ট হিসাবে নিযুক্ত হইলেন। এইখানেই ডেনভারের ব্যবসায়ী-কন্যা অষ্টাদশী মামি জেনীভা ডাউডের সঙ্গে তিনি পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁহাদের প্রথম পুত্র তিন বৎসর বয়সে মারা যায়। দ্বিতীয় পুত্র জন বর্ত্তমানে হোয়াইট হাউসে সহকারী ষ্টাফ সেক্রেটারি।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ডুইট পানামা খাল অঞ্চলে সৈন্য-বাহিনীর অফিসার হিসাবে কাজ করেন। ১৯৩৫ সনে তিনি জেনারেল ডগলাস ম্যাকআর্থারের সহকারী হিসাবে ফিলিপাইনে যান। ডুইট এই সময়ে ফিলিপাইন বিমান-বাহিনী গড়িয়া তোলার কাজে বিশেষ সহায়তা করেন এবং নিজেও বিমান চালাইতে শেখেন।

১৯৪১ সনে আমেরিকা যখন মহাযুদ্ধে যোগদান করে, তখন তিনি আমেরিকার থার্ড আর্ম্মির সর্ব্বাধিনায়ক ছিলেন। ১৯৪২ সনের নবেম্বর মাসে ডুইট আফ্রিকায় মিত্রশক্তির অধিনায়ক নিযুক্ত হন। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে উত্তর-আফ্রিকায় অভিযান পরিচালিত হইয়াছিল। সেই সময় তাঁহার সমর-জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার হিসাবে ইউরোপে মিত্র-শক্তির সর্ব্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন। ১৯৪৪ সনে ফ্রান্স-যুদ্ধও তিনিই পরিচালনা করেন এবং পশ্চিম জার্ম্মানী জয় করেন। ১৯৪৫ সনে যুদ্ধ শেষ হইলে, ডুইট মার্কিন সেনাবাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক হিসাবে জেনারেল মার্শালের স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯৪৮ সনের ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহার পর আসিল তাঁহার স্মরণীয় ১৯৫২ সন। যে সনে তিনি রিপাবলিকান দলের প্রার্থী হিসাবে সর্ব্বোচ্চ ভোট পাইয়া প্রেসিডেণ্ট পদে নির্ব্বাচিত হন। ১৯৫৬ সনে পুনরায় প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী হইয়া তিন কোটি ৫৫ লক্ষের বেশী ভোটে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এত অধিকসংখ্যক ভোট আজ পর্য্যন্ত কেহই পান নাই।

তিনি গল্‌ফ খেলার বিশেষ ভক্ত। চিত্রাঙ্কনেও তাঁহার অনুরাগ দেখা যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সম্বন্ধীয় তাঁহার উল্লেখযোগ্য বই 'ক্রুসেড ইন ইউরোপ' ১৯৪৮ সনে প্রকাশিত হয়।

মিঃ ডালেস যখন অসুস্থ হন, তখন হইতে পররাষ্ট্র দপ্তরের পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব ডুইট ডি. আইসেনহাওয়ারের হাতে আসে। তখন হইতেই তাঁহার মনে জাগে, তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হইবার পূর্ব্বে জগত হইতে এই ঠাণ্ডা-যুদ্ধের অবসান করিয়া যাইবেন। ক্রুশ্চেভের সহিত ব্যক্তিগত আলোচনার সাফল্য তাঁহাকে এই প্রচেষ্টায় আরও উৎসাহিত করিয়াছে। মাত্র একটি বৎসর তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হইতে বাকী— এইজন্যই তাঁহাকে এত তাড়াতাড়ি করিতে হইতেছে।

এই কারণেই প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের ভারত-সফর গভীর তাৎপর্য্যপূর্ণ। বিশ্ব-শান্তির সদিচ্ছা লইয়াই, শুধু ভারতবর্ষেই নহে, পারস্য, গ্রীস, টিউনেসিয়া, মরক্কো, ফ্রান্স, স্পেন, পশ্চিম জার্ম্মানী দেশগুলিও পরিদর্শন করিতেছেন। ইহা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।



পুস্তক-পরিচয়

রম্যাণি বীক্ষ্য—(সৌরাষ্ট্র পর্ব)। শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী। এ, মুখার্জ্জী এণ্ড কোং (প্রাঃ), লিঃ। ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ৬্ টাকা।

রম্যাণি বীক্ষ্য একখানি উপন্যাস, অন্ততঃ বইয়ের শিরোনামায় এই ঘোষণা রয়েছে। কিন্তু বইখানি পড়ে পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে—এটি রোমান্সের সুতোয় গাঁথা ভ্রমণ-কাহিনী অথবা ভ্রমণের পটভূমিকায় রোমান্টিক গল্প? যে কোন একটি নামে আলোচ্য বইখানিকে অভিহিত করার বাধা আছে বলেই এই প্রশ্ন স্বাভাবিক। এতে সৌরাষ্ট্র-মণ্ডলীর কয়েকটি দেশ—দ্বারকা, বেট দ্বারকা, প্রভাস মণ্ডল, সোমনাথ প্রভৃতির কথা রয়েছে। বিস্তৃত ভাবেই রয়েছে এই সব অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ তীর্থভূমির পরিচয়। আরও রয়েছে মন্দির ও পর্বত সংশ্লিষ্ট পুরাণ কথা, ইতিহাসের কথা, প্রাকৃতিক দৃশ্যবর্ণনা, যা নাকি ভ্রমণ-কাহিনী রচনার মূল্যবান উপকরণ, অথচ রোমান্সের সূত্র-বিধৃত হওয়ায় প্রকৃত ভ্রমণ-কাহিনীর গোত্রে মেলে না। রোমান্সের জাল বুনে ভ্রমণ-কাহিনীকে উপাদেয় করা যে যায় না—তা নয়, এই দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ নয়। বরং এই জাতের কাহিনীই পাঠক-সমাজে সমাদর লাভ করে থাকে। তবু মনে হয় ভ্রমণের আসল পরিচয় কোথায় যেন একটু খাদ মিশে থাকে। দেশ, পথ, প্রকৃতি ও মানুষের যথার্থ পরিচয়ে যে কটি ভ্রমণ-কাহিনী বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছে—রোমান্সের আলো না জ্বালিয়েও এদের জ্যোতি দূর কালে প্রসারিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ জলধর সেনের 'হিমালয় ভ্রমণ', প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়ের 'হিমালয় পারে কৈলাস ও মানস সরোবর', উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'গঙ্গাবতরণ' প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। এদের বর্ণনায় নগাধিরাজ হিমালয়—ধ্যান-গম্ভীর প্রকৃতি পরিবেশ নিয়ে কাহিনীর নায়ক হয়ে উঠেছে। তাঁর চারি পাশে রয়েছে অসংখ্য কুশীলব-গুহা উপত্যকা অরণ্য তুষারপুঞ্জ জলবায়ু সন্ন্যাসী যোগী গৃহী পথিক বণিক শ্রমিক পাণ্ডা ও পুরোহিত প্রভৃতি। কল্পিত রোমান্সকে না পেয়েও—এদের সঙ্গ মানুষের সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনাকে উদ্বেল করে তোলে না কি?

এত কথা বলার উদ্দেশ্য রম্যাণি বীক্ষ্যের মধ্যেও এই গুণটি লক্ষ্য করা যায়। সৌরাষ্ট্রের যে ক'টি তীর্থভূমির পরিচয় এতে রয়েছে—সেগুলি অসম্পূর্ণ নয়—কৌতূহলোদ্দীপক এবং বর্ণনার গুণে মনোহারীও। কিন্তু গল্পের খাদটুকু ওর সঙ্গে মেলে নি। আবার গল্পের ক্ষেত্রেও—রোমান্সের রঙ ধরাবার চেষ্টা সত্ত্বেও—সেটা পুরোপুরি গল্প হয়ে ওঠেনি। ভ্রমণকে উপলক্ষ্য করে আরও কয়েকটি পর্বে গল্পের জের টানা হয়েছে বলেই হয়ত এমনটি ঘটেছে।

প্রশ্ন হতে পারে এই রচনা না হউক উপন্যাস, নাই বা হ'ল ভ্রমণ-কাহিনী—আসলে ওটা মনকে টানে কি না? সাহিত্যে এর মূল্যটুকু স্বীকৃত হলেই ত লেখার সার্থকতা। কথা ঠিক। তবে প্রত্যেক পাঠকই একটি প্রত্যাশা নিয়ে বই পড়েন। গল্প উপন্যাস ভ্রমণ প্রবন্ধ কিংবা রম্য রচনা যাই হউক—পাঠকালে পাঠকের মেজাজও সেই মত তৈরী হয়ে যায়—আর সঙ্গে সঙ্গে একটি ছবিও মনেতে ফুটে ওঠে। সেই ছবির রংটা যদি কিছুমাত্র ফিকে হয় পাঠকের মন খুঁত খুঁত করে। খালি মনে হয় কেন এমনটা হ'ল।

রম্যাণি বীক্ষ্য যদি দুর্বল রচনা হ'ত—এমন প্রশ্ন কেউ করতেন না। বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা, পুরাণ ও ইতিহাসের গভীর জ্ঞান, ভাষার সাবলীলত্ব সব দিক থেকেই এটি উল্লেখযোগ্য রচনা। পাঠক-চিত্ত আকর্ষণ করার—ওর চেয়ে প্রকৃষ্টতর পন্থা আর কি থাকতে পারে।

বইয়ের ছাপা ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট। কয়েকখানি ছবিও এর মূল্য বৃদ্ধি করেছে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

চিত্র-দর্শন—কানাই সামন্ত, ২১২ পৃষ্ঠা, ৫৮ খানি হাফ-টোন চিত্র, ১৫খানি রঙীন চিত্র,—বিভোদয় লাইব্রেরী, ৭২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য ২৫৲।

বাংলা ভাষায় রূপবিদ্যা সম্বন্ধে বেশী বই লেখা ও প্রকাশিত হয় নাই। অবনীন্দ্রনাথের 'বাগেশ্বরী প্রবন্ধাবলী' (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), যামিনীকান্ত সেনের 'আর্ট ও আহিতাগ্নি' (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়), সুধা বসুর 'ছয়খানি সেরা ছবি' (প্রকাশক শিবলাল বসু), অশোক মিত্রের 'ভারত শিল্পের ইতিহাস' সুরেন্দ্রনাথ দাশ-গুপ্তের 'সৌন্দর্য্যতত্ত্ব' (মিত্রালয়) এবং 'ইউরোপে আধুনিক চিত্রাবলীর প্রগতি' (দেবকুমার বসু)—মাত্র এই কয়খানি পুস্তকই বাংলা ভাষায় রূপশিল্পের পরিচয় দিয়াছে। বাংলার উচ্চ শিক্ষিত সমাজ রূপবিদ্যা সম্বন্ধে যথেষ্ট বিমুখীভাব পোষণ করিয়া থাকেন। ছবির প্রদর্শনীতে উন্নাসিক সাহিত্যিক মহাশয়েরা বড় পদার্পণ করেন না। সুতরাং কৃষ্টির জগতে সাহিত্য ও সঙ্গীত-বিদ্যা ব্যতীত—জ্ঞানের আর কোনও শাখা তাঁহাদের আলোচনার বহির্ভূত। সুতরাং বিভোদয় লাইব্রেরী শ্রীকানাই সামন্ত রচিত বহুচিত্র-শোভিত এই বইখানি প্রকাশ করিয়া বাংলা সাহিত্যের একটি অভাব পূর্ণ করিয়াছেন, এবং নিশ্চয়ই চিত্রপ্রেমীদের অভিনন্দন লাভ করিবেন। গ্রন্থকার ভারতের প্রাচীন চিত্রশিল্পের পটভূমিকায় আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের প্রবর্ত্তিত নূতন চিত্রকলাপদ্ধতির ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই চেষ্টা বিশেষ সফল না হইলেও তাঁহার রচনা সুখপাঠ্য হইয়াছে। এই নিবন্ধে গ্রন্থকার আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসুর চিত্র ব্যতীত আচার্য্যের আর কোনও শিষ্যের নাম উল্লেখমাত্র করেন নাই। ভারতের নবীন চিত্রকলার আলোচনায়—ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, অসিতকুমার হালদার, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, বীরেশ্বর সেন, নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্র বাদ দিয়া—গ্রন্থকার পক্ষপাত ও সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিয়াছেন। কেবলমাত্র নন্দলাল বসুর চিত্রাবলী অবলম্বন করিয়া বাংলার নবীন চিত্রকলার সুষ্ঠু পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। তথাপি, বার পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনায় (১৩৩-১৫৪) নন্দলালের শ্রেষ্ঠকীর্ত্তি ও শ্রেষ্ঠসৃষ্টি—শিবলীলার চিত্রাবলীর উল্লেখমাত্র না করিয়া কেবল যে নন্দলালের চিত্র-সৃষ্টি ও মৌলিক প্রতিভার পরিচয় অসম্পূর্ণ ও বিকৃত হইয়াছে তাহা নহে, ভারতের প্রাচীন পৌরাণিক চিত্রাবলীর ঐতিহ্যকে অবজ্ঞা করা হইয়াছে। কেবলমাত্র "শিব-সীমন্তিনীর" একখানি অক্ষম ও দুর্ব্বল বর্ণ প্রতিলিপির সংযোজনে—নন্দলালের মৌলিক রূপসৃষ্টির পরিচয়—সম্পূর্ণ করা যায় না। প্রকাশক পুস্তকে ১৫খানি ত্রিবর্ণের প্রতিলিপি প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দুই-তিনখানি ব্যতীত প্রায় সব-গুলিতে আসলের গুণ ও সৌরভের পরিচয় পাওয়া যায় না। এ দেশে সঠিক ও নিখুঁৎ রঙীন প্রতিলিপি প্রস্তুত হয় না। সুতরাং এই ত্রুটির জন্ত প্রকাশককে দায়ী করা যায় না। নানা দোষ ও ত্রুটি থাকিলেও আমরা পুস্তকখানির প্রশংসা করি। চেষ্টা সফল না হইলেও চিত্রবিদ্যার আলোচনার ক্ষেত্রে চেষ্টামাত্রই প্রশংসনীয়। পুস্তকখানি প্রত্যেক লাইব্রেরীতে স্থান পাইবার যোগ্য।

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

গীতিমুখর ভিয়েনা—শ্রীশেফালি নন্দী। পপুলার লাইব্রেরী, ১৯৫।১-বি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য দুই টাকা।

যশস্বিনী লেখিকার এই গ্রন্থখানিতে ভ্রমণকাহিনীর স্বাভাবিক আবেদন ছাড়াও চমৎকার প্রচ্ছদপট, খানকয়েক মনোরম আলোক-চিত্র ও ছাপার পারিপাট্যের আকর্ষণ আছে। ভাষা প্রাঞ্জল ও বর্ণনায় বৈঠকী আমেজ থাকাতে পুস্তকখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে। ভিয়েনা নগরীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও প্রাচীন গৌরব লেখিকার অন্তরকে গভীরভাবে আলোড়িত করিয়াছিল; বিশ্ববিখ্যাত সঙ্গীত-সুধাকরদের জন্ম বা সাধনক্ষেত্রে সশরীরে উপস্থিত থাকিয়া বর্ত্তমানের কুশলী সুরকারদের যন্ত্র ও কণ্ঠে সেই সব মহারথীদের রচিত সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া সঙ্গীতানুরাগিণীর সংবেদনশীল হৃদয়বীণার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ঝঙ্কার উঠিয়াছিল। এই গ্রন্থের পাতায় পাতায় "ভিয়েনা-সুন্দরী"কেও আড়াল করিয়া লেখিকার সেই বিহ্বল হৃদয়ের প্রতিচ্ছবিই বেশী ফুটিয়াছে। রচনা খুবই সংক্ষিপ্ত না হইলে বাংলা ভ্রমণ-সাহিত্যে গ্রন্থখানি একটি মর্য্যাদার আসন অধিকার করিতে পারিত।

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

রাষ্ট্র-জ্ঞানের মধুভাণ্ড—'মৌমাছি', সরস্বতী লাইব্রেরী, ৩২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য তিন টাকা।

'রাষ্ট্র-জ্ঞানের মধুভাণ্ড' বইখানি আকারে ছোট হইলেও ইহা গ্রন্থের মর্য্যাদা পাইবার যোগ্য। স্বাধীন হইয়াও আমরা স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রের খবর প্রায় কেহই জানি না। গ্রন্থকার তাঁহার এই বইখানিতে আমাদের সেই কথাই শুনাইয়াছেন। বইখানিতে আটটি অধ্যায় আছে: ভারতের রাষ্ট্র-সাধনা, ভারতের রাষ্ট্র-বিপর্য্যয়, ভারতের রাষ্ট্র-চেতনা, ভারতের রাষ্ট্র-বিপ্লব, ভারতের রাষ্ট্র-সংগ্রাম, ভারতের রাষ্ট্র-সংস্কার, ভারতের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এবং নয়া-ভারতের ভিত্তি। অধ্যায়গুলি দেখিলেই পুস্তক সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা জন্মে। এক কথায় ইহা একখানি ইতিহাস—ভারত-ইতিহাস। আমাদের দেশে ইতিহাস বলিতে যাহা আছে তাহা মিথ্যার ইতিহাস। যে-ইতিহাসে আমাদেরকে পাই না, যাহার সহিত ভারত-আত্মার কোন যুগসূত্র নাই, তাহাকে আর যাহাই বলি না কেন, ইতিহাস বলিতে পারি না।

সত্য কথা বলিতে কি রাষ্ট্র-জ্ঞান বিষয়ে আমাদের জ্ঞান প্রায় সকলেরই সীমাবদ্ধ। এবং এই জ্ঞানের অভাবেই সামাজিক বিশৃঙ্খলতা, দলাদলি, মারামারি। এই তথ্যপূর্ণ ইতিহাস রচনায় গ্রন্থকারের প্রযত্ন ও প্রয়াস প্রশংসনীয়। এরূপ ইতিহাসেরই আমাদের দেশে এতকাল প্রয়োজন ছিল। ইহা ছাত্রদের জন্ত

লিখিত হইলেও প্রত্যেকের ইহা 'অবশ্য সংরক্ষণ' হিসাবে ঘরে রাখা উচিত।

শিশু-সাহিত্য রচনায় সিদ্ধহস্ত মৌমাছি যে এরূপ জটিল জিনিসের জট ছাড়াইতেও অভ্যস্ত ইহা আমাদের জানা ছিল না। তাঁহার শ্রম সার্থক হইয়াছে। বইখানির নামকরণও হইয়াছে চমৎকার। নামেই তাহার স্বরূপ প্রকাশ।

মনীষীদের ছোটবেলা—শ্রীবিমল ঘোষ (মৌমাছি)। সরস্বতী লাইব্রেরী, ৩২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ২.২৫ নঃ পঃ।

শ্রীযুক্ত বিমল ঘোষ 'মৌমাছি' নামেই পরিচিত। বিশেষ করিয়া ছেলেমেয়েরা তাঁহাকে ভাল করিয়াই জানে। শুধু ছেলে-মেয়েরাই বা বলি কেন, তিনিও তাদের প্রাণের কথা বোঝেন। এই প্রাণের কথাটি ধরা বড় সহজ কথা নয়। আমরা বড় হইলে তাদের ঐ প্রাণের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ি, তাই ঠিক ছোটটি হইয়া ছোটদের কথা বলিতেও পারি না, বলিতে গেলেও ঠিকমত বলা হয় না। 'মৌমাছি' সেই তত্ত্বটি জানেন। অগ্রজদের মত ছেলেদের সহিত তাঁহার আত্মিক যোগ ছিন্ন হয় নাই। তাই তিনি ছেলেদের কথা এমন ভাল করিয়া বলিতে পারেন।

আলোচ্য বইখানিতে গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, পরমহংস-দেব, এডিসন, হেনরী ফোর্ড, হান্‌স এণ্ডারসন, রাজেন্দ্রনাথ, স্বামীজী ও নেতাজীর ছোটবেলার কথা বলিয়াছেন। ছোটবেলার কথা অনেকেই বলেন, তাহা শুধু জীবন-কথা মাত্রই। ডঃ কালিদাস নাগ তাঁহার ভূমিকায় বলিয়াছেন, "জীবন শুধু তত্ত্ব নয়, জীবন-বনস্পতির মূল রয়েছে শৈশবে এবং সেই শৈশব-জীবনের বিশিষ্ট রূপ আছে, ছন্দও আছে; সেটি ধরতে না পারলে জীবনীর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা যায় না।" ছেলেদের কথা বলিতে হইলে এই মূল তত্ত্বটি ধরা চাই। সেদিক দিয়া 'মৌমাছি'র এই বইখানি অনবদ্য হইয়াছে। ছেলেদের জন্য এরূপ একখানি বই-এর বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সে প্রয়োজন সার্থক হইয়াছে তাহা বইখানির ছয়টি সংস্করণ হইতেই বুঝা যায়।

শ্রীগৌতম সেন

দেশ-বিদেশের কথা

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ

ভারতের গৌরব আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বহন করিয়া চলিয়াছে আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ সংগঠন ও অনুশীলনের দুর্গম পথে। এবার পরিষদ আটাশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। আগামী পৌষ মাসে (জানুয়ারী, ১৯৬০) উহার সপ্তাহব্যাপী অষ্টবিংশতিতম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে।

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নিরবচ্ছিন্ন গতিপথে মানুষ স্থাণুর মত বসিয়া থাকিতে পারে না। সত্যের সন্ধানে সে চির-জাগ্রত। জনগণের সাহায্য ও সহানুভূতিই আয়ুর্ব্বেদকে প্রাণবন্ত করিয়া রাখিয়াছে এবং চলিবার পথে তাহার চিরন্তন পাথেয়। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া আয়ুর্ব্বেদের শাশ্বতনীতি, অব্যর্থ ঔষধাবলি, স্বস্থবৃত্ত, অষ্টাঙ্গের গবেষণা, প্রত্যক্ষদর্শন, সুষ্ঠু প্রয়োগ ও বিস্ময়কর চিকিৎসা পীড়িত জনের নিরাময়তা, বিষাদের মধ্যে আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত করিয়াছে। স্বাধীন ভারতে আয়ুর্ব্বেদের গতি মন্থর হইলেও কোটি কোটি ভারতীয়ের জীবন ও স্বাস্থ্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় অটুট আছে। ইহাকে আধুনিক বিজ্ঞানের চক্রে ফেলিয়া উন্নতিশীল করা ত দূরের কথা, ছিন্নমূল বৃক্ষের মত উহা প্রাণহীন হইবে—উহার অস্তিত্ব লোপ পাইবে। আধুনিক বিজ্ঞানের মহাসমারোহের মধ্যেও নিরাভরণ আয়ুর্ব্বেদ বাঁচিয়া থাকিবে সত্যানুসন্ধানী আয়ুর্ব্বেদসেবীর নিষ্ঠা ও কর্ম্মোদ্যমের বিপুলতায়। শত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও পরিষদ তাহার ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া নানাভাবে আয়ুর্ব্বেদের উৎকর্ষ সাধনে ব্রতী আছে। বিভিন্ন কবিরাজের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও চাক্ষুষ জ্ঞান, আধুনিক ও পুরাতন স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের তুলনা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মৌলিক ভিত্তি বিজ্ঞান-বিভাগের অধিবেশনে আলোচিত হয় ও নূতন সত্য অনুসন্ধানের ইঙ্গিত করে। সারস্বত সভায় অষ্টাঙ্গের বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের দ্বারা উপসমিতি বা শাখা সমিতি গঠিত হয়। প্রত্যেক বিষয়ের অনুসন্ধানে সদস্যগণ লিপ্ত আছেন। চলতি বৎসরে সংস্কৃতি, মনোবিজ্ঞান, শালাক্য, দ্রব্যবিজ্ঞান, জনস্বাস্থ্য, শিশুরোগ ও কায়চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ প্রবন্ধ পাঠ, আলোচনা ও প্রত্যক্ষদর্শনের ফলাফল উপস্থাপিত করেন।

পরিষদের আর একটি কর্ম্মপদ্ধতি আয়ুর্ব্বেদীয় আরোগ্যশালা সম্মেলন। হাসপাতালগুলিতে এককভাবে নিজ নিজ চিকিৎসা ও শুশ্রূষাকার্য্য সম্পন্ন করা হয়। সম্মেলনের উদ্দেশ্য—আরোগ্যশালা সংক্রান্ত বিভিন্ন চিকিৎসাপ্রণালী, ঔষধনির্ম্মাণ, ঔষধপ্রয়োগের ফলাফল, নিদানাদি বহু প্রকার বিষয়ের পারস্পরিক আলোচনার সাহায্যে অধিকতর উন্নতিশীল চিকিৎসার প্রবর্তন করা, যাহাতে করিয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসা পরিচালনা ও শুশ্রূষার মান উন্নত হইতে পারে।

সম্প্রতি পরিষদ লোকস্বাস্থ্যের পরীক্ষাকার্য্যে হাত দিয়াছে। পার্ক ষ্ট্রীট অঞ্চলে এবার শিশুস্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে—এই নিরীক্ষা অন্যান্য অঞ্চলেও পরিচালিত হইবে—শুধু শিশুস্বাস্থ্যের নয়, বয়স্কদেরও।

'ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলন' পরিষদের আর একটি কর্ম্মোদ্যম ও বার্ষিক অধিবেশনের বিশেষ অঙ্গ। ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সাহিত্য, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, চিত্রকলা, অর্থনীতি, আয়ুর্ব্বেদ, দর্শন প্রভৃতি একই সংস্কৃতির বিচিত্র প্রকাশ। আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ যদিও পরবর্ত্তীকালে ইহার অপরিসীম উৎকর্ষ লাভ হইয়াছে ক্রমোন্নতির পথে। ভারতীয় কৃষ্টির প্রগতি ও বিভিন্ন ধারার সাগরসঙ্গমে বিশ্বের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ঢেউ আসিয়া নব নব উন্মেষের সহিত নবতর বিশ্বভারতী জন্মলাভ করুক—ইহাই অভিপ্রায়।

একটি আয়ুর্ব্বেদ-প্রদর্শনীও ইহার সহিত খোলা হইবে। উহাতে থাকিবে জনস্বাস্থ্য ও মুষ্টিযোগের চার্ট, আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থরাজি, পুরাতন পুথি, কাঁচা ও শুষ্ক গাছগাছড়া, যন্ত্রশস্ত্রাদির চিত্রাবলি, ধাতুভস্ম, খনিজ পদার্থ, বিভিন্ন তৈল প্রভৃতি। জনসাধারণকে স্বাস্থ্য ও সংক্রামক ব্যাধি সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য জনপ্রিয় বক্তৃতামালার ব্যবস্থা হইবে। বিশেষজ্ঞগণ ইহাতে যোগদান করিবেন।

অন্যান্য বৎসরের মত এবারও সপ্তাহব্যাপী বার্ষিক অধিবেশনে শল্য, শালাক্য, কায়চিকিৎসা, রসায়ন—বাজীকরণ, মনোবিজ্ঞান, দ্রব্যবিজ্ঞান, সংক্রামক ব্যাধি, প্রমেহ, জনস্বাস্থ্য—শিশুরোগ, কুষ্ঠরোগ, প্লীহা-যকৃৎরোগ সম্বন্ধে এগারটি বিভাগে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা হইবে।

দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার

৩৭ বছর আগে 'দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার' যখন সেবাব্রত সুরু করে, সেদিনের প্রথম পুঁজি ছিল শুধু দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা। অদম্য উৎসাহ ও বুকভরা আশা নিয়ে প্রেম, প্রীতি ও মমতাপূর্ণ প্রাণচঞ্চল একদল কিশোর ও তরুণ একাত্ম হয়ে সমর্পণ করেছিল নিজেদের বিপুল কর্ম্মশক্তি। সেই নিঃস্বার্থ সেবা কোমল অনাড়ম্বর কর্ম্মধারায় মিলিত হয়েছিল জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত গভীর সহানুভূতি ও অকৃপণ দান।

আজ নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে, রূপ নিয়েছে এক একটি কল্যাণবর্ষী প্রতিষ্ঠান, উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে কর্মসূচী।

মহামারী, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ভূমিকম্প, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতি প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ে আর্ত্তত্রাণ সেবাদি, স্বাস্থ্যপ্রদর্শনী বক্তৃতা, পাঠাগার মাধ্যমে জনশিক্ষা ও বিবিধ জনহিতকর কার্য্যাদি ভিন্ন, বর্ত্তমানে ভাণ্ডারের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে :—

ক। দুইটি এ্যালোপ্যাথিক ও দুইটি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কেন্দ্র 'চিত্তরঞ্জন দাতব্য চিকিৎসালয়।'

খ। একটি যক্ষ্মা হাসপাতাল, 'শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী সেবায়তন।'

গ। যক্ষ্মারোগীদের গৃহে চিকিৎসক দ্বারা 'গৃহচিকিৎসা' ব্যবস্থা ও রক্তপরীক্ষা-কেন্দ্র 'দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার চেষ্ট ক্লিনিক'

ঘ। যক্ষ্মারোগমুক্ত মহিলাদের 'শিল্পশিক্ষা-কেন্দ্র'

ঙ। প্রসূতিসদন ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র 'শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী সেবায়তন'

চ। গ্রন্থাগার ও অবৈতনিক পাঠাগার 'সচ্চিদানন্দ গ্রন্থাগার'

ছ। দুইটি দুগ্ধ বিতরণ-কেন্দ্র।

চিত্তরঞ্জন দাতব্য চিকিৎসালয়

এই চিকিৎসালয়ের মূলকেন্দ্র ৬৫।২বি, বিডন ষ্ট্রীট ও শাখা কেন্দ্র ১০৫।১, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে অবস্থিত। মূল ও শাখাকেন্দ্রে এ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক উভয় বিভাগই আছে।

আলোচ্য বৎসরে দুইটি শাখা মিলাইয়া ১,১০,৮৯৩ জন রোগীকে পরীক্ষা করা ও ঔষধ দেওয়া হয়।

দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার চেষ্ট ক্লিনিক

১৯৪১ সনে, ৫ই এপ্রিল, পরলোকগত স্যার এন, এন, সরকার এক্সরে'র যন্ত্রপাতি সমন্বিত একটি যক্ষ্মা চিকিৎসা-কেন্দ্র উদ্বোধন করেন। বর্ত্তমানে এই চিকিৎসা-কেন্দ্রটি 'দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার চেষ্ট ক্লিনিক' নামে পরিচালিত। এই ক্লিনিকটি অধিকতর স্থানের সুবিধার জন্য রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটস্থিত 'শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী সেবায়তনে'র নিয়ন্ত্রণে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই বহির্কেন্দ্রে গত বৎসর ১৩,০০৫ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। ১৯৪৪ সনে যক্ষ্মারোগীদের গৃহে গৃহে পাঠিয়েও ঔষধপথ্যাদি দিয়া চিকিৎসা করা হয়। 'গৃহ চিকিৎসায়' খুব সন্তোষজনক ফল পাওয়া এক্সরে বাবদ নামমাত্র ৫৲ টাকা নেওয়া হয়। থুথু, রক্ত ইত্... পরীক্ষার জন্য খরচা লাগে না।

শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী সেবায়তন

গত ১৬ই এপ্রিল, ১৯৫২, তদানীন্তন রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক 'শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী সেবায়তন' হাসপাতাল উদ্বোধন হয়। বর্ত্তমানে এই হাসপাতালটি ৫২টি শয্যাসমন্বিত। এই হাসপাতালে প্রাথমিক অবস্থায় যক্ষ্মারোগ চিকিৎসা করা হয়। সেবায়তনে চিকিৎসার জন্য রোগীদিগকে ঔষধপত্র ইঞ্জেকশন, এক্সরে থুথু ইত্যাদি পরীক্ষা ও দুই বেলা টিফিন বাবদ কোন খরচা দিতে হয় না।

আলোচ্য বৎসরে ১৪০টি রোগী সেবায়তনে চিকিৎসিত হয়।

যক্ষ্মারোগমুক্ত মহিলাদিগের শিল্প শিক্ষা কেন্দ্র

আলোচ্য বর্ষে ৪২ জন ছাত্রী শিল্পশিক্ষা কেন্দ্রে সেলাই শিক্ষাধীন আছে।

শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী সেবায়তন

গত ১লা ডিসেম্বর, ১৯৫৭, কলিকাতার পৌরপ্রধান ডাঃ ত্রিগুণা সেন কর্ত্তৃক ২২এ, শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, কাঁকুড়গাছিতে প্রসূতিসদন ও ও শিশুমঙ্গল-কেন্দ্র শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী সেবায়তনের উদ্বো... হয়। সেবায়তনটি ৩২টি শয্যাসমন্বিত। সেবায়তনে প্র... প্রাতে ১৫০টি শিশুকে দুগ্ধ বিতরণ করা হয়।

সচ্চিদানন্দ গ্রন্থাগার

১৯২৩ সনের মার্চ্চ মাসে গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হয়। বর্ত্তম... পুস্তকের সংখ্যা ৪,৭৮৮ তন্মধ্যে ইংরেজী পুস্তক ৭৭৮। আলো... বর্ষে 'আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় ১১২ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ ক... ও প্রতিযোগীর পারিতোষিক বিতরণ করা হয়।

বর্ত্তমান বিভাগগুলির ব্যয়ভারের সঙ্গে সম্প্রসারণ কার্য্যাদি নূতন নূতন পরিকল্পনাগুলি বাস্তবে পরিণত করার জন্য চাই প্র... অর্থ সাহায্য সেই জন্য ভাণ্ডারের পরিচালকগণ ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে দেশবাসীর দ্বারস্থ হইয়াছেন। ইহা জনসাধারণেরই কাজ। যাঁহার পক্ষে যেটুকু সম্ভব অর্থ অথবা জিনিসপত্র দিয়া ভাণ্ডারকে সাহায্য করুন।

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯



প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

মেঘসঞ্চার

শ্রীপঙ্কজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়



মাছধরা

খররৌদ্রে

[ফটো : শ্রীরমেন বাগচী

:: ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::



"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৯শ ভাগ ২য় খণ্ড | মাঘ, ১৩৬৬ | ৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

রোগ ও তাহার প্রতিকার

বর্ত্তমানে দেশে অসহিষ্ণুতা ও অসংযম এত বেশী বাড়িয়াছে যে, উচ্ছৃঙ্খলতার কুশ্রী রূপটা প্রকট হইয়া উঠিতেছে যেখানে সেখানে। বিশেষ করিয়া বিদ্যায়তনে ইহার অনুপ্রবেশ দেশবাসীর উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতীয় সংসদেও ইহার আলোচনা হইয়াছে এবং সংসদের সদস্যেরা তরুণ সমাজের মতি-গতিতে একাধিকবার উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সে উৎকণ্ঠা প্রকাশের কি মূল্য আছে যদি তাঁহাদের কথায় ও কাজে না থাকে সামঞ্জস্য? কারণ, তাঁহারা নিজেদেরই—কি আচার-আচরণে, কি চরিত্র-গঠনে একটি আদর্শ খাড়া করিতে পারেন নাই। সেই অসংযম নানা আকারে বাহির হইয়া পড়িতেছে। তাঁহাদের উপদেশ আর কোন কাজেই আসিতেছে না। তাই মনে হয়, যে সংযমহীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা সমাজের সর্ব্বস্তরে দেখা যাইতেছে, তাহার জন্য জনসাধারণের প্রতিনিধিদের অশোভন আচরণ কতখানি দায়ী তাহা বিচার করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।

রাজনীতির নামে যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার অশিষ্ট আচরণ, অস্থিরতা, অধৈর্য্য ও অসংযমের প্রশ্রয় দিতেছেন, তাঁহাদের আচরণ দেখিয়া লোকে কি শিখিবে? অন্ততঃ ধৈর্য্য ও সংযম যে নয়, তাহা অনস্বীকার্য্য। ভারতীয় সংসদেও মাঝে মাঝে এইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। মতের সহিত না মিলিলেই উষ্মা প্রকাশ করিতে হইবে, এই বা কিরূপ কথা? তাঁহাদের চিন্তা করা উচিত ইহাতে শুধু ভারতীয় সংসদের মর্য্যাদার প্রশ্ন জড়িত নাই—ইহার সহিত জড়িত রহিয়াছে জাতির নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধের প্রশ্ন। সমগ্র জাতির কল্যাণবিধানের গুরু-দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে তাঁহাদের উপর।

মতবাদ পৃথক হইতে পারে, কিন্তু দেশ অপেক্ষা কি মতবাদ বড়? তাঁহাদের আচরণে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা দেশদ্রোহিতারই নামান্তর। মানুষ যখন ক্ষেপিয়া যায়, তখন বুঝিতে হইবে যে, তাহার যুক্তিবুদ্ধির অভাব ঘটিয়াছে। লোকসভায় কম্যুনিষ্ট সদস্যদের আচরণে সেই উগ্রতাই প্রকাশ পাইয়াছে।

ব্যাপার কিছুটা লঘুভাবে দেখা যাইতে পারিত, যদি কি কেন্দ্রে, কি অঙ্গরাজ্যগুলিতে এই অবাঞ্ছিত ঘটনা আর কখনও না ঘটিত। যদি আইনসভার সদস্যদের আচরণ কদাচিৎ শোভনতার সীমা লঙ্ঘন করিত। কিন্তু ভারতীয় সংসদে এবং একাধিক রাজ্য আইন-সভায় যে-ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অশিষ্টতা বার বার প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে উদ্বিগ্ন হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। লোক-সভায় যে-কোনও বিষয়ে, যে-কোনও প্রশ্ন তুলিবার মৌলিক অধিকার প্রত্যেক সদস্যেরই আছে—তাঁহাদের রাজনৈতিক আদর্শ বা মতবাদ যাহাই হউক না কেন। বৈধতার প্রশ্ন তুলিবার অধিকারও তাঁহাদের আছে, একথাও কেহ অস্বীকার করে না। অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তে তাঁহারা সব সময় তুষ্ট নাও হইতে পারেন। কিন্তু উপলক্ষটা যাহাই হউক না কেন, সংযম তাঁহারা হারাইবেন কেন? কেন এমন আচরণ করিবেন যাহাতে সংসদের মর্য্যাদা নষ্ট হয়?

দুর্নীতি ও অসংযম আজ সর্ব্বত্র দেখা দিয়াছে। কিন্তু ইহাকে প্রতিরোধ করিবে কে? আইন করিয়া বা ধমকাইয়া ইহাকে আয়ত্তে আনা যায় না। চাই এমন একটি আদর্শ যে আদর্শে মানুষ অনুপ্রাণিত হইবে। অভাব সেই আদর্শের। সেই আদর্শ খাড়া করিবার দায়িত্ব যাঁহাদের উপর, তাঁহাদেরই আজ সকল রকমে সংযত হইতে হইবে।

অনুকরণপ্রিয়তা একটি ব্যাধি। এ ব্যাধি সংক্রামক। যার জন্য সারা ভারত আজ নীতিবোধ হারাইতে বসিয়াছে। কি শিক্ষা ক্ষেত্রে, কি রাজনীতি ক্ষেত্রে, কি সমাজ-জীবনে সর্ব্বত্র এই দুষ্ট ব্যাধি অনুপ্রবেশ করিয়াছে। আমরা ঔষধ প্রয়োগে তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিতেছি। 'কারণ' দূর করিবার চেষ্টা করি নাই। আজ আমাদের সেই পথ ধরিয়াই আগাইয়া যাইতে হইবে। প-স

মানবাত্মিক আদর্শবাদ সম্বন্ধে আইসেনহাওয়ার

সকলেরই বোধ হয় স্মরণ আছে গত ১১ই ডিসেম্বর দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় এক বিশেষ সমাবর্তনে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারকে সম্মানার্থে 'ডক্টর অফ ল' উপাধি দিয়াছেন। এই সমাবর্তনে আইসেনহাওয়ার যে কথাগুলি বলিয়াছেন তাহা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে জ্ঞানের পথে মিলনের আদর্শটিই যাহাতে শিক্ষার প্রধানতম লক্ষ্য হয়, পৃথিবী যাহাতে বিদ্বেষ-বিমুক্ত সমৃদ্ধ এবং সুন্দর হয়, সেইদিকে সকল দেশের নায়ক, শাসক ও শিক্ষাব্রতীদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। মানুষ তাহার কয়েক হাজার বৎসরব্যাপী সভ্যতার অগ্রযাত্রায় অনেক ঐশ্বর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে, অনেক অজ্ঞাত লোকের দরজা খুলিয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও পৃথিবী সুখের স্থান হয় নাই। তাহার কারণ, মানুষ অন্য দেশ ও জাতির ক্ষয়ের উপর আপন দেশের জয়ের ইমারত গড়াকেই তাহার মুখ্য কামনার বস্তু মনে করিয়াছে। জাতিধর্মনির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে ভালবাসা, দুঃখী, দরিদ্র ও অনগ্রসর দেশগুলিকে বন্ধুর মত প্রীতি এবং প্রত্যয়ের সহিত হাত ধরিয়া আগাইয়া আনা, কোনদিন পুঁথির পাতা ছাড়িয়া মানুষের অভ্যাসের মধ্যে বাসা বাঁধে নাই। প্রভূত শিক্ষা সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির মধ্যেও মানুষ তাই যুদ্ধের মত কদর্য্য বস্তুকে সযত্নে লালন করিয়াছে। আজ দিন আসিয়াছে, যখন সভ্যতার এই প্রাচীন শত্রুকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে হইবে। যুদ্ধ আজিও থাকিবে, কিন্তু সে যুদ্ধ করিতে হইবে দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও অস্বাস্থ্যের বিরুদ্ধে। জ্ঞানের বিত্ত ও বিজ্ঞানের আলোকবর্ত্তিকা হাতেই মানুষকে সংহত হইতে হইবে এই যুদ্ধের জন্য এবং সারা দুনিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই হইবে তাহার প্রধান পীঠস্থল। তরুণ-তরুণীরা সেখানে মিলিত হইবেন এবং পুরাতন জ্ঞানের তাঁহারা অনুশীলন করিবেন, নূতন জ্ঞানের করিবেন উদ্বোধন এবং দুইয়ের সুষ্ঠু সমন্বয়ে এমন এক সার্বভৌম চিন্তা ও মননশীলতার কাঠামো গড়িয়া তুলিবেন, যাহা ধর্মসংস্কার ও ভূগোলের বেড়া অতিক্রম করিয়া বিশ্বের সমস্ত মানুষকে অনুপ্রাণিত করিবে।"

এই উক্তিগুলি সকলেরই চিত্ত স্পর্শ করিবে। মানবজাতি আজ যে প্রধান দুটি সমস্যার সম্মুখীন, তাহা সমাধানের পথে বিশ্ববিদ্যালয় কি ভূমিকা লইতে পারে, এই কথায় তাহাই স্পষ্ট করা হইয়াছে। আজিকার পৃথিবীর একদিকে দারিদ্র্য, অন্যদিকে যুদ্ধত্রাস এবং এই দুই বিপদের বোঝা পিঠে লইয়াই মানুষকে চলিতে হইতেছে। বিজ্ঞান অসীম ঐশ্বর্য্য সৃষ্টি করিতেছে ঠিকই, কিন্তু সে ঐশ্বর্য্য আজও অল্পসংখ্যক দেশের করতলগত হইয়া রহিয়াছে এবং তিন-চতুর্থাংশ পৃথিবী শুধু তাহার দিকে সতৃষ্ণ হতাশায় তাকাইয়া আছে। তথাকথিত উন্নত দেশগুলি এই সব 'অনুন্নত' দেশের ঘাড় ভাঙিয়া যথাশক্তি লাভের কড়ি কামাইতেছে। আর এই কড়ি-কামানোর প্রতিযোগিতা হইতেও যেমন, ইহার পথ রোধ করার ন্যায়সঙ্গত তাগিদ হইতেও তেমন, যুদ্ধের সম্ভাবনাও মানুষের সম্মুখে একটা অনতিক্রম্য দুর্বিপাকের মত ফণা উচাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। রাজনীতির নামে, দেশপ্রেমের নামে মানুষ তাহাকে উস্কাইতেছে। বিজ্ঞান তাহার হাতে তুলিয়া দিতেছে অমোঘ বিশ্ব-বিনাশের হাতিয়ার। এই বিপত্তি হইতে পৃথিবী ও মনুষ্য জাতিকে উদ্ধার করিতে হইলে, চাই প্রচলিত চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল রূপান্তর। মানুষ কোনদিন কোন কারণেই আর যুদ্ধ করিবে না, এই প্রতিজ্ঞা যদি সার্বভৌম নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করে, বিজ্ঞানের শক্তিকে যদি শুধু গঠন ও সমুন্নতির পথেই প্রবাহিত করিতে মনস্থ করে, এক দেশের দারিদ্র্য ও নিরুপায়তার উপর বাণিজ্য করিয়া অন্য দেশ লাভবান হওয়াকে যদি নিন্দনীয় অমানুষিকতা বলিয়া বোঝে এবং বিশ্বের সমস্ত শক্তি, সমস্ত সম্পদ যদি পারস্পরিক শুভবুদ্ধির প্রেরণায় সমভাবে সবাই ভোগ করিতে পায়, তাহা হইলে আজিকার পৃথিবী সত্যসত্যই অভাব, অনটন ও বঞ্চনা-বিমুক্ত হইতে পারে। কিন্তু যে শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সমাজ-মানসিকতার মধ্যে আমরা রহিয়াছি, তাহা এই বিশ্ববোধ সৃষ্টির অল্পই সহায়তা করিতেছে। আমরা খণ্ড খণ্ড মানব-গোষ্ঠী হইয়া অখণ্ড মানবত্বকেই বিনাশের পথে ঠেলিয়া দিতেছি। এমন দিনে বাস্তবিকই চাই শিক্ষার উদ্দেশ্য ও উপকরণগুলি আগাগোড়া নূতন ভাবে যাচাইয়া দেখা এবং এমনভাবে ঢালিয়া সাজা, যাহাতে মানুষের মনের আকাশটা বৃহৎ হইয়া উঠে।

এই জন্যই আইসেনহাওয়ার বলিয়াছেন, "পুরা-পৃথিবীর নীতিধর্ম ও মানবাত্মিক আদর্শবাদও আমাদের ফিরাইয়া আনিতে হইবে, আবার নূতন যুগের বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার সহায়তাও আমাদের পূর্ণভাবে লইতে হইবে। দ্বিতীয়টি দিবে আমাদের বিত্ত ও বস্তুসম্পদ, আর প্রথমটি দিবে তাহাকে মানুষের মত ব্যবহার করার উপযোগী বিবেক ও নৈতিক জ্ঞান। যুগধর্মে শুধু দ্বিতীয় দিকটাই সারা পৃথিবীতে আজ প্রধান হইয়া উঠিতেছে, আর প্রথমটার আসন হইতেছে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত।"

সভ্যতা ও সংস্কৃতির চরম উৎকর্ষের মধ্যেও মানুষ এই কারণেই আজ ভয়, অশান্তি ও বঞ্চনা-মুক্ত হইতে পারিতেছে না।

গ-স

দর্শন ও বিজ্ঞান

ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেস এবং দর্শন-কংগ্রেস—নামে পৃথক হইলেও ইহারা পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কারণ বিজ্ঞান এবং দর্শন উভয়েই সর্বজনীন সত্যের আবিষ্কারক, ধারক ও প্রচারক। সুতরাং উভয়ের সমস্যা যদি কিছু থাকে তবে তাহা বিশ্বজনীন সমস্যা—শুধু ভারতের নহে।

বিজ্ঞান আজ অনেক কিছু করিয়াছে। আণবিক শক্তির অনুশীলনীতে ভারত পিছাইয়া আছে সত্য, কিন্তু দূর অতীত-ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, সেই পুরাতন

পৃথিবীতে বিজ্ঞানের শক্তিতে ও অধিকারে একমাত্র ভারতই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিল। প্রাচীন ভারতের ইস্পাত-শিল্প তাহার দৃষ্টান্ত। ধাতু-রসায়নেও প্রাচীন ভারতীয় কৃতিত্বকে কোন দেশ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই। ভারতের দার্শনিকী প্রজ্ঞার ইতিহাসও তাই। জীবন কি এবং তাহার স্বরূপই বা কি, সৃষ্টির কারণ ও তাহার রহস্য—এই সব মূল সত্যের অন্বেষণে ভারতের তাত্ত্বিক প্রতিভা যেকালে ষড়দর্শন সংস্থাপিত করিয়াছিল, সেকালে পৃথিবীর কোন জাতির পক্ষে এরূপ চিন্তাশক্তির পরিচয় দেওয়া সাধ্য ছিল না। তার পর আসে অন্ধকারের যুগ—ভারত তাহার পূর্ব্ব গৌরব হারাইল।

ধীরে ধীরে ভারত বিজ্ঞান-অনুশীলনের পথ হইতে সরিয়া আসিল। ঋষিরা দেখিয়াছিলেন, এ পথে মানুষের কল্যাণ নাই। শক্তির শেষ ধাপে আসিয়া ঋষিরাই একদা প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ততঃ কিম? এই প্রশ্নই তাঁহাদের আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত করায়। তাঁহারা বাস্তব-জগত হইতে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করিলেন। এই অধ্যাত্ম-অনুশীলনের প্রত্যক্ষজাত ফল ষড়্‌দর্শন।

মতভেদ আছে এবং থাকিবেও। যেমন বৈজ্ঞানিক প্ল্যাঙ্ক বলিয়াছেন, চৈতন্য হইতে জড়ের উৎপত্তি। আবার অন্য বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, জড় হইতেই চৈতন্যের জন্ম হইয়াছে। যাহা হউক, জড় আগে, না চৈতন্য আগে, এই দুরূহ প্রশ্নের মধ্যে না গিয়া বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনের উক্তিই ধরা যাক। তিনি বলিয়াছেন, "আত্মিক দৃষ্টিই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির জন্মদাতা।"

যদি তাহাই সত্য হয়, তবে দর্শনকেই প্রাধান্য দেওয়ায় আপত্তি কোথায়? আসল কথা, উভয়ই মূলতঃ একই প্রজ্ঞার দুই প্রকাশ। উভয়ের সার্থকতা পরস্পর-নির্ভর। দর্শনের পুনর্গঠন ছাড়া বৈজ্ঞানিকী ভাবনার পুনর্গঠন সার্থক হইতে পারে না। এইজন্যই, এ কথা জোর করিয়া বলা চলে, কেহ কাহাকেও বাদ দিয়া নয়। বৈজ্ঞানিক সত্যের রহস্য ভেদ করিতে হইলে, মানুষের দার্শনিক প্রত্যয়ে বলিষ্ঠ হইতেই হইবে।

কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দিগদর্শনও বদলাইয়া যাইতেছে। সেইজন্য কোন উন্নতিরই সমাপ্তি-রেখা বলিয়া কিছু নাই—বিজ্ঞানেরও নাই, দর্শনেরও নাই। আজ বিজ্ঞান মানবতার অভিশাপ হইতে সরিয়া আসিতে পারিতেছে না, আবার দর্শন সম্বন্ধে সেই একই অভিযোগ করা যায়, সে মানুষকে সেই-মন-গঠনের উপযোগী প্রত্যয়ই বা দিতে পারিতেছে কই?

এই পরিবর্ত্তন যিনি আনিতে পারিবেন—কি বিজ্ঞানের দিক দিয়া, কি দর্শনের দিক দিয়া তিনিই হইবেন জগতের বন্ধু।

গ-স

সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা

ভারতে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সূচনা করে, যদিও আপাতদৃষ্টিতে ইহার সাফল্য তেমন পরিলক্ষিত হয় না। এই পরিকল্পনাকে বটবৃক্ষের সহিত তুলনা করা হয়, যাহার আশু কোন উপকারিতা হয়ত নাই, কিন্তু দূর ভবিষ্যতে যাহার সুশীতল কায়ায় লোকে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। ইহার ভবিষ্যৎ সাফল্য সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ এখনও তেমন সুনিশ্চিত হইতে পারেন নাই। তাই তাঁহারা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কারিগরী সাহায্য-সংস্থাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত দেওয়ার জন্য। সেই অনুসারে এই সংস্থার পক্ষ হইতে ভারতে একটি কমিটি আসে এবং এই কমিটি রিপোর্ট সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে।

কমিটি তাহাদের রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, ভারতের সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা বিংশ শতাব্দীর একটি বৈশিষ্ট্যমূলক পরীক্ষা এবং ইহার ফলাফলের উপর বিশ্বব্যাপী কৌতূহল জাগ্রত হইয়াছে, কারণ ভারতবর্ষে যে বৃহদাকারে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে, পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে তাহা হয় নাই। এই আন্তর্জ্জাতিক কমিশনকে অনুরোধ করা হইয়াছিল যে, সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা, সামগ্রিক উন্নয়নের প্রতি ইহার প্রভাব, গ্রাম্য মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইহার অবদান, এবং বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ইহার সাফল্য প্রভৃতি নির্দ্ধারণ করিবার জন্য।

গ্রাম্যজীবনের পরিবর্ত্তন সাধন সহজসাধ্য নয় কারণ অতীতের ঐতিহ্য এখনও দৃঢ়ভাবে বলবৎ আছে এবং ইহার প্রভাব অতীব বিস্তৃত। দুইটি পুরানো প্রথা, যথা, ভূমিপ্রথা এবং জাতিপ্রথা, অত্যন্ত রক্ষণশীল এবং ইহারা পরিবর্ত্তনের পরিপন্থী। বাধ্যতামূলক ব্যবস্থার দ্বারা পরিবর্ত্তন সাধন করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা উচিত হইবে না বলিয়া কমিশন অভিমত প্রকাশ করিয়াছে।

এই বিষয়ে ভারতবর্ষ যে নীতি গ্রহণ করিয়াছে তাহার সমর্থন এই আন্তর্জ্জাতিক কমিশন করেন। ভারতবর্ষের নীতি হইতেছে যে, স্থানীয় উদ্যোগে ও ইচ্ছাজাত সহযোগিতার দ্বারা সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করা। কর্ত্তৃপক্ষ বর্ত্তমানে যে পরিপূরক অর্থসাহায্য দিতেছেন সে সম্বন্ধে কমিশন সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহাতে পরিকল্পনাটির সমূহ রূপই বহুল পরিমাণে প্রভাবান্বিত হয় এবং অর্থব্যয়ের মাপকাঠিতে উন্নয়নের মাপকাঠি বিচার করা হয়, যদিও বাস্তবিক অগ্রগতি সেই পরিমাণে হয় না।

কমিশন কৃষি-উন্নয়নের প্রতি জোর দিয়াছেন এবং মনে করেন যে, সমাজ উন্নয়নের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত কৃষির উন্নয়ন ও বিস্তৃতি। কিন্তু বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত দেখা যায় যে, রাস্তা নির্ম্মাণ, কূপ খনন এবং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিকেই অধিকতর নজর দেওয়া হইয়াছে এবং এই কার্য্যগুলি সাধারণতঃ জেলা বোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটি সম্পন্ন করে। সুতরাং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-সংস্থা ও সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রায় একই কাজে লিপ্ত আছে, ফলে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার সত্যিকার কৃতিত্ব পরিস্ফুট হইতেছে না। সেই কারণে এই আন্তর্জ্জাতিক কমিশন যথার্থই বলিয়াছেন

যে, গ্রাম্য কৃষি-উন্নয়নই সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান কার্য্য হওয়া উচিত, সেই উদ্দেশ্যে সেচ-ব্যবস্থার বিস্তৃতির জন্য অর্থ এবং লোক নিয়োগের প্রয়োজন এবং বর্ত্তমানে পতিত জমিকে কৃষির আওতায় আনিতে হইবে। কমিশন মনে করেন যে, একটি "জরুরী কার্য্যকরী সঙ্ঘ" সৃষ্টি করা প্রয়োজন। গ্রাম্য কর্ম্মীবৃন্দ লইয়া এই দল গঠিত হইবে এবং গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রয়োজন অনুসারে এই দল ভ্রমণ করিবে, এইরূপ শ্রমিক দল গঠন করিলে পতিত জমিতে দ্রুত চাষ-আবাদ সম্ভব হইবে এবং সেচ-কার্য্যও বিস্তৃতি লাভ করিবে।

তৃতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় কৃষির উপর অবশ্যই জোর দেওয়া হইবে, কারণ, আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি যে রূপ পরিগ্রহণ করিতেছে তাহাতে খাদ্যশস্য উৎপাদনে ভারতবর্ষকে স্বাবলম্বী হইতে হইবে। কৃষি-উৎপাদনে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার সাহায্য বিশেষ ভাবে প্রয়োজন কারণ কেবলমাত্র এই পরিকল্পনার দ্বারাই গ্রাম্য অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্ত্তন সাধন সম্ভবপর। সমবায়-ব্যবস্থা একক ভাবে এতদিন কোনও সফলতা অর্জ্জন করিতে পারে নাই, এবং পঞ্চায়েতের যে কাঠামো প্রচলিত হইতে যাইতেছে তাহারও তেমন কার্য্যকারিতা থাকিবে না যদি না সমগ্র গ্রাম্য জনসাধারণকে তাহাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সজাগ এবং প্রণোদিত করা হয়।

ভারতের কৃষির উন্নতির জন্য যান্ত্রিক ব্যবস্থা বহু বিশেষজ্ঞ অনুমোদন করিয়াছেন, কিন্তু সবকিছুর মূলে আছে মানুষ। চীন-দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যে দ্রুত প্রগতির পথে চলিয়াছে তাহার প্রধান কারণ যে, সেখানে সমগ্র মানুষকে নূতন আদর্শে উদ্দীপিত করা হইয়াছে, এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে জনসাধারণকে নূতন আদর্শে উদ্বোধিত করা না হইতেছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কেবলমাত্র আমলাতান্ত্রিক প্রচেষ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে। ভারতবর্ষে সমবায়প্রথা কিংবা পঞ্চায়েতপ্রথা আশানুরূপ সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই কারণ জনগণের সহজ সাবলীল উদ্দীপনার ও সহযোগিতার অভাব আছে বলিয়া। ভারতবর্ষে আজ প্রয়োজন গণচেতনার জাগরণ এবং সেই কারণে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনাকে নূতন ভাবে কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে হইবে, অর্থাৎ, সমবায়প্রথা ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা সংস্থার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে সমবায় ব্যবস্থা ব্যতীত সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা বিশেষ অগ্রসর হইতে পারিবে না। সেই কারণে প্রয়োজন যে, সমবায় ব্যবস্থা, বিশেষতঃ সমবায় ক্রয়-বিক্রয় এবং সমবায়ের ভিত্তিতে যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রয়োজন। ন-র

ভারত-চীন সীমানা বিরোধ

ভারত ও চীনের মধ্যে উত্তরের সীমানা লইয়া যে বিরোধ শুরু হইয়াছে তাহার জন্য ভারতবর্ষই প্রধানতঃ দায়ী, দায়ী তাহার তথাকথিত পঞ্চশীল, দায়ী তাহার উদারতা (অথবা দুর্ব্বলতা) এবং নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে উদাসীনতা। যে পঞ্চশীল নীতির ভিত্তির উপর ১৯৫৪ সনে ভারত-চীন চুক্তি হয়, চীন কর্ত্তৃক ভারতীয় উত্তর সীমান্তের কিছু অংশ দখলের ফলে আজ সে নীতি ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, আন্তর্জ্জাতিক কূটনৈতিক চালে ভারতবর্ষ এখনও অনভিজ্ঞ এবং অপটু। প্রথমতঃ, চীন কর্ত্তৃক তিব্বত দখল ব্যাপারকে স্বীকার করিয়া লওয়া ভারতের পক্ষে অত্যন্ত দুর্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হইয়াছে। ভারত ও চীনের মধ্যে স্বাধীন তিব্বতের অবস্থিতি অবশ্য প্রয়োজন, এবং চীন কর্ত্তৃক ১৯৫১ সনে পরাধীন হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, অর্থাৎ, ১৯১২ সন হইতে তিব্বত নিজস্ব স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া আসিতেছিল।

বর্ত্তমান চীন অতীতের চেঙ্গিসখানী সাম্রাজ্যবাদী আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত, এবং সাম্রাজ্য বিস্তারে সে আজ বদ্ধপরিকর। এই দূরদৃষ্টি ভারতের থাকা উচিত ছিল এবং যদি থাকিত তাহা হইলে বর্ত্তমান পরিস্থিতি যাহা উঠিয়াছে তাহা ভারতবর্ষ সময় থাকিতে প্রতিরোধ করিতে পারিত। চীনকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য ভারতবর্ষ চীনের সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষার নিকট তিব্বতকে প্রায় বলিদান দিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য তিব্বতের ব্যাপার লইয়া চীনের সহিত যুদ্ধ করিবার কথা আসে না, কিন্তু ভারতবর্ষ যদি নৈতিক সমর্থক না দিত এবং তিব্বত দখলকে যদি কূটনৈতিক পর্য্যায়ে অস্বীকার করিত তাহা হইলে বিশ্বের বহু দেশের সমর্থন ভারতবর্ষ লাভ করিত এবং তিব্বতের স্বাধীন অবস্থা ভবিষ্যতে ফিরিয়া পাইবার সম্ভাবনা ছিল। তিব্বতের স্বাধীনতা অপহরণের ব্যাপারে ভারতবর্ষ চীনকে শুধু নৈতিক সমর্থন দেয় নাই, সেই সঙ্গে নিজের নতুন বিপদের চিরন্তন গোড়াপত্তনও করিয়া রাখিয়াছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের সমস্ত পরাধীন জাতির স্বাধীনতার জন্য প্রচেষ্টা করেন, কিন্তু তিব্বতের ব্যাপারে যে ভুল করিয়াছেন তাহা অমার্জ্জনীয়। আজ একদিকে পাকিস্থান, অন্যদিকে চীন, এই দুইটি দেশের সহিত সীমান্ত রক্ষার জন্য ভারতবর্ষের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্যকে নিয়োজিত রাখিতে হইবে এবং অর্থনৈতিক কাঠামোকেও যুদ্ধের পর্য্যায়ে রক্ষা করিতে হইবে। ভারতের শান্তিকামী মনোবৃত্তি দুর্ব্বলতার সামিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতের এই দুর্ব্বলতার সাহায্য গত আট নয় বৎসর ধরিয়া চীন লইয়াছে এবং নিজেকে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত করিয়া ভারতের উত্তর সীমান্তে আঘাত হানিয়াছে, শুধু তাহাই নহে, নিজেকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা করিয়াছে যেখান হইতে আজ তাহাকে হটানো মুস্কিল, কারণ চীন যুদ্ধে পরাজিত না হওয়া পর্য্যন্ত হটিতে রাজী হইবে না এবং চীনের সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেই বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনা, এই অবস্থায় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র কিংবা রাশিয়া কেহই প্রত্যক্ষভাবে চীনের বিরুদ্ধে ভারতের পক্ষ অবলম্বন করিতে রাজী হইবে না। সুতরাং এ বিষয়ে ভারতের চিঠি লেখালেখির উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন যে, ভারতের যে সকল অংশ চীন

দখল করিয়াছে তাহার পুনরুদ্ধারের জন্য ভারতবর্ষ যুদ্ধ করিবে না, আলোচনা করিয়া যাইবে এবং প্রয়োজন হইলে অনিশ্চিতকালের জন্য সে আলোচনা চালাইয়া যাইবে, অবশ্য তাহার ফলাফল অনিশ্চিত। যেমন কাশ্মীরের ব্যাপার লইয়া ভারতবর্ষ পাকিস্থানের সহিত গত ১৪ বৎসর ধরিয়া বুঝাপড়া করিতেছে। কাশ্মীরের ব্যাপারে যদিও বুঝাপড়ার আর বাকী কিছু নাই, অর্থাৎ কাশ্মীরের ভাগ্য সুনিশ্চিত হইয়া আছে—ভারতবর্ষের মধ্যে যে অংশ আছে তাহা ভারতবর্ষের এবং পাকিস্থান যে অংশ জোর করিয়া দখল করিয়া লইয়াছে তাহা পাকিস্থানের অধীনেই থাকিবে। যাত্রাদলের রাজার মত ভারতবর্ষ যতকাল ইচ্ছা গলাবাজী করিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কাশ্মীরের বাকী অংশটুকু ফিরিয়া আসিবে না। যদি ভারতবর্ষ প্রথমেই পাকিস্থানকে সামরিক শক্তির দ্বারা হটাইয়া দিতে পারিত তাহা হইলে অবশ্য সমস্ত কাশ্মীরই আজ ভারতবর্ষের থাকিত।

সেইরূপ লাদাকের যে অংশ বর্ত্তমানে চীন জোর-জবরদস্তি করিয়া দখল করিয়া লইয়াছে তাহা চীনেরই থাকিবে, সে সম্বন্ধে ভারতবর্ষ যতই চীৎকার করুক তাহাতে চীনের কিছু হইবে না। ১৯৫২ সন হইতেই চীন তিব্বতের বিভিন্ন এলাকায় রাস্তা, পথঘাট তৈয়ারী করা সুরু করিয়া দিয়াছিল এবং সেই সকল রাস্তা বর্ত্তমানে চীন ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত এবং কোন কোনও স্থানে ভারতের অভ্যন্তর পর্যন্ত টানিয়া আনিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, চীন আজ ভারতের সমগ্র উত্তর সীমান্তব্যাপী সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে, এবং প্রয়োজন হইলে যে কোন সময়ে ভুটান, সিকিম ও নেফা এলাকায় সৈন্য চালনা করিয়া দিতে পারে। আজ লাদাকের অংশ দখলের ফলে চীনের সিংকিয়াং প্রদেশ ও দক্ষিণ তিব্বতের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে এবং এই সুবিধা চীন সহজে ছাড়িয়া দিবে বলিয়া মনে হয় না, কারণ চীন যেহেতু এখন ম্যাকমোহন লাইনকে অস্বীকার করিতেছে। আশ্চর্য্য এই যে, যদিও সরকারী ইতিবৃত্তে দেখানো হইয়াছে যে, গত তিন হাজার বৎসর ধরিয়া লাদাক ভারতের অংশ হিসাবে আছে, কিন্তু তাহাকে রক্ষার জন্য একটি ভারতীয় সৈন্যও সেখানে ছিল না।

ন-র

বিশ্বভারতীর সমাবর্ত্তনে শ্রীনেহরু

বিশ্বভারতীর আচার্য্য শ্রীনেহরু তাহার সমাবর্ত্তন উপলক্ষে যে কয়টি কথা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, "বিশ্বভারতী ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মত নয়। বিশ্বভারতীতে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে যেখানে সর্ব্বোত্তম পদ্ধতিতে ছাত্র-ছাত্রী গঠিত হয়। শিক্ষক ও ছাত্রদের পারস্পরিক সম্পর্কই শিক্ষার ভিত্তি। শিক্ষকের বক্তৃতা অপেক্ষাও এই পারস্পরিক সৌহার্দ্দ্যের সম্পর্কই জীবন-গঠনে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। দেশে গ্রাজুয়েটের প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু শান্তিনিকেতনে এমন শিক্ষা দেওয়া হয়, যাহাতে ব্যক্তিসত্তা যেন জনতার মধ্যে নিজেকে হারাইয়া না ফেলে। বিশ্বভারতীর ইহাই প্রধান লক্ষ্য। প্রকৃতির সান্নিধ্যে থাকিয়া শিক্ষালাভ—ইহাই গুরুদেবের আদর্শ ছিল। পাশ্চাত্ত্য জগতে ইহা নাই। এই ব্যর্থতার জন্য ব্যক্তিবিশেষ ও দেশের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। শান্তিনিকেতনে দুইটি ধারা বর্ত্তমান। একটি বিশ্বভারতীর মৌলিক আদর্শ, অন্যটি যুগের ধারা। যুগের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন প্রতিষ্ঠান বাঁচিতে পারে না। বিচ্ছিন্ন থাকিবার চেষ্টা করিলে উহা শ্রেণীবিশেষের প্রতিষ্ঠান হইয়া পড়িবে। এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে প্রত্যেককে নূতন কিছু যোগ করিতে হইবে; কিন্তু মূল আদর্শকে ভুলিলে চলিবে না।"

শ্রীনেহরু আর একটি কথা বলিয়াছেন, যাহার গুরুত্ব বর্ত্তমান যুগে সকলেরই উপলব্ধি করা উচিত। তিনি বলিয়াছেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া প্রভৃতি দেশে শ্রমের মর্য্যাদা আছে। কোন পরিশ্রমের কাজই যে ক্ষুদ্র নহে, তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লক্ষপতির পুত্রকেও পরিশ্রম করিতে হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে সময়ের পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও মনে করা হয় যে, শ্রম মানুষের মর্য্যাদা লাঘব করে।" বাগানের কাজ, কৃষিজাত যে কোন দ্রব্য উৎপাদনের কাজ, গৃহের বা কিছু তৈয়ার করার যে কোন কাজ—যাহাতে শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় এবং শরীর ও মন সুস্থ, সবল থাকে, লেখাপড়া ছাড়াও তাহা করিবার জন্য তিনি ছাত্রদিগকে বিশেষভাবে অবহিত হইতে বলেন। ধনী হউক, নির্ধন হউক প্রত্যেকেরই যে শ্রমের কিছু কাজে ছেলেবেলা হইতেই অভ্যস্ত হইবার প্রয়োজন আছে এবং প্রত্যেকের পক্ষেই যে উহা বাধ্যতামূলক বা আবশ্যিক হওয়া উচিত, তাহা যেন কেহই না ভুলেন।

শ্রীনেহরু যে বিশ্বভারতীকে একখানি স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছেন তাহাতে কবিগুরুর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাই প্রকাশ পাইয়াছে। একথা বলাই বাহুল্য, বিশ্বভারতী আপন বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। গুরুদেবের আশা ও আদর্শের সার্থকতা ঐখানেই। কিন্তু এই আদর্শ কি সর্ব্বত্র রক্ষা করা যায় না?

গ-স

নিঃ ভাঃ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী

সম্প্রতি বাঙ্গালোরে নিঃ ভাঃ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন হইয়া গেল। এই সম্মেলনে মূল সভাপতি শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী একটি মূল্যবান কথা বলিয়াছেন। আমরা তাঁহার ভাষণের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তিনি বলিয়াছেন, "বিষয়বস্তুর সম্পর্কে অধুনাতম বাংলা-সাহিত্যে দুটো বিষয়ের অভাব চোখে পড়ে। আমি তথ্য-সাহিত্যের কোন অভাবের কথা বলছিনে। আমি বলছি সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের কথা। প্রথম বাংলায় দেশের স্বাধীনতা লাভ নিয়ে অথবা স্বাধীনতা লাভের পরবর্ত্তী জাতিমানস নিয়ে কোন সাহিত্য রচিত হয়নি। অথচ ভারতের স্বাধীনতা লাভ

একটা যুগান্তকারী ব্যাপার। আশ্চর্য্য যে, এই দাসত্বমোচনের উল্লাস সাহিত্যে প্রকাশ পেল না।

"এর কারণ এই হওয়া অসম্ভব নয় যে, দেশের সাধারণ মানুষ স্বাধীনতা লাভের মধ্যে মুক্তির আস্বাদ পায় নি—তার কাছে স্বাধীনতা লাভটা শুধু বিদেশীদের কাছ থেকে কয়েকজন স্বদেশীয়ের নিকট সরকারী দপ্তরখানাটা হস্তান্তরের ব্যাপার—সে নিজে এমন কিছু পায়নি যা তার অন্তর স্পর্শ করতে পারে, বরং তার ব্যক্তি-স্বাধীনতা রাষ্ট্রের শাসনে দিন দিন খর্ব্ব হতে খর্ব্বতর হচ্ছে। কিন্তু দেশবিভাগ এবং অগণিত মানুষের জন্মভূমি থেকে চিরনির্ব্বাসনের বেলায় ত সেকথা খাটে না। বাঙালী স্বাধীনতার আনন্দ অনুভব না করুক, দেশবিভাগের নিদারুণ দুঃখটা পেয়েছে। অথচ লক্ষ লক্ষ মানুষের চিরদিনের বাসভূমি অনিচ্ছায় ত্যাগের করুণতা, তাদের আশ্রয়লাভের অনিশ্চিত আশায় দেশান্তরে দুঃখযাত্রা অপরিচিত বিদেশে পশুবৎ অধম অবস্থায় অসহনীয় কষ্টের নিরুপায় জীবন এবং জীবনে যা কিছু প্রিয় ছিল সবকিছুর নিঃশেষ ধ্বংস—এই মহা সর্ব্বনাশের কাহিনী বাংলা-সাহিত্যে রচিত হ'ল না কেন? দু' একজন দেশচ্যুত মানুষের পরবর্ত্তী জীবনের দুঃখকষ্ট নিয়ে সামান্য কিছু লেখা হয়েছে দেখেছি, কিন্তু দেশবিভাগের সমগ্র দুঃখটার রূপ দিতে কেউ চেষ্টা করেন নি। আমি এখনও আশা করি যে, কোন শক্তিধর সাহিত্যিক এই সর্ব্বনাশা মহাবিপ্লব নিয়ে সাহিত্য রচনা করবার প্রেরণা পাবেন।

"বিষয়বস্তুর পরে রূপ এবং রূপের কথায় প্রথম কথা ভাষার। আমার যেন মনে হয় যে, বর্ত্তমান সাহিত্যিকেরা ভাষার লাবণ্য সম্বন্ধেও নিরাসক্ত। ইচ্ছা করলে যে, এই লেখকেরা তাঁদের ভাষাকে ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত করতে পারেন না এমন নয়, তবে তা তাঁরা করেন না। নিজের বিশিষ্ট রূপটি রক্ষা করে ঐসব বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে অবশেষে বাংলা এমন একটা অপরূপ ভাষা হয়ে উঠেছিল যে, পৃথিবীর কোন ভাষাই বোধহয় সৌন্দর্য্যে, শক্তিতে, প্রকাশক্ষমতায়, ব্যঞ্জনায় এবং তীক্ষ্ণতায় তাকে অতিক্রম করে যেতে পারত না। কিন্তু আজ আমরা ঐ অপূর্ব্ব সম্পদটাকে স্বেচ্ছায় বিনষ্ট করতে বসেছি কেন? কর্ত্তৃপদ, কর্ম্মপদ এবং সম্বন্ধপদকে সবলে বাক্যের শেষপ্রান্তে ঠেলে দিচ্ছি, অন্যান্য পদগুলিও যদৃচ্ছা ওলট-পালট করছি এবং বাক্যের সুঠাম ঋজু মূর্ত্তিটাকে অষ্টবক্র মূর্ত্তিতে পরিণত করে ও তার গতির তালটাকে বেতাল ঢুকিয়ে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে পরম আনন্দ অনুভব করছি। তবে একথার উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে যে, আজ যদি সাহিত্য সংবাদধর্ম্মী এবং চিত্রসর্ব্বস্ব হয়ে উঠে থাকে তার একটা কারণ বোধ হয়, একটা নূতন শ্রেণীর পাঠকসমাজের অভ্যুদয়। শিক্ষার প্রসারের ফলে পাঠক্ষম লোকের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এমন একটা পাঠকশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছে, যারা প্রকৃতপক্ষে অর্দ্ধ-শিক্ষিত। কোন দেশের সাহিত্যপাঠকদের অধিকাংশ যদি এই শ্রেণীর মানুষ হয়, তবে সে দেশের সাহিত্যের উন্নত মানরক্ষা কঠিন হয়ে পড়ে। তবে যেখানে পাঠকসমাজের রুচি মার্জ্জিত নয় এবং রসবোধশক্তির দীনতা গভীর, সেখানে সকলের পক্ষে আদর্শ রক্ষা করা কঠিন। সাহিত্যিককেও ত বাঁচতে হবে। কিন্তু তবু এই কামনা করব যে, সাহিত্যিকেরা শুধু গল্পই বলবেন না বা শুধু চিত্রই আঁকবেন না, বাস্তবকে অন্তরের রস দিয়ে নিষিক্ত করে জীবনের মহিমাও প্রকাশ করবেন।

"এ কথাটা যে এত বিশেষ করে বলছি তার কারণ যে, সাহিত্যিকের দায়িত্ব অপরিসীম। মানুষকে নিত্যসত্যের সন্ধান দিতে, তাকে জীবনের গৌরবে বিশ্বাস দিতে, তার মানসলোকে জ্যোতির্ম্ময় আদর্শের আলো জ্বালিয়ে রাখতে এবং তার হৃদয়কে কল্যাণের অভিমুখী করতে একমাত্র সাহিত্যই পারে। আবার সে মানুষকে বিভ্রান্তও করতে পারে। তাঁর দায়িত্ব সমসাময়িক মানুষের মন চালিত করবার গুরুভার গ্রহণ করা এবং সৃষ্টিধর্ম্মী সাহিত্যের মাধ্যমে সেই মনকে সত্যের পথে, শান্তির পথে, কল্যাণের পথে চালিত করা। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সাহিত্যের সেই মহৎ দায়িত্ব মহত্তর হয়ে উঠেছে। আজ এই যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে মানুষের মনের অবস্থা আর সহজ নেই। পুরাতন সব আদর্শ আজ তার কাছে মিথ্যা হয়ে গেছে, মনের তার কোন আশ্রয় নেই, অন্তরে আজ সে হৃতসর্ব্বস্ব, নিতান্ত কাঙাল। পৃথিবী আজ সেই অস্থির দিশাহারা মানুষের পৃথিবী। সে মানুষকেও দুই মন্দিরের পূজারী-পাণ্ডারা দুই দিক থেকে টানাটানি করছে—একদল চায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, অন্যদল চায় রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌমত্ব। এই দুই দলের বিরোধে সমগ্র মানবসমাজ দ্বিধা হয়ে গেছে।...

"আজ পৃথিবী জুড়ে যেন সমুদ্রমন্থন চলেছে—সেই বিমথিত জলধির ঘূর্ণিত অতল থেকে বাংলার সাহিত্যিকেরা অমৃতভাণ্ডহস্তা লক্ষ্মীকে আবাহন করে তুলুন—সেই অমৃতের পুণ্যপ্রভাবে বাসুকীর বিষ-শ্বাসের গরল দূর হয়ে গিয়ে পৃথিবীর বায়ু নির্ম্মল হোক—মানুষের অতৃপ্তি যাক, জ্বালা জুড়াক—আবির্ভূত হোক নিত্যকালের শান্ত শিব সুন্দর।"

গ-স

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্ত্তন

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় অতি অল্পদিন প্রতিষ্ঠিত হইলেও প্রয়োজনের দিক দিয়া ইহার গুরুত্ব সমধিক। সেদিনও দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তাহার ত্রুটি ছিল অনেক। সেই ত্রুটি-বাহুল্যের মধ্যে যেটি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পুরোধাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল তাহা আধুনিক বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যা-শিক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব। বিজ্ঞান-সাধনায় সেদিন বাঙালী তথা ভারতবাসী ছিল অপাংক্তেয়। এই কলঙ্ক-মোচনই ছিল জাতীয় শিক্ষা পরিষদের বিশেষ লক্ষ্য। নবজাগ্রত ভারতে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গল টেক্নিক্যাল ইনষ্টিটিউট' শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নবযুগের সৃষ্টি করিয়াছিল। যাদবপুর স্বদেশীযুগের সেই ক্ষুদ্র অঙ্কুরজাত বৃক্ষের পরিণত ফল। বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্য্যাদা লাভ

করিয়াছে যাদবপুর মাত্র চার বৎসর আগে। কিন্তু ঠিক মামুলি ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে যাদবপুর গড়িয়া উঠে নাই। তাহার ধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার উপর প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে এখানে। এবং এ উদ্দেশ্যও ইহার ছিল, কেবল স্নাতক উৎপাদনের যন্ত্র হইয়াই সে থাকিবে না। তাই দেখি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে যাদবপুর একটা বিশেষ মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে এই স্বল্পকালের মধ্যে। দেশের আর্থিক পুনর্গঠনের জন্য যে বিরাট প্রয়াস চলিয়াছে, তাহার জন্য প্রয়োজন বাস্তুকার ও যন্ত্রবিদের দল—যাহারা কলকারখানা গড়িয়া ও চালাইয়া দেশের সমৃদ্ধির স্বপ্ন সার্থক করিয়া তুলিবে। কি শিল্প, কি কৃষি কোনও কিছুরই উন্নতি আশানুরূপ হইতে পারে না যদি নাকি কুশলী কর্ম্মীর অভাব না দূর হয়। কারিগরী শিক্ষার দিকে তাই দৃষ্টি না দিয়া আর উপায় নাই। কারিগরী বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্রে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। কিন্তু যে আদর্শ রূপায়িত হইয়াছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহা কি সার্থকতার উপকূলে উত্তীর্ণ হইয়াছে যাদবপুরে ও তাহার সগোত্র অন্যান্য বিদ্যায়তনে? এই সংশয় দ্বিধাগ্রস্ত করিয়াছে অনেককেই। কারিগরী বিদ্যায় যাঁহারা নৈপুণ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও বেকারির প্রকাশ দেখিয়া রাজেন্দ্রপ্রসাদ উদ্বিগ্ন হইয়াছেন ও সে উদ্বেগ তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে।

দেশ যখন এক বৃহৎ কর্ম্মযজ্ঞে ব্রতী হইয়াছে—যাহার সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করিবে কারিগরী বিদ্যায় অভিজ্ঞ কর্ম্মীদের উপর তখন তাহাদের মধ্যে কর্ম্মের অভাব হয় কি কারণে আমরা বুঝিতে অক্ষম। স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠিবে, এই বিচিত্র ব্যাপারের নিগূঢ় রহস্যটা কি? আমাদের দেশে সত্যই কি কারিগরী বিদ্যার সমাদর নাই? আর তাহা যদি না থাকে তাহা হইলে এত অর্থ ব্যয় করিয়া, এত কষ্ট করিয়া নূতন নূতন সেই সব বিদ্যা-কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্য কি? সাধারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য না হয় মনের প্রসার—সে ক্ষেত্রে শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের মধ্যে বেকারি দেখা দিলেও, শিক্ষা-সঙ্কোচের প্রশ্ন উঠিতে পারে না। কিন্তু কারিগরী শিক্ষার সার্থকতা ব্যবহারিক প্রয়োগে। যে সে-শিক্ষা পাইয়াছে, তাহার যদি কর্ম্ম সংস্থান না হয় তাহা হইলে সে-শিক্ষার বাস্তব মূল্য কতটুকু?

এই সব দেখিয়া মনে হয়, কারিগরী বিদ্যার পদ্ধতি বা রীতির মধ্যেই গলদ আছে। কারিগরী বিদ্যার প্রসার নিশ্চয়ই দরকার, কিন্তু তাহা হাতে-কলমে কাজ করিয়া কলকারখানা চালাইবার জন্য, চেয়ারে বসিয়া হুকুম দিবার জন্য নয়। এই বোধ তাহাদের জাগাইতে হইবে। গলদ হইয়াছে ঐ দিক দিয়াই।

গ-স

গণতন্ত্র আজ কোন্ পথে ?

গণতান্ত্রিক শব্দের অর্থ প্রত্যেক দেশেই সমান। সুতরাং ভারতীয় গণতন্ত্রকে যদি দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে হয়, তবে সর্ব্বপ্রথম উহাকে দুর্নীতিমুক্ত রাখিয়া, জনমনের আস্থা অর্জ্জনে যত্নবান হইতে হইবে। যদি কাহারও বিরুদ্ধে মিথ্যা কারণেও জনসাধারণের মন বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, তবে তাহা ক্ষমতার ঔদ্ধত্যে উপেক্ষা করিয়া নহে, যথোচিত ধীরতার সঙ্গে যুক্তি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াই তাহাদিগকে ঠাণ্ডা করিতে হইবে। কিন্তু শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের, বিশেষতঃ উচ্চপদাধিকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ খণ্ডনে যথেষ্ট ধীরতার পরিচয় দেওয়া হয়, ইহা এ দেশের জনসাধারণ প্রায়ই উপলব্ধি করিতে পারে না। বরং তাহারা দেখে, জনমতের চাপে উচ্চপদাধিকারী কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য সরকার কমিশন গঠন করিলেও, কমিশনের সিদ্ধান্ত মনোমত না হইলে প্রধানমন্ত্রী পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠেন। কিছুদিন পূর্ব্বেও প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিম্ন ও মধ্যপদস্থ কর্ম্মচারীদের দুর্নীতি ও অকর্ম্মণ্যতা সম্বন্ধে যেরূপ মুখর হইয়াছিলেন, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের সম্বন্ধে বা প্রয়োজনমত মন্ত্রীদের সম্বন্ধে সেরূপ হইতে পারেন নাই। অথচ উপর-মহল সততা ও নিষ্ঠাসম্পন্ন হইলে যে নিম্নমহলগুলিতে স্বভাবতই সততার পরিবেশ সৃষ্টি হয় তাহা সম্ভবত কেহ অস্বীকার করিবেন না।

অবশ্য দুর্নীতি, অপব্যয় ইত্যাদির প্রতিকারের জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যথেষ্টই আছে। যেমন দেখা যায়, অপব্যয় ও অপচয় নিবারণের জন্য অডিট করাইবার ব্যবস্থা আছে, দুর্নীতি, অনাচার সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য পুলিস আছে, ন্যায়বিচারের জন্য বিচার বিভাগও আছে। কিন্তু এ কথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, অডিটের ফলে সরকারী অপব্যয়, অপচয়—এমনকি দুর্নীতির যে সব দৃষ্টান্ত ধরা পড়ে, তাহার প্রতিকার বা তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন সাধারণত করা হয় না বলিয়াই, জনমন বিরুদ্ধ ধারণা করিয়া বসে। অন্যান্য ব্যবস্থাতেও প্রশাসনিক অবস্থার কোন উন্নতি হইতেছে না বলিয়াই জনগণের বিশ্বাস।

কিন্তু উচ্চ সরকারী মহল সাধারণ মানুষের এই অভিযোগ বা বিক্ষোভ সম্বন্ধে কোন গুরুত্বই দেন না। ইহাও বহুবার দেখা গিয়াছে। সম্প্রতি শ্রীনেহরুর উক্তিতে সেইরূপ তাচ্ছিল্যের ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে।

কিন্তু এবারে সাধারণ মানুষের মুখ হইতে নহে, ভারতের ভূতপূর্ব্ব অর্থমন্ত্রী শ্রীসি. ডি. দেশমুখ অভিযোগ করিয়াছেন একেবারে সরাসরি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ও মন্ত্রী পর্য্যায়ের কয়েক ব্যক্তির বিরুদ্ধেই। একটি উচ্চক্ষমতাবিশিষ্ট ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইলে, তিনি অভিযোক্তা ব্যক্তিদের নাম ও তাঁহাদের বিরুদ্ধে যে সব প্রমাণ আছে, তাহা উপস্থাপিত করিবেন। রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি প্রশাসনিক দুর্নীতি সম্বন্ধে তদন্তের ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে দীর্ঘ পত্রও লিখিয়াছেন। কিন্তু সাংবাদিক বৈঠকে শ্রীনেহরু স্পষ্ট ভাবেই জানাইয়া দিয়াছেন, সেরূপ উচ্চক্ষমতাবিশিষ্ট ট্রাইব্যুনাল গঠনে তিনি রাজী নন। ট্রাইব্যুনাল গঠন না করায়

পক্ষে শ্রীনেহরু যে সব যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে প্রধান কথা হইল, তিনি মনে করেন, এরূপ ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইলে উহার ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে তদন্তের জন্য আর একটি ট্রাইব্যুনাল গঠনের দাবি উত্থাপিত হইবে। ইহা নিতান্তই কাঁচা যুক্তি। জনসাধারণের সম্পূর্ণ আস্থাভাজন ব্যক্তির নিতান্তই অভাব হইয়াছে আমাদের দেশে, সেরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। তবে যদি তিনি মনে করেন, এইরূপ ট্রাইব্যুনালের দ্বারা তদন্ত হইলে, উপর-মহলের অনেক কীর্ত্তি-কাহিনী সর্ব্বসাধারণ্যে ছড়াইয়া পড়িবার সম্ভাবনা আছে, সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু সেরূপ ক্ষেত্রে জনমনের সন্দেহ, সংশয় ও অবিশ্বাস যে আরও ঘনীভূত হওয়ার সুযোগ পাইবে তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রীদেশমুখের উক্তির পরে দেশে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে, ট্রাইব্যুনাল গঠনই তাহা প্রশমনের উপায় বলিয়া মনে করি। শ্রীনেহরু দেশের ও গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া এরূপ ট্রাইব্যুনাল গঠনের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিলে দেশবাসী আশ্বস্ত হইবে। গ-স

পুলিসের কর্ত্তব্য-শৈথিল্য সম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেটের কঠোর মন্তব্য

হ্যারিসন রোডের অধিবাসী এক ব্যক্তি তাঁহার প্রতিবেশী ভাড়াটিয়ার দ্বারা গুরুতরভাবে আহত হইবার সংবাদ জোড়াসাঁকো থানায় পৌঁছিলে, পুলিস তদন্ত কার্য্যে গাফিলতি দেখায়। তখন আহত ব্যক্তির পত্নী ডেপুটি কমিশনারের নিকট এই মর্ম্মে লিখিত অভিযোগ করেন যে, একদিকে তাঁহার স্বামী হাসপাতালে অচৈতন্য অবস্থায় রহিয়াছেন, অন্যদিকে বাড়ীতে অভিযুক্ত ব্যক্তি তাঁহাকে শাসাইতেছে। ম্যাজিষ্ট্রেট মন্তব্য করিয়াছেন, এই অভিযোগের পর ডেপুটি কমিশনারের নির্দ্দেশ পাইয়া জোড়াসাঁকো পুলিস তদন্ত-কার্য্যে প্রকৃত আগ্রহী হইয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে পুলিসের দারুণ শৈথিল্য প্রকাশ পাইয়াছিল। কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম. রায় এই সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন যে, "উচ্চতর পর্য্যায়ে অভিযোগ না পৌঁছান পর্য্যন্ত যিনি কর্ম্মতৎপর হন না, তাঁহার মত কর্ম্মচারীর হাতে মানুষের ধন-প্রাণ কিভাবে নিরাপদ থাকিতে পারে, তাহা আমি ভাবিয়া পাই না।"

এইরূপ আর একটি বিচারে রায় দিতে গিয়া প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীবিজয়েশ মুখার্জ্জি বলিয়াছেন, "পুলিস কর্ত্তৃক পীড়নের অভিযোগ আজকাল কেন এত বাড়িতেছে ভাবিয়া আমি অবাক হই!...সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি এই মর্ম্মে সতর্ক করিয়া দিতে চাই যে, এইরূপ অভিযোগ যদি চলিতে থাকে এবং তাহা প্রমাণ হয়, তাহা হইলে পুলিসের হেফাজত নামক ব্যাপারটার আমি সম্পূর্ণ অবসান ঘটাইব এবং কার্য্যবিধি ও ঐরূপ অন্যান্য বিধান অনুসারে আমার সমস্ত ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া পুলিসের অবাধ্য কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে আইনের বিভীষিকা প্রয়োগ করিব—সে ব্যক্তিরা যেই হউন, আর যে পদেরই অধিকারী হউন না কেন।"

দুইটি মন্তব্যই অত্যন্ত কঠোর এবং স্পষ্ট। কোনও কোনও ব্যাপারে পুলিসের অসাধারণ গাফিলতি, আবার ক্ষেত্রবিশেষে মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহ ব্রিটিশ-আমলেও দেখা গিয়াছে। আজকের এই পুলিসের কর্ত্তব্য-শৈথিল্যের প্রকৃত কারণ সেই ব্রিটিশ-আমলের ঐতিহ্যগত দুর্নীতি। এ ব্যাধি পুরাতন ও জটিল। কোন এক বা একাধিক কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনে ইহার প্রতিকার হইবে না, ইহার জন্য পুলিস-বিভাগকে ঢালিয়া সাজা দরকার। বস্তুতঃ পুলিস যাহাতে ব্রিটিশ আমলের সেই আচরণ ত্যাগ করিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে তদন্ত চালাইতে সমর্থ হয়, সেজন্য তাহাদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষিত করিয়া তোলা আবশ্যক। পরাধীন ভারতে মানুষের প্রাণ ও মানের মূল্য ছিল না। তখন সন্দেহক্রমে যাহাকে-তাহাকে ধরিয়া পুলিস তাহাদের প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছে, আজ তাহাকে সে ব্যবহার করিতে দেওয়া অন্যায়। এই স্বীকারোক্তির নামে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি যে কদর্য্য ব্যবহার পূর্ব্বে করা হইত, আজ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরেও সেই ব্যবস্থাই চালু আছে। ইহারও পরিবর্ত্তন আবশ্যক। পরাধীন আমলের শাসন-ব্যবস্থা আজ যে অচল এবং তাহার যে পরিবর্ত্তন আবশ্যক, সে চেষ্টাও কোন পক্ষ হইতে দেখা যায় না।

গ-স

দামোদরের চতুর্থ বাঁধ উদ্বোধন

দামোদরের আর একটি বাঁধ—পাঞ্চেত বাঁধের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন-কার্য্য এবারে সম্পূর্ণ হইল। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার ইহা চতুর্থ বাঁধ। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে আরও অন্ততঃ দুইটি বাঁধ নির্ম্মাণ করা দরকার, সেকথা অস্বীকার না করিয়াও বলা যায় যে, এই ব্যাপারে যেটুকু কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার গুরুত্বও বড় সামান্য নহে। বাঁধের উদ্বোধন কাজ ভারতের প্রধানমন্ত্রীর দ্বারাই যদিও সম্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু দেশের সেবায় এই বাঁধকে উৎসর্গ করিয়া দিবার জন্য যাঁহার ডাক পড়িয়াছে—শুনিলে আশ্চর্য্য লাগে, তিনি কোনও বিখ্যাত নেতা বা নেত্রী নহেন, সামান্য একজন নারী-শ্রমিক মাত্র।

গান্ধীজী একবার বলিয়াছিলেন, স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতির পদে তিনি একজন ভাঙ্গীকে দেখিতে চান, তাঁহার কথার সরলার্থই হইল ভেদাভেদের সকল প্রশ্নই তুলিয়া দিতে চান। আজ পাঞ্চেত বাঁধের জলধারায় যেন ভেদাভেদের সেই অভিশাপটিরই আজ বিসর্জ্জন ঘটিল। সামান্য একজন নারী-কর্ম্মীকে এক অসামান্য সম্মান দিয়া যেন এই সত্যটাকেই আবার স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইল যে, এ দেশ গণতান্ত্রিক, জাতিবর্ণ অথবা সামাজিক প্রতিষ্ঠা নহে। শ্রমের মর্য্যাদা এবং মনুষ্যত্বকেই এ দেশে বড় করিয়া দেখা হইবে।

প্রসঙ্গত তবু একটি কথা বলিতে হইতেছে, বাঁধ সম্পূর্ণ করিবার পূর্ব্বে নদী-পথকে মুক্ত আমাদের করিতেই হইবে। ভুল যাহা হইবার হইয়াছে, দ্বিতীয়বার আমরা যেন ভুল না করি। গ-স

পাকিস্থানের সহিত নূতন বাণিজ্য-চুক্তি

খবর পাওয়া গেল, পাকিস্থানের সহিত ভারতের আর একটি নূতন বাণিজ্য-চুক্তি সম্পন্ন হইয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে ভারত পাকিস্থান হইতে তুলা, ফল, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি ক্রয় করিবে এবং পাকিস্থান ভারত হইতে ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য, কল ও চামড়া ক্রয় করিবে। এইভাবে উভয় দেশের মধ্যে মোট দুই কোটি টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদান হইবে। ইহাতে আরও স্থির হইয়াছে, রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য উভয় দেশের টাকার হিসাবে গ্রহণ করা চলিবে। অর্থাৎ উভয়কেই সমপরিমাণ টাকার পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে হইবে। যদিও ইহার গুরুত্ব বিশেষ কিছু নাই, কারণ ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে বাণিজ্যের যে বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহার তুলনায় ইহা কতটুকু? তবে এতদিন যে কারণেই হউক এই পরস্পর আদান-প্রদানের পথ যাহা বন্ধ ছিল, এই চুক্তিতে তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিল। ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে খালের জল লইয়া যে বিরোধ তাহারও একটা মীমাংসা প্রায় হইয়াছে। দেনা-পাওনার আলোচনাও চলিতেছে। আশা করা যায়, কাশ্মীর এবং উভয় দেশের পরিত্যক্ত সম্পত্তিরও এবারে একটা কিনারা হইবে। ঐ সঙ্গে পাসপোর্ট ও ভিসার কড়াকড়ি যাহাতে তুলিয়া লওয়া হয় তাহার চেষ্টা অবিলম্বে করা উচিত। উভয় দেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণ ছাড়া কেহই যে বাঁচিতে পারে না, হয়ত এতকাল পরে তাঁহারা বুঝিয়া থাকিবেন। তাই এদিক দিয়া—সামান্য হইলেও এই নূতন বাণিজ্য-চুক্তির গুরুত্ব অনেকখানি।

গ-স

পুরাকীর্ত্তি সংরক্ষণে সরকারের অবহেলা

প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার ফলে আমাদের অনেক কিছুই জানিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। কিন্তু যাহা আবিষ্কার নয়, এমনি হেলা-ফেলায় প্রত্নতত্ত্বের বিষয়বস্তুগুলি চিরকাল পড়িয়া রহিবে, তাহার সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থাই হইবে না, ইহা শুনিতেও কেমন লাগে! মুর্শিদাবাদের প্রত্নতাত্ত্বিক ঐশ্বর্য্যের কথা কাহারও অবিদিত নয়। এই জেলার প্রায় সর্ব্বত্রই নানাবিধ পুরাকীর্ত্তিগুলি ছড়াইয়া আছে। উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেই বিপুল ঐশ্বর্য্যের এক সুবৃহৎ অংশই আজ খোয়া গিয়াছে। কিছু অযত্নে নষ্ট হইয়াছে, কিছু বা অসাধু ব্যবসায়ীদের কবলে পড়িয়াছে। এখনও যাহা আছে তাহার সংখ্যাও কম হইবে না। পরাধীন দেশে যেগুলির সংরক্ষণ সম্ভব হয় নাই, আজ দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও সেগুলিকে রক্ষা করিবার কোন চেষ্টাই হইতেছে না, ইহাই লজ্জার কথা। অথচ এই সম্পদগুলিকে লইয়া একটি সংগ্রহশালা অনায়াসেই স্থাপন করা যাইত। এইরূপ একটি সংগ্রহশালা স্থাপিত হইলে দেশবাসীরা ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হইতে পারিতেন।

কিন্তু কেন জানি না, সরকারী তরফ হইতে আজও তেমন কোন উদ্যম দেখা যাইতেছে না। তবে সুখের কথা, একটি বেসরকারী উদ্যোগ সম্প্রতি দেখা গিয়াছে। ইহারা সংগৃহীত মূল্যবান পুরাকীর্ত্তির কিছু কিছু লইয়া জিয়াগঞ্জে একটি মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ইহা ব্যয়সাধ্য। সরকারী সহায়তা না পাইলে কাহারও একার চেষ্টায় এ কাজ সফল হওয়া সম্ভব নয়। সে সহায়তা যে পাওয়া যাইবে এমন লক্ষণ অবশ্য এখনও দেখা যায় নাই। ইহা পরিতাপেরই বিষয়। কল্যাণমূলক একটি কাজের জন্য বেসরকারী উদ্যম যেখানে প্রস্তুত হইয়াই আছে সরকার যদি সেখানে হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকেন বা তাহার পরি-কল্পনা যদি দপ্তরেই আবদ্ধ থাকে তবে ইহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর নাই। অতঃপর আমরা সরকারকে এ বিষয়ে তৎপর হইতে দেখিব।

গ-স

কলিকাতা শহরে বৃত্তাকার রেলপথ নির্ম্মাণ

ভারতের মধ্যে কলিকাতা অঞ্চল সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ উৎপাদন ও বণ্টন-কেন্দ্র। এই অঞ্চলে কর্ম্মীর সংখ্যাও অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অধিক। পূর্ব্বে যাহা ছিল, স্বাধীনতা লাভের পর কি শিল্পের দিক দিয়া, কি উৎপাদক-সংস্থার দিক দিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা আরও বাড়িয়াছে। সেই অনুপাতে কর্ম্মীর সংখ্যাও পূর্ব্বাপেক্ষা দশ গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গত দশ-বারো বৎসরের মধ্যে এই অঞ্চলে পরিবহনের সংস্থান সেই অনুপাতে বাড়িল না। ইহা আমরা নিত্যই প্রত্যক্ষ করিতেছি, কর্ম্মীগণ কি ভাবে উৎপাদন-কেন্দ্র এবং অফিসাদিতে যাতায়াত করে। বর্ত্তমানে রেলপথে শহরতলী হইতে প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ কর্ম্মীকে কলিকাতায় আসিতে কি অবর্ণনীয় দুঃখ ভোগ করিতে হয় তাহা সকলেই জানেন। কলিকাতা শহরের অবস্থাও তদনুরূপ। শহরতলী ও শহরাঞ্চলে পরিবহনের এই অভাবের ফলে এখানকার উৎপাদন ও বণ্টনের যে প্রভূত ক্ষতি হইতেছে ইহা বলাই বাহুল্য। অতীব দুঃখের কথা, এই দশ-বার বৎসরের মধ্যে শহরে ট্রাম লাইনের কিছুই সম্প্রসারণ হয় নাই। বাস সার্ভিস সরকার হাতে লইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা যে করে পর্য্যন্ত শহরের সকল অঞ্চলে প্রয়োজনানুরূপ সংখ্যায় বাস প্রবর্ত্তন করিতে পারিবেন তাহা বুঝা যাইতেছে না। কিন্তু আরও একটি প্রস্তাব বহু দিন ধরিয়া প্রায় ধামা-চাপা অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

১৯৪৭ সনেরও আগে অর্থাৎ তখনও দেশ বিভাগ হয় নাই, তখন এই প্রস্তাবটি উঠিয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পরিকল্পনাটি কাগজেপত্রেই রহিয়া যায়। পরিকল্পনা ছিল, কলিকাতা শহরের চতুর্দ্দিকে একটি বৃত্তাকার রেল স্থাপন। তখনই যাহার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল, আজ প্রয়োজনের দিক দিয়া তাহা শত গুণ বাড়িয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পরিকল্পনা পরিকল্পনাতেই রহিয়া গেল। মাঝে মাঝে কর্ত্তাদের টনক নড়ে। এইরূপ টনক একবার নড়িয়াছিল ১৯৫২ সনে। সে সময় একটি বিশেষ কমিটি গঠিত

হয়। কিন্তু উহাই শেষ। তার পর এই আট বৎসরের মধ্যে কোন কথাই শুনা যায় নাই। কেন যে ইহার কাজ অগ্রসর হয় না ইহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। পরিকল্পনাটি এরূপ বৃহদাকারও নয়, ব্যয়বহুলও নয় যে কর্তৃপক্ষ ভীত হইবেন। এই রেলপথটি দমদম, চিৎপুর, কেয়ারলি প্লেস, হেষ্টিংস, খিদিরপুর ডক, মাঝের-হাটের মধ্য দিয়া যাইয়া আবার দমদমে ফিরিয়া যাইবে। ইহাতে মালপত্রের আদান-প্রদান এবং কর্মীদের যাতায়াতের পক্ষে অনেক-খানি সুবিধা হইবে এবং ট্রাম-বাসের ভীড়ের চাপও কমিবে।

আর একটি ট্রেন—যাহা সোজা ডায়মণ্ডহারবার হইতে রাণাঘাট এবং অপর দিক আসানসোল হইতে বালী ব্রীজ হইয়া দমদম পর্যান্ত যাতায়াত করিলে বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলের যাত্রী এবং মালপত্রের আদান-প্রদানের পক্ষে খুবই সুবিধার হয়। এই ব্যবস্থায় ট্রাম-বাসে ভীড়ের চাপও আশানুরূপ কমিয়া যাইবে। বৃত্তাকার রেলের সহিত এই লাইনটিকেও সমান মূল্য দিতে হইবে তবেই এই পরিকল্পনার পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করিবে।

কলিকাতা শহরের ও শহরতলীর লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর স্বার্থের দিকে চাহিয়া এবং সমষ্টিগত ভাবে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থের কথা বিবেচনা করিয়া রেল কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরি-কল্পনাতে কলিকাতার এই নূতন রেলপথ নির্ম্মাণের প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করিবেন ইহাই আমরা আশা করি। রেলের অর্থসঙ্গতি যেরূপ তাহাতে এই ধরনের একটি ক্ষুদ্র পরিকল্পনা রেলকর্তৃপক্ষ যদি উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গের তিন কোটি অধিবাসীরই সমষ্টিগত স্বার্থ উপেক্ষা করিবেন।

গ-স

উড়িষ্যাকে লইয়া পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যাঞ্চল গঠন

অবশেষে উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্ট যে পশ্চিমবঙ্গের সহিত উড়িষ্যার একটি খাদ্যাঞ্চল গঠনের প্রস্তাবে রাজী হইয়াছেন ইহা আশার কথা। এই একজোট হওয়া বিষয়ে উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্টের যে সব আশঙ্কা ছিল তাহার নিরসন কেন্দ্রীয় সরকার করিয়াছেন। স্থির হইয়াছে, উড়িষ্যার কোন অঞ্চলে যাহাতে খাদ্যাভাব না ঘটিতে পারে, তজ্জন্য উড়িষ্যার উৎপন্ন চাউল দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার তথায় ৭৫ হাজার টন চাউলের একটি ভাণ্ডার গঠন করিবেন। কেন্দ্রীয় সরকার এরূপ প্রতিশ্রুতিও দিয়াছেন যে, উড়িষ্যার কোন অঞ্চলে সাধারণ শ্রেণীর চাউলের মূল্য যদি প্রতি মণে ১৮ টাকার বেশী হয়, তাহা হইলে উড়িষ্যাবাসী যাহাতে অনধিক ১৮ টাকা মণ দরে চাউল পাইতে পারে সেজন্য একটা সাবসিডি বা অর্থসাহায্যের ব্যবস্থাও কেন্দ্রীয় সরকার করিয়াছেন। সুতরাং আশা করা যায়, এই দুইটি ব্যবস্থার ফলে চাউলের মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে উড়িষ্যার আশঙ্কা আর থাকিবে না।

তবে এই ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের কতটা সুবিধা হইবে জানি না। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর মতে চলতি বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে ১০ লক্ষ টন, কিংবা কিছু বেশী পরিমাণে চাউলের ঘাটতি দাঁড়াইবে। এই ঘাটতি উড়িষ্যার উদ্বৃত্ত চাউল দ্বারা পূরণ হইবে না। তবে কেন্দ্রীয় সরকার হইতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে যে, সরকার খাদ্যশস্যের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের ঘাটতি পূরণ করিবেন। এই সম্পর্কে বিশেষ ভাবে কলিকাতার প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের জোগান দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থের দিক হইতে এই ব্যবস্থাটি সন্তোষ-জনক বলিয়াই মনে হয়। তবে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী পশ্চিম-বঙ্গ উড়িষ্যা হইতে মোট কি পরিমাণ চাউল পাইবে তাহা এখনও বুঝা যাইতেছে না। কারণ, বর্ত্তমান বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের মতই উড়িষ্যাতেও বন্যার দরুণ ফসলের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। তাহার উপর উড়িষ্যায় উৎপন্ন চাউল হইতে উড়িষ্যাবাসীর প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ৭৫ হাজার টন চাউল উড়িষ্যাতেই মজুত রাখা হইবে। এবং উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্ট এরূপ আদেশ জারী করিয়াছেন যে, উক্ত রাজ্যে যাহারা প্রত্যহ ৫০ মণের বেশী চাউল কেনাবেচা করিবে, তাহাদের প্রত্যেককেই উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে লাইসেন্স লইয়া ব্যবসা চালাইতে হইবে। তার পর প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশমত সময়ে সময়ে উহাদের হস্তস্থিত চাউলের শতকরা ২০ ভাগ গবর্ণমেণ্টের নিকট বিক্রয় করিতে হইবে। এইরূপ অবস্থায় আইনের এই সব বেড়াজাল ডিঙাইয়া উড়িষ্যা হইতে পশ্চিমবঙ্গ যে খুব বেশী পরিমাণে চাউল পাইবে এমন মনে হয় না। তবে ভারত সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গের চাউলের অভাব পূরণ করিবেন। বর্ত্তমানে ইহাই আশার কথা।

গ-স

'জাল-ভেজাল' নাটকের পুনরভিনয়

জাল এবং ভেজাল দ্রব্যের অপসারণ বিষয়ে কর্ত্তাদের হুমকি আজ নূতন নয়। কিছু কাজ না থাকিলে, এই লোক-ঠকান তম্বিরে তাঁহারা আসর গরম করিয়া তোলেন। আজকাল মানুষের ইহা গা সওয়া হইয়া গিয়াছে। তাহারা বুঝিয়া লইয়াছে, যতদিন খাদ্যবস্তু থাকিবে ততদিন ভেজাল থাকিবেই।

কিন্তু এই লোক-ঠকান চীৎকার তাঁহারা করেন কেন? এ আস্ফালন যে নিতান্তই অভিনয় এ বুঝিবার মত বুদ্ধি সাধারণের আছে। কর্ত্তারা এতটা তাহাদের নির্ব্বোধ ভাবেন কেন?

গত ১১ই ডিসেম্বর কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় আবার জাল ও ভেজালের প্রসঙ্গ উঠিয়াছিল। জনৈক সদস্য অভিযোগ করিয়াছেন, উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে সক্রিয়তার অভাবেই ভেজাল বাড়িয়া যাইতেছে। অতএব এই অপরাধ দমনের জন্য কঠোর বিধান আবশ্যক।

ভেজাল-দমনের এই করতালি-দৃপ্ত অভিনয় কত রজনী অতিক্রম করিল জানি না। কিন্তু যত রাত্রিই অতিক্রান্ত হউক, এই নির্লজ্জ

অভিনয় আর ভাল লাগে না। সকলেই জানেন, খাদ্যে যাহারা ভেজাল দেয় বা রোগীর ঔষধে যাহারা বিষ মিশ্রিত করে, তাহারা দেশের শত্রু। ইহাদের জন্য কঠোর শাস্তির আবশ্যকতাও সর্ব্বসম্মত। তথাপি ইহাদের সম্বন্ধে কঠোর আইন প্রণীত বা প্রবর্ত্তিত হইতেছে না কেন? অথচ ইহাদের মুখেই দেশপ্রেমের, সমাজরক্ষার কত বড় বড় কথাই না শোনা যায়। হায়, দুর্ভাগা দেশ! কারাগারের কয়েদীদের সুখ-সুবিধার জন্য ইহাদের প্রাণ কাঁদে, দেশের পতিতাদের উদ্ধারের জন্য যাঁহারা আগ বাড়াইয়া যাইতেছেন তাঁহারা জাল ও ভেজাল দমনে কঠোর দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা করিতে এত কুণ্ঠিত বা উদাসীন কেন? শূন্যগর্ভ আস্ফালন ও দাপাদাপি এ পর্য্যন্ত অনেক হইয়াছে। এখন উহা কমাইয়া কাজের কাজ যদি কিছু থাকে, তাহাই করিতে অগ্রসর হউন। আইন সংশোধন করিতে হয় করুন, কিন্তু অসার অভিনয়ে আর লোক হাসাইবেন না। খাদ্যে ভেজাল দিয়া যাহারা প্রাণহানি ঘটাইতেছে, আর যাহারা আইনের অজুহাত দেখাইয়া প্রাণ লইয়া এরূপ ছিনিমিনি খেলিতেছেন তাঁহারা সমান অপরাধী। এ কথা যেন তাঁহারা না ভোলেন।

গ-স

পুস্তকের মুদ্রণ ও প্রচ্ছদপট বিষয়ে রাষ্ট্রপতি

বর্ত্তমানে পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারে মুদ্রণ-পারিপাট্য এবং রুচিকর প্রচ্ছদপটের দিকে সকলেরই দৃষ্টি পড়িয়াছে। ইহা আশার কথা সন্দেহ নাই। কারণ সৃষ্টির সাধনা, সুন্দরেরই সাধনা। এই সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ মুদ্রণ-পারিপাট্য ও পুস্তকের ডিজাইনের জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দিতে গিয়া বলিয়াছেন, "সাধারণ ভাবে ভারতে মুদ্রণ-ব্যবস্থার উন্নতি হইয়াছে সত্য, কিন্তু পাঠ্যপুস্তকগুলি মুদ্রণের কোন উন্নতিই হইতেছে না। অথচ ঐ সব অপরিণতশিশু ও বালক-বালিকাদের পাঠ্যপুস্তকগুলিরই সংস্কার বিশেষ করিয়া আবশ্যক। তাহাদের প্রত্যেকটি বই সুন্দর প্রচ্ছদপটে অলঙ্কৃত করিয়া এবং ততোধিক সুন্দর করিয়া ছাপিয়া বাহির করা উচিত। কারণ তাহাদের চিত্ত আকর্ষণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন। সুন্দর বই হাতে পাইলে তাহাদেরই আনন্দ হয় বেশী। এই আনন্দের উপরই তাহাদের অধ্যয়নের স্পৃহা নির্ভর করে।"

রাষ্ট্রপতির এই কথাগুলি আমাদের দেশের প্রকাশকদের স্মরণ করিতে বলি। বর্ত্তমানে শিক্ষা-পদ্ধতিও হইয়াছে যেরূপ অবহেলিত পাঠ্যপুস্তকগুলিও তদনুপাতে কম অবহেলা পাইতেছে না। কোনরূপে জোড়াতাড়া দিয়া বইগুলি বাহির করিয়াই তাঁহারা খালাস। শিশু-মন জয় করিতে হইবে, এদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই—না প্রকাশকের, না লেখকের। অথচ দাম তাঁহারা কম করেন না—যে ব্যয়বাহুল্যের জন্য ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া দরিদ্র গৃহস্থের বর্ত্তমানে চিন্তার কারণ হইয়াছে। তাহাদের পাঠ্যপুস্তক সুলভ ও সুন্দর হইবে ইহাই আমরা প্রকাশকদের নিকট হইতে আশা করিব। দেশের অগণিত ছাত্রছাত্রীর কল্যাণ তাঁহাদের উপর নির্ভর করিতেছে ইহাও ঐ সঙ্গে তাঁহাদের স্মরণ করিতে বলি।

গ-স

বাংলা-বিহারের সংযোগরক্ষাকারী বরাকর-সেতু

শুনা যাইতেছে, বরাকর সেতুতে ফাটল ধরিয়াছে। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপরে এই বরাকর সেতুটির গুরুত্ব যে কতখানি তাহা কাহারও অবিদিত নাই। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের মধ্যে যোগরক্ষাকারী এই সেতুর উপর দিয়া প্রত্যহই হাজার হাজার যাত্রী এবং যানবাহন চলাচল করে। শিল্পসমৃদ্ধ এই অঞ্চলটিতে বর্ত্তমানে মালপত্র পরিবহনের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং এই সেতুটি সংযোগ রক্ষার একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। এইরূপ একটি সেতুর সংস্কার করিতে যদি দীর্ঘ সময় লাগে, তবে বড়ই লজ্জার কথা! যাবতীয় মালবাহী ট্রাক ও ভারবাহী অন্যান্য গাড়ীগুলিকে দীর্ঘদিন ধরিয়া মাইথন বাঁধের উপর দিয়া ঘুরিয়া আসিতে হইতেছে। সম্প্রতি যাত্রীদেরও নাকি চলাচল করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। সুতরাং এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। সকলকেই যদি মাইথন বাঁধের উপর দিয়া ঘুরিয়া যাইতে হয়, আধ মাইল দূরে পৌঁছিবার জন্যও তাহাদের দশ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইবে। অথচ এই অব্যবস্থাকেই তাঁহারা চালু করিলেন!

অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, বরাকর সেতুর সংস্কারের কাজ যতদিন না শেষ হয়, ততদিনের জন্য সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে উহার পার্শ্বেই একটি অস্থায়ী সেতু বাঁধিয়া দেওয়া দরকার। অন্যথায় শুধু স্থানীয় লোকদেরই নয়, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের প্রতিটি যাত্রীকেই—বিশেষ করিয়া মাল যাতায়াতের পক্ষে যে এক চরম অসুবিধায় পড়িতে হইবে ইহা বলাই বাহুল্য।

গ-স

চলন্ত ট্রেণে আবার ডাকাতি

চলন্ত ট্রেণে ডাকাতি রাহাজানি এমন একটা নিত্যকার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, একটার প্রতি মনোনিবেশ করিতে না করিতে আর একটা ঘটিয়া যাইতেছে। এই ঘটনাগুলি পরস্পর লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, উহাদের অধিকাংশই ঘটিতেছে এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী প্রভৃতি স্থানের মধ্যেই। রিহান্দ বাঁধের একজন সহকারী ইঞ্জিনীয়ার গত ৩১শে ডিসেম্বর তাঁহার পত্নীসহ একখানি ট্রেণের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় লক্ষ্ণৌ হইতে এলাহাবাদ যাইতেছিলেন; মাণিকপুরের কাছাকাছি কোন স্থানে দুই ব্যক্তি—কামরায় আর কোন যাত্রী না থাকায়, ছোরা হাতে উঠিয়া আসে এবং তাঁহাদের সর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া লয়। নগদ টাকা ও গহনায় অন্ততঃ পক্ষে হাজার টাকা ছিনাইয়া লইয়া তাহারা পলাইয়া যায়। নিরুপায় দম্পতি যে দুর্ব্বৃত্তদের হাত হইতে প্রাণ বাঁচাইতে পারিয়াছেন, ইহা নিতান্তই ভাগ্যের কথা। কারণ, বহুক্ষেত্রে তাও সম্ভব হয় না।

সমাজ-জীবন কতখানি বিশৃঙ্খল ও অনির্ভরযোগ্য হইয়া উঠিলে তবেই এই রকম ঘটনা হইতে পারে, তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। চলন্তি ট্রেনের এই ডাকাতি ও খুনখারাপি স্থায়ীভাবে বন্ধের জন্য সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি কর্ম্ম-পরিকল্পনা তৈয়ারী এবং অচিরেই তাহা কার্য্যে পরিণত করা দরকার। দুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত তাহা হয় নাই বলিয়াই এই আপদ একটা প্রতিকারহীন কলঙ্কস্বরূপ হইয়া উঠিতেছে!

গ-স

পরাধীনতা-মুক্ত আর একটি দেশ

আবার আর একটি দেশ স্বাধীনতা লাভ করিল। ক্যামেরুনস—পশ্চিম আফ্রিকায় অতলান্তিকের উপকূলবর্ত্তী এই রাজ্যের কয়েক লক্ষ অধিবাসী চল্লিশ বৎসরের ফরাসী অভিভাবকত্ব হইতে মুক্তি পাইয়াছে। কিন্তু এ মুক্তিতে তাহারা উল্লসিত হইতে পারে নাই। কারণ মোট একুশটি জেলার মধ্যে এগারটি জেলার অধিবাসীরা এই অধিকার লাভ করিয়াছে। আগামী মার্চ্চ মাসে নির্ব্বাচন না হওয়া পর্য্যন্ত প্রধানমন্ত্রী অহমাদু আহিদজো বিশেষ আইনের দ্বারা রাজ্য-শাসন করিবেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে প্রথম মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত ক্যামেরুনস রাজ্যটি ছিল জার্ম্মানীর প্রোটেক্টোরেট। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্ম্মানী পরাজিত হইবার পর বিজয়ী ব্রিটেন ও ফ্রান্স ক্যামেরুনসকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লয়। চার-পঞ্চমাংশে ফরাসী কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, এক-পঞ্চমাংশ পায় ব্রিটেন। ভার্সাই সন্ধিতে এই ভাগাভাগি এবং ইঙ্গ-ফরাসী কর্ত্তৃত্ব স্বীকৃত হয়।

মাতৃভূমির এই বিভাগের বিরুদ্ধে প্রথম হইতেই ক্যামেরুনসের দুই অংশে জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই বিক্ষোভ প্রবল আকার ধারণ করে। গত ১৯৪৮ সনে রাজ্যের দুই অংশের জাতীয়তাবাদীদের উদ্যোগে ইউ-পি-সি বা ইউনিয়ন অব দি পিপলস অব ক্যামেরুনস দল গঠিত হয়। ঐক্যবদ্ধ সার্ব্বভৌম ক্যামেরুনস গঠন এই দলের উদ্দেশ্য। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পক্ষ হইতে ঐক্যকামী জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে দমন-নীতি প্রযুক্ত হইয়াছে নির্ম্মমভাবে। ১৯৫৫ সনে ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের হিংস্র আক্রমণে পাঁচ হাজার ক্যামেরুনবাসী নিহত হইয়াছিল। ১৯৫৭ সন হইতে ব্রিটিশ ক্যামেরুনসেও দমননীতি প্রয়োগ করা হয়। ব্রিটেন ও ফ্রান্স ক্যামেরুনসের বিভাগ চিরস্থায়ী করিতে চাহিয়াছিল।

কিন্তু চাকা ঘুরিয়া গেল। ফরাসী ক্যামেরুনস স্বাধীনতা লাভ করিল। এখন এই স্বাধীনতা লাভের পর স্বভাবতঃই এই রাজ্যের একতাবদ্ধ হইবার প্রশ্ন অত্যন্ত প্রবল হইবে। ফরাসী ক্যামেরুনস স্বাধীনতা লাভ করিল বটে, কিন্তু ক্যামেরুনসের প্রকৃত জাতীয়তা-বাদী দল—ইউ-পি-সি এখনও নিষিদ্ধ। ফরাসী ক্যামেরুনসের স্বাধীনতা জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা আজ অভিনন্দিত না হইলেও, এই দুর্ভাগা রাজ্যের স্কন্ধ হইতে ঔপনিবেশিক শাসনের জোয়াল নামিয়া যাওয়ায় বিশ্বের স্বাধীনতাপ্রিয় জাতিমাত্রই সন্তোষ প্রকাশ করিবে। এই স্বাধীনতাকে প্রকৃত জাতীয় স্বাধীনতায় পরিণত করিতে সহায়তা করিবার দায়িত্ব অনেকখানি রাষ্ট্রসঙ্ঘের। আজ শুধু ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়াতেই এই রাজ্য সম্বন্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘের কর্ত্তব্য শেষ হয় নাই। এই ক্ষমতা যাহাতে জাতীয় প্রতিনিধিদের হস্তে অর্পিত হয় তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই দিক হইতে আগামী মার্চ্চ মাসের নির্ব্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে দেশের অবস্থা স্বাভাবিক হওয়া এবং জাতীয় নেতাদের নির্ব্বাচনে অংশ লইবার সম্পূর্ণ সুযোগ সৃষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সমগ্র প্রাচ্যে যে জাতীয়তার মহাপ্লাবন আসিয়াছে, তাহাতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ধীরে ধীরে অবনমিত হইতে বাধ্য হইতেছে। ভারতবর্ষ ও চীনসহ এশিয়া এবং আফ্রিকার প্রায় দেড় শত কোটি মানুষ গত দশ-পনের বৎসরে জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ক্রমে ক্রমে আফ্রিকার দশটি রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদের কবলমুক্ত হইল। সাহারার দক্ষিণে এখনও বিশাল অঞ্চলগুলি পরাধীনতার বন্ধনে আবদ্ধ। স্বাধীনতাকামী জাতিগুলির বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি তাহাদের সকল অস্ত্রই প্রয়োগ করিতেছে। ভেদনীতির সুকৌশলী প্রয়োগের দ্বারা মুক্তিকামী জাতিগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি, তাহাদের মাতৃভূমিকে খণ্ডিত করা, স্বাধীনতার নামে তাঁবেদার গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা, সংবিধানের জটিলতার দ্বারা সংখ্যাল্প শ্বেতাঙ্গদের হাতে ক্ষমতা প্রদান প্রভৃতি কোনও আয়োজনেই তাহারা ত্রুটি করিতেছে না। কিন্তু সমগ্র আফ্রিকায় আজ যে উত্তাল জাতীয়-তরঙ্গ আসিয়াছে, তাহাকে রোধ করা সম্ভব হইবে না। আমরা বিশ্বাস করি, ক্যামেরুনসের পর আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চলের স্বাধীনতাও অদূরভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। কারণ, সাম্রাজ্যবাদ এ যুগে টিঁকিতেই পারে না।

গ-স

হগ মার্কেটে গুণ্ডা কর্ত্তৃক ভদ্রমহিলা লাঞ্ছিত

১০ই জানুয়ারীর 'যুগান্তরে' প্রকাশিত একটি সংবাদের উপর সম্পাদকীয় মন্তব্য দেখিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছি। চঞ্চল হইয়াছি এই কারণে যে, অতঃপর আমরা কোথাও নিরাপদ নহি—ঘরেও নহি, বাহিরেও নহি। মন্তব্যটি এই:

"গত বড়দিনের সন্ধ্যায় কলিকাতা হগ মার্কেটে এক দল দুর্ব্বৃত্ত একটি ভদ্র তরুণীকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিয়া যে ভাবে নির্ব্বিঘ্নে পলাইতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা কলিকাতার সমাজ-জীবনের এক আতঙ্কজনক চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছে। কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের পরিচালনাধীন কলিকাতার সর্ব্বপ্রধান বাজারে ভদ্রনারীর চলাফেরা নিরাপদ নয়, ইহা যেমন প্রগাঢ় লজ্জার কথা, এক-বাজার লোকের মধ্যে কয়েকটি গুণ্ডা একজন নারীর সম্ভ্রম ও শালীনতার উপর আক্রমণ চালাইল, অথচ কেহই আগাইয়া আসিয়া তাঁহাকে বিপদ-মুক্ত করিতে সাহস পাইল না, ইহা তেমনি জঘন্য কাপুরুষতার নিদর্শন! কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় বিষয়টি লইয়া সম্প্রতি

যে আলোচনা হয়, তাহাতে জানা যায় যে, মার্কেট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ঐ সময় বাজারে উপস্থিত ছিলেন না। একজন সার্জেণ্ট ছিলেন, তিনিও বিশেষ কিছুই করেন নাই। চারজন দারোয়ান ও শতাধিক মেথর ছিল, তাঁহাদেরও কাহারও কোন ভূমিকার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। বাজারের ভিতরে শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা-রক্ষার দায়িত্ব তাহা হইলে কাহার? সমাজের সকল স্তরেই আজ গুণ্ডামি ও মারামারির একাধিপত্য চলিতেছে। দেখিতে দেখিতে আমরা যেন এক সর্ব্বগ্রাসী গুণ্ডারাজের আওতায় গিয়া পড়িতেছি। এই ঘটনার সঙ্গে যাহারা জড়িত, তাহাদের গ্রেপ্তার ও দণ্ডের জন্য গোয়েন্দা পুলিস তৎপর হইবেন কি?"

গ-স

বিদ্যাসাগর কলেজের শতবার্ষিকী

সম্প্রতি বিদ্যাসাগর কলেজের শতবার্ষিক-উৎসব সম্পন্ন হইয়া গেল। বিদ্যাসাগর কলেজটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অবশ্য এ নাম পূর্ব্বে ছিল না। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কলেজটির নাম 'বিদ্যাসাগর কলেজ' রাখা হয়। 'কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল' ছিল ইহার পূর্ব্ব নাম। 'কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল' হইতে 'মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসন' এবং পরে উহা কলেজে পরিণত হয়। ইহা শুনিতে বেশ, কিন্তু তখনকার দিনে এ দেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের এই বে-সরকারী প্রয়াসের ইতিহাসটি নেহাত সহজ উদ্যমের ইতিহাস নয়। বস্তুতঃ বিদ্যাসাগর কলেজের শতবার্ষিক-উৎসব এক মহামনস্বী পুরুষের সুকঠিন সঙ্কল্প ও তপশ্চর্য্যার ইতিহাসকেই আবার স্মরণ করাইয়া দিতেছে। শত বৎসর পূর্ব্বে 'কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল' নামক যে একটি ক্ষুদ্র বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং একনিষ্ঠ সাধনায় তাহার পূর্ণতর বিকাশ ঘটিতে বিশেষ দেরি হয় নাই। মাত্র তের বৎসরের মধ্যেই সেই বিদ্যায়তনকে তিনি বেসরকারী শিক্ষাব্যবস্থার এক পীঠস্থানে—মেট্রোপলিটান কলেজে পরিণত করিয়াছিলেন। কথাটা সকলেই জানেন, তবু নূতন করিয়া আবার বলা প্রয়োজন যে, ১৮৭২ সনে প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান কলেজই এখানকার প্রথম বে-সরকারী কলেজ। তখন কলেজ বলিতে সংস্কৃত কলেজ আর হিন্দু কলেজ। পর পর অবশ্য আরও অনেক কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 'কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল' যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন স্কুল বলিতে 'ডফ সাহেবের স্কুল' আর গৌরমোহন আঢ্যের 'ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী' ছাড়া আর কোন স্কুল ছিল না। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। তাই 'কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল' হইতে 'মেট্রোপলিটান স্কুল' এবং ক্রমে আজিকার 'বিদ্যাসাগর কলেজে'র বিপুল পরিণতি এক দীর্ঘ ইতিহাস।

মেট্রোপলিটান কলেজ অর্থাৎ বিদ্যাসাগর কলেজ কর্ত্তৃক উদ্‌যাপিত আজিকার এই শতবার্ষিক-উৎসব, বস্তুতঃ উচ্চশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রথম বে-সরকারী উদ্যমের সূচনামুহূর্ত্তেরই স্মরণোৎসব। সামান্য সেই সূচনাকে, আপন নিষ্ঠা এবং সাধনায়, যিনি এক অসামান্য সিদ্ধির সাফল্য দান করিয়াছিলেন, স্মরণোৎসবের এই লগ্নটিতে আজ আবার সেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্দেশেই আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। আশা করিতেছি, শিক্ষার যে প্রদীপটি তিনি জ্বালাইয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহার অম্লান শিখা হইতেই আবার জ্ঞানের আরও অসংখ্য প্রদীপ এ দেশে জ্বালাইয়া তোলা হইবে।

গ-স

হাসপাতাল হইতে নবজাত শিশু লইয়া কুকুর উধাও

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর আমাদের দেশের হাসপাতালগুলি সম্বন্ধে যেসব অভিযোগ নিত্যই শুনা যাইতেছে তাহা যে-কোন সভ্য দেশের পক্ষে কলঙ্কের কথা। সম্প্রতি জলপাইগুড়ি জেলা-হাসপাতাল হইতে একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ হাসপাতালের প্রসূতি-বিভাগ হইতে এক নবজাত শিশুর গলদেশ কামড়াইয়া ধরিয়া একটি কুকুর হাসপাতালের গেট অতিক্রম করিয়া সদর রাস্তার উপর দিয়া ছুটিয়া যাইয়া নিকটবর্ত্তী ধরধরা নদীর সেতুর নীচে লইয়া গিয়া মাংস ভক্ষণে উদ্যত হইলে পাড়ায় প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। জনতার কোলাহলে আকৃষ্ট হইয়া হাসপাতালের এক নারী কর্ম্মচারী ছুটিয়া আসে এবং শিশুটিকে উদ্ধার করিয়া হাসপাতালে লইয়া যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা একবাক্যে এই অভিযোগ করেন যে, কুকুরের গ্রাস হইতে যখন শিশুটির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় তখন তাহার গলদেশের গভীর ক্ষত হইতে রক্তক্ষরণ হইতেছিল।

যদিও হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষ পরে জানাইয়াছেন, শিশুটি মৃত ছিল। তাঁহারা জানাইয়াছেন, গর্ভবতী মহিলাটি কঠিন একলম্প-সিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া হাসপাতালে ভর্ত্তি হন, এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে শিশুটি অল্পক্ষণ পরেই মারা যায়। ঘটনাটি ঘটিয়াছে ২রা জানুয়ারী। এই ২রা জানুয়ারী হইতে ৪ঠা জানুয়ারী পর্য্যন্ত শিশুটির মৃতদেহ নাকি হাসপাতালের ওয়ার্ডের মধ্যেই পড়িয়া থাকে। সেখান হইতে কোন উপায়ে কুকুরটি মৃত শিশুকে মুখে করিয়া অলক্ষ্যে সরিয়া পড়ে।

শিশুটির মাতার সহিত সাংবাদিকগণ সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে জলপাইগুড়ির চীফ মেডিক্যাল অফিসার অব হেলথ রোগিণী তখনও অজ্ঞান অবস্থায় আছেন বলিয়া জানান এবং সাক্ষাতের অনুমতি দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন।

এই নবজাত কন্যা সন্তানটি যে ২রা জানুয়ারী মারা গিয়াছে সেই সংবাদ অভিভাবকদের দেওয়া হইয়াছে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে জেলা স্বাস্থ্যবিভাগের মুখপাত্র জানান যে, শিশুটির পিতামহী হাসপাতালে রোগিণীকে দেখিতে আসিলে তাঁহাকে এই সংবাদ জানান হয় এবং তিনি শিশুর মৃতদেহটি সৎকার করিবার জন্য লিখিতভাবে হাসপাতাল কর্ত্তৃপক্ষকে নাকি অনুরোধ জানান। কবে

তিনি এই অনুরোধ জানান, তাহার উত্তরে উক্ত মুখপাত্র বলেন যে, তারিখের উপর কালি পড়িয়া যাওয়ায় তারিখটির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব নয়।

এই ঘটনার পর যেসব রোগিণী হাসপাতালে ছিলেন তাঁহারা একে একে আপন সন্তানের নিরাপত্তার জন্য হাসপাতাল ছাড়িয়া চলিয়া যান।

আমাদের বলিবার কথা এই, হাসপাতালগুলি যদি মানুষের কল্যাণই না করিতে পারিল তবে তাহা রাখিবার প্রয়োজনই বা কি? কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিকারের আশা নিরর্থক। কারণ, এত অভিযোগ সত্ত্বেও তাঁহাদের চৈতন্য হয় নাই। শুধু বলিব, "হে মোর দুর্ভাগা দেশ!"

গ-স

চিনির দর বৃদ্ধির কারণ কি

চিনির দর অস্বাভাবিক বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার কারণ সাধারণের দুর্বোধ্য। সত্য বটে যে, গত সেপ্টেম্বর মাসে চিনির যে মরশুম শেষ হইয়াছে তাহাতে দেশের চিনির কলগুলিতে পূর্ব্ব মরশুমের তুলনায় প্রায় এক লক্ষ টন কম মাল উৎপন্ন হইলেও দেশ হইতে কতক পরিমাণে চিনি বিদেশে রপ্তানী করা হইয়াছে। এদিকে দেশে চিনির চাহিদা দিন দিন বাড়িতেছে এবং চলতি বৎসরের ইক্ষু ফসলের অবস্থা তেমন সন্তোষজনক নহে, তাই চিনির চলতি মরশুমে দেশে কি পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হইবে সে সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছে। কিন্তু উহা চিনির মূল্যবৃদ্ধির কারণ হইতে পারে না। কেননা ভারত সরকার বর্ত্তমানে ভারতের চিনির কলসমূহে উৎপন্ন সাকুল্য চিনি নির্দ্দিষ্ট দরে ক্রয় করিয়া তাহা নির্দ্দিষ্ট দরে চিনি-ব্যবসায়ীদের নিকট বাজারে বিক্রয়ার্থ প্রদান করিতেছেন। এইরূপ অবস্থায় দেশে চাহিদার তুলনায় চিনির যোগান কম হইলেও উহার মূল্যবৃদ্ধির কোনও কারণ ঘটিতে পারে না।

সুতরাং এখানেও দেখা যাইতেছে, অতিরিক্ত মুনাফালোভী মহাজনদের খেলা চলিতেছে। সরকারী শাসন এখানে ব্যর্থ। সরকার যাহা করিয়াছেন তাহা মামুলি ব্যবস্থা। সেই 'ফেয়ার প্রাইস শপে'র মাধ্যমে নির্দ্দিষ্ট দরে চিনি বিক্রয়ের উদ্যোগ। কিন্তু যেখানে এই 'ফেয়ার প্রাইস শপ' নাই, সেখানকার অধিবাসীদের কি দশা হইবে? যাহা করা উচিত ছিল তাহা না করায় সরকারের অক্ষমতাই বার বার প্রকাশ পাইতেছে। এইসব ধনী মহাজনরা— যাহারা ইচ্ছামত বাজার-দর চড়াইতেছে ও নামাইতেছে তাহাদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু সরকার সেইদিকেই সর্ব্বাপেক্ষা উদাসীন।

আবার জলদস্যু

মোগল আমলে পর্ত্তুগীজ জলদস্যুর কথা শুনিয়াছিলাম। কিন্তু সে এক যুগ আগের কথা। বর্ত্তমান যুগে যে এরূপ অবাধ-দস্যুতা সম্ভব, ইহা চিন্তা করিতেও কেমন লাগে। অথচ ইহাই হইতেছে। কাঁথির রসুলপুর নদীর মোহনা হইতে হলদিয়া বন্দর পর্য্যন্ত মধ্যবর্ত্তী জলপথে জলদস্যুর আক্রমণে মাল বোঝাই নৌকাগুলি লুণ্ঠিত হইতেছে। ইহার ফলে ব্যবসায়ী মহলে আতঙ্ক ও ত্রাসের সৃষ্টি হওয়ায় বহুসংখ্যক ব্যবসায়ী জলপথে মাল আনা বন্ধ করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে কলিকাতা হইতে কাঁথি সরাসরি লরী-যোগে মালপত্র আনা ও নেওয়া চলিতেছে। ইহার ফলে মাল আমদানির খরচ বাড়িয়াছে, ফলে দর বাড়িতেছে। প্রত্যেক দ্রব্য জলপথে আমদানি হইলে খরচ পড়ে কম। কিন্তু জলদস্যুর উপদ্রবে ব্যবসায়িগণ নৌ-পথে মাল আনা বন্ধ করায় কয়েক সহস্র নৌকা, মাঝি ও মাল্লা আজ বেকার হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা এখন কোনক্রমে কায়ক্লেশে দিনযাপন করিতেছে। বঙ্গোপসাগর বক্ষে সমুদ্রের প্রাকৃতিক বহু পরিবর্ত্তন হইতেছে, রসুলপুর নদীর মোহনা হইতে হলদিয়া পর্য্যন্ত সমুদ্রগর্ভে যত্রতত্র বিশাল চড়া পড়িয়াছে। তাহাতে নৌকা চালানোও ভয়ের কারণ, খুব অভিজ্ঞ মাঝি না হইলে, উক্ত চড়ায় নৌকা আটকাইয়া যায় এবং কখন কখনও দুই-তিন দিন পর নৌকা উদ্ধার করা সম্ভব হয়। বহুক্ষেত্রে নৌকা নষ্ট হইয়াও যায়। জলদস্যুদের সুযোগ এইখানেই। সমুদ্রের বক্ষে কোন মালবাহী নৌকা আটকা পড়িতেই, জলদস্যুরা দল বাঁধিয়া ছোট ছোট নৌকা লইয়া উক্ত নৌকার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং কোন প্রকার বাধার পূর্ব্বেই তাহারা মূল্যবান দ্রব্যাদি নৌকায় বোঝাই করিয়া সরিয়া পড়ে। বিশেষ করিয়া দিঘা হইতে তাজপাটি ও হলদিয়া, মোহনা হইতে রূপনারায়ণের মোহনার মধ্যে এই প্রকার লুণ্ঠন চলিতেছে।

এখন কথা হইতেছে, এরূপ লুণ্ঠন মাত্র একদিন হয় নাই। অনেকদিন হইতেই দল বাঁধিয়া তাহারা লুণ্ঠনকার্য্য চালাইতেছে। বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না, আমরা এক সুসভ্য, সুশৃঙ্খল সুশাসিত রাজ্যে বাস করিতেছি। রাজ্যে কি পুলিস নাই? সরকারও কি এ সংবাদ অবগত নহেন? হলদিয়ায় নূতন বন্দরও সরকার নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কিন্তু বন্দর রক্ষার ব্যবস্থা নাই ইহা ততোধিক বিস্ময়!

গ-স

মাধ্যমিক শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্ত্তনে সরকার

দিল্লীতে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির শিক্ষা কমিটির যে অধিবেশন হইয়া গেল, তাহাতে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে পরীক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে মাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিল এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতির দ্বারা ছাত্রদের যোগ্যতা সঠিক ভাবে নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির শিক্ষা কমিটি মাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিলের উপরিলিখিত অভিমত বিচার করিয়া দেখিয়া ঐ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। দেশের সাধারণ শিক্ষাবিদগণও মনে করেন যে, প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন আবশ্যক। শিক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ যে কোন ব্যক্তি উপলব্ধি করেন যে, বর্ত্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতি ছাত্রদের বুদ্ধি ও চিন্তা শক্তির পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে ব্যর্থ হইতেছে। ছাত্রেরা মুখস্থ কার্য্যে দক্ষতা এবং কয়েকটি নিয়ম যন্ত্রের মত অনুসরণ

করিলেই প্রচলিত পরীক্ষা কেবল পাস করিতে নহে, খুব উচ্চস্থান অধিকার করিয়া কৃতিত্বও দেখাইতে পারে। কিন্তু অধীত বিষয়ে তাহার প্রকৃত জ্ঞানলাভ হইল কিনা, অথবা তাহাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হইল কিনা, প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতির দ্বারা তাহা নির্ণয় করা সম্ভব নহে। দেখা যাইতেছে যে, প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতির ব্যর্থতা এবং উহার পরিবর্তনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে দেশের সরকারী এবং বে-সরকারী প্রায় সকল শিক্ষাবিদই একমত। কিন্তু কিরূপ পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত হওয়া উচিত, তাহা স্থির করিবে কে? এখন শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং বে-সরকারী শিক্ষাবিদ্‌গণের কর্তব্য হইতেছে, নূতন পরীক্ষা পদ্ধতি নির্ণয় করার দিকে মনোযোগ দেওয়া। গ-স

ডাঃ বি. পট্টভী সীতারামায়া

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি ডাঃ বি. পট্টভী সীতারামায়া গত ১৭ই ডিসেম্বর পরলোকগমন করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮০ বৎসর হইয়াছিল।

পট্টভী সীতারামায়া কৃষ্ণা জেলায় মসলীপট্টমে জন্মগ্রহণ করেন। গত নবেম্বরে তাঁহার ৮০ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। মসলীপট্টম এবং মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেন। ২৬ বৎসর বয়সে তিনি জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেন এবং গান্ধীজীর একান্ত ভক্ত শিষ্য হন। জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে তিনি অন্ধ্রের স্বতন্ত্র প্রদেশ করিবার প্রস্তাব পেশ করেন। বালগঙ্গাধর তিলক এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। ১৯৩৭-৪০ সন পর্যন্ত তিনি অন্ধ্রপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। গান্ধীজী প্রবর্তিত সকল আন্দোলনে যোগ দিয়া তিনি কারাবরণ করেন। জেলে বসিয়া তিনি কংগ্রেস আন্দোলনের ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করেন।

১৯৩৮ সনে ত্রিপুরী-কংগ্রেসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে গিয়া তিনি সুভাষ বসুর নিকট পরাজিত হন। এই সময় গান্ধীজী বলিয়াছিলেন, সীতারামায়ার পরাজয় তাঁহার নিজেরই পরাজয়।

স্বাধীনতার পর তিনি পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডনকে পরাজিত করিয়া ১৯৪৯ সনে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। ইহার পর তিনি মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি হায়দ্রাবাদে অবস্থান করিতেছিলেন। ডাঃ পট্টভী পণ্ডিত এবং সুলেখক ছিলেন। কংগ্রেসের ইতিহাস ব্যতীত তিনি "গান্ধীবাদ ও সমাজবাদ" এবং "হিন্দুসমাজে নারী" গ্রন্থগুলিও রচনা করিয়া গিয়াছেন।

প্রথম জীবনে ডাক্তারী পাস করিয়া তিনি ১৯০৬ সনে মসলীপট্টমে চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করেন। তাঁহার সম্পাদনায় "জন্মভূমি" নামে একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। পরে তিনি গান্ধী আন্দোলনে যোগ দেন। পরাধীন ভারতে যাঁহারা স্বাধীনতা সংগ্রামের পতাকা দৃঢ়হস্তে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন ডাঃ সীতারামায়া ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। ভারতের প্রথম ভাষাভিত্তিক রাজ্য স্বতন্ত্র অন্ধ্র গঠনের আন্দোলনে তাঁহার ভূমিকা চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবে। তাঁহার কংগ্রেসের ইতিহাসে কংগ্রেসের গঠন ও উন্নতিতে বাংলার দানকে যোগ্য স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই—একথা সাহসের সঙ্গে তিনিই বলিয়াছিলেন। একথা আজ অস্বীকার করা চলে না, অন্ধ্রের সীমানা ছাড়াইয়া তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও মননশীলতা সারা ভারতকে স্পর্শ করিয়াছে। তাঁহার নাম জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে। গ-স

মহারাণী সুচারু দেবী

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের তৃতীয় কন্যা ময়ূরভঞ্জের মহারাণী সুচারু দেবী গত ১৪ই ডিসেম্বর পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৮৬ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই অক্টোবর সুচারু দেবী জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ময়ূরভঞ্জের মহারাজা রামচন্দ্র ভঞ্জদেবের সহিত সুচারু দেবীর বিবাহ হয়। বিবাহিত জীবনের মাত্র আট বৎসর পরেই ১৯১২ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হয়। তাঁহার একমাত্র পুত্র ধ্রুবেন্দ্রনারায়ণ বিগত মহাযুদ্ধে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন।

সুচারু দেবী বিদুষী। কাব্যে, সঙ্গীতে, চিত্রবিদ্যায় এবং সমাজের বিবিধ কল্যাণার্থে তিনি অনেক দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজেও চিত্র-শিল্পী ছিলেন। তাঁহার অঙ্কিত বহু চিত্র সংরক্ষিত আছে। 'ভক্তি অর্ঘ্য' ও 'প্রণতি' নামক কাব্য তাঁহার রচিত। গ-স

প্রশান্তচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

রেলওয়ে বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও চিত্তরঞ্জন রেল-ইঞ্জিন কারখানার প্রাক্তন জেনারেল-ম্যানেজার শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মুখার্জি গত ৪ঠা জানুয়ারী মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। খ্যাতি-প্রতিপত্তি ও বহু কর্মকীর্তি পিছনে রাখিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। তাঁহার মৃত্যুসংবাদে দেশবাসী মাত্রেই মর্মাহত হইবেন।

১৯০৪ সনে প্রশান্তচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। পি. সি. মুখার্জি নামেই তিনি পরিচিত। তিনি কেম্ব্রিজে যন্ত্র-বিজ্ঞানে 'ট্রাইপস' লাভ করিয়া ১৯২৫ সনে পুরাতন 'ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলে'র কাজে যোগদান করেন এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে উন্নীত হইতে থাকেন। ৩৪ বৎসর কাল তিনি ভারতের রেলপথ পরিচালনায় ও এতৎসংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে যে পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন, তাহাতে ১৯৫৬ সনে তিনি রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ১৯৫৮ সনে রেলমন্ত্রী দপ্তরের সর্বপ্রধান সেক্রেটারীরূপে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার কর্ম-প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশের পরিচয় দেন। অসাধারণ ধীশক্তি, কর্মকুশলতা ও জনপ্রিয়তা ছাড়া কর্ম-কীর্তির এই শীর্ষে আরোহণ সম্ভব হয় না। প্রশান্তচন্দ্র কঠোর শ্রমের গুরুদায়িত্বপূর্ণ কাজ যেরূপ উৎসাহ ও প্রফুল্লতার সহিত সম্পাদন করিতেন, তাহা যেমন অনুকরণীয় তেমনি আদর্শস্থানীয়। প্রতিভাদীপ্ত, কর্মচঞ্চল, হাস্যোজ্জ্বল মুখার্জির সান্নিধ্যলাভের সুযোগ যাঁহারই হইয়াছে তাঁহার অমায়িক আচরণে তাঁহাকেই আকৃষ্ট করিয়াছে। তিনি কর্মজীবনে যে কৃতিত্ব রাখিয়া গেলেন, তাহা বাঙালীর ইতিহাসে সুদীর্ঘকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। গ-স

গল্প-প্রতিযোগিতা

প্রবাসীর পক্ষ হইতে আমরা গল্প-প্রতিযোগিতার আয়োজন করিতেছি। ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬ হইতে ১লা চৈত্র, ১৩৬৬-এর মধ্যে লেখকগণ-প্রেরিত গল্প লওয়া হইবে। প্রতিটি গল্প তিন হাজার হইতে ছয় হাজার শব্দের মধ্যে হওয়া চাই। গল্পের সঙ্গে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় অবশ্য লেখা প্রয়োজন :

১। নাম

২। ঠিকানা

৩। প্রেরণের তারিখ

৪। ইতিপূর্ব্বে সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রিকায় বা উভয়ে লেখকের কোন গল্প প্রকাশিত হইয়াছে কিনা।

৫। মোড়কের উপর অথবা গল্পের শিরোনামার পাশে লেখা থাকিবে প্রবাসীর গল্প-প্রতিযোগিতার জন্য।

গল্পের গুণানুসারে নিম্নরূপ পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে :

(ক) সর্ব্বোৎকৃষ্ট গল্পের জন্য পুরস্কার একশত টাকা,

(খ) পরবর্ত্তী শ্রেষ্ঠ দুটি গল্পের প্রত্যেকটির জন্য পুরস্কার পঁচাত্তর টাকা,

(গ) পরবর্ত্তী উৎকৃষ্ট পাঁচটি গল্পের প্রত্যেকটির জন্য পুরস্কার পঞ্চাশ টাকা।

এতদ্ব্যতীত যেসব গল্পের জন্য পুরস্কার দেওয়া হইবে না, অথচ প্রবাসীতে প্রকাশযোগ্য বিবেচিত হইবে সে সকল গল্পের নিমিত্ত লেখকগণকে যথানিয়মে দক্ষিণা দেওয়া যাইবে।

প্রকাশ থাকে যে, প্রাপ্ত পুরস্কার গল্প এবং অপ্রাপ্ত পুরস্কার অথচ প্রকাশযোগ্য সকল গল্পই ক্রমান্বয়ে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইবে।

গল্প-প্রতিযোগিতার জন্য প্রদত্ত গল্প অন্য কোন গল্পের অনুবাদ, আংশিক অনুবাদ বা ছায়া-অবলম্বনে লিখিত হইলে চলিবে না এবং অন্যত্র প্রকাশিত গল্প গ্রাহ্য হইবে না।

প্রবাসীর বিচার চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। গল্প-প্রাপ্তির শেষ-তারিখের পর যথাসম্ভব শীঘ্র প্রবাসীতে প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষিত হইবে। এ সম্বন্ধে কোন পত্রালাপ চলিবে না।

কর্ম্মাধ্যক্ষ—"প্রবাসী"

জীবনচর্চা বনাম সাহিত্যচর্চা

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী

আমরা বাঙালীরা আমাদের সাহিত্যের গৌরব করে থাকি। সাহিত্য আমাদের একটা বড় আত্মাভিমানের স্থল। আমরা এই বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করবার চেষ্টা করি যে, সাহিত্য ও কাব্য আমাদের মাথার মণিস্বরূপ; বাঙালী জাতির শ্রেষ্ঠ মহিমাচ্ছটা ওই মণি থেকেই বিকিরিত হয়েছে। ভারতবর্ষীয় সমাজে সাহিত্যের কারণেই আমাদের যা কিছু প্রতিষ্ঠা।

বাঙালী যে সহজাত ভাবে সাহিত্যপ্রিয় ও সাহিত্যকুশল জাতি তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ওই বৈশিষ্ট্যটাই আমাদের শ্রেষ্ঠ গৌরবের স্থল হওয়া উচিত কিনা, কিংবা তাতেই আমাদের সমস্ত অভিমান নিঃশেষিত হওয়া ভাল কি না সেকথা আমাদের বিচার-বিবেচনা করে দেখা কর্তব্য। বিশেষতঃ, আজকের দিনে সাহিত্যের যে খণ্ডিত অর্থ ও খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গী সমাজে প্রচলিত হয়েছে তাতে করে সাহিত্যের সূত্রে পূর্বের গৌরববোধ আর আঁকড়ে ধরার অবকাশ আছে কিনা সেকথা আমাদের ধীরচিত্তে ভেবে দেখা দরকার। কেন আমাদের এই দ্বিধা ও সংশয়াপন্ন মনোভাব তা একটু বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

আমরা দেখতে পাই, যুদ্ধোত্তর যুগের বাংলা সাহিত্যের মূল প্রকৃতি নানাদিক দিয়ে জাতীয়তার ঐতিহ্য থেকে স্খলিত হয়ে পড়েছে। প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় থেকে এই স্খলনের আরম্ভ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ওই প্রক্রিয়া আরও প্রবলতাপ্রাপ্ত ও ত্বরান্বিত হয়েছে। আজ প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর যাবৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি, বাংলা সাহিত্য তার মূল প্রেরণা একান্ত ভাবে ইউরোপীয় ভাবাদর্শ থেকে সংগ্রহের চেষ্টায় আছে। 'সবুজ-পত্রে'র কালে এই পাশ্চাত্ত্যীকরণের শুরু, তার পর 'কল্লোল', 'কালিকলম' প্রভৃতি অতি-আধুনিক পত্রিকার ধারা বেয়ে এখন পর্যন্ত ওই পাশ্চাত্ত্য-ভাবনাই আমাদের সাহিত্যে সমধিক বলবৎ রয়েছে বলা যেতে পারে। আত্যন্তিক পাশ্চাত্ত্য প্রবণতার পাশে পাশে তদ্বিপরীতে জাতীয় আদর্শের প্রভাবযুক্ত সাহিত্য যে রচিত হচ্ছে না এমন নয়, আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যের কতিপয় শ্রেষ্ঠ লেখক প্রকৃতপক্ষে জাতীয় ভাবেরই বিশেষরূপে উদ্‌গাতা, কিন্তু সব জড়িয়ে বিচার করতে গেলে যুদ্ধোত্তর-পর্বের বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য মনোভাবেরই জয়-ঘোষণা আমরা দেখতে পাচ্ছি।

সাহিত্যের উপর আত্যন্তিক পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের একটা কুফল হয়েছে এই যে, বাঙালী সংস্কৃতি-ভাবনা ও সংস্কৃতি-চর্চার যে একটা নিজস্ব আদর্শ রয়েছে তার বন্ধনসীমা থেকে সাম্প্রতিক সাহিত্যের ভাবনা চিন্তা-কল্পনা অনেক দূরে সরে গিয়েছে। সুস্থির জীবনচর্যার আদর্শ এখন আর লেখকদের কল্পনাকে তেমনভাবে উদ্দীপিত করে না; নীতি ও ধর্মবুদ্ধি-যুক্ত চিন্তা এখনকার নন্দনবাদী সাহিত্যিক ধারণায় প্রায়শঃ উপহসিত হয়—আজকের দিনে সাহিত্য নিছক লিখন-চাতুর্য আর আঙ্গিক-নৈপুণ্যে এসে ঠেকেছে। জীবনসম্পর্ক বিরহিত এই একান্তভাবে সাহিত্য-আশ্রিত চিন্তা ও কল্পনা সাহিত্যকে যে কি রিক্ততার দশায় এনে ফেলতে পারে তা সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের ধারা-ধরনের দিকে একনজর তাকালেই আমরা বুঝতে পারব।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে এ রকমটি ছিল না। সত্য বটে, তখনকার সাহিত্যের পরিধি আজকের মত এত বিস্তৃত ছিল না, লেখকদের সংখ্যা এবং কর্মতৎপরতাও ছিল আজকের তুলনায় অনেক সীমিত; কিন্তু যত জনাই বা যা-ই তাঁরা লিখে থাকুন না কেন, তার ভিতর তাঁদের প্রত্যয়ের জোর ছিল। সাহিত্যকে তাঁরা জীবনচর্যাবিমুক্ত বলে মনে করতে পারেন নি। জীবনে তাঁরা যা-কিছু গভীর ভাবে ভেবেছেন, অনুভব করেছেন, মনন ও ধ্যান-ধারণা করেছেন তারই ছাপ গিয়ে পড়েছে তাঁদের সাহিত্যের উপর। তাঁদের চোখে সাহিত্য জীবন-নিরপেক্ষ একটা নির্বস্তুক কল্পনামাত্র ছিল না, জীবনের সঙ্গে যোগেই তাঁদের সাহিত্য সার্থকতা লাভ করত। দেশের বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ভাবনা-ধারণা ও কর্মপ্রয়াসের সঙ্গে তাঁদের সাহিত্যসৃষ্টির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আদর্শবাদ তৎকালীন লেখকদের নিশ্বাস-বায়ু-স্বরূপ ছিল বললেও চলে।

এমন নয় যে. ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী গদ্য ও কাব্য-লেখকগণ সমসাময়িক পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার সঙ্গে অপরিচিত ছিলেন। মোটেই তা নয়, বরং সব জড়িয়ে বিচার করলে দেখা যায়, এখনকার লেখকদের তুলনায় তাঁদের পাশ্চাত্ত্য

সাহিত্যের সঙ্গে যোগ অনেক বেশী গভীর ছিল। তবু জাতীয়তার ভূমির উপর তাঁরা সকলেই দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান ছিলেন। ইউরোপীয় ভাবধারার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সম্মোহনজনিত প্রতিক্রিয়ায় গোড়ার দিকে কিছু অমিতাচার ও আতিশয্য ঘটেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ওই বিভ্রম কাটিয়ে উঠে জাতীয় ধ্যান-ধারণার কক্ষপথে ফিরে আসতে ও তথায় আত্মস্থ হতে তাঁদের বেশী বিলম্ব হয় নি। রেনেসাঁসের একটা প্রধান ধর্মই এই যে, তা নূতন নূতন সূত্র থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করে, কিন্তু সেই প্রেরণাকে কাজে লাগায় জাতীয়তার গভীরে আরও নিবিড় ভাবে প্রবেশ করবার জন্য। ভিন্ন দেশের সঙ্গে পরিচয় নব-ভাবে উদ্বুদ্ধ লেখকদের স্বদেশের বৈশিষ্ট্যকে আরও অন্তরঙ্গ ভাবে জানবারই শুধু প্রণোদনা দান করে। এটা কি পশ্চিম ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মূল কথা, কি উনিশ শতকীয় বাংলা রেনেসাঁসের মূল কথা। বাংলার নব-জাগৃতি আন্দোলন ইউরোপীয় ভাবধারার অনুশীলনজাত সমৃদ্ধতর অভিজ্ঞতার আলোকে জাতীয় ঐতিহ্যকে যে আরও সার্থকভাবে চিনতে পেরেছিল সে ইতিহাস সুবিদিত।

এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি কখনও জাতীয়-জীবনের বিভিন্ন দিকের প্রস্ফুরণ ভিন্ন কল্পনীয় নয়—একথা প্রতিপন্ন করতে চাওয়া। উনিশ শতকের বাংলা দেশে ধর্মে, সমাজ-সংস্কার চেষ্টায়, শিক্ষায় জাতীয়তার ভাবধারার প্রসারে ও অন্যান্য বিবিধ কর্ম-তৎপরতায় জাতীয় উদ্যমের যে সর্বাঙ্গীণ পরিস্ফুতি ঘটেছিল তার থেকে তখনকার সাহিত্য বিযুক্ত ছিল না। সমাজের আর দশটা কর্মের মত সাহিত্যও তখন দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন-পরিকল্পনার একটা দিক্‌ মাত্র ছিল এবং ওই পরিকল্পনার পরিধির ভিতর তার যথাযোগ্য স্থান নির্দিষ্ট ছিল। জীবনের পরিধি অনেক বড়, সাহিত্যের পরিধি সেই তুলনায় অনেক সঙ্কুচিত বলা যায়। সাহিত্যকে সামগ্রিক জীবন-চর্যার অংশ ও অধীনরূপে দেখলে তবেই তাকে যথার্থ দৃষ্টিতে দেখা হয়। উনিশ শতকের লেখকদের মনে জীবন সম্বন্ধে এই অখণ্ডবোধ ছিল বলেই সাহিত্যকেও তাঁরা প্রকৃত সার্থকতায় ভূষিত করতে পেরেছিলেন।

কিন্তু যখনই আমরা সাহিত্যকে অখণ্ড জীবন-সাধনার প্রভাব-পরিধি থেকে দূরে সরিয়ে এনে তাকে নিছক সাহিত্য-ভাবনার সীমাবদ্ধ আয়তনের মধ্যে সংকুচিত করে দেখবার চেষ্টা করব তখনই সাহিত্যের বিকার অনিবার্য। আজকের সাহিত্যে এমনতর বিকার প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে বলে মনে হয়। সাহিত্যচর্চা জীবনচর্যা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তার ফলে সাহিত্যে যেসব কুফল দেখা দেওয়া সম্ভব তার সবই একে একে দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। সামগ্রিক জীবনচর্যার আদর্শ থেকে সাহিত্য ক্রমশঃ অপসৃয়মাণ হওয়ার ফলে আমাদের মধ্যে এই ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, সাহিত্য বুঝি শুধুই ভাষা-চাতুর্যের বিকাশ সাধন ও আঙ্গিক নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের ক্ষেত্র, সাহিত্যের সঙ্গে আদর্শবাদের, নীতির, ধর্মবুদ্ধির যেন কোন সম্পর্ক থাকতে নেই। ইদানীন্তন কালের অধিকাংশ উপন্যাস-লেখক উপন্যাসকে একান্তভাবে কাহিনী পরিবেশনের ক্ষেত্র বলে মনে করেন, উপন্যাসের পশ্চাতে যে সুগভীর জীবন-বোধের একটা দৃঢ় পট বিলম্বিত থাকা দরকার সে কথা তাঁরা বিস্মৃত হন। অবশ্য এ কথার ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, তবে সব জড়িয়ে দেখলে, পর্যবেক্ষণ-নির্ভর, কাহিনী-পরিবেশন প্রবণতাটাই এ কালের উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ বলে মনে হয়।

এইখানেই বিপত্তির শেষ নয়। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শিল্প-সম্ভার যেন তেন প্রকারেণ কাটাবার বৈশ্য মনোবৃত্তি। শিল্পসৃষ্টি আজ আর তার অন্তর্নিহিত শিল্পোৎকর্ষের জন্য পুরা মর্যাদা পায় না; যে শিল্পকর্মের সঙ্গে বাণিজ্যিক সাফল্য-সম্ভাবনা জড়িত নয়, অশেষ গুণপনা থাকা সত্ত্বেও তার যে শুধু বাজারদরই নেই তা নয়, তার কৌলীন্যও স্বীকৃত নয়। এ বড় ভয়াবহ অবস্থা। আমরা সাহিত্যকর্মের ব্যবসায়িক দিক উপেক্ষা করি না, তা বলে ব্যবসায়িক মূল্যমানই যদি সাহিত্যের মর্যাদা নিরূপণের একমাত্র মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়, সে অতিশয় অপকৃষ্ট পরিস্থিতির সূচনা করে। অন্যান্য দশটা বিক্রেয় পণ্যের মত সাহিত্যও আজ জনতার হাটে নিছক বেচা-কেনার সামগ্রীর সামিল হয়ে পড়েছে।

এ সবই হতে পেরেছে সাহিত্য থেকে জীবন বিশ্লিষ্ট হয়ে যাবার ফলে। জীবন অর্থে এখানে জীবনের আধ্যাত্মিক, আত্মিক, নৈতিক দিকটির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ আদর্শবাদ উন্নত জীবনাচরণের ধারণা সমাজবোধ, পরহিত-ব্রত, সুমার্জিত রুচি ইত্যাদি মিলে জীবনের যে সার্থকরূপের ছবি আমাদের মনে জাগরূক রয়েছে, তার সঙ্গে এখনকার সাহিত্যের ধারা-ধরনের বিশেষ কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। এ যুগের সাহিত্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য বেড়েছে, ভৌগোলিক পরিধির প্রসার আর কর্মতৎপরতার গভীর বিস্তার হয়েছে—সবই স্বীকার করা গেল, কিন্তু একটি বড় মূল্যের বিনিময়ে আমরা এই সুবিধাগুলি লাভ করেছি। বাংলা সাহিত্যের বর্তমান মানসভঙ্গীর ভিতর চিত্ত দারিদ্র্য অতি প্রকট। চিত্তের এই রিক্ততা এসেছে, যে-কথা এই মাত্র বলা হয়েছে, জীবনচর্যা আর সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হওয়ার ফলে। বর্তমান লেখকদের মধ্যে নাকি

সমাজ-চেতনা প্রবল—এই রকম বলা হয়ে থাকে। বস্তুতঃ কোন কোন সমালোচক সমাজ-চৈতন্যকে এ যুগের সাহিত্যের একটি প্রধান লক্ষণ রূপে নির্দেশ করে থাকেন। কিন্তু এঁদের নিকট আমাদের জিজ্ঞাস্য, সমাজ চৈতন্য কি নীতিকে বাদ দিয়ে, ধর্মবুদ্ধিকে বাদ দিয়ে? ব্যক্তিগত জীবনাচরণে ফাঁক এবং ফাঁকি রেখে কি সাহিত্যকে ফলেফুলে সুশোভিত করে তোলা যায়? জীবনের সাধনায় নানাবিধ বিচ্যুতি রয়ে গেল সেদিকে দৃকৃপাতমাত্র করলাম না অথচ সাহিত্যের সাধনায় উত্তুঙ্গ কৃতিত্বের সৌধ গড়ে তোলার আশা করলাম—এ রকম বিপরীত প্রবৃত্তির সার্থক সহ-অবস্থান কি সম্ভব? এই যে আজকাল কথায় কথায় দুর্গত-নিপীড়িত শ্রেণীর মানুষের জন্য সাহিত্যের পাতায় দরদ আর সমবেদনার স্রোত বইয়ে দেওয়া হয়, তা কবিগুরুর ভাষায় 'সৌখিন মজদুরী'র এক কাঠিও উপরে কেন উঠতে পারছে না তা কি শ্রমিক-দরদী লেখকগণ কখনও ধীরচিত্তে ভেবে দেখেছেন? আত্মোন্নয়নের সাধনা-ব্যতিরিক্ত যে সমষ্টি-কল্যাণের সাধনা তার মূলেই গলদ। ব্যক্তি-জীবনের চিন্তায় কর্মে ও আচরণে পরিশুদ্ধ হবার চেষ্টা না করে যাঁরা সমষ্টির কল্যাণ-বিধানের চেষ্টা করেন, তাঁরা সমাজ-হিতব্রতের গোড়ায় কোপ মারেন। ইংরেজী বাক্যরীতি অনুসরণ করে তাঁদের এ চেষ্টাকে ঘোড়ার আগে গাড়ীজোতা-রূপ বিচ্যুতির দোষে দুষ্ট বলা যেতে পারে। এ যুগের সাহিত্যের প্রবহমান সমাজ-চেতনার আদর্শের একটা মস্ত ভ্রান্তি এই যে, তা সমষ্টিকে একটা আকারহীন যৌথসত্তা বলে মনে করে, রাষ্ট্রের (state) হেগেলীয় ধারণার মতই তা এক বিমূর্ত (abstract) কল্পনা বই আর কিছু নয়। কিন্তু সমষ্টি কি ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে কল্পনীয়? বহু বহু ব্যক্তির সমবায়েই ত সমষ্টির কলেবর গঠিত। আর এ কথা যদি আমরা একবার স্বীকার করে নিই তা হলেই দেখা যাবে, সমষ্টি-কল্যাণেরও আগে আমাদের ব্যক্তিক উন্নয়নের কথা ভাবা দরকার। ব্যক্তির আধ্যাত্মিক, আত্মিক, নৈতিক স্বভাবের শোধন না হলে আমরা সমষ্টির কল্যাণবিধান করব কোন্ হাতিয়ারের সাহায্যে?

এ সব কথা সাহিত্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে আপাত-দৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ সম্পর্কবিহীন জল্পনা মনে হতে পারে, কিন্তু তা নয়। আমরা সাহিত্যের পটভূমিকা সচেতন ভাবে মনে রেখেই এই ব্যক্তি-সমষ্টির প্রশ্নের অবতারণা করেছি। আমরা সাম্প্রতিককালে জীবন আর সাহিত্যের বিয়োগের কথা বলছিলাম। জীবন হ'ল ব্যক্তির প্রতীক, আর সাহিত্য হ'ল সহিতত্বের অর্থাৎ সমষ্টির সঙ্গে সম্পর্কের প্রতীক। একে আত্মোন্নয়ন চেষ্টা; অপরে আত্মোন্নয়নের পরিশুদ্ধ ফল বহু মানুষের মধ্যে বিতরণের প্রয়াস। নিজে শুদ্ধ হলে তবে ত অন্য অনেক মানুষকে উচ্চ ভাবনায় দীক্ষিত, মহৎ কল্পনায় অনুপ্রাণিত করে তোলা সম্ভব। আমরা জীবন-সাধনায় জয়যুক্ত হওয়ার প্রয়োজনের কথা বলি না, এদিকে সাহিত্য-সাধনায় বুঁদ হয়ে যেতে চাই। সাহিত্য কি জীবন-পরিকল্পনার বাইরে? সে কি নিছকই লীলাবাদ? মহৎ মূল্য-বোধ আর আদর্শবাদ ধ্যান-ধারণা বিরহিত যে সাহিত্য, সে সাহিত্য সৌন্দর্যসৃষ্টির নামে আমাদের প্রাণ-মন কতটুকু ভরাতে পারে?

এই প্রশ্নেই যত গেরো। বর্তমান বাংলা সাহিত্যে যে অগুনতি গল্প-উপন্যাস-আধুনিক কবিতা ইত্যাদির সৃষ্টি হচ্ছে, তার সঙ্গে জীবন-সাধনার কতটুকু যোগ আছে, সে জিজ্ঞাসা কি সংশ্লিষ্ট লেখকদের মনে কখনও কোন উপলক্ষে উঁকি দিয়েছে? তাঁরা কি কখনও আত্মানুসন্ধান করে দেখেছেন তাঁদের রচিত সাহিত্যের মধ্যে মহৎ ও উচ্চ জীবনাদর্শের কতদূর প্রণোদনা রয়েছে? নিরবচ্ছিন্নভাবে কেবল পর্যবেক্ষণ-নির্ভর সাহিত্য সৃষ্টি করলেই ত হ'ল না, তার পিছনে জীবনানুভূতি থাকা চাই, নয় ত সে সাহিত্যের প্রকৃত মর্যাদা লাভের সম্ভাবনা দেখা যায় না। উপন্যাসে যাঁরা শুধু কাহিনী-পরিবেশনে তাঁদের সকল মনোযোগ ও উদ্যম ব্যয় করেন, তাঁরা উপন্যাস সৃষ্টির প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে অবহিত নন বলেই মনে হয়। কাব্যকে যেমন জীবনের সমালোচনা (criticism of life) বলা হয়, তেমনি উপন্যাসও হ'ল জীবনের একপ্রকার গঠনাত্মক সমালোচনা। জীবনচর্যার সশ্রদ্ধ অনুশীলন ব্যতিরেকে এ সমালোচনার বোধ লেখকের মনে উদ্রিক্ত হওয়া সম্ভব নয়। এবিষয়ে পাশ্চাত্য একজন সমালোচকের অভিমত বাস্তবিকই প্রণিধানযোগ্য—

"The money rewards of the successful novelist allure to the profession not a few men destitute of any sense of responsibility for the use of their gifts; and the fact that these rewards are often to be won by pandering to the unrefined or actually base tastes of the multitude throws a temptation in their way which some otherwise well-endowed writers have not been able to resist. But in the right hands the novel, by the very fact of its being so closely in touch with actual life, has a magnificent opportunity to take a large share in moulding the thought of the new age. It will do well if it listens to the suggestion of Matthew Arnold's often-quoted definition of poetry, and takes as

its mission the offering of a constructive criticism of life."

(A. I. Du Pont Coleman of Fiction, Encyclopaedia of Religion and Ethics, Second Impression, 1930)

এর অর্থ, সফল ঔপন্যাসিকের আর্থিক প্রতিষ্ঠা এমন অনেককে লেখক-বৃত্তি গ্রহণে প্ররোচিত করে, যাঁদের মধ্যে তাঁদের ক্ষমতার প্রয়োগ সম্বন্ধে কোনরূপ দায়িত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায় না। জনতার অমার্জিত কিংবা স্থূল রুচির চাহিদা মেটাতে পারলে প্রায়ই বেশ দু'পয়সা গুছিয়ে নেওয়া চলে, এই দেখে তাঁরা প্রলুব্ধ হন। কেউ কেউ সুলেখক হয়েও এই প্রলোভন দমন করতে পারেন না। কিন্তু যোগ্য লেখকের হাতে পড়লে এই উপন্যাসই বাস্তব জীবনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য হেতু নূতন যুগের ভাবনা কল্পনার নিয়ন্ত্রণে একটা বড় ভূমিকা গ্রহণের চমৎকার সুযোগ লাভ করতে পারে। ম্যাথু-আর্নল্ড বর্ণিত কাব্যের সংজ্ঞা থেকে সংকেত গ্রহণ করে উপন্যাস যদি জীবনের রচনাত্মক সমালোচনা প্রচারকে তার ব্রত হিসাবে নেয় তবে কাজ হয়।

পূর্বেই বলেছি, জীবনের এই রচনাত্মক সমালোচনার সঙ্গে জীবনচর্যার যোগ অতি নিগূঢ়। ব্যক্তিগত জীবনে অনুক্ষণ ভাবনা, চিন্তা, মনন, বিশ্লেষণ, আত্ম-সমালোচনা, আত্ম-শুদ্ধির চেষ্টা—এসব থেকেই ক্রমে জীবনের সামগ্রিক ধারণার নাগাল পাওয়া যায়, আর সেই সামগ্রিক ধারণা সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলতে পারলে তবেই সাহিত্য যথার্থ সার্থকতা প্রাপ্ত হয়, তৎপূর্বে নয়। আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা দরকার, জীবন সাহিত্যের চেয়ে অনেক বড়। সাহিত্য জীবনের একটা দিক্ মাত্র; পরন্তু সাহিত্য শিল্প-সংস্কৃতি, জ্ঞান-সাধনা, ধর্ম, সমাজসেবা, রাজনীতি, কর্ম, জীবিকা ইত্যাদি বিচিত্র অভিব্যক্তি মিলিয়ে জীবনের বৃত্ত পূর্ণ। শিল্পের দাবির চেয়ে জীবনের দাবি বহু বহু গুণে ব্যাপক ও গভীর। সুতরাং স্বভাবতঃই শিল্প-সাহিত্য জীবন-পরিকল্পনার অংশ ও অধীন একটি খণ্ডিত সাধনার এলাকা মাত্র, শিল্প-সাহিত্যের আওতার বাইরে জীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে।

সাহিত্য-সাধনাকে যথার্থ ফলপ্রসূ করে তুলতে হলে জীবনের এই সামগ্রিক পরিকল্পনার বোধ লেখক-মনে সুগ্রথিত হওয়া দরকার। নয় ত সাহিত্যের এলাকা শুধু অসার বস্তুতেই ভরে ওঠা সার হবে। পরিতাপ এই যে, বর্তমান যুগটাই এমন যে, এযুগে জীবনবান না হয়েও লেখক হওয়া যায়, সংস্কৃতিকে জীবন থেকে সর্বৈব ছাঁটাই করেও সংস্কৃতিবান বলে নিজের পরিচয় দেওয়া যায়। জীবনানুশীলন ব্যতিরেকে সংস্কৃতি অর্থহীন। বহু বিষয়ে মন সুকর্ষিত, সুমার্জিত না হলে সংস্কৃতিবত্তার গৌরব করা চলে না। জীবনের সাধনা আর সংস্কৃতির সাধনা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বর্তমান শিল্প-সাহিত্যের এলাকায় এই একান্ত আবশ্যক-বোধটির অত্যন্তই অভাব দেখা দিয়েছে।

দীপশিখা

শ্রীকালিদাস রায়

বিজলীর বাতি জ্বলে বড় বড় শহরে
ছোট ছোট শহরেতে কেরোসিন।
দীনের কুটীরে গ্রামে, বসতির ভিতরে
দীপশিখা জ্বলিতেছ চিরদিন।

তিন শ' বছর আগে যতগুলি জ্বলিতে,
তারো বেশী জ্বলে আজ, কমে নাই।
কুটীর বেড়েছে ঢের তাই চাই বলিতে,
তোমার প্রতাপ আজো দমে নাই।

'বিজলীর যুগ এটা'—বিলাসীরা বলিছে
সারা দেশে নজর যে পড়ে না।
দেখে না যে লাখ লাখ দীপ আজো জ্বলিছে
কাঙালে মানুষ বলি' ধরে না।

বিজলীতে শহরের রাতগুলি হোক দিন,
দীপশিখা তুমি অমরতা পাও।
কুটীরের চন্দ্রমা রও তুমি অমলিন,
নয়ন না ঝলসিয়া আলো দাও।

প্রাঙ্গণে তুলসীর ডালে ডালে বাঁধি তার,
বিজলীর বাতি সাঁজে জ্বলিবে ?
মন্দিরে পূজারীর বাল্‌ব হাতে প্রতিমার
নিত্য আরতি কি গো চলিবে ?

দীপশিখা তব আলো পোড়া আঁখি জুড়াবে
ফুরাল তোমার দিন কে বলে ?
আকাশে তারার দিন কখনো কি ফুরাবে
বিজলী জ্বলিছে বলি ভূতলে ?

ফাংশন

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

নটবর ঘোষ লেনের তিরিশ নম্বর বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল জনচারেক ছেলে।

বাড়ীটা প্রকাণ্ড নয়, দুয়োরে শান্ত্রী-পাহারাও নাই, তবু ছেলেগুলির মুখে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার ঈষৎ ম্লান ছায়া। দুয়োরের কড়া নাড়তে সাহস হচ্ছে না কারও।

বাড়ীটা প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রমণীমোহন মিত্রের। সাহিত্যের নানা বিভাগে নয়—একটি মাত্র বিভাগে আর সেইটিই আধুনিক পাঠকগোষ্ঠীর সবচেয়ে প্রিয় বিভাগ—অর্থাৎ কথা-সাহিত্যে রমণীমোহনের খ্যাতি বাংলাজোড়া—(বিজ্ঞাপনের ভাষায় পৃথিবীজোড়া, যদিও এযাবৎ তাঁর কোন বই পৃথিবীর অপর কোন ভাষায় অনূদিত হয় নি।) তা খ্যাতি ওঁকে যত উর্দ্ধেই তুলুক সাহিত্য-অনুরাগী ছেলেদের সঙ্কোচ হবে কেন ওঁকে সাহিত্য-অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ জানাতে এসে? অবশ্য বিনা উপলক্ষে আলাপ-আলোচনা করতে এলে সঙ্কোচ হয়। তখন জ্ঞান বা বিদ্যাবত্তার কথা ভেবে কিংবা ক্ষুরধার আলোচনার আবর্ত্তে পড়বার ভয়ে অথবা অসাধারণ ব্যক্তিত্বের ভারে বক্তব্যকে ঠিকমত গুছিয়ে উপস্থাপিত করতে পারবে কি না এই সন্দেহ দ্বিধায় বিচলিত হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। ছেলেদের সঙ্কোচের মূলে ছিল অন্য কারণ,—একটি বহুশ্রুত কাহিনী। ওরা শুনেছে রমণীমোহন অত্যন্ত রাশভারি মানুষ। কোন সভা-সমিতিতে, বিশেষ করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদান করা পছন্দ করেন না। চিরকালই যে উনি সভা-বিদ্বেষী ছিলেন—তা নয়। অল্প কিছুদিন থেকে—প্রায় মাসতিনেক হবে উনি সর্ব্বপ্রকার সভা-সমিতি উৎসব-অনুষ্ঠান বর্জ্জন করেই চলেছেন। ইদানীং বহু সভা-আহ্বায়ক, বহু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ওঁকে সভাপতিত্বে বরণ করতে এসে বিফলমনোরথ হয়েছেন। শুধু বিফলমনোরথ নয় রীতিমত কড়া কড়া কথাও শুনেছেন। পারতপক্ষে আজকাল ওঁর কাছে কেউ আসছেন না।

তবে উৎসব-অনুষ্ঠানগুলি যে একেবারে পরিহার করেছেন তাও নয়। এই কিছুদিন আগে কোন বিশেষ বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করেছেন—আবার একজন অপরিচিতকেও আশ্বাস দিয়ে দায় উদ্ধার করেছেন। মোটের উপর মানুষটি খাম-খেয়ালিতে ভরা।

ওরা কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যে করে হোক ওঁর সম্মতি আদায় করবেই। ওরা চায় না এমন কোন যশস্বী সাহিত্যিককে যাঁরা যে কোন অনুষ্ঠানের পক্ষে সুলভ। তাঁরা ত হামেশাই সভাস্থ হচ্ছেন—একটি দিনে তিন-চারটি সভা ছুঁয়ে একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে শ্রোতৃমণ্ডলীকে ধন্য করছেন। আর সেই সঙ্গে সুধীজনের কৌতূহলকে বেশ খানিকটা স্তিমিত করে দিচ্ছেন। ওরা চায় সভাক্ষেত্রে দুর্লভ-দর্শন পুরুষ—যাঁকে সভাপতি বা প্রধান-অতিথি করে নিয়ে যাওয়া মানেই সভার গৌরব বর্দ্ধন আর সমিতির পরমায়ু অর্জ্জন। এ ছাড়া নূতন কিছু করার মোহও ত রয়েছে।

কিন্তু সম্প্রতিকালে এমন একটি ঘটনা ঘটেছে যা নাকি লোকের মুখে মুখে ফিরছে এবং এরাও তা শুনেছে। শুনে যদিও ওদের মনে হয়েছে এটা দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা, তবু হতোদ্যম হয় নি ওরা। সব রকম কঠিন কথা শোনবার এবং নির্দ্দয় ব্যবহার পাবার আশা করেই প্রস্তুত হয়ে এসেছে ওরা।

ওরা বাজী ফেলে এসেছে। জাঁক করে বলেছে, এমন একজন বিখ্যাত সাহিত্যিককে এবার আনব যাঁকে সাধারণ সভা-সমিতিতে বড় একটা দেখা যায় না। যিনি যে কোন ধরনের সভার নাম শুনলেই উচ্ছল হয়ে ওঠেন না, অনুনয়-বিনয়, স্তুতি-তোষামোদে যিনি অবিচলিত চিত্ত, যিনি ঈশ্বরের চেয়েও খেয়ালি আর লোহের মত অনমনীয় তাঁকেই আনব আমরা।

প্রতিজ্ঞার ঘোরে, উত্তেজনার আবেগে এতটা পথ ছুটে এসে তিরিশ নম্বর নটবর ঘোষ লেনের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করছে কেমন করে খবরটা পৌঁছে দেবে ভিতরে? নাম ধরে সম্বোধন করবে, না দুয়োরের কড়া নাড়বে? কোন্‌টা অধিকতর শোভন বা যুক্তিযুক্ত?

তার আগে মাসতিনেক পূর্ব্বে যে ঘটনাটি ঘটেছে—যা ওরা শুনেছে, বাংলা দেশের অনেকেই বিশেষ করে যাঁরা সাহিত্যের আনাচে-কানাচে উঁকি মারেন কিংবা যাঁরা দৈনিক সংবাদপত্র ও সিনেমা পত্রিকা পড়ে সাহিত্য-চর্চ্চা করছি ভেবে আত্মতৃপ্তি লাভ করেন, এঁরা সকলেই জানেন ঘটনাটা। এখানে আসবার আগে ওদের মধ্যেও আলোচনা হয়েছিল সেই ঘটনা নিয়ে। অবশ্য তার খুঁটিনাটি তথ্য ওরা

জানত না, কেউই তা জানেন না। আমরাই কি জানতাম? ভাগ্যিস ট্রেনের সেই পরোপকারী ব্যক্তিটি এবং বিখ্যাত সমালোচক অবনী সমাদ্দারের মুখে সবটা শুনেছিলাম। তার সঙ্গে নিজেদের উর্ব্বর কল্পনাশক্তিকে মিশিয়ে নিয়েছি অবশ্য। তর্ক উঠবে, বাস্তব ঘটনার সঙ্গে কল্পনার ভেজাল দেবার কি প্রয়োজন? প্রয়োজন এই কারণে—খাঁটি সোনায় যেমন নয়নলোভন অলঙ্কার হয় না, তেমনি নিছক বাস্তব বর্ণনার দ্বারা মনোরোচক কাহিনী তৈরি করা যায় না। অতএব ছেলেরা দুয়োরের কড়া নাড়বার আগে মাসতিনেক আগেকার সেই ঘটনাটা তুলে দিচ্ছি :

মাসতিনেক আগে চৈত্রের প্রথমে সাহিত্য-সমালোচক অবনী বলল, দাদা, কলকাতার বাইরে এক জায়গায় যাবেন? বেশী কাছেও নয়, আবার খুব দূরেও নয়। চলুন দু'জনে মিলে ঘুরে আসি।

রমণীমোহন বললেন, শহরের বাইরে যেতে ত খুব ইচ্ছে করে, কিন্তু সাহস হয় না।

কেন দাদা, নিজেদের ত কোন ঝঞ্চাট পোয়াতে হবে না, ওরা নিয়ে যাবে গাড়ী করে—রাখবে রাজসমাদরে। এতে ভাবনার কি আছে?

একটু থেমে বলল অবনী, কালও ওরা এসেছিল আমার কাছে। ফাংশনটা শুনলাম জাঁকিয়েই হবে। গাড়ীভাড়া বলে কিছু আগাম টাকা দিতে এসেছিল, নিইনি। আপনার সম্মতি না পেলে—

রমণীমোহন বললেন, না এতে আর অসম্মতির কি আছে? তবে সবটা না জেনে—

অবনী বলল, আমি কি না জেনেশুনে একটা বাজেমার্কা জায়গায় আপনাকে নিয়ে যাব? যাবেন মফঃস্বলের চমৎকার একটি গ্রামে, থাকবেন ওখানকার এক জমিদার বাড়ীতে রাজার হালে। যাওয়া-আসায় বাষ্পযান, পেট্রলযান, জল-যান চাই কি গোযান পর্য্যন্ত চড়ার সখ মিটবে। যে খোলা-মেলা মাঠ আর নীল আকাশ আর সবুজ শস্যক্ষেত নিয়ে গল্প-উপন্যাস লেখেন—তা দেখবেন দু'চোখ ভরে। হয় ত এমন রিয়ালিষ্টিক ঘটনাও চোখে পড়বে যার ছবি পাকাপাকি ভাবে তুলে দিতে পারবেন সাহিত্যে।

তবু বললে না আসল ব্যাপারটা কি? খালি থাকা-খাওয়া-বেড়ানোর কথাই বলছ ফলাও করে।

অবনী হেসে বলল, দাদা, থাকা-খাওয়া-বেড়ানটাই ত আসল—সাহিত্য সভা হ'ল ফাউ। তা হলে শুনুন আসল বৃত্তান্ত। নরসিংপুরে একটা মেলা বসে তিন দিন ধরে—ওখানকার বিখ্যাত কবি ত্রিলোচন রক্ষিতের নামে। বিশ বছর আগেকার কয়েকটি পত্রপত্রিকা খুললে কবি ত্রিলোচন রক্ষিতের কবিতার সঙ্গে পরিচয় হবে। যদিও বাংলা সাহিত্যে তাঁর দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়, ওখানকার লোকেরা ওকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। ওর নামে সভা হয়, একটি মেলাও বসে। একজন রাজপুরুষ মেলার উদ্বোধন করেন। একজন সাহিত্যিক থাকেন সভাপতি আর একজন সাহিত্যিক প্রধান অতিথি। আপনাকে ওঁরা সভাপতি করতে চান, আমাকে প্রধান অতিথি। কি দাদা রাজী ত?

তা তুমি যখন যাচ্ছ, না বলি কি করে।

তবে একটা কথা বলে রাখি—আমাদের হয় ত দু'দিন আটকাবে ওরা।

দু'দিন কেন?

একদিন স্মৃতিসভা আর একদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অর্থাৎ—

থাক আর ব্যাখ্যা করতে হবে না। আমি কিন্তু দু'দিন থাকতে পারব না—আমরা অসংস্কৃতের দল—

অবনী হাসল, দাদা মিছেই রাগ করছেন। কালের হাওয়া কি হাত দিয়ে ফেরাতে পারেন। দেশেবিদেশে পৃথিবীর সব জায়গাতেই সংস্কৃতির মনোলোভা চেহারাটার জয়জয়কার। ও না থাকলে আমরাও শূন্য। যাক—তা হলে আজই জানিয়ে দিই ওদের।

কল্পনায় রঙীন চিত্র আঁকতে আঁকতে অবনী আর রমণীমোহন ট্রেণে এসে বসলেন। ওঁদের নিয়ে যাবার জন্য যারা এসেছিল তারা উঠল অন্য কামরায়।

ট্রেণ ছাড়বার আগে ওদেরই একজন বলল, এই পাশের থার্ড ক্লাসেই রইলাম স্যার। মাইক, ফুল, হ্যাণ্ডবিল, প্রোগ্রাম আরও নানান জিনিস ম্যানেজ করে নিয়ে যেতে হচ্ছে স্যার—আমরা মাত্র তিনজন—বুঝতেই ত পারছেন। কিছু মনে করবেন না—

অবনী বলল, না না, এতে আর মনে করাকরির কি আছে—তা আপনার নামটি কি ভায়া?

আমার নাম মদন। আমাকে আর আপনি কেন স্যার—আমি আপনাদের ছোট ভায়ের মত। বিনয়ে অবনত হয়ে ছেলেটি দুজনের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

একজন সবে ইস্কুল-ছাড়া কিংবা নতুন চাকরি-পাওয়া তরুণ ওপাশের বেঞ্চিতে বসে ফুটবল খেলার আলোচনা করতে করতে প্রায় হাতাহাতির প্রাক্-মুহূর্ত্তে পৌঁচেছিল। মদনের মুখে মাইক, ফুলের মালা প্রভৃতি শব্দগুলি শুনে ওরা উৎকর্ণ হয়ে উঠল। মদন প্রণাম সেরে গাড়ী থেকে নামবার উপক্রম করতেই ওদের মধ্যে জনদুই একসঙ্গে বলে উঠল, বড়দা, শুনুন, আপনাদের ফাংশনটা কোথায় হচ্ছে?

মদন মুখ ফিরিয়ে জবাব দিল, নরসিংপুরে।

ওহো—ওই যে কি একটা মেলা বসে ওইখানে।

হাঁ, কবি ত্রিলোচন রক্ষিতের স্মৃতিমেলা।

মস্তবড় নাম বড়দা—মনে থাকবে না। তা আপনাদের প্রোগ্রাম কি? ভাল ভাল আর্টিস্ট আনাচ্ছেন ত কলকাতা থেকে? ওই যে প্লে-ব্যাকে যাঁর গান শুনি সব ছবিতেই—রাত্রি দে—তাঁকে আনাচ্ছেন ত?

সবাই আসবেন। এ ছাড়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট আসছেন। আরও দু'জন বিখ্যাত সাহিত্যিক আপনাদের সামনেই রয়েছেন—এঁরাও যাচ্ছেন অনুষ্ঠানে।

ছোকরার দল একবার অপাঙ্গে চোখ বুলিয়ে নিল রমণীমোহন ও অবনীর দিকে। ওদের চোখেমুখে একটুও আগ্রহের চিহ্ন ফুটে উঠল না।

মদন তখন প্ল্যাটফরমে নেমেছে—ওরা তিন-চার জন একসঙ্গে জানালা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে বলে উঠল, ফাংশনটা কবে হচ্ছে বড়দা? মানে আর্টিস্টরা কবে আসচেন?

দুর থেকে কি যেন বলল মদন। তিন-চার জন একসঙ্গে বেঞ্চি চাপড়ে কলরব করে উঠল, তবে মাইরি যেতেই হবে।

অতঃপর সিনেমা-প্রসঙ্গ নিয়ে তুমুল তর্ক সুরু হ'ল।

রমণীমোহন গলা নামিয়ে বললেন, ভ্যালা এক সেকেণ্ড ক্লাসে তুলে দিয়ে গেল! ছোঁড়াগুলো সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কেটেছে ত?

অবনী ফিসফিস করে বলল, ক্ষেপেছেন দাদা! ওরা অল ক্লাসের পুষ্যিপুত্তুর।

ওদের ভাগ্য ভাল বলতে হবে। এই সময়ে প্ল্যাটফরমের দুর প্রান্তে কালো আলপাকার কোট গায়ে চেকারের আবির্ভাব। জানালায় গলা বাড়ানো একটি ছেলে বলে উঠল, ওরে মামা আসছে রে!

যেমন বলা দলটি চটপট উঠে পড়ল—আর চক্ষুর পলক পড়তে না-পড়তে কামরাটা খালি হয়ে গেল।

অবনী বলল, যাক্—বাঁচা গেল।

রমণীমোহন বললেন, ওদের একজন কিন্তু আমাদের সঙ্গে থাকলে ভাল হ'ত। ধর, চা-টা খেতে হবে ত।

অবনীমোহন বলল, ঘাবড়াবেন না দাদা—সঙ্গে যখন যাচ্ছে—ঠিক সময়ে এসে ব্যবস্থা করবেই। আপনি বসুন ত স্থির হয়ে।

স্থির হয়ে বসবার উপায় কি। দু'একটা স্টেশন পার হতে না হতে রমণীমোহনের চায়ের পিপাসা প্রবল হয়ে উঠল। গাড়ীতে চাপলেই অধিকাংশ চা-খোর যাত্রীর এটা হয়ই। বড় জংশন স্টেশন এলে চাওয়ালারা যখন ঝাঁকে ঝাঁকে গাড়ীর কামরাগুলি আক্রমণ করে তখন কে এমন চা-লোভী স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি আছেন—

আধঘণ্টা পরে মাঝারি মত একটা জংশন স্টেশনে থামতেই রমণীমোহন আকুল হয়ে উঠলেন।

অবনীভায়া, এইবার চা আর কিছু নোন্‌তা খাবার পেলে ভাল হ'ত। ট্রেণ জার্নিতে খিদেটা বেশ বাড়ে দেখছি।

যা বলেছেন। তা ওদেরও কোন হুঁস নেই দেখছি। দরজার কাছে এসে দাঁড়াল অবনী।

নামব কি নামব না করতেই পাঁচ মিনিট কেটে গেল—গাড়ী ছাড়বার ঘণ্টা পড়ল। তখন ভেণ্ডাররা একজোটে কামরার সামনে এসে ঐকতানে গলা সাধছে।

রমণীমোহন অধৈর্য্য কণ্ঠে বললেন, গাড়ী ছেড়ে দিল যে, ছোঁড়াটা গেল কোথায়? দু'খানা টিকিট কেটে গাড়ীতে বসিয়ে দিয়ে কৃতার্থ করে দিয়েছে দেখি!

অবনীর মেজাজও ভাল ছিল না। কিন্তু সে ক্রোধ প্রকাশ করবে কার উপর? অনেক কষ্টে মনোভাব সংযত করে বলল, যা বলেছেন দাদা—আজকালকার ছেলেরা ভারি ইরেস্‌পন্‌সিব্‌ল। ফুল আর মাইক নিয়েই মেতে রইল। যাদের বাণী ছড়িয়ে মাইক জাঁকিয়ে তুলবি—তাদের কথাই একদম ভুলে গেলি! নামবার সময় দেখে নেব—

তা ত নেবে, এখন চায়ের তৃষ্ণা মেটে কিসে? তুমি ত বাড়ী থেকে দিব্যি সেঁটে এসেছ—

আপনি ক্ষেপেছেন—আপনার বৌমাটি সেই পাত্রীই বটে! ভারি হিসাবী। চায়ের কথা তুলতেই জবাব দিলেন, এখন সাত-তাড়াতাড়ি চায়ের হাঙ্গামা করে কে? যাচ্ছ ত রাজবাড়ীতে—থাকবে রাজার হালে, তাঁরা কি এক কাপ চা আর এক প্লেট নোনতা মিষ্টি খাওয়াবেন না! যেন এক লাফে রাজবাড়ীতেই পৌঁছব আমরা—পথটা ফাউ!

রমণীমোহন হেসে ফেললেন। বললেন, ভায়া কি জাতিস্মর হলে? ত্রেতার স্মৃতিটা উপমার ক্ষেত্রে টেনে আনা ঠিক হচ্ছে না।

অবনী লজ্জিত হাস্যে বলল, দেখুন ত ওদের আক্কেল! পরের স্টপেজে নেমে ওই ছোকরার কান ধরে যদি না নিয়ে আসি—

নামতে হ'ল না—পরের স্টপেজে মদনই গাড়ীর দরজায় এসে বলল, নামুন স্যার, আমরা পৌঁছে গেছি।

এখনও তিনটে স্টেশন আছে না?

আজ্ঞে, আমরা এইখানে নেমে সর্টকাট করব।

তা বাপু সর্টকাট কি সব দিক থেকেই করতে চাও? রমণীমোহন উষ্ণকণ্ঠে বললেন।

সে কি স্যার—

বলি অতিথিদের ত ট্রেণে তুলে দিয়ে খালাস—তার পর তারা রইল কি গেল…চা টা—

ইস্—ভারি অন্যায় হয়ে গেছে স্যার। মদন ব্যস্ত হয়ে উঠল। রঞ্জিৎ—রঞ্জিৎ—

ওর ডাকে ঘাড়ছাঁটা লম্বা চুল—লম্বা গলা একটি ছেলে অদূর থেকে জবাব দিল, ইয়েস মদনদা—

মদন চেঁচিয়ে বলল, বলি তোদের আক্কেলটা কি? আমি মাইক টাইক সামলাচ্ছিলাম—তুই কোথায় এদিক সামলাবি, তা না—

রঞ্জিৎ কাছে এসে বলল, আমার কি দোষ মদনদা, ট্রেণে উঠবার আগে এঁদের চিনিয়ে দিতে যদি—

মদন সকাতরে এঁদের পানে চেয়ে জিভ কাটল, এ-হে হে—সত্যি আমারই অন্যায়। মাপ করবেন স্যার, আসুন ষ্টেশনের ষ্টলে বসে চা-টা…হাঁরে রঞ্জিৎ, শুধিয়ে আয় ত মালবাবুকে—এদিকে অসুক-টসুকগুলো একটু কমেছে কি?

কোথায় কমেছে! রঞ্জিৎ মাথা ঝাঁকিয়ে লম্বা চুলগুলিকে পিছনে ঠেলে দিতে দিতে জবাব দিল, এই ত আসবার সময় দেখলাম—চারটে ষ্ট্রেচার রয়েছে প্ল্যাট-ফরমে।

রমণীমোহন উৎসুক হয়ে বললেন, কি অসুখ?

আজ্ঞে সে আর শুনে কাজ নেই। চায়ের জন্য ত গরমই খাবারগুলো না হয় জিজ্ঞেস করে—

না না, আর চা-টা দরকার নেই। সত্রাসে বলে উঠলেন রমণীমোহন।

ওর কথাটা লুফে নিয়ে মদন বলল, সেই ভাল, মনের ধুকপুকুনি রেখে না খাওয়াই ভাল। আর ঘণ্টাদুয়েকের জানি বইত না—একেবারে সেখানে গিয়েই—

রঞ্জিৎ মাথা ঝাঁকিয়ে চুলগুলিকে পিছনে ঠেলে দিয়ে হাত জোড় করল, অপরাধ নেবেন না স্যার—দেখতেই ত পাচ্ছেন—আমরা মাত্র তিনজন—এনি হাউ ম্যানেজ করে নিয়ে যেতে হচ্ছে—

ঠিকানায় পৌঁছতে বেশ কিছুক্ষণ লাগল। একে চৈত্রের গুমোট গরম—তার উপর চায়ের মৌতাত মেটে নি, এদিকে অসমতল পথে বাসের ঝাঁকুনিটাও প্রাণান্তকর। কয়লার গুঁড়ো—ধুলো আর ঘামে শরীরটায় গ্লানি জমেছে প্রচুর। তবু যা হোক কালিমত একটি নদী পার হবার সময় নদীর জলে হাতমুখ ধুয়ে কিছুটা সুস্থবোধ করছিলেন, কিন্তু গো-যানে চেপে উঁচুনীচু পথে যে ধাক্কাটা সর্ব্ব অঙ্গের উপর দিয়ে গেল—তাতে মনে পুলক সঞ্চার হবার কথা নয়।

অবনী বলল, দাদা দেখেছেন—কি চমৎকার সিনারি?

মনে মনে জলছিলেন রমণীমোহন—খিঁচিয়ে উঠলেন, তুমি দেখ দু'চোখ ভরে! আদেখলা কোথাকার! এই তোমার সোজা পথ—আরামের যাত্রা? এখন বাপমার পুণ্যে ঘরে ফিরতে পারলে বাঁচি।

ঘরে ফিরবেনই দাদা—ঘাবড়াবেন না। অবনী কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, ছুটো চ্যাংরা ছোঁড়াকে পাঠিয়েছে—ওদের ঘটে আর কত বুদ্ধি! একটু ধৈর্য্য ধরুন দাদা—এই গরুর গাড়ীর ক্ষেপটা শেষ হলেই ড্যারায় পৌঁছব—তখন চব্যচোষ্য—

রমণীমোহন গুম হয়ে রইলেন।

ধূম দেখে যাঁরা বহ্নিকে অনুমান করেন—তাঁরা সব সময়ে অভ্রান্ত নন। অন্ততঃ এই ক্ষেত্রে সেটা প্রমাণিত হ'ল। জমিদারবাড়ীতে খাতিরযত্নের বাহুল্য দেখে নতুন করে অস্বস্তিবোধ করলেন রমণীমোহন। অতিথি হলে মানুষ না হয় দেবতাতুল্য হয়, কিন্তু তাকে পুতুল বানাবার বিধিটা কোথা থেকে জন্মাল? আশ্চর্য্য—গাড়ী থেকে নামতে-না-নামতে একজন চাকর এসে গাড়ুর জলে পা ধুইয়ে নতুন কেনা তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিলে, আর একজন প্রকাণ্ড একখানা তালপাতার পাখা নেড়ে বাতাসের ভঙ্গী করতে লাগল। রমণীমোহনের চোখের সামনে রামরাজার পুরাতন ছবিখানা ফুটে উঠল। রামসীতা বসে আছেন সিংহাসনে, লক্ষ্মণ স্বর্ণছত্র ধরেছেন ওঁদের মাথায়—ভরত আর শত্রুঘ্ন মিলে ব্যজন করছেন—পাত্রমিত্র—হনুমান-জাম্বুবানের দল জোড়হস্ত, মুনিরা উচ্চারণ করছেন স্বস্তিবচন।

এখানেও পাত্রমিত্র পুরোহিতের অভাব নাই। ওঁরা বাৎসল্যে, বিনয়ে এমনই নরম হয়ে উঠেছেন—যা নাকি মৌন গম্ভীর স্তুতিরই নামান্তর।

প্রথমে চা—তারপরে ডাব—সর্ব্বশেষে জলখাবার। সে কি প্রচুর উপকরণ! বৃহৎ থালাভরে যেন ঠাকুরের বৈশাখী শীতল নিবেদন! ঢালা ফরাসের উপর ধপধপে চাদর পাতা আর তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পাশ বালিশ, তোয়ালে প্রভৃতি। জলযোগান্তে তাকিয়ায় আড় হয়ে পড়বামাত্র সুবৃহৎ রেকাবীতে এল পান ও মশলা, দু'প্যাকেট সিগারেট—একটা কূর্ম্মাকৃতি ছাইদান। সিগারেট ধরাতে-না-ধরাতে পায়ে চাপ পড়ল। চমকে উঠলেন রমণীমোহন, কে—কে?

এজ্ঞে, বাবু আমি নিতাই। একটু পদসেবা—। রোগা কালোমত একটি প্রৌঢ় অপরাধ স্খালনের ভঙ্গীতে দু'হাত জুড়ে বুকের উপর রাখল।

রমণীমোহন সোজা হয়ে বসে বললেন, আরে বাপরে—পদসেবা! না না, যাও তুমি।

লোকটি কাঁদ কাঁদ মুখে বলল, এজ্ঞে, হাক্লান্ত হয়ে এয়েছেন—শরীলটা বেজুত হয়ে আছেন—

না বাপু, বেশ আছি, তুমি যাও।

অবনী বলল, দাদা, টিপুক না একটু। ও বেচারীর ত চাকরি—উপরওয়ালা নারাজ হতে পারেন।

আরে রাখ তোমার উপরওয়ালা! গলা নামিয়ে বললেন, যাই বল ভাই—এদের ধরনধারণ ভাল ঠেকছে না। হয় স্বর্গ নয় পাতাল—মাঝখানে যে পৃথিবীটা রয়েছে সে ভোলে কি করে, আশ্চর্য্য!

লোকটি ততক্ষণে একপাশে সরে গেছে। জোড়হাত—বিবর্ণ মুখ।

রমণীমোহন ওর পানে চেয়ে বললেন, তুমি আবার গরুড় মূর্ত্তি হলে কেন? যাও না।

এজ্ঞে, আপনাদের সেবার জন্যেই ত বাবুরা রেখেছেন—

অবনী বলল, শুনলেন দাদা, সেবার অধিকার না পেলে আহারের অধিকারও থাকবে না। অতএব—। সটান শুয়ে পড়ল অবনী। বলল, এস হে—এদিকে এস। বেশ ভাল করে সারা অঙ্গ মর্দ্দন করে দাও—যাতে গোযানের গোবেড়েন থেকে দেহটা সুস্থ হয়ে ওঠে!

অপরাহ্ণে বসবে সভা।

গ্রাম দেখে রমণীমোহনের মনটা মুষড়ে পড়েছিল। এই অজ পল্লীর সভায় বিশেষ করে বলবার কিই-বা আছে। তেমন গুণীজনের সমাগম হবে কি সভায়? কলকাতার বাবুরা আসছেন—রং-তামাসার ব্যবস্থা রয়েছে—এসব দেখতে লোকসমাগম যথেষ্ট হবে, কিন্তু সে সভায় বিদ্যাবত্তা জাহির করার অবকাশ কোথায়? সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনাও নিরর্থক।

মধ্যাহ্নে গুরুভোজনের পর দেহ ক্লান্ত হয়ে পড়ল। শয্যায় দেহ ঢেলে দিয়ে ভাবলেন—অতিথিসেবার জন্য যারা চাকরি পেয়েছে—তাদের চাকরি বজায় থাক, তার সঙ্গে যদি নিদ্রা আসে ত মন্দ কি! আলস্যভারে দিন যদি সন্ধ্যায় মিলিয়ে যায় যাক না, সভা না বসলে খুসিই হবেন রমণীমোহন।

ভাবতে ভাবতে পায়ের উপর হাতের চাপ—মাথার চুলে ফুরফুরে বাতাস—দু'চোখে তন্দ্রার শিথিল স্পর্শ—তার পর কোথায় যেন তলিয়ে গেলেন।

অতল থেকে একসময়ে ভেসে উঠলেন। মনে হচ্ছে স্বপ্নের জগৎ। এক ঘর লোক, ফিসফিস গুঞ্জন, শিয়রে ফানুসের আলো, ধূপচন্দনের সঙ্গে টাটকা বেলফুলের সুবাস, তার সঙ্গে চায়ের মৌতাতাধরানো মিষ্টি গন্ধ—

অবনী বলল, কি দাদা, শরীর ভাল ত?

অঙ্গস্পর্শ করে দেখলেন দেহবোধ আছে, স্বপ্ন দেখছেন না। গ্রামের গণ্যমান্য মানুষগুলি এসেছেন পরিচয় করতে—পাছে ওঁদের বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটে তাই সন্তর্পিত চলাফেরা—চুপিসারে আলাপন।

ওঁকে উঠতে দেখে একজন প্রৌঢ় সর্ব্বাঙ্গে সবিনয় ভঙ্গী মাখিয়ে এগিয়ে এলেন। তাঁর পিছনে আরও কয়েকজন।

এঁরা সমিতির প্রেসিডেণ্ট, সেক্রেটারী, হনি মেম্বারের দল। তারও পিছনে গ্রামস্থ সজ্জনবৃন্দ। আলাপ করে খুসি হলেন রমণীমোহন। সভাটা জমবে ভাল—এমন বিশিষ্ট শ্রোতাও যখন রয়েছেন!

সত্য—চমৎকার জমল সভা। উপস্থিত সুধীবৃন্দ জমিয়ে তুললেন। শ্রোতা এবং বক্তা দু'পক্ষের সহিষ্ণুতা দেখে চমৎকৃত হলেন রমণীমোহন। এবং এঁদের ধৈর্য্য পরীক্ষা করার আগ্রহে নিজের বক্তব্যকেও এতখানি টেনে বাড়ালেন—যা তাঁর কল্পনার অতীত।

অবনী সংক্ষেপে বক্তৃতা সেরে বসে পড়েছিল। চুপি চুপি সতর্ক করে দিয়েছিল ওঁকে—সংক্ষেপে সারবেন দাদা, ফিরতে হবে কাল ভোরবেলায় মনে রাখবেন।

বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে বাড়ী ফেরার কথা যে ভাবে সে ত পেশাদারী বক্তা। তার উপর শ্রদ্ধা নাই রমণীমোহনের। এমন জনসমাবেশ—এমন আগ্রহ ইতিপূর্ব্বে কোন সভাতেই লক্ষ্য করেন নি। ওরা বক্তৃতা শুনছে না, সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে পান করছে।

অবনীর পানে না চেয়েই নানা প্রসঙ্গ তুলতে লাগলেন।

বেগতিক দেখে অবনী একটা স্লিপে লিখল, সংক্ষেপ করুন—কাল ভোরবেলায় ফিরতে হবে।

কাগজখানায় অপাঙ্গ দৃষ্টিপাত করে দলা পাকিয়ে ফেলে দিলেন—দ্বিগুণ উৎসাহে বক্তৃতা দিতে লাগলেন রমণীমোহন।

হঠাৎ উঃ বলে চমকে উঠলেন! রোষকটাক্ষে অবনীর পানে চেয়ে চাপা ধমক দিলেন, কি হচ্ছে ছেলেমানুষি!

ওঁর জামা ধরে বসাতে গিয়ে অবনী একটি মোক্ষম চিমটি কেটেছে পিঠে।

একটু নিরাপদ দূরত্বে সরে দাঁড়ালেন রমণীমোহন এবং বক্তৃতার উৎস উৎসারিত করে দিলেন।

সে স্রোতে অবনী ভাসল—শ্রোতৃবৃন্দ ভাসল।

সভা ভাঙল রাত এগারোটায়।

সভাভঙ্গের পরমুহূর্তে ওঁরা পড়লেন ঘূর্ণীপাকের মধ্যে। ধন্যবাদ দান, হাতজোড়, কৃতার্থ হওয়া, পাদস্পর্শ, অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে কচি ও কাঁচা ছেলেমেয়েদের ঠেলাঠেলি। অটোগ্রাফ শিকারীরা ঘিরে ধরল দুজনকে। বায়না ধরল, শুধু সই দিলে চলবে না, যা হোক কিছু লিখে দিতে হবে।

রমণীমোহন হোমটাস্ক দেখার মত এক-একখানি খাতা তুলে নিচ্ছিলেন। একটুখানি ভেবে নিয়ে বাণী লিখছিলেন কখনও দু'ছত্র পদ্যে, কখনও-বা এক লাইন গদ্যে। অবনী কলম চালাচ্ছিল ডাক্তারের প্রেসক্রিপসন লেখার মত করে। শুধু স্বাক্ষর আর তারিখ।

রমণীমোহনের ধীর গতি দেখে অসহিষ্ণু হয়ে উঠল অবনী। বলল, দাদা, ও বাণী-টাণি থাকুক, ঝপাঝপ সই মেরে কাজ সারুন, না হলে কাল ভোরে আর উঠতে হবে না।

তবু ভোরবেলাতেই উঠলেন। বাড়ীশুদ্ধ তখন জেগে। আবার আদর-আপ্যায়নের ঝড় বইতে লাগল। চা, জলখাবার প্রভৃতির পালাশেষে মেলানি। প্রণাম, আশীর্বাদ, স্নেহ-সম্ভাষণ। একপক্ষের ত্রুটি স্বীকার, অন্যপক্ষের আনন্দলাভের স্বীকৃতি। অতঃপর পর্য্যায়ক্রমে পদযান, গোযান, জলযান। জলযানের পর পেট্রলযান। সবশেষে বাষ্প-যান।

কিন্তু ব্যাপারটা ঘটল পেট্রলযান অর্থাৎ বাসে উঠবার কালে।

বাসে উঠে রমণীমোহন গুছিয়ে বসলেন। তৃপ্তির একটা উদ্গার তুলে বললেন, ভারি আনন্দ পেলাম ভাই, না এলে আপসোস হ'ত।

অবনী হেসে বলল, কেমন, আসবার আগে আপনাকে বলেছিলাম কিনা।

এই সময়ে অলক্ষ্যে বিধাতা একবার মুখ টিপে হাসলেন।

কণ্ডাক্টার কাছে এসে বলল, বাবু টিকিট?

টিকিট! রমণীমোহন চাইলেন অবনীর পানে, অবনী চাইল রমণীমোহনের দিকে।

পুরো দু'মিনিট কাটল পরস্পরের দৃষ্টিবিনিময়ে।

অবশেষে অবনী বলল, দাদা—ভাড়াটা কি ওঁরা দেন নি?

সেকি আমার কাছেই দেবার কথা ছিল? কটমট চক্ষে চাইলেন রমণীমোহন।

তুমি চেয়ে নিতে পারনি?

অবনী বলল, আমার কথা ছেড়ে দিন দাদা, কোনকিছুই সীরিয়াসলি নিতে পারলাম না। চিরদিনকার ভবঘুরে—বাউণ্ডুলে। ওসব মনেই ছিল না।

কচি খোকা কিনা! দাঁতে দাঁত রেখে চাপা ধমক দিলেন রমণীমোহন। তার পর গম্ভীর গলায় বললেন, তা হলে ট্রেণ ভাড়াটাও আগাম চেয়ে নাও নি?

অবনী অপ্রতিভ কণ্ঠে বলল, কি জানেন দাদা, কথা ছিল ওঁরাই টিকিট কেটে ট্রেণে তুলে দিয়ে যাবেন। তা—তা—সভা ভাঙতে খানিকটা রাত হয়েছিল ত। যাঁদের পৌছে দেবার কথা—তাঁরা—

তা বেশ হয়েছে। এখন পকেটে যদি কিছু থাকে বার কর। বাসওয়ালা ত সাহিত্যসভা ডাকেনি, সাহিত্যিকও নয় ওরা।

অবনী লজ্জিতহাস্যে বলল, জানেনই ত দাদা, আপনার বৌমাটি ভারি হিসেবী মানুষ। আসবার সময় চেয়েছিলাম কিছু—তা বললেন ওরা নিয়ে যাচ্ছেন রাজসমাদরে—পয়সা কি হবে শুনি?

হুম্। অবনীর পানে একটি অগ্নিগর্ভ কটাক্ষ হেনে পকেট থেকে মনিব্যাগটা বার করলেন। ব্যাগ খুলে রমণীমোহনেরও চক্ষুঃস্থির! ব্যাগটা বলতে গেলে শূন্যগর্ভ। ওতে যা দু'একটি আনি-দুয়ানি পড়ে আছে তাতে একজনেরও বাসভাড়া কুলোবে না।

এতক্ষণ একবাস লোক কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে ওঁদের বাদানুবাদ শুনছিল। এর পরের অবস্থাটা কল্পনা করে নতমুখ রমণীমোহন ঘামতে লাগলেন।

বিপরীত বেঞ্চে-বসা এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক এই বিপদ থেকে ওঁদের উদ্ধার করলেন। শুধু বাসের ভাড়াই মিটোলেন না তিনি—ট্রেণেরও টিকিট কাটলেন তিনখানা। রমণীমোহন দারুণ লজ্জায় সেই থেকে মাথা হেঁট করে রইলেন—ট্রেণে উঠেও মাথা তুললেন না।

ভদ্রলোক বললেন, আপনি কিন্তু করছেন কেন দাদা? আমারই যদি এমন বিপদ হ'ত আপনি কি এগিয়ে আসতেন না? ভাল হয়ে বসুন। পান খাবেন?

না।

অবনী বলল, দিন—আমায় দিন।—সিগ্রেট? আলবৎ চলে।—চা? অমৃতে কার অরুচি বলুন?

সবগুলিই প্রত্যাখ্যান করলেন রমণীমোহন। অবনীর নির্লজ্জতায় বেশী করে লজ্জিত হলেন এবং ক্রুদ্ধ হলেন ততোধিক।

দাদা—উঠুন, আমরা এসে গেছি। ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলেন রমণীমোহন। উঃ—একভাবে জানালার দিকে মুখ করে তিনটি ঘণ্টা কেটে গেছে!

হঠাৎ সচেতন হয়ে মুখ ফিরিয়ে বললেন, আপনার নাম আর ঠিকানা যদি দয়া করে দেন। আপনার কাছে—

বিলক্ষণ! হেসে উঠলেন ভদ্রলোক। আপনাদের কাছে সারা বাংলাদেশ ঋণী—আপনি মিছিমিছি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমি একদিন আপনার বাড়ীতে গিয়ে—

রমণীমোহন বললেন, কিন্তু আপনি ত আমাকে চেনেন না, আমার ঠিকানা—

তেমনি হাসতে হাসতে ভদ্রলোক জবাব দিলেন, আপনি ভারত বিখ্যাত লোক—আপনার ঠিকানা জানা কি এমন কঠিন!

দৃঢ়কণ্ঠে বললেন রমণীমোহন, যাই হোক—আপনার ঠিকানাটা দিন। আমারও কর্ত্তব্য আছে।

অবনী বলল, দাদা—অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?

তুমি থাম। প্রচণ্ড একটি ধমক দিয়ে রমণীমোহন নোট-বইটা বার করলেন। তার পর ঠিকানা নিয়ে ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানিয়ে ও নমস্কার করে সোজা বেরিয়ে গেলেন গেট দিয়ে—অবনীর দিকে ফিরেও চাইলেন না।

নটবর ঘোষ লেনের তিরিশ নম্বর বাড়ীর সামনে প্রতীক্ষমান ছেলের দল ততক্ষণে কড়া-নাড়া-পর্ব্ব শেষ করে রমণীমোহনের আহ্বানে বৈঠকখানায় ঢুকে পড়েছে।

রমণীমোহনকে প্রণাম করার পর মুখপাত্র ছেলেটি বলল, আপনার কাছে এলাম স্যার। আমাদের একটা ফাংশন আছে তেরোই আষাঢ়, আপনি যদি দয়া করে—

ফাংশন! ভ্রু কুঁচকে রমণীমোহন এক মিনিটকাল কি চিন্তা করলেন। বললেন, তা উপলক্ষ্যটা কি?

মুখপাত্রটি সবিনয়ে বলল, আজ্ঞে রবীন্দ্র-জয়ন্তী।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী? তেরোই আষাঢ়? উঃ—সাংঘাতিক ছেলে ত তোমরা!

ওঁর প্রচণ্ড বিস্ময়ের ধাক্কায় দলটি একেবারে নিভে গেল। পরস্পরের পানে চেয়ে ওরা মাথা চুলকোতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। অবশেষে মুখপাত্রটি সাহস সঞ্চয় করে নিভন্ত গলায় বলল, আজ্ঞে স্যার, আপনারা ত নানান জায়গায় ফাংশন নিয়ে ব্যস্ত—আমরা কাউকেই জোগাড় করতে পারি নি। তা ছাড়া শহরের হিড়িক না মিটলে—

কোথা থেকে আসচ তোমরা?

আজ্ঞে সরষে থেকে।

সরষে? পাড়াগাঁ ত? ট্রেণ, বাস, নৌকা—

আজ্ঞে না, ট্রেণ থেকে নেমেই সাইকেল রিকশা, মাত্র এক ঘণ্টার জার্নি।

না বাপু, পাড়াগাঁয়ে যেতে-টেতে পারব না। মানে যাবই না ঠিক করেছি। গম্ভীর মুখে বললেন রমণীমোহন।

মুখপাত্রটি এবার হাতজোড় করে সকাতর কণ্ঠে বলল, আজ্ঞে কিচ্ছু কষ্ট হবে না। আমরা গ্যারাণ্টি দিচ্ছি। তা ছাড়া প্রধান অতিথি মশায় যাবেন। দু'জনে একসঙ্গে—

প্রধান অতিথি! ভ্রূ কুঁচকে রমণীমোহন প্রশ্ন করলেন, প্রধান অতিথি কে?

মুখপাত্রটি বিনীতকণ্ঠে বলল, আজ্ঞে বিখ্যাত সমালোচক অবনীনাথ সমাদ্দার।

হুম্! গম্ভীর একটা হুঙ্কার ছেড়ে রমণীমোহন তুষ্ণীভাব অবলম্বন করলেন।

মুখপাত্রের পিছনের তিনটি ছেলে সে আওয়াজে চমকে উঠল। আড়চোখে রমণীমোহনের গম্ভীর ভ্রুকুটি কুটিল মুখের পানে চেয়ে একটু একটু করে পিছুতে লাগল দুয়োরের দিকে।

মুখপাত্রটি সাহস সঞ্চয় করে বলল, তা হলে স্যার আমাদের ফাংশন—

ফাংশন! হঠাৎ ধমকে উঠলেন রমণীমোহন, ফাংশন? ইয়াকির আর জায়গা পাওনি? তেরই আষাঢ় রবীন্দ্র-জয়ন্তী! বলি ঘটা করে ফাংশন ত করছ—মনে পড়ে তেরই আষাঢ় দিনটা কি? বল ত দেখি—ওই দিনটিতে বাংলা-সাহিত্যের কোন্ দিকপাল জন্মগ্রহণ করেছিলেন? বল—?

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে ধমক।

মুখপাত্রটির মুখ চুণ হয়ে গেল। কি সাংঘাতিক প্রশ্ন! ইস্কুল ছাড়ার পর এমন কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে—সেকথা কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছে কোনদিন?

ছেলেটি কিন্তু চালাক এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মনে মনে দমে গেলেও অপ্রতিভ ভাবটুকু কাটাবার জন্য সঙ্গীদের সম্বোধন করে বলল, কিরে অন্তা—বিজয়—কুন্টু—তোরা কি বলিস? বল না রে?

মুখ ফিরিয়ে দেখে পিছনটা একদম ফাঁকা।

শব্দের প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ

শ্রীবিনায়ক সান্যাল

ভাব-প্রকাশের জন্যই হয়েছে ভাষার সৃষ্টি। কোন্ সুদূর অতীতে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীগুলির উৎপত্তি হয়েছিল আজ তা নির্ণয় করা সহজ নয়। তবুও কোন ভাষার বিবর্তন-ধারাটি উজানে অনুসরণ করলে তার জন্মরহস্যের আদি উৎসে পৌছাতে না পারলেও তার অবক্ষিপ্ত, অলক্ষ্য স্তরগুলির সন্ধান পাওয়া যায়। শব্দ-গ্রথিত বাক্যই ভাষার একক (unit), সুতরাং শব্দের উৎপত্তি ও বিকাশ-ধারাটি পর্য্যালোচনা করলে এমন বহু তথ্যই আবিষ্কার করা যায় যা অতীব কৌতূহলপ্রদ। কোন জীবন্ত ভাষাই স্থির নয়, নদীর মত সে নিরন্তর বয়ে চলে; প্রবাহ-পথে কত নূতনকে সে গ্রহণ করে, কত পুরাতনকে বর্জ্জন করে এবং এই হরণ-পূরণের মধ্যে দিয়েই অর্জ্জন করে প্রকাশের পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য। শব্দ-রূপের কত রূপান্তর ঘটে, কত শব্দার্থ পরিবর্ত্তিত হতে হতে হয়ত এমন অবস্থায় এসে পৌছায় যে মৌলিক অর্থের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধই আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে দেখা যায় ভাষাবিদ্‌দের মধ্যে দুটি বিশিষ্ট দল; এক দলের মত, যেহেতু বাংলা, সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন না হলেও, তার প্রভাবপুষ্ট সেই হেতু তাকে সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্রশৃঙ্খলে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রাখতে হবে, নতুবা ভাষার শুচিতা নষ্ট হবে। দ্বিতীয় দল ভাষাকে দেখেন ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে, তাঁরা জানেন যে, এই ভাষার মূল কাঠামোটা মাগধী প্রাকৃত থেকে উদ্ভূত হলেও ইন্দো-ইউরোপীয়, ইরাণীয়, দ্রাবিড়, অষ্ট্রিক্ প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষাবর্গের অজস্র শব্দের সমুচ্চয়ে গঠিত এর দেহ; সুতরাং একে সংস্কৃতের খবরদারীতে আগলে রাখা নিছক গোঁড়ামি ছাড়া আর কিছুই নয়, বিশেষ করে এ যুগে যখন সংস্কৃত তার জীবন্ত সত্তা হারিয়ে প্রায় প্রেতলোকের কাছাকাছি পৌঁছেছে। দ্বিতীয় দলের লোকের মধ্যে শুচিবায়ুতা না থাকলেও আছে হুজুগপ্রিয়তা, স্বাধীনতার নামে স্বৈরাচারের স্পৃহা। তাই ভাষার ব্যাপারে একটা মধ্যপথ বেছে নেওয়াই বোধ হয় বাঞ্ছনীয়, যাতে শব্দের শুচিতাও যথাসম্ভব বজায় থাকে, অথচ প্রকাশের স্বচ্ছন্দতাও ব্যাহত না হয়। ধরা যাক 'সৃজন' শব্দটি; সংস্কৃত ব্যাকরণমতে এটি অশুদ্ধ, হওয়া উচিত 'সর্জ্জন'; কিন্তু 'সৃজন' রূপটি ভাষায় এমন কায়েম হয়ে গিয়েছে যে, একে উচ্ছেদ করা এখন এক রকম অসম্ভব। 'ভগবান্ এই জগৎ সর্জ্জন করেছেন' বললে অতিবড় শুদ্ধিবাদীও কি তর্জ্জন করে উঠবেন না? অন্যদিকে, 'বিসর্জনে'র স্থানে 'বিসৃজন' লিখলেও ফল সমানই হবে। অশুদ্ধ হলেও 'বিতরিত'র বদলে 'বিতীর্ণ' লেখা কেউ সমর্থন করবেন কি?

অর্থ নৈতিকের বদলে আর্থনীতিক? এমনি করে রূপের দিক থেকে অর্থের দিকে দৃষ্টি ফেরালে সেখানেও আমরা দেখতে পাব বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন। কিন্তু কেমন করে এবং কত দিনে কোন শব্দ তার মুখ্য অর্থ ত্যাগ করে গৌণ অর্থ গ্রহণ করে তা নিশ্চয় করে বলা শক্ত, তবে হাল-আমলের দু'একটা দৃষ্টান্ত দিলে মোটামুটি একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। লোক-ব্যবহারের কথা আলোচনার বাইরে রেখে আমরা বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের লেখা থেকে শব্দার্থের অপব্যবহারের দু'একটা নজীর দিই। 'প্রদোষ' শব্দটির আসল অর্থ সায়ংসন্ধ্যা, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোন লেখায় শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন প্রাতঃসন্ধ্যা অর্থে, মধুসূদন বক্ষঃকে রজত অর্থে, নিকষকে কোষ বা পিধান অর্থে প্রয়োগ করেছেন, দাশরথি 'কোদণ্ড' শব্দটি ব্যবহার করেছেন কোদাল অর্থে। কিন্তু এই সব সাহিত্যরথী শব্দ-গুলিকে ভুল অর্থে প্রয়োগ করেছেন বলেই যে ঐ ঐ অর্থ ভাষায় প্রচলিত হয়েছে তা নয়। 'বলাকা' শব্দটির বেলায় কিন্তু লক্ষ্য করা যায় এর ব্যতিক্রম। রবীন্দ্রনাথ প্রায় সর্ব্বত্রই শব্দটি ব্যবহার করেছেন 'যূথ' বা 'শ্রেণী' অর্থে, অথচ শব্দটির যথার্থ অর্থ 'বক'; 'রাজহংসদল আকাশে বলাকা বাঁধি' সত্বর চঞ্চল' ইত্যাদি পংক্তি থেকেই এর প্রমাণ মিলবে। দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের অনুগামী কোন কোন সাহিত্যিকও শব্দটিকে ঐ অভিনব অর্থেই নেবার পক্ষপাতী। এমনি করে পর পর বহু সাহিত্যিকই যদি ঐ অর্থে শব্দটি ব্যবহার করতে থাকেন, তা হলে কালক্রমে হয়ত মুখ্য অর্থকে পাশ কাটিয়ে এর কল্পিত অর্থটাই ভাষায় খুঁটি গাড়বে। 'সতীর্থ' শব্দটিকে সহকর্ম্মী বা সহযোগী অর্থে কে বা কারা করে প্রথম প্রয়োগ করেছেন তা নির্ণয় করা সহজ নয়, কিন্তু খবরের কাগজের পাতা ওল্টালেই এর ভূরি ভূরি নিদর্শন চোখে পড়বে। আসল কথা এই যে, ভাষা চায় ভাবকে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করতে, সংস্কারের শক্ত বাঁধও তার তোড়ের মুখে ভেসে যায়, কিন্তু তাই বলে অজ্ঞতাজনিত অপপ্রয়োগ ক্ষমার্হ নয়। আজকাল ভাষা না শিখেই কলম ধরার রেওয়াজ হয়েছে, ষত্ব-ণত্বের জ্ঞান এখন অনাবশ্যক, ই-ঈ, উ-ঊ নিয়ে এখন ছিনিমিনি খেলা চলছে। এই স্বৈরাচার ভাষাকে করে তুলেছে বিশৃঙ্খল, কাজেই মনগড়া হরেকরকম বানান আজ বাজারে চলছে। একটা ছেদ টানা আশু আবশ্যক হয়ে পড়েছে। অবশ্য, ভাষা পুরোপুরি গড়ে উঠবার আগে পর্য্যন্ত এই রকম একটা অব্যবস্থিত অবস্থা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু এখন থেকেই প্রয়োগের যোগ্যতা সম্বন্ধে অবহিত না হলে একটা সার্ব্বজনীন বিপর্য্যয় অনিবার্য্য হয়ে উঠবে।

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা প্রধান ভাবে অর্থের বিবর্তন এবং গৌণ ভাবে বানান-বিপর্যয় সম্বন্ধেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

শুদ্ধিবাদীরা দাবী করেন 'আবশ্যকীয়', 'সিঞ্চন', 'মনান্তর', 'নিশি', প্রভৃতি ব্যাকরণমতে ভুল, সুতরাং সাধু ভাষায় ওগুলির প্রয়োগ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। প্রত্যেকটি শব্দ স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করে দেখা যাক তাঁদের এই দাবি কতদূর সমর্থনযোগ্য। 'আবশ্যক' শব্দটি বিশেষণ হলেও বিশেষ্যরূপেও ব্যাকরণসম্মত এবং প্রাচীন সংস্কৃতে বিশেষ্যরূপে ওর প্রয়োগ আছে, অর্থবিহিত কর্ম, প্রয়োজন, দ্রষ্টব্য—'উত্থায়াবশ্যকং কৃত্বা' ইত্যাদি (মনু ৪, ৯৩,)। কাজেই বিশেষ্য 'আবশ্যক' থেকে নিষ্পন্ন 'আবশ্যকীয়' শব্দটিকে বাতিল করবার পক্ষে যুক্তি কি থাকতে পারে, বিশেষ করে যখন 'প্রয়োজনীয়', শব্দের সাদৃশ্যে ঐরূপটি ভাষায় কায়েম হয়ে গিয়েছে? 'সিঞ্চন' সম্পর্কে বলা যায়, যদিও ব্যাকরণমতে ওটি ভুল তবুও শিষ্ট প্রয়োগসম্মত বলে অবশ্যই গ্রহণীয়। তা ছাড়া, পিপ্পলী অর্থে সংস্কৃতে সিঞ্চিতা শব্দ পাওয়া যায়, এ থেকে অনুমান হয় পরে অপ্রচলিত হয়ে পড়লেও 'সিঞ্চ' ধাতু প্রাচীন সংস্কৃতে ছিল। সংস্কৃতে নিশা শব্দ যেমন আছে তেমনি আছে নিশ শব্দ, এই নিশ শব্দের সপ্তমীর একবচনের রূপ নিশি। প্রথমার স্থলে সপ্তমীর প্রয়োগ কখনই সমর্থনীয় নয়; কিন্তু নিশিপাল (ছন্দোবিশেষ), নিশিপুষ্পা (শেফালিকা) সংস্কৃতে পাওয়া যায়। বাংলায় পদ্যে এর প্রয়োগ শিষ্টসম্মত। কবিকঙ্কণে অধিকরণ কারকেও পদটির প্রয়োগ পাওয়া যায়, 'আজি দেখিলাম নিশি (রাত্রিতে) ভীষণ স্বপন' পথিন্ শব্দের সপ্তমীর একবচনের পদ পথি, হৃৎ শব্দের হৃদি, কিন্তু বাংলায় কর্তৃকারকের স্থলে এ দুটির প্রয়োগ প্রচুর পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত:— 'কে বলিবে বিধাতার সেই পথি' (হেমচন্দ্র), 'কথন কুপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি' (রবীন্দ্রনাথ) ইত্যাদি। 'মনান্তর' সংস্কৃতমতে অবশ্যই অশুদ্ধ, মনঃ+অন্তর=মনোঽন্তর হওয়া উচিত, কিন্তু শব্দটি সাহিত্যে এবং সাধারণ কথাবার্তায় এতই প্রচলিত যে ওকে শুদ্ধ বলে মেনে না নিয়ে উপায় নেই। এই প্রসঙ্গে নিধুবাবুর 'যদি হয় প্রাণান্তর মনান্তর তায় হবে না'—পংক্তিটি আশা করি অনেকেরই মনে পড়বে। এই ধরনের ব্যাকরণ-বিগর্হিত, প্রয়োগ সংস্কৃতেও পাওয়া যায়। মনঃ+ঈষা=মনীষা হওয়া উচিত কি? সাধারণভাবে প্রয়োগসিদ্ধ ব্যতিক্রমগুলি ব্যাকরণে নিপাতন নামে পরিচিত। শিক্ষিত কোন লোক লজ্জান্তর বললে আমরা লজ্জা পাই, কিন্তু সংস্কৃতে 'বনপতি' না বলে 'বনস্পতি', 'গোপদ না বলে 'গোষ্পদ' বলাই বিধি (তুলনীয়—বানর<বান্দর, সুনর<সুন্দর)। লোক-ব্যবহারের ফলেই এই সব অতিরিক্ত আগন্তুকধ্বনি (শ্রুতি ধ্বনি বা glide) শব্দের মধ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু এর কারণ নির্ণয় করা সহজ নয়। তবে উচ্চারণ সৌকর্য্য যে অন্যতম কারণ তাতে সন্দেহ নেই। ইংরেজীতে 'message', অর্থাৎ 'সংবাদ' বহন করে যে সে 'messenger', 'messager' নয়। ভাষার চরিত্র-বিচিত্র, কলকথা, ব্যাকরণ ও প্রয়োগ-রীতির (idiom) মধ্যে যেখানে দ্বন্দ্ব সেখানে প্রথমটিই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়, সব ভাষাতেই এই একই নিয়ম।

এইবার কতকগুলি সংস্কৃতাভাস অর্থাৎ ছদ্ম-সংস্কৃত শব্দ নিয়ে আলোচনা করা যাক। বিব্রত, বিদায়, সাব্যস্ত, সাশ্রয়, ছত্র (পংক্তি), গল্প, গঠন, গাভী, শিহরণ, অনটন, বিভ্রাট ইত্যাদি এই পর্য্যায়ে পড়ে। আবার ছবি, ছুরি, গুড়, গোল, পাগল, ছাগল প্রভৃতি শব্দগুলিকে অপভ্রংশ বা দেশজ বলে মনে হলেও আসলে এগুলি সংস্কৃত; পটোল শব্দও পাওয়া যায় বৈদ্যকে। অবশ্য, এদের মধ্যে কোনটি কত পুরানো এবং আদিম অবস্থায় অন্য কোন ভাষাগোষ্ঠীর শব্দ কিনা তা বলা শক্ত। সংস্কৃত ছবি (অর্থ শোভা) ছাড়াও আর একটি ছবি-শব্দ ভাবভাণ্ডারে আছে যার অর্থ চিত্র বা প্রতিকৃতি। সেটি এসেছে আরবী শবীহ থেকে। গোলযোগ বা বিপর্যয়-বোধক শব্দের অভাব নেই ইংরেজীতে, তবুও এদেশের 'বাপরে!' প্রয়োগটি ঐ ভাষায় প্রবেশ করে 'bobbery'-রূপে কায়েম হয়ে গিয়েছে। কোন ভাষাকে ঐশ্বর্য্যময়ী বলা যায় তখনই যখন তার শব্দ-ভাণ্ডার হয় এত সম্পন্ন যে, প্রতিরূপের অভাবে ভাবের প্রকাশ রুদ্ধ হয় না কিছুতেই। সংস্কৃত শব্দগুলি ব্যাকরণ অনুসারে সিদ্ধ এবং এদের অর্থ ধাত্বর্থের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। খুশী-মত এদের অর্থ বা রূপের পরিবর্তন-সাধন কখনই বাঞ্ছনীয় নয়। সে যা হউক, এখন শব্দগুলিকে এক এক করে বিচার করা যাক।

বিব্রত-শব্দ সংস্কৃত অভিধানে নেই; যে অর্থে শব্দটি বাঙলায় ব্যবহৃত হয় সে অর্থ নিষ্পন্ন করা খুবই শক্ত। ব্যাকরণমতে এর অর্থ হওয়া উচিত ব্রতভ্রষ্ট, কিন্তু বাঙলার অর্থ কি তাই? 'নানা-ব্যাপারে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছি' বললে বোঝায় 'ফাঁপরে পড়েছি', 'বিপন্ন বোধ করছি।' 'Farewell'-অর্থে বিদায় আরবী 'বিদাঅ' শব্দ থেকে এসেছে, দা-ধাতু থেকে নিষ্পন্ন বিদায়-শব্দের সঙ্গে এর শোণিত-সম্পর্ক নেই। সম্ভবত, 'সব্যবস্থে'র সংক্ষিপ্ত রূপ 'সাব্যস্ত'। সাশ্রয়-শব্দও অভিধানসম্মত নয়, সংস্কৃতে এর ব্যবহার নেই। বাঙলায় অর্থ দাঁড়িয়েছে ব্যয়-লাঘব, অর্থ-সংস্থান। কেমন করে এই অর্থ এল বলা শক্ত। সম্ভবত আশ্রয় প্রশ্রয় পেয়ে ক্রমে সাশ্রয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেমন অবকাশ হয়েছে সাবকাশ। 'আর বল কেন, মরবার সাবকাশ নেই' ইত্যাদি প্রয়োগ সেকালের শিক্ষিত লোকের মুখেও হামেশাই শোনা যেত, আশ্রয় মানে 'অবলম্বন', তার থেকে সম্বল বা সঞ্চয় অর্থ আসা অসম্ভব নয়। আরবী 'সতর' (পংক্তি) প্রথমে হয়েছে ছতর বা ছত্তর, পরে ছত্রের অপভ্রংশ এই ধারণায় ছত্রাকারেই একে জাতে তোলা হয়েছে। 'গঠন'-শব্দ সংস্কৃতে নেই; ধ্বনি-বিকৃতির ফলে মহাপ্রাণ স্থান পরিবর্তন করায় 'ঘটন' 'গঠন' হয়ে দাঁড়িয়েছে। গল্পের সংস্কৃতরূপ জল্প, ধ্বনি-বিকারে রূপে রূপান্তর ঘটেছে। মূল-সংস্কৃত শব্দ 'গবী' ধ্বনি-বিকৃতির ফলে বাঙলায় গাভীতে পরিণত হয়েছে, গবী প্রথমে প্রাকৃতে গাবী-রূপ ধারণ করেছে। প্রাচীন বাঙলায় ঐ রূপটির ব্যবহার বিরল হলেও একেবারে অচল নয়; দৃষ্টান্ত: 'নন্দিনী গাবীর তরে মুনি কৈল

ডাকি' (কাশী-মহাভারত)। অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে গাভী শব্দেরও প্রয়োগ পাওয়া যায়। আধুনিক সাহিত্যে 'শিহরণ' শব্দটির ছড়াছড়ি, সম্ভবতঃ এটি অনুকৃতি শব্দ। সংস্কৃত বলে গণ্য হলেও আসলে এটি অসংস্কৃত, তাই বলে বাঙলায় এর দাবি নগণ্য নয়। অনটন শব্দ অভিধানে নেই। অটন শব্দের অর্থ চলা; কাজেই মনে হয় অচল অবস্থা বা অভাব অর্থ বোঝাতে শব্দটি গড়ে নেওয়া হয়েছে। বিপর্য্যয় অর্থে বিভ্রাট কেমন করে এল বলা শক্ত, সংস্কৃতে যে বিভ্রাজ শব্দটি আছে—যার প্রথমার একবচনের রূপ বিভ্রাট—তার অর্থ দীপ্তিমান। রটনা অর্থে রাষ্ট্র শব্দটির বাঙলায় অনুপ্রবেশ একটি বিশেষ ঘটনা, হেতু-নির্ণয় দুঃসাধ্য। কিন্তু যেমন করেই আসুক এর প্রয়োগ ঠেকানো যাবে না। 'খবরটা শহরময় রাষ্ট্র হয়ে গেল' ইত্যাদি প্রয়োগ অহরহই শোনা যায় এবং যাবে। 'তালিকা' শব্দটিকে 'মালিকার' সগোত্র বলে মনে হলেও আসলে ওটি বর্ণচোরা আরবী শব্দ। বিদ্রূপ শব্দটিও সংস্কৃত নয়, কোন অনার্য্য ভাষা-গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত কিনা বলা যায় না। সংস্কৃত 'বিদ্রব' (অর্থ-ক্ষরণ, পলায়ন) থেকে এর উৎপত্তি সম্ভব কি?

এইবারে কয়েকটি খাঁটি সংস্কৃত শব্দ নিয়ে আলোচনা করা যাক যেগুলি রূপ না বদলালেও অর্থের বদল হয়েছে যথেষ্ট। প্রথমেই নেওয়া যাক 'বিচ্ছুরিত' শব্দটি; আধুনিক বাংলায় এর অর্থ বিকীর্ণ, মূল অর্থ অনুলিপ্ত, শেষোক্ত অর্থে কুমারসম্ভব থেকে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক, 'মনঃশিলা বিচ্ছুরিতা নিষেদুঃ শৈলেয়নদ্ধেষু শিলাতলেষু'। প্রথ ধাতুর অর্থ খ্যাত হওয়া, সুতরাং 'প্রথা' শব্দটির মৌল অর্থ খ্যাতি; বাংলায় অর্থ বদলে দাঁড়িয়েছে রীতি, মূল অর্থে বাংলায় এর প্রয়োগ নেই বললেই চলে। 'ব্যপদেশ' শব্দের আদি অর্থ বিজ্ঞপ্তি, সংজ্ঞা, ছল, যথা: 'এবং ব্যপদেশভাক্‌' (উ ৬) 'অথ কোহস্য ব্যপদেশঃ' (ওর নাম কি?) কার্য্য-ব্যপদেশে বললে বোঝান উচিত 'কাজের নামে বা ছলে', 'কাজের জন্যে' নয়, অথচ একমাত্র শেষের অর্থটিই বাংলায় প্রতিষ্ঠিত। 'বিড়ম্বন' (।) মানে অনুকরণ, তিরস্করণ, বাংলার অর্থ বঞ্চনা, অনর্থক কষ্টভোগ, অবশ্য শেষের অর্থটি প্রাচীনেও না ছিল তা নয়। মহ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন 'মহিলা' আধুনিক প্রয়োগে সম্মানসূচক, শব্দটির অর্থ এখন 'সম্ভ্রান্ত স্ত্রী', প্রাকৃতে কিন্তু মহীলা বা মহেলা শব্দের অর্থ ছিল 'মদমত্তা বা কামুকী স্ত্রী সংস্কৃতেও এই অর্থ প্রচলিত নয়। ব্যবসায় শব্দটির অর্থ সংস্কৃতে উদ্যম, অধ্যবসায় এবং সবশেষে বাণিজ্য, বাংলায় কিন্তু এক-মাত্র অর্থ বাণিজ্য, 'রূঢ়' সংস্কৃতে জাত, প্রসিদ্ধ, বাংলায় কঠোর, কর্কশ 'জন্য' সংস্কৃতে জনিত, উৎপাদ্য, বাংলায় কারণে, ফলে, উদ্দেশ্যে, প্রয়োজনে, 'ঘৃণা' (ঘৃ ধাতুর অর্থ আর্দ্র করা, সেচন করা) সংস্কৃতে করুণা—'কারুণ্যং করুণা ঘৃণা' (অমর), বাংলায় জুগুপ্সা, বিতৃষ্ণা, করুণা অর্থে এর প্রয়োগ নেই। 'এবং' সংস্কৃতে 'এইরূপ' বাংলায় 'আরও', 'সুতরাং' সংস্কৃতে 'অতীব', বাংলায় 'অতএব', 'ভাস্কর' সংস্কৃতে সূর্য্য, অগ্নি, স্বর্ণ, বাংলায় মূর্তিনির্ম্মাতা (Sculptor), 'সন্তর্পণ' সংস্কৃতে সম্যক্‌ তৃপ্তিদান, দ্রাক্ষাদিযুক্ত খাদ্য বিশেষ, বাংলায় সতর্ক, 'সন্তর্পণে আসা-যাওয়া কর' বললে বোঝায় 'সাবধানে'। সমূহ শব্দটি আসলে বিশেষ্য, অর্থ—গণ, সমুদয়, সেনাদল; বাংলায় কিন্তু বিশেষণরূপেও এর ব্যবহার আছে, অর্থ বহু, খুব। 'বিপৎসমূহ' এখানে 'সমূহ বিপদে' পরিণত হয়েছে। 'ব্যাজ' শব্দের যৌগিক অর্থ ছল, বিঘ্ন; বাংলায় রূঢ়ার্থ বিলম্ব। 'বাধিত'—সংস্কৃতে বাধা-প্রাপ্ত, নিষিদ্ধ, নিবারিত, বাংলায় প্রধানত 'অনুগৃহীত' অর্থেই শব্দটি প্রযুক্ত হয়। 'ম্রিয়মাণ' অর্থ সংস্কৃতে মুমূর্ষু, বাংলায় বিষণ্ণ। সংস্কৃতে 'স্তোক' শব্দের অর্থ বিশেষ্যে জলবিন্দু, চাতক, বিশেষণে অল্প। বাংলায় অর্থ দাঁড়িয়েছে মিথ্যা প্রবোধ বা স্তুতি। সম্ভবত, স্তোত্র শব্দের সঙ্গে ধ্বনি সাদৃশ্যে ঘটেছে এই অর্থ-বিভ্রাট। স্তোভ শব্দের আভিধানিক অর্থ—গানাদিস্বরপূরণের জন্য অর্থশূন্য শব্দ, তার থেকে মিথ্যা প্রবোধ অর্থ আসা অসম্ভব নয়। সঙ্গতি শব্দের অনেক অর্থ, যেমন—মিলন, সঙ্গ, সামঞ্জস্য, যোগ্যতা ইত্যাদি; বাংলায় একটি অতিরিক্ত অর্থ দাঁড়িয়েছে অর্থ-সংস্থান, বোধ হয় আয়-ব্যয়ের সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য থেকেই এই অর্থের উৎপত্তি। 'সঙ্গতি নেই' মানে আয়-ব্যয়ের সমতা নেই অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলে 'Cannot make both ends meet'. 'স্তিমিত'—শব্দটি বাংলায় প্রায়ই 'ক্ষীণ' অর্থে প্রযুক্ত হয়, অথচ এর আসল অর্থ—আর্দ্র, স্থির, নিমীলিত; স্তিম্‌ ধাতুর অর্থ আর্দ্র হওয়া, স্থির হওয়া। মুলতুবী অর্থে 'স্থগিতে'র ব্যবহারও সংস্কৃতসম্মত নয়, শব্দটির যথার্থ অর্থ আবৃত, তিরোহিত; স্থগ্‌ ধাতুর অর্থ আবৃত করা, গোপন করা। 'সচরাচর' সংস্কৃতে 'চরাচরের সহিত', বাংলায় সাধারণতঃ, প্রায়শঃ। উপন্যাস শব্দের অর্থ সংস্কৃতে উপস্থাপন, প্রস্তাব বা প্রস্তাবনা। বাংলায় গল্প, আখ্যায়িকা, প্রধানত novel-এর প্রতিশব্দরূপেই এর ব্যবহার। 'সম্ভ্রম' শব্দের মুখ্য অর্থ ভ্রম, ভ্রমণ, উৎসাহ, ভয় এবং সবশেষে ভক্তিজনিত বেগ ব্যস্ততা বা শুধু সম্মান ভক্তি। মুখ্যার্থগুলি লুপ্ত হয়ে শেষের গৌণ অর্থটিই বাংলায় কায়েম হয়েছে। 'সমীহা' (সমীহ) শব্দের আদি অর্থ সম্যক্‌ ইচ্ছা (তুলনীয় অনীহা অনিচ্ছা) অথচ বাংলায় প্রচলিত অর্থ শ্রদ্ধা, সম্মান। 'নিরীহ' শব্দের যৌগিক অর্থ নিশ্চেষ্ট, নিস্পৃহ, বাংলায় রূঢ়ার্থে শান্ত, নির্ব্বিরোধ, গো-বেচারা। 'প্রশস্ত' সংস্কৃতে উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ, বাংলায় চওড়া, বিস্তৃত। 'ভাসমান' সংস্কৃতে দীপ্তিমান, শোভমান, বাংলায় 'যা ভাসছে।' এই রকম আরও বহু শব্দের উল্লেখ করা যেতে পারে, বাহুল্য ভয়ে নিবৃত্ত হলাম।

ভাষায় সব শব্দই যে চিরকাল একই অর্থে প্রযুক্ত হতে থাকবে এ ধারণা শব্দার্থ-বিজ্ঞানসম্মত নয়। শব্দের এইরূপ অর্থ পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত সব ভাষাতেই পাওয়া যায়। ইংরেজী 'knave' শব্দের মূল অর্থ বালক, প্রচলিত অর্থ দুর্বৃত্ত; 'villain' শব্দের মূল অর্থ গ্রাম-বাসী, প্রচলিত অর্থ দুর্বৃত্ত, swain শব্দের মূল অর্থ বালক, প্রচলিত অর্থ কৃষক, uncouth শব্দের মূল অর্থ অপরিচিত প্রচলিত অর্থ অমার্জ্জিত, কুদর্শন। অনেক সময় দেখা যায় বৈদিকে যে শব্দ যে অর্থে প্রচলিত ছিল লৌকিকে সেই শব্দ সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ গ্রহণ

করেছে। গুপ (গোপায়তি) ধাতুর অর্থ রক্ষা করা, গোপন করা, যথা—শ্রুতং মে গোপায় (তুমি আমার শ্রবণলব্ধ জ্ঞান রক্ষা কর)' —তৈত্তিরীয় ৪র্থ অনুবাক্। উক্ত ধাতু নিষ্পন্ন গোপ শব্দের প্রাচীন অর্থও রক্ষক। গোপালক হিসাবে গোপের (গো—পা+অ কর্তৃ) প্রয়োগ ভাগবতাদি পরবর্তী গ্রন্থেই পাওয়া যায়। আধুনিক কাব্যে বৈদিক 'ক্রন্দসী' শব্দটির ছড়াছড়ি, অর্থ (যদি থাকে) 'ক্রন্দনবতা নারী', অথচ আসল অর্থ 'স্বর্গ ও মর্ত্য।' উষা অর্থে 'উষসী'র প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথ করেছেন এবং উত্তরসাধক আধুনিক কবিরাও করে থাকেন অসঙ্কোচে, 'স্বর্গের উদয়াচলে মূর্তিমতী তুমি হে উষসী' —উর্বশী কবিতার এই পংক্তিটি এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। শব্দটির প্রকৃত অর্থ কিন্তু প্রদোষ বা সায়ংসন্ধ্যা। কৃষ্টি শব্দের বৈদিক ও সংস্কৃত অর্থ—বিদ্বান্ (ব্যক্তি), কর্ষণ (cultivation) বা আকর্ষণ, বাংলায় 'culture' বা সংস্কৃতি অর্থে হামেশা খুব চলছে। 'সন্দেশ' ও 'তত্ত্বে'র অর্থান্তর-তত্ত্ব এতই পরিচিত যে, তার বিশদ বিস্তারে নিরস্ত হলাম।

এর পরে কয়েকটি সর্বদা ব্যবহৃত শব্দের অপপ্রয়োগ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। বলা প্রয়োজন, শিষ্ট প্রয়োগকেই আমি শুদ্ধির মান বলে মানি, যদিও অকারণ ব্যাকরণ-বিধি লঙ্ঘন করাও আমি সমর্থন করি না। অপপ্রযুক্ত শব্দগুলির মধ্যে কতকগুলির রূপ বদলান হয় নিছক নূতনত্বের খাতিরে, কতকগুলি আবার প্রযুক্ত হয় কপোল-কল্পিত অর্থে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুলগুলি ঘটে বাল্যশিক্ষার ত্রুটির জন্যে, কোন কোন স্থানে ইচ্ছাকৃত ঔদাসীন্যের ফলে। এইভাবে যথেচ্ছ শব্দপ্রয়োগের ফলে ভাষার বাঁধন যায় আলগা হয়ে এবং একের ভুল অপরে সংক্রমিত হয়ে ভাষাকে করে তোলে বিপর্যস্ত। ভাষার মাধ্যমেই হয় ভাবের বিকিকিনি, তাই ভাষার বাজারে এই 'অবাধ নীতি' চলতে দিলে এমন একটা অবস্থা অচিরেই আসবে যখন, শুধু ভিন্নভাষী বিদেশীর পক্ষে নয়, সেই ভাষা-ভাষী শিক্ষার্থীর পক্ষেও, প্রয়োগ-সিদ্ধ, শুদ্ধ রচনা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। তাল দিয়ে যেমন বাঁধতে হয় সুরকে, তেমনি ভাষাকেও বাঁধতে হয় শৃঙ্খলার শৃঙ্খলে, নইলে তার সুষমা নষ্ট হয়। এখন একে একে শব্দগুলি পরীক্ষা করা যাক:—

ভ্রাম্যমান, অগ্রসরমান, প্রবহমান, চলমান প্রভৃতি শানচ প্রত্যয় যোগে গঠিত কতকগুলি শব্দ সাহিত্যে, সংবাদপত্রে সম্প্রতি খুবই চলছে। আত্মনেপদ ধাতুর উত্তরই কেবল শানচ হয়; কিন্তু ভ্রম, সৃ, প্র-বহ, চল কোনটিই আত্মনেপদ নয়। বহ ধাতু উভয়পদ; কাজেই বহমান শুদ্ধ; কিন্তু 'প্রাদ্বহঃ' সূত্র-অনুসারে প্র-পূর্ব্ব-বহ ধাতুর আত্মনেপদত্ব বাধিত হয়েছে। অবশ্য ভ্রাম্যমাণ শব্দ হতে পারে 'যাকে ভ্রমণ করান হচ্ছে' এই অর্থে। রুচিবান্, সংস্কৃতিবান্, সম্মানীয় প্রভৃতি শব্দও বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের লেখাতেও আজকাল অবাধে চলছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, রুচিমান্, সংস্কৃতিমান, সম্মাননীয় প্রভৃতি শুদ্ধ শব্দ ব্যবহার করা বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। 'মতুপ' সম্বন্ধে নিয়মটি সংক্ষেপে এই:—অ-(অ, আ) বর্ণান্ত প্রাতিপদিকের উত্তর মতুপের 'ম' স্থানে 'ব' হয়, অন্যত্র 'ম'। প্রাতিপদিকের উপধা স্থানে 'ম' থাকলেও ম স্থানে ব হয়, যেমন লক্ষ্মীবান্। 'বিকশিত' বানানটি বাংলায় খুব চলতি; রবীন্দ্রনাথই বিশেষ করে বানানটিকে চালু করে গিয়েছেন; অথচ প্রকৃত বানান হওয়া উচিত বিকসিত; বি-পূর্ব্বক কাশ ধাতু ক্ত করলে হয় বিকাশিত (তুলনীয় প্রকাশিত), বিকশিত নয়। 'মোচন' অর্থে 'স্খলন' বাংলায় আর একটি বিশিষ্ট অপপ্রয়োগ, এই মজ্জাগত দোষ 'ক্ষালন' করতে সময় লাগবে। 'ইতিহাসপূর্ব্ব' অর্থে 'প্রাগৈতিহাসিক' শব্দের ব্যবহারও সমর্থনীয় নয়।

অরণ্যানী শব্দের সাদৃশ্যে বনানী, অরুন্তুদ শব্দের সাদৃশ্যে মর্মন্তুদ, পুরাতন শব্দের সাদৃশ্যে নবতম বাংলায় খুব চলে গিয়েছে। অপরপক্ষে, প্রত্ন শব্দটি খুব প্রচলিত হলেও শুদ্ধ শব্দ নূত্নের প্রয়োগ বাংলায় নেই।

'কামান' শব্দটি ফারসী (কমান্) অর্থ ধনু। প্রাচীন বাংলায় ঐ অর্থে প্রয়োগও আছে প্রচুর; যথা—'ভুরুযুগ কামের কামান,' 'কামের কামান জিনি ভুরুর ভঙ্গিমা খানি' (চণ্ডী)। ক্রমাগত ভুরুর সঙ্গে তুলনার ফলে শুধু ভ্রূ অর্থেও এর প্রয়োগ পাওয়া যায় প্রাচীন কাব্যে—যথা, 'দশনে অধর চাপে খেঁচিয়া কামান'। আধুনিক বাংলায় কিন্তু ঐ অর্থে শব্দটির প্রয়োগ নেই। ইংরেজী 'cannon' শব্দের সঙ্গে ধ্বনি সাম্যের ফলে এখন এর অর্থ দাঁড়িয়েছে 'তোপ'। ইংরেজ আমলের আগে 'cannon' অর্থে 'তোপ' শব্দই বাংলা তথা হিন্দীতে প্রচলিত ছিল। হিন্দীতে আজও কমান্ এর অর্থ ধনুক (যথা তীর-কমান্); cannon অর্থে তোপ শব্দই ঐ ভাষায় প্রধানত প্রচলিত। বাংলায় 'আয়াস' এবং 'আয়েশ' দুটো শব্দ চলতি আছে। অনেক সময় দেখা যায় বিশিষ্ট লেখকরাও এ দুটির প্রয়োগে ভুল করেন। শব্দ দুটি আকার এবং ধ্বনির দিক থেকে কতকটা অনুরূপ হলেও আসলে ওরা দুটি সম্পূর্ণ পৃথক্ বর্গের শব্দ। প্রথমটি সংস্কৃত, অর্থ—ক্লেশ, প্রযত্ন; দ্বিতীয়টি আরবী অর্থ—আরাম। 'আরাম' অর্থে আয়াসের প্রয়োগ সাহিত্যরথীদের রচনাতেও বিরল নয়। দৃষ্টান্ত:—'সিপাইবাবাজীরা যখন দ্বিপ্রাহরিক (?) আয়াস উপভোগ করেন…ইত্যাদি। আয়াস থেকে আসে আরাম এবং তার থেকে নিদ্রা।' (লৌহ-কপাট, দ্বিতীয় পর্ব্ব, পৃষ্ঠা ৩১)। 'আভাস' ও 'আভাষ' শব্দ দুটিরও অপব্যবহার প্রায়ই চোখে পড়ে। আভাস—[আ+ভাস (দীপ্তি পাওয়া) অচ] শব্দের অর্থ দীপ্তি, প্রতিবিম্ব, সাদৃশ্য, ইঙ্গিত (তুলনীয় রসাভাস, হেত্বাভাস)। ভাষ ধাতু (অর্থ বলা)-নিষ্পন্ন আভাষ শব্দের অর্থ আলাপ, সম্ভাষণ, ভূমিকা, মুখবন্ধ শব্দ দুটি সম্পূর্ণ ভিন্নার্থক। দুঃখের বিষয়, প্রথমটির অর্থে দ্বিতীয়টির প্রয়োগ সাম্প্রতিক সাহিত্যে এক রকম নিয়মই হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে তুলনা-নির্দেশক 'তর' প্রত্যয়ের স্থলে 'তরো' লেখা অসঙ্গত। অথচ আধুনিক সাহিত্যিকদের রচনায় এটা একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'কেমনতরো', 'নানানতরো'

ইত্যাদির 'তরো' আরবী তরহ শব্দ থেকে এসেছে ; অর্থ রকম, প্রকার।

একত্র শব্দটি অব্যয়, অর্থ এক সঙ্গে (সূত্র সপ্তম্যাস্ত্রল), সুতরাং 'একত্রিত' লেখা অনাবশ্যক ও অন্যায়, অথচ মুখের ও লেখার ভাষায় শব্দটির 'হরির লুট'। শ্রদ্ধাস্পদা শব্দটিরও খুব চল, শ্রদ্ধাই কোন মহিলা সম্বন্ধে আমরা শব্দটি খুবই ব্যবহার করি ; কিন্তু আস্পদ, ভাজন, প্রমাণ প্রভৃতি শব্দগুলি অজহল্লিঙ্গ অর্থাৎ লিঙ্গভেদে এদের রূপভেদ হয় না। পত্রে কোন মহিলাকে সম্বোধন করবার সময়ও 'শ্রদ্ধাস্পদাসু' না লিখে 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' লেখাই বিহিত। 'বয়স হয়েছে যার' এই অর্থে বয়স্ক লেখা ভুল ; সমাসের উত্তর পদ হলেই কেবল 'বয়স' প্রভৃতি শব্দের উত্তর 'কপ' প্রত্যয় হয়, যেমন সমান-বয়স্ক, অল্প-বয়স্ক। অসমস্ত অবস্থায় বয়স্থ বা বয়ঃস্থ দিয়ে কাজ চালান যেতে পারে। সহকর্ম্মী বা সহযোগী অর্থে 'সতীর্থ' শব্দটিও দিব্যি চলছে আজকাল ; অথচ ওর অর্থ 'সমান তীর্থ বা গুরু যাদের' অর্থাৎ সহপাঠী। পাণিনিমতে শব্দটির বানান হওয়া উচিত সতীর্থ্য (এই প্রসঙ্গে 'সমান-তীর্থে বাসী', 'তীর্থে যে' প্রভৃতি সূত্র দ্রষ্টব্য) ; ক্রীড়া-সাংবাদিকদের কৃপায় 'পেশল' শব্দটি (মাংসল শব্দের সাদৃশ্যে ?) 'পেশীবহুল' অর্থে এতই প্রসার লাভ করেছে যে শব্দটির প্রকৃত অর্থ যে সুকুমার, মনোহর একথা অনেকেরই অজানা রয়ে গিয়েছে। উপাদান অর্থে অবদানের, রক্ষিত্রীর স্থলে রক্ষয়িত্রীর (শিক্ষয়িত্রীর সাদৃশ্যে) ব্যবহারও বিরল নয়। তৎসম শব্দ সম্বন্ধে এই স্বৈরাচার কখনই উপেক্ষণীয় নয় এবং পরিস্থিতি আরও ঘোরাল হবার আগেই রাশ টেনে ধরার প্রয়োজন আছে।

সন্ধির নিয়ম অনুসারে অন্তস্থ 'ব' এর আগের 'ম' 'ং' হয়ে যায়। অনেক সময় অনবধানতাবশত এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা হয়, অর্থাৎ কিম্বা, সম্বাদ, সম্বিৎ, বারম্বার, বশম্বদ, প্রিয়ম্বদা প্রভৃতি লেখা হয়। বাংলায় অন্তস্থ 'ব' এর বিশিষ্ট উচ্চারণ না থাকায় এই জাতীয় ভুল হওয়া স্বাভাবিক। এ সম্বন্ধে বিকল্প-বিধি থাকলে ভাল হয় ; অথবা বর্গীয় 'ব' এর বেলায় সংস্কৃতে বিকল্প-বিধি থাকায় 'ব' এর পূর্ব্বে সর্ব্বত্র 'ং' লিখলে ভুলের হাত সহজেই এড়ান যায়।

সর্ব্বদা-ব্যবহৃত কয়েকটি তৎসম শব্দের বর্ণাশুদ্ধির নমুনা নীচে দেওয়া হ'ল। তদ্ভব ও দেশজ শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা পরে করা যাবে।

শুদ্ধ		অশুদ্ধ	
দুর্ব্বিষহ	স্থলে	দুর্বিসহ	ষত্ববিধির বিরুদ্ধতা
আনুষঙ্গিক	"	আনুসঙ্গিক	"
পরিস্ফুট	"	পরিস্ফুট	"
সর্ব্বাঙ্গীণ	"	সর্ব্বাঙ্গীন	ণত্ববিধির বিরুদ্ধতা
রুগ্‌ণ	"	রুগ্ন	"
পূর্ব্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ	"	পূর্ব্বাহ্ন, অপরাহ্ন	"
রুক্ষ	"	রুক্ষ্ম	সূক্ষ্ম শব্দের সাদৃশ্যে
বিকিরণ, উদ্‌গিরণ	"	বিকীরণ, উদ্‌গীরণ	বিকীর্ণ, উদ্‌গীর্ণ শব্দের সাদৃশ্যে
ওতপ্রোত	"	ওতঃপ্রোত	উচ্চারণ বিকৃতি হইতে
আপাতদৃষ্টি	"	আপাতঃদৃষ্টি	"
মন্ত্রপূত	"	মন্ত্রঃপূত	"
প্রাতরাশ	,,	প্রাতঃরাশ	
পাশ্চাত্ত্য	,,	পাশ্চাত্য	'দক্ষিণা-পশ্চাৎ-পুরোভ্যস্ত্যণ্' সূত্র দ্রষ্টব্য
ত্যাজ্য, পরিত্যাজ্য (ত্যজ-ণ্যৎ)	,,	ত্যজ্য, পরিত্যজ্য	ক্যপ নিষ্পন্ন পরিত্যজ্য শব্দের সাদৃশ্যে
ভৌগোলিক, পৌরোহিত্য		ভৌগলিক, পৌরহিত্য	
প্রনষ্ট	,,	প্রণষ্ট	'নশেঃ ষান্তস্য' সূত্র দ্রষ্টব্য
নির্নিমেষ	,,	নির্ণিমেষ	
বিকসিত	,,	বিকশিত	
ভান	,,	ভাণ	(ছল, কপটতা প্রভৃতি অর্থে)
কুৎসিত	,,	কুৎসিৎ	
উচিত	,,	উচিৎ	
অদ্ভুত (অৎ-ভূ+ডুতচ)		অদ্ভুত	ভূ-ধাতু-নিষ্পন্ন 'ভূত' শব্দের সাদৃশ্যে
পৈতৃক	,,	পৈত্রিক	তদ্ধিত বিধির বিরুদ্ধতা
সম্ভাবনা	,,	সম্ভবনা	
বক্তব্য	,,	ব্যক্তব্য	
লক্ষণীয়	,,	লক্ষ্যণীয়	
অপস্রিয়মাণ	,,	অপসৃয়মান	
অপেক্ষমাণ, প্রতীক্ষমাণ		অপেক্ষমান, প্রতীক্ষমান	ণত্ববিধির বিরুদ্ধতা
চূষ্য	,,	চোষ্য	
দূষণীয়	,,	দোষণীয়	
কার্ত্তিক, বার্ত্তিক	,,	কার্তিক, বার্তিক	(বার্তাবাহক অর্থে শুদ্ধ)
ইয়ত্তা, আয়ত্ত	,,	ইয়ত্ত্বা, আয়ত্ব	
সত্তা, সত্ত্ব	,,	সত্ত্বা বা সত্ব', সত্ব	
স্বত্ব (স্বামিত্ব অর্থে)		সত্ব বা সত্ত্ব	
পক্ব (পচ্‌-ক্ব)	,,	পক্ক	
গ্রস্ত	,,	গ্রস্থ	
প্রজ্বলিত	,,	প্রজ্জ্বলিত	উজ্জ্বলের সাদৃশ্যে
কজ্জল	,,	কজ্জ্বল	,,
আকাঙ্ক্ষা	,,	আকাঙ্খা	
ক্ষোদিত	,,	খোদিত	
উহ্য	,,	উহ্য	
স্বত-উৎসারিত	,,	স্বতোৎসারিত	সন্ধিবিধির বিরুদ্ধতা
সদ্যোজাত, সদ্য-উত্থিত		সদ্যজাত, সদ্যোত্থিত	,,
মনঃকষ্ট	,,	মনোকষ্ট	,,
সমীচীন	,,	সমীচিন বা সমিচীন	

মহীয়সী	,,	মহিয়সী	
কূল (তট, তীর)		কুল	বংশার্থক কুল শব্দের সঙ্গে গোলযোগের ফলে
আকৃতি	,,	আকুতি	
দূর্ব্বা, স্তূপ	,,	দুর্ব্বা স্তুপ	
তূলি, তূলিকা	,,	তুলি, তুলিকা	
কৌতূহল	,,	কৌতুহল	কৌতুক শব্দের সাদৃশ্যে

র-ড় এর গোলযোগ এবং অনুনাসিকের (চন্দ্রবিন্দুর) যথেচ্ছ প্রয়োগ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত দিতে গেলে পুঁথি বেড়ে যাবে। তা ছাড়া অনুনাসিকের ব্যাপারে ঐকমত্যেরও অভাব আছে, যেমন, নিক্ষেপ অর্থে ছোড়া, ছোঁড়া, অলস অর্থে কুড়ে কুঁড়ে, বিন্দু অর্থে ফোটা ফোঁটা দুয়েরই ব্যবহার আছে ; আঞ্চলিক উচ্চারণ অনুসারে খোপা খোঁপা, বোজা বোঁজা দুইরূপই সাহিত্যে চলছে।

যে ভুলগুলি সংবাদপত্রে ও সাহিত্যে সর্ব্বদা চোখে পড়ে উপরে তারই একটি তালিকা দাখিল করা গেল, বলা বাহুল্য এটি সম্পূর্ণ নয়। এই জাতীয় কোন তালিকাই সম্পূর্ণ হতে পারে না ; আর আমার উদ্দেশ্যও নয় ভুলের ফিরিস্তি সামনে ধরে পাঠকদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটান। পদ-প্রয়োগের শিথিলতা আধুনিক সাহিত্যে এত ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে যে, সময়োচিত সাবধান-বাণী উচ্চারণ করা ভাষা-শিক্ষক হিসাবে আমার পবিত্র কর্ত্তব্য বলে আমি মনে করি। নতুবা কেবল উপদেশকের উচ্চ মঞ্চে চড়ে বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করা আমার অভিপ্রায় নয়। ইংরেজির অনুকরণে অনেক নতুন প্রয়োগ-রীতি আজ ভাষায় প্রবেশ করেছে। দুশো বছর ধরে যে ভাষা আমাদের উপর আধিপত্য করে আসছে তার প্রভাব আমাদের ভাষায় কিছুই পড়বে না এ কখনই সম্ভব নয় ; কিন্তু তাই বলে অন্ধ অনুকরণও বাঞ্ছনীয় নয়। বেহিসাবী গ্রহণে ঋণের পরিমাণই বেড়ে যায়, ভাষার সমৃদ্ধি বাড়ে না। এই প্রসঙ্গে এক-জন বিশ্রুত সাহিত্যিকের লেখা থেকে একটা দৃষ্টান্ত দিই :—'এক সেকেণ্ড পরে আমি নিজেকে দেখতে পেলাম ঘরের মধ্যে'—(হৃদয়ের জাগরণ', বুদ্ধদেব বসু ; শারদীয় 'ধূপছায়া' ১৩৫৯, পৃষ্ঠা ৫০)। এরূপ প্রয়োগে ইংরেজী-রীতির গন্ধ একটু উগ্রভাবেই ফুটে উঠে ; পরক্ষণেই 'আমি ঘরে ঢুকলাম' বললেই খাঁটি বাংলা-রীতিসম্মত হ'ত না কি ? 'এই লেখকের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিশ্রুতি আছে।' এই ধরনের উক্তি প্রায়ই চোখে পড়ে। স্পষ্টতই এখানে প্রতিশ্রুতি শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে ইংরেজী 'promise'-এর প্রতিশব্দ হিসাবে, কিন্তু 'promise' শব্দটির অন্বয়গত অর্থ কি এখানে 'অঙ্গীকার' ? এ সব স্থলে লেখা উচিত 'সম্ভাবনা'। কিন্তু কে অতশত চিন্তা করে, কেই বা কার কড়ি ধারে ? কাজেই ভাষার রাজ্যেও 'স্ব-রাজ' চলতে থাকুক। মেয়েদের নাম রাখবার মত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের কি অভাব আছে আমাদের ভাষায় ? তবুও খাঁটি পুংলিঙ্গ-শব্দ 'সবিতা', 'নীলিমা' প্রভৃতির প্রতি কেন এই অকারণ পক্ষপাত ? মোট কথা, শিক্ষানবিশীর শ্রম স্বীকার না করেই সাহিত্যের আসরে নামার মাশুল আমাদের দিতেই হবে। এ আমাদের বিধিলিপি।

ধূসর গোধূলি

শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

তবে তাই হোক।
এ'দিকে রাত্রির ছায়া অন্তহীন আঁধারে মিলোক।
দেখেছি অজস্র দিন রৌদ্রময় উজ্জ্বল মধুর
তবু কি শ্রান্তির ভারে বক্ষ তার ব্যথায় বিধুর!
কি নির্জন বেদনায় আকাশের সায়াহ্ন ছায়ায়
নিলায় গোধূলিহেম। রাত্রি নামে ; দিন থেমে যায়
বিবর্ণ বিষণ্ণ ম্লান জীবনের ভারে ;
অহর্নিশি সংগ্রামের ব্যর্থতার ক্ষুদ্র বারে বারে।

তবে তাই হোক।
তোমারে বিদায় দিই। জীবনের গোধূলি আলোক
নিঃশব্দে নিভিয়া যাক্ প্রসারিত সন্ধ্যার অঙ্গনে।
তারপর পুঞ্জিভূত তমিস্রার একাকার রাতে
আমার সমাধি আমি গড়ে নিই আপনার হাতে।

একান্ত নিবিড় রাত্রি ;
আমি যাত্রী
একাকার ছায়া অন্ধকারে।
আকাশের শূন্যতার পারে
আমি শুধু মুছে যাই জীবনের স্বপ্ন ব্যর্থতারে॥

লালসন্ধ্যা

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

২৪

কিছুক্ষণের মধ্যেই মিত্রা ফিরে এল। সঙ্গে কেষ্ট এসেছে ট্রে নিয়ে।

মিত্রা বলল, খান কয়েক পেষ্ট্রি শুধু এনেছি। চা আর এখন দেব না। কোকো খান। কথায় কথায় আজ আপনার বড্ড দেরি হয়ে গেল।

কেষ্ট টিপয়ের উপর ট্রে রেখে নিঃশব্দে চলে গেল।

অতনু বলল, সেজন্য তুমি দায়ী মিত্রা।

মিত্রা একটু হেসে কথাটা স্বীকার করে নিয়ে বলল, আমার দোষ হয়ে গেছে মেনে নিলাম। এবারে দয়া করে আপনি আরম্ভ করুন।

অতনু খেতে খেতে বলল, আচ্ছা, কেষ্ট হঠাৎ তোমার এমন ভক্ত হয়ে উঠল কেমন করে বলতে পার মিত্রা?

জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে মিত্রা, হয়েছে নাকি?

অতনু বলল, কেন, বুঝতে পার না তুমি?

পারি। মিত্রার কণ্ঠস্বর সহসা গাঢ় হয়ে উঠল। বলল, সত্যিকারের প্রভুভক্ত বলেই শত্রুমিত্র চিনতে ভুল করে না।

অতনু সহাস্যে বলল, এক সময় কিন্তু তোমাকে চোখে চোখে রাখত আর সুযোগ পেলেই চীৎকার করত।

নিতান্ত সহজ কণ্ঠে মিত্রা জবাব দিল, আজ আর বলতে বাধা নেই অতনুবাবু। চীৎকার করে কিছু অন্যায় করত না। আপনার আশে-পাশে জনকয়েক লোক সব সময় জেগে ছিল, আর আছে বলেই আজও আপনার মাথা উঁচু করে চলবার পথ আছে। আর আমিও নিজেকে শুধরে নেবার সুযোগ পেয়েছি।

অতনু পুনরায় গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, সুযোগ কে কাকে দিয়েছে ওটা তর্কের বিষয়। কিন্তু মাথা উঁচু করে চলার অর্থটা ঠিক বোঝা গেল না মিত্রা। তুমি কি আমাকে আঘাত করবার চেষ্টা করছ?

মিত্রা উত্তাপহীন কণ্ঠে বলল, আমার দুর্ভাগ্য যে, আঘাত করবার কথাটা আপনি ভাবতে পারলেন। অবস্থার গুরুত্বটা বোধ হয় আপনি বুঝতে পারেন নি, তাই এ কথা বলতে পারলেন।

অতনু বলল, অবস্থার গুরুত্ব বুঝেও আমি সুতো ছেড়েছি মিত্রা। এত খেলেও তাই মুখ থেকে তুমি বঁড়শি খুলতে পারছ না।

একটুখানি চুপ করে থেকে মিত্রা জবাব দিল, তা হয়ত পারি নি, কিন্তু শিকারীকে জলেও নামিয়েছি আর ল্যাজের ঝাপটাও মেরেছি। এ কথা নিশ্চয় স্বীকার করবেন।

তবে প্রাণে মারতে পার নি। অতনু পরিহাস করে বলল।

মিত্রাও রহস্য করে বলল, হতমান করতে পেরেছি ত?

তা পেরেছ। অতনু জবাব দিল, আর এইটেই ত আমারও প্রশ্ন, কিন্তু তোমার আজ কি হয়েছে বল দেখি মিত্রা? একবার বলছ মাথা উঁচু করে চলতে পারছি আবার বলছ হতমান হয়েছি, তোমার কোন কথাটা সত্যি?

মিত্রা সহজ গলায় বলল, দু'টোই সত্যি অতনুবাবু। যে আপনাকে জলে নামিয়েছে আপনি তাকে ডাঙায় তুলেছেন। আপনারই সেবায় সে দিয়ে বসল তার প্রাণ। যে জানে আপনার জলে নামার ইতিহাস তার মুখ ত চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে।

অতনু মাথা নাড়তে নাড়তে বলে, মেয়েদের চরিত্র দুর্জ্ঞেয়, এটা ঋষি বাক্য। ও জানবার আমার আগ্রহ নেই তাই বলে কথাগুলো এমন দুর্বোধ্য হবে কেন? আমার মাথায় একেবারেই ঢোকে না।

মিত্রা গভীর আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলল, সেই জন্যেই মুঠো ভরতি পেয়েও তা গ্রহণ করতে জানেন না। মূল্য দিতে পারেন না।

অতনু বলল, মুঠো ভরতি ছাই পেলেও তাকে মূল্য দিতে হবে মিত্রা?

মিত্রা গম্ভীর হয়ে উঠে বলল, আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেবার আগে একবার নেড়েচেড়ে দেখতে দোষ কি? ছাইয়ের তলায় মণি-মুক্তাও পাওয়া যেতে পারে।

অতনু বলল, এত ঘুরিয়ে কথা বল কেন মিত্রা? আর একটু সহজ-সরল ভাষায় বলতে পার না?

মিত্রা গম্ভীরভাবে জবাব দিল, পারি। তবে সকলে যে সহজ-সরল কথা সহ্য করতে পারে না অতনুবাবু। আপনিও পারবেন না।

খানিক মিত্রার মুখের পানে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে অতনু বলল, আর একটু সহজ করে বল।

মিত্রা বলল, রাতদুপুরে একজন যুবতী সুন্দরী স্ত্রীলোকের ঘর থেকে স্বামীকে বার হয়ে আসতে দেখলে কোন স্ত্রীই চুপ করে থাকতে পারে না। কিন্তু তারই অভিযোগের পাল্টা জবাব দিতে গিয়ে সেই স্ত্রীর চরিত্রের উপর অকারণে যদি দোষারোপ করে ব্যঙ্গ করা হয় তা হলে—

থাম মিত্রা—অতনু ধমকের সুরে চীৎকার করে উঠল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সে তার অতীতে ফিরে গেল।

মিত্রা জবাব দিল, সত্যকথা সহজভাবে বললে আপনার ভাল লাগবে না বলায় অনুযোগ দিয়েছিলেন না অতনুবাবু?

অতনু ইতিমধ্যে সামলে নিয়েছে।

মিত্রা কিন্তু থামতে পারল না। বলে চলল, আপনি অনেক বোঝেন, কিন্তু এই অতি সাধারণ কথাটা কেন বুঝতে চান না আমি জানি না। মানুষ সব সময়ই মানুষ। গ্রহের ফেরে আপনি ওখানে আমি এখানে। তারই জোরে আপনি আমাকে গরু-ছাগল মনে করতে পারেন না। মনে করা উচিত নয়।

অতনু একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, শ্রীমতী কি তোমাকে উকিল নিযুক্ত করে গেছে মিত্রা দেবী?

মিত্রা শান্তভাবে জবাব দিল, এ আপনার অশ্রদ্ধার কথা অতনুবাবু। মনটাকে আর একটু উদার করবার চেষ্টা করুন। দেখবেন অনেক সমস্যাই কত সহজ হয়ে যাবে।

একটু ইতঃস্তত করে অতনু বলল, শ্রীমতী পুরোপুরি মেয়ে নয়—

মিত্রার বিস্ময় সীমা ছাড়িয়ে গেল। বলল, এমন উদ্ভট কথা কখনও শুনি নি আমি। একজন মেয়ের সম্বন্ধে অপর একটি মেয়ের কাছে এই ধরনের কথা আর কোনদিন আপনি বলবেন না। আপনার আসল বক্তব্যটা আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি শুধু খেলাতেই ভালবাসেন না—খেলেও আনন্দ পান। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ যে ঐ একটি বিশেষ বিন্দুতে সীমাবদ্ধ নয় অতনুবাবু।

অতনু চুপ করে আছে।

মিত্রা বলে চলেছে, আপনার স্ত্রী অত্যন্ত স্পষ্ট। স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধের মধ্যে এই ধরনের খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তিকে সম্ভবতঃ কোন দিন আমোল দিতে পারেন নি, তাই পুরোপুরি পেয়েও আপনার মন ভরে নি।

অতনু তথাপি নীরব।

মিত্রা বলতে থাকে, আগের দিনে মেয়েরা স্বামীর কাছ থেকে সন্তান পেলেই ভালবাসার চরম পুরস্কার পেয়েছে মনে করতে দ্বিধা করত না, কিন্তু আজ আর এইখানে এসেই তারা থামতে পারে না। দেহ এবং মন দুটোই তাদের সজাগ হয়ে উঠেছে। এর কোনটাকেই আর উপেক্ষা করা চলে না।

এতক্ষণে দ্বিধাভরে অতনু থেমে থেমে জবাব দিল, তোমার কথাগুলো কি নিতান্তই এক তরফা হয়ে যাচ্ছে না মিত্রা?

মিত্রা দ্বিধাহীন কণ্ঠে জানাল, না অতনুবাবু। এটা হ'ল নিছক পরস্পর পরস্পরকে বোঝাপড়ার প্রশ্ন। এই প্রশ্নটিকে পাশ কাটিয়ে না গিয়ে দরদ দিয়ে বিবেচনা করে দেখলে দেহ আর মন কোনটাই উপবাসী থাকে না।

অতনু ধীরে ধীরে বলে, তোমার কথাগুলি কিছু কিছু বুঝতে পারছি মনে হচ্ছে। আরও একটু সহজ করে বলবে কি?

মিত্রা একটু হেসে বলল, মিথ্যা বাদপ্রতিবাদ করে সব কিছুকে লঘু করে দেখবার চেষ্টা করেন বলেই সহজটাও আপনার কাছে সহজ মনে হয় না। কথাটা আপনিও জানেন আর আপনার স্ত্রীকেও জানিয়ে দিয়েছেন আপনাদের মধ্যের প্রকৃত ব্যবধানটা। তাই তিনি চাইলেও আপনি সম্পূর্ণ এগিয়ে যেতে পারেন নি। আপনার অহঙ্কার আপনাকে এগোতে দেয় নি। উপরন্তু খোঁচা দিয়ে তাঁর উপবাসী মনটাকে রক্তাক্ত করে ছেড়েছেন—

অতনু যেন আর্ত্তনাদ করে উঠল, মিত্রা—

মিত্রা থামতে পারে না। কতকটা যেন নেশার ঝোঁকে সে বলে চলেছে, অস্বীকার করতে পারেন এ সব কথা? অথচ সবচেয়ে আশ্চর্য্য যে, একদিন আপনিই তাঁকে উপযাচক হয়ে বিয়ে করেছেন।

অতনু উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, তুমি কি চাও মিত্রা—

অতনুকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে মিত্রা বলতে থাকে, আপনার চোখে না পড়লেও আমার দৃষ্টিকে তিনি ফাঁকী দিতে পারেন নি। আপনার এই ধরনের ব্যবহারকে তিনি সুরুতে উপেক্ষা করে চলবার চেষ্টাই করেছেন। মিথ্যে বলব না—প্রথম প্রথম আমি অবাক হয়ে ভাবতাম এ তিনি করছেন কি? কেন তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করছেন না এত বড় অসম্মানজনক অন্যায়ের বিরুদ্ধে?

অতনু ক্লান্ত গলায় বলল, তোমার মতে আমি আগাগোড়া শুধু ভুল আর অন্যায়ই করেছি?

মিত্রা জবাব দিল, গোড়ার কথা আমি জানি না অতনুবাবু। আমার যতটুকু চোখে পড়েছে সেইটুকুই আপনাকে বললাম। আপনিই ভাবুন দেখি, কতবড় অন্যায় আর নোঙরা কথা স্বামী হয়ে স্ত্রীকে বলেছেন? এর পরে কোন্ স্ত্রী মুখ বুজে থাকতে পারে?

অতনু ধীরে ধীরে বলে, তুমি ত স্বামীর স্ত্রী নও মিত্রা!

মিত্রা খানিকটা ধমকের সুরে বলল, থামুন অতনুবাবু। মা হয়েই মেয়েরা মায়ের পেট থেকে জন্মায় না। তাই বলে তাদের পুতুল খেলায় মায়ের ভূমিকায় নিখুঁৎ অভিনয়কে নিছক অভিনয় মনে করার পিছনেও কোন যুক্তি নেই।

কাতর কণ্ঠে অতনু বলল, তুমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর মিত্রা।

মিত্রা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জবাব দিল, কিন্তু জ্ঞানপাপী নই অতনুবাবু।

অতনু মৃদু কণ্ঠে বলল, যত কথা আজ তুমি আমাকে শোনালে তা আমার মনে থাকবে মিত্রা। কিন্তু শ্রীমতীকে নিয়ে এতটা

বাড়াবাড়ি করবার যে তোমার কি উদ্দেশ্য তা আমি এখনও বুঝলাম না।

মিত্রা বলল, একটুও বাড়িয়ে বলিনি। যা আমার মনে হয়েছে আমি অকপটে তা প্রকাশ করেছি। তা ছাড়া এতে আমার লাভ কি?

অতনু এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে মিত্রার মুখের পানে খানিক চেয়ে থেকে এক সময় মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, সেটা তুমিই ভাল জান। কিন্তু আমি তোমার উদ্দেশ্যটা সত্যিই বুঝতে পারি নি।

মিত্রা বলল, এর মধ্যে বোঝাবুঝির কি আছে—আমার যা মনে এসেছে বলে গেছি। যদি মনে করেন এ সব ভিত্তিহীন কথা, তা হলে ভুলে যাবেন। আমরা ইতর জন, চাকরিটি বজায় থাকলেই সুখী হব।

মিত্রা মুহূর্তের জন্য থেমে পুনরায় অন্য প্রসঙ্গে এল, বলল, আচ্ছা অতনুবাবু, আপনার স্ত্রী যদি এখন ফিরে আসেন তা হলে কি করেন?

অতনু ধীরে ধীরে বলে, শ্রীমতী খুব সহজে আসবে বলে আমার মনে হয় না।

মিত্রা বিস্মিত কণ্ঠে বলল, তাঁর সম্বন্ধে এত বড় একটা সিদ্ধান্ত কোন যুক্তিতে করে বসেছেন আমি বুঝি না অতনুবাবু?

অতনু বলে, ওটা আমার বিশ্বাস।

মিত্রা দৃঢ় কণ্ঠে বলল, আপনার ভুল—আপনার স্ত্রীকে আসতেই হবে। তাঁর নিজের জন্য না হলেও অন্ততঃ সন্তানের মঙ্গলের জন্য—

অতনু বসে ছিল। সহসা সোজা উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, কি পাগলের মত বকছ মিত্রা—

মিত্রার বিস্ময় সীমা ছাড়িয়ে গেল। সে বোকার মত খানিক অতনুর মুখের পানে চেয়ে থেকে হতাশ কণ্ঠে বলল, আপনাকে আমার আর বলবার কিছু নেই। আপনি আমার চেয়েও দুর্ভাগা অতনুবাবু।

অতনু জবাব দিতে পারে না। তার কথা হারিয়ে গেছে।

২৫

অকস্মাৎ ঠাকুর্দ্দার উপর অতনুর মনটা বিরূপ হয়ে উঠল। মিত্রার কথাগুলি যুক্তি-বিচার দিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে বারে বারেই তার মন বলছে যে, সে হয় ত মিথ্যে বলে নি। তার জীবনের এতগুলি বছর যে পথ বেয়ে এগিয়ে এসেছে তার দু'পাশে অতনু অনেক ফুল ফোটাতে পারত। কিন্তু তা সে করে নি। করবার কথা একবারও মনে হয় নি। আত্মচিন্তায় নিমগ্ন ছিল। যে চিন্তা শুধু দেহকে কেন্দ্র করেই বাস্তব রূপ নিয়েছে। ভেঙেছে অনেক, ছিঁড়েছে প্রচুর। এ পথে যে আনন্দ সে পেয়েছে তা শুধু তাকে উদ্দাম করে তুলেছে। ঠাকুর্দ্দা তাকে দু'হাত ভরে নিতে শিখিয়েছিলেন, দিতে নয়। চিরদিন পেয়ে পেয়ে অতনুর মনের একটা দিক প্রায় মরে যেতে বসেছিল। শ্রীমতীই তার জীবনে প্রথম মেয়ে যার হাতের সোনার কাঠির ছোঁয়া লেগে সে ঘুম ভেঙে জেগে উঠে দু'হাত বাড়িয়ে বলেছিল, আমাকে গ্রহণ কর। শ্রীমতী নিজে—নিজেকেও উজাড় করে দিলে। এত দিনের ঘুম-জড়ান চোখে সে চিনতে করল ভুল। শ্রীমতী কল্পনার রাজকন্যা নয়। একজন নারী। তার রূপ আছে, শক্তি আছে। অতনু স্বল্প সময়ের জন্য নিজেকে আদর্শ পুরুষরূপে ফিরে পেল। যে পুরুষ নারীর কাছে ধরা দেয় নিজেকে নবরূপে ফিরে পাবার আকাঙ্ক্ষায়। ছন্ন ছাড়া অতনু শ্রীমতীকে ঘরে নিয়ে এল গৃহলক্ষ্মীরূপে।

কিন্তু লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠার শুদ্ধ পরিচ্ছন্ন মন আবার নতুন করে অন্ধকারে বিপথগামী হ'ল। আবির্ভাব ঘটল মিত্রার। আবির্ভাব বললে ভুল বলা হবে। একলা বিপদাপন্ন অবস্থায় পেয়ে আশ্রয় দেবার নাম করে অতনুর দুটো পোষা নেকড়ে তাকে নিয়ে এল তার বিশ্রামকুঞ্জে। অতনুর চোখে তখন উন্মাদ নেশা। ঘরের মধ্যে মিত্রা একলা দাঁড়িয়ে। আর দোরগোড়ায় পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে জানকান আর আগারওয়ালা। অতনু চোখ তুলে তাকাল। মেয়েটা ভয়ে কুঁকড়ে গেছে, কিন্তু চোখ দুটো জ্বলছে। অতনু চমকে উঠল। তার মনের অসংযত মত্ততা কেটে গেছে। আশ্চর্য্য! ঐ দুটো অদ্ভুত জ্বলন্ত চোখের মধ্যে শ্রীমতী এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছে। হাতে তার সেদিনের সেই সোনার কাঠি, মুখে বিচিত্র একটুকরো হাসি। অতনু আর একবার চমকে উঠল। ওর দৃষ্টির সম্মুখ থেকে অন্ধকারের কাল যবনিকা ধীরে ধীরে সরে গিয়ে আলোয় আলো হয়ে গেছে। সে আবার নতুন চোখে দেখল মিত্রাকে, দেখল নিজেকে। অতনুর সমস্ত সত্তা কেঁপে উঠেছিল সেদিন। আর এক পা সে এগোতে পারে নি। একটা মিষ্টি সঙ্কোচ আর দ্বিধা তাকে থামিয়ে দিয়েছিল। অতনু ইঙ্গিতে মেয়েটিকে মুক্তি দেবার আদেশ জানাল। জানকান আগারওয়ালা দূরে দাঁড়িয়ে মিত্রার বিব্রত আর বিপর্যস্ত অবস্থা উপভোগ করছিল। হঠাৎ তারাই ত্রাণকর্তার ভূমিকায় এগিয়ে এল। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে তাকে নিয়ে উধাও হয়ে গেল।

অতনু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। কি সুন্দর আর স্নিগ্ধ মনে হয়েছিল সেই আলোটুকু যে আলোতে সে দেখতে পেয়েছিল মানুষ অতনুকে। কিন্তু কোথায় শ্রীমতী! তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। অতনুর জীবনযাত্রার এই অন্ধকার পথের সন্ধান কেমন করে সে পেল? কেমন করে ঘটল তার আবির্ভাব? কে দিল এখানকার সন্ধান?

অতনুর দ্বিধা বিভক্ত মনের আর এক দিক বিদ্রোহী হয়ে উঠল তার জীবনের এই গোপন মহলে শ্রীমতীর প্রবেশ করবার দুঃসাহস দেখে, কিন্তু অপর দিক খুশী হ'ল আনন্দের আর একটি সহজ-সুন্দর পথের সন্ধান পেয়ে।

অতনুর চলার পথে এই ধরনের অভিজ্ঞতা ইতিপূর্ব্বে আর হয় নি। অভিনন্দন জানাতে ইচ্ছা করে অতনুর। একটা অনাস্বাদিত পরিতৃপ্তির স্বাদ পেয়ে সে যেন জেগে উঠেছে। নিজের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখার ইচ্ছেটা আবার প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

এখানে মিত্রা নয়, চিত্রা নয়, হেনা কিংবা সুচিত্রাও নয়—কাঁটা বনে চলতে-ফিরতে তার দেহ থেকে অনেক রক্তক্ষরণ হয়েছে, বিন্দু বিন্দু তাজা রক্ত। ফিরে সে কিছুই পায় নি। শুধু মনের কোণে জড়িয়ে আছে খানিকটা স্মৃতি। অতৃপ্ত আনন্দের চঞ্চল অনুভূতি মাখান স্মৃতি, ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে দেহ। জর্জ্জরিত হয়েছে মন। তবুও অতনু থামতে পারে নি। থামার কথা সে মনেও স্থান দেয় নি।

নতুন সম্ভাবনার চিন্তায় অতনু চঞ্চল হয়ে উঠেছে, অনুরণিত হয়ে উঠেছে এক অপূর্ব্ব সুর! যে সুরে তাল আছে, মান আছে, লয় আর ছন্দ আছে।

অতনু ফিরে এল ঘরে, খুলে দিল স্বামী-স্ত্রীর দুই শয়ন কক্ষের মাঝের দরজাটা! তাজা ফুলের মধুর মদির সৌরভে ভরে গেছে তার মন। কোথাও একটুকু অন্ধকারের মালিন্য নেই। অতনু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে আশে-পাশের সবকিছু। কাঁটা নেই—সৌরভ আছে। নরম একরাশ তাজা ফুল। তুলে নিল বুকে। প্রাণ ভরে খেলা করল। ডুবে গেল গভীর থেকে আরও গভীরে।

কিন্তু তার মনের আর একটা দিক মেনে নিতে পারল না এই নতুন ব্যবস্থাকে। সুযোগ মত আবার ঐ খোলা দরজা বন্ধ করে দিয়ে কানে তার বিপরীত বুদ্ধির বিষ ঢেলে দিল। অতনু চমকে উঠে। যে ফুল বুকে তুলে নিয়েছিল তাকেই সে ধুলোয় ছুঁড়ে ফেলে দিল। পা তুলে মাড়িয়ে দিতে উদ্যত হ'ল। ফুলের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে সাপ। দংশন করে না। শুধু চোখের বিষাক্ত দৃষ্টি দিয়ে একবার অতনুর সর্ব্বাঙ্গ লেহন করে নিঃশব্দে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। সেই থেকেই অতনু ছটফট করছে অন্তরে। দৃষ্টিতে যে এত বিষ থাকতে পারে ইতিপূর্ব্বে ঠিক এ ভাবে সে কোনদিন অনুভব করে নি। এর চেয়ে দংশন চের ভাল ছিল।

অতনু আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এ অসুস্থতা তার মনের। মিত্রা অনুযোগ দিয়ে বলে, আপনি দেখছি খুব ভেঙে পড়েছেন।

একটি নিঃশ্বাস ফেলে অতনু ম্লান কণ্ঠে বলল, মিথ্যে বল নি মিত্রা। কথাটা আমিও প্রতি মুহূর্ত্তে অনুভব করছি। একের পর এক আমার সবকিছু ভেঙে যাচ্ছে।

মিত্রা স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলে, ইচ্ছে করলেই সে ভাঙন আপনি রোধ করতে পারেন।

বাধা দিয়ে অতনু বলল, না মিত্রা, ইচ্ছে করলেই মানুষ তা পারে না। অন্ততঃ আমি যে পারছি না তা ত দেখতেই পাচ্ছ। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলেও মচকাতে পারছি না।

মিত্রা কোমল কণ্ঠে বলে, দয়া করে কয়েকটা দিন অন্ততঃ আপনার এই চিন্তাগুলো ছাড়ুন। শান্ত হয়ে বিশ্রাম নিন।

অতনু বলল, বিশ্রাম কি কিছু কম নিচ্ছি মিত্রা? কিন্তু নিশ্চিন্ত হয়ে সে বিশ্রাম উপভোগ করা আমার ভাগ্যে নেই, তোমরা সকলে মিলে এ আমায় কোথায় নিয়ে এলে বল দেখি। বেশ ছিলাম আমি।

মিত্রা নরম দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। কোন জবাব দিতে পারে না।

অতনু স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলে, অতনু কোনদিন তার অতীত, বর্ত্তমান আর ভবিষ্যতকে পাশাপাশি রেখে চিন্তা করে নি। করতে সে জানত না।

মিত্রা ভিজে গলায় জবাব দেয়, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন অতনুবাবু।

একটুখানি হেসে অতনু বলে, ক্ষমা কে কাকে করবে আমি বুঝি না মিত্রা। নিতে হলে কিছু দিতে হয়, এই চিরদিনের সত্যটা তুমি আমাকে শিখিয়েছ। শ্রীমতীও চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তার হাতের মুঠি দৃঢ় ছিল না। আমার গতিবেগ তাই আয়ত্তাধীনে রাখা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি।

মাথা নেড়ে মিত্রা বলল, ভুল বললেন। আসলে শ্রীমতীই আপনার বেপথু মনটাকে তৈরি করে দিয়েছেন, নইলে মিত্রার দ্বারা কিছুই হ'ত না। কিন্তু এসব কথা আপনার কাছে কে শুনতে চাইছে? আপনি এবারে চুপ করুন।

অতনুর কণ্ঠস্বর গাঢ় শোনাল। সে বলতে থাকে, আমাকে বাধা দিও না। কথা বলতে দাও। জান মিত্রা, আজ ক'দিন ধরেই আমি তোমার মধ্যে শ্রীমতীকে পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছি। অথচ আমার জীবনপথে তুমিই একমাত্র মেয়ে যে অন্যায় আঘাতে ভেঙে পড়ে নি বরং নিঃশব্দে বুক বেঁধেছে সেই আঘাতকে ফিরিয়ে দেবার জন্য। যে দেহটাকে কেন্দ্র করে তার চতুর্দ্দিকে এত জঞ্জাল জড়ো হয়েছিল সেই দেহকে কেন্দ্র করেই জঞ্জাল সাফ করতে লেগে গেল। মনে মনে বললাম, সাবাস। অথচ এমনি মজা যে, তোমাকেই জব্দ করবার জন্য সেই জঞ্জালের মধ্যে সঙ্গোপনে ছড়িয়ে দিলাম প্রচুর ভাঙা কাচ। তখন কি একবারও ভাবতে পেরেছি যে, সেই ভাঙা কাচগুলি একদিন আমার বুকেই এ ভাবে বিঁধবে!

মিত্রা কাঁপা গলায় বলল, আমিও রেহাই পাই নি অতনুবাবু। আমারও সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। খেলাটা সব সময় খেলা থাকে না বলেই সংসারে এত দুঃখ অতনুবাবু। কিন্তু এই দুঃখের মধ্যে শুধু বেদনা নেই বলেই এ খেলা থেমে যায় না।

অতনু বলে, তোমার এ কথার মানে?

মিত্রা হঠাৎ অনেকখানি সাবধান হয়ে উঠল। বলল, কেন আবার—মানুষের দুঃখে কখন মানুষকে উল্লাস করতে কি আপনি দেখেন নি? সেও ত এক ধরনের আনন্দ।

অতনু চুপ করে থাকে।

মিত্রা বলতে থাকে, এই দেখুন না—নিছক খেলা করবার জন্যই মিত্রাকে আপনি এ বাড়ীতে দিলেন আশ্রয়। শ্রীমতী কিন্তু

এসেছিলেন সহধর্মিণীর পদমর্যাদা নিয়ে—তিনি থাকতে পারলেন না। কিন্তু যাকে খেলার পুতুল হিসেবে—

কথাটা শেষ না করেই মিত্রা থামল।

অতনু গম্ভীরভাবে বলল, থামলে কেন, বল।

মিত্রা মৃদু কণ্ঠে বলল, তার পরের কথা আপনার অজানা নেই অতনুবাবু।

অতনু বলল, অর্থাৎ তোমাকে খেলিয়ে পেতে চেয়েছিলাম আনন্দ। কিন্তু শ্রীমতীকে দুঃখ দিয়ে কি পেতে চেয়েছিলাম বলবে কি?

মিত্রা সহজ কণ্ঠে জবাব দিল, উভয়ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য একই ছিল। হয়ত ধরনটা ছিল আলাদা।

অতনু বলে, হয়ত তোমার কথাই ঠিক। খেলা সব সময় খেলা থাকে না বলেই এত দুঃখ, এত আনন্দ। শ্রীমতীকে দুঃখ দিতে আমি চাই নি। কিন্তু সে পেল দুঃখ। তোমাকে নিয়ে এলাম দুঃখের আঘাতে ভেঙে গুঁড়ো করতে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই তোমারই হাতে আত্মসমর্পণ করতে হ'ল। হয়ত এমনি করেই মানুষকে শিখতে হয়। নইলে শ্রীমতীর জন্য আমার মনের এ আকুলতা কেন, আবার তোমার কথা ভেবেই বা এমন ব্যাকুল হয়ে উঠছি কিসের জন্য?

অতনুর কথা বলার ধরনটা আজ এলোমেলো। মিত্রা সাবধানে এগোতে চাইছে। সে মৃদু কণ্ঠে বলে, আমার কথা ছেড়ে দিন, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আপনার স্ত্রীর আর একটু তলিয়ে দেখা উচিত ছিল। আর খানিক ধৈর্য্য ধরলে ভাল করতেন।

অতনু সহজ কণ্ঠে জবাব দিল, না মিত্রা, তাতে অতনুর কোন দিন চৈতন্য হ'ত না। তার অহঙ্কার আরও বেড়ে যেত। বড় আঘাতেই বড় পরিবর্তন ঘটে।

মিত্রা বলল, এত ভালবেসেও তাকে ধরে রাখতে পারলেন না।

অতনুর মুখে সুন্দর খানিকটা হাসি দেখা দিল। বলল, ওখানেও সন্দেহ ছিল মিত্রা। শ্রীমতীরও ছিল, আমারও ছিল। শ্রীমতীর জন্য আজ আমি আর ভাবছি না, আমার ভাবনা তোমাকে নিয়ে। এই ভাবনাগুলি সত্যিই আমাকে দুঃখ দিচ্ছে—

সহসা খিল খিল করে হেসে উঠল মিত্রা। হাসির শব্দে অতনু চমকে ওঠে। তার মনের আচ্ছন্ন ভাব কেটে যায়। বিব্রত-বোধ করে।

মিত্রা বলে, হঠাৎ আপনার দুঃখের সাগর এমন করে উথলে উঠল কেন অতনুবাবু। আপনি এমন ত কোনদিন ছিলেন না?

অতনু ম্লান হেসে জবাব দেয়, নিজে দুঃখ না পেলে অপরের দুঃখ অনুভব করা যে সম্ভব নয় মিত্রা—

মিত্রা কতকটা রহস্যের ছলে বলল, আজকাল তা হলে অনুভব করতে পারছেন? কিন্তু সত্যিই কি এটা আপনার মনের কথা অতনুবাবু?

অতনু ম্লান হেসে বলে, তোমার কি সন্দেহ হয়?

মিত্রা স্পষ্টভাবে বলল, হয়।

অতনু বলল, আমার দুর্ভাগ্য। কিন্তু এই সন্দেহের কারণটা বলবে মিত্রা?

মিত্রা সহসা যেন একেবারে বদলে গেল। সে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জবাব দিল, কারণটা ত সামনেই পড়ে আছে। আপনি চোখ বুজে থাকলে কেমন করে আর দেখতে পাবেন।

একটু থেমে সে পুনরায় বলতে থাকে, আপনার সান্নিধ্যে এসে কতটুকু পেলাম আর কতখানি খোয়ালাম তার হিসেব আজ আর করবেন না। তাতে কোন পক্ষেরই দুঃখ ঘুচবে না। তার চেয়ে আমাকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে, মাথা উঁচু করে চলতে সাহায্য করুন অতনুবাবু। হায় ভগবান! নিজের স্ত্রীকে অকারণে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে উনি এসেছেন আমার মত একটা অপবিত্র মেয়ের দুঃখ ঘোচাতে। এ ধরনের চিন্তা আপনি কেমন করে করেন আমি বুঝি না।

অতনু বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। মুখে তার কথা যোগায় না।

মিত্রার দু'চোখ সজল হয়ে উঠেছে। তাই লুকাতে সে দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেল।

২৬

বেশীক্ষণ না। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে মিত্রা পুনরায় ফিরে এল। অতনু তখনও দু'হাতের মধ্যে মাথাটা চেপে ধরে চুপ করে বসে আছে। মিত্রা ঘরে ঢুকে খানিক পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তার আনত অন্যমনস্ক মুখের পানে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে তার কাঁধের উপর একখানি হাত রেখে মোলায়েম কণ্ঠে ডাকল, অতনুবাবু—

অতনু মুখ তুলে তাকাল। কথা বলল না।

মিত্রা পুনরায় বলল, এত কি ভাবছিলেন?

অতনু বলল, আত্মসমর্পণের মধ্যে যে এতবড় আনন্দ আছে তা আমি জানতাম না—

মিত্রা আরও একটু ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে অন্তরঙ্গ কণ্ঠে বলল, আপনাকে একেবারেই মানাচ্ছে না অতনুবাবু। এসব কথা আপনার মুখে সত্যিই বড় বেমানান লাগছে। আপনি বরং আগের মত ধমক দিন। অকারণে দুঃখের কারণ হোন, তবুও কারণে এমনভাবে পাশ কাটিয়ে যাবেন না।

অতনু যেন শুনতে পায় নি এমনি ভাবে সে বলল, তুমি যদি গ্রহণ কর আমি তোমাকে আমার কারখানাটা দিয়ে দিতে পারি।

মিত্রা হেসে ফেলে বলল, কি বললেন? আমাকে দেবেন আপনার কারখানা? কিন্তু আপনি দিতে চাইলেও আমি কি নিতে পারি? সেইজন্যই বুঝি দুঃখ দূর করবার কথা বলছিলেন? সত্যি করে বলুন দেখি অতনুবাবু, এতে আমার দুঃখ দূর করা হবে না শত্রুতা করে আরও ঢের বেশী বিপদের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হবে?

তার চেয়ে বরং ডানকান আর আগারওয়ালাকে ডেকে দান করুন।

মিত্রা পুনরায় হেসে উঠল।

অতনু গম্ভীর হয়ে বলল, তুমি কি আমাকে পাগল ঠাউরেছ মিত্রা?

মিত্রা হালকা সুরে জবাব দিল, তার বড় বাকীও নেই। নইলে মিত্রাকে নিয়ে এই ধরনের পরিহাস করতে অতনুবাবুর আটকাত।

অতনু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, তোমাকে বেশী প্রশ্রয় দিয়েছি বলেই কি আমাকে এভাবে আঘাত করছ মিত্রা?

মিত্রা স্নিগ্ধ হেসে জবাব দেয়, শুধু প্রশ্রয় পেলে এতখানি এগোতে ভরসা পেতাম না অতনুবাবু। এ সাধারণ কথাটা আপনার বোঝা উচিত ছিল।

অতনু গাঢ় কণ্ঠে বলল, এই কথাই এতক্ষণ ধরে তোমার কাছ থেকে আমি শুনতে চাইছিলাম। বলতে পার মিত্রা, এতবড় অসম্ভব কি করে সম্ভব হ'ল?

মিত্রা ভিতরে ভিতরে সঙ্কুচিত হলেও প্রকাশ্যে সে খিল খিল করে হেসে উঠল।

অতনু বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ হ'ল না।

মিত্রা শান্ত কণ্ঠে বলল, এই সব আজে-বাজে চিন্তাই বুঝি আজকাল আপনি করেন?

অতনু কথাটা একপ্রকার স্বীকার করে নিল।

মিত্রা গম্ভীর হয়ে উঠে বলল, তার পর বোধ হয় মিত্রাকে নিয়ে মনে মনে এক নাটক সৃষ্টি করেন? তাই না? হাতের কাছে এমন উপযুক্ত নায়িকা পেয়ে ছাড়বেন কেন?

অতনু বলল, তুমি হঠাৎ এমন গম্ভীর হয়ে গেলে কেন মিত্রা?

মিত্রা বলল, গম্ভীর না হয়ে কি করি বলুন ত? মিত্রা সত্যি-সত্যিই আপনার কেউ নয়। ভাগ্যদোষে সে সম্ভ্রম হারিয়েছে বলেই না তাকে নিয়ে এই ধরনের ঠাট্টা—

বাধা দিয়ে অতনু বলল, না মিত্রা, ঠাট্টা তোমাকে আমি করি নি। ভাগ্য তোমার সম্ভ্রম নষ্ট করতে পারলেও তোমার মনকে স্পর্শ করতে পারে নি।

মিত্রা জবাব দিল, দেহটাই যদি না বাঁচল মন বাঁচবে কাকে আশ্রয় করে অতনুবাবু? দেহের বিষে মনটা যে নীল হয়ে গেছে।

অতনু বলল, তোমার কথার মধ্যে যুক্তি থাকলেও অনুভূতি নেই। বলতে পার মিত্রা—যাকে কেন্দ্র করে তোমার জীবনে এতবড় বিপর্যয় তারই মঙ্গল-চিন্তায় সেই তুমি এতখানি উতলা হয়ে উঠেছ কিসের প্রেরণায়?

মিত্রা এতক্ষণে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। সে সহজ কণ্ঠে বলল, এক কথা আপনাকে আমি কতবার বলব? ভুল আপনিও যেমন করেছেন আমি নিজেও তেমনি করেছি। ভুল করে সে ভুল শুধরে নেওয়ার মধ্যে কোন লজ্জা নেই। তা ছাড়া আপনি ভুল করতে গিয়েও শেষ পর্য্যন্ত করেন নি। কিন্তু আমি ভুল করে আপনার সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছি।

অতনু চুপ করে থাকে।

মিত্রা বলে চলে, প্রশস্ত করে দিয়েছি একথাই বা বলি কেন? আপনার অনেক ক্ষতিই করেছি। আপনার এত অনুগ্রহের আমি উপযুক্ত নই অতনুবাবু। আপনি অনেক দিয়েছেন, অনেক দিতেও চেয়েছেন। অনেক আমি নিয়েছি আরও হয়ত নিতে হবে, কিন্তু তার আগে আমাকেও কিছু দেবার সুযোগ দিন। আমার সর্বনাশা কাজের ফলে যত আপনার ভেঙেছে তার কিছুও যদি আমি গড়ে দিতে না পারি তা হলে নিজেকেও যে আমি কোনদিন ক্ষমা করতে পারব না।

এতক্ষণে অতনু মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল, তুমি আর আমার কতটুকু ক্ষতি করতে পেরেছ?

করেছি—করেছি অতনু বাবু—মিত্রা ধৈর্য্য হারিয়ে বলল, যেখানে যতকিছু অঘটন ঘটেছে তার মূলে রয়েছে আমার প্রতিহিংসা নেবার দুষ্টবুদ্ধি।

অতনু অবিচলিত কণ্ঠে বলল, আর আমার আত্মবিশ্বাসের মিথ্যা দম্ভ। মিত্রা যে দোষ করে তার চেয়ে যে দোষ করবার সুযোগ করে দেয় সে কম অপরাধী নয়। কিন্তু তোমার এতবড় সর্বনাশা বুদ্ধি হঠাৎ এমন মঙ্গলময় হয়ে উঠল কিসের ছোঁয়া লেগে?

মিত্রার কান্না পাচ্ছিল। কিন্তু ভিতরের আবেগ বাইরে প্রকাশ পেল না। যথাসম্ভব সহজ কণ্ঠেই সে বলল, সব কথা বলতে নেই অতনুবাবু। তবে পারেন যদি ডাক্তারবাবুর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবেন। আপনি অন্যায়ভাবে তাঁকে মর্মান্তিক অপমান করেছেন। অথচ অমন লোক হয় না।

শ্রীমতীও কথাটা বহুবার আমাকে শুনিয়েছে। অতনু বলল, তুমিও বলছ। কিন্তু আমি তোমাদের কারুর কথাই পুরোপুরি বিশ্বাস করি না।

মিত্রা বলল, আপনার দুর্ভাগ্য। আপনার সে চোখ নেই বলেই দেখতে পান না। ভদ্রলোকের একটি চোখ আর একখানি কান সব সময় আপনাকে পাহারা দিয়ে চলেছে। আপনাকে বেশী বলে লাভ নেই, কিন্তু একটা অনুরোধ—বিশ্বাস করতে না পারলেও তাঁকে অবিশ্বাস করবার দুর্বুদ্ধি যেন আপনার কোনদিন না হয়।

অতনু বলে, তোমার কথা ভবিষ্যতে মনে রাখবার চেষ্টা করব।

মিত্রা বলল, আপনাদের মধ্যে এসে পড়ে কি পেলাম আর কি হারালাম তার হিসেব করতে আজ আর ভাল লাগে না অতনুবাবু। কিন্তু একটা কথা খুব ভাল করে বুঝেছি যে, মানুষের ভাল করা শক্ত অথচ মন্দ করাটা কত সহজ। কত অল্প চেষ্টায় আপনার কতবড় ক্ষতি করে বসলাম।

অতনু বলল, সেই থেকেই শুধু মন্দ আর ক্ষতি ক্ষতি করে তুমি চীৎকার করছ মিত্রা। কিন্তু আমার মনে হয় অতনুর ক্ষতি করতে গিয়ে তার যথেষ্ট উপকারই করেছ।

মিত্রা দ্বিধাহীন কণ্ঠে জবাব দেয়, না অতনুবাবু, মিত্রা স্বেচ্ছায় আপনার কোন উপকার করে নি। ডাক্তারবাবুর ইচ্ছাশক্তিই

রক্ষাকবচের কাজ করেছে। আমি নিমিত্ত মাত্র। আচ্ছা, লোকটিকে আপনি জোটালেন কোথা থেকে?

অতনু বলল, জোটাতে হয় নি। আপনি এসে জুটেছেন। ঠাকুর্দ্দার অ্যাটর্নীর পরিচয়-পত্র নিয়ে তিনি এসেছিলেন। সেই থেকেই আছেন। কিন্তু তোমরা তাঁকে নিয়ে যতই বড় বড় কথা বল না কেন ওঁর প্রত্যেক ব্যাপারে অনাবশ্যক মাথা গলান আমার ভাল লাগে না। যদিও সোজাসুজি কোনদিনই তাঁকে অবজ্ঞা করি নি।

মিত্রা বলে, প্রথম প্রথম আমারও তাই মনে হ'ত। আজ কিন্তু কথাটা ভুলেও মনে আসে না। বরং অভিভাবক বলে মনে করতে ভালই লাগে। শ্রীমতী রাগ করে চ'লে গেলেন। আপনি বোতল নিয়ে বসলেন। ভয় পেয়ে ছুটে গেলাম ডাক্তারবাবুর কাছে। বললাম সব কথা অকপটে। বুদ্ধি চাইলাম।

বললেন, জল অনেকদূর গড়িয়েছে দেখছি, কিন্তু তোমাকে যদি কেউ সাহায্য করতে পারে সে তুমি নিজেই। কল্যাণের পথটা যখন তোমার চোখে পড়েছে তখন নিজেই তুমি বাকী পথটুকু এগিয়ে যেতে পারবে। একের জন্য বহুর দুঃখের কারণ আর হতে পারবে না।

অতনু নিঃশব্দে শুনতে থাকে।

মিত্রা বলতে থাকে, কারুর দুঃখ দূর করবার ক্ষমতা নেই আর এতগুলি লোকের দুঃখের কারণ হয়ে বসলাম। আশ্চর্য্য! এই সহজ সত্যটা এতদিন আমার চোখে পড়েনি। একবারও ভেবে দেখিনি যে, যাকে চূর্ণ করবার জন্য আমার এমন নিষ্ঠুর আয়োজন তার কতটুকু যাবে কিন্তু যারা মাসের শেষ দিনটির পানে চোখ রেখে দিন গোনে তাদের অমন করে সর্ব্বনাশ করতে চলেছি আমি কোন বুদ্ধিতে? আমাকে থামতে হ'ল, আবার নতুন করে ভাবতে আরম্ভ করলুম। ডাক্তারবাবু আমার দ্বিধাগ্রস্ত মনকে শক্তি যোগালেন।

মিত্রা থামতেই অতনু বলল তার পর—

মিত্রা একটুখানি হেসে বলল, কিন্তু পিছু হটতে গিয়ে দেখি যাঁদের সঙ্গে নিয়ে এতদিন ধরে কাজ করেছি তারা আমাকে মানতে চায় না। আবার ছুটে গেলাম ডাক্তারবাবুর কাছে। তিনি ধৈর্য্য ধরে আমার সব কথা শুনে সস্নেহে বললেন, আমি জানি মা, কিন্তু তাই ভেবে পিছিয়ে পড়লে ত চলবে না। ওদের এগোবার পথটা আরও সহজ করে দাও। বাধা দিয়ে বুদ্ধিহীন করে তুল না।

বললাম, তাতে কি ওদের গতিরোধ হবে ডাক্তারবাবু?

তিনি বললেন, সামনে থেকে বাধা না পেলে তবেই না ওরা ডাইনে, বাঁয়ে আর পিছন ফিরে তাকাবার কথা ভাববে মা। বাধা সব সময়ই যোগায় বুদ্ধি আর উদ্দীপনা। যা সব সময় কল্যাণকর হয় না।

অতনু বলল, শ্রীমতীও ঠিক এই কথাই বলেছিল। তার মতে ওরা যা দাবী করে তা দেবার যদি যথার্থ শক্তি নাও থাকে তবুও দেব না একথা বলো না।

আমি জবাবে বলি, আমার বক্তব্যটাও তাই। কিন্তু কথার মধ্যে আমি কোথাও ফাঁকী রাখতে চাই না, স্পষ্ট করেই বলতে চাই যে, শুধু বর্ত্তমান নিয়ে কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে না—বর্ত্তমানের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের কথাটাও ভাবতে হবে। কিন্তু এই কথাটাই কেউ বুঝতে চায় না।

মিত্রা বলল, কেমন করে বুঝবে বলুন অতনুবাবু। আপনাদের আর ওদের জীবনধারণের মান এর জন্য দায়ী। কিন্তু আমার কথা থাক, আপনার স্ত্রী আর কি বলেন শুনি—

শ্রীমতী বলে, ওদের প্রয়োজন আছে একথা যদি স্বীকার কর তা হলে এতদিন ধরে যা তুলে নিয়েছ তার থেকে কিছু দিয়ে দাও। ওরাও বাঁচুক, তুমিও বাঁচ।

আমি বলেছিলাম, এর নাম কি বাঁচা? তার চেয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে আলু পটলের ব্যবসা করব।

শ্রীমতী জবাব দিয়েছিল, ওটাও নাকি আমার ছেলেমানুষের মত কথা হ'ল। দরজা বন্ধ করায় যুক্তি নেই—ওতে সন্দেহকেই বাড়িয়ে তোলা হবে, তার চেয়ে ওদের ডেকে বলা হোক এ ভাবে কোন প্রতিষ্ঠান বড় হতে পারে না। ওদের এত দিনের পরিশ্রমে এই প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান অবস্থা। একে রাখতেও ওরাই পারে, ভাঙতে হলেও ওরাই ভাঙ্‌ক···

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তার পর? কিন্তু শ্রীমতী এর পরে আর কোন জবাব দিতে পারে নি। শুধু এড়িয়ে যাবার ছলে বলেছিল, এর আর তার পর নেই···

মিত্রা বলল, সব আরম্ভেরই শেষ আছে অতনুবাবু। আসলে সর্ব্বত্র আমাদের ঘটেছে নৈতিক অধঃপতন। কেউ কাউকে আজ আর বিশ্বাস করতে পারছে না। ডাক্তারবাবু বলেন, গান্ধীজীর নাম করে যাঁরা যত চীৎকার করছেন তাঁরাই ওঁর পথ থেকে বেশী সরে গেছেন। তাই কেউ কারুর কথা শুনতে চাইছে না। আপনি আচরি ধর্ম্ম পরেরে শিখাও, নইলে অপরে শিখবে কেন? কিন্তু এ সব আলোচনা থাক।

অতনু বলে, থাকবে কেন মিত্রা? অপরের কথা আমি জানি না, কিন্তু নিজে আমি সঙ্কল্প করেছি আবর্জ্জনা পরিষ্কার করবার। আমার সীমানার মধ্যে যত জমেছে তা নিজে হাতে সাফ করে আবার নতুন করে আরম্ভ করব।

মিত্রা বলল, এটাও কি আপনার সেই পুরাতন বাড়ীতে নূতন করে বালীর পলেস্তারা দেওয়া হবে না?

অতনু বলে, শ্রীমতী কিন্তু আশার কথা শুনিয়েছিল। তার মতে মানুষের মনটা শুধু মাত্র কয়েক বিঘা জমি নয়। বিশাল তার পরিধি। পুরাণ থাক না এক পাশে নিজের অস্তিত্ব নিয়ে। নতুন করে নতুনের জন্ম হ'ক সময়ের সঙ্গে সমতা রেখে। তাতে হয়ত পুরাতনও বাঁচবে, নতুনও এগোবার পথ পাবে। পুরাতন ছিল বলেই না নতুনের আবির্ভাব।

মিত্রা নীরব দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

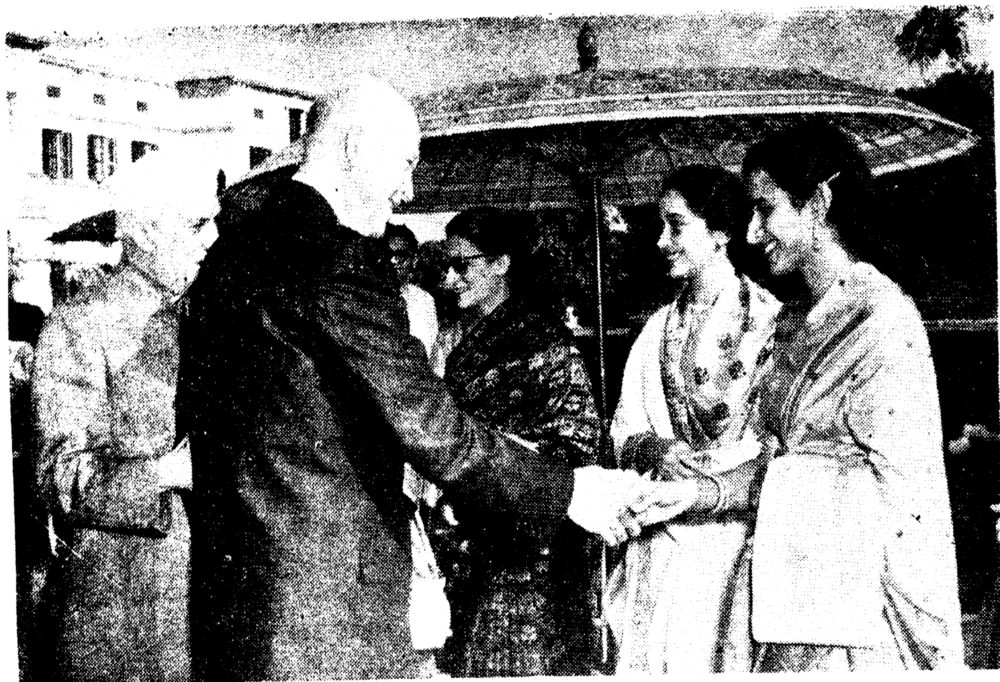


পর্বত দুহিতা



পহেলগাঁওয়ের একটি মনোরম দৃশ্য—শ্রীনগর

ফটো : শ্রীসচ্চিতকুমার চট্টোপাধ্যায়



নিউ দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের সহিত প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারকে পরিচয় করাইয়া দিতেছেন



ভারতীয় পার্লামেণ্ট-অভিমুখে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার

অতনু একটু হেসে বলে, শ্রীমতীকে কোন দিনই আমল দিইনি, পরিহাস করে সব সময় হেসে উড়িয়ে দিয়েছি। তা ছাড়া স্ত্রীর কাছ থেকে এই ধরনের উপদেশ শোনবার মত আমার মন তৈরী ছিল না। উপেক্ষা করে তাই উপহাস করেছিলাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আমার এত দিনের চলার পথে কোথাও ফাটল ছিল,আজ সেই ফাটল হাঁ করে আমাকে গ্রাস করতে বসেছে। জান মিত্রা, জীবনে আমি অনেক জুয়া খেলেছি। খেলায় হার-জিত দুইই আছে। আর একবার না হয় নতুন পথে খেলা সুরু করে দেখি, নইলে, যে পরস্পর-বিরোধী চিন্তা আমাকে শত পাকে জড়িয়ে শ্বাস-রোধ করে মারবার চেষ্টা করছে তার হাত থেকে আমি বাঁচতে পারব না।

মিত্রা ধীরে ধীরে জবাব দিল, আপনার কাছে ত ধারাল অস্ত্রের অভাব নেই অতনুবাবু।

অতনু প্রশান্ত কণ্ঠে বলল, এতদিন সেই কথাই ভেবে এসেছি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আমি তা পারি না। সে শক্তি আজ আর আমার নেই। হাত কেঁপে উঠবে। যে অস্ত্রে বন্ধন ছিন্ন করতে যাব তা আমাকেই শেষপর্য্যন্ত ক্ষত বিক্ষত করবে। বলতে পার মিত্রা কেন এমন হ'ল?

মিত্রা কোন জবাব দেয় না। তার চোখেমুখে খালি স্নিগ্ধ হাসি ফুটে ওঠে। অতনুর তা দৃষ্টি এড়ায় না। সে বলে, তুমি হাসছ—ভাবছ বোধ হয় এ আমার পরাজয়? কিন্তু তবুও আজ আমাকে তুমি ব্যথা দিতে পারবে না। দুঃখের চেয়ে আজ আমার আনন্দই হচ্ছে বেশী, ভারী হাল্কা লাগছে নিজেকে। কোথাও আজ আর গ্লানি নেই।

মিত্রা খোঁচা দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারল না। সে বলল, বড় চমৎকার আপনার মন ত?

অতনু রাগ করে না, কথাটা স্বীকার করে নিয়ে বলে, সত্যিই তাই—বিচিত্র এর গতি আর প্রকৃতি। শ্রীমতী এখান থেকে চলে গেছে বলেই একটা দিক এমন করে স্পষ্ট অনুভব করতে পারছি। নইলে হয় ত আরও সময় নিত।

মিত্রা খানিক চুপ করে কিছু ভেবে নিয়ে বলল, তা হলে রুদ্ধ দুয়ার আবার নিজের হাতেই খুলে দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানাবেন বলুন?

অতনু প্রশান্ত দৃষ্টিতে খানিক মিত্রার মুখের পানে চেয়ে থেকে হাসিমুখে জবাব দিল, বন্ধ করতে গিয়েই না সর্ব্বপ্রথম বুঝতে পারলাম অজ্ঞাতসারে আমার হাত দু'খানা কত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। সেই জন্যেই এত গলাবাজী আর বিতর্কের ঝড় তুলেছিলাম।

মিত্রা বলে, মনের দুর্ব্বলতা ঢাকবার জন্য বুঝি?

অতনু বলল, আজ আর অস্বীকার করতে চাই না মিত্রা; কিন্তু শ্রীমতী সম্বন্ধে আর আমি ভাবতে চাই না। আমি তোমার কথা ভেবে শান্তি পাচ্ছি না।

মিত্রা সাগ্রহে অতনুর মুখের পানে তাকাল। বলল, আমাকে নিয়ে আবার কিসের চিন্তা অতনুবাবু। আমি ত নতুন করে আর কোন জট পাকাই নি।

অতনু মৃদু কণ্ঠে বলে, ডাক্তারবাবু কোথায় গেছেন তুমি জান মিত্রা?

মিত্রা জবাব দেয়, জানি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ?

অতনু বলল, কেন গেছেন তাও জান নিশ্চয়?

মিত্রা বলল, না জানলেও আন্দাজ করতে পারি। তিনি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে আসবেন বলেই গেছেন।

অতনু বলল, সেই জন্যই আমাকে ভাবতে হচ্ছে।

মিত্রা অবাক হয়ে বলল, তাঁর বাড়ীতে তিনি আসবেন, এতে ভাববার কি আছে?

অতনু মৃদু গলায় বলল, আছে মিত্রা। আর ভাবনাটা আজ তোমার জন্যেই।

একটু হাসবার চেষ্টা করে মিত্রা বলল, আমার জন্য একটু কম করে ভাবলেই আমি বেশী খুশী হব অতনুবাবু। অনেক বড় লজ্জার হাত থেকে আমি বাঁচতে পারব।

অতনু চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে থাকে, আমি সবই বুঝি মিত্রা—

মিত্রা সহসা খিল খিল করে হেসে উঠে বলল, ভেবে ভেবে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন এই কথা বলতে চান বুঝি?

অতনু ধীরে ধীরে জবাব দেয়, তাই মিত্রা—

মিত্রা পুনরায় গম্ভীর হয়ে উঠে বলল, এ ভাবনাটাও আমার উপর ছেড়ে দিন অতনুবাবু। দেখবেন, কত সহজে আপনার সব সমস্যার মীমাংসা করে দেব।

অতনু প্রশ্ন করে, কোন পথে মিত্রা?

মিত্রা সহজভাবে জবাব দিল, যে পথে শ্রীমতী আসবেন সেই পথেই—

একটু হাসবার চেষ্টা করে অতনু বলল, শ্রীমতী আমার বিবাহিতা স্ত্রী। তাঁর রয়েছে আইন-সম্মত অধিকার, কিন্তু তোমার ত কোন অধিকার নেই মিত্রা! তার পথে তোমার—

মিত্রা কিছুটা যেন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে এমনি ভাবে বলল, থামুন অতনুবাবু—তার পরেই আকস্মিক ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বাইরে দৃষ্টি মেলে চেয়ে চেয়ে দেখছিল অনন্ত উদার নীল আকাশ। নাকে এল বাগানের সদ্য-ফোটা রজনীগন্ধার মিষ্টি গন্ধ। চোখের কোণে হয়ত অকারণেই খানিকটা জল এসে পড়েছে ···অপরিসীম ঘৃণা আর প্রাণভরা প্রীতি। একদিনের সত্য আর একদিন কি ভাবে মিথ্যায় রূপান্তরিত হয়ে গেল।

মিত্রা নিজেকে নিজে শাসন করল।

ইতিমধ্যে কখন যে অতনু উঠে এসে মিত্রার পাশে দাঁড়িয়েছে তা সে টের পায় নি। সহসা তার আহ্বানে সে ঘুরে দাঁড়াল।

মিত্রার মুখের পানে চোখ পড়তেই অতনু বিস্মিত ব্যাকুল কণ্ঠে

বলল, তোমায় কি হ'ল মিত্রা? কোন অসম্মান করেছি কি তোমায়?

মিত্রা হাসতে লাগল—চোখে যদিও জল ছিল তখনও। নিজেকে গোপন করবার বিন্দুমাত্র ব্যস্ততা প্রকাশ পেল না। শান্তভাবে সে বলল, নিজের অবস্থার কথা ভেবে চোখে জল এসে পড়েছিল অতনুবাবু। নইলে যাকে বাড়ীতে স্থান দিতে ভয় পান তাকেই অন্ত ভাবে সাহায্য করবার কথা মুখেও আনতে পারতেন না। আমার জন্ত আপনার এত বেশী চিন্তা করাও যেমন অশোভন আপনার কাছ থেকে কিছু হাত পেতে নেওয়াও তেমনি অপমানকর—বলেই মিত্রা চক্ষের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অতনু নির্ব্বাক বিস্ময়ে শুধু চেয়ে রইল। সাধারণ ভাবে একটা প্রতিবাদ করবার মতও ভাষা তার মুখে যোগাল না। ক্রমশঃ

বালিকা বধূ

শ্রীউর্ম্মিলা দেবী

বহুদিন আগে এই শুভ দিনটিতে
তুমি এসেছিলে আমারে লইয়া যেতে,
মহা সমারোহে পুষ্প শোভিত রথে
এসেছিলে তুমি দীপমালা জ্বালি পথে।

হেথায় তখন উৎসব বাঁশী বাজে
ছেলেমেয়ে সব কত বিচিত্র সাজে,
হাসিভরা মুখে ধরি মোর হাতখানি
তাহাদের মাঝে লয়ে গেল মোরে টানি।

ছোট্ট হৃদয় উঠেছিল মোর দুলি
বাজনার সুরে লজ্জা সরম ভুলি,
ছুটেছিনু ছাদে বর দেখিবার আশে
সেই কথা স্মরি আজ মোর হাসি আসে।

নয়ন মেলিয়া সকলি দেখেছি ভালো
বলেছি পরাণ প্রেমের প্রদীপ জ্বালো,
ভালোবেসে জয় করিব সবার মন
এরি সাধনায় করেছি পরাণ পণ।

প্রেম ভালোবাসা পুলকের শিহরণ
কিছুই তখন বোঝেনিক মোর মন,
বিয়ে? সেটা ভাবি মজার একটা খেলা
গয়না কাপড় বাজনা ফুলের মেলা।

সারাদিন ধরে সবাকারে খুশী করে
ক্লান্ত নয়ন ঘুমে যেত মোর ভরে,
শ্রান্ত চরণে আসিলে শয্যা পাশে
কাছে নিতে প্রিয় সুমধুর হাসি হেসে।

বুঝি নি তখন বিচ্ছেদ ব্যথা কিছু
গুরু দায়িত্বের ভার আছে এর পিছু,
তব পিছে পিছে প্রবেশিনু বধূবেশে
নারীর শ্রেষ্ঠ পুণ্য তীর্থে এসে।

উজাড় করিয়া দিতে যে প্রেমের ডালি
প্রতিদানে দেখি আমার সকলি খালি,
সবাকারে তুমি নিঃস্ব পরাণ মম
তোমারে দেবার কিছু নাই প্রিয়তম।

আজিকে বুঝেছি আমার জীবন মাঝে
তোমার মূরতি ধ্রুবতারা সম রাজে,
তুমি ছাড়া আর কেহ নাই মোর প্রিয়
অন্তর ভরা আমার প্রণাম নিও।

কালিদাস সাহিত্যে 'জন্মান্তর' ও 'পূর্ব্বাভাস'

শ্রীরঘুনাথ মল্লিক

জন্মালে মরতে হয়, আর মরণের পর সকল প্রাণীকে যে আবার সময়মত 'জননী-জঠরে শয়ন করতে হয়' হিন্দুধর্ম্মের এই মূল তত্ত্বটি মহাকবি কালিদাস তাঁর কাব্য ও নাটকগুলির গল্পের মধ্যে এমন সুন্দর ভাবে সন্নিবেশ করেছেন যে, পড়লে পাঠকের মনে হবে ইহা যেন ছিল তাঁর মজ্জাগত বিশ্বাস, এ তত্ত্বকে তিনি স্বয়ংসিদ্ধ সিদ্ধান্তের মত অনায়াসে মেনে নিয়েছেন, প্রমাণের আবশ্যকতা অনুভব করেন নি।

পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্মের উল্লেখ তিনি তাঁর রচনায় বহুস্থানে বহুবার করেছেন, এমনকি পূর্ব্বজন্মের সংস্কার যে পরজন্মের মন ও কর্ম্মের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে একথাও তিনি স্পষ্টভাবে একাধিকভাবে বলে গেছেন।

"রঘুবংশের" অষ্টম সর্গে তিনি বলেছেন: 'পরলোকজুষাং স্বকর্ম্ভির্গতয়ো ভিন্নপথা হি দেহিনাম্' (রঘু—৮.৮৫)।

দেহীরা পরলোকে গিয়ে নিজ নিজ কর্ম্মফল অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন গতি প্রাপ্ত হয়।

এখানে মহাকবি বলতে চেয়েছেন যে, মানুষ সংসারে থাকার সময় যে ধরনের কাজ করতে থাকে, মৃত্যুর পর পরলোকে গিয়ে সেই সব কর্ম্মের ফল অনুযায়ী তাকে সেই রকমের দেহ, মন, অনুভূতি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদি পেতে হয়।

তাঁর একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, যদি কোনও নর বা নারী মৃত্যুর পূর্ব্বে ইচ্ছা করে যে, সে তার প্রিয়া বা প্রিয়ের সঙ্গে মৃত্যুর পর পরলোকে গিয়ে একসঙ্গে বাস করবে, তার সে ইচ্ছা পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম, কারণ তার কর্ম্মের ফল আর তার প্রিয়ের বা প্রিয়ার কর্ম্মের ফল সমান নাও হতে পারে। সে তার নিজ কর্ম্মের ফলে যে লোকে গিয়ে বাস করতে পেল তার বাঞ্ছিতের কর্ম্মফল ভিন্নপ্রকারের হওয়ায় তাকে যেতে হ'ল বিভিন্ন লোকে। সুতরাং মহাকবির মতে, মৃত স্বামী বা মৃতা পত্নীর চিতায় ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করলেও স্বামী-স্ত্রী যে পরলোকে গিয়ে এক জায়গায় একসঙ্গে দুটিতে বাস করতে পাবে এমন কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

মৃত্যুর পর পরলোকে গিয়ে মানুষ কি সেখানে অনন্তকাল বাস করতে পায়? মহাকবি বলেন, 'না'। 'পূর্ব্ব-মেঘের' এক শ্লোকে তিনি বলেছেন, "স্বল্পীভূতে সুচরিত ফলে স্বর্গিনাং গাং গতানাম্" (পূর্ব্ব-মেঘ—৩১)।

যে পুণ্যের ফলে মানুষ স্বর্গে গিয়ে বাস করতে পায়, সে পুণ্যের মেয়াদ যখন ফুরিয়ে আসে আবার তখন তাকে মর্ত্ত্যলোকে ফিরে এসে জন্মগ্রহণ করতে হয়। একথা তিনি আরও কয়েক জায়গায় বলেছেন।

"জন্মান্তর" প্রসঙ্গে কালিদাসের আরও একটি বিশ্বাসের কথা জানিতে পারা যায়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, একজন্মের ভালবাসার স্মৃতি পরজন্মেও কিছুটা রয়ে যায়, একেবারে লোপ পায় না। 'রঘুবংশে'র সপ্তম সর্গে তিনি লিখেছেন: 'মনো হি জন্মান্তর—সঙ্গতিজ্ঞম্' (রঘু—৭।১৫)। অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের ভালবাসা মন বেশ বুঝতে পারে।

যাদের মুখ দিয়ে মহাকবি একথাগুলি বলিয়েছেন, তারা যেন বুঝাতে চায় যে, পূর্ব্বজন্মে যাদের মধ্যে প্রণয় ছিল, মৃত্যুর পর আবার যদি তারা নর ও নারী হয়ে জন্মায় ও দু'জনার মধ্যে কখন আকস্মিক ভাবেও সাক্ষাৎকার ঘটে, পরস্পরের প্রতি তারা একটা অহেতুক আকর্ষণ অনুভব করে। মন যেন জানাতে চায় কতদিনের এক পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

পূর্ব্বজন্মে ও পরজন্মে যে একটা যোগাযোগ আছে, পূর্ব্বজন্মের কোনও কোনও স্মৃতি মনের চেতনাংশে না এলেও অবচেতনাংশে রয়ে যায়, মহাকবির এই বিশ্বাস তাঁহার 'রঘুবংশ' কাব্যের রামের 'বামনাশ্রম' দর্শনের কাহিনী হতে বুঝা যায়।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র যখন রাক্ষসদের অত্যাচার থেকে তপোবন রক্ষা করবার জন্য রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে বনের পথ দিয়ে যেতে যেতে 'বামনাশ্রমের' কাছে এসে পড়লেন আর তাঁদেরকে বলিরাজা ও বামন অবতারের গল্প বলতে লাগলেন, রামের মন সহসা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। মহাকবি যেন বলতে চাইলেন যে রামের যদিও বামন অবতারের কোনও কথা মনে পড়ল না, তবু পূর্ব্বজন্মের ব্যাপারগুলি তাঁর মনের অবচেতনাংশে সংস্কাররূপে রয়ে যাওয়ায় তাঁর মনে হ'ল এ আশ্রম যেন তাঁর পরিচিত, বলিরাজ ও বামনের কথা যেন তাঁর জানা। কিন্তু কি করে যে এ আশ্রম তাঁর পরিচিত হ'ল, বলি-বামনের কি কথা যে তিনি জানতেন তার কিছুই তিনি মনে করতে পারলেন না। পূর্ব্বজন্মের কোনও কথা তাঁর মনে পড়ল না। তিনি উদ্বিগ্ন মনে পথ চলতে লাগলেন।

পূর্ব্বে বলা হয়েছে, কালিদাসের বিশ্বাস ছিল পূর্ব্বজন্মের সাধনা পরজন্মে জন্মগত সংস্কারের মত থেকে মানুষের মন ও কর্ম্মকে প্রভাবিত করে। একথার সমর্থন পাওয়া যায় 'কুমার-সম্ভব' কাব্যে। পার্ব্বতীর বাল্যাবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে মহাকবি তাঁর 'প্রাক্তন' বা পূর্ব্বজন্মের সংস্কারের কথা বলেছেন। পার্ব্বতী এমন অনায়াসে ও এত অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করতে লাগলেন যে,

মহাকবিকে লিখতে হ'ল, 'স্থিরোপদেশামুপদেশকালে। প্রপেদিরে-প্রাক্তনজন্মবিদ্যা' (কু—১।৩০)।

তাঁর পূর্ব্বজন্মে অর্জ্জিত বিদ্যা সংস্কাররূপে এজন্মে তাঁকে আশ্রয় করে রইল, তাই উপদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিদ্যা অনায়াসে তাঁর আয়ত্ত হয়ে যেতে লাগল। এখানে মহাকবি স্পষ্টভাবে জানাতে চেয়েছেন যে, কেবল অসাধারণ মেধার জন্য নয়, পূর্ব্বজন্মে অর্জ্জিত বিদ্যা তাঁর মনের মধ্যে সংস্কাররূপে থাকাতে ও এজন্মে বিদ্যাশিক্ষা করার সময় সেগুলি মনে পড়াতে পার্ব্বতী অমন অনায়াসে সমস্ত বিদ্যা শিখে ফেলতে লাগলেন।

'রঘুবংশে'ও তিনি একটি অসাধারণ মেধাসম্পন্ন বালকের উল্লেখ করেছেন। সূর্য্যবংশের একটি সুসন্তান, সুদর্শন যিনি পরে অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করে সমগ্র দেশ সুশাসনে রেখেছিলেন কেন যে বাল্যকালে অনায়াসে সকল বিদ্যা শিখে ফেলতে লাগলেন তার কারণ দেখাতে গিয়ে মহাকবি বলছেন : "স পূর্ব্বজন্মান্তর পূর্ব্বপন্থা। স্মরেন্নবা ক্লেশকরো গুরুণাম' (রঘু—১৮।৫০)।

পূর্ব্বজন্মে তিনি নানা বিদ্যার পার দর্শন করেছিলেন বলে, আর সেগুলি তাঁর এজন্মে স্মরণপথে আসতে লাগল বলে তাঁর গুরুকে শিক্ষা দেওয়ার ক্লেশ অনুভব করতে হ'ত না।

এখানে মহাকবি পূর্ব্বজন্মের সঙ্গে পরজন্মের একটা সূক্ষ্ম যোগ-সূত্রের সন্ধান দিলেন।

অভিশাপগ্রস্তদের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনায় মহাকবি যেন খোলাখুলি ভাবে পূর্ব্বজন্ম-পরজন্মের ব্যাপার দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। 'রঘুবংশে' দেখা যায়, মহারাণী ইন্দুমতীর কেন যে অতি সুকোমল পুষ্পমালার স্পর্শে মৃত্যু ঘটল, এ জটিল সমস্যার সমাধান করে মহামুনি বশিষ্ঠ বলে পাঠালেন যে, পূর্ব্বজন্মে ইন্দুমতী ছিলেন স্বর্গের এক অপ্সরা—তাঁর নাম ছিল হরিণী। কোনও মুনির শাপে তাঁকে এজন্মে মানুষের ঘরে জন্মাতে হয়, তার পর মুনির কথামত স্বর্গের পুষ্প চোখে পড়াতে শাপের অবসান হ'ল। তিনি পূর্ব্বরূপ ফিরে পেয়ে স্বস্থানে চলে গেলেন।

কতকটা এইরকমের আর একটি ঘটনার উল্লেখ 'রঘুবংশের' পঞ্চম সর্গে পাওয়া যায়। অজের জীবনী বর্ণনা প্রসঙ্গে মহাকবি সেখানে এক গল্পের অবতারণা করেছেন। রাজকুমার অজ যখন সসৈন্যে বিদর্ভনগরে আসছিলেন, পথে এক বিরাটকায় হাতী তাঁর সৈন্যদের তাড়া করে। হস্তী-বধ শাস্ত্রের নিষেধ বলে তিনি তাকে ভয় পাইয়ে নিরস্ত করবার জন্য তার কানে এক বাণ মারলেন। বাণ মারবার সঙ্গে সঙ্গে হাতীটা অদৃশ্য হয়ে গেল আর তার স্থানে দেখা গেল দাঁড়িয়ে আছে এক অতি সুপুরুষ গন্ধর্ব্বকুমার। গন্ধর্ব্ব বললেন, পূর্ব্বজন্মে তিনি রূপের অত্যন্ত গর্ব্ব করতেন বলে মাতঙ্গ-মুনির শাপে কদাকার হস্তী হয়ে জন্মেছিলেন। এখন অজের বাণের স্পর্শ পেয়ে তিনি শাপমুক্ত হয়ে পূর্ব্বজন্মের গন্ধর্ব্বরূপ ফিরে পেলেন।

'পূর্ব্বাভাষ' (ইংরেজীতে যাকে বলে "Premonition") সম্বন্ধেও কালিদাসের প্রশংসার যোগ্য জ্ঞান ও বিশ্বাসের যথেষ্ট প্রমাণ তাঁহার সাহিত্যে পাওয়া যায়। অদূরভবিষ্যতে জীবনে যে কোনও একটা বিশিষ্ট ঘটনা ঘটবে সে সম্বন্ধে মানুষের মনে অনেক সময় পূর্ব্ব হতে একটা আভাসের উদয় হয়—একে বলে 'পূর্ব্বাভাষ'। মানব মন সম্বন্ধে মহাকবির সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা না করে থাকা যায় না।

'পূর্ব্বাভাষের' কয়েকটি উদাহরণ এখানে দেখান গেল :

'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকের নায়ক তরুণ রাজা পুরুরবা একদিন তাঁর উদ্যানের এক নির্জ্জন স্থানে বসে প্রিয়বন্ধু বিদূষককে মনের দুঃখ শোনাচ্ছিলেন। দুঃখ—স্বর্গের অপ্সরা উর্ব্বশী, যাঁকে তিনি দৈত্যদের কবল থেকে উদ্ধার করে আনার সময় ভালবেসে ফেলেছিলেন, তিনি তাঁকে একটি বারের জন্য দেখা দিতে আসছেন না। উর্ব্বশীকে একবার দেখবার জন্য তাঁর মন যে কত ব্যাকুল হয়ে রয়েছে তার বর্ণনা করার শক্তি যে তাঁর নাই, এই কথাই তিনি বন্ধুকে বলছিলেন। দুঃখের কথা বলতে বলতে সহসা তাঁর মনে একটা স্বস্তির ভাব এল। তিনি বন্ধুকে বললেন, 'অভিমুখীষ্বির বাঞ্ছিতসিদ্ধিসুব্রজতি নির্বৃতিমেকপদে মনঃ' (বিক্রম—২য় অঙ্ক)।

মনের কোনও অভিলাষ পূরণ হওয়া নিশ্চিত হয়ে এলে মানুষের মনে যেমন একটা স্বস্তির ভাব আসে আমার মনে তেমনি একটা আনন্দের ভাব আসছে।

যার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নাই, হঠাৎ তাকে দেখতে পাওয়ার আশা মনের মধ্যে কেন একটা পুলকের সঞ্চার করল। পরের ঘটনায় মহাকবি যেন তারই উত্তর দিতেছেন। ঘটনাটি এই—যে সময় পুরুরবা তাঁর বন্ধুকে এই কথা বলছিলেন, ঠিক সে সময় উর্ব্বশী এক আকাশ-যানে বসে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠানপুরের রাজ-উদ্যানের অপর প্রান্তে নেমে এলেন। পুরুরবা জানতেন না যে, উর্ব্বশী তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য তাঁর উদ্যানে এসেছেন। তিনি হতাশ-প্রেমিকের মত বন্ধুর কাছে মনের দুঃখ জানাচ্ছিলেন। সহসা তাঁর মনে একটা স্বস্তির ভাব এল, যে ভাবটি মানুষের মনে তখনই আসে যখন তার কোনও একটা দুষ্পূরণীয় অভিলাষ পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা নিশ্চিত হয়ে পড়ে। রাজার এ 'পূর্ব্বাভাষ' যে যথার্থই পূর্ব্বাভাষ তাহা প্রমাণিত হতে বিলম্ব হ'ল না। কারণ কিছুক্ষণের মধ্যে উর্ব্বশী তাঁর এক সখীকে সঙ্গে নিয়ে রাজার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন।

'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের পঞ্চমাঙ্কে মহাকবি যেন এই ভাবটি ফুটাতে চেয়েছেন। রাজকন্যা নিরুদ্দিষ্টা, তিনি ইহলোকে না পরলোকে নিশ্চিত করে জানবার উপায় ছিল না। রাজকন্যা কিন্তু মারা পড়েন নি, তিনি ভাগ্যের বিড়ম্বনায় অপর এক দেশের রাজার প্রাসাদে তাঁর এক রাণীর অনুচরীরূপে বাস করছিলেন। এই সময় এদেশের রাজার এক সামন্ত সর্দ্দার অপর এক দেশের রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে তাঁর অনেক লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে দুইজন নৃত্যগীতকুশলী তরুণীকেও মহারাজের প্রাসাদে উপহার পাঠিয়ে দিল। এই তরুণী দুটি ছিলেন সেই নিরুদ্দিষ্টা রাজ-

কুমারীর অত্যন্ত পরিচিতা, এক সময় এক প্রাসাদে সকলে বাস করতেন। তাঁদেরকে যখন রাজপ্রাসাদে আনা হ'ল, একজন অপরকে বললেন, "অস্তি লোকপ্রবাদ আগামী সুখং দুঃখং বা হৃদয়াবস্থা কথয়তি।" 'লোকে বলে সুখ আসছে না দুঃখ আসছে মনের অবস্থা থেকে তা' বুঝা যায়'—যেন অদূরভবিষ্যতে মানুষের জীবনে কিছু সুখ প্রাপ্তি ঘটবে না দুঃখের বোঝা এসে চাপবে তার একটা ছায়া যেন মনের পটভূমিকায় আবির্ভূত হয়ে পূর্ব্ব হতে সে কথা জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

যিনি বললেন এ কথা তিনি জানতেন না যে, তাঁদের নিরুদ্দিষ্টা রাজকন্যা এখানে এই রাজপ্রাসাদে বাস করেন। তার পর যখন রাজা ও রাণীর সম্মুখে তাঁদের দু'জনকে নিয়ে আসা হ'ল, রাণীর কাছে তাঁর অনুচরীরূপে দণ্ডায়মানা পরিচিতা রাজকুমারীকে অপ্রত্যাশিত রূপে দেখতে পেয়ে তাঁদের আনন্দের সীমা রইল না। তাঁদের পূর্ব্বাভাষ যে মিথ্যা নয় এখানে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল।

'অভিজ্ঞান শকুন্তলে'র পঞ্চমাঙ্কেও পূর্ব্বাভাষের একটা আভাস পাওয়া যায়। মহর্ষি কণ্বের শিষ্যেরা শকুন্তলাকে তাঁর স্বামী রাজা দুষ্যন্তের নিকট রেখে আসবার জন্য রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হওয়ার কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের ঘটনা—

রাজা দুষ্যন্ত বসে আছেন রাজসভায়, রাজকাজে ব্যস্ত, এমন সময় প্রাসাদের 'সঙ্গীতশালা' থেকে তাঁর এক নবীনা রাণী হংসপদিকার গান শোনা গেল। রাণী গাহিতেছেন, যেন 'এক মধুকর আম্রমুকুলের মধু পান করে তাকে ছেড়ে চলে গেল কমলিনীর মধু পান করতে, মুকুলকে কি সে ভুলে গেল?'

তরুণী রাণীর সুমিষ্ট কণ্ঠে মধুর সুরে গাওয়া গান শুনে রাজার মনে একটা বিষাদের ভাব এল, কেন যে এল তিনি ভেবে পেলেন না। তাঁর মনে হ'ল, এ পরিপূর্ণ সুখ ও ঐশ্বর্য্যের মাঝে দুঃখের যখন কোনও অবতারণা নাই, কোনও প্রণয়িণীর সঙ্গে বিচ্ছেদও হয় নাই, তখন কেন এমন সুমিষ্ট স্বরে গাওয়া গান তাঁহার হৃদয় এক অজানা ব্যথায় ভরিয়ে দিল। বিস্মিত হয়ে তিনি বলছেন, "নূনং অবোধ-পূর্ব্বং ভাবস্থিরাণি জননান্তর সৌহৃদানি"—নিশ্চয় পূর্ব্ব-জন্মেরই কোনও প্রণয়ের ব্যাপার মনের মাঝে সংস্কাররূপে রয়ে গেছে অথচ স্মৃতির পথে আসতে পারে না, তাই বুঝা যায় না।

তিনি ভাবলেন, অনেক সময় সুন্দর বস্তু দেখে, মধুর শব্দ শুনে সুখী মানুষের মনও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে, তার কারণ এই হতে পারে যে, পূর্ব্বজন্মের কোনও প্রণয় বিচ্ছেদের কথা এ জন্মে মনের মধ্যে সংস্কার রূপে রয়ে যায় অথচ স্পষ্ট করে কিছু মনে পড়ে না। তিনি রাজকার্য্য ছেড়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে রইলেন।

মহাকবি এখানে পূর্ব্বাভাষের একটি সুন্দর উদাহরণ দিলেন। রাজা দুষ্যন্তকে যে, মাত্র কয়েক মুহূর্ত্ত পরে দৈবের বিড়ম্বনায় লুপ্ত-স্মৃতি হয়ে নিজের প্রণয়িণী শকুন্তলাকে—কেবল প্রণয়িণী নয়, বিবাহিতা ও সন্তান-সম্ভাবিতা ধর্ম্মপত্নীকে চিনতে না পেরে প্রত্যাখ্যান করতে হবে, ও যার জন্য পরে তাঁকে অনুতাপের অনলে দগ্ধ হতে হবে, জীবনের সেই কলঙ্কময় অধ্যায় যে এসে পড়ছে রাণী হংসপদিকার গান তাঁর হৃদয়ে একটা অহেতুক বিষাদের অনুভূতির সৃষ্টি করে পূর্ব্ব হতে যেন তারই একটা আভাস দিয়ে গেল।

ছায়ার তীর্থ

শ্রীকৃতান্তনাথ বাগচী

প্রখর তাপের নখরে যখন মাটির চেতনা লুপ্ত,
শোষণ ভীষণ পাষাণে পাষাণে কি ষড়যন্ত্র গুপ্ত!
দুঃখ যখন দৈত্যের মত মত্ত ঝড়ের প্রলাপে,
হতাশ তিমিরে সপ্ত ঋষির দীপ্ত নয়ন সুপ্ত;

তখন তোমার সুরু নিয়তির ক্রুর হরধনু ভঙ্গ,
নির্ব্বাণহীন প্রাণ বহ্নিরে আনো বহি নিঃসঙ্গ।
রুদ্ধপুরের যক্ষ দুয়ারে হানি অলক্ষ্য আঘাতে
মুক্তি লভিল চির দুর্লভ শ্যামল সরস অঙ্গ।

ভরে অম্বর গুরু গুরু গম্ভীর মেঘ ডম্বরু ছন্দে,
শিহরিত ধরা প্রগাঢ় প্রেমের নিবিড় মদির গন্ধে।
নৃত্য নেশায় সরম হারায় উপল-মেখলা ঝর্ণা,
দ্রুত বিদ্যুৎ পতাকা উড়ায়ে দশদিগন্ত বন্দে।

হে চিরকুমার! ললাটে তোমার অরুণ তিলককান্ত,
অমিত বীর্য্য বিশাল বক্ষে ললিতধৈর্য্যে শান্ত।
ইন্দ্রধনুর মাল্য তোমার, চন্দ্রের সুধাপাত্র,
ছায়ার তীর্থে ক্লান্তি জুড়াক মরুনগরীর পান্থ।

মেকি

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

ভূদেব রায় মারা গেলেন। বহুকালকার লোক—এই নবদ্বীপ শহরকে একদিন একটি ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র দেখিয়াছিলেন। তখন নবদ্বীপের রাস্তার পাশে পাশে পচা ডোবা, বাকসের ঝোপ আর বাঁশবন ছিল। সারা শহরে মাত্র দুই-তিনখানি মনোহারী দোকান, একটি ঔষধের দোকান ছিল। চায়ের দোকান ছিলই না—আর মাত্র দু'খানি খাবারের দোকান ছিল। ক্রমশঃ তাঁহার চোখের সম্মুখেই শহর বড় হইতে লাগিল। দোকানপত্র বাড়িল, পীচের রাস্তা, বিদ্যুতের আলো-পাখা-রেডিও, তিন-চারখানি সিনেমা-হাউস দেখা দিল। এখন এখানে কলেজ হইয়াছে—ছেলে ও মেয়েদের স্কুলের সংখ্যা বাড়িয়াছে এবং নিত্য-নতুন স্কুল, গানের স্কুল, নাচের স্কুল, পাঠাগার প্রভৃতি ব্যাঙের ছাতার মত গজাইয়া উঠিতেছে। দেশ ভাগের পর হইতে এখানে পূর্ব্ব-বাংলা হইতে অজস্র লোক আসিয়াছে। গৌর ও গঙ্গা এই দুই বস্তুর জন্য নাকি বহুলোকই নবদ্বীপকে পছন্দ করে। তীর্থস্থান ক্রমশঃ ব্যবসায় কেন্দ্রস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই আদ্যিকালের বহু পুরাতন ভূদেব রায় মারা গেলেন। কিন্তু সবচেয়ে মর্ম্মান্তিক ব্যাপার এই, পুত্র হরিপদ রায়ের জন্য রাখিয়া গেলেন নড়বড়ে একখানি জীর্ণ-শীর্ণ একতলা বাড়ী আর কিছু দেনা। হরিপদর বিবাহ হইয়াছে—একটি কন্যা ও একটি পুত্রও হইয়াছে। হরিপদ পিতার মৃত্যুর পর চক্ষে অন্ধকার দেখিল। যাহা হউক, যতদিন বাবা জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁহার পেনসনের বাঁধা টাকা কয়টি একটা মস্ত সহায় ছিল। এখন সেই মস্ত সহায়টি পর্য্যন্ত চলিয়া গেল। বলিতে গেলে হরিপদ অগাধ জলের মধ্যে পড়িল। হরিপদ লেখাপড়া যৎসামান্য শিখিয়াছে—তবে বাংলা হাতের লেখা ভাল, এবং হিসাব-পত্র ভাল জানে। তাই শহরের বিখ্যাত একটি মুদীখানার দোকানে হিসাবের খাতাপত্র লেখে। কিন্তু মাহিনা বড়ই অল্প—মাত্র ত্রিশটি টাকা।

মালিক যদুঘোষ মাসান্তে এই যৎসামান্য টাকা কয়টি দিতেই বহু কথা শুনাইয়া থাকেন। এখন নূতন করিয়া এই বাজারে চাকরি খুঁজিবার সাহসও তাহার নাই। কাহার উপর ভরসা করিয়া ঘর-সংসার ছাড়িয়া বিদেশে ঘুরিবে? ইহা ছাড়া সংসারের অবস্থা ত দিন-আনি দিন-খাই করিয়া চলিতেছে। ভাতের উপর ডাল জোটে না। ছেলেমেয়েরা মাছ মাছ করিয়া পাগল করিয়া ফেলে। কিন্তু চার টাকা সেরে মাছ কিনিয়া খাইবার ক্ষমতা ত তাহার নাই। আর ঘি, দুধ, ভাল-মন্দ মিষ্টি, ডিম, মাংস—এই সব স্বপ্নেও ভাবা যায় না। চাউলের দাম ত্রিশ টাকায় উঠিয়াছে না জানি আরও যদি বাড়িয়া যায় তবে উপস্থিত এখন যাহা এক-বেলা জুটিতেছে, ভবিষ্যতে তাহাও জুটিবে না। হরিপদর চক্ষের সম্মুখে নিরানন্দময়, আশাহীন ভবিষ্যৎ ফুটিয়া ওঠে। নিজেরা না খাইয়া একদিন একবেলা কাটাইতে পারে, কিন্তু ছেলেমেয়েটি, তারা ত ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করিতে পারিবে না, বা তাহারা পিতার অবস্থা বুঝিবে না। উহারা খাইতে চায়—খাবার না পাইলে কান্না জুড়িয়া দেয়। ছোট মেয়েটি একটুখানি গুড়, দুটি মুড়ি, বা একটু-খানি দুধের জন্য সুর করিয়া এক নাগাড়ে কাঁদিতে থাকে, চুপ করিতে বলিলে চুপ করে না—ধমকাইলে বা মারিলেও চুপ করিবে না, কান্না থামাইবে না। শুনিলে কষ্ট হয়, দেখিলেও মায়া হয়, দুঃখ হয়। উপযুক্ত আহারের অভাবে ঐটুকু ছেলেমেয়ের বাড়-বাড়ন্ত নাই। হাত-পাগুলি সরু সরু, মুখ ছোট, পেটটি স্ফীত হইয়াছে, মাথার চুলগুলি শ্রীহীন রুক্ষ।

হরিপদ অপলক দৃষ্টিতে ছেলেমেয়ের দিকে তাকাইয়া থাকে। স্ত্রীর শূন্য হাত দুইটি স্মরণ করিয়া দেয় যে, সরু সরু সোনার দুই-গাছি চুড়ি পোদ্দারের বৃহদাকার ঠাণ্ডা সিন্দুকের মাঝে পড়িয়া আছে। উহা যে আর কোনদিন ছাড়াইয়া লইয়া সুষমার হাতে উঠিবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

সুষমা বলিল, যা চাল আছে তাতে টেনেবুনে ওবেলা হতে পারে। কিন্তু এ বেলায় তেল, নুন, আলু, হলুদ এ-সব আনতে হবে। তার পর চাল—সুষমা স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া থামিয়া যায়।

হরিপদ বলে, ত্রিশ টাকা করে চাল—এদিকে লক্ষ্মণবাবু টাকার তাগাদা দিচ্ছেন। মিউনিসিপ্যালটির ট্যাক্সও অনেক বাকি পড়েছে, তারাও দুবেলা তাগাদা দিচ্ছে—আর এর পর খাতির করবে না। পূজো এসে গেল, ছেলেমেয়েদের যা হোক জামা-প্যাণ্ট দিতেই হবে। আর তোমারও ঐ একখানি মাত্র শাড়ী—

—আমার? আমি ত ঘরেই থাকি। তোমায় বাইরে বেরুতে হয়, তোমারই দরকার। জুতোর অবস্থা যা, ওতে আর তালি চলবে না। ঐ জুতো পায়ে দিয়ে রাস্তা-ঘাটে হাঁটছ? ধুতি-জুতো তোমারই দরকার। কিন্তু—। এই কিন্তুর পর আর কোন সমাধান নাই। সমস্ত কিন্তুর সমাধান হয় যদি টাকা থাকে। কিন্তু কোথায় সে টাকা।

ধীরে ধীরে গলির ভিতর অন্ধকার নামিয়া আসে। আশে-পাশের বাড়ীর উনুন হইতে রাশিকৃত ধোঁয়া আসিয়া দিবসের

প্রখর আলোকে ডুবাইয়া অন্ধকার করিয়া দেয়। হরিপদর মনে হয়, তাহার জীবনের আলো এমনি অকালে নিভিয়া অন্ধকার হইয়া যাইতেছে।

এখন একমাত্র আশা, শোনা যাইতেছে, মালিক নাকি এক মাসের বোনাস দিবেন। তবুও বিশ্বাস হয় না। অমন হাড়-কৃপণ যদুঘোষ যে, তাহাদের এক মাসের মাহিনা বোনাস দিবেন, বিশ্বাস হয় না। কিন্তু দোকানের অন্যান্য কর্মচারীরা চুপি চুপি জানাইয়াছে যে, না দিলে মজা দেখাব না!—পূজোর মরশুমে ধর্মঘট করে বাছাধনকে চোখে সরষের ফুল দেখিয়ে দেব। ইহার মধ্যে বলাই ছোকরাটি ভারী সাহসী আর চটপটে। সে একখানি দরখাস্ত লিখিয়া সকলের সহি লইয়া মালিকের কাছে দিয়াছে। উহাতে দাবি আছে—প্রত্যেককে এক মাসের মাহিনা বোনাস দিতে হইবে, এবং প্রত্যেককে একখানি করিয়া নতুন কাপড় দিতে হইবে। হরিপদ প্রথমে সহি করিতে চাহে নাই। ভয়ে ভয়ে বলিয়াছে, ভাই ঘোষ মহাশয়ের যা মেজাজ তাতে ভয় লাগে। তোমাদের তাড়ান শক্ত। তাড়াতাড়ি তোমাদের মতন লোক জোটান কঠিন। কিন্তু আমার মতন হিসেব লিখিয়ে নবদ্বীপ শহরে অনেক আছে। আমায় ত দুবেলা চোখ রাঙাচ্ছেন—এই ছুতো পেলে আর কি চাকরিতে রাখবেন? কিন্তু সেই বলাই ছেলেটি ভারি সাহসী! হরিপদর পিঠে হাত রাখিয়া অভয় দিয়া বলিল, কুছ পরোয়া নেই। তাড়াক না দেখি একবার! তার পর আমরা বাছাধনকে বিন্দাবন দেখিয়ে দেব না! এই একটি মাত্র ভরসাতে হরিপদ মনকে দৃঢ় করিয়াছে। মনে মনে হিসাব করিয়াছে—এক মাসের মাহিনা বোনাস পাইলে, উহা হইতে চাল-ডাল ও ছেলে-মেয়েদের জামা-কাপড় কিনিয়া দিবে। সস্তা দেখিয়া, নিজের জন্য একজোড়া জুতা, একখানি ধুতি ও সুষমার জন্য একখানা সাড়ী কিনিয়া দিবে। আজ কতদিন যে সুষমা পূজার সময় কাপড় পায় নাই—এ দুঃখ খুব বড় হইয়া, হরিপদর বুকে বাজিয়াছে। পূজার সময় পাড়ার ছেলেমেয়েরা, বৌ-ঝিরা নূতন জামা-কাপড় পরিয়া, কেমন সাজিয়া-গুজিয়া ঠাকুর দেখিয়া দেখিয়া বেড়াইতেছে আর তাহার স্ত্রী-পুত্র ছেঁড়া, তালিমারা জামা-কাপড় পরিয়া হতাশ, ম্রিয়মান দৃষ্টিতে, অপরের নূতন জামা-কাপড়ের দিকে চাহিয়া আছে। হরিপদ একটা বড় রকমের দীর্ঘশ্বাস ফেলে। না, এইবার আর তাহা হইতে দিবে না। পূজার আগেই মাহিনা আর বোনাস তাহার চাই-ই। হরিপদ ঠিক করে—কালই বলাইকে আবার স্মরণ করিয়া দিবে।

সুষমা বলে, ওগো! পূজো ত এসে গেল। মাঝে মাত্র পাঁচ দিন বাকী। এবারও বোধ হয় ছেলেমেয়েটার জামা-টামা কিছু হচ্ছে না। আমার জন্য কিছু বলি নে। ওরা ছেলেমানুষ—পাঁচটা ছেলেমেয়েদের জামা-কাপড় দেখছে আর আমার কাছে এসে বায়না ধরছে, মা আমাদের জামা-প্যাণ্ট কবে হবে—

হরিপদ স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া বলে, চেষ্টা ত করছি। ঘোষ মশাই ত বলেছেন, পূজার আগে মাইনে আর একমাসের বোনাস দেবেন। দেখি কি হয়।

পূজা আসিয়া পড়িল। পাড়ায় পাড়ায় সার্ব্বজনীন পূজা-মণ্ডপে বাজনা, বাঁশী বাজিয়া উঠিল। দোকানে দোকানে নূতন নূতন জামা-কাপড় আর আলোয় আলোয় জানাইয়া দিতেছে, বৎসরের পর আবার মা দুর্গা আসিতেছেন। চতুর্দ্দিকে ছুটির বাঁশী বাজিয়া উঠিয়াছে। বিদেশ হইতে কাহারও বাবা, কাহারও দাদা, জেঠা, কাকা, নূতন নূতন জামা-কাপড়, খাবার-দাবার, নূতন কপি লইয়া বাড়ী আসিতেছে। কেহ বা নূতন বাক্সের মধ্যে, ছেলেদের জুতা, জামা, কাপড়—স্ত্রীর জন্য এসেন্স, সাবান, নানা গল্পের বই লইয়া আসিয়াছেন। মেঘমুক্ত আকাশে শরতের সূর্য্যকিরণ, ঠিক উৎসবের মধুর হাস্যের মত, চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রতিবেশীদের গৃহের অঙ্গনে, শিউলী ফুল ফুটিয়াছে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা প্রতিদিন ভোরে শিশিরসিক্ত ফুলগুলি লইয়া কলরব করিয়া ছুটিতেছে। স্কুল-কলেজ বন্ধ হইয়াছে কেরাণীরা ছুটি পাইয়াছে। ছাত্র, চাকুরিয়ারা নূতন জুতা মচমচ শব্দ তুলিয়া অকারণ হাস্যে রাজপথ সচকিত করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে নূতন নূতন রঙচঙে শারদীয়া পত্রিকাগুলি হকাররা বিক্রয় করিতেছে—মাইকে নূতন নূতন রেকর্ডের গান ধ্বনিত হইতেছে। দেওয়ালে দেওয়াল-জোড়া নূতন নূতন সিনেমার বিজ্ঞাপন—জামা-কাপড়ের বিজ্ঞাপন প্রভৃতিতে, শারদীয়ার উপস্থিতি ভালরূপে জানাইয়া দিতেছে।

না, আর পূজার দেরী নাই, মা আসিতেছেন। হরিপদ অন্য-মনস্কভাবে এই সব দেখে—তাহার হৃদয় হইতে গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে, এবং বোধ করি, দুই বিন্দু উষ্ণ অশ্রুজল চোখের কোণে দেখা দেয়। নিজের নিরানন্দ গৃহ—অন্ধকার ঘর, প্রেয়সীর অশ্রু—ছেলেমেয়েদের উদাস, ম্রিয়মান দৃষ্টি, সমস্তই একে একে তাহার চক্ষের উপর ভাসিয়া ওঠে। এক সময় অস্ফুট কণ্ঠে বলে, ভগবান—ভগবান!

ষষ্ঠীর দিন একটু সকাল সকাল দোকানে যাইতেই, যদু ঘোষ ফাটিয়া পড়িল, বলি ওহে হরিপদ, এই দরখাস্তের নীচে এই সইটা তোমার ত! হরিপদ অষ্টমীর পাঁঠার মত কাঁপিতে কাঁপিতে দেখিল সেই দরখাস্তখানি। তাহাদের নানাবিধ দাবীর দরখাস্তখানি ঘোষ মশায়ের হাতে।

মৃদু কণ্ঠে বলিল, হুঁ।

যদু ঘোষ বলিল, এক মাসের বোনাস। বলি বোনাসটা কি? আমি ত ঐ ইংরেজী ভাষা জানিনে বাপু। আর একখানা করে নূতন কাপড় আমায় দিতে হবে। তোমাদের দাবী জোড়দার হয় নি। মাত্র একখানা কাপড় চেয়েছ। কেন, গুষ্টিশুদ্ধ সকলের জন্য শান্তিপুরে ফরাসডাঙার ধুতি, সাড়ী চাইলেই পারতে। বৌয়ের জন্য একখানা করে বেণারসী, কুন্তেল তেল, পাউডার, পমেডম্—

এগুলো দরখাস্তে বাদ দিলে কেন? সে নবাবপুত্তর কোথায়? সেই বলাইটা।

বলাই তখনও আসে নাই। এইবার যদু ঘোষ ফাটিয়া পড়িল। তাঁর মুখ দিয়া একসঙ্গে যেন স্রোত বহিতে লাগিল। নানারূপ সম্বোধন করিয়া, দোকানের সমস্ত কর্ম্মচারীদের দিকে তাকাইয়া সে তিনখানি দশ টাকার নোট হরিপদর দিকে ফেলিয়া দিয়া বলল, এই নাও, তোমার এই মাসের মাইনে। খাতায় ষ্টাম্পের উপর সই করে বিদেয় হও। আর আসতে হবে না—তোমার মত ঢের ঢের খাতা লিখিয়ে পাব। আর তোমাদের ব্যবস্থা পূজোর পর হচ্ছে। বোনাস, বাপের জন্মে শুনি নি মুদীখানার দোকানে বোনাস দেয়। বলি, আমি কি টাটা-বিড়লা—যে বোনাস দেব। বলাইটা আসুক—তার বড় তেল হয়েছে। দাবী করতে শিখেছে—যা এবার, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে নিশেন ঘাড়ে করে বলগে—আমাদের দাবী মানতে হবে।

হরিপদ কান্নাভরা সুরে কিছু বলিতে গেল। কিন্তু যদু ঘোষ হাত নাড়িয়া ধমক দিয়া বলিল, খুব হয়েছে—আর মায়াকান্না কাঁদতে হবে না। দোকান করতে করতে চুল পেকে গেল, বহু লোক দেখেছি—মানুষকে চিনতে আর যদু ঘোষের বাকী নেই। নাও—এখন খসে পড়।

নোট তিনখানি পকেটে করিয়া হরিপদ দোকান হইতে বাহির হইল, তখন সারা শহরে উৎসবের বন্যা বহিয়াছে। পাঁচটি প্রাণীর মাত্র এই তিনখানি নোট সম্বল। সমস্ত বাড়ী খুঁজিলে, আর একটি আধলাও পাওয়া যাইবে না। সম্বল মাত্র ঐ ভাঙা একতলা বাড়ী, তাহারও ট্যাক্স বাকী পড়িয়াছে অনেক কোয়ার্টারের। ঘরে চাল নাই—তেল নাই—কাহারও একখানি আস্ত কাপড় পর্য্যন্ত নাই। বিষয়-সম্পত্তি বলিতে গেলে কিছুই নাই। কিন্তু পৃথিবী হাসিতেছে—গাছে গাছে পাখী ডাকিতেছে—ফল ফুল ফলিতেছে। দোকানে দোকানে কত খাবার—কত চাল—ডাল—তেল। খাবারের দোকানে অফুরন্ত খাদ্যের আয়োজন, দোকানগুলি আলোয় আলোয় হাসিতেছে। শহরের আরও কত লোক, তাহারা হাসিতেছে—পকেট হইতে নোটের তাড়া বাহির করিয়া, কত প্রয়োজনীয় অ-প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্তর কিনিয়া স্তূপাকার করিতেছে। শুধু সেই—এই ফল-ফুল শোভিত শস্য-শ্যামল বসুন্ধরার মাঝে, ভিক্ষুকের মত, ঘন অন্ধকারে মুখ লুকাইয়া নীরবে চোখের জল ফেলিতেছে। জীবনের একি পরিহাস!

আধ মণ চাল, নুন, তেল কিনিতেই কুড়িটি টাকা খরচ হইয়া গেল। একখানি মাত্র নোট—মাত্র দশ টাকা। এই মাত্র তার সম্বল। সে নিজে, তাহার স্ত্রী, দুটি শিশুপুত্র, এই কয়জনের জন্য এই একখানি নোটই কি যথেষ্ট? বার বার প্রশ্ন করে, হরিপদ নিজেকেই। ছেলেমেয়ে দুটি, নূতন জামা প্যান্টের জন্য পথ চাহিয়া আছে। বাড়ী ফিরিলেই, তাহারা কত আশাভরা স্বরে, বলিবে—বাবা আমাদের জামা—সেই আনন্দভরা, খুসী-ঝলমল মুখকে কি করিয়া সে একটি ফুৎকারে নিভাইয়া অন্ধকার করিয়া দিবে? জগৎ জোড়া এই আনন্দের দিনে, পিতা হইয়া, কি করিয়া বলিবে, নারে—এবারও হ'ল না তোদের জামা-প্যান্ট। না—হরিপদ আর ওকথা বলিতে পারিবে না। নোটখানি আর একবার স্পর্শ করিয়া, হরিপদ একটি ছোট্ট-খাট্ট দোকানে ঢুকিল।

রাত অনেক হইয়াছে। ছেলেমেয়েটি, তাহাদের নূতন জামা-প্যান্ট হাতে করিয়া, ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আজ তাহাদের মুখে হাসি ফুটিয়াছে। উহারা ঘুমাইবার আগে বলিয়াছে, বাবা নোতুন জুতো দিও কিন্তু। ওবাড়ীর অপর্ণা যেমন পরছে—শিবুদার যেমন জুতো সেই রকম দিও কিন্তু। ঘাড় নাড়িয়া, হরিপদ বলিয়াছে—হাঁ, ঐ রকমই দেব।

সুষমা ঘরে আসিয়া দেখিল, লণ্ঠন টিপ টিপ করিয়া জ্বলিতেছে, আর হরিপদ ছিন্ন বিছানায় বসিয়া, আপন মনে বিড়ি টানিতেছে।

—একি এখনও ঘুমোও নি?

—ঘুম! ঘুম কি চোখে আছে? ঘুম চোখ থেকে উড়ে গিয়েছে।

—কিন্তু ভেবে কি করবে? ভগবান কি এমনি নিষ্ঠুর হবেন! না—না—একটা উপায় করবেনই। ঠাকুরের ওপর মতি রাখ, দেখবে, নিশ্চয়ই একটা হিল্লে করে দেবেন। হরিপদ কোন কথা বলিল না।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া গেল, পাড়ার কোলাহল বন্ধ হইল, রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইল, তবুও হরিপদর চোখে ঘুম আসিল না। কি যেন ভাবিতে ভাবিতে, বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার ভাবনার শেষ নাই। লোকের কাছে অনেক দেনা, ঘরে একটি পয়সাও নাই। এত বড় বিশাল পৃথিবীতে, তাহার আত্মীয়স্বজন বলিতেও কেহ নাই। যে দুই-একজন আত্মীয় আছে, তাহারা খোঁজ লয় না। সে একাকী আত্মীয়স্বজন বিহীন হইয়া, এই বিরাট পৃথিবীর সমস্ত আনন্দরস হইতে বঞ্চিত হইয়া ভগ্ন হৃদয়ে লাঞ্ছিত জীবন বহন করিতেছে। কিন্তু তবুও তাহাকে বাঁচিতে হইবে। নিদ্রিত স্ত্রী-পুত্রকন্যার দিকে চাহিয়া, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া হরিপদ গৃহমধ্যস্থ অসীম অন্ধকারের ভিতর ডুবিয়া গেল।

আজ মহা অষ্টমী। সন্ধ্যার পর সন্ধিপূজা সুরু হইবে। ছেলে-মেয়ে দুটি পাড়ার বারোয়ারী তলা হইতে ঠাকুর দেখিয়া দুটি বাতাসা, চাল, ছোলা, কলা খাইতে খাইতে আসিয়া বলিল, বাবা আমাদের জুতো কই? বলেছিলে যে কিনে দেবে? সবাই কত ভাল ভাল জুতো পরছে। চল না দোকানে—দেখবে কত ভাল সব জুতো। হরিপদ অন্যমনস্ক ভাবে বলিল, হুঁ কিনে দেব। কালই কিনে দেব—

সন্ধ্যার পর রাস্তায় আর পা বাড়াইবার উপায় নাই। লোকে

দোকানপাট—এমন ভীড় যে, ঠেলিয়া রাস্তা পার হওয়া যায় না। উৎসব-প্রমত্ত নরনারী, বালক-বালিকা, নূতন জামা-কাপড় পরিয়া, স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়া, প্রতিমা দর্শনে বাহির হইয়াছে। অন্য সকলের মত হরিপদও বাহির হইয়াছে। তাহার দুই চোখ যেন জ্বলিতেছে—ভীড়ের মধ্যে সে যেন কিছু সন্ধান করিতেছে। অনেকগুলি স্ত্রীলোক এক জায়গায় ভীড় করিয়া ঠাকুর দেখিতেছিল। মনে হইল, তাহারা শহরের নয়—পার্শ্ববর্তী গ্রাম হইতে ঠাকুর দেখিতে আসিয়াছে। উহাদের মধ্যে একটি বার তের বৎসরের মেয়ের গলায় বেশ মোটা একটা সোনার হার ঝক্ ঝক্ করিতেছে। হরিপদ সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ভীড় ঠেলিয়া ঠিক সেই মেয়েটির পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার দুই চক্ষু ঠিক ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত জ্বলিতেছে। সে ভীড় দেখিতেছে না—প্রতিমা দেখিতেছে না—এত আলোকসজ্জা—এত ভীড়—এত জনকোলাহল—সব যেন তাহার নিকট হইতে মুছিয়া গিয়াছে। শুধু একাগ্র দৃষ্টিতে, অত্যন্ত লুব্ধ দৃষ্টিতে মেয়েটির গলার হারটির দিকে তাকাইয়া থাকে।

এক সময় জোরে ঘড়ি ঘণ্টা বাজিয়া উঠে। লোকজন উচ্চৈঃস্বরে 'দুর্গা মাঈকী জয়' বলিয়া চীৎকার করিয়া ওঠে। ঠিক সেই সময় হরিপদ, মেয়েটির গলার হার সজোরে টান দিতেই হারগাছটি ছিঁড়িয়া তাহার হাতে আসিল। মেয়েটি চীৎকার করিয়া উঠিল, কিন্তু তাহার চীৎকার পূজার বাজনা ও জয়ধ্বনির মাঝে ডুবিয়া যায়।

একটা চায়ের দোকানের এক কোণে বসিয়া এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়া হরিপদ মুখের ঘাম মুছিয়া ফেলিল। পকেটে হাত ঢুকাইয়া হারগাছটি অনুভব করিয়া মনে মনে ভাবিল, অন্ততঃ চার-পাঁচ ভরির কম নয়। পাঁচশো টাকা ত বটেই—

পরের দিন একটা চেনা সেকরার দোকানে আসিয়া বলিল, কি হচ্ছে দাদা—

সেকরা তাহার কাজ হইতে মুখ তুলিয়া বলিল, কি হরিবাবু যে, আজ ছুটি নাকি—

—নাঃ, আমার আবার ছুটি! দেখ ত দাদা, হারগাছ বিক্রী করতে হবে। আমার শালীর হার, এটা বিক্রী করে দেবে। ক'দিন আনি আনি করে আর আনা হয় না।

কপালের ঘাম মুছিয়া, কম্পিত-হাতে পকেট হইতে সেই হারগাছটি সেকরার হাতে তুলিয়া দিয়া হরিপদ বিপুল আশায় তাকাইয়া থাকে।

হারগাছটি হাতে লইয়া সেকরা বলিল, একি বাবু এ যে গিল্‌টীর হার—এ ত সোনা নয়—

—সোনা নয়? বল কি হে? হরিপদ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—না না ভাল করে দেখ। আমার শালীর বিয়ের হার—এ কি করে গিলটির হবে!

মৃদু হাসিয়া সেকরা কষ্টি-পাথরে হার ঘষিয়া বলিল, এই দেখুন বাবু, এ সোনা নয়—।

কপালের ঘাম মুছিয়া বিবর্ণ মুখে হারগাছটি হাতে লইয়া হরিপদ উঠিয়া দাঁড়াইল। দিবসের সমস্ত আলো তাহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে নিভিয়া গেল। কোনমতে পকেটে হারগাছটি ঢুকাইয়া বিড় বিড় করিয়া হরিপদ বলিল, এ সোনা নয়—মেকি!

'মেকি! মেকি!' বলিতে বলিতে হরিপদ দোকান হইতে বাহির হইয়া গেল।

ত্রয়ী

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

১

উপল-বন্ধুর পথ—
পরিখায় ঝরণা ঝুলছে;
সাঁকোর ওপর চলে অশরীরী আরণ্যক
ছায়ার মিছিল।
আশে-পাশে দুর্ধর্ষ পাহাড় প্রাচীর।
প্রভাতের সূর্যকরে কুয়াসা দুলছে!
তখন না যদি তুমি ঝরালে রুধির
পৃথিবী কি করে হবে এত অনাবিল?

২

মৌমাছি এ ফুলে ও ফুলে
ছুটে ছুটে যায়।
চঞ্চল কোথায়?
অজানা অকূলে!

৩

কাল কবি বসে বসে না জানি কী করে।
মাল ফেলা শুরু হয় বিদেশী বন্দরে!

শঙ্করমতে "সাধন" ঃ কর্ম

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

৪

পূর্বসংখ্যায় পুণ্যকর্ম ও শাস্ত্রোপদিষ্ট নিত্যকর্মও যে মোক্ষের সাধন নয়, সে বিষয়ে কিছু বলা হয়েছে। শঙ্কর এ সম্বন্ধে আরো বিশদ আলোচনা করেছেন।

পুনরায় যদি বলা হয় যে, নিত্যকর্ম অন্যান্য কর্মের অপেক্ষা ভিন্ন প্রকৃতির, সেজন্য তার ফলও বিভিন্ন হওয়া প্রয়োজন—তার উত্তরে শঙ্কর বলেছেন যে, যখন নিত্য-কর্মও "কর্ম", তখন তার ফল সম্পূর্ণ বিভিন্ন হবে কেন? বস্তুতঃ "কাম্য" কর্ম বাদ দিলে, "নৈমিত্তিক" ও নিত্য "কর্ম" উভয়ই তুল্যরূপ, উভয়েই যাবজ্জীবন বিহিত হয়েছে। কিন্তু নৈমিত্তিক কর্মের ক্ষেত্রে ত মোক্ষ ফল কল্পনা করা হয় না কোনোদিনও, নিত্যকর্মের ক্ষেত্রেই বা হবে কেন?

"নৈমিত্তিকেষু ফলেষু ন মোক্ষঃ ফলং কল্প্যতে, তৈশ্চাবিশেষাৎ নৈমিত্তিকত্বেন, জীবনাদি-নিমিত্তে চ শ্রবণাৎ, তথা নিত্যানামপি ন মোক্ষঃ ফলম্।"

(বৃহদা-ভাষ্য-ভূমিকা, ৩-৩)

এই প্রসঙ্গে একটি সুন্দর উদাহরণও শঙ্কর দিয়েছেন। পেচকাদির চক্ষু অন্যান্য প্রাণীদের চক্ষু থেকে বিভিন্ন প্রকৃতির, যেহেতু অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে চক্ষু দ্বারা রূপ বা নীল-পীতাদি বর্ণ অবলোকনের জন্য আলোকের প্রয়োজন হয়, পেচকাদির ক্ষেত্রে তা' হয় না। কিন্তু তা' সত্ত্বেও এ কথা কল্পনা করা নিতান্তই হাস্যকর হবে যে, পেচকের চক্ষু অন্যান্য প্রাণীদের চক্ষু অপেক্ষা ভিন্ন এবং অন্যান্য প্রাণীদের চক্ষু রূপ-গ্রহণ করে বলে, পেচকাদির চক্ষু রূপ-গ্রহণ না করে রস-গ্রহণ করে। সেজন্য, কোনো বিষয়ে যদি কল্পনা করতেই হয়, তা হলে সেই বস্তুর যা' শক্তি-সামর্থ্য আছে, সেই বিষয়েই কেবল কল্পনা করা চলে, তার বাইরে কিছু নয়। একই ভাবে, কর্মের ক্ষেত্রে যদি ফলের কল্পনা করতেই হয়, তাহলে কর্ম যেরূপ ফল উৎপাদন করতে পারবে, সেরূপ ফলই কেবল কল্পনা করা উচিত মোক্ষ-প্রমুখ অন্য কোনোরূপ ফল কদাপি নয়।

"দধি" ও "বিষের" যে উদাহরণ উপরে দেওয়া হয়েছিল, তা' ত কেবল এই মাত্রই প্রমাণ করে যে, নিষ্কামভাবে এবং জ্ঞান-সহযোগে অনুষ্ঠিত নিত্যকর্ম সকাম ও জ্ঞানহীনভাবে অন্যান্য কর্মের অপেক্ষা স্বতন্ত্র ফল উৎপাদন করে। কিন্তু সেই ফল যে মোক্ষ, তা'র প্রমাণ কি? একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। বস্তুতঃ নিত্যকর্মের স্বতন্ত্র ফল হলেও আপত্তি হতে পারে না, যদি সেই ফল, কর্মেরই উপযোগী হয়। যেমন, দেবাদিলোক লাভ, ক্রমমুক্তি প্রভৃতি ফল নিত্যকর্মের হয় যখন তা' উপাসনাদির সঙ্গে যথাযথ ভাবে সংযুক্ত হয়

পুনরায় নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত নিত্যকর্মের ফল যে চিত্ত-শুদ্ধি, তা' ত পূর্বে বহুবারই বলা হয়েছে। এরূপ আত্ম-শুদ্ধির জন্য যাঁরা নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান করেন, এবং তার ফলে আত্মদর্শন এবং সর্বত্র সমদর্শন করতে সমর্থ হয়ে, মোক্ষ লাভ করেন, তাঁদের শাস্ত্রে "আত্মযাজী" বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই দিক্ থেকে, যা' পূর্বেই বহুবার বলা হয়েছে, জ্ঞানসহযোগে অনুষ্ঠিত নিত্যকর্ম আত্মজ্ঞানের সাধন।

"আত্মযাজিশব্দস্তু ভূতপূর্ব-গত্যা প্রযুজ্যতে জ্ঞানযুক্তানাং নিত্যানাং কর্মণাং জ্ঞানোৎপত্তি-সাধনত্ব-প্রদর্শনার্থঃ।"

(বৃহদা-ভাষ্য-ভূমিকা, ৩-৩)

নিত্যকর্মের আর একটি ফল হ'ল পঞ্চভূতে বিলয়—"ভূতাপ্যয়ম্"।

এরূপে, নিত্যকর্মের নানারূপ ফল ঃ

(১) সকামভাবে অনুষ্ঠিত নিত্যকর্মের ফল হ'ল ব্রহ্মাদি-দেবভাব বা দেবপদ প্রাপ্তি। এই হ'ল সকাম কর্মের ফলের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ফল ("ব্রহ্মান্ত-কর্ম-বিপাকঃ")। অবশ্য সকাম কর্ম বলে, এর ফলে সংসারে প্রত্যাবর্তন অনিবার্য, যা' পূর্বেই বলা হয়েছে।

(২) নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত নিত্যকর্মের ফল হ'ল চিত্ত-শুদ্ধি, জ্ঞানাধিকার, জ্ঞানোৎপত্তি। এর ফলে মোক্ষ এবং সংসারে অনাবৃত্তি।

(৩) নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত নিত্যকর্মের আর একটি ফল হ'ল ক্রমমুক্তি, যখন তা' সগুণোপাসনার সঙ্গে যুক্ত হয়।

(৪) নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত নিত্যকর্মের আর একটি ফল হ'ল পঞ্চভূতে বিলয়।

সেজন্য, নিত্যকর্ম সম্বন্ধে আলোচনার অন্তে, শঙ্কর সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন ঃ

"তস্মাৎ সাভিসন্ধীনাং নিত্যানাং সর্বমেধাশ্বমেধাদীনাং চ ব্রহ্মত্বাদীনি ফলানি। যেষাং পুনর্নিত্যানি নিরভিসন্ধীনি আত্মসংস্কারার্থানি, তেষাং জ্ঞানোৎপত্ত্যর্থানিত্যানি...তেষা-মারাদুপকারকত্বাৎ মোক্ষসাধনান্যপি কর্মাণি ভবন্তীতি ন বিরুধ্যতে।"...

"তস্মান্ন মোক্ষার্থানি কর্মাণীতি সিদ্ধম্। অতঃ কর্ম-ফলানাং সংসারত্ব প্রদর্শনায়ৈব ব্রাহ্মণমারভ্যতে,"

যাঁরা ফলাভিলাষী, তাঁদের নিত্যকর্ম এবং সর্ব-অশ্বমেধাদিরূপ কাম্য-কর্মের ফল হ'ল ব্রহ্মাদিপদ লাভ। অপর পক্ষে, যাঁরা ফলাভিলাষী নন এবং কেবল আত্মশুদ্ধির জন্যই নিত্য-কর্ম সম্পাদন করেন, তাঁদের সেই সকল নিত্য-কর্ম জ্ঞানোৎপত্তির কারণ হয়। এই ভাবে, নিত্যকর্ম পরম্পরাক্রমে জ্ঞানের পরোক্ষ সাধন বলে, সেই অর্থে মোক্ষ-সাধন।

কিন্তু কোনো কর্মই সাক্ষাৎভাবে মোক্ষের কারণ নয়। যাঁরা জ্ঞানযোগে অধিকারী, তাঁদের পক্ষে নিত্যকর্মও অবশ্য প্রয়োজনীয় নয়। যাঁরা কর্মযোগে অধিকারী, তাঁদের পক্ষে তা' অত্যাবশ্যক।

এরূপে, নিষ্কাম কর্ম এইভাবে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তির উপায়স্বরূপ হলেও, যে' সকলের পক্ষে অত্যাবশ্যক নয়—এ বিষয়ে শঙ্কর তাঁর তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ভাষ্যে (১-১১) পূর্বপক্ষ খণ্ডন ব্যপদেশে প্রপঞ্চিত করেছেন।

এক্ষেত্রে, নিষ্কাম কর্ম জ্ঞানোৎপত্তির কারণ হলে, আশঙ্কা হতে পারে যে, যেহেতু কর্মানুষ্ঠান একমাত্র গার্হস্থ্যাশ্রমেই সম্ভবপর, সেহেতু অন্যান্য আশ্রম নিষ্প্রয়োজন।

এর উত্তরে শঙ্কর বলছেন যে, এরূপ আশঙ্কার কোনো ভিত্তি নেই।

"কর্মানেকত্বাৎ" (তৈত্তি-ভাষ্য, ১-১১)

কর্ম অনেক প্রকার। সেজন্য গার্হস্থ্যাশ্রমের অগ্নিহোত্র প্রভৃতিই কেবল কর্ম নয়। সেই সঙ্গে ব্রহ্মচর্য, তপস্যা, সত্য-বচন, শম, দম, অহিংসা প্রভৃতি অন্যান্য আশ্রমের জন্য বিহিত কর্মও কর্ম, এবং এই সকল কর্মও সমানভাবে জ্ঞানোৎপত্তির সাধক। একই ভাবে ধ্যান, ধারণা প্রভৃতিও ব্রহ্মজ্ঞানের উপায়স্বরূপ বলে' বিহিত হয়েছে। সেজন্য কেবল গার্হস্থ্যাশ্রমের জন্য বিহিত কর্মের মাধ্যমেই যে জ্ঞানোৎপত্তি হতে পারে, একথা মনে করা ভ্রমই মাত্র।

পুনরায়, জন্মান্তরীয় কর্মের ফলে, বর্তমান জন্মে কর্মানুষ্ঠানের পূর্বেই, অর্থাৎ, গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশের পূর্বেই, জ্ঞানে অধিকার জন্মাতে এবং জ্ঞানোদয় হতে পারে। এরূপ পরম-সৌভাগ্যবান্ সাধক নিত্য আত্মাকে দর্শন করে, প্রজা বা পুত্র, সকাম কর্ম ও সকাম উপাসনা দ্বারা লভ্য মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোকে বীতস্পৃহ হন—সেজন্য তাঁর আর পুনরায় গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ এবং কর্মে প্রবৃত্তি হবে কেন? একই ভাবে, যিনি গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করেছেন, এবং যথাবিহিত কর্ম নিষ্কামভাবে সাধনও করেছেন, তিনিও জ্ঞানলাভের পরে কর্মের জ্ঞানের পরিপক্ক বা পূর্ণতম অবস্থায় আর কোনো প্রয়োজন বোধ করেন না, এবং স্বভাবতঃই কর্ম থেকে বিরত হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

পুনরায়, বলা যেতে পারে যে, গার্হস্থ্যাশ্রমের অগ্নিহোত্রাদি কর্মের বিধানই শ্রুতিতে বিশেষভাবে দেওয়া আছে। অন্যান্য আশ্রমের তপস্যা, ব্রহ্মচর্যাদির বিধান সেরূপ অধিক ভাবে দেওয়া নেই। অগ্নিহোত্রাদি অধিক ক্লেশ-সাধ্যও নিশ্চয়, এবং অন্যান্য আশ্রমের জন্য বিহিত-তপস্যা, ব্রহ্মচর্যাদি গার্হস্থ্যাশ্রমেও সম্ভবপর। এই তিন কারণে, গার্হস্থ্যাশ্রম এবং অন্যান্য আশ্রমকে তুল্য বলে গ্রহণ করা অনুচিত।

এর উত্তরে শঙ্কর বলছেন যে, সাধারণ জনদের ক্ষেত্রে কর্মই সর্বাপেক্ষা উপযোগী। তাঁরা স্বভাবতঃই বিভিন্ন ফলের আশায় বিভিন্ন কর্মে রত হন, এবং এরূপ সকাম কর্ম অসংখ্য বলে', সে সম্বন্ধে বিধিবিধানও সমভাবে প্রচুর। পুনরায়, কর্ম হচ্ছে উপায়, জ্ঞান হচ্ছে উপেয় বা উপায় দ্বারা লভ্য লক্ষ্য। স্বভাবতঃই উপায় সম্বন্ধেই অধিক আলোচনার প্রয়োজন হয় উপেয় অপেক্ষা। এই কারণেই, শ্রুতিতে কর্ম সম্বন্ধেই অধিক বিধিবিধান দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, জন্মান্তরকৃত গার্হস্থ্যাশ্রমের অগ্নিহোত্রাদির ন্যায় অন্যান্য আশ্রমের ব্রহ্মচর্যাদিও জ্ঞানোৎপত্তির সহায়ক হতে পারে, সেজন্য কোনো কোনো ব্যক্তি জন্মাবধিই বৈরাগ্যসম্পন্ন হন। অন্য কেহ কেহ পুনরায় প্রথম থেকেই বৈরাগ্যবিহীন ও বিদ্যাবিদ্বেষীও হন। সেজন্য যাঁরা প্রথমাবধিই সন্ন্যাস প্রবৃত্তিশীল, তাঁরা গার্হস্থ্যাশ্রম ভিন্ন অন্য আশ্রমেরই আশ্রয় গ্রহণ করেন।

যদি পুনরায় বলা হয় যে, নিষ্কাম কর্ম দ্বারা চিত্ত-মল অপসারিত হলে জ্ঞানোৎপত্তির বাধা বিদূরিত হয়, এবং তার পরই স্বতঃই জ্ঞানের উদয় হয়; সেজন্য পুনরায়, কর্ম-কাণ্ডের উপর জ্ঞানকাণ্ডেরই বা কি প্রয়োজন? তার উত্তর হ'ল এই যে, কেবল প্রতিবন্ধক নিবৃত্তি হলেই জ্ঞানের উদয় হয় না, তৎপরে জ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনও অত্যাবশ্যক।

এই আলোচনার দ্বারা শঙ্কর দুটি তত্ত্ব পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন। প্রথমতঃ,নিষ্কাম কর্ম জ্ঞানোৎপত্তির বিশেষ সহায়ক হলেও; সকলের পক্ষেই অত্যাবশ্যক নয়। এ' সম্বন্ধে "সাংখ্য" ও "যোগের" মধ্যে প্রভেদ নির্ধারণ প্রসঙ্গেও বলা হবে।

দ্বিতীয়তঃ, নিষ্কাম কর্ম জ্ঞানোৎপত্তির বিশেষ সহায়ক হলেও, সাক্ষাৎ সাধন নয়, সাক্ষাৎ সাধন হ'ল জ্ঞানকাণ্ডের শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন। এরূপে নিষ্কাম কর্ম নঞর্থক (Negative) দিক্ থেকে চিত্তমলরূপ জ্ঞানোৎপত্তির বাধাই মাত্র দূর করে, সদর্থক (Positive) দিক্ থেকে জ্ঞানের সাক্ষাৎ উদয়ের কারণস্বরূপ হয় না। এই হ'ল শঙ্করের নিষ্কাম কর্ম বিষয়ক মতবাদের মূল কথা।

বঙ্গীয় মধ্যযুগের প্রতিভাবতার শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণি

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

কেবল স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের গুরুরূপে নয়, শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণি অন্যান্য কারণেও বিদগ্ধ সমাজে চিরস্মরণীয়।

প্রথমতঃ, তিনি বহু স্মৃতি-নিবন্ধের প্রণেতা, যে নিবন্ধসমূহ স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের মনীষা ও প্রতিভাকে বিশেষ উদ্দীপ্ত করেছিল—যে নিবন্ধগুলি, ফলতঃ, রঘুনন্দনের অতুলসৌধসমূহের ভিত্তিস্বরূপ ছিল।

দ্বিতীয়তঃ, আচার্য্য চূড়ামণির পিতা শ্রীকর এবং তাঁহার পুত্র রামভদ্রও বিশেষ গুণী জ্ঞানী পণ্ডিতাগ্রগণ্য ছিলেন। শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণি বংশপরম্পরায়ও প্রখ্যাত।

তৃতীয়তঃ, আচার্য্য চূড়ামণির সমাজ-হিতৈষণা সমাজ-চেতনার বহু উর্দ্ধে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তাঁর পরবর্ত্তী সময়ে রাষ্ট্রীয় বিপর্য্যয়ে ও অন্যান্য কারণে নানা সামাজিক বিধান পরিগৃহীত হয়েছিল যা আচার্য্য চূড়ামণি স্বীকার করে নেন নি। তাঁর বলিষ্ঠ পৌরুষ ও হিতপ্রতিষ্ঠ পাণ্ডিত্য—সামাজিক হিত কখনও ব্যাহত হতে দিত না।

এখন উপরের তিনটি বিষয়কে আরও প্রপঞ্চিত করছি।

শ্রীনাথাচার্য্য-চূড়ামণির গ্রন্থাবলী এখনও প্রায়ই অমুদ্রিত। হস্তলিখিত পুঁথি থেকে সংগৃহীত তথ্যই এখানে পরিবেশন করা হচ্ছে।

১। শ্রীনাথের নিবন্ধাবলী।

(ক) টীকাবলী।

১। নারায়ণের ছন্দোগ—পরিশিষ্ট—প্রকাশের টীকা সার-মঞ্জরী।১

২। শূলপাণি-কৃত তিথি-বিবেকের টীকা তাৎপর্য্য-দীপিকা।২

৩। শূলপাণি-কৃত শ্রাদ্ধ বিবেকের টীকা শ্রাদ্ধ-বিবেকব্যাখ্যা।৩

৪। জীমূতবাহন-কৃত দায়ভাগের টিপ্পণ।

(খ) অর্ণব-গ্রন্থ।৪

১। বিবেকার্ণব। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে শ্রীনাথ স্ব-রচিত কৃত্য-তত্ত্বার্ণবে উল্লেখ করেছেন (L. 1933).

২। কৃত্য-তত্ত্বার্ণব।৫

গ্রন্থের প্রারম্ভ—

শ্রীগোবিন্দ-পদাম্ভোজদ্বন্দ্বমদ্বন্দ্ব-সাধনম্।
[illegible]ন্দে বৃন্দারকধুনী—মকরন্দ—মনোহরম্ ॥১
শ্রীকরাচার্য্য-পুত্রেণ শ্রীমচ্ছ্রীনাথ-শর্ম্মণা।
প্রীতয়ে বিদুষাং চক্রে কৃত্য-কাল-বিনির্ণয়ঃ ॥২
শ্রৌতে বিধৌ কালকৃতো বিরোধঃ
প্রায়ঃ সদৈব প্রথিতো বুধানাম্।
অতস্তদুচ্ছেদকৃতে মুনীনাং
বিচার্য্য বাচো বিদধামি তত্ত্বম্ ॥৩
নানাবিদেশ-বিদুষাং মতমাকলয্য
শ্লোকশ্লোকং যদভিলিখ্য সমর্পয়ামি।
শ্রদ্ধাং বুধা বিপথগড্ডারিকাপ্রবাহে
দূরাদ্বিহায় কুরুতাদরমত্র গাঢ়ম্ ॥৪

ইহ খলু নিত্য-নৈমিত্তিকাদি—যাবদ্বৈদিক-কর্ম্মাণি কালন্ত-বিশেষাঙ্গকাণি শ্রূয়ন্তে তে চ বিশেষ বৎসরায়ণর্ত্তু-মাস-পক্ষ-তিথি-নক্ষত্র-রূপতয়া ভিন্নাঃ…প্রত্যেকং নানাপ্রকারঃ কুত্র কর্ম্মণি কীদৃশ-স্যাঙ্গত্বমিতি নির্ণয়মন্তরেণ প্রবৃত্তৌ কদাচিৎ কর্ম্মণো বৈগুণ্যমপি স্যাদিতি তন্নির্ণয়ারম্ভো যুক্ত ইতি ॥

গ্রন্থের শেষভাগেও আচার্য্য চূড়ামণি অতি সুন্দরভাবে নিজের উদ্দেশ্য পুনরায় ব্যক্ত করেছেন—

অতএব পুরাণং শৃণুয়াদিপ্রান্নরসিংহস্য পূজনমিতি নরসিংহপুরাণম। আগমোক্তমন্ত্রো বিধিবলাজ্জপ্য এব ন পঠনীয়ঃ। শেষং বিবেকার্ণবে জ্ঞেয়ম্ ॥

বিচার্য্য নানামুনিবর্ষবাচো
নিবন্ধজাতঞ্চ মহার্ণবাদ্যম্।
ময়া কৃতঃ কালবিনির্ণয়োঽয়ং
মুদং বুধানাং চিরমাতনোতু।
কৃত্য-তত্ত্বার্ণবো নাম নিবন্ধো রচিতো ময়া।
প্রীয়ন্তামত্র বিবুধা ব্যবস্থারত্নরাশিভিঃ ॥

১। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, ৬৪৩ নং পুথি।

২। প্রাচ্যবাণী মন্দির হইতে ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী কর্ত্তৃক মূলসহ Contributions of Bengal to Sanskrit Literature নামক সিরীজের ৩য় গ্রন্থ রূপে প্রকাশিত।

৩। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুথি, ২. ৪৩৩। এই গ্রন্থে লেখক স্বীয় সার-মঞ্জরী টীকার নাম তিনবার উল্লেখ করেছেন। এখানে নিজের নাম "আচার্য্যচূড়ামণি"ও একবার উদ্ধৃত করেছেন।

৪। "দায়ভাগঃ…বহুবিধ-টীকা সহিতঃ"—ভারত শিরোমণির সংস্করণ। কলিকাতা বিদ্যারত্ন প্রেস, ১৮৬৩। এই গ্রন্থে অচ্যুতানন্দ চক্রবর্ত্তী ও রামভদ্রের টীকাও আছে।

৫। এই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণের শ্লোকদ্বয়ের আচার্য্যচূড়ামণি নিজেই গ্রন্থের উদ্দেশ্য সুন্দরভাবে বিবৃত করেছেন। হস্তলিখিত পুথি, এসিয়েটিক সোসাইটি—৩৬৯০।

ইতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীমচ্ছ্রীকরাত্মজ-শ্রীমচ্ছ্রীনাথাচার্য্য চূড়ামণি-কৃতঃ কৃত্য-তত্ত্বার্ণবঃ সমাপ্তঃ।

উপরে উদ্ধৃত প্রারম্ভিক ২ নং শ্লোক থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, এ গ্রন্থ "কৃত্য-কাল-বিনির্ণয়" নামেও তিনি অভিহিত করেছিলেন। কালক্রমে শ্রৌত ক্রিয়াকলাপের বিষয়ে যে সকল পরস্পর-বিরোধী মত পরিদৃষ্ট হয়, তা' দূর করাই আচার্য্য চূড়ামণির উদ্দেশ্য। এজন্য তিনি কেবল স্বদেশের পণ্ডিতগণের মত পর্য্যালোচনা করেন নি, সসম্মানে বিদেশীয়দের মতও তিনি বিশেষভাবে বিবেচনা করেছেন। তাই তাঁর বিশেষ কামনা—যেন গড্ডালিকা প্রবাহের দিকে ছুটে না গিয়ে পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁর এই বহু বিবেচনাপ্রসূত গ্রন্থের প্রতি যথোচিত আদর প্রদর্শন করেন।

এই গ্রন্থের শেষাংশে তিনি স্বীয় গ্রন্থ "বিবেকার্ণবে"র নাম উল্লেখ করেছেন। কাজেই কৃত্যতত্ত্বার্ণব গ্রন্থ "বিবেকার্ণব" গ্রন্থের পরবর্ত্তী রচনা, সন্দেহ নাই।

আচার্য্য চূড়ামণির এই আকৃতি—নিত্য-নৈমিত্তিক প্রভৃতি যে সকল বৈদিক ক্রিয়া এবং কালক্রমে উদ্ভূত সেই সকলের অঙ্গরূপ যে সকল ক্রিয়াকলাপ—সেই সকলের বৎসর, অয়ন, ঋতু মাস, পক্ষ, তিথি, নক্ষত্র প্রভৃতির বিবেচনায় নানারূপ বিচার অবশ্যম্ভাবী—সেই সব ক্ষেত্রে তিথি যে ব্যবস্থাবস্তু উপস্থাপিত করেছেন, তা' যেন বিবুধমণ্ডলীর প্রীতির কারণ হয়॥

(৩) শুদ্ধি-তত্ত্বার্ণব ৬

এই গ্রন্থের শেষে শ্রীনাথ বিনয় সহকারে বলেছেন,

শুদ্ধি-তত্ত্বার্ণবেঽস্মিন্ যা প্রমাদাদন্যথা লিপিঃ।
বিদ্বদ্ভিঃ শোধনীয়া সা গুণলেশানুসারতঃ॥

এই গ্রন্থে প্রাচীন সমূহ ব্যতীত নবীন নিবন্ধেরও উল্লেখ আছে, যেমন হস্তলিখিত পুঁথির ৪১থ পৃষ্ঠায় কামধেনু, কল্পতরু, মহার্ণব, হেমাদ্রি, মিতাক্ষরা, হারলতা, পারিজাত প্রভৃতি।

(৪) বিবাহ-তত্ত্বার্ণব।৭

এই গ্রন্থের প্রারম্ভিক শ্লোকেও স্মার্ত্ত নানামুনির মতের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনপূর্ব্বক বলেছেন,

প্রণম্য গোবিন্দ-পদারবিন্দং
বিচার্য্য নানামুনিবর্য্যবাচঃ।
আচার্য্য চূড়ামণিরেব যত্নাদ
বিবাদ-তত্ত্বার্ণবমাতনোতি॥

প্রথম তরঙ্গের শেষে এই তরঙ্গের নাম উল্লেখপূর্ব্বক তিনি বলেছেন,

ইতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীমচ্ছ্রীনাথাচার্য চূড়ামণি-বিরচিতে বিবাহ-তত্ত্বার্ণবে সম্বন্ধবিবেকঃ প্রথমস্তরঙ্গঃ।

এই গ্রন্থের প্রথমেই গার্হস্থ্যাশ্রমকেই শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলে ঘোষণা করে শ্রীনাথাচার্য্য চূড়ামণি বলেছেন যে, "সজাতিঃ শ্রেয়সী ভার্য্যা"—স্বজাতের ভার্য্যাই শ্রেয়ঃ। আশ্বলায়নের নাম উল্লেখপূর্ব্বক শ্রীনাথ বধূ আভ্যন্তরীণ লক্ষণ পরীক্ষার যে উপায় নির্ণয় করেছেন, তার কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্ভবপর কি না বিবেচ্য। তাঁর মতে আটটি বিভিন্ন স্থানের মাটি নিয়ে তা গোলাকার করে এক জায়গায় রাখতে হইবে, এবং বধূ তার থেকে মৃত্তিকা বেছে নেবেন। কোন্ মাটির কি ফল, আচার্য্য চূড়ামণি তা উল্লেখ করেছেন।

বধূর গুণাবলীও শ্রীনাথ সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। তার পরে নিষিদ্ধ গোত্র প্রভৃতির আলোচনা।

(৩) চন্দ্রিকা-গ্রন্থসমূহ

(ক) আচার-চন্দ্রিকা।৭
(খ) শ্রাদ্ধ-চন্দ্রিকা।৮
(গ) দান-চন্দ্রিকা।৯

(৪) দীপিকা-গ্রন্থ

(ক) গূঢ়-দীপিকা।১০
(খ) শ্রাদ্ধ-দীপিকা।১১

(৫) বিবেক-গ্রন্থ

(ক) দুর্গোৎসব-বিবেক।১২

---

(৬) এসিয়েটিক সোসাইটির হস্তলিখিত পুঁথি ৩৬৮৯।

(৭) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ১৪৮৪ নং পুঁথি।

(৭) ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, Cat. III, p. 524, Ms. No. 1648.

(৮) ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, No. 1734 & Brojendra Mitra, Notices, VIII, p. 270, Ms. No. 3683 of the Asiatic Society : H. P. Shastri, vol. III, p. 406.

(৯) কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ পুঁথি। (Vide 2nd vol. of Hrishikesh Shastri), 563, folls. 10-196, Incomplete.

ষোড়শদানাদি বিষয়ক এই নিবন্ধের প্রথমে আচার্য্য চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করেছেন—

শ্রীগোবিন্দপদদ্বন্দ্বং বন্দ্যমিন্দ্রাদিভিঃ সুরৈঃ।
বন্দে বৃন্দাবনেচরমিন্দিরানন্দকন্দুকম্।
শ্রীকরাচার্য্যপুত্রেণ শ্রীমচ্ছ্রীনাথশর্ম্মণা।
বিচার্য্য মৎস্যতন্ত্রাদি ক্রিয়তে দানচন্দ্রিকা।

(১০) কৃত্য-তত্ত্বার্ণবে উল্লিখিত। এই গ্রন্থের পুঁথি এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। "ইতি বিস্তরস্তু অস্মদীয়গূঢ়-দীপিকায়াং সিদ্ধান্তাদর্শে চানুসন্ধেয়ঃ।"

(১১) শুদ্ধি-তত্ত্বার্ণব এবং রঘুনন্দনের যজুঃ-শ্রাদ্ধ-তত্ত্বে উল্লিখিত।

(১২) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, Notices, তৃতীয় খণ্ড, ৯২ পৃঃ, ১৪৩ নং পুঁথি। সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থমালা, ১ম গ্রন্থ। কলিকাতা, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ (১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ)

(খ) প্রায়শ্চিত্ত-বিবেক।১৩

(গ) শুদ্ধি-বিবেক।১৪

প্রায়শ্চিত্ত-বিবেকের প্রারম্ভে আচার্য্য চূড়ামণি শ্রীরামচন্দ্রকে স্তুতি জ্ঞাপন করেছেন এবং প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ কথন থেকে আরম্ভ করে যাবতীয় প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে স্বকীয় মত জ্ঞাপন করেছেন। শুদ্ধি-বিবেকের প্রারম্ভেও শ্রীরামের স্তুতি।

শ্রীনাথের গ্রন্থ-গৌরব ও ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী স্মার্ত্তগণ।

উপরিলিখিত পাঁচ ভাগে বিভক্ত গ্রন্থসমূহে স্মৃতি-শাস্ত্রের বিভিন্ন দিক্ পর্য্যাপ্তভাবে পর্য্যালোচিত হয়েছে।

দায়ভাগ টিপ্পণ গ্রন্থে শ্রীনাথ "কুল্লূকমতমপাস্তম" করে কুল্লূকের মত নিরস্ত করেছেন। অন্য দিকে অচ্যুতানন্দ চক্রবর্ত্তী স্বকীয় দায়ভাগ-সিদ্ধান্ত-কুমুদ-চন্দ্রিকা শ্রীনাথের এই টিপ্পণের কটু সমালোচনা করেছেন। এই সকল বিভিন্ন মত গ্রন্থের গুরুত্ব প্রতিপাদনের দিক থেকে একান্ত উপাদেয়। অন্যদিকে কুল্লূকভট্টের সময় নির্দ্দেশের দিক থেকেও এটা সত্য হয়ে দাঁড়াল কুল্লূক শ্রীনাথের পরবর্ত্তী নন।

এই দায়ভাগ-টিপ্পণে শ্রীনাথ ধর্ম্মেশ্বরের মত চারবার, নারায়ণোপাধ্যায়ের মত পাঁচবার, মদনপারিজাত তিনবার এবং বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ের নাম তিনবার উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থে স্বকীয় সার মঞ্জরীর নামও তিনবার উল্লেখ করেছেন।

কৃত্য-তত্ত্বার্ণব গ্রন্থে শ্রীনাথ ভবদেব, লক্ষ্মীধর ও শঙ্খধরের নাম উল্লেখ করেছেন।

কৃত্য-তত্ত্বার্ণবের এক স্থানে উল্লিখিত হয়েছে যে দানসাগর বল্লাল-সেন কর্ত্তৃক ১০৯১ শকে রচিত হয়।১৫

(২) শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণির বংশগৌরব

(ক) পিতা শ্রীকর আচার্য্য

শ্রীনাথ স্বকীয় শ্রাদ্ধবিবেক-টীকায় স্পষ্ট বলেছেন যে, তিনি তাঁর পিতার উপদেশ অনুসারেই এ গ্রন্থ রচনা করেছেন।১৬

(খ) শ্রীনাথপুত্র রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য।

(১) দায়ভাগ টীকা—দায়ভাগ-বিবৃতি বা দায়ভাগ-দীপিকা।১৭

গ্রন্থের প্রারম্ভে রামভদ্র বলেছেন যে, তাঁর পিতার গ্রন্থ আলোচনাপূর্ব্বক দায়ভাগের এই বিবৃতি তিনি লিখছেন—

আলোচ্য তাতনির্ম্মিতনিবন্ধমারাধ্য বিশ্বেশ্বরম্।
অর্থাচার্য্যস্তুতে বিবৃতিমিমাং দায়ভাগস্য॥

গ্রন্থের শেষ কবিতায় লেখকের অহঙ্কার প্রকাশ পেলেও গ্রন্থকারের উক্তি সর্ব্বাংশে সত্য—

শ্রীরামভদ্র-রচিতং পাণৌ সংস্থাপ্য দীপিকামেতাম।
জীমূতবাহনকৃতের্গভীরার্থং বিদন্তু বিদ্বাংসঃ॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-শ্রীনাথাচার্য্য-চূড়ামণিতনুজ-শ্রীরামভদ্র-ন্যায়ালঙ্কার-ভট্টাচার্য্য-বিরচিতা দায়ভাগ-টীকা সমাপ্তা॥

এ গ্রন্থ পাঠে এটি সুস্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে, পিতার দায়ভাগ-টীকার বিরুদ্ধে যাঁরা মত প্রকাশ করেছিলেন, তাঁদের মত নিরস্ত বা অপাস্ত করবার জন্যই রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য লেখনী ধারণ করেছিলেন। যেমন—দায়ভাগের ১·৫৫ (পৃঃ ৮৯)র অচ্যুত চূড়ামণির মতের সমালোচনাপূর্ব্বক বলছেন—"কিঞ্চেতি চূড়ামণিস্তদসৎ।" তার পুনঃ সমালোচনাপূর্ব্বক রামভদ্র বলছেন, "তস্য দাস্যমিত্যস্যাভাবং বিবেচিতং নাম সাম্যেন জীমূতবাহনমতং ন দূষিতং তাতপাদেন।" এই গ্রন্থের সর্ব্বত্রই "গুরবঃ" পদের দ্বারা তাঁর পিতৃদেবের উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর মত উদ্ধৃত করে—অন্যদের মত উল্লেখপূর্ব্বক পিতার বিরুদ্ধমত খণ্ডন করেছেন।

(২) স্মৃতি-তত্ত্ব-বিনির্ণয় বা ব্যবস্থাসংগ্রহ।১৮ তিথি, দান, শ্রাদ্ধ, প্রায়শ্চিত্ত, শুদ্ধি, উদ্বাহ, প্রভৃতি বিষয়ে বিবিধ মত-বিচার। এই গ্রন্থের শেষভাগে পুষ্পিকায় তিনি নিজকে "নবদ্বীপবাসী" বলে ঘোষণা করেছেন।

রামভদ্রের দ্বিতীয় পুত্র রামেশ্বর তন্ত্র-প্রমোদ(১৯) এবং ষষ্ঠ পুত্র রঘুমণি আগম-সার(২০) নামক তন্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থদ্বয় রচনা

---

(১৩) Mitra, Notices, VIII 272, No. 2830.
প্রণম্য কামদং রামং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহম।
প্রায়শ্চিত্ত-বিবেকোঽয়ং শ্রীনাথেন বিতন্যতে।
ইতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীকরাচার্য্য-সূনু—
শ্রীনাথাচার্য্য-বিরচিত প্রায়শ্চিত্ত-বিবেকঃ সমাপ্তঃ॥

(১৪) Do, Do, 273, No. 2831.
এই গ্রন্থে অশৌচপদার্থ-বিবেচন থেকে আরম্ভ করে আচার্য্য চূড়ামণি অশৌচ বিষয়ে বহু বিষয় আলোচনা করেছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভঃ—
প্রণম্য সচ্চিদানন্দং বাগীশং জগতাং প্রভুম।
শ্রীরামং কমলাকান্তং পরমাত্মানমীশ্বরম।
শ্রীকরাচার্য্যপুত্রেণ শ্রীনাথেন সতাং মুদে।
বিবেকঃ শুদ্ধিবিষয়ে ক্রিয়তে পরমাদরাৎ॥

(১৫) As. Soc. Ms. Fol. 45, তদুক্তং নিখিলনৃপচক্রতিলক-শ্রীমদ বল্লালসেনদেবেন পূর্ণে শশিনবদশমিতে শকবর্ষে ১০৯১ দানসাগরো রচিতঃ।

(১৬) কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ পুঁথি, vol. II, No. 433—
ব্যবস্থাদ্বৈধসংভ্রান্তি-সন্তাচ্ছেদহেতবে।
বিবুধশ্রেণিবন্দ্যায় নমঃ শ্রীশূলপাণয়ে।
শ্রীকরাচার্য্যপুত্রেণ শ্রীমচ্ছ্রীনাথশর্ম্মণা।
ব্যাখ্যা শ্রাদ্ধবিবেকস্য জনকোক্ত্যা নিবধ্যতে।

(১৭) ভরত শিরোমণির সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

(১৮) ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী (৩,৪৮৫-৮৬), পুঁথি নং ১৫৬৭-১৫৬৯

করেন। এই আগম গ্রন্থদ্বয়ের প্রারম্ভে পুত্রেরা সুপণ্ডিত পিতার প্রতি অশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্ব্বক পিতার স্তুতি করেছেন।

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করলে সুস্পষ্ট প্রতীতি হবে যে, জীমূতবাহনের "দায়-ভাগ"কে জনপ্রিয় করার জন্য এই পরিবার যে রকম প্রযত্ন করেছেন, বঙ্গদেশের আর কোনও পরিবার তা করেন নি। তদুপরি, এঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যদের মধ্যে পুনরায় রঘুনন্দনের মত বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রতিভাবান্ পণ্ডিতাগ্রগণ্যেরাও ছিলেন বলে দায়ভাগের মর্য্যাদা বঙ্গদেশে চিরকাল অক্ষুণ্ণ হয়ে রয়েছে।

রামভদ্র, খুব সম্ভবতঃ, রঘুনন্দনের থেকে বয়সে ছোট ছিলেন। স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন রামভদ্রের নামোল্লেখ কোনও স্থানে করেন নি। রঘুনন্দন শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সমসাময়িক—খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে তিনি নবদ্বীপে পণ্ডিতকুলশিরোমণিরূপে শোভা পাচ্ছিলেন। রামভদ্র খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নিশ্চয় স্বকীয় গ্রন্থাদি বিরচণ করেছিলেন।

(৩) আচার্য্য চূড়ামণির সমাজ-হিতৈষণা।

বাঁকুড়া জেলার স্মার্ত্তশিরোমণি গোবিন্দানন্দ কবিকঙ্কণ ভট্টাচার্য্য স্বীয় বর্ষকৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থে স্বীয় মতের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে স্বতঃপ্রচেষ্ট ছিলেন। আচার্য্য চূড়ামণি তাঁর পূর্ববর্তী বঙ্গীয় সুরিগণের মত সংরক্ষণপূর্ব্বকই নিজের প্রভাব বিস্তার করেছিলেন সমগ্র সমাজে। রঘুনন্দন বহুল স্থানে স্বীয় গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থসমূহে কৃত্য-তত্ত্বার্ণব থেকে আটবার[২১] স্বীয় গুরুর মত উদ্ধৃত করেছেন। এ ভাবে শুদ্ধি-তত্ত্বার্ণব এবং তত্ত্বার্ণব থেকেও এক একবার স্বীয় গুরুর মত স্বীয় শুদ্ধি-তত্ত্বে[২২] এবং উদ্বাহ-তত্ত্বে[২৩] উদ্ধৃত করেছেন। এ ভাবে 'গুরুচরণাঃ' বলে অষ্টবিংশতি-তত্ত্বের দ্বাদশ স্থানে[২৪] 'ভট্টাচার্য্য চরণাঃ' বলে একবার[২৫] এবং 'আচার্য্য চূড়ামণি' বলে দুবার[২৬] স্বীয় গুরুর মত সমুদ্ধৃত করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন।

কিন্তু স্বীয় সময়ের কাঠিন্যের জন্যই হোক্ বা অন্য কোনও কারণেই হোক্—তিনি শুদ্ধি-তত্ত্বে তৎসময় থেকে আর ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ব্যতিরিক্ত কোনও বর্ণ বঙ্গদেশে থাকবে না বলেছেন, নারীদের সামাজিক ব্যবস্থাপনায় তাঁদের প্রতি তুলনামূলকভাবে অধিকতর ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেছেন। কালের প্রভাব অবশ্য স্বীকার করে নিলেও রঘুনন্দন এ সবকিছুর ঊর্দ্ধে উঠেছেন—দেখতে পেলে আমাদের চিত্ত হৃষ্টতর হ'ত।

আনন্দের বিষয়—রঘুনন্দনের গুরুদেব শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণি সামাজিক ব্যবস্থাপনায় কঠোর ন্যায় ও উচ্চতম আদর্শ সর্ব্বদা অনুসরণ করেছেন। এ বিষয়ে ব্যাপকতর বিশ্লেষণ আমরা বারান্তরে করব।

---

(১৯) (২০) রাজেন্দ্রলাল মিত্র, Notices, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৩৯ ও ১৪১ (নং ২৬০ ও ২৬৩)।

(২১) জীবানন্দ সংস্করণ, তিথি-তত্ত্ব, পৃঃ ৮৬, কৃত্যতত্ত্বার্ণবে রাজমার্ত্তণ্ডঃ, ইত্যাদি, ঐ পৃঃ ১৬১ 'মেঘমালা···স্নানপূর্ব্বকম্' ইতি কৃত্য-তত্ত্বার্ণব—ধৃত-বচনাৎ। আহ্নিকতত্ত্ব, পৃঃ ৩৫৭, যেন বাসসা স্নানং কৃতং জলস্থস্তু তেনৈব তর্পণম্' ইতি কৃত্য-তত্ত্বার্ণবঃ। প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্ব, পৃঃ ৪৯৮, ত্র্যাহ্নিকমজোযোগস্ত নীরাজনার্থং··· ইতি কৃত্য-তত্ত্বার্ণবঃ। পৃঃ ৫০৯, কৃত্য-তত্ত্বার্ণবেঽপি স্কন্দপুরাণম্। মলমাস-তত্ত্ব, পৃঃ ৮১৩। উদ্বাহ-তত্ত্ব, পৃঃ ১৩২। শুদ্ধি-তত্ত্ব, পৃঃ ২৩৬।

(২২) শুদ্ধি-তত্ত্ব, পৃঃ ২৫৭ (২৩) উদ্বাহ-তত্ত্ব, পৃঃ ১১৭ 'আসপ্তমাৎ পিতৃমাতৃত' ইতি নারদবচনে···বিবক্ষিতত্বাৎ এবমেব বিবাহ-তত্ত্বার্ণবঃ।

(২৪) তিথি-তত্ত্ব, পৃঃ ৩১, ৮৫, ১৫০; মলমাস-তত্ত্ব, পৃঃ ৭৬৯-৭০, ৮১৫, সংস্কার-তত্ত্ব, ৮৭৩, একাদশী-তত্ত্ব, পৃঃ ৫, ১০৩, শুদ্ধি-তত্ত্ব, পৃঃ ৪০১, যজুর্ব্বেদি শ্রাদ্ধ-তত্ত্ব, পৃঃ ৪৯৩, (এবং শ্রাদ্ধ-চন্দ্রিকায়াং গুরুচরণাঃ); পৃঃ ৫০০, ছন্দোগ-বৃষোৎসর্গ-তত্ত্ব পৃঃ ৫৪৭

(২৫) শুদ্ধি-তত্ত্ব, পৃঃ ৩৩৬।

(২৬) যজুর্ব্বেদি-শ্রাদ্ধ-তত্ত্ব, পৃঃ ৪৮৮ এবং যজুর্ব্বেদি বৃষোৎসর্গতত্ত্ব; পৃঃ ৬৪০।



প্রতীক্ষা

শ্রীআশিস গুপ্ত

আমি সাড়া পাচ্ছি
আমি অনুভব করতে পারছি
তোমাকে।
হয়তো সেই তোমাকে
যাকে জেনেছিলাম আমার শৈশবে,
আনন্দিত অজ্ঞান বর্ণময় দিনগুলিতে।
হয়তো সেই তুমি
এতদিন হারিয়েছিলে আমার সচেতন বয়স্কতায়।

তবু আজ নিশ্চিত মনে হ'ল
তুমি আছ,
যদিও তোমায় আজ আর আমার মনে নেই।
তুমি আছ,
এই অসংখ্য জনতার মাঝখানে
আমার বিশিষ্ট একজন।
সেই তোমাকে
তোমার রয়ে যাবার সত্তাকে
সেই বিশিষ্ট তোমাকে
আমি আবার জেনেছি।

তোমাকে জেনেছি অন্তরের অন্তরলোকে
কঠিনতম আবেগে।
যে আবেগ
জীবনযুদ্ধে আমার অস্ত্র।
যে আবেগ পাশুপত অস্ত্রের মত
আমার জীবনের সমস্ত দৈন্য
সব গ্লানি বেঁধে দেবে
মন্ত্রের বাঁধনে।

তোমাকে দেখিনি
তোমাকে পেয়েছি তবু।
তোমাকে পেয়েছি
স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল, বিষুব সূর্য্যের মত।
তোমার দহনে আমি দীর্ণ শুষ্ক
আমি ঊষর।

হে আমার সূর্য্য!
উদয় শিখরে আর একবার তুমি
অবস্থান কর,
স্বর্ণময়তার উজ্জ্বল ভাস্বরতায়
তোমাকে একবার দেখবো,
বিচিত্র অপরূপ বর্ণময় তোমাকে
নিরুপম অনুপম তোমাকে
আর একবার দেখবো।

হে সূর্য্য!
বর্ণময় তুমি সুন্দর।
বর্ণহীন তুমি কঠোর রুক্ষ।
উদয়াচলে তুমি ছিলে বর্ণময়।
তোমার রঙ, আমায় মনকে রাঙিয়েছিল
কোনদিন।
আর আজ আমাকে রুক্ষ কঠোর
সন্ন্যাসী করেছে
স্বচ্ছ করেছে আমার মন।
আলো ছাড়া সামান্য বস্তুকণাও
অস্বচ্ছতার সৃষ্টি করে।
কিন্তু রঙ তোমার
রাঙিয়ে দেবে আমার মনকে!

হে মধ্যাহ্ন তপন
জানি আমি
আর ত কখনো ফিরবে না তুমি
পূর্ব্ব তীরে;
যেমন আমি আর
সেই ছোট অবুঝ আমি হয়ে
নিতে পারবো না জন্ম!

তাই,
অপেক্ষায় আছি
ধূসর তপ্ত বালুময়
মরু ঝড় বুকে নিয়ে।
সুদূর অস্তাচলের পানে
যখন তুমি আবার হবে বর্ণময়
শীতার্ত মরুরাত্রি আসবার আগে
আর একবার আমার স্বচ্ছ মন
সপ্তবর্ণে রামধনু রাঙা হয়ে উঠবে।



পূজোর আনন্দ সারা কলকাতায় ছড়িয়ে পড়েছে। নিয়ন-বাতির রঙীন আলোয় ঝলসে উঠছে রঙবেরঙের শাড়ী; আর মাইকের মুখে ঝরে পড়ছে অজস্র সুরস্রোত। রঙ দেখে চোখে ঘোর লাগছে দর্শকদের; আর হাসির উচ্ছলতায় স্পন্দিত হয়ে উঠছে মাটির কোল-ঘেঁষা ধূসর আকাশ।

কিন্তু আনন্দময়ীর আগমন সত্ত্বেও কোথাও যে বঞ্চনার করুণ সুর শোনা যায় না, তা নয়। বরং বঞ্চনাকে ভুলতে হলে অপরের সাফল্যের আনন্দে মেতে উঠতে হয়। আর সেই সবচেয়ে সহজ পন্থাটুকু অবলম্বন করতে হয় অধিকাংশকেই। অতএব নতুন শাড়ী পরণে না থাকলেও দলে দলে মেয়েরা বেরিয়ে আসে ঘরের বাইরে, পকেট মরুভূমি হলেও পূজামণ্ডপে ভিড় করতে সঙ্কোচ করে না কোনও পাড়ার ছেলেরা। তাই কলকাতার পথে জনতার কোলাহল এতদিনের রুদ্ধ মনের আত্মপ্রকাশের বন্যাস্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে চলল সবাইকে। মেতে উঠল আবালবৃদ্ধ-বনিতা। ঘুচে গেল প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণতা। হিন্দুপূজার প্রতিমা দেখতে ভিড় করে এল কত বিধর্মী। অকালবোধন কালাতীত কলকাকলীতে ভরপুর হয়ে ওঠে; সকলের মধ্যে সঞ্চার করে দেয় শীতোত্তরের সজীবতা হেমন্তের আগেই। মধুমাসের মাদকতা শরতের হাল্কা মনে এনে দেয় অপার্থিব পুলক, অনির্বচনীয় আবেগ।

তবু আনন্দের প্রকাশ বিচিত্র বসুমতী ধারায়। তাই বিভিন্ন মনে আপন আপন ভঙ্গিতে যে আনন্দের পরিকল্পনা রূপায়িত হয়ে ওঠার চেষ্টা করে, অনেক ক্ষেত্রেই বিবাদের সঙ্ঘাতে তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, বিনষ্ট হয় অঙ্কুরেই।

শুক্তির বেলায় ঘটল ঠিক তাই।

সবে সে সেজেগুজে বন্ধুর সঙ্গে ঠাকুর দেখতে বেরুনোর উদ্‌যোগ করছে। এমন সময়ে বকুনি খেতে হ'ল বাপের কাছে। আর তাও কিনা সেই বন্ধুর সামনেই।

দোষ তার খুবই সামান্য। কলাবৌ গঙ্গায় যখন ডুব দিয়ে এল, তখন পুরুতঠাকুরকে ঘিরে যে সব তরুণ-তরুণীরা নানারকম মন্তব্য করছিল, সেও ছিল তাদের একজন।

প্রশ্নগুলো মোটেই জটিল নয়।

—কবার ডুব দিলে গঙ্গায় কলাবৌ, ঠাকুরমশায়?

—ষাঁড় তাড়া করে নি ত গণেশদার সতীলক্ষ্মী বৌকে?

—ডুবে যেত যদি! গণেশদার অমন মানানসই বৌদি!

শুক্তি শুধু বলেছিল, কি ফাঁড়াটাই আজ গেল গণেশ-বৌদির!

কৌতুকদীপ্ত সঙ্গিনীদের মুখের দিকে একপলক তাকিয়ে আবার বলেছিল, বেচারা গণেশদা অত বড় ভুঁড়ি নিয়ে কি আর জলেডুবন্ত বৌকে বাঁচাতে পারত? শুধু শুঁড় দিয়ে ভুঁড়ি থাপড়িয়ে হাউ হাউ করে কাঁদত। কি করুণ পরিস্থিতি—ভাবতেও গা শিউরে ওঠে।

সারা দেহটা দুলিয়ে তাড়াতাড়ি আঁচলটা টেনে দিয়েছিল পিঠের উপর। আর হাসিতে মুখর হয়ে উঠল সারা আঙিনা।

কিন্তু চটে উঠেছিলেন ঠাকুরমশাই।

—ঠাকুরদেবতা নিয়ে যত সব ইয়ার্কি! তোমাদের এখানে মোড়লি করতে কে বলেছে শুনি? যাও, যাও

এখান থেকে, সরে যাও। এটা পূজামণ্ডপ, ঢলাঢলির জায়গা নয়।

জ্বলন্ত চোখে শুক্তির দিকে তাকিয়েছিলেন তিনি। কারণ, ঠিক তার পেছনেই দাঁড়িয়েছিল সুকোমল। ছেলেটি বাঁশী বাজায় ভাল। সন্ধ্যার মজলিশে সকলের মনোরঞ্জন করার গুরুদায়িত্ব নিতে হয়েছে তাকে। ভিন্ন পাড়ার ছেলে হলেও ওকে যোগাযোগ করে আনার ব্যাপারে আগ্রহটা অবশ্য শুক্তিরই। শুক্তির আগ্রহ যে বিষয়ে সেটা করা যে হবেই এ ত জানা কথা। কারণ ওর মত কথায় আর কাজে চটপটে, রূপে আর সাজে ফিটফাট এই শহরতলীতে আর দ্বিতীয় কোন মেয়ে আছে কি ?

ঠাকুরমশায়ের কটাক্ষ তাই নেত্রীর পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব হ'ল না।

—চলে যাও মানে ? আপনি কি যা-তা বলছেন ঠাকুরমশাই ? আমরা এখানে কি করতে এসেছি জানেন ?

রাগে আর জিজ্ঞাসায় পুরুতঠাকুরের কপাল ভ্রূকুটি কুটিল হয়ে উঠল।

—আপনি ত কলাবৌকে নাইয়ে নিয়ে এলেন। কিন্তু এখন ওকে দাঁড় করাবেন কোথায় ?

—কেন, গণেশঠাকুরের পাশে ?

ঠোঁট উলটে জবাব দিলেন পুরুতঠাকুর।

—আহা, তাতো বটেই ! কিন্তু কি ভঙ্গিমায় দাঁড়াবেন সেটা ত ঠিক করতে হবে আমাদের। সব জিনিসটা যাতে দেখতে বেশ সুন্দর হয়—

শুক্তির মুখের কথা শেষ হ'ল না। খেঁকিয়ে উঠলেন পুরুতঠাকুর।

—থাম। কলাবৌ তোমাদের আধুনিকা নায়িকা নয়। তাকে কি তোমাদের মত ঠোঁটে-গালে রঙ মেখে গণেশের মন ভোলাতে হবে ? যাও, যাও। এখানে জ্যেঠামো করতে হবে না।

ধমক খেয়ে কিন্তু মোটেই ঘাবড়ে গেল না শুক্তি। চোখ দুটো বাঁকিয়ে টেনে টেনে বলল, ঠোঁটে-গালে কলাবৌ বেচারা কিই বা আর রঙবে ? সে অবস্থা কি আর আপনারা রেখেছেন ? তবে গতবার যে হাঁটুর ওপর একখানা গামছার মত শাড়ী পরিয়ে রেখেছিলেন, এটা কি ভাল করেছিলেন ? যদি গণেশদা ডাইভোর্স করে দিত ? হিন্দু-কোডবিল পাশ হয়েছে সে ত উনি জানেন।

লহর তুলে সবাই হাসল। রাগে, অপমানে ঠাকুরমশাইয়ের মুখে আর কথা সরে নি। তাই বুঝি শুক্তির বাপের সঙ্গে পথে দেখা হওয়াতে নিজের রুদ্ধমনের অগ্নি-উদ্গীরণ আর সামলাতে পারেন নি।

আদিনাথবাবু আধুনিকতার সব কিছু পছন্দ করেন না। প্রতিবেশীর মুখে নিজের মেয়ের নিন্দা বা বক্রোক্তি প্রসন্নমনে নিতে পারেন নি। তাই বাড়ীতে পা দিয়েই শুক্তির সাজসজ্জা দেখে আর স্থির থাকতে পারলেন না।

—চললি কোথায় ? গণেশবৌদিকে সিনেমার নায়িকা সাজাতে ?

মুখরা শুক্তি বাপের কাছে একেবারে মূক। সবই জেনে ফেলেছেন আদিনাথ। পরিস্থিতি লঘু করবার চেষ্টা করল শুক্তি-সঙ্গিনী।

—পুরুতকাকা বড্ড শুচিবেয়ে লোক, মেশোমশাই, ও ত সত্যি সত্যি ঠাকুরদেবতা নিয়ে কিছু বলে নি। শুধু ওঁকে চটিয়ে দিয়ে মজা দেখছিল।

—কেন ? মজা করবার আর কিছু ছিল না ? অমন মজা করা কেন ?

এবার শুক্তি প্রয়োগ করল তার অব্যর্থ অস্ত্র। কাঁদ কাঁদ গলায় জানায়, পূজার দিনে মনের রাশ আলগা হলে একটু-আধটু বেফাঁস কথা বেরুবেই। তা নিয়ে যদি আজও তোমাদের কাছে বকুনী খেতে হয়—

ইচ্ছে করেই বক্তব্য শেষ করল না শুক্তি। কিন্তু অস্ত্র ওর সফল হ'ল। মুহূর্তে ভিজে গেলেন আদিনাথবাবু।

—পুজোর দিনে ফুর্তি করবে নিশ্চয়ই। তবে গুরু-লঘু জ্ঞান রেখে। আমরা যে কত কাণ্ড করতাম !

অতীত-স্মৃতি রোমন্থন করতে লাগলেন আদিনাথবাবু। আর এই সুযোগে কেটে পড়বার তাল করল শুক্তি।

আমরা একটু ঠাকুর দেখতে যাচ্ছি বাবা। শুনেছি ফায়ারব্রিগেডের ঠাকুর খুব চমৎকার হয়েছে।

—সে কিরে ? অতদূরে যাবি ? সঙ্গে যাবে কে ? ফিরবি কখন ?

এক সঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন করলেন আদিনাথ।

—আমরা এক সঙ্গে মস্ত একটা দল যাচ্ছি। মনে হচ্ছে আধখানা বাস আমরাই রিজার্ভ করব। তুমি কিছু ভেবনা বাবা।

আদিনাথ কিন্তু শুক্তির আশ্বাসের ধার দিয়েও গেলেন না। অপ্রসন্ন সুরে আগের প্রশ্নগুলোর জের টেনেই বললেন, তা ছাড়া নিজেদের পুজো ছেড়ে অন্য জায়গাতে তোরা যাসই বা কেমন করে ?

—পুজো ত হচ্ছেই। কিন্তু চাঁদা যে ঠিকমত ওঠে নি। তাই মনের মত ঠাকুর আনা যায় নি। সে জন্যেই ত পল্টুদারা মুষড়ে পড়েছে। অন্য পাড়া থেকে এখানে কি আর কেউ ঠাকুর দেখতে আসবে ? বরং আমাদেরই ছুটতে হচ্ছে অন্য পাড়ায় ঠাকুর দেখতে।

—কি বললি ?

ধারাল ধমক শোনা গেল আদিনাথের গলায়। বিকৃত রে বিদ্রূপ ঝরে পড়ল, 'মনের-মত-ঠাকুর' ? পুজোটাকে তোরা ফুটবল খেলা পেয়েছিস ? এবারে ভাল টিম হয় । অতএব সামনের বার তার শোধ মেটাতে হবে—এই নোভাব নিয়ে তোরা বন্দনা করবি মা দুগ্‌গার ? ছি ছি ছি !

শুক্তি এণ্ড কোং-র অবস্থা করুণ। ন-যযৌ ন-তস্থৌ। ার আদিনাথ রাগে কথা হারিয়ে ফেলেছেন।

ঠিক এমনি সময়ে ভবানী ঘরের ভেতর থেকে বারান্দায় সে দাঁড়ালেন। পরনে লালপাড় গরদের শাড়ী। হাতে জোর নৈবেদ্য। স্নিগ্ধগলায় বললেন, আরতির ভোগ নিয়ে চ্ছি। শুক্তি, তুই কি আমার সঙ্গে আসবি ?

মেয়ের মৌনতাকে অসম্মতির লক্ষণ বুঝে বললেন, নিমাদের সঙ্গে যাচ্ছিস বুঝি ? বেশী দেরী করিস নি কিন্তু।

—চমৎকার ! নিজেদের পূজা ছেড়ে বে-পাড়ায় ড্যাং ড্যাং করে নেচে বেড়ানো। এর নাম পুজো ? আমাদের ছোটবেলায় আমরা ঠাকুরমণ্ডপ থেকে এক পা নড়তাম না কটা দিন। দশমীর দিনে সুন্দরীর খালে ঠাকুর বিসর্জন য়ে মণ্ডপ থেকে শান্তিজল নিয়ে তবে ফিরতাম। ফিরে সে কোলাকুলির পালা সারতেই কাটত একটা পুরো প্তাহ। এই হ'ল পুজো।

আর একটু গলা চড়ালেন।

—আর তোরা ? পুজার সঙ্গে সম্পর্ক নেই, শুধু কিবাজি। মার সঙ্গে আরতির ভোগ না নিয়ে গিয়ে ঠাকুর দেখে বেড়ানো। কি দরকার ? কোনটা আগে ? পুজো ত নয়, ভক্তি ত নেই, শুধু ঠাকুরদের নিয়ে মিস ইণ্ডিয়া কম্পিটিশন বানানো ?

মেয়েকে বকুনী খেতে দেখে মনে মনে অসন্তুষ্ট হচ্ছিলেন ভবানী। বকতেও পারে লোকটা। অনর্গল, একবার সুরু হলে আর থামতেই চায় না।

—আহা ভোগ নিয়ে যে আমি যাচ্ছি। ওর তাই যাওয়ার দরকার কি ? যত আজেবাজে বকতেও পার তুমি।

—আজেবাজে বকছি ? তার মানে তুমি ধরতে পার না। তা পারবে কি করে ? তুমি ত আবার কিছু খোঁজ রাখ না। আজকাল যে রূপসীদের রূপ ওজন করা হয়, কারটা কত বেশী তা মাপা হয়, সেটা জান কি ?

—যত বয়স বাড়ছে—

রাগে, লজ্জায় ভবানীর আর বাকস্ফূর্তি হ'ল না। আড়-চোখে দেখলেন শুক্তি-তনিমার ঠোঁটে চাপা হাসি। আদি-নাথ কিন্তু থামবার পাত্র নন।

—তেমনি মা-দুগ্‌গার যত প্রতিমা হয়েছে, তাদের মধ্যেও একটা কম্পিটিশন লাগানো হবে, কোন্ প্রতিমা সবচেয়ে ভাল হয়েছে—অধঃপতনের আর বাকি কোথায় ?

এবার আর ভবানী সামলাতে পারলেন না। চাপা-গলায় আগুন ঝরিয়ে বললেন, পুজোর দিনে মেয়েটাকে ত নাহক্ নাকাল করছ—ওদিকে যে গুণধর ভাগ্নে সমস্ত দিন বাড়ীতে পা দেয় নি, সে বেলায় বুঝি কোন দোষ নেই ?

—কে, উদয়ন ? কি হয়েছে তার ?

—বড়দা ত জলসার গেটে বই বিক্রি করছে।

আস্তে আস্তে অথচ বেশ জোরগলায় বলল, শুক্তি।

—সেটাই বা এমন কি পুজোর অঙ্গ শুনি ? ওরা ত তবু ঠাকুর দেখতে যাচ্ছে, ও যে প্রতিমার ছায়াও মাড়ায় না, সেটা বুঝি কিছু নয় ?

মুখে কথা সরলো না আদিনাথের। দুর্বল জায়গায় আঘাত করেছেন ভবানী। শুধু আজ নয়। বহুদিন, বহুবার। বার বার ঘা খেয়ে খেয়ে গা-সওয়া হয়ে গেছে প্রায়। বাপ-মরা ছেলেটাকে নিয়ে তাঁর বিধবা দিদি যেদিন এসে দাঁড়িয়ে-ছিলেন তাঁর কাছে, সেদিন থেকেই কি অসীম স্নেহে বুকে তুলে নিয়েছিলেন উদয়নকে। তারই অন্নে প্রতিপালিত হয়ে আজ সে বড় হয়ে উঠেছে, কিন্তু মতবাদের দিক থেকে যেন কোথায় একটা ব্যবধান গড়ে উঠেছে দু'জনের মধ্যে। মার্চেন্ট আপিসের বড়বাবু আদিনাথ তাঁর সংস্কার-জীর্ণ মন নিয়ে বুঝতে পারেন না, কিসের মোহে উদয়ন তাঁদের সেই অতীতের ভিৎটাকে গুঁড়িয়ে ফেলতে চায়। মাঝে মাঝে দুর্বল প্রতিবাদ যে করেন নি তা নয়। কিন্তু নীরব উদয়নের দুর্ভেদ্য বিশ্বাসে ফাটল ধরাতে পারেন নি এক চুলও। তবু তাঁর স্নেহ এক ফোঁটা কমে নি। ওর উপর ভরসাও যেন বেড়ে গিয়েছে দিনের পর দিন। আর সে কথা জানেন ভবানী ভাল করেই।

আদিনাথের স্তব্ধ-বিষণ্ণ মূর্তি দেখে শুক্তি ও তনিমা সুযোগ বুঝে দৌড় মারল। আর ভক্তিবিনম্র হৃদয়ে ধীর পায়ে ওদের অনুসরণ করলেন ভবানী।

গলি থেকে বেরিয়েই চোখে পড়ে পুজামণ্ডপ। কিন্তু সেদিকে নয়, শুক্তিদের লক্ষ্য তার উল্‌টো দিকে, রাস্তার উপরে। সেখানে ফুটবল গ্রাউণ্ডে জলসার আয়োজন হচ্ছে। মাঠের সবুজ ঢেকে দিয়েছে শতরঞ্জ, আর খোলা আকাশকে সীমায়িত করেছে ত্রিপলের ঘেরাটোপ।

মাঝখানে গেট। তারই এক পাশে বুকষ্টল। চৌকির ওপর সাজানো বইয়ের সারি। তারই একটার ওপর ঝুঁকে পড়েছে উদয়ন। মাথার চুল উস্‌কোখুস্‌কো, একটা গেরুয়া-খদ্দরের পাঞ্জাবী গায়ে।

—আচ্ছা বড়দা, তুমি কি? পেটের মধ্যে কি উটের মত একটা থলি রেখেছ?

চমকে শুক্তির দিকে চোখ তুলল উদয়ন। খোঁচা খোঁচা দাড়ির ফাঁকে প্রসন্ন হাসি ঝরে পড়ল। স্বপ্নাতুর চোখে কৌতুক ঝিকমিক্‌ করে উঠল।

—কি সর্বনাশ! হিঁদুর ঘরের ছেলে আমি, আজ যে আমার উপোস।

—তাই বুঝি মুরগীর ডিম আর চায়ের শ্রাদ্ধ করা হচ্ছে? টেবিলের তলায় আঙুল দিয়ে উচ্ছিষ্টগুলোকে দেখিয়ে দিল শুক্তি। আর মুখে আঁচলচাপা দিয়ে খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে উঠল।

হাসল উদয়নও। ধরা পড়ে যাওয়ায় অপ্রতিভ, কিন্তু স্নেহ-কোমল হাসি। লম্বা রুক্ষ চুলগুলোকে কাঠির মত আঙুল দিয়ে পিছনের দিকে ঠেলে দিল। তার পর আচমকা কি মনে পড়াতে জিজ্ঞেস করল, তোরা যাচ্ছিস্‌ কোথায় বলত?

—ঠাকুর দেখতে, ফায়ারব্রিগেডটা দেখা হয় নি।

—আরে সে ত সাতদিন রয়েছে। পরে গেলেও ক্ষতি নেই। তুই একবার পল্টুর ওখানে যা দিকি। নতুন কতকগুলো ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্টের ওপর লিটারেচার এসেছে, সেগুলো এক্ষুণি পাঠিয়ে দিতে বলবি। লোকজন ত আর একটু পরে এসে হাজির হবে।

মুখ শুকিয়ে গেল শুক্তির। পল্টুর বাড়ীতে যেতে হলে আবার ওদের বাড়ী ঘুরে যেতে হবে এবং এবার আর বাবাকে এড়ানো যাবে না। ওদিকে বাস ষ্টপেজে সুকোমল এতক্ষণ নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে। সব মাটি।

কি বলবে ভেবে না পেয়ে শুধু আমতা আমতা কথা শোনা গেল, এখন কি পল্টুদা বাড়ীতে আছে? ও হয়ত কোথাও বেরিয়ে গেছে।

—তোর মুণ্ডু! ওর যে জিম্‌নাষ্টিকের মহড়া চলছে। বাত্তিরে তোদের সব ফিজিক্যাল ফিট্‌স্‌ দেখাতে হবে না? আচ্ছা এক প্ল্যান ওর মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছি। কাল থেকে সারাক্ষণ ওই নিয়েই মেতে আছে।

হেসে উঠল উদয়ন। কিন্তু শুক্তি মোটেই উৎফুল্লবোধ করল না। শরীর-চর্চার কৌশল দেখাবে সব তালপাতার সেপাই! ভাবতেও গা ঘিন্‌ ঘিন্‌ করে। উদয়নের যত উদ্ভট পরিকল্পনা! কিন্তু মুখ ফুটে সে কথা বলবার সাহস ওর নেই। উদয়নের ব্যক্তিত্ব এমনিই যে, ভবানী স্বয়ং ওকে সামনাসামনি কিছু বলতে ভরসা পান না। যদিও আদিনাথের পক্ষপাতিত্ব নিয়ে উদয়নের অনুপস্থিতিতে যথেষ্ট মন্তব্য মাঝে মাঝে তিনি করেন। অতএব শুক্তির উপর সে আবাল্য শাসন আর কর্তৃত্ব করে এসেছে অপ্রতিহত-ভাবে।

—যাই বলিস শুক্তি, রূপ, ধন, যশ, এসবের বর চাওয়ার আগে শরীরে একটু বলংদেহি, এইটে বলাই আজ সবচেয়ে বেশী দরকার। চারদিকে যা সব নমুনা দেখি তার মধ্যে অধিকাংশই ফরফরে ফড়িং; বাদবাকি প্রায় সবই পেটমোটা নাজীদাদা!

মনে মনে আতংকিত হ'ল শুক্তি। একবার বক্তৃতার বান ডাকলে কি আর রক্ষে আছে! ওদিকে তনিমা চিমটি কাটছে। কিন্তু শুক্তির বিপদ ও বুঝবে কি করে?

হঠাৎ ঢাকের আওয়াজ সচকিত করে তুলল সবাইকে। আরতি আরম্ভ হবে, তারই পূর্বাভাষ। ঢাকী পূর্ব-বাংলার উদ্বাস্তু। এককালে ঢাকের বাজনায় তার প্রসিদ্ধি ছিল। কিন্তু দেশ ছেড়ে আসার মধ্যে কি তার প্রতিভাও সে ফেলে এসেছে?

ঢাকের আওয়াজ মোটেই ভাল লাগছিল না শুক্তির। কি বিশ্রী চামড়া আর কাঠির বেসুরো আওয়াজ। অথচ ঢাকের বাজনা পুজোর একটা প্রধান অঙ্গ। মানুষগুলোর কি রুচি, মনে মনে ভাবলে সে।

ঢাকীর দিকে অপলক চোখে দেখছিল উদয়ন। শুধু এবড়ো-খেবড়ো চামড়া দিয়ে কাঠির মত শরীরটাকে ঢেকে রেখেছে কোনমতে। অথচ বোধনের জাগরণ ওর আঙুলের চঞ্চলতাতেই। কিন্তু রুটির অভাব যার সমস্ত চৈতন্য জুড়ে রয়েছে, শিল্পীর প্রতিভা তার কাছে কি করে আশা করতে পারে মানুষ? বেদনায় সমস্ত মনটা টনটন করে ওঠে তার।

—বুঝলি উদয়ন, ছোটবেলাকার মত ঢাকের বাজনা আজকাল শুনতেই পাই না। সে ঢাক শুনলে মনে হ'ত সত্যিসত্যিই মাদুর্গা নেমে আসছেন কৈলাস থেকে—সমস্ত আকাশটা যেন গমগম্‌ করতে থাকত আর সারা মনটা তারই রেশে যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত।

পাড়ার এক বৃদ্ধ হাতে লাঠি নিয়ে ওদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। আশেপাশের বাড়ীর মহিলারাও এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছেন। ভবানীকেও ওঁদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

উদয়নের দিকে মুখ ফেরাল শুক্তি। চোখের কোণে কালি অথচ চাপা এক অদ্ভুত আলো থরথর করে কাঁপছে ওর বিশাল মণি দুটোতে। সেই বৃদ্ধটিকে কি যেন বোঝাতে সে ব্যস্ত। হয়ত ঢাকীর বেদনার কথা।

এই ত সুযোগ! পায়ে পায়ে পিছু হটে গেল। আঙুল নেড়ে ইঙ্গিত করল তনিমাকে। তার পরেই ছুট!

হাঁপাতে হাঁপাতে বাস স্টপেজে এসে পৌঁছে দেখে

সুকোমলের কোন চিহ্নও নেই সেখানে। বুক দমে গেল একেবারে।

ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞেস করল তনিমাকে, তবে কি আমাদের দেরি দেখে সুকোমলদা চলে গেল ?

—দেরী হয়েছে কি এমন ? আর তাছাড়া, চলে যাবে মানে ? আজ ওর প্রোগ্রাম আছে না ?

—সে ত আটটার পর। তার আগে এই সময়টুকুর জন্যে যে রেষ্টুরেণ্টে নিয়ে যাবে বলেছিল।

—যাঁও এবার কোথায় যাবে। ওদিকে হয়ত তোর বড়দা আবার চটে আগুন হচ্ছে।

বিরস গলায় শুক্তি জবাব দিল, সেসব বালাই ওর নেই। আমাদের কথা এতক্ষণ বেমালুম ভুলে গেছে। ও একটা ক্ষ্যাপা। দেখলি না কিরকম ঝগড়া বাধাবার তাল করছিল। ওই জন্যেই ত যত দেরি। ছোটবেলা থেকেই আমাকে এমনি জ্বালিয়ে মারছে ও।

প্রায় কাঁদোকাঁদো হয়ে গেল শুক্তি। সামনের উড়ে পানওয়ালার দোকানে এক ডজন লোক একই সঙ্গে বিভিন্ন রকমের পান চাইছে ; আর পাশে হিন্দুস্থানী খাবারের দোকানের গুহাটা মানুষে ঠাসাঠাসি। রাস্তার ধারে শাল-পাতার উচ্ছিষ্ট খুঁটছে ছেঁড়াজামা পরা একটা ভিখিরী।

হঠাৎ ক্যাঁচ ; একটা ট্যাক্সী প্রায় ওদের গায়ের ওপরেই এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ভ্রূ কুঁচকে ওরা চোখ ফেরাল কাচের জানালার দিকে আর সঙ্গে সঙ্গে খুশীতে নেচে উঠল শুক্তির মন।

ট্যাক্সী থেকে নামল সুকোমল। কিন্তু সঙ্গে দুজন ভদ্রলোক আর একটি মহিলা। ভদ্রলোকদের দিকে এক-পলক তাকিয়েই মেয়েটির আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখল শুক্তি। মেয়েটিও রুজমাখা গালে সুগন্ধী রুমাল বুলোতে বুলোতে ওদের দিকেই দেখছিল। সুর্মাটানা চোখদুটো আর নিপুণ-ভাবে আঁকা ভ্রূযুগল কেন হঠাৎ আজ কঠিন হয়ে উঠল ?

ট্যাক্সীর বিল মিটিয়ে দিল সুকোমলের সঙ্গীদের একজন। পুজার দিনেও তার পোশাক বিজাতীয়। বসে-যাওয়া গাল দুটোকে ফুলিয়ে নিয়ে একটা শিস দিল সে লোকটি। ফিকে রঙের শোফার আড়াল থেকে চোখ দুটো দিয়ে যেন লেহন করছিল শুক্তি-তনিমার উদ্ধত যৌবনকে।

হাসিমুখে এগিয়ে এল সুকোমল।

—তোমাদের জলসার জন্য কলকাতা থেকে এঁদের নেমন্তন্ন করে নিয়ে এলাম। ইনি হচ্ছেন শীলা সরকার। নামকরা নৃত্যশিল্পী। বড় বড় বহু ফাংশনে ইনি নেচেছেন। আর ওঁরা হলেন আমার বন্ধু শোভন সরকার (এঁর ভাই) আর অমিত বসু।

মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করল শুক্তি। কিন্তু মনে তখন তার অভিমানের তুফান উঠেছে।

কি আক্কেল সুকোমলের! এদের এনে হাজির করার কি দরকার ছিল ? এখন যে সমস্ত সন্ধ্যাটা নষ্ট হবে এদেরই আপ্যায়ন করতে। নিজের পায়ে কুড়ুল মারার দৃষ্টান্ত এর চেয়ে প্রকৃষ্ট আর কি হতে পারে ?

কিন্তু মনে যাই হোক, বাইরে তার প্রকাশ ঘটতে দিল না শুক্তি। হাত দুটো লীলায়িত ভঙ্গিতে বুকের উপত্যকায় সন্নিবদ্ধ করে স্বাগত সম্ভাষণ জানাল মান্য অতিথিদের। ঘাড় কাত করে পথের দিগন্ত নির্দেশ করে নিল। তার পরে চলতে সুরু করল যে পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথেই।

পাশ থেকে ফিস্‌ফিস্ করে সুকোমল নিবেদন করল, শীলাকে একটা নাচের প্রোগ্রাম প্রথমেই দিয়ে দিতে হবে। সেটা দিয়ে সুরু করলে তাক্ লেগে যাবে সকলের। এর আরত্তি-নাচ বিখ্যাত।

সমস্যায় পড়লো শুক্তি। সর্বপ্রথমেই শরীরচর্চার কৌশলগুলি দেখিয়ে দেবার কথা। উদয়ন বার বার বলেছে পল্টুকে সে কথা। শক্তিমান হতে হবে দেশের তরুণদের—তবেই বলিষ্ঠ মনের অধিকারী তারা হবে, দূর হয়ে যাবে যত সংস্কার আর দুর্নীতি। দীর্ঘ এক বক্তৃতা সে দিয়েছে এই বিষয়ে। কিন্তু সুকোমল বিপদ বাধাল যে!

দুশ্চিন্তায় পথে হোঁচট খেতে খেতে চলল শুক্তি। শহরতলীর সামাজিক জীবনে নেত্রী শুক্তি।

গুঞ্জনরত মৌমাছির মত তার পিছনে এল সুকোমল এণ্ড কোং।

গেটের কাছে উদয়ন তখনও দাঁড়িয়ে। ভিতরে ইতি-মধ্যেই বেশ ভিড় জমে গেছে। মঞ্চের সামনে মাইকে সংখ্যা গণনা করছে রেডিও দোকানের ভদ্রলোকটি।

শুক্তির চোখ পল্টুর খোঁজে ঘুরতে লাগল। আর শীলার মুখের ওপর সভাশুদ্ধ লোকের চোখ ঘুরে ঘুরে এসে পড়তে লাগল।

হঠাৎ একটা কলরব। গেটের মুখে ভিড়। সভা-পতিকে নিয়ে ঢুকল পল্টু। আর তক্ষুনি দৌড় দিল শুক্তি। পল্টুর কাছে পৌঁছে বার বার গুঁতো দিতে লাগল ডান-হাতের কব্জিটাতে।

—বিস্মিত বিরক্ত পল্টু তার দিকে ফিরে চাইল। সংক্ষেপে শুক্তি বিবৃত করল তার বিপদের কথা।

সুকোমলকে ত পল্টু জানে। যথারীতি সে এসেছে। কিন্তু সঙ্গে আছেন শীলা সরকার। দয়া করে এসেছেন সুকোমলের সনির্বন্ধ অনুরোধে। চমৎকার নাচতে পারেন। পল্টু কি ওর নাচ দেখেনি। নাই দেখুক, আজ এই সুযোগ



হারানো ঠিক হবে না। তাই প্রথমেই ওকে একটা ছোট্ট প্রোগ্রাম দেওয়া হোক্। কতক্ষণই বা লাগবে? কাঠখোট্টা আসন না দেখিয়ে যদি আরতিনৃত্য দিয়ে আরম্ভ করা যায়, তবে বেশী আকর্ষণীয় হবে নিশ্চয়ই।

ভ্রূ কুঁচকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শুক্তির দিকে চাইল পল্টু। বহু লোকের সঙ্গে মিশতে হয় তাকে। ঠোঁট নাড়া দেখে পেটের কথা বুঝতে হয় তাকে। কাজেই বলার ভঙ্গি আর ভাষা আকুতির সুর আর যুক্তি উদ্ভাবনের চেষ্টা সবটাই বুঝল সে।

এগিয়ে গেল সুকোমলের দিকে। সৌজন্য বিনিময় যথারীতি সম্পন্ন হ'ল।

উদয়ন বইয়ের স্তূপের সামনে বসে তখনও কি একটা পড়ছে। হঠাৎ মাইকের ঘোষণা শুনে চমকে উঠল, আজকের অনুষ্ঠান শ্রীমতী শীলা সরকারের আরতি নাচ দিয়ে সুরু করা হ'ল।

গম্ভীর গলা সভাপতির। সুললিত সুর বাদ্যযন্ত্রের। সূক্ষ্ম শিঞ্জিনী নূপুরের। আর লীলায়িত দেহবল্লরী শীলা সরকারের।

আসরের সমস্ত অনুভূতি একটি ইন্দ্রিয়ে এসে সংহত হয়েছে, চোখের পলক আর কারও পড়ছে না। আর উদয়নের সমস্ত চৈতন্য জুড়ে একটি রিপু তাণ্ডব তালে নেচে উঠছে—ক্রোধ।

মঞ্চের এক পাশে নিরীহ সভাপতি বসে আছেন। পাশে আছেন জড়পদার্থ তাঁর সহধর্মিণী। আর তাঁরই কাণে কাণে ফিসফিস করে কি যেন বলছে পল্টু। চীৎকার করে তাকে গালাগাল দিতে ইচ্ছে করল উদয়নের। দাঁতে দাঁত ঘষল সে। অপেক্ষা করতে লাগল অন্ধকার থেকে আলোয় যাওয়ার মুহূর্তটির।

একটু পরেই এল সে লগ্ন। মঞ্চের দিকে সে এগিয়ে গেল আর জনমণ্ডলীর করতালিকে বার বার মাথা নুইয়ে অভিনন্দন জানাল শীলা সরকার।

উদয়নকে দেখতে পেয়েই পল্টু তাড়াতাড়ি সভাপতিকে কি যেন একটা বলল।

কিন্তু সভাপতি কিছু ঘোষণা করার আগেই কে একজন বলে উঠল, আমরা ওঁর পূজারিণী নাচ দেখতে চাই।

চমকে উঠে বক্তার দিকে তাকাল উদয়ন। নবাগত; তাই তার অপরিচিত। পল্টুও চিনতে পারল না; কিন্তু শুক্তি এবার অসন্তুষ্ট হ'ল; সে চিনতে পেরেছে। শোভন সরকার। অতিথি বলেই কি এই জুলুম সইতে হবে? তাই সে উইংয়ের পাশ থেকে মুখ বাড়িয়ে পল্টুকে কি যেন বললে। এবং পল্টুর মুখ থেকে যথারীতি সে বাণী সভাপতির মুখে বাহিত হয়ে মাইকের মধ্য দিয়ে জনমণ্ডলীর কাছে এসে পৌঁছল, শ্রীমতী সরকারের কাছে আমরা যথেষ্ট কৃতজ্ঞ; কিন্তু ওঁকে আর পীড়ন করা ঠিক হবে না। তাছাড়া এর পর আপনারা শ্রীমান ইন্দ্রজিতের 'আসন' দেখবেন।

কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, না, না, আসন নয়; আর একখানা নাচ হোক্। দু-চারজন তাকে সমর্থন করল।

কিন্তু বাকী সবাই বিনা প্রতিবাদে নীরব দ্রষ্টা হয়ে শুধু বসে রইল।

নিজের মনে গজরাতে লাগল উদয়ন, সাংখ্যের পুরুষ সব। নির্বিকার, নিশ্চল, প্রকৃতির নাচে আত্মহারা।

আর বিব্রত বোধ করলেন সভাপতি। পলটুর দিকে তাকালেন। পলটু উইংয়ের পাশে দাঁড়ানো ছেলেটিকে বলল, তাড়াতাড়ি অডিটোরিয়মের আলো নেভাও পরে ইন্দ্রজিতকে আসতে বল।

পলটু জানে, একবার ইন্দ্রজিত হাজির হলে কেউ কিছু বলবে না। অনেক সভা, অনেক ফাংশন সে পরিচালনা করেছে।

টপ্ করে আলো নিভে গেল। কিন্তু ইন্দ্রজিত মঞ্চের ওপর এগিয়ে আসবার আগেই লাফিয়ে পড়ল শীলা। পূজারিণীর ভঙ্গিমায়।

করতালিতে মুখর হয়ে উঠল আসর। অপমানে মুখ কালো হ'ল পলটুর। লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করল শুক্তির। কৌতুকে হাসতে লাগল শোভনের চোখ দুটো। বাঁশীর সুরে আকুল হয়ে উঠল সুকোমলের ঠোঁট দুটো। আর রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল উদয়নের। চেঁচিয়ে সে বলল, সভাপতির ঘোষণা অনুসারে আমরা ইন্দ্রজিতের আসন দেখব আশা করছিলুম।

থেমে গেল শীলা। একটা ক্রুদ্ধ প্রতিবাদের ঝড় উঠল সারা আসর থেকে। উদয়নকে চেনে অনেকেই। অনেকের সঙ্গেই এর আগে বহু ব্যাপারে মতের গরমিল হয়েছে তার। ওর ধারালো কথার খোঁচায় জখম হয়েছে বহুলোক। আজ তারা সুযোগ পেয়েছে প্রতিশোধের। ছেড়ে দেবে কেন?

অপমানের চাইতেও সেই অবহেলাই বেশী করে বাজল উদয়নের বুকে। স্তব্ধ হয়ে গেল সে। আবার নৃত্যের হিল্লোলে দুলে উঠল শীলার সারাদেহ। আর সীমাহীন বেদনায় অসাড় হয়ে গেল উদয়নের সমস্ত অনুভূতি। পাথরের মন নিয়ে সে বেরিয়ে এল অন্ধকার আসর থেকে। আকাশের নীচে এসে দাঁড়াল। স্বচ্ছ আলোয় ভরে গেছে সমস্ত দিগন্ত; তবু কেন নীরন্ধ্র অন্ধকার উদয়নের সমস্ত চৈতন্য জুড়ে? পিছলে পড়ছে বৈদ্যুতিক আলো। পিচেমোড়া কলকাতার বুকে; তবু কেন বজ্রের জ্বালা শুধু তার অন্তরের মধ্যে?

হঠাৎ চোখে পড়ল একটি ছোট মেয়ে অঝোরধারায় কেঁদে চলেছে। তাড়াতাড়ি সে কাছে এগিয়ে গেল। অনেক চেষ্টা করে সে বুঝতে পারল যে, মেয়েটি তার বাপ-মার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। থাকে কাছেই একটা গাঁয়ে। দল বেঁধে সবাই এসেছিল শহরতলীর পূজা দেখতে। ভিড়ের মধ্যে এই বিভ্রাট।

উদয়নকে দেখে তাড়াতাড়ি সরে গিয়েছিল সবাই। পরম নিশ্চিন্তমনে। ঘাড় থেকে একটা উটকো মেয়ের ভার নেমে গিয়েছে বলে। কারণ উদয়ন থাকতে কে আর এই সব ঝামেলা পোয়াতে যাবে? এ বিষয়ে সবাই ওর তুলনায় অনেক ছোট। তাই তারা উদয়নকে যথাযোগ্য স্থানে উপস্থিত দেখেই চটপট কেটে পড়ল যে যার গন্তব্য পথে; পুজোর স্ফূর্তি নষ্ট করবে কে একটা অজানা-অচেনা গাঁয়ের মেয়ের খোঁজ নিতে গিয়ে? তার জন্য রইল উদয়ন।

তাই কোলাহলমুখরিত শহরতলী ছেড়ে উদয়ন পাড়ি দিল এক গ্রামের ভীরু স্তব্ধতার দিকে। কখন পৌঁছাবে, কিভাবে পৌঁছাবে, কার কাছে পৌছবে এ-সব অবান্তর প্রশ্ন তুলে অকারণ উৎকণ্ঠিত হওয়া তার স্বভাববিরুদ্ধ।

তারার নিশানা আর জ্যোৎস্নার আলো হ'ল তার দিশারী। বাপ-হারানো মেয়ে হ'ল তার সঙ্গিনী। ঘাসের চুলচেরা পায়েহাঁটা পথে তাদের পৌঁছে দিল এক মাঠ থেকে অন্য মাঠে, এক গাঁ থেকে অন্য গাঁয়ে, এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্তে।

কিন্তু সে ত আর পৃথিবী পরিক্রমার অভিযান করেনি। তাই এক সময়ে সে গন্তব্য গ্রামে গিয়ে পৌঁছল; খুঁজে পেল মেয়ে-হারানোর বাপ-মার ঘর। তার পরে আবার সে ফিরে এল নিজের বাসায়। ভোরের শুকতারা তখনও কলকাতার প্রাসাদচুড়ে নিভে যায় নি; ঠাণ্ডা হাওয়া আর শেষরাতের পাখীর ঝটপটানি সবে শুরু হয়েছে। কিন্তু কি চেহারা হয়েছে তার?

শিউরে উঠলেন বিমলা; মুখ বিকৃত করলেন ভবানী; আর বোবা হয়ে গেলেন আদিনাথ।

ধুলোয় ভরে গেছে সমস্ত শরীর; কাদায় হাঁটু পর্য্যন্ত নোংরা হয়ে উঠেছে। ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে পা দুটো। আর অনিদ্রায় চোখ দুটো লাল টকটকে। ঠিক মাতালের মতই!

তবু তার ঠোঁটের কোণে পরম প্রশান্তি স্নিগ্ধ হাসির মধ্যে ফুটে উঠেছে কেন? অসীম মমতায় চোখ দুটোই বা কেন ভিজে করুণ হয়ে উঠেছে?

ভীষণ ক্লান্ত; ঘুমে ভেঙে আসছে চোখ দুটো। বিমলার উৎকণ্ঠিত প্রশ্নের উত্তর দেবার অবকাশ মিলল না। হারিয়ে ফেলল নিজেকে স্বপ্নজড়ানো তন্দ্রার মধ্যে।

আর স্বপ্ন ছুটে গেল শুক্তির চোখ থেকে। মাতালের মত টলতে টলতে সে ঢুকল নিজের ঘরে। পাথরের মতই নিথর হয়ে গিয়েছে তার সারা অন্তর।

সেও বেরিয়েছিল রাতের কোলকাতার দিকে। সঙ্গে ছিল কতলোক, আর তাদের মধ্যে সুকোমল। মসৃণ পিচে-

ঢাকা রাস্তার ধুলোটুকুও লাগেনি তার পায়ে। হাওয়ার গতিতে উড়ে চলেছিল তাদের ট্যাক্সী। এক পাড়া থেকে আর এক পাড়া; এক পূজামণ্ডপ থেকে আর এক পূজা-মণ্ডপ; এক প্রতিমা থেকে আর এক প্রতিমা।

কিন্তু তার পর?

শিউরে উঠল শুক্তি। সমস্ত শরীরটাকে নোংরা মনে হচ্ছে; সারা অস্থিই যেন ধুলোয় মিশে গেছে; আর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে মনটা।

কেন এমন হ'ল? কেন যে সুকোমলের মিষ্টি হাসিতে ভুলে গিয়েছিল? কেন মখমলের প্যাণ্ট-পরা শোভনের পাশে গিয়ে সে ট্যাক্সীতে বসেছিল? কোন্ সাহসে জন্তু-আঁকা জামা-পরা শোভন ফিসফিস করে বলেছিল সুকোমলকে—আজকের মত শুক্তিকে আমায় ছেড়ে দে সুকু। তুই আমার প্রাণের বন্ধু; এটুকু চাইবার দাবী আমার আছে; তোর জিনিস আবার তোকেই ফিরিয়ে দেব।

সে কি আকণ্ঠ ডুবে গিয়েছিল নোংরা পাঁকে। তাই কি ঝিন্‌ঝিন্ করছে সমস্ত শরীর আর শিরশির করছে সমস্ত অন্তর?

কিন্তু সুকোমল? কি জবাব দিল সে?

একটা পণ্য—বাজারের বেসাতীমাল! শুধু খদ্দেরের চোখেই তার দাম, নিজস্ব কোন মর্য্যাদা নেই তার!

তাই পুরনো পুতুলের মত তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না সুকোমল। স্বচ্ছন্দে সম্মতি জানিয়ে গাড়ী থেকে শীলার হাত ধরে নেমে গেল। বংশীবাদক সুকোমল আর নৃত্যশিল্পী শীলা। সাপুড়ে আর সাপ!

সাপের চোখ নিয়েই এগিয়ে এসেছিল শোভন। সাপের শরীরের মতই ঠাণ্ডা হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল শুক্তির মরালশুভ্র গ্রীবা।

কিন্তু ফণা তুলে রুখে উঠল শুক্তি। ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে ছুটে বেরিয়ে এল ট্যাক্সীর কোটর থেকে। তার পর কোলকাতার জনারণ্যে হারিয়ে ফেলল নিজেকে। পায়ে হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে এসে দাঁড়িয়েছে নিজের ঘরের দোরগোড়ায়।

মাথাটা ভীষণ ঘুরছে। মা, পিসিমা শুধু বোবার মত তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? কেন এই স্তব্ধতা? কি লক্ষ্য করছেন তাঁরা তার মুখের রেখায়? কেন জিজ্ঞেস করছেন না কিছু? কেন তাকে এই চরম লজ্জার কথা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কেটে মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে হচ্ছে?

সমস্ত মন তার বিদ্রোহী হয়ে উঠল। জোর করে তাই নির্ধারিত করে দিতে চাইল রুদ্ধ বেদনাকে।

—ক্রট—সুকোমল জঘন্য—

কিন্তু কথা আর শেষ হ'ল না। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে। সব চৈতন্য সমাহিত হ'ল মৃত্যুর মত মূর্চ্ছার মধ্যে। সব বঞ্চনা ডুবে গেল বোধাতীত সুপ্তির অতলে।

ঘুমিয়ে পড়ল শুক্তি আর স্বপ্ন দেখতে লাগল উদয়ন।

ইষ্ট-দেবতার স্মরণ করলেন আদিনাথ-ভবানী-বিমলা। ফিরে এসেছে শুক্তি, শান্ত হয়েছে উদয়ন।

ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে শুধু প্রতিমার তৃতীয় নয়ন ঝকমক্ করে ঝলসে উঠছে হাতের খর্পর। শেষরাতের হিমেল হাওয়ায় বারবার কেঁপে উঠছে মাটির প্রদীপটা।



রুশ পর্য্যটক নিকিটিন ও মধ্যযুগের ভারত

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মুখোপাধ্যায়

পঞ্চদশ শতাব্দীতে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ব্যবসাবাণিজ্য করবার উদ্দেশ্য নিয়ে যে সব দুঃসাহসিক বণিক ভারতে এসেছিলেন রুশদেশীয় মিঃ অথানাসিয়াস নিকিটিন তাঁদের মধ্যে একজন। নিকিটিন তাঁর জন্মভূমি ত্বিয়ের থেকে ঠিক কোন সময়ে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন তার সঠিক কালনির্ণয় সম্ভব নয়, তবে তিনি তাঁর বিবরণীতে এ সম্বন্ধে যা লিখে গেছেন তা থেকে দেখা যায় যে, তিনি ওয়েসিলি পাপিন নামক অপর একজন রাশিয়ানের সঙ্গে কাজান যুদ্ধের এক বৎসর পূর্ব্বে রাশিয়ার গ্র্যাণ্ড ডিউক তৃতীয় ইসওয়ান কর্ত্তৃক শিরভান-এর শাহের কাছে প্রেরিত বিভিন্ন উপহারাদি পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিয়ে বিদেশ যাত্রা করেছিলেন। ইতিহাসের সালতামামিতে ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দেই কাজান যুদ্ধ হয়েছিল বলে উল্লিখিত আছে এবং সেই হিসাব অনুযায়ী নিকিটিন ১৪৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বিদেশ যাত্রা করেছিলেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

বিদেশ ছেড়ে নিকিটিন ভল্গানদী বয়ে ক্যাসপিয়ান সমুদ্রপথে বিদেশ যাত্রা করেন, কিন্তু পথিমধ্যে তাতারী দস্যুদলের হাতে পড়ে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হন ও বন্দী হন। অবশেষে তাতারের রাষ্ট্রদূত হাসান-বেগের মধ্যস্থতায় নিকিটিন মুক্তি পান এবং তাঁরই সহযোগিতায় নিকিটিন নির্ব্বিঘ্নে বোখারোয় এসে পৌঁছান। বোখারো থেকে নিকিটিন কীরওয়ান, বন্দর আব্বাস, হরমুস (অরমুস), মাসকট হয়ে পশ্চিম-ভারতের সামুদ্রিক বন্দর চাউল-এর মধ্য দিয়েই তিনি ভারতে প্রবেশ করেন। চাউলে সাত দিন অবস্থানের পর নিকিটিন পদব্রজে আঠারো দিন পর গিয়ে পৌঁছালেন ওমরিতে (সুরাটের চল্লিশ মাইল দূরবর্ত্তী বর্ত্তমান ওমরিটা শহর) এবং সেখান থেকে জুনায় হয়ে বিদরে গিয়ে পৌঁছান। নিকিটিন বিদরে প্রায় চার বৎসর ছিলেন এবং সেখানে অবস্থানকালেই তিনি সেখান থেকে কালিকট, সিংহল দ্বীপ, পেগু প্রভৃতি অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছিলেন। বিদরে চার বৎসর কাটাবার পর নিকিটিন চলে যান সামুদ্রিক বন্দর দাবোল বা দেওয়াল-এ এবং সেখান থেকেই সমুদ্রপথে তিনি স্বদেশ যাত্রা করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ স্বদেশে পৌঁছবার পূর্ব্বেই পথিমধ্যে ১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। নিকিটিনের স্বলিখিত বিবরণীর পাণ্ডুলিপিটি কয়েকজন রাশিয়ান ব্যবসায়ী ঐ বৎসরেই স্বযত্নে মস্কোতে বয়ে নিয়ে যান ও গ্র্যাণ্ড ডিউকের সেক্রেটারীর হস্তে সেটি সমর্পণ করেন।

নিকিটিন ভারতীয়দের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে ভারতীয়েরা খালিগায়েই থাকে, তবে মেয়েরা মাথায় খোঁপা বাঁধে ও ওড়না ঢাকা দেয়। পথেঘাটে বেরোলেও তাদের এই পোশাকের কোন অদলবদল করা হয় না। রাজপুরুষ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গরা গায়ে সিল্কের একটা চাদর জড়িয়ে রাখে। ভৃত্য শ্রেণীরা বা ক্রীতদাসরা খালি গায়ে ও খালি পায়ে তীর-ধনুক বা বর্শা, ছোরা বা তলোয়ার ও ঢাল নিয়েই রাস্তায় চলাফেরা করে থাকে। সাত বৎসরের কম বয়স্ক বালকবালিকারা উলঙ্গ অবস্থাতেই রাস্তায় চলাফেরা করে এবং এর জন্য কোনরূপ লজ্জাবোধ করে না। ভারতীয়দের গায়ের রং কালো, তাই তারা সাদা চামড়ার মানুষদের দেখলে বিস্মিত হয়ে যায় ও হতবাক হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

নিকিটিন চাউল থেকে যান জুনের এবং সেখানে প্রায় দু'মাস-কাল অবস্থান করেন [দুর্ভাগ্যবশতঃ নিকিটিনের বিবরণীর অনুবাদকার Count Wielhorsky নিকিটিনের উল্লিখিত এই স্থানের অবস্থান বা তার বর্ত্তমান নাম সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি। ভারতবর্ষের পুরাতন মানচিত্রেও এই নামের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। নিকিটিন যখন বিদর (বর্ত্তমান আমেদাবাদ) পরিভ্রমণ করেন তখন জৌনপুর নামে একটি স্বল্পস্থায়ী মুসলমান রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। খুব সম্ভবতঃ নিকিটিন এই জৌনপুরকেই জুনের বলে উল্লেখ করেছেন—লেখক] জুনের-এর শাসক আস-খান সম্বন্ধে নিকিটিন বলেছেন যে, এই শক্তিমান মুসলমান শাসক যখনই পথে বেরোতেন তখন হাতী বা ঘোড়ায় না চেপে পাল্কীতে করেই বেরোতেন, যদিও হাতী বা ঘোড়া কোনটার তাঁর অভাব ছিল না।

নিকিটিন জুনের-এর আবহাওয়া সম্বন্ধে বলেছেন যে, শরৎ-কালেই এঅঞ্চলে সবচেয়ে বেশী বৃষ্টিপাত হয়, তাই এখানকার প্রধান চাষ-আবাদ যা কিছু এই সময়েই হয়। গম, ছোলা, কড়াইশুটি ও সজীব চাষটাই এখানে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে হয়। নিকিটিন বলেছেন এখানকার লোকেরা ঘোড়াকে ছোলা ছাড়াও খিচুড়ীও খেতে দেয়। এ দেশে যে সব ঘোড়া দেখতে পাওয়া যায় প্রায় সবই চালানী ঘোড়া, কারণ এদেশে ঘোড়া জন্মায় না বললেই হয়। এখানকার অধিবাসীদের যানবাহনের প্রধান সম্বল হ'ল মোষ ও ষাঁড়, যাদের পিঠে চেপে বা মালপত্র চাপিয়েই একস্থান থেকে অন্যস্থানে জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বা নিজেরা যাতায়াত করে।

নিকিটিন বলেছেন যে, ভারতীয় প্রথানুযায়ী বিদেশী সওদা-গরদের পথিপার্শ্বস্থ সরাইখানাতেই থাকতে হয়। এই সব সরাই-খানায় অভ্যাগতদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য দেখার জন্য মহিলা পরিচারিকা রাখা হয়েছে, যারা পথিকদের জন্য খাদ্যাদি প্রস্তুত করে দেয় ও

শয়নের সুবন্দোবস্ত করে দেয়, প্রয়োজন হলে তারা পথিকদের শয্যাসঙ্গিনীও হয়।

জুনের-এ অবস্থানকালে জুনের-এর শাসনকর্তা আসতখান নিকিটিনের ঘোড়াটি কেড়ে নেন এবং পরে যখন তিনি শোনেন যে, নিকিটিন খ্রীষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী তখন তিনি ঘোড়াটি ফেরত দিতে রাজী হন, যদি নিকিটিন মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করতে রাজী হন। আসতখান নিকিটিনকে এই ধর্ম্মান্তর গ্রহণের জন্ত ১,০০০ স্বর্ণমুদ্রা উপহার দিতেও স্বীকৃত হন। আসতখান নিকিটিনকে আরও জানিয়ে দেন যে, তাঁর প্রস্তাব যদি নিকিটিন প্রত্যাখ্যান করেন তা হলে তাঁর ঘোড়াটি ত ফেরত দেবেনই না, উল্টে নিকিটিনের শিরশ্ছেদ করার জন্ত তিনি ১,০০০ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করে দেবেন। আসতখান নিকিটিনকে তাঁর প্রস্তাব সম্বন্ধে চিন্তা করার জন্ত মাত্র চার দিন সময় দিয়েছিলেন। যাহা হউক, শেষপর্য্যন্ত খোজা ইওচা মহম্মদ নামক একজন খোরশানী সহৃদয় ভদ্রলোকের চেষ্টায় আসতখান নিকিটিনকে এ যাত্রা রেহাই দেন ও তার ঘোড়াটি ফেরত দেন। নিকিটিন এই ব্যাপারে খুবই দুঃখিত হন ও তাঁর স্বদেশবাসীকে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন যে, যদি কোন খ্রীষ্টান রাশিয়ান হিন্দুস্থান পরিভ্রমণের সঙ্কল্প করেন, তাহলে তার ধর্ম্মবিশ্বাস জলাঞ্জলি দিয়ে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়ে তবে যেন তাঁরা হিন্দুস্থানের পথে পা বাড়ান। এদেশে বিভিন্নরকমের মশলাদি ও রঞ্জনদ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে হয় এবং দামেও খুব সস্তা কিন্তু সেগুলি রাশিয়ানদের কোনই কাজে লাগবে না বলে নিকিটিন মন্তব্য করেছেন। সমুদ্রপথে যে সব পণ্যাদি এদেশ থেকে চালান যায় তার উপর কোনই কর ধার্য্য করা হয় না। অবশ্য অন্ত বহুরকমের কর দিতে হয়। এদেশে সমুদ্রপথে বাণিজ্য করার সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে সামুদ্রিক বোম্বেটেদের উৎপাত। এই সব জলদস্যুরা প্রায় সবাই হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী অর্থাৎ মূর্ত্তি উপাসক। ব্যবসায়ীরা অনেক সময় এদের হাতেই সবচেয়ে বেশী নিগৃহীত বা ক্ষতিগ্রস্ত হন। ভারতের রাজপথে যদিও দস্যুদের উৎপাত নেই কিন্তু বাঁদরের উৎপাত রয়েছে বলে নিকিটিন মন্তব্য করেছেন।

নিকিটিন জুনের থেকে যাত্রা করে কুলবর্গা (গুলবর্গা) হয়ে প্রায় এক মাস বাদে বিদরে এসে পৌছান। বিদর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে নিকিটিন বলেছেন যে,বিদর ভারতের একটি প্রধান বাণিজ্যিক ঘাটি। বিভিন্ন দেশ থেকে এবং ভারতের অন্যান্ত অঞ্চল থেকে ঘোড়া, বিভিন্ন খাত্তশস্যাদি, মশলাদি, সিল্কের দ্রব্যাদি ও বিভিন্নরকমের বাণিজ্যিক পণ্যাদি এখানে বিক্রয়ার্থে আসে। এখানকার বাজারে ক্রীতদাস পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। নিকিটিন বলেছেন, এই অঞ্চলের নারীরা প্রায় অধিকাংশই চরিত্রহীনা ও হিংস্র প্রকৃতির। প্রয়োজন হলে এরা নিজেদের স্বামীকেও বিষপ্রয়োগে হত্যা করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। নিকিটিনের মতে হিন্দুস্থানের মুসলমান-অধিকৃত অঞ্চলসমূহের মধ্যে বিদরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শহর। শহরটি আকারে যেমন বিরাট তেমনি ঘন লোকবসতি। বিদরের বর্ত্তমান সুলতানের বয়স মাত্র ২০ বৎসর। তিনি নামেমাত্রই সুলতান, আসলে রাজ্য পরিচালনা করছেন খোরসান দেশীয় তাঁর আমীরবর্গেরা। আমীরদের মধ্যে মালিক তুচার, মালিকখান ও খারাতখান-এর নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। মালিক তুচারের অধীনে প্রায় দু'লক্ষ সৈন্ত, মালিকখানের অধীনে ১ লক্ষ ও খারাতখানের অধীনে প্রায় ১০ হাজার সৈন্ত এবং অপরাপর আমীরদের অধীনে প্রায় ১০ হাজার সৈন্ত আছে। সুলতানের নিজস্ব সৈন্তসংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। সুলতান যেখানেই যান তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সৈন্তবাহিনীও যায়।

নিকিটিন বলেছেন, অসংখ্য লোকবসতিপূর্ণ এই রাজ্যের একদিকে যেমন দেখা যায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ও আমীররা ঐশ্বর্য্যের চূড়ায় বসে চরম বিলাসিতার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করছেন অপর দিকে তেমনি সাধারণ অধিবাসীদের দুঃখ-দুর্দ্দশা অবর্ণনীয়। আমীররা যখন পথে বেরোন তখন রূপোর পালকে চেপেই যান, কুড়ি জন ভৃত্য কাঁধে করে এই পাল্কী বয়ে নিয়ে যায়। এ ছাড়া ৩০০ অশ্বারোহী, ৫০০ পদাতিক সৈন্ত, দশ জন মশালধারী ও দশ জন সঙ্গীতকলাকারকে তিনি সঙ্গে করে নিয়ে যান। সুলতান যখন বাইরে যান তখন তিনি মণিমুক্তাখচিত পোশাকাদি পরে, মাথায় পাগড়ী বেঁধে ঘোড়ায় চেপেই বাইরে যান। সুলতানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অগণিত সৈন্তও দেহরক্ষীরূপে যায়।

সুলতানের শিকার অভিযান সম্বন্ধে নিকিটিন বলেছেন, সুলতান যখনই শিকারে যান, সুলতানের মাতা ও বেগমরা, শতাধিক বিদেশীয় উপপত্নী ও তিনজন উজীরই সঙ্গে যান। এ ছাড়া ১০ হাজার অশ্বারোহী, ৫০ হাজার পদাতিক সৈন্ত, ২০টি যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হস্তী, ১০০ জন ভেঁপুবাদক, ১০০ নর্ত্তকী, ৩০০ অশ্ব, শতাধিক বাঁদরও তার সঙ্গে থাকে। সুলতান সাধারণতঃ সপ্তাহের মধ্যে দু'দিন অর্থাৎ মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার শিকারে যান।

বিদরের রাজপ্রাসাদের বিবরণ দিতে গিয়ে নিকিটিন বলেছেন, প্রাসাদের সাতটি তোরণদ্বারের প্রতিটিতেই শতাধিক প্রহরী ও শতাধিক মুসলমান কেরাণী মোতায়েন আছে—যাদের কাজ হচ্ছে প্রাসাদে প্রবেশেচ্ছু ও নির্গমেচ্ছু প্রতিটি লোককে পরীক্ষা করা ও তাদের নাম-ধাম লিখে রাখা। সাধারণতঃ কোন বিদেশীকে শহরের মধ্যে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। প্রাসাদের স্থাপত্য-শিল্প ও নির্ম্মাণ-কৌশল দেখে নিকিটিন মুগ্ধ হয়ে যান এবং প্রাসাদের সুক্ষ্ম-কারুকার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রাসাদের মধ্যে অনেকগুলি বিচারালয় রয়েছে, সেখানে বিভিন্ন অভিযোগের বিচার করে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হয়। রাত্রিকালে শহরের রাজপথে প্রায় ১০০০ কোতোয়ালী অর্থাৎ অশ্বারোহী শান্ত্রীরা মশাল নিয়ে পাহারা দিয়ে বেড়ায়।

বিদরের হিন্দু অধিবাসীদের সম্বন্ধে নিকিটিন বলেছেন যে, এখানকার হিন্দুদের সঙ্গে তিনি খুব ভালভাবে মিশে দেখেছেন যে, তারা আদমের প্রতি বিশ্বাসী ও বুদ্ধদেবই (?) হচ্ছেন তাদের সেই

আদর। সর্ব্বসাকুল্যে এদেশে প্রায় ৮৪টি বিভিন্ন ধর্ম্মমত রয়েছে, যদিও এরা সবাই বুদ্ধের প্রতিই আস্থাশীল। এক ধর্ম্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়েও এদের প্রত্যেক মতাবলম্বীদের মধ্যে আচার-বিচার-গত প্রভেদ সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান, যা দেখে নিকিটিন মন্তব্য করেছেন যে, একের মধ্যে প্রভেদটা এতই বেশী যে, একে অপরের অনুরূপ খাদ্য বা পানীয় পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না। প্রত্যেকেরই খাদ্য তালিকা ভিন্ন প্রকারের। এদের মধ্যে অনেকেই শূয়োর, গরু, ডিম, মুরগী সবই খায়, আবার অনেকে সম্পূর্ণরূপে নিরামিষাশী। রুচির প্রভেদ প্রত্যেক ধর্ম্মমতাবলম্বীদের মধ্যে বিশেষরূপে লক্ষ্যণীয়।

নিকিটিন পেরুওয়ের হিন্দুদের পবিত্র বুদ্ধথানাটি (বৌদ্ধ চৈত্য ?) পরিদর্শন করেন এবং এই মন্দিরটি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন—মন্দিরটি খুবই বিরাট আকারের এবং সবটাই পাথরের তৈরী। মন্দিরের দেওয়াল এবং থামগুলি কুঁদে কুঁদে বুদ্ধদেবের জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা হয়েছে, স্থাপত্য ভাস্কর্য্যের দিক থেকে যার মূল্য অপরিমেয় এবং চমৎকারিত্বে সেগুলি অতুলনীয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতি বৎসর অসংখ্য হিন্দু এই মন্দির দেখতে আসে। এখানে ৫ দিন ব্যাপী একটি মেলাও হয় এবং প্রতি বৎসর সেই মেলায় প্রায় এক কোটি লোকের সমাগম হয়। দর্শনার্থীদের মধ্যে নারীর সংখ্যাই বেশী, যারা এখানে এসে মস্তক-মুণ্ডন করে বুদ্ধের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা জানায়। মন্দিরে বুদ্ধের প্রস্তর-নির্ম্মিত একটি বিরাট মূর্ত্তি রয়েছে এবং মূর্ত্তিটির সামনে কাল পাথরের তৈরী একটি ষাঁড়ের মূর্ত্তিও রয়েছে। এ ছাড়া মন্দিরগাত্রে বহু রকমের মূর্ত্তিবিশিষ্ট চিত্রাদিও অঙ্কিত করা হয়েছে। উপাসকরা প্রথমে ষণ্ডমূর্ত্তির পা চুম্বন করে ফুল দিয়ে পূজা করে। পরে বুদ্ধদেবকে পূজা করে। বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিটি যে ঘরে আছে সেই ঘরের একটি মাত্র দরজা ছাড়া ঘরের আর কোন দরজা-জানলা নেই।

বিদরের কাছেই সালিরাদিনান্দ নামক একটি স্থানে শিকবালা-উদ্দীন বাজারে প্রতি বৎসর একটি মেলা হয় এবং মেলায় বিভিন্ন রকমের জন্তুজানোয়ার বিক্রয়ার্থে আসে। এই মেলা থেকে বিদরে কেবল ঘোড়াই চালান যায়—প্রায় বিশ হাজার। নিকিটিনের মতে এত বড় কেনাবেচার হাট আর কোথাও বসে কি না সন্দেহ, অন্ততঃ তাঁর জানা নেই।

নিকিটিন বিদরের হিন্দুদের আচার-বিচার লক্ষ্য করে মন্তব্য করেছেন যে, এরা গরু-মোষকে দেব-দেবীজ্ঞানে পূজা করে এবং গৃহপালিত পশুরূপে প্রতিপালন করে। হিন্দুরা দিনে দু'বার খায় কিন্তু রাত্রিকালে কিছুই খায় না। প্রতি রবিবার ও সোমবার এরা মাত্র একবারই খায়। কোনরূপ মদ এরা খায় না। হিন্দুরা স্থানীয় মুসলমানদের সঙ্গে এক সঙ্গে খাদ্যাদি গ্রহণ করে না, এমনকি, মুসলমানেরা যাতে তাদের খাদ্যাদি দেখে না ফেলে সেই জন্য খাদ্যাদি চাপা দিয়ে ঢেকে রাখে। উচ্ছিষ্ট খাদ্য খাওয়া হিন্দুদের নীতিবিরুদ্ধ এবং প্রত্যেকের জন্য নির্দ্দিষ্ট পাত্রেই এরা খাওয়া-দাওয়া করে, স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে বসে খাওয়া এদের সামাজিক রীতি-বিরুদ্ধ। হিন্দুরা মাথার ওপর দু'হাত একত্রে তুলে পূর্ব্বমুখী হয়ে ঈশ্বর ভজনা করে এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে এবং এদের আরাধ্য দেব-দেবীকে প্রণাম জানায়। হিন্দুরা পথেঘাটে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলে নীরবে মাথা নীচু করে ভূমিস্পর্শ করে দু'জনেই দু'জনকে শুভেচ্ছা জানায়। নিকিটিন বলেছেন, হিন্দু নারীর সন্তান প্রসব-কালে তাদের স্বামীরাই ধাত্রীর কাজ করে। পুত্রের নামকরণ করে পিতা ও কন্যার নামকরণ করে মাতা। প্রথা অনুযায়ী হিন্দুরা শবদেহকে মাটিতে কবর না দিয়ে পুড়িয়ে ফেলেই সংকার করে এবং পোড়া ছাই নিয়ে নদীতে ফেলে দেয়। হিন্দুরা যখন যুদ্ধ করতে যায় তখন তারা হাতীর সাহায্য নেয়। এদের সৈন্যব্যূহ রচনায় প্রথমে থাকে পদাতিক ও পরে অশ্বারোহী সৈন্যেরা যুদ্ধযাত্রা করে। হস্তীবাহিনী নিয়ে যাওয়ার সময় এরা লোহার চাদর দিয়ে হস্তীদের গা ঢেকে দেয়।

হিন্দুস্থানের মুসলমানদের ধর্ম্মীয় আচারাদি সম্বন্ধে নিকিটিন বলেছেন যে, এ দেশের মুসলমানরা মার্চ্চ মাস ভোর উপবাস করে। ভারতে পদার্পণের পর নিকিটিন খ্রীষ্টানধর্ম্মের কোন অনুষ্ঠানই পালন করতে পারেন নি, কারণ তিনি যে সব ধর্ম্মপুস্তক স্বদেশ থেকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন সেগুলি পথিমধ্যে দস্যুহস্তে নিগৃহীত হওয়ার সময় খোয়া যায়। নিকিটিন সারা মার্চ্চ মাস ভোর মুসলমানদের আচারাদি পালন করেছিলেন—বোধ হয় বাধ্য হয়েই করেছিলেন। নিকিটিন বিদর থেকে দেওয়ালে যান। দেওয়াল বা দাবোল মুসলমান-অধিকৃত হিন্দুস্থানের সর্ব্বশেষ সামুদ্রিক বন্দর। বহির্দেশ থেকে দাবোলে বিক্রয়ার্থে বিভিন্ন জাতের অশ্ব চালান আসে। দাবোল থেকে কালিকটের দূরত্ব প্রায় ২৫ দিনের পথ এবং কালিকট থেকে সিংহল দ্বীপ প্রায় ১৫ দিনের পথ। নিকিটিনের মতে ক্যাম্বে সারা ভারতের বন্দরগুলির মধ্যে অন্যতম। ক্যাম্বেতে কম্বল, সিল্কের কাপড়ের পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। কালিকটও ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ সামুদ্রিক বন্দর। কালিকট অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের মশলাদি, আদা, প্রচুর জন্মায় ও বিভিন্ন রঞ্জনদ্রব্যাদিও প্রস্তুত হয়। এখানে প্রত্যেকটি জিনিসই খুব সস্তায় পাওয়া যায়। এখানকার দাসদাসীদের আচার-ব্যবহার প্রশংসনীয়। বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে শ্রীহট্ট ও পেগুর নামও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দুটি স্থানেই প্রচুর চন্দন গাছ জন্মায়। সিল্ক ও বিভিন্ন ধরনের মণিমুক্তা প্রচুর পাওয়া যায়। সিংহল দ্বীপ পরিভ্রমণান্তে নিকিটিন বলেছেন, এই দ্বীপে প্রচুর পরিমাণে মণিমুক্তা, দামী দামী পাথর, স্ফটিক ও হস্তী পাওয়া যায় এবং এখান থেকে ভারতে চালান যায়।

ভারতীয়দের কালগণনা সম্বন্ধে নিকিটিন বলেছেন যে, ভারত-বাসীরা সাধারণতঃ একটি বৎসরকে চারিটি প্রধান ঋতুতে ভাগ করেছে, যথা, গ্রীষ্ম, শরৎ, শীত ও বসন্ত। প্রতিটি কালের স্থায়িত্ব

হচ্ছে তিন মাসকাল। গ্রীষ্মকালে এ দেশে বেশী গরম বোধ করা যায় না (?) বলেই নিকিটিন মন্তব্য করেছেন।

নিকিটিন কালিকট থেকে পুনরায় দাবোলে ফিরে আসেন এবং সেখানে পৌঁছানোর পরই তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত করেন। দাবোল থেকে জলপথে অবমুস হয়ে পারস্যের মধ্যে দিয়ে অনেক দুঃখ-কষ্ট ও লাঞ্ছনা সহ্য করে তিনি ৪ঠা নভেম্বর ১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কাফিয়াতে (বর্ত্তমান সিয়োডোসিয়া) গিয়ে পৌঁছান।

নিকিটিন তাঁর স্বলিখিত বিবরণীর এইখানেই অতর্কিতভাবে সমাপ্তি টানেন, খুব সম্ভবতঃ এর পরই তিনি মারা যান।*

* [এই বিবরণীটি Count Wielhorsky কর্ত্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত নিকিটিনের ভ্রমণ কাহিনীর উপর ভিত্তি করেই লিখিত। উপরোক্ত ইংরেজী অনুবাদটি Mr. R. H. Major কর্ত্তৃক সম্পাদিত। "India in the Fifteenth Century"-তে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সংযোজিত হয়েছিল—লেখক]

ডুবুরি

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

ডুবে ডুব-সাঁতার কেটে
পাথার ঘেঁটে অগাধ জলে
আমি চাই মুক্তা মণি, সারাক্ষণই
হাতড়ে মরি কৌতূহলে,—
রত্নাকরের সেই অতলে।
অতলের তলাস্তিকে, শুক্তি বুকের মুক্তাটিকে
নয়নের প্রদীপ জেলে, যেথায় মেলে
আনবো পেলে সেই মাণিকে।
মুকুতার রশ্মিমালা,—সাগরের সেই গহ্বরে
তুলে তায় গাঁথবো মালা, বুকে তাই থাকবো প'রে
প'রে সেই সাতনরী হার রঙীন আশার রেশমি ডোরে।
রূপে তার জ্বালবো বাতি
সে-রূপের আলোয় মাতি
সে মণির এমনি অসীম দীপ্তি বলে—
তিমিরে বক্ষ চিরে লক্ষহীরে উঠবে জ্বলে।
আমার এই জীর্ণ তরী
বাইতে ডরি
অথৈ অচিন ঘূর্ণি জলে
শুধু এই মুক্তা ঘাটে
জীবন কাটে
অশ্রুজলে এই বিরলে।

পেয়েছি অনেক মণি
বর্ণ লালিম ডালিম-ভাঙা
এবে চাই চোখের মণি, বুকের মণি
রক্ত কমল রক্ত রাঙা,
আমার বুকের সুখের দুখের
জোয়ার ভাঁটার ভাঙন-ভাঙা।
আমি চাই একটি যেটি
পদ্মরাগের শ্রেষ্ঠতম,—
দোলাবো কণ্ঠহারের মধ্যমণি বক্ষে মম।

আজো তাই সন্ধ্যা বেলায়
এই অবেলায়
ডুবছি খালি, তুলছি বালি,
তবু হায়! ডুবছি যত উঠছি তত
অঞ্জলি মোর শূন্য খালি।

ঘরে তাই ফিরছি এখন
নিত্যি যেমন রিক্ত হাতে
নিয়ে যাই সেই ভাঙা মন
—তখন যেমন, এখন তেমন,
সেই না-পাওয়ার তিক্ততাতে।

চরক-সংহিতার কথা

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত

চরক ও সুশ্রুত সংহিতার চাইতে আয়ুর্বেদশাস্ত্রের প্রাচীনতম পুস্তক দেখা যায় না। চরক বলেন যে, যে-ইন্দ্রের হাতে আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রের ভাণ্ডার তা হতে তাঁর গুরু ভরদ্বাজ সে-শাস্ত্র শিক্ষা করেন। সুশ্রুত বলেন যে, ঐ ইন্দ্র হতেই তাঁর গুরু ধন্বন্তরি আয়ুর্বেদ শিখে-ছিলেন। সুতরাং এঁদের দু'জনের গুরু—ভরদ্বাজ ও ধন্বন্তরি—দুজনেই একই যুগের। এবং সেই সূত্র ধরে আশা হয় যে, চরক ও সুশ্রুত—দু'জনের কালের বেশী তফাৎ ছিল না। কিন্তু কিছু তফাৎ যে ছিল তার প্রমাণ আছে দু'জনের সংহিতায়। সুশ্রুত যেন কিছু পরবর্ত্তী কালের। কারণ, রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস আলোচনায় জানা যায় যে, সভ্যতার অনেকখানি উন্নতি হলে তবে মানুষ রোগ-চিকিৎসায় পারদের ব্যবহার করতে শিখেছিল। সুশ্রুতে পারদের ব্যবহারবিধি বর্ণিত হয়েছে। চরকে তা নেই। আধুনিক পণ্ডিতেরা গবেষণা দ্বারা স্থির করেছেন যে, চরকের কাল হ'ল এখন হতে প্রায় দুই হাজার বছর আগে।

চরকের কাল সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রবন্ধে এর বেশী জানার প্রয়োজন নেই। কারণ চরক-সংহিতা বইখানিতে কি আছে সেই সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মাবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা। এই পুস্তকের আয়তন বৃহৎ, ভাষা সংস্কৃত এবং বিষয়টি জটিল। সুতরাং এই সংহিতা জনসাধারণের সহজ আয়ত্তের বাইরে। মূলের বাংলা অনুবাদও সহজপ্রাপ্য নয়। তার সূচীপত্র পড়লে বিষয়বস্তুর অস্পষ্ট ধারণা জন্মে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা রোগ-চিকিৎসার অংশ বাদ দেব। অন্য অংশের একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা দেবার চেষ্টা করব।

২

আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র-পাঠকারীদের কাছে প্রাচীন আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রে যা সব চাইতে বিচিত্র মনে হবে তা হ'ল শরীর ভাল রাখার জন্য কি ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে হবে তার জন্য উপদেশ। চরক-সংহিতার অনেকখানিই এই জন্য নিয়োজিত হয়েছে। শরীর ভাল রাখাকে অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। শরীর ভাল রাখার জন্য সংচিন্তাপরায়ণ, শুদ্ধাখাদ্যভোজী, সচ্চরিত্র-সংযমী ও দেহমনে নির্ম্মল থাকার জন্য বিস্তৃত ও তথ্যপূর্ণ উপদেশ আছে। কালিদাসের ঋতুবর্ণনে ঋতুভেদে বসবাসের বিভিন্ন রকম উপদেশ আছে। কিন্তু তা কাব্যগন্ধী ও বিলাসীর চিত্তশান্তিকর। চরকের উপদেশ বিজ্ঞানের বিচারধারা সমর্থিত এবং মানুষের দেহমন, আত্মার মঙ্গলার্থে কীর্ত্তিত। স্বাস্থ্য ভাল রাখার উপদেশ-সম্বলিত আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তিতে লেখা বই আজকাল পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু তা সবই বস্তুতান্ত্রিক। মন, আত্মা ও ভগবৎভক্তির যে প্রয়োজনীয়তা সেখানে স্বীকৃত হয় নি যা চরকের সংহিতায় ঘন ঘন ও বিশিষ্ট স্থান পেয়েছে।

৩

শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মা—এই মিলে হ'ল আয়ুঃ। এই আয়ুর পক্ষে কি হিতকর, কি অহিতকর, কতখানি আয়ু, ও আয়ুর রকমটা কতখানি ভাল—এই সব যে শাস্ত্রে আছে তার নাম আয়ুর্বেদ।

এই শাস্ত্র রোগ-চিকিৎসার জন্য রোগের কারণের সন্ধান করে অতি সহজ যুক্তিতে, তাই রোগ চিকিৎসার পদ্ধতিও সহজ। রোগ হলে বুঝতে হবে, রোগীর দেহে কোন কার্য্য বা দ্রব্যের অভাব বা বৃদ্ধি হয়েছে। সুতরাং দ্রব্যও বা কর্ম্মে যা কম তা বেশী কর অথবা যতটা বেশী তা বাদ দাও।

কিন্তু আয়ুর্বেদের দ্রব্যের অর্থ খুব ব্যাপক—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতি এবং আত্মা, মন, কাল ও দিক্—সবই দ্রব্য। সংযোগ ও বিয়োগ হ'ল কর্ম্ম। এই সব কথা বিস্তৃত করে বলার পর চরক-সংহিতা দ্রব্যগুণের বিবরণ দিয়েছেন। মধু, দুগ্ধ-ঘৃতাদি, জীবদেহের নানা অংশ, অনেকরূপ ধাতু। লতা-গুল্মাদি, নানা প্রকার ফল, গাছের নানা অংশ বা নির্য্যাস, পাঁচ প্রকার লবণ, আট প্রকার মূত্র, আট প্রকার দুধ, তৈলাদি স্নেহপদার্থ—সবই চিকিৎসায় লাগে—তাদের নামের বিস্তৃত তালিকা, পরিচয় ও গুণবর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

এই বর্ণনা হতে জানা যায় যে, কোন কোন জিনিস স্বাস্থ্যের পক্ষে কোন দিক হতে কতখানি হিতকর। এবং শরীরে যার অভাব হয়েছে তা কোন পথে পূরণ হবে এবং যা বেশী হয়েছে তা সহজে কি ভাবে বর্জ্জন করা যায়। কিন্তু চরক যার-তার হাতে চিকিৎসাশাস্ত্র দিতে অনিচ্ছুক। তাঁর স্মৃতিবান, হেতু ও যুক্তিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয় ও প্রত্যুৎপন্নমতি হওয়া চাই।

৪

চরক শরীরের ভিতর ও বাহির পরিষ্কার রাখার জন্য নানারূপ উদ্ভিজ্জ ও ধাতব লবণ ব্যবহারের উপদেশ দিয়েছেন এবং সত্যই কোন চর্ম্মরোগ হলে তারও পরিত্রাণের উপায় বলেছেন। অন্তর

পরিষ্কারের উপায় বমি এবং মলত্যাগ করানো। কখনও তা বন্ধ করাও দরকার হয়। সবই আলোচিত হয়েছে খুব বিস্তৃতভাবে।

শরীর সুস্থ রাখার জন্য যে আহার করতে হবে তা যেন পরিমিত হয়। তবে যাঁর যেরূপ ক্ষুধা, তাঁর তেমন আহার চাই। রক্তশালী ও যেটে ধান, মুগ, লাব ও গৌরতিত্তিরি পাখী, কৃষ্ণসার, খরগোস, মস্ত সিংওয়ালা হরিণ, শাম্বর নামক হরিণবিশেষের মাংস প্রভৃতি সহজে হজম হয়। পিঠা, গুড়, দধি, ছানা, মাষকলাই, শূকর ও কাছিমের মাংস গুরুপাক। যিনি খাবেন তাঁর যদি হজম-শক্তি ভাল থাকে তবে সহজেই হজম হবে। ব্যায়াম দ্বারা যাঁর অগ্নিবল প্রবল তাঁর পক্ষে গুরুপাক দ্রব্যও কিছু বেশী খেলে অপকার আনে না। সুতরাং লঘু ও গুরুদ্রব্য—সবই উপযুক্ত মাত্রায় খেতে হবে।

পেটভরা থাকলে গুরুপাক চালের পিঠে ও চিড়ে কিছুতেই খাবে না। খিদে পেলে এসব জিনিস উপযুক্ত পরিমাণে খাওয়া যায়। শুকনো মাংস ও শাক, শালুক ও পদ্মের ডাটা, রোগা-পশুর মাংস, রান্না করা দৈ, শুকনো নষ্ট দুধ, শূকর, গো-মহিষের মাংস, মাছ, দৈ, মাষকলাই ও যবকনামক ধান সর্বদা খাবে না। যেটে ধান, শালি ধান, মুগ, সৈন্ধব, আমলকী, যব, বৃষ্টির জল (পরিশ্রুত জলের সমতুল্য) দুধ, ঘি, জংলাপশুর মাংস ও মধু রোজ খাওয়া যায়। এমন কিছু খাবে না যা রোগ নিয়ে আসতে পারে।

রাত্রে দৈ খাবে না। দিনেও ঘি, চিনি, মধু, মুগের যুষ বা আমলকীর রস না মিশিয়ে খাবে না। কেন এসব মেশাতে বলা হ'ল চরক তা বিস্তারিত বলেছেন।

৫

চক্ষের দৃষ্টির উপকারের জন্য চোখ হতে জলস্রাব করান ভাল। তার জন্য রাত্রে চোখে কাজল দেওয়া উচিত। কোন কোন মানুষের ভিতরটা রুক্ষ। নানা বস্তুর সংযোগে একটা শলা তৈরী করে তা হতে ধূমপান করলে রুক্ষ ব্যক্তি স্নিগ্ধ হয়। মাথা পরিষ্কারের জন্য অনুরূপ শলা তৈরী করতে হয়। স্নান, আহার, বমি, হাঁচি, মুখ-ধোয়া, নস্য নেওয়া, চোখে কাজল দেওয়া ও ঘুমের পর ধূমপান কর্তব্য। কারণ তখন বাতশ্লেষ্মা বেরিয়ে আসতে চায়। নানারূপ গন্ধ দ্রব্যাদি সহ তৈল পাক করে তা দিয়ে নস্য নিলে ত্রিদোষ কমে, ইন্দ্রিয়ের বল বাড়ে, মাথার অনেক রকম রোগ হতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

কটু, তিক্ত বা কষায় রসবিশিষ্ট কোন গাছের ডাল নিয়ে দাঁত দিয়ে তার অগ্রভাগ চিবিয়ে নেবে—তা দিয়ে এরূপে দন্ত ঘর্ষণ করবে যেন দন্তের মাড়ীতে আঘাত না লাগে। একবার সকালে, একবার সন্ধ্যায়—দিনে দু'বার দাঁত মাজবে। এ কাজে করঞ্জ, করবী, আকন্দ, মালতী, অর্জুন, ও অসন গাছের ডাল ভাল। সোনা, রূপা, তামা, সীসা ? বা পীতল দিয়ে জিবছোলা গড়াবে। জায়ফল, লতাকস্তুরীর ফল, সুপারী, লবঙ্গ, পান, কর্পূর, ছোট এলাচে মুখের দুর্গন্ধ যায়, আহারে রুচি হয়।

মাথায় তেল দিলে মাথাধরা, টাক, অকালপক্কতা, চুলওঠা হতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। চুল কাল হয়—ভাল ঘুম হয়। গায়ে তেল মাখলে শরীর স্নিগ্ধ ও তাজা থাকে।

স্নানে শরীর পবিত্র করে, আয়ু বাড়ায়। মালা ও গয়না পড়লে মনের আনন্দ ও আয়ু বাড়ে। জল ও মাটি দিয়ে দুই পা ও মলদ্বার ধুলে মেধা বাড়ে, দেহ-মন পবিত্র হয়ে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। চুল, দাড়ি ও নখ কাটলে এবং তাদের পরিষ্কার রাখলে পুষ্টি, আয়ু ও মনের পবিত্রতা বৃদ্ধি পায়। জুতা ও ছাতা ব্যবহার করলে পথ চলতে সুখ হয় এবং বল বাড়ে।

৬

অতঃপর চরক-সংহিতা শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত—এই ছয় ঋতুতে—কখন কি ভাবে থাকতে হবে যুক্তিসহ তার নির্দেশ দিয়েছেন। অতি সংক্ষেপে তার বিবরণ দিচ্ছি—

(ক) শীতকালে শরীরের পাচকাগ্নি ভিতরেই থেকে যায়। তাই তখন গুরুপাক দ্রব্য হজম হয়। তখন কাছিম, গো-গর্দ্দভাদির মাংস শিককাবাব করে খাবে। খাবার পর মধু ও মদ খাবে। যে ব্যক্তি শীতকালে ঘি, দুধ, গুড়, বসা, তৈল ও নূতন চাউলের ভাত ও গরম জল খায় তার আয়ু ক্ষয় হয় না। কাছিম ও মহিষাদির মাংস কফকর হলেও মহা অনিষ্টকর বাতবিকার নিবারণার্থ শীতকালে সেব্য। শীতকালে রাত্রে অগুরু-চন্দন-চর্চ্চিতাঙ্গী স্ত্রীকে যথেষ্ট উপভোগ করবে, দিনে নিদ্রা যাবে।

(খ) হেমন্তকালে গায়ে তেল ও হরিদ্রা মেখে, মাথায় তেল দিয়ে স্নান করবে, গায়ে একটু রোদ লাগাবে, চারদিকে যার ঘর আছে এমন ঠাণ্ডা ঘরে মোটা ফরাসে থাকবে, গুরু অথচ উষ্ণ বস্ত্র পারবে। এই ঋতুতে অল্লাহারে থাকবে না, বায়ুজনক এবং জল বা দুধে ভিজিয়ে ছাতু খাবে না।

(গ) হেমন্তকালের সঞ্চিত শ্লেষ্মাদি বসন্তকালে নানা পীড়া নিয়ে আসে। সুতরাং তখন শ্লেষ্মহর নানা রকম কাজ করবে। দুষ্পাচ্য কিছু খাবে না, দিনে ঘুমাবে না। ব্যায়াম করবে, গায়ে আমলকী ও হরিদ্রা বেটে মাখবে, চোখে কাজল দেবে এবং সুখোষ্ণ জলে স্নান করবে। যবের ছাতু, শরভ মৃগ, খরগোস, হরিণ, লাব ও চাতকপক্ষীর মাংস হিতকর। বসন্তকালে নবকিশলয়-কুসুম-সুরভিত-কানন ও যুবতী কামিনী উপভোগ করবে।

(ঘ) গ্রীষ্মকালে যিনি ঠাণ্ডা জলে মেখে ছাতু, জঙ্গলমৃগ ও পক্ষীর মাংস, ঘি, দুধ ও শালিধানের ভাত খান তিনি অবসন্ন হন না। এই সময় মদ খাওয়া ভাল নয়—নিতান্ত ছাড়তে না পারলে জল মিশিয়ে খাবে। স্ত্রী-সঙ্গম করবে না।

(ঙ) বর্ষাকালে জলে-গোলা ছাতু, দিবা-নিদ্রা, শিশির, নদীর জল, ব্যায়াম, রৌদ্র বর্জ্জন করবে। পানীয় ও ভোজ্য, ঘি, মশলা ও মধু মিশিয়ে খাবে। গাত্র মার্জ্জনা ও স্নান করে ধৌত পাতলা কাপড় পরে শুষ্ক স্থানে বাস করবে।

(চ) বর্ষায় সঞ্চিত পিত্ত শরৎকালে জেগে ওঠে। তখন

প্রখর সূর্য্যতাপে দেহ তপ্ত হওয়ায় পিত্ত প্রকুপিত হয়। তাই তার উপশমের জন্ত লঘু শীতল তিক্ত ও মধুর অন্নপান উপযুক্ত মাত্রায় খেতে হয়। তখন বসা, তেল, কাছিম ও মহিষাদির মাংস খাবে না। তখন স্নান খুব উপকারী। শরৎকালে ফুলের মালা ও নির্ম্মল কাপড় পরে সন্ধ্যাকালে চাঁদের আলো ভোগ করলে আয়ুর হিত হয়।

৭

বুদ্ধিমান ব্যক্তি মল, মূত্র, শুক্র, বায়ু, বমি, হাঁচি, উদ্গার, জৃম্ভা, ক্ষুধা, পিপাসা, অশ্রু, নিদ্রা ও শ্রমজনিত নিশ্বাসের বেগ ধারণ করবে না। কোনটিতে কি দোষ হয় চরক তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন।

কিন্তু বেগ ধারণ করা কর্ত্তব্য—লোভ, শোক, ভয়, ক্রোধ, দ্বেষ, মান, পরনিন্দা, নির্লজ্জতা, অত্যাসক্তি ও পরধন-বিষয়ক স্পৃহার। অতিরিক্তও কিছু করবে না, যেমন—ব্যায়াম, হাস্য, বক্তৃতা, কথাবার্ত্তা, বেড়ান, স্ত্রী-সঙ্গম ও রাত্রি-জাগরণ।

হেমন্তের সঞ্চিত শ্লেষ্মা চৈত্র মাসে, গ্রীষ্ম-সঞ্চিত বায়ু শ্রাবণ মাসে ও বর্ষা-সঞ্চিত পিত্ত অগ্রহায়ণ মাসে—বমন-বিরেচনাদি দ্বারা দূর করবে। কি কি ঔষধাদি দ্বারা এ সব হবে তার বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন।

৮

যাদের আচরণ, বচন ও মন পাপান্বিত ও যারা খল ও কলহ-প্রিয়, যারা উপহাস দ্বারা মর্ম্মে ব্যথা দেয়, লুব্ধ, পরশ্রীকাতর, শঠ, পরের অপবাদ রটায়, চঞ্চলমতি, রিপুসেবী, নির্দ্দয়, ধর্ম্মহীন সেই নরাধমদের সহবাস ছেড়ে দেবে। যাঁরা বুদ্ধি-বিদ্যাবয়স, সৎস্বভাব, ধৈর্য্য, স্মৃতি ও সমাধি দ্বারা উন্নত, যাঁরা বৃদ্ধদের সেবা করেন, বস্তুতত্ত্বজ্ঞ, শোকে অবসন্ন নন, যাঁরা সকলের প্রতি প্রসন্নবদন, যাঁরা প্রশান্তচিত্ত, ব্রহ্মচারী, সৎপথের উপদেষ্টা, পুণ্যকথা শুনতে ভালবাসেন, পুণ্য দর্শনে অভিলাষী, সর্ব্বদা তাঁদের সহবাস করবে।

এ সব পড়লে মনে হবে, এটি কি চিকিৎসাশাস্ত্রের বই নয়? এ কি ধর্ম্মশিক্ষার বই? চরিত্র ভাল রাখলে স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, রোগীর সংখ্যা বেশী হবে না, ঋষিরা ভাবতেন। এখনকার চিকিৎসা-শাস্ত্র এ দিক দিয়ে বড় যায় না। তাই দিন দিন রোগ ও রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। এত বেড়েছে ও আরও বাড়ছে যে, এত চমকপ্রদ আধুনিক ঔষধাদি ব্যবহার করেও রোগীর সংখ্যা কমান যাচ্ছে না। তাই দিন দিন আরও বেশীসংখ্যক মানুষের দুঃখ বেড়েছে।

৯

চরক সংহিতা আরও অনুসরণ করছি—

প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালে স্নান, আচমন ও উপাসনা করবে, পরিচ্ছন্ন থাকবে; এক পক্ষের মধ্যে তিনবার চুল দাড়ি কামাবে ও নখ কাটবে। ছেঁড়া কাপড় পরবে না, নিত্য মালা গলায় দেবে, সুন্দর বেশভূষা করবে। দীন-দরিদ্রদের দান করবে, পরস্ব অপহরণ করবে না।

বালিশ ছাড়া শোবে না। পাপাচরণশীল স্ত্রী, মিত্র ও ভৃত্যকে পরিত্যাগ করবে। নীচ লোকের উপাসনা করবে না, উত্তম ব্যক্তির বিরোধী হবে না। স্নান না করে, কাপড় না ছেড়ে, মুখ না ধুয়ে, উত্তর মুখে বসে খাবে না।

স্ত্রীকে অবজ্ঞা করবে না, সম্পূর্ণ বিশ্বাসও করবে না এবং কোন গুহ্য কথাও শোনাবে না। তাঁকে সর্ব্বেসর্ব্বা করবে না। অধীর হবে না, উদ্ধতমনাও হবে না। পোষ্যপরিপালক হবে।

শোকের বশীভূত হবে না। অভিষ্টকার্য্যের সিদ্ধিতে অতি হর্ষ এবং অসিদ্ধিতে অতি বিষাদ প্রদর্শন করবে না। শুচি হয়ে হোম করবে। তৎপর নিম্নলিখিত বাক্যে নিজেকে আশীর্ব্বাদ করবে—অগ্নি যেন আমার শরীর হতে না যান। বায়ু প্রাণ, বিষ্ণু বল, ইন্দ্র বীর্য্য ও জল কল্যাণ আমার দেহে প্রবিষ্ট করুন।

১০

ভিষক, দ্রব্য, পরিচারক ও রোগী—এই চারের সহযোগ কার্য্যকরী হলে তবে রোগ সারে। ধাতুদিগের বৈষম্য হ'ল রোগ, আর সমতা হচ্ছে আরোগ্য—তারই অপর নাম প্রকৃতি।

বৈদ্যের চাই শাস্ত্রে নির্ম্মল জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, চিকিৎসায় দক্ষতা ও আত্মপবিত্রতা।

দ্রব্য চাই প্রচুর ও গুণবিশিষ্ট। পরিচারকেরও গুণ চাই—যেন নানা পথ্যাদি তৈরি করতে জানেন, রোগীকে আরাম দিতে পারেন এবং তার প্রতি অনুরাগী হন। রোগী যেন পূর্ব্ব কথা স্মরণ করতে পারেন, বৈদ্যের কথা শোনেন, রোগে ভীত না হন এবং নিজের রোগ বৈদ্যকে বুঝিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু বিচার করলে দেখা যাবে যে, রোগ-চিকিৎসায় বৈদ্যই প্রধান। বৈদ্য যদি সুচিকিৎসক না হন তবে দ্রব্য, পরিচারক ও রোগী কেউই কোন কাজে লাগবে না।

রোগের হেতু, লক্ষণ, প্রশমনের উপায় এবং যাতে পুনরাক্রমণ না হয়—এই সব বিষয় যাঁর জ্ঞান আছে তিনিই শ্রেষ্ঠ বৈদ্য। কিন্তু সেই বৈদ্যের প্রকৃতি যদি দুষ্ট হয় তবে সব শাস্ত্রই বৃথা। সুতরাং সদ্গুরুর উপাসনা দ্বারা আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করে বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করতে হবে।

বিদ্যা, বিতর্ক, বিজ্ঞান, স্মৃতি, তৎপরতা, ক্রিয়া, এই ছয়টি গুণ যাঁর আছে, তাঁর চিকিৎসায় সাধ্যব্যাধি কখনও অসাধ্য হয় না। বিদ্যা, মতি, কর্ম্মদৃষ্টি, অভ্যাস, সিদ্ধি ও সদগুরুর আশীর্ব্বাদ যিনি পেয়েছেন তিনিই যথার্থ বৈদ্যপদবাচ্য হয়ে থাকেন। আর্ত্ত ব্যক্তি-দিগের প্রতি মিত্রভাব ও কারুণ্য, সাধ্যরোগের চিকিৎসায় আসক্ত এবং আসন্নমৃত্যু ব্যক্তিদিগের চিকিৎসার ভার বহন না করা—এ সকল হ'ল বৈদ্যবৃত্তি।

১১

প্রতি সুস্থ পুরুষের তিনটি বাসনা থাকা চাই। প্রাণ, ধন ও পরলোকের সুখশান্তি। প্রাণ ত্যাগে সব যায়, সুতরাং সুস্থ জীবন চাই-ই। ধনহীন ব্যক্তির দীর্ঘ জীবন গুরুতর পাপ। সুতরাং ধনোপার্জ্জনের বিশেষ চেষ্টা করবে। পরলোক আছে কি না, অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব সত্ত্বেও এই সন্দেহ পরিহার যে কর্ত্তব্য, তা বিস্তৃতভাবে চরক আলোচনা করেছেন এবং পরলোক ও পুনর্জন্মের কালে সুখী হবার জন্ত পরামর্শ দিয়েছেন—গুরুজনের সেবা, পড়াশুনা, ব্রতচর্চ্চা, বিবাহ, পুত্রোৎপাদন, ভৃত্যপালন, অতিথিসেবা, দান ও তপস্তা করবে।

১২

ভিষক তিন রকম। ছদ্মচর, সিদ্ধসাধিত ও বৈষ্ণগুণযুক্ত। বৈষ্ণ নয় অথচ বৈষ্ণের ভেক ধরে বেড়ায়, তারা ছদ্মচর; সিদ্ধসাধিত ভিষকেরা মূর্খ, তারা শ্রী, যশঃ, জ্ঞান ও কার্য্যসিদ্ধি প্রভৃতিতে শুন্য-শূন্ত। তাঁরাই বৈদ্যগুণযুক্ত যাঁরা ঔষধ প্রয়োগে, শাস্ত্রজ্ঞানে ও লোকব্যবহারে সুপ্রতিষ্ঠিত ও আরোগ্যপ্রদ।

১৩

এর পর চরক ক্রমশঃ শরীরের নানা অবাঞ্ছিত অবস্থার আলোচনা করে তার উপশমের উপায় বর্ণনা করেছেন। এই ভাবে আলোচনা করে করে অনেক পরে ঔষধ দ্বারা চিকিৎসার অধ্যায়ে উপনীত হয়েছেন। এ সব এই প্রবন্ধের উপজীব্য নয়। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হ'ল, পাঠকের সঙ্গে চরক সংহিতার কিছু পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

'ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ'—এই আদর্শে যাতে মানুষ মঙ্গলজনক জীবন-যাপন করে, চরকের তাই অভিপ্রায়। তাই রোগ চিকিৎসার চাইতে এই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মন ও শরীরকে সুস্থ ও নির্ম্মল রাখার জন্ত যুক্তিপূর্ণ উপদেশই বেশী।

কিন্তু আজ-কালকার মানুষে নিয়ত কর্ম্মব্যস্ত—তাই এখন চরকের অনেক উপদেশ পালন করা সহজ হবে না—তবু চরকের উদ্দেশ্য যদি জানা থাকে এবং তা ভাল লাগে তবে প্রয়োজনানুসারে মানুষ তার সারতত্ত্ব অনুসরণ করতে পারবেন।

১৪

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র প্রাচীনকালে যেখানে ছিল, আজ আর সেখানে নেই। দিন দিন কবিরাজেরা (তাঁদের মধ্যে অনেকে আধুনিক ডাক্তারী পাশ) আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও ঔষধ নিজেদের শাস্ত্র ও চিকিৎসার কুক্ষিগত করে বর্ত্তমান আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রকে অধিকতর উপযোগী করে তুলেছেন।

তবু কেমন করে মানুষ সুন্দর জীবন-যাপন করবে তাই তাঁদের চিরদিনের ধ্যান ছিল, এখনও তাই আছে। পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান এদিকে আগে তত মনোযোগী ছিল না। এখন সেদিকে তারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

মুহূর্ত্ত

শ্রীশ্বেতকুমার মুখোপাধ্যায়

সেদিন তখনো সন্ধ্যা নামেনি গেরুয়া নদীর কূলে,
তোমার তরণী ভেড়েনি আমার বালুকা-ছড়ানো তীরে,
আমি বসে শুধু ঢেউ গুণে গুণে বারবার গেছি ভুলে,
বারবার শুধু আনমনা হই, শুধু চাই ফিরে ফিরে।
হয়ত ভেবেছি অনেক কথাই, গেয়েছি অনেক গান,
সেদিন তখনো আমার সে বেলা হয়নিক' অবসান।

দিনের ক্লান্ত পাখীরা চলেছে ডানা দুইটিরে টানি'
ওপারের মেয়ে জল নিয়ে যায় এপারের কথা জানি।
কারা ঘরে ফেরে, কারা ফেরে নাকো—দাঁড়ায় পথের বাঁকে,
যাযাবর কোন পথিকের হিয়া কি জানি সে কারে ডাকে!
সে ডাক আমারে করে উন্মনা তোমারেও ডেকে আনে,
সেদিনের সেই সন্ধ্যার নদী সেই কাহিনীটি জানে।

আকাশ দেখেছে গোধূলি-ধূসর সেদিনের ক্ষণটিরে
যে-ক্ষণে তোমার তরণী ভিড়িল আমার এ-বেলা তীরে।

শিল্পী চিত্রনিভা চৌধুরী

শ্রীগৌতম সেন

আজ এই প্রচারের যুগে গুণাগুণের বিচার করা কঠিন। তাই এমনও দেখা গিয়াছে, অনেক গুণিজন অপরিচয়ের অন্ধকারেই রহিয়া গেলেন—প্রকাশের সুযোগই পাইলেন না। শ্রীমতী চিত্রনিভা চৌধুরীর নাম তেমনি প্রায় অজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে। যতটা খ্যাতি তাঁহার পাওয়া উচিত ছিল তাহা পাইলেন কোথায়? চিত্রনিভা জাত-শিল্পী। সুন্দরের পূজারি, সুন্দরের সাধনাই তিনি সারাজীবন করিয়া গেলেন। তাঁহাকে জানিলাম আর্টিষ্ট্রি-হাউসে, তাঁহার একক চিত্র-প্রদর্শনীতে। দেখিলাম এ জগতে তিনি সত্যই একা। জীবনকে প্রত্যক্ষ না করিলে এমন 'স্কেচ' শিল্পীর হাতে ধরা দেয় না। তেমনি দেখিলাম, প্রকৃতির কোলে একটি উচ্ছল দুলালী মেয়ে। প্রকৃতির সহিত এতটা অন্তরঙ্গতা না থাকিলে প্রকৃতিকে আঁকা যায় না। শ্রীমতী চিত্রনিভার এই বৈশিষ্ট্যই তাঁহাকে স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছে। জীবন ও প্রকৃতির অন্তরঙ্গ দিকটাই তাঁহার চিত্রপটে প্রভাসিত। এই একক প্রদর্শনীতে তাঁহার যে ছবিগুলি দেখিলাম, তাহা তাঁহার সমগ্র জীবনের পরিচয়। তাঁহার প্রতিটি কাজ নিখুঁত। জীবনের বিচিত্র ধারা বিচিত্র চরিত্র তাঁহার স্কেচে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। তাঁহার আলপনা-আঁকা হাত এত সহজে যে লীলায়িত হইতে পারে ইহা না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন। আঁকিবার এই সরল ভঙ্গীটিই মানুষের মনকে এত কাছে টানিয়াছে।

তবে চিত্রনিভা এক হিসাবে ভাগ্যবতী, তিনি শান্তিনিকেতনে থাকিবার সুযোগ পাইয়া কবিগুরুর স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ পাইয়াছিলেন। বাল্যকাল তাঁহার মাতামহের কাছে জিয়াগঞ্জে (মুর্শিদাবাদ) কাটিয়াছে। তখন হইতেই দেখা যাইত, অন্য বালক-বালিকার সহিত তাঁহার প্রকৃতি স্বতন্ত্র। অন্যেরা খেলা ভালবাসিত, খেলা লইয়াই থাকিত—চিত্রনিভার মন পড়িয়া থাকিত গঙ্গাতীরে। এই গঙ্গার ধারটি তাঁহার এত মনোরম মনে হইত যে যখন-তখনই তিনি আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। যেন সাধক আসিয়া বসিয়াছেন সাধনার পীঠক্ষেত্রে।

এই বালককালেই তাঁহার বিভিন্ন দেশ দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। পিতা ছিলেন গোমোর (মানভূম) চিকিৎসক। এই গোমোয় আসিয়া তিনি প্রকৃতির নূতন রূপ দেখিলেন। পাহাড় দেখিয়া তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেলেন। সারাদিন মহুয়া বনে কাটাইতে কি অপূর্ব্বই না লাগিত। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর তাঁহাকে গোমো পরিত্যাগ করিতে



হেমলতা ঠাকুর

হইল। ইহার পর তাঁহাকে কিছুদিন কাটাইতে হইয়াছে পৈতৃকভূমি চাঁদপুরে (ত্রিপুরা)। এ বাড়ীটিও ছিল মেঘনা নদীর তীরে। মেঘনা দেখিয়া তাঁহার নূতন করিয়া গঙ্গার কথা মনে পড়িল। গঙ্গাই যেন ফিরিয়া আসিয়াছে মেঘনার রূপ ধরিয়া। মেঘনা ছিল পাগলা নদী। কিন্তু প্রকৃতির নানা বৈচিত্র্যে শিল্পী-মন উতলা হইয়া উঠিল। এই নানা রংকে শিল্পী তুলির আখরে ধরিয়া রাখিলেন। বিবাহের পর তিনি গেলেন লামচর নোয়াখালিতে। স্বামীর উৎসাহে তিনি আবার নূতন করিয়া অনুপ্রেরণা লাভ করিলেন। এই সময় তাঁহার শান্তিনিকেতনে আসিবার সৌভাগ্য হয়।

এই পরিবেশই তিনি চাহিয়াছিলেন। শান্তিনিকেতনের স্বপ্ন তাঁহার আবাল্য ছিল। শান্তিনিকেতনে গঙ্গা-মেঘনা ছিল না বটে, কিন্তু ছিল মনোরম পরিবেশ, সঙ্গীতের স্বতোৎসারিত আনন্দ-নির্ঝর।



জ্যোৎস্না প্লাবিত মাঠ

প্রথম জীবনে গঙ্গা ও মেঘনার আত্মীয়তার পরে এই অন্তরঙ্গতা তাঁহার জীবনকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিল। প্রকৃতি যেন শান্তিনিকেতনে বিশেষ করিয়া ধরা দিয়াছে। এই বিশেষ রূপটিই তিনি তুলির টানে ধরিয়া রাখিয়াছেন। ছবির পর ছবি—যেন ছবির মালা গাঁথিয়া চলিয়াছেন। এ যেন আবিষ্কার। শান্তিনিকেতনকে এমন করিয়া আর কেহ দেখিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

কলাভবনে পাঁচ বৎসর শিক্ষা করিয়া চিত্রনিভা নোয়াখালিতে স্বামীর কাছে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু ফিরিয়া আসিলেও শান্তিনিকেতন হইতে তাঁহার বার বার ডাক আসে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে নূতন পথ দেখাইয়া দিলেন। তাঁহার নির্দেশে গ্রামোন্নতির বিবিধ দিক তিনি চিত্রে রূপায়িত করিয়াছেন। ছবি আঁকা ছাড়াও শান্তিনিকেতনের চারু-শিল্পেও তাঁহার দান কম নয়। তাঁহার জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় দিন হইল যেদিন তিনি রাজঘাটে গান্ধী-মণ্ডপে 'আলপনা' আঁকিবার জন্য আমন্ত্রিত হন। এই 'আলপনা' আঁকিতে তিনি প্রাণ-মন যেন ঢালিয়া দিয়াছেন। তাঁহার চিত্র-জীবন সার্থক হইয়া উঠিয়াছে, ধন্য হইয়াছে।

চিত্রনিভার 'পেনসিল স্কেচ'গুলিও অপূর্ব্ব। বহু মনীষীর ছবি এই পেনসিলের রেখায় তিনি ধরিয়া রাখিয়াছেন। এদিক দিয়া এই ছবিগুলির একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে। এরূপ দুইখানি স্কেচ আমরা 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করিয়াছি। আমরা এবারেও তাঁহার চিত্র প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত একখানি উৎকৃষ্ট পেনসিল-স্কেচ এবং একখানি রঙীন চিত্রের প্রতিলিপি প্রকাশ করিলাম।

'শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘ'—এই প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়া সত্যই শিল্পীকে সম্মানিত করিলেন এবং দেশবাসীও তাঁহাকে জানিবার সৌভাগ্যলাভ করিল। শিল্পীর নিকট আমরা বহু কিছু আশা করি। কারণ তাঁহার দেবার এখনও অনেক আছে।

একদিন

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

কখনো চাইনি ঐ চোখে।
চলতে-ফিরতে দেখা,
তবুও নিচু ঘাড়
ছিল যেমন—তেমনি
রেখেছি চোখ।
ভুলেও আকাশ দেখিনি
—ঐ চোখ।

ফোটে ফুল—গোলাপ, টগর, হাসনুহানা
—রঙবাহার
দেখিনি—ফুল দেখি না—
নীল আকাশ।

দেখি—ঝড়
ডানাভাঙা পাখি,
নদী—মাতাল, উথালপাথাল,
শুনি—কান্না
একটানা দীর্ঘশ্বাস
আর হাপরের শব্দ।

তবু
হঠাৎ একদিন—
(প্রায়ই দাঁড়ায়—আজও দাঁড়িয়েছিল পাশে
সে দাঁড়িয়েছিল আলুথালু কেশ)
আচমকা চেয়েছিলুম চোখে—ঐ চোখে
যে-চোখে তখন
ক'ফোঁটা অশ্রু
মুক্তোর মত কাঁপছে।
আকাশও দেখেছিলুম—
সেদিন ঘোমটা-খোলা চাঁদ।

পাড়াগাঁয়ের কথা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

"প্রবাসী"র পাঠক-পাঠিকারা জানেন যে, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর হুগলী জেলার আঁটপুর গ্রামে বাবুরাম ঘোষের (স্বামী প্রেমানন্দ) বাটীর প্রাঙ্গণে সন্ধ্যার সময়, প্রজ্বলিত ধুনীর সম্মুখে নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) অন্তরঙ্গ আটজন সঙ্গীসহ সন্ন্যাসধর্ম্মগ্রহণের চরম সঙ্কল্প করেন। এই পবিত্র দিনটি স্মরণার্থে গত কয়েক বৎসর হইতে ২৪শে ডিসেম্বর, আঁটপুরে উক্ত স্থানে একটি উৎসবের আয়োজন হয়। বাবুরাম ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শান্তিরাম ঘোষ কর্ত্তৃক সঙ্কল্পগ্রহণের স্থানটিতে একটি প্রস্তরফলক স্থাপিত হইয়াছে। বেলুড়মঠের একজন মহারাজ এই উৎসবে পৌরোহিত্য করেন; এবং এই উৎসবে বহু ভক্তের সমাগম হয়। এই বৎসরও ২৪শে ডিসেম্বর ঐ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, এবং "উদ্বোধন" সম্পাদক স্বামী নিরাময়ানন্দজী মহারাজ পৌরোহিত্য করেন। এই বৎসরের উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল এবং বহুজনের সমাগম হইয়াছিল। উৎসব উপলক্ষে আঁটপুরে আসিয়াছি। কিন্তু এখানে আসিয়া কি দেখিলাম ?

এ অঞ্চলে ধানের ফসল মাঝামাঝি রকমের হইয়াছে। গত দুই বৎসরের তুলনায় ভালই বলিতে হইবে। কিন্তু এই ভালোর কোনও অর্থ নাই। যাঁহাদের জমি একটু বেশী আছে তাঁহারা উপকৃত হইতে পারেন, যাঁহাদের জমি অল্প তাঁহাদের বিশেষ উপকার হইবে না। যাঁহারা ভূমিহীন শ্রমিক তাঁহাদের দুঃখদুর্দ্দশা ঘুচিবে না। নূতন ধানের দাম ১৩।১৪ টাকা মণ, নূতন চাউলের দাম ২২।২৩ টাকা মণ। শ্রমিকের দৈনিক মজুরী এক টাকা চারি আনার মধ্যে; অর্থাৎ মোটামুটি দুই সের চাউলের মূল্য। ইহা হইতেই অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা, বাসস্থান, শিক্ষা, লোকলৌকিকতা প্রভৃতির যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে। সুতরাং পল্লী-অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থার সাধারণ পরিচয় ইহা হইতে পাওয়া যাইবে। একটি পরিবারের হিসাব দিতেছি :

একটি কৃষক-পরিবারের সাংসারিক আয়-ব্যয়ের হিসাব নিয়ে দিলাম :

(১) কৃষকের নাম : নকুড়চন্দ্র সাঁতরা, গ্রাম ও পোঃ আঃ আঁটপুর, জেলা হুগলী।

(২) পরিবারের সংখ্যা : পূর্ণবয়স্ক সাত জন, অল্পবয়স্ক একজন। মোট আট জন।

(৩) ভাগচাষের জমির পরিমাণ : ১৩।১৪ বিঘা। বেশীর ভাগ জমিতে কেবল ধান চাষ হয়। ২।৩ বিঘা জমি পাট ও আলু চাষের যোগ্য। মোটামুটি সে ত্রিশ মণ ধান, অর্থাৎ কুড়ি মণ চাউল পাইতে পারে। তাহার দৈনিক খরচ ভাত ও মুড়িতে প্রায় পাঁচ সের চাউল। সুতরাং মাসিক প্রয়োজন প্রায় চারি মণ চাউল। কুড়ি মণ চাউলে তাহার বৎসরে পাঁচ মাসের মাত্র খোরাকী হয়। অবশিষ্ট সাত মাসের খোরাকের চাউল এবং জীবনধারণের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সংস্থান অল্পপরিমাণ জমি হইতে উৎপন্ন পাট, আলু ও তরিতরকারী বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে করিতে হয়। কিন্তু তাহা দ্বারা সাত মাসের খোরাক, অর্থাৎ আটাশ মণ চাউল, মোটামুটি ২৮ × ২০ = ৫৬০৲ টাকা পাওয়া যায় না। ইহা ছাড়া, বস্ত্র, চিকিৎসা এবং সংসারের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য (ডাউল, তৈল, মসলা প্রভৃতি), লোকলৌকিকতা প্রভৃতি আছে। সুতরাং, এইরূপ পরিবার কি ভাবে দিনাতিপাত করিতেছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। পরিসংখ্যানের কোনও প্রয়োজন হয় না। পল্লী-অঞ্চলে নকুড়ের সংখ্যাই অধিক।

গত দুই বৎসর অজন্মার জন্য প্রায় প্রত্যেকেই ঋণগ্রস্ত হইয়া আছে। ধানের ফসল বিক্রয় করিয়া ঋণ শোধ করিতে হইবে।

সংসারের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য এইরূপ :

নূতন চাউল	৸৴০ আনা সের
মসুর ডাউল	৸০ "
মুগ ডাউল	৸৶০ "
ছোলা	৷৷৴০ "
সঃ তৈল	২৲ "
নাঃ তৈল	৩৲ "
ঘৃত (সাধারণ)	৬।০ "
বনস্পতি	২৷৷০ "
চিনি	১।০ "
গুড় (দেশী)	৷৷৴০ "
গুড় (ভেলী)	৷৷০ "

আলু	॥০	,,
বেগুন	।৶০	,,
মাছ	২॥০	,,
মূলা	৵০	,,
পালং শাক	৵০	,,
সীম	॥০	,,
পেঁয়াজ	।৶০	,,
ফুল কপি ১টি	॥০-॥৶০	
সুপারি	৬৲	,,
চিঁড়া	১৲	,,
নূতন ধান	১৪৲	মণ
কয়লা	২৲	,,

শীতকালীন সব শস্যই এখন মাঠে ; আলু, কপি, বিলাতী বেগুন, অন্যান্য শাকসব্জী প্রভৃতি খুবই "নাবী" হইবে। স্থানীয় ফসল এখনও বাজারে আসে নাই। শেষ পর্য্যন্ত এই সকল ফসলের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা সঠিকভাবে এখনও বলা যাইবে না। তবে সেচের অভাব হইবে না। এ অঞ্চলে রবিশস্যের চাষ সাধারণতঃই কম।

খেজুর গুড় স্থানীয় অর্থনীতিতে বিশেষ স্থান অধিকার করিত। কিন্তু বর্ত্তমানে দেখিতেছি, খেজুর গুড়ের উৎপাদন নাই বলিলেই চলে। আমার অঞ্চলে কেহই গাছ "কাটে" নাই। এইরূপ অনেক পুরাতন শিল্পের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। দেশে বাঁশ নাই বলিলেই চলে। এমনকি ইহার ফলে মৃতদেহ সৎকারের অতিশয় অসুবিধা ঘটিয়াছে। ছাড়া গোরু বাছুরের আক্রমণ নিবারণের জন্য, শাকসব্জীর বাগানে বেড়া দিবার জন্য প্রয়োজনীয় বাঁশও পাওয়া যাইতেছে না।

চারিদিকেই দারিদ্র্য পরিস্ফুট। দারুণ শীত, বলিতে গেলে কাহারও গাত্রাবরণ নাই। একদা সমৃদ্ধ পরিবারের লোকেরা যেরূপ শীতবস্ত্র ব্যবহার করিতেছে দেখিলে বিশ্বাস হয় না। পরিধানের বস্ত্র নাই ; গাত্রবস্ত্র কোথা হইতে জুটিবে। এইরূপ অনেক অভাবের উদাহরণ দেওয়া যায়। তবে ভরসার কথা এই যে, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য ব্যাধির প্রকোপ নাই। কিন্তু পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, সকলেরই স্বাস্থ্য জীর্ণশীর্ণ।

শিক্ষাসঙ্কট এখনও চলিতেছে। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে লিখিয়াছি। স্থানীয় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব আগের মতই আছে। সুতরাং স্কুলের সম্পাদক হইয়াও বলিতেছি, ইহার ফলে ছেলেদের লেখাপড়া সুষ্ঠুভাবে হইতেছে না। কংগ্রেস বা অন্য কোনও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের গঠনমূলক কার্য্যের কোনও নিদর্শন দেখিতে পাইলাম না। ঝগড়া, বিবাদ, দলাদলি প্রভৃতিতে গ্রামাঞ্চল ক্ষতবিক্ষত ; নেতৃত্বের চরম অভাব। সকলেই নেতা।

এই পর্য্যন্ত লিখিবার পর, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু এলাহাবাদের খাগা নামক গ্রামে, লক্ষাধিক কিষাণদের এক সমাগমে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা পড়িলাম। তিনি বলিয়াছেন, তিনি অত্যন্ত দুঃখবোধ করেন, যখন তিনি দেখেন গ্রামের বালক-বালিকারা খাদ্য, বস্ত্র ও শিক্ষার উপযুক্ত সুযোগ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন, আজিকার শিশুরাই আগামীকালের নেতৃত্বের স্থান অধিকার করিবে। সুতরাং তাহাদের সুস্থভাবে গড়িয়া তোলাই দেশের প্রধান সমস্যা। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এই কথার সহিত কাহারও মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। কিন্তু এই সমস্যার সমাধানের জন্য সর্ব্বাঙ্গীণ ও ব্যাপকভাবে কোনও পরিকল্পনা আজ পর্য্যন্ত গৃহীত হয় নাই। রাষ্ট্র এবং সমাজ এ সম্বন্ধে যেন মোটামুটি উদাসীন। অবশ্য বিক্ষিপ্তভাবে "ছিটেফোঁটা" কাজ হইতেছে। সেই জন্য প্রধানমন্ত্রীর নিকট বিনীত নিবেদন, তিনি তাঁহার কথা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করুন। তিনি ইচ্ছা করিলেই ইহা করিতে পারেন।

শ্রীজহরলাল নেহরু আরও একটি খাঁটি সত্য কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "কৃষকেরা আত্মনির্ভর হইয়াছে। কিন্তু সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনাকে রূপদান করার জন্য যে সকল পদস্থ কর্ম্মচারী নিযুক্ত রহিয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্যে শৈথিল্য ও নিষ্ঠার অভাব লক্ষ্য করিয়া তিনি অত্যন্ত মনোবেদনা অনুভব করেন। তাঁহারা আপিসের ফাইলাদি কাগজপত্র "দুরস্ত" রাখিতে অত্যন্ত ব্যস্ত ; এবং তাঁহারা মনে করেন, কৃষকদিগের উপর প্রভুত্ব করাই যেন তাঁহাদের প্রধান কার্য্য।" নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি, প্রধানমন্ত্রীর কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। প্রধানমন্ত্রী এ কথা পূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছেন ; কিন্তু এই সমস্যারও সমাধান কি ?

ধলভূম

শ্রীপ্রবুদ্ধনাথ চট্টোপাধ্যায়

বিহারে সিংভূম জিলায় ধলভূম একটি মহকুমা। ধলভূমের আয়তন ১,১৬০ বর্গমাইল। সিংভূমে আরও দুইটি মহকুমা আছে—একটি হইল সিংভূম সদর, অপরটির নাম সেরাইকেলা। বিহারের অপরাপর অংশের সহিত ধলভূমের সংযোগ হইল উত্তরে মানভূম দিয়া, পশ্চিমে সেরাইকেলা দিয়া আর ঈষৎ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত সিংভূম সদর দিয়া।

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এখনকার স্থায় পূর্ব্বেও সিংভূম এককভাবে বিহারের একটি সম্পূর্ণ জিলা হইলেও, তাহার দুইটি অঞ্চল সদর এবং ধলভূমের পরস্পরের সহিত বিহারের মধ্য দিয়া সরাসরি কোন সংযোগ পূর্ব্বে ছিল না; মাঝখানে পড়িত সেরাইকেলা এবং তৎসংলগ্ন খারসোয়ান, এই দুইটি দেশীয় রাজ্য। দুইটি অঞ্চল ভৌগোলিক হিসাবে একেবারে অসংলগ্ন হইলেও কেবল তাহাদের দুইটিকে লইয়া উদ্ভটরূপে একটি জিলা গঠন করা হইয়াছিল। স্বাধীনতা লাভের পর সেরাইকেলা আর খারসোয়ানকে মিলাইয়া সেরাইকেলা মহকুমা করিয়া বিহারে ঢুকান হইলে তবেই সদর সেরাইকেলা আর ধলভূম পাশাপাশি এই তিন মহকুমা দিয়া সিংভূমের দ্বিধাবিভক্ত আকার বর্ত্তমানে একীভূত করিতে পারা গিয়াছে।

সিংভূম জেলা বিহারের ছোটনাগপুর বিভাগের অন্তর্গত। বর্ত্তমানে বিহারের বিভাগ হইলেও ছোটনাগপুর বরাবরই তাহা ছিল না। ১৯১২ সনে বিহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা লইয়া এক পৃথক প্রদেশ গঠিত হয়,—তৎপূর্ব্বে বর্ত্তমান বিহার রাজ্যের সমগ্র আয়তন বাংলাদেশের সহিত একত্র ছিল। ইংরেজ আমলের সেই বিরাট একত্রিত মিশ্রিত প্রদেশে বিহারের এমন কোন স্বতন্ত্র সংজ্ঞা বা অস্তিত্ব ছিল না যাহার দ্বারা বলা যাইতে পারে যে, তৎকালে ছোটনাগপুর বিহার নামক কোন স্থানের অন্তর্গত ছিল। বরঞ্চ সমগ্র বৃহৎ প্রদেশকে বাংলাদেশ বলিয়াই ধরা হইত—প্রদেশের শাসনকর্ত্তাকে বলা হইত লেফটেনাণ্ট গবর্ণর অব বেঙ্গল (Lieutenant Governor of Bengal)—বিহার কথাটির উল্লেখ তাহাতে ছিল না। এই হিসাবে ছোটনাগপুরকে তখন বিহারের বিভাগ না বলিয়া প্রকৃতপক্ষে বাংলার বিভাগ বলা যাইতে পারিত।

১৯১২ সনে পৃথক প্রদেশ গঠিত হইবার পরেও, ইংরেজ আমলে বরাবর—বর্ত্তমানে যাহা বিহার রাজ্য, তাহাকে বিহার ও ছোটনাগপুর নামে অভিহিত করিয়া ছোটনাগপুরের একটি পৃথক সংজ্ঞা ও অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ছোটনাগপুর আর বিহারে প্রকৃতপক্ষে এক অখণ্ড অস্তিত্বই নাই—অনিবার্য্য ভাবে ছোটনাগপুর বিহারের অংশ নহে—তাহা আসল বিহার নহে।

বর্ত্তমান ছোটনাগপুর বিভাগের পূর্ব্বাঞ্চল মানভূম ও ধলভূমের সহিত বিহারের ঐতিহাসিক সম্বন্ধ আরও ক্ষীণ—১৯১০ সন পর্য্যন্ত মানভূম ও ধলভূমের আইন-আদালত বাঁকুড়া জেলার এলাকাভুক্ত ছিল।

সুবর্ণরেখা নদীর উপত্যকাভূমি ধলভূম। উত্তরে তাহার পর্ব্বত-শ্রেণী, দক্ষিণে তাহার রুক্ষ টিলা বা ক্ষুদ্র গিরিকন্দর খচিত উচ্চভূমি—মাঝখান দিয়া বাংলা দেশেরই সমতল ভূমি প্রসারিত হইয়া ধলভূমের সমভূমি গঠন করিয়াছে। এই সমভূমি পশ্চিমে অতি ধীরে উন্নত হইয়া ক্রমে ছোটনাগপুর মালভূমি বা Plateauতে মিশিয়া গিয়াছে। ধলভূমের বাহিরে চাঁইবাসা হইতে এই উচ্চতা বৃদ্ধি উত্তরোত্তর প্রখর হইয়া উঠিয়াছে—দেশভূমিকে তখন আর বাংলাদেশের সমতট বলিয়া আখ্যাত করিবার উপায় নাই।

অক্সফোর্ড প্রাকৃতিক মানচিত্রেও তাই সুবর্ণরেখার দুইকূলে ধলভূম সমভূমিকে, এমনকি জামসেদপুর ছাড়াইয়া সেরাইকেলার এক বৃহৎ অংশকে পার্শ্ববর্ত্তী মেদিনীপুরের সহিত এক রঙে চিত্রিত করিয়া দেখান হইয়াছে।

অতএব মানভূম ধলভূম লইয়া বিহারের ছোটনাগপুর বিভাগ আর কেবল হাজারিবাগ, রাঁচী, পালামৌ লইয়া প্রকৃতি গঠিত ছোটনাগপুর অধিত্যকা এক নহে—কূটনীতির স্বার্থে ধলভূম এক্ষণে বিহারের ছোটনাগপুর বিভাগের ভিতর পড়িলেও স্বাভাবিক নিয়মে তাহা ছোটনাগপুর মালভূমির কিংবা অধিত্যকার অন্তর্গত নহে।

ধলভূম প্রভূতরূপে খনিজ এবং বনসম্পদের অধিকারী। কর্ষণ-যোগ্য জমিও সেখানে সুপ্রচুর—লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি সেখানে অনাবাদী পড়িয়া রহিয়াছে—আবাদ করিলেই হয়। স্থানীয় আবহাওয়া এবং জলবায়ুও ধলভূমে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর।

ধলভূমে গ্রাম্যজীবিকা প্রধানতঃ চাষ আবাদের উপরেই নির্ভর করে। তাহার পল্লীসমৃদ্ধির সম্ভাবনা পার্শ্ববর্ত্তী মেদিনীপুর এবং মানভূম জেলার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বিহারের পূর্ব্ব সীমান্তবর্ত্তী স্থানগুলির আর্থিক উন্নতির জন্য বিহার গভর্ণমেণ্ট বিশেষ কিছু ব্যবস্থা করে নাই—বিশেষতঃ মানভূম ও ধলভূমের গ্রাম্য অঞ্চল অনুন্নত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। ইহার কারণ আছে—এই সব জায়গা প্রধানতঃ নদী উপত্যকার দেশ—দেশের শিল্প গঠনের জন্য চাই নদী-নিয়ন্ত্রণ, নদনদীর উপর বিরাট বাঁধের পরিকল্পনা। ইহা ছাড়া এখানে আর্থিক উন্নতি সম্ভব নহে; এখন স্থানীয় নদী-নিয়ন্ত্রণ ব্যয়সাধ্যও বটে, বৃহৎ স্থাপত্য-শিল্পের উৎকর্ষ না

হইলে এ পরিকল্পনা ফলপ্রদ নহে—আবার ইহাতে বিহারের সমগ্র ভাবে তেমন উপকার নাই—উপকৃত হইবে বিহারের পূর্ব্ব সীমানায় অবস্থিত কয়েকটি অঞ্চল মাত্র। আর মুখ্যতঃ উপকৃত হইবে কে? পশ্চিমবঙ্গ, কারণ পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ নদীরই উৎসস্থান বিহারের ভিতরে, কাজেই উৎসস্থলে নদী নিয়ন্ত্রিত হইলে বন্যাপ্লাবন, আবার অপর পক্ষে সাময়িক জলাভাব, এই দুই প্রকার বিপর্যয় হইতেই পশ্চিমবঙ্গ বহুলাংশে বাঁচিয়া যায়। আসল লাভ হইবে পশ্চিমবঙ্গের, এই সম্ভাবনায় বিহার গভর্ণমেণ্টকে ব্যয়সাধ্য কোন পরিকল্পনায় নামায় কাহার সাধ্য! ফলে উক্ত গভর্ণমেণ্টের নিষ্ক্রিয়তায় হইয়াছে এই যে, সুবর্ণরেখা উপত্যকার ধলভূম, গ্রাম্য ধলভূম অনুন্নত অবহেলিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

ধলভূমের অধিবাসীরা যে উপভাষায় কথা বলে, সেই উপভাষাতেই কথা বলে উত্তর-পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্দ্ধমান এবং বীরভূমের সাধারণ মানুষ।

ধলভূমে বাংলা সাল ও পঞ্জিকা প্রচলিত এবং পাল-পার্ব্বণ উৎসবাদিও মেদিনীপুর এবং মানভূমে যে রকম হয় অবিকল সেই রকম। ছট, ফাগুয়া, রামনবমী, মহাবীর ঝাণ্ডা প্রভৃতি উৎসবের নামগন্ধও এখানে নাই; পরিবর্ত্তে দুর্গাপূজা, কালীপূজা, মনসাপূজা, টুসুপূজা, হরিনাম-সংকীর্ত্তন, পৌষপার্ব্বণ প্রভৃতি বাংলাদেশের ও বাঙালী সংস্কৃতিরই পরিচয় বহন করে। পল্লীগীতি, লোকনৃত্য, যাত্রা, পাঁচালী, কথকতা, রাধাকৃষ্ণের বিরহ ও মিলন লীলা-বিষয়ক সংকীর্ত্তন সকলই হুবহু বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি। লোকাচার এবং ঐতিহ্যের দিক দিয়া, সামাজিক ব্যবহার এবং সাধারণ জীবনযাত্রার প্রণালীর দিক দিয়া—যে দিক দিয়াই দেখা যাক্ না কেন, ধলভূমে বাঙালী ভাবেরই অবিসংবাদী আধিপত্য। বিবাহপদ্ধতি সম্পূর্ণ ভাবে বাংলাদেশের—সেই শঙ্খধ্বনি আর উলুধ্বনি মুখরিত বিবাহ-প্রাঙ্গণ, স্ত্রী-আচার, কুশণ্ডিকা—যেমন বাংলাদেশের হিন্দুদিগের মধ্যে বিবাহে সচরাচর দেখা যায়—হিন্দুস্থানীদের ন্যায় ঢোল বাজানর আধিক্য এখানে নাই।

বিশেষ করিয়া মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহকুমা এবং সারা মানভূমের সহিত ধলভূমবাসিগণের আত্মীয়তা।

আহারে-পরিচ্ছদে, শুচি-অশুচি বিচারে সমগ্র ধলভূমবাসীদের মধ্যে বাঙালীয়ানা অত্যন্ত স্পষ্ট। সে দেশের রন্ধনের বিশেষত্ব—সেখানে পুরুষদের ভিতর ধুতী পড়ার রকম, সেখানে নারীদের কেশ-বিন্যাস, শাড়ী পরার প্রণালী, তথায় পরস্পরের মধ্যে অভিবাদনের কায়দা—সবেতেই একটি বিশিষ্ট বাঙালীয়ানার ছাপ রহিয়াছে। দিবস শেষে গৃহস্থ বধূ তুলসীতলায় ধুনা সহকারে সান্ধ্য প্রদীপ জ্বালাইয়া প্রণাম করিতেছে এ চিত্র বাংলাদেশের ন্যায় ধলভূমেরও বৈশিষ্ট্য। তুলসীদাসের রামায়ণের পরিবর্ত্তে সেখানে কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারত সমাদৃত। জাতিতে ও বংশে, আচারে-ব্যবহারে, ভাষায়-সংস্কৃতিতে, অশনে-ব্যসনে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা পদ্ধতিতে প্রকৃত বিহারের সহিত ধলভূমের কোন মিল নাই ত বটেই—সিংভূম সদর হইতেও ধলভূমের যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ, ইহা পূর্ব্বে সরকারী ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। (Notes on languages by Census Superintendent, Census of India, Volume VII on Bihar and Orissa, Page 240 দ্রষ্টব্য) এ প্রবন্ধের প্রারম্ভেই দেখান হইয়াছে যে ধলভূম ও সদর লইয়া জেলা গঠন প্রথম হইতেই অস্বাভাবিক হইয়াছিল।

ধলভূমের আদিবাসীরা হিন্দুস্থানীদিগের অপেক্ষা বাঙালীদের সহিত ঢের বেশী ঘনিষ্ঠ; হিন্দী অপেক্ষা বাংলা ভাষাই তাহাদের শীঘ্র এবং সহজে আয়ত্ত হয়। নরনারী নির্ব্বিশেষে তাহারা অন্যান্যদিগের সহিত বাংলা ভাষায় কথা বলিতেই অভ্যস্ত। বাংলা ভাষাই তাহাদের অন্যতম দ্বিতীয় ভাষা। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের নিকট যখন ধলভূমের প্রতিনিধিবর্গ সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন তখন তাঁহাদের মধ্যে সাঁওতালী সদস্যগণ এই কথাই প্রমাণিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা সাঁওতালী ভাষায় লিখিত পুস্তকাদি বাহির করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, সকল পুস্তকই বাংলা অক্ষরে লিখিত এবং সে সমস্ততে টীকা-টিপ্পনী, ব্যাখ্যাও সব বাংলা ভাষায়।

রাজ্যপুনর্গঠন সমিতির নিকট ধলভূম প্রতিনিধিদের স্মারকলিপিতে বলা হইয়াছিল যে ধলভূমের আদিবাসীরা বাংলাদেশের হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার এবং পূজা-পার্ব্বণ উৎসবাদির বেশীর ভাগ গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেকে আবার সম্পত্তির উত্তরাধিকার বিষয়ে বাংলা দেশের দায়ভাগ আইন স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

আদিবাসীগণের ভিতর সাঁওতাল ও ভূমিজগণ বাংলা ভাষা ও বাঙালীদের চালচলন বহু পরিমাণে স্বকীয় করিয়া ফেলিয়াছে। কয়েক বৎসর এই প্রকার চলিলে সাধারণ বাঙালী আর ইহাদের ভিতর বিশেষ কিছু প্রভেদ থাকিবে না।

ধলভূমের আর এক শ্রেণীর অধিবাসী কুর্ম্মী অথবা কুর্ম্মীক্ষত্রিয়দের সম্বন্ধে বহু অবাঙালীর এক সংস্কার আছে—তাহা তাহাদের মাহাতো পদবী হইতে উদ্ভূত। ইহারা মনে করেন, যেহেতু তাহারা মাহাতো—তাহারা মূলতঃ হিন্দুস্থানী হইবেই, বাঙালী হইতেই পারে না। এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

কুর্ম্মী সম্প্রদায় কেবল ধলভূম মানভূম নহে, সারা ভারতে ছড়াইয়া রহিয়াছে। উহাদের সংখ্যা অন্যূন ৫ কোটি। যেমন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সম্প্রদায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বসবাস করে, সেইরূপ কুর্ম্মীরাও বাঙালী, বিহারী, মারাঠী হইয়াও জাতিতে কুর্ম্মী। বীরভূম, মেদিনীপুর এমনকি বাংলাদেশের একেবারে ভিতরের জেলাগুলিতেও কুর্ম্মীক্ষত্রিয় কম নাই। ধলভূমের কুর্ম্মীরা বিহারী কুর্ম্মী নহে। পাটনা, গয়া ইত্যাদি স্থানেও কুর্ম্মী মাহাতো আছে—তাহারাই প্রকৃত বিহারী কুর্ম্মী। তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, রাঁচী, হাজারিবাগ প্রভৃতি স্থানের কুর্ম্মী হইতেও ধলভূমের কুর্ম্মীরা স্পষ্টতঃ বহুল পরিমাণে ভিন্ন যেমন বাঙালী কায়স্থ, পাঞ্জাবী

কায়স্থ ও বিহারের কায়স্থ লালা কায়স্থ—ইহারা পরস্পরে এক নহে।

বিহারে কিন্তু গত ১৯৫১ সনের লোক গণনায় ধলভুমের কুর্ম্মী-গণকে কুর্ম্মালী ভাষায় কথা কহে, এই মিথ্যা অজুহাতে হিন্দীভাষীর পর্য্যায়ে দেখান হইয়াছে। কুর্ম্মালী ভাষা নাকি অনেকটা হিন্দী ভাষার অনুরূপ এবং কুর্ম্মালী ভাষাভাষীগণ নাকি হিন্দীভাষী বলিয়া পরিগণিত হইতে আগ্রহশীল! ধলভুমের কুর্ম্মীগণের সম্বন্ধে ইত্যাকার ধারণা যে কতদূর অসত্য—অধিক কথার প্রয়োজন নাই—তাহা কুর্ম্মীসম্প্রদায়ভুক্ত লোকসেবকদলের শ্রীভজহরি মাহাতোর দিল্লীতে লোকসভায় নির্ব্বাচন হইতে বুঝা যায়। শ্রীভজহরি মাহাতো দক্ষিণ মানভূম ও ধলভুম লোকসভা নির্ব্বাচনী কেন্দ্র হইতে বিপুল ভোটাধিক্যে নির্ব্বাচিত হন, ১৯৫২ সনে, অর্থাৎ ১৯৫১ সনের সেন্সাস গ্রহণের পরে। ইনি বাংলা ভাষাভাষী এবং বাংলা ভাষার জন্য বিহার গভর্ণমেণ্টের অধীনে মানভূম ধলভুমে বাঙালীদের ন্যায্য অধিকার সাব্যস্তর জন্য, বাংলা টুসু গানে মানভূমে বাঙালীর লোকাচার বজায় রাখিয়া তাহার আত্মচেতনা উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য ইঁহার নির্য্যাতন বরণ ও ত্যাগ স্বীকার সর্ব্বজনবিদিত।

বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় ধলভুমেও ভূমি-ব্যবস্থায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত ছিল। ধলভুমের ভূমি-ব্যবস্থায় বঙ্গ-দেশীয় বৈশিষ্ট্য একমাত্র ইহাই নহে। ১৯৩৪ সন হইতে ১৯৩৭ সন অবধি বিহার সরকার ধলভুমে ভূমির পরিমাণ, ভূস্বত্ব, রাজস্ব এবং জমিদারকে দেয় খাজনা ইত্যাদি বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করিতে এক ব্যাপক ভূমি জরীপ এবং স্বত্ব লিপিবদ্ধর কার্য্য করাইয়াছিলেন। তাহাতে জমির স্বত্বের যে তালিকা ও লিখিত পরিমাণ বিভিন্ন মানচিত্র সহকারে প্রস্তুত হইয়াছিল, সে সমস্তই বাংলা ভাষায় বাংলা অক্ষরে লিখিত। ভূমি স্বত্বের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ অথবা পরচা ধলভুমে বাংলা ভাষাতেই লিখিত হয়। যে সমস্ত দলিলপত্র সরকারী মহাফেজখানায় রক্ষিত আছে তাহা সমস্তই বাংলায়। ধলভুমে দলিলপত্র সাধারণতঃ বাংলা ভাষাতেই লিখিত হয়; সনদ, পত্তনী আদি সমস্তই বাংলা ভাষাতে। বন সংরক্ষণের জন্য বিহারে যে আইন আছে, তদনুসারে নোটিশ কিংবা বিজ্ঞপ্তি ১৯৪৮ সন অবধি বাংলা ভাষাতেই হইয়া আসিয়াছে। সম্প্রতি বিহার সরকার এ বিষয়ে অনেকটা অবহিত এবং তৎপর হইয়াছে এবং বাংলা ভাষার চলন নানাভাবে বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। ধলভুমে আদালতে বাংলা ভাষাই ছিল আদালতের ভাষা। ১৯৩৪ সন অবধি বাংলা ভাষার আধিপত্য ছিল সেখানে অবিসংবাদিত—অন্য ভাষার স্থান সেখানে ছিল না। ১৯৩৪ সনে বিকল্প হিসাবে হিন্দী ভাষা সেখানে স্থান পাইল, কিন্তু সে বিকল্পের ব্যবহার অল্প ক্ষেত্রেই হইত। ১৯৪৮ সন হইতে হঠাৎ জোর করিয়া বিহার সরকার ধলভুমে আদালতের ভাষা হইতে বাংলাকে স্থানচ্যুত করিল—আদালতের কার্য্যে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিষেধ হইয়া গেল। বহু চেষ্টাতেও কিন্তু বাংলা ভাষাকে সরকারী কার্য্যকলাপ হইতে একেবারে বাদ দিতে পারা যায় নাই—১৯৫১-৫২ সনে একমাত্র জামসেদপুর বাদে ধলভুম নির্ব্বাচন মণ্ডলীর তালিকা (Voters list) সরকার কর্ত্তৃক বাংলা ভাষায় প্রকাশিত করিতে হইয়াছে।

বাঙালী অধিবাসীর সংখ্যাধিক্য ধলভুমে কিন্তু বেশী দিন থাকিবে কিনা সন্দেহ। বাঙালী-বিদ্বেষ প্রচারে বিহার সরকারের উৎসাহ দানের অন্ত নাই। রাশি রাশি সরকারী ও বেসরকারী অর্থ বিহারী-দের মধ্যে বঙ্গ ও উড়িষ্যা-বিদ্বেষ বদ্ধমূল করিয়া দিবার জন্য নিয়োজিত হইয়াছে। শত শত দৃষ্টান্ত আছে যে বিহারের কংগ্রেসী সরকার বাঙালীদের প্রতি ভীতিমূলক আদেশ ও নির্দ্দেশ বাহির করিয়াছে, এমন কি গুণ্ডামীর প্রশ্রয় দিয়াছে। আশঙ্কা হয় যে, বিহার-বাংলা অঞ্চল প্রদেশান্তর আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর বাকি যে সকল বাঙালী অঞ্চল বিহারে থাকিবে, তাহাদের আর রক্ষা নাই। বিহারীস্থিত স্বার্থীদের প্ররোচনায় এবং বিহারের কংগ্রেসী সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থনের ফলে অসহায় হইয়া বাঙালীদের প্রতি মূর্খ দেহাতীরা উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত হইয়া সময় সময় হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ অবধি হয়ত বাদ দিবে না; গুণ্ডামীর অত্যাচারে হতাশ হইয়া ক্রমে ক্রমে বাঙালীরা ধলভুমের বাস উঠাইতে বাধ্য হইবে।

একেই ত ১৯৫১ সনের লোক গণনায় অন্যায় করিয়া, প্রতারণা করিয়া বিহারের দক্ষিণে ও পূর্ব্বে সীমান্ত অঞ্চলে অবিহারীর সংখ্যা অত্যন্ত কম করিয়া দেখান হইয়াছে, যাহাতে বিহারের সীমান্ত অঞ্চল-গুলি অবিহারী অধ্যুষিত হইয়াও বিহারে বজায় থাকে; তাহার পর অত্যাচার ও অবিচারে ধলভুম হইতে যদি বহু বাঙালী বিদায় লয়, তখন সত্যই বিহার সরকারেরও সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিক মনোভাবাপন্ন বিহারী নেতৃবর্গের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। অনায়াসে তাহারা পরবর্ত্তী আদমসুমারীতে প্রচার করিয়া দিবে যে ধলভুমে বঙ্গভাষীর সংখ্যা নিতান্তই তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর এবং ইহার ফলে ধলভুম কায়েমী-ভাবে বিহারে রহিয়া যাইবে। বিহার অঞ্চল প্রদেশান্তর বিল আলোচনার শেষে পণ্ডিত পন্থ যে স্পর্দ্ধায় লোকসভায় ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, বিহার হইতে দেশাংশ কর্ত্তন ভাবীকালে আর কখনই করা হইবে না—তাহা ভবিষ্যতের এই সম্ভাবনার কথা স্মরণ করিয়া দিবে কিনা কে জানে।

ইহা প্রায় সর্ব্বজন বিদিত যে বিগত সেন্সাসে বিহার সরকারের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত বিহার সীমান্তের পরিসংখ্যা গ্রহণযোগ্য বা স্বীকার-যোগ্য নহে। সেন্সাসের বহু সংখ্যক স্লিপ ত পাটনা সরকারী দপ্তরে হারাইয়াই গেল; তাহাদের পরিবর্ত্তে বিহার সরকার যাহার উপর নির্ভর করিয়াছে তাহা বিহারীদের সুবিধানুযায়ী কল্পনা, প্রকৃত তথ্য নহে।

অতএব সঠিক বিবরণ অবগত হইবার পক্ষে কেবল ১৯৫১ সনের সেন্সাস যথেষ্ট নহে; তাহাকে আগেকার সেন্সাস হইতে আহৃত মালমশলা দ্বারা যাচাই করিয়া লওয়া দরকার। পূর্ব্বেকার সেন্সাস সকলের ভিতর আবার ১৯৪১ সনের সেন্সাসে ভাষা অনুযায়ী লোক সংখ্যার বিবরণ নাই।

১৯৩১ সনের লোকগণনা অনুযায়ী ধলভূমে মোট লোক সংখ্যা ছিল ৩,৯৪,৫৯৫ ; মাতৃভাষা যাহাদের বাংলা তাহাদের সংখ্যা ১,৪১,১০৫ (অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩৫'৭), হিন্দীভাষীর সংখ্যা ৪৯,৮২৪ (অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা ১২'৭) এবং আদিবাসীদের মোট সংখ্যা ছিল ১,৪১,০১০ (অর্থাৎ বাঙালীদের চাইতে ৯৫ জন কম)। আদিবাসীদিগের মধ্যে আবার ৬৪,০১০ ব্যক্তির অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে শতকরা ৪৬ জনের নিজ নিজ মাতৃভাষা ছাড়া দ্বিতীয় ভাষা ছিল বাংলা,—ধলভূমের ওড়িয়াদের মধ্যে শতকরা ৪০ জনের অর্থাৎ ১৭,৪৭৭ জনের দ্বিতীয় ভাষা ছিল বাংলা এবং হিন্দীভাষীদের মধ্যেও ধলভূমে ২,৬৯৪ জন তাহাদের দ্বিতীয় ভাষা বাংলা বলিয়া স্বীকার করিয়া ছিল। ধলভূমের বাঙালীদের সংখ্যার সহিত বাংলা যাহাদের দ্বিতীয় ভাষা ছিল তাহাদের সংখ্যা যোগ করিলে বাংলা ভাষা ব্যবহারক্ষম কলতঃ বাংলাভাষীদের মোট সংখ্যা দাঁড়াইত ২,২৫,৬৯০ অর্থাৎ ধলভূমবাসীগণের মোট সংখ্যার শতকরা অনূন ৫৭ জন। আদিবাসীরা খুব কম লোকেই হিন্দী জানিত—সাঁওতাল ও ভূমিজদিগের মধ্যে সব ধরিয়া ১০০ জনও হিন্দী জানিত কি না সন্দেহ ; বরং সাঁওতাল ও ভূমিজগণের মধ্যে কিছু কম ৭০০০ জনের দ্বিতীয় ভাষা ওড়িয়া ভাষা বলা যাইতে পারিত।

১৯৫১ সনে বিস্তর কৌশলে হিসাবে কারচুপি সত্ত্বেও ধলভূমে বাঙালীদের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১,৮৭,৯৮৯ অর্থাৎ মোট লোক সংখ্যার (৬,১০,৫০৪) শতকরা ৩১'৪ জন। হিন্দীভাষীর সংখ্যা অনেক বাড়াইয়া দেখান হইয়াছে ১,১৯,৯৭৮ ; তাহা হইলেও তাহা বড় জোর শতকরা ২০'১ জন। ওড়িয়াদের সংখ্যা হইয়াছে ৬৩,৬৯২—শতকরা ১০'৭। সাঁওতালীরা প্রায় সকলেই বাংলা বলে—তাহাদের সংখ্যা করা হইয়াছে ১,১৯,২৩৫ অর্থাৎ শতকরা ১৯'৯। সাঁওতাল সমেত সকল আদিবাসীদের মোট সংখ্যা ১,৭৬,৯৮২—শতকরা ২৮'৮। (বিহার সরকারের তত্ত্বাবধানে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রকাশিত "Census of India, 1951, Language Handbook, Singbhum District" ১১৬-১১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ইহা অতি স্পষ্ট যে, ধলভূমে বাঙালীর ভাষাভাষীর সংখ্যা যত অল্প কোন সংখ্যা তত নহে।

ধলভূমের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রসিদ্ধ জামসেদপুর শহর অবস্থিত। জামসেদপুরের বিষয়ে বিহার সরকার সঙ্কলিত পরিসংখ্যান এতই পরস্পর-বিরোধী যে, উহা নির্ভরযোগ্য হইতে পারে না। ১৯৫১ সনের সেন্সাস কার্য্যের অঙ্গ হিসাবে বিহার সরকারের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত দুইটি পরিসংখ্যান পুস্তকে জামসেদপুরের লোকসংখ্যা দেওয়া হইয়াছে। উহার মধ্যে একটি "Census of India, 1951, Language Handbook, Singbhum, District" জামসেদপুরে হিন্দীভাষী লোকসংখ্যা দেখান হইয়াছে ৮১,৯১৮, কিন্তু আর একটিতে "Census of India, 1951, District Handbook, Singbhum"-এ গোলমুড়ী, যুগসলাই ও পটকা এই তিন থানা বাদ দিয়াও জামসেদপুরে সেই হিন্দীভাষী লোকসংখ্যাকেই অনায়াসে দেখান হইয়াছে ৯১,৭৮২ বলিয়া। শেষপর্য্যন্ত কোন সংখ্যা যে বিহার সরকারের মতে অভ্রান্ত, তাহা কেহ জানে না!

এমতাবস্থায় আমরা জামসেদপুর শহরের খাস নাগরিক সমিতির বিবরণই নির্ভরযোগ্য মনে করি। তাহাও ১৯৫১ সেন্সাসের অন্তর্গত করা হইয়াছে।

Jamshedpur Town Committee Report অনুসারে জামসেদপুরের মোট জনসংখ্যা ১,৯৪,৯৯০, তাহার মধ্যে খাঁটী বাঙালীর সংখ্যা ৫৪,৭৬২।

যাহারা হিন্দীভাষী তাহাদের মধ্যে বিস্তর লোক জামসেদপুরে অস্থায়ী বাসিন্দামাত্র ; ইহা ছাড়া তাহারা সকলে যে বিহারী তাহাও নহে, অধিকাংশই উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদি হইতে আসিয়াছে। এই সব কথা না ধরিয়াও সমগ্র হিসাবে হিন্দীভাষীদের সংখ্যা জামসেদপুরে ৪২,৪২০ তাহার বেশী নহে। হিন্দীভাষীদের ভিতর হইতে খাঁটী বিহারী হিন্দুস্থানীদের খুঁজিয়া বাহির করিলে তাহাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩,২৪০ অর্থাৎ তাহারা জামসেদপুরের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮ জন মাত্র (১৯৫১ সেন্সাস অনুসারে Jamshedpur Town Committee Report দ্রষ্টব্য।)

জামসেদপুর বাদ দিলে ধলভূমের অবস্থা দেখায় এইরূপ—

	মোট জনসংখ্যা	হিন্দীভাষী	বাঙালী	সাঁওতালী	ওড়িয়া
১৯৩১ সেন্সাস	৩,১০,৮৫৭	১২,৯০২ (৪'২%)	১,২৩,৩৩৭ (৩৯৭%)	৯৬,৫৫৫ (৩১'৬%)	৩৫,৮৪৯ (১১'৫%)
১৯৫১ সেন্সাস	৩,৯২,৩৪২	৩৮,০৬০ (৯'৭%)	১,৩৬,৩৯৩ (৩৪'৮%)	১,১৭,৬৭৪ (৩০%)	৪৪,২৮৭ (১১'৩%)

বিহারের বিগত সেন্সাসে বিভিন্ন ভাষাভাষীদের যে সংখ্যা নির্ণয় হইয়াছে তাহা অবিহারীগণের দাবি ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য একটি অপকৌশল মাত্র। সেন্সাসের যাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহা আমরা যদি কিছু বিশ্লেষণ করিয়া দেখি তাহা হইলে সেন্সাসে কারচুপির বহর যে কতখানি সে বিষয়ে কিছু ধারণা হইবে। রাজ্য পুনর্গঠন সমিতির নিকট পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটির স্মারকলিপিতে এই বিষয়ের বিশদ আলোচনা রহিয়াছে।

১৯৩১ হইতে ১৯৫১ সনের মধ্যে

সিংভূমের হিন্দিভাষীগণের সংখ্যা বৃদ্ধি

৯১,২৭৩ হইতে ২,১৫,৭৮৮ অর্থাৎ	...	১,২৪,৫১৫
১৯৫১ সনে সিংভূমে সমগ্র জনসংখ্যা	...	১৪,৮০,৮১৬
ইহাদের মধ্যে সিংভূমে যাহাদের জন্ম	...	১২,৮৮,৪০৩
বাকি সিংভূমে আগন্তুক	...	১,৯২,৪১৩



প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

সন্ধ্যা-প্রদীপ

শ্রীনন্দলাল বসু

(প্রবাসী আশ্বিন, ১৩৪১ হইতে পুনর্মুদ্রিত

বাদ, আগন্তুকদের মধ্যে—

যাহারা বিদেশী, ভারতের বাহির হইতে আগত	২৬,১৫৯
যাহাদের মাতৃভাষা বাংলা	৩৭,০২৪
যাহাদের মাতৃভাষা ওড়িয়া	৩১,০৮৩
যাহারা দাক্ষিণাত্যের লোক	১৩,৭৯৮
	১,০৮,০৬৪
বাকি	৮৪৩৪৯

এই ৮৪,৩৪৯ আগন্তুককে হিন্দীভাষী বলিয়া ধরিলে যে সব হিন্দীভাষী বরাবর সিংভূমেই ছিল—সিংভূমে অনাগন্তুক হিন্দীভাষীর সংখ্যাবৃদ্ধি এইরূপ দাঁড়ায়—

সিংভূমে হিন্দীভাষীগণ

উপরোক্ত মোট সংখ্যা বৃদ্ধি	১,২৪,৫১৫
বাদ আগন্তুক	৮৪,৩৪৯
বাকি অনাগন্তুকদের সংখ্যা বৃদ্ধি	৩৭,০৮৭

অর্থাৎ ১৯৩১ সনে যে হিন্দীভাষীর সংখ্যা ৯১,২৭৩ ছিল, কেবল বংশবৃদ্ধির দ্বারা ২০ বৎসরে শতকরা ৪০'৯ হারে তাহা বৃদ্ধি পাইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে এই সমগ্র বিহারের জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ২৯-এর বেশী নহে। ১৯৫১ সেন্সাসে অনাগন্তুক মানে অবশ্যই যে স্থায়ী বাসিন্দা তাহা নহে; অনাগন্তুক মানে সেন্সাস হিসাবে অনাগন্তুক। ১৯৫১ সনের আগের আদমসুমারী ১৯৪১ সনে হইয়াছিল; যাহারা ১৯৪১ সনের পূর্ব্বে সিংভূমে আসিয়া থাকিয়াছে—১৯৫১ সনে সিংভূমে বাসকালে তাহারাই অনাগন্তুকের পর্য্যায়ে গণ্য হইয়াছে। বহুসংখ্যক হিন্দীভাষী যদিও তাহারা 'অনাগন্তুক', কেবল উপার্জ্জনের আশায় পরিবারবিহীন হইয়া অস্থায়ীভাবে সিংভূমে বাস করিতেছে; বৎসর বৎসর তাহারা নিজ নিজ জন্মস্থানে গমন করে। এতদবস্থায়, বিশেষতঃ যখন সিংভূমে হিন্দীভাষীদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা তুলনায় অতি অল্প, ২০ বৎসরে শতকরা ৪০'৯-এর ন্যায় এত উচ্চ হারে তাহাদের বংশবৃদ্ধি কিরূপে হইতে পারে? কাগজে-কলমে কারসাজী ছাড়া ইহা সম্ভবে না। সিংভূমে হিন্দীভাষীদের সংখ্যা অসম্ভবরূপে ফাঁপাইয়া তোলা হইয়াছে—হয়ত মিথ্যা করিয়া বহু আদিবাসী হিন্দীভাষীরূপে গণিত হইয়াছে, কারণ সিংভূমে ১৯৫১ সনের সেন্সাসে আবার আদিবাসীর সংখ্যা অস্বাভাবিক নামিয়া গিয়াছে।

আর একটি ব্যাপার লক্ষ্য করিবার মত—সিংভূম সদরে বাঙ্গালীর সংখ্যাবৃদ্ধি। বাংলাদেশ কখনও সিংভূমের সদরকে বাংলাভাষী বলিয়া দাবি করে নাই, অতএব সে স্থানে বাঙ্গালী অধিবাসীর সংখ্যা ৬,৪১২ হইতে পাঁচগুণ বাড়াইয়া ৩০,২৭০ করিলেও বিহারের অসুবিধা নাই, কিন্তু ধলভূমকে বাংলাদেশ নিজস্ব বলিয়া দাবি করে কি না—ধলভূমের ঐতিহ্য বাংলাদেশেরই ঐতিহ্য কি না, কাজেই লোকগণনায় ধলভূমে বাঙ্গালীর সংখ্যা যাহাতে বেশী না দেখান হয় এই বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বিত হইয়াছে, অপর দিকে সিংভূম সদর ও সেরাইকেলার প্রতি উড়িষ্যার দাবি খণ্ডনেরও চমৎকার ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে হইয়া গিয়াছে; সেই সব স্থানে ওড়িয়াভাষী জনসংখ্যা ক্রমশঃই নাকি কমিয়া যাইতেছে!! অন্ততঃ বিহারের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত সেন্সাসে সেরাইকেলা আর সদরে ওড়িয়াভাষীর সংখ্যা যে ভাবে কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা লক্ষ্যণীয় মাত্র—তদ্দেশীয় কতকগুলি অভিসন্ধিপরায়ণ সঙ্কীর্ণচেতা নেতার রাজনৈতিক স্বার্থ ও উদ্দেশ্য ভাল করিয়াই যাহাতে পূরণ হয়, এমন ভাবে ইহা রচিত হইয়াছে।

বিহারের ১৯৫১ সনের সেন্সাস ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে এমনই অপকৌশলজনিত প্রমাদে পরিপূর্ণ যে, সেই আদমসুমারীর বৎসর হইতে ছয় বৎসর পরেও—রাজ্য পুনর্গঠনবিধি এবং বিহার ও বাংলা অঞ্চল প্রদেশান্তরবিধি বলবৎ হইবার পর অন্ততঃ এক বৎসর না অতীত হইলে—বিহার সরকার তাহাদের সেন্সাসের বিবরণীর অংশ বা ধানবাদ ব্যতিরেকে পূর্ব্ব সীমান্তবর্ত্তী জেলাগুলির আনুপূর্ব্বিক তথ্যাংশ প্রকাশ করিতে সাহস করে নাই অথবা বিহারের বাহিরে সাধারণের প্রচারার্থে পাঠায় নাই। অথচ ইতিপূর্ব্বে এই সকল ভ্রান্ত অপ্রকাশিত তথ্য রাজ্যপুনর্গঠন সমিতির সম্মতিক্রমে তাঁহাদের নিকট উপস্থাপিত এবং তৎপরে তাঁহাদের দ্বারা স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু যত অভিসন্ধিমূলকভাবেই বিহার এবং তৎসহিত ধলভূমের পরিসংখ্যান রচিত হউক না কেন, যাহা হইয়াছে তাহাদের মধ্য হইতেও দেখা যায় যে, ধলভূমের একটি প্রধান অংশে বাঙ্গালীদের সংখ্যাধিক্য কেবলমাত্র আপেক্ষিক নহে, পরন্তু অনন্য-সাপেক্ষ এবং নির্ব্যূঢ়; সে অংশ আবার বাংলাদেশের মেদিনীপুর জেলার ঠিক পাশাপাশিও বটে।

অর্থাৎ ঘাটশীলার ঠিক পূর্ব্বে ধলভূমের যে অংশটি পড়ে—কেবল তাহা নহে, তৎসংলগ্ন এবং ঘাটশীলার পশ্চিমে সুবর্ণরেখা নদীর দুই ধারে চার-পাঁচ মাইল জুড়িয়া সমস্ত জায়গার সহিত জামসেদপুরের দিকে সুবর্ণরেখার দক্ষিণে লুয়াবাসা, গীতিলতা, হলুদ-পুকুর, পটকা, বালিকাপুর, মৌ-ভাণ্ডার, আসানবানি প্রভৃতি গ্রাম ও নগরে বেষ্টিত স্থানটিও অবিসংবাদীরূপে বঙ্গভাষী প্রধান। বিহার সরকারেরই তত্ত্বাবধানে ১৯৫১ সনের ভারতীয় সেন্সাসের অন্তর্গত করিয়া প্রস্তুত "Languages Handbook, Singhbhum District" পুস্তকের ৬৬-১২৩ পৃষ্ঠায় বিভিন্ন গ্রামের ভাষাভাষীদের অঙ্ক সকল হইতে হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, ঘাটশীলার পূর্ব্ব ও পশ্চিমে উপরি নির্ণীত সুবৃহৎ অবিভক্ত ভূমিখণ্ডে বাংলা ব্যতীত অন্যান্য প্রতিটি ভাষাভাষীদের সকলকে জড়াইয়া তাহাদের মোট সংখ্যা যাহা হয়, বাংলা ভাষাভাষীদের সংখ্যা তাহার দ্বিগুণেরও অধিক।

মাদ্রাজ এবং কেরালায় যখন জিলা ভাঙ্গিয়া তাহার ক্ষুদ্রাংশ

এক প্রদেশ হইতে বিযুক্ত হইয়া অপর প্রদেশে সংযুক্ত হইতে পারে, কর্ত্তাদের মধ্যে সদিচ্ছার লেশমাত্র থাকিলে সেই ভাবে ধলভূমের বেলাতেও তাহার যে অংশে বঙ্গভাষাভাষীর অনাপেক্ষিক আধিক্য রহিয়াছে, অন্ততঃ তাহা বাংলার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারিত।

ইহা ছাড়া স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ধলভূমের জন্য বাংলাদেশের দাবি শুধুই ভাষাগত সংখ্যাগুরুত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। স্বাধীনতার প্রাক্কাল হইতে দেশবিভাগের ফলে বাংলাদেশের উপর দিয়া ঝড় চলিয়াছে। তাহার দুই-তৃতীয়াংশ ভূমি পাকিস্থানের কবলে গিয়াছে; পাকিস্থান হইতে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী আসিবার ফলে বাকি পশ্চিমাংশের আর্থিক সংস্থান বিপর্য্যস্ত ও প্রায় বিধ্বস্ত হইয়া যাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গে জনবসতির ঘনত্ব পৃথিবীতে সর্ব্ববৃহৎ উপমানের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া উঠিয়াছে, এই অবস্থায় ইহাই ত স্বাভাবিক যে, ধলভূমের ন্যায় প্রচুর অনাবাদী ভূমি-সংবলিত বিহারের সীমান্তবর্ত্তী বাঙ্গালী অধ্যুষিত জনবিরল অঞ্চলসমূহ বিহার স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া তাহার ভারতের প্রতি, ভারতীয়দের প্রতি অনুরাগের খাতিরেই, ভারতের একটি বিড়ম্বিত বিপদগ্রস্ত অংশের প্রয়োজনার্থে ছাড়িয়া দিবে। পশ্চিমবঙ্গ কি ভারতের অংশ নহে? বাঙ্গালীরা কি ভারতীয় নহে? তাহাদের সাহায্য করিতে বিহার সরকারের তথা ভারত সরকারের এ বিমুখতা কেন, এত অনিচ্ছা, এত কৃপণতা কেন? ধলভূমাদি বিহারের সীমান্ত অঞ্চল বাংলাদেশে আসিলে বিহারের কি এমন ক্ষতি? বিহারের সমগ্র আয়তনের তুলনায় বাংলাভাষী সীমান্ত আয়তন বেশী হইলে নয় ভাগের এক ভাগ হইবে।

ধলভূমের জন্য বাংলার দাবি শুধু ভাষার অনুরোধে নহে, কৃষ্টি ও সভ্যতার অনুরোধে, অশনবসন, রীতিনীতির সমতার অনুরোধে, উৎসব, শিল্প ও জনগণের স্বভাবের ঐক্যের অনুরোধে। নামকরণ, সাল গণনা, সাধারণ মানুষের আকৃতি-প্রকৃতি সকলই ধলভূমবাসীগণের বাঙ্গালীত্বের পরিচয় দেয়। ধলভূমের আদিবাসীদের অধিকাংশেরই মাতৃভাষা ছাড়া অপর ভাষা বাংলা—বাঙ্গালীদের সঙ্গে সহজেই এবং স্বভাবতঃই আদিবাসীদের যে সহানুভূতি গড়িয়া উঠিয়াছে সেরূপ আর কোন জাতি, কোন সম্প্রদায়ের সহিত আদিবাসীদের হয় নাই। আদিবাসীদের ধরিয়া গণনা করিলে সমগ্র ধলভূমে বাংলাভাষীদের নিশ্চিত সংখ্যাধিক্য হয়, ইহাও প্রণিধানযোগ্য। অপরাপর সকলে মিলিয়া ধলভূমে যে সংখ্যা হয়, বাংলাভাষীরা একলে তাহাকেও অনায়াসে ছাড়াইয়া যায়। ভৌগোলিক দিক দিয়াও ধলভূম বাংলাদেশের—ইহা বাংলাদেশের সমভূমি—পশ্চিমে বিস্তৃত মাত্র।

বিহারে বাসিন্দা বাঙালীদের প্রতি যে ভাল ব্যবহার করা হয়, তাহা নহে। রাজ্য পুনর্গঠন সমিতির নিকট ধলভূমের বাঙালীদের পক্ষ হইতে যে স্মারকলিপি দেওয়া হইয়াছিল তাহা হইতে জানা যায় যে, বিহারের নাগরিক হইয়াও তথাকার বাসিন্দা বাঙালীরা বিহারীদের তুলনায় বিহার সরকার হইতে ভেদাত্মক অন্যায় আচরণ পাইয়া থাকে। ধলভূম মুক্তি পরিষদের কর্ম্মসচিব গত ৪ঠা মে, ১৯৫৬-তে এক বিবৃতিতে বলেন যে, কার্য্যতঃ এখনও ধলভূমের স্থায়ী বাসিন্দাদের সরকারী কর্তৃপক্ষকে ডোমিসিল সার্টিফিকেট দেখাইতে হয়, যাহাতে কর্তৃপক্ষ নিশ্চয় করিতে পারে যে, তাহারা বিহারেই স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে। বিহারের হিন্দীপ্রধান অংশে হিন্দীভাষীদের এই দায় নাই, ধলভূমের হিন্দীভাষীদেরও নাই, কিন্তু ধলভূমের বাঙালীর নিকট ডোমিসিল সার্টিফিকেট না থাকিলে কাগজ-কলমে যাহাই নিয়ম থাকুক, কার্য্যতঃ বিহারে সরকারী চাকুরি ত মিলিবেই না, সরকার হইতে অন্য কোন সুবিধা, যথা, পারমিট বা কোন কোন ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত অনুমতি আদায় কিংবা সরকারী কণ্ট্রাক্ট বা সরকারের কোন কাজ করিয়া দিবার জন্য আর্থিক চুক্তি—এ সকলও একজন বিহারীর সহিত সমতুল্য ভাবে পাইবার জো নাই। যে সব বাঙালী ধলভূমে পুরুষানুক্রমে বাস করিতেছেন ধলভূমে যাঁহাদের বাস্তুভিটা, তাঁহাদেরই এই দুর্দ্দশা; তাঁহাদের অপরাধ যে, তাঁহারা বাঙালী।

তার পরে শিক্ষার ব্যাপারে অহিন্দী স্কুল-পাঠশালা হইতে সরকারী সাহায্য বন্ধ করিয়া দিবার হুমকি ত বিহার গবর্ণমেণ্ট তরফ হইতে সদা-সর্ব্বদা আছেই। বহু জায়গায় সরকার জোর করিয়া বয়স্কদের জন্য নৈশ বিদ্যালয়সমূহকে হিন্দী মাধ্যমে শিক্ষা দিতে বাধ্য করিয়াছেন। হিন্দী মাধ্যম স্কুল আর বাংলা মাধ্যম স্কুলে কি রকম তারতম্য করা হয় তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ জামসেদপুরে রামকৃষ্ণ মিশন চালিত দুই স্কুলের ব্যাপার হইতে পাওয়া যায়। স্কুল দুইটির একটিতে হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয় আর একটির শিক্ষার বাহন বাংলা; প্রথমটি অনায়াসে বিহার বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবর্ণমেণ্ট হইতে স্বীকৃতি পাইল, দ্বিতীয়টি তিন বৎসর অক্লান্ত চেষ্টার পরেও তাহা পায় নাই। রাজ্য পুনর্গঠন সমিতির নিকট ধলভূমবাসীর স্মারকলিপি হইতে আরও জানা যায় যে, বাঙালী হইলে স্থানীয় ছাত্রদের পক্ষে স্কুলসমূহে প্রবেশানুমতি পাওয়া দুরূহ হইয়া উঠিতেছে।

অতঃপর ধলভূমে জনসাধারণের মতামত ব্যক্ত করিবার স্বাধীনতা ও সুবিধার কথা। ১৯৪৭ সন আগষ্ট মাসে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণার তিন-চার দিন পরে ১৮ এবং ১৯ আগষ্ট তারিখে জামসেদপুরে বিহার-বাংলা সম্মিলনীর নবম বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশন হয়। তাহাতে বিহারের বাঙালী-অধ্যুষিত সীমান্ত অঞ্চল বাংলাদেশের সহিত যুক্ত করা হউক, এই মত গৃহীত হওয়ার পর সভায় যে তুমুল উপদ্রব আরম্ভ হইল তাহা বর্ণনাতীত। বাহির হইতে আসিয়া বিহারী গুণ্ডারা অস্ত্রহস্তে সভায় শ্রোতাবক্তা-আগন্তুক নির্ব্বিশেষে সকলকে আক্রমণ করিয়া সভা ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল। দুইজন বাঙালী সাংঘাতিকভাবে জখম হইলেন। পুলিস নিষ্ক্রিয় রহিল। ইহার কিছু পরে সভাসমিতি করিবার যে সব নিয়ম কর্তৃপক্ষ বাঁধিয়া দিলেন তাহা অপেক্ষা অসম্ভব সর্ত্ত আর কিছু হইতে পারে না। নিয়মগুলি করার অর্থ, কর্তৃপক্ষের

অনুমতি ব্যতীত সভাসমিতি যাহাতে না হইতে পারে তাহাই সুনিশ্চিত করা।

সভাসমিতি করার সর্ত্তগুলি হইল এই—

১। পূর্ব্বেই সভার আহ্বায়ক ও বক্তাগণের নাম কর্তৃপক্ষকে জানাইতে হইবে,

২। কোন রাজনৈতিক আলোচনা চলিতে পারিবে না,

৩। সভায় যাহা প্রস্তাব করা হইতে পারে যায় যে সকল বক্তৃতা করা হইতে পারে, তাহার অথবা তাহাদের নকল কর্তৃপক্ষকে সভার পূর্ব্বেই পাঠাইতে হইবে,

৪। সভার প্রতিদিনের কার্য্যক্রম অন্ততঃ একদিন আগে কর্তৃপক্ষকে জানাইতে হইবে।

সময় বিশেষে উপরোক্ত নিয়মগুলির প্রয়োগের ব্যতিক্রম ছিল, বিশেষতঃ বলা বাহুল্য, এই নিয়মগুলি কখনও সরকার-সমর্থিত হিন্দীভাষীদের সভায় কিংবা হিন্দীভাষীর অনুকূলে সভাসমিতি, বক্তৃতায় প্রযোজ্য হয় নাই।

রাজ্য পুনর্গঠন সমিতির জামসেদপুর সফরকালে, বিহার সরকারের তরফ হইতে বাংলার দাবি ব্যর্থ করিবার আয়োজনের সীমাপরিসীমা ছিল না। প্রচারের জন্য মোটরগাড়ী ও লরী অবরদখলের হুকুম হইয়াছিল—গাড়ীগুলির মালিকদিগের প্রতিজনের কাছে পূর্ব্বরাত্রে পুলিস কনষ্টেবল পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল যে, গাড়ীগুলি যেন যথাসময়ে হাজির হয়, শুধু তাহাই নহে, হাজির হইবার হুকুম তামিলের জামিন হিসাবে গাড়ীগুলির চালকদিগের লাইসেন্সগুলি কাড়িয়া লইয়া পুলিস তাহাদের নিজেদের হেফাজতে রাখিয়াছিল।

১৯৫৫ সনের ৯ই ফেব্রুয়ারীতে রাজ্য পুনর্গঠনে সমিতির নিকট সাক্ষ্যদানের পর ও আগে ধলভূমের প্রতিনিধিগণের লাঞ্ছনার অবধি ছিল না। সাক্ষ্যদানের পর রাস্তায় বাহির হইলে কয়েকটি গুণ্ডা আসিয়া তাঁহাদের প্রহার করে—পুলিস অবশ্য নিষ্ক্রিয়ভাবে তামাসা দেখিয়াছে। তাঁহাদের নেতা ধলভূম হিতৈষিণী সমিতির সভাপতি ডাক্তার স্বরজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর প্রহার আর লাঞ্ছনার চোটটা বেশ বড়ভাবে পড়িয়াছিল। আবার এক বৎসর বাদে ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৫৬-তে যখন জামসেদপুরে বিহারীরা পুরুলিয়ার ও কিষাণগঞ্জের কিছু অংশ বাংলায় চলিয়া যাইবার প্রতিবাদে হরতাল ঘোষণা করিয়াছিল—তখন সেই হরতাল ভঙ্গের অভিযোগে গুণ্ডাগণ দ্বারা এই ভদ্রলোক আর একবার ভীষণভাবে প্রহৃত হইলেন। তিনি জামসেদপুরে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক—হরতাল হইলেও সর্ব্বজনস্বীকৃত প্রথা অনুযায়ী কয়েকটি জরুরী কর্ম্মানুসরণ, বিশেষতঃ চিকিৎসার কার্য্য কখনও বন্ধ থাকে না। ডাক্তার স্বরজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপরাধ, তিনি হরতালের দিনে তাঁহার চিকিৎসাগার বন্ধ রাখিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন।

রাজ্য পুনর্গঠন সমিতির নিকট কিন্তু বিহারীদের এই প্রকার গুণ্ডামীর দাম ছিল। বিহার সরকারের অপকৌশল তাঁহারা বুঝিয়াও বুঝিলেন না। বলপূর্ব্বক স্থানীয় জনগণের কণ্ঠরোধ করা হইয়াছে, বাহির হইতে প্রচুর অর্থ দিয়া লোক আনিয়া বহু আস্ফালনে ধলভূম বিহারের বলিয়া প্রচার করা হইতেছে, ধলভূমের নেতৃস্থানীয় অধিবাসীদের পক্ষে স্ব স্ব গৃহের বাহির হওয়া অবধি বিপজ্জনক; রাজ্য পুনর্গঠন সমিতির নিকট এই সমস্তই তুচ্ছ ও অগ্রাহ্য হইয়া গেল—গোয়ালপাড়ায় তদ্দেশীয় কয়েকজনের স্বার্থবুদ্ধিতে সুকৌশলে উদ্ভাবিত বাঙালী নির্য্যাতন দেখিয়া যেমন তাঁহাদের বুদ্ধিতে উদয় হইয়াছিল যে, গোয়ালপাড়া আসামীদেরই দেশ, বাঙালীর নহে, —তেমনই ধলভূমে বিহারীদের জাঁকজমক, বাহবাস্ফোট কলরবে অভিভূত হইয়া মন্তব্য করিলেন—ধলভূমকে বাংলার অন্তর্গত করিতে যথেষ্ট আন্দোলন হয় নাই। গুণ্ডামী এবং ধূর্ত্ত রাজনৈতিক প্রচারে এই সমিতি বরাবর বিভ্রান্ত হইয়াছেন—শুধু বিহারে নহে, অন্য কয়েকটি স্থানেও সরকারী বা বেসরকারী অর্থে পুষ্ট কয়েকজনের প্রশ্রয়ে গুণ্ডামী, ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও স্থানীয় লোকদিগকে ভীতি প্রদর্শনের ফলে অপপ্রচারের দ্বারা তাঁহারা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হইয়াছেন বলিয়া দেখা গিয়াছে।

সিংভূমের সদরে ওড়িয়া ভাষীর প্রাধান্য হইলেও ওড়িয়াভাষীরা জানে যে, সিংভূম জেলার ধলভূম মহকুমায় তাহাদের কোন দাবি নাই। ধলভূম বাংলাদেশের প্রাপ্য বলিয়া ওড়িয়ারা স্বীকার করে ও তাহার বঙ্গভুক্তির আন্দোলন সমর্থন করে। উড়িষ্যার বহু নেতা, তাঁহাদের মধ্যে উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি, পরে উড়িষ্যা হইতে নির্ব্বাচিত লোক সভার সদস্য শ্রী বি, কে, রায় একজন—পার্লামেন্টের ভিতরে ও বাহিরে, প্রকাশ্যে এ বিষয়ে বাঙালীর দাবিকে যুক্তিসহ ও অত্যাবশ্যক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ভারতের অন্যান্য স্থানে বহু নিরপেক্ষ ব্যক্তি ধলভূমকে বঙ্গভুক্তি সমীচীন বোধ করিয়াছেন। লোক সভার সদস্য ডাক্তার [illegible] ইহাই মত এবং তাঁহার সভাপতিত্বে ১৯৫৩ সনের এপ্রিল মাসে অকংগ্রেসী দলগুলি কর্তৃক আহুত যে সর্ব্বভারতীয় ভাষাভিত্তিক প্রদেশ সম্মিলনীর অধিবেশন বসিয়াছিল, তাহাতে ধলভূমের প্রতি বাংলার দাবি জোরের সহিত স্বীকৃত হইয়াছিল।

পুরুলিয়ার ও কিষাণগঞ্জের কিয়দংশ পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরেও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহের সে সিদ্ধান্ত উল্টাইয়া দিবার চেষ্টার বিরাম ছিল না—প্রায়ই তিনি পশ্চিমবঙ্গের দাবির বিরুদ্ধে বিহারে বহুস্থানে ধর্ম্মঘট, হরতাল ও বিক্ষোভের কথা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন; যখন তখন বলিয়া বেড়াইয়াছেন যে, বিহার হইতে কিয়দংশ ভূমি পশ্চিমবঙ্গকে ছাড়িয়া দিবার সিদ্ধান্তে বিহারবাসীদের ভিতর যে গভীর সন্তাপ এবং ক্রোধের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত এবং সে মর্ম্মব্যথা তিনি নিজ প্রাণে অনুভব করেন। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বঙ্গের বাহিরে নিকট-সীমান্তে বাঙালীদিগকে বঙ্গে ফিরাইয়া আনিবার ব্যাপারে নিতান্তই উদাসীন। পরসম্পদে শ্রীকৃষ্ণ সিংহ চালিত বিহার সরকারের যত আগ্রহ, নিজ অধিকারে শ্রীযুক্ত বিধান রায়ের অধীনে পশ্চিমবঙ্গ

সরকারের ভত নহে, কারণ এখানে অধিকার সাব্যস্ত করিতে হইলে শক্তের সহিত বিবাদ করিতে হইবে। বাংলার সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতা ও নিরপেক্ষতার অভাব রহিয়াছে, একথা কে অস্বীকার করিবে?

তাই রাজ্য পুনর্গঠন সমিতি ধলভূমের বঙ্গভুক্তির পক্ষে ভাষা কিংবা অন্য কোন দফায় আপাতদৃষ্টিতে একটি কারণও খুঁজিয়া পান নাই (রাজ্য পুনর্গঠন সমিতির বিবরণী—৬৬৭ অনুচ্ছেদ)। এই রকম ত হবেই! প্রাদেশিক বা রাজ্য সরকার, জাতির সম্মান এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাহার দায়িত্ব ও আগ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হওয়া স্বাভাবিক—সেই সরকারই যদি স্বীয় জাতির জন্য সুপারিশ করিতে উদাসীন থাকে বা ভয়ে পিছাইয়া যায়, তাহা হইলে ভারতের বর্ত্তমানাবস্থায় বৃহত্তর ভারতীয় মহাজাতির দরবারে সে জাতি তাহার ন্যায্য প্রাপ্য কিরূপে পাইবে?

ধলভূমকে বিহারের জন্য বজায় রাখিতে রাজ্য পুনর্গঠন সমিতিকে কম বাধা অতিক্রম করিতে হয় নাই। পশ্চিম বাংলা এবং উড়িষ্যা দুই প্রদেশের দাবি ডিঙ্গাইয়া তবেই না বিহার রাজ্য পুনর্গঠন সমিতির সুপারিশে ধলভূম নিজ সীমানার ভিতর রাখিয়াছে। পুরুলিয়া উপজিলার বিষয় নিমরাজি হইয়া শেষকালটা রাজ্য পুনর্গঠন সমিতি যখন উহা পশ্চিমবঙ্গকে দিয়াই দিলেন, তখন সমস্যা হইল যে, তাহা হইলে বিহারবাসী ধলভূমে বিহারের পথে যাইবে কি করিয়া? একমাত্র উপায় সিংভূম সদর আর সেরাইকেলা মহকুমার ভিতর দিয়া যাওয়া, কিন্তু সে সব স্থানের প্রতিও যে উড়িষ্যাবাসীর দাবি অকাট্য! তখন ধলভূম বিহারে রাখিবার জন্য রাজ্য পুনর্গঠন সমিতি উড়িষ্যার ন্যায্য প্রাপ্য অগ্রাহ্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সিংভূম সদর ও সেরাইকেলা খারসোয়ান সমেত বিহারে থাকিয়া গেল। একটি অন্যায় বজায় রাখিতে আরও বহু অন্যায়ে প্রবৃত্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত সচরাচর বহুস্থানে পাওয়া যায় না।

সেরাইকেলা ও খারসোয়ানে ওড়িয়ারাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তর জাতীয় গোষ্ঠি এবং সিংভূম সদরে হো শ্রেণীর আদিবাসীর পরেই সংখ্যায় ওড়িয়াদের স্থান। হো'রা শতকরা ৯৫ জনে উড়িষ্যা প্রদেশ এবং সিংভূম সদর ও সেরাইকেলা মহকুমায় থাকে। সেরাইকেলাও সদর মহকুমাদ্বয় উড়িষ্যার সহিত একেবারে লাগাও, পাশাপাশি। সুতরাং এখন যেমন হো'রা দুই রাজ্যের শাসনে বিভক্ত হইয়া আছে—একটি অংশ পড়িয়াছে উড়িষ্যায় আর একটি বর্ত্তমান বিহারস্থ সেরাইকেলা ও সিংভূম সদর এই দুইটি মহকুমায়, সেরাইকেলা ও সদর উড়িষ্যার শাসনাধীন হইলে তেমনি হো জাতির প্রায় সকলেই এক রাজ্যের এলাকায় থাকিতে পারিত—তাহাদের আর দ্বিধাবিভক্ত হইতে হইত না। হো জাতির সহিত ওড়িয়াদের বিশেষ সম্প্রীতি, ওড়িয়া ছাড়া আর কাহারও সহিত হোদের বনিবনাও হয় না। ভাষার সাদৃশ্যে, রাজনৈতিক চিন্ত-বৃত্তিতে এবং সামাজিক সদ্ভাবে হো এবং ওড়িয়াদের ভিতর-সম্বন্ধ নিকট হইতে নিকটতম। হো'রা তাই স্বভাবতই তাহাদের সমগ্র বাসভূমি উড়িষ্যার সহিত সংযুক্ত করিতে চাহে—তাহাদের মধ্য হইতে সিংভূম এলাকায় নির্ব্বাচিত পাঁচজন বিহারের বিধান সভার সদস্যর অন্যূন চারিজন বার বার সিংভূম সদর ও সেরাই-কেলাকে উড়িষ্যার সহিত সংযুক্ত করিবার দাবি উত্থাপন করিয়াছেন। উড়িষ্যার সহিত সংযোগকামী রাস্তাঘাট ও ব্যবস্থা সবই সিংভূম সদরে এবং সেরাইকেলা খারসোয়ানে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। বরং একটি পর্ব্বতশ্রেণীর দ্বারা বিহার হইতেই এই সব অঞ্চল প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে। তাহা ছাড়া ওড়িয়া ও হোদের উপর বিহারীরা ভাষার অত্যাচার চালাইতেছে—চাইবাসা এবং সেরাইকেলা মহকুমায় ও সদরে ওড়িয়া ভাষা ও কৃষ্টি দমনের চেষ্টা চলিতেছে অবিরাম এবং পদ্ধতিবদ্ধভাবে।

কিছুতেই কিছু হইল না, রাজ্য পুনর্গঠন সমিতির নিকট কোন যুক্তিই খাটিল না। রাজ্য পুনর্গঠন সমিতির ভয় হইল যে, যদি বিহার পুরুলিয়ার অংশের সহিত সেরাইকেলা বা সদর মহকুমাও হারায় তাহা হইলে ধলভূম মহকুমার সহিত বিহারের ভৌগোলিক সংযোগ থাকিবে না। বিহারকে সন্তুষ্ট রাখিতেই হইবে, অগত্যা, বিহারের সহিত ধলভূমকে সংযুক্ত রাখিবার জন্য উড়িষ্যার দাবি তুচ্ছ ছলে পরিত্যক্ত হইল। ধলভূমকে বিহারে রাখা উচিত কি না সে প্রশ্নের পাশ কাটাইয়া গিয়া ধরিয়া লওয়া হইল ধলভূম বিহারে থাকিবে এবং সুষ্ঠুভাবে তাহার ব্যবস্থা রাখিবার নিমিত্ত সিংভূমের সদর ও সেরাইকেলাকেও বিহারে রাখিতে হইবে। যে বিষয় প্রমাণ করিবার কথা তাহা প্রমাণিত বলিয়া ধরিয়া লইয়া লোককে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা রাজ্য পুনর্গঠন সমিতির যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, বুঝা যাইতেছে।

বিহার ও বাংলা অঞ্চল প্রদেশান্তর আইন পাশ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে ধলভূমের উল্লেখ মাত্র নাই। মানভূম লোকসেবক সঙ্ঘের পরিচালক শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন যে, বাংলার ন্যায়সঙ্গত দাবির বেশীর ভাগ উপেক্ষা করিয়া আইনটি যেন যাহারা ক্ষমতার শিখরে বসিয়া জনসাধারণের ন্যায়সঙ্গত আকাঙ্ক্ষা সহজ ও শোভনভাবে মানিয়া না লইয়া তাহা অগ্রাহ্য করিতে মনস্থ করে, তাহাদেরই জিদ ও ঔদ্ধত্যের প্রতিচ্ছবি। "আমরা ধলভূমাদি বিহারে পরিত্যক্ত বাঙালী অঞ্চলের বাঙালীদের দুঃখ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করি!" বাঙালীরা বিহার চাহিয়াছিল, কর্ত্তারা দম্ভভাবে ও জঘন্যভাবে তাহাদিগকে বিড়ম্বিত করিয়াছেন—সুবিচারের চেষ্টাও অবজ্ঞাভরে করেন নাই। আমরা বুঝিতে পারি না, কেন বিহারীরা ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে একটি বহু সংখ্যক বিশিষ্ট অংশের অর্থাৎ বাঙালীদের নিরীহ জাতীয় আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণে প্রতিবন্ধকতা করিল। আমাদের সহিত তাহাদের কিসের শত্রুতা? তুচ্ছ সীমানার অংশ প্রদেশান্তরিত হইলে বিরাট বিহারের এমন কি আসে যায়?

বিহার ও বাংলা অঞ্চল প্রদেশান্তর বিধি দিল্লীতে কেন্দ্রীয়

আইন সভায় আলোচনা হইবার কালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত পন্থ এবং তাঁহার সহকারী শ্রীদাতারের ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি বাঙালীরা শুনিয়াছে—'যাহা হইবার তাহা হইল—বিহার স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া না দিলে বিহার সীমান্তের অন্ত কোন ভূমির প্রতি পশ্চিমবঙ্গের দাবি যাহাই হউক, ভবিষ্যতে আর কোনক্রমেই পশ্চিমবঙ্গ তাহা পাইবে না।' বাঙালীর উপকার পাছে হইয়া যায়, সেইজন্ত যুক্তি ও সদবুদ্ধিকেও কর্তৃপক্ষ স্থান দিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু আমরা শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষের বাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে চাই যে, বাংলা প্রদেশগঠনে এই বিহার ও বাংলা অঞ্চল প্রদেশান্তর আইনটি যে শেষ কথা—ইহাই যে বাংলার দাবি মিটাইবার প্রথম এবং শেষ কিস্তি—এই সব উক্তির প্রশ্রয় ভুলিয়াও আমরা দিতে পারিব না। নিজভাষী অঞ্চল পুনরুদ্ধারের ন্যায় যে সব বিষয় একটি জাতির জন্মগত ও অবিচ্ছেদ্য অধিকারের সহিত জড়িত, যতদিন পর্যন্ত সেই অধিকারের অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণপ্রাপ্তি না হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের ব্যাপারে শেষ কথা বলিয়া কিছু নাই।

সীতার ভয়

রামকে সোনার হরিণ শিকারে পাঠিয়ে)

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য

আশার কুটীর বেঁধেছি পঞ্চবটির তীরে
ময়ূর-পাখায় গাঢ় নীল-সোনা-সবুজ নাচে ;
হাল্কাবাতাসে কাশের রেশম কাঁপছে ধীরে ;
মনকে পাঠিয়ে মৃগয়ায় চোখ স্বপ্ন খোঁজে।

মনকে পাঠিয়ে মৃগয়ায় কোনো নতুন খোঁজে
আঁচলেতে একা কুড়ুই আকাশ-ঝরানো সোনা,
এমন দুপুরে বিপদের ভয়,—মন কি বোঝে ?
এক-দুই-তিন-নিমেষে নিমেষে আদর গোনা।

হরিণশিশুর চোখের চাওয়ায় গভীর কালো,
বিশ্বাসে ভ'রে তুলেছে আমার আগামী কাল ;
ভরাট বনের মনের খবরে জ্বালিয়ে আলো
দীপান্বিতার খুশী ভ'রে তুলি রাত-সকাল।

এমন সময়ে মনকে পাঠিয়ে ব্যাধের মতো
স্বপ্ন শিকারে, গভীর বনের মনের স্রোতে,
হঠাৎ ঘনায়, পাখার ঝাপটায়, চিন্তা যতো,—
কেন পাঠালাম রামকে আমার কঠিন ব্রতে !

বিপদ চেঁচায় ; মন কি আমার ফুরিয়ে গেলো ?
স্বর্ণ-আশার হঠাৎ মৃগয়া রুখলো বেঁকে ?
রামের হাতের শর সন্ধান ব্যর্থ হোলো ?
কোন্ কৈকেয়ী নতুন বিপদ আনলো ডেকে ?

অনার্য রুচি বিধবার ভালোবাসায় খুশী
হই নি। আমার বুকে চেয়ে আছে সাপের মণি,
শূর্পনখার চোখের জ্বলন আজও পুষি,
ভয়ের মতন। ছোবলালো নাকি নাগিন ফণী ?

বিপদ চেঁচায়। অসম্ভবের মৃগয়া লোভে
কেন পাঠালাম, যা ছিলো আমার স্বর্গপুঁজী ?
ফিরবে কি আর এমন সকাল কখনও কবে ?
দেখবো কি আর হারানো রামকে যতই খুঁজি ?

জটার জালে

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

(১৮)

সেদিন আর এগিয়ে যেতে পারি নি, পিছিয়ে গিয়ে রাত্রিবাস করেছিলাম আবার ঐ মণ্ডপচটিতেই। সারা দিনটা কেটেছে শম্ভু পাণ্ডার বাড়ীতে।

চরণ দুটি আমার বিশ্রাম পেয়েছে নিশ্চয়ই। সেদিন এক বেলাও রাঁধতে হয় নি বলে হাত দুটিও। কিন্তু মন? সে যেন সারাটা দিন ক্রমাগতই দোল খেয়েছে সুখ-দুঃখের নাগরদোলায়। ফুলের মত নিষ্পাপ কুমারী মেয়ে সীতার দৈহিক দুর্ভোগ প্রত্যক্ষ করবার পর তার বাপ-মায়ের মুখে তার ব্যর্থ-জীবনের কাহিনী মোটামুটি শুনবার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া ওটি। এর চেয়ে চড়াই-উতরাই ভাঙাও বুঝি ভাল—তাতে দেহই ক্লান্ত হয়, মন অস্থির হয় না।

বোঝার উপর বোঝা। ভাবানুষঙ্গে সে কাহিনীও মনে পড়ে যায়—পুরাতন দুঃখও আবার নূতন হয়ে মনে জেগে উঠে।

সেদিনও দুঃখ পেয়েছিলাম। একদিন কেন, পর পর দুদিন। প্রথমে বরাসু ও পরে রামপুর চটিতে গঙ্গোত্রীর নষ্টনীড় আর দীর্ঘ-নিশ্বাসের কাহিনী শুনবার পর।

গঙ্গোত্রী আর সীতা, সীতা আর গঙ্গোত্রী। রাত্রে শুয়েও পর্য্যায়ক্রমে দুটি মেয়েকেই ঠিক যেন চোখের সামনে দেখি। দুটি জীবনের একই জাতের ব্যর্থতা এক অদৃশ্য তুলাদণ্ডের দুদিকে চাপিয়ে তুলনা করতে থাকি। ভারী দেখি সীতার দুঃখের দিকটা; আর অনুকম্পার সেই দিকেই বেশী ঝুঁকে পড়ে আমার মন।

দুঃখিনী গঙ্গোত্রীও। তবু সীতার দুঃখের সঙ্গে তুলনা হয় না তাঁর দুঃখের। শিক্ষিত মনের অসাধারণ শক্তিবলে গঙ্গোত্রী নিজেই তাঁর দুঃখকে জয় করে ইদানীং প্রায় নিরাসক্তভাবে তাকে বিশ্লেষণ করতে পারেন। কিন্তু সীতা গঙ্গোত্রী নয়; সীতার দুঃখের প্রকৃতিও স্বতন্ত্র। ভালবাসার কুঁড়ি তার হৃদয়ে ফুল হয়ে ফুটবার পূর্ব্বেই সাপ হয়ে দংশন করেছে তাকে। নিরক্ষরা, সরলা পল্লী-বালা এখন বোবা পশুর মত ছটফট করছে সেই বিষের জ্বালায়। কেউ নেই তাকে একটু সাহায্য করবার।

খোঁড়া মেয়ের বিয়ে যদি নাও হয়, চিকিৎসা হতে ত কোন বাধা নেই। কিন্তু তাও হয় নি, হবেও না।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম এক ফাঁকে সীতার জননী যশোদাকে। কিন্তু শুনেই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন প্রৌঢ়া। কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, তা কি করাবেন উনি! জন্মদাতা পিতা হলে কি হবে—মানুষটির বুকখানা যে ভগবান পাথর দিয়ে গড়ে দিয়েছেন।

দিল্লী-লক্ষ্ণৌ না হয় বহুদূরের দেশ। মাত্র মাইল দশেক দূরেই চামোলিতে যে সরকারী হাসপাতাল আছে, চিকিৎসার জন্য সীতাকে সেখানেও একবার নিয়ে যান নি শম্ভুজী।

মিথ্যা বলেন নি যশোদা—হৃদয়খানি শম্ভুজীর বোধ করি পাষাণ দিয়েই গড়া। কিন্তু এ কেমন পাষাণ!

বৈকালে চটিতে ফিরে যাবার পূর্ব্বে আমিও একবার শম্ভুজীকে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু উত্তরে বিষণ্ণকণ্ঠে তিনি বললেন, ডাক্তার কি করবে বাবু? স্বকৃতকর্ম্মের দুর্ভোগ থেকে ডাক্তার-বৈদ্য কি কাউকে রক্ষা করতে পারে!

উত্তরে ডাক্তার ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা চলত। কিন্তু সে সব যুক্তি মুখে দূরে থাক, মনেও এল না আমার। বিরক্ত হয়েই আমি বললাম, ঐ কচি মেয়ে আপনার কি এমন দোষ করেছে ঠাকুর মশায় যার জন্য এমন দুর্ভোগ তাকে ভুগতে হবে!

শুনে কিন্তু হাসলেন শম্ভুজী; আমার মুখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, তোমরা এ সব কথা মানবে না, কিন্তু আমরা মানি। কোন জন্মের কোন কৃতকর্ম্মের ফল মানুষ এ জন্মে ভোগ করে তা কি সঠিক জানা যায়? তবে সীতার বেলায় এ জন্মের দোষও একটু আছে বৈকি! যে আশা কিছুতেই মেটাবার নয়, তেমন আশা করাও একটা দোষ, বাবু। সে দোষ করলেও মানুষকে সাজা পেতে হয়।

এমন যুক্তি মানতে পারি নে আমি। সুতরাং আরও বেশী বিরক্ত হয়ে তিক্তকণ্ঠে আমি বললাম, অভিশাপ দেবার একটা যে অভিযোগ আছে আপনার বিরুদ্ধে তা তা হলে একেবারে মিথ্যা নয়—মনে মনে ওদের দু'জনেরই শাস্তি আপনি কামনা করে-ছিলেন।

আশ্চর্য্য! এবার ঘাড় কাৎ করে স্বীকার করলেন শম্ভুজী। কিন্তু তার পর সোজা আমার চোখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন: আমার সে কৃতকর্ম্মের ফল আমিও কি ভোগ করছি নে? সে দিন গম্ভুরকে কেটেছিল যে সাপ সে, বাবু, আমাকেও রেহাই দেয় নি। কোন মানুষের চোখ যেখানে যেতে পারে না, সেই আমার বুকের মধ্যেও তখনই ছোবল মেরেছিল সে। তার পর থেকেই বিষের জ্বালায় আমিও নিরন্তর জ্বলে মরছি।

ভুলতে পারি নি ঐ কথাগুলি, ভুলতে পারি নি শম্ভুজীকে।

পরদিন বদরীনাথের পথে আমার সহযাত্রী হতে পারেন নি তিনি—শুধু আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, একদিন পর যাত্রা করেও

আমাদের আগেই বদরীধামে উপস্থিত হয়ে সেখানে যথাসময়ে তিনিই আমাদের তীর্থকৃত্য করাবেন। তথাপি একাকী পথ চলতে চলতে সেদিন সীতার পাশে পাশে শম্ভুজীকেও আমি যেন থেকে থেকেই প্রত্যক্ষ দেখছিলাম।

বিশাল এক মহীরুহ যেন বজ্রাঘাতে দগ্ধ হয়েও খাড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে।

গীতার অর্থে নির্মম ও নিরহঙ্কার ব্রাহ্মণ। তথাপি স্থিতপ্রজ্ঞ হতে পারেন নি তিনি। বিচারক হয়ে মেয়েকে সাজা দেবার পর মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও জ্বলে মরছেন।

অন্যমনস্ক হয়ে পথ চলছিলাম। হাঁটা পথে এই প্রথম আমার পরিবেশ সম্বন্ধে উদাসীন আমি। এমনকি, আগের দিন যে জায়গায় সীতাকে নিয়ে অমন অঘটন ঘটেছিল সে জায়গাটাও কখন যে পার হয়ে গিয়েছি তা আমার খেয়ালই হয় নি। বুঝি ঘণ্টা-খানেক পর প্রথম থমকে দাঁড়ালাম উত্তেজিত ছোট একটি জনতার সম্মুখীন হয়ে।

অর্দ্ধবৃত্তের আকারে চলার পথ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দাঁড়িয়েছে স্থানীয় কয়েকজন লোক। জনতাব্যূহের অভ্যন্তরে প্রায় কেন্দ্রস্থলে মূর্তিমান বীররসের মত দণ্ডায়মান যে নায়ক, সে দেখি আমাদের জিতেন।

হাতের লাঠির সাহায্যে এইমাত্র একটি সাপকে বধ করেছে সে।

তেমন দীর্ঘ নয় সরীসৃপটি—বড় জোর গজখানেক। তবু নাকি ফণা তুলে ফোঁস করে উঠেছিল সেটি, আর চলার পথে জিতেনের প্রায় পায়ের কাছেই। স্থানীয় যে যুবকটি জিতেনের সঙ্গে সঙ্গেই আসছিল সে সাপটির মারমূর্ত্তি দেখেই সভয়ে ও সরবে জিতেনকে পিছন দিকে আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু ততক্ষণে জিতেনের পায়ের রক্তও তার মাথায় চড়ে গিয়েছে। সেই যুবকটির মুখেই এখন শুনলাম আমি যে তার শক্ত মুঠার ভিতর থেকে নিজের হাতখানি ছাড়িয়ে নিয়ে জিতেন তৎক্ষণাৎ লড়াই শুরু করে দিয়েছিল সাপটির সঙ্গে।

কিন্তু লড়াই শব্দটাতে ঘোরতর আপত্তি জিতেনের—অতটুকু এক সাপের সঙ্গে তার মত লোক লড়াই করবে কি?

ঐ একবারই যা ফোঁস করে উঠেছিল সাপটা—জিতেন আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে: তার পরেই, আমি ওকে কিছু করবার আগেই, ফণা নামিয়ে পালাবার চেষ্টা বেটার। তখন হাতের লাঠি দিয়ে দিলাম দু'ঘা বসিয়ে। তৃতীয় বার আঘাত করবার আর দরকারই হ'ল না।

অসম্ভব নয়—যা সরু আর ছোট দেহ সাপটার। সেই জন্যই তাকে আর একবার দেখে নিয়ে আমি ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললাম, তা হলে মারলে কেন ওকে—তীর্থের পথে—

মুখের কথাটা শেষ করতেও পারলাম না আমি; জিতেন তার হাতের লাঠিখানা সশব্দে মাটিতে ঠুকে প্রায় গর্জন করে বলে উঠল: মারব না? কে জানে এই সাপটাই ছোবল মেরেছিল কি না সেই



অলকনন্দা

গড়ুর না কি মহারাজকে। তা না হলেও ওটা অমনি আরও কাউকে কেটে আর কোন সীতার সর্বনাশ ত করতে পারত।

চমকে উঠলাম আমি—কাল ত এমন উত্তেজিত দেখি নি জিতেনকে! ভাবতেই পারি নি আমি যে, কিশোরী সীতার জীবনের নিদারুণ বিড়ম্বনার কাহিনী আমার অগোচরে জিতেনের পৌরুষকে এত বেশী উত্তেজিত করে রেখেছে। এখন নিঃসংশয় হবার পর খুশীও হলাম আমি। দু'পা এগিয়ে গিয়ে জিতেনের পিঠ চাপড়ে বললাম, ঠিকই করেছ তুমি—বেশ করেছ।

হাঁ, বাবুজী—ভিড়ের ভিতর থেকে কে যেন সায় দিয়ে বললে: আচ্ছা কিয়া বাবুজী নে। সাপ জরুর বিষৈলা থা।

ওটুকু উত্তেজনায় উপকারই হ'ল আমার—নিজের পরিবেশ সম্বন্ধে আমি সচেতন হয়ে উঠলাম।

দেখি যে খুব খাড়া না হলেও চড়াই ভেঙে উপরে উঠছি।

এও পাহাড়ে চড়া। তবে অন্য একটি পাহাড় এবং তা একেবারে ভিন্ন জাতের। আর একটি অতিকায় কাছিমের পিঠ যেন। কিন্তু তুঙ্গনাথের পথে যে বন পার হয়ে এসেছি তার চিহ্নও নেই এই পাহাড়টির উপর। গাছ যা আছে তা চোখে পড়বার মত নয়। চোখে পড়ে না পাথরও। বরং আমাদের যে দিকে খাদ সেই ডান দিকে দেখি অনেক দূর পর্যন্ত ঢালু জমির উপর আমাদের দেশের মতই ক্ষেতখামার। পাকা ধান কেটে কেটে গোছা বেঁধে রাখছে মেয়ে-পুরুষ চাষীরা। ধান ক্ষেতের ফাঁকে ফাঁকে লাউ-কুমড়োর ক্ষেত, আর বুঝি কোন কোন রবিশস্যের। পা দু'টিতে চড়াই ভাঙবার ক্লান্তি না থাকলে বোধ করি মনেই হ'ত না যে খাস হিমালয়ের এলাকাতেই আর একটি পাহাড় অতিক্রম করছি আমি।

তবে তা বেশ বুঝা যায় যখন চোখের দৃষ্টি ডান দিকের ক্ষেত-খামার এবং তার পর বালখিল্য গঙ্গার অদৃশ্য ধারা পার হয়ে ওপারে

চলে যায়। সেখানে নদীর ধারে ধারে এক সারি পাহাড়, কিন্তু সব ক'টিই ভাঙা।

নেড়া পাহাড়, লালচে রং, ভেঙে গিয়েছে বলেই দেখতে আরও রুক্ষ। বেনিয়াকুণ্ড চটিতে প্রবেশ করবার পূর্ব্বে এমনি একটি পাহাড়ের গায়ে যে স্বাভাবিক দেয়াল চিত্র দেখেছিলাম তার আভাসও নেই এদের কোনটির কোন একখানি প্রস্তরফলকেও। সংহার ও সৃষ্টির বিচিত্র সমন্বয় এখানে নেই। ভূতনাথ নন, কেবল ভূতেরাই বুঝি নিছক ভাঙবার জন্যই ভেঙেছে এই পাহাড়গুলিকে।

বিস্মিত হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলাম বাহাদুরকে। সে নির্ব্বিকার ভাবে উত্তর দিল: প্রবল বৃষ্টিতে ধসে গিয়েছে পাহাড়।

ঐ 'ধস' কথাটা শুনেই আমার স্মৃতির অতলে প্রবল এক আলোড়ন শুরু হ'ল। আবার গঙ্গোত্রীকে মনে পড়ে গেল আমার —মনে পড়ল তাঁর মুখে পাহাড়ের ধস নামার যে বর্ণনা আমি শুনেছিলাম তাঁর পিতার অপঘাত মৃত্যুর বিবরণের সঙ্গে। এমনি ভয়ঙ্কর তাহলে সেই ভাঙন!

ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর একটি জিজ্ঞাসাও মনে জেগে উঠল আমার—এমনি ধস নামা যদি তেমন অস্বাভাবিক না হয় এই পাহাড় অঞ্চলে তবে সব জেনেশুনেও গঙ্গোত্রী পাহাড়ে পাহাড়েই অবিরাম ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন? নির্মম নিয়তির অলৌকিক কোন আকর্ষণ কাজ করছে নাকি তাঁর পিতার মত তাঁর নিজের উপরেও? না তাঁর নিজেরই অবচেতন মনের কোন ইচ্ছার অসহায় ক্রীড়নক সে!

গঙ্গোত্রী যাই হোক না কেন, আমার নিজের তখন প্রায় সম্মোহিত অবস্থা। ঐ ভাঙা পাহাড়টির উপর থেকে আমার দৃষ্টি যেন আর সরতে চায় না। চোখের মতই চরণ দুটিও আমার অচল হয়ে গিয়েছে যেন।

সম্বিৎ ফিরে এল বাহাদুরের অসহিষ্ণু কণ্ঠের নির্দ্দেশ শুনে: চলিয়ে বাবুজী—ধূপ কড়ী হো রহী।

সচেতন হবার পর ভাল করে তাকিয়ে জিতেনকে আর দেখতে পেলাম না—নিশ্চয়ই তার অভ্যাসমত এগিয়ে গিয়েছে সে। তবে এখন তাতে ক্ষোভের চেয়ে স্বস্তিই আমার বেশী, কারণ বাহাদুরের তাড়া খেয়েই লজ্জিত হয়েছি আমি—যেন চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ার অবস্থা।

ভাল জ্বালা হয়েছে আমার। গঙ্গোত্রী, তাঁর জননী, সীতা, সেই নাম-না-জানা যাযাবরী এবং তেমনি আরও অনেকের কোন না কোন একজন চোখের সামনে উপস্থিত না থাকলেও মনের পথে আনাগোনা করছেই।

আমারও সেই লক্ষ্মণের অবস্থা আর কি!

বনের পথে তিন জন একত্র চলেছেন। সকলের আগে রামচন্দ্র, মাঝখানে সীতা, পশ্চাতে লক্ষ্মণ। মাঝখানে থেকে সীতা আড়াল করে রেখেছেন বলে লক্ষ্মণ পূর্ণব্রহ্ম রামকে দর্শন করতে পারছেন না।

ঠাকুরের কথা। রূপক দিয়ে তত্ত্ব বুঝিয়েছেন তিনি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য মিল আমার বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে।

কেদারনাথের পথে যাত্রা আমার শুরু হতে না হতেই পার্ব্বতীরা এলেন আমার সামনে। একজন অদৃশ্য হতে না হতেই আর একজন আসেন, অথবা চোখের আড়াল হলেও বিচরণ করতে থাকেন আমার মনের আনাচে-কানাচে। কেদারনাথ-বদরীনাথকে স্মরণ করবার সময় বা সুযোগ পাচ্ছি কই!

একটু ঘুরিয়ে এবং রাগ করবার ভাণ করে বাহাদুরকে বললাম, তুই যা-তা সব ভূতের গল্প শুনিয়েই আমার মনটাকে দুর্ব্বল করে দিয়েছিস। নইলে এমন ভয়-ভয় ভাব হবে কেন!

সরল বাহাদুর মুখ কাচুমাচু করে উত্তর দিল: আমার কোন দোষ নেই, বাবুজী; আর মিছে কথাও আমি বলি নি। কেদারনাথজীর রাজ্যে সর্ব্বত্রই ওনারা হাজারে হাজারে বিচরণ করেন। ওপারে বৈকুণ্ঠে একবার পৌঁছলেই দেখবেন যে, একটুও ডর লাগবে না।

বদরীনাথ বিষ্ণুরই নাম। অলকনন্দা পার হলেই তার নিজস্ব এলাকা শুরু হবে। বৈষ্ণবেরা তাকে বলে বৈকুণ্ঠ। শোনা কথা বাহাদুর আবৃত্তি করল প্রতিধ্বনির মত।

কিন্তু সেই বৈকুণ্ঠ যে আনন্দলোক তা মানেন না আর একজন। বাহাদুর যাকে মনে করে ভূতপ্রেতের দৌরাত্ম্য তাকেই তিনি বলেন ভেলকি—সেই বিষ্ণু বা বদরীনারায়ণেরই ইন্দ্রজাল যা দিয়ে মানুষকে তিনি সংসারে বেঁধে রেখেছেন।

সামনের চটিতে গোপেশ্বরের মন্দিরের কাছে তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল।

নামের মধ্যে বৃন্দাবনের আভাস থাকলে কি হবে—গোপেশ্বর এখানে শিব। তাঁর নামেই চটি ও বসতির নামও গোপেশ্বর। এখান থেকেই বের হয়ে গিয়েছে একেবারে আদি ও অকৃত্রিম পাকদণ্ডি পথ দশ না বার মাইল দূরে পঞ্চকেদারের পঞ্চম রুদ্রেশ্বরের মন্দির পর্য্যন্ত।

পূর্ব্বেও খুব কম যাত্রীই যেত দুর্গম পথে আরও অতিরিক্ত কুড়ি মাইল হেঁটে রুদ্রেশ্বরকে দর্শন করতে। আজকাল বোধ করি একেবারেই কেউ যায় না। গোঁড়া শৈব চন্দ্রচূড় হয়ত সেই কারণেই ক্ষুব্ধ হয়ে আরও গোঁড়া হয়েছেন।

সন্ন্যাসী তিনি নন। রুদ্রেশ্বরের পাণ্ডাই হয়ত হবেন এই চন্দ্রচূড়। তবে কেবলই পেশাদার লোক বলে মনে হয় না তাঁকে। গোঁড়া হলেও তিনি প্রধানতঃ ভক্ত, যা শম্ভুজী নন। বিশ্বাস তাঁর শিলাময় পাহাড়ের মতই অনড় হলেও তাঁর সেই বিশ্বাসের প্রকাশ বড় মধুর।

আমরা তখনই চামোলির দিকে যাত্রা করব শুনে চন্দ্রচূড় মুচকি হেসে বললেন, জাল কাটতে পারলে না তা হলে!

মানেই বুঝতে পারি নি তখন, বিহ্বল হয়ে বললাম, কি বলছেন আপনি? কিসের জাল?

উত্তর হ'ল: ইন্দ্রজাল।

আমি নির্ব্বাক। দেখে তিনি মৃদু হাসি তাঁর সারা মুখে ছড়িয়ে দিয়ে আবার বললেন, কি করে পারবে। এই কেদার-নাথজীর রাজ্যেও ত ভেলকির জাল পেতে রেখেছে সে যাতে বেঁধে মুমুক্ষু যাত্রীকেও আবার সে তাঁর মায়ায় সংসারে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

তথাপি অর্থবোধ হয় না। আবারও বিহ্বল স্বরেই জিজ্ঞাসা করলাম, কি বলছেন আপনি? আমরা ত বদরীনারায়ণকে দর্শন করতে চলেছি।

আর আমিও ত তাঁর কথাই বললাম, উত্তর দিলেন চন্দ্রচূড়: ভেলকি ত সেই বদরীনাথেরই। কেবল মায়াবী নয়, মায়াবীর রাজা সে।

এতক্ষণ পর মোটামুটি বুঝতে পারলাম তাঁর বক্তব্য। এবার আমিও হেসেই বললাম, বদরীনাথ যেতে আমাদের নিষেধ করছেন আপনি?

দৃঢ়স্বরে উত্তর হ'ল: হ্যাঁ। ডান দিকে না গিয়ে বাঁ দিকের পাকদণ্ডি পথ ধর তোমরা। সেই পথের শেষে পঞ্চম কেদার রুদ্রেশ্বরের মন্দির। শান্তি যদি চাও তবে তাঁরই চরণতলে তা পাবে। কেদারনাথজী-তুঙ্গনাথজীকে দর্শন করবার পর আবার কেন সেই মায়াবীর ফাঁদে গিয়ে পড়বে?

বিস্ময় লাগে চন্দ্রচূড়ের চোখের দিকে চেয়ে। জ্বলন্ত বিশ্বাসের উত্তাপ তাঁর কণ্ঠস্বরে থাকলেও চোখের দৃষ্টিতে তাঁর বিদ্বেষের লেশ-মাত্রও নেই। এ আলোচনায় পরিহাস অচল বিবেচনা করেই ঈষৎ কুণ্ঠিতস্বরে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বদরীনাথকে বার বার মায়াবী কেন বলছেন আপনি?

উত্তরে চন্দ্রচূড় বললেন, মায়াবী না বললে তাঁকে ত বলতে হয় শঠ।

শঠ?

তা বই কি। বৃন্দাবনের গোপীরা কি বলেছিল তাকে—'নিঠুর নট, কপট শঠ',—নয়?

কিছু পাণ্ডিত্যও যে আছে এই চন্দ্রচূড়ের তা বুঝতে পেরে আরও কুণ্ঠিত হয়ে পড়লাম আমি। সত্যই পাণ্ডিত্যের তর্ক যদি শুরু হয় তবে আমি নির্ঘাৎ হেরে যাব। তা ছাড়া তর্ক করবার সময়ই বা আমাদের কোথায়!

কিন্তু আমি চুপ করে থাকলেও চন্দ্রচূড়ই আবার বললেন, ঐ ত নারায়ণের স্বভাব—সবাইকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিজের স্বার্থরক্ষার কাজ হাসিল করে সে। স্বয়ং শিবকেও রেহাই দেয় নি সেই চোট্টা নারায়ণ।

'শঠ' কথাটারই প্রতিশব্দ হলেও এ বিশেষণটি বড় বেশী কানে লাগে। জিতেন একটু বিরক্ত হয়েই বললে, কি বলছেন আপনি?

চন্দ্রচূড় কিন্তু একটু যেন বিস্মিত হয়েই বললেন: তোমরা জান না তা? শোন নি, কি করে নারায়ণ বদরীনাথ দখল করেছেন?

আমরা দুজনেই ঘাড় নেড়ে অস্বীকার করলাম। চন্দ্রচূড় তখন মুচকি হেসে বললেন, শিবকেই নারায়ণের বেশী ভয় কি না, তাই সকলের আগে তাঁকেই তাড়িয়েছে বদরীনাথ।

সংক্ষেপে সম্পূর্ণ কাহিনীই শোনালেন তিনি।

স্বয়ং কেদারনাথেরই আদি বাড়ী নাকি ছিল ঐ এখন যেখানে বদরীনাথের মন্দির আছে সেই উপত্যকায়। দেবাদিদেব মহাদেব তিনি। ভারতবর্ষের সকলের তিনি আরাধ্য দেবতা। বিষ্ণুকে কেউ পরোয়াই করে না। শিবের প্রভাব-প্রতিপত্তিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে তখন বিষ্ণু একদিন তিব্বতে তার নিজস্ব মন্দির পরিত্যাগ করে এসে কেদারনাথের বাড়ীর কাছাকাছি এক উপত্যকায় ছোট একটি শিশুর রূপ ধরে কাঁদতে আরম্ভ করলেন।

ওদিকে বাড়ীতে কেদারনাথের সঙ্গে পার্ব্বতীর কথাবার্ত্তা হচ্ছিল তখন। অন্নপূর্ণা রোজই যেমন করেন সেদিনও তেমনি জিজ্ঞাসা করলেন স্বামীকে: তোমার রাজ্যে কেউ এখন অভুক্ত বা নিরাশ্রয় নেই ত?

কেদারনাথ উত্তর দিলেন, না।

কিন্তু ঠিক তখনই শিশুরূপী বদরীনাথের কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন পার্ব্বতী। তাড়াতাড়ি তিনি বাইরে আসতেই তাঁর চোখে পড়ল শিশুটি। স্নেহে ও করুণায় গলে গিয়ে তখনই পার্ব্বতী কোলে তুলে নিলেন তাকে। ঘরে এসে স্বামীকে ভর্ৎসনা করে বললেন, কি করে অমন কথা বললে তুমি? এই দুধের বাচ্চা এত শীতে খোলা মাঠে পড়ে পেটের খিদেয় কাঁদছে। একে আমাদের ঘরে আমার কাছেই রাখব আমি।

কেদারনাথজী কিন্তু শিশুটির দিকে একবার তাকিয়েই সন্ত্রস্ত-কণ্ঠে বললেন, অমন কর্ম্মও করো না, দেবী। এটি শিশু নয়, কপট-কুল চূড়ামণি। কোন অভাবই ওর নেই। ওকে তুমি দুঃখী ভেবে ঘরে যদি ঠাঁই দাও তাহলে আসলে খাল কেটে কুমীর ডেকে আনা হবে।

হ'লও তাই। স্বামীর সতর্ক-বাণীতে কান দেন নি পার্ব্বতী। স্নেহ ও করুণায় অন্ধ হয়ে নিজের ঘরেই তিনি রেখেছিলেন শিশুটিকে। ফল পেলেন পরদিনই।

শিশুটিকে খালি ঘরে রেখে দু'জনে অলকনন্দায় স্নান করতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখেন যে, সমস্ত ঘরখানাই জুড়ে বসে আছে আগের দিনের সেই অতটুকু শিশু বিরাট এক চতুর্ভুজ পুরুষ হয়ে। দু'জনেই চিনলেন বিষ্ণুকে, কিন্তু প্রতিবাদ করবার সময়ই পেলেন না তাঁরা। ঘরের ভিতর থেকে বিষ্ণুর গম্ভীর কণ্ঠের আদেশ কানে এল তাঁদের—তোমরা আর কোথাও গিয়ে ঘর বাঁধ গে; এখানে এখন থেকে আমিই বাস করব।

নিরুপায় হয়ে বিতাড়িত কেদারনাথ তাঁর বর্তমান ধামে আশ্রয় নিয়েছেন।

বদরীনাথ ও তাঁর মন্দিরের উৎপত্তি সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব বলেই কল্পনা নানা কাহিনী সৃষ্টি করেছে। তাদেরই একটি এই উদ্ভট কাহিনী। অসংস্কৃত কল্পনার সৃষ্টি নিশ্চয়ই এবং বৌদ্ধ-বিদ্বেষের গন্ধও একটু ওতে আছে। তবে হিন্দুধর্মের মূলধারা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয় ঐ কল্পনা। প্রলয়পয়োধিজল অপসারিত করে অনন্তদল সৃষ্টিকমলের আবির্ভাবের তত্ত্বই বুঝি রূপ নিয়েছে এই কষ্ট-কল্পিত স্থূল আখ্যায়িকার মধ্যে।

তবে তত্ত্ব বা তথ্য নিয়ে তেমন মাথাব্যথা নেই চন্দ্রচূড়ের। রসগ্রাহী তিনি এবং রস নিয়েই বিভোর। গল্প শেষ করবার পর আমার মুখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, এমন চালবাজ যে বদরী-নাথ, রুদ্রেশ্বরকে ছেড়ে তাকে দর্শন করতে যাবে তোমরা?

গোঁড়া ভক্তের এ হেন প্রশ্নের কি উত্তর দেব আমি! লজ্জিত হাসিমুখে চুপ করেই থাকলাম দেখে তিনিও যেন হাল ছেড়ে দিলেন। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বিষণ্ণ-কণ্ঠে তিনি বললেন, তবে যাও। নূতন কিছু ত নয়! বিষ্ণু ত চিরদিনই তার ভেলকি দেখিয়ে জীবকে মোক্ষের পথ থেকে ভুলিয়ে সংসারে নিয়ে বাঁধছেন। তোমরাও যে ভুলবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি!

আমি আড়চোখে জিতেনের মুখের দিকে চেয়ে দেখি যে, আবার কেমন যেন উন্মনা হয়েছে সে। সেটা আমার পক্ষে ভয়ের কারণ। আর এদিকে চন্দ্রচূড়ের কথাগুলিও আশীর্ব্বাদ বলে মনে হয় নি। আমরা পঞ্চম কেদারকে দর্শন করব না শুনে সত্যই ক্ষুণ্ণ হয়েছেন তিনি। তাঁর সেই ক্ষোভকে অন্ততঃ আংশিকভাবে দূর করবার উদ্দেশ্যে আমি বললাম, এখানকার গোপেশ্বরও ত শিব। আর তাঁকে দর্শন করবার জন্যই ত, দেখুন, এই মন্দির পর্য্যন্ত এসেছি আমরা। এখানে পূজা করবার জন্য দয়া করে আমাদের পুরোহিত হবেন আপনি?

রাজী হলেন না তিনি; কিন্তু হেসে বললেন, গোপেশ্বরজীর পুরোহিত মন্দিরেই আছেন। যাও—দর্শন-পূজা কর গে তোমরা। বলেই একটি সরু গলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি।

তত্ত্ব থেকে বস্তুর স্তরে নেমে একটু আশ্বস্ত হ'ল আমার মন। মন্দির দেখতে দেখতে ভয়-ভয় ভাবটা একেবারে কেটে গেল।

মণ্ডলচটি থেকে গোপেশ্বর মাইল ছয়েক মোটে দূর। শেষের দিকে খানিকটা চড়াই থাকলেও পথও বেশ ভালই। সুতরাং বেলা ন'টা বাজবার পূর্ব্বেই ওখানে পৌঁছে গিয়েছিলাম আমরা।

বিরাট এক কাছিমের পিঠের মত পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় গোপেশ্বর চটি। কিন্তু পাহাড় বলে মোটে মনেই হয় না জায়গাটিকে। পরিবেশ চোখে যতটা পড়ে তার সর্ব্বত্রই ক্ষেত। মাঝখানের বসতি বর্দ্ধিষ্ণু হলেও গ্রামই মনে হয়। দোতলা বাড়ীর সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়। মন্দিরের তেমন ঠাট ত এদেশে কোথাও চোখে পড়ে নি! গোপেশ্বরের মন্দির তুলনায় আরও ছোট, আরও সাদাসিধে। তবে বহু প্রাচীন মন্দির এটি। এর উপর নির্মমকালের ধ্বংসলীলা মানুষের উপেক্ষায় প্রশ্রয় পেয়েছে। মন্দির এখন জীর্ণ, বিগ্রহ উপেক্ষিত। ভিতরে টিম টিম করে একটি প্রদীপ জ্বলছে দেখলাম। ভিতরটা স্যাঁতসেঁতে। দেয়ালে কেবল যে শেওলা জমেছে তাই নয়, যেখানে ফাটল সেখানে ঘাসও গজিয়েছে বুঝি। আমরা ভিতরে গিয়ে ঢুকতেই ক'টি চামচিকে ঝটপট পাখার আওয়াজ করে উড়ে গেল।

মন্দিরের পাশেই বাইরে বিরাট একটি ত্রিশূল দেখলাম। তার গায়ে মস্ত বড় একটি কুঠার ঝুলছে। ত্রিশূল মহাদেবের; কুঠারটি নাকি পরশুরামের।

মন্দির যাত্রী-সড়ক থেকে বেশ একটু দূরে। সড়কের দু'ধারে একদিকে ঘন বসতি, মন্দিরে যাবার পথ গিয়েছে বাজারের ভিতর দিয়ে। এ গ্রামের লোকসংখ্যা যে নিতান্ত কম নয় তা অনুমান করলাম জলের কলের কাছে গাড়োয়ালী গৃহিণীদের ভিড় দেখে। যাত্রী-সড়কের ধারে পাঠশালাও একটি আছে।

খালি পড়ে আছে যে চালাঘরগুলি সেগুলি বুঝি চটি। উঁকি দিতে দিতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম—থমকে দাঁড়ালাম হঠাৎ একজনের সঙ্গে চোখাচোখি হওয়াতে। বেশী-বয়সের একজন স্ত্রীলোক, তার পাশেই হাঁটু মুড়ে বসে আছে আরও বেশী-বয়সের পুরুষ একজন। মেটে মেঝেতে ছেঁড়া কম্বল একখানা বুঝি এইমাত্র পাতা হয়েছে, তার উপর ময়লা কাপড়ের দু'টি পুঁটুলি। পুরুষটির শীর্ণ ও জীর্ণ দেহে জরা এবং রোগ উভয়েরই যুগপৎ আক্রমণের চিহ্ন স্পষ্ট বুঝা যায়।

চেয়ে দেখবার মত মুখ একখানাও নয়। কিন্তু চেনা চেনা ঠেকছে যে! হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

সেই বেণিয়াকুণ্ড চটিতে সন্ধ্যাবেলায় দোকানে সওদা করতে বসে পিছনে অবিরাম খুক্ খুক্ কাশির শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখেছিলাম একটি স্ত্রীলোককে নিয়ে জন-চারেক লোকের ছোট একটি দল। সেই দলের একজন পুরুষ তার শীর্ণ হাত বাড়িয়ে আমার কাছ থেকে এক গ্লাস চায়ের দাম ভিক্ষা চেয়ে নিয়েছিল। পরদিন আবারও সেই দলটিকে দেখেছিলাম ভুলোকনা ও পাঙ্গরবাসা চটির মাঝামাঝি পথে।

মোটামুটি শক্ত দেহ লক্ষ্য করেছিলাম তাদের মধ্যে একা এই স্ত্রীলোকটির। পুরুষ তিনজনই বৃদ্ধ। তা ছাড়া তখনই মনে হয়েছিল যে, তারা প্রত্যেকেই কোন না কোন দুরারোগ্য রোগে ভুগছে—হয় শ্বাস, নয় ত রাজ রোগই। স্পষ্ট উচ্চারণ করে কথাও বলতে পারে না কেউ—বিড় বিড় করে যা বলে তার অর্থ বুঝতে হয় প্রসারিত হাতের তেলোর দিকে চেয়ে।

মনে পড়ল যে দেখেছিলাম তারা ধুঁকতে ধুঁকতে চলছে—কখনও আগে-পিছে, কখনও একসঙ্গে দল বেঁধে। বাহাদুর তখন বুঝিয়ে বলেছিল আমাকে—বাস ভাড়া দেবার সাধ্য ওদের কেই

বলেই হাটা-পথে ওরা চলেছে বদরীনাথ দর্শন করতে। নির্ভর সম্পূর্ণ ভিক্ষার উপর।

ভাল করে তাকাতেই সন্দেহ-ভঞ্জন হ'ল। ততক্ষণে আমাদের দেখে স্ত্রীলোকটিও এগিয়ে এসে দোরের কাছে দাঁড়িয়েছে—আর সেই পরিচিত ভঙ্গিতে আমার দিকে হাত বাড়িয়েছে কিছু ভিক্ষার জন্য।

বিনা আয়াসে পকেট থেকে যা উঠল তাই তার হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আমি : দলে চারজন ছিলে না তোমরা ?

হাঁ বাবু—ঘাড় নেড়ে উত্তর দিল স্ত্রীলোকটি : দলের আর দু'জন এগিয়ে গিয়েছে, কিন্তু ইনি অশক্ত।

তাতে সন্দেহ নেই। বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে বসে বসেও ধুঁকছে সে। পিছনের চড়াই কেমন করে যে পার হয়ে এল এই রুগ্ন বৃদ্ধ তা বুঝতে পারি নি আমি। ঐ যে শুনেছি 'পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং'—এ কি তারই উদাহরণ দেখছি আমার চোখের সামনে!

সসম্ভ্রম বিস্ময়ে ভাবছিলাম আমি, কিন্তু তখনই তাল কেটে গেল। করুণ সুর আবার কানে এল আমার : মোটে এক আনা দিলে বাবু—এক গ্লাস চা-ও ত হবে না এতে।

হাত আবার পকেটে ঢুকে গেল আমার। সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীলোকটির মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি বুঝি তোমার স্বামী ?

হাঁ বাবু—যেমন কপাল করেছিলাম—

কানে গিয়ে লাগল স্ত্রীলোকটির তিক্ত কণ্ঠস্বর। কিন্তু ততক্ষণে পুরা একটি টাকাই হাতে উঠেছে আমার। আর ইতস্ততঃ না করে তাই ফেলে দিলাম স্ত্রীলোকটির হাতের তেলোতে।

পুকুরে ছোট একটি ঢিল ফেললেও জল নড়ে জানি। কিন্তু এ যে দেখছি উত্তাল তরঙ্গভঙ্গ। দান পেয়েই বড় বেশী যেন চঞ্চল হয়ে উঠল স্ত্রীলোকটি।

তৎক্ষণাৎ এমন ভাবে ঘুরে দাঁড়াল সে যাতে ভিতরের পুরুষটি আমার দৃষ্টির আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। ক্ষিপ্ত হস্তে টাকাটি সে বেঁধে ফেলল তার আঁচলের খুঁটে ; তার পর আমার মুখের দিকে চেয়ে প্রায় গদগদ স্বরে সে বললে, তুম, বাবু, বহুত আচ্ছা আদমী হো।

তোমাদের শুনি স্বয়ং ভগবানও তুষ্ট হন। আমি ত কোন ছার! ক্ষণেকের বিস্ময়কে হটিয়ে আত্মপ্রসাদ আমার সম্পূর্ণ মন জুড়ে বসল। এবার হেসেই তাকালাম স্ত্রীলোকটির মুখের দিকে। বললাম, খানা বনায়ো—মজেসে খা লো। বন্দোবস্ত সব ঠিক হ্যায় তো ?

জরুর হো জায়েগা—উল্লসিত কণ্ঠে উত্তর দিল স্ত্রীলোকটি। সঙ্গে সঙ্গেই তার দেহের বিভিন্ন তটে আরও কয়েকটি তরঙ্গ ভেঙে পড়ল যেন। সেও আমার মুখের দিকে চেয়ে আবার বললে, তোমরা এখানে থাকবে বাবু ?

থাকবার পরিকল্পনা নেই আমাদের—একটানে পিপুলকুঠি পর্যন্ত যাবার ইচ্ছা নিয়েই মণ্ডলচটি থেকে যাত্রা করেছি আমরা। তথাপি স্ত্রীলোকটির প্রশ্ন শুনে জিজ্ঞাসু চোখে জিতেনের মুখের দিকে তাকালাম আমি।

কিন্তু জিতেন নির্ব্বিকার। সে দৃঢ়স্বরে বললে, না, মণিদা, চলুন এগিয়ে যাই।

সুতরাং ফিরে স্ত্রীলোকটির মুখের দিকে চেয়ে আমি বললাম, নহী ঠহরেঙ্গে। হমলোগোঁকো অভী চলনা হ্যায়।

কয়েক পা এগিয়েও গিয়েছিলাম, কিন্তু হঠাৎ আবার চেনা সুরের ডাক কানে এল—বাবুজী!

ফিরে তাকিয়ে দেখি যে, সেই স্ত্রীলোকটি ঘর থেকে পথে নেমে দাঁড়িয়েছে। আমি থমকে দাঁড়ালাম দেখেই সে দ্রুতপদে আমার দিকে এগিয়ে এল। কাছে এসে আবার বললে, আজ দিনটা এখানে থেকেই যাও না বাবু। কাল সকালে একসঙ্গেই যাওয়া যাবে।

আমি আবারও অস্বীকার করলাম, নহী হো সকতা।

পরক্ষণেই চোখের পলকে ঘটে গেল ব্যাপারটা। বিদ্যুদ্বেগে ছুটে এসে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত উদ্ধত ভঙ্গিতে তার মাথাটাকে পিছনে হেলিয়ে প্রায় আমার মুখের কাছে মুখ তুলে স্ত্রীলোটি বললে, হর্জ ক্যা ? বলেই ফিক্ করে হেসেও ফেলল সে।

একটা সাপ যেন হঠাৎ ফোঁস করে ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে আমার সামনে—তার বিষাক্ত নিশ্বাস আমার গায়ে এসে পড়ল—না, দংশনই করল সে ? পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত আমার সির সির করে উঠল। না, মন ? চমকে দু'পা পিছনে হটে গেলাম আমি।

বৃদ্ধা না হলেও প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি। অমার্জ্জিত ময়লা রং তার রোদে পুড়ে ও জলে ভিজে মৃতের চামড়ার মত বিবর্ণ। হাতের আঙুলগুলি দেখতে পাকানো দড়ির মত। লাবণ্যের সংস্পর্শহীন পাকা মুখখানিতে গঠনের পারিপাট্য একেবারেই নেই। চাপা হাসির আকস্মিক প্রলেপে আরও কুৎসিৎ হয়েছে সেই মুখ।

নিদারুণ বিরক্তি ও বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে নিলাম আমি। কিন্তু কমছে না ত সেই সির সির ভাবটা!

রক্ষা করল বাহাদুর। পিঠের বোঝা তুলে নিতে স্বতঃই একটু তার দেরি হয়েছিল বলেই আমার পিছনে আসছিল সে। কাছে এসে এখন সে থমকে দাঁড়াল। চোখ দুটি তার যথাসম্ভব উপর দিকে তুলে প্রথমে আমাকে ও পরে স্ত্রীলোকটিকে দেখে নিল সে। তার পর তাকে সে ধমক দিয়ে বললে, ভাগ যহাঁসে। পুরা এক রূপয়াহী তো তুঝে মিল গয়া। ফির দুখ ক্যাঁও দেতী হো ?

সঙ্গে সঙ্গেই সে আমাকে এগিয়ে যাবার নির্দ্দেশ দিল তার হাতের ইসারায়।

মিনিট পনর পর আমার কাছাকাছি এসে বাহাদুর আমাকে বললে, আচ্ছা কিয়া বাবুজী কি উস চট্টিমে আপ ঠহরে নহী। মুঝে মালুম হোতা হ্যায় কি বহ আওরত অচ্ছী নহী থী।

আমি বিব্রত ভাবে বললাম, কি বলছিস তুই? কি করে জানলি?

বাহাদুর উত্তরে বললে, মনে এল তাই আপনাকে বললাম বাবুজী। এই তীর্থের পথে কত লোকই ত আসে। তাদের সবাই কি আর সাধুসন্ত হতে পারে!

তখনও সেই অনুভূতিটা মনে রয়েছে আমার—অজ্ঞানতে কোন অশুচি বস্তু মাড়ালে দেহ ও মনের যে অবস্থা হয় কতকটা সেই রকম। বাহাদুরের কথা শুনেই মনে হ'ল বুঝি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা একটি পেয়ে গিয়েছি আমার ঐ অবস্থায়—দেবমন্দিরের শুচিতা যেমন মনকে শুচি করে অশুচি পরিবেশেরও ত শুনি যে তেমনি বিপরীত প্রভাব আছে মানুষের মনের উপর।

কিন্তু ব্যাখ্যাটা আমার মনের মত হলেও তৎক্ষণাৎ চোখ রাঙিয়ে নিজের মনকে শাসন করলাম আমি। ও ব্যাখ্যা যে দুমুখো তলোয়ারের মত। দুপক্ষ নিয়ে যেখানে কারবার সেখানে নিশ্চয় করে কে বলতে পারে কার অশুচিতা কার মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে!

মনে মনে প্রভু যীশুখৃষ্টের আদেশ স্মরণ করলাম—যে ব্যক্তি জীবনে কোন দিন কোন পাপ করে নি সেই প্রথম ঢিল ছুড়ুক ঐ পাপিষ্ঠার গায়ে।

১৯

কলুষনাশিনী গঙ্গা। হরিদ্বার থেকে শুরু করে এ পর্য্যন্ত যতবার গঙ্গায় স্নান করেছি ততবারই মনে পড়েছে ঐ বর্ণনা। দেহ ও মনের অতি স্নিগ্ধ অনুভূতির মধ্যে কিছু কিছু প্রমাণও পেয়েছি তার। কিন্তু সে ত স্নান করবার পর। গঙ্গা দর্শন করলেও কিছু কলুষ নাশ হয় নাকি!

বাহাদুর এক সময়ে আমাকে বললে, ঐ যে বাবুজী, অলকনন্দা।

অনেক উঁচু থেকে দেখা। তবু বেশ ভালই দেখা গেল। বিপুল জলধারা খরস্রোতে বয়ে চলেছে। কিন্তু গঙ্গার অঙ্গ বেশ এখানে। বাহাদুর না বলে দিলেও আমি বুঝতে পারতাম যে ইনি মন্দাকিনী নন। স্ফটিক শুভ্র নয় এর জল। আর দুকূলের পাহাড়েই স্পষ্ট লালের আভা থাকলেও রাঙাও নয় তা। কাদা-গোলা রংএর ঘোলা জল অলকনন্দার—বর্ষাকালে কলকাতার ঘাটে যেটে রংএর যে গঙ্গা জল দেখি আমরা তার চেয়েও যেন কালো। অলকনন্দা এখানে ঠিক কুলুনাদিনী না হলেও মন্দাকিনীর মত গর্জ্জন নেই তাঁর।

অত দূর থেকে দেখেও চোখ জুড়িয়ে গেল যেন। চোখের পথে মনে গিয়েও ছড়িয়ে পড়ল সেই স্নিগ্ধতা। তার পর পায়ের গতি আমার দ্বিগুণ বেড়ে গেল।

তার একটি কারণ যে, উতরাই পথ তা সঠিক বুঝলাম অলকনন্দার উপরকার পুলের কাছাকাছি উপস্থিত হবার পর। বাঁয়ে উপর দিকে তাকাতে গিয়ে মনে হ'ল যে আমার ঘাড় বুঝি মট করে ভেঙে যাবে—এতই উঁচু সেদিকের পাহাড়। বিশ্বাসই হয় না যে ঐ পাহাড় থেকেই এইমাত্র নদীর ঘাটে নেমে এলাম আমি।

ওপারে চামোলি। মনোরম পার্ব্বত্য শহর একটি।

পূর্ব্বে নাম ছিল লালসাঙ্গা। অলকনন্দার উপরে যে পুলটি পার হয়ে ওপারে শহরে গিয়ে উঠতে হবে সেটির রং তখন আগা-গোড়া লাল ছিল বলেই শহরের নামও ছিল লাল "সাঙ্গা", মানে পুল। পুলের লাল রং এখন আর নেই, লাল নামও এখন নেই শহরের। ভালই হয়েছে। আমাদের দেশের "লাল" দলের শাখা এখানেও যদি থেকে থাকে তবে তা অন্ততঃ টকটকে লাল রং বা লাল নামের অতিরিক্ত সমর্থন ও সহযোগিতা পাবে না।

দেবপ্রয়াগের চেয়ে অনেক বড় শহর চামোলি—দোকান-পশার, আপিস, আদালত, ধর্ম্মশালা, হাসপাতাল নিয়ে বেশ জমজমাট। মাঝের থাকে কাটরা অঞ্চলে পণ্যের বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য্য প্রথম দৃষ্টিতেই চোখে ধরা পড়ে।

জিতেনের তর সয় না—তাড়াতাড়ি উপরে গিয়ে বাস ধরবার ইচ্ছা তার। কিন্তু আমার অন্য প্রবৃত্তি—গৃহস্থালীর শূন্য ভাণ্ডার আবার পূর্ণ করতে চাই আমি। সুতরাং সবিনয়ে জিতেনকে নিবৃত্ত করবার পর বাজারে খুঁজে খুঁজে লজেন্স, মিছরি, বিস্কুট ত বটেই, নুন, তেল, হলুদ, মশলাও কিনলাম থরে থরে। ফলে বোঝা যে বাড়ছে সেদিকে খেয়ালই নেই আমার।

অত সব জিনিস যে থলেটির মধ্যে রাখা হবে সেটির খোঁজ করতে গিয়েই ধরা পড়ল যে বাহাদুর আমাদের সঙ্গে নেই।

আধ ঘণ্টাখানেক পর উপরে বাস-সড়কের ধারে গিয়ে দেখা পেলাম তার। টিকেট ঘরের পাশে আমাদের মোটঘাট গুছিয়ে রেখে কাছেই ছায়ায় বসে আর একটি কুলির সঙ্গে গল্প করছিল সে। একটু ধমক দিলাম তাকে আমাদের না জানিয়ে সোজাসুজি সে উপরে উঠে এসেছে বলে; তার পর খাবারের ঠোঙাটি তার হাতে দিয়ে বললাম চটপট খাওয়া সেরে নিতে।

সে কিন্তু অমন লোভনীয় ঠোঙাটিও এক পাশে সরিয়ে রেখে কুণ্ঠিতস্বরে আমাকে বললে, একটা ঠিকানা লিখে দেবেন, বাবুজী? চিঠি আমি আর একজনকে দিয়ে লিখিয়েছি। বলতে বলতে তার ডান হাতখানা একটু বাড়িয়ে সে একখানা পোষ্টকার্ড দেখাল আমাকে। হিজিবিজি কি যেন লেখা আছে তাতে—কেবল ঠিকানায় ঘরটাই খালি।

কার্ডখানা আমি হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম তাকে: কাকে চিঠি লিখছিস?

উত্তরে দেখি কথাই ফোটে না তার, শুধু চোখ দুটিই নয়, মুখ-খানাও নীচু করে অস্ফুটস্বরে যা সে বললে তার মধ্যে কেবল 'শ্রীনগর' নামটাই ঠিক ঠিক বুঝতে পারলাম আমি।

তবে ঐটুকুই শুনেই মনে পড়ে গেল আমার—আসবার পথে

ঐ শ্রীনগরেই বাহাদুরকে আমরা দেখেছিলাম তার বাক্‌দত্তা বধূ রুক্মিণী এবং তারই মাতাপিতার সঙ্গে স্থানীয় এক বস্তী বাড়ীর প্রাঙ্গণে। বাহাদুরের হোঁতকা মুখে নারীসুলভ লজ্জার লালিমার অর্থও সঙ্গে সঙ্গেই বোধগম্য হ'ল আমার। সুতরাং মুচকি হেসে বললাম: রুক্মিণীকে চিঠি লিখছিস নাকি?

প্রশ্ন শুনে স্পষ্টই সে আরও বেশী বিব্রত হয়ে থাকলেও এবার সম্পূর্ণ উত্তরই দিল সে: না, বাবুজী। তার বাপ দলবাহাদুর গুড়ুংকে।

ও একই হ'ল। সুতরাং মনে মনে খুশী হয়েই তার ফরমাজ তামিল করলাম। তবে বেশ সময় লাগল ঐটুকু ঠিকানা লিখতে। বাহাদুরের কোন উচ্চারণই তেমন স্পষ্ট নয়। দু' তিনবার শুনলে তবে এক-একটি শব্দ বোধগম্য হয় আমার। সুতরাং ঠিকানার ভুলে এমন মূল্যবান চিঠিখানাও ডাকঘরেই যাতে পঞ্চত্ব না পায় সে-জন্য সম্পূর্ণ ঠিকানাটি হাতের কাছে টুকরা কাগজের অভাবে আমার নোট বইতে প্রথমে টুকে নিয়ে পরে তাই নকল করে বড় বড় অক্ষরে লিখলাম পোষ্টকার্ডের পিঠে। তার পর কার্ডখানি বাক্সে ফেলে দেবার জন্য বাহাদুরের হাতে দিয়ে আবার তার মুখের দিকে চেয়ে হেসে জিজ্ঞাসা করলাম আমি: রুক্মিণীর জন্য তোর মন খুব উতলা হয়েছে নাকি রে?

উত্তর না দিয়েই পালিয়ে গেল বাহাদুর—মানে, ছুটে গেল অদূরে পোষ্ট আপিসের দিকে।

নিচে মুদীর আর মনোহারী দোকানে সওদা শেষ করবার পর বাহাদুরকে কাছে না দেখে বিরক্ত হয়েছিলাম নিশ্চয়ই। কিন্তু তখনই তাকে খুঁজে বের করবার তাগিদের চেয়েও আরও কড়া একটা তাগিদ অনুভব করছিলাম আমি আমার নিজের মধ্যেই। একটানা প্রায় নয় মাইল পথ হেঁটে আসবার পর পেটের মধ্যে তখন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। দুপুরে কোথায় গিয়ে কখন যে রান্না করতে পারব তার ঠিক নেই। সুতরাং ঐ চামোলির বাজারেই তখনই পেটের আগুন নেভাবার চেষ্টা করতে হ'ল।

মিষ্টির দোকানের অভাব নেই ওখানে। পেড়া ও লাড্ডু জাতের মিঠাই থরে থরে সাজান রয়েছে দেখতে পাচ্ছি। মালাই-সহ গরম দুধ সব দোকানেই পাওয়া যায়। কিন্তু দুধের চেয়ে দইয়ের উপর বেশী আসক্তি আমার। খুঁজতে খুঁজতে তাও পাওয়া গেল। সেই দোকানে বসেই দুজনে পরিপাটি ভোজন সমাধা করলাম। এখন সিঁড়ির মত পথ বেয়ে উপরে যেতে হবে বাস-সড়ক পর্য্যন্ত।

কিন্তু উঠে দাঁড়াতেই খচ করে উঠল আমার ডান পায়ের গুলফ-সন্ধির কোন একটা জায়গায়। যতবার পা ফেলি ততবারই তাই। চলতে চলতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালাম একটু। বুঝলাম যে স্থির হয়ে দাঁড়ালে কোন কষ্ট বোধ হয় না, কেবল চলতে গেলেই কন্ কন্ করে জায়গাটা। আমার পক্ষে যত জোরে চলা স্বাভাবিক তত জোরে চলা এখন দেখছি একেবারে অসম্ভব।

শেষে অবস্থাটা জানালাম জিতেনকে। সে জিজ্ঞাসা করল, পা মচকায় নি ত আপনার?

মনে করতে পারলাম না। চলতে চলতে নিশ্চয়ই পাথরের ফাঁকে অনেকবার পা আটকে গিয়েছে, গোড়ালীর সন্ধিস্থলটা বেঁকেও গিয়েছে মাঝে মাঝে। কিন্তু একবারও মনে হয়নি যে, কোথাও আঘাত লাগল তাতে। আর ব্যথা অনুভব করলাম ত এই প্রথম—দোকানঘরের দিব্যি সমতল বারান্দায় বেঞ্চির উপর আরামে পা ঝুলিয়ে বসে পরম পরিতোষ সহকারে ভোজন সমাধা করবার পর।

জুতা মোজা খুলে ডান পায়ের পাতা ও গুলফ দু'জনেই অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করলাম। দেখা গেল যে একটু ফোলা আছে গোড়ালীর ডান দিকে। তবে জিতেনের চোখে তা অস্বাভাবিক ঠেকলেও আমি নিরুদ্বিগ্ন। অনেক বৎসর পূর্ব্বে এক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে গিয়ে কিছুদিন থাকতে হয়েছিল আমাকে দুটি পায়েরই নানা জায়গায় ছেঁড়া চামড়া জোড়া লাগাবার জন্য। কেটে গিয়েছিল ডান পায়ের গুলফ অঞ্চলের মোটা চামড়াও। ঘা শুকাবার পরেও বিশেষ ঐ জায়গাটা একটু ফুলেই রয়ে গিয়েছে। ব্যথা বা অন্য কোন উপসর্গ গত পনর বৎসরের মধ্যে ওখানে একবারও প্রকাশ পায় নি বলে ঐ জায়গায় সামান্য স্ফীতিকে মোটেই অস্বাভাবিক মনে করিনি আমি।

তবে এখন যে হাঁটতে গেলেই লাগছে ঐ জায়গাটাতে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং ওষুধের ছোট বাক্সটি খুলতে হ'ল। টিংচার আইডিনের শিশি দেখি শূন্য—ছিপির ফাঁক দিয়ে ইতিমধ্যে তরল পদার্থটুকু অদৃশ্য হয়েছে। তবে আয়োডেক্স মলম পাওয়া গেল একটি অক্ষত ডিবাতে। তখনই ব্যথার জায়গায় তাই একটু মালিশ করে গোড়ালীর চারিদিকে হাল্কা একটি ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল জিতেন। তার পর সে আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললে, উপরে গেলেই বাস পাওয়া যাবে, মনিদা। আর সামনের বাস-ষ্টেশন পিপুলকুঠি পর্য্যন্তই আজকের প্রোগ্রাম আমাদের। অর্দ্ধেকটা দিন আর পুরা এক রাতের বিশ্রামে আপনার পায়ের ব্যথা সেরে যাবে আশা করি।

সেটা ভবিষ্যতের সম্ভাবনা। আপাততঃ উপকার পেলাম অন্য একটি উৎস থেকে। ডান পায়ের কাজটা যথাসম্ভব হাতের লাঠিকে দিয়ে করিয়ে উপরে গিয়ে পৌঁছবার পরেই তখনকার মত ভুলেই গেলাম ব্যথাটাকে—নূতন খোরাক পেয়েছে আমার মন।

উপরে আরও জমজমাট। পথের ধারেই পাশাপাশি কয়েক-খানা দোতলা বাড়ী। নূতন সরকারী বিশ্রামভবন যেটি নির্ম্মিত হয়েছে সেখানা ত রাজপ্রাসাদ। সারি সারি বাড়ী ও বাস-সড়কের মাঝখানে ফুটপাতের মত যে দীর্ঘ ও প্রশস্ত জায়গা আছে সেখানে বাস-কোম্পানীর টিকেট ঘর ও প্রতীক্ষালয় ছাড়াও পান-সিগারেটের

ইস, মিষ্টির দোকান ও একটি রীতিমত হোটেল আছে দেখলাম। সড়কের উপর লম্বা এক সারি বাস দাঁড়িয়ে আছে ; বাস আসছে ও ছাড়ছেও পাঁচ-দশ মিনিট পরে পরেই। ঠিক গিজগিজ না করলেও লোকজন এখানে অনেক। ব্যস্তসমস্ত ভাব সকলেরই। সব মিলিয়ে হৈ হৈ, রৈ রৈ কাণ্ড।

চাঁদনী-চক থেকে চৌরঙ্গির মোড়ে এসে পড়লাম যেন— অন্তমনস্ক ত হবই।

কেবল বিস্মৃতি নয়—নূতন এবং বেশ মূল্যবান এক প্রাপ্তির উপলব্ধি যেন আমার মনে।

যেন জলের মাছ ডাঙায় পড়ে অনেকক্ষণ ছটফট করবার পর আবার জলে এসে পড়েছে।

বাস-এ উঠে ড্রাইভারের পাশের দুটি আসন দুজনে দখল করে বসেই জিতেনকে আমি বললাম, একটা সিগারেট দাও ত।

জিতেন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, বিড়ি ছেড়ে হঠাৎ সিগারেট যে ?

হাসিমুখে উত্তর দিলাম : বর্ব্বরতা থেকে সভ্যতায় ফিরে এসেছি—উৎসব করতে হবে না !

কিন্তু উৎসব বলতে কেবল ত ঐ জ্বলন্ত সিগারেটটি ফুঁকে ফুঁকে ধোঁয়াতে পরিণত করা। গাড়ী ছাড়তে দেরি থাকলে কি হবে— পায়ের ব্যথা নিয়ে অকারণে হেঁটে চলে বেড়াবার সাহস হয় না। সুতরাং বাধ্যতামূলক ঐ অবসরের ফাঁকটুকুকে আর কোনরকম সক্রিয় উৎসব দিয়ে ভরতে না পেরে গাড়ীতে বসেই অলস-দৃষ্টিতে লোকজনের চলাফেরা দেখে উৎসব করবার দুধের স্বাদ ঘোলেই মেটাচ্ছিলাম আমি।

সেই দৃষ্টিও আমার জনতার মধ্যে বিশেষ একজনের মুখের উপর গিয়ে পড়বার পর একেবারে যেন নিশ্চল হয়ে গেল।

গেরুয়া রঙের আলখাল্লা-পরা বৃদ্ধ সন্ন্যাসী। শীর্ণ-দেহে জরার চেয়েও রোগের দৌরাত্ম্যের চিহ্ন বেশী দেখা যায়। মাথার চুল ও মুখমণ্ডলের দাড়ি-গোঁফ গত দু-এক দিনের মধ্যেই নির্ম্মূল করা হয়েছে বলে চোয়ালের উদ্গত হাড় ও মুখের অসুস্থ পাণ্ডুর বর্ণ এত দূর থেকেও বেশ চোখে পড়ে। কিন্তু তা ছাড়াও অস্পষ্টভাবে আরও কি যেন দেখছি আমি। চেনা-চেনা ঠেকছে সন্ন্যাসীর মুখখানি।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। একটু পরেই মনে হ'ল যে, তিনিও আমাকে দেখছেন। তার পরেই চোখাচোখি দুজনের।

বিব্রতভাবে চোখ ফিরিয়ে নিলাম আমি। কিন্তু মন আমার ক্রমাগতই বলছে যে, ঐ সন্ন্যাসীকে কোথায় যেন দেখেছি আমি। চুপি চুপি জিতেনকে বললাম আমার সন্দেহের কথা। তার পর দুজনেই একসঙ্গে তাকালাম তাঁর দিকে। তখনও দেখি যে, তিনি চেয়েই আছেন আমাদের দিকে।

কিছুক্ষণ অভিনিবেশ সহকারে তাঁকে লক্ষ্য করবার পর জিতেনও স্বীকার করল যে, চেনা-চেনা মনে হচ্ছে তারও ; কিন্তু কোথায় যে ঐ সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল তা ঠিক ঠিক স্মরণ হচ্ছে না তার।

তবে স্মরণ করবার জন্ত আর বেশী চেষ্টা করতে হ'ল না। আমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখেই সন্ন্যাসী দ্রুতপদে আমাদের বাস-এর কাছে এসে নিজেই হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, মুঝকো নহী পহচানতে হো ?

গলার স্বরও চেনা-চেনা। তথাপি ঠিক মনে পড়ছে না ত ! সুতরাং কুণ্ঠিত হয়ে বললাম,ঠিক কোথায় যে দেখেছি আপনাকে—

ঋষিকেশমে—আমার মুখের কথা শেষ হবার পূর্ব্বেই বললেন সন্ন্যাসী : উসসে ভী আগে হরদোয়ারমে।

স্মৃতির দুয়ার আমাদের সশব্দে খুলে গেল। জিতেন উল্লসিত হয়ে বললে, ঠিক—ঠিক মনে পড়েছে এখন। ঋষিকেশে গঙ্গার ঘাটে দেখা হয়েছিল আমাদের। আপনার নাম স্বামী সত্যানন্দ আশ্রম না ?

স্মিতমুখে ঘাড় কাৎ করলেন সন্ন্যাসী। আর তখন সব কথাই আমারও মনে পড়ে গেল। এই সন্ন্যাসীর নিজের মুখ থেকেই শুনেছিলাম এর ব্যর্থসাধনার করুণ ইতিহাস। সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে এক আশ্রমে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন ইনি সাধন-ভজন করবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু সেখানে তিনি না পেয়েছেন ঈশ্বর, না মানুষ। ভগ্নহৃদয়ে সে আশ্রম থেকে বের হয়ে এসে পরিব্রাজক হয়েছেন। বলেছিলেন যে, তাঁর চেষ্টাও আছে নিজস্ব একটি আশ্রম করবার।

সন্ন্যাসীর ঐ ইচ্ছার কথা শুনে জিতেন সেদিন আমার কাছে তাঁকে বিদ্রূপ করেছিল। পাছে এখনও সন্ন্যাসীর মুখের উপরেই আবার তেমনি কোন বেফাঁস কথা বলে ফেলে সে, সেই আশঙ্কায় আমি অলক্ষ্যে জিতেনের গা-টিপে সতর্ক করে দিলাম তাকে। তার পর সন্ন্যাসীকে বললাম, আপনি না গোয়ালিয়রে আপনার এক শিষ্যের কাছে যাবেন বলেছিলেন।

শুনে সন্ন্যাসী প্রীত হয়েছেন মনে হ'ল আমার। একটু হেসেই তিনি বললেন, সে কথাও মনে আছে তোমার ? কিন্তু, বাবা, মনে মনে মথুরা-বৃন্দাবনই যাওয়া চলে। গোয়ালিয়র যেতে অর্থের প্রয়োজন হয়। একে কপর্দ্দকহীন পরিব্রাজক সন্ন্যাসী আমি, তার আবার অসুখে পড়েছিলাম। বদরীনাথ থেকে নেমে যোশীমঠ পর্য্যন্ত আসবার পর একেবারে চলৎশক্তিহীন অবস্থা আমার। সেখানেই পড়েছিলাম কয়েক দিন।

শেষের দিকে স্বতঃই বিষন্ন কণ্ঠস্বর। মুখখানাও দেখি যে ম্লান হয়ে গিয়েছে।

আমার ভাব সেইজন্তই কুণ্ঠিত ; কিছু-একটা বলবার জন্তই বললাম, তার পর ? এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছেন ত ?

না বাবা।

তবে

আমার ঐ প্রশ্ন শুনেই তৎক্ষণাৎ একেবারে যেন বদলে গেলেন সন্ন্যাসী। চোখমুখ তাঁর দেখতে দেখতে আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। উৎফুল্লকণ্ঠে তিনি বললেন, সুস্থ না হলেও এখন আর কোন দুর্ভাবনা নেই আমার। ভগবান আমাকে আশ্রয় জুটিয়ে দিয়েছেন—একেবারে অন্নপূর্ণার কোল।

আমি বিহ্বলের মত জিজ্ঞাসা করলাম, তার মানে।

তিনি উত্তরে বললেন, ঐ যা বললাম ঠিক তাই। না, না বাবা—তার চেয়েও বেশী। একসঙ্গেই অন্নপূর্ণা ও লক্ষ্মী দুজনেই কোল দিয়েছেন আমাকে। এখনও ত মায়ের কোলেই রয়েছি আমি।

বলে কি সন্ন্যাসী—ইনি প্রকৃতিস্থ আছেন ত!

নিশ্চয়ই আমার মুখের ভাবেও মনের সন্দেহ প্রকাশ হয়ে পড়েছিল এবং সন্ন্যাসীর চোখ এড়ায় নি তা। হাসতে হাসতে তিনি আবার বললেন, না বাবা—আমি রুগ্ন হলেও পাগল হই নি। তোমরা ত তাদের দেখ নি! দেখলে তোমরাও মানবে যে, কৈলাসের অন্নপূর্ণা ও বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী রূপ ধরে এসেছেন আমার কাছে। আমি একসঙ্গেই পেয়েছি মা ও মেয়ে। তাঁরাও সম্পর্কে তাই—জননী আর কন্যা।

চমকে উঠলাম আমি। তাড়াতাড়ি জিতেনের মুখের দিকে চেয়েই বুঝতে পারলাম যে, সেও আমার মতই চমকে উঠেছে। পুনরায় স্বামীজীর মুখের দিকে চেয়ে রুদ্ধনিঃশ্বাসে আমি বললাম, আরও একটু স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলুন ত!

বুঝিয়েই বললেন তিনি, তবে হাসিমুখে আর নয়। গম্ভীর হয়ে গম্ভীর স্বরে তিনি বললেন, সব কথা কি বুঝিয়ে বলা যায়, বাবা? না, নিজেই বুঝতে পারে কেউ? যোশীমঠের এক চটির বারান্দায় চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়েছিলাম আমি। কত যাত্রী ওখান দিয়ে এল গেল—আমার দিকে চেয়েও দেখল না কেউ। কিন্তু পরশু দুপুরের দিকে বদরীনাথ দর্শন করে যোশীমঠে নেমে এলেন সেই মা আর তাঁর মেয়ে। আমার দু-চারটি কথা শুনবার পরেই একেবারে কোল পেতে দিয়েছেন তাঁরা। আমাকে কাণ্ডিতে বসিয়ে এনেছিলেন পিপুলকুঠি পর্য্যন্ত। তার পর ত মোটরের পথ। সমাদর করে তাঁদের বাড়ীতে আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। বলতে বলতে সন্ন্যাসীর চোখের কোলে যেন জল দেখা দিল।

কিন্তু শুনতে শুনতে আমার বুকের মধ্যে মনে হ'ল যেন ঝড় উঠেছে। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আবার আমি তাকালাম জিতেনের মুখের দিকে। কিন্তু তার পূর্ব্বেই জিতেনের চঞ্চল চোখ দু'টি গিয়ে পড়েছিল বাইরের জনতার উপর। আমি তার দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ অনুসরণ করবার পূর্ব্বেই উল্লাসে প্রায় চীৎকার করে উঠল সে: আর সন্দেহ নেই, মনিদা—ঐ ত মাসীমা।

আর একটু চেষ্টা করতেই আমিও স্পষ্ট দেখলাম—টিকেট-ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে গঙ্গোত্রীর জননী তাঁর দুই চোখের ব্যাকুল দৃষ্টি দিয়ে কি যেন পাঁতি পাঁতি করে খুঁজছেন।

জিতেন আমাকে একটি ঠেলা দিয়ে আবার বললে, নামুন, মনিদা। অন্ততঃ এ গাড়ীতে আমাদের যাওয়া হবে না।

বৃদ্ধা যে চোখে ভাল দেখতে পান না তা অবশ্য আমার অজানা নয়। কিন্তু তাই কি একমাত্র, এমন কি প্রধান কারণও হতে পারে তাঁর ঐ আচরণের?

একসঙ্গেই তিনজন আমরা তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি, কিন্তু আমাদের দু'জনকে যেন দেখতেই পেলেন না তিনি। আর যে সত্যানন্দ আশ্রমের সঙ্গে মাত্র দু'দিনের পরিচয় তাঁর, সোজা তাঁরই দিকে দু-পা এগিয়ে গিয়ে তিনি বললেন, আমাকে বলে আস নি কেন, বাবা? তোমাকে খুঁজে খুঁজে আমি যে এদিকে হয়রাণ!

সত্যানন্দ কুণ্ঠিত হাসিমুখে উত্তর দিলেন: দূরে কোথাও যাই নি ত আমি। মিছামিছি মাতাজী, কেন আমাকে খুঁজতে বের হয়েছ?

উত্তর হ'ল: খুঁজব না! তোমাকে কি বাবা বিশ্বাস আছে! একবার নিজের ঘর থেকে পালিয়েছ তুমি, দ্বিতীয়বার আশ্রম থেকে। আমার কাছ থেকেও আবার যে তুমি পালিয়ে যাবে না তা আমি মানি কেমন করে!

আশ্চর্য্য! সবিস্ময়ে লক্ষ্য করছিলাম আমি। কেদারের পথে কতবার কত কাছে থেকেই ত এই মহিলাকে দেখেছি আমি। তাঁর মুখে মিষ্টি কথাও নিশ্চয়ই শুনেছি। তবু তখন অধিকাংশ সময়েই একে আমি দেখতাম যেন বিমর্ষ, না হয় উদাসীন। কিন্তু আজ দেখছি একেবারে ভিন্ন মূর্ত্তি তাঁর। সত্যানন্দের সঙ্গে তিনি কথা বললেন ভর্ৎসনার ভাষায়, কিন্তু কণ্ঠ থেকে তাঁর মধু যেন ঝরে পড়ছে। বৃদ্ধার সাদাটে নিষ্প্রভ চোখ দুটি এখন মনে হয় যেন চক্‌-চক্‌ করছে।

সেই মুখের দিকে চেয়ে সত্যানন্দ উত্তরে হাসিমুখে বললেন, মাফ কর, মাতাজী। দূরে যাবার ইচ্ছাই ছিল না আমার—ঘর থেকে বাইরে এসে চটির সামনেই দাঁড়িয়েছিলাম আমি। হঠাৎ এই দু'জন চেনা লোককে দেখে একটু এগিয়ে গিয়েছিলাম কথা বলতে। গিয়ে শুনি যে এঁরাও তোমাকে চেনেন।

বহুবচন ব্যবহার করলেও স্বামীজী আঙুল দিয়ে জিতেনকেই দেখিয়ে দিয়েছিলেন। আর জিতেনও পরক্ষণেই বৃদ্ধার দিকে দু-পা এগিয়ে গিয়ে সহাস্যকণ্ঠে বললে, কেমন আছেন, মাসীমা? চিনতে পারছেন ত?

বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া ঐ সম্ভাষণের।

ভুল করেছিলাম আমি, মনে মনে একটু অবিচারই করেছিলাম বৃদ্ধার প্রতি। আমাদের তিনি মোটেই উপেক্ষা করেন নি—আসলে দুজনের কারও উপর এতক্ষণ চোখই পড়ে নি তাঁর। এখন প্রথমে জিতেনকে এবং পরে আমাকে চিনতে পেরেই উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন তিনি। বললেন, এই যে তোমরাও এসে গিয়েছ দেখছি!

কি ভাগ্য আমার যে, আবারও তোমাদের দেখা পেলাম। তা কোন দিক থেকে এলে তোমরা? বদরীনাথ দর্শন করে ফিরে এলে নাকি? না সবে চলেছ সে দিকে?

জিতেন তাঁকে বুঝিয়ে বললে আমাদের অবস্থা, এক সপ্তাহ বনবাসের মোটামুটি কাহিনীও। শুনে বৃদ্ধা বললেন, তাই বল। সেইজন্যই ত পথে আর আমাদের দেখা হ'ল না।

মাথাটাকে দুলিয়ে দুলিয়ে, টেনে টেনে কথাটা বললেন বৃদ্ধা। তার পর একবার আমার ও একবার জিতেনের মুখের দিকে চেয়ে হাসতে থাকলেন পরম আত্মীয়ের মত।

অগত্যা আমিই জিজ্ঞাসা করলাম, গঙ্গোত্রী কোথায়?

শুনে যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠলেন বৃদ্ধা। যেন মস্ত একটা অপরাধ করে ফেলে তার জন্য মার্জ্জনা চাচ্ছেন এমনি ভঙ্গিতে তিনি বললেন, এই দেখ কি ভোলা মন আমার। আসল কাজটাই ফেলে রেখে আগড়-বাগড় বকে যাচ্ছি। গঙ্গোত্রী যাবে আবার কোথায়—চটির ঘরে বসে আমাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে ঠিক করছে। চল, চল তার কাছে। পথে কতবার যে সে তোমাদের কথা বলেছে!—

ফুটপাত থেকে এক ধাপ নিচেই ছোট একটি দোতলা বাড়ীর কাছে গিয়ে গলা চড়িয়ে তিনি ডাকলেন: গঙ্গোত্রী, ও গঙ্গোত্রী—আও বেটি। দেখো ফির কিসকা দর্শন মিল গয়া।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল দোতলার বারান্দায় গঙ্গোত্রীর পরিচিত মুখখানি। পরক্ষণেই আমার কানে এল তাঁরও উল্লসিত কণ্ঠস্বর: আঃ হাঃ—চাচাজী আ গয়ে! কিতনা ভাগ্য হায় মেরা। বদরীনাথজীকী কৃপা। নহী ত ফির ভেট ক্যায়সে হোতা। হম ত অভী চলরহী থী।

বলতে বলতে তর তর করে নিচে নেমে এলেন তিনি।

জিতেনের সঙ্গে চোখোচোখ হতেই আবারও উচ্ছ্বসিত সম্ভাষণ গঙ্গোত্রীর: যহ দেখিয়ে—লছমন ভাইয়া ভী আজ সাথহীমে হ্যায়, তব হনুমানজী কাঁহা জায়েগা। বহুত ভাগ্য হ্যায় মেরা—ফির সবকা দর্শন মিল গয়া।

নির্ম্মল কৌতুক আর আন্তরিক আনন্দ যেন উথলে পড়ছে গঙ্গোত্রীর চোখ দুটি থেকে; হাসি তাঁর সারা মুখেই। জিতেনও উৎফুল্ল; হাসছে আমাদের বাহাদুরও।

দোতলার ঘরে গিয়ে দেখি যে তাঁদের জিনিসপত্র পরিপাটি করে গুছিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ। তবু কোটদ্বারের বাস ছাড়তে ঘণ্টাদুয়েক দেরী আছে শুনে মেঝের উপর গোল হয়ে বসলাম আমরা। প্রথমেই গঙ্গোত্রীর মুখে শুনলাম তাঁদের ভ্রমণ-কাহিনী। আমরা যা অনুমান করেছিলাম তাই ঘটেছে—মোটরের পথে চলেছেন বলেই এরই মধ্যে বদরী-বিশাল দর্শন করে আবার এই পর্য্যন্ত ফিরে আসতে পেরেছেন তাঁরা।

গঙ্গোত্রীর জননীর মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আমি: বদরীনাথজীকে কেমন দেখলেন?

শুনেই দুই হাত জোড় করে উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন বৃদ্ধা। আমার প্রশ্নের ঐ তাঁর উত্তর। কিন্তু গঙ্গোত্রী হাসতে হাসতে আমাকে বললেন, সে বড় অদ্ভুত ব্যাপার, চাচা। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দর্শন করলেও দু'জন যাত্রী এক রকম দেখে না বদরী-বিশালকে। মা বলেন যে তিনি বিষ্ণুজী দর্শন করেছেন, স্বামীজী মহারাজ দর্শন করেছেন শিবমূর্ত্তি।

মনে কৌতূহলের চেয়ে কৌতুকই বেশী জাগে এরকম কথা শুনলে। সুতরাং আমি গঙ্গোত্রীর মুখের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললাম, আর তুমি কি দর্শন করলে?

শুনে শব্দ করেই হেসে উঠলেন গঙ্গোত্রী, আর সেই হাসির ফাঁকে ফাঁকে বললেন, আমার, চাচা, পাপ-চোখ। আমি দেখলাম কেবল কিরীট-কবচ-কুণ্ডল—সোনাদানা মণিমুক্তার বাহার।

হাসি হাসি মুখে আমাদের আলাপ শুনছিলেন স্বামী সত্যানন্দ, এবার তিনি মন্তব্য করলেন সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে: 'যাদৃশী ভাবনার্যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'।

শুনে হো হো করে হেসে উঠল জিতেন। আমার মুখের দিকে চেয়ে সে বললে, তা হলে মণিদা সেখানে গেলে দেখবেন যে প্রকাণ্ড একটি কড়াতে আলু-কাঁচকলার ডালনা রাঁধা হচ্ছে।

গঙ্গোত্রী ঈষৎ বিস্মিত দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়েছেন দেখে জিতেন হাসি একটু কমিয়ে তার সরস ভবিষ্যদ্বাণীর আরও সরস ব্যাখ্যা শুনিয়ে দিল সকলকে: একটুও বাড়িয়ে বলিনি আমি। তীর্থে এলে কি হবে। মণিদা ত দিনরাত কেবল রান্না আর খাওয়ার কথাই ভাবছেন। এই চামোলিতে ঢুকেই উনি এক ঘণ্টা ধরে প্রায় এক বিয়ের বাজার করলেন—নূতন এক গন্ধমাদন চাপিয়েছেন বেচারা বাহাদুরের পিঠে। তা ছাড়া মণিদার নিজের ঝোলা খুঁজে দেখুন—দেখবেন যে সের খানেক কোটা তরকারী আছে তার মধ্যে।

অভিযোগ মিথ্যা নয়। সুতরাং হাসিমুখেই সেটি হজম করে আমি বললাম, ডালনা হউক, ডাল হউক, ভাগ্যে থাকলে তা ত দেখব বদরীনাথের মন্দিরে উপস্থিত হবার পর। আপাততঃ আমার দুর্ভাবনা অন্য কারণে। পায়ে এখন যে রকম ব্যথা বোধ করছি তাতে সামনের ত্রিশ মাইল পাড়ি দিতে পারব কি না, সেই সম্বন্ধেই মনে সন্দেহ আমার।

গঙ্গোত্রীর উদ্বিগ্ন প্রশ্নের উত্তরে বুঝিয়ে বললাম ব্যাপারটা। শুনে অভিজ্ঞ জনের মতই আমাকে পরামর্শ দিলেন তিনি: ঝুঁকি না নিয়ে পিপুলকুঠিতেই একটি ডাণ্ডি বা কাণ্ডি ভাড়া করবেন, চাচা। আমার মা ত জ্বর গায়েও ঐ কাণ্ডির দৌলতেই প্রায় একশো মাইল পাড়ি দিয়ে এলেন। আর এই স্বামীজী—যোশীমঠ থেকে পিপুল-কুঠি পর্য্যন্ত তাঁকে ত কাণ্ডিতেই এনেছি আমরা।

আবার স্বামীজীকে তাকিয়ে দেখলাম আমি; পরক্ষণেই তাকালাম সোজা গঙ্গোত্রীর চোখের দিকে।

গল্প করতে করতেও কয়েকবার এমনি নীরবে স্বামীজীর সম্বন্ধে

প্রশ্ন করেছি গঙ্গোত্রীকে। এবার বুঝি বুঝতে পারলেন তিনি যে, শুধু ঐটুকু শুনেই কৌতূহল আমার তৃপ্ত হয় নি। না হলে ঐ কৌশলটুকু তিনি করতে গেলেন কেন?

নিজের হাত-ঘড়িটির দিকে একবার তাকিয়ে দেখেই হঠাৎ একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, শেষবার আপনার উপর একটু জুলুম করব, চাচা। চলুন আমার সঙ্গে একটি চায়ের দোকানে। দেখি, একটু স্পেশাল চা আপনাকে খাওয়াতে পারি কি না।

খাওয়াটা নেহাতই উপলক্ষ। আমার জানবার ইচ্ছাটা মিটল বাকি দুজনের চোখের আড়ালে যাবার পর।

প্রথমে আমাকেই প্রশ্ন করেছিলেন গঙ্গোত্রী: স্বামীজী মহারাজকে, চাচা, আপনারাও চেনেন নাকি?

ঘাড় নেড়ে স্বীকার করলাম দেখে গঙ্গোত্রী আবার জিজ্ঞাসা করলেন: কোথায় দেখা হয়েছিল আপনাদের?

উত্তর দিলাম, হরিদ্বারে। একটি আশ্রম দেখতে গিয়েছিলাম আমরা। সেখানেই এই স্বামীজীর সঙ্গে দেখা হ'ল।

কথাবার্ত্তাও হয়েছে নাকি?—আবারও জিজ্ঞাসা করলেন গঙ্গোত্রী?

সত্য উত্তরটা তৎক্ষণাৎ মুখে এল না আমার। এঁরা যাঁকে সমাদর করে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন বলে বুঝতে পেরেছি তাঁর সম্বন্ধে গঙ্গোত্রীর মনে কোন বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করতে চাই নে আমি। সুতরাং এবারও গোপনে জিতেনের গা টিপে তাকে সতর্ক করে দিয়ে গঙ্গোত্রীকে আমি বললাম, অতি সামান্য—সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে যেমন হয়ে থাকে।

তার পর অল্প একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু তোমরা ওঁকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ যে?

উত্তরে গঙ্গোত্রী যেন লজ্জিত হয়ে বললেন, আমি কেন? ও খেয়াল ত আমার মায়ের।

চমকে উঠলাম আমি। তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেল ঐ গঙ্গোত্রীর মুখ থেকেই তাঁর জননীর যে অসুস্থ আবেশের বর্ণনা আমি শুনেছিলাম যে, স্বামী তাঁর মৃত, তাঁকেই সন্ন্যাসীর সাজে জীবন্ত ফিরে পাবার অদম্য ও অসংশোধনীয় আকাঙ্ক্ষার কথা। সন্দেহ জাগল আমার মনে—বৃদ্ধার সেই আকাঙ্ক্ষাই তৃপ্ত হয়েছে নাকি এই সত্যানন্দ আশ্রমকে দেখে?

কিন্তু গঙ্গোত্রী দৃঢ়স্বরে অস্বীকার করলেন তা: না চাচাজী। অতটুকু জ্ঞানবুদ্ধি আমার মায়ের এখনও আছে। তবে তাঁর মনের আর একটি দুর্ব্বল দ্বার ধাক্কা দিয়ে ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করেছেন স্বামীজী।

আমার মনের মধ্যে উদগ্র কৌতূহল সত্ত্বেও নির্ব্বাক আমি। কোন উত্তর না পেয়ে গঙ্গোত্রীই আবার জিজ্ঞাসা করলেন: স্বামীজী মহারাজ তাঁর নিজের কথা আপনাকে কিছু বলেছেন নাকি?

গঙ্গোত্রীর দৃষ্টি এড়িয়ে উত্তর দিলাম আমি: একবার বুঝি শুনেছিলাম যে, নিজস্ব একটি আশ্রম করবার ইচ্ছা আছে স্বামীজীর।

আর কোন কথা? ওঁর পূর্ব্বাশ্রমের কোন সংবাদ?

গঙ্গোত্রীর কণ্ঠে আগ্রহের সুর। কিন্তু আমি নিজে ঐ কথাটাই বলতে চাইনে তাঁকে। মিথ্যা কথা মুখে উচ্চারণ করতে না পেরে ঘাড় নেড়ে অস্বীকার করলাম।

বোধ করি সেই জন্যই আরও মন খুলে বললেন গঙ্গোত্রী: আমরা শুনেছি ভারি অদ্ভুত মানুষ উনি। আপন জন সকলকে ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে ঢুকেছিলেন গিয়ে এক আশ্রমে। কিন্তু সেখানে আর ভাল লাগছে না স্বামীজীর। অথচ নিজের বাড়ীতেও ফিরে যাবার মুখ নেই তাঁর।

গঙ্গোত্রীর মনের মধ্যেই বলবার তাগিদ রয়েছে বুঝে আমি চুপ করেই অপেক্ষা করছিলাম। ধৈর্য্যের পুরস্কার হাতে হাতেই পেয়ে গেলাম। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকবার পর ফিক্ করে হেসে ফেললেন গঙ্গোত্রী; হাসতে হাসতেই বললেন: উনি কি বললেন, জানেন চাচাজী? বললেন যে, যে স্ত্রী-সন্তানকে বঞ্চিত করে নিজের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের সব টাকাও উনি আশ্রমে দান করেছেন এখন আশ্রম থেকে রিক্তহস্তে পালিয়ে এসে আবার সেই স্ত্রী-পুত্রের কাছেই উনি কোন মুখে ভরণপোষণ দাবি করবেন?

বোগাস (bogus)—

হঠাৎ জিতেনের তিক্ত কণ্ঠস্বর কানে এল আমার। ঋষিকেশেও সমালোচনায় ঠিক এই কথাই ব্যবহার করেছিল জিতেন। আর তেমনি তিক্ত এখনও তার কণ্ঠস্বর। বুঝলাম যে, ব্যর্থ হয়েছে আমার সতর্কবাণী—জিতেনের মনের কথা সংযমের অর্গল ভেঙে তার মুখে প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

কিন্তু আশ্চর্য্য! ঐ সমালোচনারই প্রতিক্রিয়া গঙ্গোত্রীর আচরণ ও কথায় যা প্রকাশ পেল তা সম্পূর্ণ বিপরীত। দেখি যে, নিজের প্রগলভতার জন্য নিজেই বুঝি লজ্জিত গঙ্গোত্রী—অনুতাপের সঙ্গে করুণারও উদয় হয়েছে তাঁর মনে। আতঙ্কের মত জিতেনের মুখের দিকে চেয়ে প্রতিবাদের ভাষা করুণ সুরে প্রকাশ করলেন তিনি: না ভাইয়া, তা নয়। আমি বলি যে, ট্রাজিক (tragic)—বড়ই করুণ স্বামীজী মহারাজের ব্যর্থ জীবন।

ওতো আমারই মনের কথা—ঋষিকেশে গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে স্বামীজীর সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী শুনবার পর ঠিক ঐ কথাই মনে হয়েছিল আমার। গঙ্গোত্রীর মুখে আমারই অন্তরের প্রতিধ্বনি শুনে আমি স্মিতমুখে তার দিকে চেয়ে বললাম, তুমি ঠিকই ধরেছ মা, আমারও তাই মনে হয়।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়—গঙ্গোত্রীর ঐ গভীর মানবতাবোধের

উৎসও পরক্ষণেই উদ্ঘাটিত হ'ল। সমবেদনার করুণ মুখখানিতে বিষণ্ণ একটু হাসি ফুটিয়ে গঙ্গোত্রী আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, স্বামীজীকে দেখবার পর থেকেই গুরুদেবের আর একটি রচনা বার বার মনে পড়েছে আমার।

সেই বরাস্থু চটির কাছে দাঁড়িয়ে যা করেছিলেন গঙ্গোত্রী এবার আর তা করলেন না তিনি—হিন্দী গদ্যে ভাব প্রকাশ করে বাংলা পদ্যের ভাষা ও ছন্দ খুঁজে বের করতে বললেন না আমাকে। নিজেই তিনি আবৃত্তি করলেন :

"ঘরেও নহে পারেও নহে যে জন আছে মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে।"

সেই আর একদিনের মতই ভাঙা ভাঙা উচ্চারণ, সে দিনের মতই কুণ্ঠিত মুখের ভাব গঙ্গোত্রীর। কিন্তু আমি দেখছি যেন মন্ত্রশক্তির প্রভাবে সেই কুণ্ঠিত মুখখানিও দীপ্ত হয়ে উঠেছে। বোধ করি আমার চোখের দৃষ্টিতে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লক্ষ্য করেই গঙ্গোত্রী বিব্রতভাবে চোখ নামিয়ে নিলেন, লজ্জিত স্বরে তিনি বললেন, কি জানি, ঠিক আবৃত্তি হ'ল কি না। সেই কতকাল আগে পড়েছিলাম আমার এক বাঙালী সখীর কাছে। ইদানীং ত একেবারেই চর্চা নেই—ভুলেই গিয়েছি সব।

উত্তর দেবার সুযোগই পেলাম না আমি। জিতেন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে : চর্চা না থাকলেও রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাব ও ভাষা যা আপনি মনে রেখেছেন, আমি বাঙালী হয়েও তা পারি নি। লাইন দুটি ত আমার একেবারেই মনে ছিল না, যদিও আপনার মুখে শুনবার পরেই বুঝতে পেরেছি যে, কোন দিন সম্পূর্ণ কবিতাটিই নিশ্চয়ই পড়েছিলাম আমি।

ও মন্তব্যের উত্তর দিলেন না গঙ্গোত্রী। বরং সলজ্জ আনন্দের যেটুকু রক্তিমা তাঁর মুখের উপর ফুটে উঠেছিল সেটুকু চেষ্টা করেই মুছে ফেলে আগের কথারই সূত্র ধরে তিনি বললেন : সত্যি, চাচা,—স্বামীজীর মুখের দিকে আমি চাইতে পারি নে। তাকালেই মনে হয়—ঐ যে গুরুদেব লিখেছেন : "দিনের আলো যার ফুরলো সাঁজের আলো জ্বলল না"—ইনিই বুঝি সেই।

এও আমারই মনের কথা। একটি উদ্গত দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে রেখে আমি বললাম, বেঁচে থাক, মা। ঘাটের কিনারা থেকে এমন হতভাগ্যকে নিজের ঘরে ডেকে এনে বড় ভাল কাজ করেছ তুমি।

কিন্তু ও কথার প্রতিবাদ করলেন গঙ্গোত্রী। তবে বড় মধুর সেই প্রতিবাদ। মুখের হাসি লুকাবার জন্যই বুঝি খুব জোরে মাথাটা তাঁর ঝোঁকে। তিনি বললেন : সে, চাচা, আমি নই,—আমার মা। তিনিই জেদ করলেন স্বামীজীকে সঙ্গে নেবার জন্য।

আমি স্মিতমুখে বললাম : ও একই কথা হ'ল। তার পরের কথাও একটু ভেবেছ কি? একটি আশ্রম করে দেবে নাকি স্বামীজীকে?

এবার পরিহাসে তরল আমার কণ্ঠস্বর ; চেষ্টা করেও শেষের দিকে হাসি চাপতে পারি নি আমি। আমার মুখের দিকে চেয়ে গঙ্গোত্রীও হাসি হাসি মুখে বললেন : সে কথা আমার মাকে জিগ্যেস করেছিলাম আমি। কিন্তু শুনে মা কি বললেন আপনি অনুমান করতে পারেন তা?

ভাবেই প্রকাশ করলাম যে, পারি নে। তখন গঙ্গোত্রী আবার বললেন : মাকে তখন দেখলে আপনি, চাচা, তাকে চিনতেই পারতেন না। আমিও দেখে একেবারে তাজ্জব বনে গিয়েছিলাম। আমি আশ্রমের কথা বলতেই প্রথমে ত তিনি চটে লাল। কিন্তু তার পরেই একেবারে বদলে গেল মায়ের মুখের ভাব। চোর-চোর খেলতে গিয়ে খেলার সাথীকে জব্দ করবার জন্য কাঁচা বয়সের মেয়েরা চোখমুখের হাসি চেপে যেমন ফিস ফিস করে কথা বলে তেমনিভাবে মা আমাকে বললেন—আমাদের বাড়ীতে ওঁকে নিয়ে যাচ্ছি দু'দিন আটকে রাখবার জন্য। গোপনে ওঁর স্ত্রীকে-ছেলেকে খবর পাঠিয়ে দেব। তারা কি খবর পেলে না এসে থাকতে পারবে!

উত্তর দিতে বেশ একটু দেরি হ'ল আমার। কিন্তু স্নিগ্ধকণ্ঠে বললাম : উঠ গঙ্গোত্রী। তোমার মাকে প্রণাম করব আমি।

পায়ে হাত দিয়েই প্রণাম করেছিলাম গঙ্গোত্রীর জননীকে। গঙ্গোত্রীর মাথায় হাত দিয়ে তাঁকে আশীর্ব্বাদ করলাম যখন স্বামী সত্যানন্দ আশ্রমকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন।

গাড়ী ছাড়বার পূর্ব্বে আবারও নিমন্ত্রণ করলেন গঙ্গোত্রী কোন এক সুযোগে আলমোড়ায় গিয়ে তাঁদের আতিথ্য গ্রহণ করতে।

বিদায়ের বেদনা জীবনে এত তীব্রভাবে কমই অনুভব করেছি আমি। শেষের দিকে চুপ করেই ছিলাম। অন্যমনস্ক ভাব আমার। হঠাৎ যে শব্দ শুনে চমকে উঠলাম তা ষ্টার্ট-পাওয়া মোটর ইঞ্জিনের কর্কশ গর্জ্জন নয়, গঙ্গোত্রীর কণ্ঠে যেন অলকনন্দার উচ্ছল কলকল্লোল।

জিতেনের মুখের উপর সহাস্য একটি কটাক্ষ নিক্ষেপ করে গঙ্গোত্রী বললেন : সত্যই, কৈলাস যদি দেখতে যান তবে, ভাইয়া, অবশ্যই আলমোড়া হয়ে যাবেন। ঐ কঠিন পথের সব খবর আপনাকে লিখে দেব আমি। আর আপনাদের মত সাথী পেলে হয়ত আমারও ঝোঁক চাপবে আর একবার কৈলাস দর্শন করবার।

ক্রমশঃ

অন্ধ আকাশ

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

২৬

বিকাল হইতেই গ্রামে একটা সাড়া পড়িয়া যায়, মেয়েরা নতুন শাড়ী পরিয়া ব্যস্তভাবে এ-বাড়ী ও-বাড়ী আনাগোনা করে, শিশুরা কলরব করে, মাঝে মাঝে মাদল বাজিয়া ওঠে। আজ করম পরবের শেষ রজনী, সারারাত নাচ ও গান চলিবে। আঙিনায় খাটিয়া টানিয়া তিলকা বসিয়া খৈনি টেপে। খৈনির নেশাটা তাহার একরকম শিশুকাল হইতে, কয়েক মাস রোগে পড়িয়া থাকায় সে উহাতে বঞ্চিত ছিল, আজ তাই বারে বারে খৈনি মুখে ফেলিতেছে।

একটুখানি তামাকের পাতা অতি যত্নসহকারে ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া বাঁ হাতের তেলোতে রাখে, তার পরে ছোট একটা কৌটা হইতে একটু চূণ ডান হাতের আঙুলে তুলিয়া লইয়া তামাকের সঙ্গে মিলাইয়া দুই হাতে বহুক্ষণ ধরিয়া ডলিয়া মলিয়া রসাল করিয়া তোলে। এমন সময় সরযু আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই পা ভাঙিবার পরে সরযুকে তিলকা আর দেখে নাই, আজ তাহাকে দেখিয়া খুশী হইয়া বলে, "এ যে পূবের সূর্য পশ্চিমে উঠল গো, এস এস, খবর কি বল ?"

সরযু আসিয়া তিলকার পাশে খাটিয়ার উপর বসিয়া পড়িয়া বলে, "কি বলব ভাই, এতদিন আসতে পারিনি, হাঙ্গামার মধ্যে ছিলুম।"

"কি হাঙ্গামা গো ?" আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করে তিলকা।

সরযু বলে, "সে অনেক কথা, কি আর শুনবে !"

হাঙ্গামাটা যে কি তিলকা তাহা কিছু কিছু জানে। সরযুর বউ এ গাঁয়ের সেরা সুন্দরী, ছুতানাতায় রাগ করিয়া সে নাইহার চলিয়া যায় আর বউপাগলা সরযু কাজকর্ম ছাড়িয়া তাহার পিছনে পিছনে ছুটাছুটি করে। এই ব্যাপার হামেশাই ঘটে। হাত হইতে এক টিপ খৈনি তুলিয়া লইয়া সরযুর দিকে আগাইয়া দিয়া হাসিয়া তিলকা বলে, "বউ কোথা গো, এখানে না নাইহার ?"

খৈনিটুকু মুখে ফেলিয়া দিয়া লজ্জিতভাবে সরযু বলে, "গিয়েছিল চলে, কিছুতেই আসতে চায় না, বলে করমার পরে আসব। জান ত ভাই, ঘরে আমার অন্য লোক নাই, ও না থাকলে অচল, তাই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পরশু নিয়ে এসেছি। এনেও ত শান্তি নাই !"

সরযুকে একটা ঠেলা দিয়া তিলকা প্রশ্ন করে, "কেন গো ?"

বিব্রতভাবে সরযু বলে, "বায়না ধরেছে পরব করবে।"

"সে ত ভাল কথা গো।" তিলকা বলে।

একটু গম্ভীর হইয়া সরযু বলে, "ভাল ত বটেই, কিন্তু ঝক্কি ত কম নয়। নতুন শাড়ী কিনতে হ'ল, ঝুলা কিনতে হ'ল, কিনলুম সব ধার করে।"

মাথা নাড়িয়া তিলকা বলে, "পরব করতে হলে খরচ করতেই হবে ভাই।"

সরযু বলে, "আজ আবার বলছে রাত্রে নাচবে গাইবে।"

শুনিয়া তিলকা উৎসাহিত হইয়া ওঠে, বলে, "নাচগান না হলে করমা পরব হয় গো ? বেশ ত বলেছে তোমার বউ।"

মুখ ভার করিয়া সরযু বলে, "বেশ ত বলেছে, কিন্তু নাচ-গান একা হয় না, সঙ্গী চাই। তাই জোগাড় করতে পাড়াময় ঘুরে বেড়াচ্ছি। হ্যাঁ ভাই, যাবে তুমি মাদল বাজাতে ? এ গাঁয়ে তোমার মত মাদল বাজিয়ে আর দ্বিতীয়টি নেই।"

সত্যই তিলকা মাদল বাজাইতে ওস্তাদ। ঘাটোয়ারের ছেলে, ছেলেবেলা হইতে সে মাদল বাজায়, তার হাতের চাঁটিতে মাদল কথা কয়। বাজনার নামে তিলকার শিল্পী-মন চঞ্চল হইয়া ওঠে, সরযুর পিঠে একটা চাপড় দিয়া বলে, যাব ভাই, নিশ্চয় যাব, কিন্তু নাচতে-কুঁদতে পারব না বসে বসে যা পারি বাজাব।"

খুশী হইয়া সরযু বলে, "বেশ বেশ, তাই হবে, আর ভৌজীকে সঙ্গে নিও, নাচবে-গাইবে। বউ খুব করে বলে দিয়েছে, কই গো ভৌজী ?"

তিলকা বলে, "ও বাড়ী নেই—এলে বলব।" সরযু এইবার উঠিয়া পড়ে।

রুকিয়া জল আনিতে বাহিরে গিয়াছিল, খানিকপরে ফিরিয়া আসে। তিলকার তর সয় না, রুকিয়া আসিতেই

ডাকাডাকি সুরু করে। জলের কলসীটা নামাইয়া রুকিয়া বলে, "কি হ'ল, এত ডাকাডাকি কেন ?"

তিলকা উৎসাহের সঙ্গে বলে, "সরয়ূ এসেছিল, বউপাগলা সরয়ূ গো।"

"বেশ ত, তা কি হয়েছে ?" বলে রুকিয়া।

তিলকা হাসিয়া বলে, "আজ রাত্রে ওর বাড়ী ঝুমর লাগবে, তাই তোকে আমাকে যেতে বলেছে—যাবি গো ?"

রুকিয়া তিলকার মুখের দিকে আশ্চর্য হইয়া তাকায়, সে দৃষ্টির সামনে তিলকার মুখের হাসি দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া যায়। একটু পরে কোন জবাব না দিয়াই সে ঘরে গিয়া ঢোকে কিন্তু পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিয়া বলে, "তুই যা, আমি যাব না।"

এইবার রুকিয়ার দিকে তাকাইয়া তিলকা লজ্জায় মরিয়া যায়, ছি ছি, কত বড় অন্যায় কথা সে বলিয়াছে। গায়ে শতচ্ছিন্ন একটি ঝুলা, পরণে আরও জীর্ণ শাড়ী, ইহা ছাড়া অন্য বস্ত্র তাহার নাই, কোনরকমে লজ্জা নিবারণ করিয়া সে ঘরের বাহির হয়, ইহাকে কেমন করিয়া তিলকা পরবের রাত্রে অন্যের বাড়ী যাইতে বলিল ! অতীতের কথা তাহার মনে পড়ে, নিতান্ত গরীব হইলেও পরবে পরবে স্ত্রীকে কখনও শাড়ী, কখনও ঝুলা দিয়াছে, কিন্তু এবার কিছুই দেয় নাই। অপরাধীর মত তিলকা নিঃশব্দে মাথা নীচু করিয়া বসিয়া থাকে।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে, এ-বাড়ী ও বাড়ী গানের সুর ও মাদলের আওয়াজ শোনা যায়। কাজের ফাঁকে রুকিয়া একবার বাহিরে আসিয়া তিলকাকে বলে, "কি গো, তুই যাবি নে ?"

তিলকা মাথা নাড়িয়া বলে, "না।"

রুকিয়া বলে, "অত করে বলে গেছে, তুই যা।"

তিলকা আবার মাথা নাড়িয়া বলে, "না গো, যাব না ; তোকে আমি কি করে যেতে বললুম তাই ভাবছি। আরও দশজন আসবে, সেখানে তাদের সব নতুন কাপড়-চোপড়, আর তুই যাবি ছেঁড়া শাড়ী পরে ! ছি ছি ! আমার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে গো।"

রুকিয়া তিলকার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, কাঁধের উপর হাত রাখিয়া আস্তে আস্তে বলে, "তুই যা, পরবে যেতে বলেছে, যেতে হয়। তোর দেহেও ত ছেঁড়া কাপড়, তা আর কি হবে, তুই পুরুষ মানুষ, তোর দোষ নাই।"

কোন উত্তর না দিয়া তিলকা বসিয়া থাকে। রুকিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলে, "ওঠ, খেয়ে নে—ভাত হয়ে গেছে।"

সরয়ূর বাড়ী কাছেই, তাই শুইয়া শুইয়া রুকিয়া তাহার বাড়ীর গান ও বাজনা পরিষ্কার শুনিতে পায়। মাদল যে তিলকার হাতে বাজিতেছে তাহা সে অনায়াসেই বুঝিতে পারে, এত মিঠে বাজনা আর কাহারও হাতে বাজে না। মেয়েরা গাহিতেছে :

"ভাইয়া হো, বিচ নগরা থাকে ত বসলা,
কিছু শাড়ীয়া ভেজিহ হামারা খাতির সন্দেশ
পূজব করম গোঁসাই।"

অর্থাৎ, ভাই তুমি গ্রাম ছেড়ে সহরের মাঝখানে গিয়ে বাস করছ, কিছু কাপড়-চোপড় আর তোমার খবর পাঠিও, আমি করম গোঁসাইয়ের পূজা করব। মেয়েরা আবার গাইছে, এবার ভাইয়ের জবাব :

"বহিন গে, সবকুছ সস্তা ভেল, শাড়ীয়া মাহাগা ভেল।"

অর্থাৎ—বোন, সবকিছুই সস্তা হয়েছে কেবল শাড়ীই বড্ড মহার্ঘ।

রুকিয়া কান পাতিয়া শোনে, গানের সুর, গানের ভাষার সঙ্গে তাহার পরিচয় আছে, কত উৎসবে কতবার সেও এই গানই গাহিয়াছে। গানের সঙ্গে মাদল বাজে, আসর জমিয়া ওঠে। অন্ধকার ঘরে রুকিয়া চোখ বুঁজিয়া শুইয়া থাকে, কিন্তু তাহার মনের চোখ মেলিয়া সে দেখিতে পায় সরয়ূর জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আঙিনায় নতুন শাড়ীপরা মেয়ের দল হাত-ধরাধরি করিয়া গান গাহিয়া নাচিতেছে আর তাহাদের সামনে বসিয়া তিলকা মশগুল হইয়া মাদল বাজাইতেছে।

গান আবার বদল হইয়া যায়—মেয়েরা গায় :

"কাকরো যে হাথঁা সোনমুন্দ্রী আংগুঠি রে আংগুঠি,
কাকরো খোপাকে ভরি ফুলরে
আখারা মাহাকি গেলা ?
মান্দরিয়াকে হাথঁামে সোনমুন্দ্রী আংগুঠি রে আংগুঠি
পেলমিকে খোপোয়া ভরি ফুল
আখারা মাহাকি গেলা।
কাঁহা পাইলে গে আতর গুলাব
আখারা মাহাকি গেলা—
গেল হেলুঁ শ্বশুরবাড়ী, হুঁয়াই পাইলুঁ আতর গুলাব,
আখারা মাহাকি গেলা।"

অর্থাৎ—কার হাতে সোনার আংঠি গো, কার হাতে সোনার আংঠি ?
কার খোঁপায় ফুল গো, গন্ধ ছড়িয়ে গেল চারিদিকে ?
মান্দরির হাতে সোনার আংঠি গো, সোনার আংঠি।
পেলমির খোঁপায় ফুল গো, গন্ধ ছড়িয়ে গেল চারিদিকে।

কোথায় পেলে গো এত আতর আর গোলাপফুল,
গন্ধ ছড়িয়ে গেল চারিদিকে ?
শ্বশুরবাড়ী গিয়েছিলুম, সেখানে পেলুম আতর আর
গোলাপফুল, গন্ধ ছড়িয়ে গেল চারিদিকে।

শুনিতে শুনিতে রুকিয়া এক সময় নিজেও গুনগুন করিয়া গাহিতে স্বরু করে। ঘাটোয়ারের মেয়ে সে, চলিতে শিখিয়াই সে নাচিয়াছে, কথা বলিতে শিখিয়াই সে গাহিয়াছে। গানের সুর ও মাদলের আওয়াজ তাহাকে মন্ত্রের মত মুগ্ধ করিয়া দেয়, অন্ধকার ঘরে শুইয়া রুকিয়া সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া গায় :

"কাকরো যে হাথ্ঁ সোনমুন্দ্রী আংগুঠি রে আংগুঠি,
কাকরো খোপাকে ভরি ফুলরে
আথারা মাহাকি গেলা।"

২৭

ঘরের দরজা খুলিয়া রুকিয়া বাহিরে আসিয়া দেখে পূবের আকাশটা রাঙা করিয়া সূর্য উঠিতেছে। গত রাত্রের উৎসবান্তে গ্রাম এখনও ঘুমাইয়া। রুকিয়া নিঃশব্দে দরজার সামনে আসিয়া বসে। ধীরে ধীরে সূর্য ওঠে, রোদ আসিয়া পড়ে তাহার ছোট্ট আঙিনায়, রুকিয়া ওঠে না, উঠিবার তাড়া নাই, বসিয়া বসিয়া কত কথা ভাবে। সঞ্চিত কয়েক সের ধান প্রায় ফুরাইয়া আসিল, অথচ রোজগারের আর কোন পথ নাই। ইহার পরে কি খাইবে তাহারা ? সকালের অপূর্ব শান্তির মধ্যে বসিয়া সে কিছুমাত্র শান্তি পায় না। পৃথিবী জুড়িয়া এত আলো, অথচ তাহার চারিদিকে কেবল অন্ধকার।

তিলকার ঘুম ভাঙে না, শেষরাতে বাড়ী ফিরিয়া সে শুইয়াছে। গ্রাম ধীরে ধীরে জাগিয়া ওঠে, রাখালেরা হল্লা করিয়া গরুর পাল মাঠের দিকে লইয়া যায়, পিছনে পিছনে গোবর কুড়োনীরা গোবর লইয়া ঝগড়া করে। চাষীরা যে-যাহার ক্ষেতের দিকে চলে, তাহাদের অনেক কাজ, সদ্য-রোপা ধানক্ষেতে জল রাখিতে হইবে, তাহার জন্য সর্বদা তদারক দরকার, হয় ত কোথাও আল ভাঙিয়া গিয়াছে, হয়ত কোথাও পাশের ক্ষেতের মালিক রাতারাতি আল ফুটা করিয়া জল চুরি করিয়াছে। বেলা ক্রমে বাড়িয়া যায়।

তিলকা একটা প্রকাণ্ড হাই তুলিয়া উঠিয়া বসে, তার পরে খাটিয়া ছাড়িয়া সে দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। ঘুম-ভরা দুই চোখে আলো লাগিতেই সে দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া রুকিয়ার পাশে বসিয়া পড়ে, বলে, "অনেক বেলা হয়ে গেছে যে।"

রুকিয়া বলে, "না গো, বেলা হয় নি, আর একটু ঘুমিয়ে নিলিনে কেন ? সারারাত জেগে মাদল বাজিয়েছিস।"

চোখ দুটি রগড়াইয়া তিলকা বলে, "শরীরে তাগদ নেই, হাতছুটো ধরে গেছে গো।"

রুকিয়া তাহার হাতখানা কোলের মধ্যে টানিয়া নিয়া বলে, "একটু টিপে দি।"

ভারি আরাম পায় তিলকা, সে রুকিয়ার গা ঘেঁসিয়া বসে, বলে, "নেশার ঝোঁকে বাজিয়ে গেছি গো, তখন ত কিছু টের পাই নি।"

রুকিয়া প্রশ্ন করে, "মদ খেতে দিয়েছিল ?"

মাথা ঝাঁকিয়া তিলকা বলে, "সরযুর দিল আছে, পুরো এক বোতল সামনে এনে বসিয়ে দিল, সাবরে দিলুম সবখানি, এক ছটাক মদ পেটে পড়লে সংযুগ বেসামাল হয়ে যায়—মাতলামি স্বরু করে দিল, আমি কিন্তু মাথা ঠিক রেখে বাজিয়ে গেছি।"

বাহির হইতে দরজায় ঘা দিয়া কে যেন ডাকে, "পরসাদের মা, ঘুম ভেঙেছে গো ?"

তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া রুকিয়া দরজা খুলিয়া দেয়, মনুয়ার বউকে দেখিয়া হাসিয়া বলে, "এস দিদি, এস উঠেছি অনেকক্ষণ।"

মনুয়ার বউ আঙিনায় আসিয়া দাঁড়ায়, তাহার পরণে হলুদ রং-করা নতুন শাড়ী, গায়ে ছিটের নতুন ঝুলা, কপালের আধখানা তেলসিঁদুরে লেপা।

"রাতে তোমাকে দেখলুম না পরসাদের মা, তাই এলুম খবর নিতে।" বলে মনুয়ার বউ।

কেন যে মনুয়ার বউ আজ সকালবেলা আসিয়াছে রুকিয়ার তাহা বুঝিতে দেরী হয় না। গরীবের ঘরে নতুন কাপড়, নতুন ঝুলা হামেশা আমদানী হয় না, বৎসরে একবার হইলেই সে একটা মস্তবড় ঘটনা বলিয়া গণ্য হয়। সেদিন সেই ভাগ্যবতী নতুন শাড়ী পরিয়া আত্মীয়-বান্ধব-পরিচিতের বাড়ী কিছু একটা ছুতা করিয়া ঘুরিয়া আসে। মনুয়ার বউ যে নতুন শাড়ী ও ঝুলা দেখাইতে আসিয়াছে তাহা রুকিয়া বোঝে, তাই প্রসঙ্গটা তুলিবার জন্য বলে, "বেশ শাড়ী আর ঝুলা কিনেছ দিদি, কত দাম হ'ল ?"

"শাড়ীর কথা বলছ পরসাদের মা", হাসিয়া বলে মনুয়ার বউ, "ত দাম পড়েছে অনেক—সাড়ে সাত টাকা, বার হাত গো।"

কাছে আসিয়া শাড়ীর একটা প্রান্ত হাতে তুলিয়া রুকিয়া বলে, "তা ত পড়বেই, বেশ গপসো আর মজবুত শাড়ী, বেনোয়ারীর বাপ সওদা করতে জানে।"

মনুয়ার স্ত্রীর কাজ হইয়া গিয়াছে, সে এইবার আর এক বাড়ী যাইবার জন্ত ব্যস্ত, শাড়ীর বাহারটা দেখাইবার জন্ত একটা ঘুরপাক দিয়া বলে, "চলি গো পরসাদের মা।"

"এই ত এলে, এখনই যাবে কি গো। একটু বস না দিদি।" বলে রুকিয়া।

ইচ্ছা না থাকিলেও মনুয়ার বউ বসে, বলে,"রান্না চেপেছে তোর?"

মলিনভাবে একটু হাসিয়া রুকিয়া বলে, "না দিদি, বেলা ত বেশী হয় নি, কাজকর্ম নাই, হবে এখন ধীরে-সুস্থে।"

"তা যা বলেছিস পরসাদের মা, রোপার কাজ শেষ হয়ে গেল, এবার হাত-পা কোলে করে বসে থাকতে হবে।" বলে মনুয়ার বউ।

রুকিয়া কাছে আসিয়া বসে, প্রশ্ন করে, "হ্যাঁ দিদি, তুমিও বেকার হয়ে বসেছ নাকি?"

ভ্রূ দুটি কুঁচকাইয়া আহতকণ্ঠে মনুয়ার বউ বলে, "দেখ না বউ, ভেবেছিলাম, ধানক্ষেত নিড়োতে কেউ না কেউ ডাকবে, তা কেউ ডাকলে না গো। গত বছর ধান রোপার পরেও দু'হপ্তা নিড়োনোর কাজ করেছিলুম।"

এই খবরটা পাইবার জন্য রুকিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল, তাহার মনে ক্ষীণ একটু আশা ছিল যে, দু'চার দিন হয়ত নিড়োনোর কাজ জুটিবে। মনুয়ার স্ত্রীর কথা শুনিয়া বুকটা দমিয়া যায়। সে কোন কথা বলে না।

মনুয়ার বউ বলে, "না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হ'ত গো যদি না ঠিকাদারের বন কাটাই হ'ত। তখন দু'পয়সা যা রোজগার করেছে তাই দিয়ে আধপেটা কার্ত্তিকমাস খেয়ে পর্যন্ত দিনগুজরান হয়ে যাবে, তার পরে শীত পড়লে একটা না একটা কাজ জুটবেই।"

এই হিসাব রুকিয়াও করিয়াছিল কিন্তু তাহার কপালে বিড়ম্বনা আছে, তাই সুস্থ-সবল মানুষটা পা ভাঙিয়া বিছানায় পড়িল। মনুয়ার বউ যাহা বলিল ঠিক তাহাই হইবে, না খাইয়া শুকাইয়া মরিতে হইবে। রুকিয়ার জবাব না পাইয়া মনুয়ার বউ বলে, "কি ভাবছিস গো এত, কথা কইছিস না?"

রুকিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া জবাব দেয়, "তোমার কথা শুনছি গো দিদি।"

রুকিয়ার মনের ভাব কিছুটা আঁচ করিয়া মনুয়ার বউ বলে, "পরসাদের বাপ ত চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে, এইবার ওর হেপাজত কর, পেট ভরে খেতে দে, ভাল হয়ে উঠবে।"

ক্ষীণকণ্ঠে রুকিয়া বলে, "হ্যাঁ দিদি, ঠিক বলেছ।"

একটু পরে মনুয়ার বউ উঠিয়া যায়, কিন্তু রুকিয়া ওঠে না, চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। তিলকা খৈনি টিপিতে টিপিতে খোঁড়াইয়া আঙিনায় ঘুরিয়া বেড়ায়। গত রাত্রের গান-বাজনার আনন্দে সে এখনও মশগুল আছে, বলে,"লোক হয়েছিল গো, পাড়ার অনেক মেয়ে এসেছিল, কিন্তু এলে কি হবে, আজকালকার মেয়েরা নাচতেও জানে না, গাইতেও জানে না, হৈ-হল্লা।"

তিলকার একটা কথাও রুকিয়ার কানে ঢোকে না, মনুয়ার স্ত্রীর কথাগুলি তাহার কানে বাজিতে থাকে, "এইবার ওর হেপাজত কর, পেট ভরে খেতে দে, ভাল হয়ে উঠবে।" কিন্তু কেমন করিয়া সে হেপাজত করিবে, পেট ভরিয়া খাওয়াইবার অন্ন কেমন করিয়া যোগাড় হইবে এই প্রশ্নের উত্তর মনুয়ার বউ ত দিয়া গেল না।

তিলকা হাতের খৈনি মুখে ফেলিয়া বলে, "গায়ে আমার তাগদ নাই তবু সারারাত বাজিয়ে গেলুম ত। এসেছিল মতি ছোঁড়া বাজাতে, ঘণ্টাখানেক নাচনীদের সামনে লাফঝাঁপ করেই বেদম হয়ে বসে পড়ল, আর ওঠে না। গত ব... সারারাত নাচনীদের সঙ্গে মাদল নিয়ে সমানে নেচেছিলুম, বেদম হয়ে বসে পড়ি নি। তুই ত ছিলি গো?"

রুকিয়া মাথা নাড়ে।

তিলকা বলে, "এবার আমার তাগদ নাই তা নাচব কি! তবে এও বলে দিচ্ছি, একবার যখন উঠে দাঁড়িয়েছি আর আমাকে খাটিয়ায় পাড়তে পারবে না।"

এমন জোরালো কথা শুনিয়াও রুকিয়া আশ্বস্ত হইতে পারে না, যাহার বলে তিলকা বলীয়ান হইবে তাহা যে ঘরে নাই, উৎসাহের আতিশয্যে তিলকা সেকথা ভুলিয়া গিয়াছে। অথচ রুকিয়া ভাল করিয়াই জানে, খোরাক না পাইলে তিলকা আবার খাটিয়ায় পড়িবে।

ধীরে ধীরে রুকিয়ার মনের মধ্যে আবার একটা ভয় ঘনাইয়া ওঠে। কিন্তু না ভয়কে আর সে প্রশ্রয় দিবে না, ঐ মানুষটিকে পেট ভরিয়া খাইতে দিতেই হইবে, যেমন করিয়াই হোক খাদ্য তাহাকে জোগাড় করিতেই হইবে—তাহা না হইলে—রুকিয়া আর ভাবিতে পারে না, হঠাৎ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। তিলকা বলে,"কি হ'ল গো?"

রুকিয়া বলে, "না, কিছু না।"

২৮

আজ আবার রুকিয়ার ঘরে হাঁড়ি চাপে না। আয় না হইয়া কেবল খরচ হইলে কুবেরের ভাণ্ডারও শেষ হইয়া যায়; রুকিয়ার ত দু'কলসী ধান। দু'দিন সে আধপেটা খাইয়া তিলকাকে পুরো খোরাক দিয়াছে, আজ তাহার দুটি কলসী শূন্য।

ঘরের কোণে রুকিয়া বসিয়া থাকে, খাটিয়ার উপর বসিয়া তিলকা পা দুটি দোলায়। বাহিরে সকালের সূর্য ধীরে ধীরে মাথার উপর উঠিয়া আসে।

তিলকা হঠাৎ বলে, "জল তেষ্টা পেয়েছে গো, জল দিবি ?"

রুকিয়া উঠিয়া গিয়া কলসী হইতে এক ঘটি জল গড়াইয়া তিলকাকে আনিয়া দেয়। ঢক্ ঢক্ করিয়া এক ঘটি জল নিঃশেষ করিয়া তিলকা হাসিয়া বলে, "জলটা ত পেট ভরে খেতে পাচ্ছি।" কিন্তু জল খাইলে পেট ভরে না। একটু পরে তিলকা বলে, "হাঁড়িগুলো ভাল করে দেখেছিস, কোথাও কিছু নেই ?"

ঘরের কোণ হইতে রুকিয়া মাথা নাড়িয়া বলে, "না।"

তিলকা বারদুই হাই তুলিয়া ঝুপ করিয়া শুইয়া পড়ে, বলে, "বড্ড ঘুম পাচ্ছে গো, একটু ঘুমিয়ে নি।"

রুকিয়া ঘরের কোণ হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে তিলকার খাটিয়ার পাশে আসিয়া দাঁড়ায়, আবছায়া অন্ধকারে তিলকার শীর্ণ মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। রুকিয়ার মনে পড়ে, এই মানুষটি দুই দিন আগে বড়াই করিয়া বলিয়াছিল আর খাটিয়ায় পড়িবে না। সে আজ একবেলা না খাইয়াই খাটিয়ায় পড়িয়াছে। রুকিয়ার মন ভয়ে যেন অসাড় হইয়া আসে, এই যে শুইল—বুঝি তিলকা আর উঠিবে না।

দরজা খোলার আওয়াজ পাইয়া তিলকা চোখ মেলিয়া বলে, "কোথা চললি গো ?"

রুকিয়া বলে, "তুই ঘুমো, আমি এখনই আসছি।"

তিলকা উঠিয়া বসিয়া বলে, "কেউ আর আমাদের একটা কাণাকড়ি, এক ছটাক চালও ধার দেবে না, কেন মিছে ঘুরে মরবি, তার চেয়ে বসে বসে ঝিমো।"

কপালে একটা চাপড় মারিয়া সে আবার বলে, "বরাত, বরাত! ভেবেছিলাম এ বছর ভাল কাটবে, উল্টে যা হ'ল তাতে প্রাণে বাঁচব কি না সন্দেহ। শরীরে যদি আর একটু তাগদ পেতুম তা হলে তোকে নিয়ে কয়লার খাদে চলে যেতুম।"

রুকিয়া বলে, "তুই শুয়ে পড়, আমি পরদাদকে নিয়ে বেনোয়ারীর মার বাড়ী থেকে একবার ঘুরে আসি।"

তিলকা আবার শুইয়া পড়ে, বলে, "তবে যা।"

ঘরের বাহির হইয়া রুকিয়া মনুয়ার বাড়ীর দিকে যায় না, গ্রামের গলিপথ ধরিয়া উদ্দেশ্যহীনভাবে চলে। গ্রামের চেহারা এখন অন্য রকম, প্রত্যেক গৃহস্থের ঘর বাদে আর সব জমি কাঁটাগাছ দিয়া ঘেরা, তাহাতে কেহ ভুট্টার, কেহ মারুয়ার চাষ করিয়াছে। গ্রামপথ এখন খুবই সঙ্কীর্ণ, সেই পথ ধরিয়া রুকিয়া আগাইয়া চলে। চলিতে গেলে অনেক স্থানে ভুট্টার বড় বড় পাতাগুলি গায়ে আসিয়া লাগে। রুকিয়া হঠাৎ দাঁড়ায়, হাত বাড়াইয়া সবুজ পাতাগুলি স্পর্শ করে, আর একটু হাত বাড়াইলেই কচি ভুট্টাটি ছুঁইতে পারে। একবার সে চারিদিকে তাকাইয়া দেখে, না, কেহ কোথাও নাই, একটা প্রচণ্ড লোভ মনকে অভিভূত করিয়া ফেলে, হাত ধীরে ধীরে বাড়াইয়া দেয়। হঠাৎ একটা দমকা বাতাস আসিয়া ভুট্টা গাছগুলাকে হেলাইয়া দিয়া চলিয়া যায়, রুকিয়া চমকাইয়া ওঠে, হাত টানিয়া লইয়া একরকম ছুটিয়া চলে, বুকের মধ্যেটা তাহার ঢিপ ঢিপ করিতে থাকে। অনেকক্ষণ রুকিয়া কোনদিকে তাকায় না, তাকাইতে যেন ভয় পায়।

গলিপথে মাঠে আসিয়া পড়ে, ক্ষেতের পাশ দিয়া রুকিয়া চলে। ধান রোপার পরে সে এদিকে আর আসে নাই, এ কয়েক দিনে ধানগাছ বেশ বাড়িয়াছে, বাতাসে সবুজ ডগাগুলি হেলিয়া পড়িতেছে। এপারে অনেকগুলি ক্ষেত তাহারই হাতে রোপা। প্রত্যেকটি ধানগাছে তাহার স্পর্শ লাগিয়া আছে, এরা যেন তাহারই সন্তান, প্রত্যেকে তাহাকে চেনে। রুকিয়া অবাক হইয়া সেইদিকে তাকাইয়া থাকে। বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত এত যে ধানক্ষেত ইহার মধ্যে একটুও তাহার নাই। আর দুই মাস পরেই পাকা ফসলের ভারে ধানগাছ হেলিয়া পড়িবে, অথচ তাহাতে তাহার কিছুমাত্র আসিয়া যাইবে না, তাহার মাটির কলসী দুটি খালিই থাকিয়া যাইবে।

হঠাৎ রুকিয়ার অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হয়, সে ফিরিয়া আবার গ্রামে ঢোকে। মতি গোপের বাড়ীটা পার হইয়া যাইতেই বাঁ-পাশে অনেকখানি জমি ভাগ করিয়া কাঁটা-গাছ দিয়া ঘেরা, তাহাতে মারুয়া রোপা হইয়াছে। সেইদিকে চোখ পড়িতে রুকিয়া থমকিয়া দাঁড়ায়, আহা, ফসলের কি প্রাচুর্য! মারুয়ার বড় বড় কোয়াগুলি প্রায় পাকিয়া উঠিয়াছে, আর দু'চার দিনেই কাটিবার মত হইবে। যাহার অভাব নাই, ভগবান যেন তাহাকেই বেশী করিয়া দেন। রুকিয়া জানে, এটা গোবিন্দ মহতোর ক্ষেত, এ মারুয়া তাহারই ঘরে যাইবে। গোবিন্দ মহতো বড়লোক, মারুয়া সে খাইবে না, গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া তিত্‌লির হাটে বেচিতে লইয়া যাইবে আর তাহারই মত গরীবের পাল কিনিয়া খাইবে।

রুকিয়া নিঃশব্দে একটা কাঁটাগাছ টানিয়া খানিকটা ফাঁক করে, তার পরে হাত বাড়াইয়া মারুয়ার কয়েকটা কোয়া ছিঁড়িয়া নেয়, আঙুলে রগড়াইয়া দানাগুলি ছাড়াইয়া মুখে ফেলিয়া দেয়। স্বাদহীন দানাগুলি তাহার ভারি মিষ্টি লাগে। হাত বাড়াইয়া একটি-দুটি করিয়া সে অনেকগুলি কোয়া

ছিঁড়িয়া কোঁচড়ে রাখে। এমন সময় পিছনে লোকের সাড়া পাইয়া সে ধীরে ধীরে চলিতে শুরু করে। গুটিদুই ছেলে হল্লা করিতে করিতে চলিয়া যায়, রুকিয়া দাঁড়ায়, তার পরে আবার সেইখানে ফিরিয়া আসে। চারিদিকে তাকাইয়া সে আরও কিছু মাকুয়ার কোয়া ছিঁড়িয়া লইয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে চলে।

২৯

তিলকার টানা টানা নিশ্বাসের শব্দ শোনা যায়, সে ঘুমাইতেছে। কোলের কাছে ছেলেটাও ঘুমাইতেছে, রুকিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে উঁকি মারে আকাশে একফালি চাঁদ গাছের আড়ালে হেলিয়া পড়িয়াছে কিন্তু অস্ত যায় নাই। রুকিয়া দরজা ভেজাইয়া সেইখানে চুপ করিয়া বসে। তিলকা একবার একটা অস্পষ্ট আওয়াজ করিয়া পাশ ফিরিয়া শোয়, খানিকক্ষণ কাটিয়া যায়, রুকিয়া উঠিয়া আবার দরজা ফাঁক করিয়া বাহিরে তাকায়, চাঁদ অস্ত গিয়াছে। সাবধানে হাতড়াইয়া রুকিয়া ঘরের কোণ হইতে একটা বোরা ও একখানা কাস্তে হাতে লইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়। কোথাও কোন শব্দ নাই, আকাশে তারা ঝলমল করে, রাত প্রায় দুপুর। দরজায় শিকল তুলিয়া দিয়া নিঃশব্দে পথে নামিয়া রুকিয়া মাঠের দিকে চলে। গ্রামের সরু গলি দিয়া চলিতে তাহার নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হইয়া আসে, সন্তর্পণে পা ফেলিতে গিয়াও পায়ে পাথর ঠেকিয়া আওয়াজ হয়, রুকিয়া ভয়ে চমকিয়া ওঠে, ছুটিয়া গলিটা পার হইয়া মাঠে আসিয়া পড়ে। একপাশে একটা মস্ত বড় আমগাছ, তাহার নীচেটা গভীর অন্ধকার, সেইখানে গিয়া দাঁড়াইয়া রুকিয়া হাঁপায়। একা এমনভাবে সে অন্ধকারের রূপ কখনও দেখে নাই, অতি চেনা পথ, চেনা গাছ, চেনা মাটির দেয়াল, চেনা ঘর সবই যেন অচেনা, অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়, কোনটা বড়, কোনটা ছোট, কোনটা যেন নড়িতেছে, কোনটা যেন তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। রুকিয়ার গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে, একছুটে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

চোখ বুঁজিয়া রুকিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া দাঁড়ায়। না, সে কিছুতেই ফিরিয়া যাইবে না, যে কাজ করিতে সে দুপুর রাতে ঘরের বাহির হইয়াছে তাহা সে করিবেই। না খাইয়া মরার মহাভয় যাহাকে রাত্রদিন ঘিরিয়া আছে, রাতের অন্ধকার দেখিয়া তাহাকে ভয় পাইলে চলিবে কেন? যেমন করিয়াই হোক তিলকাকে সে খাওয়াইবে, তাহা না হইলে তিলকা মরিবে, সে মরিবে, পরসাদ মরিবে। রুকিয়ার ভিতরটা ক্রমে স্থির হইয়া আসে, সে আবার চোখ মেলিয়া তাকায়, অন্ধকার তাহার কাছে আর তেমন ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে হয় না। রুকিয়া আঁচলটা কোমরে শক্ত করিয়া জড়াইয়া নেয়, তার পরে বোরা আর কাস্তে তুলিয়া লইয়া নিঃশব্দে পা ফেলিয়া মতিগোপের বাড়ীর দিকে চলে। অন্ধকারে তাহাকে একটা নিশাচর পশুর মতই দেখা যায়, ক্ষুধিত পশুর মতই অতি চুপি চুপি খাদ্যের সন্ধানে চলিয়াছে।

মতিগোপের বাড়ীর পাশ দিয়া রুকিয়া আবার গ্রামের পথ ধরে, একটু পরে সে কাঁটাগাছ দিয়া ঘেরা মাকুয়ার ক্ষেতের পাশে আসিয়া দাঁড়ায়। চারিদিকে তাকাইয়া দেখে, পথের দুই পাশে কাঁটাগাছের বেড়াগুলি অন্ধকারে অদ্ভুত দেখায়, কোনদিকে কোন শব্দ নাই। অন্ধকারেও রুকিয়া মাকুয়ার পরিপুষ্ট কোয়াগুলি দেখিতে পায়, কি এক মন্ত্রে তাহার মন হইতে সমস্ত ভয় চলিয়া যায়। বেড়ার যে কাঁটা-গাছটা সে দুপুরে টানিয়া খানিকটা সরাইয়াছিল সেটাকে এখন তুলিয়া ফেলিয়া ক্ষেতের ভিতর ঢুকিয়া যায়, তার পরে মাকুয়ার কোয়াগুলি কাটিয়া কোঁচড়ে রাখে। কোঁচড় ভরিতে বেশীক্ষণ লাগে না. কোঁচড়ের কোয়াগুলি বোরায় ঢালিয়া দিয়া রুকিয়া আবার কাটিতে সুরু করে। কোনদিকে এখন তাহার খেয়াল নাই, তাড়াতাড়ি যাহাতে বোরাটি ভরিয়া ফেলিতে পারে প্রাণপণে সেই চেষ্টা করে। হঠাৎ পথের উপর কাহার পায়ের আওয়াজ পাইয়া ভয়ে কাঠ হইয়া দাঁড়ায়। কাছেই কোথায় শুকনো পাতা খড়মড় করিয়া ওঠে, রুকিয়া ঝুপ করিয়া ক্ষেতের মধ্যে বসিয়া পড়ে, তাহার বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করিতে থাকে। পায়ের আওয়াজ আগাইয়া আসে, খুব কাছেই শুক্‌নো পাতা আবার খড়মড় করিয়া ওঠে, রুকিয়ার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে। আওয়াজ আরও কাছে আসে, তার পরে একটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করিয়া কাহারা যেন ছুটিয়া পলাইয়া যায়। রুকিয়ার ভিতরটা এতক্ষণে হাসিতে ভরিয়া যায়, বুনো শূয়োর দুটো তাহাকে কি জব্দটাই না করিল! সাবধানের মার নাই, রুকিয়া আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, তার পরে হাত চালাইয়া বোরার অর্দ্ধেকটা ভর্তি করিয়া ফেলে। আর লোভ করা উচিত নয়, বিপদ হইতে কতক্ষণ, রুকিয়া বোরা লইয়া ক্ষেতের বাহিরে আসে, তুলিয়া ফেলা কাঁটাগাছটা আবার যথাস্থানে বসাইয়া দিয়া বোরাটা কাঁখালে লইয়া তাড়াতাড়ি ফিরিয়া চলে।

এবার তাহার তেমন ভয় করে না। মাঠের রাস্তাটা সে একরকম ছুটিয়াই পার হয়। গ্রামের গলিতে ঢুকিয়া সে আবার সাবধানে চলে। ঘরের দরজায় বোরাটা নামাইয়া রুকিয়া হাঁপাইতে থাকে, এতক্ষণ উত্তেজনার বশে সে ক্লান্তি বোধ করে নাই, এখন তাহার দেহের সব শক্তি যেন লোপ

য়। রুকিয়া সেইখানে ধীরে ধীরে বসিয়া পড়ে। অনেক ক্ষণ পরে সে ওঠে, নিঃশব্দে শিকল খুলিয়া বোরা লইয়া সাবধানে ঘরে ঢোকে। তিলকা তখনও অঘোরে ঘুমাইতেছে, রুকিয়া বোরাটা ঘরের কোণে লইয়া গিয়া খালি কলসীতে মারুয়ার কোয়াগুলি ঠাসিয়া ভরিয়া রাখে।

৩০

"হ্যাঁ গো, মারুয়ার লপসি রাঁধছিস বুঝি, কোথায় পেলি মারুয়া?" উনুনের কাছে আসিয়া প্রশ্ন করে তিলকা।

জ্বাল ঠেলিতে ঠেলিতে রুকিয়া বলে, "ও পাড়ার গোয়ালারা মারুয়া কাটতে লেগেছে, এক সের চেয়েচিন্তে নিয়ে এলুম।"

তিলকা সেইখানে বসে, গতকাল তাহারা উপোস করিয়া আছে, উনুনে চাপান হাঁড়িটার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া বলে, "আহা, নতুন মারুয়ার কি মিঠে সুবাস বেরিয়েছে গো।"

কাঠের খুন্তি দিয়া মারুয়া ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে রুকিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলে, "হুঁ।"

দুই হাঁটুর উপর হাত দুইখানা রাখিয়া উবু হইয়া বসিয়া তিলকা বলে, "ভাতের চেয়ে মারুয়ার লপসি খেতে আমার ভাল লাগে। ভারী জিনিস গো, পেটে থাকে অনেকক্ষণ।"

রুকিয়া কোন জবাব দেয় না, কাজ করিয়া চলে।

তিলকা নিজের মনেই বলে, "ওপাড়ার গোয়ালাদের ধানক্ষেত নেই বটে, টাঁড় জমিতে ওরা যা মারুয়া-মকাই পয়দা করে তাতে ওদের ছ'মাস চলে যায়। হ্যাঁ, কিষাণ বটে ওরা।"

রুকিয়া নিঃশব্দে মাথা নাড়ে। তিলকা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলে, "আমার যদি দু'চার কাঠা টাঁড় জমিও থাকত তা হলে আজ এমন হাল হয় গো! গাছটা পড়লই যদি আমার পায়ের উপর না পড়ে আমার মাথায় পড়লেই হ'ত, সব ল্যাঠা চুকে যেত।"

রুকিয়া মুখ তুলিয়া তিলকার মুখের দিকে তাকাইয়া আবার মুখ নীচু করে।

সারাদিন রুকিয়া ঘরের বাহির হয় না, সন্ধ্যা লাগিতে বোরা আর কাস্তেখানা তিলকার চোখ এড়াইয়া দরজার পাশে লুকাইয়া রাখে। রাত হইলে সকলের সঙ্গে সেও শোয় কিন্তু তিলকা ঘুমাইয়া পড়িলে পরসাদের গায়ে একটা চাদর চাপা দিয়া রুকিয়া আসিয়া দরজা খোলে। আজ আকাশে মেঘ ঘনাইয়াছে, একটা তারাও দেখা যায় না, জমাট অন্ধকার যেন কষ্টিপাথরের মত কালো। বোরা ও কাস্তে লইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই তাহার গা ছমছম করিয়া ওঠে, পা চলিতে চায় না। নিঃশব্দে আবার সে ঘরে ঢোকে, পরসাদের পাশে গিয়া শুইয়া পড়ে। কিন্তু তাহার ঘুম আসে না, কত কথা সে ভাবে। যেমন করিয়াই হোক একটা দিন ত মারুয়ার লপসি খাইয়া কাটিল, তিলকাকে উপোস করিতে হইল না। কিছুটা মারুয়া আছে কালও চলিবে, কিন্তু পরশু? রুকিয়া পাশ ফিরিয়া শোয়। হয় ত কালই গোবিন্দ মহতো ক্ষেতের মারুয়া কাটিয়া লইয়া যাইবে, আর এমন সুযোগ সে পাইবে না। রুকিয়া উঠিয়া বসে, পাশে পরসাদ ঘুমাইয়া আছে, ঘুমন্ত তিলকার টানা টানা নিশ্বাস শুনিতে পাওয়া যায়, রাত নিঝুম। রুকিয়া বোরা কাস্তে লইয়া বাহিরে আসে, দরজায় শিকল তুলিয়া দেয়, তার পরে তাড়াতাড়ি পথে গিয়া নামে।

আজ সে কোথাও দাঁড়ায় না, আজ তাহার ভয় নাই, মনে হয় সেও যেন বাঘ-ভালুকের মত অন্ধকারের একটা জীব। মারুয়া ক্ষেতের পাশে আসিয়া রুকিয়া দাঁড়ায়, ভাল করিয়া চারিদিকে তাকাইয়া দেখে, তার পরে বেড়ার কাঁটা-গাছটা তুলিয়া ফেলিয়া ক্ষেতে ঢোকে। আজ গভীর অন্ধকার, হাতের কাছের জিনিসও প্রায় দেখা যায় না, রুকিয়া এক রকম হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া মারুয়ার কোয়া কাটিয়া কোঁচড়ে রাখে।

হঠাৎ ক্ষেতের অপর প্রান্ত হইতে "ধর ধর, চোর" বলিয়া একটা চীৎকার ওঠে, হুড়মুড় করিয়া কাহারা মারুয়া ক্ষেতের ভিতর দিয়া ছুটিয়া আসে, রুকিয়া যেন বেহুঁস হইয়া যায়, হাত হইতে কাস্তেখানা খসিয়া পড়ে। চীৎকার করিতে করিতে লোকগুলা প্রায় কাছে আসিয়া পড়ে। রুকিয়ার হুঁস ফিরিয়া আসে, আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মুহূর্তে তাহাকে তৎপর করিয়া তোলে, আক্রান্ত বন্যপশুর মতই সে ছুটিয়া ক্ষেত হইতে বাহির হইয়া পড়ে। রাস্তায় পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে একখানা লাঠি আসিয়া রুকিয়ার বাঁ হাতে পড়ে, তৎক্ষণাৎ হাতখানা অবশ হইয়া যায়। যন্ত্রণায় সে আহত পশুর মতই আর্তনাদ করিয়া ওঠে, পাগলের মত ছুটিতে থাকে।

একটা হল্লা খানিকক্ষণ তাহার কানে আসে তার পরে সে আর কিছু শুনিতে পায় না। ছুটিতে ছুটিতে যখন সে ঘরের সামনে আসিয়া দাঁড়ায় তখন তাহার সর্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে। ঘরে ঢুকিয়া রুকিয়া তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করিয়া দেয়, তার পরে ছেলের পাশটিতে গিয়া শুইয়া পড়ে। বুকের মধ্যে তাহার হাতুড়ি পিটিতে থাকে, মূর্ছিতের মত সে পড়িয়া থাকে।

অনেকক্ষণ পরে হাতের অসহ্য ব্যথা ধীরে ধীরে তাহার

চেতনা ফিরাইয়া আনে। বাঁ হাতে কব্জিটায় কি ভীষণ যন্ত্রণা, সমস্ত হাতটা যেন অসম্ভব ভারী, নাড়াইতে পারে না। হাঁটুর কাছটাতেও জলিয়া যাইতেছে, সেখানে হাত দিয়া রুকিয়া ভয় পাইয়া যায়, হাঁটু হইতে অনেকখানি নীচের দিক পর্যন্ত মাংস বাঘের নখের মত ধারাল শেয়াকুলের কাঁটা ফুঁ'কাঁক করিয়া চিরিয়া দিয়াছে, তখনও সেখান দিয়া রক্ত পড়িতেছে।

হঠাৎ রুকিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া ওঠে। ক্রমশঃ

বয়স্ক শিক্ষা আন্দোলন ও সুকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রীনলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়

মানুষ পৃথিবীতে আসে, আবার চলে যায়। মানুষকে ধরে রাখবার সাধ্য কারও নাই। মানুষকে মনে রাখতে পারে, যদি সে রেখে যায়—কাজ, যে কাজ দেশের ও দশের কল্যাণ সাধনে সহায় হয়। ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ খুব ধনী হতে পারে, বড় শিক্ষিত হতে পারে, কিন্তু, যদি সেই ধন, সেই শিক্ষা দশের উপকারে না আসে, তার সার্থকতা থাকে না। সুকুমারবাবু ইউনিভার্সিটির ভাল ছেলে ছিলেন, কৃতী ছাত্র ছিলেন, বড় স্কলার ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনর্গল মুখস্থ বলে যেতে পারতেন, বড় চাকুরী করতেন, ভাল পাকা বাড়ী ছিল, মটর গাড়ী ছিল,তিনি দেখতে খুব সুন্দর ছিলেন, দীর্ঘাঙ্গ, বলিষ্ঠ দেহ ছিল—এসব তাঁর বড় পরিচয়ের মাপ-কাঠি নয়। তাঁর প্রকৃত পরিচয় তিনি মিশতেন গরীবের সঙ্গে, তিনি মিশতেন—ঐ যে মাঠে রোদে পুড়ে, বৃষ্টি ভিজে লাঙল চষছে সেই গরীব চাষীর সঙ্গে। তাদের দুঃখ, কষ্ট কি, তাদের অভাব, অভিযোগ কি, তার সঙ্গে পরিচিত হ'তেন প্রগাঢ় ভাবে, যশোরে সরকারী চাকুরীর মাধ্যমে আমার সঙ্গে হয় তাঁর পরিচয়। দেখেছি যে সময় তাঁর সহকর্মী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের দল খেলাধূলো, গল্প-গুজবে কাটাচ্ছেন তাঁদের অবসর, সুকুমারবাবু তখন কারও কলা বাগানে, আম বাগানে, কচু বাগানে, ধানের ক্ষেতে—গরু চরাচ্ছে এক রাখাল, সেই রাখালের পাশে। এদের সঙ্গে সোজাসুজি মেশবার ফলই তাঁর অনুভূতি, বয়স্ক শিক্ষা। এদের অজ্ঞতা দূর করলে এরা কতখানি লাভবান হতে পারে,এই ছিল তাঁর বড় চিন্তা—নিরক্ষর জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা এদেশে যা ছিল, তা যাচ্ছে উঠে। রামায়ণ মহাভারত পাঠ আর নাই—কথক ঠাকুর আজ নির্ব্বাক, প্রহ্লাদ চরিত্র, ধ্রুব চরিত্র, ভীষ্ম, কর্ণ, বুদ্ধ, হরিশ্চন্দ্র অভিনয় বিনে-পয়সায় বড় আসরে বসে সেই যাত্রাগান শোনবার সুযোগ আজ লুপ্ত। অথচ এদের শিক্ষার দরকার। এই অনুভূতি কার্য্যকরী করবার সুযোগ পেলেন—যখন তিনি ইনেস্পেক্টর-জেনারেল অফ রেজিষ্ট্রেশন হয়ে যুক্ত বাংলায় হাজার খানেক সব-রেজিষ্ট্রারের হর্ত্তাকর্ত্তা হয়ে বসলেন। সকলের অবসর যাতে কার্য্যকরী প্রয়াসে ব্যয় হয়, তার জন্যে নির্দেশ দিলেন সমস্ত অফিসারকে এই বয়স্ক শিক্ষা আন্দোলন প্রচারে। নির্দ্দেশ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না। মাসিক বুলেটিনে ব্যবস্থা হ'ল তাতে ছাপা হ'ত—কোথায় কে কি কাজ করলেন এবং কতখানি। সম্পাদক ভাবে আমাকে এই বুলেটিনের কাজ করতে হ'ত। সে আজ বিশ বৎসর আগেকার কথা—সে সময় এত ডেভলপমেণ্ট ডিপার্টমেণ্ট হয় নাই—তিনি এ কাজ করেছেন শুধু মানবতার প্রেরণায়। দুঃখের বিষয় বেশীদিন তাঁর আর আই, জি, আর থাকা হ'ল না—যুক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন ফজলল হক সাহেব, তাঁর সঙ্গে তাঁর মানসিক প্রবণতা নিয়ে কাজ করা বেশী দিন সম্ভব হ'ল না—দেড় হাজার টাকার সরকারী চাকুরী মুহূর্ত্তে ছেড়ে দিয়ে গুরুদেবের ডাকে একশত টাকা বেতনে তিনি চলে গেলেন শ্রীনিকেতনে গুরুদেবের হাল লাঙলের পাশে—তাঁর পরিচয় আমার এইখানেই শেষ।

সোনার তরীর 'দুই পাখী' আর মহুয়ার 'বন্দিনী'

শ্রীতপতী চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রকাব্যে মানব অন্তরে বিচিত্র সত্তার সরল ঐশ্বর্য্যময় প্রকাশ দেখা দিয়েছে বারংবার। মানুষের অন্তরে আছে দুটি সত্তা—একটি গৃহী অপরটি পথিক। গৃহীটি টানে জীবনের সহজ স্বাচ্ছন্দ্যের অলস ভোগের মধ্যে, আর পথিকটি নিয়ে যেতে চায় ত্যাগময় বৈরাগ্যের মহিমায়। প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনের বেড়াঘেরা চেতনায় এই পথিক সত্তাটি থাকে সুপ্তির গহনে। গৃহীটিকে সদাজাগ্রত করিয়া রাখে মানুষ—যে তাহাকে করিরা রাখে সুখ-নিশ্চলতায় তৃপ্ত। এ পথিক যখন জানাইয়া দেয় মুক্তির আশীর্ব্বাদ, তখন সে-মন্ত্রের দীক্ষায় ঘরের আশিটিও বলে ওঠে, "ন অল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্।"

চিত্র উপমার দিক দিয়া "সোনার তরী"র "দুই পাখী" আর "মহুয়ার" "বন্দিনী" অভিন্ন। এ দুয়েই এই গৃহী আমিটির বলা কথার রূপকল্প দেখি, ভাবের দিক দিয়াও আত্মার জাগরণই দুই কবিতার ধ্বনি। খাঁচার পাখীটি ছিল খাঁচার শান্ত নির্ভরতার প্রাত্যহিকতার আবাসে, বন্দিনী নারীটিও সাংসারিকতায় ছিল সুখে। ছিল না দুঃখবোধ। বনের পাখী আসিয়া শোনাইল খোলা আকাশের সুর—পথিক আসিয়া জানাইল মুক্তির বাণী। সে গান প্রবেশিল বন্দী জীবনের শ্রবণে, মুক্তির আশীর্ব্বাদের প্রত্যাশায় হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। জাগিল অন্তরে শান্তিহীন দাহ। "দুই পাখী"র মর্ম্মবাণীর সমাপ্তি এইখানে। তাহাতে অন্তরের সে জাগরণ তাহার মূল্য অনস্বীকার্য্য। কিন্তু এখানে মুক্তির পথ খোঁজার ক্রন্দন থাকিলেও পাওয়ার পূর্ণতা নাই। এখানে জীবনের প্রাত্যহিকতার বাধাকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। সেখানে মন বলে, জানি মুক্ত গগনে আছে আশীর্ব্বাদ, আছে সুন্দরের বাণী কিন্তু "মোর শকতি নাহি উড়িবার"। বহু জাগ্রত হৃদয়ের এখানেই ঘটে পরিসমাপ্তি। চির ক্রন্দন তাহাদের সম্বল। সেই দিক দিয়া "দুই পাখী" অধিকতর বাস্তবধর্ম্মী কিন্তু "মহুয়া"র "বন্দিনী" নারী, সেখানে প্রেমের সহিত বীর্য্যের গ্রন্থি অবিচ্ছিন্ন। সে শক্তিহীনতার দীনতা সহ্য করিবে না, পথিকের সুরে যখন মিলিয়াছে অন্তরের সুর। প্রেমের সেই আন্তরমিলনেই ত মুক্তি। থাকুক না তুচ্ছ প্রাত্যহিকতার পিছুটান, কিছু ক্ষতি নাই তাহাতে। সে খাঁচার পাখীর মত ভুল করিয়া বনের পাখীটিকে খাঁচায় টানিতে চায় নাই। কিন্তু এও কি সম্ভব প্রেমের গানে যখন অন্তর জাগিয়াছে তখন কেমনে বাহিরিব বলিয়া বসিয়া থাকিবে? সে আপন গৃহকোণে বসিয়াই পরাইবে মিলন-রাখী। বৈষ্ণব কাব্যে যাহাকে কবিগণ বলিয়াছেন ভাবসম্মেলন। সে মিলনে গৃহ হয় পথের ধর্ম্মে দীক্ষিত। গৃহেই তার অবস্থিতি কিন্তু আছে পথের জন্য বিরহ। তার প্রেম পাওয়ার স্বীকৃতি বিরাটকে অনুভব করার প্রতিভা। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, এ অনুভূতি আনিয়া দেয় সেই পথিকের যোগ্য হইবার সাধনা। সাধনার ফলে জীবনে পথের মহিমার সঞ্চার হয়। সেই অধ্যাত্ম-সম্পদই জীবনের প্রকৃত প্রেমের মিলন। এ মিলন আত্মার মিলন। পার্থিব জগতের নৈকট্যের প্রশ্ন নাই এখানে, তাহার অনেক উর্দ্ধে এর স্থান। প্রেমের এই অসাধারণ সমুন্নতির যে জীবনবাদ তাহার মহিমা হইতে "সোনার তরী"র "দুই পাখী" বঞ্চিত। দুই পাখীর সমাপ্তি দ্বন্দ্বের বেদনায়, আর বন্দিনীর শেষ মিলনের সার্থকতায়। প্রেমোপলব্ধির দিক দিয়া "দুই পাখী"কে যদি বলি উৎসের জাগরণ তবে "বন্দিনী"তে পাই মোহনার অতলস্পর্শীতা।

বারোয়ারি সংস্কৃতি-চর্চা ও বাংলাদেশ

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

কবিগুরু একদা দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমাদের দেশে কলা-বধূকে লক্ষ্মীও ত্যাগ করিয়াছেন, গণেশের ঘরেও এখনও তাহার স্থান হয় নাই" (সংগীত—পথের সঞ্চয়)। এ আফশোসের কারণ তাঁহার সময়ে আংশিক ভাবে থাকিলেও, এখন যে আর বিন্দুমাত্রও নাই একথা শপথ করিয়া বলা যাইতে পারে। বিশেষ করিয়া সংগীতের ক্ষেত্রে।

সংগীত-বধূ লক্ষ্মীছাড়া হইয়া গণেশের ঘরে জাঁকিয়া বসিয়াছেন। গণেশও কৃতার্থ হইয়াছেন। তিনি যথারীতি মেরাপ বাঁধিয়া, আলোকসজ্জার বাহার রচনা করিয়া মহোৎসাহে বারোয়ারি সংগীত পূজার ব্যবস্থা করিতেছেন আর সংগীত-বধূ 'লাউড-স্পীকারে'র মাধ্যমে তারস্বরে প্রণয়-সম্ভাষণ করিয়া ধন্য হইতেছেন! গণেশ আজ কলাকে ছল করিয়া ব্যবসায়ে নামাইয়াছেন; এ ব্যবসায়ের ঢেউ তাহাকে কোন্ সমুদ্রে নিয়া যাইবে কে জানে?

বারোয়ারি পূজা ও বারোয়ারি সংগীতের আসরে আজ বাংলাদেশ ছাইয়া গিয়াছে। পূজা-ভক্তির, আর সংগীতের আসর, কৃষ্টির নিদর্শন। বাঙালী তরুণের দল ঘরে ঘরে চাঁদা আদায় করিয়া বারোমাসে তেরোটা পূজা চালাইয়া যাইতেছে আর সুবিধা ও সুযোগ পাইলেই কালে ও অকালে এক একটা সংগীতের আসর বসাইতেছে। বাংলাদেশে এমন ভক্তি ও কৃষ্টির জোয়ার আর কোনদিন আসিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

কথাটা যদি সত্য হইত তবে বাংলার নবজাগরণ আসিয়াছে বলিয়া বলা যাইতে পারিত। যেমন আসিয়াছিল ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তিরোভাবের পরে। তখন যে ভাবের বন্যা বহিয়াছিল সে প্লাবনে অর্দ্ধমৃত বাংলার প্রাণ পুনরায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল। শুধু সংগীতকলায় নয়, কর্মে, ধর্মে, দর্শনে, সাহিত্যে সর্বত্রই নবজীবনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। সে সাড়া আসিয়াছিল ভাবের রাজ্যে। ভাষার মধ্যে নিহিত ছিল আত্মচেতনার বাণী। তাহার উৎস ছিল সাম্যে, প্রেমে। আজ বাংলাদেশে বারোয়ারি ধর্মের ও বারোয়ারি কৃষ্টির যে সাড়া জাগিয়াছে তাহার মূল অভাববোধ, তাহার মূল আত্মবিস্মৃতি। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাহার জন্ম, চিন্তাহীনতার মাঝে তাহার স্ফূর্তি। কাজেই সে সাড়ায় না আছে কোন মহৎ প্রেরণা, না আছে কোন আন্তরিক আবেদন।

বাংলার তরুণ তরুণীর নিকট তাহাদের ভবিষ্যৎ এখনও পরিষ্কার হইয়া দেখা দেয় নাই। যেটুকু দেখা গিয়াছে সেটুকু খুব উজ্জ্বল বলিয়া তাহাদের মনে হয় নাই। নূতন পরিবেশে, বিশেষ করিয়া স্বাধীনতার পরে, তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়াছে প্রচুর কিন্তু তদনুরূপ কর্মশক্তি তাহাদের দেহে বা মনে সঞ্জীবিত হয় নাই।

ইহার কারণ আমাদের আধুনিক ইতিহাসের মধ্যে নিহিত। প্রতিষ্ঠা যে একমাত্র কঠোর পরিশ্রমের দ্বারাই লাভ করা যায়, বিদ্যা ও সংস্কৃতি যে নিরন্তর সাধনা ছাড়া আয়ত্ত করা যায় না, এ পরম সত্যের সন্ধান তাহারা পায় নাই। পাইবার কথাও নয়। কারণ তাহাদিগের চতুর্দিকে প্রতিষ্ঠার যে ছবি তাহারা দেখিয়াছে তাহার ভিত্তি সাধারণতঃ সাধনা বা পরিশ্রমের উপর স্থাপিত হয় নাই। সে সকল প্রতিষ্ঠার সৌধ প্রায়শঃই ময়দানবের তৈরী—রাতারাতি গড়িয়া উঠিয়াছে। বিদ্যা ও সংস্কৃতির যে রূপ তাহারা দেখিয়াছে তাহার গঠন যে মাত্র প্রচারের মাল-মশলায় রচিত এ সন্দেহ তাহাদের কোনক্রমেই হয় নাই। সাধকের রূপ তাহারা দেখে নাই—দেখিয়াছে পল্লবগ্রাহীর রূপ।

প্রচার-শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পল্লবগ্রাহীর সংখ্যা অপরিমিতভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। শুধু বস্তুজগতেই নয়, আজ ভাবজগতেও প্রচার প্রতিষ্ঠার বাহন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শুধু প্রচারের দ্বারা মূর্খকে বিদ্বান বলিয়া চালাইয়া দেওয়া এখন আর অসম্ভব নয়। সংস্কৃতির ত কথাই নাই, প্রচারই তার একমাত্র বাহন। সাধনার কথা যাহারা উল্লেখ করে তাহারা মূর্খ। তারপর সংস্কৃতিরও নূতন সংজ্ঞা হইয়াছে। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, তাহার কিছুটা ঢং, কিছুটা বকুনি আর বাকিটা সমস্তই প্রচার। এই প্রচার-কৌশল অবশ্য প্রকৃত গুণীকে বিভ্রান্ত করা যায় না; কিন্তু সেরূপ জ্ঞানীর সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। আর, আসিবেই বা না কেন? যদি কেবল প্রচারের দ্বারাই কাম্যফল লাভ হয়, তবে নৈষ্ঠিক সাধনার মূল্য রহিল কি? ফলে সাধকের সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে আর পল্লবগ্রাহী প্রচার-কুশলী লোকের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়া যাইতেছে।

ইহাতে দেশের অকল্যাণ হইতেছে দুই প্রকারে।

প্রথমতঃ, জনসাধারণের বিচার-বুদ্ধি ক্রমাগত হ্রাস পাইতেছে, আর দ্বিতীয়তঃ, সহজ-সিদ্ধির দৌলতে প্রকৃত সাধনার মান নামিয়া যাইতেছে।

সাধনার সঙ্গে প্রচারের প্রায় আহি-নকুল সম্পর্ক। সাধনা ধ্যানের বস্তু; কোলাহলের মধ্যে তার স্থান হয় না। আর প্রচার কোলাহলের অন্তরঙ্গ বন্ধু; উহার মধ্যেই তার জন্ম ও প্রসার। কোলাহল মনকে বিভ্রান্ত করে, ধ্যান মনকে শান্ত করে, তার শক্তি বৃদ্ধি করে।

কোলাহলের প্রতি তরুণ-তরুণীর স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে। তার উপর যদি তা প্রচারের কোলাহল হয় তবে ত আর কথাই নাই। তাই বারোয়ারি পূজা ও জলসার কোলাহল আজ বাংলাদেশে উৎকট হইয়া দেখা দিয়াছে। পল্লবগ্রাহী প্রচার-কুশলী লোকের দল নিজেদের অর্থ, সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য এই কোলাহলের স্থায়িত্ব কামনা করিতেছেন। এদিকে নানাপ্রকারে বিভ্রান্ত হইয়া বাংলা-দেশের জনসাধারণের বিচার-বুদ্ধি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে; তাহারা তাই জলসাঘরে প্রবেশের টিকেটকে সংস্কৃতির মানপত্র বলিয়া মনে করিতেছে।

না করিবার কারণ নাই। ইহাই স্বাভাবিক। একটা সাধারণ কথাই ধরা যাক। আজ বাংলাদেশে ঘরে ঘরে পঁচিশে বৈশাখ 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' অনুষ্ঠান হয়। হিন্দুর ঘরে লক্ষ্মীপূজার মত ব্যাপকভাবে। রবীন্দ্রনাথের একখানা ফটো ফুলে ও মালায় সাজাইয়া ধূপধুনা দিয়া উহা অর্চনা করা হয়। এই পূজা করিয়া বাংলার তরুণ-তরুণী আত্মপ্রসাদ লাভ করে। ভাবে, একটা কাজের মত কাজ করা হইল; এ অনুষ্ঠানটি শুধু সারা ভারতবর্ষে কেন, সারা বিশ্বের দরবারে তাহার সংস্কৃতির সাক্ষ্য দিবে। কিন্তু যে সাক্ষ্য ইহা দেয় তাহা তাহার সংস্কৃতির নহে—তাহার চিন্তাহীনতার। রবীন্দ্রনাথের পূজা যে তাহার ফটোপূজা নহে, তাহার কাব্য-সাহিত্যের পূজা সেকথা তাহারা বিস্মৃত হইয়াছে। সে পূজা কোলাহলের মধ্যে হয় না; সে পূজার প্রধান উপচার ধ্যান ও সাধনা।

তাই বলিয়া, পূজার বহিরঙ্গের যে কোন মূল্যই নাই একথা কেহ বলিবেন না। কিন্তু সে মূল্য অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ভাবের অভাবকে রূপের রেখা দিয়া ঢাকা যায় না; নিষ্ঠার ফাঁকি শুধু আচারের প্রলেপে দূর হয় না।

তেমনি করিয়া আজ বাংলার বারোয়ারি পূজা ও জলসা সারা দেশের চিন্তাহীনতারই পরিচয় দিতেছে—সংস্কৃতির নহে। সংস্কৃতির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। ইহা দেশের সমগ্র সভ্যতার প্রতীক্। শুধু শিল্প, কলার সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ নহে, রুচি ও নীতির সঙ্গেও ইহার অঙ্গাঙ্গীভাব। কোন বিষয়ে পারদর্শী হইলেই যে সংস্কৃতি লাভ ঘটে তাহা নহে। অমার্জিত রুচি ও নীতি সে পারদর্শিতাকে সংস্কৃতির পথে যাইতে বাধা দেয়। সংস্কৃতির পরিচয় জলসাঘরে পাওয়া যায় না। ইহার পরিচয় পথে, ঘাটে, সামাজিক আচারে, ব্যবহারে মূর্ত হইয়া উঠে। সংস্কৃতি দরবারী পোশাক নহে যে, দরকার মত ইহা পরিধান করিয়া সজ্জনের দরবারে হাজির হওয়া যায়; ইহা নিতান্তই আটপৌরে কাপড়।

বাংলার যুবশক্তিকে যাহারা ধ্যানের পথ হইতে কোলা-হলের পথে টানিয়া আনিতেছে, তাহারা বাংলার শত্রু। নানাপ্রকার ঘাত প্রতিঘাতে বাংলাদেশ আজ হীনবীর্য, তাহার উপর যদি এই সাংস্কৃতিক ভূতের বোঝা তাহার ঘাড়ে চাপে তবে ভূতের বেগার খাটিতে খাটিতে তাহাকে মৃতপ্রায় হইতে হইবে। আর তাহাই হইতে বসিয়াছে।

এই বারোয়ারি সংস্কৃতি-চর্চার পথে বাংলার কর্মশক্তি রসাতলে যাইতেছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিরুদ্ধতাকে অতিক্রম করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টাই জীবনের লক্ষণ। বাংলার যুবশক্তির মধ্যে সে লক্ষণ কোথায়? নানাপ্রকার প্রচার মোহে আজ সে শক্তি বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। সংস্কৃতি, ধর্ম, জীবনাদর্শ প্রভৃতির শাশ্বত রূপ দেখিবার চেষ্টা আজ প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। প্রচারের মারফত ইহাদের যে রূপ দেখা যায় তাহাকেই সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যুবশক্তির পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে, ক্রমাগত দেশের চিন্তাহীনতা বৃদ্ধি পাইতেছে আর ইহাই বাংলার যুবশক্তির অবসন্নতার প্রধান কারণ।

সত্যি যদি এই ব্যাপক বারোয়ারি সংস্কৃতি-চর্চায় বাংলার কোনও উপকার হইত, তবে পথে, ঘাটে, হাটে, বাজারে আমাদের এত অভদ্রতা, এত অসৌজন্য প্রকাশ পায় কেন? তবে শ্রদ্ধেয় লোকের উপর শ্রদ্ধা, স্নেহভাজনের উপর স্নেহ, বিদ্যার প্রতি ভক্তি এত কমিয়া আসিয়াছে কেন? তবে দেশের রুচি হীন হইতে হীনতর আর নীতি গর্হিত হইতে গর্হিততর হইতেছে কেন?

যুবশক্তির পক্ষে একথাটার বিচার করিবার সময় আসিয়াছে। আধুনিক তরুণ-তরুণীর একথাটা মনে রাখিতে হইবে যে, যে জগৎ তাহারা আজ সৃষ্টি করিতে বসিয়াছে তাহার মধ্যে তাহাদেরই বাস করিতে হইবে; তাহাদের কৃতকর্মের ফল পরিশেষে তাহাদিগকেই ভোগ করিতে হইবে। কর্মের পথে আত্মশক্তি বৃদ্ধি না করিতে পারিলে আত্মপ্রতিষ্ঠা অসম্ভব; বাংলা সকল দেশের পিছনে পড়িয়া থাকিবে।

সূত্রপাত

শ্রীপুষ্প দেবী

কত সামান্য জিনিস থেকে কি কাণ্ডই না হয়ে গেল।

সত্যিই সুমিতা ভেবে পায় না কি দরকার ছিল নিখিলের বিয়ে করার? সামান্য একটা সুতোর রীল কেনার ক্ষমতা যার নেই সে কি ভরসায় বিয়ে করার দায়িত্ব নেয়? কি জানি বাপু এরা কি শুধু ফুলের গন্ধ আর রূপেই মাতোয়ারা? কাঁটার সম্বন্ধে একেবারেই অচেতন? আজ প্রায় দু'মাস ধরে চলছে এই সুতো আনার বিভ্রাট। না আনবে নিজে, না আনতে দেবে অন্য লোককে! এই জ্বালাতেই ত কোনও জিনিস আনার কথা বলতে ভয় করে সুমিতার। আর কত বিভ্রাট যে মনে পড়ে বায়স্কোপের ছবির মত অতীত দিনের—তা বলার নয়। কখনও বিরক্তিতে ভরে যায় সারা শরীর মন, আবার কখনও এই অসহায় দুর্ব্বল মানুষটির কথা ভেবে মমতা জাগে।

কিন্তু শুধু মমতা করলেই ত চলবে না—সংসারও যে চালাতে হবে। সাতটা নয় পাঁচটা নয় একটা মেয়ে—পূজোর দিনে তার একটা জামা নিজের হাতে সেলাই করে দেবে—এইটুকু মাত্র সখ তার, সেও কি একটা অপরাধ? কেন, ঐ নিখিলের বন্ধু সমরেশের বউ ত কত রকম সেজে আসে। তারও ত আয় এমনকিছু অদ্ভুত নয়—কিন্তু যখন যা ফ্যাসান সর্ব্বাগ্রে দেখ সমরেশের বউ পরে আছে। এই ত এখনকার দিনের 'অজন্তা শাড়ী'—প্রায় একশ' টাকা দাম, আগাগোড়া জরির ঢাকাই-কাজ করা। মুখ ফুটে চায় না বলে সুমিতার প্রাণে কি কোনও শখ নেই? এমনকি কথাটা ভুলেও দেখেছে নিখিল বুঝতে পারে না। সেবার যখন প্রথম 'হায়দ্রাবাদী শাড়ী' উঠেছে মীরা পরে আসায় সুমিতা জিজ্ঞেস করল, "ওমা, কত দাম নিল শাড়ীটার? কি চমৎকার দেখতে!" তখনও নিখিল সমরেশের সঙ্গে তন্ময় হয়ে রইল রাজনীতির আলোচনায়। আবার তারা চলে গেলেও সুমিতা সে প্রসঙ্গ তুলে দেখেছে, নিখিল হায়দ্রাবাদ নামটুকু শুনেই হায়দ্রাবাদের কি কি বৈশিষ্ট্য তার আলোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে। সুমিতা মাঝে মাঝে ভাবে, হায় রে, স্ত্রী না হয়ে যদি ছাত্র হতাম। ঋষি আচার্য্য বড় বড় অনেক আখ্যা দিয়ে মনকে স্তোক দিতে চেয়েছে সুমিতা স্বামীর সম্বন্ধে। কিন্তু এখন যেন নিজের মনের কাছেও হার মানতে হয়েছে।

এবার স্পষ্ট বিদ্রোহ জানাল সুমিতা—বেশ ত ওর না হয় সখ নেই সাধ নেই আমাকে সাজানর। মেয়েকে আমি সাজাব আমার মনের মত করে। ও কেন আমার মত যা হোক করে লজ্জা-নিবারণ করবে? যখন সুমিতার বয়স ১৬ কি ১৭ তখন একবার একটু গরম কাপড় আনতে বলেছিল সুমিতা। এসেছিল একটা খেঁসকুটে ছাই রংয়ের গরম কোটের মত শক্ত কাপড়। রাগে, দুঃখে সুমিতার চোখে জল এসে গিয়েছিল। অমন শাঁখের মত সুন্দর রং সুমিতার—যে কোনও রঙেই ত মানাবে তাকে। তাই কোনও রং বলে নি সুমিতা। তা ছাড়া বললেই বা কি হ'ত? সুমিতার কথার কিই-বা দাম আছে নিখিলের কাছে? যদি দোকানদার বলে যে এই টিকিন বা খেয়োর রং জলে রোদে ভীষণ টেকসই তখন সেই টিকিন বা খেয়োই পরতে হবে সুমিতাকে। কিংবা যদি কোনও অধ্যাপক তার বুড়ো জ্যাঠামশায়ের জন্যে বা বিধবা মায়ের জন্য কোনও রং পছন্দ করে নেয় তা হলে ত আর রক্ষে নেই। কিন্তু এমন বিশ্রী সে রং থাকতে পারে তা সুমিতার ধারণাও ছিল না। তবে টেকসই বটে ছিল জিনিসটা—উঃ! আজ দশ বচ্ছরে একটুও ছিড়ল না। এর পরে যখন এটা ছিড়বে তখন কি সুমিতা বেঁচে থাকবে? না, রঙীন জামা পরার বয়েস থাকবে তখন? তা ছাড়া এই বিদঘুটে খেঁসকুটে রংয়ের জামা কাপড় পরায় সকলের চোখ যেন তার দিকেই চেয়ে থাকে। সামান্য ফর্সা জামা কাপড় পরলেও বাড়ীর লোকেরাই অবাক হয়—আর সবচেয়ে অবাক হয় নিখিল। সে বলে, "কোথাও বেরুচ্ছ নাকি? সুমিতার যেন কপাল চাপড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হয়।"

থাক গে ওসব কথা। বলতে গেলে যা শেষ হবার নয় তা বলার চেষ্টা করার মত বোকামী আর নেই। তবুও মনে সে সব একবার এলে আর রক্ষা নেই।

একে ত সেলাইয়ের কল নিয়েই বিভ্রাটের অন্ত নেই। তবু ভাগ্যে বাপের বাড়ী থেকে ন'দি এই দরকারী জিনিসটি যৌতুক দিয়েছিলেন, নইলে কেনানো সে ত জীবনেও হয়ে উঠত না। কত হাঙ্গামা করে পাশের বাড়ীর অমিয়াদিকে দিয়ে দু'গজ সিল্ক আনিয়ে ছিল সুমিতা—মনে আশা ছিল সুনেত্রাকে সাজাবে মনের মত মুস্কিল হ'ল সুতো নিয়ে—একটা জর্দ্দা রং আর একটা ভায়োলেট রং—অতই যদি করল অমিয়াদি সুতো করে। দুটোও যদি ঐ সময় মিলিয়ে এনে দিত? যাক্ রোজই নিখিলকে একবার করে তাগাদা দেয় আর ধোপার বাড়ী দেবার সময় পাঞ্জাবীর পকেট থেকে নমুনার সিল্কের টুকরোটুকু পাটভাঙা নতুন পাঞ্জাবীর পকেটে পুরে দেয়। তিন সপ্তাহ কেটে গেল—সুতো আর আসে না। শেষে জোর মন্তব্য করে সুমিতা, "আশ্চর্য্য মানুষ তুমি! দুটো রিল কিনতে

ে থাকে না ? সত্যি, আজ যদি তুমি না আনো আমি নিজেই র সুতো কিনতে।"

তাকে বিশেষ আশ্বাস দিয়ে নিখিল বেরিয়েছিল—ফিরল াতে—হাতে দুটো প্রকাণ্ড প্যাকেট। বলল, "এই দেখ চাবুক াড়া শুদ্ধ এনেছি।" প্যাকেট খুলে দেখল খুব মোটা মোটা দুটো ালা। বলল, "ভাবলাম এলাম যখন তালাপটিতে তালা দুটো নয়ে যাই, যা চোরের উপদ্রব—তাছাড়া শ্রীমুখ থেকে যখন বরিয়েছে যে, এবার নিজেই যাব বাজারে তখন আর অন্তঃপুরিকা রে রাখা কেন ? উঃ, এই তালার জন্যে কম ঘুরতে হ'ল— সখানে আবার রামুর সঙ্গে দেখা। রামু যাচ্ছে নৈনিতাল— াজোর বাজার সঙ্গে। সারা চাঁদনী এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত কত ব ঘুরেছি। হ্যাঁ, এই দেখ ভুলে যাচ্ছি, খুব ভাল লেসও পলাম, তের আনা করে গজ বাজারে। ওখানে এগার আনা করে িল। আমরা দুজনে পুরো একটা প্যাকেট কিনলাম। দাও তামার ফ্রকের তলায় কত দেবে।"

লেসের নমুনা দেখে সুমিতার ত চক্ষুঃস্থির—সাদা-কালোয় মশানো সুতির লেস, যা সুন্দর সিল্কের ফ্রকে মানাবে সে আর াঝাতে ইচ্ছা হ'ল না সুমিতার। বলল, "হ্যাঁ, ভালই হ'ল। কই, ুতো দুটো দেখি ?"

তখন নিখিলের মনে পড়ল। বলল, "আরে সত্যি তাই ত। ুতোটাই ত কেনা হয় নি—অনেক ঘুরে ঘুরে বড্ড ক্লান্ত লাগল ক না। আসার সময় রামুর সঙ্গে ট্যাক্সিতেই ফিরলাম তাই সুতোটা র নেওয়া হয় নি—পছন্দ করে রেখে এসেছি।

এবার সুমিতার পক্ষে ধৈর্য্য রাখা কঠিন হয়ে উঠল, বলল, 'চমৎকার হবে। জরদা রঙের সিল্কে কালো আর সাদা মেশানো লেস বসিয়ে যা বাহার হবে তাতে আর রঙ মিলিয়ে সুতোরই বা ক দরকার—সবুজ সুতোতেই সেলাই করব এখন।"

নিখিলের কিন্তু তাতে একটুও প্রশান্তি ব্যাহত হ'ল না। বলল, "কি আশ্চর্য্য, এত সহজে চটে যাও কেন ? সুখের কথা ুসালেই হুলুস্থুল। বলছি ত কাল এনে দেবই। এই জন্যে তোমায় খুশী করা যায় না—মানুষের কি ভুল হয় না ? তাছাড়া ঙ-টং সব পছন্দ করা আছে—শুধু গিয়ে নিয়ে আসা, এ আর কতক্ষণের কাজ ?"

তবুও সুমিতার রাগ যায় না। বলে, "তোমার পছন্দ করা ত ? যেমন লেস পছন্দর বাহার ? অমন লেস মানুষ পরে নাকি ? ঝিয়েরা সায়ার তলায় দেয়।"

অবাক চোখে নিখিল সুমিতার দিকে চায়। বলে, "কি আশ্চর্য্য ! দোকানদার ত বললে, ফ্রকের গলায় আর তলায় কুঁচিয়ে দিলে খুব বাহার হবে—আর রামুও ত নিলে।"

সুমিতা বলল, "বলবে না কেন, তার বিক্রী হচ্ছে না যে, নেড়ে বুদ্ধি ত। তা তুমিও নিজের জন্যে একটা কেজ কিনলে পারতে—মেয়ের ফ্রকের সঙ্গে মানিয়ে।

রাতটা একটু অসন্তোষের মধ্যেই কাটল। তার পরদিন সকালে নিখিল বার বার স্বগতোক্তি করছে। "আজ আর কোন ভুল নয়—প্রথমেই সুতো কেনা।" তাছাড়া লেসটা কেনা যে বুদ্ধির কাজ হয় নি তাও বুঝতে পেরেছে। মনের অগোচরে পাপ নেই—নিখিল ত জানে লেসটা কিছুতেই কিনতে রাজী ছিল না রামু। নিখিলই তাকে অনেক করে বুঝিয়েছে—"মিসেস খুশী হবে, নাও না কিনে।"

কারণ সব বাণ্ডিলটা কিনলে গজে এক পয়সা কম পাওয়া যায়, অথচ পুরো বাণ্ডিল কিনলে তার টাকায় কুলোয় না। আগেই তালা কিনতে গিয়ে পকেট অনেকটা হালকা হয়ে গেছে। সুমিতার মুখের দিকে চেয়ে রামু বেচারীর গৃহ-অশান্তি ও কল্পনা করে নিয়েছে, বুঝছে, মিসেসদের পক্ষে জিনিসটা আনন্দদায়ক নয়। বেরুবার সময় বারে বারে বলল, "আজ সকাল সকাল আসব—দিনের আলোতেই ফ্রক সেলাই করতে পারবে। দাও ত নমুনা দুটো ভাল করে নিয়ে যাই।"

সুমিতা কড়ায় খুন্তি নাড়তে নাড়তে বলে, "পকেটেই আছে আজ এক বচ্ছর।"

নিখিল আর কথা বাড়ানো নিরাপদ নয় বলে বেরিয়ে পড়ে। অফিস থেকে প্রথমেই যায় সুতোর দোকানে, দুটো নয় রীতিমত চারটে চার রঙের সুতোই কিনে নেয়। একবার যেন কি সবুজ রঙে সেলাই করব বলেছিল সুমিতা—'অধিকন্তু ন দোষায়'! নিশ্চয়ই খুশী হবে—মনের আনন্দে ফিরছিল নিখিল। রাস্তায় ডাঃ সোমের সঙ্গে দেখা। হর্ণ বাজিয়ে গাড়ী থামালেন সোম।

হেসে বললেন, "কি ব্যাপার বলুন ত ? আজ তিনদিন আপনার দেখা-সাক্ষাৎ নেই—বাড়ীতে অসুখ-বিসুখ নাকি ? মানুটার আবার পরীক্ষা কাল থেকে। রোজই আপনার দিদি বলেন আপনার খোঁজ নিতে।"

নিখিল মানুর গৃহ-শিক্ষক, সত্যিই পর পর তিনদিন যাওয়া হয় নি। আগের দিন মাথাটা ধরায় সকাল সকাল অফিস থেকে বাড়ীই গিয়েছিল। দ্বিতীয় দিন রামুর পাল্লায় পড়ে যাওয়া হয়ে ওঠে নি। আজও বাড়ীই ফিরছিল দোকান থেকে—অপ্রস্তুতের একশেষ।

ডাঃ সোম সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত তার হাতে মানুকে দিয়ে। তাছাড়া মানুর মত ছেলে হাফ-ইয়ারলিতে মাত্র একটা সাবজেক্টে দু'নম্বর কম পেয়ে সেকেণ্ড হয়েছে। এখন পর পর তিনদিন তার অনুপস্থিতি কম অপরাধ নয়। বিশেষতঃ এল. মল্লিকের দোকান থেকে বেরুনো স্বচক্ষে দেখেছেন ডাঃ সোম। কি ভাবলেন কে জানে ? ভাল হ'ত যদি দেখতেন ওষুধের দোকান থেকে বেরুতে। মিথ্যা বলা অভ্যাস না থাকলেও চক্ষুলজ্জা কাটাতে বলা যেত—কোনও আত্মীয় বা সহকর্মীর অসুখে কর্ত্তব্যে বাধা পড়েছে। গরুচোরের মত মুখ করে নিখিল বেচারা গাড়ীতে উঠল। মনে ভরসা পকেটে সুতো দুটো আছে কেনা। সোমের গাড়ী বাড়ীতে থামতে না থামতেই

নানা গুঞ্জন। দিদি স্মিতহাস্যে বললেন, "বিয়ে করে অবধি বেচারা ফুরসৎই পান না।"

ডাঃ সোম তাতে ঘৃতাহুতি দিয়ে বললেন, "আজও কি আসতেন—আমি একেবারে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসেছি।"

মান্নু ছলছল চোখে এসে দাঁড়ায়, বলে, "জানেন মাষ্টারমশাই, কালও আমি স্বপ্ন দেখেছি দেবাশীষ কাষ্ট হয়ে গেল। কাল বিকেলে দাদা দিদি যুদ্ধের জাহাজ দেখতে গেল, আমি যাই নি আপনি আসবেন বলে।"

এ না যাওয়া যে মান্নুর কাছে কতটা আত্মত্যাগ তা বুঝতে নিখিলের দেরী হ'ল না। সোম আবার বলেন, "পরীক্ষার আগের দিন যে আপনি আসবেন না, এ অভাবনীয় ব্যাপার—নইলে আমিই যা হয় একটু দেখিয়ে দিতাম। কি ব্যাপার? মিসেসের আদেশে শ্বশুরালয়ে গিছলেন নাকি—না সিনেমায়?"

উত্তর দিতে পারে না—মনে মনে চটে ওঠে সুমিতার ওপর। আশ্চর্য্য! মান্নুর পরীক্ষার আগেই ওঁর সুতো না হলে চলবে না। শুধু শুধু লোকের কাছে অপদস্থর একশেষ। কেনা চাকর পেয়েছে একেবারে—মনে পড়ে ক্ষুদে বোনের কথা, বোন বলেছিল, "বৌদির এম. এ. পাস চাকর।"

মনে বিষের ক্রিয়া চলে পড়াতে পড়াতে। রাত প্রায় ন'টা বাজে। উঃ, অসম্ভব মাথাটা ধরেছে। আজকাল কি যে বিশ্রী মাথা ধরাটা হচ্ছে—চশমাটা হয়ত বদলাতে হবে—একেই ত যথেষ্ট পাওয়ার আছে—আরও বাড়লে ত অন্ধের পর্যায়ে পড়তে হবে। চশমার কথা মনে পড়তেই রুমাল খোঁজে চশমা মোছার জন্য, পকেটে হাত দিতেই প্রথমে বেরুল সুতোর ঠোঙ্গাটা। সেটা টেবিলে রেখে চশমা মোছে। মনটা আবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সুতোর ঠোঙ্গা দেখে—উঃ, যা মেজাজ হয়েছে সুমিতার, সহ্যের অতিরিক্ত। ঐ রকম মেজাজ সইতে গেলে ব্লাডপ্রেসার ছাড়া উপায় কি? কে জানে, ব্লাডপ্রেসারই হয়েছে কি না? মান্নুর দিদি রুনুর কাছ থেকে একটা অ্যাসপ্রো নিয়ে ঢক ঢক করে এক গ্লাস জল খায় নিখিল। ক্ষিধের পেট চোঁ চোঁ করছে—দুপুরে টিফিনও আজ খায় নি সকাল সকাল বাড়ী ফিরবে বলে। মনে আশা ছিল, সুমিতাও আজ হয়ত কালকে বকাবকি করার অনুশোচনায় কিছু ভালমন্দ খাবার করে রাখবে, হয়ত চায়ের সঙ্গে আসবে গরম গরম কড়াইসুঁটির কচুরি বা মাংসের সিঙ্গাড়া। এধারে রাত প্রায় ন'টা বাজে, রাতের খাবার খাওয়ারও সময় হয়ে গেল। বাধ্য হয়ে গোপাল চাকরকে এক কাপ চা দিতে বলল—অন্য সময় এর সঙ্গে দু'খানা বিস্কুট অন্ততঃ জুটত কিন্তু আজ মেজাজ খারাপ দিদির। কাজেই মিসেস সোমের দিক থেকে কোন কথা না পেয়ে চাকর এক কাপ অখাদ্য 'চা'ই শুধু দিল। একবার মনে হ'ল নিখিলের যে, দরকার নেই খালি পেটে এই চা খেয়ে। কিন্তু ভদ্রতা বড় বালাই—কাজেই গা গুলুলেও গোপালের সেই গামছা নিংড়ানো জল গিলতে হ'ল অম্লানবদনে।

মান্নুকে পড়া তৈরি করে দিতে দিতে প্রায় পৌনে দশটা বাজে মনকে ততক্ষণে সম্পূর্ণ তৈরি করে নিয়েছে নিখিল। সত্যিই সুমিতাকে যতই ভালবাসে—তা বলে তার ঐসব খেয়ালে কর্ত্তব্যে গাফিলতা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এতে তার মেজাজ দিনকে-দিন বেড়েই যাচ্ছে। বিয়ের আগেই বন্ধু বলেছিল, "সুমিতার মা'র কিন্তু বেজায় রাগী বলে সুনাম আছে, সামলাতে পারবি ত?"

মেজাজ প্রায় সপ্তমে নিয়েই বাড়ী ফিরল নিখিল। এসে দেখে, সুমিতা জানালার ধারে বসে সুপুরি কুচোচ্ছে—মুখ ভাব-লেশশূন্য। ছোট্ট সুনেত্রার মনে ভাবান্তর নেই। ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল বাবাকে—নিখিল পকেট থেকে সুতোর ঠোঙ্গাটা তার হাতে দিতেই খুশীতে ঝলমলিয়ে উঠল তার মুখ—বলল, "ওমা, চকোলেট এনেছ বুঝি?" টপ করে একটা চকোলেট মুখে পুরতেই নিখিলের মনে পড়ল মান্নু যখন পড়তে বসেছিল তখন তার হাতে ছিল এই ব্রাউন রঙের ঠোঙ্গা। অন্যমনস্কে সেইটেই এনেছে পকেটে পুরে। পকেট হাতড়ে দেখলো সুতোর ঠোঙ্গাটা রয়ে গেছে ডাঃ সোমের টেবিলের উপরে। এধারে সুনেত্রা বলে চলেছে, "জান বাবা, মা বলে—'তোমার বাবার কিচ্ছু মনে থাকে না—কি করে তোমার জামা করব বল?' এই ত বাবার সব মনে থাকে। পরশু চকোলেট আনতে বলেছিলাম না বাবা?"

মনে মনে সুমিতাকে আর প্রশ্রয় দেবে না ঠিক করেই এসেছিল নিখিল। তার উপর ক্লান্তি ও বিরক্তিতে শরীর ভেঙে পড়েছিল, কাজেই রাগের মুখে নিজের ভুলটা না মেনেই বলে, "মনে কেন থাকবে না, কিন্তু সব কাজেই কি মেজাজ চলে?"

ব্যস এবার অগ্ন্যুৎপাত ঘটল—সুমিতা বলল, "কি দরকার আমার মেজাজ সইবার? একটা কথা না বলেও উপায় নেই, বললে সে কথাও থাকবে না, শুধু শুধু অশান্তি। রাত দশটায় বাড়ী ফিরে এখন মেজাজ কে দেখাচ্ছে সবাই দেখছে। বলে দে সুনেত্রা, আমরা কাল বাগবাজার যাচ্ছি।"

নিখিল বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, বলে, "কারুকে যেতে হবে না। আমিই যাচ্ছি চলে এ মুখ আর দেখতে হবে না।" গায়ে কামিজটা গলাতে গলাতে নিখিল বেরিয়ে যায় বাড়ী থেকে।

নিজের অসংযমে কান্নায় ভেঙে পড়ে সুমিতা।

রাতটা পার্কের বেঞ্চে কাটিয়ে সকালে মাথা খানিক ঠাণ্ডা হলে নিখিল ভাবে, কাছেই ত মান্নুর স্কুল, দেখে আসি কেমন পরীক্ষা দিল। গিয়ে দেখে মান্নু বিমর্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্কুলের ফটকে। হাতে সেই বিভ্রাটের মূল সুতোর ঠোঙ্গা। বলল, "দেখুন মাষ্টার মশাই, বাবাকে চকোলেট আনতে বলেছিলাম, বাবা ভুলে কতক-গুলো সুতোর গুলি এনে দিয়েছে। সেই সেদিন ত আমি যুদ্ধের জাহাজ দেখতে যেতে চেয়েছিলাম—বাবা বললেন পড়ার ক্ষতি হবে, মাষ্টারমশাই ফিরে যাবেন। তার বদলে তোমায় চকোলেট এনে দেব। এমন ভুলো মন বাবার!"

বাড়ী ফিরে দেখে সুস্মিতা, সুনেত্রা কেউ নেই—পাশের বাড়ী টুনু এসে একটা চিরকুট হাতে দেয়। তাতে লেখা—'চললাম, সুস্মিতা।' টুনু বলল, "বাবা! কি কান্না কাঁদছিল সুনেত্রা 'না যাব না, না যাব না' বলে। ওরা কেন গেল কাকাবাবু?"

নিখিল চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে—ঘরের সামনেই কলের উপর সেই সিল্কের টুকরো দুটো তেমনি পড়ে আছে। মনে ভাবে, সামান্য সুতোর সূত্র ধরে কি বিভ্রাটের সূত্রপাতই হ'ল। ষষ্ঠীর দিনে সুনেত্রাকে সাজানোর সাধ মিটল না সুস্মিতার।

মধ্যবিত্ত

শ্রীরথিন মিত্র

ভারতবর্ষের অরণ্যচারী পশু-সমাজের দ্রুত লুপ্তপ্রায় কয়েকটি সম্প্রদায়কে রক্ষা করবার জন্তে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলি নানা পরিকল্পনা করছেন। তাদের পুনর্বসতি, বংশবৃদ্ধি এবং নিঃশঙ্ক বিহারের জন্তে বহু বনাঞ্চল সংরক্ষিত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এই সব পরিকল্পনার জন্তে যে অর্থ বরাদ্দ হচ্ছে তা শুনলে অনটন-পীড়িত দেশবাসী সময় সময় চমকে ওঠেন। যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এবং যে উদ্দেশ্যে সরকার এই কাজে ব্রতী হয়েছেন তাতে সমালোচনা করার কিছু নেই, আধুনিক সব দেশেই অরণ্য-সম্পদকে রক্ষা করার জন্যে বিভিন্ন চেষ্টা চলছে। কিন্তু ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলা দেশে অন্য এক সম্প্রদায়ের যে ত্বরিত বিনষ্টি ঘটছে সে দিকে সরকারী ঔদাসীন্য সমালোচনার পূর্ণ অপেক্ষা রাখে। অবশ্য এ সম্প্রদায় মনুষ্যেতর কোন প্রাণীর নয়, মানুষের। এ সম্প্রদায় জাতির রাজনৈতিক ও সংস্কৃতির ইতিহাসে মধ্যবিত্ত নামে আখ্যাত হয়ে আছেন। যে হিসেবের উপর ভিত্তি করে একদিন এই সম্প্রদায়ভুক্তদের বিত্ত-বৈভবের পরিমাণ মধ্যম বলে চিহ্নিত হয়েছিল সে হিসেব আজকের অর্থনৈতিক মানদণ্ডে বাতিল হয়েছে, পুরণদিনের মধ্যবিত্তেরা আজ মূলত বিত্তহীন সম্প্রদায়ভুক্ত।

শুধু আমাদের দেশ নয়, পৃথিবীর সব দেশের সার্ব্বিক জাগৃতির মূলে রয়েছেন এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়; একটা সমগ্র দেশকে অন্ধকার হতে আলোকে উত্তীর্ণ করতে যে মানসিক সংগ্রামের প্রয়োজন হয় সে সংগ্রামের নায়ক এই মধ্যবিত্তেরা, যে কটা বিপ্লব আর বিদ্রোহ পৃথিবীর ইতিহাসের গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করেছে তা এই মধ্যবিত্ত সমাজের মস্তিষ্কপ্রসূত। ভারতবর্ষ বা বাংলাদেশের স্বাধিকার অর্জ্জনের সংগ্রামের সেই রক্তক্ষরা ও সংশয়াম্বিত প্রথম মুহূর্ত্তে ধনী এগিয়ে আসেনি আর সাধারণ মানুষ নিশ্চেষ্ট ছিল তাদের জীবনের নিভৃত বৃত্তে। একমাত্র বলতে গেলে বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত, সংগ্রামের রক্তমশালে সমগ্র জাতির চিন্তা-চেতনায় স্বাধীনতা লাভের স্পৃহাকে অদম্য করে তোলেন।

মধ্যবিত্তেরা স্বাধীনতাপূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমাজের কেন্দ্রভূমি ছিলেন, তাঁদের জ্ঞানে, শিক্ষায়, আদর্শ ও মর্য্যাদাবোধে বাঙালীর আত্মিক-তেজ অন্য জাতির আর্থিক গরিমাকে ম্লান করে দিয়েছিল। সমগ্র দেশের গতির নিয়ন্তা ছিল এই সম্প্রদায়ের কর্ম্মব্যাপ্তি। কিন্তু স্বাধীন হবার পর থেকে পালা বদল ঘটেছে। সম্প্রদায় হিসেবে মধ্যবিত্তেরা আজ নিশ্চিহ্নের পথে। স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই দেশের সামাজিক গঠনে যে পরিবর্ত্তনের সূচনা হয়েছে আপাত-দৃষ্টিতে তা সাধারণের লক্ষ্যে আসে না কিন্তু সমাজের গভীরে যাঁদের আনাগোনা করতে হয় তাঁরা স্বচ্ছন্দেই উপলব্ধি করতে পারেন এত দিন সমাজ-ব্যবস্থার মেরুদণ্ড স্বরূপ যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ছিল তার ক্ষয় কত গভীর হয়ে উঠছে। এ ক্ষয়ের কথা, এ দুর্দ্দশার কথা অঘোষিত থেকে যায়, কারণ এ সম্প্রদায়ের আভিজাত্য ও শিক্ষাদর্শ নিজেদের দৈন্যকে সর্ব্বসমক্ষে তুলে ধরতে বাধা দেয়; তাই নোনা-ধরা ঘরের অন্ধকারে বা হাসপাতালের হিম-শীতল পরিবেশে বহু লাঞ্ছিত জীবন নির্ব্বাণলাভ করে।

যে সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে বাঙালীর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় একদিন বাঙালী জাতির চিন্তা চেতনায় বিপ্লব এনেছিল সে সম্পদ আর্থিক নয় আত্মিক। মধ্যবিত্তের এই আত্মিক সম্পদ তাকে বিশিষ্ট করে ছিল অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে। আজকে আত্মিক সমৃদ্ধির মূল্যবোধ কমে গেছে। শিক্ষার ঔজ্জ্বল্য নয়, অর্থের দ্যুতি আজ সামাজিক সম্ভ্রমের মাপকাঠি। বাঙালী মধ্যবিত্ত এতদিন মানুষের মনের হাটে সংস্কৃতির পসরা সাজিয়ে বসেছিল, সংসারের বাজারে স্থূল পণ্যের কারবার করেনি, ফলে তার আত্মিক বিত্ত সঞ্চিত হয়েছে কিন্তু আর্থিক মূল্য কিছু পায় নি। তাই আজকের পরিবর্ত্তিত সমাজে এ সম্প্রদায়ের স্থান নীচে, অনেক নীচে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সংগ্রামী, সংগ্রাম তারা করতে জানে একটা আদর্শের জন্যে একটা মহৎ লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্যে। কিন্তু আজ সে সংগ্রাম করবে কোন উৎসাহে? শঠতা আর বঞ্চনা যেখানে সব নীতি ধর্ম্মের উপরে স্থান পাচ্ছে সেখানে কিসের প্রেরণায় সে ঝাঁপাবে সংগ্রামের মধ্যে?

"সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ সাথে যুঝে" কোন আশ্বাসে মানুষ অন্ধকারে পাড়ি জমাবে?

একটা কথা আছে, তা হচ্ছে সক্ষমতম ব্যক্তি বেঁচে থাকার অধিকারী। কিন্তু আজকের দিনে সক্ষমতম কে? আধুনিক বিচারে সেই জন অথবা সমষ্টিই নির্বোধ বা অক্ষম যিনি বা যাঁরা শঠে শাঠ্যং নীতি পালন করেন না। আজকের মধ্যবিত্ত বাঙালী শুধু শিক্ষিত নন তাঁরা এক ঐতিহ্যশালী সংস্কৃতির রক্ষক এবং বাহক। তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয় জীবনের সুকুমার বৃত্তি আর মর্য্যাদাবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে তথাকথিত জীবন সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে। একথা স্বীকার করতেই হবে আহত বাঙালী মধ্যবিত্ত যে শিক্ষা সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে তার ফলে বাঙালীর জাতি হিসেবে আত্মিক ধ্বংস ষোলকলায় পূর্ণ হতে পারেনি।

হাহাকার আর হতাশায় মূহ্যমান হয়ে রয়েছে বলতে গেলে সমস্ত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। এ ব্যথা হয় ত রাজপথে লাল নিশানের তলায় ঘোষিত হয় না, হয়ত তা ময়দানের লক্ষ মানুষের জমায়েতে উচ্চারিত হয় না; কিন্তু তাকে অস্বীকার করা সূর্য্যের অস্তিত্বকে অবিশ্বাস করার সামিল। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের জন্যে নূতন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা কি করা হচ্ছে।

এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য আমরা আজি এক যুগ-সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছি, এই নূতন যুগের সঙ্গে একতালে পা না ফেলতে পারলে বাঙালী কেন, যে কোন জাতেরই অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠবে। কিন্তু এর অর্থ কি এই যে একটা জাতের সবাই ইট ভাঙবে, লোহা গলাবে আর মাটি খুঁড়বে? প্রত্যেক দেশেরই একটা জাতীয় মানসিকতা আছে; আর এই মানসিকতা গড়ে উঠে ভৌগোলিক ইত্যাদি নানান পরিবেশের বিচিত্র প্রভাবের ফলে; বাঙালীর শ্রম-বিমুখতা চারিত্রিক দোষ নয়, চারিত্রিক গঠনের ফল। এ গঠন পারিপার্শ্বিকের চাপে এক দিন নিশ্চয়ই ভেঙে যাবে, আর বাঙালীর শ্রম সহিষ্ণুতার প্রমাণ এখনই পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু একদিনের মধ্যে ভিন্ন মানসিকতার একটা সম্প্রদায়কে ত বলা যায় না তোমরা হাতিয়ার নিয়ে নেমে যাও খনির ভেতরে, নয় ত ভেসে যাও সমুদ্রে। সে জন্যে সময় চাই। তা ছাড়া জনহিতব্রতী সরকার একটা জাতির আত্মিক এবং আর্থিক পুনর্বাসনের সময় সে সম্প্রদায়ের জাতিগত বৈশিষ্ট্যকে পূর্ণ মর্য্যাদা দেবেন বৈকি।

বাঙালী মধ্যবিত্তের প্রয়োজন জীবন-ধারণের নিশ্চিন্ত পরিবেশ, আলোক-উজ্জ্বল জীবনের উচ্ছ্বসিত বিলাস-ব্যসন নয়, সাধারণ জীবনের নিশ্চিত নিরাপত্তাই বাঙালীর কাম্য। এত অভাবেও বাঙালীর চরিত্রের সহজ ধর্ম্মিতা অক্ষুণ্ণ আছে তাই বস্তু বৈভবের বিস্তৃতি অপেক্ষা এখনও মানসিক বিস্তারের পক্ষপাতী বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, আর সে জন্যে প্রয়োজন বাস্তব ভিত্তির উপর রচিত সরকারী পরিকল্পনা।

মণিমালার জন্যে

শ্রীকৃতী সোম

শ্রাবণী নদীর দোলা রক্তজবা রূপের জোয়ার
রিমিঝিমি নেশা মহুয়ার
অজানা পথের মত নতুন ইসারা
কুচির কুঁড়ির বুকে জাগে যেই সাড়া
এনে দিলে শিহরণ—স্বপ্ন, গান—মধুক্ষরা দিন
মোহের আবেশ দিলে রঙন-রঙীন।

তুমি ত রহস্যময় অপরূপ সৌন্দর্য্যের দেশ!
তোমাতেই খুঁজে পাই স্বর্ণনীল কামনার শেষ।
আমার নিঃসঙ্গ প্রাণে জেলে যাও দুরন্ত অঙ্গার,
নিশ্চল নিপুণ শিল্প মনে হয় দূর অজন্তার।

যন্ত্রণার তীরে বিঁধে অসহ্য আঁচড়ে
আমাকে জ্বালাও তুমি, তুমি জল নাকি?
করুণ বেহাগরাগ কেন টান হৃদয়ের ছড়ে
কি সুখ তোমার বল? কেন শুধু মিথ্যা এই ফাঁকি?

প্রতারণা আর কেন, মণিমালা, উন্মীল প্রহরে
সাহসী ডুবুরি হও মুক্তোভরা মনের সাগরে।

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীসংজ্ঞা দেবী

যাঁর সঙ্গে বারো বৎসর বয়সে বিবাহসূত্রে জীবনের যোগ হয়েছিল এবং প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স পর্য্যন্ত সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী রূপে যাঁর সঙ্গে বাস করেছি, তাঁর দেবতুল্য জীবনের কথা যথাশক্তি কিছু প্রকাশ করে বলা আমার কর্ত্তব্য বলেই মনে হচ্ছে। সম্পূর্ণ রূপে সৌষ্ঠবের সঙ্গে তাঁর চরিত্র অঙ্কন করা আমার মত বিদ্যাহীনার কর্ম্মই নয়। তবে নাকি যাঁর ইঙ্গিতে আমার এ জীবনতরী এ-যাবৎকাল ভেসে চলেছে, তাঁরই ইঙ্গিতে আংশিক ভাবে স্বামীর চরিত্রের মাধুর্য্য—খাতার পাতায় অল্প-স্বল্প ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করব।

আমার স্বামীর তিরিশ বৎসর বয়সে বিবাহান্তে আমি তাঁর সঙ্গে মিলিত হই। তাঁর অল্প বয়সে বিলেত যাবার প্রবল ইচ্ছা ছিল, কিন্তু একমাত্র ছেলের বিরহ সইতে পারবেন না বলে তাঁর মা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাঁকে বিলেত যেতে বাধা দেন। সেই দুঃখে ও অভিমানে ইনি বিয়ে করব না বলে কোট ধরে প্রায় তিরিশ বছর কাটিয়ে দেন। পরে মায়ে ছেলেয় বহু কান্নাকাটি ও মান-অভিমানের পর ছেলে বিয়েতে মত দেন। বার বৎসর বয়সে কিশোরী আমি প্রথমটা তাঁকে ভয়ই করেছিলাম। কিন্তু তিনি এমন সুনিপুণ কৌশলে দূর থেকেই স্নেহ ছড়িয়ে আস্তে আস্তে মাস ছয়েকের মধ্যে আমার ভয় এতটাই ভাঙিয়ে দিয়েছিলেন যে, বছরখানেকের ভিতরই আমি তাঁর উপর আধিপত্য করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করি নি এবং তিনিও আমার কর্তৃত্বের উপর নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

গীতায় যাকে কর্ম্মযোগী বলে তিনি তাই ছিলেন। যোগভ্রষ্ট পুরুষই এসে কর্ম্মক্ষয় করে সাধনোচিত ধামে ফিরে গেলেন। "কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"—এই ভগবৎবাণী তাঁর মুখে কোন দিন শুনি নি কিন্তু এই মহৎ বাণীর নির্য্যাস দিয়েই তাঁর জীবনটি গঠিত ছিল। সুবৃহৎ পরিবারের তিনি একজন ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে থেকে কর্ম্মজীবনে দেশবিদেশে বহু ভিন্ন-দেশীয় লোকের সঙ্গে মেশবার আমার সুযোগ হয়েছিল কিন্তু তাঁর মত "আপন মোছা" লোক আমি দ্বিতীয় একটি দেখিনি। সংসারে থেকে সংসার করে যে মানুষ নিজের নাম যশ সুখ সুবিধা অর্থ ইত্যাদির দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না করে পরের জন্য নিজেকে এমন ভাবে বিলিয়ে দিতে পারে এ দৃষ্টান্ত একান্তই বিরল বলে আমার মনে হয়।

শ্রীমান দিলীপ রায় তাঁর একটি গানের আসরে একবার বলে-ছিলেন—"তাঁর ঘর নেই তাঁর পর নেই, যাঁর ঘর্ নেই তাঁর পর নেই।" কিন্তু স্ত্রী-পুত্রাদি নিয়েও পুরোমাত্রায় ঘর থেকেও যাঁর পর থাকে না এর দৃষ্টান্ত যেমন তিনি ছিলেন এমন আর কেউ হতে পারেন কিনা আমার জানা নেই। এ আমার অত্যুক্তি নয়। বোধ করি যোগভ্রষ্ট ছিলেন বলেই এই অসাধারণ ভাব এত অধিক পরিমাণে তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছিল। এদিকে সংসারে স্বামী হয়ে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য পুরামাত্রায় করেও অপর পক্ষে স্বামীর দাবীর প্রতি সম্পূর্ণই উদাসীন ছিলেন। বাইরের সকল কর্ম্মের মধ্যেও রুগ্না স্ত্রীর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে সেবার কর্ম্ম বেশীর ভাগ নিজের হাতেই করে গেছেন। শেষ মৃত্যুশয্যা ছাড়া দীর্ঘ জীবনে একটি দিনের জন্যেও এতটুকু সেবা স্ত্রীর কাছে নেন নি। এই রকম পিতা হয়েও সন্তান সন্ততিদের প্রতি প্রচুর স্নেহ ঢেলেছেন অথচ পিতার দাবী সম্বন্ধে মনের কোণেও কখনও কোন অঙ্কুর উঠতে দেখি নি। এই রকম ঘরে বাইরে সর্ব্বত্রই তাঁর একই ব্যবহার, একই ভাব দেখেছি।

কর্ম্মজগতে তাঁর প্রধান কীর্ত্তি হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স সোসাইটি। এর আইডিয়াটি অবশ্য ধীশক্তির আধার অম্বিকাচরণ উকিল মহাশয়েরই। তিনি আমাদের বাড়ী ঘন ঘন এসে আমার স্বামীকে কনভিনস করিয়ে এই মহান্ কর্ম্মযজ্ঞে নামিয়েছিলেন। এটি যে জগতের বুকে ক্রমশঃ হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স রূপ মহীরুহ আকার ধারণ করে ভারতবর্ষব্যাপী ফুটে উঠেছিল, তা একমাত্র এই নীরব কর্ম্মীর প্রাণঢালা সাধনা, স্থিরবুদ্ধি, বিচারপূর্ণ গবেষণা এবং শরীর-পাত করা পরিশ্রম দ্বারা।

জমিদারের ঘরের ও প্রথম সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একমাত্র পুত্র মায়ের চক্ষের মণি হয়ে তিনি যেভাবে এই কর্ম্মসাধনায় নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন তা দেখবার ও শেখবার বস্তু। দীর্ঘ-দিন এই প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে তাঁর শরীর ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে বহুদিন ভুগেছিলেন। এক দিকে ঔষধপথ্য এবং অভিজ্ঞ লোকের দ্বারা তেল মালিশ ইত্যাদি চলতে থাকলেও অন্য দিকে কর্ম্মসাধনা বিরামবিহীন ভাবে এগিয়ে চলেছিল।

তিনি কাজ করতেন সম্পূর্ণ একাগ্র এবং অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে। যখন লেখাপড়া নিয়ে থাকতেন বাইরের কোন কথাই তাঁর কাণে যেত না। একদিনের একটি ঘটনা বলি—একদিন তাঁর হিন্দুস্থানের লেখাপড়ার কাজ দস্তুরমত চলছে এমন সময়ে একটি অপরিচিতা মহিলা আমার কাছে বেড়াতে আসেন। তখন যে ঘরে তিনি তাঁর সেক্রেটারিয়েট টেবিলে বসে কাজ করছিলেন তার ঠিক সামনেই আমি সেই সুসজ্জিতা মহিলাটির সঙ্গে আলাপ করছিলাম। ঘণ্টা-খানেক মহিলাটি ছিলেন এবং সমস্ত সময়ই আমার স্বামীকে নিবিষ্ট-

চিত্তে লেখাপড়ার কাজ করে যেতে দেখে সেই সুসজ্জিতা মহিলা যাবার সময় বেশ ক্ষুণ্ণমনে এক সার্টিফিকেট দিয়ে গেলেন—"এত সময় যে বসে রইলাম, ইনি ক্ষণিকের তরেও কোনও দিকে চান নি, কি নিবিষ্ট ভাব, যেন একটি পোকা।" বহুদিন আমরা নিজেদের মধ্যে তাঁর পোকা খ্যাতি নিয়ে হাসাহাসি করেছি। যাই হোক এই হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স যখন তাঁরই মন প্রাণ শরীর ঢালা সাধনায় ফুলেফলে সুশোভিত হয়ে উঠেছিল তখনই আস্তে আস্তে তাঁকে আপিসের শীর্ষস্থান থেকে সরাবার চেষ্টা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। সদা-প্রসন্ন কর্মযোগী তিনি তাতে তিলার্দ্ধ বাধা দেওয়া দূরে থাক, জানতে পেরে সে কাজে সম্পূর্ণ সাহায্য করেছিলেন।

তাঁর জীবনযাত্রায় কি আইন, কি ইঞ্জিনীয়ারীং যে বিষয়ের যখন জ্ঞানের অপেক্ষা হয়েছে, নিজেই পড়াশুনা করে নিয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির মত নিপুণতার সঙ্গে সেই কাজ সম্পন্ন করে নিয়েছেন। এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় তর্জ্জমায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি', 'জীবনস্মৃতি' ইত্যাদির ইংরেজী তর্জ্জমা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা সকলেই সে কথা স্বীকার করেন। অবসর সময়ে টলষ্টয়, জর্জ্জ এলিয়ট প্রমুখদের বিখ্যাত নভেলগুলি হাতে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই এমন সহজ বাংলায় উপাখ্যানটি বলে যেতেন যে, কোথাও একটু বাধত না বা মুহূর্ত্তের জন্য ইতস্ততঃ করতে হ'ত না। সে সময়ে কেউ ঘরে এলে বুঝতেই পারত না যে, তাঁর হাতে ইংরেজী বই। এ জিনিস যাঁরা দেখেছেন সবাই জানেন। কত বক্তার বক্তৃতা যে তিনি সুন্দর করে বিশদ করে লিখে দিয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই। সে সব বক্তৃতা অবশ্য চিরদিন বক্তাদের নামেই প্রকাশিত হয়েছে।

একবার এক জার্ম্মান দার্শনিক পণ্ডিত ইংরেজীতে একটি প্রবন্ধ লেখেন। কিন্তু ইংরেজী ভাষা তাঁর তেমন আয়ত্ত না থাকায় তার মনের সূক্ষ্ম ভাবগুলি ইচ্ছামত ফুটিয়ে তুলতে পারছিলেন না। এমন অবস্থায় একটি পার্টিতে আমার স্বামীর সঙ্গে এই পণ্ডিতটির আলাপ হয়। উক্ত পণ্ডিত কথাবার্ত্তায় কি করে জানি না বুঝে নেন যে, ইনিই তাঁর মুস্কিলের আসান করতে পারবেন। তখন তিনি একে তাঁর অসুবিধার কথা মোটামুটি বলেন। তার পর আমার স্বামী ইংরেজীতে সেই ভাবটি সুন্দর পরিস্ফুট করে তাঁকে লিখে দেন। জার্ম্মান পণ্ডিত সেই লেখাটি পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং বার বার বলতে থাকেন, "আমি ঠিক এই কথাটিই বলতে চেয়েছিলাম, বলতে পারি নি, তুমি কি সুন্দর সহজে প্রকাশ করেছ!" সেই জার্ম্মান ভদ্রলোক তার পর থেকে এতই কৃতজ্ঞ হয়ে পড়েন যে, দেশে ফিরে যাবার পর থেকে প্রায়ই উচ্ছসিত কৃতজ্ঞতাপূর্ণ পত্র লিখতে থাকেন। আমার স্বামী প্রথম দু'তিনটি পত্রের উত্তর দিয়ে আর পত্র দেন নি। ভদ্রলোক উত্তর না পেয়ে শেষে চিঠি লেখা বন্ধ করলেন।

আমার স্বামী নিজে মাত্র খানতিনেক বই প্রকাশ করেছিলেন। তার প্রথমটি হ'ল মহাভারতের রত্নসাগর ছেচে সরল বাংলায় তার মূল আখ্যানের প্রকাশ। এটি আমার বিবাহের পূর্ব্বে লেখা। শুনেছিলাম এক সময় রেমিটেন্ট জ্বরে প্রায় দু'আড়াই মাস তাঁকে বিছানায় আবদ্ধ থাকতে হয়েছিল, সেই সময় এই মহাভারতের সারাংশ লিখে রোগশয্যাটিকে জীবনে বৃথা যেতে দেন নি। অনেক পরে "বসন্ত প্রাতের প্রস্ফুটিত সকুরা পুষ্প" নামে একটি ঐতিহাসিক জাপানী গল্প তর্জ্জমা করেন। শেষ মৃত্যুর আগে লেখা বইখানির নাম "বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ" এইটিই তাঁর রচিত একমাত্র মৌলিক পুস্তক।

নিজেই তিনি বলতেন আমার জীবন-অভিধানে পারব না কথাটি নেই। বাস্তবিক তিনি পারতেন না এমন কাজই ছিল না। ট্রেনে যেতে যেতে এক ভদ্রলোক তাঁর হস্তরেখা বিচার করে বলেছিলেন—"বহুবিধ প্রতিভার একত্র সমাবেশ হওয়াতে কোনও বিশেষ একটি প্রতিভা আপনার মধ্যে ফোটবার সুযোগ পায় নি।" ভদ্রলোকের রেখাবিচার যে কত সত্য তা যাঁরা তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন তাঁরা অবশ্যই স্বীকার করবেন।

তাঁর দেহটি বিধাতা সৌন্দর্য্য দিয়ে নিখুঁৎ করে গড়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে সৌন্দর্য্যবোধ ছিল তাঁর আজন্মসিদ্ধ। হেলায় ফেলায় তাঁর হাত থেকে যা কিছু বেরুত তাও ফুলের মত ফুটে উঠত। ঘর-সংসারের কোন কিছু কাজ করতে হলে সেটি তাঁর মনের অনুপাতে সুন্দর না হলে সইতে পারতেন না। তিনি সুরজ্ঞ ছিলেন। দেশি ও বিলিতি সব রকম সুরেরই তাঁর যেন সহজাত তীক্ষ্ণ জ্ঞান ছিল। এসরাজে ছড় দিয়ে মৃদু টানটি যখন দিতেন তখন সেই যন্ত্রটি গুণী লোকের হাতে পড়েছে বুঝেই যেন সুমিষ্ট সুরে বেজে উঠত। অল্পস্বল্প আঁকতেও তাঁকে দেখেছি। স্বভাবে ছিলেন সুরসিক উদার এবং পরোপকারপ্রবণ। তাঁর প্রশান্তচিত্ত পরের জন্য সর্ব্বদা উন্মুখ থাকত। কোন কটু ভাষণ বা অপবাদ এই প্রশান্তিকে বিচলিত করতে পারত না। বিশেষতঃ হিন্দুস্থানের বিরাট সাফল্যে জগতের ঈর্ষাপরতন্ত্র লোক প্রকাশ্যে কাগজে লিখেও কত নিন্দাবাদ করেছে। আবার তাদের মধ্যে থেকেই কেউ কেউ নিলজ্জের মত এসে বলেছে, "অমুক জায়গায় অমুককে আপনি বললে আমার একটি চাকরি হতে পারে।' তিনি তৎক্ষণাৎ সহাস্যবদনে টুপি এবং লাঠিটি নিয়ে সেই নিন্দুক ব্যক্তিরই সঙ্গে যেতে প্রস্তুত হতেন। কেউ অনুযোগ করলে বলেছেন, "অমুক আমার নিন্দা করেছে বলে আমি কি তার শত্রুতা করব? তা ছাড়া কেউ গালাগাল দিলে আমি কাবু হইনে, আমার গণ্ডারের চামড়া।"

একটি ঘটনা বলি—কোন ব্যাপারে এক ভদ্রলোক নিজের স্বার্থরক্ষার বা নিজেকে বাঁচাবার জন্য তাঁর নামে প্রকাশ্যে বহু নিন্দাবাদ করেছিলেন। এতে ওঁর ছেলেমেয়েরা সেই অত্যন্ত পরিচিত ভদ্রলোকের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। অনেক চেষ্টার পর সেই ব্যাপারটি মিটিরেও ছেলেমেয়েদের মনের ক্ষোভ যাচ্ছে না দেখে, তিনি এমন ভাব দেখাতে লাগলেন যেন উক্ত ভদ্রলোক কিছুই

অন্যায় বলেন নি। তার পর আগের সেই সহজ ভাব দেখাবার জন্য বিশেষ ফরমাস দিয়ে একটি মস্ত কেক আনিয়ে ছেলেদের সামনে দিয়ে মোটরে করে নিয়ে সেই কেক হাতে করে তার বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এলেন। তাঁর অনুরোধে আমাকেও তাঁর সঙ্গে কেক পৌঁছতে যেতে হয়েছিল। এমনি কত ঘটনাই আছে।

তিনি যে দানশীল ছিলেন তা বলাই বাহুল্য। তাঁর ক্যাসিয়ার অনেকবার বলেছেন, "বাবু মশাই যাকে যা দিতেন তা প্রয়োজনের অতিরিক্তই দিতেন। আমি যদি বলেছি 'এতটা দেবার আবশ্যক কি?' তখন বাবুমশাই বলতেন তুমি বোঝ না অনন্ত, মানুষকে দিতে হলে তার প্রয়োজন পুরো করেই দিতে হয়।" আমাদের পাড়ার গরীব মুসলমানেরা চিরদিন বলেছে, 'ঠাকুর সাহেব পীর'।

তাঁর মৃত্যুর পরে বৈষয়িক কর্ম্মসূত্রে বহু লোকের সঙ্গে আমায় দেখা করতে হয়েছিল। তাদের সকলের মুখে এই একটি কথাই শুনেছি যে, তিনি ছিলেন দেবতা। সেনসাস এনকোয়ারী উপলক্ষে এক পদস্থ ব্যক্তি আমাদের বাড়ী এসে বলেছিলেন—"মিঃ টেগোর বাস করায় এ বাড়ী তীর্থ হয়েছে। আমি কর্ম উপলক্ষে এখানে এসে আজ ধন্য হলাম।"

এই নীরব ত্যাগী পুরুষটি জগতে কারুর কাছ থেকে কিছু না নিয়ে, কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা না করে, যাকে যা দেবার তার অতিরিক্ত দিয়েই পৃথিবীর বুক থেকে নীরবে ঝরে গিয়েছেন। মৃত্যু যখন কঠিন বাহুপাশে তাঁকে ঘিরে ধরেছিল, তখন প্রায় তিন মাস সেই বেষ্টনীর মধ্যে তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি এবং ততোধিক যন্ত্রণাদায়ক চিকিৎসার মধ্যে শরীরটিকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে সব সময় তিনি চোখ বুজে প্রশান্তবদনে নীরবে শুয়ে থাকতেন। কেউ কোন দিন উঃ কি আঃ করতে শোনে নি এবং তাঁর মুখের প্রশান্তভাবের কদাপি কোন বিকৃতি ঘটে নি এই তিন মাসের মধ্যে। আমি যখনই জিজ্ঞাসা করেছি, 'এখন কেমন আছ'? বলেছেন 'ভাল'। একদিন বলেছিলেন—'আমি সবসময় ভালই থাকি'। তার পর নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখিয়ে বললেন, 'এরা কে কেমন আছে, তুমি দেখে নাও'। আরও একদিন নিজের বুকে হাত দিয়ে বলেছিলেন মৃদু হেসে, 'এ বড় বোকা, পৃথিবীতে এত বাতাস আর এ টানতেই পারছে না'। পেট থেকে জল তখন তাঁর ফুসফুসে আক্রমণ করেছে, শ্বাসকষ্ট পাচ্ছেন, কিন্তু ঐ কথাটি ছাড়া আর কিছুই বলেন নি।

তাঁর মৃত্যুর পরে তখনকার হিন্দুস্থানের চীফ মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ যতীলাল সেন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে বলেছিলেন, "আমি আমাদের আপিসের প্রধান প্রধান সকলকে বলেছি—আমাদের সঙ্গে মিঃ টেগোরের মেলামেশায় এবং ব্যবহারে তাঁর সম্বন্ধে আমাদের যা বলবার আছে তা আমরা সবাই একটু একটু করে লিখব।"

তখন যদি বাস্তবিক এটি লেখা হ'ত তা হলে সাধারণে তাঁর সুন্দর ব্যবহারের এবং উদার চরিত্রের পরিচয় কিছু কিছু পেতেন। কিন্তু বিধাতার বোধ হয় ইচ্ছা ছিল ইনি গোপনে থেকে গোপনেই সরে যাবেন। ডাঃ সেনের এ সদিচ্ছা তাই কার্য্যে পরিণত হয় নি। আজ দীর্ঘকাল বাদে ভগবৎবিধানে সাধ্যমত সংক্ষেপে আমাকেই কিছু বলতে হ'ল।

এই প্রসঙ্গে আমার সংসারের কথাও কিছু বলি। সংসার-জীবনে শেষের দিকটা কি প্রচণ্ড ঝড়-ঝঞ্ঝা উঠেছিল এবং সেই ঝড়ের ভিতর থেকেই পরমপ্রভু কি ভাবে তাঁর এই দীনা সেবিকাকে রক্ষা করেছেন সেইটুকু বলে প্রভুর মহিমা ঘোষণা করে ধন্য হয়ে লেখনী ধারণের অযোগ্য আমি এ লেখনী থামিয়ে দেব।

জগতে কোন বিষয়ই অতি ভাল নয়, তা পুরাকাল থেকেই প্রমাণিত হয়েছে—অতি-দানে বলি রাজারও বন্ধন হয়েছিল তাই শাস্ত্র বলেছেন, 'সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতম্' ঠিক এই কারণেই আমার স্বামীর স্বভাবগত উদারতা, দানশীলতা বিশেষ করে কাউকে না বলবার অক্ষমতা ধীরে ধীরে আমাদের সংসারটিকে ঋণের বেড়াজালে ঘিরে ফেলে এবং তাঁর মৃত্যুর অল্পপূর্ব্বে তাঁকে সর্ব্বস্বান্ত করে দেয়।

আজীবন প্রচুর ধনসম্পত্তির মধ্যে নিশ্চিন্ত বিলাসে থাকা এবং জীবনের শেষে সর্ব্বস্বান্ত হওয়া এ দুটি যে কি ভীষণ ব্যাপার তা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য কেউ সম্যক উপলব্ধি করতে পারবেন না। সংসারে যদি ঋণ একবার প্রবেশ করে তা হলে স্বভাবতঃ সে ঋণ বেড়েই চলে। এই রীতিতে ঋণ আমাদের সংসারে বেড়েই চলেছিল। সুদ এবং সুদের সুদ ক্রমে জমে উঠতে লাগল। উত্তমর্ণেরা আদালতের সাহায্যে তাগাদা সুরু করলেন।

সেই সময় থেকে থেকে এক একটি উত্তাল তরঙ্গ যেন মুখব্যাদান করে তেড়ে আসত। মানুষ আমরা—আমাদের সাধ্য ছিল না তা নিরাকরণ করা। সেই তরঙ্গের সামনে আমরা ছিলাম সম্পূর্ণ অসহায়। বিধির বিধানে মানুষের বুদ্ধির অগম্য উপায়ে এই তরঙ্গগুলি যেভাবে প্রতিনিবৃত্ত হয়েছে—তা দেখে সর্ব্বশক্তিমান বিধাতার কৃপাহস্ত নিরীক্ষণ করে আমি চোখের জল সংবরণ করতে পারি নি। এই উত্তাল তরঙ্গগুলি যেভাবে ক্রমান্বয়ে উঠত এবং মিলিয়ে যেত তা ভাষায় বলা আমার অসাধ্য। সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলির সম্যক বর্ণনা করার আজ অবশ্য আমার ইচ্ছাও নেই।

জীবের জীবনে যত বড়ই জটিলতা, যত বড়ই দুর্দ্দশা আসুক না কেন সে যদি প্রভুর স্মরণ মননরূপ অভয়দণ্ডটি সম্পূর্ণরূপে নির্ভরতার সঙ্গে দৃঢ়হস্তে ধরে থাকতে পারে, তা হলে সকল বিক্ষেপ, সকল দুর্দ্দশাই একদিন মিটে যায়। এ আমার ক্ষুদ্র জীবনের চরম অভিজ্ঞতা—বহুকষ্টে উপার্জ্জিত সত্যজ্ঞান।

মহাত্মা দয়ালদাস স্বামী কোনও অবস্থায় তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন :

"ভজন করা তেরা কাম হ্যায়
ভোজন দেনা মালিককা।"

তাঁর এ কথার সত্যতা তাঁর শিষ্যেরা অচিরেই জেনেছিলেন। আমার নিজেরও এ কথা সর্ব্বদা মনে হয়। আমাদের কাজ আরাধনা

করা, আমরা যদি তাঁর প্রতি নির্ভরশীল হয়ে ভজন চালিয়ে যেতে পারি ত, ভোজন পাবই। যে ভীষণ দুঃসময় সংসারে এসেছিল, তাতে আমরা সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি কিন্তু তবু ভোজন আমাদের ঠিকই চলেছে।

আমাদের সন্তানেরা বৃহৎ জমিদারের ঘরে জন্মগ্রহণ করে যতটা আরামে কাটাতে পারত তা পেল না বটে, কিন্তু সেই ভীষণ ঝঞ্ঝার কবল হতে মুক্ত হয়ে অন্তরকম ভালভাবে তাদের জীবন চলে যাচ্ছে। শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—দুনিয়ার সকলের সঙ্গে ওদেরও শ্রীবৃদ্ধি হোক, সকলের কল্যাণ হোক আর আমি যেন আমার পরম-প্রভুর জয়গান করে সংসারের ক্ষেত্র থেকে চিরবিদায় নিই।

জারী গান

শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ

জারী গান বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের অতি প্রিয়। কারবালায়-নিহত হাসান-হোসেনের উদ্দেশে মুসলমান সম্প্রদায় মহরম মাসে যে শোক প্রকাশ করে, সেই করুণ কাহিনী অবলম্বনে বাংলার পল্লীকবিরা যে সমস্ত গান রচনা করেছেন—বাংলাদেশে তা জারী গান নামে পরিচিত।

প্রকাশ্যে কোন বিষয় প্রচার বা জাহির করার নাম জাহিরী বা জারী। আবার, পারসী শব্দে জারী অর্থ—ক্রন্দন করা। মীর মশাররফ হোসেন এই হাসান-হোসেনের কাহিনী সাহিত্যরসে পুষ্ট করে বাংলার জনসমাজে প্রচার করেন।১ তাঁরই চেষ্টায় এমন একটি মর্মান্তিক কাহিনীর রসাস্বাদন সবার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। জারী গানের বিষয়বস্তু নিয়ে আবার ইমাম-যাত্রার সৃষ্টি হয়েছে।২

সমাজে নৈতিকতত্ত্ব প্রচারে জারী গানের বিশেষ দান রয়েছে। রামায়ণ-মহাভারত ও শাস্ত্র-পুরাণের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বালা'দার৩ এবং কবিওয়ালারা যেমন হিন্দু সমাজে ধর্মভাব জাগ্রত রাখতে সাহায্য করেছেন, তেমনি কোরাণের সুক্ত এবং আরবিক কাহিনী অবলম্বনে মুসলমান পল্লীকবিরা মুসলমান সমাজে নৈতিকতত্ত্ব প্রচার করেছেন এবং জনসাধারণের আত্মিক ক্ষুধার খোরাক জুগিয়েছেন। আবার, সামাজিক অন্যায়-অত্যাচার এবং নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধেও এই সমস্ত পল্লীকবিরা বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানিয়েছেন—জারী গানের মাধ্যমে।৪

বাংলায় দলবদ্ধভাবে গীতগানের মধ্যে জারী গান অন্যতম। মূল গায়েন, দু'চারজন বাদক ও দোহার-সমবায়ে একটি জারী গানের দল গঠিত। জারী গানে ধুয়া, আরেব, ফেরতা, মুখড়া, বাহির, চিতেন ইত্যাদি ছয়টি অংশ থাকে। আসরে, প্রথমে বন্দনা ও পরে ধুয়া গাওয়া হয়। 'বয়েৎ' অর্থাৎ গীত, এবং গীত-রচয়িতাকে 'বয়াতি' বলে। মূল গাইয়ে বা গায়েনকেও অনেক সময় 'বয়াতি' বলা হয়। কেননা, মূল গায়েনরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে গীত-রচয়িতা। এই 'বয়াতি' বা গীত-রচয়িতাদের মধ্যে দু'চারজন হিন্দু—সনাতন, রামচাঁদ প্রভৃতির নাম শোনা গেলেও প্রধানতঃ, মুসলমানগণই এই জারী গানের গায়ক, বাদক, পালক, প্রচারক—সব কিছু।৫

২

জারী গানের প্রাচীনতা এবং জনপ্রিয়তা সম্পর্কে 'সঙ্গীত রত্নাকর' গ্রন্থের ভূমিকায় জানা যায়:

"কোম্পানীর আমলে রাজধানী কৃষ্ণনগরে দুর্গাপূজার কালে কত জারী গীতের প্রচলন ছিল। সেই আমোদেতে পূজার দিনে রাসযাত্রা, চণ্ডীগীত, পাঁচালি, মনসার ভাসান, কবি, পীরের গীত, জারী গীত, পুতুলনাচ, কুস্তিখেলা, নৌকা বাইচ, ঘোড়ার দৌড় হইয়া রাজবাড়ীর মান থাকিত।"৬

জারীগান বাংলার প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত। তবুও, এই জারী গানের উৎপত্তিস্থান, কাল এবং প্রধান প্রবর্তকদের সম্পর্কে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্র বলেন:

"প্রায় ১৫০ বৎসর ধরিয়া যশোহর জেলায় জারীগান চলিতেছে—এই গানের উৎপত্তিস্থান বলিয়া যশোহর যশস্বী।...জারী গীতের প্রধান প্রবর্তকদিগের মধ্যে পাগলা

---

১ বিষাদ-সিন্ধু—মীর মশাররফ হোসেন। ১৮৮৫

২ হারামণি—মু, মনসুরউদ্দীন; পৃঃ ৩৲। ১৯৪২, ক-বি

৩ বালা'দার॥ চৈত্র মাসে শিবের গাজন উপলক্ষে যশোহর-খুলনায় পল্লী-কবিরা এক রকম গান রচনা করেন, নাম—বালা-গান; গায়ক—বালা'দার।

৪, ৫, ৯ যশোহর-খুলনার ইতিহাস—সতীশচন্দ্র মিত্র। ২য় খণ্ড, পরিশিষ্ট।

৬ সঙ্গীত-রত্নাকর—নবীনচন্দ্র দত্ত। [বইখানি অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য, কেবলমাত্র সমালোচনা পাওয়া যায়; বঙ্গদর্শন, ১২৭৯ পৌষ সংখ্যায়।

গনাই৭ প্রথম এবং ইদু বিশ্বাস৮ দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। যশোহরের উত্তরাংশ অর্থাৎ ঝিনাইদহ ও মাগুরা মহকুমা জারী গানের পীঠস্থান।"৯

একটি ছড়ায়১০ এই পাগলা কানাই এবং তার সমসাময়িক আরো কয়েকজন জারী গায়ক এবং হিন্দু-মুসলমান পল্লী-কবির পরিচয় পাওয়া যায়। ছড়াটির প্রথমাংশ১১ এখানে যশোহর-খুলনার জারী গায়কদের পরিচায়ক হিসাবে উদ্ধৃত করলাম :

"নামটি আমার মেহেরচাঁদ,
কালীশঙ্করপুর বাড়ী।
আমি দেশ-বিদেশে গেয়ে বেড়াই জারী।
শুনি আকাশে এক মেলা হয়েছে ভারী,
তাতে বায়না নিয়ে পাগলা কানাই,
গাইতে গিয়াছে জারী।
আসানউল্লা, সোনা, সেদু, তরিবুল্যা,
কোরবান মোল্লা,
গেছে রোশন খাঁ, নৈমদ্দী মুন্সী,
আর সুলতান মোল্লা—
এরা কয়জনেতে পাগলা কানাইর সাথে
দিয়াছে পাল্লা;
এরা সব চালাক চতুর, কানাই বড় কল্লা॥"

—এই সমস্ত বিচার করে দেখলে সহজেই বোঝা যায়, পূর্ববঙ্গেই এই জারী গানের প্রচলন বেশী, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গেও একদা জারী গান যে একেবারে অজ্ঞাত ছিল না, তার প্রমাণ—জারী গানের একখানি প্রাচীন পুথি পশ্চিমবঙ্গেই পাওয়া গেছে॥১২

৭ পাগলা কানাই। জন্ম: ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ; যশোহরের ঝিনাইদহ মহকুমার অন্তর্গত বেড়বাড়ী গ্রাম। পিতা: কুড়ন শেখ॥

৮ ইদু বিশ্বাস। পাগলা কানাই-এর সমসাময়িক। জন্মস্থান: যশোহরের ঝিনাইদহ মহকুমার ঘোড়ামারা গ্রাম॥—দ্রষ্টব্য: যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পরিশিষ্ট।

১০ মৎ-সংগৃহীত একটি ছড়া, অপ্রকাশিত। এই ছড়াটির ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ ১৩১২ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত।

১১—ঐ [১০] ছড়াটির কেবলমাত্র প্রথমাংশ যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ডের পরিশিষ্টে সংগৃহীত।

১২ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত—পুথি পরিচয়। পুথি নং ৩১২। বিশ্বভারতী, ১৩৫৮।

৩

গান সংগ্রহ॥ এখানে, যশোহর-খুলনার কয়েকজন প্রাচীন পল্লী-কবির গান প্রকাশ করা গেল। গানগুলি জারী গানের বন্দনা বা ধুয়া হিসাবে গীত হয়। [খুলনা জেলার জনৈক বলাইলাল বিশ্বাস ও তোয়াজ আলী গাজীর সহযোগিতায় গানগুলি সংগৃহীত।] গানগুলিতে দেহতত্ত্বের ভাবই সুস্পষ্ট॥

(১)

ওগো মনেরি কষ্ট বলবো পষ্ট
এখন এই সভায়—
অনেকদিনের মনের কষ্ট, বলবার
সময় নাইকো হয়।
ভাগ্যগুণে পেয়েছি তোমায়,
কোন্ মাটিতে কথা বলো কয়—
সে মাটি আছে কোন্ জায়গায়॥

মগরবের নামাজ বাদে,
আসর কোন্ দিন হয়—
আর একদিন শুনি সূর্য্য উদয়,
আর নাইকো দেখি সেথায়।
এমন কাণ্ড ঘটেছে কোথায়,
আমি শুনবো বলে করেছি আশায়,
বয়াতি দাও না পরিচয়॥

বৃক্ষডাল সর্প রূপ ধরে, বলো কোন্ সময়—
এর কোন্ বৃক্ষেতে এরূপ হলো,
সে বৃক্ষ আছে কোথায়,
শুনব বলে করেছি আশায়।
আমি তাহের গাইন অতি দুরাশয়,
বয়াতি বলো সব বিষয়॥

(২)

তরাও নিজগুণে নিজেরও অধীনে
বরকত-জননী মা আমার—
পড়ে ভবঘোরে, ডাকি বারে বারে,
মা তোমায়—
ওগো রসুলের মেয়ে,
ইমাম হোছেনের মা হয়ে, হলে জগৎ-মা।

তোমার ইমাম হোছেন কাঁদে,
জামা দিলে পিঁন্দে, পুত্র ব'লে তায়,
ওমা খুসী হয়ে মনে, যেয়ে সেই ময়দানে,
ইদের নামাজ করিলেন আদায় ॥

তরাও নিরবধি, ওগো সৈয়েদজাদী,
দয়া করো যদি আপনি—
হাসরেরও মাঠে, বিষম সঙ্কটে,
পড়িব মোরা যেদিনে। অন্তেরি তলাসে,
পৌছাবেন নবী এসে, কিতাবে শুনি।
সেদিন নবীর তলাসে,
পাগলিনীর বেশে আসিবেন আপনি।
সেদিন আমাদেরি ভয়, না জানি কি হয়,—
মাগো মা এই ভাগ্যে না জানি ॥

মা ব'লে কোলেতে যাবো, মনেতে আশা—
ওমা সেইদিন যেন হয় না মা,
সেই কুলছুমির দশা।
তোমার পুষ্যিবেটা শুনি,
দোমের মাদার মণি,
দোজকে যেদিন পড়িলো—
আজরাইল ধরে ছোড়া,
মারে অগ্নির কোড়া,
ধমকে আগুন উড়িলো।
ধমকেরি চোটেতে, মা মা মা ব'লে
ডাকে রক্ষা পাইলো।
যেদিন ঘোর বিপদ, ভারি বিপদভয় হলো,—
তাই, তাহের আলি বলে, থেকে চরণতলে,
মাগো মা দাও চরণধুলো ॥

(৩)

নিশি প্রভাত কালে,
কোকিল বলে, ওরে সখিনা—
এ বেশে আর ঘুমিয়ে থেকো না।
মাঝ-দরিয়ায় ডুবলো তোমার, লাল ডিঙ্গাখানা।
তুমি জাগিয়ে দেখ বিছানা 'পর
খসে প'লো নাকের সোনা,
বুঝি গলার হার খসিয়ে প'লো—
বিধির কারখানা।
তখন শিরে করাঘাত মেরে বলে,
বিধিরে, তোর কি এই বিবেচনা ॥

বলে, আর ডাকিসনে কালো কোকিল,
প্রভাতেরও কালে—
শুয়ে ছিলাম, ছিলাম নিরালে,
ও তুই ডাক দিয়ে কেন,
শোকের অনল দিলিয়ে জেলে।
একগুণ আগুন ত্রিগুণ জলে,
নির্বাণ হয় না জলে গেলে।
প্রাণপতি মোর ছেড়ে গেছে,
বসন্তেরও কালে ;—
আমি কোন্ দেশে যাই, কোথা বা পাই
কোকিলরে, ও তুই, দে আমায় বলে ॥১৩

করি এই নিবেদন, হে নিরঞ্জন,
তোমার দরবারে,—
তুমি ভালবেসে দোস্ত কও কারে।
কি মহালীলা প্রকাশিলে
সেই বংশের 'পরে।
তুমি, কারও হাসাও কারও কাঁদাও,
কাহারে ভাসাও সায়রে।
আমার বিয়ের রাত্তি ম'লো পতি,
কোন্ বা বিচারে—
মোসলেম কয়, তার অসীম লীলা,
সসীমে, কে তা বুঝতে পারে ॥

(৪)

এ ধন যৌবন, কভু নয় আপন,
নিশিকা স্বপন যেছা দেখতে পাই।
কাহে ধন কাহে জন, কাহে পুত্র পরিজন,
কাহেকে বলরে আপন আপন ভাই ॥১৪

১৩ এই অংশটুকু বারাসি (বারমাসি) গান হিসাবেও গাওয়া হয়।

১৪ গানটির এই অংশে, কবি হেন্‌রী ওয়ার্ডসওয়ার্থ লং-ফেলো (১৮০৭-৮২)-র 'A Islam of Life' কবিতাটির প্রথম দু'লাইন বিশেষ ভাবে মনে পড়ে :

Tell me not in mournful number,
Life is but an empty dream !

বেল্‌কা লেংটি তাজ, ভোর কপ্‌নি সাজ,
মউত্‌ কালে সব নিদয়দে খুলে লেগা।
দুই হস্ত পদকা ধরি, বন্ধন লাগাবে ডুরি,
থাক্‌সে ভেরে দাখিলে ক'রে দেগা।

হায় গো, ভাবো সে বারিতালা, ১৫
ঘুচিবে সকল জ্বালা—
আখেরে পাবে ভালা কাম।
মা থাকুন জিয়াত ইয়াদ করো,
মুখেতে বলো নবীজীকো নাম॥

১৫। খোদাতালা।

লালচাঁদ ভণে, নবীজীকো একমনে,
আরজ করি বারে বারে।
করিম রহীম হাদী, ভাবো সে গুণনিধি,
আখেরে কে করিবে পার॥

আমার নবী যেমন, আর কি অমন,
ভবের মাঝে হবে—
এই নবীর নামে, কতো বান্দা, পার হয়ে যাবে॥১৬

১৬। গানটিতে বাংলার সঙ্গে গ্রাম্য হিন্দীর মিশ্রণ লক্ষণীয়। এই প্রসঙ্গে রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের 'চণ্ডীনাটকের' বাংলা-হিন্দী মিশ্রিত ভাষার কথা মনে পড়া স্বাভাবিক।

ভারতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ

শ্রীআণমা রায়

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে লোকসংখ্যা-সমস্যা বিভিন্ন মূর্ত্তিতে দেখা দেয়। অতীতে জার্ম্মানী, ফ্রান্স, ইটালী, বেলজিয়াম ও জাপানকে স্ব স্ব লোকসংখ্যা বাড়াবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে হয়েছে এবং এখনও কিছু কিছু চেষ্টা করা হচ্ছে। এই-জন্য এই সব দেশকে বিবাহে উৎসাহদান, গর্ভস্রাব বন্ধ করা, গর্ভ-নিরোধ করার ঔষধাদির ব্যবহার কমিয়ে দেওয়া এবং বৃহৎ পরিবার গঠনে অধিবাসীদের প্রণোদিত করবার জন্য যাদের অধিক সন্তান তাদের অর্থসাহায্য ও অন্যান্য নানাবিধ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতে হয়। এর কারণ যে, এই সব দেশে, বিশেষ করে প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, লোকসংখ্যা অত্যন্ত কমে যায় এবং জন্মের হার সেই থেকে নীচের দিকে নামতে থাকে। এমনকি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও স্বাস্থ্যবান, সবল ও উপযুক্ত গুণসম্পন্ন লোকসংখ্যা বজায় রাখবার চেষ্টা চলছে এবং ইংলণ্ডে যাতে লোকসংখ্যা কিছু বাড়ে সে চেষ্টা করা হয়। সম্প্রতি লোকসংখ্যা বিষয়ে ব্রিটেনে গঠিত একটি রাজকীয় কমিশন মন্তব্য করেছেন যে, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে প্রতি দম্পতির সাম্প্রতিক ২'২ জন সন্তানের স্থানে ২'৪ জন সন্তান যাতে জন্মায় তার ব্যবস্থা করা দরকার। এই সব দেশ উন্নত এবং এখানে বহু আগে শিল্পবিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে ও জনশিক্ষা বিস্তারও ভালভাবে হয়েছে। সুতরাং দেশবাসীকে গ্রাসাচ্ছাদন যোগাবার ও কর্ম্মে নিযুক্ত করবার শক্তি এই সব দেশের আছে।

কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ অংশটি জুড়ে যে সব অনুন্নত ও কৃষি-প্রধান দেশ আছে সেখানে লোকসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। অথচ বিজ্ঞানচর্চ্চা না থাকাতে ও যন্ত্রশিল্পের অভাবে এই সব দেশে অন্নসমস্যা ও বেকারসমস্যা ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই সব দেশকে বাঁচতে হলে জন্মনিয়ন্ত্রণ দ্বারা লোকসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি বন্ধ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, কয়েকটি দেশে লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতির উদ্দেশ্যে জনসংখ্যা সমান রাখা, কতকগুলি দেশে জনসংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা করা এবং অধিকাংশ দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত জনসংখ্যা কমান।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতির আর একটি দিক আছে—তা শুধু সংখ্যার মধ্যে আবদ্ধ নয়। দুরারোগ্য শারীরিক বা মানসিক রোগাক্রান্ত নরনারী যাতে নির্ব্বোধ, অপটু ও অকর্ম্মণ্য কতকগুলি সন্তানের জন্ম না দেয়, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ-নীতির সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।

চীন দেশে মাও-সে-তুং সভাপতি হবার পর মন্তব্য করেন, চীন দেশে লোকসংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজন। চীনের অত্যধিক লোক-সংখ্যা সর্ব্বজনবিদিত। তা সত্ত্বেও মাও-সে-তুঙের এরূপ মনোভাবের পিছনে যে অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধভীতি রয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই যুদ্ধভীতিই বহু উন্নত দেশে লোকসংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টার একটি প্রধান কারণ।

সর জুলিয়াম হাক্সলী প্রভৃতি বহু বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা জোর গলায় বলেছেন যে, পৃথিবীতে জন্মনিয়ন্ত্রণ দ্বারা লোকসংখ্যা বৃদ্ধি বন্ধ না করলে মানুষের দুর্গতির সীমা থাকবে

না। সর উইলিয়ম হাক্সলী জন্মনিয়ন্ত্রণ করবার প্রয়োজনীয়তার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নয়টি কারণ দিতেছেন :—

(১) এই বিজ্ঞানের যুগে নানাবিধ ঔষধ ও রোগের জীবাণু আবিষ্কৃত হওয়ায় মৃত্যুর হার সর্বত্র বেশ ভালভাবে কমে যাচ্ছে এবং মানুষের আয়ু বেড়ে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে জন্মের হারও সঙ্গে সঙ্গে না কমলে বিস্ফোরণের ন্যায় জনসংখ্যা হঠাৎ এমন বেড়ে যাবে যে, পৃথিবীতে এত লোকের খাদ্য ও কর্ম্ম জোগান সম্ভব হবে না।

(২) পৃথিবীর বনসম্পদ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যময় স্থানগুলি বাড়তি মানুষের অত্যাচারে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—ফলে পৃথিবী মরুময় হয়ে যেতে পারে।

(৩) উন্নত ও পরাক্রান্ত দেশের বাড়তি মানুষগুলিকে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অনুন্নত দেশগুলিতে পাঠিয়ে সেখানকার লোকদের শোষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

(৪) অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য মানুষকে দেশান্তরে বাস করতে হচ্ছে—ফলে, সেখানে সামাজিক অসামঞ্জস্য ও নানাবিধ অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। তার জন্য তৃতীয় মহাযুদ্ধ হতে পারে।

(৫) এত বেশী লোককে চাকরী দেবার মত কাজ পৃথিবীতে থাকবে না।

(৬) যন্ত্রশিল্পে অগ্রণী দেশগুলিতে এত জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য পথেঘাটে সর্বত্র দুর্ঘটনার সংখ্যা বেড়ে উঠছে এবং বাসস্থানের দারুণ অভাব ঘটছে।

(৭) বঙ্গদেশে জনসংখ্যা এরূপ ভাবে বেড়ে উঠেছে যে, সে সব জায়গায় জলকষ্টের অন্ত নেই।

(৮) বাড়তি মানুষকে কাজের জন্য গ্রাম ছেড়ে শহরে আসতে হচ্ছে। এত লোকের ভীড়ে শহরগুলি যেমন বাসের অযোগ্য হয়ে পড়ছে তেমনি গ্রামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি শিথিল হয়ে যাওয়াতে কৃষিপ্রধান দেশগুলিতে রাজনৈতিক অশান্তির আগুন জ্বলে উঠছে।

(৯) পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ লোক আজ নিরক্ষর, জনসংখ্যা আরও বাড়লে এরা কোন দিন ই শিক্ষার আলোক পাবে না এবং জীবন্মৃতের মত কাল কাটাবে।

একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলে বুঝা যায় যে, উপরোক্ত কারণগুলির অধিকাংশই ভারতের পক্ষে প্রযোজ্য।

প্রায় দু'শতাব্দীব্যাপী ইংরেজের ন্যায় একটি প্রথম শ্রেণীর রাজশক্তির অধীনে থেকেও ভারত একটি অনুন্নত কৃষিপ্রধান দেশ হয়ে পড়েছিল। ভারতে শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, এমন কি কৃষি সম্বন্ধেও কোন আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নি। অথচ বৎসরের পর বৎসর ভারতের লোকসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। ফলে, ভারতবাসীর জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নীচে নেমে গিয়েছে। দশ বছর আগে, স্বাধীনতা লাভের পর, ভারতের নেতারা দেশবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করবার চেষ্টা আরম্ভ করেন এবং সেইজন্য একটি প্ল্যানিং কমিশন গঠন করে ১৯৫১-৫২ সনে প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার কাজ সুরু হয়। তখনকার লোকসংখ্যা ও পরবর্তী পাঁচ বছরে লোকসংখ্যা কত বাড়তে পারে সে সম্বন্ধে একটি আনুমানিক প্রাকফলন তৈরি করে মোট লোকসংখ্যার জন্য পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করা হয়। কিন্তু পাঁচ বছরে দেখা গেল যে, ভারতের লোকসংখ্যা ইতিমধ্যে পরিকল্পিত লোকসংখ্যার চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। কাজেই পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য, ভারতবাসীর ভাত-কাপড় ও চাকরীর ব্যবস্থা করা প্রায় বিফল হয়ে যায় এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা এসে পড়ে। অবশ্য এর অনেক আগে থেকেই দেশের নেতারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, জন-কল্যাণের জন্য দেশের জনসংখ্যা সীমাবদ্ধ করা দরকার। ১৯৩১ সনে ভারতের সেন্সাস কমিশনার মন্তব্য করেন যে, ভারতে এই অপরিমিত লোকসংখ্যা বৃদ্ধি শঙ্কার কারণ, সন্তোষের কারণ নয়। মহাত্মা গান্ধী, প্রধানমন্ত্রী নেহরু, ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র সকলেই অনুভব করেন যে, জন্মনিয়ন্ত্রণ দ্বারা ভারতের এই অপরিমিত লোকবৃদ্ধি বন্ধ করা দরকার। ১৯৩৬ সনে হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতির অভিভাষণ দেবার সময় নেতাজী বলেন যে, শহর অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন বেশী। এ কথা খুবই সত্য—কেননা ভারতের অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করে ও তাদের উৎপন্ন ফসল সারা বছর একবেলা খাবার মতও পর্যাপ্ত হয় না। মহাত্মা গান্ধীর মতে ভারতে জন্মনিয়ন্ত্রণ করার অত্যন্ত প্রয়োজন, তবে তা করতে হবে ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা, কোন রকম কৃত্রিম উপায়ে নয়।

ভারতে লোকসংখ্যা বছরে শতকরা প্রায় দু'জন করে বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু শুধু বেশি সংখ্যায় শিশুর জন্ম এর জন্য দায়ী নয়। গত দশ বছরে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে এত অবহিত হয়েছেন যে, মৃত্যুর সংখ্যা হাজারে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কমে গিয়েছে এবং ভারতবাসীর আয়ুর পরিমাণ গড়ে প্রায় বার বছর বেড়ে গিয়েছে। জন্মের হার কিন্তু বিশেষ কমে নি এবং কোথাও কোথাও বেড়ে চলছে। এই পরিস্থিতিতে বিশেষজ্ঞেরা ভারতের জনসংখ্যা সম্বন্ধে গবেষণা করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, সাম্প্রতিক হারে যদি ভারতের লোকসংখ্যা বাড়তে থাকে, তা হলে আগামী পঁয়তাল্লিশ বছরে ভারতের লোকসংখ্যা মহাপদ্মের (billion) তিন-চতুর্থাংশে দাঁড়াবে (৭৫০,০০০,০০০,০০০)। এই বিপুল জনসংখ্যা ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সর্বনাশ এনে ফেলবে ও ভারত আরও অনুন্নত দেশ হয়ে পড়বে—অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে কখনও উন্নত দেশগুলির সমকক্ষ হতে পারবে না। এই জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বার বার বলেছেন যে, ভারতের জনসংখ্যা যদি সাম্প্রতিক জনসংখ্যার অর্দ্ধেক হ'ত, তা হলে অতি শীঘ্র ভারত একটি উন্নত দেশ হয়ে যেত। এই জন্য দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় ভারত সরকার ও প্ল্যানিং কমিশন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপর ঝোঁক দিয়েছেন এবং তৃতীয় ও

চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায়ে এখনকার চেয়ে বেশী ঝোঁক দেবেন বলে সঙ্কল্প করেছেন।

ভারতে নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্যও জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন :

(১) দুই-এক বছরের ব্যবধানে সন্তান জন্মালে মাতার শরীর একেবারে ভেঙে পড়ে। অথচ এখানে দেড় বছর থেকে দু'বছর অন্তর সচরাচর নারীকে গর্ভধারণ করতে হয়। ডাঃ ম্যারী ষ্টোপস-এর মতে দুটি সন্তানের মধ্যে অন্ততঃ দুই থেকে তিন বছরের ব্যবধান থাকা উচিত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পাঁচ বছরের ব্যবধান থাকলে ভাল হয়।

(২) দুর্ব্বল পিতামাতার পুনঃপুনঃ সন্তান হওয়ার জন্য বহু রুগ্ন সন্তান জন্মকালে আঘাত পায় এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গর্ভাবস্থায় ও ভূমিষ্ঠ হবার পর বহু শিশু মারা যায় এবং শৈশবে ও যৌবনে বহু সন্তান মারা পড়ে। বহু নারী এই কারণে চিরকালের জন্য রুগ্ন হয়ে পড়েন এবং জনশক্তির অত্যন্ত অপচয় ঘটে।

(৩) ভারতে লক্ষ লক্ষ রুগ্ন, বিকলাঙ্গ এবং স্বভাবদুর্বৃত্ত নরনারী সন্তান প্রজনন করছে এবং সমাজের উপর অনর্থক বোঝা চাপাচ্ছে। আইন দ্বারা তাদের প্রজনন বন্ধ করা দরকার ও এই সব ক্ষেত্রে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন।

(৪) জাতীয় প্রয়োজনীয়তার কথা বাদ দিলেও দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, কৃষক ও সাধারণ লোকদের নিজেদের কল্যাণের জন্য পরিবার নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। তারাই দেশের লোকসংখ্যা সবচেয়ে বাড়ায়। দরিদ্রের সংসারে ক্ষুধা বেশি—এমন কি সৃষ্টির ক্ষুধাও।

স্বামী-স্ত্রীর ইচ্ছামত সন্তান প্রজননকে পরিবার নিয়ন্ত্রণ বা জন্মনিয়ন্ত্রণ বলে। এ কি করে সম্ভব হতে পারে সে বিষয়ে কিছু বলা দরকার। মহাত্মার কথামত ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা জন্মনিয়ন্ত্রণ যে সম্ভব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। তাই দুই বা তিনটি সন্তানের পিতামাতা যদি অতঃপর ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে পারেন তা হলে পরিবার নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়ে পড়ে। কিন্তু অধিকাংশ লোকের পক্ষেই ইহা সম্ভব নয়। স্ত্রী ঋতুমতী হবার পরবর্ত্তী তৃতীয় হপ্তাকে নিরাপদ সময় বলে—কেন না এই সময়ে স্বামী-স্ত্রীর মিলনে গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা খুবই কম। এই প্রকার মিলনকে বিদ্‌মিক্ বলে এবং এর দ্বারাও পরিবার নিয়ন্ত্রণ কতকটা সম্ভব। কিন্তু এটিও ব্রহ্মচর্য্য সাপেক্ষ এবং সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। সম্ভব হলে ভারতের লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য এটি আদর্শ পন্থা হ'ত। বহু রকম রাসায়নিক দ্রব্য ও যান্ত্রিক কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে, যার ব্যবহারে গর্ভ-নিরোধ হতে পারে। কিন্তু সেগুলি ব্যয়সাপেক্ষ এবং দরিদ্র ভারতবাসীর ক্ষমতার বাইরে। তা ছাড়া ভারতে বাসগৃহের অভাবে এক ঘরে বহু দরিদ্র দম্পতিকে রাত্রিবাস করতে হয়, সেখানে এইরূপ ভাবে গর্ভ-নিরোধ ব্যবস্থা করা অসম্ভব। পুরুষ ও নারীর যৌন মিলনের প্রবৃত্তি ও শক্তি অক্ষুণ্ণ রেখে তাদের দেহে সামান্য একটু অস্ত্রোপচার করে সাময়িক ভাবে বন্ধ্যাত্ব আনা যায়। স্বেচ্ছায় যে সব পুরুষ ও নারী এই রকম অস্ত্রোপচারে রাজী হবেন সরকারকে যথাসম্ভব বিনামূল্যে তাদের উপর অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিম বাংলার আইন সভায় বলেছেন যে, অতি নগণ্য মূল্যে যদি গর্ভ-নিরোধের কোন খাবার ঔষধ দেওয়া সম্ভব হয় তা হলে তার দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এই সব ঔষধ নগণ্য মূল্যে দিলেও চলবে না—বিনামূল্যে দরিদ্র গ্রামবাসীর মধ্যে বিতরণ করতে হবে।

ভারত গণতান্ত্রিক দেশ। এখানে শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি-গ্রস্ত ও স্বভাব-দুর্বৃত্ত নরনারী ছাড়া অন্যান্য ভারতবাসীর উপর জুলুম করে পরিবার নিয়ন্ত্রণ করা চলবে না। জনসাধারণকে পরিবার নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা ভাল করে বুঝিয়ে তবে এ কাজ করতে হবে। পরিবার নিয়ন্ত্রণে জনসাধারণের যে যথেষ্ট উৎসাহ আছে তা ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত কয়েকটি নমুনা-জরিপ থেকে বেশ বোঝা যায়। ১৯৫১-৫২ সনে ভারত সরকারের অনুরোধে আমেরিকার ডাঃ ষ্টোন দিল্লীর নিকটে লোদিকলোনী নামক একটি মধ্যবিত্ত পৌরকেন্দ্রে ও মহীশূরে রামনা গ্রামে পরিবার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে দুটি নমুনা-জরিপ করেন। লোদিকলোনীতে শতকরা ৭৫ জন ও রামনা গ্রামে শতকরা ৭৮ জন অধিবাসী পরিবার নিয়ন্ত্রণে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। তাঁরা জানান যে, দারিদ্র্যমোচন ও স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য পরিবার নিয়ন্ত্রণ করতে তাঁরা প্রস্তুত।

ডাঃ চন্দ্রশেখরণের নেতৃত্বে ভারত সরকারের আর একটি জরিপে দেখা যায় যে, বাঙ্গালোর শহরে ৩০০ দম্পতির মধ্যে শতকরা ৭২টি এবং গ্রামাঞ্চলে ৩০০ দম্পতির মধ্যে শতকরা ৫৪টি দম্পতি সাগ্রহে পরিবার নিয়ন্ত্রণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, তাঁরা চার থেকে ছ'টির বেশি সন্তান চান না। নিখিল ভারত হাইজিন ও পাবলিক হেলথ ইনষ্টিটিউট কলিকাতার বেনেটোলায় মধ্যবিত্ত লোকদের মধ্যে ও বালিগঞ্জের উচ্চ মধ্যবিত্ত লোকদের মধ্যে জরিপ করে দেখেন যে, এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৬৫ জন তিনটির বেশি এবং ৮৪ জন পাঁচটির বেশি সন্তান চান না।

যুক্তপ্রদেশের লক্ষ্ণৌ জেলার গ্রামাঞ্চলে জরিপ করে দেখা গিয়াছে যে, সন্তানবতী নারীদের মধ্যে শতকরা ৭০ জন চারটির বেশি সন্তান চান না এবং সাড়ে তিন বছর অন্তর গর্ভধারণের পক্ষপাতী, পিতাদের মধ্যে শতকরা ৫৭ জন আরও কমসংখ্যক সন্তান কামনা করেন। মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৩৮ জন এবং পিতাদের মধ্যে শতকরা ৪৭ জন গর্ভ-নিরোধ কৌশল শেখবার জন্য উৎসুক। গোখেল ইনষ্টিটিউট জরিপ করে দেখেছেন যে, শহরে ও গ্রামাঞ্চলে পুরুষদের মধ্যে শতকরা ৬৫ জন, নারীদের মধ্যে শতকরা ৫৩ জন পরিবার নিয়ন্ত্রণ নীতি সাগ্রহে শিখতে চান।

এই সব জরিপ দ্বারা বেশ বোঝা যায় যে, ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি চেষ্টা করলে জনসাধারণের দ্বারা সহজেই পরিবার নিয়ন্ত্রণ করিয়ে ভারতের জনসংখ্যা সীমাবদ্ধ করতে পারেন।

দম্পতিদের উপর প্রয়োজনমত জন্মনিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিয়ে সরকারকে শুধু জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে জ্ঞানের বিস্তার ও গর্ভ-নিরোধের ঔষধাদি সহজলভ্য করতে হবে এবং সেগুলিকে জনসাধারণ যাতে বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকারের মধ্যে ভারত সরকারই সর্ব্বপ্রথম পরিবার নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব সরকারী দপ্তর মারফত জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করেছেন। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার মেয়াদ কালে পরিবার নিয়ন্ত্রণ কাজ বাবদ ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করবার পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং ১৪৭টি ক্লিনিক খোলা হয়েছিল। (শহরাঞ্চলে ২১টি এবং গ্রামাঞ্চলে ১২৬টি)। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার মেয়াদকালে পরিবার নিয়ন্ত্রণ বাবদ ৪৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করার সঙ্কল্প করা হয়েছে। পরিবার নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে জনসাধারণকে পরামর্শ দেবার জন্ম ও সেই সম্পর্কে অন্য কাজ করবার জন্য ভারতে ২ হাজার ৫ শত ক্লিনিক (শহরাঞ্চলে ৫০০ ও গ্রামাঞ্চলে ২,০০০) খোলা হচ্ছে—শহরাঞ্চলের প্রত্যেকটি ক্লিনিক ৫০ হাজার লোকের এবং গ্রামাঞ্চলের প্রত্যেকটি ক্লিনিক ৬৬ হাজার লোকের সেবা করবে।

পরিবার নিয়ন্ত্রণ ভবিষ্যতে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নীত করবার একটি ধাপ বটে, কিন্তু তার সঙ্গে শিক্ষা বিস্তার, রোগনিরোধ, খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধি, চিকিৎসা-ব্যবস্থা, বেকার-সমস্যা সমাধান, শ্রমিক-কল্যাণ, জনসাধারণের জন্য অসংখ্য গৃহনির্ম্মাণ, বিজ্ঞানচর্চ্চা, শিল্পোন্নতি প্রভৃতি জনকল্যাণকর কাজ না করলে ভারতবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নীত হবে না। এই সব সমাজ-কল্যাণ কাজ দ্বারা ভারতবাসীর মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগবে ও ভারত-নারীদের মধ্যে একটি অভিনব মর্য্যাদাবোধ অঙ্কুরিত হবে—যার ফলে ভারত সত্যসত্যই পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির মধ্যে নিজের আসন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

অতি পুরাকালেও পৃথিবীতে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা করা হ'ত। প্রাচীনকালে গ্রীক, রোমান, ইহুদি, ফিনিসিয়ান, চীনা, আরব ও হিন্দুরা গর্ভ-নিরোধের জন্য নানা রকম ঔষধ ব্যবহার করত। প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর ধরে মানুষ লোকসংখ্যা-সমস্যা সমাধান করবার চেষ্টা করে আসছে। অবশ্য বেশি বয়সে বিবাহ, চিরকুমার ব্রত, মন্ত্রতন্ত্র, কবচ-মাদুলী দ্বারা গর্ভনিরোধ ও লোকসংখ্যা সীমাবদ্ধ করবার চেষ্টা করা হ'ত। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" ও "পঞ্চাশোর্দ্ধম্ বনং ব্রজেৎ" এই দুটি অনুশাসন থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে প্রাচীন ভারতের সমাজে লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হ'ত।

ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ সুকল্পিত সমাজ-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করছে—পরিবার নিয়ন্ত্রণ যার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আজ যদি আমরা এ কথা বুঝতে না চাই বা উপেক্ষা করি তা হলে আমাদের চিরকাল দারিদ্র্যের মধ্যে ডুবে থাকতে হবে।

পুস্তক-পরিচয়

বরণীয়—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। এ. মুখার্জ্জী এণ্ড কোং, প্রাইভেট লিমিটেড, ২নং বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৫৲ টাকা।

"আমার জীবনতন্ত্র গঠনে বিবিধ বিষয়াভিজ্ঞ খ্যাত-অখ্যাত নানা লোকের নিকট হইতেই প্রেরণা লাভ করিয়াছি" লেখকের এই সত্যবোধ তাঁর গ্রন্থখানিকে 'বরণীয়' করেছে।

যোগেশবাবু 'নিশিকান্তের মা' বা তাঁর 'গুরুমহাশয়' সেজন্য তাঁর রেখা-চিত্রে জীবন্ত হয়ে আছেন। তাঁর 'স্মৃতির মণিকোঠায়' জলধর সেন ও তাঁর 'পিতৃদেব' পড়ে সবাই মুগ্ধ হবেন। তা ছাড়া বাঙালী তথা ভারতীয়ের কাছে চিরস্মরণীয় প্রায় কুড়িজন মহাপুরুষ জীবনীর রেখাপাতও তিনি করেছেন, তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও গভীর অনুভূতির আলোছায়ায়। তাঁদের মধ্যে শতাব্দী পার করে উজ্জ্বল হয়ে আছেন : হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, জগদীশচন্দ্র বসু, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি। আবার রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের শত-বার্ষিকীও আগতপ্রায়। আবার এই ষষ্ঠ দশকের মাঝামাঝিই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকীও আসবে। এই সময়ে দেশের ছেলেমেয়েদের জীবনী পাঠে উন্মুখ করবে 'বরণীয়' গ্রন্থখানি, এবং তারা বিশেষভাবেই উপকৃত হবে। একদিকে স্বনামধন্য অশ্বিনীকুমার দত্ত ও যদুনাথ সরকার যেমন আছেন তাঁদের পাশে আছেন নেতাজী সুভাষ এবং মেঘনাদ সাহা। ছাত্রদের সঙ্গে ছাত্রীরাও প্রেরণা পাবে যখন তারা দেখবে লেডী অবলা বসু (বিদ্যাসাগর বাণীভবন প্রতিষ্ঠাত্রী) ও জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলীর জীবনালেখ্য। আবার যোগেশবাবুর যুগব্যাপী জীবনী-সাধনার ফলও 'বরণীয়'কে বহুদিন স্মরণীয় করে রাখবে।

যোগেশবাবুকে এই সমালোচনা প্রসঙ্গে অনুরোধ করি যে, এক্ষেত্রে তাঁর গভীর ও বিস্তৃত গবেষণা ও স্বদেশ-প্রেরণা দিয়ে তিনি বাঙালীদের চরম উপহার দিন গত ২০০ বৎসরের "জীবনী-কোষ"। (Dictionary of National Biography-র সংক্ষিপ্ত

সংস্করণ) বাঙালীর নব-জাগরণে সে গ্রন্থ প্রভূত সাহায্য করবে, এবং এক্ষেত্রে যোগেশবাবুর অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এ রকম গ্রন্থের উপযুক্ত প্রকাশকও আছে সেটা আশা করি ; যিনি যোগেশবাবুর লিখিত জীবনী-কোষ বিবর্দ্ধমান গ্রন্থাগারগুলিতে ও ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবেন। "বিশ্বকোষ" ও সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা থেকে সুরু করে, 'প্রবাসী' 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতির মধ্যে কত মূল্যবান জীবনীর উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে সেটি "বরণীয়" পাঠে অনুভব করছি—তাই সেকথা স্মরণ করালাম।

শ্রীকালিদাস নাগ

কাশ্মীর পরিক্রমা—শ্রীনলিনীকিশোর গুহ। এ. মুখার্জ্জী এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২নং বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২.০০।

ভ্রমণকাহিনী নামে পাঠক-সমাজে সাধারণতঃ যাহা পরিবেশিত হয় তাহা হয় নীরস দিনপঞ্জী, নয় প্রচুর অবান্তর কথা ও কিছু মিথ্যার সরস ভেজাল মিশ্রিত মেরচনা নামক সাহিত্যিক খিচুরী। কিন্তু সুপরিচিত দেশসেবক ও সাংবাদিক লেখকের এই গ্রন্থখানি নিয়মের ব্যতিক্রম। লেখক সাংবাদিক হিসাবে ভারত-সরকারের আমন্ত্রণে কাশ্মীর গিয়াছিলেন এবং সরকার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যক্রম অনুসারেই সারা কাশ্মীর 'ট্যুর' করিয়াছেন। সেই ভ্রমণের কাহিনী অন্যতম একখানি সরকারী প্রচারপত্র হওয়াও অসম্ভব ছিল না। কিন্তু কুশলী লেখক সে চোরাবালিও সুকৌশলে অতিক্রম করিয়া সত্যনিষ্ঠ অথচ প্রসাদগুণে সমৃদ্ধ সাহিত্য রচনা করিয়াছেন। সরকারী পরিচালনার অধীনেও তিনি যে নিজের চোখ দুইটিকে খোলা এবং বিচার ও বিশ্লেষণ-শক্তিকে সক্রিয় রাখিয়াই সারা কাশ্মীর ভ্রমণ করিয়াছেন তাহার প্রমাণ এই গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠাতেই পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় এই গ্রন্থ রচনা করিবার জন্য তাঁহার শ্রমসাধ্য বিশেষ অধ্যয়নের প্রমাণ।

"ভূস্বর্গ" কাশ্মীরের প্রকৃতি বর্ণনা এ গ্রন্থে একেবারে যে নাই তাহা নহে। কিন্তু কাশ্মীরের প্রকৃতি অপেক্ষা মানুষকেই লেখক অধিকতর অভিনিবেশ সহকারে দেখিয়া পরে ঐতিহাসিকের সত্যনিষ্ঠ ও শিল্পীর সহানুভূতি দিয়া কাশ্মীরের সাধারণ ও অসাধারণ সব রকম মানুষকেই পাঠকের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। কাশ্মীরের অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাস, অন্তর্জ্জাতীয় সমস্যা হিসাবে বর্ত্তমান কাশ্মীরের বিশিষ্ট রূপ এবং ঐ রাজ্যের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি লেখক স্বয়ং বিশেষভাবে আয়ত্ত করিবার পর খুব অল্প কথায় ও রীতিমত মুন্সিয়ানার সঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে কাশ্মীর তথা ভারত-সীমান্ত রক্ষার জন্য ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর "জোয়ানেরা" যে ত্যাগ ও নিষ্ঠার সঙ্গে স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন তাহার সপ্রশংস অথচ বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা এ গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অনেকগুলি মনোরম ছবি গ্রন্থের আকর্ষণ ও মূল্যবৃদ্ধি করিয়াছে। কাশ্মীর সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন।

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

আচার্য্য যোগেশচন্দ্র—শ্রীসুধময় সরকার। কুলটি, বর্দ্ধমান। মূল্য ১.২৫ নয়া পয়সা।

গ্রন্থখানি আকারে ছোট কিন্তু জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। আচার্য্য যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয়ের নাম সুধীমহলে সুপরিচিত। আলোচ্য বইখানি তাঁহার জীবন-কাহিনী নয়, কিন্তু তাঁহাকে জানিবার এবং তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনের অনেক কথাই ইহাতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। গ্রন্থকার তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়া যেভাবে তাঁহাকে দেখিয়াছেন তাহারই কিছু কিছু আভাস এই গ্রন্থে উপস্থাপিত করিয়াছেন। যোগেশচন্দ্রের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথাই সকলে জানেন, কিন্তু সে যে কত গভীর এবং কত দূর প্রসারিত তাহাই গ্রন্থকার আমাদের জানাইয়া দিলেন। সবচেয়ে বড় কথা আচার্য্যের চরিত্র। এরূপ চরিত্র বর্ত্তমান যুগে বিরল। এককথায় বলিতে হইলে ইঁহাকেই 'গীতার পুরুষ' বলে।

গ্রন্থে যেসব অধ্যায়গুলি ভাগ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে তাঁহার গবেষণার দিকটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। গবেষণা কি একদিকে, প্রায় সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। অসাধারণ ধীশক্তি ও কর্ম্মে নিষ্ঠা না থাকিলে এরূপ কার্য্য তাঁহার দ্বারা সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব ছিল না। সকলেই দেখিত, এক আত্মভোলা পুরুষ তাহাদের মধ্যে কাজ করিয়া চলিয়াছেন। অত বড় পণ্ডিত হইয়াও, সব ছাড়িয়া তিনি স্বেচ্ছায় শিক্ষকতার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। "শিক্ষকতা তাঁহার জীবিকা মাত্র ছিল না, শিক্ষকতাই ছিল তাঁহার জীবন।" কারণ তিনি বলিতেন, "শিক্ষকতা সহজ কর্ম্ম নয়, এ কর্ম্ম যার-তার নয়। অনেক গুণ থাকলে তবে শিক্ষক হওয়া যায়। হাজার হাজার ছেলে শিক্ষকের আচরণ অনুকরণ করবে, শিক্ষককে সাবধান হয়ে চলতে হয়।"

সত্যই, ভগবান তাঁহাকে যেন 'শিক্ষক' করিয়াই এ পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু আজ সে আদর্শও নাই, শিক্ষকও নাই।

যোগেশচন্দ্রের সম্পূর্ণ জীবনী আজও লেখা হয় নাই। কিন্তু লিখিবার যোগ্য উপকরণ গ্রন্থকার এই গ্রন্থে রাখিয়া গেলেন। সেদিক দিয়া এই গ্রন্থের মূল্য অসামান্য।

হরিপদ মাষ্টার—শ্রীসুনীল দত্ত। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য দুই টাকা।

সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অনভিনীত নাটকের কোন মূল্য নাই—কারণ ইহার পাঠক নাই। এই জন্য সাহিত্য হিসাবে নাটকের স্থান আজও আমাদের দেশে হইল না। প্রকাশকও ছাপিতে চাহেন না, কারণ বিক্রি হয় না। কিন্তু দেখা যাইতেছে এই নাটক তাহার ব্যতিক্রম। নহিলে এত অল্প সময়ের মধ্যে ইহার আর একটি সংস্করণ হইত না।

হরিপদ মাষ্টার লাঞ্ছিত শিক্ষক-জীবনের মর্ম্মকথা। বাস্তব-ধর্ম্মী নাটক। প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া এরূপ নিখুঁত চরিত্র-সৃষ্টি সম্ভব নয়। জীবনের প্রতিফলনই ত নাটক। এই নাটকে কোথাও বক্তৃতা নাই। সেইজন্যই হরিপদ মাষ্টার এতখানি জীবন্ত হইতে পারিয়াছে। লেখকের জীবন-বোধ এবং শিল্প-সৃষ্টির ক্ষমতা প্রশংসনীয়।

শ্রীগৌতম সেন

দেশ-বিদেশের কথা

দক্ষিণ ভারতে সংস্কৃত প্রচার

দাক্ষিণাত্যের সহিত বাংলাদেশের আত্মিক যোগ শাশ্বতকালের। বিশেষ করে—সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি ভারতের এই দুই অঞ্চল বিশেষভাবে অনুরাগী। সেজন্য বিগত ডিসেম্বর মাসে বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ৩৫তম অধিবেশনে যে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা অতি সুবিবেচনা-প্রসূত। এর জন্য আহূত হন কলিকাতার ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী ও ডঃ রমা চৌধুরী স্থাপিত প্রাচ্যবাণীর সুবিখ্যাত অভিনেতৃবৃন্দ। এঁরা কয়েক মাস পূর্ব্বেই মাদ্রাজ ও পণ্ডিচেরীতে সর্ব্বপ্রথম বাংলার সংস্কৃত অভিনেতৃদলরূপে প্রভূত যশ অর্জ্জন করেছেন। এবারও তাঁরা পূর্ব্বেরই মত ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীসারদামণির পুণ্যজীবনীর পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ অবলম্বনে বিরচিত সঙ্গীতমুখর প্রাঞ্জল সংস্কৃত নাটক "শক্তি-সারদম্" ও "মুক্তি-সারদম্" বাঙ্গালোরে পর পর দু'দিন অভিনয় করে বাঙালী ও অবাঙালী সকলেরই চিত্ত জয় করেছেন। এই দুটি সংস্কৃত নাটক যথাক্রমে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন এবং বাঙ্গালোরস্থ রামকৃষ্ণ মিশনের তত্ত্বাবধানে সুবিশাল দেশ-বিদেশের প্রাজ্ঞমণ্ডলীর সম্মুখে অতি সুন্দরভাবে মঞ্চস্থ হয়। অভিনয়ের পূর্ণ সাফল্য যে চারটি প্রধান বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যথা : নাটকের ভাষা ও ভাব, অভিনয়, সঙ্গীত ও রূপসজ্জা—সে সবকিছুরই পরাকাষ্ঠা এই ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছিল। প্রথমতঃ ডঃ চৌধুরী বিরচিত নাটকগুলির ভাব ও ভাষা অতি সহজ, সরল ও সুন্দর। দ্বিতীয়তঃ প্রাচ্যবাণীর সংস্কৃত অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ বহুদিন যাবৎ প্রাচ্যবাণীর সঙ্গে সংস্কৃত অভিনয় করে ভারত-বিখ্যাত হয়েছেন। তৃতীয়তঃ এবারের নাটকের মধ্যে সঙ্গীতাংশে বিশেষ চমৎকারিত্ব দেখান সুবিখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পী শ্রীমতী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীগৌরীকেদার ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতী রত্না রায় ও তরুণ-শিল্পী শ্রীপূর্ণেন্দু রায়ের কৃতিত্বও এদিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চতুর্থতঃ, রূপসজ্জার পূর্ণ ভার গ্রহণ করেন

ভারতবিখ্যাত রূপসজ্জাকার—শ্রীযুক্ত হরিপদ চন্দ্র। এভাবে সর্ব্বদিক থেকেই প্রাচ্যবাণী মন্দিরের সংস্কৃত নাট্যাভিনয় দাক্ষিণাত্য-বাসিগণের চিত্তজয়ে সমর্থ হয়।

আর এক দিকেও ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী কর্ণাটকবাসিগণের চিত্তজয় করেন। সেটি হচ্ছে নিখিল-ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কর্ণাটক সাহিত্য অধিবেশনে গৌড়ীয় সাহিত্য ও কর্ণাটক-সাহিত্যের যোগসূত্র এবং কর্ণাটের মহীয়সী নারীগণের বিষয়ে অপূর্ব্ব তথ্যপূর্ণ ভাষণের দ্বারা। একই ভাবে "সমাজ ও সংস্কৃতি" শাখার অধিবেশনে প্রধান বক্তারূপে ডঃ রমা চৌধুরী "বাংলার দর্শন এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার প্রভাব" বিষয়ে যে মনোজ্ঞ জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেন, তা সকলেরই মর্ম্ম স্পর্শ করে।

প্রাচ্যবাণী মন্দির তাঁদের এবারের তৃতীয় সংস্কৃত নাট্যাভিনয় করেন পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে। এ স্থানে তাঁরা ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর বহুবার অভিনীত সুপ্রসিদ্ধ নাটক "ভক্তি-বিষ্ণুপ্রিয়ম্" দ্বিসহস্রাধিক দেশ-বিদেশ থেকে সমাগত ভক্ত ও পণ্ডিত-গণের সম্মুখে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেন। পণ্ডিচেরীতে শ্রীশ্রীমা ডক্টর চৌধুরী দম্পতী ও শ্রীমতী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশেষ দর্শন করে আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করেন।

এই সমস্ত নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন অধ্যাপক শ্রীঅলোক চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা শ্রীমতী স্বপ্না দাস, অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীমিহির ভট্টাচার্য্য, শ্রীশক্তিপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী সুনন্দা মিত্র। সংস্কৃত অভিনয়ের ক্ষেত্রে এঁরা সত্যই নবরত্ন।

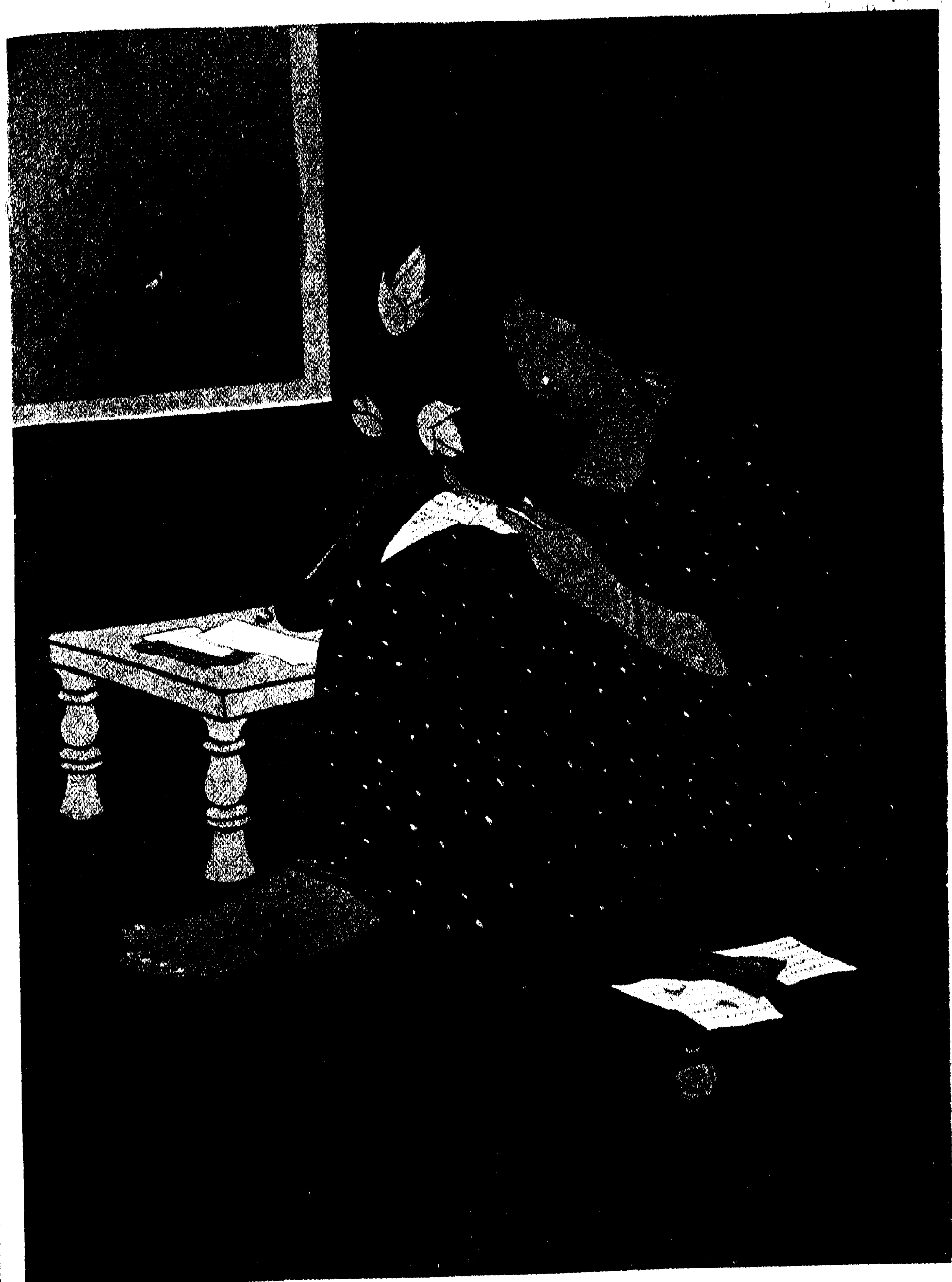
সংস্কৃত শিক্ষা সম্প্রসারণের দিক থেকে বঙ্গদেশ থেকে এই যে অপূর্ব্ব প্রচেষ্টা চলেছে, ভগবদ কৃপায় তা পূর্ণ সার্থকতা লাভ করুক। ১৯৪৩ সনে প্রাচ্যবাণী সংস্থাপিত হয়—সংস্কৃত শিক্ষার সম্প্রসারণের নিমিত্ত। বিগত ১৬ বৎসরে এই গবেষণাগার থেকে ১৬০ খানা গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে—সংস্কৃত সাহিত্যে নারীদের দান, সংস্কৃত সাহিত্যে মুসলমানদের দান, দূতকাব্য-সাহিত্যের ইতিহাস, প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি, বেদ-বেদান্ত-সূফী দর্শন বিষয়ে বহু গ্রন্থ, এ প্রকারের কত গ্রন্থ—কিন্তু প্রত্যেকটিই প্রাচীন পুঁথির উপরে নির্ভর করে লিখিত বিষয়ে এবং পর্য্যালোচনায় অভিনব। তার পর সর্ব্বসাধারণে সংস্কৃতকে প্রিয় করে তোলার জন্য ডক্টর চৌধুরী দম্পতি স্থাপন করেছেন প্রাচ্যবাণীর তত্ত্বাবধানে সংস্কৃত সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় এবং সংস্কৃত ভাষণ পরিষৎ। এই উভয় পরিষদের তত্ত্বাবধানে নিখিল ভারতব্যাপী একটি গণ-সংস্কৃতান্দোলন ব্যাপকভাবে গড়ে তোলবার প্রচুর সহায়তা ঘটেছে। প্রাচ্যবাণীর পরিচালিত তিনটি চতুষ্পাঠী, বিশেষতঃ মহিলা চতুষ্পাঠী, শিক্ষাদানে ও আদর্শসংস্থাপনে বঙ্গদেশে গরিষ্ঠ। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র রয়েছে প্রাচ্যবাণীর শাখা। প্রাচ্যবাণী থেকে দৈনিক ভারতীয় সাধনায় সিদ্ধি বিষয়ে কিছু না কিছু নূতন পরিচিতি প্রকাশিত হচ্ছেই।

নিখিল ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচ্যবাণীর এই উদারতম আদর্শ দেশবাসীর চিত্ত অনিবার্য্যভাবে আকর্ষণ করুন—ভগবৎ-সকাশে এই প্রার্থনা।

নিকুঞ্জকামিনী দেবী

'প্রবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গত রামসদন চট্টোপাধ্যায় (ভূতপূর্ব্ব আলিপুরের এ্যাডিশনাল ম্যাজিষ্ট্রেট) মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী নিকুঞ্জকামিনী দেবী গত ২৩শে ডিসেম্বর ৮৬ বৎসর বয়সে তাঁহার ভবানীপুরস্থ বাড়ীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺সুকুমার চট্টোপাধ্যায়, যিনি কবিগুরুর আহ্বানে শ্রীনিকেতন-সচিব হইয়া-ছিলেন। মধ্যম পুত্র বিজয়কুমার এডভোকেট ছিলেন, কনিষ্ঠ পুত্র বসন্তকুমার ভূতপূর্ব্ব একাউন্টেন্ট জেনারেল। একমাত্র কন্যা শৈলবালা, জামাতা শ্রীলোকনাথ মুখোপাধ্যায় ও বহু পৌত্র পৌত্রাদি তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ের নামে বাঁকুড়ায় গঙ্গানারায়ণ চতুষ্পাঠী ও শ্বশ্রূদেবীর নামে চিকিৎসালয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পৌত্রী শ্রীপুষ্প দেবী উপনিষদের অনুবাদিকা হিসাবে সাহিত্য-জগতে সুপরিচিতা।

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯



প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

পত্রলিখন

শ্রীশিবশঙ্কর কুণ্ডু



পাহাড়ী মেয়ে



লুকোচুরি খেলা

ফটো : শ্রীশান্তনুকুমার মুখোপাধ্যায়

:: ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৯শ ভাগ ২য় খণ্ড | ফাল্গুন, ১৩৬৬ | ৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

অথ চক্র ও চক্রী সমাচার

কেরলে নির্ব্বাচনী যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। বলিতে কি, এই যুদ্ধ শ্রীপদ্মনাভনের সংযুক্ত সংগ্রাম পরিষদের কম্যুনিষ্ট বিমোচন-অভিযানের পরিসমাপ্তি। এখন চলিতেছে সংযুক্তদলের মন্ত্রীসভা গঠন-পর্ব্ব—এবং নির্ব্বাচনের "ময়না তদন্ত"।

কেরলের এই নির্ব্বাচনে অনেকগুলি বিশেষ লক্ষণীয় উপকরণ ছিল। নানাপ্রকার বিপরীত শক্তির প্রতিক্রিয়ায় এই নির্ব্বাচনে সারা কেরল প্রদেশ উদ্বেলিত হইয়া উঠে। ভোট দিবার অধিকারী জনতার শতকরা ৯০ ভাগের অধিক নির্ব্বাচনে যোগদান করে। প্রত্যেকটি দলেরই কর্ম্মীবৃন্দ প্রাণপণ করিয়া লড়িতে থাকে, কিন্তু বিমোচন-সংগ্রাম পরিশেষে প্রেসিডেন্টের শাসন থাকায় মারপিট দাঙ্গার সুযোগ ছিল না।

ফলে কম্যুনিষ্ট দল ১৯৫৭ সনের নির্ব্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের অপেক্ষা প্রায় ১২ লক্ষ বেশী ভোট পাইয়াছে কিন্তু বিধান পরিষদে আসন পাইয়াছে ২৬টি মাত্র, যেখানে ১৯৫৭ সনে পাইয়াছিল ৬০টি। এই অদ্ভুত ব্যাপারে লোকের মনে কেমন একটা ধাধা লাগিয়া গিয়াছে। কম্যুনিষ্ট দল প্রথমে নিজেদের ও নিজের অনুচর-বর্গকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলেন, তাঁহাদের লোকসমর্থন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক হইয়াছে—যাহার অর্থ যে, কেরলের জনসাধারণে তাঁহাদের সমর্থক দল ক্রমেই বাড়িতেছে। পরে অবশ্য তাঁহারা হার মানিয়াছেন। কম্যুনিষ্ট-বিরোধী সংযুক্তদলের পক্ষেও জয়-পরাজয় লইয়া কিছু মতভেদ রহিয়াছে মনে হয়।

আসলে এই নির্ব্বাচনে দেখা গিয়াছে যে, লোকে বুঝিতেছে অন্য রাজনৈতিক দলের মত কংগ্রেসও একটি দল মাত্র এবং উহাও অন্যদের মত সুবিধাবাদী দলগত-স্বার্থসর্ব্বস্ব, আদর্শবিহীন ও ক্ষমতা-লোলুপ। সুতরাং দল হিসাবে বা আদর্শবাদের গুণে তাহার কোনও বিশেষ গুণাগুণ নাই। শুধুমাত্র আছে তুলনাত্মক ভাবে পরিমাণ ও পরিমাপের কথা। এবং সেখানেও কোন স্থিরতা নাই যে, "এই বিড়াল বনে যাইলে বনবিড়াল" হইবে না।

কম্যুনিষ্ট পার্টি কেরলের শাসনতন্ত্র হস্তগত করিয়া নিছক পার্টির স্বার্থে দেশকে পোষণ, শোষণ ও দমনের গর্ত্তে ফেলিয়াছিলেন। অর্থাৎ নিজ দলকে পোষণ, অন্যদলীয় ও নিরীহ দলহীনজনকে শোষণ এবং তাহার প্রতিক্রিয়াকে কঠোর হস্তে দমন এই চালাইয়াছিলেন। বোধ হয় তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, নয়া দিল্লীর "অন্ধের নগরী বেবুঝ রাজার দল" "গণতন্ত্র" "জনমত" ইত্যাদি মেকীর বাট্টা ঠিক করিতেই আরও তিন বৎসর কাটাইবেন। ততদিন কেরলে কম্যু-নিজম একছত্র হইয়া যাইবে।

হইতও ঠিক সেইমতই, যদি না এই সংযুক্ত সংগ্রাম পরিষদ পদ্মনাভনের নেতৃত্বে বিমোচন আন্দোলন চালাইতে থাকেন। যাহার ফলে নয়া দিল্লীর স্বার্থকেন্দ্রীক মন্ত্রী-বৈঠকেরও টনক নড়ে এবং কেরলে প্রেসিডেন্ট হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইলেন।

দলীয় শাসন শেষ হইল, প্রেসিডেন্টের শাসন চলিল, দেশের লোক সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল এবং স্থির ভাবে চিন্তার অবকাশও পাইল। তখন আসিল নির্ব্বাচনের সমস্যা ও তাহার ভাবনা—"রাহুর দল ত বিদেয় হ'ল, কেতুর দলই বা কোন কম?" এই 'দোটানা' চিন্তার ফলই আমরা নির্ব্বাচনে দেখিতে পাই।

যদি বলেন যে এই কথা বাড়াবাড়ি, তবে বলিব যে, শ্রীচিন্তামন দেশমুখের শাসনতন্ত্রে দুর্নীতির পরিমাণ ও কারণ নির্দ্ধারণ সম্পর্কিত প্রস্তাবের পরিণতির কথা ভাবিয়া দেখুন। এ দেশের অধিকারীবর্গ যে দুর্নীতির প্লাবন বহাইয়াছেন তাহার ফলভোগী কে নহে? শতকরা ৯৯ জন ঐ দুর্নীতির ভাবে ক্লিষ্ট এবং বাকিরা—প্রত্যক্ষ ভাবে বা পরোক্ষভাবে—উহারই কল্যাণে পুষ্ট। অথচ আজিকার সংবাদে দেখি যে, প্রকাশনাথ সাক্ষর মত লোকও দেশমুখের এই প্রস্তাবকে কটুবাক্যে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। তবেই না নেহরুর কংগ্রেস!

ঘরের কথাই দেখুন। কোথায় কেরলের যুদ্ধজয়ে জনসাধারণের সম্মুখে উল্লাস, আর কোথায় দলগত স্বার্থে মেয়র বধের চেষ্টা। ধন্য বাংলার কংগ্রেস!

কেরলার ভোটযুদ্ধে ইউনাইটেড ফ্রণ্ট

কেরলার নির্ব্বাচনী দ্বন্দ্বের এবারে অবসান হইল। এই ভোটযুদ্ধে ইউনাইটেড ফ্রণ্ট ৯৪টি আসন দখল করিয়াছেন। সুতরাং কম্যুনিষ্ট পার্টি যে মাইনরিটিতে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কেন এমন হইল ইহাই অনেকের প্রশ্ন। ভোটের সংখ্যা তাঁহাদের গতবারের তুলনায় কম নয়, বরং বেশী। তথাপি তাঁহারা যেরূপ সংখ্যায় ভোট পাইয়াছেন, এবারেও হয়ত বাজিমাৎ করিতে পারিতেন। কিন্তু এবারে কংগ্রেস-পি-এস-পি-লীগ একত্র হইয়া এই সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই সংযুক্ত ফ্রণ্টের কৌশলে ভোটগুলি বিভক্ত হওয়ায় কম্যুনিষ্টরা হারিয়া গিয়াছেন ইহাই অনেকের ধারণা। কিন্তু হারিবার মূলেও বিশুদ্ধ গণতান্ত্রিক আদর্শ ও নীতির বদলে সাম্প্রদায়িক জোটবদ্ধতাই বেশী কার্য্যকরী হইয়াছে—এই ব্যাখ্যাও অনেকে করিতেছেন। অর্থাৎ মুস্লিম লীগ ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায় এবং সেই সঙ্গে নায়ার সম্প্রদায়ও কংগ্রেসের সহিত জোট বাঁধিয়াছেন।

গণতান্ত্রিক আদর্শ ও লৌকিক আচরণ, অর্থাৎ ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের উর্দ্ধে সর্ব্বমানবিক আদর্শের উপরেই কংগ্রেস এতকাল জোর দিয়া আসিয়াছেন। কোন সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের হাইকমাণ্ড অপর কোন পার্টির সঙ্গে আপোষ-রফার প্রশ্নে যান নাই। ভারতীয় গণতন্ত্রকে গড়িয়া তুলিবার পক্ষে এই মনোভাব ও নীতি নিঃসন্দেহে পরিচ্ছন্ন ছিল। কেরলার নির্ব্বাচন-ক্ষেত্রে কংগ্রেস শুধু পি-এস-পির সঙ্গে একত্র হন নাই, তাঁহারা মুস্লিম লীগের সহিতও জোট বাঁধিয়াছেন। ভারতবর্ষের নির্ব্বাচনী ইতিহাসে ইহা শুধু অভিনবই নয়, রাজনীতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে মুস্লিম লীগকে লইয়া ভারতে এত অশান্তি, এত ভাগাভাগি—যে প্রতিষ্ঠান সাম্প্রদায়িক-নাম চিহ্নিত এবং যে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রায় প্রতিদিন বক্তৃতা দেন, সেই প্রতিষ্ঠানকে ডাকিয়া কোল দেওয়া এবং স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আসনে বসাইবার আয়োজন কতখানি দূরদর্শিতার কাজ হইতেছে, তাহা যেন কংগ্রেস হাইকমাণ্ড চিন্তা করিয়া দেখেন। আজ কম্যুনিষ্টদিগকে হারাইতে গিয়া যদি কম্যুনালইজমের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তবে চোর তাড়াইতে ডাকাত ডাকিবার মত অবস্থা একদিন দেখা দিতে পারে, ইহাও ঐ সঙ্গে স্মরণ রাখিতে বলি।

গ-স

বর্ত্তমান কংগ্রেস এবং কংগ্রেস সভাপতি

এইবার কংগ্রেসের নূতন সভাপতি হইলেন শ্রীসঞ্জীব রেড্ডী। নূতন সভাপতিকে লইয়া কংগ্রেসের অধিবেশনও হইয়া গেল। পরাধীন ভারতে একদা কংগ্রেসের প্রয়োজনীয়তা ছিল। তখন সভাপতির ভাষণ সমগ্র দেশে যে ঔৎসুক্য ও উদ্দীপনা জাগাইত, আজ যদি তাহার অভাব দেখা যায় তাহাতে বিস্মিত বা দুঃখিত হইবার কিছুই নাই। সেদিন কংগ্রেস ছিল স্বাতন্ত্র্যকামী ভারতীয়-দের মিলিত শিবির এবং কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রবৃত্ত জাতির মহানায়ক। প্রতি বৎসর তাই কংগ্রেসের নির্দ্দেশ ও কংগ্রেস সভাপতির সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ লোকে আগ্রহ ও শ্রদ্ধার সহিত শুনিত এবং সমগ্র জাতি তাহা হইতে নূতন প্রেরণা ও নবীন উৎসাহ লাভ করিত। সে অবস্থার আজ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। দেশ স্বাধীন হইয়াছে—সুতরাং ইহার প্রয়োজনও ফুরাইয়াছে! এই জন্যই গান্ধীজী চাহিয়াছিলেন, কংগ্রেসকে তুলিয়া দিয়া একটি গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের নূতন আত্মপ্রকাশ। কিন্তু তাহা সম্ভব হয় নাই। বর্ত্তমানে ইহার প্রয়োজনীয়তার কথা সরকারই বলিতে পারেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, ইহা অন্যান্য পার্টির মত একটি পার্টি মাত্র। যে মাপ-কাঠি দিয়া অন্যান্য রাজনৈতিক দলের বিচার হইয়া থাকে আজকাল তাহাই কংগ্রেসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

নূতন সভাপতি শ্রী রেড্ডী প্রকারান্তরে সেকথা স্বীকারও করিয়াছেন। বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে, কংগ্রেস ও সরকার পৃথক বস্তু নয়। সরকার যাহা বলিবেন, কংগ্রেস তাহার প্রতিধ্বনি করিবে। এ নীতি সমর্থনযোগ্য নয়। সভাপতির ভাষণেও সরকারের কথারই পুনরুক্তি দেখা গেল। অর্থাৎ ভারত সরকারের আর্থিক, বৈষয়িক ও বৈদেশিক সমস্ত নীতিরই তাত্ত্বিক সমর্থন তিনি যোগাইয়াছেন। এমনকি যেখানে যুক্তির হালে তিনি পানি পান নাই, সেখানে প্রধানমন্ত্রীর দোহাই দিয়াই কাজ সারিয়াছেন। তাঁহার অভিভাষণ পড়িয়া এই কথাই মনে উদয় হয়, বক্তা সরকারের মুখপাত্র কিনা! পরিকল্পিত অর্থনীতি, সোশ্যালিজম্, সরকারী ভাষা, চীনের আক্রমণ, পঞ্চশীল ও পররাষ্ট্র-নীতি সকল ক্ষেত্রেই তিনি ভারত সরকারের নীতি অনুসরণ করিয়া প্রশস্তি গাহিয়াছেন। এমনকি হিন্দীপ্রসার প্রসঙ্গেও সেই স্তুতি লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার এই সরকার-সমর্থন চরমে উঠিয়াছে, যখন তিনি প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রনীতির সমালোচকদের উপর বিদ্রূপবাণ হানিয়া পঞ্চশীলের গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। চীনের ভারত আক্রমণ আর যাহাই করুক পঞ্চশীলের সার্থকতা নিশ্চয়ই সূচিত করিতেছে না। ভারত সরকারের বৈদেশিক নীতি যদি সফল হইত, তাহা হইলে এই দেশকে কি এতখানি বিব্রত, এতটা বিড়ম্বিত হইতে হইত, যেমন হইয়াছে পিকিং-এর আত্মপ্রসারের চেষ্টার ফলে? ভারত সরকার যদি সজাগ থাকিতেন, যদি পঞ্চশীলের প্রকোপে তাঁহাদের বাস্তববুদ্ধি বিমূঢ় না হইত তাহা হইলে কি চীনা সৈন্য ভারত-সীমান্ত লঙ্ঘন করিয়া ভারতীয় অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিত?

কিন্তু কংগ্রেস সভাপতি সে আলোচনার মধ্যে না গিয়া স্তাবকের ভূমিকা গ্রহণ করিলেন। যে দেশে বিরোধীদলের অস্তিত্ব নাই বলিলেও চলে, সে দেশেও যদি পার্টি সরকারের শুধু অনুগামী নয়, অন্ধ স্তাবকে পরিণত হয় তাহা হইলে সরকারের দোষ-ত্রুটি চোখে আঙুল দিয়া কে দেখাইয়া দিবে?

প্রশ্ন উঠিতে পারে, রাজনৈতিক দল-পরিচালিত সরকার ত পার্টির প্রতিচ্ছায়া মাত্র। সরকার যন্ত্র, দল যন্ত্রী। সরকার ছায়া, দল কায়া। ইহাই হওয়া উচিত। কিন্তু কংগ্রেসের ক্ষেত্রে তাহা হইতেছে কই? এখানে ত দেখা যাইতেছে যন্ত্রই যন্ত্রীকে চালাইতেছে—যন্ত্রী যন্ত্রকে নয়। সরকারের ভ্রান্ত নীতি সংশোধিত হইলে দেশের কল্যাণ হয়। ইহাতে সরকারেরও চৈতন্যোদয় হইত এবং প্রত্যেকটি কর্ম্মপন্থার নব মূল্যায়ন হইত। সমালোচনা ছাড়া সংশোধন হয় না। বর্ত্তমান কংগ্রেসের সেই ভূমিকাই গ্রহণ করা উচিত ছিল।

গ-স

ভারতবর্ষে মার্শাল ভরশিলফ

পৃথিবীর মধ্যে দুইটি সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্র হইল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া। এই দুই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি অতি অল্পকালের ব্যবধানে ভারত পরিদর্শন করিয়া গেলেন। ইহা ভারতের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কেন না আমাদের জাতীয় জীবনের এক কঠিন সঙ্কট সময়ে তাঁহারা এ দেশে আসিলেন। উত্তর-সীমান্তে অতর্কিত চৈনিক আক্রমণের ফলে ভারতের জনচিত্ত আজ ক্ষুব্ধ। বহুদর্শী সোভিয়েট রাষ্ট্রনায়কও আশা করা যায়, ভারতে আসিয়া তাহার গুরুত্ব অনুভব করিয়া গেলেন।

ভারতবর্ষ কোনদিনই বিরোধ চাহে নাই, বরং বন্ধুত্বই কামনা করিয়াছে। এবং সে ন্যায়নীতির ভিত্তিতে আন্তর্জ্জাতিক শান্তির জন্য ক্ষয়ক্ষতিও স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। এমনকি সে রাজনৈতিক মতবাদগত পার্থক্যের প্রশ্নও দূরে রাখিয়া বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতায় অগ্রসর হইয়াছে। গত পাঁচ বৎসরে ভারতবর্ষ এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও পরস্পারিক সহযোগিতা যে ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছে, তাহাও বর্ত্তমান জগতে দৃষ্টান্ত স্বরূপ। উভয় দেশের আন্তরিক কামনায়, আলাপ-আলোচনায় অতিথি-সমাগমে ও বিনিময়ে, পরস্পর পরামর্শ, সহযোগিতা ও সাহায্যের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়া এই দুই দেশের বন্ধুত্ব-সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইতে ঘনিষ্ঠতর হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। মত এবং আদর্শে পার্থক্য থাকিলেও, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে থাকিতে ইহাদের কোথাও বাধে নাই। সেইজন্যই সাংস্কৃতিক ও বৈষয়িক ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারতবর্ষকে বিনাসর্ত্তে সাহায্য করিতে দ্বিধা করে নাই। এই সাহায্যের ফলে ভারত যেমন একদিকে উপকৃত হইয়াছে, তেমনি উভয়ের সহযোগিতায় বন্ধুত্বও প্রগাঢ় হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। মার্শাল ভরশিলফের ভারতবর্ষে আগমন তাহারই স্বীকৃতি।

সোভিয়েট দেশের রাষ্ট্রিক গঠন ও পরিচালন ব্যবস্থার সহিত ভারতের কোথাও মিল নাই সত্য, কিন্তু জাতীয় উন্নতির সঙ্কল্প ও প্রয়াসের ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে সাদৃশ্য অনেকখানি। দারিদ্র্য এবং অনগ্রসরতা দূর করিবার জন্য সোভিয়েট জনসাধারণ দীর্ঘকাল যে দুঃখ সহিয়া সংগ্রাম চালাইয়াছে, তাহার সাফল্য কেবল ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর সকল দেশেই বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও আজ সোভিয়েট দেশ পৃথিবীকে তাক্ লাগাইয়া দিয়াছে। এক কথায় বড় হইবার সকল গুণই তাহাদের মধ্যে বর্ত্তমান। গঠন মনোবৃত্তি তাহাদের রক্তের মধ্যে। নহিলে একটা দেশকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া, এত শীঘ্র তাহারা আবার নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিত না। দারিদ্র্য এবং অনগ্রসরতা দূরীকরণে ভারতবর্ষ সোভিয়েট ইউনিয়ন হইতে স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করিলেও, সোভিয়েটের অগ্রগতি আমাদের উন্নয়ন-প্রচেষ্টাকে নানা-ভাবে প্রেরণা দিয়াছে। আমাদের শিল্পোন্নয়ন কার্য্যেও তাহারা যন্ত্রপাতি দিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। সুতরাং উদ্দেশ্যের দিক দিয়া, নীতির দিক দিয়া এবং আদর্শের দিক দিয়া, উভয় দেশের মধ্যে একটা আত্মিক যোগ আছে। যে নিরস্ত্রীকরণের মাধ্যমে তাঁহারা আজ শান্তির বাণী প্রচার করিতেছেন, তাহা ভারতেরই শাশ্বতবাণী। এই কারণেই উভয়দেশের সৌহার্দ্দ্য কোনদিনই ছিন্ন হইবার নহে।

গ-স

অব্যবস্থার যাঁতাকলে ভারতীয় বিজ্ঞানকর্ম্মীরা

ভারতীয় কৃষি-গবেষণা পরিষদের বিজ্ঞানকর্ম্মী ডঃ জোসেফের আত্মহত্যার কথা সকলেই জানেন। এই আত্মহত্যার কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? মৃত্যু দিয়া তিনি দেখাইয়া গেলেন, কত বড় প্রতিভার অপমান আমরা করিয়াছি। বিজ্ঞানকর্ম্মী হিসাবে ডঃ জোসেফ যে গুণ ও যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার যথোচিত সদ্ব্যবহারের সুযোগ হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করা হইয়াছিল, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষোভের বিষয়। কেবল ডঃ জোসেফ নয়, এদেশে বহু তরুণ প্রতিভাবান বিজ্ঞানকর্ম্মীর ভবিষ্যৎ এই দিক দিয়া হতাশাময়। প্রধানমন্ত্রী নেহরু বলিয়াছেন, বহু ভারতীয় বৈজ্ঞানিক স্বদেশ অপেক্ষা বিদেশে কাজ করিতে আগ্রহী, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। শ্রীনেহেরু ইহার কারণ অনুসন্ধানে মনোযোগ দিয়াছেন কি না বলিতে পারি না। কিন্তু ইহা সকলেই জানেন যে, এদেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্র এতই সঙ্কীর্ণ এবং নানা রকম আমলাতান্ত্রিক বন্ধনে আবদ্ধ যে, গবেষণা অপেক্ষা ফাইল, রিপোর্ট ইত্যাদি ঠিক করিতে ও টাকা-আনা-পয়সার হিসাব মিলাইতেই উদ্যোগ এবং উদ্যমের অধিকাংশ নষ্ট হয়। বিজ্ঞানকর্ম্মীরা কেবলই এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় চাকুরির সন্ধান করিবেন, ইহা অবশ্য গবেষণা-কার্য্য চালাইবার পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়। আর এই চাকুরীর সন্ধানই বা তাহাদের করিতে হয় কেন? এই 'কেন'র উত্তরই এখানে জটিল। যোগ্যতা অনুযায়ী গবেষণা করিবার সুযোগ এবং উপযুক্ত বেতন অথবা বৃত্তি পাইলে নিশ্চয়ই তাঁহারা অন্যত্র ভাগ্যান্বেষণে বাহির হন না। সমস্যা সেইখানে।

আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ব এদেশের অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান ও প্রয়োগক্ষেত্রের উপর আটিয়া বসিয়াছে। আমলারা গবেষণা সম্পর্কে প্রায় নিস্পৃহ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা ফাইল এবং হিসাবের খবরদারি করিতে ব্যস্ত। আমলাতন্ত্রের হিসাবে গ্রেড অনুযায়ী বেতন ও পদমর্য্যাদা—সেখানে বিজ্ঞানকর্ম্মীর যোগ্যতা ও গবেষণা-কৃতিত্ব নিতান্ত গৌণ ব্যাপার। গ্রেড অনুযায়ী বেতন অথবা বৃত্তির খোপে খোপে বিজ্ঞানকর্ম্মীদের বসাইয়া দিবার পর চাকা ঘুরিতে থাকিল আমলাতন্ত্রের নিজস্ব নিয়মে। ডঃ জোসেফের চাকুরির চাকা পনের বৎসর ধরিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে যে এক শত ষাট টাকায় ঠেকিয়াছিল, উহা সেই আমলা-তান্ত্রিক ভাগ্যচক্রের অপরিবর্ত্তনীয় বিধান অনুযায়ী। তাঁহার যোগ্যতা অথবা গবেষণা-কৃতিত্ব কিছুই ঐ আমলাতান্ত্রিক গ্রেড ও গড় হিসাবের দুষ্টচক্র হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই।

জানি না, সরকার এ সম্বন্ধে কোন খোঁজ রাখেন কিনা। খোঁজ লইলে দেখিতে পাইবেন, গলদ কোথায়? সরকারের অন্যান্য দপ্তরে নিয়ম যাহাই হউক, বিজ্ঞানকর্ম্মীদের ক্ষেত্রে পদোন্নতি এবং বেতন-বৃদ্ধি কেবল কর্ম্মকালের দৈর্ঘ্য অনুসারে হওয়া উচিত নয়। যাহার ফলে, বহু প্রতিভার অপচয় ঘটিতেছে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বেতন ইত্যাদির যে হার, বিজ্ঞানকর্ম্মীদের বেতন ও বৃত্তি ইত্যাদি সে তুলনায় অত্যন্ত সামান্য। এই অদ্ভুত বৈষম্য কেবল এ দেশের আমলা-সর্ব্বস্ব ব্যবস্থাতেই বোধ হয় সম্ভব হইয়াছে। এই অবস্থায় প্রতিভাবান বিজ্ঞানকর্ম্মী বিদেশে কর্ম্ম সংস্থানের চেষ্টা করিলে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় কি? আকর্ষণ শুধু অর্থেরই নয়—আরও একটা দিক আছে, যাহা প্রতিভাধর মাত্রই উপেক্ষা করিতে পারেন না। এ দেশে বৈজ্ঞানিক কর্ম্ম ও গবেষণা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক কলে ছাঁটাই বলিয়া প্রতিভাবান তরুণ বিজ্ঞানকর্ম্মীরা সর্ব্বত্র স্বচ্ছন্দে কাজ করিবার সুযোগও পান না। এ অভিযোগ নূতন নয়, অতিরঞ্জিতও নয়—দৃষ্টান্তও বহু রহিয়াছে। ডক্টরেট উপাধিপ্রাপ্ত বহু ভাষাবিদ বিজ্ঞানকর্ম্মী—তিনি যে বিষয়ে অভিজ্ঞ, সে বিষয়ে উপযুক্ত কাজের সুযোগ না পাইয়া বিদেশে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। এইরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া, ২০শে জানুয়ারীর 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখিয়াছেন—"ডক্টরেট উপাধি প্রাপ্ত বহু ভাষাবিদ বিজ্ঞানকর্ম্মী, তিনি যে বিষয়ে অভিজ্ঞ সে বিষয়ে উপযুক্ত কাজের সুযোগ না পাইয়া বিদেশে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। এম-বি, বি-এস ও রসায়ন শাস্ত্রে এম-এস-সি উপাধি প্রাপ্ত গবেষকের প্রবন্ধ এ দেশের বৈজ্ঞানিক আমলাদের খামখেয়ালী বিচারে অনাদৃত হইয়াছে, পরে জার্ম্মেনির বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় উহা প্রকাশিত হইয়া আমেরিকার পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগীয় অধ্যাপকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এই তরুণ ভারতীয় বিজ্ঞানকর্ম্মী আমেরিকার উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে কাজ করিতে আমন্ত্রিত হন। সম্প্রতি একটি সংবাদে প্রকাশ যে, উপরওয়ালারা অপ্রসন্ন হওয়ায় একজন ভারতীয় বিজ্ঞানকর্ম্মীর গবেষণার ফলাফল চাপা দিয়া রাখা হয়, অথচ কিছুকাল পরে অন্য দেশের দুইজন বিজ্ঞানী অনুরূপ গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করিয়া নোবেল প্রাইজ লাভ করিয়াছেন। বিদেশে কয়লা-সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণার কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়া এদেশে ফিরিয়াছিলেন একজন তরুণ বিজ্ঞানকর্ম্মী, একটি প্রসিদ্ধ সরকারী কলেজে চাকুরিও তিনি পান, কিন্তু গবেষণা চালাইবার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বিস্তর সাধ্যসাধনা করিয়াও তিনি পান নাই এবং অবশেষে অপেক্ষাকৃত কম বেতনে বিদেশে কাজ লইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন গবেষণার সুযোগ পাইবেন বলিয়া।"

দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া লাভ নাই। এই সনাতন প্রথার পরিবর্ত্তন করার দায়িত্ব সরকারের, নহিলে এই অব্যবস্থার অবসান কোন দিনই হইবে না।

গ-স

বাজার হইতে চিনি উধাও হইল কাহার দোষে?

চিনির দর দেখিতে দেখিতে মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া গেল। এই সম্ভাবনা-পথ সরকারই প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। সরকার যাহাতেই কণ্ট্রোল দর বাঁধিয়া দিতে গিয়াছেন, তাহা লইয়াই এরূপ ছিনিমিনি খেলা পূর্ব্বেও হইয়াছে, এখনও হইতেছে। বাজারে চিনি ছিল—কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সরকার হস্তক্ষেপ করিলেন, অমনি বাজার হইতে চিনি উধাও হইয়া গেল! আজ কোথাও চিনি নাই। কিন্তু সরকার এই 'নাই' কথাটি বিশ্বাস করিতে চাহেন না। তাঁহারা পরিসংখ্যানের খাতা খুলিয়া দেখাইয়া দিবেন প্রচুর চিনি আছে। আর 'নাই' বলিলেই হইল? চিনি যে আছে তাহার প্রথম প্রমাণ মিষ্টান্নের দোকানগুলি আজও বন্ধ হয় নাই, চায়ের দোকানেও ঝাঁপ পড়ে নাই। চিনি আছে বটে, তবে সাদা বাজার আজ কালো হইয়াছে।

সরকার নিশ্চেষ্ট নাই—তাহাই প্রমাণ করিতে রেশন-কার্ডের ব্যবস্থা করিলেন। এই কার্ড দেখাইলেই সপ্তাহে এক পোয়া (আজকাল দেড় পোয়া হইয়াছে) হিসাবে চিনি মিলিবে। প্রথম কথা হইতেছে এই কার্ড অনেকেই সংগ্রহ করিতে পারেন না, দ্বিতীয় কথা হইল, কাজ-কর্ম্ম বন্ধ করিয়া লাইন দিবারই বা তাহাদের অবকাশ কোথায়? তাহার উপর চিনির বরাদ্দ হইতেছে, সপ্তাহান্তে দেড় পোয়া! চমৎকার ব্যবস্থা!

চাহিদা অনুযায়ী উৎপন্ন দ্রব্যের অভাব, দেশে চিনির কলেরও সংখ্যাধিক্য নাই—তাহার উপর ইক্ষু-চাষ সেরূপ হয় নাই, এরূপ মামুলি কথা দিয়া সাধারণকে আর ভুলানো যাইবে না। তাহারা ক্রমশঃই সাবালক হইতেছে। তাহারা আজ বুঝিতে পারিয়াছে, দেশে চিনির মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা একটি সম্পূর্ণ মনুষ্যসৃষ্ট সমস্যা। ব্যবসায়ীদের দুর্নিবার লোভ-পরবশতার জন্যই এই সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, এই সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব সম্পূর্ণ ভাবে গবর্ণমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত থাকিলেও তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত এই

ব্যাপারে একপ্রকার নিশ্চেষ্টই রহিয়াছেন। ভারত সরকার চিনির কলগুলি হইতে যে চিনি গ্রহণ করিতেছেন, তাহা হইতে পশ্চিম-বঙ্গের প্রয়োজনীয় চিনি সরবরাহ করা হইতেছে না। কেন করা হইতেছে না, তা তাঁহারাই জানেন। যে কারণেই হউক, আমরা দেখিতেছি, চিনির মূল্যবৃদ্ধির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারই দায়ী। কারণ, তাঁহারা লোভী ও দুর্নীতিপরায়ণ চিনি ব্যবসায়ীদের সংযত করিবার জন্য আজ পর্যান্ত কার্য্যকরীভাবে কোনও চেষ্টা করেন নাই। সরকারের এই নির্লিপ্ততার ফলে ব্যবসায়ীগণের সাহস বাড়িতেছে এবং দিন দিন উহারা চিনির মূল্য অধিকতর পরিমাণে চড়াইয়া দিতেছে। এমনকি সরকারের সকল নির্দ্দেশকেই উপেক্ষা করিয়া, চিনি বাজার হইতে উধাও করিয়াও লইতেছে।

সরকারের তরফ হইতে গত ১৬ই জানুয়ারী তারিখে এরূপ ঘোষণা করা হয় যে, ২০শে জানুয়ারী হইতে গবর্ণমেণ্টের কলিকাতা ও হাওড়াস্থিত 'ফেয়ার-প্রাইস-শপ'গুলির মাধ্যমে প্রতি সের চিনি এক টাকা দশ নয়া পয়সা দরে বিক্রয় করা হইবে। এই অনুগ্রহের দানও কিছুদিনের মধ্যেই বন্ধ হইয়া যায়। পরে সরবরাহ-মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ঘোষণা করেন, চিনির সমস্যা আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের পূর্ব্বে সমাধান হইবে না। তাহাও কোন তারিখ হইতে, সে বিষয়ে সরবরাহ-মন্ত্রী ভরসা দিতে পারেন নাই। যদি চিনির সমস্যার সমাধান হইতে ফেব্রুয়ারীর শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে অবস্থা যে কিরূপ ঘটিবে তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন।

জনসাধারণ আজ আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেছে, এরূপ একটি গুরুতর সমস্যার সমাধান করিতে কর্তৃপক্ষের এই টালবাহানার কারণ কি? পশ্চিমবঙ্গে প্রতি মাসে কুড়ি হাজার টন চিনি খরচ হয়। এই চিনির উপর ব্যবসায়ীরা বর্ত্তমানে প্রতি সেরে দশ আনার মত লাভ করিতেছে। কাজেই মুনাফাশিকারীগণের প্রত্যেক মাসে লাভ হইতেছে দেড় কোটি টাকার কাছাকাছি। গত সাত-আট মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই অনাচারের প্রতিরোধ করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই। আজ চিনির অবস্থা চরমে উঠিয়াছে, কিন্তু সরকার সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট। শুধু চিনি কেন, সকল পণ্যের ব্যাপারেও কোটি কোটি টাকা আজ ব্যবসায়ীদের কুক্ষিগত হইতেছে। জন-সাধারণের মনে আজ এই প্রশ্নই বড় হইয়া উঠিয়াছে, হয়ত সরকারের সহিত ব্যবসায়ীদের কোন অ-লিখিত চুক্তি রহিয়াছে, যাহার ফলে সরকার এমন উদাসীন! সরকার কি বুঝিতেছেন না, দেশবাসী আজ চতুর্দ্দিক হইতে জর্জ্জরিত? এই অসহায় দেশ-বাসীকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব সরকারের। তাঁহাদের ইহাও স্মরণ রাখা উচিত, সকল রকম দুর্নীতির প্রতিকারের জন্য দেশবাসী না খাইয়া ও না পরিয়া একটা ব্যয়বহুল গবর্ণমেণ্টকে তাহারাই পোষণ করিতেছে।

সরকার ও ফাটকাবাজী

ফাটকাবাজী যেন ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থার স্তরে স্তরে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে এবং ইহার প্রভাব হইতে অর্থনৈতিক কাঠামোকে মুক্ত করিতে কর্তৃপক্ষ আজও সমর্থ হইলেন না; ফাটকাবাজীদের ক্ষমতার বিরুদ্ধে সরকারী ক্ষমতা শুধু যে অক্ষমতার পরিচায়ক তাহা নহে, ইহাদের প্রতি যেন সরকারের দুর্ব্বলতা আছে, এবং মাঝে মাঝে প্রচ্ছন্ন সমর্থন আছে বলিয়াও মনে হয়। সম্প্রতি চাউল ও চিনির দুষ্প্রাপ্যতা ও মূল্যবৃদ্ধির পিছনে শুধু যে সরকারী ব্যবস্থার ব্যর্থতা আছে তাহা নহে, তাঁহাদের উদাসীনতাও এই বিপর্য্যয়ের জন্য দায়ী।

খাদ্যশস্য উৎপাদনে পশ্চিম বাংলা একটি চিরন্তন ঘাটতি-প্রদেশ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এবং এই ঘাটতির জন্য সরকারী নিশ্চেষ্টতা অনেকখানি দায়ী। ঘাটতি পূরণের জন্য সম্প্রতি পশ্চিম-বাংলা ও উড়িষ্যাকে লইয়া একটি যুক্ত অঞ্চল গঠিত হইয়াছে এবং ইহার ফলে উড়িষ্যার উদ্বৃত্ত চাউল পশ্চিম বাংলায় আমদানী করা হইবে। ইহাতে আশা হইয়াছিল যে, এই প্রদেশে চাউলের ঘাটতি দূরীভূত হইবে এবং চাউলের মূল্যও কমিয়া আসিবে। কিন্তু এই দুইটি আশার কোনটিই আজ পর্য্যন্ত সফল হয় নাই। উড়িষ্যার খাদ্যসচিব কলিকাতায় আসিয়াছেন এবং তাঁহার অভিমতে উড়িষ্যা প্রতিমাসে পশ্চিম বাংলায় প্রায় ৩০,০০০টন চাউল রপ্তানি করিবে, এবং উড়িষ্যা চায় যে, পশ্চিম বাংলায় চাউলের মূল্য ২১।২২্ টাকার অধিক হইবে না, কারণ এখানে মূল্য বৃদ্ধি পাইলে উড়িষ্যার চাষীরা স্বভাবতঃই অধিক মূল্য দাবি করিবে এবং তাহার ফলে উড়িষ্যাতেও চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। অর্থাৎ উড়িষ্যার চাষীদের নিকট হইতে যে দরে ধান ক্রয় করা হইতেছে তাহার অনেক অধিক মূল্যে পশ্চিম বাংলায় চাউল বিক্রয় হইতেছে এবং পাইকারী ব্যবসায়ীরা এই মাধ্যমিক লাভ লুটিয়া লইতেছে। সুতরাং পশ্চিম বাংলায় চাউলের বাজার-দর অত্যধিক হওয়ার কারণ পাইকারী ব্যবসায়ীদের অত্যধিক লাভ করিবার প্রবৃত্তি এবং ইহারা যেন সরকারের পোষ্য-পুত্র, এবং ইহাদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে এবং মাধ্যমিক লাভ করিবার বিষয়ে কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল আছেন।

উড়িষ্যার খাদ্যসচিব বলেন যে, কেবলমাত্র জানুয়ারী মাসেই কলিকাতায় চাউলের মূল্য ২০্ টাকা মণ হইতে ২৩্ টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমাদের মতে এই বৃদ্ধির পরিমাণ আরও বেশী, কারণ, খোলা বাজারে অত্যন্ত সাধারণ চাউলই প্রায় ২৬্ টাকায় বিক্রয় হইতেছে। উড়িষ্যার অভিযোগ এই যে, বাংলা দেশের পাইকারী ব্যবসায়ীরা যে পরিমাণে চাউল আমদানি করিতেছে তাহা গোপন রাখিয়া নিম্ন পরিমাণের হিসাব দিতেছে। অর্থাৎ, যেমন চিনি ও মিলবস্ত্র ব্যাপারে ঘটিতেছে, সেইরূপ উড়িষ্যার চাউলের ব্যাপারেও বাংলা দেশের পাইকারী ব্যবসায়ীরা জোট করিয়া চাউলের সরবরাহকে গোপন করিয়া রাখিতেছে এবং কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিয়া জনসাধারণের খরচায় বিরাট মুনাফা লাভ করিতেছে।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইহার প্রতিরোধে যথোচিত কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই।

উড়িষ্যার হিসাব অনুসারে গত ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত পশ্চিম-বাংলায় উড়িষ্যা হইতে ৪০ হাজার টন চাউল রপ্তানি করা হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিম বাংলার ব্যবসায়ীরা বলিতেছেন যে, তাঁহারা মাত্র ১৪হাজার টন চাউল আমদানি করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে বাকি চাউল কোথায় গেল? সবচেয়ে আশ্চর্য্য বিষয় হইতেছে, পশ্চিম বাংলার খাদ্যমন্ত্রীর ব্যবসায়ীদের সমর্থনে সাফাই গাওয়া। তিনি বলিয়াছেন যে, উড়িষ্যার খাদ্যসচিব আবোল-তাবোল বকিয়াছেন; কিন্তু পশ্চিম বাংলার খাদ্যমন্ত্রীই বা কি সদুত্তর দিতেছেন যে, পশ্চিমবাংলায় চাউলের ব্যবসায় কেন ক্রমান্বয়ে কালোবাজারী ও মুনাফাখোরী ব্যবসা চলিতেছে। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া এই প্রদেশে চাউলের ব্যবসায়ে যে প্রহসন চলিতেছে তাহাতে অন্য কোনও আত্মসম্মানজ্ঞানী ব্যক্তি হইলে এতদিনে খাদ্যমন্ত্রীর পদ হইতে ইস্তফা দিতেন।

প্রশ্ন হইতেছে যে, উড়িষ্যায় চাউল সংগ্রহ করা এবং আমদানি করিবার ব্যাপার পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন বেসরকারী পাইকারী ব্যবসায়ীদের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের উচিত ছিল নিজেদের বেতনভোগী কর্ম্মচারীদের দ্বারা উড়িষ্যা হইতে চাউল আমদানি করা। এই সকল বেসরকারী পাইকারী ব্যবসায়ীদের নাম খবরের কাগজে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন যাহাতে জনসাধারণ এইরূপ সমাজবিরোধী ব্যক্তিদের চিনিয়া রাখিতে পারে। ইহাদের সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট দুর্ব্বলতা আছে এবং তাঁহাদের নির্লিপ্ততা দেখিয়া মনে হয় যে, সমর্থনও আছে।

চাউলের মূল্যবৃদ্ধি রোধ করিবার জন্য গত ৮ই ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও উড়িষ্যা সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি বৈঠক হয়। এই বৈঠকে কতকগুলি উপায় অবলম্বনের প্রস্তাব করা হয়। এই প্রস্তাবের মধ্যে সবচেয়ে আপত্তিজনক ব্যবস্থা হইতেছে যে, উড়িষ্যা হইতে আমদানীকৃত ধান সরাসরিভাবে কলিকাতা অঞ্চলস্থিত চাউলকলের মালিকদের দেওয়া হইবে, ইহাতে নাকি মাধ্যমিক ব্যবসায়ীদের মুনাফালাভ বন্ধ হইবে এবং তাহার ফলে চাউলের মূল্য হ্রাস পাইবে। কিন্তু এই ব্যবস্থার মধ্যে অনেক গোঁজামিল আছে। প্রথমতঃ, উড়িষ্যায় চাউল সংগ্রহ করা এবং সেইখান হইতে চাউল আমদানি করিবার জন্য বর্ত্তমানে যে বেসরকারী ঠিকাদার নিযুক্ত করা হইয়াছে, যদি তাহারাই চাউল আমদানি করিতে থাকে তাহা হইলে চাউলের মূল্য বিশেষ কমিবে না। দ্বিতীয়তঃ, চাউলকলগুলি পাইকারদের কি দরে চাউল বিক্রয় করিবে এবং প্রতি মণ ধানে কত সের চাউল দিবে সে সম্বন্ধে কোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা হয় নাই। চোরাকারবারীর সুবিধার জন্য এই ব্যাপারগুলি অন্ধকারের মধ্যেই রাখা হইয়াছে। চাউল-কলগুলির লাভের অংশ কি পরিমাণ থাকিবে? তাহারা কি শুধু ধান ভাঙিবার খরচটুকু লইবে, না তাহার অধিক লাভ রাখিবে? যেখানে পাইকারী পরিমাণে ধান ভাঙান হইবে, সেখানে এক মণ ধান ভাঙিতে সাধারণতঃ মণপ্রতি চারি আনাই যথেষ্ট। এই বিষয়ে চাউলকলের মালিকদের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। তাহারা যে নিজেরাই চোরাকারবারী করিবে না, কিংবা চাউলকে গোপন করিয়া রাখিবে না, সে সম্বন্ধে কোনও নিশ্চয়তা নাই। এবং কর্তৃপক্ষও এই বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। সরকারী প্রস্তাব হইতেছে, ধান ভাঙিবার পর চাউলকলগুলি "অন্ততঃ কিছু পরিমাণ" চাউল সরকারকে বিক্রয় করিবে যাহাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার "ন্যায্য-মূল্য" দোকানের মারফৎ বিক্রয় করিতে পারেন। সুতরাং বেসরকারী পাইকারী ব্যবসায়ীরা যাহাতে অধিক লাভ করিতে পারে তাহার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন যে, তাহারা সরাসরি-ভাবে চাউল কলগুলি হইতে যথেষ্ট পরিমাণে চাউল পাইবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেবলমাত্র "কিছু পরিমাণ" চাউল লইবেন কেন? বাকি চাউল কাহারা লইবে এবং তাহারা কি ভাবে বিক্রয় করিবে? পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন এই সমস্ত চাউল নিজেদের অধীনে রাখিতেছেন না এবং তাঁহারা নিজেরাই কেন এই সমস্ত চাউল সরকারী দোকানের মাধ্যমে বিক্রয় করিতেছেন না তাহা জনসাধারণ বুঝিতে অপারগ। ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাংলা দেশে, খাদ্যদ্রব্যে যেরূপ ফাটকাবাজী চলিতেছে তাহাকে প্রতিরোধ করিবার জন্য সারা দেশব্যাপী স্থায়ী সরকারী দোকান থাকা প্রয়োজন এবং এই দোকানগুলি হইতে অল্পমূল্যে চাউল, চিনি প্রভৃতি যদি বিক্রয় করা হয়, তাহা হইলে খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ে অযথা মুনাফা লাভের প্রচেষ্টা বন্ধ হইয়া যাইবে।

বাংলা দেশে চালের উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় ঘাটতি পড়ে। তাই সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য শুধু কেন্দ্রীয় সরকার কিংবা অন্য প্রদেশের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলেই চলিবে না; বাংলা দেশে চাউলের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে। কিন্তু এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কংগ্রেস নেতারা নিশ্চেষ্ট ও নির্ব্বিকার। তাই সম্প্রতি কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রী পাতিল দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, চাষযোগ্য পতিত জমিগুলিকে আবাদী করিবার প্রচেষ্টায় প্রাদেশিক সরকারের উৎসাহের অভাব পরিলক্ষিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার যখন প্রাদেশিক সরকারের নিকট হইতে এই বিষয়ে প্রগতি সম্বন্ধে খবর চাহিয়া পাঠান, তখন চারি মাসের মধ্যেও প্রাদেশিক সরকারের উত্তর দেওয়ার অবসর থাকে না। কিন্তু তাঁহাদের উত্তর দেওয়ার কিছুই নেই কারণ এই বিষয়ে তাঁহারা কিছুই করেন নাই। ভারতবর্ষে প্রায় ৫·৩ একর আবাদযোগ্য কৃষিজমি পতিত পড়িয়া আছে; এই জমিগুলিকে যদি চাষ আবাদী করা হয় তাহা হইলে এদেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১·৩ কোটি টন বৃদ্ধি পাইবে। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী স্বীকার করিয়াছেন যে, জমির সর্ব্বোচ্চ মাথাপিছু গড়নির্দ্ধারণের ফলেও ভূমিহীন চাষীর সমস্যা সমাধান হয় নি।

ন-ম

মিল-বস্ত্রের দুরবস্থা

ভারতের মিল-বস্ত্র-শিল্প দেশের বৃহত্তম শিল্প। কিন্তু কয়েক বৎসর ধরিয়া ইহার অগ্রগতি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ১৯৫৯ সনে মোট ৭১৫·৩ কোটি গজ সূতীবস্ত্র এদেশে উৎপাদিত হয়, তাহার মধ্যে মিল-বস্ত্রের পরিমাণ হইতেছে ৪৯২·৫ কোটি গজ এবং তাঁত-বস্ত্রের পরিমাণ ২২২·৮ কোটি গজ। ১৯৫৩ সনে ভারতে মিল-বস্ত্রের পরিমাণ ৫০০ কোটি গজ হয়; ১৯৫৮ সনে ইহার পরিমাণ ছিল ৪৯৮ কোটি গজ এবং গত বৎসর ইহা হ্রাস পাইয়া ৪৯২·৫ কোটি গজে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মিল-বস্ত্রের উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল ৫০০ কোটি গজ। ভারতে যেখানে বৎসরে ৫০ লক্ষ করিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, সেখানে মিল-বস্ত্রের আরও দ্রুতহারে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে উৎপাদন পরিমাণ কয়েক বৎসর স্থিরবদ্ধ থাকার পর ১৯৫৮ সন হইতে ক্রমাবনতির পথে চলিয়াছে। ভারতের রপ্তানি-শিল্পে বস্ত্র রপ্তানি তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে, সুতরাং সেদিক দিয়াও মিল-বস্ত্র-শিল্পের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। কিন্তু মিল-বস্ত্রের রপ্তানি ১৯৫৮ সন হইতে ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে, এবং ইহার আভ্যন্তরিক চাহিদাও যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে। এই চাহিদার কমতির প্রধান কারণ হইতেছে, ব্যবসায়ীদের অসাধু আচরণ, অর্থাৎ, অত্যধিক লাভ করিবার প্রবৃত্তি এবং ইহার ফলে বস্ত্রমূল্য অধিক হওয়ায় চাহিদা হ্রাস পাইতেছে। ভারতীয় সূতীমিল যুক্তসংস্থা সম্প্রতি স্বীকার করিয়াছে যে ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত মুনাফার লোভ বস্ত্র-শিল্পের বর্ত্তমান দুরবস্থার জন্য দায়ী। ১৯৫৯ সনে সূতীবস্ত্রের রপ্তানি বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যবসায়ীরা ফাটকাবাজী ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে, কারণ তাহারা মনে করে যে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ভারতে সূতী-বস্ত্রে অভাব পরিলক্ষিত হইবে। এই কারণে সূতীবস্ত্রের মূল্য অত্যধিক হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। মিল-মালিকরা একজোট হইয়া উৎপাদনকে কমতির দিকে রাখিয়াছে এবং তাহাতে মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে।

ন-ব

ছাত্রদের নৈতিক পতন ও তাহার মূল উৎস কোথায়?

প্রায় একই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া লাভ নাই। ছাত্রেরা বিগড়াইয়াছে, অভিভাবকেরা অসহায় অথবা উদাসীন, শিক্ষকদের প্রভাবও আজ লুপ্তপ্রায়—ইহা ত পুরাতন কথা। এ বিষয়ে আলোচনাও হইয়াছে অনেক। কিন্তু প্রতিকার সম্বন্ধে কেহ কোন পথ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-পর্যদের অধিবেশনে ছাত্র-সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ শ্রীমালী সাম্প্রতিক ছাত্র-বিশৃঙ্খলার দীর্ঘ বিবরণ দিয়া দেখান যে, ছাত্র-ছাত্রীরা কথায় কথায় ধর্ম্মঘট করে, কলেজের বেতনের হার সম্পর্কে আপত্তি তুলিয়া আন্দোলন, অযোগ্য ছাত্র-ভর্ত্তির দাবি, শিক্ষককে বরখাস্ত করিবার জন্য হুকুম ও জুলুম, পরীক্ষায় অসাধু উপায় অবলম্বনের জন্য শাস্তি-ভোগীর পক্ষ লইয়া অনশন-সত্যাগ্রহ, সিনেমা, আমোদ-প্রমোদ অনুষ্ঠানে জোর করিয়া ঢুকিবার চেষ্টা—এই রকম নিত্য-নূতন অন্যায় দাবি এবং জুলুমের সূত্র ধরিয়া স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-ব্যবস্থা পণ্ড করিবার অভিযানে ইহারা খুব তৎপর। উত্তর-ভারতেই নাকি এইরূপ ছাত্র-গোলযোগের উৎপাত সবচেয়ে বেশী। ডঃ দেশমুখও বলিয়াছেন, বর্ত্তমানে দক্ষিণ ভারতে এবং পঞ্জাবে ছাত্রবিক্ষোভ-ঘটিত উপদ্রব অপেক্ষাকৃত কম।

কোথায় কম, কোথায় বেশী এ লইয়া আলোচনা করিয়াও আজ লাভ নাই। প্রয়োজন, অবিলম্বে সুদৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্যোগ। এইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধির মূল কারণ সম্বন্ধে কোথাও কাহারও মত-ভেদ নাই। তবু কোন কোন মহলের ধারণা, ছাত্র-সম্প্রদায়ের অসন্তোষ বৃদ্ধির অনেক সঙ্গত কারণ আছে। এই ধারণার স্বপক্ষে সামাজিক এবং আর্থিক দুরবস্থা, শিক্ষা-ব্যবস্থায় যথেষ্ট সুযোগের অভাব ইত্যাদি কারণ দেখান হইতেছে বটে। কিন্তু সঙ্গত অভাব-অভিযোগ, অসুবিধা থাকিলেই ছাত্র-ছাত্রীরা নিয়মশৃঙ্খলাগুলিকে ভাঙিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা লণ্ডভণ্ড করিয়া দিবে, ইহা কোনরূপেই বরদাস্ত করা যায় না। ডঃ দেশমুখ এই প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, যুক্তির দিক দিয়া তাহা উল্লেখযোগ্য। শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং শিক্ষায়তনের পরিবেশের অনেক উন্নতি প্রয়োজন, দেশমুখ তাহা স্বীকার করেন। শিক্ষা-ব্যবস্থায় ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ছাত্রদের মধ্যে নিরাশভাব থাকাও স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাভাবিক বলিয়া উচ্ছৃঙ্খলতা শোভা পায় না।

এ বিষয়ে শুধু ছাত্রদের দোষ দিলেই চলিবে না। এ সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সত্য কথা বলিয়াছেন, উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র-নেতাদের শাস্তিবিধান ব্যাপারে কোনরূপ দ্বিধা করা উচিত নয়। যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজ্য সরকার হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী ছাত্র-কর্ম্মপরিষদ ইত্যাদির আলাপ-আলোচনা করেন, তাঁহারা ভুল করেন। ইহার ফলে, পরোক্ষে আইন-অমান্যকারীদের প্রশ্রয় দেন। ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গত অভাব-অভিযোগ সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করা হউক, কিন্তু বিশৃঙ্খলা যাহারা সৃষ্টি করে, তাহাদের কঠোর শাস্তিবিধানে কোনরূপ দুর্ব্বলতা প্রদর্শন উচিত নয়। ডঃ দেশমুখের এই পরামর্শ প্রত্যেকটি ছোট-বড় শিক্ষায়তনের পরিচালকগণের অবিলম্বে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ডঃ দেশমুখ আরও বলিয়াছেন, ছাত্র-ছাত্রীগণের মধ্যে অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কাজে যাহারা পটু এবং নিরন্তর তৎপর সেই সকল রাজনৈতিক দল এবং রাজনীতি-ব্যবসায়ীগণের বিরুদ্ধে অবশ্য সোজাসুজি ব্যবস্থা অবলম্বনের উপায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাই। কিন্তু না থাকিলেও একথা জোর করিয়া বলিতেই হইবে, দেশে এমন কোনও রাজনৈতিক দল নাই যাহারা ছাত্রদের উস্কানী দেয় না। কেরলে নদী পারাপারের মাশুল লইয়া যে

ছাত্র-আন্দোলন হইয়াছিল, তাহার উদ্যোক্তা অথবা পৃষ্ঠপোষক ছিল কংগ্রেস।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা-পর্ষদের অধিবেশনে উত্তরপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠী বলেন, "রাজনৈতিক দলগুলি ছাত্র-অসন্তোষ উস্কানী না দিবার জন্ত 'ভদ্রলোকের চুক্তিতে' আবদ্ধ হইলে ভাল হয়।" ভাল অবশ্যই হয়। কিন্তু দলীয় রাজনীতি এমনই সুবিধা-সন্ধানী যে, উহার সহিত 'ভদ্রলোকের চুক্তি'র সামঞ্জস্যবিধান অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। উত্তর প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র-বিক্ষোভের পশ্চাতে কংগ্রেসেরই একটি প্রভাবশালী উপদলের উদ্যোগ সম্পর্কে প্রবল জনশ্রুতি সম্ভবতঃ একেবারে অমূলক নয়। পশ্চিম বাংলায় ছাত্র-বিশৃঙ্খলার পশ্চাতে রাষ্ট্র-বিরোধী দল-উপদলের ক্ষমতাবৃদ্ধির চক্রান্ত বর্তমান—অধ্যাপক সিদ্ধান্তেরও এই অভিযোগও সম্পূর্ণ সত্য। দেশের রাজনৈতিক দলগুলির শুভবুদ্ধির উদয় হইবে এমন ভরসা করিয়া লাভ নাই। রাজনৈতিক দলগুলি যাহাতে ছাত্র-ছাত্রদের বিপথে পরিচালিত করিবার সুযোগ না পায়, প্রধানতঃ, সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্যই অবিলম্বে উদ্যোগী হওয়া দরকার।

বর্তমানে আর একটি সর্বনাশা প্রতিষ্ঠান হইয়াছে ছাত্র-ইউনিয়ন। গোলযোগ ও হাঙ্গামা এইখান হইতেই সুরু হয়। এই ছাত্র-ইউনিয়নের পাণ্ডারা অনেকেই দলীয় রাজনীতির নির্দেশে পরিচালিত অথবা রাজনীতি-ব্যবসায়িগণ দ্বারা প্রভাবিত হয়। কাজেই ছাত্র-সমাজকে সংপথে আনিতে হইলে প্রথম কর্তব্য হইল ছাত্র-ইউনিয়নগুলির বিলোপসাধন। ডঃ দেশমুখ বলিয়াছেন, অন্ততঃপক্ষে ছাত্র-ইউনিয়নগুলিকে সম্পূর্ণ রাজনীতি-মুক্ত করিয়া সাংস্কৃতিক এবং সমাজ-সেবামূলক কাজকর্মে নিযুক্ত হইতে বাধ্য করা উচিত।

ছাত্রদের অসন্তোষ এবং বিক্ষোভের কারণ, অনেকে অনুমান করেন শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থাই ইহার জন্ত দায়ী। অর্থকরীবৃত্তি হিসাবে শিক্ষকতা যথেষ্ট আকর্ষণীয় নয়—ইহা কেহই অস্বীকার করিবে না। কিন্তু শুধু সেই কারণে শিক্ষাব্রতীরা তাঁহাদের কর্তব্য-পালনে নিরুৎসাহ কিংবা উদাসীন হইবেন—এই যুক্তি ক্ষতিকর। বৃত্তি হিসাবে শিক্ষকতা কোন দেশেই অন্যান্য অর্থকরী বৃত্তির সঙ্গে তুলনীয় নয়। অথচ অন্য কোন দেশে এইরূপ কর্তব্যে অবহেলা দেখা যায় না। শিক্ষাব্রতী যদি তাঁহার কর্তব্য করিতে উৎসাহ-বোধ না করেন, তবে অন্য কোন অধিক অর্থকরীবৃত্তি অবলম্বন করিতে তাঁহার বাধা কোথায়? অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করিতে উৎসাহ নাই, অথচ শিক্ষাক্ষেত্রে কোনরূপে জীবিকা-অর্জনের সুযোগটিও ছাড়িব না, এই মনোভাব নীতিগতভাবে চরম লজ্জার এবং নিন্দার। অধ্যাপকরা ছাত্রসমাজের অনুরাগ ও শ্রদ্ধা যে হারাইতেছেন তাহার একটি প্রধান কারণ, তাঁহারা নিজেরাই শিক্ষাব্রতীর আদর্শ হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পতনই ছাত্রদের সেই পথে টানিয়া আনিয়াছে। জট বহুদিক হইতে বাধিয়াছে। এই জট খুলিতে হইলে শিক্ষক ছাত্র সকলেরই মতিগতি, মনোভাব সংশোধনের জন্ত একটা বিরাট পরিবর্তন আবশ্যক।

গ-স

শিক্ষা-ব্যবস্থায় গলদ কোথায়?

শিক্ষা-ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত, এবারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসবে আমেরিকার মিসৌরী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট ডঃ এলমার এলিস কয়েকটি মূল্যবান কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, শিক্ষা ও ভাবধারার আদান-প্রদানে উগ্র স্বাদেশিক গোঁড়ামির স্থান নাই। এক দেশের শিক্ষাপদ্ধতি, প্রকরণ, গবেষণা-লব্ধ জ্ঞান ও ভাবসম্পদ অন্যদেশে ব্যবহৃত হইতেছে, আধুনিককালে প্রতিনিয়ত তাহার দৃষ্টান্ত মিলিতেছে। তিনি ঠিকই বলিয়াছেন, শিক্ষা ও ভাবধারার ক্ষেত্রে সকল দেশকেই প্রয়োজনমত ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। আমেরিকার শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রধানতঃ ব্রিটিশ, জার্মান এবং ফরাসী শিক্ষা-ব্যবস্থার আদর্শে গঠিত। ভারতবর্ষের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থাও সে দিক দিয়া মূলতঃ ইউরোপীয়, অথবা আরও নির্দিষ্ট ভাবে বলিতে গেলে, ব্রিটিশ ছাচে ঢালাই। শিক্ষাক্ষেত্রে আধুনিক ভাব ও ধর্মধারার অনুশীলনে বিদেশ হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে ভারতবর্ষ দ্বিধা করে নাই। তবে এই ঋণ কতখানি আমাদের উপকারে লাগিয়াছে তাহাই ভাবিবার বিষয়। প্রসঙ্গক্রমে ডঃ এলিস এ কথাও বলিয়াছেন, বিদেশ হইতে ঋণ লইতে হইবে বটে, কিন্তু কোনরূপ বিচার-বিবেচনা না করিয়া অন্য দেশের শিক্ষাপদ্ধতি ও ভাবধারার অন্ধ অনুকরণ করিলে লাভ না হইয়া ক্ষতিই বেশী হইবে।

আর হইয়াছেও তাহাই। আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে যে সঙ্কট দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিতেছে তাহার একটি কারণ, আমাদের শিক্ষার ছাচের সঙ্গে সামাজিক প্রয়োজনের জোড় মিলে নাই। অন্যদেশের অনুকরণে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় গড়িলেই, শিক্ষা-ব্যবস্থা চাবি-দেওয়া গাড়ীর মত গড় গড় করিয়া চলিতে থাকিবে, এই অন্ধ-সংস্কারের মূলে আর যাহাই থাকুক, বাস্তব-জ্ঞানের অভাব ইহা বলিতেই হইবে।

ডঃ এলিস বলিয়াছেন, এককালে আমেরিকাও তাহার শিক্ষা-ব্যবস্থা ব্রিটিশ-জার্মান-ফরাসী ছাচে গড়িয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল, তাহাতে কুলাইতেছে না। শিক্ষা-ব্যবস্থার অনেকখানি জুড়িয়া থাকিতেছে বিশুদ্ধ কেতাবী-পাণ্ডিত্য। অথচ আমেরিকার দ্রুত-গতিশীল শিল্প-প্রধান বৈষয়িক উদ্যোগের জন্ত দরকার, বিশেষ বিশেষ বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান, বৃত্তিগত দক্ষতা। সনাতন কলা-শাস্ত্র ও ধর্ম-সংস্কৃতিমূলক শিক্ষার আদর্শ এবং পদ্ধতিকে আমেরিকা একেবারে বাতিল করিল না বটে, কিন্তু মার্কিন সমাজের বৈষয়িক উন্নতির বাস্তব প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কৃষি, শিল্প ও কারিগরী বিদ্যাচর্চার উদ্দেশ্যে অসংখ্য নূতন নূতন শিক্ষায়তন গড়িয়া তুলিল।

এ কথায় যেন আমরা আবার ভুল না করিয়া বসি, আমেরিকা যাহা করিয়াছে তাহা তাহার নিজের প্রয়োজনে। আমরা শিক্ষায়তন গড়িয়া তুলিব, আমাদের সামাজিক প্রয়োজনমত। পরিবর্তন আমাদের অবশ্যই আনিতে হইবে, কিন্তু তাহা তাড়াহুড়া করিয়া আনিলে চলিবে না। আমেরিকা এইরূপ তাড়াহুড়া করিতে গিয়াছিল তাহাতে ফল ভাল হয় নাই। আমেরিকা ঠেকিয়া ঠেকিয়া শিখিয়াছে। আমরা ঠেকিতেছি, কিন্তু শিখিতেছি না। কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া কোন লাভ নাই, যতদিন না তাহার শিক্ষা-পদ্ধতি বদলাইতেছে। আমাদের উচ্চশিক্ষায় যে সঙ্কট, তাহার মূল কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়তন অথবা সংখ্যাল্পতা নয়। আয়তন খাটো করিলে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়াইলেই শিক্ষা আধুনিক যুগের প্রয়োজনোপযোগী হইবে, উন্নত হইবে এমন আশ্বাস শিক্ষা-কর্তারাও দিতে পারিতেছেন না। মান্ধাতার আমলের 'লেকচার পার্সেণ্টেজ' মার্কা শিক্ষাদান-পদ্ধতি, অপ্রয়োজনীয় বিষয়-বস্তুর ভার-বোঝাই পাঠক্রম এবং পাইকারী-ভর্তি ও পরীক্ষা-ব্যবস্থা—এই ত্রিদোষযুক্ত শিক্ষা-কল যতদিন চালু থাকিবে, ততদিন উচ্চশিক্ষার আধুনিকীকরণ কোন মতেই সম্ভব হইবে না।

গ-স

ব্যবসায়-ক্ষেত্রে অসৎ আচরণ

ইতিহাস সাক্ষ্য দিবে, দূর অতীতে কোন বিদেশী পর্য্যটক ভারত ভ্রমণে আসিয়া ভারতীয় জনসমাজের আচরণে উচ্চমানের সততার আদর্শ লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন, এমনটি আর দেখি নাই। তিনি দেখিয়াছিলেন, বিনা-দলিলে ঋণপ্রদান ও গ্রহণ এবং ক্রেতা দোকান হইতে নিজেই ওজন করিয়া পণ্যদ্রব্য তুলিয়া লইতেছে এবং দোকানের মালিককে মূল্য দিয়া চলিয়া যাইতেছে। বিশ্বাসভঙ্গের অথবা প্রতিশ্রুতিভঙ্গের ভয় ছিল না।

কিন্তু আজ সেই ব্যক্তি বাঁচিয়া থাকিলে কি দেখিতেন? স্বর্গ আজ নরকে পরিণত হইয়াছে। সেই মানুষ আজ কত নীচে নামিয়া গিয়াছে! আজ মানুষের আচরণে অসততাই যেন একটা আদর্শে পরিণত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সহকারী রেলমন্ত্রী শ্রীযুক্ত রামস্বামী কোয়েম্বাটুরে তাঁতবস্ত্র-ব্যবসায়ী সমিতির দ্বারা আয়োজিত সম্বর্দ্ধনা-সভায় জনৈক ভারতীয় ব্যবসায়ীর নিদারুণ অসততার কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। উক্ত ভারতীয় ব্যবসায়ী দামাস্কাসের জনৈক ব্যবসায়ীকে ভাল চায়ের নমুনা দেখাইয়া চায়ের মত রং-করা করাত-গুড়া সরবরাহ করিয়াছিলেন। দামাস্কাসের ব্যবসায়ী এগার লক্ষ টাকার চা সরবরাহের অর্ডার দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রামস্বামী আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, ভারতীয় ব্যবসায়ীর সততার নমুনা যদি ইহা হয়, তবে বৈদেশিক ব্যবসায়ী ভারত হইতে পণ্য ক্রয় করিতে উৎসাহিত হইবে কেন? একজন ভারতীয় ব্যবসায়ীর এই প্রকারের অসততায় সমগ্র ভারতীয় জাতির চরিত্র সম্বন্ধে বৈদেশিকের মনে অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস সঞ্চারিত হয়। বলা বাহুল্য, এই ধরনের এক জন অসৎ ভারতীয় ব্যবসায়ী বস্তুতঃ সর্ব্বভারতের ক্ষতিসাধন করিয়া থাকে। আরও পরিতাপের বিষয়, এই ধরনের অপকর্ম্মে একজন নহে, বহুজনকেই লিপ্ত হইতে দেখা গিয়াছে, এবং ভারত সরকার সেসব অসততার অনেক খবরও রাখেন। অনেক ঘটনায় ভারত সরকারকে বৈদেশিক সরকারের কাছে বিব্রতভাবে কৈফিয়তও দিতে হইয়াছে।

বৈদেশিক ক্রেতার কাছে বিক্রেয় দ্রব্যের ভাল নমুনা দেখাইয়া অপকৃষ্ট দ্রব্য চালান দেওয়া হইয়া থাকে, ভারতীয় রপ্তানী ব্যবসায়ীর সম্পর্কে বৈদেশিকের এই অভিযোগ বহুবার উত্থাপিত হইয়াছে। ভারত-সরকার এ ক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন জানি না। সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিলে, এরূপ দৃষ্টান্ত আর নিশ্চয়ই দেখা যাইত না। সরকার এ সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। শুধু তাহার ব্যবসায় করিবার অধিকার ও সুযোগ বাতিল করিয়া দেওয়া নহে, যথারীতি তদন্তের পর তাহার সম্পত্তির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত বৈদেশিকের ক্ষতিপূরণ করিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত। সামান্য নিন্দাবাদে বা লঘুদণ্ডে এই অসততা স্তব্ধ হইবার নহে।

গ-স

প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থায় নূতন প্রচেষ্টা

প্রাথমিক শিক্ষার অব্যবস্থার কথা বহুবার আলোচিত হইয়াছে। যে অব্যবস্থার মধ্য দিয়া বর্ত্তমানে শিক্ষা-পদ্ধতি চলিতেছে, তাহাতে এ দেশে শিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কিত হইবার কারণ আছে। অবশ্য প্রাথমিক শিক্ষার অব্যবস্থা চলিতেছে বলার অর্থ ইহা নহে যে, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা সুব্যবস্থিত। তথাপি প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলার উদ্দেশ্য এই যে, প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার বনিয়াদ যদি সুদৃঢ়ভাবে গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা করা না যায়, তাহা হইলে শিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা গোড়াতেই বিঘ্নিত হইয়া থাকে। অথচ একথা বোধ হয় অস্বীকার করা চলে না যে, প্রাথমিক শিক্ষা-দান ব্যাপারে যেন আগাগোড়া একটা অবহেলার ভাব চলিয়া আসিতেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে ইহা একটি জাতীয় অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়।

ত্রুটি কোথায় এবং তাহার কারণ বিশ্লেষণও বহুবার করা হইয়াছে, কিন্তু ধারাবাহিক কার্য্য-পদ্ধতি আজও বাঁধা গেল না। অর্থাৎ কোথা হইতে কাজ আরম্ভ করিবেন ইহা কর্ত্তৃপক্ষের কাহারও মাথায় আসিতেছে না। ফলে, বিভিন্ন পরীক্ষামূলক পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া ছাত্রদের সর্ব্বনাশকে ডাকিয়া আনিতেছেন। এবারে সুখের বিষয়, এ সম্বন্ধে দেশের শিক্ষাবিদদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং শীঘ্রই সর্ব্বভারতীয় শিক্ষা-পরিষদে এ বিষয়টি আলোচিত হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে। আরও শুনিয়াছি, এ বিষয়টি শিক্ষা-পরিষদে যাইবার পূর্ব্বে, বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষা-বিভাগীয় ডিরেক্টরগণও এ সম্পর্কে আলোচনার জন্য ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হইয়াছেন। প্রাথমিক স্তরে অসংখ্য ছাত্র পরীক্ষায় অকৃত-

কার্য্য হইলে তাহারা চিরতরে পড়াশুনা ত্যাগ করিয়া শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হয়, এই গুরুতর বিষয়টির প্রতিকার বিশেষভাবে চিন্তনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রতিকারের জন্য ও অক্ষম শিক্ষার্থীদের শিক্ষাপটু করিয়া তুলিবার জন্য শিক্ষকদের বিশেষ শিক্ষাদানের কথাও উঠিয়াছে। শুধু আক্ষরিক শিক্ষা নহে, মনোবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে দৈহিক পটুতা জন্মে, তজ্জন্য খেলাধূলার যথাযথ ব্যবস্থা করার প্রয়োজনও অনুভূত হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষার বিবিধ সমস্যা সম্বন্ধে এই সচেতনতার ফলে যদি প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার সু-সংস্কার সাধিত হয়, তবে তাহা খুবই আনন্দের কথা হইবে।

কিন্তু তাঁহাদের এই চিন্তার ক্রম সেই গতানুগতিক। কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করিলে ছেলেদের তৈরি করা যায়, আজ সেই দিক দিয়াই চিন্তা করিতে হইবে। আমরা যা কিছু করি বা ভাবি তাহার মধ্যেও মৌলিকত্ব নাই। ইউরোপীয় প্রভাব আজও আমাদের মধ্যে সমানে কাজ করিয়া চলিয়াছে। আজকের শিক্ষা-পদ্ধতিকে মোড় ঘুরাইবার ক্ষমতাও তাই ইঁহাদের মধ্যে দেখা যাইতেছে না। এবং সেই সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে, যাঁহারা শিক্ষা দিবেন, তাঁহাদের স্বচ্ছন্দ জীবিকার ব্যবস্থা করা। নিত্য অভাব-পীড়িত শিক্ষকের কাছে সুশিক্ষাদানের প্রত্যাশা করা অবাস্তব ব্যাপার বলিয়াই মনে হয়। তাঁহাদের আগে বাঁচাইতে হইবে। প্রাথমিক স্তরে সু-শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইলে প্রাথমিক শিক্ষকদের জীবন-মানের উন্নয়নের ব্যবস্থা অপরিহার্য্য।

গ-স

তাঁত-শিল্প এবং অন্যান্য শিল্পে পশ্চিমবঙ্গ

শিল্পপ্রধান স্থান বলিতে একদিন বাংলা দেশকেই বুঝাইত। বৃহৎ-শিল্পের দিক দিয়া নয়, কুটির-শিল্প এবং কারু-শিল্পের একটা বড় রকম ঐতিহ্য রহিয়াছে এই বাংলা দেশের। বাংলা দেশের তাঁত-শিল্পজাত 'মসলিন' এক সময়ে সমগ্র জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গের রেশম-শিল্পে এখনও যে শ্রেণীর রেশম-জাত বস্ত্র উৎপন্ন হয়, জগতের আর কোথাও তাহা হয় না। পিতল-কাঁসার দ্রব্যাদিতেও পশ্চিমবঙ্গের সুনাম আজও সর্ব্বত্র। এই সম্পর্কে খেলনা-শিল্প, মাদুর-শিল্প, হাতীর দাঁতে প্রস্তুত বিবিধ উপকরণাদিরও নাম করা যাইতে পারে। এই সব শিল্পের উন্নতির জন্য যথোপযুক্ত চেষ্টা হইলে এবং এই সব শিল্পজাত পণ্য দেশে ও বিদেশে ক্রেতাদের দৃষ্টিপথে আনিতে পারিলে প্রচুর অর্থ পশ্চিমবঙ্গে আসিতে পারে এবং বহু ব্যক্তি জীবিকা-সংস্থানের সুযোগ লাভ করিতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যেভাবে এই সব শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিগণকে সাহায্য করিলে সেই শিল্পগুলি সমধিক উন্নত হইতে পারে এবং যে ভাবে প্রচারকার্য্য করিলে এই শিল্পজাত দ্রব্যগুলি দেশে ও বিদেশে জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে পারে, পশ্চিমবঙ্গে সেইভাবে কাজ হইতেছে না। তাঁত-শিল্পের কথাই ধরা যাক। জগতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গই তাঁত-শিল্পের আদি জন্মস্থান। এক সময়ে এই পশ্চিমবঙ্গ হইতেই ছাপা-তাঁতবস্ত্র ইংলণ্ডে রপ্তানি হইত, এবং এই বস্ত্রের প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ডের বস্ত্র-শিল্পসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল বলিয়া, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আইন প্রণয়ন করিয়া পশ্চিম-বঙ্গ হইতে ইংলণ্ডে তাঁতবস্ত্র আমদানী বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এখনও পশ্চিমবঙ্গের শান্তিপুর, ধনেখালি, বালুচর ইত্যাদি জাতীয় তাঁতবস্ত্র পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ জনপ্রিয় এবং মাদ্রাজ ও অন্যান্য অঞ্চল হইতে আগত রং-বেরঙের শাড়ির প্রতিযোগিতায় এই সব শাড়ির জনপ্রিয়তা কমে নাই। মূলধন, সুতা, বস্ত্রের বিক্রয় ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া এবং তাঁতিগণকে নানাপ্রকার ডিজাইন দিয়া এই সব শাড়ির জনপ্রিয়তা আরও বাড়ান যায়। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য কুটির-শিল্প, কারু-শিল্প ইত্যাদি সম্বন্ধেও অনুরূপ কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ-জাত এই সব উৎপন্ন পণ্যগুলি বিক্রয়ের জন্য যদি মাত্র পশ্চিমবঙ্গবাসীর উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহা হইলে এই সব শিল্পের বেশী উন্নতির সম্ভাবনা নাই। কারণ এই দেশবাসীর ক্রয়ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। বাহির হইতে ধনাগম হইবার সম্ভাবনাই বা কোথায়? সুতরাং ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও এবং বিদেশেও যাহাতে বিক্রয় হইতে পারে সেই চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে করা কর্ত্তব্য।

দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমানে কলিকাতা, উত্তর প্রদেশ, মহীশূর, মাদ্রাজ ইত্যাদি অঞ্চলে উৎপন্ন তাঁত-বস্ত্র ও কারু-শিল্পজাত পণ্য বিক্রয়ের জন্য ষ্টল থাকিলেও, পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন এই জাতীয় পণ্য বিক্রয়ের জন্য অন্যান্য রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের কোন ষ্টল আছে কি না আমাদের জানা নাই। তবে ইহা জানি, দেশের নানাস্থানে যেসব শিল্পপ্রদর্শনী খোলা হয় তাহাতে প্রায়ই পশ্চিমবঙ্গের কোন ষ্টল দেখা যায় না। বাহিরের কথা দূরে থাক, খাস কলিকাতাতেও এমন কোন ষ্টল নাই যেখানে দেশবাসী ও বিদেশীগণ পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। কলিকাতার কোন কেন্দ্রীয় স্থানে পশ্চিমবঙ্গের কুটির ও কারুশিল্পজাত সমস্ত পণ্য প্রদর্শনের জন্য যদি একটি স্থায়ী শিল্প-মিউজিয়াম স্থাপিত হয় তাহা হইলেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

সরকার ইহার পিছনে অর্থব্যয়ও করিতেছেন শুনিতেছি। কিন্তু কাজ কতটা হইতেছে তাহাই ভাবিবার বিষয়। শিল্পের উন্নতি এবং প্রচার বিষয়ে কিছু সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিতে না পারিলে, কেবলমাত্র তাঁত-শিল্প-সপ্তাহ পালনের দ্বারাই কর্ত্তব্য করা হইবে না।

দেখিতে হইবে কি কি কারণে এই তাঁত-শিল্প পশ্চাতে পড়িয়া আছে। প্রথমতঃ, তাঁত-শিল্পের যান্ত্রিক উন্নতি আবশ্যক। যাহাতে হস্তচালিত তাঁতের পরিবর্ত্তে বিদ্যুৎচালিত তাঁত প্রবর্ত্তন হয় তাহার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। ইহাতে উৎপাদন-শক্তি চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইবে। কারণ উৎপাদন বাড়াইতে না পারিলে, প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিবে।

গ-স

দুর্নীতি দমনে অক্ষমতা

বর্দ্ধমান হইতে 'আর্য্য' পত্রিকা জানাইতেছেন :

"বর্দ্ধমান জেলায় এ্যান্টিকরাপসন নামে একটি বিভাগ আছে। এই বিভাগের শৈথিল্য শুধু উল্লেখযোগ্যই নয়, পরন্তু দুর্নীতির তদন্তগুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ করিতে ঐ সংস্থাটি কুণ্ঠিত। এখানকার কোন সংস্থা রিলিফ ওয়ার্কের জন্য জনৈক সৌভাগ্যশালী কনট্রাক্টর দ্বারা মাল-সরবরাহ কার্য্য করান। ঐ কনট্রাক্টরকে দিয়া কিছুকাল পূর্ব্বে কাটোয়া-গোডাউন হইতে মাল আনানো হয়, আবার উহার কয়েকদিন পরেই কাটোয়ায় মাল না থাকার জন্য বর্দ্ধমান হইতে পুনরায় তথায় মাল প্রেরিত হয়? ঐ সময়ে কি কাটোয়া অপেক্ষা নিকটবর্ত্তী গলসীতে মাল মজুত ছিল? সরকারী গো-ডাউনগুলি খালি থাকা সত্ত্বেও এজেন্ট মারফৎ বেসরকারী স্থানে অধিক ব্যয়ে মাল মজুত রাখার উদ্দেশ্যই বা কি? সরকারী গুদামগুলি কি শুধু ঘুঘুর বাসা হইয়া থাকিবে?

স্থানীয় এনফোর্সমেণ্ট উপরোক্ত জাতীয় দুর্নীতিদমনে নিশ্চেষ্ট। শুধু তাহাই নহে, কিছুকাল পূর্ব্বে 'আফতাব ভবনে'র মধুচক্রের তদন্তও যেন সুপ্তরূপে বিরাজ করিতেছে। সহরে ভেজাল তেল, মশলা, খাদ্যদ্রব্যাদি অবাধে বিক্রয়ের প্রতিরোধ করিতেও এই বিভাগ অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে।"

এইরূপ দুর্নীতি সর্ব্বত্র ব্যাপক আকারে দেখা দিয়াছে। প্রতিকার করিবেন যাঁহারা তাঁহারাই যদি 'রক্ষক হইয়া ভক্ষক' হন তবে কি উপায় হইবে? এই অবাধ দুর্নীতির প্রশ্রয় সরকারের অক্ষমতারই পরিচায়ক।

গ-স

দেশ কি অরাজক?

"কিছুদিন হইতে গোয়ালাদের অত্যাচারে নিরীহ চাষীগণ সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছে। গোয়ালারা দল বাঁধিয়া চার-পাঁচ শত গো-মহিষাদিসহ এমনকি বিশ-পঁচিশ মাইল দূরবর্ত্তী শস্যক্ষেত্রে বেপরোয়াভাবে চড়াও হইয়া শস্য খাওয়াইয়া দিতেছে। বাধা দিতে গেলে লাঠিবাজী করিয়া খুনজখম করিতেছে। পুলিসের কাছে অভিযোগ করিতে গেলে খুন করিয়া ফেলিবে বলিয়া শাসাইতেছে।

এবার একে বন্যা ও অতিবর্ষণের ফলে গ্রামবাসীর দুর্দ্দশার সীমা নাই। তাহার উপর চাষীর রক্ত-জল-করা ফসল যদি এই-ভাবে নষ্ট হইয়া যায় তবে ইহার পরিণতি অত্যন্ত সর্ব্বনাশা হইবে।

দলবদ্ধ গোয়ালাদের প্রতিরোধ করার শক্তি নিরীহ চাষীর নাই। আর সেভাবে জোট বাঁধিয়া প্রতিরোধ করিতে গেলে ব্যাপক খুনজখম হইয়া সকলকেই বিপদে জড়াইয়া পড়িতে হইবে।

নাগরিকদের ধনসম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব সরকারের কি না বুঝা যাইতেছে না। অপরাধ করার পরই কি পুলিসের কর্ত্তব্য থাকিবে, অপরাধ যাহাতে না ঘটে সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের দায়িত্ব কি পুলিসের নাই?"

রঘুনাথগঞ্জ হইতে 'ভারতী' পত্রিকা উপরের যে সংবাদটি পরিবেশন করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া সত্যই বলিতে ইচ্ছা করে, 'দেশ কি অরাজক?'

গ-স

ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত প্রসঙ্গে শ্রীনেহরু

ভারতের উত্তর পূর্ব্ব সীমান্তের নেফা, নাগাপাহাড়, মণিপুর ও ত্রিপুরা আসামের মধ্যে যাইবে, কি স্বতন্ত্র থাকিবে এই লইয়া বহু আলোচনা পূর্ব্বেও হইয়াছে, বর্ত্তমানেও হইতেছে। গৌহাটিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছেন, এই সকল অঞ্চলকে আসামের সহিত একই শাসনাধীনে যুক্ত করার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। তিনি তাঁহার এই অভিমতের সপক্ষে কারণও দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে এই সকল অঞ্চলের প্রত্যেকটিরই নিজস্ব সমস্যা আছে এবং আসামেরও কতকগুলি বিশেষ সমস্যা আছে। সমস্যাভারাক্রান্ত আসামের স্কন্ধে আরও বহু সমস্যার বোঝা চাপাইয়া দিলে কেবল যে আসামের অগ্রগতি ব্যাহতই হইবে তাহা নহে, বহু জটিল সমস্যার ভার আসামকে নীচের দিকে টানিয়া নামাইবে। সেই জন্য উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তের এই অঞ্চলগুলির শাসন-ব্যবস্থা ভারত গবর্ণমেণ্টের হাতেই থাকা উচিত। এই সকল স্থানের জটিল সমস্যাবলীর সমাধান করিতে যে প্রচুর সম্বল এবং সামর্থ্য থাকা দরকার তাহা ভারত গবর্ণমেণ্টেরই আছে। যাঁহারা এখন নেফা, নাগা প্রভৃতি অঞ্চলকে আসামের সহিত যুক্ত করিতে চাহেন, তাঁহাদের উদ্দেশে শ্রীনেহরু বলিয়াছেন যে, এইরূপ করিতে গেলে নেফা প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা আসাম হইতে আরও দূরে সরিয়া যাইবে। আসামের সহিত এই সকল অঞ্চলের মিলনের কথা ঐখানকার অধিবাসীদের দ্বারা উত্থাপিত হওয়াই উচিত।

এই কথাগুলি পাঠ করিলেই বুঝা যায় শ্রীনেহরু খুব দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। ইহা খুবই সত্য, সীমান্তস্থিত সকল অঞ্চলগুলির শাসনভার কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হাতেই থাকা উচিত। কারণ, এই শ্রেণীর সমস্ত স্থানই দেশরক্ষার প্রশ্নের সহিত জড়িত। তা ছাড়া, নাগাদের লইয়া বর্ত্তমানে যে সঙ্কট দেখা দিয়াছে, তাহার সমাধানও একান্ত আবশ্যক।

গ-স

দুর্ঘটনার স্বরূপ

দুর্ঘটনা কেন হয়—এ লইয়া কেবল বিচার-বিশ্লেষণ করিলেই ত দুর্ঘটনার হাত এড়ানো যাইবে না। প্রথম দেখিতে হইবে, এই দুর্ঘটনাগুলিকে প্রতিরোধ করিবার জন্য কোন সুষ্ঠু প্রচেষ্টা করা হইয়াছে কিনা। কোন চেষ্টাই হয় নাই। চেষ্টা হইলে, ক্রমবৃদ্ধি হারে ইহা এতটা ব্যাপক হইত না। কিছুদিন আগেও এমন একটি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহাতে অবহেলার একটা দিক স্পষ্টভাবে

উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। দুর্ঘটনাটি ঘটে চৌরঙ্গীর মোড়ে। একটি যুবক মোটর-স্কুটার করিয়া আসিতেছিলেন, লাল আলো দেখিয়া যথারীতি গাড়ীও থামাইয়াছিলেন এবং সবুজ আলো জ্বলিয়া উঠিলে গাড়ী চালাইতে সুরু করেন। কিন্তু হঠাৎ পিছন হইতে একখানি বেসরকারী মোটরবাসের ধাকা খাইয়া তিনি ছিটকাইয়া পড়েন। এবং পরমুহূর্তেই একখানি দোতলা সরকারী বাস আসিয়া তাঁহাকে চাপা দেয়।

আরও কয়েকটি ঘটনার কথা বলি। কয়লাখনি অঞ্চলে পানাগড় হইতে বরাকরের মধ্যে বিভিন্ন রাস্তায় ৩৭টি দুর্ঘটনা ঐ একই দিনে ঘটে। তন্মধ্যে ২৯টিই গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে। হতাহতের সংখ্যা না বলাই ভাল। স্থানীয় ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থাদির জন্য স্থানীয় পুলিসের নিকট আবেদন জানাইয়াছিল। থানার কর্তৃপক্ষ নাকি জানাইয়াছেন যে, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের দুর্ঘটনা সম্পর্কে তাঁহাদের করণীয় কিছু নাই। এত গুরুতর তথা মর্মান্তিক ব্যাপারে এ ধরনের সাফ জবাব যে নিতান্ত হৃদয়হীনতার পরিচায়ক, সেকথা বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নাই। এ বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। দুর্ঘটনা এড়াইবার জন্য যানবাহন চলাচল সম্পর্কে সর্ব্ববিধ সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন ঘটিয়াছে। কলিকাতা বা কয়লাখনি অঞ্চল—যেখানেই হউক না কেন, রাস্তায় গাড়ীর ও লোকের ভিড় অত্যন্ত বাড়িয়াছে। অথচ এত ভিড় ধরাইবার জন্য রাস্তাগুলি চওড়া করা হইতেছে না, রাতারাতি এত চওড়া করা সম্ভবও নয়। এ রকম অবস্থায় ভিড় কমান অসম্ভব, সুতরাং গাড়ীগুলি বেশী বেগে চলিলে দুর্ঘটনা অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং আপাততঃ দুর্ঘটনা এড়াইবার একমাত্র উপায় বাজার, স্কুল, রাস্তার মোড়, সঙ্কীর্ণ রাস্তা প্রভৃতি যে সব স্থানে মুহূর্ত্তের মধ্যে গাড়ী থামাইবার দরকার হইতে পারে, যে সব জায়গায় গাড়ীগুলি ধীরগতিতে চলিতে বাধ্য করা। ইহা ছাড়া দুর্ঘটনা এড়াইবার অন্য কোন উপায় নাই। অনেকে বলিতে পারেন যে, খুব আস্তে গাড়ী চালাইতে হইলে গাড়ী রাখিবার বা চড়িবার সার্থকতা কি? উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, সময় যত মূল্যবানই হউক না কেন, মানুষের জীবন অনেক বেশী মূল্যবান। নিত্য দুর্ঘটনার দ্বারা অমূল্য জীবন-নাশের আশঙ্কা এড়াইবার জন্য হাজার হাজার ঘণ্টা সময় নষ্ট হইলেও আপত্তি নাই। গাড়ী চালাইবার উপযোগী রাস্তা তৈয়ারী করার সামর্থ্য যেখানে নাই, সেখানে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়া দ্রুত চলিবার নেশা ত্যাগ করাই সমীচীন।

গ-স

লরী-চালনার ফলে গোবিন্দপুরে দুর্ঘটনা

খবরের কাগজ খুলিলেই দুর্ঘটনাগুলি নজরে পড়ে। ইহা নিয়মিত এবং একাধিক। আসানসোল হইতে ত্রিশ মাইল দূরে গোবিন্দপুরের নিকট একটি মোটরের সহিত লরীর সংঘর্ষ যেমন শোচনীয় তেমনি মর্ম্মান্তিক। ঘটনাগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায়, লরী-চালকের বে-পরোয়া হওয়ার ফলেই প্রায় এই দুর্ঘনাগুলি ঘটিতেছে। নিহত ও আহতের সংখ্যার দিক দিয়া বিচার করিলে তাহা ভয়াবহ বলিয়া মনে হইবে। এই যাত্রীদল বন-ভোজনের উদ্দেশ্যে পরেশনাথ যাইতেছিলেন। এই শোকাবহ পরিণতি শুধু তাঁহাদের স্বজনবর্গের নহে, মানুষ মাত্রেরই মনে পরম বেদনার সৃষ্টি করিবে।

এই দুর্ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া কয়েকটি কথা আমাদের বলিবার আছে। দুর্ঘটনাসমূহের প্রকৃতি যাঁহারা পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, অধিকাংশ দুর্ঘটনার সঙ্গে লরী বা ট্রাক জড়িত থাকে। লরী বা ট্রাক চালকেরা যেরূপ বেপরোয়াভাবে এবং যেরূপ তীব্র গতিতে যানগুলি চালনা করে, তাহাতে দুর্ঘটনা যে আরও বেশী ঘটে না তাহাই আশ্চর্য্যের কথা। বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে না যে, এই যান-চালকদের অধিকাংশই অ-বাঙালী। এই চালকদের অনেকের মাল-বহনের লাইসেন্স থাকে না বলিয়া ও অনেক সময় তাহারা আপত্তিজনক মাল-বহন করে বলিয়াও সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। অথচ সরকার হইতে যান-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে, তবে কেন এরূপ ঘটিতেছে ইহাই ভাবিবার বিষয়। হয়, সরকার-নিযুক্ত কর্ম্মচারীগণ এ বিষয়ে উদাসীন অথবা টাকা খাইয়া তাহারা বোবা হইয়া বসিয়া আছে। এই দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকদের অবিমৃষ্যকারিতায় বহু লোকের জীবন যাইতেছে। ইহা একদিনের ঘটনা নহে, নিত্য নিয়মিতভাবে হইয়া চলিয়াছে। সরকার কি এই সব চালকের বেপরোয়াপনা নিয়ন্ত্রণ করিতে অক্ষম? অক্ষম না হইলে, বার বার এরূপ ঘটনা ঘটিতেছেই বা কেন? সরকার যদি ইহাদের সতর্কতার সহিত যান-চালনা করাইতে অপারগ হন, তাহা হইলে লরী বা ট্রাক চালনার জন্য পৃথক রাস্তার ব্যবস্থা করুন। ভদ্র, নিরীহ পথচারী বা যান-যাত্রীদের জীবন এইভাবে বিপন্ন করিবেন না।

গ-স

চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নূতন বিস্ময়

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি আজ জগতকে স্তব্ধ করিয়া দিয়াছে। মরা মানুষকেও এই বিজ্ঞানই কিছুক্ষণের জন্য বাঁচাইয়া রাখিতেছে। বিশেষ করিয়া শল্য-চিকিৎসায় এই বিজ্ঞান 'হয়'কে 'নয়' করিতেছে, আবার 'নয়'কে 'হয়' করিতেছে। সদ্যমৃত মানুষের দেহ হইতে উৎপাটিত চক্ষু সংযোজনের দ্বারা দৃষ্টিহীন মানুষকে চক্ষুষ্মান করা সম্ভব, ইহা কি পূর্ব্বে কেহ ভাবিতেও পারিয়াছিল? তাহাও আজ সম্ভব হইল। নিউইয়র্ক রোচেষ্টারের ডাঃ উইলিয়াম কোকোমিজ নামক একজন চক্ষুচিকিৎসক পাটনা হাসপাতালে সম্প্রতি দানাপুরের ১৬ বৎসর বয়স্ক রাখাল বালক শ্রীশ্যামবিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের কার্সিয়াং হইতে আগত ২৪ বৎসর বয়স্কা যুবতী শ্রীমতী খৃষ্টাইনের নয়নতারা সাফল্যজনক ভাবে পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাদের অন্ধত্ব দূর করিয়াছেন।

রোচেষ্টারের আর একজন বিখ্যাত চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ লিওনার্ড

স্রোজ পরলোকগমনের পূর্ব্বে এই চক্ষু দুইটি দান করিয়া যান। নিউইয়র্ক হইতে প্রায় নয় হাজার মাইল পথ অতিক্রম করিয়া চক্ষু দুইটি পাটনায় আনা হয়। লণ্ডন ও কলিকাতা হইয়া জলাধারপাত্রে রেফ্রিজারেটরে করিয়া চক্ষু দুইটি পাটনা বিমানঘাঁটিতে আসিয়া পৌছিলে, পাটনার কুরজী হোলি ফ্যামিলি হাসপাতাল হইতে উহার ডেলিভারী লওয়া হয়।

ডাঃ কোকোমিজ ইতিমধ্যে চক্ষুতে অস্ত্রোপচার দ্বারা এখানকার কয়েকশত দরিদ্র অন্ধের দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া আনিয়াছেন।

যদিও ইউরোপ-আমেরিকায় এই নয়নতারা পরিবর্ত্তন বর্ত্তমানে খুব সহজ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তবে আমাদের দেশে ইহা প্রথম। সে দেশে অনেক দয়াবান মানুষ—জীবন শেষ হইয়া আসিতেছে, আর কোন কিছুর প্রয়োজন নাই বুঝিয়া চক্ষু উইল করিয়া যাইতেছেন। কারণ চক্ষু দান না করিয়া গেলে, এরূপ চিকিৎসা হইতেই পারিবে না। অতঃপর ভারতবর্ষও এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে, ইহা আশা করা যায়। ইহার ফলে বহু দৃষ্টিহীন দৃষ্টি ফিরিয়া পাইবে, এ কি কম সুখের কথা। আজ ডাঃ উইলিয়াম কোকোমিজ শুধু একজন বালক ও যুবতীর দৃষ্টি ফিরাইয়া দিয়াছেন ইহাই শেষ কথা নয়। তাঁর মারফৎ একটি নূতন যুগের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘটিয়াছে এবং এই যুগে বহু অন্ধ ব্যক্তি আলোর মুখ দেখিতে পাইবেন, এই আশা করা যাইতে পারে। তা ছাড়া, যাহাদের চোখ আছে, তাঁহারাও এই ঘটনার মধ্যে আরও একটি সত্য স্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাইবেন—বিজ্ঞান এই বহু সহস্র মাইল বিস্তৃত ধরিত্রীকে কি দুরন্ত আকর্ষণে এক ক্ষুদ্র পরিবারের আত্মীয়তার মধ্যে আনিয়া দাঁড় করাইতেছে। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে, মানুষে মানুষে হানাহানি ও যুদ্ধ যতই চলুক, যতই তার আদিম প্রবৃত্তি, বিভেদ ও দূরত্ব সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করুক, বিজ্ঞান বিশ্বমানবের হৃদয়কে অলক্ষ্য বন্ধনে এবং নিবিড় আত্মীয়তায় টানিয়া আনিতেছে। এই বিস্ময়, এই আত্মীয়তা, এই বিশ্ব-বন্ধন আধুনিক বিজ্ঞানের দান এবং বিংশ শতাব্দীর দান।

গ-স

রোগ-চিকিৎসায় মধু

মধুর ভেষজগুণ অতি প্রাচীন কাল হইতেই মানুষের জানা। কয়েক হাজার বৎসর পূর্ব্বে যখন মিশরে চিত্রলিপি বা 'হিয়েরোগ্লিক'-এর সাহায্যে লেখার কাজ চলিত, সেই সময়ের প্রাচীন মিশরীয় লিপিতে মধুর স্বাস্থ্যপ্রদ এবং ভেষজগুণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র খুব উন্নত হইয়া উঠে বৌদ্ধ যুগে। কিন্তু তাহারও বহু পূর্ব্ব হইতে ঐ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেই মধুর গুণ সম্বন্ধে অসংখ্য উল্লেখ রহিয়াছে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান পুরাণকাহিনীতে মধুকে 'দেবতার খাদ্য' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ভারতে যেমন সুশ্রুতকে বলা হয় 'আদি-আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ', তেমনি গ্রীসের হিপোক্রেটিসকে বলা হয়, 'চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জনক।' এই হিপোক্রেটিস ১০৭ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। তাঁহার এই দীর্ঘায়ু-লাভের রহস্যও নাকি এই মধু। তিনি বলিয়াছেন, প্রত্যহ সকালে আহারের সঙ্গে এক চামচ করিয়া মধু খাইতেন।

রাসায়নিক পদার্থ হিসাবে, মধু হইল এক অতি জটিল জৈব রাসায়নিক তরল পদার্থ। হাজার হাজার ফুল, গাছগাছড়া আর ভেষজ-উদ্ভিদ হইতে সার চয়ন করিয়া মৌমাছি যে ভাবে তাহাদের চাকে এই মধু তৈরী করিয়া রাখে, তাহা কোন মানুষের তৈরী ল্যাবরেটরীতে করা এ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই। এক আউন্স মধু তৈরী করার জন্য একটি মৌমাছিকে দশ হাজার হইতে বার হাজার ফুলের পুষ্পসার আহরণ করিতে হয়। এই ভাবেই একটি মৌমাছি পরিবার একটি ঋতুতেই প্রায় ১৫০ সের পর্য্যন্ত মধু তৈরী করে।

প্রাচীন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মতে মধু যত পুরাতন হয় ততই নাকি তাহার গুণ বাড়ে। অন্তত খাদ্য হিসাবে তাহার গুণ যে কিছুমাত্র নষ্ট হয় না তাহা সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। ১৯২৩ সনে মিশরের একটি পিরামিড হইতে যখন প্রত্নতত্ত্ববিদরা 'ফারাও তুতানখামেন'-এর ৩৩০০ বছরের প্রাচীন মমি বা সংরক্ষিত শব উদ্ধার করেন, তখন সেই সঙ্গে একটি পাথরের পাত্রে রাখা কয়েক সের মধুও তাঁহারা পান। রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই ৩৩০০ বছরের পুরাতন মধু তখনও পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ খাদ্যোপযোগী রহিয়াছে।

ইহার কারণ, মধুর ভিতর রহিয়াছে অতি মূল্যবান কয়েকটি বীজাণুনাশক গুণ। এইজন্যই আঘাত লাগার ফলে বা দগ্ধ স্থানে যে সব পুরাতন ঘা কিছুতেই সারান যাইতেছে না এবং অনবরত তাহা হইতে পুঁজ নির্গত হইতেছে, সে সব ক্ষেত্রে মধু প্রয়োগ করিয়া সুফল পাওয়া যায়। ফোঁড়ার উপরে, পেশীর বেদনায় আর স্ফীত গ্রন্থির উপর চুণ আর মধুর প্রলেপ লাগাইবার ব্যবস্থা ভারতে বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে। তাহা ছাড়া, ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদে প্রায় প্রত্যেকটি ঔষধই মধুর সহিত মিশাইয়া খাইবার রীতিও চলিয়া আসিতেছে।

সোভিয়েট চিকিৎসকেরা বর্ত্তমানে মধুকে আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানসম্মত ভাবে রোগনিরাময়ের কাজে প্রয়োগ করিতেছেন। যেমন, মস্কোর একটি হাসপাতালে ডাক্তার উদিনৎস্কি কয়েকটি রোগীর ফুসফুসের যক্ষ্মারোগ সারিয়া তোলার কাজে পরীক্ষামূলক সাফল্য অর্জ্জন করেছেন। এই রোগীদের প্রত্যেককে প্রতিদিন ১০০ হইতে ১৫০ গ্রাম করিয়া মধু খাইতে দেওয়া হয়। ফলে ইহাদের ক্রমেই কাসি কমিতে থাকে, ওজন বাড়িয়া যায় এবং রক্তের সংযুতি সুস্থতর হইতে থাকে। পাকস্থলীর ক্ষত বা গ্যাসটিক আলসার নিরাময়েও মধু বিশেষ উপকারী বলিয়া দেখা গিয়াছে। মস্কোর নিউট্রিশন ইনষ্টিটিউটের গবেষকেরা এই ধরনের একদল রোগীকে দৈনিক ৬০০ গ্রাম করিয়া মধু খাইতে দিয়া দেখেন যে, প্রত্যেকেরই পেটের যন্ত্রণা, বমির ভাব, বুক জ্বালা প্রভৃতি একেবারে সারিয়া গিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদোক্ত মধু এতকাল আমাদের দেশে

উপেক্ষিতই হইয়া আসিতেছে, এইবারে সোভিয়েট বিজ্ঞানীর কথা শুনিয়া যদি আমাদের চৈতন্য হয়।

গ-স

নয়া দিল্লীতে বিশ্ব-কৃষিমেলা

কিছুদিন পূর্ব্বে দিল্লীতে বিশ্ব-কৃষি সম্মেলন হইয়া গেল, এ সংবাদ সকলেই জানেন। ইহাতে আমরা কি দেখিলাম? দেখিলাম, বিশ্বের কৃষি-প্রতিষ্ঠানগুলি আপন আপন ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিয়া গেল। ইহার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে। আমাদের দেশেও—মেলা-অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যই হইল এই, পরস্পরের সহিত মেলা-মেশা এবং যোগসূত্র স্থাপন। ইহার মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং আপন আপন উৎকর্ষ-সাধনের প্রয়াস সাধিত হইবার প্রচুর অবকাশ আছে। সুতরাং দিল্লীর কৃষি-সম্মেলন এদিক দিয়া উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

কিন্তু আমরা আলোচনা করিতে চাই অন্যদিক দিয়া। এই অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহার এক ভাষণে প্রকারান্তরে বলিয়াছেন, পাশ্চাত্য কৃষিনীতি গ্রহণেই আমাদের মুক্তি।

অবশ্য, এ কথা অস্বীকার করা চলে না, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আমাদের কৃষি-ব্যবস্থা ঢালিয়া সাজিবার প্রয়োজন আছে। কিন্তু যন্ত্রকেন্দ্রিক সেই কৃষিপদ্ধতি ভারতবর্ষে প্রয়োগ করিবার সময় এখনও আসে নাই। তাহার কারণও আছে। এক দিকে যাঁহারা যন্ত্রবিরোধী তাঁহারা যেমন কৃষি-উন্নয়নের কোনও পথ দেখাইতে পারেন নাই, তেমনি অপর দিকে দেখা যায়, পূর্ব্ব পঞ্জাবে ও অন্যান্য অনেক নূতন আবাদি অঞ্চলে যন্ত্রের সাহায্যে (ট্রাক্টর) কৃষিক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতিসাধন করিতেছে। তবু এ কথা বলা অসঙ্গত হইবে না যে, এ দেশের কৃষি-ব্যাপারে আমেরিকা বা সোভিয়েটের মত অতি নির্মম ভাবে যন্ত্র চালনা কোনরূপেই বাঞ্ছনীয় নয়। তাহার কারণও আছে। আমাদের দেশের অবস্থা আর উহাদের দেশের অবস্থা এক নয়। যদিও জল-বায়ু-মাটি প্রায় সকল দেশেই মূলতঃ এক। যাহা কিছু রূপান্তর ঘটে তাহা আবহাওয়ার গুণে। অবশ্য মানুষের বুদ্ধিও ইহার জন্য অনেকখানি দায়ী। কিন্তু সে প্রভেদ সকল সময়ে বা সকল প্রদেশে দুস্তর বাধা নয়। সারের পার্থক্যও কোথাও কিছু নাই। যে পার্থক্য দেখা যায়, তাহা জমির গুণাগুণ এবং ফসলের প্রভেদ অনুসারে। আমাদের দেশে খণ্ড জমির জন্য যে অসুবিধা, তাহাও দূর করা যায় কো-অপারেটিভ ব্যবস্থায় বা অন্য কোন সুব্যবস্থার সাহায্যে। তবে এ কথা নিশ্চিত, এই বিজ্ঞানের সূত্রকে প্রয়োগ করিতে হইবে স্থান, কাল ও পাত্রের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, দেশের আর্থিক অবস্থার সহিত সমতা রাখিয়া। শুধু নির্ব্বিচারে পরের অনুকরণ করিলে সুখের মুখ আমরা কোনও দিনই দেখিব না।

এই বিশ্ব-মেলাও অনুষ্ঠিত হইয়াছে সেই অনুকরণের মনোভাব লইয়া। মেলা জিনিসটা এ দেশে নূতন নয়। ইহারই মাধ্যমে রকমারি পণ্যবস্তুর একত্র সমাবেশ ও দেশ-দেশান্তরের না হউক—দূরদূরান্তরের মানুষের ক্ষণিক মিলন এদেশে প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। এদেশের বহু মেলাই ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আধুনিকতার সজ্ঘাতে তাহার বিলুপ্তি না ঘটিলেও, তাহার প্রকার অনেকটা বদলাইয়াছে। কিন্তু নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব-কৃষিমেলা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস। এখানে বিশ্বের কৃষিসম্পদ আপন আপন নিদর্শন দেখাইতে ব্যস্ত। এইরূপ মেলা ইউরোপে প্রায় ঘটিয়া থাকে। নিয়মিত ভাবে এই ধরনের বিশ্ব-মেলার উদ্যোগ হয় মিলানে, লাইপজিগে, ইউরোপের আরও অনেক শহরে এবং আমেরিকাতেও। এই ধরনের মেলাতে গুরুত্ব দেওয়া হয় শিল্পজাত পণ্যের উপরই। তাহাদের উৎপাদনের বৈচিত্র্য ও সমস্যার উপর গিয়া পড়ে সমস্ত জোর। ভারত চিরদিনই কি এই অবস্থায় থাকিবে? যদি না থাকে, তবে সাধারণের দেখা উচিত, আমরা অন্য দেশের তুলনায় কোথায় আছি। তবে অন্য দিক দিয়া বিচার করিলে, ইহার মঙ্গলের দিকও একটা আছে। সে দেশ-বিদেশের কৃষির প্রসার ও প্রগতি দেখিয়া শিখিবে, কেমন করিয়া ভারত তাহার গৌরবের আসন আবার ফিরিয়া পাইবে।

যে সমস্ত দেশে কৃষিকর্ম্মে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ইদানীং কালে, তাহাদের অনেকগুলিই বিশ্ব-কৃষিমেলায় যোগ দিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও আছে, সোভিয়েট ইউনিয়নও আছে। এ যুগে শিল্প ও কৃষি দুই ব্যাপারেই এই দেশ দুইটির প্রগতি পৃথিবীর প্রায় অন্য সব দেশকেই ছাড়াইয়া গিয়াছে। কেমন করিয়া তাহাদের বিস্ময়কর অগ্রগতি সম্ভব হইল তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে এই বিশ্ব-মেলায়। কিন্তু রাতারাতি তাহাদের নাগাল আমরা ধরিয়া ফেলিতে পারিব, এ আশা দুরাশা। তবে তাহাদের ধারা অনুসরণ করিয়া আমাদের ত্রুটি আমরা অনেকটা সারিয়া লইতে পারিব, এমন আশা করাটা অন্যায় হইবে না। এই সব দিক দিয়া বাংলা দেশ এখনও অনুন্নত। সুতরাং কৃষি-মেলা আমরা যে চোখে দেখি, প্রগতিশীল প্রদেশগুলি সে চোখে দেখে না।

কৃষি-মেলার যে বিবরণ আমরা অন্য প্রদেশের বা বিভিন্ন রাষ্ট্রের 'ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্ট' হইতে পাই, তাহাতে দেখা যায়, দর্শকদের মধ্যে কৃষকের দলই সর্ব্বপ্রধান এবং তাহারাই যাহা কিছু খোঁজখবর লয়। আমাদের উপর ব্যর্থতার তিক্ত অভিশাপ রহিয়াছে সত্য, তাই বলিয়া আমাদের সবকিছুই প্রহসন একথা বলা চলে না। এ ধরনের আন্তর্জ্জাতিক মেলার উদ্দেশ্য পণ্য-বিনিময় ততটা নয়, যতটা ভাব-বিনিময়। নয়া দিল্লীর এই মেলা সার্থক হইবে যদি দেশ-বিদেশের প্রগতি ও প্রাচুর্য্য দেখিয়া আমাদের চৈতন্যের উদয় হয়।

গ-স

হাসপাতাল ও জনগণের স্বাস্থ্য

'বর্দ্ধমান বাণী' জানাইতেছেন :

"রোগের চিকিৎসা, স্বাস্থ্যরক্ষা এবং মহামারী প্রতিরোধ একমাত্র চিকিৎসক ও ঔষধের উপর নির্ভর করে না। সরকার, চিকিৎসক এবং জনগণের সমবেত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। হাসপাতাল আছে জেলা সদরে, মহকুমায় এমন কি পল্লীতেও কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাহা এত স্বল্প যে আনুপাতিক হিসাব উল্লেখ না করাই ভাল। বর্দ্ধমান শহরে বিজয়চাঁদ হাসপাতালে—১০ বছর আগে যে ব্যবস্থা ছিল, আজ জনসংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও সেই অবস্থাতেই আছে। কলিকাতায় রোগী প্রতি যেখানে দু'টাকা আহার্য্য বাবদ বরাদ্দ আছে এখানে এক টাকা ধার্য্য হইয়াছে। এই তারতম্য ঘোচান উচিত।

বর্দ্ধমান শিল্পাঞ্চলে দ্রুত রূপান্তরিত হতে চলেছে। যানবাহনের সংখ্যা বেড়েছে সেই সঙ্গে বেড়েছে দুর্ঘটনা। এমার্জেন্সী ব্লক নাই। প্রাথমিক চিকিৎসা প্রায় রাস্তার উপরই দিতে হয়। এমার্জেন্সী বিভাগে যে রোগী আসে তার পঁচিশ ভাগ দুর্ঘটনাজনিত। অবিলম্বে শয্যাযুক্ত এমার্জেন্সী ওয়ার্ড না খুললে রোগীর পরিচর্য্যা হবে না।

হাসপাতালে সাধারণ মহিলা ওয়ার্ড সম্বন্ধে কিছু না বলাই উচিত। ওখানে সুস্থ রোগী অসুস্থ হয়ে যাবে একদিন থাকলেই। হয় ঐ বিভাগ উঠিয়ে দিতে হবে নয়ত ভেঙে নূতন ঘর তৈরি করতে হবে।"

এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্ত্তব্য।

গোয়ালার অত্যাচার

"রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত গদাইপুর, সোনাটিকুরী, মঙ্গলজুন, ঘোড়শালা, বাঘা, তক্ষক ও শাখালীপাড়া মৌজার সমূহ বিস্তীর্ণ বড়লের বিলের পূর্ব্ব কিনারায় অবস্থিত বলিয়া ইহাদের প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণ উচ্চভূমি আমন ধান চাষের উপযোগী এবং অবশিষ্ট জমিতে রবিশস্য এবং বোরো ধান্য উৎপন্ন হয়। এ বৎসর প্রথম বর্ষায় বৃষ্টির অভাবে আমন ধান রোপনে বিলম্ব হয় এবং শেষ বর্ষায় অতিবৃষ্টির ফলে নামলা ধানের ক্ষতি হইলেও প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কিছু কিছু ফসল আছে। সে সকল ফসল এখনও সম্পূর্ণরূপে পাকে নাই। কেবলমাত্র আউস ধান কাটা হইয়াছে বলিয়া কৃষকগণ দু'বেলা দু'মুঠো খাইয়া বাঁচিতেছে। রবি ফসল সুচারুরূপে বোনা হইয়াছে। আশা করা যায়, রবি ফসল এ বৎসর ভাল উৎপন্ন হইবে। বোরো ধানের বীজবপন সবেমাত্র বিলের ধারে ধারে আরম্ভ হইয়াছে।

কিন্তু এই অবস্থায় এই অঞ্চলে এক ভীষণ উৎপাতের সৃষ্টি হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে প্রায় শতাধিক গোয়ালা তাহাদের হাজার হাজার গরু-মহিষ লইয়া এই অঞ্চলে হানা দিয়াছে। ইহারা কেহই উপরোক্ত মৌজার বাসিন্দা নহে। কয়েকদিন মাত্র আসিয়াই গোয়ালারা বহু জমির কাঁচা-পাকা ধান তাহাদের গরু-মহিষ দ্বারা খাওয়াইয়া তছরূপ করিয়াছে। প্রতিবাদ করিলে তাহারা গ্রাহ্য করে না। ইহাদের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির বা লাঠির সম্মুখে খুন জখম ব্যতীত গরু মহিষ ঘেরিয়া খোঁয়াড়ে দেওয়ার উপায় নাই।"

রঘুনাথগঞ্জের 'ভারতী' পত্রিকা প্রদত্ত এই সংবাদটির প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। গ-স

বাস ও নামাল শ্রমিক

বাঁকুড়ার 'হিন্দুবাণী' পত্রিকা নিম্নলিখিত সংবাদটি জানাইতেছেন :

"চিরাচরিত প্রথা হিসাবে বাঁকুড়ার দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল হইতে সাওতাল ও ভূমিহীন শ্রমিকদের বর্দ্ধমান ও পূর্ব্ব বাঁকুড়ায় গমন সুরু হইয়াছে। ইহাতে বাস মালিকদের মরশুম সুরু হইয়াছে। মালপত্রের বস্তার মত মানুষ বোঝাই করিয়া দক্ষিণ বাঁকুড়া হইতে আনা হইতেছে এবং তাহাদিগকে আবার দুর্গাপুর বা পাত্রসায়ের দিকে পাঠান হইতেছে। বাসগুলিতে যে এ ভাবের ওভারলোড আসিতেছে তাহা রাস্তার কোন পুলিস থানাই লক্ষ্য করা দরকার মনে করে নাই। সাধারণ যাত্রী বিশেষত মাঝ হইতে যাহারা বাসে ওঠার অপেক্ষা করে তাহাদের দুর্দ্দশার শেষ নাই। এমন ঘটনাও বহু শোনা গিয়াছে যে দশ বার ঘণ্টা রাস্তার ধারে বসিয়া থাকার পরও লোক বাস পায় নাই। এই অবস্থা যাহাতে না ঘটে সেজন্য আর-টি-এ কর্তৃপক্ষ কয়েকটি স্পেশ্যাল বাসের রুট পারমিট দিয়াছিলেন কিন্তু বাস মালিকগণ তাহা ব্যবহার না করিয়া সাধারণ রুটের বাসগুলি হইতেই অতি লাভের চেষ্টায় আছেন এবং এই অতি লাভের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে সাধারণ যাত্রীরা। এ বিষয়ে লক্ষ্য করিবার সম্ভবতঃ পুলিস বা আর-টি-এ কাহারও সময় নাই।"

ভাগীরথীর ভাঙন

'বর্দ্ধমান' জানাইতেছেন :

"পুণ্যতোয়া ভাগিরথীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত সাধক কমলাকান্ত, প্রভু চৈতন্য, যুগাবতার রামকৃষ্ণের পুণ্য পদরেণুধন্য কালনা সহর আজ ভাগিরথীর সর্ব্বগ্রাসী ভাঙনের কবলে। বিগত বন্যার পর হইতে প্রতি বছর এই শহর ভাঙনের কবলে পড়িয়াছে। বহু আবেদন নিবেদন করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি তাহার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। অচিরে ইহাকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলে ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ের অন্যতম কেন্দ্রস্থল চিরদিনের জন্য অবলুপ্তির পথে চলিয়া যাইবে। এবং বহু পরিবার বাস্তুহারা হইয়া পড়িবে। আমরা উক্ত এলাকার অধিবাসীদের এই আসন্ন বিপদের বিষয় চিন্তা করিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছি। আশাকরি মাননীয় সরকার বাহাদুর ইহাকে রক্ষা করিবার যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া উক্ত এলেকার অধিবাসীদের রক্ষা করিবেন।"

হুগলী পাবলিক লাইব্রেরী

আমাদের দেশে বহু প্রাচীন গ্রন্থাগার শুধু অবহেলার জন্যই নষ্ট হইয়া যাইতেছে। সম্প্রতি খবর পাওয়া গেল, 'হুগলী পাবলিক লাইব্রেরী'টি অতীব শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছে। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে বিগত ১৮৫৪ সনে হুগলীর কয়েকজন আইনজ্ঞ ও শিক্ষাবিদ কর্ত্তৃক এই লাইব্রেরী স্থাপিত হয়। তারপর ১৯০৮ সনে হুগলী কোর্ট চুঁচুড়ায় স্থানান্তরিত হইলে লাইব্রেরীটিও সেখানে স্থানান্তরিত হয়। এই লাইব্রেরীর বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে, উহাতে নাটক-নভেলের বাহুল্য নাই। এখানে এরূপ অনেক অমূল্য জ্ঞানগর্ভ পুস্তক রহিয়াছে যাহা অন্য কোন গ্রন্থাগারে দুষ্প্রাপ্য। উহার মধ্যে ১৮৪৩ সনে ভারতীয় বাষ্পীয়-যান সম্পর্কে প্রমাণিত একখানি পুস্তক, স্বর্গত সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভারতীয় সঙ্গীত-কলা বিষয়ক একখানি গ্রন্থ, ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অফিসিয়াল কলেকসন ইত্যাদি বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের নাম করা যাইতে পারে। এই সব পুস্তক হইতে বহু কৃতী ছাত্র ও শিক্ষাবিদ তাঁহাদের জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া জাতির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, উপযুক্তরূপে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এই গ্রন্থাগারটি বর্ত্তমানে এক আর্থিক বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছে এবং উহার ফলে গত আগষ্ট মাস হইতে গ্রন্থাগারটি এক প্রকার বন্ধ হইয়াই আছে। যদি এরূপ অবস্থা চলে তাহা হইলে গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত প্রায় সাড়ে আট হাজার পুস্তক উপযুক্তরূপ তত্ত্বাবধানের অভাবে নষ্ট হইয়া যাইবে এবং উহার সহিত বহু মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। এরূপ অবস্থা কিছুতেই ঘটিতে দেওয়া উচিত নয়। আমরা অবগত হইলাম, গ্রন্থাগারের বর্ত্তমানে যে পরিচালক সমিতি রহিয়াছে, তাহার মধ্যে অনেক বিদ্বান ও খ্যাতনামা ব্যক্তি আছেন। তাঁহারা নিজেরা গ্রন্থাগারটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করিতে পারেন। গবর্ণমেণ্টও বর্ত্তমানে গ্রন্থাগারের প্রসারের জন্য বৎসরে কয়েক লক্ষ টাকা করিয়া ব্যয় করিতেছেন এবং উহাদের এই গ্রন্থাগারের সাহায্যে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। মোটের উপর এই গ্রন্থাগারটি একটি জাতীয় সম্পদ। উহা কিছুতেই বিনষ্ট হইতে দেওয়া উচিত হইবে না। গ-স

সুরেন্দ্রনাথের বাসভবন

মনীষিদের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা সরকার করিবেন ইহা সকলেই আশা করে। পরাধীনতার ফলে যাহা এতদিন সম্ভব হয় নাই, আজ স্বাধীন রাষ্ট্রে কেন তাহা সম্ভব হইতেছে না, ইহাই আমাদের প্রশ্ন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দীনবন্ধু মিত্র—বাংলার তথা ভারতের ইতিহাসে দুইটি চিরস্মরণীয় নাম। পরাধীন ভারতে জাতীয় চেতনার উদ্বোধনে সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতা, মনীষা ও অসামান্য রাজনীতিজ্ঞতা যে প্রেরণার সঞ্চার করিয়াছে, ভারতবাসী নিতান্ত অকৃতজ্ঞ না হইলে তাহা কখনও বিস্মৃত হইবে না। আর দীনবন্ধুর সাহিত্য-কীর্ত্তি—বিশেষতঃ নীলকরদের নৃশংস ও বীভৎস অত্যাচারের রক্তাক্ষরে লিখিত বাস্তব চিত্র 'নীলদর্পণ' বাংলা সাহিত্যে অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। জাতীয় জীবনে যাঁহাদের দান ভুলিবার নয়, তাঁহাদের স্মৃতিবিজড়িত বাসভবনগুলি জাতির তীর্থক্ষেত্ররূপে যাহা পরিগণিত হওয়া উচিত ছিল এবং জাতীয় সম্পদরূপে যাহা সংরক্ষিত হওয়া অবশ্যকরণীয় ছিল, শুনা যাইতেছে, সেগুলি পরহস্তে বিক্রীত হইবার উপক্রম হইয়াছে, ইহা অত্যন্ত দুঃখের কথা। এইরূপে আমরা পূর্ব্বে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়ীও হারাইয়াছি।

ইহাতে দেশের কৃতী সন্তানগণের স্মৃতি-সংরক্ষণে-উদাসীন দেশের সরকারের তথা দেশবাসীর চিত্তের দৈন্যই সূচিত করে। এ দেশে মাইকেল মধুসূদনের অমর সাহিত্যকীর্ত্তির সঙ্গে বিজড়িত ভবন জাতীয়করণে সরকারের ঔদাসীন্য দেশবাসীর মনোবেদনার কারণ হইয়া রহিয়াছে। এই দুই স্মরণীয় পুরুষের বাসভবনও যদি সরকার ও দেশবাসীর উদ্যমাভাবে নষ্ট বা হস্তান্তরিত হয়, তবে সমস্ত দেশের পক্ষেই তাহা লজ্জার কারণ হইবে। সরকার এইগুলি সংরক্ষণ করিতে তৎপর হন, ইহাই অনুরোধ। গ-স

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

গত ৩০শে জানুয়ারী প্রবীণ সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৯ বৎসর হইয়াছিল। বয়স হইলেও, তাঁহার এমন আকস্মিক মৃত্যু হইবে কেহ ভাবিতে পারেন নাই।

১৮৮১ সনে উপেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। ভাগলপুরের গাঙ্গুলীরা ছিলেন প্রতিষ্ঠাবান পরিবার। উপেন্দ্রনাথ সেই পরিবারের সন্তান। প্রথম জীবনে তিনি ভাগলপুরেই ওকালতি করিতে সুরু করেন। পরে তাঁহার ঐ কাজ মনঃপূত না হওয়ায়, সাহিত্য-সেবাকেই তিনি বাছিয়া লইলেন।

সাহিত্যিক হিসাবে যে তাঁহার স্থান কোথায়, সেকথা আজ আর নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। উনবিংশ শতাব্দীর ভাবধারায় লালিত হইয়াও, বিংশ শতাব্দীর জীবনকে তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। পুরাতন কালের মানুষ হইয়াও, নূতন কালের মানুষকে তিনি আপন করিয়া লইয়াছিলেন। এ ক্ষমতা সকলের থাকে না। সাহিত্যের ক্ষেত্রে আজ যাঁহারা খ্যাতিমান, প্রথম দর্শনেই তাঁহাদের শক্তিকে স্বীকৃতি জানাইতে তাঁহার কখনও দ্বিধা হয় নাই। উপেন্দ্রনাথ শুধু সাহিত্যিকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন সাহিত্য-নায়ক। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সেই নেতৃত্বের দায়িত্ব তিনি অপরিসীম নিষ্ঠার সঙ্গেই বহন করিয়া গিয়াছেন।

তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'শশিনাথ', 'অমূলতরু', 'অভিজ্ঞান', 'রাজপথ' প্রভৃতি উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদরূপে চিহ্নিত হইয়া থাকিবে।

কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার ৭৯তম জন্মদিবস অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কে জানিত, দেশবাসীর নিকট হইতে ইহাই তাঁহার শেষ সম্বর্দ্ধনা। গ-স

ভারতের সংস্কৃতি

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

"সংস্কৃত" অর্থে,—মার্জিত, নির্মলীকৃত, শোধিত,—সুবর্ণের অগ্নি সংস্কারে তাহার মলিনতা নষ্ট হওয়ায় সুবর্ণ যেমন বিশুদ্ধ উজ্জ্বল এবং ভাস্বর হয়, সংস্কৃতি বা সংস্কারের ফলে ব্যক্তি বস্তু মানব-সভ্যতা ও সমাজও তেমনি নির্মল উজ্জ্বল এবং উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

সংস্কৃত ভাষা—প্রাচীন ভারতের বৈদিক দার্শনিক, পৌরাণিক তথা সাহিত্যিক ভাষা মার্জিত অলংকৃত সুসংবদ্ধ ও পারিপাট্যসম্পন্ন—এবং সে জন্যই উহাকে 'সংস্কৃত' বলা হয়।

বস্তু সংস্কার, গৃহসংস্কার, পথঘাট সংস্কার বা ইষ্টাপূর্তাদি এই প্রবন্ধের বিষয় নহে। লোক-সংস্কৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আমার বক্তব্য।

সংস্কৃতির তারতম্য—মানুষ সংস্কৃত না হইলে তাহাকে ব্রাত্য বলা হয়। অর্থাৎ 'ব্রতং অতীত্য তিষ্ঠতি। সংস্কৃত হইবার জন্য যে যে ক্রিয়া কর্মপদ্ধতি বা ব্রতাদি তাহাই সংস্কার। সে জন্যই বলা হয়—

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদুচ্যতে দ্বিজঃ
বেদাভ্যাসাত্তবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥

এই জ্ঞান-তারতম্যের জন্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদি দ্বিজ এবং এবম্বিধ জ্ঞান বা সংস্কারের অভাবে শূদ্র এইরূপ শ্রেণী বিভাগ প্রাচীন ভারতে করা হয়।

সংস্কার অনুযায়ী দ্বিজ বা শূদ্র আখ্যা দেওয়া হইত। প্রথম জন্ম মাতৃ গর্ভ হইতে—দ্বিতীয় জন্ম উপনয়ন সংস্কার হইতে গণ্য করা হইত। "প্রথমং মাতৃগর্ভাৎ স্যাৎ দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।"

অতঃপর "অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্যং দয়ার্জবং"—এবং আহার শুদ্ধি প্রভৃতি সংযমাভ্যাসের ফলে চিত্তশুদ্ধি লাভ হইত। "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ"—এইরূপ শুদ্ধি ও সংস্কারের ফলে—"ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ"—আত্মা দেহ মন বুদ্ধি ব্রহ্ম বিষয়ক শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের উপযোগী হয়।

দশবিধ সংস্কার- জাতকর্মের পূর্ব হইতেই এই সংস্কারের বিধান ছিল। যথা "গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্তন ও বিবাহ।"

পুরাকালে আর্যকুমারীগণেরও উপনয়ন সংস্কার হইত। যথা বৌধায়ন সূত্রে—"পুরাকল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জিবন্ধনমিষ্যতে অধ্যয়নঞ্চ বেদানাং সাবিত্রী বচনং তথ।" তাঁহারাও কুমারগণের ন্যায় শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে পরিনিষ্ঠিতা হইয়া নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণীও হইতে পারিতেন এবং ব্রহ্মতত্ত্বে নিষ্ণাত হইতেন।

উপনয়ন সংস্কার হইতেই পঞ্চ মহাযজ্ঞের আচরণ আরম্ভ হইত—দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ। দেবযজ্ঞ—পূজোপাসনা, ঋষিযজ্ঞ শাস্ত্রপাঠ, পিতৃযজ্ঞ শ্রাদ্ধ তর্পণাদি, নৃযজ্ঞ অতিথিসেবা ভূতযজ্ঞ জীবকে অন্নদান।

আহার ও আচার—আহারে এবং আচারে সতত সাবধান হওয়ার অনুশাসন ছিল। কারণ "আচার প্রভবো-ধর্মঃ।" আহার সম্বন্ধেও একই কথা। ক্ষুধাকে বৈশ্বানর অগ্নি বলা হয় (গীতা ১৫।১৪) নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তি প্রাণাগ্নিহোত্র। পরের ক্ষুন্নিবৃত্তি ভূতযজ্ঞ বলিয়া খ্যাত। তাই আহারের প্রথম পঞ্চগ্রাস পঞ্চপ্রাণকে আহুতি দেওয়া হয়। প্রাণায় স্বাহা ইত্যাদি বলিয়া।

ভোগ ও ত্যাগ—এই আহুতি বা উৎসর্গ প্রসঙ্গে 'স্বাহা' মন্ত্রটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ইহার ব্যুৎপত্তি স্ব+আ+হু+ড+আ অর্থাৎ স্বং বা আত্মানম্ আজুহোমি। অর্থাৎ নিজেকেই আহুতি দিলাম। নিজের অহমহমিকা অহং মমত্ব প্রভৃতি অভিমান সহ। তাহার মন্ত্র ছিল—"মাং মদীয়ং সকলং সম্যক্ ...সমর্পয়ামি স্বাহা।"

ঐহিক জীবনে সংস্কৃতির সাধনায় এবং ধর্মের প্রতিষ্ঠায় ভোগের স্থান অবশ্যই আছে, কিন্তু সে ভোগ সংকীর্ণ স্বার্থের অন্বেষণ বা পরস্বাপহরণ করিবে না, বৃহত্তর জীবনাদর্শে ত্যাগের মুখে ভোগ করিবে। তাই বিধি ছিল—যজ্ঞ সম্পূর্তির পর যজ্ঞাবশেষ হোতা গ্রহণ করিবেন। অধ্যাত্ম শক্তির স্ফুরণ ভোগের মুখে হয় না, কারণ ভোগের দ্বারা বুভুক্ষারই বৃদ্ধি হয় ভোগাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না। তাই শ্রুতি বলেন, "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" (ঈশোপনিষৎ)।

প্রকৃতি, বিকৃতি ও সংস্কৃতি—'সংস্কৃতি' শব্দের অর্থ এবং বিনিয়োগ বুঝিতে হইলে 'প্রকৃতি' ও বিকৃতি শব্দ দুইটির অর্থও প্রণিধানযোগ্য। প্রাণী মাত্রেই ক্ষুধা পাইলে খায়, মানুষও ক্ষুধা পাইলেই খায় সুতরাং ক্ষুধা পাইলে খাওয়া প্রাণী মাত্রেরই প্রকৃতি, মানুষেরও। কিন্তু মানুষ অখাদ্য

খায়—বিকৃত রুচিবশতঃ গর্ভবতী নারী মাটি খায় এবং শিশুরাও খায় (Geophagy) ক্ষুধা না পাইলেও খায় এবং ক্ষুধার অতিরিক্তও খায়—ইহা তাহার 'বিকৃতি'।

তাই আচার্য্য বিনোবাজী বলেন যে, যখন মানুষ-ক্ষুধার্ত্তকে খাওয়াইবার জন্য নিজে উপবাস করে, নিজের মুখের গ্রাস নিঃসম্পর্ক অনাত্মীয় অতিথিকে তুলিয়া দেয় তখন তাহা হয় তাহার 'সংস্কৃতি'। 'সংস্কৃতি' কখনও মন্দ অর্থে ব্যবহৃত হয় না। (ভূদানযজ্ঞ ২২শে মার্চ ১৯৫৮ পৃঃ ৫১)

ভারতের ভেদ ও ঐক্য—ভারতে জাতিভেদ প্রথার প্রতি পাশ্চাত্ত্যদেশীয়েরা অনেকে কটাক্ষ করেন, কিন্তু এক বিষয়ে ভারত অগ্রসর, ইয়ুরোপ অনগ্রসর। ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বহু সহস্র বৎসরের প্রাচীন। এখানে ঐতিহ্যপূর্ণ ও শক্তি সম্পন্ন দশ-বারটি ভাষা প্রচলিত আছে। তথাপি বিভিন্ন প্রদেশে ধর্ম্মের মাধ্যমে এক ভারতীয় রাষ্ট্র-বোধের স্বীকৃতি আছে। কেহই এ কথা বলেন না যে রাজ্যগুলি ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র হউক। অথচ এই প্রদেশগুলি ফ্রান্স জর্মনী, ইটালী, গ্রীস, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম-এর তুলনায় ক্ষুদ্র নহে। 'বাল্‌কান' ষ্টেটগুলি পৃথক পৃথক ভাগে বিভক্ত হইয়া যাওয়ায় ইংরাজীতে একটি নূতন শব্দই উদ্ভূত হইয়াছে Balkanisation ; সুতরাং কুমারিকা হইতে হিমাচল পর্যন্ত এই ভারতীয়তার বোধ, সাজাত্য ও সাধর্ম্যের বোধ, ইহা ভারতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বলিতে হইবে এবং ইহা তাহার প্রাচীন সংস্কৃতি প্রসূত।

সত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম ও রাজনীতি—সনাতন সত্যের সর্ব-ব্যাপী রূপ প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে হইলে মহাত্মা গান্ধী বলেন, "One must be able to love the meanest creation as oneself" অর্থাৎ "আত্মোপম্যেনভূতেষু দয়াং কুর্বন্তি সাধবঃ।" তিনি আরও বলেন,

"A man, who aspires after that, cannot afford to keep out of any field of life. That is why my devotion to truth has drawn me into the field of politics, and I can say, without the slightest hesitation, and yet in all humility, that those who say that religion has nothing to do with politics—do not know what religion means."

ভারতের 'ধর্ম' ও ইংরেজী 'religion' এক বস্তু নহে—মহাত্মাজী ভারতীয় ব্যাপক অর্থেই 'religion' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন যাহা মনুষ্য সমাজের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ধারণ করিয়া আছে তাহাই 'ধর্ম'।

সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য—সভ্যতা ও সংস্কৃতির ফলে সমগ্র মানব-জাতির মধ্যে অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য থাকিলেও প্রত্যেক মানবগোষ্ঠীর কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। প্রত্যেক দেশেরই আপন আপন বিশিষ্ট সত্তা আছে। এই বৈশিষ্ট্য গড়িয়া উঠে সেই সেই দেশের আপন আপন বিশেষ পরিবেশে। কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে, ভৌগোলিক পরি-স্থিতির সঙ্গে, ইতিহাসের ধারা এবং সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে চলিতে প্রত্যেক মানবগোষ্ঠী এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়, আপন সহজাত স্বভাব, শিক্ষা এবং সাধনায়, তাহার সমষ্টিগত সিদ্ধির উত্তরাধিকার সূত্রে।

সংস্কৃতির ঐতিহ্য—আবহমান অতীতের ঐতিহ্যের প্রভাব হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা সকল জাতির পক্ষে, অশুভ এবং অশোভন তাই ভাগবত বলেন, "আজীব্যৈকতরং ভাবং যস্তন্যমুপজীবতি ন তস্মাদ্বিন্দতে ক্ষেমং জারং নার্যসতী যথা।" যদিও মানুষের সঙ্গের দ্বারা মানুষ যেমন প্রভাবিত হয়, সেইরূপ এক জাতির সম্পর্কে—অপর জাতি,—এক সভ্যতার সংস্পর্শে অপর এক সভ্যতাও অবশ্যই প্রভাবিত এবং পরিবর্তিত হয়। ভারতবর্ষও এইরূপ অসংখ্য জাতির সংস্পর্শে আসিয়াছে যথা :

"কিরাতহূনান্ধ্র পুলিন্দ পুক্কশা।
আভীর শুম্ভা যবনাঃ খসাদয়ঃ॥"

ইহাদের সংস্পর্শ এবং ইহাদের সহিত সংঘর্ষের ফলে ভারতীয় সংস্কৃতিরও পরিচ্ছদ পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

খাদ্যের পরিপাকের ফলে যেমন মানুষের শরীর পুষ্টিলাভ করে সেইরূপ আবহাওয়া, আহার্য ও পানীয়ের ফলে জাতির দেহ গঠিত হয় এবং শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অনুশীলনের ফলে জাতির চিন্তা ও ভাবধারাও এক বিশিষ্ট প্রণালীতে প্রবাহিত হয়। 'বিজ্ঞান'—বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের অনুশীলনপরায়ণ এবং 'দর্শন' বিভিন্ন জ্ঞানের সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করিতে, তাহাদের শাশ্বত মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে এবং তাহাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতে যত্নবান।

ভাবী ভারতের জাতীয় সংস্কৃতির সৌধ—নির্ম্মাণ করিতে হইলে তাহার 'প্ল্যান' বা পরিকল্পনা একটি বিরাট অট্টালিকা নির্মাণের প্রণালীতেই করিতে হইবে। বৃহৎ অট্টালিকা গঠন করিতে হইলে তাহার ভিত্তি যেমন সুগভীর হওয়া প্রয়োজন, এবং সেই ভিত্তি দৃঢ়ভূমি বা প্রস্তর-কঠিন মাল-ভূমির উপর স্থাপিত হইলে তাহার স্থায়িত্ব যেরূপ অবিনশ্বর হয়, সেইরূপ জাতির ভিত্তিস্থানীয় জাতীয় চরিত্র যদি নৈতিক বল এবং আধ্যাত্মিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে সেই জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল এবং উৎকর্ষ অবিধ্বংসী হইয়া থাকে। প্রস্তর নির্মিত অট্টালিকাও যদি বালি বা নমনীয়

ভূমির উপর নির্মিত হয়, তাহা হইলে অচিরেই তাহার ভিত্তিতে ফাট ধরে, ভিত্তি বসিয়া যায় এবং কালক্রমে অট্টালিকাও ধ্বসিয়া যায় এবং তাহার প্রস্তরাদি খসিয়া পড়িয়া গৃহবাসীর প্রাণহানির কারণ হয়।

জাতীয় চরিত্র—দেশের এবং জাতির সাধনায় কোন উচ্চতর বা বৃহত্তর পরিকল্পনা থাকিলে জাতির মেরুদণ্ডরূপ নৈতিক চরিত্রের উন্নতি এবং উৎকর্ষ বিধান না করিলে সমস্ত আশা ও কল্পনা—মরীচিকায় পর্যবসিত হয়।

সংস্কার বা সংস্কৃতি শব্দের ব্যবহারিক অর্থ হইল শুদ্ধি-জনক কার্য। এই সংস্কৃতি নির্ভর করে মানুষের সভ্যতা-জনিত উন্নতি ও উৎকর্ষ লাভের উপর। পূর্বেই বলিয়াছি যে সংস্কারের অর্থ নির্মলীকরণ—জীর্ণোদ্ধার সাধন, মার্জন-শোধন প্রোক্ষণ প্রভৃতির দ্বারা পরিষ্কারকরণ প্রভৃতি বুঝায়। সংস্কৃতির এই অংশটি negative অর্থাৎ বর্জন বা ব্যবকলনের দিক। অন্য অংশটি positive বা ধনাত্মক, তাহা অর্জন, সংযোজন বা সংকলনের দিক।

বর্জনের দিকে পড়িবে, দোষ দূর করা—অর্থাৎ যথা সম্ভব এবং যথাসাধ্য দোষ পরিহারপূর্বক জীবনকে নির্দোষ নিষ্কলঙ্ক এবং নির্মল করা।

অর্জনের দিকে পড়িবে,—সত্য, ক্ষমা, ত্যাগ, আত্মসংযম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, শুচিতা, পৌরুষ এবং উদারতা প্রভৃতি গুণকে নিষ্ঠার সহিত—আশ্রয় করা।

গীতার ষোড়শাধ্যায়ে—বর্জনীয় দোষগুলিকে আসুরী সম্পদ এবং অর্জনীয় গুণগুলিকে দৈবী সম্পদ বলা হইয়াছে। এবং বলা হইয়াছে—"দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা"। অর্থাৎ আত্মা দেহ এবং মন-কে সংস্কৃত পরিশুদ্ধ নির্মল এবং নির্মুক্ত করিতে হইলে চাই দৈবীসম্পদ এবং আপন সত্তাকে পৃথিবীর আবিলতা, সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতার দ্বারা আষ্টে পৃষ্ঠে আবদ্ধ করিতে হইলে চাই আসুরী সম্পদ। প্রকৃতপক্ষে শেষোক্ত তথাকথিত সম্পদগুলি মানুষের সর্ববিধ অগ্রগতির অন্তরায় এবং সকল বিপদের কারণ।

ব্যক্তি বা ব্যষ্টির পক্ষে যে কথা সত্য, সমষ্টিগতভাবে জাতির পক্ষেও সেকথা সমানভাবে প্রযোজ্য।

সভ্যতা ও শিক্ষা—ইংরেজীতে—Civilization বলিতে বুঝায় culture, refinement of feelings taste & manners, freedom from crudeness, coarseness and vulgarity, এবং তাহার সহিত development of arts & science, embellishment of mind & intellect. চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে এই সভ্যতা প্রকৃত সভ্যতা অর্জন করিতে হইলে দৈবীসম্পদ অর্জন এবং চরিত্র গঠন ব্যতীত হইতে পারে না। বর্তমান সভ্যতার ফলে বিভিন্ন দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমরা যে দৃশ্য দেখিতে পাই তাহা অনেক ক্ষেত্রেই সভ্যতার রেশমী পোষাক পরা মুখোস ঢাকা বর্বরতা। এতদ্দেশীয় পণ্ডিতেরা বলেন,

"দুর্জনঃ পরিহর্তব্যো বিদ্যয়ালঙ্কৃতোঽপি সন্
মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ?"

তাহার ছবি আমরা আলোকচিত্রে দেখি, ডিটেকটিভ গল্পে পড়ি এবং প্রত্যেক দিনের ফৌজদারী আদালতের বিবৃতিতে তাহার নগ্নরূপ দর্শন করি।

সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক—ইদানীং যে কয়জন মহা-পুরুষ ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের দায়িত্ব বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বিবেকানন্দ, তিলক, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী ও বিনোবাজীর নাম অবশ্য স্মরণীয়। ইঁহারা সকলেই ভারতের এবং ভারতীয় সংস্কৃতির উজ্জীবনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

সঙ্কীর্ণতা—সর্ববিধ সংস্কৃতি এবং অগ্রগতির পথে মহান্ অন্তরায়। সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে নিজের চতুর্দিকে প্রাচীর তুলিয়া, কূপ মণ্ডুকের মত তাহাকেই জগৎ মনে করিলে শুধু আত্মপ্রবঞ্চনা করা হইবে। বিশ্বকে উপলব্ধি করিয়া, 'এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে'—বিশ্বকে আমন্ত্রণ করিয়া—"যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্" এইরূপ 'বিশ্বভারতী' নির্মাণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ যথার্থ বিশ্বকবি হইয়াছেন।

জাতীয়তার প্রয়োজন ও সীমারেখা—যতদিন কোনও দেশ বা জাতি পরপদানত থাকে ততদিন তাহার সঙ্কীর্ণ অর্থে 'জাতীয়তা বা patriotism বা nationalism'এর মুখ্যতঃ প্রয়োজন আছে, নচেৎ জাতীয়তার নামে ইতিহাস যে অত্যাচার, অনাচার এবং শোণিতস্রাবের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছে তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। তাই রবীন্দ্র-নাথ বলিয়াছেন, "Nationalism is a cruel epidemic that is sweeping over the world and eating its moral vitality" গত মহাযুদ্ধে অ্যাটম বোমা দ্বারা (৬ আগষ্ট ১৯৪৫) হিরোসিমা-নাগাসাকিতে অন্যূন ২ লক্ষ নিরীহ নর-নারীর হত্যা, ইতিহাসে চিরদিন রক্তাক্ষরে (!) লেখা থাকিবে।

স্বাধীনতার অর্জন, পালন এবং রক্ষার জন্যই জাতির এই গণ্ডী দিয়া আত্মরক্ষার প্রয়োজন এখনও রহিয়াছে এবং ততদিন থাকিবে যতদিন না—United Nations তাঁহাদের সমষ্টির প্রতিভা সংযোগে—এক সম্মিলিত অখণ্ড জগৎ বা One world-এর পরিকল্পনাকে শাশ্বতিক শান্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন। বিশ্বমানবতা বোধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ গদ্যে পদ্যে পত্রে এবং প্রবন্ধে অনেক কিছু লিখিয়াছেন। তিনি ছিলেন বিশ্বমানবতা

বোধের মূর্ত প্রতীক। তিনি দেশের মাটিকে প্রণাম করিয়াছেন—

'হে আমার দেশের মাটি তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা—
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।'

তাঁহার 'ব্যাধি ও প্রতীকার', 'মানুষের ধর্ম' প্রভৃতি অসংখ্য প্রবন্ধ এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

সংস্কৃতি ও উদারতা—সাহিত্য সৃষ্টির পথেও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি মানুষের মনুষ্যত্বকে ক্ষুণ্ণ সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ করে, তাহার সৃজনী প্রতিভাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে। চিত্র সঙ্গীত, ললিত-কলা ও ভাস্কর্য সম্বন্ধেও একই মন্তব্য প্রযোজ্য।

ভারতীয় সংস্কৃতির মূলভিত্তি উদারতা, সার্বজনীনতা এবং বিশ্বমৈত্রীর উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই আমরা শিখিয়াছি—

অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাম্—
উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥

তাই এখানে "সর্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ", অতিথি সর্বত্র গুরু এবং বরণীয়। "সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম"—সর্বভূতে সমদৃষ্টি লাভ হইলেই ঈশ্বরে পরাভক্তি লাভ হয়। "শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।"

সংস্কৃতি ও ধর্ম—ধর্মের প্রসঙ্গেও এই উদারতা অবশ্য প্রযোজ্য। বৈদিক ঔপনিষদিক ধর্ম গীতায় প্রচারিত ধর্ম, যে ধর্মের উপর রামমোহন প্রভৃতি সমাজ সংস্কারকেরা জাতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন, তাহা মানুষের ব্যক্তিকে বা ব্যষ্টিকে সম্মান এবং স্বীকৃতি দান করিয়া তাহার উপর সমষ্টিকে—অর্থাৎ সমাজকে—তথা জাতিকে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে। ব্যক্তি মানুষ যে 'নর', সে নারায়ণেরই প্রতীক। শ্রুতি বলেন, "এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।"
তুলসীদাস বলেন, "সব ঘট বিরাজে রাম।" বিবেকানন্দ বলেন, "জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন পূজিছে ঈশ্বর।" ভাগবত বলেন,

যো মাং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
হিত্বার্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥

সর্বভূতস্থ পরমেশ্বরকে ত্যাগ বা অবহেলা পূর্বক যে মূর্তি-পূজা সে কেবল ভস্মে ঘি ঢালিয়া হোম করার মত পণ্ডশ্রম। মহাভারত বলেন, "ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ"।

ইহাকেই চণ্ডিদাস তাঁহার অনবদ্য কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন, "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

এই প্রসিদ্ধ শ্লোকে 'জয়' শব্দটির অর্থে সাধারণ জয় বা বিজয় মাত্র নহে 'জয়' শব্দের অর্থ রামায়ণ মহাভারত পুরাণাদি ধর্ম শাস্ত্রকে বুঝায় যাহা পাঠ বা অনুশীলন করিলে আমরা সংসার 'জয়' করিতে এবং সংসারের বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে সমর্থ হই।

ধর্মান্ধতা—ধর্ম এবং সমাজের গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'অচলায়তন'কে রূপ দিয়াছেন। এই মূঢ়তাকে ভর্ৎসনা করিয়া তিনি লিখিয়াছেন :

"আমাদের দেশে ধর্মই মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ ঘটাইয়াছে। আমরাই ভগবানের নাম করে পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করেছি। স্ত্রীলোককে হত্যা করেছি, শিশুকে জলে ফেলেছি, বিধবাকে নিতান্তই অকারণে তৃষ্ণায় দগ্ধ করেছি, নিরীহ পশুদের বলিদান করেছি এবং সকল প্রকার বুদ্ধি যুক্তিকে লঙ্ঘন করে এমন সকল নিরর্থকতার সৃষ্টি করেছি যাতে মানুষকে মূঢ় করে।" (শ্রীগোপালকৃষ্ণ রায় উদ্ধৃত পত্র—২০শে আষাঢ় ১৩১৭। সংহতি পত্রিকা জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫ দ্রষ্টব্য)

মহাকবি দেশের জড় বুদ্ধিকে কষাঘাত করিয়া মানবতার প্রতি মমত্ববোধ জাগাইতে চাহিয়াছেন।

ভারতীয় সংস্কৃতি যখন বহু সহস্র বৎসরের অসংস্কার এবং পরাধীনতা নিবন্ধন অবসাদের ফলে, আপন সংস্কৃতির শস্য ত্যাগ করিয়া তুষমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছিল, যখন ভারত সন্তান আপন শোণিত স্রাব করিয়া বিদেশীয় জলৌকার পুষ্টি সাধন করিতেছিল, ধর্ম যখন 'বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ী'র প্রথায় পাকশালায় প্রবেশ করিয়া নিজের 'পাক' (!) বা পবিত্রতা রক্ষা করিতেছিল, তখন সংস্কৃতির ঘোর দুর্বিপাক উপস্থিত হইয়াছিল তাই এই যুগন্ধর পুরুষেরা মিষ্ট কটু নানাবিধ মিঠে-কড়া বচনে জাতির আরোগ্যার্থে আঘাত-চিকিৎসায় (shock treatment) ব্রতী হইয়া তাহার অপ্রকৃতিস্থতা দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

প্রকৃত ধর্ম—মৌলিক অর্থে 'ধর্ম' শব্দের অর্থ অতি ব্যাপক এবং উদার। "ধারণাদ্ধর্ম ইত্যাহুর্ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ। যঃ স্যাৎ ধারণসংযুক্তঃ স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।" অর্থাৎ ধর্মই সমাজ এবং জাতিকে ধারণ করিয়া তাহাদের একতা ও সমগ্রতা (integrity) রক্ষা করে। ইহাই ভারতের প্রকৃত ধর্ম।

ধর্ম এবং সঙ্ঘ—শ্রীরামকৃষ্ণ 'চারাগাছে'র উপমা দিয়াছেন। তাহাকে যেমন বেড়া দিয়া বাঁচাইতে হয় চতুষ্পদের বুভুক্ষু আক্রমণ হইতে—তেমনি করিয়া কোমল এবং নমনীয় শৈশবের অপরিণত অবস্থায় মানুষের তথা জাতির চরিত্রকে রক্ষা করিতে হয় কতকগুলি অবশ্য পালনীয় সংযম নিয়মের

অনুবর্তিতায়। 'দুঃসঙ্গঃ সর্বথৈব ত্যাজ্যঃ',—কারণ মানুষের মনের সহজাত ষড়রিপু দুঃসঙ্গ পাইলে অগ্নির ন্যায় ঝটিকার সংযোগে অদম্যশক্তি লাভ করে, তাই দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন, "তরঙ্গায়িতা অপি ইমে সঙ্গাৎ সমুদ্রায়ন্তে।" কিন্তু এ সমস্ত কথা দুঃসঙ্গের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। ইহা কোনও জাতি বা ধর্ম বিশেষের প্রতি প্রযোজ্য নহে। এখন শৈশবের বেড়া অতিক্রম করিয়া নওযোয়ান স্বাধীন ভারত, বিশ্ব-জগতের সহিত করমর্দন করিয়া, লাভবান হইতেছে এবং হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

জাতি এবং বর্ণ—আমাদের সমাজের স্মার্ত ব্যবস্থায় 'জাতি' এবং 'বর্ণ'-কে এক পর্যায়ে ফেলিবার চেষ্টা হইয়াছে। ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়ের সন্তান ক্ষত্রিয়ের জাতি এবং বর্ণ পাইলে সামাজিক শৃঙ্খলা বিভাগের সুবিধা হয় বলিয়া। কিন্তু জাতি ও বর্ণ এক বস্তু নহে। 'বর্ণ'—গুণ কর্ম বিভাগের উপর নির্ভর করে। অভিধানে এখনও দেখা যাইবে 'জাতি ব্রাহ্মণ' অর্থে নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণকেই বুঝায়, যাহার জন্মলব্ধ জাতিই একমাত্র পরিচয়। 'সংস্কার' লাভ করিয়া সে দ্বিজও হয় নাই, বেদ পাঠ বা জ্ঞানলাভ করিয়া সে ব্রাহ্মণও হয় নাই। ভগবান বুদ্ধ, তাঁহার ধর্মপদে, 'ব্রাহ্মণ-বর্গে'—ব্রাহ্মণকে যে সকল গুণের পরিচয়ে নমস্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহাই ব্রাহ্মণের প্রকৃত পরিচয়। পঞ্জিকায় বলে অমুক সময় জন্ম হইলে অমুক 'বর্ণ' হইবে এবং সেই হিসাবে কোষ্ঠীতে উল্লেখ করা হয় এবং জাতি নির্বিশেষে ব্রাহ্মণাদিবেও ক্ষত্রিয় শূদ্রাদি বর্ণে পরিচায়িত করা হয়।

ফলিত জ্যোতিষ—যদিও 'বর্ণ' এবং 'জাতি'র পার্থক্যের প্রামাণ্য হিসাবে জ্যোতিষ শাস্ত্রের এই প্রথা উল্লেখ করিতেছি, তথাপি এই প্রসঙ্গে বলা অবশ্য প্রয়োজন যে, ফলিত-জ্যোতিষ, জ্যোতিষীর অর্থাগম এবং অন্ন সংস্থানের জন্যই রচিত হইয়াছে। ভবিষ্যৎ যতই অন্ধকারপূর্ণ, ভবিষ্যৎ জানিবার জন্য মানুষের কৌতুহলও সেই পরিমাণে উগ্র। সেই কারণে, সেই দুর্বলতার ফলেই, ফলিত জ্যোতিষ প্রশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে, নচেৎ জন্মলগ্নের উপর নির্ভর করিয়া কোষ্ঠী-বিচার এবং বিবাহের যোটক বিচার এক অন্ধ-কুসংস্কারের পরিণাম এবং প্রতিফল মাত্র। এই কুসংস্কার প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির অবিলম্বে দূর করা কর্তব্য নচেৎ উঠিতে হাঁচি, বসিতে টিকটিকি এবং যাইতে অশ্লেষা-মঘার ভয়ে ভীত জাতি—যে তিমিরে সেই তিমিরেই চিরদিন থাকিবে। দৈনিক পত্রিকায়—"এ সপ্তাহ কেমন যাইবে" অদ্যাপি এই কুসংস্কারের পরিচয় এবং প্রশ্রয় দিতেছে।

গীতার "চাতুর্বর্ণ্য"—বর্ণ এবং জাতি যে একার্থব্যঞ্জক নহে, এবং গীতার গুণকর্ম বিভাগ অনুসারেই যে একদিন জাতির নির্ণয় হইত, তাহা ভাগবত হইতে এবং মহাভারতের যুধিষ্ঠির নহুষের কথোপকথন হইতে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। শ্রীমদ্‌ভাগবত বলিয়াছেন:

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসাং বর্ণাভিব্যঞ্জকম্
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দিশেৎ।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণের গুণ যদি অন্যত্রও দেখা যায় তাহা হইলে সেই গুণের দ্বারাই সেখানে বর্ণের নির্দেশ করিতে হইবে।

সত্যকামের উপাখ্যান এবং পুরাণের বিভিন্ন উপাখ্যানও তাহাই প্রমাণ করে। অনুলোম বিলোম বিবাহেও বিভিন্ন বর্ণ ও জাতির মধ্যে শোণিত সংমিশ্রণের প্রমাণ ইতিহাসে ভুরি ভুরি পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের সমগ্র বৌদ্ধ-ধর্মকে ভারতবর্ষ স্পঞ্জের মত স্বশরীরে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে। তাই আর্য, অনার্য, দ্রাবিড়, চীন, 'শকহুন দল পাঠান মোগল' এখানে এক দেহে লীন হইতে পারিয়াছে।

জাতি ও সংস্কৃতি—রামমোহন এই জন্মগত জাতিবাদকে পরিহার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু 'কুসংস্কার' কঠিনপ্রাণ, একবার তাহার শিকড় বা মূল বাড়িলে তাহাকে উন্মূলন করা সুকঠিন। তবে সময়ের গতি, বিজ্ঞানের প্রগতি এবং স্বাধীনতার যুদ্ধের ফলে লোকে এখন পূর্বোক্ত মনস্বীদের উপদেশে অধিকতর শ্রদ্ধাবান হইতেছে ইহা মঙ্গলের কথা।

বিজ্ঞানের প্রভাব—বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ফলে বিভিন্ন দেশের দূরত্ব দ্রুতবেগে দূর হইয়া যাইতেছে। বৎসরের পথ দিনে অতিক্রান্ত হইতেছে। পৃথিবীর উভয় গোলার্দ্ধ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক তথা ব্যবসায়িক আদান-প্রদানে ক্রমশঃই ঘনিষ্ঠতা লাভ করিতেছে।

বিশ্বমৈত্রী ও রবীন্দ্রনাথ—এরূপ অবস্থায় যেমন অনেক প্রকার বৈষম্য দূর হইতেছে, তেমনি আবার নানাবিধ রাজ-নৈতিক এবং অর্থনৈতিক অশান্তি, জিগীষা ও হিংসা উপস্থিত হইতেছে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন:

"The human world is made one, all the countries are losing their distance everyday, their boundaries not offering the same resistance as they did in the past age. Politicians struggle to exploit this great fact and wrangle about establishing trade relationships. But my mission is to urge for a world-wide commerce of heart and mind, sympathy and understanding and never to allow this sublime opportunity to be sold in the slave markets for the cheap price of indivi-

dual profits or be shattered away by the unholy competition in mutual destructiveness." (Paris May 3, 1930).

রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই কামনা করিয়াছেন প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে মৈত্রী এবং মিলন, মন বুদ্ধি অন্তঃকরণ এবং আন্তরিক সহানুভূতির মাধ্যমে। অর্থাৎ "দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে,—এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।" ভারতের সংস্কৃতিও এই মিলনের প্রস্তুতির জন্য সাধনা করিয়াছে—মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এবং উপেক্ষা প্রভৃতি উদার সদ্‌গুণাবলী।

পশ্চিমের কবি Rudyard Kipling বলিয়াছেন, "The west is west, the east is east, And the twain shall never meet". অর্থাৎ পূর্ব পশ্চিমের মিলন অসম্ভব। ভারতীয় সংস্কৃতির রাজদূত রবীন্দ্রনাথ এই অসম্ভবকে অবশ্যই সম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি—ভারতীয় সাহিত্যের মূলকথা রস-সৃষ্টি। এই রসকে বলা হইয়াছে 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরঃ'। ব্রহ্ম রসস্বরূপ 'রসোবৈ সঃ।' সেই রস-স্বরূপের আস্বাদন হয় সাহিত্যের মাধ্যমেও। অর্থাৎ শব্দ-ব্রহ্মের মাধ্যমে রস-ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইয়া থাকে। শ্রুতি বলেন, "একঃ শব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ সম্যগ্‌ জ্ঞাতঃ স্বর্গে লোকে কামধুগ্‌ ভবতি।" হর-পার্বতীর মত এই শব্দের সহিত ও বাক্যের সহিত অর্থ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, কালিদাস বলিয়াছেন, "বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ", শক্তির সহিত শক্তিমানের মত, অগ্নির সহিত তাহার দাহিকা শক্তির মত—অন্যোন্যাশ্রয়ী এই সম্পর্ক। সত্য, সুন্দর এবং কল্যাণের সাধনাই ভারতীয় সাহিত্যের ত্রিপথগামী ভাগীরথীর ধারা যাহা ভাবসমুদ্রে মিলিত হইয়াছে।

সাহিত্যে—বিশেষতঃ কাব্যসাহিত্যে বাক্য এবং অর্থ, রস এবং ভাব, ধ্বনি এবং ছন্দ ঘনিষ্ঠভাবে সন্নিবদ্ধ থাকা প্রয়োজন এবং তাহাই ভারতীয় কাব্যের সম্পদ এবং আদর্শ।

সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ডস্ব স্বরূপানন্দচিন্ময়ঃ
বেদ্যান্তর স্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরঃ॥

এবং,—ন ভাবহীনোঽস্তি রসো ন রসো ভাববর্জিতঃ
পরস্পরকৃতাসিদ্ধিরনয়ো রসভাবয়োঃ॥

সাহিত্য এবং দর্শন—উভয়েরই লক্ষ্য প্রকারান্তরে একই। দুঃখ দূর করা এবং আনন্দ লাভ করা। এই সুখবাদ (hedonism) পবিত্রতর, উন্নততর এবং সাধারণ সুখবাদ হইতে মহত্তর এবং উজ্জ্বলতর। হিতবাদ এবং সুখবাদ পাখীর দুটি ডানার মত। উভয় পক্ষে ভর করিয়া কাব্য কল্পলোকে উড্ডীন হয়, শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ উভয়ের মিলিত শক্তির যোগে।

সাহিত্য শব্দটির ব্যুৎপত্তি হইতে দেখা যায় এই অর্থের সমর্থন। 'সাহিত্য' শব্দে এক সংসর্গ, এক ক্রিয়ান্বয়িত্ব বা বৈদিক ভাষায় সমাম্নায়ত্ব সূচিত হয়। 'সহিত' অর্থে সংযুক্ত, সমভিব্যাহৃত। তাই বৈদিক প্রার্থনায় পাই 'সহনাববতু' ইত্যাদি শ্রুতিতে সকলে এক সঙ্গে পালিত, শিক্ষিত, বীর্যবান, তেজস্বী এবং ঈর্ষাহীন হইবার সম্মিলিত প্রার্থনা।

'হিত' শব্দের অর্থ—যোগ্য, পথ্য, উপকারক, প্রিয়। এই প্রসঙ্গে আমরা পূর্ব ব্রহ্মাস্বাদের উল্লেখ করিয়াছি। ইহার অর্থ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছেন:

"ধূলির আসনে বসি ভূমারে দেখেছি ধ্যানচোখে
আলোকের অতীত আলোকে।"

তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিভূ বা প্রতিনিধিস্বরূপ ক্রান্তদর্শী, মহাকবি। তাঁহার ঋষিচেতনা কবিদৃষ্টির দ্বারা উদ্ভাসিত। সাহিত্যের সুখবাদও সেই অনন্ত ভূমানন্দের আস্বাদকামী। 'নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্‌'। 'আগুনের পরশমণির' দ্বারা তিনি baptism of fire লাভ করেন। তিনি 'সকল দুখের প্রদীপ জেলে'—অন্তর দেবতার আরতি করেন। সুন্দরের জয়ধ্বনিগানে তাঁহার বাঁশি যৌবন-বেদনারসে উচ্ছল এবং মাধুর্য রভসে উন্মত্ত হইয়া মন্দ্রিত হয়। দুটি নয়ন মেলে অপরূপকে দেখে যাওয়ার যে অলৌকিক আনন্দ, তাহাতেই তাঁহার অন্তর হয় পরিপ্লুত এবং 'ভাব হতে রূপে অবিরাম' চলে তাঁহার 'যাওয়া আসা'।

সাহিত্যিকের দর্শন Dialectic materialism নহে, antihumanic religion নহে, antireligious humanism নহে, egoistic hedonismও নহে কারণ ইহা ব্যক্তিগত সুখবাদ নহে। কবি বলেন, "অপরূপ আনন্দের ভার, বিধাতা যাহারে দেন তার বক্ষে বেদনা অপার।" ইহা ব্যক্তিগত নহে যেহেতু কবির প্রসাদ যে গ্রহণ করে সে-ই এই অপরূপ আনন্দ বেদনা আস্বাদ করে। ইহাকে আইনষ্টাইনের কথায় cosmic religious consciousness অথবা অঙ্কশাস্ত্রের ভাষায় an L. C. M. of science, philosophy and religion বলা যায়।

সাহিত্যে মানবধর্ম—religion শব্দটির ব্যুৎপত্তি হয় 'ligo' to bind হইতে। যাহা প্রত্যেক নর-নারীকে জাতিগত বন্ধন ছাড়াও অভিনব আত্মীয়তা সূত্রে বদ্ধ করিয়া বিশ্বমানবকে একপরিবারভুক্ত করে, তাহাকে Religion of Humanity, devotion to human interests বা Humanism বলা হয়। ইহার দেবতাও নরাকৃতি পরব্রহ্ম। ইনি এই নূতন বন্ধনে আবদ্ধ এবং অনুপ্রাণিত নিজের ভক্তগণের দ্বারা ভাবে ভাষায়, রূপে ও অরূপে পূজা গ্রহণ করেন। ইনি তিন পুরুষে মানুষ। আদিতে ইনি 'নরোত্তম' (বা

গীতার পুরুষোত্তম) মধ্যে ইনি 'নর' এবং তৎপর ইনি নরের পুত্র (নর+অপত্যার্থে ষ্ণায়ণ) 'নারায়ণ'। এই Humanism-এর প্রণাম গীত হইয়াছে মহাভারতে—

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্"। অর্থাৎ নরোত্তম বা apotheosised man, নর=average man এবং নারায়ণ বা progeny of man-কে প্রণাম জ্ঞাপন। এই নরোত্তমই গীতার পুরুষোত্তম এবং ভাগবতের ভগবান।

দর্শনে ও সাহিত্যে রসবস্তু—ভারতীয় দর্শন, জগতের যিনি 'কারণং কারণানাং', তাঁহার পরিচয়-সূত্র করিলেন 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' অর্থাৎ 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ব্রহ্ম তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব"। তাহার পর এই অনির্দ্দেশ্যস্বরূপ বস্তুটি সম্বন্ধে আর একটু আভাস দিলেন, বলিলেন তিনি আনন্দ স্বরূপ। "আনন্দাদ্ধ্যেব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।" এবং পরে বলিলেন, "রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা স্বন্ধী ভবতি, নন্দীভবতি অমৃতী ভবতি।" বলিলেন, "স এব রসানাং রসতমঃ"। এই রসই সাহিত্যের ভূমা, অখণ্ড আনন্দ চিন্ময়স্বরূপ ইনি "কখনো বা ভাবময় কখনো মূর্তি।"

"তাহারি উদ্দেশে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান ছড়াইছে দেশে দেশে।" কবি আশা করেন: "উত্তরিব একদিন শ্রান্তিহরা শান্তির উদ্দেশে দুঃখহীন নিকেতনে।" সে-নিকেতন হইতে আর পুনরাবৃত্তি হয় না 'ন স পুনরাবর্ত্ততে' বা 'যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে'। সে-লাভ অপেক্ষা অধিকতর লাভ নাই সে-সুখ অপেক্ষা অধিকতর সুখও নাই। তাহা "বুদ্ধি-গ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।" ভারতীয় সংস্কৃতির 'ধর্ম' ধারণাত্মক, গ্রহণাত্মক, সমন্বয়াত্মক। সমুদ্র যেমন "নদীনাং বহবোম্বু বেগাঃ" অচল-প্রতিষ্ঠ হইয়া শান্তভাবে গ্রহণ করে এবং আত্মসাৎ করে—ভারতীয় সংস্কৃতিও তদ্রূপ। 'যত মত তত পথ' বলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। মহিম্ন স্তোত্রেও তাহাই বলেন—

রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজু কুটিল নানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥

"ভিন্ন ভিন্ন মত, ভিন্ন ভিন্ন পথ, কিন্তু এক গম্যস্থান। যে যেমন পারে ট্রেনে ইষ্টিমারে হোক সেথা আগুয়ান ॥"

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পার্থক্য—পশ্চিম বলেন—চাহিদা বাড়াও—যত পাও তত নাও এবং আরও চাও। ভোগের দ্বারাই জীবন সার্থক হয়। ভোগ কর। ভারতবর্ষ বলেন, চাওয়া কমাও, তাহা চাহিয়া কি হইবে যাহা দ্বারা জীবনে অমৃতত্ব লাভ হইবে না। "যেনাহং নামৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্?" যেহেতু "হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্।" কারণ চাহিয়া এবং পাইয়া জীবের অনন্ত তৃষ্ণা মিটিবার নহে। অগ্নিতে ঘৃত দিলে আকাঙ্ক্ষার অগ্নিতে ভোগ দিলে—"ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।" রবীন্দ্রনাথ বলেন—

এ কেবল দিনে রাত্রে
জল ঢেলে ফুটা পাত্রে
বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মিটাবারে।

দর্শন ও কাব্য—দর্শন প্রথমে নিম খাওয়াইয়া পরে চিনি দেয়। কাব্য প্রথম হইতেই মধুরাস্বাদ দেয়। তাই "কাব্যং হি দর্শনং হন্তি", যদিও উভয়েই দেয় চরমে পরম আনন্দ। তাই সূত্রকার বলেন, "প্রয়োজনমানন্দঃ কাব্যস্য" "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্" "মনোহারিণ্যৌ শব্দার্থৌ কাব্যম্।' তাহার মনোহারিত্বের কারণ, রস-মাধুর্য্য, ভাব-বৈচিত্র্য ছন্দঃ সৌন্দর্য্য এবং অলঙ্কার-সৌকুমার্য্য, যাহার দ্বারা কাব্য রসিক-জনকে আহ্লাদিত করে। তাই ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়া পরে বেদব্যাস ভাগবত রচনা করিয়া চরিতার্থ হন।

ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য—ভারতবর্ষ উপলব্ধি করিয়াছে যে, প্রকৃত স্বার্থ লাভ হয় পরার্থপরতায়, তাই এখানে শ্রুতি বলেন, 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' ত্যাগের মুখে ভোগ করিবে অর্থাৎ ভোগ দিয়া প্রসাদ পাইতে হইবে ইহাই প্রকৃত আত্মপ্রসাদ। নচেৎ স্বার্থ সেবায় লোভই বাড়িয়া উঠে তৃপ্তি লাভ হয় না। তাই মহাকবি বলেন:

"স্বার্থ যত পূর্ণ হয় লোভ ক্ষুধানল
তত তার বেড়ে উঠে বিশ্বধরাতল
আপনার খাদ্য বলি না করি বিচার
জঠরে পূরিতে চায়!"

কারণ এই লোভ, এই কাম, 'মহাশনঃ' 'মহাপাপ্মা' মানুষের মহাবৈরী। চাহিয়া না পাইলে ইহা হইতেই ক্রোধ হয়, হিংসা হয়। যাহার ফলে আজ আমরা সকলেই আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া দেখিতেছি "হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব।" ভারতবর্ষ শান্তিকামী, প্রত্যহ প্রতি অনুষ্ঠানে শান্তিমন্ত্র তাহার অবশ্য পাঠ্য "যদিহ ঘোরং যদিহ ক্রূরং যদিহ পাপং তচ্ছান্তং তচ্ছিবং সর্ব্বমেব শমস্তু নঃ।"

সমস্ত পৃথিবীর তর্পণ কামনা করিয়া সে নিত্য তর্পণ করে "ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু" ইহাই ভারতীয় দর্শনের, ভারতীয় সাহিত্যের, তথা সংস্কৃতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য।

রোগীকে নিরাময় করিয়া, অভুক্তকে অন্নদান করিয়া, দুঃখিতকে আনন্দ এবং ভীতকে অভয়দান করিয়াই তাহার আনন্দ। 'আত্মৌপম্যেন' সর্বত্র সমদর্শনই তাহার দর্শনের শিক্ষা। আমরা এই শিক্ষা ও আদর্শ হইতে কত দূরে, পড়িয়া রহিয়াছি তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়।

ভারতবর্ষ বলেন, যাহা দেওয়া হয় তাহাই সার্থক হয়,

যাহা না দেওয়া হয়, শুধু নিজের অযথা ভোগে বা বিলাসে ব্যয়িত হয়, তাহা ব্যর্থ হয়। "তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে।"

ভারতবর্ষ ও কমিউনিজম্—আজকাল রুশিয়ার Communism-এর উদারতায় অনেকেই বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের অবগতির জন্য বলা প্রয়োজন যে, তাহা অপেক্ষা অনেক উচ্চতর এবং শ্রেষ্ঠতর মতবাদ বহু পূর্বে ভারতে প্রচারিত হইয়াছে। অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে তাহারই বীজ সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে রুশিয়াকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। ভাগবত বলিয়াছেন: "যাবদ্ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম। অধিকং যোভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি॥" নিজের ঠিক যতটুকু অবশ্য প্রয়োজন তাহার অতিরিক্তে যে লোভ করে সে তস্করের মত দণ্ডনীয়। নিজের আবশ্যিক প্রয়োজনটুকুই তাহার প্রকৃত স্বত্ব। এই বুনিয়াদের উপরেই মহাত্মাজীর trusteeship বা ন্যাসরক্ষার মতবাদ প্রতিষ্ঠিত। যাহার নিকট উদ্বৃত্ত বা অতিরিক্ত কিছু আছে তাহা তাহার নিকট ন্যস্ত আছে মাত্র। দেশের সঙ্কটমুহূর্তে তাহা অম্লান মুখে দান করিতে হইবে।

ভারতবর্ষের চিকিৎসার আদর্শ—মহান্ এবং লোকোত্তর। "নাত্মার্থং নাপি চার্থার্থম্ অথ ভূতদয়াং প্রতি"—চিকিৎসক চিকিৎসা করিবেন তাঁহার নিজের কোন স্বার্থ বা কাম্য কামনা বা যশোলিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্য নহে, শুধু রোগীর প্রতি, আতুরের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া তাহারই দুঃখ-কষ্ট নিবারণের জন্য।

"কুর্বতে যে তু বৃত্ত্যর্থং চিকিৎসা পণ্যবিক্রয়ং, তে হিত্ব কাঞ্চনং রাশিং পাংশুরাশিমুপাসতে" যাহারা চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে পণ্যদ্রব্যের মত বিক্রয় করিয়া অর্থলাভ করে তাহারা কাঞ্চনরাশি ত্যাগ করিয়া ভস্মরাশির সমাদর করে।

ভারতীয় সমাজে নারীর স্থান—ভারতীয় আদর্শে নারী দেবীর মত পূজা পাইবার যোগ্যা। "যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।" চণ্ডীতে দেবী সমগ্র নারীশক্তির মধ্যে ওতপ্রোতরূপে প্রকাশিতা—"স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।" তাই বিবাহের মন্ত্রেও দেখি "সম্রাজ্ঞীশ্বশুরে ভব।"

ভারতের কর্মযোগ—ভারতীয় আদর্শে জড়তা বা আলস্যের স্থান নাই। গীতা প্রত্যেক নরনারীকে নিয়ত কর্ম করিবার এবং স্বশক্তিতে শ্রদ্ধাবান হইবার প্রেরণা দিয়াছেন। "নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং" "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" জ্ঞানের দেবতা সরস্বতী এখানে "নিঃশেষ জাড্যাপহা"।

ভারতের ভক্ত সাধক স্বার্থলিপ্সাহীন—ভারতবর্ষের ভক্ত সাধকগণ নিজের স্বর্গ, নিজের সুখ, বা নিজের মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেন না। তাঁহাদের আদর্শ মহত্তম, তাঁহারা বলেন:

"ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরাম্...আর্তিং প্রপদ্যেঽখিল দুঃখভাজাম" তিনি ঈশ্বরের নিকট পরমা গতি প্রার্থনা করেন না। দুঃখশোকার্ত জনের বেদনার অংশভাগী হইতে চাহেন, যাহাতে তাহাদের দুঃখের কণামাত্রও লাঘব হয়।

উপসংহার: আজ কোথায় এই আদর্শ ভারত, আর কোথায় আমরা পতিত ভারতবাসী। তথাপি মহাকবির ভাষায় বলিব, 'তা বলে ভাবনা করা চলবে না' সুতরাং "আগে চল, আগে চল ভাই।" গীতার ভাষায় বলিব, "উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ"—কারণ "নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ"। সুতরাং "কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা"—সকলে আপন শক্তির সমস্তটুকু প্রয়োগ করিয়া 'আদর্শ'-সিদ্ধির জন্য যত্নবান হউন। স্বাধীন ভারত আদর্শনিষ্ঠ হইয়া যশস্বী হউক। ভারতবর্ষ নিখিলের মঙ্গল প্রার্থনা করে এবং সেই প্রার্থনার দ্বারাই এই প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করি:

"সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভবন্তু সুখিনো মা কশ্চদ্দুঃখভাগ্ ভবেৎ॥"





চোরকাঁটা

সরিৎশেখর মজুমদার

ব্রেক্-কষা নয়ত, যেন হৃদ্‌পিণ্ডের ওপর পা দিয়ে শাসন। আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, বুঝি হুড়মুড় করে যাত্রীসমেত বাসটা একেবারে নদীগর্ভে গিয়েই পড়বে। পারঘাটামুখো ঐ ঢালু গড়ানে রাস্তায় অমন দুরন্ত গতিতে গাড়ীটা নামানোই বা কেন আর অমনভাবে ব্রেক্ই বা কেন কষা!

—ব্যস, এইবার নামুন স্যার। খেল খতম্।

কথাগুলো বলল ভূষণ ড্রাইভার। ওরই পাশটিতে বসে নানা বিষয়ে আলাপ করতে করতে আসছিলাম এই দীর্ঘ আড়াই-ঘণ্টার পথ। সরকারী অফিসার, যাচ্ছি সুলতান-পুরের জমিদার বাড়ীতে, এই সব শুনে বেশ খাতিরই করল ভূষণ।

—আপনাকে ত দেখছি কেউ নিতেও আসে নি বাবুদের বাড়ী থেকে! এ-পাশ ও-পাশ চেয়ে নিয়ে শেষে ভূষণ ওপর-পড়া হয়ে বললে—কিস্সু ভাবতে হবে না স্যার, আমি সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।

কুলি কয়েকজন মুখিয়েই ছিল, তাদের মধ্যে চতুর যেটা সে ইতিমধ্যেই আমার হাতের থলেটা টান মেরে কেড়ে নিয়ে বলল—আসুন বাবু, আমি পৌঁছে দেব।

ভূষণ বললে—ত্যাঁড়া ব্যাটা। শুধু কি থলেটাই? সাধে কি তোকে গিদ্‌ধোড় বলি! নে, বাকি মাল নে।

কণ্ডাক্টার গুণে গুণে আমার মাল তিনটে নামিয়ে দিল গিদ্‌ধোড় অর্থাৎ গদাধরের মাথায়।

—বুঝলি? সাহেবকে নিয়ে যা বাবুদের বাসায়। কলকাতা থেকে এয়েছেন।

পরণে ধবধবে দামি প্যাণ্ট, সরকারী অফিসার, অতএব ভূষণ 'সাহেব' বলেই সম্মানিত করল। মুখে-চোখে অর্দ্ধস্ফুট ধন্যবাদ এঁকে আমি গদাধরের পিছু নিলাম। পারা-পারের কড়ি মিটিয়ে ঢালু পথ বেয়ে নামতে লাগলাম। ইতি-মধ্যেই মনে গ্রাম্য পরিবেশের মাধুর্য্যের ছোঁয়া লেগেছে। ঢালু বালি-বালি পথ মাড়িয়ে নামছি আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি চারিদিক। ছল্ ছল্ কল্ কল্, ঢেউগুলো না জানি কি-কথা কইছে তটভূমির সঙ্গে। দূরে বলাকার সারি। ও-পারে একটা বড় নৌকার পাটাতনে পাট বোঝাই করছে কুলিরা। সূর্য্য এখন পাটে বসেছেন। গদাধর পারের নৌকায় মাল নামাল। আমিও উঠলাম।

উপুড় হয়ে বসে একটা বিড়ি ধরিয়ে গদাধর শুধাল—আপনি কি বাবুদের আত্মীয়-কুটুম্বি?

পরিচয়টা কি জানি কেন গোপনই করে ফেললাম। বললাম—হ্যাঁ। গদাধর জানল না, আমি জমিদারদের কত বড় শত্রু, আজ এসেছি ওদেরই অতিথি হতে। সরকার পক্ষ থেকে আমায় পাঠিয়েছে। জমিদারী-প্রথা বিলুপ্তি-সাধনের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার, আমি তারই প্রতিমূর্ত্তি হয়ে চলেছি শেষ যবনিকা টেনে দিতে। অদৃষ্টের সবচেয়ে বড় পরিহাস এই যে, ঐ বাবুদেরই বারমহলে সরকারের আপিস খোলা হচ্ছে আর আমি সেই আপিসের অফিসার হয়ে চলেছি ঐ বাবুদেরই অধিকারের ওপর যুগদাবির স্বাক্ষর দিতে।

—নামুন বাবু!

নৌকাটা তর্ তর্ করে বয়ে ইতিমধ্যেই ঘাটে ভিড়েছে।

—বাবুদের কি চিঠি নেকেন নি? কেউ ত নিতে এয়ে নি আপনাকে?

আমি চুপ করে রইলাম। এগোলাম গদার পিছু পিছু।

ইট সাজিয়েছে সিঁড়ির মত। কুলিদের পাশ কাটিয়ে ওপরে উঠছি। পরণের প্যাণ্টে কাদামাটির ছোপ বাঁচাতে মাঝে মাঝে অশ্বত্থগাছের বিস্তৃত শিকড় ধরে টাল

সামলাচ্ছিলাম। কলসী কাঁকালে দুটো যুবতী বউ নেমে যাচ্ছিল ঘাটে, আমার আড়ষ্টতা দেখে তারা মুচকি হাসল।

ঘাটের ওপরটা বেশ জমজমাট। গোটা পাচেক দোকান। পাশ দিয়ে কংক্রীটের রাস্তা এঁকেবেঁকে কোথায় কোন ভিন-দেশে চলে গেছে, আম-কাঁঠালের বন পেরিয়ে খাল-বিল ডাইনে-বাঁয়ে ফেলে।

—অনেক দূর নাকি রে বাবুদের বাসা?

—না বাবু, এই ত কাছেই।

বাঁধানো রাস্তা ছেড়ে মেঠো পথে নামতে হ'ল। আঁকা-বাঁকা পথ। একটা অড়হর ক্ষেত পড়ল। সেটা শেষ হতেই একটা মাঠ।

—এই মাঠ পেরোলেই উই আমবনের মধ্যে বাবুদের বাসা।

—তাই নাকি! বাঁচলাম। চল।

বিস্তৃত মাঠটা থিক্ থিক্ করছে চোরকাঁটায়। বেশ বড় বড় ঝাড়। ডগাগুলো কটা-কটা রং, তাতে কালচে-লালের ছোপ। একটু চিন্তিত হলাম। প্যাণ্টের আর কিছু থাকবে না।

—ইস, এ কি কাণ্ড রে গদাধর। এতো চোরকাঁটা! এটা কাদের মাঠ?

—বাবুদের।

—সাফ করে না কেন? অসম্ভব চোরকাঁটা যে!

সাফ কি আর বাবুরা করবে বাবু। কেউ জমা নিত ত হ'ত।

—নেয় না কেন? ফসল তুললেই পারে। ঐ ত পাশেই কেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অড়র ক্ষেত।

—এ জমি কেউ নেবে না বাবু। এ-মাঠে মেয়েছেলে খুন হয়েছিল।

—খুন হয়েছিল? সে কি রে? কারা করেছিল?

—বাবুরা। জমিদার চন্দ্রমৌলী চৌধুরী। এ জমিতে ফসল করবে কি বাবু, চাষীরা বলে—ফসল বিষে লাল হয়ে যাবে, মেয়েছেলের রক্ত খেয়েছে এ-জমি।

আশ্চর্য্য লাগল। কিন্তু আশ্চর্য্য হবারই বা আছে কি! কবেকার সেই সামন্তযুগ থেকে পৃথিবীর অনেক মাটি রক্তে লাল হয়েছে এমন। কখনও জমি দখল নিয়ে, কখনও বা মেয়েমানুষ। জমিদারেরা দেশের অনেক উপকার করেছে, কিন্তু কৃতজ্ঞতার ঘরে অসংখ্য স্তুতি জমা রেখেও মানুষ হাঁফিয়ে উঠেছিল ওদের শোষণে আর অত্যাচারে। সেই পুঞ্জীভূত পাপের ফলেই যুগের দাবিতে আজ জমিদারী-প্রথার বিলুপ্তি ঘটছে। আর আমি চলেছি সরকারের প্রতিনিধি হয়ে সেই জমিদারী-প্রথার চিতা সাজাতে। পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে জমিদারের দরিদ্র-নিপীড়িত প্রজাদেরই এক বংশধর। চোরকাঁটার তীক্ষ্ণ সূচ্যগ্রভাগ আমার পরণের প্যাণ্ট ভেদ করে হাঁটু পর্য্যন্ত বিঁধে দিচ্ছে।

মাল তিনটে নামিয়ে গদাধর বলল—এটা কাছারি-বাড়ী। বাবুরা বোধ হয় ভিতর-বাড়ীতে। ডাকব?

—হ্যাঁ, ডাক।

—কি বলব বাবুদের?

আমি কার্ড বার করে দিলাম, বললাম—এইটে দেখাবি, বুঝবেন। গদাধর চলে গেল। পূবদিক বেড়ে যে রাস্তা গেছে, সেইটে ধরে। আমি বাঁধানো চত্বরের ওপর রুমাল পেতে বসলাম। এদিক-ওদিক চাইলাম। জনপ্রাণী নেই যেন, কেমন খাঁ খাঁ ভাব। একটা দারোয়ান নেই? বা অন্য কোন কর্ম্মচারী? ওদের কাউকে এখনও পর্য্যন্ত না দেখে অবাক হলাম। হঠাৎ বিনা নোটীশে আসা নয়। চিঠি দেওয়া হয়েছে সরকার পক্ষ থেকে। আমার নাম, কোন তারিখে কোন গাড়ীতে যাচ্ছি, সব কিছু। বিষয়টা বিশ্লেষণ করে দেখতে লাগলাম। না, ওদের দোষ দেওয়া যায় না। রক্ত মাংসেরই মানুষ ত! আমার ওপর একটা বিদ্বেষ থাকারই কথা। অন্ততঃ সংবর্দ্ধনা জানানোর কারণ নেই। দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল ফটকে। কি বিরাট, কি কারুকার্য্য! মাঝখানে মস্ত বড় রাজমুকু[illegible]। নীচে অর্দ্ধবৃত্তাকারে লেখা God Save the King! ব[illegible] জলে মরচে ধরেছে, কেউ আর নূতন করে রং দেয় না। বাগানটা শ্রী[illegible]ন। অভিজাত গোলাপ গাছের বংশধরদের অসৎসঙ্গ থেকে বাঁচাবার জন্য আগাছাদের চুলের মুঠি ধরে উপড়ে ফটকের বাইরে ফেলে দেবার মত অভিভাবক মালীও কি নেই একটা? পিছন ফিরে দেখি, স্খলিতবাস এক বিদেশিনী অপ্সরার শ্বেত-প্রস্তরমূর্ত্তি কেমন তামাটে বিগত-যৌবনা হয়ে পড়ে আছে পিছনে। বাগানেরই এক ফোয়ারার জলে একদা হয়ত স্নান করত রূপসী, স্থানচ্যুত হয়ে এক প্রান্তে পড়ে আছে আজ।

—কিছু মনে করবেন না দিব্যেন্দুবাবু! আপনাকে বসিয়ে রাখলাম। পিছন ফিরে চাইলাম। দেখি, এক সুদর্শন তরুণ, চাবি হাতে আসছেন, কাছে এসে নমস্কার করলেন। প্রতি-নমস্কারের সময় লক্ষ্য করলাম তরুণের দীর্ঘ দেহ-সৌষ্ঠবের মধ্যে শুধু আভিজাত্যের সদম্ভ ঘোষণাই নয়, বিনীত শালীনতাও আছে।

—আমরা বড় লজ্জিত। কাকাবাবুর হঠাৎ ব্লাডপ্রেসার বেড়েছিল, তাই আপনাকে 'রিসিভ' করার জন্য লোক পাঠাতেও পারি নি।

—না, না, তাতে কি হয়েছে! মনটা হাল্কা করে

বললাম—নির্দ্দিষ্ট ঘরখানা খুলে দিয়ে উনি চাবিটা আমার হাতে দিলেন।

—আপনিই কি শ্রীবিক্রমকান্তি…

—না, বিক্রমকান্তি আমার কাকার নাম। আমি তরুণকান্তি। ফিরে এসে আবার আলাপ করব। এখন চলি, আপনার চা, জলখাবার ও হাত-মুখ ধোয়ার বন্দোবস্ত করি।

সন্ধ্যা নামো-নামো। চৌকির ওপর চিৎ হয়ে ভাবছিলাম, আগামীকাল আমার সহকারীরা কাগজপত্র নিয়ে এলে পর আপিসটা সাজাতে হবে। পৌঁছানো সংবাদ দিয়ে চিঠি দিতে হবে মাকে আর স্ত্রীকে। ভাবছিলাম, ঐ যে ঝাড়লণ্ঠনটা ঝুলছে সিলিং থেকে, কত দাম হবে ওর? দু'তিন হাজার?

—দিব্যেন্দুবাবু কি শুয়েছেন? তরুণকান্তি ডাকলেন দোরগোড়া থেকে। তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম।

—না, এমনি একটু গড়িয়ে নিচ্ছি। আসুন না ভেতরে।

—কাকাবাবু আপনার সঙ্গে আলাপ করবেন। ডাকছেন। আসবেন না কি?

—কাকাবাবু! ওনারই না ব্লাডপ্রেসার? অসুস্থ বলছিলেন, তবে কেন…তরুণকান্তির মুখে এক বিচিত্র হাসি ফুটে উঠতে দেখলাম।

—দীর্ঘদিনের অভ্যাস, কিছুতেই ছাড়তে পারেন না। এই সময় অল্প একটু পায়চারি করে কাছারী-ঘরে বসবেনই, তা সে যত খারাপই হউক না কেন শরীর। তাছাড়া আপনি একজন অতিথি এসেছেন বাড়ীতে, আপনার সঙ্গে দেখা না করে হাঁফিয়ে উঠছেন উনি।

তাড়াতাড়ি জামা পরে এগোলাম। কাছারি ঘরে প্রবেশমাত্র বুঝতে পারলাম, কে মধ্যমণি। তরুণকান্তির কাকা কোন্ জন। 'আসুন দিব্যেন্দুবাবু' বলে স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন বলেই যে তাঁকে চিনলাম তা নয়। হাজার লোকের মধ্যে নির্ব্বাক বসে থাকলেও এ-লোককে চেনা যায়। টকটকে রং, মানানসই কালো ঘন সযত্নলালিত গোঁফজোড়া। সুঠাম দেহখানা যেন মূর্ত্ত সামন্ততন্ত্র। নিখুঁত সুন্দর সেগুন কাঠের মস্ত চেয়ারে বসে আছেন ঠিক মাঝখানে, ডাইনে-বাঁয়ে কয়েকজন। মাথার ওপর ঝাড়-লণ্ঠনটা নিষ্প্রদীপ হলেও মানাচ্ছে।

—নমস্কার! বলে, বিক্রমকান্তির ঠিক সামনে টেবিলের ওপারে লম্বা বেঞ্চে বসলাম।

বসার সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রমকান্তির পার্শ্বচরেরা সমস্বরে প্রতিবাদ করে উঠল। আমি অপ্রস্তুত হয়ে ক্যাল্-ক্যাল্ করে চাইলাম। মেঘডম্বরুর মত গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বিক্রমকান্তি জানালেন—ওটা প্রজাদের আসন। আপনি উঠে এসে এপাশে বসুন।

লজ্জায় কান দুটো লাল হয়ে গেল। মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে হ'ল। ওটা প্রজাদের আসন! মুমূর্ষু জমিদারী-প্রথার ঝুটা বনেদীয়ানা আমার মত চাকুরিয়াকে যেন তীব্র ব্যঙ্গের কষাঘাতে জর্জ্জরিত করে দিল। নিঃশব্দে উঠে অন্য আসনে বসলাম।

—আমি খুব লজ্জিত দিব্যেন্দুবাবু, আপনার সম্বর্দ্ধনা হয় নি তেমন। আপনার কোন অসুবিধা হয় নি ত?

—হয় নি, হলে জানাব। রাগতঃ বলে ফেললাম কথাটা।

এর পর আলাপ সুরু হ'ল। ছোট ছোট অনেক প্রশ্ন। আমিও সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে গেলাম। আর, কথার ফাঁকে ফাঁকে চোখ ফিরিয়ে দেখে যেতে লাগলাম ঘরের আসবাব-পত্র, জানালা-দরজা, মেঝের গালচে, দেওয়ালে-টাঙানো বাইসন, বনশূয়োর আর হরিণের মুণ্ড, আর চওড়া সোনালী-ফ্রেমে-বাঁধানো বড় বড় ওয়েলপেন্টিংগুলো। আমার চোখে-মুখে কৌতূহল লক্ষ্য করেছিলেন বোধ হয় বিক্রমকান্তি।

—ওগুলো আমার দাদার শিকার। তরুণের বাবার। অব্যর্থ লক্ষ্য ছিল তাঁর। ঐ যে—

ওঁর সামনের দেওয়ালে প্রলম্বিত বিরাট অয়েলপেন্টিংটার দিকে মুখ তুলে চেয়ে বিক্রমকান্তি বললেন—ঐ হ'ল আমার দাদার ছবি। আমি নিজেও এতক্ষণ ঐ ছবিটারই পরিচয় জানবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলাম। এমন আশ্চর্য্য পৌরুষ-দীপ্ত দেহখানা কার? গুলীবিদ্ধ সিংহটার ওপর পা রেখে হাতে রাইফেল নিয়ে ঐ যে দুঃসাহসী পুরুষসিংহ, তার সঙ্গে তরুণকান্তির মিল খুঁজে পাই কি না দেখলাম একবার।

—বাঘের থাবাতেই মৃত্যু হয়েছিল দাদার!

আত্মীয়বিয়োগের বেদনামথিত দীর্ঘশ্বাস বার হয়ে এল বিক্রমকান্তির বুক থেকে।

ঠিক এই সময় ঘরে প্রবেশ করলেন এক মুসলমান বৃদ্ধ। জীর্ণ দেহখানা যতখানি সম্ভব ঝুঁকিয়ে শ্রদ্ধা জানালেন—আস্-সালাম্-আলাইকুম্!

—এস নুরুল মিঞা! বিক্রমকান্তির কণ্ঠস্বর থেকে অগ্রজবিয়োগ ব্যথা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে লক্ষ্য করলাম।—তারপর, কি খবর?

—আর খপর ছোটবাবু! বলতেও লজ্জা হয়। আপনার এখানে আসতেছিলাম ছেলেটা মেট্রিক পাশ করল খপর দিতে, তা কুদ্দুস মিঞার সঙ্গে রাস্তায় দেখা। শুধোলো, কোথায় যায় গো? বললাম, ছোটবাবুকে শুভ খপরটা দিন্তে

আসি। তা, কুদ্দুস কি কইল জানেন? আল্লা জানেন, কি জখম পেলাম বুকের মধ্যে। কুদ্দুস কইল—আরে ওদের আর খোসামুদি করে লাভ।

নুরুলের মুখের দিকে তাকালাম আমি। সরল অনুগত প্রজার অকপট বেদনাবোধ তার চোখে-মুখে। বুড়ো পাঁজরায় জখম পেয়েছে বলেই কথাগুলো সরলভাবে বলেছে। ঘরখানা থমথমে হয়ে গেল। খাঁচার বাঘ যেমন রাগে গরগর করে লোহার গরাদে থাবা মেরে বিফল আক্রোশে ফিরে যায় ঠিক তেমন এক চাপা ক্রোধ ফুটে উঠল বিক্রমকান্তির মুখমণ্ডলে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। হাতের ছড়িটা চেপে ধরলেন বার কয়েক। ফ্যাকাশে আনন্দ প্রকাশ করলেন একবার—তোমার ছেলে পাস করেছে শুনে খুশী হলাম নুরুল।

আমার বুকখানা কিন্তু কি এক বুনো-উল্লাসে সাত হাত হয়ে গেল। ওটা প্রজাদের আসন। চমৎকার হয়েছে, ঐ প্রজাদের আসন থেকেই শেষ প্রজা নুরুলমিঞার সরল কণ্ঠে উচ্চারিত হ'ল চরম অপমান। খোলা পিঠের ওপর 'সপাং' শব্দে চাবুক যেন।

—ব্লাডপ্রেসারটা আবার যেন বাড়ল তরুণ। বলে, ভীত-দৃষ্টি মেলে অসহায় বিক্রমকান্তি চারপাশে তাকালেন একবার। ওরা তৎক্ষণাৎ ধরাধরি করে ওকে ভিতর-বাড়ীতে নিয়ে গেল।

রাত্রি ন'টা নাগাদ খাওয়া-দাওয়া সেরে বিছানায় এলিয়ে রবি ঠাকুরের 'ক্ষুধিত পাষাণ' পড়ছিলাম। সার্থক গল্প বটে, খানিকক্ষণ পড়ার পর মনে হ'ল কে যেন আমার ঘরে ঢুকে 'সব ঝুটা হায়', 'সব ঝুট্ হায়' বলে চিৎকার সুরু করে দিয়েছে। বই বন্ধ করে বসলাম চোরকাঁটা ছাড়াতে। একটা, দুটো, তিনটে,···ছেলেমানুষের মত গুনে গুনে একটা একটা করে খবর কাগজের ওপর রাখতে লাগলাম। তামাটে, ছুঁচলো, তীক্ষ্ণাগ্র চোরকাঁটা। এমন যে শক্ত জিনের কাপড় তারও বুনন ভেদ করে কি আশ্চর্য্য চাতুর্য্যে চোরের মত চুপি চুপি প্রবেশ করেছে। অবাক হচ্ছিলাম দেখে দেখে। চোরকাঁটা! উপযুক্ত নাম।···একশ', একশ' এক, একশ' দুই···এবার ধৈর্য্য হারালাম। অসম্ভব, আর গোনা হ'ল না। তবু ছাড়িয়ে যেতে লাগলাম—শত্রুর শেষ রাখব না। সামনের হ্যারিকেনটা যেন আলোর নয় অন্ধকারেরই বৃত্ত রচনা করে চলেছে বেশী। যেন চোরকাঁটার সঙ্গে তার মিতালি। ও জানে না এ বিষয়ে চাণক্যের মত জিদ্ আমার। প্যাণ্টের ক্রীজ নষ্ট হলে শান্তির ভাঁজ নষ্ট হয় মনের, চোরকাঁটার উপদ্রব অসহ্য আমার কাছে। টেনে টেনে বার করে যাব শেষ চোরকাঁটা পর্য্যন্ত। মাঠের ছবিটা মনে পড়ল বার বার। সেই চোরকাঁটার মাঠ, থিক্‌থিক্ করছে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত। মনে পড়ল গদাধরের কথা—এ মাঠ কেউ জমা নেবে না। ফসলে দোষ হবে, মেয়ে-মানুষের খুন খেয়েছে এ জমি। খবরের কাগজের ওপর স্তূপীকৃত চোরকাঁটাগুলো দেখে তাই মনে হয়। যেন এক রাশ মশা, রক্ত চুষে খেয়েছিল আকণ্ঠ, তারই কালচে রং নিয়ে মরে পড়ে আছে।

আহা-হা—হো-ও-ও-ও!

ঘরের গা-লাগা কাছাকাছি কোনখান থেকে হঠাৎ হাঁক্ পাড়ল একজন। বুঝলাম চৌকিদার। তার কাঁপা কাঁপা হাঁক তরঙ্গায়িত হয়ে ছড়িয়ে গেল চারিদিকে। লাঠি ঠুকে এগিয়ে এসে গলা খাঁকারি দিল। আমার আলোটা জ্বলছে দেখে আলাপ করতে এল।

—কে?

—হাম্ চৌকিদার বাবুজি।

—ও! বলে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলাম। আমার চোর-কাঁটা-ছাড়ান ও না দেখে, এই ইচ্ছে।

মিলিটারী কায়দায় সেলাম ঠুকে চৌকিদার বললে—আপ ত সরকারী অফসর হ্যায় বাবুজি।

—হ্যাঁ, আমি সরকারী কাজেই এসেছি। তোমার নাম?

—অযোধ্যা সিং।

—কদ্দিন কাজ করছ?

—হাম? চালিশ সাল হো গিয়া বাবুজী। হামারা নানা কিয়া দশ সাল, পিতাজী তিশ আওর হাম চালিশ।

অবাক হয়ে গেলাম। চল্লিশ আর ত্রিশ সত্তর, সত্তর আর দশ আশী।—আশী বছর?

—হাঁ হুজুর, আশী বরষ সেবা কিয়া হুজুর লোগোঁকো।

ওদের এই বংশপরম্পরায় সেবা করার গর্ব্বটা যেন ফস্‌ফরাসের মত জ্বলজ্বল করে উঠল।

নারকেল দড়ির চারপাইয়া টেনে মাথার মুরেঠা আর হাতের লাঠিটা রাখতে রাখতে দীর্ঘশ্বাস ফেলল অযোধ্যা সিং।

—আপ লোগ সত্যনাশ কর্ দিয়া বাবুজী।

—সত্যনাশ! মানে?

—জমিন্দারী ছিন্ লেনেকো আয়া আপ। হ্যায় না?

—আমি ছিনিয়ে নিতে আসি নি অযোধ্যা। সরকার ছিন্ লিয়া।

—একহই বাত হুজুর, আপহই সরকার।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বুড়ো অযোধ্যা সিং প্রশ্ন করল—আব হামারা ক্যা হোগা? হামারা লড়কা কা ক্যা হোগা?

অযোধ্যা সিংয়ের সহায়হীনতা ঝরে ঝরে পড়ল কথা-গুলোয়—মুল্লুকমে কুছ নেহি! না জমিন, না জোথনেকা গাই, ইয়া বলদ! হামারা লড়কা ভুখা মরে গা!

আমি চুপ করে গেলাম, কোন উত্তর খুঁজে পেলাম না। অযোধ্যাই অবশ্য অস্বস্তি কাটাল আমার। বললে—চেয়ারটা বাইরে এনে দি', খানিকক্ষণ গল্প করি!

তাই হ'ল, বসলাম বাইরে। অযোধ্যা ধীরে ধীরে তার জীবনের ষাটটা বছরের পুরনো পাতা উলটে উলটে অনেক কথাই বলার চেষ্টা করল। এত বড় একটা জবরদস্ত জমিদার বাড়ীর যাবতীয় সম্পত্তি চৌকী দেওয়ার দায়িত্ব যে কি বার বার বোঝাবার চেষ্টা করল অযোধ্যা।

—তরুণবাবুকা পিতাজী হাম্‌শে পাঁচ দিনকা ছোটা থা।

—তা হলে তোমরা সমবয়সী ছিলে?

—জী। এক সাথ খেলা হাম্ দোনো।

—কি নাম ছিল তাঁর?

—চন্দ্রমৌলি চৌধুরী।

—কি, কি? চন্দ্রমৌলি?

—হাঁ হুজুর, বড়া দিলদার জমিন্দার থে'।

জমিদার চন্দ্রমৌলির হৃদয় যে কত দরাজ ছিল সে দৃষ্টান্ত দিচ্ছিল অযোধ্যা।

—কিন্তু মুটে গদাধর যে বলছিল, চন্দ্রমৌলি ঐ মাঠে এক মেয়ে খুন করেছিলেন! সেই খুনে-জমিদারই তরুণ-কান্তির বাবা! সেই হ'ল দিলদার জমিন্দার? আমার কৌতূহল যেন দাপাদাপি সুরু করে দিল বুকের ভেতর। জিজ্ঞেস করব নাকি অযোধ্যাকে?

—অযোধ্যা সিং! খুব চাপা গলায় ডাকলাম। ছায়া-ছায়া পরিবেশের মধ্যে আমার সেই সন্তর্পণ সম্বোধন যে অর্থ-পূর্ণ বুঝেছিল অযোধ্যা।

—বোলিয়ে হুজুর!

কাছে এগিয়ে এসে তার চারপাইয়ায় বসলাম। চারি-দিকে চেয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললাম—এক বাৎ পুছেগা?

—হাঁ হাঁ, পুছিয়ে।

—চন্দ্রমৌলি জমিদার ত খুনে লোক শুনেছি।

অযোধ্যা সিং তীব্র প্রতিবাদ করে উঠল। তার লোল-চর্ম্ম মুখমণ্ডলের মধ্যে জলন্ত অগ্নিপিণ্ডের মত জলজল করে উঠল চোখ দুটো। তার প্রশ্ন—কে বলেছে? কোন্ বেকুব বলেছে?

আমিও রুখে উঠলাম—কে আবার বলবে? আমার কাছে আবার গোপন করছ কি? এ গাঁয়ের সকলেই জানে চোরকাঁটার মাঠের কথা।

—ও চোরকাঁটার মাঠের কথা শুনেছেন আপনি?

—নিশ্চয়।

—ও অমন দু'একটা ঘটনা জমিদার মাত্রেরই জীবনে থাকে বাবুজি। তা ছাড়া ওকে খুন করা বলে না। চন্দ্র-মৌলি খুন করতে চায়নি মনসুরবাঈকে।

—মনসুরবাঈ? কে এই মনসুরবাঈ?

—লক্ষ্ণৌ শহরকা এক বাঈজী, এক নৌটঙ্কী।

একরাশ কৌতূহল অসংখ্য প্রশ্নের রূপ ধরে আঁখালি-পিথালি সুরু করে দিল আমার কণ্ঠে। মনে হ'ল অযোধ্যা সিংকে ফুসলিয়ে ডেকে নিয়ে যাই আমার ঘরে, তার পর পাশে বসিয়ে চুপি চুপি বলি—তোমার ছেলেকে একটা খুব ভাল চাকরি করে দেব অযোধ্যা, তুমি শুধু বল দেখি মনসুর-বাঈজীর পরিচয়! কিন্তু এমন অধৈর্য্যতা অশোভন। বললাম—তা বটে অযোধ্যা সিং—এমন দু'একটা ঘটনা জমিদারের জীবনে থাকে বৈকি! যাই, শুয়ে পড়ি। একটু গরম লাগছে যেন, দরজাটা খুলে রাখব? বাঁ চেটোর খৈনী ডলাই-মলাই করতে করতে অভয় দিল অযোধ্যা—কুছ ফিকির মাৎ কিজিয়ে, মৌজ সে শো যাইয়ে বাবুজি।

বালিশে থুঁৎনি ভর দিয়ে শুয়ে পড়লাম। আর ভাবতে লাগলাম, কে সেই নৌটঙ্কী মনসুরবাঈ। সুদূর লক্ষ্ণৌ থেকে এই নির্জন গ্রামে সে এলই বা কেন? এল যদি বা খুন হ'ল কেন চন্দ্রমৌলির হাতে?

ঝম্ ঝম্ ঝম্। কেবলই মনে হতে লাগল, খোলা দরজাটার ফ্রেমের ওধারে ঐ যে অনন্ত আকাশের ছায়া-ছায়া পটভূমি, ঐ আকাশের জ্যোৎস্নার ঝালর তুলে একটি পরমা সুন্দরী নর্ত্তকী তালে তালে পা ফেলে নেমে আসছে মর্ত্ত্য-লোকে। কুর্নিশের ভঙ্গিতে দোলায়িত তার দক্ষিণ পাণি, কিন্তু চটুল চাহনিতে তীক্ষ্ণ পঞ্চশর। যেন স্বর্গ থেকে মর্ত্ত্যে নেমে এসে মুক্ত হ'ল নর্ত্তকী। বালিশের ওপর মাথা রেখে চোখ বুজে আমি শুনতে লাগলাম তার নূপুর-নিক্কণ। ঝম্ ঝম্ ঝম্।

চৌধুরী বাড়ীর অন্দর মহলে কি এমন রূপ নেই, না ছিল না! এমন টলমল যৌবন, এমন দুধে-আলতা রং, এমন টানা টানা কাজল-কালো চোখ! ছিল নিশ্চয়। অন্তঃপুরের পদ্মদীঘিতে সন্ধ্যাস্নান সেরে সজল এলোচুলে চন্দ্রমৌলির শয়নকক্ষের দিকে যেতেন বৈকি বড়রাণী এমনি ঝমঝম্ শব্দে। সে শব্দ নৌটঙ্কীর নূপুরের নয়, গৃহিণীর পায়ের মলের। নিতম্বের ছলচাতুরীর ছন্দে বাজত না সে মল, বাজত শান্ত সংযত গৃহিণীর পদক্ষেপে। হয়ত মন ভরতো না চন্দ্রমৌলি চৌধুরীর। তিনি শিকারী লোক যে। আজ আগ্রা, কাল কাশী। সেখান থেকে দিল্লী, দিল্লীতে দিল ভরল না, চল লক্ষ্ণৌ।...

ঝম্ ঝম্ ঝম্। বাঈজী নাচছে যৌবনছন্দে। যুঁই আর বেলফুলের সঙ্গে আতরের খসবু, তারও সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে উগ্র সুরার গন্ধ। তাকিয়ায় হেলান দিয়ে অর্দ্ধবৃত্তাকারে বসে আছে কেউ নবাবজাদা, কেউ শেঠ, কেউ জমিদার। মদালস চোখে লোলুপদৃষ্টিতে সর্ব্বাঙ্গ লেহন করছে বাঈজীর আর মাঝে মাঝে তারিফ জানাচ্ছে—সাবাস! সাবাস!

বটুন লাগি পিয়াকে মিলন কি
পিয়াকে দরশ বিনা জিয়া তড়পত হোই
তুম্‌হারে কারণ নিশা জাগি···
পিয়াকে মিলন কি···

গাইছে মনসুরবাঈ। ভাবানুসঙ্গ মনোরম ভঙ্গি তার, চোখমুখ ও সর্ব্ব অবয়বের মাধ্যমে পিয়া-মিলন-পিয়াসীর বিরহ-বেদনার কি অপূর্ব্ব রসপ্রকাশ।

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলেন একজন শ্রোতা। গলার পাকানো চাদরটা খুলে রেখে সঙ্গতিয়ার হাত থেকে কেড়ে নিলেন সারেঙ্গী। মনসুরবাঈ ফিরে চাইল একবার, সমর্থনের মিষ্ট হাসি হেসে নূতন উদ্যমে গাইল তার ঠুংরী। 'পিয়াকে দরশ বিনা জিয়া তড়পত হ্যায়!' কিন্তু কে ঐ সারেঙ্গী-বাদক? চন্দ্রমৌলী না? বাংলা দেশের সেই জমিদার চন্দ্র-মৌলী চৌধুরী! হ্যাঁ, সেই নাক চোখ মুখ রং, সেই সযত্ন-লালিত গুম্ফ। কিন্তু হাতের সেই বন্দুক কই? অব্যর্থ শিকারী সেই চন্দ্রমৌলী চৌধুরীর বন্দুক?

গানের শেষে আদাব জানিয়ে মৃদুহাস্যে বলল মনসুরবাঈ—প্রথম পরিচয় যে পেয়েছিলাম, তা দেখছি বর্ণে বর্ণে সত্যি।

সারেঙ্গী নামিয়ে অবাক হয়ে তাকালেন চন্দ্রমৌলী—মানে?

—মানে, সত্যি আপনি শিকারী। বন্দুক কাঁধে করে সুদূর বাংলা দেশ থেকে এসেছেন শিকার করতে, কিন্তু সারেঙ্গীর ছড় টেনেও শিকার করতে আপনি পারেন দেখছি।

বাঈজীর বিমুগ্ধ চোখের দিকে আর যেন চাইতে পারলেন না পুরুষসিংহ চন্দ্রমৌলী চৌধুরী।

—বাঃ খুব, বাঃ খুব! বলে সুরাপাত্রটা মনসুরবাঈয়ের অধরের দিকে এগিয়ে দিলেন মদমত্ত নবাবজাদা। কলরব করে উঠল চাটুকার সাঙ্গপাঙ্গ। চন্দ্রমৌলী কিন্তু আর বেশীক্ষণ বসলেন না। বাঈজীর কোলে আলতো ভাবে ছুঁড়ে দিলেন তাঁর গলার চেনহার, তার পর বার হয়ে চলে গেলেন। মনসুরবাঈয়ের হৃদয়-সারেঙ্গীতে ছড়খানা নির্ম্মম মাধুর্য্যে চালিয়ে চালিয়ে কি এক অপূর্ব্ব কান্না তুলেছিলেন চন্দ্রমৌলী চৌধুরী। বাঈজীর কণ্ঠ থেকে তাল মান লয় মীড় সবকিছুই হরণ করে চলে গেলেন আসর থেকে। নবাবজাদা নিয়ামুৎউল্লা আর শেঠ সুখনলালের কাছ থেকে বায়না নিয়েছিল সারেঙ্গীবাদক বাচ্চু মিঞা; পাঁচ শত মুদ্রার পরিবর্ত্তে ও, মনসুরবাঈ আর তার সঙ্গিনী রতনবাঈ নাচগানের মদিরায় ডুবিয়ে রাখবে ওদের আজ সারারাত। উপলক্ষ্য চন্দ্রমৌলী চৌধুরী। কিন্তু তাল কেটে গেল।

···আমি আর সেদিন নাচতে-গাইতে পারলাম না। আরে গাও মেরে জান, গাও মনসুরবাঈ। বলে বার বার ঢলে পড়ল আমার গায়ে আর কাকুতি মিনতি করল কিন্তু তবু আমি পারলাম না। বললাম—গুস্তাগি মাফ কিজিয়ে নবাবজাদা, তবিয়ৎ ঠিক নহি! ওরা হাসল, গা টেপাটেপি করে বিদ্রূপ করল—ওঃ হো, মহব্বৎ! 'পিয়া দরশন বিনা জিয়া তড়পত!' বাঈজীর আবার ভালবাসা। পেশাদার নর্ত্তকীর আবার প্রেম! বিশ্রী ইঙ্গিত করে হাসল ওরা সকলে। রাগে গরগর করতে লাগল বাচ্চু মিঞা। রতন-বাই কিন্তু বুঝল আমার মনের কথা। হাজার হোক মেয়ে-মানুষ ত!

—তুমি ভালবাসলে চন্দ্রমৌলীকে?

—হাঁ বাবুজি! ভালবাসলাম।

—কি করলে তার পর?

—কি আর করব! খোঁজ নিয়ে জানলাম চন্দ্রমৌলী ঐ রাত্রেই কাশী রওনা হয়েছেন। বাচ্চু মিঞাকে বললাম—তুমি ত কাশী থেকেই একটা বায়না পাচ্ছিলে, চল না সেখানে যাই।

বাচ্চু রেগে উঠল। বলল—তুমি প্রেম করবে বলে আমরা এই দল গড়িনি মনসুরবাঈ। আগ্রায় একরাত্রের জন্য আমরা পেতে পারি হাজার টাকা, কাশীর শেঠ দিতে চেয়েছে মাত্র ছ'শো। কেন যাব সেখানে?

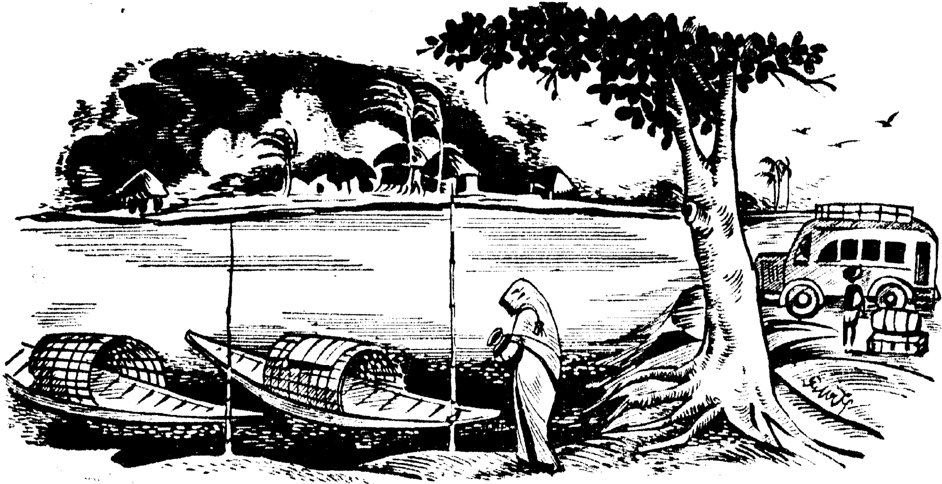
—কি হ'ল শেষ পর্য্যন্ত? গেলে কাশী?

মনসুরবাঈ মৃদু হাসল, জয়ের হাসি। বললে—আমার ওপর রাগ করে থাকতে পারত না বাচ্চু। লক্ষ্য করলাম, কেমন যেন রাঙা হয়ে গেল বেচারা।

—বাচ্চু বুঝি তোমার প্রণয়প্রার্থী ছিল?

মাথাটি ঈষৎ নত করে মনসুরবাঈ চলে গেল চন্দ্রমৌলী প্রসঙ্গে।

—খুঁজে পেলাম দশাশ্বমেধ ঘাটে। স্নান সেরে শুদ্ধবস্ত্রে যাচ্ছেন কাশী বিশ্বনাথের মন্দিরে। আমি মুসলমান, বিবেক আমায় বাধা দিল, সে অবস্থায় তাঁকে আর ডাকলাম না। কোন কথা হ'ল না সেবার। রাত্রে সেই শেঠের বাড়ীতে নাচগান সেরে পরের দিনই আমাদের রওনা হতে হ'ল আগ্রা।



অবাক বিস্ময়ে আমি চেয়ে রইলাম মনসুরবাঈয়ের দিকে। —তুমি মুসলমান, উনি হিন্দু, তবে কেন এমন ভালবাসার ভুল করলে মনসুরবাঈ ?

—এর উত্তর নেই বাবুজী। তবে কি জান তোমাদের বিশ্বনাথজী আমার প্রতি দয়া করলেন।

—কি রকম ?

—পনর দিন পর আমাদের লক্ষ্ণৌয়ের সফদরগঞ্জের বাসায় হঠাৎ এসে পায়ের ধুলো দিলেন জমিদার চৌধুরীজী। বললেন—মনসুরবাঈ। চোরকাঁটা কাকে বলে জান ?

আমি ঘাড় নাড়লাম—না, জানি না।

উনি বুঝিয়ে দিলেন আর বললেন—ঐ চোরকাঁটারই মত তুমি চুপিসারে কখন যেন আমার এই বুকের মধ্যে বিঁধে আশ্রয় নিয়েছ। আমি তাই ছুটে এলাম তোমার কাছে।

মনসুরবাঈয়ের টানা টানা দুই চোখের পাতা অশ্রুসিক্ত হ'ল। আমি দেখলাম, তার আর্দ্র আঁখিপল্লবে শুধু একটি মাত্র ভাষা। সে ভাষা ভালবাসার।

—জান বাবুজী, চন্দ্রমৌলী চৌধুরী একজন অতি উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতরসিক ছিলেন।

—না জানি না। বাইসন বুনো মোষ শিকার করতেন তারই নিদর্শন দেখেছি আজ সন্ধ্যায়, ওঁদের কাছারী ঘরে।

—শুধু ঐটুকু ? তা হলে কিছুই জানেন নি ওঁর সম্বন্ধে। কি ধ্রুপদ, কি খেয়াল, কি ভজন, কি ঠুংরী সব গানই গাইতেন সুন্দর, জ্ঞানও ছিল গভীর। তাঁর ঐ পুরুষসিংহের মত রূপ আর মহৎ শিল্পীর প্রাণের কাছে আমি সর্বস্ব উৎসর্গ করে বসলাম।

ভারাবনত বল্লরীর মত মনসুরবাঈ মাথা নীচু করে বসে রইল। আমি দেখলাম টপটপ করে কয়েক ফোঁটা চোখের জল মাটিতে পড়ল।

বাচ্চু মিঞার দল গেল ভেঙে। রতনবাঈ জুনাগড়ের নবাব বংশের কোন এক বংশধরের বেগম হয়ে চলে গেল আর আমি বাংলা দেশের চোরকাঁটা হয়ে পড়ে রইলাম সফদরগঞ্জের এক কোণে।

—আর বাচ্চ মিঞা ?

—বাচ্চু মিঞা আমাকে সে অবস্থায় ফেলে কোথাও যেতে চাইল না। আমি অবাক হয়ে আবার চাইলাম মনসুর বাঈয়ের দিকে। দেখি, সেই ঝমঝম্ নুপুর-বাজানো মর্ত্ত্য-লোকে নেমে-আসা চটুলা নর্ত্তকী নয়, সর্বাঙ্গে মাতৃত্বের মাধুরী নিয়ে মনসুরবাঈ চেয়ে আছে মাটির দিকে।

সহসা কানে এল কর্কশ চিৎকার।

বাচ্চ মিঞা চেঁচাচ্ছে—শালা বেইমানকো হাম ছোড়েগা নেহি—ছাড়ব না বেইমান জমিদারকে। মাসে মাসে টাকা পাঠালেই তার কর্ত্তব্য শেষ ? চল মনসুরবাঈ, সুলতানপুরে যাই, সেখানে গিয়ে শায়েস্তা করে আসি চন্দ্রমৌলীকে। তোমার গর্ভে যে সন্তান···

—না না না, আমি যাব না মিঞাজী। আমায় মাফ কর।

—আমি কোন কথা শুনব না তোমার, তোমায় যেতেই হবে। ভালবাসার নামে যে সন্তান আসছে দুনিয়ায়, তার সম্পূর্ণ অধিকার আছে চন্দ্রমৌলীর অন্তঃপুরে যাবার।

সন্তান! চন্দ্রমৌলীর সন্তান! আমি আর প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না বাচ্চ মিঞার প্রস্তাব, রওনা হলাম। দীর্ঘ ক্লান্তিকর পথ অতিক্রম করে পৌঁছলাম সুলতানপুর

গ্রামে। নদী পেরিয়ে পথ খুঁজে খুঁজে এসেছি ঐ মাঠে, ঐ মাঠ অতিক্রম করলেই জমিদার চন্দ্রমৌলীর প্রাসাদ।

—একি! চোরকাঁটা, তুমি?

বাচ্চ মিঞা আর মনসুরবাঈয়ের পথ আগলে হঠাৎ রুখে দাঁড়াতে দেখলাম চন্দ্রমৌলীকে। হাতে সারেঙ্গী নয়, রাইফেল। কাছাকাছি কোথাও বেরিয়েছিলেন বোধ হয়, সখের শিকারে।

মনসুরবাঈ একবার মাত্র চোখ তুলে চাইল চন্দ্রমৌলীর দিকে। বড় করুণ মনতিভরা সে চাহনি।

জবাব দিল বাচ্চ মিঞা—হ্যাঁ, তোমার চোরকাঁটা এসেছে তোমার বেইমানীর জবাব দিতে।

—বেইমানী! গর্জ্জন করে উঠল চন্দ্রমৌলী।

—হাঁ জী, বেইমানী! ওকে তোমার অন্দরমহলে ঠাঁই দিতে হবে, দেবে কি না বল?

—দেখ বাচ্চ মিঞা! সাবধানে কথা বল। চন্দ্রমৌলী চৌধুরী কখনও পরিণামের কথা ভেবে কাজ করে না।

—আরে যাও যাও, বেইমান কাঁহাকার...

দ্বিতীয়বার 'বেইমান' সম্বোধন উচ্চারিত হবামাত্র ক্রোধোন্মত্ত চন্দ্রমৌলী হাতের রাইফেল তুলে চক্ষের নিমেষে গুলি চালিয়ে দিলেন। মনসুরবাঈ আর্ত্ত চিৎকারে চন্দ্রমৌলীকে বিরত করার চেষ্টায় সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু চন্দ্রমৌলীর রাইফেলের গুলী সেদিনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল না। রক্তাক্ত দেহে দু'জনেই লুটিয়ে পড়ল মাঠে।

আমি সে দৃশ্য দেখে শিউরে উঠলাম। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল শরীর। দেখলাম, সন্ধ্যাবেলায় যে চোরকাঁটাগুলো জড়ো করেছিলাম, স্তূপীকৃত সেই চোরকাঁটা ঠেলে রক্তাক্ত কলেবরে উঠে দাঁড়াল মনসুরবাঈ। সুন্দর ক্ষমাস্নিগ্ধ চোখ দুটি তার। কাতর কণ্ঠে আমায় বলল—এবার বুঝছ বাবুজী, তোমার অঙ্গবাসকে ভর করে কেন আমি উঠে এসেছি এই জমিদার বাড়ীতে! এ আমার তীর্থস্থান, তাই। চন্দ্রমৌলী আদর করে আমায় চোরকাঁটা বলে ডাকত। তাই আমি রক্তভগা চোরকাঁটা হয়ে জন্মালাম ঐ মাঠ ভরে। ওরই সারেঙ্গীর ছড়ে আমার বাঈজী-জীবনের মৃত্যু ঘটেছিল, ওর বন্দুকের গুলীতে আমার সার্থক নবজন্ম হ'ল চোরকাঁটার দেহে।

—বাবুজী!

—বল মনসুরবাঈ!

—আমার একটা কথা রাখবে?

—কি কথা?

—তুমি নাকি ওদের জমিদারী কেড়ে নিতে এসেছ?

কাতর দুটি চোখ মেলে উত্তরের অপেক্ষায় আমার দিকে চেয়ে রইল মনসুরবাঈ। চন্দ্রমৌলীর বংশকে জমিদারী থেকে চিরকালের জন্য বঞ্চিত করে মনসুরবাঈয়ের হয়ে প্রতিশোধ নেবার উল্লাস আমায় পেয়ে বসল।

বললাম—হ্যাঁ তাই!

—তুমি ফিরে যাও বাবুজী! আমার হাত দুটো চেপে ধরে করুণ মিনতি জানাল মনসুরবাঈ।

—ফিরে যাব কেন?

—তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ফিরে যাও। চন্দ্রমৌলীর সন্তান তরুণকান্তি, সে আমারও সন্তান। ওর মুখ চেয়ে আমি অনুরোধ করছি।

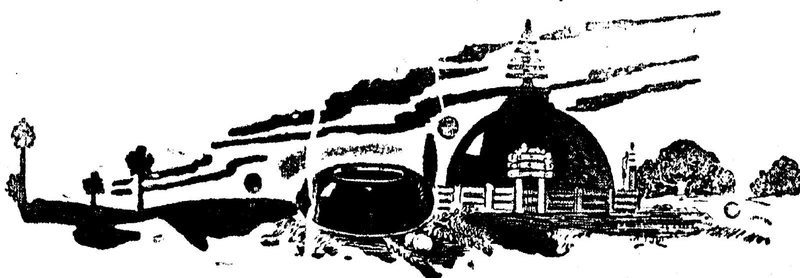
টপ টপ করে দু'ফোঁটা নিটোল অশ্রুবিন্দুর রূপ ধরে ঝরে পড়ল মাতৃত্বের মহিমা। কিন্তু এতখানি উদারতা অসহ্য মনে হ'ল আমার কাছে। চিৎকার করে উঠলাম—না-না-না, কিছুতেই হবে না তা।

বাবুজী! বাবু-জী-ঈ-ঈ!

গায়ে হাত রেখে সজোরে ঝাঁকানি দিয়ে কে যেন ঘুম ভাঙাল আমার। খানিক পর ঘোর কাটল আমার। চেয়ে দেখি, অযোধ্যা সিং।

বলছে—বাবুজী কি ভয় পেয়েছেন? অমন করে কি সব বকছেন সারারাত?

শুধু অযোধ্যা নয়, দেখি তরুণকান্তিও। আমার কপালে হাত দিয়ে বলছে—ইস্! দিব্যেন্দুবাবু! জ্বরে গা যে পুড়ে যাচ্ছে আপনার!



উনবিংশ শতাব্দীর মহীয়সী মহিলা পণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতী

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাস

পূর্ব পরিচয়

ভারতীয় বিদুষী পণ্ডিতা রমাবাই ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল তারিখে মহীশূর রাজ্যের সীমান্তে পশ্চিমঘাট গিরিমালার শৃঙ্গদেশে অবস্থিত 'গঙ্গামল' নামক স্থানের এক নিবিড় অরণ্যে জন্ম-পরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতার নাম অনন্ত শাস্ত্রী। তিনি "চিৎপাবন ব্রাহ্মণ" বংশসম্ভূত ছিলেন। অনন্ত শাস্ত্রী অসাধারণ পণ্ডিত এবং উদার মনোভাবাপন্ন ছিলেন। তখনকার দিনে হিন্দু স্ত্রীলোককে শিক্ষার আলোকদান সমাজবিগর্হিত কার্য্য ছিল। কিন্তু শাস্ত্রী ইহা গ্রাহ্য না করিয়া স্বীয় স্ত্রী লক্ষ্মীবাইকে সংস্কৃত ভাষায় সুশিক্ষিতা করেন। তজ্জন্য গোঁড়া হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক শাস্ত্রী এবং তাঁহার স্ত্রীকে বহু সামাজিক অত্যাচার ও নিগ্রহ সহ্য করিতে হয়। রমাবাই এহেন উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত এবং তেজস্বী পিতামাতার সন্তান। পিতামাতার শিক্ষাদান-প্রণালীর গুণে রমাবাই অল্প বয়সেই সংস্কৃত ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করিতে সমর্থা হন। তাঁহার মাতা ব্রহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া সাত বৎসরের বালিকা রমাবাইকে ঘুম হইতে জাগাইতেন এবং মুখে মুখে গীতা, ভাগবত ইত্যাদি ধর্ম্মগ্রন্থের শ্লোকের অর্থ মারাঠি ভাষায় বুঝাইয়া মুখস্থ করাইতেন। ফলে রমাবাইর বয়স যখন বার বৎসর তখন তিনি ভাগবতের আঠার হাজার শ্লোক সম্যক হৃদয়ঙ্গম ও কণ্ঠস্থ করিয়া স্বীয় অলোকসামান্য প্রতিভার পরিচয় দেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অনন্ত শাস্ত্রীর মত উদার মনোভাবাপন্ন পিতাও রমাবাইকে বেদ এবং উপনিষদ পাঠের অনুমতি দেন নাই, কারণ তখন স্ত্রীলোকের পক্ষে বেদ ও উপনিষদ পাঠ নিতান্ত রীতিবিগর্হিত ছিল। সামাজিক উৎপীড়ন হইতে দূরে অবস্থান এবং ধর্ম্মচর্চ্চায় নির্জ্জন-বাসের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া অনন্ত শাস্ত্রী গভীর অরণ্যে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবত্তার কাহিনী চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হওয়ায় দলে দলে লোক প্রত্যহ শৈলশিখরে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল, গঙ্গামলের অরণ্য-বাটিকা ক্রমে তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইল। ধান্যক্ষেত্র ও নারিকেলের চাষ দ্বারা শাস্ত্রীর গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়নির্ব্বাহ হইত। আতিথেয়তা তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল, কেহই বুভুক্ষিত উদরে শাস্ত্রীর কুটীর হইতে ফিরিতে পারিত না। ফলে, তের বৎসরের মধ্যে অত্যধিক মাত্রায় ঋণজালে জড়িত হইয়া তিনি শৈলশিখর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

গৃহহারা

অনন্ত শাস্ত্রী গৃহহারা হইয়া পর্য্যটকের জীবন আরম্ভ করিলেন। সস্ত্রীক শাস্ত্রী মহোদয় তিনটি শিশু-সন্তান সহ সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তিনি তীর্থে তীর্থে তাহাদিগকে লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। পুরাণ, ভাগবতাদি পাঠ দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। এইরূপ দেশে দেশে ঘুরিতে ঘুরিতে শাস্ত্রী-পরিবার অবশেষে ১৮৭৪ সনে মাদ্রাজে উপস্থিত হন।

অদৃষ্টের পরিহাস

মাদ্রাজে তখন ঘোর দুর্ভিক্ষ। লোক তখন ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির। চারিদিকে হাহাকার লাগিয়া গিয়াছে। পুরাণ পাঠ শুনে কে? অনশন ও অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট ৭৮ বৎসরের অন্ধ বৃদ্ধ অনন্ত শাস্ত্রী ১৮৭৪ সনে এমনি এক দুর্দ্দিনে অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। শৈলশিখরে যাঁহার কুটীর হইতে একদিন সহস্র সহস্র নরনারী বুভুক্ষিত উদরে ফিরিতে পারিত না, আতিথেয়তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে গিয়া যিনি একদিন সর্ব্বস্বহারা হইয়া রিক্ত হস্তে পথে দাঁড়াইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, আজ অন্নাভাবে তাঁহাকে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইল! ইহাকেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস।

অনাথিনী রমাবাই

পিতার মৃত্যুর ছয় মাসের মধ্যে রমাবাইর মাতা এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী মৃত্যুমুখে পতিত হন। রমাবাই এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীনিবাস শাস্ত্রী অকূল সাগরে ভাসিলেন। চিন্তাকুল হৃদয় ও অনশনক্লিষ্ট শীর্ণদেহ লইয়া তাঁহারা দুই জন অতিকষ্টে মাদ্রাজ ত্যাগ করিলেন। তখন অনাহার ও মানসিক দুশ্চিন্তায় ভ্রাতা-ভগ্নীর শরীরের অবস্থা যে কি আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। রমাবাই তখন ষোড়শবর্ষীয়া যুবতী। ভ্রাতা ও ভগ্নী উত্তর-ভারত অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। তাঁহারা ভৃত্যের কাজ করিতে অক্ষম, ভিক্ষা করিতেও পারেন না, গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় হয় কিরূপে? উভয়ে বিষম বিপদে পড়িলেন। পিতামাতা তাঁহাদিগকে ভগবানে আত্মনির্ভর করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহারা আরও বলিয়াছিলেন যে, শাস্ত্রে বিধান আছে, বিশেষ ভাবে ভগবানের পূজা করিলে, ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা দান করিলে, ভগবানের নাম সঙ্কীর্ত্তন করিলে, উপবাস প্রায়শ্চিত্তাদি এবং ধ্যান-ধারণা করিলে, ভগবান সশরীরে উপস্থিত হইয়া ভক্তের সঙ্গে আলাপ পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন ও তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। ভ্রাতা-ভগ্নী সাময়িক অর্থকৃচ্ছ্রতার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পিতামাতার উপদেশ মত চলিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। দীর্ঘ তিন বৎসরকাল তাঁহারা তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করতঃ ধর্ম্ম-কর্ম্ম, দেব-দ্বিজে দান ইত্যাদি ক্রিয়াকাণ্ডে পিতামাতার পরিত্যক্ত যে সামান্য

অর্থ ছিল, তাহা ব্যয় করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিলেন না। আবার তাঁহারা বিষম অর্থাভাবে পতিত হইলেন। রমাবাইর পরিধানের মাত্র একখানা ধুতি ছিল, স্নান করিয়া আর্দ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া তাহার অর্দ্ধেক শুখাইতে দিতেন এবং বাকী অর্দ্ধেকের দ্বারা বহুকষ্টে গাত্রাচ্ছাদন করিতেন। এমনই ভাবে কোনও দিন অনাহারে, কোনও দিন বা অর্দ্ধাহারে তাঁহাদের দিন কাটিতে লাগিল। উত্তর ভারতে তাঁহারা কাশ্মীর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া অবশেষে পূর্ব্ব ভারতের দিকে রওয়ানা হইলেন এবং ১৮৭৮ সনে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন। এই কঠোর জীবন-সংগ্রামের আবর্ত্তে পড়িয়া রমাবাই প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের প্রতি কতকটা সন্দেহ ভাবাপন্ন হইয়া পড়িলেন। হিন্দুধর্ম্মে অনাস্থার বীজ এই সময়েই ভিতরে ভিতরে তাঁহার অন্তরে রোপিত হইল।

কলিকাতায় ভ্রাতাভগ্নী

রমাবাই কলিকাতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার যশঃসৌরভ চার দিকে ছড়াইয়া পড়িল। "চিৎপাবন-ব্রাহ্মণ" বংশসম্ভূতা অলোকসামান্য প্রতিভাশালিনী বিংশবর্ষীয়া অবিবাহিতা এই ব্রাহ্মণ-কন্যার বিবরণ কলিকাতার—তথা সমগ্র ভারতবর্ষের সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হইতে লাগিল। কলিকাতা মহানগরীর পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া প্রকাশ্য-সভায় তাঁহাকে 'সরস্বতী' উপাধিতে ভূষিতা করেন। পণ্ডিতা রমাবাই পূর্ব্বে বিন্দুমাত্র প্রস্তুত না হইয়াও সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারিতেন। সুকঠিন সমস্যা-পূরণে তিনি অদ্বিতীয়া ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কলিকাতায় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাসাদে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী রমাবাইকে দুরূহ প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করেন, কিন্তু তিনি স্বীয় অনন্যসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ববলে প্রত্যেক প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছিলেন। কলিকাতার নারীমণ্ডলীর পক্ষ হইতে স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসুর নেতৃত্বে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় পণ্ডিতাকে এক মানপত্র প্রদান করা হয়। এতদ্ব্যতীত ভারতীয় খ্রীষ্টীয় সমিতির সভ্যগণ ভ্রাতা-ভগ্নীকে এক সামাজিক সম্মেলনে আমন্ত্রণ করিয়া বিশেষ ভাবে সম্বর্দ্ধিত করেন। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সমিতির সভাবৃন্দ এই সম্বর্দ্ধনা-সভার উদ্যোক্তা ছিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব রেজিষ্ট্রার টনি সাহেব (Mr. Tawney) সংস্কৃতে বড় পণ্ডিত ছিলেন। রমাবাইর কলিকাতায় আগমন সময়ে টনি সাহেব তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষায় এক অভিনন্দন দেন, তাহার প্রথম ছত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন "আর্য্যে, তব শ্রুতাকীর্ত্তি ময়াপি ম্লেচ্ছজাতিনা।" বিশ্ব-বরেণ্য মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন পণ্ডিতা ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া যথোচিতভাবে আপ্যায়িত করেন। কথা-প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্র পণ্ডিতাকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি বেদপাঠ করিয়াছেন কি? পণ্ডিতা উত্তর দেন, হিন্দু-মহিলার বেদপাঠে অধিকার নাই। কেশবচন্দ্র মৃদুহাস্য করিয়া এক সেট বেদ তাঁহাকে উপহার দিয়া বেদ ও উপনিষদ পাঠের জন্য উপদেশ দেন। কেশবের কথায় তিনি বেদপাঠে মনোনিবেশ করেন এবং ক্রমে একেশ্বরবাদিনী হইয়া পড়েন। হিন্দুধর্ম্মে অনাস্থার বীজ ইতিপূর্ব্বেই রোপিত হইয়াছিল। বেদপাঠের পর আর তিনি মূর্ত্তি পূজায় অগ্রসর হন নাই, ভ্রাতা শ্রীনিবাস শাস্ত্রীও পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী হইয়া পড়েন। তাঁহারা উভয়েই এই সময়ে "ছুঁৎমার্গ" পরিহার করেন। দেশভ্রমণ ব্যপদেশে ভ্রাতাভগ্নী বহু সম্ভ্রান্ত হিন্দু-পরিবারের সংস্পর্শে আসিতেন, তথায় বালবিধবার নিদারুণ লাঞ্ছনা দর্শনে রমার কোমল প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। মাদ্রাজে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতির ব্যবহার-বৈষম্য তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, সদ্য-স্বামীহারা বালিকা-বধূর কঠোর নির্য্যাতন তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তীর্থে তীর্থে পাণ্ডা ও গুণ্ডাদের দৌরাত্ম্য ভ্রাতাভগ্নী কতবার সহ্য করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। অশীতিপর বৃদ্ধের ষোড়শী তরুণীর সহিত বিবাহ, তীর্থস্থানে রজতমুদ্রার বিনিময়ে সদ্য স্বর্গে যাওয়ার ব্যবস্থা—তথা 'সুফল' লাভ, দেব-মন্দিরে মোহান্ত-মহারাজের অপার লীলা, সেবাদাসীর বীভৎসকাণ্ড ইত্যাদি বহু দৃষ্টান্ত ভ্রাতাভগ্নী ভারত-পরিভ্রমণের সময় অবলোকন করিয়াছেন। রমাবাইর মন সন্দেহের দোলায় দোলায়িত হইতে লাগিল, তিনি প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস হারাইলেন।

আসামে

কলিকাতা হইতে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ও রমাবাই আসাম অভিমুখে যাত্রা করেন এবং তথাকার নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া শেষে গৌহাটী আসিয়া উপস্থিত হন। রমাবাইর ভাবী স্বামী বিপিন-বিহারি মেধাবী তখন গৌহাটি নর্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক থাকায় তথাকার বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। বিপিনবিহারীর বিদ্যাবত্তা, চারিত্রিক মাধুর্য্য এবং অমায়িক ব্যবহারের জন্য গৌহাটির শিক্ষিত সমাজ এবং জনসাধারণ তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ ও শ্রদ্ধা করিতেন। ভ্রাতা-ভগ্নী গৌহাটি গিয়া জনপ্রিয় বিপিন-বিহারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁহাদিগকে প্রথমেই গৌহাটির তৎকালীন জননায়ক শ্রদ্ধাভাজন গুণাভিরাম বড়ুয়ার সহিত পরিচিত করিয়া দেন। বড়ুয়া মহোদয় শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে একখানা "আসাম বুরুঞ্জি পুঁথি" উপহার প্রদান করেন। রমাবাই ও তাঁহার ভ্রাতা গৌহাটিতে বিদ্বজ্জন সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছিলেন। বিপিনবিহারীর বিদ্যাবত্তা, সংগঠন-ক্ষমতা ও অন্যান্য গুণাবলী দৃষ্টে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী তাঁহার গুণমুগ্ধ হইয়া পড়েন। ইহা পরে প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

শ্রীহট্ট

১৮৭৯ সনের ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে পণ্ডিতা রমাবাই ও শ্রীনিবাস শাস্ত্রী শ্রীহট্টে পদার্পণ করেন। তাঁহাদিগকে সাদর

অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিবার জন্য এক অভ্যর্থনা-কমিটি গঠিত হয়। রমাবাই ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রীনিবাস শাস্ত্রী সুরমানদী তীরস্থ চাঁদনীঘাটে পৌঁছাইবার পর শ্রীহট্টের গণ্যমান্য সুধীমণ্ডলী এক মিছিল করিয়া তাঁহাদিগকে নয়াসড়কে খাজাঞ্চি-বাটীর সন্নিকটে নির্দ্দিষ্ট একটি বাটীতে লইয়া যান। সেখানে শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁহাদের সহিত সাক্ষাত করিতে যাইতেন। মণিপুরী রাজবাটীর সুবৃহৎ নাটমন্দিরে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। পণ্ডিতাকে সংস্কৃতে একখানা অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়। শ্রীহট্ট জেলাস্কুলের হেড পণ্ডিত ৺কালীকিঙ্কর শর্ম্মা উহা পাঠ করেন। রমাবাই সংস্কৃতে ইহার সুদীর্ঘ উত্তর দেন। সমগ্র শ্রীহট্ট জেলার স্বনামখ্যাত পণ্ডিতমণ্ডলী এই সভায় যোগদান করেন। সভাপতিত্ব করেন শ্রীহট্টের ডেপুটি কমিশনার মিঃ নটমন্ জনসন্ সাহেব। এই সভায় পণ্ডিতমণ্ডলী রমাবাইকে তিনটি কঠিন সমস্যা পূরণ করিতে দেন। সামান্য চিন্তা করিয়াই তিনি অবলীলাক্রমে সমস্যা তিনটি পূরণ করিয়া দেন। নিম্নে তিনটি সমস্যা ও তাহার প্রত্যুত্তর সন্নিবেশিত করিলাম :

প্রথম সমস্যা—গদ্যমিদং বিনাঙ্গম্
উত্তর— বিত্তাংসমভাস্য সদানবদ্যাং
  গ্রাহ্যো বিবেকো মনসেতিসম্যক্
  নরস্য সর্ব্বৈরপি তত্ত্ববুদ্ধ্যা—
  নালোচ্যতে গদ্যমিদং বিনাঙ্গম্।
দ্বিতীয় সমস্যা—সা তত্র চিত্রায়তে
উত্তর—যা জানাতি পরপ্রজ্ঞামুকমতিঃ স্ত্রী সা সমাজে সতী,
  ধর্ম্মৈক প্রতিপাদকেঽবিদিতসদ্ধর্ম্মেঽভিজাত্যপি
  মুগ্ধস্বাদনবদ্যনীতিবিষয়জ্ঞানাববোধক্ষমা
  বাক্সানাতিবিবেকবাদকুশলা সা—তত্র চিত্রায়তে।
তৃতীয় সমস্যা—অহো দগ্ধোস্মি বৃষ্টিভিঃ
উত্তর— বিদ্যুৎপাত ভয়গ্রস্তমতিজ্ঞান জনঃ কশ্চিৎ,
  শীতকালে বদত্যেবং অহো দগ্ধোস্মি বৃষ্টিভিঃ।

এই সভায় রমাবাইকে এক তোড়া টাকা উপহার প্রদান করা হয়। পণ্ডিতা বক্তৃতান্তে উপবিষ্টা হইলে, ৺রায়বাহাদুর সীতা-মোহন দাস কলিকাতাস্থ 'শ্রীহট্ট সম্মিলনী' প্রদত্ত একখানা মানপত্র পাঠ করেন। শুনিয়াছি, এই মানপত্রের রচয়িতা ছিলেন শ্রদ্ধেয় ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস। পণ্ডিতা এই মানপত্রেরও যথোপযুক্ত উত্তর দেন। শ্রীহট্ট জেলা স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ ভ্রাতাভগ্নিকে স্কুলে ছাত্রদের প্রতি উপদেশমূলক বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। সেখানে তিনি সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা দেন এবং পণ্ডিতমণ্ডলী-প্রদত্ত সমস্যাও পূরণ করেন। জেলা স্কুলে পণ্ডিতাকে শ্রীহট্টে প্রস্তুত এক-খানা হাতীর দাঁতের পাখা এবং একটি সোনার আংটি উপহার দেওয়া হয়। তখনকার দিনে শ্রীহট্টের রায়নগরে হাতীর দাঁতের পাখা, শীতলপাটি ইত্যাদি প্রস্তুত হইত। মুর্শীখানা মহলায় (রায়সাহেব) ৺নবকিশোর সেন মহাশয়ের বাসায় একটি ক্ষুদ্র মহিলা-সভার অনুষ্ঠান করা হয়। তথায় শ্রীহট্টের মহিলারা পণ্ডিতাকে সম্বর্দ্ধিত করেন। গিবিশ বিদ্যালয়ে রমাবাইকে অভ্যর্থনার জন্য যে সভা আহূত হয়, তাহাতে ডেপুটি কমিশনার, ডাক্তার সাহেব, পুলিস সাহেব, ডাক্তার সাহেবের মেম এবং শহরের যাবতীয় পদস্থ ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। গিবিশ বিদ্যালয়ের সম্মুখে সুসজ্জিত তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার উপরে লিখা ছিল "রমা রমে সমাগচ্ছ কৃপয়া ছাত্র-মন্দিরে।" উক্ত সভায় বিপিনবিহারী দাস (মেধাবী), এম-এ, বি-এল, মহাশয় উপস্থিত ছিলেন এবং স্বীয় ওজস্বিনী ভাষায় রমাবাইর অতীত জীবনের ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করেন। (রায়বাহাদুর) ৺সীতামোহন দাস ও (রায়-বাহাদুর) ৺বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্ত্তী এই সভার সুশৃঙ্খলা বিধানার্থ যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। শ্রীহট্টে অবস্থানকালে বিপিনবাবু রমা-বাইর কাছে বিবাহের প্রস্তাব করেন, রমাবাই ভ্রাতা শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর অনুমতি পাইলে বিবাহে আপত্তি নাই বলিয়া জানান।

শ্রীপদ বাবাজী ঠাকুর

ঠিক এই সময় বোম্বের সিভিলিয়ান শ্রীপদবাবাজীঠাকুর ছদ্মবেশে শ্রীহট্টে আসিয়া কালীঘাটের নরসিংহজীউর আখড়ায় বাস করেন। বলা বাহুল্য, পণ্ডিতাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যেই তিনি এই শহরে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীহট্টে আসিয়া তিনি এক বিজ্ঞাপন প্রচার করেন যে, একটি জনসভায় সংস্কৃতে বক্তৃতা করিবেন। স্থানীয় গিবিশ বঙ্গবিদ্যালয়ে এই সভা আহূত হয়। উক্ত সভার বিপিনচন্দ্র পাল একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা দেন। পরদিন ইংরেজী ভাষায় 'ভারতীয় জাতীয়তা' (Indian Nationality) সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করা হয়। শ্রীপদ বাবাজী হিন্দুভাবাপন্ন ছিলেন এবং পণ্ডিতাকে দেখিতে যান। রমাবাইর সহিত সাক্ষাতের পর বিবাহের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীপদ বাবাজী দাবা ও পাশা খেলায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

বিবাহ

শ্রীহট্ট হইতে ভ্রাতা-ভগ্নী ঢাকা চলিয়া যান। তাঁহারা ঢাকা ও বিক্রমপুরের কতকগুলি গ্রাম পরিভ্রমণ করেন। ঢাকায় তাঁহারা কমিশনারের 'পার্সনেল এসিষ্ট্যান্ট' অভয়চরণ দাসের অতিথিরূপে বাস করেন। অভয়বাবু পণ্ডিতাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। ঢাকায় অভয়বাবুর বাড়ীতে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হন। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মৃত্যুর প্রাক্কালে রমাবাইকে বিপিনবিহারীর সহিত বিবাহে অনুমতি দিয়া যান এবং তদনুসারে ১৮৭২ সনে ৩ আইন মতে বাঁকীপুরে তাঁহাদের বিবাহ-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Mr. Beveridge I. C. S. ও তাঁহার পত্নী এই বিবাহের সাক্ষীরূপে উপস্থিত ছিলেন।

সমাজ-বিপ্লব

এই অসবর্ণ বিবাহে সমাজে হুলস্থুল পড়িয়া যায়। ব্রাহ্মণী ও

শূদ্রে বিবাহ শ্রীহট্টের ইতিহাসে এই প্রথম। বিবাহের পর স্থানীয় সংবাদপত্র নিন্দাসূচক মন্তব্য প্রকাশ করে। শ্রদ্ধেয় ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস পণ্ডিতার বিবাহ সমর্থন করিয়া এই মন্তব্যের উত্তর দেন। শ্রীহট্টের মুন্সেফ নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় সুন্দরী-বাবুর লেখার প্রতিবাদ করেন। এইরূপ বাদ-প্রতিবাদ কিছুদিন চলিতে থাকে। বিপিনবাবু সমাজবর্জ্জিত হন। শুধু একবার তাঁহার মাসতুতো ভগ্নী শ্রীহট্টের প্রথম গ্রন্থ-রচয়িত্রী ৺কৃষ্ণপ্রিয়া চৌধুরাণী তাঁহাদিগকে সমাজে স্থান দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

বিবাহিত জীবন

বিবাহের পর পণ্ডিতাকে লইয়া বিপিনবাবু শিলচর যান। সেখানে তিনি ওকালতি করিতেন এবং ক্রমে একজন প্রথম শ্রেণীর উকীলরূপে পরিগণিত হন। শিলচরে যেখানে Dr P. K. Das-এর Philanthropic Dispensary ছিল, ঐ জায়গায়ই তাঁহারা বাস করিতেন। বিবাহের উনিশ মাস পর ১৮৮২ সনের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে বিপিনবাবু হঠাৎ কলেরায় আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। একমাত্র কোলের শিশু মনোরমাবাইকে নিয়া পণ্ডিতা অকূল পাথারে ভাসিলেন। বিপিন বাবুর মৃত্যু সময়ে শ্রীহট্ট লাতু নিবাসী ৺প্রহ্লাদচরণ দাস অষ্টপতি মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, বিপিনবাবুর মৃত্যুর পর রমাবাই "বি-বি" "বি-বি" বলিয়া করুণ স্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে অস্থির হইয়া পড়েন, তাঁহার কাতর আর্ত্তনাদে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারেন নাই। রমাবাই বিপিনবিহারীকে "বি-বি" বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

শিলচর পরিত্যাগ

বিপিনবাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার আত্মীয়েরা সমাজবর্জ্জিতা বিধবাকে স্থান দিলেন না বা স্থান দেওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। তাহাদের মধ্যে অনেকেই মনে করিলেন, বলিষ্ঠ তনু বিপিনবিহারী এই 'চিৎপাবন ব্রাহ্মণ" তনয়াকে বিবাহ করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। সুতরাং স্বামীর মৃত্যুর পর রমাবাইকে একমাত্র শিশুকন্যাটিকে নিয়া শিলচর পরিত্যাগ করিতে হয়। তিনি শিলচর হইতে পুণা চলিয়া যান, তথায় এক বৎসর বাস করেন। হাইকোর্টের চীফ জাষ্টিস মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে, ডক্টর ভাণ্ডারকর, মিঃ টিলাং, মিঃ চন্দ্রভারকর প্রভৃতির সহায়তায় তিনি সেখানে "আর্য্য মহিলা সমাজ" সংস্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠান আজ পর্য্যন্ত জীবিত আছে।

বিলাত যাত্রা ও খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মে দীক্ষা

১৮৮৩ সনের প্রথম ভাগে দুই বৎসরের শিশুকন্যা মনোরমাকে কোলে লইয়া রমাবাই বিলাতযাত্রা করেন। শিলচরে থাকিতে Mr. Allen নামক একজন মিশনারি সাহেব তাঁহাকে বাইবেল পড়াইতেন। পুনাতে মিস হারফোর্ড এবং রেভারেণ্ড ফাদার গোরে তাঁহাকে ইংরেজী পড়াইতেন এবং বাইবেল শিক্ষা দিতেন। গোরে নিজে একজন "চিৎপাবন ব্রাহ্মণ" ছিলেন, শেষে খ্রীষ্টধর্ম্ম পরিগ্রহ করেন। বিলাতে Wantage-এর Little Sister গণ মাতাপুত্রীকে সাদরে গ্রহণ করেন। হিন্দুধর্ম্মের উপর রমার বিদ্বেষভাব ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছিল, ফলে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে তিনি কন্যা মনোরমাবাইসহ Wantage-এ খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মে দীক্ষিতা হন।

রমাবাই বিলাতযাত্রার পাথেয় কিরূপে সংগ্রহ করিলেন, জানিবার জন্য অনেকের ঔৎসুক্য জন্মিতে পারে। "স্ত্রীধর্ম্মনীতি" নামক একখানা উৎকৃষ্ট পুস্তক তিনি মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় লিখেন এবং উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা 'ডেক'-যাত্রীরূপে বিলাতগমন করেন। ত্রিপুরা কালীকচ্ছ নিবাসী ৺রজনীনাথ নন্দী মহাশয় রাটলাম কলেজের অধ্যক্ষ থাকা সময়ে ইহার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। আমি বাংলা অনুবাদ পড়িয়াছি। সমগ্র পুস্তকে রমাবাইর খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মে আসক্তির লেশমাত্রও পরিচিহ্ন খুজিয়া পাওয়া যায় না। তিনি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় স্ত্রীজাতিকে সীতা-চরিত্র অনুশীলন করিতে এবং সীতার ন্যায় সতীসাধ্বী হইতে উপদেশ দিয়াছেন। এই ১৪৫ পৃষ্ঠার পুস্তকখানি ৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত।

আমেরিকায় রমাবাই

Wantage হইতে পণ্ডিতা বিলাতের Chltenham Ladies College-এ সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপিকার কাজ করিতে চলিয়া যান। উক্ত কলেজে তিনি ছাত্রী ও অধ্যাপিকা দুই-ই ছিলেন। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিস ডোরথি বিলের নিকট ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিতেন, এদিকে ছাত্রীদিগকে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা দিতেন। ১৮৮৬ সনে বন্ধু পরলোকগতা আনন্দীবাই যোশী আমেরিকার Womens Medical College হইতে মাত্র ২১ বৎসর বয়সে ডাক্তারী শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম চিকিৎসাবিদ্যায় M. D. উপাধি লাভ করেন।

এই উপাধিলাভের "কনভোকেশন" সভায় পণ্ডিতার নিমন্ত্রণ হয় এবং নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে তিনি শিশুকন্যাসহ আমেরিকায় গমন করেন। Women's Medical College-এর অধ্যক্ষ বড্‌নি সাহেব তাঁহাকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করায় তিনি কয়েকটি বক্তৃতাও দেন। আমেরিকা বাসকালে পণ্ডিতা (সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহিলা) নামক একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রণয়ন করেন। আমেরিকার 'কিণ্ডেরগার্টেন' প্রণালী শিক্ষা করিয়া তিনি এই সম্পর্কে মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ভারতীয় শিশুদিগের উপযোগী কয়েকখানা সচিত্র শিশুপাঠ্য পুস্তক প্রকাশিত করেন। "যুক্তরাজ্যে প্রবাস বৃত্তান্ত" নামক একখানি বই ১৮৮৯ সনে মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় লিখেন, বহুকাল ইহা বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত ছিল, আজকাল আছে কি না জানি না।



মাতা-পিতার সঙ্গে সপ্তম বর্ষিয়া রমাবাই ও তাঁহার ভ্রাতা

সারদা-সদন

রমাবাই সমগ্র আমেরিকায় ভারতীয় বিধবা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ফলে, তথায় একটি রমাবাই-সমিতির প্রতিষ্ঠা হইল। হিন্দু-বিধবার শিক্ষার জন্য একটি স্কুল খুলিতে সমিতি তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করিয়া জানাইলেন যে, দশ বৎসর পর্যন্ত তাঁহারা স্কুলের সাকুল্য ব্যয়ভার বহন করিবেন। ১৮৮৯ সনের প্রথম ভাগে রমাবাই ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া 'সারদা' নাম্নী মাত্র একটি বালিকা লইয়া 'সারদা-সদনের' প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু ১৮৯০ সনে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহা পুনা নগরীতে স্থানান্তরিত হয়। তথায় দশ বৎসরেরও অধিককাল ইহা বর্তমান ছিল। ১৮৯৪ সনে সারদা-সদনের জনৈকা ছাত্রী খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছুক হয়। ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়িল। শহরময় গুজব উঠিল, রমাবাই জোর করিয়া ছাত্রীদিগকে খ্রীষ্টান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অভিভাবকগণ ছাত্রীদিগকে দলে দলে স্কুল ছাড়াইয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। রমাবাই ছাত্রীদিগকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। কাঁদিতে কাঁদিতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহারা অভিভাবকের আদেশানুযায়ী স্কুল ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। 'সারদা-সদন' কমিটির ভারতীয় সদস্যগণ এই গোলমালে কমিটির কার্য্যে ইস্তফা দিলেন। রমাবাই ইহাতে ভয় না পাইয়া ধীর ভাবে কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। অবশিষ্ট কয়েকটি পিতৃমাতৃহীনা ছাত্রী লইয়া স্কুল চালাইতে লাগিলেন। ইহাদের মধ্যে যাহারা হিন্দু ছিল, তাহাদের থাকা ও খাওয়ার ভিন্ন বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

মুক্তি-মিশন

পণ্ডিতা ১৮৯৫ সনে পুনায় কেডগাঁও নামক পল্লীগ্রামে একশত একর ভূমি ক্রয় করেন। দশ বৎসর পর আমেরিকা হইতে যখন সারদা-সদনের সাহায্য বন্ধ হইয়া যাইবে, তখন এই ভূমিতে কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়া তাহার আয় দ্বারা সারদা-সদনের ব্যয়ভার বহন করিবেন, ইহাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। Mukti Prayer Bell নামক একখানা ক্ষুদ্র সাময়িক পত্র তিনি সম্পাদন করিতেন, ইহা অদ্যাপি জীবিত থাকিয়া তাঁহার কার্য্যকারিতার যাবতীয় সংবাদ বহন করিতেছে। ক্ষুদ্র বীজ হইতে কিরূপে মহা-মহীরুহের উৎপত্তি হইতে পারে, পত্রিকাখানা পড়িলেই তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এই পত্রিকা ভারতের নানা স্থানে এবং বিলাত, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে বহুল পরিমাণে প্রচারিত হয় এবং নানা স্থান হইতে মিশনের জন্য অযাচিত সাহায্য আসিয়া থাকে। ইহার দ্বারা কেডগাঁওয়ে তিনি সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ, কূপ খনন, ফলকর বৃক্ষ রোপণ, গোশালা স্থাপন, কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কার্য্য সুষ্ঠুরূপে সমাধা করেন। ১৮৯৬ সনে মধ্য-ভারতে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। তিনি তখন তথায় গিয়া দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট, কঙ্কাল-সার, তিন শত বুভুক্ষু স্ত্রীলোক, বালিকা ও শিশুকে উদ্ধারক্রমে মুক্তি-আশ্রমে প্রেরণ করেন। ইহারা পরে খ্রীষ্টীয়-ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়।

বিউবনিক প্লেগ

১৮৯৭ সনে বোম্বাই নগরীতে 'বিউবনিক প্লেগ" দেখা দেয়। লর্ড স্যাণ্ডহার্ষ্ট তখন বোম্বাইয়ের গবর্ণর। ভারতবর্ষে প্লেগ তখন নূতন দেখা দিয়াছে। দলে দলে লোক বোম্বাই ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল। রাস্তায় মৃত ইন্দুর স্তূপীকৃত অবস্থায় পাওয়া যাইত। গবর্ণমেণ্টও ভয় পাইলেন এবং যাহাতে এই মারাত্মক ব্যাধি আর বিস্তারলাভ না করিতে পারে, তজ্জন্য তাঁহারা এক অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার করিলেন। যাহার প্লেগ হইত তাহাকে তখনি ধরিয়া তাঁহারা প্লেগ-হাসপাতালে পাঠাইতে লাগিলেন।

দেশবাসী ইহাতে সন্তুষ্ট হইল না, পিতামাতা বা আত্মীয়বর্গ ছাড়া কেহই একা হাসপাতালে যাইতে রাজী হইত না। আত্মীয়েরাও রোগীকে তথায় পাঠাইতে চাহিতেন না। গবর্ণমেণ্ট তখন ঘরে ঘরে খুঁজিয়া রোগী বাহির করার জন্য গোরা সৈন্য নিযুক্ত করেন। ইহারা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া রোগীদিগকে এবং যাহাদের রোগের সম্ভাবনা বলিয়া সন্দেহ করিত, তাহাদিগকে জোর করিয়া হাসপাতালে লইয়া যাইত। পণ্ডিতা যে সকল দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগকে 'মুক্তি'তে স্থান দিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যেও অনেকেই বাদ গেল না। রোগিণীদিগকে পুরুষ ডাক্তারেরা সাধারণের দৃষ্টি-সমক্ষে, কুঁচকিতে বাঘি (Bubo) হইয়াছে কি না পরীক্ষা করিতেন। রোগিণীদের আপত্তি গ্রাহ্য হইত না। এই বিসদৃশ ব্যবহার পণ্ডিতার সহ্য হইল না। যিনি স্ত্রীজাতির উন্নতিকল্পে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, তিনি কখনও এমতাবস্থায় চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না।

দৃপ্তা সিংহিনী

১৮৯৭ সনের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখের 'Bombay Guardian' পত্রিকায় তিনি লিখিলেন :

"My dear 'Guardian',

..... The shameful way in which women were to submit to treatment by male doctors goes to prove that the English authorities in general do not believe that the Indian women are modest and need special consideration. I know it would have been impossible to provide women doctors, in all the places where the Plague appeared. It was therefore out of necessity that male doctors had to treat the women. But I do not see why women patients could not atleast have been screened and protected from the public gaze, while being treated by the Government physicians.

How would an English women, poor though she may be, like to be exposed to the public gaze and roughly handled by male doctors ? Is not the Indian woman quite as modest as the English woman ? Does she not as a woman deserve better treatment at the hands of the Governor and the Plague Committee of Poona ?

Believe me, yours for the sake of truth and righteousness.

Ramabai."

রমাবাই সীতা নাম্নী তাঁহার মুক্তি-আশ্রমের একটি বালিকার প্রতি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ঈদৃশ ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করায় লর্ড স্যাণ্ডহার্ষ্ট পণ্ডিতার উক্তি grossly inaccurate and misleading বলিয়া উত্তর দেন। পণ্ডিতা ইহার উত্তরে যে দীর্ঘ প্রতিবাদ 'Bombay Guardian' পত্রে প্রকাশ করেন, তাহা স্থানাভাব বশতঃ সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিলাম না। শুধু সামান্য কয়েক ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"My dear 'Guardian',

.... So the Governor of Bombay has declared my statement about the shameful treatment os one of my girls and the bad management of the Poona Plague Hospital as 'grossly inaccurate and misleading'. Some assume that only Orientals make certain assertions, without giving any proof of their truth. But I see that the Occident also can boast of some people including our worthy Governor who make certain assertions without giving any proof of their truth. How else could he say that he made enquiries about things stated in my letter when he never condescended to ask me a word about it. The manager of the Plague Hospital can never be expected to acknowledge the truth of the facts stated by me, for they were not the suffering parties. In the name of truth and justice, I ask the conscientious Christian public to say if Lord Sandhurst did right to declare my statements as 'grossly inaccurate' when he has never so much as asked me to prove them.

পণ্ডিতার এই প্রতিবাদের উল্লেখ করিয়া ১৮৯৭ সনের ১২ই সেপ্টেম্বরের 'অমৃত বাজার পত্রিকা' মন্তব্য করেন :

No "Maharatta paper, we belive, has delineated the arrangements in the plague hospital in such horrid colours as the learned Pundita has done. Lord Sandhurst is bound to contradict the statements as specifically as they have been made by her ; for the Pundita has sought to turn the table upon him."

শেষ জীবন

১৮৯৬ সন হইতে ১৯২২ সন পর্য্যন্ত দীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসরকাল তিনি 'মুক্তি-মিশনে'র উন্নতিকল্পে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। মিশনের উন্নতির জন্য শেষ বয়সেও তাঁহার অবসর ছিল না। তাঁহার কন্যা মনোরমাবাই এই কার্য্যে তাঁহার দক্ষিণ-হস্ত-স্বরূপা ছিলেন। মনোরমা বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট ছিলেন। তিনি মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে শুধু হিন্দু মহিলাদের জন্য এক স্কুল স্থাপন করেন এবং নিজে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতেন।

স্ত্রী-শিক্ষাবিস্তার ও খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারে মাতার ন্যায় তাঁহারও একান্ত আগ্রহ ছিল। ১৯২১ সনের ২৪শে জুলাই মনোরমাবাই ইহধাম পরিত্যাগ করেন। বৃদ্ধা মাতা এই দারুণ শোক অধিক দিন সহ্য করিতে পারিলেন না। ১৯২২ সনের ৫ই এপ্রিল তারিখে তিনি আহারান্তে নিদ্রা গেলেন। এই নিদ্রাই মহানিদ্রায় পরিণত হইল। প্রত্যূষে মুক্তির আশ্রমবাসীগণ সবিস্ময়ে দেখিতে পাইল, তাঁহার প্রাণহীন দেহ বিছানায় পড়িয়া আছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি "A Testimony" নামক একখানা পুস্তিকা এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় সমগ্র বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশিত করিয়া যান। 'মুক্তি-মিশনে' বয়ন-বিভাগ, সূচি-শিল্প বিভাগ, মুদ্রণ-বিভাগ, কৃষি-বিভাগ, গোশালা-বিভাগ, মৃৎ-শিল্প বিভাগ, পশু-পক্ষী-পালন বিভাগ ইত্যাদি তাঁহারই হাতে-গড়া জিনিস। মিশন-সংলগ্ন হাসপাতাল ও 'কৃপাসদন' নামক একটি উদ্ধারাশ্রম প্রতিষ্ঠা তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তি।

ইংরেজীতে যাহাকে বলে, 'True Christian' তিনি তাহাই ছিলেন। পণ্ডিতা ভারতের নানা স্থানে Prayer Circle প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রার্থনার উপকারিতায় তিনি চিরকাল বিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন এবং আশ্চর্য্য ফলও লাভ করিয়াছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি, 'মুক্তি-মিশন' প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্ব্বের এক দিনের কথা। আশ্রমের এতটি নরনারীর গ্রাসাচ্ছাদন তিনি কিরূপে দিবেন? আমেরিকার সাহায্য আসিতে এখনও তিন চার দিন বাকী আছে। তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া প্রার্থনায় ডুবিয়া রহিলেন। সাহায্য যেদিন আসার কথা তার আগের দিন তিনি একা তন্ময় হইয়া ভগবানের নাম জপ করিতে করিতে বোম্বাইগামী ট্রেনে গিয়া আরোহণ করিতে মনস্থ করিলেন। উদ্দেশ্য, বোম্বাইয়ের কোনও বন্ধু হইতে হাওলাত আনিয়া আশ্রম রক্ষা করিবেন। কোনও দিন ট্রেনের আসিতে এত দেরী হয় না। তিনি প্লাটফর্ম্মের এক বেঞ্চে বসিয়া পড়িলেন। বেঞ্চে বসিয়া একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করিয়া যাইতেছেন। প্লাটফর্ম্মে গাড়ী আসিয়া ঢুকিল, শীঘ্রই ছাড়িয়া দিবে, কারণ গাড়ী আজ দেরীতে আসিয়াছে। ঠিক এমনি সময় তাঁহার বেঞ্চের সামনে ট্রেনের যে কামরা ছিল, তাহা হইতে এক অপরিচিত ভদ্রলোক দৌড়িয়া বাহির হইলেন এবং তাঁহাকে আসিয়া বলিলেন, "আমি আপনাকে মনে মনে খুঁজিতেছিলাম। যাক, অপ্রত্যাশিত ভাবে আপনাকে এখানেই পাইয়া গেলাম, তা না হইলে আজ রাত্রেই আপনার 'আশ্রমে' আমায় যাইতে হইত। 'মুক্তি-মিশনে'র জন্ম আমার এই সামান্য দানটুকু গ্রহণ করুন।" দৌড়িয়া ভদ্রলোকটি কামরায় উঠিতে না উঠিতে ট্রেন ছাড়িয়া দিল। রমার নোটগুলি গণনা করার আগেই ট্রেন প্লাটফর্ম্ম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। পুণার ট্রেন আসিতে এখনও কিছু দেরী আছে, তাই রমা ঐ বেঞ্চে বসিয়াই টাকাগুলি গণনা করিয়া দেখেন, ঠিক যত টাকা তিনি বোম্বাইয়ের সেই বন্ধু হইতে হাওলাত আনিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, অপরিচিত ভদ্রলোকটির দানের পরিমাণও ঠিক তাহাই। এক পয়সা বেশীও নহে, কমও নহে। রমার চক্ষে আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল, তাঁহার বাইবেলের কথা মনে হইল, "I am poor and needy, yet the Lord thinketh upon me." রমার জীবনে এরূপ ঘটনা আরও বহুবার ঘটিয়াছে, তাই বলিতেছিলাম, তিনি ছিলেন প্রকৃত যীশুভক্ত খ্রীষ্টান। প্রার্থনায় অবিচলিত বিশ্বাস ছিল বলিয়া এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান তিনি গড়িয়া যাইতে পারিয়াছেন। প্রার্থনা ও উপবাস ছিল তাঁহার নিত্যধর্ম্ম। তিনি কখনও মাংস খাইতেন না এবং স্বল্পাহারে সন্তুষ্ট থাকিতেন। তাঁহার স্বামী ৺বিপিনবিহারী আইন-বহি ক্রয়ের জন্য শ্রীহট্টে তাঁহার জনৈক আত্মীয়ের নিকট হইতে ২৫০৲ ঋণ গ্রহণ করেন। রমা বোম্বাই গিয়া স্বামীর এই ঋণ পরিশোধ করেন। ইহা তাঁহার মহানুভবতার পরিচায়ক। তাঁহার আজীবন পরিশ্রমের পুরস্কারস্বরূপ গবর্ণমেণ্ট ১৯১৯ সনের ১লা জানুয়ারী তারিখে তাঁহাকে 'কৈশর-ই-হিন্দ' স্বর্ণপদক দিয়া পুরস্কৃত করেন। আজ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মিশনে প্রায় দুই হাজার সহায়-সম্বলহীন অনাথ প্রতিপালিত হইতেছে। তাঁহার মৃত্যুর পর পরিচালকবর্গ আশ্রমের নাম 'রমাবাই-মুক্তি-মিশন' রাখিয়াছেন। স্যার ডব্লিউ. ডব্লিউ. হাণ্টারের নেতৃত্বে যখন শিক্ষা-কমিশন পুণাতে যায়, তখন পণ্ডিতা উক্ত কমিশনে সাক্ষ্য প্রদান করেন। তাঁহার সাক্ষ্যে হাণ্টার সাহেব এতই প্রীত হন যে, তিনি উহা দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন। ১৮৮৯ সনের ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির বোম্বাই অধিবেশনে তিনি মহিলা প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, তামিল, মারহাট্টি এবং হিব্রু এই ছয়টি ভাষা জানিতেন। পণ্ডিতা রমাবাই সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় নারীদিগকে তাহাদের উচ্চতর কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া উন্নত করিতে প্রয়াস পান। তাঁহার মত এবং কর্ম্মপন্থা আমাদের মধ্যে হয়ত অনেকে অনুমোদন নাও করিতে পারেন, কিন্তু তিনি যে একজন উচ্চ-হৃদয়া এবং কর্ত্তব্য-পরায়ণা মহীয়সী মহিলা ছিলেন, সে বিষয়ে কোনও মতদ্বৈধ নাই।

ক্ষতি কি

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

ক্ষতি কিবা বলো ভুলে যদি যাই
তোমাকে !
চিরদিন মনে রাখিবারে পারে
কোথা কে ?
প্রাণ-বিনিময় !—বাতুলের কথা !
প্রেমের নেশার ঘোরে আকুলতা !
ব্যঙ্গের হাসি হাসে মহাকাল
হোথা সে !

২

শাশ্বত প্রেম !—আকাশ-কুসুম !—
জানো কি ?
নহি আমি রাম,—তুমি নহ মোর
জানকী !
যে হেতু জীবন নহেক কাব্য,—
অভিলাষ তব অসম্ভাব্য !
দুয়ে আর দুয়ে চার হয় সখি,
মানো কি ?

৩

এ জগতে কেহ ভোলে না কি কভু
কাহারে ?
ঝরাফুল,—কভু রাখে মনে তরু
তাহারে ?
কতো বিচিত্র উচ্ছ্বাস তুলি'
একে একে চলে যায় ঢেউগুলি ;—
নদীতটে কি গো থাকে স্মৃতি তার
আহা রে !

৪

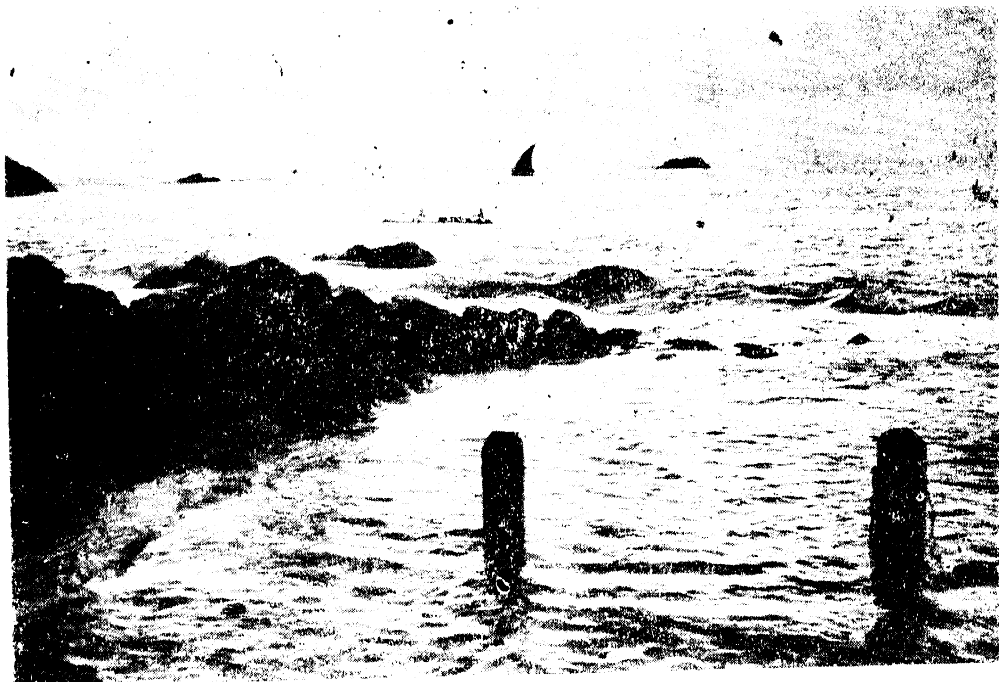
ভেবেছ জীবন শুধু প্রেম আর
কবিতা ?
জানো না কি হায়, তোমারি মনের
ছবি তা ?
অনন্তকাল চিরদিবাযামী
না রহিবে তুমি, না রহিব আমি !—
তাই ওগো আমি লই হাতে হাতে
লভি যা' !

৫

যারে কহ প্রেম সে যে সুমধুর
ছলনা !
একটি আকাশে ক'টা চাঁদ ওঠে
বল না !
হৃদয়-গগনে শত শত চাঁদ
নিত্য সে পাতে নব মায়াফাঁদ ;
একটি কমল ফোটে কি সলিলে
ললনা !

৬

কোনো ক্ষতি নাই—যদি যাই তোমা
ভুলিয়া !
স্মৃতিটিরে কেন রাখো ঝেড়ে পুঁছে
তুলিয়া ?
ভেবেছ কি প্রেম তব পোষা পাখী,—
রাখিবে বাঁধিয়া মরিবারে ডাকি' ?—
চিরদুরন্ত,—যায় সে শিকল
খুলিয়া ।



কন্যাকুমারীতে ১৯৫৯ সনের শেষ সূর্য্যাস্ত



রাজস্থানের মরু-প্রান্তরে



নিউইয়র্কের প্রদর্শনীতে একজন যুবক ভারতীয় তাঁত-শিল্পের
নমুনা দেখাইতেছেন



থাই লোক-নৃত্য
ভিয়েতনামবাসী দুজন মহিলা এই নৃত্য দেখাইতেছেন

লালসন্ধ্যা

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

২১

পিত্রালয়ে শ্রীমতী অনেকদিন হ'ল এসেছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সে নিজেও যেমন কারুর কোন খবরা-খবর নেয় নি ও-তরফও তেমনি নীরব। ক্ষীরিয়া বারকয়েক চুপি চুপি জিজ্ঞেস করতে এসে ধমক খেয়েছে। রাণী একেবারে বিস্ময়করভাবে থেমে গেছেন। শুধু বাবার সঙ্গেই যাহোক দুটো মন খুলে কথা হয়—আর দাদার সঙ্গে পুরানো দিনের মত ঝগড়াঝাটি। কিন্তু এ অবস্থাও বেশী দিন স্থায়ী হয় না।

শ্রীমতী নিজেই ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে এনেছে। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া বড় একটা ঘরের বাইরে যেতে চায় না। দশ জনার দশ রকমের প্রশ্নকে সে সযত্নে এড়িয়ে চলতে চায়।

প্রণব অনুযোগ দিয়ে বলেন, এ ভাবে চললে শেষ পর্য্যন্ত যে একটা শক্ত অসুখে পড়বি মা।

শ্রীমতী বলে, ভয় নেই বাবা—আমার অসুখ-বিসুখ হবে না।

প্রণব বলেন, না হলেই ভাল, কিন্তু ক্ষীরিয়াকে নিয়ে রোজ বিকেলে একটু ঘুরে আসতে দোষ কি? ওতে শরীরটাও ভাল থাকবে, মনটাও প্রফুল্ল হবে মা।

শ্রীমতী জবাবে বলে, এবারথেকে যাব বাবা।

প্রণব খুশী হয়ে বলেন, তাই যেও—

বাবার কথা শ্রীমতী ঠেলতে পারে নি। রোজই ক্ষীরিয়াকে নিয়ে সে নদীর পারে বেড়াতে যায়। দূরে ঘন বনানীর পানে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। অতীত নতুন করে তার চোখে ধরা দেয়। একদিন ওরা তাকে দুর্নিবার বেগে আকর্ষণ করত। বাঙ্ময় হয়ে উঠত গাছপালা, লতাপাতা। আজ কিন্তু শ্রীমতীর কাছে ওরা সব বোবা। শুধুই একরাশ মৃত স্মৃতি—মাধুর্য্য নেই। গাছকে শুধু গাছই মনে হয় আর পাতাকে নিছক পাতা।

ক্ষীরিয়া বলে, যাবে দিদি ঐ বনে? নিয়ে আসব তীর আর ধনুক?

শ্রীমতী অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দেয়, নিয়ে আয়—

ক্ষীরিয়া চলে যায়। কাছেই তার ঘর।

শ্রীমতী চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। পায় পায় এগিয়ে চলে। কোন কিছুতেই সে আর তেমন উৎসাহ পায় না। মন এবং দেহের উপর একটা অপরিসীম ক্লান্তি নেমে এসেছে। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে সে হতাশ হয়। তার বিবাহিত জীবনের মধ্যে অতনুর কাছ থেকে এমন কিছুই সে পায় নি যার জন্যে পিছন ফিরে তাকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে হবে। তবু সে অতনুকে তার চিন্তার বাইরে সরিয়ে রাখতে পারে না। তার গর্ভের সন্তান বারে বারে এ দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করে। শ্রীমতী অবাক হয়ে যায়। মুখে কেমন এক প্রকারের বিচিত্র হাসি ফুটে উঠে। তার জীবনে এটা একটা চরম পরিহাস—একটা প্রকাণ্ড দুর্ঘটনা।

ক্ষীরিয়া ফিরে এসেছে। শ্রীমতী তাকে আসতে দেখে দাঁড়াল। কাছে আসতে বলল, বেশী দূরে কিন্তু যাব না ক্ষীরিয়া।

ক্ষীরিয়া মৃদু মৃদু হাসতে থাকে। কথা বলে না। এমন অদ্ভুত কথার কি জবাব সে দেবে।

দু'জনাই ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। কারুর মুখে কথা নেই। এক সময় ক্ষীরিয়াই এই নীরবতা ভঙ্গ করে কথা কয়ে উঠল, তোমার মন ভাল নেই দিদি। চল, ঘরে ফিরে যাই। ফিরে যাবার প্রস্তাবেও শ্রীমতীর কোন আপত্তি নেই। সে মৃদু কণ্ঠে বলল, তাই বরং চল ক্ষীরিয়া।

ক্ষীরিয়ার মুখে অর্থপূর্ণ হাসি। জামাইবাবুর জন্যে মন কেমন করছে বুঝি?

শ্রীমতী অন্য কথা বলে, আমি চলে যাবার পর আর একদিনও বোধ হয় তীর-ধনুক ব্যবহার করিস নি ক্ষীরিয়া?

ক্ষীরিয়া জবাব দিল, না। তোমার জন্য তুলে রেখেছিলাম। আজ নদীর জলে ফেলে দিয়ে যাব।

শ্রীমতী আশ্চর্য্য হয়ে যায়। নরম গলায় বলে, হঠাৎ ফেলে দিতে যাবি কেন?

ক্ষীরিয়া ক্ষুব্ধ হয়ে জবাব দেয়, রেখে দেব আর কার জন্যে?

ওর রাগ দেখে শ্রীমতী একটুখানি হাসল। বলল, তুই শুধু শুধু রাগ করছিস ক্ষীরি। আমি কেমন করে এ অবস্থায় যাই বল দেখি—

ক্ষীরিয়া বিস্মিতভাবে খানিক চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, কি সরম দিদি—আমার মনেই ছিল না তুমি যে পোয়াতী।

শ্রীমতী একটু হাসল।

সন্ধ্যার পূর্বেই ওরা ফিরে এসেছে। বাড়ীতে এসে প্রথমেই শ্রীমতী তার বাবার কাছে উপস্থিত হ'ল। তিনি যেন অপেক্ষা করে আছেন এমনি ভাবে আহ্বান জানালেন, আয় মা। আজ বুঝি নদীর পারে গিয়েছিলি?

সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে শ্রীমতী জবাব দিল, হ্যাঁ বাবা।

প্রণব খুশী হয়ে বললেন, বেশ করেছ মা। সাধ্যমত কাজের মধ্যে থেক। মনও ভাল থাকবে শরীরও ভাল থাকবে।

শ্রীমতী খানিক চুপ করে থেকে একটু ইতস্ততঃ করে বলল, কথাটা আমিও ভেবেছি বাবা। তুমি যদি রাগ না কর তবে বলতে পারি।

প্রণব স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন।

শ্রীমতী বলল, তোমার অনুমতি পেলে আমি একটা কাজে হাত দিতাম। প্রফেসার কাকার সঙ্গেও এ নিয়ে আমার কথা হয়েছে। এখন তুমি বললেই এগুতে ভরসা পাই বাবা।

প্রণব হেসে বললেন, কিন্তু আসল কথাটাই যে এখনও জানতে পারলাম না মা?

শ্রীমতী বাবার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে বলল, তোমাদের মেয়ে-স্কুলে একটা চাকরি নেব ভাবছিলাম বাবা।

প্রণব সহসা সোজা হয়ে বসে খানিক কন্যার মুখের পানে চেয়ে থেকে একটু হেসে বললেন, তোমার প্রফেসার কাকা বুঝি তোমাকে এই বুদ্ধি দিয়েছেন মা?

না বাবা, শ্রীমতী জবাব দেয়, তিনি বলবেন কেন—আমারই সময় কাটতে চাইছে না। তা ছাড়া আমি কি কিছুই বুঝি না?

প্রণব বললেন, হঠাৎ বোঝা-বুঝির কথা বলছ কেন মা?

একটু ইতস্ততঃ করে শ্রীমতী বলল, আমি এখানে চলে আসবার ফলে তোমাকে আর একটা নতুন টুইসানি নিতে হয়েছে বাবা। অথচ আমার ওবাড়ী থেকে নিয়ে আসা টাকা তুমি ছোঁবে না।

প্রণব একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, সে টাকা যদি না ছুঁতে পেরে থাকি তা হলে তোমার রোজগারের টাকা যে নিতে পারব তা তোমায় কে বললে শ্রীমতী? টুইসানি তুমি না এলেও নিতে হ'ত। তাছাড়া আজ তোমার বিয়ে হয়ে গেছে বলেই ত এ কথা ভাবতে পারছ মা।

শ্রীমতী কথাটা স্বীকার করে নিয়েই বলল, তোমার অনুমান সত্যি বাবা।

প্রণব বললেন, তোমার যদি বিয়ে না হ'ত?

শ্রীমতী জবাব দিল, তা হলে হয়ত এ চিন্তা মনেই আসত না।

প্রণব সহসা সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, কেউ তোমাকে কিছু বলেছে কি শ্রী?

শ্রীমতী সবেগে মাথা নেড়ে বলল, তুমি অকারণে সন্দেহ করছ। এ সব আমার নিজের কথা। তা ছাড়া আজকের দিনে মেয়েদেরও এই পথে চিন্তা করবার সময় এসেছে বাবা।

প্রণব বললেন, তোমার এ কথা আমিও স্বীকার করি। আমার কাছে অরুণ আর শ্রীমতীর মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। কিন্তু এ যুক্তি তোমার বিয়ের আগে চললেও বিয়ের পরে চলতে পারে না। চলা উচিত না। সেই জন্যেই তোমায় বাধা না দিয়ে আমার উপায় নেই।

একটা জবাব দেবার জন্যই শ্রীমতী মুখ তুলেছিল—সহসা দাদার চেঁচামেচিতে তাকে থামতে হ'ল। বলল, অত চীৎকার করছ কেন—আমি বাবার কাছে আছি।

অরুণ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে এসে উপস্থিত হ'ল। রাণীও ছেলের পিছু পিছু ঘরে প্রবেশ করেছেন। শ্রীমতীর হাতে একখানি চিঠি ধরিয়ে দিয়ে সে সরে পড়ল। ছেলের সঙ্গে সঙ্গেই মাও অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

প্রণবের সম্মুখেই শ্রীমতী চিঠিখানি খুলে পড়তে সুরু করল। লিখেছেন ডাক্তারবাবু।

শ্রীমা—

তুমি কোথায় যেতে পার তা আমাকে জানিয়ে না গেলেও আমি জানি। আর জানি বলেই একটুও ব্যস্ত হই নি। তুমি ঠিকই করেছ। আমি হলেও এই কাজই করতাম। প্রতিবাদ না করে যারা অন্যায়কে মেনে নেয়, ধৈর্য্যের পরীক্ষায় তারা উত্তীর্ণ হলেও অন্যায়কে যে প্রশ্রয় দেয় তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অনেক আগেই তোমাকে চিঠি দিতাম। দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হাওয়ার গতি কোন দিকে ঘুরে যায় সেই দিকেই একাগ্রভাবে চেয়ে ছিলাম। তোমার চলে যাওয়া সকল দিক দিয়ে সার্থক হয়েছে, এ কথাটা বুঝতে পেরে আর একটি মুহূর্ত্ত দেরি করি নি। অনেকদিন তোমাকে দেখি নি। সন্ধ্যা হলেই মনটা কেমন উতলা হয়ে ওঠে। অতনুবাবুর কারখানা আমাকে ধরে রেখেছে। ওর জন্যে নয় মা। ঐ কারখানাকে উপলক্ষ্য করে যারা দু'মুঠো খেতে পায় তাদেরই জন্য। বড় গোলমাল। একদিকে আড়াল থেকে ডানকান আর আগরওয়ালা চাকা ঘুরাচ্ছে আর কোথাকার কে এক শিলাদিত্য বিশ্বাস ভিতরে বসে ইন্ধন জোগাচ্ছেন—বুদ্ধি দিচ্ছেন। বন্ধুর ছদ্মবেশে ওদের যে কত বড় সর্ব্বনাশ তিনি করে চলেছেন এ কথা বুঝিয়ে বলবার একটা লোকও নেই। এ অবস্থায় কেমন করে আমি দূরে সরে যাই বল দেখি?

তুমি এখান থেকে চলে যাবায় দিনকয়েক পর থেকেই অতনুবাবু কারখানায় যাওয়া বন্ধ করেছে। বন্ধ করে ভালই করেছে। নইলে সহজটা জটিল হয়ে পড়ত। আগুন জ্বালিয়ে রাখতে শিলাদিত্য এক সঙ্গে প্রচুর কাঠ গুজে দিয়েছেন। প্রথমে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় চতুর্দিক ঢেকে ফেলেছিল। এখন ধোঁয়া নেই—আগুন জ্বলছে। কাঠগুলি সব পুড়ে শেষ হয়ে এসেছে। ভবিষ্যতের জন্য কিছুই শিলাদিত্য মজুত রাখেন নি। আমি এই সুযোগের

অপেক্ষায়ই ছিলাম। হাতের কাছে আর কাঠ না পেয়ে নিজেকেই সে আগুনে নিক্ষেপ করেছে। দুঃখ হয়, কিন্তু উপায় নেই ···

এইমাত্র খবর পেলাম, ছেলেটির আসল নাম শিলাদিত্য নয়—সূর্য্য বিশ্বাস। আর, একদিন নাকি সে তোমাদের পরিবারের একজন ছিল! তোমার বাবার প্রিয় ছাত্র আর দাদার বন্ধু। তাই আমাকে থামতে হয়েছে। নতুন করে ভাবতে হচ্ছে কি করা যায়। শিলাদিত্যকে যেভাবে সরাতে চেয়েছিলাম সূর্য্যকে ত সেভাবে সরানো সম্ভব হবে না!

মনে হচ্ছে, এ সব কথা তোমাকে না জানালেই বোধ হয় ভাল করতাম। দূরে বসে তুমি ত আমার কোন উপকার করতে পারবে না মা! তার চেয়ে বল দেখি কেমন আছ তুমি? আচ্ছা, এই বুড়োই না হয় নানা ঝঞ্ঝাটে তোমার খোঁজ করতে পারে নি, কিন্তু তুমিও ত একবার এ বুড়োকে স্মরণ করলে না মা।

এ দিকের কথা নিয়ে তুমি ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। নিজের শরীরের উপর দৃষ্টি রেখো। বহুদিন তোমাকে দেখি নি। মন আমার ব্যাকুল হয়ে আছে। অনেক আগেই ছুটে যেতাম, কিন্তু তোমাদের সকলের মঙ্গল চিন্তাই আমাকে থামিয়ে রেখেছে।

এখুনি একবার উঠতে হচ্ছে। মিত্রা এইমাত্র ফোন করে একবার দেখা করবার অনুরোধ জানিয়েছে। মেয়েটিকে যতই দেখছি বিস্ময় আমার উত্তরোত্তর ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সবকথা একদিন তোমাকে মুখে বলব।

তুমি আমার আন্তরিক স্নেহ আর মা বাবাকে নমস্কার জানিও।

ইতি শুভাকাঙ্ক্ষী

কাকাবাবু

চিঠিখানি পড়া শেষ করেও শ্রীমতী একই ভাবে বহুক্ষণ বসে রইল। ভাবছিল সে সূর্য্যদার কথা। আর ভাবছিল মিত্রার কথা। সূর্য্যদা আজ শত্রুর ভূমিকায় আর মিত্রা মিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। সূর্য্যদাকে সে বুঝতে পারে, কিন্তু মিত্রার এই রূপান্তর অবিশ্বাস্য।

যে মেয়ে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত তাকে ছায়ার মত অনুসরণ করেছে ছোবল দেবার জন্য—যার চোখে সে সাপের মত হিংস্র আর কুটিল চাহনি ছাড়া অন্য কিছু একদিনের জন্য দেখে নি, সেই মেয়ে রাতারাতি তার স্বভাব-ধর্ম্ম ত্যাগ করে বদলে যেতে পারে এ সে—

শ্রীমতী আপন অজ্ঞাতে কথা কয়ে উঠল, না এ হতেই পারে না।···

প্রণব অনেকক্ষণ ধরেই শ্রীমতীকে লক্ষ্য করছিলেন। তিনি বললেন, কি হতে পারে না শ্রী? চিঠিতে কোন খারাপ খবর নেই ত মা?

শ্রীমতী ইতিমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে। একটু হাসবার চেষ্টা করে সে জবাব দিল, কাকাবাবু এখানে আসবেন লিখেছেন। তাই···

প্রণব বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, তাঁর এখানে আসা কেন হতে পারে না শ্রীমতী?

বাবার প্রশ্নে শ্রীমতী লজ্জা পেল। বলল, সূর্য্যদা সম্বন্ধে কতগুলো কথা লিখেছেন কি না—

প্রণব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, কে—সূর্য্য গিয়ে আবার ওখানেও উৎপাত সুরু করেছে?

হ্যাঁ বাবা। শ্রীমতী জানাল, ওঁদের কারখানায় নাকি কি সব গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলেছে।

তেমনি উত্তেজিত কণ্ঠে প্রণব পুনরায় বললেন, আমি নিজে সেখানে যাব। শয়তানকে জেলে পাঠিয়ে তবে আমার অন্য কাজ।

তিনি চেয়ার ছেড়ে সহসা উঠে দাঁড়ালেন।

তাঁর উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে পাশের ঘর থেকে অরুণ এবং তার মা ছুটে এলেন।

শ্রীমতী তার বাবার একান্তে দাঁড়িয়ে বলতে থাকে, তুমি কি ক্ষেপে গেলে বাবা! যেতে যদি হয় অবশ্যই যাবে, কিন্তু তার আগে সব কথা ভালভাবে জেনে নেবে ত? আমি বরং কাকাবাবুকে এখানে আসবার জন্য লিখে দিচ্ছি। তাঁর মুখে সব শুনে তার পরে যেতে হয় যেও। আগে থেকেই—

তাকে বাধা দিয়ে প্রণব বললেন, সব কথা তুই আজও জানিস নে বলেই···নইলে হতভাগা একটা কালসাপ। আমি আদর করে দুধ-কলা দিয়ে পুষেছিলাম। তারই প্রতিদান দিচ্ছে।

শ্রীমতী সহসা কঠিন কণ্ঠে বলল, জানব না কেন বাবা? সাপের যা স্বভাব সেই ভাবেই সে চলবে—আর আমরা মানুষের মতই বাধা দেব। তুমি ব্যস্ত হয়ো না। ব্যবস্থা কাকাবাবুই করবেন। আমি বরং তাঁকে এখানে আসবার কথাই লিখে দিই।

খানিক চুপ করে থেকে প্রণব বললেন, তাই দাও শ্রীমতী—চিঠি পেয়েই যেন তিনি চলে আসেন।

২৮

ঘরে মিত্রা আর বাইরে সূর্য্য। চিঠি লিখতে বসে নতুন করে কথাটা শ্রীমতীর মনে হ'ল। কিন্তু ডাক্তারবাবুকে মেয়েটা যে কেমন করে হাত করল এ রহস্য তার কাছে অজ্ঞাত। তিনি অবুঝ নন। তাঁর বয়েস হয়েছে। চতুর্দ্দিকে প্রখর দৃষ্টি তাঁর। এ ছাড়া কেষ্ট সর্ব্বদা মেয়েটাকে পাহারা দিচ্ছে। এ সব তার নিজের চোখে দেখা।

শ্রীমতী আশ্চর্য্য হ'ল তার চিন্তাধারাকে এই পথে পাক খেতে দেখে। যে ঘরকে সে ছেড়ে এসেছে তারই প্রতি এই অকারণ মমতা কেন! কেন সে আজ এতখানি চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

শ্রীমতী জোর করে এই চিন্তার আবর্ত্ত থেকে নিজেকে মুক্ত করে ডাক্তারবাবুকে চিঠি লিখতে সুরু করল।

কাকাবাবু—

এইমাত্র আপনার চিঠি পেলাম। এই চিঠি অনেক আগেই পাবার আশা নিয়ে আমি রোজ পথের পানে চেয়ে থাকতাম। ভেবেছিলাম আপনি আমাকে কিছুতেই ভুল বুঝবেন না। আমার চলে আসার কৈফিয়ৎ হিসেবে এ কথা লিখছি না। আজ বড় আনন্দ হ'ল যে, আমার সে ধারণা মিথ্যে হয় নি। আপনি আমাকে ভুল বোঝেন নি।

শুনে দুঃখিত হলাম যে, চতুর্দিকের গোলমালের সব ঝক্কি একলা আপনাকেই পোহাতে হচ্ছে। কিন্তু এত লোক থাকতে কেন যে আপনি এত মিথ্যা ঝামেলা পোহাচ্ছেন এর কোন সত্য কারণ খুঁজে পেলাম না। কিসের জন্যে আপনি নিজেকে এ ভাবে জড়িয়ে ফেলেছেন। এর কি যথার্থ কোন প্রয়োজন আছে কাকাবাবু? তা ছাড়া যাঁর জন্যে আপনি এত ভাবছেন তিনি ত আপনাকে চান না। তবুও কেন এই মিথ্যে বোঝা আপনাকে বইতে হবে?

সূর্য্যদা সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে আমি গোটাকয়েক কথা বলা একান্ত আবশ্যক মনে করছি। তাঁর সম্বন্ধে আপনি কতটুকু জানতে পেরেছেন লেখেন নি, কিন্তু আমি যতটুকু জানি শুনুন। এক সময় তিনি বাবার অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র ছিলেন। দাদার অকৃত্রিম বন্ধু বলেও জানতাম। আমি নিজেও তাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতাম। কিন্তু আমার বিয়ের পরে তাঁর যে পরিচয় পেয়েছি তাতে তাঁকে শ্রদ্ধা করা ত দূরের কথা তাঁর সঙ্গে এক সময় আমাদের পরিচয় ছিল এ কথা স্বীকার করতেও লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা যায়।

তখন দেশ বিভক্ত হয় নি। আমাদের প্রজা হরি বিশ্বাসের ছেলে সূর্য্য বিশ্বাসকে বাবা সঙ্গে করে নিয়ে এলেন লেখাপড়া শেখাবার জন্য। লেখাপড়ায় ওঁর আগ্রহ দেখে, আর হরি বিশ্বাসের একান্ত অনুরোধ এড়াতে না পেরে বাবা তাকে নিয়ে এসেছিলেন। লেখাপড়া শিখলেও তিনি মানুষ হলেন না। আমার বিয়ের পরেই তাঁর শিক্ষার মুখোস খসে পড়ল। তার পরে যে পথে তিনি চলতে সুরু করলেন তাকে প্রত্যেক শিক্ষিত আর সভ্য মানুষই বিপথ বলে থাকেন।

সংক্ষেপে এই হ'ল সূর্য্য বিশ্বাসের কাহিনী। এর পরেও যদি তাকে এই পরিবারের একজন বলতে চান তা হলে আমাদের বলবার কিছু নেই। তবে আমি বাবার হয়ে আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে, শিলাদিত্যর জন্য যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল সূর্য্য বিশ্বাসের বেলায়ও তার কিছুমাত্র তারতম্য করা হলে আমরা দুঃখিত হব। আর সেই সঙ্গে আপনার কথাটাই আর একবার বলব—অন্যায়কে যাঁরা বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয় তাঁরা অন্যায়-কারীকেই প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন। আমার একান্ত অনুরোধ আপনার নিজের কথার অন্যথা যেন আপনি নিজেই করবেন না।

আপনি চলে আসুন কাকাবাবু। আমার নিজের ইচ্ছেমত দু'দিন আপনাকে সেবা করবার সুযোগ আমাকে দিন।

সূর্য্য বিশ্বাসের কথা আমি বাবাকে বলেছি। তিনি খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। এমনকি নিজেই ওখানে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। আমি বাধা দিয়েছি। এতে কোন লাভ হবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। বরং দুষ্টকে অত্যন্ত বেশী মূল্য দেওয়া হবে।

ওখানকার কথা মনে হলেই সবার আগে আপনার কথা মনে হয় কাকাবাবু। ঐ আকর্ষণহীন প্রাসাদে আপনাকে না পেলে আমি হয়ত দম বন্ধ হয়ে মারা যেতাম।

আমার জন্য ভাববেন না। আপনার আশীর্ব্বাদে ভালই আছি। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নেবেন। ইতি স্নেহধন্যা শ্রীমতী।

চিঠিখানি সেই রাত্রেই শ্রীমতী পোষ্ট আপিসে পাঠিয়ে দিল।

২৯

চিঠি পেয়ে আর দেরি করেন নি ডাক্তারবাবু। তুফান এক্সপ্রেস তাঁকে সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছে দিয়ে গেল। খবর দিয়ে আসেন নি তিনি। কিন্তু প্রণব মাষ্টারের বাড়ী খুঁজে বার করতে বেগ পেতে হয় নি।

শ্রীমতী সেইমাত্র ক্ষীরিয়ার সঙ্গে ফিরে এসেছে। ইদানিং রোজই সে ওর সঙ্গে সান্ধ্য-ভ্রমণে যায়। বাড়ীর প্রাঙ্গণে সর্ব্বপ্রথম শ্রীমতীর সঙ্গেই ডাক্তারবাবুর দেখা হ'ল। হেসে পায়ের ধুলা নিতেই তিনি মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করলেন। বললেন, চেহারাটা ত তোমার ভাল দেখাচ্ছে না মা?

শ্রীমতী একটুখানি হাসল, কোন জবাব দিল না।

ডাক্তারবাবু পুনরায় বললেন, হাসির কথা নয় মা। ডাক্তারের চোখকে তুমি অত সহজে ফাঁকি দিতে পারবে না। নিশ্চয় শরীরের উপর তুমি যত্ন নিচ্ছ না। এটা ভাল কথা নয়—

শ্রীমতী স্মিত হেসে বলল, আপনি যখন এসে পড়েছেন তখন সব ঠিক হয়ে যাবে কাকাবাবু। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর একটি কথাও আপনার শোনা হবে না। সারাদিন আপনার গাড়ীতে কেটেছে। ঘরে চলুন। খানিক বিশ্রাম করে মুখ-হাত-পা ধুয়ে যতখুশী কথা কইবেন, আমি না করব না।

ডাক্তারবাবু সস্নেহে হাসলেন।

ইতিমধ্যে বাবা এবং তাঁর পিছু পিছু মা এসে উপস্থিত হয়েছেন। মা মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, কিন্তু প্রণব কতকটা যেন হতবুদ্ধির মত দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মুখে একটা সাধারণ ভদ্রতাসূচক কথাও যোগাল না। বাবার এই বিভ্রান্ত ভাব লক্ষ্য করে শ্রীমতী রীতিমত বিস্মিত হলেও সে ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে একটু হেসে বলল, ইনিই ডাক্তারবাবু—আমার কাকাবাবু, বাবা।

প্রণব এতক্ষণে আত্মস্থ হয়েছেন। ডাক্তারবাবুর মুখে প্রশান্ত হাসি ফুটে উঠল। তিনি এগিয়ে এসে প্রণবের একখানি হাত ধরে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, এতদিনের দীর্ঘ অদর্শন আর একমুখ দাড়ি একমাত্র তোমাকেই দেখছি ঠকাতে পারে নি নব।

প্রণব হা হা করে হেসে উঠলেন। বললেন, কি মুস্কিল—তুমি নালু মুন্সীই হলে আমার শ্রীর কাকাবাবু! তুমি তা হলে আজও—

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে তিনি বললেন, বেঁচে আছি হে নব—আজও বেঁচে আছি। কিন্তু আমাদের এখন থামতে হচ্ছে। দেখছ না, তোমার মেয়েটা কেমন করে তাকাচ্ছে! ওকে আমি চটাতে চাই না ভাই।

প্রণব কন্যার মুখের পানে সস্নেহে চেয়ে দেখে বললেন, তোমার কাকাবাবুকে নিয়ে আমার ঘরে যাও মা। আমি এলাম বলে। তিনি আপন মনে বিড় বিড় করতে করতে স্ত্রীর উদ্দেশে চলে গেলেন।

ডাক্তারবাবু একটি বেতের আরাম কেদারায় হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়েছেন। শ্রীমতী পাখা হাতে তাঁকে বাতাস করছে।

শ্রীমতীই প্রথমে কথা কইল, খবর দিয়ে এলেন না কেন কাকাবাবু? আপনার মনের মত দু'চারটে খাবার তৈরি করে রাখতাম।

ডাক্তারবাবু চোখ বুজেই জবাব দিলেন, সেইজন্যেই খবর দিয়ে আসি নি, আগে মা-ব্যাটার মধ্যে বোঝাপড়া তার পর খাওয়া।

শ্রীমতী স্নিগ্ধ হেসে বলল, ঝগড়া কোথায় যে বোঝাপড়ার কথা বলছেন, কাকাবাবু?

প্রশান্ত হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে ডাক্তারবাবু বললেন, কথাটা মনে থাকে যেন।

শ্রীমতীও হেসে জবাব দিল, ভুলে গেলে মনে করিয়ে দেবেন, কাকাবাবু। ঐ যে, বাবা আসছেন। আবার যেন গল্প মেতে উঠবেন না। আমি এখুনি আপনার মুখ হাত-পা ধোবার জলের ব্যবস্থা করে আসছি।

শ্রীমতী দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেল।

শ্রীমতী চলে যেতে ডাক্তারবাবু প্রণবকে উদ্দেশ করে বললেন, দরজাটা বন্ধ করে দাও নব। তোমার মেয়েটা ফিরে আসবার আগেই দুটো গোপন কথা সেরে নি।

প্রণব দরজা বন্ধ করে দিলেন।

ডাক্তারবাবু বললেন, নালু মুন্সী যে: মরে নি তা আজ জানলে তুমি আর জানেন তার অ্যাটর্নী। কথাটা আপাততঃ আর কাউকে জানতে দিও না।

প্রণব বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, তুমি যে রহস্য-উপন্যাসকেও হার মানিয়ে দিলে হে নালু মুন্সী! আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না ভাই!

ডাক্তারবাবু একটু হেসে জবাব দিলেন, এতদিন যখন না বুঝেও তোমাদের চলে গেছে তখন আর ক'টা দিন না বুঝলেও কোন ক্ষতি হবে না নব, কিন্তু দোহাই ভাই, তোমার ঐ উকিল মেয়েটাকে যেন কিছু বল না। তাকে যা বলবার আমিই বলতে চাই। যাও, এবারে দরজাটা খুলে দাও।

তা দিচ্ছি। আর বলছ যখন তখন গিন্নীকেও সাবধান করে দিয়ে আসছি।

প্রণব দ্রুত চলে গেলেন। এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে পুনরায় বললেন, তোমার আদেশ জানিয়ে এলাম।

দু'জনেই একসঙ্গে হাসতে থাকেন।

হাসি থামিয়ে প্রণব সহসা অন্য প্রসঙ্গে এলেন, সূর্য্য নাকি তোমাদের খুব বেগ দিচ্ছে?

ডাক্তারবাবু কথাটা তেমন গায়ে না মেখে উত্তর দিলেন, তা একটু দিচ্ছে কিন্তু, ও নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। আমরা মা-ব্যাটাতে সহজেই তাকে সায়েস্তা করতে পারব।

ডাক্তারবাবু ভুলেও শ্রীমতীর চলে আসা নিয়ে কোন কথা বললেন না। প্রণবও তা নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য করলেন না।

শ্রীমতী পুনরায় ফিরে এসেছে। ডাক্তারবাবু উঠে দাঁড়ালেন। হেসে বললেন, আমি প্রস্তুত মা।

এ কথার জবাব শ্রীমতী কথায় দিল না—দিল মধুর হেসে।

(৩০)

হাত-মুখ ধুয়ে কিছু জলযোগ সমাপ্ত করে ফিরে আসতে ডাক্তারবাবুর আধ ঘণ্টাও লাগে নি। তাঁর বিশ্রামের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দিয়ে শ্রীমতী বলল, এবারে একটু গড়িয়ে নেবার ব্যবস্থা করুন, আমি আপনার খাবার ব্যবস্থা করতে যাব।

ডাক্তারবাবু সহাস্যে বললেন, এটা ত তোমার বাড়ী নয় মা। যাদের বাড়ী এসেছি ব্যবস্থাটা তাদের করতে দিয়ে তুমি বরং আমার কাছে বসে গল্প কর। তা ছাড়া তোমার কাছে খাওয়া ত আমার একটি রাত্রেই ফুরিয়ে যাবে না, মা।

শ্রীমতী ছেলেমানুষের মত জবাব দিল, ফুরিয়ে যেতে আমি দিলে ত।

ডাক্তারবাবু সস্নেহে বললেন, কথাটা সময়মত ভুলে যেও না কিন্তু।

ভুলব না কাকাবাবু। শ্রীমতী জবাব দিল।

ডাক্তারবাবু বললেন, শুনে খুশী হলাম। ভাল কথা, তোমার বাবা গেলেন কোথায়?

শ্রীমতী বলল, বোধ হয় বাজারের দিকে গেছেন।

ডাক্তারবাবু বললেন, ভালই হয়েছে। এই সুযোগে আমার বক্তব্যটা শেষ করে ফেলি। সময় আমার হাতে অত্যন্ত কম মা। মাত্র একটি দিন। এরই মধ্যে আমাদের ভবিষ্যৎ-কর্ত্তব্য স্থির করে নিতে হবে।

শ্রীমতীর মুখের ভাব দেখে মনে হ'ল কথাটা সে ঠিক বুঝতে পারে নি। ডাক্তারবাবুরও তা দৃষ্টি এড়াল না। তিনি পুনরায় বললেন, সূর্য্য বিশ্বাসকে নিয়ে খুবই অসুবিধের মধ্যে পড়েছি—কোথা দিয়ে আবার নতুন করে কি জট পাকিয়ে বসবে তার ঠিক নেই—নইলে দু' চারদিন থেকে যেতে আমার আপত্তি ছিল না।

শ্রীমতী গম্ভীর কণ্ঠে বলল, একটা অতি সাধারণ লোককে আপনারা বড় বেশী মূল্য দিচ্ছেন কাকাবাবু।

ডাক্তারবাবু মাথা নেড়ে বললেন, তোমার কথাটা ঠিক হ'ল না

মা। শত্রুকে ছোট করে ভাবতে নেই তাতে শেষ পর্যন্ত ঠকতে হয়।

শ্রীমতী কতকটা উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, কিন্তু এই ঠকা-জেতায় আপনার ত কোন লাভ-লোকসান নেই কাকাবাবু!

ডাক্তারবাবু স্মিত হেসে বললেন, কি যে আছে আর কি যে নেই সে প্রশ্ন থাক। তা ছাড়া জান ত মা, ভাগ্যবানের বোঝা সবসময় দুর্ভাগারাই বয়ে থাকে। কি কুক্ষণেই যে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল তাই মাঝে মাঝে ভাবি।

শ্রীমতী অভিমানভরা কণ্ঠে বলল, আপনার কথা শুনে দুঃখ পেলাম। কিন্তু ভাগ্যবান আপনি কাকে বলছেন?

ডাক্তারবাবু মৃদু হেসে বললেন, যদি বলি তোমাকে, আর তোমার জন্যই আমার সব দুর্ভাবনা?

শ্রীমতী বলল, তা হলে আমার জন্য দুর্ভাবনা করতে নিষেধ করব।

ডাক্তারবাবু তাঁর স্বভাবসুলভ হাসিমুখে বললেন, অবশ্য সবটাই যে ঠিক তোমার জন্য এ কথাও বলা চলে না। আংশিক সত্য বললেই ঠিক হবে।

শ্রীমতী ধীরে ধীরে বলতে থাকে, ওদের ভাল-মন্দর বাইরে চলে এসেও কি আমার সম্বন্ধে দুর্ভাবনা থেকে আপনাকে মুক্তি দিতে পারি নি কাকাবাবু?

ডাক্তারবাবু স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে জবাব দেন, এক বিন্দুও না, শ্রীমতী। বরং আমার দুর্ভাবনা বেড়ে চলেছে। তা ছাড়া মুক্তি যে আমি নিজেই চাই না মা। কিন্তু তোমার রাগ দেখছি আজও ষোল-আনাই আছে।

শ্রীমতী মাথা নেড়ে অস্বীকার করে বলল, না কাকাবাবু এটা রাগ-অভিমানের কথা নয়।

ডাক্তারবাবু বললেন, তা হলে একে আমি কি বলব মা?

আমাকে আপনি ক্ষমা করুন! শ্রীমতীর কণ্ঠস্বর কঠিন হয়ে উঠল। সে দৃঢ়কণ্ঠে বলল, সে-সব কথা আপনার না শোনাই ভাল।

ডাক্তারবাবুর মধ্যে কিন্তু এতটুকু পরিবর্তন দেখা গেল না। তিনি তেমনি হাসিমুখেই বললেন, কথাটা কিন্তু আমাকে শুনতেই হবে। অবশ্য তুমি যদি অধিকারের প্রশ্ন না তোল।

শ্রীমতী অনেকখানি দমে গেল। সে আর্তকণ্ঠে বলল, আপনি এভাবে আমাকে বলতে বাধা করবেন না কাকাবাবু—

ডাক্তারবাবুর কণ্ঠস্বর স্নেহসিক্ত হয়ে উঠল। বললেন, তোমার অনিচ্ছা থাকলে আমি আর জোর করব না মা। তবে তোমার কাকাবাবুকে যদি সত্যিসত্যিই তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মনে কর তা হলে সবকথা তাঁকে অকপটে বলতে পার।

শ্রীমতীর দু'চোখ ছলছলিয়ে উঠল। ডাক্তারবাবুর তা দৃষ্টি এড়াল না। তিনি একটু যেন অপ্রস্তুত হয়েছেন মনে হ'ল। কথা না বলে অন্যমনস্কভাবে কি চিন্তা করতে লাগলেন।

শ্রীমতী বলল, সব কথা জানেন না বলেই—

তাকে বাধা দিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, জানলে পরে তোমাকে প্রশ্ন করব কেন মা? ভুল কিছু জেনেছি কি না সেই জন্যেই তোমাকে জিজ্ঞেস করছিলাম। তোমাকে দুঃখ দেবার জন্য নয়।

সহসা খানিকটা উত্তেজিত হয়ে শ্রীমতী বলতে সুরু করল, রাত বারোটায় মিত্রার ঘর থেকে বার হয়ে আসতে দেখেও আমি তেমন গুরুত্ব দিতাম না যদি···শ্রীমতী কথাটা শেষ না করেই থামল।

ডাক্তারবাবু মৃদুকণ্ঠে বললেন, ভাল বুঝলাম না মা।

শ্রীমতী পুনরায় বলতে লাগল, একটি মেয়ের ঘর থেকে বেশী রাত্রে বার হয়ে আসার কারণ শুধু একটা ছাড়া অন্য কিছুও থাকতে পারে। এর মধ্যে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে, কিন্তু সেটা তখনই সন্দেহজনক বলে মানুষ মনে করে যখন সেইটেকেই উপলক্ষ্য করে আর পাঁচটা জঘন্য মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া হয়। কাকাবাবু, এত-বড় অপমানকেও হয়ত আমি মুখ বুঁজে সহ্য করে যেতাম, যদি তা শুধু আমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। আমাকে মাপ করুন এর বেশী আর একটা কথাও আমি বলতে পারব না। আমি মুক্তি চাই।

ডাক্তারবাবু সস্নেহে শ্রীমতীকে কাছে আকর্ষণ করে গভীর কণ্ঠে বলতে লাগলেন, দেখছি, মিত্রা আমাকে একবর্ণ মিথ্যা বলে নি, তোমার সম্বন্ধেও বলে নি—তার নিজের সম্বন্ধেও বলে নি।

শ্রীমতী কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে উঠল, এর পরে কোন প্রসঙ্গ এসে পড়তে পারে এই ভয়ে। কিন্তু ডাক্তারবাবু নিজের কথা মোটেই তুললেন না। শ্রীমতী হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

ডাক্তারবাবু বলতে থাকেন, আমাদের চারিদিকে একটা বিষাক্ত হাওয়া বইছে, তা আমি জানি মা। কিন্তু বিষের ভয়ে পালিয়ে না গিয়ে মুখোস এঁটে এগিয়ে গিয়ে সেই বিষের উৎসকে ধ্বংস করে ফেলাই কি আমাদের উচিত নয় শ্রীমতী?

শ্রীমতী ধীরে ধীরে বলল, মিত্রা বিষাক্ত সাপ—

বাধা দিয়ে ডাক্তারবাবু বলেন, সাপ কিন্তু মানুষ নয় মা, এ দুইয়ে অনেক প্রভেদ।

শ্রীমতী ক্লান্তকণ্ঠে বলল, আমি তর্ক করতে চাই না কাকাবাবু। এ নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি, কিন্তু তাতে দুঃখটাই আরও বেড়েছে।

ডাক্তারবাবু একটু হেসে বললেন, তুমি কিন্তু দুঃখটাকেই প্রকারান্তরে লালন করতে চাইছ। শোন মা, যে অবস্থার মধ্যে পড়ে তুমি চলে এসেছ তা আমার অজানা নয় এবং এই চলে আসার সেদিনে যেমন প্রয়োজন ছিল আজ আবার তোমার ফিরে যাবারও তেমনি প্রয়োজন দেখা দিয়েছে মা।

একটু থেমে খানিক কি চিন্তা করে তিনি পুনরায় বলতে লাগলেন, মাত্র কয়েক মাস বয়েসের সময় অতনু তার মাকে হারিয়েছে। মানুষ হয়েছে সে পুরুষের কাছে এক ভিন্ন পরিবেশে। ওর প্রকৃতির মধ্যে হয়ত সেই জন্যই কোমলতার এত বেশী অভাব। তার উপর ওর বাপ এবং ঠাকুর্দার মতবিরোধকে উপলক্ষ্য করে বাপের স্নেহ থেকেও বঞ্চিত হ'ল।

শ্রীমতী নিরস কণ্ঠে বলল, পুরুষ মানুষের কাছে এমন বহু ছেলেই মানুষ হয়ে থাকে কাকাবাবু। তাই বলে তাকে।

কথাটা তাকে সমাপ্ত করতে না দিয়ে ডাক্তারবাবু পুনশ্চ বলতে থাকেন, তুমি যা বলবে তা আমি জানি মা, কিন্তু অতনুর ঠাকুর্দা তাকে যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন তা ওকে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে সহায়তা না করে বরং একজন আত্মসর্বস্ব মানুষ করেই গড়ে তুলেছিল। তাই স্ত্রী হয়েও তুমি স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছ। ডানকান-আগারওলার মত লোকও তার বিশ্বস্ত বন্ধু হতে পেরেছিল একদিন, আর মিত্রা তার সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করবার সুযোগ পেয়েছিল।

শ্রীমতী এতক্ষণে একটুখানি হেসে জবাব দিল, অথচ সেই মিত্রাই এই অল্প সময়ের মধ্যে বদলে গেছে, এই কথাটা আমাকে আপনি বিশ্বাস করতে বলছেন?

ডাক্তারবাবু দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, তাই বলছি মা। মিত্রার যে চোখে আমি একদিন আগুন জ্বলতে দেখে ভয় পেয়েছিলাম সে দৃষ্টি আজ আর তার নেই। এখন তা স্নেহে আর মমতায় টলমল করছে।

শ্রীমতীর মুখে একটু বাঁকা হাসি দেখা দিল। সে নিরস কণ্ঠে বলল, এই সুলক্ষণ দেখে আপনি খুশী হতে পারলেও আমি পারছি না কাকাবাবু।

ডাক্তারবাবু প্রবলবেগে মাথা নেড়ে বললেন, অবস্থাটা আমি হয়ত তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারি নি মা। কিন্তু আমার অক্ষমতার জন্য তুমি আর একজনার উপর অবিচার কর না।

ডাক্তারবাবুর কথার ধরনে শ্রীমতী না হেসে থাকতে পারল না। সে বলল, আমাকে একটা সত্য কথা বলবেন কাকাবাবু—

তোমার কাকাবাবু এতক্ষণ ধরে তোমাকে মিথ্যে বলেছে, এইটেই কি শেষ পর্যন্ত তুমি বলতে চাও শ্রীমতী? ডাক্তারবাবু ক্ষুব্ধকণ্ঠে জবাব দিলেন।

শ্রীমতী লজ্জিত হয়ে বলল, ছিঃ কাকাবাবু! আপনি আমাকে কি মনে করেন? আমি শুধু বলতে চাই যে, কিসের জন্য এই পরিবারের সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দর সঙ্গে আপনি নিজেকে এভাবে জড়িয়ে ফেলছেন? যাক না সে উচ্ছন্নে—ডুবে যাক তার কারখানা। আপনার কিসের দায়—কিসের দায়িত্ব।

ডাক্তারবাবু সহসা হা হা করে হেসে উঠলেন।

শ্রীমতী বলল, হয়ত হাসির কথাই বলেছি, তাই হাসছেন। আমারও মাঝে মাঝে কেমন একটা সন্দেহ হয়। সম্ভবতঃ, আপনার কিছুই না জেনে আমরা নানা কথা বলে থাকি। কোথায় যেন একটা গভীর রহস্য রয়ে গেছে যেখানে আজও পৌঁছাতে পারি নি।

ডাক্তারবাবু আর একবার হেসে উঠে বললেন, রহস্য মনে করলেই রহস্য, নইলে জলের মত সোজা। দুই আর দুই চারের মত।

শ্রীমতী মাথা নেড়ে বলে, কিন্তু আমি যোগ করতে বসলেই যোগফলটা অনেক বড় হয়ে যায়।

ডাক্তারবাবু রহস্য করে জবাব দিলেন, ওটা অঙ্ক না জানার ফল। কিন্তু এতক্ষণ এত কথার মধ্যেও আমার আসল কথাটাই তোমাকে বলা হয় নি মা। মুখ্যতঃ তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যই আমি এসেছি। আর আগামী পরশুই আমি যেতে চাই।

শ্রীমতী অবিচলিত কণ্ঠে বলল, আমার কিন্তু যাওয়া হবে না কাকাবাবু।

ডাক্তারবাবু একটু যেন উত্তেজিত হয়েই জবাব দিলেন, হবে না মানে? একশ' বার হবে। তোমার কোন ওজর-আপত্তি আমি শুনব না।

শ্রীমতী হেসে ফেলে বলল, আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন, আপনি শ্রীমতীর কাকাবাবু হলেও ও বাড়ীর কেউ নন। তাছাড়া আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ আমাকে ও বাড়ী নিয়ে যেতে পারবে না।

ডাক্তারবাবু হতাশ হয়ে বললেন, তুমি বড় তর্ক করতে ভালবাস শ্রীমতী। এই কথাই কি তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বল যে, তুমি তোমার স্বামীকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়েছ?···

শ্রীমতী চুপ করে থাকে।

ডাক্তারবাবু বলেন, কিন্তু আজ বাদে কাল যখন তোমার কোলে সন্তান আসবে তাকে তুমি কিসের জোরে ধরে রাখবে—

শ্রীমতী একটুখানি ইতঃস্তত করে ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিল, দরকার হলে ফিরিয়ে দিতে হবে কাকাবাবু। জোর করে ধরে রাখতে যাব না।

ডাক্তারবাবু বার বার মাথা নেড়ে স্নেহকোমল কণ্ঠে বললেন, তখন কি পারবে মা?

শ্রীমতী ভাবলেশহীন কণ্ঠে বলল, পারবার চেষ্টা করব কাকাবাবু।

ডাক্তারবাবু ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করলেও প্রকাশ্যে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, মনে মনে তুমি যখন স্থির করে ফেলেছ, তখন আর জোর করে কি করব মা, কিন্তু তোমার কাকাবাবু যদি তাঁর নিজের বাড়ীতে তোমাকে নিয়ে যেতে চায় তা হলেও কি তুমি আপত্তি করবে?

শ্রীমতী হাসি মুখে জবাব দিল, না—

খুশী হলাম। ডাক্তারবাবু স্মিত হেসে বললেন, তা হলে আমার ভাঙা ঘরে চল। মা লক্ষ্মীর পায়ের ছোঁয়া লেগে আমার ভাঙা ঘরই হয়ত একদিন রাজপ্রাসাদ হয়ে উঠবে। তবে একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না মা। একজন সাধারণ স্বামীকে নিয়ে ঘর করতে যে কোন মেয়েই পারে। ওতে কোন কৃতিত্ব নেই। অতনুবাবু সাধারণ নয় স্বীকার করি, কিন্তু বার আনা এগিয়ে গিয়েও তুমি যে কেন না বুঝে পিছু হটতে সুরু করলে এইটেই আমার মাথায় ঢুকছে না।

শ্রীমতী মৃদু কণ্ঠে বলল, পিছু যখন একবার হটেছি তখন নতুন করে আবার সুরু করবার আমার ইচ্ছেও নেই, উৎসাহও নেই কাকাবাবু।

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, বার আনা ত তোমার নামে জমা হয়ে আছে মা—বাকী শুধু চার আনা। আমার কথা যে কত সত্য তা আজ অতনুবাবুকে দেখলে তুমিও স্বীকার করবে।

একটা জবাব দেবার জন্যই শ্রীমতী মুখ তুলেছিল। অকস্মাৎ প্রণব এসে উপস্থিত হতে তাকে থামতে হ'ল।

ডাক্তারবাবু প্রণবের কাছে নালিশ জানাবার ভঙ্গিতে বললেন, একটি ঘণ্টা এই ঝগড়াটে মেয়েটার কাছে ফেলে রেখে কোন রাজ্য জয় করে এলে নব?

প্রণব তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ উচ্ছ সিত কণ্ঠে বললেন, কি তুমি রাজ্য জয়ের কথা বলছ নালু মুন্সী? আমার আজকের আবিষ্কার কি তার চেয়ে কিছু কম। প্রথমতঃ, আমার বাল্যবন্ধু, দ্বিতীয়তঃ কতবড় এক জমিদার, তৃতীয়তঃ সম্মানিত কুটুম—কত যুগ অজ্ঞাতবাসের পর আত্মপ্রকাশ করেছে। আজ যে আমার কি আনন্দ সে তুমি বুঝবে না কল্যাণ মুন্সী—

প্রণব হুচোট খেয়ে থামলেন।

শ্রীমতী অস্বাভাবিক রকম চমকে উঠল। তার চোখ দুটি বিস্ময়ে, আনন্দে যেন ঠিকরে বার হয়ে আসতে চাইছে। মনে মনে সে বার কয়েক আবৃত্তি করল, কল্যাণ মুন্সী···কল্যাণ মুন্সী···

সহসা শ্রীমতী ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। ডাক্তারবাবু উঠে এসে সস্নেহে তাকে কাছে টেনে নিলেন।

শ্রীমতী তখনও ফুলে ফুলে কাঁদছে।

আর প্রণবের চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে এক ঝলক স্বর্গীয় হাসি।

[আগামী বারে সমাপ্য

মুরলীধর

শ্রীদিলীপকুমার রায়

শোন শোন সখী, শোন না উছাস লো ঃ
সে কে নদীকূলে বাঁশিসুরে ডাকে!
শোন যমুনায় তানের বিলাস লো ঃ
আসে ভেসে ঐ কত অনুরাগে!

রুমুক ঝুমুক তাল নূপুরে রণি' গোপাল ঠুমুক ঠুমুক তালে আসে।
উছলে সপ্তসুরে মুরলী এ-মধু সুরে প্রেমের রাগিণী উচ্ছ্বাসে!
চল্ তৃষিত এ-আঁখির পিয়াস লো
হরি দরশনে মিটাবে সোহাগে।
শোন শোন সখী শোন না উছাস লো ঃ
সে কে নদীকূলে বাঁশিসুরে ডাকে!

শিখিচূড়া শিরে দোলে, বনমালা দোলে গলে কে ঐ পীতাম্বরধারী!
কমল নয়ন মরি, কটাক্ষ বাঁকা হরি নাচে নাচে কৃষ্ণ মুরারী!
সখী, যমুনায় চল চল—রাস লো
যেথা রবে নাথ—দেখি চল তাকে।
শোন শোন সখী শোন না উছাস লো ঃ
সে কে নদীকূলে বাঁশিসুরে ডাকে!

নন্দের নন্দন, মাধব, মনোমোহন, গিরিগোবর্দ্ধনধারী!
মীরার হে সুন্দর পরম মনোহর, হৃদিবৃন্দাবনচারী!
চল চল যাই কেটে মায়াপাশ লো
যেথা ডাকে বঁধু ডাকে অনুরাগে।
শোন শোন সখী শোন না উছাস লো ঃ
সে কে নদীকূলে বাঁশিসুরে ডাকে!

[ইন্দিরা দেবীর সমাধিলব্ধ মীরাভজনের অনুবাদ]

রাষ্ট্রের দণ্ডনীতির মৌলিক উদ্দেশ্য

শ্রীযোগনাথ মুখোপাধ্যায়

মানুষ সমাজবাসী। সমাজ ছাড়া তার জীবন অসম্পূর্ণ, অনিশ্চিত ও অর্থহীন। সমাজত্যাগী সন্ন্যাসীকেও তাই নির্জ্জন তপস্যা ভঙ্গ করে বার বার ফিরে আসতে হয় লোকালয়ের কোলাহলের মাঝখানে, সমাজচ্যুতকে পূর্ব্বজীবন ফিরে পাওয়ার আগ্রহে নতি স্বীকার করতে হয় সমাজ-শাসনের কাছে।

জীবনের অবিচ্ছেদ্য পরিবেশ এই সমাজকে মানুষ তাই স্মরণাতীত কাল থেকে সব রকম সম্ভাব্য ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করে এসেছে। সহজাত বুদ্ধি আর সমাজবদ্ধ জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে সে বুঝেছে যে, সমগ্র জীবনের সুখ ও শান্তির প্রয়োজনে কিছু কিছু ক্ষুদ্র স্বার্থ সকলকেই ত্যাগ করতে হয়। সকলেই যদি সবকিছু পাওয়ার চেষ্টা করে তবে শেষ পর্য্যন্ত সকলকেই বঞ্চিত হতে হয়। বিরামবিহীন দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে অসহনীয় হয়ে উঠে সকলের জীবন। তাই মানুষ সকল যুগে কতকগুলি বিধিনিষেধ অতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে এসেছে, এবং যে তা ভঙ্গ করেছে তাকেই দণ্ড পেতে হয়েছে। অপরাধীর অপরাধ যে ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে নয়, সমগ্র সমাজের বিরুদ্ধে— এ কথাটা কয়েক হাজার বছর আগেই মানুষ বুঝতে পেরেছিল।

সমাজ-বিরোধী অপরাধী যদি তার অপরাধ অনুসারে শাস্তি না পায়, বিশেষ কোন প্রভাবের জোরে অপরাধ করেও অবাধ বিহারের সুযোগ পায় তবে তার বিষময় প্রতিক্রিয়া সমগ্র সমাজ-দেহকেই বিষাক্ত করে তোলে। অপরাধী যদি মুক্তি পায় তবে যার সে ক্ষতি করেছে শুধু সেই ব্যক্তিই নয়, সমাজের আর সকল শান্তিকামী নাগরিকও রাষ্ট্রের ন্যায় বিচারে আস্থা হারায়। সকলেই নিজেদের জীবন ও সম্পদ অনিশ্চিত বলে ভাবতে আরম্ভ করে, আর যে সকল দুর্বৃত্ত শুধু শাস্তির ভয়ে সংযত হয়ে থাকে তারাও পাপের পথে পা বাড়াতে প্রলুব্ধ হয়। সুতরাং একজনমাত্র অপরাধীর অন্যায় নিষ্কৃতির অর্থ সমগ্র সমাজের শান্ত জীবনকে বিচলিত করা। একটিমাত্র দুর্বৃত্তকে প্রশ্রয় দেওয়ার অর্থ শত দুর্বৃত্তকে উচ্ছৃঙ্খলতার উৎসাহ দেওয়া। স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের অন্যায় প্রশ্রয় যদি দুর্যোধনকে অবাধ্য, উদ্ধত ও নিষ্ঠুর হওয়ার সুযোগ না দিত তবে দুঃশাসনের পক্ষে অমন নির্ভয়ে, দ্বিধাহীন চিত্তে, প্রকাশ্যে দ্রৌপদীকে লাঞ্ছিত করা কখনই সম্ভব হ'ত না। তাই রাষ্ট্রের সকল মানুষের শুভ কল্যাণের দায়িত্ব যাঁদের তাঁরা কোন যুক্তিতেই একজন অপরাধীকে তার প্রাপ্য দণ্ড থেকে অব্যাহতি দিতে পারেন না, এমনকি 'গণদাবি'র প্রতি স্বীকৃতি জানাতেও নয়। অনেক সময় দেখা যায় অনেক অভিযুক্ত ব্যক্তির সমর্থনে আদালতে বিপুল জনতার সমাবেশ হয়। তাদের মনোরঞ্জন করতে গিয়ে কোন বিচারপতি যদি কখনও কোন অপরাধীকে অন্যায় ভাবে মুক্তি দেন তবে সেই অপরাধীর মতই তিনি অপরাধ করবেন। সমাজের সাধারণ মানুষের মনে একবারও যদি এ ধারণা দৃঢ়মূল হওয়ার সুযোগ পায় যে,আইনের যাবতীয় বিধিনিষেধ শুধু তাদেরই জন্যে ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের জন্যে নয়, তবে রাষ্ট্রের সমগ্র বিচার ব্যবস্থাই তার নৈতিক শক্তি হারিয়ে ফেলবে। বিচার হয়ে দাঁড়াবে প্রবলের অত্যাচার। "Laws grind the poor and rich men rule the laws" এ ক্ষোভ সাধারণ মানুষের মনের সব সময়ই থাকে। এ কারণে রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলার রক্ষক যারা তাদের কখনও এমন কাজ করা উচিত হবে না যাতে ঐ বিশ্বাসই তাদের আরও বেশী দৃঢ়মূল হতে পারে। রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হ'ল তার অভ্যন্তরস্থ সকল মানুষকে সব রকমের বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি থেকে রক্ষা করা। এ কারণে তার সার্ব্বভৌম শক্তি বা নিরপেক্ষ ন্যায়বিচারে কারও মনে এতটুকু সন্দেহ জাগতে পারে এমন কোন কাজ তার কখনও করা উচিত হবে না। অপরাধীকে কোন অজুহাতেই রাষ্ট্র প্রাপ্য দণ্ড থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারে না।

কিন্তু এ ত গেল সমাজের সামগ্রিক স্বার্থে অপরাধীর প্রতি রাষ্ট্রের কর্ত্তব্যের কথা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অপরাধীরও কি রাষ্ট্রের কাছে কিছুই আশা করার নেই? সেও ত রাষ্ট্রের নাগরিক, সুতরাং তার ভালমন্দ দেখার দায়িত্বও ত রাষ্ট্রের আছে? নিশ্চয়ই আছে, এবং এই কারণেই কবি বলেছেন:

"দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।"

অর্থাৎ সমষ্টির স্বার্থে ব্যক্তি বিশেষকে যে দণ্ড রাষ্ট্র দিয়ে থাকে তার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র দুঃখকষ্ট দিয়ে অপরাধীর উপর প্রতিশোধ নেওয়া নয়। দণ্ডের সঙ্গে দুঃখকষ্টের সম্পর্ক অতি নিকট হলেও ঐটিই তার শেষ কথা নয়, এমনকি উদ্দেশ্যও নয়। প্রকৃতপক্ষে তা হ'ল আর এক মহৎ উদ্দেশ্যের অনিবার্য্য মাধ্যমমাত্র। সে মহৎ উদ্দেশ্য হ'ল অপরাধীর সংশোধন। দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে বিষয়টি আমরা আরও ভালভাবে বুঝতে পারি। মা যে শাস্তি দেন সন্তানকে বা শিক্ষক দণ্ডিত করেন ছাত্রকে তার মধ্যে দুঃখ-যন্ত্রণা থাকলেও প্রতিশোধের মনোভাব নিশ্চয়ই কোথাও নেই। সংশোধনই হ'ল তার একমাত্র উদ্দেশ্য। অবোধ সন্তান বা অবাধ্য ছাত্র হয়ত সেই মুহূর্ত্তেই তা বুঝতে পারে না,

আর সে কারণে দারুণ ক্ষোভে অনেক কিছুই করে তখন। কিন্তু তবুও তাদের প্রকৃত শুভার্থীরা কখনও সেই নির্বুদ্ধি ঔদ্ধত্যের কাছে নতি স্বীকার করেন না। কারণ সে পরাজয় স্বীকারের অর্থ সেই বিপথগামী হতভাগ্যেরই সর্বনাশ করা।

রোগীর দেহে যখন অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয় তখন তার কতখানি লাগবে তা নিয়ে মুহূর্তের জন্যেও চিন্তা করেন না কোন শল্য-চিকিৎসক। ভয়ার্ত রোগী হয়ত আকুল হয়ে সে অস্ত্রপ্রয়োগে আপত্তি জানায় বা তার প্রিয়জন কেউ মূর্চ্ছিত হয়ে আছড়ে পড়ে চিকিৎসকের পায়ের কাছে। কিন্তু তবুও তাঁকে নিজ সিদ্ধান্তে অবিচল থাকতে হয়, আর সকলের সব কাতর অনুরোধ উপেক্ষা করে হাতে তুলে নিতে হয় শাণিত অস্ত্র। রোগীর কল্যাণকামীদের মধ্যে স্থিরবুদ্ধি যারা তারাও সেই সঙ্গে এগিয়ে আসে চিকিৎসকের সহযোগিতায়। অস্ত্রপ্রয়োগকালে রোগীর কাতর যন্ত্রণায় হয়ত দু'চোখ তাদের জলে ভরে যায়, রোগীর ব্যথা শত ব্যথা হয়ে লাগে তাদের বুকে। তবুও তাদের শক্ত হাতে ধরে রাখতে হয় রোগীকে, আর তার ক্ষতস্থান উন্মুক্ত করে মেলে ধরতে হয় চিকিৎসকের শাণিত অস্ত্রের সম্মুখে।

ঠিক এমনি ভাবেই সঙ্গদোষ ও পারিপার্শ্বিক ঘটনার প্রভাবে যে হতভাগ্যের মনুষ্যত্ব সাময়িক ভাবে তার পশুত্বের কাছে পরাস্ত হয়েছে তাকে তার লাঞ্ছিত জীবন থেকে রক্ষা করতে তার শুভার্থীদের দৃঢ় মনোভাব নিতে হয়। মনের পশু বনের পশুর মতই অবাধ্য, উদ্ধত; নিছক স্তোকবাক্যে তাকে সংযত করা যায় না। শুধুমাত্র পাশব শক্তির কাছেই পশু হার মানে। কিন্তু এই পাশব শক্তি প্রয়োগকালে তার উদ্দেশ্যের কথা সব সময় মনে রাখা দরকার। এক মুহূর্তের জন্যেও দণ্ডদাতার এ কথা ভোলার উপায় নেই যে, প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে নয়, অপরাধীর সুপ্ত বা পরাস্ত মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যেই একটি বিশেষ ব্যবস্থা তার উপর প্রয়োগ করা হচ্ছে। এক কথায় অপরাধ-প্রবণতা থেকে তাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই দণ্ড দেওয়া হচ্ছে।

সুতরাং রাষ্ট্রের দণ্ডনীতির মূল উদ্দেশ্য কি, এ প্রশ্নের জবাবে এক কথায় বলা যেতে পারে সংশোধন, প্রতিশোধ গ্রহণ নয়। প্রতিশোধ মানুষকে আরও বেশি উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল করে তুলতে পারে, তাকে ভাল করতে পারে না। প্রতিশোধের শুষ্ক রসনা অপরাধীর হৃদয়ের সবটুকু আর্দ্রতা নিঃশেষে লেহন করে নিয়ে তাকে আরও বেশী নিষ্ঠুর করে তোলে। তাতে শুধু সেই ব্যক্তিরই ক্ষতি হয় না, সারা সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তাও বিপন্ন হয়ে পড়ে। পৃথিবীর সকল দেশের সভ্য সমাজই পরীক্ষা করে দেখেছে, চোখের বদলে চোখ বা দাঁতের বদলে দাঁত নিয়ে সমাজকে অপরাধমুক্ত করা যায় নি। বরং অপরাধের মাত্রা বেড়ে গেছে তাতে।

দণ্ড দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অপরাধীকে এ কথা বুঝিয়ে দিতে হবে যে, তাকে ঘৃণিত লাঞ্ছিত জীবনযাপনে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে শাস্তি দেওয়া হয় নি। তার কাজের ফলে সমাজের শান্ত জীবন আহত হলেও সমাজ তাকে ত্যাগ করে নি। যে দণ্ড সে ভোগ করছে সমাজ ও তার উভয়ের কল্যাণেই তা অনিবার্য প্রয়োজন ছিল। শিশুকে যখন তার মা-বাবা বা ছাত্রকে যখন তার শিক্ষক শাস্তি দেন তখন সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও তারা তাকে বুঝিয়ে দেন যে, সে শাস্তি তার অপরাধের জন্যে, নইলে তার প্রতি কারও স্নেহ-ভালবাসা এতটুকুও কমে নি। যে মুহূর্তে সে ভাল হবে সেই মুহূর্তেই তার শাস্তিদাতা তাকে কাছে টেনে আনবে। অনুশোচনায় যখন তার দু'চোখ দিয়ে জল ঝরবে তখন তার দণ্ডদাতাই তা সযত্নে মুছে দেবেন। এ কারণে দণ্ডদাতা ও দণ্ডিতের মধ্যে আত্মিক যোগ ও স্নেহের বন্ধন যত বেশি দৃঢ় হয় দণ্ডদানের ঈপ্সিত ফলও তত বেশি ত্বরান্বিত হয়।

নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে যে মানুষের মন সারা সমাজের ওপর বিষিয়ে উঠেছে তাকে এ কথা বোঝানো নিশ্চয়ই সহজ কাজ নয়। ক্ষেত্র বিশেষে এত কঠিন যে, তা প্রায় অসম্ভবের সমতুল। তাই এই সুকঠিন কর্তব্যপালনের দায়িত্ব যদি উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে অর্পিত না হয় তবে অপরাধীর দণ্ডভোগের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। শিশুর চরিত্র গড়ে ওঠে বাপ-মায়ের শিক্ষায়, ছাত্রের চরিত্র গড়ে ওঠে শিক্ষকের দক্ষ পরিচালনায়, সমাজবাসীর জীবন সুশৃঙ্খল ও নিয়মানুগ হয় সমাজনেতার আদর্শে। দণ্ডিত অপরাধীর বন্দীজীবনের দুঃখভোগও এই ভাবে সুফলপ্রসূ হতে পারে তার রক্ষকের কর্তব্যনিষ্ঠায়। তাঁদের সহানুভূতিশীল আচরণ ও যোগ্য পরিচালনাই শুধু বন্দীদের এ কথা বোঝাতে পারে যে, তাদের বন্দীদশা অভিশাপ নয়, ছদ্মবেশী আশীর্ব্বাদ। দণ্ডভোগের সঙ্গে লজ্জা ও গ্লানির সম্পর্ক অতি নিবিড় হলেও তার প্রভাব কখনও এত বেশি হওয়ার সুযোগ দিতে নেই যার ফলে বন্দীর ব্যক্তিত্ব গুরুতর ভাবে আহত হতে পারে। কারণ তা যদি হয় তবে সেই হতভাগ্য চিরদিনের জন্যে তার ভাল হওয়ার সকল আশা হারিয়ে ফেলবে। যার ফলে দণ্ড শুধু নিত্য-নূতন অপরাধীরই সৃষ্টি করবে, কোন অপরাধীকে তার অভিশপ্ত জীবন থেকে উদ্ধার করে সবল সুস্থ মানুষে পরিবর্তিত করতে পারবে না।

সুতরাং দণ্ডিত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে সব চেয়ে বেশি দায়িত্ব তাদের অবধায়কদের। দণ্ডলাভের পর যে কর্তৃপক্ষের জিম্মায় তারা থাকবে তাঁদের যদি দণ্ডনীতির মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকে এবং সে জ্ঞানকে কার্য্যকর করার জন্যে থাকে আন্তরিক ইচ্ছা ও কর্ম্মক্ষমতা, তবেই অপরাধীর দণ্ডভোগের বেদনা তার ভবিষ্যৎ জীবনে আশীর্ব্বাদ হয়ে দেখা দিতে পারে। এত বড় গুরুদায়িত্ব যে অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত ওয়ার্ডার এবং আত্মচিন্তায় বিভোর কারাকর্ম্মচারীদের দ্বারা কোন মতেই পালন করা সম্ভব নয় তা। জেলখানা সম্বন্ধে যার এতটুকুও অভিজ্ঞতা আছে তাকে বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। সব জেলখানাতেই কর্ম্মচারী-ওয়ার্ডার-কন্ট্রাক্টার-মেট-কয়েদী মিলে এমন এক অন্তহীন জটিল আবর্তের সৃষ্টি হয়েছে

যে,তার মধ্যে একবার কেউ পড়লে তার আর উদ্ধারের আশা নেই। আজকের কারাগার যেন এক স্বতন্ত্র রাজ্য, যার সঙ্গে বাইরের জগতের ন্যায়-নীতি, শ্রদ্ধা-ভক্তি ও জীবনাদর্শের কোনই সম্পর্ক নেই। সেটা যেন আশ্রয়হীন, সংস্থানহীন, বিপথগামী ব্যক্তিদের এক সাময়িক আশ্রয়। ভবিষ্যৎ জীবনে যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে তার কোন শিক্ষা, কোন অনুপ্রেরণাই আজকের কারা-ব্যবস্থা তাদের দেয় না।

তা হলে কেমন করে এই আকাঙ্ক্ষিত ফললাভ সম্ভব হতে পারে? এ প্রশ্নের জবাবে শুধু এই কথাই বলা যেতে পারে যে, কারাগারকে রূপান্তরিত করতে হবে মানুষ-গড়ার কারখানায়। আর সে কাজের দায়িত্ব হৃদয়হীন আমলাতন্ত্রের হাত থেকে নিয়ে দিতে হবে আদর্শবাদী সমাজসেবী শিক্ষাব্রতীদের। যাঁদের প্রথম কাজ হবে হতভাগ্য অপরাধীদের পরাজিত মনুষ্যত্বকে নূতন করে জাগিয়ে তুলে নিজের ও সমাজের উপর তাদের হারান বিশ্বাস আবার ফিরিয়ে আনা। যে ব্যক্তি নিজেকে সমাজ থেকে যত বেশি দূর বলে মনে করবে তার অপরাধ-প্রবণতা তত বেশি হবে, ঠিক যেমন বৃহৎ পরিবারে যে ছেলে যত বেশি উপেক্ষিত তার সমগ্র পরিবারের উপর আক্রোশ ও কুচিন্তা তত বেশি। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত না একজন অপরাধীকে উপযুক্ত শিক্ষা ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে সমাজে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের উপযোগী করে গড়ে তোলা যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজের সুস্থ শান্ত জীবনের উপর তার আক্রোশ কিছুতেই দূর হবে না। যার অর্থ হ'ল, কিছুতেই তাকে অপরাধমুক্ত করা যাবে না। এ সকল কারণে কারাবিভাগের সঙ্গে সরকারের স্বরাষ্ট্র-বিভাগের চেয়েও শিক্ষা-বিভাগের সম্পর্ক নিকট হওয়া উচিত। প্রত্যেক কারাগারে অপরাধ-বিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত এমন কয়েকজন শিক্ষক নিযুক্ত করা উচিত যাঁরা নিয়মিত ভাবে বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে দণ্ডিত ব্যক্তিদের কারিগরী শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক শিক্ষাও দেবেন।

অপরাধীমাত্রেরই ধারণা যে, তারা শহীদ, হৃদয়হীন সমাজ-ব্যবস্থার বলি। তাদের মন থেকে এ মিথ্যা ধারণা দূর করতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে যে, তাদের চেয়েও অনেক দুঃস্থ লক্ষ লক্ষ মানুষ সমাজে বাস করছে, যারা জীবিকার জন্যে অহোরাত্র পরিশ্রম করলেও কখনও সততার পথ ত্যাগ করে নি। শিক্ষার মধ্য দিয়ে তাদের এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ করতে হবে যে, সম্মানই হ'ল মনুষ্য-জীবনের সব চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষার বস্তু। প্রতিদিনের সংবাদপত্র পড়িয়ে তাদের শোনাতে হবে কোথায় কোন ব্যক্তি নিজ জীবন তুচ্ছ করে প্রবল স্রোতের মুখে ঝাঁপিয়ে বা জলন্ত ঘরের মধ্যে ঢুকে অপর এক বিপন্ন ব্যক্তির জীবন রক্ষা করেছে, কোথায় রাস্তা থেকে নোটের তাড়া কুড়িয়ে পেয়ে কোন ব্যক্তি সংবাদপত্রে প্রকৃত মালিকের সন্ধানে বিজ্ঞাপন দিয়েছে, কোথায় কোন রিক্সাওয়ালা বা ঘোড়ার গাড়ীর কোচম্যান আরোহীদের ভুলে ফেলে যাওয়া মনিব্যাগ বা গহনার বাক্স পাওয়ামাত্রই স্বেচ্ছায় ফিরিয়ে দিয়ে এসেছে। এ ব্যাপারে সংবাদপত্র বা সরকারের কর্তব্যও কিছু কম নয়। সংবাদ-পত্রে 'বিবিধ সংবাদ' বা 'ঘটনা ও দুর্ঘটনা'র মধ্যে এই মহান সততার সংবাদগুলি সংক্ষেপে না ছাপিয়ে বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব দিয়ে ছাপাতে হবে। ঐ সকল সৎ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদের ছবি বড় করে ছাপিয়ে বার বার করে বলতে হবে যে, তাদের কৃতিত্ব গিরি-লঙ্ঘন বা সাগর অতিক্রমণের চেয়ে একটুকুও কম উল্লেখযোগ্য নয়। যেখানে ভদ্রলোকের শিক্ষিত ছেলেরাও ট্রাম বাসের প্রাপ্য কয়েকটি মাত্র পয়সা ফাঁকি দেওয়ার লোভ সামলাতে পারে না সেখানে এই অতি সাধারণ অথচ সত্যনিষ্ঠায় অবিচল মানুষগুলি দারিদ্র্যের গিরি ও প্রলোভনের সাগর অতিক্রম করে সত্যের জয়-পতাকা প্রথিত করেছে। আর তা করেছে কোন রকম পুরস্কার বা সম্মানের প্রত্যাশা না রেখেই।

রাষ্ট্র-পরিচালকদেরও কর্তব্য হবে, শুধু শুধু নিজেদের রত্ন বা মণিমাণিক্য বলে ঘোষণা না করে ঐ সকল সরল আদর্শনিষ্ঠ মানুষ-গুলিকে প্রকাশ্য সভায় আমন্ত্রিত করে সম্মান জানান, আর যোগ্যতা অনুসারে তাদের সরকারী পদে প্রতিষ্ঠিত করা। সৎ ও সত্যনিষ্ঠ মানুষগুলির এই সম্মান ও প্রতিষ্ঠা দণ্ডিত ব্যক্তিদের বুঝিয়ে দেবে যে, অন্যের স্বার্থে নয়, নিজের প্রয়োজনেই মানুষের সৎ হওয়ার দরকার। কোন সৌভাগ্য নিয়ে না জন্মিয়েও মানুষ শুধু তার সততার গুণেই বড় হতে পারে। মুক্তির পর বিভিন্ন ব্যক্তিকে তাদের যোগ্যতা অনুসারে সরকারী পদে বহাল করে রাষ্ট্রের কর্তৃ-পক্ষকে অন্যান্য বন্দীদের একথা বোঝাতে হবে যে, সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার পথ আজও তাদের সম্মুখে খোলা রয়েছে। মুক্তির সাত দিন পরেই 'এ' ক্লাস বন্দীকে যে 'বি' ক্লাশ হয়ে জেলে ফিরে আসতে হয় তার একমাত্র কারণ ঐ সাত দিনের উপবাস, অপমান ও নিরাশ্রয়তা তাকে বুঝিয়ে দেয়, পাপের পথ ছাড়া আর কোন পথই তার সম্মুখে খোলা নেই। এই অসহনীয় অবস্থা থেকে ঐ হতভাগ্য মানুষগুলিকে একমাত্র সহানুভূতিশীল সরকারই রক্ষা করতে পারেন। আশ্রয়চ্যুত উদ্বাস্তুকে পুনর্বাসনের দায়িত্ব যেমন সরকারের, সমাজচ্যুত অপরাধীর পুনর্বাসনের দায়িত্বও ঠিক তেমনি তার।

লম্বা দাগটানা কুর্তা কয়েদীদের গা থেকে খুলে ফেলে তাদের বার বার করে বলতে হবে তারা মানুষ, শিক্ষার্থী—'এ' ক্লাশ বা 'বি' ক্লাশ কয়েদী নয়। সাধারণ পোশাক পরেই তারা আসবে তাদের শিক্ষাগারে আর সেখানে কারিগরী শিক্ষার সঙ্গে লাভ করবে মানুষ হওয়ার শিক্ষা। সে শিক্ষা যেমন তাদের বিগত জীবনের যাবতীয় ভুল-ভ্রান্তি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ করবে, ঠিক তেমনি দেখাবে তাদের আগামী দিনের চলার পথ। আর এ পরিকল্পনাকে ফল করে তুলতে হলে আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হবে কারাগারের বর্তমান পরিচালন-ব্যবস্থায়।

সম্প্রতি কারাসংস্কারের দিকে সরকার দৃষ্টিপাত করেছেন। কিন্তু তাঁরা যে পথ ধরেছেন তাতে বন্দীর দণ্ডভোগের ঈপ্সিত ফললাভের

সম্ভাবনা খুবই কম। গান-বাজনা ও নিত্য-নূতন প্রমোদানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে এবং পরিশ্রমের বিনিময়ে নগদ-প্রাপ্তির সুযোগ করে দিয়ে জেলখানাকে যে ভাবে একটি আরামদায়ক ও নিরাপদ আশ্রয়ে পরিণত করার ব্যবস্থা হয়েছে তাতে বন্দীর ভবিষ্যৎ জীবনে মানুষ হওয়ার শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা লাভের কোনই অবকাশ নেই। এমন কি সে যে অন্যায় করার অপরাধে কারাগারে আনীত হয়েছে এ কথাও তার মনে থাকে না। ফলে মুক্তির পর আবার যখন তার উপবাস ও লাঞ্ছনা সুরু হয় তখন জেলখানার নিশ্চিন্ত নিরাপদ দিনগুলির সুখ স্মৃতি তাকে নূতন করে অপরাধের পথে পা বাড়াতে হাতছানি দিয়ে ডাকে। আর সেই দুর্ব্বলচিত্ত মানুষটি অতি সহজেই সে প্রলোভনের কাছে পরাজয় স্বীকার করে। অপরাধীর মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোলার গুরুদায়িত্ব অস্বীকার করে ও ভবিষ্যতে তার সম্মানজনক জীবনযাত্রার কোন সুযোগ না করে দিয়ে শুধু যদি কারাগারের দৈনন্দিন জীবনের সুখবৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়, তবে তাতে শুধু অপরাধীর অপরাধ-প্রবণতাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে। একারণে পবিত্র ও কঠোর কৃচ্ছ হতে হবে কারাগারের দৈনন্দিন জীবনরীতি, সৎ, সংযত ও কর্ম্মনিষ্ঠ মানুষ গড়ে তোলা হবে তার একমাত্র কাজ। সামরিক শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা পালন করতে হবে কারাগারের প্রত্যেকটি কাজে। তবেই দণ্ডভোগ এক বিপথ-গামী মানুষের অভিশপ্ত জীবনে আশীর্ব্বাদ হয়ে দেখা দিতে পারে।

যক্ষের প্রতি

শ্রীহরিপদ গুহ

তোমার বিরহ-ব্যথা জাগিয়া মনে,
চঞ্চল করি তোলে বিজন ক্ষণে।
কেমনে রহিলে তুমি প্রিয়ারে ছাড়ি ?
বুকে লয়ে এত ব্যথা বুঝিতে নারি।

কোথায় অলকা আর সে রামগিরি,
ব্যবধান রচে কত তোমারে ঘিরি।
তোমার মনের যত না বলা বাণী,
মেঘে মেঘে ফিস্ ফিস্ করে কানাকানি।

কাটাইতে বিভাবরী কেমনে একা ?
প্রিয়া সাথে বহুদিন ছিল না দেখা।
ফেলিতে কি আঁখিজল একেলা থাকি ?
শিহরিতে ক্ষণে ক্ষণে বদন ঢাকি।

সান্ত্বনা দিতে কেহ ছিল না পাশে,
কাটিত দিবস কি গো শুধু হুতাশে ?
যখন ঝরিত বারি, ডাকিত দেয়া,
নাচিত ভবন-শিখি, ফুটিত কেয়া।

ডাহুক ডাহুকী সনে হরষে মাতি,
লুকোচুরি খেলাখেলি সারাটি রাতি।
নিশি ভোর চখাচখী কাঁদিয়া সারা,
ডাকিত দাদুরীগণ পাগল পারা।

তখন তোমার হিয়া ব্যথিত দুখে,
কেহ নাহি নিত তোমা টানিয়া বুকে।
তাই কি জলদে তুমি ডাকিয়া আনি,
পাঠাইলে বিরহের বারতাখানি ?

তোমারি বেদনা মোরা বুকেতে বাঁধি,
বরষে বরষে তাই বিরহে কাঁদি।
আজিও বরষা দিনে তোমারে স্মরি,
বিরহের নব নব মূরতি গড়ি।

মহাজন

শ্রীধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায়

ছোট্ট সহর। আর এই ছোট্ট সহরটারই আশেপাশের দশ-বিশ মাইলের মধ্যে প্রধান ব্যবসা-কেন্দ্র হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। উত্তরে বিশ মাইলের মধ্যে কোন সহর নেই। দক্ষিণে পনের মাইল। পূব-পশ্চিমে শুধু গ্রাম আর গ্রাম।

এ সহর আজকের নয়। কবে তুর্কী সেনাপতি বখতিয়ার খাঁর আক্রমণে বিব্রত লক্ষ্মণসেন বুঝি এই সহরের বুক থেকে পালিয়ে পূর্ব্ববঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন ইতিহাসের পাতায় সে ভীরু-কাহিনী এই সহরের ছেলেমেয়েরা ঘরে বসে মুখস্থ করতে থাকে আজও। লক্ষ্মণসেনের রাজধানীর কোন চিহ্ন এ সহর বা তার আশেপাশে খুঁজে পাওয়া যায় না। শুধু পাওয়া যায় এর তিন-চার মাইল দূরে বল্লালসেনের ঢিবি যা দেখবার জন্য দূর দূরান্তর থেকে মানুষ ছুটে আসে এখানে।

ইতিহাসের পাতায় যে সহরের নাম জড়িয়ে আছে তা যেমন ছোট তেমনি ঘিঞ্জি। উত্তর-দক্ষিণে আড়াই মাইল লম্বা আর পূব-পশ্চিমে এক মাইল চওড়া এই সহরটায় লোক বাস করে এক লক্ষের উপর। ঘেঁষাঘেঁষি আর গাদাগাদি করে মানুষ থাকে এখানে। অনায়াসে এক বাড়ীর ছাদ থেকে আরও দশ বাড়ীর ছাদে বেড়িয়ে আসা যায়। আর রাস্তার কথা না বলাই ভাল। সরু গলির মত এর বড় রাস্তা। একখানা ছাড়া দুখানা গাড়ী পাশাপাশি যাবার উপায় নেই।

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এই সহরের না আছে শ্রীছাঁদ, না আছে গঠন-পরিকল্পনা। বাজারের মধ্যে দোকানগুলো যেখানে যার খুসী সে দাঁড়িয়ে আছে। ময়রার দোকানের পাশেই কাঁচা চামড়ার কাজ চালাচ্ছে মুচি আর তার পাশেই মুদির দোকান।

কেবল সোনারূপার দোকানগুলি এখানে গলি রাস্তাটায় দু'পাশে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে। এই সোনাপট্টিতে অন্য দোকান নেই বললেই চলে। সোনাপটির সব চেয়ে পুরাণ দোকান মল্লিক মশায়ের। আদিনাথ মল্লিক এই দোকান যখন খোলে তখন এখানে কোন দোকান ছিল না। বাজারের ওদিকটায় নন্দীদের চালের আড়ত। আর বিশ্বেশ্বর দাসের মুদিখানার দোকান। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আদিনাথ বুঝেছিলেন এ সহর বাড়বে। গড়ে উঠবে এক বিরাট ব্যবসা-কেন্দ্র। সত্যিই আদিনাথের অনুমান সত্যে পরিণত হয়েছে। তার দোকানের পাশে আগে-পিছনে এদিকে-ওদিকে আরও ছোট বড় দশ-বিশখানা দোকান বসল। রাস্তার ওপারেও বসল স্যাকরার দোকান। এই সব দোকান নিয়ে গড়ে উঠল সোনাপট্টি।

তখনও সহর এভাবে গড়ে ওঠেনি। সহরে একমাত্র সোনা-রূপার দোকান মল্লিকদের। গহনা গড়াতে বা সোনারূপা বেচাকেনা করতে লোক ওখানেই আসত। শুধু সাধারণ মানুষ নয় চোরাই সোনার কারবার করেই নাকি মল্লিকরা ফেঁপে উঠেছে এ গল্প এখনও আশেপাশের স্যাকরার দোকানীরা ফিসফিস করে খদ্দেরকে শোনায়।

অনেকে বলে ওদের গায়ের জ্বালা। মল্লিকদের পুরাণ দোকান বহু দিনের বাঁধা খদ্দের। আস্তে আস্তে সুনাম বেড়ে উঠেছে। গ্রাম ও সহরের মানুষ আসে এখানেই। তাই ওদের হিংসা।

সত্যিই হিংসা করার মত। গলির মধ্যেই এ দোকানটায় সহর ও তার আশেপাশের দশ-বিশ মাইলের মানুষকে আসতেই হয়। প্রাণের টানে না হোক দায়ে পড়েই আসে বিপন্ন মানুষ এখানে। এ দোকান যেন সহর ও গাঁয়ের মানুষের প্রাণকেন্দ্র। দুর্দ্দিনে সকলকেই আসতে হয় ছুটে। সুদিনেও আসে দু'চার জন গহনা গড়াতে। তার সংখ্যা আজকাল কমই।

সহর আর গ্রামের মিলনসেতু এই মল্লিকমশায়ের দোকান। সারা দিনরাত তিনজন লোক হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে খদ্দের সামলাতে। জিনিস আসছে আর কষ্টিপাথরে যাচাই হচ্ছে। দু'চারটে হচ্ছেও না। ওজন দেখছে তার পর তারিখ, নাম ঠিকানা বাঁধান খাতায় লিখে তার পাশে ওজন, কি জিনিস এবং কত টাকা দেওয়া হ'ল তা লিখে যাচ্ছে।

—লিখুন। মকরমুখো কানপাশা একখানা সাড়ে তিন আনা —খরচ বার টাকা। মেট্রো হার একগাছা দু'ভরি পাঁচ আনা—খরচ এক শো কুড়ি টাকা। রূপার গোট এক ছড়া ওজন—

—দু'ভরি পাঁচ আনায় মাত্র এক শো কুড়ি টাকা দিচ্ছেন? বেশী টাকার জন্য আবেদন করে খদ্দেরটি।

—আজ্ঞে! খদ্দেরের দিকে চেয়ে দেখলেন মল্লিক। ওর বেশী ত দেওয়া যায় না? তা আপনার দরকার কত?

—অন্ততঃ আরও কুড়ি টাকা।

—তা, হয় না? আচ্ছা লিখুন! এক শো ত্রিশ টাকা। সোনার দরটা হঠাৎ পড়ে গেল কিনা!

—আমারটা। আর একজন প্রশ্ন করল।

—কিছু বলতে হবে না। যে পর্য্যন্ত আমরা পারি দিই। লিখুন। মিনে করা আংটি একটি চার আনা আধ পাই—খরচ —একটু থামল মল্লিক। আপনার দরকার?

—গোটা বাইশ টাকা। ঢোক গিলে কথা বলল খদ্দেরটি।

—তা ত হয় না? লিখুন আঠার টাকা।

সকাল আটটায় দোকান খুলে বেলা দেড়টা পর্য্যন্ত এক ভাবে মল্লিককে গহনা ওজন করা, জাবদা খাতায় লেখা আর টাকা দেওয়া চালাতে হয় রোজই। গ্রীষ্ম, বর্ষা নেই। সকল সময়, সকল দিন এ দোকান খোলা রাখতে চায় মল্লিক। সরকার বাধ সাধে। সপ্তাহে দেড় দিন বন্ধ রাখতেই হবে। এ দেড় দিন আর দুপুরে খাবার সময় ছাড়া রাত্রি এগার-বারটা পর্য্যন্ত মল্লিক দোকান খোলা রাখে। বলে—লোকের যেন কোন অসুবিধা না হয়।

সকালে এসে এক কাপ চা খেয়েই একজন খাতা নিয়ে বসে কেবল লিখে যাবে। মল্লিক নিজে কষ্টিপাথরে কষে, ওজন দেখে টাকা দেবে। তার পর সুরু হবে—লিখুন পাঁচ আনা আধ পাই—

অদ্ভুত ধৈর্য্য মল্লিকের। বাড়ী থেকে দু'খানা লুচি, পরোটা আর একটু চা খেয়ে এসে বসবে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে দিয়ে, পুরাণ পাওয়ারওয়ালা চশমাটা চোখে লাগিয়ে ভিড় সামলাতে। তার দোকানে ভীড় নেই এমন দিন মল্লিকের মনেই পড়ে না। মনে করার সময়ও নেই। আয়রণ-চেষ্টের ডালাটা খোলা। তার মধ্যে থোকা থোকা নোটের গোছা জড়াজড়ি করে পড়ে আছে নিতান্ত অবহেলায়। তুলে নাও আর দাও। পাঁচ টাকার সঙ্গে, দশ টাকার নোট বুঝি মিশে যাচ্ছে। এক টাকার নোটগুলি বাতাসে উড়ে যাবে বোধ হয়। এক শো নোটগুলি সব চেয়ে একপাশে ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে। সকাল বেলায় বেশ গোছান ছিল। খদ্দেরের ভীড়ে কেবল হাত ঢুকিয়ে গোছাভরে নোট বার করতে হয়েছে। গুণে দিয়ে বাকীগুলি রেখে ডালাটা ঠেলে দেয় মল্লিক। দুমড়ে, গুটিয়ে, ভাঁজ ভেঙে পড়ে থাকে নোটগুলি গাদা-গাদি করে, যেন মায়া নেই টাকার ওপর।

খদ্দের আসছে। মল্লিকের এ-পাশ ও-পাশ সামনের দোকানীরা জুলজুলে চোখে তাকিয়ে দেখছে। ঈর্ষায় গা জলে যাচ্ছে। যত খদ্দের সব ওখানে, যেন বিনা সুদে টাকা পায়। দু'পয়সা করে টাকা প্রতি মাসে মাসে যেন সুদ দিতে হয় না। কোন কোন সময় তারও বেশীও যে দিতে হয়। অন্যেরা এক পয়সা সুদ নিলেও সেখানে যাবে না খদ্দের। কি যাদু জানে অঘোর মল্লিক।

ঠিক মল্লিকের ডান পাশের দোকানটা নরেশ পোদ্দারের। সেখানে তিন-চার দোকানের ছোকরা মালিক এসে বসে যখন কোন কাজ থাকে না। কাজ প্রায়ই থাকে না, কে কাজ করাবে। তের আনা সেরের চাল খেয়ে গহনা গড়াতে বড় কেউ আসে না। যারা আসে তা মল্লিকের দোকানে। কানাই নন্দী বলে—শালা মল্লিক যেন চুম্বক দিয়ে খদ্দের টানে।

—যা বলেছিস। কি মধু আছে ওর দোকানে।

—আমি ভাবছি এক ছুড়ি এনে বসাব দোকানে। দেখি শালা খদ্দের কোথায় থাকে?

—সত্যি তুই ভেবে দেখ কানাই। আমাদের দোকানে কি আমায় চিমটি কাটি খদ্দেরকে?

নানা রকম মন্তব্য করে বিক্ষুব্ধ ছোকরা দোকানীরা। সময় সময় চীৎকার করে ওঠে হঠাৎ। বলে—খদ্দের জব্দ কর নিতাই! খদ্দের জব্দ কর!

অঘোর মল্লিকের ওসব শোনার সময় নেই। আরও রেগে যায় ওরা। নরেন পোদ্দার চীৎকার করে উঠে কানাইকে বলে, কি বরাতই করে এসেছিলি কানাই। কাণা খোঁড়া সবই এক জায়গায়!

কানাই মনে মনে খুসী হয়। নরেন বেশ বুদ্ধি করে কথা শোনায় মল্লিককে। সামনের দোকানে যারা একটু-আধটু কাজ পেয়েছে তারা ছেনি দিয়ে চুড়ির ধার কাটতে কাটতে মুখ তুলে বলে, বরাত দাদা! সবই বরাতে করে।

বরাতই বটে! গহনা গড়ান ছাড়া অন্য দোকানগুলোর কাজ নেই। মল্লিকের যেমন সুদী কারবার তেমনি গহনা গড়ান আছে। গহনা গড়ায় অন্য যে কোন দোকানীর থেকে সে বেশী। পূব-পশ্চিম লম্বা দোকানটার মাঝখানে আলমারি একটা আর আয়রণ-চেষ্ট দিয়ে পার্টিসান করা। ভিতরের দিকে দিনরাত ঠুকঠাক শব্দে কাজ হচ্ছে। বিয়ে, অন্নপ্রাশন, পৈতায়, সব রকম কাজেই অলঙ্কার গড়ায় মল্লিক। রেডিমেডও গড়িয়ে রাখে। গহনা বাঁধা বিক্রীর মতই শুভকাজেও প্রায় একচেটে ব্যবসা তার। ভাল নক্সার কাজে অঘোর মল্লিকেরই নাম বেশী। অনেক টাকা মাইনে দিয়ে ভাল কারিকর সে রাখে।

তাই ত সব ব্যাপারেই ধনী থেকে সাধারণ লোক পর্য্যন্ত আসে তার দোকানে।

বৃন্দাবন সাহার নামডাক কম নয়। শহরের বহু লোক বৃন্দাবন সাহাকে ধনী বলেই জানে। কেমন করে তার লাখখানেক টাকা সিনেমার বই করতে গিয়ে উড়ে গেল সে খবর দু'চার জন ছাড়া কেউ জানে না। কলকাতা থেকে ফিরে এল বৃন্দাবন। ফর্সা গোলগাল মুখটায় কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে।

—কি হ'ল? দীপান্বিতা শুধাল।

—সব চলে গেল দীপা!

—যাবে না? আমাকে সং সাজিয়ে রেখে সবগুলো গয়না নিয়ে গেলে বই করতে! তখনই বারণ করেছিলাম! ব্যবসাটাকে তুলে ধর! কিছু পুঁজি গিয়েছে যাক! আবার কিছু পুজি ফেল! তা হলে ত সব গয়না যেত না!

—সত্যিই তোমার কথা না শুনে কি ভুলই যে করেছি!

—কি করে এখন এই গিলটিকরা গয়না পরে সং সেজে আমি গিয়ে দাঁড়াব লতার বিয়েতে? লজ্জায় মাথা কাটা যাবে না?

—যাবে না? গম্ভীর ভাবে জবাব দিল বৃন্দাবন, বার বার এককথা! ভুল সে করেছে তাই বলে স্ত্রী সহানুভূতি দেখাবে না! বুঝবে না লোকটা ভাল করতে গিয়ে পথে বসেছে। এ অবস্থা ইচ্ছা করে ডেকে আনে নি। অতগুলো টাকা নষ্ট হয়ে যাওয়ায়

তার যে দুঃখ সেটা বুঝবে না নিজের স্ত্রী। কেবল খোঁচাবে তার গহনা নিয়ে নষ্ট করে এসেছি সেই কথা বলে! তাকে গিলটি করা গহনা পরিয়ে রেখেছি বলে।

রেগে গেল দীপান্বিতা আরও। বললে, তোমার কথায়? আমি যাবই লতার বিয়েতে আমাকে টাকা দাও।

—টাকা নেই!

—কেন নেই? কেন আমার টাকা সব এমন করে নষ্ট করে এলে?

—বাজে বকো না?

—বেশ! আমি এখনও এমন অসহায় নই যে তুমি টাকা না দিলে আমার যাওয়া হবে না। আমি আংটি বাঁধা রেখে যাব বাপের বাড়ী।

—যাও! যা খুসী করগে।

পরেশ অনেকক্ষণ পরে ফিরে এল আংটি নিয়ে। বললে দোকান আজ বন্ধ মা! বাবুর পেয়ারের চাকর।

দীপান্বিতা বুঝেছে বাবুর শেখান কথা। বলেছে ওভাবে বাধা দিয়ে তুমি আমাকে আটকে রাখতে পারবে না। আমি নিজেই চললাম। দোকান থেকে সোজা ষ্টেশনে চলে যাব।

গা-ভর্ত্তি অলঙ্কার, হাতে রিষ্টওয়াচ, সুবেশা এবং সুন্দরী দীপান্বিতা পোদ্দারের দোকানেই জিজ্ঞাসা করে—মল্লিকের দোকানটা কোথায়?

অভিজাত ঘরের সুন্দরী বৌয়ের আবির্ভাবে নরেন পোদ্দার চমকে ওঠে। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে মল্লিকের দোকান দেখিয়ে দেয়।

—কি ব্যাপার রে নরেন? কানাই দোকান ছেড়ে উঠে আসে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য দোকানীরাও সবাই। মল্লিকের দোকানের সুমুখে গিয়েই ভিড় করে।

বেলা দশটা। মল্লিকের দোকানে বেশ ভিড়। চাষী, ব্যবসাদার, মাষ্টার সব রকম লোকে দোকান গিসগিস করছে।

মল্লিক দীপান্বিতাকে চশমার ফাঁক দিয়ে দেখে উঠে দাঁড়াল।

—আসুন।

ছোট্ট এক ফালি দোকান। তার মধ্যে একটি বেঞ্চি পাতা। তিন জন ছাড়া বেঞ্চিতে বসার উপায় নেই। বাকী লোককে হয় দোকানে নয় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

অন্য খদ্দেরদের দিকে চাইতেই তারা সরে গেল। যারা বেঞ্চে বসেছিল তারা উঠে জায়গা দিল।

—দেখুন ত কত টাকা পাওয়া যাবে এ আংটিতে?

—আজ্ঞে! অবাক হয়ে চেয়ে রইল মল্লিক একটুখানি। তার পর নিক্তিতে চাপিয়ে ষ্ট্যাণ্ডের সঙ্গে লাগান হাতটার নীচের দিকে ঠেলতেই কাঠের ওপর থেকে নিক্তির পাল্লাটা উঁচু হয়ে উঠল।

—কতটা ওজন হ'ল?

—আজ্ঞে আট আনা তিন পাই!

—কত টাকা পাব?

তরুণীর মুখের দিকে চেয়ে মল্লিকের মত পোড়-খাওয়া প্রৌঢ় আর ঝানু ব্যবসাদার বুঝি হিসেবে ভুল করে বসল। বললে, পঞ্চাশ টাকা।

—তাই দিন?

—কি নামে লিখব?

—দীপান্বিতা দেবী!

—ঠিকানাটা!

এবারে ঘাবড়ে গেল দীপান্বিতা। একটু ইতস্তত: করে বলল, ঠিকানার দরকার নেই। শুধু নামটাই লিখে রাখুন।

—আজ্ঞে আমাদের লিখে রাখতে হয়!

—দরকার নেই! শুধু নামেই হবে!

—আচ্ছা থাক! কেমন যেন নরম হয়ে গেল পাথরের মত কঠিন মনের মালিক অঘোর মল্লিক।

পাঁচখানা দশ টাকার নোট নিয়ে উঠে পড়ল দীপান্বিতা দেবী।

—রসিদটা নিয়ে যান! একটুকরো সাদা কাগজে নাম তারিখ ওজন ও টাকার অঙ্কটা লিখে একটা চিরকুট হাতে গুঁজে দিল মল্লিক।

দীপান্বিতা দেবী চলে যাওয়ার পরও নরেন, কানাইয়ের দল হাঁ করে তার যাওয়া পথের দিকে চেয়েছিল। এই শহরেই বাস করে, ওঁকে তারা দেখে নি ত কোনদিন। দেখবে কেমন করে? ঘরের বউ কি বার হয় নাকি রাস্তায়? তবে আজকে বার হ'ল যে!

—কি রে বোবা হয়ে গেলি নাকি? কানাই ধাক্কা দেয় নরেনকে।

—মাইরি! বোবা হয়ে যাওয়ার মতই রূপ! যেন দুর্গা প্রতিমা!

—কিন্তু আংটি বাঁধা দিতে এল কেন? ও ত বাবা অভাবে নয়?

—ঝগড়া-ঝাটি করে এসেছে দেখছিস নে?

—হ'লই বা নিজে আসবে কেন?

গবেষণা সুরু হ'ল সোনাপট্টিতে। কেবল আলোচনা নেই মল্লিকের দোকানে। দীপান্বিতা সাহা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য খদ্দেরের দিকে মন দিলে মল্লিক।

—মাষ্টারমশাই! আপনার চুড়িটা তা হলে বিক্রী করাই সাব্যস্ত করলেন!

পরাণ মাষ্টারের মুখটা লাল হয়ে উঠল অপমানে। পাশেই এসে দাঁড়াল তাঁর গ্রামের এক চাষী ঠিক এই সময়েই। লোকটি মাষ্টারমশাইকে দেখলেই নমস্কার করে খাতির জানায়। তার কাছেই তাঁর অবস্থাটা এমন করে উলঙ্গ ভাবে প্রকাশ করে দিল মল্লিক। লোকটা জেনে গেল মাষ্টারমশাই গহনা বিক্রী করছে।

বাঁধা রেখে তা তুলে নিতে পারছে না। মনে হ'ল তার মান-সম্ভ্রম সব গেল। আর কোনদিন তাঁকে নমস্কার করবে না লোকটি।

—কি হ'ল মাষ্টার মশাই ? মল্লিকের কথায় সময় নষ্ট হওয়ার বিরক্তি।

—হাঁ। বিক্রীই করব।

—আচ্ছা! আপনার তা হলে নেওয়া আছে কুড়ি টাকা। এগারো মাসে সুদ হ'ল ছ' টাকা চৌদ্দ আনা। চুড়ির দাম হ'ল বত্রিশ টাকা, ফেরৎ পাঁচ টাকা দু'আনা।

বিক্রী করার কথা বলতে চায় নি মাষ্টার। বিক্রী কেন, বাঁধা রাখার সময়ই মনটা খারাপ হয়েছে। সোনার হাতে সোনার কাঁকন কেবল অলঙ্কারই। তাকে টাকায় ভাঙিয়ে সংসারের স্থূল প্রয়োজন মেটাতে ভারী কষ্ট হয়। মনে পড়ে রমাকে বিয়ের সময়ে রকমের সাজে। গায়ে গহনা, পরনে বেনারসী, মাথায় মুকুট, কপালে চন্দনের ফোটা, খোঁপায় রজনীগন্ধার মালা। কন্যা সম্প্রদানের সময় কে ভেবেছে এ মেয়ের গায়ের গহনা বেচে খেতে হবে। কারও দুঃস্বপ্নেও ত ছিল না তা। সেই আনন্দ হুল্লোড়ের মাঝে কেউ এ ভবিষ্যৎ বাণী প্রচার করতে পারত! কত আদরে, কত আশায়, এ গহনা বাবা মা তার দিয়েছিল শুধু মেয়েকে সাজাবার জন্যেই।

সত্যিই সাজিয়ে দিয়েছিল তারা। রমার দু' গাছি চুড়ি, তার নিজের ও রমার আংটি রমার একজোড়া দুল, আর অমন সুন্দর হার ছড়া সবই গিয়েছে। এই দোকানই গ্রাস করেছে সব। প্রথমে বাঁধা তার পর বিক্রী। রমার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে এসেছে। ছিঃ ছিঃ গহনা বন্ধক রেখে সংসার চালাতে হবে। যে গহনা দিয়ে রমাকে বিয়ের সময় সাজিয়ে দিয়েছিল। সুন্দর কোমল অঙ্গের অলঙ্কার রমা বুঝতে পারে ঠিকই! বলে, চুড়িগাছা না হয় নিয়ে যাও শহরে। বিক্রী করে টাকা আন।

—না, না বাঁধা রাখব! বিক্রী করব কেন? তোমাকে দিতে পারিনে কিছু আর তা খোয়াব এমন করে।

রমা বুঝি ম্লান হাসে। বার বার তার হাসির কথা মনে পড়ে মাষ্টারের। ঐ ম্লান হাসি তার অন্তঃস্থলে গিয়ে হাতুড়ির মত ঘা দেয়। রমা যেন হাসির মধ্যে দিয়েই বলে, তুমি ত নেবার সময় প্রতিবারই বল, বাঁধা রাখলে ছাড়িয়ে আনতে পারব। বিক্রী করলে যে একেবারেই যাবে। না, না তা পারব না! কিন্তু···

ফিরিয়ে আনতে পারে নি একবারও। মিছামিছি মাস-কয়েকের সুদ গুণে দিয়েছে শেষে বিক্রী করার সময়। প্রথমে বিক্রী করলে ঐ সুদের টাকাটা মল্লিকের ঘরে উঠত না। পারে নি।—কোন বারই মাষ্টার প্রথমে বিক্রী করতে পারে নি। হাতে নিয়েই মনে হয়েছে আহা এমন সুন্দর জিনিসটা বিক্রী করব। কত সুন্দর মানায় রমাকে এটা পরলে! এখনও যেন রমার দেহের স্পর্শ লেগে আছে এতে। একি একেবারে ঘুচিয়ে দেওয়া যায়।

—এই নিন টাকাটা হাতে দিতেই চমকে উঠে মাষ্টারমশাই। বুঝি মনে হয় কি পেলাম। রমার সাধ-আহ্লাদ আর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বিক্রী করে পাঁচ টাকা দু'আনা পেলাম। তার কাছে রমার জিনিসের এই মূল্য?

—কত টাকা দর ধরলেন সোনার? কে একজন প্রশ্ন করলে পাশ থেকে।

—আশী টাকা। দু'আনা খাদ। মল্লিকের জবাব যেন মুখস্থ করা।

কেমন বিশ্রী লাগে মাষ্টারের। কি গরম এই ছোট্ট ঘরটায়। পকেট থেকে রুমালটা বার করে মুখটা মুছে নেয়। এবারে উঠতে হবে। কি হবে আর বসে থেকে। সবই ত গেল। আরও যাবে। যারা বসে আছে পাশে তাদেরও যাবে। চাষী অনাজুদ্দি সেখানে দেখলেন আড়চোখে। চেয়ে আছে মল্লিকের দিকে। একবার তার কথা শুনছে আর একবার দেখছে রমার চুড়িটাকে।

—আদা পা লাগে গায়ে।

—না, না, আপনি যান মাষ্টারমশাই। সেলাম করল অনাজুদ্দি সেখ।

—তোমার কি আছে গো সেখের পো? পর পর ডাক হচ্ছে গহনা বিক্রীর আদালতে, মল্লিকের তীক্ষ্ণ নজর। জহুরি সে। সবারই দিকে তার সমান দৃষ্টি।

—আজ্ঞে! একজোড়া উপোর মল আছে?

—দেখি!

গামছা জড়ান মল জোড়া খুলে ফেলল অনাজুদ্দি। তার পর মল্লিকের হাতে দিতে হাত কেঁপে উঠল বুঝি। বুড়ো হয়েছে খানিকটা। তাই হাত কাঁপছে, না ঘুমন্ত মেয়ের পা থেকে মল খুলে এনে বিক্রী করছে তাই কাঁপছে, সে কথা চাষী অনাজুদ্দি ছাড়া কে জানে।

—ময়লা বাদ যাবে যে অনেক?

—আজ্ঞে!

ময়লা! ময়লাই ত। তার মেয়ের পা থেকে খুলে আনা যে। কালও ফতিমা পায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। ওই মলে শুধু ময়লাই দেখল স্যাকরা, বাপের স্নেহ কোমল অনুভূতিও যে ঐ সঙ্গে জড়িয়ে আছে সে বুঝি মল্লিক দেখে না। মল্লিক বুঝি বাপ নয়।

বাপ হয়েই বা কি করল অনাজুদ্দি। সে রাখতে পারে নি এ মল জোড়া। সালেমা রেখে দিয়েছিল। শ্বশুরের স্মৃতির নাম করে। শ্বশুর রেখে গিয়েছিল পুত্রবধূ পরবে। সালেমা বড় হবার পর উত্তরাধিকার সূত্রে ফতিমা পাবে। ছেলে নেই ত মেয়েই সব।

আট-দশ বিঘে জমির ছ' বিঘেই ঘুচিয়েছে অনাজুদ্দি। বান বন্যা, অনাবৃষ্টি আর আকাল। এ দেশে শুধু হাহাকার আর নেই নেই। জল নেই তাই আবাদ হয় না। জল হয় ত সব ভাসিয়ে

দেয়। অজন্মা আর বান এ দুটোই লেগে আছে। চাষ করতে পারে না, যদি করে বানে সব ডুবিয়ে দেবে। কোন প্রতিকার নেই। আছে কেবল শুকিয়ে মরা, অনাহার। জমি বেচ, ঘড়া ঘটি বদনা বেচ। গরু-লাঙ্গল বেচ, চাষীর চাষ বিক্রী কর! পেটে ত খেতে হবে। চাষ হয় নি পেট শুনবে না। তার চাই-ই।

—আবাদ করবা কি দিয়ে! জো হয়েছে ত! সালেমা কঠিন এক প্রশ্ন নিয়ে এল অনাজুদ্দির সামনে।

—তাই ত ভাবছি!

—ভেবে কি হবে! মল জোড়া দিয়ে এস শহরে।

—না, ও কথা বলিস নে সালেমা! ও আমার বাপজানের দেওয়া জিনিস!

—আহা! বাপজানের ওপর কত ছেদ্দা! আমি না থাকলে ও মল থাকত!

সবই ঘুচিয়েছে অনাজুদ্দি। জমি, ঘড়া ঘটি বদনা সানকি কি বিক্রী না করেছে।

ঘুমিয়ে আছে ফতিমা। সবে ভোরের আলো দেখা দিছে। পাখীরা গান গাইছে। ঝিরঝির করে হাওয়া বইছে। কোন সুখস্বপ্ন দেখে বুঝি ফতিমা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। মুখে মৃদু হাসি।

—আমি পারব না সালেমা? তুই খোল।

—কি পার তুমি?

—বাপ হয়ে ঘুমন্ত মেয়ের পা থেকে মল খুলতে পারব না—বুকজোড়া দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

—আহা-হা! জন্ম গেল ছেলে খেতে, এখন বলে ডান।

দু' একবার পা ছুড়ল ফতিমা। ঘুমের মধ্যেও বুঝি বুঝে নিয়েছে তার আদরের মল জোড়া জন্মের মত চলে যাচ্ছে। তাই প্রতিবাদ জানিয়েছে।

—এই নাও।

—নাঃ, থাক রে সালেমা!

—তাড়াতাড়ি যাও! গাড়ী পাবে না।

যোয়ান মরদ অনাজুদ্দির চোখে বুঝি জল আসে। কি পড়ল চোখে। বাপের স্মৃতি না মেয়ের ঝন ঝন্ করে মল পায়ে দিয়ে চোখের সুমুখে ঘুরে বেড়ানোর দৃশ্য।

—পনের ভরি ন' আনা! রুপোর মল একজোড়া—ছুট বাদ দু' ভরি—ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে অনাজুদ্দি মল্লিকের দিকে।

—তোমার দাম হ'ল গিয়ে এক টাকা বারো আনা ভরি—তেইশ টাকা দশ আনা।

খোলা ড্রয়ার থেকে নোটের তাড়া টেনে নিল মল্লিক। তেইশ টাকা আর খুচরোর কৌটো থেকে দশ আনা তুলে নিয়ে দিয়ে দিল অনাজুদ্দিকে। চাষীদের সঙ্গে কারবারের কৌশল মল্লিকের বহুদিন থেকে রপ্ত। তাড়াতাড়ি টাকাটা হাতে গুজে দিলেই হয়ে গেল। দরদস্তর ওরা করতে পারে না বেশী। করলেও ওদের বোঝাতে সময় লাগে না মল্লিকের। টাকা হাতে নিলে আর জিনিস ফেরত চায় না। নয় ত বলে বড্ড কম হচ্ছে দামটা, অন্য দোকানে দেখব।

—কে? শোভেন নয়?

শোভেন যেন দেখতে পায়নি পরাণ মাষ্টারকে এমনি করে পাশ কাটাল। পরাণ মাষ্টারের ক্লাসফ্রেণ্ড শোভেন। পাশের গ্রামেই বাড়ী—মধ্যস্বত্ব ছিল, গিয়েছে। থাকতে আর ছিল এখন নেই। ক্ষতিপূরণ এক পয়সা পায় নি ক'বছরের মধ্যে। রিটার্ণ দিয়ে নানা রকম ফর্ম্ম পূরণ করে সদরে হাঁটাহাটি করাই সার হয়েছে।

শোভেন দু'বার ঘুরেছে এই পথে। মল্লিকের দোকানে উঠছে দেখে পরাণ মাষ্টার। মাষ্টারের সঙ্গে এক সঙ্গে মল্লিকের দোকানে উঠতে বুঝি প্রেষ্টিসে বেধেছে, আবার ঘুরে এসেছে এক পাক। আবারও চেনা লোক, গৌর দাস, গ্রামের মুদী দোকানদার। সেও মল্লিকের শিকার।

বিকেলের ট্রেনে আলোয় আলোয় ফিরতে হবে, বর্ষা কাল, রাস্তায় অসম্ভব কাদা। টেষ্ট রিলিফের মাটি দিয়ে রাস্তা উঁচু করা হয়েছে, নরম ঝুরঝুরে মাটি। জল পেয়ে আর গরু, বাছুর মানুষের পায়ে পায়ে ধানের জমির মত কাদা হয়েছে। কাদার সাগর পার হতে হলে দিনে দিনেই সুবিধে।

মরিয়া হয়ে দোকানে উঠছে শোভেন। যে থাকে থাক। যে দেখে দেখুক। সব ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। আভিজাত্যের খোলস খুলে পড়ছে। উলঙ্গ করে দিয়ে যাচ্ছে সকলকে। দিক। টাকা কিছু চাই। জিনিস ক'টা কিনতেই হবে, থাক পরাণ মাষ্টার।

দু'জনেই সামনাসামনি, লজ্জায় মুখ নামিয়ে নেয় উভয়েই। যেন কেউ কাউকে চেনে না এমন ভাবে কথা না বলে পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

বিড়ম্বনা সর্ব্বত্রই। দোকানে উঠে একটু বসবার জায়গা নেই। গৌর উঠে দাঁড়িয়ে জায়গা করে দিল বাবুকে।

—আসুন বাবু, আসুন? মল্লিকের অমায়িক আপ্যায়ন।

গৌরের কাজ সারা। টাকা ক'টা কাপড়ের খুঁটে বেঁধে নিল। ব্যবসাদার মানুষ, ব্যবসা করতে করতে বুঝি ভুয়ো প্রেষ্টিজ উবে গিয়েছে। মুদীখানার দোকানের তেল নুনের দাগ ধরা ময়লা জামাটা পরেই চলে এসেছে গৌর। দরকার টাকার, পুঁজি বাড়াতে হবে, পুঁজি চাই।

চার ধারে চেয়ে দেখল শোভেন, চাষীর দলই বেশী। জমি চাষ করবে, যা আছে সম্বল তাই নিয়ে এসেছে, গ্রামের মহাজনের টাকায় এক আনা সুদ, এখানে দু'পয়সা।

গৌরের সঙ্গেও মুখোমুখি, লজ্জায় কান লাল হয়ে ওঠে শোভেনের, উপায় নেই, মানসম্ভ্রম থাকছে না। সকলকেই এক ঘাটে জল খেতে হচ্ছে, ছোট-বড়র প্রভেদ নেই। চাষী, মধ্যবিত্ত, মজুর বলে কোন কথা নেই, সবাই সমান, মহাজনের কাছে সব খদ্দের। সমাজ-ব্যবস্থা সবাইকে এক সঙ্গে টেনে এনে ধুলায় নামাচ্ছে। বাদ কেবল মল্লিকের মত দু'চারটে লোক, তারা জাল

পেতে রেখেছে, ছোট-বড় সব মানুষকে গুটিয়ে টেনে এনে তুলবে আয়রণ-চেষ্টের অন্ধকার গুহায়।

—আসুন? কি আছে আপনার? হাসি দেখা দিয়েছে মল্লিকের মুখে, ভারী আনন্দ। ভদ্রলোক খদ্দেরের সোনার জিনিস, লাভ বেশী।

পাশে-বসা চাষী নিয়ে এসেছে রূপার গোট এক ছড়া, ওজন করতে করতেই মুখ তুলে এক মুখ হাসি নিয়ে আপ্যায়িত করতে ভুল হয় না মল্লিকের।

—এই আংটিটা—?

—বসুন? দেখি।

কষ্টিপাথরে ঘসছে একদিকে অন্ত দিকে কথা বলছে খদ্দেরের সঙ্গে, আবার নূতন কেউ এলে আপ্যায়িত করছে। ত্রিনয়ন মল্লিকের, মাথাও বুঝি অনেক। সব দিকে তাল সামলাচ্ছে, ভুল হয় না।

শোভেন মল্লিকের পিছনে ক্যালেণ্ডারটা এক মনে দেখে। ব্রজের গোপাল হাত বাড়িয়ে মা যশোদার কাছে বুঝি নাড়ু চাইছে। মাথার কোঁকড়া চুলগুলি চূড়া করা কপালের উপর বাঁধা, সেই চূড়া থেকে ঝুলছে একটি টিকলি।

নিজের গোপালের কথাও বুঝি মনে পড়ল শোভনের। মা বলছে খোকন তোমার চুল কোথায়?

খোকন চুল দেখায়।

তোমার টিকলি?

টিকলি দেখায়।

আনন্দে এ যশোদাও হাততালি দেয়। বলে দেখেছ—

তোমার খোকনের কেমন বুদ্ধি। টিকলি দেখাচ্ছে।

ছবিতে সত্যিই কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে গোপালকে। এ যুগের গোপাল হলে?

টিকলিটা মল্লিকের দোকানে তুলে দেওয়ার পরও টিকলির কথা খোকন ভোলে নি। মা যেই বলেছে খোকন তোমার চুল কোথায়? খোকন কপালে হাত দিয়ে টিকলি দেখাতে চেয়েছে। তার পরেই আধো আধো স্বরে বলেছে নেই।

শোভেন কল্যাণীর দিকে চাইতেই দেখেছে অশ্রুতে টলমল এক জোড়া পদ্ম আঁখ নীরব ভর্ৎসনায় কাতর। মনে হয়েছে এবারে বুঝি ঐ অশ্রু বন্যা হয়ে নামবে। ভাসিয়ে দেবে তাকে মা যশোদার ক্ষোভের পাথারে।

টাকা আর রসিদের চিরকুট হাতে নিয়ে দেখল হিসেব করে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে হিসাব করল শোভেন। চিরকুটে দোকানের নাম নেই, নেই ষ্ট্যাম্প। যত ক্ষোভ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। বাঁধা-পড়ার শিকলের দাগ বুঝি চিড় চিড় করে জ্বালা ধরিয়ে দিল। বলল—আপনাদের রসিদে দোকানের নাম নেই কেন? ষ্ট্যাম্প কই।

মল্লিক একটু অবাক হয়ে চেয়ে রইল। ইনি ত অনেকবার দোকানে এসেছেন, হঠাৎ বিগড়ে গেলেন কেন?

—আজ্ঞে, আমরা নাম দিইনে। আর ষ্ট্যাম্পও না।

—কেন?

—নিয়ম নেই।

—এ চিরকুটে আপনার নাম নেই? এটা দেখালে আপনি যদি আমার জিনিস ফেরৎ না দেন?

হাসল মল্লিক। ভুবনমোহিনী হাসি। আর যারা বসেছিল তাদের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে হাসতে লাগল অঘোর মল্লিক। কি বলে বাবু! দেখুন আপনারা! মল্লিকের সম্বন্ধে কি বলে? যখন শহর গড়ে ওঠে নি সেই সময়ের মল্লিকের দোকান। হাসি দিয়ে সেই কথা বলতে লাগল মল্লিক সকলকে। সকলকে যেন সালিশ মানল।

লজ্জাই পেল শোভেন। সত্যি সে নিজেও ত এ দোকানে বহুবার এসেছে। কই এ প্রশ্ন ত মনে জাগে নি?

পথ চলতে চলতে আবার মনে হ'ল, তবে কেন দোকানের নাম দেয় না? কারণ কি? নাম দিলেই বিপদ। যে খাতায় রাজ্যের সোনা রূপো বাঁধা পড়ছে সে খাতা লুকান থাকবে। ডুপ্লিকেট খাতায় কয়েকটি জিনিসের মাত্র হিসাব দেখাবে। তা না হলে আয়কর ফাঁকি দেওয়া যাবে না। প্রতিদিন যত জিনিস বাঁধা বিক্রী হচ্ছে তার হিসাব জানবে না কেউ কোনদিনও। জানবে না সরকারও। সামনেই থানা, সরকারী প্রতিষ্ঠান। সেই-জন্যই সুবিধা সরকারকে ফাঁকি দেওয়া, আয়কর থেকে রেহাই পাওয়া।

শোভেন দেখেছে একদিন রাত্রি দশটায় এসে সারাদিনের বাঁধা-রাখা আর বিক্রী-করা জিনিসের স্তূপ। বড় একটা কৌটা থেকে ঢেলেছে সানের উপরে। ইলেকট্রিকের তীব্র আলো পড়ে ঝিক্‌মিক করছে বন্ধকে বন্দী অলঙ্কারগুলি। আংটি, চুড়ি, হার, পাশা, মল, টিকলি, বাজুবন্ধ, কঙ্কণ। এককালের জমিদারের পুত্রবধূর কঙ্কণের সঙ্গে চাষী বৌয়ের রূপার হাঁসুলীর অদ্ভুত মিতালি। কোথাকার চাষী বৌয়ের সঙ্গে কোথাকার জমিদার পুত্রবধূর সাক্ষাৎ নেই। কোন দিন কেউ কাউকে দেখবেও না, কিন্তু তাদের দেহসৌরভে গর্ব্বিত কঙ্কণ আর হাঁসুলীতে বড় মিতালি, পাশাপাশি একই বাক্সে, সিন্দুকে তারা বন্দী হয়ে থাকছে। কত সোহাগ আর স্নেহে আত্মীয়স্বজনের দেওয়া জিনিস আয়রণ-চেষ্টের অন্ধকারের কালো গহ্বরে, অনাদরে জড়াজড়ি করে পড়ে থাকবে। যে সোনা শোভা পায় সোনার বরণী কন্যার ঢলঢল অঙ্গে, সে সোনা বোবা হয়ে মুখ লুকিয়ে থাকবে অঘোর মল্লিকের কারাগারে।

দোকান থেকে বেরিয়ে পয়াণ মাষ্টার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছে। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। মনটা ভারী হয়ে উঠেছে। দেহ যেন চলতে চাইছে না। মল্লিকের দোকান নয়, গুদামখানা। দেহের সঙ্গে মনটাও হাঁপিয়ে উঠেছে। একটু আনন্দ নেই, হাসি নেই, দুঃখকে দুদণ্ড ভুলে থাকার উপায় নেই।

সামনেই বড় রাস্তার উপর সিনেমা হল। দাঁড়িয়ে পড়ল

মাষ্টার। কত লোক লাইন দিয়েছে সিনেমা দেখবে বলে। একটা নয় এইটুকু শহরে তিন তিনটে সিনেমা হল। সামনে বিরাট ছবি টাঙান। নায়ক নায়িকা হাসছে। আদর করছে নায়িকাকে। ওখানে বোধ হয় দুঃখ নেই। ওদের বুঝি মল্লিকের দোকানে যেতে হয় না বৌয়ের শেষ গহনা নিয়ে।

—কি হে সিনেমায় যাবে নাকি মাষ্টার? ভাল বই হচ্ছে।

মাষ্টার চমকে উঠে দেখে শোভেন। মল্লিকের দোকানের সামনে সে চিনতে চায় নি। এখন হাসিমুখ।

—চল, খুব ভাল বই হচ্ছে!

ভাল বই। কি দেখাবে। ওখানেও কি দুঃখের কাহিনী দেখাবে নাকি? তা হলে সে যাবে না, আনন্দ চাই। দুঃখকে ভুলে থাকতে চায় মাষ্টার। চারিদিকে দারিদ্র্যের বিভীষিকা থেকে স্বাচ্ছন্দ্যের আলো দেখতে চায়।

—চল, মাষ্টার চল। কষ্ট ত সারা জীবন ধরেই আছে। একটু আনন্দ, একটু রিক্রিয়েশান দরকার।

দরকার ত বটেই! জীবনকে ক্ষয় করে করে বাঁধা রাখা মহাজনের ঘরে। জীবনের কোমল প্রবৃত্তিগুলো কঠোর বাস্তবের আঘাতে আঘাতে পিষে মেরে ফেলাই ত জীবন নয়।

মাষ্টারের পাশেই এক সুখী দম্পতি। বৌটি ছবি দেখতে দেখতে কথা বলছে, প্রশ্ন করছে, কোন সময় বা হেসে গড়িয়ে পড়ছে, রমার কথা মনে পড়ছে মাষ্টারের। বহুদিন ধরে রমার সিনেমা দেখার সখ। পারে নি, মাষ্টার তাকে দেখাতে পারে নি। তাই বুঝি ভাল লাগে না। বার বার রমার কথাই মনে হয়, 'একদিন সিনেমায় নিয়ে চল না, দশ বছর বিয়ে হয়ে এসেছি, এর মধ্যে একদিনও সিনেমা দেখালে না।"

রমার কথা কোন সময় ভুলে গিয়েছে মাষ্টার। হল থেকে বেরিয়ে এল সে আর শোভেন। আরও কত লোক। এ যে অনেক লোক। এত লোক সিনেমা দেখেছে?

—চল মাষ্টার তাড়াতাড়ি চল, নইলে ট্রেন পাওয়া যাবে না। এটাই লাষ্ট ট্রেন।

পা চালাল দু'জনে। সঙ্গে গৌর মুদীও এল। সেও দেখেছে সিনেমা। বড় রাস্তা থেকে গলি দিয়ে ঢুকছে তারা তাড়াতাড়ি যাবার জন্য। আবছা অন্ধকার গলিটায় মোড়ে দেখা যাচ্ছে মল্লিকের বিরাট দোতলা বাড়ী। দরজায় কে কড়া নাড়ছে।

কড়া নাড়ার শব্দ শুনে বেরিয়ে এল একটা ছেলে। কথা-বার্ত্তা নেই। হাত বাড়িয়ে চিরকুটটা নিয়ে আবার ভিতরে ঢুকে গেল। কয়েক মিনিট পরেই এনে দিল গহনাটা। গহনার সঙ্গে ভাঁজ-করা পুরিয়ার মত ছোট্ট মোড়ানো কাগজে লেখা নাম। বাঁধা-রাখা জিনিস ফেরৎ নিল লোকটি।

—কে? তাদের পিছু পিছু আসছে লোকটি।

—ওঃ, পরাণ, কোথায় এসেছিলে? সিনেমা দেখতে?

—না, আপনি?

—আমি এসেছিলাম মল্লিকের দোকানে।

ইনিও মল্লিকের দোকানে। গ্রামের মহাজন দেবেশ রায়। গ্রামের চাষীর জমি যার কাছে বাঁধা। সোনা রূপো থেকে বদনা, ঘড়া, ঘটি যাঁর বাড়ীতে স্তূপাকারে চিরদিনের জন্য জমা রাখে দুঃখী মানুষেরা।

মনে পড়েছে দেবেশ রায়ের কথাই। এই দুর্দিনে মানুষ কেবল নিয়েই যাচ্ছে। ফেরত দিচ্ছে না কেউ। তাই সময় সময় দেবেশবাবুর হাতে টাকা থাকে না। তখন তাঁকেও আসতে হয় শহরে মল্লিকের দোকানে। দু' পয়সা সুদে টাকা নিয়ে গ্রামে চার পয়সা সুদে ধার দেবেন। দু' পয়সা লাভ সেখানেও।

নীরবে হাঁটছে চার জন। পাশাপাশি গ্রামে বাড়ী। একই ট্রেনের যাত্রী। আবছা অন্ধকারে দেবেশ রায়ের মুখটা দেখা যাচ্ছে না ভাল করে। কিন্তু মল্লিকের হাসিমুখ মনে পড়ছে। তার আপ্যায়নের ভাষা ভেসে আসছে কানে।

মনে পড়ছে এই সঙ্গে ভূগোলের সেই ভ্যামপায়ার বাদুড়ের কথা। শ্রান্ত পথিক বিশ্রামের জন্য গাছতলায় এসে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়বে। ছুটে আসবে ভ্যামপায়ার। শ্রান্ত আর ঘুমন্ত পথিককে তার পক্ষ ব্যজন করে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন করে রাখবে আর সেই সুযোগে তার সুতীক্ষ্ণ চঞ্চু পথিকের দেহের মধ্যে সন্তর্পণে আস্তে আস্তে প্রবেশ করিয়ে তার দেহের সমস্ত রক্ত শুষে নেবে। ঘুমন্ত পথিকের আরামের নিদ্রা আর কোন কালে ভাঙবে না।

রাত্রি দশটা। মল্লিকের দোকানে এতক্ষণে ভিড় কমেছে। দু' একজন আসছে, কেউ গহনার খদ্দের, কেউ বাঁধা রাখার। দেবেশ রায়ের মত কেউ এক-আধজন বাঁধা-রাখা জিনিস ছাড়িয়ে নিতে আসবে মল্লিকের বাড়ীতে। আবার ভোর হবে, আবার মল্লিক দোকান খুলবে আর আসবে পরাণ মাষ্টার,শোভেন, অনাথদি, গৌর মুদীর দল। সবাই ভাঙবে, গড়ে উঠবে শুধু অঘোর মল্লিক?



সমবায় ও অনুমান

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মাইতি

প্রাচীন ন্যায়ে সমবায় সংজ্ঞার প্রকৃত রূপ গৌতম প্রকরণের প্রত্যক্ষ প্রমাণ সূত্র ১-১-৪ হইতে পাওয়া না গেলেও নব্য নৈয়ায়িকেরা বৈশেষিকের উক্ত পদার্থ সংজ্ঞা স্বীকার করিয়া তাহা নিজস্ব ধারায় গ্রহণ করিয়াছেন। কনাদ সূত্র ৭।২।২৬ হইতে পাওয়া যায় যে—ইহেদমিতি যতঃ কার্য্যকারণয়োঃ স সমবায়ঃ—এই সূত্রের "ইহেদমিতি" অংশ হইতে ইহা ধরা যায় যে, সমবায় প্রত্যক্ষসিদ্ধ ব্যাপার। [অতএবেহেতি প্রত্যয়োপপত্তৌ সমবায়ানুমান প্রসঙ্গাচ্চ—ন্যায় লীলাবতী, পৃঃ ১০৬।] কিন্তু প্রশস্তপাদ তাঁহার "পদার্থ ধর্ম-সংগ্রহ" ব্যাখ্যায় ইহা অস্বীকার করিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে—"অযুতসিদ্ধানামাধার্য্যাধার ভূতানাং যঃ সম্বন্ধ ইহ প্রত্যয় হেতু স সমবায়ঃ" ফলে পরবর্ত্তী ব্যাখ্যাকারেরা শুধু যে এই সমবায়কে অনুমানসিদ্ধ ধরিয়াছেন তাহা নহে মূলসূত্র-ধৃত কার্য্য-কারণ সম্বন্ধকেও অস্বীকার করিয়াছেন। অবশ্য শঙ্কর মিশ্র প্রভৃতি উক্ত অস্বীকৃতি সত্ত্বেও শুধু যে 'অযুতসিদ্ধি' লক্ষণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে—"অসম্বদ্ধয়োর বিদ্যমানত্বমযুত সিদ্ধিঃ" উক্তি করিয়াছেন তাহা নহে এই সমবায়কে ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্য্য টীকাকার সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাচস্পতি মিশ্র নির্দ্দিষ্ট ধারায় নিয়ম ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ন্যায়শাস্ত্রে প্রশস্তপাদ ব্যাখ্যা বা শঙ্কর মিশ্রের কার্য্য-কারণ বিধি অস্বীকারের স্থান না থাকিলেও সমবায়ের অন্য দুই তথ্যের মূল্য আছে এবং বৈশেষিকের ন্যায় সমবায় অনুমানসিদ্ধ না হইয়া প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ মাত্র। ইহা ছাড়া সমবায় লক্ষণ স্বীকারে ন্যায়শাস্ত্র অন্য যে বিশেষ লক্ষণ অস্বীকার করিয়াছে তাহা এই যে—"পরমাণু-বদনাশ্রিতঃ সমবায় ইতি (ন্যায়বার্ত্তিক; পৃঃ-৫৩)। এই স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃতি সত্ত্বেও সমবায়ের সহিত অনুমানের সম্বন্ধ বিচারের আবশ্যকতা বল্লভাচার্য্য উদ্যোতকর রীতিতেই অনস্বীকার্য্য।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, নব্য ন্যায়ে যাহা ব্যাপ্তি প্রাচীন ন্যায়ে তাহা অবিনাভাব। অবিনাভাবের অর্থবিচারে নৈয়ায়িকেরা 'বিনা-ভাবের অভাব' এই নিষ্কর্ষ অবধার্য্য করিয়াছেন। 'বিনাভাবের অভাব' সূত্রার্থ বিচারে আবার 'অভাব' লক্ষণ জানা আবশ্যক। "অভাব" বিষয়ে ন্যায়প্রকরণে যে পাঁচটি সূত্র পাওয়া যায় (২।১।৩৮-৪০; ৩।১।৫ ও ৪।১।১৪) তাহা দ্বারা ইহার লক্ষণ অস্পষ্ট থাকিয়া যায়। মীমাংসক ভাট্ট মতে ইহা অন্যতম প্রমেয় পদার্থ। কিন্তু গুরু মতে ইহা কেবল অধিকরণ স্বরূপ এবং সেজন্য সমানাধিকরণ্য ও ব্যাধিকরণ এই উভয় প্রকার ভিত্তিতে ইহার স্বরূপ নির্ণীত হয়। "ভূতলে ঘট নাই" বলিলে ঘটাভাব ভূতল ও ঘটের সমানাধিকরণ্য ও ব্যাধিকরণ সম্বন্ধ বিচারে ধরা যায় এবং উভয় সম্বন্ধই সমবায় লক্ষণ বিচারে বোধ্য; কেন না—"অযুতসিদ্ধানামাধার্য্যাধার ভূতানাং যঃ সম্বন্ধ স সমবায়ঃ।" সমবায় মূলীভূত অযুতসিদ্ধির ব্যাখ্যায় পরমাণুবাদী নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকেরা বলিয়াছেন—"দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে একমবিনাশ্যদপরাশ্রিতমেবাবতিষ্ঠতে তাবযুত-সিদ্ধৌ।" দুইটি বিষয়ের এরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে কিনা তাহা এখন বিবেচ্য।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী থমসন ইলেকট্রন সম্বন্ধে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য লইয়া গবেষণা করিতে গিয়া একটি বিশেষ ঘটনা লক্ষ্য করেন। তিনি দেখেন যে কোনও বস্তুর গায়ে বিদ্যুতের সঞ্চার হইলে বস্তুটির ওজন বাড়িয়া যায়, যেন বিদ্যুতের একটি আলাদা ওজন আছে এবং বস্তুটির ওজনের সঙ্গে বিদ্যুতের এই ওজনটি যোগ হইয়া একুনে বিদ্যুৎবাহী বস্তুটির ওজন বাড়ে। এই ঘটনাটি লক্ষ্য করিয়া বিজ্ঞানী প্রশ্ন করিলেন—একটি ইলেকট্রনের ওজনের কতটুকু বস্তুপিণ্ড বা ভরের উপর নির্ভর করে আর কতটুকু অংশ বৈদ্যুতিক চার্জ্জ বা জোরের উপর? এই প্রশ্নের সমাধান করিতে গিয়া ইলেকট্রনের ভর ও বৈদ্যুতিক চার্জ্জ আলাদা ভাবে মাপা হইলে এক অভাবনীয় তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেল। জানা গেল, ইলেকট্রনের বস্তুপিণ্ড বা ভর এবং চার্জ্জ ওজনের দিক হইতেও আলাদা আলাদা কোনও স্বতন্ত্র জিনিস নয়। ইলেকট্রনের সবটুকু কণা বা ভরই বৈদ্যুতিক চার্জ্জের জন্য। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে চূড়ান্ত ভাবে স্থির হয় যে, ইলেকট্রন বিদ্যুৎবাহী বা বিদ্যুৎ-গুণসম্পন্ন পদার্থ কণা নয়। ইলেকট্রন নিজেই আগাগোড়া বিদ্যুৎ-ময় একটি তড়িৎ রেণু মাত্র। এই আবিষ্কারের ফলে পদার্থের মৌলিক উপাদান সম্বন্ধে এতদিনের লব্ধ জ্ঞানের আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। জানা গেল, ইলেকট্রন পদার্থমাত্রেরই একটি মৌলিক উপাদান বা পরমাণু [পরং বা ক্রুটে; ন্যা, সূ-৪।২।১৫] এবং পার্থিব বস্তুপুঞ্জে বিদ্যুৎশক্তি অবিনশ্য ও সক্রিয় অবস্থায় পরস্পরাশ্রয়ে বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ যাবতীয় বস্তুপুঞ্জে সমবায় শক্তি স্বীকার্য্য। ক্যাথোড রশ্মি উৎপাদনের সময় দেখা যায় যে, যে ধাতব চাকতি হইতে ক্যাথোড রশ্মি উৎপন্ন হয়, সেই চাকতি হইতেই পজিটিভ রশ্মি সৃষ্টি হয়। এ ঘটনা হইতে তখন পর্য্যন্ত একটি ভাসা ভাসা কল্পনা করা হইয়াছে যে শুধু ইলেকট্রন নয়, পজিটিভ রশ্মিকণা বা প্রোটনও পদার্থমাত্রেরই মূল উপাদান। ভর ও বিদ্যুৎশক্তির সমানাধিকরণ্য ফলেই বস্তুর উৎপত্তি এবং যে সকল বস্তুতে বিদ্যুৎ অক্রিয় থাকে সেখানে এই শক্তি অযুতসিদ্ধ অবস্থায় অবস্থান করে।

আধুনিক আবিষ্কারে যাহা প্রমাণিত প্রাচীন সমবায় চিন্তায় আমরা তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাই। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, সমবায়ের সহিত জাগতিক বস্তু ও শক্তির সম্বন্ধ ভিত্তি অযুতসিদ্ধ সার্ব্বজনীন সম্পর্ক বিষয়ে প্রাচীনেরা কোনও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন কি না। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, বৈশেষিক সমবায় সূত্র (৭।২।২৬) ব্যাখ্যায় উপস্কার-কার শঙ্কর মিশ্র বলিয়াছেন—"স্বভাবশক্তিরেব সর্ব্বত্র নিয়ামিকা।" কাজেই কোন কোনও নৈয়ায়িক 'সমবায়েন শব্দগ্রহ' বলিয়া এই সমবায়কে শব্দশাস্ত্রে মাত্র প্রযোজ্য বলিলেও প্রাকৃতিক অযুতসিদ্ধ বিষয়ে প্রযোজ্য গণ্য করিবার বহু কারণ আছে, বিশেষতঃ কিরণাবলী-প্রকাশকার বর্দ্ধমানের—"পদপদার্থয়ো ন সংযোগো নবা সমবায় সম্বন্ধঃত্যর্থঃ"—উক্তি আমাদের উক্ত সিদ্ধান্তে সহায়ক।

ন্যায় বৈশেষিক সম্প্রদায় বহু বিচার করিয়া সমবায় নামক অতিরিক্ত সম্বন্ধ (প্রমাণ) স্বীকার করিলেও ইহাকে আশ্রিত বলেন নাই, স্বতন্ত্র বলিয়াছেন [নাপ্যাশ্রিতত্বমস্য সমবায়িত্বম্; ন্যায়—লীলাবতী, পৃঃ-৭৮৩]। প্রত্যক্ষ, মূলীভূত সন্নিকর্ষের এই অংশ বিভাগ বিষয়ে নৈয়ায়িকেরা উল্লিখিত সিদ্ধান্ত হইতেও অগ্রবর্ত্তী হইয়া সমবায় যেখানে থাকে তাহা স্বরূপ সম্বন্ধেই থাকে; সংযোগ বা সমবায়ের ন্যায় অতিরিক্ত কোনও সম্বন্ধে নহে [স্বতন্ত্রঃ সমবায়িনাং সমবায় ইতি—ন্যায়বার্ত্তিক, ১।১।৫] সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উপায়কারক বর্দ্ধমানোপাধ্যায় তাৎপর্য্য পরিশুদ্ধির প্রকাশটীকায় উক্তরূপেই উদ্যোতকরের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সমবায়ের এরূপ অভিব্যক্তির ফলে ইহা স্বতন্ত্র (প্রমাণ) প্রকরণ (Inductive System) রূপে আলোচনা পাইবার উপযুক্ত। সমবায় সম্বন্ধাস্ত নিরপেক্ষ সম্বন্ধ বলিয়া বৈশেষিক সূত্র—"ইহেদমিতি যতঃ কার্য্যকারণয়োঃ স সমবায়ঃ (৭।২।২৬)" ব্যাখ্যায় নব্য নৈয়ায়িক। শঙ্কর মিশ্র কার্য্য-কারণ সম্বন্ধকে উপলক্ষণ বিবেচনায় বাদ দিয়া কেবল "স্বভাবশক্তিরেব সর্ব্বত্র নিয়ামিকা" সূত্র লক্ষণ করিলেও আধুনিক আলোচনায় উভয় লক্ষণই পাই।

আলোচনা দ্বারা ইহা সুস্পষ্ট যে, ব্যাপ্তি যেরূপ অনুমানের ভিত্তি তেমনই উক্ত ব্যাপ্তির প্রতিযোগী অবিনাভাবও সমবায়ের ভিত্তি অর্থাৎ আন্বীক্ষিকী শাস্ত্রে অনুমান ও সমবায় উভয় প্রকরণই আমাদের জ্ঞানের পথপ্রদর্শক।

এই প্রসঙ্গে সাধারণতঃ দুইটি প্রশ্ন উঠিতে পারে—এই দুইয়ের মধ্যে কোনটি মৌলিক প্রক্রিয়া? যৌক্তিকতার দিক হইতে দেখিতে গেলে (logically) সমবায় অনুমানের পূর্ব্বগামী না অনুমান সমবায়ের পূর্ব্বগামী।

ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্য্য টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের "অনুমানস্য প্রত্যক্ষ বৈলক্ষণ্যম্" প্রসঙ্গে উক্তি এই যে—"সত্যুপলব্ধি কারণান্তর সম্ভাবে সর্ব্বত্রোপলভ্যতা ব্যাপকত্বম্ (চৌখাম্বা সংস্করণ; পৃ-১৮৫)" অর্থাৎ প্রত্যক্ষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুভূতি এবং সেই অনুভূতি বলেই ব্যাপকতা জ্ঞান জন্মে, আর সেই ব্যাপকতা জ্ঞান আদৌ সমবায়ে সম্ভব বলেই সমবায়ই মৌলিক পদ্ধতি এবং অনুমানের পূর্ব্বগামী। এমতে যথার্থ অনুমান পদ্ধতিমাত্রই মূলতঃ সমবায় পদ্ধতি। কিন্তু অনুমান সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে না, কারণ ইহাতে সিদ্ধান্তটি আমাদিগকে কোনও নূতন সত্যের সন্ধান দেয় না, স্বীকৃত হেতু বাক্যগুলিতে যে সত্য নিহিত আছে তাহাই প্রকটিত করে মাত্র, অনুমান (ক) স্বার্থানুমান ও (খ) পরার্থানুমান এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। উদ্ভাবন (ন্যায় পরিশিষ্ট প্রকাশ বা প্রবোধ সিদ্ধি, পৃঃ-১১৩, ১১৬-১১৮, ১২১ দ্রষ্টব্য), উত্থাপন, উপস্থাপন প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীভুক্ত প্রক্রিয়াগুলিকে প্রকৃতপক্ষে অনুমান বলিতে পারা যায় না, কারণ তাহাদের কোনওটিতে আমরা একটি সত্য হইতে পৃথক অপর সত্যে উপনীত হই না, যে সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হই তাহা হেতু বাক্যেরই ভিন্ন আকারে পুনরাবৃত্তি মাত্র। পরার্থানুমান অথবা ন্যায়ানুমান সম্বন্ধেও এই অভিমতই প্রযোজ্য। পরার্থানুমান বা ন্যায়ে প্রধান হেতু বাক্যের ব্যাপক কথা হওয়া প্রয়োজন। এই প্রধান হেতু বাক্য হইতেই সিদ্ধান্তটি নিঃসৃত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধান্তটি সত্য পূর্ব্বেই ইহা জানা না থাকিলে প্রধান হেতু বাক্যকে সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না, অর্থাৎ ন্যায়ানুমানের সাহায্যে কোনও নূতন সত্য প্রতিপন্ন করা অসম্ভব। যে চিন্তন প্রক্রিয়ার দ্বারা আমরা সত্য লাভ করিবার চেষ্টা করি তাহার সাধারণতঃ দুইটি অংশ—একটি অংশ অনুমানমূলক এবং অপরটি ব্যবস্থামূলক। যে প্রক্রিয়া-দ্বারা কোনও সাধারণ সত্য প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহাই সমবায় পদ্ধতি এবং যাহা দ্বারা সেই সাধারণ সম্বন্ধটির ব্যাখ্যা করা যায় তাহাই অনুমান পদ্ধতি। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বক্তব্যটি পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। যে সকল মানুষকে আমরা জানি তাহাদের অনেকেরই মৃত্যু হইয়াছে—ইহা দেখিয়া এবং মানুষের জীবন ও মরণশীলতা এই দুইয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ (সমবায়) রহিয়াছে তাহা উপলব্ধি করিয়া আমরা একটি সাধারণ সত্যে উপনীত হইলাম যে, "সকল মনুষ্যই মরণশীল" অর্থাৎ যে সকল মনুষ্যকে আমরা বাস্তবিক দেখিয়াছি মরণশীলতা কেবল তাহাদেরই বিশেষণ নয়, যাহাদিগকে আমরা কখনও দেখি নাই অথবা যাহাদিগকে আমাদের কখনও দেখিবার সম্ভাবনা নাই তাহাদেরও বিশেষণ। এখানে যে সিদ্ধান্তটি করা হইল তাহা নূতন সত্যের সন্ধান দিতেছে এবং আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করিতেছে; সুতরাং এই প্রক্রিয়াকে যথার্থই (দ্বিতীয় শ্রেণীর পরার্থ) অনুমান বলা যাইতে পারে। কিন্তু যখন আমরা আবার যুক্তি প্রয়োগ করি "সকল মনুষ্যই মরণশীল, রাম মনুষ্য, অতএব রাম মরণশীল" তখন আমাদের সিদ্ধান্তে নূতন কোনও সত্য থাকে না। এখানে প্রধান হেতু—বাক্যের ব্যাখ্যা করা হইতেছে মাত্র এবং কোনও বিশেষ স্থলে ইহার প্রয়োগ কি ভাবে হইতেছে তাহাই নির্দ্দেশ করা হইতেছে। কোনও সাধারণ সত্যকে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া দেখাইলে ইহার অর্থ সম্বন্ধে আমাদের একটা সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে

কিন্তু কোনও নূতন সত্য প্রতিপাদন করা হয় না। কতকগুলি বিশেষ বস্তু পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যখন একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম তখনই দ্বিতীয় শ্রেণীর পরার্থানুমান [অনুমিত্যোপাধিক সমস্তরূপোপপন্নো বস্তুবাচকং বাক্যং পরার্থম্—ন্যায়লীলাবতী ; পৃঃ-৭৭৪] প্রক্রিয়া শেষ হইয়া গেল ; সাধারণ সত্য হইতে বিশেষ সত্যে নামিয়া আসার যে প্রক্রিয়া তাহাতে ঐ শ্রেণীর পরার্থানুমানের কোনও স্থান নাই ; সুতরাং যুক্তি প্রয়োগ ব্যাপারে অনুমান পদ্ধতির স্থান অতি গৌণ।

এই মতানুসারে সমবায়ই অনুমিতি প্রক্রিয়ার মৌলিক রূপ, কেবলমাত্র তাহাই নয়, যুক্তির ক্রম হিসাবে সমবায় অনুমানের পূর্ব্বগামী, অর্থাৎ সমবায়ের প্রয়োগ পূর্ব্বে না হইলে অনুমানের প্রয়োগ হইতে পারে না। সমবায় পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া একটি সাধারণ সত্য প্রতিপন্ন করা হইলে তবেই অনুমান পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব হইতে পারে। ন্যায়কে অনুমানের নিদর্শন স্বরূপ গ্রহণ করিলে দেখা যায় ইহার একটি হেতু বাক্য সাধারণ সত্য হইতে বাধ্য এবং স্বতঃসিদ্ধ সত্য ব্যতীত অন্য শ্রেণীর সাধারণ সত্য প্রমাণ করিতে হইলে শেষ পর্য্যন্ত সমবায় পদ্ধতির সাহায্য না লইয়া উপায় নাই। আমরা প্রথমে সমবায় পদ্ধতির দ্বারা সাধারণ সত্যে উপনীত হই এবং পরে তাহা বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি। এ স্থলে যদি কেহ আপত্তি করেন যে সমবায়ানুমানগুলিও স্বয়ংসিদ্ধ নয় তাহারা প্রকৃতির নিয়মানুবর্ত্তিতার উপর প্রতিষ্ঠিত সুতরাং প্রকৃতির একরূপতা বা সর্ব্বত্র নিয়ামিকা স্বভাবশক্তি (Law of the Uniformity of Nature)-কে প্রধান হেতু বাক্যরূপে লইয়া প্রত্যেক সমবায়কেই অনুমানের আকারে পরিণত করা যাইতে পারে তাহা হইলে তাহার উত্তরে বলা যায় যে, প্রকৃতির নিয়মানুবর্ত্তিতার সাধারণ বিধি ও কতকগুলি প্রাক্তন সমবায় ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত [কেন পুনঃ প্রমাণেন স্বাভাবিকঃ সম্বন্ধো গৃহ্যতে। প্রত্যক্ষ সম্বন্ধাদিষু প্রত্যক্ষেণ—তাৎপর্য্য টীকা ; পৃঃ-১৬৬] সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত সমাবায় পদ্ধতিকেই অনুমান পদ্ধতির পূর্ব্বগামী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে এবং এই ভাবেই ন্যায়বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর এবং তাৎপর্য্য টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র আলোচনা করিয়াছেন।

যুক্তি বা বিচারের ক্ষেত্রে ন্যায়ানুমানের স্থান কোথায় এবং কোনও সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করিবার পক্ষে ইহার মূল্য কতটুকু সে সম্বন্ধে গুরুতর আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, এই আপত্তি যুক্তিসঙ্গত হইলে সত্য নির্ণয়ের প্রচেষ্টায় অনুমান যে কেবলমাত্র গৌণ স্থান অধিকার করিয়া থাকে এই অভিমতকে গ্রহণ করা যায় না। এখানে আরও বলা যাইতে পারে যে, সহচার অর্থাৎ কতকগুলি পদার্থের একত্রাবস্থান দর্শনই সমবায়ের ভিত্তি। আমরা প্রথমে বার বার কয়েকটি বিশেষ বস্তু বা ঘটনার ব্যতিক্রমহীন সহচার [উভয়ো সামানাধিকরণ্যং সহচারঃ—সপ্তপদার্থীঃ এমতভাষিণা ; পৃঃ-৭] দর্শন করিয়া প্রকৃতির সর্ব্বত্র নিয়ামিকা সাধারণ বিধি প্রতিপন্ন করি এবং তৎপরে সেই বিধিটিকেই অন্যান্য জটিল সমবায় প্রক্রিয়াতে মূলসূত্র হিসাবে ব্যবহার করি। কিন্তু অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে ইহা বহুস্থলে প্রত্যক্ষ করিয়া যখন অনুমান করিতে যাই যে, অপর একটি ক্ষেত্রে অগ্নি বস্তুকে দগ্ধ করিবে তখন আমরা ইতঃপূর্ব্বেই নির্ব্বিচারে প্রকৃতির সর্ব্বত্র নিয়ামিকা সাধারণ বিধিকে স্বীকার করিয়া লইয়াছি। এই বিধির প্রতি বিশ্বাস যদি পূর্ব্ব হইতেই কোনও না কোনও রূপে আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান না থাকিত তাহা হইলে আমরা কোনও ক্ষেত্রেই জ্ঞাতপূর্ব্ব সত্য হইতে অজ্ঞাতপূর্ব্ব সত্যে উপনীত হইতে পারিতাম না। কার্য্য-কারণ বিধি সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। কার্য্যমাত্রেরই কারণ আছে এই বিশ্বাস সমস্ত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মূলভিত্তিস্বরূপ। কার্য্য-কারণ বিধির অলঙ্ঘনীয়তা স্বীকার না করিলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এক পাও অগ্রসর হইতে পারে না, অথচ কেবলমাত্র দুইটি বস্তু বা ঘটনার ব্যতিক্রমরহিত পৌর্ব্বাপর্য্য দেখিয়া কার্য্য-কারণ বিধিকে নির্ব্বিচারে স্বীকার করিয়া না লইলে কোনও বিশেষ ক্ষেত্রেই সমবায় পদ্ধতির প্রয়োগ করা যায় না। এই দুই মূল নিয়মকে স্বীকার করিয়া লইয়া এবং ইহাদিগকে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া কতকগুলি সাধারণ সত্যে (সর্ব্বলোক-সিদ্ধ নিয়মে) উপনীত হওয়াই সমবায় পদ্ধতি। কিন্তু যেহেতু ইহাতে কতকগুলি সাধারণ সত্য হইতে অপেক্ষাকৃত অল্পব্যাপক সাধারণ সত্যে উপনীত হইয়া থাকি সেই হেতু আমরা ইহাকে সমবায় পদ্ধতি বলিয়াও বর্ণনা করিতে পারি। সুতরাং সমবায়ের যে লক্ষণ আমরা দিয়াছি সেই লক্ষণ গ্রহণ করিলে সমবায়ই যে একমাত্র অনুভূতি পদ্ধতি তাহা স্বীকার করা যায় না এবং যেহেতু প্রকৃতির সর্ব্বত্র নিয়ামিকা এবং কার্য্য-কারণ বিধিকে সমবায় পদ্ধতির দ্বারা প্রমাণ করিতে পারা যায় না। [তচ্ছেঽ প্রত্যয় কারণত্ব-মাত্মনিচ সমবায়ে চাবিলক্ষণমিতি—তাৎপর্য্য টীকা ; পৃঃ-১৮৫ ৬] সেই হেতু সমবায় যে মূলতঃ অনুমানের পূর্ব্বগামী এই মতও যুক্তি-যুক্ত বলিয়া মনে হয় না। তাৎপর্য্য টীকায় "অনুমানস্য প্রত্যক্ষ বৈলক্ষণ্যম্" প্রসঙ্গে বাচস্পতি ইহাই আলোচনা করিয়াছেন।

কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌমের "ভাষা পরিচ্ছেদ" মতে—অনুমানে সংযোগাদি বাধাৎ সমবায় সিদ্ধিঃ (পৃঃ-১১), অর্থাৎ অনুমানই মূল পদ্ধতি। সমবায় পদ্ধতির কোনও স্বতন্ত্র সত্তা নাই ; ইহাও মূলতঃ অনুমান পদ্ধতি অথবা ইহা অনুমান পদ্ধতির রূপান্তর মাত্র। যাবতীয় যুক্তি ও বিচার মূলতঃ একমাত্র অনুমান পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। অনুমান সমবায়ের পূর্ব্বগামী। কোনও সমবায়কে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই এই মন্তব্যের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে। কয়েকটি বিশেষ বস্তু বা ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিলে তাহাদিগকে একটি সম্বন্ধ সূত্রে গ্রথিত করিতে পারে এমন একটি সাধারণ নিয়ম অনুপসংহারী (Hypothesis ; 'বস্তুমাত্র পক্ষকোঽনুপসংহারী'—তর্ককৌমুদী ; পৃঃ-১২) রূপে আমাদের মনে উদিত হয়। এই অনুপসংহারীকে আশ্রয় করিয়া আমরা সেই বস্তু বা ঘটনাবলী সম্বন্ধে কতকগুলি সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি। যদি সেই সিদ্ধান্তগুলি অধিকতর বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা

সমর্থিত [তাদৃশস্ত কতিপয় বিষয় ভূয়োদর্শন বা সংস্কার সচিব বাহ্যেন্দ্রিয় বেদ্যত্বাং—ন্যায়লীলাবতী, পৃঃ-৪৯৩] হয় তাহা হইলে তাহা আর সংযোগ না হইয়া [সংযোগে প্রাপ্তিস্বস্থ ন বৃত্ত্যা স্বাভাবিকঃ সম্বন্ধঃ তাৎপর্য্য টীকা ; পৃঃ-১৮৬], সেই অনুপসংহারী নিয়মের বস্তুগত সত্যতা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। এই অনুপসংহারীটি প্রথমে যেরূপে আমাদের মনে আসিয়াছিল অনুসন্ধান ও বিচারের ফলে তাহা হয়ত সংশোধিত অথবা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে কিন্তু কল্পনার সাহায্যে প্রথমেই ঐরূপ একটি সাধারণ নিয়মের ধারণা করা সমবায় পদ্ধতির একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ, অপর পক্ষে বাস্তব তথ্যের সাহায্যে অনুপসংহারী নিয়মকে প্রতিষ্ঠিত করাই অনুমান পদ্ধতি [তত্ত্বচিন্তামণির অনুমান খণ্ডে—অনুপসংহারী প্রকরণ দ্রষ্টব্য]। সুতরাং এই উপায়েও যখন কোনও সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হই তখন আমরা অনুমান পদ্ধতির সাহায্যেই তাহা করিয়া থাকি ইহা বলাই যুক্তিসঙ্গত। একটি অনুপসংহারীকে অনুমান পদ্ধতির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে একটি সাধারণ সত্য প্রমাণিত হয়, সুতরাং কোনও ক্ষেত্রে সমবায়ের প্রয়োগ করিতে হইলে পূর্ব্বে অনুমান প্রয়োগ করিতে হইবে।

তবুও "ন্যায়লীলাবতী" গ্রন্থে বল্লভাচার্য্য "অতএবেহেতি প্রত্যয়োপপত্তৌ সমবায়ানুমান প্রসঙ্গাচ্চ" (পৃঃ-৭০৬) উক্তি দ্বারা সমবায় ও অনুমানকে পারস্পরিক সম্বন্ধে বিপরীতমুখী প্রক্রিয়ার সিদ্ধান্ত ছাড়া আরও কিছু বলিতে চাহিয়াছেন। এ মতে অনুমানই সাক্ষাৎ অর্থাৎ সম্মুখগামী প্রক্রিয়া (Direct process); সমবায় অনুমানের প্রকার ভেদমাত্র এবং এই দুইয়ের মধ্যে মূলতঃ বা প্রকৃতিগত কোনও ভেদ নাই। মীমাংসক পার্থসারথী মিশ্র তাঁহার "শাস্ত্রদীপিকা" গ্রন্থে ভিন্ন কথা বলিয়াছেন যে—"যস্ত যাদৃশস্ত যেন যাদৃশেন সহ সাক্ষাদ্বা প্রণাল্যা বা যাদৃশঃ সম্বন্ধঃ সংযোগ সমবায় একার্থ সমবায়ঃ কার্য্যকারণত্যামহঙ্গো বা দৃষ্টান্ত ধর্ম্মিষ্ঠ নিয়ত জ্ঞাতস্তং তাদৃশং সাধ্যধর্ম্মিষু দৃষ্টবতস্তস্মিং স্তাদৃশে তাদৃশ সম্বন্ধিনি প্রবন্ধেন প্রমাণেন তাদ্রূপ্যাত্তদ্বিপর্য্যয়াভ্যাম্ পরিচ্ছেদে যা বুদ্ধিঃ সাহঅনুমানম [অনুমান নিরূপণম]।" অনুমানে কতকগুলি হেতু বাক্য হইতে সোজাসুজি তাহাদের মধ্যে নিহিত একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি ; সেজন্ত ইহা সাক্ষাৎ পদ্ধতি কিন্তু সমবায়ে কতকগুলি বিশেষ তথ্যের জ্ঞান হইলে আমরা সেইগুলি হইতে সাক্ষাৎ ভাবে একটি সাধারণ সত্যে উপনীত হইতে পারি না ; একটি জটিল (Indirect) পথ ধরিতে হয় ; এই জন্তই সমবায় জটিল পদ্ধতি। যে বিশেষ বস্তু বা ঘটনাবলী আমরা কোনও এক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করিতেছি সেগুলিকে হয়ত কতকগুলি কাল্পনিক নিয়মের যে কোনটির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। সুতরাং আমরা সেই-রূপ একটি নিয়মকে সাময়িকভাবে স্বীকার করিয়া লইয়া তাহা হইতে যে সিদ্ধান্তগুলি অনুমান প্রণালীর সাহায্যে পাইয়া থাকি সেগুলিকে বাস্তব তথ্যের সাহায্যে পরীক্ষা [লক্ষিতস্তত্ত্বলক্ষণমুপপদ্যতেনবেতি বিচারঃ পরীক্ষা—ন্যায়মঞ্জরী, পৃঃ-১১] করিয়া থাকি। যদি তাহারা বাস্তব তথ্য দ্বারা সমর্থিত হয় তাহা হইলে যে কাল্পনিক নিয়ম হইতে তাহারা নিঃসৃত হইয়াছিল তাহাকে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সাধারণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করি নতুবা সেই নিয়মটিকে পরিহার করিয়া অপর একটি নিয়ম কল্পনা করিয়া তাহাকেও সেই পূর্ব্বোক্ত উপায়ে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। সুতরাং সমবায় পদ্ধতি যে বিচার প্রণালীর উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা প্রকৃতপক্ষে অনুমান পদ্ধতি। অনুমানের বিপরীতমুখী প্রয়োগই সমবায়। কোনও ন্যায়ের হেতু বাক্যগুলি এবং সিদ্ধান্তের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহার সহিত একটি অনুমিত্যানুমান বা প্রসক্তিমূলক কথার অন্তর্গত পূর্ব্বগ ও অনুগের সাদৃশ্য আছে। পূর্ব্বগ দেওয়া থাকিলে তাহা হইতে অনুগ কি হইবে তাহা নির্ণয় করা যায় কিন্তু অনুগ দেওয়া থাকিলে তাহা হইতে সাক্ষাৎ ভাবে পূর্ব্বগ কি হইবে তাহা নির্ণয় করিতে পারি না। প্রথমে একটি পূর্ব্বগ কল্পনা করিয়া লইয়া তাহা হইতে সেই অনুগ নিঃসৃত হইতেছে কি না তাহা নির্ণয় করিতে হয়। ঠিক এইরূপে কতকগুলি বিশেষ বস্তু বা ঘটনার জ্ঞান হইবার পর আমাদের চিন্তা বিপরীত দিকে গমন করে এবং সাময়িকভাবে একটি নিয়মকে স্বীকার করিয়া লয়। এই কাল্পনিক নিয়ম হইতে সমবায় প্রণালীতে ঐ বিশেষ বস্তু বা ঘটনাগুলিকে ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইলে আমরা পুনরায় সেই কাল্পনিক নিয়মে ফিরিয়া যাই এবং তাহারা সত্য বলিয়া গ্রহণ করি। [কার্য্যাৎপূর্ব্বমুৎপন্নঃ সমবায়ঃ পশ্চাদুৎপদ্যমানং কার্য্যমুপাদানাধারকং করিষ্যতি ; কার্য্যহেতুবলাৎ —তাৎপর্য্য টীকা ; পৃঃ-১৮৭]। ইহাই সমবায় এবং ইহার গতি অনুমানের বিপরীতগামী।

উপরে যে মতটির কথা বলা হইল তাহা যে কতকাংশে সত্য তাহা অস্বীকার করা যায় না ; কেন না "ন্যায়লীলাবতী"-কার বল্লভাচার্য্য অনুমান আলোচনা প্রসঙ্গে ইহাও বলিয়াছেন যে, "নচতদেবানুমিতম্। অনবগত নিয়মত্বাৎ (পৃঃ-৪৯৩)"। আমরা কতকগুলি বিশেষ বস্তু বা ঘটনা দেখিয়া একটি সাধারণ নিয়মে উপস্থিত হই এবং সেইজন্ত মনে করি যে, সাধারণ নিয়মের স্থান বিশেষ বস্তু বা ঘটনাসমূহের পরে কিন্তু প্রকৃতিতে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রকৃতিতে সাধারণ নিয়মের স্থান আগে বিশেষ বস্তু বা ঘটনাগুলির স্থান পরে। কোনও বিশেষ বস্তু বা ঘটনা কোনও এক সময়ে আবির্ভূত হইয়া আবার বিলীন হইয়া যায় কিন্তু যে সাধারণ নিয়মগুলি তাহার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে তাহারা তাহার আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বেই বর্ত্তমান ছিল এবং পরেও থাকিবে [নাপ্যনাগতম। অনবগতত্বাৎ—ন্যায়লীলাবতী, পৃঃ-৪৯৩]। এই সাধারণ নিয়মগুলি আছে বলিয়াই বস্তু বা ঘটনাগুলি বিশেষ আকার ধারণ করিয়াছে এবং বিশেষ গুণের অধিকারী হইয়াছে। প্রকৃতিতে সাধারণ নিয়ম ও বিশেষ বস্তুগুলির যে পৌর্ব্বাপর্য্য সম্পর্ক আছে [অনাগত প্রাক্কালিকমেবেত্যর্থঃ—উপরোক্ত লীলাবতী সূত্রের কণ্ঠাভরণ ; পৃঃ-ঐ] সমবায়ে আমরা তাহার বিপরীত দিকে গমন করি বলিয়া সমবায়কে অনুমানের বিপরীত প্রক্রিয়া বলা সঙ্গত।

অনুমানে আমরা বিশেষ সত্য হইতে সাধারণ সত্যে উপনীত হই এবং সমবায়ে সাধারণ সত্য হইতে বিশেষ সত্যে উপনীত হই। ঠিক এই কারণেই অনুমান ও সমবায়কে পরস্পর সম্পর্কে উদ্ভাবন প্রক্রিয়া (converse processes) বলা যায় কি না বিবেচ্য। কয়েকটি নিয়মানুসারে একটি কথার উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের স্থান পরিবর্তন করিয়া যে নূতন কথা পাওয়া যায় তাহাকে পূর্ব্বগামী কথার উদ্ভাবিত কথা বলে; যথা: "কোনও কোনও দ্বিপদ জীব মনুষ্য", এই কথাটি "সকল মনুষ্যই দ্বিপদজীব"—এই কথাটির উদ্ভাবিত কথা। অনুরূপ অর্থেই কখনও কখনও বলা হইয়া থাকে যে, সমবায় অনুমানের উদ্ভাবন; কিন্তু এই দুই পদ্ধতির মধ্যে বহু বিষয়ে যে পার্থক্য রহিয়াছে একটিকে অপরটির উদ্ভাবন বলিলে তাহা সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হয় না। সেজন্যই ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্তভট্ট ১।১।৭ সূত্র ব্যাখ্যায়—"অনুমানং তু বাক্যার্থ বিষয়ম্" পৃঃ-১৪০। উক্তি করিয়াও "আবার পোদাপদ্বারেণ শব্দার্থ" সম্বন্ধে নিশ্চিয়মানে উপযুক্তোক্তে" সূত্র (পৃঃ-১৪২) বিচার করিয়াছেন।

উদয়নের পরবর্তী ন্যায়াচার্য্য গঙ্গেশের সুবিখ্যাত গ্রন্থ "অনুমান চিন্তামণি"-তে 'সমানাধিকরণ' ও 'ব্যাধিকরণ' সূত্রকে অনুমান প্রসঙ্গে আলোচিত দেখা গেলেও পরমাচার্য্য বাচস্পতি তাঁহার "তাৎপর্য্য টীকা" গ্রন্থে উল্লিখিত উভয় বিষয়কে প্রত্যক্ষমূলীভূত 'সমবায়' প্রসঙ্গে গৌতম প্রকরণের ১।১।৪ সূত্রক্রমে আলোচনা করিয়াছেন। ফলে, সমবায় অনুমানের পূর্ব্বগামী অথবা অনুমান সমবায়ের পূর্ব্বগামী এ সম্বন্ধে তর্ক উঠিতে পারে কিন্তু ইহাদিগকে বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যাইবে যে, ইহারা সর্ব্বাংশেই পরস্পরের পরিপূরক এবং অনুমান চিন্তামণির সিংহ-ব্যাঘ্র প্রকরণ ও ব্যাধিকরণ অধ্যায়দ্বয়ে সমবায়ের উল্লেখ করিলেও বস্তুতঃ ইহাদের মধ্যে কোনটি পূর্ব্বগামী সে প্রশ্নের কোনও সার্থকতা নাই। ইহাদিগকে দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হইবে। সত্যের সন্ধানে ইহারা উভয়েই অপরিহার্য্য।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অনুমান ও সমবায় উভয়েই অনুমানের প্রকার ভেদ, যে মানস প্রক্রিয়া দ্বারা আমরা এক বা একাধিক জ্ঞান পূর্ব্ব বা স্বীকৃত সত্য হইতে একটি অজ্ঞাত পূর্ব্বে উপনীত হই তাহাই অনুমিতি। এস্থলে প্রশ্ন উঠে যে, আমাদের যে বিষয়ের সাক্ষাৎ-জ্ঞান আছে তাহাকে ভিত্তি করিয়া যে বিষয়ের সাক্ষাৎ-জ্ঞান নাই তাহার সম্বন্ধে কিছু বলা কি উপায়ে সম্ভব। জগতের বিভিন্ন বস্তু বা ঘটনার মধ্যে নানা বিষয়ে যে সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহাতেই এই প্রশ্নের উত্তর মিলিবে। আমরা বিশ্বাস করি যে দুই বা, ততোধিক বস্তুর মধ্যে কোনও কোনও বিষয়ে যে সাদৃশ্য আছে সেই সাদৃশ্যকে ভিত্তি করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে পরোক্ষ-জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। সাদৃশ্য বস্তুগুলির মধ্যে একটিতে যদি কোনও বিশেষ গুণ বর্ত্তমান থাকে অথবা কোনও বিশেষ অবস্থায় তাহাতে কোনও বিশেষ ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে অন্যান্য বস্তুগুলিতেও সেই বিশেষ গুণ দেখিতে পাওয়া যাইবে অথবা অনুরূপ অবস্থায় অনুরূপ ক্রিয়াও দেখা যাইবে [অসতি বাধকে সামান্য নিয়ম সদৃশ কার্য্যস্যৈবোপলব্ধেঃ, অন্যথা কার্য্য-সাদৃশস্যাকস্মিকত্ব প্রসঙ্গাৎ—ন্যায়লীলাবতী; পৃঃ-৮০৯]। কোনরূপ বিচার বা আলোচনার পূর্ব্বেই এই যে সাধারণ বিধিকে আমরা স্বীকার করিয়া লই তাহাকে সাধর্ম্ম্যবিধি (Principle of Similarity) বলা হইয়াছে এবং যে কোনও প্রকারের অনুমান হউক না কেন সকলেই এই সাধর্ম্ম্যবিধির উপর প্রতিষ্ঠিত। সকল বস্তুই যদি সর্ব্বপ্রকারে বিসদৃশ হইত তাহা হইলে অনুমিতি অসম্ভব হইত। এই সাধর্ম্ম্যবিধিকে ভিত্তি করিয়া কিভাবে আমরা অনুমান করিয়া থাকি তাহা কয়েকটি দৃষ্টান্ত লইলেই বুঝা যাইবে।

সকল মনুষ্যেরই মতিভ্রম হইয়া থাকে
মুণিরাও মনুষ্য
মুনিদেরও মতিভ্রম হইয়া থাকে (মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ)

ইহা একটি অনুমান। আমরা জানি যে, দুর্ব্বলতা বহু মনুষ্যের স্বভাবের একটি অঙ্গ। দুর্ব্বলতা আছে বলিয়াই তাহাদের মতিভ্রম হইয়া থাকে। আবার আমরা ইহাও জানি যে, যাঁহারা মুনি বলিয়া পরিচিত মননবিষয়ে অন্যান্যের সহিত পার্থক্য সত্ত্বেও তাঁহাদের সহিত অন্যান্য মনুষ্যের বহু বিষয়ে সাদৃশ্য আছে; সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করিলাম যে, দুর্ব্বলতা বিষয়েও অন্যান্য মনুষ্যের সহিত তাহাদের সাদৃশ্য থাকিবে। আবার—

একটি প্রস্তরখণ্ড আকাশে ছাড়িয়া দিলে আকাশে পড়িয়া যায়।
একটি ফল আকাশে ছাড়িয়া দিলে ভূমিতে পড়িয়া যায়।
একই আপেল আকাশে ছাড়িয়া দিলে ভূমিতে পড়িয়া যায়।

এই সকলই জড়বস্তু এবং ভূপৃষ্ঠে ও বায়ুরাশির মধ্যে সক্রিয়; সুতরাং যে সকল বস্তুর মধ্যে এই সাধর্ম্ম্য থাকিবে তাহাদের সকলকেই আকাশে ছাড়িয়া দিলে তাহারা ভূমিতে পড়িয়া যাইবে। ইহা একটি সমবায় সূত্র; কারণ এক্ষেত্রে আমরা কয়েকটিমাত্র বস্তু দেখিয়া একটি সাধারণ সত্য নিরূপণ করিতেছি।

সুতরাং অনুমানই হউক অথবা সমবায়ই হউক বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সাধর্ম্ম্যের জ্ঞানই উভয়ের ভিত্তি। এই দিক দিয়া দেখিলে উপমানকেই (Analogical inference) উভয়ের মৌলিক আকার বলিতে হয়। অবশ্য দুই বা ততোধিক বস্তুর মধ্যে কোনও সাদৃশ্য দেখিয়া তাহাদের সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্ত করিলে তাহা যে নিশ্চয়ই সত্য হইবে এরূপ নয়, বস্তুগুলির সাধর্ম্ম্য যদি তাহাদের সারধর্ম্ম (Essential attributes) সম্বন্ধে হয় এবং যে বিষয়ে বস্তুগুলির মধ্যে সাদৃশ্য আছে এবং যে বিষয় সম্বন্ধে অনুমান করিতে যাইতেছি তাহাদের মধ্যে যদি কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ বা অন্য কোনও অব্যভিচারী (যেমন—সমানাধিকরণ্য) সম্বন্ধ থাকে কেবলমাত্র তাহা হইলেই সিদ্ধান্ত সত্য হইবে। "সকল মনুষ্যই মরণশীল; রাম মরণশীল, রাম মনুষ্য অতএব মরণশীল" এ স্থলে সিদ্ধান্ত সত্য হইল; কারণ "মনুষ্যত্ব" এবং "মরণশীলতা" এই দুইয়ের মধ্যে অব্যভিচারী সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং রাম ও অন্যান্য

মনুষ্যের মধ্যে সাধর্ম্ম সম্বন্ধে সাদৃশ্য রহিয়াছে। কিন্তু "কোনও কোনও ফল মিষ্ট; তেঁতুল এক প্রকার ফল, অতএব তেঁতুলও মিষ্ট," এ স্থলে ফলত্ব এবং মিষ্টত্ব এই দুইয়ের মধ্যে অব্যভিচারী সম্বন্ধ না থাকায় সিদ্ধান্ত সত্য হইবে না। "কয়েকজন ম্যালেরিয়া জ্বরাক্রান্ত রোগী কুইনাইন সেবনে সুস্থ হইয়াছে, অতএব যে কোনও ম্যালেরিয়া রোগী কুইনাইন সেবনে সুস্থ হইবে" এই সমবায় সূত্র সত্য হইতে হইলে কুইনাইন ও ম্যালেরিয়া হইতে মুক্তি, এই দুইয়ের মধ্যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ আছে দেখাইতে হইবে। উপমান [সাধ্যসাধনমিতি করণ্যল্ট। করণ লক্ষণমেবেদমুপমানম্— ন্যায় সূত্রবৃত্তি; বিশ্বনাথ] কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ অথবা অন্য কোনও অব্যভিচারী সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বলিয়া উহার সিদ্ধান্ত সকল সময়েই অনিশ্চিত হইয়া থাকে।

উপরে যাহাকে সাধর্ম্ম্য বিধি বলা হইয়াছে তাহাকে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, জগতের মৌলিক ঐক্য সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা আছে উহা তাহাদের প্রকারভেদ। আমরা যে জগতে বাস করিতেছি এবং যাহার সহিত আমাদের নিত্য পরিচয় ঘটিতেছে তাহা যে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ও অসংবদ্ধ পদার্থ-রাশির সমষ্টিমাত্র নয় পরন্তু ইহা একটি ঐক্যবদ্ধ সুসংহত বস্তু এবং ইহার প্রত্যেক অংশের সহিত অপর অংশের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে এই বিশ্বাস আমাদের অন্তর্নিহিত। কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ এবং সর্ব্বত্র নিয়ামিক স্বভাব শক্তিতে বিশ্বাস এই মূল বিশ্বাসের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। দুইটি গুণ বা ক্রিয়ার মধ্যে যদি কোনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে তাহা হইলে যে কোনও পদার্থে প্রথম গুণ অথবা ক্রিয়া থাকিলে তাহার গুণ ও ক্রিয়াও অবশ্যই থাকিবে। সুতরাং কতক-গুলি পদার্থের মধ্যে কোনও গুণ বা ক্রিয়া সম্বন্ধে একটা মৌলিক সাধর্ম্ম থাকিলে সেই গুণ বা ক্রিয়ার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পৃক্ত অন্য গুণ বা ক্রিয়াও সকলের মধ্যে থাকিবে। জগতের মৌলিক ঐক্যে এই বিশ্বাসই সর্ব্বপ্রকার প্রমাণের মূল ভিত্তি।

অনুমান ও সমবায় যদি একই (সামানাধিকরণ্য) নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইবে যে, তাহাদের পার্থক্য প্রস্থান ভেদে (difference in the starting point)। কোনও এক জাতীয় বস্তুসমূহের সাধর্ম্মের সহিত একটি বিশেষ গুণ বা ক্রিয়ার অব্যভিচারী সম্বন্ধ আছে, অনুমানে এরূপ জ্ঞান হইতেই চিন্তন বা মনন ক্রিয়া আরম্ভ হয়। যখন আমরা জানিতে পারি যে, কোনও বস্তু সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত তখন সেই বিশেষ গুণ বা ক্রিয়া তাহাতেও থাকিবে ইহাই সিদ্ধান্ত করি। সমবায়ে আমরা যে কতকগুলি বিশেষ বস্তু পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে পাই তাহাদের সকলের মধ্যে একটি গুণ বা ক্রিয়া বর্ত্তমান এবং তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করি যে,অপর যে সকল বস্তুর সহিত এই বস্তুগুলির মৌলিক সাধর্ম্ম্য আছে তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে সেই গুণ বা ক্রিয়া থাকিবে। অনুমানে আমরা একটি সাধারণ সত্যকে স্বীকার করিয়া লইয়া কতকগুলি বিশেষ বস্তু বা ঘটনাতে তাহাকে প্রয়োগ দ্বারা তাহার অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করি [নব্যবর্ত্তকস্য স্বভাবস্য তথাচ সাদৃশ্যাৎ কার্য্যাৎ সদৃশকারণানুমানবিলয়াপত্তেঃ—ন্যায়লীলাবতী; পৃঃ-৮০৯] এবং সমবায়ে কতকগুলি বিশেষ বস্তু বা ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদের মধ্যে যে সংযোগসূত্র রহিয়াছে তাহা আবিষ্কার করিয়া একটি সাধারণসূত্র নিরূপণ করিবার চেষ্টা করি। [সম্বন্ধত্বঃ বিশিষ্ট প্রতীতি নিয়ামকত্বম—তর্কসংগ্রহস্য ন্যায়বোধিনীটীকা, পৃঃ ৬২]। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই জগতের একটা অংশ আমাদের সম্মুখে ঐক্যবদ্ধ সুসংহত পদার্থসমষ্টি রূপে দেখা দেয় [যদবচ্ছিন্নং তদ্ভিন্নান্ত-তরত্বমযুত সিদ্ধত্বমিত্যর্থঃ—তর্কসংগ্রহস্য ন্যায়বোধিনীটীকা, পৃঃ ৬২]। সেই ঐক্য বা সংহতি রূপকে বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট করিয়া তোলাই অনুমানের কার্য্য। অনুমান এবং সমবায় এই কার্য্যটি দুই প্রণালীতে নিষ্পন্ন করিতে পারে কিন্তু তাহাদের মূলগত উদ্দেশ্য একই। কোনও বৃত্তের কেন্দ্রের অবস্থান এবং ব্যাসার্দ্ধের দৈর্ঘ্য জানা থাকিলে আমরা সম্পূর্ণ বৃত্তটি অঙ্কিত করিতে পারি, অর্থাৎ তাহার পরিধিস্থ প্রত্যেক বিন্দুর অবস্থান নির্ণয় করিতে পারি, আবার পরিধিস্থ কয়েকটি বিন্দুর অবস্থান জানা থাকিলে আমরা তাহাদের সাহায্যেই বৃত্তের কেন্দ্র এবং ব্যাসার্দ্ধ নিরূপণ করিয়া সমগ্র বৃত্তটি অঙ্কিত করিবার পদ্ধতি নির্ণয় করিতে পারি। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই বৃত্তের সংহতিবদ্ধ রূপের ধারণা আমাদের মনে আছে বলিয়াই আমাদের জ্ঞান অগ্রসর হইতে পারে। অনুমান প্রথম প্রক্রিয়ার অনুরূপ এবং সমবায় দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার অনুরূপ। সমবায় ও অনুমান দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া নহে, আবার তাহাদের মধ্যে একটি মূল প্রক্রিয়া এবং অপরটি তাহার প্রকার ভেদ মাত্র ইহাও সত্য নহে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে সর্ব্বদাই এই দুই প্রকার অনুমানের ব্যবহার হইয়া থাকে [অকৃতকঃ সমবায় ইতি চ কার্য স্যাধার বত্বেনানুমীয়তেঃ—ন্যায়বার্ত্তিক, পৃঃ-৫৩] তবে এইরূপ সমবায়ের ব্যবহার হইবার পরও সমবায়ের অংশ বিশেষ অবশিষ্ট থাকে।*

উল্লিখিত সমূহ আলোচনা ন্যায়সূত্র ১।১৫ এর "তৎপূর্ব্বকম" অংশ ব্যাখ্যারূপে স্বীকার্য্য [এবং তাবৎ ব্যবস্থিতমেতৎ তৎ পূর্ব্বকমনুমানমিতি—ন্যায়বার্ত্তিক, পৃঃ-৫০] এবং সূত্রোল্লিখিত অনুমানের ত্রিবিধ বিভাগ পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ প্রভৃতি সমবায়ে প্রযুক্ত অনুমান বিভাগই মাত্র।

* Whilst the inductions of all advanced sciences make great use of deduction they can never be reduced without residue to that process—Our Knowledge of the external World, Dr. Broad, page-36.

জটার জালে

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

(২০)

নয় মাইল দূরে পিপুলকুঠি। ভারত-তিব্বত সীমান্তে অন্যতম প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। তিব্বতের ভোটকম্বল, চামর, বাঘ-হরিণের চামড়া, শিলাজতু ইত্যাদি পণ্য দিয়ে ঠাসা এক একটি দোকান। বিনিময়ে তিব্বতে যেতে পারে যে-সব ভারতীয় পণ্য অনেক দোকানেই তাদেরও প্রাচুর্য্য চোখে পড়বার মত। যাত্রীর প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী এবং সাজসজ্জা ত আছেই। চামৌলির চেয়েও অনেক বেশী জমজমাট শহর এই পিপুলকুঠি।

কিন্তু সেই শহরেই একি অভ্যর্থনা আমাদের! যেমন প্রকৃতির, মানুষেরও তেমনি অপ্রসন্ন মুখ। অতিথির অভ্যর্থনা দূরে থাক, আশ্রয়ই পাইনে কোথাও।

কালি কমলিওয়ালার প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালার দীনহীন সাজ দেখে এবং ভিতরে স্থানাভাব আছে শুনে বাস থেকে নেমে আমার ভাঙা পা নিয়েই জিতেনের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে তিন-চারটি চটি পর্য্যবেক্ষণ করলাম। কিন্তু সর্ব্বত্রই শুনি স্থানাভাব। একজন প্রথমে আশ্বাস দিয়ে কিছুক্ষণ তার বারান্দায় বসিয়ে রাখবার পর শেষ পর্য্যন্ত বিদায় করে দিল আমাদের দলটিকে। অগত্যা ধর্ম্মশালাই আশ্রয়।

সেই ত বাবারই প্রতিষ্ঠান। কিন্তু একি দুরবস্থা তার! শহর ও পল্লীজীবনের যা যা অবাঞ্ছনীয় কেবল সেইগুলিরই যেন বিশৃঙ্খল একটি স্তূপ। দোতলায় সিঁড়ির মুখেই শৌচাগার। সিঁড়ির দুই ধারে সুদীর্ঘ ঢালা বারান্দা থাকলেও তা অতিক্রম করে পায়রার খোপের মত যে-সব প্রকোষ্ঠে গিয়ে প্রবেশ করতে হয় তাদের প্রত্যেকটিরই দ্বার বলতে কেবলই ঐ প্রবেশপথ! তাতে চৌকাঠই নেই, তা কবাট থাকবে কোথায়? মাটির মেঝে, মনে হয় যেন এই উত্তরাখণ্ডেরই রিলিফ ম্যাপ এক একখানি—এমনি অসমান পাথর ও মাটির বিন্যাস। বাতায়ন দূরে থাক গবাক্ষও নেই বিপরীত দিকের দেয়ালে। অপরিচ্ছন্ন অন্ধকার ঘরগুলি মনে হয় যেন এক একটি অন্ধকূপ।

অথচ এহেন ধর্ম্মশালাতেও গিজগিজ করছে লোক। পাতি পাতি করে খুঁজেও কোন ঘরেই জায়গা না পেয়ে শেষ পর্য্যন্ত যেখানে আশ্রয় নিলাম আমরা, তাকে চিলে-ঘর বলা যেতে পারে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাম দিকের ঢালা বারান্দায় যাবার পথ বই নয়। তবু আয়তন একটু বেশী আছে দেখে ওখানেই দেয়ালের পাশে তাড়াতাড়ি আমাদের বিছানা দুটি পেতে অর্দ্ধেকটা পথ অধিকার করলাম আমরা। তার পর ছুটে নেমে গেলাম একটু আলো এবং খোলা হাওয়ার সন্ধানে।



পিপুলকুঠির পথ

কিন্তু হাওয়ার অভাব না থাকলেও বাইরে খোলা আকাশের নীচেও আলো কোথায়! আকাশ যে ইতিমধ্যে আরও কালো হয়ে গিয়েছে। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পেয়েছিলাম পথেই, এখন দেখি যে, বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। প্রকৃতির ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছে আমার নিজের দেহটিও। চা খাবার উদ্দেশ্যে পাশের একটি দোকানে যেতে যেতেই বেশ বুঝতে পারলাম যে, আমার ডান পায়ের সেই খচ খচ ব্যথাটা একটুও কমে নি।

চামৌলিতে গঙ্গোত্রীদের বিদায় দেবার পর থেকেই মনটা ত খারাপ হয়েই ছিল। তার উপর এত সব প্রতিকূল অবস্থার চাপে আরও মুষড়ে পড়ল তা।

অনুকূল নয় কোন অবস্থাই। উপরের ঐ মেঘে-ঢাকা আকাশের মতই গোমড়ামুখ দেখি চায়ের দোকানদারদেরও। অভ্যাস-মত স্বতন্ত্র একটু পরিচ্ছন্ন গরম জল চেয়েছিলাম তার কাছে। কারণটা সে মন দিয়ে শুনলেও পরে কিন্তু সে বিরক্ত হয়েই উত্তর দিল: অত ঝামেলা করতে পারব না বাবু। আমার তৈরি চা অন্য পাঁচজনে যা খাচ্ছে তাই খাও ত খাও, নইলে অন্য দোকান দেখ।

হোটেলের অভ্যর্থনা ও সদ্ব্যবহার ওর চেয়ে উন্নত নয়।

ধর্মশালার নীচের তলায় রান্নাঘরে ঢুকতেও প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং জিতেন স্থানীয় একটি হোটেলেই রাত্রে আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু যথাসময়ে সেখানে উপস্থিত হয়েও শুনি যে, ভাত তখনও উনানের উপরে চাপানোই হয় নি। আধঘণ্টা-খানেক অপেক্ষা করবার পর অপরিচ্ছন্ন টেবিলের উপর আহার্য্য-হিসাবে যা পাওয়া গেল তা ভোজ্য হলেও খাদ্য নয়। কেদারক্ষেত্রে অপরিপক্ব খিচুরিও যে সমাদর ও শ্রদ্ধার সংমিশ্রণে দেবভোগ্য পরমান্ন হয়ে উঠেছিল তার বিন্দুমাত্রও নেই এই মহাব্যস্ত পেশাদার ব্যবসায়ীর বাক্য বা আচরণে। নিছক পেটের তাগিদেই কিছু গলাধঃকরণ করতে হ'ল। অমন যে বাহাদুর, তারও অরুচি না থাকলেও অতৃপ্তি প্রায় আমাদেরই মত।

হোটেলের বাইরে অবস্থা আরও প্রতিকূল। ইতিমধ্যে ধারা-বর্ষণ শুরু হয়েছে। চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। কয়েকটি দোকানে মিটমিট করে আলো জ্বলছে বলেই অন্যত্র অন্ধকার মনে হয় আরও গভীর। টর্চ জ্বেলে পথ ঠিক করলাম। কিন্তু প্রতি পদক্ষেপেই ভাঙা পায়ে সেই খচখচ ব্যথাটা লাগছেই।

ইতিমধ্যে ধর্মশালায় আমাদের দখল-করা জায়গাটুকুতে যা ঘটেছে তা আমি কেবল যে কল্পনা করতে পারি নি তা নয়, এখন চোখে দেখেও বিশ্বাস হয় না আমার। সঙ্কীর্ণ ঐ চিলে-ঘরের মধ্যেই দেখি যে, আরও দু'জন লোক এসে অবশিষ্ট জায়গাটুকু দখল করে সটান শুয়ে পড়েছে। পরিপাটি করে পাতা আমাদের শয্যা দুখানিও অন্য একরকম আক্রমণে বেদখল হয় হয় অবস্থা।

দর্শনের পূর্ব্বেই স্পর্শ। বেশ মোটা এক ফোঁটা জল এসে পড়ল আমার প্রায় ব্রহ্মতালুর উপরে। ভয়ের নয়, শীতের শিহরণ অনুভব করলাম আমার সর্ব্ব অঙ্গে; আর সেই জন্যই চোখের দৃষ্টিও আমার অত্যন্ত সতর্ক ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

ততক্ষণে বাহাদুর একটি মোমবাতি জ্বালিয়েছে। সেই অল্প আলোতে দেখি যে, টালির ছাদের চার-পাঁচটি ফুটোর ভিতর দিয়ে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টির জল পড়ছে আমাদের শয্যার উপরেও। ইতিমধ্যেই বেশ ভিজেও গিয়েছে লেপতোষকের কোন কোন জায়গা।

ঘটনা শোকাবহ হলেও শোক করবার সময় নেই তখন। শাস্ত্রবাক্য—সর্ব্বনাশ উপস্থিত হলে পণ্ডিতেরা অন্ততঃ অর্দ্ধেক রক্ষা করতে চেষ্টা করবেন। আমরাও তাই করলাম। জিতেন ক্ষিপ্রহস্তে দুটি শয্যাই গুটিয়ে ফেলল। ঠিক কোন কোন জায়গায় যে উপর থেকে বৃষ্টি-জলের ফোঁটা পড়ছে তা মিনিট দশেকের মধ্যেই বুঝে নিল সে। তার পর থালা-ঘটিবাটি যা আমাদের সঙ্গে ছিল তা থেকে এক একটি পাত্র নির্দ্দিষ্ট এক এক স্থানে রেখে জলের নিম্নগতি সাফল্যের সঙ্গেই প্রতিরোধ করল সে। অবশিষ্ট যে নিরাপদ স্থানটুকু পাওয়া গেল সেইখানেই অতঃপর সংক্ষিপ্ত শয্যা রচনা হ'ল আমাদের।

কিন্তু সুপ্তি কোথায়? বৃষ্টির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করে সার্থকভাবেই তা প্রয়োগ করেছি আমরা। কিন্তু ধ্বনির আক্রমণ প্রতিরোধ করবার উপায় ত জানা নেই! খাঁটি ধর্মশালা এটি। খোল-করতাল সহযোগে সাড়ম্বর ও সমবেত কণ্ঠের তুমুল কীর্ত্তনধ্বনি ঠিক আমাদের পাশের ঘর থেকেই যেন আকার পরিগ্রহ করে তরঙ্গের মত ছুটে এসে পড়ছে আমাদের উপর। লেপ দিয়ে আগেই গা ঢেকেছিলাম, এখন কানও ঢাকলাম। তথাপি স্বরব্রহ্মের আক্রমণ থেকে নিস্তার নেই। আর ঘুম আসছে না বলেই দেহের বিভিন্ন স্থানে এত কণ্ডূয়ন নাকি?

মরার উপর খাঁড়ার ঘা হানল জিতেন। আমি ক্রমাগতই উসখুস করছি বুঝে এক সময়ে সে আমার গায়ে একটি ঠেলা দিয়ে বললে: বর্ব্বরতা থেকে সভ্যতায় ফিরে এসেছেন বলে চামোলিতে আপনি উৎসব করতে চেয়েছিলেন। এখানে পাশের ঘরে উৎসবই ত হচ্ছে। তাতে এত বিরক্তিবোধ করছেন কেন?

কেবল কি বিরক্তি! দৈহিক যন্ত্রণাও ততক্ষণে অসহ্য হয়ে উঠেছে। আমি উঠে বসে বললাম, একটা আলো জ্বাল ত জিতেন। দেখি, কিসে এত কামড়াচ্ছে।

টর্চের অল্প আলোতেই যা চোখে পড়ল তা অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য। প্রথমে ইঁদুর-ছানা বলেই ভ্রম হয়েছিল—এতবড় আকৃতি এক একটির। চশমা পরে ভাল করে তাকিয়ে দেখি যে ওরা আসলে ছারপোকাই—হিমালয়ের প্রাণী বলেই বুঝি অনুপাতরক্ষার জন্য প্রকৃতি অতবড় আকার দিয়েছেন ওদের। দুটি শয্যারই সর্ব্বত্র পিপীলিকার মত ছড়িয়ে পড়েছে তারা। ইতিমধ্যেই আমাদের রক্ত কিছু কিছু যে তাদের প্রত্যেকেরই পেটে গিয়েছে তারও প্রমাণ পেলাম বিছানার-চাদরের অঙ্গেই। আমার অজানতে আমারই কণ্ডূয়নশীল অঙ্গুলির নিষ্পেষণে যে ক'টি প্রাণী মারা পড়েছে তাদের পেটের ভিতর থেকে বের হয়ে আমার দেহের তাজা রক্ত আমারই শয্যায় ছড়িয়ে পড়েছে। প্রায় যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা প্রত্যক্ষ করে বিস্ফারিত চোখ আমাদের দু'জনেরই।

মোমবাতি জ্বালিয়ে তার উজ্জ্বলতর আলোতে দেখা গেল যে, দেয়ালের গা বেয়ে অগণিত পিপীলিকা-বাহিনীর মত অসংখ্য ধারায় অমনি অতিকায় ছারপোকারা সব নেমে আসছে হয় উপরের ছাদ, নয় ত ঐ দেয়ালেরই কোন কোন ফুটো বা ফাটল থেকে। সব ক'টি বাহিনীরই লক্ষ্য যেন আমাদেরই দুগ্ধফেননিভ শয্যা দুটি, যদিও আরও তিনটি লোক এই ঘরের মেঝেতেই কালো কম্বলের উপর শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করেছিলাম আমরা। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। রক্তবীজের মত ওদের প্রতি বিন্দু রক্ত থেকেই নূতন প্রাণীর জন্ম হয় না বটে তবে আক্ষরিক অর্থেই ওরা যে অসংখ্য। মেরে শেষ করা যাচ্ছে না ঐ ছারপোকা-বাহিনীকে। আর গায়ের জোরে ওরা আমাদের সঙ্গে না পারলেও কৌশলের প্রতিযোগিতায় ওদের

জুড়ি আমরা নই। আলো দেখলেই পালাতে জানে ওরা, আর টালির ছাদওয়ালা এই ভাঙা বাড়ীতে ওদের লুকোবার জায়গারও অভাব নেই। আমরা আলো নিভিয়ে শুলেই গোপন-গুহা থেকে বের হয়ে এসে আবার আক্রমণ সুরু করে ওরা।

পুনঃ পুনঃ শরশয্যার যন্ত্রণা আর সহ্য করতে না পেরে শেষে আমরাই রণে ভঙ্গ দিয়ে বাইরে বারান্দায় গিয়ে বসলাম।

পাশের ঘরে কীর্তন তখন থেমে গিয়েছে, তথাপি ঘুমোবার অনুকূল নয় পরিবেশ। অসহায়ের মত আমি বললাম, তিন সপ্তাহেরও বেশী হিমালয়ে ভ্রমণ করছি আমরা—এত দুর্ভোগ অন্য কোথাও ভুগতে হয় নি। আজ এমন কেন হ'ল তা বলতে পার জিতেন ?

উত্তর না দিয়ে আর একটি প্রশ্ন করল সে: আপনার কথাই সত্য হ'ল নাকি, মণিদা ? পথে সাপটাকে মেরেছি বলেই এখানে এই দুর্ভোগ নাকি আমাদের ?

অন্ধকারে মুখ দেখা গেল না তার, কিন্তু স্পষ্টই আতঙ্কিত কণ্ঠস্বর। শুনে এত কষ্টের মধ্যেও হাসি পেল আমার। বললাম, একটি সাপ মারবার প্রতিফল যদি এই হয় তাহলে আজ রাত্রে শত শত আরশোলা মারবার শাস্তি কি হতে পারে তা কল্পনা করতে পার তুমি ?

সে চেষ্টা করল না জিতেন। কিন্তু অপ্রসন্ন কণ্ঠেই সে বললে, নালা-চটি থেকে ফিরে গেলেই ভাল ছিল।

আমি এবার তার পিঠের উপর আলগোছে একটি হাত রেখে বললাম, তা যখন করা হয় নি, তখন প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়া ছাড়া আর কি উপায় আছে এখন ? রোগীর মত এস, বসে বসেই একটু ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করা যাক।

শেষ পর্যন্ত ঐ সঙ্কীর্ণ বারান্দাতেই ভূমিশয্যায় একটু ঘুমিয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু তাতে কি আর বিশ্রাম হয় ! সকালে দেহে রাজ্যের ক্লান্তি আর মনে অবসাদ।

তথাপি সকালে উঠেই বাহাদুরকে যাত্রার জন্য তৈরী হবার হুকুম দিল জিতেন।

তিক্ত কণ্ঠস্বর তার। বুঝলাম যে আজ সামনের টানের চেয়ে পিছনের ঠেলাই তার দেহ ও মনের উপর বেশী কাজ করছে। গত রাত্রির দুর্ভোগের স্মৃতিই কেবল নয়, বর্তমানের অস্বস্তিও প্রবল। দিনের আলোতে আবার স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে ঐ ধর্মশালা ও তার পরিবেশের সমস্ত কদর্যতা। সুরু হয়েছে আরশোলার বদলে মানুষের উৎপাত। কলরবে মুখর হয়ে উঠেছে সমস্ত বাড়ীখানি। আমাদের অধিকৃত টিনে-ঘরখানির ভিতর দিয়ে পায়ে কাদা বা কাঁধে মোট নিয়ে অবিরাম স্রোতে নর-নারী যারা যাতায়াত করছে তাদের চোখের দৃষ্টিতে একটুও নিমন্ত্রণ নেই আমাদের জন্য। নিমন্ত্রণ নেই চায়ের কোন দোকানেও; কলতলাতেও ঠেলাঠেলি। সমগ্রভাবে এই পিপুলকুঠি যেন প্রতি মুহূর্তেই ঠেলে বহিষ্কার করতে চায় আমাদের মত দু'জন অবাঞ্ছিত অতিথিকে।

কিন্তু সামনে বদরীনাথেরই বা আমন্ত্রণ কোথায় ? সামনের পথ অবশ্য এখান থেকে চোখে পড়ে না। তবে প্রকৃতি যে বাধা দিচ্ছেন তাতে 'ঢাক-ঢাক গুড়-গুড়' নেই। তেমন ধারাবর্ষণ এখন না থাকলেও বৃষ্টি পড়ছেই। তার সঙ্গে আজ আবার একটু হাওয়াও আছে। কালো আকাশে প্রতিশ্রুতির পরিবর্তে মাঝে মাঝে বরং দেখা যায় ভ্রূকুটির হুঁশিয়ারী।

কঠিনতর প্রতিবন্ধকতা রয়েছে আমার নিজেরই ডান পায়ের গুল্‌ফ-সন্ধিতে।

গত রাত্রে অনেকক্ষণ ধরে সেই ব্যথার জায়গাটাতে আয়োডেক্স মালিশ করেছিলাম, কিন্তু কোন উপকারই হয় নি। চলতে গেলেই খচ খচ করছে সেই জায়গাটা।

তিক্ত কবিরাজী পাচনের মত চা খেতে খেতে মনটা আমার যখন আরও তিক্ত হয়ে গিয়েছে তখনই পথের ওপারে ধর্মশালার বারান্দা থেকে জিতেনের অসহিষ্ণু কণ্ঠের ডাক কানে এল আমার: শিগগির আসুন, মণিদা, বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে যে !

তাকিয়ে দেখি যে, ইতিমধ্যে নিজেও সে রণসাজে সেজে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে গিয়েই ডানদিকের বারান্দায় চোখে পড়ল কয়েকটি পরিচিত মুখ। কেদারক্ষেত্রেই দেখেছিলাম এই দলটিকে। অনেক কুলি সঙ্গে নিয়ে ডাণ্ডি ও কাণ্ডিতে চড়ে এসেছিলেন পাটনার স্ত্রী-পুরুষ চার-পাঁচ জন। প্রৌঢ় বয়স সকলেরই। তাদেরই একজন পুরুষ হাসি-মুখে সম্ভাষণ করলেন আমাকে।

আমরা তখনই রওনা হব শুনে দুই চোখ বড় করে তিনি বললেন: অমন কম্মও করবেন না বাঙালীবাবু। কাল বিকেল থেকেই যাত্রা আমরা স্থগিত রেখেছি এই দুর্যোগের জন্য। বৃষ্টি থাকলে পাহাড়ের পথে চলতে নেই।

পিপুলকুঠিতে প্রবেশ করবার পর এই প্রথম বন্ধুভাবের সম্ভাষণ শুনলাম; সুরও আন্তরিক মঙ্গলকামনার। নিজেদের ঘরে এসে আমি জিতেনকে বললাম কথাটা।

কিন্তু সতর্কবাণী কানেও তুলল না সে; বললে, এখানে থাকার চেয়ে জাহান্নমে যাওয়াও ভাল।

একটু যা তার উদ্বেগ তা কেবল আমার ভাঙা পা'খানির জন্য। আমি যে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছি তাই লক্ষ্য করে সে বললে, একটা কাণ্ডি নিলে হয় না ?

ম্লানমতন একটু হেসে আমি উত্তর দিলাম: অতিরিক্ত টাকা কি সঙ্গে আছে ? নিজের পায়ের উপর নির্ভর করা ছাড়া এখন অন্য উপায় নেই।

একটু থেমে আমি সসঙ্কোচে আবার বললাম: তুমি, জিতেন,

আজ আমার একটু কাছে কাছেই থেকো। তাহলেই পায়ে জোর পাব আমি।

হয়ত চেষ্টাও করেছিল জিতেন। কিন্তু ঐ যে একবার বলেছি, পায়ে বুঝি পাখা আছে তার। ক্রমশঃ আমাকে ছেড়ে এগিয়ে যেতে যেতে আধ-ঘণ্টাখানেক পর একেবারেই অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

বাহাদুর অবশ্য আমার পিছনে আছে। তবু মনে আমার স্বস্তি নেই। বৃষ্টি মাথায় করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পথ চলছি। মনটা আমার উপরের আকাশের মতই ভার ভার আজ। প্রতি পদক্ষেপেই আমি যে বদরীনারায়ণের মন্দিরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি তার জন্ম একটুও উৎসাহ বোধ হচ্ছে না। বরং মনে আমার বিরক্তির সঙ্গে কেমন যেন একটা উদ্বেগ।

অনুকূল অবস্থা কেবল একটি। পথ ভাল—খুবই ভাল।

পায়দলমার্গ নয়, বাস-সড়ক। পিছনে পিপুলকুঠি পর্যন্ত যেমন এদিকেও তেমনি, যদিও যাত্রী নিয়ে মোটর-বাসগুলির নিয়মিত যাতায়াত এখনও সুরু হয় নি। অন্ততঃ যোশীমঠ পর্যন্ত মোটর চালাবার পরিকল্পনা আছে উত্তর-প্রদেশের সরকারের। তখন বুঝতে পারি নি, কিন্তু এখন, ১৯৬০ সনে, বেশ বুঝতে পারছি যে ভারত-তিব্বত সীমান্তের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা দৃঢ়তর করবার জন্মই ঐ আয়োজন হয়েছে। কেবল যাত্রীবাহী বাস নয়, সামরিক বিভাগের ভারি ভারি ট্রাক চালাবার জন্ম প্রস্তুত হচ্ছে এই নূতন মোটর-সড়ক। সুতরাং যেমন দৃঢ় তেমনি প্রশস্ত এই পথ। আর বিস্ময়কর বিন্যাস। এমন ভাবে টেনে টেনে, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পথ যে, চড়াই-উতরাই প্রায় বুঝাই যায় না।

পথ সুগম বলেই ভাঙা পা ও ভাঙা মন নিয়েও চলতে পার-ছিলাম আমি। কিন্তু খানিকক্ষণ পরেই ভেংচি কাটল সেই আমার একমাত্র বন্ধুও। আর তাও অনেকক্ষণ পর একজন মানুষ দেখে মনটা যেই আমার একটু তাজা হয়েছে ঠিক তখনই।

বিপরীত দিক থেকে একা একা আসছিলেন একজন। গৃহস্থের বেশ, কিন্তু সাধু-সাধু রূপ। সৌম্যমূর্তি প্রৌঢ় যাত্রী। কাঁচা-পাকা লম্বা চুল মাথায়, তেমনি লম্বা দাড়ি বুক পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। আমার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে স্মিতমুখে সম্ভাষণ করলেন তিনি : জয় বদরীবিশালকী!

খুশী হয়ে আমিও প্রতি-সম্ভাষণ করলাম। কিন্তু তার পরেই একটি যেন বজ্র হানলেন তিনি—দুঃসংবাদের বজ্র।

বললেন : একটু সাবধান হয়ে পথ চল বাবু—সামনে ধস নামছে।

ধস! ভদ্রলোকের মুখ থেকে শুনলাম কথাটা, না আমারই বুকের মধ্যে ধপ করে একটা শব্দ হ'ল! বিহ্বলের মত জিজ্ঞাসা করলাম আমি : কি নামছে? কি বললেন আপনি?

সামনে পাহাড় ভাঙছে, উত্তরে বললেন ভদ্রলোক : পথ কঠিন, তাই সাবধানে চলতে বললাম।

তথাপি মূঢ়ের মত আমি তার মুখের দিকে চেয়ে আছি দেখে একটু হেসে আশ্বাসের সুরেই তিনি আবার বললেন, অত ভাবনা কেন? তেমন কিছু নয়—আমিও ত সেই পথেই এলাম। বদরীবিশালের নাম করতে করতে চলে যাও। তবে সাবধানে পা ফেল।

মুখ ফিরিয়ে দেখি যে, ভারবাহী বাহাদুর ঠিক আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আমাদের কথাবার্তা শুনছে। অসহিষ্ণু মুখের ভাব তার। শুভাকাঙ্ক্ষী যাত্রীটিকে পথ ছেড়ে দেবার পর আমাকে উদ্দেশ করে সে বললে, চলিয়ে বাবুজী হম নে পহলেহী শুনা থা।

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, তবে আগে বলিস নি কেন?

বাহাদুরও বিরক্ত হয়েই উত্তর দিল : ক্যা হোতা বোলনে সে? ঠহরনেকা মন নহী থা ছোটাবাবুকা।

তরুর মত সহিষ্ণু যে বাহাদুর, তার আজ এত অসহিষ্ণুতা কেন? বিস্মিত হলাম আমি। কিন্তু পিঠের উপর বোঝা রয়েছে তার—প্রায় গরু-মোষের মতই এখন তার আকার। মুখ দেখা যায় না। কি যে সে ভাবছে তা সঠিক বুঝা গেল না।

এদিকে বৃষ্টির বেগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে পথের চেহারা এবং পরিবেশের রূপও। সড়ক এদিকে আর তত প্রশস্ত নয়, দেখতেও কাঁচা সড়কের মত। সেই মোটর সড়ক হলেও অনুমান করলাম যে, এদিকে নির্মাণকার্য তখনও সম্পূর্ণ হয় নি। আজ উতরাই পথেই বরাবর চলে এসেছি। এখন যেখানে আছি সেটা মনে হ'ল যে পাহাড়ের কোল নয়, চরণের কাছাকাছি। আমরা আরও একটু অগ্রসর হবার পর স্পষ্টই বুঝা গেল তা। সামনেই দেখা গেল ছোট একটি পুল যার মানে এই যে,অবিলম্বেই একটি পাহাড় অতিক্রম করে আর একটি পাহাড়ের গোড়ায় গিয়ে পৌঁছব আমরা। আমাদের বাম দিকে অলকনন্দার খদ। ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে এখন মাঝে মাঝে দেখা যায় তাকে।

ওদিকে কেদারের পথের সঙ্গে কতকটা সাদৃশ্য আছে এ পথের। তবে বৈসাদৃশ্যও বেশ প্রকট। ওদিকে দু'এক ফার্লং পরে পরেই রীতিমত চটি না হউক, দু'একটি চায়ের দোকান অবশ্যই পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু পিপুলকুঠি ছাড়বার পর এ পথে তেমন একটিও চোখে পড়ল না।

একমাত্র ভরসা নিজের মনেরই একটা কল্পনার মধ্যে। পাণ্ডার দেওয়া গাইড বইতে দেখেছি যে পিপুলকুঠির পরেই গড়ুর গঙ্গা চটি। সেটি আবার বদরীপথের স্বনামধন্য তীর্থ। পাহাড়ের উপর থেকে নেমে যাত্রী সড়ক কেটে দু' ভাগ করে যে পাগলা ঝোরা খানিকটা নীচে অলকনন্দার সঙ্গে গিয়ে মিলেছে তারই নাম গড়ুর গঙ্গা। বিষ্ণুর বাহন পক্ষীরাজ গড়ুর নাকি সেই নদীর তীরে দীর্ঘকাল তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলে গড়ুর গঙ্গা নাম হয়েছে তার। সে গঙ্গায় স্নান করলে অসীম পুণ্য লাভ হয়; অতিরিক্ত মহামূল্য একটি পার্থিব লাভও নাকি হয় গড়ুর গঙ্গার গর্ভ থেকে কোন একটি নুড়ি কুড়িয়ে ঘরে নিয়ে যেতে পারলে।

গড়ুরের বরেই নাকি সর্পবিষের অব্যর্থ প্রতিষেধক হয়ে আছে গড়ুর-গঙ্গা নদীর গর্ভস্থ প্রত্যেকটি নুড়িই।

কিন্তু সে নুড়ি সংগ্রহ করবার জন্য কোন আগ্রহ ছিল না আমার মনে, এমন দুর্যোগের দিনে গড়ুর-গঙ্গায় স্নান করবার ইচ্ছাও নয়। তীর্থ নয়, চটির জন্য আগ্রহ আমার। আশা ছিল যে, অমন একটি নামকরা তীর্থের এলাকায় প্রবেশ করলেই দেখতে পাব যে, কোন একটি দোকানে গরম চা প্রস্তুত করে জিতেন আমার জন্য অপেক্ষা করছে। ভরসাও ছিল যে তখন তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করাতে পারব আজকের দিনটা সেখানেই থেকে যাবার জন্য।

কিন্তু সে আশাও নির্মূল হল আমার।

সামনের পুলটি পার হয়ে লোকালয়ের আভাস যেখানে পেলাম সে জায়গাটার নাম গড়ুর চটি হলেও প্রসিদ্ধ গড়ুর-গঙ্গা তীর্থ তা নয়। এখানে না আছে মন্দির, না ধর্মশালা। চটিও নেই। একটিমাত্র দীনহীন কুটিরে সামান্য কয়েকটি বিবর্ণ আসবাব ও একটি জ্বলন্ত উনান নিয়ে বুড়োমতন যে গাড়োয়ালী দোকানদার ছবির গড়ুড়ের ভঙ্গিতেই উপবেশন করে একা একা তন্দ্রাসুখ উপভোগ করছিল, তার কাছে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম যে, আমারই মত দীর্ঘদেহ একজন বাঙালী যাত্রী আধঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে এই পথ দিয়েই যোশীমঠের দিকে এগিয়ে গিয়েছে।

সুতরাং থাকা চলে না এখানে। আর থাকবার উপযুক্তও নয় জায়গাটা। গড়ুর-গঙ্গা চটি এটি নয়। নূতন মোটর সড়কের ধারে একেবারে নূতন একটি চটির পত্তন হয়েছে মাত্র। এখানে জলের কল নেই, শৌচাগার নেই, দ্বিতীয় আর কোন দোকান নেই, একটিমাত্র দোকানঘরের চারিদিকেই সুদৃঢ় বেড়াও নেই। কাজেই এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায়ই নেই আমাদের।

এগিয়েই চললাম।

একটি নয়, এক টানে দুটি বাঁক—কতকটা ইংরেজী "S" অক্ষরের মত। সবটা দুরন্ত এক ফার্লং হবে হয়ত। একটি যেন কিম্ভূতকিমাকার অতিকায় জীবের অনাহারক্লিষ্ট উদর ও অতি-স্ফীত বুক। দোকান থেকেই সোজা গিয়ে নামতে হয়েছিল তার জঠর গহ্বরে। সেখানে আর একটি ছোট পুল। সেটি পার হয়ে উঠলাম গিয়ে সেই অতি-স্ফীত বক্ষের উপরে। ইংরেজী "S" অক্ষরের দ্বিতীয় অর্দ্ধবৃত্ত সেটি। অমনি বাঁক সামনে আরও আছে কি না, তাই ভাবতে ভাবতে পায়ের সেই খচ খচ ব্যথাটা নিয়ে আজকের পথে এই প্রথম কষ্টসাধ্য একটি চড়াই ভাঙছিলাম। কিন্তু বাঁকের বঙ্কিমত্বটুকু অতিক্রম করতেই সামনে দেখলাম যেন তেপান্তরের মাঠ। পাহাড় ও পথের যে দৃশ্য এইমাত্র পিছনে ফেলে এলাম, সামনে একেবারে তার বিপরীত।

মোটেই তেমন উঁচু নয় আমার ডান দিকের খাড়া পাহাড়টি। সামনে অনেক দূর পর্য্যন্ত একটানা দৈর্ঘ্য ও চ্যাপটা গঠন। দেখলে মনে হয় যে, ওটি পাহাড় না হয়ে আধুনিক বন্যানিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার একটি 'ড্যাম'ও হতে পারে। বামদিকে অলকনন্দার খদ কিন্তু তুলনায় অনেক বেশী গভীর এবং খাড়া। তার অপর তীরে ধূসর রেখার মত যে পাহাড়শ্রেণী দেখা যাচ্ছে তা মনে হয় যেন খুবই নীচু। সামনে আমার প্রসারিত দৃষ্টিকে বাধা দেবার জন্য না আছে কোন পাহাড়, না গাছপালা। পায়ের নীচের সড়ক কাঁচা হলেও বেশ প্রশস্ত; আর এ জায়গাটাতে মোটেই তরঙ্গায়িত গঠন নয় তার। হঠাৎ যেন সমতল ভূমিতে নেমে এসেছি বলে ভ্রম হয়। আর সেইজন্যই মনে হ'ল যেন মাঠ।

কিন্তু উল্লাসে নেচে উঠল না আমার মন। বরং সে যেন ভয়ে বিহ্বল। মনে হচ্ছে যেন জনহীন প্রান্তরে পথহারা এক পথিক আমি—সামনে ধু ধু করছে তেপান্তরের মাঠ। বৃষ্টির বেগ আগেই ত বৃদ্ধি পেয়েছিল, এখন এই খোলা জায়গায় আমার দুর্ব্বল দেহের উপর চারিদিক থেকে মুষলধারার আক্রমণ অসহ্য হয়ে উঠল। পায়ে ক্যানভাসের জুতা ও পশমী মোজা আগেই ভিজে গিয়েছিল, এখন গায়ের বর্ষাতিও দেখি যে জল আর প্রতিরোধ করতে পারছে না। বেশ শীত লাগছে এখন। পায়ের সেই খচ খচ ব্যথাটার জন্য দ্রুতবেগে চলতে পারছি নে বলে আরও বেশী।

এমনি যখন দেহ ও মনের অবস্থা আমার তখন হঠাৎ একটা আওয়াজ কানে এল—গুম গুম গুম—

ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়ালাম, পিছনে তাকিয়ে দেখি যে বাহাদুরও থমকে দাঁড়িয়েছে। বিহ্বলের মত জিজ্ঞাসা করলাম তাকে: ও কি রে?

সে বললে, ধস।

আর একবার চমকে উঠলাম। মাথার ছাতাটাকে চোখের সামনে থেকে পিছন দিকে একটু সরিয়ে দুই চোখ বড় করে তাকালাম একবার সামনে ও একবার আমার দক্ষিণের পাহাড়টির ভোঁতা চূড়ার দিকে। দৃষ্টি অতদূর পর্য্যন্ত তুলতেও হ'ল না। ইতি-মধ্যেই প্রত্যক্ষ-দর্শন। হাল্কা কুয়াশার পাতলা চাদরখানা ছাড়া মাঝে আর কোন আবরণ নেই। একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি আমরা—আমি আর ধস।

২১

তা হলে এই সেই ভয়ঙ্কর।

সামনে হাত দশেক দূরেই পথ দেখি যে আর পথ নেই। রাশি রাশি মাটি, কাদা, সমূল ও সপল্লব ছোট ছোট গাছ এবং ছোট, মাঝারি, বড়—নানা আকারের শিলা স্তূপাকারে এসে পড়েছে পথের উপর। নিশ্চল স্তূপ নয় তা, যেন প্রাণ আছে তার। আছে অঙ্গসঞ্চালন, আছে গতি। অথবা কোন এক অদৃশ্য চুল্লীর আগুনে প্রকাণ্ড একটি কটাহের মধ্যে টগবগ করে ফুটছে কাদামাটি পাথরের ঘনীভূত ক্বাথ—থেকে থেকে উপচে পড়ছে এবং সেই

গতির বেগেই বাম দিকে প্রশস্ত এই মোটর সড়কের সীমা অতিক্রম করে সশব্দে গড়িয়ে পড়ছে গিয়ে অলকনন্দার পাতালস্পর্শী গহ্বরে।

আরও ভয়ঙ্কর আমার ডানদিকের পাহাড়ের রূপ। হিমাদ্রি স্থাণু নন এখানে, গতির বেগে চঞ্চল হয়ে উঠেছে তার প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তবে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ হয়ে আকাশে উড়ে যাবার আবেগ তার নয়, ওদিকে মন্দাকিনী এবং এদিকে অলকনন্দার সঙ্গে মিলনের জন্য যে আবেগ ইতিপূর্ব্বে থেকে থেকেই লক্ষ্য করেছি অবতরণশীলা প্রত্যেকটি নির্ঝরিণীর অবিরাম গতিছন্দে, তেমনি উচ্ছল না হলেও ঠিক সেই আবেগই দেখছি আমার ডাইনে এই পাহাড়টির বিপুল বক্ষের অবিরাম কম্পনের ভয়ঙ্কর গদ্য-ছন্দেও। বুঝি অলকনন্দার কোলের জন্যই তারও এই ক্রন্দন, তার গতিও নীচের দিকেই। ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে ভেঙে লুটিয়ে পড়ছে পাহাড় পথের উপর এবং সেখান থেকে গড়িয়ে বাম দিকে খাদের পথে অলকনন্দার কোলের দিকে।

ঝুর ঝুর করে ভাঙছে, ফট ফট করে শব্দ হচ্ছে পতনোন্মুখ শিলার সঙ্গে অন্যান্য শিলার সংঘর্ষের। গোড়া থেকে শিখর পর্যন্ত যতটুকু চোখে পড়ে তার সর্ব্বত্রই ঐ একই লীলা। যেন একই সুরে বাঁধা হয়েছে বিপুলায়তন একটি যন্ত্র, একই ছন্দে গতি এই পাহাড়টির অগণিত কম্পমান অঙ্গ প্রত্যঙ্গের। সম্মিলিত ঐকতান গুম গুম গুম।

নটরাজের প্রলয় নাচন মনে করতে পারি নে। জটাজাল আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয় নি, ফুঁ পড়েনি প্রলয় বিষাণে, তাথৈ তাথৈ পদক্ষেপের আভাসও নেই দৃশ্য বা শব্দের মধ্যে। ঢিমে তাল ও বিলম্বিত লয়ের মৃদুকম্পন শুধু বুঝি তার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটির, তথাপি তারই ছন্দে ছন্দে নিয়তির মত দুর্ব্বার, সর্পের মত ক্রুর ও মৃত্যুর মত নিশ্চিত ধ্বংস ধীরে ধীরে গ্রাস করছে মিশ্রিত শিলা ও মাটির বিপুলায়তন এই অচল পাহাড়টিকে।

অদৃশ্য ক্ষয় ও অনিয়ন্ত্রিত ছন্দ, কিন্তু পতন অবিরাম, তাকালেই বেশ বুঝা যায় যে, চোখে দেখা যাচ্ছে যে কালো কালো পাথরগুলি তাদের প্রত্যেকটিই যেন একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে কোন এক অদৃশ্য সেনাপতির নির্দ্দেশ পেলেই লাফিয়ে পড়বার জন্য। পড়ছেও থেকে থেকেই। কিন্তু একটিও একা নয়। গড়িয়ে পড়তে পড়তে ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে যাকে যাকে সে ছুঁয়ে যেতে পারছে তাদেরও সবাইকেই সঙ্গে নিয়ে পড়বে সে, সেই সঙ্গে পথের উপর টেনে নামাবে সে ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি-কাদা এবং অগুন্তি পাথরকুচিও।

নামাচ্ছেও তাই। ধস ধস শব্দে পড়ছে বলেই ধস নাম হয়েছে পাহাড়ের এই ধ্বংসলীলার। কিন্তু মাঝে মাঝে অধিকতর তীক্ষ্ণ ধ্বনিও কানে আসে। গতির বেগে এবং অন্যান্য শিলাখণ্ডের সঙ্গে সঙ্ঘাতের ফলে প্রকাণ্ড এক একখানি পাথরও মাঝপথেই বোমার মত সশব্দে ফেটে চৌচির হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

পাহাড়ের ভাঙন সুরু হবার পর কখন যে কি আকারের ধস নামবে কে বলতে পারে তা? অন্ততঃ আমার মত অনভিজ্ঞেরা ত নিশ্চয়ই নয়।

বিস্ফারিত চোখদুটির সমস্ত দৃষ্টি দিয়ে কিছুক্ষণ ঐ ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখবার পর আমি পিছনে বাহাদুরের দিকে চেয়ে অসহায়ের মত বললাম, এই জায়গাটা কেমন করে পার হব বাহাদুর?

নীরসকণ্ঠে উত্তর দিল সে: পার না হয়ে আর উপায় কি? খদের দিকটা ঘেঁষে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে হবে।

তার চেয়ে ফিরে গেলে হয় না?

সো ক্যায়সে হো সকতা বাবুজী? ছোটা বাবুজী ত আগে বাড় গয়ে।

ঠিকই ত। এতক্ষণে স্মরণ হ'ল আমার যে জিতেন আমাদের সঙ্গে নেই এবং সে একা একাই এগিয়ে গিয়েছে। অসাধারণ মোটেই নয় তার এ হেন ব্যবহার। তবু—

এক নিমেষেই সবগুলি দৃষ্টান্তই মনে পড়ে গেল। প্রথমে প্ররোচনা এবং পরে অনেক আশ্বাস দিয়ে যে ব্যক্তি ঘর থেকে আমাকে হিমালয়ের এই দুর্গম পথে টেনে এনেছে তার কর্ত্তব্যচ্যুতির দৃষ্টান্ত হিসাবে ওদের কোনটিই উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু আজ একেবারে সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে সে। চরম অবিবেচনা ও দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতার অকাট্য প্রমাণ তার আজকের আচরণ। আমাদের মঙ্গলামঙ্গল সম্বন্ধে তার নির্ম্মম উপেক্ষারও। এমন একটি ভয়ঙ্কর জায়গাতেও সে যে তার পিছিয়ে-পড়া সাথীটির জন্য অপেক্ষা করবে না তা ইতিপূর্ব্বের অত সব তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও আমি কল্পনা করতে পারি নি। আশা ও আস্থা ছিল বলেই মৃত্যুর ঐ ভয়ঙ্কর ফাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে বাহাদুরের তিক্ত কণ্ঠের নির্ম্মম সত্যকথন শুনবার পর রাগের চেয়ে ক্ষোভ ও দুঃখই বেশী আমার মনে। অকস্মাৎ আমার চোখ ফেটে জল এল যেন। অসহায়ের মত আমি বাহাদুরকে বললাম, কি করা যাবে তা হলে?

বাহাদুর আড়চোখে আর একবার তাকিয়ে দেখল তার সামনে, ডান দিকে সেই অবিরাম ধস নামার দৃশ্য, তার পর আমাকে উৎসাহ দেবার জন্যই সে বললে, কি আর করা যাবে—এগিয়ে চলুন। ছোট বাবুও ত এই পথেই গিয়েছেন।

তাও ঠিক।

জিতেনের অবাঞ্ছিত আচরণের অপর দিক ওটা। অভিমানে অন্ধ হয়ে এতক্ষণ দেখতে পাই নি, এখন সে দিকটাও চোখে পড়ল আমার। দেখে সাহস এবং উৎসাহও একটু পেলাম। যে জায়গাটা কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই জিতেন পার হয়ে গিয়েছে সেটা আমরা পার হতে পারব না কেন? আমার চোখের সামনে যে পাহাড়টা ভাঙছে তার দৈর্ঘ্যও ত খুব বেশী নয়।

আরও একটু উৎসাহ পেলাম অন্য একটি দৃশ্য থেকে। এতক্ষণ পর সেটিও এই প্রথম চোখে পড়ল আমার। গজ দশেক দূরেই অটুট রয়েছে যে পাহাড়গুলি তাদের গোড়ার কাছে এই সড়কের

উপরেই তিন জন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখলাম। তাদের একজন দেখতে একটু বাবু মতন, অপর দুজনের হাতে কোদাল না শাবল কি সব যন্ত্র—যা থেকে অনুমান করা যায় যে, তারা খেটে-খাওয়া মানুষ। তিন জনেই দেখি যে আমাদের দিকে চেয়ে আছে—মনে হ'ল যেন মুচকি মুচকি হাসছেও।

তাতেই নিজে আমি ভয় পেয়েছি বলে একটু লজ্জাও হ'ল আমার। আবার বাহাদুরের দিকে চেয়ে আমি বললাম, তাই হোক তা হলে। আমি এগই—তুমি এস আমার পিছনে পিছনে। জয় বদরীবিশালকী—

বলে সামনের দিকে পাও বাড়িয়েছিলাম আমি। কিন্তু তখনই বাহাদুর খপ করে আমার একটা হাত চেপে ধরল; মুখে সে ব্যাকুল স্বরে বললে, ঠহরো বাবুজী। ঐ সে মত চলনা।

তার পর একটা কাণ্ড করল সে।

খানিকটা পিছিয়ে গেল বাহাদুর। কিছুক্ষণ বুঝি সে খুঁজল জুতসই একখানা উঁচু পাথর; কিন্তু তা না পেয়ে অবশেষে কুশলী-খেলোয়ারের মত পথের উপরেই চিৎ হয়ে শুয়ে কপালের ফাঁস আলগা করে পিঠের বোঝা মাটিতে ফেলে আবার উঠে দাঁড়াল সে। ফিরে এসে আমার হাত ধরল; তার পর বললে, অব চলো বাবুজী।

সেই অতিকায় উত্তপ্ত কটাহে ফুটন্ত ক্বাথের মত উত্তাল, কিন্তু বরফের মত শীতল ভগ্নস্তূপের উপর দিয়ে অস্থির চরণে সতর্ক গতি আমার। পাহাড় তখনও ভাঙছেই; গড়গড় শব্দে ছোট মতন একটি পাথর অনেকখানি মাটি-কাদা সঙ্গে নিয়ে একবার এসে পড়ল প্রায় আমার পায়ের কাছেই। শীতের দোসর এখন ভয়; হাত-পা আমার কাঁপছে ঐ যাকে বলে বাতাহত বেতসীলতার মত, মুখ শুকিয়ে গিয়েছে; আর প্রতি পদক্ষেপে খচ খচ ব্যথা লাগছে ডান পায়ের গুল্‌ফ-সন্ধির কাছে।

তবে জায়গাটা দু'জনে নিরাপদেই পার হয়ে এলাম। সেই তিনটি লোকের কাছাকাছি আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে বাহাদুর আবার ঐ ভগ্নস্তূপ অতিক্রম করে ফিরে গেল তার মোট, মানে আমাদের মালপত্রের কাছে।

লোক তিন জনের এক জন কি যেন আমাকে জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু তখন আমার সম্পূর্ণ মনোযোগ গিয়েছে বাহাদুরের দিকে। দেখলাম যে কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টা করবার পর সেই প্রায় দেড়-মণি বোঝাটা পিঠে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে; যথাসম্ভব চোখ উঁচু করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ডানদিকের সেই ভয়ঙ্কর টলমলে পাহাড়টির দিকে। তার পর চোখ নামিয়ে নিজেও সে ঐ পাহাড়টির মতই টলতে টলতে আমার দিকে অগ্রসর হ'ল।

রুদ্ধনিঃশ্বাসে চেয়ে দেখছি আমি—অথবা কিছুই দেখছি নে। হঠাৎ কানে এল আমার—হুঁশিয়ার জওয়ান।

পর মুহূর্তেই কাতর একটি চিৎকারের সঙ্গে বিকট একটি নাদ—ঝপাৎ—ঠং।

মাটিতে পড়ে গিয়েছে বাহাদুর। মোটটি তার পিঠ থেকে ছিটকে পড়েছে। কিন্তু আয়তনে সেই মোটের চেয়েও অনেক বড় মাটি-কাদা-পাথরের বিরাট একটি তাল হুর হুর করে নেমে এসে চেপে বসেছে বাহাদুরের পিঠ বা বুকের উপর। সম্পূর্ণ মানুষটিকে আর দেখা যায় না। কেবল একখানা তার হাতই বুঝি দেখলাম কিছু একটা আঁকড়ে ধরবার ব্যর্থ চেষ্টায় ভগ্নস্তূপের উপরে উঠে এসেছে। আর যেন কানে এল আমার তার আর্তকণ্ঠের কাতর আহ্বান—বাবুজী!

কিন্তু একি বৈসাদৃশ্য! আরও একটি ধ্বনি কানে এল যেন পৈশাচিক অট্টহাস্য। ঐ সঙ্গে দুটি শব্দও—শালা নেপালী!

বিশ্বাসই হয় না যে কানে শুনেছি আমি। তবে চমকে উঠে পাশের দিকে তাকাবার পর আর অবিশ্বাসও করতে পারি নে। দেখলাম যে সেই তিন জন লোক প্রায় আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ভূপতিত বাহাদুরের দিকে চেয়ে দাঁত বের করে হাসছে।

নারকীয় দৃশ্য। কিন্তু ওখানে ও অবস্থায় ঐ তিনটি লোকই যে আমার একমাত্র আশ্বাস ও আশ্রয়। তাদেরই উদ্দেশ্যে দুই হাত জোড় করে আমি বললাম, বদরীবিশালকা নামপর বচাও উস আদমীকো।

উত্তর হ'ল: আদমী আপ কিসকো বলতে হ্যায়? ওহ ত এক বুদ্ধ জানোয়ার। উসকো ত মরণা হী চাহিয়ে।

অবিশ্বাস্য আচরণ মানুষের প্রতি মানুষের। ঘৃণায়, বিরক্তিতে রি রি করছে আমার মন। তথাপি আমার দুই হাতে আমি হাত জড়িয়ে ধরলাম সবচেয়ে কাছের লোকটির; কাতর অনুনয়ের স্বরে বললাম, সব মানছি। তবে এখন নয় ভাইয়া—গালমন্দ যা ইচ্ছা পরে দিও। এখন বাঁচাও ওকে—তুলে নিয়ে এস এই জায়গাটাতে। আমার ত সাধ্য নেই—গায়ে জোরই নেই আমার।

তবে গরজই বা কেন? মরুক না। ও ত কুলি।

তবু মানুষ।

ভস্মে ঘি ঢালা। ও কথা শুনে ভাবান্তর যা হ'ল তা আমার প্রত্যাশার বিপরীত। আবার দেখি যে, দাঁত বের করে হাসছে ওরা তিন জনেই।

আর মাটি-কাদা-পাথর স্তূপের নীচে পড়ে বাহাদুর ওখানে কাঁদছে—আহত একটি কুকুরের কোঁও কোঁও ক্রন্দনধ্বনি যেন।

মাথাটা আমার কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। তবু তাতে খেলে গেল বুদ্ধিটা। বললাম, অচ্ছা বকশিস মিলেগা—পহলে বচাও উস কুলিকো।

লোক তিন জন একথা শুনে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল কিছুক্ষণ; তার পর তাদের একজন বললে, দু'টাকা লাগবে বাবু।

তৎক্ষণাৎ রাজী আমি। ফলও হ'ল তাতে। বাবুমতন দেখতে যে লোকটি সে মাথার ইসারায় সম্মতি ও হুকুম দিল, যে দুটিকে



দোল পূর্ণিমা

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

(প্রবাসী, মাঘ ১৩৩১ হইতে পুনর্মুদ্রিত)

মনে হয়েছিল মজুর তারাই এগিয়ে গিয়ে তুলে নিয়ে এল প্রথমে আমার মোটটি ও পরে বাহাদুরকে।

তবে তিন জনেই আবার গালিও দিচ্ছে তাকে। পাহাড়-ভাঙা মাটি পাথরের চেয়ে কম ভারি ও কম তীক্ষ্ণ নয় বেচারা বাহাদুরের উপর বিরক্তি ও বিদ্বেষের এই অসাধারণ ও অতিরিক্ত বর্ষণ।

কিন্তু বাহাদুরের দিকেই তখনও প্রধান মনোযোগ আমার। নিজের ভাঙা পা নিয়ে যথাসম্ভব দ্রুতবেগে তার কাছে গিয়ে একটি হাত ধরলাম তার। তাকে টেনে তুলবার মত দৈহিক শক্তি আমার নেই, শুধু মুখে বললাম, উঠ বাহাদুর—উঠে দাঁড়াও ত।

তার পর আবার রুদ্ধনিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করছি।

কিন্তু আবার দেখলাম অপ্রত্যাশিত দৃশ্য। এবার আর ভয়ঙ্কর নয়, শোচনীয়। মাটিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার জন্য সে কি প্রাণপণ চেষ্টা বাহাদুরের—একবার এক পায়ের উপর নির্ভর করছে সে, আবার অপরটির উপর। একবার উঠেও দাঁড়াল সে। কিন্তু ভঙ্গি যে দেখছি অষ্টাবক্রের। অদূরের ঐ পাহাড়টার মতই থরথর কাঁপছে বাহাদুর—যন্ত্রণায় বিকৃত তার মুখ। পরক্ষণেই এক চাপ ধসের মতই আবার সে মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই আমার কানে এল তার আর্তকণ্ঠের কাতর বিলাপ—বাবুজী হম ত মরগয়া।

চোখে দেখে কিছুই বুঝা যায় না। বাহাদুরের দেহের দু-তিন জায়গায় কেটে গিয়েছে দেখলাম, রক্তপাত কিছু হয়েছে এবং হচ্ছেও। কিন্তু একটি ক্ষতও তেমন গভীর নয়, রক্তপাতের পরিমাণও সামান্য। বাহাদুরের লোহা-পেটা শরীরটিকে কাবু করবার মত উপসর্গ একটিও নয়। তথাপি উঠে যে সে দাঁড়াতে পারছে না তা ত আমার কাছে প্রত্যক্ষ সত্য। সুতরাং অনুমান করছি যে, তার কোমড় বা পায়ের কোন অস্থি গুরুতরভাবে জখম হয়েছে।

ফল বাহাদুরের পক্ষে যাই হোক না কেন, আপাততঃ আমার পক্ষে মারাত্মক। ভারবাহী কুলির সচল দেহ আকস্মিক আঘাতে অচল আর একটি গুরুভার বোঝাতে পরিণত হয়েছে। সে ভার এখন বইবে কে?

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে আবার সেই তিনটি লোকের দিকে তাকালাম আমি, তাড়াতাড়ি দুটি টাকা বের করে তাদের এক জনের হাতে দিয়ে বললাম, তোমরা অনেক উপকার করেছ আমার। তবু আরও একটু করতে হবে ভাই। দয়া করে তোমরা তিন জনে ভাগাভাগি করে আমার এই কুলি আর মোটটাকে সামনের চটিতে পৌঁছিয়ে দাও।

উত্তরে সেই বাবু মতন লোকটি বললে, নহী হো সকতা। সড়ক ঠিক নহী হ্যায়। উসতরফ হম নহী জায়েঙ্গে।

কোন দিকে যাবে তাহলে?

আঙুল দিয়ে বিপরীত দিক নির্দেশ করল লোকটি—অর্থাৎ যেদিক থেকে আমরা এসেছি।

সর্বনাশ! এ যে উভয়সঙ্কট আমার। সামনে আরও যে ধস নামছে তা না জেনেই ত জিতেন যোশীমঠের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। পথে সেও পাহাড়-চাপা পড়ল না ত? আমি না পাচ্ছি তার কোন সংবাদ, না তাকে জানাতে পারছি আমাদের দুরবস্থার কথা। তার টাকা পয়সা এবং বিছানাপত্রও ত রয়েছে আমাদেরই সঙ্গে। সে সব নিয়ে বিপরীত দিকে আমি যাই কেমন করে? আর না গিয়ে এই ঘোর দুর্যোগের দিনে আহত কুলিটিকে নিয়ে এই তেপান্তরের মাঠের মধ্যে আমি থাকবই বা কোন হিসাবে? এ দিকের যে পাহাড়টা এখনও অক্ষত আছে দেখছি তাতেও যদি ভাঙন সুরু হয়!—

ভাবতেই ভয়ে আমার বুকের রক্ত জল হয়ে গেল। নিশ্বাসও যেন বন্ধ হয়ে আসছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই যে ভাব আমার মনে জেগে উঠল তা আত্মরক্ষার আদিম প্রবৃত্তি, জিতেনের বিরুদ্ধে একটা অন্ধ আক্রোশ এবং আমার পায়ের কাছেই যোক্রদ্যমান আহত বাহাদুরের প্রতি করুণার একত্র সংমিশ্রণে প্রায় এক বীভৎস রস। সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডে মেপে ভাল-মন্দের বিচার করবার শক্তি তখন আর আমার নেই। সময়ও নেই। সুতরাং তৎক্ষণাৎ মনের ভিতর থেকে সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে সেই লোকটির দিকে চেয়ে আমি বললাম, তাহলে উলটো দিকেই নিয়ে চল কুলিটাকে—অন্ততঃ গড়ুর চটি পর্যন্ত।

কিন্তু এবারও অস্বীকার করল লোকটি: সো ভী নহী হো সকতা।

ক্যোঁও?

হমলোগ সরকারকে নোকর, কুলী নহী হ্যায়।

পুরা বকশিষ দেঙ্গে।

তব ভী ছোটা কাম নহী কর সকতে।

লেকিন য়হ তো ধরমকা কাম হ্যায়।

নহী হো সকতা বাবুজী—উপরসে হুকুম নহী হ্যায়।

বলেই তার সঙ্গী দু'জনকে সে হুকুম দিল যন্ত্রপাতি সব গুছিয়ে নিয়ে রওনা হবার জন্য। আর সত্যই আমাদের দু'জনকে ওখানে ফেলে রেখে গড়ুর চটির দিকে যাত্রাও করল তারা।

বিশ্বাস হয় না আমার। কিন্তু বিশ্বাস না করবার যখন আর কোন উপায় থাকল না তখন আমি প্রায় আর্তনাদ করে বললাম: তব হমলোগোকে ক্যা উপায় হো গা?

দূর থেকে উত্তর এল: কুলি মিলনেসে ভেজ দেগা।

কিন্তু কোথায় কুলি? আধঘণ্টাখানেক পরে গড়ুর চটির দিক থেকে যারা এল তারা তিন-চারটি ছোট ছোট ছেলে। পরণে তাদের হাফ-প্যান্ট ও গরম কোট, মাথায় কান-ঢাকা টুপি এবং পিঠে ছোট ছোট ব্যাগ। সামনে যোশীমঠে অবস্থিত এক আবাসিক বিদ্যালয়ের ছাত্র তারা। কি একটা ছুটিতে বাড়ীতে এসেছিল, এখন বোর্ডিং-এ ফিরে যাচ্ছে। পাহাড়ের ধস-নামা তারা জন্ম থেকেই দেখে আসছে বলেই বুঝি এ রকম অবস্থায় সঙ্কট এড়িয়ে চলতে জানে তারা। এলাও তাই। পার্বত্য

মূষিকের মত দ্রুতবেগে এবং নিরাপদেই তারা পার হয়ে এল ঐ ভাঙনের জায়গাটা।

আমাদের দুরবস্থা দেখে তাদের সহানুভূতির অন্ত নেই। কিন্তু কি করতে পারে ঐ বালকেরা? আমিই বা কি করতে বলব তাদের? সামনের পথ খারাপ আছে জেনেও তারা সেদিকেই এগিয়ে গেল দেখে আমি শুধু তাদের বললাম, পথে আমার মত কোন বাঙালী-যাত্রীর দেখা পেলে তাকে আমাদের অবস্থা জানিয়ে দিতে।

জিতেনকে ফিরে আসতে বলব, এখন সে প্রবৃত্তিও আমার হয় না।

তবু ঐ ছেলে ক'টি এগিয়ে গিয়ে একটি বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হবার পর আমি আমার মনের কানে ক্রমাগতই আশার গুঞ্জন শুনছি যেন—জিতেন খবর পাবে এবং খবর পেয়েই চলেও আসবে সে। সেই আশাই আমার উদগ্র হয়ে উঠল যখন মিনিট পনর পরেই অস্পষ্ট কুয়াশার ভিতর দিয়ে ছায়ামূর্তির মত একজনকে দেখলাম যোশীমঠের দিক থেকে আমাদের দিকে আসতে।

তবে মরীচিকা। মূর্তিটি আরও একটু কাছে আসতেই ভুল ভেঙে গেল—সে জিতেন নয়। তথাপি আশ্বাস পেয়েছে আমার মন। মানুষ ত আসছে একজন—কিছু সাহায্য পেতে পারি তার কাছে।

কিন্তু আমার কাতর অনুরোধ মন দিয়ে শুনবার পর লোকটি আমার চেয়েও কাতর স্বরে আমাকে বললে যে, আসতে আসতে নিজেই সে পাথরচাপা পড়ে মরতে বসেছিল; এখন সে আস্ত একটি মানুষ দূরে থাক, পাঁচ-সেরি একটি পুটুলিও বয়ে নিতে পারবে না।

আবার ঐ তেপান্তরের মাঠে আমি একা—মানে, অর্দ্ধ-অচৈতন্য অক্ষম বাহাদুরের পাশে নিজের অক্ষমতার তীব্র সচেতনতা নিয়ে সক্ষম কিন্তু অপদার্থ পুরুষ আমি, নৈরাশ্যের অন্ধকারের মধ্যে ক্রমেই যেন ডুবে যাচ্ছি। ইতিমধ্যে আমার গায়ের বর্ষাতিটি খুলে বাহাদুরের গা-মাথা ঢেকে দিয়েছিলাম। কিন্তু অবিরাম বৃষ্টিপাত থেকে তাকে কতখানি রক্ষা করতে পারে ঐ পাতলা বর্ষাতি! বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কনকনে হাওয়াও বইছে। বাহাদুরের ভূলুণ্ঠিত দেহের দিকে তাকিয়ে দেখি যে, সে ম্যালেরিয়ার রোগীর মত হি হি করে কাঁপছে—আর বিড় বিড় করে কি যেন বলছেও।

আরও একটু আচ্ছাদন তাকে দেবার জন্য আমি ছাতা নিয়ে বসলাম তার মাথার কাছে, তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, খুব কষ্ট হচ্ছে নাকি বাহাদুর?

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল সে, এবং কান্নার ফাঁকে ফাঁকে জড়িতস্বরে বললে, হম নে পাপ কিয়া বাবুজী—অচ্ছা হ্যায় কি মুঝে সাজা মিলী। লেকিন আপকী যাত্রাভী তো হম নে বরবাদ করদী। মুঝকো আপ মার ডালিয়ে বাবুজী,—লাথ মারকে খদকা অন্দর গিড়া দিজিয়ে।

বলে কি বাহাদুর! আর যা সে বলছে তার উত্তরই বা কি দেব আমি! তার মাথায় আলগোছে হাত বুলাতে বুলাতে পূর্ব্ব-প্রসঙ্গেই ফিরে গিয়ে আমি বললাম, তোমার ঠিক কোন্ জায়গাটাতে লেগেছে তাই আমায় বল ত বাহাদুর—দেখি একটু টিপে দিলে যদি তুমি উঠে দাঁড়াতে পার।

শুনে যেন আরও অধীর হয়ে উঠল বাহাদুর। সে তার নিজের দুই হাত তুলে তার মাথার উপরেই আমার হাতখানি চেপে ধরে আরও অধীর, আরও গাঢ়স্বরে বললে, আপ তো মেরা মাতাপিতা হ্যায় বাবুজী। লেকিন হম নে ক্যা কিয়া? হায় ভগবান, হম নে ক্যা কিয়া!—

বলতে বলতে আমার হাত ছেড়ে দিয়ে নিজের মাথা নিজেই চাপড়াতে সুরু করল সে।

তাতে আরও বিপন্ন অবস্থা আমার। অনেক কষ্টে নিবৃত্ত করলাম তাকে, তার সক্রিয় হাতখানি নিজে আমি দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে ঢুকিয়ে দিলাম বর্ষাতির নীচে। কিন্তু তারপর আবার তার মুখের দিকে চেয়ে দেখি যে, গরুর মত ড্যাবডেবে চোখে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে সে। এবার চোখাচোখি হতেই একেবারে ভিন্ন সুরে, প্রায় ফিস ফিস করে সে বললে, মেরে ওয়াস্তে আপ ক্যোঁও জান দেওগে বাবুজী? মুঝকো একেলাহী মরণে দো—যহাপর মুঝে ছোড়কর আপ গড়ুর চটি মে লৌট জায়ো, বাবুজী।

কান্নার চেয়েও দুঃসহ বাহাদুরের এই কাতর আবেদন। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম আমি। একটা ধমক দিলাম বাহাদুরকে: কি যে বলিস তুই! তোকে এখানে ফেলে রেখে আমি যেতে পারি নাকি? মরতে হয় দু'জনে একসঙ্গেই মরব।

একটু থেমে তারপর আশ্বাস দিলাম তাকে: অত ঘাবড়াচ্ছিস কেন? উপায় একটা হবেই।

কিন্তু মুখে ঐ কথা বললেও নিজের মনে আমি আশ্বাস পাচ্ছি কই? দু'টি অসহায় প্রাণী পড়ে আছি ত সেই তেপান্তরের মাঠে। ঘড়ি বের করে দেখি যে বেলা তখন প্রায় একটা। কিন্তু বৃষ্টি ও কুয়াশার জন্য তখনই মনে হয় বুঝি সন্ধ্যা হয়ে এল। কুয়াশা এখন আগের চেয়েও নিবিড় হয়েছে। আকাশ আরও বেশী কালো।

দু'চোখ ফেটে জল এল আমার, তবে কি এই তেপান্তরের মাঠে জীবন্ত সমাধিই নির্মম নিয়তি আমার।

অসহায়ের মত চারিদিকে তাকাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি—সেই ছেলেদেরই দলটি না? ঠিক তাই। তবু মনে হয় যে এরা বুঝি তারা নয়। যাবার সময় এদের মুখ কটি দেখেছিলাম ফোটা ফুলের মত। কিন্তু এখন দেখছি বিবর্ণ। কেমন যেন সন্ত্রস্ত দৃষ্টি প্রতি জোড়া চোখেই।

আমি কোন প্রশ্ন করবার পূর্ব্বেই ওদের একটি ছেলে কৈফিয়তের সুরে বললে, বহুত পাথর গিড়তে। জা নহী সকে হমলোগ। ইসলিয়ে ওয়াপস আ গয়ে। অব ঘর লৌট জায়েঙ্গে।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনেছিলাম, ওরা গড়ুর চটির দিকে চলতে সুরু

করবার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম একটি—শেষ আশাও নির্মূল হ'ল তাহলে। জিতেনকে সংবাদ দেওয়া গেল না।

কোন্ নিষ্ঠুর দেবতা কি খেলাই যে খেলছেন আমার সঙ্গে—আশা ও নৈরাশ্যের নাগরদোলায় দোল খাওয়ার আর বিরাম নেই। আমার দীর্ঘনিশ্বাস বাতাসে মিলিয়ে যেতে না যেতেই আবার একটি আশ্বাসও কানে এল আমার—কিশোরকণ্ঠের বাঁশীর মত মিহিসুরের আশ্বাস। ভাঙনের জায়গাটা নিরাপদে পার হয়ে যাবার পর ঐ দলেরই একটি ছেলে ওপার থেকে ডেকে বললে আমাকে : পিছেসে ভৈসাল আ রহে, উসসে আপকো মদদ মিল জায়েগা।

সত্যিই ত। বিপরীত দিকে ফিরে চেয়ে দেখি যে ঐ আশ্বাসই রূপ ধরে এগিয়ে আসছে যেন। কেবল এক পাল মোষ নয়, সঙ্গে ঘোড়া না খচ্চরও আছে কয়েকটি। পশুপালকেরাও সংখ্যায় তিন জন।

কেবল আশ্বাস নয়, আশায় নেচে উঠেছে আমার মন—এতগুলি বাহন যখন একসঙ্গে আসছে তখন কেবল বাহাদুর কেন, আমিও একটা ঘোড়ায় চাপতে পারব।

কিন্তু হরি হরি! মরীচিকা দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল। ঐ দলের একটি পশু বা একটি মানুষও থমকে দাঁড়াল না। আমার সকাতর অনুনয় এবং প্রচুর পারিশ্রমিকের প্রলোভনকে সমভাবেই উপেক্ষা করে পশুপালকদের একজন চলতে চলতেই আমাকে বলে গেল যে, এই দুর্যোগের দিনে তাদের ঘোড়া-খচ্চরের পিঠে কোন মোটই তারা চাপাবে না।

আমি রুদ্ধ নিশ্বাসে বললাম, তা হলে কি উপায় হবে আমাদের।

উত্তরও দিল না লোকটি। পশু ও মানুষের অত বড় দলটিও ধীরে ধীরে কুয়াশার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বসে পড়লাম আমি। দাঁড়িয়ে থাকবার মত দৈহিক শক্তিও আর আমার নেই। অনেকক্ষণ যাবতই ভিজে ঢোল হয়ে আছি। অসহ্য শীত লাগছে এখন, তার উপর নৈরাশ্য প্রকাণ্ড একটি বরফস্তূপের মত আমার বুকের উপর চেপে বসল যেন। হঠাৎ আমার মনে হ'ল যে আমি অভিশপ্ত, আমি পরিত্যক্ত, মানুষ ত বটেই, স্বয়ং ভগবানও আমায় পরিত্যাগ করেছেন।

আর তখনই অনুভব করলাম আমি আমার দক্ষিণ বাহুতে বজ্রমুষ্টির কঠিন নিষ্পেষণ, যেমন দৃঢ়, তেমনি শীতল। এই নাকি তুহিন-শীতল মৃত্যুর গ্রাস! কিন্তু বাহুতে কেন তা? ভীতিবিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখি যে মৃত্যু নয়, মৃত্যুপথযাত্রী বাহাদুর তার হাত বাড়িয়ে আমার বাহু চেপে ধরেছে। চোখোচোখি হ'ল তার সঙ্গে। বিস্ফারিত তারও চোখ দুটি, কিন্তু দৃষ্টি ভীতিবিহ্বল নয়—স্নেহময়ী জননীর চোখের দৃষ্টির মতই যেন মমতায় কোমল, সমবেদনায় করুণ।

ফিস ফিস করে বাহাদুর বললে, অব তো মৈ জাতা হুঁ। মেরা সব কসুর মাফ করনা বাবুজী।

সত্যিই মরছে নাকি বাহাদুর? আর তা ঠায় চেয়ে দেখছি আমি? কথাটা মনে হতেই সমস্ত দেহে আবার একটি শিহরণ অনুভব করলাম। কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। বাহাদুরের সেই শীতল স্পর্শ থেকেই একটা যেন উত্তপ্ত বিদ্যুতপ্রবাহ আমার প্রত্যেকটি শিরা উপশিরায় সঞ্চারিত হ'ল এবং সঙ্গে সঙ্গেই সঞ্জীবিত হয়ে উঠল আমার অবসন্ন স্নায়ু ও পেশীগুলি। উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

এ কি ক্লৈব্য আমার। বাহাদুরই না হয় আহত ও চলৎশক্তিহীন। কিন্তু আমি ত তা নই। তথাপি নারীর মত, শিশুর মত বাহাদুরের পাশে বসে তার সঙ্গে একত্র জীবন্ত সমাধি লাভ করাকেই কেন আমি আমার একমাত্র কর্তব্য মনে করেছি? কেন নিজে আমি সক্রিয় হয়ে চেষ্টা করছি নে তাঁকে বাঁচাবার জন্য? সামনের পথই না হয় আমার অজানা, কিন্তু পিছনের পথ ত চিনে এসেছি আমি—যে পথে মাইল চারেক মাত্র দূরেই পিপুলকুঠি শহরে একটি কেন, দশটি কুলি আমি পেতে পারি এখান থেকে বাহাদুরকে জীবন্ত তুলে নিয়ে যাবার জন্য। সেই দিকে ছুটে না গিয়ে কেন এখানে আমি দৈবের মুখ চেয়ে বসে থাকব।

পাছে করুণার ছদ্মবেশে ক্লৈব্য আবার আমাকে নিষ্ঠুর কর্তব্য-সাধনের কঠিন পথ থেকে বিচ্যুত করে সেই আশঙ্কায় বাহাদুরের কাতর মুখচ্ছবি দ্বিতীয়বার চেয়েও দেখলাম না আমি। একটু সরে গিয়ে তাকে উদ্দেশ করে বললাম, তুমি ভাবনা কর না বাহাদুর—তোমাকে আমি মরতে দেব না। তোমার জন্য কাণ্ডি আনতে যাচ্ছি আমি—গড়ুর চটিতে যদি না পাই, পিপুলকুঠি থেকে নিয়ে আসব।

তৎক্ষণাৎ এক টানে আমাদের একটি বিছানা খুলে ফেলে লেপ-তোষক দিয়ে ঢেকে দিলাম বাহাদুরকে। তার উপর বর্ষাতি চাদরখানি চাপিয়ে দিয়ে নিজে আমি নির্মম হয়ে যাত্রা করলাম পুনরায় পিছনে ফেলে-আসা সেই গড়ুর চটির দিকেই।

আশ্চর্য! আমার নিজেরই একটা পা যে ভাঙা তা আর তখন মনেই পড়ছে না। খচ খচ ব্যথাটাকেও যেন জয় করেছে আমার জাগ্রত পৌরুষ।

পিপুলকুঠি পর্যন্ত যাবার দরকার হ'ল না।

গড়ুর চটি পর্যন্ত গিয়েই দেখিই দেখি যে, ঐ জায়গাটার তেমন লক্ষ্মীছাড়া রূপ আর তখন নেই। এখন সেই ছোট চায়ের দোকানটিতে বৃদ্ধ দোকানী ছাড়াও আরও চার জন লোক উনানের ধারে বসে জটলা করছে দেখলাম। চেনা মুখ চারটিই। ওদের মধ্যে যে লোকটি প্রৌঢ় সে কিছুক্ষণ পূর্বে যোশীমঠের দিক থেকে আমারই সমুখ দিয়ে এ দিকে এসেছে—আমি তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতেই তখন সে অজুহাত দেখিয়েছিল পাথর চাপা পড়ে তার নিজেরই আহত অবস্থার। এখনও দেখলাম যে, সে উনানের ধারে পা ছড়িয়ে বসে কি যেন তাতে মালিশ করছে।

বাকি তিন জনই সম্পূর্ণ সুস্থ ও শক্ত-সমর্থ যুবক—সেই তিন

জন যারা ছোট কাজ করবে না বলে আহত বাহাদুরকে স্পর্শ করতে চায় নি।

ওখানে থাকতেই পরিচয় পেয়েছিলাম তাদের।

সরকারী পূর্ত্ত বিভাগের ওভারসিয়র ওদের মধ্যে সেই বাবুমতন লোকটি; বাকি দু'জন মজুর। যাত্রীসড়কে প্রয়োজনীয় মেরামতি কাজের জন্ম নিযুক্ত বাহিনীর ছোট একটি গ্যাং।

অনুনয় করে এদের কাছে কোন সাহায্য যে পাওয়া যাবে না তা পূর্ব্বেই বুঝেছিলাম আমি। সুতরাং এবার একেবারে বিপরীত চাল চাললাম।

ওভারসিয়রটির মুখের দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললাম, আমার ঐ আহত কুলিটিকে অন্ততঃ এই পর্য্যন্ত এনে দিতে হবে। যদি তা না কর তবে এখনই পিপুলকুঠি গিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে নালিশ করব আমি—পৌড়িতে তোমাদের বড় সাহেব আর লক্ষ্ণৌতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তার করব। তিন দিনের মধ্যেই তোমাদের তিনটিকে জেলে পাঠাব ঘানি টানবার জন্ম। জান আমি কে?

মিথ্যা কথাই বললাম। কিন্তু তাতেই কাজ হ'ল একেবারে মন্ত্রের মত। দোকানের সব কটি মানুষই তৎক্ষণাৎ সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। ওভারসিয়রটি আমাকে লম্বা একটি সেলাম ঠুকে মুখ কাঁচুমাচু করে বললে, হুজুর তখন যদি বলতেন এ কথা—

চুপ রহো—

তখন পাকা অভিনেতাই হয়ে উঠেছি আমি। পুলিসী ভঙ্গিতে হাতের লাঠিখানা মাটিতে ঠুকে আমি ধমক দিয়ে কথা বন্ধ করলাম তার; আগের চেয়েও গরম সুরে আবার বললাম, আমি কথা চাই নে, কাজ চাই। এক্ষুনি রওনা হয়ে যাও তোমরা। আধ-ঘণ্টার মধ্যে ঐ কুলিটাকে এখানে নিয়ে আসা চাই।

শুনে দেখি যে, পাংশুবর্ণ হয়ে গিয়েছে সব ক'টি মুখ, অথচ গড়িমসি ভাবটা আছেই। সুতরাং দ্বিতীয় একটি অস্ত্রও নিক্ষেপ করলাম আমি; আবার বললাম, আমার হুকুম তামিল না করলে জেল খাটবে নির্ঘাৎ। তবে কুলিটিকে যদি বয়ে এনে দাও তবে শুধু রেহাই নয়, বকশিসও পাবে।

চোখে চোখে কি যেন কথা হ'ল ওদের তিন জনের; তার পর ওভারসিয়রটি আবার হাত জোড় করে আমাকে বললে, ওরা হুজুর গরীব দিন-মজুর—জানতে চাইছে বকশিসের পরিমাণটা। অমন হাতীর মত চেহারা কুলিটার। আর পথও ত হুজুর কম নয়।

কত চাই।

দু'জন লোক যাবে—দশ টাকা হুজুর।

রাজী হলাম আমি। কিন্তু চোখ মুখের সেই কটমটে ভাবটা বজায় রেখেই বললাম, এক্ষুণি ছুটে যাও তোমরা। কুলিটিকে আগে আনবে—মালপত্র আসুক বা না আসুক।

তার পর রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রতীক্ষা আমার। এবার ঐ দোকানে আমার খাতিরের আর অন্ত নেই। কিন্তু কিছুই ভাল লাগছে না। এমনকি ঝাড়া আড়াই ঘণ্টা তেপান্তরের মাঠে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজবার পর অতিবাঞ্ছিত আগুনতাতও নয়। মন আমার পড়ে আছে বাহাদুরের কাছে, চোখ দুটি পথের উপর—বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে আছে যে পাহাড়টা সেটা স্বচ্ছ নয় বলেই যেন আরও অসহিষ্ণু তাদের দৃষ্টি।

ঠিক আধঘণ্টা পরে ফিরে এল তারা। কিন্তু এ কি দেখছি আমি! একটি মোটই দু'ভাগ করে দু'জনে বয়ে এনেছে। বাহাদুরকে দেখছি নে ত! ওদের পিছনে জনশূন্য সড়ক খাঁ খাঁ করছে দেখলাম।

শুষ্ককণ্ঠে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বাহাদুর কোথায়?

উত্তর হ'ল: উসকো হমনে ছোড় দিয়া।

কেঁও?

আপকা সাথী উঁহাপর আ গয়ে।

তার মানে আমাদের জিতেন।

[আগামীবারে সমাপ্য]

বসন্তে

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

ফুলে ফুলে কি সুন্দর সেজেছে শাল্মলী!
পাখীদের কণ্ঠে কণ্ঠে মধুর কাকলি!
বাতাবি-ফুলের গন্ধে মদির বাতাস!
মধুপের গুন্ গুন্; বাগান বিলাস
গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটিয়াছে লোহিত বরণ;
বনে বনে কেঁদে যায় ক্ষ্যাপা সমীরণ;
আমারও হৃদয় কাঁদে কিসের লাগিয়া!
যারে কভু দেখি নাই, দেখিব না, হিয়া
তারই তরে তৃষ্ণাতুর! হেথা হতে যবে
চলে যাবো, হে বসন্ত, পুষ্পের সৌরভে
তখনও মাতাল হবে দখিনাসমীর
আজিকার মতো ঠিক! তখনও পাখীর
কলরবে পূর্ণ হবে ফাগুনের বন!
বাতাস কাঁদিয়া যাবে আজিকে যেমন।

শঙ্করমতে সাধন : দ্বিবিধ সাধক

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

শঙ্করমতে, সকাম-কর্ম জ্ঞান-বিরোধী এবং সেজন্য মোক্ষ-বিরোধী হলেও, নিষ্কাম-কর্ম জ্ঞান-সহায়ক ও সেজন্য মোক্ষ-সহায়ক। অর্থাৎ, নিষ্কাম-কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হলে, তবেই সেই বিশুদ্ধ চিত্তেই জ্ঞানের প্রকাশ সম্ভবপর। কিন্তু সকলের পক্ষেই এরূপ নিষ্কাম-কর্ম সমান প্রয়োজন নয়। কারণ, পূর্বজন্মে অতি সুষ্ঠুভাবে নিত্যকর্মের দ্বারা যাঁদের চিত্ত এ জন্মে প্রথম থেকেই শুদ্ধ হয়েই আছে, তাঁদের ত আর নিষ্কাম-কর্মের প্রয়োজন হয় না নূতন করে। সেজন্য গীতা-ভাষ্যে, মূলানুযায়ী, শঙ্কর দ্বিবিধ বুদ্ধি এবং দ্বিবিধ সাধকের উল্লেখ করেছেন—সাংখ্য-বুদ্ধি ও যোগ-বুদ্ধি, সাংখ্য ও যোগী।

এরূপে জ্ঞান-নিষ্ঠ "সাংখ্য" এবং কর্ম-নিষ্ঠ "যোগীর" মধ্যে সাধন-প্রণালী এবং সাধন-ফলের মধ্যে মূলীভূত প্রভেদ শঙ্কর গীতার শেষে অষ্টাদশ অধ্যায়ের ভাষ্যে অতি সুন্দর ভাবে নির্দেশ করেছেন। শঙ্করের মতে, এই সর্বশেষ অধ্যায়ে সমগ্র "গীতা-শাস্ত্রার্থঃ সর্বশ্চ বেদার্থঃ" গীতা-শাস্ত্রের ও সকল বেদের মূলীভূত অর্থ উপসংহার করে বলা হয়েছে।

"সর্বেষু হি অতীতেষু অধ্যায়েষু উক্তোঽর্থঃ অস্মিন্নধ্যায়েঽবগম্যতে।" (গীতা-ভাষ্য, ১৮-১)।

পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে বিস্তারিত এবং ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ভাবে যে সকল তত্ত্ব প্রপঞ্চিত করা হয়েছিল, সেই সকল তত্ত্বেরই এই শেষ অধ্যায়ে উপসংহার করে, সংক্ষেপে পুনরায় বলা হচ্ছে, যাতে অনায়াসে সেই সকল নিগূঢ় অর্থ উপলব্ধি করা যায় (আনন্দগিরি-টীকা)।

এই গীতা সার-ভূত অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভেই "সংন্যাস" এবং "ত্যাগের" মধ্যে প্রভেদ করেছেন শ্রীভগবান এই বলে:

"কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব-কর্ম-ফল-ত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥"

(গীতা, ১৮-২)।

ভাষ্যে শঙ্কর বলছেন যে, অশ্বমেধাদি যজ্ঞ প্রমুখ "কাম্য-কর্ম" ত্যাগই হ'ল "সন্ন্যাস"; এবং সেই সঙ্গে নিত্য-নৈমিত্তিক-কর্ম" ত্যাগই হ'ল "ত্যাগ"।

অবশ্য, প্রকৃতপক্ষে, "সন্ন্যাস" ও "ত্যাগ" এই দুটি শব্দ সমার্থক—

"যদি কাম্য কর্ম-পরিত্যাগঃ ফল-পরিত্যাগো বা অর্থো বক্তব্যঃ, সর্বথাপি-ত্যাগ-মাত্রং সন্ন্যাস-ত্যাগ-শব্দয়োরেকোঽর্থো ন ঘট-পট-শব্দাদিব জাত্যন্তর-ভূতার্থো।"

(গীতা-ভাষ্য, ১৮-২)।

কাম্য-কর্ম-পরিত্যাগই হোক, বা সর্ব-কর্ম-পরিত্যাগই হোক, সবই ত সেই একই ত্যাগ ব্যতীত আর অন্য কিছুই নয়। সেজন্য "ঘট" ও "পট" এই দুটি শব্দের অর্থ যেরূপ বিভিন্ন, "সন্ন্যাস" ও "ত্যাগ" এই দুটি শব্দের অর্থ সেরূপ বিভিন্ন নয়।

যা হোক্, "সন্ন্যাসই" হোক্, বা "ত্যাগই" হোক্—"সাংখ্য" বা জ্ঞান-নিষ্ঠ সাধকের সাধন-প্রণালী হ'ল এই সন্ন্যাস বা ত্যাগ, এক কথায়, এই সর্ব-কর্ম-ত্যাগকেই বরণ করে নেওয়া। "কাম্য" কর্মের কথা ত দূরে থাক, এমন কি, "নিত্য" ও "নৈমিত্তিক" কর্মও তিনি নিঃশেষে বর্জন করেন।

এস্থলে যদি আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, নিত্য-কর্ম অবশ্য অনুষ্ঠেয়, এবং সেজন্য জ্ঞানাধিকারী নিত্য-কর্মও পরিত্যাগ করলে, তিনি পাপের ভাগী হবেন—তার উত্তর পরে দেওয়া হচ্ছে।

পুনরায় যদি আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, নিত্য-কর্ম ত সকাম-কর্মের ন্যায় কোনও ফলের সৃষ্টি করে না, তা ত্যাজ্য হবে কেন—তার উত্তর হ'ল এই যে, নিত্য-কর্মেরও নিশ্চয় ফল আছে। এ সম্বন্ধে পূর্বে বলা হয়েছে পরেও বলা হবে।

সেজন্য, জ্ঞানযোগাধিকারী, জ্ঞান-নিষ্ঠ "সাংখ্য" "কাম্য-নিত্য-নৈমিত্তিক" সকল প্রকার কর্মই নিঃশেষে পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস অবলম্বন করেন।

অপর পক্ষে, কর্ম-যোগাধিকারী, কর্ম-নিষ্ঠ "যোগী" "কাম্য-কর্ম" পরিত্যাগ করলেও "নিত্য নৈমিত্তিক-কর্ম" পরিত্যাগ করেন না।

এ স্থলে, মূলানুসারে কর্ম-ত্যাগ-বিষয়ে দুটি মতবাদের উল্লেখ শঙ্কর করেছেন:

"ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ।
যজ্ঞ-দান-তপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে॥"

(গীতা, ১৮-৩)।

কোন কোন মনীষী বলে থাকেন যে, কর্মমাত্রেই

সদোষ বলে সকল কর্মই পরিত্যাজ্য ; পুনরায়, কেহ কেহ বলেন যে, যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম পরিত্যাজ্য নয়।

ভাষ্যে শঙ্কর বলছেন যে, প্রথম মতবাদ যাঁরা প্রপঞ্চিত করেছেন, তাঁরা "সাংখ্য-দৃষ্টিকে"ই আশ্রয় করে তা করেছেন। সেজন্য তাঁরা বলছেন যে, সকল কর্মই দোষপঙ্কিল, যেহেতু তা সবই সংসারের হেতু এবং রাগ-দ্বেষাদি-দুষ্ট। এই কারণে সংসার ও রাগ-দ্বেষাদি-দোষ যেরূপ পরিত্যাজ্য, সকল কর্মও সেরূপ একই ভাবে পরিত্যাজ্য। এরূপে তাঁদের মতে, কর্মাধিকারিগণেরও সকল কর্ম পরিত্যাগ করা কর্তব্য।

কিন্তু দ্বিতীয় মতবাদ যাঁরা প্রপঞ্চিত করেছেন, তাঁরা বলছেন যে, অন্য কর্ম পরিত্যাগ করলেও যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম পরিত্যাগ করবেন না কোনদিনও কর্মাধিকারিগণ। এরূপ মতভেদ কিন্তু একমাত্র কর্মাধিকারিগণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য,—একমাত্র তাঁদের ক্ষেত্রেই প্রশ্ন উঠতে পারে সর্ব-কর্মই পরিত্যাগ করা, অথবা যজ্ঞ-দান-তপস্যা বাদ দিয়ে অন্যান্য সকল কর্ম পরিত্যাগ করা কর্তব্য। কিন্তু জ্ঞানাধিকারিগণের ক্ষেত্রে এরূপ বিভিন্ন মতবাদের কোনরূপ অবকাশই নেই, যেহেতু তাঁদের ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার কর্ম-ত্যাগই অত্যাবশ্যক, তার আর অন্যথা হতে পারে না কোনক্রমেই।

প্রকৃতপক্ষে, পূর্বেই যা বলা হয়েছে, অলসতা-বশতঃ, বা অন্য কারণে কর্ম-ত্যাগ করলে তা "নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধিও" নয়, অনুমোদন-যোগ্যও নয়। কিন্তু জ্ঞানসহযোগে কর্ম-ত্যাগই মোক্ষসাধন কর্ম সন্ন্যাস। সেজন্য এস্থলেও শঙ্কর বলছেন যে, জ্ঞানমার্গাধিকারী "সাংখ্যগণ" জ্ঞানসহকারেই কর্ম পরিত্যাগ করেন, অন্য কোন পার্থিব কারণে নয় :

"তেষাং মোহ-দুঃখ-নিমিত্ত-ত্যাগানুপপত্তেঃ"।

(গীতা-ভাষ্য, ১৮-৩)

সাধারণ কর্ম-ত্যাগের দুটি প্রধান কারণ : মোহ ও দুঃখ।

প্রথমতঃ, তাঁদের ক্ষেত্রে "মোহ" বা অজ্ঞানের কোন সম্ভাবনাই নেই। তত্ত্বদর্শী বলে তাঁরা আত্মার সঙ্গে কর্মের কোন সম্বন্ধই দেখেন না, সেজন্য আত্মা থেকে কর্ম বর্জন বা ত্যাগের কোন প্রশ্নই এ ক্ষেত্রে নেই। দ্বিতীয়তঃ "দুঃখ" বা কায়ক্লেশ-ভয়েরও কোন প্রশ্ন এস্থলে নেই। কায়ক্লেশ-নিমিত্ত দুঃখ এবং ইচ্ছা-দ্বেষাদিও যে আত্মার নয়, দেহের—এই উপলব্ধি তাঁদের আছে বলে তাঁরা কায়-ক্লেশ-ভয়েও সর্ব-কর্ম পরিত্যাগ করেন না। সেজন্য তাঁরা সর্ব-কর্ম-পরিত্যাগ করেন এই জ্ঞান-সহকারে :

"গুণানাং কর্ম, নৈব কিঞ্চিৎ করোমি ইতি।" (গীতা-ভাষ্য, ১৮-৩)।

"কর্মজও প্রকৃতির গুণসমূহ বা দেহেরই ধর্ম, সেজন্য আমি কিছুই করি না"—এই বুদ্ধিতেই তাঁরা কর্ম সন্ন্যাস করেন, অন্য কোন কারণে নয়।

সেজন্য শঙ্কর বলছেন যে, গীতার ১৮-৩ শ্লোকে যে "সন্ন্যাস" ও "ত্যাগে"র কথা বলা হয়েছে, তা "সাংখ্য" বা জ্ঞানাধিকারিগণের জন্য নয়, "যোগী" বা কর্মাধিকারিগণের জন্যই কেবল। এই শেষোক্তদের ক্ষেত্রেই কেবল মোহ ও কায়ক্লেশ-ভয়াদি বশে অকারণে কর্ম-ত্যাগ হতে পারে। যাঁরা কর্মাধিকারী, তাঁদের ক্ষেত্রেও এরূপ অলসতা, মোহ, ক্লেশ-ভয় প্রভৃতি কারণে যদি কর্ম-ত্যাগ করা হয়, তা হলে তা অনিষ্টেরই কারণ হবে। সেজন্য কর্মাধিকারিদের সেরূপ "রাজস" ও "তামস" কর্ম-ত্যাগ অপেক্ষা "সাত্ত্বিক" কর্ম-ত্যাগ শতগুণে শ্রেয়ঃ বলে এরূপ "সাত্ত্বিক" কর্ম-ত্যাগকেই এ স্থলে "সন্ন্যাস" বলা হয়েছে।

"তস্মাজ্ জ্ঞান-নিষ্ঠাঃ সন্ন্যাসিনো নেহ বিবক্ষিতাঃ, কর্ম-ফল-ত্যাগ এব সাত্ত্বিকত্বেন গুণেন তামসত্বাদ্যপেক্ষয়া সন্ন্যাস উচ্যতে। ন মুখ্যঃ সর্ব-কর্ম সন্ন্যাসঃ।"

(গীতা ভাষ্য, ১৮-৩)

সেজন্য "সন্ন্যাস" শব্দের অর্থ এস্থলে জ্ঞান নিষ্ঠদের সন্ন্যাস নয়—মুখ্য, প্রকৃত সর্ব-কর্ম-সন্ন্যাস নয়।

অবশ্য, জ্ঞান-নিষ্ঠদের এরূপ মুখ্য, প্রকৃত সন্ন্যাস স্বতঃসিদ্ধ সত্য এবং তা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

সেজন্য এই ভাষ্য শেষে শঙ্কর সিদ্ধান্ত করছেন :

"তস্মাৎ কর্মণি অধিকৃতান্ প্রতি এবৈষ সন্ন্যাস-ত্যাগ-বিকল্পঃ। যে তু পরমার্থ-দর্শিনঃ সাংখ্যাস্তেষাং জ্ঞান-নিষ্ঠায়ামেব সর্ব-কর্ম-সন্ন্যাসলক্ষণায়াম্ অধিকারো নান্যত্রেতি তে বিকল্পার্হাঃ।"

(গীতা ভাষ্য ১৮-৩)

যাঁরা কর্মাধিকারী তাঁদের ক্ষেত্রে সন্ন্যাস, ত্যাগ প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন মতভেদের সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু যাঁরা পরম তত্ত্বদর্শী, জ্ঞান-নিষ্ঠ "সাংখ্য", তাঁদের ত লক্ষণই হ'ল সর্ব-কর্ম-সন্ন্যাস বা ত্যাগ, সেজন্য তাঁদের ক্ষেত্রে এরূপ মতভেদের বিন্দুমাত্রও অবকাশ বা সম্ভাবনা নেই।

জ্ঞানীদের প্রকৃত ও মুখ্য "সন্ন্যাস" এবং কর্মিদের তথা-কথিত "সন্ন্যাসে"র মধ্যে যে মূলগত প্রভেদ, তা শঙ্কর তাঁর গীতা-ভাষ্যে বারংবার বলেছেন। যেমন, পঞ্চম অধ্যায়ে অর্জুন প্রথম শ্লোকে শ্রীভগবানকে প্রশ্ন করছেন যে, শ্রীভগবান কর্মানুষ্ঠান এবং কর্ম-সন্ন্যাস উভয়েরই বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন, তা হলে কোন্‌টি শ্রেয়ঃ? উত্তরে শ্রীভগবান দ্বিতীয় শ্লোকে বলছেন যে, কর্মযোগ ও সন্ন্যাস—দুটিই মোক্ষ-সাধন। কিন্তু তাদের মধ্যে কর্মযোগই শ্রেয়ঃ।

এই দুটি শ্লোককে সাধারণ আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করতে গেলে কর্মই নৈষ্কর্ম্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তা শঙ্করের অদ্বৈতবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী বলে শঙ্কর এস্থলেও "সন্ন্যাস" অর্থে জ্ঞানিদের সর্ব-কর্ম-ত্যাগ গ্রহণ না করে, কর্মিদের কর্মফল ত্যাগই গ্রহণ করেছেন। পূর্ববৎ, তিনি এস্থলেও বলছেন যে, জ্ঞানিদের ক্ষেত্রে কর্মানুষ্ঠান ও কর্ম-ত্যাগ—এই বিকল্পের অবকাশই নেই, যেহেতু কর্মানুষ্ঠান তাঁদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

"আত্মবিদস্তু সংন্যাস-কর্মযোগয়োঃ অসম্ভবাৎ তয়োর্নিঃশ্রেয়সকরত্বাভিধানং কর্মসংন্যাসাচ্চ কর্মযোগে বিশিষ্যতে ইতি চানুপপন্নম্।"

(গীতা ভাষ্য, ৫-১)

আত্মজ্ঞের ক্ষেত্রে কর্ম-ত্যাগ ও কর্মানুষ্ঠান—এই দুটি অসম্ভব। এই কারণে কর্ম-ত্যাগ ও কর্মানুষ্ঠান উভয়েই মোক্ষসাধন এবং কর্ম-ত্যাগ অপেক্ষা কর্মানুষ্ঠানই শ্রেয়ঃ—এরূপ উক্তি জ্ঞানীর ক্ষেত্রে অযৌক্তিক।

সেজন্য এই কর্মানুষ্ঠান ও কর্ম-সন্ন্যাস কর্মিগণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

এরূপ কর্মিগণের ক্ষেত্রে কর্মযোগকে কর্ম-সংন্যাস অপেক্ষা শ্রেয়ঃ বলে গ্রহণ করা হয়েছে এইজন্য যে, কর্তৃত্বাভিমানী কর্মীকে এস্থলে যম-নিয়মাদি-প্রমুখ সুকঠোর সাধন পরিপালন করতে হয়, অথচ নিষ্কাম-কর্মের অনুষ্ঠান সহজতর :

"সত্যেব কর্তৃত্ব-বিজ্ঞানে কর্মৈকদেশ-বিষয়াৎ যম-নিয়মাদি-সহিতত্বেন চ দুরনুষ্ঠেয়াৎ সুকরত্বেন চ কর্মযোগস্য-বিশিষ্টত্বাভিধানম্।"

(গীতা-ভাষ্য, ৫-১)

এস্থলে কর্মাধিকারিগণের "সংন্যাসের" অর্থ হ'ল : সকাম "কাম্য" কর্ম-পরিত্যাগ (গীতা, ১৮-২) "কর্মযোগে"র অর্থ হ'ল : নিষ্কাম "নিত্য-নৈমিত্তিক" কর্মসাধন। কিন্তু জ্ঞানিগণের প্রকৃত, মুখ্য ও পূর্ণ "সন্ন্যাস" সর্ব-কর্ম নিঃশেষে পরিত্যাগ। সেজন্যই বলা হচ্ছে :

"অনাত্মবিৎ-কর্তৃকয়োরেব সংন্যাস-কর্মযোগয়োঃ নিঃশ্রেয়সকরত্ববচনং তদীয়াচ্চ কর্ম-সংন্যাসাৎ পূর্বোক্তাত্মবিৎ-কর্তৃক-সর্ব-কর্ম-সংন্যাস-বিলক্ষণাৎ...

(গীতা-ভাষ্য, ৫-১)

অনাত্মজ্ঞগণের সংন্যাস আত্মজ্ঞগণের সন্ন্যাস পরস্পর-বিভিন্ন।

প্রকৃতপক্ষে অবশ্য, কর্মাধিকারিগণের "সন্ন্যাস" বা সকাম "কাম্য" কর্মত্যাগ এবং "কর্মানুষ্ঠান" বা নিষ্কাম "নিত্য-নৈমিত্তিক" কর্মসাধন ফলতঃ একই সাধনের অন্তর্গত : সকাম কর্ম সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে চিত্তশুদ্ধির জন্য নিষ্কাম কর্ম সম্পাদন করা যে মোক্ষের পরোক্ষ সাধন, তা' পূর্বেই বলা হয়েছে তা সত্ত্বেও পৃথকভাবে ধরতে গেলে নিষ্কাম কর্মসাধন সকাম কর্মপরিত্যাগের অপেক্ষা শ্রেয়ঃ, যেহেতু নিষ্কাম কর্মসাধনের মধ্যেই ত সকাম কর্ম-পরিত্যাগও নিহিত হয়ে রয়েছে, কিন্তু সকাম কর্মপরিত্যাগের মধ্যে নিষ্কাম কর্মসাধন সেরূপে নিহিত নেই। কেবলমাত্র সকাম কর্ম পরিত্যাগ করে, নিষ্কাম কর্ম সেই সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত সাধন না করেও থাকা যেতে পারে। কিন্তু সকাম কর্ম পরিত্যাগ না করলে নিষ্কাম কর্ম সম্পাদন করা যায় না। সেজন্য সমূলে সকাম কর্ম পরিত্যাগ করলে চিত্তমলের হেতু কামনা-বাসনার বিনাশ হয় বলে চিত্তশুদ্ধির উদয় হতে পারে—সেজন্যই সেই দিক্ থেকে সকাম কর্ম পরিত্যাগ ও পরম্পরাগত ভাবে মোক্ষের সাধন হতে পারে। কিন্তু এরূপ সাধন অতি কঠিন—পূর্ণ আত্মজ্ঞ না হয়েও সম্পূর্ণ কর্মবর্জন অসম্ভব। সেজন্য এক্ষেত্রেও যম-নিয়মাদিরূপ দুষ্কর যোগাঙ্গের মাধ্যমে চিত্তকে নিরন্তর বশে রাখতে হয়। অতএব নিষ্কাম নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মসম্পাদনই শ্রেয়ঃ এবং চিত্তশুদ্ধির উৎকৃষ্টতর উপায়।

এরূপে শঙ্করের মতে গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় হ'ল এই যে, যাঁরা কর্মাধিকারী, তাঁদের পক্ষে কর্মত্যাগ শ্রেয়ঃ নয়, নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানই শ্রেয়ঃ। এরূপ নিষ্কাম কর্মই যথাক্রমে চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানাধিকার ও জ্ঞানোৎপত্তির মাধ্যমে মোক্ষের সাধক যাঁরা অবশ্য জ্ঞানাধিকারী, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁরা জ্ঞানমার্গানুসারী বলে সকল কর্মত্যাগী। সেজন্য :

"জ্ঞানবতো জ্ঞান-ফলভূতং সংন্যাসং বিবক্ষন্ বিবিদিষোঃ সাধনরূপমপি সন্ন্যাসং ভগবান্ বিবক্ষিতবান্।"

(গীতা ৫-১, আনন্দগিরি-টীকা)

এরূপে জ্ঞানিগণের জ্ঞানের ফলস্বরূপ সংন্যাস বা সর্ব-কর্ম-ত্যাগ তা জ্ঞানলিপ্সু কর্মীদের জ্ঞানসাধনরূপ সংন্যাস বা কাম্য-কর্ম ত্যাগ থেকে পৃথক্।

কর্মাধিকারিগণের উপরে উক্ত ত্রিবিধ কর্মত্যাগ হ'ল এইরূপ :

মোহ বা অজ্ঞানবশতঃ নিত্য-কর্ম পরিত্যাগ করা হ'ল "তামস" ত্যাগ। কায়ক্লেশভয়ে নিত্যকর্ম পরিত্যাগ হ'ল "রাজস" ত্যাগ। আসক্তি ও ফল পরিত্যাগ করে কর্তব্য-বোধে নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান হ'ল "সাত্ত্বিক" ত্যাগ।

(গীতা-ভাষ্য, ১৮।৭-৯)

কর্মাধিকারী কর্মনিষ্ঠ "যোগিগণ" এই সাত্ত্বিক ত্যাগকেই অবলম্বন করে সাধনপথে অগ্রসর হন। এরূপ আসক্তি ও

ফলত্যাগ, অথবা নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান তাঁদের পক্ষে অত্যাবশ্যক। কারণ, যা' পূর্বেই বলা হয়েছে, এরূপ নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে যথাক্রমে চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানাধিকার, জ্ঞানোৎপত্তি হলে তাঁরা পরম্পরাগতভাবে মোক্ষলাভ করেন।

সেজন্যই শ্রীভগবান শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় বলছেন কর্ম-নিষ্ঠ "যোগিদের" উদ্দেশ্যে :

"যজ্ঞো দানং তপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥
এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্।"

(গীতা ১৮'৫-৬)

যজ্ঞ, দান ও তপস্যা—এই তিনটি কর্ম পরিত্যাগ করবে না। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা মনীষিগণকে পবিত্র করে।

সেজন্য আসক্তি ও ফল ত্যাগ করে এই সকল কর্ম করা কর্তব্য। এই হ'ল আমার নিশ্চিত ও উত্তম মত।

এরূপে "সাংখ্য" ও "যোগীর" মধ্যে সাধন-প্রণালীর দিক্ থেকে প্রভেদ হ'ল এই যে, "সাংখ্য" সর্ব-কর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র জ্ঞানযোগকেই আশ্রয় করেন; "যোগী" নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম নিষ্কাম ভাবে সাধন করে ক্রমশঃ জ্ঞান-যোগের অধিকারী হন। সেজন্য জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্মনিষ্ঠার মধ্যে যে ভেদ, সাংখ্য ও যোগের মধ্যেও সেই ভেদ :

"লোকেঽস্মিন দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্।"

(গীতা, ৩-৩)

ভাষ্যে শঙ্কর পুনরায় বিশদতর ভাবে বলছেন :

"কা সা দ্বিবিধা নিষ্ঠা ? ইত্যাহ তত্র জ্ঞান-যোগেন জ্ঞানমেব যোগঃ তেন সাংখ্যানাং আত্মানাত্ম-বিষয়-বিবেক-জ্ঞানবতাং ব্রহ্মচর্যাশ্রমাদেব-কৃত-সন্ন্যাসানাং বেদান্ত-বিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থানাং পরমহংস পরিব্রাজকানাং ব্রহ্মণ্যেব অবস্থিতানাং নিষ্ঠা প্রোক্তা। কর্মযোগেন কর্মৈব যোগঃ তেন কর্মযোগেন যোগিনাং কর্মিণাং নিষ্ঠা প্রোক্তা ইত্যর্থঃ।"

(গীতা-ভাষ্য, ৩ ৩)

যাঁরা জ্ঞান-যোগকেই আশ্রয় করেছেন তাঁরাই হলেন "সাংখ্য"। তাঁরা আত্মা ও অনাত্মার মধ্যে মূলীভূত প্রভেদ সম্বন্ধে জানেন, ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন পরমহংস পরিব্রাজকরূপে, বেদান্তজ্ঞানের দ্বারা পরমতত্ত্বের অর্থ উপলব্ধি করেছেন, এবং একমাত্র ব্রহ্মেই স্থিতি করেন। অপরপক্ষে, যাঁরা কর্ম-যোগকেই আশ্রয় করেন, তাঁরাই হলেন "যোগী।"

এরূপে, সাধন-প্রণালীর দিক্ থেকে "সাংখ্য" ও "যোগীর" মধ্যে প্রভেদ হ'ল এই যে, সাংখ্যগণ কর্মনিষ্ঠা অবলম্বন না করেই কেবল জ্ঞান-নিষ্ঠার দ্বারাই মোক্ষলাভ করেন ; যোগিগণ প্রথমে কর্ম-নিষ্ঠা এবং তার পর জ্ঞান-নিষ্ঠা অবলম্বন করে মোক্ষলাভ করেন।

পুনরায়, সাধন-ফলের দিক থেকে "সাংখ্য" ও "যোগীর" মধ্যে প্রভেদ হ'ল এই যে, সাংখ্য প্রথম থেকেই অকর্তা, কেবলমাত্র জীবনধারণের জন্যই ভিক্ষাচর্যা প্রমুখ কর্মে রত হন (গীতা-ভাষ্য, ৪-২০) ; যোগী পরে জ্ঞানযোগের মাধ্যমে অকর্তা হন এবং লোকশিক্ষা ও শিষ্টাচার রক্ষার জন্য কর্মে রত হন।

(গীতা-ভাষ্য, ৪-২০, ৩-২৫—পৃঃ—২২২)

পরিশেষে, সাধন-ফলের দিক্ থেকে "সাংখ্য" ও "যোগীর" মধ্যে প্রধানতম প্রভেদ হ'ল এই যে, সাংখ্য সাক্ষাৎভাবে সদ্যোমুক্তির, কিন্তু যোগী কেবল ক্রমমুক্তির এবং পরম্পরাগত ভাবে মুক্তির অধিকারী।

এরূপে যা পূর্বেই বলা হয়েছে, "সাংখ্য" বা "জ্ঞান-মার্গাবলম্বিগণ" জ্ঞানোদয়ে তৎক্ষণাৎ মোক্ষলাভে ধন্য হন। অপরপক্ষে, "যোগী" বা "কর্মমার্গাবলম্বিগণ" নিষ্কাম কর্ম ও সগুণ উপাসনার মাধ্যমে ক্রমমুক্তি, অথবা নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমে জ্ঞানাধিকার, জ্ঞানাধিকারের মাধ্যমে জ্ঞান এবং পরিশেষে জ্ঞানের মাধ্যমে মোক্ষলাভ করেন পরম্পরাগত ভাবে।

অবশ্য, এ'কথা অবশ্যস্বীকার্য যে, সাক্ষাৎভাবেই হোক, পরম্পরাগত ভাবেই হোক "সাংখ্য" ও "যোগ"—উভয় মার্গই পরিশেষে সেই একই ফলের সাধক; মুক্তি বা মোক্ষ। সেজন্যই গীতা বলছেন :

"সাংখ্য-যোগৌ পৃথগবালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্॥"

(গীতা, ৫-৪)

"অজ্ঞ ব্যক্তিরাই সাংখ্য ও যোগকে পৃথক্ বলে থাকেন, পণ্ডিতেরা নয়। এদের মধ্যে একটিমাত্রও সম্যক্‌ভাবে অনুষ্ঠিত হলে উভয়েরই ফল লাভ করা যায়।

ভাষ্যে শঙ্কর বলছেন যে, "সাংখ্য" ও "যোগ", জ্ঞান ও কর্ম, কর্ম-ত্যাগ ও কর্মানুষ্ঠান পরস্পরবিরোধী, সেজন্য তাদের ফলও পরস্পরবিরোধী, সেজন্য উভয়েই সেই একই মোক্ষের সাধন হতে পারে না—এই আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে। কিন্তু এর উত্তর হ'ল এই যে, "সাংখ্য" ও "যোগের" ফল সেই একই :

"সাংখ্য-যোগৌ পৃথক্ বিরুদ্ধ ফলৌ বালাঃ প্রবদন্তি, ন পণ্ডিতাঃ। পণ্ডিতাস্তু জ্ঞানিন একং ফলমবিরুদ্ধমিচ্ছন্তি।"

(শঙ্কর-ভাষ্য, ৫-৪৪)

অজ্ঞ ব্যক্তিদের মতেই সাংখ্য ও যোগের বিরুদ্ধ ফল

হয়। কিন্তু পণ্ডিতদের মতে, তাদের একই, অবিরুদ্ধ ফল হয়।

"যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি সঃ পশ্যতি॥"

(গীতা ভাষ্য ৫-৫)

সাংখ্য দ্বারা যে স্থান লাভ হয়, যোগ দ্বারাও সেই একই স্থান লাভ হয়। যিনি সাংখ্য ও যোগকে একরূপে দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন।

ভাষ্যে শঙ্কর বলছেন যে, স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন উঠবে যে, সাংখ্য ও যোগের মধ্যে একটির অনুষ্ঠান করলেই উভয়েরই ফললাভ হবে কিরূপে? এর উত্তর হ'ল ঃ

"যৎ সাংখ্যৈঃ জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ সংন্যাসিভিঃ প্রাপ্যতে স্থানং মোক্ষাখ্যং, তৎ যোগৈরপি। জ্ঞানপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বেন ঈশ্বরে সমর্প্য কর্মাণি আত্মনঃ ফলমনভিসন্ধায় অনুতিষ্ঠন্তি যে তে যোগিনঃ, তৈরপি পরমার্থ জ্ঞান-সন্ন্যাস-প্রাপ্তি-দ্বারেণ গম্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ।"

(গীতা-ভাষ্য, ৫-৫)

জ্ঞান-নিষ্ঠ সন্ন্যাসী "সাংখ্যগণ" যে স্থান "মোক্ষ" প্রাপ্ত হন, "যোগিগণ"ও ঠিক সেই একই স্থান প্রাপ্ত হন। এরূপে জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য ঈশ্বরে সমস্ত কর্ম অর্পণ করে নিষ্কাম ভাবে যে যোগিগণ কর্ম সম্পাদন করেন, তাঁরাও ক্রমশঃ পরমার্থ-জ্ঞান ও সন্ন্যাস লাভ করে মোক্ষলাভ করেন।

গীতার শেষ অধ্যায়েও, শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে এই বিষয়ে পুনরায় উপসংহার মুখে আলোচনা করেছেন। তিনি এস্থলে বলছেন যে, কর্মযোগের ফল হ'ল জ্ঞানযোগে অধিকার, এবং তার ফল হ'ল, কর্মত্যাগ, জ্ঞানলাভ ও মোক্ষ।

"যা চ কর্মজা সিদ্ধিরুক্তা জ্ঞান-নিষ্ঠা-যোগ্যতা-লক্ষণা, তস্যাঃ ফলভূতা নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধিঃ জ্ঞাননিষ্ঠা-লক্ষণা বক্তব্যেতি শ্লোক আরভ্যতে।"

(গীতা-ভাষ্য, ১৮-৪৯)

এরূপে, কর্মযোগিগণের মুক্তিক্রম হ'ল এরূপ ঃ

কর্মযোগ→কর্মযোগসিদ্ধি অথবা জ্ঞান-নিষ্ঠা-যোগ্যতা→জ্ঞান-নিষ্ঠা অথবা মোক্ষ।

অর্থাৎ ঃ

নিষ্কাম কর্ম—চিত্তশুদ্ধি→জ্ঞানাধিকার→জ্ঞানলাভ—মোক্ষ।

পুনরায় বিশদতর ভাবে শঙ্কর গীতা-ভাষ্য শেষে বলছেন যে, কর্মযোগিগণের মোক্ষ-ক্রম হ'ল এই ঃ তাঁরা শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে নিষ্কাম ভাবে "স্বকর্ম' বা ঈশ্বরার্চনাদি কর্ম সম্পাদন করেন, তার ফলে ঈশ্বরেরই অনুগ্রহে তাঁদের দেহেন্দ্রিয়াদি জ্ঞান-নিষ্ঠা যোগ্যতারূপ সিদ্ধি লাভ করে; এবং এইভাবে জ্ঞান নিষ্ঠা প্রাপ্তিরূপ ক্রমের সাহায্যে তাঁরা পরিশেষে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

(গীতা-ভাষ্য, ১৮ ৫০)

সেজন্য শঙ্কর বলছেন যে, কর্মযোগের ফল হ'ল "সম্যগ-দর্শন" ঃ

"কর্মযোগ-নিষ্ঠায়াঃ পরম-রহস্যমীশ্বরশরণতামুপসংহৃত্য অথেদানীং কর্মযোগ-নিষ্ঠা-ফলং সম্যগদর্শনং সর্ব-বেদান্ত-বিহিতং বক্তব্যমিত্যাহ।"

(গীতা ভাষ্য, ১৮-৬৬)

কর্মযোগ নিষ্ঠার পরম রহস্য বা গূঢ়ার্থ হ'ল ঃ ঈশ্বরে শরণ গ্রহণ করা, এবং তার ফল হ'ল ঃ সর্ববেদান্তবিহিত সম্যগ-দর্শন বা ব্রহ্মোপলব্ধি।

এরূপে "সাংখ্য" ও "যোগের" পরমে ও চরমে ফল হ'ল ব্রহ্মোপলব্ধি বা মোক্ষ। এস্থলে সাক্ষাৎ অসাক্ষাৎ রূপ ক্রম ভেদ থাকলেও শেষ ফলের দিক থেকে কোনরূপ ভেদ নেই।

এই ভাবে সাংখ্য ও যোগ, জ্ঞান ও নিষ্কাম কর্ম, কর্মত্যাগ ও কর্মানুষ্ঠানকে মোক্ষের দিক্ থেকে উপায়স্বরূপ বলে গ্রহণ করলেও, প্রকৃতপক্ষে সাংখ্যই যে যোগ অপেক্ষা শ্রেয়ঃ, এই হ'ল শঙ্করের মত। স্বভাবতঃই, সাক্ষাৎ ভাবে জ্ঞাননিষ্ঠা, এবং প্রথমে কর্মনিষ্ঠা, তার মাধ্যমে জ্ঞাননিষ্ঠা—এই দুটির মধ্যে প্রথমটিই সহস্রগুণ উৎকৃষ্টতর, যেহেতু শেষ পর্যন্ত জ্ঞান-নিষ্ঠাই মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধক। সেজন্য বিলম্ব না করে, অপর কোন সাধনের অপেক্ষা না করে' যদি প্রথম থেকেই জ্ঞানমার্গে অধিকার থাকে ও জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করা যায়, তা হলে তা নিশ্চয়ই অধিকতর কাম্য। একথা শুদ্ধ জ্ঞান-বাদী শঙ্কর বারংবার নানা ভাবে বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলেছেন। এ বিষয় পরে আলোচনা করা হচ্ছে।

এই কারণে, শঙ্করের মতে "সাংখ্য" উচ্চাধিকারী, "যোগী" নিম্নাধিকারী। সেজন্য শঙ্কর বলেছেন যে, অর্জুনও নিম্নাধিকারী বলেই শ্রীভগবান তাঁর নিকট এই ভাবে শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতায় কর্মযোগের প্রশংসা করেছেন ও বিধান দিয়েছেন।

"কুরু কর্মৈব তস্মাত্ত্বমিতি" চ জ্ঞাননিষ্ঠাসম্ভবমর্জুন স্যাবধারণেন দর্শয়িষ্যতি।"

(গীতা-ভাষ্য ৩—ভূমিকা)

"তুমি কর্মই কর"—এই উপদেশ শ্রীভগবান অর্জুনকে দিয়েছিলেন এই কারণে যে অর্জুনের পক্ষে জ্ঞাননিষ্ঠা অসম্ভব ছিল।

"যথোক্তানেক পক্ষানুষ্ঠানাশক্তিমসন্তমর্জুনমজ্ঞং প্রতি বিধানাৎ।"

(গীতা ভাষ্য, ১৮-৩)

অন্য কোন সাধন প্রণালী অবলম্বনে অক্ষম বলেই অজ্ঞ অর্জুনের জন্য এরূপ কর্মযোগের বিধান।

এরূপে "সাংখ্য" ও "যোগের" মধ্যে মূলীভূত প্রভেদ হ'ল, যা উপরেই বলা হয়েছে, শুদ্ধজ্ঞান এবং নিষ্কাম কর্ম মাধ্যমে শুদ্ধজ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ। এস্থলে "সাংখ্য" নামটি দ্বারা ভ্রান্ত ধারণা হতে পারে যে, এর দ্বারা মহামুনি কপিল-প্রপঞ্চিত প্রকৃতি পুরুষ ভেদমূলক সাংখ্যদর্শন; এবং "যোগ" অর্থে মহামুনি পতঞ্জলি প্রপঞ্চিত "চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধ" রূপ যোগ দর্শন। সেজন্যই এই দুটি শব্দের বিশদ ও পুনঃ পুনঃ ব্যাখ্যা গীতা ভাষ্যে পাওয়া যায়। যেমন শঙ্কর বলছেন:

"সাংখ্যং নাম—ইমে সত্ত্বরজস্তমাংসি গুণা ময়া দৃষ্টাঃ অহং তেভ্যোঽন্যঃ তদ্ ব্যাপারসাক্ষিভূতঃ, নিত্যঃ, গুণ বিলক্ষণঃ আত্মেতি চিন্তনমেষসাংখ্যো যোগঃ।"

(গীতা ভাষ্য, ৩ ২৪)

'এই সত্ত্ব, রজস ও তমস গুণ আমি দেখছি, কিন্তু আমি এই গুণত্রয় থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন, বরং আমি গুণত্রয়ের সমস্ত ব্যাপারের নির্বিকার সাক্ষীই মাত্র, আমিই নিত্য, গুণ বিভিন্ন আত্মা।'—এরূপ চিন্তার নামই হ'ল "সাংখ্যযোগ"।

সেজন্যই, গীতার শেষ অধ্যায়ে শঙ্কর বলেছেন যে, এস্থলে "সাংখ্য" শব্দের অর্থ "বেদান্ত"।

"সাংখ্যে জ্ঞাতব্যাঃ পদার্থাঃ সংখ্যায়ন্তে যস্মিন শাস্ত্রে, তৎ সাংখ্যঃ বেদান্তঃ।"

(গীতা ভাষ্য ১৮-১৩)

জ্ঞাতব্য বস্তু যে শাস্ত্রে সম্যক্ ভাবে প্রপঞ্চিত করা হয়, সেই শাস্ত্রই হ'ল "সাংখ্য" অর্থাৎ "বেদান্ত।"

কবিকে

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস

আমি আনিয়াছি প্রীতি-চন্দন,
আমি আনিয়াছি গীতি-বন্দন,
হে কবি, হে সখা, হে প্রসূন মন—
উদার দীপ্ত ললাটে তোমার পর,
কর পল্লবে ছন্দ-অর্ঘ্য ধর।

আমি আনিয়াছি মুক্ত হৃদয়
সে-হৃদয় শুধু আমারই তো নয়,
সে তোমার—তার কত পরিচয়
পেয়েছি, পেতেছি আরো আমি পাব, পাব—
তীর্থে চলেছ, আমি তব সাথে যাব।

আমাদেরও ছিল ভারতী-সাধনা,
আমাদেরও ছিল অসীম কামনা,
সীমানা ছাড়াতে ডানার প্রেরণা—
সে-কথা বন্ধু ভুলো না, বন্ধু ভুলো না,
কি পেয়েছি আর কি পেলাম না, ও-তুলো না।

তোমার শুভ্র হৃদয়ে ফলকে
আজো শিশু মন দীপ্তি ঝলকে;
রাঙায়ে, মাতায়ে পলকে পুলকে
ভাবের ভুবনে রঙে রঙে কত খেলা—
হে কবি বন্ধু আজো হেমন্ত-বেলা।

এসো, বাহু ডোরে বুকে বুকে বাঁধি,
প্রখর সূর্য্য দিয়েছিল ধাঁধি'
ধূয়ার ছন্দনে এসো বসে কাঁদি—
নূপুরের ধ্বনি যেটুকু শুনেছি, আহা
মধুর মধুর, তুমিও শুনেছ তাহ ॥



ঘটনা ও রটনা

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

সাধারণ মানুষের পক্ষে যাহা ঘটে তাহার নির্জ্জলা সত্য বিবরণ দেওয়া সম্ভব হইয়া উঠে না, সামান্য কম বেশী, একটু এদিক ওদিক কখনও বা কিছু অবান্তর কথাও ইহার মধ্যে বেফাঁস আসিয়া পড়ে। মানুষের স্মৃতি, দৃষ্টিভঙ্গি, ঘটনা বিশ্লেষণ করিবার শক্তি, বলিবার রীতি-পদ্ধতি, নিজের বা ঘটনা সম্পর্কীয় ব্যক্তির সহিত আত্মীয় বন্ধুরূপে পরিচয় বা ঘনিষ্ঠতা প্রভৃতি নানা কারণ এই ঘটনা বিবরণকালে সত্যের ব্যতিক্রম সাধন করিয়া থাকে।

যাহা প্রকৃত, তাহাও একই ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষীর বিবরণে নানা প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। গল্প আছে, সার ওয়াল্টার স্কট এক সময় ইংলণ্ডের এক বিশদ ইতিহাস লেখার সঙ্কল্প করেন। একদিন পথে দেখলেন একটি ঘোড়ার গাড়ী (তখন মোটর গাড়ী ছিল না) অতি দ্রুতবেগে আসিয়া একটি পথচারীকে চাপা দিল, ঘটনাস্থলের চারিদিক ঘিরিয়া বহু লোকের ভিড় হইয়া গেল। যথানিয়মে বেশী ভাগ লোকই শকট-চালকের উপর দোষারোপ করিল। (বর্ত্তমানে যেমন কেহ মোটর চাপা পড়িলে রাস্তার লোক আসিয়া বিনা বিচারে গাড়ীর চালককে বেদম প্রহার করে এবং গাড়ীতে অগ্নি-সংযোগ করে, সেইরূপ কিছু হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় নাই।) কেহ বা গাড়ী-চাপা লোকটির দোষ দর্শাইল। তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য মাত্র দু'একজন পাওয়া গেল, বাকি সবই নানা কোলাহলে স্থানটি মুখরিত করিয়া তুলিল। অনেকেই "যদি"র উপর অর্থাৎ যদি গাড়ীখানা আর একটু ধীরে ধীরে আসিত, যদি একটু দক্ষিণ বা বামদিক ঘেঁষিয়া যাইত, যদি লোকটি তাড়াতাড়ি পার হইতে চেষ্টা না করিত, ইত্যাদি, ইত্যাদি, যদির উপর জোর অর্থাৎ stress বা emphasis দিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

স্কট সাহেবের কানে তাহার আশ-পাশের কতক আলোচনা আসিয়া পৌঁছিল। তিনি ইতিহাস লিখিবেন, তাঁহার সম্মুখে যাহা ঘটিয়াছে, তাহারই একটা বিচার করিয়া দেখিবার জন্য মাথায় "দুষ্টবুদ্ধি" গজাইয়া উঠিল। ("দুষ্টবুদ্ধি" কেন, তাহা পরেই বলা হইতেছে।) তিনি সামান্য একটু দূরে সরিয়া গিয়া ভিড় হইতে অপসৃয়মান এক ভদ্রলোককে ঘটনার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি তাঁহার সজ্ঞানে প্রাপ্ত-জ্ঞান বিবৃত করিলেন। মধ্যে স্কট সাহেব একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি নিজে দেখেছেন, না, আপনার শোনা কথা?" ভদ্রলোক দস্তুরমত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "বলেন, কি মশায়? নিজে চোখে না দেখলে আমি এ রকম পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিতে পারতাম!"

তিনি আরও কয়েক ব্যক্তিকে ঐ একই কথা প্রশ্ন করিলেন, মোটের উপর ঘটনাটির চাক্ষুষ দর্শন সম্বন্ধে সকলেই নিশ্চিত, একের সঙ্গে অপরের বিবরণের সামান্য হইতে গুরুতর পার্থক্য রহিয়াছে এবং স্কট যাহা দেখিয়াছেন তাহা হইতে মোটামুটি সকলেরই বিবরণের সহিত যে সাদৃশ্য আছে তাহা উপেক্ষণীয়।

ইহাতে তাঁহার মনের মধ্যে এক গভীর সংশয় উপস্থিত হইল। যাহা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন সেই ঘটনার সহিত উপস্থিত লোকের বিবরণের মিল নাই, আর যাহা শত শত বর্ষ পূর্ব্বে ঘটিয়া গিয়াছে। রাজ-রাজড়ার ব্যাপার, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘটনার সময় কেহ উপস্থিত ছিলেন না; যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা লিখেন নাই। প্রবাদের মত মুখে মুখে যে গল্প চলিয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া ইতিহাস রচিত হইয়াছে এবং তাঁহাকেও সেই সব তথ্যের উপর নিজ ইতিহাস রচনা করিতে হইবে। কথিত আছে, তাঁহার মাথায় অপর এক দুর্বুদ্ধি জাগিল, দুষ্ট সরস্বতী তাঁহার উপর ভর করিলেন তিনি তাঁহার লিখিত পাণ্ডুলিপি, (যখন স্কটের লেখা এবং তাঁহার লিখিবার শক্তি অসাধারণ ছিল, সুতরাং তাহার পরিমাণ অন্ততঃ গল্পের খাতিরে ধরিয়া লওয়া গেল—(বহু শত পৃষ্ঠা ব্যাপী) খণ্ড খণ্ড করিয়া সাগরের জলে ভাসাইয়া দিলেন। জগৎ স্কট লিখিত ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠে বঞ্চিত হইয়া নিশ্চয়ই এখনও হায়! হায়! করিতেছে, কেবল শব্দে তাহা শোনা যাইতেছে না।

এরূপ ঘটনা একেবারে অনিচ্ছাকৃত বলিয়া গ্রহণ না করিতে পারিলেও ইহাতে কাহারও বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, এবং রাম যখন মনে করিতেছে শ্যাম ঘটনাটি স্বচক্ষে দেখিয়াছে, তখন রামের জিজ্ঞাসার উত্তরে কিছু না বলিলে শ্যাম নিজেকে নিতান্ত "বোকা" বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহে না, ইহা সাধারণ মানুষের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ।

সত্য কথা বলার চেষ্টার মধ্যে আরও নানা প্রকারে যাহা অ-সত্য, সরাসরি যাহা মিথ্যা নয় এমন বিবরণও আসিয়া পড়িতে পারে। ইহার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। পণ্ডিত মোক্ষমূলর (Max Muller) পরমহংসদেবের দু'একটি অলৌকিক শক্তির কথা শুনিয়া পরমহংসদেবের এক পরম ভক্ত শিষ্যকে এই সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। প্রচলিত কাহিনীমতে; এবং সরল বিশ্বাসে শিষ্য উহার সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। তাঁহার উত্তর হইতে এই বিষয়ে যে সন্দেহের কোনও অবকাশ আছে, তাহার কোনও লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। পণ্ডিত প্রশ্ন-কর্ত্তার ইহাতে সন্দেহ সম্পূর্ণ দূর হয় নাই। তখন তিনি বলেন, কথায় কথায় আসল ঘটনা তরল হইয়া আসে, ইহা "dialague-ic process." লোক-পরম্পরায়

শুনিতে শুনিতে এবং তাহা বিবৃত করিতে খাঁটি সত্য কিছু কিছু মলিনতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যিনি যেমন শোনেন তাহা ভাল লাগিলে এবং নিজ শক্তি থাকিলে মূল ঘটনা বা বিবরণে কিছু "রসান" (রসায়ন) যোগ করিবার একটা দুর্বার প্রবৃত্তি মাথার মধ্যে গজাইয়া উঠে। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট প্রমাণ, আমাদের মহাভারত মহাকাব্য। এক দল পণ্ডিত আছেন, যাঁহাদের মতে আদি ও "অকৃত্রিম" মহাভারতে মাত্র ছাব্বিশ হাজার শ্লোক ছিল। ইহা রচনা করিতে এবং শ্রীগণেশজী তাহা লিখিয়া লইতে গলদঘর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছিলেন; ইহাকেও আবার একটি কাহিনী বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে; কারণ তত্ত্বান্বেষী পণ্ডিতেরা বলেন, মহাভারতের যুগে কোনও লিখিত অক্ষর সৃষ্টি হয় নাই। বর্ত্তমানে মহাভারত এক লক্ষ শ্লোকে সম্পূর্ণ। গণেশ-লিখিত একখণ্ড আদি মহাভারত থাকিলে আর অতিরিক্ত চুয়াত্তর হাজার শ্লোক সংযোজিত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। যাহাই হউক এইরূপ ঘটনাও খুব অস্বাভাবিক নহে। ইহাতে সাধারণ লোকের ক্ষতি ত হয় নাই, বরং জ্ঞানবৃদ্ধির সুযোগই হইয়াছে।

এ সকল যুগের অবসান ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না; মানুষ যতদিন মানুষ আছে ততদিন ইহা থাকিয়া যাইবে। আমাদের পুরাতন পুঁথিতে বর্ণিত দেবতারা এই সত্য ঘটনায় মোচড় দিয়া তাহার যে নানা রূপ দিতে পারিতেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণও আছে। বর্ত্তমানে ইহাকে যুগোপযোগী মূর্ত্তি দান করা হইয়াছে। প্রচার ইহার বাহন এবং শ্রোতা আর ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি এক-আধ জন নয়, এখন সমস্ত দেশবাসী বা তাহারও বাহিরে, সমস্ত জগৎজন।

অকারণে নিজেদের গৌরব-কীর্ত্তিকাহিনী প্রচারের জন্য যে পথ গ্রহণ করা হইতেছে, তাহাতে প্রকৃতপক্ষে গৌরব করিবার বিশেষ কিছু নাই; তাহা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রোতা সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকে। সত্যের যেখানে নামমাত্র স্পর্শ আছে, তাহা যথাসম্ভব সত্যের রূপ দিয়া লোকের কাছে প্রতিপন্ন করিবার একটা বিরাট অপপ্রচেষ্টা জগতের লোকের সমক্ষে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে।

এখানেও একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ দ্বারা বক্তব্যটি পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিব। ভারতবর্ষ হইতে একদল "প্রতিনিধি" ১৯৫৯ সনের শেষভাগে সরকারী উৎসাহে "সাগর দর্শন যাত্রা"য় এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্বাঞ্চলে অবস্থিত কয়েকটি দেশভ্রমণে বাহির হন। এই দলের কার্য্যকলাপ এবং এই বিদেশ-ভ্রমণের মোট ফলাফল সম্বন্ধে গত ৯ই ডিসেম্বর (১৯৫৯) তারিখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ('সত্যমেব জয়তে" প্রতীকের ধারক ও বাহক) রাজ্যসভায় কোনও এক "অ"-সভ্যের উত্তরে বলেন, "it was a remarkable success" ইহা আশ্চর্য্য বা অসাধারণরূপে সফল হইয়াছে। অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে তাহারা সাগর দর্শন যাত্রায় ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য বিশেষভাবে সিদ্ধ হইয়াছে।

এখন এই "রিমার্কেবল সাক্‌সেস" যে কি তাহা বিবৃত করিলে সত্য ঘটনা এবং তাহার রটনা কি তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যাইবে। যাঁহারা নিত্য সংবাদপত্র পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট ইহার কতকগুলি বিষয় অজ্ঞাত নয়, তথাপি এই সফল জয়যাত্রারূপ সাজির ফুলগুলি স্বতন্ত্ররূপে একবার দেখাইয়া দিলে পরে এই সাজি সম্বন্ধে একটা প্রকৃষ্ট ধারণা করিবার সুবিধা হইবে।

এই দলে মাত্র দুইজন পার্লামেন্টের সভ্য সমেত ৪৩৫ জন লোক সরকারী সহযোগিতায় নবতম জয়যাত্রায় বহির্গত হন। সমস্ত যাত্রার পথে ইহাদের শৃঙ্খলা পালনের বালাই লক্ষ্য করা যায় নাই। নূতন স্বাধীন দেশের মানুষ ইহারা, সুতরাং প্রত্যেকের আচরণে স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করাই যেন এক মহৎ উদ্দেশ্য বলিয়া মুখে প্রকাশ না হইলেও কার্য্যতঃ প্রমাণিত হয়। শ্রীবাবুরাও প্যাটেল এক বিখ্যাত সংবাদিক; তিনি যে সকল ঘটনা সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছেন তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, জলতরী "সোনাবতী" কোচিনে পৌঁছিলে দুইজন পুরুষ এবং একজন মহিলাকে তাঁহাদের আচরণের জন্য জাহাজ হইতে নামিয়া যাইতে বলা হয় এবং তাঁহারাও বিনা আপত্তিতে সে অনুরোধ পালন করেন। নূতন প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রভাবিত হইয়া একজন পুরুষ ও তাঁহার বান্ধবী সিংহল ত্যাগে আর কোনও উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই। এই দল সিংহলে বন্দরনায়কের শবযাত্রায় যোগদান করিয়া যে রুচির পরিচয় দেন, তাহাতে একজন সিংহলবাসী বিস্মিত হইয়া ভারতে মৃতের প্রতি এইভাবে সম্মান প্রদর্শন করা হয় কিনা, প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিয়া বসেন। আমরা ইহার কি উত্তর দিয়াছিলাম, তাহা জানিতে পারিলে ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণের বড় একটা নির্দ্দেশ পাওয়া যাইত।

সাগর দর্শন এবং দেশের যাহা কিছু সু, শ্রেয়ঃ তাহাই বহন করিয়া লইয়া যাইবার যে প্রতিনিধিদলের মুখ্য উদ্দেশ্য তাহারা মালয়ে পণ্যক্রয়ের দল বসিয়া অবিলম্বে পরিচিতি লাভ করিয়া ভারতের সমৃদ্ধি প্রচারে সমর্থ হইলেন। বিদেশী মুদ্রার বিনিময় লাভের জন্য প্রত্যেককে মোট পঁচাত্তর টাকা লইয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু ইহারা যে মাল ক্রয় করিলেন তাহা পঁচাত্তর টাকার বিশ হইতে ত্রিশগুণ দরের অধিক। ভারতে যখন ইহারা ফিরিলেন তখন মোট ১,২২,০০০ টাকার আমদানী শুল্ক দিতে হইয়াছিল। ইহা প্রকাশ্য মালের উপর ধার্য্য করা টাকা। ব্যক্তিগত ব্যবহার, সরকারী প্রতিনিধিত্ব, প্রভাবপ্রতিপত্তি প্রভৃতি কারণে কত মালের উপর শুল্ক দিতে হইল না, তাহা অনুমানসাপেক্ষ ব্যাপার। ইহার মধ্যে একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি একাই ১,২৭৫ টাকা শুল্ক দিতে অসুবিধা বোধ করেন নাই।

এখন কৃষ্টির দিকটা একটু আলোচনা করা যাইতে পারে। এই প্রতিনিধি দলের সম্মানার্থে যেখানেই কোনও সভা ও ভোজের

আয়োজন করা হইয়াছে সেখানে ৪৩৫ (বাদ পাঁচ) জনের মধ্যে এককালে ত্রিশ জনের বেশী লোক উপস্থিত হইতে পারেন নাই। মালয়ের গুজরাটী সমাজ অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে ৫০০ থানি ভোজ সাজাইয়া ছিলেন, আনন্দের বিষয় নির্লোভী ভারতবাসীর মধ্যে একজনও উপস্থিত হন নাই। সিঙ্গাপুরে, জনশ্রুতি অনুসারে কাহাকেও কাহাকেও কুখ্যাত পল্লী-অঞ্চলে নিন্দনীয় ব্যবহারের জন্য পুলিস হেপাজতে কালহরণ করিতে হইয়াছে। ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের কর্ম্মচারী গিয়া কাহাকেও পনর ঘণ্টা বাদে পুলিস হাজত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।

ইহাই আমাদের "novel type of adventure" নূতন ধরনের অভিযান এবং প্রধানমন্ত্রীর মতে ইহা অভাবনীয়রূপে উদ্দেশ্য সফল করিয়াছে। বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, এই অ্যাডভেঞ্চার অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে সৃষ্ট এবং পরিচালিত।

ভারতের সর্ব্বস্তরে সত্য ঢাকা দিবার অভিসন্ধি লইয়া প্রচার-কার্য্য চলিতেছে ইহা যে উদ্দেশ্যমূলক "অ-সত্য" তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। সাধারণ ভাবে লোকে যাহাকে অস ্য বলে, তাহা হইতে ইহা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। খাদ্য, শিল্প-প্রয়াস ও তাহার ফলাফল, দ্রব্যমূল্য, বৃহৎ পরিকল্পনার ব্যয় ও ব্যায়ানুপাতিক ফল, উচ্চস্তরে অসাধু আচরণ প্রভৃতি সকল বিষয়েই ইহা প্রমাণিত হইতেছে।

সত্য গোপন করিয়া একটা ছদ্মরূপে তাহা বাহিরে প্রকাশ করার রীতি মানুষের সমাজ সৃষ্টি বিশেষতঃ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে প্রচলিত আছে। পরস্পরের মধ্যে জাগতিক ব্যবহার সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া লর্ড বেকনের একটা বিশ্বজোড়া খ্যাতি আছে। তিনি বলিলেন, যাঁহারা শক্তিমান তাঁহাদের ঘটনা উল্লেখ বা মতামত প্রকাশে অ-সত্য আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। সত্য ঘটনা গোপন করা বা যাহা ঘটে নাই তাহা রচনা করিয়া বলা (Dissimulation and simulation), অথবা যাহাই হউক কোনও রকমে তাহা প্রকাশ না করা (Reserve), মানুষ এই তিনটি পথের একটি বা একাধিক অবলম্বন করিতে পারে।

ডিসসিমিউলেশন বা সিমিউলেশন দুর্ব্বলের আশ্রয়। ইহার প্রয়োগবিধি বহু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হইতে সঞ্চয় করিতে হয়, সুতরাং ইহা যত্রতত্র প্রয়োগে সুফল অপেক্ষা কুফল প্রসব করে বেশী। যাহারা শক্তিমান্, কর্ম্মপটু তাহাদের উক্তি ও আচরণ সকলের সমক্ষে সূর্য্যালোকের ন্যায় স্পষ্ট হইয়া উঠে। যাহাদের গলদ যত বেশী, তাহাদের খোলস ততই প্রয়োজন; দ্ব্যর্থঘটিত বাক্যের আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া তাহাদের গত্যন্তর নাই।

ছলনা বা পাতলা অস্বচ্ছ পর্দ্দার আড়ালে সত্যকে গোপন করা যে একেবারে নিষ্ফল তাহা বলা যায় না। যাহারা সরল বিশ্বাসী তাহারা উচ্চপদস্থ, বিত্তশালী, বক্তৃতাবাগীশ লোকের কথা বিশ্বাস করিয়া থাকে। ইহাতে বড় সুবিধা, জনসাধারণের একটা বড় অংশের নিকট হইতে কোনও প্রতিবাদ শোনা যায় না। দ্বিতীয়তঃ এই দ্ব্যর্থ্যঘটিত বাক্যের আশ্রয়ে প্রয়োজনকালে মুখ্য হইতে গৌণ অপ্রকাশিত অর্থের সাহায্য লওয়া যাইতে পারে। আর না হয় "খুড়ি" বলিয়া একেবারে ভিন্ন মত প্রকাশ করা অসম্ভব নয়।

প্রকৃত ঘটনা আর তাহার প্রচারে এত পার্থক্য দাঁড়াইতেছে যে, লোক বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। সারা জগৎ জুড়িয়া এই এক খেলার অভিনয় ভিন্ন ভিন্ন খাতে চলিতেছে। যাহারা শক্তিমান, তাহাদের ভাষণে, অধিকমাত্রায় অ-সত্যের অংশ লক্ষ্য করা যায়। সদাসর্ব্বদা অপ্রাকৃত বস্তু সত্য বলিয়া প্রচারে রাষ্ট্রের কর্ণধারদের আত্মবিশ্বাস লঘু হইয়া পড়ে, বন্ধুরা নানারূপ অসুবিধার মধ্যে পড়ে এবং ক্রমে ক্রমে দুই-একটি করিয়া সম্পর্ক ছেদ করিয়া চলিয়া যায়। প্রধান ক্ষতি, অধিকাংশ লোকই ক্রমে অবিশ্বাসী হইয়া উঠে। যিনি যত উচ্চ দায়িত্বশীল পদে আসীন থাকেন, তাঁহার সত্য-বিচ্যুত উক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রের তত অধিক ক্ষতি সাধন করিয়া থাকে।

আজ ভারতবর্ষ বহু বিপদের সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছে, তাহার মধ্যে রাষ্ট্রের প্রধানদিগের প্রতি সাধারণ লোকের আস্থার অভাব। যাহা শোনা যায়, কার্য্যক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রমের মাত্রা এত বেশী যে, তাহাতে লোক অনাস্থা হইতে বিরূপ মনোভাব অর্জ্জন করিতে থাকে। অনবরত উচ্চস্তরে ঘটনা হইতে মিথ্যা রটনার বাহুল্যে, সমস্ত জাতীয় চরিত্র আজ মিথ্যার জালে জড়াইয়া পড়িতেছে। অ-সত্য কথা বলিয়া, ধূর্ত্তামি, শঠতায় আর কেহ লজ্জা অনুভব করে না। যখন মানুষের লজ্জা-সঙ্কোচের আবরণ খসিয়া যায়, "দু'কান কাটা" লোকের মত তাহারা গ্রামের মধ্য দিয়া বুক ফুলাইয়া চলিতে থাকে, তখন নিশ্চয়ই শঠের প্রাধান্য বলিয়া দেশের ঘোর দুর্দ্দিন বুঝিতে অসুবিধা হয় না।

অপর বা তৃতীয় একটি পথ রহিয়াছে, তাহা লর্ড বেকনের মতে "রিজার্ভ", বর্ত্তমানে তাহাকে (বাক্) সংযম বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। বহু কথা যাহাকে বলিতে হয়, পণ্ডিতরা বলেন, তাহার কথার মধ্যে সাধারণ নিয়মেই বহু মিথ্যা আসিয়া পড়িতে বাধ্য। আর কিছু না হউক লম্বা-চওড়া কথা যে ভবিষ্যৎ বাস্তব ঘটনার সহিত না-মিলিবার সম্ভাবনা আছে, তাহা মনে থাকে না। আবেগের ভরে, বিশেষতঃ ঘন ঘন করতালি পাইলে, মানুষ নিজ শক্তির কথা ভুলিয়া যায়। ইহার প্রতিকার আছে বাক্-সংযমে বা সম্পূর্ণ তুষ্ণীম্ভাব। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কথা বলিতে হইলে সদাসর্ব্বদা বক্তৃতা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

আর যেখানে ঘটনা এক এবং অবস্থার গতিকে বলিতে হয় আর সেখানে কোনও কথা না বলিয়া বরং মূক বা অহঙ্কারী দুর্ণাম লওয়া শ্রেয়ঃ ; সকল কথার উত্তর দিয়া 'সবজান্তা' হওয়ার বাহাদুরি গ্রহণের চেষ্টা করা সমীচীন নয়। যে সকল শ্রোতা প্রকৃত ঘটনা জানে, বা শীঘ্রই লোকের জানাজানি হইয়া পড়িবে, সে ক্ষেত্রে বাক-সংযম করাই একমাত্র পথ, অন্যথায় সত্য কথা বলিয়া দোষ স্বীকার করায় কোনও দোষ নাই।

সাধারণ লোক হইতে প্রধানতম রাজপুরুষ পর্য্যন্ত একটু বিচার-বিবেচনা করিয়া কথা বলিতে না শিখিলে সমাজ ও রাষ্ট্রের বনিয়াদে ভাঙন ধরিতে বিলম্ব হইবে না।

পাড়াগাঁয়ের কথা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

গ্রামে (আঁটপুরে) অবস্থানকালে পল্লী অঞ্চলের সকল সম্প্রদায়ের সর্ব্ববিষয়ে দুরবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। স্থানীয় বিদ্যালয়ের সম্পাদকরূপে কত অভিভাবকের, কত ছাত্রের বিদ্যালয়ের বেতন মকুব করিবার কাতর মিনতি শুনিতে হইয়াছিল এবং কত চিঠি পাইতে হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে, ইহাও উপলব্ধি করিয়াছিলাম, পল্লী অঞ্চলের সকলস্তরের মানুষদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়িয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়। কত অসহায়, দীনদরিদ্র বিধবা পুত্রকন্যাদের শিক্ষাদানের জন্য প্রবল চেষ্টা করিতেছেন, তাহার নিদর্শন নিম্নের চিঠিখানিতে পাওয়া যাইবে। এইরূপ চিঠি অনেক পাইয়াছি। কিন্তু, সহানুভূতি প্রদর্শন ছাড়া আর বিশেষ কিছুই সাহায্য করিতে সক্ষম হই নাই।

মাননীয় আঁটপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়, আপনার নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমার পুত্র শ্রীমান নিমাইচাঁদ চট্টোপাধ্যায় আঁটপুর বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র। ইহার ১৯৫৮-৫৯ এই দুই বৎসরের মাহিনা বাকী আছে। আমি অতি দরিদ্র বিধবা, কোনও রকমে কায়িকশ্রমের দ্বারা গ্রামের লোকের মুড়ি ভাজিয়া ও ধান ভানিয়া দিয়া দিনপাত করিয়া থাকি। সেই জন্য আমার পক্ষে এই বিদ্যালয়ের বেতনভার বহন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাহা ছাড়া আমার আর কোনও সঙ্গতি নাই, যাহার দ্বারা আমি ইহার বিদ্যালয়ের বেতন দিতে সমর্থ হই। এজন্য আমি আপনাকে জানাইতেছি যে, আমাকে সম্পূর্ণ ভাবে এই ঋণজাল হইতে মুক্তিদান করিতে হইবে। না করিলে, আমি কোনও প্রকারে ঐ বেতন দিতে সমর্থ নহি। দয়া করিয়া, আপনি এই দরিদ্র বিধবার সুব্যবস্থা করিবেন। আশা করি, আপনি আমার এই অনুরোধ রক্ষা করিবেন। অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। নিবেদন ইতি—

নিবেদক কালীবালা দেবী

গ্রাম সোমনগর : জেলা হুগলী।

তাং ৩০ ১২ ৫৯

পল্লী অঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহেও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। সহরের মত তীব্র না হইলেও, পল্লী অঞ্চলের পক্ষে উহাকে তীব্র বলিতেই হইবে। স্থানীয় বিদ্যালয়েও কিছুদিন পূর্ব্বে এইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা গিয়াছিল। কাহাদের প্ররোচনায় ছাত্রেরা এইরূপ উচ্ছৃঙ্খলা প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। বিদ্যালয়ের সম্পাদকরূপে, বিনা দ্বিধায় বলিতে পারি, বিনা কারণে, কর্ত্তব্য-পরায়ণ, ছাত্রদের প্রতি হৃদয়বান, প্রবীণ প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভটা বেশী ছিল। সেই সময়, নিজে প্রধান শিক্ষকের ধৈর্য্যে সীমা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। কিন্তু, প্রধান শিক্ষকই জয় লাভ করিয়াছেন। সেই উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রদের একজন প্রধান নেতা প্রধান শিক্ষককে লেখা, নিম্নোদ্ধৃত চিঠি পড়িলেই ইহা বুঝা যাইবে মনে হয়, এইরূপ অনুতপ্ত ছাত্রের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু, তাহাদের সৎসাহসের অভাবে, তাহারা তাহাদের দুঃখ ও মনোবেদন এইরূপ ভাবে প্রকাশিত করিতে পারে নাই। এই প্রসঙ্গে, ইহ মনে করাও ভুল হইবে না যে, ছাত্র-ছাত্রীরা স্বভাবতঃই সৎ, কি বাহিরের প্রভাবে—তাহারা বিপথে পরিচালিত হয়। কলিকাতা সহিত যুক্ত কোনও স্কুলের ছাত্রদের নিকট হইতেও এইরূপ চি পাইয়াছি।

"অসংখ্য ভক্তিপূর্ণ প্রণামান্তে,

মাষ্টার মশাই, আশা করি আপনার শারীরিক ও মানসি সুস্থতার বার্ত্তা। আজ বহুদিন হ'ল, আপনার সঙ্গে দেখা করবা সুযোগ করে উঠতে পারলাম না। তাই আজ আমার বিড়ম্বি জীবনটার শান্তিলাভের জন্যে পত্রের মাধ্যমে আপনার শুভাশী কামনা করছি। যদিও জানি যে, আপনার কাছে না চাওয়াতে আমরা অযাচিতেই শুভাশীষ পেয়ে থাকি, কিন্তু তবুও আমার ম আজ অশান্ত ভাবে ছুটে চলতে চায় ঐ জিনিসটি সর্ব্বাগ্রে পাওয়া আশায়। কারণ, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, আমি গত ১৯৫ সনের আই. কম. পরীক্ষায় আমার অধ্যয়ন-জীবনে সর্ব্বপ্রথম মসীম তুলির আঁচড় কেটেছি—তাও আবার Commercial Geography Paper-এ—যেটা আমার ছাত্রজীবনের প্রিয়পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। এ রকম অভাবনী বিপর্য্যয়ের জন্যে সত্যিই এখন আমার নিজের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। তবুও আবার আগামী ১৯৬০ সনের জন্যে তৈরী হচ্ছি। আজ আমাদের Test-এর Result বের হওয়ার পর University Examination Fees দিতে যাচ্ছি। তাই সর্ব্বাগ্রে চাই, আপনাদের মত গুরুর অশেষ শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ। কারণ, কোন শুভকাজে গুরুর আশীষ না পেলে কিছু সিদ্ধ হয় না। আশা করি অতি সত্বর আপনার স্নেহাশীষ লাভ করব।

আমার ছাত্র জীবনের শেষ ক দিনের জন্যে আমরা উচ্ছৃঙ্খলতার চরম শিখরে উঠে আপনাদের অনেক ব্যথা দিয়েছি, তাই আজ তার প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করছি বোধ হয়। জানি না, এর জন্যে

এখনও কত দিন অশান্তির জ্বালা ভোগ করতে হবে? তখন আমার কি একটুকুও বুদ্ধি ছিল না, যা দিয়ে নিজের আত্মার উন্নতি করে একজন প্রকৃত ছাত্রের আদর্শ স্থাপন করি? সুতরাং তার এ রকম দুর্গতি হবে না ত—হবে কার?? সত্যিই মাষ্টার মশাই, আজ আমার বিগত জীবনের ঘটনাবলীগুলো আলোচনা করে এক অসহ্য অনুশোচনাপূর্ণ জ্বালার সৃষ্টি করছে।

আমি দেশে গেলেও উপেনবাবুর স্মৃতি আমাকে আর এক প্রকার দুঃখের মাঝে ফেলে দেয়। উপেনবাবু যে আমাদের মাঝ থেকে হঠাৎ সরে যাবেন, তাও এক আশ্চর্য্য রকমের কাণ্ড—নিষ্ঠুরা নিয়তি দেবীর নীতি। আজ আমি ভাবছি যে, উপেনবাবুর আত্মার কাছে—আমি ব্যক্তিগতভাবে কি কৈফিয়ৎ দেব? ঈশ্বরের কাছে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

আমি ভালবাসি আঁটপুর স্কুলের ছাত্রদের আর শ্রদ্ধা করি স্কুলের সমস্ত শিক্ষকদের। তাই ছুটে যেতে চাই আঁটপুরের দিকে, কিন্তু আজ গত ছ'মাস হ'ল আমার সে গতি মন্থর করে দিয়েছে—গত পরীক্ষার ফল। আমার পরিকল্পিত নীতি নিয়ে দ্বারহাট্টার প্রাক্তন ছাত্রসমাজ তাদের স্কুলে এক সভার আয়োজন করে আমাকে নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছে। কিন্তু আমি আমার স্কুলেই সে রকম প্রীতিসভার আয়োজন করতে পেলাম না—তার আগেই দ্বারহাট্টার ছাত্রেরা করে ফেলল। আমি ওদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেই উক্ত পরিকল্পনা ওদের (দ্বারহাট্টার ছাত্র) কাছে স্থাপন করেছিলাম। এটাও আমার ব্যক্তিগত জীবনে আর এক পরাজয়। যাক্, আপনাদের শুভাশীষ যদি পাই, তা হলে আমরাও (প্রাক্তন ছাত্রেরা) স্কুলের উন্নতির জন্যে নিজেদের প্রাণ ঢেলে স্কুলের সেবা করবার সুযোগ পাব।

আমি এখান থেকে আগামীকাল দেশে যাচ্ছি। এখন, অর্থাৎ Final Examination পর্য্যন্ত বাড়ীতে থেকেই পড়াশুনা করবার আশা করছি। কারণ এখন ত আর আমাদের ক্লাশ হবে না। সুতরাং এখানে থেকে এখন শুধু (খরচ বাড়ানোর জন্যে) কর্ম্মব্যস্ত-জীবনে পড়াশোনা ভাল লাগে না। তাই "টিউশনি" ছেড়ে দিয়েই চলে যাচ্ছি—আপনাদের আশীর্ব্বাদের ভরসা নিয়ে।

তাই সর্ব্বাগ্রে আশা করি, আমার এই ধোয়া-মোছা আজকের শুভ দিনে আপনার আন্তরিক স্নেহাশীষ।

আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন, আর অন্যান্য মাষ্টারমশাইদিগকে আমার প্রণাম জানাবেন। স্কুলের সমস্ত ভাই-বোনকে আমার আন্তরিক ভালবাসা দিয়ে এবং বাড়ীর ঠিকানায় আপনার শুভাশীষপূর্ণ করুণার আশা নিয়ে পুনরায় প্রণামান্তে—ইতি

আপনার ছাত্র, ২৬-১২-১৯৫৯

স্বীকৃতি

শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ

একটি আকাশ থাক চেতনার চরিত্র নির্মাণে।
তোমার স্মৃতির রং ঝরুক ঝরুক তবে মেয়ে
নির্জন আকাশে নীল বৃষ্টির মত সারাদিন,
(প্রেমের প্রতিভা সব মেঘ হয়ে ঝরুক এখানে)।
যে সব কান্নার বীজ হৃদয়ের গভীরে ঘুমিয়ে
তুমি তাকে মুক্তি দাও—তারা সব সৃষ্টিতে প্রবীণ
হোক। এই ত এ পৃথিবীর আদিম স্বভাব:
আমাকে বাজাও তুমি যন্ত্রণার নিপুণ আঙুলে
আমাকে উত্তীর্ণ কর; সময়ের সাঙ্কেতিক ধূলে
সন্ধ্যার অতসী হোক,—তার পর তুমি তাকে পাবে।

হে পৃথিবী, হে আকাশ হে আমার ধূসর সময়—
তোমাদের সব সর্ত মেনেছি প্রসন্ন পরাভবে।
কান্নার বৃষ্টিরা ছাড়া আঙুরেরা হয় না নিটোল,
নিভৃত নরম মোমে রূপ হয় রাত্রির আকাশ।
এখন তোমাকে আমি মেনে নেব; আর আমি ভয়
করব না: যন্ত্রণার কারুকাটে প্রত্যহের শবে
রূপ দেব; দু'হাতে ছড়াব রং-রোল।
এই কথা বলে গেল যৌবনের শালীন বাতাস,—
"যন্ত্রণা উজ্জ্বল দাহ কখন যে হীরে হয় কাচ
আমরা জানি না। তবু খনির অতল অন্ধকারে,
গলে গলে রূপ নেয় সোনার উজ্জ্বল অভিলাষ।"

সময়ের হাতে শেষে ফিরে পাব লাবণ্যপ্রভাবে—
সে আমার শুদ্ধ মন—হিরণ্ময় স্রষ্টার স্বভাব—
যন্ত্রণা নিখিল বিশ্বে সৃষ্টির আদিম উত্তাপ।

মানসিক স্বাস্থ্য

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

বর্ত্তমানে জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে যতগুলি সমস্যা আছে তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে মানসিক রোগের সমস্যা। ক্যানসার, হৃদরোগ এবং ক্ষয়রোগ এই তিন মিলাইয়া হাসপাতালে যতগুলি বেডের দরকার হয় উন্মাদ রোগীরা তদপেক্ষা বেশী বেড দখল করিয়া আছে। মানসিক রোগের জন্য হাসপাতালে (চলতি ভাষায় পাগলা গারদে) যেখানে একটি রোগী স্থান পায় বাহিরে একরূপ রোগীর স্থলে অন্ততঃ দুই রোগী রহিয়াছে যাহাদের হাসপাতালেও পাঠাবার মত রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই অথচ স্বাস্থ্যপূর্ণ সুখের সংসার বাস করিতে পারে একরূপ অবস্থাও নয়।

বিকৃতমস্তিষ্ক লোকের মোটসংখ্যা পৃথিবীতে কত তাহা অবশ্য জানা যায় না, কিন্তু যে সকল দেশের স্বাস্থ্য-বিভাগের তৎপরতা উন্নত ধরনের (যথা ইউরোপ ও আমেরিকা) সেই সকল দেশে হাসপাতালের অর্দ্ধেক বিছানা মানসিক রোগীতে ভর্ত্তি। আর বড় বড় সাধারণ হাসপাতালের বহির্বিভাগে যাহারা চিকিৎসিত হয় সেই সকল রোগীর এক-তৃতীয়াংশ বা বরং ইহারও বেশী মানসিক রোগের জন্যই সেখানে যায়।

ইউরোপের হাসপাতালে মানসিক রোগীর সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের হাসপাতালের একরূপ রোগীর সংখ্যা ৬,০০,০০০ লক্ষ। প্রত্যেক ষোলজন লোকের মধ্যে একজনের কোন না কোনরূপ মানসিক অস্থিরতা আছেই। হল্যাণ্ডে প্রতি এক-সহস্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে মোটামুটি ৩৫ জনের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়। পৃথিবীর মধ্যে জাপান, ডেনমার্ক, অষ্ট্রিয়া এবং সুইটজারল্যাণ্ড আত্মহত্যায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে, ফরাসীদেশে হারাহারি ভাবে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বা সুইডেন অপেক্ষা দশগুণ, ইংলণ্ড হইতে পাঁচগুণ সুরা পান করে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিশ্ব-স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের এক আলোচনা সভায় ঘোষণা করা হইয়াছিল, "মানসিক ও ভাবপ্রবণতার জন্য যে পরিমাণ সামাজিক ব্যাধি আছে (যথা অল্প বয়স্কের অপরাধ-প্রবণতা, পানদোষ, অন্যান্য নেশা, আত্মহত্যা প্রভৃতি), মামুলি উন্মাদ রোগের কথা ছাড়িয়া দিলেও তাহার পরিমাণ এত বেশী যে, একরূপ অবস্থাকে মহামারীর অবস্থা বলিয়া ঘোষণা এবং ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হয়।" ঘোষণার পর কয়েক বৎসর গত হইলেও পৃথিবীর অবস্থা কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই।

মানসিক রোগ আজ ব্যাপকভাবে সমস্ত জনগণের মধ্যে ছড়াইয়াছে। আশার কথা ইহার চিকিৎসা বিষয়ে বহু উন্নতি হইয়াছে। জীবনের দৈনন্দিন ব্যস্ততা ও উদ্বেগ সম্বন্ধেও (কারণ ইহা হইতেই অনেক সময় মানসিক রোগ জন্মে) মানুষ সজাগ হইতেছে। আমাদের অনেকের জীবনেই একরূপ অনেক ছোটখাট ঘটনা হয় যাহাতে মানসিক শান্তি ব্যাহত হয়। পারিবারিক জীবন এবং সামাজিক সম্বন্ধ বিক্ষুব্ধ হয় এবং কর্ম্মক্ষমতাও বাধাপ্রাপ্ত হয়। আমাদের সকল সময়ই মনে রাখা প্রয়োজন যে, আধুনিক জীবনের বহু সমস্যাই মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যা, স্নায়ু সম্পর্কীয় সমস্যা, যদিও আপাতদৃষ্টিতে ঐগুলিকে ভয়, সাহসের অভাব, অসংযম, ঘৃণা ও ভাবপ্রবণতার সমস্যা বলিয়া মনে হয়।

সকল লোকেরই বর্ত্তমানের মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থা ও উহার করা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া উচিত। বিশ্ব-স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান এই দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসংঘ শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান (UNESCO), জগতের বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সমবায়ে World Federation of Mental Health নামক একটা সংস্থা গঠন করিয়াছে এবং বৎসরটিকে World Mental Health, Year 1959-60, এই নামে অভিহিত করিতেছে।

গত এপ্রিল, ১৯৫৯ হইতে 'বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য বৎসর' সুরু হইয়াছে এবং ইহা ১৮ মাস পর্য্যন্ত চলিবে—কর্ম্মসূচীতে রহিয়াছে—গবেষণা, তথ্যানুসন্ধান, জনসাধারণকে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে জাগ্রত করা এবং শিক্ষাদান।

শত শত বৎসর ধরিয়া মানসিক রোগগ্রস্তকে 'পাগল' বা 'উন্মাদ' আখ্যা দিয়া গারদে আটক রাখা হইত, পায়ে বেড়ি দেওয়া হইত। মানসিক রোগ সম্পর্কে পুরাতন ভীতি সমাজ আজ ধীরে ধীরে বর্জ্জন করিতে চলিয়াছে—অন্যান্য রোগের মত মানসিক রোগও নিরাময় হয়, এই ধারণা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। যদি রোগের প্রথম অবস্থায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায় তবে শতকরা ৮০টি রোগীর নিরাময় হওয়ার সম্ভাবনা। মানসিক রোগমুক্ত এই সকল নর-নারী আবার সমাজে নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া গেলে পৃথিবীর কল্যাণ হইবে।

অন্ধ আকাশ

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

৩১

ঘুম হইতে উঠিয়া মস্তবড় একটা হাই তুলিয়া তিলকা প্রশ্ন করে, "জেগে আছিস্ গো, উঠিস নি যে এখনও, অসুখ করেছে বুঝি ?"

ছেঁড়া কাঁথাখানায় সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া রুকিয়া শুইয়াছিল, তিলকার ডাকে সাড়া দিয়া বলে, "হুঁ ।"

খাটিয়া হইতে নামিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে কাছে আসিয়া রুকিয়ার কপালে হাত দিয়া তিলকা মাথা নাড়িয়া বলে, "উঃ, কপালটা ত বড্ড তেতেছে গো, জর এসেছে যে।"

রুকিয়া কোন জবাব দেয় না। তিলকা বলে, "তুই যেন উঠিস নি, চুপ করে শুয়ে থাক, আমি যা হয় করব এখন।"

তিলকা কলসীতে হাত দিয়া দেখে তাহাতে জল নাই। জল না হইলে চলিবে না, কলসীটা তুলিয়া লইয়া তিলকা জল আনিতে বাহিরে চলিয়া যায়। রুকিয়া এইবার কোন মতে উঠিয়া দেয়ালে ঠেস দিয়া বসে। রাত্রের ঘটনাটা দুঃস্বপ্নের মত এখনও তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। অসাড় আহত হাতখানা কোলের উপর লইয়া সে চোখ বুঁজিয়া বসিয়া থাকে। অনেকক্ষণ পরে সে চোখ মেলিয়া তাকায়, কোলের কাছে ছেলেটা তখনও ঘুমাইয়া আছে, রুকিয়া তাহার গায়ের উপর হাত রাখে। নিজেকে সে অত্যন্ত অসহায় মনে করে। এই ছোট্ট ঘরখানা এতদিন তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে, তাহাকে ঘিরিয়া নিরাপদে রাখিয়াছে, আজ যেন তাহার কোলে বসিয়াও সে শান্তি পায় না। ধীরে ধীরে নিজের প্রতি একটা অপরিসীম ঘৃণা মনের মধ্যে ঘনাইয়া ওঠে, সে ভাবে, কেন তাহার জন্ম হইয়াছিল, কি প্রয়োজন ছিল এই দীন-দরিদ্র জীবনটার।

বেলা হইয়াছে, পথে মানুষ চলিতেছে, গাছে পাখী ডাকিতেছে, বাহিরে অজস্র আলো, অথচ রুকিয়ার মন সঙ্কুচিত হইয়া আসে, লোকজন, আলো হইতে সে নিজেকে আড়াল করিতে চায়, সে যেন আলোর মানুষ নহে, অন্ধকারের জীব। একদিন সে এই অন্ধকার হইতে, এই চরম দুঃখ-দারিদ্র্য হইতে গুলবার হাত ধরিয়া পলাইয়া বাঁচিতে চাহিয়াছিল, আজ তাহার সে ইচ্ছা নাই, আজ সে বাঁচিতে চায় না, মরিতে চায়।

গলাটা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ঘরে জল নাই। তিলকা এখনও আসে নাই। হঠাৎ একটা সন্দেহ তাহার মনের মধ্যে উঁকি মারে, রাত্রের ব্যাপারটা যদি জানাজানি হইয়া গিয়া থাকে, হাতে হাতে ধরিতে না পারিলেও যদি কেউ তাহাকে চিনিতে পারিয়া থাকে ? সন্দেহটা ধীরে ধীরে তাহার সমস্ত মনকে জুড়িয়া বসে।

তিলকা আসিয়া ঘরে ঢোকে, জলের কলসীটা নামাইয়া রাখিয়া বলে, "একটা কথা শুনে এলাম গো!" রুকিয়ার ভিতরটা কাঁপিয়া ওঠে, কি কথা শুনিয়া আসিয়াছে তিলকা ?

তিলকা বলে, "গোবিন্দ মহতোর ক্ষেত থেকে রাতে মারুয়া চুরি হয়েছে। চোর ধরা পড়ে নি, সাড়া পেয়ে পালিয়ে গেছে, একটা বোরা আর কাস্তে ফেলে গেছে। বোরা, কাস্তে গোবিন্দ মহতো চিনেছে।"

রুকিয়া কোন কথা বলে না, চোখ বুঁজিয়া বসিয়া থাকে, সে কিছু শুনিতে চায় না।

তিলকা কাছে আসিয়া বলে, "গোবিন্দ বলে বেড়াচ্ছে এ লালমনিয়ার কাজ। হাতে হাতে ধরতে না পারলেও সে তাকে ছাড়বে না, এমন শিক্ষা নাকি দিয়ে দেবে যা সে জীবনে ভুলবে না।"

রুকিয়া এইবার চোখ মেলে, বুকের উপর হইতে একটা ভারী বোঝা হঠাৎ নামিয়া যায়, ক্ষীণকণ্ঠে বলে, "বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, এক ঘটি জল দে গো।"

তিলকা জল আনিয়া রুকিয়ার হাতে দেয়, সে এক চুমুকে ঘটিটা প্রায় খালি করিয়া ফেলে। তিলকা বলে, "তুই শুয়ে থাক, আমি সব করে নেব।"

গরীবের সংসারে পুরুষেরা ঘরের কাজে মেয়েদের মতই পটু। তিলকা ঘর ঝাঁট দেয়, বাসন মাজে, উনুন ধরাইয়া মারুয়ার লপসি রাঁধিবার আয়োজন করে। মাটির হাঁড়িটা উনুনের উপর চাপাইয়া সে গতরাত্রের চুরির গল্পটা আবার সুরু করে, বলে, "গোবিন্দ মহতোর লোকেরা ক্ষেতের ভিতর লুকিয়ে বসেছিল, চুপি চুপি কখন এসে লালমনিয়া মারুয়া কাটতে লেগেছে ওরা তা টের পায় নি, মেঘ করে নাকি ঘোর আঁধার হয়েছিল। হ্যাঁ গা, চোরেদের ভয়ডর নাই ?"

রুকিয়া এ প্রশ্নের কোন জবাব দেয় না, তিলকা বলিয়া চলে, "আওয়াজ শুনে ওরা তেড়ে যায় কিন্তু ধরতে পারে না,

রাতের বেলা মাঠের মাঝখানে চোর ধরা কি সহজ কথা গো, বললে লাঠি ছুঁড়ে মেরেছিল, মাথায় লাগলে বাপধনকে আর উঠতে হ'ত না।"

রুকিয়ার মাথাটা আবার ঝিম ঝিম করে, সে শুইয়া পড়ে। মনের মধ্যে কত রকম চিন্তা আসিয়া ভিড় করে, আহা! বেচারা লালমনিয়া, চুরির অপবাদটা তাহার ঘাড়ে গিয়া পড়িয়াছে অথচ সে চোর নয়। লালমনিয়া ও তাহার স্ত্রীর একটা বদনাম আছে, কোথাও চুরি হইলে গ্রামের লোক প্রথমে তাদেরই সন্দেহ করে। এ ক্ষেত্রেও যে তাহাই হইয়াছে রুকিয়া তাহা বুঝিতে পারে। লালমনিয়ারা গরীব, তাহার উপর অনেকগুলি ছেলেমেয়ে, সর্বদাই তাহাদের ঘরে অভাব লাগিয়া থাকে, এক বেলা খাইলে অন্য বেলা উপোস করে। অনেকগুলি অনাহার-শুষ্ক মুখের দিকে তাকাইয়া যাহার যথেষ্ট আছে তাহার অধিকার হইতে লালমনিয়া দু'এক দানা বহুকষ্টে সংগ্রহ করিয়া আনে, ইহারই নাম চুরি। রুকিয়াও ত রুগ্নস্বামী আর শিশুপুত্রের মুখ চাহিয়া গোবিন্দ মহতোর ক্ষেত হইতে দু'চার দানা মারুয়া আনিতে গিয়াছিল, সেও চোর। তাহার মনে পড়ে গত বৎসর লালমনিয়ার বউ সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া কাঁঠাল চুরি করিতে মতি গোপের কাঁঠালগাছে উঠিয়াছিল। মতি গোপ সজাগ ছিল, চীৎকার করিয়া গাছতলায় লোক জমা করিয়া ফেলে, বেচারা লালমনিয়ার বউ নামিয়া পলাইবার সুযোগ পায় না, গাছের উপর কাঠ হইয়া বসিয়া থাকে। শেষে অবশ্য নামিতেই হয়, স্ত্রীলোক বলিয়া কেহ গায়ে হাত দেয় না, কিন্তু গালাগালি দিয়া খেদ মিটাইয়া নেয়। রুকিয়া সেদিন ভাবিয়াছিল, বউটা এমন অপমানের পরেও কেমন করিয়া বাঁচিয়া আছে, গলায় দড়ি দিয়া মরে নাই কেন? আজ সে প্রশ্নের জবাব মিলিল। ছেলেকে কোলের কাছে টানিয়া রুকিয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাকে।

৩২

সারাদিন ও সারারাতের বিশ্রামের পর ভোরবেলা রুকিয়ার হাতের ব্যথা কমিয়া যায়, সে অনেকটা সুস্থ বোধ করে। উঠিয়া দরজা খুলিতেই তিলকার ঘুম ভাঙিয়া যায়, সে চেঁচাইয়া বলে, "কেমন আছিস গো—উঠে পড়লি যে?"

রুকিয়া বলে, "ভাল আছি।" তারপরে বাহিরে রৌদ্র-প্লাবিত আঙিনায় আসিয়া দাঁড়ায়।

তিলকাও উঠিয়া আসে, চারিদিকে তাকাইয়া বলে, "আহা, কি সুন্দর দিন গো!"

দিনটা এত সুন্দর যে রুকিয়ার মনও খুশী হইয়া ওঠে, পৃথিবীর দিকে সেও মুগ্ধনেত্রে তাকাইয়া দেখে। পশুর মত গরীবের প্রাণ বড় কঠিন, দারিদ্র্যের নির্দয় পেষণে সে সহজে মরে না, তাহাদের মনের স্বাস্থ্যও তেমনি মজবুত, সহজে ভাঙিয়া পড়ে না, অল্পেতেই খুশী হইয়া যায়।

খুশীমনে আঙিনায় ঘুরিতে ঘুরিতে তিলকা খৈনির কৌটাটি খুলিয়া দেখে কৌটা শূন্য, তবু কৌটা উলটাইয়া হাতের উপর বারকয়েক ঝাড়ে, কিন্তু কিছুই যখন পড়ে না, তখন আবার সেটাকে বন্ধ করিয়া ট্যাঁকে গুঁজিয়া রাখে। রুকিয়া ব্যাপারটা লক্ষ্য করে, তাহার চোখে চোখ পড়িতেই তিলকা ম্লানভাবে একটু হাসিয়া বলে, "এক পাতা তামাক কতকাল চলবে বল, ফুরিয়ে গেছে।"

রুকিয়া কোন জবাব দেয় না, তাহারও মুখ ম্লান হইয়া আসে, সে জানে তাহার সবকটা হাঁড়ি উলটাইয়া ঝাড়িলেও আজ এক দানা অন্ন পড়িবে না। এত আলো তাহার ভাল লাগে না, সে নিঃশব্দে ঘরে গিয়া ঢোকে, কিন্তু সেখানেও সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, শূন্য কলসীটা লইয়া আবার বাহিরে আসে।

তিলকা চেঁচাইয়া ওঠে, "এই দেখ, তুই কেন যাবি জল আনতে। একদিনের জ্বরে তোকে বড্ড কাবু করেছে গো, দে কলসীটা, আমি যাচ্ছি।" রুকিয়ার হাত হইতে কলসীটা কাড়িয়া লইয়া তিলকা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিয়া যায়।

রুকিয়া দোরগোড়ায় বসিয়া থাকে। কর্মব্যস্ত পৃথিবীতে তাহার কোন কাজ নাই। অতীতের কথা তাহার মনে পড়ে, সেও একদিন দশজনের মতই ছিল, ভোরে উঠিয়া সংসারের কাজের মধ্যে এক মুহূর্ত ফুরসুৎ ছিল না। এখন তাহার ছুটি, সারাদিন গালে হাত দিয়া বসিয়া থাকিতে পারে।

খানিক পরে জলের কলসী লইয়া তিলকা আঙিনায় ঢোকে, কেমন একটা অস্বাভাবিক ব্যস্ততার সঙ্গে আগাইয়া আসিয়া কলসীটা রুকিয়ার সামনে রাখে। তিলকার ব্যস্ততার কারণ রুকিয়া বুঝিতে পারে না। তিলকা কাছে আসিয়া ঝুপ করিয়া বসিয়া পড়িয়া বলে, "ওগো শোন্, তোকে একটা খবর দিতে ছুটে এলুম।"

রুকিয়া আশ্চর্য হইয়া তিলকার মুখের দিকে তাকায়। তিলকা বলে, "শোন্ গো, ভগবান আমাদের দুঃখু দেখে দয়া করেছেন।"

তিলকার কথার সুরে রুকিয়া অবাক হইয়া যায়, যে সুরের সঙ্গে এতদিন সে পরিচিত এ ত সে সুর নয়। তিলকা পরম উৎসাহের সঙ্গে বলে, "ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন, তা না হলে ঘরে এসে কাজ দেয়, সেও আবার আমার মত খোঁড়া লোকের সাধ্যমত।"

রুকিয়া এইবার বলে, "কি হয়েছে ভাল করে বল্. আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে।"

তাহার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া তিলকা বলে, "শুনলে তুই বিশ্বাস করবি নে কিন্তু সত্যিই রোজগারের উপায় হয়েছে গো। কলসী নিয়ে জল আনতে চলেছি, দেখি আকলু মুদীর দোকানের সামনে ভীড় জমেছে। এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালুম। আকলুর খাটিয়ার উপর এক এই মোটা কাচ্ছি ঠিকাদার বসে আছে, বলছে—সরকার ইষ্টিশেন থেকে মহুয়াডি পর্যন্ত পাকা সড়ক করবে, সে সড়ক যাবে আমাদের গাঁয়ের পূব দিয়ে। সড়কের জন্য পাথর ভাঙবার ঠিকা নিয়েছে কাচ্ছি ঠিকাদার। পাথর ভাঙতে হবে গো, ঐ আমাদের গাঁয়ের পূব দিকের মাঠে বসে পাথর ভাঙতে হবে, বসে বসে কাজ। আবার নগদ কারবার, গাদামেপে হপ্তা হপ্তা পয়সা দেবে। আহা, ভগবানের কি দয়া গো!"

খবরটা এত ভাল যে রুকিয়া তাহা মোটেই বিশ্বাস করিতে চায় না, সন্দেহের সঙ্গে বলে, "কি বলেছিস, ভাল করে শুনেছিস ত?"

ঘাড় নাড়িয়া তিলকা বলে, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, শুনেছি বই কি, তাই ত এতক্ষণ দেরী হ'ল। রেট ভাও সব শুনে এসেছি, যার খুশী সে আজ থেকেই কাজে লাগতে পারে, ঠিকাদারের এমনি তাড়া গো।"

একটা অমৃতময় স্পর্শে রুকিয়ার জ্বরগ্রস্ত দেহমন যেন শীতল হইয়া যায়, অনেকদিন পরে সে আবার হাসে, বলে, "তুই আমি দু'জনেই পাথর ভাঙব।"

তিলকা উঠিয়া দাঁড়ায়, খালি কলসীটার দিকে নজর পড়িতেই হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে। রুকিয়া বলে, "হ্যাঁ গো, জল আনিস নি?"

তিলকা হাসিতে হাসিতে বলে, "ভুলে গেছি গো, একেবারেই ভুলে গেছি। খবরটা পেয়েই তোর কাছে ছুটে এলুম, জল আনব কখন?"

মন খুলিয়া রুকিয়া হাসে। কলসীটা আবার তুলিয়া তিলকা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে জল আনিতে চলিয়া যায়। রুকিয়া আহত হাতের যন্ত্রণা ভুলিয়া বাহিরে আলোয় আসিয়া দাঁড়ায়।

৩৩

ভোর হইয়াছে, আশ্বিনের সোনালী রোদ মাঠে ঘাটে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ঝুড়ি হাতে মহুয়ার বউ তিলকার বাড়ীর সামনে আসিয়া হাঁক দেয়, "কই গো পরসাদের মা?"

ভিতর হইতে কোন সাড়া আসে না। মহুয়ার বউ আর একবার কণ্ঠস্বর আর একটু চড়াইয়া হাঁক দেয়, কিন্তু তবুও কেহ সাড়া দেয় না। বৈজুর মেয়ে টুকনীকে আসিতে দেখিয়া মহুয়ার বউ বলে, "দেখ না বেটি ভিতরে গিয়ে, এত ডাকলুম, পরসাদের মা সাড়া দেয় না কেন?"

টুকনী আঙিনায় গিয়া ঢোকে, সেখান হইতে চেঁচাইয়া বলে, "দরজায় তালা ঝুলছে গো বেনোয়ারীর মা, ঘরে লোক নেই।"

এতক্ষণে মহুয়ার বউও আঙিনায় আসিয়া দাঁড়ায়, অবাক হইয়া বলে, "তাই ত গো।"

টুকনী মাথা নাড়িয়া বিজ্ঞের মত বলে, "ওরা এক পহর রাত থাকতে উঠে পাথর ভাঙতে মাঠে চলে যায়, এত বেলায় তুমি ওদের ঘরে পাবে না বেনোয়ারীর মা।"

"তাই ত দেখছি গো।" বলে মহুয়ার বউ।

টুকনী বলে, "ভৌজী কাল বলছিল ওরা দু'হপ্তাতে তিন হপ্তার কাজ করেছে।"

দরদের সঙ্গে মহুয়ার বউ বলে, "আহা, তা বেশ করেছে, বড়ই অভাবে পড়েছিল গো।"

দুইজনে আবার বাহিরে আসিয়া পথ ধরে। ইহারাও পাথর ভাঙিতে চলিয়াছে, গ্রামের সমস্ত বেকার লোক ও তাহাদের ঘরের মেয়েরা, এমনকি শিশুরা পর্যন্ত পাথর ভাঙার কাজে লাগিয়াছে।

মহুয়ার বউ আর টুকনী গাঁয়ের পূবদিকের মস্ত বড় টাঁড়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই টাঁড়ের একপ্রান্ত ঘেঁষিয়া সরকারী সড়ক তৈরী হইবে। টাঁড়ের প্রায় সর্বত্রই পাথর ভাঙা চলিতেছে। এক এক পরিবার এক এক স্থানে আড্ডা গাড়িয়াছে, ঘরের বৌ-ঝিরা ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কাছাকাছি নদীনালার কোল হইতে পাথর আনিয়া জমা করিতেছে, মরদেরা সেই পাথর হাতুড়ি দিয়া ভাঙিয়া স্তূপ করিতেছে। সারাদিন ঘরের সঙ্গে ইহাদের সম্পর্ক নাই, সকাল বেলা সপরিবারে ইহারা মাঠে আসিয়া উপস্থিত হয়, ঝুড়িতে করিয়া খাবার লইয়া আসে, গৃহপালিত ছাগলটি, মুরগীটি পর্যন্ত আনিয়া কাছাকাছি বাঁধিয়া রাখে। অনেকেই কাঠখুঁটি গাড়িয়া মাথার উপর একটা ছেঁড়া চাদর টাঙাইয়া লইয়াছে, কেহ আবার ছিন্ন ছাতাটি একটা খোঁটার সঙ্গে বাঁধিয়া একটু ছায়ার সৃষ্টি করিয়াছে। দেখিলে মনে হয়, টাঁড়ের উপর মস্ত হাট বসিয়াছে।

টাঁড়ের মাঝামাঝি আসিতেই টুকনী দেখাইয়া দেয়, "ঐ হোথা গো, বেনোয়ারীর মা, ঐ যে ওপাশে পলাশের ডালটা পোঁতা, ঐটে তিলকাদার আড্ডা।"

একটু ঘুরিয়া সেইদিকে যাইতেই রুকিয়া তাহাদের

দেখিতে পায়, ডাকিয়া বলে, "এস গো বেনোয়ারীর মা, এই যে, এখানে।"

মনুয়ার বউ সেইখানে গিয়া দাঁড়ায়। রুকিয়া হাতের হাতুড়ি রাখিয়া খাড়া হয়, আড়ষ্ট মাজাটা দু'বার বাঁকাইয়া আড় ভাঙিয়া বলে, "কি ভাগ্যে তুমি এদিকে এলে দিদি, কাল তোমাকে দেখিনে। যাব যে একবার তোমার বাড়ী সে ফুরসুৎও নাই।"

মাথার ঝুড়িটা কাঁকালে করিয়া মনুয়ার বউ বলে, "গিয়েছিলুম তোর বাড়ী গো, ঘরে দেখলুম তালা ঝুলছে।"

রুকিয়া হাসিয়া বলে, "খুব ভোরে উঠে চলে আসি দিদি, যে দু'ঘণ্টা আয়েশ করে ঘরে থাকব সে দু'ঘণ্টা কাজ করলে দু'পয়সা রোজগার হবে, জান ত আমাদের অবস্থা।"

পাশের স্তূপীকৃত টুকরো পাথরের দিকে চাহিয়া মনুয়ার বউ বলে, "পরসাদের বাপ খাটিয়ে আছে, খুব ত ভেঙেছে গো।"

হাতুড়িটা সশব্দে ফেলিয়া দিয়া তিলকা হাসিয়া বলে, "আমি খাটিয়ে? তুমি কি ভেবেছ বেনোয়ারীর মা, এত পাথর আমি ভেঙেছি? তা নয় গো, ভেঙেছে পরসাদের মা। রাতদুপুরে উঠে বলে চল গো চল, ভোর হয়ে গেছে। আমি কিছু করিনে, একটু আধটু খুটখাট করি আর খৈনি টিপি।"

"শোন কথা", বলে রুকিয়া, "ও ভাঙে নি, আমি সব ভেঙেছি!"

মনুয়ার বউ ঝুড়িটা সামনে রাখিয়া বসিয়া বলে, "যে কথাটা বলতে এলুম গো, পরসাদের মা—"

উদ্‌গ্রীব হইয়া রুকিয়া বলে, "কি কথা দিদি?"

মনুয়ার বউ বলে, "আমার বেনোয়ারীর যে অসুখ করেছিল সেই গত বছরের আগের বছর গো, ধান রোপার সময়, বাঁচবার আর আশা ছিল না—"

মাথা নাড়িয়া রুকিয়া বলে, "মনে আছে বেনোয়ারীর মা।"

মনুয়ার বউ বলে, "আশ্বিন মাসে মা দুর্গার পুজোর ঢাক বেজে উঠতেই মানত করেছিলাম, আমার বেনোয়ারী ভাল হয়ে উঠলে পাঁঠা দেব, ভালও হয়ে উঠল ছেলে।

নিঃশব্দে মাথা নাড়ে রুকিয়া। মনুয়ার বউ বলে, "সে বছর ত পাঁঠা দিতে পারি নি, গত বছরেও হয়ে ওঠে নি, কম করেও এক কুড়ি টাকার দরকার। এ বছর দেবীর কৃপায় দু'পয়সা রোজগার হয়েছে, আর দেরী করা নয়, এই পুজোয় পাঁঠা দেব ঠিক করেছি। আশ্বিনের আজ বার দিন গেল, পুজোর আর পাঁচদিন বাকি, নবমীর দিন তোমরা আমার বাড়ী খাবে গো।"

ব্যাপারটা রুকিয়া আঁচ করিয়া লইয়াছিল, বলল, "যাব দিদি।"

তিলকা উৎফুল্ল হইয়া ওঠে, মাংসভাত সে অনেকদিন খায় নাই, মন খুলিয়া হাসিয়া বলে,' নবমীপুজোর দিনটা আর পাথর ভাঙব না, সকাল সকাল পৌঁছে যাব।"

মনুয়ার বউ বলে, "হ্যাঁ, তাই করো, খেয়ে দেয়ে বড়কা গাঁয়ের মেলা দেখতে যাব।"

উৎসাহিত হইয়া তিলকা বলে, "বেশ, বেশ, মায়ের চরণে প্রণাম জানিয়ে আসব।"

রুকিয়া অবাক হইয়া বলে, 'বরকা গাঁ দু'কোশ রাস্তা, তুই কেমন করে যাবি বল ত?'

সবেগে মাথা নাড়িয়া তিলকা বলে, "হেঁটে যাব, আর কেমন করে যাব। হাঁ, তোদের সঙ্গে সমানে পা চালিয়ে যেতে পারব না, ধীরে ধীরে চললে আমি এখন দু'কোশ কেন, দশ কোশ চলে যেতে পারি।"

মনুয়ার বউ উঠিয়া দাঁড়ায়, বলে, "তা হলে আমি চলি গো, বেলা অনেক হ'ল।"

আকাশের দিকে তাকাইয়া রুকিয়া বলে, "তাই ত গো, দেখতে দেখতে বেলা বেড়ে গেল।"

ঝুড়িটা মাথায় তুলিয়া মনুয়ার বউ তাড়াতাড়ি চলিয়া যায়।

৩৪

সবে ভোর হইয়াছে, ইহারই মধ্যে এখানে-ওখানে ঢাকের বাজনা শোনা যাইতেছে। এ পূজার বাজনা নয়, এ গাঁয়ে পূজা হয় না, দেবীর ভক্তজনের উপর ভর হইয়াছে, এ তাহারই বাজনা। আজ নবমী পূজা, গাঁয়ে পূজা না হইলেও চারিদিকে উৎসাহ ও আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

ময়লা ছেঁড়া কাপড় কয়খানা ক্ষারসেদ্ধ করিয়া হাঁড়িটি মাথায় লইয়া কাচাকুচির জন্যে রুকিয়া বাঁধে গিয়া উপস্থিত হয়। বাঁধে অনেক মেয়ে আসিয়া জুটিয়াছে, কাপড় কাচিয়া স্নান করিয়া উৎসবের জন্যে সকলে প্রস্তুত হইতেছে। বাঁধের উঁচু ঢিপির উপর দাঁড়াইয়া রুকিয়া একবার চারিদিকে তাকাইয়া দেখে, দূরের সবুজ মাঠ, সবুজতর শাল অরণ্য ও নীলাভ পাহাড় তাহার ভারি ভাল লাগে। আজ তাহার মন হালকা, আজ সে দশজনের মত কথা কহিতে পারে, হাসিতে পারে।

কাপড় কাচা শেষ করিয়া রুকিয়া বাড়ী ফিরিয়া দেখে আঙিনার মাঝখানে ছেলেকে সামনে বসাইয়া তিলকা মাদল বাজাইতেছে। হাসিয়া তিলকা বলে, "বেটা মাদলের

আওয়াজে কেমন মশগুল হয়ে গেছে দেখ। বাটোয়ারের বাচ্ছা কিনা! এখন থেকে মাদলে চাঁটি মারলে তবে মাদল বাজাতে শিখবে।"

রুকিয়া ভিজে কাপড় রোদে দিতে দিতে জবাব দেয়, "মাদল বাজালে নিজের পেট ভরে না, বউ ছেলেরও পেট ভরে না। ও বিদ্যেয় আর দরকার নাই, ওকে আর মাদল বাজনা শেখাতে হবে না।"

তিলকা শিল্পী, তুচ্ছ খাওয়াপরার কথায় সে কান দেয় না, মাথা নাড়িয়া বাজাইয়া চলে।

একটু বেলা বাড়িতেই তিলকা মাদল ফেলিয়া উঠিয়া পড়ে, বলে, "কই গো, চল, বেরিয়ে পড়ি, মনুয়াদার বাড়ী খেয়ে মেলার পথ ধরব।"

রুকিয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়, বলে, "চল।"

তখন তিলকার সাজসজ্জার পালা সুরু হয়, সকালবেলার কাচা কাপড়খানা শতচ্ছিন্ন, সেখানা কিভাবে পরিলে ফুটো-ফাটাগুলি কিছু ঢাকা পড়ে সেই চেষ্টা চলিতে থাকে। যখন এই অসাধ্যসাধন সমাধা হয় তখন গামছাখানা মাথায় জড়াইয়া হাঁক দেয়, "আমি তৈরী গো।"

রুকিয়াও ছেঁড়া শাড়ীখানা কোনমতে পরিয়া নেয়, তার পরে ছেলের হাত ধরিয়া পথে নামিয়া পড়ে।

মনুয়ার বাড়ীতে লোকসমাগম না হইলেও হৈচৈ হইতেছে যথেষ্ট। পরবে পাঁঠাকাটা গরীবের সংসারে বৃহৎ ব্যাপার, মনুয়া, মনুয়ার বউ, একপাল ছোটবড় ছেলেমেয়ে সবাই ব্যস্ত, সবাই মুরুব্বি। তিলকারা আসিয়া উপস্থিত হইলে বাড়ী সরগরম হইয়া ওঠে। শালপাতা জুড়িয়া বড় বড় থালার মত করা হইয়াছে, তাহাই এক একখানা লইয়া উঠান জুড়িয়া সকলে খাইতে বসিয়া যায়। ভাত দেওয়া হইয়া গেলে মাংসের হাঁড়ি আসে, ছেলেবুড়ো সকলের দৃষ্টিই তাহাতে গিয়া কেন্দ্রীভূত হয়। মনুয়া বউকে বলে, "তিলকাকে দেখেশুনে দে গো।"

তিলকা পাতাস্থ ভাতের স্তূপের মাঝখানে সযত্নে একটা গর্ত করে, মনুয়ার বউ হাতা করিয়া তুলিয়া সেইখানে মাংস ঢালিয়া দেয়। দু'হাতা দেওয়া হইলে মনুয়ার বউ ইতস্তত করে, মনুয়া বলে, "দে দে, আর এক হাতা দে।"

তিলকা খুশী হইয়া ওঠে, মনুয়ার বউ আর এক হাতা মাংস তুলিয়া ঢালিয়া দেয়, কিন্তু সেটা আসলে ভদ্রতারক্ষা, তাহাতে ঝোলই বেশী, মাংস মাত্র দু'এক টুকরা। তিলকা মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেও মুখে বলে, "আহা, কত দিচ্ছ গো বেনোয়ারীর মা।"

বেনোয়ারীর মা সেই সুযোগে নিজের ছেলেমেয়ের দিকে আগাইয়া যায়। দিনে ইহারা একবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, ইহাদের বরাতে মাংসভাত বৎসরে এক-আধদিন মাত্র জোটে। খাওয়া যখন শেষ হইয়া যায় তখন পাতায় বা তাহার আশেপাশে একটি ভাতও পড়িয়া থাকে না।

এইবার সাজগোজ করিয়া মনুয়ার বউ, ছেলেমেয়েরা মেলায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হয়। বেলা প্রায় দুপুর, দু'ক্রোশ পথ যাইতে হইবে, তাই আর দেরী না করিয়া সকলে পথে বাহির হইয়া পড়ে।

বরকা গাঁয়ের পথে আজ বেশ ভীড়, আশেপাশের বহু গ্রাম হইতে মেলার যাত্রীরা দল বাঁধিয়া হল্লা করিয়া করিয়া চলিয়াছে। ইহাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া তিলকা চলিতে পারে না। সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চলে। ছেলেকে কোলে লইয়া রুকিয়া এক একবার অনেকখানি আগাইয়া যায়, আবার পথের পাশে দাঁড়াইয়া তিলকার সঙ্গ নেয়।

পথ ক্রমে ফুরাইয়া আসে, সামনের বড় টাঁড়খানার ওপারেই বড়কা গাঁ; এখান হইতে মেলার ভিড় দেখা যায়। সেই দিকে কত লোক যে চলিয়াছে তাহার অন্ত নাই, মেয়ে ও শিশুর সংখ্যাই বেশী। মেয়েদের পোশাকের বাহারই বা কত! লাল, সবুজ, হলদে কত রঙের শাড়ী পরিয়া, গহনায় গা ঢাকিয়া পথ আলো করিয়া তাহারা চলিয়াছে। ইহাদের সঙ্গে চলিতে রুকিয়ার মন সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, সে পাশে সরিয়া দাঁড়ায়।

গ্রামের বাহিরে মাঠের কোলে ইটের তৈরী ছোট এক খানা মণ্ডপ, ইহার ভিতরে প্রতিমা স্থাপিত হইয়াছে।

গ্রামের পূজা হইলে কি হয়, অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া মেলা বসিয়াছে, অসংখ্য লোকসমাগম হইয়াছে। তিলকা আর রুকিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া মেলা দেখে। অনেকগুলি মিঠাইয়ের দোকান বসিয়াছে, স্তূপাকার লাড্ড ও গজা বিক্রয় হইতেছে, সেখানে ঠেলাঠেলি সবচেয়ে বেশী। খানকয়েক মনিহারীর দোকানের সামনেও ভীড় খুব, কাচের চুড়ি ও টিনের ছোট আয়নার চাহিদা সেখানে যথেষ্ট। বাঁশের তৈরী ঝুড়ি, ঝাড়ু, ডালাকুলো ও মাটির হাঁড়ি-কলসী ইত্যাদি লইয়া গ্রামীণ শিল্পীরা একদিকে দোকান পাতিয়াছে। শিশুর স্বপ্ন সার্থক করিয়া মেলার একপ্রান্তে গোটাদুই নাগরদোলা সশব্দে ঘুরিতেছে।

ভিড় ঠেলিয়া তিলকা আর রুকিয়া কিছুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়ায়, তার পরে মিঠাইয়ের দোকান হইতে ছেলের জন্য দু' আনার লাড্ড কেনে। তিলকা বলে, "এইবার চল গো, দেবী দর্শন করি।"

তাহারা মণ্ডপের দিকে অগ্রসর হয়। মণ্ডপের সামনে খুব ভিড়, যথেষ্ট ঠেলাঠেলি না করিলে ঠাকুর দেখা সম্ভব নয়।

রুকিয়া বলে, "আমি ছেলে নিয়ে ফাঁকায় দাঁড়িয়ে থাকি, তুই যা, দর্শন করে আয়।"

তিলকা আশ্চর্য হইয়া বলে, "তুই যাবি নে?"

ঘাড় নাড়িয়া রুকিয়া বলে, "না গো, আমি অত ভিড়ে ঢুকতে পারব না, আমি এখান থেকেই মায়ের চরণে প্রণাম জানাব।"

তিলকা ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া যায়, রুকিয়া দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া মনে মনে বলে, "মা, আমি মহাপাপী মা, তাই আমি দূর থেকে তোমায় প্রণাম জানাচ্ছি। আমি অসতী, পরপুরুষ পাপমন নিয়ে আমার হাত ধরেছে, আমি চোর, পরের ক্ষেত থেকে মারুয়া চুরি করেছি, আমায় সাজা দিতে চাও দিও মা, আমার স্বামীপুত্তুরের ভাল করো।"

বার বার এই আবেদন জানাইয়া রুকিয়া তাহার যুক্তকর কপালে ঠেকায়।

একটু পরে তিলকা ঠাকুর দেখিয়া ফিরিয়া আসে, বলে; "কি ঠাকুর দেখলুম, চোখ জুড়িয়ে গেল।"

রুকিয়া বলে, "এবার বাড়ী চল, আর দেরি করিস নে।"

তিলকা বলে, "চল।"

ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইয়া রুকিয়া আগে আগে চলে, তিলকা খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া পিছনে আসে। বেলা পড়িয়া আসিলে মেলা জমাট বাঁধিয়া ওঠে, উৎসব-মত্ত নর-নারীর কাহারও ঘরে ফিরিবার তাগিদ নাই—পথ তাই জনশূন্য। সন্ধ্যা নামিয়া আসে, বনের আড়ালে সূর্য ঢলিয়া পড়ে, দীর্ঘ ছায়া দীর্ঘতর হয়। নিস্তব্ধ অরণ্যপথ ধরিয়া তিলকা রুকিয়া আর পরসাদ মন্থরগতিতে চলিতে থাকে। ক্রমে আকাশ হইতে শেষ আলো মুছিয়া যায়, অন্ধকার দিগন্তে নিবিড় হইয়া ওঠে, সেইখানে ছিন্নবসন মলিনমুখ একটি পুরুষ একটি নারী ও একটি শিশু ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া যায়। ক্রমশঃ

উপনিষদমালা

শ্রীপুষ্প দেবী

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতম্ মুখম
তত্ত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্য ধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥ (১৫)

হিরণ্ময়ের পাত্রের মাঝে ঢাকা সত্যের মুখ
হে পুষণ তুমি আবরণ খোল তার।
সূর্য তোমার দীপ্তিতে ভরা উগ্রতা যাক সরে
উজ্জ্বলতর আলোর অন্ধকার।
করজোড় করি মিনতি আমার হে অরুণ তব কাছে
তোমার প্রভার যবনিকা যাক্ সরে
সত্যের সেই অরূপ বিভায় বিকশিয়া যেন উঠি
চির শিবময় সত্যে দরশ কোরে। (১৫) ঈশোপনিষদ

পুষন্নে কর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্
সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি
সোঽসাবশৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি। (১৬)

হে একা পথিক অনাদিকালের গুণ্ঠন তব খোল
স্বরূপ তোমার বারেক হেরিতে চাই,
কল্যাণময় মূরতি তোমার আমার নয়ন ভরি
বিকশিত কর, দরশ যেন যে পাই।
সংবর তব রুদ্র ও-রূপ তুমি মঙ্গলময়
আমারে তোমার শিব রূপে দাও দেখা
তোমার মাঝেতে আমারে হেরিয়া বিস্ময়ে ভরে প্রাণ
করজোড়ে প্রভু থাকি ও আশীষ লেখা॥
(১৬) ঈশোপনিষদ

সাবর্ণ চৌধুরীবংশের আদিকথা

শ্রীশীতল বন্দ্যোপাধ্যায়

ইংরেজী ১০৩২ খ্রীষ্টাব্দের কথা। গৌড়েশ্বর আদিস্থর বঙ্গদেশকে জ্ঞান-গরিমায় ভূষিত করিবার উদ্দেশ্যে কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন পঞ্চগোত্রীয় বেদপারগ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। এই পাঁচজন ব্রাহ্মণ বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষে প্রজ্ঞার যে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন, তাহা আজও অনির্ব্বাণ শিখায় জ্বলিতেছে। তাঁদের ন্যায় স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রালাপন পরবর্ত্তী যুগে, এমনকি আজকের আধুনিক যুগসন্ধিক্ষণের মাঝেও প্রাজ্ঞজনের নিকট শ্রদ্ধার সহিত স্মরিত হইতেছে।

ঐ পঞ্চগোত্রীয়ের মধ্যে সাবর্ণি ঋষির গোত্রজাত দেবগর্ভ নামে একজন ব্রাহ্মণ অন্যতম। ইনি মহারাজ আদিস্থরের নিকট বটগ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বটগ্রাম পূর্ব্বে কোথায় অবস্থিত ছিল তাহা এক্ষণে নির্দ্ধারণ করা যায় না। কালক্রমে এই পাঁচজন ব্রাহ্মণের ছাপ্পান্নটি পুত্র জন্মে। এদিকে আদিস্থর স্বর্গারোহণ করায় তাঁহার উত্তরাধিকারী ক্ষিতিস্থর রাজা হইলেন। তিনি এই ছাপ্পান্নটি ব্রাহ্মণ সন্তানকে ছাপ্পান্নখানি গ্রাম দান করেন। তখন হইতেই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সন্তানগণের নামানুসারে অমুক গাঁই বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে।

দেবগর্ভের বারটি পুত্রের মধ্যে হল নামক সন্তান গঙ্গগ্রাম প্রাপ্ত হন বলিয়া তাঁর সন্তান সন্ততিরা গঙ্গোপাধ্যায় বলিয়া বিখ্যাত। এই বংশের পূর্ব্ব-পুরুষেরা বল্লালসেনের রাজত্বকালে কৌলীন্য প্রাপ্ত হন নাই। সেই কৌলীন্য মর্য্যাদার সমীকরণকালে এরা শ্রোত্রীয় সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। (সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "কালীক্ষেত্র দীপিকা", প্রকাশকাল-১৮৯১ অব্দে, ৭৬ পৃষ্ঠা)।

ইহার পর খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দেরও পূর্ব্বে) গঙ্গবংশীয় সাবর্ণ চৌধুরীগণের আদিপুরুষ 'পাঁচু শক্তি খান' হাবেলী শহর (বর্ত্তমান হালিশহর) পরগণার আধিপত্য লাভ করেন ও সুপ্রসিদ্ধ "হালিশহর সমাজের" প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার সময়ে বিক্রমপুর হইতে বৈদ্যগোষ্ঠী, কোন্নগর হইতে সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবার আসিয়া ইহার উন্নয়ন বৃদ্ধি করেন বলিয়া প্রবাদ আছে। (এ, কে, রায় লিখিত "লক্ষ্মীকান্ত", প্রকাশকাল-১৯২৮, ১৫ হইতে ৪৪ পৃষ্ঠা)।

পাঁচু শক্তি খাঁর বিচিত্র উপাধি হইতেই (ইহার পূর্ব্ব নাম, পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়) প্রমাণিত হয়, তিনি পাঠান রাজত্বকালে দরবারের বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, এবং তিনিই সর্ব্বপ্রথম জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ নিম্নবঙ্গের গুড়বংশীয় শুভরাজ খাঁর কন্যার সহিত বিবাহ হওয়ায় তিনি বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। তাঁহার সাতটি পুত্র ছিল, এবং কুলগ্রন্থে স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ আছে, তাঁহারা সকলেই হালিশহরে বাস করিতেন। ("এতে পাঁচু শক্তি খান সন্তানা হালিশহর নিবাসিনঃ")। পরে এখান হইতেই সাবর্ণগোষ্ঠীরা বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়েন, এবং সর্ব্বত্রই তাঁদের প্রতিষ্ঠা লাভ হয়।

পাঁচু শক্তি খানের প্রপৌত্র স্বনামধন্য "লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার" প্রায় ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া সুলতান হুসেন শাহ, নসরৎ শাহ বা শের শাহের রাজত্বকালে বিপুল জমিদারী অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন। তাঁহার সহিত মানসিংহের কোন রকম সম্বন্ধই ছিল না, এ বিষয়ে এতদিন যে সব কাহিনী ও প্রবন্ধাদি মুদ্রিত হইয়াছে তাহা বঙ্গীয় পুঁথিশালার স্বর্গগত অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক ৺দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ, মহাশয় সম্পূর্ণ ভুল ও অলিককল্পনা বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। (কুমারহট্ট-হালিশহর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থে "কুমারহট্ট বিদ্যাসমাজ" প্রবন্ধের ২১৮ পৃষ্ঠা, প্রকাশকাল-১৩৬১ বঙ্গাব্দ)।

এই লক্ষ্মীকান্তের পিতার নাম কামদেব ব্রহ্মচারী। আনুমানিক হলের চৌদ্দপুরুষ পরে কামদেব গঙ্গোর উদ্ভব দেখা যায়, সম্ভবতঃ ১৩৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বা তার পূর্ব্বে। ইনি একজন সন্ন্যাসীভাবাপন্ন যোগী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল পদ্মাবতী। এই পদ্মাবতীর গর্ভে লক্ষ্মীকান্তর জন্ম হয় বলিয়া শ্রীযুক্ত বিভূদান রায়-চৌধুরী মহাশয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, কামদেবের পিতার নাম ছিল, শম্ভুপতি এবং কামদেবেরই পিতামহ পঞ্চানন গাঙ্গুলী ওরফে পাঁচু শক্তি খান।

শক্তি খানের পারিবারিক ইতিহাসের সমৃদ্ধ উপকরণরাজি কুলগ্রন্থে পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, তাহা আলোচনা করিয়া অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ, মহাশয় লক্ষ্মীকান্তের উপরোক্তকাল নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং সে সম্বন্ধে নিসংশয় হইয়াছিলেন। (ঐ শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থে "কুমারহট্ট বিদ্যাসমাজ" প্রবন্ধের ২১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

প্রবাদ অনুসারে লক্ষ্মীকান্ত কালীঘাটে, হালিশহরে এবং সাবর্ণ চৌধুরীপরিবারের আদিস্থান গোঘাটে ও আমাটিয়া গ্রামে— (শ্রীযুক্ত বিভূদান রায়চৌধুরী মহাশয় আবার সাবর্ণ চৌধুরীগণের আদিস্থান বর্দ্ধমান জেলার পাহাড়পুর গ্রাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে পঞ্চানন গঙ্গো অথবা তাঁহার পুত্র কর্ত্তৃক এই

স্থানে সাবর্ণিগণের বসবাস সুরু হয়।) দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ("লক্ষ্মীকান্ত", ৪৪ পৃষ্ঠা)।

শোনা যায়, লক্ষ্মীকান্তর সময়ে হালিশহর হইতে বঁড়িশা পর্যান্ত এক প্রাচীন রাজপথ ছিল, 'আইন-ই-আকবরী'তে সরকার সাতগাঁর অন্তর্গত পরগণা সমূহের মধ্যে হালিশহরের নাম পাওয়া যায়। ("জারেরেটট্রান সেলশন", নতুন সংস্করণ, ১৫৪ পৃষ্ঠা)। এই সমস্ত পরগণা হইতে ১২,৫০০ টাকা রাজস্ব আদায় হইত বলিয়া উল্লিখিত আছে। সে সময় অবশ্য লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার জীবিত ছিলেন না।

লক্ষ্মীকান্তের 'মজুমদার' উপাধি প্রাপ্তি সম্বন্ধে যে সব কাহিনী প্রচলিত বা মুদ্রিত হইয়াছে তাহা ভুল। এমন কি অনেকে লক্ষ্মীকান্তকেই প্রথম জমিদার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ইহাও যে, অলীককল্পনা মাত্র তাহা ৺দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ, মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন।

ঐ লক্ষ্মীকান্তের আটটি পুত্র ছিল, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাম রায় ওরফে রামেশ্বর রায় সম্ভবতঃ আকবরের সময় জীবিত ছিলেন। অতএব মানসিংহ বিষয়ক সমস্ত কাহিনী যে ভুল তাহা আর একবার প্রমাণিত হইল। এই রামেশ্বর রায়ের পৌত্র বিদ্যাধর রায় বর্ত্তমান সিদ্ধেশ্বরী মাতা, বুড়োশিব, এবং শ্যাম রায় রাধিকামাতাজীউর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার রায়চৌধুরী মহাশয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখককে বলেন, বিদ্যাধর রায়ের গঙ্গায় অবগাহনকালে পায়ে এক প্রস্তরখণ্ড লাগায়, তিনি উহা পায়ের দ্বারা দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক স্নান সারিয়া উঠিয়া আসেন এবং ঐদিন রাত্রেই স্বপ্নাদেশ পান, উপরে উদ্ধৃত ঐ তিনটি মূর্ত্তি গঙ্গাস্থিত পাথরের দ্বারা নির্ম্মাণের জন্য। পরদিন প্রভাতে বিদ্যাধর রায় দেখিতে পান, ত্রিবেণীর জনৈক অন্ধ-ভাস্কর তাঁহার ন্যায় স্বপ্নাদেশে দৃষ্ট হইয়া মূর্ত্তিনির্ম্মাণের জন্যই আগত হইয়াছেন। কিছুক্ষণ তাঁহার অন্ধতা লইয়া বাদানুবাদের পর ঐ অন্ধ-ভাস্করকেই মূর্ত্তি নির্ম্মাণের জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। পূর্ব্বে সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির কালীতলার উত্তর দিকে অবস্থিত ছিল এবং ঐ মন্দির থাকাকালীন যে এই নামের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য।

বিদ্যাধর রায় এই কালীতলার (বর্ত্তমানে যে স্থানে পুলিস ফাঁড়ি অবস্থিত) নিকট একটি বাজার নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন ও এই তিনটি দেব-দেবীর উৎসব এবং বহু জনহিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন।...কিন্তু এ সম্বন্ধে অনেক চেষ্টাতেও আমি কোনরূপ প্রমাণাদি সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

আবার স্বর্গগত অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ, মহাশয়ের মতে, বিদ্যাধর রায়ের সময়ে হালিশহর সাবর্ণ চৌধুরীদের হাতছাড়া হইয়া যায় এবং কালক্রমে ইহা দুই ভাগে বিভক্ত হয়, তাহার প্রধান অংশ নবদ্বীপের রাজা রাঘব রায়ের করতলগত হয়। ১১৩৫ সালে তুমারজময়া নদীর অন্তর্গত ৭৫ মহালের অন্যতম হালিশহর। রাজস্ব আদায়ের কাগজপত্রে লিখিত আছে, ৮,০৯৩৲ টাকা রুদ্র রায়ের সময়ে আদায় হইত। ইহা ছাড়াও তাঁহাদের প্রভুত্বের নিদর্শন আজও স্থানে স্থানে বর্ত্তমান থাকিয়া অতীতের ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। কিন্তু সাবর্ণ চৌধুরী বংশের ঔজ্জ্বল্য তাহাতে খানিকটা ম্লান হইয়া আসিলেও একবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। বরং নবদ্বীপাধিপতিদের প্রভুত্বের নিদর্শনের পাশে তালুকদাররূপে সাবর্ণ চৌধুরীগণের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণরূপে বিরাজ করিতেছে। একটু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলেই এই দুই প্রতাপের সমন্বয় দৃষ্ট হইবে বলিয়াই মনে করি। যদিও আজকালের ধ্বংসলীলার মুখে আসিয়া হালিশহরস্থিত সাবর্ণ চৌধুরীবংশ কোনরকমে টিকিয়া আছে। একদিন যাঁর লক্ষ লক্ষ টাকা আয় হইত আজ সেই শ্যাম রায়ের আয় মাত্র ৫০৲ টাকায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাও আবার জমিদারী প্রথা বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শ্যাম রায় যে সুরম্য মন্দির মাঝে বাস করিতেন, আজ তাহা ধ্বংসস্তূপে পরিণত। এই ধ্বংসের মুখে দাঁড়াইয়া লোলচর্ম্মসার বৃদ্ধ সাবর্ণ চৌধুরীদের ক্ষীণ প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত রাখিয়াছেন। কিন্তু তাহাও নিভিতে বিশেষ দেরি নাই।

অতীতে যে এই সাবর্ণ চৌধুরীরা শ্রেষ্ঠ জমিদার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন তাহা আজ কাহারও অজানা নহে। নিদর্শনস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে, এই বংশীয় জমিদার দর্পনারায়ণ রায়, রাম রায় ও কালীচরণ রায় স্বগ্রামবাসী বিখ্যাত সাধক ও কবি রামপ্রসাদ সেনকে সর্ব্বপ্রথম ভূমি দান করিয়াছিলেন। সনন্দের তারিখ ১৭ই চৈত্র, ১১৬০ বঙ্গাব্দ। ভূমির পরিমাণ ৮/০ বিঘা। (নদীয়া কালেক্টরীর ১৮,৩৫০নং তায়দাদ)। ইহার কিছুকাল পরে অর্থাৎ ১১৬৫ সনে কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় রামপ্রসাদকে ভূমিদান করেন। (ঐ, ৩১,৩৪৭নং তায়দাদ)।

হালিশহরের অপর অংশ বাঁশবেড়িয়ার রাজাগণ "কীসমতপং হালিশহর" নামে দখল করেন বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। রাম রায়ের মৃত্যুর পর যে বাটোয়ারা হয়, তদ্দ্বারা উক্ত অংশ আবার দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া রাম রায়ের প্রথম পক্ষের পুত্র রঘুদেব ও দ্বিতীয় পক্ষের পুত্রদ্বয় মুকুন্দদেব ও রামকৃষ্ণদেবের দখলে চলিয়া যায়। ('বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস', উত্তর রাঢ়ীয়, কায়স্থকাণ্ড, তৃতীয় খণ্ড—১১৫ পৃষ্ঠা)। এই সমস্তটা পাঁচু শক্তি খানের ১৪।১৫ পুরুষ কাল বলিয়া বঙ্গীয় পুঁথিশালার স্বর্গগত অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ, মহাশয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ("কুমারহট্ট-হালিশহর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থে" লিখিত "কুমারহট্ট বিদ্যাসমাজ" প্রবন্ধের ২২০ পৃষ্ঠা, প্রকাশকাল-১৩৬১ বঙ্গাব্দ)।

আবার ৺সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত "কালীক্ষেত্র দীপিকা" গ্রন্থে (প্রকাশ, ১৮৯১ অব্দে, ৭৯ হইতে ৮৬ পৃষ্ঠা)। দেখা যায়—মুরসিদ কুলি খাঁর সময়, অর্থাৎ ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে রাজস্বের নতুন বন্দোবস্ত হয়। খাঁ সাহেব সমস্ত বঙ্গভূমি ১৩ চাকলা ও ১৬৬০ পরগণায় বিভক্ত করেন। প্রত্যেক চাকলার রাজস্ব আদায়ের জন্য এক এক জন জমিদারের উপর ভার দেওয়া হয়। তাঁহারা

ঐ প্রজাদিগের নিকট রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন। সুবেদার আবার এই (কর্মচারী) জমিদারদের নিকট বাৎসরিক টাকা লইতেন।

এই সময় সাবর্ণ চৌধুরীবংশের জনৈক জমিদার কেশবচন্দ্র মজুমদার* বাংলার দক্ষিণ চাকলার কর্মচারী (জমিদার) ছিলেন, এবং ঐ সময়েই তিনি 'রায়চৌধুরী' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। এঁর পিতামহের নাম গৌরহরি ও পিতার নাম শ্রীমন্ত মজুমদার। এঁদের সম্পূর্ণ অধীনে না হইলেও অধীনস্থ পাঁচটি পরগণা, যথা: মাগুরা, খাসপুর, কলিকাতা, পৈকান ও আনোয়ারপুর; এবং ইহা ছাড়াও হেতেগড় পরগণার কিয়দংশের জায়গীর মোগল সম্রাটের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এঁদের পূর্ব্ব বাসস্থান হুগলী জেলার গোপালপুর বাগীটি স্থানে ছিল বলিয়া দেখিতে পাই। পরে গৌরহরি রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য বর্ত্তমান দমদমার নিকট নিমতা-বিরাটি গ্রামে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন।

কেশবচন্দ্রের 'রায়চৌধুরী' উপাধি প্রাপ্তির কিছু পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজেবের পৌত্র সুলতান আজিম ওসমানের বাংলা শাসন কালে ইংরেজেরা সুতানটি, কলিকাতা ও গবিন্দপুর, এই তিনখানি গ্রাম বাণিজ্যের জন্য ১৬,০০০৲ টাকায় ক্রয় করে, এবং উক্ত তিনখানি গ্রামের জন্য নবাব-সরকারে বাৎসরিক খাজনা দিতে বাধ্য থাকে।

উপরোক্ত গ্রাম তিনখানি ইংরেজগণের হস্তগত হওয়ায় কেশব রায়ের পক্ষে দক্ষিণ অঞ্চলের জমিদারীর কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় ব্যাঘাত জন্মে। তাহার উপর আবার ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে হ্যামিলটন নামক জনৈক ইংরেজ ডাক্তার বাদশাহ ফেরক শাহের পীড়া আরোগ্য করিয়া দিয়া তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। ঐ হ্যামিলটনের চেষ্টায় আটত্রিশটি মৌজা কিনিবার ইংরেজরা অধিকারী হয়। এ ব্যাপারে মুরশিদকুলি খাঁ কিছু বিরক্ত হইয়া উঠেন, এবং তিনি কলিকাতার নিকটস্থ জমিদারদিগকে জমি বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়া দেন।

কেশব রায়চৌধুরী দেখিলেন আপন জমিদারীর মধ্যস্থলে না থাকিলে সব বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে। অতএব তিনি পূর্ব্ব বাসস্থান তুলিয়া কালীঘাটের তিন মাইল পশ্চিমে ভাগীরথীর অপর পারে বঁড়িশা গ্রামে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কেশব রায় কর্তৃক ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দের পর সাবর্ণ চৌধুরীদের বঁড়িশায় আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু এ সম্বন্ধেও মতবিরোধ আছে। স্বর্গগত অধ্যাপক দীনেশ ভট্টাচার্য্যের মত অনুসরণ করিয়া দেখা যায়, হালিশহর হইতে সাবর্ণ চৌধুরীবংশীয় জমিদারগণ যখন বিভিন্নস্থানে ছড়াইয়া পড়েন, তখনই তাঁদের বঁড়িশায় আবির্ভাব ঘটিয়াছে, এবং পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, লক্ষ্মীকান্তর সময়ে হালিশহর হইতে বঁড়িশা পর্য্যন্ত এক প্রাচীন রাজপথের কথা। ইহা হইতেও মনে হয়, ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দের বহু পূর্ব্বেই সাবর্ণ চৌধুরীদের বঁড়িশায় বাস হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা দুই মতই এ স্থানে উল্লেখ করিয়া এ প্রসঙ্গের এখানেই শেষ করিলাম।

এখন আমরা পূর্ব্ব আলোচনায় ফিরিয়া যাই।

কেশব রায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার চতুর্থ পুত্র শিবদেব জায়গীর প্রাপ্ত হন। তিনি শক্তিমান এবং দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার আরেক নাম ছিল সন্তোষ রায়। এই "সন্তোষ রায়" নাম সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। শোনা যায়, তিনি প্রার্থীকে এরূপ পরিমাণ দানে সন্তোষবিধান করিতেন যে, লোকে ঐ নামেই তাঁহাকে ডাকিত এবং চিনিত। এমনকি জমিদারী কাগজপত্রেও ঐ নামের উল্লেখ দেখা যায়।

সন্তোষ রায়ের আমলে অর্থাৎ ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশে বর্গীর উৎপাত সুরু হয়, এবং শেষ পর্য্যন্ত এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, সম্রাট আলীবর্দ্দি খাঁ বর্গীদের 'চৌথ' যোজনার ন্যায় বাৎসরিক টাকা দিতে স্বীকৃত হন, ও ঐ টাকা সংগ্রহের জন্য সম্ভ্রান্ত জমিদারগণের উপর অত্যধিক কর চাপাইয়া দেন। ঐ টাকা দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় অনেক জমিদারের ভাগ্যে কারাবাসও জোটে। কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও সন্তোষ রায় ইহাদের মধ্যে অন্যতম।

সন্তোষ রায় ঐ ঘটনার অল্পদিন পরেই অবশ্য মুক্তি পান, এবং সেই সঙ্গে ডায়মণ্ড হারবারের সন্নিকটে 'আবজাখালি' নামক একটি গ্রামও প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার মুক্তি ও গ্রামপ্রাপ্তি সম্বন্ধে সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "কালীক্ষেত্র দীপিকা" গ্রন্থে (প্রকাশ, ১৮৯১ অব্দে, ৮২ পৃষ্ঠায়) যে কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে তাহা বিশ্বাস করা শক্ত। সেই কারণে এ স্থানে তাহার পুনরুল্লেখ করা হইল না।

যাহা হউক, সন্তোষ রায় যে উপায়েই হউক মুক্তিলাভ করিয়া মুরশিদাবাদ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, এবং কালীঘাটে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত কালীকা দেবীর পূজা দেন। এখানে একটি কথা বলে রাখা দরকার বলিয়া মনে করি, সাবর্ণ চৌধুরীরা তাঁদের পূর্ব্বপুরুষ পাঁচু শক্তিখানের আমল হইতেই শাক্ত ধর্ম্মীয়।

সন্তোষ রায় এই সময় ঐ পূজাদি ছাড়াও তখনকার সেবাইত-গণের অনেককে বহু দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর দান করিয়াছিলেন। ১২০৯ সালে অর্থাৎ ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে মনোহর ঘোষাল, গোকুলচন্দ্র হালদার প্রভৃতি তদানীন্তন সেবাইতগণ এবং আরও অনেককে আপন জমিদারীর ভিতর বিস্তর জমি দান করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহার জীবদ্দশায় দানের পরিমাণ ছিল প্রায় লক্ষ বিঘা। জমিদারী-প্রথা বিলুপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বহু

*কেশবচন্দ্র বা তাঁর পিতামহ গৌরহরির সহিত লক্ষ্মীকান্তর ঠিক কিরকম সম্বন্ধ ছিল তাহা কেহ সঠিক বলিতে পারেন না, সেই কারণে আমরা তাঁকে "জনৈক জমিদার" বলিয়া উল্লিখিত করিলাম।—লেখক।

লোক তাঁহার প্রদত্ত জমি লইয়া পুরুষানুক্রমে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন ও তাঁহার যশোগৌরব ঘোষণা করিয়া উক্ত নামের সার্থকতা রক্ষা করিতেছিলেন।

ঠিক এই সময় পৈতৃক জমিদারী লইয়া কেশব রায়ের পুত্রগণের মধ্যে ভীষণ গণ্ডগোল উপস্থিত হওয়ায় কমিটি বোর্ডের সেক্রেটারী কর্তৃক ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে আগষ্ট তারিখে উহা পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া পাঁচ ভাইকে প্রদান করা হয়। মোট জমিদারীর জন্য লবণ শুল্ক ব্যতীত ৭৭,২৭৭ ৵/১০।০ টাকা ইংরেজ সরকারের খাজনা স্থির হয়।

১৭৮৯ অব্দে জমিদারদিগের সহিত ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতস্থ গবর্ণমেন্টের যে "দশসালা" বন্দোবস্ত হয়, তাহার কাগজ-পত্রে সন্তোষ রায়ের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। পরে ঐ বন্দোবস্ত ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হইয়াছিল। (সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "কালীক্ষেত্র দীপিকা", প্রকাশ, ১৮৯১ অব্দে, ৮০ হইতে ৮৫ পৃষ্ঠা)।

ইহার কিছুকাল পরেই সন্তোষ রায়ের মৃত্যু হয়, এবং তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সাবর্ণ চৌধুরীবংশের জ্যোতিপ্রভাও ক্রমশঃ ম্লান হইতে থাকে। কিন্তু আজও তাহাকে তথা সাবর্ণ চৌধুরী-জমিদার-গণকে লোকে ভোলে নাই। বোধ করি কোন দিন ভুলিতেও পারিবে না। ইহারা হয়ত একদিন মহাকালের ঝড়ে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবেন, কিন্তু বাঙালী তথা বাংলার ইতিহাস অন্যান্যদের সঙ্গে ইহাদেরও স্মরণ করিবে। বাংলার শিক্ষিতসমাজ যুগ যুগ ধরিয়া ইহার অনুশীলন করিয়া যাইবেন এবং ইহা শাশ্বতরূপেই বাংলার জমিদারবংশের মাঝে বিরাজ করিবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।*

* এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ রচনায় বহুতর ব্যক্তি ও পুস্তকের সাহায্য-গ্রহণে বর্তমান লেখক ঋণী রহিলেন।

জন্মদিনে

শ্রীঊর্ম্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায়

দেখিতে দেখিতে বছর ঘুরিল পৌষ আসিল ফিরে
এক বছরের হলি আজ তুই ওরে—
গত বছরের এই দিনটিতে জনম হ'ল যে তোর।
সেদিনের সেই আনন্দ মোর—
আজিও রয়েছে প্রাণ মন ঘিরি রহিবেও চিরদিন
নির্ম্মল অমলিন॥
নব প্রভাতের অরুণ আলোর প্রথম রশ্মিকণা
পৃথিবীর বুকে ছড়ায় যেমন সোনা—
ও রাঙা অধরে তেমনি সে মধু হাসি
মোদের বুকেতে ছড়ায় অমৃতরাশি।

মঙ্গলদিনে আজিকে দেবের যাচি গো আশীর্ব্বাদ
পূর্ণ হউক সাধ—
মানুষের মত মানুষ হইয়া উচ্চ রাখিয়া শির
হইও বিজয়ী বীর।
দুষ্টের তরে রেখো মনে ঘৃণা দুঃখীরে দিও স্নেহ
ভরিয়া হৃদয় গেহ॥
আদর্শ তব উচ্চ হউক ইহাই কামনা করি
মোর প্রাণ মন ভরি—
জয়গান তোমা গাহিবে যেদিন সবে
সেদিন আমার হৃদয় পূর্ণ হবে॥

বন-হরিণী

শ্রীকল্যাণী কর

পশ্চিমের এক কলেজে অধ্যাপনার কাজ নিয়েছিলাম, সেই সময়েই প্রশান্তবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয়। এ পৃথিবীর চলার পথে কত লোক আসে কত লোক যায়, কত লোকের সঙ্গে হয় পরিচয়; কিন্তু এক এক সময় ক্ষুদ্র একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে কখন যে একজন আর একজনের একেবারে অন্তরের দ্বারে পৌঁছে যায় তা কেউ বলতে পারে না।

প্রশান্তবাবু এসেছিলেন বায়ুপরিবর্ত্তন করতে, শুভক্ষণে আমাদের সাক্ষাৎ, তাই প্রথম পরিচয়ের ব্যবধানটুকু কাটিয়ে উঠতে বেশী দেরি লাগল না। প্রশান্তবাবু হয়ে উঠলেন আমাদের সান্ধ্যসভার নিয়মিত সভ্য। রাজনীতির সরস আলোচনায় প্রতিদিন আমাদের অলস সন্ধ্যা মুখর হয়ে উঠত।

সেদিন কি কারণে সভার অন্য সভ্যরা সবাই অনুপস্থিত, কেবল প্রশান্তবাবু প্রতিদিনকার মত ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে 'ইভনিং নিউজে'র পাতা ওল্টাচ্ছেন। সামনে টেবিলের উপর ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা, চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে প্রশান্তবাবু হাসিমুখে বললেন, এবার আপনার সঙ্গে তর্কটা জমবে ভাল।

আমি হো হো করে হেসে উঠলাম। তার পর পিরিচে চা ঢেলে নিয়ে ডাকলাম, ঝুমরী—ঝুমরী—

আমার প্রিয় হরিণশিশু ঝুমরী ছুটে এল এবং পরম তৃপ্তিতে আমার হাতের চাটুকু নিঃশেষ করে ঘাসের উপর ছুটে বেড়াতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে গলার ঘুঙুর বাজতে লাগল ঝুম ঝুম করে।

প্রশান্তবাবু হঠাৎ যেন কেমন আনমনা হয়ে গেলেন, মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। বললাম, কি প্রশান্তবাবু, তর্কটা সুরু হোক।

ম্লান হাসি হেসে প্রশান্তবাবু বললেন, নাঃ, আজকে আর তর্ক জমবে না।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল। দু'একটা নিশাচর পাখী এদিকে সেদিকে গাছের উপর পাখা ঝাপ্টে উঠল। গাছের আড়াল থেকে পূর্ণিমার চাঁদ সোনালী আলোর ইসারা পাঠাচ্ছে, রজনীগন্ধা পাপড়ী মেলে সুবাসটুকু ছড়িয়ে দিল চারিদিকে। ঝুমরী ছুটতে ছুটতে এসে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়াল, আমি গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলাম, ঝুমরী আয়তচক্ষু তুলে প্রশান্তবাবুর দিকে তাকিয়ে রইল। দূরদিগন্ত থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে ঝুমরীর দিকে দৃষ্টি তুলে ধরলেন প্রশান্তবাবু। তার পর ধীরে ধীরে বলতে আরম্ভ করলেন, জানেন সুব্রতবাবু, মানুষের জীবনে এমন কোনও কোনও ঘটনা ঘটে যায়, যার স্মৃতি মন থেকে কিছুতেই মুছে ফেলা যায় না। এমনি এক ঘটনা ঘটেছিল আমার জীবনে।

প্রশান্তবাবু বলতে থাকেন, "সে প্রায় বিশ বছর আগের কথা। আমি তখন আসামের এক চা বাগানে ছিলাম। ডাক্তারীতে বেশ নাম করেছিলাম, ওখানকার কুলিরা ত আমাকে দেবতার মত ভক্তি করত, আমার উপর ছিল তাদের অগাধ বিশ্বাস।

আমাদের সুবিস্তীর্ণ চা বাগানের পরেই আসামের গভীর অরণ্য। কত জানা-অজানা জন্তু—কত ভীষণ সাপ, বাঘ, হাতী যে সেই অরণ্যের গহনে আত্মগোপন করে আছে তার সীমা নেই। সুপ্রশস্ত ব্রহ্মপুত্রের ফেনিল জলরাশি ছল ছল করে বয়ে চলে সেই রহস্যময় অরণ্যের গা ঘেঁষে। বর্ষায় ব্রহ্মপুত্রের প্রচণ্ড মূর্ত্তি, সমস্ত নদী যৌবনের উচ্ছ্বাসে ফুলে উঠে চতুর্দ্দিক ভাসিয়ে নেয়, ধীরমন্থর নৃত্যের ছন্দ—যেন নটরাজের প্রলয়নাচনে গিয়ে সমাপ্তির রেখা টানে।

সেবার ব্রহ্মপুত্রের প্রবল বন্যায় এক গর্ভবতী হরিণী ভেসে এল আমাদের চা বাগানে, একটা শিশু প্রসব করেই হরিণী শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। আমার একজন অনুগত লোক হরিণ-শিশুটিকে আমার কাছে নিয়ে এল—আমার জীবজন্তু পোষবার সখ ওদের অজানা ছিল না। কুকুর, বিড়াল, খরগোস, অনেক পাখী পুষেছি, অনেক দিন থেকেই একটি হরিণ পুষবার বড় সখ ছিল, এত দিনে সে ইচ্ছা পূর্ণ হ'ল। কিন্তু হরিণশিশুটাকে বাঁচিয়ে তোলা কঠিন—কি করে যে তাকে বাঁচাব তাই হয়ে উঠল আমার সারাদিনের সব চেয়ে বড় চিন্তা। সারাদিন ঘড়ি ধরে ওকে দুধ খাওয়ান, গ্লুকোস খাওয়ান, সময়মত স্নান করান, লোম ব্রাশ করে দেওয়া—আমার ও মণিকার এই হ'ল এক কাজ। এর একটু ত্রুটি হতে পারত না। ওর জন্য নূতন কাঠের বাক্স এল, নরম পালকের বিছানা হ'ল, ওর যাতে কোনও কষ্ট না হয় সে বিষয়ে আমাদের দু'জনেরই সজাগ দৃষ্টি। আমাদের নিঃসন্তান জীবনের স্নেহকাতর মন যেন হঠাৎ এক অবলম্বন পেয়ে তাকে আঁকড়ে ধরল।...."

প্রশান্তবাবুর চোখে যেন এক অদ্ভুত দীপ্তি, কোন অতীতের স্বপ্নে ডুবে গেছেন তিনি, বর্ত্তমান লুপ্ত হয়ে গেছে তাঁর দৃষ্টির সামনে থেকে। "কি অধীর উৎকণ্ঠা আমাদের এই হরিণশিশুটি শেষ পর্য্যন্ত বাঁচবে ত? কাজ থেকে ফিরেই ওকে না দেখলে চলত না। রাত্রিতে কতবার জেগে জেগে দেখতাম ওকে, কি জানি, সে কেমন আছে? শেষ পর্য্যন্ত আমাদের এত কষ্টের, এত আকুল আগ্রহের পুরস্কার মিলল। হরিণশিশুটি ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠতে লাগল। আদর করে ওর নাম রাখলাম লায়লী।

লায়লী এখন বেশ নাদুসনুদুস হয়ে উঠেছে। তৈলচিক্কণ মসৃণ চামড়ায় পরিপুষ্টির লক্ষণ। লায়লী এখন গৃহ চিনেছে, এখন তাকে আর বেঁধে রাখতে হয় না, স্নেহের ডোরেই বাঁধা পড়েছে লায়লী। মাঝে মাঝে বাইরে ছেড়ে দিতাম, মুক্তির আনন্দে এদিকে সেদিকে মাঠের বুকে সামনের পা দুটি তুলে সে নেচে বেড়াত, কচি সবুজ ঘাস কচকচ করে খেত, কখনও এ-গাছে কখনও ও-গাছে মুখ দিয়ে সে খেলায় মেতে উঠত। অদূরে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতাম, ধূসর দেহের উপর যেন অসংখ্য তারা ফুটে রয়েছে, যেন কোন শিল্পীর খেয়ালী তুলিতে আঁকা। কখনও আকুল স্নেহে ডাকতাম—লায়লী! ডাক শুনেই লায়লী খেলা ভুলে ছুটে আসত, গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে গা চেটে দিত, কখনও বা ভীরু দুটি আয়তচক্ষু মেলে চেয়ে থাকত মুখের দিকে, সেই মৌন চাহনিতে কত কথা, কত ভাষা। আমি তাকে কোলে নিয়ে আদর করলাম সে পরম তৃপ্তিতে চুপ করে আদর উপভোগ করত।

আমি হাসপাতাল থেকে ফিরে এলেই লায়লী এসে আমার কাছে দাঁড়াত; আমার জামা টেনে পা চেটে তার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করত। আদর করে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতাম, আমার সঙ্গে বিস্কুট কিংবা পাঁউরুটি খাওয়া ছিল তার রোজকার বরাদ্দ। কখনও আমার একটু অবহেলা টের পেলেই লায়লীর কি অভিমান, ডাকলেও আসবে না, খেতে দিলেও খাবে না, ঠিক যেন ছোট্ট মেয়েটির মত।

এমনি করে অনেকদিন কেটে গেল। লায়লী আরও বড় হয়ে উঠেছে। ভয় হ'ল, বনের হরিণী এবার বনে পালিয়ে যাবে। এক বন্ধুর পরামর্শে এবার তাকে একটু একটু আফিং খাওয়াতে আরম্ভ করলাম। কয়েকদিন খেয়েই তার নেশা হয়ে গেল। সকালবেলা লায়লীকে ছেড়ে দিতাম, লায়লী মুক্তির আনন্দে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে যেত দূরের পাহাড়ে। সারাদিন বনের হরিণ-হরিণীর সঙ্গে পাহাড়ে পাহাড়ে, বনে বনে ঘুরে বেড়াত, ঝরণার জল খেত, বন্ধনহীন জীবনের আনন্দে মশগুল হয়ে থাকত; কিন্তু সেই একটুখানি আফিং-এর নেশা সন্ধ্যার আগেই তাকে টেনে আনত গৃহের বন্ধনে। আপনি এসে ধরা দিত বনের হরিণী।... আপনার মতই তাকে আমি নেশায় বাঁধতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তা নিষ্ফল হয়েছে।"

রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করে প্রশান্তবাবু আবার বলতে আরম্ভ করলেন—"লায়লীর জীবনে তখন যৌবন এসেছে। আমি লক্ষ্য করতে লাগলাম, লায়লী আর ঠিক সময়ে গৃহে ফিরে আসে না, অন্ধকার ঘিরে আসে চারদিকে, কখনও বা গভীর রাত হয়, লায়লী এসে আফিং খেয়ে চুপ করে পড়ে থাকে। আমাদের স্নেহের আহ্বানে আর যেন তেমন করে সাড়া দেয় না লায়লী। লায়লীর গতিবিধি লক্ষ্য করে মন যেন অভিমানে, বেদনায়, উৎকণ্ঠায় ভরে উঠল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বুকের উপর যেন আশঙ্কার এক জগদ্দল পাথর চেপে বসত, কি জানি লায়লী যদি না আসে! যতক্ষণ পর্য্যন্ত লায়লী না আসত মনের এ অস্বস্তির অবসান ঘটত না।

তবুও তাকে ছেড়ে দিতে হ'ত, কারণ এই বনের হরিণীকে বাঁধতে গেলে তাকে একেবারেই হারাতে হবে। গৃহের প্রতি তার আর কোনও আকর্ষণ নাই। আমার বিছানার কাছে কাছে, আমার টেবিলের চারপাশে নেচে বেড়াত যে লায়লী, একটু আদরের লোভে গা ঘেঁসে দাঁড়াত যে লায়লী, এ ত সে লায়লী নয়! বনের নির্ঝরিণীর কলোচ্ছ্বাসে, তরুলতার শ্যামলিমায়, দুর্গম অরণ্যানীর বুকে আলো-আঁধারের খেলায় যেন মায়া-অঞ্জন পরিয়েছে লায়লীর চোখে; এ যেন কোন অপরিচিত জগতের হরিণী, তার কানে বাজছে অরণ্যের মর্ম্মরধ্বনি, তাকে টেনে নিচ্ছে দূরে—কত দূরে!

তিন-চার দিন হয় লায়লী চলে গেছে, আজও ফিরে আসে নি। ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় আমাদের দিন কাটছে, কত আশঙ্কা, কত ভয় মনে। আমার অনুগত লোকেদের পাঠিয়েছি চারদিকে, কেউ কোনও খোঁজ দিতে পারছে না। একদিন একটা লোক খবর দিল—লায়লীকে অন্য একটি হরিণের সঙ্গে ঝর্ণায় জল খেতে দেখেছে কিন্তু মানুষের সাড়া পেয়েই ওরা ছুটে পালায়। তবুও একটু আশ্বস্ত হলাম, লায়লী তবে জীবিতই আছে।

লায়লী ফিরে এল না; শূন্য গৃহে যেন হঠাৎ শুনি লায়লীর পদধ্বনি, হাসপাতাল থেকে ফিরেই মনে হয়, বুঝি লায়লী ছুটে এল। কিন্তু লায়লী ত এল না। অন্য এক কুলি খবর দিল, নদীর ধারে লায়লীকে আরেকটা হরিণের সঙ্গে ছুটে যেতে দেখেছে! আমাদের উৎকণ্ঠা শুধু বেড়েই চলে।

সেদিন এমনি পূর্ণিমা রাত্রি। পশ্চিমগগনে খামখেয়ালী চিত্রকরের বিচিত্র রঙের খেলা শেষ হয়েছে, সারা গগনে এঁকে দিয়েছে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার আলিম্পন। মোহময়ী রজনীর আলো-আঁধারে দূরের পর্ব্বত রহস্যঘন হয়ে উঠেছে, শাল-অর্জ্জুন-সরল বৃক্ষের অভ্যন্তরে যুগযুগান্তের পুঞ্জীভূত অন্ধকার, তারি ফাঁকে ফাঁকে চন্দ্রালোকের গোপন অভিসার।

বাংলোর বারান্দায় বসেছিলাম আমি ও মণিকা। হঠাৎ দেখি দূরে অনুচ্চ পাহাড়ের উপর পাশাপাশি দু'টি হরিণ—সে যে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য তা আপনাকে আমি বোঝাতে পারব না সুব্রতবাবু। জ্যোৎস্নালিপ্ত আকাশের পটভূমিতে রহস্যপূর্ণ বিস্তীর্ণ অরণ্যানী, তারই পাশে শুভ্র জ্যোৎস্নাপ্লাবিত পাহাড়ের গায়ে এই হরিণ-যুগলের মূর্ত্তিতে যেন এতক্ষণের অসমাপ্ত ছবিখানি সম্পূর্ণ হয়ে উঠল। পূর্ণ সৌন্দর্য্যের ছবিখানিতে শেষ তুলির রেখাটি টেনে দিয়ে অদৃশ্য শিল্পী হয় ত তৃপ্তির হাসি হাসছিলেন। মুগ্ধবিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে আমরা চেয়ে রইলাম।

সকলেই আমাকে পরামর্শ দিল—হরিণটিকে বেঁধে রাখুন, নইলে আর রাখতে পারবেন না। তার পর দিন লায়লী ফিরে আসতেই তাকে তার ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হ'ল। আদরযত্ন করে তাকে খুশী করতে চেষ্টা করলাম, তার প্রিয় নানা রকম জিনিস

এনে তাকে খেতে দিলাম, সন্ধ্যায় নিজে সঙ্গে করে বাগানে বেড়িয়ে নিয়ে এলাম।

পর দিন চুপি চুপি লায়লীর প্রেমিক এসে তার কাছে দাঁড়াল। অসহায়া লায়লী করুণ চোখে তার দিকে চেয়ে রইল, বাঁশের বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে মুখ ঘসে নীরবে দু'জনে কি কথা হ'ল কে জানে। তার পর দিনও এল। কুলিরা বলল, বাবু, যদি হুকুম দেন, ঐ হরিণটাকে মেরে ফেলি, তা হলে হরিণী আর যাবে না।

তাদের এই নিষ্ঠুরতায় তীব্র আপত্তি জানালাম। কিন্তু অবচেতন মনে হয় ত ভেবেছিলাম—ওকে মারুক, আমার লায়লীকে ত তা হলে হারাব না এবং সেই পাপেরই এই শাস্তি।..."

প্রশান্তবাবু কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার বলতে আরম্ভ করেন—"দু'দিন পর থেকে লায়লীর প্রেমিক আর আসে না। লায়লী যেন নিঝুম হয়ে পড়ে আছে, খাবার পাশে পড়ে আছে, কোনও কিছু মুখে দেয় না, চুপ করে এক কোণে পড়ে থাকে, হঠাৎ কাণ খাড়া করে কি শোনে, বাঁশের বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে মুখ গুজে কি যেন খোঁজে। দু'দিন, তিন দিন গেল, লায়লীকে বহু চেষ্টা করেও কিছু খাওয়াতে পারি নি, ওকে দেখে বুকের ভিতর বেদনায় টনটন করে উঠল।...মাতৃহীনা শিশু হরিণীকে কত যত্ন করে খাইয়ে বাঁচিয়ে তুলেছিলাম, সেই হরিণী আজ চোখের সামনে অনাহারে মৃতপ্রায়, তাকে কিছুতেই খাওয়াতে পারলাম না।

পর দিন ঘুম ভাঙতেই মনটা যেন বেদনায় ভারাক্রান্ত মনে হ'ল, ছুটে গেলাম লায়লীর ঘরে, আমার লায়লী তখন আর নাই। এক কোণে পড়ে আছে লায়লীর হিমশীতল দেহ।"

প্রশান্তবাবু হঠাৎ উঠে দ্রুত পায়চারী করতে লাগলেন। অলক্ষ্যে চেয়ে দেখলাম, তাঁর দুই গালে অশ্রুধারা চাঁদের আলোয় চিক্‌চিক্ করছে।

কিছুক্ষণ পরে নিজেকে একটু সংযত করে প্রশান্তবাবু এসে চেয়ারে বসলেন। ধীরে ধীরে বললেন, "লায়লীকে আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না সুব্রতবাবু, তার সেই ভীরু সুন্দর দুটি চোখ মনে পড়ে, সে চোখের চাহনীতে যেন আমার প্রতি নীরব তিরস্কার। লায়লীকে বেঁধে রেখে আমি যে নিষ্ঠুরতা করেছি, কি করে আমার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে বলতে পারেন?"

ঝুমঝুম করে ঝুমরীর ঘুঙুর বেজে উঠল। ঝুমরী এখনও পায়ের কাছে বসে আছে, চাঁদের আলোয় স্বপ্নালু দৃষ্টি তার চোখে, সেও কি দেখছে দূর বনানীর স্বপ্ন?

কবিতার দিন

শ্রীকালিদাস রায়

বলছ ত কবিতার দিন গেছে ফুরিয়ে
কেমন করে তা বল এড়াবে?
আকাশের নব মেঘ তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে
আন দিকে আঁখি তব ফেরাবে?
দেখিবে না শরতের ভরা নদী, কূলে তার
কাশবনে নাচে গাঙশালিকে?
ঠেলিবে কি ছয় ঋতু আনিবে যে উপহার
তাহাদের ফোটা ফুল ডালিকে?
চাবে না কি তারাভরা নিশীথের গগনে?
যাবে নাকি সৈকতে বারিধির?
কানে তুলা দিয়ে রবে কুলায়ের কূজনে
শুনিবে না প্রেমালাপ কপোতীর?
কচিমুখে হাসি নিয়ে এলে ধূলা মাখিয়া
শিশুর গালের চুমা হারাবে?
প্রিয়া যবে মানভরে বসে রবে বাঁকিয়া
তারে কি ধমক দিয়ে তাড়াবে?
বলছ ত কবিতার লীলা হ'ল বন্ধ,
তাহা যে ছড়ানো সারা ভুবনে।
কালা যদি নাই হও নাই হও অন্ধ
কবিতা এড়াবে বল কেমনে?

বাংলার বাউল ও বাউল গান সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তব্য

শ্রীমতী বেলা দাশগুপ্তা

সম্প্রতি অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' গ্রন্থখানি পাঠ করার সৌভাগ্য হ'ল। দু'খণ্ডে বিভক্ত প্রায় হাজার পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে বাউল ধর্মের উৎপত্তির ইতিহাস, তত্ত্ব, দর্শন ও সাধন সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। প্রথম খণ্ডের মধ্যে বাউল ধর্ম্মের উপাদান, বাউলের সাধন-পদ্ধতি এবং দ্বিতীয় খণ্ডের বাউল গানের সংগ্রহটির মূল্য অবশ্যই স্বীকার্য্য। তা ছাড়া লেখক বাউল ধর্ম্মের আলোচনা প্রসঙ্গে সুফী, বৌদ্ধ, নাথ, বৈষ্ণব-সহজিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধন ইত্যাদি সম্বন্ধে বহু তথ্য পরিবেশন করেছেন। কৌতূহলী পাঠক সে সকল পড়ে লাভবান হবেন সন্দেহ নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলার বাউল-ধর্ম্মের উৎপত্তির ইতিহাস, তাদের তত্ত্ব, দর্শন ও সাধন বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে লেখকের মতবাদ সর্ব্বাংশে গ্রহণযোগ্য মনে হ'ল না। এ ছাড়া গ্রন্থমধ্যে প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত বৈষ্ণবাগ্রগণ্য অদ্বৈতাচার্য্যের সাধন সম্বন্ধে তাঁর উল্লেখও ভ্রমাত্মক। যে সকল বিষয়ে লেখকের সঙ্গে একমত হতে পারি নি সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য প্রকাশের জন্যই এ আলোচনার অবতারণা।

১। প্রথমে অদ্বৈতাচার্য্যের সাধন প্রসঙ্গেই আলোচনা করা যাক্। লেখক গ্রন্থমধ্যে অদ্বৈতাচার্য্যকে বহুবার 'অবধূত'রূপে উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ৪১-৪৫)। তাঁর অনুমান অদ্বৈত প্রথমে যোগমার্গাবলম্বী শক্তির উপাসক ছিলেন, পরে যোগের সঙ্গে কৃষ্ণ-প্রেমের অবতারণা করেন। এ অনুমানের পরিপোষকরূপে তিনি চৈতন্য-ভাগবত থেকে একটি (২।৮) এবং চৈতন্য-চরিতামৃত থেকে দুটি (৩.১৯) দৃষ্টান্ত উদ্ধার করেছেন (পৃঃ ৪১)। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, তাঁর সাধন সম্বন্ধে লেখকের অনুমান ও উল্লেখ সম্পূর্ণরূপেই ভ্রমাত্মক। অদ্বৈতাচার্য্য কোন কালেই 'শিবশক্তির সামরস্যের' সাধনা করেন নি, তিনি 'অবধূত' সাধক ছিলেন না, তিনি কখন 'যোগের' সাধনা করেন নি। চৈতন্য-ভাগবত থেকে শ্রীচৈতন্যের যে উক্তি উদ্ধৃত করে তিনি তাঁকে অবধূত প্রমাণ করেছেন, সে উক্তিটি আদৌ অদ্বৈতাচার্য্য সম্বন্ধীয় নয়, সেটি নিত্যানন্দ সম্বন্ধীয়। চৈতন্য-ভাগবতের ঐ অধ্যায়টি মনোযোগ দিয়ে পড়লেই তিনি স্পষ্ট দেখতে পেতেন যে, অবধূত নিত্যানন্দকে আশ্রয় দিয়েছিলেন বলেই শ্রীচৈতন্য কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করে শ্রীনিবাসকে বলেছিলেন—"এই অবধূত কেন রাখ নিরন্তর। কোন্ জাতি কোন্ কুল কিছু নাহি যার॥" (লেখকের এ উদ্ধৃতিটিতেও ভুল আছে।)

চৈতন্য-ভাগবত থেকে জানা যায় যে, অদ্বৈতাচার্য্য যোগবাশিষ্ঠানুযায়ী শিষ্যদের সঙ্গে জ্ঞানচর্চ্চা করতেন (২।১০; ২।১৯)। যোগবাশিষ্ঠ অধ্যাত্ম-তত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ। বশিষ্ঠ, শিষ্য রামচন্দ্রকে তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তরে যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান করেছিলেন, তাই জ্ঞানযোগ। এজন্যই এ গ্রন্থের নাম যোগবাশিষ্ঠ। অদ্বৈতাচার্য্য যে অদ্বৈতবাদী জ্ঞানী ছিলেন, তাঁর নামেই সে পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল কমলাক্ষ। অদ্বৈতাচার্য্যের পূর্ব্ব-শিষ্যদের মধ্যে মুরারী গুপ্ত ও মুকুন্দ বৈদ্য অন্যতম ছিলেন। জ্ঞান-চর্চ্চার জন্য শ্রীচৈতন্য তাঁদের তিরস্কার করেছিলেন, মুরারী গুপ্ত স্বয়ং সে কথা উল্লেখ করেছেন (কড়চা—২।৪; ২।৬)। অতএব অদ্বৈতাচার্য্য প্রথমে অদ্বৈতপন্থী জ্ঞান-সাধক ছিলেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। পরে তিনি মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত থেকে তিনি যে দু'টি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেছেন তার একটিতে জ্ঞানযোগের সাধকরূপেই তাঁকে 'মহাযোগেশ্বর' বলা হয়েছে এবং মাধবেন্দ্রের নিকট দীক্ষিত হবার পরে বৈষ্ণব-আগমানুযায়ী তাঁর পূজার্চ্চনা নিষ্পন্ন হ'ত বলেই দ্বিতীয়টিতে তাঁকে 'আগম-শাস্ত্রের বিধি বিধানে কুশল' বলা হয়েছে।

অদ্বৈতাচার্য্য প্রথমে অবধূত, যোগসাধক বা শিবশক্তির উপাসক ছিলেন এরূপ কোন প্রমাণই কোন প্রামাণিক গ্রন্থে নেই, লেখকের এরূপ উল্লেখে তথ্যের বিকৃতি হয়েছে।

২। এবারে বাউলদের প্রেমতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করে দেখাতে চেষ্টা করব যে তাদের প্রেমতত্ত্ব বিষয়ে লেখকের মতবাদ সমর্থনযোগ্য নয়।

বাউলদের প্রেমতত্ত্ব সম্বন্ধে লেখকের অভিমত উদ্ধৃত করা যাচ্ছে—"ইহা স্পষ্ট বুঝিতে হইবে যে, বাউলদের প্রেম প্রকৃতিপুরুষ মিলনাত্মক প্রকৃত দেহোৎপন্ন আকর্ষণ হইতে উদ্ভূত, দেহের উর্দ্ধগত এক আত্মবিস্মৃতিময় অনুভূতি। ইহা একান্তই মানবিক। দেহের বাহিরে বাউলদের কোন সাধনা নাই।" (পৃঃ ৮২)

এই প্রেমকে 'মানবিক প্রেম' বলার কারণটি আর একটি উক্তিতে সুস্পষ্ট হয়েছে—"প্রেম অর্থে নিত্যানন্দময় পরমতত্ত্বের মানবিক প্রতিনিধি—কৃষ্ণস্বরূপ ও রাধাস্বরূপিণী—পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে অচ্ছেদ্য আকর্ষণ।" (পৃঃ ৮৯]

অন্যত্র শ্রীযুত ক্ষিতিমোহন সেনের বাউল পরিচয় থেকে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করে তিনি মন্তব্য করেছেন—"শ্রীযুত সেন মহাশয়ের মতে বাংলার বাউলদের সাধনা ভগবৎ-প্রেমের সাধনা, কিন্তু বাংলার বাউলরা প্রেম বলিতে যাহা বুঝে, তাহা ভগবৎ-প্রেম নয় ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।" [পৃঃ ৮৯।]

এ সকল উক্তি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে বাউলদের প্রেমতত্ত্ব সম্বন্ধে লেখকের মতবাদ এই যে, বাউলগণ ভগবৎ-প্রেমিক নহে, তাদের প্রেম প্রাকৃত নর-নারীর মধ্যে আকর্ষণজনিত এক আত্মবিস্মৃতিময় অনুভূতি সুতরাং একান্তই মানবিক।

প্রেম বাউলদের প্রধান তত্ত্ব সে কথা লেখক স্বীকার করেছেন এবং বাউলদের তত্ত্ব যে তাদের গানেই সুস্পষ্ট একথাও তিনি অনেক স্থানে জানিয়েছেন। সুতরাং বাউলদের প্রেমতত্ত্ব উপলব্ধির জন্য প্রথমে লেখকের দ্বিতীয় খণ্ড থেকে বাউলদের কয়েকটি গানের অংশ উদ্ধৃত করা যাচ্ছে—

ক। সময় গেলে সাধন হবে নারে
অবোধ মন।
যতন আগ্রহ বিনে মিলবে কিরে
প্রেম রতন॥ [৩৭৯ নং]

খ। আছে কাম প্রেমেতে মাথামাখি, প্রেমের জন্য বুঝা ভার।
ও যে জন চিনেছে জগৎস্বামী
কাম থেকে হয় নিষ্কামী
তার আর কর্ম্ম আছে কি,
ও সে প্রেমেতে খেলে সাঁতার॥ [৪০৮ নং]

গ। প্রেম পাথারে যে সাঁতারে
তার মরণের ভয় কি আছে।
জাতিকুল ভয়-লজ্জা তার সব গিয়াছে।

পাগল নয় সে পাগল পারা,
দু' নয়নে বহে ধারা,
ও তার ধারায় ধারা মিশে গেছে।
দীন গোপাল কয়, সে আপন ভোলা
প্রেম পাগলা
রসের স্রোতে ভাসতেছে॥

ঘ। ভাবের ভাবুক, প্রেমের প্রেমিক
হয় যে জন,
ও তার বিপরীত রীতি পদ্ধতি,
কে জানে কখন
সে থাকে কেমন॥ [৪১৩ নং]

বাউলদের এই গান থেকে জানা যাচ্ছে যে, বাউল-সাধক সাধন করার জন্য ব্যগ্র, কারণ যতন-আগ্রহ বিনে প্রেম-রতন লাভ হয় না। কাম আর প্রেমে মাখামাখি, কিন্তু জগৎস্বামীকে যে চিনেছে সে কাম থেকে নিষ্কামী হয়ে প্রেমেই সাঁতার কাটে। যেজন ভাবের ভাবুক প্রেমের প্রেমিক হয় তার রীতি-পদ্ধতিও সাধারণের থেকে আলাদা। লাজ-লজ্জা ত্যাগ করে প্রেমপাথারে সাঁতার কেটেই তার পাগলের অবস্থা হয়েছে, সুরধুনীর ধারার মত প্রবাহিত হচ্ছে তার নয়ন-ধারা। সেই প্রেম-পাগলা, আপন-ভোলাই রসের স্রোতে ভাসে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, প্রেম-রতন লাভ করার সাধনায় বাউল যত্নবান, আর সে রতন লাভ করেই তার পাগলের অবস্থা, জগতের থেকে সে আলাদা, সে আপন-ভোলা।

ইষ্টবস্তুকে লাভ করার জন্যই সাধনার প্রয়োজন। বাউল-সাধক এই প্রেমের সাধনা করে কোন্ ইষ্টলাভের জন্য? তাদের গান থেকেই তার উত্তর পাওয়া যাবে :

ক। এমন দিন কবে হবে, পাব মনেরি মানুষ রতন।
আকারে নরত মানুষ, প্রেম ধরম তাহার লক্ষণ॥ (৩২৪নং)

খ। আমার মনের মানুষ যে রে
আমি কোথায় পাব তারে॥

এ সকল গানের দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে 'মনের মানুষ'ই বাউলদের সাধ্যবস্তু। মনের মানুষকে তারা অবশ্য সহজ মানুষ, অটল মানুষ, জগৎস্বামী ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছে। এই সাধ্যবস্তু লাভের জন্যই তাদের প্রেম-সাধনা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদেরও প্রেম প্রধান তত্ত্ব, পুরুষার্থের সাধন। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের জন্যই তাদেরও প্রেম-সাধনা। তাদের প্রেম কৃষ্ণপ্রেম, এবং প্রেম যাদের লাভ হয়েছে তারাই কৃষ্ণপ্রেমিক। বাউল-সাধকও তাদের নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে প্রেমের সাধনা করে মনের মানুষরূপী ভগবানের জন্য, অতএব তাদের প্রেমকে ভগবৎ-প্রেম বলতে বাধা কি আছে?

বাউলদের এই প্রেমতত্ত্বকে লেখক—পরম তত্ত্বের মানবিক প্রতিনিধি, কৃষ্ণস্বরূপ ও রাধাস্বরূপিনী, পুরুষ ও প্রকৃতির আকর্ষণ-জনিত প্রেম, সুতরাং মানবিক প্রেম—কেন বলেছেন তার তাৎপর্য্য অনুধাবন করার চেষ্টা করা যাক্। এই তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম করতে হলে তন্ত্রশাস্ত্রের তত্ত্ব-গহনে প্রবেশ করা প্রয়োজন। তন্ত্রের-আলোকে বিচার করলেও দেখা যাবে যে, লেখকের মানবিক প্রেম কথাটি তাৎপর্য্যহীন।

তত্ত্বালোচনার পূর্ব্বে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। তন্ত্র-সাধন সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, বৌদ্ধ ও শাক্ত সম্প্রদায়ই কেবলমাত্র তন্ত্রের সাধক। ধারণাটি ভুল সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ বর্ত্তমানকাল-প্রচলিত সকল সম্প্রদায়ের সাধনাই তন্ত্র-মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। যাই হউক, এবার আলোচনা আরম্ভ করা যাক্।

তন্ত্রমতে শক্তিমান ও শক্তির মিলিত রূপই পরমেশ্বরের স্বরূপ। সুতরাং বৈষ্ণবদের শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার মিলিত রূপ, শৈবদের শিব বা হর—শিব ও পার্ব্বতী (শক্তি) বা হর ও গৌরীর মিলিত রূপ, শাক্তদের শক্তি—শক্তি ও শিবের মিলিত রূপ। জীবও পরমেশ্বরের শক্তি সুতরাং অভিন্ন তত্ত্ব। আবার তন্ত্রমতে জীবদেহ আশ্রয় করেই পরমেশ্বরের অবস্থিতি স্বীকৃত হয়েছে, অতএব তাঁর শক্তিমান ও শক্তি-তত্ত্বেরও প্রকাশ রয়েছে প্রত্যেক নর-নারীর মধ্যে। এই তত্ত্বানুযায়ী বিভিন্ন সম্প্রদায় নর-নারীর দেহে কৃষ্ণ-রাধা, শিব-শক্তি, পুরুষ-প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন।

নর-নারীর অন্তর্নিহিত শক্তি-শক্তিমান সত্তার ভেদ-প্রতীতি সংসার-বন্ধনের এবং অভেদ-জ্ঞান মোক্ষের কারণ। যতক্ষণ এই ভেদ-প্রতীতি ততক্ষণ জীবের কামনা, বাসনা, ভোগাকাঙ্ক্ষা বলবৎ থাকে। অভেদ-জ্ঞানেই জীবের স্বরূপ উপলব্ধি হয়, তা হলেই পরমেশ্বরের সঙ্গে মিলন সম্ভবপর হয়। এই মিলনই তন্ত্র-সাধকের চরম লক্ষ্য।

এই লক্ষ্যপথে দৃষ্টি রেখেই শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতি সগুণ-বাদী সম্প্রদায়ের এবং অন্যান্য নির্গুণবাদীদের সাধন-পদ্ধতি নির্দ্ধারিত হয়েছে। সেই অনুসারেই কেউ ভক্তিপথের সাধক, কেউ জ্ঞান-পথের ও কেউ যোগপথের।

নর-নারীর প্রকৃতি বিকার ও ষড়রিপুর মূলে তাদের শক্তিমান ও শক্তি-সত্তার ভেদ-জ্ঞান। সুতরাং এরূপ জ্ঞানের বিনাশসাধন তন্ত্র-সাধকের প্রথম প্রয়োজন, সেই সাধনাতেই স্বরূপ-জ্ঞানও লাভ হয়। স্বরূপ-উপলব্ধির জন্য যে সাধন, তন্ত্র সাধনার সেই প্রাথমিক স্তরকেই বলা হয়—চিত্তশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি বা কায়সাধন। ভক্ত, যোগী ও জ্ঞানীভেদে এই সাধন-পদ্ধতিও বিভিন্ন।

প্রথম স্তরের এই সাধনে স্বরূপ-উপলব্ধির ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হয় তাকেই বলা হয় জিয়ন্তে মরা বা সহজ অবস্থা। এই অবস্থাতেই পরমেশ্বরের সঙ্গে মিলনের পথ প্রশস্ত হয়। এই মিলনের জন্য ভিন্ন সাধনার প্রয়োজন। সেই সাধনাকেই ষটচক্র-ভেদ, সহজসাধন, প্রেমের সাধন, উল্টাসাধন বলা হয়েছে। এর ফলে পরমেশ্বরের সঙ্গে মিলন বা একাত্মতা লাভ হলেই সামরস্যের অবস্থা হয়. সামরস্যের আস্বাদনেই সাধক আনন্দাভিভূত হয়ে থাকে। একেই বলা হয় সমাধি, নির্ব্বাণ, বা মহাভাবের অবস্থা।

তন্ত্রমতানুযায়ী সাধনের স্তর দুটিকে বাহ্য ও অন্তর ভেদে ভাগ করা চলে। বাহ্য সাধনে লক্ষ্যপথের জন্য প্রস্তুতি, অন্তর সাধনে সিদ্ধিলাভ। এই হ'ল মোটামুটি তন্ত্র-সাধনার তাৎপর্য্য।

এবার বাউলদের সাধন প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক্। বাউলদের সাধন যৌগিক প্রক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম স্তরের সাধনটিকে তারা নাম দিয়েছে 'চারিচন্দ্রের ভেদ'। এই সাধনের দুটি উদ্দেশ্য—প্রথম, ইন্দ্রিয়-দমন ও লজ্জা-ঘৃণাদি প্রকৃতি বিকার দূর করা; দ্বিতীয়, শক্তি-শক্তিমান বা পুরুষ-প্রকৃতি ভাবের বিলোপ সাধন দ্বারা স্বরূপ-জ্ঞান লাভ। বাউলদের গানের দৃষ্টান্ত থেকেই এই সাধনের মর্ম্ম উপলব্ধি হবে—

ক। ইন্দ্রিয়-দমন কর আগে মন
না হলে সাধন হবে না। (৩৮১নং)

খ। প্রেম করা কি সহজ কথা, আগে স্বভাব রাখ দূরে।
তোমায় আমায় করব পিরিত এ জনমের তরে॥ (৪২৮নং)

এই গান দুটি থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, ইন্দ্রিয়-দমন ও ভেদ-জ্ঞানের বিলোপ অর্থাৎ স্বভাব-ত্যাগ তাদের সাধনার প্রাথমিক স্তর অর্থাৎ সাধন সিদ্ধির প্রস্তুতিমাত্র।

বিশেষ দুটি 'চন্দ্র' অবলম্বনে সাধনের দ্বারাই স্বভাব-ত্যাগ বা স্বরূপ-উপলব্ধি হয়, তখনই প্রাকৃত কাম প্রেমে পরিণত হয়। বাউল-সাধক তাই বলেছে:

ক। কাম যেথা প্রেম সেথা
দেখনা নজর করে।
দুধেতে হয় ঘি উৎপন্ন মথনের জোরে॥ (৪২৮নং)

খ। ওরে প্রেম করা কি কথার কর্ম্ম,
আছে কামের মধ্যে প্রেমের জন্ম
সেই প্রেম করা জ্যান্তে মরা
কুমড়ো পোকার যেমন ধারা॥ (৪০৭নং)

সাধনের প্রভাবে কাম থেকে যে প্রেমের জন্ম, সে প্রেম ভগবৎ-প্রাপ্তির সহায়ক সুতরাং সে শুদ্ধ প্রেম ভগবৎ-প্রেম। মোটের উপর দেখা যাচ্ছে যে, প্রকৃতি-পুরুষ ভেদভাব যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ কামকে প্রেম বলা চলে না, স্বরূপের উপলব্ধি বা স্বরূপ-জ্ঞান হলেই কাম প্রেমে রূপান্তরিত হয়। অতএব লেখকের অভিমতানুযায়ী প্রকৃতি-পুরুষের অচ্ছেদ্য আকর্ষণজনিত কামকে যেমন প্রেম বলা চলে না, মানবিক প্রেম কথাটিরও এক্ষেত্রে কোন সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রকৃতপক্ষে লেখক বাউলদের 'চারিচন্দ্র ভেদের' প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। যে ক্রিয়াতে কাম প্রেমে পরিণত হয় তাকে তিনি মহাযোগের সাধন বলেছেন। বাউলদের সাধন-বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—"'এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দুইটি প্রধান। একটি সাধন সঙ্গিনী প্রকৃতির শারীরিক ও মানসিক এক বিশেষ অবস্থায় যোগ সাধনা এবং তাহাকে মহাযোগ বলিয়া গ্রহণ। অপরটি চারিচন্দ্র ভেদ।" (পৃঃ ২৮৯)

যে ক্রিয়াকে তিনি মহাযোগের সাধন এবং চারিচন্দ্র ভেদ থেকে আলাদা বলেছেন সেটি বস্তুতঃ ঐ সাধন নয়, চারিচন্দ্র ভেদ অর্থাৎ বাহ্য সাধনের একটি প্রক্রিয়া মাত্র। এই ক্রিয়াটিকে তিনি বাউলদের চরম সাধন অর্থাৎ মহাযোগের সাধন মনে করে পরম ভুল করেছেন। বাউলদের প্রকৃত সাধন আরম্ভ হয় ঐ ক্রিয়ার পরে। সুতরাং এটি মহাযোগের প্রথম সোপান মাত্র।

ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয়ের সমীকরণ দ্বারা সুষুম্না-পথ উন্মুক্ত করাই এই চন্দ্রভেদের যৌগিক প্রক্রিয়া। এর পরে সুষুম্না-পথেই সাধকের উল্টাসাধনা বা মহাযোগের সাধনার আরম্ভ। এই পথেই সাধক দেহমধ্যস্থ ছ'টি পদ্ম ভেদ করতে সক্ষম হয়। তাই বাউল-সাধক লিখেছে—'সুষুম্না ধরিয়ে মৃণাল বাহিয়ে উঠ সেই পদ্ম পরে।' ছ'টি পদ্ম ভেদ করে সহস্রদল পদ্মে সাধকের স্বরূপ-শক্তি পরমেশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয় বা একাত্মতা লাভ করে। বাউলদের চরম সাধনার এই হ'ল শেষ অবস্থা, সামরস্যের অবস্থা। এ অবস্থায় অপূর্ব্ব এক আনন্দরসের আস্বাদন হয়।

এই সাধনের আরম্ভ থেকে সাধকের ভাবারূঢ় অবস্থা—প্রেমের শেষ সীমা মহাভাবে এর পরিণতি। এজন্যই এ সাধনাকে প্রেমের সাধন বলা হয়। এ ভাবেই বাউল-সাধক প্রেম-তত্ত্বের সঙ্গে

যোগ-তন্ত্রের মিলন সাধন করেছে। তাই তাদের মিষ্টিক বা মরমিয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলা যায়।

এবার এ প্রসঙ্গের শেষ করি: বাউলদের যে সাধন-বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করা হ'ল তা থেকে তাদের প্রেম যে মানবিক প্রেম নয়, ভগবৎ-প্রেম—এ তত্ত্বটি উপলব্ধি করা যাবে আশা করি।

৩। লেখকের মতে বৈষ্ণব-সহজিয়া ধর্মের তত্ত্ব-দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে বাংলার বাউল ধর্মের উদ্ভব। এ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত উদ্ধৃত হ'ল—"চৈতন্য পরবর্তী সহজিয়া-বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্ব-দর্শনই বাউল ধর্মের প্রাথমিক স্তর। তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম বা পরবর্তী সহজিয়া-বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্ব-দর্শনই বাউল ধর্ম ও সাধনার ভিত্তি।" (পৃঃ ৩৫৬)

বাউল ধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে লেখকের এ অভিমত সমর্থন-যোগ্য নয়। পরবর্তী আলোচনা থেকে লেখকের মতবাদের অসারতা প্রতিপন্ন হবে।

বাউল-ধর্মের উৎসের সন্ধান পেতে হলে ষোড়শ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস জানা প্রয়োজন। সেজন্য প্রথমে ঐ শতাব্দীর বৈষ্ণব ধর্মের ক্রমবিকাশের ঐতিহাসিক ধারাটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাক্। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলা দেশে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে উপাস্য দেবতারূপে গ্রহণ করে ভক্তি-প্রধান বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তন হয়েছিল। নবদ্বীপে এই ধর্মকে কেন্দ্র করে যে বৈষ্ণব সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল, শ্রীচৈতন্য ছিলেন তার মধ্যমণি। এই ভক্তগোষ্ঠীর সঙ্গে তিনি মিলিত হয়েছিলেন ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে। এর কয়েক মাস পরে নিত্যানন্দ নামে এক অবধূত শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হন। তিনি বাংলা দেশে শ্রীকৃষ্ণ নাম ও প্রেমধর্ম প্রচারের ভার গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মহাযোগেশ্বর, সর্বপ্রকার প্রকৃতি বিকার মুক্ত, জাতিভেদ বিচারহীন, বিধিনিয়মের অনধীন এক আপন-ভোলা মহাপুরুষ। এরূপ একজন সাধক বাংলা দেশে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমধর্ম প্রচার করে যশস্বী হয়েছেন।

বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আর এক সাধক অদ্বৈতাচার্য্য, তিনি ছিলেন মহাজ্ঞানী। তাঁর সাধন-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পূর্ব্ব প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। তিনিও শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিধর্ম প্রচার করেই যশস্বী হয়েছেন। অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ এই দু'জন তত্ত্বজ্ঞানী ও আত্মারাম সাধক গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে প্রভুরূপে খ্যাত। সন্ন্যাসোত্তর জীবনে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নীলাচলবাসী হয়েছিলেন, সুতরাং বাংলার বৈষ্ণব সমাজের ভার অর্পিত হয়েছিল প্রভুদ্বয়ের উপর। আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর পঞ্চদশকের মধ্যে উভয়ের তিরোধান ঘটে। এই সময়ে নিত্যানন্দের শিষ্য সম্প্রদায় বাংলা দেশে বৈষ্ণব সমাজের কর্ণধার হয়েছিলেন। এর পরে এদের সঙ্গে নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্র যোগ দিয়েছিলেন। বাংলার বৈষ্ণব সমাজে তাঁরও প্রতিপত্তি ছিল। নিত্যানন্দের শিষ্যসম্প্রদায় ছিলেন সখ্যভাবের সাধক। কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বীরভদ্রের নাম নিত্যানন্দের শাখায় উল্লেখ করাতে মনে হয় বীরভদ্রও সখ্যরসের সাধক ছিলেন। প্রেম-বিলাস ও ভক্তি-রত্নাকরের উল্লেখ থেকে মনে হয় নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবী বা জাহ্নবা দেবী মধুর ভাবে কৃষ্ণভজন সমর্থন করতেন। বাংলার বৈষ্ণব সমাজে তাঁরও বিশেষ প্রভাব ছিল। এই জাহ্নবা দেবী পর্য্যন্ত বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের একটি যুগধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছিল।

এর পরের যুগধারায় বাংলা দেশে শ্রীনিবাসাচার্য্য ও নরোত্তম ঠাকুরের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল। এই বৈষ্ণবাচার্য্যদ্বয় বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর উত্তর-সাধক। তাঁদের প্রচারিত ধর্ম-বৈশিষ্ট্য থেকেই আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর অষ্টদশক থেকে বাংলা দেশে শ্রীরাধার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শিবপ্রধান শৈব এবং শক্তিপ্রধান শাক্তধর্মের মধ্যে যে পার্থক্য, তার সঙ্গে বাংলার এই দুই যুগের কৃষ্ণপ্রধান ও রাধাপ্রধান ধর্ম-বৈশিষ্ট্যের তুলনা করা যেতে পারে। যাহা হউক, অদ্বৈত-নিত্যানন্দ প্রভাবিত যুগকে শ্রীকৃষ্ণপ্রধান ধর্মের এবং নরোত্তম-শ্রীনিবাস প্রভাবিত যুগকে শ্রীরাধাপ্রধান যুগরূপে স্পষ্টতঃই অভিহিত করা চলে। প্রথম যুগের শ্রীকৃষ্ণধর্মে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চতুর্বিধ প্রেমভাবেরই স্থান ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় যুগে মধুর ভাবই প্রাধান্য লাভ করে। প্রথম যুগের সাধন-বৈশিষ্ট্য—রাগমার্গে ব্রজের চতুর্ব্বিধ ভাবে শ্রীকৃষ্ণভজন (রাধাকৃষ্ণের মিলিত রূপই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ—তন্ত্রশাস্ত্রের এ তত্ত্বটি এ ক্ষেত্রেও মনে রাখা প্রয়োজন), দ্বিতীয় যুগের বৈশিষ্ট্য—রাগমার্গে মধুর ভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল-ভজন।

ষোড়শ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের এই হ'ল মোটামুটি ইতিহাস। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে বাংলা দেশের বৈষ্ণব ধর্ম থেকে দুটি শাখা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল, তাদের মধ্যে একটি শাখা নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও তাঁদের শিষ্যসম্প্রদায়ের প্রভাবান্বিত প্রথম যুগের শ্রীকৃষ্ণভজনের বৈশিষ্ট্য থেকে উদ্ভূত—এই শাখাটিই বাউল। বাউলদের গানে যে বৈরাগ্য, নিরাসক্তি, জাগতিক বিধিনিয়ম-বিমুখতা, আত্মভোলা, ও প্রেম-পাগল ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তার মূলে নিত্যানন্দের ন্যায় আপন-ভোলা, প্রেম-পাগল, আত্মারাম সাধকের এবং অদ্বৈতের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানী সাধকের সাধন-বৈশিষ্ট্যের প্রভাব সহজেই অনুভূত হবে। এই সম্প্রদায়ের শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বই বাউলদের 'মনের মানুষ' তত্ত্বে রূপান্তরিত হয়েছে।

রাগমার্গে রাধাকৃষ্ণের যুগল-ভজনের যে ধারা দ্বিতীয় যুগে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল, তার বৈশিষ্ট্য হ'ল মধুর ভাবে ভজন, কিন্তু ব্রজগোপীদের প্রেমবৈশিষ্ট্যানুসারে পরকীয়াভাবই হ'ল এর আদর্শ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের এই পরকীয়া প্রেমতত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই বৈষ্ণব-সহজিয়া ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। গৌড়ীয় মতের অনুসরণে বৈষ্ণব-সহজিয়াগণও বলে, যুগল ভজনে ব্রজভাব প্রয়োজন এবং

তার ফলেই গিরিধারীকে লাভ করা যায়। চণ্ডীদাসের সহজিয়া-ভজনের পদে এরূপ উল্লেখই দেখতে পাই, তিনি লিখেছেন :

"যুগল ভজন তাহার যাজন
বেদবিধি অগোচর।
ব্রজভাব লয়ে ভজন করিলে
সেই পায় গিরিধর॥"

কিন্তু গিরিধারী বা নন্দের নন্দনকে ভজনের জন্য চাই পরকীয়া ভাব, তাই তারা বলে—'নন্দের নন্দন করয়ে ভজন, উপপতি ভাব লয়া।" কারণ ব্রজধামের সখীদের প্রেমও ছিল পরকীয়া—'ব্রজের মাধুর্য্যরস পরকীয়া হয়।' (উদ্ধৃতিগুলি মনীন্দ্রমোহন বসুর সহজিয়া সাহিত্য থেকে গৃহীত)। বাউল সম্প্রদায় পরকীয়া প্রেমের কথা কখনই বলে না, এ প্রেম তাদের আদর্শ নয়। বৈষ্ণব-সহজিয়াদের সঙ্গে বাউলদের প্রেমতত্ত্বের এই হ'ল প্রধান পার্থক্য। এ আলোচনার সংক্ষিপ্ত পরিসরে উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মতত্ত্বের তুলনা-মূলক বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ নেই—শুধু এই বললেই যথেষ্ট হবে যে, প্রেমতত্ত্বে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন পার্থক্য, উভয় সম্প্রদায়ের দর্শন ও সাধন তখন সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন হতে কখনই পারে না। বৈষ্ণব-সহজিয়া ধর্ম্মের সঙ্গে বাউল ধর্ম্মের মূলতত্ত্বেই প্রভেদ, অতএব এ ধর্ম্মকে বাউল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মের আদিস্তর সিদ্ধান্ত করা একেবারেই অসঙ্গত।

৪। এই গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে লেখক 'নিবেদন' করেছেন—"আমি এই গ্রন্থের মধ্যে একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি যে, মুসলমান ফকিররাই বাউল সাধনার আদি প্রবর্ত্তক বলিয়া মনে হয় এবং বাউল সাধনার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য খুব সম্ভব ফকিরদের নিকট হইতে আসিয়াছে।" (পৃঃ ।০)

মুসলমান ফকিরদের বৈশিষ্ট্য অবলম্বনে বাউল ধর্ম্মের উদ্ভব, তারাই এ ধর্ম্মের আদি প্রবর্ত্তক—এ অনুমানও সমর্থনযোগ্য নয়। এ বিষয়েই এবার আলোচনা করা যাচ্ছে।

ফকিরদের যে বৈশিষ্ট্যগুলি বাউল ধর্ম্মকে প্রভাবিত করেছে বলে লেখকের অভিমত, তার মধ্যে একটি হ'ল বাউলদের গানে প্রকাশিত ভগবানের প্রতি আর্ত্তি, দৈন্য ও তাঁহার কাছে করুণাভিক্ষা। সহজিয়াদের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্য নেই, সুতরাং এটি সুফী প্রভাবিত ফকিরদের নিকট থেকে বাউলরা গ্রহণ করেছে বলে তাঁর অনুমান (পৃঃ ২৮৪)।

বৈষ্ণব-পদাবলী সংগ্রহের অন্তর্গত প্রার্থনাপদগুলির সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরাই বুঝতে পারবেন যে, বৈষ্ণব-সাধকদের বৈশিষ্ট্যই বাউল গানে পূর্ণরূপে প্রকাশ পেয়েছে। শ্রীচৈতন্য-পরবর্ত্তী-যুগের বাউল-সাধকদের অন্য সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন হয় নি। সুফী ধর্ম্মের সঙ্গে বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম্মের সাদৃশ্য স্বীকার্য্য, কিন্তু সুফী প্রভাবান্বিত ফকিরদের থেকে বাউলরা পূর্ব্বোক্ত বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছে, এ অনুমান অসঙ্গত।

ফকিরদের আর একটি বৈশিষ্ট্য বাউল সম্প্রদায় গ্রহণ করেছে বলে লেখকের অনুমান, সেটি হ'ল তাদের 'কায়-সাধন'। এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—"চারিচন্দ্রভেদ নিঃসন্দেহে কায়-সাধন বা সহজ-সিদ্ধির সাধনার ধারা হইতে বাউল ধর্ম্মে গৃহীত হইয়াছে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মুসলমান ফকিররাই বৌদ্ধ সহজ-সাধনার ধারাটি বহুদিন সঙ্গোপনে রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল এবং আমার মনে হয় বাউল ধর্ম্মের এই বৈশিষ্ট্য মুসলমান ফকিরদের নিকট হইতে গৃহীত।" (পৃঃ ২৮৯)

বাউলদের চারিচন্দ্র ভেদ বা কায়-সাধন অর্থাৎ যৌগিক প্রক্রিয়াটি বৌদ্ধ-সহজিয়া প্রভাবিত ফকিরদের থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে এরূপ অনুমান করাও ভুল হবে। নিম্ন আলোচনা থেকে বাউলদের এই বৈশিষ্ট্য যে বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায় থেকেই গৃহীত তা অনুমান করা যাবে।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে, অবধূত নিত্যানন্দ ও তাঁর শিষ্যসম্প্রদায় প্রভাবিত প্রথম যুগের কৃষ্ণ-ভজনের ধারা থেকে বাউল ধর্ম্মের উদ্ভব। কৃষ্ণপ্রেমের আদর্শ ও যোগ-সাধনের পদ্ধতি অবলম্বন করেই বাউলদের প্রেমের সাধনা। বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায় যোগপথ অবলম্বন করেন নি একথা স্বীকার্য্য। কিন্তু অবধূত নিত্যানন্দের অন্তরঙ্গ শিষ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে যোগ শিক্ষা করেছিলেন—এরূপ প্রমাণ দুর্ল্লভ নয়। নিত্যানন্দের অন্তরঙ্গ শিষ্যদের অন্যতম রামদাস অভিরাম চৈতন্য-মঙ্গল প্রণেতা জয়ানন্দের শিক্ষা-গুরু ছিলেন। জয়ানন্দের গ্রন্থে যোগমতানুযায়ী দেহতত্ত্বের উল্লেখ রয়েছে (বৈরাগ্য খণ্ড, পৃঃ ৭৭)। গ্রন্থকার নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্রেরও কৃপালাভ করেছিলেন। অভিরাম ও বীরভদ্রের কৃপাপ্রাপ্ত জয়ানন্দ, নিত্যানন্দের দারপরিগ্রহণের পর খড়দহে অবস্থিতি প্রসঙ্গে লিখেছেন—'নিত্যানন্দ নিবাস করিলা খড়দহে। মহাকুল যোগেশ্বর বংশ যাহে রহে।' বীরভদ্রকে উদ্দেশ করেই যে এই উক্তি তা অনুমান করা যায়। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বীরভদ্রকে নিত্যানন্দের 'স্কন্ধ মহাশাখা'রূপে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি একসময়ে বাংলার বৈষ্ণব সমাজের কর্ণধারও ছিলেন। অথচ কোন প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে তাঁর ধর্ম্মমতের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রেমবিলাস থেকে বীরভদ্রের কিছু পরিচয় লাভ করা যায়, তাঁর যোগবিভূতির কিছু কিছু নিদর্শনও মেলে। এ সকল দৃষ্টান্ত থেকে অনুমান করা যায় যে, বীরভদ্র যোগসাধক ছিলেন। সুতরাং নিত্যানন্দের শিষ্য ও পুত্রের প্রভাবেই জয়ানন্দের যোগ-জ্ঞান লাভ হয়েছিল এবং আরও অনুমান করা যায় যে, বাংলা দেশে নিত্যানন্দ-পরবর্ত্তী যুগে তাঁর নিকট দীক্ষিত ও তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত একটি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। বাউলগণ এই সম্প্রদায়েরই উত্তর-সাধক, সেজন্যই তাদের প্রেমভক্তি ও যোগসাধনার আদর্শের সঙ্গে বাউল ধর্ম্মের সম্পূর্ণ ঐক্য। বীরভদ্রকে বাউল সম্প্রদায় আদিগুরু স্বীকার করে সে কথা লেখক উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ৪৪)।

কায়-সাধন বা সহজসাধন যোগ-সাধনেরই অন্তর্গত, অতএব বাউলদের সাধন-পদ্ধতিটি ঐ সম্প্রদায়ের যোগ-সাধনের উপ

প্রতিষ্ঠিত বলাই সঙ্গত। সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে কিছু-সংখ্যক মুসলমানও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবে ফকির সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছিল, সেজন্যই তাদের সঙ্গে বাউল ধর্ম্মের সাদৃশ্য রয়েছে বলে আমার অনুমান। এই সম্প্রদায় যে প্রথমে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিল, এবং তাদের কিছু প্রভাব যে বাউল সম্প্রদায়ে পড়েছে সে কথা স্বীকার করা যায়।

আলোচনা আর বাড়িয়ে লাভ নেই। মোটের উপর বৈষ্ণব-সহজিয়া ও ফকির ধর্ম্মের সমন্বয়ে বাউল ধর্ম্মের উদ্ভব এবং বাউল ও বৈষ্ণব-সহজিয়াদের ধর্ম্ম, তত্ত্ব ও দর্শন মূলতঃ অভিন্ন—লেখকের এ মতবাদ আমি সমর্থনযোগ্য মনে করি না, কেন মনে করি না—এই আলোচনা থেকে তা উপলব্ধি হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

শেষ বক্তব্য এই যে, শ্রীযুত ক্ষিতিমোহন সেনের 'বাউল-পরিচয়' থেকে ভগবৎ-প্রেমিক, ভাবুক, দার্শনিক ও সহজ-সাধক (যৌগিক প্রক্রিয়া দ্বারাও যখন সহজাবস্থা লাভ হয় তখন সহজ-সাধক মাত্রেই প্রকৃতি সংসর্গে সাধন করে মনে করা ভুল) যে বাউল সম্প্রদায়ের পরিচয় পাওয়া যায়, তারা আলোচ্য গ্রন্থের লেখকের অভিমতানুযায়ী কল্পনার বাউল নয়, উপরন্তু তারাই সপ্তদশ শতাব্দীতে উদ্ভূত আদি বাউল সম্প্রদায়—একথা স্বীকারে বাধা আছে মনে করি না। বাউল ও বৈষ্ণব-সহজিয়া—এ দুটি প্রধান শাখা থেকে পরবর্ত্তী সময়ে অনেক উপশাখার সৃষ্টি হয়েছে এবং তিন শ' বছরে উভয়ের ভাবধারার ও আচারের কিছু সংমিশ্রণ ঘটেছে স্বীকার করা যায়, কিন্তু মূলের স্বাতন্ত্র্য তাতে নষ্ট হয়েছে সে কথা মেনে নেওয়া যায় না। বৈষ্ণব-সহজিয়া ও বাউলদের তত্ত্ব, দর্শন ও সাধন বর্ত্তমানে অভিন্ন—লেখকের এ অভিমত যদি স্বীকার করতেই হয়, তবে একথাও মানতে হবে যে, বিংশ শতাব্দীতে প্রকৃত বাউল ধর্ম্মের সম্পূর্ণ লোপ হয়েছে।

শীত

শ্রীতারকপ্রসাদ ঘোষ

পাদপের পীত পর্ণে পাণ্ডুরের দীর্ণ শিহরণ
খসায়েছে বর্ণাঢ্য খোলস,
অবশীর্ণ অবয়ব ক্রন্দনে যাচিছে আকিঞ্চন,
সম্মোহন সঞ্জীবন-রস
শিকড়ের তলে;
পলে পলে
বিলয়ের-ফেনপুঞ্জ আড়ষ্ট আনীল
বিদ্রূপ বিভঙ্গে স্ফুঁশে উন্মত্ত আবিল!

জীবন-ঈর্ষ্যায় যেন পরিকীর্ণ পউষ-প্রান্তর,
ছন্নছাড়া রিক্ততার রূপ,
করোটি-কঠিন মাটি—ঊষরের পিয়াস-জর্জ্জর
শুষ্ক তালু, নিক্রান্ত নিশ্চুপ—
মুহুর্মুহু হাঁকে,
ছার্ব্বিপাকে
শুধু জাগে ব্যর্থতার ব্যত্যয়-বুদ্‌বুদ—
লালসা-উৎকীর্ণ তবু অভীপ্সার-দূত!

ঊর্দ্ধলোকে বীরাচার; যোগাবিষ্ট উলঙ্গ আকাশ
জাগায়-যে অন্ধ অমানিশি
গূঢ় গুহ্য তন্ত্রবলে; হি-হি কম্প শৈত্যের-সন্ত্রাস
পরিব্যাপ্ত, আর্ত্ত দশ দিশি;
স্তব্ধ হাহাকার
বারম্বার
আকর্ষিছে বীর্য্যহীন রুদ্ধ ঊর্দ্ধশ্বাস
কুহেলিকা-আস্তরণে নিস্তীর্ণ নৈরাশ!

প্রকৃতির ত্বক্‌-চ্যুত নেমিহারা যেন এই শীত
প্রলম্ব-সে এ-পৃথ্বীর গায়ে—
ভ্রংশ বুদ্ধি মত্ত মতি গতি তাই আঁকে যে ইঙ্গিত
দিনান্তের পুষকের বায়ে—
মৃত্যু-গাঢ় হিম্‌
ঝিম্‌ঝিম্‌
সারারাত—জীবনে-যৌবনে প্রাত্যহিক
দেশ-কাল-পাত্র ভরি' সম্পৃক্ত সার্ব্বিক!

কবে হবে বেগ-ব্যগ্র?—বজ্র করে তোমার নৈর্ঋত
ছড়াবেনা দুর্বিজ্ঞান-বিষ
কাতর এ-প্রাণের পল্লবে; মুক্ত হব ওগো শীত,
অনন্তের লভিয়া আশিস্‌
তোমার তুহিনে—
অন্তরীণে—
আহরিব গতি-রাগ-নিগূঢ় আশ্লেষ
মৃত্যুহীন চুম্বনের শেষ-অনির্দ্দেশ!

ফটো

শ্রীঅর্ণব সেন

দুটি পাতলা মসৃণ ঠোঁট শুকনো, বিবর্ণ। যেন এক মায়ামন্ত্রে সব রক্ত লুপ্ত হয়ে গেছে। মুখখানি ফ্যাকাশে। কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমেছে। দুটি চোখ স্থির। চোখ সরিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই।

শোভনার মাথা ঝিমঝিম করছিল। ও হয়ত চীৎকার করে উঠত, কিংবা এ ঘর থেকে পালিয়ে যেত। কিন্তু ওর সমস্ত শক্তি যেন লুপ্ত হয়ে গেছে। ও অবাক্ হয়ে চেয়ে আছে ফটোর দিকে।

ছবিটা বুঝি কথা বলে উঠবে এখুনি। ঠোঁট দুটি বোধ হয় এইবার নড়ে উঠবে। ভুরু দুটি কেঁপে উঠবে। দুটি চোখ জীবন্ত হয়ে শোভনাকে জড়িয়ে ধরতে চাইছে। বিঁধতে চাইছে শোভনার কোমল বুক, শরীর।

অথচ কেবল ছবি একটা। বাঁধানো ছবি। সুরঞ্জনদার মৃত স্ত্রীর ফটো।

সুরঞ্জন এসে ঘরে ঢুকল।

'কি শোভনা, তুমি বস নি এখনও? অত লজ্জা কিসের? আর তোমায় কেই-বা বসতে বলবে বল?'

শোভনা তখনও দাঁড়িয়ে। ফটোর দিকে চেয়ে আছে।

সুরঞ্জন ডাকল, 'ওকি, তোমার কি হয়েছে? তোমার চোখমুখ ওরকম কেন? শরীর খারাপ করছে? এদিকে চেয়ারটায় বস।'

শোভনা কোন কথা বলল না।

'কি, কি হ'ল?' সুরঞ্জন এক গ্লাস জল নিয়ে এল।

শোভনা জল খেয়ে চেয়ারটায় বসল।

'না কিছু হয় নি। তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না।'

সুরঞ্জন হাত-পাখা দিয়ে ওকে বাতাস করছিল। শোভনা ওর হাত থেকে পাখাটা টেনে নিল।

সুরঞ্জন বলল, 'তোমার কি শরীর খারাপ করছে এখনও?'

সুরঞ্জন আলতো করে শোভনার কপালে হাতটা ছোঁয়াল। 'না, কিছুই হয় নি। জ্বর ত নয়। তবে কি হঠাৎ মাথাটা ঘুরে উঠেছিল? কিংবা কোন আকস্মিক শারীরিক যন্ত্রণা?'

শোভনা বাতাস খেতে খেতে বলল, 'না, আমার কিছু হয় নি। ওই ছবিটা দেখছিলাম ঘরে ঢুকে। হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। এখন ঠিক হয়ে গেছে।'

'ওঃ, ছবিটা!' সুরঞ্জন নিশ্বাস ফেলল, 'যাক্, অন্য কিছু নয়, তবু ভাল। হ্যাঁ, অনুপমার ওই ছবিটা এনলার্জ করিয়ে বাঁধিয়ে এনেছি ক'দিন হ'ল।'

'বড় জীবন্ত ছবি।' শোভনা চুপ করল।

সুরঞ্জন ম্লান হেসে বলল, 'জীবন্ত! কি জানি, আমার ত মনে হয় নি কখনও। এমনি খুব সাধারণ একটা ফটো ওটা। অনুপমার আমার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার মাস দুই-তিনের মধ্যে তোলা।'

শোভনা বলল, 'এখন বাড়িতে ত তুমি একলাই আছ?'

'হ্যাঁ, একলাই একরকম। একটা বাচ্চা চাকর আছে। আর কেই-বা থাকবে?'

শোভনা হাসল।

'সে ত বোঝাই যাচ্ছে একলাই আছ। ঘরদোর এমন-ভাবে আর রাখবে কে? একলা আছ বলে কি ঘরের ঝুল ঝাড়তে নেই, বিছানার চাদর বদলাতে নেই, টেবিলটা একটু গুছিয়ে রাখতে নেই?'

সুরঞ্জন বলল, 'ওসব করবার সময় কোথায় আমার? যাক্, তুমি চা খাবে ত? দাঁড়াও, আমি চায়ের ব্যবস্থা করতে বলি চাকরটাকে।'

শোভনা বলল, 'আমি চা করব। তুমি কেবল গরম জলটা তৈরি করে দিতে বল।'

সুরঞ্জন বলল, 'আমার বাড়িতে এসে তুমি নিজে চা করে খাবে?'

শোভনা হেসে উঠল। ওর কানের দুলটা দুলে উঠল ওর হাসিতে।

'তুমি চুপ করে বসে থাকবে। আমি তোমায় চা করে খাওয়াব।'

শোভনা উঠে দাঁড়াল। ওর ঠোঁটের কোণে হাসি স্তব্ধ হয়ে আছে।

চা খেতে খেতে সুরঞ্জন বলল, 'শোভনা, তোমার স্বামীর ফিরতে আর কত দেরি? তিনি না ফেরা পর্যন্ত ত তুমি এখানেই থাকবে বাপ-মার কাছে?'

শোভনার মুখের দিকে চাইল সুরঞ্জন। আগের চেয়েও সুন্দর দেখতে হয়েছে শোভনা বিয়ের পর। ওর ফর্সা গালে গোলাপী আভা দেখা দিয়েছে। চোখ দুটি আগের

মত নীলিমা। আর গভীর কালো চোখের তারা দুটি দুরন্ত, চঞ্চল।

শোভনা হেসে বলল, 'ওর কোর্স ত আড়াই বছরের। ফিরতে এখনও ঢের দেরি। ও না ফেরা পর্যন্ত আমি এখানেই থাকব।'

সুরঞ্জন বলল, 'তা হলে তোমার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হতে পারে ?'

শোভনা বলল, 'হ্যাঁ, তোমাকে আমি জানি না! তোমার কথাই আছে, কাজ নেই। তুমি একদিনও আমাদের বাড়ি যাবে না এ আমি বাজি ফেলে বলতে পারি। তুমি কম স্বার্থপর! তোমাকে কি আমার চিনতে বাকি আছে ?'

সুরঞ্জন শোভনার কথা শুনতে শুনতে হাসছিল।

'তুমি একলাই আমার বাড়িতে চলে আসবে আমি ভাবি নি। অনুপমা মারা গেছে তুমি মাসিমার কাছে শুনেছিলে বোধ হয়।'

'তুমি ত কিছুই ভাব নি। অত দূর থেকে কলকাতায় এসেই আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি, অথচ তুমি বিয়ের পর একটা খবর পর্যন্ত নিলে না আমার। তোমার বউয়ের সঙ্গে আমার দেখা হ'ল না, এই দুঃখ রয়ে গেল।'

দোতলা বাড়িটা ওপরতলা আর নিচেতলা, দুটি ভাগে ভাগ করা। ওপরতলায় থাকে শোভনারা আর নিচের-তলায় থাকে সুরঞ্জনরা। শোভনারাই বাড়ির মালিক, সুরঞ্জনরা ভাড়া থাকে। তবু দুটি পরিবারের মধ্যে গভীর অন্তরঙ্গতা।

'সুরঞ্জনদা, আজ আমাদের ওখানে খাবে। মা বলে পাঠিয়েছে।' শোভনা শাড়ির আঁচলের খুঁট আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলে সুরঞ্জনের মাকে।

সুরঞ্জনের মা হাসতে হাসতে বলেন, 'বেশ ভাল। কাল কিন্তু তুমি আমাদের এখানে খাবে। সুরঞ্জনের জন্মদিন কাল।'

শোভনা বলে, 'তাই বুঝি, কই, আমাকে কিছু বলেনি সুরঞ্জনদা। আপনি ভাগ্যিস বললেন মাসিমা।'

'তাই নাকি ? সুরঞ্জন বুঝি লুকিয়ে রেখেছিল তোমার কাছে ?'

'হ্যাঁ, সেদিন ওকে জিজ্ঞেস করলাম জন্মদিনের কথা। তা ও বলল যে, বুড়ো বয়সে আর জন্মদিন হয় না। দেখুন কি কথা!'

সুরঞ্জনের মা হাসতে থাকেন।

'আজকাল বেশ কথা শিখেছে তোমার সুরঞ্জনদা। আমাকেও সেদিন কি একটা কথা শোনাল যেন।'

'হুঁ, হবেই ত। যত বাজে ফাজিল ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দেয় আজকাল। বাড়ি থাকতে দেখি না বড় একটা। কেবল আড্ডা আর আড্ডা। মা ওর জন্যে যে সোয়েটারটা বুনছিলেন তার উল একটু কম পড়েছে। আজ এক মাস ধরে ও আর সেই উলটুকু এনে দিতে পারছে না। অথচ ওরই নিজের জিনিস ত।'

সুরঞ্জনও ছাড়ে না। শোভনার মার কাছে গিয়ে বলে, 'জানেন মাসিমা, শোভনা আজকাল বড্ড গল্পের বই পড়ছে। পড়াশুনা কিছুই করে না। এই দেখুন না, আমার লাইব্রেরীর বই ওঁর বন্ধুদের পড়তে দিয়েছেন আজ পনেরো দিন হয়ে গেল। এদিকে আমার দরকারী বই আনা বন্ধ হয়ে আছে।'

শোভনার মা হাসেন।

'হ্যাঁ, তুমি ওকে ধমকে দিলেই পার।'

সুরঞ্জন বলে, 'ও আমার কথা শোনে নাকি! আমাকে গ্রাহ্যই করে না। যদিও বা আগে একটু করত, আজকাল মোটেই করে না।'

শোভনার মা বলেন, 'আমার ত মনে হয় একমাত্র তোমাকেই ও কিছুটা মানে। আমার কথা ত একদম শোনে না। তোমাকে কিন্তু একটি কাজ করতে হবে বাবা। ইডেন গার্ডেনে কি একটা একজিবিশান্ হচ্ছে, তোমাকে দেখিয়ে আনতে হবে। শোভনা আমাকে বলছে ক'দিন থেকে। তোমার সঙ্গে ওর একটু ঝগড়া না করলেও চলে না, আবার তুমি না হলেও ওর চলে না।'

সুরঞ্জন বলে, 'হাঁ, নিজের কাজের বেলা আমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেবে। অথচ আমি একটা কাজ করে দিতে বললে বলবে সময় নেই। একটা রুমাল সেলাই করে দিতে বলছি কবে থেকে।'

শোভনার মা বলেন, 'বেশ ত, আমি করে দেব। ওকে সাধতে যাওয়ার দরকার কি ?'

সন্ধ্যেবেলাতেও সুরঞ্জন ঘরের ভেতর বসেছিল। শোভনা এসে ঘরে ঢুকল।

'আজ বেড়াতে বের হও নি সুরঞ্জনদা ?' শোভনা আরও কাছে এগিয়ে এসে ফিস্ ফিস্ স্বরে বলল, 'পয়সা ফুরিয়েছে বুঝি, সিগারেট খাওয়ার পয়সা নেই ?'

সুরঞ্জন একবার শোভনার মুখের দিকে চেয়ে আবার মাথা নিচু করল। টেবিলের ওপর থেকে পেনসিলটা নিয়ে হিজিবিজি কাটল একটা খোলা খাতার পাতায়।

'আজ্ঞে না। বিকেলে আর বেরুব না ক'দিন। তুমিই ত মাকে বলেছ আমি সর্বদা আড্ডা দিই আজকাল। তাই ক'দিন একটু রেষ্ট নেব।'

'ঈস্, কি বাধ্য ছেলে!' শোভনা ঠোঁট বেঁকাল। 'দেখব ক'দিন বাড়ী থাকতে পার।'

সুরঞ্জন শোভনার দিকে চাইল আর একবার। ফিকে সবুজ রঙের শাড়ী, মুখে পাউডারের হালকা প্রলেপ। নতুন কায়দায় তৈরী দুল ওর কানে।

'বেরুচ্ছো বুঝি? ভাল, যাও।'

শোভনা জানলার কাছে দাঁড়াল।

'আমার সঙ্গে একটু যাবে? দমদমে পিসিমার বাড়ী যাব।'

সুরঞ্জন মাথা নাড়ল।

'আমি বেরুবো না আজ। আর তোমার পিসিমার বাড়ী আমি যাবও না'

শোভনা বলল, 'পিসিমার বাড়ী তোমায় যেতে হবে না। শুধু দমদম পর্যন্ত বাসে যেতে বলছি। পিসিমার বাড়ীর কাছে পৌঁছে দিয়েই তুমি চলে এস। আমি মণ্টুদাকে নিয়ে ফিরব।'

সুরঞ্জন বলল, 'আমি যেতে পারব না।'

শোভনা অভিমানের ভঙ্গিতে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'একলা আমি যেতে পারতাম, কিন্তু দু'জনে গল্প করতে করতে যাব, তাই তোমাকে সঙ্গে নিতে চাইলাম। বেশ, তুমি যেও না। আমি একলাই যাচ্ছি।'

শোভনা চলে যাচ্ছিল ঘর থেকে।

সুরঞ্জন ডাকল, 'এই শোন, শোন। যাচ্ছি চল।'

এমনি করেই একটির পর একটি মাস কেটে যাচ্ছিল। শোভনা আর সুরঞ্জন। আকাশের রঙ ঘন নীল আর গাছের পাতার রঙ গাঢ় সবুজ। জীবনে ক্লান্তি নেই, মনে ভ্রান্তি নেই। বছরও ঘুরে গেল। কিন্তু শোভনা আর সুরঞ্জনের চোখে রামধনুর সাত রঙের খেলা বন্ধ হ'ল না।

কিন্তু পরিবর্তন ও বিবর্তন একদিন আসে।

শোভনা একদিন সুরঞ্জনের ঘরে এসে ঢুকল দুপুরবেলার দিকে।

শোভনা বলল, 'একটা দরকারী কথা বলতে এসেছিলাম। আমার শীগ্রি বিয়ে হবে জান ত?'

সুরঞ্জন হাসল।

'নিশ্চয় জানি মস্তবড় ইঞ্জিনীয়ার তিনি। বিলেত যাবেন কিছুদিন পরে। সব খবর আমি শুনেছি মাসিমার কাছে। এখন আমাকে কি করতে হবে?'

শোভনা সুরঞ্জনের চোখে চোখ রাখল। একবার ঠোঁট কামড়াল। ওর চোখের কোণে কান্নার আভাস।

'আমার বিয়ের খবর শুনে তোমার খুব আনন্দ হচ্ছে, না? স্বার্থপর!'

শোভনা মুখ ফিরিয়ে নিল।

সুরঞ্জন বলল, 'আমি স্বার্থপর? কিন্তু শোভনা তুমি আমাকে বুঝতে পারবে না কোনদিন।'

শোভনা বলল, 'তুমি কেন আমাকে ঠকালে?'

সুরঞ্জন একটু চুপ করে থেকে বলল, 'শোভনা, আমি অনেক ভেবে দেখেছি। তুমি যা চাইছ তা হয় না। হওয়ার কোন উপায় নেই। আমার কতটুকু সাধ্য, সামর্থ্য?'

শোভনা বলল, 'বুঝেছি, আমি শুধু বোঝা হয়ে থাকব। আমারই ভুল হয়েছিল।'

সুরঞ্জন বলল, 'তুমি তোমার বাবা মা, আত্মীয়স্বজন সবাইকে ছাড়তে পারবে, শোভনা। কিন্তু আমি তোমাকে আমার কাছে টেনে নেব কোন্ সাহসে? তোমার বা আমার বয়েসই বা কত? আমি চাকরি করি না, তোমায় খাওয়াব কি করে? আর, এতকালের মিষ্টি সম্পর্কটা তেতো করে লাভ কি?'

শোভনা বলল, 'চমৎকার উপদেশ দেওয়া হয়েছে! থাক্, আর দরকার নেই।'

সুরঞ্জন বলল, 'তোমাকে কি দিতে পারব বলতে পার? শুধু শুধু তোমার সমস্ত জীবনটা নষ্ট হবে। আমার যোগ্যতা কতটুকু?'

এর পর সুরঞ্জন অনেক ভেবে দেখেছে। না, সত্যিই অসম্ভব। শোভনাকে বিয়ে করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। কোন্ ভরসায় ও বিয়ে করবে? শোভনাকে সুরঞ্জন একথা বোঝাতে পারে নি। সুরঞ্জন মনে মনে ভেবে দেখেছে, শোভনা যেন সুরঞ্জনের কাছে ছায়ার মতো। সুরঞ্জন তাকে ভালবাসতে পারে, কাছে টেনে নিতে পারে না। ওকে দেখতে পারে, কিন্তু ধরতে পারে না। শোভনা যেন রূপকথার দেশের রাজকন্যা। দৈত্যরা সেই রাজকন্যাকে পাহারা দেয় সারাদিন, সারারাত। সুরঞ্জন তাকে উদ্ধার করবে কি করে? রাজকন্যার কান্নায় বৃথাই মুক্তো ঝরে পড়ে।

শোভনার বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়ের পরে শোভনা ওর স্বামীর সঙ্গে চলে গেছে। মাঝে মাঝে দু'একবার এসেছে, তখন সুরঞ্জনের সঙ্গে ওর দেখা হয়েছে। তার পর সুরঞ্জনরা সেই বাড়ী ছেড়ে অন্য জায়গায় উঠে গেছে। তবু সুরঞ্জনদের পরিবারের সঙ্গে শোভনাদের পরিবারের যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রয়ে গেছে।

আরও কয়েক বছর পর সুরঞ্জন চাকরিতে ঢুকেছে। ওর বাবা-মা কলকাতা ছেড়ে দেশের বাড়ীতে গিয়ে বাস করতে আরম্ভ করেছেন। সুরঞ্জনের সঙ্গে অনুপমার বিয়ের খবরও শোভনা পেয়েছে। বিয়েতে উপহারও পাঠিয়েছে।

সুরঞ্জন ঘরে বসে বসে শোভনার কথাই ভাবছিল। আজ এতদিন হঠাৎ শোভনা যে একলাই ওর সঙ্গে দেখা করতে আসবে একথা সুরঞ্জন ভাবে নি। শোভনা নিশ্চয় এখন সেইসব ঘটনা ভুলে গেছে। হয়ত তার উল্লেখ করলেও ও লজ্জা পাবে। হ্যাঁ, শোভনা বিয়ে করে সুখী হয়েছে। তবু সুরঞ্জনকে এতদিন ও মনে রেখেছে এটাই আশ্চর্য। শোভনা হঠাৎ ফটো দেখে অমন নার্ভাস হয়ে গেল কেন? সুরঞ্জন হাসল। অনুপমার সঙ্গে শোভনার দেখা হ'ল না।

সুরঞ্জন অনুপমার ফটোটার দিকে চাইল। যে ঘুরে বেড়াত, যে হাসত, যার হাঁটার মধ্যে ছন্দ ছিল, ভোরবেলা যার চুলের গন্ধে ঘুম ভাঙত, সে আর নেই। অথচ এইখানেই সে একদিন ছিল।

শোভনা এই ফটোটা দেখে বলেছিল, বড় জীবন্ত। ও তাই হয় ত হঠাৎ চমকে উঠেছিল। কিন্তু কেন, ভয়ে? ছবি দেখে ভয় পাওয়ার কি আছে? শোভনা কি সত্যিই ভয় পেয়েছিল? অনুপমা মারা গেছে ঠিক, কিন্তু তার ছবিটা ত ভয়ংকর কোনকিছু নয়। বরং অমন মিষ্টি চেহারা ছিল অনুপমার, দুটি চোখ কি স্নিগ্ধ ছিল! ছবিটাতে সেই ভাবটি বেশ ফুটে উঠেছে। দুটি লাজুক চোখ! ওই ফটোর মধ্যে দিয়ে অনুপমাকে যেন হৃদয়ে ফিরে পাওয়া যায়। দুটি নরম চোখ কি গভীর শান্তি দেয়!

শোভনাদের বাড়ী আর যাওয়া হয়ে উঠছিল না। সুরঞ্জন প্রায়ই ভাবে একদিন শোভনার সঙ্গে দেখা করবে কিন্তু যাওয়া হয় না। কাজ ত রয়েইছে। কাজের ফাঁকে একবার যে শোভনাদের বাড়ী যাওয়া যায় না এমন নয়। তবু হয়ে ওঠে না। হয় ত কোন সংকোচ, জড়তা সুরঞ্জনের যাওয়ার ইচ্ছেকে জড়িয়ে ধরে। এগোতে দেয় না। কিংবা হয় ত তাও নয়। শুধু আলস্য, উদ্দীপনার অভাব। কি হবে গিয়ে, কি লাভ? কিন্তু একবার যাওয়া উচিত; অন্তত শোভনাকে ও কথা দিয়েছিল একদিন ও যাবে ওদের বাড়ী। সেই কতদিন আগে শোভনা এসেছিল সুরঞ্জনের কাছে। না, অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরে একবার যাওয়া উচিত ছিল। সুরঞ্জন নিজের ব্যবহারেই লজ্জা পায়। কোন কিছুই ভাল লাগে না। আবার শোভনার কাছে যাবে?

সেদিনও বিকেলে কোন কাজ ছিল না। রোজ কোন রকমে বিকেলটা কাটিয়ে দেয় এখানে ওখানে আড্ডা দিয়ে, বেড়িয়ে। না, আজ শোভনাদের বাড়ী একবার ও যাবে। ছিঃ! আরও অনেক আগেই যাওয়া উচিত ছিল। শোভনা নিশ্চয় কথা শোনাবে এজন্যে। তবু ওর রাগ করবার ভঙ্গিটি মনোরম।

দরজাটা খোলাই ছিল। সুরঞ্জন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল।

'এই যে, সুরঞ্জন। মাসিমার বাড়ী বুঝি ভুলেও আসতে নেই?'

শোভনার মা দাঁড়িয়েছিলেন।

'না, নানা কাজে আর আসা হয়ে ওঠে না।'

সুরঞ্জন মাথা চুলকে প্রণাম করল।

'ভাল আছ ত? তোমার কথা প্রায়ই ভাবি, বাবা। এস, বসবে চল।'

'শোভনা আছে ত মাসিমা?'

'হ্যাঁ তুমি বস। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

শোভনা হঠাৎ বেরিয়ে এল সামনের ঘর থেকে।

'কে এসেছে, মা?'

সুরঞ্জন কথা বলতে গেল। কিন্তু ওর গলার স্বর স্তব্ধ হয়ে রইল। শোভনা কথা বলল না। মাথা নিচু করল।

সুরঞ্জন তখনও অবাক হয়ে চেয়ে আছে শোভনার দিকে। নির্বোধের মতো, অচেতনের মতো ও চেয়েই আছে। শোভনার সারা অঙ্গ জুড়ে শুধু রিক্ত শুভ্রতা। মাথায় সিঁদুর নেই। সিঁথিতে অপরিসীম রিক্ততা, শূন্যতা। দু'একটি রুক্ষ চুল উড়ছে। নিরাভরণ দুটি বাহু চোখকে পীড়া দেয়, কিন্তু তবু চোখ ফিরিয়ে নেওয়ার উপায় নেই।

'প্রশান্ত আজ দু'মাস হ'ল মারা গেছে বিলেতে, ওদের কারখানার একটা এ্যাক্সিডেন্টে।'

শোভনার মা চোখ মুছলেন।

শোভনা কথা বলল, 'এস, বসবে এস ঘরে।'

সুরঞ্জন অন্ধের মত শোভনার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে শোভনার ঘরে ঢুকল।

সুরঞ্জন ডাকল, 'শোভনা।'

শোভনা বলল, তুমি একটু বস। আমি আসছি এখুনি।'

সুরঞ্জন একলা বসে রইল। কি আশ্চর্য নির্জন ঘর! আর তেমনি শূন্য। কিছু নেই ঘরে। জিনিসপত্র সব সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কেবল একটি খাট, আর একটি বেতের ছোট্ট টেবিল।

একটিমাত্র ফটো দেওয়ালে। ফুলের মালা ঝুলছে। দু'একটি পোড়া ধূপকাঠি তার পাশে। শোভনার স্বামীর ফটো ওটা। বহুকাল আগে দেখা মানুষকে সুরঞ্জন ফটোর মধ্যে চিনতে পারল।

বড় গম্ভীর চেহারাটা সুরঞ্জন ফটোর দিকে চেয়েই

রইল সম্মোহিতের মতো। ফটোর দুটি চোখ যেন সুরঞ্জনের হৃদয়ের গভীর প্রদেশে ডুবে যেতে চাইছে। ছবিটা বুঝি কথা বলে উঠবে এখুনি। ঠোঁট দুটি বোধ হয় এইবার নড়ে উঠবে। ভুরু দুটি কেঁপে উঠবে। দুটি চোখ জীবন্ত হয়ে সুরঞ্জনকে জড়িয়ে ধরতে চাইছে। বিঁধতে চাইছে সুরঞ্জনের শরীর, বুক। কে তুমি? তুমি কি চাও? কেন এসেছ?

শোভনা ঘরে এসে ঢুকল। ওর হাতে চায়ের কাপ।

'ওকি, তোমার শরীর খারাপ করছে?'

শোভনা ভয়ার্ত চোখে সুরঞ্জনের মুখের দিকে চাইল। কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। বিবর্ণ মুখ, দুটি ঠোঁট শুকনো।

'না, কিছু হয় নি।'

সুরঞ্জন শোভনার হাত থেকে চায়ের কাপটা নিল। ওর হাত কাঁপছিল।

শোভনা বলল, 'হঠাৎ ঘেমে উঠলে কেন? এখন ত গরম পড়েনি মোটেই।'

শোভনা ফ্যানটা খুলে দিল।

শ্রীনিকেতন গঠনে সুকুমার চট্টোপাধ্যায়

অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ি। হিন্দু হোষ্টেলে থাকি। হিন্দু হোষ্টেলে সব সময়েই অনেক ভাল ছেলে বাস করিয়া লেখাপড়া শিখিয়াছে। আমাদের সময় যাহাদের নাম মনে আসিতেছে তাহাদের মধ্যে বিশেষ করিয়া শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদের নাম উল্লেখযোগ্য। নবাগত একটি ভালো ছেলে বিশেষ ভাবে আমার আকৃষ্ট করিল। ইনি সুকুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার চরিত্রের যে দিকটা সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল তাহা তাঁহার অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা-প্রণালী ও তাঁহার প্রত্যেকের সহিত অন্তরঙ্গ ভাবে মিশিবার শক্তি।

সুকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ধনীর সন্তান। পিতৃদত্ত বৈভব তাঁহাকে নষ্ট করিতে পারিত কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহার অন্তর্নিহিত প্রতিভা ও চরিত্রবলকে উদ্দীপিত করিল। এই পাথেয় লইয়া তিনি যাত্রা করিলেন। নিজের প্রতিভার বলে তিনি সরকারী চাকুরি পাইলেন এবং কর্ম্মশক্তি তাঁহাকে উহার শীর্ষস্থলে উন্নীত করিল। ইহা নিশ্চয়ই বড় কথা।

কিন্তু সুকুমারের জীবন মহীয়ান হইয়া উঠিল তখনই যখন নির্দ্দিষ্ট কালপূর্ত্তির বহু পূর্ব্বে তিনি ঐ চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শ্রীনিকেতনের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। সে আসন আই-সি-এস-দিগেরও কাম্য ছিল, কিসের লোভে তাহা তিনি ত্যাগ করিয়া আসিলেন সেই কথাই আজ আমরা চিন্তা করি। সরকারী কার্য্যে সুকুমারবাবু বাংলার বিভিন্ন জেলার সর্ব্বশ্রেণীর সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। শুধু আদালত গৃহের আবেষ্টনীতে নয়, বাহিরে তাহাদের জীবনযাত্রার ভিতরে। দেশবাসীর দারিদ্র্য ও অশিক্ষা তাঁহাকে ক্লিষ্ট করিয়াছে। সরকারী কার্য্যের ভিতর থাকিয়া এই দুঃখ-দুর্দ্দশা যতটুকু দূর করা সম্ভব তিনি তাহা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মন তাহাতে তৃপ্তি পায় নাই।

একদিন রবীন্দ্রনাথ বলিলেন শ্রীনিকেতনের কর্ম্ম পরিচালনার জন্য একজন ভালো লোক বড় সরকারী চাকুরি ছাড়িয়া আসিতে চায়। এই লোক যে সুকুমার চট্টোপাধ্যায় তাহা আমি অনুমান করিলাম। আত্মীয়-বন্ধুদের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া সুকুমার চলিয়া আসিলেন। টাকার অঙ্কের ক্ষতিটার হিসাব করিলেন না। অনেকে মনে করিল লোকটার মাথায় ছিট আছে। নিশ্চয়ই ছিট থাকিবারই কথা। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, বুদ্ধিমান লোকেরা সংসারকে চিরন্তন পথে লইয়া যায় মাত্র কিন্তু উঁচুতে তোলে ঐ ছিটগ্রস্ত লোকেরাই। সুকুমারবাবু শ্রীনিকেতনে যোগদান করিলেন। দীর্ঘ কয়েকবৎসর পর নানা কারণে তিনি ঐ কার্য্যভার ত্যাগ করিয়া আমাকে উহা গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি উহা গ্রহণ করিলাম।

কিন্তু গিয়া দেখি সুকুমার যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন আমার মত লোকের পক্ষে তাহা বজায় রাখা দুঃসাধ্য। ধনীর দুলাল সুকুমার, অনেক টাকার মালিক সুকুমার দেশের কাজ করিতে যাইয়া সম্পূর্ণ নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছেন। খাওয়া-দাওয়ায়, বেশ-ভূষায় গ্রামবাসীর সরল জীবনযাত্রা-প্রণালী সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এই সিদ্ধান্ত লইয়া কাজে নামিলেন যে, গ্রামবাসীদের সমপর্য্যায়ে না নামিলে তাহাদের সঙ্গে একত্র কাজ করা সম্ভব নয়। দেশসেবার এই উচ্চ আদর্শের নিকট আজ আবার আমার মস্তক অবনত করিতেছি।

কবির কথা অনুসরণ করিয়া বলি। আজ তোমার বাঁচিয়া থাকা উচিত ছিল। তোমাকে দেশের প্রয়োজন আছে।

হাল্‌কা পল্টনের আক্রমণ

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

সার্দ্ধ মাইল, সার্দ্ধ মাইল,
সার্দ্ধ মাইল সম্মুখে,
সবাই মৃত্যুর উপত্যকায়
ছুটল ছয়শ' ঘোড়সোয়ার।
"হাল্‌কা পল্টন, সামনে ধাও!"
কয় সে, "কামান সব পাকড়াও!"
মৃত্যুর উপত্যকার মধ্যে
ছুটল ছয়শ' ঘোড়সোয়ার।
"হালকা পল্টন, সামনে ধাও!"
কেউ কি ভয়ে সেথা চমকাও?
যদিও কোন জানে না সৈন্য।

কোন একজন করল ভুল!
উত্তর দেওয়া তাদের মানা,
কারণ কারুর হয় না জানা,
কেবল তাদের কর্‌না মর্‌ণা!
মৃত্যুর উপত্যকার মধ্যে
ছুটল ছয়শ' ঘোড়সোয়ার।

তাদের ডাইনে কামানগুলো,
তাদের বাঁয়ে কামানগুলো,
তাদের সামনে কামানগুলো
ছাড়ল গোলা বজ্রনাদে;
গোলা-গুলীর বইল ঝড়,
নির্ভয় তারা অশ্বের উপর,
মৃত্যুর মুখের মধ্যভাগে,
দোজগ মুখে অতঃপর
ছুটল ছয়শ' ঘোড়সোয়ার।

তাদের খোলা কৃপাণ ঝল্‌সায়,
হাওয়ায় ঝল্‌সায় যখন ঘুরায়,
গোলন্দাজদের কেটে তথায়
সৈন্যদেরকে হামলায়, যখন
বিশ্বসংসার স্তম্ভিত হয়।
কামানশ্রেণীর ধোঁয়ায় মগ্ন,
তারা ডান পাশ করল ভগ্ন,
কসাক্ এবং রুশদেশীরা
এলোমেলো কৃপাণ-ঘায়,
হ'ল চুরমার টুক্‌রো টুক্‌রো।
তারপর তারা ফিরল ঘোড়ায়,
ফিরল ছয়শ' ঘোড়সোয়ার।

তাদের ডাইনে কামানগুলো,
তাদের বাঁয়ে কামানগুলো,
তাদের পশ্চাৎ কামানগুলো
ছাড়ল গোলা বজ্রনাদে;
গোলা-গুলীর বইল ঝড়,
পড়ল ঘোড়া, বীর এর পর,
লড়ল যারা এতই সুন্দর
ফিরল মৃত্যুর মুখ থেকে,
দোজগ মুখাৎ ফিরল তারপর,
যা সব ছিল তাদের এর পরে,
ছিল ছয়শ' ঘোড়সোয়ার।

মুছবে তাদের আর কি গৌরব?
ওঃ, কী ভীষণ লড়ল ঐসব!
বিশ্বসংসার স্তম্ভিত হয়।
পা'ক মান তারা আক্রমণের।
হোক্ মান হাল্‌কা সেনাদের,
শ্রেষ্ঠ ছয়শ' ঘোড়সোয়ার!

* লর্ড টেনিসনের "The Charge of the Light Brigade অবলম্বনে।

দুরাশার মৃত্যু

শ্রীআশিস গুপ্ত

আমি ত জানতাম নিশ্চয়ই
তুমি অপেক্ষা করবে।
অপেক্ষা করবে
দিস্তে দিস্তে সাদা
আর সুন্দর কাগজের মত
ঐতিহাসিক আমার
সুন্দর টেবিলের উপরে।

মনে করেছিলাম
আগামী হাজার বছরের ইতিহাস
আমি লিখব
সেই কলংকহীন শুভ্র পাতাগুলিতে।
সে ইতিহাস হবে
আগামী দিনের অনেক সৌন্দর্য্যের
অনেক গানের
অনেক হৃদয়ের প্রাচুর্য্যের।

হায়!
এল এক দমকা হাওয়া
আত্মনিয়ন্ত্রণ
আর ইকনমিক্সের খোলা জানালা দিয়ে।
গোছা গোছা সুন্দর
আইভরী-ফিনিশ কাগজগুলো সব
ঐতিহাসিকের টেবিল ছেড়ে
ছড়িয়ে পড়ল
নোংরা রাস্তায়,
ডাষ্টবিনে
সারা শহরের পদদলিত অবহেলাতে।

তবু মনে ছিল অসীম উৎসাহ,
অসম্ভবকে সম্ভব করবার মত
মত্ত যুবক মন,
সংস্কারকের স্থৈর্য্য!

পচা ড্রেন হতে
ডাষ্টবিনের বিভীষিকাময় পরিবেশ হতে,
কর্দমাক্ত
হোসপাইপের জল দেওয়া রাস্তা থেকে
কুড়িয়ে কুড়িয়ে
জড়ো করলাম কাগজগুলিকে!

কিন্তু সব মিথ্যে হ'ল!
বুঝি নি ত,
আগে বুঝি নি ত!
মিথ্যে হ'ল তাই সব।
দেখলাম,
সেই সব সুন্দর সাদা কাগজ
বিচিত্র কুৎসিত দাগে বোঝাই
রাস্তার আর
ডাষ্টবিনের দাগ।
নতুন কিছু লেখবার
কিছু জায়গাও আর বাকী নেই।

আমার ইতিহাস লেখা আর হ'ল না।
আমার আর তোমার ইতিহাস
সে কি
অনন্তকালের জন্য থমকে দাঁড়াল?

কেন্দ্রীয় সরকার ও বেকার-সমস্যা

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

ভারতীয় অর্থনীতির অতীত ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, বেশীর ভাগ কাজ পল্লী অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। শুধু তাই নয়, এগুলো প্রধানতঃ কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। পল্লী-অঞ্চলে যাঁরা কুটিরশিল্প নিয়ে নিযুক্ত থাকতেন তাঁদের আবার আংশিকভাবে ক্ষেতের কাজ করতে দেখা গেছে এবং যেটুকু সময় অবশিষ্ট থাকত সেটুকু সময় হাতের কাজ করে এঁরা নিজেদের অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা করতেন। এ ছাড়া যাঁরা প্রধানতঃ কৃষিজীবী ছিলেন তাঁদের ভিতর থেকেও বহু লোক ঠিকা কাজ করে যতটা সম্ভব উপার্জ্জন করতেন। অবশ্য, যখন ক্ষেতের কাজ বন্ধ থাকত তখনই এঁদের ঠিকা কাজ করতে দেখা যেত। তবে ক্ষেতের কাজ বন্ধ থাকার সময়টাও নেহাৎ কম নয়। বছরে প্রায় ছয় মাস হবে, কিন্তু আজ এই ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে। এর কারণ হ'ল দুটো। প্রথমতঃ গ্রামীণ শিল্পের অবনতি ঘটেছে। দ্বিতীয় কারণ হ'ল কৃষির উপর চাপবৃদ্ধি। তাই অসংখ্য লোক গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে ছুটে আসছে এবং কলকারখানায় চাকুরির সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তা ছাড়া ভূমি-সংস্কারের জন্য যে সব প্রস্তাব করা হয়েছে সে সব প্রস্তাব যদি কার্য্যকরী করা হয় তাহলে ক্ষেতের কাজ আগের চাইতে আরও কমে যাবে। এজন্যই কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক গঠিত কর্ম্ম-সংস্থান কমিটি বলেছেন, মোট কাজের মধ্যে শতকরা পঞ্চান্নটির বেশী কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাখা যাবে না। কমিটির মতানুসারে অবশিষ্ট কাজগুলো শিল্প, ব্যবসা ইত্যাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবে। অর্থাৎ এগুলো হবে কৃষিবহির্ভূত। কিছুদিন ধরে সরকারের তরফ থেকে যে সব বিবৃতি প্রকাশিত হচ্ছে সে সব বিবৃতি বিশ্লেষণ করলে মনে হয়, সরকার কৃষির উপর নির্ভরশীলদের সংখ্যা হ্রাস করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। শোনা যাচ্ছে, আগামী ১৯৭৬ সনের মধ্যেই কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা সত্তর শতাংশ থেকে কমিয়ে পঞ্চান্ন শতাংশ করার সুপারিশ করা হয়েছে।

আগেকার হিসাবে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার গোড়ায় সত্তর লক্ষ লোকের কর্ম্ম-সংস্থানের বরাদ্দ ধরা হয়েছিল। অবশ্য, দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রারম্ভে সাড়ে পঞ্চান্ন লক্ষ লোকের চাকুরির হিসাব ধরা হয়েছিল। সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম তিন বছরে প্রতি বছর নাকি ত্রিশ লক্ষ লোকের কর্ম্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। সরকারী মুখপাত্ররা বলছেন, যদি পরিবর্ত্তিত হিসাব পঁয়ষট্টি লক্ষে পৌছতে হয় তাহলে বর্ত্তমান এবং আগামী বছরে দেশবাসীর পক্ষে বিশেষভাবে চেষ্টা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এছাড়া তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ যখন সুরু হয়ে যাবে তখন দেখা যাবে, হিসাব অনুযায়ী যত লোকের কর্ম্ম-সংস্থান বাকী থাকবে তার উপরও ১৯৬১ সন থেকে ১৯৬৬ সনের মধ্যে বহু নূতন লোক কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করার সুযোগ পেয়েছে। অনুমান করা হয়েছে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে কমপক্ষে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ লোকের কর্ম্ম-সংস্থানের প্রয়োজন হবে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগে সর্ব্বসাকুল্যে দু' কোটি দশ লক্ষ লোকের কর্ম্ম-সংস্থান একরকম অসম্ভব। শ্রীনন্দ বলেছেন, যেসব ব্যক্তিকে কর্ম্ম-সংস্থান প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে পরিকল্পনাধীন কাজে ও চাকুরির সুযোগ করে দেওয়া সম্ভব নয় সে সব ব্যক্তির জন্য উৎপাদনমূলক কর্ম্ম-সংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারিত করা কর্ত্তব্য।

গত বছর অক্টোবর মাসে কেন্দ্রীয় কর্ম্ম-সংস্থান কমিটি গঠন করা হয়েছে। যখন এই কমিটি গঠন করা হয়েছে, কিম্বা গঠন করার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল তখন আমাদের দেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থাঘটিত কয়েকটা বিশেষ প্রয়োজন-সিদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছিল। প্রথম থেকেই এই কমিটি এই মর্ম্মে অভিমত প্রকাশ করে আসছেন যে, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তৈরি করার সময় যথাসম্ভব অধিক কর্ম্ম-সংস্থানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা একান্ত দরকার। যখন দেখা যাবে, নানারকম পদ্ধতিতে উৎপাদন করা সম্ভব তখন এমন পদ্ধতি অবলম্বন করার জন্য কমিটি সুপারিশ করেছেন যার ফলে অধিকতর সংখ্যক লোকের কর্ম্ম-সংস্থান দরকার হবে। অবশ্য, যে কোন পদ্ধতিই অবলম্বিত হোক না কেন, স্থানীয় এবং আঞ্চলিক অবস্থার উপর সর্ব্বদা নজর রাখতে হবে। বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে যাতে কর্ম্মের সুযোগ বর্দ্ধিত হয় সেজন্য চেষ্টা করা দরকার।

যদি পল্লী-অঞ্চলগুলোতে শিল্পক্ষেত্র স্থাপিত হয় তাহলে ঐ সব অঞ্চলের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করা যেতে পারে। কেন্দ্রীয় কর্ম্ম-সংস্থান কমিটি এই মর্ম্মে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, যদি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা লোক সংগ্রহ করা না হয় তাহলে সরকারী চাকুরি এবং সরকার পরিচালিত শিল্প-সংস্থাগুলোতে কর্ম্ম-বিনিময় কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে বাধ্যতামূলকভাবে লোক সংগ্রহ করতে হবে। অবস্থা পর্য্যালোচনা করে কলকাতার 'দি ষ্টেটসম্যান' পত্রিকা মন্তব্য করেছেন

As Minister for Employment, Mr. Nanda, is understandably worried ; but he would be justified in telling his colleagues, in the cabinet and on the Planning Commission, that creation of employment is not his business at all. It is certainly beyond his means, for jobs can be created only by increased economic activity—the concern of other Ministries.

আমাদের দেশে এমন অনেক শিল্প আছে যেগুলো সম্পর্কে শিল্প উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আইন আজও সম্প্রসারিত হয় নি। কাজেই যাতে এই সব শিল্পের ক্ষেত্রে এই আইন সম্প্রসারিত হয় সেজন্য কোম্পানী আইনের পরিবর্ত্তন দরকার। তা ছাড়া কারবার গুটাবার মামলায় যাতে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার-গুলোর হস্তক্ষেপের অধিকার থাকে সেজন্যও কোম্পানী আইনের প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয়, কারণ তা না হলে উৎপাদন এবং কর্ম্ম-সংস্থানের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়ে যাবে। বর্ত্তমানে যে রকম কারবার গুটাবার সময় কেবলমাত্র কোম্পানীর সম্পত্তি ও দায়ের বিষয় বিবেচনা করা হয়ে থাকে, সে রকম বিবেচনা করা ঠিক নয়। কারবার গুটাবার সময় দেশের বৃহত্তর স্বার্থ এবং কর্ম্ম-সংস্থান সম্পর্কীয় অবস্থার কথা সকলের আগে বিবেচনা করতে হবে। ১৯৫৯ সনের ২৫শে মে তারিখে শ্রীগুলজারীলাল নন্দ কেন্দ্রীয় কর্ম্ম-সংস্থান কমিটির বৈঠকে ভাষণ দেবার সময় এই মর্ম্মে সুপারিশ করেছেন যে, প্রত্যেক শিল্পে এমন একটা বিশেষ তহবিল গঠন করা দরকার যেটার সাহায্যে কোন শিল্প-সংস্থা বন্ধ করে দেবার দরুণ যে সমস্যার উদ্ভব হয় সে সমস্যার প্রতিকার করা যেতে পারে এবং ছাঁটাই ও বেকারির ক্ষেত্রে দায়িত্ব বহন করা সহজ হবে। এ কথা অনস্বীকার্য্য যে, যদি কোন কারখানা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, কিম্বা বন্ধ হবার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে হয়, তা হলে এর প্রতিকারের জন্য খুব শীঘ্র ব্যবস্থা অবলম্বন করা একান্ত দরকার। তবে একটা পরিকল্পনা-বিন্যাস ছাড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর নয়। এমন অনেক সময় আসে যখন কোন শিল্প-সংস্থার দখল নিয়ে বিকল্প পরিচালক নিযুক্ত করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। যেহেতু আর্থিক সঙ্গতির অভাব রয়েছে অথবা আবশ্যকীয় লোকজন পাওয়া যাচ্ছে না সেহেতু পরিচালক নিয়োগ স্থগিত রাখা বাঞ্ছনীয় নয়। প্রথমেই যাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে সেজন্য শিল্প-সংস্থাগুলোতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা দরকার। কয়েকটা গৃহীত মান অনুযায়ী এজন্য মাঝে মাঝে খোঁজ-খবর নেওয়া উচিত।

বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, যখন কোন কারখানা বন্ধ হয়ে যায় তখন কারখানার কর্ম্মীরা অসহায় অবস্থার সম্মুখীন হন। এঁদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে যে অর্থ জমে সে অর্থের পরিমাণ সামান্য বললেই চলে। অথচ কারখানা বন্ধ হবার পর জীবনধারণের জন্য এঁরা এই সামান্য সঞ্চয়-টুকুও নিঃশেষ করতে বাধ্য হয়ে পড়েন। বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে, কোন কোন শিল্প-সংস্থা কর্ম্মীদের কিছুটা সময়ের মাহিনা দিতেও সক্ষম হন নি। অথচ এর প্রতিবিধানের জন্য এখনও পর্য্যন্ত কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর হয় নি। তাই বিশেষ তহবিল গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। যাতে কর্ম্মীদের আবার শিক্ষা দেওয়া এবং অন্য কাজে সরিয়ে নেওয়া সম্ভবপর হয় সেজন্য এই বিশেষ তহবিল কাজে লাগান যেতে পারে।

দিনের পর দিন যেভাবে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে তাতে বেকার-সমস্যা খুব জটিল আকার ধারণ করেছে। তাই শ্রীনন্দ শিক্ষিতের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সুপারিশ করেছেন, কারণ তিনি মনে করেন, যদি শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাধিক্য অব্যাহত থাকে তা হলে বেকার-সমস্যার সমাধানের পথ ক্রমশঃ কঠিন হয়ে উঠবে। যদিও একথা ঠিক যে, শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাধিক্য আমাদের দেশের বেকার-সমস্যার জটিল উপসর্গ ছাড়া আর কিছুই নয়, তথাপি শিক্ষিতের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার নীতি সমর্থনযোগ্য কি না ভালভাবে ভেবে দেখা দরকার। শ্রীনন্দ বলেছেন, কেবলমাত্র সে সব ছাত্রকে বিদ্যালয়, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাস করানো বাঞ্ছনীয় যাদের কর্ম্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর। শ্রীনন্দের এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলার আছে। তবে এক্ষেত্রে আমরা শুধু এইটুকু বলছি, বিগত কয়েক বছর ধরে সাধারণ মানুষের পক্ষে ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষা দেওয়া খুব কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর প্রধান কারণ হ'ল দুটো। প্রথম কারণ হচ্ছে, শিক্ষার ব্যয় খুব বেড়ে গেছে। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার সুযোগ সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে। সুতরাং সরকার যদি কর্ম্ম-সংস্থানের সুযোগ-সুবিধার কথা বিবেচনা করে শিক্ষালাভের

একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচা যায়

— তার কারণ এক অতিরিক্ত ফেনা

SUNLIGHT SOAP

Rs 10,000 Reward!

আদরের পুতুলের জন্য সুন্দর জামাকাপড়!

মিন্টু তার পুতুলের জন্য সর্ব্বদাই সুন্দর জামাকাপড় যোগাড় করে। মিন্টু তার দিদির জামা নেয়, ওর মার শাড়ী নেয়, আর তাছাড়া ওর নিজের জামাকাপড় তো আছেই। আর সব জামাকাপড় অল্প একটু সানলাইট দিয়ে কাচা—কিন্তু কি ধপধপে ফর্সা আর ঝক ঝকে রঙীন।

জামাকাপড় তোয়ালে আর চাদরগুলোর দিকে দেখুন। অত সব কাপড় কাচতে অল্পই একটু সানলাইট লেগেছে। সানলাইটের সরের মত প্রচুর ফেনায় অনেক কাপড় কাচা যায়, আর আছড়াবার দরকার হয়না। আপনার কাপড় কাচার জন্য সানলাইট সাবানই ব্যবহার করুন।

সানলাইটে জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে

S/P. 2-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্ত্তৃক প্রস্তুত

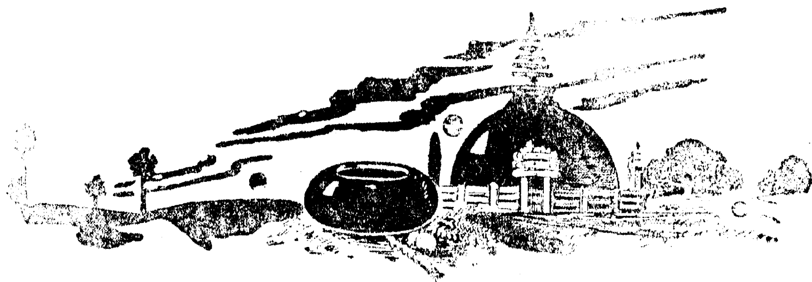
সুযোগ আরও সঙ্কুচিত করেন তা হলে বেশীর ভাগ গৃহস্থের পক্ষে ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষা দেওয়া বন্ধ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। এটা সত্যি দুঃখের কথা যে, যখন পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করার জন্য চেষ্টা চলছে তখন আমাদের দেশে শিক্ষার সুযোগ সঙ্কুচিত করার জন্য সরকারী মুখপাত্ররা সুপারিশ করছেন।

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গঠিত কর্ম্ম-সংস্থান কমিটি পল্লী-অঞ্চলের শিল্পায়নের উপর জোর দিয়েছেন। কমিটির মতানুযায়ী পল্লী-অঞ্চলের শিল্পায়নকে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নের অন্যতম মূলনীতি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এ ছাড়া কমিটি সর্ব্বাধিক সংখ্যক কর্ম্মের সুযোগ সৃষ্টি করার কর্ম্মসূচী গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করেছেন, কারণ তা হলে অধিকতর সংখ্যায় লোকের কর্ম্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা হবে। পল্লী-অঞ্চলের নেতৃত্ব শিক্ষিত ব্যক্তিদের হাতে থাকা বাঞ্ছনীয়, এ সম্বন্ধে কোনও দ্বিমত আছে বলে মনে হয় না। তবে নেতৃত্ব হাতে রাখতে হলে পল্লী-অঞ্চলে কাজ করতে হবে। কেন্দ্রীয় কর্ম্ম সংস্থান কমিটি ও পল্লী-অঞ্চলে শিক্ষিত ব্যক্তিদের কর্ম্মে নিযুক্ত রাখার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন।

'দি ষ্টেটসম্যান' পত্রিকা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলেছেন—

"Preoccupation with the problem of unemployment as such, although it is really the result of the economy's failure to expand in proportion to the growth in population, may well have been an effective hindrance in finding an answer to it. With the economy given the impetus it needs to expand, and with something done about population, the problem may well be brouget down to manageable proportions quicker than by undefined unorthodox ways."

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্প-ব্যবসা প্রসারের উদ্দেশ্যে নূতন নূতন কাজ সম্পূর্ণ করার জোর আয়োজন চলেছে। কাজ যতই সম্পূর্ণ হচ্ছে, লোকের কর্ম্ম-সংস্থানের সুযোগও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু পুরানো বেকার এবং নূতন কর্ম্মপ্রার্থীর জন্য যতটা পরিমাণ কাজের সংস্থান প্রয়োজনীয় ততটা পরিমাণ কাজের সংস্থান করা অসম্ভব। আমরা আগেও এ সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছি। কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীনন্দ বলেছেন, কেবলমাত্র গতানুগতিক ধারায় কর্ম্ম-সংস্থান-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের আশা নেই। তাঁর অভিমত হ'ল, যদি সমস্যার সমাধান করতে হয় তা হলে নূতন পথের সন্ধান করতে হবে। অবশ্য, নূতন পথ, এই কথাটির দ্বারা তিনি কি বুঝাতে চেয়েছেন সেটা সুস্পষ্ট নয়। তবে আমাদের মনে হচ্ছে, যদি কোন-রকমে স্বাধীনভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং শিল্পের মাধ্যমে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় যেটা লোকের কর্ম্ম-সংস্থানের উপযোগী, তা হলেও কিছুটা মঙ্গল সাধিত হবার আশা আছে। জনসাধারণ সাধারণতঃ মনে করেন, যদি কলকারখানায় কিম্বা দপ্তরে চাকুরির ব্যবস্থা করা হয় তা হলে বেকার-সমস্যার সমাধান হবে, ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে জনসাধারণ এইভাবে চিন্তা করে থাকেন, কারণ কেবল-মাত্র কলকারখানায় কিম্বা দপ্তরে চাকুরির ব্যবস্থা হলে বেকার সমস্যার সমাধান হবে না। পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, এইভাবে কখনও বেকার-সমস্যার সমাধান হয় নি। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে মোট কর্ম্মরত লোকবলের শতকরা পঁয়ষট্টি ভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং কারখানা চালাইয়া অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা করছেন। আমাদের দেশেও কর্ম্ম-সংস্থান-সমস্যার সমাধানের জন্য এইভাবে চেষ্টা করলে মন্দ হয় না। ফল ভালই হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।



ক্যাম্পে

শ্রীবিশ্বনাথ দাস
(আঁটপুর সর্বার্থ সাধক বিদ্যালয়)

রাত্রি সাড়ে তিনটায় লালগোলা প্যাসেঞ্জারে বেলডাঙ্গা ষ্টেশনে এসে, সঙ্গে সঙ্গেই শেষবারের মত পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে, ধস্তাধস্তি করে মাটির বুকে ফিরে এলাম। মুহূর্তের হৈ চৈ স্তব্ধ হয়ে গেল। বহুদূরে গাড়ীর লাল আলোটা ক্রমশঃ আঁধারে মিলিয়ে গেল। বাকি রাতটুকু কোনরকমে বসে-দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দেওয়া গেল। পূবের আকাশ রাঙ্গা করে, দূরের বনানী দীর্ণ করে ঘনকৃষ্ণ কেশদামের মধ্যে সিঁথির লাল টকটকে সিঁদুরের মত আবির্ভাব হ'ল সূর্যদেবের। দিকবালারা মেতে উঠল রঙের হোলি খেলায়। "ওঁ জবাকুসুমশঙ্কাশং..." মন্ত্র মনে মনে উচ্চারণ করে যুক্তকর কপালে স্পর্শ করলাম।

বেলা সাড়ে ছ'টা, ২২শে ডিসেম্বর '৫৯। আপন আপন জিনিসপত্র কাঁধে, মাথায়, বগলে চেপে একত্রিশ জনের লাইন এগিয়ে চলল ওভারব্রিজ পেরিয়ে। নূতন দেশ, অচেনা রাস্তা, মাঝে মাঝে থামতে হচ্ছে—অজগর যেন শিকারের পিছু নিয়েছে।

'গোবিন্দ সুন্দরী বিদ্যালয়'। একহাঁটু ধুলো পেরিয়ে ইঁটের প্রাচীরঘেরা, কালশিরে-পরা বিদ্যালয়-চত্বরে এসে পৌঁছলাম। সঙ্গে সঙ্গে অনুরূপ আর একটা অজগরও এসে হাজির হ'ল। চট করে মাঠে একটা পাক দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না। উত্তর ও দক্ষিণে দুটি ছোট ছোট সিঁড়ি এবং তিন দিকে ছোট ছোট সাধারণ ফুলের বাগান। উত্তরদিকে সারি সারি আমগাছ দিয়ে সাজান একটি সুন্দর আমবাগান। সামনেই প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের বাসা। পূবদিকে একটি ছোট ও একটি বড় জলাশয় আগাছাপূর্ণ। তারই কোণ ঘেঁষে বোর্ডিং বাড়ী। দক্ষিণদিকের এক কোণে সর্বার্থসাধক ব্লক তৈরী হচ্ছে—সবেমাত্র নেড়ামাথা। এখানকার বালি খুব সাদা—ময়দায় ভেজাল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

দোতলার এক কোণের দিকে ঘর পেলাম। শিক্ষকদের পৃথক ঘর হলেও আমি ছেলেদের কাছেই রইলাম। প্রথম দিনটি সাধারণভাবে ঘুরে ফিরেই কাটল। রাত্রি পর্যন্ত অন্যান্য দল আসতে লাগল। আমরা সর্বসমেত প্রায় সতেরটা শিক্ষায়তন থেকে এখানে মিলিত হলাম। এই দারুণ শীতে কারও কারও বেশ কষ্ট হয়েছিল।

রাত্রিশেষে পুরাতন সূর্য নব আবর্তনে নূতনরূপে দেখা দিল। সুরু হ'ল আমাদের অভিযান। প্রায় এক মাইল দূরে "হরেক নগর রোড" তৈরী করার ভার পড়ল আমাদের উপর। চা পানান্তে প্রায় সাতটায় আরম্ভ হ'ল খোঁড়া, কোদাল, হাতলের ছুড়োছুড়ি। প্রায় বেশীর ভাগই ছোট ছোট ছেলে। সে কি উৎসাহ তাদের! কার রাস্তা ভাল হবে! মেজর চক্রবর্তী, ক্যাপ্টেন সিনহা, ক্যাম্পের কমাণ্ডার ও ডেপুটি কমাণ্ডার মাঝে মাঝে এসে পিঠ চাপড়ে ছেলেদের উৎসাহ বৃদ্ধি করলেন। ক্ষণিকের বিশ্রাম, আবার কাজ। দশটায় টিফিন, সাড়ে বারটায় ছুটি, সারি দিয়ে ক্যাম্পে ফিরে আসা, একতালে রাস্তা চলা—এ যেন এক নূতন ব্যাপার। পথের দু'ধারে লোকেরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকত এই ক্ষুদে পল্টনদের দিকে, কারণ সকলের একই রকমের খাকি পোশাক। ক্যাম্পে ফিরে কাক-স্নান, তার পর লাইন দিয়ে খাবার নেওয়া, অনভ্যস্ত হাতে থালা ধোওয়া—সে এক উপ-ভোগ্য ব্যাপার। বৈকালে চা পানান্তে খেলাধূলা—বল, ভলি, ব্যাডমিণ্টন প্রভৃতি। সন্ধ্যায় 'রোল-কল', 'জাতীয় সঙ্গীত'। পরে ছেলেদের খাবার ও আমাদের মিটিং মেজর চক্রবর্তীর সঙ্গে। কয়টা দিনের মোটামুটি ধারা ছিল এইরূপ।

একদিন স্থানীয় প্রেক্ষাগৃহে 'টিপু সুলতান' দেখিয়ে আমাদের সম্বর্দ্ধনা জানান হ'ল। পরদিন দুপুরে মেজরের অনুমতিক্রমে মুর্শিদাবাদে প্রাচীন নবাবী কীর্তি অবলোকন করার একটা সুযোগ এল। প্রায় দুই শতাব্দীর পূর্বের এই স্থান আজ প্রায় নির্জন। তোরণে তোরণে বাজে না নহবৎ সকাল সাঁঝে; মোল্লারা পড়েন না কোরাণ মসজিদে মসজিদে; হাজার দুয়ারী, ইমামবারা, হারেমখানা নির্বাক সাক্ষী নবাবী বিলাসের। অস্ত্রাগার জানায় তাঁদের শৌর্য; আসবাবের চাকচিক্য, বিরাট ঝাড়লণ্ঠন, পাঠাগারের উন্মুক্ত দ্বার আজিও জানায় কারে স্বাগত সম্ভাষণ! বন্দীরা গাহে না গান, পাখীরা মিলায় না তান। সবই যেন খাপছাড়া, বেমানান। নবাব সিরাজের অতৃপ্ত আত্মা যেন আজও ঘুরে বেড়ায় দ্রব্যসম্ভারের আনাচে-কানাচে; মতিঝিল, হীরা-ঝিলের তরঙ্গে তাঁর কণ্ঠস্বর ভেসে বেড়ায় শীর্ণকায়া পুণ্য-সলিলা মন্দাকিনীর কুলুকুলু তান—"দাদু সাহেব, দাদু সাহেব...!" আ[illegible]দের ভয় [illegible]চার করতে থাকে

ব্যঙ্গ। পথের লাল কাঁকর ও ধূলি নীরবে জানায়—"নাই নাই, নাই সে পথিক নাই।" কীর্তি অবিনশ্বর, Once for all, জানায় সে "ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।" চোখের দেখা শেষ, মনের মধ্যে কত কথার আনাগোনা, কত পাপপুণ্যের স্পর্শ পাওয়া বাংলার প্রাচীন রাজধানীর মাটি ছেড়ে সেদিন সন্ধ্যায় ফিরে এলাম ক্যাম্পে।

"দিন যায়, আসে নিশা ; যায় নিশা, আসে দিন" গড়িয়ে গড়িয়ে কেটে যায় দিনের পর দিন। হঠাৎ শুনি, কাল Camp fire, ঘরে ঘরে ছেলেদের মধ্যে উদ্দীপনার ঝড় উঠেছে। হারমনিয়াম, তবলা, মাউথ-অর্গান, নাচগান কত না আনন্দ, কত না প্রস্তুতি।

শেষের দিন—Camp fire day, আজ যেন ছুটির দিন ; মনের কোণে স্বজন মিলনের সুখানুভূতি আবার বিদায়েরও বিষণ্ণতা—একটা complex। প্রভাতে সামান্য বাকি কাজ শেষ করে গ্রামবাসীদের স্নেহে সকলে মিষ্টিমুখে আপ্যায়িত হলাম। এখানকার 'মনোহরা' বিখ্যাত। বহরমপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মিঃ দত্ত নবনির্মিত রাস্তাটির উদ্বোধন করে এই সামাজিক কাজের প্রয়োজনীতা সম্বন্ধে সতর্ক করে দিলেন। গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে তোরণে মালায় পথটি সুশোভিত করা হয়েছিল। মুসলমানপ্রধান এই গ্রামটি ঘুরে 'হিন্দুস্থান-পাকিস্থান' ভাবটা একান্ত অবাস্তব বলে মনে হ'ল। গ্রামের ডাক্তার সাহেব, প্রেসিডেন্ট, শিক্ষক মহাশয় ও অন্যান্য ভদ্রমহোদয় অশ্রুসিক্ত হয়ে আমাদের বিদায় জানালেন। আমাদের স্মৃতিকে তাঁদের মধ্যে জাগরূক রাখার জন্য আমাদেরকে "ক্যামেরায়িত" করলেন। আর তারই কিছু কিছু তাঁদের স্মৃতিরূপে আমাদের পরিবেশন করলেন। এ মিলন ও বিরহ-স্মৃতি বড়ই মধুর—অব্যক্ত, শুধু প্রণিধান-যোগ্য।

মাঠে বৈদ্যুতিক আলোকে দূর্বাদলশ্যাম বক্ষে সুরু হ'ল আমাদের বিদায়-বিধুর মিলন উৎসব। 'ক্যাম্প ফায়ার' জ্বলে উঠল। সহৃদয় মেজর চক্রবর্তীর আন্তরিকতাপূর্ণ উপদেশ ছুটে গেল সকলের কানে কানে, মনে মনে। পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় 'চরিত্র'—একথা পরিষ্কার ভাষায় জানালেন তিনি। মনে পড়ল, সকল শিক্ষক ধূমপান না করলেও ১৪ বছরের ছেলেদের সাদাকাঠি ছাড়া চলে না। এ বড় লজ্জার ব্যাপার—ছাত্রসমাজের কলঙ্কস্বরূপ। জানি না, এতে তাদের কি কৃতিত্বের পরিচয় লুক্কায়িত আছে। বিদায়-ব্যথায় মিলিটারী মানুষ মেজরেরও কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে উঠল। সুরু হ'ল ছেলেদের নাচ, গান, আবৃত্তি, কমিক। আমার ছাত্ররা ক্যাম্প জীবনের অভিজ্ঞতা 'ক্যাম্প লাইফ' গেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করল। দুটি মাত্র পুরস্কার বিতরণ করা হ'ল—রাস্তার কাজে ও অনুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠতায়, আমাদের ছাত্রেরা দ্বিতীয় পুরস্কারটি লাভ করার গৌরব অর্জন করল। 'বড় খানা'য় মাছ, মাংস, মিষ্টান্নের ঘটল প্রাচুর্য। প্রায় সারারাত্রি চলল, 'লয়ে রসারসি করি কষাকষি পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধা।'

৩১শে ডিসেম্বর। বর্ষ বিদায়ে আমাদেরও বিদায়ের পালা। শীতের ঝরাপাতার মত এক-একটা দল হতে লাগল বৃন্তচ্যুত। মেজর চক্রবর্তী শেষ বিদায় জানাতে এলেন আমাদের ঘরে। ছেলেদের স্মরণ করিয়ে দিলেন তাঁর পূর্ব দিনের কথাগুলি ; জানালেন শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ। আমরা হলাম ধন্য, বিস্ময়ে হতবাক্। উচ্চ গুণসম্পন্ন ব্যক্তির ব্যবহারই এত মধুর, এত অতলস্পর্শী। দু'একটি অশ্রুবিন্দু মনের অজ্ঞাতে টলমল করে উঠল চোখের কোণে। মেজর চক্রবর্তীর নির্দেশে গরম হালুয়া, পুরী, রসগোল্লা হ'ল আমাদের বাস্তব পাথেয়। গেট পর্যন্ত এলেন তিনি এগিয়ে দিতে। 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'—

আবার এক হাঁটু ধূলা, সেই অজগর-শিকার শেষে ফিরে যাওয়া, মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাকান। নিস্প্রাণ বিদ্যায়তনটিকে ছেড়ে যেতে অন্তরের কতই না ব্যাকুলতা, কতই না মমতা। 'adieu adieu', বিদায়, বিদায়, অয়ি! জননী মনোমুগ্ধকারিণী!'

পথের বাঁকে পিছনে ফেলে আসি তাকে...।

বিস্মৃতপ্রায় উপজাতি বোডো

শ্রীভারতজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

সে অনেককাল আগেকার কথা। আর্য্যরা তখনও ভারতবর্ষে তাদের বিজয় অভিযান আরম্ভ করে নি। সেই সুপ্রাচীন কালেও এদেশে কয়েকটি জাতিগোষ্ঠীর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। নৃতাত্ত্বিকেরা ঐ সমস্ত জাতিগোষ্ঠীগুলিকেই মনে করেন ভারতের আদিম অধিবাসী। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এই জাতিগুলিকেই আবার কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়েছে যেমন, অষ্ট্রিক্, নিগ্রোয়াইড প্রভৃতি। অষ্ট্রিক এবং নিগ্রোয়াইডগোষ্ঠীর পরে এদেশে বসবাসকারী যে জাতিটির প্রমাণ পাওয়া যায়, তাদেরকে বলা হয় বোডোগোষ্ঠী। এদেশে অনুপ্রবেশ করবার আগে তারা যে অঞ্চলে বসবাস করত তাদের ভাষায় তার নাম হ'ল "বোডা"। নৃতাত্ত্বিকেরা তাই এই নবাগতদের নামকরণ করেছেন বোডা উপজাতি।

ভারতে প্রবেশ করবার আগে বোডোদের আদি বাসভূমি সম্ভবতঃ এখনকার গোবি মরুভূমির কাছাকাছি কোনও জায়গায় ছিল। আসামে একটি উপকথা প্রচলিত আছে কয়েকটি আদিবাসীগোষ্ঠীর মধ্যে যে তাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বাস করত "ডিলাউব্রা" আর "চাংগীবা" বলে দুটি নদীর মধ্যবর্ত্তী কোনও এক দেশে। কোন কারণবশতঃ নদীদুটি গেল একেবারে শুকিয়ে আর জলের অভাবে গাছপালা সব মরে দেশটি একেবারে মরুভূমিতে পরিণত হ'ল। বাধ্য হয়ে তারা তখন বাস্তুভিটা ত্যাগ করে আরও পূর্ব্বদিকের পাহাড়িয়া দেশে এসে বসবাস আরম্ভ করে দিল। যাদের মধ্যে এই কাহিনী প্রচলিত সেই খাসি, জয়ন্তি প্রভৃতি উপজাতিগুলিকে অনেকে বোডোজাতির বংশধর বলে মনে করেন। তাই কোনও কোনও নৃতাত্ত্বিকের ধারণা, বোডোদের ভারত আগমনের সঙ্গে এই কাহিনীর কোনও যোগ আছে। ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলের কয়েকটি জায়গার নামের শেষে দেখা যায় "বোড" এই কথাটির ব্যবহার রয়েছে। যেমন—হোর-বোড, কুর-বোড ইত্যাদি। নামের শেষে "বোড" কথার ব্যবহার বোডোদের মধ্যেও দেখা যায়। তাই এই বিশেষ শব্দের বহুল ব্যবহার দেখে মনে হয়, ঐ অঞ্চলগুলিতেই বোডোরা প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। বহুকাল পরে বোডোদের মধ্যে অনেকে তাদের আদিম ধর্ম্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। তখন এই নববৌদ্ধদেরকে বোডোরা বলতে লাগল বিষ্টি বোড। বিষ্টি মানে হ'ল লামা। তাই পরে বিষ্টি বোড বলতে লামা বসবাসকারী দেশকে বুঝাতে লাগল।

সমসাময়িক অন্যান্য আদিবাসীদের তুলনায় বোডোরা কিছু উন্নত ছিল। কারণ তাদের মধ্যে সুতী ও রেশম বস্ত্রের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। মনে হয় ভারতে আসবার আগেই সেই সময়কার অন্যান্য সুসভ্য জাতির সংস্পর্শে এসে তারা বয়নশিল্পে পারদর্শিতা লাভ করে। এছাড়া তাদের দু'একটি উপাস্য দেবতার সঙ্গেও মিশর ব্যাবিলোনিয়ার দেবতাদের বেশ সাদৃশ্য চোখে পড়ে। বোডোদের মধ্যে সর্পপূজা প্রচলিত ছিল। তাদের ভাষায় সর্পদেবের নাম ছিল দুটি যেমন "সি-বু" আর "বতু-বুয়া"। এই "সি-বু" বা "বতু-বুয়া"-র সম্মান ছিল সবচাইতে বেশী। গ্রামের মধ্যে খুব উঁচু গাছের গোড়ায় বেদী করে তার উপর "বতু-বুয়া"-র মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা করে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে রাত্রিবেলায় পূজা হ'ত। বতু-বুয়ার এক মূর্ত্তি সম্প্রতি পাওয়া গিয়েছে। এই মূর্ত্তিটির আকৃতির সঙ্গে মিশরদেশে প্রচলিত সর্পদেবতা "বী"-র অদ্ভুত সাদৃশ্য চোখে পড়ে। তাই মনে হয় বোডোরা মিশরীদের সংশ্রবে এসেছিল। অবশ্য অন্যান্য উপজাতিদের মতন বোডোদের ধর্ম্মও ছিল মূলতঃ কৃষিপ্রধান। দেখা যায়, তারাও শস্য-উৎপাদনকারী অরণ্যদেবকে পূজা করছে অত্যন্ত ভক্তিভরে। হুয়েন সাং-এর বিবরণীতেও তাদের বৃক্ষপূজার কথা লিখিত আছে। এ সম্পর্কে তিনি আরও লিখেছেন যে, এরা অর্থাৎ বোডোরা একখণ্ড উজ্জ্বল বস্ত্রের দ্বারা বৃক্ষের কাণ্ড আবৃত করে।" এই বস্ত্রকে বলা হ'ত "হালালী"। এই হালালী দিয়ে তারা জামা-কাপড়ও তৈয়ারি করত। কিছুদিন আগে অবধি আসামের কয়েকটি উপজাতি রেশমী কাপড়কে বলত "হা-লা-লী"। তাই মনে হয় বোডোরা হালালী বলতে রেশমকেই বুঝাত। তাদের ধর্ম্ম আর কৃষ্টি সম্পর্কে এর বেশী আর কিছু জানা যায় না।

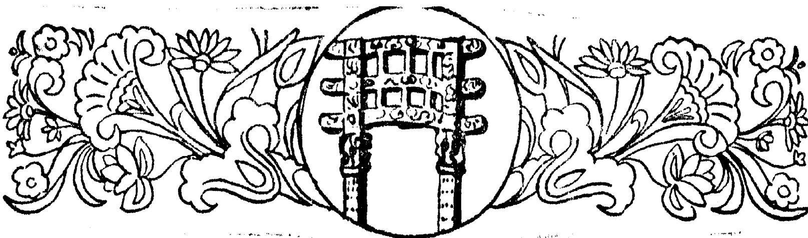
আসামের পার্ব্বত্যঅঞ্চল পেরিয়ে তারা ভারতে বসতি স্থাপন করেছিল একথা আগেই বলা হয়েছে। কতকাল আগে তাদের বসবাস আরম্ভ হয়েছিল একথার জবাব কিন্তু এখনও মেলে নি। এদেশে প্রবেশের পর তাদেরকে যে

দেশীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় তা বলাই বাহুল্য। যুদ্ধ করতে হলেও মনে হয় এ অবস্থা বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। কারণ দেখা যায়, খুব অল্পদিনের মধ্যেই স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে তারা বেশ সদ্ভাবেই বসবাস করছে। এই মিলনের ফলে বোড়োদের আচার-ব্যবহারেরও বেশ পরিবর্ত্তন দেখা দিল। স্থানীয় অধিবাসীদের দেবতা কামাখ্যা দেবী তাদেরও অন্যতম উপাস্য দেবতা হয়ে পড়লেন। আর তাদের সর্প-দেবতাও কামাখ্যা দেবীর মন্দিরে একই সঙ্গে পূজা পাচ্ছেন স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের কাছ থেকে। এই সময়ে কামাখ্যা দেবীর নামের কিছু পরিবর্ত্তন চোখে পড়ে। দেবীর নাম হয়েছে "উমালুডা-উমালুডা"। কথার যে কি মানে তা এখন আর কেউ জানে না। অনেকে বলেন "উমালুডা" কথা থেকেই উমানন্দ পর্ব্বতের নামকরণ হয়েছে। এ ছাড়া আরও এক নতুন দেবীর পরিচয় এই সময়ে পাওয়া যায়, তার নাম হ'ল "কা-মেই-ক্রিয়"। নামের সাদৃশ্য দেখে মনে হয় এখনকার কামরূপের কাছাকাছিই এই দেবীর কোনও মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। যাক সে কথা, আসামে বোড়োদের উপনিবেশ স্থাপন নানাকারণেই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে এসে কয়েকটি নগরের তারা পত্তন করে। তাদের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি নগরের চিহ্ন এখনও চোখে পড়ে। কোনওটি তাদেরই দেওয়া নামে অথবা একটু-আধটু পরিবর্ত্তিত হয়ে। শুধু তাই নয়, আসামের কয়েকটি অঞ্চল তাদের দেওয়া নামেই এখনও অবধি নিজেদের পরিচয় বহন করছে। হাফলং, জাপলং, রঙ্গারং প্রভৃতি জনপদগুলি সেই সুপ্রাচীন বোড়ো উপনিবেশের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। অনেকের মতে এখনকার ত্রিপুরা রাজ্যও বোড়োদের অন্যতম কীর্ত্তি।

আসামে উপনিবেশ স্থাপনের পর সম্ভবতঃ বোড়োরা উত্তর বাংলায় বসতি স্থাপন করে। রংপুর-দিনাজপুর প্রভৃতি জেলাগুলিতে যে সমস্ত আদিবাসী দেখা যায় তাদের আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম-কর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষ্য করলে মনে হয় এদের সঙ্গে বাড়োদের কোনও-না-কোনও মিল ছিল। তাইতে মনে হয় উত্তর বাংলার বোড়োরা ঐ জেলাগুলিতেই তাদের বসতি স্থাপন করে, আর জেলার আদিবাসীরা সম্ভবতঃ বোড়োদেরই বংশধর। এর বেশী অবশ্য বাংলা দেশে বোড়োদের অবস্থানের আর কোনও চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় না।

উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে বোড়োদের অস্তিত্বের চিহ্ন আজ যদিও কিছু দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে তাদের কোনও পরিচয়ই আজ আর অবশিষ্ট নেই। মহাকাব্যে উল্লিখিত হিড়িম্বার কাহিনীকে অনেকে বোড়োদের সঙ্গে আর্য্যদের সংঘর্ষের কাহিনী বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা করে-ছিলেন। কিন্তু অনেকেই এ বিষয়ে একমত হতে পারেন নি। পশ্চিম ভারতে একমাত্র পরিচয় যা মেলে তা হচ্ছে খ্রীঃ পূঃ প্রায় পনের শতকে বোড়োদের এক শাখা উত্তর প্রদেশের তরাই অঞ্চলে বসবাস আরম্ভ করে। এদেরই কোন দলপতি-কন্যার সঙ্গে চন্দ্রবংশের এক রাজকুমারের বিয়ে হয়। মনোমালিন্যের জন্যে অল্পদিনেই তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়। আর বোড়োকন্যা মনোদুঃখে পূর্ব্ব ভারতের দিকে চলে যায়, কিন্তু চন্দ্রবংশের কোন রাজকুমারের সঙ্গে বিয়ে হয় তা এখনও ঠিক হয় নি। এ ছাড়া উত্তর-পশ্চিম ভারতে বোড়োদের অস্তিত্বের অন্য কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না।

বোড়োদের আধিপত্য কবে যে লোপ পায় তা অবশ্য বলবার কোনও উপায় নেই। মনে হয় অন্যান্য আদিবাসী-গোষ্ঠীদের মতই তারাও আর্য্যদের কাছে সম্পূর্ণ পরাজিত হয় অথবা আত্মসমর্পণ করে। ধীরে ধীরে আর্য্যদের আচার-ব্যবহার গ্রহণ করে তারা এই সমাজে এমনভাবে মিশে যায় যে, তাদের ব্যক্তিগত সত্তার চিহ্নও আর অবশিষ্ট থাকে না। জাতি হিসাবে তারা লোপ পেলেও তারা কিন্তু এখনও বেঁচে আছে—আমাদের মধ্যে, আমাদের পূজা-পার্ব্বণের মধ্যে, আর কয়েকটি নগরে তাদের দেওয়া নামের মধ্যে। বলা বাহুল্য আমাদের একান্ত অজান্তেই।



পুস্তক-পরিচয়

আধুনিক ভারতের গল্প সঞ্চয়ন—অনুবাদক শ্রীবি. বিশ্বনাথম। প্রকাশক শ্রীনিরঞ্জন বসু, ১৭, বেণিয়াটোলা লেন, কলিকাতা—৯। দ্বিতীয় সংস্করণ। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০১; মূল্য দু' টাকা

গ্রন্থখানি চৌদ্দটি ছোট গল্প নিয়ে রচিত। তেরটি গল্প ভারতের তেরটি রাজ্যের ভাষা ও একটি নেপালী ভাষা থেকে বাঙলায় অনূদিত। নেপাল পৃথক স্বাধীন রাজ্য। এ কারণ গল্পটিকে ভারতের গল্প বলা যায় না। তবে নেপালের সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির মিল বিস্তর।

গল্পগুলি পাঠে এ কথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে, ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও লেখকগণ একই দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে দর্শন করেছেন, গল্পগুলির উপজীব্যের অন্তর্নিহিত সুরেও মিল আছে। আমাদের বাংলার এক শ্রেণীর লেখকও গল্প রচনায় এইরূপ বাস্তব পথাবলম্বী। কাজেই এ দিক দিয়ে বাংলাও বিচ্ছিন্ন নয়।

ছোট গল্পের পাঠকের সংখ্যা সকল দেশেই প্রচুর যদিও উপন্যাসের মত ছোট গল্পের সঞ্চয়ন গ্রন্থের কাটতি বেশি হয় না। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থখানির একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় গ্রন্থখানির জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। এর প্রধান কারণ গল্পগুলির রসোত্তীর্ণতা 'এক বিঘৎ জমি আর একটি কুঁড়ে ঘর', 'চোর', 'সৈনিক', 'আবার পকেট কাটা গেল'—নামক গল্প কয়টি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। যে কোন দেশের সাহিত্যের সম্পদ হবার মত গুণ এগুলিতে বিদ্যমান।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

জলপিপি—শ্রীঅতুলচন্দ্র মেইকাপ। প্রকাশক: শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন। ৩৭, মতিশীল স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২.৫০ নঃপঃ।

লেখকের কবি-অনুভূতি আছে। প্রকাশ-নৈপুণ্যও অনেক স্থলে প্রশংসনীয়, তবে সর্বত্র নয়। ছন্দের প্রচলিত নিয়ম তিনি কোথাও কোথাও স্বেচ্ছায় লঙ্ঘন করেছেন—'সাবলীলতা' বজায় রাখবার জন্য। দু'এক স্থানে—যেমন 'স্যর আশুতোষের' প্রথম দিকে—'সাবলীলতা' থাকলেও, মনে হ'ল, একটু অশোভন লঘুতা এসে গিয়েছে। পল্লীর কতকগুলি দৃশ্য ও ভাব সুন্দর হয়ে ফুটেছে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সাগ্নিক—শ্রীরমেশচন্দ্র সেন। ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৩.৫০ নঃ পঃ।

পরাধীন ভারতের মুক্তি-কামনায় একদা বাংলার তরুণ-তরুণীরা যে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মরণ পণ করিয়াছিল, সেই বিপ্লব-যুগের একটি খণ্ড-চিত্র এই উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে। ইংরেজ শাসনের যাঁতাকলে কি ভাবে বিপ্লবীরা নিষ্পেষিত হইয়াছিল, কি অমানুষিক অত্যাচার তাহারা চালাইয়াছিল, লেখকের বর্ণনা-কৌশলে তাহা জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। কয়েকটি চরিত্রের নিখুঁত-চিত্রণে মনে হইয়াছে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। 'সাগ্নিক' ইতিহাস না হইয়াও, ইহা ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে এই কারণে।

সুমিত্রা ও শুভাশিস দুটি প্রধান চরিত্র। বিপ্লবের মধ্য দিয়াই ইহারা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। প্রেম ইঁহাদের নীচে নামায় নাই, বরং ত্যাগের মধ্য দিয়াই ইহারা সার্থক হইয়াছে। আর একটি মেয়ে শান্তা। সেও শুভাশিসকে ভালবাসিত। তাহার প্রেমে ঈর্ষা ছিল। কিন্তু সে ঈর্ষাও একদিন এই আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। শান্তার সে-চরিত্রের পরিচয় পাইয়া সুমিত্রারও ভুল ভাঙিল।

একজন বিপ্লবীর মা হইতে হইলে, কিরূপ হইতে হয় তাহা শুভাশিসের মা 'দিনমণি' আমাদের দেখাইয়া দিলেন। মা বড় না হইলে সন্তান বড় হয় না। বিপ্লব-যুগে এরূপ 'মা'-ই ঘরে ঘরে জন্মিয়াছিলেন। উপন্যাস হিসাবে ইহার মূল্য যাহাই হোক না কেন, উপন্যাসের মাধ্যমে একটা যুগকে প্রত্যক্ষ করিলাম, সাগ্নিকের সার্থকতা এইখানেই। লেখকের ভাষা বলিষ্ঠ, কোথাও জড়তা নাই—চরিত্র-চিত্রণে তাঁহার নিপুণতা প্রকাশ পাইয়াছে। পাকা হাতে পড়ায়, ইহা কতকগুলি অবান্তর ঘটনার জাল বিস্তার করিবার অবকাশ পায় নাই। সেইজন্যই ইহা উপন্যাসের মর্য্যাদাও লাভ করিয়াছে। গ্রন্থখানি সাধারণের সমাদর লাভ করিবে বলিয়া বিশ্বাস।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার—শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, ৯নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

বিজ্ঞান-সাধক-চরিত-মালার ইহা তৃতীয় গ্রন্থ। জীবনী-গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যই হইল সেই মানুষটিকে পরবর্ত্তীকালের মানুষের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া। অর্থাৎ একটি কালকে অপর কাল পর্য্যন্ত ধরিয়া রাখা। এই সংরক্ষণের অভাবেই আমরা বহু মহাপুরুষের নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইতে বসিয়াছি। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী 'বিজ্ঞান-সাধক-চরিত-মালা'র এই সিরিজগুলি বাহির করিয়া দেশের কল্যাণ করিতেছেন।

আলোচ্য জীবনীটি ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের। মহেন্দ্রলাল ছিলেন সেকালের প্রসিদ্ধ ডাক্তার। প্রভূত যশ ও অর্থের অধিকারী হইয়াও তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ব্রতী হইয়াছিলেন, এ কাহিনী কাহারও অবিদিত নয়। কিন্তু কেন তাঁহার এই মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, কেনই বা ইহাকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই ব্রত গ্রহণ করিতে তাঁহাকে কিভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে হইয়াছিল ও কি দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়া তাঁহাকে কিছু সময় অতিক্রম করিতে হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় লেখক এই গ্রন্থে দিয়াছেন।

ভারতবর্ষে তখন নূতন চিকিৎসা হিসাবে হোমিওপ্যাথিক সবেমাত্র প্রবেশ করিয়াছে। সুতরাং ইহাকে সু-প্রতিষ্ঠিত করিতে মহেন্দ্রলালকে সারাজীবন কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। সহস্র বাধাও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। কারণ তিনি যাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তাহা কোন কারণেই মিথ্যা হইতে পারে না। এমনি ছিল তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা। এই দৃঢ়তার বলেই, তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে পুত্রকে আদেশ করিয়াছিলেন, কোন কারণেই যেন তাঁহার জীবনের জন্য এলোপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ করা না হয়। এত বড় আত্মবিশ্বাস জগতে দুর্লভ। এই আত্মবিশ্বাস ছিল বলিয়াই তিনি অত বড় হইতে পারিয়াছিলেন। এইরূপ চরিত্রের সহিত পরিচিত হইতে পাইয়া আজকালকার ছেলেমেয়েরা উপকৃত হইবে। লেখকের ভাষা সরল এবং সংক্ষেপিত হইলেও ইহা তথ্যবহুল। এরূপ গ্রন্থের প্রচার যত হয় ততই মঙ্গল।

সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি—শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, শান্তি-লাইব্রেরী, ১০-বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মূল্য ৩·২৫।

প্রবন্ধ-লিখিয়ে হিসাবে শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরীর খ্যাতি আছে। তাঁহার লেখার বৈশিষ্ট্যই হইল, বক্তব্য বিষয়কে দৃঢ়তার সহিত প্রতিষ্ঠিত করা। এ সাহস সকলের থাকে না। অথচ প্রবন্ধ রচনায় এ গুণ না থাকিলে চলে না। সেইজন্যই অধিকাংশ আলোচনা হয় পক্ষপাত-দুষ্ট অথবা আক্রমণাত্মক। সমালোচনা ঠিক এই কারণেই খুব কঠিন কার্য্য। বক্তার মতই এখানে নির্ভীক হইতে হইবে, তবেই লোকে কথা শুনিবে। এরূপ সমালোচক আজকের দিনে বড় একটা নাই। পূর্ব্বে ছিলেন, সুরেশ সমাজপতি এবং কাব্যবিশারদ মহাশয়। সাহিত্যে অনাচার এই জন্যই তখনকার দিনে সম্ভব ছিল না। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে সেই অনাচারের কথাই বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। যে অনাচার আজ সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে নিয়ত আঘাত করিতেছে। এগারটি প্রবন্ধে এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ। প্রত্যেকটি প্রবন্ধই সাহিত্য-বিষয়ক। সমালোচক হইয়াও তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—"সাহিত্য থেকে জীবনকে আমরা বর্জ্জন করেছি। আমাদের পক্ষে সাহিত্য যদি জীবনের সাধনা হ'ত, শিল্প আর জীবনের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের বোধ যদি আমাদের মনে স্পষ্ট হ'ত, তাঁহলে সাহিত্যকে কখনই পর্য্যবেক্ষণের ফলাফলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে আমরা তৃপ্ত থাকতাম না, পর্য্যবেক্ষণের সঙ্গে মননেরও যুগপৎ চর্চ্চা করতাম, কাহিনীর রসের উপর এবং কাহিনীর রসের থেকে কিছু বেশী—জীবন-রহস্যের অনুভূতি পরিবেশনেও সমান সচেষ্ট থাকতাম। দার্শনিক নৈতিক রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণাকে তাহলে এমন সযত্নে পাশ কাটিয়ে চলবার প্রয়োজন হ'ত না।"

সাহিত্যে শ্লীল-অশ্লীলের সীমানা যেমন কেহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে না, আচার-অনাচারের রেখাও তেমনি টানা যায় না। "রচনা বাস্তব সংসারের রুক্ষ-মলিন ঘটনা নিয়েই হউক আর অবাস্তব স্বপ্নজগতের মায়াকুহেলিঢাকা অদেখা পরিবেশ নিয়েই হউক সৃষ্টিধর্ম্মিতার সংস্পর্শে অচিরেই সে রচনার গোত্র বদল হয়। সৃষ্টি-ধর্ম্মী রচনা কিছুক্ষণের জন্যে হলেও মনকে প্রাত্যহিকতার মালিন্যস্পর্শ থেকে মুক্ত করবেই, তাকে অসীমের সুরে বাঁধবেই" গ্রন্থকারের এই উক্তি হইতেই সাহিত্যের আসল রূপ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। সৃষ্টির প্রধান লক্ষণই হইল, মনকে তাহা আকর্ষণ করিবেই এবং হৃদয়কেও এক অপূর্ব্ব অনুভূতিতে ভরিয়া তুলিবেই। জীবন যে সাহিত্যের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। জীবন বড় হইলে তাহার সাহিত্য বড় হইতে বাধ্য। আমরা জীবনকেই ছোট করিয়া আনিতেছি, সাহিত্য বড় হইবে কি করিয়া? কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক। এই পরিবর্ত্তন আনিতে হইলে, নারায়ণবাবুর মত কঠোর সমালোচকের প্রয়োজন। এই জন্যই তাঁহার দায়িত্ব আজ অনেকখানি। বইখানি সময়োপযোগী হইয়াছে বলিয়াই ইহার মূল্য আছে। এরূপ গ্রন্থ যত প্রচার হয় ততই দেশের কল্যাণ। বইখানির প্রচ্ছদপট সুরুচিসঙ্গত।

রমেশ রচনাবলী—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্ত্তৃক সম্পাদিত। সাহিত্য-সংসদ, ৩২ এ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য নয় টাকা।

রমেশ রচনাবলীর সহিত পরিচয় নাই, এরূপ লোক বাংলা দেশে বিরল। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে তাঁহার রচিত সমগ্র উপন্যাস-গুলি গ্রথিত হইয়াছে। বঙ্গবিজেতা, মাধবী-কঙ্কণ, মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত, রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা, সংসার, সমাজ—এই ছয়খানি উপন্যাস ছাড়াও রমেশচন্দ্র বিবিধ বিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রথম চারখানি ইতিহাস-ভিত্তিক, অপর দুইখানি সামাজিক সমস্যা লইয়া বিরচিত। সংখ্যায় অল্প হইলেও উপন্যাসগুলির মধ্যে তাঁহার শিল্পি-মানসের ক্রম-বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিবার ধারা আমরা প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে দেখিতে পাই। ঘটনা বৈচিত্র্যে এবং তৎকালীন পারিপার্শ্বিক বর্ণনায়, আচার-আচরণ ও আদর্শের বিকাশে, বীরত্ব-মহিমার প্রকাশে ইহা মানুষের মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তাহা অন্য কোন রচনায় প্রকাশ পায় না। যুগের প্রয়োজনে একদা এই ধারায় উপন্যাস লিখিবার প্রয়োজন হইয়াছে। ধারা যাহাই হউক, বঙ্কিমের পর এরূপ সার্থক রচনা একমাত্র তাঁহার মধ্যেই দেখিতে পাই। সেইজন্য আজও—একটা শতাব্দীর পরেও—রমেশ-সাহিত্য সমান মর্য্যাদা পাইয়া আসিতেছে। রমেশচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার মূল উৎস স্বদেশ-প্রেম বা দেশ-ভক্তি। কারণ তিনি জানিতেন, একমাত্র সাহিত্যের মধ্য দিয়াই দেশের অগণিত জনমানবকে দেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ করা যায়। রমেশচন্দ্রের যুগ ইংরেজিয়ানার যুগ। কাজেই সে যুগে যাঁহারাই সাহিত্য করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহারাই ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই প্রথমে করিতে গিয়াছিলেন। রমেশচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনাও সুরু হয় ইংরেজী ভাষাতেই। তাঁহার বহু ইংরেজী প্রবন্ধ এবং কবিতা তাহার সাক্ষ্য দিবে। প্রকৃতপক্ষে বাংলায় লিখিবার প্রেরণা তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট হইতেই পাইয়াছিলেন। বাংলা ভাষায় অনভিজ্ঞ রমেশচন্দ্র নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করিলে, বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "রচনা-পদ্ধতি আবার কি, তোমরা শিক্ষিত যুবক, তোমরা যাহা লিখিবে তাহাই রচনা-পদ্ধতি হইবে।" এই কথাই রমেশচন্দ্রকে বাংলা ভাষায় লিখিতে অনুপ্রাণিত করে। সুতরাং এদিক দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্রের গুরু। এ কথা নিঃসংশয়ে আজ বলা যায়, সাহিত্য-সাধনায় রমেশচন্দ্র গুরুর মান রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির মধ্যে 'জীবন-প্রভাত' ও 'জীবন-সন্ধ্যা' আজও শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে।

রমেশচন্দ্র সিবিলিয়ান এবং ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াও তিনি খাঁটি স্বদেশী ছিলেন। প্রকৃত পক্ষে এই স্বদেশ-প্রেমই তাঁহাকে সাহিত্য-সাধনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। তাঁহার সাহিত্য-সাধনার মূল উৎসই ছিল স্বদেশ-বাৎসল্য বা দেশ-ভক্তি। স্বাধীনতার বীজ সে যুগে যাঁহারা রোপণ করিয়া গিয়াছেন, রমেশচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে রমেশচন্দ্রের এই দানের কথা নিশ্চয়ই স্বীকৃত হইবে।

রমেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, "তাঁহার চরিত্রে প্রাণের বেগের সঙ্গে অপ্রমত্ততার যে সম্মিলন ছিল তাহা এখনকার কালে দুর্লভ। তাঁহার সেই প্রচুর প্রাণ-শক্তি তাঁহাকে দেশহিতকর বিচিত্রকর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়াছে, অথচ সে শক্তি কোথাও আপনার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে নাই। কি সাহিত্যে, কি রাজকার্য্যে, কি দেশহিতে, সর্ব্বত্রই তাঁহার উদ্যম পূর্ণবেগে ধাবিত হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বত্রই আপনাকে সংযত রাখিয়াছেন।"

আজ আমরা স্বাধীন হইয়াছি। কিন্তু ইহা ত একদিনেই সম্ভব হয় নাই। ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে এইসব মনীষীদের বহুবিধ কর্ম্ম-সাধনা। ইঁহারা নমস্য।

সম্পাদনাকার্য্যে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয়ের যে নিষ্ঠা ও যত্ন দেখা গেল তাহা প্রশংসনীয়। গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ এই সম্পাদনার গুণেই সার্থক হইয়াছে। বিশেষ করিয়া এই গ্রন্থের ভূমিকা এবং রমেশচন্দ্রের কর্ম্ম-জীবন ও সাহিত্য-সাধনা সম্বন্ধে তিনি যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন তাহা একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। রমেশচন্দ্রকে জানিতে হইলে এই অধ্যায়টি অপরিহার্য্য। এইজন্যই এ-ভূমিকাটি হইয়াছে গ্রন্থের একটি মূল্যবান সংযোজন।

গ্রন্থের অঙ্গ-সৌষ্ঠব সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া এবং পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়া নিখুঁত হইয়াছে। সাহিত্য-সংসদের প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে একটি জিনিস বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করা গেল, তাঁহাদের রুচি। এই মার্জ্জিত রুচিই তাঁহাদিগকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে।

শ্রীগৌতম সেন

কাঞ্চনজঙ্ঘার ছেলেমেয়ে—শ্রীনীহাররঞ্জন চক্রবর্ত্তী। বেঙ্গল পাবলিসার্স, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২·২৫।

একথা অনস্বীকার্য্য যে, আজ বাংলা সাহিত্যের প্রসার দিগন্ত-চারী হয়েছে অনেক কীর্ত্তিমান মানুষের অনলস সাধনার অর্ঘ্য পেয়ে। উপন্যাস, ছোট গল্প, রম্যরচনা, কবিতা এবং রসরচনার ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি বিস্ময়কর না হলেও তা যে সন্তোষজনক, একথা সকলেই স্বীকার করেন। গবেষণা-অন্বিষ্ট, নানান ধরনের লেখায় অধুনা বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হচ্ছে। এ যুগের মননসাধনার প্রধানতম লক্ষণ হচ্ছে আমাদের অতীত মননসাধনার বিস্মৃত অধ্যায় পুনরাবিষ্কার করা এবং মানুষের সামগ্রিক জীবনের অতীত ইতিহাসকে উদ্‌ঘাটিত করা। আলোচ্য গ্রন্থখানি এই লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত। পার্ব্বত্যপ্রদেশের লেপচাদের সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ এবং আমাদের জ্ঞানার্জ্জনের প্রয়াসও নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থ থেকে বহুদিনের গবেষণার ফলটুকু পরিবেশন করেছেন মনোজ্ঞ ভাষায়। আজ পর্য্যন্ত লেপচা-দের কোন পূর্ণাঙ্গ ইতিকথা লেখা হয়েছে বলে আমরা জানি না। সেদিক থেকে গ্রন্থটিকে পথিকৃৎ হিসাবে গ্রহণ করা যায়। বহু কথা বলবার আছে লেপচাদের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে ; তাদের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, পূজাপার্ব্বণবিধি, লোকচার এবং লোকগীতির মাধ্যমে আমরা যে একদা-সমৃদ্ধ পূর্ণাঙ্গ জাতীয় এবং সমাজ-জীবনের ছবির আভাসটুকু এই গ্রন্থে পাই তাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বহু বর্ণবিচিত্রিত একখানি আলেখ্যের মর্য্যাদা দিতে হলে এ যুগের অন্যান্য গবেষক-দেরও এ দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। পার্ব্বত্যজাতিদের সম্বন্ধে আমাদের ঔৎসুক্যের সীমা নেই। আলোচ্য গ্রন্থখানি আমাদের ঔৎসুক্যকে উদ্দীপিত করেছে।

লেপচা জাতি আজ ক্ষয়িষ্ণু। আধুনিক সভ্যতার সর্ব্বগ্রাসী বিস্তার থেকে আপনাদের সু-প্রাচীন ঐতিহ্যকে সযত্নে রক্ষা করবার চেষ্টা করছেন লেপচারা। আমাদের সর্ব্বপ্রযত্নে এই ঐতিহ্যটুকুকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। শুধু দর্শকের ভূমিকাই আমাদের ভূমিকা নয়। এদেশের মানুষের এবং রাষ্ট্রের এ সম্বন্ধে গুরু দায়িত্ব রয়েছে। গ্রন্থকার তাঁর সুনিপুণ বিশ্লেষণে এই ক্ষয়িষ্ণু জাতিটির সমাজ এবং সামগ্রিক জীবনের মূল সমস্যাগুলির কথা আমাদের বলেছেন। আমাদের হিমালয়-আশ্রিত বিরাট সীমান্তকে যদি সদাজাগ্রত প্রহরীর অতন্দ্র প্রহরায় রাখতে হয় তবে পর্ব্বতের ছেলে-মেয়েগুলির দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। সেখানে আমাদের মহৎ কর্ত্তব্য রয়েছে। সে গুরুদায়িত্ব আমাদের অচিরেই বহন করতে হবে। গ্রন্থকার তার ইঙ্গিতও করেছেন।

আমরা এই কৃযতনু গ্রন্থটিকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকের ঐতিহাসিক পটভূমিতে গ্রন্থখানির আবির্ভাব একান্তই কালোচিত হয়েছে। এ গ্রন্থ সমাদৃত হবে।

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

দেশ-বিদেশের কথা

আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী

১৮৫৯ সনের নভেম্বর মাসে এই আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। আজ এই একশত বৎসরের ইতিহাস স্মরণ করিলে প্রথমেই মনে পড়ে, স্বর্গীয় যদুনাথ শর্ম্মার কথা। আহিরীটোলা পল্লীতে এই যদুনাথ পণ্ডিত বাস করিতেন। সাধারণের নিকট তিনি যদু পণ্ডিত নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রথমে নিমু গোস্বামী লেনে নিজের বাসায় পল্লীর কয়েকটি ছাত্র লইয়া একটি পাঠশালা স্থাপন করেন। পল্লীস্থ বিদ্যোৎসাহী ভদ্র মহোদয়গণের সাহায্যে এবং উক্ত পণ্ডিতের প্রাণপণ যত্নে ঐ ক্ষুদ্র পাঠশালা অচিরে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং বাংলা গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুমোদিত হইয়া যথারীতি গবর্ণমেণ্ট সাহায্য পাইতে আরম্ভ করে।

ইহাই আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়ের প্রাথমিক ইতিহাস। আহিরীটোলা বঙ্গবিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্ত্তি বাংলা দেশের শিক্ষা-জগতের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সন্দেহ নাই। যে সময়ে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, সে সময়ে সমগ্র বাংলা দেশে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল অতি অল্প। কাজেই এই ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়ের অতীতের কথা স্মরণ করার সঙ্গে, জনসাধারণের সুদুর্লভ সাধনার কথাও স্মরণ করি—তাঁহাদের ত্যাগ, সহায়তা ও শুভ প্রচেষ্টাই আজ ইহাকে এতটা গৌরবদানে সমর্থ হইয়াছে। ইহা স্কুল জীবনের পক্ষেই শুধু গৌরবের নয়, সমগ্র বাঙালী জাতির পক্ষে গর্ব্বের বস্তু।

শ্রীমতী স্নেহলতা দাস

সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ছাত্রীবাসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অধ্যাপক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাসের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী স্নেহলতা (পুষ্প) দাস পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি একজন ধর্ম্মশীলা, পরহিতৈষিণী ও সমাজ-সেবাপরায়ণা নারী ছিলেন। এই নিঃসন্তান মহিলার স্নেহপূর্ণ সরল ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য সকলেই তাঁহাকে প্রীতি ও ভালবাসার চক্ষে দেখিতেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স পঞ্চাশ বৎসর হইয়াছিল। বাঁকুড়া জেলার ইন্দাসগ্রামে তাঁহার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রীযুত দাস হরিজন পল্লীতে একটি নলকূপ প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই গ্রামে একটি কালীমন্দির নির্ম্মাণ করিতেছেন। সেখানে তাঁহাদের বসতবাটিতে স্নেহলতা আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। এই আশ্রমের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক জীবনগঠন, জনগণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান এবং কৃষি ও শিল্পের উন্নতিসাধন করা।

গল্প-প্রতিযোগিতা

প্রবাসীর পক্ষ হইতে আমরা যে গল্প-প্রতিযোগিতার আয়োজন করিয়াছি, তাহার শেষ তারিখ ১৩৬৬ সালের ১লা চৈত্র ইহা স্মরণ রাখিতে বলি। প্রতিটি গল্প তিন হাজার হইতে ছয় হাজার শব্দের মধ্যে হওয়া চাই। গল্পের সঙ্গে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় অবশ্য লেখা প্রয়োজন :

১। নাম

২। ঠিকানা

৩। প্রেরণের তারিখ

৪। ইতিপূর্ব্বে সংবাদপত্রে বা সাময়িক পত্রিকায় বা উভয়ে লেখকের কোন গল্প প্রকাশিত হইয়াছে কিনা।

৫। মোড়কের উপর অথবা গল্পের শিরোনামার পাশে লেখা থাকিবে প্রবাসীর গল্প-প্রতিযোগিতার জন্য।

গল্পের গুণানুসারে নিম্নরূপ পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে :

(ক) সর্ব্বোৎকৃষ্ট গল্পের জন্য পুরস্কার একশত টাকা,

(খ) পরবর্ত্তী শ্রেষ্ঠ দুটি গল্পের প্রত্যেকটির জন্য পুরস্কার পঁচাত্তর টাকা,

(গ) পরবর্ত্তী উৎকৃষ্ট পাঁচটি গল্পের প্রত্যেকটির জন্য পুরস্কার পঞ্চাশ টাকা।

এতদ্ব্যতীত যেসব গল্পের জন্য পুরস্কার দেওয়া হইবে না, অথচ প্রবাসীতে প্রকাশযোগ্য বিবেচিত হইবে সে সকল গল্পের নিমিত্ত লেখকগণকে যথানিয়মে দক্ষিণা দেওয়া যাইবে।

প্রকাশ থাকে যে, প্রাপ্ত পুরস্কার গল্প এবং অপ্রাপ্ত পুরস্কার অথচ প্রকাশযোগ্য সকল গল্পই ক্রমান্বয়ে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইবে।

গল্প-প্রতিযোগিতার জন্য প্রদত্ত গল্প অন্য কোন গল্পের অনুবাদ, আংশিক অনুবাদ বা ছায়া-অবলম্বনে লিখিত হইলে চলিবে না এবং অন্যত্র প্রকাশিত গল্প গ্রাহ্য হইবে না।

প্রবাসীর বিচার চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। গল্প-প্রাপ্তির শেষ-তারিখের পর যথাসম্ভব শীঘ্র প্রবাসীতে প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষিত হইবে। এ সম্বন্ধে কোন পত্রালাপ চলিবে না।

কর্ম্মাধ্যক্ষ—"প্রবাসী"

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

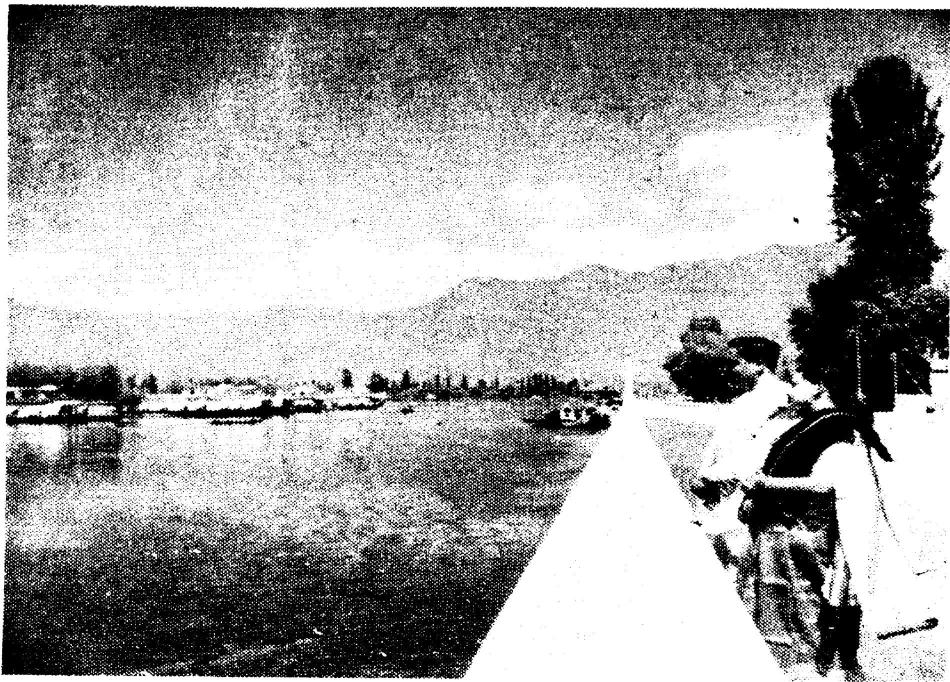
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯



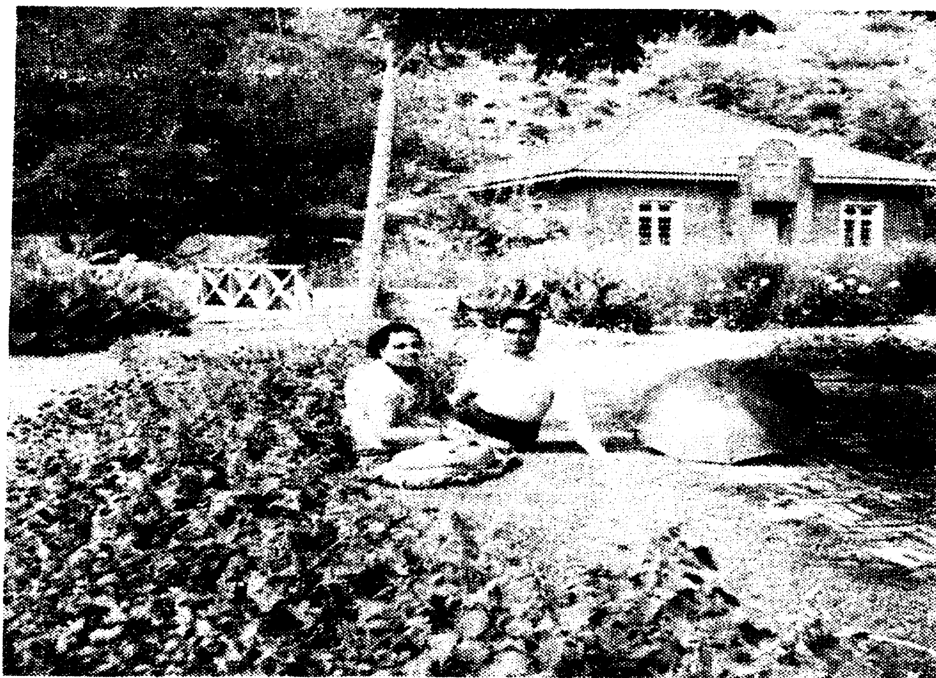
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রতীক্ষা

শ্রীসতীন্দ্রনাথ লাহা



ডাল থেকে প্রভাত ঃ – শ্রীনগর



প্রাসাদ-উদ্যান—কাশ্মীর

ফটো ঃ—সচ্চিতকুমার চট্টোপাধ্যায়

৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৯শ ভাগ
২য় খণ্ড

চৈত্র, ১৩৬৬

৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

চীন ও বিশ্বশান্তি

এই প্রসঙ্গ লিখিবার সময় দৈনিকের পৃষ্ঠায় সংবাদ পাওয়া গেল যে, শ্রীনেহরু গত ৪ঠা মার্চ্চ শ্রী চৌ-এন-লাইয়ের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, ইহাতে আগামী ২০শে এপ্রিল নাগাদ নয়া দিল্লীতে তাঁহার সহিত বৈঠকের প্রস্তাব আছে। এই পত্র শ্রী চৌ-এন-লাইয়ের ২৬শে ফেব্রুয়ারীতে লিখিত পত্রের জবাব। ইহাতে শ্রীনেহরু দিল্লীতে আসিবার আমন্ত্রণ গ্রহণ করার জন্য শ্রীচৌ-এন-লাইকে ধন্যবাদ জানাইয়াছেন এবং লিখিয়াছেন যে, এই সাক্ষাৎ আলোচনায় "আমরা এই সকল সমস্যার পূর্ণ বিবেচনা করিতে পারিব এবং ঐ সমস্যাগুলির পূরণের পথ খুঁজিতে পারিব, যাহাতে শান্তির পথে আমাদের সকল বিবাদের মীমাংসা হইতে পারে।" তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, এপ্রিলের শেষে তাঁহাকে বিদেশে যাইতে হইবে, সুতরাং ২০শে এপ্রিল নাগাদ যদি শ্রীচৌ-এন-লাই আগমন করেন তবে বড়ই ভাল হয়।

বলা বাহুল্য, এই পত্রের সঙ্গে অন্য অনেক বাজে কথা মিশাইয়া একটি "শ্বেত কাগজ" প্রকাশ করায় এই সংবাদ প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রীনেহরুর সকল ব্যাপারের ন্যায় এই চিঠিও ইহার পূর্ব্বের চিঠি দেশবাসীকে চমৎকৃত করিয়াছে।

আমরা জানি না এই সাক্ষাৎকারের ফলাফল কি হইবে, কেননা শ্রীনেহরু এবং তাঁহার বৈদেশিক দপ্তরের সহকারীবৃন্দের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করা আমাদের ক্ষমতার অতীত। তবে এইটুকু বলা চলে যে, দেশের লোকের মন যদি দৃঢ় থাকে তবে আমাদের বৈদেশিক দপ্তর দেশকে আর বেশী ডুবাইতে পারিবেন না।

শ্রীনেহরু বিদেশে যাইবার পূর্ব্বে এই জটিল ব্যাপারের একটা মীমাংসা হইলে মঙ্গল। নচেৎ বিদেশ হইতে প্রত্যাগমনের পর নূতন ভাবের প্রেরণায় তিনি কি করিয়া বসিবেন বলা অসম্ভব। পররাষ্ট্র ব্যাপারে—বিশেষতঃ রাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে—যে সূচ্যগ্রতীক্ষ্ণ জ্ঞানবুদ্ধিবিবেচনার প্রয়োজন তাহার কতটা আমাদের রাষ্ট্রচালক-বৃন্দের আছে সে ত সারা জগতই জানিয়া গিয়াছে। নতুবা আমাদের এই বর্ত্তমান অবস্থা আসিতেই পারিত না।

বিদেশের অভিজ্ঞতা যাহাদের আছে তাহাদের কোন কথাই শ্রীনেহরু কানে তুলেন না। তিব্বতে চীনের কার্য্য-প্রকরণ সম্পর্কে তাঁহাকে সতর্কীকরণের চেষ্টা একাধিক লোকে করিয়াছিল এবং তাঁহাদের মধ্যে পররাষ্ট্র বিভাগের লোকও ছিল। তিনি চীনের তৎকালীন ভারতীয় দূতের কথায় এবং তাঁহার নিজের দলের লোকের পরামর্শে সে সকলই অগ্রাহ্য করেন। তিব্বতকে চীনের হাতে বিনা প্রতিবাদে তুলিয়া দেওয়ার পরও আমাদের হিমালয় প্রাকারভেদের দুরভিসন্ধির বিষয়ও তাঁহাকে একাধিক লোকে বলে তাহাও তিনি তুচ্ছ করেন। লোকসভায় ম্যাকমেহন সীমান্তরেখা চীনারা অতিক্রম করিয়াছে এই কথা কংগ্রেসেরই এক সদস্য বলিলে তিনি রূঢ় ভাষায় তাহার প্রতিবাদ করেন এবং ম্যাকমেহন সীমান্তরেখাকে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চিহ্ন বলিয়া অভিহিত করেন। ঐ অযৌক্তিক ও অবাস্তব উক্তিই এখন শ্রীচৌ-এন-লাই শ্রীনেহরুর মুখের উপর নিক্ষেপ করেন। যাহাই হউক পাঁচ বৎসর চিঠি চাপাটি চালাইয়া এবং দেশবাসীকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখিয়া এখন ত এই অবস্থা। ইহার পর দিল্লীতে গোপন বৈঠকে কি আলোচনা হইবে এবং তাহার ফলাফল কি হইবে তাহা দেবতারও অজ্ঞাত, আমরা সে বিষয়ে কি বলিব।

দিল্লীর বৈঠকে একদিকে অতি চতুর রাষ্ট্রনীতিবিশারদ ও কূটনীতিতে অভিজ্ঞ চীনা প্রতিনিধিবর্গ এবং অন্যদিকে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ও পররাষ্ট্র বিষয়ে "আনাড়ি", অথচ নিজের বুদ্ধিবিবেচনা সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণাযুক্ত ভারতীয়ের দল—আলোচনা হইবে অপরূপ সন্দেহ নাই! তবে ভরসা এইমাত্র যে, আমাদের দিকে ন্যায়ধর্ম্ম এবং অন্যদিকে অন্যায় শক্তিলালসা এবং বর্ত্তমান কালের জগৎ ঐরূপ অন্যায় লালসার বিরোধী। নতুবা শ্রীনেহরুর এই যুক্তিতর্কবিহীন শান্তিবাদ ভারতকে ডুবাইতে বসিয়াছিল। এখনও বলা যায় না যে দেশ কোথায় আছে, তবে এই কয় মাসে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান দুই রাষ্ট্রের উচ্চতম অধিকারী পর পর আসায় এবং তাঁহাদের বাণীতে ভারতের পক্ষসমর্থন থাকায় ভবিষ্যৎ আকাশে ঝড়ের লক্ষণ কতকটা কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু শ্রীনেহরু এখনও

বৈঠকের কথাবার্তায় বেফাঁস কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়া বসিতে পারেন। সুতরাং আশঙ্কা বায় নাই।

আজিকার দিনে সারা জগতে বিশ্বশান্তির কথা চলিতেছে। সোভিয়েট রাশিয়া এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, এই দুই প্রবল পরাক্রান্ত রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে যুদ্ধের অনল ধূমায়িত হইতেছিল, সম্প্রতি তাহার নির্কাপণের চেষ্টা চলিতেছে। সোভিয়েটের মুখপাত্র ও কর্ণধার নিকিতা ক্রুশ্চভ এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রসর ও চেষ্টিত হইয়াছেন। তিনি এ দেশে ইতিপূর্ব্বেও আসিয়াছিলেন এবং আমাদের রাষ্ট্রের সহিত নিজ দেশের সখ্য ও মৈত্রীর সম্পর্কের স্থাপনা সেইবারেই করিয়া গিয়াছিলেন। এইবার প্রথমে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রেসিডেণ্ট ও পরে রাষ্ট্রনায়ক ক্রুশ্চভ সেই সম্পর্ক দৃঢ়তর করার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ক্রুশ্চভ মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন যে, বিশ্বশান্তির অভিযানে তাঁহার শ্রেষ্ঠ সমর্থক আমাদের ভারত এবং ঐ বিশ্বশান্তি পরিকল্পনার উদ্ভবও এই দেশে।

আমাদের সময়ে বিশ্বশান্তির ও পঞ্চশীলের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রথমে হয় বান্দুং সম্মেলনে, যেথায় এশিয়া ও আফ্রিকায় সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার পথনির্দ্দেশ ঐ পঞ্চশীলের পথেই করা হইয়াছিল। এই সম্মেলনে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধ ও গণতন্ত্রবাদের জয়যাত্রার আহ্বান যাহারা দিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে চৌ-এন-লাই বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতের সঙ্গে ব্রহ্মদেশ ও ইন্দোনেশিয়া পূর্ণ সহযোগ দিয়া একমত প্রকাশ করে। এই সম্মেলনের ফলে বহু অ-কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র চীনের সহিত সখ্যতা স্থাপন করে।

আজ সেই সখ্যতা সম্পূর্ণ ভাবে নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে এবং বিশ্বশান্তির প্রধান অন্তরায় দাঁড়াইয়াছে "গণতন্ত্রবাদী" চীনের সম্প্রসারণনীতির দাপট। বলা বাহুল্য, সম্প্রসারণনীতি সাম্রাজ্যবাদেরই অন্যনাম মাত্র। এই সম্প্রসারণ নীতির নগ্ন ও বীভৎস রূপ দেখা দেয় ভারতের সীমান্তে। ব্রহ্ম এবং ইন্দোনেশিয়ায়ও অশান্তি ও বিরোধের সৃষ্টি হয় চীনের অন্যায় দাবিদাওয়ায়। এই সকল অশান্তির মূলে আছে "গণতান্ত্রিক" চীনের অ-গণতান্ত্রিক যুদ্ধশক্তি আস্ফালন এবং সেই গর্ব্বের উন্মাদনায় পরের ভূমি ও পরের ধনসম্পত্তি দখল করিবার প্রবৃত্তি।

এখানে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই, কিন্তু যে ভাবে ১৯৫৪ সন হইতে গত বৎসর পর্য্যন্ত চীনের এই ভারত সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতের ভূমিতে নিজ অধিকার স্থাপনের চেষ্টাকে এদেশের লোকের চক্ষু-কর্ণগোচর না করিয়া লুকাইয়া রাখা হয়, তাহারই ফলে বর্ত্তমান অবস্থার উদ্ভব হয়। এখন এই অবস্থার "শান্তিপূর্ণ" মীমাংসা কি ভাবে করা হয় তাহাই লক্ষ্যণীয়।

জগতে হিংসা, দ্বেষ, পরস্বাপহরণ প্রবৃত্তি, এ সবই সমানে রহিয়াছে। মনুষ্যসমাজ এখনও স্বভাবতঃ পঞ্চশীলমুখী হয় নাই। পূর্ব্বেও বহুবার বিশ্বশান্তির বাণী প্রচার জগতে হইয়াছে কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে, যে শান্তিকামী প্রথমে অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছে তাহারই সমূহ বিপদ ঘটিয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে বিশ্বশান্তির প্রচার যাঁহারা করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে শুধু ভারতই অস্ত্রসজ্জায় আচ্ছাদিত নহে। সুতরাং আমাদের মুখে শান্তির বচন দুর্ব্বলের শান্তিভিক্ষা বলিয়া মনে করায় চীন কিছু নূতন প্রতিক্রিয়া দেখায় নাই। অল্পদিন পূর্ব্বেও জগতে যে রীতি প্রচলিত ছিল এবং এখনও বিশ্বমানবের মধ্যে যে আদিম প্রবৃত্তি আছে, তাহার বশে আমাদের অবস্থার বিচার ঐ ভাবে করাই স্বাভাবিক। আমাদের সৌভাগ্য এইমাত্র যে, ইহা আণবিক বোমার যুগ এবং জগতের মধ্যে আণবিক বলে বলীয়ান জাতিদের মধ্যে এই চেতনা জাগিয়াছে যে আণবিক যুদ্ধের একমাত্র পরিণাম সমগ্র মানব জাতির চরম দুর্গতি এবং সেই দুর্গতির মধ্যে বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে কোনও প্রভেদ থাকিবে না। এই চেতনার বশেই শক্তিমান জাতির মধ্যে শান্তির প্রেরণা আসিয়াছে। আমাদের বাক্‌সর্ব্বস্ব নেতৃবর্গ শুধুমাত্র তাহার আবাহন করিয়াছেন। কিন্তু এই শান্তিপ্রচেষ্টা এখনও সবল ও ফলপ্রসূ হয় নাই এবং তাহা হইবেও না যতদিন জাতিপুঞ্জে পরস্পরের মধ্যে সন্দেহের অবকাশ থাকিবে। সন্দেহ দূর না হওয়া পর্য্যন্ত অস্ত্রবল ভিন্ন স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার বজায় রাখার অন্য কোনও উপায় নাই। এবং চীন যাহা করিয়াছে তাহার পর সহজে তাহার উপর বিশ্বাস করা বুদ্ধিবিবেচনার অভাবই দেখানো হইবে। ভারতের নিরাপত্তার জন্য হিমালয়ের প্রাকার অটুট ও অভেদ্য করাই প্রয়োজন। পঞ্চশীল বা শান্তিবাচন পূর্ব্বেও আমাদের রক্ষা করে নাই, এখনও করিবে না। জগতের সকল অঞ্চলেই চীনের এই হিংসাত্মক কার্য্যক্রমের সাড়া পৌঁছিয়াছে এবং পৃথিবীর প্রবলতম দুই শক্তিই এই কার্য্যক্রমের পরিণতিতে বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখায়, তাহাদের উচ্চতম অধিকারীদ্বয় ভারতকে পরোক্ষভাবে সহানুভূতি ও সমর্থন জানাইতে এখানে আসিয়াছিলেন। সেই আগমনের প্রতিচ্ছায়াই চীনের এই সুর বদলের প্রধান কারণ। অবশ্য পণ্ডিত নেহরু দৃঢ় ও অনমনীয় ভাব প্রদর্শন না করিলে আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়া এরূপ সমর্থন জানাইতেন না সন্দেহ নাই। চীনও নেহরুর এই দৃপ্ত ও দৃঢ় মনোভাব এবং ভারতের জনসাধারণের মধ্যে এই ক্রোধের বন্যা দেখিয়া চকিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু শুধু তাহাতেই এরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিত না, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

আইসেনহাওয়ার ও ক্রুশ্চভ দুই জনই ভারতকে পূর্ণরূপে সহায়তা দিতে প্রস্তুত ছিলেন। উপরন্তু চীনের শস্ত্রবলের প্রায় শতকরা ৮০.৯০ ভাগ সোভিয়েট রাশিয়ার সাহায্যের উপর নির্ভর করে। ক্রুশ্চভ শান্তির 'অভিযান" চালাইতেছেন। এমত অবস্থায়, আমাদের পররাষ্ট্র দপ্তরে মানুষ থাকিলে অনেক কিছুই করা সম্ভব হইত। কিন্তু কূটনীতির চাল দূরে থাকুক, আমাদের পণ্ডিতজী এবং তাঁহার উপদেষ্টাবর্গ রাষ্ট্রনীতির কোন কিছুরই খবর রাখেন কিনা সন্দেহ। যদি তাহা রাখিতেন তবে চীনের কথা ও ব্যবহারের এই অসঙ্গতি এবং সেই ব্যবহারের মধ্যে উত্তরোত্তর রূঢ় ও হিংস্রভাবের বৃদ্ধি তাঁহাদের অনেক পূর্ব্বেই চৈতন্য প্রদান করিত। এখন যেভাবে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা কি চার বৎসর পূর্ব্বে করা যাইত না?

দুর্নীতি দমনে ট্রাইব্যুনাল

উপর মহলে দুর্নীতি দমনের জন্য পূর্ব্বে যে ট্রাইব্যুনাল গঠনের প্রস্তাব হয় সেই প্রসঙ্গে শ্রী নেহরু সাংবাদিকদের নিকট বলেন, আমি এই ট্রাইব্যুনাল গঠনের পক্ষপাতী নই। সর্ব্বত্রেই দুর্নীতির কথা চলিতেছে ইহাও আমার অজ্ঞাত নহে। দুর্নীতি দমন যে অত্যাবশ্যক, ইহা শ্রী নেহরু স্বীকার করেন। তবে তাঁহার পদ্ধতি অন্যরূপ। অবশ্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল গঠন করিবার প্রস্তাবও তিনি করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মতে দুর্নীতি দমনের স্থায়ী ট্রাইব্যুনাল গঠন যেমন দেশের পক্ষে ক্ষতিকর তেমনি অ-গণতান্ত্রিক। ঘুষ, দুর্নীতি প্রভৃতি এমনই জিনিষ যে, উহার নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ অভিযোগকারীর পক্ষে দেওয়া কঠিন। উহারই সুযোগ গ্রহণ করিয়া কেহ যদি বলেন যে, নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ লইয়া উপস্থিত হও তাহা হইলে অভিযোগকারীর প্রতি সম্যক্ সুবিচার করা হয় না। জনসাধারণের ব্যাপারে এনফোর্সমেণ্ট পুলিস বেনামী চিঠি বা অস্পষ্ট সংবাদের উপর নির্ভর করিয়াই তদন্ত আরম্ভ করিয়া প্রকৃত তথ্য বাহির করেন। ইনকামট্যাক্স সেলট্যাক্স ঘটিত বিষয়-গুলি ইহার দৃষ্টান্ত। অতএব সরকারী ঘুষ, দুর্নীতির ব্যাপারেও সেইরূপ পন্থাই অবলম্বিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অভিযোগের কারণ থাকিলে লোক অভিযোগ করিবেই, কিন্তু উহা সত্য বা মিথ্যা তাহা অনুসন্ধানের দায়িত্ব সরকারের হাতে। স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে হউক, দায়িত্বশীল, মান্যগণ্য ব্যক্তি হইতে নগণ্য লোকেরাও বিভিন্ন প্রয়োজনে তাহাদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ ঘটনা হইতে এইরূপই মনে করেন যে, উচ্চ-নিম্ন প্রায় সব মহলেই দুর্নীতির মহামারী লাগিয়াছে। শাসনের পুরোভাগে অবস্থিত ব্যক্তিগণও ইহা অস্বীকার না করিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছেন। গোয়েন্দা পুলিসের চেষ্টায় বহু সরকারী উচ্চ ও নিম্নপদস্থ ব্যক্তির দুর্নীতি অহরহ ধরা পড়িতেছে। প্রকৃত অবস্থা যেখানে এই, সেখানে আরও কঠোর এবং ব্যাপকভাবে দুর্নীতি দমনের ব্যবস্থা না করিলে ইহার প্রতিকার কোন পথেই হইবে না।

ট্রাইব্যুনাল গঠন প্রসঙ্গে শ্রী নেহরু বলিয়াছেন, ইহা অ-গণ-তান্ত্রিক। বর্ত্তমানে এই ঘুষ এবং দুর্নীতি যে ব্যাপক আকারে দেখা দিয়াছে, ইহাকে প্রশ্রয় দেওয়াই কি হইবে তবে গণতান্ত্রিক রীতি? গণতন্ত্র মানে কি শুধু দল ও গোষ্ঠী পোষণ ও তাহার বাহিরে শুধু শোষণ ও পোষণ? গ-স

জনগণের সহিত পুলিসের সম্বন্ধ

দীর্ঘদিনের পরাধীনতা শুধু পুলিসের কেন, সকল মানুষেরই প্রকৃতিকে বদল করিয়া দিয়া গিয়াছে। সাধারণ মানুষের এই পরিবর্ত্তন কালের প্রলেপে হয়ত সংশোধিত হইতে পারে, কিন্তু পুলিসের মনোভাব বুঝি পরিবর্ত্তিত হইবার নয়। পুলিসকে আমরা দেখিতে চাই বিপন্নের রক্ষক, শিষ্টের বন্ধু, আর্ত্তের ত্রাতা ও দুষ্টের ত্রাসক হিসাবে। বহু অগ্রসর দেশেই জনসাধারণের নিকট পুলিসের এই রূপটিই পরিচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, এ রূপটি আমরা আর দেখিতে পাইলাম না।

পাইলাম না, তাহার কারণও আছে। দীর্ঘ পরাধীনতাকালে এদেশের পুলিস বিদেশী শাসকদের স্বার্থ-সংরক্ষণের যন্ত্র হিসাবে তাঁহাদের হুকুম তামিল করিয়া আসিয়াছে। জনসাধারণের স্বার্থের দিক হইতে তাহারা নিজেদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে নাই, করিবার অধিকারও তাহাদের ছিল না। ফলে পুলিস দেশের শিষ্ট, দুষ্ট সকলের পক্ষেই ত্রাসক ছিল। বন্ধুরূপে নহে, শঙ্কা ও সন্দেহকুটিল দৃষ্টিতে পুলিসকে দেখিতেই তাহারা অভ্যস্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিল। পুলিস সম্বন্ধে যে ভয় তাহারা মানুষের মনে ঢুকাইয়া দিয়াছিল, আজও তাহারা সেই ভয়ের চোখেই পুলিসকে দেখে।

তবু পুলিস ও জনসাধারণ উভয়েরই মানসিক পরিবর্ত্তন বাঞ্ছিত আদর্শের দিকে যে কিছুটা অগ্রসর হয় নাই, সে কথা বলিব না। হইয়াছে, আন্তরিকতা থাকিলে পুলিস ও জনসাধারণের মধ্যেকার সম্বন্ধ প্রত্যাশিত লক্ষ্যের দিকে ক্রমশ অগ্রসর না হইয়া যাওয়ারও কোন সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া মনে করি না। তবে এ কথা মনে করি, সম্বন্ধকে বাঞ্ছিত লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর করাইতে হইলে একক প্রয়াসে তাহা সম্ভব হইবে না। পুলিস ও জনসাধারণ উভয়কেই সেজন্য আন্তরিক ভাবে সচেষ্ট হইতে হইবে।

সম্প্রতি কলিকাতায় অনুষ্ঠিত পুলিস ও জনসাধারণের সহযোগিতা সম্বন্ধে এক আলোচনা-সভায় জাতীয় অধ্যাপক ডঃ রাধাবিনোদ পাল এবং উক্ত সভায় ও ময়দানে অনুষ্ঠিত কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের প্যারেডে পশ্চিমবঙ্গের পুলিসমন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় যে ভাষণ দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারাও পুলিস ও জনসাধারণের মধ্যে সুসম্বন্ধ স্থাপনের উপরই বিশেষভাবে জোর দিয়াছেন। ডঃ পাল এই সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা সম্ভব করিয়া তুলিবার জন্য পুলিসকে সেবার মনোবৃত্তি লইয়া জনসাধারণের মধ্যে কাজ করিতে অগ্রসর হইতে বলিয়াছেন, আর শ্রীমুখোপাধ্যায় জনচিত্ত জয় করিবার জন্য প্রয়াসী হইতে পুলিসকে উপদেশ দিয়াছেন। অবশ্য ডঃ পাল জনসাধারণকেও তাহাদের নাগরিক আচরণ সম্বন্ধে সচেতন থাকার প্রয়োজনীয়তা স্মরণ করিয়া দিতেও বিস্মৃত হন নাই। জনসাধারণ যে নাগরিক সদাচরণের আদর্শ হইতে বহুল পরিমাণে বিচ্যুত হইয়াছে এবং পুলিস ও জনসাধারণের মধ্যে মধুর সম্বন্ধ স্থাপন যে নাগরিক কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল, সে অভিমতও তিনি দৃঢ়ভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। ডঃ পাল সত্যই বলিয়াছেন যে, সুগঠিত পুলিসবাহিনী না থাকিলে দেশে সঙ্ঘবদ্ধ সামাজিক জীবনযাপন সম্ভবপর হয় না এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পুলিসবাহিনীর দেশের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনেও একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। ডঃ পাল পুলিসকে আর একটি কর্ত্তব্যের কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। সেই মূল্যবান কথাগুলি পুলিস যদি সতত স্মরণে রাখে তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে কর্ত্তব্যপালন অনেক সহজ হইবে। ডঃ পালের সেই মূল্যবান উক্তি হইল: পুলিসের রাজ-

নীতির প্রভাব ও সংস্পর্শ হইতে মুক্ত থাকা সম্পর্কে। পুলিস যদি রাজনীতির সহিত নিজেদের জড়াইয়া ফেলে তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে সরল ও সহজ ভাবে কর্তব্য সম্পাদন কখনই সম্ভব হয় না। প্রতিপদে দ্বিধা, সংশয়, ঔদাসীন্য ও অবহেলা তাহাদের কর্মের পথ বিঘ্নিত করিয়া তোলে। পুলিসের যাহা কর্তব্য তাহা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করিতে হইলে রাজনৈতিক মতবাদের স্পর্শ হইতে তাহাদের নিজেদের সযত্নে দূরে সরাইয়া রাখিতে হইবে।

রাষ্ট্রের কল্যাণসাধনের জন্য সতত জাগ্রত থাকাই যে পুলিসের কর্তব্য ইহা স্মরণ করাইয়া দিয়া অব্যবহিত একটি বিশেষ কর্তব্য সম্বন্ধে পুলিসমন্ত্রী তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। সে কর্তব্যটি হইল চীনের আক্রমণাত্মক কার্য্যকলাপের ফলে ভারত সীমান্তের কোন কোন স্থানে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। সে সব অঞ্চলে, সামরিকবাহিনী ছাড়াও পুলিসের কর্তব্য রহিয়াছে।

যাহা হউক, পুলিস ও জনসাধারণের মধ্যে বাঞ্ছিত সম্বন্ধ সংস্থাপনের ফলে যদি জনমন পুলিসকে বন্ধুভাবে ভাবিতে পারে তবেই দেশের সত্যকার মঙ্গল হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। গ-স

উড়িষ্যার চাউল গেল কোথায় ?

সকলেই মনে করিয়াছিলেন, উড়িষ্যাকে লইয়া খাদ্যাঞ্চল গঠিত হইলে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসমস্যা মিটিবে এবং উড়িষ্যার চাষীও বাড়তি ধান-চাউল কিছু বেশী দরে বেচিয়া সামান্য সচ্ছলতার মুখ দেখিতে পাইবে। এইরূপই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহা হইল না। উড়িষ্যার বাড়তি চাউল পশ্চিমবঙ্গে কি পরিমাণ আমদানি হইতেছে তাহা একমাত্র সরকারই বলিতে পারেন। সত্য কথা বলিতে কি, সরকারও সম্ভবতঃ তাহা বলিতে পারেন না। অথচ চাউল তাঁহারা প্রচুর পাঠাইয়াছেন, ইহা সত্য। একটা হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে উড়িষ্যা হইতে এক লাখ টন ধান এবং চাউল পশ্চিমবঙ্গে নাকি আসিয়াছে। তাহা হইলে এত পরিমাণ ধান-চাউল কোথায় যাইতেছে ? রহস্য এইখানেই।

সরকারী ব্যবস্থার কৃপায় উড়িষ্যার ধান-চাউল যে ভাবে পশ্চিমবঙ্গে আমদানি করা হইতেছে তাহাতে আমদানী চাউলের একটি বৃহৎ অংশ মজুতদার-মুনাফাশিকারীদের গোপন-গহ্বরে অদৃশ্য হইতেছে। ইহা সরকারেরই সৃষ্ট। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার উড়িষ্যা-পশ্চিমবঙ্গ খাদ্যাঞ্চল গঠন করিয়া 'স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্যে বিঘ্ন না ঘটাইবার' নামে উড়িষ্যার উদ্বৃত্ত চাউল লইয়া ছিনিমিনি খেলিবার অবাধ সুযোগ ইহাদের হাতেই তুলিয়া দিয়াছেন। খেলাটা চলিতেছে খোলাখুলি ভাবেই, আর খেলায় সাহায্য করিতেছে আইনে ফাঁক অথবা ফাঁকি। উড়িষ্যার বাড়তি চাউল পশ্চিমবঙ্গে আমদানী করাটাই খাদ্যাঞ্চল গঠনের একমাত্র উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ছিল না। চাউল কি পরিমাণ আসিতেছে, কোথায় যাইতেছে, এবং পশ্চিমবঙ্গের ক্রেতাগণ তাহা ন্যায্যমূল্যে পাইতেছে কি না, এই সমস্ত প্রশ্নের সুনিশ্চিত সদুত্তর দিবার দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। উড়িষ্যা হইতে আমদানী চাউল যাহাতে ফাটকাবাজ ব্যবসায়ীও চোরাকারবারীদের কুক্ষিগত না হইতে পারে, সেজন্য উড়িষ্যা সরকারের সহিত একযোগে বিধিব্যবস্থা করিবার দায়িত্বও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। সরকার এই সকল দায়িত্ব যথাসময়ে এবং যথোচিত দৃঢ়তার সহিত পালন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

চাউলের পাইকারী ব্যবসায় রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার সঙ্কল্প সরকার পরিত্যাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহার অর্থ নিশ্চয়ই এরূপ হইতে পারে না—স্বাধীন ব্যবসায়ের সুযোগ লইয়া ফাটকাবাজ ও মুনাফা-লোভীগণ যথেচ্ছ কারবার চালাইবেন এবং জনসাধারণের নিত্য-প্রয়োজনীয় খাদ্য লইয়া চোরা-কারবারে সরকার প্রশ্রয় দিবেন। অথচ সেইরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ দেখা দিয়াছে।

কি করিয়া এই সব চাউল মুনাফালোভী মজুতদারের গুদামজাত হইতেছে, প্রশ্ন উঠিতে পারে। আইনের ফাঁক এমন যে, উড়িষ্যাতে পঞ্চাশ মণ ধান বা চাউল কিনিতে কোনও লাইসেন্স দরকার হয় না এবং সরকারকে শতকরা কুড়ি ভাগ লেভিও দিতে হয় না। কাজেই মজুতদাররা ত সুবিধা পাইবেই। আইন বাঁচাইয়া এক এক দফায় চব্বিশ বস্তা অর্থাৎ আটচল্লিশ মণ ধান বা চাউল পশ্চিমবঙ্গে চালান দিবার অবাধ সুযোগ। সে ধান-চাউল কোথায় পৌঁছাইতেছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহার হিসাব রাখেন না। অপর পক্ষে যাঁহারা লাইসেন্সধারী ব্যবসায়ী তাঁহাদের ঝক্কি বেশী। সরকারী লেভির দাবি মিটাইতে হইবেই। ইহার উপর মালগাড়ীর অভাব। সব মিলাইয়া চাউল-রহস্যের পরিহাসটা মারাত্মক, আইনের ফাঁক দিয়া মজুতদারের ঘরে চাউল উঠিতেছে, পশ্চিমবঙ্গে উঠিতেছে হাহাকার। চমৎকার প্রহসন! কিন্তু এ প্রহসন আর কতকাল চলিবে ? গ-স

সরকারী টাকার অপচয়ে মেডিকেল ষ্টোর্স

কেন্দ্রীয় মেডিকেল ষ্টোর্সে অব্যবস্থার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। এই হতভাগ্য আমলাতন্ত্র-সর্বস্ব দেশে প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও দায়িত্ব-বিভাগ এমনই ছক-কাটা যে, কোনও সরকারী প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের গুরুতর গলদ বাহির করিতে বিস্তর সময় লাগে। গলদ বাহির হইলেও, তাহার জন্য দায়িত্ব নিরূপণ করা আরও দুঃসাধ্য ব্যাপার। অথচ সরকারের হিসাব-দক্ষতা বিষয়ে খ্যাতি আছে, নিয়ম-কানুনও কেতাদুরস্ত। কিন্তু এখানে দেখা যাইতেছে, কেন্দ্রীয় মেডিকেল ষ্টোর্সের হিসাব-পত্রের গলদ বাহির করিতে দপ্তর-কর্তারা গলদঘর্ম। কেন্দ্রীয় মেডিকেল ষ্টোর্সে লক্ষ লক্ষ টাকার অপচয় ঘটিয়াছে নাকি কয়েক বৎসর ধরিয়া। অথচ অপচয়ের অভিযোগ সম্পর্কে স্বাস্থ্য-দপ্তর সচেতন হইলেন মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে। তারপর যথারীতি কয়েকজন ইনস্পেক্টর প্রেরিত হইলেন তদন্ত করিবার জন্য। তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, খাতাপত্র সব ঠিক আছে।

ইহাই প্রহেলিকা! যাহাই হউক, সরকার নাকি সিদ্ধান্ত

করিয়াছেন যে, এই ষ্টোর্সের হিসাবপত্রের অব্যবস্থা একজন অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটি একাউন্টেন্ট-জেনারেল দ্বারা তদন্ত করিয়া তাঁহার রিপোর্টের ভিত্তিতে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। সিদ্ধান্ত অতীব চমৎকার সন্দেহ নাই। বৎসরের পর বৎসর বে-হিসাবী কারবার দিব্য চলিতে পারিল—হিসাব-রক্ষক, হিসাব-পরীক্ষক, তদন্তকারী ইনস্পেক্টর প্রভৃতি তাহা লইয়া গোজামিল দিলেন, অবশেষে পরম সাবধানী স্বাস্থ্য-দপ্তর স্থির করিলেন, আরও অ্যাদরেল একজন হিসাব-পরীক্ষক নিযুক্ত না করিলে, কেন্দ্রীয় মেডিকেল ষ্টোর্সের মান থাকে না। সুতরাং সেই ব্যবস্থাই হইল।

মান হয়ত রক্ষা হইল। কিন্তু ইহাতে অপচয়ের রন্ধ্র-পথ বন্ধ হইবে কি? সরকারী অর্থের অপব্যয়, অপচয় ও অসদ্ব্যবহার কোনদিনই বন্ধ হইবার নহে। কারণ, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা-দপ্তরের কার্য্যকলাপ দেখিলেও কতকটা অনুমান করা যায়। ১০ই মার্চ্চ তারিখের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় দেখিতেছি—"শ্রীকৃষ্ণ মেনন কর্ত্তৃক জীপ কেনা ব্যাপারের পুরানো কেলেঙ্কারিটা চাপা পড়িয়া গেলেও প্রতিরক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তরের নিত্য-নূতন কৃতিত্ব সমানে চলিতেছে। যদিও প্রধানমন্ত্রী নেহরু প্রতিরক্ষামন্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ—শ্রীকৃষ্ণ মেননের উদ্যোগে প্রতিরক্ষা-দপ্তর নাকি বহু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিদেশ হইতে আমদানী না করিয়া দেশেই তৈয়ার করিতেছেন—লোকসভায় সদস্যগণ কিন্তু এই দপ্তরের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করিয়াছেন। এমন অনেক জিনিসপত্র বিদেশ হইতে চড়া দরে কেনা হইয়াছে, যাহা দেশেই উৎপাদন করা সম্ভব হইত। উপরন্তু, বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া কানাডা হইতে ষাট লক্ষ টাকার যে সমস্ত যন্ত্রপাতি কেনা হইয়াছে তাহাতে সরকারী অর্থের ঘোর অপচয় ঘটিয়াছে।"

খেলা সর্ব্বত্র এইরূপই চলিতেছে। তাই মনে হয়, এই খেলা বন্ধ করিতে হইলে, শুধুমাত্র হিসাব পরীক্ষা করিলেই চলিবে না। সরকারী অর্থ এবং জিনিসপত্রের এইরূপ অপচয় যাহাতে আর না ঘটিতে পারে, তাহার জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা থাকা উচিত।

গ-স

উন্নয়নের হট্টগোলে প্রয়োজনীয় কাজ বন্ধ

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর প্রায় বারো বৎসর উত্তীর্ণ হইতে চলিল, কিন্তু জনসাধারণের দুর্দ্দশার কিছুমাত্র উপশম হইল না ইহাই পরিতাপের কথা। উন্নয়নের কাজ অবশ্য সাড়ম্বরে চলিতেছে এবং তাহাতে ব্যয়ও কম হইতেছে না। আর পরিকল্পনাগুলিও হইতেছে প্রায় দীর্ঘমেয়াদী। সেই বৃহৎ কর্ম্মযজ্ঞের সোরগোলের মধ্যে উপস্থিত মুহূর্ত্তের প্রয়োজনগুলির দিকে কাহারও নজর পড়ে না। দুর্দ্দশা তাহার ফলে বাড়িতেই থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি সড়কের কথা বলিতেছি। আমতা থানার অন্তর্গত ঝিকিরা হইতে বেতাই পর্য্যন্ত প্রসারিত সাত মাইল দীর্ঘ এই পথটি আজও সম্পূর্ণ ব্যবহার-যোগ্য হইয়া উঠে নাই। পথটি গুরুত্বপূর্ণ, চল্লিশটি গ্রামের অধিবাসী এ পথে যাতায়াত করে। কিন্তু বিস্তর লেখালেখি ও আবেদন-নিবেদন সত্ত্বেও নাকি গ্রাম-জীবনের এই যোগসূত্রটি আজও অবহেলিত হইয়াই আছে। গত বৎসর হইতে এই সড়কটিতে কিছু মাটি ফেলা হইতেছিল বটে, কিন্তু কাজ বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। সম্মুখে বর্ষাকাল। গুরুত্বপূর্ণ এই পথের অবস্থা তখন আরও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে। কর্ত্তৃপক্ষ হয়ত বলিবেন, তাঁহাদের অনেক বড় বড় কাজ করিতে হয়—ওসব ছোট-খাট কাজের দিকে নজর দিবার সময় কই?

এখন কথা হইতেছে, তবে নজর দিবে কে? তাঁহারা কি শুধু বড় বড় পরিকল্পনা লইয়াই থাকিবেন? তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত, এইসব ক্ষুদ্রাকার সমস্যাগুলিই অনেক সময় গ্রাম-জীবনের স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ বিকাশকে একেবারে পঙ্গু করিয়া রাখে।

গ-স

কেন্দ্রীয় বাজেট

প্রতি বৎসরই দেখা গিয়াছে, বাজেট পেশ করিবার পূর্ব্বে সাধারণের মনে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয়। কারণ, আঘাতটা তাহাদের উপরই আসিয়া পড়ে অধিকাংশ সময়। এবার কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে প্রত্যক্ষ-করের হার অপরিবর্ত্তিত রাখিলেও, অর্থ-সচিবের কয়েকটি প্রস্তাব যৌথ-ব্যবসায়ে ও শিল্পে উৎসাহ-দানের উপযোগী। যৌথকারবারের উপর কয়েকটি করলোপের দাবি অর্থ-সচিব মানিয়া লইয়াছেন। অতিরিক্ত লভ্যাংশের উপর করের উচ্চতর হারও কিছুটা মকুব করা হইতেছে। ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য্যের উপর কর স্থাপনের যৌক্তিকতা স্বীকৃত হইলেও, শিল্প-ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি জাতীয় সম্পদবৃদ্ধির যন্ত্রস্বরূপ। ইহার উপর সম্পত্তির মূল্য অনুপাতে ঐশ্বর্য্য-কর আদায় করিলে নূতন সম্পদ সৃষ্টির পথে সমূহ বাধা সৃষ্টি হয়। উচ্চতর হারে লভ্যাংশ ঘোষণার উপর বৈষম্য-মূলক কর ধার্য্য করিলে পুরাতন সুপরিচালিত কারবারের অংশীদার-গণ মোট মুনাফার ন্যায্য অংশ ভোগের অধিকারে বঞ্চিত হইয়া থাকে। মূল্যবৃদ্ধির ফলে শিল্প-কারবার স্থাপনের জন্য প্রাথমিক লগ্নীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠায় উৎসাহও কম। এ ধরণের প্রতিষ্ঠান আরও পাঁচ বৎসরের জন্য আয়কর হইতে একাংশে অব্যাহতি পাওয়ায় শিল্প-প্রসারের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইবে। রাজনৈতিক সামাজিক কিংবা দুঃস্থতা-ক্লেশ নিবারণের উদ্দেশ্যে কর দানের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণও অর্দ্ধেক বাড়ানো হইয়াছে। এখন মোট আয়ের শতকরা পাঁচ ভাগ কিংবা সর্ব্বোচ্চে এক লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত দান-কর হইতে অব্যাহতি পাইত। ভবিষ্যতে আয়ের শতকরা সাড়ে সাত ভাগ কিংবা সর্ব্বোচ্চে দেড় লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত দান কর-রহিত বলিয়া গণ্য হইবে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার কিংবা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের জন্য দানের উপর কর রেহাই সম্পর্কে কতকগুলি বাধা-নিষেধ ছিল। আয়কর-দাতা যে ব্যবসায়ে নিযুক্ত মাত্র সে ব্যবসার সংহিত সংশ্লিষ্ট গবেষণা-কার্য্যের জন্য দান কর-রহিত বলিয়া গণ্য হইত। অতঃপর সেরূপ সম্পর্কশূন্য গবেষণার জন্য কিংবা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে দানও করমুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে। অন্যান্য উন্নত দেশের

তুলনায় এদেশে গবেষণার জন্য দানের পরিমাণ অতি নগণ্য। অতঃপর এ বিষয়ে উৎসাহ বৃদ্ধি পাওয়া উচিত।

ইহার উদ্দেশ্য অবশ্য মহৎ। নূতন মূলধন সৃষ্টি কিংবা শিল্পে, ব্যবসায়ে উৎসাহ দান করা। কিন্তু প্রত্যক্ষ-কর সম্পর্কে অর্থ-সচিবের নূতন প্রস্তাবগুলি স্বল্প ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর অবিকল বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে। প্রস্তাবিত অপ্রত্যক্ষ-করের অধিকাংশই টেকসই জিনিসের কিংবা কলকারখানার ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রভৃতির উপর। লৌহপিণ্ড, টিনের পাতলা ও মোটা চাদর এবং এলুমিনিয়ামের পিণ্ড এবং চাদর ইত্যাদির উপর উচ্চহারে আভ্যন্তরীণ শুল্ক প্রবর্তনের ফলে কেবল যে লোহা, এলুমিনিয়াম ও টিন দিয়া তৈয়ারী ঘরকন্নার আসবাবপত্র প্রভৃতির দর চড়িবে তাহা নহে, ঐ সকল ধাতুর পাতলা চাদরে তৈয়ারী টিনে বা কৌটায় ভর্ত্তি নানা রকম জিনিসের দরও চড়িবে। বিজলী পাখা, বাল্‌ব ও ব্যাটারী, সব রকম মোটর গাড়ী, লরী, স্কুটার, মোটর সাইকেল, বিদ্যুৎ-চালিত মোটর প্রভৃতির উপর সদা-প্রবর্ত্তিত শুল্কের হার রীতিমত চড়া। সাইকেলের চাকা ও রিমের উপর যে হারে শুল্ক ধার্য্য হইয়াছে তাহাতে প্রত্যেকখানি সাইকেলের জন্য দশ টাকা আদায় হইবে। ডিজেল তেলের উপর প্রথমে গ্যালন প্রতি ২৫ ন, প. শুল্ক ধার্য্য হইয়াছিল। চড়িতে চড়িতে ইহা ৮০ ন. প. উঠিয়াছে। এখন আরও ২৫ ন, প, বাড়ানো হইতেছে। মোটর গাড়ী, সাইকেল ও ডিজেল-তেলের উপর উচ্চহারে শুল্ক ধার্য্য করায় যাতায়াতের খরচ যেমন চড়িয়া যাইবে, মূলধন অপচয়ের পথও তেমনই প্রশস্ত হইবে।

আজকাল পল্লী-অঞ্চলে এবং ছোট ছোট শহরে যাতায়াতের জন্য সাইকেলই প্রধান ভরসা, কেবল-মাত্র মধ্যবিত্ত নহে—অনেক দরিদ্র ব্যক্তিও সাইকেলের উপর ভর করিয়া কাজ-কারবার চালাইয়া থাকেন। ডিজেল তেলের দর সস্তা এবং ডিজেল তেলে চালিত মোটর লরী, বাস প্রভৃতি অনেক বেশী টেকসই হয়। ইহাই ডিজেল-চালিত গাড়ী জনপ্রিয় হওয়ার মূল কারণ। ক্রমাগত শুল্ক বাড়াইয়া ডিজেলের দর চড়াইয়া দেওয়ায় কেবল যে এ ধরনের গাড়ী চালাইবার খরচ বৃদ্ধি পাইবে তাহা নহে। ডিজেলের পরিবর্ত্তে পেট্রোল-চালিত গাড়ী চালাইবার জন্যও পরোক্ষভাবে চাপ পড়িবে।

দরিদ্র দেশে ব্যয় হ্রাসের জন্য যথাসাধ্য ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে, সরকার ব্যয় বৃদ্ধি করিতে বাধ্য করিতেছেন। ডিজেলের উপর শুল্কবৃদ্ধির মূল রহস্য কি? ভারতে তিনটি তৈল শোধনাগার খুলিবার সময় পেট্রোল, ভারি ডিজেল, হাল্কা ডিজেল প্রভৃতি বিভিন্ন তেলের আনুপাতিক চাহিদা সঠিক সন্ধান না করিয়া বেশী পরিমাণে পেট্রোল তৈয়ারীর ব্যবস্থা বোধ হয় হইয়াছিল। সেই অনুপাতে কিন্তু ডিজেল প্রস্তুতের ব্যবস্থা হয় নাই। ফলে বেশী পেট্রোল উৎপন্ন হইলেও, ডিজেলের ঘাটতি পড়িয়াছে। এই বিভ্রাটের মূল দায়িত্ব পরিকল্পনা-রচয়িতাদের। আর সরকার ক্রমাগত ডিজেলের উপর শুল্ক বাড়াইয়া সে ভুলের জন্য জনসাধারণের উপর চাপ দিতেছেন। এই সব অ-প্রত্যক্ষ-করের জন্য সংসার খরচ যে আরও বৃদ্ধি পাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রাজস্ব ও রাজস্ব-বহির্ভূত দুইটি খাত মিলাইয়া ঘাটতি ব্যয় সংকুলানের জন্য অর্থ-সচিব আগামী বৎসর ১৫৩ কোটি টাকার ফালতু নোট ছড়াইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই টাকাটাও বাজার ফাঁপাইয়া তুলিয়া দর চড়াইবার অনুকূল অবস্থাই সৃষ্টি করিবে। সরকার কি এদিক দিয়া একবারও চিন্তা করেন নাই? ইহাতেও ক্ষতি ছিল না, যদি বাজার ফাঁপাইয়া তুলিয়া দর ন্যায্য স্তরে রাখিবার জন্য সরকার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিতেন। তাহা পারিতেছেন না বলিয়াই এই বিভ্রাট।

অন্যদিকে ব্যয়ের খাতে অপব্যয় ও অপচয়—যাহাকে সহজ বাংলায় "পাচার" বলে—নিবারণ করা ত দূরের কথা, সঙ্কোচনের চেষ্টাও দেখা যাইতেছে না। পরিণতি যে কি হইবে সে কথা কেহই ভাবে না। গ-স

উপেক্ষিত পশ্চিমবঙ্গ

সোভিয়েট রাশিয়া ভারতকে ভেষজ ও ভেষজের উপাদান উৎপাদনের ব্যাপারে স্বাবলম্বী করিবার জন্য আট কোটি রুবল অর্থাৎ নয় কোটি টাকা সাহায্য করিবে—একথা সকলেই শুনিয়াছেন। এই টাকায় ভারতে পাঁচটি কারখানা স্থাপন করা হইবে, একথাও কাহারও অজ্ঞাত নয়। এই কারখানাগুলির একটিতে পেনি-সিলিন, ষ্ট্রেপটোমাইসিন প্রভৃতি এ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষধ, একটিতে যৌগিক ঔষধ ও উহার উপাদান, একটিতে ভেষজ গাছ-পালা হইতে উৎপাদনযোগ্য ঔষধ, একটিতে জীবজন্তুর শিরা রক্ত প্রভৃতি হইতে ইনসুলিন জাতীয় ঔষধ এবং আর একটিতে অস্ত্রো-পচারের জন্য প্রয়োজনীয় বার রকম যন্ত্রপাতি তৈয়ার হইবে স্থির হয়।

উক্ত পরিকল্পনা গৃহীত হইবার পর গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে এই সম্পর্কে মস্কোতে ভারত ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় এবং চুক্তি অনুযায়ী একটি সোভিয়েট বিশেষজ্ঞ দল ভারতে আসিয়া তথ্যানুসন্ধানের পর ভারত সরকার কারখানার জন্য কোন্ কোন্ স্থান উপযুক্ত, সে বিষয়ে সুপারিশ করিতে একটি কমিটি গঠন করেন।

বর্ত্তমানে ভারত সরকার এই কমিটি-রিপোর্ট অনুযায়ী স্থান নির্ব্বাচন করিয়াছেন—পেনিসিলিন ইত্যাদি উৎপাদনের কারখানা উত্তর প্রদেশের হৃষিকেশে, যৌগিক ঔষধ ও তাহার উপাদান উৎ-পাদনের কারখানা অন্ধ্রের সনৎনগরে, ভেষজ গাছপালা হইতে উৎপাদনযোগ্য ঔষধের কারখানা কেরলের কোনও একস্থানে, অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি তৈয়ারের কারখানা মাদ্রাজ শহরের নিকট-বর্ত্তী একস্থানে এবং শিরা-গ্রন্থি-রক্ত ইত্যাদি হইতে উৎপাদনযোগ্য ঔষধের কারখানার একটি শাখা কলিকাতা ও একটি শাখা বোম্বাইয়ে স্থাপিত হইবে। এই পাঁচটি কারখানার প্রয়োজনীয়

বিবিধ ভেষজ সরঞ্জাম উৎপাদনের উদ্দেশ্যে আর একটি কারখানা স্থাপনের জন্য ভারত সরকার পশ্চিম জার্মানীর বেয়ার কোম্পানীর সহিতও একটি চুক্তি করিয়াছেন। এই কারখানাটি বোম্বাইয়ের থড়পদ নামক স্থানে স্থাপিত হইবে স্থির হইয়াছে।

ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্তে বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না। এই স্থান নির্ব্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের কথা একবারও মনে পড়িল না, ইহাই আশ্চর্য্য! অথচ এই জাতীয় কারখানা তৈয়ারীর উপযুক্ত স্থান পশ্চিমবঙ্গ। কেননা, ভেষজ-শিল্পে পশ্চিমবঙ্গের একটা বিশেষ ঐতিহ্য রহিয়াছে। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে যখন এদেশে কয়েকটি কাপড়ের কল ও অন্যবিধ দুই-চারিটি শিল্প ছাড়া অন্য শিল্প ছিল না, সেই সময়েই পশ্চিমবঙ্গে একাধিক ভেষজ কারখানা স্থাপিত হয় এবং সেদিন পর্য্যন্ত এই সব প্রতিষ্ঠান প্রায় একচেটিয়া ভাবে সমগ্র ভারতে সুনামের সহিত বহুসংখ্যক ভেষজ সরবরাহ করিয়াছে। বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গ ও উহার সন্নিহিত আসাম রাজ্যে ভেষজ প্রস্তুতের উপযোগী কয়লা হইতে উদ্ভূত রাসায়নিক দ্রব্য এবং ইপিকাক, জার্গট, ডিজিটালিশ ইত্যাদি ভেষজ উৎপাদনের গাছ-গাছড়ার অভাব নাই। পশ্চিমবঙ্গে আফিমজাত ঔষধ, চা-জাত কেফিন ও গ্রন্থিজাত ঔষধ উৎপাদনেরও প্রচুর সুযোগ রহিয়াছে। এই রাজ্যের ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প এত উন্নত যে, এখানে অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের সুযোগেরও কোন অভাব নাই। মোটের উপর পশ্চিমবঙ্গে ভেষজ ও অস্ত্রোপচারের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি উৎপাদনের এত সুযোগ রহিয়াছে যে, সোভিয়েট রাশিয়ার সাহায্যে পরিকল্পিত পাঁচটি এবং জার্ম্মাণীর বেয়ারের সাহায্যে পরিকল্পিত একটি কারখানার প্রত্যেকটিই এই রাজ্যে সাফল্যের সহিত পরিচালিত হইতে পারিত। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, ভেষজ প্রস্তুতের এই রাজসূয়-যজ্ঞে পশ্চিমবঙ্গকে কোন স্থানই দেওয়া হয় নাই। একমাত্র শিরা, গ্রন্থি ও রক্ত হইতে ঔষধ উৎপাদনের কারখানার একটি ক্ষুদ্র ও অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় শাখা কলিকাতায় স্থাপিত হইবে স্থির হইয়াছে। উহা উল্লেখযোগ্য কিছুই নহে। এই অবস্থার কারণ কি তাহা আমরা অনুধাবন করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। ভারত সরকার ভেষজ শিল্পের স্থান নির্ব্বাচনে যে কমিটি গঠন করিয়াছিলেন, তাহার পাঁচ জন সদস্যই অবশ্য ভারতবাসী কিন্তু তাহার মধ্যে কেহ বাঙালী নাই। অথচ বাঙালীর মধ্যে চিকিৎসা-বিদ্যা ও ভেষজ-শিল্পে খ্যাতনামা ব্যক্তির অভাব ছিল না। উঁহাদের মধ্যে একজনকেও ভেষজ-শিল্পের স্থাননির্ব্বাচন-কমিটিতে স্থান দেওয়া হয় নাই। উহা কোন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যাপার ছিল কি? নচেৎ পশ্চিমবঙ্গ এই শিল্প হইতে একেবারে বঞ্চিত হইল কেন? এখন পর্য্যন্ত কেরলে কোন উপযুক্ত স্থানের সন্ধান পাওয়া যায় নাই—উহা সত্ত্বেও গাছগাছড়া হইতে উৎপাদনযোগ্য ঔষধ প্রস্তুতের কারখানার স্থান কেরলের 'কোনও উপযুক্ত স্থানে' হইবে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সব কথার কে জবাব দিবে? এই ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কি কোন দায়িত্বই ছিল না? বরং দেখা গিয়াছে তাঁহারা বরাবরই নিশ্চেষ্ট ছিলেন।

যেদিক দিয়াই হউক, ব্যাপারটি পশ্চিমবঙ্গের দিক হইতে অত্যন্ত দুঃখজনক। পশ্চিমবঙ্গের বৃহৎ শিল্পে সুবিদিত কারণে বাঙালীর বড় একটা কর্ম্মসংস্থান হয় না। সেক্ষেত্রে এই রাজ্যে কারখানাগুলি স্থাপিত হইলে বাঙালীর কর্ম্মসংস্থানের পথ অনেকটা সুগম হইতে পারিত। বরং দেখা যাইতেছে, যে সব শিল্প স্থাপনে পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে, সেই সব শিল্পও পশ্চিমবঙ্গে স্থাপিত হইতেছে না। একথা কেবল ভেষজ-শিল্প সম্বন্ধেই সত্য নয়, অন্যান্য অনেক শিল্প সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। ভারত সরকার বর্ত্তমানে দেশে কয়লাভিত্তিক রং ও রঞ্জনদ্রব্য উৎপাদনের জন্য একটি বৃহদাকার কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। ইস্পাত উৎপাদনের জন্যও কারখানা স্থাপিত হইতেছে। প্লাষ্টিকজাতীয় দ্রব্য উৎপাদন নিমিত্ত দেশে আর একটি বড় কারখানা স্থাপনের তোড়জোড় চলিতেছে। এ সব কারখানা অনায়াসে পশ্চিমবঙ্গে স্থাপিত হইতে পারে। কারণ পশ্চিমবঙ্গে কয়লা ইস্পাত, প্লাষ্টিকের কাঁচামাল ইত্যাদি কিছুরই অভাব নাই। কিন্তু কোথাও পশ্চিমবঙ্গের নাম করা হইতেছে না। ইহা কি অজ্ঞতা—না ইচ্ছাকৃত উপেক্ষা?

যে কারণেই হউক, বর্ত্তমানে এই অবস্থার অবসান হওয়া বাঞ্ছনীয়।

গ-স

পশ্চিম বাংলার বাজেট-বিশ্লেষণে মুখ্যমন্ত্রী

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট বাহির হইবার পূর্ব্বে যেরূপ আশঙ্কা করা গিয়াছিল, বাহির হওয়ার পরে দেখা গেল ইহাতে ভয় পাইবার কিছু নাই। গত বর্ষার পর এই রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্যাপিয়া একটা ভয়াবহ বিপর্য্যয় ঘটিয়া গিয়াছে এবং বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে জনসাধারণের একটি বৃহৎ অংশ শোচনীয় দুর্দ্দৈব ভোগ করিতেছে। খাদ্য এবং অন্যান্য নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যের দর ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকায় সাধারণ লোকের অবস্থা উত্তরোত্তর শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। উপার্জ্জনের ক্ষেত্রও প্রসারিত হইতেছে না। ধান-চাউলের দর এখনই যে স্তরে উঠিয়াছে, তাহাতে পরে—স্বাভাবিক টানাটানির সময় অবস্থা কি দাঁড়াইবে তাহা কল্পনা করাও যায় না। এত প্রতিকূল উপসর্গ সত্ত্বেও রাজকোষে আর্থিক অবস্থার যে অবনতি ঘটে নাই, ইহাই সান্ত্বনা। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় অনুমান করিয়াছিলেন যে, রাজস্ব খাতে ৩ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে। সেক্ষেত্রে সংশোধিত বাজেটে ৪ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্তের ভরসা দিয়াছেন। এবং আগামী বৎসরের মূল বাজেটে রাজস্ব খাতে ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি অনুমান করিয়াছেন। রাজস্ব খাতের বাহিরে আয় ও ব্যয় মিলাইয়া চলতি বৎসরের মূল বাজেটে মোট ৪৮ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্তের স্থানে এখন সংশোধিত হিসাবে ৭ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত ধরা হইয়াছে। ইহা

সম্পূর্ণই আগের বৎসরের উন্নয়ন-পরিকল্পনা বাবদ বকেয়া বরাদ্দের জের। আগামী বৎসর এ ধরনের বিলম্বিত বরাদ্দ জুটিবার কোন সম্ভাবনা এখনও নাই। সেজন্য রাজস্ব খাতের বাহিরে ব্যয় মিলাইয়া মোটের উপর ২ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে। বর্ষারম্ভে মজুত তহবিল হইতে তাহা পূরণের পরেও ১৯৬১ সনের ১লা এপ্রিল পর্য্যন্ত ৫ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা মজুত থাকিবে। তবে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাজ্যসরকারের কর্ম্মচারীদের বেতন, ভাতা প্রভৃতি পুনঃবিবেচনার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছে। ইহাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে, বাজেটের পরিবর্ত্তন ঘটিবে।

রাজ্য সরকারের অর্থকৃচ্ছ্রতা সুস্পষ্ট। তাহার উপর অতিরিক্ত অর্থের চাপও নানাদিক হইতে আসিয়া পড়িয়াছে। নূতন নূতন স্কীম রূপায়ণের জন্য সমগ্র বা আংশিক ব্যয় বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য করিলেও, সেগুলি সম্পূর্ণ হওয়ার পর রাজ্য সরকারকেই একমাত্র দায়িত্ব বহন করিতে হয়। এই কারণেই প্রথম পরিকল্পনার সমাপ্ত স্কীমগুলি চালু রাখার জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে রাজ্য সরকারের উপর বার্ষিক ৬½ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয়ের চাপ পড়িয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় প্রবর্ত্তিত স্কীমগুলির জন্য ইহা ছাড়া মোট আরও ১৮ কোটি টাকা অতিরিক্ত চাপ পড়িয়াছে। এবং তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে এই বাবদ মোট ৭০ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয়ের চাপ পড়িবে। এই বিরাট ব্যয়ের বিনিময়ে এখন পর্য্যন্ত আয় কতটা বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিংবা জীবনযাত্রার কতটুকু উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহার কোন হদিস মুখ্যমন্ত্রী দেন নাই। বৎসরের পর বৎসর বাজেটে পরিকল্পনার জন্য মোট বরাদ্দ, তন্মধ্যে কত খরচ হইয়াছে এবং আর কত খরচ করিতে হইবে, তাহার বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণ আর্থিক অবস্থার কতটা উন্নতি ঘটিয়াছে কিংবা কতদিনে উন্নতি ঘটিবে, সে সম্পর্কে কোন ধরা-ছোঁওয়া নাই। পরিকল্পনার জন্য অর্থ ব্যয় করাই যেন মূল লক্ষ্য। প্রতিদান কতটুকু পাওয়া গিয়াছে, তাহার হিসাব-নিকাশ করিবার প্রয়োজনও নাই—বোধ হয় উহা অবান্তরও। অবশ্য একদিন ইহার সুফল দেখা যাইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই আশায় মানুষ আর কতকাল প্রতীক্ষা করিবে?

তবে সুখের বিষয়, মুখ্যমন্ত্রী জানাইয়াছেন, এত ব্যয়ভার চাপা সত্ত্বেও, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় সাধারণের উপর এবারে কোন করই চাপান হইবে না। সংবাদটি শুভ। জনসাধারণ ইহাতেই খুসী হইবে।

গ-স

দরিদ্র দেশে মন্ত্রীদের বিলাস

আমাদের দরিদ্র দেশ। কিন্তু মন্ত্রীদের আরামের বিবিধ উপকরণ ও দেশভ্রমণের জাঁকজমক দেখিয়া, কে বলিবে ভারতবর্ষ গরীবের দেশ। ইংরেজ চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু ইংরেজী আদব-কায়দা আজও আমরা ত্যাগ করিতে পারি নাই। সেই সেলামি-মোহ, পদানুযায়ী মর্য্যাদা রক্ষার প্রয়াস, ট্রেনে 'সেলুন' ব্যবহার এবং সর্ব্বপ্রকার বৈশিষ্ট্য রক্ষায় যত্নশীল মন্ত্রীরা সর্ব্বসাধারণ হইতে নিজেদের পৃথক করিয়া লইয়াছেন। শুনা যাইতেছে, কেন্দ্রীয় সরকার মন্ত্রীদের এই জাঁকজমক কমাইবার জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

অবশ্য রেল-পথে যাতায়াতকালে মন্ত্রীগণ যাহাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন তাহার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। তবে প্রয়োজনটা যুক্তিসঙ্গতপরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্যের, মন্ত্রিত্ব-পদমর্য্যাদা জাহির করিবার অনুরূপ নয়। সর্ব্বক্ষেত্রে না হইলেও, প্রায় অনেক ক্ষেত্রে সেকালের বাদশাহী বিলাস, ইঁহাদের ভোগাড়ম্বরের তুলনায় খুব বেশী ভিন্ন ছিল না।

কেন্দ্রীয় সরকার সেইদিকেই কটাক্ষ করিয়াছেন। এবং রেলওয়ে সেলুন ব্যবহার, সামরিক কায়দায় সেলাম ও সম্বর্দ্ধনা দান ইত্যাদি ব্যাপারে আড়ম্বর কমাইবার কথাও ঐ সঙ্গে বলিয়াছেন। এই ব্যবস্থা অনেককাল আগেই করা যাইত। বহু তিক্ত এবং তীক্ষ্ণ বিরূপ সমালোচনা শুনিবার পর কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন। বিলম্বে হইলেও, দৃষ্টি যে পড়িল ইহাই সুখের কথা। যতই বকুন, মনে হয় রাজধানী দিল্লীর সর্ব্বোচ্চ মহলে জাঁকজমকের প্রতি সংগুপ্ত অনুরাগ সহজে যাইবার নয়।

এই প্রসঙ্গে এই মাসের 'আনন্দবাজার' পত্রিকা তাঁহার সম্পাদকীয় কলমে একটি মজার কথা বলিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, "গ্ল্যাডষ্টোন ছিলেন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমলে ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত প্রধানমন্ত্রী। তিনি রেলে যাতায়াত করিতেন সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে। শোনা যায় তিনি বলিতেন ট্রেনে আরও নিচু ক্লাস থাকিলে তাহাতেই যাতায়াত করিতাম। আমাদের দেশের মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অতটা আশা করি না,... গ্ল্যাডষ্টোন সম্পর্কে লোকে বলিত, 'উপরে অক্সফোর্ডের অর্থাৎ বিদ্যার পালিশ, কিন্তু ভিতরে লিভারপুল অর্থাৎ পুরাপুরি ব্যবসায়ী মন।' আমাদের ক্ষমতাধর জাতীয় নেতারা, স্বাধীনতালাভের পর যাঁহাদের বারো বৎসর লাগিতেছে আড়ম্বরপ্রিয়তার সংক্রামক মোহ কাটাইতে তাঁহাদের সম্পর্কে লোকে কি বলিবে? উপরে গান্ধীবাদী আদর্শের পালিশ, ভিতরে ওমরাহী বিলাসবাসনা?"

গ-স

উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় নূতন সঙ্কট

কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে, ইঁহাদের জন্য শিক্ষার আয়োজন বাড়াইতে হইবে। কিন্তু আয়োজন নামমাত্র হইলে কোনও উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইবে না। উচ্চশিক্ষার মান দ্রুত অবনতির দিকে যাইতেছে, ইহার প্রধান কারণ কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অত্যধিক ভিড়। এই ভিড় কমাইতে হইলে কলেজের সংখ্যা বাড়াইতে হইবে এবং প্রত্যেক কলেজে ছাত্র-ভর্ত্তির সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা বাঁধিয়া দিতে হইবে। এবং কলেজের সংখ্যা শুধু বাড়াইলেই চলিবে না। উচ্চশিক্ষার আদর্শ

অনুযায়ী পুনর্বিন্যাসে প্রথম প্রয়োজন কলেজগুলিকে ভিতরে বাহিরে ঢালিয়া সাজানো এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর জন্য নূতন নূতন কলেজ স্থাপন। সংখ্যাগত নয়, গুণগত উৎকর্ষের দিকে লক্ষ্য রাখা উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে সবচেয়ে বেশী দরকার।

এইজন্যই মনে হয় কেবল কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেই ছাত্র-ভর্তির সমস্যা মিটিয়া যাইবে না। কারণ উচ্চশিক্ষার্থীর সংখ্যা বৎসরে বৎসরে যে হারে বাড়িয়া চলিয়াছে—তাহার সহিত সমান-তালে কলেজের সংখ্যা বাড়াইতে পারা অসম্ভব। কেবল অসম্ভব নয়, ক্ষতিকরও। যেমন-তেমন কলেজ খুলিয়া গুণ ও যোগ্যতা বিচার না করিয়া হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীকে উচ্চশিক্ষার কলে জুড়িয়া দিলে সমাজ অথবা শিক্ষার্থী কাহারই লাভ হইতে পারে না। উচ্চশিক্ষা যে বর্তমানে গভীর হতাশা ও অশ্রদ্ধা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার একটি কারণ উচ্চশিক্ষার নামে যাহা চলিতেছে, বলিতে গেলে তাহা একটি প্রহসন। সকলের পক্ষেই কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ প্রয়োজন নয়—সকলেই উচ্চশিক্ষা লাভের যোগ্য নয়, একথা আমাদের দেশে লোকে সহজে বুঝিতে চাহে না। অবশ্য তাহার কারণও আছে। ডিগ্রী না হইলে, আমাদের দেশে কোনো চাকুরিই মিলিবে না—মোহ সেইখানেই। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত অযোগ্যের ভিড় কমাইতে হইলে, এই সব দিক বিবেচনা করা কর্তব্য।

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন এই ভিড় কমাইবার জন্য যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার নীতিগত যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। স্কুল হইতে পাস করিয়া সব ছাত্রছাত্রীকে নির্বিচারে কলেজে ভর্তি হইবার অবাধ সুযোগ দিবার যে বর্তমান রীতি, ইহার পরিবর্তন সাধন। কমিশন প্রস্তাব করিয়াছেন, কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহারা উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে চায়—প্রথমে তাহাদের গুণগত যোগ্যতার একটি মান নির্দিষ্ট করা কর্তব্য। এই মান অনুযায়ী পরীক্ষা করিয়া কেবলমাত্র যোগ্য ছাত্রছাত্রীকেই উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ দেওয়া উচিত। এক কথায়, কমিশন উচ্চশিক্ষার সুযোগ সঙ্কোচনের প্রস্তাব করিয়াছেন। কমিশন অবশ্য ইহা সদুদ্দেশ্যেই করিয়াছেন। তবে ইহার সহিত দেশের অসংখ্য তরুণবয়স্ক শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জড়িত। গুণ ও যোগ্যতা বিচারে যাহারা কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার সুযোগ হারাইবে—তাহাদের সংখ্যা নেহাৎ কম হইবে না, তাহারা করিবে কি? যাইবেই বা কোথায়?

এই সব ছাত্রছাত্রীর জন্য কি কোন ব্যবস্থা করা হইয়াছে? কলেজী শিক্ষার উপর যে প্রচণ্ড চাপ পড়িয়াছে তাহা অবাঞ্ছিত এবং তাহা নানা ভাবে ক্ষতিকর স্বীকার করি। চাপ কমাইবার এক উপায় উচ্চশিক্ষার প্রতি এই সার্বজনীন ঝোঁক কমান। কিন্তু তাহার জন্য প্রয়োজন, নানা রকম বৃত্তিকরী, ব্যবহারিক, বাণিজ্যিক ও কারিগরি শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ। কমিশনও অবশ্য সেই কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু কথা হইল, উচ্চশিক্ষার সুযোগে বঞ্চিত ছাত্রছাত্রীদের জন্য কার্যকরী শিক্ষার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা সমানতালে অগ্রসর হওয়া চাই। নহিলে বিড়ম্বনা ত বাড়িবেই বরং কঠিন সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হইবে।

ব্রিটেনে স্কুলের সাধারণ শিক্ষা সমাপ্ত করিবার পর শতকরা মাত্র তিন জন ছাত্রছাত্রী কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায়। কিন্তু তাই বলিয়া বাকি ছাত্রছাত্রীর জীবন ব্যর্থ হয় না। তাহাদের জন্য বিবিধ ব্যবস্থা সেখানে বর্তমান। আমাদের দেশেও যাহারা উচ্চশিক্ষা পাইবে না, তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শিক্ষানীতি বিধায়কগণ ও রাষ্ট্রকর্তাদের সহানুভূতির সঙ্গে ভাবিতে হইবে। গ-স

পুস্তকের ভারে শিক্ষা-মানের অবনতি

উঁচু ক্লাসের ছেলেদের কথা ছাড়িয়া দিলাম। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীরা যে অযথা পুস্তকের ভারে শুধু বিব্রত নহে, নিপীড়িত হয় এ কথা দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে যাঁহারা চিন্তা করেন, তাঁহারাই অনুভব করেন। পাঠ্যপুস্তকের এইরূপ বাহুল্য থাকিলে প্রকাশকদের রুজি-রোজগারের সুবিধা হয় বুঝিতে পারি, কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ ছাত্র-ছাত্রীদের পুস্তকভারে প্রপীড়িত করিয়া তাহার কি হিত বা স্বার্থসাধন করেন, সে রহস্য প্রতি অভিভাবককেই ভাবাইয়া তোলে। পূর্বে বড় ভাই যে বই পড়িত, ছোট ভাই সেই শ্রেণীতে উঠিলে সেই সব বই-ই পাঠ্য হিসাবে পাইত। তাহাতে অভিভাবকের বহু অর্থ বাঁচিয়া যাইত। এখন সে সব ত অতীতের কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। কোন ছাত্র পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইয়া কোন শ্রেণীতে থাকিয়া গেলে, তাহাকেও আবার একগাদা নূতন বই কিনিতে হয়। অথচ সকলেই জানেন যে, পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট পুস্তকগুলির অতি সামান্য অংশই বিদ্যালয়ে পড়ান হইয়া থাকে। আর পরিবর্তিত বইগুলি মানের দিক দিয়া উন্নত ত নয়ই, বরং নিকৃষ্ট শ্রেণীর। তথাপি পরিবর্তিত হইতেছে। এই ভাবে বৎসরের পর বৎসর চলিতেছে, শিক্ষা বিভাগ চোখ বুজিয়া রহিয়াছেন, অভিভাবকেরা অসহায় ভাবে শ্রমার্জ্জিত অর্থ, বলা চলে একরূপ জলেই ফেলিতেছেন। এ সব বিষয়ে অভিযোগেরও অন্ত নাই। কিন্তু কে কাহার কথা শোনে। উঁহারা যাহা করিবার তাহা করিবেনই।

শৈশবে অযথা পুস্তকের চাপে ক্লিষ্ট করিয়া শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের মনে বিভীষিকা সৃষ্টি করা হয় বলিয়া, এ মানাবনতি ঘটিতেছে কিনা কে বলিবে? আমরা সরকারী শিক্ষা বিভাগকে অনুরোধ করিতেছি, কাহাদের স্বার্থে দরিদ্র অভিভাবকদের অর্থের এইরূপ অপচয় ঘটান হইতেছে এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভের আগ্রহ শৈশবেই অযথা পাঠ্যগ্রন্থের চাপে নষ্ট করিয়া দেওয়া হইতেছে, তাহা তাঁহারা অনুসন্ধান করুন এবং বিভিন্ন স্বার্থের আঁতাতের ফলে যদি পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে এইরূপ যথেচ্ছাচারের প্রবর্তন হইয়া থাকে তবে কঠোর হস্তে বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করুন। গ-স

ট্রেন-ডাকাতি রোধকল্পে উত্তর-প্রদেশ সরকার

চলন্ত ট্রেনে ডাকাতির সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই ডাকাতি দমনের জন্য উত্তর-প্রদেশের সরকার নাকি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন যে, পুলিসের সংখ্যা না বাড়াইলে আর এই উৎপাত দমন করা সম্ভব হইবে না। অতএব কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর-প্রদেশ সরকারকে পুলিসের সংখ্যা বাড়াইবার জন্য অর্থসাহায্য করুন। বর্ত্তমান যুগ ধার করিয়াও অর্থবৃষ্টি করার যুগ। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার মুক্তহস্তে দানও হয়ত করিবেন। কিন্তু তাহাতে চলন্ত-ট্রেনে ডাকাতি বন্ধ হইবে কি?

উত্তর-প্রদেশে ট্রেনে-ডাকাতি কিরূপ ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে তাহা একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝা যাইবে। গত ৯ই নবেম্বর একদল সশস্ত্র ডাকাত সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ট্রেনের কামরায় প্রবেশ করে। সেই কামরায় বারজন যাত্রী ছিল, তাহাদিগকে অস্ত্র দেখাইয়া তাহাদের টাকাকড়ি, জিনিসপত্র লইয়া ট্রেনের চেন টানিয়া পলায়ন করে। ইহা ছাড়া সুটকেস, টাকা ইত্যাদি অপহরণ ত অহরহই চলিতেছে। মধ্যপ্রদেশ এতকাল ডাকাতির জন্য কুখ্যাত ছিল, এখন উত্তর-প্রদেশেও উহা সংক্রামিত হইল। এত উন্নয়ন পরিকল্পনা, সমাজ-কল্যাণ, জনসাধারণের জীবনের মানোন্নয়ন চেষ্টার মধ্যে এই চুরি, ডাকাতি, ঘুষ, দুর্নীতির প্রবাহ অদ্ভুত মনে হয় না কি? ডাকাতের দল অস্ত্রশস্ত্র লইয়া এমন সুসংবদ্ধ যে, তাহারা একটি কামরার সকল যাত্রীকে ঘায়েল করিয়া চলিয়া যায়! পুলিসের সংখ্যা কত বাড়াইলে তাহাদের দমন করা সম্ভব হইবে?

গ-স

অপরাধমূলক চিত্রের প্রদর্শন বন্ধ

তথ্য ও বেতার দপ্তরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডাঃ বি. ভি. কেশকার লোকসভার প্রশ্নোত্তরে জানাইয়াছেন যে, হত্যা, লুণ্ঠন ও রাহাজানি প্রভৃতি অপরাধমূলক ছায়াচিত্রের প্রদর্শন সরকার চলচ্চিত্র আইন অনুসারে এক বিজ্ঞপ্তির দ্বারা নিষিদ্ধ করিয়াছেন। এই নিষিদ্ধি-করণ সরকারের বহু পূর্ব্বেই করা উচিত ছিল। কারণ এই সব বিদেশী চিত্রের সাহায্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এদেশবাসীরা ঐ সব দুষ্কৃতির কলা-কৌশলে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে এবং নব নব উদ্ভাবনীর ফলে তাহারা ঐ কাজে রীতিমত পাকা হইয়া উঠিয়াছে। আজ যে দেশে বিজ্ঞানপ্রসূত পদ্ধতিতে লুণ্ঠতরাজ হইতে দেখা যায়, বিভিন্ন কৌশলে চলন্ত ট্রেনে উঠিয়া ডাকাতি করিয়া চলন্ত ট্রেন হইতেই অনায়াসে পলাইয়া যাইতে সমর্থ হইতেছে, ইহার গুরুও সেই চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্রগুলি আমাদের উপকারও যেরূপ করিতেছে, অপকার তাহা অপেক্ষা বেশী করিয়াছে। নিষ্পাপ নিষ্কলুষ কতকগুলি যুবক যুবতীর সর্ব্বনাশ করিতেছে এই সব চিত্রগুলি। আজ ইহা অনেকেই স্বীকার করিতেছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষও অনুরূপ একটি অভিযোগ করিয়াছিলেন।

ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কি ভাবে অতি সহজেই অন্যায় করা যায় এবং কি করিয়া নিরাপদে সরিয়া পড়া যায়, তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত চোখের উপর দেখিলে, অপরাধ-প্রবণ মানুষ উৎসাহ পায়। কিন্তু অপরাধের আদি প্রবণতাটি আসে কোথা হইতে? সমাজ-জীবনে যদি কর্ম্মহীন, লক্ষ্যহীন, আশা ও আদর্শহীন মানুষের ভিড় জমে এবং সঙ্গত পথে জীবননির্ব্বাহের রাস্তা যদি তাহারা খোলা না পায়, তবেই তাহারা অসঙ্গত পথকে খুঁজিয়া বাহির করে। অপরাধমূলক কাহিনী বা ছায়াচিত্র সেই অবস্থাতেই তাহাদের বিপথগামী করিতে পারে। অশ্লীল সাহিত্যও ঠিক একই কারণে তাহাদের আকর্ষণ করে।

সুতরাং সমাজকে সুস্থ করাই প্রথম কর্ত্তব্য। 'তাড়ি' বন্ধের জন্য তালগাছ না কাটিয়া, যে কারণে তাড়ি চলে তাহাই অপসারিত করার প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রগণ্য। তথাপি সরকারের এ প্রচেষ্টাকে সমর্থন করা উচিত। আমরা আশা করিব, সরকারের মূল প্রচেষ্টা হইবে, অতঃপর সমাজ-জীবনকে সুস্থ করে তোলা।

গ-স

দুর্নীতির কবলে মিলজাত বস্ত্র

কাপড়ের দাম উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই দর বৃদ্ধি আজ এত দূরে পৌঁছিয়াছে যে, তাহা ক্রেতাদের নাগালের বাহিরে। কারণ অবশ্যই আছে নহিলে কার্য্য হয় কি করিয়া। মিলের মালিক বলিতেছেন, সুতার দর বাড়িয়াছে। কাপড়ের এইরূপ মূল্য বৃদ্ধি দেখিয়া সরকারও কিছুটা বিচলিত হইয়াছেন দেখা যাইতেছে। তাঁহারা কাপড়ের কলগুলিকে অধিকতর পরিমাণে বস্ত্র নির্ম্মাণের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এবং ইহাও বলিয়াছেন, ছুটি বন্ধ রাখিয়া সপ্তাহে সাত দিনই কাজ চালাইয়া যাইতে এবং একাধিক শিফটে কাজ চালাইতে। মিলগুলি যাহাতে তুলার অভাবে না পড়ে, তাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট বিদেশ হইতে ৬ লক্ষ বেলের পরিবর্ত্তে ১২ লক্ষ বেল তুলা আমদানির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কিন্তু ব্যবস্থা করিলেই যে সুফল ফলিবে তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? কারণ, এদেশে প্রায়ই দেখা যাইতেছে যে, পণ্য-দ্রব্যের উৎপাদন বাড়িলেও বাজারে তাহার মূল্য ঊর্দ্ধমুখী হয়। খাদ্যশস্য, চিনি ইত্যাদির ব্যাপারে আমরা এই অবস্থা নিয়তই প্রত্যক্ষ করিতেছি। মিলজাত বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে এরূপ আশঙ্কার কারণ বুঝা যাইবে। ভারতে স্বাধীনতার পূর্ব্বে ৩৮৮টি কাপড়ের কল ছিল এবং এই সব কলে ১ কোটি টাকু ছিল। বর্ত্তমানে দেশে কাপড়ের কলের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৪৮২ এবং উহাতে টাকুর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১ কোটি ৩২ লক্ষ। এই সময়ের মধ্যে কাপড়ের কলে বস্ত্র ও সুতা উৎপাদনের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৪৮ সনে দেশের কাপড়ের কলগুলিতে ১৪৪ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড সুতা ও ৪৩১ কোটি ৯০ লক্ষ গজ বস্ত্র উৎপন্ন হয়। ১৯৫৭ সনে উহার পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৭৮ কোটি পাউণ্ড ও ৫৩১ কোটি ৭০ লক্ষ গজ। এই নয় বৎসর কালের মধ্যে কাপড়ের কলসমূহ

কোনও দিন এরূপ অভিযোগ উত্থাপন করে নাই যে, উহাতে উৎপন্ন বস্ত্র আশানুরূপ ভাবে বিক্রয় হইতেছে না এবং উহার ফলে কলে মজুত বস্ত্রের পরিমাণ বাড়িয়া যাইতেছে। ১৯৫৭ সনে ভারত হইতে ৮৪ কোটি গজ মিলবস্ত্র বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। আন্তর্জাতিক নানা কারণে ১৯৫৮ সনে উহা হ্রাস পাইয়া ৫৮ কোটি গজে পরিণত হয়। উহাও মিলসমূহের উপরোক্ত ধুয়া তুলিবার অন্যতম কারণ ছিল। এই সব দেখাইয়া ১৯৫৮ সনে মিলসমূহ ১৪৪ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ডের বেশী সূতা এবং ৪৩১ কোটি ৯০ লক্ষ গজের বেশী বস্ত্র উৎপাদন করে নাই। কিন্তু ১৯৫৯ সনে ভারত হইতে বিদেশে মিলজাত বস্ত্রের রপ্তানি বৃদ্ধি পায় এবং দেশের অভ্যন্তরেও মিলজাত বস্ত্রের অধিক চাহিদা দেখা দেয়। এ দিকে দেশে তুলার উৎপাদন কম হওয়ার জন্য স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ বাজারে এরূপ রটাইয়া দেয় যে, অদূর ভবিষ্যতে দেশে মিলজাত বস্ত্রের একটা দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। এই সুযোগে মজুতদার শ্রেণীর ব্যক্তিগণ অনেক বস্ত্র মজুত করিয়া ফেলে। এই সব কারণেই দেশে মিলবস্ত্রের দর শতকরা ৪০ ভাগ পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এ রিপোর্ট আমরা ২৫শে ফেব্রুয়ারীর 'আনন্দবাজার পত্রিকা' হইতে পাইতেছি।

এখন কথা হইতেছে, দেশে মিলজাত বস্ত্রের উপযুক্তরূপ চাহিদা থাকা সত্ত্বেও কলওয়ালারা বস্ত্রের ও সূতার উৎপাদন কমাইয়া দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবে কেন? প্রথমে তাহারা আপত্তি তুলিয়াছিল অতিরিক্ত উৎপাদন শুল্কের বিরুদ্ধে। গবর্ণমেণ্ট শুল্কের পরিমাণ কমাইয়া দিলেও, কলওয়ালারা সন্তুষ্ট হয় নাই। তাহারা সরকারকে জব্দ করিবার জন্য কলে উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ কমাইয়া দেয়। ইহাতে তাহাদের ক্ষতি হয় নাই। উৎপাদন কম হইলেও, মূল্য বাড়াইয়া সে ক্ষতি তাহারা পূরণ করিয়া লইতেছে।

সুতরাং খাদ্যশস্য, চিনি প্রভৃতির ন্যায় বাজারে বস্ত্রের যে অভাব ও দুর্মূল্যতা দেখা দিয়াছে তাহা বস্ত্রের অভাবজনিত নয়—চাউল, চিনির মতই সে অভাব মনুষ্যসৃষ্ট। এই সমস্যার সমাধান না হইলে কলে বস্ত্রের উৎপাদন বাড়িলেই বা কি কমিলেই বা কি! অন্য দিক দিয়া গবর্ণমেণ্ট যত চেষ্টাই করুন, এই সব ফাটকাবাজী, দুর্নীতি প্রভৃতি কঠোর হস্তে দমন করিতে না পারিলে, আসল সমস্যার সমাধান কোনদিনই হইবে না।

গ-স

অপচয় বিষয়ে অজ্ঞতা, না উদাসীনতা?

বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা কেন্দ্রের ডিরেক্টর জেনারেল অধ্যাপক এম. এস. থ্যাকার ভারতীয় শিল্পে অপচয় সম্বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য কথা বলিয়াছেন। বলিয়াছেন, মাত্র চামড়া-শিল্পে যে পরিমাণ সহ উপাদানের অপচয় ঘটিয়া থাকে তাহার সদ্ব্যবহার হইলে বৎসরে ৩৫ কোটি টাকা আয় বৃদ্ধি পাইতে পারে। ইহা চামড়া শিল্পে বার্ষিক উৎপাদনের দ্বারা অর্জ্জিত মূল্যের সমান। কেবলমাত্র চামড়া নহে, অন্যান্য শিল্পেও এই একই অবস্থা চলিতেছে। আখের রস বাহির করিয়া লওয়ার পরে ছিবড়াগুলি চিনি-কলে পোড়ান হয়। ইহা হইতে 'নিউজ-প্রিণ্ট' ও 'পিজবোর্ড' তৈয়ারি করা সম্ভব। ভারতে একটি কলে 'পিজবোর্ড' তৈয়ারী হইতেছে। 'নিউজ প্রিণ্ট' তৈয়ারীর জন্য আর একটি কল স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য কলে এখনও এ ধরনের চেষ্টা সুরু করে নাই। আখের রস জ্বাল দিয়া চিনি তৈয়ারীর পরে যে মাতগুড় পড়িয়া থাকে, তাহা দিয়া কৃত্রিম সুরা-সার প্রস্তুত করিলে অতিরিক্ত আয় হয়। কয়েকটি কলে সেরকম ব্যবস্থা আছে, কিন্তু অধিকাংশ কল এ বিষয়ে উদ্যোগীও হয় নাই। সাবান-কারখানায় অপচিত গাদ হইতে গ্লিসারিণ প্রস্তুতের ব্যবস্থা থাকিলে, মূল উৎপাদন সাবানটি পড়তা খরচে বিক্রয় সত্ত্বেও গ্লিসারিণ হইতে প্রভূত মুনাফা অর্জ্জন করা সম্ভব।

বিদেশে বড় বড় সাবান-কোম্পানী এই ভাবেই পড়তা খরচ কমাইয়া থাকে। ঘানিতে তৈল পিষিয়া লওয়ার পরে খইলের মধ্যে যথেষ্ট তৈল পড়িয়া থাকে। যন্ত্রের সাহায্যে উহা পিষিয়া লওয়ার ব্যবস্থা হইলে তৈলের অভাব আংশিক পরিমাণে হ্রাস পাইত। নানা দিক দিয়া এদেশে কত অপচয়ই যে হইতেছে তাহার কোন হিসাব নাই। মাদ্রাজের শিল্প ও শ্রমসচিব আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, যে দেশ যত বেশী দরিদ্র, সে দেশে অপচয়ের পরিমাণও তত বেশী।

কিন্তু এ অপচয় হয় কেন? হয় তাঁহারা এ সব বিষয়ে অনভিজ্ঞ, কিম্বা জানিয়া শুনিয়াও সর্ব্ব বিষয়ে উদাসীন। দেশের দুর্ভাগ্য এই যে, গরীব গৃহস্থের মাথায় কাঁঠাল ভাঙিয়া চড়া দরে বাজে মাল চালাইবার সুযোগ সুবিধা এদেশে যেমন আছে অমনটি সারা পৃথিবীতে নাই। যদি খোলাবাজারে মুনাফা যথেষ্ট না হয় তবে কালোবাজারের পথ ত খোলাই আছে। অন্য দিকে শ্রমিক ইত্যাদি দলবদ্ধ যাঁহারা আছেন তাঁহারাও এই মুনাফার অংশ পাইয়া চুপ করিয়া থাকেন। যদি প্রতিযোগিতার বাজারে মাল বেচিতে হইত তবে সকল পক্ষেরই হুঁস হইত।

গ-স

মরক্কোতে ভয়াবহ ভূমিকম্প ও জলোচ্ছ্বাস

গত ১লা মার্চ মরোক্কোতে প্রবল ভূকম্পন ও জলোচ্ছ্বাসের ফলে সমগ্র শহরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। শুনা যাইতেছে, এই দুর্ঘটনায় প্রায় দশ সহস্র লোক নিহত এবং বহু ব্যক্তি আহত হইয়াছে। আহত ব্যক্তিদের আগাদীর বিমানঘাটিতে লইয়া যাওয়ার কথাও শুনা গিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণের দিক দিয়া ইহা স্মরণ-কালের ইতিহাসের বৃহত্তম ভূমিকম্পের ঘটনাগুলির অন্যতম। প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা হিসাবে ভূমিকম্প শুধু তাহার আকস্মিকতার জন্য নহে, তাহার প্রচণ্ড ধ্বংসকারিতার জন্য ভয়াবহ! ইহা এমনই এক বিপর্য্যয় যাহা নিরোধ করিবার এবং যাহার সম্ভাবনা এড়াইবার

কোন বৈজ্ঞানিক উপায় মানুষের পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব হয় নাই। কোথায় এবং কবে ভূমিকম্প কতখানি প্রচণ্ডতা লইয়া আত্মপ্রকাশ করিবে, তাহা সঠিক করিয়া বলিবার ক্ষমতা বিজ্ঞানেরও হয় নাই। সুতরাং সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় এবং অসহায়ভাবে ভূমিকম্পের আঘাতের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে হয়। এইরূপ ভূমিকম্প জাপানে বহুবার হইয়া গিয়াছে। উত্তর বিহার এবং কোয়েটার ভূমিকম্পেও ভারতকে অজস্র প্রাণহানি এবং ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছিল।

ক্ষতি, ক্ষতিই। এবং যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। তবে মরক্কোর এই ক্ষতি যেন তাহার জাতীয় দুর্গতিতে পরিণত না হয়, সে বিষয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জেরও কিছুটা নৈতিক দায়িত্ব আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়।

গ-স

আবার গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে দুর্ঘটনা

বর্দ্ধমানের নিকট শক্তিগড় অঞ্চলে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর এক ভয়াবহ মোটর দুর্ঘটনায় বর্দ্ধমান মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার শ্রীসন্তোষকুমার খান সহ মোট চার জন আরোহীর মৃত্যু হইয়াছে। একখানি ধাবমান লরীর ধাক্কায় তাঁহাদের প্রাইভেট গাড়ীখানি চূর্ণ হইয়া যায়। একটি বালক ঘটনাস্থলেই মারা যায়। অবশিষ্ট লোকেরা কেউ হাসপাতালের পথে, কেউ-বা সেখানে পৌঁছাইয়া মারা যান। ঘটনাটি যেমনই দুঃখের তেমনই আতঙ্কজনক। প্রকাশ্য দিবালোকে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের মত রাস্তার উপর এই ঘটনা ঘটিতে দেখিয়া সকলেই নিশ্চয় অবাক হইবেন। কিন্তু অবাক হইবার কিছুই নাই। এরূপ ঘটনা গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে হামেশাই ঘটিতেছে, এবং এই দুর্ঘটনা ঘটিতেছে একমাত্র লরী হইতে। এই লরীগুলি খাস কলিকাতার পথেই প্রায় উন্মত্ত ষাঁড়ের মত দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়া দৌড়ায়—ফলে যাহা হইবার তাহা হইতেছে। আর কলিকাতার এলাকা ছাড়াইলে ইহাদের বেপরোয়াভাব যে কতগুণ বাড়ে তাহা বলিবার নয়। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, দেশে আজ এমন এক নৈরাশ্যজনক অবস্থা দেখা দিয়াছে যে, কোন অন্যায়েরই প্রতিকার হয় না। যে-কোন অনাচার উপদ্রব, গুণ্ডামি ও অব্যবস্থার মুখে জনসাধারণ যেন অসহায় তৃণখণ্ডের মত ভাসিয়া চলিয়াছেন। নতুবা দিনের পর দিন একই বিয়োগান্ত নাটকের পুনরাবৃত্তি হয় কি করিয়া?

গ-স

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় চাকুরির জটিল গ্রন্থিমোচন

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় বাঙালীর প্রবেশাধিকার নাই—এই বহু আলোচিত অপবাদের নিরসন হইতে চলিল। শুনা যাইতেছে, এখন হইতে দুর্গাপুরস্থ ইস্পাত কারখানার তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর চাকুরির খালি পদের জন্য স্থানীয় এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে লোক নির্ব্বাচন করা হইবে এবং এজন্য দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার জেনারেল-ম্যানেজার শ্রী কে. কে. সেনকে ভারত সরকারের তরফ হইতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহা একটি শুভ সংবাদ সন্দেহ নাই। কারণ স্থানীয় এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে উপরোক্ত শ্রেণীর চাকুরিতে লোক নিয়োগ হইলে তথায় বাঙালী উপযুক্তরূপ সুযোগ-সুবিধা পাইবে।

কিছুদিন পূর্ব্বে এই বিষয়টি সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারত সরকারের নিকট তাঁহাদের দাবি জানাইয়াছিলেন এবং এই উপলক্ষেই শ্রমমন্ত্রী আবদুস সাত্তার দুইবার দুর্গাপুর ও আসানসোল গিয়াছিলেন। মনে হয়, এই চেষ্টার ফলেই দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় বাঙালীর প্রবেশপথ সুগম হইল। বাঙালীর বেকার-সমস্যার সমাধানের জন্য দুর্গাপুরে বিবিধ শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপনে পশ্চিমবঙ্গে কি প্রকার আগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বর্ত্তমানে দুর্গাপুরে কেবল ইস্পাত কারখানা নয়, আরও অনেক সরকারী ও বেসরকারী কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দুর্গাপুরের সরকারী ও বেসরকারী কোন কারখানাতেই চাকুরির ব্যাপারে আজ পর্য্যন্ত বাঙালী তাহার যথাযোগ্য স্থানগ্রহণ করিতে সমর্থ হয় নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে পশ্চিম-বঙ্গের শ্রমমন্ত্রী এ বিষয়ে দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, দুর্গাপুর অঞ্চলে শিল্পসংস্থাগুলির চাকুরিতে বাঙালী কোন সুবিচার পাইতেছে না। তাঁহার একথার অর্থ এই যে, ইতিমধ্যে এসব কারখানার চাকুরিতে বহুসংখ্যক অবাঙালী জুড়িয়া বসিয়াছে। তাহাদিগকে চাকুরি হইতে অপসারণ সম্ভবপর নহে এবং এরূপ কথা বলাও যুক্তিযুক্ত নহে। আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রথম হইতে এ বিষয়ে চেষ্টা করিলে দুর্গাপুর অঞ্চলের কারখানাগুলিতে হাজার হাজার বাঙালীর কর্ম্মসংস্থান হইতে পারিত। এখন অবশ্য অন্ততঃ দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার চাকুরিতে বাঙালী সুবিচার পাইবে মনে হইতেছে। কিন্তু এই অঞ্চলের সরকারী ও বেসরকারী অন্যান্য কারখানায় বাঙালীর চাকুরির সমস্যা এখনও অমীমাংসিতই রহিয়া গেল।

সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলাস্থ 'টায়ার' নির্ম্মাণের কারখানার পরিচালক স্থানীয় ডানলপ কোম্পানী কারখানার খালি পদে লোক নিয়োগকালে পশ্চিমবঙ্গের এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের নির্দ্দেশ মান্য করিয়া চলিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আমরা আশা করিতেছি, পশ্চিমবঙ্গের ইউরোপীয় পরিচালিত অন্যান্য শিল্প ও বাণিজ্য-সংস্থাসমূহও ডানলপ কোম্পানীর এই প্রশংসনীয় দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন।

প্রাদেশিক মনোভাবের প্রশ্রয় আমরা দিতেছি না। পশ্চিম-বঙ্গে বেকারসমস্যা বর্ত্তমানে অত্যন্ত জটিল। দেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে উহার নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতেছে। সেই জন্যই এত কথা বলিতে হইল।

গ-স

যদুনাথ সরকারের অমূল্য গ্রন্থাগার

ঐতিহাসিক আচার্য্য যদুনাথ সরকারের গ্রন্থাগারটি অমূল্যরত্নের ভাণ্ডার বিশেষ। নানা ভাষায় লিখিত দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি, মুদ্রিত গ্রন্থ, মানচিত্র ইত্যাদির সমাবেশে এই গ্রন্থাগারটি সমৃদ্ধ। আচার্য্য সরকারের ষাট বৎসরের চেষ্টায় সংগৃহীত এই গ্রন্থাগারে মোগল ও ব্রিটিশ যুগের ইতিহাসের অমূল্য আকর-গ্রন্থ ও অন্যান্য ঐতিহাসিক উপকরণাদি সংগৃহীত হইয়া আছে। মরাঠা জাতির এবং ভারতে ফরাসী ও পর্তুগীজ রাজত্বের ইতিহাসের যেসব উপকরণ এই গ্রন্থাগারে সংগৃহীত আছে তাহা শুধু মূল্যবান নহে, দুর্লভও বটে। তাহা ছাড়া ভারতের সামরিক ইতিহাস-সম্বন্ধীয় বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদিও তাঁহার সংগ্রহের মধ্যে রহিয়াছে। এক কথায় বলিতে পারা যায় যে, ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে যাঁহার অনুসন্ধিৎসা আছে তিনি আচার্য্য যদুনাথের সংগ্রহের মধ্যে জীবনব্যাপী গবেষণার উপকরণ লাভ করিতে পারিবেন। আচার্য্য-পত্নী এই অমূল্য গ্রন্থাগারটি জাতীয় গ্রন্থাগারে দান করিয়া কেবল জাতীয় গ্রন্থাগারকেই সমৃদ্ধ করেন নাই, জাতির জ্ঞানৈশ্বর্য্য সৃষ্টিরও সহায়ক হইয়াছেন, সমগ্র জাতিকে এক অসাধারণ মানুষের তপস্যার ফলভাগী করিয়াছেন। তাঁহার এই বদান্যতা জাতি চিরদিন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিবে বলিয়া আমরা মনে করি।

পরিশেষে একটি আশঙ্কার কথা প্রকাশ না করিয়া পারিতেছি না। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত দুই-একটি অমূল্য গ্রন্থাগারের পরিণাম দেখিয়াই আমাদের মনে এই আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গ্রন্থসূচী প্রণয়ন, অথবা গ্রন্থবিন্যাসে অবহেলা, বিলম্বের দরুণ বা অন্য কোন কারণে এই গ্রন্থাগারের প্রত্যেক উপকরণ যদি সুরক্ষিত ও গবেষকদের ব্যবহারোপযোগী অবস্থায় না থাকে তবে তাহা অপরিসীম পরিতাপের কারণ হইবে। জাতীয় গ্রন্থাগারে সেরূপ অব্যবস্থা ঘটিবে না বলিয়াই আমরা আশা করিব।

গ-স

কসবায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-মণ্ডপে অগ্নিকাণ্ড

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে কসবার একটি অতিকায় অনুষ্ঠান-মণ্ডপ সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়া যায়। চিত্তরঞ্জন বিদ্যালয়ের সম্মুখে খোলা মাঠে নবনির্ম্মিত মণ্ডপে এই দিন সন্ধ্যায় উদয়শঙ্কর অমলাশঙ্করের নৃত্যানুষ্ঠান দিয়া উৎসবের সূচনা হওয়ার কথা ছিল। ক্ষতির পরিমাণ সামান্য হইবে না। সৌভাগ্যের বিষয়, কেহ প্রাণ হারান নাই। তবু বেদনাবোধ করিতেছি এই কারণে, কসবার এই ঘটনাটিই আমাদের আবার মনে করাইয়া দিতেছে যে, বিপদের আশঙ্কা যেখানে পদে পদে, অসতর্ক মানুষের আত্মসন্তুষ্ট মনোভাব যেন সেখানেও কিছুতে কাটিতে চাহে না। এবং এই অসতর্ক শিথিল মনোভাবই শেষ পর্য্যন্ত মস্ত একটা বিপদের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। কলিকাতা শহরে আগুন এই প্রথম লাগিল না—প্যাণ্ডেলও ইতিপূর্ব্বে অনেক পুড়িয়াছে। হালসী-বাগানের মর্ম্মান্তিক দৃশ্য বোধ হয় আজও কেহ ভুলিতে পারেন নাই। তবু যে এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিতে পারিল, তার কারণ আর কিছুই নয়, পূর্ব্বের ঘটনাগুলি হইতে শিক্ষা-গ্রহণ করিবার এবং ভবিষ্যতে তাহাকে কাজে লাগাইবার মনোভাব আজও গড়িয়া উঠে নাই। কসবার ঘটনায় উদয়শঙ্করের ক্ষতিই সর্ব্বাধিক। অগ্রগণ্য এই নৃত্যশিল্পীর যে সাজসরঞ্জাম সেদিন বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার মূল্য প্রায় অর্দ্ধলক্ষ টাকা। কসবার ঘটনার যাহাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, সকলকেই সেজন্য সতর্ক থাকিতে বলি। এবং সরকারকেও বলি, আইন করিয়া এই সব বিপজ্জনক মণ্ডপ নির্ম্মাণের পথ বন্ধ করিয়া দিন কিংবা এইরূপ দুর্ঘটনার প্রতিকারের জন্য বাধ্যতামূলক ভাবে ইন্সিওরান্স ও পাহারার ব্যবস্থা করুন।

গ-স

বিজ্ঞানশিক্ষায় নূতন ব্যবস্থা

কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা পরিষদের যে অধিবেশন নয়া দিল্লীতে হইয়া গেল, তাহাতে দেশের ভবিষ্যৎ শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। তাঁহারা আলোচনায় বলিয়াছেন, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে প্রত্যেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সর্ব্বস্তরে বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং এই বিজ্ঞানশিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষকদের শিক্ষার ব্যবস্থাও ঐ সঙ্গে থাকিবে।

বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে বিজ্ঞান কিছু নূতন বিষয় না হইলেও দেশে বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা যে অনেক গুণ বাড়িয়া গিয়াছে তাহা অস্বীকার করা চলে না। কাজেই বিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞান যে ভাবে পড়ান হইত, বর্ত্তমান পরিপ্রেক্ষিতে তাহার আমূল সংস্কার ও উৎকর্ষ সাধনের আশু প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বিজ্ঞানের কয়েকটি সাধারণ তত্ত্ব শিখাইলেই যে বিজ্ঞানশিক্ষা দেওয়া হয় না, উহা যে হাতে-কলমে শিখিবার ও শিখাইবার বিষয়, একথা এখন বুঝিবার ও বুঝাইবার সময় আসিয়াছে। শুধু পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবিষ্ট বিষয়টুকু শিখাইলেই যে বিজ্ঞানশিক্ষা দান সার্থক হয় না, উহা সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে শিক্ষার্থীর মনে বিজ্ঞান সম্বন্ধে কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে—একথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। এ সম্বন্ধে পৃথিবীর বিজ্ঞানে অগ্রসর দেশসমূহের বিজ্ঞানশিক্ষা প্রণালী হইতে আমাদের অনেক কিছুই শিখিবার ও গ্রহণ করিবার আছে। আর সেই উন্নত প্রণালীতে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিজ্ঞান শিখাইতে হইলে উপযুক্ত শিক্ষক আবশ্যক। বলা বাহুল্য, সেরূপ শিক্ষক আমাদের দেশে বিরল। সেইজন্যই পরিষদ বিজ্ঞান শিক্ষকদের শিখাইবার জন্য স্বল্প-মেয়াদী ও দীর্ঘ-মেয়াদী ব্যবস্থার সুপারিশ করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, দেশে বিজ্ঞান শিক্ষা

দেওয়ার জন্য শুধু শিক্ষকের নহে, আঞ্চলিক ভাষাসমূহে উপযুক্ত বিজ্ঞানগ্রন্থের অভাবও অত্যন্ত বেশী। পৃথিবীর অগ্রসর দেশগুলিতে বিজ্ঞান-বিদ্যায় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণও বিদ্যালয়-পাঠ্য ও সাধারণ পাঠকের উপযোগী বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচনা করিয়া জাতির মনে বিজ্ঞান-প্রীতি উদ্দীপ্ত করিতে সহায়তা করেন। কৃতী ব্যক্তিগণ যদি আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য সরস সরল বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে এই অভাব বহুলাংশে দূরীভূত হইতে পারে। এক সময়ে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞানতত্ত্বকে মনোহারী করিয়া মাতৃভাষায় প্রচার করিয়া গিয়াছেন। জগদানন্দ রায় মহাশয়ের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। দেশের বিজ্ঞানীদের জাতির মঙ্গলের জন্য তাঁহাদের আদর্শানুসরণ করিতে অনুরোধ জানাইতেছি।

গ-স

মহাজনী ব্যবস্থা

'দামোদর' পত্রিকা পরিবেশিত সংবাদটি শুধু বিস্ময়কর নহে, অভিনবও বটে!

"সম্প্রতি গুসকরা বাজারে মিহি চিনি প্রতি মণ ৪৫ টাকা ও মোটা চিনি ৪১ টাকা পাইকারী ভাবে বিক্রয় হইতেছে। সরকারী টেণ্ডার মূলে যাঁহারা চিনি পাইয়াছেন তাহাদের চিনি বিক্রয়ের সর্ত অত্যন্ত চমৎকার, প্রতি বস্তা চিনিপিছু দুই বস্তা বিক্রয়ের অযোগ্য বাদাম খইল বাজার দরে না লইলে কোন খুচরা দোকানদারকে চিনি দেওয়া হইতেছে না বলিয়া অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে। গত অক্টোবর মাসেও প্রতি বস্তা চিনিপিছু কয়েক বস্তা ডাইল, কলাই বা দালদা ইত্যাদি অপর যে কোন জিনিস লইতে বাধ্য করিয়া তবে দোকানদারদের চিনি বিক্রয় করা হইয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। ডিলারের কোন সেলসম্যান না থাকায় জনসাধারণকে দু'এক সের চিনির জন্য বারে বারে হয়রানি হইতে হইতেছে।"

গ-স

ছাত্রদের কীর্ত্তি

মেদিনীপুর তমলুক হইতে নিম্নের সংবাদটি যাহা বাহির হইয়াছে তাহাতে ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র যে কতদূর নিম্নগামী হইয়াছে তাহার একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত। শিক্ষা-পদ্ধতিকে আগাগোড়া ঢালিয়া সাজিতে না পারিলে, ইহার আদর্শ-বনিয়াদ গড়িয়া উঠিবে না।

"এক সংবাদে প্রকাশ যে, হাঁড়িয়া হাইস্কুলের কতিপয় স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার্থী স্কুল টেষ্ট পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়ায় রাত্রির অন্ধকারে ছাত্রাবাসে হেড মাষ্টারের ঘরে আগুন লাগাইয়া দেয়। মাষ্টার মহাশয় জাগিয়া দেখেন যে, গৃহটি চারিদিক হইতে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। তাঁহার কক্ষটিও বাহির দিক হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তিনি আকস্মিক বুদ্ধিবলে একটি কাটারী দ্বারা জানালার কাঠের গরাদগুলি কাটিয়া কোনক্রমে বাহিরে আসিতে সক্ষম হন। মাষ্টার মহাশয়ের দেহে আগুনের ঝলক লাগায় তিনি আহত হইয়াছেন। পুলিস তদন্ত চলিতেছে। কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

গ-স

হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় অযথা বিলম্ব

রঘুনাথগঞ্জের 'ভারতী' পত্রিকা নিম্নলিখিত সংবাদটি দিতেছেন:

"জঙ্গীপুর মহকুমা সদর হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সরকারী টালবাহানার বিষয় ইতিপূর্ব্বে আমরা কয়েক বারই আমাদের সম্পাদকীয় স্তম্ভে আলোচনা করিয়াছি। অতীব দুঃখের বিষয় যে, আজ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে সরকারী নীতি কি, তাহা আমরা জানিতে পারিলাম না। আমরা যতদূর অবগত আছি তাহাতে এখানে এই হাসপাতালটি স্থাপনের সিদ্ধান্ত বহু দিন পূর্ব্বে চূড়ান্তভাবে গৃহীত হইয়াছে এবং দুই-তিন বৎসর পূর্ব্বেই ইহা এখানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা। চাহিদামত অর্থও স্থানীয় জনসাধারণের তরফ হইতে সরকারের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং প্রয়োজনীয় জমিজমাও সরকার সংগ্রহ করিয়াছেন। এ অবস্থায় পরিকল্পনাটি রূপায়ণের পথে বাধা কোথায় তাহা আমাদের বোধগম্য হইতেছে না। এখানে এইরূপ একটি হাসপাতালের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, বিশেষ করিয়া সরকারী পর্য্যায়েই যখন ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। তবে আমাদের বক্তব্য এই যে, ১৯৫৬ সনেই যে হাসপাতাল এখানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা তাহা ১৯৬০ সনেও প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার মূলে কোন্ যুক্তি থাকিতে পারে তাহা আমাদের জানা দরকার। আমাদের মহকুমার এম-এল-এগণ এ বিষয়ে কি কতদূর করিয়াছেন জানি না, তবে বর্ত্তমানে তদ্বিরের যুগে তাঁহাদের কিছুটা করণীয় আছে তাহা বলাই বাহুল্য। স্থানীয় জনসাধারণের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া সরকারকে অবিলম্বে এ সম্পর্কে চাপ দিবার জন্য আমরা তাঁহাদিগকে আহ্বান জানাইতেছি এবং সরকারও যাহাতে এই 'সময়ক্ষেপ' নীতি পরিহার করেন তজ্জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।"

গ-স

দণ্ডকারণ্য বিষয়ে সরকারের হস্তক্ষেপ

দণ্ডকারণ্য লইয়া কেলেঙ্কারী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। জল অনেক ঘোলা হইয়াছে, আর ঘোলা করিয়া লাভ কি? শোনা যাইতেছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এতদিনে টনক নড়িয়াছে। এতদিনে তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন যে, ১০০ কোটি টাকার এই পরিকল্পনার যে মূল উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গের ক্যাম্পবাসী ৩৫ হাজার উদ্বাস্তু পরিবারের কিংবা দেড় লক্ষাধিক উদ্বাস্তুর পূর্ণ পুনর্ব্বাসন, তাহা শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হইতেছে। গত ৯ই মার্চ্চ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় উদ্বাস্তুখাতে ব্যয়-বরাদ্দের দাবি-প্রসঙ্গে দণ্ডকারণ্য ও শ্রীমেহেরচাঁদ খান্নার নিন্দাবাদ ধ্বনিত হইয়াছে। কেবল নিন্দাবাদ নয়, লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বিরোধীদলের নেতৃবৃন্দ ত বটেই, খাস কংগ্রেসী দলের সদস্যগণও খান্নার পদত্যাগ দাবি করিয়াছেন। এক কথায় পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা দলমত নির্ব্বিশেষে একযোগে

খান্নাকে অপসারণের দাবি করিয়াছেন। বিস্ময়ের সঙ্গে আরও লক্ষ্য করিবার এই যে, এতদিন পর্য্যন্ত খান্নাজী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় এবং পুনর্ব্বাসন-মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের যে দোহাই দিতেছিলেন, অর্থাৎ দণ্ডকারণ্যে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীসভার অজ্ঞাতে কিছু করা হয় নাই বলিয়া খান্না এতদিন যে সাফাই গাহিতেছিলেন, তাহাও সম্পূর্ণরূপে ধূলিসাৎ হইয়াছে। কারণ এক দিকে যখন শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন দণ্ডকারণ্যের ব্যর্থতার কথা স্বীকার করিতেছেন, অন্য দিকে তখন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় ঘোষণা করিয়াছেন, দণ্ডকারণ্যে যাহা-কিছু করা হইতেছে তাহা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে পূর্ব্বে না জানাইয়া এবং পূর্ব্বে কোন সম্মতি না লইয়া করা হইয়াছে। তাঁহার মতে এই ব্যবস্থা অসন্তোষজনক। কারণ ডাঃ রায় মনে করেন যে, দণ্ডকারণ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া উচিত এবং এ বিষয়ে তিনি কেন্দ্রের নিকট ইতিমধ্যেই লিখিয়াছেন।

কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী এ বিষয়ে কি বলেন তাহার জন্য আমরা অপেক্ষায় রহিলাম। তবে পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুর বর্ত্তমান দুর্দ্দশার পিছনে এখানকার কর্ত্তৃপক্ষের দায়িত্বও অনেক। তাহাদের দেহ-মনের অবনতির পিছনে অনেক দলীয় চক্রান্ত অর্থাৎ তাহাদের দুর্দ্দশার সুযোগে দলীয় ও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি ও অনেক হীনস্বার্থ পূরণের চেষ্টা ব্যর্থ হইত যদি এখানকার কর্ত্তৃপক্ষ সজাগ ও দৃঢ় ব্যবস্থা রাখিতেন।

গ-স

অনুন্নত শ্রেণী কাহারা ?

অনুন্নত শ্রেণী কাহাদের বলা হইবে, এ লইয়া কেন্দ্রীয় সরকার মহা মুস্কিলে পড়িয়াছেন। এই অক্ষমতার কথাটা খুবই স্পষ্টভাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্যে অভিব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কমিশনের মতে জাতির ভিত্তিতে অনুন্নত শ্রেণী বাছাই করা উচিত, কিন্তু সংসদীয় অভিমত ইহার বিপরীত। তাঁহারা বলিয়াছেন, জন-সমাজের কোন অংশকে অনুন্নত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইলে, জাতির নাম এবং অবস্থাকে বিচারের মাপদণ্ড যেন করা না হয়। রাজ্য সরকারেরা আবার পুরাতন গতানুগতিক রীতিকেই অনুসরণ করিতে চাহিতেছেন। তাঁহারা অনুন্নত শ্রেণীর পুরাতন তপশীল তালিকাটির কোন ব্যতিক্রম ঘটাইতে রাজী নহেন। এই বিভিন্ন মতই তাঁহাদের বিভ্রান্ত করিয়াছে।

অথচ তাঁহাদের কাজ করিয়া যাইতে হইতেছে, কিন্তু কাজের কোন নিয়ামক নীতি নাই। সংবিধানের নির্দ্দেশ অনুযায়ী অনুন্নত শ্রেণীগুলিকে বিশেষ সুবিধার অধিকার দিতে হইবে, অথচ কাহাকে ঐ শ্রেণী বলা হইবে তাহাই নিরূপিত হইতে পারিতেছে না। এই অবস্থায় সংবিধানোক্ত সদুদ্দেশ্যটিই যে প্রকৃত সার্থকতা লাভ করিতে পারিতেছে না, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শুধু জাতি ব্যক্তির অনুন্নত অবস্থার পরিচায়ক হইবে, এইরূপ মাপদণ্ড নির্ভরযোগ্য নহে, নীতিসঙ্গত অথবা গণতন্ত্রসম্মতও নহে। এমন ঘটনা বিরল নয়, যাহাতে দেখা গিয়াছে যে, বিত্তবান ও শিক্ষিত পরিবারের ব্যক্তিগণ শুধু জাতির নামটি অনুন্নত তপশীলের অন্তর্ভুক্ত থাকিবার সুযোগ গ্রহণ করিয়া বিশেষ-সুবিধা আত্মসাৎ করিয়াছেন। ইহা জাতির সামগ্রিক উন্নয়নের সহায়ক নহে। মনে হয়, জাতির অনুন্নত অবস্থাকে ভিত্তি করিয়া নহে, পারিবারিক অনুন্নত অবস্থাকে ভিত্তি করিয়াই অনুন্নত শ্রেণী নির্ণীত হওয়া উচিত। শিক্ষায় এবং যোগ্যতায় নিতান্ত অনগ্রসর পরিবারসমষ্টিই যথার্থ অনুন্নত শ্রেণী।

গ-স

সাব-রেজিষ্টার আপিস

ত্রিপুরার 'সেবক' পত্রিকা নিম্নলিখিত সংবাদটি দিতেছেন। বিষয়টি সরকারকে জানানো কর্ত্তব্য :

"মহকুমার অন্যত্র দূরের কথা সদরেই কোন সব-রেজিষ্টার নাই। প্রকাশ ১৯৫৮ সনে সাত সহস্র এবং ১৯৫৯ সনে ন্যূনপক্ষে ছয় সহস্র দলিল রেজিষ্টারী হয়। সব-রেজিষ্টারী আপিসটি একটি পায়রার খুপরীর মতন। সংশ্লিষ্ট নর-নারীকে আপিসের সম্মুখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া অনেক সময়ই বিফলমনোরথে ২০.৪০ মাইল পথ হাঁটিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়।

যিনি সব-রেজিষ্টারের কাজ করেন তাঁহার প্রকৃত পদ এস-টি-ও। এস-টি-ও হইলেও কথা ছিল না, তাঁহাকে বিচার, রেশন, সিভিল-সাপ্লাই আরও বহু রকমের কাজ সম্পাদন করিতে হয়। কোর্টে বসিলে ট্রেজারী চলে না। ট্রেজারীতে গেলে, রেশনের কাজ অচল, রেশনের কাজে গেলে দলিল রেজিষ্টারী হয় না। ফলে প্রায়ই দেখা যায় সন্ধ্যার পরও বাতি জ্বালাইয়া দলিলদাতাগণ টিপসহি দিতেছে। যাহারা বেলা ১১টায় হাজিরা দিয়া অনাহারে, রৌদ্রে, বৃষ্টিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উঠি-বসি করিয়া সন্ধ্যার পর দলিলে টিপসহি দেয় তাহারাই বুঝিতে পারে ত্রিপুরা রাজ্যে দলিল রেজিষ্টারী কাহাকে বলে ?"

গ-স

পোষ্টমাষ্টারের জিদ

'দামোদর' পত্রিকা জানাইতেছেন :

"শ্যামসুন্দর পোষ্ট আপিসের মাষ্টার মহাশয়ের জেদের ফলে শ্যামসুন্দরের চটি বিশেষ নূতন গ্রামবাসীরা (শ্যামসুন্দর গ্রামেরই একটি অংশ বলিলে অত্যুক্তি হয় না) আজ বৎসরাধিককাল বহু দুর্ভোগ ভোগ করিতেছেন। পোষ্ট আপিসের অতি সন্নিকটে থাকিয়াও তাঁহাদের চিঠিপত্র পাইতে চার-পাঁচ দিন সময় লাগে। তাঁহাদের অপরাধ তাঁহারা ঐ স্থানে একটি লেটার-বক্স দিবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন এবং কর্ত্তৃপক্ষ মহল তাহা অনুমোদনও করিয়াছিলেন। এমন কি লেটার-বক্সও আসিয়া পড়িয়া আছে। কিন্তু মাষ্টার মহাশয়ের অন্যায় জেদের দরুণ তাহা আজ পর্য্যন্ত উক্ত গ্রামে স্থাপিত হয় নাই। তিনি প্রকাশ্য বাজারে বলিয়াছেন, আমি যতদিন থাকিব কিছুতেই ইহা হইতে দিব না।"

এই অবিচারের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। গ-স

সরকার অবহেলিত গ্রাম

বৰ্দ্ধমানের 'ডাক' নিম্নের খবরটি দিয়াছেন :

"স্বাধীনতার পর দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকারী সাহায্যে অনেক অনুন্নত স্থানের উন্নতি ও সমৃদ্ধির দিকে মোড় ঘুরিলেও বৰ্দ্ধমান জেলার একটি সমৃদ্ধ গঞ্জ কিরূপে সরকারী অবহেলা ও উপেক্ষার ফলে ক্রমশঃ অবলুপ্তির পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মালডাঙ্গা বাজার অঞ্চল। মন্তেশ্বর রাস্তার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মালডাঙ্গা গঞ্জের অবনতি ও মন্তেশ্বরে নূতন গঞ্জের উত্থান লক্ষ্যণীয়। অথচ এই মন্তেশ্বর রাস্তার সহিত মালডাঙ্গার সংযোগ সাধন করা হয় নাই। মালডাঙ্গা গঞ্জের অবনতি রোধের জন্য আশু প্রয়োজন তিনটি—(১) মন্তেশ্বর রাস্তার সম্প্রসারণ, (২) ভাতাড়নাসি গ্রাম রাস্তার সহিত মালডাঙ্গার সংযোগ-রাস্তার উন্নয়ন এবং (৩) খড়ি নদীর ফেরি ঘাট নিয়ন্ত্রণ।

গ-স

ক্ষিতিমোহন সেন

পরমশ্রদ্ধাভাজন ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী ৮০ বৎসর বয়সে গত ২৮শে ফাল্গুন (ইং ১২ই মার্চ ১৯৬০) ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি পরিণত বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, এজন্য ক্ষোভের কোন কারণ নাই। কিন্তু দুঃখ এই যে, রবীন্দ্রনাথের সহকর্মী যে প্রবীণ ত্রয়ী এতদিন বাঁচিয়াছিলেন তাঁহারা একে একে বৎসরখানেকের ভিতর আমাদের মধ্য হইতে চলিয়া গেলেন এবং তাঁহাদের অনুরূপ আর কেহই বাঁচিয়া রহিলেন না।

ক্ষিতিমোহন ২৮ বৎসর বয়সে ১৯০৮ সনে "শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ে শিক্ষাব্রতীরূপে যোগদান করেন। তাঁহারা তিন পুরুষ কাশীতে অবস্থান করিতেছিলেন, এবং তিনি বিভিন্ন অধ্যাপকের নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্য বিশেষভাবে অনুশীলন করেন। কৈশোরেই তিনি সন্তপন্থীদের অনুগামী হন। তাঁহাদের নিকট হইতে তিনি যে প্রেরণা পাইয়াছিলেন মৃত্যুকাল পর্যান্ত তাহাই তাঁহার জীবন ও কর্ম্মে রস এবং রসদ যোগায়। তিনি শান্তিনিকেতনে আসিয়া রবীন্দ্রনাথের আদর্শ শিক্ষায়তনটির প্রথম অবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে দেখিবার সুযোগ পান। এই বীজ ক্রমে মহামহীরুহে পরিণত হইয়া বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। দীর্ঘ ৫০ বৎসর এই বিদ্যায়তনের বিভিন্ন বিবর্ত্তনের সঙ্গে ক্ষিতিমোহন নিজেকে একান্ত ভাবে নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন। প্রথমে সামান্য মাত্র শিক্ষাব্রতী পরে অধ্যক্ষ এবং সর্ব্বশেষে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য পদেও তিনি অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

এই সেবাব্রতই ক্ষিতিমোহনের জীবনের সম্যক পরিচয় নয়। আকৈশোর সাধু-সন্তবাণী সংগ্রহ ও আলোচনায় তিনি জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি উত্তর ভারত, মধ্যভারত ও বঙ্গদেশ পরিক্রমা করেন। ভারতবর্ষের যে মানবধর্ম্মে জীবনের সঙ্গে একাত্ম হইয়া আছে তাহা সাধারণ মানুষের ভিতর হইতে তিনি খুঁটিয়া খুঁটিয়া বাহির করিয়া বিদগ্ধ সমাজের গোচরে আনেন। বাংলার বাউল রবীন্দ্রজীবনে এক অভূতপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, ক্ষিতিমোহন সাধারণ মানুষের মধ্য হইতে এই 'বাউল-দর্শন' যেন আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি বহু পত্র-পত্রিকায় এ বিষয়ে প্রবন্ধাদির মাধ্যমে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রবাসীতে যাঁহারা বিগত যুগে অমূল্য রচনা পরিবেশন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ক্ষিতিমোহন ছিলেন অন্যতম। ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী, ও গুজরাটিতে তিনি বহু মৌলিক তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থগুলির নাম : বাংলা-কবীর ৪ খণ্ড, দাদূ, জাতিভেদ, প্রাচীন ভারতে নারী, ভারতের সংস্কৃতি, বাংলার সাধনা, হিন্দু-সংস্কৃতির স্বরূপ, ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্তসাধনা, মধ্যযুগে ভারতীয় সাধনার ধারা, বলাকা কাব্য পরিক্রমা, যুগগুরু রামমোহন, চিন্ময় বঙ্গ, হিন্দী : ভারতে জাতিভেদ, সংস্কৃতি সঙ্গম, গুজরাটি : চীন-জাপানো প্রবাস, শিক্ষগো ব্যাখ্যানো মালা, তন্ত্রনী সাধনা ; ইংরেজী : Medieval Mysticism of India।

ক্ষিতিমোহন কথক বলিয়াও বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করেন। তাঁহার কথকতা যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহাদের কর্ণে এবং হৃদয়ে যেন তাহা একেবারে গ্রথিত হইয়া আছে। ক্ষিতিমোহন সেনের মৃত্যুতে আমরা একজন অন্তরঙ্গ আত্মীয়-প্রধানের বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিতেছি।

য

গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন

যাঁহারা সন ১৩৬৬ সালে প্রবাসীর গ্রাহক আছেন, আশা করি, আগামী ১৩৬৭ সালেও তাঁহারা গ্রাহক থাকিবেন।

গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক আগামী বর্ষের বার্ষিক মূল্য ১২৲ (বার টাকা) মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইয়া দিবেন। মনি-অর্ডার কুপনে তাঁহাদের স্ব-স্ব গ্রাহক নম্বর উল্লেখ না করিলে টাকা জমার পক্ষে অসুবিধা হয় এবং তিনি নূতন না পুরাতন গ্রাহক ইহা ঠিক করিতে না পারায় ভি-পিও চলিয়া যায়।

অতএব প্রার্থনা যেন তাঁহারা গ্রাহকনম্বরসহ টাকা পাঠান, অন্যথায় পূর্ব্ব গ্রাহক নম্বরে ভি-পি যাইতে পারে ; তাহা ফেরত দিবেন।

যাঁহারা আগামী ২২শে চৈত্রের মধ্যে টাকা পাঠাইবেন না তাঁহাদের নামে বৈশাখ সংখ্যা ভি-পিতে পাঠানো হইবে।

যাঁহারা অতঃপর গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক তাঁহারা দয়া করিয়া আমাদিগকে ২০শে চৈত্রের পূর্ব্বেই জানাইয়া দিবেন।

ভি-পিতে টাকা পাইতে কখনও কখনও বিলম্ব ঘটে, সুতরাং প্রবাসী পাইতে গোলমাল হয়। মনি-অর্ডারেই টাকা পাঠানো সুবিধাজনক। ইতি—

প্রবাসী-ম্যানেজার

উপনিষদের কথা

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়, শাস্ত্রী

ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার মূলমন্ত্র—'আত্মানং বিদ্ধি'—নিজেকে জান। নিজেকে কি আমরা জানি না? আর কি ভাবে জানিতে হইবে? এ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন শাস্ত্র। শাস্ত্র বলিয়াছেন—'আত্মন্'-শব্দের অর্থ কেবল দেহ বা জীব-ই (Individual body or soul) নয়, ব্রহ্মও (Universal soul) বটে। 'বৃহ্'-ধাতু+মন্ করিয়া ব্রহ্ম। 'বৃহ্'—বৃদ্ধৌ। 'মন্' নিরতিশয়ে। অবধি-রহিত বৃহত্ত্ব-ই ব্রহ্মের স্বরূপ। যাহা বৃহত্তম—বিশ্বব্যাপী বস্তু—তাহাই ব্রহ্ম। আত্মা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ,—আত্মাই ব্রহ্ম। নিজেকে ব্রহ্মস্বরূপে জান—বৃহৎ করিয়া জান। সমুদ্রবক্ষে যে তরঙ্গটি উত্থিত হইয়া পরক্ষণেই বিলীন হইয়া যায়, তাহাই সমুদ্রের সামগ্রিক পরিচয় নয়। যে অন্তঃপ্রবাহ অনাদিকাল থেকে চলিয়াছে একটির পর একটি তরঙ্গের লীলা-চঞ্চল গতিকে সঞ্চারিত করিয়া, তাহাকে না জানিলে, সেই অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গ-প্রবাহের প্রাণসত্তাকে না জানিলে,—সমুদ্রের সত্যকার পরিচয়ে অনেক ত্রুটি থাকিয়া যায়। মানুষের ব্যক্তি-জীবনেও তেমনি দু'টি পরিচয় আছে। ইহার বাসনা-বাসিত মানুষ যে ভাবে প্রতি মুহূর্ত্তে অর্থ-খ্যাতি-ভোগের ভিতর দিয়া আপনাকে জানিতে অভ্যস্ত, তাহা তাহার চেতনের (Consciousness-এর) পরিচয় অতি স্থুল বহিরঙ্গের পরিচয়। এ পরিচয়ে প্রবৃত্তি আছে, নিবৃত্তি নাই; সুখ আছে, শান্তি নাই; ভক্তি আছে মুক্তি নাই। এই চেতনের পরপারে আছে অতি-সূক্ষ্ম পরা-চেতন (Super-consciousness) সেই নিভৃত আভাময় চিৎ-লোকেই মানুষের বৃহত্তর ও মহত্তর স্বরূপের আবাস। সেই সূক্ষ্ম সুদূর চিন্ময় সত্তাকে না জানিতে পারিলে মানুষের সত্যকার পরিচয়ের অনেকখানি বাদ থাকিয়া যায়। তাই, ধর্ম্ম-বুদ্ধির উদ্ভব-আখ্যায়িকার প্রথমেই মানুষের সংবেদনশীল মনে প্রশ্ন (Metaphysical speculation) সঙ্কেত হইয়াছিল—"আমি কে? আমার স্বরূপ কি? যে জগতে আমি বাস করি তাহার প্রকৃতি কি? কোথা হইতে জন্মিয়াছি? জন্মের পর কাহার সাহায্যে জীবিত আছি? বিনাশের পর কোথায় যাইয়া স্থিতিলাভ করিব? এ স্থান হইতে সে-স্থানে যাইবার যথার্থ পথ কোন্‌টি?" এক মন হইতে এই প্রশ্ন অন্য মনে সঞ্চারিত হইয়া চলিল,—সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চারিত হইয়া চলিল এক দিব্য অভাববোধ। 'কাসৌ পুরুষঃ'? কোথায় সে? এই আত্ম-জিজ্ঞাসা হইতে আরম্ভ হইল আত্মানু-সন্ধানের—অন্তরঙ্গ পরিচয়ের—বিপুল প্রয়াস; কেবল সন্ধান বা আবিষ্কার নয়—বস্তুর পরপারে যিনি বিদ্যমান আছেন বস্তুর আশ্রয় হইয়া, দৃশ্যের অন্তরালে যিনি গুপ্ত রহিয়াছেন দৃশ্যাতীতের ভূমিকায়, নশ্বর ভঙ্গুরকে অতিক্রম করিয়া (transcend) যিনি প্রতিষ্ঠিত আছেন শাশ্বত-নিত্যরূপে, সেই পরমসত্যকে জীবনে অব্যবহিত ভাবে লাভ করাই হইল সে প্রয়াসের চরম লক্ষ্য। আত্মার অসীম তত্ত্বান্বেষিতার ভিতর দিয়া সেই চিররহস্যময় লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছিল আমাদের এই ভারতবর্ষই সর্ব্বাগ্রে। স্মরণাতীতকালের এক শুভ দিনে, যখন জগতের অন্যান্য দেশে জ্ঞান-সূর্য্যের ঈষন্মাত্র আলোক-সম্পাতও বহু শতাব্দী বিলম্বিত, যখন মানুষের চিন্তাধারা বাহ্য-জীবনের সুখ-দুঃখ, আরাম-ব্যারামের সমস্যা সমাধানেই ছিল সীমিত, সেই শতকল্প পূর্ব্বেকার বস্তু-সভ্যতার দিনে, ভারতের সমাধি-মগ্ন ঋষির অন্তর্লোকে সেই দিব্য পুরুষের জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল আর অমনি ঋষির চিত্ত-উৎসে উচ্ছ্রিত হইল—

'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।'

—'আমি অন্ধকারের অতীত আদিত্য-প্রতিম স্বপ্রকাশ মহান্ পুরুষকে দর্শন করি।'

এ দর্শন চক্ষুর দর্শন নয়, সুগভীর চেতসিক অবলোকন (Soul-sight), অপ্রাপ্তবস্তুর প্রাপ্তি নয়, প্রাপ্তবস্তুর পরম উপলব্ধি। এই জ্যোতির্ম্ময় অন্তর্য্যামী অমৃত পুরুষই আত্মা ('এষ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ') তাহাই ব্রহ্ম তাহাই বস্তু—আর সব প্রতীতিমাত্র, অবস্তু। ধ্যানে অতীন্দ্রিয় চিন্ময় সত্তার সঙ্গে যোগ-যুক্ত হইয়া ঋষি দেখিলেন—জলে-স্থলে ওষধীতে বনস্পতিতে একই দেবতার লীলা, দেখিলেন—'স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ'—এই যে তিনি ঊর্দ্ধে, এই যে তিনি অধে, এই যে পশ্চাতে তিনি, এই যে সম্মুখে তিনি, এই যে তিনি দক্ষিণে, এই যে তিনি উত্তরে। দেখিলেন—যিনি

'অস্মিন্ আত্মনি তেজোময় অমৃতময়ঃ পুরুষঃ' (এই আত্মায় তেজোময় অমৃতময় পুরুষ), তিনিই 'সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ' (সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া নানারূপে প্রকাশিত) ইহাই আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান, অর্থাৎ দিব্যানুভূতির জ্যোতিঃ-প্রপাতে সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনাদি অখণ্ড অবাধিত পরম একেকে জীবনে ও বিশ্বের সর্ব্বত্র অনস্যূত দর্শন। এই আত্মিক বোধই মানুষের সত্যকার পরিচয়। আত্মজ্ঞান লাভ করিলে অন্য কোন লাভ 'মন্যতে নাধিকং ততঃ', কারণ, 'পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ'। পরমাত্মা, হইতে শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই। তিনি পরাকাষ্ঠা, তিনি পরাগতি।

কিন্তু শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় সঙ্কট-বন্ধুর সাধন-মার্গে অগ্রসর হইয়া সেই দুরবগ্রাহ চিন্ময় সত্তাকে উপলব্ধি করার অধিকার ত সকলের নাই। সে অধিকার লাভ করিতে হইলে ব্যবহারিক জগতের প্রলোভন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া সত্য, সংযম, নিষ্ঠা ও বৈরাগ্যের পাথেয়সহ জ্ঞানসূত্রের সাহায্যে সে পথে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। এই জন্যই ব্রহ্মসূত্রের আরম্ভনে আম্নাত হইয়াছে—

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥

'অথ'—অনন্তর। কাহার অনন্তর? অধিকারী হইয়া। অধিকারী কে? সাধন-চতুষ্টয় (বিবেক, বৈরাগ্য, ষটসম্পত্তি মুমুক্ষুতা) যাঁহার মধ্যে প্রতিষ্ঠা পায়, তিনিই অধিকারী। 'অতঃ'—সেই হেতু। হেত্বর্থ কর্ম্মের ফল—স্বর্গ। স্বর্গ নশ্বর। জ্ঞানের ফল—মোক্ষ। মোক্ষ অবিনশ্বর। সেই পরম পুরুষার্থ মোক্ষের জন্য। 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'—ব্রহ্মণঃ (কর্ম্মে ষষ্ঠী)—সর্ব্বব্যাপী পরমপুরুষকে, আত্মাকে। 'জিজ্ঞাসা'—জানিবার ইচ্ছা। পানের ইচ্ছাকে যেমন পিপাসা বলে, জানিবার ইচ্ছাকেও তেমনি বলে জিজ্ঞাসা। পানের ইচ্ছা বলবতী হইলে পান ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে যেমন প্রবৃত্তি জন্মে না, জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইলেও যেমনি জ্ঞান ব্যতীত সংসারাদি বিষয়ে কোন প্রবৃত্তি থাকে না। এখন, 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'-সূত্রের মিলিতার্থ হইতেছে—বিবেক-বৈরাগ্য-যুক্ত, সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন, মুক্তিকামী[১] সাধকই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার (ব্রহ্মের স্বরূপ যথার্থ অবগত হইবার) অধিকারী, অন্যে নহে। বস্তুতঃ, অধ্যাত্মচেতনার তীব্র সংবেগই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার প্রথম ভূমিকা। সাধন-চতুষ্টয় অধিগত হইলে চিত্ত নির্ম্মল হয় এবং তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হয়।

সেই ব্রহ্ম কিরূপ?

জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥

'যতঃ'—যে কারণ হইতে। 'অস্য' (জগতঃ)—এই জগতের। 'জন্মাদ্যঃ'—জন্মাদি (জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গ) হয়। যে কারণ হইতে এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হয়, তাহাই ব্রহ্ম।

ব্রহ্মের প্রমাণ কি?

শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥

(ব্রহ্ম) 'শাস্ত্রং' 'যোনিঃ'—প্রমাণ। ব্রহ্ম শাস্ত্রযোনি, সেই হেতু। ব্রহ্মের অস্তিত্বের বা স্বরূপ-নির্ণয়ের একমাত্র প্রমাণ শাস্ত্র। 'অজ্ঞাতজ্ঞাপকং শাস্ত্রম'—যাহা কেহ জানে না, অন্য কোন উপায়ে জানা যায় না, তাহা জানিবার একমাত্র উপায় শাস্ত্র। ব্রহ্মজ্ঞানের শাস্ত্র হইতেছেন নানা বিদ্যার আকর—উপনিষদ্।

উপনিষদ্ শব্দটি উপ-নি-সদ্-ধাতুর উত্তর কিপ-প্রত্যয়-যোগে সাধিত হইয়াছে। এই শব্দটির ধাত্বর্থ-সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ ও ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। ভগবান শঙ্করাচার্য্যপাদ 'সদ্'-ধাতুকে বিশিরণ (বিনাশ), গতি ও অবসাদন (শিথিলী-করণ) এই তিন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন ('সদ্‌বিশিরণ-গত্যবসাদনেষু')। উপ (উপাশ্রিত্য যাং বিদ্যাং) নি (নিঃশোষণ) সদ্ (সীদতি—অবসাদয়তি বিনাশয়তি বা মায়াং তৎকার্য্যঞ্চ) ইতি উপনিষদ্। অথবা 'পরমশ্রেয়সি নিষণ্ণং মুমুক্ষুং পরব্রহ্ম গময়তীতি' উপনিষদ। অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা সংসার (জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ) ও তৎকারণীভূত অবিদ্যার উচ্ছেদ-সাধন (বিশিরণ বা অবসাদন) করে বলিয়া অথবা শ্রেয়োনিষ্ঠ মুমুক্ষুকে পরব্রহ্ম প্রাপ্ত করায় বলিয়া উপনিষদ নামে অভিহিত। 'ব্রাহ্মীং বাব ত উপনিষদমব্রূমেতি' (কেন)—নিশ্চয়ই তোমাকে ব্রহ্মবিষয়িনী উপনিষদ বলিলাম; 'য এতামেব ব্রহ্মোপনিষদং বেদ' (ঐ)—যে এতাদৃশী

---

১ বিবেক—নিত্যানিত্যবস্তু-বিচার। আত্মা অবিনাশী, অচল, ব্যাপক, তদতিরিক্ত পদার্থবিনাশী, চল ও পরিচ্ছিন্ন—এবম্প্রকার জ্ঞান।

বৈরাগ্য—সংসারের দুঃখময় পরিণাম-সমীক্ষণে বিষয়-ভোগে নির্লিপ্তি।

ষটসম্পত্তি—শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা—এই ছয়টিকে ষটসম্পত্তি বলে। শম—বিষয় হইতে অন্তরেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ। দম—বিষয় হইতে বহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ। উপরতি—শ্রবণ ও মননাদি ব্যতিরিক্ত কর্ম্ম হইতে বিরতি। তিতিক্ষা—সুখ-দুঃখ, শীত-গ্রীষ্ম, মান-অপমান ইত্যাদিতে উপেক্ষা। সমাধান—ব্রহ্মে চিত্তৈকাগ্রতা। শ্রদ্ধা—গুরু-বাক্যে ও বেদান্ত-শাস্ত্রে বিশ্বাস।

মুমুক্ষুতা—অনিত্যবস্তুতে বিরক্ত হইয়া নিত্যবস্তুতে সম্পন্ন হইবার জন্য উদগ্র বাসনা।

ব্রহ্মবিদ্যা জানে; 'তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি' (বৃহদারণ্যক) —আপনাকে সেই উপনিষদ্গম্য পুরুষের (ব্রহ্মের) বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি; ব্রহ্ম তে ব্রবাণি (কৌষীতকী)—তোমাকে ব্রহ্মতত্ত্বোপদেশ দিব; 'ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং শরং হ্যুপাসা নিশিতং সন্ধয়ীত' (মুণ্ডক)—উপনিষদ (জ্ঞান)-ধনু গ্রহণপূর্ব্বক তাহাতে উপাসনা-শাণিত মহাস্ত্র শর সন্ধান কর ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যও উপনিষদ্ যে ব্রহ্মবিদ্যা তাহা সমর্থন করে। কেহ কেহ উপনিষদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এরূপও করিয়া থাকেন—উপ (উপগম্য গুরুং) নিঃ (নিশ্চয়েন) সদ (সীদতি, গচ্ছতি প্রাপ্নোতি বা ব্রহ্মতত্ত্বং যয়া বিদ্যয়া) সা উপনিষদ। (শিষ্য গুরুসমীপে যাইয়া যে বিদ্যাবলে নিশ্চিতরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করে, তাহাই উপনিষদ্। 'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠন্॥ তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রসান্ত-চিত্তায় শমান্বিতায়। (যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্॥' (মুণ্ডক)—তাহা জানিবার জন্য তিনি (শিষ্য) সমিৎপাণি হইয়া (হোমাগ্নি-কাষ্ঠ হস্তে লইয়া) বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকটে যাইবেন। সেই বিদ্বান সম্যকরূপে প্রশান্তচিত্ত, শমগুণান্বিত, সমীপাগত ব্যক্তিকে (শিষ্যকে) যদ্দ্বারা সেই অক্ষর সত্য পুরুষকে জানা যায় সেই ব্রহ্মবিদ্যা যথাবৎ উপদেশ করিলেন। আবার কেহ বা বলেন —উপ=সমীপস্থ (অন্তরাত্মা), নি=নিশ্চয় (অন্তরাত্মাই ব্রহ্ম, এইরূপ নিশ্চয়), সদ্=নাশ (তদ্ঘাটিত অজ্ঞানের); অর্থাৎ, যে বিদ্যার অনুশীলনে জন্ম মৃত্যু-প্রবাহের কারণীভূত অজ্ঞানের নাশ হয় এবং অন্তরাত্মার ব্রহ্মত্বে নিশ্চয় হয়, তাহারই নাম উপনিষদ্। ব্যুৎপত্তি বিশ্লেষণে মতানৈক্য থাকিলেও, যাঁহার অনুশীলনে অনাদি অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া অতি-নিকটস্থ অন্তরাত্মা স্বরূপ-ব্রহ্ম বলিয়া নিরূপিত হয়, তাদৃশ ব্রহ্মবিদ্যাই যে উপনিষদ, সে বিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই। উপনিষদ্ এই নামকরণ হইতে জানা যায় যে, জ্ঞানই পরমপুরুষার্থ মোক্ষের একমাত্র সাধন।

ভারতীয় সংস্কৃতির উৎস—বেদ। যাহা কিছু জ্ঞানের, ধ্যানের ও সাধনার বস্তু তাহার পরিচয় আমরা বেদে পাই। বেদ-সাহিত্যের চারিটি স্তম্ভ—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্। দেবতার মন্ত্র ও স্তুতি-বাক্যের নাম সংহিতা। যে বাক্যে সংহিতার বিনিয়োগ, তাৎপর্য্য ও প্রশস্তি বর্ণিত আছে, তাহাই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট ভাগ আরণ্যক নামে আখ্যাত। কর্ম্ম-পরিপাকে যাহারা বাহ্য যজ্ঞের প্রতীকে আন্তর যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া অরণ্যাশ্রমে বাস করিতেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ ভাগ হইতে তত্ত্বমূলক সূক্তাবলী চয়ন করিয়া ধ্যান করিতেন। আরণ্যক ঋষির এই ধ্যানলব্ধ তত্ত্বের নামই —উপনিষদ্। শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়—এই প্রস্থানত্রয়ই (ত্রিবিধ পন্থা) ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রধান [illegible]। তন্মধ্যে উপনিষদ্সমূহ শ্রুতি-প্রস্থানের অন্তর্গত, সনৎসুজাতগীতা ও ভগবদ্গীতা স্মৃতি-প্রস্থানের অন্তর্গত, শারীরিক-সূত্র (বেদান্ত) ন্যায়-প্রস্থানের অন্তর্গত বলিয়া অভিহিত। লোকমান্য তিলক 'Orien' পদ্ধতির সূত্র অবলম্বন করিয়া ঋগ্বেদের কালকে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৪৫০০-৫০০০ বৎসর ধরিয়া লইয়াছেন। ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগে উপনিষদ্ শব্দ সন্নিবেশিত থাকায় উপনিষদের প্রাচীনত্ব স্বতঃই প্রমাণিত হয়। উপনিষদের রচনাকাল সাধারণ ভাবে বুদ্ধদেবের জন্মের অন্যূন তিন-চারি শত বৎসর পূর্ব্বে ধরিয়া লইলেও শাস্ত্রের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে বলিয়া মনে হয় না। উপনিষদের প্রাচীন নাম—শ্রুতিশির।

মুক্তিকোপনিষদে ১০৮ খানি উপনিষদের নাম লিপিবদ্ধ আছে। তন্মধ্যে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও শ্বেতাশ্বতর—এই এগারখানি উপনিষদের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়াই মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদান্তসূত্রের উত্তুঙ্গ সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং এই এগারখানি উপনিষদের উপরই শঙ্কর-ভাষ্য দৃষ্ট হয়। প্যারিসের গ্রন্থাগারস্থ গ্রন্থপঞ্জীতে ২৬০ খানি উপনিষদের নামোল্লেখ আছে। ইহাদের অধিকাংশই খ্রীষ্টীয় শতকে রচিত বলিয়া নিতান্ত অর্ব্বাচীন, অপ্রামাণ্য ও সাম্প্রদায়িকতা-দোষ-দুষ্ট। পণ্ডিতগণ উপনিষদ্সমূহকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—

১। বৈদিক—সংহিতা, ব্রাহ্মণ বা আরণ্যকের অঙ্গীভূত। ঈশ, কেন, কঠ, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, কৌষীতকি উপনিষদ্ বৈদিক।

২। বৈদিকভাবানুসরণে ঋষি-প্রণীত উপনিষদ্ আর্ষ। প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, শ্বেতাশ্বতর ইত্যাদি আর্ষ উপনিষদ।

৩। সাম্প্রদায়িক—জাবাল, নৃসিংহতাপনী, রুদ্রাক্ষ, নারায়ণ, কৃষ্ণ, বরাহ, মহোপনিষদ্ প্রভৃতি শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের রচিত উপনিষদ্।

৪। কৃত্রিম—যাহাতে আর্য্য-ধর্ম্ম-বহির্ভূত মত সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাই কৃত্রিম উপনিষদ্; যথা আল্লোপনিষদ্।

উক্ত এগারখানি উপনিষদের মধ্যে 'ঐতরেয়' উপনিষদ্ ঋগ্বেদীয়। উহা ঐতরেয়-আরণ্যকের দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়। 'কেন' ও 'ছান্দোগ্য'-উপনিষদ সামবেদীয়। কেন তলবকার-ব্রাহ্মণের নবম অধ্যায় এবং ছান্দোগ্য তাণ্ড্য শাখার ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের তৃতীয় হইতে একাদশ অধ্যায়। 'কঠ' ও 'তৈত্তিরীয়'-উপনিষদ কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়। কঠ তৈত্তিরীয়-সংহিতার পরিশিষ্টের প্রথম

অধ্যায়। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ তৈত্তিরীয়-আরণ্যকের সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়। 'ঈশ' ও 'বৃহদারণ্যক'-উপনিষদ শুক্লযজুর্ব্বেদীয়। ঈশ শুক্লযজুর্ব্বেদ-সংহিতার চত্বারিংশৎ অধ্যায় এবং বৃহদারণ্যক বাজসনেয়ী শতপথ-ব্রাহ্মণের সপ্তদশ কাণ্ডের তৃতীয় অধ্যায় হইতে আরব্ধ হইয়া ষষ্ঠ অধ্যায়ে সমাপ্ত হইয়াছে। 'কৌষীতকি'-উপনিষদ্ ঋগ্বেদীয় কৌষীতকি-ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। 'প্রশ্ন', 'মুণ্ডক' ও 'মাণ্ডুক্য'-উপনিষদ্ত্রয় অথর্ব্ববেদীয়। প্রশ্ন মহর্ষি পিপ্পলাদ-প্রোক্ত এবং মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য তন্নামক ঋষিদ্বয়-দৃষ্ট। 'শ্বেতাশ্বতর'-উপনিষদ্ কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয় শ্বেতাশ্বতর ঋষির দৃষ্ট-সংহিতার শেষ ছয় অধ্যায়।

ব্রহ্মবিদ্যাই উপনিষদের চরম ও পরম লক্ষ্য হইলেও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ক্রম সকল উপনিষদ্ একরূপ নয়। নিম্নোদ্ধৃত উদাহরণসমূহ হইতে এ উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপাদিত হইবে।

'কেন'-উপনিষদের ঋষিগণ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন—

'কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি॥'

'কাহার ইচ্ছায় মন সক্রিয় হইয়া রহিয়াছে? প্রাণ কাহার প্রেষণায় বিষয়াসক্ত হয়? কাহার ইচ্ছায় মানুষের বাক্য-স্ফুর্ত্তি হয়? কোন্ দেবতাই-বা আমাদের চক্ষু ও কর্ণকে স্ব-স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকেন?' (ইহা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা) উত্তরে উক্ত হইয়াছে—

'শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনঃ
যদ্বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য।
প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্যধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥
নতত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনো
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ।

যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥'

'যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, তিনিই মন-আদির নিয়ামক। তিনিই প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু! এই জ্ঞান দ্বারা শ্রোত্রাদির আত্মত্ব-ধারণা পরিত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞানীগণ ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়া অমর হ'ন। যাঁহা চক্ষুর গোচরীভূত নয়, বাক্য যাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না মন যাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না, তাঁহাকে আমরা জানিতে পারি না। তাঁহার সম্বন্ধে কিরূপে উপদেশ দিতে হয়, তাহাও আমরা জানি না।—

যিনি বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত হন না, অথচ যাঁহার দ্বারা বাক্য প্রকাশিত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়ো—লোকে এই যে পরিচ্ছিন্ন বস্তুর উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নয়।

তৈত্তিরীয়োপনিষদে ভৃগু পিতা বরুণের সমীপে উপনীত হইয়া প্রার্থনা করিলেন—'অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি।' —'ভগবন্, আমাকে ব্রহ্মোপদেশ করুন।' উত্তরে বরুণদেব বলিলেন—'যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তৎ-ব্রহ্মেতি।'—যাঁহা হইতে এই ভূতবর্গ জাত হয়, জাত হইয়া যদ্দ্বারা জীবিত থাকে, এবং পরিণামে যাঁহাতে প্রবিষ্ট হইয়া লয়প্রাপ্ত হয়, তাঁহার বিষয় জিজ্ঞাসা কর। তিনিই ব্রহ্ম।' (ইহা ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ) এখানে প্রশ্নের লক্ষ্যবস্তু ব্রহ্ম হইলেও, উত্তরটি সৃষ্টিতত্ত্বে পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

বাজশ্রবা ঋষির বালক পুত্র নচিকেতা ও যমরাজের মধ্যে প্রশ্নোত্তরের সমষ্টি হইতেছে সমগ্র কঠোপনিষদ্। সেখানে নচিকেতার প্রশ্ন এই—

'যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
হস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্ বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াঽহং
বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥'

—"মৃত মনুষ্য সম্বন্ধে এই যে একটা সংশয়,—কেহ বলেন (পরলোকগত) আত্মা 'থাকে', কেহ বলেন 'থাকে না'—আপনার উপদেশ হইতে আমি সে সম্বন্ধে (আত্মার অস্তিত্ব-অনাস্তিত্ব সম্বন্ধে) সত্যাবধারণ করিয়া লইব। বরের মধ্যে এইটি আমার তৃতীয় বর'। প্রশ্নের উত্তরে যমরাজ বলিলেন ঃ

'ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চি-
ন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥'

সর্ব্বজ্ঞ আত্মার জন্ম বা মৃত্যু নাই, ইনি কোন বস্তু হইতে উদ্ভূত হ'ন না, ইঁহা হইতেও কোন বস্তু উদ্ভূত হয় না। ইনি অজাত, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাতন। দেহের বিনাশে ইঁহার (দেহীর—আত্মার) বিনাশ হয় না।" এখানে আত্ম-জিজ্ঞাসাই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।

মুণ্ডকোপনিষদে শৌনক যথাবিধি অঙ্গিরার নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি।'—'ভগবন্, কোন্ বস্তুটি জ্ঞাত হইলে এই সমস্তই জ্ঞাত হওয়া যায়?' উত্তরে অঙ্গিরা বলিলেন ঃ

'যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং
মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ।

তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা
বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ ॥'

—'যাহাতে দ্যুলোক, ভূলোক, অন্তরীক্ষ ও সমস্ত প্রাণের সহিত মনও বিধৃত রহিয়াছে, সেই আত্মাকে—কেবল সেই আত্মাকেই জান। অন্যান্য কথা পরিত্যাগ কর। ইনিই অমৃতের সেতু (মোক্ষলাভের উপায়)' এখানে প্রশ্নের লক্ষ্যবস্তু ব্রহ্মজ্ঞান হইলেও উত্তরটি আত্মজ্ঞানে পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

বৃহদারণ্যকোপনিষদেও অনুরূপ ভাবই অভিব্যক্ত হইয়াছে। সেখানে মৈত্রেয়ীর প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'ইয়ং পৃথিবী সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু; যশ্চায়মস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং শারীরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব সঃ, যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্ ॥'

—'এই পৃথিবী সমস্ত ভূতের মধু (মধুবৎ প্রিয়), তেমনি সর্ব্বভূতও আবার পৃথিবীর মধু। আর এই পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত যে এই চৈতন্যময় পুরুষ (কূটস্থ) আর এই যে দেহাভিমানী শরীরাধিষ্ঠিত তেজোময় পুরুষ (জীবাত্মা), ইঁহারাও সর্ব্বভূতের মধু এবং সর্ব্বভূতও আবার ইঁহাদের মধু; ইনিই সেই আত্মা, ইনিই সেই অমৃত, ইনিই সেই ব্রহ্ম, ইনিই সেই সর্ব্ব। এ স্থানে আত্মজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান তথা সর্ব্বজ্ঞান।'

ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রধান উপদেশও এই সত্যই। সে স্থানে 'পিতোবাচ শ্বেতকেতো সোম্যেদং...তমাদেশম প্রাক্ষ্যঃ। যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি। কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি ॥'

—পিতা (উদ্দালক) (পুত্র) শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে সৌম্য শ্বেতকেতু, তুমি কি আচার্যকে সেই আদেশের (যাহার দ্বারা পরব্রহ্ম উপদিষ্ট হ'ন, তাহার) কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ?—যাহার দ্বারা অশ্রুতও শ্রুত হয়, অচিন্তিতও চিন্তার বিষয়ীভূত হয়, অবিজ্ঞাতও সুবিজ্ঞাত হয়, সেই আদেশের কথা ?"

এই অদ্ভুত প্রশ্নে শ্বেতকেতু বিস্ময় প্রকাশ করিলে পিতা বলিলেন—'স যঃ এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্ তৎ সত্যং স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ॥'

—'সেই যে এই অণিমা (সদ্বস্তু) এ সমস্তই এতৎস্বরূপ; সেই সদ্বস্তুই সত্য, তাঁহাই আত্মা। হে শ্বেতকেতু, তুমিও তৎস্বরূপ।'

ঐতরেয়োপনিষদে মুমুক্ষু ব্রাহ্মণগণ পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'কোঽয়মাত্মেতি বয়মুপাস্মহে কতরঃ স আত্মা।'

—'যাঁহাকে আমরা 'ইনি আত্মা' এইরূপে উপাসনা করি, তিনি কে ? (দেহমধ্যে করণরূপী ও কর্তৃরূপী এই দুই প্রকার আত্মার মধ্যে) কোন্‌টি সেই আত্মা ?" উত্তরে বলা হইতেছে—'এষ ব্রহ্মৈষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিরেতে সর্ব্বে দেবা ইমানিচ পঞ্চমহাভূতানি পৃথিবী বায়ুরাকাশআপো জ্যোতীংষীত্যেতানীমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব বীজানীতরাণি চেতরাণি চাণ্ডজানিচ জারুজানিচ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চাশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তিনো যৎ কিঞ্চেদং প্রাণি জঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরং সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ॥'

—'ইনিই (উক্ত প্রজ্ঞানস্বরূপ আত্মাই) ব্রহ্ম, ইনিই ইন্দ্র, ইনিই প্রজাপতি, ইনিই এই সমস্ত দেবতা, এই সমস্ত পঞ্চমহাভূত—পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, তেজঃ—এবং এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণিদেহ সমেত সমস্ত বীজ, সমস্ত অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, অশ্ব, গো, হস্তী, অধিক কি, মনুষ্য, পক্ষী প্রভৃতি যাহা কিছু জঙ্গম ও স্থাবর সেই সমস্তই প্রজ্ঞান (ব্রহ্মচৈতন্য) হইতে সমুৎপন্ন, সমস্ত লোকই প্রজ্ঞানে আহিত এবং প্রজ্ঞানই তাহাদের লয় স্থান—প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম।' (ইহা ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ) এ স্থানে আত্মতত্ত্বের প্রশ্নটি ব্রহ্মতত্ত্বে মীমাংসিত হইয়াছে।

মাণ্ডুক্যোপনিষদে উপদিষ্ট হইয়াছে—

'নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ ॥'

—'যিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ (স্বপ্নাবস্থার ন্যায়) নহেন, বহিঃপ্রজ্ঞ (জাগ্রতের ন্যায়) নহেন, উভয়প্রজ্ঞ (জাগরণ ও স্বপ্নের অন্তরালাবস্থাযুক্ত) নহেন, প্রজ্ঞানঘন (সুষুপ্তির ন্যায় তমোভাবাপন্ন) নহেন, প্রজ্ঞ (দ্বৈতভাবাত্মকজ্ঞানযুক্ত) নহেন, অপ্রজ্ঞ (অচেতন) নহেন, যিনি অদৃষ্ট, অব্যবহার্য্য (অবিষয়তত্ত্বনিবন্ধন ব্যবহারের অতীত), অগ্রাহ্য (কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়), অলক্ষণ (দ্বৈতসম্বন্ধের অভাবহেতু অবর্ণনীয়), অচিন্ত্য (ধারণার অযোগ্য) অব্যপদেশ্য (তিনি এত বিরাট যে যে দেশ ও কালের দ্বারা ব্যপদেশ করার অর্থাৎ তিনি ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন ইত্যাদি আরোপিত করার অযোগ্য), যিনি একাত্মপ্রত্যয়ের বিষয়ীভূত (জাগ্রদাদি অবস্থায় 'এক আত্মাই আছেন' এই প্রত্যয়গম্য), প্রপঞ্চোপশম (রূপরসাদিপঞ্চবিষয়ের অতীত), শান্ত (অচঞ্চল), শিব (মঙ্গলস্বরূপ) ও অদ্বৈত (শুদ্ধবিদ্রূপ) —তাঁহাকে জ্ঞানিগণ চতুর্থ (তুরীয়-অবস্থাত্মক—জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অতীত তত্ত্ব) বলিয়া মনে করেন। তিনিই

আত্মা—তিনিই বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য।" এখানে আত্মজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান।

প্রশ্নোপনিষদে কত্য-পুত্র কবন্ধী সমিৎহস্তে মহর্ষি পিপ্পলাদের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভগবন্ কুতো হবা ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত ইতি॥'—'ভগবন্, এই প্রাণিবর্গ কোথা হইতে উদ্ভূত হয়?' উত্তরে ঋষি বলিলেন—'প্রজা-কামো বৈ প্রজাপতিঃ স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা স মিথুন-মুৎপাদয়তে। রয়িঞ্চ প্রাণঞ্চেত্যেতৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি॥'—"প্রজাকাম প্রজাপতি তপস্যা (সিসৃক্ষা) করিলেন। তপস্যা করিয়া, 'ইহারা আমার জন্য বহুবিধ প্রাণী সৃষ্টি করিবে' এই ভাবিয়া রয়ি (প্রকৃতি) ও প্রাণ (পুরুষ) এই মিথুন সৃষ্টি করিলেন।' এখানে প্রশ্নটি ব্রহ্ম বা আত্মা সম্বন্ধে নয়,—সৃষ্টি সম্বন্ধে।

ঈশোপনিষদের ভাষায় তত্ত্ব-জ্ঞানের মূল কথা হইতেছে—

'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥'

—'জগতে যাহা কিছু প্রপঞ্চভূত চঞ্চল (নশ্বর) বস্তু আছে, সেই সমুদয়ে ব্রহ্ম অনুস্যূত, এই জ্ঞানের দ্বারা জগতের সত্যতা-বুদ্ধি বিলুপ্ত করিবে। তাহাতে বিষয়-লালসা ত্যাগ করিয়া পরমাত্মাকে লাভ কর এবং পরমানন্দ উপভোগ কর।' কাহারও ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না। এই শ্লোকটির বিশ্লেষণ হইতে যে গভীর সত্য আমাদের সম্মুখে স্বচ্ছ হইয়া ফুটিয়া উঠে, তাহা এই :

অশেষ-বিশেষের প্রত্যনীকস্বরূপ চিন্ময় ব্রহ্মকে আত্মার আলোকে দর্শনের নাম—জ্ঞান। তদ্ব্যতিরিক্ত সমস্তই কর্ম্ম। ব্রহ্ম স্বয়ম্ভু। এই নিমিত্ত তিনি অ-করণ, কিন্তু সর্ব্বকারণ-কারণ। এ সব দৃশ্যপ্রপঞ্চ সৃষ্টি (কর্ম্ম)। কর্ম্ম ও কর্ত্তা সর্ব্বদাই পৃথক। জ্ঞান (ব্রহ্ম) হইতে পৃথক্ 'জগত্যাং জগৎ'-রূপ (সৃষ্টিরূপ) কর্ম্ম। ব্রহ্ম নিত্য, কর্ম্ম অনিত্য। ব্রহ্ম জ্ঞান-স্বরূপ, কর্ম্ম অজ্ঞানপ্রসূত। সুতরাং কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয় অসম্ভব। 'জগত্যাং' জগতে। জগৎ অসৎ, গতিশীল, অনিত্য। জগৎ হইতে ভিন্ন—সৎ, নিত্য, শাশ্বত ও সর্ব্বাত্মক একজন আছেন, তিনি—ব্রহ্ম। (সুতরাং অসৎ-অনিত্য সংসার-বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া তাহার মূলীভূত সৎ-নিত্য বস্তুতে বঞ্চিত হওয়া—কণার জন্য ভূমা ত্যাগ করা—বুদ্ধিমন্তের কখনও বাঞ্ছনীয় নহে)। ব্রহ্ম নির্গুণ, নিরাকার, নিরাধার সর্ব্বগত, এজন্য অচল। অচল বলিয়া অবস্থান্তর-হীন, অর্থাৎ অবিনাশী। সুতরাং-ই নির্ব্বিকার। নির্ব্বিকার বলিয়া সর্ব্বদাই একরূপ, সুতরাং নিত্য-সত্য। সচরাচর ত্যাগ অপেক্ষা ভোগের প্রতিই লোকের অধিকতর অনুরাগ জন্মিয়া থাকে। কিন্তু জগৎকে অসৎ-অনিত্য বলিয়া জানিলে ভোগ-লিপ্সা নিবর্ত্তিত হয়। সুতরাং, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' —বাক্যের দ্বারা (সংসার-নিবৃত্তি ও কর্ম্মফলে বৈরাগ্য আনাইবার জন্য) অনিত্য ধনজনাদির এষণা (—রূপ যে অন্তরায়, তাহা) ত্যাগ করিয়া শাশ্বত ব্রহ্মানন্দ-সম্ভোগে উপদেশ করিয়াছেন।

এইভাবে দেখা যাইতেছে, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা, আত্ম-জিজ্ঞাসা ও জগৎ-জিজ্ঞাসা মূলে একই ব্যাপার—একই প্রশ্ন বিভিন্ন-ভাবে জিজ্ঞাসিত। ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ ও তৎপ্রাপ্তির উপায় এবং ফল বিচারের আশ্রয় ভূমি বলিয়াই মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন উপনিষদকে 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' আখ্যা দিয়াছেন। সাধন-সম্পন্ন শিষ্যের পক্ষে যাহা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্যের পক্ষ হইতে তাহাই ব্রহ্মমীমাংসা।' এবং উভয়কে যুক্ত করিয়া সমগ্রতার প্রেক্ষাপটে বিচার করিলে উপনিষদকে বলা যাইতে পারে—'ব্রহ্মবিদ্যা'। 'সেয়ং ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষচ্ছব্দ-বাচ্যা'।—'ব্রহ্মবিদ্যাই উপনিষদের উপক্রমণিকা, ব্রহ্মবিদ্যাই উপনিষদের উপসংহার।' বস্তুতঃ, কেবল বিচারণাত্মক জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত অনিত্য বস্তু বর্জ্জনপূর্ব্বক একমাত্র ব্রহ্মো-পলব্ধিই উপনিষদের তাৎপর্য্য। 'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্?' 'যাহা আমাকে অমৃতত্ব দিতে পারে না, তাহা লইয়া আমি কি করিব?'

উপনিষদ্ ভারত-জননীর ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার এক অনিন্দ্য আনন্দ-সংগ্রহ। এখানে ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার উপলব্ধ সত্য মহামহিমায় সমাহিত হইয়া আছে। উপনিষদ্ ভারতের এমন একটা ঋদ্ধিবান্ ঐতিহ্য বহন করিয়া চলিয়াছেন যাহা সর্ব্বদেশে সর্ব্বযুগে সর্ব্বক্ষেত্রে অপরাজেয় প্রতিদ্বন্দ্বীর গৌরবে অধিষ্ঠিত থাকিবে। বেদে যে জ্ঞানবৃক্ষের অঙ্কুর উদ্গত হইয়াছিল, তাহাই উপনিষদে পুষ্প-ফল-সমন্বিত উদার-প্রসারী মহাবনস্পতিতে পরিণত হইয়া অধ্যাত্ম নভোবিহারী বিহঙ্গমদলের পবিত্র আশ্রয়-নীড় হইয়াছে। তন্ত্র, পুরাণ ও ষড়্দর্শনে যাহাকিছু সত্য ও প্রামাণ্য নিহিত আছে, সে-সকলের মূল নিকষ হইতেছে—উপনিষদ্। বেদান্ত-গঙ্গা উপনিষদেরই মানসসরোবর হইতে উদ্ভূত হইয়া কত ধারায় কত দার্শনিক মতবাদের ক্ষেত্রকে উর্ব্বর করিয়া রাখিয়াছে। শুধু এদেশের নয়, য়ুরোপীয় দার্শনিক চিন্তাধারায়ও উপনিষদের প্রভাব বিস্তর। উপনিষদে যে ধর্ম্মতত্ত্ব উপন্যস্ত হইয়াছে, জগতের আর কোন দেশের ধর্ম্মমতে বা তত্ত্বচিন্তায় তাহা দৃষ্ট হয় না। উপনিষদের তত্ত্ব বোধি-দীপ্ত প্রত্যাদেশ —ব্রহ্মজ্ঞানের বাঙ্ময় প্রকাশ। এক একটি উপনিষদ্ যেন সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের তপোলব্ধ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও মনস্তাত্ত্বিক তথ্যের অমৃত-নিঃস্যন্দিনী কবিতা। যুগ-যুগান্তরের সূক্ষ্ম-সমীক্ষণ-লব্ধ অন্তরতম দার্শনিক প্রত্যয়ের শীর্ষ থেকে ব্যক্ত

এই স্বল্পাক্ষর ও দৃঢ়-পিনদ্ধ কবিতাবলী ভাষার ঐশ্বর্য্যে, ভাবের গাম্ভীর্য্যে, আদর্শের ঔদার্য্যে ও ছন্দের মাধুর্য্যে ঋষিদের কণ্ঠে সুরময় হইয়া এক অপূর্ব্ব বিদেহী শুচিতায় যেন ধ্রুবলোকে পৌঁছিতেছে। উপনিষদে ভারতের অধ্যাত্ম-মহিমা সমাধি-মগ্ন—দেহ লালসা মৃত, প্রাণ দেহাতীতের সন্ধানে অতীন্দ্রিয়লোকে উর্দ্ধায়িত। সমাধির সেই নির্ব্বিকল্প ভূমি হইতে উপলব্ধির আলোকে আপ্লুত হইয়া ব্রহ্মসাধক ঋষিগণ উপনিষদে অভয়মন্ত্র, অশোকমন্ত্র ও অমৃতমন্ত্র পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন—যে-মন্ত্রের পরম আস্বাদন মানবের পরিক্লিষ্ট ক্ষুদ্রায়িত আত্মাকে বিস্তারের অভিমুখে—অভয়-প্রতিষ্ঠার অভিমুখে—জ্যোতির্ম্ময় অক্ষয় অমৃতের অভিমুখে লইয়া যায়। গ্যালিলিও, নিউটন, মার্কনি, ফ্যারাডে, রুথার ফোর্ড, আইনষ্টাইন প্রভৃতি বস্তু-বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারে আমরা বিস্ময়ের পর বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকি। কিন্তু ভারতের আত্ম-বিজ্ঞানীরা আজীবন গবেষণার পর অসীম আত্মার অতলে অবগাহন করিয়া প্রজ্ঞার সন্ধানী আলোকে জীবনের যে সর্ব্বোত্তম সম্পদ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, বিশ্বের সেই বিরাট বিস্ময়ের কথা কি আমাদের স্মৃতিপথে উদয় হয়? আমরা কি মনে করি যে, সেই ক্রান্তদর্শী ঋষিদের পদাঙ্কিত পন্থাই মনুষ্যত্বের সনাতন পন্থা, তাঁহাদের অমর বাণীই মানবাত্মার বোধন গায়ত্রী?

উপনিষদের একটি বিশিষ্ট বিভাব হইতেছে—অদ্বৈত-ভাবনা। জীব ও ব্রহ্মচৈতন্যের একত্বই অদ্বৈতভাবনার মূল কথা। উপনিষদ্ বলেন—এক অদ্বৈত অখণ্ড অনন্ত আত্মাই সকলের মধ্যে জ্ঞাতারূপে অনুস্যূত—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। ইহাই ভারতের অখণ্ড সার্ব্বভৌম আধ্যাত্মিক গণতন্ত্র এবং বিশ্বের সকলেরই এ গণতন্ত্রের সাধারণ নাগরিক, কারণ সকলের মধ্যেই যে বিশ্বদেবের অমৃত প্রকাশ। উপনিষদ্ মানুষকে মানুষ বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। যিনি সকলের মধ্যে এককে দেখেন এবং সকলকে একের মধ্যে দেখেন, তিনি আর কদাপি কোন জীবকে হিংসা বা ঘৃণা করিতে পারেন না। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'তত্ত্বমসি', প্রভৃতি ঔপনিষদিক মহাবাক্য মূলতঃ জীবাত্মার তথা বিশ্বাত্মারই প্রশস্তি। অখণ্ড ব্রহ্মৈকত্বের বোধ হইতেই ভারত নিখিল বিশ্ববাসীর সঙ্গে আত্মিক সংযোগ অনুভব করিতে শিখিয়াছে। ভারতীয় মনে ঐক্য, সাম্য ও মৈত্রীভাবনা আত্মার ব্যাপ্তিময়তারই প্রসন্ন পরিণতি। উপনিষদে 'আত্মানাং বিদ্ধি'র যে উপদেশ, তাহা এই প্রেম ও ঐক্যের পথেই, 'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা'র যে উদাত্ত আহ্বান, তাহাও এই প্রেম ও সাম্যেরই অভিব্যঞ্জনা। উপনিষদ্ ভারতীয় মনে এমন একটা অমোঘ শক্তি প্রদান করিয়াছেন যাহাতে সে নূতনকে বর্জন না করিয়া করিয়াছে গ্রহণ,—বৈচিত্র্যকে প্রভেদ মনে না করিয়া আনিয়াছে তাহার মধ্যে সুসমঞ্জস সমাহার ও সমন্বয়। এই শক্তিবলেই সে আক্রমণকারী বিজেতাকে জয় করিয়াছে, বহিরাগত শত্রুকেও বরণ করিয়া লইয়াছে পরম মিত্ররূপে, যাহার ফলে 'শক-হুন-দল, পাঠান-মোগল একদেহে হ'ল লীন'। সংস্কৃতির এমন বিরাট রাসায়নিক সংমিশ্রণ জগতের ইতিহাসে বিরল। যুগে যুগে মহাপুরুষগণ এই সমন্বয়-সাধনার (Synthetical idiology) পূতপ্রবাহে ভারতীয় মনের আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রকে সরস-সজীব রাখিয়াছেন। বুদ্ধ-অশোকের মৈত্রী ও করুণা, শঙ্করের প্রজ্ঞা ও তপস্যা, নানক-মহাপ্রভুর প্রেম-সাধনা, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের মহাজীবন ও গান্ধী রবীন্দ্রনাথের বাণী ঔপনিষদিক তত্ত্বেরই অন্তর্নিহিত বহিঃপ্রকাশ।

আজ সমস্ত জগৎ এক বিরাট বিপর্য্যয়ের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মানুষের নৈতিক জীবনে আসিয়াছে অবসাদ, তাহার বিবেক হইয়াছে বিভ্রান্ত, তাহার পৌরুষ হইয়াছে মিথ্যার জঞ্জাল। দেশে-দেশে, মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে কৃষ্টিতে কৃষ্টিতে চলিয়াছে সংঘাত। পরস্পর সন্দেহ আর অবিশ্বাস মানুষের শান্তিকে করিতেছে বিঘ্নিত। দিকে-দিকে কত বিরোধ, কত সংঘর্ষ আজ উত্তাল হইয়া জীবনকে উতরোল করিয়া তুলিয়াছে। হিংসা-দ্বেষ-জিগীষার ঝঞ্ঝাবায়ু আণবিক অসুরের প্রলয়-গর্জ্জনে পাক খাইয়া ফিরিতেছে। 'উদ-বুদ্ধির দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে তত্ত্বের রাজ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতেছে। আজ মানুষ বিস্মৃত হইয়াছে—'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্'। মানুষ মানুষকে আঘাতের পর আঘাত হানিতেছে। আহতের দল সাহসের সঙ্গে বলিতে পারিতেছে না—'সর্ব্বব্যাপী পরম-পিতার এ-অমর দান। একা ভোগ করিলে চলিবে না। 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'। ত্যাগের মধ্যে সকলের সঙ্গে একত্রে এ পরমানন্দকে ভোগ করিতে হইবে। আজ কম্বুকণ্ঠে বলিতে হইবে—'মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্'—কাহারও ধনে লোভ করিও না। ধন-সম্পদ, জীবন-যৌবন, রাজ্য-রাজমুকুট, বিজয়-গৌরব নিত্য নয়, নিত্য হইতেছে স্নেহ, মমতা, ত্যাগ, প্রেম, সন্তোষ আর ভগবান্। ভোগে ভগবান্ নাই। কাড়া-কাড়ি হানাহানিতেও তাঁহাকে লাভ করা যায় না। তাঁহাকে লাভ করিতে হইবে ত্যাগের দ্বারা—'ত্যাগেনৈকেনামৃতত্ব, মানশুঃ—'একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করা যায়'। কিন্তু কে এই তত্ত্বকথা বলিবে? কে এই যুযুৎসু প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে মৈত্রী ও প্রেমের নবপ্রাণ সঞ্চার করিবে?—ভারত। পুরাণী প্রজ্ঞার ধারক ও বাহক ভারত, মহাপুরুষগণের মহাসাধনার উত্তরাধিকারী ভারত সাম্য, মৈত্রী ও ঐক্য এখনও বিস্মৃত হয় নাই। ইতঃপূর্ব্বেই

সে সানন্দে এ-ভার গ্রহণ করিয়াছে। শান্তিই ভারতের প্রতীক্। শান্তি ও মৈত্রীর বাণী লইয়াই ভারতের অশোক একদিন আন্তর্জ্জাতিক পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। কালের পরিবেশে অহিংসামন্ত্রের ঋত্বিক ভারতের প্রধানমন্ত্রী লোককান্ত জবহরলাল শান্তি ও মৈত্রীর বাণী অনাড়ম্বরভাবে দেশে-বিদেশে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছেন। আধ্যাত্মিক শক্তিতে আস্থাবান শান্তিপ্রিয় ভারতের কণ্ঠে আজ পঞ্চশীল, সহাবস্থান, অহিংসা, সাম্য ও মৈত্রীর মন্ত্র উদ্গাত হইতেছে। এই মন্ত্র-বলে ঃ

'হিংসা-দ্বেষ মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত—শঙ্কাভরে
হোক্ শান্ত হোক্ ;
আঁধারের প্রাণী যত ফিরে যাক্ আঁধার বিবরে,
নামুক আলোক।'

আমাদেরও কামনা—আলোক নামুক। সে আলোকে হিংসা-দ্বেষের কলুষ-কালিমা ধৌত হইয়া সকল মালিন্য বিগলিত হইয়া উপনিষদের উদার বিশ্ব-ভারতী ভাবাদর্শের ভিত্তিতে পারস্পরিক সহযোগিতায় এক বিশ্বজনীন সমাজ-ব্যবস্থা রচিত হউক—যে-সমাজে নিজ নিজ ধর্ম্ম, সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও বৈশিষ্ট্য লইয়া সখ্যে-সাহচর্য্যে বসবাস করিতে পারিবে অনুবর্ত্তী দিনের মানবগোষ্ঠী। মিলনব্রতী ভারতের প্রযত্ন বিশ্বসংস্থায় স্বীকৃতি লাভ করিলে বিশ্বজগৎ শান্তিময় হইবে।

'দ্যৌঃ শান্তি রন্তরিক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিরাপঃ
শান্তি রোষধয়ঃ শান্তিঃ।
বনস্পতয়ঃ শান্তি বিশ্বদেবাঃ শান্তি ব্রহ্ম শান্তি সর্ব্বং শান্তি
শান্তিরেবচ সা মা শান্তিরেধি ॥'

—দ্যুলোক, ভূলোক, অন্তরিক্ষ শান্তিতে পূর্ণ হউক, আপ, ওষধী, বনস্পতি শান্তিময় হউক, সমগ্র বিশ্বে শান্তি বিরাজ করুক। যে শান্তি পরমশান্তি, সেই শান্তি আমাতে আসুক।

নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ

দীর্ঘপথ

শ্রীকরুণাময় বসু

এ জীবন কিছু নয়, শুধু জানি আকাঙ্ক্ষিত সুরে
অশ্রান্ত পথের বাধা পার হয়ে হৃদয়ের কেন্দ্র পথ ঘুরে
নিয়ে যাব অগ্নিক্ষরা নৈবদ্য-বেদনা ;
মানুষের অনির্বাণ এই ত সাধনা।
নিয়েছি পথের ধূলো মূঢ়তম মুহূর্ত সঞ্চয়,
কোথায় তরুর ছায়া, রৌদ্র-দিনে কোথায় আশ্রয় ?
কোথায় বকুলবীথি, গন্ধমাখা অপরাহ্ণ বেলা
হঠাৎ ফুরাবে দিন ; সাঙ্গ করি এই তুচ্ছ পুতুলের খেলা
অক্লান্ত আনন্দ স্নিগ্ধ নবতর পুষ্পিত বিকালে
নূতন নক্ষত্র-পথে আত্মা মোর আশা দীপ জ্বালে।

এ জন্মে তীর্থদ্বারে কত যাত্রী পদচিহ্ন রেখে,
আশ্চর্য জীবন-প্রশ্ন, অজানিত সুখ-দুঃখ এঁকে
চলে গেছে দূর হতে দূরে ;
পথ হতে পথান্তরে, নদী হ'তে মহা সমুদ্দুরে।
দুঃখ আছে, ব্যথা আছে জানি,
জীবনের মর্মকোষে যদি কোন থাকে সত্যবাণী,—
সেই বাণী কোন দিন অন্ধকারে হবে না নিঃশেষ ঃ
খণ্ড তুচ্ছ ক্ষুদ্র ক্ষতি পার হয়ে দুর্লভের পাবে সে উদ্দেশ।
অনির্বাণ বেদনার জ্যোতি
তিলে তিলে গড়ি তোলে নামহারা দেবতার আশ্চর্য মূরতি
এ জীবন-পদ্ম বনে কোন ক্ষণে নেমে আসে চাঁদ,
কখন জোয়ার জলে লেগে থাকে কার যেন অশ্রুর আস্বাদ ?
আকাশের ছায়াপথ, সপ্তর্ষি আলোয়
এ বিষণ্ণ বাসাভাঙা হৃদয়ের স্বপ্নটুকু ছোঁয় ঃ
তারপর মাঠ ঘাট, শালবন, রাঙা পথে অনন্ত স্বাক্ষর,
শিল্প-কীর্তি ফেলে রেখে চলে গেছে রূপদক্ষ কোন যাদুকর।

সাইরেন

ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়

—চললাম বৌমা, চললাম প্রদীপ। একদিন তোমরা আমাদের ওখানে যেও সব।

—যাব মামীমা, নিশ্চয়ই যাব। বলতে বলতে যূথিকা হেঁট হয়ে তর্জনীর প্রান্ত দিয়ে রমলার দু' পায়ের আঙুল স্পর্শ করে মাথায় ছোঁয়ায়। রমলা ডান হাত বাড়িয়ে তার চিবুক ছুঁয়ে ওষ্ঠে ঠেকায়। তার পর বলে, ভারী ভাল লাগল তোমাদের। বেশ আনন্দে কেটে গেল সময়টা। কিন্তু ওনাকে নিয়ে—অদূরে দণ্ডায়মান স্বামী কল্যাণকে হাত দিয়ে দেখিয়ে—কোথাও যে স্বস্তিতে কাটাতে পারব তার উপায় নেই। এমন ধড়ফড়ে মানুষ দু'টি যদি কোথাও থাকে। যদি আসবার ইচ্ছেই ছিল না তোমার তবে এলে কেন? অনর্থক লোকজনকে বিরক্ত করে মারা। এখন খুশী হয়েছ ত? চল, লক্ষ্মী-ছেলের মত খোঁয়াড়ে গিয়ে ঢুকবে চল। বাব্বা, বাবা, অস্থির করে মারলে আমায়। বলে নিজেই এগিয়ে গিয়ে গাড়ীতে উঠে বসে।

যূথিকা বলে, কি চমৎকার মানুষ। দু'জনের মনের মিল যেমন, চেহারার মিলও তেমন।

স্ত্রীর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নেয় প্রদীপ। তার পর বলে, মিল হবে না কেন? আমাদের মত দিনরাত খিটিমিটি ত ওদের লেগে নেই, গজ-কচ্ছপের লড়াইও হয় না অষ্টপ্রহর। তাই সুখেই আছে ওরা। উঃ! কি বিয়েই হয়েছে আমার।

যূথিকা বলে, সত্যি। দিনরাত দাঁতের বাদ্যির কচ্-কচানিতে পাড়ার লোকেরা পর্যন্ত অতিষ্ঠ। ওদের দেখে শেখ, কেমন করে সংসার করতে হয়।

—খুব শিখেছি। আর শেখবার বাকি কিছু নেই। সংসার করছি বটে আমি। বাপ-ঠাকুর্দার নামটা না হয় ছেড়ে দিলাম, নিজের নামটা পর্যন্ত ভুলে যেতে বসেছি। পাগল হবার আর কিছু বাকি নেই আমার। সেই বেটি মোতির মা ঘটকী মাগীকে একবার যদি পাই—।

—কি কর তার?

—বিশেষ কিছু না। শুধু ঐ ভক্তি খেকো দাঁতগুলি তার উপড়ে ফেলি একটি একটি করে। কি ধরিবাজ মেয়ে-মানুষ রে বাবা! মরা-কান্না জুড়ে দিত বাড়ীতে এসে। বলত, এখানে বিয়ে না হলে মেয়ের ঠাকুর্দা আত্মহত্যা করবে। রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী মেয়ে। হাজারে অমন একটা মেলে কিনা সন্দেহ। এ মেয়ে বিয়ে করবে না ত করবে কোন মেয়েকে। এখন হাড়ে-মাশে টের পাচ্ছি, কেমন লক্ষ্মী-সরস্বতীকে নিয়ে ঘর করছি আমি।

যূথিকাও রেগে উঠে। বলে, আমিও দেখে নি একবার মাগীকে পেলে। বলেছিল, ছেলে রূপে গণপতি, গুণে ময়ুর-ছাড়া কার্তিক। গৌরীর মত আর জন্মে অনেক তপস্যাই করেছিলে মা, যে, এমন ছেলে জুটেছে তোমার ভাগ্যে। এখন তাই ভাবি, কি পাত্রই না জুটেছে আমার ভাগ্যে। তপস্যাটা যদি একটু বুঝে-সুঝে করতাম, হয়ত এমনটি জুটত না। শুধু রূপটাই মিলেছে গণেশ ঠাকুরের সঙ্গে, আর কিছু নয় এই দু'বছরেই হাড়ে দুব্বো গজিয়ে উঠল আমার। এখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। রূপ আর গুণ কাকে বলে একবার তাকিয়ে দেখ মামাবাবুটিকে তোমার। তা হলেই বুঝতে পারবে সব।

প্রদীপ বলে, শুধু মামাবাবুটিকেই দেখলে হবে না। মামীটিকেও দেখ, লক্ষ্মী-সরস্বতী কাকে বলে। তখনকার দিনের বি-এ পাশ করা মেয়ে। কিন্তু মামাবাবুকে মান্য করে কত। তার কথা এতটুকু অমান্য করে না। একটা দিনের তরেও ওদের মধ্যে অমিল দেখলাম না আমি।

—দেখবে কোত্থেকে। শুনেছি ওদের না কি ভাল-বাসার বিয়ে। ভালবেসেই ওরা নাকি বিয়ে করেছে পরস্পরকে।

—ভুল শুনেছ। ভালবেসে ত নয়ই, বরং বলতে পার এ বিবাহে মত ছিল না মামাবাবুর। যা হয়েছে, বলতে পার সে শুধু মামীমারই কৃতিত্বে। সেই অগ্রণী হয়ে বিবাহ করেছে মামাবাবুকে।

—বল কি?

—উপায় ছিল না। কলঙ্কের ভয় মেয়েদের বড় ভয়। আর সেই ভয়েই এক দিনের না-ধর্মী মামীমাটি তার সব কিছু সংস্কার, মতবাদ বদলে বিবাহ করে বসল মামাটিকে, এক রকম জিদ করেই।

—এমন অপূর্ব সমন্বয় হ'ল কি করে?

প্রদীপ বলে, সাইরেনের কৃপায়।

বিস্মিত যূথিকা প্রশ্ন করে, সাইরেন? সে আবার কি কথা?

—ভারী মজার কথা। তোমার আমার বিয়েতে ঘটকালি করেছিল মোতির মা, তাই এমন বিপর্যয়। আর ওদের বিয়েতে ঘটকালি করেছে সাইরেন, তাই এমন সমন্বয়। সে দিন ঠিক ঐ সময়টিতে সাইরেন যদি না বাজত, তা হলে এমন অপরূপ সমন্বয় সম্ভবপর হ'ত না কখনই।

—বাজে কথা। যূথিকা মুখ ঘুরিয়ে নেয়, মোতির মাকে তুমি ছ'চক্ষে দেখতে পার না, তাই।

—উঁহু। এ পারাপারির কথা নয় যুঁই। এ বাস্তব। ঘটনাটা শুনলেই বুঝতে পারবে তুমি। আমি যেমনটি শুনেছি ঠিক তেমনটি তোমায় বলি শোন। যুদ্ধের সময়, জাপানীদের ভয়ে থরহরি সকলেই। সাইরেন বেজে চলেছে প্রতি নিয়তই। এমনি একদিন অপরাহ্নে ওরা চলেছে ছ'জনেই চৌরঙ্গীর ওপর দিয়ে।

গাড়ীতে ভিড়ের অন্ত নাই। ঠাসাঠাসি লোক দাঁড়িয়ে আছে হাতল ধরে। শীতের অপরাহ্ন। সোনা-রোদে ঝলমল। ডান পাশে সুদূর প্রসারিত মাঠ। মাঠে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল। মানুষের নিরুদ্বিগ্ন জটলা। শান্ত পরিবেশ। বেশ একটা অলস মন্থর ভাব। বাঁ দিকে রাস্তার ধারে ধারে বড় বড় সওদাগরী আপিস। মাঝে মাঝে ইউরোপীয়ান পল্লী। মামা অর্থাৎ কল্যাণ সেন বসেছিল ট্রামের সামনের সীটে। লেডিজ সীটে বসেছিল রমলা সোম অর্থাৎ বর্তমানে যিনি আমার মামী। ছ'জনের পরিচয় দূরে থাক, চাক্ষুষ দেখাটি পর্যন্ত হয় নি এর আগে। সেই দিন দেখা হ'ল। মামা বলেন বেশ, জান হে প্রদীপ, ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে তোমার মামী চলেছিলেন ভিক্ষা করতে।

মামীমা প্রতিবাদ করে বলে, কখখন না। সমিতির চাঁদা আদায়ের জন্যে বেরিয়েছিলাম। চাঁদা আদায় করাকে ভিক্ষে করা বলে না।

—তা বলে না। কিন্তু ওটি ত ছল। ওরই আবরণে যা-কিছু আসে। ব্যবসাটা কিন্তু মন্দ ছিল না রুমি।

মামীমা রেগে ওঠে। বলে, দেখ, রাগিও না বলছি। ভাল হবে না কিন্তু।

যূথিকা বাধা দেয়। বলে, ঝগড়ার কথা পরে শুনব'খন। আগে পরিচয়টা কি ভাবে সুরু হ'ল তাই বল।

—পরিচয় সুরু হ'ল সাইরেনের সুবাদে। সেই শান্ত পরিবেশের মধ্যে অকস্মাৎ অশান্তির ঢেউ তুলল সাইরেন। শান্ত প্রকৃতির বুক চিরে উঁচু-নীচু স্বরে সাইরেন বেজে উঠল তীব্র আর্তনাদে। মুহূর্ত মধ্যে একটা স্তম্ভিত ভয়-চকিত ভাব। পরমুহূর্তে মাঠের সেই ছোট ছোট জটলা কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেল চক্ষের নিমিষে, বোঝা গেল না। সৈন্য-ভর্তি লরীগুলির দ্রুত গমনাগমন আর মোটর-বাইকের তর্জন-গর্জন পরিবেশটিকে ভয়াল করে তুলল আরও বেশী। ট্রামেরও গতি রুদ্ধ হ'ল সেই সঙ্গে। কণ্ডাক্টর গম্ভীর কণ্ঠে আরোহীদের জানিয়ে দিল, আপনারা দয়া করে গাড়ী থেকে নেমে স্লিট-ট্রেঞ্চে আশ্রয় নিন। এ সময়ে গাড়ীতে থাকবার হুকুম নেই কাহারও। ভীত-সন্ত্রস্ত আরোহীর দল যে যেভাবে পারল গাড়ী থেকে নেমে বাতাসে মিলিয়ে গেল। পূর্ণগর্ভগাড়ী মুহূর্তমধ্যেই শূন্যগর্ভ হয়ে পড়ল। কিন্তু বিপদ হ'ল একজনের।

—কার? মামীমার নিশ্চয়ই। যূথিকা প্রশ্ন করে মাঝখানে।

প্রদীপ ঘাড় নেড়ে বলে, তারই। সে তখন সীট ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে সামনে যাকে পাচ্ছে বিহ্বল কণ্ঠে প্রশ্ন করছে, কি ব্যাপার বলুন ত?

কিন্তু উত্তর দেবে কে? নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত সকলেই। সুতরাং প্রত্যুত্তর এল না কারো কাছ থেকেই। কল্যাণ আসছিল সকলের পিছু পিছু। রমলার প্রশ্নে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, সাইরেন বাজছে। ট্রাম থেকে নেমে চট্ করে কোথাও আশ্রয় নিন। এ সময়ে ট্রামে থাকা নিরাপদ নয়।

রমলা ভীত হয়ে ওঠে। ভীত কণ্ঠে বলে, কিন্তু আশ্রয় নেব কোথায়? এ অঞ্চলে আমার ত জানা-শুনা কেউ নেই।

কণ্ডাক্টর দ্বিতীয়বার তাড়া দিল, দেরি করবেন না। পাশেই স্লিট-ট্রেঞ্চ আছে। উপস্থিত সেখানে সব আশ্রয় নিন। গাড়ী খালি করে দিন।

রমলা স্লিট-ট্রেঞ্চগুলির দিকে তাকিয়ে দেখে। ইতি-মধ্যেই কালো কালো মাথায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে সেগুলি। অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর পথচারীর দল। এতক্ষণ মাঠের মধ্যে জটলা করছিল নিরুদ্বেগে, এখন ট্রেঞ্চগুলিতে আশ্রয় নিয়েছে সেঁধিয়ে। দেখে-শুনে মুখ শুকিয়ে উঠল রমলার। বলল, এই ট্রেঞ্চে আশ্রয় নিতে বলেন আমাকেও?

—আমি বলি না। কিন্তু গাড়ীতে যখন থাকতে দেবে না, তখন আশ্রয় ত নিতে হবে কোথাও?

—তা হ'ক। ওখানে মরে গেলেও আমি ঢুকতে পারব না।

কল্যাণ বলে, মরামরির কথা নয়। বেঁচে থাকতেই আশ্রয় নিতে হবে। এখানে আমারও পরিচিত কেউ নেই যে সেখানে আশ্রয় দেব আপনাকে।

গাড়ী খালি হয়ে যায়। কণ্ডাক্টর আবার তাগাদা দেয়।

রমলা তাকায় অসহায় ভাবে কল্যাণের মুখের দিকে। কল্যাণ একটু ইতস্ততঃ করে, তার পর বলে, আসুন আমার সঙ্গে। একবার চেষ্টা করে দেখি কোথাও আশ্রয় পাই কি না।

সঙ্কোচ করবার সময় নয়। রমলা করেও না। পুরুষের অবলম্বন পেয়ে সে কতকটা সাহসী হয়ে উঠে। কল্যাণেরই সঙ্গে ট্রাম থেকে নেমে পড়ে ক্ষিপ্র-পদে। মাথার উপর খান দু'য়েক প্লেন আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছিল। তাদের গুরু-গম্ভীর রব পারিপার্শ্বিক অবস্থার গাম্ভীর্যকে বাড়িয়ে তুলেছিল চতুর্গুণ। রাস্তা ফাঁকা—জনহীন। একটা সর্বনাশের পূর্বাভাস যেন সর্বত্রই পরিস্ফুট। তারই মধ্য দিয়ে কল্যাণ এগিয়ে চলে পূর্বদিকের একটা রাস্তা লক্ষ্য করে। পিছনে রমলা। পরিষ্কার পথ, পরিচ্ছন্নতায় ভরা। কল্যাণ বোঝে সৌখীন ইউরোপীয়ান পল্লী। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য দেবার সময় নাই তার। নিজের জন্য সে বিব্রত নয়। বিব্রত সঙ্গিনী মেয়েটির জন্য। এ মেয়ে তার আত্মীয়া নয়, পরিচিতা নয়। সঙ্কোচ তার এইখানে। তবে বিপদে মানসিক বৃত্তিগুলি আপনা থেকেই শিথিল হয়ে আসে বলেই সে মুখ ফিরিয়ে বলতে পারে, কি কাণ্ড দেখুন, এমন জায়গায় এসে পড়েছি যেখানে আশ্রয়ের চিহ্নমাত্র নেই।

রমলা কথা বলে না। একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখে। তার পর আর একটু এগিয়ে এসে কল্যাণের পাশে পাশে চলতে থাকে।

কল্যাণ বলে, একটা আশ্রয় না পাওয়া পর্যন্ত আমরা নিরাপদ নই। যতক্ষণ না পাই, অসুবিধে ভোগ করতে হবে আপনাকে।

রমলা এবার উত্তর দেয়, তা হ'ক। স্লিট-ট্রেঞ্চে থাকার চাইতে এ অনেকগুণে ভাল। এখানে একটা না একটা আশ্রয় কোথাও মিলবে নিশ্চয়ই।

—আশা করি মিলবে। সেই আশা নিয়েই এসেছি এখানে। কিন্তু যতক্ষণ না পাই, ততক্ষণই ভাবনা। আপনাকে একটা নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে না দেওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছি না মনে।

রমলা হয় ত মনে মনে একটু লজ্জিত হয়। নতকণ্ঠে বলে, আমার জন্যে আপনার কতখানি দুর্ভোগ দেখুন। তাই ভাবছি, আপনার দেখা না পেলে কি দুরবস্থাই না হ'ত আমার। শেষ পর্যন্ত স্লিট-ট্রেঞ্চেই হয় ত আশ্রয় নিতে হ'ত আমাকে। কিন্তু সেখানে থাকলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই দমবন্ধ হয়ে মরে পড়ে থাকতাম আমি।

কল্যাণ বলে, স্লিট-ট্রেঞ্চে যে আপনি আশ্রয় নিতেন না, এ আমি জানি। কিন্তু আপনার দুর্ভোগের নিরসন না করা পর্যন্ত কোন কৃতিত্বই আমার নেই জানবেন। এখন তপ্ত কটাহ থেকে আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দেওয়ার মত অবস্থা দাঁড়িয়েছে আমাদের।

প্রত্যুত্তরে রমলা কি একটা বলবার উপক্রম করছিল। কিন্তু মুখের কথা তার ওষ্ঠপ্রান্তে এসেই মিলিয়ে গেল। সহসা অনতিদূরে বিস্ফোরণের এক প্রচণ্ড শব্দ শঙ্কা-ব্যাকুল মহানগরীর সমস্ত নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিয়ে মনের মধ্যে এক বিভীষিকার সৃষ্টি করে তুলল আর সঙ্গে সঙ্গে সমবেতকণ্ঠের একটা চাপা ভয়ার্তনাদ বাতাসে ভেসে এসে শরীরের রক্ত চলাচল বন্ধ করে দিল।

—মাগো! একটা অস্ফুট আর্তনাদ রমলার মুখ দিয়েও বার হয়ে এল। ভীত বিবর্ণ মুখখানি দু'হাতে ঢেকে সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে সে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু বুদ্ধিভ্রষ্ট হ'ল না কল্যাণ। এতক্ষণকার সমস্ত সঙ্কোচ, সমস্ত ইতস্ততঃ ভাবকে সে মুহূর্তমধ্যে কাটিয়ে উঠে রমলার একখানি হাত দৃঢ়ভাবে ধরে সামনে যে বাড়ীখানা পেল সেইখানে তাকে টেনে এনে বলল, ভয় পাবেন না। আশ্রয় আমরা পেয়েছি একটা।

রমলা হাত ছাড়বার চেষ্টা করে না। শুধু ভীত-কম্পিত কণ্ঠে বলে, ভগবান রক্ষা করেছেন। কিন্তু বোমা পড়ল কোথায়?

—বোমা পড়ে নি। মিলিটারী লরীর টায়ার ফেটে আওয়াজ হয়েছে। মনের অবস্থা স্বাভাবিক নয় বলেই ভয় পেয়েছিলেন অতখানি। নইলে বুঝতে পারতেন সব।

লজ্জায় রমলা এতটুকু হয়ে যায়। বলে, ছি! ছি! কি কেলেঙ্কারী! সত্যি সত্যি বোমা পড়েছে মনে করে কি কাণ্ডটাই না করে ফেলেছিলাম বলুন ত?

কল্যাণ বলে, আপনাকে দোষ দিই না। ভয় জিনিসটা মানুষকে দুর্বল করে ফেলে। আপনাকেও ফেলেছিল।

যে বাড়ীখানার সামনে এসে তারা দাঁড়িয়েছিল সেখানা বিরাট না হলেও সুদৃশ্য বাড়ী। দ্বিতল বাড়ীখানি বাগানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে নিস্তব্ধ পুরীর মত। ইউরোপীয়ান পল্লীর মধ্যে ইউরোপীয়ানেরই বাড়ী। রমলাও সেই কথাই বলে, এ যে খাস সাহেবের বাড়ী দেখছি।

কল্যাণ উত্তর দেয়, সাহেব-পল্লীতে সাহেবেরই বাড়ী হওয়া উচিত। এখানে বাঙ্গালীর বাড়ী পাব কোথায়? তবে আশ্রয়ের জাত নেই।

রমলা একটু আহত হয়। বলে, সেটুকু শিক্ষা আমার আছে। ও ভেবে কথাটা বলি নি আমি।

—না বলাই ভাল। তবু ত আশ্রয়। বিপদের সময় এর মূল্য অনেক। কিন্তু পরিবেশ দেখে মনে হয় সাহেব লোকটি সৌখীন। আপনার কি মনে হয়?

—কিছু না। রমলা মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

কল্যাণ কলিংবেল এ হাত দিতে যায়। কিন্তু তার আগেই দরজা খুলে যায়। সাহেবের আর্দালী এসে সসম্ভ্রমে সেলাম বাজিয়ে দাঁড়ায়। কল্যাণ বলে, মাইজী বিপদে পড়ে সাহেবের কুঠিতে আশ্রয় নিয়েছেন। 'অল ক্লিয়ার' হলেই চলে যাবেন। সাহেবকে জানিয়ে এস তুমি।

কিন্তু জানাতে হয় না। সাহেব ছিলেন পাশের ঘরেই। বেরিয়ে এসে আহ্বান জানালেন তিনিই, কাম ইন প্লীজ। গ্ল্যাড টু মিট্ ইউ। যেন কত কালের পরিচয়।

সাহেবের নাম জন মরিসন। কলকাতার উপকণ্ঠে কোন এক নাম-করা জুট-মিলের মালিক। সুতরাং, ধনী ব্যক্তি। অতিক্রান্ত-যৌবন ভদ্রলোক। কিন্তু শরীরের বাঁধন এখনও তাকে যৌবনের মাঝপথে আগল দিয়ে রেখেছে। উন্নত-বলিষ্ঠ দেহ, কেশ-বিরল মস্তিষ্ক এবং সারল্য-মণ্ডিত মুখশ্রী, দেখলেই গ্রীক-দেবতা দের কথা স্মরণে জাগে।

কল্যাণ ঘাড় দুলিয়ে বলে, থ্যাঙ্কস্। সাইরেন আমাদের মিলিয়ে দিয়েছে। রাস্তার মোড়ে লরী ফাটার শব্দকে বোমার শব্দ মনে করে ইনি বড় বিচলিত হয়ে পড়েছেন। তাই আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেম এখানে। আপনাদের বিরক্ত করলাম অযথা।

—বেশ করেছেন। অতিথি সর্ব অবস্থায় বরণীয়। বিরক্তির কোন কারণ নেই এতে। আপনারা কিন্তু হবেন না। আপনাদের আমন্ত্রণ জানাতে পেরে বরং খুশীই হয়েছি আমি। আসুন, আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি আপনাদের।

পাশের ঘরেই ছিলেন মরিসনের স্ত্রী ডোরা। স্বামীরই উপযুক্ত স্ত্রী। তেমনি অমায়িক, তেমনি ভদ্রমনা। দু'জনাকেই অভ্যর্থনা করলেন হাসিমুখে। রমলাকে পাশে বসিয়ে অভয় দিয়ে বললেন, ভয় পাবার কিছু নেই মিসেস সেন। এত আজকাল প্রায় দৈনন্দিন ব্যাপার বললেই হয়। তা ছাড়া এখানে আপনারা নিরাপদ, অন্ততঃ রাস্তার চাইতে ত বটেই।

মিসেস সেন? কথাটা তীরের মত গিয়ে বেঁধে রমলার কানে। রমলা চমকে উঠে। বিবর্ণ মুখে কল্যাণের মুখের দিকে তাকায়। দেখে, সেও তেমনি বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে দেখে তারই দিকে।

আশ্চর্য ঘ'না! এমন অসম্ভব কেমন করে হ'ল? এমন অভাবিত সম্বন্ধই বা এরা অনুমান করে নিল কি করে। কোন পরিচয় ত এখনও দেওয়া হয় নি এদের কাছে। রমলা ঘাবড়ে যায়। মিসেস মরিসনের ভুল সংশোধন করতেও ভুল হয়ে যায় তার। সে শুধু তাকিয়ে থাকে।

ডোরা মরিসন বলে চলেন, এ দেশে এসেছি অনেক দিন। এ দেশের ছেলেমেয়েদের দেখেছি। মেয়েদের অনেক কথাই শুনেছি। তাদের শ্রদ্ধাও করে থাকি যথেষ্ট। কিন্তু তাদের সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচিত হয়ে উঠতে পারি নি আজও পর্যন্ত। মনে হয়, আপনার সঙ্গে আলাপ করে সে ক্ষোভ আমার অনেকাংশে মিটবে, মিসেস সেন।

রমলা কেমন আড়ষ্ট হয়ে থাকে। তার মুখে ভাষা জোগায় না। সে বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে আরক্ত মুখে একটুখানি ঘাড় নাড়ে।

মিসেস মরিসন বলেন, মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয় সম্পদে আর বিপদে। বিপদের পরিচয়-ই তাদের কাছে টানে, ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ দেয়। বিপদ আমাদেরও সুযোগ দিয়েছে। সুতরাং এর সদ্ব্যবহার আমরাও করব। আশা করি, এতে আপনার অমত হবে না কিছু। দৈনন্দিন জীবনে না হ'ক, মাঝে মাঝে যদি দেখা সাক্ষাৎ হয়, তাতেও আমি খুশী হব খুব।

রমলা এবার সচেষ্ট হয়ে উঠে। সে যে মিসেস সেন নয়, এই কথাটাই সে বোঝাতে যায় মরিসন দম্পতিকে, কিন্তু কেমন এক অনাস্বাদিত লজ্জায় কণ্ঠতালু তার জড়িয়ে আসে। গলার স্বর গলার মধ্যেই আটক পড়ে যায়। সে মুখ নামিয়ে নেয়।

মিসেস মরিসন কৌতুক বোধ করেন। বলেন, আপনি বড় বেশী সঙ্কুচিত হচ্ছেন, মিসেস সেন। কিন্তু এখানে সঙ্কোচ করবার মত কিছু নেই। বাড়ীতে নিজেকে যতখানি স্বাচ্ছন্দ্যময় আর নিরুদ্বিগ্ন মনে করে থাকেন, এখানে তার চাইতে কম মনে করবেন না।

রমলা এইবার কথা বলে। চকিতে একবার কল্যাণের দিকে তাকিয়ে দেখে মৃদুকণ্ঠে বলবার চেষ্টা করে, না, না, নিরাপত্তার অভাব আমি এক বিন্দুও অনুভব করছি না মিসেস মরিসন। তবে—।

—তবে কি বলুন?

কিন্তু বলবার সুযোগ রমলা পায় না। ততক্ষণে মরিসন দম্পতির বছর দু'য়েকের শিশুপুত্রটি শাড়ীপরিহিতা অপরূপ এক অতিথিকে দেখে একেবারে তার কোল-ঘেঁসে এসে দাঁড়ায় এবং দু'হাতের দু'টি পুতুলকে তুলে ধরে পরম বিজ্ঞের মত বলে, পাপ্পা, মাম্মা। অর্থাৎ দু'টি পুতুলের একটি দিয়েছেন বাবা, অপরটি দিয়েছেন মা।

রমলা যেন অব্যাহতি পায়। তার হকচকিত মন এমনি

এক অস্বস্তিকর পরিবেশের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য যেন অবলম্বন খুঁজে ফিরছিল, এবার সে অবলম্বন পায়। তাই সে দু'হাত বাড়িয়ে পরম স্নেহভরে শিশুটিকে কোলের উপর টেনে নেয়। তার পর আদর করে তার নরম গাল দু'টি টিপে দিয়ে বলে, আর একটা দেবে তোমার মাসীমা, বেবী। খু-ব বড়, কেমন, নেবে ত ?

শিশু গম্ভীর মুখে ঘাড় নাড়ে।

অপর দিকে কল্যাণ আর মরিসন নিজের মধ্যে আলোচনায় মগ্ন হয়ে উঠে। সাইরেন থেকে সুরু করে, রুশ-জার্মান যুদ্ধ, জাপানীদের ভারতবর্ষ আক্রমণ, আমেরিকানদের যুদ্ধে যোগদান, কোন আলোচনাই বাকি থাকে না তাদের। একটির পর একটি প্রসঙ্গ তুলে তারা আলোচনা করে চলে অনর্গল।

কিন্তু আলোচনা জমাট বাঁধতে পারে না রমলা আর মিসেস মরিসনের। আলাপ করবার উৎসাহ রমলার কম নয়, কিন্তু সঙ্কোচ পথ রোধ করে দাঁড়ায়। নিজের আসল পরিচয় প্রকাশ করতে না পেরে সে সঙ্কটে পড়ে। এমন সময় মিসেস মরিসন বলেন, বেশ মিলেছে, কিন্তু আমার স্বামী আর আপনার স্বামী দু'জনে : দু'জনেই সমান মিশুকে। আপনি কিন্তু একটু বেশী লাজুক, মিসেস সেন। তাই স্বস্তি পাচ্ছেন না এখানে।

রমলা বিপন্ন বোধ করে। এ সব কথার উত্তর দেওয়া যায় না। অথচ নিরুত্তরে থাকাও ভদ্রতা-বিরুদ্ধ। অনেক চেষ্টা করে চোখমুখ লাল করে একটা উত্তর সে দিতে যায় বটে, কিন্তু 'অল-ক্লিয়ারের বাঁশী' বেজে উঠে সেই মুহূর্তে।

স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচে সকলেই। মিঃ মরিসনই কথা বলেন প্রথমে, জাপানীরা বোধ হয় ভয় পেয়ে পিছু হটে গেল।

মিসেস মরিসন সায় দেন, খুব সম্ভব তাই। তা না হলে এতক্ষণে গোলগোল পড়ে যেত। কিন্তু এই বদ্ধ ঘরে বসে বসে হাঁপিয়ে ওঠার চাইতে মুক্ত বাতাসে যাওয়া অনেক ভাল। কি বলেন, মিঃ সেন ? শেষ কথাগুলি তিনি কল্যাণকে উদ্দেশ করেই বললেন।

কল্যাণ সায় দিল, নিশ্চয়ই। এক'শো বার ভাল, কিন্তু এবার আমরা উঠি। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের। বলে কল্যাণ তাকায় রমলার দিকে।

কিন্তু রমলা তাকায় না। সে তখন গল্পে মশগুল শিশু-মরিসনের সঙ্গে। তারই হাত ধরে সে তখন এগিয়ে চলেছে বাগানের দিকে।

মিসেস মরিসন বলেন, নিশ্চয়ই যাবেন। তবে সম্মানিত অথিতি আপনারা। সচরাচর জোটে না এমনটি। 'এ লাভিং বেঙ্গলী পেয়ার।' আপনাদের ওপর লোভ আমার খুব বেশী, তাই ছাড়ছি না সহজে। চায়ের টেবিলে আরও কিছুক্ষণ থেকে তবে ছাড়া পাবেন। তার পর রমলার দিকে ফিরে মিষ্টি হেসে বলেন, আমার ছেলের 'আন্টি' আপনি। অতএব আমার নিকট আত্মীয়। আপনার ত কোন ওজরই খাটবে না এ ক্ষেত্রে। তাড়াহুড়ো চলবে না। বসতে হবে আরও কিছুক্ষণ। আমি এলাম বলে, বলতে বলতে মরিসন দম্পতি একটু ব্যস্ত ভাবেই অন্দরের দিকে প্রস্থান করলেন।

স্ত্রীর অনুরোধে মিঃ মরিসন অতিথিদের তত্ত্বাবধানে রইলেন বটে, কিন্তু বেশীক্ষণের জন্য নয়। সহসা পাশের ঘরে টেলিফোন যন্ত্র বেজে উঠল ঝন ঝন করে। বয় এসে খবর দিয়ে গেল, হ্যামিল্টন সাহেব ফোন করছেন 'মিল' থেকে।

মিঃ মরিসন উঠে পড়ে বললেন, এক্স্‌কিউজ মি, মাই ফ্রেণ্ডস। আপনাদের অনুমতি নিয়ে এক মিনিটের জন্যে বিদায় নিচ্ছি আমি। আপনারা দু'জনে ততক্ষণ একটু গল্প করুন, আমি এলাম বলে। মিঃ মরিসন চলে যান।

কল্যাণ আর রমলা দু'জনে বসে থাকে মুখোমুখি। একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি চাড়া দিয়ে উঠে দু'জনার মধ্যে। প্রথমে কথা বলে রমলা, তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে, অপমানের ত চূড়ান্ত হ'ল আমার। এবার এ প্রহসনের যবনিকা ফেলুন। সাহেবী-খানার প্রতি লোভ আমার নেই। আপনার যদি থাকে, আপনি থাকুন, আমি বিদায় নি।

কল্যাণ মনে মনে আহত হয়, কিন্তু শান্তকণ্ঠে বলে, লোভ আমার কিছুতেই নেই। তবে ভদ্রতা জ্ঞানটুকু আছে।

রমলা আশ্চর্য হয়ে বলে, আপনার ভদ্রতা জ্ঞানের জন্যে বসে বসে এই সব আপত্তিকর কথাগুলো শুনতে হবে আমাকে ? বেশ লোক ত আপনি !

—শুনবেন কেন ? ওদের ভ্রান্তি সংশোধন করে দিন। সেইটাই ত উচিত ছিল আপনার।

—শুধু আমার ! আপনার নয়, আপনিও ত নিরসন করতে পারতেন ওদের ভ্রান্তি।

কল্যাণ রাগ করে না। বলে, পারতাম, কিন্তু সুযোগ জুটেছিল আপনার, সে সুযোগের যখন সদ্ব্যবহার করলেন না, তখন মুস্কিল হ'ল আমার। বেশ ত, যাবার বেলায় এদের ভুল ভেঙে দিয়ে যাই, আসুন।

—না, রমলা মাথা নাড়ে, কেলেঙ্কারী বাড়িয়ে কাজ নেই আর। অপমান যা হবার হয়ে গেছে। তার সঙ্গে শ্রদ্ধাটুকু হারাতে যাই কেন ? এতক্ষণ পর ভুল ভাঙতে গেলে লাভ হবে না কিছু, বরং সন্দেহই জাগিয়ে তোলা হবে ওদের মনে।

অপমান যদিও বা সয়ে গেছি কোন মতে, অসম্মান সইতে পারব না কিছুতেই।

কল্যাণ বলে, আপনি বুদ্ধিমতী। পরিবেশের চক্রান্ত বুঝতে পারছেন সবই। এতে আমি আশ্চর্য হই নি। তবে নিজেদের অসাবধানতায় যা ঘটে গিয়েছে তার জন্যে সাবধান হওয়া ছাড়া কি-ই বা করবার আছে আমাদের।

রমলা রাগ করে বলে, কিছু না। শুধু জড়-ভরতের মত বসে থাকব এখানে আর নিঃশব্দে গলাধঃকরণ করব অকথা-কুকথাগুলোকে। সাবধান হতে হয়, আপনি হন। আমি পারব না, এ অসহ্য, আর এক দণ্ডও এখানে থাকতে চাই না আমি। আমি চললাম। রমলা সত্যসত্যই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

কল্যাণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বলে, দোহাই আপনাকে। এতক্ষণ যখন সইতে পেরেছেন তখন আর একটু সহে যান। চায়ের টেবিলে এঁরা আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আমাদের। এ ভাবে চলে যাওয়া শোভনীয় হবে না। অভদ্র না হয়ে অন্ততঃ আশ্রয় দানের মর্যাদাটুকু এদের দিন।

রমলা ঝাঁঝিয়ে উঠে, দিতে হয় আপনি দিন। আমি অপারগ, অপরের অমর্যাদা হ'ক, এ আমি চাই না। কিন্তু তাই বলে এক টেবিলে বসে মেমসাহেবী-খানা আমার মুখে রুচবে না।

কল্যাণ হতাশ হয়ে বলে, এর পর আপনাকে দ্বিতীয় অনুরোধ করা শোভনীয় হবে না। তবে আমার মনে হয়, মিসেস মরিসন বোধ হয় আপনাকেই বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

—তাঁর এ অনুরোধ রাখতে আমি অক্ষম। আপনি বলে দেবেন, চা আমার সহ্য হয় না। খেলে—।

কিন্তু কথাটা শেষ হয় না, মিসেস মরিসন ফিরে আসেন। হাসিমুখে বলেন, আপনাদের দাম্পত্য আলাপটা পাশের ঘর থেকেই শুনতে পাচ্ছিলাম মিসেস সেন। বুঝি আর না বুঝি, বেশ লাগছিল কিন্তু, নতুন নতুন এমনই হয়। ও বয়সে আমাদেরও হ'ত, কিন্তু খবরদার, রাশ আলগা করবেন না, তা হলেই ঠকবেন। স্বামীকে বশে রাখতে গেলে রাশ শক্ত করবেন। কর্তাটি বুঝি বাড়ী ফেরবার জন্যে খুব বেশী তাড়া লাগাচ্ছিলেন আপনাকে? নীড় ছাড়া থাকতে পারেন না বোধ হয়?

রমলা বিব্রত বোধ করে। মুখচোখ লাল হয়ে উঠে। শীতকালেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়।

কল্যাণ রমলার অবস্থা বুঝতে পারে। তাড়াতাড়ি বলে, আপনার বুঝতে একটু ভুল হয়েছে মিসেস মরিসন। আমাদের আলাপটা হচ্ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। নীড় ছাড়ার প্রশ্নই ওঠে নি সেখানে। এটা একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। আজ ওনার কাষ্টিং ডে। সেই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন আমাকে। আপনারা হয় ত জানতে পারেন হিন্দু-ঘরের মেয়েরা অনেক রকম বার-ব্রত, উপবাস পালন করে থাকেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে।

মিসেস মরিসন ঘাড় নেড়ে সায় দেন, জানি। আপনাদের মেয়েদের অনেক রকম আচার-নিষ্ঠার কথাই শুনেছি আমি। তবে জানতাম বিধবারই আচার-নিষ্ঠা খুব বেশী।

—আপনার অনুমান মিথ্যা নয়। তবে সধবারাও বাদ যায় না অনেক বার-ব্রত থেকে।

—পুণ্যাত্মা মেয়ে। মিসেস মরিসন স্মিত-মুখে তাকান রমলার দিকে।

পাশের ঘর থেকে মিঃ মরিসন ফিরে আসেন কাজ সেরে। স্ত্রীর মুখ থেকে রমলার ধর্মনিষ্ঠতার কথা শুনে খুশীমুখে বলেন, বিলিজিয়স্ মাইণ্ডেড গার্ল! হাউ গ্রেসাস! হাউ ওয়াণ্ডারফুল! ডোরা, এই বয়সেই দেখ মেয়েটি কেমন ধার্মিক।

ডোরা বলেন, হ্যাঁ গো হ্যাঁ। সকলেই তোমার কাছে গ্রেসাস, সকলেই ওয়াণ্ডারফুল। আমিই শুধু ফুল।

সাহেব হাসতে থাকেন। রমলাও মুখ টিপে টিপে হাসে। শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে বলে ফেলে, ফুল নয় মিসেস মরিসন, ফ্লাওয়ার। বাংলা ভাষায় যা ফুল ইংরেজীতে তারই নাম ফ্লাওয়ার।

এবার সমবেত কণ্ঠের হাস্যধ্বনিতে ঘরখানা ভরে উঠে।

চা পরিবেশন করেন মিসেস মরিসন। রমলাকে লক্ষ্য করে বলেন, শুনেছি এ দেশের মেয়েরা পর পুরুষের সামনে, এমনকি নিজেদের স্বামীর সামনেও কিছু খায় না। আপনার আপত্তি যদি সেইখানেই হয়, বলুন, সে ব্যবস্থাও আমি করে দিচ্ছি।

রমলা আকর্ণ-রঞ্জিত হয়ে উঠে। চকিতে একবার কল্যাণের মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নেয়।

অমৃতভাষণে কল্যাণ অভ্যস্ত নয়। তবুও কোনমতে বলে ফেলে, ধন্যবাদ মিসেস মরিসন। তার কোন প্রয়োজন হবে না। আমাদের দেশের মেয়েরা প্রকৃতিতেই একটু নিষ্ঠাবতী। এই সব বার-ব্রতকে তারা বেশ নিষ্ঠার সঙ্গেই মেনে চলে। সুতরাং বিশেষ ব্যবস্থা করলেও কোন ফল হবে না। উনি রাজি হবেন না। আপনি এ নিয়ে ক্ষোভ করবেন না। আপনার সব ক্ষোভ আমি একাই পুষিয়ে দিতে পারব। ওনারটাও না হয় আমাকেই দেবেন।

মিসেস মরিসন হেসে বলেন, সেই ভাল। ওনারটাও আপনাকেই দেব। আপনারা শুধু কথায় নয়, কাজেও 'বেটার হাফ'।

মিঃ মরিসন কি বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু বাধা পেলেন স্ত্রীর কাছ থেকে, তুমি বাপু থাম। এখুনি হয় ত বলে বসবেন, হাউ ওয়াণ্ডারফুল, হাউ প্রেসাস। কিন্তু এ ওয়াণ্ডারফুলও নয়, প্রেসাসও নয়। এ হৃদয়বত্তা। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যে নিষ্ঠা, যে ঐকান্তিক শ্রদ্ধা, এ তারই নিদর্শন। এ তুমি বুঝবে না। এ সব তোমার বুদ্ধির অগম্য।

মিঃ মরিসন বললেন, এ সত্যিই আমি বুঝব না ডোরা। কারণ হৃদয় বলে যে পদার্থটি আমার ছিল, সেটিকে অনেকদিন আগেই তোমায় দান করে বসে আছি।

আবার একটা হাস্যস্রোত ঘরের মধ্য দিয়ে বয়ে যায়।

কথা বলে রমলা, এর পর আর কোন কথা শুনব না মিসেস মরিসন। মিঃ মরিসনের ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং শ্রদ্ধা যে আপনার প্রতি কতখানি, ঐ একটি কথায় প্রকাশ পেয়ে গেল। ডোরা স্মিতহাস্যে কটাক্ষ হানেন স্বামীর প্রতি।

লঘু হাস্য-পরিহাসের মধ্য দিয়ে গল্প এগিয়ে চলে। মিসেস মরিসন রমলাকে এক সময় বলেন, সোমথ বয়স আপনাদের। কত রঙীন স্বপ্নই না দেখবেন এ বয়সে। আমাদেরও একদিন ছিল।

রমলা পাল্টা জবাব দেয়, ছিল না, বলুন এখনও আছে। এখনও যে চুলে চুলে রঙীন স্বপ্ন দেখেন তা আপনাকে দেখলেই বোঝা যায়।

—উঁহু। ভুল দেখেছেন আপনি। কোন স্বপ্নই আর চোখে ভেসে ওঠে না। তাই মনে হয়, কোন রকমে ভালয় ভালয় এখন দিনগুলো কাটিয়ে দিতে পারলেই বাঁচি।

রমলা গম্ভীরমুখে বলে, শুনে ভারী দুঃখ পেলাম মনে। মিঃ মরিসনের জন্যে দুঃখটা আমার আরও বেশী। আহা বেচারী! হৃদয় দান করে আজ এ কি বিড়ম্বনা তাঁর ভাগ্যে।

মিঃ মরিসন প্রাণখোলা হাসি হাসেন। স্ত্রীকে বলেন, তুমি হেরে গেছ মেরী। মিসেস সেনের কাছে আজ তোমার পরাজয়।

—কাজিল, একটা আস্ত কাজিল মেয়েটা। মিঃ সেনকে বলে, তোমাকেও হৃদয়দানের বিড়ম্বনা ভোগাচ্ছি দাঁড়াও। মিসেস মরিসন হাসিমুখে কথাগুলি বলেন।

এরই মধ্যে রমলার গল্পের ভাগীদার জুটল আরও এক জন। বালক মরিসনের সঙ্গে রমলার ভাব জমে উঠল বেজায়। একটি ডলি পুতুলকে ঘিরে তাদের আলাপের সূত্রপাত। বালকের কৌতুহল সৃষ্টি করবার জন্য রমলা আবিষ্কার করে এক আশ্চর্য ভল্লের গল্প। সেটা কুম্ভকর্ণের ভাই লম্বকর্ণ। তার পর কুম্ভকর্ণের সঙ্গে মিলিয়ে গল্প বলে লম্বকর্ণের। গল্প শেষ করে বলে, সেই ম্যাজুলে ভলটাকে সে উপহার দিতে চায় বালককে। বালক সানন্দে রাজি হয়। বলে জন্মদিনে এ উপহার সে গ্রহণ করবে তার নূতন আন্টির হাত থেকে।

অল্পক্ষণের পরিচয়। অথচ এরই মধ্যে বেশ একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠে ছোট এই পরিবারটির সঙ্গে। পরিচয় যখন সামাজিক ভদ্রতার বিধিনিষেধ ডিঙিয়ে আন্তরিকতার মধ্যে অনুপ্রবেশ করছিল সেই সময় অকস্মাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল রমলা। কল্যাণকে উদ্দেশ করে বাংলাতে বলল, বাড়ীতে আপনার ভাববার কেউ না থাকতে পারে কিন্তু আমার আছে। হয়ত এতক্ষণে তারা পুলিসে খবর দিয়ে বসেছে। আপনার যদি আলাপ করবার সখ না মিটে থাকে আপনি বসুন, আমি উঠি।

অত্যন্ত রূঢ় কথা। আঘাতের প্রচণ্ডতায় কল্যাণ প্রথমটা অবাক হয়ে যায়। তার পর এক মুহূর্ত রমলার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করে, মানে?

রমলা এতটুকু ইতস্তত না করেই বলে, মানে সোজা। রাত্রিবাসের সংকল্প নিয়ে এখানে আসি নি। এবার আমায় বিদেয় দিন, আমি উঠি।

এবার রূঢ় হয় কল্যাণ। বলে, স্বচ্ছন্দে। পায়ে বেড়ি দিয়ে আপনাকে ধরে রাখি নি আমি। পথ খোলা, সোজা চলে যেতে পারেন। রাত্রিবাস করাবার জন্যে এখানে টেনে আনা হয় নি আপনাকে। আপনি কচি খুকিটি নন যে, ভালমন্দ বোঝেন না কিছু। অপাত্রে করুণা দেখাতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে এনেছি আমি। স্লিট-ট্রেঞ্চই ছিল আপনার উপযুক্ত স্থান। ট্রামে ফেলে এলেই হ'ত আপনার উপযুক্ত শাস্তি।

রমলাও আহত হয়। মৃদুকণ্ঠে বলে, তারই শোধ নিচ্ছেন এইভাবে?

—না। আমি হীন নই, বর্বর ইতরও নই যে, শরণাগত এক অসহায় মেয়েকে এই ভাবে শাস্তি দেব।

—কিন্তু প্রতিমুহূর্তেই আমার যে অসম্মান বেড়ে উঠছে এ ত আপনার অজানা নয়। আমার ক্ষতি হ'ক, এই কি আপনার কাম্য?

কল্যাণ অসম্মতি জানায়। বলে, বিশ্বাস করুন। শুভ ছাড়া আমি অশুভ কামনা কারও করি নি কখনও। আপনারও করি না। চলুন, এদের কাছে বিদায় নিয়ে আপনাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি আমি।

দিনের আলো ম্লান হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বিদায়ের পালা শেষ হয়। অত্যন্ত সৌহার্দপূর্ণ বিদায়। এর মধ্যে কৃত্রিমতা নেই। সবেতেই আন্তরিকতা।

প্রদীপ থামে। এতক্ষণ একটানা বলে একটু দম নেয় সে।

যূথিকা তাড়া দেয়, তার পর ? থামলে কেন, বল ?

প্রদীপ একটুখানি হেসে বলে, মধু পেয়েছ, না ? তার পর জানি না।

যূথিকা অনুনয় করে, তোমার দুটি পায়ে পড়ি। লক্ষীটি বল, তার পর কি হ'ল ?

প্রদীপ বলে, তার পর দু'জনে বেরিয়ে আসে পাশাপাশি ট্রামলাইনের উদ্দেশ্যে।

রমলা তার দুর্ভোগের কথা তুলতে যায়। কিন্তু কল্যাণ বাধা দেয়। বলে, থাক, ও-কথা নাই বা তুললেন। অপাত্রে করুণা বিতরণ করতে গিয়ে ও জিনিসটা আমারও বড় কম হয় নি। অসম্মানও ভোগ করেছি অনেক। এবার আপনার সব দুর্ভোগের ইতি হ'ক। আপনি দক্ষিণ দিকে পা বাড়ান আমি বাড়াই উত্তর দিকে।

—অর্থাৎ অনিষ্ট যা কিছু সব আমারই হ'ক। তাই দক্ষিণ দিকে মানে শমনসদনে ঠেলে দিচ্ছেন আমাকে।

কল্যাণ দাঁত দিয়ে জিভ কেটে বলে, ছিঃ ছিঃ, ও-কথা বলবেন না। বলছিলেন দক্ষিণ কলকাতায় আপনার বাড়ী। বাড়ীর কথাই বলছিলাম আপনাকে। আপনার অকল্যাণ হ'ক এ আমার কামনা নয়। তার পর একটু হেসে বলে, ক'দণ্ডেরই বা পরিচয়। এর পর আর আমাদের দেখা না হওয়াই স্বাভাবিক। বিরাট কলকাতা নগরী। লক্ষ লক্ষ লোকের আবাসভূমি। তার মধ্যে আপনার আমার দেখা একেবারে অসম্ভব না হলেও, সম্ভাবনার খুব নীচু স্তরেই পরে। তবে কোনদিন যদি স্তরের পরিবর্তন হয় অর্থাৎ নীচু স্তর উঁচু স্তরের পর্যায়ে আসে, আমাদের দেখা হয়, সেদিন সোজা মুখখানা ঘুরিয়ে নেবেন ডান দিকে। পরিচয়ের লেশমাত্র ইঙ্গিত প্রকাশ করবেন না চোখেমুখে।

রমলা মনে মনে আহত হয়। বলে, অভদ্র হবার শিক্ষা আমি পাই নি। তাই উপকারীর ঋণ এ ভাবে পরিশোধ করবার রীতি আমার জানা নেই। যদি কোনদিন আবার আমাদের দেখা হয়, বুঝবেন আমি অকৃতজ্ঞ নই।

—শুনে সুখী হলাম। আপনার কল্যাণ হ'ক। আমার উত্তর-মুখো ট্রাম এসে গেছে। আপনারও দক্ষিণ মুখো ট্রাম ঐ আসছে। সুতরাং আর আপনার দুর্ভোগ বাড়ান উচিত হবে না। আচ্ছা নমস্কার। বলতে বলতে কল্যাণ এগিয়ে যায় সামনের দিকে।

এইখানে প্রদীপ আর একবার থামে। যূথিকা বিস্মিত হয়ে বলে উঠে, ওমা, তোমার গল্প শেষ হয়ে গেল নাকি ?

প্রদীপ হেসে বলে, শেষ আর হ'ল কই ? এমন চমৎকার যামীটিকে পেতাম কোথায়।

—তবে ? যূথিকা উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করে।

—ধীরে। অত ব্যস্ত হলে চলবে কেন। গল্পও ত একটুখানি জিরুতে চায়। তাই কল্যাণকে ট্রামলাইন পার হতে দিয়ে সে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিল। কিন্তু জিরুতে আর পেল কই ? কল্যাণ হয় ত লাইনটা পার হয়েই গিয়েছিল, কিন্তু পিছন থেকে ডাক শুনে তাকে দাঁড়াতে হ'ল ফিরে। রমলা তার পাশে এসে জামার এক প্রান্তে টান দিয়ে বলছে, শুনছেন, কানেও কম শোনেন নাকি আপনি ? তখন থেকে ডেকে ডেকে গলা মোটা হয়ে গেল আমার। লোকেরা যে কি ভাবছে জানি না। কল্যাণ তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়। প্রশ্ন করে, কি ব্যাপার ? আবার সাইরেন নাকি ?

—না। এবার মিসেস মরিসনের গাড়ী। সোফার দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমাকে, মানে আমাদের পৌছে দেবার জন্যে। সোফার গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করছে ঐখানে—বলে অদূরে দণ্ডায়মান ঝকঝকে একখানা গাড়ীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। তার পর অসহায় কণ্ঠে আবার বলে, এখন কি করি বলুন ত ?

—কিছু না। স্রেফ সাহেবের গাড়ী চড়ে বাড়ী চলে যাবেন।

—আর আপনি ?

—আমার ট্রাম এসে গেছে। তবে উত্তর মুখো আর হ'ব না। আপনার যখন হিল্লে একটা হয়ে গেছে তখন দক্ষিণ দিকেই যাব। কারণ আমারও পথ ঐ দিকে।

—তবে আমিও যাব না। আপনি সোফারকে বলে দিয়ে আসুন। একে সাইরেন বেজেছে, বাড়ীর লোকেরা এমনিতেই উদগ্রীব হয়ে আছে আমার জন্যে, এ অবস্থায় পরের মটরে করে যদি যাই তা হলে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে আমার।

—আমার প্রাণ কিন্তু আপনার চেয়েও চালাক। সে ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা রাখে নি। বর্তমানেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আচ্ছা, দেখি কি করতে পারি।

কিন্তু করতে পারা গেল না কিছুই। সোফার রাজি হ'ল না। বলল, মেমসাহেবের আদেশ, এ আদেশ অলঙ্ঘনীয়। সে চাকরি খোয়াতে রাজি নয়। অতএব—।

কল্যাণ বলে, অতএব রাস্তায় দাঁড়িয়ে অনর্থক কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। উঠুন গাড়ীতে।

গাড়ীতে উঠে রমলা বলে, আজ যে কার মুখ দেখে উঠেছিলাম জানি না। এর পর অদৃষ্টে যে আর কি আছে, কে জানে।

কল্যাণ বলে, যে জানে সেই বলছে, অদৃষ্ট আপনার সুপ্রসন্ন। নইলে হঠাৎ কথাটা কেন মনে পড়বে আমার।

রমলা সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে তাকায় কল্যাণের মুখের দিকে।

কল্যাণ বলে, ভবানীপুর চক্রবেড়েতে থাকেন আমার দুরসম্পর্কে এক মাসীমা, মাসী চোখে দেখেনও কম, কানে শোনেনও কম। উপস্থিত সেইখানে নেমে বিদেয় করব সোফার ব্যাটাকে। তার পর আপনি আপনার, আমি আমার।

এ ব্যবস্থা রমলা মেনে নেয়। সুতরাং সোফারকে সেই মতই গাড়ী চালাবার আদেশ দেয় কল্যাণ। চক্রবেড়ে রোডের উপর মাসীমার বাড়ী। গাড়ী থেকে নেমে কল্যাণ রমলাকেও নামায়। তার পর সোফারকে মোটা বকশিস্ দিয়ে বিদায় করে সে। রমলা মনে মনে খুশি হয় কল্যাণের সুবিবেচনায়।

ছোট বাড়ী আর কর্মব্যস্ত মাসীমা। একেবারে মুখো-মুখি পড়ে যায় কল্যাণ—পিছনে রমলা। পাশ কাটাবার উপায় নাই। সুতরাং পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলে, দেখা করতে এলাম মাসীমা—আমি কল্যাণ।

রমলা এগিয়ে আসে। সে অকৃতজ্ঞ নয়, সুতরাং কল্যাণের মাসীমার প্রতি অসৌজন্য প্রকাশ করতে রাজি নয়। তাই এগিয়ে এসে হেঁট হয়ে মাসীমার পদধূলি মাথায় তুলে নেয়। কল্যাণ কিছু বলবার বা বোঝাবার আগেই কাণ্ডটি ঘটে যায়।

মাসীমা ক্ষীণদৃষ্টি সম্প্রসারিত করবার চেষ্টা করে বলেন, কে কল্যাণ? এতদিন পর মাসীমাকে মনে পড়ল বাবা? সঙ্গে এটি কে? বৌমা নাকি? দেখি দেখি, বলে তিনি রমলার চিবুক স্পর্শ করে চুমু খেয়ে তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে মুখখানি দেখবার চেষ্টা করেন। তার পর খুশি-ভরা কণ্ঠে বলে ওঠেন, আহা, বেঁচে থাক মা, রাজরাণী হও মা। হ্যাঁরে কল্যাণ, বিয়ে করলি, কিন্তু তোর গরীব মাসীমাকে একটা খবর পর্যন্ত দিলি না! কত আশা করেছিলাম যে দিদি নেই, তোর বিয়েতে বৌ ঘরে তুলব আমি। সে আশা মিটল না আমার। যাক গে, যা হয়েছে ভালই হয়েছে। কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বৌমাকে নিয়ে ওপরে চল। এস মা, এস, ঘরের লক্ষ্মী এস। কলি এসেছে। তাকেই ডাকি। সেই নিয়ে যাবে তোমায় ওপরে। বলেই তিনি ডাক দিলেন, ওরে কলি, অ কলি। দেখে যা, কারা এসেছে, তোরা কল্যাণদাদা কেমন রাঙা বৌ নিয়ে এসেছে।

কল্যাণ মহাদমস্যায় পড়ে। ফিস্‌ফিস্ করে কঠিন কণ্ঠে রমলাকে বলে, মাসীমাকে অতখানি ভক্তি কে দেখাতে বলেছিল আপনাকে? এখুনি ত বলে বসবেন যে, অপমানের চূড়ান্ত হ'ল আপনার। কিন্তু এর জন্যে দায়ী কে? না, এখানে আর এক মুহূর্তও আপনার থাকা হবে না। কলি এসে পড়বার আগেই আপনাকে চলে যেতে হবে এখান থেকে। ডান দিকে মোড় ফিরলেই ট্রামলাইন। পথ চিনে নিতে কষ্ট হবে না আপনার। আমিই না হয় পথ দেখিয়ে দিচ্ছি, আসুন। বলেই সে মাসীমার অলক্ষিতে সহসা রমলার হাত ধরে দরজার দিকে আকর্ষণ করে। কিন্তু রমলা ঘাবড়ে যায়। কেমন একটা বিহ্বলতা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। একদিকে কল্যাণের মাসীমার কথাগুলি, অপর দিকে কল্যাণের এই অতি-ব্যস্ততা তার স্নায়ুতন্ত্রী-গুলির উপর প্রতিক্রিয়া করে সেগুলিকে অবশ করে দেয়। সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে কল্যাণের মুখের দিকে। কিন্তু বেশীক্ষণের জন্য নয়। সিঁড়ির মাথা থেকে কল্যাণীর কলকণ্ঠ ভেসে আসে, ওকি দাদা, বৌদিকে নিয়ে অমনভাবে টানাটানি করছ কেন? দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি এলাম বলে। বলতে বলতে সে সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে আসে একেবারে রমলার পাশটিতে।

রমলা চমকে উঠে। বিস্ময়াতিশয্যে তার মুখ দিয়ে শুধু একটা অস্ফুট ধ্বনি বার হয়ে আসে, কল্যাণী তুই।

—রুমি! কল্যাণী থমকে পড়ে। তার পরেই উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠে, কি ব্যাপার বল ত? কল্যাণদার ঘর আলো করলি কবে থেকে?

রমলা যেন বুকে বল পায়। কল্যাণীকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলে, উঃ, বাঁচলাম ভাই এতক্ষণে। চল, তোর ঘরে চল। সব কথা শুনবি এখন।

কল্যাণ থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

আধঘণ্টা পর কল্যাণী ফিরে আসে। সারা মুখচোখ কৌতুকহাস্যে ভরিয়ে তুলে কল্যাণকে বলে, অভিনয়টা বাইরের পর্দায় বেশ জমে উঠেছে দাদা। এখন মনের পর্দায় নামিয়ে আনতে পারলে শেষরক্ষা হয়।

কল্যাণ বলে, অভিনয় দিয়ে শেষরক্ষা হয় না কলি। অভিনয়ের স্থান চিরদিনই বাইরের পর্দায়, মনের পর্দায় নয়।

কল্যাণী ঈষৎ হেসে বলে, যাতে হয় সেইটাই আমি দেখতে চাই দাদা। কিন্তু তার আগে রমলার একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তোমার জানা দরকার। রমলা আমার সহপাঠিনী। স্কুলের সঙ্গিনী, কলেজেরও এক বছরের সঙ্গিনী। কলেজের দ্বিতীয় বছরে আমার হ'ল বিয়ে। আমি কলেজ ছেড়ে গেলাম শ্বশুরবাড়ীতে। রমলা রয়ে গেল কলেজ বাড়ীতেই। বড় লোকের মেয়ে। খেয়ালী মেয়ে। পণ করল বিবাহ করব না বলে। সখ হ'ল মেয়েদের একটা স্বাধীন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার। বাংলা দেশের মেয়েরা বড় অবলা। তাদের সবলা করবার জন্যই তার এ অভিযান। প্রতিষ্ঠান সচল যেখানে অর্থ সচ্ছল। সেই অর্থ সংগ্রহের দুরাশায় সে ঘুরে বেড়াচ্ছিল দোরে দোরে।

আজও সেই উদ্দেশ্য নিয়েই বেরিয়েছিল। পথে এই দুর্যোগ।

কল্যাণ স্মিতমুখে বলে, সাইরেন তার এই মহান ব্রতের অন্তরায় হ'ল।

কল্যাণী মুচকি হেসে বলে, তা হ'ল। তবে ভিক্ষের ঝোলা শূন্য রইল বটে, কিন্তু পূর্ণ হ'ল মনের ঝোলা।

রমলা বলে, সে তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। এ ঋণ সে আর বাড়াতে চায় না। এখান থেকে কাছেই তার বাড়ী। চিনে যেতে কোন অসুবিধে হবে না। অতএব এখন থেকে তুমি মুক্ত।

কল্যাণ বলে, বাঁচলাম। এ মুক্তি আনন্দের মুক্তি। বোঝা বহে বহে ঘাড়টাই আমার পড়েছে নুয়ে। তোমার বন্ধুর অবলা বান্ধব প্রতিষ্ঠানের জয় হ'ক। আমি তার শুভ কামনা জানাচ্ছি এখান থেকেই। প্রদীপ থামে।

যূথিকা অসহিষ্ণু হয়ে উঠে। বলে, এ ভারী অন্যায় কথা। অবলা বান্ধব প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাত্রীকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়েই মামাবাবু সরে পড়লেন ?

প্রদীপ বলে, রসো রসো। সরে পড়বার জো-টি কোথায়। মাসখানেক পরই চিঠি এসে হাজির। অবলা বান্ধব প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাত্রী লিখেছে কল্যাণকে নিজের বিপদের কথা।

—বিপদ ? কিসের বিপদ ? কোন এ্যাকসিডেণ্ট নাকি ?

প্রদীপ মৃদু হেসে বলে, এ্যাকসিডেণ্টই বটে, তবে শারীরিক নয় মানসিক। কর্তব্যবোধে রমলা মরিসন দম্পতিকে চিঠি লিখে জানাতে গিয়েছিল সেদিনের কৃতজ্ঞতার কথা। তাঁরা খুশি হয়ে পাল্টা আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাকে। শিশু মরিসনের জন্মদিন। আমন্ত্রণ সেই উপলক্ষেই। 'আণ্টি'র উপস্থিতির দ্বারা এ উৎসব সম্পন্ন না হলে তাঁরা খুশি হবেন না কেউ। সুতরাং এ উৎসবে শ্রী এবং শ্রীমতী সেনের উপস্থিতি অপরিহার্য। এ উৎসবে না এলে শুধু যে তাঁরা আন্তরিক দুঃখিত হবেন তা নয়, হয় ত মরিসন দম্পতিকেই ছুটে আসতে হবে তাদের কাছে। রমলার যত ভয় এইখানেই। এ অঘটন যদি ঘটে কোনদিন তা হলে লজ্জার পরিসীমা থাকবে না তার। তাই সে অনুরোধ জানিয়েছে কল্যাণকে, সেদিনের মত এ বিপদেরও কাণ্ডারী হতে হবে তাকে। সেদিন সর্ব বিপদে সে যেমন আগলে রেখেছিল রমলাকে, আজকের এ বিপদেও সে যেন আগল দেয় তাকে। অবশ্য অনিবার্য কারণবশতঃ এ নিমন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভবপর হবে না রমলার পক্ষে। কিন্তু কল্যাণ যেন এ নিমন্ত্রণের মর্যাদাটুকু রাখে। বালক মরিসনকে একটা বাক্সুসে ডল দিতে প্রতিশ্রুত রমলা। একটা মনোমত ডল কল্যাণ যেন কিনে নেয় 'ডল-মার্কেট' থেকে। টাকা সে পাঠিয়ে দেবে লোক মারফত।

যূথিকা বলে, মন্দ কথা নয়। দায় আমার কিন্তু উদ্ধার কর তুমি। কিন্তু কি করলেন মামাবাবু ?

—করবার আর কি থাকতে পারে নিজের গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করা ছাড়া। বড় লোকের নিমন্ত্রণ রক্ষা করা মানে পুরো এক মাসের মাইনেটাই পকেট থেকে খসা। এইটাই কল্যাণকে অভিভূত করে ফেলল বড় বেশী। বার বার আক্ষেপ করে বলতে লগল, এ মেয়েকে সাহায্য করতে গিয়ে এ বোকামি সে কেন করতে গিয়েছিল সেদিন।

যূথিকা জিভ আর তালুর দ্বারা মুখে চুক চুক ধ্বনি তুলে বলে, আহা, সাইরেন তোমারও যদি এমনি একটা ঘটকালি করত তা হলে আজকের গণ্ডদেশে তোমার কি বাহারই না খুলত। যোতির মা ভুল করেছে ভারী।

—করেছেই ত। সেদিন গণ্ডদেশের অমন বাহারের জন্যে মামা কি পেলে জান ? এক রাজকন্যে আর অর্দ্ধেক রাজত্ব। কারণ বর্তমানের মামী তার বাপ মায়ের একটি মাত্র মেয়ে। এমন ষড়ৈশ্বর্যময়ীর জন্যে আমি একটা কেন, বিশটা গালেও অমন বাহার খোলাতে রাজি আছি। যোতির মা এ থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছে। উঃ! তাকে একবার পেলে—।

—বেশ করেছে। খুব বাহাদুর তুমি। এখন বল, কি হ'ল তার পর ?

—তার পরের ঘটনাতেই বাজিমাত। দু'দিন ধরে মনের জ্বালায় ছটফট করে বেড়াতে লাগল কল্যাণ। তৃতীয় দিনে সে চলল কল্যাণীর সঙ্গে পরামর্শ করতে আর রমলাকে তার মনের অনিচ্ছার কথা জানাতে। কিন্তু বেরুবার মুখেই বাধা পড়ল। কড়া নেড়ে একেবারে ঘরে এসে ঢুকল রমলা। মুখ তার ফ্যাকাশে; উত্তেজনায় শরীর কম্পমান।

দরজা খুলে দিয়ে কল্যাণ অবাক হয়ে যায়। বলে, আপনি ? কি ব্যাপার ?

রমলা একেবারে ভেঙে পড়ে, আমায় বাঁচান কল্যাণবাবু, বড় বিপদ আমার।

কল্যাণ বলে, জানি। আপনার চিঠি পেয়েছি। সেই জন্যেই বেরোচ্ছিলাম কল্যাণীর সঙ্গে একটা পরামর্শ করবার জন্যে।

রমলা বলে, না, আপনি জানেন না। চিঠি যখন পেয়েছেন তখন বিপদ ছিল না। ছিল তারই একটা ইঙ্গিত। এখন ইঙ্গিত মূর্ত হয়ে উঠেছে। সশরীরে আবির্ভূত হয়েছে।

কল্যাণ বুঝতে পারে না। অবুঝের মত প্রশ্ন করে, আবির্ভূত হয়েছে, মানে?

—মানে, মরিসন কোম্পানী সদলবলে এসে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের বাড়ী। মিষ্টার, মিসেস আর মাষ্টার সব মরিসনই এসেছেন সেখানে।

—বলেন কি?

—তাঁরা খুঁজছেন—?

—খুঁজছেন? কাকে? বলুন, চুপ করে থাকবেন না? কাকে খুঁজছেন তাঁরা?

—আপনাকে আর আমাকে দু'জনকেই খুঁজছেন তাঁরা। আমাদের সম্বন্ধে আলোচনা করছেন বাবার সঙ্গে। খবর পেয়ে আমি পালিয়ে এসেছি চুপি চুপি।

কল্যাণ তাকিয়ে থাকে নির্বাক বিস্ময়ে। কোন কথাই বার হয় না তার মুখ দিয়ে।

রমলা আকুল হয়ে বলে, এখন কি করি আমি বলে দিন। সর্বনাশ হয়ে যাবে আমার। কি করে মুখ দেখাব সেখানে। তাই ছুটে এসেছি আপনার কাছে।

কল্যাণ ধীরে ধীরে বলে, আমি কি করতে পারি বলুন?

—আপনি পুরুষ। বুদ্ধি দেবেন আপনি। আর সেই বুদ্ধিমত কাজ করব আমি। বলুন, কি করা উচিত আমার?

কল্যাণ বলে, ভুল যা হবার হয়ে গেছে গোড়াতেই। তখনই মরিসন-দম্পতির ভুল ভেঙে দেওয়া উচিত ছিল আমার। কিন্তু এখন দেরী হয়ে গেছে অনেক।

—তা হলে? রমলা হতাশ হয়ে পড়ে।

কল্যাণ বলে, এখন আবার নতুন করে ভুল ভাঙতে হবে আমাকেই। সব দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিয়ে আমায় বলতে হবে তাদের এর জন্যে দায়ী আমি আর আমার অসাবধানতা।

রমলা যেন অকূলে কূল পায়। সাগ্রহে অনুনয় করে বলে, তা হলে আপনি চলুন।

কল্যাণ অবাক হয়ে যায়। বলে, যাব? কোথায়?

—কেন, আমাদের বাড়ী। বাবার কাছে সব কথা খুলে বলবেন চলুন। অবিশ্বাসিনী মেয়ে হয়ে আমি বেঁচে থাকতে পারব না।

—আমিও তা বলি না। কিন্তু—।

রমলা ব্যাকুল হয়ে বলে, না, কিন্তু না। কোন আপত্তিই আমি শুনব না। দোহাই আপনাকে, আপনি চলুন। তা না হলে আপনার দিব্যি বলছি এখান থেকে সোজা গঙ্গায় গিয়ে ঝাঁপ দেব আমি।

কল্যাণ বিব্রত বোধ করে। হয়ত একটু বা ইতস্ততও করে।

রমলা ধৈর্য হারায়। কল্যাণের দিকে আরও এক পা এগিয়ে এসে বলে, এখন ইতস্তত করবার সময় নয়। আমার মান, আমার সম্ভ্রম এখন সব কিছুই নির্ভর করছে আপনার ওপর। দোহাই আপনার, আপনি আমায় রক্ষা করুন কল্যাণবাবু। এই আপনার নামে শপথ করে বলছি, ভবিষ্যতে কোনদিনই অবাধ্য হ'ব না আপনার, অসম্মানও করব না। জানি না, এতক্ষণে বাবা মা কি না ভাবছেন আমার সম্বন্ধে। ভাবছেন কুলটা মেয়ে—। উঃ, মাগো! রমলা দু'হাতে মুখ ঢাকে।

কল্যাণ ব্যস্ত হয়ে বলে, বেশ আমি গেলে আপনার মান, আপনার সম্ভ্রম যদি রক্ষা পায়, আমি যাচ্ছি, চলুন। বলতে বলতে সে রমলার পাশে সরে আসে।

যুথিকা গালে হাত দিয়ে বলে, মাগো, কী কাণ্ড দেখ। অত বড় মেয়ে, লজ্জা করল না এতটুকু। আমরা হলে ত মরে যেতাম লজ্জায়।

—এ তোমরা নও তাই রক্ষে। এ অবলা বান্ধব প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাত্রী, চিরকুমারী ব্রতধারিণী শ্রীমতী রমলা সোম। কিন্তু তাকেই বা দোষ দেব কেন। এ কি লজ্জা করবার সময়। জীবনে এমন মুহূর্তও আসে যখন লজ্জা-ভয়ের বালাই থাকে না। রমলার জীবনে এমনি মুহূর্তই এসেছিল সেদিন।

—কিন্তু এর পরিণতি হ'ল কি?

—সে ত বুঝতেই পাচ্ছ আজকের দু'জনার আনন্দঘন জীবন দেখে। রমলার বাবা বিচক্ষণ ব্যক্তি। রায়ও দিলেন বেশ বিচক্ষণ। এক ঢিলে দু' পাখী মারলেন। মেয়ে পণ করেছিল বিবাহ করব না বলে। তারই সদ্‌গতি করে নিলেন এই সুযোগে। মেয়েকে বললেন, যে তোমার সম্মান সম্ভ্রম রক্ষা করেছে মা অসময়ে, যার কাছে তুমি প্রতিশ্রুত অবাধ্য হ'ব না বলে, তার অসম্মান হ'ক এ আমি চাই না। চাই না যে মরিসন-দম্পতি হাজার হ'ক তারা বিদেশী লোক—ক্ষুব্ধ হ'ক তোমাদের আচরণে। আর এ বিধিনির্দিষ্ট জিনিস। এর ওপর হাত নেই কারও। ভগবান মিলিয়ে দিয়েছেন তোমাদের। তিনিই যখন যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছেন, তখন একে মেনে নিতেই হবে তোমার। তুমি অমত কর না মা, কল্যাণ তোমার অনুপযুক্ত হবে না। আমি আশীর্বাদ করছি, তোমার মাও আশীর্বাদ করছেন, তোমরা সুখী হবে দু'জনে। বালক মরিসনের জন্মদিনে তোমরা উপস্থিত থাকতে পারবে সেদিনকারই পরিচয়ে।

যুথিকা বলে, সাইরেনের বাহাদুরী আছে বল?

প্রদীপ উত্তর দেয়, আছে বলেই ত মোতির মায়ের ওপর আমার এত আক্রোশ। বিয়ের রাতে কনে-চন্দন পরাতে

পরাতে এই কথাটাই চুপি চুপি জিজ্ঞেস করেছিল কল্যাণী, কোন্‌টি বেশী মিষ্টি রে ভাই রুমি? শঙ্খধ্বনি, না সাইরেনের ধ্বনি?

—কি উত্তর দিয়েছিলেন মাসীমা? যূথিকা প্রশ্ন করে সকৌতুকে।

রমলাও উত্তর দিয়েছিল তেমনি ভাবে, আজকের দিনে শঙ্খধ্বনি নিশ্চয়ই। কিন্তু সেদিনের সাইরেনের ধ্বনিটাও কম মিষ্টি ছিল না ভাই, কলি।

যূথিকা বলে, মামীমাও ত ফাজিল মেয়ে বড় কম নয়!

প্রদীপ বলে, সেদিন ছিলেন কিন্তু এখন আর নেই। বিবাহের পর বদলে গেছেন একেবারে। এখন একেবারে মাটির মানুষ। কে যেন ভেঙে গড়েছেন নতুন করে। সেদিন বিপদের দিনে যে কথা দিয়েছিলেন মামাবাবুকে, এখন অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেন সে-কথা। মাঝে মাঝে তাই ভাবি, মোতির মা না হয়ে সাইরেন যদি এমনি ঘটকালি আমারও করত, তা হলে এমনি অনাবিল, এমনি নির্বিরোধী জীবন আমিও যাপন করতে পারতাম।

যূথিকা রাগ করে। চোখমুখ ঘুরিয়ে অপরূপ ভঙ্গিমায় বলে, আ হা-হা, তুমি আর ঢঙ কর না বাপু। নির্বিরোধী জীবন? কি এমন চিরবিরোধী জীবন তোমায় যাপন করতে হচ্ছে শুনি যে, সব সময় খোঁটা দাও মোতির মার?

রণ-রঙ্গিণী নয়, রাগিণী মূর্তি। পত্নীর এই মাদকতা-মাখান রাগিণী মূর্তি ভারী ভাল লাগে প্রদীপের। তাই মুখে আর কোন কথা বলে না। শুধু মনে মনে এই মাধুর্যটুকু উপভোগ করে আর মৃদু মৃদু হাসে।

আসছে ভালো সময়

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

আসছে ভালো সময়, বাছা,
আসছে ভালো সময়!
হয় তো মোরা বাঁচবো না কেউ দেখতে রে সেইদিন,
ধরা কিন্তু ঝকমকিবে সারা রাত্রিদিন
আগামী সেই সুসময়ের আলোয়!
কামান-গোলা লাগতে পারে সত্য প্রতিষ্ঠায়,
যুক্তি কিন্তু শক্তিশালী অনেক বেশী তার;
মোদের যুদ্ধ জিতবো মোরা এদের সাহায্যেতে—
অপেক্ষাটা একটু করো আর!

আসছে ভালো সময়, বাছা,
আসছে ভালো সময়!
করবে কলম তরবারির স্থানটি অধিকার,
শক্তি নহে—ন্যায়ের দাবী কর্ত্তা হবে তার
আগামী সেই সুসময়ের আলোয়!
'নেশন'গুলো করবে না আর ঝগড়া পরস্পরে,
কাহার চেয়ে কে বলীয়ান করতে প্রমাণ তার,
মানুষ কভু করবে না বধ তুচ্ছ গৌরবেতে—
অপেক্ষাটা একটু করো আর!

আসছে ভালো সময়, বাছা,
আসছে ভালো সময়!
শিশুরা আর করবে না কেউ মোটেই পরিশ্রম
মাটির নীচে কিংবা উর্দ্ধে থাকতে তাদের দম,
আগামী সেই সুসময়ের আলোয়,
স্বাস্থ্যপূর্ণ মাঠে খেলা খেলবে ততক্ষণ
যাবৎ দেহ মনটা শক্ত না হয় সবাকার;
লেখাপড়া করবে তারা সকলে এক সাথে—
অপেক্ষাটা একটু করো আর!
আসছে ভালো সময়, বাছা,
আসছে ভালো সময়!
আমরা প্রতি পুরুষ-নারী আনতে সুদিন ভবে
যথাসাধ্য সহায়তা করবো সগৌরবে,
আগামী সেই সুসময়ের আলোয়!
ক্ষুদ্রতম সাহায্যটা সঠিক ভাবে দিলে,
আবেগটাকে করবে প্রবল বড়ই চমৎকার;
একদিন তা হবেই হবে ভীষণ শক্তিশালী—
অপেক্ষাটা একটু করো আর!

চার্লস ম্যাকের—'The Good time coming' অবলম্বনে।

জীবনে আকস্মিকতা

শ্রীবিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়

আমরা একাধিক ক্ষেত্রে শুনতে পাই—অমুকের জীবনে মুহূর্তের মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন এসে গেল। সত্যিই কি তাই? কারুর জীবনে মুহূর্তের মধ্যেই একটা স্থায়ী পরিবর্তন আসা কি সম্ভব?

হেগেলের নৈয়ায়িক দ্বন্দ্ববাদ কম্যারবাকের মাধ্যমে দার্শনিক রূপ পরিগ্রহ করে। মার্ক্স সেই তথ্যকেই যাচাই করে দেখলেন বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। তাঁর বিজ্ঞানী মনের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে ইতিহাসের উত্থান-পতনের আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য দেখে তিনি এই অভিজ্ঞতাকে শুধুমাত্র তাত্ত্বিক রূপ দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না। পরন্তু দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনা থেকে সুরু করে সমাজ—তথা জাতির জীবনে পর্য্যন্ত তা' প্রয়োগ করে দেখাতে চেয়েছেন তিনি।

তাঁর মূল বক্তব্য এই—দু'টি পরস্পর-বিরোধী ভাবধারার অবিরত সংঘর্ষে তৃতীয় একটি নবতর ভাব বা তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। সবিশেষ বিশ্লেষণে তিনি বহুবিধ জাগতিক তথ্য পরিবেশন করেই এই প্রতিপাদিক তত্ত্বটিকে জনসাধারণের বোধগম্য করতে সক্ষম হয়েছেন। এই মৌলিক সত্যটিকে একটা মনগড়া উদাহরণ দিয়ে এবার পরীক্ষা করে দেখা যাক। যেমন, একশ্রেণীর লোক বরাবর মনে পোষণ ও বাক্যে প্রচার করে আসছেন—ঈশ্বরই জগতের একমাত্র কারণ ও নিয়ামক। আবার অপর একশ্রেণী বলে আসছেন—ঈশ্বর বলে কোনও চরম স্বীকৃতি কিছুই নেই; জ্ঞানের বিকাশ আমাদের এখন পর্য্যন্তও পর্য্যাপ্ত হয় নি, তাই কল্পনাশ্রয়ী মন একটা মানসিক আশ্রয়-ভূমি নির্ম্মাণ করে, মানস-পরিচরণের পরিধিকে বোধের আয়ত্তে রেখে, আত্মতৃপ্তি লাভ করেন এবং এ ভাবেই সে বিশ্ব-রহস্যের সমাধান করতে চেয়েছে। এই দু'টি পরস্পর-বিরোধী মত যে সমাজে যখন প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠেছে সেখানেই এই অস্তি-নাস্তির চরম দ্বন্দ্বে জন্মলাভ করেছে গতিবাদ। সেই নবোত্তরণ-যুগের দার্শনিকগণ বলে বেড়ান, ঈশ্বর কে, তা' আমরা জানি না, জানবার দরকারও নেই। গতিই জীবনের একমাত্র উপলব্ধ সত্য ও পরীক্ষিত তত্ত্ব। জগৎ ও জাতির যা'তে গতি অব্যাহত থাকে তা'ই সৃষ্টির একমাত্র লক্ষ্য। এই লক্ষ্যাদর্শের পূর্ণতা বিধানই মানব-জাতির একমাত্র কর্ত্তব্য—ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই ব্যাখ্যারই প্রচলিত নাম (যথার্থ কিনা সন্দেহ) প্রগতিবাদ।

এটা গেল দর্শনের দ্বান্দ্বিক অধ্যায়ের তাত্ত্বিক দিক। তাছাড়া বাস্তব জীবনে ঐতিহাসিক দৃষ্টি দিয়েও একে বিচার করা হয়েছে। সে সব ক্ষেত্রেও এই তত্ত্ব একই সত্যে পরিণতি লাভ করেছে। যেমন, সামন্ত-তন্ত্র ও চাকয়াণ-প্রথার দ্বন্দ্ব থেকে জন্ম নিয়েছে বৈশ্যযুগের আধিপত্য। আর সর্ব্বহারা ও আত্মম্ভরীদের পরস্পর-দৃঢ় সংঘাতের পরিণতিতে মধ্যবিত্তের অভ্যুত্থান—ইত্যাদি।

যাক, সে সব তত্ত্বকথা ছেড়ে এবার আমরা মূল বক্তব্যে ফিরে আসছি। তবে কি আকস্মিকতা বলে কোনও সত্তা নেই? স্থান, কাল ও শূন্যের ত্রিবন্ধনে জীবন-প্রবাহের যে ঘূর্ণাবর্ত্তের অজস্রধারা জীবনকে ঘিরে বইছে প্রতিনিয়ত, সে সব কি কবিকল্পনা? এর উত্তরে বলব, না মশাই, সে সব আবর্ত্ত ও প্রতিক্রিয়াই বাস্তব সংঘটন। সে সবের কোনটাই কল্পনা-বিলাস বা স্বপন-সত্তার নয়। এ বিষয়ে আমরা সকলেই স্থূল ইন্দ্রিয়াশ্রয়ী বৃহস্পতি ও চার্ব্বাকের অনুগামী হতে দ্বিধাবোধ করি না। তবে কথাটা হচ্ছে এই যে, মুহূর্ত্তেই ঘটুক কি দীর্ঘ দিনের ব্যবধানেই ঘটুক, কোন ঘটনাই হঠাৎ ঘটে না। যন্ত্র বিকল হয়ে দুর্ঘটনা ঘটা বা রাজপথে চলতে চলতে "পা পিছলে আলুর দম" হওয়া প্রভৃতির কথা এই আকস্মিকতার প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করতে চাই না। কারণ ও সব তুচ্ছ ঘটনার বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে নিবন্ধের কলেবর অনেক বৃদ্ধি করতে হয়। তাই এমন ধরনের আকস্মিকতার কথা আলোচনা করব যাতে আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়টি অতি ক্ষুদ্র পরিসরে স্বল্প-কথায় পরিবেশন করা সম্ভব হয়।

অতি-প্রচলিত একটি জনশ্রুতি নিয়েই প্রসঙ্গটির অবতারণা করছি। সুপ্রসিদ্ধ প্রবলপ্রতাপ অমুক লালাবাবুর নাকি পাল্কী চেপে মহলের জমিদারীর তদারকে যেতে যেতে একটি সাধারণ কথা থেকে মনে দারুণ বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। কথাটি নাকি আবার তাঁকে উদ্দেশ করেও বলা হয় নি। তাঁরই প্রজা—এক রজক-গৃহস্থের আঙিনা দিয়ে তাঁর পাল্কী চলছিল দিনের পড়ন্ত-বেলায়। গৃহস্বামীকে উদ্দেশ করে ঘরের কেউ নাকি ঠিক তখনই বলছিল, "উঠলে না বাবা, বেলা যে গড়িয়ে গেল; আর ঘুমিয়ে কাটালে বাসনায় আগুন দিবে কখন?"

বাস! ঐ কথাগুলি কানে আসতেই লালাবাবুর চিত্ত বিচলিত হয়ে উঠল। তিনি কথাটাকে রহস্যের দৈনন্দিন-জীবনের সাধারণ অর্থে গ্রহণ না করে দার্শনিকের মর্ম্মে বিচার করলেন। পরবর্ত্তী ইতিহাস এইরূপ—এতে রজকের কলার বাসনা পোড়ান হয়েছিল কিনা আমাদের কাহারও জানা নেই, তবে এতে লালাবাবুর পার্থিব বাসনা নাকি চিরতরে ভস্মীভূত হয়েছিল। শ্রীধাম বৃন্দাবনে তাঁর উত্তর-জীবন ও কীর্ত্তিকলাপ উপরোক্ত বক্তব্যের সাক্ষ্য বহন করে আসছে।

একদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে লালাবাবুর জীবন-সায়াহ্নে

ভোগ-প্রাচুর্য্যের অবসিত লগ্নে বাসনায় (অবশ্য রঞ্জকের কথায় বাসনা) অগ্নি সংযোগ করার ইঙ্গিত তাঁকে অতিমাত্রায় ব্যাকুল করেছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন ধারা কত শত কথাই ত হামেশা আমরা শুনে থাকি। কই, কাহারও ত তেমন মনে কোনও আলোড়ন সৃষ্টি করে না।

প্রশ্ন এই—লালাবাবুর জীবনে তবে এমনটি হ'ল কেন ?

তার জবাবে বলব—লালাবাবুর জীবনে ঐ পরিবর্ত্তন কিন্তু কোনও আকস্মিকতার সৃষ্টি নয়। আর নেহাৎ তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, আকস্মিক প্রভাবের এক মাহেন্দ্র মুহূর্ত্তেই চিত্তের ঐ পরিবর্ত্তন এসেছে, তবে বলব—তা হলে সেই চিত্তবিক্ষোভ কখনও স্থায়ী রূপ গ্রহণ করত না। দু'দিনের মর্কট বৈরাগ্যেই পর্য্যবসিত হ'ত মাত্র। কিন্তু লালাবাবুর অমনটি না হয়ে, সেই পরিবর্ত্তন আমৃত্যু কার্য্যকরী হয়েছিল।

এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা আবার সেই দ্বন্দ্বিক সংঘর্ষণের তত্ত্বে ফিরে আসছি। দুধের স্থিরত্বে অবিরাম গতির (ঘূর্ণনের) সঞ্চার হলে দুধের বিকার হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বেকার আকার থেকে দুধ বিশেষ একটি অন্য আকার পায়। এই আকৃতির বিকৃতিই রূপান্তর। দুধ তখন আর দুধ থাকে না, নবনীমণ্ডিত তক্র অর্থাৎ উপরিভাগে মাখনসমেত ঘোলে পরিণত হয়। আবার অপর একটি উদাহরণ ধরা যাক—যেমন, শীতল জল। শীতল জলে উত্তাপ সঞ্চারিত হলে বাষ্পের সৃষ্টি হয়। এ ভাবে প্রাকৃতিক সব রকম উপাদানেই বিজাতীয় অপর কোনও শক্তির সংঘর্ষে বা মিশ্রণে বিশেষ বস্তুটির বা উভয় বস্তুরই রূপান্তর হয়। পদার্থদ্বয় সমধর্ম্মী হলে একাকার হয়ে যায়, যেমন জল ও দুধ, আবার পদার্থদ্বয় সংঘর্ষধর্ম্মী হলে উভয়ের রূপান্তর হয়ে তৃতীয় একটি নূতন বস্তুর সৃষ্টি হয়—যেমন, জল ও উত্তাপ।

এখন কথা হ'ল পরস্পর সংঘর্ষধর্ম্মী বস্তুদ্বয়ে এই দৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিবর্ত্তন সংঘর্ষের একটা নির্দ্দিষ্ট সীমান্তে আসলেই সম্ভব হয়, নতুবা নয়। জলের সঙ্গে উত্তাপের সংগ্রাম বাধিয়ে দিলেই ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই বাষ্প হয় না। ধৈর্য্যের সঙ্গে জলের স্ফুটনাঙ্ক পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। খোলা চোখে আবার সেই স্ফুটনাঙ্ক পরীক্ষার উপায় নেই তাপমান যন্ত্র ভিন্ন। কিন্তু ফুটন্ত জলে বাষ্পের সৃষ্টি হওয়া মাত্রই বিনা যান্ত্রিক প্রক্রিয়াতেই খোলা চোখেই তা আমরা বুঝতে পারি। এ ভাবে প্রকৃতির রাজ্যেও নিতান্ত আনাড়ী দৃষ্টি দিয়েই সর্ব্বত্রই আমরা দ্বন্দ্ব-প্রসূত সৃষ্টি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সে সব বিশ্লেষণ করে যথার্থ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করতে পারছি না।

আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের কোনও আকস্মিক সঙ্ঘটন সম্বন্ধেও সেই একই কথা। অর্থাৎ যে কোনও ঘটনার উদ্ভব যখনই এবং যে ভাবেই হ'ক না কেন, তা কোনও না কোনও দ্বন্দ্বেরই চরম পরিণতি। তবে আমরা অনেক সময়ই সে সব পরস্পর সংঘর্ষের গতি-প্রকৃতি সঠিক আঁচ করতে পারি না। আবার, ক্ষেত্র বিশেষে দ্বন্দ্বমান তত্ত্ব দু'টি আঁচ করতে পারলেও সংঘর্ষের চরম পর্য্যায়ের মুহূর্ত্তটির ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে সক্ষম হই না। তাই আমরা প্রায়ই লোককে বলতে শুনি—"একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে ভোজবাজির মত ব্যাপারটি ঘটে গেল, মশাই।"

ভূয়োদর্শন, তীব্র অনুসন্ধিৎসা, বিজ্ঞানীসুলভ বিশ্লেষণী প্রতিভা, ঐতিহাসিকসুলভ ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণাবলীর একত্র সমাবেশ হলেই সংঘর্ষের এই চরম মুহূর্ত্তের ইঙ্গিত ধরতে পারা সম্ভব। বৈজ্ঞানিক বীক্ষণাগারের যান্ত্রিক উপায়ে লব্ধ কোনও তথ্যের মত সামাজিক ঘটনা সম্বন্ধে দিন-ক্ষণ জানিয়ে ভবিষ্যদবাণী করা কখনই সম্ভব নয়। বীক্ষণাগারের অতি সীমাবদ্ধ পরিবেশ সম্পূর্ণ ভাবে আয়ত্তে রাখা আমাদের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু নিঃসীম একটি বিশাল সমাজ-জীবনের পরিবেশ যান্ত্রিক সুইচের মত কোনও ব্যক্তিবিশেষের করায়ত্ত হতে কখনই পারে না। তাই সামাজিক ঘটনা বিশ্লেষণে কোনও একটি মনোমত পরিবেশ বিশেষ একটি সামাজিক প্রভুত্বের প্রভাবে স্থায়িত্ব দিয়ে কিছুদিন রাখতে প্রয়াস করলেও সেই দুর্ব্বার প্রতাপের রন্ধ্রপথে শত শত বহিরাগত প্রভাবে তা ক্ষুণ্ণ হয়ে যায় মানস-ভূমের লেবরেটোরির সৌধ কোনও দিনই গড়ে উঠতে পারে না কোনও চলমান সামাজিক বা দৈনন্দিন তত্ত্ব বিচারে। তাই, অতীতের অনুরূপ ঘটনার বিশ্লেষণ থেকেই আমরা এই দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের বাস্তবায়িত রূপ খুঁজে বের করতে বেশী উৎসাহ বোধ করি এবং সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাই।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়, কিন্তু ঘটনার কখনও পুনরাবৃত্তি হওয়া সম্ভব নয়। এটা বৈজ্ঞানিক সত্য। তাই পুরাতন অভিজ্ঞতা আমাদিগকে কেবল দ্বন্দ্ববাদের মূল সূত্রটিকেই ধরিয়ে দেয়—কতকটা ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসের মত। শুধুমাত্র পার্থক্য এই যে, গণিতের বিশেষ বিশেষ রাশিগুলির পরিবর্ত্তে আমাদিগকে বিভিন্ন তথ্য সেই সূত্রের ছকে বসাতে হয়। তার পর গাণিতিক নিয়মে অঙ্ক কষে গেলেই হ'ল। ছকের তথ্যগুলি পরিবেশনের ত্রুটি-বিচ্যুতির উপরই অঙ্কুরকলনের ফলাফল নির্ভর করে। এবং খাঁটি কথা এই যে, সে সব ক্ষেত্রে তথ্য ত্রুটিপূর্ণ অল্প বিস্তর থাকবেই থাকবে। তাই গণিতের 'প্রেছিশান' বা নির্ভুলত্ব সমাজ-বিজ্ঞানের ভবিষ্যদবাণীর সঙ্গে কোনও কালেই সমতা রক্ষা করে চলে না।

আবার উক্ত লালাবাবুর কথায় ফিরে আসছি। লালাবাবুর জীবনী সম্বন্ধে হয়ত আগাগোড়া ইতিহাস যথাযথ কিছু লিপিবদ্ধ নেই। তবে যখন থেকে তিনি আধ্যাত্ম জগতে একজন বরেণ্য ব্যক্তি বলে পরিগণিত হলেন, তখন থেকে তাঁর অনেক ভক্তই হয় ত তাঁর সন্ন্যাস-জীবনের অনেক কথাই লিখে থাকবেন। ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে হয় ত আমরা এমন সংবাদও পেতে পারি যে, তাঁর গার্হস্থ্যাশ্রমের দৈনন্দিন-জীবনে এমন কোনও দৃশ্যমান ঘটনা ঘটেনি যা তাঁর পরবর্ত্তী ভাগবত-জীবনের বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত

দান করতে পারে। এমনকি প্রাক্‌-সন্ন্যাস জীবনে ঘোর বৈপরীত্য লক্ষিত হওয়াও বিচিত্র নয়।

উপরে আমরা দেখিয়েছি যে, দ্বন্দ্বের পরস্পর বৈপরীত্যের চূড়ান্ত সংঘর্ষের পরিণতিতেই তৃতীয় একটি সম্পূর্ণ নূতন তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ প্রসঙ্গে এ কথা স্পষ্ট করেই বলব যে, বৈপরীত্যের পরস্পর সংঘর্ষ যদি তুল্য-মূল্য অর্থাৎ উভয়তঃ সমান না হয়, তবে সেই সংঘর্ষে লক্ষণীয় নবতর কোনও সৃষ্টি হয় না। সংগ্রামরত দুটি ভাবের মধ্যে যদি একটি অধিকতর বলীয়ান হয় তবে তৃতীয় নূতন একটি সঙ্ঘটন না হয়ে উভয়ের মধ্যে অধিকতর শক্তিশালী ক্রিয়াটিই অপরটিকে নিশ্চিহ্ন করে সগৌরবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করে। মনীষী ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদের সমর্থনে—"অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম এবং পরিণামে যোগ্যতরের উদবর্তন"—প্রাণী জগতে এই অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে। স্থূল জৈব জগতের পরিধি ছাড়িয়ে সূক্ষ্মমনন-শীলতাপূর্ণ মানব-রাজ্যে ঐ উত্তরণ-নীতি কতখানি কার্য্যকরী সে সম্বন্ধে প্রচুর মতদ্বৈধ অদ্যাপি বিদ্যমান। বর্তমান নিবন্ধে সে আলোচনা মুখ্য প্রতিপাদ্য নয় বলে শুধুমাত্র আমাদের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণে কিছুটা প্রাসঙ্গিক বলে একটুখানি ইঙ্গিত করেই যাব।

হাঁ, লালাবাবুর লিখিত জীবনবৃত্তান্ত যেরূপই হোক না কেন, তাঁর নিভৃত জীবনের অলিখিত কার্য্যকলাপ সমীক্ষা করার সামর্থ্য যদি আমাদের থাকে তবে আমরা অবশ্যই দেখতে পাব, তিনি আশৈশব মূলতঃ ঈশ্বরানুরাগী ও আধ্যাত্মপরায়ণ নিশ্চয়ই ছিলেন। শক্তিশালী পারিপার্শ্বিক আবরণ তাঁর মৌলবৃত্তিকে চেপে রাখায় সাধারণের চোখে তার বৈষয়িক রূপটাই ফুটে উঠেছিল। অন্তরের অনির্বাণ বৈরাগ্যপ্রবণতা ও আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা স্বজনগণের চর্ম্ম-চক্ষুর অগোচরে থেকেই দিন দিন প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছিল। হৃদয়কন্দরের উদাসী একতারার অনাহত-ধ্বনি এতদিন তাঁকে বিষয়-রসের মত্ততার ফাঁকে ফাঁকে ক্ষণিকের জন্য সচেতন করে তুলত মাত্র। ঐ সেদিনের স্থান-কাল-উপযোগী নিভৃত পরিবেশে তা' প্রতিটি সাত্ত্বিক পরমাণুকে চঞ্চল করে তুলল। উদাসীর একতারা এবার তাঁকে সুযোগ বুঝে শুনিয়ে দিল—

মন এবার তুই চিনে নে রে আপনারে,
এধার ওধার ঘুরিস কেনে,—কিসের অন্বেষণে?
কিসের বিত্ত, কিসের সংসার—সকলি যে মায়ার আগার
বুঝেও তুই বুঝলি না রে—দুঃখ রইল মনে!
এসেছিলি আপন কাজে, দিন কাটালি সঙের সাজে,
—সার করিলি তারে
হায়, চিনবি তবে সব আপনারে।
বাসনা-সাগরে রইলি ডুবে—মণি-মুক্তার অসীম লোভে
মনের সুরে মধুর স্বরে, ডাকছি তোরে বারে বারে;
শুনেও তুই শুনলি না রে, বিষয়-রসের বন্ধনে।

মানুষ মননশীল প্রাণী। মানবের পরিচয় ও প্রবৃত্তি মুখ্যতঃ জৈব ধর্ম্মের তাগিদেই পরিচালিত হয় না—এ কথা স্বীকার করতে অনেকেই ইতস্ততঃ করেন। প্রতিটি মানুষের অদৃশ্য ও অলিখিত জীবনের গূঢ় পর্য্যালোচনা করলেই তার মানসিক ও অবচেতন রাজ্যের সংবাদ পাওয়া সম্ভব। শুধু মাত্র তখনই মানুষের আধ্যাত্ম এষণার প্রবৃত্তির সন্ধান মেলে। প্রকাশ্য জীবনের ঘটনাপঞ্জীর উপকরণ নিয়ে মানব-চরিত্রের বিচার-বিশ্লেষণ কখনই সম্ভব নয়। ইতিহাসের চরিত্র বর্ণনায় বা সাহিত্যের সমালোচনায় ঐ সব বাহ্যিক উপকরণ ভিত্তি করেই 'থিসিস' লিখতে হয় সত্য, কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের মূলগত তাত্ত্বিক তথ্য নির্ণয়ে ঐ সব উপকরণ বিশেষ মূল্যবান নয়।

দ্বন্দ্ববাদের উদার সমর্থক—এক কথায় বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণকর্ত্তা ফয়ারবাক্‌ মানবের শরীর ও মনের এই দ্বৈত সত্তার কথা জোর করে বলতে গিয়েই মার্কসপন্থীদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। স্বর্গতঃ মনীষী এম, এন, রায়ও তাঁর এই সত্যবোধকে ব্যক্ত করেই ষ্টালিনপন্থীদের মনঃপূত হতে পারেন নি।

প্রসঙ্গক্রমে এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, মনে একরূপ ভাব পোষণ করে কার্য্যতঃ কোনও ব্যক্তি অন্যরূপ আচরণ করতে পারে কিনা। তবে এখানে বলা প্রয়োজন যে, দার্শনিক পরিভাষায় মনের জটিল সংজ্ঞা নিয়ে আমরা এক্ষণে মস্তিষ্কের ব্যায়াম করতে চাই না। তাই উপরোক্ত প্রশ্নের জবাবে আমরা সকলেই একবাক্যে বলতে পারি—হাঁ মশাই, তা সম্ভব—শুধু সম্ভবই নয় সম্পূর্ণরূপেই সম্ভব। মনের সঙ্গে দেহের নৈকট্য সম্বন্ধ থাকলেও মনোবৃত্তির সম্যক অনুশীলন ও সুনিয়ন্ত্রিত প্রথায় দৈহিক চর্চ্চার দ্বারা দেহাত্মবোধের উপর মানসবৃত্তি বহুলাংশে আধিপত্য করতে সমর্থ হয়। দেহ স্থূল আহার্য্য গ্রহণ করে আপনাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে, পক্ষান্তরে মানসপুষ্টি শুধুমাত্র দেহের স্থূল যোগানের উপরই নির্ভর করে না, স্থূল দৃষ্টির অগোচর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়বৃত্তির মাধ্যমে তার পুষ্টি অনেকাংশে নির্ভর করে। এই অর্থেই ঈশ্বরপুত্র বলেছিলেন—Man does not live by bread alone—মানুষ শুধুমাত্র স্থূল আহার্য্য গ্রহণ করেই বাঁচতে পারে না।

মানব-জীবনের আকস্মিকতা বিচার করতে গিয়ে কেবল আলোচ্য ব্যক্তির বাহ্যেন্দ্রিয়ের দৃশ্যমান কার্য্যকলাপ বিচার বিশ্লেষণ করলেই চলবে না, অন্তরিন্দ্রিয়েরও সম্যক পর্য্যালোচনা করা চাই। তা' না হলে প্রমাদ পদে পদে অনিবার্য্য। রত্নাকরের বাল্মীকিতে রূপান্তর নারদের এক মুহূর্ত্তের মন্ত্রণায়ই সম্ভব হয় নি। রত্নাকরের বাহ্যিক আচরণের আবর্জনাস্তূপের নিম্নে মূল্যবান্‌ মানসরত্নের আকর লুক্কায়িত ছিল। অসদুপায়ে জীবিকার দায় তাকে মিটাতে হলেও নেহাৎ সঙ্কীর্ণ পরিবেশে সাংসারিক কর্ত্তব্যবোধ তার অটুট ছিল। তার জীবিকার হীনবৃত্তিকেও সে তার নিজস্ব কর্ত্তব্যরূপ ধর্ম্মরক্ষার এক বিশেষ অঙ্গ বলেই মনে মনে শ্রদ্ধা করত। তাই ক্ষেত্র তৈরী থাকায় এক মোহ-মুদ্গরের আঘাতেই তার অন্তরতম সত্তা তমসার আবরণ ভেদ করে আত্মপ্রকাশ করল। এটাও

অন্তর্দ্বন্দ্বেরই এক বিশেষ পরিণতি—যোগ্যতরের উদবর্ত্তন। পূর্ব্বেই প্রকারান্তরে বলা হয়েছে যে, দ্বন্দ্ব ক্ষেত্রবিশেষে উভয়তঃ প্রবল সংঘর্ষ-ধর্ম্মী হয়ে নবতর সৃষ্টি ঘোষণা করে, আর কোথাও বা দ্বন্দ্বমান তত্ত্ব দুটি সমভাবে তীব্রতর না হওয়ায় দুর্ব্বল বৃত্তি সবলের পদানত হয়ে থাকে। অবশ্য জন্তুজগতে পদানত হওয়ার প্রশ্ন আসে না—সেখানে প্রবল দুর্ব্বল প্রাণীকে একেবারে ধ্বংস করেই উদবর্ত্তন করে। এই ক্রমঃবিকাশের ধারা নীতিগত ভাবে সর্ব্বত্রই সমভাবে সক্রিয় বলে ব্যক্তিবিশেষের চারিত্রিক সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে বলেছিলেন—The ultimate value of a man is not to be measured by what he says, not even by what he does, but by what he becomes. বলা বাহুল্য এই 'what he becomes'ই জীবদ্দশায় মানুষের সবশেষ উত্তরণ।

কাজেই এক্ষণে বলতে হয়, আকস্মিকতা বলে কোনও সংঘটন বা বিশেষ প্রভাব কিছু নেই মানব-জীবনে। মানুষের চিন্তার সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে আমরা যেমন অনন্ত প্রবহমান মহাকালকে পর পর অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ-এর মাইল-পোষ্টের প্রক্রিয়ায় সীমায়িত করে রাখি, ঠিক তেমনি, নিয়ত সংগ্রামশীল মনোরাজ্যের এক একটি বিশেষ সজ্ঘর্ষের উত্তরণের মুহূর্ত্তকেই আমরা দৈনন্দিন জীবনে আকস্মিকতা বলে চিহ্নিত করি।

"মরুভূমি কি সুখে বাঁচিয়া আছে"

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মরুভূমি কি সুখে বাঁচিয়া আছে!
কে বা তারে দিল কতটুকু জল,
কি বা চেয়ে কি পেয়েছে সে কাহার কাছে,
ছলনা এ ছলনা কেবল।
আকাশ অঙ্গনে কালো আষাঢ়ের মেঘ,
অনন্ত মরুর তীরে করিছে গর্জন,
ছলনায় পরিহাসে বর্ষণ আবেগ,
দ্বিচারিণী মাটি পায় সবুজ চুম্বন।
হায়,
কত যে 'সাহারা' 'গোবী' পড়ে আছে আপন গৌরবে,
অফুরন্ত বালুর ভাণ্ডার তার,
তার নিমন্ত্রণ নাই পৃথিবীর ভোজের উৎসবে,
তাই সে যে মহাশিব দক্ষের সভার।
দক্ষ-ছলনা ভরা শ্যাম সমারোহে,
সে ভোলে না কোনদিন,
ঝরে যাওয়া কুসুমের মোহে,
যজ্ঞ তাই হয় শিবহীন।
এই নিয়ে কবি লিখে কাব্যের সম্ভার তার,
চিত্রকর চিত্র তার আঁকে।
কত গান, কত ভান, কত মান অভিমান বিচিত্র কথার,
ইতিহাস লিখে লিখে রাখে।
ইতিহাস ইতিহাস,—
মুগ্ধ ভ্রমর ফিরে কুসুমের দেহে কত সাজ।
পরিহাস পরিহাস,
'শুভ্র মর্ম্মর প্রিয়া' তবু কেন প্রেত হাসি হাসে মমতাজ!
মরীচিকা, মরীচিকা,
ছলনা এ ছলনা কেবল,
মরীচিকা মরীচিকা,
নিত্য চলে নিত্যকালে, উষর প্রান্তর পথে মরু-যাত্রীদল।
তারা জানে তারা শুধু জানে,
মরুভূমি আপনারে করেনি বঞ্চনা।
তারা জানে তারা শুধু জানে,
মরুভূমি মরীচিকা করেনি রচনা।"



রাজস্থানে রাস্তা নির্মাণে পুরুষ ও স্ত্রী কর্মিদল



রবার-নির্য্যাস নিষ্কাশনে কেরেলার রমণী



মনোযোগ



মমতা

ফটো ঃ—হৃষিকেশ ভট্টাচার্য্য

লালসন্ধ্যা

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

৩১

শ্রীমতীর মুখে হাসি চোখে জল। সে ভিজে গলায় বলল, এতদিন আপনি পরিচয় দেন নি কেন?

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, সে অনেক কথা, মা। কিন্তু একজন বাইরের লোককে যে সম্মান আর ভালবাসা তুমি দেখিয়েছ তাতেই তোমার আসল পরিচয় আমি পেয়েছি। তুমি যে আমার বুকের কতখানি ভরিয়ে রেখেছ তা শুধু জানি আমি আর আমার অন্তর্যামী।

শ্রীমতী লজ্জিত হেসে বলল, একটু আগেও আপনাকে আমি কত শক্ত কথা বলেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।

ডাক্তারবাবু শান্তকণ্ঠে বললেন, কঠিন হলেও কথাগুলি সত্যি। সত্যকথা বলার জন্য ক্ষমা চাইতে হয় না, পাগল মেয়ে।

ছেলেমানুষের মত চঞ্চল কণ্ঠে শ্রীমতী বলল, আপনার কুঁড়েঘর সত্যিসত্যিই তা হলে রাজপ্রাসাদ হয়ে গেল! আমার কাছে কিন্তু আপনার কুঁড়েঘরও স্বর্গ মনে হ'ত শুধু আপনাকে সব সময় কাছে পেলে।

ডাক্তারবাবু নীরব।

শ্রীমতী বলতে থাকে, আর আপনাকে নিয়ে আমার কোন দুর্ভাবনা নেই—কোন দিক দিয়ে কোন বাধাই আর পথ আটকে দাঁড়াতে পারবে না।

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, বাধা পেলেই বা তা মানছে কে—

শ্রীমতী আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল, আমরা তা হলে পরশুই যাচ্ছি ত?

ডাক্তারবাবু বলেন, যেতেই হবে মা। নইলে শেষ পর্যন্ত সবদিক সামলান যাবে না। সূর্যবাবু হয়ত নতুন করে জট পাকিয়ে তুলবেন। তারচেয়ে আমরা ফিরে গিয়ে দু'জনে মিলে আর একবার বুঝিয়ে বলে দেখি। যদি মেনে নেয়, ভাল—নইলে যা ঘটবার তাই ঘটবে—

শ্রীমতী বলল, আমার মতে যার যতটুকু প্রাপ্য তা পাওয়াই উচিত।

ডাক্তারবাবু মাথা নাড়তে নাড়তে ধীরে ধীরে বলতে থাকেন, অনেক সময় লঘুপাপে গুরুদণ্ডও পেতে হয় মা। আমি শুধু সেই পথটাই বন্ধ করে দিতে চাই। তা সে যে কেউই হোক।

শ্রীমতী বলল, আপনি যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন। আমি আর কতটুকু বুঝি—কথাটা শেষ না করেই সে খানিকটা কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে অন্য কথায় এল, কিন্তু আমি যে বড় মুস্কিলে পড়ে গেলাম—

ডাক্তারবাবু মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন, কিসের মুস্কিল, মা—

শ্রীমতী ইতঃস্তত করে বলল, আপনাকে ত আর কাকাবাবু বলে ডাকা উচিত হবে না—

আমার অপরাধ মা? ডাক্তারবাবু প্রশ্ন করেন।

যতদিন জানতাম না সে এক কথা, শ্রীমতী বলল, কিন্তু জেনে-শুনে···কথাটা শেষ না করেই শ্রীমতী থামল।

ডাক্তারবাবু বললেন, লঘু পাপে গুরু দণ্ড দিচ্ছ নাকি মা? কোথায় পরিচয় দিলাম বলে পুরস্কৃত করবে না যা নিজের ইচ্ছায় দিয়েছিলে সেটুকুও কেড়ে নিতে চাও?

শ্রীমতী লাজনম্র কণ্ঠে ফিসফিস করে বলল, এ বাড়ীতে আপনি কাকাবাবুই থাকুন ও বাড়ীতে আপনাকে আমি বাবা বলেই ডাকব। শ্রীমতী মাথা নীচু করল।

ডাক্তারবাবুর চোখ দুটি সহসা বাষ্পাকুল হয়ে উঠল একটা অদ্ভুত সুখানুভূতিতে। তিনি শ্রীমতীর মাথায় হাত রেখে গভীর কণ্ঠে বলতে লাগলেন, একেবারে কংক্রিটের দেওয়াল তুলে দিতে চাও মা!···

প্রণব নিঃশব্দে এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। শ্রীমতী উঠে দাঁড়াল। প্রণব বলল, না হে কল্যাণ মুন্সী, অন্দরমহল তোমার প্রস্তাবে কিছুতেই রাজি হতে পারছেন না। আর অন্দরমহলেরও দোষ নেই। আমার কাছে তুমি নালু মুন্সী হলেও তিনি তাঁর এতবড় কুটুমকে এত সহজে ছাড়তে চাইবেন না, এ আমি জানতাম। মোটকথা পরশু তোমাদের যাওয়া নাকি হতেই পারে না।

ডাক্তারবাবু নিঃশব্দে টিপে টিপে হাসতে থাকলেও শ্রীমতী চুপ করে থাকতে পারল না। বলল, আমি মাকে বুঝিয়ে বললে তিনি আর বাধা দেবেন না। ওঁর পরশুদিন না গেলেই চলবে না বাবা।

ডাক্তারবাবু শ্রীমতীর কথায় সায় দিয়ে বললেন, শ্রীমা ঠিক

কথাই বলেছে, নব। অজ্ঞাতবাসের মেয়াদ যখন শেষ হয়েই গেল তখন মাঝে মাঝে আসব ভাই। এ যাত্রা তোমরা আমাকে রেহাই দাও।

শ্রীমতী ধীরে ধীরে চলে গেল। দুই বাল্যবন্ধুর আলোচনার মধ্যে সে আর বেশীক্ষণ থাকা সঙ্গত মনে করল না।

শ্রীমতী প্রস্থান করতেই ডাক্তারবাবু অন্যপ্রসঙ্গে উপস্থিত হলেন, তোমার মেয়েটার খুব বুদ্ধি হে নব।

প্রণব কৃতার্থের হাসি হেসে চুপ করে রইলেন।

ডাক্তারবাবু বলতে থাকেন, এই মেয়েটার জন্যই আমায় সংসারের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হ'ল। আমার উপোসী মনটাকে শ্রীমতী আবার জাগিয়ে তুলেছে। ফাঁদে পড়ে আত্মপ্রকাশ করেছি, বুঝলে হে প্রণব, আত্মপ্রকাশ না করে আমার উপায় ছিল না।

তিনি হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন।

প্রণব গম্ভীর হয়ে বললেন, তোমাদের বড়লোক জাতটাকে এই জন্যেই আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। বাপের সঙ্গে মতান্তর হতে তিনি ছেলেকে দিলেন দূর করে, ছেলে রাগে, দুঃখে, অভিমানে বাপকে ছেড়ে চলে গেল। এ পর্যন্ত না হয় বোঝা গেল, কিন্তু তার পরের ঘটনাগুলোর কোন সহজ অর্থ আমি খুঁজে পাই না। ছেলের পাশে পাশে রয়েছ অথচ পরিচয় গোপন করে—

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে ডাক্তারবাবু হাসি মুখে বললেন, এখানেও সেই একই প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিল প্রণব। অর্থাৎ মতের অমিল। বাবা আমাকে সব দিক দিয়ে জব্দ করবার একেবারে পাকা ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। অতনুকে তিনি শৈশব থেকেই এমন ভাবে শিক্ষা দিতে সুরু করলেন যাতে ভবিষ্যতেও আমি যেন আর মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারি।

প্রণবের কণ্ঠে বিস্ময়, ভারী আশ্চর্য্য কথা ত!

ডাক্তারবাবু হাসতে হাসতেই উত্তর দিলেন, এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই প্রণব। এমন ঘটনার অভাব নেই, প্রতিদিনই ঘটছে। হয় ত ভিন্ন ভিন্ন পোশাক পরে। তাই হতাশ না হয়ে সময় এবং সুযোগ মত অতনুর পাশে এসে দাঁড়ালাম। ব্যবস্থাটা অবশ্য আমাদের অ্যাটর্নী নলিনী বাবুই করে দিলেন। অত্যন্ত সজ্জন লোক তিনি। তাঁর সাহায্য না পেলে আমাকে খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়তে হ'ত। বিশেষ করে, বাবার শেষ উইল নিয়ে, বাবা মৃত্যুর বহু পূর্ব্বে আমাদের যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রী করে নগদে রেখে যান। আর এই বিরাট টাকার অঙ্ক থেকে সামান্য কয়েক হাজার অতনুকে দিয়ে বাকীটা আমাকে দিয়ে যান।

প্রণব বললেন, কিন্তু তোমার সন্ধান ত তিনি জানতেন না নালু মুন্সী—

ডাক্তারবাবু বললেন, তার ব্যবস্থাও উইলে তিনি করে গেছেন, তাঁর মৃত্যুর বার বছরের মধ্যে আমার সন্ধান না পাওয়া গেলে তবেই অতনু এই টাকার অধিকারী হবে।

একটু থেমে ডাক্তারবাবু পুনরায় সুরু করলেন, বাবার মৃত্যুর পরেই আমি অতনুর কাছে কাছে থেকে ওর চরিত্রের দুর্ব্বল অংশের সন্ধান নিয়ে চাকা ঘোরাতে আরম্ভ করি। এমনি দিনে হঠাৎ খবর পেলাম, শ্রীমান বিবাহ করেছেন—এবং তা আবার আমারই বাল্য বন্ধু প্রণব মাষ্টারের মেয়েকে। বড় আনন্দ হ'ল খবরটা পেয়ে। আমার কাজ আরও সহজ হবে ভেবে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। কিন্তু বাবার শিক্ষার প্রভাব অতনু কাটিয়ে উঠতে পারল না। সে ভালবাসা চায়, কিন্তু শ্রদ্ধা দিতে জানে না। শ্রীমতী চেষ্টা করেও ঠিক কায়দা করতে না পেরে একদিন চরম আঘাত হেনে চলে এল। এমনি আঘাত পাবার তার প্রয়োজন ছিল প্রণব। অতনুর অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেল। তাই আমাকেই ছুটে আসতে হ'ল আমার মাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য, আর আমিও এই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের সুযোগ নিয়ে কায়েম হয়ে বসব। তিনি পুনরায় হেসে উঠলেন।

প্রণব বার বার মাথা নেড়ে বললেন, বুঝলাম না কল্যাণ মুন্সী, প্রথম থেকে তোমার পরিচয় দিলে কি এমন ক্ষতিবৃদ্ধি হ'ত।

ডাক্তারবাবু বললেন, কি হতে পারত আর কি পারত না তা বলা শক্ত, তবে একবার ব্যর্থ হলে আমি বাপ হিসেবে আর এগোতে পারতাম না। আত্মসম্মান বাঁচাবার জন্যই আমাকে মানে মানে সরে যেতে হ'ত।

প্রণব বলতে থাকেন, কথাটা ঠিক বলেছ নালু মুন্সী। খাসা পন্থাটি বার করেছিলে তুমি। জলেও নেমেছ—মাছও ডাঙায় তুলেছ অথচ কাপড় ভেজাও নি।

ডাক্তারবাবুর মুখে আত্মপ্রসাদের হাসি ফুটে উঠল।

৩২

আজ সকাল থেকেই মিত্রা ছটফট করে বেড়াচ্ছে, যে খবরটা সে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই পেয়েছে তা অভাবিত না হলেও নিজেকে সে কিছুটা অসহায় মনে করল, তার সব চেষ্টাই কি শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হবে? ডাক্তারবাবু এখানে নেই, অতনুকেও সব কথা অকপটে বলা চলে না, হয় ত হিতে বিপরীত হবে।

সময় কাটতে চাইছে না। মিত্রা তার নিয়মিত কাজগুলি করতেও আজ বারে বারে ভুল করছে। তার এই অন্যমনস্কতা অতনুর দৃষ্টি এড়াল না। সে অনুযোগ দিয়ে বলল, আমায় সকাল বেলার ওষুধ দিতে তুমি ভুলে গেছ মিত্রা। তোমার কি আজ শরীর ভাল নেই?

মিত্রা ম্লান হেসে বলল, আমি যদি ভুলেই গিয়ে থাকি—আপনি ডেকে একবার মনে করিয়ে দিলেন না কেন?

মিত্রার উত্তর করবার ধরনে অতনু রীতিমত বিস্মিত হ'ল, কিন্তু এই নিয়ে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করল না। চুপ করে রইল। কিন্তু মিত্রার পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব হ'ল না। কতকটা অনুতপ্ত হয়েই সে বলল, আপনি বুঝি রাগ করলেন অতনুবাবু?

অতনু শান্ত গলায় বলল, রাগ করব কেন মিত্রা? ভুল

হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তার জের টানতে গেলেই অশান্তি বাড়ে, আমি নিজেকে দিয়েই তার যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। তাই আর সহজে রাগ করি না।

মিত্রা এ কথার কোন জবাব দিল না।

অতনু অন্য কথায় এল, বলল, ডাক্তারবাবুর আর কোন খবর পেয়েছ?

মিত্রা একটু রহস্য করে বলল, আপনার বুঝি অন্য ডাক্তারের চিকিৎসা পছন্দ হচ্ছে না?

অতনু জবাব দেয়, বিলক্ষণ—ভদ্রলোককে বহুদিন দেখি না, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম, তিনি আসবেন কবে?

মিত্রা বলল, এত খবর রাখেন আর এ সংবাদটা রাখেন না?

অতনু বলল, জানলে তোমাকে জিজ্ঞেস করতাম না মিত্রা।

মিত্রা জবাব দিল, আমারও জানা নেই।

অতনু খানিক চুপ করে থেকে অন্য কথা তুলল, তোমাদের শিলাদিত্যবাবু নাকি খুব সোরগোল করছেন? তিনি এগোলেন কতখানি?

মিত্রা বিস্মিতকণ্ঠে বলল, খবরটা আপনাকে কে দিলে শুনতে পাই কি?

অতনুর মুখে বিচিত্র একটুকরা হাসি দেখা গেল, সে বলল আমার বুকের উপর দাঁড়িয়ে ওরা নাচবে আর আমি তা জানব না, এ তুমি কেমন করে আশা কর মিত্রা? সব খবরই আমার কাছে আসে, কিন্তু তোমাদের মত দিশেহারা হয়ে পড়ি না। আমি নিজেও খেলতে ভালবাসি, অপরকেও খেলিয়ে আনন্দ পাই।

মিত্রা গম্ভীর হয়ে বলে, কিন্তু খেলাটা সব সময় খেলা থাকে না অতনুবাবু—

থামলে কেন মিত্রা—অতনু সহজকণ্ঠে বলল, অনেক সময় মারাত্মক হয়ে উঠে, এই কথা তুমি বলবে ত?

মিত্রা চুপ করে থাকে। অতনু বলতে থাকে, কথাটা ইদানীং আমি বুঝতে শিখেছি। কিন্তু অভ্যাস ছাড়তে পারি না—তাই শিলাদিত্যকে জেনেশুনে আমি বাড়তে দিয়েছিলাম। আজ সে ফণা তুলেছে মরণ-ছোবল মারবার জন্য। ওর ঐ উদ্যত ফণা আমি মাটির সঙ্গে পিষে ফেলতে পারতাম, যদি তোমরা সকলে মিলে আমাকে দুর্বল করে না ফেলতে। আমি বোধ হয় কোন দিন আর অতীত জীবনে ফিরে যেতে পারব না। আবার হয় ত নূতন করে আমাকে আরম্ভ করতে হবে।

অতনু মৃদু মৃদু হাসতে থাকে।

মিত্রা ম্লান দৃষ্টিতে খানিক চেয়ে থেকে বলে, এ সব আপনি কি বলছেন অতনুবাবু?

অতনু বলে, ঠিক কথাই বলছি, তাই ঐ মরণ-ছোবল বুক পেতে নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি মিত্রা। মরে আবার নূতন করে আমি জন্ম নেবই। ওকি, চমকে উঠলে কেন? আরে, না না, ভয় পেয়ে চমকে উঠবার মত কোন কথা আমি বলি নি। কিন্তু এ সব কথা থাক।

মিত্রা মৃদু কণ্ঠে বলে, থাকবে কেন অতনুবাবু। আপনি বলুন, আমি শুনব।

অতনু বলল, সেই জন্যেই ডাক্তারবাবুর খোঁজ করছিলাম। অনেক দুর্ব্যবহার আমি তাঁর সঙ্গেও করেছি। কে বলতে পারে আগামীকাল হয় ত এ বাড়ী থেকেও আমাকে চলে যেতে হতে পারে। তাই হিসেব করতে বসেছি, আর মনে হয়েছে দেনা আর পাওনাটা বড় অসমান হয়ে পড়েছে, তাই—

মিত্রা স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকল, অতনুবাবু।...

অতনু হাসিমুখে বলল, অসঙ্কোচে বলতে পার মিত্রা, দেখছ না, আমি আর সহজে কারুর উপর রাগ করি না!

মিত্রা উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলল, ওরা যদি সত্যি সত্যিই আপনার এতবড় প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে ফেলে?

অতনু নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল, তা হলে আমি ঘরে বসে পরমানন্দে বীণা বাজাব মিত্রা, অতনু উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল।

এ হাসি মিত্রা সহ্য করতে পারে না, কেমন যেন অপরাধীর মত মুখ করে চলে যাবার জন্য উদ্যত হ'ল।

অতনু পিছনে ডাকল, যেও না মিত্রা—

মিত্রা ফিরে দাঁড়াতেই অতনু পুনরায় বলল, তোমার সেই খর-বুদ্ধি আর প্রচণ্ড সাহস কোথায় গেল মিত্রা? তুমি কেন নিজেকে দোষী মনে করছ? দোষ যদি কোথাও তোমার থেকে থাকে তার চেয়ে ঢের বেশী দোষ আমি করেছি।

মিত্রা জবাব দেয় না।

অতনু বলতে থাকে, জীবনের আরম্ভ থেকে এত বেশী খোসামোদ আর স্তুতি পেয়ে এসেছি যে, আসল নকল চিনতেও ভুলে গেলাম। সেই জন্যেই কেউ আমার কাছে তার প্রাপ্য পায় নি, দু'হাত ভরে নিয়েছি—দেবার কথা একবারও মনেও আসেনি। নিতে গেলে দিতে হয়, এই কথাটাই কেউ কোন দিন আমাকে বুঝিয়ে বলে নি।

মিত্রা এতক্ষণে কথা বলল, আপনি কি কোন দিন বোঝবার চেষ্টা করেছেন?

অতনু বলল, করেছি বলেই ডাক্তারবাবুকে এতদিন ধরে সহ্য করতে পেরেছি। তুমিও আমার কাছে—

বাধা দিয়ে মিত্রা বলল, আমার কথা থাক।

অতনু বলল, থাকবে কেন? সত্যিই ত তোমাকেও আমি সহ্য করে আসছি।

মিত্রা বলল, শুধু নিজের স্ত্রীকেই আপনি সহ্য করতে পারলেন না।

অতনু কথাটা এক প্রকারে স্বীকার করে নিয়েই বলল, অস্বীকার করতেও তাকে পারছি না মিত্রা, বরং তার কথা ভেবে আজ আমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছি। একে তুমি কি বলবে?

মিত্রা ধীরে ধীরে বলে, সম্ভবত এ আপনার সাময়িক দুর্বলতা।

অতনু জবাব দিল, হয় ত তাই, কিন্তু এই দুর্বলতার মধ্যে যে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য লুকিয়ে আছে তার সন্ধান আমি পেয়ে গেছি, বুঝতে পারছি যে, মানুষের মধ্যে এই দুর্ব্বলতা না থাকলে সে সুন্দর হয়ে উঠতে পারে না—পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না।

মিত্রা চোখ তুলে স্থির দৃষ্টিতে অতনুর পানে তাকাল।

অতনু বলতে থাকে, কথাকটি নানা ভাবে শ্রীমতী আমাকে বহু বার শুনিয়েছে, আরও বলেছে, ভালবাসার সঙ্গে খানিকটা শ্রদ্ধার খাদ না মেশালে তার পরমায়ু স্বল্পস্থায়ী হয়। আমার ভালবাসায় নাকি বেগ আছে—প্রশান্তি নেই। তাই জলকে তা শুধু ঘোলা করতেই পেরেছে, নির্ম্মল করতে নয়।

অতনু একটু থেমে পুনরায় বলতে লাগল, অহঙ্কারে কথাগুলি তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করি নি, বরং হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েছি মাষ্টারের মেয়ের মাষ্টারী করবার দুঃসাহস দেখে, তার পরে আঘাত করেছি বর্ব্বরের মত। আঘাতকে মাথা পেতে নিলেও শ্রীমতীর চোখেমুখে ঘৃণা-মেশান অনুকম্পার যে ভাব ফুটে উঠতে দেখেছিলাম, সে দিনে তার যথার্থ অর্থ না বুঝলেও আজ আমাকে অনেক কথাই মনে করিয়ে দেয়।

অতনুর মুখে শ্রীমতীর কথাগুলির পুনরুক্তিতে মিত্রা অকারণে ব্যথা পায়, কিন্তু প্রকাশ্যে সে কোন কথা বলে না।

অতনু বলতে থাকে, আজ আমি তোমাকেও বুঝতে পারি—শ্রীমতীকেও বুঝি, কিন্তু ডাক্তারবাবু আমার কাছে গভীর সমুদ্র। তাঁকে আমি কোন দিনই বুঝলাম না।

সহসা অতনু চুপ করল, চোখ বুজে সে যেন তার অন্তরের মধ্যেই ডুবে গেল, একটা শান্ত সমাহিত ভাব। যাঁর মাথার উপর এত বড় বিপদের ধারাল খাঁড়া ঝুলছে, তাঁর এমন শান্ত নির্লিপ্ত ভাব কতকটা অসম্ভব এবং অবিশ্বাস্য। মিত্রা কোমল দৃষ্টিতে তার মুখের পানে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। কথা বলে বিরক্ত করল না।

খানিক পরে অতনু ক্লান্ত দুটি চোখ মেলে তাকাল। হাসি মুখে বলল, এখনও তুমি যাওনি মিত্রা?

মিত্রা আর দ্বিতীয় কথা না বলে অত্যন্ত দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেল। তার যে আজ কি হয়েছে—কিছুতেই সে অতনুর কাছে সহজ এবং স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারছে না।

আশ্চর্য্য! এই কি সেই অতনু? একসঙ্গে অনেক দিনের অনেক কথাই তার মনে পড়ল। হাসিও পায় দুঃখও হয়।

আকস্মিক ভাবে মিত্রার দৃষ্টি স্থানভ্রষ্ট হয়ে তার নিজের উপর পড়ল। মানুষের চরিত্র বড় অদ্ভুত। আশ্চর্য্য হবার কোথাও কিছুই নেই, নইলে অতনুর সর্ব্বনাশ করতে এসে সে তার নিজের এত বড় ক্ষতি করে বসল কিসের লোভে—কিসের লোভে সেই অতনুর মঙ্গলের জন্য সে পাগলের মত পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে?···

মানুষ একটা গতিশীল চক্রযান। প্রয়োজনে তার গতির পরিবর্ত্তন ঘটে, শুধু ষ্টিয়ারীং কাটাবার অপেক্ষা। সোজা থেকে বাঁকা আর বাঁকা থেকে সোজা···

মিত্রা আর ভাবতে পারে না।···

৩৩

অতনু আজ প্রচুর ঘুমাচ্ছে, নির্ব্বিকার নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। ডাকতে এসে বারকয়েক ফিরে গেছে মিত্রা। ওর নিরুপদ্রপ বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাল না, কিন্তু নিজে সে এক মুহূর্ত্তের জন্য চুপ করে থাকতে পারছে না। চতুর্দ্দিক থেকে একটা গাঢ় অন্ধকার তাকে যেন চেপে ধরে আছে। এই দুর্ভাবনা থেকে সে অব্যাহতি চায়, মুক্তি চায়। সে তার মনের স্থৈর্য্য হারিয়ে ফেলেছে, গুমরে গুমরে কাঁদছে তার আত্মা।

ইতিমধ্যে মিত্রা শিলাদিত্যের কাছে ছুটে গিয়েছিল তাকে নিবৃত্ত করবার জন্য। তাকে উপেক্ষার হাসি দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে শিলাদিত্য। তার নাকি করবার কিছুই নেই, সে চলতে জানে—থামতে জানে না।

মিত্রা বলেছে, এতবড় প্রতিষ্ঠানের এতগুলি কর্ম্মচারী যে না খেয়ে মরবে শিলাদিত্যবাবু।

শিলাদিত্য জবাবে জানিয়েছে যে, ওরা নাকি সব মরেই আছে, সে শুধু ওদের শ্মশান যাত্রার ব্যবস্থা করে দিয়ে পারলৌকিক ক্রিয়ার সহায়তা করতে উদ্যত হয়েছে।

মিত্রার আপাদমস্তক জ্বলে উঠলেও সে আর দ্বিতীয় কথা না বলে প্রস্থানে উদ্যত হতে শিলাদিত্য পুনশ্চ বলেছে, আর একটা খবর জেনে যান মিত্রা দেবী—

মিত্রা ঘুরে দাঁড়াল।

শিলাদিত্য বিশ্রী ভাবে হেসে বলেছে, আপনাদের ডাক্তারের ফিরে আসবার অপেক্ষায় আমরা বসে থাকব না। কিন্তু মিত্রা দেবীর পতন দেখে সত্যিই বড় দুঃখ পেয়েছি।

মিত্রা বলেছিল, ভারী আশ্চর্য্যের কথা সূর্য্যবাবু—ওকি চমকে উঠলেন কেন। আমি কিন্তু আপনার উত্থান দেখে খুসী হয়েছি।

একটু থেমে পুনরায় বলে এসেছিল, আমি যাচ্ছি, কিন্তু যাবার আগে আর একবার আপনাকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করে যাচ্ছি···

দৃঢ় পায়ে মিত্রা সেখান থেকে চলে এসেছে। মনে মনে সে তার ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা স্থির করেই স্থান ত্যাগ করেছে।

ডাক্তারবাবু আজই শ্রীমতীকে নিয়ে ফিরে আসবেন। কিন্তু তাঁর ফিরে আসবার অপেক্ষায় চুপ করে বসে থাকলে তার চলবে না। নিজের বুদ্ধি এবং শক্তি আর কেষ্টর সহায়তায় সে সূর্য্য বিশ্বাসের অগ্রসর হবার সবকটি পথেই প্রচুর বিষাক্ত কাঁটা ছড়িয়ে দিল। একটু ভুল করলেই নিশ্চিত মৃত্যু···

সন্ধ্যা হতে বেশী দেরী নেই। মিত্রা তার দুই করতলের মধ্যে মস্তক স্থাপন করে গভীর চিন্তায় মগ্ন ....

...ইতিমধ্যে কেষ্ট এসে খবর দিয়ে গেল যে, সেই মুহূর্ত পর্যান্ত তাদের হিসেব আগাগোড়া মিলে যাচ্ছে...

কেষ্ট চলে যেতেই মিত্রা পুনরায় গভীর চিন্তায় মগ্ন হ'ল। অতনুর কারখানার ভালমন্দ সব দায়িত্ব ডাক্তারবাবু তার উপর দিয়ে গেছেন, আর সেও এই দায়িত্ব প্রতিপালন করতে যথাসাধ্য সচেষ্ট থাকবে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তখন কিছু মনে না হলেও এখন মনে হচ্ছে, ডাক্তারবাবুর এই ধরনের অনুরোধ করাটাও যেমন স্বাভাবিক নয়, তার পক্ষেও কোন প্রকার কথা দেওয়া অর্থহীন। অথচ অনুরোধটাও মিথ্যে না, আর সে নিজে যে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই করে চলেছে এ কথাও সত্য।

পাশের ঘর থেকে অতনুর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, মিত্রা —মিত্রা...

মিত্রার চিন্তার ঘোর কেটে গেল, সে দ্রুতপদে অতনুর ঘরে এসে উপস্থিত হ'ল এবং অতনুর বিভ্রান্ত মুখের পানে দৃষ্টি পড়তে মুহূর্তের জন্ম সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। মুখে তার এক ফোটা রক্ত নেই, কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে, সে বারে বারে শুধু একটি প্রশ্নই করতে থাকে, কি হয়েছে আপনার অতনুবাবু?

অতনু মিত্রার হাত ধরে টেনে জানালার কাছে নিয়ে গেল। দূরে তার কারখানার পানে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, শেষ পর্যন্ত ওর কারখানাটাকে ধ্বংস করাই ঠিক করল মিত্রা?...

ধ্বংস—মিত্রা যেন আর্ত্তনাদ করে উঠল।

অতনু স্তিমিত গলায় বলতে থাকে, হাঁ, ধ্বংস—দেখছ না ওখানকার আকাশটা কেমন লাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু এতটা আমি ভাবতে পারিনি। অভিযোগ ক'রবার ওদের কিছু নেই এমন কথা আমি বলি না। বলবার হয়তো উভয় পক্ষেরই আছে মিত্রা, কিন্তু তবুও আমার জিজ্ঞেস ক'রতে ইচ্ছে হয় যে, এইটেই কি যথার্থ বাঁচার পথ?

অতনু অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে এক সময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল, তার চোখের সম্মুখে তখন হয় ত আর এক দিনের আর একটি সন্ধ্যা স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে। শ্রীমতীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সন্ধ্যাটি। শাল বনের ফাকে ফাকে তখন ফাগের সমারোহ .... অতনু নিজেকে ভুলে গেল, মনে তার রং ধরল...তার পর...

মিত্রা মৃদুকণ্ঠে ডাকল, অতনুবাবু—

অতনু বর্ত্তমানে ফিরে এল। একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ধীরে ধীরে বলতে লাগল, এরই নাম বোধ হয় বিধিলিপি মিত্রা, চেষ্টা করেও তাই অভিষ্টে পৌঁছতে পারছি না, আমার অহঙ্কার আমাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, ঘরে-বাইরে সর্ব্বত্রই আমি একা।

মিত্রা আবার ডাকল। অতনু তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, তুমি ভাবছ, আমি বুঝি ভেঙে পড়েছি, মিত্রা? না না, ভেঙে পড়ব কেন—আজ বরং আমার আনন্দের দিন, নিজেকে আমি ফিরে পেয়েছি। আবার নতুন করে চলার পথ ঐ আগুনের মধ্যে দেখতে পেয়েছি। আমার অতীতের যা কিছু ভুল, যা কিছু গ্লানি সব পুড়ে ছাই হয়ে যাক, আবার নতুন করে চলার পথ সুগম হয়ে উঠুক।

অতনু উদভ্রান্তের মত হা হা করে হেসে উঠল।

মিত্রা ভয় পেয়ে গেল, এই হাসির ধরন আলাদা—এর চেহারা আলাদা।

অতনু পুনরায় কথা করে উঠল, ঐ লাল রঙ একদিন আমাকে মুগ্ধ করেছিল মিত্রা, আমার মনে রঙ ধরিয়েছিল। আমার মনের রঙ শ্রীমতীর সিঁথিতে লেপে দিয়েছিলাম, কিন্তু সেদিনের রঙটা ছিল কাঁচা, তাই সামান্য জল লাগতেই তা ধুয়ে গেল...

অতনু পুনরায় হেসে উঠল, এ হাসি সর্ব্বহারার উন্মাদ হাসি। মিত্রা স্থান-কাল-পাত্র ভুলে তাকে বেষ্টন করে ধরে বারে বারে শুধু বলতে থাকে, অতনুবাবু, চেয়ে দেখুন ত আমার দিকে। কি হ'ল আপনার? আমি বলছি, কিছু যায় নি আপনার—আপনার সব আছে...সব...

নিজেকে বেষ্টন-মুক্ত করে বরফের মত ঠাণ্ডা গলায় অতনু বলতে থাকে, কি আমার আছে আর কি আমার খোয়া গেছে, সে কি আর আমি জানি না? কিন্তু তুমি কেন অত ভয় পেয়েছ মিত্রা, আমি ত পাই নি? আমার কাছে আজকের সন্ধ্যাটি একটি স্মরণীয় সন্ধ্যা। মন বলছে, এখান থেকেই আমাকে সুরু করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্থ কারখানারও—নিজের জীবনেরও। আমার অহঙ্কারের শ্রেষ্ঠ স্তম্ভটা জ্বলে উঠতে পথ আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে।

অতনু আবার হেসে উঠল, হাসিটা যেন তার থামতেই চায় না।

মিত্রা ঠিক বুঝতে পারছে না এই মুহূর্ত্তে কি সে করবে। কি করা তার কর্ত্তব্য। অতনুর বর্ত্তমান অবস্থাকে সে ঠিক প্রকৃতিস্থ অবস্থা বলে ভাবতে পারছে না। মুখে সে যত কথাই বলুক, ঐ আগুনের শিখা যে তারও সর্ব্বাঙ্গ বেড়ে ধরেছে, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে মিত্রা নিজেও কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়েছে—উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। সে বারে বারে শুধু ঘর-বার করছে...

সিঁড়িতে দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা গেল। মিত্রা ছুটে এগিয়ে গেল। কেষ্ট আবার ফিরে এসেছে। চোখে-মুখে তার বিজয়-উল্লাস। মিত্রাকে সম্মুখে পেয়ে অনেকক্ষণ সে কথাই বলতে পারল না।

মিত্রা আকুল আগ্রহে জিজ্ঞেস করল, কি খবর কেষ্ট—অমন করে হাঁপাচ্ছ কেন?

কেষ্ট দম নিয়ে বলল, জান দিদিমণি, সে এক ভীষণ ব্যাপার হয়েছে। কারখানার মজুররা ক্ষেপে গিয়ে ঐ শিলাদিত্য মশাইকে আগুনে ফেলে দিয়েছে—

মিত্রা আর্ত্ত চীৎকার করে উঠল, কেষ্ট—

কেষ্ট নির্ব্বিকার ভাবে জবাব দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ—আপনাকে আমি মিথ্যে বলছি না দিদিমণি। ওরা দুটো বেশী পয়সা চেয়েছিল; কারখানাটা নষ্ট করতে চায় নি, কিন্তু শিলাদিত্যবাবু যে শুনলেন না, চুপি চুপি কারখানায় আগুন লাগিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন।

মিত্রা ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, তার পর ?

কেষ্ট বলে, ধরা পড়ে গেলেন। তার পরেই তাকে ঐ আগুনের মধ্যে···একটু থেমে সে পুনরায় বলতে থাকে, ডাক্তারবাবু বৌদি-রাণীকে নিয়ে আসছিলেন—কারখানায় আগুন দেখে ওখানেই নেমেছেন। সামান্যই ক্ষতি হয়েছে। আগুন প্রায় নিভে গেছে, এখনি তাঁরা এসে পড়বেন। আপনাকে তিনি খবরটা দিতে বললেন।

মিত্রা হঠাৎ যেন দুঃস্বপ্নের ঘোর থেকে জেগে উঠেছে, সে চঞ্চল কণ্ঠে বলল, এতক্ষণ এ কথা আমাকে বলনি কেন কেষ্ট ? তুমি খবরটা তোমার দাদাবাবুকে দাও গিয়ে—আমি ততক্ষণে তাঁদের এগিয়ে আনতে যাই।

মিত্রা কেষ্টর বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখ দিয়ে দ্রুত চলে যেতে যেতে একবার থমকে দাঁড়াল—মনে হ'ল, অতনু তাকে যেন পিছন থেকে বারে বারে ডাকছে, মিত্রা···মিত্রা···কিন্তু এ বাড়ীতে তার স্থান কোথায়···অধিকার কতটুকু—মিত্রার পায়ের গতি আরও দ্রুত হয়ে উঠল, ফিরে যাবার সহজ রাস্তা যখন তার জন্য নেই তখন দূরে সরে না গিয়ে উপায় কি···চলতে চলতে মিত্রা একবার অঞ্চলপ্রান্তে তার চোখ দুটো ঘষে নিল···

সমাপ্ত

কালীপ্রসন্ন সিংহ

শ্রীঅনিলকুমার আচার্য্য

অকালমৃত্যু জীবনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার গতিপথে ছেদ টানে। স্বাভাবিক আয়ু-পরিধির অনুকূল আবহাওয়ায় যে জীবন ফুলে-ফলে মঞ্জরিত হয়ে উঠার সম্ভাবনা রাখে, অকালমৃত্যু তার মূলে কুঠারাঘাত হানে। ফুল না ফুটতেই জীবন ধরণীতে লুটায়। কিন্তু যাঁরা অসাধারণ প্রতিভা ও কর্ম্মক্ষমতার অধিকারী, তাঁরা স্বল্পায়ু জীবনেও নিজ নিজ কীর্ত্তির ছাপ রেখে যান। চেটারটন, শেলী, কীটস, বাইরন, সত্যেন্দ্রনাথ এরূপ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।

কালীপ্রসন্নের এদের মত কবি-প্রতিভা ছিল না। জনসাধারণের নিকট তাঁর যেটুকু পরিচয়, তা হুতোম প্যাঁচার নক্সার লেখক ও সংস্কৃত মহাভারতের বাংলা অনুবাদের প্রকাশক হিসাবে। কিন্তু নিজের স্বল্পপরিসর জীবনে (মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে তিনি মারা যান) তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, সংবাদপত্র, নাটক প্রভৃতির উন্নতির জন্য যে চেষ্টা করে গেছেন, সে সম্বন্ধে আজকাল আমরা কতটুকু খবর রাখি ? অথচ এ কথা খুবই সত্য, যাঁদের অক্লান্ত ও আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং অর্থানুকূল্যের ফলে সে যুগে বঙ্গ সাহিত্যের দ্রুত অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল, কালীপ্রসন্ন ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

১৮৪০ সনে কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত সিংহ পরিবারে কালীপ্রসন্নের জন্ম হয়। পিতা নন্দরাম সিংহের তিনি ছিলেন একমাত্র সন্তান। মাত্র ছয় বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগের পর হরচন্দ্র ঘোষ নামক এক ভদ্রলোকের উপর কালীপ্রসন্নের দেখাশুনা ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পড়ে। কালীপ্রসন্ন ছেলেবেলায় হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করেন, কিন্তু ছাত্র হিসাবে সেখানে তাঁর কৃতিত্বের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। শেষে বাড়ীতে উইলিয়ম কাক প্যাটরিক নামক এক সাহেবের নিকট ইংরেজী এবং দুজন পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত ও বাংলা অধ্যয়ন করেন এবং তিনটি ভাষাতেই যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তবে তাঁর সমধিক টান ছিল বাংলা ভাষার প্রতি। নিজের বাল্যজীবন সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে হুতোম প্যাঁচার নক্সায় তিনি লিখেছেন, "ছেলেবেলা থেকেই আমাদের বাংলা ভাষার উপর বিলক্ষণ ভক্তি ছিল, শেখবার নিতান্ত অনিচ্ছা ছিল না।··· সংস্কৃত শেখাবার জন্য আমাদের একজন পণ্ডিত ছিলেন, তিনি আমাদের লেখাপড়া শেখাবার জন্যে বড় পরিশ্রম করতেন। ক্রমে আমরা চার বছরে মুগ্ধবোধ পার হলেম, মাঘের দুই পাত ও রঘুর তিন পাত পড়েই আমাদের জ্যাঠামোর সূত্র হ'ল। টিকি, ফোঁটা ও রাঙা বনাতওয়ালা টুলো ভট্টাচার্য্য দেখলেই তর্ক করতে যাই, ছোড়াগোছের ঐ রকম বেয়াড়া-বেশ দেখতে পেলেই তর্কে হারিয়ে টিকি কেটে নিই, কাগজে প্রস্তাব লিখি—পয়ার লিখতে চেষ্টা করি ও অন্যের লেখা প্রস্তাব থেকে চুরি করে আপনার বলে অহঙ্কার করি—সংস্কৃত কলেজ থেকে দূরে থেকেও ক্রমে আমরাও ঠিক একজন সংস্কৃত কলেজের ছোকরা হয়ে পড়লেম। গৌরব লাভেচ্ছা হিন্দুকুশ ও হিমালয় পর্ব্বত থেকেও উঁচু হয়ে উঠল।···ক্রমে কি উপায়ে আমাদের পাঁচজন চিনবে, সেই চেষ্টাই বলবতী হ'ল। তারই সার্থকতার জন্যই যেন আমরা বিদ্যোৎসাহী সাজলেম—গ্রন্থকার হয়ে পড়লেম—সম্পাদক হতে ইচ্ছে হ'ল—সভা করলেম, ব্রাহ্ম হলেম, তত্ত্ববোধিনী সভায় যাই—বিধবা বিয়ের দালালি করি ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি বিখ্যাত লোকদের উপাসনা করি—আন্তরিক ইচ্ছে, যে লোকে জানুক যে আমরাও ঐ দলের একজন ছোটখাট কেষ্ট বিষ্টুর মধ্যে ! হায় ! অল্প বয়সে এক-একবার অবিবেচনার দাস হয়ে আমরা যে সকল পাগলামো করেছি, এখন সেইগুলো স্মরণ হলে কান্না ও হাসি পায়।"

কালীপ্রসন্নের স্বল্পপরিসর জীবন অপূর্ব্ব কর্মনিষ্ঠার ইতিহাস। বস্তুতঃ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার, প্রসার ও সাহিত্যিকদের উৎসাহবিধানের উদ্দেশ্যে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম বিস্ময়ের উদ্রেক করে। মাত্র তের বৎসর বয়সে তিনি বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রতিষ্ঠা করেন। প্যারীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি মনীষীগণ এই সভার সভ্য ছিলেন। সভার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল—বাংলা সাহিত্যের চর্চা। তা ছাড়া বহু জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ ও কবিতা সে সভায় পাঠ করা হ'ত এবং সমসাময়িক বিখ্যাত দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতদের সভায় আহ্বান করা হত। সভার পক্ষ থেকে কালীপ্রসন্নের অর্থানুকূল্যে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হ'ত।

কালীপ্রসন্ন গুণগ্রাহী, বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যরসিক ছিলেন। চরিত্রের এই সব সহজাত বৈশিষ্ট্যের ফলে তিনি সেকালের সমস্ত কল্যাণকর প্রচেষ্টার সহিত যুক্ত হয়ে সহজেই সকলের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনার জন্য মাইকেল মধুসূদন দত্তকে দেশবাসীর তরফ থেকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে কালীপ্রসন্ন বিদ্যোৎসাহিনী সভার মারফত এক জনসভার আয়োজন করেন। সে সভায় স্বরচিত মানপত্রে তিনি বলেছিলেন, "আপনি বাংলা ভাষায় যে অনুত্তম অশ্রুতপূর্ব্ব অমিত্রাক্ষর কবিতা লিখিয়াছেন তাহা সহৃদয় সমাজে অতীব আদৃত হইয়াছে, এমনকি আমরা পূর্ব্বে স্বপ্নেও এরূপ বিবেচনা করি নাই যে, কালে বাংলা ভাষায় এতাদৃশ কবিতা আবির্ভূত হইয়া বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। আপনি বাংলা ভাষার আদি কবি বলিয়া পরিগণিত হইলেন, আপনি বাংলা ভাষাকে অনুত্তম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিলেন, আপনা হইতে একটি নূতন সাহিত্য বাংলা ভাষায় আবিষ্কৃত হইল, তজ্জন্য আমরা আপনাকে সহস্র ধন্যবাদের সহিত বিদ্যোৎসাহি সভা সংস্থাপক প্রদত্ত রৌপ্যময় পাত্র প্রদান করিতেছি। আপনি যে, অলোক-সামান্য কার্য্য করিয়াছেন তৎপক্ষে এই উপহার অতীব সামান্য। পৃথিবীমণ্ডলে যতদিন যেখানে বাংলা ভাষা প্রচলিত থাকিবেক তদ্দেশবাসী জনগণকে চিরজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিতে হইবেক, বঙ্গবাসিগণ অনেকে এক্ষণেও আপনার সম্পূর্ণ মূল্য বিবেচনা করিতে পারেন নাই কিন্তু যখন তাঁহারা সমুচিতরূপে আপনার অলৌকিক কার্য্য বিবেচনায় সক্ষম হইবেন, তখন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা-প্রকাশে ত্রুটি করিবেন না। আপনি উত্তরোত্তর বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে আরও যত্নবান হউন। আপনা কর্ত্তৃক যেন ভাবী বঙ্গসন্তানগণ নিজ দুঃখিনী জননীর অবিরল বিগলিত অশ্রুজল মার্জ্জনে সক্ষম হন। তাঁহাদিগের দ্বারা যেন বঙ্গভাষাকে আর ইংরেজী ভাষা সপত্নীর পদাবনত হইয়া কালাতিপাত করিতে না হয়...।"

উক্ত মানপত্র হতে কালীপ্রসন্নের দূরদৃষ্টি ও সাহিত্যরসিকতার পরিচয় মিলে। সমসাময়িক সাহিত্যিক-সমালোচক মহলে মেঘনাদবধ কাব্যের বিরূপ সমালোচনা হয়েছিল—এর ইঙ্গিত উক্ত মানপত্রেই আছে। বিচার-বিভ্রমের সেই আবিল মুহূর্তে কালীপ্রসন্ন মেঘনাদ-বধ কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব ও বাংলা কবিতার ছন্দোমুক্তির তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করে মধুসূদনকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, এ তাঁর কম দূরদর্শিতা, অন্তর্দৃষ্টি ও রসজ্ঞানের পরিচয় নয়। এই সহজাত সাহিত্যবোধ, বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ, এর প্রসারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও অকাতর অর্থব্যয় এবং বাংলা গদ্যরীতিতে কথাভাষার সাবলীল প্রয়োগ বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে কালীপ্রসন্নের অমরত্বের দাবী রাখে।

বাংলা কবিতাকে পয়ার ও ত্রিপদীর শৃঙ্খল হতে মুক্তি দিয়ে মধুসূদন যে বাংলা কাব্যের গতিপথ মসৃণ ও তার ভবিষ্যৎ অপূর্ব্ব সম্ভাবনাময় করে তুললেন, কালীপ্রসন্ন তা বুঝেছিলেন। তাই তিনি একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "লোকে অপার ক্লেশ স্বীকার করিয়া জলধিজল হইতে রত্ন উদ্ধারপূর্ব্বক বহুমানে অলঙ্কারে সন্নিবেশিত করে। আমরা বিনাক্লেশে গৃহমধ্যে প্রার্থনাধিক রত্নলাভে কৃতার্থ হইয়াছি।" মাইকেলের অনুসরণে হুতোম প্যাঁচার নক্সায় তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দে দুটি কবিতা লিখেন। তন্মধ্যে একটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। কবিতাটি হতে কালী-প্রসন্নের কবি-ক্ষমতার পরিচয় মিলবে:

'হে সজ্জন! স্বভাবের সুনির্মল পটে,
রহস্যরসের রঙ্গে
চিত্রিনু চরিত্র-দেবী সরস্বতী বরে।
কৃপাচক্ষে হের একবার, শেষে
বিবেচনা মতে
যার যা অধিক আছে, তিরস্কার
কিম্বা পুরস্কার
দিও তাহা মোরে। বহু মানে লব
শির পাতি।"

এই প্রসঙ্গে হুতোম প্যাঁচার নক্সা সম্বন্ধে দু'চারটি কথা বলা দরকার। কি সে যুগের সমাজচিত্র হিসাবে, কি শ্লেষাত্মক রচনার নমুনা হিসাবে, কি বাংলা গদ্যরীতিতে নূতন ধারার সাক্ষ্য হিসাবে এই পুস্তকটি আমাদের বিশেষ মনোযোগের অপেক্ষা রাখে। বাংলা গদ্যের সেই আদি যুগে সংস্কৃতপ্রধান গদ্যরীতিকে উপেক্ষা করে যেরূপ আশ্চর্য সরলতা ও প্রাঞ্জলতার সহিত তিনি কথা ভাষার প্রয়োগ করেছিলেন, তাতে শুধু তাঁর সাহসেরই পরিচয় মিলে না, এ তাঁর অপূর্ব্ব দূরদর্শিতারও পরিচায়ক। টেকচাঁদ ঠাকুর ও হুতোম বাংলা গদ্যরীতিতে যে নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করলেন, তার ফলে বঙ্গ ভাষা অসামান্য গতিবেগ লাভ করল। সংস্কৃতপ্রধান গদ্যরীতির নাগপাশ থেকে ভাষাজননীর মুক্তিবিধান কালীপ্রসন্নের এক মহৎ কীর্ত্তি।

হুতোম প্যাঁচার নক্সা ছাড়া কালীপ্রসন্ন কালিদাসের 'বিক্রমোর্ব্বশী' ও 'মালতীমাধব' ভবভূতির নাটকের অনুবাদ করেন

এবং 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটক রচনা করেন। তা ছাড়া তিনি পুরাণসংগ্রহ নাম দিয়ে পুরাণসমূহের এবং শ্রীমদভাগবদগীতারও সটীক অনুবাদ করেছিলেন। 'বঙ্গেশ বিজয়' নামক অপর একটি পুস্তকও (অসম্পূর্ণ ও অপ্রকাশিত) মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি রচনা করেন।

দেশের সমস্ত কল্যাণকর অনুষ্ঠানের সহিত কালীপ্রসন্ন ও তৎ-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভার যোগ ছিল—একথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নীলকরদের নির্মম অত্যাচারের কাহিনী লোকের চক্ষের সম্মুখে তুলে ধরল। পুস্তকটির ইংরেজী অনুবাদ প্রচার করায় পাদ্রি লঙ সাহেবের এক মাস কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা হয়। কালীপ্রসন্ন আদালতে গিয়ে স্বয়ং জরিমানার টাকা পরিশোধ করেন এবং লঙের কারামুক্তির পর বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে তাঁর সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করেন। তা ছাড়া বহু অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন, দুঃস্থ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত অর্থসাহায্য, সাহিত্যিকগণকে বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তক রচনায় উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে পুরস্কারের ব্যবস্থা প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্যের দ্বারা তিনি শিক্ষা বিস্তারের পথ সুগম করে তুলেছিলেন। সে সময়ে কলকাতায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের অতিশয় অভাব ছিল। এ অভাবের প্রতিকারকল্পে তিনি বিলাত থেকে দুই হাজার টাকা ব্যয়ে চারিটি ধারাযন্ত্র আনাবার ব্যবস্থা করেন। ১৮৬২ সনে এক দুর্ভিক্ষ তহবিলেও তিনি হাজার টাকা দান করেন।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুন 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর পত্রিকাটি বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। হরিশ্চন্দ্রের পরিবারকে সাহায্য ও পত্রিকাটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে তিনি পাঁচ হাজার টাকা ব্যয়ে পত্রিকা ও প্রেসের স্বত্ব ক্রয় করেন। কালীপ্রসন্ন হরিশ্চন্দ্রের স্বদেশপ্রাণতার অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর তাই তিনি এক পুস্তিকা রচনা করে হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করেন এবং 'হরিশ স্মৃতি ভাণ্ডারে' স্বয়ং পাঁচ শত টাকা দান করেন। হরিশ স্মৃতি মন্দির স্থাপনার্থ তিনি বাদুড়বাগানে দুই বিঘা জমি দিবার প্রস্তাবও করেছিলেন। কিন্তু 'স্মৃতি সমিতির' অনগ্রসরতার দরুন সে প্রস্তাব শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হয় নি।

স্যার মর্ডান্ট ওয়েলস সুপ্রিম কোর্টের বিচারাসন থেকে প্রায়ই বলতেন—বাঙালী জাতি মিথ্যাবাদী ও প্রতারক। নীলকর মকদ্দমায়ও তিনি অনুরূপ উক্তিই করেছিলেন। সমগ্র জাতিকে অপমানিত করার বিরুদ্ধে ১৮৬১ সনের ২৬শে আগষ্ট রাজা রাধাকান্তদেবের বাড়ীতে দেশীয় নেতৃবর্গের যে সভা হয়, কালীপ্রসন্ন তাতে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ আন্দোলনেরও তিনি বিশিষ্ট সমর্থক ছিলেন এবং যে সব ব্যক্তি বিধবা বিবাহে সম্মতিসূচক অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষর করে বিবাহের জন্য প্রস্তুত হতেন, তাঁদের প্রত্যেকের জন্য তিনি হাজার টাকা পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছিলেন। বহুমুখী কর্ম্মপ্রবণতা ও স্বভাবের ঔদার্য্যের জন্য বিদ্যাসাগর কালীপ্রসন্নকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন কালীপ্রসন্ন যখন পণ্ডিতবর্গের সাহায্যে মহাভারতের অনুবাদ আরম্ভ করেন বিদ্যাসাগর তাঁকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে স্বলিখিত মহাভারতের কথার রচনা ও প্রকাশ বন্ধ করে দেন। এই সব নানাবিধ জনহিতকর কার্য্য ছাড়াও তিনি বাংলার নাট্য সাহিত্য ও নাট্যাভিনয়ের উন্নতিকল্পে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করেন। সে রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'বেণীসংহার' ও কালীপ্রসন্নের 'বিক্রমোর্ব্বশী', 'সাবিত্রী সত্যবান' প্রভৃতি নাটক অভিনীত হয়। তিনি নিজেও একজন সু-অভিনেতা ছিলেন।

এর পর কালীপ্রসন্ন বিদ্যোৎসাহিনী নামে একটি মাসিক পত্রিকা এবং সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা নামক ভূবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, ভূগোল ও শিল্পসাহিত্য-আলোচনা বিষয়ক অপর একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকা দুইটি সেকালের সাহিত্যিক ও পাঠক-মহলে বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবিধার্থ সংগ্রহ এবং পরিদর্শক নামক একটি দৈনিক পত্রিকাও কিছুকাল তিনি সম্পাদনা করেন। ইংরেজী ভাষায় আইন গ্রন্থও তিনি রচনা করেছিলেন। তা ছাড়া নিজ ব্যয়ে বাংলা মুদ্রাযন্ত্র কিনে ছাপাখানা ও বাংলা পত্রপত্রিকার বিস্তারকল্পে তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টার তুলনা মিলে না। মাত্র ত্রিশ বৎসর তিনি বেঁচে ছিলেন। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য, রঙ্গালয়ের উন্নতির জন্য, সমাজ সংস্কারের জন্য এবং শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য তিনি যেরূপ অক্লান্ত ভাবে অর্থ ও পরিশ্রম দিয়ে দেশের সেবা করে গেছেন, তা বাস্তবিকই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। অক্লান্ত কর্ম্মসাধনা, উদারপ্রাণতা, বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি অপরিসীম নিষ্ঠা, সমাজ-হিতৈষণা ও পরার্থপরতার জন্য তিনি সেকালে মহাত্মা উপাধি লাভ করেছিলেন। দুঃখের বিষয়, দেশ ও দশের সেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ, সাহিত্য-রসিক ও সাহিত্যিক এমন একজন লোকের কথা আজ আমরা ভুলতে বসেছি!



বুড়ো শিবের গাজন আর টেঁপী

শ্রীসন্ধ্যা রায়

বুড়ো শিবের মেলা বসেছে এক্তেশ্বরে। মানুষের চীৎকার, গাড়ী-ঘোড়ার আনাগোনা আর ভক্তদের ঢাক-ঢোলের বাদ্য, আর 'এক্তেশ্বরনাথ মণি মহাদেব' 'শিবশম্ভুনাথ মণি মহাদেব' এসব মিলে এক্তেশ্বরের আকাশ, বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছে। মানুষের পায়ের মেঠো ধুলো আর ট্রাকবাসের লালধুলো দুটো মিলে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে একেবারে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় কালো একটা মেঘ জমেছে দক্ষিণ দিগন্তে।

যুগ যুগ ধরে মেলা বসছে এক্তেশ্বরে। মাত্র একটি দিনের মেলা। চৈত্র-সংক্রান্তির দিন দুপুরের দিকে শেষ হয় মেলা আর সুরু হয় তার আগের দিন দুপুরের দিকে। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মেলা, তবুও আশে-পাশের গ্রামবাসীরা এই দিনটির জন্য আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করে। শেষ হয় একটি বছর, আবার তারা দিন গোণে পরের বছরের মেলার। এমনই ভাবে চলে তাদের প্রতীক্ষা, বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ। বুড়ো শিবের বয়স কেউ জানে না। কেউ বলতেও পারে না। টেঁপীও জানে না, তার বাবাও না, আবার তার বাবার বাবাও না। বুড়ো শিবের বয়সের কোন হিসেব-নিকেশ নেই।

বাঁকুড়া শহর থেকে সোজা একটা লাল কাঁকরে এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা চলে গেছে বিষ্ণুপুর হয়ে আরও পূবে। ঐ রাস্তাই ভাদুলের পাড়ায় এসে চার ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, সোজা একটা চলে গেছে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর, বাঁদিকেরটা ভাদুল গাঁয়ের মধ্যে আর ডান দিকেরটা এক্তেশ্বর।

হুস করে একটা বাস পেরিয়ে গেল এক্তেশ্বরের দিকে, লোকে ঠাসা। শহর থেকে লোক বোঝাই করে আসছে—আবার ফাঁকা ফিরে যাচ্ছে আরও লোক আনতে। জনসমুদ্র এখন একমুখী। সবাই চলেছে এক্তেশ্বরের দিকে, সবারই লক্ষ্য বুড়ো শিব। মানুষ, বাস-ট্রাক আর রিক্সার মিছিল, চলেছে আপন আপন ছন্দে, গতিতে।

তাল পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে সেই দিকে চেয়ে থাকে টেঁপী।

জাগ্রত শিব এক্তেশ্বরের। ভক্তের ডাকে সাড়া দেয় বুড়ো শিব, মনস্কামনা পূর্ণ করে ভক্তের। হাজার রকমের ভক্ত ধর্ণা দেয় শিবের মন্দিরে। তাদের কেউ চায় অর্থ বৈভব, কেউ চায় মান-যশ, কেউ চায় রোগমুক্তি আবার কেউ বা সত্যিকার শান্তি। কেউ বা বিল্বদল আর চিনির বাতাসা দিয়ে নৈবেদ্য সাজায়, আবার কেউ বা দেয় সোনার টিকলী আর এক মণ দুধের ভোগ, আবার কেউ বা অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি, সবেরই রকম-ফের।

পাপ খণ্ডন করতে আসে অনেকেই, সারাটা বছরের জমান পুঞ্জীভূত পাপ তারা খণ্ডন করতে চায় বৎসরের শেষান্তে···একটি দিনে। তারা জীবন্ত শিবের অন্নে কাঁকর মিশিয়ে, জীবন্ত প্রাণময় শিবকে গৃহহীন ভিখারী সাজিয়ে পাথরের জড়-স্থবির শিবের মাথায় ঝুনো নারকেল ভেঙে জল দেয়, খাঁটি দুধ দিয়ে স্নান করায় শিব-লিঙ্গকে। শ্বেত-মারবেল পাথরে বেদী বাঁধিয়ে দেয়। নাম খোদাই করে বড় বড় অক্ষরে। সোনাদানা চড়ায় শিবের সর্বাঙ্গে, জলসত্র খোলে মেলার মধ্যে। হায়রে দুনিয়া! বাপ-মাকে নিরন্ন রেখে তাদের মৃত্যুর পর বৃষোৎসর্গ করা যেন।

এর আগের বছরও মেলা দেখেছে টেঁপী। এ বছর মা বেঁকে বসেছেন, "সোমত্ত আইবুড়ো মেয়ে মেলায় যাওয়া হবে না।" ষোল পেরিয়ে সতেরোয় পড়েছে টেঁপী মাঘে। বাড়বাড়ন্ত গড়ন তার, তা সে কি করবে? ঐ ত বিশ্বাসদের টুনি, বোসেদের বিন্দে তার চেয়ে দু'এক বছরের বড় বৈ কম না, তাদের গড়নই আলাদা। চিমসে আমচুরের মত সব। কেউ দেখলে বলবেই না তাদের এত বয়েস,আর তারাও বেধে-ঢেকে বয়েস বলে তাই। যেন দু'জনেই টেঁপীর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। তারা এখনও দু'চার বছর দেখবে মেলা, আর টেঁপী? কান্না পায় টেঁপীর। ভাবে সেও কেন ওদের মত শুটকী হয়ে জন্মায় নি, তা হলে ত আর বছরের সাধ এমন একটা মেলা দেখা থেকে বাদ পড়ত না সে। মা ত বলেই খালাস, "তোর সব জিনিস এসে যাবে টেঁপী।" হেঁ, এসে যাবে বললেই এসে গেল আর কি? বাবার কোন পছন্দ আছে নাকি? কত রকমারী মাথা-বাঁধা ফিতা উঠেছে আজকাল, তা বাবা জানে, না দেখেছে? কিনে আনবে হয় ত সেই ঠাকুর-মার আমলের কালো কয়েক হাত বাজে মাথা-বাঁধা দড়ি। ধোৎ! ও সব নিজের জিনিস নিজে কেনাই ভালো, পরের পছন্দ আর নিজের পছন্দ এক হয় নাকি কখনও?

মায়ের স্বভাবটাই এই রকম। বরাবর ভাল কাজে বাগড়া লাগানই মায়ের কাজ। কেন, একটা দিনের মেলা, তা কিছুক্ষণ যদি টেঁপী যেতই বাবা কিম্বা দাদার সঙ্গে, কি এমন ভাগবতটা অশুদ্ধ হ'ত শুনি? সোমত্ত মেয়ে? সোমত্ত মেয়েরা বুঝি রাস্তায় বেরোবে না? ঘরের কোণে বসে থাকবে চুপ করে? কেন, তারা কি বৈকুণ্ঠ ময়রার দোকানের রসগোল্লা নাকি, যে, রাস্তার লোকে তুলেই কুপ করে মুখে পুরবে? তবে হেঁ, পুরুষ জাতটার চাউনিটাই যেন কেমন কেমন। কেমন যেন সব হেংলা চাউনি। হাঁ করে যেন গিলবে মানুষটা সুদ্ধোই। এমন ভাবে বেহায়াগুলো

টে'পীর দিকে চায় যে, লজ্জায় মরে যায় টে'পী। কেন, আর কি কিছু দেখবার নেই নাকি দুনিয়ায়? গাড়ী-ঘোড়া দেখ, গাছপালা দেখ, আকাশের রঙ দেখ,তা না, সব ছেড়ে তাকাবে টে'পীর দিকে। আগে কিন্তু এমনটা ছিল না। এটা সুরু হয়েছে আজ বছর তিনেক হ'ল। লোকেরই বা দোষ কি? টে'পী নিজেই নিজেকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছে। পূজোয় কেনা ব্লাউজ, বডিজ আজও সব ছোট মনে হচ্ছে বুকের দিকে। মাকে বলতে পারে না লজ্জায়, বৌদি ঠাট্টা করে মুখ টিপে টিপে হাসে। ঠাট্টা করবে নাই বা কেন বৌদি, নিজেও শুটকীদের দলেই ত!

আগের বছরেও হয়ত বা মেলা দেখা হ'ত না টে'পীর। মা ত এ বছরের মত বলেই দিয়েছিল, যাওয়া হবে না তার। এক্কেশ্বরের বকুলফুলের মা নিয়ে গিয়েছিল টে'পীকে নিমন্ত্রণ করে—মেলা দেখতে। বকুলফুলও শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছিল। বছর দুয়েক হ'ল বিয়ে হয়েছে বকুলফুলের। সেবারেও কেনাকাটা অবশ্য অনেক কিছুই করেছিল টে'পী—তবে মেলা যাকে দেখা বলে সে ভাবে সে দেখতে পায়নি। পরের সঙ্গে কি মেলা দেখা যায় কখনও, না তা সম্ভব? বকুলফুলের নামটা খেয়াল হতেই টে'পীর চোখের পাতা দু'টো ভিজে উঠে অশ্রুতে। তার বকুলফুল আজ আর নেই, মারা গেছে সে। মাস ছ'য়েক হ'ল বাপের বাড়ীতে সে এসেছিল ছেলে হতে। কিন্তু বাবা এক্কেশ্বর তাকে বাঁচাতে পারলেন না, তার ছেলেকেও না। এক্কেশ্বরের শিবের স্নানজল আর প্রসাদী ফুল-বেলপাতা কিছুই ধরে রাখতে পারলে না তার বকুলফুলকে। শহর থেকে ডাক্তার আসবার আগেই মারা গেল তার বকুলফুল। পাপ! পাপ আর পুণ্য মানে টে'পী। বকুলফুল মারা গেল তার বাপ-মায়ের পাপে। এত বড় পাপ কি কখনও সহ্য করতে পারে বুড়ো শিব? টে'পী নিজের চোখে দেখেছে, ঠাকুরের মাথায় চড়ে আবার সেই প্রসাদী ফিরে আসছে বকুলফুলদের দোকানে। সেখানে আবার বিক্রি হচ্ছে সব নূতন পূজার জন্যে। বকুলফুলের বাবা পূজা করে মন্দিরে—আর বাড়ীতে দোকান চালায় তার মা। এ আর এক দুনিয়া!

মেলা দেখেছিল টে'পী তার আগের বছরটায়। মেলায় গিয়েছিল ভজাদার সঙ্গে। পনের বছরের মেয়ে টে'পী—আর ভজাদা বিশ কি বাইশ। বিকালে বেরিয়ে বাড়ী ফিরেছিল সেই রাত বারটায়। ছোটখাটো নানান জিনিসে ভরে গিয়েছিল তার দু'হাত, ভজাদার হাতও খালি ছিল না একটু।

মেলা! যেন বিরাট জনসমুদ্র একটা, তার কূলকিনারা নেই কোন, কেবল মানুষ—মানুষ আর মানুষ। ছোট-বড়, বুড়ো-যোয়ান শিশু। দোকান, দোকান আর দোকান!

গাইগয়লার পাশ থেকেই দোকানের সুরু। সারি সারি দোকান বসেছে রাস্তার দু'ধারে,রকমারি দোকান, খাবারের দোকান, মাদুর, তালপাখা, মনোহারী জিনিস, লোহার বঁটি, হাতা, আরও নানান টুকিটাকী। খেলনার দোকান। একটা দম-দেওয়া ঘোড়া পা উঠাচ্ছে-নামাচ্ছে। রেল-ইঞ্জিন ছুটছে, কত বড় বড় ডল-পুতুল গাটাপার্চার, চমৎকার ভাবে সাজান। সাড়ে ছ'আনার দোকানই বসেছে দু'দশটা। মাথার ফিতার দোকানে এসে দাঁড়ায় টে'পী। ফিতা কেনে পছন্দমত, কপালের টিপ কেনে কয়েকটা, মাথার কাঁটা কেনে।

ভজাদা তাকে একটা মাথায়-গোঁজা চিরুণী কিনে দেয়। সোনার মত অক্ষরে লেখা 'ভালবাসা', চিরুণীটা হাতে নিয়ে নাড়া-চাড়া করে টে'পী, ভারী সুন্দর চিরুণীটা, খুবই পছন্দ হয়েছে তার। আর হবে নাই বা কেন—পুরো একটা টাকা দাম নেয় চিরুণীটার। চানাচুর বিক্রি হচ্ছে, খুব ঘন্টি নাড়ছে দোকানদার। 'চনা বানায়া মজাদার।' খুব বিক্রি হচ্ছে তার।

চুড়ির দোকান বসেছে পুরো এক সারি। দশ-বারটা দোকান হবে, রকমারি সব চুড়ি, চোখ ঝলসে যায় ওদিকে তাকালে। হ্যাসাক আর ডেলাইট জ্বলতে সুরু হয়েছে, অনেকে জ্বেলেছে কার্বাইড বাতি। রকমারি দোকান আর রকমারি সব বাতি। সারাটা প্রান্তর যেন এক মুহূর্তে ইন্দ্রপুরীর মত হয়ে যায়। চুড়ির দোকানে এসে দাঁড়ায় টে'পী। শাখের চুড়ির দর করে। তার পুরুষ্ট গোলগাল হাত দুটো তুলে ধরে দোকানদারের দিকে। দোকানদার একবার মুখ তুলে তাকায় হাতের মালিকানীকে দেখতে। তার চোখে চোখ পড়ে টে'পীর, সারা মুখটা লাল হয়ে ওঠে তার, মুখটা নীচে নামিয়ে শাখা পরে। দাম মিটিয়ে দেয় ভজহরি, পুরা পাঁচসিকা। একপাশে শাখআলু, পাট শাক, কেঁদপাকা, কচিশশা, কুলকুটো বিক্রি হচ্ছে। একটা মনোহারী দোকানের দিকে এগিয়ে যায় টে'পী। বড় দোকানগুলো সব গলাকাটা। চোখ বুজে দাম বলে সব, নখ-পালিস আর একটা কুমকুম কেনে সে। নাগরদোলা আর চড়ক বসেছে নীচের দিকের মাঠে, খুব ঘুরছে চড়ক আর নাগরদোলা, ছেলে ছোকরাদের ভিড় জমেছে বেশ। দু'আনা পয়সা দিয়ে তারা দু'জনে চড়কে চাপে, দু'জনে একটা বাক্সের মধ্যেই। টে'পী আর ভজহরি, বনবন করে ঘুরছে বাক্সগুলো—মাথা গুলিয়ে যায় টে'পীর, ভয়ে জড়িয়ে ধরে ভজহরিকে। ভজহরি আনন্দ পায়, হাসে, চড়ক থেকে নেমে তারা সোজা একটা খাবারের দোকানে গিয়ে ঢোকে, পেটপুরে খায় দু'জনে, খিদে পেয়েছিল খুবই। পাশে একটা লোক কাঠের বাক্সে চানাচুর আর গুপচুপ বিক্রী করছে। কেরোসিনের একটা ডিবরী বাতি জ্বলছে তার সামনে, ধোঁওয়া উঠছে খুব, একটা ছেলে গুপচুপ খাচ্ছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। কুপকুপ করে মুখে চালাচ্ছে একটার পর একটা। একটা গোলগাল কুকুর পাতা চাটছে আপন মনে।

আরও অনেক কেনাকাটা করে তারা দু'জনেই মেলার চারদিকটা ঘোরে-ফেরে। জরি-দেওয়া পাখা কেনে কয়েকটা দেখে-শুনে। তার পর পাথর বাটি কেনার জন্য এগিয়ে যায় বড় শিমুল গাছটার দিকে, রাস্তার একটা পাশ জুড়ে সারি সারি গরুর গাড়ী দাঁড়িয়ে। তার মধ্যে বিক্রী হচ্ছে পাথরের বাটী, খুরি প্লেট, শিল

নোড়া। দরদস্তুর করে কয়েকটা বাটী আর প্লেট কেনে টেঁপী। আমের অম্বল খেতে এগুলো বেশ, আমের অম্বলের কথা মনে হতেই জিভে জল সরে তার, শুধু টেঁপীর কেন, কত লোকেরই ত এমন হয়। কেন এমন হয় কে জানে? আচ্ছা, বেটাছেলেদেরও কি হয় এমনই? লজ্জায় সে জিজ্ঞেস করতে পারে না ভজহরিকে। একটা পকেটমার ধরা পড়েছে কার পকেট কাটতে গিয়ে, রাম-ধোলাই হচ্ছে মেলার লোকগুলোর কাছে, নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে গলগল করে, এখনও হাত পাকেনি বেচারীর।

কেনাকাটার কথা মনে মনে ভাবে টেঁপী। নিজের ত প্রায় সবই কেনা হয়ে গেছে, এবারে ছোট ভাইপোটার জন্যে একটা কাগজের নীল-লাল ফিরফিরি, বেস্ত বাজনা আর ঝুমঝুমি—ব্যাস, তা হলেই ত হয়ে গেল একরকম। আচ্ছা বৌদির জন্য একটা কিছু কিনলে কেমন হয়? একটা পাউডার কিম্বা স্নো? একটা স্নোই কিনে ফেলে টেঁপী পুরো চোদ্দ আনা দিয়ে, সাড়ে ছ'আনার দোকানের সামনে এগিয়ে যায় সে। বেজায় ভিড় সেখানে, যত রাজ্যের প্লাসটিকের জিনিসপত্র। আয়না, তরল আলতা, পেতলের ধূপদানি, বড় চামচ। একটা ধূপদানি কেনে মায়ের জন্যে। অনেক-গুলি ধূপ দেওয়া যায় এক সঙ্গে। পূজা করার সখ আছে মায়ের ষোল আনা অথচ একটা ধূপদানি কিনবে না, হাড়কিপ্টে সব, ধূপ দিতে হলেই মাটি আন, না হয় গোবর খোঁজ। যত সব!

পরিতৃপ্তির একটা নিশ্বাস ফেলে টেঁপী, ভজহরিকে বলে: চল, এবার ঠাকুর দেখব। মন্দিরের রাস্তা ধরে এগিয়ে যায় তারা। পুলিস আর ভলেন্টিয়ারে রাস্তা পাহারা দিচ্ছে, মাঝে দড়ি বেঁধে রাস্তাটাকে দু'ভাগ করেছে। একটা ভিতরে যাবার আর একটা বাইরে আসবার। ভিতরে যাবার রাস্তাটা ধরে এগিয়ে চলে দু'জনে। কার যেন ছেলে হারিয়েছে, মাইকে বলছে তাই। "নাম থাকহরি, বয়েস দশ বছর, পরণে কালো হাফ প্যান্ট, ডোরা কাটা হাফ সার্ট। ওর বাবা সত্যকিঙ্কর রায় অপেক্ষা করছেন আমাদের ক্যাম্পে। ভলেন্টিয়ার ভাই-বোনেরা লক্ষ্য রাখ।" একটা চাঞ্চল্য জাগে যেন ভলেন্টিয়ারদের মধ্যে, বাচ্চা ছেলে দেখলেই তারা তাকায় তার জামা আর প্যান্টের দিকে। মন্দিরের কাছাকাছি চলে আসে তারা। ঢেউয়ে ঢেউয়ে যেন এগিয়ে যাচ্ছে। দাঁড়াবার উপায় নেই কারুর, একটু দাঁড়িয়েছ ত পিছনের ঢেউ এসে মারবে পিঠে ছপাৎ করে। তামার গোটাকয়েক পয়সা ছুড়ে ছুড়ে দেয় টেঁপী ভিখারীগুলোকে, সব ক'জনেই ব্যাধিগ্রস্ত, কুষ্ঠ ব্যাধি হয়েছে তাদের, একটা বিশ্রী গন্ধ বেরোচ্ছে তাদের গা থেকে।

বড় ফটকটা দিয়ে ভিতরে আসে তারা, ফটকের বাহিরে কত কারুকার্য্য। ভিতরে ঢুকে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে টেঁপী। ভিতরে মানুষের ভিড় কিছুটা কম। ছোট ছোট মন্দিরগুলোকে পাশে রেখে এগিয়ে যায় টেঁপী বড় মন্দিরটার দিকে। মন্দির-চত্বরে তখন পালাকীর্ত্তন সুরু হয়েছে, মাথুর হচ্ছে। কীর্ত্তনিয়া এসেছেন মানভূমের কি একটা গাঁ থেকে, বেশ গলা ভদ্রলোকের, যেমন গলা তেমনই তাঁর দেবকান্তি চেহারা। সামনের থালায় একটা দু'আনি রেখে দণ্ডবত করে টেঁপী। তার দেখাদেখি ভজহরিও। মাথায় চামরের স্পর্শ অনুভব করে টেঁপি। বেশ সুড়সুড়ি লাগে তার। থালায় বেশ পয়সা পড়েছে।

মন্দিরের সামনে টাঙান পিতলের বড় বড় ঘণ্টাগুলো বাজাতে সাধ যায় টেঁপীর, সাধ হলেই কি সব জিনিস হয়? না লাফিয়ে নাগালই পাবে না সে। ভজহরির সামনে লাফালাফি করতে তার কেমন বাধ বাধ ঠেকে। ভজহরি ঘণ্টা বাজায়, বেশ মিষ্টি আওয়াজ—টুং টাং।

ভজহরি আর টেঁপী দু'জনেই মন্দিরের দেওয়ালে নাম লেখে কাঠকয়লা দিয়ে। সারা দেওয়াল নামে নামে ছেয়ে গেছে একেবারে। তিলধারণের জায়গাও নেই কোথাও। পূজারীর নামাবলীর মত যেন দেখাচ্ছে মন্দিরের দেওয়াল। ভজহরির নামের নীচেই নাম লেখে টেঁপী ভাল ভাবে, ধরে ধরে।

তামাসা করে ভজহরি: 'বিশ্রী নাম, আজকালকার দিনে টেঁপী, খেঁদী, পেঁচী, এসব নাম অচল। ঠাকুরমা-দিদিমাদের যুগে ওসব চলত, তোমার নাম হবে রাণী, কি, ঠিক ত?

টেঁপীর নিজেরও এ নামটা পছন্দ নয়, কিন্তু সে করে কি? নিজের নাম ত নিজে বদলান যায় না। রাণী! কয়েকবার মনে মনে আওড়ায় নামটা, সুন্দর! খুসীতে ভরে উঠে টেঁপীর মন, সম্মতিসূচক মাথা হেলায়।

পূজারীকে কয়েক আনা খুচরা পয়সা দেয় ভজহরি পূজার জন্যে। তারা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামে শিবলিঙ্গ দর্শনের জন্য। চমৎকার একটি পরিবেশ, ধূপ-ধুনা-চন্দন আর নানান ফুলের গন্ধে মন্দির মাতোয়ারা যেন, ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে এক পাশে টিমটিম করে। গেরুয়া বস্ত্রে সজ্জিত ভক্তেরা পূজার উপচার নিয়ে ঘোরাফেরা করছে। ধ্বনি উঠছে 'হর হর ব্যোম ব্যোম'। ঠাকুরের মানসিক শোধ দিতে যারা এসেছে তারা ধর্ণা দিয়ে পড়ে আছে এখানে-সেখানে, বাবার স্বপ্ন আর আশীর্ব্বাদ পাবে,তবে তারা উঠবে, জাগ্রত শিব এক্তেশ্বরের।

পূজারী মন্ত্র পড়ছে। আজ তাদের ফুরসৎ নেই কারুরই। শুদ্ধ আর পবিত্র পরিবেশে মাথা নিজেই নুয়ে আসে টেঁপীর। প্রণাম করে টেঁপী আর ভজহরিও। শ্বেত চন্দনের বাটি থেকে চন্দন নিয়ে ভজহরির কপালে দেয় টেঁপী, ভজহরি দেয় টেঁপীর কপালে।

—কি চাইলে ঠাকুরের কাছে? কৌতুক করে টেঁপী।

—তোমাকে। সোজা জবাব দেয় ভজহরি।

—দুষ্ট!

মন্দিরের চূড়ার দিকে তাকায় টেঁপী, বাপরে, কত উঁচু। কিম্বদন্তী আছে, এত বড় মন্দির নাকি একই রাত্রে তৈরী হয়েছিল। ভোরের কোকিল ডাকার সঙ্গে সঙ্গে কাজ বন্ধ হয়ে যায় মন্দিরের। অসমাপ্ত আছে তাই চূড়ার কাছে খানিকটা জায়গা আজও, আর

আছে নাকি একটা পাথরের কোকিল, সেই কোকিলটা, যেটা ডেকে ছিল সেদিন। এসব অবশ্য শোনা কথা টেপীর। নিজে কোকিল-টোকিল দেখবার সুযোগ পায় নি সে, আর বিশ্বাসও করে না তাই এসব।

মন্দিরের সর্ব্বত্রই শিল্পকার্য্যের নিদর্শন, হাজার হাজার দেবদেবীর মূর্ত্তি মন্দিরের গায়ে খোদিত। ভক্তেরা ভক্তির প্রাবল্যে সিন্দুর আর তেল দিয়ে সেগুলি বোঝাই করে তুলেছে। আজ দেখলে মনে হয় যেন সব সিন্দুরের তালগোল।

মন্দিরের একপাশে শিবদুর্গা সেজে দু'জন ছেলে ভিক্ষা করছে, বেশ রোজগার তাদের। আজকে যেন ঠিক ভিক্ষা নয়। শিব-দুর্গা ভক্তদের কাছে কিছু নিয়ে তাদের যেন ধন্য করছে, এই রকম একটা ভাব তাদের চোখেমুখে। বাচ্ছা ছেলে, নিদ্রায় একেবারে তাদের জড়িত নয়ন—কিন্তু তবু বিশ্রামের অবকাশ নেই হর-পার্ব্বতীর। এগিয়ে চলেছে তারা পায়ে পায়ে। পায়ের নূপুর বাজছে রুমঝুম রুমঝুম।

খাঁদারাণীর মন্দিরে প্রণাম সেরে বাইরে বেরিয়ে আসে দু'জনে বড় ফটকটা দিয়েই, বড় ফটকের বের হলেই আবার জনসমুদ্র। যেন সমুদ্র আরও উত্তাল আরও উদ্বেল। পিছনের দিকে মৃত দারকেশ্বর পড়ে আছে সরীসৃপের মত।

আর কেনাকাটা নয়, মেলার বাকী একটা দিক দেখে ফিরে যাবে তারা এবার। সার্কাস বসেছে এদিকটায়। দুটা বানর একটা বাঁধা মাচার উপর ঘোরাফেরা করছে আর দাঁত খিঁচুচ্ছে দর্শকদের দেখে। একটা জোকার মুখ দিয়ে লাল, নীল, সাদা হরেক রকমের কাগজ বের করছে। কাগজের শেষ নেই যেন। তার সাজ-পোশাক আর টুপীটা দেখেই হাসি আসে টেপীর। তাঁবুর ভিতর বাঘের গর্জ্জন শোনা যাচ্ছে। খেলা সুরু হয় নি এখনও। টিকিট বিক্রী হচ্ছে তারই।

একটু দূরেই একটা পুলিসের ক্যাম্প। তার পাশে স্যানিটারী ডিপার্টমেণ্ট আর ভলেণ্টিয়ার্স ক্যাম্প। মাড়োয়াড়ীদের দেওয়া একটা জলসত্র, টিনের লম্বা চোঙা দিয়ে জল দিচ্ছে একটা লোক। এত রাত্রেও জল খাচ্ছে অনেকে। পুণ্য সঞ্চয় করছে মাড়োয়াড়ী বাবুরা। কাঠের লাঙল বিক্রি হচ্ছে একপাশে, চাষীর দল ভিড় করে দাঁড়িয়েছে, দরাদরি চলছে।

স্যানিটারী ডিপার্টমেন্টের লোকগুলোকে দুচোখে দেখতে পারে না টেপী। ওরা কিছু দেখেনা মেলার, দোকানে দোকানে খেয়ে বেড়ায় আর উপরি আদায় করে। দোকানদারেরাও চোখ বুজে ভেজাল চালায় তাই, তাই না রাত্রের অবিক্রীত আলুর দম আবার সকালে বিক্রি হয়। চপের মধ্যে সে আলু পাচার হয়। লোকে মুড়ি আর আলুর চপ খায় শালপাতার ঠোঙা করে পরিতৃপ্তি সহকারে। তারা কেউ জানে না আলুর আসল রহস্য। টেপী নিজে এসব দেখেছে আর শুনেছেও।

দূরের ফাঁকা মাঠটায় আর হ্যাসাকের রোশনাই পৌঁছাতে পারে নি, তাই অন্ধকার হয়ে আছে সেই স্থানটা, কতকগুলো ছায়ামূর্ত্তি নড়াচড়া করছে তারই আশে পাশে, তাদের ফিসফিসানি কানে আসছে। রাত্রি এবার গভীর হয়েছে, ভদ্রলোকের আনাগোনা কমে আসবে এবার। মেলায় আওয়াজ উঠছে গমগম।

মেলা এবার বিপরীতমুখী, ভদ্রলোকেরা কেনাকাটা শেষ করে ফিরছে, প্রায় সবারই হাতে মাদুর আর পাখা। এবারে মেলায় আনাগোনা বাড়ে অসৎ, মাতাল, চরিত্রহীন আর লম্পটদের। অন্ধকার মাঠে তাদেরই পদধ্বনি আর ফিসফিসানি। শহরের বারাঙ্গনা আর গ্রামের চরিত্রহীনাদের ভিড় সেখানে। সঙ্গসুখ দিতে এসেছে তারা লম্পট পুরুষদের, রাত কাটাবে তারা আর হৈ-হুল্লোড় করবে তাদের সঙ্গে অর্থের বিনিময়ে। সামান্য অর্থের বিনিময়ে নিজেদের ইজ্জত বিকোতে এসেছে তারা স্ব ইচ্ছায়। পুলিস বন্ধু তাদের, অর্থে বশ সবাই, সাবাস রৌপ্যচক্র।

রাত অনেকটা বেড়েছে, দোকানের হ্যাসাকগুলো কেমন নিষ্প্রভ লাগছে চোখে। সারাটা দিনের বেচাকেনায় দোকানদার ঝিমিয়ে পড়েছে, পরিশ্রান্ত সেও।

বাড়ীর পথ ধরে তারা দু'জনেই। টেপী আর ভজহরি।

ভজাদা তখন রিক্সা চালাত না, গোপাল নন্দীর ধানকলে মেটের কাজ করত, লোকজন খাটাত আর খবরদারী করত তাদের উপর, হপ্তা পেত দশ টাকা। ভজাদাকে তাদের বাড়ীর সবাই ভালবাসত, মান খাতির ছিল তার, মাঝে মধ্যে চা-টা পেত। তার সঙ্গে ভজাদাকে জোড়া লাগাবার গোপন পরামর্শ চলত বাড়ীতে, টেপী সে সব আড়ি পেতে শুনত, শুনতে ভাল লাগত তার। কিন্তু ভজাদা যাঁহাতক রিক্সা চালাতে আরম্ভ করলে বাড়ীর সবাই ছো ছো করে উঠল। ছিঃ ছিঃ করলে সবাই, এর চেয়ে ধানকলের মেটের কাজ নাকি অনেক ভালো, বেতন অল্প হলেও ইজ্জত ছিল তাতে। ভজাদা তা মানতে রাজী নয়। বললে, কেন, আমি ত চুরিও কচ্ছি ন', সিঁদও কাটছি না—খেটে খাব, তা সে যে কাজই হোক না কেন, এতে অন্যায়টা কোথায়? মেটের চাকুরিতে মাসে চল্লিশ টাকা আর রিক্সা চালিয়ে পুরো দু'শ, তা ছাড়া ওটা পরাধীন আর এটা স্বাধীন।

এক দিন ত মা ভজাদারই মুখের উপর যা তা বলে বসলেন: সে রিক্সা চালায়—ছোট কাজ করে। আরও কত কি।

সে দিন থেকেই ভজাদা তাদের বাড়ীতে আসা বন্ধ করে দেয়, আচ্ছা, আমি স্বীকার করলাম রিক্সাই না হয় সে চালায়—তাই বলে কি তার আত্মমর্য্যাদাও থাকবে না নাকি? টেপী ত কোন অন্যায় দেখেনি ভজাদার। না-করে সে নেশা-ভাঙ আর না আছে কোন বদ খেয়াল। কি দোষ ভজাদার? রিক্সা চালালে কি তার জাত-গোত্র সব শেষ হয়ে যায় নাকি? তা যদি হয় তা হলে যারা রেল-গাড়ী চালায়, মোটর চালায়, হাওয়াই জাহাজ চালায়, তারাও ত জাত-গোত্রহীন? তা যদি না হয় তা হলে তার ভজাদাই বা হতে যাবে কেন?

অনেকক্ষণ পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে টেপী। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে এবারে। শহরের দিক থেকে একটা বাস আসছে, আলো জ্বলছে তাতে। একটা যেন নেকড়ে ছুটে আসছে সহরের দিক থেকে। চোখ দুটো তার জ্বলছে—জ্বল জ্বল করে। গাড়ীটা বেঁকে যায় এক্কেশ্বরের দিকে। পিছনে সাইকেল-রিক্সা চলেছে দল বেঁধে, যেন শোভাযাত্রা বেরিয়েছে তাদের, একটা মস্ত মিছিল।

একটা সাইকেল-রিক্সা ফিরে আসছে মেলার দিক থেকে। খালি রিক্সা। রেল লাইনের ঢালে জোরে নামছে। প্যাঁক প্যাঁক করে তার হর্ণ বাজছে। সামনে একটা টিমটিমে বাতি জ্বলছে। আলোটা কাঁপছে, রিক্সার গতি মন্থর হয়ে আসছে যেন। থেমে পড়ে এক সময়।

—রাণী।

চমকে উঠে টেপী।

এগিয়ে আসে ভজহরি। তার হাতে একটা কাগজের মোড়ক, মোড়কটা টেপীর হাতের দিকে বাড়িয়ে দেয় ভজহরি। বলে : শাড়ী আছে তোমার, আর এটা প্রসাদী ফুল ঠাকুরের। একটা শালপাতের ঠোঙা ভজহরির হাতে।

হাত বাড়ায় টেপী ভজহরির দিকে। দুঃখেই ত মানুষ কাঁদে কিন্তু তার চোখে জল আসে কেন হঠাৎ? এ টেপীর আনন্দাশ্রু। আনন্দে টেপী যে কি করবে ভেবেই পায় না প্রথমে। পেখম তুলে ময়ূরীর মত নাচতে ইচ্ছা করে তার। আনন্দের আবেগে ভজহরির পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে সে।

মেলা ক্রমশই জমে আসছে যেন। গম গম আওয়াজ ভেসে আসছে এক্কেশ্বরের দিক থেকে। হ্যাসাকের আলোর রোশনাই উঠেছে উপরে। দু'জনেই চেয়ে থাকে সেই দিকে অপলক নেত্রে। বুড়ো শিবকে প্রণাম জানায় দু'জনেই অবনত মস্তকে।

পান্থ

শ্রীআইভি রাহা

জীবনের ব্যর্থতার গ্লানি, মুছিয়া নিমেষে—
দিকহারা পান্থ আমি দাঁড়াইনু শ্রান্ত বেশে,
রিক্তপ্রাণে শূন্য হাতে ফিরি দীর্ঘপথ শেষে!
আঁধার ঘনায়ে আসে—
এখনও যে দীর্ঘপথ বাকী;
আনমনে দীপ জ্বালি
ভ্রান্ত আমি চলেছি একাকী।
কেহ নাই পথ হতে
সমাদরে গৃহে লবে ডাকি,
দৈন্য নাই, নাই ক্ষোভ
হাসি আছে বেদনারে ডাকি।
আশার মুকুলগুলি ছিন্ন হয়ে গেছে মোর—
নিঃসঙ্গ হয়েছে যাত্রা, তীব্র অমা-ঘন-ঘোর;
বন্ধুর পথে আমি চলেছি অক্লান্ত বিভোর।

পূর্ণতম

শ্রীতপতী চট্টোপাধ্যায়

জগৎভরা এই যে আলো আকাশ ভরা গান।
ফুলের মাঝে এত যে রঙ ফলের মাঝে দান।
সবুজ পাতা ঝির ঝিরনো প্রাণ জুড়নো ছায়া।
মায়ের বুকে প্রিয়র চোখে স্নেহভরা মায়া।
বিস্মিত মোর হিয়া সে আজ পরাণ দিয়ে লোটে
মুগ্ধ হিয়া নূতন করে নবীন হয়ে ওঠে।
সেই হিয়া মোর জগৎভরা জ্যোৎস্না দেখে মেতে
ছুটে যে চায় সে জ্যোৎস্নারই উৎসলোকে যেতে।
যারই ছোট কণায় আমার হৃদয় উপচে পড়ে।
কেমন তুমি পূর্ণতম দাও গো দেখা মোরে।
তোমায় খোঁজার পথে আমায় হাতছানি দেয় যারা
কেমন করে মিথ্যা বলি মূল্যহীন কি তারা।
দোষ ত তাতে নয়,
সেইখানেতেই থামলে যে মন পূর্ণ নাহি হয়।

ঘাটু পূজা

শ্রীসুখময় সরকার

ফাল্গুনের শেষ দিবসে উষাকালে ঘাঁটু পূজা একটি কৌতুক-জনক ধর্মকৃত্য। পূর্বদিন বৈকালবেলায় বালক-বালিকারা ঘাঁটু পূজার জন্য ঘাঁটু ফুল সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। গ্রামে পুষ্করিণীর পাড়ে অথবা ঝোপ জঙ্গলে ঘাটুগাছের অভাব নাই। প্রায় চক্রাকার অমসৃণ পত্রযুক্ত গুল্মের শীর্ষে গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তাভ-শুভ্র পুষ্পরাজি বসন্ত সমীরণে কেশর বিস্তার করিয়া মৃদু সৌরভ বিকীর্ণ করিতে থাকে। পুষ্প আহরণের সময় ভ্রমর ও মক্ষিকার গুঞ্জরণের সঙ্গে বালক-বালিকাদের কলগুঞ্জন মিশ্রিত হইয়া এক বিচিত্র শব্দমাধুরী সৃজন করে। সদ্য-আহৃত ফুলে ঘাঁটুর পূজা হয় না। 'বাসি ফুলে' পূজা করিতে হয়। প্রাচীনারা ঘাঁটু ফুল না বলিয়া ঘাঁটকন' ফুল বলেন। পঞ্জিকায় ঘাঁটুর নাম ঘণ্টাকর্ণ। বলা বাহুল্য, ঘণ্টাকর্ণ শব্দের বিকারে 'ঘাঁটকন'। তাহা হইলে ঘাঁটু সংস্কৃতায়িত হইয়া ঘণ্টাকর্ণ হয় নাই; ঘণ্টাকর্ণ শব্দেরই রূপান্তরিত ও সংক্ষিপ্ত রূপ ঘাঁটু'।

ঘণ্টাকর্ণ নামটিও কৌতুকাবহ। যাঁহার কর্ণে ঘণ্টা আছে, তিনি ঘণ্টাকর্ণ। ঘাঁটুর কানে ঘণ্টা কেন? ইহার এক লৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। এ কাহিনীর মূল কোন পুরাণে আছে বলিয়া মনে হয় না। ঘাঁটু নাকি প্রথমে এক রূপবান্ দেবকুমার ছিলেন। কি একটা অপ-রাধের জন্য ভগবান বিষ্ণু তাঁহাকে অভিশাপ দেন, ফলে ঘাঁটুর জন্ম হয় পিশাচকুলে। লঘুপাপে গুরুদণ্ড হইয়াছিল বলিয়া ঘাঁটু বিষ্ণুর উপর ভীষণ চটিয়াছিলেন। তিনি বিষ্ণুর নাম উচ্চারণ করিবেন না, বিষ্ণুর নাম শ্রবণ করিবেন না। পাছে কেহ বিষ্ণুর নাম করিলে তাঁহার কর্ণে তাহা প্রবেশ করে, তাই কর্ণে ঘণ্টা বাঁধিয়া রাখিলেন। কানের কাছে সর্বদা ঘণ্টা বাজিতে থাকিলে বিষ্ণুর নাম তিনি আর শুনিতে পাইবেন না। একটা ছড়ায় ঘাঁটুর উৎপত্তি ও প্রকৃতি বর্ণিত আছে:

শুন শুন সর্বজন ঘাঁটুর জন্ম-বিবরণ।
পিশাচ-কুলে জন্মিলেন শাস্ত্রের লিখন॥
আবার হরিনাম কর্ণেতে করবে না শ্রবণ।
তাই দুই কানেতে দুই ঘণ্টা করেছে বন্ধন॥

অতি প্রত্যূষে ঘাঁটুর পূজা। সুতরাং পূর্বদিন রাত্রিতেই পূজার আয়োজন করিয়া রাখিতে হয়। আয়োজন অতি অনাড়ম্বর। মুড়ি ভাজিবার এক টুকরা খোলাই ঘাঁটুর আসন; পুরাতন এক টুকরা কাপড়ে হলুদ মাখাইয়া হয় ঘাটুর বসন। শুষ্ক চাউলে গুড় মাখাইয়া ঘাঁটুর নৈবেদ্য প্রস্তুত করা হয়। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া গৃহিণীরা ঘাঁটুর প্রতিমা নির্মাণ করেন। গোয়াল হইতে তাজা এক-তাল গোময় লইয়া পাকাইতে পাকাইতে ঠিক বর্তুলাকার করিয়া ফেলেন, যেন একটি শালগ্রাম-শিলা। তাহাতে দুইটি ঘেঁচি-কড়ি এমন ভাবে বসাইয়া দেওয়া হয় যেন দুইটি চক্ষু। কোমল গোময়-পিণ্ডের প্রতিমায় একটি ঘাটুফুলের মঞ্জরী গুঁজিয়া দেওয়া হয়।

বাড়ীর অঙ্গনে একটি স্থান, সাধারণতঃ তুলসীতলা, ঘাঁটু-পূজার জন্য নির্দিষ্ট হয়। স্থানটি ধৌত করিয়া গোময় লেপিয়া পরিচ্ছন্ন করা হয়। তার পর ভাঙা মুড়ি-ভাজার খোলায় ঘাঁটুর প্রতিমা স্থাপন করা হয়। হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা প্রতিমার কিয়দংশ আচ্ছাদিত করা হয়। ঘাঁটুর কপালে সিন্দুর এবং ঘেঁচি-কড়ির চোখ দুটিতে কাজল পরাইয়া দেওয়া হয়। পার্শ্বে ধূপ-দীপ জ্বলিতে থাকে। গুড়-মিশ্রিত শুষ্ক চাউলের নৈবেদ্য সজ্জিত করা হয়। পূজার জন্য পুরোহিতের প্রয়োজন নাই, গৃহিণীরাই ঘাঁটুর পূজা করেন। ঘাঁটু-পূজার একটি মন্ত্র আছে পঞ্জিকায়:

ঘণ্টাকর্ণ মহাবীর সর্বব্যাধি বিনাশন।
বিস্ফোটক ভয়ে প্রাপ্তে রক্ষ রক্ষ মহাবল॥

এই মন্ত্রটি কেহ শুদ্ধ ভাবে, কেহ অশুদ্ধ ভাবে তিন বার উচ্চারণ করিয়া গৃহিণীরাই ভক্তিভরে ঘণ্টাকর্ণের অর্চনা করেন। বালক-বালিকারা তখন অঙ্গনে আসিয়া সমবেত হয় এবং নানাবিধ ছড়া কাটিতে থাকে। কেহ বলে:

ঘাঁটু এল লড়ে
হাতীর উপর চড়ে॥

আবার কেহবা বলে:

ঘাঁটু, ঘোর ঘোর ঘোর।
ঘাঁটু, বিয়া দিব তোর॥

ইতিমধ্যে পূজা সাঙ্গ হয়, শঙ্খ বাজিয়া উঠে। পূজান্তে পূজারিণী ঘাঁটু-প্রতিমাকে একটি প্রকাণ্ড খোলা দিয়া ঢাকিয়া দেন। তখন কোন বালক আসিয়া লাঠির আঘাতে খোলাটি ভাঙিয়া দেয় এবং ঘাঁটু আবার দৃষ্টিগোচর হ'ন।

অবশ্য এমনভাবে লাঠির আঘাত করিতে হয়, যেন উহা ঘাঁটু-প্রতিমাকে স্পর্শ না করে। ঘাঁটুর চারিপার্শ্বে দুই-চারিটি কড়ি ছড়াইয়া রাখা হয়। বালক সানন্দে ঐ কড়িগুলি কুড়াইয়া লয়। তার পর ঘাঁটু-পূজার প্রদীপের শিখায় কাজল পাড়িয়া গৃহিণীরা ছেলেমেয়েদের চোখে পরাইয়া দেন। কাজল-পরা শেষ হইলে প্রসাদ বিতরণ। শুষ্ক চাউলে গুড় মাখাইয়া ঘাঁটুর যে ভোগ হয়, তাহাই প্রসাদ পাইয়া বালক বালিকার দল সানন্দে চিবাইতে থাকে। এইরূপে ঘাঁটু-পূজার প্রথম পর্ব সমাপ্ত হয়।

বৈকালে বালক-বালিকারা দল বাঁধিয়া "আলোর মালোর" করিতে বাহির হয়। একটি ছোট বাঁশের চুপড়িতে এক কোণে ঘাঁটুকে বসাইয়া প্রত্যেক বাড়ী হইতে বালক-বালিকারা বাহির হয়। ভাষা যেমন হউক, বিষয়বস্তু যাহাই হউক, বালকণ্ঠে সমস্বরে ছড়া শুনিতেই ত ভাল লাগে। সেদিন বৈকালে গ্রামের পথ শিশুদের কলকণ্ঠে মুখর হইয়া উঠে। সাধারণতঃ বালকদের হাতে থাকে বাঁশের চুপড়ি; তাহাতে পুষ্পাচ্ছাদিত ঘাঁটুর প্রতিমা। ঘাঁটু ফুলের মৃদু গন্ধে সুরভিত হইয়া উঠে গ্রামের পথ। বালিকাদের হলুদ-ছোপানো কাপড়, পায়ে মল, চোখে ঘাঁটুর কাজল, কপালে সিন্দুরের ফোঁটা। গ্রামের পথে পথে যখন তাহারা ছড়া বলিতে বলিতে আগাইয়া চলে, তখন মনে হয় যেন ধূলার ধরণীতে চাঁদের হাট নামিয়া আসিয়াছে। প্রত্যেক বাড়ীর সম্মুখে গিয়া তাহারা দল বাঁধিয়া দাঁড়ায় আর সমস্বরে বলিতে থাকে:

"আলোর মালোর চাল গুচ্ছের দাও।
নইলে খোস-পাতাড়ী লাও॥"

গৃহিণী তখন বাহির হইয়া আসেন এবং প্রত্যেক ঘাঁটুর চুপড়িতে একমুঠা করিয়া চাউল-ছোলা-কুসুমবীচি* ফেলিয়া দেন। বালক-বালিকার দল ইহাতেই তুষ্ট হইয়া হাসিমুখে সে স্থান ত্যাগ করে এবং অন্য বাড়ীর সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হয়। একমুষ্টি চাউল-কলাই দিতে কাতর, এমন কৃপণ গৃহিণীও থাকেন। খানিকক্ষণ ছড়া বলার পর যখন দেখা যায় কেহ বাহির হইয়া আসিল না, তখন বালক-বালিকারা রাগিয়া যায় এবং ঘাটুর প্রতিমা হইতে একটু গোবর লইয়া বাড়ীর দেওয়ালে লেপিয়া দিতে দিতে বলে:

"তবে এই খোস-পাতাড়ী লাও।"

তাহাদের বিশ্বাস, ঘাটুর গোবর দেওয়ালে লেপিয়া দিলে ঐ বাড়ীর লোকেদের খোস-পাচড়া ইত্যাদি চর্মরোগ হইবে।

* কুসুমবীচি, কুসুম্ভ নামক শস্যের বীজ। ইহা শুভ্র ও সুগন্ধি। কুসুম্ভের আরক্ত পীতবর্ণ পুষ্পদলে বস্ত্র রঞ্জিত হইত।

সংগৃহীত চাউল-ছোলা-কুসুমবীচি লইয়া বালক-বালিকারা বাড়ী ফিরিলে গৃহিণীরা সেগুলি ভাজিয়া দেন, আর তাহারা চাল-কলাইভাজা চিবাইতে চিবাইতে আহ্লাদ প্রকাশ করিতে থাকে।

ঘাঁটু চর্মরোগের দেবতা। পূজায় সন্তুষ্ট হইলে তিনি চর্মরোগ নিবারণ করেন; তাঁহার পূজা না দিলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া চর্মরোগের দ্বারা শাস্তি দেন। এইরূপ ভাবনাকে নিছক 'অনার্য' বা 'লৌকিক' বলিয়া উপহাস করিয়া লাভ নাই। বেদে রুদ্রদেবও যজ্ঞ দ্বারা পরিতোষিত না হইলে ক্রুদ্ধ হইয়া মানব ও জীবজগৎকে 'রোদন করান', ব্যাধি দ্বারা প্রপীড়িত করেন। পঞ্জিকায় লিখিত মন্ত্রে মহাবল ঘণ্টাকর্ণ মানুষকে বিস্ফোটকভয় হইতে ত্রাণ করেন। কিন্তু ফাল্গুন সংক্রান্তির উষাকালে অমন বিচিত্র রীতিতে ঘাঁটু পূজা কেন? ঘাঁটু প্রতিমাকে একটা খোলা দিয়া ঢাকিয়া আবার লাঠি দিয়া খোলাটা ভাজিয়া দেওয়া হয় কেন? বিশেষতঃ, 'আলোর মালোর' কথাটার অর্থই বা কি? বাল্যকাল হইতে মনে এই সকল প্রশ্ন লুকাইয়াছিল। সম্প্রতি বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশে আসিয়া প্রশ্নগুলির সম্ভাব্য উত্তর মিলিয়াছে।

এ অঞ্চলে ফাল্গুন-সংক্রান্তির দিন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সমগ্র চৈত্রমাস সন্ধ্যাকালে বালক-যুবকেরা 'ঘাঁটু গাইতে' বাহির হয়। উচ্চবর্ণসম্ভূতেরা নহে, বাউরী-হাড়ী-মুচি-ডোম ইত্যাদি তথাকথিত অন্ত্যজশ্রেণীর বালক-যুবকেরা দল বাঁধিয়া 'ঘাঁটু গাইয়া' থাকে। একটি ক্ষুদ্রাকার দোলা নানাবর্ণের কাগজের ফুল ও মালা এবং আমপাতা ও ঘাঁটু-ফুলের মালা দ্বারা সজ্জিত করা হয়। ঐ দোলার ভিতরে একটি প্রদীপ জ্বলিতে থাকে। এখানে ঐ প্রদীপটিই ঘাঁটু। দুই জন বাহক ঘাঁটুর দোলাটি বহিয়া লইয়া যায়। প্রয়োজন-মত মাঝে মাঝে বাহক পরিবর্তন করা হয়। এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছি, বাঁকুড়ার পশ্চিমাংশে বালক-বালিকারা কেন "আলোর মালোর" বলিয়া থাকে। প্রকৃত কথাটা নিশ্চয় "আলোর মালা"; প্রাকৃতজনের মুখে উহা "আলোর মালোর" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যেমন করিয়া ইন্ধন পিঙ্গলী শব্দ রূপান্তরিত হইয়া "ইঁজোল-পিঁজোল" হইয়াছে। এক সময় হয়ত প্রদীপই বাঁকুড়াতেও ঘাঁটুর প্রতীক-রূপে গৃহীত হইত; কালক্রমে সে রীতি পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু 'আলোর মালা' কথাটা বিকৃতরূপে লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছে, সেটা সহজে ভুলিয়া যায় নাই। ইহারই নাম 'স্মৃতি'। প্রজ্বলিত দীপই যদি ঘাটুর প্রতীক হয়, তবে তাহাকে 'আলোর মালা' বলা অসঙ্গত নহে। কথাটা অন্য কারণেও যুক্তিসঙ্গত; পরে আলোচনা করিতেছি।

ঘাঁটু-গাইয়ের দল দোলার মধ্যে ঠাকুর লইয়া কোন গৃহস্থের লাছ-দুয়ারে* আসিয়া সমবেত হয়। তার পর ছড়া গাইতে আরম্ভ করে। দলের মধ্যে যাহার কণ্ঠস্বর স্পষ্ট ও উচ্চ, সে এক পঙক্তি করিয়া গাহিয়া যায় এবং অপর সকলে সমস্বরে "বোল রাম" বলিয়া ধুয়া ধরে। যথা:

পরথম এলাম পরথম এলাম ঘর গেরস্থর বাড়ী।
—বোল রাম॥
গেরস্থরা বেঁধে রেখেছে সাগ্‌নের খাড়ি।
—বোল রাম॥
সাগ্‌নে গেল আগ্‌নে দিয়ে।
—বোল রাম॥
চোর পালাল ছুপ ছুপিয়ে।
—বোল রাম॥ ইত্যাদি···

ছড়া সাধারণতঃ অর্থহীন শব্দ-সমষ্টিমাত্র মনে করা হয়। কিন্তু এই ছড়া অর্থহীন নহে। ফাল্গুন গত, চৈত্র আগত। ঘাঁটু গাইয়ের দল প্রথম গৃহস্থের বাড়ীতে আসিয়াছে। গৃহস্থ সজিনা ডাঁটা (সাগ্‌নের খাড়ি) বাঁধিয়া রাখিয়াছে। সজিনা-ডাঁটা প্রকৃতপক্ষে 'ডাঁটা' নহে, উহা সজিনা (সং শোভাঞ্জন) বৃক্ষের ফল। আকার দণ্ডের ন্যায় বলিয়া ডাঁটা, খাড়া বা খাড়ি নামে অভিহিত হয়। যেমন সোঁদালের যষ্ট্যাকার ফলকে অনেকে বলে 'বাঁদর-লাঠি'। সজিনা-ডাঁটা চর্মরোগ-নিবারক, এমন কি বসন্তরোগের প্রতিষেধক। ছড়ার মধ্যে একটা রূপক আছে। সজিনা যখন আগ্নিনা দিয়া আসিল, তখন চোর ছুপ-ছুপাইয়া পলাইয়া গেল। কে এই চোর? চর্মরোগই চোররূপে কল্পিত হইয়াছে; কারণ ইহা চোরের ন্যায় সকলের অলক্ষ্যে মানবদেহরূপ গৃহে প্রবেশ করে। ছড়ার মর্মার্থ এই যে, সজিনা ডাঁটা আহার করিলে চর্মরোগ দেহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। আর একটি ছড়া আছে:

নীল বনায় চুমচুমি।
বুড়ি আনল গুমগুমি॥
গুম্‌গুমিয়ে ভাঙ্গব দাঁত।
বুড়ি আনল চৈত্র মাস॥
চৈত্র মাসের চতুর্দশী।
ঘাঁটুর কপালে চন্দন ঘষি॥
ঘষতে ঘষতে পড়ল ফোঁটা।
একা ঘাঁটুর সাত বেটা॥

এই ছড়াটিও যেমন অর্থবহ, তেমনই কবিত্বপূর্ণ। বসন্তকাল। নৈশ গগনের অনন্ত নীলিমায় অগণিত হীরার চুমকি ঝিক্‌মিক করিতেছে। [নীলবনা=আকাশের সীমাহীন নীলিমা। প্রাচুর্য ও বাহুল্য বুঝাইতে 'বন' শব্দের প্রয়োগ বাংলায় বহু প্রচলিত। বন+আ (স্বার্থে)।] এক বুড়ির কীর্তিতে মাঝে মাঝে মেঘের সঞ্চার হয়, আকাশে মেঘের চাপা গুম্ গুম্ শব্দ শোনা যায়। [এই বুড়ি এক অশুভ শক্তি। মকর-সংক্রান্তিতে এই বুড়ির ঘর পোড়ান হয়।] এই বুড়ি চৈত্রমাস আনিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে গুমট ও চর্মরোগ। তথাপি এই চৈত্রেরই শুভ চতুর্দশী তিথিতে ঘাঁটুর বিবাহ। সেদিন চন্দন ঘষিয়া ঘাঁটুর কপালে ফোঁটা দিয়া তাঁহাকে বরবেশে সজ্জিত করিতে হয়। বিবাহের পর ঘাঁটু সাত পুত্র লাভ করেন॥

নিম্নের দুইটি পঙক্তি বলিয়া ঘাঁটু গাওয়া শেষ করে:

ধোপা ঘাটের জল খেয়ে।
মোষ পড়ল ধড়াম্ দিয়ে॥

অমনি এক বালক কিংবা যুবক ধড়াম করিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থ তাহার মাথায় জল ঢালিয়া দেয়। সে উঠিয়া বসিলে তাহার হাতে তেল দেয়, তেলটা সে মাথায় অথবা সর্বাঙ্গে মাখিয়া লয়। তার পর গৃহস্থ কিছু চাউল পয়সা ইত্যাদি দিয়া ঘাঁটু গাইয়ের দলকে বিদায় করে। প্রায় এক মাস ধরিয়া বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিয়া এইরূপে ঘাঁটু গাইয়া তাহারা যে চাউল ও পয়সা সংগ্রহ করে, মাসান্তে তাহা দিয়া একদিন সকলে মিলিয়া ভূরি-ভোজনের আয়োজন করে।

বিভিন্ন স্থানে ঘাঁটু-পূজার বিচিত্র ধরনের বিচ্ছিন্ন অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ও সম্পর্ক নির্ণয় সহজ কর্ম নহে। তথাপি এই উৎসবের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিয়া সহজ বুদ্ধিতে যাহা আসিয়াছে, এখানে সংক্ষেপে তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি। 'ঘণ্টাকর্ণ' নাম সম্বন্ধে যে লৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে তাহা হইতে ঘাঁটুকে চিনিবার উপায় নাই। কত বিচিত্র কারণে লৌকিক কাহিনীর উদ্ভব হইতে পারে, এখানে সে আলোচনার স্থান নাই। কিন্তু কয়েকটা লক্ষণ দেখিয়া মনে হয়, ঘাঁটু পূজা আদৌ সূর্য পূজা ছিল। কথাটা সহসা শুনিলে বিস্ময়ের উদ্রেক করিবে; কিন্তু অনুধাবন করিলে ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ থাকিবে না। বঙ্গদেশের ইতু পূজা এবং বিহারের ছটপরব প্রকৃতপক্ষে সূর্য পূজা, কিন্তু সাধারণ লোকে এ কথা জানে না। হঠাৎ সে কথা বলিতে গেলে লোকে বিস্ময় প্রকাশ করে। বাঁকুড়ায় ঘাঁটুর প্রতিমা একটি গোলাকার গোময়-

* লাছ < লচ্ছা প্রা° < রথ্যা স° (রথ চালনযোগ্য প্রশস্ত পথ)। লাছ-দুয়ার=বড় রাস্তার সংলগ্ন দ্বার ('নাচ-দুয়ার' নহে)।

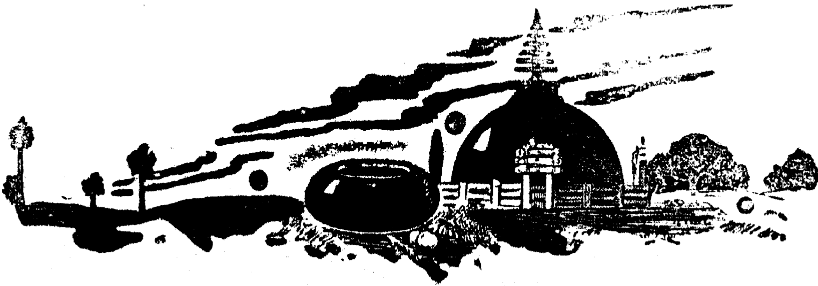
পিণ্ড। পূর্বে বলিয়াছি, উহা দেখিতে প্রায় শালগ্রাম-শিলার মত। শালগ্রাম শিলা বিষ্ণুর প্রতীক। বিষ্ণু সূর্য; সুতরাং উহা সূর্যেরই প্রতীক। বর্তুলাকার গোময়-পিণ্ডে যে ঘাঁটু-প্রতিমা নির্মিত হয়, তাহাও সূর্যের প্রতীক বলিয়াই মনে হয়। বাঁকুড়ার "আলোর মালোর" এই অনুমানের পোষকতা করিতেছে। পূর্বে বলিয়াছি, কথাটা প্রকৃতপক্ষে "আলোর মালা"। কারণ বর্ধমানের পশ্চিমাংশে একটি জলন্ত প্রদীপই ঘাঁটুর প্রতীক। মনে হইতেছে, অমিত-জ্যোতিঃ মরীচিমালী সূর্যই "আলোর মালা" নামে কীর্তিত হইয়া থাকেন।

বৈদিক সাহিত্যে সূর্যই মানুষের চর্মরোগ নিবারণ করেন। ঘাঁটুও চর্মরোগ নিবারণের দেবতা। সুতরাং ঘাঁটু-পূজা যে সূর্য পূজারই একটা রূপান্তরিত সংস্করণ, এমন অনুমান অসঙ্গত হইবে কি? প্রাচীনকালে বৈদিক ঋষিগণ প্রত্যূষেই উদীয়মান রবিকে যজ্ঞস্থলে আহ্বান করিতেন। ঊষাকালই সূর্য-পূজার প্রশস্ত সময়। ঘাঁটু-পূজাও প্রত্যূষে বিহিত হইয়াছে। এই সাদৃশ্য কি একান্তই আকস্মিক?

পূজান্তে একটা খোলা দ্বারা ঘাঁটুকে আবৃত করা হয় এবং যষ্টির আঘাতে উহা ভাঙ্গিয়া এক বালক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কড়িগুলি সংগ্রহ করে। কেন এই অদ্ভুত অনুষ্ঠান? বেদে সূর্য হিরণ্য-পাণি অর্থাৎ স্বর্ণ-রশ্মি। পরবর্তীকালে ইহার অর্থ এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল—সূর্যের পাণিতে (হস্তে) হিরণ্য (স্বর্ণ, ধন) আছে। যজমানকে তিনি স্বর্ণ দান করেন। সূর্য পূজা করিলে ধন লাভ হয়, এই বিশ্বাসও অতি প্রাচীন। খোলা ভাঙ্গিয়া আবৃত ঘাঁটুকে অপাবৃত করা হইল; যেন সূর্যদেব শর্বরীর তিমির ভেদ করিয়া পূর্বদিগন্তের তল দেশ হইতে আত্মপ্রকাশ করিলেন। কড়ি ধনের প্রতীক। এই হেতু লক্ষ্মী পূজাতেও কড়ির প্রয়োজন হয়। শতবর্ষ পূর্বেও মুদ্রারূপে কড়ির প্রচলন ছিল। ঘাঁটুর চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত কড়িগুলি বালক কুড়াইয়া লইল; যেন হিরণ্য-পাণি সূর্যদেব আবির্ভূত হইয়া তাহাকে ধন দান করিলেন।

একটি ছড়ায় আছে, চৈত্র মাসের চতুর্দশীতে ঘাঁটুর বিবাহ। ইহা নিশ্চয় চৈত্রের কৃষ্ণা চতুর্দশী; কারণ শুক্লা-চতুর্দশী কোন কোন বৎসর সৌর বৈশাখ মাসে পড়িয়া যায়। চৈত্রের কৃষ্ণা-চতুর্দশীর পূর্বদিন মধু কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে বারুণী-স্নান বিহিত। ইহা এক বিশেষ জ্যোতিষিক যোগ। 'বারুণী-স্নান' প্রবন্ধে (প্রবাসী—বৈশাখ, ১৩৬৪) সে যোগের কথা সবিস্তারে লিখিয়াছি। অতি প্রাচীনকালে সেদিন সূর্যের উত্তরায়ণ হইত। এ দিক হইতেও সূর্যের সহিত ঘাঁটুর যোগাযোগ দেখিতেছি। বিবাহের ফলে ঘাঁটুর সাত পুত্র লাভের কথা ছড়ায় উল্লিখিত আছে। বেদে সূর্য 'সপ্তাশ্ব'। বর্ণালীর সপ্তবর্ণই সপ্তাশ্ব। সূর্য-রশ্মির সপ্তবর্ণই কি ঘাঁটুর সাত পুত্র?

ঘাঁটু পূজা কতকাল ধরিয়া চলিতেছে, স্থূলভাবে তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে। ফাল্গুন-সংক্রান্তিতে ঘাঁটু পূজা। ছড়াতেও চৈত্র মাসের উল্লেখ আছে। ছড়ার বর্ণনা হইতে মনে হয়, ফাল্গুন-সংক্রান্তিতে যখন বসন্ত ঋতু আরম্ভ হইত, তখন এই পর্বোৎসবের উদ্ভব হইয়াছিল। বসন্ত ঋতু আরম্ভ হইলেই চর্মরোগের ভয় দেখা দেয় এবং রোগ হইতে পরি-ত্রাণের নিমিত্ত লোকে দেবতার অর্চনা করে। সে যুগে নিশ্চয় চৈত্র-বৈশাখ দুই মাস বসন্ত ঋতু ছিল। এই দুই মাসের প্রাচীন আর্তব নাম মধু-মাধব। কালিদাসেও মধু-মাধব বসন্ত ঋতু। বর্তমানকালে ফাল্গুন-চৈত্র দুই মাস বসন্ত ঋতু গণ্য হয়। অর্থাৎ ঋতু সে কাল হইতে এক মাস পশ্চাদ্‌গত হইয়াছে। অয়ন-চলন-হেতু কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র বৎসরে ঋতু এক মাস পশ্চাদ্‌গত হয়। ঘাঁটু পূজাও প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্বে প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্বে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরা ভারতে শকাব্দ-গণনার প্রবর্তন করেন। তাঁহারা সূর্যোপাসক ছিলেন। সেই সময়েই ভারতের নানাস্থানে নানা আকারে সূর্য পূজা প্রচলিত হইয়াছিল।



জটার জালে

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

২২

নিজের পাখা থাকলে তখনই উড়ে গিয়ে দেখতাম জিতেন কি করছে ওখানে। কিন্তু পাখা ত নেই-ই, তার উপর দু'খানা চরণের একখানা ভাঙা। সুতরাং আবার দুঃসহ প্রতীক্ষা। আধ ঘণ্টার বেশী নয়, কিন্তু তখন মনে হয়েছিল যেন এক যুগ।

তার পর চোখে পড়ল।

লম্বা লম্বা পা ফেলে আগে আগে এল জিতেন। রাজ্যের বিরক্তি তার মুখের ভাবে। দূর থেকে আমাকে দেখেই সে গলা চড়িয়ে বললে, তা হলে, মণিদা, আমাদের বদরীযাত্রা এবারকার মত এখানেই শেষ—কেমন?

কানেই গেল কথাটা, মন পর্য্যন্ত নয়। বদরীনাথ নন, অন্য এক জনের কথা ভাবছিলাম আমি। শুষ্ক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, বাহাদুর কোথায়?

ঐ ত—বলে তার পিছন দিকে হাতের ইশারা করল জিতেন।

অত ভারি বোঝা পিঠে নিয়ে স্বভাবতঃই পিছিয়ে পড়েছিল বাহকটি। এবার নীচে পুলের উপর দেখা গেল তাকে। পিঠে বোঝা থাকলে যেমন বেঁকে যায় মানুষের শরীরটা, ঠিক তেমনি বেঁকে গিয়েছে। তথাপি বুঝা যায় যে, বেশ শক্ত-সমর্থ পুরুষটি। চায়ের দোকানের মেঝেতে বাহাদুরকে নামিয়ে দিয়ে যখন সোজা হয়ে দাঁড়াল লোকটি তখন এক নজরেই বুঝতে পারলাম যে, বেশ দীর্ঘও তার দেহ। দশাসই চেহারা।

কিন্তু আমার প্রধান মনোযোগ তখন বাহাদুরের দিকে। ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বেই যাকে আধমরা দেখে এসেছি, সে এখন পর্য্যন্ত বেঁচে আছে কি না, সেই সম্বন্ধেই উদ্বেগ ও সন্দেহ আমার মনে। হাঁটু গেড়ে বসে তার মাথায় জোরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে ডাকলাম, এই বাহাদুর, কেমন আছ তুমি?

না, আশঙ্কা আমার অমূলক। বেশ বেঁচে আছে সে। তার দেহের থর থর কম্পনের মধ্যে জীবনের এবং হাউ হাউ ক্রন্দনধ্বনির মধ্যে তীব্র সচেতনতার অমোঘ প্রমাণ পাওয়া গেল। অমন হাতীর মত জোয়ান লোকটি দুর্ব্বল, অসহায় একটি শিশুর মতই চোখের জলে দুই গাল ভাসিয়ে জড়িত স্বরে বলে যাচ্ছে, আপলোগ তো মেরে মাতা-পিতা হ্যয়—লেকিন হম নে ক্যা কিয়া!

চুপ কর হারামজাদা, জিতেন কিন্তু ধমক দিল তাকে; যা করবার তা ত করেইছিস। তার পর আবার এই কাঁদুনি কেন?

কিন্তু আমার মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলল সে, বললে, কেবল পিতা নয়, মাতা-পিতা দুইই হয়ে বসে আছেন দেখছি ত সেই ঋষিকেশ থেকেই। ঠ্যালা সামলান এখন।

বুঝা যায় না জিতেনকে। তার বিরুদ্ধে আমার মনের মধ্যে যত অভিমান ও বিরক্তি পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল তা ফেটে পড়বার মুখেই প্রবল বাধা পেয়েছে। এখনও বাধা পাচ্ছে তার মুখের ঐ হাসিতে। জিতেনের কণ্ঠের ভাষা ও গলার আওয়াজের সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না তা, যেমন তার এই ফিরে আসাটা খাপ খায় নি আমাদিগকে পিছনে ফেলে তার ঐ ভয়ঙ্কর জায়গাটাও পার হয়ে এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু দুইই ত সত্য। সুতরাং তার মন্তব্য শুনবার পর আমি বিব্রত ভাবে বললাম, তাই ত? এখন কি করা যাবে এটাকে নিয়ে?

মুখের হাসিটুকু মোটামুটি বজায় রেখেই উত্তর দিল জিতেন: আপাততঃ একটু সেক দিতে হবে। তারও আগে ভিজে জামা-কাপড়গুলি ওর গা থেকে খুলে ফেলতে হবে।

কেবল মুখে বলাই নয়, তখনই কাজেও লেগে গেল সে। কতকটা টেনে ও কতকটা ঠেলে বাহাদুরকে সে ফেলল নিয়ে উনানের ধারে; আমাদের উভয়ের ঝোলাঝুলি খুঁজে শুকনো জামাকাপড় যা পাওয়া গেল, তারই কিছু কিছু দিয়ে নিজের হাতে সে সাজিয়েও দিল তাকে, কাজ করতে করতেই দোকানদারকে সে হুকুম দিল বাহাদুরকে খুব কড়া করে এক গ্লাস চা দিতে।

বাহাদুর তখনও হি হি করে কাঁপছে, চলছে তখনও তার সেই শিশুসুলভ কান্নাটাও। কিন্তু আমার অবস্থা তখন কতকটা স্বাভাবিক। মনে মনে আশ্বাস পেয়েছি আমি, অকূল সাগরে ভাসতে ভাসতে পেয়েছি যেন একটি সুদৃঢ় আশ্রয়। তা ঐ জিতেন। কেবল আশ্রয় নয়, হারাধন ফিরে পেয়েছি আমি—আমার লক্ষ্মণ ভাইকে।

তবে আশ্বাসের পিছনে পিছনেই এল অনুসন্ধিৎসা—আমি ত জিতেনকে খবর দিতে পারি নি, তথাপি কি সূত্রে ওখানে ফিরে এল সে? এবং—

মুখ ফুটে জিজ্ঞাসাই করলাম তাকে।

উত্তরে জিতেন বললে, খবর আর কোথা থেকে পাব? আরও গোটা দুই ধস পার হয়ে গিয়ে ভাল একটি চটি পেয়ে সেখানেই রান্নাবান্নার আয়োজন শুরু করেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাবনা জাগল আপনারা আসছেন না দেখে। ঘণ্টা দুয়েক পথ চেয়ে বসে থাকবার পর উল্টো দিকে ফিরে না এসে আর কি করতে পারি আমি?

তার পর ?

ওখানে এসে দেখলাম যা চোখে দেখেও বিশ্বাস করা যায় না—বাহাদুর হাউ হাউ করে কাঁদছে আর আপনি যাদের পাঠিয়েছিলেন সেই দুটি কুলি ওর গায়ের উপর থেকে লেপ-বর্ষাতি ইত্যাদি ছিনিয়ে নিতে নিতে মুখে ওর চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করছে।

সে কি কথা! বাহাদুরকে আনবার জন্যই ত দশ টাকা কবুল করে ওদের দু'জনকে ওখানে পাঠিয়েছিলাম আমি।

তাই নাকি! কিন্তু ওরা যে বললে—নেপালী কুলিকে কিছুতেই ওরা পিঠে তুলবে না।

দু'জনেই আমরা একসঙ্গে ফিরে তাকালাম ওভারসিয়রের সেই মজুর দুটির খোঁজে। চালার নিচেই আছে দু'জনে। কিন্তু দেখি যে, বোধ করি ভয় পেয়েই দুটিতে গিয়ে বসেছে তাদের মুনিবের পিছনে। ওভারসিয়র নিজে দুটি হাত জোড় করে কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়েছে আমার দিকে যেন ওদের হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করবার জন্যই। তার চোখের সঙ্গে আমার চোখ গিয়ে মিলতেই মুখেও সে বললে, বুঝবার ভুল হয়ে গিয়েছে বাবুজী। ওরা তখন একটু রঙ্গ করছিল কুলিটার সঙ্গে। আর তাতেই আপনার সঙ্গী রেগে গিয়ে বললেন যে তিনিই ওটাকে বয়ে আনবেন। নইলে—

চুপ রহো।

আমি ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলাম লোকটাকে। প্রবৃত্তিই হয় না ওদের সঙ্গে আর কথা বলবার। আমার প্রত্যাশারই কেবল নয়, এই উত্তরাখণ্ডে আমার ইতিপূর্ব্বের সমস্ত অভিজ্ঞতারও ওরা যেন মূর্তিমান প্রতিবাদ। দেবলোকে বিচরণ করতে করতে অকস্মাৎ যেন তিনটি পিশাচের সম্মুখীন হয়েছি আমি।

জিতেনের মুখের দিকে ফিরে তাকিয়ে তিক্তকণ্ঠে আমি বললাম, কেদারের পথে এমন ত একজনও দেখি নি। সেখানে না ডাকলেও প্রত্যেকটি লোকই এগিয়ে এসেছে আমাদের সাহায্য করবার জন্য। কিন্তু বদরীনাথের পথে কাল থেকেই এ কি অভাবনীয় ব্যতিক্রম দেখছি!

উত্তরে জিতেন বললে, বর্ব্বরতা থেকে সভ্যতায় ফিরে এসেছেন বলে খুব ত উল্লাস হয়েছিল আপনার। এখন বুঝুন।

বিদ্রূপে তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর তার, তীক্ষ্ণ তার ওষ্ঠপ্রান্তের হাসিটুকুও। এই দ্বিতীয়বার জিতেন আমার উপর প্রতিশোধ নিল মোটর ও মোটর সড়কের প্রতি আমার পক্ষপাতিত্বের জন্য। কিন্তু তার পরেই একেবারে বিপরীত গতি ও ভিন্ন সুর তার। হাসি থামিয়ে গম্ভীর স্বরে সে বললে, তবে ব্যতিক্রমেরও ব্যতিক্রম আছে। নেপালী কুলিকেও বয়ে আনবার জন্য শেষ পর্য্যন্ত লোক যে পাওয়া গিয়েছে তা ত আর অস্বীকার করবার জো নেই।

সেই দশাসই চেহারার লোকটিকে দেখিয়ে ও কথাটা বলেছিল জিতেন। আমিও মিনিট পাঁচেক পর আবার দেখলাম তাকে। ততক্ষণে তিনিও উনানের ধারে জেঁকে বসেছেন। আলাপও জমিয়ে তুলেছেন তিনি বুড়ো দোকানীর সঙ্গে। আমরা দু'জনেই তাঁর দিকে তাকিয়েছি বুঝে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে একটু হাসলেন তিনি।



বদরিনাথ—দূরে থেকে

প্রথমেই যাঁকে অভ্যর্থনা করা উচিত ছিল তাঁকে এতক্ষণ উপেক্ষা করেছি বলে অপ্রতিভ বোধ করছি। কিন্তু আলাপ সুরু করি কেমন করে?

কুণ্ঠিত চোখ দুটি জিতেনের মুখের দিকে ফিরিয়ে তাকেই জিজ্ঞাসা করলাম, এ কে পেলে কোথায়?

পাব আর কোথায়? মাটি ফুড়ে উঠলেন উনি। বলেই একটু যেন হাসল জিতেন।

কথাকটির মতই দুর্ব্বোধ্য ঐ তার হাসিও। আমি বিহ্বল ভাবে বললাম, মাটি ফুড়ে উঠলেন মানে?

মানে ঐ যা বললাম, তাই। মাটি ফুড়ে উনি যদি না উঠে থাকেন তবে নিশ্চয়ই আসমান থেকে নেমেছেন।

আরও দুর্ব্বোধ্য হেঁয়ালি ওটি। না বুঝে আমি মূঢ়ের মত জিতেনের মুখের দিকে চেয়ে আছি দেখে সে আবার বললে, তা ছাড়া আর কি বলব আমি? আমার মাথার কি কিছু ঠিক ছিল তখন, না খুটিয়ে খুটিয়ে সবকিছু দেখতে পারছিলাম? আপনার লোক দুটি ত মালপত্র তাদের পিঠে নিয়ে চলে এল ওখান থেকে। আর বাহাদুর এদিকে খালি গায়ে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে হাউমাউ করে কাঁদছে। তখন একবার অবশ্য আমার মনে হয়েছিল যে, দিই বেটাকে অলকনন্দার খদের মধ্যে ঠেলে ফেলে। কিন্তু তা পারলাম না। অগত্যা হারামজাদাকে আমারই পিঠের উপর তুলে নিলাম।

সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। বিশ্বাসই হয় না আমার যে, জিতেন ঐ কথাটা বলেছে এবং আমি নিজের কানে শুনেছি তা। দুই চোখ

বন্ধ করে বার দুই ঢোক গিলবার পর আমি বললাম, কি বললে তুমি? তুমি পিঠে তুলে নিলে বাহাদুরকে?

তা ছাড়া করি কি আমি? জিতেন এবার যেন একটু বিরক্ত হয়েই উত্তর দিল, প্রায় একুশ দিন ত ঐ হারামজাদা আমাদের সোনা-মণি বোঝাটা ওর নিজের পিঠে নিয়ে পিছনে পিছনে এসেছে আমাদের। আজও আমাদের সেই বোঝাটা ওর পিঠে ছিল বলেই ত এই দুর্দ্দশা হ'ল ওর। তার পর ওকে ওখানে ফেলে আমি চলে আসি কেমন করে।

হাঁ করে শুনছিলাম আমি। কেবল যে আমার রসনাই তখন নির্ব্বাক হয়ে গিয়েছে তা নয়, মনও আমার বিশ্বাস ও অবিশ্বাস উভয়কেই অতিক্রম করে যেন অনুভূতির উপরের স্তরে গিয়ে স্তব্ধ হয়েছে। মুখে দূরে থাক, কোন কথা আমার মনেও আসে না আর।

কিন্তু জিতেন আমার বিহ্বল মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলল। এখন একটু যেন সলজ্জ ভাব তার। ঈষৎ কুণ্ঠিত স্বরেই সে আবার বললে, কিন্তু, মণিদা, আমি পারব কেন। শরীর আর মনের সমস্ত শক্তি একত্র করে ঐ ভাঙা জায়গাটা পার হয়ে এসেছিলাম। তার পরেই মনে হ'ল যেন আমার নাভিশ্বাস উঠছে। বুঝেছিল বুঝি বাহাদুরও—'হাঁ হাঁ—বাবুজী, বাবুজী'—বলতে বলতে ও নিজেই আমার গলা ছেড়ে দিয়ে ঝুপ করে পথের উপর পড়ে গেল। আর আমি ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলাম মূর্তিমান আশ্বাসের মত এই অতিকায় পুরুষটিকে। চোখোচোখি হতেই হেসে বললেন উনি, যহ কাম আপসে হো নহী সকতা বাবুজী, লেকিন আপ ঘাবড়াইয়ে মত—হম অপনা পিঠ পর ইসকো উঠা লেঙ্গে।

যেমন কথা তেমনি কাজ, পরক্ষণেই বাহাদুরকে নিজের পিঠে তুলে নিয়ে ছিলেন তিনি, তার পর নিয়েও এসেছেন তাকে এই গড়ুর চটি পর্য্যন্ত।

সসম্ভ্রম বিস্ময়ে লোকটির দিকে আবার ফিরে তাকালাম আমি। আর তখনই তাঁর হাতের আধ-পোড়া বিড়িটিকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে তিনিও উঠে দাঁড়ালেন।

আমাদের আলাপের সারাংশ নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। সেই জন্যই আমি তাঁকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার পূর্ব্বেই নিজের মাথাটাকে একটু ঝেঁকে মুচকি হেসে তিনি বললেন, নহি বাবুজী—আসমান জমিন কুছ নহী হায়। হম পিছেসে আ রহা থা। ইন লোগোঁকে হাল দেখকর কুছ কুছ সমঝ লিয়া ঔর অপনা পিঠপর উঠা ভী লিয়া জখমী আদমীকো।

তৎক্ষণে কৃতজ্ঞতা ছাড়াও আরও যেন কি কি দিয়ে বুকের ভিতরটা আমার কানায় কানায় ভরে উঠেছে। আমি গাঢ়স্বরে বললাম, লেকিন আপনে হম লোগোঁকে বহুত উপকার কিয়া। ক্যা হম দেঙ্গে আপকো?

কুছ নহী—উত্তর দিলেন লোকটি: আপকা কোই কাম হম নে কিয়া ভী তো নহী। কাম কিয়া বদরীবিশালকে জিন হোনে মুঝে খোরাসে তাকত দেকরকে ইস সনসারমে ভেজ দিয়া।

হাসতে হাসতেই কথা কটি বললেন তিনি, বলেই দোকান থেকে নেমে গেলেন পথের উপর, সেখান থেকে আমাদের দিকে আবার ফিরে তাকিয়ে বললেন, অব হম চলতে বাবুজী—জয় বদরী-বিশালকী।

বেশ মিষ্টি তাঁর মুখের হাসিটুকু, মিষ্টি কণ্ঠস্বরও, কিন্তু—

জিতেন তখন বলেছিল যে, লোকটি হয় মাটি ফুড়ে উঠেছে, নয় ত নেমেছে আকাশ থেকে। এখন আমার নিজের চোখের সামনেও তেমনি একটি ব্যাপার ঘটল যেন। তাঁর বক্তব্যটি ঠিক ঠিক বোঝবার পর আর দেখা পেলাম না তাঁর।

অন্ধকারে বিদ্যুদ্দীপ্তি যেন! ক্ষণপ্রভা মিলিয়ে যাবার পর চারিদিকে আবার গভীর অন্ধকার। আমাদের সমস্যা যেমন ছিল প্রায় তেমনি রয়েছে।

চালের নীচে আগুনের ধারে এসেও বাহাদুরের অবস্থার তেমন কোন পরিবর্ত্তন হয় নি। এখনও যন্ত্রণায় বিকৃত তার মুখ, থেকে থেকে চোখের জল তার দুই গাল বেয়ে ঝরে পড়ছে। ধরাধরি করে তাকে দাঁড়করাবার জন্য আবার একটা চেষ্টা করা গেল। কিন্তু ফল একেবারে বিপরীত—চীৎকার করে কান্না সুরু করল সে।

চীৎকার বন্ধ হলেই আবার সেই তার বিড় বিড় প্রলাপ সুরু হয়, হম নে ক্যা কিয়া—হায় ভগবান।

সওয়া যায় না অত বড় মানুষটার অমন শিশুর মত কান্না। আমি জিতেনের মুখের দিকে চেয়ে বললাম, কি করা যাবে এখন?

জিতেন একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে উত্তর দিল, আমরা আর কি করব—ডাক্তার যখন নেই। ওকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

তা ত সেই পিপুল কুঠিতে। সেখানে ওকে পাঠাবার জন্য বাহন চাই যে। মাথার উপর এখন একটু ছাদ আছে, এই যা তফাৎ, নইলে মৌলিক সমস্যা যেমন ছিল তেমনি রয়ে গিয়েছে।

একটু দূরে নিয়ে গিয়ে জিতেনকে বললাম কথাটা—ওভারসিয়রের ঐ মজুর দুটি ছাড়া এখন আর ত কোন লোক নেই এখানে। আরও কিছু টাকা কবুল করে ওদের দিয়েই বোঝা বওয়ানো ছাড়া আর কি উপায় হতে পারে?

কিন্তু প্রস্তাব শুনেই যেন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল জিতেন: কথা মত দশ টাকা আপনি ওদের যদি দিতে চান ত দিন। কিন্তু অতিরিক্ত আর এক পয়সাও নয়।

ঐ লোকগুলির বিরুদ্ধে অমনি বিরক্ত ও বিতৃষ্ণা আমারও মনে, কিন্তু ওদের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আমাদের উপায়ই বা কি আছে? অসহায়ের মত আমি ঐ কথাটা জিতেনকে বলতেই সে দৃপ্তকণ্ঠে উত্তর দিল, অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তারা দুই-ই এক। এই লোকগুলিকে আর এক পয়সাও দেব না আমি। তাবা

মজুরী দিয়ে পেশাদার কুলি আনব, আপনি বসুন এখানে, আমি কুলি আনতে যাচ্ছি।

আমার মাথাটা আবার যেন গুলিয়ে যাচ্ছে, বিহ্বল হয়ে আমি বললাম, তুমি আবার যাবে?

যাব বই কি। জিতেন উত্তরে বললে, ওর একটা গতি করতে না পারলে আমরাও ত নড়তে পারছি নে এখান থেকে।

কিন্তু গিয়ে সময় মত ফিরতে পারবে ত? খুব কাছে ত নয় পিপুল কুঠি।

সেখানে যাব না আমি—যাব ভেলাকুচি।

তার মানে সামনের দিকে—আবার সেই ভয়ঙ্কর পথে একটি মাত্র নয়, একাধিক ধস অতিক্রম করে! ভয়ে বুক কেঁপে উঠল আমার।

কিন্তু আমার আপত্তিতে কান দিল না জিতেন, আশঙ্কা হেসে উড়িয়ে দিল, সে বললে যে, দু'দুবার ধস অতিক্রম করবার ফলে ধস এড়িয়ে চলবার কায়দাটা শিখে নিয়েছে সে। তা ছাড়া বৃষ্টি থেমে একটু রোদ যখন উঠেছে তখন ভাঙনের সে তোড়ও হয় ত এখন নেই।

তা হয় ত ঠিক। তথাপি সংশয় যায় না আমার, সেই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার পূর্ব্বেই জিতেন হেসে বললে, আপনার বুঝি ভয় হচ্ছে যে, আবার ওদিকে গেলে আমি আর ফিরে নাও আসতে পারি? কিন্তু ভাববেন না, আমি ফিরে আসবই, আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কুলিও নিয়ে আসব।

জিতেন পথে নামতে না নামতেই বাহাদুরের কথা কানে এল আমার, ব্যাকুল স্বরে সে বলছে, আপ ভী জাইয়ে বাবুজী, আপ ভী।

কাতর অনুনয় কেবল তার মুখের কথাতেই নয়, হাত বাড়িয়ে আমার একখানা পাও চেপে ধরল সে। আবার বললে, মেরে ওয়াস্তে আপভী যাত্রা নষ্ট মত কর না—আপভী জাইয়ে ছোটা বাবুজীকা সাথ।

আমার বিহ্বল ভাব, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থা, কিন্তু জিতেন ওকথা শুনে হাসল, আবার তখনই সে ধমকও দিল বাহাদুরকে, চুপ কর হারামজাদা। নিজে ত তুই পা ভেঙে বসে আছিস, এখন অন্য কুলি না পেলে আমরাই বা যাব কেমন করে?

জিতেন চলে যাবার পর বুড়া দোকানী আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললে, ভাববেন না বাবুজী, কুলি ওখানে পাওয়া যাবে। আর একটি মাত্র কুলিও যদি পাওয়া যায় তবে তাকে নিয়েই চলে যাবেন আপনারা। নেপালীটা পড়ে থাকে, থাকুক এখানে, ও আপনিই ভাল হয়ে যাবে।

সায় দিল সেই ওভারসিয়র, ঠিক বাবুজী, এ পথে কুলি-কামিন হরদম জখম হয়। সে জন্ত যাত্রীরা কেউ বসে থাকে নাকি—না ফিরে যায়?

শুনেই বাহাদুর আবার ভেউ ভেউ করে কাঁদতে শুরু করল দেখে ওভারসিয়রটি তাকে একটি ধমক দিয়ে বললে, তুই বেটা জখম হয়েছিস তোর নিজের দোষে। তার জন্ত তোর যাত্রীকে তুই হয়রাণ করছিস কেন? হেঁটে ফিরে যা তুই, আর তা যদি না পারিস ত দু'দিন পড়ে থাক এখানে, নিজে তুই কুলি হয়েও অন্য এক কুলির পিঠে চাপবার সখ কেন তোর?

শুনে নিজের কপাল নিজে চাপড়ায় বাহাদুর, আর সেই বুলি তার মুখে, হায় ভগবান—হম নে ক্যা কিয়া!

ওরা সকলেই কিন্তু দাঁত বের করে হাসে, থেকে থেকে আবার ধমকও দেয় বাহাদুরকে।

বাহাদুরের হয়ে আমিই প্রতিবাদ করলাম, রাগ করে একবার ধমকও দিলাম ওভারসিয়রকে তার হৃদয়হীন আচরণের জন্য, কিন্তু সেজন্য লজ্জা পাওয়া দূরে থাক, উত্তরে লোকটি যা আমাকে বললে তা পরোক্ষ বিদ্রূপ আর কি—নেপালীটার শয়তানি বুঝবার মত বুদ্ধিই নাকি আমার নেই।

হয় ত সত্যই ওরা বিশ্বাস করে না যে, বাহাদুর গুরুতর ভাবে জখম হয়েছে। বুড়া দোকানীও একবার অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মতই গম্ভীর স্বরে আমাকে বললে যে, কুলিটার 'নিয়াস' হয়েছে যা এই পাহাড় অঞ্চলে অনেকেরই হয়ে থাকে।

চিকিৎসার বিধানও দিল সে—আগুনে পুড়িয়ে টকটকে লাল লোহার শিক দিয়ে ওর দুই পায়ে কয়েকবার সেকা দিলেই এখনই নাকি ও চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারে।

মাথা নেড়ে সায় দিল ওভারসিয়র। আর শুধুই তাই নয়, ঐ আসুরিক চিকিৎসা-পদ্ধতি তখনই তারা বাহাদুরের উপর প্রয়োগও করতে চায়।

হাঁ হাঁ করে বাধা দিলাম আমি—আহত, অসহায় লোকটিকে মেরে ফেলবার মতলব নাকি ওদের?

ঐ রকম একটা আশঙ্কাই আমার মনে আরও প্রবল হয়ে উঠল যখন ঐ ওভারসিয়র যথোচিত ভাবে আমাকে উপদেশ দিল বাহাদুরের পাওনাগণ্ডা চুকিয়ে দিয়ে ঐ গড়ুরচটিতেই তাকে ফেলে রেখে যেতে।

জিতেনকেও আমার ঐ আশঙ্কার কথা খুলেই বলতে হ'ল।

ঘণ্টা দেড়েক পর দুটি কুলি সঙ্গে নিয়ে ফিরে এসেছিল সে,তখন খুবই উৎফুল্ল ভাব, পথ তাকে টানছে—এগিয়ে যাবার পরিকল্পনাই তারও মনে। বাহাদুরের মজুরি তাকে চুকিয়ে দিয়ে একটি কুলির পিঠে চাপিয়ে তাকে পিপুলকুঠির দিকে রওনা করিয়ে দেবে, তার পর দ্বিতীয় কুলিটিকে নিয়ে আমরা পাড়ি দেব ভেলাকুচির দিকে, সেখানে সে নাকি আমাদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থাও করে এসেছে।

আমারও ইচ্ছা এগিয়ে যাবার, কিন্তু জিতেনের প্রস্তাবে মন সায় দেয় না আমার, একান্তে ডেকে নিয়ে সব কথা খুলে বললাম তাকে, সায় ঐ আসুরিক চিকিৎসা-পদ্ধতির খুঁটিনাটিও। তার পর বললাম, ঐ হাত-পা, না কোমর ভাঙা অক্ষম লোকটিকে নগদ কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে এ রকম জায়গায় একটা অচেনা কুলির হাতে

সঁপে দিলে সে ত হাসপাতালের পরিবর্ত্তে সোজা যমালয়েও গিয়ে উঠতে পারে।

মন দিয়ে শুনবার পর কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইল জিতেন, তার পর একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে সে বললে, ঠিকই বলেছেন আপনি—এ অবস্থায় বাহাদুরকে একলা ছেড়ে দেওয়া যায় না। পিপুলকুঠি পর্য্যন্ত আমাদেরও ওর সঙ্গে যেতে হবে।

কিন্তু ঐ কথা বলতে বলতেই দেখি যে বিরক্তিতে কালো হয়ে উঠেছে ওর মুখ। একটু থেমেই হাতের লাঠিখানা সশব্দে মাটিতে ঠুকে রীতিমত তিক্তকণ্ঠে সে আবার বললে, সেই হাওড়া ষ্টেশনেই আপনাকে বলি নি আমি—ধর্ম্মপথে সবচেয়ে বড় বাধা হ'ল কর্ত্তব্য-জ্ঞান। চুলোয় যাক আমাদের বদরীনাথ দর্শন। ঘাড়ের বোঝা আগে নামাই।

ফিরে চললাম।

নিজেরই আমার বিশ্বাস হয় না, ঘর-বাড়ী ছেড়ে প্রায় দেড় হাজার মাইল দূরে চলে এসেছি। প্রায় তিন সপ্তাহ হয়ে গেল—কেবল চলছি আর চলছি,দিন পনের কেটেছে এই হিমালয়ের গিরি-কন্দর আর আদিম অরণ্যে। শিখরের পর শিখর, উপত্যকার পর উপত্যকা পার হয়ে এসেছি। দুর্গম পথে পায়ে হেঁটেই ত চলেছি প্রায় পো' খানেক মাইল। লক্ষ্য বদরীনাথ, খুব কাছাকাছিই এসে ছিলাম সেই লক্ষ্যের—সামনে মাইল পঁচিশ মোটে পথ। তথাপি আর এগিয়ে না গিয়ে ফিরেই চলেছি।

অভাবনীয় পরিণতি। কোন কষ্টকেই কষ্ট মনে করি নি, গ্রাহ্য করি নি কোন বাধাকেই—সে দিন সকালেও প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ এবং আমার ভাঙা পায়ের ব্যথাকেও নয়। অচল হয় নি আমার সে ভাঙা পা-খানি, সে দুর্য্যোগও কেটে গিয়েছে। তথাপি যাত্রা ব্যর্থ হ'ল আমার।

দুঃসহ ঐ ব্যর্থতার বেদনা, কোন দিক থেকেই সান্ত্বনা পাইনে।

আমরা গড়ুরচটিতে উপস্থিত থাকতেই দু'টি-একটি করে দেশী ও বিদেশী পথিক দুদিক থেকেই এসে জুটছিল ঐ ছোট দোকানটিতে। যোশীমঠের দিক থেকে যাঁরা এসেছেন, আশ্বাসের বাণী শুনিয়েছেন তাঁরা—এখন তেমন আর ভাঙছে না ওদিকের পাহাড়গুলি। অতিরিক্ত মূর্ত্তিমান আশ্বাস ত আমাদেরই জিতেন—একবার নয়, চার-চারবার ঐ জায়গাগুলি নিরাপদে অতিক্রম করেছে সে। এগিয়ে গেলে আমিও নিরাপদে পার হতে পারতাম, তথাপি এগিয়ে যাওয়া হ'ল না, যেন নির্ম্মম নিয়তি ঠেলে ফিরিয়ে দিল আমাকে।

রূঢ় বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে অভিজ্ঞ পথিকের আশ্বাস মনে হয় যেন উপহাস। উপহাস করছেন স্বয়ং প্রকৃতিও। আমরা বিপরীত দিকে যাত্রা করবার সঙ্গে সঙ্গেই রোদ উঠল।

আমার মনের কাটা-ঘায়ে নুনের ছিটেও পড়ে। মাঝ পথ থেকে ফিরে যাচ্ছি শুনে সহানুভূতি প্রকাশ করে কেউ কেউ। একবার একটু ভর্ৎসনাও শুনতে হ'ল, সেই সঙ্গে একটি বক্রোক্তিও।

পথে দেখা হ'ল এক এক করে পাটনার সেই যাত্রীদলের সব ক'জনের সঙ্গেই। আবহাওয়ার উন্নতি হয়েছে দেখে পিপুলকুঠি থেকে যার যার বাহনের উপর আসীন হয়ে রওনা হয়েছেন তাঁরা। আজই সকালে বৃষ্টি মাথায় করে বদরীনাথের দিকে যাত্রা করছি দেখে আমাদের দৈহিক মঙ্গল কামনায় উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন তাঁরা। এখন তাঁরাই আবার বিমর্ষ হলেন আমাদের পারত্রিক কল্যাণের চিন্তায়। চুক্তিমত পাওনাগণ্ডা চুকিয়ে দিয়ে অনায়াসে যে কুলিকে বিদায় করে দেওয়া চলে—যেমন তাদের দীর্ঘ যাত্রাপথে একাধিক অসুস্থ কুলিকে তাঁরাই বিদায় করেছেন—তেমনি একটি কুলির পিছনে বদরীনাথকে ছেড়ে ছোটে নাকি কোন ধর্ম্মপ্রাণ যাত্রী!

ম্লানমুখে শুকনোমত একটু হেসে আমি উত্তরে বললাম, স্বয়ং বদরীনাথজীই ত ছাড়লেন আমাকে—তাঁর দোরগোড়া থেকে ফিরিয়ে দিলেন।

ঐসে মত বোলিয়ে বাঙালীবাবু।

প্রবীণ বিহারী উকিল গম্ভীর মুখে ভ্রূভঙ্গি করে মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন আমাকে, ভগবান কভী কোইকো ছোড়তে নহী হ্যায়। আপ আপনা দিলমে দেখিয়ে। শায়েদ আপহীকে মনমে দর্শন করনেকী ইচ্ছা নহী থী।

মনে জোর পাই নে প্রতিবাদ করবার। শ্রদ্ধা ভক্তি ও ঐকান্তিক আগ্রহ যে আমার মনে নেই তা আমার চেয়ে বেশী আর কে জানে—পথ চলতে চলতে ক্রমাগতই রূপ দেখে বিহ্বল হয়েছি, দেহ ক্লান্ত হলে ঘরের আরাম বা শহরের নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে আমার মন, চড়াই ভাঙতে ভাঙতে মনের চোখে যেন হাতছানি দেখেছি পিছনে ফেলে-আসা সমতল ভূমির। তার পরেও যেটুকু নিষ্ঠা ও আগ্রহ ছিল তাও অটুট আছে বলে এখন আর জোর গলায় দাবি করতে পারি নে। যে ধস বাহাদুরের পা না কোমর ভেঙেছে সে আমার মনটাকেও ত রেহাই দেয় নি—ভেঙে দিয়েছে আমার নিজের সাহস ও উদ্দমকেও। সুতরাং মন্দিরের দিকে এগিয়ে যাবার পথে আহত বাহাদুরের অক্ষম দেহটাই যে এখন একমাত্র বাধা তা আমি জোর গলায় ঘোষণা করি কেমন করে!

মনের অগোচরে পাপ নেই বলেই অপরাধীর মত ম্লানমুখে চুপ করেই ছিলাম। বোধ করি তাই বুঝতে পেরেই ভদ্রলোক আবার একটু আশ্বাস ও উপদেশ দিলেন আমাকে, জো কিয়া আচ্ছা হী কিয়া আপনে। লেকিন পিপুলকুঠিমে জাকরকে ইস কুলিকো ছোড় দিজিয়ে। ওর উহাঁসে দুসরা এক মজবুত কুলি লেকর ফির আ জাইয়ে। ইতনা নিকটতক আকরকে ভী দর্শন নহী করকে ঘর লৌট জানা কোই কামকী বাত নহী হ্যায়।

ঐ যা একটু আশা আমার ভাঙা মনের কোন এক কোণে টিম টিম করে জ্বলছিল। নিবিড় অন্ধকারে অত্যন্ত ক্ষীণ একটি

দীপশিখা যেন। কিন্তু পিপুলকুঠিতে পৌঁছতে না পৌঁছতেই তাও নিভে গেল।

শহর এলাকায় প্রবেশ করতেই জিতেনের সঙ্গে দেখা। পথের ধারেই দাঁড়িয়ে ছিল সে। আমাকে দেখেই বললে, কোন লাভ হ'ল না, মণিদা। দুর্ভোগ আরও ভুগতে হবে।

পিপুলকুঠিতে যা আছে তা একটি ডিসপেনসারি মাত্র। তাতেও ডাক্তার নেই। যাত্রীর মরশুম ফুরিয়ে আসছে বলে গুটিকয়েক শিশি-বোতল নিয়ে ঠাটটুকু যিনি বজায় রেখেছেন তিনি কম্পাউণ্ডার। আবাসিক হাসপাতাল আছে সেই চামোলিতে।

সে ত আরও প্রায় দশ মাইল দূরে।

উত্তরে জিতেন তিক্তকণ্ঠে বললে, কেবল দশ মাইল নয়, কম করেও চোদ্দ ঘণ্টার পথ। কাল সকাল আটটার আগে বাস পাওয়া যাবে না।

রোগী নিয়ে তা হলে এখানেই আমাদের রাত কাটাতে হবে?

তা ছাড়া আর উপায় কি।

শুনতে শুনতে নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে আমার। সারাটা পথ বাহাদুরের কাতরোক্তি শুনতে শুনতে এসেছি। একবার তার গায়ে হাত দিয়েছিলাম—তখন মনে হয়েছিল যে,জ্বর এসেছে তার। আর নিজের জন্যও আমার দুশ্চিন্তা কি কম! এ ত আবার সেই পিপুলকুঠি যেখানে কাল ভাল এক বাটি চা পাই নি, অসংখ্য ছারপোকার অবিরাম নির্মম দংশনের জন্য সারা রাত চোখের দুটি পাতা এক করতে পারি নি। সেই সব স্মৃতি এখন এক সঙ্গে মনে জেগে উঠল আমার। আমি রুদ্ধ নিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় থাকতে হবে—আবার সেই ধর্মশালায়?

না—মাথা নেড়ে উত্তর দিল জিতেন, অন্য একখানা ঘর পেয়েছি।

শুনে একটু আশ্বস্ত বোধ করলেও তখনই আবার বাহাদুরের কথা মনে পড়ে গেল আমার। তাকে নিয়ে কাণ্ডিওয়ালা ততক্ষণে কাছে এসে গিয়েছে। দেখি যে, পিঠের ঝুড়িতে চোখ বুজে নির্জীবের মত বসে আছে বাহাদুর। যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট তার মুখ, দুই চোখের কোণ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে মনে হ'ল।

আমি ফিরে আবার জিতেনের মুখের দিকে চেয়ে বললাম, ঘরই না হয় পাওয়া গেল। কিন্তু এটাকে নিয়ে কি করব?

জিতেন উত্তর দিল, কম্পাউণ্ডার লোক ভাল। বলেছেন যে, আমাদের ঘরে এসেই রোগী দেখে যাবেন তিনি। ঘরে যান আপনারা—আমি ডেকে আনছি তাকে।

২৩

সেই পিপুলকুঠিই ত। আজ সকালেই জিতেন বলেছিল যে, এখানে থাকার চেয়ে জাহান্নামে যাওয়াও ভাল। অথচ ঘণ্টা দশেক পরেই এ কি বিস্ময়কর পরিবর্তন তার! কি করে যে হ'ল তা আজও ভেবে পাই নে।

সত্যই ভাল ঘর। বেশ ভাল। আশাতীত রকমের ভাল। গৃহস্থ বাড়ীর ধবধবে, তকতকে শোবার ঘর। এক রাত্রির ভাড়া এক টাকা, খুশী হয়েই কবুল করেছে জিতেন।

ভাল কেবল ছাদ, দেয়াল, মেঝে নিয়ে ঐ ঘরখানাই নয়। যাদের ঘর তারাও ভাল। ভাল চারিদিকের পরিবেশও।

দিন কেটেছে তেপান্তরের মাঠে—বল্লমের ফলার মত কখনও বৃষ্টির ফোঁটা, কখনও বা হু হু করা বাতাসের খোঁচা খেয়ে খেয়ে। তেমনি তীক্ষ্ণ খোঁচার মত বুকে এসে বিঁধেছে থেকে থেকে এক একজন মানুষের মুখের কথা বা নীরব উপেক্ষা। কিন্তু এখন একেবারে বিপরীত।

আশ্রয় পেয়েছি যেন সুরক্ষিত একটি দুর্গের মধ্যে। না মন্দির এটি? ঘরে ঢুকতেই ধূপের গন্ধ পেলাম।

যার বাড়ী তিনিই সপরিবারে বাস করেন পাশের ঘরখানাতে। ধূপকাঠি পুড়ছে সেখানে। কানে এল বুঝি গৃহলক্ষ্মীর কঙ্কণ ঝঙ্কার।

আমরা সদলবলে ঘরে গিয়ে ঢুকতে না ঢুকতেই দুটি ছেলে না মেয়ে নাচতে নাচতে ছুটে এল। একটির ত পা টলছে—এতই ছোট সে। তাদের একজন আধো আধো স্বরে বললে, জয় বদরী বিশালকী। দ্বিতীয়টি বললে, এক পাই দো শেঠ।

মুখে 'হঠ জা' 'হঠ জা' বলতে বলতে পাশের ঘর থেকে বের হয়ে এলেন ঐ শিশুদের মা—মাঝবয়সী মহিলা একজন। ছোটটিকে কোলে তুলে নিয়ে তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন, বৈঠো বাবুজী, আরাম কর। বহুত তথলিব হুয়া হোগা সব কোইকে। কৌন জখম হুয়া? দেখে দেখে।

ততক্ষণে কাণ্ডিকুলি দ্বিতীয় কুলিটির সাহায্যে বাহাদুরকে ঝুড়ি থেকে নামিয়ে মেঝের উপর বসিয়ে দিয়েছে। মহিলাটি আমার হাতের সঙ্কেত বুঝে বাহাদুরের কাছে গিয়ে বললেন, ক্যা হুয়া রে? কহা পর চোট লগা? কায়সা বুরবক তো জো সামালকে চল নহী সকে?

তিরস্কারের ভাষা হলেও কোমল কণ্ঠস্বর মহিলার। অনেক দূর থেকে একটি বিস্মৃতপ্রায় সঙ্গীতের রেশ আমার কানে ভেসে এল যেন। বাহাদুরের চোখে আবার দেখি যে, ধারা নেমেছে।

ঘটনাগুলি সত্যই যে ঘটছে তা যেন বিশ্বাস হয় না আমার। তথাপি ঘটল অমনিই আরও অনেক ঘটনা।

একটু পরেই জিতেনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ঐ ঘরে এসে প্রবেশ করলেন স্থানীয় ডিসপেনসারির ভারপ্রাপ্ত কম্পাউণ্ডার। তাঁর বিদ্যা কম, কিন্তু হৃদয় আছে। আবাসিক হাসপাতাল এখানে নেই বলে একটু যেন লজ্জিতই তিনি। ভদ্র, অমায়িক ব্যবহার। যত্ন করে বাহাদুরকে তিনি দেখলেন, দেশী বুলিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানা কথা তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। তার পর জিতেনকে লক্ষ্য করে বললেন, এখন কিছু বুঝা যাচ্ছে না। তবে জ্বর যখন

হয়েছে তখন ভিতরের কোন একটা যন্ত্র নিশ্চয়ই বিকল হয়েছে ধরতে হবে। আমি তেমন কিছু করতে পারব না। কাল সকালেই আপনারা ওকে চামোলির হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবেন।

শুনে জিতেন অপ্রসন্ন কণ্ঠে বললে, সেটাও এই রকম হাসপাতালই হবে না ত?

না বাঙালীবাবু—লজ্জিত হাসিমুখে প্রতিবাদ করলেন ভদ্রলোক, লক্ষ্ণৌ-এর মত না হলেও বেশ ভাল হাসপাতাল সেটি। ঔষধ, পথ্য, শুশ্রূষা সব ব্যবস্থাই আছে সেখানে। ডাক্তারও গুণী লোক—এসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জন।

বাহাদুরের নির্দ্দেশ মত তার ব্যথার জায়গাটাতে কি একটা লোশন লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন তিনি, দু'তিনটি বড়িও দিলেন খেতে, চলৎশক্তিহীন রোগীর জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম অবিলম্বেই সরকারী মেথরের মারফতে আমাদের ঘরে পৌঁছিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজের অক্ষমতার জন্য আর একবার আমাদের কাছে মার্জ্জনা চেয়ে তবে বিদায় নিলেন তিনি।

ঔষধের পর পথ্য। সারাটা দিন না খেয়ে আছে বাহাদুর, অথচ গায়ে বেশ জ্বর। সুতরাং জিতেনকে বললাম ওর জন্য কোন দোকান থেকে একটু দুধ আনতে।

কিন্তু বারণ করলেন সেই মহিলা। এতক্ষণ কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। রোগীর সঙ্গে এবং আমাদের সঙ্গে কম্পাউণ্ডারের যেসব কথাবার্ত্তা হয়েছে তার সবই শুনে থাকবেন। আমি দুধের কথা তুলতেই তিনি মাথা নেড়ে বললেন, নহী বাবুজী। বুখার রহনেসে ভৈসীকে দুধ নহী পিলানা চাহিয়ে। উসকো দেনে হোগা সাবুদানা।

বিজ্ঞের মত কথা, গিন্নীর মত ভারিক্কি চাল! তবু বেশ ভাল লাগল তা। আমি হেসে বললাম, কিন্তু বহিন, সাবুদানা এখানে পাব কোথায়?

কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করে তিনি উত্তর দিলেন, দোকান থেকে এনে দাও, আমার ঘরেই জ্বাল দিয়ে দিচ্ছি আমি। উনান ত আমার জ্বলছেই। তোমরা আমার হাতে যদি খাও তবে তোমাদের জন্যও ডালরুটি দিতে পারি আমি।

আগের মতই কোমল, মধুর স্বর, হাসি হাসি মুখ মহিলার। মূর্ত্তিমতী সান্ত্বনা যেন। গতকাল অপরাহ্ণ থেকে আজ ঘণ্টাখানেক পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পর পর অনেকগুলি দুর্ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে আমার মনের মধ্যে যত ক্ষোভ ও গ্লানি জমেছিল সব যেন দূর হয়ে গেল এই সদ্য পরিচিতা পার্ব্বত্য রমণীর সহৃদয় ব্যবহারে। তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাৎ করে আমি বললাম, আমরা, বহিন, জাত মানি নে। তোমার হাতের ডালরুটি বদরীনাথের প্রসাদ মনে করেই খাব আমরা। কিন্তু বিনিময়ে আমি যদি কিছু তোমাকে দিই, তুমি নেবে ত?

মহিলাকে একটু বিব্রত দেখে পরক্ষণেই খুলেই বললাম কথাটা। শুধু বলা নয়, খুলে দেখিয়েও দিলাম আমার প্রস্তাবের নিরাবরণ বাস্তু রূপও।

কেবল সেই কৌটা তরকারিগুলিই নয়, চামোলির বাজার থেকে আগের দিন তেল-নুন-মশলা ইত্যাদি যা যা কিনেছিলাম সব ঝোলা থেকে বের করে দিয়ে আমি আবার বললাম, তোমার ভাণ্ডার থেকে তোমাদের জন্যও আজ আর কিছুই খরচ করবার দরকার নেই। এইগুলিই রাঁধ তুমি, অবশিষ্ট যা থাকে তাও তোমারই। ভবিষ্যতে আবার আমাদের প্রয়োজন হলে তখন কিনে নেব আমরা।

এত সব উপকরণ দেখে যত খুসী মহিলা, বিব্রত যেন তার চেয়ে অনেক বেশী। ভাল ভাল জিনিস তিনি রাঁধলে আমাদের মুখে রুচবে কিনা সেই জন্য উদ্বেগ তাঁর। আমি আশ্বাস দিলেও আশ্বাস পান না তিনি। মা, মাসী, ভগিনী, দুহিতার কথা মনে পড়ে যায় আমার।

বিস্ময়ের ঘোরটা আর কাটতে চায় না। বাইরে আসবার পর বরং আরও বাড়ছে তা।

নৈশ ভোজন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার পর চায়ের পিপাসা মেটাবার জন্য দোকানে গিয়েছিলাম। গত কালের তিক্ত অভিজ্ঞতার স্মৃতি তখনও মন থেকে মুছে যায় নি। স্বতন্ত্র একটু গরম জল সাহস করে চাইতে পারলাম না। অন্য দশ জনের জন্য তৈরী চা যত বিস্বাদই হোক না কেন, তাই খানিকটা গলাধঃকরণ করে যথাসম্ভব মৌতাত জমাবার উদ্দেশ্যে পথের উপরে দাঁড়িয়েই এক গ্লাস চা চেয়েছিলাম। কিন্তু ভরা গ্লাসটি আমার দিকে বাড়িয়ে ধরেও আমার মুখের দিকে চেয়ে দোকানী আবার টেনে নিল তা, তার পর একটু সন্দিগ্ধ সুরে সে বললে, আপহী বাবুজী কাল গরম পানী মাংগা থা না?

আমার সন্দেহ অন্য রকম—কাল অমন একটি ফরমাশ করে ছিলাম বলে আজ ফরমাশ না করেও অপমানিত হতে হবে নাকি? বিব্রত ভাবে মাথা নাড়লাম আমি।

কিন্তু না। হাওয়া ইতিমধ্যে বদলে গিয়েছে। আমাকে সঠিক ভাবে চিনতে পারবার পর দোকানী স্মিতমুখে বললে, উঠকে বৈঠিয়ে বাবুজী। হম পাঁচ মিনিটকে অন্দর আপকো অচ্ছা গরম পানী দেঙ্গে।

ভাল খাদ্যের প্রতিশ্রুতির চেয়েও অবিলম্বে সুপেয় চা পাবার সম্ভাবনা ঢের বেশী প্রীতিপ্রদ আমার কাছে, আমি পুলকিত হয়ে উঠে বসলাম।

কেবল ভাল চা নয়, নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে পরম উপাদেয় এবং উপযুক্ত নোনতা জলখাবারও পাওয়া গেল।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতেই লক্ষ্য করেছিলাম দোকানের মেঝেতে একটি জলন্ত ষ্টোভ এবং তার কাছেই খুব চটকদার একখানা শাড়ী

পরা খুব ফর্সা এক ভদ্র মহিলাকে। মাথায় কাপড় নেই এবং নাকে নাকছাবি আছে দেখে যা অনুমান করেছিলাম তার সমর্থন পেলাম ঐ ঘরের মধ্যেই শাদা পাঞ্জাবী এবং লুঙ্গির মত করে শাদা ধুতি পরা সুদর্শন একজন পুরুষকে দেখে। দক্ষিণ-ভারতীয় দম্পতি তাঁরা।

ভদ্রলোক দোকানীর ভাণ্ডার থেকে 'উপমা' প্রস্তুত করবার জন্য আবশ্যকীয় উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। নামটা আমার কানে গিয়েছিল, তার পর বস্তুরও ভাগ পেলাম আমি।

বলা নেই, কওয়া নেই, ভদ্রলোক পাতায় করে খানিকটা সেই উপাদেয় খাদ্য এনে দিলেন আমাকে। একেবারে টাটকা—তখনও ধোঁয়া উঠছে, আর খাঁটি ঘৃতের সুগন্ধ তাতে।

সৎকর্ম্ম বা অপকর্ম্ম যা আমি করেছিলাম তা একখানা বিস্কুট ঐ দোকান থেকে পয়সা দিয়ে কিনেও দাঁতের অভাবে চিবুতে না পেরে পিরিচের উপর ফেলে রাখা, তার পর শুধু চা-ই ঢক ঢক করে গিলছিলাম আমি।

ভদ্রলোক খাদ্যটুকু সসঙ্কোচে আমাকে পরিবেশন করবার পর ইংরেজীতে বললেন, আপনি অনুগ্রহ করে এটুকু খেলে আমার স্ত্রী ও আমি উভয়েই খুশী হব। যাঁর জন্য আমাদের দেশীয় এই খাদ্য আমার স্ত্রী ঐ ধার-করা ষ্টোভের উপর নিজের হাতে এই মাত্র প্রস্তুত করলেন সেই আমার মায়েরও দাঁত নেই—ঠিক আপনারই মত অসহায় অবস্থা তাঁর।

ইঙ্গিত সুস্পষ্ট হলেও লজ্জা নয়, আনন্দের রোমাঞ্চ অনুভব করলাম আমি। চমকে মুখ ফিরিয়ে দেখি যে ভদ্রলোকের মুখমণ্ডলে অনুকম্পা নয়, সশ্রদ্ধ অনুনয় ফুটে রয়েছে, অদূরে মেঝের উপর তাঁর স্ত্রী হাসিমুখে চেয়ে আছেন আমার দিকে। নিশ্চয়ই তিনিই প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন লোহার মত শক্ত বাসি বিস্কুটখানাকে নিয়ে আমার দুরবস্থা, আমি তাঁর দিকে তাকাতেই তিনিও ইংরেজীতেই বললেন, আমাদের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করবেন, আর একটুও বিব্রত হবেন না আপনি—আমাদের মায়ের জন্য এই দেখুন অনেক আছে।

যে কোন অবস্থাতেই 'উপমা' প্রিয় খাদ্য আমার, সেদিন ঐ অবস্থায় ও জিনিস ত মনে হ'ল যেন অমৃত।

দোকানে বসেই একটু আলাপ হ'ল ঐ দম্পতির সঙ্গে, তামিল ব্রাহ্মণ—চক্রবর্ত্তী রাজা গোপালাচারির সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে একটু নাকি সম্বন্ধও তাঁদের আছে। মাদুরার কাছাকাছি একটি গ্রামে পৈতৃক বাসভূমি ভদ্রলোকের, তবে চাকরি উপলক্ষ্যে নানা শহরে ঘুরে বেড়ান তিনি। কলকাতাতেও একাধিকবার এসেছেন বললেন, এবং সেই জন্য বাঙালী দেখলেই খুশী হন তিনি—কলকাতার কালীঘাট, চিড়িয়াখানা, ময়দান প্রভৃতির স্মৃতি নিয়ে কিছুক্ষণ রোমন্থন করবার সুযোগ পাওয়া যায় বলে।

তবে সে রাত্রে কেদারবদরীর স্মৃতি নিয়েই বিভোর দু'জনে। ভদ্রলোক তাই কিছু কিছু শোনালেন আমাকে। বৃদ্ধা জননীকে নিয়ে নির্ব্বিঘ্নে উভয় তীর্থই দর্শন করে ফিরতে পেরেছেন বলে যেমন গভীর পরিতৃপ্তি তাঁর মনে তেমনি দুই দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতাও। আমাদের দুর্ঘটনার খবর আমার মুখ থেকে শুনে উভয়েই সমবেদনা প্রকাশ করলেন।

আমার মনের ক্ষতের উপর আর এক পোঁচ প্রলেপ লাগল যেন। মাদ্রাজী দম্পতির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একা একাই ঘুরে বেড়ালাম কিছুক্ষণ। সেই সব পথ ঘাট, সেই ধর্ম্মশালা, সেই সব ঘরবাড়ীই এখন যেন নতুন ঠেকছে চোখে। ধর্ম্মশালার দোতলায় উঠে গিয়ে সব কখানা ঘরই এক একবার উঁকি দিয়ে দেখলাম, আজ আর তত ভিড় নেই ওখানে, বাজারেও ভিড় কম। কালকের মত হাঁড়িপানা মুখ আজ আর একটিও চোখে পড়ল না।

আমাদের নতুন বাসায় পাত্তান বহিনের কাছ থেকে কেবল যে মুখরোচক খাদ্যই পাওয়া গিয়েছে তা নয়, শুকনো কম্বলও পাওয়া গিয়েছে খান চারেক। সে রাত্রে নিদ্রা সম্পূর্ণ নির্ব্বিঘ্ন—না বৃষ্টির ফোটা, না দুর্গন্ধ, না একটি আরশোলা।

অথচ সেই পিপুলকুঠিই।

পরদিন সকালে উঠে মুখ ফুটে বলেই ফেললাম জিতেনকে ভুল হয় নি ত আমাদের? এ কি সত্যই পিপুলকুঠি?

উত্তর না দিয়ে কেবল হাসল জিতেন—তার মনেও তত আর ক্ষোভ নেই।

দিনের আলোকে গৃহস্থ বাড়ীর ঝকঝকে তকতকে ঘরখানি আরও ভাল দেখাচ্ছে। বাইরে আজ আবহাওয়াও ভাল। বৃষ্টি ত নেই-ই। তার উপর তেমন উজ্জ্বল না হলেও রোদ উঠেছে। অল্প শীতে ভালই লাগে সে রোদটুকু। প্রাতঃকৃত্যের তাগিদ মেটাবার জন্য কিছুটা পথ হাঁটতে হ'ল। তাও ভালই লাগল। শৌচাগার দেখলাম বেশ পরিচ্ছন্ন। জমাদার মোতায়েন আছে সেখানে। হাসিমুখে সেলাম করল সে। দুটি পয়সা বকশিস পেয়েই খুশীতে একেবারে ডগমগ।

মুখহাত ধোবার জন্য আরও একটু দূরে কলতলায় যেতে হ'ল। ভিড় দেখে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ পাশের কোন একটা বাড়ী থেকে যেন পরিচিত একটা সুর কানে এল আমার। সংস্কৃত মন্ত্র আবৃত্তি করে কেউ বুঝি কোন ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান পালন করছে—অথবা অমনি আবৃত্তি করছে হয় ত। আর একটু মনোযোগ দিতেই কয়েকটি কথাও বুঝতে পারলাম। তার পর সম্পূর্ণ শ্লোকটিই মনে পড়ে গেল আমার:

"মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।"

শুনেই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল মন—এ যে আমারই অন্তরের প্রতিধ্বনি। কতকটা এই রকমই ত মনে হচ্ছিল যেন আমার—এখানকার আকাশ, বাতাস, মাটি সবই আজ মনে হচ্ছিল মধুময়। বাইরে থেকে মধু গিয়ে জমেছে আমার মনে, না আমারই

মনের মধু বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে, তাই ভাবতে ভাবতে আমার আসল কাজটাই ভুলে গেলাম আমি।

তন্ময় হয়ে ভাবছিলাম, কিন্তু হঠাৎ একটা ছেদ পড়ল যেন।

চোখ, কান ইত্যাদি ইন্দ্রিয়, এমন কি মন ছাড়াও আরও কিছু বোধ হয় আমাদের মধ্যে আছে যার মাধ্যমে পারিপার্শ্বিকের কোন বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমরা অকস্মাৎ সচেতন হয়ে উঠি। তাই হ'ল আমার। চোখে না দেখেও হঠাৎ এক সময়ে খুব তীব্র ভাবে আমি অনুভব করলাম যে, কে যেন একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছে। সচেতন হয়ে সন্ত্রস্ত ভাবে চোখ দিয়ে খুঁজতে সুরু করেই পরক্ষণেই দেখতেও পেলাম তাকে।

শুধু যে তাঁর চোখ দুটি দিয়েই আমাকে দেখছেন তা নয়, হাসিমুখে দেখছেন তিনি। পুরুষ নয়, একজন মহিলা। বেশ সুন্দর মুখখানি।

বিব্রত হয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম আমি। কিন্তু সেই সহাস্যদৃষ্টি তথাপি আমাকে বিদ্ধ করছে বুঝে আবারও তাকাতে হ'ল সেই মুখখানার দিকে। আমার চোখে চোরা চাহনি, কিন্তু সম্পূর্ণ অকুণ্ঠিত দৃষ্টি সেই মহিলার। তখনও তিনি আমারই দিকে চেয়ে হাসছেন।

প্রথমে কেবলই অস্বস্তি বোধ করেছিলাম, এখন একটু বিরক্তিও জেগে উঠল মনে। কিন্তু তার তাড়নায় তৃতীয় বার মহিলার দিকে তাকাতেই বিদ্যুদ্দীপ্তির মত মনে পড়ে গেল আমার। অচেনা ত উনি নন—কাল রাত্রে উনিই আমায় উপহার দিয়েছিলেন তাঁর নিজের হাতের তৈরি 'উপমা'। সেই মাদ্রাজী ভদ্রলোকের স্ত্রী উনি। কাল রাত্রেও ত দেখেছিলাম—ঠিক এমনি সহাস্য চোখেই কালও আমার দিকে তাকিয়েছিলেন উনি।

চিনতে পারবার পর যা কিছু সঙ্কোচ আমার তা প্রথমেই তাঁকে আমি চিনতে পারি নি বলে। মাফ চাইলাম আমার সে ভুলের জন্য। উনি উদার ভাবে ক্ষমাও করলেন। তার পর ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কিছুক্ষণ কথাবার্তা হ'ল আমাদের। আমার অন্তরে সঞ্চিত মধুর পরিমাণ আরও একটু বৃদ্ধি পেল যেন।

নিজেদের বাসায় ফিরে আসতে আসতে সেই বৈদিক মন্ত্রই মনে মনে আবৃত্তি করছিলাম আমি। কিন্তু ঘরে এসে ঢুকতে না ঢুকতেই তাল কেটে গেল যেন।

জিতেনের অবস্থা দেখি একেবারে অন্যরকম।

আমাদের ঝোলাঝুলি থেকে সব জিনিস বের করে মেঝেতে চারদিকে ছড়িয়ে নিয়ে মাঝখানে চটি একখানা বই হাতে নিয়ে বসে অন্যমনস্ক হয়েছে সে। মুখের ভাব তার গম্ভীর; চোখের দৃষ্টিতে কেমন যেন একটা আবেশ।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, ব্যাপার কি জিতেন?

উত্তর না দিয়ে হাতের বইখানা সে আমার হাতে তুলে দিয়ে বললে, ঐ জায়গাটা একবার পড়ে দেখুন ত।

কনখলের শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম থেকে যে খানকয়েক প্রচার পুস্তিকা বিনামূল্যে পাওয়া গিয়েছিল তারই একখানা বই। কোন একটি ঝুলিতে এতদিন অন্যান্য জিনিসের নীচে অযত্নে চাপা পড়ে ছিল। ঝুলি উপুড় করবার পর প্রথমে মেঝেতে এবং তার পর জিতেনের চোখে পড়েছে।

এখন আমার চোখেও পড়ল। স্বামী বিবেকানন্দের বহু-প্রচলিত একটি রচনা থেকে ক্ষুদ্র একটি উদ্ধৃতি:

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"…

জানা কথাই ত। তবে তা নিয়ে জিতেনের এত ভাবনা কেন?

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। শুনে জিতেন মৃদু-গম্ভীর স্বরে বললে, বদরীনাথ শেষে এইরূপেই আমাদের দর্শন দিলেন নাকি? হাতের ইঙ্গিতে বাহাদুরকে দেখিয়ে দিল সে।

চমকে উঠলাম আমি—দেহের শিরায় শিরায় আমার অকস্মাৎ যেন অত্যন্ত উচ্চ শক্তির তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চারিত হয়েছে। এত কথাও মনে আসে ছেলেটার!

তার মন্তব্যের উত্তর না দিয়ে অদূরে বাহাদুরের পাশে হাঁটুগেড়ে বসলাম আমি। চোখবুজে শুয়ে আছে সে; জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে তার। কপালে হাত দিতেই বেশ বুঝতে পারলাম আমি যে, গায়ে তার কাল রাত্রের চেয়েও বেশী জ্বর আছে এখন। তবে আমার ছোঁয়া পেয়েই জবাফুলের মত লাল চোখ দুটি মেলে বাহাদুর কাতরকণ্ঠে বললে, বাবুজী!—

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালাম আমি। জিতেনকে বললাম, জিনিসপত্র গুছিয়ে ঝোলাঝুলি বেঁধে ফেল তুমি। আমি বাস-এর টিকেট কিনতে যাচ্ছি।

২৪

হতভাগাটাকে নিয়ে সমস্যার আমাদের অন্ত নেই।

পিপুলকুঠিতে থাকতেই বাহাদুরের প্রাপ্য টাকাটা হিসাব করে তাকে দিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু নেবে না সে। ঐ জ্বর গায়েও হাত নেড়ে, মাথা নেড়ে সে কি দৃঢ় প্রত্যাখ্যান তার—হম নে আপকী যাত্রা নষ্ট কর দী। তব রূপয়া কৈসে লে সকতা। নহী লেঙ্গে হম—কভী নহী লেঙ্গে।

বেশী পীড়াপীড়ি করতে ভরসা হয় না। ১০২° ডিগ্রী জ্বর দেখেছি তার গায়ে। বেশী উত্তেজিত হলে নতুন কোন উপসর্গ দেখা যদি দেয়—সেই আশঙ্কা।

সুতরাং টাকাগুলি আবার নিজের পকেটেই যথাস্থানে রেখে দিয়ে বিব্রতমুখে কুলির প্রতীক্ষা করছিলাম। তখন হঠাৎ পায়ে টান লাগল আমার।

টান নয়, বাহাদুরই আমার একখানা পা জড়িয়ে ধরেছে। আমি তার দিকে তাকাতেই কাতরস্বরে সে বললে, আর একটা কুলি

এখান থেকে নিয়ে তোমরা বাবুজী বদরীবিশাল চলে যাও। আমার জন্ম আর হয়রাণ হয়োনা তোমরা। কেবল একটা গাড়ীতে আমাকে তুলে দাও—তা হলেই হবে।

সেই গরুর মত ড্যাবডেবে চোথ তার; মুখের ভাবে সকাতর, সনির্বন্ধ অনুনয়। চেয়ে থাকা যায় না তার সেই মুখের দিকে।

সেই জন্তই তার ঐ কথা শুনবার পর চুপ করেও থাকতে পারলাম না। বললাম, গাড়ীতে না হয় তুলে দিলাম—কিন্তু যাবি কোথায় তুই ?

উত্তরে সে মৃদুস্বরে বললে, শ্রীনগর।

শুনে অমন অবস্থাতেও হাসি পেল আমার। বললাম, শ্রীনগরে কোথায় যাবি তুই ? রুক্মিণীর কাছে ?

মাথাটা একটু ঝেকে স্বীকার করল বাহাদুর। আমি জিতেনের মুখের দিকে চেয়ে দেখি যে, সেও মুচকি মুচকি হাসছে। আমার চোখের দৃষ্টিতেই মনের প্রশ্ন বুঝতে পেরে সে বললে, শ্রীনগরে ওর ভাবী শ্বশুরবাড়ীতে ওকে পাঠাতে পারলে সব দিক দিয়েই ভাল হ'ত। কিন্তু লোকটা যে একেবারে অচল। তার উপর এত জ্বর রয়েছে ওর গায়ে। একেবারে একা একা ওকে আমরা ছেড়ে দিই কেমন করে ?

ঐ দ্বন্দ্বই আমারও মনে। সুতরাং মৌন থেকেই সায় দিতে হ'ল। একটু পরে জিতেনই পুনরায় বললে, একজন আসল ডাক্তার দিয়ে ওকে পরীক্ষা না করালে কিছুই ঠিক করা যাবে না। সুতরাং চামৌলির হাসপাতালে ওকে নিয়ে যেতে হবেই। আর অন্ততঃ সে পর্য্যন্ত ওর সঙ্গে না গিয়ে আমাদেরও নিস্তার নেই।

তার মানে বদরীনাথ থেকে আরও দশ মাইল পিছিয়ে যাওয়া। তাই যেতে হ'ল। ফিরে আবার যখন চামৌলি গিয়ে পৌঁছলাম তখন বেলা প্রায় এগারটা। সেখানে নতুন ফ্যাসাদ আবার। প্রথমে ত হাসপাতালে যেতেই চায় না বাহাদুর; বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দেবার পর আমাদের জন্ম নতুন এক সমস্যার সৃষ্টি করল সে।

তখন একেবারে বিপরীত আচরণ তার। দুর্ঘটনা ঘটবার পর থেকেই ক্রমাগতই ত সে আমাদের অনুরোধ করে আসছিল তাকে ফেলে রেখে আমার নিজের গন্তব্য পথে এগিয়ে যাবার জন্ম। সেই লোকটিরই একি হ'ল এখন !

হাসপাতালের ঘরে মেঝের উপর আধ-শোয়া অবস্থায় দুই হাতে আমার পা জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বাহাদুর বললে, হমকো ছোড়কর মত জায়ো বাবুজী—তব তো হম মর জায়েঙ্গে।

যা আশঙ্কা করেছিলাম তা নয়। আর যা ভাবি নি এ যে তাই !

সংস্কৃতি ও সভ্যতার পীঠস্থান কলকাতায় বাসিন্দা আমি। জনকল্যাণ রাজ্যের রাজধানী মহানগরী কলকাতা। সেখানেও শক্ত রোগীকে এ্যাম্বুলান্স গাড়ীতে চাপিয়ে বড় বড় হাসপাতালের দোরে দোরে ধর্ণা দিয়েও কতবারই ত ভর্তি করতে পারি নি। এই অসভ্য পার্ব্বত্য এলাকায় ছোট একটি হাসপাতালে অপরিচিত যাত্রী আমি পারব কি এই কুলিটাকে ভর্তি করতে !

এমনি একটি আশঙ্কাই মনে ছিল আমার।

সুতরাং বাহাদুরকে উপরে সড়কের ধারেই জিতেনের জিম্মায় রেখে একাই আমি নিচে নেমে গিয়েছিলাম খোঁজ-খবর করতে। সেখানে কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমার সব আশঙ্কার নিরসন হ'ল।

ছোট হাসপাতাল, সীমিত আয়োজন। কিন্তু ওটাকে পরিচালনা করছে যে মন সেটা ছোট নয়।

রোগীর তেমন ভিড় যে ওখানে নেই সেটা নিশ্চয়ই একটা বড় কারণ। তবু সেটাকেই একমাত্র কারণ বলে মানতে পারি নে।

হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার আমার মুখ থেকে রোগীর ইতিহাস ও রোগের বর্ণনা শুনেই তৎক্ষণাৎ বললেন, নিয়ে আসুন রোগীকে, আমি এক্ষুণি ভর্তি করে নিচ্ছি।

যেমন কথা তেমনি কাজ। ডাক্তার রোগী দেখছেন, সঙ্গে সঙ্গেই কেরাণী না কম্পাউণ্ডার আমার মুখ থেকে শুনে রোগীর নাম-ধাম ইত্যাদি ভর্তির খাতায় লিখে নিচ্ছেন। লিখতে লিখতেই জিজ্ঞাসা করলেন তিনি, ওর টাকাপয়সা কিছু আছে নাকি ? থাকলে আপিসে জমা করে দেওয়াই নিরাপদ।

আমার নিজের একটি বড় সমস্যার সমাধান হয়ে গেল তাতে। বাহাদুরকে দ্বিতীয় বার আর জিজ্ঞাসা না করেই তার পাওনা সব টাকা তার নামে জমা করিয়ে কেরাণীর হাতে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম আমি।

ততক্ষণে ডাক্তার রোগীর প্রাথমিক পরীক্ষা শেষ করেছেন। স্যুট-পরা ডাক্তার রোগীর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে তাকে পরীক্ষা করছিলেন; হয়ে গেলে উঠে আমার কাছে এসে বললেন, বড় রকম কোন জখম হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। বুকটাই যা একটু খারাপ দেখছি। তা রেখে যান ওকে। এর পর যা করবার তা আমরাই করব।

আমি সসঙ্কোচে বললাম, লোকটি একে গরীব, তায় নির্ব্বান্ধব। দামী ওষুধ-টষুধ যদি লাগে—

লাগলে আমরাই দেব। হাসিমুখে বললেন ডাক্তার।

হাড়-এর ছবি-টবি যদি নিতে হয় ?

দরকার হলে সে ব্যবস্থাও আমরাই করব।

তথাপি সংশয়ের দৃষ্টিতে আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছি দেখে তিনি হেসে বললেন, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ? তা আমরা নাও যদি কিছু করি তা হলেও আপনি ওর জন্ম আর কি করবেন ? যত ভাল মানুষই আপনি হোন না কেন, ডাক্তার ত আপনি নন !

আমি লজ্জিত হয়ে বললাম, না, আপনাকে অবিশ্বাস করি নি

আমি। শুধু ভাবছিলাম যে, ওর চিকিৎসার জন্য অতিরিক্ত কিছু টাকা আপনার কাছে রেখে যাব কি না!

কোন দরকার নেই।

ডাক্তার কথা ছাড়াও তাঁর মুখের হাসি ও হাতের ইঙ্গিতে আশ্বাস দিলেন আমাকে। তার পর আবার বললেন, মোটামুটি সব ব্যবস্থাই এখানে আছে। আর যা নেই তা এই দুর্গম স্থানে হাজার টাকা খরচ করলেও সময়মত পাওয়া যাবে না। সুতরাং দার্শনিকের মনোবৃত্তি নিয়ে ওকে রেখে যান এখানে। বদরীনাথ থেকে ফিরবার পথে আশা করি যে, ওকে আপনারা সঙ্গে নিয়েই যেতে পারবেন—যদি তাই ইচ্ছা হয় আপনাদের।

অতদূর বাড়িয়ে তখন ভাবতে পারছিলাম না আমি; আর যা ভাবছিলাম তা স্বল্প পরিচয়ের ক্ষেত্রে বলাও যায় না। সুতরাং ঘুরিয়ে বললাম, দেশেই ফিরে যাচ্ছি আমরা। যে ধস দেখে এসেছি তাতে আবারও ঐ পথে চলবার সাহস হচ্ছে না।

শুনে কিন্তু অন্যান্য অনেকের মত ডাক্তারও বিস্মিত। আমার মুখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, এত কাছে থেকে ফিরে যাবেন দর্শন না করেই? কেউ কি তা করে?

উত্তরে আবারও বললাম সেই সড়কের কথাই। কিন্তু ডাক্তার আশ্বাস দিলেন, সড়কের কথা ভেবে ভয় পাবেন না। আমাদের রাষ্ট্রপতির গৃহিণী আজই এই পথে যাচ্ছেন বদরীনাথ দর্শন করতে। সুতরাং আর কি রাস্তা খারাপ থাকতে পারে? এখন সামনে এগিয়ে গেলেই দেখতে পাবেন যে, এই গাড়োয়াল জিলার সব ইঞ্জিনিয়র আর সব মজুর ভাঙা পথ মেরামত করতে লেগে গিয়েছে।

বলতে বলতে একটু যেন ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠল ডাক্তারের ওষ্ঠপ্রান্তে।

হতেও পারে। লাল সাঙ্গার লাল রং মুছে দিলে কি হবে, যে বিদ্বেষ ও বিদ্রোহের প্রতীক ঐ রং তার প্ররোচনা আসে যে বৈষম্য থেকে তা ত দূর হয় নি। কারণ থাকলে কার্য্যকে ঠেকাবে কে? স্বাধীন ভারতে রাজারাণী না থাকলেও রাজকীয় আড়ম্বর অব্যাহত রয়েছে বলে জনচিত্তের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ হয়ত এই সরকারী ডাক্তারের মনেও কমবেশী সংক্রামিত হয়েছে। কিন্তু তখন নিজের সমস্যা নিয়েই রীতিমত বিব্রত আমি। সুতরাং কথা আর বাড়ালাম না। ডাক্তারের মন্তব্যের কোন উত্তর না দিয়ে বাহাদুরের কাছে গেলাম বিদায় নিতে। আর তখনই আমি চলে যাচ্ছি শুনেই সে আবার আমার দুই পা জড়িয়ে ধরে আর্ত্তকণ্ঠে বলে উঠল, আপ তো মেরে মাতা-পিতা হ্যায়, বাবুজী। মুঝকো ছোড়কর মত জায়ো।

আবার যেন ধস নামছে আমার চোখের সামনে। আবার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থা আমার। কিন্তু জিতেন দেখি হাসছে। আমি বিব্রতভাবে তার মুখের দিকে তাকাতেই সে হাসতে হাসতেই বললে, এটা প্রকৃতির পরিশোধ। এতদিন যে বেশ এড়িয়ে এসেছেন আপনি, এই তার প্রতিফল। পিতা-মাতা হবার দায় যে কি তা বুঝুন এখন।

ডাক্তারও দেখলাম যে হাসছেন। তিনিও একটু খোঁচা দিয়েই বললেন, কত যাত্রীর কত কুলিই ত এ পথে চলতে চলতে জখম হয়। আর সব যাত্রীই পথেই তাদের ফেলে রেখে অন্য কুলি ভাড়া করে এগিয়ে যায়। আপনারা যখন সাধ করে উলটো আচরণ করেছেন তখন ও বেটা আপনাদের পেয়ে বসবে না ত কি!

তবে তার পরেই তিনি স্বয়ং এবং হাসপাতালের আর সব লোক বাহাদুরকেও বুঝাতে আরম্ভ করলেন। নানাভাবে তাঁরা আশ্বাস দিলেন ওকে। ডাক্তারের নিজের মুখের কথা এবং চোখের ইঙ্গিতে আমার সমস্যার সাময়িক একটা সমাধানও পেয়ে গেলাম আমি। সুতরাং বাহাদুরের দৃষ্টি এড়িয়ে তাকে আমি বললাম, আমরা একেবারে চলে যাচ্ছি নে বাহাদুর—উপরে যাচ্ছি নাওয়া-খাওয়ার জন্য। তা হয়ে গেলেই ফিরে আসব আবার।

বাহাদুরের দৃঢ় মুষ্টি থেকে আমার পা-খানিকে ছাড়িয়ে নিয়ে উপরে উঠে এসেছিলাম। কিন্তু আমার নিজের মন আমাকে মুক্তি দিচ্ছে কোথায়?

আধ ঘণ্টা পরে পরেই বাস ছাড়ছে। যেদিকে খুশী যেতে পারি এখন। তথাপি টিকেট ঘরের কাছেও যেতে পারলাম না।

জিতেনের মনেও বুঝি ঐ একই দ্বন্দ্ব চলছিল। কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে পায়চারি করবার পর সে আমার কাছে এসে বিরক্ত কণ্ঠে বললে, ভালই হ'ত ওকে সোজা শ্রীনগরে নিয়ে গেলে—ওর আপন জনের কাছে ওকে ফেলে রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে চলতে পারতাম আমরা।

তাতেই মনে পড়ে গেল আমার যে, দিন দুই পূর্ব্বে এই চামোলিতে বসেই রুক্মিণীর পিতার নাম-ঠিকানা আমার নোট বইতে টুকে নিয়েছিলাম আমি। তাড়াতাড়ি বই খুলে দেখলাম যে, ঠিকই আছে লেখাটা। তাই জিতেনকে দেখিয়ে বললাম, এই লোকটিকে একখানা চিঠি লিখে সব খবর জানিয়ে দিলে হয় না? খবর পেলে সে আসতেও পারে এখানে।

একটু দেরিতে উত্তর দিল জিতেন। চিন্তিতমুখে আবারও কিছুক্ষণ পায়চারি করবার পর সে গম্ভীরস্বরে বললে, তা হলে চিঠি নয়, 'তার' করতে হবে। আর বাস ভাড়াটাও সেই সঙ্গে পাঠিয়ে দিলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়।

প্রস্তাবটি আমার কাছেও ভালই লেগেছিল। তদনুসারে পোষ্ট আপিসের কাজটা সেরে আসবার পর জিতেন উৎফুল্ল হয়ে বললে, এইবার বিবেকের কাছে বেকসুর খালাস আমরা। এবার চলুন এ পিপুলকুঠির দিকেই। ওখান থেকে নতুন একটি কুলি নিয়ে কাল সকালে আবার বদরীনাথের পথে যাত্রা করা যাবে।

কিন্তু 'উত্থায় হৃদি লিয়ন্তে'। আবারও বাধা পড়ল।

ভাঙা পথ মেরামত হয়েছে খবর পেয়েছি। বাহাদুর কুলির যে অচল দেহটা বোঝা হয়ে আমাদের পঙ্গু করেছিল তাকেও কাঁধের উপর থেকে নামাতে পেরেছি। বিবেকের বাধাও আর নেই এবং আমার নিজের ভাঙা পায়ের ব্যথাটাকেও অতিক্রম করবার মত জোর এসে গিয়েছে আমার মনে। তথাপি দেখি যে পথ বন্ধ। এবার বেঁকে বসল আমাদের শূন্য পকেট।

দু'জনে হিসাব করে টাকা এনেছিলাম। কিন্তু হিসাবের অতিরিক্ত অর্থ ইতিমধ্যেই খরচ করে বসে আছি। যে কটি টাকা অবশিষ্ট আছে তা ঐ চামৌলি থেকেই কলকাতায় ফিরে যাবার জন্যও যথেষ্ট নয়। এখন আবার দ্বিতীয় একটি কুলি নিয়ে অতিরিক্ত দিন সাতেকের জন্য সামনের অনিশ্চিত পথে যাত্রা করব কোন ভরসায়!

অল্প টাকা বার বার গুণলে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় কি না তাই পরখ করলাম কিছুক্ষণ। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। নিরাশ হয়ে জিতেনের মুখের দিকে চেয়ে বললাম, ও সাধটা এবারের মত শিকেয় তুলেই রাখতে হবে, কারণ ফুরিয়ে গিয়েছে।

টাকা না থাকার যে যুক্তি তা একেবারে অকাট্য। জিতেনের মত বেয়াড়া লোকও এবার আর তা খণ্ডন করতে চেষ্টা করলে না। উত্তরে বদরীনাথ পর্ব্বতশ্রেণীর দিকে কিছুক্ষণ উদাস, বিষন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবার পর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে সে বললে, তবে ফিরেই চলুন। কোন পথ ধরবেন—হরিদ্বার না কোটদ্বারের?

দুটিই বাস-এর পথ। তবে চামৌলি থেকে গাড়োয়াল জিলার রাজধানী পৌড়ি হয়ে কোটদ্বার রেল ষ্টেশনে যাবার পথ অর্দ্ধেকেরও বেশী নতুন হবে জেনে সেই পথে ফিরে যাওয়াই ঠিক করলাম আমরা। তবে যাত্রা করবার পূর্ব্বে আর একবার বাহাদুরকে দেখে আসতে হবে।

২৫

ফিরেই চলেছি—কোটদ্বারের দিকেই।

আজ আর একটুও অনিশ্চয়তা নেই, কুহকিনী আশার বিদ্যুদ্দীপ্তি মনের দিগন্তে একবারও ফুটে উঠছে না। মনের মধ্যে আজ নির্ম্মম সত্যের কঠিন উপলব্ধি—যাত্রা আমার ব্যর্থ হয়েছে—দর্শনের পূর্ব্বেই বদরীনারায়ণের মন্দিরের দিক থেকে একেবারে বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে দ্রুতগামী মোটর গাড়ীতে চড়ে সত্য সত্যই ঘরের পানে ফিরে চলেছি এখন। জীবনের এই অপরাহ্ন বেলায় ভবিষ্যতের অন্ধকার গর্ভেও আশার হাতছানি দেখতে পাই নে। যে দুর্গম পথ আর ব্যয়সাধ্য ভ্রমণ! অসম্পূর্ণ যাত্রা সম্পূর্ণ করবার জন্য আর কি কোন দিন এই হিমালয়ে আসতে পারব!

এক একটি শৃঙ্গ, এক একটি উপত্যকা পার হই, আর মনে হয় যে, জন্মের মতই পিছনে ফেলে চললাম তাকে।

তবু মনে আজ ক্ষোভ নেই। সেই বোবা কান্নাটা বুকের ভিতর থেকে কণ্ঠ পর্য্যন্ত আজ আর ঠেলে ঠেলে উঠছে না।

গাড়ীতে চাপবার পূর্ব্বে বাহাদুরকে আবার দেখে এসেছি। চোখের দেখা বই ত নয়—তখন ঘুমিয়ে ছিল সে। পা টিপে টিপে তার শয্যার কাছে গিয়ে দুদণ্ড তার মুখখানি দেখেই আবার পা টিপে টিপেই বের হয়ে এসেছি। ভালই হয়েছে তাতে—তার কান্না আর কানে শুনতে হয় নি। আর ভালই দেখেছি তাকে—বেশ শান্তিতেই ঘুমচ্ছিল সে। ডাক্তারও বলেছেন যে, সে ভালই আছে। হাড়গোড় নাকি ভাঙে নি—পায়ের কয়েকটি মাংসপেশী অকস্মাৎ সঙ্কুচিত হয়ে সেদিন ঐ বিভ্রাট ঘটিয়েছিল, তার সঙ্গে আছে 'শক' আর একটু নিউমোনিয়া—এই পেনিসিলিনের যুগে যাকে রোগ বলেই বিবেচনা করা হয় না। দৃঢ় বিশ্বাসের গভীর সুরে ডাক্তার আশ্বাস দিয়েছেন আমাকে যে, তিন-চার দিনের মধ্যেই বাহাদুর সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যাবে।

কিন্তু মনে যে আমার ক্ষোভ নেই, ঐ আশ্বাসই তার একমাত্র কারণ নয়। আমার হৃদয়ের পাত্রটি আরও অনেক উপাদানে পূর্ণ হয়ে আছে বলেই ক্ষোভ আর সেখানে প্রবেশ করবার পথ পায় নি।

আশ্চর্য্য! দেবদর্শন যে আমায় হয় নি তাই যেন এখন মানতে চায় না আমার মন।

না-ই বা পেলাম ছোট একটি মন্দিরের মধ্যে চতুর্ভুজ বিগ্রহের দর্শন। বিরাট বদরীনাথ ত আমাকে বিমুখ করেন নি। পথ চলতে চলতে দূর থেকে অনেকবারই দেখেছি তাঁর ঝলমল কিরীট-কুণ্ডল, তাঁর প্রশান্ত বয়ানে প্রসন্ন নয়নের স্নিগ্ধ দৃষ্টি। পৌড়ি শহরে বাস থামবার পর আরও একবার দর্শন দিলেন বদরীবিশাল।

নির্ম্মল প্রভাতে তরুণ সূর্য্যের সোনালী কিরণে উদ্ভাসিত দেখলাম অনেক দূরে অর্দ্ধবৃত্তের আকার এবং প্রায় রামধনুবর্ণের বোধ করি অর্দ্ধেকটা হিমালয়ই—চৌখাম্বা, ত্রিশূল এবং আরও কয়েকটি দুর্জ্জয় শৃঙ্গকে পাশে নিয়ে কেদারবদরী উভয় তীর্থই যেন আমাকে দর্শন দেবার জন্যই বিপুল গরিমা ও বিরাট মহিমা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

মন্দির পর্য্যন্ত যেতে পারলেও আমার ছোট ছোট দুটি চশমা-পরা চোখ দিয়ে আর বেশী কি দেখতাম?

আর কেমন করে বলি আমি যে, তরঙ্গিত হিমালয়ের শিখরে শিখরে কেবল সুদূরের বিস্ময় হয়েই আমাকে তিনি দর্শন দিয়েছেন? খুব কাছে থেকেও হিমালয়ের যে অপরিমেয় ও অতুলনীয় শোভা দেখলাম দিনের পর দিন, তা কি ছিল কেবলই গাছ, মাটি, পাথর?

ইতিপূর্ব্বে দেশ-বিদেশে কত দৃশ্য, কত মানুষই ত দেখেছি। খুব কাছে থেকে দেখলেও তা ছিল যেন রেলগাড়ীতে চলতে চলতে দেখা—চোখের সামনে ক্ষণিকের জন্য ফুটে উঠেই মিলিয়ে গিয়েছে তা, কিন্তু বিগত প্রায় তিন সপ্তাহকাল এই হিমালয়েরই অসংখ্য শিখরে-কন্দরে, উপত্যকায়-অধিত্যকায়, অরণ্যে-উপবনে, শিলায় ও সলিলে দুই চোখভরে যা দর্শন করেছি, তার কিছুই, এই এত দিন পরেও, কৈ হারিয়ে বা ফুরিয়ে যায় নি ত!

আগে কোন দিন যা অনুভব করি নি, এ পথে তাই যে

আমার সাক্ষাৎ উপলব্ধি। দূরে ঐ আকাশচুম্বী ত্রিশূল শৃঙ্গের মতই এও এক অনন্ত বিস্ময়, আর এ ত সুদূরের নয়, আমার অন্তরেই যে অধিষ্ঠান এর।

এবার আমার অবিরাম গতিপথে চঞ্চল ইন্দ্রিয়সমূহের অত্যন্ত সীমিত শক্তির আওতার মধ্যে হয়ত ক্ষণিকের জন্যই ধরা পড়েছিল যত দৃশ্য, যত ধ্বনি, যত রস তার সবই ত দেখছি যে স্থান-কাল-পাত্রকে অতিক্রম করে আমারই মনের মধ্যে অক্ষয় হয়ে রয়েছে। অবচেতন মনে ম্রিয়মান স্মৃতির এক বিশৃঙ্খল স্তূপ নয় তা। টুকরো টুকরো দৃশ্য, বিচ্ছিন্ন ঘটনা, সাময়িক সুখ-দুঃখের মৃদু হিল্লোল ইন্দ্রিয়ের সঙ্কীর্ণ দ্বারপথে, আমার অন্তরের মণিকোঠায় প্রবেশ করে ফুল হয়ে ফুটেই কেবল উঠে নি, না জানি কোন নিপুণ মালাকরের কোমল অঙ্গুলির যাদুস্পর্শে অদৃশ্য এক স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত হয়ে নয়ন-মনোহর বিচিত্র একগাছা মালা হয়ে বিরাজ করছে সেখানে। মধু-মত্ত ভৃঙ্গসম আমার লুব্ধ মনের এখন পরম আশ্রয় তা—অনন্ত বিচরণক্ষেত্র।

সেই সব চড়াই-উৎরাই, নিবিড় অরণ্য, কল্লোলিনী-স্রোতস্বিনী, আকাশচুম্বী পর্ব্বতমালা, অমল-ধবল বরফের তরঙ্গায়িত মহাসমুদ্র, অসীমের সাদর আমন্ত্রণ, রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্য ও জীবনের লীলায়িত হিন্দোল—এখনও চোখ বুজলেই সবই ত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

রূপ নয়, অপরূপও নয়। রূপে রূপে প্রতিরূপ যাঁর, তিনিই ত জীবনের দেবতা বদরীনারায়ণ। নিজের অজ্ঞাতে প্রতি পদ-ক্ষেপেই জাগ্রত বদরীনাথকে চোখভরে দর্শন করেছি বলেই ত রূপ-রস-শব্দ-গন্ধের এত প্রাণময় স্মৃতি আমার মনে।

এই তাঁর শাশ্বত বিলাসক্ষেত্রে তিনিই আমাকে দেখিয়েছেন সীমার মাঝে অসীমের, নিসর্গের কোলে অনৈসর্গিকের অভিব্যক্তি। তাই এখনও চোখ বুজলেই দেখছি সেই সব বালক-বৃদ্ধ-নরনারীকেও, যাঁরা আমার যাত্রাপথে তাঁদের সাময়িক সাহচর্য্য ও ক্ষণিকের প্রীতির সঙ্কীর্ণ বাতায়নপথেও মানুষের নারায়ণের বিপুল মহিমা বার বার আমার মনের চোখের সামনে প্রকাশ করে দেখিয়েছেন। যে সৌরভ, যে হাসি, যে বেদনা পিছনে ফেলে এলাম, মনে করেছিলাম তার সবই ত এখন দেখছি আমার মনের মন্দিরেই অক্ষয় হয়ে বিরাজ করছে। রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিপূর্ণ আমার স্মৃতির মধুচক্র। ক্ষোভ সেখানে ঠাঁই পাবে কোথায়?

"যখন নয়ন মুদিয়া থাকি, অন্তরে গোবিন্দ দেখি"—বলে-ছিলেন বৈষ্ণব মহাজন। অতবড় দাবি করতে পারি নে আমি। তবে দর্শন হ'ল না বলে কোন ফাঁকে মনে আমার একটু ক্ষোভ যদি জাগেও তা হলেও সান্ত্বনার অভাব হয় না। আমার মনের বীণার তারে একালের মহাজন মহাকবির নতুন সুর তখনই বেজে ওঠে। একবার ওষ্ঠপ্রান্তেও উছলে উঠল তা।

পৌড়ি ছেড়ে আসবার পর জিতেনকে বিষণ্ণ দেখে তার এক-খানা হাত ধরে আমি বললাম:

"জীবনে যত পূজা হ'ল না সারা
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা।"

সমাপ্ত

সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ স্মরণে

শ্রীপুষ্প দেবী

কিশোরী জীবনে তোমার লেখাটি ছিল মোর মনোরম
অভিনব তব পুত ও লেখনী পাঠকের প্রিয়তম,
তব লেখনীতে আঁকা অগ্রজ মহিমায় ভরা ছবি
জনকের মত উজল মুরতি নিষ্প্রভ শশী রবি।
ফল্গু ধারার সম অন্তরে স্নেহধারা সদা ঝরে
ভাই-বোনদের বুকখানি তুমি আলোয় দিলে যে ভরে,
পরিহাস তব প্রলেপের মত জুড়াইয়া দেয় ক্ষত
স্নেহ মমতার মূর্ত্ত প্রতীক হেরি মাথা হয় নত।
পড়ি রাজপথ দিকশূল তব কাঁদিয়াছি কত দিন,
শশীনাথ আর অমূল্য তরুতে বাজালে মোহন বীণ।
বিদুষী ভার্য্যা তব লেখনীতে দিল নিজ পরিচয়
শিক্ষায় তার হবে উন্নতি অবনতি কভু নয়।

শিক্ষা লভিয়া নারীর মহিমা ম্লান কভু নাহি হবে
জননীর রূপে প্রেয়সীর রূপে চির আলোকিত রবে
ছদ্মবেশীর প্রতি আখরেতে সুনিপুণ তব তুলি
নির্মল সেই হাস্য ধারায় গিয়াছি আপন ভুলি।
অভিজ্ঞানের চিহ্ন তোমার পাঠকের বুকে আঁকা
আদর্শ তব মঙ্গল সাথে কল্যাণ মধু মাখা।
দরশ তোমার মেলেনি জীবনে তবুও আমার মনে
অগ্রজ রূপে চির অমলিন ভকতি শ্রদ্ধা সনে।
চলে গেলে আজ ছাড়ি জগতেরে তবুও অমর তুমি
শুধু আমি নয় তোমার তরেতে কাঁদিছে বঙ্গভূমি।

মৌন অতীত

শ্রীসমর বসু

আমাকে অনুরোধ করেছ একটা গল্প লিখতে—যে গল্পের নায়িকা হবে তুমি। রবি ঠাকুরের সাধারণ মেয়ে মালতী ঠিক এই ধরনের অনুরোধ করেছিল শরৎবাবুকে। নিজের কথা অনেক বলেছিল মালতী, কেমন করে গল্প লিখতে হবে তাও বলে দিয়েছিল। তুমি কিন্তু সে সব কথা কিছুই বল নি। শুধু অনুরোধ জানিয়েছ, তোমাকে নিয়ে যেন একটা গল্প লিখি.

কিন্তু কতটুকুই বা তোমাকে আমি জানি? কতদিনই বা তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়? তবু ঐ অপরিচয়ের আড়ালে যেটুকু অজানা সেইখানেই আমার দায়িত্ব কম। আর সেইখানটুকুতেই তোমাকে আমি বাঁচিয়ে রাখব।

দুপুরের একটা জনবিরল ট্রামের মধ্যে তোমাকে আমি প্রথম দেখি। আমার সেই দেখাটাকে আবিষ্কারও বলতে পার। আমি আবিষ্কার করি মাথা নীচু করে বসে-থাকা একটি-মেয়েকে। হাতে কতকগুলো বই আর খাতা। খাতা থেকে জানতে পারি মেয়েটির নাম সুজাতা। পড়ে ইউনিভার্সিটিতে। বোধ হয় বাঙলা।—চোখে তার পুরু লেন্সের চশমা। অধিক লেখা-পড়া করার কুফলের সাক্ষী। এমন একটি মেয়ের হাতে দেখলাম আমারই লেখা একটা উপন্যাস সযত্নে রক্ষিত। এমন মেয়েও উপন্যাস পড়ে। আর সে উপন্যাস আমারই লেখা। ভাবলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পড়া যারা পড়ে তাদের যখন আকৃষ্ট করতে পেরেছে আমার লেখা, তখন নিশ্চয়ই সে লেখা…। যাক নিজের কথা আজ আর বলব না। তোমার কথাই বলি।

সুজাতার চশমা-খোলা চোখ আমি কোন দিনই দেখি নি। দেখলে হয়ত তার মনোরাজ্যের অনেক খবরই পেতে পারতাম। কিন্তু তার হাতের লেখা দেখেছি। দেখেছি বেশে-বাসে তার রুচিবিদগ্ধ পারিপাট্য, আর লক্ষ্য করেছি তার কথা বলার ভঙ্গি।

ট্রামের মধ্যেই সুজাতা যখন জানতে পারল যে, তারই পাশে বসে আছে ঐ উপন্যাসটির রচয়িতা, তখন লাল হয়ে ওঠা তার সমস্ত মুখমণ্ডলে যে অন্তর উচ্ছ্বাস উদ্ভাসিত হয়ে উঠল—অত্যন্ত প্রযত্নে তাকে অবদমন করে সে শুধু হাত তুলে নমস্কার জানাল। গোধূলির রাঙা আকাশ যেন কাল হয়ে উঠল হঠাৎ-ছেয়ে আসা নিবিড় মেঘে, আর সেই আকাশে নেমে এল সন্ধ্যা।—ঈষৎ লজ্জায় আনত শিরে।

বুঝতে পারলাম, অন্তরে সুজাতা কত কোমল আর বাইরে তার কি নিষ্ঠুর কাঠিন্য। সুজাতা কী এমন পরিবেশে মানুষ হয়েছে যেখানে আন্তরিক স্বাভাবিকতা বাইরের শাসনে ক্ষুণ্ণ, ক্ষুব্ধ। দেহে যার ঐ অটুট স্বাস্থ্য, ঠোঁট দুটো তার অত বিবর্ণ কেন! পড়তে ভাল লাগে বলে পড়ছে মেয়েটা—নাকি জোর করে ওকে পড়ানো হচ্ছে! এতখানি স্বাতন্ত্র্য, এতখানি দার্ঢ্য—সে কি ছাত্রীতে সম্ভব

আমাকে আশ্চর্য্য করে দিয়ে একটা ছোট 'নোট-বুক' বার করল সুজাতা। জিজ্ঞেস করল—আপনার ঠিকানা?

বললাম—একটা বারোয়ারী মেসে থাকি রাত্রে, সকাল-সন্ধ্যায় ছেলে-পড়াই, সারাদিন ঘুরে বেড়াই এখানে সেখানে —পত্র-পত্রিকার আপিসে আপিসে—কিংবা পাবলিশার্সদের স্বল্পপরিসর 'নিকেতনে'। ঠিকানা বলতে যা বোঝায় সে রকম আমার কিছু নেই। তা ছাড়া ঠিকানা কেন চাইছেন সেটাও ত আমার জানা দরকার।

—নিশ্চয়ই। দৃঢ় জবাব সুজাতার,—লেখকদের ঠিকানা সংগ্রহ আমার একটা বাতিক। কি জানি, কাকে কখন কি প্রয়োজন হয়।—একটা মিষ্টি হাসি ওর ঠোঁটে লেগেছিল আর চোখে ছিল গভীর স্নিগ্ধতা। কিন্তু এতটুকু কৌতূহল ছিল না কোথাও, ছিল না এতটুকু আগ্রহ।

বললাম—চিঠি যদি দেন, পাবলিশার্সদের ঠিকানায় দেবেন—আমি পাব। কিন্তু দেখা যদি করতে আসেন হয় ত দেখা মিলবে না। অল্প সময়ের মধ্যেই ওর সঙ্গে কেমন যেন অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলাম। ও শুধু আমার পার্শ্ববর্তিনী সহ-যাত্রিণী নয়, তার চেয়েও যেন আরও কিছু বেশী। উপন্যাসের সেতু বেয়ে ও যেন আমার অনেক কাছে এসে গেছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ উঠে পড়ল সুজাতা। —নমস্কার, এইখানেই আমি নামব।

সুজাতা নেমে গেল। হাওয়া লেগে ওর চুলগুলো উড়ছিল। আঁচলটা সরে যাচ্ছিল—আর আমি তাই দেখছিলাম, যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ।…সুজাতা পথ হাঁটে না, বোধ হয় হাঁটছে না। স্থির, শান্ত! রাস্তার পাশে যেন

একটা শ্বেত পাথর। একজন দক্ষ ভাস্করের হাতে গড়া উর্ব্বশী—মোনালিসা!—কিংবা অন্য কিছু!

মনে হ'ল, কিছু যেন ফেলে গেছে ও ভুল করে, আর সেটা যেন আমিই কুড়িয়ে পেয়েছি। হয় ত ও আবার ডাক দেবে—হয় ত আবার দেখা হবে ওর সঙ্গে।...

দেখা হ'ল সীমাদের বাড়ী। সীমারই আহ্বানে যেতে হয়েছিল অন্য সমস্ত কর্ম্মসূচী বর্জ্জন করে—একটি শনিবারের সন্ধ্যায়। সীমা আমার ভাগ্নী, বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট। ওর দাদা-বৌদি সেটা মানে, ও কিন্তু তা মানতে চায় না। ও বলে—পাঠক আর লেখকদের মধ্যে যে সম্বন্ধ সেটা বন্ধুত্বের, বিশেষ করে সে পাঠক যদি সমালোচক হয়। সুতরাং পরিবারে আমার স্থান যেখানেই হউক না কেন, লেখক হিসাবে আমি ওর বন্ধু।

সীমার সঙ্গে সুজাতার কবে থেকে আলাপ তা আমার জানার কথা নয়। সীমা ইউনিভার্সিটিতেও পড়ে না। তাই সুজাতাকে ওদের বাড়ী দেখে আমার বুঝতে দেরী হ'ল না যে ঘটনাটি নেহাত দুর্ঘটনা নয়, পূর্ব্ব-পরিকল্পিত।

পড়ার ঘরে মজলিস বসল। আলোচ্য বিষয় আমার সেই উপন্যাস। সীমা যে 'বি-এ' বাংলা অনার্সের ছাত্রী, এইটাই সে প্রমাণ করতে লাগল যুক্তির জাল বিস্তার করে আমার উপন্যাসকে নস্যাৎ করে দিয়ে। এম-এ ছাত্রী সুজাতা বললে, তোমার বিচার একদেশদর্শী। ওদের অ্যাকাডেমিক তর্কে-বিতর্কে আমার যে অংশটুকু ছিল সেটা শ্রোতার। তবুও আমার কাছ থেকে মত চাওয়া হ'ল। বললাম—সাহিত্য-সমালোচনায় সমকালের বাধা মস্ত বড় বাধা। সুতরাং ও প্রসঙ্গ রেখে অন্য আলোচনা কর।

হাসি চাপবার জন্য মুখ মুছতে সুরু করল সুজাতা। আর সীমা রইল গম্ভীর হয়ে—এত আয়োজন বুঝি ব্যর্থ হ'ল ওর।

সীমাকে চিনি, কিন্তু সুজাতাকে সেদিন নতুন করে চিনলাম। সারাজীবন ধরে পাশাপাশি থেকেও মেয়েদের নাকি চেনা যায় না। অথচ দেড় ঘণ্টার মধ্যে সুজাতাকে চিনে নিতে কিছুমাত্র অসুবিধা হ'ল না। কিন্তু সত্যই কি চিনতে পেরেছি?—আলো দেখেছি সত্যি, কিন্তু সে আলো জ্বলছে, না পুড়ছে।

সুজাতা হাসে, অনর্গল কথা বলতে পারে। উচ্ছ্বাস, চঞ্চলতা, প্রাণপ্রাচুর্য্যে উদ্দাম হয়ে উঠা সবই তার পক্ষে সম্ভব। কিন্তু সুজাতার হাসি যে দেখেছে, যে লক্ষ্য করেছে তার বাক-ভঙ্গি, সে-ই বুঝতে পারবে, কত কাছে থেকেও সুজাতা কত দূরের। সুজাতা শোভাময়ী, কিন্তু সে শোভা দূর-দিগন্তের। কল্লোলিনীর কলরব সমুদ্রের প্রশান্তিতে শুধু গম্ভীর নয়, কেমন যেন ধ্যাননিমগ্না!

সুজাতার এই দ্বৈত সত্তার পারস্পরিক সংগ্রাম হয়ত অবিরাম চলেছে তার অন্তরে, কিন্তু বাইরে সুজাতা শান্ত, সমাহিত, স্থির, মৌনী। ও যেন একটা শেষ-হয়ে-যাওয়া কবিতা। কথা যা ছিল ফুরিয়ে গেছে—যা আছে তা শুধু ভাববার।

তা হলে সুজাতার জীবন কি অভিশপ্ত! যে জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ নেই, যে জীবন সামনের দিকে চলে না, একটি সীমার মধ্যে নিয়তই যা আবর্ত্তিত হতে থাকে, যেখানে বৈচিত্র্যের প্রবেশ নিষেধ—সে জীবন অভিশপ্ত বৈকি!

কিন্তু সুজাতা অন্য কথা বলে। ও বলে বাহ্যিক উচ্ছলতায় জীবনের কথা ঢাকা পড়ে যায়। প্রত্যেক মানুষেরই জীবনের একটা বক্তব্য থাকা উচিত, জীবনের মধ্যেই যা ক্রমপ্রকাশ্য।

কথা বললে সুজাতার শুধু ঠোঁট নড়ে, চোখ নাচে না, মাথা দোলে না। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোথাও কোনখানে এতটুকু ঢেউ তোলে না। আর তাতেই বুঝতে পারা যায় ও যা বলে তাতে খাদ নেই। নিখাদ সোনা বেশী ঝকমকে হয় না।

—সীমার সঙ্গে আপনার পরিচয় হ'ল কি করে!—জিজ্ঞেস করি।

—সীমাকে জিজ্ঞেস করুন না,—উত্তর দেয় সুজাতা। ফুল থেকে ঝরে-পড়া পাপড়ির মত আশ্চর্য্য নৈঃশব্দে বেরিয়ে আসে কথাগুলো ওর পাতলা ঠোঁট দুটো থেকে।

—কেন, আপনার বলতে বাধা কি?

—বলতে বাধা যাদের থাকে—বাধার যে কোনও কারণও তারা দেখাতে পারে। সুতরাং ও উত্তরে আপনার আসল উত্তর মিলবে না।

—তবে কি আমি মনে করব, প্রশ্নটা আপনাকে করা আমার উচিত হয় নি?

—ব্যক্তিগত প্রশ্ন না করাই উচিত—এটা আপনার অজানা থাকার কথা নয়। তবুও আপনি যখন প্রশ্ন করেছেন তখন বুঝতে হবে ওর উত্তরটুকু আপনার একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। যার জন্যে সাধারণ নিয়ম লঙ্ঘন করতেও আপনি পরাঙ্মুখ হন নি।—'নেসেসিটি নোজ নো ল'।

সীমা এবার হেসে উঠল। বললে—ওঁর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ কর মামা। পারবে না, তুমি কথাশিল্পী, আর উনি হলেন মিতভাষী। স্বল্প কথায় বক্তব্যকে উনি এমন কঠিন করে তুলবেন, কথার জালবুনেও তুমি তার উত্তর দিতে পারবে না।

—সীমা যা বললে সত্যি?—আবার জিজ্ঞেস করি।



প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

দোলন চাঁপা
শ্রীনন্দলাল বসু

(প্রবাসী বৈশাখ ১৩৩৪ হইতে পুনর্মুদ্রিত)

—সত্য কি মিথ্যা—সীমার উপর আপনার যা ধারণা তার উপরই তো নির্ভরশীল। ওখানে আমার কোনও মন্তব্য নেই—থাকতেও পারে না।

বুঝলাম, কথার মাধ্যমেও এতটুকু অন্তরঙ্গতা পছন্দ করে না সুজাতা। সুজাতা হয়ত চায় না ওর সম্বন্ধে অন্য কেউ কৌতূহলী হউক, ওর কথা আর পাঁচজনের আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠুক। আলোচনা শুধু আলোচনাই হয়ে থাকে না বেশীক্ষণ। ওর আলোচনাতেও ধরা পড়ে যায় অনেক কিছু—যা ধরতে দেওয়া চলে না। তাই কথাবার্তায় সুজাতা যেমন আত্ম-উদাসীন, আচরণেও ঠিক তেমনি নৈর্ব্যক্তিক।

সুজাতার সঙ্গে আর কোনও দিনই দেখা হয় নি।…না, দেখা হয়েছিল—কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাথে। রেলিঙে টাঙানো পুরণো বইগুলি দেখছিলাম। অত্যন্ত কাছে এসে দাঁড়াল সুজাতা। হয়ত আমায় দেখতে পায় নি, কিংবা দেখেও চিনতে পারে নি। ওর দোষ নেই। দোষ ওর চোখের, পুরু চশমার যষ্টি নিয়ে যাকে পথ চলতে হয় তার উপর আর অভিমান করা চলে না। সুতরাং আমাকেই কথা কইতে হ'ল—কী বই দেখছেন?

ওঃ, আপনি, নমস্কার। এখানে দেখা হবে ভাবতেই পারি নি। এসেছিলাম কলেজে।…একটা দর্শনের বই খুঁজছি। ভাল আছেন?

সুজাতার চোখ বইগুলির দিকে। কথা বলছে মুখে—কিন্তু চোখ খুঁজছে সেই বইটা। দেখলাম সুজাতার দৃষ্টি, সে দৃষ্টিতে কি গভীর ঐকান্তিকতা। স্থান-কাল-ব্যক্তি-নিরপেক্ষ সুজাতার সে অস্তিত্ব সত্যই বিস্ময়ের।

আমার চোখে কিছুটা কাঙালপনা হয়ত প্রকাশ পেয়েছিল—যা দেখে হেসেছিল সেই দোকানদার। কলেজ-যাওয়া দুটি ছেলে, আরও হয়ত অনেকে। একটু অপ্রস্তুত, একটু অন্যমনস্ক। ওপাশের ফুটপাথের দিকে চেয়ে কি যেন খুঁজতে চাওয়া—তার পর আবার সব ঠিক। বললাম—চলুন না, একটু কফি খেয়ে আসি।

নতুন কিছু আবিষ্কারের প্রবল ইচ্ছাটাকে আর চেপে রাখতে পারলাম না। সুজাতাও রাজী হয়ে গেল। রাস্তা দিয়ে যারা যাচ্ছিল তাদের চোখ দিয়ে দেখলাম সুজাতাকে—ধীর শান্ত গতিতে একটা গম্ভীর মরালছন্দ। অথচ বাতাস লেগে ফুলে-ওঠা কালো চুলগুলিতে যেন অন্ধকার সমুদ্রের ঢেউ। সেখানে সবকিছু যেন আছড়ে পড়তে চায়—যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে চায়।

আমরা পাশাপাশি হাঁটছি—মাঝখানে একটু ব্যবধান। গভীর নীরবতা। কলেজ স্কোয়ারে একটা গাছের ডালে অনেক পাখী। কত কাছাকাছি তারা। কত চেঁচামিচি। এরপর অনেক রাতে ভিড় করে আসবে ওদের বাসায়। কালো অন্ধকার রাত। রাস্তায় তবু আলো জ্বলবে। এই সন্ধ্যাটা পেরিয়ে রাত আর সেখানে আসবে না। এই সন্ধ্যাটা যেন অনন্ত সন্ধ্যা হয়ে বেঁচে থাকবে। এত মুখরতার মাঝে একটু মৌন অবসর।

কফি হাউস। সুজাতা পিছনে। দুটো চেয়ার। সুজাতা সামনে। কফি, ধোঁয়া, গন্ধ। সুজাতার চশমা। চশমা ঢাকা চোখ। অবিন্যস্ত চুল। সাদা ধবধবে কাপড়ের ঘন-সবুজ পাড়—সাপের মত জড়িয়ে আছে পাকে পাকে।

—আপনি বুঝি খুব কফি খান? আমি কিন্তু কফিতে অভ্যস্ত নই।—অত্যন্ত সহজ সুজাতার কণ্ঠস্বর। বিহ্বলতা নেই, বিমূঢ়তা নেই। আমার সঙ্গে তার কফি খাওয়া আজ বোধ হয় প্রথম নয়।

লক্ষ্য করলাম, কবিতার মত এক টুকরো ইঙ্গিত ওর ঠোঁটের ডগায় কেঁপে উঠল। কিসের ইঙ্গিত! একটু প্রশস্তি শোনার! হয়ত বা—বললাম—কফিতে অভ্যস্ত হওয়া ভাল নয়। তবে মাঝে মাঝে এই ধরনের অলস সন্ধ্যায় এক কাপ কফি নিয়ে বসে থাকতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে এই ধোঁয়ার মধ্যে সমস্ত পৃথিবী থেকে নিজেকে কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে ফেলতে।

—আর কী বই লিখলেন?—একটা রসঘন পরিবেশকে বোধ করি ইচ্ছে করেই ছিন্নভিন্ন করে দিল সুজাতা।

—কিছু না। উপন্যাস লিখতে বড় সময় লাগে। আমি ত আর নাম করা কেউ নই যে, বছরে দু'চারটা উপন্যাস গড়গড় করে লিখে যাব। লিখতে গেলে ভাবতে হয় অনেক। ভাবতে গেলে দেখতে হয় অনেক কিছু। দেখতে গেলে ঘুরতে হয়, পড়তে হয়।

সুজাতা হেসে উঠল। বললে—আমায় ত দেখেছেন, আমায় ত জেনেছেন, অবশ্য পড়তে পেরেছেন কি না বলতে পারি না। তবে আমাকে নিয়েও গল্প লিখতে পারেন। লিখুন না একটা।

কফিতে একটু চিনি মেশাল সুজাতা। চামচেটা এগিয়ে দিল …

একটা ক্লান্ত অস্পষ্টতা। একটা ঠাণ্ডা কুয়াশার আস্তরণ।

সুজাতা কোথায় হারিয়ে গেল।

সুজাতার অতীতকে খুঁজতে গিয়ে আমি ক্লান্ত হয়েছি। তবু নিরুৎসাহ হই নি। সীমার কাছ থেকে জেনেছিলাম, সুজাতা ছাত্রী নয় অধ্যাপিকা। ওদের কলেজে ও 'পার্ট-টাইম' ক্লাশ নেয়। আর সেই সূত্রেই ওর সঙ্গে আলাপ।

সুজাতা বলে—আমিও ছাত্রী—তোমাদের বন্ধু। অধ্যাপিকা বলে আমাকে দূরে রেখ না।—সীমাদের তাই অতখানি স্পর্দ্ধা, অতখানি অগ্রসর।

সুজাতা একা থাকে। লেডিজ হোষ্টেলে। যে হোষ্টেলের ও নিজেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। সেখানকার অন্ত্য-বাসিনীদের লিখিত কোনও নিয়মপালন করতে হয় না। সুজাতার কর্ত্তব্যানুশীলনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত, অকথিত নিয়মের এক একটি অনুচ্ছেদ। সুজাতা যেন মূর্ত্তিবান নিয়মকানুন।

কিন্তু রক্তমাংস তার দেহে আছে—একথা সে কেমন করে ভুলে থাকে! হৃদয়বৃত্তিকে না হয় টুঁটি টিপে মারা যায়, কিন্তু রক্তমাংস!...কি গভীর আত্মশ্রদ্ধাশীল সুজাতা! কি পবিত্র তার সৌন্দর্য্যবোধ!

সুজাতার আত্মীয়স্বজন কে কোথায় থাকে সেকথা কেউ জানে না। নামধাম হয়ত তাঁদের লেখা আছে 'আপিস রেকর্ডে; কিন্তু সুজাতার মুখে সে-কথার উল্লেখ কেউ কোনদিন শোনে নি। সীমা একদিন জিগ্যেস করেছিল। সুজাতা বলেছিল—একটা স্বয়ংসম্ভূত মানুষ তোমরা কেন কল্পনা করতে পার না। দেশ-কালের সঙ্গে পাত্রের কি সম্বন্ধ তা বিশ্লেষণ করতে গেলে অবশ্য অনেক কিছু ইতিহাস সংগ্রহের প্রয়োজন হয়—কিন্তু যতক্ষণ সেই ভাবে আমার সঙ্গে তোমরা পরিচিত হতে না চাইছ, ততক্ষণ আমি একক এবং স্বয়ংসম্ভূত, একথা মেনে নিতে তোমাদের ক্ষতি কি?

তা হলে সুজাতার কি অতীত নেই? আজকের এই বর্ত্তমান, ভবিষ্যতে যেদিন অতীত হয়ে উঠবে সেদিনও কি তার সমস্ত অতীতটা আমাদের কাছে ধরা দেবে না? সুজাতা যদি সুজাতাই হয়ে থাকবে তবে তাকে নিয়ে আর গল্প কেন?...

সেই স্বয়ংসম্ভূত সুজাতা একদিন হোষ্টেল ছেড়ে চলে গল। কোথায় গেল—সে-কথা কারও জানবার কথা নয়। শোনা গেল অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্যে সে ছুটিও চেয়েছে কলেজ থেকে। হঠাৎ কেন তার এই অস্বাভাবিক ছুটি চাওয়া—সে কথাও চিঠিতে বলেছে সুজাতা।

একটি মাত্র ছেলে তার, থাকত দার্জ্জিলিঙে। কোনও একটা আবাসিক স্কুলে করত পড়াশোনা। অসুস্থ হয়ে সেখান থেকে চলে এসেছে দেশের বাড়ীতে। ছেলের জ্যেঠামশাই জানিয়েছে রোগটা বোধ হয় যক্ষ্মা। সেবা করবার লোক নেই। তাই মাকে ছুটে যেতে হ'ল। যক্ষ্মারোগীর পাশে আর কে বসবে—মা ছাড়া? স্ত্রীও বসতে পারে—সে-বসাও বসেছিল সুজাতা ওর স্বামীর যখন ঐ অসুখই হয়। কিন্তু সে-বসা ব্যর্থ হয়েছে—স্বামীকে ফেরাতে পারে নি সুজাতা।

ভাশুরের চিঠিটা পেয়ে হয়ত সুজাতার মনে পড়ে গেল সেই অতীতটাকে। সেই মরে-যাওয়া অতীতটা যাকে সে ভুলতে চায়, যাকে সে সহ্য করতে পারে না। দূরান্তের সমুদ্র-গর্জ্জনের মত সেই অন্ধকার অতীতের গুহা থেকে একটা মর্ম্মন্তুদ ক্রন্দন ভেসে এল সুজাতার কানে। নাকি সুজাতা নিজেই কেঁদে উঠল।

তোমার কূলে নদী

শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

বালির চরা পেরিয়ে এলাম, খোয়াই হলাম পার,
এবার তোমার ভালবাসার অগাধে ডুব দিই;
ধূসর ধূলো, নিরাশ হাওয়া—আশঙ্কা দুর্বার,
হেঁটেছি পথ আঁধার রাতে—মৃত্তিকা নিঃসাড়
এবার শুধু হৃদয়ভরা গাহনে তৃপ্তিই।

পথের ধূলো জ্বলছে দূরে পায়ের রেখা মেখে,
"জলকে চল" সন্ধ্যে এলে গাঁয়ের মেয়ে দাঁড়ায়,
কাঁদর ছেড়ে তীরের কাছে ডিঙিকে বেঁধে রেখে
জেলের ছেলে তৃষ্ণা নিয়ে জলেতে হাত বাড়ায়।

ছায়ার লেখা কাঁপছে দূর তালের বনে বনে,
বাতাসে ভেসে চলেছে বক, নদীর বুকে ছায়া,
ওপারে মাঠ অড়র ক্ষেত, এপারে বসে গোপনে—
একটি-দুটি জ্বলছে তারা, একটি-দুটি মনে
গহন কালো নদীর বুক ছড়াল কি যে মায়া!

শুভ্রনীল বালির চরা, মগ্ন ভীরু ভাষা,
রিক্তকর এসেছি আমি তোমার কূলে নদী,
শান্তি দাও, অতল প্রেম অগাধ ভালবাসা,
মুক্তি দাও, হৃদয়ে শেষ তৃপ্তি নিরবধি॥

জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়-বাদ

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

১

ভারতীয় দর্শনে জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়-বাদ অন্যতম সাধন-প্রণালীরূপে কোন কোন ক্ষেত্রে স্বীকৃত হয়েছে। জ্ঞান ও নিষ্কামকর্ম সম্মেলিত ভাবে মুক্তির সাধক; এবং সেই দিক্ থেকে, নিষ্কামকর্মও জ্ঞানেরই ন্যায় সাক্ষাৎ ভাবে মোক্ষোপায়। বৈদান্তিক ভাস্করাচার্যের "ঔপাধিক-ভেদাভেদবাদে" এই জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়-বাদ বিশেষভাবে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু শুদ্ধ জ্ঞানবাদী শঙ্করের অদ্বৈত-বেদান্তে স্বভাবতঃই জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়-বাদের কোনরূপ স্থান থাকতে পারে না। সেজন্য তিনি মোক্ষের ক্ষেত্রে নিষ্কামকর্মের প্রকৃষ্ট স্থান ও দানের কথা বারংবার উদাত্তকণ্ঠে স্বীকার করলেও, এমন কি, নিষ্কাম-কর্মও যে জ্ঞানের তুল্য মূল্যবান, এবং জ্ঞানের ন্যায়ই মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধন—সে কথা একবারও স্বীকার করে নেন নি। সেজন্য তিনি তাঁর গ্রন্থাবলীর সর্বত্রই জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়-বাদ খণ্ডন করবার প্রচেষ্টা করেছেন নানা ভাবে, নানা যুক্তি-তর্কের সাহায্যে।

গীতা-ভাষ্যেই শঙ্কর বিশেষ করে সাধন-প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, যেহেতু সমগ্র শ্রীমদ্-ভাগবদ্গীতাই একটি প্রকৃষ্টতম সাধন শাস্ত্র। সেজন্য গীতা-ভাষ্যেই শঙ্কর বিশদভাবে জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়-বাদের বিষয় আলোচনা করেছেন।

গীতা-ভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ের অবতরণিকায় শঙ্কর বলছেন যে, কারও কারও মতে, গীতায় জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়-বাদ প্রপঞ্চিত করা হয়েছে। তাঁদের মতে, সকল কর্ম পরিত্যাগ করে, কেবলমাত্র আত্মজ্ঞানের সাধনা করলেই মোক্ষলাভ হতে পারে না—

"কিং তর্হি? অগ্নিহোত্রাদি-শ্রৌত-স্মার্ত-কর্ম-সহিতাৎ জ্ঞানাৎ কৈবল্যপ্রাপ্তিরিতি সর্বাসু গীতাসু নিশ্চিতোঽর্থ ইতি।" (গীতা-ভাষ্য, দ্বিতীয় অধ্যায়—অবতরণিকা)।

তবে কিসে হতে পারে? অগ্নিহোত্রাদি প্রমুখ শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত কর্ম-সমন্বিত জ্ঞান থেকেই কেবল মোক্ষলাভ হতে পারে, এবং এই হ'ল সমগ্র গীতার স্থিরীকৃত মতবাদ।

এই মতবাদের বিরুদ্ধে শঙ্কর কয়েকটি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, গীতা-ভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভাষ্য-ভূমিকায়।

প্রথমতঃ, গীতায় "সাংখ্য-বুদ্ধি" এবং "যোগ-বুদ্ধি"—এই দু' প্রকারের বুদ্ধি অনুযায়ী দুটি বিভিন্ন সাধন, উপায় বা মার্গের বিষয় পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হয়েছে—যথাঃ, প্রারম্ভ থেকেই জ্ঞান এবং নিষ্কামকর্মের মাধ্যমে পরে জ্ঞান। সেজন্য যখন দুটি বিভিন্ন সাধনের বিধান দেওয়া হয়েছে, তখন সেই দুটির সমুচ্চয়ের কোনরূপ প্রশ্নই এ স্থলে নেই। পূর্বেই যা' বারংবার বলা হয়েছে, সাংখ্যমার্গের ক্ষেত্রে কেবল জ্ঞানই মোক্ষের সাধন, কর্মের কোন স্থান পূর্বে বা পরে নেই। অপর পক্ষে, যোগমার্গের ক্ষেত্রেও নিষ্কামকর্মের স্থান কেবল প্রারম্ভেই মাত্র, পরিশেষে নয়। অর্থাৎ, এক্ষেত্রেও কর্ম মোক্ষের প্রত্যক্ষসাধন নয়, প্রত্যক্ষসাধন হ'ল পূর্ববৎ কেবল জ্ঞান, জ্ঞান ব্যতীত অপর কিছুই নয়। সেজন্য জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় থেকে নয়, নিষ্কামকর্ম-প্রসূত-শুদ্ধ-চিত্তে শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন-প্রসূত-জ্ঞান থেকেই এক্ষেত্রেও মোক্ষ লাভ হয়।

"সাংখ্য বুদ্ধিং যোগ-বুদ্ধিঞ্চ আশ্রিত্য দ্বে নিষ্ঠে বিভক্তে ভগবতৈবোক্তে জ্ঞান-কর্মণোঃ কর্তৃত্বাকর্তৃত্বৈকত্বানেকত্ব-বুদ্ধ্যাশ্রয়য়োঃ একপুরুষাশ্রয়ত্বাসম্ভবং পশ্যতা।" (গীতা-ভাষ্য, দ্বিতীয় অধ্যায়—ভূমিকা)।

"সাংখ্য" এবং "যোগ" দুটি স্বতন্ত্র প্রণালী। প্রথমটি "জ্ঞান", দ্বিতীয়টি "কর্ম"। প্রথমটি থাকে অকর্তৃত্ব ও একত্ব জ্ঞান; দ্বিতীয়টিতে কর্তৃত্ব ও অনেকত্ব জ্ঞান। সেজন্য সাংখ্য ও যোগ, জ্ঞান ও কর্ম একই পুরুষে একত্রে থাকতে পারে না। এই নিরীক্ষণ করেই শ্রীভগবান্ এরূপ দুটি বিভিন্ন সাধনের নির্দেশ দান করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ, জ্ঞান ও কর্মের এরূপ বিভাগ কেবল গীতায় কেন, অন্যত্রও প্রপঞ্চিত হয়েছে। যেমন, সুবিখ্যাত শতপথ-ব্রাহ্মণে এই বিষয়ে সুন্দর ভাবে বলা হয়েছে। এই শাস্ত্রে এরূপে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অবসানে, গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন ও ধর্মবিচারের শেষে, গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশোদ্যত আত্মাকে "প্রাকৃত আত্মা" বলা হয়। এই "প্রাকৃত আত্মাই" দেবলোক, পিতৃলোক ও মনুষ্যলোক—এই লোকত্রয়; স্ত্রী, পুত্র ও বিত্ত—এই কাম্যত্রয়; মানুষ্য এবং দৈব—এই বিত্তদ্বয় কামনা করে সকামকর্মে প্রবৃত্ত হয়। মানুষ্য-বিত্ত হ'ল যাগযজ্ঞাদি কর্ম, দৈব-বিত্ত হ'ল

উপাসনা। প্রথমটির ফল হ'ল পিতৃলোক, দ্বিতীয়টির ফল হ'ল দেবলোক। এই ভাবে—

"অবিদ্যা কামবত এব সর্বাণি কর্মাণি শ্রৌতাদীনি দর্শিতানি।" (গীতা-ভাষ্য, দ্বিতীয় অধ্যায়—ভূমিকা)।

অবিদ্যা ও কামসম্পন্ন ব্যক্তিই শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত কর্ম-সাধন করে। অপর পক্ষে, যিনি এই সকল কাম্যবস্তু লাভে অভিলাষী নন, তিনি গার্হস্থ্যাশ্রম এবং সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ-পূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

"তদেতদ্-বিভাগ-বচনম্ অনুপপন্নং স্যাৎ, যদি শ্রৌতকর্ম-জ্ঞানয়োঃ সমুচ্চয়োঽভিপ্রেতঃ স্যাদ্ ভগবতঃ।" (গীতা-ভাষ্য, দ্বিতীয় অধ্যায়—ভূমিকা)।

যদি শ্রৌত-কর্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয়ই মোক্ষসাধক হ'ত, তা' হলে তাদের মধ্যে এরূপ বিভাগ নিশ্চয়ই অযৌক্তিক।

এই ভাবে, গীতা এবং অন্যান্য শ্রুতি-স্মৃতিতেও জ্ঞানমার্গ এবং কর্মমার্গের মধ্যে প্রভেদ প্রপঞ্চিত করা হয়েছে বলে, জ্ঞান ও কর্ম দুটি স্বতন্ত্র সাধন, যাদের মধ্যে সমুচ্চয় অসম্ভব।

তৃতীয়তঃ, অর্জুনের প্রশ্ন থেকেও জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়-বাদ যে গীতার নিষ্পাদ্য বস্তু নয়, তা' স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভেই অর্জুন শ্রীভগবানকে প্রশ্ন করছেন—

"জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন।
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিযোজয়সি কেশব॥"

(গীতা, ৩-১)

"যদি তোমার মতে কর্ম অপেক্ষা জ্ঞানই শ্রেয়ঃ, হে জনার্দন! তা হলে আমাকে এই ঘোর কর্মে কি জন্য নিয়োজিত করছ, হে কেশব?"

এরই উত্তরে শ্রীভগবান্ "সাংখ্য" ও "যোগের" পুনরুল্লেখ করে বলছেন:

"লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্॥"

(গীতা, ৩-২)

"সংসারে যে দু' প্রকারের মার্গ আছে, তা আমি তোমাকে পূর্বেই বলেছি, হে পার্থ! তা হ'ল সাংখ্যদের জ্ঞানমার্গ এবং যোগীদের কর্মমার্গ।"

যদি জ্ঞান এবং কর্ম একই মার্গ হয়, তাহলে উপরের প্রশ্নোত্তর ত অনর্থক হয়ে দাঁড়ায়।

চতুর্থতঃ, অর্জুন আরেকটি মূলীভূত প্রশ্নও পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারম্ভে শ্রীভগবানকে করছেন—

"সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥"

(গীতা, ৫-১)

"হে কৃষ্ণ, তুমি কর্মত্যাগ ও কর্মানুষ্ঠান দুই-ই আমাকে করতে বলছ। কিন্তু এই দুটির মধ্যে কোনটি শ্রেয়ঃ, তা' আমাকে নিশ্চয় করে বল।

এর উত্তরে শ্রীভগবান বলছেন—

"সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে॥"

(গীতা, ৫-২)

"সন্ন্যাস ও কর্মযোগ দুইই মুক্তির সাধন। কিন্তু সাধারণ জনদের পক্ষে সন্ন্যাস অপেক্ষা নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান শ্রেয়ঃ।"

এ ক্ষেত্রেও জ্ঞান ও কর্ম একই মার্গ হলে, এই প্রশ্নোত্তর বৃথা হয়ে দাঁড়ায়। যদি গীতা সত্যই জ্ঞান এবং কর্ম উভয়কেই মোক্ষসাধনরূপে নির্দিষ্ট করতেন, তাহলে তাদের মধ্যে মাত্র একটির বিষয়ে এরূপ প্রশ্ন হতে পারে কি করে? যেমন, বৈদ্য রোগীকে পিত্তপ্রশমনের জন্য "মধুর ও শীতল দ্রব্য ভক্ষণ করবে"—এই বিধান দিলে, রোগী নিশ্চয়ই "মধুর ও শীতল দ্রব্যের মধ্যে কোনটি পিত্তনাশের উপায়, তা' আমাকে নিশ্চয় করে বলুন"—এরূপ অকারণ প্রশ্ন করবেন না, যেহেতু বৈদ্য পূর্বেই মধুর দ্রব্য ও শীতল দ্রব্য উভয়কেই একই সঙ্গে পিত্তনাশের উপায়রূপে ত নির্দেশ করে দিয়েছেনই। একই ভাবে, শ্রীভগবান যদি পূর্বে জ্ঞান ও কর্ম উভয়কেই সম্মেলিত ভাবে মোক্ষের উপায়রূপে নির্দেশ করে থাকেন ত, পরে অর্জুন "কোনটি শ্রেয়, তা' আমাকে নিশ্চিত করে বলুন"—এরূপ অনর্থক প্রশ্ন করবেন কেন?

"নাপি স্মার্তেনৈব কর্মণা বুদ্ধেঃ সমুচ্চয়েঽভিপ্রেতে বিভাগ-বচনাদি সর্বমুপপন্নম্।" (গীতা-ভাষ্য, দ্বিতীয়-অধ্যায়—ভূমিকা)।

স্মৃতিশাস্ত্রাদি-বিহিত কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের সমুচ্চয়, যদি শ্রীভগবানের অভিপ্রেত হত, তাহলে "সাংখ্য" ও "যোগের" মধ্যে এরূপ বিভাগ অযৌক্তিক হয়ে পড়ত নিশ্চয়ই।

পঞ্চমতঃ, যুদ্ধ যে ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম, তা'ত অর্জুন স্বয়ং জানতেনই। তা হলে তিনি পুনরায় "তাহলে আমাকে এই ঘোর কর্মে কি জন্য নিয়োজিত করছ, হে কেশব?" (গীতা, ৩-১) এরূপ নিরর্থক প্রশ্ন করবেন কেন, যদি কর্ম মোক্ষের সাক্ষাৎ উপায়ই হ'ত জ্ঞানের ন্যায়?

ষষ্ঠতঃ, যিনি অজ্ঞান অথবা বাসনা-কামনা বশতঃ সকাম-কর্মে প্রবৃত্ত হন, তিনি "যোগ"মার্গ অবলম্বন করে, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা (১৮-৩) নিষ্কাম ভাবে অনুষ্ঠান করতে পারলে, বিশুদ্ধ-চিত্ত হন। এরূপ, চিত্ত-বিশুদ্ধির ফলে, ক্রমশঃ তিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই যে ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম যে অকর্তা, এই পরমার্থ-তত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেন। তার ফলে, তিনি

মোক্ষলাভ করেন বলে, তাঁর আর অন্য কিছু প্রয়োজন থাকে না, কর্মেরও প্রয়োজন থাকে না। তা' সত্ত্বেও তিনি অবশ্য লোক-শিক্ষার জন্য পূর্ববৎ যত্নসহকারে বিহিতকর্ম সম্পাদন করে চলেন। কিন্তু এই কর্ম সত্যই প্রবৃত্তিমূলক "কর্ম" নামের যোগ্যই নয়, সেজন্য বলা যেতে পারে যে, জ্ঞানী, জীবন্মুক্ত পুরুষে জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় দেখা যায়। বস্তুতঃ, জ্ঞানী, জীবন্মুক্ত যে সম্পূর্ণরূপেই অকর্তা, তা' পূর্বেই বলা হয়েছে। শ্রীভগবানের ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধাদি কর্ম যেরূপ অবিদ্যা, বাসনা-কামনা, ফলভোগেচ্ছা, অভিমানাদি সহকারে অনুষ্ঠিত হয় নি বলে, প্রকৃতপক্ষে প্রবৃত্তি-লক্ষণ কর্ম নয়, জ্ঞানীর ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। সাধারণ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করলেও দেখা যাবে যে, স্বর্গকামী যখন সেই কামনার বশবর্তী হ'য়ে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম অনুষ্ঠান করতে আরম্ভ করেন, তখন কোন বিশেষ কারণবশতঃ অর্ধপথে তাঁর কামনা বিনষ্ট হয়ে গেলেও তিনি সেই কর্ম বা যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান পূর্ববৎ অবশ্য করেই চলেন ; কিন্তু তা' সত্ত্বেও তাঁর সেই কর্ম আর "কাম্য-কর্ম" থাকে না, "নিত্য-কর্ম" হয়ে দাঁড়ায়—।

"নিত্য-কাম্য-বিভাগস্য স্বাভাবিকত্বাভাবাৎ।" (আনন্দগিরি টীকা)। "নিত্য" ও "কাম্য" কর্মের মধ্যে কোন অলঙ্ঘ্য সীমা নেই।

একই ভাবে, জ্ঞানোদয়ের পরে কৃত কর্ম ও সাধারণ কাম্য কর্ম নয়, অথবা "কর্ম" পদ বাচ্যই নয়।

"বিদ্বৎপ্রবৃত্তীনাং কর্মাভাসত্বম্" (আনন্দগিরি টীকা)। জ্ঞানিগণের কর্ম দৃশ্যতঃ কর্ম হলেও, প্রকৃত কর্মই নয়। সেজন্য জীবন্মুক্তের ক্ষেত্রেও জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় হয় না।

সপ্তমতঃ, রাজর্ষি জনকের দৃষ্টান্তও জ্ঞানী বা জীবন্মুক্তের ক্ষেত্রে জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় প্রমাণিত করে না। তিনি যে পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞ হয়েও শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তার একমাত্র কারণ হ'ল, যা পূর্বেই বলা হয়েছে, লোকশিক্ষা। অথবা, যদি বলা হয় যে, জনক সত্যই পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন না, তা হলে তিনি যে চিত্তশুদ্ধি লাভের জন্যই কেবল কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন সম্পূর্ণ নিষ্কাম ভাবে, তা বলাই বাহুল্য।

এই ভাবে, দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভাষ্য-ভূমিকায় শঙ্কর সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন যে—

"তস্মাৎ গীতা-শাস্ত্রে ঈষন্মাত্রেণাপি শ্রৌতেন স্মার্তেন বা কর্মণা আত্মজ্ঞানস্য সমুচ্চয়ো ন কেনচিদ্দর্শয়িতুং শক্যঃ।"

"তস্মাদ্ গীতাসু কেবলাদেব তত্ত্ব-জ্ঞানান্মোক্ষ-প্রাপ্তিঃ, ন কর্ম-সমুচ্চিতাদিতি নিশ্চিতোঽর্থঃ।"

(গীতা-ভাষ্য, দ্বিতীয় অধ্যায়—ভূমিকা)

"এই সব কারণে, গীতা-শাস্ত্রে যে শ্রৌত ও স্মার্ত-কর্মের সঙ্গে আত্ম-জ্ঞানের অল্প মাত্রও সমুচ্চয় বিহিত হয়েছে, তা' কেহই দেখাতে পারবেন না।"

"এই সব কারণে, সুনিশ্চিত অর্থ এই যে, কেবলমাত্র তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই মোক্ষলাভ হয়, জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয় দ্বারা নয়।"

কামনা

শ্রীঅনুরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজ মহিমায় পূত ঐ হৃদিখানি
সুরভিত হোক সবাকার ঘরে ঘরে
শুভ্র সে হৃদি আবরণ সম যেন
কালিমারে ঢাকে অমৃতের নির্ঝরে।
শত আঘাতেতে তার লাবণ্যরেখা
উজ্জল হোক লক্ষ্মী প্রতীক সম

দুঃখের মাঝে হয়ে অতুলন তাহা
সবাকার মাঝে থাকে যেন অনুপম।
আর কিছু আজ নেই মোর প্রার্থনা
শুধু এই ভাষা যা দিল তোমারে বলে
সার্থক হোক মহানের রূপ নিয়ে
মুকুলিত হোক সবাকার হৃদি তলে

অন্ধ আকাশ

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

৩৫

আশ্বিন শেষ হইয়া গিয়াছে, কার্তিকের মাঝামাঝি। গাঁয়ের পাশে যে মস্ত বড় টাঁড়টায় পাথর ভাঙ্গা হইতেছিল সেটা কখন জনশূন্য, কেবল এখানে ওখানে স্তূপাকার পাথর পড়িয়া আছে। পাথর ভাঙ্গার কাজ অবশ্য চলিতেছে, কিন্তু তাহা গ্রাম হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে অন্য গাঁয়ের সীমানায়, রোজ অত দূরে গিয়া কাজ করা সম্ভবপর নয় বলিয়া এ গাঁয়ের সকলেই কাজ ছাড়িয়া দিয়াছে।

বেকারের দল এখন মাঠে-ঘাটে অরণ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। রোদের তাপ অনেক কমিয়া গিয়াছে, পশ্চিমের বাতাসে একটা ঠাণ্ডার আমেজ আসিয়াছে, মাঠ-ঘাট অরণ্যের রূপ এখন অপূর্ব, কিন্তু গাঁয়ের বেকারের দল এই রূপ দেখিতে ঘুরিয়া বেড়ায় না, এক ঝাঁক পাখীর মতই দানার সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়। রুকিয়া একদিন কাঠ কুড়ায়, একদিন জংলী শাকপাতা খুঁটিয়া আনে, আবার একদিন ধান ক্ষেতের আল ধরিয়া মাঠের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত অনাবশ্যক যাওয়া-আসা করে। সেইদিন দুপুরবেলা গাঁয়ের অলি-গলি ঘুরিয়া সে মাঠে আসিয়া নামে, ধান গাছগুলি বড় হইয়া এখন ছড়া ছড়া ফসলের ভারে নুইয়া পড়িয়াছে। আলের সরু পথে চলিতে গেলে ধানের ছড়া আসিয়া গায়ে লাগে, কাঁচা ধানের মৃদু-মিষ্টি গন্ধে মন খুশী হইয়া ওঠে। রুকিয়া চলিতে চলিতে নিজের মনেই বলে, "এটা কৈলাস সিং-এর ক্ষেত, এটা মাণিক পাঁড়ের ক্ষেত, এটা চমন গোপের ক্ষেত, এটা হরি মহতোর ক্ষেত।" খানিক গিয়া সে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়ায়, তাহার সামনে একখানা ক্ষেতের ধানে যেন গাঢ় হলুদের ছোপ লাগিয়াছে! হেঁট হইয়া একটা ছড়া হইতে দুই-চারিটা ধান হাতে লইয়া পরীক্ষা করিতেই সে বুঝিতে পারে ক্ষেতের ধান পাকিয়া গিয়াছে, এখন কাটিয়া ঘরে তুলিলেই হয়: এই আকস্মিক আবিষ্কারে তাহার ভারাক্রান্ত মনটা ধীরে ধীরে প্রসন্ন হইয়া ওঠে, কেন না ধান কাটিবার কাজে আবার তাহার ডাক পড়িবে। এইবার সে ভাল করিয়া চারিদিকে তাকাইয়া দেখে, মাঠের মাঝখানের নাবাল জমিগুলির ধান পাকিতে এখনও কিছুদিন বাকি আছে, কিন্তু উঁচু জমির কাতকা ধান অনেক ক্ষেতেই পাকিয়া উঠিয়াছে।

ক্ষেত-পরিক্রমা শেষ করিয়া রুকিয়া গাঁয়ের গলিপথ ধরিয়া চলে। হঠাৎ পিছন হইতে কে যেন ডাকিয়া বলে, "ওগো পরসাদের মা', কোথায় চলেছ গো?"

শুনিয়া ফিরিয়া তাকায় রুকিয়া,'দেখে মতিগোপের বাড়ীর সুমুখ হইতে মনুয়ার বউ তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। সেদিকে রুকিয়া আগাইয়া যায়। মতি-গোপের খরিহান অর্থাৎ ধান মাড়াই করিবার জায়গা তৈরী হইতেছে ২৫।৩০ হাত লম্বা এবং প্রায় ততখানি চওড়া এক ফালি জমির ঘাস চাঁচিয়া ফেলা হইয়াছে, এবার পুরু করিয়া কাঁকর-শূন্য ভাল মাটি বিছাইয়া গোবর দিয়া লেপিবার আয়োজন হইতেছে, মতিগোপের বাড়ীর মেয়েরা ও মনুয়ার বউ সেই কাজেই নিযুক্ত। রুকিয়া আসিয়া সেইখানে দাঁড়ায়।

মনুয়ার বউ বলে, "কোথায় যাচ্ছিস গো?"

রুকিয়া বলে, "অমনি ঘুরে বেড়াচ্ছি—কাজ ত কিছু নেই।"

মনুয়ার বউ বলে, "আমিও অকেজো বসেছিলাম গো, কাল থেকে এই কাজে লেগেছি।"

রুকিয়া বসে, খরিহানের দিকে তাকাইয়া বলে, "আহা, বেশ পরিপাটি খরিহানটি হয়েছে।"

মনুয়ার বউ-এর হাতের কাছে গোবর-মাটি আগাইয়া দিয়া মতিগোপের স্ত্রী বলে, "বেনোয়ারীর মায়ের কাজ খুব সাফ, তাই ত ওকে ডাকি। দেখ না আমার বৌ-এর কাণ্ড, ঐ যে ওদিকটায় একটুখানি মাটি দিয়েছে, তারই কি ছিরি!"

বিব্রত হইয়া রুকিয়া বলে, তা বেশ দিয়েছে—ছেলে-মানুষ ত।"

কাদামাখা হাত নাড়িয়া মতিগোপের স্ত্রী বলে, "ছেলে-মানুষ কাকে বল পরসাদের মা, চেহারা দেখে ওর বয়স বলতে পারবে না তুমি। কুড়ের কুড়ে হদ্দ কুড়ে গো।"

প্রতিনিয়ত শাশুড়ীর নিকট হইতে এই রকম প্রশংসা পাওয়া মেয়েটির অভ্যাস, তাই সে শুনিয়াও কিছু শোনে না। রুকিয়া এই অপ্রীতিকর আলোচনাটার মোর ঘুরাইবার জন্যে বলে, "তা কবে তোমরা ধান কাটছ গো।"

মতিগোপের স্ত্রী বলে, "পরশু ক্ষেতে নামব গো পরসাদের মা, দু'খানা ক্ষেতের কাতকা ধান পেকেছে, তাড়াতাড়ি

কেটে ঘরে তুলতে পারলে বাঁচি। রাতে আমার ঘুম হয় না গো।"

"কেন, এত ভাবনা কিসের ?" প্রশ্ন করে রুকিয়া।

মতিগোপের স্ত্রী বলে, "ভাবনা কিসের বলছ পরসাদের মা, তা ভাবনা আছে বৈকি।" গলা খাটো করিয়া সে বলে, "এ সব ছিল না আমাদের গাঁয়ে, কিন্তু হচ্ছে আজকাল, বুঝলে পরসাদের মা ? সেদিন গোবিন্দ মহতোর ক্ষেত থেকে মাকুয়া চুরি হয়েছে, আজ ধান চুরি হবে।"

রুকিয়ার ভিতরটা কে যেন সবলে চাপিয়া ধরে, তাহার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে, কোন কথা বলিতে পারে না। মতির স্ত্রী বলিয়া চলে, "আর দেরি করব না, পরশু ক্ষেতে নামব, তাই ত খরিহান নিয়ে পড়েছি। ওগো, ও বউ, হাত তুলে বসে আছিস কেন ? কুড়ের কুড়ে হদ্দ কুড়ে, এ বউ আমার হাড় জ্বালিয়ে খাবে।"

বউ হাত তুলিয়া মোটেই বসিয়াছিল না, কাজই করিতেছিল, তবু খোঁচা খাইয়া একবার নড়িয়া-চড়িয়া বসে। রুকিয়া এই ফাঁকে উঠিয়া দাঁড়ায়, বলে "চলি গো বেনোয়ারীর মা।"

মনুয়ার বউ হাত থামাইয়া বলে, "এই দেখ, যে কথা বলতে ডাকলাম তাই বলা হ'ল না। হ্যাগা মহতোআইন, তোমরা ত ধানকাটুনী রাখবেই, তা পরসাদের মাকে বল না, ও খাটিয়ে মানুষ, ফাঁকি জানে না।"

মতিগোপের স্ত্রীকে মহতোআইন বলিলে, বড়ই খুশী হয়, সে মুখ তুলিয়া বলে, "তা এস গো পরসাদের মা, পরশু আমরা ক্ষেতে নামব।"

"আসব গো মহতোআইন।" বলে রুকিয়া, তার পরে গলি ধরিয়া ঘরের দিকে চলে।

৩৬

ধানকাটা সুরু হইয়া গিয়াছে, এ একটা মহোৎসব, উৎসাহ ও হৈ-চৈ এর অন্ত নাই। যাহারা বড় গৃহস্থ তাহাদের ধান ক্ষেত হইতে গরুর গাড়ী বোঝাই হইয়া ক্যাঁ-কোঁ শব্দে খরিহানে চলিয়াছে, ছোটখাটদের অল্প ধান মাথায় মাথায় চলিয়াছে, ঘর হইতে ক্ষেত, ক্ষেত হইতে ঘর, গৃহস্থের আনাগোনার অন্ত নাই। বউ-ঝিদের মাথায় বড় বড় ধানের বোঝা, ছোট ছেলেমেয়েরাও ধানের ছোট ছোট আঁটি লইয়া আলপথ ধরিয়া টলিয়া টলিয়া কোন মতে চলিতেছে।

সন্ধ্যা লাগিতেই রুকিয়া কাস্তে ফেলিয়া বাড়ী চলিয়া আসে। তিলকা আজকাল ঘরের অনেক কাজই করিয়া রাখে, রুকিয়া আসিয়া উনুন ধরাইয়া ভাত রাঁধে। মতিগোপের ধান কাটা শেষ করিয়া সে কৈলাসমহতোর ধান কাটিতেছে, আর সপ্তাহখানেক তাহার ধান কাটা চলিবে। এখন তাহার সংসার অনেক স্বচ্ছল, নুন-ভাত জুটিতেছে। সেদিন সন্ধ্যায় সে উনুনে ভাতের হাঁড়ি চাপাইয়াছে, এমন সময় মনুয়ার বউ আসিয়া হাঁক দেয়—"কোথায় গো পরসাদের মা !"

রুকিয়া ঘরের ভিতর হইতে জবাব দেয়—"এস গো দিদি, ভেতরে এস।"

মনুয়ার বউ ভিতরে আসিয়া উনুনের ধারটিতে গিয়া বসে, কোলে তাহার বেনোয়ারী। রুকিয়া মুখ তুলিয়া বলে, ক'দিন তোমাকে দেখি নি দিদি, কার ধান কাটছ ?"

মনুয়ার বউ বলে, "গোবিন্দ মহতোর ধান কাটছি গো, সময় পাই নে দেখা করবার। সন্ধ্যার পরে সময় করে তাই আজ এলাম, বলি অ পরসাদের মা, তোমার কাছে রাতজ্বরা আছে ?"

"কেন গো, কার জ্বর হ'ল ?" প্রশ্ন করে রুকিয়া।

মনুয়ার বউ বলে, "আজ ক'দিন থেকে আমার বেনোয়ারীর রাত্রে জ্বর হচ্ছে গো, রাতজ্বরা পেলে কোমরে বেঁধে দিতাম।"

রুকিয়া দুঃখিত হইয়া বলে, "ও জিনিস নাই কো দিদি।"

মনুয়ার বউ বলে, "তোমরা ত এতাবৎ অনেক অষুধ-পত্তর, জড়িবুটি ঘাঁটাঘাঁটি করলে, তাই ভাবলাম হয় ত তোমার কাছে পাব।"

বেনোয়ারীর মুখের দিকে তাকাইয়া কেরোসিনের ডিবার অল্প আলোতেও রুকিয়া দেখিতে পায় ছোট মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে, সে দরদের সঙ্গে বলে,"তাই ত গো, বড্ডই কাবু হয়ে পড়েছে।"

আঁচল সরাইয়া মনুয়ার বউ বলে, "এই দেখ না বেনোয়ারীর গায়ে হাত দিয়ে, জ্বর লেগেই আছে, ছাড়ছে না।"

বেনোয়ারীর শীর্ণ উলঙ্গ গায়ে হাত দিয়া রুকিয়া চমকিয়া ওঠে, গা-টা কি ভীষণ গরম! সে বলে, "আঁচলটা ভাল করে চাপা দাও দিদি, দেহটা যেন বাছার পুড়ে যাচ্ছে!"

বেনোয়ারীকে আঁচল দিয়া ভাল করিয়া ঢাকিয়া মনুয়ার বউ বলে, "সারাদিন ক্ষেতে পড়ে থাকি, ভাল করে দেখতেও পারি নি ভাই। বলেছিলাম, ধান কাটা সুরু হলে অঘ্রাণ মাসে তোকে পেট ভরে ভাত খেতে দেব, তা এই জ্বরে ধরল।"

রুকিয়া বলে, "ভাল হয়ে যাবে দিদি, একটু সাবধানে রেখ।"

"তাই বল গো পরসাদের মা, তাই বল, বাছা আমার ভাল হয়ে উঠুক। চলি এখন গো—রাত হ'ল।"

মনুয়ার বউ উঠিয়া দাঁড়ায়, রুকিয়াও ওঠে, সঙ্গে ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়।

ইহারই দিন দুই পরে সন্ধ্যায় কাজের শেষে মনুয়ার বাড়ীর পাশ দিয়া আসিতে রুকিয়া কান্নার আওয়াজ পাইয়া থমকিয়া দাঁড়ায়। কান পাতিয়া শুনিতেই সে বুঝিতে পারে, সর্বাঙ্গ তাহার কাঁপিয়া ওঠে—দুই চোখ জলে ভরিয়া যায়, আহা—এখনও যে বেনোয়ারীর শীর্ণ দেহটার উত্তাপ হাতে লাগিয়া আছে। রুকিয়া সেখানে আর দাঁড়াইতে পারে না, তাড়াতাড়ি বাড়ী চলিয়া আসে। মনুয়ার বাড়ী দূরে নয়, কান্নার আওয়াজ এখানেও তাহার কানে পৌঁছায়। রাত্রে তাহার ভাল করিয়া ঘুম হয় না, যখনই জাগে তখনই মনুয়ার স্ত্রীর বিলাপ শুনিতে পায়। পরসাদকে বুকের মধ্যে টানিয়া নিয়া তাহার সর্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দেয়।

সকালবেলা ধান কাটিতে মাঠে যায় রুকিয়া। গোবিন্দ মহন্তোর বড় ক্ষেতটার দিকে একবার নজর পড়িতে রুকিয়া দেখে, ধানকাটুনীদের সঙ্গে মনুয়ার স্ত্রীও ধান কাটিতেছে। কাল যাহার ছেলে মরিয়াছে আজ তাহাকে ধান কাটিতে দেখিয়া রুকিয়া আশ্চর্য হইয়া যায়। রুকিয়া ভাবে, এও কি সম্ভব, কিন্তু সে ত ভুল দেখিতেছে না, সত্যই মনুয়ার বউ ধান কাটিতেছে। রুকিয়া ধান কাটে আর মাঝে মাঝে মনুয়ার বউকে দেখে, অন্যান্য সকলের মত সেও আপনার কাজ সুষ্ঠু ভাবে করিয়া চলিয়াছে। কাজের শেষে বাড়ী ফিরিবার সময় রুকিয়ার ইচ্ছা হয়, একবার মনুয়ার বাড়ী যায়, কাছাকাছি আসিয়া আর যাইতে পারে না। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে, উহাদের বাড়ীতে এখনও আলো জলে নাই, কোন সাড়াশব্দও নাই, অন্ধকারে পোড়ো বাড়ীর মত মনে হয়।

অনেক রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া যায় রুকিয়ার। হঠাৎ ক্ষীণ কান্নার আওয়াজ পাইয়া সে চমকিয়া ওঠে। মস্ত বড় গ্রাম-খানায় এ সময় কেহ কোথাও জাগিয়া নাই, কেবল একটি অন্ধকার ঘরে মৃত ছেলেকে স্মরণ করিয়া নিদ্রাহীন মা কাঁদিতেছে। দিনের প্রহরগুলি তাহার আপনার নহে, এক মুঠি অন্নের জন্যে তাহা বেচিতে হইয়াছে, রাত্রির প্রহর-গুলি তাহার নিজের, সেই সময়ে সকলের অগোচরে মনুয়ার বউ বেনোয়ারীকে ডাকিতেছে, "ওরে বেটা, বেটা আমার, কোথায় গেলি রে—কোথায় গেলি তুই।"

একটা ভয় রুকিয়ার মনের মধ্যে ঘনাইয়া আসে। তাহার পর প্রসাদ যদি বেনোয়ারীর মত একদিন চলিয়া যায়, তাহা হইলে সেও কি বেনোয়ারীর মায়ের মত দিনে কাঁদিবারও অবসর পাইবে না? রাত্রির অন্ধকারে অমনি করিয়া কাঁদিবে। না, তাহার পরসাদকে সে যাইতে দিবে না, আঁচল দিয়া ছেলেকে সে ঢাকিয়া দেয়, দুই হাত দিয়া বুকের মধ্যে টানিয়া নিয়া সমস্ত আপদ হইতে রক্ষা করিতে চায়।

৩৭

সেদিন ধান কাটার কাজ শেষ করিয়া সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিয়া আসিতে রুকিয়া তাহার আঙিনায় মেয়ে-গলার হাসি শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়ায়, দরজার ফাঁক দিয়া উঁকি মারিয়া দেখে, রঙিন ডুরে শাড়ী-পরা একটি যুবতী হাত নাড়িয়া কি যেন বলিতেছে এবং মাঝে মাঝে হাসিয়া উঠিতেছে, সামনে দাঁড়াইয়া তিলকা হাঁ করিয়া শুনিতেছে। ব্যাপার কি বুঝিতে পারে না রুকিয়া, নিঃশব্দে আঙিনায় ঢোকে। তাহাকে দেখিয়া যুবতীর হাসি-গল্প থামিয়া যায়, পিছন হইতে একজন বলিয়া ওঠে, "এই যে এসেছ ভৌজী, তোমার জন্যে এতক্ষণ আমরা দাঁড়িয়ে আছি।"

চেনা গলার আওয়াজ শুনিয়া চমকিয়া ওঠে রুকিয়া, আড়ালে ছিল বলিয়া এই লোকটিকে সে আগে দেখিতে পায় নাই, আঁচলটা সংযত করিয়া জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, চোখ তুলিয়া তাকাইতেও সাহস হয় না। লোকটা একটু স্নেহের সঙ্গে বলে, "কি গো, আমাকে চিনতে পারলে না বুঝি!"

রুকিয়ার মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হয় না, বুকটা টিপ্ টিপ্ করিতে থাকে।

তিলকা বলে, "গুলবা গো, গুলবা, কাতরাস থেকে ফিরে এসেছে।"

যুবতীটি এইবার রুকিয়ার সামনে আগাইয়া আসে, একগাল হাসিয়া বলে, "তোমাদের গাঁ দেখতে এলাম গো, ও আমাকে বললে, চল গো, আমাদের গাঁ দেখে আসবি,তাই এলাম।"

গুলবার দিকে তাকাইয়া সে আবার হাসিয়া ওঠে। কি জবাব দিবে রুকিয়া ভাবিয়া পায় না, কোন মতে বলে, "তাই বুঝি!"

কাঁচের একগোছা রেশমী চুড়িপরা হাত নাড়িয়া যুবতী বলে, "তা সত্যি কথা বলব ভাই, আমি কিন্তু এ গাঁয়ে দু'দিনও টিকতে পারব না।"

রুকিয়া একথার কোন জবাব দেয় না, তিলকা বিরক্ত ভাবে বলে, "কেন গো, আমাদের গাঁ এত অপছন্দ হ'ল কেন?"

হাত নাড়িয়া যুবতী বলে, "পান না হলে আমার চলে না গো, সেই সকাল থেকে মুখে একটা পান দিই নাই।"

গুলবা মুরুব্বির মত বলে, "আসল কথা, গাঁয়ে ত কখনও থাকে নি, তাই একটু কেমন কেমন ঠেকছে।"

তিলকা মাথা নাড়িয়া বলে, "তা সত্যি—যার যেমন অভ্যাস।"

হেঁট হইয়া পায়ের ভারী মল দু'গাছা এক পাক ঘুরাইয়া দিয়া যুবতী গুলবাকে বলে, "চল গো, হেঁটে হেঁটে আমার পা দুটো টন টন করছে।"

গুলবা আগাইয়া আসিয়া বলে, "চল হাঁটা হ'ল অনেকখানি, অভ্যাস ত নেই!"

যুবতী আবার হাসিয়া ওঠে, ডুরে শাড়ীর আঁচলটায় অনাবশ্যক একটা টান দেয়, গলার মোটা হাঁসুলি আর টাকা-গাঁথা মালাগাছ সেই অবসরে ক্ষণিকের জন্যে দেখা যায়।

গুলবার পিছনে যুবতী বাহির হইয়া গেলে রুকিয়া বলে, "বেশ ত বিয়ে করে এনেছে গো!"

ট্যাঁক হইতে খৈনির কৌটা বাহির করিতে করিতে তিলকা বলে, "বিয়ে করে আনে নি, তবে ঐ হ'ল।"

বলিতে বলিতে থামিয়া যায় তিলকা, খৈনির টিপ মুখে ফেলিয়া দিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে থাকে। রুকিয়ার মুখে ভাব কঠিন হইয়া আসে, ঠোঁট উল্টাইয়া বলে, "যেমন দেবা তেমনি দেবী, তা কোন দেশের মেয়ে গো, কেমন কথা কয় বাঁকা বাঁকা।"

তিলকা বলে, "কোন দেশের কে জানে, বার জায়গার ছত্রিশ জাতের লোক আমদানি কাতরাসে গো। তবে হ্যাঁ—বেশ চিজ বাগিয়েছে, ওস্তাদ বটে গুলবা।"

রুকিয়া জবাব দেয় না, মুখ বাঁকাইয়া ঘরে গিয়া ঢোকে।

দিন দুই রুকিয়া সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিয়া দেখে তিলকা দোর গোড়ায় বসিয়া খৈনি টিপিতেছে। ঘরে ঢুকিয়া দিনের অর্জিত দেড় পাইলা চাল হাঁড়িতে ঢালিয়া রাখিতে রাখিতে বলে, "বচ্ছরের মত ধানকাটুনীর কাজ শেষ হ'ল গো।"

তিলকা উঠিয়া দাঁড়ায়, বলে, "তাই ত বসে বসে ভাবছিলাম, গত বছর শীতকালভর লোকের কাজ জুটেছিল, এ বছর সবাইকে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে।"

জলের কলসীটায় হাত দিয়া রুকিয়া দেখে তাহাতে জল নাই, উনুনের ধারে গিয়া দেখে সেখানে কাঠকুটো জড়ো করা নাই। রুকিয়া কাজে বাহির হইয়া গেলে সংসারের এইসব ছোটখাট কাজ তিলকা করিয়া রাখে, রুকিয়া তাই আশ্চর্য হইয়া বলে, "হ্যাঁগা, তুই বুঝি আজ বিকেলে বাড়ী ছিলিনে।"

মাথা নাড়িয়া তিলকা বলে, "না গো—এই ত বন থেকে ফিরলাম।"

"বন—বনে কেন গিয়েছিলি?" প্রশ্ন করে রুকিয়া।

তিলকা বলে, "কাঠ আনতে গো।"

শুনিয়া রুকিয়া আরও আশ্চর্য হইয়া যায়—গত রবিবারে তাহারা দু'জনে বনে গিয়া মাসখানেক চলিবার মত কাঠকুটো আনিয়া রাখিয়াছে, আজ আবার হঠাৎ কাঠ আনিবার কি প্রয়োজন হইল সে বুঝিতে পারে না। রান্নার গোছগাছ করিয়া উনুনের ধারে বসিতেই তিলকাও আসিয়া কাছে বসে। জাল ঠেলিয়া দিতে দিতে রুকিয়া অনুযোগের কণ্ঠে বলে, "কাঠ আনতে একা একা বনে কেন গেলি আজ? কাল থেকে আমার ছুটি, কাল গেলে আমিও সঙ্গে যেতে পারতাম।"

ট্যাঁক হইতে খৈনির কৌটাটা বাহির করিয়া কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া তিলকা বলে, "আমি পরশু কাতরাস যাচ্ছি গো—তাই কাঠকুটো কিছু এনে রাখলাম।"

পরম বিস্ময়ে তিলকার মুখের দিকে তাকাইয়া রুকিয়া বলে, "কাতরাস যাবি—কৈ, আগে ত বলিস নি?"

তিলকা বলে, "হঠাৎ ঠিক করে ফেললাম গো। বেকার হয়ে ঘরে বসে থাকলে ত চলবে না, তাই ভাবলুম দু'মাস খাদে কয়লা কেটে আসি, গুলবা বললে, আজকাল মজুরির হার বেড়ে গেছে।"

গুলবার নাম শুনিবামাত্র রুকিয়ার ভিতরটা তিক্ত হইয়া ওঠে, বলে, "না, তোকে যেতে হবে না, তোর শরীর এখনও সারে নি, পারবি নে ওসব তাগতের কাজ।"

"পারব গো" বলে তিলকা, "পারব বৈকি, একটু পা টেনে এখনও চলি বটে, দেহে কিন্তু বল এসেছে।"

মাথা নাড়ে রুকিয়া, বলে, "না, যেতে হবে না।"

"তিনটে পেট তাহলে কি করে চলবে?" বলে তিলকা, "না, বাধা দিসনে, তুই এখানে যা পারবি করবি, আমি গিয়ে কাজে লাগব, মাসে মাসে যা পারি পাঠাব।"

রুকিয়া নিঃশব্দে উনুনে জাল ঠেলিতে থাকে—অনেকক্ষণ কিছুই বলে না, অতীত জীবনের ছবিগুলি দুঃস্বপ্নের মত একে একে মনের মধ্যে ভাসিয়া ওঠে। হঠাৎ সে মুখ তুলিয়া বলে, "তবে যা।"

রুকিয়ার চোখে ঘুম নাই, তিলকার পাশটিতে শুইয়া অনেক রাত পর্যন্ত সে কত কথা ভাবে, কয়লার খাদে তাহাদের আত্মীয় স্বজন অনেকেই কাজ করিয়াছে, টাকা রোজগার করিয়া ঘরেও ফিরিয়াছে; আবার এমন ঘটনাও ত হামেশা ঘটিয়াছে—মরদ কামাই করিতে কাতরাস গেল, ঘরে বউ-ছেলে পথ চাহিয়া রহিল, মাস গেল, বছর গেল, মরদ আর ফিরিল না। রুকিয়ার বুক কাঁপিয়া ওঠে।

তিলকাও আজ জাগিয়া আছে। কল্পনা যেন তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে, ভবিষ্যৎ জীবনের রঙিন ছবি একটার পর

একটা আঁকিয়া চলে, রুকিয়া শুনিয়া যায়। টাকা রোজগার করিবে, পুরনো এই ঘরখানা মেরামত করিয়া নতুন করিয়া ছাইবে—বর্ষায় জল পড়িবে না, শীতে হাওয়া ঢুকিবে না। বছরে দু'খানা শাড়ী সে রুকিয়াকে দিবে, গলায় হাঁসুলি, হাতে বাজু গড়াইয়া দিবে। নিজের জন্যেও যথেষ্ট খরচ করিবে, একটা নতুন মাদল কিনিবে, লোকে দেখিয়া বলিবে, তিলকা সৌখীন 'বটে'! গরীবের ঐশ্বর্যের স্বপ্ন, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। তিলকার স্বপ্ন মাঝে মাঝে রুকিয়াকেও আবিষ্ট করে, পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে—এ ত সহজ কথা নয়।

৩৮

কাল তিলকা কাতরাস রওনা হইবে, আজ তাই রুকিয়া তিলকার ছেঁড়া কাপড় কাচাকুচি করিয়া সুচসুতার সাহায্যে যথাসাধ্য জোড়াতালি দিয়া গুছাইয়া রাখে। দু'খানা কাপড় আর গামছার একটা পোঁটলা বাঁধিলেই যাইবার আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে, তাই করিবার আর কিছুই নাই, ছেলেকে কোলের কাছে নিয়া সে দোরগোড়ায় বসিয়া থাকে। হঠাৎ তাহার অত্যন্ত একা মনে হয়, সে যেন এই পরিচিত আবেষ্টন হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে, এতদূরে, যেন ডাকিলেও কাহারও সাড়া পাওয়া যাইবে না। তাড়াতাড়ি ছেলেকে সে বুকের আরও কাছে টানিয়া নেয়।

তিলকা আজ ভারি ব্যস্ত, সলাপরামর্শ করিতে বার বার গুলবার বাড়ী যায়। রুকিয়া ডাকিয়া বলে, "হ্যাগা, এত ছুটোছুটি করছিস কেন, একটু বস না থির হয়ে।"

অপ্রস্তুত হইয়া তিলকা রুকিয়ার পাশে বসিয়া পড়ে, বলে, "বলি তোকে তাহলে আসল কথাটা, শালা গুলবা দু' বোতল মদ এনেছে, ওরা দু'জনে খাবে। ছুঁড়িটা কিছুতেই ছাড়বে না, ধরেছে আমাকেও এক চুমুক খেতে হবে।"

"ও, তাই বুঝি এত ঘুরঘুর করছিস, ছুঁড়িটার অনুরোধ ফেলবি কি করে!" শ্লেষের সঙ্গে বলে রুকিয়া।

তিলকা বিব্রত বোধ করে বলে, "কথাটা হচ্ছে, যাব ওদের সঙ্গে, কাজকর্ম জুটিয়ে দেবে ওরাই, তাই এখন একটু খাতির করে চলেছি।"

রুকিয়া তিলকার হাতখানা কোলের উপর টানিয়া লইয়া বলে, "মদের নামে তুই বড্ড বেসামাল হয়ে পড়িস, বিদেশে গিয়ে ওসব বেশী খাসনে যেন!"

"হ্যাগো, মদ খেয়ে পয়সা ওড়াবার অবস্থা আমার নাকি!"

শুনিয়া অনেকখানি আশ্বস্ত হয় রুকিয়া। তিলকা উঠিবার জন্যে উসখুস্ করে, একটু পরে বলে, "তা হলে ঝপ করে ঘুরে আসি ওদের বাড়ী থেকে—কি বলিস্!"

রুকিয়া তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরে বলে, "না, না, এখন একটু বস, এত তাড়াতাড়ি কিসের, আমার বড্ড একা বোধ হচ্ছে গো।"

"ওরা কি ভাববে বল ত, বলে এলুম এক্ষুনি আসছি," বলে তিলকা।

রুকিয়া সে কথায় কান দেয় না, তিলকার হাতখানার উপর গাল রাখিয়া বলে, "আমি একটা টাকা দিচ্ছি, তুই সন্ধ্যাবেলা এক বোতল মদ এনে খা—আমি ওদের সঙ্গে তোকে মদ খেতে দেব না।"

তিলকা হাসে, মাথা নাড়িয়া বলে, "অত মেহনতের পয়সা গো, জলে ভিজে, রোদে পুড়ে পাথর ভেঙে পয়সা কামাই করেছিস, সে পয়সা খরচ করে মদ খেতে বলিস নে। ওদের পয়সায় আমোদ করব, সুযোগ পেয়েছি ছাড়ব কেন?"

যুক্তি অকাট্য, রুকিয়া ধীরে ধীরে তিলকার হাত ছাড়িয়া দেয়।

তিলকা চলিয়া গেলে রুকিয়া অনেকক্ষণ সেইখানে বসিয়া থাকে। গুলবার সঙ্গে তিলকার এ ঘনিষ্ঠতা তাহার মোটেই ভাল লাগে না। ওই ডুরে শাড়ী-পরা ছুঁড়িটার প্রতি প্রথম হইতেই তাহার মন বিরূপ হইয়া আছে, কেমন ঢং করিয়া কথা বলে, অচেনা পুরুষের সামনে হি হি করিয়া হাসে—লজ্জা হয় না, কি বেহায়া! হঠাৎ রুকিয়া উঠিয়া ঘরে গিয়া ঢোকে, কুলঙ্গি হইতে ছোট ভাঙা আয়নাখানা লইয়া আঁচল দিয়া ভাল করিয়া পুঁছিয়া আবার বাহিরে আসে—অনেকদিন পরে মনোযোগ দিয়া সে নিজের মুখ দেখে। একরাশ রুক্ষ এলোমেলো চুলের মধ্যে শীর্ণ লাবণ্য-হীন মুখখানা দেখিয়া নিজের প্রতি অশ্রদ্ধায় তাহার মন ভরিয়া যায়, আয়নাখানা একপাশে ফেলিয়া দিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

নেশা করিয়া সন্ধ্যার পর তিলকা বাড়ী ফেরে, মন তাহার স্ফূর্তিতে মশগুল। খাটিয়ার উপর শুইয়া পড়িয়া সে অবিরাম আবোল-তাবোল বকিতে থাকে,—"এ দুনিয়াটা বড় ভাল, রুকিয়া বড় ভাল, মনুয়া বড় ভাল, সরযু বড় ভাল, গুলবা বড় ভাল, গুলবার সাঙ্গাত ছুঁড়িটা বড় ভাল।" বকিতে বকিতে সে ঘুমাইয়া পড়ে। অনেক রাত পর্যন্ত রুকিয়া তিলকার পাশে বসিয়া থাকে।

ভোরবেলা উঠিয়া রুকিয়া তাড়াতাড়ি নিজের ময়লা ছেঁড়া শাড়ী ও খান দুই জীর্ণ কাঁথা মাথায় করিয়া বাঁধে যায়, সেগুলি কাচিয়া-কুচিয়া স্নান করিয়া বাড়ী ফেরে। আজ সে ভারি ব্যস্ত, ছুটাছুটি করিয়া এবাড়ী-ওবাড়ী যায়, তার পরে

একটু বিশেষ যত্নের সঙ্গে ঘরদোর পরিষ্কার করিয়া রান্না চাপাইয়া দেয়। কাতরাসের গাড়ী মহুয়াটাড় ষ্টেশনে অনেক রাতে আসে, তিলকারা তাই বিকালের দিকে রওনা হইবে, খাইয়া-দাইয়া একটু বিশ্রাম করিবার সময়ও থাকিবে।

দুপুর নাগাত খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া তিলকা খাটিয়ার উপর বসিয়া খৈনি টেপে—রুকিয়ার কাজ তখনও শেষ হয় না। ঘরের যত হাঁড়িকুঁড়ি এক জায়গায় আনিয়া জড়ো করে, একখানা ছেঁড়া কাপড়ে সঞ্চিত দু'চার সের ধান-চাল ঢালিয়া পোঁটলা বাঁধে। তার পরে ঘরের অন্ধকার কোণ হইতে পুরনো অকেজো ভাঙ্গা লণ্ঠনটা আনিয়া সামনে রাখে।

তিলকা এইবার উঠিয়া আসে, বলে, "এসব কি করছিস গো?"

রুকিয়া মুখ না তুলিয়াই বলে, "কাতরাস যাবার ব্যবস্থা করছি।"

"অত ধান-চাল পোঁটলা করে বাঁধলি কেন, ও ত আমি সঙ্গে নেব না" বলে তিলকা।

রুকিয়া হাতের কাজ রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, তিলকার সামনে আসিয়া বলে."ধান-চাল ক'টা সঙ্গে না নিলে খাব কি, আমরাও ত তোর সঙ্গে কাতরাস যাচ্ছি গো।"

তিলকা অবাক হইয়া যায়, রুকিয়া যে সঙ্গে যাইবার মতলব করিয়াছে তাহা সে ত জানে না, বলে, "কাতরাস যাবি—সে কি গো?"

"আমি এখানে একা থাকব না, আমিও যাব, তাই ত সব গুছিয়ে নিচ্ছি" বলে রুকিয়া।

তিলকা সভয়ে বলে, "তুই ক্ষেপে গেলি নাকি, তুই কেন যাবি আমার সঙ্গে!"

মাথা নাড়িয়া রুকিয়া বলে, "আমি যাব।"

তিলকা বুঝাইয়া বলে,"বিদেশে যাচ্ছি, বলদিকি, তোকে নিয়ে কোথায় রাখব; এসব পাগলামি ছাড়। আমি গিয়ে একটা আস্তানা করি, তার পরে একবার এসে তোকে নিয়ে যাব।"

তিলকা যতই বুঝাইতে চেষ্টা করে রুকিয়ার রোখ ততই বাড়িয়া যায়। শেষটা তিলকা রাগিয়া ওঠে, ধমক দিয়া বলে, "না, তুই যেতে পারবি নে, আমি তোকে সঙ্গে নেব না।"

রুকিয়া নিঃশব্দে অনেকক্ষণ তিলকার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে, তার পরে ঘরের কোণটিতে গিয়া বসিয়া কঠিনভাবে বলে, "বেশ, আমি যাব না, যা, তোর যেখানে খুশী তুই যা।"

তিলকা নিতান্ত অসহায়ের মত দাঁড়াইয়া থাকে।

ইতিমধ্যে গুলবা ও তাহার সঙ্গিনী ষ্টেশনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া তিলকার আঙিনায় আসিয়া দাঁড়ায়। গুলবা ডাকে, "কৈগো তিলকাদা, বেরিয়ে পড়, বেলা পড়ে আসছে, অনেকটা পথ যেতে হবে।"

ভিতর হইতে তিলকা কোন সাড়া দেয় না। গুলবার সঙ্গিনী দরজার কাছে আসিয়া ভিতরে উঁকি মারে, রুকিয়াকে দেখিয়া এক গাল হাসিয়া বলে, "ও পরসাদের মা, এইবার পরসাদের বাপকে ছেড়ে দাও।"

রুকিয়া মুখ ঘুরাইয়া বসে। তিলকা বিব্রতভাবে হাসিয়া বলে, "এই আসছি গো—একটু দাঁড়াও তোমরা, কাপড় আর গামছাখানা নিয়ে আসছি।"

কাপড় ও গামছাখানা কাঁধে ফেলিয়া তিলকা রুকিয়ার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার হাতটি ধরিয়া বলে, "ওগো, রাগ করিস নে, যাবার সময় ভালভাবে একটা কথা ক। আমি দু'মাস পরেই আবার ফিরে আসব, ভাবনা কি গো।"

রুকিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া থাকে, কোন কথাই বলে না। তিলকা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলে, "আর ত দেরী করতে পারছি নে, ওরা হাঁক দিচ্ছে—আমি চলি গো।"

রুকিয়ার হাতখানা মুঠোর মধ্যে একবার ধরিয়া ব্যথিত-চিত্তে আবার বলে, "সাবধানে থাকিস।"

তার পরে পরসাদকে চুমো খাইয়া ঘরের বাহির হইয়া আসে। রাগে, দুঃখে রুকিয়ার ভিতরে একটা ঝড় বহিয়া চলে, সে কিছু শুনিতেও পায় না, দেখিতেও পায় না।

অনেকক্ষণ পরে যখন তাহার সম্বিত ফিরিয়া আসে রুকিয়া তখন ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। বাহিরে ত কোন সাড়াশব্দ নাই। তবে কি তিলকারা চলিয়া গিয়াছে? তাড়াতাড়ি সে ঘরের বাহিরে আসে, সেখানে কাহাকেও দেখিতে পায় না। একটা প্রচণ্ড ব্যথা তাহার বুকের মধ্যে উদ্বেল হইয়া ওঠে, তিলকা যদি আর একবার আসিয়া তাহার হাত ধরিত, তাহা হইলে এই অভিমান তাহার কোথায় ভাসিয়া যাইত। ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইয়া সে পথে বাহির হয়, গাঁয়ের অলিগলি ধরিয়া ছুটিয়া চলে। মাঠে আসিয়াও তাহাদের দেখিতে পায় না, সে নদীর পাড়ে আসিয়া দাঁড়ায়। ওপাড়ের দীর্ঘ আঁকাবাঁকা পথ তাহার চোখে পড়ে, অনেক দূরে, পথের শেষ বাঁকে, অরণ্যের কোল ঘেঁষিয়া তিনটি মানুষকে দেখিতে পায়।

রুকিয়া চীৎকার করিয়া ডাকে, "পরসাদের বাপ, পরসাদের বাপ গো!" কিন্তু সে ডাক অতদূরে পৌঁছায় না, দেখিতে দেখিতে অরণ্যের আড়ালে তাহারা অদৃশ্য হইয়া

যায়। রুকিয়ার দুই পা থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে, সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না, পথের পাশে বসিয়া পড়ে; দুই চোখ তাহার জলে ভরিয়া যায়। সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসে।

সমাপ্ত

রমনা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

ঢাকার সন্নিকট রমনা বিখ্যাত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুকবি স্বর্গীয় মোহিতলাল মজুমদার একবার বলিয়াছিলেন যে তিনি "রমনা" কথাটার অর্থ বহু ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন কিন্তু কোনও সদুত্তর পান নাই।

গ্রামের নাম সম্বন্ধে আলোচনাকালে মুর্শিদাবাদ জেলায় রমনা-বাগসরাই, রমনা বড়খাড়ি, রমনা চাঁদপুর, রমনা দাদপুর ও রমনা এংবারনগর বসন্তপুর প্রভৃতি নামের গ্রামের সাক্ষাৎ পাইয়াছি। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলায় কোনও "রমনা"র সাক্ষাৎ পাই নাই। এই "রমনা" কথাটির অর্থ কি?

আচার্য্য স্যর যদুনাথ সরকার মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত উইলিয়ম আরভাইন প্রণীত লেটার মুঘলস পুস্তকের ২য় খণ্ডের ১২৫ পৃষ্ঠা পাঠে জানিতে পারি যে ইংরাজীতে যাহাকে 'game preserve' বলে, অর্থাৎ শিকার উপযোগী জন্তুজানোয়ার পূর্ণ জঙ্গলের সমার্থ-বাচক শব্দ হইতেছে R A M N A বা রমনা।

তাহা হইলে ঢাকার রমনায় এককালে শিকার উপযোগী জন্তু জানোয়ার পাওয়া যাইত এবং ঢাকাস্থ সুবেদার, নবাবরা তাহা শিকার করিতেন। ইংরাজী ১৯০৫ সনে যখন পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের রাজধানী স্থাপিত হয়, তখনও রমনা জঙ্গলাবৃত ছিল। এখনও কিছু কিছু জঙ্গল আশে-পাশে আছে।

মুর্শিদাবাদ জেলায় সাতটি রমনার সমাবেশ নবাবদের শিকার-প্রিয়তার প্রমাণ। তাঁহারা এই সব স্থানে চাষ আবাদ হইতে দেন নাই, শিকারের জন্য স্থান ঘিরিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। অন্যান্য জেলায় 'রমনা' না থাকা এবং কেবলমাত্র মুর্শিদাবাদ আমাদের অনুমানের সমর্থক। ইহাদের ভৌগোলিক অবস্থান—মুর্শিদাবাদ সহরের সান্নিধ্যও আমাদের অনুমানের সমর্থক।

ইং ১৭০৪ সনে মুর্শিদকুলি খাঁ ঢাকা হইতে দেওয়ানের কার্য্যালয় মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করেন। পরে তিনি বাংলার নবাব নাজিম হইয়া দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে বাংলা শাসন করেন। ইং ১৭৬৫ সনে ইংরাজদের দেওয়ানী লাভের সঙ্গে সঙ্গে নবাবের প্রকৃত ক্ষমতা লোপ পায়। এই সময়ের মধ্যে এই সব 'রমনা'র সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে যদি স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ রাজস্ব বিভাগীয় পুরাতন কাগজপত্রাদি ও লোকমুখে প্রচলিত কিম্বদন্তী-সমূহ লইয়া আলোচনা করেন ত ভাল হয় এবং এই 'রমনা' সৃষ্টির প্রকৃত তথ্য উদঘাটিত হইতে পারে।

মুর্শিদাবাদ জেলার 'রমনা' গ্রামের নাম ও আয়তন নিম্নে দেওয়া হইল। যথা :—

১।	রমনা দাদপুর	— ২৩৩	একর
২।	রমনা চাঁদপুর	২,৫৭৫	,,
৩।	রমনা এংবার নগর-বসন্তপুর	১,০৫৬	,,
৪।	রমনা বাগসরাই	৭২	,,
৫।	রমনা গোবরা	৪০৮	,,
৬।	রমনা মহাদিপুর	৩৩৭	,,
৭।	রমনা বড়খাড়ি	১১১১	,,

গোকুল নগর

পশ্চিম বাংলায় গোকুলনগর নামে ১১টি গ্রাম আছে। বাঁকুড়া জেলায় ২টি, মেদিনীপুর জেলায় ৫টি, ২৪ পরগণায় ১টি, নদীয়ায় ২টি এবং জলপাইগুড়ি জেলায় ১টি। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমায় বিষ্ণুপুর শহর হইতে ১০ মাইল পূর্ব্বে গোকুলনগর বলিয়া একটি গ্রাম আছে। বিষ্ণুপুর রাজবংশের আদিপুরুষ হইতে অধঃস্তন ৪৬শ পুরুষ হইতেছেন চন্দ্রমল্ল। ইনি ইং ১৪৬০ সাল হইতে ইং ১৫০১ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই গ্রামে ইনি শ্রীশ্রীগোকুলচাঁদ ও তাঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীশ্রীগোকুলচাঁদের নামে সেখানকার নামকরণ গোকুলনগর করেন। অনেকে বলেন যে, এই মন্দিরই বিষ্ণুপুরের রাজাদের প্রাচীনতম মন্দির। পূর্ব্বে এই স্থানের কি নাম ছিল তাহা জানা যায় না।

শেষ মিনতি

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

খেলা যখন ফুরিয়ে যাবে, বেলা শেষে নামবে অন্ধকার,
মিলিয়ে যাবে এই জীবনের অর্থবিহীন সমস্ত চীৎকার
মহাঘুমের মহামৌনে—দোহাই, তখন নয়কো কোনো গোল;
ঐ যেখানে নদীর তীরে বসুন্ধরার স্নিগ্ধ সবুজ কোল,
'জলাঙ্গী'র ঐ জলের ধারা দিন-রাত্তির কুলুকুলিয়ে বয়—
হোথায় মোরে শুইয়ে দিও। মাথার দিব্যি, অন্য কোথাও নয়।

তোমরা জানো, টাকার জন্যে ছিল নাকো এমন কিছু লোভ;
রাজা-উজীর হই নি বলেও মনের মধ্যে খুব ছিল না ক্ষোভ;
মনে হচ্ছে, এই প্রসঙ্গে একটা কথা স্বীকার করাই ঠিক:
নারী-মায়ার দুর্ব্বলতায় মাঝে মাঝে ভুলেছিলাম দিক;
অনেক কান্না কেঁদেছিলাম; জীবনতরীর ভেঙেছিল হাল;
নৌকা যখন ডুবুডুবু হঠাৎ ছিঁড়ে গেছে মৃত্যুজাল
সেই দয়ালের অনুগ্রহে। অহঙ্কারের আছে কোন দাম?
করুণাময় ওগো ঠাকুর, পাদপদ্মে অসংখ্য প্রণাম।

এই প্রসঙ্গে ইতি এখন। যে-কথাটি বলতে চাইছে প্রাণ
সেটি হচ্ছে: মাটির প্রতি মজ্জাগত ছিল একটা টান।
সেই প্রেমেতে খাদ ছিল না; শহরেতে সুখ পাই নি তাই;
পাষাণ মরুর বক্ষ ছেড়ে মনে হতো পালিয়ে কোথাও যাই।

গভীর ক'রে যা চাই মোরা অপূর্ণ কি রাখেন ভগবান?
নিজের হাতে তৈরি করা তোমরা যদি দেখতে এ বাগান!
পূবের দিকে একটি কুঠির রাঙা টালির অতীব ছিমছাম;
কাজল-জলের স্বচ্ছধারা বয় অদূরে—'জলাঙ্গী' ওর নাম।
দুর্ব্বাদলের গালচেটিতে আঙিনাটি শ্যামল শোভন!
বেড়ার ধারে কমলারঙের থোকো থোকো অজস্র 'রঙন';
হলুদরঙের ঝিঙের ফুলে সন্ধ্যাবেলা চোখ জুড়িয়ে যায়;
ঘরের মধ্যে আগিয়ে এসে 'বুগেনভিলা' যেন বলতে চায়:
'ওগো বন্ধু, আছো কেমন?' রাতে গন্ধ মধুমালতীর;

সকাল থেকেই 'টিকোমা'তে ভিড় লেগেছে নানা অতিথির;
'ডালিম' ফুলের পেয়ালাতে মৌ-টুসকির চলছে মধুপান;
'লিলি'র কোমল দলগুলিতে কোন্ শিল্পীর তুলির এমন টান!
টক্‌টকে লাল জবায় দিল কে যে এমন বর্ণাঢ্য প্রলেপ!
পুষ্পবনে স্পর্শভীরু 'কামিনী'দের আলতো পদক্ষেপ;
'টগর'গুলো ডাগর ডাগর; 'গাঁদা'য় যেন গিনি সোনার রঙ!
দখিন হাওয়ায় দুলে দুলে 'করবী'দের নাচের কি বা ঢঙ!
আতার গাছে ছাতারেরা, শালিখগুলো কি যে বলে যায়!
জটলা করে টেঁয়াগুলো, দস্যি ফিঙে কি ভীষণ চেঁচায়!
নারিকেলের ঝালর কাঁপে, পাতায় পাতায় মর্ম্মর মধুর!
মাটির গন্ধ, তারার আলো, মাঠে মাঠে সোনালী রোদ্দুর!
আকাশের ঐ কোমল নীলে রেশমী মেঘে উত্তরীয় কার?
তুমি মধুর, অনবদ্য! হে ধরণী, তুমি চমৎকার!
তোমায় ভালোবেসেছিলাম, চেয়েছিলাম গগনের ঐ নীল!
চেয়েছিলাম ঘাসের শ্যামল; আর কিছুতে ভরতো কি এ দিল?

ঘরের পিছে শাক্‌সব্জী—কুমড়ো, কলা, করলা, শসা, লাউ,
কালো কালো মাকড়া-বেগুন, ভারি মিষ্টি! যত ইচ্ছে নাও;
কাঁকুড়গুলো গুড়ের মতোই, মাচাতে সিম, বরবটি আর পুঁই,
কাগ্‌চি লেবু ক' ঝুড়ি চাও? পুকুরেতে পাবে কাতলা-রুই;
হঠাৎ রাতে কুটুম এলে ঘাবড়াই নে—ফেলো ক্ষ্যাপলা জাল;
গোলায় আছেন মা-লক্ষ্মী মোর—গোয়ালেতে আছে গাভীর পাল;
খর্জ্জুর গাছ এক-আধটা নয়—একান্নটা; কিনতে হয় না গুড়!
পুত্র-কন্যা অনেকগুলি; গুড় কিনতেই হোতাম যে ফতুর!
হাঁস-মুরগী কুড়ি গণ্ডা—ডজন ডজন ডিম্ব মাসে পাই;
আম-কাঁঠালের বাগান আছে; আছে আতা, পেঁপে ও জলপাই;
জামরুল আর লিচু আছে; আছে ফলসা এবং গোলাপজাম।
বিলিতি কুল ও পেয়ারা চাও? চাও নারিকেল, সফেদা, বাদাম?
তাও পাবে। পশ্চিমেতে অনেকগুলো আছে বাঁশের ঝাড়;
বাঁশ না হ'লে পাড়াগাঁয়ে চক্ষে তুমি দেখবে অন্ধকার।

এমনি একটি গৃহস্থালি স্বয়ংপূর্ণ, সহজ, সুন্দর
স্বপ্নে আমার নিত্য ছিল। হৃদয় আমার চায় নি আড়ম্বর।
রক্তে আমার ঢেউ তুলিত ঐ 'জলাঙ্গী'। ওরই আকর্ষণ
শত কাজের মাঝেও আমায় কতবার যে করেছে উন্মন!
কত প্রভাত-দুপুর-সন্ধ্যা ওরই বুকে জল-খেলার সুখ!
ভাসবো কখন স্রোতের মুখে তারই লাগি থেকেছি উন্মুখ!
সেদিন কোথায় হারিয়ে গেছে! বালুর চরে গড়াগড়ির ধুম!
জলাঙ্গী গো, বিদায় এখন! চোখের পাতায় আসছে নেমে ঘুম!
তোমার তীরেই ঘুমাতে চাই। শিয়রেতে একটি যুঁই-এর ঝাড়।
গন্ধ-ভরা অন্ধকারে বৃষ্টি ঝরে—সঘন আষাঢ়!
কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরীতে বসন্তকাল মাখাবে আবীর!
পুষ্পিত সে তরুচ্ছায়ে কি আরামের নিদ্রা সুগভীর!
কদমচারা না লাগালে সত্যি পানসে লাগবে শ্রাবণ মাস;
ভাদ্রে তো আপনা থেকেই তীরে তীরে হাসবে কত কাশ;
শিউলি দুটো লাগিয়ে দিলে মন্দ হয় না; শরতকালের ভোর
উঠবে ভরে সৌরভেতে। শীতের দিনে কি শোভা কুন্দর!
ফাল্গুনে বাতাবীফুলে গন্ধে হিয়া করিবে উন্মাদ!
রোপণ করো একটি চারা—পরাণ ভরে দেবো আশীর্ব্বাদ।
চৈত্রীরাতে হেনার সুবাস ঘুমের মাঝে তুলবে খুশীর ঢেউ;
কাছাকাছি হাস্নুহানা তোমরা না হয় লাগিয়ে দিলে কেউ!

কি আরামে ঘুম দেবো যে! সারাবেলা পাখীর কলরব!
তেলাকুচোর পক ফলে বুলবুলিদের ভোজের মহোৎসব!
কাঠবিড়ালীর 'চিড়িক্'-'চিড়িক্', বনকপোত কাঁদছে শোকাতুর,
সজনে গাছে 'বউ-কথা-কও' ডাকছে, কানে লাগছে কি মধুর!
হাঁড়িচাচার 'ঠ্যাকা ঠ্যাকা', কুকো পাখীর 'কুক্ কুক্ কুক্' ডাক;
সুগন্ধি সঙ্গীতেভরা লেবুর ডালে মৌমাছিদের চাক!
রাখাল ছেলে চরায় ধেনু, কাদাখোঁচা পুচ্ছটি নাচায়!
মাঠের মধ্যে যেতে যেতে খ্যাঁকশেয়ালী ইতি-উতি চায়!
জোনাক-জ্বলা রাতের কানন লক্ষহীরের পুষ্পে সমাকুল!
ছায়াপথের দুধ-গঙ্গায় ভাসে তারার কত সোনার ফুল!
কালপুরুষের খড়্গ দোলে, বৃহস্পতির দৃষ্টি কি উজ্জ্বল!
জ্যোৎস্নারাতের 'পিউ কাঁহা'তে কোন্ বিরহীর ঝরে আঁখির জল!

এমনি একটা আবেষ্টনী! এরই মাঝে অনন্ত বিশ্রাম!
জলাঙ্গী ঐ কুল্‌কুলিয়ে গান শুনিয়ে বইছে অবিরাম!
হয়তো কেহ বলবে, পথিক, এইখানেতে বসো একটিবার।
একটি মানুষ ঘুমায় হেথা। জানো, বন্ধু, পরিচয়টি তার?
এমন কিছু জমকালো নয়। ত্রুটি ছিল স্বভাবে প্রচুর।
গুণের মধ্যে একটি ছিল—প্রাণে ছিল ভালোবাসার সুর।
উৎপীড়িত দুর্ব্বলেরে কদাচিত সে করেছে বর্জ্জন।'
সকল পাপের ক্ষমা প্রেমে। ক্ষমো তারে তোমরা পথিকজন।

বিন্ধ্যাচল

শ্রীপূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

বিন্ধ্য-রাজমহলের এই মর্ত্য বাঁকা চাঁদ জলধর-রঙে
সূর্য্যের উদয় ছুঁতে ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিম ঠামে খাসিয়া-শিলঙে
কতকাল প্রসারিত।
দূর সোমনাথ থেকে ঐ চন্দ্রনাথে
যে ছিল অবিচ্ছিন্ন, চড়াই-উৎরাই তার আজ অধঃপাতে
ইতস্ততঃ ন্যস্ত হ'ল।

এরি কোলে-পিঠে সব গোত্রেরা জাতক,
লালিত-পালিত আর অগণিত সময়ের স্রোতের স্নাতক।
হাঁটি-হাঁটি থির-থির সভ্যতার শৈশবের বিলম্বিত তাল
হয়ত বা স্থবিরের কুব্জহামা, ক্ষয়িষ্ণুর প্রবীণ বৈকাল।
তবু সাঁওতালী বাঁশী, ওড়াওঁ কীর্ত্তন আজও সুরে সুরে গলে,
আদিম আর্য্যের সেই মারাঠী প্রাকৃত জাগে। এস বিন্ধ্যাচলে।

বেগম পরী



শ্রীসত্যেন সিংহ

লাল পরী—নীল পরীর গল্প নয়। কোন মোগল বাদশার হারেমের রূপসীর-নূপুর নিক্কণও শুনতে পাওয়া যাবে না।

তার বদলে খট-খট-খ—ট, খট খট খট-খ—ট। সেলাই কলের অবিশ্রান্ত ধ্বনি মুখরিত করে রেখেছে মাটি দিয়ে গোল করে বাঁধানো অশ্বত্থ গাছটাকে। ঐ শব্দে একটাও পাখী সারাদিন বসে না গাছের ডালে। মানুষ বসে চুল কাটতে, দাড়ি কামাতে, হাত-পায়ের নখ ফেলতে ঐ বাঁধানো বেদীর ওপর। বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন গ্রামের বিচিত্র মানুষ।

ওরই মধ্যে খানিকটা জায়গা জুড়ে বসে আছে সেলাই-এর কল। সকাল থেকে সন্ধ্যারাত্রি পর্য্যন্ত নবী সেখের পা দুটোর বিরাম নেই। নিকেলের চশমা চোখে একাগ্রমনে সে এঁকে দিচ্ছে উইপোকার মত সাদা সাদা সেলাই নানান্ জনের নানা পরিচ্ছদে।

মাথায় পাগড়ী বেঁধে, নিলামে-কেনা কালো কোট পরে বিদেশীয়া হাজাম সান-পাথরে হাতের ক্ষুর ঘষতে ঘষতে এক একবার অন্যমনস্ক হয়ে চেয়ে থাকে নবী সেখের দিকে। ষাট বছর বয়স হ'ল নবী সেখের, প্রায় বিদেশীয়ারই সমবয়সী, তবু কেমন দিনরাত ফিট্‌ফাট্ ছোকরাটি সেজে আছে নবী সেখ। বিদেশীয়ার চুল কাটা নবী সেখের পছন্দ হয় না আজকাল। বিদেশীয়ার বড় ছেলে শিউলাল চুল কাটে তার। চারি পাশটা মেশিন দিয়ে সূক্ষ্ম করে ছেঁটে ওপরের পাৎলা সাদা বড় চুলগুলো আঁচড়ে বসিয়ে দেয়। মনে মনে হাসি পায় বিদেশীয়ার, অথচ আসল ছোকরা বয়সে বিদেশীয়াই চুল কাটত নবী সেখের। মনে পড়ে চুল কাটার বদলে পয়সা দিত না, দিত এক শিশি করে আতর। নবী সেখের বাবা দিলদার সেখ রেশমী কাপড় আর আতরের ব্যবসা করত। বাবুদের চুল কেটে বিদেশীয়া সেই আতর মাখিয়ে দিত কানে, গোঁফে একটু একটু করে; তাতে বকশিস্ দিতেন বাবুরা।

বুঝতে পারে বিদেশীয়া,কেন নবী সেখ আজকাল মাথার চুলে কলপ দেয়, কালো কলপ নয়, মেহেদি রং-এর তামাটে কলপ,আর কেনই বা পরে লাল-কালো ডোরা-কাটা কামিজ, কড়া সবুজ বড় বড় চেকের লুঙ্গি। আরও বুঝতে পারে, কেমন করে অলস নবী সেখ, সওদাগর দিলদার শেখের অপদার্থ ছেলে নবী সেখ, যার একটা জামা সেলাই করতে দশ দিন সময় লাগত, দিনে এখন দশ-বিশটা জামা অনায়াসে সেলাই করে দিতে পারে।

থানার কনেষ্টবল মহাবীর সিং বুক খুলে বসে আছে, বুকের লোম কামাবে সে। বিদেশীয়ার দেরি দেখে অস্থির হয়ে ওঠে। সযত্নে ক্ষুরটাকে কোটের আস্তিনে ঘষে নিয়ে বিদেশীয়া আপন মনেই বিড় বিড় করে বলে—'বেগম পরী'!

মহাবীর সিং বলে—ক্যায়া?

—কুছ নেহি, কুছ নেহি সিপাহী জী। চর্ চর্ করে বুকের লোমে ক্ষুরের টান মারে বিদেশীয়া। কেমন যেন উল্লাস জাগে ওর মহাবীর সিং-এর মাংসল বুকের লোমগুলোর ওপর ক্ষুর চালাতে।

ওদিকে মেশিনের একটানা শব্দটা বন্ধ হয়ে যায়। নবী সেখ এসে দাঁড়ায় বিদেশীয়ার কাছে, দেখে ওর ক্ষিপ্র ক্ষুর চালনা। মহাবীর সিং ঊর্দ্ধবাহু হয়ে অসহায় চোখে চায় নবী সেখের মুখের দিকে—কাম বন্ধ কর দিয়ে খলিফা সাহাব?

—হাঁ ভাই, থোড়া নাস্তা করনে যাতে হেঁ।

আড়চোখে চেয়ে দেখে বিদেশীয়া হাজাম। সামনের দুটো সোনা-বাঁধানো দাঁতে হাসি ঝক্‌মক্ করছে নবী সেখের। সঙ্কীর্ণ পথটা পার হয়ে ঘরে যায় নবী সেখ।

বিদেশীয়া এদিক ওদিক দেখে ফিস্‌ফিস্ করে বলে—লাল পরী নেহি, নীল পরী ভি নেহি, বেগম পরী।

—ক্যায়া পাগলাকা মাফিক বকতে হো? দেখ ছোরা লাগ গিয়া। ঘর্ম্মবিন্দুর মত এক ফোঁটা লাল রক্ত ফুটে উঠল মহাবীর সিং-এর ফরসা বুকে।

—কুছ নেহি, কুছ নেহি, বলে তাজা রক্তবিন্দুটাকে মুছে দেয় বিদেশীয়া হাজাম।

বিদেশীয়া হাজাম এর জন্যে দায়ী কি না জানি না—কয়েক দিনের মধ্যে নানাজনের মুখে কথাটা গুঞ্জরিত হতে থাকে—বেগম পরী! বেগম পরী! কেও দেখে নি, কেও শোনে নি, অথচ নামটা ঔৎসুক্য জাগায় সকলের মনে। ভিড় বাড়ে অশ্বত্থ গাছের তলায়। বিদেশীয়ারা তিন বাপ-বেটা মিলে কামিয়ে হিম্‌সিম্ খেয়ে যায়। পাড়ার লোকেরা বসে বসে কামিজ, পাঞ্জাবী তৈরি করায় নবী সেখের কাছে।

নবী সেখের কানেও হয়ত গেছে সে নাম কিন্তু সে নামের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক আছে কি না মুখ দেখে বোঝা যায় না।

অশ্বত্থ গাছ ঘিরে ত্রিভুজাকারে তিনটি ঘর। দুটো বিদেশীয়ার একটা নবী সেখের। সামান্য জায়গাকে আঁকড়ে ধরে কোনরূপে ঠাসাঠাসি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তিনটে ঘর। তিন পুরুষ ধরে এই দু'ঘর পশ্চিমা নাপিত ও মুসলমানের বাস বাংলার এই পল্লীটিতে। কিন্তু নবী সেখের পুরনো বাপের আমলের সে ঘর আর এখন নেই। দিলদার সেখের কোঠাবাড়ী ভেঙ্গে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে অনেকদিন, একপাশে একটা দেওয়াল আর কুয়ো ছাড়া সে আমলের চিহ্ন কিছু নেই। দিলদার সেখের ছেলে নবী সেখ অনেকবার ঘর বাঁধবার চেষ্টা করেছিল এখানে কিন্তু প্রতিবারেই নাকি সে বিফল হয়েছে। তিনবার তাকে বিয়ে করে বৌ আনতে দেখেছে এখানের লোক—কিন্তু বৌ দেখে নি কেও, নবী সেখ দেখতে দেয় নি। বোরখায় মুখ ঢেকে পর পর তিনটি বৌ এসেছে। তিনজনে একটি ছেলে ও দুটি মেয়ে উপহার দিয়ে আবার পর পর পালিয়ে গেছে। কখন? কার সঙ্গে? সে কথা কেউ জানে না। কারণ প্রতিবারেই বৌ-পালানোর পরদিনই নবী সেখ ছেলে বা মেয়ে কোলে গ্রাম ত্যাগ করেছে। কোথায় মানুষ হ'ল ওর ছেলেমেয়ে, এখনি বা কোথায় আছে ওরা কেউ বলতে পারে না।

তিনটে বৌ পালানোর অনেকদিন পর আবার নবী সেখ ফিরে এল এ গ্রামে। এবার সঙ্গে বৌ নয়, একটা সেলাই-এর কল। এসে দেখল ঘরদোর মাটিতে মিশেছে, সেখানে, গোবর-মাটি দিয়ে নিকিয়ে বিদেশীয়া হাজাম ধানের খামার করেছে। তার কুয়োতলায় বাসন মাজছে, স্নান করছে শিউলাল হাজামের বৌ।

স্থানীয় মুদির দোকানের বারান্দায় সেলাই-কল রেখে নিজের কুয়োতলায় এসে বসল নবী সেখ। বোধ হয় চারপাশে চেয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেছিল। মনে হ'ল এতদিনে অবস্থাপন্ন সওদাগর দিলদার সেখের ছেলে নবী সেখ দুরবস্থায় পড়েছে। তার পরণে সাদা ছেঁড়া লুঙ্গি, ছেঁড়া কামিজের হাতা, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। বিদেশীয়া হাজামের সঙ্গে তার কি কথা হ'ল কে জানে, কয়দিন পরেই দেখা গেল মুদির দোকানের দাওয়ায় সেলাই-এর কল চালাচ্ছে নবী সেখ—আর রাত জেগে রাস্তার দিকে সোজা দেওয়াল টেনে একখানি ছোট ঘর তুলছে নিজের ভিটায়।

অদ্ভুত স্থপতি-শিল্পের প্রয়োগ করতে লাগল নবী সেখ তার এই ছোট ঘরখানি বানাতে। এ কোথাও সে শিখে এসেছিল কিংবা নিজের উর্ব্বর মস্তিষ্কের উদ্ভাবনা তা বলা মুস্কিল। চারটে দেওয়ালে হাতের এক বৃত্ত-মাপের চারটে ঘুলঘুলি ছাড়া আর কোথাও রইল না কোন ফাঁক। দরজাটা কাটল পথের বিপরীত দিকে ঘরের এক কোণে। তবু সেখানেও কি কম সতর্কতা—দরজার সামনে পড়ল তিনটে দেওয়ালের বেড়। সেই বেড় অদূরে কুয়োতলাটাকে পর্য্যন্ত মণ্ডলী করে ঘিরে ধরল। মনে হ'ল যে থাকবে সে ঘরে সে গোলকধাঁধার মত ঐ দেওয়ালের মধ্যেই ঘুরবে ফিরবে—তার বাইরে বেরুতে পারবে না। বাইরেরও কোন চোখ কোন ফাঁক দিয়েই দেওয়ালের মধ্যে দৃষ্টি গলাতে পারবে না।

বিদেশীয়া একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল নবী সেখকে—এমন করে ঘর তৈরীর মানে কি তার? নবী সেখ চমকে একবার চেয়েছিল বিদেশীয়ার মুখের দিকে, তার পর ওর উর্দ্দু ভাষায় কি একটা বলেছিল বুঝতে পারে নি হিন্দুস্থানী নাপিত। অবশেষে এত সতর্কতার কারণ কতকটা বোধগম্য হ'ল বিদেশীয়ার কাছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে একদিন একটা বদ্ধ-কপাট-ঘোড়ারগাড়ী এসে দাঁড়াল নবী সেখের দোরে। বিদেশীয়া দেখল ঘোড়ার গাড়ীর দোর খুলে নবী সেখ ভূতের মত আপাদমস্তক সাদা কাকে যেন হাত ধরে ঢুকিয়ে দিল তার সেই দেওয়ালের গোলকধাঁধার মধ্যে।

সকালবেলা বিদেশীয়া জিজ্ঞাসা করল নবী সেখকে, কাল কোন্ আয়া তোমারা ঘরমে?

নির্লিপ্তভাবে জবাব দিল নবী সেখ—বেগম।

—বেগম। তোমারা জরু? ফিন্ সাদি কিয়া তুম্?

তেমনি নির্ব্বিকার চিত্তে নবী সেখ ঘাড় নেড়ে জানাল—হ্যাঁ।

তার পর একে একে বিদেশীয়ার পুত্রবধূ ও গ্রামের অনেক মেয়ে নবী সেখের ঘরে গিয়ে বেগমকে দেখে এল, আর বাইরে এসে যা প্রকাশ করল তাতে বিস্মিত হ'ল সবাই। ঔৎসুক্য ত বাড়লই সকলের, তা ছাড়া বুকের রক্তে দোলা লাগল তরুণ পুরুষদের।

এমন রূপ, এমন গোলাপের মত টকটকে গায়ের রং তারা নাকি কোন দিন দেখে নি। বয়স কুড়ি-একুশের বেশী নয়, অথচ ষাট বছরের বুড়ো নবী সেখ তার স্বামী হ'ল কেমন করে—কেমন করে ঐ কুৎসিত, বুড়ো দরিদ্র লোকটাকে স্বামীত্বে বরণ করল এ মেয়েটা, তাই নিয়ে অনেক দিন আলোচনা হ'ল মেয়ে মহলে। ক্রমে প্রকাশ পেল, রূপ শুধু নয়, গুণও আছে মেয়েটির। ঐ গোপনে অতি সন্তর্পণে সমস্ত সংসারের কাজ করে মেয়েটি, সেবা করে নবী সেখের, তার পর বাকি সময়টা হাতের সেলাই করে। দোকানে-কেনা দামী শালের উপর যে সেলাই থাকে তার

চেয়েও সূক্ষ্ম ও সুন্দর বেগমের হাতের সেলাই। মেয়েদের হাত দিয়েই সে সেলাইয়ের নমুনা বার হ'ল বাইরে, পছন্দ হ'ল পুরুষদের। কিছুদিনের মধ্যে অনেক অবস্থাপন্ন ব্যক্তির বাড়ীতে বিছানার বালিশ, টেবিলের ঢাকা মেয়েদের জামা ভরে উঠল বেগমের হাতের সূক্ষ্ম মধুর সূঁচের কাজে। কি মোহ যেন লেগে থাকল সেলাইয়ের প্রতিটি সুতায়। তরুণেরা বালিশে মাথা দিয়ে সেলাইয়ের মাঝে অনুভব করল যেন কার সরু সরু চিকণ কালো চুল ও দু'টি চম্পকাঙ্গুলীর স্নিগ্ধ-পরশ।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্য কথা যা প্রকাশ পেল তা এই যে, মেয়েটির ভাষা দুর্ব্বোধ্য। তা না হিন্দুস্থানী, না বাংলা—উর্দ্দু ও বলা চলে না সেটাকে। তাই মাথা নেড়ে ইসারায় তার সঙ্গে কথা কইতে হয়—অন্তরঙ্গ হওয়া যায় না দেওয়ালের মত ভাষার অন্তরায়ে, তাই জানা যায় না, কোথায় তার বাপের বাড়ী, কোন দেশের মেয়ে সে। পেটিকার মত ঘরে চাপা রইল একটা রহস্য, আর তার মধুর সুগন্ধ সেলাইয়ের রূপ নিয়ে ছড়াতে লাগল বাইরে।

যার হাতের কাজ এমন অপূর্ব্ব না-জানি তার আঙুল কত সুন্দর। দেখবার সাধ জেগেছিল হয়ত অনেক পুরুষের মনেই, কিন্তু কতজন তাকে লুকিয়ে-চুরিয়ে দেখেছিল আর দেখবার চেষ্টা করেছিল তার হিসেব পাওয়া যায় নি, কিন্তু যেদিন বিদেশীয়া তাকে প্রথম দেখল সেদিন হতেই মাটির দেওয়ালে আবদ্ধ এই মেয়েটির আলোচনার উপর আর একটা রহস্যের আবরণ পড়ল।

সেদিন ভোরের কুয়াশা তখনও পত্রহীন গাছের গায়ে গায়ে ছেঁড়া তুলার মত লেগে আছে, আকাশে দু'একটি তারা, আধখানা মরা চাঁদ তখনও জেগে আছে। সেই তন্দ্রাতুর, আবেশ-বিহ্বল প্রভাতে বিদেশীয়া উঠেছে নবী সেখের দেওয়ালের পাশের নিম গাছটায়। নিমের দাঁতন ভাঙছে। কিন্তু উঠেই নিমের ডালে হিম হয়ে গেছে ও, কি দেখে ওর সারা শরীর থর্ থর্ করে কাঁপছে। এক চুল নড়বার জো নেই তার। সামান্য শব্দ হলেই যেন স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবে, ছিঁড়ে যাবে কুয়াশা। কুয়োতলার ওপর দাঁড়িয়ে আছে সে, ঐ কি নবী সেখের বেগম? সাদা ভোরের আবরণে ঢাকা একটা সম্পূর্ণ সাদা নগ্ন নারী মূর্ত্তি। পৃথিবীতে আলোর লজ্জা আসার আগেই ও নিজেকে নিরাবরণ করে স্নান করছে কুয়োর জলে কিংবা প্রত্যূষের স্নিগ্ধতায় কে জানে? কিন্তু সত্যিই কি অপরূপ রূপ! বিদেশীয়া হাজাম নিম গাছে সমস্ত দেহটা মিশিয়ে দিয়ে যেন মুহূর্ত্তের জন্য কোন রূপকথার কল্পলোকে চলে গেল—যেখানে ওর অবচেতন মনে এই ভোরবেলার কুয়াশার মত ছোটবেলার ভাসা ভাসা, আবছা কাহিনীগুলো সঞ্চিত ছিল। ওদিকে যেমন যেমন চাঁদের মুখ থেকে আলো সরে গিয়ে তাকে ফ্যাকাশে করে দিতে লাগল এ দিকে তেমনি এক একটি সুন্দর অঙ্গ সাদা কাপড়ের অন্তরালে ঢাকা পড়ল। নিঃশ্বাস বন্ধ করে বিদেশীয়া নেমে এল গাছ থেকে, মাটির উপর প্রথম রুদ্ধ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে সে উচ্চারণ করল আপন মনে—বেগম পরী!

তার পর একটু পরিচিত যাকেই দেখে তাকেই বলে, লাল পরী নয়, নীল পরী নয়—বেগমপরী! চুল কাটতে,দাড়ি কামাতে বসে সে বলে ঐ একই কথা। কৌতূহলে লোকে ওকে জিজ্ঞাসা করে, কাঁচির কুচ কুচ শব্দের সঙ্গে তাল রেখে ফিস্ ফিস্ করে খুশীমত সাজিয়ে রহস্যময় করে বলে ও তার অভিজ্ঞতার কথা। যাদেরই সে কথা বলে, তাদেরই মনে অদ্ভুত একটা মোহ ছড়িয়ে দেয়। নবী সেখের বাড়ীর পাশ দিয়ে গেলে সে মোহ সারা দেহে কেমন একটা বিবশতা আনে; নিজের অজ্ঞাতেই পা দুটো কিসের ভারে যেন জড়িয়ে জড়িয়ে আসে। অশ্বত্থ গাছের তলায় যত লোক বসে চুল কাটতে, সেলাইয়ের খদ্দের ততই বাড়ে নবী সেখের। অনেকে চুল না বাড়লেও আসে, অকারণে বসে থাকে অন্যের চুল কাটা উপলক্ষ্য করে। চোখ দুটো নিবদ্ধ রাখে সামনের ছোট ঘুলঘুলিতে। ভেতরের কালো অন্ধকারের দিকে চেয়ে চেয়ে চোখে ব্যথা ধরে যায়, কখনও হয়ত মুহূর্ত্তের জন্যে মনে হয় এক ঝলক আবছা আলো যেন পড়ল সে গবাক্ষে—কার যেন দুটি কালো উৎসুক চোখ দৃষ্টির সঙ্গে এক হয়ে মিলে যেতে চায়।

কিন্তু এই বা ক'দিন ভাল লাগে? অবশেষে দু'একজন দুঃসাহসী পথ চলতে ঘুলঘুলির উপর রাখল সুগন্ধী সাবান, সুবাসিত তেল, সিল্কের রুমাল। দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করতে থাকে কখন সেগুলো কেমন করে উবে যায়। তার পরই হয়ত সুরু হবে একটা চাঞ্চল্য। ঐ ছোট্ট একটা ফাঁক, তাও হয়ত নবী সেখ দেবে বন্ধ করে। তেমন অবশ্য কিছুই ঘটল না। জিনিসগুলো কার মেহেদি রাঙা আঙুলের মধ্যে দিয়ে কখন অদৃশ্য হয়ে গেল, নবী সেখ রইল তেমনি নির্বিকার। উৎসাহিত হয়ে উঠল প্রেম-নিবেদনকারীর দল—এবার হারেমের পরীকে জানাতে হবে নিজেদের পরিচয়। যারা এতদিন দল বেঁধে উপহার প্রতিযোগিতা সুরু করেছিল তারা একক হবার চেষ্টা করল। নিজে উৎসাহিত হলেও অন্যকে নানা ভয় দেখিয়ে নিরুৎসাহ করবার চেষ্টায় মন দিল।

এর পর তরুণদের বেগম পরীর মনজয়ের অভিযান কোন পথে এগিয়ে চলত কে জানে, কিন্তু তার আগেই এসে পড়ল সেই লোকটা। সাড়ে ছ'ফিট লম্বা দৈত্যের মত এক পাঠান।

সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে এল লোকটা, বোধ হয় তিন মাইল দূরের রেল-ষ্টেশন থেকে। এসে দাঁড়াল অশ্বত্থ গাছটার তলায়। নবী সেখ তখন দিনের কাজ শেষ করে মেসিন তুলে দিয়েছে ঘরে। হয়ত নমাজ পড়ছিল নবী সেখ। আর একটু পরেই ওর দেওয়ালের মধ্যে শব্দ বেজে উঠবে খট, খট—খ...ট।

গাছের গুঁড়িটায় ঠেস দিয়ে এক মনে ছোট হুঁকোয় তামাক টানছিল বিদেশীয়া। লোকটাকে দেখে সে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল বিস্ময়ে। ভাল কাবলিওয়ালা। কিন্তু ঠিক কাবলিওয়ালা বলেও মনে হ'ল না। এদিক ওদিক ইতস্ততঃ চেয়ে লোকটা একেবারে বাঁধানো বেদীটার ওপর উঠে বিদেশীয়ার খুব কাছে এসে দাঁড়াল। লোকটার ভাবভঙ্গি দেখে বিদেশীয়ার বড় ভয় হ'ল। সাদা সালোয়ারের ওপর চকলেট রং-এর আজানুলম্বিত কামিজ, নীল ভেলভেটের গায়ে সোনালী রং-এর চুমকি বসানো ওয়েস্ট-কোট আর কোমরে একটা লাল কাপড়ের চওড়া কোমরবন্ধ। মাথায় তাজ জড়িয়ে সবুজ রং এর পাগড়ি। কালো সুরমা টানা তীক্ষ্ণ একজোড়া চোখ। দাড়িটি বোধ হয় সাদা—ঠিক বোঝা যায় না, মেহেদি রং-এ ছোপা। কিন্তু এসব দিকে আর বিদেশীয়ার লক্ষ্য নেই, ওর দৃষ্টি আটকে গেছে লোকটার কোমরবন্ধে গোঁজা চকচকে সাদা ছোরার হাতলটার ওপর।

ভাঙ্গা ভাঙ্গা উর্দ্দতে প্রশ্ন করে আগন্তুক—নবী সেখের বাড়ী কোন্‌টা?

অদ্ভুত গলার স্বর। ওর গলায় কেউ যেন গুঁজে দিয়েছে কতকগুলো শক্ত কাঠের কুচি—সেগুলোকে অনায়াসে ভেঙ্গে পিষে বেরিয়ে আসছে আওয়াজটা।

বিদেশীয়া কোন উত্তর না দিয়ে সোজা নেমে যায় গাছের বাঁধানো চত্বর থেকে, দ্রুত এসে দাঁড়ায় নবী সেখের বন্ধ টিনের দরজায়। স্তিমিত বয়লারের ফাঁকে যেমন একটা আলোর আভা দেখা যায় ঠিক তেমনি একটা আভা নবী সেখের ঘুলঘুলি থেকে ভেসে আসছিল। বিদেশীয়ার ইচ্ছা লোকটাকে কিছু না বলেই নবী সেখকে ডেকে দেয়—কিন্তু ভারী জুতোর শব্দে পেছন ফিরে দেখে লোকটা সোজা তাকে অনুসরণ করে দেওয়ালের ঘুলঘুলিটায় ঈষৎ ঝুয়ে ভেতরটা দেখবার চেষ্টা কচ্ছে। সেই অবস্থায় বিদেশীয়া ওকে সঙ্কুচিতভাবে জানায়—এইটাই নবী সেখের ঘর, ওকে ডেকে দেবে কি বিদেশীয়া? ঘুলঘুলি থেকে মুখটা সরিয়ে একটা জলন্ত দৃষ্টি হানে লোকটা বিদেশীয়ার মুখে, ধীরে অথচ কড়া গলায় একটা অসম্মতিসূচক শব্দ করে। ভয়ে জড়সড় হয়ে পিছু হটে দাঁড়ায় বিদেশীয়া। তার পরই লোকটা টিনের দরজায় মারে একটা লাথি। ঝন্ ঝন্ করে সন্ধ্যার শান্ত নিস্তব্ধতাটুকু শুধু ছিঁড়েই যায় না, দরজাটাও খুলে যায় ঐ একটি আঘাতে। বিদেশীয়া চলেই আসছিল ফিরে কিন্তু ওর গাছতলায় পা দেবার আগেই ভয়াবহ আতঙ্কে একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত কণ্ঠ আর্ত্তনাদ করে উঠল। যেমন তীক্ষ্ণ, মিষ্ট তেমনি আতঙ্কে বীভৎস সে স্বর। থর থর করে বুকের ভেতরটা কাঁপতে লাগল বিদেশীয়ার—এ বুঝি তার সেই ভোরের কুয়াশায় দেখা বেগম পরীর আর্ত্তকণ্ঠ।

অনেক রাত অবধি বিছানায় শুয়ে কান খাড়া করে রইল বিদেশীয়া, কিন্তু না, আর দ্বিতীয়বার সে সুমিষ্ট স্বর তার কানে বাজল না—সেই সঙ্গে বাজল না সে রাতে অতি পরিচিত নবী সেখের মেসিনের ধাতবধ্বনি—খট-খট-খ—ট। বিদেশীয়া ঘুমিয়ে পড়ল। হঠাৎ ঘুমের ঘোরে এক সময় ওর মনে হ'ল সেই সাড়ে ছ'ফিট লম্বা পাঠানটা ভারী জুতোর শব্দ তুলে ওর বুকের ওপর হাঁটছে। যন্ত্রণায় ওর ঘুম ভেঙ্গে গেল। ছোট জানালায় মুখ রেখে চাইল বাইরে। তখনও সে শুনছে সেই ভারী জুতোর শব্দ। চাঁদের আলোয় অশ্বত্থ গাছের পাতাগুলোও স্থির হয়ে যেন শুনছে সেই শব্দ। চোখ ঘষে আবার তাকাল সে, কোথা থেকে একটা দমকা হাওয়া এসে সমস্ত জ্যোৎস্নাটাকে দুলিয়ে দিল—ঢেউ-এর মত কাঁপতে লাগল স্নিগ্ধ সাদা আলো—ঝির্ ঝির্ করে চমকে উঠল গাছের পাতাগুলো, ফিস্ ফিস্ করে ওরা যেন বলে দিল বিদেশীয়াকে যেখানে বাজছিল জুতোর শব্দটা। গ্রামের মধ্যে দিয়ে না গিয়ে সোজা মাঠ ভেঙ্গে চলে যাচ্ছে সেই পাঠানটা। জানালা বন্ধ করে আবার শুয়ে পড়ল বিদেশীয়া

পরদিন ঘুম ভাঙ্গতে দেরী হ'ল বিদেশীয়ার। তার ক্ষৌরকর্ম্মের সরঞ্জাম নিয়ে বাইরে বেরুতেই দেখল নবী সেখ অশ্বত্থ গাছের তলায় মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে বসে আছে। এ যেন এক অন্য নবী সেখ—বৃদ্ধ, রুগ্ন, হতাশায় ক্লান্ত। মাথার চুল বিশৃঙ্খলভাবে ছড়ান, উপরের কালো কলপ দেওয়া চুল সরে গিয়ে সাদা চুলগুলো সব বেরিয়ে পড়েছে, চোখের কোণে অব্যক্ত যন্ত্রণার মত কিসের একটা কালো ছায়া ফুটে উঠেছে। সবচেয়ে আশ্চর্য্য, আজ তার সামনে সেলাই-এর কল নেই, নেই পাশে কাপড়ের স্তূপ।

বিদেশীয়া সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, গলার শব্দ করে, কিন্তু নবী সেখ মুখ তুলে না। শেষে গায়ে হাত দেয় বিদেশীয়া,

নাড়া দেয় ওকে, বলে, নবী সেখ, এ ভইয়া হুয়া ক্যায়া? কাম বন্ধ করকে এ্যয়সা বৈঠা কাঁহে?

আর্ত্ত-করুণ চোখ তুলে একবার নবী সেখ চায় বিদেশীয়ার দিকে, কিন্তু তখুনি আবার সে চোখ নামিয়ে নেয়। অস্থির হয়ে ওঠে বিদেশীয়া—এখুনি লোকজন এসে পড়বে তখন আর কিছুই জানা যাবে না। অথচ কাল রাত থেকে যে রহস্যটা সঞ্চারিত হয়েছে বিদেশীয়ার মনে সেটা নবী সেখের চেহারা ও আচরণে দ্বিগুণ বেড়ে উঠেছে।

সোজাসুজি প্রশ্ন করে বিদেশীয়া—তোমারা মিসিন্ কাঁহা?

এবার গাছটায় হেলান দিয়ে উঠে দাঁড়ায় নবী সেখ, নিজের ঘরটার দিকে চেয়ে বলে, মিসিন্ লে গিয়া।

—কৌন, আরও কাছে সরে আসে বিদেশীয়া।

এর পর দু'জনেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আবার মুখোমুখি বসে পড়ে। বেলা বাড়ে একটু একটু করে, কিন্তু সেদিকে ওদের ভ্রূক্ষেপ নেই। যারা আসে চুল কাটতে, দাড়ি কামাতে, হাতের ও পায়ের নখ কাটতে তারা দেখে কি গোপন কথা যেন ফিস্ ফিস্ করে বলছে নবী সেখ বিদেশীয়া হাজামকে। যারা আসে কাপড় নিয়ে সেলাই করাতে তারাও থাকে এক পাশে দাঁড়িয়ে। ওদের দু'জনকে দেখে সবাই যেন বুঝতে পারে কিছু একটা বিপদ ঘটেছে ওদের এবং সেটা সামান্য নয় মোটেই। যারা নবী সেখের ঘুলঘুলির দিকে চেয়ে থাকে তারা যেন আজ স্পষ্ট এক জোড়া বিষণ্ণ কালো চোখের উজ্জ্বলতা অনুভব করে।

ঐ কালো এক জোড়া চোখের বদলে দিবারাত্রির সঙ্গী সেলাই কলটাকে বিদায় দিতে হয়েছে। বিদেশীয়ার কাঁচির সঙ্গে তাল রেখে সেলাইয়ের কলটা আজ আর খট খট করে বাজে না, কাঁচিটা তাই বার বার থেমে যায় বিদেশীয়ার হাতে, বেসুরো গানের মত চুল কাটার খেই হারিয়ে যায়। লোকটা কাবুলিওয়ালা নয়, কোথায় নাকি কাবুল দেশের কাছেই বেলুচিস্থান নামে একটা দেশ আছে—সেই দেশের লোক। কাল রাত্রে বিদেশীয়ার বুকে ভারী জুতার শব্দ তুলে নবী সেখের সেলাই কল নিয়ে চাঁদের আলোয় মাঠের পথ ধরে লোকটা চলে গেছে। চুল কাটতে কাটতে এক জায়গায় একটু বেশী কেটে ফেলে বিদেশীয়া—মেয়েমানুষকে গরু-বাছুরের মত বিক্রী করা যায়, আবার কেনা যায় টাকা দিয়ে এমন কথা যে সে না শুনেছে তা নয়, কিন্তু পরী? পরীও কি কিনতে পাওয়া যায়?

পাঁচশত টাকা দাম বেগমপরীর, নবী সেখ বলেছে বিদেশীয়াকে। কাশ্মীরের মেয়ে, অদ্ভুত সেলাই জানে, জানে ঘর-কন্নার সব কাজ—কঠিন পরিশ্রমী। এক ভোর-রাত্রে এসেছিল লোকটা ঐ পরীকে সঙ্গে নিয়ে—পরীর আপাদ-মস্তক বোরখায় ঢেকে। আঁধেরি বাজারে ছোট একটা খুপরি ভাড়া নিয়ে সেলাই করত নবী সেখ। সেই খুপরির দরজায় আঘাত করল লোকটা। দরজা খুলতেই ব্যস্তভাবে তাকে বলল, মিঞা একশত টাকা দাও আর এই মেয়েটিকে রাখ তার বদলে। সবিস্তারে মেয়েটির গুণের কথা বলল, বোরখার আবরণ তুলে দেখাল রূপ। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল নবী সেখ। শুনল আরও বাকি চার শত টাকা দিয়ে দিলেই এই রূপ আর গুণের ভাণ্ডারটি চিরকালের মত নবী সেখের হয়ে যাবে। মাঝে মাঝে এসে বাকি টাকা সে নিয়ে যাবে। টাকা দিতে অক্ষম হলে একশত টাকা ফেরৎ নিয়ে মেয়েটিকে ছেড়ে দিতে হবে। চোখ থেকে ভাল করে ঘুমের রেশ উবে যাবার আগেই এমন একটা সোজাসুজি প্রস্তাব দুটো বিচিত্র মানুষের সঙ্গে তার সামনে এসে দাঁড়াবে কে জানত। আর সব চেয়ে আশ্চর্য্য—কেমন করে জানল লোকটা যে নবী সেখের কাছে মাত্র একশত টাকাই আছে আর সে টাকা সে অনেক দিন থেকে মানে তার আগেকার বেগম পালানোর পর থেকেই জমিয়েছে নূতন বেগমকে ঘরে তুলবার আশায়? হয়ত বাজারে সব খবর আগেই সংগ্রহ করেছে লোকটা। কিন্তু তখন করবে কি নবী সেখ। একশত টাকা মজুত থাকলেও মানুষ কেনা-বেচার ব্যাপার, অনেক বিপদ, অনেক ঝামেলা। বাজারের লোক প্রশ্ন করবে, শেষে হয়ত পুলিশে টানাটানি সুরু করে দেবে।—না না ওসব হবে না, বলতে গিয়ে একবার চাইল মেয়েটির দিকে। পাথরের মত স্থির হয়ে চোখ নত করে দাঁড়িয়ে আছে। মুখখানিতে যেন যাদু আছে, বড় মায়া হ'ল। যত টাকাই খরচ করুক এমন নূতন বেগম আর আনতে পারবে না নবী সেখ তার এই বুড়ো বয়সে—তাছাড়া ভাল সেলাই জানে মেয়েটি—কাশ্মিরী সেলাই। লোকজন জাগার আগেই কথাবার্ত্তা পাকা হয়ে গেল। একশত টাকা হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল। বাকি টাকার জন্যে আবার কবে আসবে সে কথাও বলতে ভুলে গেল।

কিন্তু মাসখানেক পরেই দেখা দিল লোকটা। তেমন আগের মত কাতর অসহায় মূর্ত্তি নয়, বেশ উদ্ধত ভাব। এসেই বাকি চারশত টাকা চেয়ে বসল নবী সেখের কাছে। টাকা থাকলে হয়ত নবী সেখ দিয়ে দিত, কিন্তু কোথায় পাবে সে টাকা? তখন যা রোজগার—দু'জনের খেতে-পরতেই ফুরিয়ে যায়। লোকটা কিন্তু, নাছোড়বন্দা। বলে হয় টাকা ফেল, নয়ত ফেরৎ দাও সওদা। সওদা? বিদেশীয়া

শিউরে উঠেছিল শুনে। মানুষ শেষে হ'ল সওদা? কিন্তু বেগমকে ফিরে দিতে পারে না তখন নবী সেখ। এমনকি তাঁর প্রাণ গেলেও নয়। সেই এক মাস সে শুনেছে, অনেক জেনেছে। বেগমের সাদা নিটোল মার্ব্বেল পাথরের মত পিঠে দেখেছে কাল কাল চাবুকের ছাপ। যে গায়ে ঠোনা মারলে রক্ত ঝরে সেখানে নৃশংস ভাবে, চাবুক পিটেছে লোকটা—রোজ রাতে মেয়েটি নিজের দেহ ভাড়া খাটাতে অস্বীকার করেছিল বলে। ঐ ভাবে রোজগার হ'ল না বলেই ত বাধ্য হয়ে বিক্রী করে দিয়ে গেল নবী সেখের কাছে। পাঁচশত টাকা দাম চেয়েছে, অথচ কাশ্মীরে লড়াইয়ের সময় মাত্র পাঁচ টাকায় সে কিনেছিল বেগমকে লুটেরেদের কাছ থেকে।

অনেক কষ্টে, অনেক কাকুতি-মিনতি করে কোরাণ ছুঁয়ে তিন মাস পর টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নবী সেখ ফিরিয়েছিল লোকটাকে। দেখতে দেখতে এক মাস কেটে গেল—বহু চেষ্টাতেও একটি পয়সা জমল না হাতে। তখন নিরুপায় হয়ে দূরের গ্রামে এক আত্মীয়ার কাছে বেগমকে রেখে, মেসিনটা মাথায় তুলে তার পুরণো ভিটেয় পালিয়ে এল নবী সেখ। ভেবেছিল লোকটা আর তাকে খুঁজে বার করতে পারবে না। কিন্তু হঠাৎ কাল রাত্রে সাক্ষাৎ যমদূতের মত উপস্থিত হয়ে তার পাওনা দাবী করে বসল লোকটা। টাকা নেই বলায় বাক্স, পেঁটরা ভাঙল—সেখানে কিছু না পেয়ে এক হাতে চেপে ধরল সেলাইয়ের কল, অন্য হাতে বেগমের বুকের আঁচল। জিজ্ঞাসা করল নবী সেখকে, কোন্ সে যায়গা বাৎলাও? সেলাই কলটাও প্রাণের চেয়ে কিছু কম ছিল না নবী সেখের তবু বেগমের মুখের দিকে চেয়ে সে সেইটাই দেখিয়ে দিল। কিন্তু তাতেও সে রেহাই পেল না। এক মাস পর আবার আসবে লোকটা। তার হিসেবে এখনও একশত টাকা বাকি রইল, সে টাকা দিতে না পারলে অন্য কোন কিছুর বিনিময়েই আর সে বেগমকে রেখে যাবে না।

উত্তেজিত হয়ে বিদেশীয়া পরামর্শ দিল পুলিসে খবর দিতে। নবী সেখ না পারে, বিদেশীয়া নিজে গিয়ে জানাবে দারোগা-সাহেবকে। দারোগা সাহেবের সে অতি পেয়ারের নাপিত—বিদেশীয়ার কথা শুনে না করতে পারবেন না তিনি। কিন্তু নবী সেখ তাতে আশ্বস্ত হ'ল না। সে জানাল পুলিসে খবর দিলে লোকটা হয়ত সাজা পাবে, কিন্তু নবী সেখ নিজেও রেহাই পাবে না। বুঝতে পেরে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করল বিদেশীয়া। কেমন বিমূঢ় ভাবে সে নবী সেখের মুখের দিকে চেয়ে রইল। আর কোন সাহায্য বা উপায়ের পরামর্শ সেই মুহূর্ত্তে তার মাথায় এল না।

এক মাস পরেই লোকটা আবার আসবে বাকি একশত টাকার জন্য। শঙ্কায় দিন গুণে নবী সেখ, তার হারেমে দিন গুণে বুঝি বেগম কিংবা গণনায় ভুল করে বসে কাজের চাপে। তারই হাতের সেলাই বেচে এখন নবী সেখের সংসার চলে। কর্ম্মহীন নবী সেখ ম্লানমুখে গাছতলায় বসে থাকে। গ্রামের লোক বিশেষ কিছু জানে না, তারা বিদেশীয়ার কাছে শোনে—দেনার দায়ে নবী সেখ সেলাইয়ের কল বেচে দিতে বাধ্য হয়েছে। সেই কথাই বিশ্বাস করেছে সকলে।

পাখীরা এসে আবার বাসা বেঁধেছে অশ্বত্থ গাছের ডালে। সন্ধ্যাবেলা তাদের কলরবে আবার গাছটা মুখরিত হয়ে ওঠে। সকালবেলা অশ্বত্থের লাল লাল পাকা ফলে বাঁধান মাটির বেদিটা ভরে যায়। ভোরবেলা ঝাঁট দেয় আর ভাবে বিদেশীয়া হাজাম। বাবুদের কাছে এ বছর জমিটা আর বুঝি বন্দোবস্ত নেওয়া হ'ল না। নিজের জমানো টাকার এক একটি করে গুণে একশটা বার করে নিলে আর থাকে মাত্র পনরটা। মাত্র একশত টাকার জন্যে—না না নবী সেখের জন্য নয়, নবী সেখ তার কে? সাদা মার্ব্বেলের মত পিঠে কাল চাবুকের ছাপ। একটা পিঠ শুধু চাবুকের হাত থেকে রক্ষা করা। লাল পরী নয়, নীল পরী নয়—বেগম পরীর পিঠ। তার সেই ভোরের কুয়াশায় দেখা বেগম পরী। সাড়ে ছ'ফিট পাঠানটা উলঙ্গ করে চামড়ার চাবুক পিটাচ্ছে তার সর্ব্বাঙ্গে—আজকাল মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে নবী সেখ নয়—চীৎকার করে উঠে বিদেশীয়া—সেই সুন্দর রক্তাক্ত দেহটাকে লেহন করছে পাঁচটা শকুনে। অনেক রাতে ঘুম ভেঙে যায় এমনি বার বার। টাকার থলিটা সন্তর্পণে বার করে আনে আর বার বার গুণতে থাকে। চকচকে রূপার টাকাগুলো জানালায় চাঁদের আলোতে কেমন একটা সার্থকতার মায়া ছড়িয়ে দেয় বিদেশীয়ার মনে। কল্পনায় এক একটি করে টাকা পড়তে থাকে বেগম পরীর সাদা পিঠে আর এক একটি কাল চাবুকের দাগ মুছে দেয়।

পাড়াগাঁয়ের কথা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

আঁটপুর গ্রামের (জেলা হুগলী) উচ্চতর মাধ্যমিক বিবিধার্থসাধক (বহুমুখী) বিদ্যালয়ে সম্প্রতি পর পর কয়েকটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হইয়া গেল। ১৯শে ফেব্রুয়ারী পল্লীউন্নয়ন প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয় ; ২০শে ফেব্রুয়ারী, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, আই-এ-এস (জমিদারী-উচ্ছেদ বিভাগের বিশেষ কর্মচারী) ও শ্রীনিরঞ্জন বর্দ্ধন, আই-এ-এস, (পঞ্চায়েৎ বিভাগের অধিকর্তা), প্রদর্শনীতে স্ব স্ব বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে ভাষণ দেন। তাঁহারা প্রদর্শনীর বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন এবং এইরূপ গ্রাম্য-প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষ ভাবে বলেন। ২১শে ফেব্রুয়ারী বিদ্যালয়ের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় পৌরোহিত্য করেন হুগলী জেলার শাসক, শ্রী এস. এন. বিশ্বাস, আই. এ. এস. এবং পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীমতী বিভাবতী ঘোষ। এই উপলক্ষে কলিকাতা এবং নিকটবর্ত্তী অঞ্চল হইতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আঁটপুরে আগমন করেন। তাঁহারা সকলেই প্রদর্শনী এবং বিদ্যালয়ের কার্য্যাবলী দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। ২২শে ফেব্রুয়ারী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাদিবস পালিত হয়। বেলুড় মঠের স্বামী মুক্তানন্দজী মহারাজ ইহার পৌরোহিত্য করেন। এই উপলক্ষে একটি বিশেষ কার্য্যসূচী অবলম্বন করা হয়। স্বামিজী তাঁহার ভাষণে ছাত্রদের সম্বন্ধে বলেন, ছাত্র-ছাত্রীরা স্বভাবতঃই সৎ। কিন্তু বর্ত্তমানকালে তাহাদের সম্মুখে অনুসরণ করার যোগ্য আদর্শ না থাকাতে এবং তাহাদিগকে কল্যাণের পথে পরিচালনা করিবার জন্য উপযুক্ত পরিচালকের অভাব হওয়াতে, তাহাদের মন হইতে শৃঙ্খলা-বোধ ও আদর্শবাদ দূর হইয়া যাইতেছে। তিনি স্বামী প্রেমানন্দের জীবনী হইতে দুই-একটি শিক্ষাপ্রদ আখ্যান বলেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারী প্রদর্শনীর পুরস্কার বিতরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উন্নয়ন কমিশনার শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, আই-সি-এস, পৌরোহিত্য করেন এবং ভারতীয় যাদুঘরের নৃতত্ত্ব-বিভাগের অধিকর্ত্তা, অধ্যাপক নির্ম্মলকুমার বসু, প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় এইরূপ গ্রাম্য-প্রদর্শনীর সার্থকতা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বলেন। তিনি আরও বলেন যে, এইরূপ প্রদর্শনীকে 'প্রদর্শনী' না বলিয়া 'মেলা' বলাই সমীচীন। অধ্যাপক বসু মহোদয় মহাত্মা গান্ধীর জীবনী সম্বন্ধে অতি সহজ ও সরল ভাষায় এক শিক্ষাপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক ভাষণ প্রদান করেন। কলিকাতা হইতে আগত সকলেই আঁটপুরের মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, দেবালয়, স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনের সঙ্কল্পগ্রহণের স্থান প্রভৃতি দেখিয়া মুগ্ধ হন। আঁটপুরের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি প্রভৃতির তাঁহারা প্রশংসা করেন। এই কয়দিন কেবল যে স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রী ও যুবক-যুবতী সমাজের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছিল তাহা নহে, বয়স্কদেরও ইহার স্পর্শ লাগিয়াছিল। যাঁহারা এই সকল অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন কিংবা প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই সরল, অমায়িক ও নিরহঙ্কার ব্যবহারে স্থানীয় জনসাধারণ বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সকলেই তাঁহাদিগকে আপনার জন বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। এই ত গেল এক দিক্। এখন অপরদিকের কথা সংক্ষেপে বলি।

এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই বলিলেই চলে। এখানে এই বৎসর স্থানে স্থানে ধানের ফসল ভালই হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে জনসাধারণ সামগ্রিক ভাবে উপকৃত হয় নাই। বর্ত্তমানে ধানের মূল্য ষোল-সতের টাকা মণ। একটু ভাল চাউলের মূল্য ত্রিশ টাকা মণ। পূর্ব্বে সীতাশাল প্রভৃতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ধানের চাষ এই অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। কিন্তু তাহা এখন দুষ্প্রাপ্য। যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি উৎসবগুলিতে যোগদানের জন্য কলিকাতা হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে খাওয়াইবার জন্য আমাকে কলিকাতা হইতে ভাল চাউল আনিতে হইয়াছিল। ইহাও অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত কয়েক বৎসর পর পর অনাবৃষ্টির জন্য দেশে কলাগাছেরও অভাব ঘটিয়াছে। কলা ত নাই-ই, কলার পাতাও পাওয়া যায় না। কলিকাতা হইতে কলাপাতা আনিতে হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলিতেছি, এই অঞ্চলে ফলমূল যথা, পেঁপে, কাগজী বা পাতি লেবু, কাঁচা লঙ্কা প্রভৃতিরও অভাব। এই সকল দ্রব্যও কলিকাতা হইতে আনিতে হইয়াছে। পুকুরে বড় মাছ নাই। এই বৎসর বর্ষার জলে আধসের-তিনপোয়া রুই-কাতলা জন্মিয়াছে। পল্লীঅঞ্চলে লোকে মাছ খাইতে আসে, কিন্তু তাহাও দিতে পারি নাই। আলুর ফলন সন্তোষজনক ; কিন্তু স্থানে স্থানে আলু রোগে আক্রান্ত। আলু-চাষীরা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছে। শুনিলাম এইরূপ রোগাক্রান্ত আলু দুই টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছে। অন্যান্য তরিতরকারী ফুলকপি, বাঁধাকপি ইত্যাদি সস্তা। কিন্তু এই সস্তাদরে তরিতরকারী বিক্রয় করিয়া ২৬.২৭ টাকা মণ দরে চাউল কেনা যায় কি ? বলিতে ভুলিয়াছি, নারিকেল গাছ আছে, তাহাতে ডাব নাই। কলিকাতা হইতে আগত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মন খুলিয়া ডাবও খাওয়াইতে পারি নাই—হিসাব করিয়া খাওয়াইতে হইয়াছে। তাঁহারা গাছ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

দেশে দুই-একটা পাকা রাস্তা হইয়াছে বটে, কিন্তু গ্রামের অভ্যন্তরে রাস্তাঘাটের যথেষ্ট অভাব। অনেক স্থানেই জঙ্গলে পরিপূর্ণ। পানীয় জলেরও অভাব আছে। গোরুকে শুষ্ক খড় খাইয়া প্রাণধারণ করিতে ও দুধ দিতে হইতেছে। খড়ও ৫০,৬০৲ টাকা কাহন। কাঁচা পশুখাদ্য নাই বলিলেই চলে। টাকায় দেড় সের দুধ, তাহাও খাঁটি নহে। তাহাও আবার পাওয়া যায় না। দেশে পনেরো দিন অবস্থান করিয়াছিলাম। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও দৈনিক একপোয়া হিসাবেও দুধ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। চিনিও দুষ্প্রাপ্য। ভেলী-গুড় দিয়া চা খাইতে হয়, চিনির দুষ্প্রাপ্যতার জন্য। সকল দিকেই এইরূপ অবস্থা।

পল্লী-অঞ্চলে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িতেছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের নির্দ্দিষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকা পাওয়া যাইতেছে না। এই সম্বন্ধে সকলপ্রকার অনুনয়-বিনয়, প্রস্তাবের প্রতি কর্তৃপক্ষ মোটেই কান দিতেছেন না। অথচ তাঁহারা আইনের কড়াকড়ি জোরে চালাইতেছেন। উদাহরণ-স্বরূপ বলিতে পারি যে, স্থানীয় বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের বয়স ৪৫ বৎসর অতিক্রম করিয়া কয়েক মাস বেশী হইয়াছে। তাঁহাকে বি. টি. ট্রেনিং-এ যাইবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। অথচ সেই শিক্ষকের বি. টি. পড়িবার আগ্রহ খুবই বেশী, এবং বিদ্যালয়ের দিক দিয়া বিচার করিলে তাঁহার ট্রেনিং পাওয়া খুবই দরকার। আইনের কড়াকড়ির এইরূপ আরও উদাহরণ দিতে পারি।

পল্লী-অঞ্চলে শিক্ষার প্রতি অভিভাবকদের এবং ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ খুবই বাড়িয়াছে। কিন্তু মুস্কিল হইতেছে, শিক্ষার বর্ত্তমান ব্যয়ভার কয়জন এই দুর্দিনে বহন করিতে পারে? স্থানীয় বিদ্যালয়ের সম্পাদক হিসাবে, বিদ্যালয়ের বেতন মকুব করিবার জন্য কত হৃদয়বিদারক কাকুতি-মিনতি শুনিতে হয়। কিন্তু এই সমস্যার কোনও সমাধানই করিতে পারি না। নিম্নে একখানি চিঠি উদ্ধৃত করিলাম:

মাননীয় আঁটপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের
সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়,

আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমার ভ্রাতা শ্রীমান্ অজিত-কুমার হালদার আপনার বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীতে পড়িতেছে। আমি আজ ৩।৪ বৎসর কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী, উপার্জ্জন করিবার আমার আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। জমি-জমা অতি সামান্য, উহাতে পরিবারের দিনপাত হয় না। পোষ্য অনেকগুলি, আবার উহার উপর গত বৎসর দুর্ভিক্ষ হওয়ার কারণে ঐ সামান্য জমি আজ নষ্ট হইতে বসিয়াছে। আমায় সরকার বাহাদুর ও স্থানীয় ভদ্র মহোদয়গণ কিছু কিছু সাহায্য করেন। আমি অত্যন্ত গরীব, বেতন দিয়া পড়াইবার আমার আর শক্তি নাই। গত বৎসর ভ্রাতা টেষ্ট রিলিফে কিছু কাজ করিয়া টাকা যোগাড় করিয়া কিছু বেতন দিয়াছিল সেই কারণে আমার প্রার্থনা এই যে, যাহাতে গরীব ব্রাহ্মণের ভ্রাতাটি বিনা বেতনে পড়িবার অনুমতি পায় তাহার প্রার্থনা জানাই। আপনি যদি আমার ভ্রাতার প্রতি যথেষ্ট দয়া প্রদর্শন না করেন তাহা হইলে চিরকাল মূর্খ করিয়া রাখিতে হয়। ইতি—

বিনীত
পঞ্চানন হালদার
সাং বেলী
১৭।২।৬০

ভদ্রলোক যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত। এইরূপ ধরনের বহু চিঠি পাইয়া থাকি।



অনুত্তর উত্তরচরিত

অধ্যাপক শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য

ভবভূতির রচিত তিন খানা নাটকের মধ্যে 'উত্তরচরিত' শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হয় :

উত্তরে রামচরিতে ভবভূতির্বিশিষ্যতে।

বনবাস প্রত্যাগত রামের উত্তরকালীন জীবন-বৃত্তান্ত উত্তরচরিতের বিষয়বস্তু। ভবভূতি তাঁর প্রথম রচনা 'মহাবীর চরিতে' রামের পূর্ব্বজীবন চিত্রিত করেছেন। হয়ত এই প্রথম রচনা শিষ্টসমাজে তেমন আদর পায় নি তাই ক্ষুব্ধ কবি তাঁর দ্বিতীয় নাটক 'মালতীমাধবে'র গোড়ায় অভিমানভরে বলেছেন :

যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতে মম তু কোঽপি সমানধর্ম্মা
কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী॥

'যাঁরা আমাকে অবজ্ঞার চোখে দেখছেন, তাঁরা অনেক-কিছু জানেন, আমার এ প্রয়াস তাঁদের জন্যে নয়। আমার সমস্তরের লোক অবশ্য একদিন জন্মাবে, কারণ কাল অনন্ত, পৃথিবীও বিশাল।'

উত্তরচরিত রচনাকালেও ভবভূতি প্রথম অবমাননার কথা ভুলতে পারেন নি। তিনি বলেছেন—বাগ্দেবীর সেবকেরা তাঁদের কর্ত্তব্য করে যাবেন, কিন্তু দুর্জ্জনের নিন্দা থেকে পরিত্রাণের আশা করবেন না—সর্ব্বথা ব্যবহর্ত্তব্যং কুতো হ্যবচনীয়তা।

উত্তরচরিত গুণিজনের সমাদর লাভ করেছে, কবির অসামান্য নির্ম্মাণ-প্রতিভা নিন্দুকের রসনা স্তব্ধ করে দিয়েছে। পরিণতপ্রজ্ঞ ভবভূতি তাঁর সমস্ত কবিকৌশল প্রয়োগ করে এ নাটক সৃষ্টি করেছিলেন। ভাবের ঔদার্য্যে, ভাষার আভিজাত্যে, ছন্দের বৈচিত্র্যে উত্তরচরিত অতুলনীয়। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে করুণরসের এমন আলেখ্যচিত্রণ আর কোথাও দেখা যায় না। এর রসবেগের ঘাত-প্রতিঘাতে পাষাণও অশ্রু বর্ষণ করে, বজ্রহৃদয়ও বিগলিত হয় :

অপি গ্রাবা রোদিত্যপি দলতি বজ্রস্য হৃদয়ম।

বেশির ভাগ সংস্কৃত নাটকেই আখ্যানবস্তুর মুখ্য অবলম্বন হয় শৃঙ্গাররস কিংবা বীররস প্রণয়াখ্যান কিংবা যুদ্ধঘটনা।

এক এব ভবেদঙ্গী শৃঙ্গারোবীর এব বা।

কিন্তু উত্তরচরিতের কবি করুণরস দিয়েই নাট্যসৌন্দর্য্যের চরম উৎকর্ষ ফুটিয়ে তুলেছেন। এ রসের বর্ণনায় তিনি অদ্বিতীয়—'কারুণ্যং ভবভূতিরেব তনুতে'। শৃঙ্গার, হাস্য, বীর, বাৎসল্য, রৌদ্র ও অদ্ভুত রস কারুণ্যের পুষ্টিসাধনে ভবভূতির সহায়ক হয়েছে মাত্র। তিনি প্রচলিত নাট্যনিয়মের বিরুদ্ধে দম্ভ জানিয়েই যেন ঘোষণা করেছেন—করুণরস ছাড়া রস নেই।

একো রসঃ করুণ এব নিমিত্তভেদাদ
ভিন্নঃ পৃথক্ পৃথগিবাশ্রয়তে বিবর্ত্তান্।
আবর্ত্তবুদ্বুদতরঙ্গময়ান্ বিকারা
ণম্ভো যথা সলিলমেব হি তৎসমস্তম্॥

এক করুণ রসই বিভিন্ন অবসরে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। যেমন আবর্ত্ত, বুদ্বুদ, তরঙ্গ সমস্তই এক জলের বিকার মাত্র, তেমন অপর রসগুলি এক করুণরসেরই প্রকার ভেদ।

উত্তরচরিতে করুণরসের অন্তরালে কোথাও কোথাও প্রেমরসের প্রগাঢ় আবেগ দেখা যায়। ভবভূতি স্থানে স্থানে রামসীতার প্রণয়প্রসঙ্গের জীবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন, এমন দিয়েছেন যা আর কেউ দিতে পারেন নি। কিন্তু তাতে তরলতার গন্ধ নেই, অসংযমের অবকাশ নেই।

অযোধ্যার চিত্রশালায় বনবাসজীবনের আলেখ্য দেখতে দেখতে রাম একদিন তাঁর নবীন দাম্পত্যের রসভরা রাত্রিগুলির কথা স্মরণ করে সীতাকে বললেন :

কিমপি কিমপি মন্দং মন্দমাসত্তিযোগা
দবিরলিতকপোলং জল্পতোরক্রমেণ।
অশিথিলপরিরম্ভ ব্যাপৃতৈকৈকদোষ্ণো-
রবিদিতগতযামা রাত্রিরেব ব্যরংসীৎ॥

নিবিড় আলিঙ্গনে আমাদের দুই বাহু আবদ্ধ থাকত, আমরা কপোলে কপোল মিশিয়ে অস্ফুট গুঞ্জনে, অর্থহীন জল্পনায় কাল কাটিয়ে দিতাম। এমনি প্রহরের পর প্রহর অতীত হয়ে যেত, আমাদের অজ্ঞাতসারেই রাত্রির সমাপ্তি ঘটত।

চিত্রদর্শনের পর গর্ভভরপরিশ্রান্তা সীতা রামের অঙ্গে অঙ্গ এলিয়ে দিলেন, আর প্রিয়তমার অঙ্গস্পর্শে প্রেমাকুল রামচন্দ্র এক অপূর্ব্ব ভাবাবেশে বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠলেন :

প্রিয়ে কিমেতৎ
বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
প্রবোধো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমুমদঃ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি চ সমুন্মীলয়তি চ॥

প্রিয়ে এ কি হ'ল? এ আমার সুখ না দুঃখ তা নিশ্চিত বুঝতে পাচ্ছি না। এ কি জাগরণ না স্বপ্ন, বিষের জড়তা না মদের

বিহ্বলতা। তোমার স্পর্শে স্পর্শে কেমন একটা আবেগ আমার ইন্দ্রিয়গুলিকে অবশ করে দিয়ে কখনও চেতনাকে বিলুপ্ত করে দিচ্ছে, কখনও আবার উদ্বুদ্ধ করে তুলছে।

উত্তরচরিতের শৃঙ্গাররস সর্ব্বত্রই লোকোত্তর প্রেমের পূতধারায় বয়ে চলেছে। তাতে কোন স্থানেই কাম বিক্ষোভের লেশমাত্র প্রকাশ পায় নি। ভবভূতি বলেছেন—পুণ্যশীল ব্যক্তি পরম ভাগ্যের ফলে নিরাবিল দাম্পত্য প্রেমের অধিকার লাভ করেন। সে প্রেম সুখে দুঃখে অচঞ্চল থাকে, অভাবে বৈভবে সর্ব্বদাই অবস্থার অনুবর্ত্তন করে, হৃদয়কে বিশ্রান্তিসুখ দান করে। বার্দ্ধক্য এর রসবেগ হরণ করতে পারে না। যতই দিন যায়, ততই এ প্রেম নিখাদ স্নেহসারে পরিণত হয়।

অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্ব্বাস্ববস্থাসু যদ্
বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্য্যো রসঃ।
কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎ স্নেহসারে স্থিতং
ভদ্রং প্রেম সুমানুষস্য কথমপ্যেকং তৎ প্রাপ্যতে॥

এই ছিল ভবভূতির প্রেমের আদর্শ। রামসীতার এমন প্রেমেও বিচ্ছেদ ঘটল।

নিষ্ঠুর জনমতের বিচারে রাজপ্রাসাদে সীতার ঠাঁই হ'ল না। রাম রাজকর্ত্তব্য পালন করলেন, মর্ম্মগ্রন্থি ছিন্ন করে পত্নীকে নির্ব্বাসন দিলেন। করুণরসের কুশল কবির শোকার্ত্ত লেখনী সদ্য-হারান মিলনোৎসবের দুঃখস্মৃতির মধ্য দিয়ে রামের বিচ্ছেদ-বেদনাকে তীব্রতর করে তুলল। শৃঙ্গাররস করুণরসের গাঢ়তা সম্পাদনে সহায় হ'ল। বিয়োগ-বিধুর রামচন্দ্র আর্ত্তকণ্ঠে হাহাকার করে উঠলেন।

হা হা দেবি স্ফুটতি হৃদয়ং ধ্বংসতে দেহবন্ধঃ
শূন্যং মন্যে জগদবিরত জ্বালমন্তর্জ্জ্বলামি।
সীদন্নন্ধে তমসি বিধুরো মজ্জতী বান্তরাত্মা
বিষ্বঙ মোহঃ স্থগয়তি কথং মন্দভাগ্যঃ করোমি॥

হায় দেবি! আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে, দেহবন্ধন শিথিল হয়ে আসছে, জগৎ শূন্য বোধ হচ্ছে, সন্তাপ-জ্বালায় অবিরাম দগ্ধ হচ্ছি। আমার অসহায় অন্তরাত্মা গহন অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। চতুর্দ্দিকে মোহ আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। মন্দভাগ্য আমি, এখন কি করি।

দুঃসহ বিয়োগ-ব্যথায় অভিভূত রাম আরও বললেন—

দলতি হৃদয়ং গাঢ়োদ্বেগং দ্বিধা তু ন ভিদ্যতে
বহতি বিকলঃ কায়ো মোহং ন মুঞ্চতি চেতনাম্।
জ্বলয়তি তনুমন্তর্দ্দাহঃ করোতি ন ভস্মসাৎ
প্রহরতি বিধির্ম্মর্ম্মচ্ছেদী ন কৃন্ততি জীবিতম্॥

গুরুতর সন্তাপে আমার হৃদয় দলিত হচ্ছে, অথচ দ্বিখণ্ডিত হচ্ছে না; বিকল দেহযন্ত্র মূর্চ্ছায় অবশ হয়ে গেছে, কিন্তু বোধশক্তি হারায় নি; অন্তর্দাহে তনু দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ভস্মসাৎ হয় নি। মর্ম্মচ্ছেদী বিধাতা প্রহারে বিদ্ধ কচ্ছেন, কিন্তু জীবনসূত্র সম্পূর্ণ ছিন্ন করেন নি।

করুণ বর্ণনায় কবির বাক্‌শৈলী সর্ব্বত্র এমনই মর্ম্ম স্পর্শ করে। ভবভূতি ছিলেন বিদর্ভের অধিবাসী, প্রসন্ন গম্ভীর বৈদর্ভী রচনা-রীতির প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু 'বশ্যবাক্' কবি যখন যে রসের অবতারণা করেছেন, তখন সে রসের উপযুক্ত ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন; মধুর, করুণ বা ভীষণ সমস্ত ভাবই ভাবানুগুণ শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। ভাষার এমন রসায়ত্ত প্রয়োগ বেশি দেখা যায় না।

বালক লব বীরদর্পে রামের অশ্বমেধের অশ্ব আটক করেছিলেন। সে অশ্ব মোচনের জন্যে লক্ষ্মণতনয় চন্দ্রকেতু সসৈন্যে বাল্মীকির তপোবনে উপস্থিত হলেন। কিন্তু অজ্ঞাত পরিচয় আপনজনের প্রথম দর্শনেই প্রাণে প্রাণে স্নেহসিক্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর দৃষ্টি চায় ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করতে, তার বাহু চায় প্রতিপক্ষকে পরাভব করতে। ভবভূতি একই কবিতার মধ্যে কোমল ও কঠিন শব্দ গেঁথে দিয়ে দুটি বিরুদ্ধ ভাব এক সঙ্গে প্রকাশ করেছেন।

যথেন্দাবানন্দং ব্রজতি সমুপোঢ়ে কুমুদিনী
তথৈবাস্মিন্ দৃষ্টির্মম কলহকামঃ পুনরয়ম।
ঝণৎকার ক্রুরক্বণিত গুণগুঞ্জদ্‌গুরু ধনু-
র্ধৃতপ্রেমা বাহুর্বিকচ বিকরালোল্বণরসঃ॥

চন্দ্রের উদয়ে কুমুদিনী যেমন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে, এর দর্শনে আমার চোখও তেমন তৃপ্তি বোধ করছে। কিন্তু যুদ্ধের উদ্দীপনায় বিক্ষুব্ধ বাহুদ্বয় জ্যাঝঙ্কারে শব্দায়মান বিশাল ধনুটির দিকে প্রসারিত হচ্ছে।

ভাব ও ভাষার এমন সমঞ্জস প্রয়োগ অন্যত্র দুর্লভ।

ভবভূতির রচনার গতি কখনও কান্তকোমল কখনও বা ধীরোদ্ধত কিন্তু বীররসের বর্ণনায় তাঁর ভাষা রণক্ষেত্রের মতই উগ্র, বীরকর্ম্মের মতই ভয়ঙ্কর। কবি লবের সৈন্যনিধন দৃশ্যের এক বর্ণনা দিচ্ছেন:

যে ভীষণ নির্ঘোষে গিরিকুঞ্জের কুঞ্জরেরা কর্ণপীড়ায় অস্থির হয়ে বৃংহণ সুরু করেছে, সেই জ্যানির্ঘোষ দুন্দুভিনিনাদে আরও স্ফীত হয়ে ফেটে পড়ছে। মহাবীর লব সৈন্যদের ছিন্নমুণ্ডে আর মুণ্ডহীন কবন্ধে রণক্ষেত্র ছেয়ে ফেলছেন। মনে হচ্ছে যেন ভোজন-তৃপ্ত কৃতান্তের করাল বক্ত্র থেকে অভুক্ত খাদ্যরাশি ভূতলে গড়িয়ে পড়ছে।

আগুঞ্জদ্গিরিকুঞ্জকুঞ্জরঘটাবিস্তীর্ণকর্ণজ্বরং
জ্যানির্ঘোষমমন্দ দুন্দুভিরবৈরাধ্মাতমুজ্জৃম্ভয়ন্।
বেল্লদ্ভৈরবরুণ্ডমুণ্ডনিকরৈর্বীরো বিধত্তে ভুব-
স্তৃপ্যৎ কালকরালবক্ত্র বিঘসব্যাকীর্য্যমাণা ইব॥

যে ব্যক্তি 'কিমপি কিমপি মন্দম্'-এর মত মৃদুমধুর কবিতা লিখেছেন, তিনিই যে আবার 'বেল্লদ্ভৈরবরুণ্ডমুণ্ড' রচনা করেছেন এ যেন অসম্ভাব্য বলে মনে হয়। ভবভূতির হাতে তা সম্ভব হয়েছে। এখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য।

ভবভূতির আর এক বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি প্রকৃতিদেবীর কমনীয় মাধুর্যটুকু আস্বাদন করেই ক্ষান্ত হন নি, তার ভয়ঙ্কর আকৃতির মহিমাও প্রাণ দিয়ে অনুভব করেছেন এবং তাতেই যেন বেশি মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁর বর্ণনায় গোদাবরীসলিল কল কল ধ্বনিতে বয়ে যায় না, গদগদ নাদে গিরিগহ্বর মুখরিত করে। উত্তরচরিতে হরিণ-হংস-ময়ূরের সঙ্গে পেচক-ভল্লুক-অজগরেরও স্থান আছে। ভবভূতির দণ্ডকারণ্য একদিকে শ্যামলতায় স্নিগ্ধ, অপর দিকে ভীষণতায় রুক্ষ (স্নিগ্ধ শ্যামাঃ ক্বচিদপরতো ভীষণাভোগ-রুক্ষাঃ), ভূমিভাগ কোথাও নিঃশব্দ নিশ্চল, কোথাও বজ্রপ্রচণ্ড প্রোচ্চণ্ড রবে প্রধ্বনিত (নিষ্কূজস্তিমিতাঃ ক্বচিৎ ক্বচিদপি প্রোচ্চণ্ড-সত্ত্বস্বনাঃ)।

উত্তরচরিতে স্থানে স্থানে বাগবাহুল্য দেখা যায়; স্থলবিশেষে কালিদাসের রচনার ছায়া পড়েছে সে কথাও সত্য; বস্তুবিন্যাস-কৌশলেও কালিদাসের অধিকতর উৎকর্ষ না মেনে উপায় নেই। কিন্তু ভাবের বিশুদ্ধতায়, ভাষার ওজস্বিতায় এবং কারুণ্য-সৃষ্টির হৃদয়গ্রাহিতায় ভবভূতি অসাধারণ।

বিপিনবিহারী মেধাবী

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাস

পণ্ডিতা রমাবাঈর জন্ম-শত-বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে তাঁহার সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রের সুপ্রসিদ্ধ চিৎপাবন ব্রাহ্মণবংশীয়া এই রমণী বৈশ্য-সাহা-সম্প্রদায়ভুক্ত বিপিনবিহারী মেধাবী (এম, এ, বি, এল,) নামক শ্রীহট্টবাসী জনৈক যুবকের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা হইয়াছিলেন, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। এই প্রতিলোম বিবাহে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে হুলুস্থুল পড়িয়া যায় এবং সমাজ তাঁহাদের উভয়কে জাতিচ্যুত করে। এই বিপিনবিহারী কে এবং কি ছিলেন, তৎসম্পর্কে আলোক-পাত করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহার জন্ম-তারিখ আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তবে জানি, তিনি ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতির সম-সাময়িক এবং তাঁহাদের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। সুতরাং খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (আনুমানিক ১৮৫২ ইংরেজী হইতে ১৮৫৭ ইংরেজীর মধ্যে) যে কোনও এক বৎসরে তাঁহার জন্ম হয়, ইহা আমরা মোটামুটি ধরিয়া নিতে পারি। অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকার মধ্যে কেহ যদি তাঁহার জন্ম-তারিখ আমাকে দিতে পারেন, তবে চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। করিমগঞ্জ সাবডিভিশনের অন্তর্গত মর্দ্দাতকান্দি গ্রামে বিপিনবিহারীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম মাণিক্যরাম দাস। মাণিক্য অর্থগৌরবে শ্রেষ্ঠ ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার উন্নত চরিত্র, তেজস্বিতা ও স্পষ্টবাদিতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। লাতু নিবাসী স্বনামধন্য মোক্তার গৌরীচরণ দাস অষ্টপতি, তাঁহার কন্যা সুভদ্রার সহিত মাণিক্যরামের বিবাহ দেন। বিপিনবিহারীর গর্ভধারিণী মাতা সুভদ্রা তেজস্বিনী রমণী ছিলেন। বিপিনবিহারী তেজস্বিতা ও সাহসে পিতৃমাতৃ-গুণের উত্তরাধিকারী হন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার বিদ্যার্জ্জনের প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল। দরিদ্র পিতা অর্থবল না থাকায় তাঁহার শিক্ষার ভার বহন করিতে অসমর্থ হন। তাই বিপিনবিহারীকে ঘোর দারিদ্র্যের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিয়া স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ হইতে হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চতর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার কলিকাতা গমনের ইচ্ছা বলবতী হইল, কিন্তু কলিকাতা গমনের পাথেয়ের টাকা কোথায়? বিপিনবিহারী দমিবার পাত্র নহেন। অর্থ উপার্জ্জনের জন্য সুদূর আসাম অভিমুখে রওয়ানা হইলেন এবং সেখানে বহুকষ্টে স্বোপার্জ্জিত অর্থে কোনরূপে শুধু পাঠের ব্যয়মাত্র সঙ্কুলানপূর্ব্বক এফ, এ, ও বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি, এ, পাশ করিয়া তিনি গৌহাটি নর্ম্মাল স্কুলে প্রধান শিক্ষক হন এবং শিক্ষকাবস্থায় এম, এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কৃতিত্বের সহিত এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে দেখিয়াছি, তাঁহার নামের পার্শ্বে তারকাচিহ্ন দেওয়া আছে এবং নিচে লেখা আছে (* Indicates Honours in Arts.) শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তকার ৺পণ্ডিত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি লিখিয়াছেন, কঠিন রসায়নশাস্ত্রে এম, এ পরীক্ষা দিয়া, বিপিনবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। বিপিনবিহারী এম, এ, পরীক্ষা দিয়া "হল" হইতে বাহির হইয়া যাইতেছেন, আরও দুই-জন কলিকাতার এম, এ, পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়া তাঁহার আগে আগে যাইতেছিলেন, তাঁহারা পেছনে তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। তিনি শুনিলেন, কলিকাতার একজন পরীক্ষার্থী আরেক জনকে বলিতেছেন, "আমার ধারে সিলেটের একটা বাঙ্গাল বসেছিল,

ব্যাটাছেলে কিছুই লিখতে পারে নি।" বলা বাহুল্য, পরীক্ষার "হলে" ইহাদের সহিত বিপিনবাবুর পরিচয় হয়। এম, এ,-র ফল বাহির হইলে পর দেখা যায় যিনি প্রথমে তাঁহার বন্ধু-পরীক্ষার্থীর নিকটে এই মন্তব্য করিয়াছিলেন, তিনি নিজেই পাশ করিতে পারেন নাই। বিপিনবাবু এই ঘটনা তাঁহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ৺প্রহ্লাদচরণ দাস অষ্টপতির নিকট ব্যক্ত করেন এবং প্রবন্ধ-লেখক প্রহ্লাদবাবু হইতে এই তথ্য অবগত হন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে তিনি বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অদম্য উৎসাহ ও প্রাণপাত পরিশ্রম কখনও বিফল হইতে পারে না। গৌহাটি নর্ম্মাল স্কুলের শিক্ষক থাকাকালে তিনি বাংলা ভাষায় 'রসায়নের উপক্রমণিকা' নামক এক সচিত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কলিকাতার জয়গোবিন্দ সোমের ছাপাখানায় (ইণ্ডিয়ান খ্রীশ্চিয়ান হেরল্ড প্রেস) ১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে উহা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থখানির একটা বিশেষত্ব আছে। ইহার পরিশিষ্টে বিপিনবাবু কর্তৃক সঙ্কলিত বহু পারিভাষিক শব্দ সংযোজিত হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে রসায়নশাস্ত্রের এরূপ পরিভাষা বঙ্গভাষায় আর কেহ আবিষ্কার করেন নাই। সুতরাং বিপিনবাবু এক্ষেত্রে শুধু পথপ্রদর্শক নহেন, বস্তুতঃ তাঁহার লিখিত 'রসায়নের উপক্রমণিকা' নামক সহজ বাংলা ভাষায় লিখিত এই গ্রন্থ তখনকার দিনে একক ও অদ্বিতীয় বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। বিপিনবাবু কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। শ্রদ্ধেয় বিপিনচন্দ্র পালের আত্মজীবনীতে দেখিতে পাই, সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী ও ভক্ত ব্রাহ্ম,মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন যখন বিলাত হইতে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যুব-মণ্ডলীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে যে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়, বিপিনবিহারী তাহাতে স্ব-রচিত একটি সুন্দর কবিতা পাঠ করেন। বিপিনবাবু তখন ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন এবং শ্রদ্ধেয় বিপিনচন্দ্র পাল ও ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাসের সহিত একযোগে সমাজ-সংস্কার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার কবিতা লেখা সম্বন্ধে আরেকটি দৃষ্টান্ত এ স্থলে নেহাৎ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। শ্রীহট্টের প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র-সম্পাদক কবি ৺প্যারীচরণ দাসের পদ্যপুস্তক ১ম ভাগ প্রকাশিত হইবার পরে বিপিনবাবু তাঁহাকে জানান, তিনি ইহার ২য় ভাগ রচনা করিবেন। প্যারীবাবু সানন্দচিত্তে ইহাতে অনুমতি দেন এবং স্বয়ং পদ্যপুস্তক ৩য় ভাগ প্রকাশিত করেন। নানা অনিবার্য্য কারণে বিপিনবিহারীর সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই, তাঁহার অকাল-মৃত্যু ইহার অন্যতম কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। 'পদ্যপুস্তক' ২য় ভাগ আর প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার সঙ্গীতে বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি সুললিত কণ্ঠে 'ব্রহ্মসঙ্গীত' গাহিতে পারিতেন। যেখানে সঙ্গীতের আসর বসিত নিমন্ত্রিত হইলে তিনি তথায় যাইতে কুণ্ঠিত হইতেন না। একবার আমার মেসোমহাশয় ৺বঙ্কবিহারী দাস (শ্রীহট্টের সুপ্রসিদ্ধ পাখোয়াজ ও শ্রীখোল-বাদক), তদীয় বন্ধু বিপিনবিহারীকে তাঁহার বাড়ীতে বাই-খেমটা গানের এক ঘরোয়া বৈঠকে নিমন্ত্রণ করেন। সেই বৈঠকে 'শ্রীহট্ট-প্রকাশ' সম্পাদক কবি প্যারীচরণ দাস এবং আরও তিন-চারজন সঙ্গীত-প্রিয় বন্ধু মাত্র উপস্থিত ছিলেন। কৌতূহলপরবশ হইয়া বিপিনবিহারী বন্ধুর আমন্ত্রণ রক্ষা করেন। সেখানে গিয়া তিনি দেখেন, নর্ত্তকী গান গাহিতে গাহিতে বাবুদের সাক্ষাতে এক একবার অঙ্গভঙ্গি করিয়া আসে আর বাবুরা যার যা খুসী তাহাকে 'প্যালা' (বকশিস) দিয়া রেহাই পান। কোনও বাবু উহা না দিলে নর্ত্তকী তাঁহার গা-ঘেসিবার চেষ্টা করে। আসরের এই অবস্থা দেখিয়া বিপিনবাবু প্রমাদ গণিলেন। খেমটা স্ত্রীলোকটি তাঁহার কাছে কিছু না পাইয়া তাঁহার গা ঘেসিবার উপক্রম করে। তাঁহার হাতে একটা চাবুক ছিল। তিনি ত্বরিতবেগে চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আচ্ছা করিয়া নর্ত্তকীকে চাবকাইয়া দিলেন। মুহূর্ত্তমাত্র তথায় আর অপেক্ষা না করিয়া মেসোমহাশয়কে বলিলেন, "ভাই, পবিত্র সঙ্গীত-রসের নারকীয় রূপান্তর হইতে পারে, তাহা জানিতাম না। আমার জীবনের আজ প্রথম অভিজ্ঞতা। আর জীবনে কখনও এমন আসরের ছায়া মাড়াইব না।" বিপিনবিহারী তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিলেন। জীবনে আর কখনও বাই-খেমটার আসরে যান নাই। এই ঘটনা আমার মেসোমহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি। বিপিনবাবুর এক অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল, যাহা সচরাচর খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। একদিকে তাঁহার মুহুরিকে বসাইয়া একটা মোকদ্দমার জবাব ডাকিয়া যাইতেছেন, অন্যদিকে ঠিক একই সঙ্গে একই সময়ে ঐদিন বিকালে যে একটা বিশেষ বিষয়ে সাধারণ বক্তৃতা দিবেন, সেই সম্পর্কে আর একটি লোককে সেই বক্তৃতার বিষয়বস্তু ডাকিয়া যাইতেছেন। দুই দিকের দুইটি লোকই দুইটি বিভিন্ন বিষয়ে ঠিক একই সময়ে শ্রুতলিপি লিখিয়া যাইতেছে, অথচ শ্রুতলিপিদাতার দুই বিভিন্ন বিষয়ের বিষয়বস্তু ঠিকই আছে, কোনো দিকে কোনও ভুল হইতেছে না। এই গুণ অসামান্য ধীশক্তি ও অনন্যসাধারণ বিদ্যাবত্তার পরিচায়ক। আমার বয়স এখন তিয়াত্তর (৭৩) চলিতেছে। এই সুদীর্ঘ বয়সে একমাত্র মদীয় পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের এই আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে, লক্ষ্য করিয়াছি। তিনি সংসারত্যাগী ঊর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসী—অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ। সে হিসাবে গৃহী বিপিনবিহারীর এই অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা কম গৌরবের পরিচায়ক নহে। সুবক্তা হিসাবেও তাঁহার বেশ নাম ছিল। শ্রদ্ধেয় বিপিনচন্দ্র পাল আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, "He (Bepin Behari) was one of the most successful students in the University from our District (Sylhet)" ব্রাহ্মভাবাপন্ন বিপিনবাবু এম্-এ, বি-এল, পাশ করিয়া যখন শ্রীহট্টে আসেন তখন সেখানে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ ও উদারনৈতিক ব্রাহ্মসমাজে ভীষণ আড়াআড়ি চলিতেছে। তখনকার দিনে কলিকাতা-প্রত্যাগত তেজস্বী হিন্দু যুবকেরা শুধু ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছেন, এই অজুহাতে তাঁহাদিগকে শ্রীহট্টের হিন্দুসমাজ অপাংক্তেয় করিয়া

রাখিয়াছে। পিতা পুত্রকে ত্যাগ করিয়াছেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ঘরে উঠিতে দেন নাই, এরূপ দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি বর্ত্তমান আছে। দলে দলে শ্রীহট্টের উদীয়মান তরুণেরা ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতেছে, রক্ষণশীল হিন্দুদের তাহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। বিপিনবিহারী শ্রীহট্টে আসার পর সম্ভবতঃ তাঁহার আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবের চাপে পড়িয়া তাল সামলাইতে পারেন নাই। তাই তাঁহাকে দল ছাড়িয়া হিন্দুসমাজে ভিড়িতে দেখিয়া তাঁহার সহকর্মী শ্রদ্ধেয় বিপিনচন্দ্র পাল, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস প্রভৃতি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন! বিপিনবিহারী সনাতন হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহার যুক্তি খণ্ডন করিয়া বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর ঠিক পরেই শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা দিলেন। ইহার ঠিক পরেই বিপিনবিহারী আবার শ্রদ্ধেয় পালের যুক্তি খণ্ডন করিয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য দেখাইয়া জনসভায় বক্তৃতা দিলেন। এভাবে উভয়ের বাক্‌যুদ্ধ শ্রীহট্টে বহুদিন চলিয়াছিল। ৺প্রহ্লাদচন্দ্র সেন তখন স্কুলের ছাত্র। তিনি আমাকে বলিয়াছেন, শ্রীহট্টের ছাত্র-সমাজ উভয় পক্ষের বক্তৃতা শুনিয়া আনন্দ উপভোগ করিত। তাহারা বিপিন মেধাবীর নাম দিয়াছিল "তাজী" (ওয়েলার ঘোড়া) এবং বিপিন পালকে বলিত "টাট্‌টু" (টাটটু ঘোড়া)। বিকালে দলে দলে ছেলেরা বাহির হইয়া একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করিত, "আজ কার পালা রে ভাই, তাজী না টাটটু?" সুতরাং আমরা দেখিতে পাই, বিপিনবিহারী শুধু সুলেখক ছিলেন না, সুবক্তাও ছিলেন। বিপিনবিহারী শ্রীহট্টের সম্ভ্রান্ত বৈশ্যসাহা সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, ইহাদের সহিত শৌণ্ডিক বা শুড়িদের কোন সম্পর্ক নাই। বিবাহাদি আদান-প্রদান চলে না। অল্পদিন আগে (সম্ভবতঃ বিগত এপ্রিল মাসে) দিল্লীর 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় লেখা হয়, বিপিনবিহারী 'হরিজন' ছিলেন। সুখের বিষয়, ১লা মে তারিখের উক্ত পত্রিকায় শ্রীযুত অনাথবন্ধু দাস মহাশয় এই মিথ্যা উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন। ১৩৫৬ সনে আমি কলিকাতায় ছিলাম। তখন চণ্ডীচরণ বসাক এণ্ড সন্স কর্তৃক ১২৭, মসজিদ-বাড়ী ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত 'শতজীবনী' নামক পুস্তকে দেখিয়াছি, গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, বিপিনবিহারী জাতিতে সূত্রধর ছিলেন। তৎপূর্ব্বে বাটীতে থাকা সময় আমার হাতে একখানা 'সাহিত্য-সংবাদ' পত্রিকা আসিয়া পড়ে। আমি তখন স্থানীয় গ্রন্থাগার—'প্রাইজ মেমোরিয়াল লাইব্রেরী'র অবৈতনিক সম্পাদক ছিলাম। পত্রিকাখানা যতদূর মনে পড়ে, হাওড়ার 'পৃথিবীর ইতিহাস' কার্য্যালয় হইতে বাহির হইত। তাহাতে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত (সম্ভবতঃ উপাধিধারী) এক প্রবন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন—মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ-কন্যা বিদুষী রমাবাঈ শুড়িকে বিবাহ করিয়াছিলেন। উক্ত পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে হিন্দুশাস্ত্রোক্ত সুদক্ষিণার অদৃষ্টের সহিত রমাবাঈর অদৃষ্টের তুলনা করিয়াছেন। বিপিনবাবু হরিজন বা সূত্রধর বা শুড়ি ছিলেন না, ইহা সর্ব্বজনবিদিত, সুতরাং উপরোক্ত লেখকদের মন্তব্য নিছক অজ্ঞতাপ্রসূত তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। পণ্ডিতা রমাবাঈয়ের সঙ্গে বিপিনবিহারীর বিবাহের সঠিক তারিখটা আমি সংগ্রহ করিতে আজও পারি নাই। বিবাহ বাঁকিপুরে হইয়াছিল। সেখানে গিয়া তখনকার দিনের Marriage Register খুঁজিলেই উহা পাওয়া যাইত, কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়া আমি তথায় যাইতে পারি নাই। বিপিনচন্দ্র পালের মতে ইহা ১৮৮০ সনের শরৎকালে অনুষ্ঠিত হয়। উচ্চশ্রেণীর বৈশ্যসাহা সম্প্রদায়ের কুলগত উপাধি বর্ত্তমান আছে। বিপিনবাবু উক্ত সম্প্রদায়ের 'মেধাই' (শ্রীহট্টের ভাষায়) গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাই তিনি নামের শেষে কৌলিক উপাধি 'মেধাবী' ব্যবহার করিতেন। পণ্ডিতকে বিবাহের পর বিপিনবাবু শিলচরে গিয়া ওকালতি ব্যবসা আরম্ভ করেন। তাঁহার উনিশ মাসের বিবাহিত জীবন সুখে-সম্মানে অতিবাহিত হয়। ইউরোপীয় ও ভারতীয় উভয় মহলে তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ছিল। তিনি বিলাত গিয়া ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে ছিলেন, ঠিক এমনি সময়ে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮৮২ সনের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করেন। পণ্ডিতা রমাবাঈ ইনফ্লুয়েঞ্জায় কাতর হইয়া শয্যাগতা ছিলেন। সেদিন কি কারণে পাচক (বাবুর্চ্চি)-ও আসে নাই। আগের দিন বিপিনবিহারী অফিস হইতে একটা কঠিন মোকদ্দমার কাজ শেষ করিয়া বাসায় আসিয়া দেখেন, পণ্ডিতার জ্বর বেশ বাড়িয়াছে। নিজের ক্ষুধায় পেট জ্বলিতেছে, মেয়ে মনোরমাকে খাওয়াইয়া শান্ত রাখিলেন। রাস্তা দিয়া এক চানাচুরওয়ালা যাইতে ছিল। তাহাকে ডাকিয়া /১ সের চানাচুর দিয়া সান্ধ্যভোজন শেষ করিলেন —তিনি ভোজনবিলাসী ছিলেন, খুব খাইতে পারিতেন। সমস্ত রাত্রি ভেদবমি হইতে লাগিল। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, Asiatic Cholera. বহু চেষ্টায়ও তাঁহাকে বাঁচান গেল না। ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে তাঁহার প্রাণ-পাখী দেহপিঞ্জর হইতে বাহির হইয়া গেল। পীড়িতা রমা 'B. B., B. B.' (তিনি বিপিনবিহারীকে এই নামে ডাকিতেন) ডাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত মদীয় পিতৃদেব ও ৺প্রহ্লাদচরণ দাস অষ্টপতি, রোগীর শয্যা-পার্শ্বে ছিলেন। তাঁহাদের কাছে বাল্যকালে এই মর্ম্মন্তুদ কাহিনী শুনিয়াছি। জাতিচ্যুত বিপিনবিহারীর শবদাহের জন্য কেহই আসে না। মহাপ্রাণ ৺রায় হরিচরণ দাস বাহাদুর আগাইয়া আসিয়া শবদাহের ব্যবস্থা করিলেন। লেখকের পিতৃদেব, প্রহ্লাদ বাবু এবং আরও দুইজন উৎসাহী ছাত্র আসিয়া শেষকৃত্য সমাপন করিলেন। ইহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করাইবার জন্য হিন্দুসমাজ কানা-ঘুষা করিতে লাগিল, কিন্তু পুণ্যশ্লোক ৺রায়বাহাদুরের চেষ্টায় শববাহীদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় নাই। আমি বিপিনবিহারীর সংক্ষিপ্ত চরিত-চিত্র, ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়া অঙ্কন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। চিত্রকরের সাফল্য বা অসাফল্য পাঠক-পাঠিকার মতামতের উপর নির্ভর করে, আমি শুধু চিত্র-শিল্পী মাত্র।

অধিকার ও অনধিকার

শ্রীবগলাকুমার মজুমদার

একদিকে বিশাল বিশ্বের অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য অন্যদিকে মানুষের জ্ঞানবিজ্ঞান ও সৃজনী-শক্তির বিবিধ সম্ভার—উভয়ে মিলিত হয়ে যে জটিল পরিবেশ ও উৎকট-সমস্যা সৃষ্টি করেছে তার সমাধান, বিশ্লেষণ, ও সুষ্ঠু বিনিয়োগ করবার অদম্য প্রচেষ্টা চলেছে সত্য কিন্তু মানুষের লোভ ও হিংসা সমস্যাকে জটিলতর করে তুলেছে। তাই দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ লেগেই আছে—অধিকার ও অনধিকারের দ্বন্দ্ব, স্বার্থের সংঘর্ষ। ফলে, বিধিবদ্ধ সমাজ ও শাসনব্যবস্থার পশ্চাতে মনে হয় যেন একটি বিধিবহির্ভূত অলিখিত শোষণ-ব্যবস্থা সমাজের প্রত্যক্ষ সমর্থন না থাকলেও পরোক্ষ অনুমোদনে চলেছে। তাতে যদি আবার শাসনব্যবস্থা ঘুণে ধরে তবে ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীবন কলুষিত হবে, এতে বিস্ময়ের কি আছে। বর্ত্তমানে এই দেশ সেই পরিস্থিতির নির্ম্মম আঘাতের সম্মুখীন হতে চলেছে।

সৃষ্টির বৈচিত্র্য—প্রকৃতির বৈচিত্র্য ছোটবেলা হতেই অঙ্কুরিত হতে থাকে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তা আরও বিকাশ লাভ করে। গৃহের ও বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও পরিবেশ তাকে ক্রমপরিণতির দিকে নিয়ে যায়—বাহিরের ক্রিয়া ও প্রক্রিয়াও তার চিত্তবৃত্তি গঠনে কম কাজ করে না তা ভালই হউক, আর মন্দই হউক। ইন্দ্রিয়-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার মানসিক বৃত্তির উন্মেষ ক্রমান্বয় হতে থাকে। তার সূচনা অল্পবিস্তর মাতৃগর্ভ থেকেই আরম্ভ হয়। নিজের ভালমন্দ, সুখদুঃখ সে গর্ভাভ্যন্তর ও বহিঃপ্রকৃতির সংস্পর্শে অনুভব করতে থাকে। এই অনুভূতিই কালক্রমে জ্ঞানের উদ্বোধনের-সহিত চিত্রবিচিত্র রূপ ধারণ করে। দেহের পরিপুষ্টির সহিত মানসিক পরিপুষ্টি লাভ হয়। অব্যক্ত ব্যক্ত হয়। সুবিধা-অসুবিধার ধারণা হতে অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার ছাপ তার মনে পড়তে থাকে। সমর্থন ও প্রত্যাখানের প্রবৃত্তি তার থেকে আরম্ভ হয়। যুক্তি, শক্তি ও মিথ্যার বলে মানুষ নিজের অধিকার আয়ত্ত করে, পরকে অনধিকারী করে। আবার অন্যের উপর অন্যায় অত্যাচার নিজে মাথা পেতে নেয়। মাত্রাহীন স্বাধীনতা অনাচার ও বর্ব্বরতায়ই পর্য্যবসিত হয়। প্রকৃত গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা সংযম এনে দেয়, কথা ও কাজে, চিন্তায় ও ক্ষমতার ব্যবহারে। অধিকার ও অনধিকারের যথাযথ বিচার নির্ভর করে মানবীয় ধর্ম্মের সুসংগত অনুভূতি ও তা কার্য্যে পরিণত করবার নিঃস্বার্থ প্রেরণা, দৃঢ়তা ও স্বভাবজ নির্লোভের উপর। যে পরের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলে মনে করে, পরের সুখে সুখী হয়, পরের দৈন্য-দুর্দ্দশায় সহানুভূতি-সম্পন্ন, সর্ব্বোপরি সর্ব্বাবস্থায় অন্তরে বাহিরে এত অসমতার মধ্যেও সমতার তৃপ্তি যার মানসিক স্তরে বিরাজ করে, সেই সমাজ, অর্থনীতি, বৈষয়িক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণের অধিকার ও অনধিকারের মান রক্ষা করে চলতে পারে। কিন্তু এইরূপ লোক পাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

গণতন্ত্রী বলে যতই আস্ফালন করা যাক, আপাতদৃষ্টিতে উদার ও নিঃস্বার্থ বলে যতই আখ্যা দেওয়া হউক, প্রত্যক্ষ সংশ্রবে প্রাত্যহিক জীবনের নিদর্শনে ধরা পড়বে এক একজনের চরিত্র কি। তাই পূর্ণবয়স্কদের ভোটে নির্ব্বাচিত হলেও গণপ্রতিনিধি যে আত্ম-প্রতিনিধির স্তরে বিরাজ করছে তা খতিয়ে দেখবার সময় এসেছে। গণমন যেখানে নেই গণতন্ত্র সেখানে আসতে পারে না। গণতন্ত্র এখনও অনেক দূরে—কবে আসবে জানি না। ফলে যারা ক্ষমতায় আসীন তারাই ক্ষমতার অপব্যবহার করে, জনসাধারণের প্রতিনিধি জনসাধারণকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, অবিচারে ও অনাহারে জর্জ্জরিত করে। দিন দিন করের বোঝা বাড়ছে উন্নতির জন্য—অবনত তারাই হচ্ছে। তবু বলা হয় এরাই নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি। সাধনা নেই, সিদ্ধির বড়াই করে।

আসল কথা, মানুষ বচনভঙ্গীতে যতই বড় বলে প্রতিভাত হউক, প্রকৃত পক্ষে কার্য্যকলাপে ততটা নয়, তাই কথার পিঠে কথা বুনে কথার জঞ্জালই সৃষ্টি করে, সমস্যা সমাধান করতে পারে না—আরও পারে না তার বৃদ্ধি লোভ, ক্ষমতা ও দুর্নীতির দুষ্টগ্রহগত বলে। সুতরাং সকল সমস্যার গোড়ার সমস্যা হ'ল খাঁটি লোক তৈরি করা, শিক্ষা ও কর্ম্মের মধ্য দিয়ে সমদর্শী লোকের আবির্ভাব সম্ভব করে তোলা। তা না হলে এই অধিকার-বঞ্চিত ও অত্যাচার-পীড়িত লোকের অসন্তোষবহ্নি ধ্বংস করবে গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতার বিচিত্র অবদান, তাদের কুশিক্ষা, দৈন্যদুর্দ্দশা ও নৈতিক অবনতি, পশুসুলভ মনোভাবের প্রাদুর্ভাব সমাজচিত্রকে কলঙ্কিত করবে। সে কলঙ্ক ভাগ্যান্বেষী ক্ষমতাদৃপ্ত অহমিকারও মুখশ্রী শ্রীভ্রষ্ট করবে।

খাওয়া, পরা, বাসস্থান ও স্বাস্থ্যলাভ লোকের প্রাথমিক প্রয়োজন। এত প্রাচুর্য্যের মধ্যে অভাবগ্রস্তের আর্ত্তনাদ বিচারসহ না হতে পারে (কেন না, বিচার ত একতরফা) তাতে পেট ভরবে না। অধিকার কেহ কাহাকেও দিতে পারে না, আদায় করে নিতে হয় কারণ মানুষ যুগে যুগে উচ্চ সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাক্ষ্য দিলেও আদিম বর্ব্বরতা থেকে সে নিষ্কৃতি পায় নি। দুঃখের বিষয়, যারা ক্ষমতা আদায় করল তারাই আবার বঞ্চক হয়ে দাঁড়াল। এইরূপ ভাবেই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে দলের পর দল আসছে আর যাচ্ছে, কত উদার ও নিঃস্বার্থব্যঞ্জক কথার স্রোত নিঃসৃত হচ্ছে। ক্ষমতালোলুপ বিচিত্র বুদ্ধিজীবিদের জীবনাদর্শের ইতিহাস দেশে দেশে কি

বৈচিত্র্যপূর্ণ ! ক্ষমতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের উচ্চ আসনে আরোহণ করে সাধারণের দুর্দ্দশার কি মায়াকান্না, অত্যাচারের কি যুক্তিজাল, অযোগ্যতার কি কারসাজি। ঠিকই বলেছেন বার্ণার্ড শ'—ভদ্রতার মুখোস-পরা পশুই মানুষ।

বড় লোক তারাই যারা শোষণ করলেও শোষিতরা বুঝবে না যে তারা শোষিত হচ্ছে। শ্রেষ্ঠ শাসক তিনিই যিনি সুশাসন করতে পারেন, আর নাই পারেন, সাধারণের অর্থে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করেন এবং জনসাধারণের জন্য কত বড় বড় কথা আওড়ান নিজে তা অনুসরণ করুন আর নাই করুন। পৃথিবীতে ক্ষমতাবানরাই অধিকারের মালিক জনসাধারণের ক্ষমতা ও অধিকার লাভ করে তাহাদিগকে ক্ষমতা অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। তৎসত্ত্বেও মুগ্ধ জনসাধারণ তাদের অধিকারের ইন্ধন যোগায়। অতএব বিশ্বশান্তি অসম্ভব ও অবাস্তব। মানুষের মধ্যে যে শত্রু আছে তা সর্ব্বদা পরকে বঞ্চিত করতে চায়, শুধু কিছু সতর্কতা আছে বলে জনসাধারণের মধ্যে তার দৌরাত্ম্যের মাত্রা সঙ্কুচিত হয়। কোন দেশেও শান্তি বিরাজ করতে পারে না যদি শান্তি আসে তা মৃত্যুর মধ্যে অথবা ব্যর্থ জীবনের নৈরাশ্যের মধ্যে। অন্যায় যে দেশের লোক বেশি সহ্য করে থাকে অজ্ঞাতসারে, শান্তি সে দেশেই বিরাজ করে। ভারতীয় সংসদে সমাজতন্ত্রের ধাচে দেশ গঠন করতে হবে আইন পাস হয়েছে, কিন্তু মন্ত্রী-সংসদের সদস্যগণই ধনিকতন্ত্রের প্রতীক্। সংবিধানে জনসাধারণের অধিকারের বর্ণনা আছে। রাজ্যে ও সংসদে আইনের পর আইন পাস করে, করের পর কর ধার্য্য করে সে অধিকার ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত হচ্ছে। আয় বৃদ্ধি না হতেই জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে বা করান হচ্ছে, ফলে দারিদ্র্য জনসাধারণের, সরকারী দপ্তরে উহার বাতাস লাগে না।

উদারতার মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্ব ও অধিকার গড়ে ওঠে, কৃপণতায় ও স্বার্থপরতায় তা খর্ব্ব করে। ইহার ফলে মানুষে-মানুষে জাতিতে-জাতিতে বিদ্বেষাগ্নি ধূমায়িত হতে থাকে। ফলে যেমন কীট থাকে, মানুষেও তেমন রিপু আছে। এই রিপুই কারণে-অকারণে ক্ষুব্ধ হয়ে অরাজকতা ও অশান্তি সৃষ্টি করে। মানুষ অভাবেই থাক, আর স্বভাবেই থাক,আদর্শ-জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে শিক্ষা দিতে হবে। ঘরে ঘরে গৃহযুদ্ধ যেমন হয়ে থাকে তেমনি জাতিতে জাতিতে স্বার্থ, লোভ ও ক্ষমতার মোহে প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হয়েছিল। রিপুর ন্যায় অভাববোধও মানুষের চিরন্তন সাথী, তাই সন্ধি করলেও সন্ধি টিকে না, শান্তির আবহাওয়া স্বপ্নই রয়ে যায়।

এক পক্ষের অকুণ্ঠদানে যখন অপর পক্ষ সুশিক্ষিত ও সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে তখন অধিকারের প্রশ্ন আসে না, কারণ পাওনার চেয়ে সে বেশি পেয়ে বসে। স্নেহবৎসল ও কর্ত্তব্যপরায়ণ পিতামাতার চেষ্টায় ও দানে সন্তান মানুষ হয়। কত বিনিদ্র রজনীযাপন করে থাকে অভাবে ও অনাহারে, এমনকি প্রাণও বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত থাকে। সেই সন্তানই স্বার্থান্ধ হয়ে, নিজের অসুবিধাবোধে কত পীড়ন করে থাকে অবুঝের মত। অন্যের কথা আর কি বলব। চাকরিস্থলে সেই সন্তানই 'দাসস্য দাসঃ'—প্রভুর কথায় ওঠে বসে। একটি হ'ল স্নেহমমতার প্রতিদান, অপরটি অর্থের বিনিময়। এইরূপ মানসিক স্তরে মানুষ ঘুরে থাকে; অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম খুব অল্প ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়।

অর্থ, সম্পদ, পদমর্য্যাদা—যাই হোক না কেন, মনুষ্যত্বের আসন সকলের ওপরে। এই মনুষ্যত্ব যখন ঐশ্বর্য্যের কাছে পদদলিত হয় তখন সভ্যতা, শিক্ষা ও জাতীয় চরিত্রের অবনতি ঘটবেই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষত্রুটিই বৃহৎ অন্যায়ের পথ প্রশস্ত করে দেয়। ছোট চারাগাছের মূল যদি কীটদষ্ট হয় তবে কি করে উহা বড় হবার রস আহরণ করবে?

সম্বন্ধ যেখানে ঘনিষ্ঠ, আঘাত সেখানে তীব্র হয়ে ওঠে। দোষত্রুটির প্রশ্নে অধিকারভঙ্গের কথা ওঠে না। কেন না, স্নেহমমতা, শ্রদ্ধা ও ভক্তিই সেখানে অন্তরে অন্তরে মিলনের সেতু। এইরূপ শিক্ষক ও ছাত্র আমরা দেখেছি, পিতামাতা, পুত্র কন্যাও দেখেছি, আরও দেখেছি শাসক ও শাসিতের সহৃদয়তা এবং সাধারণ মানুষে-মানুষে অন্তরঙ্গ ভাব। শিক্ষক, ছাত্র ও গুরুজনের মধ্যে সম্বন্ধ আরও উন্নত হওয়া দরকার। শিক্ষক ও গুরুজনের বিরুদ্ধে দোষত্রুটির অভিযোগে ধর্ম্মঘট, অসদ্ব্যবহার, কর্ত্তব্যে অবহেলা, অসংযম ও চরিত্রহীনতারই লক্ষণ। যেখানে শ্রদ্ধা ও ভক্তির মধ্য দিয়ে শিক্ষার বনিয়াদ, চরিত্রগঠনের আদর্শ, মনুষ্যত্বের বীজ অঙ্কুরিত হবে সেখানে অশ্রদ্ধা ও কর্ত্তব্যহীনতার অপরিণত মনের পেলব-কলিকা বিশুষ্ক হয়ে যায়, ফলে অশুভ পরিণতি সর্ব্বত্র বিস্তৃতি লাভ করে। সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতায় ত্যাগ, উপেক্ষা ও কল্যাণবুদ্ধির প্রয়োগই বেশি প্রয়োজন। সম্বন্ধের ব্যবধানে অধিকারের ঔচিত্য অনৌচিত্যের কথাই জাগে, যদিও সে ক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের দাবি উপেক্ষা করা যায় না। সে বিবেচনা ও আদর্শ প্রায় বিদূরীত হচ্ছে। নগ্ন অমানুষিকতা, বর্ব্বরতা ও হৃদয়হীনতা সর্ব্বত্র বিষবাষ্পে বিসর্পিত। একে রোধ করতে পারে একমাত্র পিতামাতা, শিক্ষক, প্রতিবেশী ও শাসকশ্রেণী, তাদের স্নেহমমতা ও সংযত জীবনের কর্ম্মাবলীর দৃষ্টান্তে ও শাসনের দরদে ও নিষ্কলুষতায়।

জীব-জগতে মানুষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব হলেও তার বিচিত্র গুণের সহিত অন্তরের কালিমাও রয়ে যাচ্ছে, তাই অনন্যসাধারণ গুণের অধিকারী হয়েও সে কতদূর নীচ ও স্বার্থপর হতে পারে, অযথা মানুষকে কি না নিপীড়ন করে থাকে, তার উদাহরণ বিরল নহে। মানুষ এই সব যথেচ্ছচারিতা ও অত্যাচারে অভ্যস্ত হয়ে গেছে তাই এর প্রতিবাদও অনেক সময় করে না অসহ্য না হলে।

নীতি মানুষের মধ্যে যেমন আছে পশু-জগতেও তেমন আছে, আবার সমাজের নিম্নস্তরের লোকের মধ্যেও আছে। তবে মানুষের নীতি সুবিধা-অসুবিধা হিসাবে চলে। চোরের রাজ্যেও চোরে চুরি করে অব্যাহতি পায় না, গুণ্ডাও গুণ্ডার বাড়ী গুণ্ডামি করে নিষ্কৃতি পায় না, তারাও নিয়ম ও স্বার্থের বাধ্য। সুতরাং সততাই শ্রেয়ঃ।

আজ যাঁরা পিতামাতা, শিক্ষক, শাসকবর্গ, যাঁরা ব্যবহারজীবী, কর্মচারী, ব্যবসায়ী, যাঁরা চলচ্চিত্রের পরিচালক, অভিনেতা ও অভিনেত্রী, যাঁরা দোকানী, খাদ্যদ্রব্য ও ঔষধ প্রস্তুতকারক, যাঁরা রাজ্যের মন্ত্রী, কূটনীতিজ্ঞ, জাতিসঙ্ঘের সদস্য, ধর্মগুরু, মোহান্ত—তাঁদের সকলের ভেবে দেখা দরকার কারণ তাঁদের নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য-কলাপের জন্য মনুষ্যসমাজ নিম্নস্তরে নেমে যাবে। দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যহানি, দেশে দেশে মনোমালিন্য ও হানাহানি—বলতে কি, সর্বস্তরে নীচতার আদর্শে ভাবী সন্তানদেরও জীবন কলুষিত হবে।

সুতরাং অধিকার ও অনধিকারের সহিত দায়িত্ব ও কর্তব্য—কর্তব্য ও দায়িত্বের সহিত শুভবুদ্ধি জাগ্রত করবার পূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির কর্তব্য সমস্ত সমাজের ওপর। আইনের জোরে যে নীতিবোধ ও সমাজগঠন করবার প্রয়াস তা হয় নির্জীব ও অনুপ্রেরণাহীন; আর অসৎ লোকের হাতে আইনও অকেজো হয়ে পড়ে। শাস্তির ভয়ে কুপ্রবৃত্তি চাপা পড়তে পারে, তাতে চিত্তশুদ্ধি হয় না। ভারতের ক্রমবর্দ্ধমান শিল্পায়নের সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তন হতে বাধ্য। কিন্তু এই পরিবর্তন যদি মনুষ্যত্বের প্রকাশের সহায়ক হয় তবে ভাল। যদি শিল্পায়নের সহিত পাশ্চাত্যের ধর্মহীন জীবন ও সামাজিক দুর্নীতির বন্যা বইতে থাকে তবে দেশ হয়ত ঐশ্বর্য্যশালী হবে—ভারতীয় আদর্শ, ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি পাশ্চাত্যের প্রতিমূর্তি হবে। সেই অবস্থা কোন দূরদর্শী চিন্তানায়কের কাম্য নহে। আর এতে ভারতের ঐতিহ্য, সমাজ ও ধর্ম ধূল্যবলুণ্ঠিত হবে। শিল্প ও বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের পূর্ব্বে সামাজিক বিপ্লবের ধারা সুনিয়ন্ত্রিত করবার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। মানুষ যদি তার প্রতিকার করতে না পারে বা না চায় তবে প্রকৃতি তার পরিশোধ নেবেই।

অভাববোধ সভ্যতার লক্ষণ, ইহা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন; বরং উহা অসভ্যতার বীজ বহন করে, উচ্চ আদর্শ রূপায়ণে যে অভাবের বোধ তা সাধনার দ্বারা বিশ্বের সংস্কৃতি ও শান্তির পথ রচনা করে। বস্তুনিষ্ঠ অভাবের তৃপ্তির জন্য, লোভ ও হিংসা চরিতার্থ করবার জন্য এই ধরিত্রী কতবার রক্তাক্ত হয়েছে, কত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। বিজ্ঞানের আবিষ্কার মনুষ্যসমাজের কল্যাণে নিয়োজিত করলে উপকার হয় কিন্তু রাষ্ট্রনায়কদের হাতে এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার—এটম ও হাইড্রোজেন বম্ব যে কি ভীতির সঞ্চার করেছে, দেশে দেশে কি অশান্তির ও অস্বস্তির কারণ হয়েছে তা তাদের শলাপরামর্শ ও নানা স্তরে অস্ত্রপ্রতিরোধ সম্মেলনের আয়োজনে উপলব্ধি করা যায়।

অজ্ঞানের তৃপ্তি ধ্বংস আনে, সাধকের তৃপ্তি পূর্ণতায়। বস্তু-নিষ্ঠ প্রবৃত্তির পথে অত্যাচার ও দ্বন্দ্ব অনিবার্য্য, বস্তু-নিরপেক্ষ প্রবৃত্তি রাগদ্বেষহীন। ধর্মজীবন বাদ দিলেও জাগতিক জীবনে সংযম প্রতিমুহূর্তে দরকার। তা না হলে অনর্থ ঘটবার সম্ভাবনা প্রতিরোধ করা যায় না। ভোগের নেশা মানুষকে পীড়িত করে, ত্যাগের আনন্দ মানুষকে শান্তি দেয়, কাহাকেও পীড়িত করে না। নিজের স্বার্থ ও জনস্বার্থে হিংসা লোভ সংযত করা প্রয়োজন।

সৃষ্টির বৈচিত্র্যে কি একটি অমিল রয়ে গেছে—স্বাধীন মানুষও মুষ্টিমেয় স্বৈরাচারী বা স্বেচ্ছাচারী লোকের নিকট আত্মবিসর্জন দিয়ে থাকে। এটা যেন স্বভাবসিদ্ধ চারিত্রিক দুর্বলতা। আমরা দেখেছি সভ্যতা ও ক্ষমতাদৃপ্ত জাতিগুলি কি ভাবে অনগ্রসর জাতি-গুলির উপর অত্যাচার ও পরাধীনতার দুঃসহ বেদনা চাপিয়ে দিচ্ছে, কুশাসন ও শোষণ চলছে অপ্রতিহত ভাবে এখনও এই বিংশ শতাব্দীতে। আর অত্যাচারিত জাতিগুলি প্রতিরোধ করতে গিয়ে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তারা সম্মুখীন হচ্ছে। অন্য দিকে সুদূরে অবস্থিত দেশগুলি যানবাহনের নৈকট্যের সুযোগে কি ভাবে সুকৌশলে কূট-নীতি ও ব্যবসার বলে পরদেশ লুণ্ঠন করছে, নিজেদের ক্ষমতা ও আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় রাখবার জন্য কি অমানুষিক জঘন্য পন্থা অবলম্বন করছে। নিজেদের বাঁচাবার জন্য দুর্ব্বল জাতিগুলি তাই স্বীকার করে নিতে বাধ্য হচ্ছে। পঞ্চশীলের মৌলিক নীতি অহিংসা ও প্রেম যদি আয়ত্ত করতে হয় তবে যে শিক্ষা, সাধনা ও শাসন প্রণালী থাকা দরকার তা পত্তন করবার জন্য সকল জাতির যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন।

অধিকার বলে যে কথা প্রচলিত আছে তা শুধু সবলের, দুর্ব্বলের কোথায়? মানুষ একনায়কত্ব চাহে না, চাহে না অত্যাচার, অবিচার। প্রত্যেকে নিজ নিজ অধিকারে বাস করতে চায়। মানবতার মধ্যে যে দুষ্ট শনি রন্ধ্রগত হয়ে আছে, তাকে কিছুদিনের জন্য জনসাধারণে দাবিয়ে রাখা যায়, কিন্তু সহজ দুষ্ট বুদ্ধি—ক্ষমতার লালসা—ভোগের ও মর্য্যাদার নেশা বড় বড় লোক-দিগকেও বিভ্রান্ত করে থাকে। তারা চিন্তা করেন না—বা ইচ্ছা করে ভুলে যান তাদের জীবনধারায় কত ভাবে অত্যাচার ও অনাচারের চিহ্ন প্রকটিত আছে।

সুতরাং সুন্দরের সহিত অসুন্দরের, সতের সহিত অসতের, ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের, নীতির সহিত দুর্নীতির যে দ্বৈত সম্বন্ধ আছে—যা একই সঙ্গে প্রতি লোককে স্বর্গের শান্তি ও নরকের অশান্তি ভোগ করতে বাধ্য করছে, আনন্দ ও নিরানন্দের, সুখ ও দুঃখের পারস্পর্য্যে, তার নিরসনকল্পে সার্ব্বজনীন প্রচেষ্টা প্রয়োজন, পরদুঃখকাতরতার আদর্শে সাম্য, মৈত্রী ও প্রেমের আদর্শে, যাতে করে শিক্ষার বনিয়াদও সুগঠিত হয়। স্বভাবজ স্বার্থ, লোভ, হিংসা ও কর্ম্মের জটিলতা উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিতে উদ্যত হবে। গণতন্ত্রে যদি প্রতিটি লোক তার অধিকার রক্ষাকল্পে সতর্ক না হয়, নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন না করে তবে মুষ্টিমেয় লোকের স্বৈরতন্ত্রতা গণতন্ত্রের পথেই আসুক, আর একনায়কত্বের পথেই আসুক—আপামর সাধারণকে ব্যথিত করবে—পীড়িত করবে জীবনের সর্বস্তরে—শাসনের রাজদণ্ড বরাভয় না দিয়ে নিষ্পেষণের মর্ম্মান্তিক দণ্ডে জনসাধারণকে উত্ত্যক্ত করে তুলবে—যতই সংবিধান রচিত হোক, গণপ্রতিনিধি যতই কেন সভাকক্ষ উচ্চ রবে প্রতি-

ধ্বনিত করে তুলুক। মন্ত্রিগণ সমাজতন্ত্রের নামে যতই সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও মর্য্যাদার চরম ভোগের মধ্যে দুর্ব্বহ করভার বাজেট ও উচ্চমান-কারী ও দুঃখাপহারী বড় বড় পরিকল্পনার অচলায়তন অর্দ্ধভুক্ত, মূক ও নিরীহ জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দিক।



বিশ্ব কৃষি-মেলা

শ্রীপরিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আজকাল কোন কিছু করতে গেলেই আন্তর্জাতিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। নইলে চাষী ভাইদের যে মেলা বসত একদিন নদীর ধারে কিংবা ছায়া সুনিবিড় গাঁয়ের মাঠে তা আজ আর গেঁয়ো বলে হেয় নয়। শুধু পাড়া আর গ্রাম নয়, দুনিয়া জোড়া দেশ যোগ দেয়। কৃষি-মেলার ইতিহাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এই প্রথম বিশ্ব মেলা দেখলে বিশ্বাস না করে পারা যায় না—সত্যই কত বিচিত্র।

বস্তুত এ মেলা একটা স্মরণীয় ঘটনা। এর কারণ এই নয় যে, ইতিহাসে প্রথম, নয় যে আমেরিকা, রাশিয়া, চীন প্রভৃতি চৌদ্দটি দেশ যোগ দিয়েছে, এমনকি এও নয় যে, প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার উদ্বোধন দিনে ডাঃ রাজেন্দ্র-প্রসাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এবং "আমরিকী মেলার" দ্বার উদ্ঘাটন করেছেন, প্রধান কারণ এই যে, সর্বপ্রথম দেখতে পাওয়া গেল পৃথিবীর অগ্রগামী দেশগুলি আমাদের থেকে কত এগিয়ে আছে।

আজ আমাদের পেটে অন্ন নেই, আবরণের নেই বস্ত্র, হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি সবটাতেই আমাদের ভাড়াড়ের বাড়-বাড়ন্ত, ফলে আন্তর্জাতিক সব রকমের সাহায্য-ছত্রের দোর-গোড়ায় লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হয়। ভিক্ষাপাত্র লয়ে প্রাণটা কোন গতিকে রক্ষা করা যায়, কিন্তু মানুষের সমাজে বেঁচে থাকতে মন চায় না। আমরা শুনেছি আমেরিকা শুধু কৃষি-কর্ম করে চারবেলাই পেট ভরে খায় না, পৃথিবীর আর দশটা দেশ—যেমন আমরা, তাদেরও কিছু কিছু যোগায়। রাশিয়াও কম যায় না। এরা সবাই আমাদের মতই হাত-পা-ওয়ালা মানুষ। মন্ত্র কিংবা যাদু কিছুতেই ওদের বিশ্বাস নেই। তবে? ওরা বিজ্ঞানের পূজারী। বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান হয়ে এরা প্রিয়দত্তা ভূমির সেবা করে। জননী বসুন্ধরা শস্যে, ফুলে, ফলে নিজে হাসেন আর সন্তানের সুখৈশ্বর্যে সহায় হন। ওদের মণ্ডপগুলি ঘুরে এলে বিস্মিত হতে হয়। গবেষণা আর ফলিত বিজ্ঞানের সাহায্যে ওরা বুভুক্ষাকে পর্যুদস্ত করে চিরবিদায় দিতে সাফল্যের দোর-গোড়ায় উপস্থিত। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ারের দৃপ্ত ঘোষণা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "ক্ষুধা নারকীয় এবং অবর্ণনীয় দুঃখের কারণ হয়ে পৃথিবীর বুকে বিরাজ করছে। এর শোষণে অগণিত শিশুর দেহ অস্থিচর্ম-সার হয়ে যাচ্ছে। পিতামাতার মন বিষাদ-কালিমায় লিপ্ত। যে জগদ্দল পাথরের নিচে পিষ্ট হয়ে নিষ্ফল বিদ্রোহ জেগে ওঠে সেই সব মেহনতি মানুষের মনে যারা অমানুষিক পরিশ্রমের তুলনায় ভোগ করে সামান্যই সেই, 'ক্ষুধা' নামক শত্রুকে পৃথিবীর বুক থেকে দূর করে দেওয়ার বৈজ্ঞানিক শক্তি আজ আমাদের করতলগত। আজ, এই মুহূর্তে, মানুষ যে বিদ্যা ও হাতিয়ারে সজ্জিত আছে, তা দিয়ে বুভুক্ষার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী সেই সংগ্রাম চালিয়ে সফলতা অর্জন করতে সমর্থ, যা মানুষকে মহৎ পর্যায়ে উন্নীত করতে পারে।"

এমনিতে এ উক্তি বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে। কিন্তু ওদের মণ্ডপটি ঘুরে এলেই পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, অণু-পরমাণুর অপরিসীম শক্তিকে কাজে লাগাতে পারলে অসম্ভব কথা পৃথিবীর যে কোন ভাষার অভিধান থেকে চির-নির্বাসন দেওয়া যাবে। আড়াই লক্ষ বর্গফুট জায়গা জুড়ে, আর সওয়া কোটি টাকা খরচ করে ওরা যে মেলা বসিয়েছে তা দেখলে মনে হয় আরব্য উপন্যাসের কোন এক স্বপ্ন-রাজ্যে উপস্থিত হয়েছি। মণ্ডপের বাইরের দিকটা সোনালী গম্বুজ আর ফোয়ারা মোগল-যুগের দিন স্মরণ করায়। ভেতরে ঢুকে দেখতে পাওয়া যায় ওদের খামার-বাড়ী, পশুশালা, হাঁস-মুরগীর যত্ন, পরমাণুর শক্তি-প্রয়োগ। দেখতে দেখতে মনে হয় কবে আমরাও এমনি বিত্তশালী হয়ে উঠতে পারব।

রাশিয়ানরাও কম যায় না। ওদের দেশের মতই বিশাল ভবনটির সামনে খোলা চত্বরে দেখা যায় আকাশভেদি পরম বিস্ময়কর লুনিক। ঘরে ঢুকতেই আছে স্পুটনিকগুলি। শুধু কৃষি নয়, শিল্পজগতে ওদের অগ্রগতির সঙ্গেও পরিচিত

হওয়া যায়। ওদের বৈদ্যুতিক মানচিত্রটি খুব মজার। এ শুধু পটে লেখা নয়, কথাও কয়। কারুর কিছু জানবার ইচ্ছে হলে ইংরেজী কিংবা হিন্দির রেকর্ডিং-এ দেশের নানা প্রগতির কথা জানতে পারা যায়। শুধু তাই নয়, সপ্ত-বার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়ণের পর বর্তমান মানচিত্রের যে সব পরিবর্তন হবে তাও জানিয়ে দেবে।

পরমাণবিক বিকিরণ (Nuclear Radiation) এবং রেডিও-আইসোটোপ কিভাবে কৃষি এবং জীব-বিদ্যা সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কাজে লাগাচ্ছে তা দেখলে অবাক হতে হয়। গামা বিকিরণের (Gauma Radiation) সহায়তায় আলু সারা বছর ধরে নিখুঁত ভাবে রাখা যায়। কেননা এতে শুধু পচনই বন্ধ হয় না, কোন রোগ বীজাণুও এর ধার ঘেঁষতে পারে না। একটা উদাহরণ মাত্র। ঘুরতে ঘুরতে চোখে পড়বে সহস্র প্রকারের দর্শনীয় বস্তু, লক্ষ লক্ষ পরিসংখ্যান। সঙ্গে সঙ্গে চলছে সিনেমা। তার মারফৎ দেখতে পাওয়া যায় গ্রাম্য আর শহুরে জীবনের মধ্যে কোন ভেদাভেদ রাখে নি। সুখ-ভোগ যা কিছু শহরে সম্ভব তা ওদের গ্রামেও বিরল নয়। এ পরিবর্তন আসে নি মন্ত্রের বলে, সম্ভব হয়েছে শহর আর গ্রামবাসীদের যৌথ সহযোগিতায়।

চীনা ভবনটিও কম চিত্তাকর্ষক হয় নি। জার্মানদের ভবনে ঢুকলেই চোখে পড়ে স্বচ্ছ একটি গাভীর মূর্তি। দেহের সমস্ত কার্যকরী অংশগুলি এবং কি প্রক্রিয়ায় ওদের দেহে দুধ উৎপাদন হয় তা পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। শুধু ওরা নয়, বিদেশাগত সবগুলি মণ্ডপ ঘুরলেই বুঝতে কষ্ট হয় না যে গোমাতা বলে যে শ্রদ্ধা আমরা প্রকাশ করতে চাই তা পুঁথিগত কু-সংস্কার মাত্র। কিন্তু ওরা তা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে। শুধু গরু নয়, মানুষের প্রয়োজনীয় সবার উপরই এদের সমান নজর। বিদেশাগত আর সব মণ্ডপই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে বিরাজমান।

আমাদের বিভিন্ন রাজ্যের আয়োজনও কম আকর্ষণীয় হয় নি। মজ্জাগত আকর্ষণ যতই থাক না কেন, বিদেশীরা যে আমাদের চাইতে অনেক অগ্রগামী সে সত্য প্রকট হয়ে উঠেছে। তবে কথা হচ্ছে "মহৎ দেখে কাঁদতে জানার" শিক্ষা আমাদের হয় তবেই বুঝব ভারত-কৃষক-সমাজ যাদের প্রচেষ্টায় এ মেলা বসেছে তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

পাঞ্জাবীদের মণ্ডপটি ওদের মতই তাগড়া, গোপুরম সহ রামেশ্বরমের মন্দির দেখিয়ে বাজি মাত করেছে মাদ্রাজীরা। শান্ত-সমাহিত বৌদ্ধ-মূর্তি বিহারী মণ্ডপ আলো করে আছে। মহীশূরের বিধান-সৌধ, ভূস্বর্গ কাশ্মীর এবং ভারতের আর সব রাজ্যই দর্শককে হাতছানি দিয়ে ডাকে।*

রুচিগত বিকাশনে পশ্চিম বাংলার প্রাধান্য অনস্বীকার্য। ঢুকতেই চোখে পড়ে আমাদের পূর্ব-পুরুষদের দেয়াল-চিত্র। আরও ভেতরে গিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে বাংলার মাটি, বাংলার জল। কৃষ্ণনগরের শিল্প-বৈশিষ্ট্য এখানেও এভারেষ্টের চূড়ায়। যে তিনটি নারীমূর্তি দেখলাম ধান ভানতে তা ভোলবার নয়।

রাজ্যগুলি ছাড়া আরও কত প্রতিষ্ঠান তাদের প্রচেষ্টা ও সাফল্য রূপায়িত করেছে তা বলতে গেলে একটা মোটা বই লিখতে হয়। সবই রঙিন, সবই মনোলোভা। কিন্তু তবুও একঘেঁয়েমি আসত বৈকি, যদি না থাকত বেচা-কেনার দোকান, না থাকত ছোট্ট ইঞ্জিনটানা একটা প্রমোদ-ভ্রমণের রেলগাড়ী ও মোটর। কত খানাপিনার দোকান রসনা সিক্ত করছে।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে চাষী ভাইদের নিয়ে এসে দেখিয়ে এবং বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে অগ্রগতির যাদু-কাঠির রূপ। ওদের মনে জাগিয়ে তুলতে হবে নয়া পদ্ধতির প্রতি আস্থা। তা নইলে ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার একটা মোটা অংশ না খেয়ে মরবে আর সমাজের উপর তার প্রতি-ক্রিয়া হবে বিষময়। জোর-জবরদস্তি করে অবশ্য কিছুই করা উচিত হবে না। যে পথে ওরা চলে অভ্যস্ত তারই মাধ্যমে ওদের মনকে করে তুলতে হবে সংস্কার মুক্ত। পথ হওয়া চাই আমাদের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে খাপ খাওয়া। মেলা দেখে বাড়ী ফিরে গিয়ে যাতে ওরা পাড়া প্রতিবেশীর কাছে বুঝিয়ে বলে ওরা কি দেখল এবং শিখল, তাতেও উৎসাহিত করতে হবে।

ক্ষেতের শস্য, গাছের ফল এবং তরি-তরকারি সহজেই পচে নষ্ট হয়ে যায়। রান্না করা খাদ্যও তাই। এ সমস্ত জিনিস অনেক দিন ধরে গ্রহণোপযোগী অবস্থায় রাখাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কারিগরি গবেষণাগারের দ্বারা দু' সপ্তাহব্যাপী খাদ্য সংরক্ষণ বিষয়ক শিক্ষণের ব্যবস্থা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মেলার বিজ্ঞানমণ্ডপে এ কাজ চলছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, এই মেলা সংগঠিত হয়েছে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে; দেখতে এসেছে অগণিত নর-নারী। কিন্তু কর্মব্রত গ্রহণ না করলে এই বিরাট ব্যাপার পণ্ডশ্রমের প্রহসনে পরিণত হবে।

দণ্ডকারণ্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

আমরা যাব, যাবই যাব, দণ্ডকারণ্য,
সঙ্গে লব, বাঙলা দেশের পুণ্য ও পণ্য।
বাঁধব 'মড়াই' ডাইনে বামে, বাঁধব সোনার ধান,
আম কাঁঠাল ও নারিকেলের প্রকাণ্ড বাগান।
ফলাইব সেই মাটিতে শ্রেষ্ঠ ফসল ঢের—
সিঙ্গাপুরী আনারস ও কমলা সিলেটের।
অঙ্গনে পুঁই, পুনকো পালং কুমড়া শশা ঝিঙা,
পদ্মভরা দীঘি দূরে—মাছ ধরিবার ডিঙা।

২

নানান রকম মাছ ফেলিব খিড়কি পুকুরে,
ছিপটি হাতে, বসবো মোরা, দিবস দুকুরে।
ঘর্ঘরিয়া ডাকবে ঘুঘু—খেলবে বৃহৎ রুই,
আসবে ছুটে চাষী—যারা 'নিরুদ্দিষ্ট' ভুঁই।
ডিমভরা সব ট্যাংরা পুঁটি ধরবো বাটা পোনা—
উল্লসিত ছেলেমেয়ের চলবে আনাগোনা।
চরবে গাভী মুখ ডুবায়ে শ্যামল তৃণ পর—
মাছে দুধে ভাতে রবে—মোদের বংশধর।

৩

জানাবো এ পুনর্ব্বাসন—নির্ব্বাসন তো নয়—
ভয়ের মাঝে লুকিয়ে রাখেন হরিই বরাভয়।
গড়বো কেহ মুড়ি ভাজার খোলা খাপুরি—
বুন্‌বো কেহ কুলো ডালা ঝাকুরি ঝুড়ি,
বানাইব অমৃতি কেউ—ঢাকাই পরোটা—
লাড্ডু পেড়া বলবে দেখে 'পর নহে ওটা'।
সরভাজা ও ছানাবড়া খইচুর ও ল্যাংচা—
সীতাভোগ ও মিহিদানা—যে চাহিবে যা।

৪

গড়বো নূতন বিক্রমপুর, নূতন নবদ্বীপ—
'চন্দ্রনাথে'র ভালে দিব নূতন চাঁদের টিপ।
বসাইব 'দত্তপাড়া' দণ্ডকেতে আনি—
'জনস্থানের' পীঠের কাছে তীর্থ রাজেন্দ্রানী।
সর্ব্বহারা একেবারে নিঃস্ব ও নিঃশেষ—
অরণ্যেতে মিলবে নূতন 'সব পেয়েছির দেশ'।
কেড়ে নিলে—ফেলে এলাম—আকুল আঁখি নীরে—
পদ্মা এবং মেঘনাতে—যা—হেথায় পাব ফিরে।

৫

আরতিতে বাজবে কাঁসর বাংলা দেশের ঢোল—
শঙ্খ ঘণ্টা হুলুরবে—বক্ষ উতরোল,
পড়বো সবে মহাভারত পড়বো রামায়ণ
হবে মহৎ দুখের সাথে দুখীদের মিলন।
শ্রীবৎস ও চিন্তা এলো কাঠুরিয়ার দেশে,
চিনবে না কেউ এলো যে হায় অতি মলিন বেশে।
লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনা পায় নি কিছু কম—
হেথায় যেন মেলে তাদের "সুরভি আশ্রম"।

৬

সবায় নিয়ে করবো যে ঘর বড়ই মনে সাধ
'জন্মাষ্টমীর' সে আনন্দ পড়বে নাক বাদ।
দশভুজা মূর্ত্তি মায়ের বাংলা দেশের ঢঙে—
তৈরি হবে চুম্‌কি চুনী, রাঙতা এবং রঙে।
লক্ষ্মী-পূজার সমারোহ এলুন দেয়া বাড়ী—
মনসা ও ষষ্ঠী-পূজা ভুলতে কি গো পারি?
পৌষ আগ্‌লাবো, রোদ পোহাবো গড়বো পুলি-পিঠা—
পার্ব্বণও যে মোদের কাছে ভিটার মত মিঠা।

৭

ত্রেতা এবং দ্বাপর যুগের দণ্ডকারণ্য—
গুণীগণের বাসে হবে নৈমিষারণ্য।
সেথায় মোরা খুঁজবো নিতি দেব-দেবীদের খোঁজ,
পুণ্য সে সব পদধূলির কিছু কি নাই আজ?
মুনি ঋষি যক্ষ রক্ষ সবার অতিথি—
তাঁদের কৃপা তাঁদের আশিস মাগবো যে নিতি।
ধুলা 'মুঠি সোনার' মুঠি—ঘরকে তপোবন—
করবো মোরা—লাগলো চোখে অমৃত অঞ্জন।

৮

যে প্রতিভা ফুটবে হেথা বল সকলে বল—
পূজবে মায়ে একশত আট দিয়ে নীলোৎপল।
অতি বিপুল সে ঐশ্বর্য্য একলা ভোগের নয়—
গোটা ভারত অংশ তাহার পাবে সুনিশ্চয়।
অনাগত—যাঁদের কথা এখনো অজ্ঞাত—
জন্মগ্রহণ করবে হেথায় মহামানব কত।
বিরাট তাদের অবদান ও মহাপ্রাণতায়—
টানবে সারা বিশ্বকে যে—যাচ্ছি সেই আশায়।

মুর্শিদাবাদ পরিক্রমা

অধ্যাপক শ্রীরামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

মুরশিদাবাদ শহর ও তাহার উপকণ্ঠ ঐতিহাসিকের নিকট তীর্থক্ষেত্র স্বরূপ। এখানেই বাংলার, তথা ভারতের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে, ব্রিটিশ রাজত্বের সূচনা হয়। আবার এই শহরের ছয়-সাত মাইল দক্ষিণে জেলার বর্তমান সদর বহরমপুরেই ইংরেজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত অসন্তোষ উনবিংশ পদাতিক বাহিনীর বিদ্রোহে আত্মপ্রকাশ করে। ১৭০৪ হইতে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীন বাংলার রাজধানী ছিল এই মুরশিদাবাদ। ১৭০১ সনে সম্রাট ঔরংজেব মুরশিদকুলি খাঁকে বাংলার দেওয়ান করিয়া পাঠান। তখন রাজধানী ছিল ঢাকায়। সেখানে সুবাদার শাহজাদা আজিম ওসমানের সহিত বিরোধ হওয়ায় মুরশিদকুলি দেওয়ানী মুরশিদাবাদে স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার রাজস্ব সংগ্রহে সন্তুষ্ট হইয়া সম্রাট তাঁহাকে পরে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার করেন। সম্রাটের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্য যখন চারিদিকেই ভাঙিয়া পড়িতে থাকে—তখন মুরশিদকুলি দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরণ বন্ধ করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া বসেন। ১৭২৫ সনে মুরশিদকুলির মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা সুজা খাঁ মসনদে আরোহণ করেন। তাঁহার ন্যায় প্রজারঞ্জক শাসক বাংলার মুসলমান রাজত্বের ইতিহাসে দুর্লভ। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ নবাব হন। কিন্তু তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য এক ষড়যন্ত্র হয়। সরফরাজের আত্মীয় আলিবর্দি খাঁ তখন পাটনার শাসনকর্তা ছিলেন। ষড়যন্ত্রকারীদিগের সহিত মিলিত হইয়া আলিবর্দি তেলিয়াগড়ি ও সক্রিগলির পথে মুরশিদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হন। পথে গিরিয়ার প্রান্তরে সরফরাজের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। নবাব-সৈন্যকে জগৎ শেঠ প্রভৃতি ষড়যন্ত্রকারীগণ পূর্ব্বেই উৎকোচদানে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছিল। যুদ্ধে সরফরাজ নিহত হইলে আলিবর্দি মসনদ অধিকার করেন।

আলিবর্দি ষোল বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার সময় মারাঠাগণ বার বার বাংলা আক্রমণ করে। মারাঠাবাহিনীর এক অংশ মুরশিদাবাদের অপর পারে ডাহাপাড়ায় উপস্থিত হয়। ভাগীরথী পার হইয়া মহিমাপুরে জগৎশেঠের বাড়ী লুণ্ঠন করে। দীর্ঘদিন মারাঠাদিগের সহিত আলিবর্দির সংগ্রাম চলিতে থাকে। বহরমপুরের পাঁচ মাইল দক্ষিণে মনকরায় মারাঠাদের সহিত আলিবর্দির যুদ্ধ হয়। মারাঠা সৈন্যাধ্যক্ষ ভাস্কর পণ্ডিত এখানে আলিবর্দির বিশ্বাসঘাতকতায় নিহত হন। বেরার প্রদেশ ছাড়িয়া দিয়া ও বার্ষিক দ্বাদশ লক্ষ টাকা চৌথ হিসাবে দিতে স্বীকৃত হইয়া আলিবর্দিকে অবশেষে মারাঠাদিগের সহিত সন্ধি করিতে হয়। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আলিবর্দি পরলোকগমন করিলে তাঁহার প্রিয় দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা মসনদে আরোহণ করেন। এই অপরিণতবয়স্ক যুবক তাঁহার ঔদ্ধত্য ও অত্যাচারে সকলকেই অতিষ্ঠ করিয়া তোলেন। মাতৃস্বসা ঘসেটি বেগমের নিকট হইতে মতিঝিল প্রাসাদ কাড়িয়া লন ও তাঁহার সমস্ত ধনরত্ন আত্মসাৎ করেন। প্রধান সেনাপতি মীরজাফর, শ্রেষ্ঠী জগৎশেঠ, প্রধানমন্ত্রী দুর্লভরাম প্রভৃতি বিশিষ্ট সভাসদগণকে প্রকাশ্য দরবারেই অপমানিত করেন। ইংরেজদিগের সহিত সিরাজের সংঘর্ষ বাধিলে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য ইহারা ইংরেজদিগের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ফলে, পলাশীক্ষেত্রে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজ পরাজিত হইয়া পলাইতে বাধ্য হন। পথে রাজমহলের নিকট ধৃত হইয়া বন্দী অবস্থায় মুরশিদাবাদে নীত হইলে মীরজাফর পুত্র মীরণের আদেশে জাফরাগঞ্জে মহম্মদীবেগ সিরাজকে হত্যা করে। এদিকে ইংরেজরা বাংলার শূন্য মসনদে মীরজাফরকে বসাইয়া প্রকৃত শাসনক্ষমতার অধিকারী হন। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হয়।

বাংলার ইতিহাসের এই অধ্যায়ের অনেক স্মৃতি-নিদর্শনই মুরশিদাবাদ শহর ও শহরতলিতে ছড়াইয়া আছে। উহা দেখিতে অনেকেই মুরশিদাবাদে আসেন। কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশই নবাব প্যালেস বা হাজারদুয়ারী, কাটরায় মুরশিদকুলির ও খোসবাগে আলিবর্দি ও সিরাজের সমাধি দেখিয়াই তাঁহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করেন। অনেকেই জানেন না যে, এই প্যালেস আধুনিক কালের, ইতিহাসের কোন চিহ্নই উহা বহন করে না। উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে উহা নির্ম্মিত হয় ও উহার স্থপতি কর্ণেল ডানকান ম্যাকলিওড ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর একজন ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু এই প্যালেসেরই অতি সন্নিকটে—ইহার গাত্রসংলগ্ন বলিলেও চলে—মসজিদ ও মদিনার ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। প্যালেসের মাত্র কয়েক গজ উত্তরে অবস্থিত "মদিনা" সিরাজ-উদ্দৌল্লার নির্ম্মিত ইমামবারারই অংশ। কালের সর্ব্বগ্রাসী স্পর্শ অবহেলা করিয়া ইহা এখনও দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ইহার পশ্চিমে ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত মসজিদটিও সিরাজের নির্ম্মিত। মদিনার পূর্ব্বে রক্ষিত—"বাচ্চাওয়ালী" তোপ, দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৫ ফুট ও পরিধিতে ৭ ফুটেরও বেশী। সম্ভবতঃ দ্বাদশ হইতে চতুর্দ্দশ শতকের মধ্যে গৌড়ের কোন বাদশাহ উহার নির্ম্মাতা। অথবা ঔরংজেবের সেনাপতি মীরজুমলা কর্ত্তৃক আসাম হইতে আনীত ৬৭৫টি কামানের মধ্যে ইহা একটি হইতে পারে। প্যালেসের দক্ষিণ-পূর্ব্বে চক-বাজারে কিল্লার প্রাচীরসংলগ্ন যে মসজিদটি এখনও সুরক্ষিত অবস্থায় রহিয়াছে—ইহা ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মীরজাফর পত্নী মণিবেগম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। এখানে পূর্ব্বে মুরশিদকুলির চল্লিশটি স্তম্ভযুক্ত

Audience Hall ছিল। এই চকবাজারের অনতিদূরে কুলেরিয়ায় মুরশিদকুলির প্রাসাদ ছিল। তাহার আর চিহ্নমাত্রও নাই। কিন্তু সদর রাস্তার পূর্ব্বে কুলেরিয়ার মসজিদ এখনও আছে—এবং এই মসজিদের সোপানাবলীর নিম্নেই একটি কক্ষে মুরশিদকুলি পত্নী নসেরী বানু বেগমের অস্থিমশয্যা বিস্তৃত রহিয়াছে। মসজিদের প্রবেশদ্বারের উপর প্রস্তরফলকই ইহা ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই প্রাচীন স্মৃতিরক্ষার কোন ব্যবস্থাই সরকার পক্ষ করেন নাই। মসজিদের প্রবেশদ্বার ও সোপানাবলি কণ্টকাগুল্মে জঙ্গলাকীর্ণ। মানুষের কথা দূরে, বন্যজন্তুও সে পথে পথ পায় না। অচিরেই এই সমাধিমন্দির কালের গর্ভে বিলীন হইবে। প্রাচীন স্মৃতিরক্ষার জন্ম আইন আমাদের আছে, কিন্তু মুরশিদকুলির বেগমের সমাধির প্রতি এই অবহেলা কেন?

এই মুরশিদাবাদ শহরেই নবাব সরফরাজ খাঁ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রহিয়াছেন। রেলওয়ে ষ্টেশনের অদূরেই নগিনাবাগে তাঁহার সমাধি। এই নগিনাবাগেই তাঁহার প্রাসাদ ছিল। সরফরাজ গিরিয়ার যুদ্ধে নিহত হইলে তাঁহার মাহুত তৎক্ষণাৎ শবদেহ মুরশিদাবাদে লইয়া আসে ও গভীর রাত্রে অন্ধকার মধ্যেই উহা সমাধিস্থ করা হয়। নগিনাবাগ প্রাসাদের কোন চিহ্নই নাই। এমনকি মুরশিদাবাদবাসী অধিকাংশ লোকই এই সমাধির সন্ধান পর্য্যন্ত জানেন না। সুখের বিষয় উহা যত্নসহকারে রক্ষিত হইতেছে। নিকটস্থ রাস্তার পার্শ্বে পথনির্দ্দেশক কোনও ফলক থাকিলে উহা সাধারণের সুবিদিত হইত। এই সমাধির অল্প উত্তরে তাঁহার স্ত্রীর নির্ম্মিত বেগম মসজিদ। মসজিদটিও ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে ও উহার চারিপাশ জঙ্গলাকীর্ণ। উহার পশ্চিমে ভগ্ন প্রাচীরবেষ্টিত স্থানটি এই মহিলার সমাধি বলিয়া অনুমিত হয়।

মুরশিদাবাদের প্রায় এক মাইল পূর্ব্বে বর্ত্তমান ষ্টেট হাইওয়ের পাশে কাটরার মসজিদ। ইহার সোপানশ্রেণীর নিম্নে মুরশিদকুলি-খাঁর সমাধি। এই মসজিদ ও সমাধি মুরশিদকুলি নিজেই তৈরি করাইয়া যান। মসজিদটির পাঁচটি গম্বুজের মধ্যে মাঝের তিনটি সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কাটরার দুই ফার্লং দক্ষিণ-পূর্ব্বে তোপখানা—এখানে জাহানকোষা তোপ আছে। ইহা দৈর্ঘ্যে সাড়ে সতের ফুট ও পরিধিতে পাঁচ ফুট। উহা সম্রাট সাজাহানের রাজত্বকালে ঢাকার জনার্দ্দন কর্ম্মকার কর্ত্তৃক অষ্ট ধাতুতে নির্ম্মিত হয়।

নবাব প্যালেসের আধ মাইল উত্তরে নশীপুর যাইবার পথের ধারে আজম নগর মসজিদ—মুরশিদকুলির কন্যা আজিমন্নেসার নির্ম্মিত। মসজিদটি সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গেলেও উহার সোপানাবলি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে ও তাহার নিম্নেই আজিমন্নেসার সমাধি। গবর্ণমেন্ট হইতে ইহা রক্ষা করিবার ব্যবস্থা আছে। আরও এক মাইল উত্তরে জাফরাগঞ্জ। এখানে আলিবর্দ্দি, সিরাজ ও মীরজাফর নবাব হইবার পূর্ব্বে বাস করিতেন। এই জাফরাগঞ্জ প্রাসাদেই সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার সকল মন্ত্রণাই গৃহীত হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাশিমবাজার কুঠির ওয়াটস স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে পালকি করিয়া এই জাফরাগঞ্জ প্রাসাদে আসেন। এখানেই মীরজাফর পুত্র মীরণের মস্তকে হাত রাখিয়া ও কোরাণ স্পর্শ করিয়া ইংরেজদের সহিত অঙ্গীকারপালনের শপথ গ্রহণ করেন। এই Audience Hall কালের গর্ভে লীন হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও আমরা উহা দেখিয়াছি। প্রাচীন কীর্ত্তি সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী উহা সংরক্ষণের কোনও ব্যবস্থা হয় নাই কেন? মীরজাফর প্রভৃতির আবাসবাটী এখনও আছে। মীরণের বংশীয়গণ এখন এখানে বাস করে।

এই জাফরাগঞ্জ প্রাসাদে একটি কক্ষে হতভাগ্য সিরাজকে মীরণের আদেশে হত্যা করা হয়। সে স্থানটি এখনও দর্শককে দেখান হয়। এই দেউড়ীর বিপরীত দিকে রাস্তার অপর পার্শ্বে জাফরাগঞ্জ সমাধিক্ষেত্র। এখানে মীরজাফর ও তাঁহার দুই স্ত্রী ববু বেগম ও মণিবেগমের সমাধি রহিয়াছে। জাফরাগঞ্জের অদূরে জগৎ শেঠদিগের প্রাসাদ ছিল। এখন গঙ্গাগর্ভে সম্পূর্ণ লীন হইয়াছে। এই শেঠ-পরিবার নবাবী আমলে বাংলার রাজনৈতিক সকল পটপরিবর্ত্তনেই বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে। সরফরাজখাঁর সৈন্যগণকে জগৎশেঠই উৎকোচ প্রদানে আলিবর্দ্দির অনুকূলে আনয়ন করেন। সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রেও প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংরেজের সহিত ষড়যন্ত্রের অপরাধে এক জগৎশেঠ মীরকাশেম কর্ত্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে মুরশিদাবাদের দুই মাইল দক্ষিণে খোসবাগ। এখানে এক আম্রবীথিকার নীরব নির্জ্জনতার মধ্যে আলিবর্দ্দি ও তাঁহার প্রিয় দৌহিত্র সিরাজ অন্তিমশয্যায় নিদ্রিত রহিয়াছে। আলিবর্দ্দির পাশেই সিরাজের সমাধি। তাঁহাদের পদতলে আলিবর্দ্দি মহিষী ও লুৎফন্নেসা শায়িতা। পরের দুইটি সমাধি আলিবর্দ্দির দুই কন্যার। খোসবাগের দুই মাইল উত্তরে ভাগীরথী তীরে রোশনীবাগে সুজাখাঁর সমাধি। ইহার উত্তরে সিরাজের মনসুরগঞ্জ প্রাসাদ ও হীরাঝিল ছিল, এখন গঙ্গাগর্ভে নিহিত।

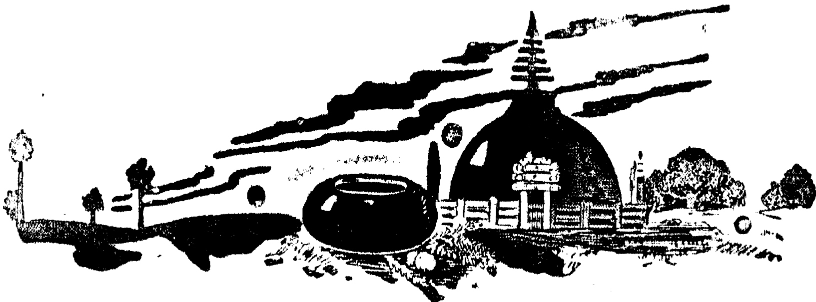
নবাব প্যালেসের প্রায় দুই মাইল দক্ষিণে মতিঝিল। আলিবর্দ্দির জামাতা ঘসেটি বেগমের স্বামী, নোয়াজেস মহম্মদ, এক মনোরম পরিবেশের মধ্যে ঝিলের উপর তাঁহার প্রাসাদ ও মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। নোয়াজেসের মৃত্যুর পর সিরাজ তাঁহার মাতৃস্বসার নিকট হইতে জোর করিয়া এই প্রাসাদ দখল করিয়া লন (১৭৫৬ অঃ) ও তাঁহার ধনরত্ন আত্মসাৎ করেন। এই মতিঝিল হইতেই সিরাজ চিরবিদায় লইয়া পলাশীতে যুদ্ধযাত্রা করেন। মিরকাশেম ইংরেজ-বাহিনীর নিকট কাটোয়ায় পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া এই মতিঝিলেই ইংরেজদিগকে বাধা দিবার জন্ম সৈন্যসমাবেশ করেন। কিন্তু বিজয়ী ইংরেজবাহিনীর অগ্রগতি প্রতিহত হয় নাই। ইংরেজ সেনাপতি অ্যাডামস এখান হইতেই

মীরজাফরকে সঙ্গে লইয়া মুরশিদাবাদ গিয়া তাঁহাকে দ্বিতীয় বার মসনদে প্রতিষ্ঠিত করেন (১৭৬৩ অঃ)। ১৭৬৫ অব্দে ক্লাইভ মতিঝিলে থাকিয়া নবাবের সহিত দেওয়ানী হস্তান্তর করিবার আলাপ-আলোচনা করেন এবং ১৭৬৬ অব্দের মার্চ্চ মাসে মতিঝিলেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম 'পুণ্যাহ' হইয়া রাজস্ব আদায় আরম্ভ হয়। নবাব দরবারে কোম্পানীর রেসিডেণ্ট হিসাবে ওয়ারেণ হেষ্টিংস এখানেই থাকিতেন। সার জন শোরও কিছুকাল এখানে ছিলেন। মতিঝিল প্রাসাদের আর চিহ্নমাত্র নাই। ঝিলের উপর একটি দালান দেখান হয়—যেখানে ক্লাইভ প্রভৃতি কোম্পানীর এজেণ্টগণ বাস করিয়াছিলেন। মতিঝিল মসজিদ প্রাঙ্গণে একটি বেষ্টনীর মধ্যে নোয়াজেস মহম্মদ ও তাঁহার পালিত পুত্র সিরাজের ভ্রাতা একরামুদ্দৌলার সমাধি রহিয়াছে। মতিঝিলের দুই মাইল পূর্ব্বে মবারক মঞ্জিল। এখানে সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালতের প্রথম অধিবেশন হইত।

মুরশিদাবাদের চার-পাঁচ মাইল দক্ষিণে কাশিমবাজার। সে সময় ভাগীরথী খোসবাগের নিকট হইতে পূর্ব্বমুখী হইয়া অশ্বখুরাকৃতি একটি বাঁকে কাশিমবাজার ও ফরাসডাঙ্গার পাশ দিয়া আবার সৈদাবাদের নিচে দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত ছিল। ভাগীরথীর এই পরিত্যক্ত খাত এখন কাটিগঙ্গা নামে কথিত। এই কাটিগঙ্গার তীরে ইংরেজদিগের কুঠি ছিল। এখনও 'হাতার বাগান' মধ্যে এই রেসিডেন্সীর ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়। তৎকালে কাশিমবাজার শহর দৈর্ঘ্যে দুই মাইল বিস্তৃত ছিল ও জনসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। নদীর গতি পরিবর্ত্তনের ফলে ম্যালেরিয়ায় কাশিমবাজার ধ্বংস হইয়া যায়। রেসিডেন্সীর সম্মুখেই ইংরেজদিগের সমাধিক্ষেত্র। এখানে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের প্রথমা স্ত্রী ও কন্যার সমাধি রহিয়াছে। 'সংরক্ষিত প্রাচীন কীর্ত্তি' বলিয়া ঘোষিত হইলেও এই সমাধিক্ষেত্র এখন জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, ভিতরে প্রবেশ করা একরূপ অসাধ্য। কাশিমবাজার রেলষ্টেশনের নিকটে ওলন্দাজদিগের সমাধিক্ষেত্র। আরও পশ্চিমে সৈদাবাদে আর্ম্মেনিয়ান গির্জ্জা। এখানে বহু আর্ম্মেনিয়ান বণিক বাস করিত। শেখ আগা শ্রীগরীর নামে এই পল্লী এখনও সেতাখাঁর বাজার নামে পরিচিত। এই গির্জ্জায় মেরী মাতার অতি সুন্দর একটি তৈলচিত্র ছিল। উহা এখন কলিকাতা আর্ম্মেনিয়ান চার্চ্চে স্থানান্তরিত হইয়াছে। গির্জ্জাটি এখন সম্পূর্ণ ভাঙিয়া পড়িয়াছে। সৈদাবাদের উত্তরে ফরাসীদিগের কুঠি ছিল। তাহার সকল চিহ্নই বিলুপ্ত হইলেও স্থানটি এখনও ফরাসডাঙ্গা নামে অভিহিত।

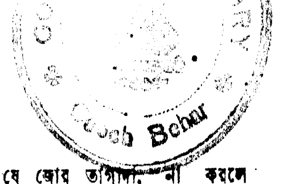
মুরশিদাবাদের চার-পাঁচ মাইল উত্তরে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে রাণী ভবানীর পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত বরানগর। এখানে তাঁহার স্থাপিত ভবানীশ্বর ও চৌবাংলা মন্দিরের স্থাপত্য বাংলার শিল্পের একটি বিশেষ পর্য্যায়ের নিদর্শন। প্রাচীরগাত্রে পোড়ান ইষ্টকে খোদাই করা রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ কাহিনীর চিত্ররূপ ইহার বিশেষত্ব। প্রতিখানি ইটে চিত্রের এক একটি অংশ খোদাই করিয়া ইটগুলি পোড়ানর পর তাহাদের সুসংবদ্ধ সমাবেশে সম্পূর্ণ চিত্রটি প্রাচীরগাত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এরূপ ইষ্টক-চিত্র বাংলার বাহিরে বিরল।

মুরশিদাবাদের ঐতিহাসিক স্থানগুলির বর্ণনায় রাঙামাটির কথা বাদ দেওয়া চলে না। বহরমপুরের চার-পাঁচ মাইল দক্ষিণে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে রাঙামাটি—সপ্তম শতাব্দীর রাজা শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ। চৈনিক পরিব্রাজক হুউ-এন্-সাঙের রক্তমৃত্তিকা বিহার এখানেই ছিল। রাঙামাটি নাম আজও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ হইতে একটি স্তূপের কিয়দংশ খনন করান হইয়াছিল। একটি দালানের প্রাচীরের খানিকটা ও কতকগুলি terra-cota মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু খননকার্য্য আর অধিক অগ্রসর হয় নাই। এখানকার স্তূপগুলি খনন করিলে সে যুগের লুপ্ত ইতিহাসের উপর অনেকখানি আলোকসম্পাত হইতে পারে।



উপেন্দ্র-স্মৃতি

শ্রীবেলা দেবী



পরিচয় ত স্বল্পকালের, কিন্তু স্মৃতি এত বুকজোড়া কেন? বেদনা এত বুকছাপানো কেন?

উনআশি বছরের জীবনে এই অল্প ক'টা দিনের ব্যাপ্তি আর কতটুকু? মহাকালের বুকে ত তা সামান্য একটি বিন্দুমাত্র!

তা হোক্। ক্ষণিকের স্মৃতির মাধুর্য্যও কিছু কম নয়, মূল্যও কিছু কম নয়। তাই ত আজ মনের আঙ্গিনায় কত টুক্‌রো টুক্‌রো কথার ভিড়, প্রাণের তারে মিষ্টি সুরের রেশ।

প্রথম দিনের আলাপ 'সাহিত্যতীর্থের' এক বিশেষ অধিবেশনে।

আমায় 'আপনি' বলবেন না, 'তুমি' বলবেন।

'বলতে পারি, তবে একটি সর্ত্তে।'

'কি সর্ত্ত।'

তা হলে আপনাকেও আমায় 'তুমি' বলতে হবে।

'সে কি? আমি যে আপনার চেয়ে অনেক ছোট, কি করে বলি, সে হয় না।'

'কেন হবে না। ইংরেজিতে ত এক You-তে কাজ চলে যায়। you মানে সাধারণতঃ আমরা বলি 'তুমি'। তবে আর এ রকমফের কেন?'

'কেমন যেন বাধোবাধো ঠেকে।'

'বলতে বলতেই ঠিক হয়ে যাবে। কেমন রাজি ত?'

কি আর করা যায়। অগত্যা বলতেই হ'ল 'রাজি'।

কিন্তু মুখে রাজি হয়ে গেলেই ত হ'ল না। কাজের বেলায় ক্রমাগতই ভুল হতে লাগল আর ক্রমাগত সংশোধন—

'উহু, তোমার ভুল হয়ে গেল কিন্তু। তুমি আবার আমায় 'আপনি' বলছ।'

'তাই ত। আচ্ছা, দেখ আর ভুল হবে না।'

খানিক পরেই। 'অন্ততঃ সাত-আট বছর বা আরও বেশি, আমি আপনার 'গল্পভারতীর' নিয়মিত পাঠক।'

হেসে বললেন, 'আবার তোমার ভুল হ'ল।' আর সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন।

ক্রমেই রপ্ত হয়ে এল 'তুমি'। আর এই আপন করা 'তুমি' সম্বোধনটির সঙ্গে যুক্ত হ'ল মিষ্টি একটি সম্পর্ক। 'দাদু'।

'দাদু। কেমন আছ?'

'না, দু'দিন যাবৎ শরীরটা তেমন ভাল না।'

'তুমি বড্ড পরিশ্রম কর। এখন থেকে খাটুনি একটু কমিয়ে দাও।'

'কিন্তু পত্রিকাওয়ালাদের যে জোর তাগাদা, না করলে চলে না।'

'তার উপর রোজই ত দেখি সভাসমিতি একটা না একটা লেগেই আছে তোমার। শরীরের দোষ কি বল।'

'না, ওতে আমার শরীর খারাপ হয় না। জান ত, জলের মাছ জলেই ভাল থাকে। বরং ডাঙ্গায় থাকলেই মুস্কিল।'

'আমরা এসে তোমাকে অসুস্থ শরীরে ব্যতিব্যস্ত করলাম ত।'

'না না' এবার সত্যিই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি। 'ভুল কর না, তোমরা আসাতে বরং সময়টা বেশ ভাল কাটল। নইলে বিছানায় শুয়ে নিজেকে রোগী রোগী মনে হ'ত।'

আর একদিন ফোন করে জানতে পারলাম তাঁর জ্বর হয়েছে। ফোনেই বললেন, 'আর কি। দিন ত ঘনিয়ে এসেছে। এবার যাবার জন্যে তৈরী হলেই হয়।'

সেদিনই বিকেলবেলা তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। গিয়েই বললাম, 'কি, তোমার বড্ড দেমাক হয়েছে দেখছি।'

একটু অবাক হয়ে বললেন, 'কিসের দেমাক।'

আমি বললাম, 'বয়সের দেমাক। সকালবেলা ফোনে অমন বিচ্ছিরি ঠাট্টাগুলো করেছিলে কেন? এখনও ত আটের ঘরে পৌঁছও নি, তাই এত। পত্রিকায় দেখতে পাওনা মানুষ একশ কুড়ি একশ পঁচিশ বছর বাঁচছে, আর একশ বছর ত মানুষ হামেশাই বাঁচছে। কাজেই তোমার দেমাক করবার মত বয়স এখনও হয় নি।'

তিনি হাসলেন। বললেন, 'আমি 'জ্যোতিষে' খুব বেশি বিশ্বাস করি না। কিন্তু পর পর তিন জন জ্যোতিষী আমার হাত দেখে বলেছেন আমার নাকি সাতাশি বছর পরমায়ু। এই তিন জনেই আর একটা কথা বলেছিলেন যেটা আমার জীবনে ফলে গেছে। আচ্ছা, মনে হয় কি আমি আরও আট বছর বাঁচব?'

'নিশ্চয়ই বাঁচবে। আমরা তার চাইতেও অনেক বেশি দিন তোমাকে ধরে রাখব। যেতেই দেব না।'

হায়রে। মানুষ স্নেহ-মমতা, শ্রদ্ধা-ভক্তির দুর্ব্বার টানে তার প্রিয়জনকে বেঁধে রাখতে চায়। বলে, 'যেতে নাহি দিব।' কিন্তু নির্ম্মম নিয়তি সেকথা শোনে না। 'তবু যেতে দিতে হয়।' তাই তাঁর উনআশিতম জন্মবাসরে অগণিত অনুরাগীর অন্তরনিঃসৃত শতায়ু কামনা তাঁকে আর ছ'টি মাসও ধরে রাখতে পারল না। তিন তিন জন জ্যোতিষীর গণনা মিথ্যা হয়ে গেল। সহজ সরল মানুষটি, তাঁর প্রাণের আঙ্গিনায় ছোট-বড় সকলের জন্যই রয়েছে

উদার আমন্ত্রণ। তাঁর আন্তরিকতা সময়ের সীমা মেপে নির্দ্ধারিত হ'ত না। ভেতরে অসাধারণ ছিলেন বলেই বুঝি তিনি বাইরে ছিলেন এত সাধারণ,স্নেহপ্রবণ মন আর একটি সুন্দর সাত্ত্বিক ভাব। গত পূজার পর বিজয়ার প্রণাম করতে গেছিলাম। সে দিন ঘরে আর কেউ ছিল না, কত গল্প করলেন। বলছিলেন—'আমার জীবনের সবচেয়ে মজার ঘটনা কি জান ?'

তার পর বললেন, 'ছাত্র-জীবনে তিনি ঝামাপুকুরে এক মেসে থাকতেন, সেখানে তার এক দাদাও ছিলেন। মেস-বাড়ীর সামনে রাস্তা দিয়ে রোজ দু'টি ফুটফুটে মেয়ে স্কুলে যেত। রোজই তিনি দেখতে পেতেন। আর কাছেই কোন বড়লোকের বাড়ীতে রাত্রিতে গানের আসর বসত। উপেন্দ্রনাথ সঙ্গীত-পিপাসু ছিলেন, গান শোনবার জন্ত সেই বাড়ীর সামনে রাস্তায় তিনি রোজ পায়চারি করতেন। কয়েক দিন এমনি কেটে গেলে একদিন বাড়ীর ভেতর থেকে গান শোনবার জন্ত আমন্ত্রণ এল, কিন্তু সঙ্কোচ করে তিনি ভেতরে যান নি। তার পর ভাগলপুর চলে গেলে কিছুদিন পর তাঁর বিয়ে ঠিক হয়। তখন তাঁর সেই দাদা তাঁকে বললেন, 'ওরে উপীন, তোর বিয়ে কার সঙ্গে ঠিক হয়েছে জানিস ?'

'কার সঙ্গে ?'

'সেই যে আমাদের মেসের সামনে দিয়ে দুটি ফুটফুটে মেয়ে স্কুলে যেত, তার মধ্যে যেটি বড় তার সঙ্গে।'

'তাই নাকি !' তিনি অবাক।

'আর তোর শ্বশুর বাড়ী কোনটা জানিস ?'

'কোনটা ?'

'সেই যে গান শোনবার জন্ত যে বাড়ীর সামনে পায়চারি করতিস।'

'এ্যা, সত্যি !' তিনি আরও অবাক। (এই ঘটনাটি তিনি তাঁর কোন লেখায় লিপিবদ্ধ করেছেন কিনা তা আমার জানা নেই।)

'কেমন, ঘটনাটা মজার নয়।'

আমরা হেসে উঠলাম। ঠিক সেই সময়ে দিদিমণি (উপেন্দ্রনাথের স্ত্রী) ঘরে ঢুকলেন। তিনি তাঁকে দেখিয়ে বললেন, 'এই যে, সেদিনের ফুটফুটে মেয়েটি।'

আমরা আবার হেসে উঠলাম।

তার পর আরও কত কথা, সেই কথা সেই সুর আজও যেন কানে এবং প্রাণে বাজছে। চলে আসার সময়ে তাঁর একটি বইয়ে নিজের হাতে আমার নাম লিখে আমাকে দিয়ে বললেন, 'এই নাও আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ।'

সত্যিই তাঁর আশীর্ব্বাদ পেয়েছিলাম। তাঁর প্রতিটি কথায় প্রতিটি আচরণেই যেন পেতাম সেই আশীর্ব্বাদের স্পর্শ।

৩১শে জানুয়ারীর পত্রিকাগুলি কাক-ডাকা ভোরেই সারা শহরে ছড়িয়ে দিল ৩০শে জানুয়ারীর দুঃসংবাদ। সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ নেই।

ছুটে গেলাম, পুষ্প অর্ঘ্য দিয়ে প্রণাম করলাম, অশ্রু আর বাধা মানল না। সৌম্য প্রশান্ত মুখখানির দিকে তাকিয়ে কত দিনের কথা মনে পড়তে লাগল। সেই কণ্ঠস্বর কানে বাজতে লাগল। মনে হ'ল একটা বিরাট স্নেহের ছায়া যেন আমাদের মাথার উপর থেকে সরে গেল।

কত গুণী আর জ্ঞানীর মেলা, কত ফুল আর মালার স্তূপ, কত ভক্তি আর শ্রদ্ধা, ভালবাসা আর অশ্রুজল, এর মধ্য দিয়ে শবযাত্রা চলল কেওড়াতলা শ্মশানে। যথাবিহিত অনুষ্ঠানের পর সৌম্যমূর্ত্তি দেহখানিকে চাপান হ'ল চিতাশয্যায়।

আঃ, কাষ্ঠময় চিতাশয্যা না জানি কি কঠিন !

কে একজন হেঁকে বললেন, 'ওরে, মাথাটা নিচু হয়ে পড়েছে, মাথার নিচে আর একখানা কাঠ দিয়ে দে।'

নাঃ, আর সহ্য করা যায় না, চোখের জল মুছতে মুছতে সেখান থেকে পালিয়ে এলাম।

কালের প্রলেপে তাঁর বিচ্ছেদজনিত ক্ষত হয়ত বা একদিন সারবে কিন্তু তাঁকে হারিয়ে আমাদের যে ক্ষতি হ'ল তা কোনদিন পূরণ হবে না।




আলোচনা


"ভারতের সংস্কৃতি"

শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

আপনার জনপ্রিয় প্রবাসী পত্রিকার বর্ত্তমান বর্ষের ফাল্গুন সংখ্যার ৫৩৩ পৃষ্ঠায় ভারতের সংস্কৃতি শীর্ষক প্রবন্ধে—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত মহাশয় ফলিত জ্যোতিষ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "ফলিত জ্যোতিষ জ্যোতিষীর অর্থাগম ও অন্নসংস্থানের জন্যই রচিত হইয়াছে। ভবিষ্যৎ যতই অন্ধকারপূর্ণ, ভবিষ্যৎ জানিবার জন্য মানুষের কৌতূহলও সেই পরিমাণে উগ্র। সেই কারণে, সেই দুর্ব্বলতার ফলিত জ্যোতিষ প্রশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে নচেৎ জন্মলগ্নের উপর ভিত্তি করিয়া কোষ্ঠী বিচার এবং বিবাহের যোটক বিচার এক অন্ধ কুসংস্কারের পরিণাম এবং প্রতিফল মাত্র। এ কুসংস্কার অবিলম্বে দূর করা কর্ত্তব্য।" শ্রীসেনগুপ্ত মহাশয়ের ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে এ উক্তি গ্রহণ করা কঠিন। জ্যোতিষশাস্ত্র ভারতের অতি প্রাচীন বিদ্যা এবং বেদাঙ্গসমূহের অন্যতম। বিজ্ঞান-নিয়ন্ত্রিত-জীবন, যুক্তিবাদী আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জগতের বহু মনীষী আজও ফলিত জ্যোতিষ লইয়া আলোচনা করিতেছেন। প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই যে বিদ্যার গবেষণা অব্যাহত আছে, তাহা নিছক ধাপ্পার উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে এতদিনে ফলিত জ্যোতিষ লুপ্ত হইয়া যাইত। মানুষ যেমন ঝড়, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় প্রতিরোধ করিতে পারে না, কিন্তু যন্ত্রের সাহায্যে এই সকল প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের আভাস পূর্ব্বাহ্ণে পাইয়া সতর্ক হইতে পারে, সেইরূপ মানুষ তাহার প্রাক্তনকে অতিক্রম করিতে না পারিলেও ফলিত জ্যোতিষের সাহায্যে ভাবী ফলভোগের আভাস পাইয়া সতর্ক হইতে পারে ও অনিবার্য্য আঘাত কাটাইয়া উঠিবার জন্য বল সংগ্রহ করিতে পারে। এইখানেই ফলিত জ্যোতিষের সার্থকতা। ফলিত জ্যোতিষের সিদ্ধান্তসমূহ সব সময়ে নির্ভুল হয় না, তার কারণ অন্যান্য সকল বিদ্যার ন্যায় এই বিদ্যায় উৎকর্ষ লাভও বিদ্যার্থীর সাধনা সাপেক্ষ। বিদ্যার্থী যে পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ করেন তাঁহার গণনাসমূহও ততটুকু পরিমাণে ফলপ্রসূ হয়।

আজিও গুপ্তিপাড়া গ্রামের শ্রীসন্তোষনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের মত জ্যোতিষী আছেন যাঁহারা অর্থ গ্রহণ করেন না, আত্মপ্রচার করেন না, জ্ঞানের জন্য ও জনহিতৈষিণার জন্যই জ্যোতিষের অনুশীলন করিয়া এই বিদ্যায় উচ্চ স্তর অধিগত করিয়াছেন। সুতরাং যাঁহারা বেদ, বেদাঙ্গ, ও বেদান্তের চর্চ্চা করিতেন—তাঁহারা অর্থাগমের জন্যই তাহা করিতেন—একথা একান্ত অশ্রদ্ধেয়।

উত্তর

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

প্রতিবাদের উত্তরে নিম্নে সংক্ষেপে এবং সবিনয়ে আমার যুক্তিগুলি নিবেদন করিতেছি :—

১। ভূমিকম্প, বন্যা, আগ্নেয়গিরির স্রাব, প্লেগাদি মহামারী, জাহাজ-ডুবি, রেল-দুর্ঘটনা এবং হিরোসিমা নাগাসাকির লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির এককালীন মৃত্যু হইতে বুঝা যায় কোষ্ঠীর বিচার কত ভিত্তিহীন।

২। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার guineapig-এর মত যে কোনও প্রাণীর কোষ্ঠী করিয়া তাহার নিধন দ্বারা কোষ্ঠীর ব্যর্থতা প্রমাণ করা যায়। অসংখ্য প্রাণী মৎস্য ছাগাদি অহরহঃ খাদ্যার্থে নিহত হইতেছে। Slave-Trade-এর যুগে ও অ্যাটমিক যুগে এবং যান্ত্রিক যুদ্ধে মানুষও প্রায় গিনিপিগে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে।

৩। যে কোন মহানগরীতে একই সময়ে বহু সন্তান প্রসূত হয়। তাহাদের ভাগ্যফল এক হয় না, হইতেও পারে না। অন্য কথা দূরে থাক প্রসূতির প্রসবের কাল এবং গর্ভস্থ ভ্রূণ পুত্র কি কন্যা কিম্বা ক্লীব হইবে তাহাও বলা যায় না।

৪। সন্তানের জন্মকালের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা অনির্দিষ্ট। জরায়ুতে পুং স্ত্রী বীজ মিলনের ফলে গর্ভ উৎপন্নের কালই প্রকৃত জন্মলগ্ন। ভূমিষ্ঠ হওয়ার কোনও সংজ্ঞা নাই। Placenta (ফুল) অংশতঃ মাতার এবং অংশত ভ্রূণের অঙ্গজাত, অথচ ফুল প্রসবের সময় রাখা হয় না। স্থান অনুযায়ী Equation of time হিসাবে সময় সংশোধনের কোনও প্রথা নাই। অবশ্য আমার প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য যুক্তি অনুযায়ী তাহা থাকিলেও কোনও লাভ হইত না।

৫। সূর্য্যাপেক্ষা বৃহৎ অসংখ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলী প্রকৃতির দ্রুতগামী রথের সংক্রমণশীল চক্রের মত। সেজন্য গণিত-জ্যোতিষের দ্বারা সূর্য্যচন্দ্রের গ্রহণ, ধূমকেতু, জোয়ার-ভাঁটা প্রভৃতির সময় নির্ণয় করা যায়। মানুষের ভবিষ্যৎ জটিল এবং বহু কারণের উপর নির্ভর করে। তাই গীতা বলেন, "অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা···দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম" (১৮।১৪)। এই পাঁচটিই পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং তাহাদের ফল অজ্ঞেয়।

৬। শাস্ত্র অর্থে যাহার দ্বারা আমরা শাসিত হই। ইহাও পরিবর্ত্তনশীল। স্মৃতিশাস্ত্র তত্তৎ যুগে শ্রদ্ধের সন্দেহ নাই, কিন্তু স্মৃতির বাক্যমাত্রকেই সত্য ধরিলে,—"বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো

বিভিন্না না সৌ মুনি র্যস্ত মতং ন ভিন্নম” বলিবার প্রয়োজন হইত না। যাহা হইতে প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয় তাহাই বেদ অথবা বেদবৎ মাননীয়। কিন্তু যাহা কিছু স্মার্ত্ত সংহিতায় লিখিত হইয়াছে তাহাই সত্য নহে, নচেৎ ‘সতীদাহ’ শিশু-বিবাহ প্রভৃতি নিবারণের কোন প্রয়োজন হইত না।

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

৭। অরিষ্ট লক্ষণ বিচারে, ফলিত জ্যোতিষ ব্যবসায়ী অমঙ্গলের প্রতিবিধানকল্পে গ্রহযাগ, গ্রহশান্তি, মাদুলী কবচ ধারণ প্রভৃতি ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। তাহা দ্বারা জ্যোতিষীর অর্থাগম হয় কিন্তু জনসমাজ, দেহে, মনে এবং ধনে ক্ষতিগ্রস্ত হয় মাত্র। রথের উপর জগন্নাথের দিকে না চাহিয়া, রথের চক্রাবলীর দিকে চাহিয়া তাহাদের চিত্ত বিভ্রান্ত হয় এবং তাহাতে আধ্যাত্মিক ব্যভিচার ঘটে। ফলে, একান্ত ভাবে, মানুষের একমাত্র আশ্রয় পরমেশ্বরের শরণ গ্রহণ করিতে অক্ষম হয়।

[এ বিষয়ে আর কোন বাদ-প্রতিবাদ ছাপা হইবে না]।

প্রবাসীর সম্পাদক

তমসার ফুল

শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত

এ পৃথিবী নিঃস্ব হ'ল
পূর্ণকুম্ভ শূন্য হ'ল তার।
সুধাহারা রিক্তা ধরা
ওষ্ঠপুটে তবু বারেবার
‘অমৃত এনেছি’ বলে
কালকুট ধরেছে এ মুখে ;
আমি তবু আত্মহারা
বুভুক্ষার প্রখর কৌতুকে
চম্পক অঙ্গুলি হেরি
নয়নাগ্রে হেরি নবালোক
আত্ম সমর্পণ করি
ভুলে গেছি অতীতের শোক।
ক্ষতাক্ত-শোণিতসিক্তা
জড়া বসুধার কোলে কোলে
আমি তবু দেখে যাই
একটি যে মধুলতা দোলে!
বুকে তার গন্ধবহা
আকর্ষণী ফুটে ওঠা ফুল
এ দেহে আপন করি
করে মোরে অধীর আকুল!
তার দেহ-পরিমলে
রিক্তা বসুধার রতিস্বাদ
নিঃশ্বাসে গ্রহণ করি
ফিরে পাই মনের আহ্লাদ!
সে সমুদ্রে ডুব দিয়ে
জীবনেরে আজ ভুলিলাম,
আলোকতীর্থের পথে
তমসার ফুলই তুলিলাম।

একটু সানলাইটেই

অনেক জামাকাপড় কাচা যায়

তার কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা

না দেখলে বিশ্বাসই হতনা: শঙ্কর সীতার পরিষ্কার করা ধবধবে সাদা সার্টটা দেখে দারুণ খুসী। আর শুধু কি একটা সার্ট দেখুন না জামাকাপড়, বিছানার, চাদর আর তোয়ালের স্তূপ—সবই কিরকম সাদা ও উজ্জ্বল এসবই কাচা হয়েছে অল্প একটু সানলাইটে! সানলাইটের কার্যকরী ও অফুরন্ত ফেণা কাপড়কে পরিপাটী করে পরিষ্কার এবং কোথাও এক কুচিও ময়লা থাকতে পারেনা! আপনি নিজেই পরীক্ষা করে দেখুনা না কেন...আজই!



সানলাইটে জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তুত।

S. 267-X52 BG

গোস্বামী তুলসীদাস ও 'রামচরিতমানস'

শ্রীহরিচন্দন মুখোপাধ্যায়

ভারতের অদ্বিতীয় ভক্তকবি গোস্বামী তুলসীদাস। তাঁহার অক্ষয় সৃষ্টি 'রামচরিতমানস'। এই অমূল্য সাহিত্য-সম্পদকে কেবলমাত্র 'রামায়ণ' আখ্যা দান করিলে ইহার ব্যাপক সত্তাকে অনেকখানি খর্ব্ব করা হইবে। ইহাকে বেদ, স্মৃতি, উপনিষদ, পুরাণ ও যোগ-বাশিষ্ঠ রামায়ণের সমন্বয়াত্মক ধর্ম্মমূলক ভক্তিগ্রন্থ বলিলেই এই যুগ-সৃষ্টিকারী কাব্যগ্রন্থের উপযুক্ত স্বীকৃতি প্রদান করা হইবে।

অমর কবি তুলসীদাস 'রামচরিতমানস' রচনাকালে বাল্মীকি রামায়ণকে অবলম্বন করিয়াই ইতিবৃত্তাংশ গ্রহণ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তিনি বলিয়াছেন—

"নানা পুরাণনিগমাগম সম্মতং
যদ রামায়ণে নিগদিতং ক্বচিদন্যতোঽপি।"

পুরাণের মূলতত্ত্ব ও তথ্যসমূহকে স্বীয় প্রতিভাবলে ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারায় প্রবাহিত করিয়া তিনি উন্নত ও বলিষ্ঠ সামাজিক আদর্শের দিক্‌নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

রামায়ণের চত্বরে 'শিব-ভবানী' তত্ত্বের সাবলীল সমাবেশ গোস্বামী তুলসীদাসের এক অভূতপূর্ব্ব অবদান। ইহা পাঠক-সমাজকে একদিকে যেমন ভক্তিরসে আপ্লুত করে, অন্যদিকে তেমনই সেই রস-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সর্ব্বকালের এবং সর্ব্বলোকের শাশ্বত এবং সনাতন ধর্ম্মীয় আবেদনকে সদা জাগ্রত রাখিয়া দেয়।

তুলসীদাস নামতত্ত্বের মহিমায় প্রোজ্জ্বল। তাঁহার এই নাম-তত্ত্বের স্বরূপ শিবতত্ত্বের মাধ্যমেই সমধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। তাঁহার রামতত্ত্ব সম্যকরূপে প্রণিধান করিতে হইলে সর্ব্বত্যাগী শিবের ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে। এইখানেই তাঁহার গ্রন্থ মৌলিক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। কারণ মূল-রামায়ণে 'শিবতত্ত্বে'র সন্ধান পাওয়া যায় না। অধ্যাত্ম-রামায়ণ হইতে কবি এই 'শিব-তত্ত্বে'র বীজ সংগ্রহ করিয়াছেন। তার পর জীবনব্যাপী সাধনার বলে সেই শিবতত্ত্বকে স্বীয় আধ্যাত্মিক অনুভূতির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ভক্তির উচ্চমার্গে। অবলীলাক্রমে নাম ও নামী একত্রী-ভূত হইয়া একক সত্তা পরিগ্রহ করিয়াছে।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের অন্তর্গত 'রাম-বশিষ্ঠ-সংবাদ' অধ্যায়ে প্রোথিত তত্ত্বনিচয় জনসাধারণের মনে স্থায়ী রেখাপাত করিতে সমর্থ হয় নাই। কারণ, স্থানে স্থানে অপ্রাসঙ্গিক উপাখ্যান অথবা আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়া সেখানে গ্রন্থকার মূলতত্ত্ব হইতে অপসারিত হইয়াছেন। বিশ্লেষণগুলিও সহজবোধ্য নহে। তুলসী-দাস সেই জটিল তত্ত্বের প্রাঞ্জল এবং সাবলীল সমাধান করিতে অসাধারণ সাফল্যলাভ করিয়াছেন ভবানীর প্রতি শিবের আচরণের মাধ্যমে। তুলসী-রামায়ণের 'শিবতত্ত্বের' মর্ম্মকথা—ভক্ত কর্ত্তৃক দৈনন্দিন কর্ত্তব্যকর্ম্মের ভিতর দিয়া সগুণ ও নির্গুণের উপলব্ধিকরণ এবং ব্যক্তিগত তথা সামাজিক জীবনে চরম ও পরম প্রাপ্তির সন্ধান-লাভ। যে মহাপুরুষের জীবনে এবম্প্রকার উপলব্ধি এবং সন্ধান-প্রাপ্তির সমন্বয় সাধিত হইয়াছে তিনিই বিধাতা প্রেরিত ধর্ম্মাবতারের প্রতীকস্বরূপ এবং এইরূপ আদর্শ পুরুষের পদরেণু স্পর্শে সমাজ তথা জাতি গ্লানিমুক্ত হইয়া চরম সত্যতে প্রণিধান করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করে।

তুলসীদাসকৃত রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বর্ণিত কাকভুশুণ্ডির মুখ-নিঃসৃত অধ্যাত্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা লোকশিক্ষার ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অপরিহার্য্য। সংশয় জর্জ্জরিত মানবমন যুগে যুগে ইহার অভ্যন্তরস্থিত শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে গ্রহণ করিয়া ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ তথা দেশকে কৃতকৃতার্থ করিতে পারেন। তাই তুলসীদাসের ক্ষয় নাই। রামায়ণের নন্দনকাননে তুলসীদাস চিরনবীন পারিজাত বিশেষ। ভারতের কাব্যনিকুঞ্জে তিনি সুচিরকালের জন্য স্মরণীয়, বরণীয় এবং অভিনন্দনীয়।

এই মহাকবির পুণ্য আবির্ভাব-দিবস সম্পর্কে একাধিক মতান্তর থাকিলেও ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দকেই প্রাধান্য দেওয়া যাইতে পারে। প্রয়াগের অনতিদূরে বাঁদা জেলার রাজপুর গ্রামে আত্মারাম দুবের ঔরসে হুলসীদেবীর গর্ভে এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। উত্তরজীবনে গোস্বামী তুলসীদাস বলিয়া খ্যাত হইলেও তাঁহার বাল্য নাম ছিল 'রামবোলা'।

বিবাহ কবির জীবনে আনয়ন করিয়াছিল ভোগের উন্মাদনা। জীবনসঙ্গিনীকে শয্যাসঙ্গিনীরূপে চিন্তা করিয়া তাঁহার নারীত্বের রূপ-রসকে অঞ্জলি ভরিয়া পান করিতে গিয়া তিনি বাধাপ্রাপ্ত হইলেন স্বীয় ধর্ম্মপত্নী রত্নাবলীর নিকট। দীনবন্ধু পাঠকের এই মহীয়সী কন্যা স্বামীকে বিপথগামী হইতে দেখিয়া একদিন ভৎ সনা-চ্ছলে বললেন—"অস্থিচর্ম্মময় এই দেহের প্রতি তোমার এই অনুরাগে ধিক্। যদি ইহার অর্দ্ধেক অনুরাগ রামের প্রতি থাকিত তবে তোমাকে ভবদুঃখ ভোগ করিতে হইত না।" সাধ্বী পত্নীর মুখনিঃসৃত এই আধ্যাত্মিক তত্ত্বপূর্ণ সারগর্ভ উপদেশবাণী শুনিয়া কবির জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। বৈরাগ্যের অনাস্বাদিতপূর্ব্ব বিহ্বলতায় কবি তদ্দণ্ডেই তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইয়া পড়েন। কালচক্রের আবর্ত্তনে নানাদেশ পরিভ্রমণ করিতে করিতে তিনি চিত্রকূটে আগমন করেন এবং এই স্থানেই অলৌকিক সাধনার বলে নবদূর্ব্বাদলশ্যাম, নয়নাভিরাম রামচন্দ্রের সহিত কবির সাক্ষাৎলাভ

ঘটে। কিংবদন্তী আছে—এই অসম্ভাব্য সৌভাগ্য অর্জ্জনের অব্যবহিত পরেই অযোধ্যায় গিয়া তিনি স্বয়ং শিব কর্তৃক 'রামচরিতমানস' রচনা করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন।

রামচরিতমানস ও তাহার অমর স্রষ্টা তুলসীদাসের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে অদ্বৈতবাদী দণ্ডী সন্ন্যাসী মধুসূদন সরস্বতী মহাশয়ের শ্রদ্ধা মিশ্রিত মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য—

'আনন্দকাননে হ্যস্মিন্ জঙ্গমস্তুলসীতরুঃ
কবিতা মঞ্জরী যস্য রামভ্রমর-ভূষিতা।'

অর্থাৎ কাশীরূপ আনন্দকাননে ভ্রমণশীল যে তুলসীবৃক্ষ তাহা স্বয়ং তুলসীদাস, তাঁহার রামচরিতমানসের কবিতা হইল সেই তুলসীবৃক্ষের মঞ্জরী আর সেই মঞ্জরীতে শোভা পাইতেছেন রামরূপী ভ্রমর।

সমকালীন মোগল সম্রাট আকবর এবং তাঁহার রাজস্বসচিব তোডরমল্লও তুলসীদাসের ভক্তিমহিমার ডোরে বাঁধা পড়িয়াছিলেন।

রামচন্দ্র কে এবং আদৌ তাঁহার পার্থিব অস্তিত্ব ছিল কি না এ বিষয়ে তর্ক এবং সমালোচনার অন্ত নাই। "বিশ্বাসে মিলিয়ে বস্তু—তর্কে বহুদূর।" আলোচ্য প্রবন্ধে সে জটিল সমস্যা সমাধানে প্রবৃত্ত না হইয়া এই কথাই বলিব যে প্রাচীন মহাপুরুষদের প্রোথিত তত্ত্বকে লইয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে ভারতের কালজয়ী ঐতিহ্য। যুগে যুগে ধূলিমলিন পৃথিবীর চত্বরকে ভাস্বর এবং প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিতে আবির্ভূত হইয়াছেন যুগস্রষ্টা মহাপুরুষ। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,:

"কবি তব মনোভূমি রামের জনমস্থান
অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।
...তাই সত্য যা রচিবে তুমি
ঘটে যা—তা সব সত্য নহে"

বিশ্বকবির এই উক্তি আমাদের সমস্ত সংশয়-নিরসনে অগ্রদূত। ভক্তের মানস-উদ্ভূত অধ্যাত্ম-রূপটিই ঈশ্বর। তিনি রাম, আবার তিনিই কৃষ্ণ। অশান্তির দাবানলে বিশ্বজগৎ যখন বিদগ্ধ—দ্বন্দ্ব, দলাদলি, সাম্প্রদায়িকতার বিষে পৃথিবী যখন জর্জ্জরিত, সেই সঙ্কটমুহূর্ত্তে অসামান্য প্রতিভাশালী কবি বা লেখক লেখনীর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হাতে লইয়া অবতীর্ণ হন বিশ্বসমস্যা সমাধানের পটভূমিকায় সার্ব্বজনীন রামতত্ত্ব লইয়া নূতন সমাজ-গঠনের মাধ্যমে রামরাজ্যের উদার পরিকল্পনায় প্লাবিত করেন সমস্ত স্খলন-পতন, দোষ-ত্রুটি, হতাশা-নৈরাশ্য এবং দৈন্য-দুর্দশাকে।

"ভায় কুভায় অনখ আলসহু।
নাম জপত মঙ্গল দিসি দসহু॥
সুমিরি সো নাম রাম গুণগাথা।
করউ নাই রঘুনাথহি মাথা॥"

গোস্বামী তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' আমাদিগকে সন্ধান দিয়াছে সেই আদর্শের যাহা ভক্তের প্রেমাশ্রুবিধৌত যূথিকাশুভ্র অন্তরের অধ্যাত্ম-উপলব্ধির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। তুলসীদাসের রামচন্দ্র গুণাতীত, বিশ্বসুখদাতা, মঙ্গলবিধায়ক, 'মানসমোহন' এবং 'ভকতজীবন'। রামের চেয়ে নামের প্রাধান্যই তাঁহার অন্তর-বীণায় অনুরণিত। রামনামের মধুর রসে মজিয়া গিয়া তাঁহার লেখনী-নির্ঝরে নিঃসরিত হইয়াছে নামের বন্যা। রামের প্রেমে তুলসীদাসের রামনাম অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত হইয়াছে। এ প্রেম সাধারণের অনুভূতির গণ্ডী-বহির্ভূত। এ প্রেমে আবিলতা নাই, কলুষতা নাই, মালিন্যের লেশ নাই। এ প্রেমে মানুষকে তিল তিল করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত করিয়া দেবলোকে প্রতিষ্ঠা করে। এ অনুভূতি দেবতাকে প্রিয় এবং প্রিয়কে দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত করিবার স্পর্দ্ধা দান করে। এ প্রেমে সংশয় নাই, দ্বিধা নাই, অন্তর্দ্বন্দ্ব নাই। এই একেশ্বরবাদী, শাশ্বত, সার্ব্বজনীন এবং চিরন্তন প্রেমই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে তুলসীদাসের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' একতারাতে। তাই তুলসীদাস অমর। তাই তাঁহার 'রামচরিতমানস' যুগস্থিকারী এবং কালজয়ী।

ঝগড়া

শ্রীশচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

যাকে বলে আদায় কাঁচকলায়। সাপে আর নেউলের সম্বন্ধ। পাড়াপড়শীরা তিক্ত বিরক্ত। দু'টিতে রাত দিন ঝগড়া।

লক্ষ্মী ও সরস্বতী। একই পাড়ার বাসিন্দে। একই বস্তীতে থাকে। কেউ কাকে নিন্দে না করে জলটুকু পর্য্যন্ত স্পর্শ করে না। কেউ কারও ছায়া মাড়ায় না, দুটির বয়স অল্প, একজন রোগা, কালো, আর একজন মোটা ফর্সা। ওদের স্বামীরা একই কারখানায় কাজ করে। দুজনের একই ডিপার্টমেণ্ট। আবার দুজনের মাইনেও একই, এক সঙ্গে আপিসে যায়, আবার এক সঙ্গে আপিস থেকে আসে, হাসি ঠাট্টা করে। একটি বিড়ি দুজনে ভাগ করে খায়। এই সব মেয়েলী ঝগড়ার মধ্যে এরা নেই। এরা রাম ও লক্ষ্মণ। সকলেই বলে হরিহর আত্মা। অথচ, ভাব নেই শুধু লক্ষ্মী ও সরস্বতীর, কেউ জানে না তার কারণ, এ রহস্য ভেদ করা অসম্ভব।

দুজনের ঘর পাশাপাশি, এ-পাশের ঘরে থাকে লক্ষ্মী, ও-পাশের ঘরে থাকে সরস্বতী, দু'জনেই নিঃসন্তান। একেবারে—ঝাড়া হাত পা। তথাপি এদের ঝগড়া। কিন্তু, এই ঝগড়া বিবাদের মধ্যেও দু'জনের কাজের একটু মিল দেখা যায়, সন্ধ্যা হচ্ছে দেখে লক্ষ্মী ঘরে ধুনো দিল। সরস্বতীও তার দেখাদেখি ধুনো জ্বালাল নিজের ঘরে। লক্ষ্মী হয়ত, ঘর ঝাট দিয়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিল। সে সময় ঘরে বসে সরস্বতী অন্য কাজ করছিল। লক্ষ্মীকে গঙ্গাজল দিতে দেখে, তার আর সহ্য হ'ল না। সে কাজ ফেলে উঠে দাঁড়াল, ঘর ঝাট দিল, পরে গঙ্গাজল এনে ছিটিয়ে দিল এ-দিক ও-দিক। আড়চোখে লক্ষ্মী একবার দেখে নিয়ে মুখ বেঁকিয়ে হাসল, তারপর নিজের কাজে মন দিল।

দু'জনেই উৎসুক নয়নে চেয়ে থাকে, কে কি করে দেখবার জন্য, অথচ কেউ কারও নিকট ধরা দিতে চায় না, এই ভাবেই চলেছে ওদের দিন, মাস, বছর।

একদিন ভোরবেলায়, লক্ষ্মী স্নান করতে গিয়েছে ঘাটে। ওদিকের একটা ঘরে নূতন ভাড়াটে এসেছে। তার ছোট্ট মেয়েটি ঘর ঝাট দিয়ে, তার জঞ্জালগুলো ফেলে দিয়ে গেল লক্ষ্মীর দোরগোড়ায়। এ দিকে লক্ষ্মী স্নান করে এসে দেখল, তার দোরগোড়ায় কতকগুলো জঞ্জাল। একেই সে নোঙরা দেখতে পারে না, তার আবার তারই ঘরের নিকট। লক্ষ্মী গেল রেগে। সরস্বতী তখন কাপড় নিয়ে ঘাটে চলছিল, তার দিকে তাকিয়ে লক্ষ্মী চীৎকার করে উঠল, বলি, ও শতেকখাগী, ময়লা ফেলবার আর জায়গা পেলি নে। আমার দোরগোড়ায় কেন, লা। যত্ন করে নিজের ঘরে রেখে দিলি নে কেন?

সরস্বতীর যাওয়া আর হ'ল না। সে থমকিয়ে দাঁড়িয়ে গর্জ্জন করে উঠল, মর, মর, হতভাগী, আমি শতেকখাগী হব কেন, রে, যে ফেলেছে তাকে শোনা গিয়ে শুটকী। সরস্বতী লক্ষ্মীকে শুটকী বলেই ডাকে।

লক্ষ্মীও কম নয়। সেও ফোঁস করে উঠল। কি, আমি শুটকী? বলি ও মুটকী, ও ভুতনী। যত বড় মুখ নয় তোর তত বড় কথা। যাবে যাবে জিব খসে যাবে। বলি অত দেমাক ভাল নয়-রে, ভাল নয়।

সরস্বতীর স্বর এবার নীচু পর্দ্দায় নেমে এল, বলল, যা—যা, শকুনের শাপে গরু মরে না।

দেখিস—মরে কিনা। বলেই লক্ষ্মী রণে ভঙ্গ দিয়ে ঘরের ভিতর চলে গেল।

বস্তীর পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে ঘেঁটুবন। তারি এক ধারে একটা এঁদো পুকুর, পানা পড়ে পুকুরটা বুজে গিয়েছে। বস্তীর মেয়েরা পানা সরিয়ে একটু জায়গা করে ঘাট বানিয়ে নিয়েছে, এখানে মেয়েরা কাপড় কাচে, বাসন মাজে, কেউ বা গা-ও ধোয়। পুকুরের ও-পাশে একটু দূরেই চটকল, ঐ কারখানায় কাজ করে রাম ও লক্ষ্মণ।

বছরের শেষ মাস। সংক্রান্তি। দিনেরও শেষ। সূর্য্য সবে পশ্চিমে হেলে পড়েছে, তার ম্লান রশ্মি এসে পড়েছে এঁদো পুকুরের ঘাটে। সরস্বতী বসে বাসন মাজছিল। তার অনাবৃত ফর্সা পিঠের উপর ঘামের বিন্দু, তার উপর সূর্য্যের রশ্মি পড়ে মুক্তার মত জ্বল জ্বল করছে। ছোট ঘাট, একজন ভাল করে বসলে, আর একজন বসে কাজ করা কষ্টকর। জনশূন্য ঘাট, ঘাটের মাঝখানে বসে সরস্বতী আরাম করে বাসন মাজছে।

এমন সময়, এক গাদা কাপড় নিয়ে লক্ষ্মী এসে ঘাটের উপর দাঁড়াল। সরস্বতী তখনও বসে বাসন মাজছিল। লক্ষ্মী তীক্ষ্ণ নয়নে একবার সরস্বতীকে দেখে নিল, পর মুহূর্ত্তেই সে চেঁচিয়ে উঠল, বলি, ও নবাবের বউ, তোর কাজ কি আজ শেষ হবে না? সেই সাত সকালে এসে ঘাট আগলিয়ে বসে আছিস, বলি, ঘাট কি, তোর বাবার সম্পত্তি নাকি?

সরস্বতী একমনে কাজ করছিল। লক্ষ্মীর আগমন সে টের পায় নি। হঠাৎ আক্রমণে, সে হকচকিয়ে গেল। সে মুখ

ঘুরিয়ে, দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল, মুখ সামলিয়ে কথা বলবি, শুটকী, ছোটলোকের মেয়ে কোথাকার। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে শেখ নি?

ঘাটের উপর থেকে লক্ষ্মীর কর্কশ কণ্ঠ ভেসে এল। ইস, কত ভদ্রলোক জানা আছে, ভদ্রলোক যদি হবি, বাপ তুললি কেন?

সরস্বতী বলল, তুই ত আগে বাপ তুললি, শুটকী।

লক্ষ্মী বলল, ফের শুটকী। নিজে মুটকী বলে এত অহঙ্কার, থাকবে না, ওরে ও গতর থাকবে না, দেখে নিস।

মুটকী কথাটা শুনতে, সরস্বতী ভালবাসে, তাই নরম সুরে বলল, যা—যা, চেঁচাস নি। শকুনের শাপে গরু মরে না।

ঘাড় বেঁকিয়ে লক্ষ্মী বলল, দেখিস, শাপ ফলে কি না?

প্রতি উত্তরে, সরস্বতী কি যেন বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ ও-পারের চটকলের সিটি বেজে উঠল। শিফটের বদলীর সঙ্কেত। এক দল কাজে যাবে, আর এক দল ছুটি পাবে। এই পুকুর-পাড়ের দুই দিকে দুইটি সরু রাস্তা গিয়েছে। এখান থেকেই শ্রমিকরা যাবে আসবে। কেউ গাইবে, কেউ বা শিস দেবে, কেউ বা হাসি ঠাট্টা নিয়ে মশগুল হয়ে পথ চলবে। তাদের ঝগড়া যদি এরা শুনতে পায়, তবে এরা ভিড় জমিয়ে ফেলবে। কেউ কেউ দাঁত বের করে হাসবে। কেউ বা অশ্লীল ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে। একটা বিশ্রী কাণ্ড হবে। অতএব চুপ করে থাকাই ভাল। এর পরেই দেখা গেল, সরস্বতী ঘাটের দক্ষিণমুখো হয়ে বাসন মাজছে। আর লক্ষ্মী উত্তরমুখো হয়ে কাপড় কাচছে। দু'জনেই নীরব। দেখা গেল ওদিকে চটকল হতে সারি দিয়ে লোক চলে আসছে। শূন্য পথ-ঘাট এখন সজীব হয়ে উঠল।

বস্তীর লোকেরা একটু অবাক হয়ে উঠল, ব্যাপার কি! হঠাৎ বাড়ীটা এত শান্ত হ'ল কেন? লক্ষ্মী ও সরস্বতী এত সভ্য হ'ল কেমন করে? লক্ষ্মীর সে কর্কশ কণ্ঠ আর নেই, সে একেবারে মাটির মানুষ। সেই রাতদিন ঝগড়া আর নেই, কেমন যেন একটু থমথমে ভাব। ঘরের দরজার নিকট ময়লা দেখলেও লক্ষ্মী চুপ করে থাকে, কেমন যেন বিমর্ষ ভাব। খায় না, দায়না—দিনরাত শুয়ে থাকে, সময় সময় ওঠে বমি করে। ঘর এখন নোঙরা হয়েই থাকে, সন্ধ্যায় সে ঘরে ধূনা গঙ্গাজল দেয় না।

সরস্বতী বসে বসে সবই লক্ষ্য করে, আড়চোখে লক্ষ্মীর দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে টিপে হাসে, লক্ষ্মী দেখেও দেখে না, সে চুপ করেই থাকে, ঝগড়া করবার মতন শক্তি এখন ওর নেই।

ওপাশের ঘর হতে হিন্দুস্থানী বউটি বলল, লক্ষ্মীদির লেড়কা হবে। জান সরস্বতীদি, তাই খায় না, শুয়ে থাকে।

সরস্বতী বলল, জানি গো, জানি। এও এক রকম ঢং, লেড়কা আর কারও হয় না, এ হ'ল লোক দেখান। সকলকে জানাতে চায়, আমার লেড়কা হবে। শুটকীর লজ্জাও করে না—ছিঃ ছিঃ।

লক্ষ্মীর দুর্বলতা দিন দিন বেড়েই চলছে, শুকনো শরীর, আরও শুকনো হয়ে উঠল। এত বড় বস্তীতে এত ভাড়াটে, কেউ আসে না, খোঁজখবরও নেয় না, সকলেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, সকলেরই ঘরসংসার আছে, দেখবার সময় কোথায়?

লক্ষ্মীর ঘরদোর দেখে আগে লোকে হিংসে করত। বলত, তোমার ঘর কি পরিষ্কার দিদি। কোথাও নোংরা একটুও নেই। কিন্তু, আজ ঘরের কোণে কোণে জঞ্জাল। লক্ষ্মী আজকাল কোন দিন রান্না করে, কোন দিন শরীর মন খারাপ থাকলে রান্না করে না। লক্ষ্মণ এটা ওটা কিনে দেয় বটে, কিন্তু লক্ষ্মীর যা প্রয়োজন সেবা, শুশ্রূষা তা হচ্ছে না। লক্ষ্মণ কোন দিন ভাতে ভাত সিদ্ধ করে দেয়, কোন দিন দেয় না। পুরুষ মানুষ, কল-কারখানা আছে। বাইরেও কাজে যেতে হয় একটু একটু। ঘরে থাকা তাঁর পক্ষে সব সময় সম্ভব নয়।

সরস্বতী সবই দেখে তাকিয়ে তাকিয়ে। মুখে কিছু বলে না। সে-ও যেন লক্ষ্মীর অবস্থা দেখে কেমন হয়ে গেছে। হাঁটতে গেলে তার পা টলে পড়ে। কিছু খেলেই ওয়াক তুলে। কখন কখন ভড় ভড় করে বমি করে দেয়। দেখে দেখে নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে—আহা! বেচারী। কিন্তু চক্ষুলজ্জায় কিছু করতে পারে না।

লক্ষ্মী একদিন কলতলা থেকে এসে দেখল। তার ঘরদোর কে যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে। দেখে প্রথমে সে হকচকিয়ে উঠল। আজ এক মাসের উপর তার ঘর নোঙরা। ঘৃণা তার হচ্ছিল খুব। কিন্তু কে দেবে তার ঘর ঝাঁট দিয়ে, কাকে সে বলবে, কে কি বলবে। কাজ কি, তার চেয়ে থাক নোঙরা হয়ে। সুখের চেয়ে অশান্তিই তার ভাল। ঘরের অবস্থা দেখে, মনে মনে সে তৃপ্তি অনুভব করল। কিন্তু কে এই কাজ করল সে বুঝে উঠতে পারল না। এত বড় বস্তীতে কে এমন বান্ধবী আছে। ওকে না জানিয়ে ঘর পরিষ্কার করে দিয়ে চুপ চাপ চলে যাবে। লক্ষ্মী দোরগোড়ায় চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবছিল। সে সময় হিন্দুস্থানী বউটি সেখান থেকে যাচ্ছিল। মৃদু কণ্ঠে তাকে ডেকে লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করল, দিদি! আমার ঘরদোর কে পরিষ্কার করেছে বলতে পার?

হিন্দুস্থানী বউটি বলল, হামি ত কিছু বলতে পারবে না লক্ষ্মীদি। হামি রান্নাঘরে ছিলাম।

লক্ষ্মী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমি সবই বুঝি দিদি। আমি বোকা নই।

কা'কে তুমি সন্দেহ কর লক্ষ্মীদি?

এ বস্তীতে কে এমন সুহৃদ আছে ভাই যে, আমার জন্য খেটে মরবে? এ করেছে আমার শত্রু ওই মুটকী।

সরস্বতী কান খাড়া করেই ছিল। কথাটা কানে যেতেই সে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, বলল, মরণ আর কি? আমি যাব শুটকীর ঘর ঝাঁট দিতে। আমার গলায় দড়ি জোটে না গা!

হিন্দুস্থানী বউটি বলল, আহা! ঝগড়া কর না দিদি। ও রোগা মানুষ কি বলতে কি বলছে।

ও শুটকী, আমার নাম করল কেন ?

চুপ কর দিদি। লক্ষ্মীদি ভাল হয়ে যাক, তার পর যত পার ঝগড়া কর। বলে উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে হিন্দুস্থানী বউটি নিজের কাজে চলে গেল। লক্ষ্মী ও সরস্বতী যার যা ঘরে গিয়ে প্রবেশ করল।

লক্ষ্মীর মুখে ভীষণ অরুচি। কোন জিনিসই খেতে পারে না। সরস্বতী একদিন শুনিয়ে শুনিয়ে হিন্দুস্থানী বউকে বলল, জান দিদি। আমার বড় বোন যখন প্রথম পোয়াতী, তিনিও ঠিক শুটকীর মতন কিছু খেতে পারত না। কেবল দিনরাত ওয়াক, ওয়াক। শেষে কবরেজ এসে দেখে বললেন, ওকে কচি শশা, আর কাঁচা পেয়ারা এনে দাও। চিবুক। দেখবে মুখের অরুচি আর নেই। সত্যি বলছি দিদি। তোমাকে বলব কি দিদি, আমার বড় বোন ভাল হয়ে গেল। বলেই আড়চোখে একবার লক্ষ্মীর ঘরের দিকে তাকাল।

এর কিছুদিন পর। লক্ষ্মী ঘরে ঢুকেই চমকিয়ে উঠল। ঘরের ভিতর এক ডজন কচি শশা, আর কাঁচা পেয়ারা। হিন্দুস্থানী বউটিকে ডেকে লক্ষ্মী বলল, দেখে যাও দিদি। দেখে যাও, আমার শত্রুর কাণ্ড। এ সব রেখে দিয়ে চলে গেছে। আমি যেন কচি খুকী কিছু বুঝি নে। আমি সব বুঝি, হিন্দুস্থানী বউটি কথা শুনে মুচকী হাসল শুধু। এদিক-ওদিক তাকিয়ে শেষে বলল, চুপ কর, দিদি। আবার যদি সরস্বতীদি শুনতে পায় খ্যাচ খ্যাচ করবে। মুখে ত ওর লাগাম নেই। যা খুশী বললেই হ'ল।

লক্ষ্মীও আর কোন কথা না বলে নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে দিয়ে চুপ করে শুয়ে রইল।

লক্ষ্মীর প্রসববেদনা উপস্থিত। লক্ষ্মণ ঘরে নেই। ডিউটি দিতে কারখানায় চলে গেছে। লক্ষ্মী পড়ে পড়ে ছটফট করছে, আর ককিয়ে ককিয়ে কাঁদছে। খবর শুনে বস্তীর মেয়েরা ছুটে এল। সকলে একত্র হয়ে বসে বসে জটলা করছে। কিন্তু প্রতিকার করবার চেষ্টা নেই। "কেউ বলছে আহা! বেচারী, কেউ বলছে—আমার দিদি এমন হয়েছিল গো, শেষে হাসপাতালে দিতে হ'ল। কিন্তু সেখানে গিয়েও দিদি বাঁচল না। মরে গেল।"

এমন সময় ভিড় ঠেলে সরস্বতী এসে উপস্থিত হ'ল। তাকে আসতে দেখে অনেকেই পথ করে দিল। অনেকে আবার গা টেপা-টেপি করে হাসতে লাগল। সরস্বতী কাহারও দিকে তাকাল না। সোজা এসে লক্ষ্মীর মাথাটা নিজের কোলে নিয়ে বসল। হিন্দুস্থানী বউটা নিকটেই দাঁড়িয়েছিল। তাকেই উদ্দেশ করে বলল, দিদি একটু কাজ করে দাও ভাই। পাঁচুর মাকে গিয়ে বল যে আমি ডাকছি। বেশী দেরি কর না দিদি, যাও।

পাঁচুর মা, হ'ল, এ পাড়ার ধাত্রী। এ পাড়ার যত ডেলিভারি-

কেস হয়, পাঁচুর মা-ই করে। হিন্দুস্থানী বউটি তাকে ডাকতেই চলে গেল।

সরস্বতী আর একটি বউকে লক্ষ্য করে বলল, তোমার বাবুটিকে একবার কারখানায় পাঠাও দিদি। লক্ষ্মণ ঠাকুরপোকে খবর দিক। শেষে আর একটি মেয়েকে হুকুম দিল, যা ত বোন, আমার ঘরের উনুনের উপর গরম দুধের বাটিটা আছে নিয়ে আয়, মেয়েটি ছুটে চলে গিয়ে দুধ নিয়ে এসে সরস্বতীর হাতে দিল।

লক্ষ্মী জানত এ দুধ সরস্বতীর। প্রতিদিন তার একটু দুধ না হলে চলে না। তাই লক্ষ্মী ক্ষীণকণ্ঠে বাধা দিল, না না ও আমি খাব না।

সরস্বতী তাঁকে একটা ধমক দিয়ে বলল, ফের যদি মুখের উপর কথা বলবি শুটকী, সত্যি বলছি আমি চলে যাব। বলেই সস্নেহে লক্ষ্মীকে বসিয়ে দিয়ে একটু একটু করে গরম দুধ খাইয়ে দিল। শেষে দুঃখ করে পুনরায় বলল, ইস। শরীরে কিছু নেইরে শুটকী। শুকিয়ে একেবারে আমসি হয়ে গেছিস।

লক্ষ্মী বলল, আর খাব না দিদি।

সরস্বতী বলল, না না এটুকু খেয়ে নে ভাই। লক্ষ্মী আর প্রতিবাদ করল না। সে নিঃশব্দে দুধটুকু নিঃশেষ করে দিল।

রাত বারটায় লক্ষ্মী একটি কন্যারত্ন প্রসব করল। প্রসবের সময় খুব কষ্ট পেয়েছিল।

সরস্বতীর যত্নে ও পথ্যে লক্ষ্মী একদিন সুস্থ হয়ে উঠল। আবার সুরু হয় ঝগড়া। এবারের লক্ষ্য মেয়েটা। বলে, আহা কি মেয়েই হয়েছে—শুটকীর মেয়ে আর কি হবে? শুটকীর মেয়ে পেত্নী। বলি, ও গতরখাকী, মেয়েটার যত্ন করতে পারবিনি ত বিয়োলি কেন?

সরস্বতী এসে মেয়েটাকে স্নান করিয়ে জামা পরিয়ে চোখে কাজল দিয়ে চলে যায়।

সারারাত্রি মেয়েটা কাঁদে। সরস্বতীর ঘুম আসে না। বার বার এসে দরজায় ধাক্কা দেয়—আ মর হতচ্ছাড়ি! মেয়ে যে ককিয়ে মরে গেল! পালতে পারবি নে ত পেটে এনেছিলি কেন?

লক্ষ্মী শোনে। দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে থাকে।

ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য

শ্রীরবীন্দ্রনাথ দাস

ছোট গল্প বাংলা-সাহিত্যের সর্ব্বাপেক্ষা সহজতম শাখা হলেও ছোট গল্পের সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য নিয়ে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা বিশেষ চোখে পড়ে না। একজন বিখ্যাত ছোট গল্প লেখক ও অধ্যাপকের সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থ পাঠ করলেই এ কথার সত্যতা অনুভূত হবে। বর্তমান প্রবন্ধে ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য নিয়ে সামান্য আলোচনা করতে চেষ্টা করব।

ছোট গল্প বললে, সাধারণ ভাবে মনে করা হয় যে, যা ছোট এবং যা গল্প তাই ছোট গল্প, কিন্তু আকারে ছোট যে কোন কাহিনীকেই ছোট গল্প বলা যায় না। সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের মত ছোট গল্পেরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সর্বজন স্বীকৃত। সেই বৈশিষ্ট্যগুলি না থাকলে, আকারে ছোট হলেও কোন কাহিনী ছোট গল্প হয় না। এই বৈশিষ্ট্যগুলিই আমাদের আলোচ্য।

এক সময়ে যে বৈশিষ্ট্য না থাকলেও কোন রচনাকে ছোট গল্প বলা চলত, এখন সেই সব বৈশিষ্ট্য না থাকলে কোন রচনাকে ছোট গল্প বলা যায় না। তা সত্ত্বেও ছোট গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি মোটামুটি একই আছে। বরং বলা যায় যে, নূতন নূতন দু'য়েকটি লক্ষণ সমালোচকরা আবিষ্কার করেছেন যে সব লক্ষণ না থাকলে আজকের যুগে কোন রচনাকে সার্থক ছোট গল্প বলা হয় না। আমরা এখন সেই সব বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণগুলির আলোচনা করে ছোট গল্পের সংজ্ঞা নির্ণয় করবার চেষ্টা করব। Brander Matthews তাঁর Philosophy of Story-তে যে কথা বলেছেন :

"A true short story is something other and something more than a mere story which is short. A fine short story differs from the novel chiefly in its essential unity of impression. A short story has unity, as a novel cannot have it."

সে কথা সকলেরই জানা আছে। দেখা যায় যে, তিনি unity of impression-কেই ছোট গল্পের অপরিহার্য লক্ষণ বলে বর্ণনা করেছেন। Unity of impression-এর অর্থ ভাবের ঐক্য অর্থাৎ গল্পটি শেষ করার পর পাঠকের মনে একটি মাত্র ভাবই থাকবে বা গল্পের সমস্ত ঘটনা একটিমাত্র ভাবের সৃষ্টি করবে পাঠকের মনে। কাজেই পাঠকের মনে একটিমাত্র ভাব ফুটিয়ে তোলাই যেখানে উদ্দেশ্য সেখানে, বোঝাই যায় যে, গল্পের আয়তন খুব বেশী বড় করবার কোন প্রয়োজন হয় না। সেই কারণেই ছোট গল্প ছোট হয়—অর্থাৎ ছোট হওয়াটা বড় কথা নয়—বড় কথা হ'ল একটি-মাত্র ভাবের উদ্রেক করা। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁর 'সাহিত্য' পত্রিকায় বলেছিলেন, "বিচিত্র সুখ, দুঃখ, হর্ষ, বিষাদ, উত্থান, পতন, সংঘাতময় জীবনের একটা ছোট ঘটনাই অধিক প্রাধান্য পাইবার উপযোগী নাও হইতে পারে ; কিন্তু তাহাকে সেই প্রাধান্য দান করাই গল্প রচনার কৌশলের কার্য্য।" যেহেতু জীবনের একটা ছোট ঘটনাকেই সর্ব্বাধিক প্রাধান্য দেওয়াই গল্প রচনা কৌশলের কাজ, সেহেতুই ছোট গল্প ছোটই হয় কারণ একটা ছোট ঘটনা কত বেশী জায়গাই বা জুড়তে পারে। ওয়েবষ্টার ডিক্সনারী ও এনসাইক্লোপিডিয়া থেকে 'সাহিত্যে ছোট গল্প' গ্রন্থে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছোট গল্পের সঙ্গে উদ্ধৃত করেছেন, "A short story usually presenting the crisis of a single problem" এবং এর অনুবাদ করেছেন, "ছোট গল্পে একটি মাত্র সমস্যার সঙ্কট রূপ দেখানো হবে।" লক্ষ্য করবার বিষয়, একটি মাত্র সমস্যা অর্থাৎ অনেকগুলো সমস্যা নয়, দ্বিতীয়তঃ তার সঙ্কট রূপ, সমগ্র রূপ নয়। তাই আমরা দেখতে পাই, ছোট গল্প ছোট হয় বড় হয় না। অর্থাৎ ছোট গল্প আকারে বা আয়তনে ক্ষুদ্র হবে এবং সেই ক্ষুদ্র আকারের মধ্যে জীবনের কোন একটা খণ্ডাংশ উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হয়ে উঠবে। বহু পুরাতন Bull's eye lantern-এর সেই উপমার কথা সবাই জানেন। তার আলো যেমন চারিদিকের অন্ধকারের মধ্যে সামান্য একটু স্থানকে আলোকিত করে তোলে উজ্জ্বল ভাবে তেমনি ছোট গল্পও "নিজের বিশেষ বক্তব্যটি ছাড়া আর কিছুই বলবে না।" অর্থাৎ জীবনের বিশালতা থেকে একটি মাত্র ঘটনা বা একটি মাত্র মনোভাবকে নিয়ে তাকেই ফুটিয়ে তুলবে ছোট গল্প—সমস্ত জীবনের কথা সে বলবে না। যদিও নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, "বাংলা ছোট গল্প—সংক্ষিপ্ত সমালোচনা" গ্রন্থে বলেছেন, "অবশ্য গল্প লেখকের এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নাই, যে একটি মুহূর্তের ব্যাপার বা একটি মাত্র ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার কাহিনী রচনা করিতে হইবে। তাঁহারা একাধিক ঘটনার সাহায্য লইতে পারেন, কিন্তু গল্পের

আসল গুণ ইহার গঠন কৌশল ও রচনায়। যদি কেহ ক্ষুদ্র পরিবেশে সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে বহু কিছুর নিবিড় সন্নিবেশকে অত্যুজ্জ্বল পরিসমাপ্তির মধ্যে নিঃশেষ করিয়া দিতে পারেন তবে আর বেশী কি চাই? পাঠকগণ ইহার দিকে কেন আকৃষ্ট হইবেন না? সম্পূর্ণ জীবনের ঘটনাবলী ছোট গল্পের বিষয়বস্তু হইতে পারে না—এই মতবাদ তখন বাতিল হইয়া যাইবে। যদি কোন লেখক ছোট গল্পের সংক্ষিপ্ত পরিসরেই জীবনকে নানা দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতে পারেন, তবে আপত্তির কোন হেতু নাই, কিন্তু ভাবের ঐক্য সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে হইবে।" অর্থাৎ ঘটনা একই হউক বা একাধিকই হউক, আয়তন ক্ষুদ্রই হউক বা বিশালই হউক একান্ত অপরিহার্য লক্ষণ হ'ল উদ্দেশ্য ও ভাবের ঐক্য। এ দুটি বজায় থাকলেই গল্প ছোট গল্পই হয়—না থাকলে হয় না।

ছোট গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য ভাবের ঐক্য হলেও তার আরও বৈশিষ্ট্য আছে। বিশেষতঃ আধুনিক সমালোচকদের মতে ছোট গল্পে ভাবের ঐক্যের চেয়েও অধিকতর প্রয়োজনীয় হ'ল তার ইঙ্গিতধর্মিতা, বিবৃতিমূলকতা নয়। অর্থাৎ ভাবের ঐক্য বজায় রেখেও একটি কাহিনী কেবলমাত্র বিবৃত করলেই, আধুনিক বিচারে তাকে সার্থক ছোট গল্প বলা চলবে না। গল্প শেষ হবার পরেও পাঠককে সে নিয়ে ভাবতে হবে—পড়তে পড়তেও তাকে ভাবতে হবে, কারণ ছোট গল্পের লেখক সব কথা বিবৃতি করবেন না। তিনি কেবল ইঙ্গিত দিয়ে পাঠককে ভাবিয়ে তুলবেন। ছোট গল্পের যেখানে সুরু, পাঠকের ভাবনার সুরুও সেখানে কিন্তু ছোট গল্পের যেখানে শেষ, সেখানেই পাঠকের ভাবনার শেষ নয়। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষাযাপন' কবিতার সেই "অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে, শেষ হয়ে না হইল শেষ।" তাই ইঙ্গিত ধর্মিতাই ছোট গল্পের দ্বিতীয় প্রধান লক্ষণ।

কিন্তু এই ইঙ্গিত কিসের ইঙ্গিত? যেহেতু সাহিত্য জীবনকে নিয়ে তাই সেই ইঙ্গিতও হ'ল জীবনেরই কোন সত্য সম্বন্ধে ইঙ্গিত। তাহলে ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য এই দাঁড়াচ্ছে যে, ছোট গল্প একটি মাত্র ভাবকে প্রকাশ করবে, তার থাকবে একটি মাত্র বক্তব্য এবং এই ভাব, এই বক্তব্য লেখক তাঁর চারদিকের চার পাশের জীবন থেকে নেবেন। এই যে বক্তব্য বিষয় তার নির্বাচন এবং প্রকাশ লেখকের ব্যক্তিত্বকেও প্রকাশ করবে। অর্থাৎ যে ছোট গল্পে একটি মাত্র ভাব যথেষ্ট ইঙ্গিতময়তার মধ্য দিয়েও প্রকাশিত তাও ছোট গল্প নয়, যদি না সেই ভাব জীবনেরই অংশ না হয় এবং তা লেখকের বক্তব্যকে প্রকাশ না করে।

মোটামুটি আধুনিক ছোট গল্প বলতে আমরা এই সবগুলিকেই বুঝি। অর্থাৎ একমুখী জীবনসচেতন ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশক ভাবের ইঙ্গিতধর্মী বা ব্যঞ্জনাময় প্রকাশই ছোট গল্প।

অবশ্য এ হ'ল আধুনিক ছোট গল্পের আকৃতি বিচার মাত্র—যাকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন ছোট গল্পের কায়া পরিচিতি। আধুনিক ছোট গল্পের এ হ'ল অর্দ্ধেকটা পরিচয় অর্থাৎ তা কেমনভাবে লেখা হবে। কি কি লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য তার রচনাভঙ্গির মধ্যে থাকবে, এ তারই পরিচয়। কিন্তু ছোট গল্পকে ভাল করে বুঝতে গেলে জানতে হবে তার প্রকৃতিকেও। তার কায়ার সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মার সঙ্গেও পরিচয় করার দরকার।

আধুনিক সমালোচকরা ছোট গল্পের আত্মা বলতে বুঝেছেন তার প্রশ্নধর্মিতাকে। "ছোট গল্পের ধর্মই হ'ল তার প্রশ্নমূলকতা। সে যেন একটির পর একটি জিজ্ঞাসাকে নগ্ন-তীক্ষ্ণতার সঙ্গে জীবনের দিকে জুড়ে দিতে থাকে।"—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। জীবনের নানা দুঃখ-কষ্ট, হতাশা-নিরাশা, অত্যাচার, উৎপীড়ন, অবিচার, ব্যভিচার—কেন হয়, কেন হবে, এই তার প্রশ্ন। লেখকের চিন্তা বা উপলব্ধি ও সমাজের বিধানে যখন সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, ছোট গল্পের লেখক তখন সমাজের বিধানের সঙ্গতির দিকে, যাথার্থ্যের দিকে তুলে ধরেন তাঁর প্রশ্নকে। এই প্রশ্নধর্মিতা না থাকলে আধুনিক সমালোচকদের মতে, আধুনিক যুগের ছোট গল্পের আত্মাই থাকে না।

আধুনিক সমালোচকদের মতে এই হ'ল ছোট গল্পের স্বরূপ। কিন্তু ছোট গল্পের প্রশ্নধর্মিতাই তার আত্মা কিনা এ সম্বন্ধে তর্ক উঠতে পারে। যেমন তর্ক উঠতে পারে ছোট গল্প, লেখকের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করবে কিনা তাই নিয়ে। অবশ্য আমাদের বক্তব্য এ নয় যে, ছোট গল্প সমাজের বিধানের বিরুদ্ধে কোন প্রশ্ন তুলে ধরতে পারবে না অথবা ছোট গল্পে লেখকের সমাজ-পরিবেশ, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও চারিত্রিক গঠন প্রভৃতি নিয়ে যে ব্যক্তিত্ব তার প্রকাশ হতে পারবে না। হয় হোক, ক্ষতি নেই। কিন্তু হতেই হবে কিনা সে বিষয়ে আরও সাবধানে বিচার করা প্রয়োজন।

আমাদের মনে হয়, জীবনের কোন একটা খণ্ডাংশকে কিংবা মানুষের মনোজগতের একটা বিশেষ দিককে উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করে, সেই প্রকাশিতব্য ভাবটির একমুখী এবং ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ ঘটাতে পারলেই তা সার্থক ছোট গল্প হয়ে ওঠে—লেখকের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ না করলেও ক্ষতি নেই, ক্ষতি নেই সমাজের কাছে কোন প্রশ্ন উপস্থিত করতে না পারলেও। যেমন ছোট গল্প ছোট হয় কারণ সে একটিমাত্র ভাবকে প্রকাশ করে অর্থাৎ ছোট গল্পে একটি মাত্র ভাবের

প্রকাশই বড় কথা, আকারে ছোট হওয়াটা বড় কথা নয়। তেমনি জীবনের একটি ঘটনা বা মনোজগতের একটি দিককে ইঙ্গিতময় করে, বিশেষভাবে প্রকাশ করতে গেলে তা পাঠকের কাছে প্রশ্নের আকারে এসে উপস্থিত হতে পারে অর্থাৎ প্রশ্ন হয়ে ওঠাটাই বড় কথা নয়—বড় কথা জীবনের খণ্ডাংশ বা মনোজগতের একটি বিশেষ দিকের ব্যঞ্জনাময় এবং সার্থক চিত্রণ। এই ভাবেই বলা যায় যে, ব্যক্তিত্বের প্রকাশ লেখকের রচনায় হতে পারে অথবা হওয়া খুবই সম্ভব, তাঁর রচনায় তাঁর শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মানসিকতার পরিচয় প্রকাশ পাওয়া খুবই স্বাভাবিক কিন্তু যদি তা নাও হয় বা প্রকাশ নাও পায়, তা হলেও সেটা তত মারাত্মক অপরাধ নয়, যদি একটি মাত্র ভাবের ইঙ্গিতময় প্রকাশ সার্থকভাবে হয়ে থাকে।

অবশ্য এই প্রশ্নমূলকতা বা প্রশ্নধর্মিতা ছোট গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য-বা লক্ষণ না হলেও একে ছোট গল্পের আধুনিক লক্ষণ বলা যেতে পারে। ছোট গল্পের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, প্রথম যুগের ছোট গল্পে ভাবের একমুখীনতাও সর্বত্র রক্ষিত হ'ত না। তার পর ধীরে ধীরে ঐটাই হয়ে উঠল ছোট গল্প লেখকদের প্রধান লক্ষ্য। ধীরে ধীরে সামাজিক অবিচার আর অত্যাচারই যখন ছোট গল্প লেখকদের বর্ণিতব্য বিষয় হয়ে দাঁড়াল তখন ঐসব দিকেই লেখকেরা অঙ্গুলিসঙ্কেত করতে লাগলেন আর তার থেকেই ছোট গল্পের আধুনিক লক্ষণ প্রশ্নধর্মিতা আবির্ভূত হ'ল। এখন আবার ক্রমশঃ দেখা যাচ্ছে বিদেশী সাহিত্যের ছোটগল্পে প্রশ্নধর্মিতাও আর নেই। শুধু ব্যঞ্জনা দিয়ে শুধু ইঙ্গিত দিয়ে লেখকেরা প্রায় গীতি কবিতার ধরনে ছোট গল্প লিখছেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্য এতদুর অগ্রসর হয় নি বলেই আমরা এই শ্রেণীর ছোট গল্পের আলোচনা থেকে নিবৃত্ত থাকলাম। আসল কথা হ'ল এই যে, যুগে যুগে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো ছোট গল্পেরও বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণাদি পরিবর্তিত হয়েছে এবং হচ্ছে। কাজেই বিশেষ কোন ছোট গল্পকারের প্রতিভার পরিচয় আলোচনাকালে সেই বিশেষ যুগের আদর্শের কথা মনে রেখে বিচার করলেই সুবিচার হবার সম্ভাবনা।

বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের উৎপত্তি ও ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করলে ও পরের মন্তব্যের যাথার্থ্য অনুভূত হবে। ১২৮০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত শ্রীপূঃ (সম্ভবতঃ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতা) রচিত বাংলা ভাষায় প্রথম ছোট গল্প "মধুমতী" থেকে আরম্ভ করে আজকের অতি-আধুনিক ছোট গল্প-লেখকদের লেখা বিভিন্ন ছোট গল্প আলোচনা করলে আমরা এই দেখব যে, যেসব লেখক সামাজিক অত্যাচার আর উৎপীড়নকেই তাঁদের গল্পে বর্ণিতব্য বিষয় বলে ধরে নিয়েছেন, তাঁদের গল্পেই আমরা ছোট গল্পের আধুনিক লক্ষণ ঐ প্রশ্নধর্মিতাকে খুঁজে পাই। ব্যঞ্জনা বা ইঙ্গিত প্রায় সব উচ্চশ্রেণীর ছোট গল্পেই পাওয়া যাবে কিন্তু প্রশ্নধর্মিতা মোটেই সার্বজনীন লক্ষণ নয়। এমন কি রবীন্দ্রনাথের সব ছোট গল্পেই তা খুঁজে পাওয়া যাবে না। সামাজিক নিপীড়নের চিত্র তাঁর ছোট গল্পেও আছে, সেখানে তিনিও পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন সামাজিক বিধানের সঙ্গতির দিকে তাঁর জলন্ত প্রশ্ন কিন্তু যেখানে তিনি "ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দুঃখ-কথা নিতান্তই সহজ সরল" ফুটিয়ে তুলেছেন, সেখানে কোন প্রশ্ন নেই—সেখানে "নিতান্তই সহজ সরল" জীবনের কথা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু ধরা যাক, শরৎচন্দ্র, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় কি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের (আরও অনেক নামই করা যেতে পারে অবশ্য) কোন কোন ছোট গল্পের কথা। সেখানে জীবনের নানা সমস্যা, দুঃখ আর অত্যাচারের কথাই বর্ণিত তাই সেখানে নানা প্রশ্ন মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁদের লেখার মধ্যে। অর্থাৎ প্রশ্নধর্মিতা ছোট গল্পের অপরিহার্য্য বৈশিষ্ট্য নয়। লেখকের ব্যক্তিত্ব বা মানসিকতা-ভেদে তা ছোট গল্পে থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে কিন্তু সার্থক ছোট গল্পে ভাবের একমুখীনতা ও ইঙ্গিতময়তা থাকতেই হবে। এই সব কারণেই আমাদের মতে, ভাবের ঐক্য ও ইঙ্গিতময়তাই ছোট গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য বা অপরিহার্য্য লক্ষণ।



পুস্তক-পরিচয়

ঘরে-বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর—শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য ৫.৫০ টাকা।

বইখানি জীবনচরিত নয়। ঠিক জীবনস্মৃতিও বলা চলে না, কেননা জীবনস্মৃতিতে অনেক জনের স্মৃতিই বিধৃত থাকে। লেখক বলিতেছেন, "আমি ইতিহাস লিখতে বসি নি—এ আমার আত্ম-মুকুরে রামেন্দ্রদর্শন।...যাঁকে আমার জীবনপ্রভাতের সূর্য্যালোকে বন্দনা করেছি, তাঁকেই আজ জীবনের গোধূলি-আলোকে আরতি করে যাই।" ভূমিকায় লেখক স্মৃতিতর্পণ কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন, এ কথাটি গ্রন্থের কিছু পরিচয় প্রদান করে।

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী একাধারে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক এবং সাহিত্যিক। তাঁহার প্রকাশভঙ্গী অপূর্ব্ব। বিজ্ঞান ও দর্শনের দুরূহ তত্ত্বগুলি তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া পাঠকের নিকট সহজ, সুন্দর, সুবোধ্য এবং সরস হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গসাহিত্যে তিনি অমর। তিনি বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বলিতে প্রধানতঃ তাঁহার কথাই মনে আসে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান তাঁহার মধ্যে একত্রে মিলিত হইয়াছিল। বৈদিক প্রবন্ধগুলি তাঁহার ত্রিবেদী নাম সার্থক করিয়াছে। তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। এই পাণ্ডিত্যেই তাঁহার পরিচয় নয়। মানুষ হিসাবে তাঁহার তুলনা নাই। সংসারে এমন উদার, বন্ধুবৎসল, নিরহঙ্কার, আত্মপ্রচার-বিমুখ মনীষীর সাক্ষাৎ কদাচিৎ মেলে। তাঁহার সমস্ত ভাব ও কর্ম্মের মূল প্রেরণা ছিল স্বদেশপ্রেম। বিদ্যা ও বিনয়ের সহিত দেশাত্মবোধ মিলিত হইয়া তাঁহাকে খাঁটি ভারতীয়, খাঁটি বাঙালী করিয়াছিল। সাহিত্য পরিষদে অনুষ্ঠিত রামেন্দ্র-সম্বর্দ্ধনায় রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত অভিনন্দনপত্রে লিখিয়াছিলেন, "সর্ব্বজনপ্রিয় তুমি মাধুর্য্যধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।"

গ্রন্থকার রামেন্দ্র-স্মৃতিতর্পণের বিশেষভাবে অধিকারী। রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন সম্বন্ধে তাঁহার মাতামহ। তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণে এবং অভিভাবকত্বে শিক্ষালাভের আশায় পৌত্র ধীরেন্দ্রনারায়ণকে পিতামহ লালগোলার প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ—আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের নিকট পাঠাইয়া দেন। তখন তাঁহার বয়স আট-নয় বৎসর। আরো নয়-দশ বৎসর অর্থাৎ বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবনে লেখক তাঁহার কাছেই মানুষ হইয়াছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের নিকট তিনি পুত্রাধিক স্নেহ লাভ করিয়াছেন। ছেলেবেলায় লালগোলায় দামোদর নামে এক পশ্চিমা ভৃত্য রামেন্দ্রসুন্দর ও তৎপত্নী ইন্দুপ্রভা দেবীকে দেখাইয়া বলিত, এই তোমার নানা, ওই তোমার নানী। লেখক বলিতেছেন, "শেষ পর্য্যন্ত তাঁরা আমার কাছে ওই নামেই চালু হয়ে গিয়েছিলেন।" তিনি বলিতেছেন :

"তাঁর অসীম বিদ্যাবত্তা বোঝবার বয়স তখন হয় নি।...তাই সাধারণ বালকের ঝাপসা চোখে তাঁকে দেখেছি, তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি, একসঙ্গে খেয়েছি, শুয়েছি, খেলাধুলা করেছি—তার মধ্যে সেই অসাধারণকে খুঁজে পাওয়ার কোনও প্রয়াসই ছিল না।...এত কাছে পেয়েও যে বিরাটের সেই মহিমাকে বুঝতে পারি নি সেই দুঃখই আজ সব-কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে।"

রামেন্দ্রসুন্দরের বিশাল জ্ঞানের পরিধি পরিমাপ করিবার মত পণ্ডিত হয়ত বা পাওয়া যাইবে, কিন্তু ঘরোয়া রামেন্দ্রসুন্দরের পরিচয় দিবার মত লোক আর নাই। আমাদের সৌভাগ্য, লেখক তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির আলোচনা করিতে না গিয়া মানুষটিকে আঁকিয়াছেন। এইখানে গ্রন্থে উল্লিখিত রবীন্দ্রনাথের উক্তিটি মনে পড়ে। একবার কবির আগমন-সংবাদে রামেন্দ্রসুন্দর অনাবৃতগাত্রেই বাহিরে ছুটিয়া আসিয়াছেন, সে বিষয়ে খেয়ালই নাই। অনুচর সে কথা মনে করাইয়া দিলে তিনি মহা অপ্রস্তুত। রবীন্দ্রনাথ মৃদুহাস্য করিয়াই বলিলেন, "পোশাকী রামেন্দ্রসুন্দরকে আমরা দেখতে চাই না, আটপৌরে ত্রিবেদী মশাইকেই আমাদের ভাল লাগে।" আটপৌরে রামেন্দ্রসুন্দরকে দেখিতে পাই বলিয়া লেখকের রচনা এত সুখপাঠ্য হইয়াছে। তাঁহার মাতৃভক্তি, কন্যাদের প্রতি স্নেহ, স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা, সন্তানস্থানীয়দের সহিত প্রীতিস্নিগ্ধ ব্যবহার, তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান, দেশপ্রীতি, বন্ধুপ্রীতি গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাগুলি হইতে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন জ্ঞানতপস্বী, কাজেই সাংসারিক নির্লিপ্ততা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। সময়মত স্নানাহারের কথা তাঁহার মনে থাকিত না, ঘড়ি তাঁহার দুই ঘণ্টা আগাইয়া চলিত, নিজের দৌহিত্রীর বিবাহে ভবন যখন নানা উৎসবে মুখরিত তখনও তিনি পাঠনিমগ্ন। পাঠগৃহে তিনি জগৎ-সংসার সবই ভুলিয়া যাইতেন। নাতনীর বিবাহের সময়ের কথা। "রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর ফরাসে বসে কি একটা বিষয়ে পাতার পর পাতা লিখে চলেছেন। অন্দর থেকে দু-তিন বার স্ত্রী ইন্দুপ্রভার ডাক এসেছে।" ডাকে সাড়া নাই। "তবে এটা ত আর নূতন নয়। সারস্বতকুঞ্জের অধিবাসী রামেন্দ্রসুন্দরের সাংসারিক ঔদাসীন্যের প্রমাণ তিনি বহুবারই পেয়েছেন। আমায় জিজ্ঞেস করলেন, বাইরের ঘরে কেউ আছে কি-না। নাই জেনে নানী মুহূর্ত্ত কাল অপেক্ষা না করে ছুটে এসে মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করে বললেন—চোখ দুটিতে বিপুল অভিযোগ :

তোমায় কি কোন কালেই খুঁজে পাব না?—কলম থেমে গেল। চমকে উঠে অসহায় শিশুর মত চেয়ে রইলেন।" আর্থিক ঝঞ্ঝাটও তিনি পোহাইতে চাহিতেন না। "সংসার খরচের টাকা নানীর হাতে তুলে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত। আর কিছু টাকাকড়ি তাঁর হাত-বাক্সেই রাখতেন। সাহায্যপ্রার্থীর ত অভাব ছিল না। কিছু না দিয়ে যেন তিনি তৃপ্তি পেতেন না।" কিন্তু যেখানে তাঁহার দায়িত্ব সেখানে কোন ঔদাসীন্য ছিল না। নিম্নলিখিত কাহিনীটি তাঁহার চরিত্রের আর একটি দিক প্রকাশ করে।

রামেন্দ্রসুন্দর তখন অত্যন্ত অসুস্থ। মাথার যন্ত্রণায় ভুগিতেছেন। ডাক্তার প্রাতর্ভ্রমণের উপদেশ দিয়াছেন। "কথাটি আমার ঠাকুরদার কানে উঠতেই গঙ্গার ধারে বেড়াবার জন্য একটা গাড়ি তিনি নানার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।...রামেন্দ্রসুন্দর দেখেশুনে সদীর্ঘনিঃশ্বাসে বললেন, রাজা বাহাদুর আমার জন্যে পাঠিয়েছেন। দু-একবার চড়তে হবে বই কি। এতে মাঝে মাঝে খোকাকে নিয়ে সাহিত্য পরিষদ্ যাব। আমার ছ্যাকড়া গাড়িই ভাল, কি বল খোকা? তোমার কি ইচ্ছা, আমার সঙ্গে থাকবে, না ওই গাড়িতে উঠবে? প্রাণের আবেগে রামেন্দ্রসুন্দরের পা ছুঁয়ে বলে ফেললাম, জানই ত নান', তোমারই কথায় নিজের হাতে কাপড় কাচি, জুতোয় কালি বুরুশ করি, মাথায় আজ পর্য্যন্ত টেরি কাটা দূরে থাক্ কোনও গন্ধতেল মাখি না, জামায় আজ পর্য্যন্ত সেণ্ট পড়ে নি। সেই মানুষের ওই-সব জুড়ি গাড়িতে চড়া পোষায় কিনা, তুমিই বল না? নাঃ, ও-সব হবে না, তোমার সঙ্গে আমিও ছ্যাকড়া গাড়িতে যাব।...বয়সের তুলনায় আমি প্রবীণের মতই কথা বলতাম, এ অভ্যাসটা আমার এসেছিল নানার মত জ্ঞানবৃদ্ধ প্রবীণের সঙ্গে থাকতাম বলে।"

রামেন্দ্রসুন্দরের জন্ম ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯১৯ সনে মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে তিনি লোকান্তরগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর মধ্যেও একটা মাধুর্য্য, একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। "রবীন্দ্রনাথের উপাধিবর্জ্জনের সংবাদ পেয়েই রোগশয্যায় শায়িত রামেন্দ্রসুন্দর তাঁকে একবার শেষ কাছে পেতে চাইলেন। খবর পেয়েই কবিগুরু ছুটে এলেন তাঁর বাড়িতে।...রামেন্দ্রসুন্দর অনুরোধ করলেন, বড়লাটের কাছে লেখা চিঠি স্বয়ং আপনার মুখে একবার শুনতে চাই। তিনিও নীল কাগজে লেখা সেই পত্রটি বের করে দৃপ্তকণ্ঠে পড়ে শোনালেন। একটা গভীর পরিতৃপ্তি ফুটে উঠল ত্রিবেদী-তাপসের মুখে। সর্ব্বাঙ্গে তাঁর উৎসাহের আবেগ। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের শিখা বুঝি এমনি করেই জ্বলে ওঠে। কবিগুরু বিদায় নিলেন। এদিকে রামেন্দ্রসুন্দর তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। সে তন্দ্রা আর ভাঙল না।"

ধীরেন্দ্রনারায়ণ সুলেখক। শিকার-কাহিনী প্রভৃতি লিখিয়া তিনি লিপিকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। এখানি তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এমন আন্তরিকতাপূর্ণ রচনার সাক্ষাৎ সহজে মেলে না। গ্রন্থে মানুষ রামেন্দ্রসুন্দর জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দরের সংস্পর্শে আসিতে যাঁহাদের দেখিয়াছেন, দু-একটি রেখার টানে তাঁহাদের চিত্রও গ্রন্থকার স্পষ্টভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। রচনা চিত্তগ্রাহী। বলিবার ভঙ্গিটি চমৎকার। পড়িতে বসিলে বইখানি শেষ না করিয়া থাকা যায় না। 'ঘরে-বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর' বাঙালী পাঠকের নিকট সমাদরলাভ করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

পাতালপুরীর কাহিনী—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র। বিশ্বোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিঃ, ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য তিন টাকা।

বইখানি কিশোরদের জন্য লেখা। এর কাহিনীও প্রসাদ বলিয়া এক কিশোরকে লইয়া। পিতৃ-মাতৃহীন দুটি ছেলে-মেয়ে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হইয়া তাহার এক মাসীর শরণাপন্ন হইল। ছেলেটি লেখাপড়া করিবার সুযোগ পায় নাই, কিন্তু লেখাপড়া করিবার ঝোঁক আছে। মাসীর অবস্থা ভাল নয়। তাই মেসোকে বিব্রত না করিয়া বোনটিকে মাসীর কাছে রাখিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল। কিশোর-মনে এই যে স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা ইহাই তাহার জীবনে বিশেষ অধ্যায়। বড়লোকের নজরে পড়িয়া কাজ মিলিল বটে, কিন্তু সে কাজ তাহার পছন্দ হইল না। তাহার পড়িবার ইচ্ছা, কিন্তু সে সুযোগ পাইবে কোথায়? চোর-অপবাদে তাহার চাকরি গেল, সে প্রতিজ্ঞা করিল আর চাকরি করিবে না—স্বাধীনভাবে যা-হয় করিবে। এই সময় এক কাগজের হকারের সহিত তাহার ভাব হইল, সেই তাহাকে তাহার বস্তী বাড়িতে আশ্রয় দিল। এই অপাংক্তেয় বস্তী-জীবনের কাহিনীকেই বোধ হয় গ্রন্থকার পাতালপুরীর কাহিনী বলিয়াছেন। কাজের সুবিধা হইল না বলিয়া প্রসাদ এখান হইতেও চলিয়া গেল। ইহার পরই বইখানি আকস্মিক ভাবে শেষ হইয়াছে। প্রসাদ বাড়ী আসিয়া দেখিল মাসী মারা গিয়াছে, মেসোও বেশীদিন রহিলেন না। বোনটির বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সে একটি ছোট-খাট দোকান করিয়াছে। এবং দোকানে বসিয়া সে তাহার ছেলেটিকে পড়ায়। "তার আশা—জীবনে সে যা পেলু না তার ছেলেটি হয়ত তা পাবে!" আমরাও বলিব, আমাদের যাহা পাইবার ছিল তাহা পাইলাম না।

শিশু-সাহিত্যিক বলিয়া খগেনবাবুর নাম আছে। লিখিতে পারিলেই ছেলেদের বই লেখা যায় না। শিশুকাল বহু পশ্চাতে আমরা ফেলিয়া আসিয়াছি। সেদিনের মনকেও আর আমরা স্মরণে আনিতে পারি না। যিনি সেই মনটিকে ধরিয়া রাখিতে পারেন, তিনিই পারেন তাহাদের কথা গুছাইয়া বলিতে, তাহাদের মনের মত করিয়া বলা ইহা বড় সহজ কথা নহে। নিজেকে সেই অবস্থায় লইয়া যাইতে না পারিলে, একাত্ম হইতে না পারিলে শিশু-সাহিত্য লেখা যায় না। সেইজন্যই আমাদের দেশে সত্যিকার শিশু-সাহিত্য বড় বেশী গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। খগেনবাবু প্রবীণ হইলেও তিনি শিশুই রহিয়া গিয়াছেন। এইজন্যই তাঁহার

হাস্তে-মুখে শিশুর খেলা ভাল ফোটে। "পাতালপুরীর কাহিনী"র বৈশিষ্ট্য হইল এইখানেই। ভাষা সহজ সরল—নদীর বেগের মত তর তর করিয়া বহিয়া চলিয়া গিয়াছে, কোথাও বাধা পায় নাই। বইখানি ছেলেদের ভাল লাগিবে।

অনেক মনের পাপড়ি ছুঁয়ে—শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত। দীপালী গ্রন্থশালা। ১২৩।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬। মূল্য ১'২৫ নয়া পয়সা।

আলোচ্য বইখানি কবিতার বই। আকারে ছোট, কিন্তু কবিতাগুলি সুচিন্তিত। আধুনিক কবিদের মধ্যে দিলীপ দাশগুপ্তের নাম চিহ্নিত। নূতন কিছু করিবার উন্মাদনায় কবি নিজেকে কোন বন্ধনের মধ্যেই বাঁধিতে চাহেন নাই—এ পরিচয় তাঁহার প্রতিটি লেখার মধ্যেই সুপরিস্ফুট। কিন্তু এই নূতনের মোহই তাঁহাকে দিগ্বিদিকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইয়াছে। এইজন্যই তাঁহার অস্থির-চিত্ত কোথাও দানা বাঁধিতে পারে নাই।

"আমার এই শান্তি-পারাবত
অতুল-ঐশ্বর্য-খ্যাতি সুনাম অতিক্রম করে
উড়ে চলেছে নতুন দিক-দিশারি হয়ে।
হায়!...তবু আমরা কতটুকু
ক্ষুদ্র গণ্ডীর সংকীর্ণতার মোহে
গড়ছি প্রাচীর এবং প্রাসাদ!
আর ঐ উড়ে চলেছে আমার পারাবত
প্রান্তর থেকে প্রান্তরান্তরে।"

'এই নূতন দিক-দিশারি হইয়া উড়িয়া চলাই' তাঁহার প্রকৃতি। স্থিতপ্রাজ্ঞ হইতে পারিলে, কবির রচনা আরও বলিষ্ঠ হইতে পারিত। তথাপি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও কবির শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বইখানি সমাদৃত হইবে বলিয়া বিশ্বাস রাখি।

কুরুপাণ্ডব—শ্রীচারুচন্দ্র দাশ। জ্ঞানচক্র প্রকাশনী। ৩৪, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫। মূল্য ১'২৫ নয়া পয়সা।

আলোচ্য বইখানি সমগ্র মহাভারতের গল্পাংশ লইয়া শিশু-উপযোগী একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। ছোট ছোট কথায়, সরল করিয়া বলা সংযমের পরিচায়ক। লেখক সেই সংযমেরই পরিচয় দিয়াছেন আগাগোড়া। এই গল্পাংশ পড়িয়া শিশু-মনে মহাভারতের একটি ছাপ রহিয়া যাইবে। এই ছাপ দেওয়াই হইল আসল কাজ। আজকাল ছেলেরা রামায়ণ মহাভারত পড়ে না। এইরূপ সুখপাঠ্য গ্রন্থ পাইলে তাহাদের পড়িবার ঝোঁক হইবে। সুন্দর করিয়া গল্প বলার শক্তি লেখকের আছে। ছেলেদের কাছে এ বই আদর পাইবে।

শ্রীগৌতম সেন

গোপীচন্দ্রের গান—ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য, এম-এ, পি-এইচ-ডি কর্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। মূল্য দশ টাকা।

প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্ব হইতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মনীষী সাধারণ জনসমাজে প্রসিদ্ধ গোপীচন্দ্রের কাহিনীর বিভিন্ন বাংলা রূপ শিক্ষিত সমাজে প্রচার করিয়া আসিতেছেন। ৩৫।৩৬ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়ের সম্পাদকতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইহার তিনটি রূপ দুই খণ্ডে মনোজ্ঞ আকারে প্রকাশিত হইয়া বাংলার সাহিত্যিক সমাজের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনেক দিন যাবৎ ইহা অপ্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছিল। বস্তুতঃ এই কাহিনীর কোন সংস্করণই সুলভ ছিল না। বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের পূর্ব্ব প্রকাশিত সংস্করণটি এক খণ্ডে পুনঃ প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বর্ত্তমান সংস্করণে পূর্ব্ব সংস্করণের সামান্য কিছু কিছু অংশ অপ্রয়োজন বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে—কিছু অংশ পরিমার্জ্জিত হইয়াছে। নূতন সম্পাদক মহাশয় সংক্ষিপ্ত টীকা, শব্দার্থ সূচী ও একটি ভূমিকা সংযোজিত করিয়াছেন। ভূমিকায় নানা দিক হইতে গোপীচন্দ্রের গানের মূল্য নির্দ্ধারণের চেষ্টা করা হইয়াছে। গোপীচন্দ্র বিষয়ক প্রকাশিত অন্যান্য বাংলা রচনা'র তালিকায় কাহিনীর অপর যে সমস্ত সংস্করণের উল্লেখ আছে তাহাদের সহিত বর্ত্তমান সংস্করণের তুলনামূলক আলোচনা বাঞ্ছনীয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

ড্র্যাগনের নিঃশ্বাস—প্রেমেন্দ্র মিত্র: গ্রন্থম, কলিকাতা ৬: দাম ছয় টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

প্রেমেন্দ্রবাবুর সাহিত্যিক পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রোত্তর যুগে যে কয়জন মুষ্টিমেয় লেখক বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। সমালোচ্য পুস্তকে দুইখানি ছোট কিশোর উপন্যাস স্থানলাভ করিয়াছে। ড্র্যাগনের নিঃশ্বাস তাঁর বহু পূর্ব্বের লেখা—পিঁপড়ে পুরাণ নতুন সংযোজন। বিচিত্র পটভূমিকায় লিখিত উপন্যাস দুখানি শুধু যে কিশোরদের মনোরঞ্জন করিতে সক্ষম হইবে তাহা নয় বড়দেরও প্রচুর আনন্দের খোরাক যোগাইবে। প্রেমেনবাবুর অপূর্ব্ব ভাষা ও পরিবেশ সৃষ্টির এমন এক সম্মোহন শক্তি আছে যাহা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যায়।

জাতিস্মর কথা—শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু। দি ঘাটশীলা কোম্পানী, ৩ ম্যাঙ্গো লেন। কলিকাতা-১। দাম ৪'৭৫।

লেখক পরলোক এবং পুনর্জ্জন্ম বিশ্বাসী। বহু ঘটনা ও প্রমাণ সহ তাঁহার এই বিশ্বাসকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত



দেশ-বিদেশের কথা



আঁটপুর পল্লী উন্নয়ন প্রদর্শনী—১৯৬০

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী হুগলী জেলার আঁটপুর গ্রামে পশ্চিমবঙ্গ পল্লীমঙ্গল সমিতি কর্তৃক অনুষ্ঠিত পল্লী উন্নয়ন প্রদর্শনীর পুরস্কার-বিতরণ সভায় পল্লীমঙ্গল সমিতির সম্পাদক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁহার ভাষণে বলেন :

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা এবং বৈদেশিক শাসননীতির প্রভাবে একদিন গ্রামীণ জনসাধারণ দেশ ছাড়িয়া শহর অভিমুখে রওয়ানা হইয়া পড়ে ; শতাব্দীর পর শতাব্দী অবহেলা এবং অবজ্ঞায় গ্রামগুলি শ্মশান সদৃশ হইয়া যায়। কিন্তু গ্রাম লইয়াই ত সমগ্র দেশের সামগ্রিক রূপ। গ্রামের সমৃদ্ধিই দেশের সমৃদ্ধি। তাই বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলার সকল জননায়কই গ্রাম সংগঠনে ব্রতী হইতে আহ্বান জ্ঞাপন করেন। স্বাধীন হইবার পর সরকারী প্রচেষ্টাকে এইদিকে বহুলাংশে প্রসারিত করিলেও আজও শহরের শিল্পকেন্দ্রিক সমাজ জীবনের প্রতি সাধারণের আকর্ষণ। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গ্রামোন্নয়নের ব্যবস্থা না করিলে কৃষি-নির্ভর গ্রাম্য সমাজের প্রতি বর্ত্তমান অশ্রদ্ধা থাকিয়া যাইবেই। তাই আজ গ্রামের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি প্রয়োজন ; প্রাচীন এবং আধুনিক …ার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া পল্লীর উন্নয়নের আদর্শে এই প্রদর্শনী অনুপ্রাণিত। প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা ইহাকে একটি বাৎসরিক …ায় পরিণত করিবার পক্ষপাতি নন। কৃষক, মধ্যবিত্ত এবং …ী সকলেরই গ্রাম উন্নয়নের দায়িত্ব সমান। এই প্রদর্শনীর ক্ষুদ্র আয়োজনের মধ্যে সমাজের প্রতি স্তরের মানুষের বিভিন্ন প্রচেষ্টার একটা সাধারণ চিত্র পাওয়া যাইবে। হয়ত ইহার তুলনায় উন্নততর দ্রব্য অন্য প্রদর্শনীতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার পশ্চাতে যে উদ্দেশ্য, উৎসাহ নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায় আছে তাহার মূল্য অনেক। এ প্রদর্শনীতে যোগদানের প্রেরণা আজ গ্রামের সকল সম্প্রদায়ের সকল বয়সের মানুষের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কৃষিজাত দ্রব্যাদি কুটির-শিল্পের বিভিন্ন নমুনা যাহা এখানে প্রদর্শিত হইতেছে তাহার মধ্যে ইহার চিহ্ন বিদ্যমান।

আজকের সমাজতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থায় সরকার এবং জন-সাধারণের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক না থাকিলে কোন কল্যাণকর কার্য্য সম্পাদন সম্ভব নহে। এই প্রদর্শনীতে সরকারী এবং বেসরকারী প্রচেষ্টার সহাবস্থানের প্রয়োজনীয়তার নিদর্শনও আছে। সরকারী উন্নয়নমূলক এবং জাতিগঠনমূলক অনেক বিভাগই প্রদর্শনীতে ষ্টল খুলিয়া উন্নয়নের বিচিত্র দিকের অগ্রসর লাভের ব্যাপারটি সাধারণের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। যে সকল আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কৃষির ফলন বৃদ্ধি করিতেছে তাহার সহিত পরিচিত হইতেছে সুদূর এই পল্লীগ্রামের অধিবাসী।

গ্রামের উন্নয়ন অন্য সব কিছুর উন্নতির সহিত যে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত তাহা বুঝাইবার জন্য এই প্রদর্শনীর সঙ্গে পশু-প্রদর্শনী এবং দেশের ভবিষ্যৎ যাহাদের উপর সেই সকল শিশুদের উপর প্রয়োজনীয় নজর দিবার জন্য শিশুমঙ্গল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়া থাকে। স্বাস্থ্যবান শিশুকে পুরস্কার দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া প্রদর্শিত দ্রব্যের মধ্যে যাহাতে বৈচিত্র্য থাকে এবং তাহা মামুলী না হইয়া শিক্ষাপ্রদ হয়, সেই দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। আমাদের লক্ষ্য গতানুগতিক পদ্ধতি বর্জ্জন করিয়া নানান পরীক্ষার মধ্য দিয়া যাহাতে গ্রামের মানুষ তাহার জমির ফলন বৃদ্ধি করিয়া সমৃদ্ধিলাভ করে।

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার সন্নিহিত অঞ্চল হওয়ায় এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেবল সেচের জল, কৃষির ফলন বৃদ্ধিই নহে কুটির-শিল্পেরও উন্নয়নের সম্ভাবনা আছে। আমরা আশা করি আমাদের এই প্রদর্শনী সারা বৎসরের গ্রাম্য

মানুষের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার সহায়ক হইবে।

বড় আন্দুলিয়া লোকসেবা শিবির

প্রায় বার বছর পূর্ব্বে নদীয়ার বড় আন্দুলিয়া গ্রামে লোকসেবা শিবিরের উদ্বোধন হয়, অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য তিথিতে। উহার জন্মলগ্নে উপস্থিত ছিলেন খ্যাতনামা মৌলভী রেজাউল করিম এবং আচার্য্য সুধীরচন্দ্র লাহা। পথে পথে অর্থ এবং গৃহনির্ম্মাণের মালমসলা ভিক্ষা করিয়া কতিপয় কর্ম্মী একখানি বড় আটচালা গড়িয়া তুলেন। দুরতিক্রম্য নানা বাধাবিপত্তির ভিতর দিয়া শিবিরের লোকসেবার কার্য্য চলিতে থাকে। দিগন্ত যখন তমসাচ্ছন্ন তখন সম্বৎসর ধরিয়া লোকসেবা শিবির জনশিক্ষার ক্ষেত্রে যে সকল কাজে অগ্রণী হইয়াছেন তাহা প্রশংসার্হ। ঈশ্বরের করুণা সহসা সরকারী সাহায্যের মাধ্যমে নামিয়া আসিল। শিক্ষা বিভাগের জন-দরদী কর্ণধার ডাঃ ধীরেন্দ্রমোহন সেন কতকগুলি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান খুলিবার জন্য অর্থসাহায্য দান করিলেন। শূন্য প্রান্তর ছাত্রদের কলরবে আজ মুখর। নিম্ন বুনিয়াদি শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের কাজ ইতিমধ্যে সুরু হইয়া গিয়াছে। মহাবিদ্যালয়ের গৃহ, ছাত্রাবাস, গুরুপল্লী নির্ম্মাণের পথে। আঞ্চলিক লাইব্রেরীটি গ্রামে গ্রামে জ্ঞানের অমৃত পরিবেশন করিতেছে। নৈশ-বিদ্যালয়টিতে নানা বয়সের শিক্ষার্থীরা আসিয়া লেখাপড়া শিখিতেছে। বিদ্বজ্জনেরা আসিয়া মাঝে মাঝে নানা বিষয়ে ভাষণ দিয়া গ্রামবাসীদের প্রেরণা দিতেছেন। বার বৎসর পূর্ব্বে যাহা মুষ্টিমেয় আদর্শবাদীর স্বপ্ন ছিল আজ তাহা নানা কর্ম্মে পল্লবিত। নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শিবিরের সংলগ্ন এক খণ্ড জমিতে পরমহংসদেবের একটি মন্দির গড়িয়া উঠিতেছে—এ কথা না বলিলে বর্ণনা অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। বর্ত্তমান বৎসরে ২৫শে জানুয়ারী জুনিয়ার বেসিক্ ট্রেনিং কলেজ আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ২৬শে জানুয়ারী গণতন্ত্র দিবসে খ্যাতনামা লেখক শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় একটি সভায় স্বাধীনতার আন্দোলন সম্পর্কে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। ইহাতে তিনি জাতির দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন। সভাপতি রূপে শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় পঞ্চায়েত সম্পর্কে গান্ধীজীর ভাবনার বিশ্লেষণ করেন। ৩১শে জানুয়ারী মৌলভী রেজাউল করিম গান্ধীজীর স্মৃতিসভায় তাঁহার জীবন ও বাণী সম্পর্কে একটি মূল্যবান ভাষণ দেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিষ্ণুপুর শাখার দশম প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব

গত ১লা ফাল্গুন, ইং ১৪ই ফেব্রুয়ারী বিষ্ণুপুর উচ্চ বিদ্যালয় হলঘরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিষ্ণুপুর শাখার দশম প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন এবং পরিষৎ শাখার স্থায়ী সভাপতি শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ রায় সভাপতিত্ব করেন। সঙ্গীতাচার্য্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার পত্নীর উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। পরিষৎ শাখার সম্পাদক শ্রীমানিকলাল সিংহের কার্য্য-বিবরণী পাঠের পর পরিষৎ শাখার সংগ্রহশালায় সংরক্ষণের জন্য যাঁহারা প্রাচীন নিদর্শনাদি দান বা সংগ্রহ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে পরিষৎ শাখার পক্ষ হইতে প্রশংসা-পত্র প্রদান করা হয়। উল্লেখযোগ্য পুরাবস্তু সংগ্রহের জন্য শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুঁথির আবিষ্কর্ত্তা বসন্তরঞ্জনের নামানুসারে পরিষৎ শাখা যে পদক প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন উক্ত পদক এই সভায় স্থানীয় বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক শ্রীফণিভূষণ কর মহাশয়কে প্রদান করা হয়।

প্রধান অতিথির ভাষণে ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষৎ শাখার এই উদ্যমের প্রশংসা করেন এবং প্রতিষ্ঠানটির প্রতি সর্ব্বসাধারণের প্রশংসনীয় সহযোগিতার কথা উল্লেখ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। প্রাচীন শিল্প সংস্কৃতি ইত্যাদির নিদর্শন সংগ্রহ বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি মধ্যযুগীয় জীবনধারায় ভগবৎ-চেতনা ও শান্তির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, আধুনিক যুগ জ্ঞানে বিজ্ঞানে অনেক উন্নতি লাভ করিলেও ভগবৎ-ভক্তি জাতীয় কোন বিষয় কেন্দ্রীয় চেতনার অভাবে নানা দিকে বিপর্য্যস্ত। প্রাচীন মধ্যযুগের লোকের সাহিত্য-প্রীতিও ছিল প্রচুর তাহার প্রমাণ পুঁথি ইত্যাদি প্রাচীন নিদর্শন নিম্নশ্রেণীর লোকের নিকটেই বেশী পাওয়া যায়। বরং সেই দিক দিয়া বর্ত্তমানকালে শিক্ষা-সংস্কৃতির সহিত সাধারণ মানুষের কোন যোগ নাই বলিলেই চলে। নানা বিভেদের মধ্যে আধুনিককালে শিক্ষিতে অশিক্ষিতে এই আর এক বিভেদ। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সেই সমস্ত লুপ্তকৃতি উদ্ধার করিয়া জাতির জীবনধারার মূলসূত্রটি আবিষ্কার করা পরিষদের মহান দায়িত্ব। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আরও বলেন যে, শিল্প-সংস্কৃতিতে আঞ্চলিকতার ছাপ পড়ে। সেই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে জাতির সজীবতা প্রমাণিত হয়। আধুনিককালে সমস্ত কিছু কলিকাতা কেন্দ্রিক। ইহা অস্বাস্থ্যের লক্ষণ। বিষ্ণুপুর একদা প্রাচীন সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। শিল্প সংস্কৃতিতে বিষ্ণুপুরের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ছিল একদা। সেই বৈশিষ্ট্য পুনরুদ্ধারে মহান দায়িত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার মনোজ্ঞ ভাষণের উপসংহার করেন।

প্রধান অতিথির ভাষণের পর শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ রায় সভাপতির ভাষণ দান করেন। পরিষৎ শাখার পক্ষ হইতে ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি মানপত্র দেওয়া হয়। শ্রীগুরুপ্রসাদ সরকারের উদ্বোধন সঙ্গীতের পর সভার কার্য্য শেষ হয়। স্থানীয় রামানন্দ কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপক মণ্ডলীর অনুরোধে তিনি পরদিন কলেজে বক্তৃতা করেন।

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

'প্রবাসী' মাসিক সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকার ও অন্যান্য বিশেষ বিবরণ প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ তারিখের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিতব্য :—

ফর্ম নং ৪
(রুল নং ৮ দ্রষ্টব্য)

১।	প্রকাশিত হওয়ার স্থান—	কলিকাতা (পশ্চিমবঙ্গ)
২।	কিভাবে প্রকাশিত হয়—	প্রতি মাসে একবার
৩।	মুদ্রাকরের নাম—	শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস
	জাতি	ভারতীয়
	ঠিকানা	১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯
৪।	প্রকাশকের নাম	
	জাতি	
	ঠিকানা	
৫।	সম্পাদকের নাম	শ্রীকেদার[illegible]
	জাতি	ভারতীয়
	ঠিকানা	১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯
৬।	(ক) পত্রিকার স্বত্বাধিকারীর নাম	প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
	ঠিকানা	১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯
	এবং	
	(খ) সর্বমোট মূলধনের শতকরা এক টাকার অধিক অংশের অধিকারীদের নাম-ঠিকানা—	১। শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯
		২। মিসেস্ অরুন্ধতী চট্টোপাধ্যায়, ১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯
		৩। মিস্ রমা চট্টোপাধ্যায়, ১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯
		৪। মিসেস্ সুনন্দা দাস, ১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯
		৫। মিসেস্ ঈপ্সিতা দত্ত, ১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯
		৬। মিসেস্ নন্দিতা সেন, ১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯
		৭। অশোক চট্টোপাধ্যায়, ১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯
		৮। মিসেস্ কমলা চট্টোপাধ্যায়, ১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯
		৯। মিস্ রত্না চট্টোপাধ্যায়, ১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯
		১০। মিস্ অলোকানন্দা চট্টোপাধ্যায়, ১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯
		১১। মিসেস্ লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়, ১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

আমি, প্রবাসী মাসিক সংবাদপত্রের প্রকাশক, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরি-লিখিত সব বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

প্রকাশকের সহি—স্বাঃ শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস

তারিখ—১৫।৩।১৯৬০ ইং

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

সচিত্র আরব্য উপন্যাস

(যন্ত্রস্থ)



কাশীদাসী মহাভারত

(যন্ত্রস্থ)